জীবনানন্দ দাশ

উপন্যাস সমগ্র

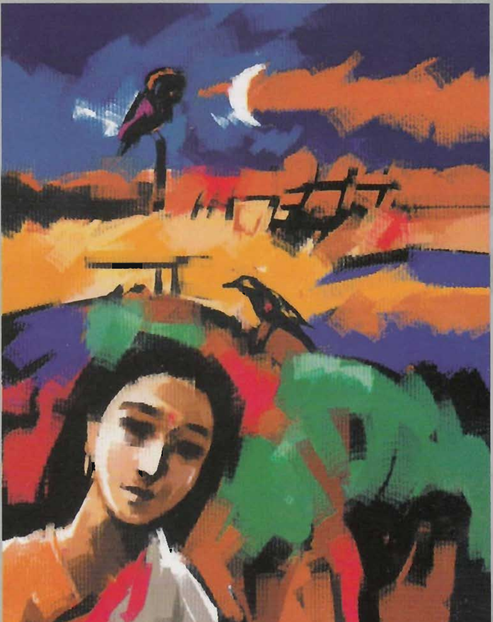

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশ

উপন্যাস সমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪) আজো প্রধান আধুনিক কবি হিসেবে পরিচিত। তিনি বাংলাভাষার অন্যতম পাঠকপ্রিয় কবি। তাঁর আধুনিক কাব্যভাষা আজো আধুনিকতম। তাঁর কবিতার প্রতি পাঠকের এমন নিবিড় সম্পর্ক যে তাঁকে কবি ছাড়া অন্যকিছু ভাবনায় আনা সম্ভব ছিল না।

একজন কবি যে বলিষ্ঠ গদ্যলেখকও হতে পারেন তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন জীবনানন্দ। এখনো তিনি সম্পূর্ণরূপে অনাবিষ্কৃত গদ্যলেখক। তাঁর গল্প উপন্যাস অনেককাল পরে একে একে প্রকাশিত হচ্ছে।

জীবনানন্দ যখন সশরীরে জীবিত ছিলেন তখন তাঁর গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি বললেই চলে। তিনি আমৃত্যু তাঁর গদ্য লেখা সম্ভবত লুকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি কি ভেবেছিলেন তাঁর গদ্য প্রকাশযোগ্য নয়, নাকি তাঁর গদ্যে এমনকিছু বাস্তববোধ ব্যক্তিগত জীবন ছিল যা তিনি প্রকাশে অপারগ ছিলেন। এ-সব এখন দীর্ঘ গবেষণার বিষয়।

জীবনানন্দ দাশের গদ্য কবিতা থেকে অনেক দূরের নয়, কবিতার অন্তর্নির্যাস তাঁর গদ্যেও বর্তমান। ব্যক্তিক প্রেম-উপলব্ধি, লৌকিক সমাজচেতনা, এবং সর্বোপরি প্রকৃতিআশ্রয় তিনি গদ্যেও নিয়েছেন। মানবের শুভ ও সুন্দরের সৌরচেতনা তাঁর কবিতাতেও যেমন ছিল। যেমন আছে তাঁর প্রেম কবিতায় :

ইতিহাসের অন্ধকারে প্রথম শিশু মানুষ জাগিয়ে
চলছে আজো একটি সূর্য হঠাৎ হারিয়ে ফেলার ভয়ে;
হয়তো মানুষ নিজেই স্বাধীন অথবা তার
দায়ভাগিনী তুমি;
ওরা আসে, লীন হয়ে যায়; হে মহাপৃথিবী
সূর্যকরোজ্জ্বল মানুষের প্রেম-চেতনার ভূমি।

১৯৪৬ সালে একটি চিঠিতে জীবনানন্দ তাঁর অন্তরের গভীরের একটা খবর দিয়েছেন, ছেলেবেলা থেকেই স্বদেশী-বিদেশী গল্প উপন্যাস তিনি নেহাৎ কম পড়েননি এবং তাঁর 'ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচেনি।' এ ইচ্ছার নেপথ্যের কথা নেপথ্যেই ছিল তখন, আরো বহু কাল গোপন ছিল।

১৯৫০ সালে 'আজকের বাংলা উপন্যাস' নিয়ে জীবনানন্দ প্রবন্ধ লিখেছেন, অর্থকষ্ট কাটাতে স্বয়ং ছদ্মনামে উপন্যাস লেখার প্রস্তাব করেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে, শোনা যায় 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদককেও, অজিত দত্তের নবপ্রতিষ্ঠিত দিগন্ত পাবলিশার্সের আনুকূল্য চেয়েছেন পূর্ণাকার উপন্যাস ছাপাতে—কোনো এক জায়গাতে ইচ্ছেটা পূরণ হলেও হয়তো তখনই অবরোধ ভেঙে ভরা নদী বয়ে উঠত কথা সরিতের, না-হওয়ার ফলে কবিতাতেই যে শতাংশ অনন্যমনা হয়ে থাকলেন তাও বলা যায় না। সে-সময়ে তাঁর আরো একাধিক উপন্যাস সম্বন্ধে খসড়া লেখা পড়ে আজ দেখতে পাওয়া যায় সাহিত্যের উপকরণ-বিনিয়োগ, তার অন্তর্গত বয়ন-বিন্যাস নিয়ে তাঁর রীতিমতো মতামত এবং আদর্শেরও কথা—এতোটাই ঘনিষ্ঠভাবে বলা যে কেবল প্রতিবেদন নয়, সক্রিয় লেখকের কথা বলে মনে হয়। আর এই সূত্রে ১৯৩৮ সালে বরিশাল সাহিত্যপরিষদে শরৎচন্দ্রের শোকসভায় পড়া লেখাটিকেও পাঠকের শোকাঞ্জলি বলে দূরে রাখা যায় না। বিশেষত অক্টোবর ১৯৩১ থেকে মে ১৯৩৩-এর এবং ১৯৩৬-এর সারা বছর ধরে খাতায় খাতায় তোলা তাঁর বহুতর সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির বাইরেও ব্যক্তিগত সংগ্রহের আরো আরো খণ্ডিত বিস্তৃততর গল্প-কাহিনীর তথ্য ক্রমাগত পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। এবং কিছু কিছু প্রকাশিতও হয়েছিল।

জীবনানন্দ দাশ ১৯৩৮ সালে তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'ভারতী'-গোষ্ঠীর প্রবল বিদেশীয়ানার হাওয়ায় [illegible] বঙ্কিম, রবীন্দ্র[illegible] শরৎচন্দ্র 'বাংলার মৃত্তিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তান হিসেবে, মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর নয়, বাংলার হেয় অবজ্ঞেয় নরনারী তাঁর কবিদৃষ্টি ও মমত্বের ভিতর নতুন জন্ম নিয়ে দীপ্তিমান হয়ে উঠল depth of intimacyর সূত্রে —যতখানি 'প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠত' বঙ্কিম-রবীন্দ্রের মধ্যেও আমরা পাই না, এবং ডিকেন্স বা বালজাকের ইতিহাস-সূত্র যেন এখানে শরৎচন্দ্র —তার প্রভাব বা প্রভাব-এড়ানোর চেষ্টা তাঁর ত্রিশ-পর্বের জিন কথা সাহিত্যে কতদূর মিলবে বলা কঠিন। 'আজকের বাংলা উপন্যাস' লেখায় অবক্ষয়িত সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং অস্থিরতা-অনিরাপত্তার বিশ্বব্যাপী পটভূমিতে স্থাপন ক'রে তিনি বিচার করেছেন সতীর্থ সমকালীনদের —বিশেষ তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা —রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের স্বর্ণপ্রসূ রচনার পরে কারও লেখাতেই তেমন নতুন বিকাশ তিনি দেখতে পাননি। চেষ্টা আছে কিন্তু প্রাপ্তি নেই, আজকের অভিজ্ঞতার প্রসার, নতুন থীম-স্টাইল ম্যানারের লেখা নেই। উপরকণব্যাপ্তি শিল্পবস্তুতে রূপান্তর করার দক্ষতা নেই তারাশঙ্করের, উচ্চ কল্পনাশক্তি সত্ত্বেও বিভূতিভূষণ সেন্টিমেন্টাল এবং আত্মনুবর্তনময়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যে চলেন, ডেকাডেন্ট রীতিকুশলীর আত্যন্তিক মনস্তত্ত্বপ্রীতিও গণ্ডি ভেঙে বাড়তে পারেনি তেমন এবং 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ভালো গল্প কিন্তু তার বেশি নয়, দ্বিতীয় পাঠেই তার ধার মরে যায়। অপিচ, জীবনানন্দ লক্ষ করেছেন ফলদ রূপে ভাঙবার মতো কোনো প্রুস্ত বা জয়েসের জন্ম হয়নি বাংলায়। প্রুস্ত বা জয়েসের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত টান কতদূর বলা যায় না (লরেন্স, ফর্স্টর, সার্ত্রকেও তিনি অবধানযোগ্য আধুনিক বলে গণনা করতেন), হেনরি জেম্‌স্ বা রবীন্দ্রনাথ বা টমাস মানের ধ্রুপদী ধরনটির উপরে নিশ্চয় ছিল।

জীবনানন্দের প্রিয় ছিল টমাস মানের উপন্যাস। ১৯৪৯ সালে 'ডক্টর ফস্টাসে'র আলোচনা-সূত্রে জীবনানন্দ লিখেছেন, 'প্রায় কুড়ি রছর আগে 'বুরেনব্রুকস্' প'ড়ে মানের ওপর আমার শ্রদ্ধা জন্মাল, পরে "আর্লি সরোজ", কয়েকটি ছোটো গল্প ও "ম্যাজিক মাউন্টেন" পড়াবার সুযোগ পেয়ে বুঝতে পারলাম এ-ধরনের একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক—হায়, আজকের আমেরিকা ও ইউরোপে কত কম্, জার্মানীতে তো নেইই—ঔপন্যাসিককের ওপর শ্রদ্ধা—আমার অন্ততঃ—কিছুতেই আর ঘোচবার নয়। "জোসেফ এ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স" ও "ডক্টর ফস্টাস" পুরোনো ইহুদীস্থান মিশর ও মধ্যযুগের জার্মান জীবনের প্রতীকীয়তার আড়ালে আজকের ক্লান্ত নষ্ট সভ্যতার ও সময়ের নিহিত ও অতীত চেতনা সমাহিতি মুমুক্ষার উপন্যাস সব; এ যুগ কি এর চেয়ে বড়ো উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে? মানের এই বহুগুলোর সমগভীর সমবিস্তীর্ণ পটের উপন্যাস কোথায়?'

জীবনানন্দ টমাস মানের তুলনা পশ্চিমেও দেখতে পাননি এবং ১৯২৮ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে অনূদিত মানের উপন্যাসগুলি যেন ধারাবাহিকভাবেই লক্ষ্যস্থলে রেখেছেন, হয়তো আরো সকারণে। রিল্‌কে অথবা গট্‌ফ্রিড বেনের কবিতা সম্বন্ধে অপরিচয়ের কৈফিয়ত দিয়ে মানের উপন্যাসমালার এমন সোচ্চার উল্লেখ বা বর্ণনার এক কারণ হতে পারে 'ডেথ ইন ভেনিস' বা 'ট্রিস্‌টানে'র শুদ্ধ লেখকের পর্যায়ক্রম সামাজিক-রাজনীতিক সঞ্চার সম্বন্ধে ব্যক্ত অনুমোদন তাঁকেও একটা বিশ্বাসের সূত্র যুগিয়েছে। উত্তর দিনে সামাজিক-রাজনৈতিক এলাকাকে লেখার ক্ষেত্রে টমাস মান অন্তর্গত সত্তা বা চিৎবিশ্বের তুলনায় উপেক্ষণীয় বা নিম্নস্থানীয় গণ্য করেন নি। 'ডক্টর ফস্টাসে'র আলোচনাতেও জীবনানন্দ বলেছেন, 'টমাস মান... চারদিককার সূচনা সমাপ্তি কারণ ও হেতুর...যথার্থ্যকে ধরতে চেয়েছেন', সে শোকাবহ বা ভয়াবহ যাই হোক। আন্তর্জাতিক বিশ্বের আশ্চর্য চলৎপ্রতিভাময়ী পটভূমি' কিংবা 'রাষ্ট্রকর্মের বৃত্তান্তে আবেগ ও মনননভূমির' সন্ধান জীবনানন্দের উত্তরপর্বের কবিতায় যেভাবে ক্ষুভিত ছায়াপাত করেছে, শুদ্ধ কবিতা স্থলে সমাজচেতন কবিতা নিয়ে যেভাবে তাঁর সংবেদনা দেখতে পাই তাতে তাঁরও এই চিত্তলক্ষণ ফুটে ওঠে।

আজ এক বড়ো বিস্ময়ের ব্যাপার, সবচেয়ে বড়ো জিজ্ঞাসা জীবনানন্দ কখন কীভাবে লিখলেন তাঁর গভীরবোধের গল্প উপন্যাস? অমলেন্দু বসু তাঁর প্রথম ছাপা উপন্যাসখানির ভূমিকা লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন, শেষ পর্যায়ের কবিতায় কবি 'ধূসর স্বপ্নের দেশ ছেড়ে চলেছিলেন দিনের উজ্জ্বল পথে, আর সেই পথে চলতে গিয়ে আপন আবেগ জড়ানো নিভৃত চিত্তের বাইরে যে অগণিত নর-নারীর বাত্যাহত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিত্ব; গণিকা দালাল রেস্ত শত্রুর যে সনির্বন্ধতা... হয়তো হয়তো তিনি অনুভব করেছিলেন যে সেই বস্তুনিষ্ঠ সময়চেতন বহির্জগতের অন্তত আংশিক প্রকাশ কথাসাহিত্যে সম্ভব এবং সেজন্যই তাঁর অভিজ্ঞতা ও চেতনা থেকে উৎসারিত নরনারীর কাহিনী রচনায় হাত দিয়েছিলেন।' পাণ্ডুলিপির তথ্যোদ্ঘাটনের পরে দেখা গেছে শেষপর্যায়ে নয়, বস্তুত প্রথমাবধিই স্বপ্ন আর বাস্তবের বৈপরীত্যের মাঝখানে কবির বাস, 'বনলতা সেন'—'মহাপৃথিবী'র শীর্ষ কবিতা-পর্বেই কথাসাহিত্যের ধূলিলিপ্ত দিনযাত্রা তিনি স্বেচ্ছায় আগ্রহ করে নিয়েছেন।

জীবনানন্দ দাশের একটি গল্পের ভূমিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন, 'তিরিশের দশকের যে-সময়ে 'ছায়ানট' গল্পটি লেখা, 'রচনায় সে কালের ছাপটুকু থাকলেই যথেষ্ট হত, কিন্তু—সেই বলিষ্ঠ অন্বেষণের যুগের বিচারেও বিষয় ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে গল্পটি অভিনব ও দুঃসাহিক।'

জীবনানন্দের তিনটি গল্প প্রকাশের পর প্রকাশিত হয় 'মাল্যবান' উপন্যাস (১৩৮০)। উপন্যাসের ভূমিকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে—'নতুন যুগের ভাব ও চিন্তা প্রতিভা' ব্যক্ত করার উপায় স্বরূপে খণ্ড কবিতার সিদ্ধি ছেড়ে কবি অবশেষে পা বাড়িয়েছেন নতুন রাস্তায়, তার পরেই তাঁর এই প্রশ্ন ও নিরসন : 'কিন্তু নতুন পথে অগ্রসর যদি হলেনই, আরো অগ্রসর কেন হলেন না, কেনই বা এ সব রচনা নিজেই প্রকাশ করেননি? অগ্রসর হওয়ার সময় তাঁকে দেয়নি কালান্তক।'

মাল্যবান উপন্যাসটি প্রকাশের পরেও কেউ তেমন উদ্দীপ্ত হননি, অতএব বোঝা যায় নিজকালেও তিনি অগ্রসর হননি হতে পারেননি বলে, প্রতিষ্ঠিত লেখক-ব্যূহ ভেদ করে তা হওয়া সহজ হয়নি বলে। অন্তত কয়েকটি চেষ্টার সূত্র গোড়াতেই আমরা বলে নিয়েছি। অমলেন্দু বসু অতএব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'জীবনানন্দের এই উপন্যাসটিকে শেষ পর্যন্ত আমরা... তাঁর কাব্যশিল্পের সূত্রে অন্বিত করতে চাইব' এবং তার ফলে 'তাঁর কবিসত্তার অসংখ্য অভ্যন্তরীণ আভাস পাব' এখানে—শব্দ প্রয়োগে, বাক্‌বিধিতে, বর্ণনায়, সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, যদিও উপন্যাস হিসেবেও 'মাল্যবান' সুপ্রতিষ্ঠিত।

জীবনানন্দ তাঁর 'মাল্যাবান' উপন্যাসে যে জীবনবোধের ঘনিষ্ঠতা তুলে ধরেছেন তা বোধকরি সে-সময়ের সমালোচকের চোখে খটকা বাধিয়েছিল, তীব্র সত্য উপলব্ধি অনেকের পক্ষেই মেনে নেয়া সহজ ছিল না। জীবনচক্রের সীমিত পরিসরে চরিত্রায়ণ, কথোপকথন ও কাহিনীর গতিতে তার শিল্পশক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। সমকালীন কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে তার পাঠও কেউ রচনা করেননি। কিন্তু ১৩৮২ সালেই 'দেশ' ছাপতে শুরু করে 'মাল্যবানে'র আগে লেখা জীবনানন্দের প্রথম উপন্যাস 'সুতীর্থ'। ১৮ পৌষ ১৩৮২ সংখ্যায় তার সম্পাদকীয় অবতরণিকায় বর্ণিত আছে : 'কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ বলেছেন : "জীবনানন্দ দাশের প্রথম উপন্যাস "সুতীর্থ" ১৯৪৮-এর মে-জুন-এ লেখা, প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৭৬-এ, আরো বলেছেন, 'সুতীর্থ' উপন্যাসটি তিনি সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে এবং 'মাল্যবান' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক অমলেন্দু বসুকে পড়তে দিয়েছিলেন, তাঁরা দুজনেই উপন্যাসগুলি প্রকাশ করবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন।' 'মাল্যবানে'র প্রচ্ছদ আঁকার সূত্রে তার প্রুফ প'ড়ে সত্যজিৎ রায়ও জীবনানন্দের সমস্ত অপ্রকাশিত উপন্যাস প্রকাশের জন্য বারবার আমাকে অনুরোধ করেন।' সম্পাদকীয় বিবরণে 'দেশ' লেখেন : 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তে, দেশ বিভাগের পর জীবনানন্দ যেন অকস্মাৎ পরপর দুটি উপন্যাস রচনা করেন। প্রথম রচনাটি মে-জুন মাসে ১৯৪৮ সালেই লেখা হয়, নাম 'সুতির্থ'। দ্বিতীয়টিও জুন মাসে ওই একই সালে। দ্বিতীয়টির নাম 'মাল্যবান'। এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। বলাবাহুল্য, কবির প্রথম উপন্যাস 'সুতীর্থ' এতকাল আমাদের অগোচরে ছিল। সম্প্রতি তা 'দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে।' 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর গ্রন্থাগারে 'সুতীর্থ' প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩৮৪ সালে।

জীবনানন্দ দাশের তৃতীয় উপন্যাস 'জলপাইহাটি' যখন প্রকাশিত হল 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় ১৩৮৮-৮৯ সালে; জানা গেল, 'সুতীর্থের'ও আগের লেখা এটা, এর রচনা ১৯৪৮-এর এপ্রিলে-মে।

জীবনানন্দ দেশভাগের সময় কলকাতার ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোডের বাসাবাড়িতে উঠে এসে পরপর অন্তত চারটি উপন্যাস লিখেছেন ১৯৪৮ সালে। 'বাসমতীর উপাখ্যান' উপন্যাসের নাম লেখকের নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়া, 'প্রথম খাতাতেই সে-নাম স্পষ্টাক্ষরে লেখা। 'মাল্যবান'ও তার জীবনানন্দের দেয়া নাম। 'জলপাইহাটি' 'নামকরণ জীবনানন্দের নয়, তাঁর ভাই অশোকানন্দ দাশ পত্রিকায় প্রকাশের সময় এই নাম দিয়েছিলেন।

দেশ ছেড়ে এসে ১৯৪৮-এর একটা অব্যবস্থিত জীবনপর্বে এক দমে লেখা চারটি উপন্যাসের শ্রমাক্ত বিপুলায়তনে নতুন মুক্তির সন্ধান করছেন জীবনানন্দ, পঞ্চাশ ছোঁয়নি যখনও বয়স এবং কবিতায় শুদ্ধ সত্ত্বভাবকে হটিয়ে চারিদিকে ঘন হয়ে উঠেছে সৎসামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির চাপ। অতঃপর ক্রমান্বয়ে প্রবন্ধেই জীবনানন্দ উচ্চকিত করে তুলেছেন এই নিয়ে তাঁর গভীর মানস-দ্বন্দ্ব কিন্তু তার চেহারা অনেকটা বিতর্কিকার মতো। উপন্যাস লেখার ইচ্ছা শেষপর্যন্ত হয়তো তাঁর অবশিষ্ট ছিল কিনা সন্দেহ।

জীবনানন্দের এগারোটি উপন্যাস রচনার ক্রমানুক্রমসারে সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। বড়ো গল্প আখ্যাত দুটি লেখাও অন্তর্গত হল এখানেই। গবেষকদের বিচারে মোট তেরোটি লেখার রচনাকাল এরকম—

পূর্ণিমা; নভেম্বর ১৯৩১। কল্যাণী; জুলাই ১৯৩২
বিভা; ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩। মৃণাল; ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩
নিরুপম যাত্রা; মার্চ ১৯৩৩। কারুবাসনা; আগস্ট ১৯৩৩
জীবন প্রণালী; মার্চ ১৯৩৩। বিরাজ; আগস্ট ১৯৩৩
প্রেতিনীর রূপকথা; আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৩৩
জলপাইহাটি; এপ্রিল—মে ১৯৪৮। সুতীর্থ; মে-জুন ১৯৪৮
মাল্যবান; জুন ১৯৪৮। বাসমতির উপাখ্যান; ১৯৪৮

একজন গদ্যলেখক জীবনানন্দ একটু নিরালা পরিবেশের জন্য, লেখার উপযুক্ত পরিবেশের জন্য হাহাকার করেছেন। তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করতেন লেখার জন্য নিবিড় কোনো স্থান পাচ্ছেন না। বোঝা যায় তাঁর বাড়িতে লেখার পরিবেশ ছিল না, কিন্তু মনে মনে তিনি অনেকগুলোর লেখার পরিকল্পনা এঁটেছিলেন, এ-কথা তাঁর কাছের মানুষের কাছে বহুবার বলেছেন। এ আজ কেবল আক্ষেপের বিষয়। অনেক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তবু তিনি যে-কটি উপন্যাস লিখেছেন তা বাংলাসাহিত্যের অনন্য সম্পদ। পাঠকের হাতে সুলভে জীবনানন্দের উপন্যাসগুলো একত্রে তুলে দিতে পেরে আমরা গর্বিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫
পূর্ণিমা ১১
কল্যাণী ২৩
বিভা ৭৭
মৃণাল ১৪৫
নিরুপম যাত্রা ১৬৫
কারুবাসনা ১৮১
জীবন প্রণালী ২৪৩
বিরাজ ৩০৯
প্রেতিনীর রূপকথা ৩১১
জলপাই হাটি ৩৪১
সুতীর্থ ৫১১
মাল্যবান ৬৩৯
বাসমতির উপাখ্যান ৭০৫
পরিশিষ্ট
জীবন যাপন ৮৬৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণিমা

সন্তোষের অবিবাহিতা বড় শালী চপলা [চামেলি] বিধবা আশ্রমের স্কুলের কাজ ছাড়বার পর থেকে সন্তোষ এ মেয়েমানুষটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এই মেয়ে কটির বাপ নেই, মা নেই—একটি বুড়ো মামা টিকির-টিকির করছেন বটে—কিন্তু কত দিন আর এ-রকম চলতে পারে ভাবতে গেলে সুস্থিরভাবে জীবনটাকে অনুভব করতে পারা যায় না।

অন্য কোনো এক রকম ব্যবস্থা হলেই ভাল হত; অন্তত এই বিধবা আশ্রমের চাকরিটিও যদি থাকত।

চাকরিটি চপলা নিজের ইচ্ছায়ই খুইয়েছে। সন্তোষ ভাবছে, জীবনের যে-অবস্থা তাদের তাতে মান-অপমানবোধ ওর একটু কম হলেই ভাল হত। নিজে সন্তোষও চাকরি খুঁজছে।

টাকাকড়ির অভাবে কামনা—আকাঙ্ক্ষা তো ঢের দূরে—মানুষের জীবনের সাধারণ ধর্মটারই এত অপব্যবহার চলেছে!

চামেলিকে সে আজ আশ্রয় দিতে পারছে না, তার অন্য ভাইবোনদেরও না, বুড়ো মামাশ্বশুর মানুষটিরও কোনো কাজেই আজ সে লাগল না—কে জানে এদের সকলের কাজে কবেই—বা সে লাগতে পারবে? শেষ পর্যন্ত ঘুরেফিরে সন্তোষকেই এরা একমাত্র নির্ভরের জিনিস বলে বুঝে নিতে চাচ্ছে কিন্তু তবুও নিজের শক্তি-সামর্থ্যের কথা ভেবে সন্তোষ কিছু বুঝে দেখতে চাচ্ছে না—মান-অপমান বোধ নিয়ে এরা সরেই থাকছে।

সেই ভাল!

একটু অপেক্ষা করা যাক। এমন একটা দিন আসবে না কি যখন আশা-বাসনার অত্যুচ্চতার স্বাদ না মেটালেও জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দায়িত্বগুলোকে সে মিটিয়ে দিতে পারবে? কেন আসবে না? নিশ্চয়ই সেই সফলতা তার জন্য প্রতীক্ষা করছে। ভবিষ্যতের এমন একটা দিন যখন চামেলি দিদিদের প্রয়োজনীয় সমস্ত দাবিদাওয়া সে মিটিয়ে দিতে পারবে—হয় তো ওদের বিয়ের ব্যবস্থাও সে করে দিতে পারবে—কিংবা চাকরির ব্যবস্থা কিংবা জীবনের আবশ্যকমত সাদাসিধে সাধারণ সচ্ছলতার বন্দোবস্ত সব—

সন্তোষের জীবনের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি এতেই।

মানুষের জীবনের সাধারণ কর্তব্যগুলোই আজ তার ধর্ম।

নিজের কোনো মতামত, স্বাধীনতা বা আকাঙ্ক্ষার জন্য কোনো ভালবাসা নেই আজ তার, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কোনো উন্নতি বা যশ আজ আর চায় না সে। এক দিন সন্তোষ এমনই ভাবত বটে যে নিজের ঐশ্বর্য বাড়াতে গিয়ে কোনো দিকেই ভ্রুক্ষেপ করবে না সে আর, কোনো প্রবঞ্চিতের কথাই ভাবতে যাবে না। বরং মানুষকে সজ্ঞানে প্রবঞ্চনা করে চলবে সে, নিপীড়ন করে, নির্যাতন করে, চারদিককার মানুষের জীবনগুলোকে ব্যথায়, ক্ষুধায়, হয় তো মৃত্যুতেও, ভরে দিয়ে নিজের সমৃদ্ধি ও সম্মান সঞ্চয় করে চলবে সে।

সঞ্চয় করতে পারা যেত কি না বিধাতা জানেন—কিন্তু সে রকম নির্মম অক্লান্ত চেষ্টার পথ ধরতে গিয়ে সন্তোষের জীবনে কোনো বাধা ছিল না। নিজের উপলব্ধি আজ তার সে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

অসাধারণ পথের অসম সাহস ও রক্তাক্ততা দিয়ে কোনো দরকার নেই তার। সাধারণ সামান্য জীবনের দায়িত্বগুলোকে সন্তুষ্ট করে এই শান্ত মধুরতার পথেই চলুক সে।

পৃথিবীর আদর—অভ্যর্থনার কোলাহলময় দারুণ রুদ্র জীবন না হয় একেবারেই চাপা পড়ে রইল।

তা হোক। সামান্য মানুষের কর্তব্যগুলোকে পালন করে, সহজ দাবিদাওয়াগুলোর ভিতর দিয়ে জীবনটাকে নিভৃতভাবে চালিয়ে, জীবনে স্নিগ্ধতা চাচ্ছে সন্তোষ।

এরই জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে সে।

সন্তোষের স্ত্রী পূর্ণিমাও স্বামীকে ভরসা দিচ্ছে—চাকরি-বাকরি টাকাকড়ি সচ্ছলতা শিগগিরই হবে তাদের। তার পর দিদিকে, ছোট বোন টুক্কুকে, আর মামাকে পূর্ণিমা নিজের কাছে এনে রাখবে।

ভবিষ্যতের এই ব্যবস্থার কথা ভেবে পরিতৃপ্তি পাচ্ছে পূর্ণিমা। পূর্ণিমার কাছে এটা দায়িত্বপালনের তৃপ্তি নয় শুধু, আরো ঢের সরসতা আছে এর ভিতর। পূর্ণিমা যেমন, তার বোন কটিও দেখতে খুবই সুন্দর।

সন্তোষও নিজে জানে শালী কটিকে নিজেদের আশ্রয়ে এনে শুকনো কঠিন কর্তব্য পালন করাই হল না শুধুঃ এর ভিতর ঢের সফলতা ও কোমলতাও আছে—বেশ একটা নীড় তৈরি হবে, যেন পৃথিবীর কয়েকটি নিরুপম নিবিড় পাখিদের নিয়ে।

পূর্ণিমাও যেমন—তার বোন কটিও দেখতে খুবই সুন্দর। কিন্তু তবুও এর ভিতর কোনো অবান্তর ক্ষুধা, পিপাসা, কামনার কথা নেই—কিন্তু সহজ সরলতা সেদিন প্রতি খুঁটিনাটিতেই কত যে ফুটে উঠবে জানে না কি সে? সন্তোষ সবই জানত।

পূর্ণিমাও যেমন—তার বোন কটিও দেখতে খুবই সুন্দর।

বিধবা আশ্রমের কাজটি, চামেলিদি, এদের সকলেরই জীবনের বর্তমান এই দুরবস্থার সময় রাখলেই পারত। তবু যে কয়েকটি টাকা পাচ্ছিল তাতে ওদের তো চলে যেত। সন্তোষরাও নিজেদের টেনে-হিঁচড়ে চালাচ্ছিল এক রকমে : কিন্তু এখন কী হবে, না হবে, ভাবতে পারছিল না সন্তোষ : সকলকে নিয়ে একটা সুব্যবস্থার ভিতর থাকতে হলে যে সুস্থির চেষ্টার প্রয়োজন, জীবনের সেই স্থির ধীরতা এমন অন্যায্য রকমে ও আকস্মিকভাবে আঘাত খেয়ে বসেছে যে ওদের এখন নানা রকম বিপাকই সম্ভব—বিশেষত ওদের রূপ চারদিকে যে-রকম লোলুপতা জাগিয়ে চলে এবং নিজেদের দু'জনের তখন দুশ্চিন্তার আর শেষ থাকবে না।

সন্তোষের দুশ্চিন্তার গভীরতা অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছুবে।

সন্তোষ খবরের কাগজের বিশেষ কলমগুলো দেখে যাচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণিমা বললে, 'চিঠি আছে।'

—'কার?'

—'মামার।'

চিঠি পড়তে-পড়তে পূর্ণিমা হঠাৎ অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে, 'সুখবর আছে।'

কাগজের ওপর থেকে উঁকি মেরে সন্তোষ বললে, 'কী রকম?'

—'ভেবে দেখো তো কী।'

পূর্ণিমার সুখবরের জন্য তেমন কিছু কৌতূহল না থাকলেও সন্তোষ একটু বুঝি আগ্রহ দেখাতে চেষ্টা করছে—বেচারি আঘাত পাবে না—হলে।

পূর্ণিমা বললে—'কই, বলতে তো পারলে না।'

সন্তোষ কাগজের এক শিট তুলে নিয়ে বললে, 'দাঁড়াও না, আগে বলো সুখবর কার, আমাদের না অন্য কারো?'

—'ধেত্তেরি তার! পূর্ণিমা ভ্রূকুটি করে হেসে উঠে বললে, 'তোমার মুণ্ডু, দিদির বিয়ে হচ্ছে।'

—'বিয়ে? চামেলিদিদির?'

—'বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি?'

সন্তোষ প্রথম ধাক্কাটা একটু সামলে নিয়ে বললে—'সুন্দরী মানুষদের বিয়ে না-হওয়াটাই তো রহস্যের জিনিস।'

একটু থেমে বললে—'আমি এত দিন ভাবছিলাম যে দিদি হয় তো সঙ্কল্পই করেছেন যে বিয়ে করবেন না; নইলে অমন রূপসীর জন্য পাত্রের অভাব ছিল?'

পূর্ণিমা শুরু করলে, 'রূপসী কিছু টুকু নয়? আমি নই? লোকে বলে দিদিরই বরং আমাদের চেয়ে রূপ কম।'

—'কথাটা সত্যি বটে।'

পূর্ণিমা বললে, 'কিন্তু আমরা গরিব বলে—'

সন্তোষ বললে, 'তা ঠিক; তোমার মত সুন্দরী যদি বড় লোকের ঘরে হত, তা হলে বিয়ে তো বিয়ে—তোমাকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখবার অধিকারও হয় তো আমার থাকত না।'

হাসছিল সন্তোষ।

পূর্ণিমা হয় তো একটু আঘাত পেয়ে নিজের জীবনের অন্য রকম একটা সম্ভাবনার কথা ভাবছিল। তা সে ভাবতে পারে। এত রূপলাবণ্য, সুস্থতা, সামর্থ্য নিয়ে কী পুরস্কার পেল সে? দিনের পর দিন একটু সামান্য সচ্ছলতার তৃপ্তির জন্যও কত যে দুর্ভাবনা ভুগতে হয় তাকে! এমন অপরূপ সম্পন্নতা তার যদি এই দামেই বিকোয় পৃথিবীতে বিচার কোথায় তা হলে?

এই সব সন্দেহ ব্যথায় পূর্ণিমা এখন কষ্ট পাচ্ছে কী না জানে না সন্তোষ—'কিন্তু মাঝে-মাঝে এখন নানা কথা ভেবে খুবই ব্যথা পায় মেয়েটি; কেনই-বা পাবে না? ওর ব্যথার গভীরতার অনুপাতে ওর জীবনের পরম তৎপরপ্রিয়তা ধরা পড়ে। সন্তোষের প্রশ্নগুলোর জন্য বিষম উত্তর সব তৈরি রয়েছে যেন মেয়েটির হৃদয়ে; সন্তোষের দারুণ উত্তরের জন্য মর্মান্তিক প্রত্যুত্তর সব। তবুও তারপর উপশম রয়েছে; মুছে দিতে আসে কিন্তু সেটা কতদূর অন্তরের বুঝতে পারা যায় না সব সময়।

যাক—পূর্ণিমা একটা সফল সমাধান মোটেই নয়।

শেষ পর্যন্ত সন্তোষের জীবনের আশ্রয় কোথায় গিয়েছে—জানে না সে।

—'পুরুষ মানুষ যদি হতাম চাকরির জন্য নর্থপোলে যেতে হলেও আমি সেটা ভাগ্যই মনে করতাম,' পূর্ণিমা বললে, 'দিদির খুব বড় লোকের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে।'

সন্তোষ খবরের কাগজের শিটে একটা মৃদু ভাঁজ দিয়ে বললে—'কী করে জামাই?'

—'বম্বেতে খুব বড় চাকরি করে।'

—'বম্বে!'

পূর্ণিমা বললে, 'বম্বে শুনে তুমি নাক সিঁটকালে কেন শুনি?'

সন্তোষ বললে, 'না তা নয়; ভাবছিলাম বম্বে—তেমন আর দূর কী—কিন্তু—' পূর্ণিমা বললে, 'বম্বেতে ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে আছেন।'

সন্তোষ দু-এক মিনিট আবিষ্টের মত থেকে বললে, 'বাঙালি আজকাল অত বড় চাকরি পায়? আরো, বম্বেতে গিয়ে?'

পূর্ণিমা একটু শ্লেষের সঙ্গে বললে—'শক্তি থাকলেই পায়।'

—'মামা লিখেছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আর কী লিখেছেন?'

—'কয়েক বছর ধরে ছেলেটি বম্বেতে আছেন।'

সন্তোষ একটু বিস্মিত হয়ে বললে—'ওর বয়েস কত?'

পূর্ণিমাও একটু বিদ্রূপের সুরে বললে—'দিদির চেয়ে বড় নিশ্চয়ই—কিন্তু তোমার চেয়ে ছোট ঢের।'

সন্তোষ একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, 'আমার চেয়ে ঢের ছোট তার কী করে হয়—বম্বেতে তো কয়েক বছর ধরেই আছেন—ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে নতুন লোক শিগগির নেয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তোষ একটু নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে বললে, 'হয় তো ছোটই হবে আমার থেকে।' একটু পরে মাথা তুলে একটু মৃদু রহস্য করে সন্তোষ বললে, তিন বোনের ভেতর সবচেয়ে রূপসী সতেজ মানুষটিই গেল এক বুড়ো অকর্মণ্যের হাতে; জীবনের বিচার, বিবেক, পুরস্কারের এই রকম উপলব্ধি নিয়ে সৃষ্টিটা কোন দিকে যাবে? টিকবেও-বা কত দিন? টিকলেও এর সার্থকতাই-বা কী?'

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সন্তোষের নিজের কাছেই ছিল। পৃথিবীতে সে আনন্দ উৎসব সম্ভোগ করতে আসে নি, এসেছে সহ্য করতে, জীবনের তামাশাটা বুঝে নিতে। কিন্তু পূর্ণিমাকে সেই রকম গোপন, নিশ্চয় জীবনের ভিতর জীবিত করে নেবার না আছে কোনো অধিকার সন্তোষের, না আছে কোনো সাহস; রুচি নেই—প্রয়োজন নেই।

পূর্ণিমা দু-এক মিনিট মাথা হেঁট করে চুপ করে রইল।

আস্তে-আস্তে মুখ তুলে বললে—'রঙ্গ করতেই শিখে এসেছিলে শুধু—এই জন্যই তোমার কিছু হল না। পুরুষ মানুষের যা কর্তব্য তা করতে পারো না? নিজেকে কেন এতটা হীন করে ফেলতে চাও?'

কিন্তু পূর্ণিমা নিজের বিবাহিত জীবনের সঙ্গে গভীর সংলগ্ন একটা দুঃখকে চাপবার জন্যই বড়-বড় সাহসের কথাগুলো পেড়ে যাচ্ছে শুধু। দুবৃত্ত জীবন—যা মেয়েমানুষকে, রূপকে, রসকে, আগ্রহ আন্তরিকতা যত্ন প্রয়াসকে, কুটোর চেয়েও নগণ্য মনে করে—সেই জীবনেরই একটি পরম কৃপার পাত্র হয়ে বেঁচে থেকেও পূর্ণিমা তাকেই চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে যাচ্ছে। প্রবল, দুর্দান্ত জীবন তামাশা বোধ করে, গোপনে হেসে চলেছে যে, পূর্ণিমা যদি কোনোদিন তা দেখত!

পূর্ণিমা একটু আশ্বস্ত হয়ে বললে—'বাপ-মা নেই আমাদের—আমরা অকূলে ভাসছিলাম। ভেবেই পেতাম না দিদির কী হবে, ওর যে এমন সুন্দর একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল এতে আমাদের সকলেরই মঙ্গল হবে।'

পূর্ণিমা তার নিজের ভাগ্যকে দিদির ভাগ্যের সঙ্গে তুলনা করে এতক্ষণ ব্যথা পেয়ে এ জিনিসটার উপশমের দিকটা খুঁজে বের করে তৃপ্তি পাচ্ছে। জীবনের অন্ধকারের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকবার মত সহ্যশক্তি, সহিষ্ণুতা বা তামাশাবোধ নেই পূর্ণিমার। এ উজ্জ্বল পথের যাত্রী—ওর দিদির চেয়েও ঢের বেশি করে। কিন্তু একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ সমুদ্রের মত হতাশার অমাবস্যা যে ওর চারদিকে! ওর ভিতর থেকে ও কী দিয়ে যে কী করবে ভাবতে পারছে না সন্তোষ।

পূর্ণিমা বললে, 'জামাইবাবুর জন্য টুক্কুরও, দেখো, একটা ভাল বিয়ে হবে! কী বলো?'

সন্তোষ কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

পূর্ণিমা বললে, 'আমার রবিনেরও পড়াশুনোর সুবিধে হবে; টুইশনি পাচ্ছিল না—দিদিও চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। টাকার জন্য ওর বি-এ পড়া হত না বোধ হয় আর। কিন্তু এখন,' পূর্ণিমা হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে, 'এখন তো জামাইবাবুই ওকে পড়াতে পারবেন; অত বড় চাকরিওয়ালা, চাকরিও দিতে পারবেন—হয়তো বিলেত ঘুরিয়েই আনলে—কী বলো? অসম্ভব কি কিছু?'

সন্তোষ ঘাড় নেড়ে বলে, 'না।'

—'এমন তো কত জায়গায়ই হচ্ছে-হচ্ছে না?'

সন্তোষ বললে—'হচ্ছে বই কি।'

পূর্ণিমা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললে—'সুখের মুখ এইবার দেখলাম আমরা। এতদিন আমরা ভাইবোন মিলে কষ্টই পেয়ে আসছিলাম।'

সন্তোষ পূর্ণিমাকে আশ্বাস দিয়ে বললে—'তোমারও সুখ। সুখ বই-কি; ওদের সুখে তোমারও সুখ।'

অনুভূতির এই সুখটুকু, এই ছাড়া ব্যক্তিগত কোনো সুখ-সম্পদ—আশ্রয় তার দিদির এ বিবাহের থেকে পূর্ণিমা কি আর আহরণ করতে পারবে? আহরণের উচ্ছিষ্ট যদিও-বা কিছু থাকে টুক্কু—রবিনের জন্য—সন্তোষকে গ্রহণ করে পূর্ণিমার সে সব সুযোগ চলে গিয়েছে।

'কিন্তু পরের সুখেও—তেমনভাবে গ্রহণ করে নিলে—সুখী হতে পারা যায়। আর এরা তো তোমার ভাইবোন, পূর্ণিমা।'

পূর্ণিমা বললে—'আমারও এত দিন পর একটা নিস্তার, মামার জন্য আমাদের ভাবনা ছিল বড্ড।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পূর্ণিমা বললে, 'কিন্তু এই সমস্ত যদি তোমাকে দিতে হত।'

এক মিনিট চুপ।

পূর্ণিমা ব্যথায় জড়িয়ে বললে—'কিন্তু যা হবার নয়-তা হয় না; নইলে এ দু-তিন বছরের ভেতর তুমি তেমন একটা চাকরি খুঁজে পেলে না? অনুপযুক্ত হলে আর-এক কথা ছিল—কিন্তু তাও তো নয়?'

পূর্ণিমা তেমনি কষ্টের সঙ্গে বললে—'কিন্তু দিনের পর যত দিন যায় মনে হয় তুমি কি উপযুক্ত!'

সন্তোষ শুনছিল।

পূর্ণিমা বললে—'অন্তত জামাইবাবুর কাছে তুমি আর কে? অত বড় চাকরি!

অমন সাহেবি! সে কী সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য আমরা ভাবতেও পারি না।'

আধ মিনিট চুপ থেকে বললে, 'অত শত কিছু চাইও না। থাকলই-বা রূপগুণ টুক্কুর—আমাদের মাঝারি জীবন হলেই চলে যায়। নিতান্ত অভাবে পড়ে না মরলেই হল। আজকালকার স্বদেশীর দিনে তবে সাহেবিই বা কে চায়? কিন্তু তাই বলে একটু স্বচ্ছলতাও কি থাকবার নয়? কতদিন আর এমন ছ্যাঁচড়ামির ভেতর দিয়ে টিকে থাকতে পারা যায়? টাকাকড়ির গর্ব চাইনে—কিন্তু মানুষের জীবনের জন্য যে-স্বাধীনতাটুকুর দরকার সেই হলেই হত। কিন্তু কিছুই তো হল না।'

সন্তোষ পূর্ণিমার হাতটা ঈষৎ আবেগের সঙ্গে টেনে নিয়ে বললে—'ছি, এত হতাশ হয়ে পড়তে হয় কি? তোমাকে কতবার আমি বলেছি, সবই হবে, শুধু একটু প্রতীক্ষা দরকার। তুমি দেখেছই তো, পূর্ণিমা, কত রকম যত্ন করছি আমি। নিশ্চয়ই হবে, নিশ্চয়ই হবে—ছি, অত নিরাশ হয়ে পড়তে হয় না লক্ষ্মীটি—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণিমা সন্তোষের ঘাড়ে মাথা রেখে ব্যথায় অভিভূত হয়ে পড়ে বললে—'আর কত দিন অপেক্ষা করব আমি? আমি যে আর পারি না।'

সন্তোষ আশ্বাস দিয়ে বললে—'আর বেশি দিন নয়। শিগগিরই একটা কিছু হবে ভাবছি। না-হয় সেই যে-এজেন্সির কথাটা বলেছিলাম তোমাকে, তাই নেব।'

পূর্ণিমা একটু নিস্তার পেয়ে বললে—'ভাবছিলাম রবিনকে পড়াব, টুক্কুকে আমার কাছে এনে রাখব। দু'বছর ধরে এই চেষ্টাই তো চলেছে। কিন্তু এখনও তা পারলাম না যে—'

সন্তোষ বললে, 'তা পারবে—পারবে। না-হয় তোমার দিদিই এখন দেখবেন।'

পূর্ণিমা আহত হয়ে বললে—'সব দিক দিয়েই দিদির ভাগ্য আমার চেয়ে বেশি। ওদের মানুষ করার ভাগ্যও তারই হাতে—''একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পূর্ণিমা উঠে দাঁড়াল।

বললে—'দিদির বিয়েটা হয়ে যাক-তার পর রবিনকে মেডিকেল লাইনে দেবার জন্য দিদিকে লিখব।'

এই প্রস্তাবের উপযুক্ততা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য না করে সন্তোষ বললে—'তা লিখো।'

—'তোমারও হয় তো কিছু সুবিধে হতে পারে; মেডিকেল লাইনে নয় অবিশ্যি—কিন্তু বম্বে-টম্বের দিকে—অত বড় চাকুরে কি না—'

সে সুবিধা-অসুবিধার পরিপূর্ণবোধ সন্তোষের আছে; জীবন ঢের শিখিয়েছে তাকে। কিন্তু সে-সব উদঘাটন করে এই মেয়েটিকে তেমন কঠিন আঘাত দেওয়ার থেকে এর এই আশা-ভরসা ও স্বপ্নের ভুলের ভিতরেই পূর্ণিমাকে রেখে দেবার প্রয়োজন বোধ করছে সন্তোষ।

তার পর একদিন সুদিন যখন আসবে—এই মেয়েটিকে জীবনের নানা রকম সত্য শেখানো যাবে তখন।

এই সবের জন্য অপেক্ষা করছে সন্তোষ।

চার—পাঁচ দিন পর মামাশ্বশুরের চিঠি এসেছে আবার।

সন্তোষ বললে—'কী লিখেছেন?'

পূর্ণিমা বললে—'তুমি কি কলকাতায় যাচ্ছ?'

'কে? আমি?'

—'হ্যাঁ।'

সন্তোষ একটু স্থির থেকে বললে—'যেতে তো হবেই।'

—'কতকগুলো জিনিস চেষ্টা করে দেখবার আছে—তার পর কিছু না হলে সেই এজেন্সিটা'

পূর্ণিমা বললে—'মামাবাবুর আর দিদিও কলকাতায় যাচ্ছেন।'

—'কবে?'

—'শিগগিরিই, তাঁরা আশা করেছেন তুমিও যাবে।'

—'আমি? তা যাব বই—কি!'

পূর্ণিমা মনের ভিতর কী-একটা প্রস্তাব ফেঁদে ফেলতে-ফেলতে বললে—'তা যেও, বেশ তাড়াতাড়ি যেও; ক-দিন ধরে তো যাবে-যাবে বলছিলেই—আজকালই তো যেতে। মিছিমিছি বাড়িতে বসে থেকে লাভ কী? তার চেয়ে ওখানে গিয়ে জোগাড়জাগাড়ের পথও দেখা যায়—কিন্তু তা ছাড়া ওদের সঙ্গেও দেখা হবে এবার। দিদির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে আগের থেকে কথাবার্তা বলে রাখা ভাল।'

সন্তোষ বললে—'কী কথা?' নিজেই থমকে গিয়ে বললে, 'ওঃ সেই?'

—'হ্যাঁ গো, সেই চাকরি-বাকরির চেষ্টাই! জামাইবাবুর এত বড় কাজ—দিদিকে দিয়ে একটা কিছু কি না হবে?'

পূর্ণিমার এই নিদারুণ সরলতা এই দু'বছরের ভিতর কতবার ভাঙল-গড়ল। আবার তা ভাঙছে, গড়ে উঠছে আবার। এই বিষম প্রক্রিয়ার কোনোদিনও কি শেষ হবে না আর?

পূর্ণিমাকে বলতে ইচ্ছা করে যে চামেলিদির স্বামী তাকে যে-চোখেই দেখুন না কেন—খুব ভাল চোখেই এখন দেখে নিন না—সন্তোষের শিক্ষা-দীক্ষা রুচি-প্রয়োজনের সঙ্গে ডাক্তার মানুষটি নিজেকে এত কম সংশ্লিষ্ট মনে করবেন যে বিয়ের আগের কয়েকটা দিন সন্তোষের সঙ্গে অপর্যাপ্ত ভদ্রতা ও খাতির করলেও বিয়ের পর কারো সঙ্গে কারো কোনো সংস্রবও থাকবে না। এ হবেই; এ হতে বাধ্য; এরা দু'জনেই একেবারে আলাদা জগতের লোক যে, চাকরি-বাকরি জোগাড় দূরের কথা, সন্তোষ কোনো সহানুভূতিরও প্রত্যাশা রাখে না, একটুও প্রয়োজন বোধ করে না। চামেলিদির বিয়ে পর্যন্ত কলকাতার দিনগুলোর ভিতর ঢের গোপন শ্লেষের ইশারা সে পাচ্ছে, নিজের মনের ভিতর ঢের নিভৃত আমোদও অনুভব করবে সে—এই মাত্র।

এ ছাড়া আর—কিছু নয়। সন্তোষ থাকলে মনের নানা রকম গোপন আমোদ নিয়ে জীবনটা বেশ চলে যেত তার, কিন্তু পূর্ণিমার লক্ষ্য একেবারেই আলাদা এবং সেটাকে পরিপূর্ণরূপেই স্বীকার করতে হবে যে!

পূর্ণিমা বললে—'আজ মঙ্গলবার। আসছে শুক্রবারের পরের শক্রবার দিদিরা গিয়ে কলকাতায় পৌছবেন-তুমি না-হয় এই শুক্রবারই কলকাতায় চলে যাও।'

—'যেতে হবে বটে, কিন্তু এই শুক্রবারই?'

পূর্ণিমা এ-রকম উদাসীন প্রশ্নে অত্যন্ত আঘাত পাচ্ছে, বিরক্ত হচ্ছে।

—'সুযোগ না বুঝতে পেরেই তুমি মরলে।'

সন্তোষ বললে—'জামাইবাবুও কলকাতায় আসছেন না কি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তিনিও আসবেন বই—কি।'

—'মামাবাবু কিছু লিখেছেন না কি চিঠিতে, সে সব কথা?'

—'না।'

—'তা হলে ওরা মিছিমিছি কলকাতায় গিয়ে কী করছে?'

—'মিছিমিছি নিশ্চয়ই নয়। মামাবাবু না জেনেশুনে এত টাকা খরচ করতে যাচ্ছেন না আর। বুড়ো মানুষ—সব কথা গুছিয়ে লিখতে পারেন নি হয় তো। আমার মনে হয়—বিরাজবাবু শিগগিরই আসবেন।'

—'বিরাজ? তোমার দিদির জামাইয়ের নাম?'

—'হ্যাঁ গো।'

সন্তোষ বললে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাচ্ছি—তোমার মামাও হয় তো খুলে লেখেন নি কিছু—কোথায় দেখা হল দিদির সঙ্গে বিরাজবাবুর? আমরা একটুও জানলাম না! তিনি বম্বের থেকে কবেই-বা এদিকে এলেন?' পূর্ণিমা একটু মুগ্ধ হয়ে হেসে বললে—'এসেছিলেন নিশ্চয়ই—না হলে আর হাওয়ায় তো কিছু হয়ে ওঠে নি। এসেছিলেন, দিদিকে দেখেছেন, পছন্দ হয়েছে, বিয়ের তারিখ অব্দি ঠিক হয়ে গেছে, এই সবই সত্যি কথা। বিশ্বেস না হয়—এই চিঠিগুলো দেখো।'

মামাবাবুর চিঠি সন্তোষের কোলের উপর ছুঁড়ে ফেললে পূর্ণিমা। বললে—'জানাবেনই বা কেন তোমাকে? দিদির চাকরি যখন গেল, আমার ভাইবোনদের একটা আশ্রয় দিতে পেরেছিলে তুমি? পেরেছিলে মামাবাবুর বোঝা কিছু হালকা করতে? ঐ রকমই সব। নিজের দিক দিয়েই ভেবে দেখ। পরের কাছ থেকে প্রত্যাশা করলে নিজেকেও আশা-আশ্রয় দিতে হয়।'

পূর্ণিমা বললে—'তুমি হয় তো বলবে যে উপায় থাকলে তো ওদের আমি আশ্রয় দেব। কিন্তু এ একটা কথাই হল না। উপায় অর্জন করবার মত শক্তি তোমার হল না কেন? কেন তবে বিয়ে করতে গেলে। বোঝো নি কি যে বিয়ে করবার সঙ্গে-সঙ্গে নানা রকম দায়িত্ব এসে মানুষকে জড়ায়?'

এক-আধ মিনিট পরে একটু নরম হয়ে বললে, 'যাক সে-সব, নাও এখন তুমি যাবার বন্দোবস্ত করো। বিরাজবাবু শিগগিরই কলকাতায় আসছেন—বিয়ের তারিখটা আরো কিছু এগিয়ে পড়বে হয় তো। তা হলে এক মাসের ভিতরেই ওদের বিয়ে হয়ে যাবে।'

এখন আর অবিলম্বে কলকাতায় না গেলেই চলে না।

চামেলিদি সন্তোষকে লিখেছে কী করে কোথায় তার সঙ্গে দেখা হল; তিনি না কি চামেলিদির রূপের কথা আগেই শুনেছিলেন। আগেই কলকাতায় একবার দেখেছিলেন পূর্ণিমার দিদিকে, জীবনের এ সব গোপন কথা—এদের দু'জনেরই—আগে কাউকেই জানানো হয় নি—সন্তোষকেও না, পূর্ণিমাকেও না। ঠিকঠাক [না] হতে জানানো যে উচিত মনে করেন নি—চামেলিদি হয় তো জানাতে পারত—তার দিক থেকে তা কি অবিসংবাদী সত্য নয়?

তা ঠিকই তো। তা ঠিক।

জীবনের নানা রকম স্থির নিয়ম ও সিদ্ধান্তকে বোধ করবার ক্ষমতা এবং সেগুলোর প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধায় চামেলিদির চিঠি এমন স্নিগ্ধ।

এই মেয়েমানুষটিকে বরাবরই অনুভব করে দেখেছে সন্তোষ। মানুষের জীবনের এমন কোমল মমতাময় বিবেচক এই লোকটি, এমন নিভৃত, এমন মৃদু সৌন্দর্যে রূপবতী, এ সহিষ্ণু যে নিজের ভবিষ্যৎ নীড়ের ভিতর এর নিতান্তই প্রয়োজন বোধ করেছিল সন্তোষ—একে ছাড়া চলবে না যে! জীবনের নানা রকম রুক্ষতা ও রক্তাক্ততার ওপর উপশমের মত এই মেয়েটি থেকে যেত। কিন্তু তার নিজের জীবনের প্রয়োজনের দিকে চলেছে চামেলিদি। তাকে ছাড়তে হবে।

পৃথিবীতে কোথাও বিরাজের মত ডাক্তারেরও হয় তো এরই জন্য আবশ্যকতা ছিল।

নীড়ের থেকে একটা পাখি খসে পড়ল।

সে নীড় মনের ভিতরই তৈরি হচ্ছিল, কল্পনার ভিতর দিয়েই তার প্রক্রিয়া চলেছে, পরিবর্তন চলেছে। কোথায় গিয়ে যে তার পরিণতি সন্তোষ জানে না, কেউ জানে না।

পূর্ণিমা বললে—'এক মাসের ভিতরেই সব, এবার আর দেরি নয়।'

সন্তোষ বললে—'তুমিও চলো তা হলে।'

কিন্তু পূর্ণিমা কী করে যাবে? পেটের ভেতর সন্তান যে তার। অত্যন্ত অগ্রসরগ্রস্ত।

এই আরেকটা শস্ত্র। বিবেক-বিচারের সমস্ত শক্তি দিয়েও এ আঘাতকে গ্রহণ করলে চলে না যেন! এ আঘাত যেন আরো তীক্ষ্ণ-জীবনের কাছ থেকে আরো গভীর উপলব্ধি দিয়ে প্রতি মুহূর্তেই নিজের বিচার পাচ্ছে যেন। গভীর অনুভূতিশীল মানুষের জীবনও তত ক্ষুধা মেটাতে পারে না যে।

পূর্ণিমা বললে—'কলকাতায় যাবার উপায় রেখেছ তুমি?'

কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে সন্তোষকে অনেক দিন ধরে অনেক পীড়ন করেছে পূর্ণিমা। কিন্তু জীবনে, এ দু'বছরের জীবনটিতে তার, নিজেই সে যে উৎপীড়িতা হয়েছে ঢের বেশি—জীবনের দুঃসময়ে সন্তানকে পেটে ধরেই শুধু নয়-সন্তোষের সঙ্গে, পূর্ণিমার এমন অপরূপ অসামান্য সম্পন্ন জীবনটাকে মিলিয়ে দিয়ে, এই নিরর্থক ভ্রষ্ট দাম্পত্যের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তেই যেন—

কিন্তু তবুও সন্তোষকে আজ নিজের এই মর্মান্তিক গর্বের কথা নিয়ে আর-একটা কঠিন কথাও বলছে না পূর্ণিমা।

ক্ষমা করেছে সন্তোষকে সে। স্বামী তার একটা চাকরি জুটিয়ে নিক, সচ্ছল হোক, সাংসারিক স্বাধীনতা অর্জন করুক, তার পর তাদের দু'জনের জীবনেই ঢের পরিতৃপ্তির সময় আসবে। এই সব বলছে পূর্ণিমা? পূর্ণিমা খুব মমতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে কথা বলছে। নিজের ভরা পেটের যথেষ্ট কষ্ট-ব্যাঘাত নিয়েও সন্তোষের জিনিস পত্রের সুশৃঙ্খল গোছগাছ করে দিচ্ছে সে—কলকাতায় যেতে এবার সন্তোষের কী-কী লাগবে, গিয়েই-বা কিসের-কিসের প্রয়োজন, সমস্তই যথাসাধ্য জুগিয়ে দিতে লেগে গেছে পূর্ণিমা।

সন্তোষ এবার একটু মুগ্ধ হয়েই কলকাতায় এসেছে।

একটা উপযুক্ত মতন আয়ের ব্যবস্থা দেখে নিতে পারলে জীবনে তাদের পরিতৃপ্তির অভাব হবে না—তারও না, পূর্ণিমারও না।

এই সুস্থিরতা-নিশ্চয়তা, ঘুম-শান্তি-কাজ ও পরিণতির মধুরতা এই? জীবনের থেকে এমন বিচিত্র ব্যবস্থাকে অধিকার করে নেবার জন্য সন্তোষের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চলেছে কলকাতায় এবার। ছ-সাত দিন কেটে গিয়েছে।

এক দিন ভোরের বেলায় মামাবাবুর একটা কার্ড পাওয়া গেল। কলকাতায় তারা দু-দিন হল এসেছে—কিন্তু ব্যস্ততায় সন্তোষকে খবর দিতে পারে নি; সন্তোষ যেন চিঠি পেয়েই অবিলম্বেই গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে। মামাবাবুর চিঠিতে কোনো ঠিকানা নেই।

পর দিন চামেলিদির খাম এসেছে—নিজের প্রতি মৃদু ভর্ৎসনা, সন্তোষের কাছে নিবিড় অনুযোগ—কিছু মনে করে না যেন সন্তোষ এর আগে খবর দেওয়া হয় নি বলে; অবিলম্বেই দেখা করবার জন্য চলে আসে যেন—ঠিকানাও রয়েছে বটে; পরিষ্কার মৃদু হাতের রূপসী চিঠিখানা এই।

এই সাত-আট দিন কলকাতার নানা রকম হিংস্র ঝঞ্ঝাটের মাথায়, মেসের রুক্ষ কঠিনতার মধ্যে চামেলিদির এই দু'পাতা একটা গভীর প্রবোধের মত এসে পড়েছে।

পূর্ণিমা ঢের দূরে। জীবনে আর আত্মীয় কোথাও কেউ নেই তো।

কলকাতায় এসে বন্ধু বলেও এবার কাউকে গ্রহণ করতে পারে নি সন্তোষ। চারদিককার নিঃসঙ্গতা নির্জন রক্তপ্রবণতার মধ্যে বন্ধুই শুধু নয়—ওর মতন, একটু আত্মীয়ার পরশ যেন সে চায়—আত্মীয়ার, পরমাত্মীয়ার।

চামেলিদি চেয়ারটা এগিয়ে দিল।

সন্তোষ বসল।

সে রইল দাঁড়িয়ে।

সন্তোষ কিছু বললে না।

চামেলি বললে—'আপনাকে স্টেশনে গিয়ে আমাদের রিসিভ করতে বলি নি কেন, জানেন? একে তো এই ভীষণ শীত-তার ওপর ট্রেন ভোর চারটে—সাড়ে চারটে সময় কলকাতায় আসে। ঐ সময়ে মানুষকে মানুষ কেউ বিব্রত করতে যায়?'

চামেলি নিজের মনের মুগ্ধতায় একটু হাসল।

বললে—'পূর্ণিমা কেমন আছে? ভাল তো? বাড়ির সব ভাল?'

সন্তোষ ঘাড় নেড়ে বললে—'ভালই।'

চামেলি বললে—'মামাবাবু বেরিয়ে গেছেন।'

—'কখন ফিরবেন?'

—'বেলা এগারটা-বারটার আগে না—'

—'বিয়ের যোগাড়-যন্ত্র করছেন বুঝি?'

চামেলি একটু ঘাড় কাত করে, কোনো জবাব দিল না।

সন্তোষ বললে—'আমার যথেষ্ট অবসর আছে, খাটবারও খুব প্রবল ইচ্ছা, কী-কী করতে হবে, বলুন।'

চামেলি বললে—'কিছু না, বিয়ে সে-রকমভাবে হবে না! খুবই চুপচাপে হয়ে যাবে; লোকজনকে খাওয়ানোও হবে না। নিমন্ত্রিতও দু-পাঁচজন মাত্র। আমাদের কিছু করবার নেই-সত্যি বলছি আপনাকে—'

সন্তোষ বললে—'ভালই, আমিও হুড়হাঙ্গামায় পক্ষপাতী নই। গরিবদের জাঁকজমকেরই বা কী প্রয়োজন?'

চামেলি বললে—'মামাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করবেন। কাজ নেই বললাম বলে আপনি হয় তো আর এ দিক মাড়াবেন না। আসবেন কিন্তু।' সন্তোষ বললে—'এখনো তো চলে যাচ্ছি না।'

চামেলি হাসছিল।

সন্তোষ বললে—'এ বাড়িটা কাদের? বেশ তো বাড়ি!'

চামেলি বললে—'মামাবাবুর এক বন্ধুর—'

চামেলি বললে—'কলকাতায় তো কয়েক দিন হল এসেছেন—কিছু সুবিধে-টুবিধে হল?'

সন্তোষ ঘাড় নাড়ল।

চামেলি বললে—'হবেই-বা কী? আমি নিজেও তো সেদিন পিকেটিং করছিলাম। বিধবাশ্রমের স্কুলের কথা বলছি-সেক্রেটারি কত অনুযোগ করলেন, কিন্তু স্কুলের টিচার হয়েও মেয়েদের সঙ্গে পিকেটিং করলাম আমি—'

চামেলি একটু বললে—'দেখুন, কী রকম আখখুটে মেয়ে আমি; সব কি থেকেই সকলে বললে-কাজটা ছেড়ো না তুমি চামেলি—মামাবাবু কত সাধলেন, আপনিও লিখলেন, কিন্তু আমার জেদ আমি রাখলামই-কী দারুণ বলুন তো দেখি। কোথায় কূল পেতাম, বলুন? কিন্তু সে-সব ভেবে দেখবার মত মন থাকে কারো?'

চামেলি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে অনুভব করে হাসতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললে—'দেশের নাড়ী-নক্ষত্র যে কোথায় নিজেরই তো খুব ভাল করে জানা আছে আমার। এ আর চাকরি-বাকরির সময় নয় যেন! কে কাকে তা দেবেই-বা বলুন—'

একটু থেমে বললে—'কিন্তু বিবাহিত লোকের পক্ষে পিকেটিং করাও মোটেই সম্ভব নয়। কী যে করবে তারা—'

চামেলি বললে—'এ কয়দিন কতকগুলো খবরের কাগজ থেকে কয়েকটা চাকরির কাটিং যোগাড় করেছি আপনার জন্য। দিচ্ছি আপনাকে—'

চামেলি একটা খাতার ভেতর করে [থেকে] কাটিংস বের করে দিলে। সন্তোষ এ সবই দেখেছিল।

তবু কৃতজ্ঞতা জানালে-পকেটে সেগুলো যত্ন করে [রেখে] দিলে-বললে, 'হ্যাঁ দিদি, দরখাস্ত আমি করবই।'

চামেলি বললে, 'দেখুন।'

সন্তোষ এক-আধ মিনিট চুপ থেকে বললে, 'তিনি কবে আসছেন?'

—'বোধ হয় চার-পাঁচ দিনের ভেতরই; এক মাসের ছুটি নিয়ে আসছে। তিনি এলে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবেন কিন্তু-করবেনই। তাঁদের বাসায় গিয়েও দেখা করতে পারেন।'

বিরাজবাবুর কলকাতার ঠিকানা জানিয়ে দিচ্ছে চামেলি।

পরের দিনই চামেলির সঙ্গে আবার দেখা।

—'আমি ভাবতে পারছিলাম না যে আপনি আসবেন, বড্ড দয়া যে! চা করে দেব?'

সন্তোষ বললে—'মিছিমিছি চায়ের ঝঞ্ঝাটে গিয়ে আমাকে কেন একা ফেলে যাবেন? বিরাজবাবু তো আকজালই এসে পড়বেন-তখন আমাদের হাতের কাজ শেষ হয়ে গেছে; আপনিও নিশ্চিন্ত-আমরাও বিমুগ্ধ!'

সন্তোষ বললে—'বিমুগ্ধ বই কি! জীবনটা একটা মুগ্ধতা ছাড়া কী-আর চামেলি দি? চারদিককার পরিবর্তন, উপহাস, অন্যায়, বেদনা মনটাকে এমন অভিভূত করে রাখছে-তিক্ততা দিয়ে নয় নিশ্চয়ই-মধুরতা দিয়ে।' চামেলি অবাক হয়ে তাকাল।

—মধুরতা নয়?'

চামেলি যে কী জবাব দেবে সে জানে না।

সন্তোষ বললে—'পূর্ণিমা অতটা বোঝে না, কিন্তু তুমি বুঝেছিলে। এ দু'বছর দুঃখ-যন্ত্রণার আর কোনো অবধি ছিল না তোমার। কিন্তু যখনই তোমার জীবনের দিকে তাকিয়েছি তার স্নিগ্ধতা ও সহ্যশক্তি দেখে আমারও হৃদয় মধুরতায় ভরে গিয়েছে। ভেবেছি, কী রকম করে মানুষ এমন হতে পারে? জীবনের আগের মতামত আমার পরিবর্তিত হল। জীবনকে, সমস্ত জীবনকেই কী বিমুগ্ধভাবে তুমি যে দেখ বুঝতে পারলাম—'

সন্তোষ বললে—'কিন্তু তবুও তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য আছে। শুধু সহ্যশক্তিই তোমার সম্বল ছিল। কিন্তু একটা বিপুল তামাশাবোধ জীবনের সমস্ত মর্মান্তিকতার ভিতর আমাকে নিশ্চয় পথে দেখিয়ে দেয়।'

চামেলি বললে—'জীবনের মর্মান্তিকতাকে আমি অস্বীকার করি নে সন্তোষ। আজীবনই পূর্ণিমার চেয়েও আমি ঢের ভুগে এসেছি-তা তুমি জানো। কিন্তু তুমি যে-মুগ্ধতা আমার ভেতর দেখে সত্যিই তা কোনো দিন ছিল না—'

চামেলি হঠাৎ থেমে গিয়ে, একটু চুপ করে থেকে, পরে বললে—'হয় তো ছিল না।'

চামেলি বললে—'ছিল কি সন্তোষ?'

সন্তোষ বললে—'ছিলই তো—কিন্তু থাকবার কোনো প্রয়োজন ছিল কি?' চামেলি চুপ করে ভাবছিল।

সন্তোষের মনে হল, কোনো একটা জীবনের কুয়াশা কর্কশতার ভিতর একটা জোনাকি যেন ডুবে-ডুবে দেখছে তার সমস্ত স্নেহগুণ সহ্যগুণ মমতা মায়া নিয়ে।

কিন্তু তবুও এ চিত্র দেখবার কোনো রুচি নেই আজ সন্তোষের-বাস্তবিকই কোনো রুচি নেই, চামেলিরও নেই-কোনো রুচি নেই, কোনো প্রয়োজনও নেই; কারণ এ ছবি একবারেই ছিঁড়ে গেছে।

চামেলিকে বিদায় দিয়ে মনের ভিতর কোনো ক্ষোভও নেই সন্তোষের। এই মেয়েটিকেও আজ তবু একটু চিন্তিত দেখা যাচ্ছে—কিন্তু পরের দিনই নতুন জীবনের উৎফুল্লতায় সমস্ত সহানুভূতিকেও হারিয়ে ফেলছে যেন চামেলি। বিরাজের স্ত্রী হবার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত হচ্ছে সে। বিধবাশ্রমের টিচারের পক্ষে সেটা বরং শক্ত জিনিসই হত-কিন্তু রূপ, শিক্ষা, অর্জন করবার শক্তি-পরিবর্তিত হবার ক্ষমতা শুধু চামেলিরই নয়, নারীদেরই। এই সব বিশেষ অস্থি-মজ্জার জিনিস চামেলিকে খুব সাহায্য করছে।

সে দিন সে পিকেটিং করছিল-দেশের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের ব্যবস্থা-গুলোকেই বরং দুর্বল মনে করছিল-এক মাসও কেটে যায় নি, বিলেতি দামি সেন্টেড নোট পেপারে বম্বেতে দু'খানা করে চিঠি লিখছে সে রোজ। দু'খানা করে পাচ্ছে ফিরে-রোজ।

অত বড় সাহেব ডাক্তারকে পিকেটার চামেলি দু'বেলা করে এত কী লিখতে পারে? কিন্তু পিকেটিঙের কথা নিশ্চয়ই সে লিখছে না-বিধবাশ্রমের সেক্রেটারির স্বদেশদ্রোহিতাকে নিন্দে করে না, বরং ডাক্তারের পরিপূর্ণ রুচিমত যথাসাধ্য সাজিয়ে লিখতে প্রয়াস পাচ্ছে চামেলি-যাতে বিরাজবাবুর খুব ভাল লাগে, মনটা সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে-সেই সব কথা। জোর করে নয়-কৃত্রিমতার ভিতর এমন বিমুগ্ধতা থাকে কি? নিজেরই মনের পরিপূর্ণ প্রেরণায় লিখে যাচ্ছে চামেলি। নিজের মতামত কিছু নেই আজ চামেলির-নিজের ভাব নেই-স্বভাব হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমে-ক্রমে-কিন্তু আশ্চর্য, কোনো কৃত্রিমতার গন্ধও নেই। সব বড় দ্রুত, বড় বিরাট পরিবর্তনের ভিতর-স্বাভাবিক আবেগের সঙ্গেই আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে সব-শেষ হয়ে যাচ্ছে।

বিরাজের চিঠি দেখাবার মত নয়। জানাবার মতোও কিছু নেই সে সবের ভিতর। চামেলি বললে—'কী আমি লিখি? তাও কী করে বলব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চামেলি বললে—'একটা ভয় হয় শুধু; আমাদের চেয়ে এর সম্পূর্ণ নতুন জীবনটার ভিতর আমাকে নিয়ে একটা নির্ঘাত ধাক্কা না খান।'

সন্তোষ জানে, তা অসম্ভব। আই-এম-এস-বড় মানুষ বটে, কিন্তু কত বড় মানুষই-বা। মেয়েমানুষের মোহ জিনিসটাই আলাদা, বিশেষত চামেলিদের মত এমন সম্পন্ন পরম মেয়েমানুষদেব। লেডি হ্যামিলটন, নেল গোয়াইনের প্রেমিকদের সঙ্গে বিরাজের তো কোনো তুলনাই হয় না, অথচ ভয় তো সে-সব মেয়েরা কোনো দিন করে নি-ট্রাফালগারের বীরেরাই বরং আশঙ্কায় আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে উঠত জীবনের রূপ, প্রেমের কথা বলতে গেলে।

চামেলি বললে—'অত বড় সাহেব, এমন গ্রেট ম্যান একজন! না পারি যদি? সমস্তই যদি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়—'

চামেলি ঘাড় হেঁট করে কী যেন ভাবছিল। আস্তে মুখ তুলে বললে, 'কিন্তু তিনি তো প্রতি চিঠিতেই আমাকে আশ্বাস দিচ্ছেন—বলছেন, ভয় তোমার কী আবার? ভাবনা বরং আমারই; আমাকে পেয়ে সুখী হবে কি? ঠিক বুঝতে পারছি না।'

চামেলি প্রসন্ন মুখে হাসতে-হাসতে বললে—'এই সব লেখেন; দেখো তো কী অন্যায়।'

সন্তোষের মনে হচ্ছিল, কী অপরিমেয় ব্যবধান হয়ে যাচ্ছে এই দুটি বোনের ভিতর। পূর্ণিমা-যে বিরাজের দিক দিয়ে, সমস্ত বড় মানুষের দিক দিয়েই, চামেলির চেয়ে ঢের বেশি যোগ্যতর ছিল—তার আজ এই অবস্থা আর চামেলি-যার জীবনে এই বীভৎস মোচড়ের কোনো প্রয়োজন ছিল না-নিজেরই স্বাভাবিক নিয়মে জীবনের প্রকৃত উপশম যে ঢের বেশি পেতে পারত-দিতে পারত ঢের বেশি-তাকে নিয়ে এমন কুৎসিত টানা-হেঁচড়া।

এক দিন সমস্তই ঠিক হয়ে যাবে বটে।

পূর্ণিমা পরিবের বৌ বলে বাৎলে [বদলে?] যাবে-চামেলি কর্নেলের লেডি বলে।

কিন্তু সেই দূর সিদ্ধান্তের স্থিরতায় পৌছতে গিয়ে এই চারটি জীবনই যা অপব্যয়, অপচয় ও রক্তাক্ততায় বীভৎস হয়ে উঠবে। কিন্তু চারটি জীবনই বা ভাবছে কেন সন্তোষ? দুটি জীবন মাত্র-তার নিজের ও পূর্ণিমার। কারণ শেষ পর্যন্ত জীবনকে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, জীবনকে বিচার, জীবনকে ধিক্কার, জীবন অনুভব, জীবনকে গ্রহণ, জীবনের শূন্যতা বেদনা শান্তি সিদ্ধান্ত সমস্তই গরিবদের দায়ে পড়া কাজ; দায়ে পড়েই তাদের অনুভূতি এমন গভীর হয়ে ওঠে-মানুষের জীবনটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে এদেরই রুধির কর্দমসিক্ত উপলব্ধির কাছে এমন পরিপূর্ণভাবে ধরা পড়ে যেতে থাকে-ধরা, পড়ে যেতে থাকে।

নিজের মৃত্যুর আগে সন্তোষ এ জীবনটাকে যেমন বুঝে যেতে পারবে, পূর্ণিমা ও-বিরাজ ও চামেলি তাদের নিজেদের জীবনের প্রবোধ ও আশ্রয়ের ভিতর থেকে কী বুঝবে সে-সবের? কতটুকুই বা? তারা আর অগ্রসর হবে না-স্বচ্ছন্দ সংসার, সমৃদ্ধিময় পৃথিবীতে তাদের পরিসমাপ্তি হয়ে গেল-কিন্তু সন্তোষ-পূর্ণিমার আকণ্ঠ প্রয়াস ও ব্যথার কোনো পূর্ণচ্ছেদ নেই কোনো দিকে, মৃত্যুর পরে এ উপলব্ধিকে কাজে ধরা জিনিস মনে হবে না সন্তোষের আর এ অনুভবকে পরিপূর্ণ প্রাণে ভালবেসে যাবে সে; জীবনকে সে দেখল সমস্ত দিক দিয়েই তারা নিষ্ফল হয়েছিল বলে; মৃত্যুর সময় পূর্ণিমা ও সন্তোষ এই সফলতার সমৃদ্ধি নিয়ে চলে যেতে পারবে।

জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা এই নয় কি?

চামেলি বললে—'তিনি লিখেছেন নিজের চোখেই তো দেখেছি কত রূপগুণ সম্পন্ন তুমি, কিন্তু তোমার গুণের জন্যও তোমাকে চাচ্ছি না, তোমার রূপের জন্যও না-তোমাকে চাচ্ছি তোমার জন্য শুধু।'

চামেলি একটু বিদ্রূপের সুরে হেসে বললে—'দেখো তো, ডাক্তার মানুষেরও কবিত্বের কী গভীরতা—'

চামেলি বিদ্রূপ অক্ষুণ্ন রেখে বললে—'কিংবা নিরর্থকতা'। একটু গম্ভীর হয়ে বললে—'সত্যি এ-সবের মানে কী?

ধীরে-ধীরে আবিষ্ট হয়ে চামেলি বললে—'ভালবাসায় মানুষকে কী রকম অভিভূত করে ফেলে। ওঁর চিঠির সমস্ত ভণিতাই ঘুরেফিরে সেই ভালবাসারই কারচুপি'—চামেলি মুগ্ধ মুখচোখে হাসতে লাগল; রুপোর চামচে যেন রুপোর বাটিতে আওয়াজ করে চলেছে-না জানি কোন অনির্বচনীয় যাদু যেন শিগগিরই উদঘাটিত হয়ে পড়বে। কিন্তু বিরাজ ছিল না-সমস্তই গুটিয়ে গেল তাই।

চামেলি বিরাজের চিঠির উত্তর দেবার আয়োজন করছিল।

সন্তোষকে আর বসাল না সে।

বিরাজের আসতে এখনও দশ-পনের দিন দেরি-বিশেষ কাজের জন্য ছুটিটা পিছিয়ে দিতে হয়েছে।

এই জন্য ঢের মনখারাপ চামেলির।

বললে—'বিয়ের তারিখ তো পিছবে না?'

সন্তোষ বললে—'না।'

'মামাবাবু কিন্তু চিঠি ছাপাচ্ছেন।'

—'ওরাও তো জানে আশা করি।'

—'হ্যাঁ, ওরা নিজেরাও ছাপাচ্ছে, শুনিছি।'

চামেলি একটু আশ্বস্ত হয়ে বললে, 'উনিও লিখেছেন—আজকের চিঠিতেও-দেরি তো হতেই পারে না—বরং আগে ছুটি পেলে আজ-কালই ব্যবস্থা করে ফেলতেন'—সমস্ত চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে চামেলির—নোট পেপারে হাত রেখে একটু কাত হয়ে বসেছে সে।

সন্তোষ মেসে এসে পূর্ণিমার একটা চিঠি পেয়েছে—সাত-আট দিন পরে একখানা চিঠি! কিন্তু সে নিজেও কি বেচারিকে এ কয় দিনের ভিতর একখানা লিখেছিল—বম্বের থেকে কলকাতায়, কলকাতার থেকে বম্বেতে রোজই দু-তিন খানা যাচ্ছে-আসছে দেখেও? কিন্তু চামেলিদের জীবনের ব্যবহার দিয়ে নিজেদের জীবনকে পরিমাপ করলে চলে কি আজ আর? বিরাজ সন্তোষের চেয়ে বয়সে ঢের বড় বটে, চামেলিও পূর্ণিমার চেয়ে অনেক বড—কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বাস্তবিক পক্ষে নিজেরাই বুড়ো তারা দু'জনে; চামেলিরাই নতুন; জীবনের প্রথম পাঠ নিতে চলেছে যেন—প্রেমের পিপাসার, রোমাঞ্চের, স্বপ্নের নীড়ের।

পূর্ণিমা লিখেছে; পেটের ভারে সে না পারে হাঁটতে, না পারে শুতে, পা ছড়িয়ে দেড়ায় ঠেস দিয়ে বসে থাকতে হয় শুধু। বসে-বসে কী ভাবে সে?

ভাবে যা তা দু'পৃষ্ঠা বসে ব্যক্ত করেছে পূর্ণিমা।

তা না বলাই ভাল। সন্তোষ যদি ভুলে যেতে পারে-কোনোদিনও এই দু'পৃষ্ঠার স্মৃতি মনে যদি না থাকে আর তার, তবেই সে বেঁচে যেতে পারে!

কিন্তু বেঁচে যেতে সে আসে নি।

কিন্তু পূর্ণিমাকেও সে বাঁচাতে পারবে না।

পূর্ণিমার যদি মৃত্যু হত-এই প্রসবের সময়-তা হলে দু'জনেই বেঁচে যেতে পারত তারা। কিন্তু তা কি হবে? তা যে হবে না এই মনে রেখেই জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল-দু'জনের সমগ্র জীবনটাব সমস্ত পরিশ্রম, প্রয়াস ও ব্যর্থতার ও প্রয়াসের জন্য।

মেসের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সন্তোষের মনে হচ্ছে এটা যদি সে ঠিক বুঝতে পারত যে পূর্ণিমা প্রসবের আঘাতটাকে কিছুতেই উৎরোতে পারবে না, মরতে তাকে হবেই, তা হলে কম্বল মুড়ি দিয়ে বাইরের শীতের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এই অন্ধকারের ভিতর এমনই একটা আরাম পেত সন্তোষ!

কী গভীর নিস্তার পেত তা হলে জীবনে সে? সমস্ত পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট তার অনুভূতিশীল হৃদয়ের কাছ থেকে যে-করুণা চায়, যে-বেদনা চায়, আনন্দের উপশমের মত মনে হত যেন সেগুলোকে সন্তোষের। পূর্ণিমার এই একটি জীবন যে করুণা, মমতা, মায়া ও ব্যথার দাবি করে চলে গেছে সন্তোষের কাছ থেকে, সে-সবের অপরিসীম বেদনার কাছে, পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-কষ্টই আনন্দের উপশমের মত মনে হত যেন।

পৃথিবীতে কাউকেই ভালবাসে নি সন্তোষ।

কিংবা পূর্ণিমাকেই শুধু ভালবেসেছে। পৃথিবীর লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি লোকের ভিতর এই মেয়েটিরই শুধু দুঃখ দূর করবার জন্য, এর জন্যই শুধু একটা আশ্রয়, একটা শৃঙ্খলা, জীবনের কাছ থেকে একটা মমতামুগ্ধ স্নেহপূর্ণ ব্যবস্থা বিচার আহরণ করে নেবার জন্য-এরই আশা-আশ্বাস পরিতৃপ্তি ও মঙ্গলের জন্য-জীবনে যদি কিছু না পারা গেল মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দিয়েও একে প্রকৃত শান্তি, স্নিগ্ধতা ও নিবিড়তা বুঝতে দেবার জন্য অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বেঁচে থাকাটাকে যদি ভালবাসা বলা যায়, তা হলে একমাত্র পূর্ণিমাকেই ভালবাসে সন্তোষ। হয় তো প্রেমের মানেও এই-ই।

কিন্তু করুণা কি প্রেমের চেয়ে বড় নয়?

সৃষ্টির অন্য নক্ষত্রগুলোর কথা জানে না সন্তোষ-কিন্তু এই পৃথিবীর প্রতি অণু পরমাণুও প্রতি মুহূর্তেই যে-অব্যক্ত বেদনায় কুঞ্চিত হয়ে পড়ছে-পরিবর্তে কোনো এক দিক থেকে যে অসীম করুণার প্রতীক্ষা করছে-প্রতীক্ষা করছে শুধু, পাচ্ছে না-এই সমস্তই তো সন্তোষ উপলব্ধি করেছে-এই সবের অপরিসীম বেদনা তাকে ব্যথা দিয়ে গেছে; কিন্তু তবুও এই সব ব্যথা যেন কিছু নয়; পূর্ণিমার জীবন যেন এদের সকলের চেয়েই ঢের কৃপার পাত্র; এদের সকলকে বঞ্চিত করেও সন্তোষের সমস্ত স্নেহ-মমতা, দক্ষিণা, করুণা জীবনের স্বাভাবিক গতিতে বারবার পূর্ণিমাকেই খুঁজে বেড়াতে চায়-পূর্ণিমাকে স্পর্শ করতে না পারলে সে অন্ধ গতির যেন কোনো স্তব্ধতা নেই, তৃপ্তি নেই, অন্ধকারের কোনো শেষ নেই আর।

জীবনের সমস্ত করুণাও এই মেয়েটিকে দিয়ে দিয়েছে সন্তোষ। একে নিয়ে তাই বড় ব্যথা।

শীত রাতের অন্ধকারের ভিতর মেসের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে নিজের জীবন থেকে পূর্ণিমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাচ্ছে সন্তোষ; পূর্ণিমা বেঁচে থাক, কী মরে যাক-সন্তোষের জীবনকে সে যেন আর স্পর্শ না করে। পূর্ণিমা তার রূপ-সৌভাগ্য, শক্তি-সমৃদ্ধি ও সুলক্ষণ নিয়ে চামেলির চেয়ে ঢের বেশি করে পৃথিবীর যে-কোনো বিরাজকে কৃতার্থ করতে পারত। পৃথিবীতে লক্ষ-লক্ষ বিরাজ বেঁচে রয়েছে-আজ এই শীতের রাতের এমন কঠিনতার ভিতর জীবনের নিঃসঙ্গতায় রুধিরাক্ত হয়ে রয়েছে-পূর্ণিমাকে পেলে এই মুহূর্তেই তারা জীবনের মানে পরিবর্তিত করে ফেলতে পারে-তাদের একজনকেও যদি চিনত সন্তোষ উপযাচক হয়ে এই রাতেই পূর্ণিমাকে দিয়ে আসত;—আ, জীবনে কী গভীর নিস্তার পেত তা হলে.

আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে সমস্ত শীতটা ভরে ঘুমের একটুও ব্যঘাত হত না তা হলে আর। চিন্তার ব্যথা থাকত না। পূর্ণিমা যখন নিজের মাথায় তুলে সে-সব কুড়িয়ে নিয়ে চলে যেত, সন্তোষের জীবনে প্রেম আর আসত না তার পর, করুণা আর আসত না। এই দুটো জিনিসই মানুষের জীবনকে পণ্ড করে দেয় না কি?

এই জিনিসগুলোকে বাদ দিয়ে সবুজ ঘাসের মত কোমল কমনীয় উপলব্ধিহীন জীবন যে কী মধুর!

কোথাও কোনো চিন্তার পীড়া নেই, ভাবের কষ্ট নেই-শুধু আস্বাদ করে যাওয়া-শুধু আস্বাদ করে যাওয়া; তাই ভাল হত না কি?

কিংবা সন্তোষ মরে যেত; এত প্রেম ও করুণা বহন করবার শক্তি তার নেই যে!

কয়েক দিন কেটে গেছে।

বিরাজ এসেছে।

আরো কয়েক দিন চলে গেল।

আজ সন্ধ্যায় চামেলির বিয়ে হয়ে গেল।

আরো দু-তিন দিন চলে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই দুই বোনের জীবনের বিরাট ব্যবধানের অবিচার সন্তোষকে পেয়ে বসেছে-এই ভীষণ অভিশাপ নিয়ে সে কোথায় যাবে? দোষ কি তার, না বিরাজের? পূর্ণিমার না চামেলির?'

হঠাৎ এমন পার্থক্য হয়ে পড়ে কেন জীবনে? যে-জিনিস ক্রমে-ক্রমে হয়, আস্তে-আস্তে, অনেক সহিষ্ণুতা, প্রতিভা, প্রয়াস ও পরিশ্রমের পর তার মহিমাকে স্বীকার করে সন্তোষ।

কিন্তু যতই মনে হচ্ছে যে পূর্ণিমা বেড়ায় ঠেস দিয়ে, দুই পা ছড়িয়ে বসে আছে, পাড়াগাঁর নিরানন্দ জীবনের ভিতর প্রসবের প্রতীক্ষা করছে, গামলা, কাঁচি ইত্যাদির জন্য সন্তোষের কাছে পয়সা চেয়ে পাঠিয়েছে, যতই মনে হয় যে নাড়ী কাটাবার কাঁচি, বোরিক, গামলা ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে ও ব্যবস্থা ও উপকরণের সঙ্গতিতে, এতেই, আন্তরিক তৃপ্তি পাচ্ছে পূর্ণিমা আজ।

রিচি রোডে বিরাজদের মস্ত বড় বাড়ির মেমসাহেব চামেলির তৃপ্তির উপকরণগুলোর আকাশস্পর্শী উচ্চতাকে যখন আর অনুসরণ করতে পারা যায় না মেসের দেয়ালে ঠেস দিয়ে মাথাটা আস্তে-আস্তে হেঁট হয়ে আসে, নিজের প্রতি অবিশ্বাস ও অবিচার সমস্ত মন ভরে উপচে থাকে, জীবনের এই নতুন সমস্যার কী মীমাংসা করবে সে? এমনিই তো অনেক অমীমাংসা জীবনকে আচ্ছন্ন করেছিল, সংসার সন্তোষকে নির্যাতন করতে একটুও ছাড়েনি তো, কিন্তু সন্তোষের এই পাপের শাস্তি কোনো সংসার, কোনো পৃথিবী, কোনো পৃথিবী কোনোদিনই, যেন দিয়ে শেষ করতে পারে না।

হয় তো কোনো অবিবেচক ভাগ্যবিধাতার যাদুর খামখেয়ালিতে চামেলি আজ এত বড়।

কিন্তু সে যে এত বড় তা যে নিতান্তই সত্য-যে জিনিসকে আলেয়া বলে উড়িয়ে দেবার কোনো উপায় নেই তা আজ।

কে বড় কে ছোট এ-সব জিনিস সন্তোষকে কোনো কালেও স্পর্শ করে না, আজও করছে না-কিন্তু পূর্ণিমা ও চামেলির অবস্থা-ব্যবস্থার এই আকাশ-পাতাল তফাতের ভিতর যে-অবিচর ও অপরাধ লুকিয়ে রয়েছে তার শিকার তো পূর্ণিমা-কিন্তু শিকারী কে? যদি ভাবা যেত, চামেলি? যদি বোঝা যেত, বিরাজ? যদি কোনো বিধাতার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়তে পারা যেত, নিস্তার পাওয়া যেত?

কিন্তু এ অপরাধ ও অবিচার-শেষ পর্যন্ত পূর্ণিমাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে যা-এই অবিচার ও অপরাধের সমস্ত ভার সন্তোষকেই বহন করতে হবে।

চামেলির জীবন হয় তো বিরাজের সঙ্গে গিয়ে মিলত। পূর্ণিমা তার নিজের বিরাজকে তার দিদির চেয়ে ঢের বেশ অবিসংবাদী ভাবে লাভ করতে পারত-সে সমস্ত উপকরণই তার ভিতর ছিল।

এবং এই তিনটি লোকের জীবনের সংস্পর্শে আসবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না সন্তোষের।

সুশৃঙ্খল-বিধাতা হলে এই কয়টি জীবনকে এমনি করেই সাজাত। কিন্তু সুশৃঙ্খল বা উচ্ছৃঙ্খল-বিধাতা বা শয়তান বলে কেউ কোথাও নেই। কিংবা আছে কি? কে জানে? থাকলে ঢের বেশি শান্তি পাওয়া যেত-নালিশ করে কিংবা প্রার্থনা করে কিংবা বিদ্রোহী হয়ে-কিংবা ভবিতব্যতাকে স্বীকার করে। কিন্তু সে সব উপায়গুলো হেমন্তের পাতার মত জীবন থেকে এক দিন ঝরে পড়ে গেছে।

সে ঢের অতীতের কথা।

জীবনের নতুন উপলব্ধির কাছে সে সবের কোনো মানে নেই আজ। সমস্ত জীবনই শান্তি ও নিস্তার খুঁজছে-কিন্তু সন্তোষের পথ আলাদা; জানে না সে এই পথে তার কোনো সঙ্গী আছে কী না; কী যে সে পথঃ বেদনার পথ বটে-খুব গভীর বেদনার পথ-খুব গভীর বেদনার পথ। একজন পূর্ণিমাকেও যে সে ভালবাসতে পেরেছে, লোকেরা বলে, বিধাতা মানুষকে যেমন ভালবাসে; একজন পূর্ণিমাকেও যে সে করুণা করতে পেরেছে, লোকেরা বলে, বিধাতা তার তুচ্ছ কীটকেও সেই রকম করুণা করে।

কিন্তু বিধাতা ও লোকদের কথা আলাদা। সন্তোষ ও পূর্ণিমা সত্য, সন্তোষের এ প্রেম, এ করুণা তার।

পূর্ণিমা লিখেছে, 'এখানে থিয়েটারের পার্টি এসেছিল-খুড়ো শ্বশুরমশায় সে সবের বিরুদ্ধে পিকেটিং করতে গিয়ে মাথা ভেঙেছেন। বাড়িতে তো আর পুরুষমানুষ নেই। শুনলাম মিশনের সিসটার দু'জন-মার্গারেট ও এডিথ-যারা আমার কাছে মাঝে-মাঝে আসছেন, এবং প্রসবের সময় থাকবেন বলেছিলেন-এখন আজ দার্জিলিং চলে গেলেন। তিন-চার মাসের ভিতর আর আসবেন না। অথচ আমার তো তিন-চার সপ্তাহের ভিতরেই হতে পারে-কী হবে বলো তো?'

হবে আর কী? এমনই যদি কিছু হয়-পূর্ণিমা নিস্তার পাবে। বেঁচে থেকে যদি সে একদিক দিয়ে চামেলি-বিরাজ ও অন্য দিক দিয়ে সন্তোষের জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত সহমরণ করতে থাকে তা হলে সে কদর্য অশ্লীল অক্ষম অবসন্ন পৃথিবীতে সে কারো ভার লাঘব করবে না-সকলেরই বোঝা হয়ে উঠবে মাত্র!

হয় তো চামেলিও তাকে ছবিটিই মনে করবে-নিজের চেয়ে ঢের যোগ্যতর ও উপযুক্ত বোনটিকে জীবনের পাঁকের ভিতর পচতে দেখে চামেলির বিবেক চামেলিকে কষ্ট দেবে।

সম্পদ ঐশ্বর্যের স্বচ্ছন্দতার ভিতর হৃদয়ের এ সূক্ষ্ম অশান্তি কেউ চায় না—। বিরাজও হয়তো জীবনের ফাঁকে-ফাঁকে দু-এক মিনিটের জন্য স্তম্ভিত হয়ে থাকবে; 'কী হতে পারত-কী না হতে পারত, হায়!' বিলাস বটে-কিন্তু সেও ব্যথারই বিলাস। বেদনার বিলাসও মাঝে-মাঝে এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে ব্যথার থেকে তাকে পৃথক করতে পারা যায় না-তাকে ছাড়াতে পারা যায় না-একটা বোঝার মত হয়ে থাকে সে। বিরাজের হৃদয়ের ওপরও একটা বোঝার মত চেপে থাকবার শক্তি পূর্ণিমার রয়েছে। কিন্তু বিরাজের স্বচ্ছন্দ স্বভাব, জীবনের সঙ্গতির ভিতর এর কি প্রয়োজন আছে!

নেই কিছু।

কোথায় কোনো প্রয়োজন নেই পূর্ণিমার যে ব্যথা দেবে, কষ্ট দেবে, গুরুভারে আক্রান্ত করবে মানুষকে।

নিজে সে বুঝে যাবে, যদি সে বেঁচে থাকে, যে সবচেয়ে বেশি প্রবঞ্চিত হল সে-সবচেয়ে বেশি উপাহাসাস্পদ হয়ে গেল; শেষ পর্যন্ত এই-ই তাকে বুঝতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণিমার আর-একখানা চিঠি এসেছে-'কাকা মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন-'সকলেরই সেই জন্য চিন্তা, বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই; আমার জন্য কারো কোনো সহানুভূতিও নেই যেন। ওগো, আমার কী হবে, বলো? তুমি এই চিঠি পেয়েই চলে এসো।'

সন্তোষ যাচ্ছে-কিন্তু পূর্ণিমার কাছে নয়-চামেলির বৌ-ভাতে। সঙ্গে অমূল্য চলেছে—পূর্ণিমাকেও সে চেনে, সন্তোষের বন্ধু সে। বড্ড শীত-ভাল একখানা চাদরও নেই সন্তোষের। অমূল্য নিজের শাল-দোশালাখানা সন্তোষকে দিয়ে বিরাজ ডাক্তারের ভায়বার উপযুক্ত করে নিয়ে যাবার প্রয়াসে রয়েছে। অমূল্যের বিবেচনা রয়েছে বটে কিন্তু ঐ শালখানাই শুধু উপযুক্ত বটে, নিজের দামের কাছে অন্তত। বাকি সবের উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা—

[অবান্তর]

বিরাজদের মস্তবড় কম্পাউন্ডের শামিয়ানার নিচে সন্তোষের কোনো অস্তিত্ব নেই-হলের পর হল, হলের পর হল, হলের পর হলের সুগন্ধি মানুষ ও মেয়েমানুষদের অপর্যাপ্ত রূপ রস ও সম্ভোগের প্রচুরতার ভিতরেও সন্তোষ নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। কী করে সে এখানে এসে পড়ল স্তম্ভিত হয়ে চোখ পাকিয়ে এ প্রশ্ন ভিড়ের যে-কোনো মানুষ তাকে করলেও সেটা মোটেই অন্যায় হত না। কিন্তু আশ্চর্য এদের উদারতা-সুন্দরী-সুন্দরী মেয়েদের হাত-পা-গা ঘেঁষে গেলেও তারা কোনো উচ্চবাচ্য করছে না-না আছে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ।

চরুট, মদ, পদস্থতা, মর্যাদা, রূপ-এবং পুরুষ-মেয়েমানুষের চামড়া-মাংসের ঘ্রাণে জীবন এখানে উপভোগের যে কোন শিখরের উচ্চতায় পৌঁছেছে সন্তোষ খানিক গিয়ে আর অনুসরণ করতে পারে না; উপলব্ধি তার স্থগিত হয়ে স্থূল হয়েই যেন মাটিতে নেমে আসে। ভাবে হয়তো পূর্ণিমা উঁচু পেটে দুই পা ছড়িয়ে বেড়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে, একজন পুরুষমানুষের অপেক্ষা করছে, কিংবা নিঃসহায় প্রসবের কিংবা মৃত্যুর।

এই সমস্ত স্থূলতার ভিতর গিয়ে অনুভব কর্দমাক্ত হয়ে পড়ছে সন্তোষের। চোখ মেলে হলের পর হল দেখা যায় - হলের পর হল-হলের পর হল-ওপরে নিচে দোতলায় তেতলায় একতলায়-আসবাব ও উপকরণের দুরন্ত বস্তুসত্যের পায়ের নিচে, কল্পনা, মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রকৃত স্বপ্ন ও প্রকৃত সাধ আহরণ করবার জন্য আকুতি জানিয়ে পাঠ নিতে চায়-লণ্ডভণ্ড হয়ে হয়ে ফিরে আসে-সন্তোষদের স্থূল কল্পনা-সন্তোষের ও পূর্ণিমার। কিন্তু বিরাজ ও চামেলির কাছে এ সমস্তই অন্ধত্ব-এ সবই সাধারণ; কল্পনা ও চিন্তার সঞ্চয় মাধুর্যের দিক দিয়েও ওরা উচ্চস্তরের লোক।

সন্তোষের মনে হচ্ছে এই সবের ভিতরে থেকে থেকে, আরো সব বিচিত্রতার ভিতর দিয়ে গিয়ে-গিয়ে ওদের মাথার পরিকল্পনা, ছবি-কবিতা-গান, জীবনের সমস্ত রূপ, রস, পুলক ও উপভোগের দিকটা যে-রকম ফুটিয়ে তুলতে পারবে, সন্তোষ ও পূর্ণিমার প্রয়াসের থেকে তা সব সময়ই ঢের বেশি আশাপ্রদ হবে। নিজেদের শরীরের স্থূলতা সব দিক দিয়েই ধরা পড়ে যাচ্ছে। একদল রূপসীর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না সন্তোষ-অবাক হয়ে ভাবছে এত সব সুন্দরীরা এমন ভরসাজনক ঘনিষ্ঠতার ভিতর থাকতেও বিরাজ কেন মামাবাবুর ভাগ্নীকেই নিকটতম বলে মনে করল? সে অদ্ভুত খোঁজই-বা পেল কোথায় সে?

বৌ-ভাতের রাত চলেছে।

চামেলি কখন কোথায় কাদের দেখা দিয়ে বৌ-ভাতের কাজ শেষ করে গেছে জানা গেল না।

চামেলিদের জন্য পূর্ণিমার ও নিজের উপহারটাও, একটা উপহারেরই হয় তো, স্তূপীকৃত মেহগিনির টেবিলের ওপর রেখে এল সন্তোষ।

দেইড়ির পাশে কয়েকজন ব্যারিস্টার ও অফিসার কথা বলছিল-চামেলি ও বিরাজ দু'জনে প্রেসিডেন্ট লাইনারে চেপে ইউরোপে যাবে না আমেরিকা, আর দু-চার দিনের ভিতরেই।

প্রেসিডেন্ট লাইনারে গল্প হচ্ছিল।

সন্তোষ একটু থেমে দাঁড়িয়ে শুনছিল।

প্রেসিডেন্ট লাইনারের বিশেষত্ব হচ্ছে, ক্যালিফোর্নিয়ার ফল-সবজি-সুপ ইত্যাদির আগাগোড়া সমস্ত যাত্রায়, প্রত্যেক মিলের সঙ্গেই, dairy product all outside state roon, twin beds ইত্যাদি, গরম জল ঠাণ্ডা জলের পাইপ, থারমস্ বটল্, রিডিং ল্যাম্প, স্যুইমিং বাথ, কটেজ অরকেস্ট্রা, টি-ডানস্, ডিনার ও ইভনিং পার্টি সব সময়ই। মাঝখানে মিশরে তিন দিন জাহাজ থাকে-পিরামিড—নাইল-

সন্তোস রাস্তায় নেমে পড়েছে।

অমূল্য বললে—'কই, চামেলিদির সঙ্গে দেখা না করেই চললে?'

সন্তোষ বললে—'আজ তার মোসাহেব ঢের-নিজের পরিচয় দিয়ে বিরাজ ও চামেলিকে লজ্জিত করা মাত্র।'

অমূল্য বললে—'পূর্ণিমা যদি একটু দাঁড়িয়ে বিয়ে করত।

সন্তোষ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে পিছনের বাড়িটার দিকে একবার তাকালে, এমন ঐশ্বর্য ও রসোন্মত্ততার ভিতর কোনোদিনও সে আর প্রবেশ করে নি-দূর থেকে এ সব উপভোগ করবার রুচিও ভবিষ্যতে কোনোদিন আর যোগাড় করে উঠতে পারবে কি না সন্দেহ।

বিরাজ ও চামেলির জীবনের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের দিকে তাকালেও কোনো দূর দূরান্তরে পীত অন্ধকারের খোড়ো ঘরের ভিতর পূর্ণিমার উঁচু পেট ও ছাড়ানো পা দুটোর কথা জেগে ওঠে যে।

প্রতি পদে-পদে এমন অপরিহার্য তুলনা নিয়ে কোথায় যাবে সে? এর অবিচার, অপরাধ, অক্ষমতা ও বেদনার ভার সমস্ত জীবন নিজেকেই শুধু বহন করতে হবে তার-এমন সামর্থ্য নেই যে খোড়ো ঘরকেও সোনার প্রাসাদে দাঁড় করায়। তা হলে সে শক্তিকেই সাহায্য করতে ডাকত সে। কিন্তু নিজে কী নিদারুণ অক্ষম সন্তোষ।

এমন কোনো সমর্থ লোকও কি কোথাও আছে যে সন্তোষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়ে যায়? সন্তোষের নিজের উপভোগের জন্য নয়, নিজে সে শীতের রাতে গরুর ঘরে খড়গাদার ওপর শুয়ে থাকতেও রাজি আছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তোষের জন্য নয়—কিন্তু পূর্ণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

জীবনের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার সামঞ্জস্যের দিক দিয়েও ব্যবধানটা এমন অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে। যে-সৃষ্টিতে নক্ষত্রেরা থাকে কিন্তু তাদের অপর্যাপ্ত নিচে কোনো দিকেই কারো কোনো সহানুভূতি নেই, কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, কোনো সাহায্য নেই, নিজের কোনো শক্তি নেই, কোনো আকস্মিক যাদু বা ভেল্কির পৃথিবী ও যুগ নেই, বিধাতা, ধর্ম বা সন্ন্যাসেও কোনো বিশ্বাস নেইঃ তা থাকলেও একটা সম্বল শান্তি থাকত বটে। এর যে-কোনো একটা জিনিস যদি জীবনে থাকত-পূর্ণিমা যে-উপলব্ধি জাগায় (যার থেকে কোনো নিস্তার নেই আর) তার থেকে ত্রাণ না পেলেও অনেকটা উপশম পাওয়া যেত। কিন্তু কোথাও যে কিছু নেই।

অমূল্য বললে—'পূর্ণিমা বিরাজের চেয়েও ভাল জামাই পেত, আহা, একটু অপেক্ষা করত যদি।'

অমূল্য সবটুকুই বোঝে-এ জন্যই ওকে ভাল লাগে সন্তোষের।

অমূল্য একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললে—'তুমিও চেষ্টা করো না সন্তোষ উপযুক্ত জামাই হতে? বিরাজের মত? তা পারবে না, কিছুতেই না; শুধু কি এই আই-এম-এস ডাক্তারের দৌলতেই এই সব? ওদের সাত পুরুষের বনিয়াদি, কলকাতায় কে না চেনে ওদের?

—'কিন্তু বিরাজের মত না হলে কিছুই যে হওয়া গেল না অমূল্য।'

অমূল্য বিস্মিত হয়ে বললে—'কেন?'

সন্তোষ বললে—'চামেলি যা পাচ্ছে-পূর্ণিমাকে সবটুকুই দিতে হবে তো। আমি ওর জীবনে হঠাৎ ঢুকে পড়ে মেয়েটাকে এমন না খুইয়ে বসতাম যদি, ও সমস্তটুকুই তো পেত-হয় তো বেশিও পেত।'

—'তা হত হয় তো-হয় তো হত না; কিন্তু এখন কিছুই যে পাচ্ছে না।'—'পাক না পাক-তাকে মরতে দাও।'

অমূল্য বললে—'একটা বৌ-ভাতে এসেই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। মানুষের জীবন ঢের বিস্তৃত। অর্জন করবার ইচ্ছা চেষ্টা ও নিজেকে অক্লান্ত ব্যবহার করবার একটা পুরস্কার পাওয়াই যায়।'

সন্তোষ বললে—'বড়জোর একটু সাধারণ সচ্ছল জীবন পাওয়া যাবে। আমার নিজের পক্ষে তা ঢের তৃপ্তির বটে, জীবনের ঘরোয়া স্ত্রীদের পক্ষেও এ জিনিস খুবই কামনারই জিনিস বটে; পূর্ণিমাও তার সমস্ত রূপগুণ সত্ত্বেও এতদিন গরিবের ঘরের মেয়েই ছিল, জীবনের সাধারণ একটা স্বচ্ছন্দতা পেলে এখনও সে খুশিই হবে। আমিও সেই ব্যবস্থার চেষ্টাই করেছিলাম এতদিন। কিন্তু বিরাজ এসে একটা ভণ্ডুল লাগিয়ে দিল।'

অমূল্য বললে—'কই, চুরুটটা জ্বালালে না।'

সন্তোষ অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল। চরুটটা কোথায় রাস্তায় হাত থেকে পড়ে গেছে তার। বাসের দোতলার একটা নির্জন কোণায় বসে সন্তোষ বলছে—'আমার যদি প্রতিভা থাকত তার বেগে আমি উৎরে চলে যেতাম-পূর্ণিমাকেও সঙ্গে-সঙ্গে উঠিয়ে নিতাম। কিন্তু অত্যন্ত সামান্য শক্তির মানুষ আমি-একটা সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবস্থার পথ খুঁজছিলাম মাত্র-তারই ভিতর আমার মুগ্ধতা ছিল। কিন্তু বলছিলাম যা ভণ্ডুল লাগিয়ে দিল বিরাজ; কিন্তু তারই বা দোষ কি? রূপসীকে পছন্দ করে বিয়ে করেছে-অস্বাভাবিক কিছু করে নি। কিন্তু মনে হয় পূর্ণিমার বোনকেই বিয়ে করবার কী দরকার ছিল বিরাজের? পৃথিবীতে সুন্দরী কি আর ছিল না? কিংবা রূপসী বুদ্ধিমতী মেয়ে দেখে বিয়ে করবারই বা কী দরকার ছিল আমার? আমার জীবন যা-আমার জীবনের গভীর প্রয়োজনের নিকট রূপ ও তীক্ষ্ণতার কী মূল্য রয়েছে? কতটুকু? নম্র মমতাময়ী সহিষ্ণু সাধারণ মেয়ে পৃথিবীতে কি ছিল না আর? তেমনই কোনো একটিরই যে বড় দরকার ছিল আমার। কিন্তু যা হয়েছে-তা হয়েছে। এই সব বিশৃঙ্খলার ভিতরেও প্রেমকে আমি হারাই নি।'

প্রেমের তার নিজস্ব সংজ্ঞা অমূল্যকে বুঝিয়ে দিচ্ছে সন্তোষ। বলছে—'একে প্রেম বলতে পারো, করুণা মমতা বলতে পারো, কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে আদরের বা কৃপার পাত্রের চেয়ে ঢের বেশি করে পূর্ণিমাকে এই জিনিস আমি দিয়েছি। একা তাকেই আমি ভালবাসি-এই পৃথিবীতে নানা জায়গায় নানা রকম দুঃস্থতা ও দুরবস্থা থাকলেও একা পূর্ণিমারই এই জিনিসটা সবচেয়ে আগে ও গভীর করে বুকে গিয়ে লাগে। কর্তব্য বোধে নয় অমূল্য—জীবনের স্বাভাবিক নিয়মের গতিতেই। কিছুতেই এই মমতা, ভালবাসা, দয়ার ফাঁদ থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিতে পারছি না আমি। বিয়ের আগে মেয়ে মানুষের ভালবাসা বলো, করুণা মমতা বলো, পুরুষ যতটুকু মাধুর্য তার জীবনের থেকে বের করতে পারে-তার বিবাহিত স্ত্রীটিকে নিয়েই সব। জীবনের দিনরাত্রির সংসর্গের এমনই একটা জোর, স্বামী-স্ত্রীর জীবনের অজস্র খুঁটিনাটির ভিতর মোহ এত কম, লালসা এত কম, অনুকম্পা এত বেশি, এবং পৃথিবীটা যতটুকু স্থির হয়ে বেঁচে রয়েছে, তুমি ভেবে দেখো, তা অনুকম্পারই অতি তুচ্ছ খণ্ডাংশ নিয়েই, লালসা বা মোহ, উত্তেজনা, ক্ষুধা বা হিংসার জোরে নয়-এ জিনিসটা এত বেশি শক্তিশালী! তোমাদের বিধাতাকেও তোমার এই দিয়েই সৃষ্টি করেছে-দাম্পত্য জীবনেও স্বামীও স্ত্রীর প্রতি উদাসীন হতে গিয়েও এরই আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারে না-যে স্ত্রীর সঙ্গে সাতটি দিনও ঘর করেছে সে অনুকম্পায় করুণায় তারই জন্য অভিভূত হয়ে পড়ে।

নইলে, জীবনের সব জিনিসের প্রতিই তো শেষ পর্যন্ত গিয়ে বিমুখই ছিলাম-স্ত্রীর রূপ ও মোহও এক দিন লালসার খাদ্য জোটাল না আর, জীবনের অশ্রুমমতার ভিতর তলিয়ে গেল। এই অশ্রু মমতাই সত্য-দাম্পত্য জীবনে বধূকে নিয়ে এই মমতা ও অশ্রু।

সাত-আট দিন কেটে গিয়েছি।

সন্তোষের চোখে সমস্ত পৃথিবী যেন নরম, কোমল, মধুর ও নিবিড় হয়ে উঠেছে; পূর্ণিমা সেই খোড়ো ঘরের ভিতর পা ছড়িয়ে বসে রুদ্ধ হয়ে নেই আর। প্রসবের ভোরের মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর ভিতর সে ছড়িয়ে পড়েছে-সমস্ত পৃথিবীর ভিতর সে ছড়িয়ে পড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী

এক

রায়চৌধুরী মশাই নানারকম কথা ভাবছিলেন ঃ প্রথমতঃ জমিদারীটা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে দিলে কেমন হয়? ভাবতে গিয়ে তিনি শিহরিত হয়ে উঠলেন। অবস্থাটা অত খারাপ হয়নি।

কোনোদিনও যেন না হয়—ও রকম অবস্থা!

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কথা তিনি ভুলে যেতে চাইলেন।

হাতের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল—

রায়চৌধুরী মশাই জ্বালিয়ে নিলেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শালিখবাড়ির নদীর পাশে তার দরদালানটা—রায়চৌধুরীদের তেতলা জমিদার বাড়ি; সেই ক্লাইভের আমলে তৈরি আধ—ইংরেজি আধ—মুসলমানী ধরণে একটা মস্ত বড় ধূসর পুরীর মতো; চারদিককার আকাশ, মাঠ, ধানের ক্ষেত, নদী, নদীর বাঁক, খাড়ি, মোহানা, চরগুলোকে উপভোগ করবার এমন একটা গভীর সহায়তা করছে—দৈত্যরাজের উঁচু কাঁধের মত এই প্রগাঢ় বাড়িখানা।

তেতলার পশ্চিম দিকে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে চৌধুরী মশাই দেখছিলেন সব—উত্তর দিকে ন্যাওতার মাঠ—ধূ ধূ করে অনেক দূরে ভিলুন্দির জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। এই মাঠে কত কি যে ব্যাপার কতবার হয়ে গেল—নিজের চক্ষেও চৌধুরী কত কিছু দেখলেন!

তারপর এল শান্তি—মাঠটা স্কুল কলেজের ছেলেদের ফুটবল গ্রাউন্ড হল, কখনো বা মীটিং হয় এখানে, কংগ্রেসের ক্যাম্প বসে, ডিস্ট্রিক্ট টিচারদের, মুসলমানদের, মাহিষ্য নমশূদ্রদের কনফারেন্স হয়; বেদিয়ারা আসে, বৈষ্ণববৈষ্ণবীদের আখড়া হয়ে ওঠে।

এই সমস্ত শান্তির (উন্নতি অবসরের) জিনিস। আগেকার অনেক গ্লানি পাপ কলঙ্কের ওপর এগুলো ঢের সান্ত্বনার মত।

(মাঠটার প্রায় সমস্ত জায়গাই এখন উলুঘাসে ভ'রে আছে—আর কাশে। কিন্তু ফুটবল খেলা আরম্ভ হবার আগেই মাঠের দক্ষিণ দিকটা বেশ পরিষ্কার করে নেওয়া হবে।)

বর্ষার মুখে শালিখবাড়ির নদীটা পেটোয়া হয়ে উঠেছে।

ইলিশ মাছের জালে জালে নদীটা ভরে গেছে; পশ্চিম মুখে নদীর কোলঘেঁষা একটা সরু লাল রাস্তার দিকে তাকালেন চৌধুরী—বিশ পঞ্চাশটা ইলিশের নৌকা জমা হয়ে গেছে ওখানে—আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত টাউনটার নাড়ীনক্ষত্রে ইলিশের চালান শুরু হবে।

কুড়ি পঁচিশটা স্টিমার তিন চারটা বড় বড় জেটির কিনার ঘেঁষে নদীর (ঘাটের কাছাকাছি) ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে; দু'একটা কয়লাঘাটার দিকে ধীরে ধীরে যাচ্ছে; সবসময়ই এমনি অনেকগুলো স্টিমার এই ঘাটে মোতায়েন হয়ে থাকে; এখানকার এ স্টিমার স্টেশন এ অঞ্চলে খুব বড়।

কলকাতার এক্সপ্রেস স্টিমার ছাড়ল।

চৌধুরী মশায়ের চুরুট জ্বলতে জ্বলতে নিভে গিয়েছে আবার।

জ্বালালেন তিনি।

জমিদারবাড়ির তেতলার কাছের আকাশটা ঘিঁষে কাকগুলো ভিলুন্দির জঙ্গলের দিকে চলল। পশ্চিমের গোলাপী পিঁয়াজী মেঘের ভিতর নলচের মত কালো কালো ঠোঁট মুখ পাখা নিচে সবুজ নাকি নীল জঙ্গল ধানক্ষেত রূপোর পৈঁছের মত নদী—শকুনের মেটে পাকা চিলের সাদা পেট সোনালি ডানা—রাত গাঢ় হয়ে নামবার আগে এইগুলো রঙের খেলা—রসের খেলাও বটে।

কিন্তু দু-এক মুহূর্তের শুধু—

শঙ্খচিলটা অন্তর্হিত হ'ল।

খানিকক্ষণ পরে পৃথিবী একটু চিমসে জ্যোৎস্না জোনাকী আর লক্ষ্মীপেঁচার দেশে এসে হাজির হয়েছে। (মন্দ নয়।) নিভন্ত চুরুটটা আবার জ্বালানো গেল।

চৌধুরী ভাবছিলেন ঃ বড় ছেলেটা বিলেত থেকে ফিরবে না আর তা হ'লে? আই-সি-এস পড়তে গিয়েছিল; কিন্তু আই-সি-এস পাস করবার মতো চোপা তো তার নয়; একটা টেকনিক্যাল কিছু শিখে এলে পারত; কিন্তু তাও তো এল না; এই আট বছরের ভিতর ফেরবার নামটি অব্দি করছে না; আগে খুব লিখত টিখত; এখন হদ্দ লুকোচুরি করছে। তাকে আর টাকা পাঠাবেন তিনি?

গুণময়ীর জন্যই—নাহ'লে দু-তিন বছর আগেই তিনি টাকা বন্ধ করে দিতেন।

ছেলেটা হয়তো বিলেতে বিয়ে করেছে; তার স্ত্রী ছেলেপুলের ফটোও নাকি কারু কারু কাছে পাঠায় সে—

না, টাকা আর তাকে পাঠাবেন না তিনি।

ছোট ছেলেটা হয়েছে কলকাতার এক লজ্জা; এদ্দিনে বি-এস-সি হয়ে যেত। কিন্তু এখনো সেকেন্ড ইয়ারে রয়েছে; বাপের টাকায় সুখের পায়রার অনেক সুখই মেটাচ্ছে সে—কিন্তু গোলাপের তোড়া হাতে থিয়েটারের গ্রিনরুমে ঢুকে শালিখবাড়ির ছোট কর্তা না কি...ভাবতে ভাবতে চৌধুরী বেকুল হয়ে পড়লেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মেজ ছেলেটির কথা ভাবলে মন বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে—সে এখানে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে প্র্যাকটিস করছে—বছরখানেক ধরে। এরি ভিতর জমিয়ে নিয়েছে।

চৌধুরী বলেছিলেন ঃ হাইকোর্টে যাবে?

একটু সবুর কর বাবা।

একটু সবুর করে প্রসাদ হাইকোর্টে যাবে—হয়তো পিউনী জজ হবে।

চৌধুরীর মন পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠল।

(তারপর তিনি) নিজের মেয়েটির কথা ভাবতে লাগলেন; কল্যাণী এবার চোখের অসুখের জন্য আই-এ দিতে পারল না। তিনিই নিষেধ করেছেন দিতে! আর কেন? পড়বার সখ—তা সে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ঢের হয়েছে—ঢের—এইবার মেয়েটার একটা কিছু স্থির করতে হবে।

দুই

চৌধুরী মশাই সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন না বটে, কিন্তু জীবনের প্রতি কাজে—প্রতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজেও পদে পদে বিধাতাকে মানেন তিনি। ভালো করলেও এ বিধাতাই করেছেন, অমঙ্গল করলেও এ বিধাতারই না জানি কি নিগূঢ় ইঙ্গিত—এমনি তার বিশ্বাস—অত্যন্ত স্পষ্ট—কেমন সরল—কি যে আন্তরিক—গভীর বিশ্বাস তার। (লোকটি) জানেন শোনেন অনেক; উনিশ শো এক সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে চৌধুরী বি-এ পাস করেছিলেন। সেই থেকে পড়াশুনার ঢের চর্চা নানা দিক দিয়ে করে এসেছেন। বাড়িতে মস্ত বড় একটা লাইব্রেরী আছে—আজো নতুন নতুন মোটাসোটা বই ঢের আসে কলকাতার দোকানপাট থেকে—বিলেতের ফার্মগুলোর থেকে অব্দি; নানারকম দেশী বিলিতী নিবিড় ম্যাগাজিন আসে সব। এত চিন্তা যুক্তি গবেষণার আবহাওয়া মানুষের শ্রদ্ধা বিশ্বাসের তাল খসিয়ে উড়িয়ে ফেলে—কিন্তু তবুও চৌধুরী আজো কোনো কথা কাজ বা ব্যবহারের ধাপ্পাবাজি ভোজবাজি গোঁজামিলের ভিতরে নেই,—মানুষের মনের অতি উৎসুক চিন্তা ও প্রশ্ন যেন বারবধূদের মত (নয় কি?)—সে সবের হাত থেকে তাঁর ধর্মকে রক্ষা করেন তিনি, ন্যায়কে রক্ষা করেন, নিজের বিধাতাকে রক্ষা করেন।

যেন কখনো কোনো ব্যভিচার না হয়—অবিচার না হয় যেন—মঙ্গলময় ভগবান জীবনের পদে পদে প্রতিফলিত হয়ে চলেন যেন—চৌধুরী মশাই খুব খাঁটি আগ্রহে নিজের মনকে অনেক সময়ই এই সব কথা বলেন।

কল্যাণী কলকাতার থেকে এসেছে; ছোট ছেলে কিশোরও এসেছে। একদিন বিকেলবেলা প্রসাদ কোর্টের থেকে ফিরে বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে চুরুট টানছিল।

বাবা এসে আরেকটা ইজি চেয়ারে বসলেন।

প্রসাদ চুরুটটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল।

চৌধুরী বললেন—তা খাও; আমিও তো খাই। লাঙ্‌স আমাদের দু'জনেরই ভাল আছে।

হাসলেন।

নিজেও চুরুট বের করলেন।

প্রসাদও টানতে লাগল।

চৌধুরী বললেন—এ বার কাজের কথা।

প্রসাদ বাবার দিকে তাকাল।

'তোমার দাদাকে আর টাকা পাঠাব না ঠিক করেছি।'

প্রসাদ চুপ করে রইল; সে তো বরাবরই বাবাকে বলে এসেছে দাদাকে টাকা পাঠান মানে জমিদারি আস্তে আস্তে গুটিয়ে ফেলা; প্রজারা খাজনা দিতে চায় না, গভর্নমেন্টকে রেভিনিউ দিতে হচ্ছে, সম্পত্তি ভেঙে খেতে হচ্ছে—ওকালতী করতে বাধ্য হতে হচ্ছে—অনেক কিছুই দাদার গুখ্‌খুরির জন্য।

পঙ্কজবাবু বললেন—অন্যায় হবে প্রসাদ?

প্রসাদ বললে—একেবারেই ওকে একটা পয়সাও আর কোনোদিন তুলে দেবে না এইটে আগে ঠিক করতে পার যদি—(তারপর কথা।)

পঙ্কজবাবু একটু স্থির থেকে বললেন—কি করে আর দেই?

প্রসাদ বললে—স্টেটে টাকা নেই বলে?

—না, তা নয়।

—তবে কি বাবা?

—টাকা এখনও—টাকা বিজলীকে পাঠাবার ক্ষমতা এখনও দু-চার বছর বেশ আছে আমার—কিন্তু—

পঙ্কজবাবু থামলেন—

প্রসাদ বললে—তা হ'লে দু'চার বছর আরো পাঠাও।

—তা পাঠাব না।

প্রসাদ একটু হেসে বললে—ওর চিঠি পেলে তোমার মন খুব উসখুস করে না বাবা? কোনো কল্পিত সঙ্কল্পই টেকে না আর তোমার। দাদা খুব চমৎকার চিঠি লিখতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ওর চিঠি এবার আর পড়বও না আমি—কেবল পাঠালে ছিঁড়ে ফেলে দেব।

প্রসাদ ঘাড় হেঁট করে চুরুটটার দিকে তাকাচ্ছিল।

পঙ্কজবাবু বললেন—এইই ঠিক হবে।

তাঁকে খুব দূর মনে হ'ল।

প্রসাদকে বললে—তোমার মাকে বলিনি।

—কি দরকার বলবার?

—মিছেমিছি কেন আর?

—অন্যায় হবে না?

—কিসে বাবা?

—এই যে তোমার মার কাছে গোপন করলাম—অন্য কাউকে বলিনি—অন্যায়? Not sending money—অন্যায়?

প্রসাদ চুরুটের মুখের থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলে কিছুক্ষণ ক্লান্ত হয়ে বসে রইল। পরে বললে—আমাদের খেতে হবে তো?

—তাই তো।

কিশোরকে দেখতে হবে, কল্যাণীর কথা ভাববার রয়েছে—

পঙ্কজবাবু বললেন—না, না, অন্যায় হবে না কিছু। কত ছেলে মরে যায় মা'রা সহ্য করে না?

বললেন—আমি তো মনে করি বিজলী মরে গেছে—তোমার মাও সেরকম ভাবতে পারবেন না?

প্রসাদ বললে—না যদি পারেন তিনিও মরে যাবেন—

পঙ্কজবাবু বিস্মিত হয়ে প্রসাদের দিকে তাকালেন।

প্রসাদ বললে—কিন্তু তিনি মরবেন না। কে কার জন্য মরে?

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল—

প্রসাদ বললে—কিন্তু মা যেন এ সবের একটুও আঁচ না পায়,—তা হলে খুঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত তোমাকে দিয়ে টাকা পাঠিয়ে ছাড়বে—

পঙ্কজবাবু বললেন—তা বটে—

প্রসাদ বললে—ঘোঁট আর কোরো না কিছু—টাকাটা বন্ধ করে দিয়ে—

গুণময়ী এক মুহূর্তের জন্য এসে দাঁড়ালেন—শাড়ীতে হলুদ লঙ্কার চ্যাপসা, হাত পা গায়ে মশলার গন্ধ মাছের মিষ্টি আঁশটে গন্ধ—একেবারে রান্নাঘরের থেকে ছুটে এসেছেন—

প্রসাদের দিকে তাকিয়ে গুণময়ী বললেন—একেবারে তিনটে রুইমাছ ভেট পাঠিয়েছে।

—কারা মা!

ঘোষালরা।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—এক একটা রুই যেন এক একটা সোমথ মানুষের বাচ্চা—এমন তরতাজা মাছ—আহা কাটতেও কষ্ট হয়—

পঙ্কজবাবু বললেন—তা হ'লে কাট কেন—

—আহা, এক দিন ভালো করে মাছের কালিয়া হল না। যাই—আমি না রাঁধলে আবার ঐ বামুনের রান্না খেতে পারবি প্রসাদ?

প্রসাদ মাথা নেড়ে বললে—তা পারব না আমি—

গুণময়ী বললেন—আহা, বিজলীও পারত না—

প্রসাদ ফু ফু করে হেসে বললে—আজ খ্রিস্টানের রান্না খাচ্ছে—

গুণময়ী হতাশ হয়ে বললেন—সে কি রকম রান্না রে?

—সে কি রান্না। সব সেদ্ধ—শালগম সেদ্ধ—মুলো সেদ্ধ—বিট সেদ্ধ—স্যালাড—আধসেদ্ধ মাছ—আঁশটে।

গুণময়ী একটা খোঁচা খেয়ে অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

পঙ্কজবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন—

পরে বললেন—মেম বিয়ে করেছে দেশে আসতে চায় না, মা বাবা ভাই বোন কারুর কাছে একখানা চিঠি অব্দি না—আমার কাছে শুধু সেই টাকাকড়ির চিঠিগুলো ছাড়া—এ কেমন?

প্রসাদ বললে—কেমন অস্বাভাবিক যেন।

—আমাদের এস্টেট তো খুব বড় নয়—নানা দিক দিয়েই জড়িয়ে গেছে—তার ওপর নবাবের হালে এই আট বছর ওকে টাকা পাঠালাম—ও যা পেত তার চেয়ে ঢের বেশি ওকে দেওয়া হয়ে গেছে—

পঙ্কজবাবু থামলেন—

তারপর বললেন—কাজেই দ্বিধার কিছু নেই—যদি আমি—

প্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—না প্রসাদ?

কিন্তু মন যেন পঙ্কজবাবুর সায় পাচ্ছে না—কোথায় যেন কেমন কি খোঁচ থেকে যায়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের এই সঙ্কোচ বাঁধাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে বললেন—টাকা পাঠাইলে বা হবে কি—কোনো ভালো কাজে তো নয়—থিয়েটার রেসে ওড়াবে। তা ছাড়া, নিজে সে ঢের বড় হয়েছে এখন; নিজের ঘাড়ের দায়িত্ব এখন ভালো করে বোঝা উচিত তার। নিজের রোজগার করা উচিত তার। না করতে পারে—আসুক এখানে—আমরা দেখব সব। নাহ'লে এক পয়সাও পাঠাব না।

(পরদিন পঙ্কজবাবু প্রসাদকে বললেন—সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিজলীকে আর এক খানা চিঠি লিখলাম এই। না যদি শোনে, আর টাকা পাঠাব না। এ বার দেড় হাজার পাঠালাম—আধাআধি কমিয়ে দিয়েছি—

কিন্তু কয়েক দিন পরে আরো দেড় হাজার পাঠিয়ে দিলেন তিনি।)

পর দিন সকাল বেলা প্রসাদ ছাড়া আর সকলেই ছিল তেতলার পুব দিকের বারান্দায়।

কল্যাণী বললে—বাবা, ন্যাওতার মাঠ কেন বলে? ন্যাওতা মানে কি?

—কী জানি।

কিশোর বললে—শব্দটা কি আরবী না ফারসী না ইংরেজি—

পঙ্কজবাবু বললেন—জানি না।

কল্যাণী বললে—কোনো ডিকশনারিতে এর মানে পাবে না ছোড়দা—

—তবে ন্যাওতার মাঠের মানে কি?

—সত্যি, ন্যাওতার মাঠ ওটাকে বলে কেন?

—কি অদ্ভুত শব্দ

—কোনো মানে নেই—কি বিশ্রী

পঙ্কজবাবু অবিশ্যি মানেটা জানতেন—(অন্তত) যে প্রবাদ অনেক দিন থেকে এ মাঠের সম্পর্কে এ অঞ্চলে প্রচলিত হয়ে এসেছে তার সমস্তটুকুই জানতেন তিনি। কিন্তু সে সব কাহিনী বলতে গেলে পূর্বপুরুষদের দু'একটা গ্লানি বেরিয়ে পড়ে—কাজেই বললেন না কিছু।

কল্যাণী বললে—ভিলুন্দির জঙ্গলই বা কি?

—তাই তো—

—আমি অনেক দিন ভেবেছি—কোনো মানে বের করতে পারিনি—

—আমিও না

কিশোর বললে—ভিলুন্দি বলে আবার একটা শব্দ আছে না কি কোথাও?

কল্যাণী বললে—ছাই আছে।

একটু পরেঃ কোন ডিকশনারিতে পাবে না তুমি ছোড়দা

কল্যাণী বললে–কত সুন্দর সুন্দর নাম দিতে পারত না ছোড়দা? তা না ভিলুন্দির জঙ্গল—

পঙ্কজবাবু বললেন— আচ্ছা বেশ।

বললেন—ও নাম আমার কাছে ঢের সুন্দর শোনায়।

এই জঙ্গলের সম্পর্কেও অনেক দিন থেকে একটা কাহিনী চলে আসছে; কিন্তু নানা কারণে সেই গল্পটাও এদের কাছে আজ তিনি পাড়তে পারলেন না।

কল্যাণী বললে—মোটের ওপর এ জায়গাটা আমার ভালো লাগে না—

পঙ্কজবাবুর হাত থেকে খবরের কাগজ আস্তে আস্তে তাঁর কোলের ওপর পড়ে গেল—

কল্যাণীর দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে তিনি বললেন—ভালো লাগে না নাকি? এ জায়গাটা তোমার ভালো লাগে না কল্যাণী?

—নাঃ!—

—কেন?

কল্যাণী বললে—বড্ড পাড়াগাঁর মত—

কিশোর বললে—হ্যাঁ, একটা ডিস্ট্রিক্ট টাউন—জজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের হেড কোয়ার্টার ওমনি পাড়াগাঁ বলে দিলেই হল আর কি!

কল্যাণী বললে—তা হোক গে—

গুণময়ী বললেন—তা ছাড়া মেয়ে আমার এই কলকাতা থেকে নেমেছে, আহা, একটু একলাটি লাগবেই তো!

পঙ্কজবাবু বললেন—আমাদের এ দিকটা আবার একেবারে শহরের এক প্রান্তে কি না—

কল্যাণী বললে—কি কেবল দিনরাত ঘুঘু ডাকে—আমার ভালো লাগে না—

কিশোর হেসে উঠল—

বললে—সেই হরিণ মারার রাইফেলটা নিয়ে এক বার বেরুতে হবে—জান মা, আমি লিলুয়াতে গিয়ে প্রায়ই পাখি মারি—ঘুঘু, লালশিরে, স্নাইপ, বুনোমুরগি, বালিহাঁস—হাত বেশ পেকে গেছে এখন—

কিশোরের কথায় কেউ কান দিচ্ছিল না—

গুণময়ী বললেন—তুমি কেন দিনরাত ঘুঘুর ডাক শুনতে যাও কল্যাণী

—বাঃ মার যেমন কথা ঘুঘু ডাকবে, আমি শুনব না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোর বললে—তুমি বুঝি শোন না মা?

পঙ্কজবাবু বললেন—কৈ, আমার তো ঘুঘুর ডাক খারাপ লাগে না।

গুণময়ী বললেন—আমারও না।

কিশোর বললেন—তা তোমরা গেঁয়ো বলে।

পঙ্কজবাবু বললেন—বাস্তবিক

কল্যাণী বললে—এমন টেনে টেনে ডাকে; সারাদিন—সারা দুপুর—শুনতে শুনতে আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না আর—তার ওপর ক্যারম বোর্ড নেই; তার খেলব কাদের নিয়ে—কেউ নেই—সে রকম কোনো লোকজন নেই, একটু সিনেমা দেখতে পারা যায় না, থিয়েটার নেই, গান নেই—সব সময়ই ঘরদোর এমন থম থম করছে।

কিশোর হো হো করে হেসে উঠল—

পঙ্কজবাবু বললে—তুমি তাহ'লে ক্যারম খেলতেও শিখেছ—?

কল্যাণী বললে—কবে শিখেছি!

—বোর্ডিঙে গিয়ে?

—বাঃ, এখানেই তো—

—এখানে?

—বাঃ, ছোড়দার একটা বোর্ড ছিল—

পঙ্কজবাবু বললেন—ওঃ—

বললেন—বিলিয়ার্ডস খেলতে জান কল্যাণী?

—না।

—কলকাতায় খুব বায়োস্কোপ দেখতে?

—হ্যাঁ

—কার সঙ্গে যেতে?

—কল্যাণী একটু ফাঁপরে পড়ল—

বললে—মেয়েদের সঙ্গেই যেতাম

—তা যেতে দেয়—

—দেয়—

পঙ্কজবাবু বললেন—আর থিয়েটার?

থিয়েটারেও সে গিয়েছে বটে ঢের—ছোড়দা আর তার বন্ধুদের সঙ্গে—কিন্তু সে সব কথা চেপে গেল কল্যাণী।

বললে—না, থিয়েটারে আমি যাই নি বাবা।

—কোনো দিনও না?

—না

—তবে যে বলছিলে?

কল্যাণী বললে—বললামই তো যাইনি

—কেন যাওনি

—তোমার অনুমতি না নিয়ে যাওয়া উচিত নয় কি না—তাই—

পঙ্কজবাবু বললেন—এবার আমি যদি অনুমতি দেই তাহ'লে যাবে?

কল্যাণী দু'এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললে—আমি আরো বড় না হ'লে তুমি কি অনুমতি দেবে বাবা?

পঙ্কজবাবু একটু থেমে বললেন—হয়তো আমি কোনোদিনই তোমাকে অনুমতি দেব না—থিয়েটার দেখতে।

কল্যাণী একটু বিস্মিত হল, আঘাত পেল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সে সব মুছে গেল তার; বাবা থিয়েটার দেখতে বারণ করলে বিশেষ কিছু আসে যায় না, টিকিট কাটবার পয়সা থাকলেই হয়—জীবনের এমন এক রকমের সত্যকে তার ভাইদের সঙ্গে সেও অধিগত করেছে। অধিগত করতে গিয়ে পঙ্কজবাবুর ছেলেমেয়েদের মধ্যে কল্যাণীকেই সবচেয়ে বেশি বেগ পেতে হয়েছে—অধিগত ক'রেও তারই সবচেয়ে কম শান্তি। কিন্তু তবুও সংস্কারহীন গণ্ডীহীন সুবিধাবাদের জীবনকেও সেও আয়ত্ত করেছে—

পঙ্কজবাবু বললেন—তোমার বাপ মা ভাইদের মধ্যে এসেও যে তোমার ভালো লাগে না—একটা ক্যারাম বোর্ড তাস বায়োস্কোপ গল্প গুজব গান কলকাতার সব আনুষাঙ্গিক না হলে তোমার যে চলে না এমনতর মনের ভাবটাকে তোমার পরিত্যাগ করতে হবে। এখানেই তোমার মন বসাতে হবে। তোমার জন্য একটা ক্যারাম বোর্ড কিনে দেব না আমি, তাসও খেলতে পারবে না, এখানে একটা বায়োস্কোপ হল হয়েছে সেখানেও যেতে দেব না তোমাকে আমি—কিন্তু—

কল্যাণী কাঁদছিল—

পঙ্কজবাবু বললেন—কিন্তু তোমার মা যেমন এই বাড়িতে বসে ঢের পরিতৃপ্তি পাচ্ছেন সে রকম একটা তৃপ্তি ধীরে ধীরে বোধ করা তোমার পক্ষেও সম্ভব হবে।

কল্যাণী চোখের জল মুছতে লাগল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঙ্কজবাবু বললেন—এখানে কোনো অশান্তি নেই তো—ভালো লাগবে না কেন তোমার?

বললেন—শালিখবাড়ি তোমার ভালো লাগে না—তোমার বাপ-মা ভাইদের ভিতরে এসেও তোমার ভালো লাগে না—এমন কথাও তুমি বলেছিলে।

কল্যাণীর আবার কান্না এল, কিন্তু জোর করে নিজেকে নিরস্ত করে রাখল সে।

পঙ্কজবাবু বললেন—তুমি এদ্দিন চাল যা শিখেছ ভুল শিখেছ—

সকলেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। পঙ্কজবাবু আবার বললেন—সব ভুল শিখেছ—

কল্যাণীর মনে হল তার বাবাই ভুল শিখেছেন—কত বড় বড় লোক থিয়েটার দেখে, বায়োস্কোপ দেখে, নাচ গান মজলিসে ফুর্তি করে, এ রকম একটা পাড়াগাঁয় এলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে—তাদের কি ভুল শিক্ষা? কক্ষণো না। তার বাবাই যেন কেমন কঠিন ধরণের মানুষ—

কিশোরের মনে হ'ল কল্যাণী তো ঠিকই বলেছিল, এ জায়গা আবার ভালো লাগে কার? কোনো ভুল করেনি—তার বাবার শিক্ষাই অসম্পূর্ণ।

গুণময়ী ভাবছিলেন, আহা, মেয়েটাকে মিছেমিছে কাঁদাচ্ছেন কেন।

পঙ্কজবাবু বললেন—শুধু কলেজে পড়লেই হয় না, ডিগ্রি নিলেই হয় না—বই তো আমিও ঢের পড়েছি—

থামলেন।

বললেন—মস্ত বড় একটা লাইব্রেরী রয়েছে আমার—

বললেন—অনেক বড় বড় লেখকদের অনেক বই আছে। তারা নাকি চিন্তাশীল—মনীষী—ঋষি—কত কি। কিন্তু যত অদ্ভুত কথা তারা বলেছে সেই সব যদি মানতাম তা হলে একটা মস্ত বড় ব্যভিচারী জমিদার হতাম আমি আজ—অনাচারকেও ধর্ম মনে করতাম। কিন্তু সে সব ভুল।

অনেকক্ষণ বসে শিক্ষার ব্যাখ্যা করলেন তিনি, ছেলেমেয়েদের শেখালেন ধর্ম কি, নীতি কি, ধর্ম নীতি চরিত্র ছাড়া যে কোনো শিক্ষা হতে পারে না বললেন তা, বিধাতা যে কি রকম মঙ্গলময় কত মঙ্গলময় খুলে বললেন।

আগাগোড়া সমস্ত কথার মধ্যেই এর ঢের আন্তরিকতা—আগ্রহ ছিল। কিন্তু এর একটা কথাও গ্রাহ্য করল না ছেলেমেয়েরা, গ্রাহ্য করল না।

তাদের মনে হ'ল বাবার চেয়ে জীবনটাকে তারা ঢের বেশি বোঝে। কল্যাণীর মনে হল বাবার মনে কষ্ট না দিয়েও তো থিয়েটার দেখা যায়—বাবা না জানলেই হ'ল; কলকাতায় যেমন সে বরাবর চলে এসেছে তেমনিই চলবে। বাবার উপদেশ শুনবার পর নিজের রকমটাকে কোনো দিক দিয়ে কোনোভাবে বদলাবার কোনো তাগিদ বোধ করল না কল্যাণী। জীবনটাকে সে নিজের রুচি অনুসারে চালাবে—বাবা হয়তো একটু আধটু কষ্ট পাবেন; কিন্তু প্রায়ই তো জানবেন না তিনি। কল্যাণীর লুকোচুরির সম্বন্ধে পঙ্কজবাবু যাতে কোনো দিনও কিছু না জানতে পারেন মনে মনে তারি নানা রকম দুঃসাধ্য উপায় বাৎলাচ্ছিল মেয়েটি। মন তার হয়রান হয়ে উঠেছিল। এক সময় মনে হল; বাবা তো চিরকাল বেঁচেও থাকবেন না।

তিন

আষাঢ় মাস—কিন্তু ঠিক যেন কার্তিক মাসের আকাশ—এমনই নীল—এমনই পরিষ্কার—ন্যাওতার মাঠের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আর ভিলুন্দির জঙ্গল—এমন গাঢ় সবুজ—গাঢ় নীল—রোদের সোনার গুঁড়ি জঙ্গলটার মাথার ওপর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত একটা জরির পাড়ের মত চলে গিয়েছে যেন—কোন্ পরীদের যেন—এমন বিচিত্র।

পঙ্কজবাবু বললেন—কল্যাণী এখনো ঘুমোচ্ছে—

মেয়ের মাথার ওপর হাত রাখলেন তিনি—

বললেন—আর ঘুমোয় না—

কল্যাণী ঘুমের গলায় বললে—বাবা আমি এখন উঠব না

—কেন?

—আমার ঘুমোতে ভালো লাগছে

সে পাশ ফিরল।

একটা কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে অলসতার নিবিড় আরামে মেয়ের সমস্ত দেহ ভরে উঠছে আবার পঙ্কজবাবু দাঁড়িয়ে দেখলেন—

গুণময়ী ছিলেন; বললেন—থাক্—ও ঘুমোক্।

পঙ্কজবাবু সে কথায় কোনও কান না দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে পুবের দিকে জানালাটা খুলে দিলেন—চড়চড়ে রোদে কল্যাণীর চোখ মুখ মাথা পুড়ে উঠল যেন।

কল্যাণী বিছানার ওপর উঠে বসে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে বললে—বাবা, তোমার এই কাজ।

পঙ্কজবাবু বললেন—অনেক ঘুমিয়েছ তুমি—

তিনি আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন—কল্যাণী নাক মুখ খিঁচিয়ে বললে—অনেক ঘুমিয়েছি তাতে তোমার কি বাবা।

গুণময়ী বললেন—থেকি হোস্ না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমিও আমার পেছনে লেগেছ মা

—এত দেরী করেই বা তুই উঠিস কেন?

—যটার সময় খুসি তটার সময় উঠব, তাতে তোমাদের কি?

পঙ্কজবাবু বললেন—নাও, এখন ওঠো, বিছানা ঝেড়ে ঘর গুছিয়ে একটু লক্ষ্মী মেয়ের মত হও।

কল্যাণী বললে—আমি উঠব না।

পঙ্কজবাবুর সাক্ষাতেই শুয়ে পড়ল সে।

গুণময়ী বললেন—থাক্।

কিন্তু কল্যাণী উশখুশ করে সবার চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেই উঠে বসল আবার; উঠে বসল, চুপ করে নখ খুঁটতে খুঁটতে।

বললে—বিছানা আমি ঝাড়তে পারব না।

গুণময়ী বললেন—আমি ঝেড়ে দেব যা—

পঙ্কজবাবু বললেন—না, তোমার নিজেরই ঢের কাজ আছে—মেয়ের কাজের জন্য তোমাকে আমি আটকে রাখব না—

কল্যাণী বললে—ঝিটা আছে কি করতে? ওসমানকেই বা কিসের জন্য রাখা?

পঙ্কজবাবু বললেন—তাদের কাজ আছে—

কল্যাণী গরগর করতে করতে বিছানাটা ঝাড়ছিল—ঝেড়েঝুড়ে বিছানাটা পাট করতে করতে বললে—কাজ না হাতী! ওসমানটার আবার কাজ! মেজদার বিছানা রোজ সাফ করে পাট করে দিচ্ছে—আর আমার বেলাই সব—

গুণময়ী বললেন—তোর মেজদার সঙ্গে তার কি কথা!

—ছোড়দারও তো

গুণময়ী বললেন—তারা তোমার চেয়ে বড়—

—তা বলছ কেন? বল যে তারা ছেলে সেই জন্যই তাদের সব দিক দিয়েই সুবিধে—

পঙ্কজবাবু বললেন—সে কথা সত্য নয় তো কল্যাণী

কল্যাণী বাপের দিকে তাকিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বলতে যাচ্ছিল 'সত্য নয়? সত্য কি মিথ্যা আমি জানি না তো?' কিন্তু এমন কান্না পেল তার—বাপের সঙ্গে এই সব নিয়ে তর্ক করা এমন নিরর্থক অকিঞ্চিৎকর মনে হ'ল যে ঘাড় হেঁট করে অত্যন্ত স্তব্ধ হয়ে ঘরের কাজ করে যেতে লাগল সে।

গুণময়ী বললেন—এই তো লক্ষ্মী মেয়ে—

পঙ্কজবাবু বললেন—কিন্তু একদিন লক্ষ্মী হলে তো চলবে না—রোজই এই রকম করতে হবে।

গুণময়ী বললেন—তা রোজই হবে—

পঙ্কজবাবু বললেন—এখন আটটা বেজেছে জান কল্যাণী—

কল্যাণী অধোমুখে অস্ফুট স্বরে বললে—বাজুক

সে কথা গুণময়ী বা পঙ্কজবাবু কারুর কানেই প্রবেশ করল না।

পঙ্কজবাবু বললেন—তোমার মা সাড়ে চারটার সময় উঠেছেন—আমি উঠেছি পাঁচটার সময়—আর তুমি ঘুমোলে আটটা অব্দি—

কল্যাণী কিছু বললে না।

পঙ্কজবাবু বললেন—এমনি তো একদিন নয়, কলকাতা থেকে এসে অব্দি রোজই এইরকম অনাচার করছ তুমি—

কল্যাণী চুপ করে রইল।

পঙ্কজবাবু বললেন—বোর্ডিঙে ক'টার সময় উঠতে?

—আটটা ন'টা—শীতকালে দশটার সময়ও উঠেছি।

পঙ্কজবাবু এক আধ মুহূর্ত স্তম্ভিত থেকে বললেন—এ তারা সহ্য করে? এর জন্য কোনো প্রতিবিধান নেই তাদের? কোনো শাস্তি নেই?

কল্যাণী গর্বের সঙ্গে বললে—না।

—রোজই এমন দেরী করে উঠতে তুমি?

—হ্যাঁ

গুণময়ী বললেন—আর সব মেয়েরা?

—যে যখন খুসি উঠত।

বোর্ডিং যে এ বাড়ির চেয়ে ঢের স্বাধীনতা ও ঢের তৃপ্তির জায়গা বাপ মাকে সে কথা বুঝতে দিয়ে কল্যাণী মর্যাদা বোধ করতে লাগল, হৃদয় তার প্রসন্ন হয়ে উঠল।

পুবের দিকের জানালাটা বাবা খুলেছিলেন। কল্যাণী এবার জানালাটার কাছে গিয়ে দড়াম করে সেটা বন্ধ করে তারপর নিজের হাতে ধীরে ধীরে সেটা খুলে দিল মেলে দিল বাবার চেয়ে ঢের নিপুণতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে।

মন তার তৃপ্ত হয়েছে।

অভিযোগের বিশেষ কিছু নেই এখন আর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার

সেদিনই-বেলা নটার সময়।

কল্যাণী দোতলার বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে কি যেন পড়ছিল।

গুণময়ী বললেন—কি পড়ছিস রে?

—একটা নভেল।

—তোর বাবা তোকে ডাকছেন—

—আমি পড়ছি

গুণময়ী একটু বিস্মিত হয়ে বললেন—পড়ার বই তো নয়—

—তা নাই বা হোক পড়ছি তো—

—বাঃ

আমি যাব না

—আঃ কি যে বলে কল্যাণী।

—বলো গিয়ে বাবাকে যে আমি যেতে পারব না

—দিক করিস নে—চল্—বাগানে অপেক্ষা করছেন

—কোথায় অপেক্ষা করছেন?

—বাগানে

—বাগান আবার কোথায়? বাগান! একটা কামিনী গাছ আর দু'টো বকুল গাছ নিয়ে বাগান! ক্যানার ঝাড় নিয়ে বাগান! বাগান!

কল্যাণী উঠে দাঁড়াল—

বললে—কিসের জন্য ডেকেছেন?

—জানি না।

—চুরুট খাচ্ছেন তো?

—কি যে বলিস কল্যাণী

কল্যাণী বললে—নিজের বেলায় বাবার কিছুতেই কিছু না—আর একটু ঘুমুচ্ছিলাম বলে তিনি আমাকে বললেন কলকাতার থেকে এসেই অনাচার আরম্ভ করেছ—অনাচার শব্দের মানে কি তা তিনি জানেন যে বড় নিজের মেয়েকে অনাচারী বলছেন।

বাগানে ধীরে ধীরে গেল কল্যাণী—মার সঙ্গে। একটা বকুল গাছের নিচে বেতের চেয়ারে বসেছিলেম পঙ্কজবাবু।

গুণময়ী বললেন—তা যা; তা যা। জমিদার মানুষ—একটু চুরুট খান। কিন্তু এই ত্রিশ বছর ধ'রে তো আমি দেখে আসছি—এ ছাড়া আর কোনো বদ অভ্যাসই তাঁর নেই। এমন সৎ ধার্মিক লোক আমি আমার জীবনে দেখিনি—

গুণময়ীকে বললেন—আচ্ছা যাও তুমি।

গুণময়ী অন্দরের দিকে চলে গেলেন।

বেতের চেয়ার মোড়া ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল কয়েকটা; কল্যাণী একটাতে বসল।

পঙ্কজবাবু বললেন—তুমি কলকাতায় যাবে কি আর?

—কেন যাব না?

—পরীক্ষা দেবে?

—নিশ্চয়ই দেব বাবা

—বলেছিলে যে তোমার চোখের অসুখ হয়েছে—

—তা হয়েছিল—

—কৈ, চশমা তো দেখছি না

—সে রকম অসুখ নয়—

পঙ্কজবাবু বুঝতে পারছিলেন না—

কল্যাণী বললে—সাধারণত স্মেলিং সল্ট শুঁকতাম; কপালে উইন্টো ঘষতাম; ক্যাফি অ্যাসপিরিন কয়েক ফাইল খেয়েছি; নিউরেলজিয়া হয়েছিল—

—নিউরেলজিয়া?

—হ্যাঁ বাবা।

—চোখ খারাপ হয়নি?

—না বাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—চোখে স্পষ্ট দেখতে পাও?
—পাই তো
—পড়তে গিয়ে কোনো কষ্ট হয় না?
—না
—চশমা লাগবে না তা হ'লে?
—না
—চোখের অসুখ নয় বলছ?
—না, চোখের অসুখ নয়—
—ডাক্তার দেখিয়েছিলে?
—না, কি দরকার?
—আচ্ছা চলো আজ এক ডাক্তারের কাছে—
—এখানে?
—হ্যাঁ, আই-স্পেশ্যালিস্ট তিনি
কল্যাণী বললে—আমি বললামই তো চোখের অসুখ নয়—
—দেখানো ভালো
—এই গেঁয়ো হাতুড়ের কাছে? তা হবে না।
কল্যাণী বললে—চোখ কি মানুষের এতই সস্তা?
পঙ্কজবাবু বললেন—অকুলিস্ট—বিলেত থেকে পাস করে এসেছেন—
কল্যাণীর একটু সম্ভ্রম হ'ল ঃ বললে—তবুও—কলকাতায় গিয়ে দেখালে ভাল হত না?
পঙ্কজবাবু বললেন—আমার গাড়ি ঠিক রয়েছে—তুমি চল
—এখুনি?
—হ্যাঁ
দু'জনেই গেল।
এগারোটার সময় বাড়িতে ফিরে এসে কল্যাণী বললে—আমার এত যে চোখ খারাপ তা তো বুঝিনি বাবা—
গুণময়ী বললেন—খুব খারাপ?
পঙ্কজবাবু বললেন—চোখ দু'টো আধাআধি নষ্ট হয়ে গেছে—
গুণময়ী অত্যন্ত আতঙ্কের সঙ্গে বললেন—অন্ধ হবে না তো?
কল্যাণী হো হো করে হেসে উঠল।
বললে—কি বল যে তুমি মা! দেখ তো বাবা মা কি রকম ভয় পেয়ে গেছে—
পঙ্কজবাবু বললেন—তোমার মাইনাস সেভেন—ডাবল লেন্স লাগবে—অ্যাস্টিগ্‌মাটিজম রয়েছে—
কল্যাণী বললে—কিন্তু এত সব কি করে হ'ল—আমি কেন বুঝিনি বাবা?
পঙ্কজবাবু একটা ঢোক গিলে একটু পরে বললেন—সেই জন্যই তো তোমাকে আর ছেড়ে দেব না ভাবছি—
—তার মানে?
—আর পড়াশুনা ক'রে কি করবে কল্যাণী?
—সে কি কথা বাবা!
গুণময়ী বললেন—ঠিকই তো বলেছেন উনি—এমন চোখ নিয়ে তুমি কি পড়বে আর—
—আমি পড়বই।
পঙ্কজবাবু বললেন—বাড়িতে বসে এক আধটু পড়তে পার—
আমি কলেজে পড়ব।
পঙ্কজবাবু হেসে বললেন—না তা পড়বে না; তার কোনো প্রয়োজন নেই।

বাবার মুখে কেমন একটা নিরেট নির্মম শাসন দেখা দিল—সেই সকাল বেলাকার মত, যখন বিছানার থেকে কল্যাণীকে উঠতেই হল—

কল্যাণী বললে—না, না, আমি ছোড়দার সঙ্গে কলকাতায় যাবই

—তাই বল—কলকাতায় যাবে; (কলকাতায় যাবে—কোনো নিয়মের ভিতর থাকবে না—) ফূর্তি করবে,—কিন্তু পড়াশুনা তোমার আর হবে না।

কল্যাণী আঁচল কামড়ে ধরে বললে—আমি পাস করবই—
গুণময়ী শঙ্কিত হয়ে বললেন—পাস! সেই গুষ্টির বই গেলা বসে বসে আর চোখ খোয়ানো!
পঙ্কজবাবু বললেন—পাস না করলেও তোমার চলবে।
কেমন নির্মম হৃদয়হীনভাবে বললেন তিনি।
কল্যাণী কাঁদ কাঁদ বললে—এ কি কথা তোমরা সকলে মিলে বলছ আমাকে!
সে কেঁদে ফেলল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণময়ী বললেন—থাক, যেও কলকাতায়—কিন্তু

পঙ্কজবাবু কল্যাণীর ঘাড়ে হাত রেখে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—না, মেয়ে আর কলকাতায় যাবে না; বাবার কাছে থাকবে—মায়ের কাছে থাকবে—চোখ ভালো হয়ে যাবে—

কল্যাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমি যাবই—আমি কলেজে পড়বই—আমি পাস করবই—

শেষ পর্যন্ত সে কলকাতায় গেল বটে।

পাঁচ

বাস্তবিক কল্যাণীদের বোর্ডিংটা মন্দ নয়—

মিশনারি মেমদের কেয়ারে মস্ত বড় নিরিবিলি বাড়িতে—আলো বাতাস মাঠ খেলা উঁচু উঁচু গাছ ক্রোটন ফার্ণ লতাপাতার ভিতর মন্দ থাকে কি তারা?—বিশেষত বাবা যখন দেড়শো টাকা করে মাসে পাঠান—ছোড়দা যখন সব সময়ই মোতায়েন—গল্পগুজব বন্ধুসংসর্গের আঁটি চুষতে কল্যাণী যখন এত ভালোবাসে।

কিন্তু এবার কলকাতায় এসে প্রথম দিনটা কল্যাণীর খুব কষ্ট লাগল—শালিখবাড়ি ছেড়ে স্টিমারে উঠে অব্দি তার মন চুনমুন করছে—ভালো লাগছে না কিছু—আবার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করে—বাবা মার জন্য কষ্ট হয়।

স্টিমারে কাঁদল সে।

কিশোর যখন স্টিমারে সেলুনে নিয়ে গিয়ে কল্যাণীকে ডিনার খাওয়াল—নিজে খেলে—তখন মনটা তার কিছুক্ষণের জন্য তাজা হয়ে উঠেছিল—

কিশোর হুইস্কি খেলে— সোডার সঙ্গে মিশিয়ে কল্যাণীকে বললে— দেখ কি খাই

কল্যাণী বললে— ছোড়দা, ছিঃ!

কিশোর বললে—তুই খাবি? খা না—

কল্যাণীকে সোডার গেলাসটা এগিয়ে দিল সে—আধ পেগ আন্দাজ হুইস্কি ঢেলে।

কল্যাণী আগুন হয়ে উঠে বললে—ছোড়দা তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! আমাকে তুমি এ সব কি দিচ্ছ!

—খুব ভালো জিনিস

কল্যাণী বললে—আমি নদীর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেব

—আহা, তা আর করতে হবে না—আহা হা—

কিশোর এক চুমুকে গেলাসটা ফুরিয়ে ফেলল

কল্যাণী বললে—বাবাকে আমি লিখে দেব

কিশোর বাঁ চোখের ভুরু কুপনের দিকে খানিকটা তুলে নিয়ে বললে—হুম্—দিস্—

কাটলেট চিবুচ্ছিল কিশোর।

—মেজদাকেও লিখব—

শিকেয় তুলে রেখে দে! মেজদা? হুইস্কি না খেয়ে কোর্টে যায় কোনো দিন।

—মেজদা?

—হ্যাঁ তোমার ধর্মদাদা—

—মাইরি বলছ?

—মাইরি বলছি।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—তুই নাই করলি যা—

কিশোর (গেলাসে) আর একটা সোডার বোতল খসাল—

কল্যাণী বললে—ছোড়দা?

কিশোর হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে বললে—এটা স্টিমারের সেলুন—এখানে বাবাও নেই—মাও নেই।

কল্যাণী আঘাত পেয়ে বাইরের দিকে তাকাল—অন্ধকার; বর্ষার শেষের খরস্রোতা নদী তিমিরাবৃত হয়ে কোন দিকে চলেছে যে—তার মুখ দেখতেও ভয় করে—স্টিমারের চাকার সেই জলেজলাকার মূর্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভীষণ হাহাকারে হৃদয় এমন বিহ্বল হয়ে ওঠে—নিজেকে এমন নিঃসহায় মনে হয়—

কিন্তু কল্যাণী দেখল ছোড়দার একেবারেই অন্য বরণ; বাইরের দিকে সে তাকাচ্ছেও না, না দেখছে নদীর মুখ, না শুনছে জলের দীর্ণবিদীর্ণ রব, না পাচ্ছে মাঠ প্রান্তর আলেয়ার একটুখানি আভাস—বাপ মা ঢের দূরে পড়ে আছে বলে ছোড়দার ভালোই লাগছে। কেন যে এত ভালো লাগে ছোড়দার—কি যে তার প্রফুল্লতা—কোত্থেকে যে সে এত আমোদ পায় এত হৃদয়হীনভাবে ফূর্তি করে, কথা বলে, চীৎকার পাড়ে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না কল্যাণী। ইলেকট্রিক বাতির নিচে, স্টিমারের সেলুন, হুইস্কি ও চুরুটের মধ্যে ছোড়দাকে যেন একটা বাঁদরের মত দেখাচ্ছে—সে যেন আর মানুষ নয়—মানুষের স্বাভাবিক হারিয়ে ফেলেছে যেন সে—ছোড়দার প্রাণে তাই কোনো ব্যথা নেই—আকুলতা নেই—ভাবনা নেই—স্বপ্ন নেই—নিস্তব্ধতা নেই—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী অবলম্বনহীন হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল—

কিশোর বললে—বৃষ্টি পড়ছে না কি?

কল্যাণী বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁ

—তোর শীত করছে?

—একটু একটু

কিশোর বললে—তাহ'লে নে—একটু খা

অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সোডা হুইস্কি কল্যাণীকে এগিয়ে দিল কিশোর—

কল্যাণী আড়ষ্ট হয়ে বললে—আমি না তোমার বোন?

—তাহ'লেই বা

একটু পরে? তুই দেখছি বাবার মত হ'লি কল্যাণী

আরো একটু পরে; বাদলার দিনে একটু আধটু হুইস্কি খাওয়া আমি অপরাধ মনে করি না। আমার বৌকেও আমি খাওয়াব। তুমি বোন-আমার বৌয়ের চেয়েও বেশি কি?

অত্যন্ত কঠিন ক্ষমাহীন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কল্যাণীর দিকে তাকাল কিশোর। তারপর বাকীটুকু গেলাস চুপে চুপে ফুরোল!

কিশোরের শেষ হয়ে গিয়েছিল—

কল্যাণীকে বললে—চল্—একটু নিচে গিয়ে থার্ড ক্লাসের ফ্ল্যাটের থেকে ঘুরে আসি

কল্যাণী বললে—চল

কিশোর চুরুট মুখে দিল, কেবিনে ঢুকে রেন-কোটটা গায় দিয়ে দিয়ে বললে—তুইও কি ম্যাকিনটোশ নিবি?

কল্যাণী ঘাড় নেড়ে বললে—না

—শীত করছিল না?

—এখন আর করছে না।

—বৃষ্টি থেমে গেছে বুঝি—

দু-জনে নিচে গেল

ইতস্তত: যথেষ্ট ভিড় ছড়িয়ে রয়েছে—গুদামের আশে পাশে কেরানীবাবুর ঘরের কিনারে—থার্ড ক্লাসের ল্যাবরেটরিগুলোর খানিক তফাতে মেয়ে পুরুষ ছোট ছোট ছেলেপিলেরা বিছানা মাদুর চট শতরঞ্চি পেতে হা করে কল্যাণী আর কিশোরকে দেখছিল

কিশোর বললে—হ্যাংলা যত সব

দু'জন আধবয়সী বৈষ্ণবীকে কল্যাণী বললে—তোমাদের গায় জলের ছাঁট লাগছে যে! তার আপ্যায়িত হয়ে উঠল।

বললে—কি আর করা

কল্যাণী বললে—কোথায় যাচ্ছ

—নবদ্বীপ

—সেইখানে তোমাদের বাড়ি বুঝি?

—না, মা, তীথ্যি করতে—

কিশোর বললে—কল্যাণী তুই ট্যালা হয়ে গেলি যে

কল্যাণী বললে—এই যে চেপে জল এল, এইবার বোষ্টমী তোমরা কি করবে—

দু'জন বৈষ্ণবঠাকুর কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন—উঠে বসে বললেন—কার আর কি—রাধাবল্লভ যা করেন।

একটা বিড়ি জ্বালিয়ে বললে—রাধাবল্লভ এবার বড় হেনেস্থা করছে, বড় নিদয় এবার ঠাকুর।

বৃষ্টির মধ্যে তারা ভিজতে লাগল।

ক্যাক করে একটা শব্দ হ'ল।

কল্যাণী বললে—ও কি ছোড়দা

—আর কি মুরগি জবাই হচ্ছে

প্যানট্রির কাছ দিয়ে যেতে যেতে তারা দেখল গলাকাটা দু'টো মুরগিকে ছাড়ানো হচ্ছে—

কল্যাণী বললে—আহা, এই রকম করে এরা কাটে!

চলতে চলতে কিশোর বললে—এই দেখ্ হাঁস—মুরগির খাঁচা

কল্যাণী তাকিয়ে দেখল ঃ অন্ধকারে—বাদলায় পাখিগুলো জড়সড় জীবন্মৃত হয়ে পড়ে—ভিজছে পাখিগুলো—

এই নিঃসহায় প্রাণীদের পাশে এসে কল্যাণী বাপ মা বাড়ির কথা ভুলে গেল সব; মনের ভিতর তার কেমন করছিল যেন: অন্ধকার—বৃষ্টি—বাইরের জলের কলরোল—মাঠ—তেপান্তর—পাড়াগাঁ—শ্মশান তার করুণ কল্পনাকে আরো কাতরতর প্রচুর খোরাক যোগাচ্ছিল।

এ রকম সব অভিজ্ঞতা তার জীবনে বড় একটা হয়নি।

এই সবের নতুনতা কল্যাণীকে অভিভূত করে ফেলতে লাগল।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোর বললে—এই ট্যালা, লাল লাল ঝুঁটি বুঝি দেখিসনি কোনো দিন

—কল্যাণীর মুখে কথা জুয়াল না।

কিশোর বললে—চল

কল্যাণী ছোড়দার পিছে পিছে হাঁটতে লাগল—

একটি দাড়িআলা মুসলমান ছুরি দিয়ে আনারস কেটে যাচ্ছিল—সমস্ত বৈষ্ণব পরিবারটা হাপিত্যেশ করে সেই আনারসের দিকে তাকিয়ে—একটি তিন মাসের শিশুকে তার মা মাই দিচ্ছে। শিশুকে একেবারে উলঙ্গ রাখা হয়েছে—সোঁ সোঁ করে বাতাস বৃষ্টি তার কোনো ক্ষতি করছে না কি? নিউমোনিয়া যদি হয়? পাশেই একটা ফর্সা ছিপছিপে হাঁপিকাশের রুগীর বুকের দু' দিকটার দু'টো পাঁজর ঝটপট্ নির্বিবাদে ফ্ল্যাটের যে দিকে খুশি সে দিকে কাশি কফ।

ছয়

কলকাতায় পৌঁছে কল্যাণী বললে—আমি বোর্ডিঙেই যাব, তুমি ছোড়দার

—আমার হোস্টেলে

কল্যাণীকে বোর্ডিঙে রেখে কিশোর চলে গেল।

কল্যাণী স্নান করে খেয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল—

কিন্তু কাঁদলে কি পৃথিবীতে চলে?

কল্যাণীর উঠতে হ'ল।

দু-তিন দিন হ'ল কলেজ খুলেছে—আজো দু-তিন ঘণ্টা ক্লাস হয়ে গেছে—আরো দু-এক ঘণ্টা হবে। কল্যাণী বই গুছিয়ে নিয়ে কলেজে গেল।

কলেজ থেকে ফিরে এসে বুকের ভারটা তার যেন একটু কমেছে মনে হ'ল। নিজের সীটটা ঠিকঠাক পরিষ্কার করে টেবিল গুছিয়ে বই সাজিয়ে বিছানা সাফ ক'রে তারপর কল্যাণী মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে বারান্দায় কম্পাউন্ডে খানিকটা ঘোরাঘুরি হাসি তামাসা করে এল।

কিন্তু মন তার আজ এ সবের ভিতর একটুও নেই যেন—কেবলই শালিখবাড়ির কথা মনে পড়ছে—বাবার কথা, মার কথা; ঘুঘুর ডাককে সে ঠাট্টা করেছিল—কিন্তু আজ হাজার কান পাতলেও সে ডাক আর শোনা যাবে না এ নিষ্ফলতা যেন পাড়াগাঁর কোন্ শান্তশ্রী পল্লীকন্যার মত ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কল্যাণীকে উপহাস করতে লাগল—দু'চোখ তার বেদনার—বিরহের জলে ভরে উঠল।

রাত হয়ে গেছে।

বাবাকে সে চিঠি লিখতে বসল:

তুমি যদি তাই চাও বাবা তা'হলে আবার আমি দেশে ফিরে যেতে পারি। তোমার মনে কষ্ট দেবার আমার একটুও ইচ্ছা নেই। তুমি ভেবেছ তোমাদের চেয়েও কলকাতার ফাইফুর্তি বুঝি আমি বেশি ভালোবাসি। তা আমি ভালোবাসি না বাবা। তোমাদেরই আমি বেশি ভালোবাসি—ঢের বেশি। কলকাতার ফুর্তির কোনো মূল্য নেই আমার কাছে এখন আর। এ সব আমার আর ভালো লাগে না।

দেশে থাকতে মুখ ফুটে কিছু বলিনি বলে, বাবা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। এই চিঠিতে তো আমি সব লিখছি; সব খুলে লিখলাম। এখন তুমি তোমার মেয়েকে ঠিক করে চিনতে পারবে।

স্টিমারঘাট থেকে সেই যে তুমি চলে গেলে তখন থেকেই আমার এত খারাপ লাগতে লাগল। আমি রেলিঙে ভর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু স্টিমারটা হঠাৎ কেমন করে যে কোন দিকে যে ঘুরে গেল ভিড়ের ভিতর তোমাকে আমি আর দেখতে পেলাম না—দেখতে দেখতে পথঘাট লোকজন কোথায় সব পড়ে রইল—রইল শুধু নদী আর ছোড়দা আর আমি। তখন এমন খারাপ লাগল আমার কি বলব তোমাকে বাবা! অনেকক্ষণ রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর রাত হ'ল।

রোজ রাতে তোমাদের সঙ্গে কত গল্প করতাম—একসঙ্গে খেতে যেতাম—একসঙ্গে ঘুমোতাম। কিন্তু স্টিমারে শুধু একা ছোড়দা—বুঝতে পারলাম বাবা মাকে আমি কত ভালোবাসি—তাদের জায়গা আর কেউ নিতে পারে না; রাত স্টিমারে এত কষ্ট হ'ল।

প্রথম রাতে কল্যাণী এর চেয়ে বেশি কিছু আর লিখতে পারল না।

বাইরে তিরিক্ষে ঝড়বৃষ্টি

জানালা খুলে রাখলে সোঁ সোঁ করে ঠাণ্ডা বাতাস—জলের ছাঁট—কেমন একটা অভূতপূর্ব স্মৃতি ও চিন্তার কাতরতা।

জানালা বন্ধ করে দিলে সমস্ত নিস্তব্ধ—বিজন; কেমন একটা গুমোট; যেন সমস্ত কিছুর থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে কল্যাণী কোন্ অজানিত অপ্রার্থিত জায়গায় পাষাণরাণী হয়ে বসেছে—

চিঠির প্যাড বন্ধ করে তাড়াতাড়ি টেবিলের এক পাশে সরিয়ে দু-চারখানা বই তার ওপর চাপা দিয়ে রেখে দিল কল্যাণী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝড়ের জন্য জানালাটা বন্ধ করে ফেলেছিল সে; খুলল আবার।

বাতি নিবিয়ে দিল।

ঘুমিয়ে পড়ল।

পর দিন খুব ভোরের বেলা উঠে কল্যাণী চিঠিখানা শেষ করলঃ

কিন্তু কলকাতায় যখন এসেছি পাস করে যাব না। মানুষকে তো ভগবান সুখের জন্যই তৈরি করেননি শুধু। তোমাদের কাছে থাকলে বেশ শান্তি পেতাম—সুখ পেতাম—কিন্তু তবুও সেটা কুঁড়েমি হ'ত; অকর্মণ্যতা হ'ত; মানুষের জীবনের কর্তব্য তাতে পালন করা হ'ত না।

আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি বটে, কিন্তু তবুও আমার ঢের করবার জিনিস আছে। প্রথমত আমি লিখতে চাই; পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জন করতে চাই। তুমি বলেছিলে ডিগ্রি নিয়ে কি হবে? হয়তো ডিগ্রির কোনো মুরোদ নেই। কিন্তু তবুও একটার পর একটা ডিগ্রির জন্য এই যে স্কুল কলেজে বছরের পর বছর পড়তে হয় এ জিনিসটা আমাদের একটা নিয়ম শেখায়, একটা শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসে আমাদের, এই শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের অন্য নানারকম জিনিস শিখিয়ে দেয়—যা হয়তো আমরা অন্য কোনো ভাবে আয়ত্ত করতে পারতাম না।

এই দেখ, আমি যদি কলেজ ছেড়ে দিতাম—তাহ'লে এই নিয়মের ভিতর থাকতাম না আর; তাতে হত কি জান বাবা? সহিষ্ণুতা ও চেষ্টা করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতাম—মন ক্রমে ক্রমে আরাম আয়েসের দিকে চলে যেত। সে রকম মন নিয়ে শুধু শিক্ষাদীক্ষাই নয়—পৃথিবীর কোনো সার জিনিসই লাভ করতে পারতাম না আমি—পারতাম কি বাবা?

সেই জন্যই আমি সঙ্কল্প করেছি যে কলেজের এই রকম সব কঠিন আইন কানুনের ভিতর অনেকদিন থেকে থেকে আমি নিজেকে ঢালাই পিটাই করে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে নেব।

এখানকার ডিগ্রি নিয়ে তারপর আমি বিলেত যাব।

বিলেত থেকে শিখে এসে তারপর এইখানে মস্ত বড় কাজের জায়গা পাওয়া যাবে, নানারকম কাজের কল্পনা আমি ঠিক করে রেখেছি; ক্রমে ক্রমে সেই সবই আমি সফল করে তুলব।

এ না করে আমি ছাড়বই না।

এখন আর আমি দেরীতে উঠি না।

আর কোনো দিন দেরীতে উঠব না।

আজ পাঁচটার সময় উঠেছি—এখন ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। বোর্ডিঙের মেয়েদের মধ্যে একজনও ওঠেনি এখন। সবাই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো আটটার সময় উঠবে—আমার এমন হাসি পায়।

দেরীতে উঠে কোনো ফূর্তি পাওয়া যায় না বাবা। তাতে মন খারাপ হয়—তাড়াতাড়ি করে পড়াশুনা, কলেজের তাড়াহুড়োর ভিতর শরীরও খারাপ হয়ে যায়—

আজ সকালটা এমন মিষ্টি।

টেবিলের পাশে জানালাটা খুলে চিঠি লিখছি। আকাশ নীল। লতাপাতা ক্রোটন ঝুমকো পাতাবাহারের ভিতর কত ফড়িং প্রজাপতি টুনটুনি চড়ুই; আমার জানালার পাশে (উইনডোবক্সের ওপর) সাদা লোটন পায়রাগুলো; ডান দিকে মস্ত বড় সেগুন গাছটাকে জড়িয়ে থোকা থোকা হলদে করবী।

কাল রাতে খুব বড় হয়ে গিয়েছিল, আজ ভোরটা বেশ ঠাণ্ডা—শ্বেতপাথরের মত ঠাণ্ডা আর শ্বেতপাথরের মত পরিষ্কার যেন—(এই ভোর—এই ভোরের আলো।)

আমার মনে হয় আমার চোখ বেশ ভালো হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তবুও এম. এন. মিত্রকে চোখ দেখাব; মেয়েরা বললে ডাক্তার অ্যাট্রোপিন দেবে তুমিও তাই বলেছিলে; অ্যাট্রোপিন দিলে আমাকে অন্ধকারে কয়েক দিন থাকতে হবে। কিন্তু চশমা তাহ'লে বেশ ভালো করে ফিট করবে। আজ ছোড়দা এলে তাকে বলব শনিবার মিঃ মিত্রের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে। শনিবার সকালে ছোড়দার সঙ্গে মিত্রের ইনফারমারিতে যাব। শনি, রবি ও ক'দিন ছুটি আছে—বুধবারও ছুটি আছে; সোম মঙ্গল কলেজ কামাই হবে।

এখন থেকে চোখ সম্বন্ধে খুব সতর্ক হব। মেয়েরা বলে চশমা নেওয়ার পর অনেক সময় চোখ ক্রমে ক্রমে ভালোও হয়ে যায়। শুনে আমার খুব ফুর্তি বোধ হ'ল। মাকে এই কথা বোলো।

থিয়েটারে আমি কোনো দিন যাব না।

পরীক্ষা না দিয়ে বায়োস্কোপেও যাব না।

তুমি যা চাও আমি ঠিক তাই করব।

আমি তোমার লক্ষ্মী মেয়ে হব।

তোমার কল্যাণী।

চিঠিখানা এই রকম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

চশমা বেশ ফিট করেছে—কালো টরটয়েজ শেলের ডাঁট—তেমনি রিম—বড় গোল গোল পাথর —কল্যাণীর রূপ যেন আরো ঢের খুলে গিয়েছে এই চশমার জন্য।

মেয়েরা তার সঙ্গে এখন আরো বেশি খাতির করতে আসে।

অনেক অদ্ভুত—অসার—আজগুবি—অনেক সেন্টিমেন্টাল—নানারকম রস লালসার কথা বলে তাকে—তাকে ব্যবহার করতে চায়, কিন্তু এবার দেশে গিয়ে কল্যাণী যে একটা গুরুত্ব পেয়ে এসেছে এখনো তা সে খোয়ায়নি।

বাবা দেড়শো টাকা করে মাসে পাঠান।

বিকেলবেলা কিশোর এল. ছোড়্দার নাম শ্লেটে দেখে কল্যাণী লাফাতে লাফাতে নিচে নেমে এল।

কিশোর কাশছিল।

কল্যাণী বললে—'এ কি তোমার শরীর খারাপ দেখাচ্ছে যে ছোঁড়দা'

'ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল।'

—আমাকে লেখনি কেন?

—তুমি আমাদের হোস্টেলের ভিজিটিং ডাক্তার, না?

কল্যাণী একটু হেসে বললে—না, জানতাম—

—জেনে কি করতে? টাট্টু প্রিন্সিপ্যালের মত প্রার্থনা করতে, না?

—টাট্টু প্রিন্সিপ্যাল আবার কে? ওঃ তোমাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল—

কল্যাণী টেনে টেনে একটু হাসল।

বললে—'ছি, টাট্টু বল কেন? প্রিন্সিপ্যাল মানুষ তাকে টাট্টু?

—কলকাতার সকলেই ওকে টাট্টু বলে :

—তাই বলে তুমিও বলবে?

—না, আমার একটা নতুন কিছু বলা দরকার, আমি বলি গিধোর—

কল্যাণী এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাইল

কিশোর বললে—গিধোরের মানে জানিস?

—না

—তবে থাক্।

কল্যাণী বললে—ইনফ্লুয়েঞ্জা তোমার খুব বেশি হয়েছিল না কি ছোড়দা

—উঃ গা হাত পা এখনও টাটাচ্ছে

—তা হ'লে সারে নি তো—

—আলবৎ সেরেছে—

—কি খাও? দু-একটা দিন ভাত না খেয়ে রুটি খেও অন্তত। দু-এক দিন শুধু ওভালটিন খেয়ে দেখলে পার না? শরীরটা একটু টানলে ভাল হয়।

—এখানে সিগারেট খেতে পারা যাবে?

—না

—কেন? কোনো মেয়ে নেই তো।

—ঐ যে মেট্রন বসে

—পাকামো সব

কিশোর বললে—আমি যাই

—বোসো না।

—বসে কি হবে?

—এরকম কর কেন? আমাকে তুমি বোনের মতই মনে কর না। যেন আমি তোমার কত পর— কি যে!

—স্টিমারের সেই হুইস্কির কথা মনে আছে?

কল্যাণী লাঞ্ছিত বোধ করল।

—বাবাকে লিখিসনি তো?

—না।

কল্যাণী একটু সন্দিগ্ধ হয়ে বললে—আর খাওনি তো?

—খেয়েছি

—কোথায়?

—ইম্পিরিয়ালে—

কল্যাণী বিরস মুখে কিশোরের দিকে তাকাল।

কিশোর বললে—বাপ রে, তোকে যে পিসিমার মত দেখাচ্ছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী চুপ করে রইল; ছোড়দার জন্য যতখানি মমতা তার আছে তার সিকির সিকি প্রভাবও এ মানুষটির ওপর তার নেই। নিজে সে কিছু করতে পারে না। কিন্তু সে সঙ্কল্প করল বাবাকে লিখবে।

কল্যাণী বললে—আবারও অপথ্য করলে?

—অপথ্য?

স্টিমারে করলে—ইম্পিরিয়ালে করলে—না জানি আরো কত জায়গায়—

—ও, —হুইস্কি—হ'ল তোমার অপথ্য। তুমি মার রঙে মন্দ না

—আর খাবে না বল

—পিসিমার মত মুখ করিস না।

কল্যাণী বললে—আমি বাবাকে সব লিখে দেব।

কিশোর বোনের দৃঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা সন্দিগ্ধ হ'ল—

বললে—সত্যি লিখবি—

—নিশ্চয়, আজকের ডাকেই আমি লিখব।

—বাবা বিশ্বাস করবে তোকে?

—আমাকে বিশ্বেস করবেন না তো কি তোমাকে করবেন?

কিশোর তা জানে।

ডেস্কের ওপর থেকে একটা চক কুড়িয়ে নিয়ে দাগ কাটতে কাটতে বললে—যাঃ, আর খাব না।

—সত্যি?

—পয়সাই বা কোথায় আর?

—না, বল খাবে না আর।

—বললামই তো—

লুকোচুরি কোরো না কিন্তু আমার সঙ্গে

কিশোর একটু অপমানিত বোধ করে ঠোঁট কামড়ে কঠিন হয়ে কল্যাণীর দিকে তাকাল—

—রাগ কোরো না ছোড়দা, তোমার ভালোর জন্যই বলেছি; চকোলেট খাবে?

—না

—রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি—

কিশোর বললে—তুমি বায়োস্কোপ দেখাও ছেড়ে দিয়েছ না কি কল্যাণী!

ছেড়ে সে দিয়েছেই তো—কিন্তু তবুও ছোড়দাকে খুশি করবার জন্য বললে—তুমি যাবে নাকি?

—আমার পয়সা নেই—তুই যদি পাঁচ টাকা দিতে পারিস তা হ'লে কাল গ্লোবে চল্

কল্যাণী বললে—আচ্ছা

—আর থিয়েটার?

থিয়েটার আমি দেখব না

—কোনো দিনও না?

—না

কিশোর বললে—অবিশ্যি তেমন জোর বই নেই—আর্টিস্টও নেই—বাংলায়। কিন্তু, চল্ না একদিন ইংরেজি থিয়েটার দেখে আসি।

কল্যাণী বললে—বললামই তো যাব না আর আমি

কিশোর জেরা করে বললে—কেন?

—কে আমি জানি না; আমি যাব না।

—ঈস?

—তাহ'লে আমি বায়োস্কোপেও যাব না।

কিশোর বললে—আচ্ছা না গেলি—আড়াইটা টাকা আমাকে দিয়ে দে

কল্যাণী বললে—আচ্ছা নিও

—এখুনি

কল্যাণী টাকা এনে দিল।

কিশোর বললে—এঃ, ঠিক আড়াইটেই এনেছিস যে বড় গুণে গেঁথে—

—তাই তো চেয়েছিলে—

—আচ্ছা বেশ পাঁচটাই দে।

কল্যাণী ঘাড় হেঁট করে ভাবল বাবা ছোড়দাকে যা টাকা পাঠান তার ওপরেও এরকম হাঁকসই কেন—এরকম আগে তো ছিল না—এর মানে কি?—না জানি টাকা কেমন করে রূপান্তরিত হয়ে কি হয়ে যায়

কল্যাণীর মন খোঁচা খেয়ে উঠল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে ধীরে মুখ তুলে সে বললে—আমি আর দিতে পারব না।

পাঁচটা কেন—দশটা পঁচিশটা—অনেক কিছুই সে দিতে পারত, কিন্তু কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে কল্যাণীর মন সন্দেহে ভ'রে উঠল।

কিশোর বললে—পারবি, পারবি—আর আড়াই টাকা তো মোটে—

কল্যাণী নিজের মনকে বললে—দেওয়া কি উচিত? বাবা কি দিতেন? মা? আমি দেব?

কিশোর বললে—তুই গেলেও আর আড়াইটা টাকা তো লাগত। সেই টাকাটা না হয় আমাকে দিয়ে দিলি—তুই আমাকে দিয়ে দে।

কিশোর একটু কেশে বললে—এতে তোর কি ক্ষতি হবে কল্যাণী?

—থাক, আর বোলো না দাদা।

একটা দশ টাকার নোট এনে কিশোরকে সে দিল।

আট

কিন্তু এবার বাড়ির থেকে যে একটা সঙ্কল্প ও মর্যাদা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল কল্যাণী বেশি দিন আর তা টিকল না।

ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে সে একদিন বায়োস্কোপ দেখতে গেল—

এর ভিতর কোনো অপরাধ ছিল না অবিশ্যি।

কিন্তু তবুও প্রতিজ্ঞা তো করা হয়েছিল—বাবার কাছে প্রতি চিঠিতেই কত প্রতিজ্ঞা জানিয়েছে কল্যাণী—সে কার্নিভালে আর যাবে না, লাকি সেভেন খেলবে না, সার্কাস দেখবে না, বায়োস্কোপেও যাবে না—

প্রতিজ্ঞা যখন ভাঙল বাবাকে আর লিখল না; অবহেলা ক্রমে ক্রমে আরো বেড়ে উঠল—আয়েস বাড়ল, আবার সেই আগের আরাম ফিরে এল। আটটা সাড়ে আটটার সময় ঘুম থেকে উঠে জীবনটাকে তার ভালো লাগতে লাগল।

বেশ চলেছে।

আর একদিন বায়োস্কোপ দেখতে গেল সে; হাফ টাইমের সময় আইসক্রিম খেলে—ছবি কিনলে—মেয়েরা সোডা ফাউন্টেন থেকে ঘুরে এল—কল্যাণীও গেল।

এই সব নির্দোষ আমোদ, কোনো গ্লানি নেই এ সবের ভিতর। কিন্তু আরাম রয়েছে।

কল্যাণীর জীবন তাহ'লে আরামের দিকে মোড় নিল আবার? এক প্রসাদ ছাড়া এরা সকলেই এই রকম—অনেক কিছুই আরম্ভ করতে পারে—কিন্তু কোনো কিছুতেই শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে দাঁড় করাবার মত অপরিসীম আখখুটেপনার গৌরব এদের চরিত্রের মধ্যে নেই—

কিশোর একদিন কল্যাণীকে থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাইল—

বললে—ভাদুড়ীর প্লে তুই কোনোদিন দেখিসনি কল্যাণী

—দেখিনি তো—

—তাহ'লে কি নিয়ে তুই বড়াই করবি।

কল্যাণী একটু বিস্মিত হয়ে বললে—তার মানে?

—লোকে তোকে ঠাট্টা করে ধুনে দেবে যে—

—কেউ ঠাট্টা করে না

—এখন করে না; আছিস তো কতকগুলো খাজা মেয়ের মধ্যে। কিন্তু যখন বড় হবি—বিয়ে করবি—সোসাইটিতে ফিরবি—তখন চোখের মাথা খেয়ে বড্ড লজ্জা পেতে হবে তোর—

কল্যাণী এ লজ্জাকে এখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিল না। থিয়েটারে যাবার তার একটুও ইচ্ছা ছিল না।

কিশোর বললে—এবার আমাদের বাঙালিদের স্টেজটা ভালো হয়েছে—

স্টেজের জন্য বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিল না কল্যাণীর—সে চোখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগল।

কিশোর গম্ভীর হয়ে উঠল।

বললে—কল্যাণী, ও রকম অবহেলা কোরো না।

কল্যাণী ছোড়দার দিকে তাকাল—

কিশোর বললে—শুধু তো নাচ গান দেখতে যাওয়া নয়—ফূর্তি তামাসা নয় শুধু। আর্ট আলাদা জিনিস।

আর্টের সম্বন্ধে কল্যাণীর বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না। আর্ট তাকে কোনো দিন বড় বেশি উৎসুক করেনি—উত্তেজিত করা তো দূরের কথা।

কিশোর বললে—না যাত্রা—ফাত্রা নয় আর, এ দস্তুর মত প্লে—

কল্যাণী একটু বিস্মিত হয়ে বললে—প্লে?

—প্লে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোর বললে—যত গাজন পাঁচালী ঢপ কথকতা যাত্রা শালিখবাড়িতে শুনেছ—কলকাতার থিয়েটারেও সেই সবেরই কপচানি দেখেছ এদ্দিন, কিন্তু এখন একেবারে আলাদা জিনিস দেখবে।

কল্যাণীর একটু কৌতূহল হ'ল, ভাবলে ঃ না জানি কেমন!

বললে-সত্যি ছোড়দা?

—আমার সঙ্গে এসো—দেখো—তারপর বোলো

কিশোর একটু কেশে বললে—তারপর বোলো চিরদিন মনে থাকবে কিনা—

—সত্যি?

—তা যদি না থাকে তাহ'লে আর্ট হয়?

—ওঃ বুঝেছি—

কিশোর বললে—কবিতা গল্প কত জায়গায় তো আর্টের পরিচয় পেয়েছ—

কল্যাণীর স্পষ্ট কিছু মনে পড়ছিল না।

কিশোর বললে—ছবিতেও

বিশেষ কোনো ছবি—কোনো ছবিই মনে পড়েছিল না কল্যাণীর।

কিশোর বললে—মানুষের মুখে কিম্বা পাথরের মূর্তিতেও

কল্যাণী গালে হাত দিয়ে ছোড়দার দিকে তাকিয়ে রইল।

কিশোর বললে—গানে বাজনায়।

একটু কেশে বললে—এবার স্টেজে দেখবে।

দু'জনে গেল—থিয়েটার দেখতে।

থিয়েটারের থেকে ফিরবার সময় কিশোর একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলে।

ট্যাক্সিতে চেপে কল্যাণী বললে—রাত হয়ে গেছে

কিশোর বললে—বেশি না হুঁ।

—ক'টা?

—একটা দু'টো হবে।

কল্যাণী ভয় পেয়ে বললে—কি হবে তাহ'লে?

—কেন?

—বোর্ডিঙে যেতে পারব না তো এখন।

কিশোর হো হো করে হেসে উঠে বললে—সেই জন্য তোমার ভাবনা?

—ভাবনা নয় ছোড়দা?

—ভাবনা আবার! এই নিয়ে ভাবনা? এই সেথো জিনিস নিয়ে? বলতে বলতে কিশোর একটা স্টলের দিকে গেল।

কল্যাণীর বুকের ভিতর ঢিব ঢিব করতে লাগল।

কিশোর পান সিগারেট কিনে এনে গাড়িতে এসে বসল; বোনের চোখের ছটফটানির দিকে তাকিয়ে বললে—ছিঃ এ কি রকম?

—কি হবে ছোড়দা?

কল্যাণীর হাত ধরে কিশোর বললে—আমি আছি না?

—তুমি তো আছ—

—তবে?

—বোর্ডিঙে যেতে পারব না যে

কিশোর বললে—এই তো থিয়েটার থেকে বেরুলে, বোর্ডিঙের ভাবনা ছাড়া তোমার মাথায় আর কিছুই কি নেই?

—এত রাতে কোথায় যাব আমরা?

—বলি, এরকম চিন্তাভাবনা ছাড়া তোমার হৃদয়ের মধ্যে আর কিছুই কি নেই?

কল্যাণী বললে—না

কিশোর অত্যন্ত নিরাশ হ'ল।

খানিকক্ষণ সিগারেট টেনে বললে—একটা নতুন কিছু দেখেছ—অজন্তার গুহায় ঢুকলে বা ইটালীর মাস্টারদের ছবি প্রথম দেখলে বা জার্মান মাস্টারদের মিউজিক প্রথম শুনলে বা কাউকে প্রথম ভালোবাসলে মন যেমন করে ওঠে—কেমন নাড়াচাড়া ফেরে তেমন কিছুই কি তোমার হয়নি কল্যাণী?

কল্যাণী ঘাড় নেড়ে বললে—না

তা যাই বলুক ছোড়দা কিশোরের আজকের রাতের এই পৃথিবী থেকে কল্যাণী ঢের দূরে—কিশোরকে তার এমন অস্পষ্ট অসংযত নির্মম মনে হতে লাগল—এমন হৃদয়হীন হয়ে গেছে ছোড়দা—এমন অর্থহীন—

কিশোর বললে—এমন অদ্ভুত তুমি—এখন অদ্ভুত—অদ্ভুত—আজগুবির এক শেষ

কল্যাণী বললে—কোথায় চলেছ?

—যেখানে খুসি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেছল—তার নিজের সহোদর বোনটা এমন ভীরু—এমন ভোঁদা—একটা মাংসপিণ্ড যেন—কেমন একটা আর্টের পৃথিবীর থেকে ফিরে এসে নট নিয়ে কথা নয়, নটী নিয়ে কথা নয়,গান কবিতা কুশলতা, প্রাণ, রস, আবেগ, সংযম, সীমা অনুভব, বেদনা কিছু নিয়ে নয়—এমন কি থিয়েটারের ঘট ঘট ফাইফুর্তি নিয়েও নয়—শুধু কোথায় চলেছ, কত রাত হয়েছে, বোর্ডিঙে যাব কি করে!

অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল কিশোরের মন।

কল্যাণী বললে—ট্যাক্সি চলেছে তো চলেইছে—

—বেশ করেছে—

—আর কত দূর যাবে?

কিশোর কোনো জবাব দিল না।

নীরবে সিগারেট টানতে টানতে সে তার নট-নটীদের কথা ভাবছিল—ভাবছিল এক দিন সেও হয়তো স্টেজে দাঁড়িয়ে অমন অভিনয় করবে—আরো রূপান্তর আনবে সে—আরো স্থির—আরো অবিকৃত প্রতিভা—(মুখোস একেবারে দেবে বদলে)—

কিশোর ভাবছিল—বিলেত যদি হ'ত—

কল্যাণী আতঙ্কিত হয়ে বললে—এ কি গঙ্গা নয়?

কিশোর টিটকারি দিয়ে বললে—গঙ্গাকে চেন কি তুমি? কল্যাণী?

কল্যাণী অভিমানক্ষুব্ধ ছোড়দার দিকে তাকাল—

কিশোর বললে—একটা নদী দেখেও তোমার মনের উৎকণ্ঠা ফুরোয় না? যেন আরো বাড়ে। ভ্যালোবেসে তুমি এর দিকে তাকাতে পার না? এ কেমন?

কল্যাণী বললে—রাত যে ঢের হয়ে গেছে ছোড়দা।

—হ'লই বা। তাতে কি নদী মরুভূমি হয়ে গেল? তোমাদের মেয়েদের ঐ বড় দোষ। মনের মুদ্রাদোষ কিছুতেই ছাড়াতে পার না তোমরা। চলতি পথের থেকে এক চুল চুমরে পড়লে সবই যেন গ্লানি—ব্যথা—ভয়—কত কি? মেয়েরা জীবনটাকে তাই বোঝে না। পর পর বিস্ময় চমক ও নতুনত্ব নিয়ে যে জীবন মেয়েরা তাতে কেমন যে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে—জীবনটাকে তোমরা অশ্রদ্ধা কর—এই নদীটাকেও তুমি আজ শ্রদ্ধা দিতে পারলে না। আমার কাছে এমন চমৎকার মনে হচ্ছে—অথচ তোমার কাছে এই গঙ্গা একটা কেঁদো জানোয়ার যদি না হয় প্রাণপণে এটা হিংসে করছ তুমি; না কল্যাণী?

কল্যাণীর মনে হ'ল ছোড়দা আজও হয়তো ঢের হুইস্কি খেয়েছে। কিন্তু কোনো রকম হুইস্কি খায়নি কিশোর আজ।

সে খুব সরল মনে কথা বলছিল—অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে: তার বাক্যের চিত্তবৃত্তি তার সমস্ত প্রাণকে ভরে ফেলেছে যেন আজ; দিনরাত্রির মাঝখানের এমন বিস্ময়কর সময়ের গঙ্গাটাকে সে খুব হৃদয় দিয়ে উপভোগ করছিল—

শেষ রাত্রের বাতাস ভালো লাগছিল। অনেকক্ষণ নদীর দিকে তাকিয়ে রইল সে।

নয়

কল্যাণী ঘুমিয়ে পড়েছে; ড্রাইভার ঘুমিয়েছে।

ভোরবেলা কল্যাণী বোর্ডিঙে পৌঁছে যেন নতুন জীবন পেল।

থিয়েটারের শেষ গ্লানি ঝেড়ে ফেলে, ভদ্রসদ্র মেয়েদের মধ্যে ঢের ভদ্র হয়ে, মেট্রনের সুনজরের শুভ্রতা বোধ করে, ঘাড় গুঁজে হিস্ট্রির নোট টুকতে টুকতে।

পরদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর জানালার ভিতর দিয়ে গাছপালা আকাশের দিকে তাকিয়ে কল্যাণীর মনে হ'ল ছোড়দার সঙ্গে থিয়েটারে গেলে এবার আর সে নার্ভাস হয়ে পড়বে না—ভালো করে দেখতে শুনতে পারবে সব। ফূর্তি করতে পারবে—গভীর রাতে ট্যাক্সিতে কলকাতার পথেঘাটে এবার আর সে একটুও সঙ্কোচ বোধ করবে না—গঙ্গা দেখেছি, কেমন ভড়কে ভয় পেয়ে গেছল সে কাল—নদীটা কেমন সুন্দর ছিল অথচ-আজ যেন সে রূপ চুপে চুপে ধরা পড়ছে সব—সেই তিনটে আন্দাজ রাত—মোটর—

—ছোড়দা—মিষ্টি বাতাস—গঙ্গাটা—

কিন্তু এ সবের ভিতর এমন বেকুবি করেছিল কেন সে কাল? বেকুব আর সে হবে না।

মিনু এল।

বললে—কি ভাবছিস?

—পড়ছি

—কি পড়ছিস?

—লজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হাতী! আধঘন্টা ধরে জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে—
মিনু থামল।
মেট্রন একটু দেখেশুনে ঘুরে গেল।
কল্যাণী বললে—মিনু বোস—
বসল মেয়েটি।
কল্যাণী বললে—একটা কথা কারুর কাছে বলবি না মিনু?
—কি কথা?
—বল বলবি না।
মিনু কৌতুহলাক্রান্ত হয়ে বললে—না।
—কাল থিয়েটারে গিয়েছিলাম
—সত্যি?
কল্যাণী ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ
—কার সঙ্গে!
—ছোড়দার সঙ্গে।
—কোন থিয়েটারে?
—নাম মনে নেই
—বেশ তো।
মিনু বললে—কেমন লাগল?
—কি যেন
—কি যেন কি আবার?
মিনু বললে—কোথায় বসেছিলি?
—বক্সে
—ঈস!
—আমি আগেও থিয়েটার দেখেছি। দেখা কি খারাপ?
—জানি না।
—তুই দেখিসনি?
—না
—কোনোদিনও না?
মিনু মাথা নেড়ে বললে—না; দেখবও না।
—কেন?
মিনু বললে—কি দেখে ছাই—আমার কোনো টেস্ট নেই
কল্যাণী বললে—আমারও বোধ হয় টেস্ট নেই
—তা হ'লে গিয়েছিলে কেন?
কল্যাণী বললে—তাই তো।
—আর যাবে?
—কি করতে যাব আর?
তোমার দাদাও তো বড় মজার লোক
—কেন?
—ছোট বোনকে থিয়েটারে নিয়ে যায়?
কল্যাণী একটু আঘাত পেল—
বললে—ছোড়দার ওদিকে বড্ড ঝোঁক কিনা—

বলতে বলতে থেমে গেল সে, থিয়েটারের দিকে ঝোঁক? কেমন শোনায়? কল্যাণী লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইল।

দু'জনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা।
মিনু বললে—আমি যাই
—কেন?
—পড় তুমি।
—ছাই পড়ছি।
কল্যাণী বললে—এই দেখ বই বন্ধ করলাম।
লজিকের বইটা কল্যাণী বুজে সরিয়ে রেখে দিল—
মিনু বললে—পড়বে না আজ আর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—না

—তুমি?

—আমিও না।

—আমার চোখ কড় কড় করে বেশি পড়লে—

মিনু বললে—কিন্তু চশমা নিয়ে তোমাকে বেশ মানিয়েছে—

—সত্যি?

—বেশ সুন্দর দেখায়

—সত্যি মিনু?

মিনু বললে—এই টিকলো নাক কার কাছ থেকে পেয়েছিস—তোর মার কাছ থেকে?

—বাবার কাছ থেকে

—এই চোখ?

—বাবার কাছ থেকে

—এমন সুন্দর থুৎনি?

—বাবার কাছ থেকে

মিনু ক্লান্ত হয়ে উঠছিল—

এ সব প্রশ্নের গুখখুরি বুঝলে সে। কাজেই কথা আর নয়—কল্যাণীর মুখের অনুপম রূপসৃষ্টির দিকে তাকিয়েই রইল সে।

কল্যাণীর নিঃশ্বাসের থেকেও কেমন যেন মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে।

মিনু বললে—কি খেয়েছিস রে?

—কখন?

—মুখের থেকে তোর কিসের গন্ধ আসে?

—জানি না তো

—জানিস না? সব সময়ই আমি পাই

কল্যাণী বললে—কিসের গন্ধ রে মিনু?

মিনু কোনো জবাব দিল না; সৌন্দর্যের রসের থেকেই এ যেন এক ঘ্রাণ; পদ্মের রক্তমাংসের থেকে যেমন গভীর বিলাসের গন্ধ আসে তেমন, পদ্ম কি কিছু খায়?

—একটা চুমো খাই কল্যাণী?

চুমো সে খেল—

এমন পরিতৃপ্তি মিনু কোনো দিনও পায়নি যেন।

দশ

পরদিন অন্যরকম ব্যাপার।

রাত দশটা আন্দাজ হবে; কল্যাণীর টেবিলের পাশে পাঁচ ছয় জন মেয়ে এসে জড় হয়েছে।

কল্যাণী বললে—উঃ, কী ভীষণ বৃষ্টি পড়ছে

মিনু বললে—পড়বে না, এখনো তো ভাদ্র মাস—

কমিশনারের মেয়ে চিতু বললে—তোমরা কি যে বল ভাদ্র মাস না কি মাস তাই বৃষ্টি পড়ছে—অন্য মাস হলে পড়বে না—এ আমি মানি না। মাসের সঙ্গে বৃষ্টির কি সম্পর্ক?

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

বাস্তবিক চিতু কিছু জানে না; কেবল কাঁটা ছুরি দিয়ে খট খট করে খাওয়া আর ইংরেজি গান গাওয়া ছাড়া।

চিতু একটু দমে গেল।

বললে—তোমরা হাসলে যে

মীরা বললে—হাসব না? শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ঝড় বাদলা হবে—এ তো সকলেই জানে

চিতু বললে—কেন তা হবে? অন্য মাসে কেন হবে না? এটা তোমাদের প্রেজুডিস্

মিনু বললে—অন্য মাসে বড় একটা হয় তো না দেখি

—খুব হয়, নভেম্বর মাসে বৃষ্টি পড়ে না ডিসেম্বরে পড়ে না?

আবার সকলে হেসে উঠল।

চিতুর মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল; অত্যন্ত কষ্টে নিজেকে সে সংযত করে রাখল। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য মোটে চেঁচিয়ে উঠে বললে—কথায় কথায় তোমাদের giggling; গা জ্বলে যায়; ঝড়বৃষ্টি কি তোমাদের বাপের চাকর দারোয়ান যে নভেম্বরে পড়বে ডিসেম্বরে পড়বে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীরা বললে—শোন চিতু

চিতু মীরার ঘাড়ে হাত রেখে বললে—বল ভাই মীরা—তুমি তবু বরং একটু truthfully কথা বলতে পারে-peacefully;

মীরা বললে—তুমি বাংলা মাসের নামগুলো জান তো চিতু

চিতু বললে—না

একটু থেমে বললে—দু'একটা জানি—এই ভাদ্র—

আর কোনো নাম তার মনে এল না।

চিতু বললে—বাংলা মাসের নাম জানতে আমি কেয়ার করি না—

মীরা মাসের নামগুলো আওড়ালে

চিতু বললে—অত আমার মনে থাকবে না

কল্যাণী বললে—লিখে নাও

চিতু বললে—বয়ে গেছে আমার—

মিনু বললে—ক'টা ঋতু তা জান?

—ঋতু আবার কি?

মীরা বললে—যেমন autumn—

—ওঃ, খুব জানি -seasons—

—বাংলায়ও তেমনি রয়েছে—

চিতু বললে—ইংরেজির থেকে নকল?

মিনু বললে—দূর!

চিতুর চোখ গরম হয়ে উঠল।

মীরা বললে—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এ দু'মাস গরম, আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষ, ভাদ্র—আশ্বিন শরৎ—

চিতু বললে—শরৎ?

—শরৎ

মীরা বললে—কার্তিক—অঘ্রাণ হেমন্ত, পৌষ-মাঘ শীত—

—মানে, ডিসেম্বরে?

—ফাল্গুন—চোত বসন্ত; বুঝলে চিতু।

চিতু বললে—তা কি কখনো হয়? বাংলা মাসের সঙ্গে শীত বা ইয়ে বৃষ্টির কোনো সম্পর্ক নেই।

বাঙালিদের মধ্যে দু'একজন তো শুধু আই-সি-এস পাস করে ডিস্ট্রিক্ট অফিস্যার হতে পারে—সাহেবদের সকলেই Administrator ওদেরই সব জিনিসগুলো ঠিক; বলে black in November, নভেম্বর এলেই শীত।

সকলে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ল।

কল্যাণীর আরসীর পাশে গিয়ে মিনু বেণী বাঁধতে লাগল।

কলেজে প্রফেসরদের কথা উঠল।

মিনু চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে—আমাদের মেয়েদের কলেজে পুরুষ প্রফেসর বড় একটা থাকে না; তাতে লেকচার খারাপ হয়ে যায়—মেয়েরা কি লেকচার দেবে? জানে কি মেয়েরা?

মীরা বললে—তুমি নিজে মেয়ে নও?

মিনু আরসীর দিকে তাকিয়ে বললে—হলামই বা

কল্যাণী বললে—মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার এত হীন ধারণা মিনু—

মিনু বললে—কিছু জানে না মেয়েরা, যা জানে তাও ফুটিয়ে বলতে পারে না। লেকচার যা ধার করে শুধু

চিতু বললে—আমি তা মানব না—মেমসাহেবরা চমৎকার ইংরেজি পড়ান—এর চেয়ে ভালো প্রফেসর কলকাতার কোনো কলেজে তুমি পাবে না—

মিনু বললে—হ্যাঁ! বললেই হ'ল কলকাতার কোনো কলেজে পাবে না—বাইবেল মুখস্থ করলে আর প্রনানসিয়েশন জানলেই হয়ে যায় না, সাহিত্য ঢের গভীর জিনিস—

মীরা বললে—তা ঠিক—সাহিত্য—

চিতু বললে—পাকামো যত সব! সাহিত্যের মানে আমি জানি না বুঝি? তোমরা কেউ বলতে পার এখন পোয়েট লরিয়েট কে?

কেউ বলতে পারল না

চিতু বললে—বরার্ট ব্রিজেস

সুপ্রভা বললে—মেসফিল্ড—

চিতু বললে—তুমি ছাই জান!

সুপ্রভা বললে মেসফিল্ড— আমি জানি।

চিতু বললে—যা জান না তা নিয়ে কথা বল কেন? রবার্ট ব্রিজেস পৃথিবীর সব চেয়ে (বড়) কবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিনু বললে—তা হোক গিয়ে; আমরা বলছিলাম কলেজের লেকচারের কথা—তার সঙ্গে ব্রিজেসের কি সম্পর্ক?

চিতু বললে—খুব সম্পর্ক। তোমরা সাহিত্য সাহিত্য কর, সাহিত্য তোমাদের চেয়ে আমি ঢের বেশি জানি। প্রনানসিয়েশনই হচ্ছে সাহিত্যের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। বাঙালি প্রফেসররা না জানে প্রনাউন্‌স্ করতে—না জানে গ্রামার—তারা আবার লেকচার দেবে কি?

কেউ কিছু বললে না।

মিনু বললে—হিস্ট্রির প্রফেসরটি চমৎকার পড়ান কিন্তু মীরা

—কোন জন?

—ঐ যিনি নতুন এসেছেন—মিঃ গাঙ্গুলি—

মিনু বললে—আওয়াজ গুম গুম্ করতে থাকে—মেমদের মত মেয়েদের মত পিন পিন করে না।

মীরা বলল—বেশ ইন্টারেস্টিং করতে পারেন।

মিনু বললে—আঃ, রোমান এম্পায়ারের কথা যা বললেন—শুনতে শুনতে গায় কাঁটা দিয়ে ওঠে—মনে হয় যেন টাইবারের পারে সেই ইটার্ণাল সিটিতে আবার চলে গেছি

চিতু হাঃ হাঃ করে করতালি দিয়ে হেসে উঠে বললে—মিনু একেবারে পিক-মি-আপ

সুপ্রভা বললে—টপিঙ

চিতু বললে—দুঃখের বিষয় আমি হিস্ট্রি নেই নি, না হ'লেও গাঙ্গুলির বাচ্ছার গ্রামার প্রনানসিয়েশন নিয়ে কড়কে দিতাম

—কি করতে

I have corked him

চিতুর কথায় কোনো কান না দিয়ে মিনু বললে—এক এক সময় মনে হয় যেন উনি একজন সেন্টুরিয়েন—প্রিফেক্ট—সিনেটর...আঃ পম্পির ওপর কি লেকচারটা দিলেন—

মীরা বললে—ভালোবেসেছিস নাকি

চিতু বললে—নিশ্চয় ওঃ ভীষণ এনামার্ড!

কল্যাণী বললে—তাহ'লে বিয়ে করলেই পার মিনু

—কাকে গাঙ্গুলিকে?

কল্যাণী বললে—হ্যাঁ, দেখতেও বেশ সুন্দর—অল্প বয়েস

মীরা বললে—বয়ে গেছে গাঙ্গুলির মিনুকে বিয়ে করতে—তার চেয়ে কল্যাণী যদি একটু বেচারাকে ভরসা দেয়।

সুপ্রভা বললে—কল্যাণীই তো আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর

মিনু বললে—কলেজের বিউটি

মীরা বললে—গাঙ্গুলিকে বললে এক্ষুণি

কল্যাণী বললে—আমার বয়ে গেছে—

মিনু আহত হয়ে বললে—কেন?

কল্যাণী বললে—টিচার বিয়ে করব আমি? আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল—এমন দেমাক কল্যাণীর পক্ষে হয়তো সাজে—খুবই সাজে বটে, তাই তো সে কেন একজন টিচারকে বিয়ে করতে যাবে?

মেয়ে কটি এই কথাই ভাবছিল—

প্রথম কথা বললে মিনু; মনটা তার কেমন একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিল, মনে হচ্ছিল এক জন যোগ্য লোককে সেধে সেধে অপমান করা হ'ল—

মিনু বললে—আচ্ছা ভাই সুপ্রভা; তুমি তো খুব ভালো ইংরেজি জান—কলেজের প্রফেসরকে টিচার ব'লে না কি আবার?

সুপ্রভা ঘোষাল চোখের থেকে চশমা নামিয়ে আস্তে আস্তে মুছে নিচ্ছিল।

মিনু বললে— এই যে কল্যাণী বললে 'টিচার বিয়ে করব আমি?'— একজন কলেজের প্রফেসরকে কেউ আবার টিচার ব'লে নাকি?

সুপ্রভা বললে—তা বলতে পারা যায়

মীরা বললে—টিচার তো স্কুলের—

মিনু বললে—আমিও তো তাই জানি

সুপ্রভা বললে—টিচার শব্দের নানারকম মানে হতে পারে। স্কুলের মাস্টার তো দূরের কথা কলেজের প্রফেসরের চেয়েও এই শব্দটির জায়গায় ঢের বেশি মর্যাদা—যেমন টলস্টয় একজন টিচার ছিলেন—

সকলেই নীরব হয়ে রইল

চিতু বললে—টিচার বিয়ে করবে না তুমি কল্যাণী?

—আমি বলেছিই তো করব না।

—কেন প্রফেসরদের মধ্যে বড় বড় তো ঢের আছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তা থাক গে

চিতু বললে—গভর্নমেন্ট কলেজের ইম্পিরিয়াল গ্রেডের প্রফেসর হলেও করবে না?

কল্যাণী বললে—না।

চিতু বললে—আমি তো করি—

সকলে অবাক হয়ে বললে—প্রসেফর বিয়ে কর তুমি চিতু?

—আই-ই-এস হলে কেন করব না?

—ওঃ আই-ই-এস!

চিতু বললে—তবে কি? একটা প্রাইভেট কলেজের বরখুটেকে তাই বলে করছি না।

ওরা খেতে পায় নাকি? ছেলেরা ওদের মাস্টারমশায় বলে।

কল্যাণী বললে—মিনুর প্রফেসর হলেই হয়—

মীরা বললে—মন্দ কি? আমারও একজন হলেই হয়—

চিতু বললে—গাঙ্গুলির মতন?

মীরা বললে—হ্যাঁ—খু-ব।

মিনু বললে—বসে আছে।

চিতু বললে—আর সুপ্রভার?

—আমি বিয়ে করব না।

—কি করবে?

সুপ্রভা দেখতে সুন্দর ছিল; খুব স্মার্ট; পড়াশুনায়ও সকলের চেয়ে সেরা।

সুপ্রভা বললে—পাস করব। পাস করে চাকরি ফাকরি নেব না আর। মেজদির ওখানে গিয়ে কাটাব—নইনীতালে—পাইন বনের বাতাসের মধ্যে।

সকলের বিমুগ্ধ হ'ল।

চিতু বললে—তোমার মেজদির বর সেখানে থাকেন বুঝি?

—হ্যাঁ

—কি করেন?

কল্যাণী বললে—আমারও ওইরকম একটা কিছু করতে হবে।

মিনু বললে—ওতে নমুষ্যত্ব থাকে না।

কল্যাণী বললে—কেন?

মিনু বললে—হয়ে স্বামীর সঙ্গে থাকতে হয়—না হয় নিজে করে খেতে হয়—

মীরা বললে—তা ঠিক

জিনিসটা কল্যাণীর মনে খুব গভীরভাবে দেগে গেল।

এগারো

পূজোর ছুটিতে কিশোরের সঙ্গে দেশে চলে গেল কল্যাণী। সকালবেলা শালিখবাড়িতে স্টিমার গিয়ে পৌছুল। কল্যাণীদের নেবার জন্য পঙ্কজবাবু গাড়ি করে স্টেশনে এসেছিলেন।

বাড়িতে পৌছে কল্যাণী দেখল দোতলার হলে একটি অদ্ভুত মানুষ বসে রয়েছে; অদ্ভুত ঠিক নয়, অদ্ভুত বলা চলে না; কিন্তু তবুও কল্যাণীর বার বার মনে হতে লাগল কি অদ্ভুত কি অদ্ভুত এই মানুষটি—

লোকটি বেঁটেও নয়—লম্বাও নয়; কুঁজো মাথার চুল পাৎলা হয়ে সামনে দিয়ে বেশ বড় টাক পড়ে গেছে; মুখ হলদে—কেমন চীনেদের মত যেন; মুখের ছাঁদও একেবারে চীনেদের মত। হঠাৎ দেখে কল্যাণী আঁৎকে উঠল—এমন খারাপ লাগল তার। কিন্তু তবুও ঠিক চীনে নয় যে—বাঙালি যে তা বোঝা যায়। মুখের ওপর পাঁচ ছয়টা আঁচিলের ভিতর থেকে দাড়ির মত লম্বা লম্বা চুল বেরিয়ে পড়েছে; লোকটা সেগুলোকে কাটেও না ছাঁটেও না। একটা সুট পরে বসে আছে সে। টাই ধরে নাড়ছিল। সামনে টেবিলের ওপর একখানা খবরের কাগজ মেলা। কল্যাণীকে দেখে খবরের কাগজ থেকে চোখ তুললে সে।

আর শিগগির সে চোখ ফেরাল না।

এমন আবিষ্ট হয়ে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে রইল। কল্যাণী ভয় পেল। লোকটার ওপর কেমন অশ্রদ্ধায় ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে উঠল তার। হলের থেকে বেরিয়ে গেল সে।

দু'এক মুহূর্তের মধ্যেই এই মানুষটিকে ভুলে গেল কল্যাণী।

গুণময়ী ঘোষ লেবু দিয়ে বেলের সরবৎ করে এনে দিলেন কল্যাণীকে—কল্যাণী খেতে খেতে বললে—আমি স্নান করে আসি গে

গেলাসটা সে টেবিলের ওপর রাখল

—এ কি এক চুমুক খেলি শুধু যে—সমস্তটুকু খেয়ে নে

—থাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কেন? ভালো লাগে না?

—লাগে বেশ

—তবে?

—আমি ভেবেছিলাম, মা, যে চা খাব—

—তা খাস্

—তুমি বেল দিলে যে?

—বেলও হবে, চাও হবে

কল্যাণী হেসে বললে—তা হয় না।

কল্যাণী গেলাসটা তুলে নিয়ে পানাটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল—

গুণময়ী বললেন—এত সাধের করা বেল—

কল্যাণী ফেলতে ফেলতে থেমে গিয়ে গেলাসটা টেবিলের ওপর রাখল—

বললে—কে খাবে?

—থাক; কেউ যদি খায়।

স্নান করে কল্যাণী তেতলার বারান্দায় গিয়ে বসল ইজি চেয়ারে। বেশ লাগছিল। পূজোর ছুটিটাই সবচেয়ে ভালো লাগে তার। বেশিদিন দেশে পড়ে থাকতে হয় না। যে ক'টা দিন থাকা যায় সেও বেশ ফুর্তিতেই থাকাই।

খানিকক্ষণ পরে।

একটা বই আনবার জন্য দোতলায় নেমে গেল কল্যাণী; হলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় আবার সেই লোকটির সঙ্গে দেখা। এর কথা এক মুহূর্ত আগেও মনে ছিল না, কাগজের থেকে মুখ তুলে কল্যাণীর দিকে আবার সে আবিষ্টের মত তাকিয়ে রইল।

কল্যাণী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করে লোকটিকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে এরকম করে তাকানো তার উচিত নয়—এ নিতান্তই অসভ্যতা তার।

সে তা বুঝল কি না কে জানে!

এবারও মুহূর্তের মধ্যেই এ মানুষটির কথা কল্যাণী একেবারেই ভুলে গেল।

একটা বই বেছে নিয়ে তেতলার বারান্দায় গিয়ে ইজি চেয়ারে ঠেসে বসল সে। বইটা; বার্নাড শ'র Intelligent Woman's Pride–

কলকাতার থেকে আসবার সময় মিনু গছিয়ে দিয়েছে। মিনুর বই।

বলেছে ঃ পড়ে দেখিস।

সুপ্রভা দিয়েছে রেড লিলি; মীরা—তার নিজের বাংলা কবিতার খাতা; চিতু—অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড; এর চেয়ে চমৎকার বই পৃথিবীতে আর নেই; নাকি কমিশনার সাহেব বলেছেন; কল্যাণীর হাসি পেল—হোক না ডিভিশনের কমিশনার—

তাই বলেও বইয়েরও কমিশনার?

অ্যালিস অবিশ্যি পড়ে দেখবে কল্যাণী—

কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার বই? তা কক্ষণো হ'তে পারে না। পৃথিবীর ? পৃথিবীর!

পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার বই কি?

জানে না কল্যাণী।

বই সে এত কম পড়েছে!

কল্যাণীর মনে হ'ল কোনো একখানা বইকে সবচেয়ে বড়—সবছেয়ে ভাল—এ রকম বলতে পারা যায় না।

লোকে বাংলা বইগুলোকে এত অগ্রাহ্য করে কেন?

কলেজের মেয়েরাও

বাঙালিদের মধ্যে কি লেখক নেই?

তেমন ধরনের বই নেই?

বাংলা বই অনেক পড়েছে বটে কল্যাণী; মাঝে মাঝে এক একটা বইকে মনে হয়েছে—মন্দ নয়; বেশ তো! এরকম একে একে ঢের বই বেশ লাগল। কিন্তু মিনুকে সেই বইগুলোর নাম বলতেই সে এমন হেসে ফেলল—

মিনু এবার বি-এ দেবে। ঢের জানে।

মিনুর কথাই গ্রাহ্য করতে হয়।

মিনু বলে বাংলায় আবার বই আছে নাকি?

সুপ্রভাও তাই বলে।

চিতু তো বলবেই; সে বাংলা পড়তেও পারে না। ছেলেমানুষের মত বানান ভুল করে যা-তা বাংলা চিঠি লেখে।

মীরার আবাল্য এদের সঙ্গে মত মেলে না। মীরা বাংলা সাহিত্যের ঢের জানে। কল্যাণীর মনে হ'ল ছোড়দা সেদিন কলকাতায় আর্টের কথা বলছিল—থিয়েটার থেকে ফিরেও কি সব বলছিল; আস্তে আস্তে মনে হতে লাগল কল্যাণীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে দিনকার সেই গঙ্গাটাকে মনে হ'ল; মীরার কবিতার খাতা Intelligent Women's Pride-এর ভেতরেই রয়েছে। খাতাটা সে কোলের উপর উঠিয়ে রাখল।

বইটা খুলল।

কিন্তু পড়তে ইচ্ছা করছিল না।

আশ্বিনের ভোরবেলা।

বহুয়ার মাঠটা কি সবুজ; সাদা সাদা কাশে ভরে গেছে; মাছরাঙা উড়ছে, এক ঝাঁক গাঙশালিখ কিচির মিচির করছে; ক্ষীরুই গাছের ডালে একটা টুনটুনি।

সুপ্রভা বলেছিল নইনীতালে গিয়ে তার মেজদির কাছে থাকবে—মেজদির বরের কাছে; রামঃ! ওতে কি মনুষ্যত্ব থাকে? মিনু যা বলেছে তাইই ঠিক, মেয়েদের স্বামীর সঙ্গে থাকতে হয়—কিম্বা করে খেতে হয়। বাবার সঙ্গেও চিরদিন থাকবার অধিকার নেই মেয়েদের। বাবা তো চিরকাল বেঁচে থাকেন না। এইসব ভাবনা কল্যাণীর মনকে নিরুদ্দেশের মধ্যে ঘোরাচ্ছিল।

কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল তার।

গুণময়ী এক গজ মসলিনের কাপড় নিয়ে এলেন

কল্যাণী বললে—কি হবে মা এটা দিয়ে?

—এটার ওপর একটা নক্সা আঁকব

—কিসের নক্সা

—পদ্মর

কল্যাণী হেসে উঠল—

গুণময়ী বললেন—হাসলি যে, ঠাট্টা হ'ল বুঝি? পদ্মর নক্সা আমি আঁকতে পারি না?

কল্যাণী বললে—না, তা নয়, মা, আমি ভাবছিলাম এত নতুন নতুন নক্সা থাকতে সেই একঘেয়ে পদ্মর নক্সা ছাড়া আর তুমি কিছু খুঁজে পেলে না?

জুতোর শব্দ হচ্ছিল

কল্যাণী বললে—বাবা আসছেন বুঝি।

পরের মুহূর্তেই পঙ্কজবাবু আর সেই ভদ্রলোকটি এসে দু'টো সোফায় বসলেন। কিশোরও এল; ইতস্তত সোফা ছড়ানো ছিল—সেও একটায় বসল।

কল্যাণী দেখলে মা উঠলেনও না, চোখও তুললেন না, ঠায় বসে ডিজাইন বুনছেন—একটা পদ্মর ডিজাইন।

কল্যাণীও বসে রইল।

ভদ্রলোকটি গুণময়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি তো আপনাদের সকলকেই চিনি—কাজেই লজ্জার আর কি?

গুণময়ী একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ, লজ্জাসঙ্কোচের আর কি?

কল্যাণীর মনে হ'ল লজ্জার যে কিছু বা কিছু নয় সে সব কথা এ মানুষটিকে জিজ্ঞেস করেছে নাকি কেউ? ভারী তো গায় পড়ে কথা বলার অভ্যাস। সে বিরক্ত হয়ে বইয়ের পাতার দিকে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোকটি বললেন—কর্ত্তা আমাকে একেবারে আপনাদের অন্দরের মধ্যে টেনে এনেছেন আমি আপনাদের ডিস্টার্ব করছি না তো—

গুণময়ী বললেন—আপনি আসাতে খুব খুসি হয়েছি—

—তার চেয়েও বেশি খুসি হয়েছি আমি—

পঙ্কজবাবু একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন—তুমি একটা চুরুট তুলে নাও চন্দ্রমোহন।

এর নাম তবে চন্দ্রমোহন? কল্যাণী ঘাড় তুলে একবার তাকাল; চন্দ্রমোহন তার দিকে কেমন এক রকম করে যেন তাকিয়ে রয়েছে। কল্যাণীর কেমন যেন গ্লানি বোধ হ'ল।

কেমন কুৎসিৎ—বিশ্রী চেহারা—হলদে রং চীনের মত মুখ—মুখে আঁচিল ভরা ভরা দাড়ি—এ ভদ্রলোক কোত্থেকে এলেন? কেন এলেন? তাদের পরিবারেই বা কেন? বাবার সঙ্গেই বা এত খাতির কেন? সমস্ত বাড়িটা পড়ে থাকতে কল্যাণী মধুর অবসরের জায়গায়ই বা কে আসতে বললে তাদের...ভাবতে ভাবতে কল্যাণীর সমস্ত শরীর মন যেন পীড়িত হয়ে উঠল।

সে উঠে যেত—কিন্তু নড়তে চড়তেও তার যেন কেমন ঘৃণা বোধ হচ্ছিল—বইটার দিকে একমনে তাকিয়ে রইল সে।

চন্দ্রমোহন বললে—আমি চুরুট খাই না; মাপ করবেন।

পঙ্কজবাবু গুণময়ীকে বললেন—দেখেছ এমন সৎ—একটা চুরুট অব্দি খায় না।

গুণময়ী একটু হাসলেন

চন্দ্রমোহন বললে—আমাকে লজ্জা দেবেন না, আপনার উদার অটুট অতুলনীয় চরিত্রের কাছে আমাকে টেনে এনে কেন কলঙ্ক বাড়ানো। চুরুট কেন, আপনি যদি মদের বোতলও হাতে ধরেন তবুও তা আপনার চরিত্রের মাধুর্য্যে যেন সুধায় রূপান্তরিত হয়ে যায়—

কল্যাণীর এমন হাসি পেল, তার মনে হ'ল ছোড়দাও নিশ্চয়ই হাসছে; কিন্তু কিশোরের মুখ গম্ভীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার দিকে তাকিয়ে দেখল কল্যাণী—মাও স্থির; বাবার মুখ প্রসন্ন।

কল্যাণী অবাক হয়ে ভাবল; এ কি, চন্দ্রমোহনের ভণ্ডামি কেউ ধরতে পারছে না কেন?

চন্দ্রমোহন গুণময়ীর দিকে তাকিয়ে বললে—আপনার অনেক পুণ্যি মা, জন্মজন্মের তপস্যায় এমন শিবস্বামী কপালে আসে—

গুণময়ী ও পঙ্কজবাবু দু'জনের দিকে লক্ষ্য করেই খুব গভীর ভক্তির সঙ্গে নমস্কার করল চন্দ্রমোহন।

কল্যাণীর মনে হ'ল চন্দ্রমোহনের বিরুদ্ধে তার মনের ঝাল আগের মতন তেমন তীব্র নেই—লোকটা অসহ্য বটে, কিন্তু তবুও অগ্রাহ্য করতে পারা যায় একে, ক্ষমা করতে পারা যায়।

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার আলুবখরার টক ভারী চমৎকার মা

গুণময়ী বললেন—একদিন তো শুধু রেঁধেছি

—ঐ একদিনেই কিনে নিয়েছেন—

পঙ্কজবাবু বললেন—যে ক'দিন আছে, একটু আলুবখরা দু'বেলা করলেই পার

গুণময়ী প্রীত হয়ে বললেন—আমি আগে যদি জানতাম—

চন্দ্রমোহন বললে—আমার মা পিসিমা জেঠিমা মাসীমা মামী—সবারই দুর্দান্ত রান্নার হাত—কলকাতার সব জাঁহাবাজ নেমন্তন্ন সামলান—কিন্তু টক, এমন চাটনি তো কেউ রাঁধতে পারেন না।

সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার চিংড়ী কাটলেটই বা কি চমৎকার! কলকাতার কত রেস্টুরেন্টে আমি খেয়েছি—একদিন এক চীনে বারী খাসা রেধে দিয়েছিল—কিন্তু আপনার হাতের ভাজা খেয়ে বুঝলাম যে এদ্দিন ছিবড়ে খেয়েছি—

গুণময়ীর চোখ মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

পঙ্কজবাবু বললেন—গিন্নী রান্না শিখেছিলেন তাঁর মার কাছে— খুব ঝাঁঝালো রাঁধুনির গুষ্টি।

চন্দ্রমোহন বললে— আপনি কি আঁকছেন মা?

পদ্ম

বাঃ কি চমৎকার ছুঁচের কাজ উঠে আসছে—কি গ্র্যান্ড বাঃ! এমন চেকনাই পদ্ম তো আমি কোনোদিন দেখিনি—

পঙ্কজবাবু বললেন—বেশ হাত আছে—

গুণময়ী বলেন—এখনও হয়নি—

চন্দ্রমোহন বললে—এরকম আরও বুনেছেন আপনি?

—হ্যাঁ

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার তো শুধু এই করাই উচিত—যে জিনিয়াস আর্টের থাকে অন্য কিছু দিয়ে খোয়ানো উচিত নয়—

কল্যাণী শিহরিত হয়ে উঠল; এ লোকটাও আর্টের কথা বলছে?

চন্দ্রমোহন পঙ্কজবাবুকে বললে—আপনাদের ড্রয়িংরুমে কার্পেট দেখলাম—চমৎকার কার্পেট—এমন কার্পেট কোথাও তো দেখিনি আমি আর—অথচ কলকাতায় বড় বড় ব্যাপারীদের সঙ্গে আমার কার্বার—

সকলেই গর্ব অনুভব করতে লাগল—কি না লাগল ঠিক বুঝতে পারল না কল্যাণী। লোকটা বেশি বাড়াবাড়ি করছে না তো।

চন্দ্রমোহন বললে—আর কি জমকালো বই বাড়িখানা করেছেন—ঠিক যেন একটা পুরীর মত; কলকাতায় কত রাজামহারাজার বাড়ি দেখেও এরকম মন ওঠেনি আমার—

চন্দ্রমোহন গম্ভীর সম্ভ্রব বিস্ময়ের সঙ্গে বাড়িখানার কড়ি বর্গা দরজা জানালা খিলান চৌকাঠের দিকে তাকাতে লাগল—

বাড়িখানার রেণুপরমাণুর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রমোহনের সঙ্গে অন্য অন্য সকলেও খুব গৌরব বোধ করছিল হয়তো; কিম্বা আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন হয়েছিল।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললে—এই ছেলেটি আপনার খুব বড় কবি হবে—

পঙ্কজবাবু ও গুণময়ী ঈষৎ কৌতূহলে চন্দ্রমোহনের দিকে তাকাল—

চন্দ্রমোহন বললে—এমন ভাবুক চিন্তাশীল চিত্তবৃত্তি শিগগির আমি আর দেখিনি—

পঙ্কজবাবু বললেন—কি করে বুঝলে?

চন্দ্রমোহন বললে—চোখ নাক কপাল দেখলেই বুঝতে পারা যায় এর কত বড় প্রতিভা—আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে বসে বসে দেখেছি—

অবাক হয়ে বসে বসে বাস্তবিক সে দেখছিল কল্যাণীকে; কিন্তু কল্যাণী মুখও তুল্ল না—কিশোরের প্রতিভার প্রশংসার কথা শুনেও চন্দ্রমোহনের মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শুনবার জন্য বিশেষ কোনও আগ্রহ বোধ করল না সে; কল্যাণীর মনে হ'ল এ লোকটি সব জিনিসকেই চমৎকার বলে, সাজিয়ে সাজিয়ে মনের মতন কথা বলে বাবা মার মন গলাতে চায় শুধু, কল্যাণী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তাদের ড্রয়িং রুমের কার্পেট কলকাতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব দোকানের সব রকম কাপের্টের চেয়ে সেরা—অত্যন্ত শস্তা সাধারণ কার্পেট তাদের; মার হাতের আঁকা পদ্ম অত্যন্ত সাদাসিদে জিনিস—আলুবখরার টকও তেমনি—চিংড়ির কাটলেটও তাই—

কিন্তু চন্দ্রমোহনের হলদে রং—আর চীনেম্যানের মত মুখ—মুখ ভরা আঁচিল আর আঁচিলের দাড়ি—সেগুলো যে অত্যন্ত কুৎসিৎ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কল্যাণী ভ্রুকুটি করে বসে রইল।

পঙ্কজবাবু বললেন—এখন কাজের কথা।

চন্দ্রমোহন অত্যন্ত বিরসভাবে বললে—কাজ আর কি? পাটের জন্য আমাদের বিস্তর ক্ষতি দিতে হয়েছে—

—কত?

—আশী লাখ টাকা

—আশী লাখ!

চন্দ্রমোহন একটু হেসে বললে—আশী লাখ আবার টাকা

বলে কল্যাণীর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু এ মেয়ের মুখের ভিতর কোনো পরিবর্তন নেই; সে ঘাড় গুঁজে বই-এর পাতার দিকে তাকিয়ে পড়ে যাচ্ছে—

পঙ্কজবাবু বললেন—তাহ'লে অদ্বিতীয় বিড়লার ব্যবসা

—হ্যাঁ পাঁচ সাত কোটি টাকার

—পাঁচ সাত কোটি

চন্দ্রমোহন একটু বিনয়ের সঙ্গে বললে—তা হ'লই বা পাঁচ সাত কোটি! টাকাকে আপনি অত বড় করে দেখেন কেন পঙ্কজবাবু। টাকাই কি সব? তাহ'লে বেনেরাই তো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাপুরুষ হ'ত। মহাপুরুষ—মনুষ্যত্ব সে সব একেবারেই আলাদা জিনিস।

এ কথাগুলো শুনতে পঙ্কজবাবুর ভালো লাগছিল—গুণময়ীরও।

কল্যাণীরও মনে হ'ল বেশ বলেছে; খনখনে গলাটাকে আগের মতন তেমন খনখনে বোধ হচ্ছে না যেন; কেমন যেন আন্তরিকতায় ভিজে উঠেছে এবার।

অনেকক্ষণ পরে এবার চন্দ্রমোহনের দিকে তাকাল কল্যাণী। দেখল চন্দ্রমোহন তার দিকেই তাকিয়ে আছে—খুব অবসন্ন মনে হচ্ছে লোকটাকে; কেমন যেন একটা নিরন্তর নিবেদন কল্যাণীর কাছে তার। চন্দ্রমোহনের ওপর আগের মত ঘৃণা নেই যেন আর কল্যাণীর—কেমন একটু দয়াবোধ হতে লাগল এ লোকটির জন্য—মনে হতে লাগল এর চেহারা তো এ নিজে তৈরি করেনি—বিধাতা দিয়েছেন; কিন্তু এর মনটা তো এ নিজে প্রস্তুত করে তুলেছে একরকম মন্দ না—

কিন্তু এ সব ভাবনা কল্যাণীর দু'এক মুহূর্তের জন্য। এ লোকটি কি—এবং কি নয় সে নিয়ে কল্যাণী আর মাথা ঘামাতে গেল না।

সেরকম চিন্তা তার ভালো লাগছিল না। মোটেই ভালো লাগছিল না।

বারো

চন্দ্রমোহন বললে—ব্যবসার ফাঁক নানারকম—আজকাল সবাই দেখছি গুড় খায়: জানেন মা ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার সিভিল সার্জন এমন কি বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও বাড়িতে এসে গুড় দিয়ে চা খান

পঙ্কজবাবু অবাক হয়ে বললেন—বটে

গুণময়ী বললেন—ম্যাজিস্ট্রেটও

—হ্যাঁ; কাজেই এই বেলা গোটা কয়েক চিনির কল শানাব ঠিক করেছি—বেশ পড়তা হবে

পঙ্কজবাবু বললেন—ব্যবসায় তোমাদের মাথা বেশ খোলে—

চন্দ্রমোহন বললে—ক্যাপিটেল থাকলেই মাথা খোলে—

—তাও বটে

টাকা আগুনে গলিয়ে দিনরাতই টের পাচ্ছি যে কি দুর্দান্ত পক্ষিরাজ ঘোড়ায়ই চড়েছি পঙ্কজবাবু—

—পাঁচ সাত কোটি টাকা। তুমি একাই?

চন্দ্রমোহন একটু আমতা আমতা করে বললে—না, হ্যাঁ—একরকম একাই চালাচ্ছি

—ক'জন পার্টনার?

—সব স্লিপিং—

—ক'জন?

—আছে দু'এক জন

পঙ্কজবাবু আর বেশি চাপতে গেলেন না; পাঁচ সাতজন পার্টনার থাকলেই বা কি—ছ সাত কোটি টাকার ব্যাপার যখন।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দ্রমোহন বাংলা জোড়া একটা মুচি বোর্ড, জার্মান ও ডেনিশদের মত বাঙালিদের একটা লটারি অর্গানিজেশন, বিপুল বিরাট স্বদেশী ব্যাঙ্ক, স্বদেশী ইনসিওরেন্স কোম্পানি ইত্যাদি নানারকম ব্যবসার কথা অনেকক্ষণ বসে বললে—

তারপর যখন বারান্দায় কেউ আর ছিল না তখন পঙ্কজবাবুর কাছে ধীরে ধীরে কল্যাণীর কথা পাড়লে।

মেয়ের পিতার কাছ থেকে এত বেশি ভরসা পেল চন্দ্রমোহন যে সে রাতটা ঘুমিয়ে—ঘুমের মধ্যে দিব্যযোনিদের স্বপ্ন দেখে কাটিয়ে দিতে পারলেই ভালো হত তার। কিন্তু সারাটা রাত ছটফট ক'রে—জেগে থাকতে হ'ল; মুখে মাথায় চাপড়ে চাপড়ে ঠাণ্ডা জল দিয়েও কোনো লাভ হ'ল না, কোনো লাভ হ'ল না আত্মরতি নিগ্রহের পথে ঘুমের আবেশ অধিকার করে নিতে গিয়ে।

পরদিন সন্ধ্যায় কেউই বাসায় ছিল না।

হরিচরণ চাটুয্যের ছেলেরা ঘটা করে যাত্রা দিচ্ছে—কর্তা গিন্নী প্রসাদ কিশোর সব সেখানে বিকেল থেকেই। কত রাতে যে ফিরবে তার ঠিক ঠিকানা নেই কিছু। কল্যাণী যায়নি—সকাল থেকেই আজ তার মাথা ধরে রয়েছে—

স্মেলিং সল্টের বোতল—মীরার কবিতার খাতা—Intelligent—এক শিশি মেন্থল—ও এক ফাইল কি যেন ট্যাবলেট নিয়ে তেতলার বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসেছিল সে।

দুপুরবেলা চশমাটা খুলে রাখতে মাথা ধরা যেন আরো বেশি বেড়ে গেছে; কল্যাণী সন্দিগ্ধ হয়ে ভাবছিল চশমা না বদলাতে হয় আবার; চোখ তাকে পৃথিবীতে অকৃতার্থ করে তুলেছে না কি?

বইটা সে খুলে—পৃষ্ঠা পঁচিশেক আন্দাজ পড়া হয়েছে—সে কিছুই বোঝে না; এ বই তার ভালো লাগে না।

বইটা সে বন্ধ করে রাখল।

কি যে ভালো লাগে তার—এই পৃথিবীতে কোথায় যে তার প্রয়োজন—জীবনে নতুন রহস্য কখন যে উদ্‌ঘাটিত হবে কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছিল না।

ভিলুন্দির জঙ্গল আঁধার হয়ে উঠছে—

সন্ধ্যার কাক নিজের ঘরে যাচ্ছে তার—না জানি কতখানি গৃহিণীপনা রয়েছে এর মধ্যে—নিস্তব্ধ পরিতৃপ্ত দাম্পত্য সম্পদ রয়েছে!

কল্যাণী অবাক হয়ে ভাবছিল—

জুতোর শব্দ শোনা গেল—

হয়তো বাবা আসছেন।

Intelligen টা আবার খুলল কল্যাণী; একটু স্মেলিং সল্ট শুঁকে নিল—হলের পুব—ধারের বাঁ দিকের দরজাটা একটা ধাক্কা খেয়ে খুলে গেল—

কল্যাণী চমকে উঠে বললে—কে

চন্দ্রমোহন বললে—আমি

মুহূর্তের মধ্যে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে—

কল্যাণী বললে—আপনি এখানে?

—ওঁরা সব কোথায়?

কল্যাণী আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল; কিছু বলতে পারলে না সে—

চন্দ্রমোহন বললে—তিনতলাই তো ঘুরে এলাম—কাউকেই তো দেখছি না কল্যাণী ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করতে করতে বললে—কেউ নেই

—কোথায় গেছে?

যাত্রা শুনতে।

—যাত্রা কোথায়?

—হরিচরণ চাটুয্যের বাড়ি—

—আপনার বাবা মা সব সেখানে?

—হ্যাঁ

—প্রসাদও?

—হ্যাঁ

—কিশোর নেই?

কল্যাণী একটু বিরক্ত হয়ে বললে—বললামই তো—

চন্দ্রমোহন বললে—ওঃ। তা বলেছেন বটে—আমার ভুল হয়েছিল—আমাকে ক্ষমা করবেন।

একটা সোফার ওপর বসল সে—এমন নির্বিবাদে; কোনোরকম বালাই যেন নেই লোকটার।

কল্যাণী রেগে কাঁই হয়ে এর এই অদ্ভুত অসভ্যতা দেখল; তারপর ভাবল, উঠে যাই। কিন্তু তক্ষুণি তার মনে হ'ল কেন উঠে যাবে সে, তার নিজের জায়গার থেকে একটা উটকো গোলা লোক এসে তাকে সরিয়ে দেবে? সে সরে যাবে? তা কিছুতেই হবে না।

সে ইজি চেয়ারে চেপে বসে রইল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার সব কটি ভাইর নামই খুব সুন্দর—বিজলী—প্রসাদ—কিশোর—বাঃ

একটু পরে—আপনার মার নামও; ওরকম নামের যে কত বাহাদুরী—কি চমৎকার নাম যে—আমি ভেবে শেষ করতে পারি না।

কল্যাণী নিস্তব্ধ হয়েছিল।

চন্দ্রমোহন বললে—চমৎকার নাম!

অন্ধকার হয়ে আসছিল—বইয়ের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকতে পারা যায়—একটা অক্ষরও বুঝতে পারা যায় না—বইটাকে একটা বিষের পুঁটুলি বলে মনে হ'ল কল্যাণীর—বাপ মা দাদাদের মর্মান্তিক নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে কান্না পেতে লাগল—কোথায় তার পাশে বসে সকলে মিলে গল্প করবে তারা না এ কি অদ্ভুত অঘটনের ভিতর তাকে ফেলে পালাল সব—

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার বাবার কাছ থেকে জেনে নিলাম আপনার নামটা—

কল্যাণী ব্যথিত হয়ে নদীটার দিকে তাকাল

চন্দ্রমোহন বললে—এমন চমৎকার নাম! সবচেয়ে চমৎকার নাম আপনার! বাঃ কি চমৎকার!

চন্দ্রমোহন বললে—মনে মনে আউড়ে কত কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছি আমি; কত কৃতার্থ হচ্ছি। কিন্তু এ সার্থকতাকে আরো পূর্ণাঙ্গীণ করে তুলতে পারা যায়—

কল্যাণী বইটার দিকে আবার তাকাল—

চন্দ্রমোহন বললে—যায় না!

নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়ে বললে—তা যায়—

ওসমান যাচ্ছিল—

কল্যাণী বললে—ওসমান

—হুজুর

—একটা বাতি নিয়ায় তো

—হুজুর—বললে ওসমান চলে গেল।

কল্যাণী চশমাটা খুলে আঁচল দিয়ে মুছতে লাগল—

চন্দ্রমোহন বললে—ভারী চমৎকার চমশাটা তো আপনার—বাঃ, কেমন সুন্দর! লরেন্সের বাড়ির?

প্রতিপক্ষের থেকে কোনো জবাব না পেয়ে বললে—আমার এক বন্ধু খুব বড় চোখের ডাক্তার—ডাক্তার হালদার—খুব শাঁসালো—বিস্তর পয়সা করেছে।

কল্যাণী ধীরে ধীরে চশমা পরল।

চন্দ্রমোহন বললে—এমন চমৎকার মানায় আপনাকে! চশমা আঁচলে! যেমন চশমার সৌন্দর্য তার চেয়ে কত বেশি চমৎকার যে—

ওসমান বাতি আনল।

কল্যাণী বললে—ঐ তেপয়টা এখানে এনে তার ওপর রাখ—

রেখে দিয়ে ওসমান চলে গেল।

চন্দ্রমোহন বললে—দেশে দেশে কত সুন্দর মুখ দেখেছি আমি কিন্তু কাল থেকে যে অতুলনীয় রূপরাশি আমি দেখলাম পৃথিবীতে যে এরকম থাকতেও পারে কোনোদিন তা কল্পনাও আমি করতে পারিনি—

কল্যাণী বললে—আমি তো আপনার কোনো কথারই জবাব দিচ্ছি না—মিছেমিছে আপনি এখানে বসে কেহ হায়রান হচ্ছেন; ওরা আসুক—তারপর কথা বললে ঢের পরিতৃপ্তি পাবেন আপনি—

চন্দ্রমোহন বললে—ভুলে করলেন

কল্যাণী বাতির আলোর ভিতর বই খুলে ঘাড় ফিরিয়ে রইল।

—আমার কিসে পরিতৃপ্তি তা আমি কি জানি না?

কল্যাণীর মুখে কোনো জবাব জুয়াল না; মুখে যা আসে তা বড় অভদ্র—উগ্র—কেমন মর্মান্তিক। শিষ্টাচার বজায় রেখে কিছু কি সে বলতে পারে না?

কল্যাণী ভাবতে লাগল।

চন্দ্রমোহন বললে—পৃথিবীর সবচেয়ে পরিতৃপ্তি আমার এইখানে বসে—বসে শুধু—

চন্দ্রমোহন আরো বললে—আপনার সান্নিধ্য বসে যা তৃপ্তি তা স্বর্গেও নেই

কল্যাণী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে বললে—কিন্তু ঠিক তাতেই আমার সবচেয়ে বেশি অতৃপ্তি—বড্ড অস্বস্তি—আপনি আমার কথা বুঝেছেন?

নিজের গলার ভয়াবহ রুক্ষতায় কল্যাণী নিরস্ত হয়ে গেল। আরো ঢের কঠিন সাংঘাতিক অনেক কথা বলবে ভেবেছিল সে। (কিন্তু কণ্ঠ তার করাতের মত এক টানেই ঢের জটিলতা কেটে দিয়েছে—কৃতার্থ হয়ে বইটার দিকে তাকাল সে—)

চন্দ্রমোহন অম্লান বদনে বললে—আজ আপনার অতৃপ্তি কিন্তু একদিন আপনিও তৃপ্তি পাবেন—

কল্যাণী স্তম্ভিত হয়ে চন্দ্রমোহনের দিকে তাকাল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দ্রমোহন বললে—বড় একটা ডাঁহা কথা বলে ফেলেছি কল্যাণী দেবী।

একটু পরে আস্তে আস্তে বললে–কিন্তু একদিন তা আর মনে হবে না।

একটা ব্যাধের জালের মত কঠিন ছিদ্রহীন যেন এইসব কথা, কল্যাণীর হৃদয় ভীরু পাখির মত নয় বটে, একটুও নয়, কিন্তু তবুও মনটা কেমন ছমছম ক'রে উঠল তার।

চন্দ্রমোহন বললে—ছোটদের বড্ড ভুল ধারণা—আপনার মত ছোট যখন ছিলাম তখন আমিও বড্ড ভুল ভাবতাম। কিন্তু এখন আমার বয়স বিয়াল্লিশ—

সে একটু থামল।

তারপর বললে—আপনারও যখন বিয়াল্লিশ হবে ঠিক আমার মতই ভাববেন।

চন্দ্রমোহন একটু কেশে বললে—এখন আপনি রূপ চান; চান না? হয়তো শুধু রূপই চান—পুরুষমানুষের, মেয়েলোকের—

চন্দ্রমোহন একটু উপহাসের সুরে হেসে বললে—যে পুরুষের শুধু রূপ আছে সে যে কত অবজ্ঞেয় জীবনের সব সাধ সাধনায় মণিকর্ণিকার মত সুন্দর আগুন জ্বালিয়ে বেড়াবার মত তার যে আর জুড়ি নেই—একদিন তা বুঝবেন।

চন্দ্রমোহন বললে—টাকার দাম সবচেয়ে বেশি—এও একদিন বুঝতে হবে।

কল্যাণী কাঠের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল—

চন্দ্রমোহন উপলব্ধি করে বুঝে নিল। অত্যন্ত সহানুভূতির সুরে বললে—মানুষের বিচারের ভুল সুন্দর বৈকি—মুহূর্তের ইন্দ্রধনুর মতনই চেকনাই; রূপ চাই বিদ্যা চাই কুশলতা চাই গান চাই বাজনা চাই আর্ট চাই—কিন্তু তবুও একদিন বুঝবেন যে এ সবের চেয়ে ঢের বড় হচ্ছে টাকা আর সে একটু ভেবে বললে, স্বাস্থ্য আর চরিত্র—

নিজের সুস্থতার কথা বলতে লাগল চন্দ্রমোহন—এই বিয়াল্লিশ বছরের মধ্যে এক দিনের জন্যও কোনো অসুখ করেনি তার; ভবানীপুরের কোনও শিখই পাঞ্জায় তার সঙ্গে লড়ে উঠতে পারে না; যে কোনও লম্বা চৌকো ক্যামেরন হাইল্যান্ডারকে কুস্তিতে সে হারিয়ে দিতে পারে; (হয়েছে? কলকাতায় সে রোজ পাঁচ সের ঘি সাত-আট সের এলাচ—পনেরো কুড়ি সের কিসমিস—পেস্তা বাদাম আখরোট বেদানা সবই এইরকম আন্দাজ খায়—)

চন্দ্রমোহন তার ধর্মের কথা পাড়ল—ভগবানে অটল বিশ্বাস না রাখলে অবিশ্যি কোনো টাকারই কোনো মূল্য নেই; একমাত্র জিনিস যা টাকার চাইতেও বড়—তা হচ্ছে প্রেম—। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম। কিন্তু ভগবান স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের চাইতেও ঢের বড় জিনিস—এত বড় যে কল্পনা করতে পারা যায় না। সেই ভগবানে আত্মনিবেদন না করতে পারলে কিছুই হয় না।

চন্দ্রমোহন বললে ঃ কিন্তু ভগবানের এমনই নিয়ম যে তাঁর ভক্তকে তিনি নিজেই চিনে নেন, নিজেই তার ওপর কৃপা করেন—বড় বিশেষ রকমের কৃপা সে এক—সমস্ত অমঙ্গল অধর্মের পথ থেকে নিজেই তাকে তিনি রক্ষা করেন।

চন্দ্রমোহন বললে ঃ নিজের জীবনে ভগবানের সেই বিশেষ কৃপা আমি রোজি অনুভব করি—প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করি। যে জিনিস আমি চেয়েছি তিনি সব সময়ই আমাকে দিয়েছেন—একবারও তো বঞ্চিত করেননি। টাকাও অনেক সময় মানুষকে প্রতারিত করে—কিন্তু ভগবানের ভালোবাসা—মায়ের ভালোবাসার চেয়েও আন্তরিক; স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের চেয়েও; কত যে আন্তরিক তা ভেবে কিনারা করতে পারা যায় না।

চন্দ্রমোহন বললে—আমার জীবনের সম্পদ টাকা নয়;—ভগবানের কাছে এই আত্মনিবেদন শুদ্ধ হয়ে নির্মল হয়ে—আমার জীবনকে সব চেয়ে বড় সম্পদ দিয়েছে—

চন্দ্রমোহন বললে—টাকার কথা আমি তুলতামই না—আপনার বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন—শুনেছেন হয়তো—সাত কোটি টাকার কার্বার আমাদের—

টাকার সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কিছু আর বললে না চন্দ্রমোহন (বলবেই বা কি; সে অনেক কথা। বড় জটিলতার ব্যাপার।)—

সে কিছুক্ষণের জন্য থামল।

পঙ্কজবাবু এসে পড়েছিলেন

বললেন—চন্দ্রমোহন তুমি এখানে?

কল্যাণীকেও দেখলেন তিনি,—মেয়ে ভাবল বাবা না জানি এ লোকটাকে কত দূর অভদ্র— অপদার্থ বলে বুঝতে পেরে দু'কথা শুনিয়ে বের করে দেবেন—কিন্তু অবাক হয়ে দেখল কল্যাণী বাবা তা কিছুই তো করলেন না— তাঁর মুখ দিব্যি প্রসন্ন— এখানে এসে আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে যেন—

কল্যাণীর মন সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে লাগল—এমন নিরাশ নিঃসহায় মনে হতে লাগল নিজেকে তার—

পঙ্কজবাবু বললেন—চন্দ্রমোহন, যাত্রা শুনতে গেলে না যে?

—যাত্রা আমি শুনি না।

—ভালো লাগে না?

—না।

—কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—নাচগানে ক্রমে ক্রমে একটু অতিশয্য এসে পড়ে—মজলিসী ভাব আসে—নানা কথা বলা হয়—ফুর্তিতামাসার বাঁধ থাকে না—এই পূজোআচ্চার সময়ে যাত্রাফাত্রায় তো ঢের কেলেঙ্কারি হয় মদ থেকে শুরু করে—

চন্দ্রমোহন থামল—

পঙ্কজবাবু চুরুট জ্বালালেন; এক টান দিয়ে বললেন—তা যা বলেছ—ভাববার মত কথা বটে—

চন্দ্রমোহন বললে—আগেকার পালাগানের সে বিশুদ্ধতাও নেই। কেমন একটা আন্তরিকতা ছিল তখন! করুণা মধুরতা প্রেমের কি কোনও অবধি ছিল পঙ্কজবাবু? ছোটবেলার কথা মনে করে এখনও মন এমন ভিজে ওঠে। সে সব দিন আর নেই—বাইজী খেমটাওয়ালী মদ—হৈরৈ, রাগ রক্ত, কি যে সব—সে করুণতা নেই—মধুরতা নেই—প্রেম নেই—

পঙ্কজবাবু যেন ভক্তির কথা শুনছিলেন—কল্যাণীর মনে হ'ল—গয়াসুরের মুখে।

তেরো

পরদিন সকালে উঠে কল্যাণী দেখল তার টেবিলের বইখাতা লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে—কে যেন সমস্ত নেড়েচেড়ে গেছে।

মীরার কবিতার খাতার ভিতর যে ফার্ণ ও গোলাপফুলগুলো ছিল সে সব টেবিলের ইতস্তত রয়েছে—কবিতার খাতাটও খুঁজে বের করতে তার ঢের দেরী লাগল—একগাদা বইখাতার ভিতরে কোথায় যে সেটাকে কে গুঁজে রেখে দিয়েছে–Intelligent বইটা পাওয়া যাচ্ছে না।

কল্যাণী চোখ কপালে উঠল; তন্ন তন্ন করে সমস্ত টেবিল খুঁজে দেখল সে—দেরাজগুলো দেখল—একে একে বইগুলো আস্তে আস্তে তুলে তুলে সমস্ত খুঁজে দেখল আবার—সমস্ত টেবিলের বই একটার পর একটা করে সাজিয়ে রাখল—কিন্তু মিনুর সে বই কোথাও পাওয়া গেল না।

শেলফ দেখল সে—ছোড়দার টেবিল দেরাজ দেখে এল—মেজদা ও বাবার ঘরেও ঘুরে এল—কিন্তু কোথাও সে বই নেই।

বই কি হল? কে নিল? বিরক্তিতে অশান্তিতে রাগে একেবারে গুম হয়ে উঠে কল্যাণী কিশোরের ঘরের দিকে গেল—নিশ্চয় এ সব ছোড়দার কাজ!

বাবার কাছে বলে মেজদার কাছে বলে দেখাব আজ মজা বাছাধনকে আমি—থিয়েটারের সব কথা বলে দেব—স্টিমারে যে হুইস্কি খেয়েছিল সব বলে দেব বাবাকে আমি—কিশোর নিজের টেবিলে বসে একটা নাটকের মতো কি যেন লিখছিল—

কল্যাণী ঢুকে পড়ে বললে—ছোড়দা

কিশোর গ্রাহ্য না করে লিখে যাচ্ছিল

কল্যাণী বললে—ছোড়দা শুনছ—

—কি

—আমার টেবিল তুমি ঘেঁটেছিলে?

—তোর টেবিল?

—হ্যাঁ

কিশোর বললে—তোর আবার টেবিল আছে নাকি?

—হাত দিয়েছিলে নাকি বল ছোড়দা

কিশোর নাটক লেখায় মন দিয়ে বললে—কি দরকার তোমার টেবিল নেড়েচেড়ে আমার?

—নাড় নি?

কিশোরের কথা বলবার অবসর ছিল না, সে ঘাড় নেড়ে বললে, না, সে হাত দেয়নি।

—সত্যি বলছ ছোড়দা

কিশোর কলের মতো ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ সত্যি বলছি—

কল্যাণী বিশ্বাস করতে পারল না—

বললে—তবে আমার বই গেল কোথায়?

কিশোরের কান এদিকে ছিল না—সে কোনও জবাব দিল না।

কল্যাণী গলা চড়িয়ে বললে—আমার বই তাহ'লে কোথায় গেল ছোড়দা? বইর কি ডানা হ'ল নাকি।

—কি হয়েছে?

—আমার বই পাচ্ছি না।

—কি বই?

—দরকারী বই।

—নাম নেই? (কি দরকারী বই?)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী ক্ষুব্ধ হয়ে বললে—কেন, Intelligent...
কিশোর ফ্যা ফ্যা করে হেসে উঠল
কল্যাণী বললে—নিয়েছ নাকি তুমি?
— ও সব বইর কিছু বুঝিস তুই?
—খুব বুঝি
—ছাই বুঝিস
—বুঝি আর না বুঝি—তাই বলে তুমি না বলে নিয়ে যাবে কেন?
—আমি না বলে নিয়ে গেছি?
কিশোর চটে লাল
—কে নিল তাহ'লে
—তা আমি কি জানি?
—নাও নি তুমি?
—ফের ট্যাটামি করবি তো বের করে দেব এখান থেকে!
কল্যাণী ঠোটে আঁচল গুঁজে বিক্ষুব্ধ হয়ে নিজের ঘরে চলে এল।

বইটা কোথায় গেল তাহ'লে। ছোড়দা নেয়নি; ছোড়দা নিলে ওরকম চটে উঠত না। শেষ পর্যন্ত বলে দিত; বইটা ফিরিয়ে দিত। চটে উঠত না। ছোড়দা আর যাই করুক, কল্যাণীর সঙ্গে এরকম ধরণের ধাষ্টামো কোনও দিনও সে করে না।

কল্যাণী অনুপায় হয়ে বসে রইল।
কোথায় গেল বই? কে নিল?

বিছানাটা ঝেড়ে খুঁজল সে। বালিশের নিচে—তোষকের নিচে অনেকবার দেখল—তেতলায় গিয়ে দেখে এল—কোথাও নেই।

কল্যাণী মেজদার ঘরে একবার গেল।
প্রসাদ ল' জার্নাল পড়ছিল—
কল্যাণী খুব ধীর শান্তস্বরে বললে—মেজদা
প্রসাদ চুরুটে একটা টান দিয়ে বললে—কি
—আমার একটা বই তুমি দেখেছ?
—তোমার বই?
—হ্যাঁ
—কি বই?
কল্যাণী একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললে—অবিশ্যি সে বই আমার পড়া উচিত নয়—
—পড়া উচিত নয়! কি বই কল্যাণী?
—শুনলে রাগ করবে না তো?
প্রসাদ ঈষৎ হেসে বললে—কেন রাগ করবার কি আছে
কল্যাণীর ঘাড়ে সস্নেহে হাত রাখল প্রসাদ....
বললে—কি বই রে কল্যাণী?
—বাবা হয়তো পড়তে অনুমতি দিতেন না
—হুঁ?
—Intelligent.........
—ওঃ, সে আবার কার বই?
—শ'য়ের
—শ?
—বার্নার্ড শ—

—ওঃ, নাটক বুঝি! তা বেশ, শ'য়ের নাকট মন্দ না; তবে—একটু গর্জন বেশি। তোমাদের মতন মেয়েদের পক্ষে না পড়াই ভাল।

প্রসাদ মুখ বিকৃত করে বললে—লিটারেচার ফিটারেচার ধার ধারি না আমি—ও বই দেখিওনি কোনও দিন চোখে। তোমার কাছে ছিল বুঝি? কিনেছিলে? কে দিয়েছিল—? মিনু? মিনু কে? কলেজের মেয়ে? ওঃ; মেয়েরা বুঝি এ সব খুব পড়ে? বোঝে কি? শ একটু শক্ত নয় কি? হার্ড নাট! কি বোঝে! তুই বুঝিস? আমরা বুঝি না—বড্ড [?] সেই এক গ্রন্থে ঘুরছে—ঘুরছে—ঘুরছে—মাকড়সার মত; এই রকম না? মাকড়সা—মাকড়সা—উর্ণনাভ—উর্ণনাভ! অনাদ্যন্ত পৃথিবীর উর্ণনাভ নয়। বিশ শতকী England-এর প্রথম ওই দশকের—। লোকটা আজ মৃত। (কে জানে আজকালকার ছেলেমেয়েরা হয়তো আমাদের চেয়ে)

প্রসাদ ল' জার্নালে মন দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী বললে—বইটা তাহ'লে তুমি দেখনি?

—না

—আমার টেবিলে ছিল—কাল রাতেও ঘুমোবার আগে দেখেছি—আজ ভোরে পাচ্ছি না।

প্রসাদ বললে— কোথাও হয়তো অসাবধানে ফেলে রেখেছে—ভাল করে খুঁজে দেখ গিয়ে—যাও—আর বিরক্ত কোরো না।

কল্যাণী চলে গেল।

আস্তে আস্তে নিজের পড়ার ঘরের চেয়ারে এসে বসল সে। তার মনে হ'ল কাউকে সে আর অপরাধী স্থির করতে পারে না—কারুর বিরুদ্ধেই কোনোরকম নালিশ সে আর তৈরি করতে পারল না—সেরকম ভিত্তি সে কোনোদিকেই খুঁজে পেল না; দোষ তার নিজেরই; হয়তো এমন কোনো জায়গায় বইটা সে ফেলে রেখেছিল সেখান থেকে বাইরের লোক এসে নিয়ে যেতে পারে!

কোথায় সে ফেলেছিল? অনেকক্ষণ কঠিন চিন্তা করে মনে করতে চেষ্টা করল; কিন্তু মাথাটা তার তাকে একটুও সাহায্য করল না যেন। কল্যাণীর মনে হ'ল সমস্ত চিত্তবৃত্তিই যেন দিনের পর দিন তার ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, অবনত হয়ে পড়ছে!—মেয়েরা যে বই বোঝে সে তা বুঝল না; পড়তে পড়তে হারিয়ে ফেলল; কোথায় হারিয়ে ফেলল তাও মনে করতে পারল না।

নিজের প্রতি ধিক্কারে তার মন ভরে উঠল।

কল্যাণীর মনে হ'ল পৃথিবীতে কাকে সে তৃপ্ত করতে পারবে? তাকে নিয়ে কেউ তৃপ্ত হবে কি? কি হবে পৃথিবীতে তাকে দিয়ে?

মিনুকে একখানা বই কিনে দিতে হবে।

কিন্তু এই বইখানার পাশে পাশে মিনুর যথেষ্ট নোট ছিল—সে নোটগুলো কোথায় পাবে সে? সেগুলো খুব মূল্যবান মন্তব্য; মিনু অনেক রাত জেগে জেগে অনেক বিদ্যাবুদ্ধি খরচ করে লিখেছে; এ জন্য অনেক বইও ঘাঁটতে হয়েছে মিনুর-অনেক ভাবতে হয়েছে। এ সব কল্যাণী কি করে উদ্ধার করতে পারবে আবার?

ভাবতে ভাবতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কল্যাণী।

চৌদ্দ

বেলা এগারোটার সয় ঘুমের থেকে জেগে উঠে স্নান করতে গেল। আজকাল পঙ্কজবাবু চন্দ্রমোহনের খাতিরে দোতলায় একটা গোল টেবিলের চারদিকে সমস্ত পরিবারকে নিয়ে খেতে বসেন—

এ পদ্ধতিটা চন্দ্রমোহন শিখিয়েছে; প্রসাদ বলেছে 'মন্দ কি?' পঙ্কজবাবুরও বোধ হ'ল এ বেশ। এক গুণময়ী ছাড়া সকলেই দু'বেলা টেবিলে বসে খায়।

স্নান শেষ করে কল্যাণী এসে দেখল টেবিলে জায়গা তৈরি। ভিজে চুলে—একটুও না নিংড়ে—সিঁথিপাটি কিছুই না করে কল্যাণী খেতে বসল এসে।

চন্দ্রমোহন তাকিয়ে দেখল—এমন বিষণ্ণ মুখ এ মেয়েটির আজ!

সমস্ত মাথার থেকে অনবরত টপটপ করে জল পড়ে ব্লাউজ শাড়ি সব ভিজে একাকার হয়ে যাচ্ছিল কল্যাণীর।

কিন্তু এক চন্দ্রমোহন ছাড়া সেদিকে আর কারুর লক্ষ্য ছিল না। পৃথিবীর কোনও কিছুকেই কল্যাণী আজ আর তার গ্রাহ্যের মধ্যে আনছিল না—একধারে বসে চোখ নত করে খেয়ে আস্তে আস্তে উঠে সে চলে গেল। নিজের ঘরে আরসীর সামনে গিয়ে ধীরে ধীরে চুল আঁচড়ে বেণী বেঁধে নিজের পড়ার টেবিলের পাশে এসে বসল সে।

চেয়ারে বসে ভাবল 'মিনুকে একখানা চিঠি লিখবে' সমস্ত কথা খুলে লিখবে সে; না জানি মিনু কি ভাববে?

ভাবতে গিয়ে কল্যাণী বড় মর্মাহত হয়ে উঠল।

মীরার কবিতার খাতা ঠিক আছে; চিতুর অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডও; সুপ্রভা যে বই দিয়েছে সেখানাও রয়েছে। ভাল করে দেখে নিল সব কল্যাণী। যে শুকনো গোলাপ ও ফার্নগুলো এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে ছিল মীরার খাতার ভিতর ধীরে ধীরে যত্ন করে গুছিয়ে রেখে দিল সব সে।

টেবিলটাই সকাল থেকে গুছিয়ে ছিল—

আরও একটু পরিপাটি করে গুছিয়ে সাজিয়ে ফেলল এখন। কল্যাণী ভাবল, দরকারী জিনিসগুলো এর পর থেকে ডেস্কের ভিতর চাবি বন্ধ করে রেখে দেবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ।

মেয়েদের বইখাতাগুলো এখনই ডেস্কের ভিতর রেখে দিল সে। রেখে দিতে দিতে ডেস্কের মধ্যে নিজে চিঠিপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখল—মনে হ'ল কে যেন এ সবও ঘেঁটেছে—দু'চারখানা চিঠিকে খসিয়েছে বলে মনে হল।

কিন্তু চিঠির তো কোনও তালিকা নেই তার কাছে—অনেক চিঠিই তো তার কাছে আসে—নিজের অবহেলায়ও চিঠি হারায় সে ঢের—অনেকগুলো রেখেও দেয় ডেস্কের ভিতর; এগুলোর ভিতর থেকে কেউ যদি আবার কিছু সরিয়ে নেয় বুঝে ওঠা বড় দুষ্কর কল্যাণীর পক্ষে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ তার ব্যথা করছিল।

চোখ মাথা—এ সব আর খাটতে চায় না যেন।

কল্যাণীর মনে হ'ল চিঠি যদি কেউ নিয়ে থাকে—নিক্ সে; যা খুশি করুক গে; করবার নেই, বলবার নেই।

নিজের ডায়েরীটা বের করল সে।

মিনু তাকে ডায়েরী লিখতে শিখিয়েছে। এক বছর ধরে দিনের পর দিন লিখে আসছে কল্যাণী

—একটা মস্ত বড় মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো খাতায় তারিখের পর তারিখ কত কি ঘটনা—কত কি দুষ্টুমি—ফুর্তি—মন্তব্য—মাঝে মাঝে এক আধটু ভালোবাসার কথা—মেয়েদের সঙ্গে, দু'একটা ছেলের সঙ্গেও অবিশ্যি।

কল্যাণীর মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল।

দু'একটা আধ-ফোটা গোপন ভালোবাসার কথা মনে পড়ে গেল তার—ভাবতে লাগল—ডায়েরীটা টেবিলে রেখে—ডায়েরীর ওপর মাথা গুঁজে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল সে—সে সব ছেলেরা আজ কোথায়? ছোড়দার সঙ্গে বোর্ডিংয়ে এসেছিল একটি একদিন; মামাবাবুর বাসায় আর একটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল; এই শালিখবাড়িতেও আর একজন রয়েছে—অবিনাশদা।

কিন্তু এ ভালোবাসাগুলো জমেনি—জমতে পারেনি তেমন; এদের সঙ্গে দেখা হয় কত কম। এত কম! বিধাতা এদের।

কে জানে অবিনাশদা এখন শালিখবাড়িতেও আছে কি না?

আছে হয়তো; পূজোর ছুটিতে এসেছে নিশ্চয়।

অবিনাশদার সঙ্গে এক দিন দেখা করতে যাবে সে—ছোড়দাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। তারপর ছোড়দাকে দেবে বিদায় দিয়ে। তারপর কথাবার্তার পর অবিনাশদা কল্যাণীকে তার বাসায় পৌঁছে দেবে। ডায়েরীতে অবিনাশের কথা মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প লিখে রেখেছে কল্যাণী। মিনু দেখতে চেয়েছিল—কিছুতেই দেখায়নি; নিজের ভালোবাসার কথাগুলো কাউকেই সে দেখায়নি।

কিন্তু এ হয়তো ভালোবাসাও নয়।

কে জানে ভালোবাসা কি না?

যাই হোক না হোক, সেই কলকাতার ছেলে দু'টির চেয়েও অবিনাশকে তার নিকটতর মনে হয়। হয় না কি?

ডায়েরীতে অনেক কথা লিখবে আজ কল্যাণী।

ধীরে ধীরে ডায়েরীটা খুলল সে। কিন্তু খুলতেই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

কল্যাণীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল যেন; এ কি ডায়েরীর মাঝখানের ক'টা পাতা (এমন করে) কাটা কেন? কে কেটে নিল? এ কি ভীষণ!

কল্যাণী সমস্ত-চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল যেন। ঘরের দরজা জানালা আটকে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। কি সে করবে? কি সে করতে পারে। এ ডায়েরীর কথা কাকে সে বলবে? ছি, ছি, ছি, ছি—

এ করে কি লাভ হ'ল তার?

তারপর বিতর্ক আর নয়। বালিশে মুখ গুঁজে নিঃসহায় শিশুর মতো প্রাণ ঢেলে কাঁদতে লাগল কল্যাণী।

বেলা তিনটের সময় ধীরে ধীরে চোখ মুছে আবার কিশোরের কাছে গেল সে। কিশোর তখনও লিখছিল—তার সেই নাটক।

কল্যাণী গিয়ে বললে—ছোড়দা—

গলা তার এত শান্ত—এত নরম—এত ব্যথিত যে কিশোর অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বললে—কি রে!

কল্যাণী বললে—ছোড়দা, কাউকে বলবে না একটা কথা।

কিশোর বললে—কেন বলব? আমার কাছে যা গোপন রাখতে চাও সে কথা তুমি আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না কল্যাণী।

কল্যাণী আশ্বাস পেয়ে বললে—ছোড়দা, সেই বইটে আমি কোথাও পেলাম না—হয়তো আমিই এমন জায়গায় রেখেছিলাম যে সেখান থেকে কেউ নিয়ে গেছে; তা হতে পারে।

কল্যাণী থামল

কিশোর বললে—আচ্ছা আমি খুঁজে দেখব

—জান ছোড়দা, আমি ডায়েরী লিখি—

—ডায়েরী লিখিস?

—হ্যাঁ

—কৈ, আমি তো জানি না—

—কাউকে আমি বলিনি—

কিশোর সমবেদনার খোরাক জুগিয়ে বললে—তা সত্যি, ঢেঁড়া পিটোবার জিনিস তো এ সব নয়; নিজের মনের যে সব কথা নিজেকে ছাড়া আর নিজের সখীদের ছাড়া আর কাউকে বলা চলে না তাই দিয়েই মানুষের ডায়েরী—মেয়েদের অন্তত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিও অনেক সময় ভাবি ডায়েরী লিখব—কিন্তু মেয়েরা ছাড়া ও লিখতে পারে না। তাই নাটক লিখছি—

কিশোরের কথার ভিতর, তার গলায়, কোথাও কোনো উপহাসের সুর নেই; কল্যাণীকে কিশোর এমন সমর্থন করল, কল্যাণী এমন ভরসা পেল।

সে বললে—ছোড়দা, ডেস্কের ভিতর আমি আমার ডায়েরী রেখে দিয়েছিলাম—কাল রাতে লিখে রেখে দিয়েছি—ঠিকঠাক কোথাও কোনও গলতি নেই। আজ দুপুরে আবার ডেস্কের থেকে বার করে দেখি মাঝখানের দশ পনেরো পাতা কেটে কেটে নিয়েছে—

কিশোর অবাক হয়ে বললে—বলিস কি!

—সত্যি কেটে নিয়েছে ছোড়দা

—কেটে নিয়েছে মানে?

—কাঁচি দিয়ে কেউ কেটে নিলে যে রকম—তাই

কিশোর স্তম্ভিত হয়ে বললে—তা কি করে হয়!

—হয়েছে তো

—ইঁদুরে কাটেনি তো?

—তুমি দেখে যাও এসে ছোড়দা মানুষ আর কেউ কেটেছে কি না—

কিশোর কল্যাণীর সঙ্গে গেল—

ডায়েরীটা টেবিলের ওপরেই ছিল

কল্যাণী বললে—এই দেখ—

কিশোর ভ্রূকুটি করে দেখল কাঁচি বা ব্লেড দিয়ে কেটে নিলে যে রকম হয় ঠিক তাই। মানুষের হাতে কাটা—বেশ নিপুণভাবেও বটে।

বললে—এ কি অন্যায়!

কল্যাণী বললে—বিশেষ করে এই পাতাগুলো নিয়ে গেছে কেটে—

কিশোর বললে—ওগুলোতে কি ছিল?

—যাই থাক না কেন?

কিশোর বললে—তোর ডেস্কের ভিতর ছিল?

—হ্যাঁ

—মজা ছোড়দা?

—জঘন্য

কল্যাণী বললে—কি করা যাবে?

কিশোর একটু ভেবে বললে—যে নিয়েছে তাকে কিছুতেই ধরতে পারা যাবে না।

কেন?

—কাকে তুমি সন্দেহ করবে?

কল্যাণী অত্যন্ত কঠিনভাবে ভেবেও কাউকে সন্দেহ করতে পারল না।

কিশোর বিমুগ্ধ হয়ে দেখছিল সুন্দর পরিষ্কার হাতে প্রায় আড়াইশো তিনশো পৃষ্ঠা ভরে কল্যাণী কত কি লিখেছে!

কিশোর বললে—পড়ব কল্যাণী?

—পড়।

দু'এক পাতা উল্টে কিশোর বললে—থাক্।

ডায়েরীটা বন্ধ করে রেখে দিল কিশোর।

উঠে দাঁড়াল।

কল্যাণী বললে—কোথায় যাচ্ছ?

—লিখতে।

—আমার কি ব্যবস্থা হ'ল?

কিশোর চোখ মুখ হাত রগড়ে একটা হাই তুলে বললে—কিছু তো আমি ভেবে বের করতে পারছি না। যখন কাটছিল তখন যদি ধরা যেত তাহ'লে প্যাঁদানো যেত—কড়িকাঠের সঙ্গে লটকে দিতাম—কিন্তু এখন করতে পারা যাবে না কিছু। কাকে সন্দেহ কর তুমি।

কিশোর এক পা দু'পা করে হাঁটতে লাগল—

কল্যাণী বললে—তা'হলে আমাকে চোখ বুঁজে এ অত্যাচার সহ্য করতে হবে?

—কেউ যদি বলে তুমি নিজে কেটেছ—?

কল্যাণী সে কথা অগ্রাহ্য করে বললে—তাহ'লে তোমরাও এ বাড়ির কেউই আমার কোনো উপায় করে দিতে পারবে না।

কিশোর বললে—এখন থেকে চাবি বন্ধ করে রেখে দিস

—কিন্তু সম্প্রতি যা সর্বনাশ হয়েছে তা মুখ বুঁজে সহ্য করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—detective লাগাতে পারিস। বাংলাদেশে তা পাবি কোথা? এ দেশে কচুর শেকড় আর ঘেঁটুফুল ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। করবি কি।

কিশোর চলে গেল

কল্যাণী কাঁদতে লাগল।

ডায়েরীর এক একটা পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল; এত বড় অন্যায়ের কেউ কোনও প্রতিকার করতে পারবে না, এ কেন হবে?

জীবন বিধাতা বললেন; এ ডায়েরীটা তুমি ছিঁড়ো না কল্যাণী, এতে আমার ব্যথা লাগে!

কিন্তু তবুও পাতার পর পাতা ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলতে লাগল মেয়েটি।

পনেরো

সন্ধ্যার সময় আজো সকলে হরিচরণ চাটুয্যের হাবেলীতে যাত্রা দেখতে চলে গেল—পঙ্কজবাবু পর্যন্ত।

কল্যাণীও ভেবেছিল সে যাবে।

কিন্তু বিকেলের ডাকে মিনু ও মীরার বেশ বড় দু'খানা চিঠি এল।

কল্যাণী তক্ষুণি জবাব লিখতে বসল। চিঠিতে একবার হাত দিলে না শেষ করে ওঠে না সে। লিখতে লিখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল—ওরা গেল চলে।

ওসমানকে চিঠি পোস্ট করতে দিয়ে কল্যাণী তেতলার বারান্দায় একটু পায়চারি করতে গেল—হাতে সুপ্রভার বইখানা! দি রেড লিলি।

বারান্দায় পা দিয়ে দেখল চন্দ্রমোহন একটা সোফার ওপর বসে আছে।

এ লোকটার কথা সারারাত ভুলে ছিল কল্যাণী; পৃথিবীতে যে এ মানুষটি আছে তাও মনে ছিল না।

একে দেখেই সে পিছিয়ে শটকে যাচ্ছিল—কিন্তু চন্দ্রমোহনের হাতের বইটার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী—

চন্দ্রমোহন বললে—ওঃ আপনি।

একটু কেশে বললে—আপনিও বুঝি যাত্রা দেখতে ভালোবাসেন না? বেশ বেশ।

চন্দ্রমোহন তার হাতের বইটা ধীরে ধীরে বন্ধ করলে—

বললে—ওঃ বসেছেন। বেশ বেশ। আমিও ভাবছিলাম বই না পড়ে কথাবার্তা বললেই বেশ লাগবে।

চন্দ্রমোহন কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বললে—আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে বাঙালির ঘরে এ রকম রূপ থাকতে পারে; কিন্তু থাকে বাঙালির ঘরেই। শিল্পীরা এ জন্যেই বাঙালি মেয়ে বিয়ে করবার জন্য পাগল।

কল্যাণী বললে—আপনার হাতে ওটা কি বই?

—এটা?

—হ্যাঁ

—এই বইটা—

চন্দ্রমোহন বইটার শিরোনামের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে—এটা হচ্ছে An intelligent.........

কোথায় পেলেন এ বইটা?

—এই সোফার ওপরেই ছিল।

—বই সোফার ওপরে?

—হ্যাঁ

—ঠিক মনে আছে আপনার?

চন্দ্রমোহন বললে— বাঃ।

কল্যাণী বললে—কখন পেলেন?

—এই তো এক্ষুণি এসে—

এই এসে পেলেন?

হ্যাঁ, কে যেন ফেলে গিয়েছিল, আপনি হয়তো?

কল্যাণী নিস্তব্ধ হয়ে চন্দ্রমোহনের দিকে তাকাল—

চন্দ্রমোহন বললে—এ এক রকম বই, না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু; না আছে কোনো মনে। এ সব বই মানুষের পড়া উচিত নয়—

কল্যাণী বললে—সোফার ওপর এ বই কে এনে রাখল? আমার যদ্দুর মনে পড়ে আমি তো সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলাম; কাল রাতে ঘুমোবার আগেও টেবিলে বসে পড়েছি বইখানা—সকালে দেখি কোথাও নেই—

চন্দ্রমোহন বললে—আপনি হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন—এইখানেই রেখে গিয়েছিলেন—এ রকম ভুল হয় মাঝে মাঝে—আমাদের সকলেরই হয়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী বললে—এ বারান্দাও তো আমি পঁচিশবার করে দেখে গেছি—সোফায়ই যদি থাকবে তাহ'লে আমার চোখে পড়ল না কেন?

চন্দ্রমোহন বললে—পড়েনি তো।

একটু পরে বললে—একটা সামান্য বই কোথায় ছিল না ছিল এ নিয়ে মানুষের বক্তব্য বেশিক্ষণ চলতে পারে না।

কল্যাণী ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইল।

চন্দ্রমোহন বললে—আসল কথা হচ্ছে এ বই আমাদের পড়া উচিত নয়—

কল্যাণী বললে—নাই বা পড়লেন।

—না, পড়ব না আমি।

—দিন বইটা।

চন্দ্রমোহন কল্যাণীকে বইটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে— আপনার বেশ ভালো লাগে?

কল্যাণী কোনো জবাব দিল না।

চন্দ্রমোহন বললে— আমি ব্যবসায়ী হয়েও প্রেমিক হয়েছি, প্রেমিক হয়েও মাস্টার হতে পেরেছি—বলে সে একটু হাসল।

পরে বললে—এখন একটু মাস্টারী করা দরকার—প্রেম না হয় আর এক সময় হবে।

কল্যাণী উঠে দাঁড়াল।

চন্দ্রমোহন বললে—শুনুন

—কিছু শুনবার নেই—

কল্যাণী চলে যাচ্ছিল—

চন্দ্রমোহন বললে—কথা আছে শুনুন—আপনার বাবা—

কল্যাণী এক নিমেষের জন্য দাঁড়াল—বাবার কথা এ আবার কি বলতে চায়?

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার বাবা আর আমি কাল আপনার কাছে গিয়েছিলাম—

—আমার বাবা?

—হ্যাঁ আপনার বাবা আর আমি

—আমার কাছে গিয়েছিলেন বাবা!

—হ্যাঁ

—কখন?

—কাল রাতে।

—কোথায়?

—আপনার ঘরে

কল্যাণী বিস্মিত হয়ে বললে রাতে আমার ঘরে—কখন?

একটা সোফার ওপর বসল সে।

চন্দ্রমোহন বললে—তখন আপনি ঘুমুচ্ছিলেন—

কল্যাণী স্তম্ভিত হয়ে বললে—বাবা তখন আমার ঘরে ঢুকেছিলেন আপনাকে সঙ্গে করে?

—হ্যাঁ

কল্যাণী আড়ষ্ট হয়ে চন্দ্রমোহনের দিকে তাকিয়ে রইল।

চন্দ্রমোহন বললে—বিশ্বেস হয় না বুঝি?

কল্যাণী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চন্দ্রমোহনের দিকে চেয়ে রইল।

চন্দ্রমোহন বললে—একটা দরকারী কথার প্রসঙ্গে গিয়েছিলাম—

সে কথা কল্যাণীর কানে গেল না, অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে সে বললে—আমার বাবা আপনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন?

—হুঁ

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার টেবিল নেড়ে চেড়ে দেখলেন আপনার বাবা।

—আমার বাবা? কল্যাণীর শরীর মন নিঃশ্বাস ফেলতে চাইছে না যেন আর।

—হ্যাঁ, এই বইটেও তিনি নিয়ে এলেন

—এই বইটে?

—হ্যাঁ

—নিজের ঘরে গিয়ে পড়েছিলেনও বুঝি—পড়ে তার অত্যন্ত খারাপ লাগল—যাত্রা শুনতে যাবার সময় এই সোফার ওপর ফেলে গেলেন—আমাকে পড়তে বললেন। আমারও ভালো লাগেনি—আপনার টেবিলের সব বইগুলি তিনি দেখেছেন— বড্ড দুঃখিত হয়েছেন তাতে—

কল্যাণী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললে—আমি বিশ্বাস করি না। মিথ্যা কথা সব।

চন্দ্রমোহন বললে—আস্তে।

কল্যাণী তেমনি চীৎকার করে উঠে বললে—কক্ষণও না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দ্রমোহন বললে—ছি

কল্যাণী বললে—না—না-না—আমার বাবা কিছুতেই নয়—মেজদা হতে পারে—ছোড়দা হতে পারে—মা হতে পারে—বাবা নয়—বলুন বাবা যাননি—বলুন—বলুন আপনি—

চন্দ্রমোহন বললে—যদি গিয়ে থাকেন, আপনার মঙ্গলের জন্য গিয়েছেন; তাতে খারাপ তো কিছু হয়নি।

কল্যাণী আড়ষ্ট হয়ে বললে—আমার মঙ্গলের জন্য?

—বাবা মা মঙ্গল ছাড়া আর কি চান?

—আমার ডায়েরী—

—আপনার ডায়েরীটাও দেখেছেন তিনি।

—বাবা?

—হ্যাঁ—কয়েক পাতা কেটেও রেখেছেন

কল্যাণীর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। যেন প্রবল প্রচণ্ড মেরুর শীত এসে ঘিরে ধরেছে তাকে।

চন্দ্রমোহন তাকিয়ে তাকিয়ে মেয়েটির আপাদমস্তক দেখতে লাগল—দেখতে লাগল শুধু—

এই মেয়েটির কোনো মঙ্গল কোনো কল্যাণ কোনো ভবিষ্যতের চিন্তা তার মনের ত্রিসীমায়ও ছিল না—এর অভূতপূর্ব রূপও মুহূর্তের জন্য অর্থহীন হয়ে গেল চন্দ্রমোহনের কাছে—মন তার কেমন দুরন্ত গভীর ক্ষুধায় ভরে উঠল। হা, বিধাতা, কেমন একটা গভীর ক্ষুধায়!

কিন্তু প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে নিজেকে সংযত করে নিলে সে।

বললে—কল্যাণী তুমি কষ্ট পাচ্ছ—কেন এত কষ্ট পাও? আমি তোমাকে আমার প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি কল্যাণী।

নিজের সোফাটা এগিয়ে আনল চন্দ্রমোহন।

কল্যাণী আরক্ত চোখ মেলে হাত ইসারা করে চন্দ্রমোহনকে সরে যেতে বললে।

চন্দ্রমোহন নিতান্ত দ্বিধাহীন নিঃস্পৃহভাবে সরে গিয়ে আগের জায়গায় বসল আবার।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে সেখান থেকে সে চলে গেল; নইলে তার ক্ষুধাকে সে রাতে কিছুতেই সে জয় করতে পারত না।

ষোলো

পরদিন সকাল বেলা।

পঙ্কজবাবু বললেন—হ্যাঁ গিয়েছিলাম বটে—

কল্যাণী বলল—পরশু রাতে?

হ্যাঁ—

—আমি তখন ঘুমিয়েছিলাম—

—তুমি ঘুমিয়েছিলে—

—তখন কেন গেলে বাবা?

—দরকার ছিল।.

চন্দ্রমোহনবাবুকেও সঙ্গে নিয়েছিলে?

-হ্যাঁ

কল্যাণী বিহ্বল হয়ে বললে—ওকে নিলে কেন?

—কি হয়েছে তাতে।

কল্যাণী হতাশ হয়ে বললে—বাবা!

চন্দ্রমোহনকে আমি আমার ছেলের মত মনে করি—

—তোমার ছেলের মত!

—হ্যাঁ, বিজলীর থেকে ভালো নয় কি?

—বড়দার থেকে ভাল?

ঢের—ঢের—ঢের—ঢের ভাল।

কল্যাণী দু'এক মুহূর্ত নিঃশব্দ হয়ে রইল।

পঙ্কজবাবু নীরবে চুরুট টানতে লাগলেন—

কল্যাণী বললে—আমার টেবিলের বইগুলোও দেখেছিলে তুমি?

—হ্যাঁ; ও রকম বই কেন তুমি পড়? ওসব বই কে তোমাকে দেয়? ফরাসী ডিকাডেন্সের ভগবানহীন সংযমহীন নরমাংসের নারীমাংসের নরককুণ্ডের বই সব—কে তোমাকে দেয়? কোত্থেকে পাও?

কল্যাণী এ বিশেষণগুলোর একটিরও কোনো মানে বড় একটা বুঝল না; সুপ্রভা অবিশ্যি কয়েকখানা ফরাসী উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ তাকে দিয়েছিল; কিন্তু সেগুলো কল্যাণী পড়তে পারেনি—বোঝেনি—দু'এক পাতা দু'এক পাতা পড়ে কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয়নি তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে নীরব হয়ে রইল।

আহা, বেচারী, কল্যাণী,—সাহিত্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই—আর্টের সঙ্গেও না; যাদের কিছু আছে—তারা কয়েকখানা বই দিয়েছিল তাকে; সেগুলোর সুন্দর সুন্দর মলাট বাঁধাইয়ের চমৎকার কারুকার্য দেখে নিজের টেবিলের ওপরে রেখেছিল মেয়েটি—নিতান্তই টেবিল সাজাবার জন্য। আর্টের কি বোঝে সে? সাহিত্যের কি জানে? জীবনের কি বোঝে?

জীবনের কাছে সে ঢের ঢের নিরপরাধ—পঙ্কজবাবু বা গুণময়ীও কোনোদিন ততখানি ছিলেন না।

পঙ্কজবাবু না বুঝে মেয়েটিকে অপরাধী সাজিয়ে আর্ট ও সমালোচনার থেকেও একেবারে ছিটকে গিয়ে জীবনের নানা রকম স্থূলতার কথা বলতে লাগলেন—নিজে ব্যাহত হতে লাগলেন—মেয়েটিকে মর্মান্তিক ব্যথা দিতে লাগলেন।

পঙ্কজবাবু বললেন—তোমার ডায়েরীও দেখলাম; ও সব কি লিখেছ তুমি? আমাকে ভুল বুঝিয়েছ এতদিন বসে। তারিখের পর তারিখ মিলিয়ে দেখলাম বায়োস্কোপ দেখেছ—সারকাস দেখেছ—কার্নিভালে গিয়েছ—লাকি সেভেন খেলেছ—সোডা পাউন্টেনে গিয়েছ—তুমি থিয়েটার অব্দি দেখেছ-কল্যাণী ওই কিশে বাঁদরটার সঙ্গে আর বাড়িতে আমাকে চিঠি লিখেছ আমি কিচ্ছু দেখি নি—এ তোমার কি অদ্ভুত অন্যায় বল দেখি কল্যাণী।

কল্যাণী কেঁদে ফেলল।

পঙ্কজবাবু বললেন—শুধু কি তাই? মেয়েদের সঙ্গে কত কি অনাচার কর তুমি বোর্ডিঙে—

পঙ্কজবাবু একটু থেমে বললেন—এই বিধাতাহীন সংসহীন নরমাংসের নারীমাংসের বইগুলো পড়ে এই রকমই তো হবে—কোন মেয়ে তোমাকে চুমো দিল তাই নিয়ে তুমি কবিতা করতে আরম্ভ করলে—চারদিককার ডিকাডেন্সের শয়তান আর্টিস্টদের মত—কি উৎকট!

কল্যাণী অতসত কিছু বুঝল না; বুঝল এইটুকু যে সে উদঘাটিত হয়ে গেছে—সে যা সহজ মনে স্বাভাবিকভাবে সৌন্দর্যের সঙ্গে করেছে—যে জিনিসকে মানুষের প্রশংসা করা উচিত বলে মনে হয়েছে তখন তার—বাবা তার ভিতর পৃথিবীর পাপ ঢুকিয়ে দিলেন; আর সে যা করেনি, যে সবের নাম শোনেনি, যা বোধ করেনি, সেই সবও বাবা তাতে আপত্তি করলেন। সে যদি পারত—তা হলে অনেক কথা বলত বাবাকে—যার পর বাবা তাকে আর অভিযুক্ত করতে পারতেন না, রাগ করতে পারতেন না তার ওপর আর। কারণ, মন তার জানে, খুব ভালো করেই জানে যে বাবা যা চান—তার নিজের মনও ঠিক তাইই চায় এবং তাইই সে করে এসেছে; যেখানে এক আধটু ব্যতিক্রম হয়েছে তা তার দোষ নয়—অপরের দোষে— অপরেরও দোষে নয়—কে জানে কার দোষে!

কার দোষ জানে না কল্যাণী। কিন্তু দোষটা মানুষের অজ্ঞানতার ও সময়ের ভবিতব্যতার।

কল্যাণী আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ভাবছিল; বাবা কেন এ সব বুঝবেন না?

কিন্তু বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতাও তার একটু ছিল না।

পঙ্কজবাবু বললেন—যাক।

তিনি চুরুট জ্বালাতেন।

'ওসব বই মেয়েদের ফিরিয়ে দিও।'

কল্যাণী শান্তভাবে ঘাড় নেড়ে বলল—দেব।

—আর ডায়েরীটা পুড়িয়ে ফেলো

—ছিঁড়ে ফেলেছি

—সমস্ত

—হ্যাঁ

—বেশ ভালোই হয়েছে।

পরে বললেন—আর ওরকম লিখো না।

কল্যাণী বুঝতে পারছিল না যে তার কবিতা বা আর্টই শুধু নয়—তার ভিতরের জীবন স্বপ্ন ও আরাধনা সাধনা ও সৌন্দর্যের জীবন তার দিনের পর দিন ঐ লেখার ভিতর দিয়ে ফলে উঠছিল তার। বাবাকে সে বললে আর কোনোদিনও ঐ সব লিখতে যাবে না সে।

কল্যাণী বললে—আমি বুঝতে পারিনি যে এসব লেখা খারাপ—এর ভেতর অন্যায়। কি যেন বললে তুমি বাবা বিধাতাহীন সংযমহীন নরমাংসের নারীমাংসের—

পঙ্কজবাবু কল্যাণীকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—না—না—না—তা নয়; কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই সব দিকে যায়।

কিছুক্ষণ ধরে নীরবে চুরুট টেনে পঙ্কজবাবু বললেন—এখন কাজের কথা কল্যাণী—কল্যাণী বাবার দিকে তাকাল—

পঙ্কজবাবু বললেন—পরশু রাতে তোমার কাছে গিয়েছিলাম আমরা—আরো একটা দরকারে—

পঙ্কজবাবু চুরুটার দিকে একবার তাকালেন—খানিক্ষণ বসে।

তারপর বললেন—তুমি কি কাউকে ভালোবাসা?

কল্যাণী মুখ নত করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঙ্কজবাবু বললেন—কোনো ছেলে ছেলেছোকরাকে? কলকাতায়?

কল্যাণী অধোমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল।

—বাসনি তাহ'লে। আমিও তাই ভেবেছিলাম। সে বেশ, সে খুব ভালো কথা। কলকাতায় কলেজেটলেজে পড়ে মেয়েরা অনেক সময় অনেক নির্বোধের মত কাজ করে ফেলে—

পঙ্কজবাবু বললেন—যাক, তুমি সে সবের থেকে ত্রাণ পেয়েছ।

কল্যাণীর মনে হ'ল ভালোবাসার থেকে তাঁর মেয়ের ত্রাণ চাচ্ছেন বাবা—বেশ তাই হোক—যথেষ্ট বিরুদ্ধাচার করা হয়েছে বাবার সঙ্গে, নিজের ভালোবাসার কথা বলে বাবাকে আর সে পীড়িত করতে যাবে না; নিজের ভালোবাসা তার নিজের মনের নিস্তব্ধতার ভিতরেই থেকেই যাক—হয়তো ভালোবাসাও পাপ, অন্তত বাবা যদি ডায়েরীর মত সেটা উদঘাটিত করতে পারেন তা হলে নিশ্চয় তা পাপ হবে—বিধাতাহীন সংযমহীন নরমাংসের নারীমাংসের জিনিস হয়ে দাঁড়াবে তা; কিন্তু নিজের মনের গোপনে তা এখন পাপ নয়—ভুল নয়—ভয় নয়—পৃথিবীর নানা দিককার নিঃসঙ্গতার ভিতর কেমন একটা ক্রমায়াত দীপ্ত অবলম্বের জিনিস।

পঙ্কজবাবু বললেন—তারপর আমাদের জমিদারীর যা অবস্থা-দিন দিন দেনা বেড়ে যাচ্ছে শুধু—তোমার দাদাকে বিলেত পাঠিয়ে আমাদের খোয়ারের এক শেষ হয়েছে।

কল্যাণী বললে—বদড়ার চিঠি পেয়েছ বাবা?

মেয়ের কাছে সে সব জিনিস চাপা দিয়ে যেতে চাইলেন পঙ্কজবাবু। কিছু বললেন না।

কল্যাণী বললে—আমাদের কাছে চিঠি লিখে না কেন বড়দা?

পঙ্কজবাবু কোনো উত্তর দিলেন না।

কল্যাণী বললে—মার কাছেও লেখে না।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। আরো কিছুটা সময় নিস্তব্ধতায় কেটে গেল।

কল্যাণী বললে—বড়দা আসবে কবে? আমাকে এসে কত বড় দেখবে, না বাবা?

যখন চলে গিয়েছিল বড়দা, আমি তখন ফ্রক পরতাম—

পঙ্কজবাবু বললেন—জমিদারীর তো এই অবস্থা—এক এক সময় মনে হয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসে তুলে দেই—

কল্যাণী চমকে উঠল।

বললে—না বাবা তা দিতে'হবে না।

—বলা যায় না, কিশোরকে দিয়েও কিছু হবে না; যা এক প্রসাদ। সে যদি রাখতে পারে তা হ'লে থাকবে—না হ'লে আমার আর কিছু করবার নেই। আমার কিছু সাধ্য নেই আর—

কল্যাণী অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে বললে—আমি ছেলে হলে তোমার ঢের উপকার করতে পারতাম বাবা—

পঙ্কজবাবু বললেন—মেয়ে হয়েও কি পারা যায় না? খুব পারা যায়। করবে?

কল্যাণী খুব উৎসাহ গর্ব অনুভব করে বললে—আমি খুব পারব।

সে ভেবেছিল তাকে বুঝি আর বায়োস্কোপ দেখতে হবে না, সার্কাস থিয়েটারে যেতে হবে না, ডায়েরী লিখতে হবে না। ভালোবাসাতে হবে না; এই সব। এই সব বিরতির কাজ করতে বলবে বাবা তাকে হয়তো; করবে সে—বাবার এই সব নির্দেশ সজ্ঞানে পালন করবে।

গুণময়ী এলেন—

পঙ্কজবাবু বললেন—তোমাকে দেখে চন্দ্রমোহনের খুব ভালো লেগেছে—আমার কথা শুনছ কল্যাণী।

চুরুটে টান দিয়ে বললেন—ছেলেও খুব সৎ—ওদের পারিবার জানি আমি; ওকেও জানি।

কল্যাণীর বুকের ভিতর ঢিবঢিব করছিল।

পঙ্কজবাবু বললেন—টাকাও ঢের—আমাদের মত দু'দশটা জমিদারী কিনে ফেলতে পারে—ওখানে গিয়ে তোমার সুখ হবে—সব দিক দিয়ে মঙ্গল হবে।

কল্যাণীর নিঃশ্বাস আটকে আসছিল—

সে ডুকরে কেঁদে উঠে বললে—কি বল তুমি বাবা!

পঙ্কজবাবু বললেন—চন্দ্রমোহন তোমাকে বিয়ে করতে চায়—আমিও চাই তুমি তাকে বিয়ে কর—তোমার মাও তাই চান—তোমার মেজদারও অমত নেই।

কল্যাণী কাঁদতে কাঁদতে তর্জ্জন করে উঠে বললে—বল কি তোমরা সব? মেজদা বিয়ে করবে, না তুমি করবে? তবে যে বড় বলছ! ঐ উল্লুকটাকে বিয়ে করব আমি? আমার বাপ হয়ে তুমি এই কথা বলতে সাহস পাও? আমি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব তবু ওই বাঁদরটাকে বাঁদর ছাড়া আর কিছু বলতে পারব না। বাঁদর উল্লুক কোথাকার! এত বড় কথা বলে।

আকাশ-পাতাল ভাসিয়ে অসাড় অবোধ হয়ে কাঁদতে লাগল কল্যাণী।

পঙ্কজবাবু স্থিরভাবে চুরুট টানছিলেন—

একটি চুরুট তাঁর ফুরিয়ে গেল—আর একটি তিনি নিলেন; আস্তে আস্তে জ্বালালেন।

যেমনি টানছিলেন—টেনে যেতে লাগলেন।

গুণময়ীও এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণময়ী বললেন—ওর যদি না ইচ্ছে করে, তবে আর মিছেমিছে এ দিয়ে কি দরকার; চন্দ্রমোহন ছেলে ভালো বটে—কিন্তু মেয়েরও তা একটা রুচি অভিরুচি থাকে—তাও তো দেখতে হয়।

পঙ্কজবাবু বললেন—আমি সব জানি, আমি সব বুঝি। কল্যাণীকে স্থির হতে দাও। নানারকম বই পড়ে সঙ্গে মিশে ওর মনের ভিতর জিলিপীর পাক আর অমৃতির প্যাঁচ। বয়সও কম—নিজের মনটাকে ধরতে পারছে না তাই। আমাদের কাছে থাকলে শান্ত সুস্থির হয়ে ভাবতে পারবে, নিজের মনের কথা টের পাবে—তখন বুঝবে—বুঝবে সব।

কল্যাণী ধীরে ধীরে মাথা তুলল—

পঙ্কজবাবু বললেন—চন্দ্রমোহনের সম্বন্ধে ও তো কিছু জানে না—

কল্যাণী বলল—আমি জানতে চাই না বাবা—

পর মুহূর্তেই বললে—যথেষ্ট জানি ঐ উল্লুকটার সম্বন্ধে আমি; চাটগাঁয়ের মগের মত মুখ-হলদে রং; চোখ দুটো কুত কুত করে—সমস্ত মুখে আঁচিল আর দাড়ি—

বলতে বলতে কেঁদে ফেললে কল্যাণী

গুণময়ী বললেন—ছি!

—আর বোলো না মা—

—কে বলছে তোমাকে যে চন্দ্রমোহনকেই বিয়ে করতে হবে তোমার

কল্যাণী মায়ের কাছ থেকে এই সান্ত্বনাটুকু পেয়ে ধীরে ধীরে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে একটু শান্ত হয়ে বসল।

মনটা তার এখন খানিকটা ভালো লাগছে,

গুণময়ী বললেন—তোমার বাবা তো বলেননি চন্দ্রমোহনকে তোমার বিয়ে করতে হবে; তবে একটু ভেবে দেখতে বলেছেন; তোমার ইচ্ছা যদি হয়—তা হ'লে তুমি করবে—পাত্রটিকে আমাদের খুব ভালো মনে হয়—আমরা তোমার মঙ্গল চাই—

গুণময়ী থামলেন।

পঙ্কজবাবু কোনো কথা বলছিলেন না।

গুণময়ী বললেন—তাড়ার কিছু নেই; তোমাকে যে এখুনি করতে হবে এমন কিছু নয়। তুমি আমাদের কাছে থাক—শান্ত হয়ে ব্যাপারটা ভাব। ধা করে একটা মতলব করে বোসো-না। তোমাকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে বলে ওমনিই যে তুমি মত দিয়ে বসবে—তাও আমরা চাই না—কিম্বা চন্দ্রমোহনকে উল্লুক বাঁদর বলে গাল দিয়ে তাড়িয় দেবে সেটাও ঠিক কথা নয়—একটু স্থিরভাবে ভেবে দেখ কল্যাণী—

কল্যাণী বললে—মা আমি ভাবতে পারি না কিছু—এ আমি কল্পনাও করতে পারি না—

—ওই তো, ছি ছি ছেলেমানুষী করতে হয় না—গুণময়ী বললেন—

পঙ্কজবাবু চুরুট টানছিলেন—

গুণময়ী বললেন—তোমার বাবা—আমি—আমার সংসারের ঢের দেখেছি; অনেক কিছু জানি শুনি—বুঝি—আমরা ভেবে যা বলি তার একটা মূল্য আছে। আমাদের নির্দেশ শুনলে তোমার ভুল হবে না। কিন্তু তবুও তোমার মতামতের স্বাধীনতা দেব আমরা। তুমি যা ভাল বোঝ তাও আমরা শুনব—

কল্যাণী বললে—আমি এই ভালো বুঝি যে চন্দ্রমোহনবাবুর কথা ভাবতে গেলেও আমার অন্নপ্রাশনের নাড়ীশুদ্ধ প্যাঁচ খেতে থাকে—তার চেয়েও মৃত্যু আমার ঢের ভালো মনে হয়।

কেউ কিছু বললেন না।

কল্যাণী বললে—বাপরে, কি ভীষণ! কলকাতার থেকে এসে দেখি একটা মগের মত একটা বাঁদরের মত দোতলার ঘরে বসে আছে—একটা ছাগলের মত আমার দিকে তাকাচ্ছে—আমার সমস্ত শরীর ভয়ে ঘেন্নায় ব্যথায় কাঁটা দিয়ে উঠল—আর তাকে নিয়েই কিনা এত দূর! বাপরে, বাপরে, বাপরে, বাপরে—

গুণময়ী বললেন—তুমি বড় অস্থির হয়ে ওঠো কল্যাণী—

—হব না? তোমরা ভেবে দেখেছ কি ভয়ঙ্কর কথা তোমরা বলেছ আমাকে—

গুণময়ী বললেন—চা খেয়েছিলি?

—না

—দুধ? ওভালটিন?

—না

—কিছু না

কল্যাণী ঘাড় নেড়ে বললে—না, আমার খেতে ইচ্ছে করে না কিছু—

গুণময়ী বললে—নে, নে, আর একটু দুধটুধ খেয়ে যা।

কল্যাণী বললে—আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করে না মা।

গুণময়ী বললে—চল চল না খেলে বাঁচবি কি করে?

মায়ের পেছনে পেছনে বাঁচবার আয়োজন করতে অবশেষে গেল সে—এখন খানিকটা শান্ত স্থির হয়েছে তার মন—চন্দ্রমোহনকে বিদায় দিয়ে দিয়েছে একেবারে সে—পৃথিবীটা আবার আনন্দ ও উপভোগের জায়গা বলে বোধ হচ্ছে কল্যাণীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব চমৎকার বেলের পানা খেল কল্যাণী—এক বাটি ক্ষীর খেল—চার পাঁচটা চাম্পিম কলা পাউরুটি আর মাখন খেয়ে কিশোরের সঙ্গে লুডো খেলতে বসে দিনটাকে তার পৃথিবীর একটি নিত্য স্বাভাবিক দিনের মত—তার সমস্ত অতীত জীবনের সমস্ত দিনের মত অঢেল সুন্দর নৈসর্গিক মনে হতে লাগল।

কিন্তু সন্ধ্যায় অন্যরকম।

প্রসাদ আর চন্দ্রমোহন পঙ্কজবাবুর বগি গাড়িতে করে হাওয়া খেতে বেরিয়ে গেছে; কিশোরও ছিল না।

তেতলার বারান্দায় তিন জন শুধু—পঙ্কজবাবু, কল্যাণী, গুণময়ী—

পঙ্কজবাবু বললেন—সারাদিনটা কি করলে কল্যাণী?

কল্যাণী সহসা কোনও উত্তর দিতে পারছিল না।

একটু পরে বললে—ঘুমিয়েছি—পড়েছি—

—কি পড়েছ?

—কলেজের বই

পঙ্কজবাবু একটু হাসলেন; কেমন যেন উদাসীন ভ্রুক্ষেপহীন একরকম হাসি। কল্যাণীর মনে হ'ল বাবা পড়াশুনার কোনও মূল্যই দিলেন না। এইরকম করে অবজ্ঞা করে হাসলেন—

পঙ্কজবাবু বললেন—এখন মনটা একটু স্থির হয়েছে তোমার?

কল্যাণী এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

পঙ্কজবাবু বললেন—শান্তভাবে ভেবে দেখলে ব্যাপারটার ভিতর কিছু অমঙ্গল পাবে না তুমি। তোমার মার কাছে যেমন, আমার কাছে যেমন—আশা করি তোমার কাছেও তেমনি জিনিসটা কল্যাণের জিনিস বলে মনে হয়েছে—

কল্যাণী বললে—কি জিনিস?

পঙ্কজবাবু উত্তর দিতে একটু দেরী করলেন—

পকেট থেকে চুরুট বের করলেন—

চুরুট নিয়ে খেলা করলেন—

পরে চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—চন্দ্রমোহনের সঙ্গে আজো আমার কথা হয়েছে; সে আর অপেক্ষা করতে পারে না। তাকে যা হয় একটা কথা দিতে হবে আমাদের—তা খুব তাড়াতাড়ি—

কল্যাণী বললে—কথা দিয়ে দেও যে আমি তাকে কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

পঙ্কজবাবু একটু হেসে বললেন—অত সহজে কি কিছু হয়—

কল্যাণী বললে—আমার তা হয়—

একটু থেমে বললে—যদি হবার হ'ত, এত কথা বলতে হত না তো তোমাদের। ঢের আগেই হয়ে যেত। আমি কি বুঝি না তোমাদের কত হেনস্থা হচ্ছে? সে জন্য আমার খুব খারাপ লাগে, কিন্তু তবুও ওকে সরে যেতে বলা ছাড়া আর উপায় নেই। আমার সামনে ওকে বেরুতেও বারণ করে দিও তোমরা—আমি টেবিলে গিয়েও আর খাব না—

পঙ্কজবাবু ও গুণময়ী চুপ করে রইলেন—

খানিকক্ষণ নীরবে চুরুট টেনে পঙ্কজবাবু বললেন—কল্যাণী, যদি বুঝতাম তুমি বড় হয়েছ—তোমার মার মত ভাবতে শিখেছ তাহলে অন্য কথা ছিল—কিন্তু এখনও তুমি ঢের ছেলেমানুষ—

কল্যাণী ছটফট করে নেচে উঠে বললে—আমি ছেলেমানুষ নই; আমি ছেলেমানুষ নই। কে বলেছে আমি ছেলেমানুষ? কেন তোমরা এমন কথা বল? ও মা, বাবা কেন আমাকে ছেলেমানুষ বলে—আমি বুড়োমানুষের মত স্থির হয়ে ভেবে কথা বলেছি; আমার মনের ঠিক সত্য কথা বলেছি আমি। জোর করে আমাকে দিয়ে মিথ্যা বলিও না তোমরা—

গুণময়ী বললেন—আঃ, কল্যাণী থামরে।

স্বামীকে বললেন—আজ আর থাক।

পঙ্কজবাবু চুরুটের ছাই ধীরে ধীরে ঝেড়ে ফেলে নদীটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুরুট টানলেন।

তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে খুব নরম সুরে : কল্যাণী, তুমি তো বায়োস্কোপ দেখতে ভালোবাস, সারকাস থিয়েটারেও যাও, তোমার ছোড়দার সঙ্গে যে দু' একটি ছেলে মাঝে মাঝে তোমাদের বোর্ডিঙে যায়—তাদের দেখে তোমার মন একটু-আধটু চিড় খায় বৈকি—হয়তো ভাব এদের ভিতর কাউকে পছন্দ করলে জীবনের সঙ্গী করে নিলে মন্দ হয় না। একজন সঙ্গী স্বামী—তুমিও হয়তো কিছুদিন থেকে খুঁজছ—কিন্তু তবুও তোমার মনকে এখনও ভালো করে বোঝ নি তুমি। যে জিনিস এখন শরবর্তী স্বর্গ মনে হচ্ছে বাস্তবিকই তা সিদ্ধির নেশা। আমরা যে সব খুব জানি। এ সব বিষয়ে তোমার মা ও আমার অভিজ্ঞতার ওপর তুমি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পার। তোমার তাই করা উচিত। তাইতেই তোমার মঙ্গল। তুমি যাই বল না কেন, কল্যাণী, চন্দ্রমোহনকেই তুমি তোমার স্বামী বলে বুঝতে চেষ্টা কর। তাতে তোমার জীবন পয়মন্ত হয়ে উঠবে। আমি তোমার বাবা হয়ে—তোমার জীবনের পরম কল্যাণ কি তা খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেই এই কথা তোমাকে বলছি—আমাকে তুমি অবজ্ঞা কোরো না।

কল্যাণী সারারাত বিছানায় লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা পাখির ছানা—যার বাপ মরে গেছে, মা মরে গেছে—চারদিককার দুর্বিসহ ভয় দুর্বলতা ও উপায়হীনতা ক্রমে ঘিরে ফেলেছে যাকে—এই মেয়েটির ধড়ের ভিতর যেন সেই আতুর অনাথ ছানার প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে উঠেছে; তাকে দেখবার বুঝবার গ্রহণ করবার জন্য কোথা কেউ নেই—কোনওদিনও যেন থাকবে না আর।

পঙ্কজবাবু বললেন—এই আমার ইচ্ছা প্রসাদ—তোমার মারও—

প্রসাদ বললে—হ্যাঁ, চারজন পার্টনার; ওদের ব্যবসার নাম আছে; খাতাপত্রখানা সঙ্গে এনেছিল—আমাকে দেখিয়েছে; যতটা বলে ততটা নয়—তবে আমাদের চেয়ে ঢের বেশি টাকা আছে—কাঁচা টাকা অন্তত।

পঙ্কজবাবু বললেন—তা তো হ'ল—

প্রসাদ বললে—তাইতেই অনেক দূর হল বাবা—

—কিন্তু টাকাই তো সব নয়—ছেলেও খুব সৎ—চরিত্রবান ছেলে—সেই জন্যই আমার আগ্রহ খুব বেশি।

চন্দ্রমোহনের জীবনের এ দিকটা প্রসাদ বিশেষ কোনও কথাবার্তা বলতে গেল না, চুপ করে রইল।

পঙ্কজবাবু বললেন—তা'হলে তোমার মত আছে?

প্রসাদ বললে—কিন্তু বিয়ের খরচটা খুব সংক্ষেপে সারাই ভাল—কাঁচা টাকার মাল ওদের না হয় খুব আছে—ওদের মেয়েদের না হয় খুব ঘটা করে বিয়ে দেবে, কিন্তু আমাদের তো আর সেরকম অবস্থা নয়—

পঙ্কজবাবু অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন—আচ্ছা সে সব বোঝা যাবে—বোঝা যাবে—বিজলীর টাকা বন্ধ করবার পর বেশ একটু আয় দেখা দিচ্ছে—কিন্তু ছেলেটা কষ্ট পাচ্ছে না তো? কোনও চিঠিও লেখে না—একেবারে গুম যে!

প্রসাদকে নাক মুখ খিঁচতে দেখে পঙ্কজবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—কল্যাণীকেও আর বোর্ডিঙে পাঠাব না—তাতেও খানিকটা লাভ হবে—

পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে বললেন—আমি বলেছি, তোমার মাও বলেছেন—এখন তুমিও কল্যাণীকে বেশ একটু ভালো করে বুঝিয়ে বোলো—আমাদের চেয়ে হয়তো তোমার কথার শক্তি বেশি হবে—তুমি তার দাদা বলে সে হয়তো বেশ—

পঙ্কজবাবু চলে গেলেন।

প্রসাদ কথার লোক মাত্র নয়—কাজকেই সে ঢের ভালো বোঝে

কোর্টের থেকে ফিরে এসে একটু খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের পর প্রসাদ কল্যাণীর ঘরের দিকে গিয়ে বললে—কৈ রে কল্যাণী

কল্যাণী দরজা জানালা বন্ধ করে অন্ধকার বিছানার ভিতর জড়সড় হয়ে পড়ে ছিল। মেজদার গলা শুনে তার যেন কেমন দিনের আলোর পৃথিবীটাকে মনে পড়ল—আশা ও সাধের সুদূর পৃথিবীটা এক মুহূর্তের মধ্যেই তার ঘরের কাছে এসে পড়ল যেন—

কল্যাণী ধড়মড় করে উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে বললে—মেজদা! মেজদা—এসো।

—ঘুমিয়েছিলি?

—না

কি করছিলি অন্ধকারের মধ্যে একা বসে বসে

কল্যাণীর চোখে জল এল—

প্রসাদ বললে—এই বিকেল বেলাটা বুঝি এমনি করে মাটি করতে হয়!

প্রসাদ বললে—একদিন তো যাত্রাও দেখলি না? দেখেছিলি?

কল্যাণী ধরা গলায় বললে—না

—কেন না?

কল্যাণী চুপ করে রইল।

প্রসাদ কল্যাণীর ঘাড়ের ওপর হাত দিয়ে বললে—লক্ষ্মীপূজোর সময় আবার হবে—আমার সঙ্গে যাস্—আমি তোকে নিয়ে যাব।

কল্যাণী বললে—আমাকে নিয়ে যেও তুমি

—হ্যাঁ নিশ্চয় নিয়ে যাব

লক্ষ্মী পূজোর সময় হবে?

—লক্ষ্মী পূজোর সময়—শ্যামা পূজোর সময়; এখন দিয়ালিও দেখতে পারবি—একটা ট্যাক্সিতে করে—না হয় আমাদের বাড়ির গাড়িটায়ই যাওয়া যাবে বেশ। সমস্ত শহরটা ঘুরে আসা যাবে বোম পটকা আতসবাজী দেখতে দেখতে।

প্রসাদ হেসে উঠল—

কল্যাণী হেসে উঠল—

প্রসাদ বললে—চল, আজ একটু গাড়িতে করে বেড়িয়ে আসি

কল্যাণী আগ্রহের সঙ্গে বললে—কোথায়?

—নদীর পাড় দিয়ে ঘোরা যাবে—বেশ জ্যোৎস্না রাত আছে

কল্যাণী বললে—চল

—সাজগোজ কর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাড়ী পরে এসে সে বললে—মেজদা, আর কেউ যাবে?

—না।

দু'জনে গেল।

গাড়ি খানিকটা চলল—

জ্যোৎস্না—নদী—মেজদার অনেক দিন পরে এমন স্নেহ—কল্যাণীর মন নানারকম ভরসা ও প্রসন্নতায় ভরে উঠল—

সে বললে—মেজদা—

প্রসাদ চুরুটে একটা টান দিয়ে বললে—কি রে—

—তোমাকে একটা কথা বলব আমি

—বল

—কিছু মনে কোরো না তুমি মেজদা—তোমাকে না বললে কাকে বলব আমি আর?

প্রসাদ কল্যাণীর পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে সস্নেহে বললে—কি কথা?

চন্দ্রমোহনের কথাটা আগাগোড়া সে বললে প্রসাদকে

প্রসাদ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল—

কল্যাণী বললে—এ লোকটাকে তুমি তাড়িয়ে দাও মেজদা—

প্রসাদ চুপ করে তাকিয়ে ছিল দূর দুর্নিরীক্ষ্য শূণ্যের দিকে, কোনোও কথা বললে না।

কল্যাণী বললে—তোমার পায়ে পড়ি মেজদা, আমাদের বাড়ি একে আর ঢুকতে দিও না তুমি—ওর গলার স্বর শুনলেই আমার প্রাণ শুকিয়ে যায়—আমার এত কষ্ট হয় মেজদা

প্রসাদ বললে—কিন্তু শুনেছি লোকটার ঢের টাকা আছে

—অমন টাকার গলায় দড়ি—

—সে টাকা তারা সাধু উপায়ে রোজগার করেছে

—তা করুক

প্রসাদ একটু ঘাড় নেড়ে হেসে খুব দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বললে—কিন্তু আমি যদি মেয়ে হতাম, চন্দ্রমোহনকে বিয়ে করতাম।

কল্যাণী অবাক হয়ে বললে—কেন?

—টাকার যে কি সুখ তা তুমি এখনও বোঝ নি কল্যাণী। কলকাতায় চন্দ্রমোহনদের রাজারাজড়াদের মত বাড়ি—সেখানে তার বৌ হয়ে বাড়ির পাটরানী হয়ে থাকা—সবসময় দাসদাসীর সেবা লোকজনের আদর সম্মান, যখন খুসি থিয়েটার বায়োস্কোপ সার্কাস—কত কি আমোদফুর্তি—সে সবের নামও জানি না আমরা। তারপর মধুপুরে বাড়ি—জামতাড়ায় বাড়ি—শিমলতলায় বাড়ি—দেওঘরে বাড়ি—দার্জিলিঙে বাড়ি—ওদিকে দেরাদূনে—আলমোড়ায়—নইনীতালে—এমন সুখ তুমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পার না কল্যাণী।

কল্যাণী হতাশ হয়ে বললে—মেজদা, তুমিও এই কথা বল?

—আমি ঠিকই বলি বোন, সব কথাই তোমাকে বলেছি—

কল্যাণী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে গাড়ির পাদানের দিকে তাকিয়ে রইল—

প্রসাদ বললে—তুমি জান না হয়তো আমাদের জমিদারীর আর কিছু নেই

—কিছু নেই মানে?

—এখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসে দিলেই ভালো হয়

প্রসাদের হাত ধরে কল্যাণী বললে—ছি, অমন কথা বোলো না।

ধীরে ধীরে হাত খসিয়ে নিয়ে প্রসাদ বললে—না বলে কি করব? বাবার হাতে আর দু'বছরও যদি থাকে তাহ'লে আমাদের পথে নামতে হবে—

কল্যাণী অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে বললে—সত্যি বলছ তুমি মেজদা?

—দাদার ওপর ঢের নির্ভর করা গেছিল। কিন্তু দাদা দিলেন উল্টে আরো পগার করে সব। সে যাক, যা হয়ে গেছে তা গেছে, কিন্তু হবে তা আরো ভীষণ—

কল্যাণী পীড়িত হয়ে প্রসাদের দিকে তাকাল।

প্রসাদ বললে—দাদা আর ফিরবেন না, সে মন্দ নয়। কিন্তু ফেরেন যদি, দাবি করলে এ বাড়িটা হয়তো তাঁকে ছেড়ে দিতে হতে পারে- তাঁকে আর তাঁর মেমসাহেবকে—আর এড়িগেড়ি ট্যাশগুলোকে-

কল্যাণী বললে—সমস্ত বাড়িটা দিয়ে তিনি কি করবেন?

—মেমসাহেবরা সমস্ত বাড়ি না নিয়ে থাকে না—আমাদের সরে যেতেই হবে—কল্যাণী অত্যন্ত আশ্বাস ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে বললে—তখন তোমার কাছে গিয়ে থাকব আমি।

প্রসাদ একটু হেসে বললে—সে ক'দিন আর থাকতে পারবে তুমি? ক'দিন আর সম্মানের সঙ্গে সেরকম থাকতে পারবে তুমি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

কল্যাণী একটু আঘাত পেয়ে বললে—ভাইদের কাছে থাকতে গিয়ে অসম্মান কি করে হয় মেজদা?

প্রসাদ বললে—তা হয়—খুব—হয় [...] বিকার হয়—

কল্যাণী বিমূঢ়ের মত প্রসাদের দিকে তাকাল।

প্রসাদ বললে—তোমার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা চেপে যাওয়া উচিত নয় তোমার কাছে আমার। শুনতে খারাপ শুনালেও যা স্বাভাবিক—যেমনটি হয় যা ঘটবে তাইই তোমার জানা উচিত—আমারও খুলে বলা উচিত সব—

চুরুটে একটা টান দিয়ে প্রসাদ বললে—জমিদারী বলে আমাদের কারুর কিছুই থাকবে না, কোনও অংশ থাকবে না, সম্পত্তি না কিচ্ছু না—ওকালতি করেই আমাকে খেতে হবে; আমি বিয়েও করব—হয়তো শিগগিরই; জমিদারী তখন ফেঁসে গেছে—তুমি জমিদারের মেয়ে নও কিচ্ছু নও—আমার বৌ তখন তোমার ঘাড়ে হাগবে—খুব জোর দিয়ে এই কথাটা বললে প্রসাদ—সেটা তোমার কেমন লাগবে কল্যাণী?

কল্যাণী শিহরিত হয়ে উঠল।

প্রসাদ বললে—কিশোর পুরুষমানুষ আছে—একটা কিছু করেও নিতে পারবে হয়তো—তার জন্য তেমন ভাবনা নেই—কিন্তু তুমি কোথায় দাঁড়াবে?

প্রসাদ বললে—আর কিশোরও যে না বিয়ে করে ছাড়বে তা আমার মনে হয় না। তার ওখানে গিয়ে থাকলে তার বৌও তোমার ঘাড়ে হেগে বেড়াবে—

এর আর কোনও এপিঠ ওপিঠ নেই—

কল্যাণী বললে—গাড়িটাকে ফিরতে বল—

প্রসাদ গাড়োয়ানকে হুকুম দিয়ে কল্যাণীকে বললে—এই বেলা জমিদারের মেয়ে থাকতে থাকতে চন্দ্রমোহনকে তুমি বিয়ে করে নাও, না হ'লে পরে দুর্গতির আর শেষ থাকবে না তোমার।

কল্যাণী আঁতকে উঠল—

প্রসাদ বললে—তুমি মনে কর তুমি খুব সুন্দর। কিন্তু নির্জলা সুন্দর মুখ দেখেই মানুষে আজকাল বড় একটা বিয়ে করে না। আমি নিজেও তা করব না। তোমার মতন এরকম সৌন্দর্য—এও অসাধারণ কিছু নয়—তুমি পঙ্কজবাবুর মেয়ে বলেই আজ এ জিনিসের একটা কিছু দাম আছে—চন্দ্রমোহনের স্ত্রী হলে এর দাম আরও হাজার গুণ বেড়ে যাবে। না হলে আমার কুচ্ছিৎ মাগ এলেও—সেই যা বলেছি—হৈ হৈ করে তোমার ঘাড়ে ঘাড়ে হাগবে—খুব সেয়ানা জিনিস হবে সেটা তখন, না?

আঠারো

শালিখবাড়িতে এসে অব্দিই অবিনাশ ভেবেছিল যে কল্যাণীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে একদিন—কিন্তু যাওয়া তার ঘটে ওঠেনি।

সে অলস হয়ে গেছে—এত অলস যে যে সঙ্কল্পের পিছনে নরনারীর ভালোবাসার মত এমন একটা অনুপ্রেরনার জিনিস তাও যেন তাকে জোর দেয় না।

সে ঢের ভাবতে শিখেছে—

অনেক সময়ই বিছানায় শুয়ে থেকে ভাবে শুধু কোনও কাজ করে না, বিশেষ কারুর সঙ্গে কোনো কথা বলে না; এক একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি ঠাই বিছানায় শুয়ে থাকে—মাঝে গিয়ে একটু স্নান করে খেয়ে আসে শুধু—

ভালোবাসার কথা আজকাল সে বড় একটা ভাবে না—

এক এক সময় মনে হয় কল্যাণীকে আর ভালোবাসে সে কি?

এক সময় এই ভালোবাসা তাকে ঢের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—এই রূপ এমন গভীর এমন সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে রেখেছিল তাকে যে পৃথিবীর মানুষের জীবনযাত্রার অন্যতম আশা আকাঙ্খা ও সার্থকতার সমস্ত দরজাই চাবি দিয়ে বন্ধ করে ভালোবাসা মোহ ও কামনার উপাসনা করেছে বসে বসে সে—তাতে কি হ'ল?

জীবন তাকে পদে পদে ঠকিয়ে গেল শুধু; কল্যাণীও যেমনি দূর—তেমনি দূর হয়ে রইল। তবুও কল্যাণীকে পাওয়ার জন্য জীবনের সব দিকই একদিন সে অক্লেশে ছারখার করে ফেলতে পারত; কল্যাণী ছাড়া আর কোনো জিনিসেরই কোনো মূল্য ছিল না—কোনো নাম ছিল না যেন; হে বিধাতা, কোনো নামও ছিল না।

আর্টের কোনো অর্থ ছিল না, প্রতিষ্ঠার কোনো মানে ছিল না, সংগ্রাম সম্মান মনুষ্যত্ব সাধনা প্রতিভা এগুলোকে এমন নিষ্ফ মনে হ'ত সাধারণের ফুর্তি আহ্লাদ দিয়েই বা সে কি করবে? ভালোবাসা ছাড়া মনে হ'ত—আর সমস্তই সাধারণের জিনিস। নিজের রোজগারের টাকাটুকু মানুষের জন্য যে স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের পথ ঠিক করে রাখে তাকেও সে প্রাণ ভরে অবজ্ঞা করেছে—

কিন্তু আজ এতদিন পরে এই জিনিসটাই চায় শুধু সে—নিজের রোজগারের নিশ্চিন্ত কয়েকটা টাকা মাসে মাসে—সেই সামান্য ভিত্তির ওপর যেটুকু স্বাধীনতা থাকে যেটুকু তৃপ্তি থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর জিনিসও আজ তাকে কেউ দিচ্ছে না। কলকাতা ছেড়ে দেশে এসে মায়ের ওপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে তার।

এমন অনেক কথা ভাবছিল অবিনাশ বিছানায় শুয়ে শুয়ে—এমন সময় কল্যাণী এল।

ব্যাপারটা যে কি হ'ল সহসা অবিনাশ বুঝতে পারল না; ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বললে—তুমি—

বিছানার এক পাশে এসে চুপে চুপে বসে কল্যাণী বললে—শুয়েছিলে—শোও।

—না—না—না—এখনই উঠতাম—

—বেড়াতে যেতে?

অবিনাশ বললে—আজ লক্ষ্মী পূজো না?

—হ্যাঁ

—এ রাতে তুমি কেমন করে এখানে এলে?

—দেখছই তো এসেছি

—পূজা ফেলে?

—পূজো খানিক হয়েছে—খানিক হচ্ছে—

—তোমাকে ছেড়ে দিল?

কল্যাণী—কৈ, তোমাদের বাড়ি পূজো হবে না?

—কে আর করে?

—আহা, লক্ষ্মী পূজো—

—লক্ষ্মী সরস্বতী সব একাকার—তুমি তো জানই সব—আহা, এই জ্যোৎস্নাটা—বেশ লাগছে! এতক্ষণ শুয়ে থেকে এই জ্যোৎস্নাটার দিকে ছিলাম পিঠ ফিরিয়ে—তুমি যদি না আসতে তা হ'লে হয়তো ঘুমিয়েই পড়তাম—

—কেন, এ বাড়ির লোকজন সব কোথায়?

—পাড়ায় গেছে হয়তো—

কল্যাণী বললে—তুমিও তো কলকাতায় ছিলে?

—হ্যাঁ।

—কবে এসেছ?

—দিন পঁচিশেক—

—আমি যে এখানে এসেছি তা জানতে না তুমি?

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বললে—জানতাম

—একদিনও গেলে না যে বড়?

অবিনাশ বললে—তোমার কাছে গেলে মনটা খুব ভালো লাগত বটে—রাতে বেশ সুন্দর স্বপ্ন দেখতাম—কিন্তু ঐ অব্দি—আর কি?

কল্যাণী অবোধের মত তাকিয়ে রইল।

অবিনাশের মনে হ'ল এই মেয়েটি বড্ড বোকা, ভেবেই তার বড় কষ্ট হল; মনে হ'ল, ছি, কল্যাণীর সম্বন্ধে এ রকম ভাবনাও এক দিন কত বড় অপরাধের জিনিস বলে মনে হত! আজো পৃথিবীর মধ্যে এই মেয়েটিকেই সব চেয়ে কম আঘাত দিতে চায় সে—নিক্তির মাপের চেয়ে একে একটু বেশি কষ্ট দিতে গেলেই নিজের মন অবিনাশের আজো কেমন একটা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু পড়া উচিত নয়।

কিন্তু, তবুও সেই ব্যথা কয়েক মুহূর্তের জন্য শুধু;—আগেকার মন তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় না আর। এ একটা চমৎকার রফা।

কল্যাণীর সময় হয়তো খুব সংক্ষেপ; সে উশখুশ করছিল—

—কি ব্যাপার?

কল্যাণী বললে—একটু দরকার—

এই বলে সে থামল—

অবিনাশ তাকাল মেয়েটির দিকে

কল্যাণী বললে—শুনেছ নাকি?

অবিনাশ একটু ভেবে বললে—হ্যাঁ, শুনেছি

—কি বলো তো।

—তোমাদের বাসায় চন্দ্রমোহনবাবু আছেন—

কল্যাণী বললে—তাকে চেন নাকি?

—না।

—কোনো দিন দেখোও নি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এই এবার দেখলাম—এ দিককার রাস্তায় মাঝে মাঝে বেড়ায়, তোমার মেজদার সঙ্গে তোমাদের বগি গাড়িটাতে চড়ে—

কল্যাণী বিছানার ওপর আঁক কাটছিল—

একটু পরে বললে—তুমি কি বল?

অবিনাশ বললে—আমার মন ক্রমে ক্রমে নিরস্ত হয়ে উঠেছে—কাজ করতে ভালো লাগে না—দুঃসাধ্য জিনিসকেও সফল করে তুলবার মত উদ্যম হারিয়ে ফেলেছি—দিন রাত চিন্তা করে করে সব কিছুরই নিষ্ফলতা প্রমাণ করতেই ভালো লাগে শুধু—এই সব অদ্ভুত ব্যাপারের কথাই ভাবি আমি। এর পর আমার কাছে কি আর শুনতে চাও তুমি?

কল্যাণী বললে—আমি দিন রাত কি....চন্দ্রমোহনবাবুর জুতোর শব্দ শুনলেও আমার ভয় পায়—এমন কান্না আসে।

অবিনাশ একটু হেসে বললে—একদিন এই জুতোর শব্দ না ভালো লাগবে যে তা নয়

কল্যাণী বললে—তার আগে যে আমি মরে যাব।

—বুড়ী হয়ে তুমি বুড়ো চন্দ্রমোহনকে রক্ত গরম করবার জন্য মরকধ্বজ ঘষবে—

কল্যাণী বললে—মিছে কথা বাড়াও কেন? তুমি তো সব জান। তোমার কাছে এসে কি আমার অনেক কথা বলবার দরকার।

—শোন তবে—

কল্যাণী অবিনাশের দিকে তাকাল—

অবিনাশ বললে—অনেক দিন আমাদের দু'জনার দেখা নেই—তোমার খোঁজ তবুও আমি সব সময়েই রেখেছি—কিন্তু আমার ব্যাপারটা তুমি একেবারেই জানতে পারনি—

—তোমাকে আমি অনেক দিন থেকে জানি—আর জানবার দরকার নেই—

মেয়েটিকেই অবিলম্বেই নিজের কথা সব জানিয়ে দিয়ে এই ক্ষণিক মুহূর্তের সৌন্দর্য অবিনাশ নষ্ট করতে গেল না।

এই জ্যোৎস্নায় এই রূপসীকে—এবং এই রূপসীর এই ক্ষণিক প্রেমকে প্রেমিকের মত না হ'লেও শিল্পী আয়ুষ্কালের মত উপভোগ করতে লাগল সে; মনে হল এ উপভোগ প্রেমিকের উপভোগের চেয়েও ঢের প্রবীণ,—একটায় মানুষ মানুষের মত আত্মহারা হয়—আর একটায় বিধাতার মত সমাহিত হয়ে থাকে। ঢের প্রবীণ—ঢের সুপরিসর এ উপভোগ।

কিন্তু এক আধ মিনিটের জন্য শুধু; তার পরেই নিজের অনিকেত পৃথিবীতে ফিরে এল অবিনাশ।

কল্যাণী বললে—চন্দ্রমোহনের মুখ দেখেছ তুমি?

—দেখেছি

—কেমন বলো তো—

অবিনাশ ভাবছিল—

কল্যাণী অত্যন্ত অসহায় বলে বললে—এমন মেনি বাঁদরের মত মুখ আমি মানুষের মধ্যে কোনো দিনও দেখিনি—তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না অবিনাশদা—

—মানুষের মুখের সৌন্দর্যই যদি এত ভালো লেগে থাকে তোমার তাহ'লে কোনো মুখ নিয়েই কোনো দিন তৃপ্ত হতে পারবে না—

—তোমাকেও কেউ ঘুষ দিয়েছে নাকি? তুমিও যে চন্দ্রমোহনের হয়ে কথা বলছ?

অবিনাশ একটু হেসে বললে—কল্যাণী—আমি—

—তুমি এ রকম অসঙ্গত কথা বল কেন

—জীবন ঢের অসঙ্গতি শিখিয়েছে; সবচেয়ে অসংলগ্ন জিনিসকেও দেখলাম শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে সত্য—

অনিবাশ বললে—আমার নিজের সুখকে এক সময় বেশ পুরুষ মানুষের মত বলে মনে হত; কিন্তু দিনের পর দিন যতই কাটছে চামড়া ঝুলে পড়ছে, মাংস খসছে—হাড় জাগছে—

তারপর এক এক দিন ঘুমের থেকে উঠে আরসীতে মুখ দেখে মনে হয়, এ কি হ'ল? নানা রকম বীভৎস জানোয়ারের আভাস মুখের ভিতর থেকে ফুটে বেরুতে থাকে। কিন্তু তাই বলে আমার কোনো দুঃখ নেই; মেয়েদের ভিতর যারা সবচেয়ে কুশ্রী তারাও আমাকে ক্রমে ক্রমে বসুশ্রী বলে ঠাট্টা করছে—হয়তো দূরে সরে যাবে আমার কাছ থেকে; আমিও তাদের কুৎসিৎ বলে টিটকারি দেব—

কিন্তু তারপর যখন কাজের সময় আসবে—তার যদি অনুমতি হয়—ওদের মধ্যে একজন পাঁচশো টাকার ইনস্পেকট্রেসকে বিয়ে করতে আমার একটুও বাধবে না; কি বাধা কল্যাণী? মুখের দোষগুণ শেষ পর্যন্ত আর থাকে না। টাকা জীবনটাকে সুব্যবস্থিত করে দেয়—

কল্যাণী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অবিনাশের দিকে তাকাল, নাক চোখ মুখ এমন কি দাঁতের ভিতর থেকেও যেন তার আগুন ঠিকরে পড়ছে; কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ'ল অনিবাশ ঠাট্টা করছে; তামাসা করতে যে এ লোকটি খুব ভালোবাসে তা কল্যাণী বরাবরই জানে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই মনটা তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল প্রায়—আস্তে আস্তে—কেমন একটা অদ্ভুত অসঙ্গতির খোঁচা খেয়ে নিরুপায়ের মত হাসতে হাসতে বললে—তোমার মুখকে তুমি চন্দ্রমোহনের মত মনে কর?

—সেইরকমই তো হয়ে যাচ্ছি

—দেখছিই তো

—চন্দ্রমোহনের ও দোষটা তুমি ধোরো না—

—সে আমি বুঝব

অবিনাশ বললে—তাকে বিয়ে করতে হয় কর, না করতে হয় না কর; কিন্তু যে কুৎসিৎ মানুষ প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালোবেসেছে তাকে কুৎসিৎ বলে ঘৃণা করে খারিজ করবে তুমি এটা বড় বেকুবি হবে।

কল্যাণী নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

একটু পরে বললে—তুমি পরিবর্তিত হয়েছ বটে।

অবিনাশ বললে—তুমি হওনি? যদি না হয়ে থাক, হওয়া উচিত তোমার।

অবিনাশ বললে—আর্টিস্ট ছিলাম—কিন্তু আর্ট জীবনকে কি দিল? প্রেমিক হয়েও জীবনের কাছ থেকে কি পেলাম আমি?

—প্রেমিক হয়ে? এখন তুমি আর প্রেমিকও নও তাহ'লে?

—কাকে ভালোবাসব? একজন রূপসীকে নিয়ে আমার কি হবে কল্যাণী? আমি নিজে খেতে পাই না; প্রেম বা শিল্পসংস্থান মানুষের জীবনের থেকে যে দুরন্ত চেষ্টা সাহস কল্পনা দুঃসাধ্য পরিশ্রম দাবী করে আমার জীবনের যে মূল্যবান জিনিসগুলো খরচ হয়ে গেছে সব—কিছু নেই এখন আর। উপহাস আছে এখন; জীবনের গতিশীল প্রগতিময় জিনিসগুলোকে টিটকারি দিতে পারি শুধু—নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভোরের থেকে রাত, রাতের থেকে ভোর সৌন্দর্যকে মনে হয় কাদা আর লাল স্রোত, ভালোবাসাকে মনে হয় পুতুলখেলা, পলিটিক্সকে মনে হয় উতোর, আর্টকে ভাঁড়ামি, জীবনের মহত্ব গুরুত্ব মঙ্গল বলে যে সব জিনিস নিয়ে লোকে দিনরাত হৈ হৈ করছে সবই আমার কাছে ভড়ং ঢং নিষ্ফলতা শুধু। আমি আজো বুঝি না এরা সত্য—না আমি সত্য। আমার কোনো বিধাতা নেই। আমার মার দুঃখ কষ্ট দেখে একটা চাকরির সামান্য ক'টি টাকা ছাড়া অন্য কোনো কিছু জিনিসের জন্যই আমার কোনো প্রার্থনা নেই। কিন্তু সে চাকরিও আমাকে দেয় না কেউ?

কল্যাণী কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে রইল।

অবিনাশ বললে—চন্দ্রমোহন তোমাকে বিয়ে করবে এ জন্য ঈর্ষাও নেই আজ আমার; তেমন কোনো একটা যৌনকাতরতাও নেই। কিন্তু গত বছর হ'লে এই শেষের জিনিসটাও কি ভয়াবহ হয়ে উঠত—অবাক হয়ে আজ ভাবতে পারা যায়। এক বছরের মধ্যে কতখানি ঘুরে গেছি—

কল্যাণী বলল—উঠি

—আচ্ছা

কিন্তু তবুও সে বসে রইল—

অবিনাশ বললে—কার সঙ্গে যাবে?

ছোড়দা আসবে—

কিশোর কোথায়?

—তোমাদের পাশের বাড়িতেই—

—হিমাংশুবাবুর বাড়ি?

—হ্যাঁ; ডেকে দেবে?

আচ্ছা দেই

অবিনাশ উঠল

কল্যাণী বললে—সত্যিই ডাকতে গেলে

—তুমি বাসায় যাবে না?

কল্যাণীর চোখ ছলছল করতে লাগল—

অবিনাশ একটা চেয়ার টেনে বসে বললে—দিব্বি রাত—লক্ষ্মীপূজোর—

—সে দিনগুলো ফুরিয়ে গেল কেন?

—কোন দিন

—যখন তুমি ভালোবাসতে পারতে—

অবিনাশ চশমাটা খুলে বললে—ফুরুলো তো

—আমরা তো ফুরোয় নি—

—অনেক স্বামী স্ত্রীর জীবনই আমি দেখেছি—ভালোবাসা কোথাও নেই, সৌন্দর্যের মানে শিগগিরই ফুরিয়ে যায়; সমবেদনা থাকে বটে—কিন্তু সমবেদনা তো প্রেম নয়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী বললে—আমি স্বামী স্ত্রীর জীবনের কথা বলছি না—

অবিনাশ বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে—একটা গল্প মনে পড়ছে—এমন লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে সেই গল্পটার ভেতর ঢের মাধুর্য জমে ওঠে বটে। তোমাকে নিয়ে যদি আজ এই জ্যোৎস্নায় কোনো দূর দেশে চলে যাই আমি যেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পায় না—তুমি আমার স্ত্রী হও, আমি তোমার স্বামী হই—তাহ'লে আমি কোনো চরিতার্থতা পাব না।

কল্যাণী বুকের ভিতর কেমন যেন ক'রে উঠল, কোনো কথা বলতে পারল না সে।—এই, জ্যোৎস্না উৎরে আবার ভোর আসবে দুপুর আসবে—অমাবস্যা আসবে—বৃষ্টি আসবে

—নানা দিক থেকে অনেক বিরুদ্ধাচারের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। সে সংগ্রাম তুমি হয়তো কিছু দিন করতে হবে। কিন্তু আমি পারব না।

কল্যাণী বললে—কেন?

—ভালোবাসা ও সৌন্দর্যকে অন্তঃসারশূন্য মনে হয় যে

—কেন?

—সৌন্দর্য তো একটা ফুলের পাপড়ির মত। কি তার মূল্য একটা কবিতার খাতায় ছাড়া এ পৃথিবীর আর কোথাও তার কোনো দাম নেই। মন আমার আজ কবিতার খাতার বদলে বিলের খাতায় ভরে উঠেছে—

কল্যাণী আঁতকে উঠল

অবিনাশ বললে—ভালোবাসাও তো শেষ পর্যন্ত লালসায় গিয়ে দাঁড়ায় শুধু— লালসার কি যে মূল্য তা গত দু'বছরের আমি খুব বুঝতে পেরেছি। সে শুখখুরির কাছে তোমার জীবনকে বিসর্জন দিতে চাই না আমি, আমার জীবনকেও নষ্ট করতে পারি না—

কল্যাণী একটি মৃতপ্রায় মানুষের মত কে কোণে জড়সড় হয়ে বসেছিল

অবিনাশ বললে—কিন্তু এও সব হ'ত আমাদের—খুব ভালোই হত যদি চন্দ্রমোহনের মত টাকা থাকত।

অবিনাশ একটু কেশে বললে—কিম্বা তোমার মেজদার মত টাকা থাকলেও আমি একবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু আমার কিছুই নেই।

উনিশ

সেই রাত্রেই—

লক্ষ্মীপূজোর অশেষ জ্যোৎস্নার মধ্যে লাল রাস্তার পর কাঁকরের আরো লাল রাস্তার বাঁক ঘুরে ঘুরে বগি গাড়িটা নিঃশব্দে চলছিল—যেন এ চলার সীমা শেষ নেই। কিন্তু তবুও খুব তাড়াতাড়িই যেন পঙ্কজবাবুর গাড়ি বারান্দায় এসে ঝট করে গাড়িটা থেমে গেল। ঘোড়াটা খট খট করে খানিকটা লাফিয়ে উঠল—পাগলামি করল—চাবুক খেল—তারপর সব চুপ।

কল্যাণী হঠাৎ চমকে উঠে বুঝতে পারল যে বাসায় এসে পৌছেছে—

ছোড়দার পিছনে পিছনে তেতলা অব্দি গেল কল্যাণী—

কোথাও কেউ নেই।

কল্যাণী বললে—কোথায় গেছে সব ছোড়দা—

—কে জানে কোথায়?

দোতলায় নেমে সিদে খাবার ঘরের দিকে চলে গেল কিশোর, কল্যাণীও দোতলায় নামল—খেতে গেল না আর। হলের একটা চেয়ারের ওপর চুপ করে বসে ছিল—কিশোরের গলার আওয়াজ রান্নাঘরে ক্রমাগত খন খন করছে—কাকে যেন ধমকে ধমকে সে ভূতঝাড়া করে দিচ্ছে—

কিশোর অবিশ্রাম বকে চলছিল—কিন্তু ছোড়দার গলার অস্তিত্ব ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে এল যেন কল্যাণীর কাছে।

কে কিছুই দেখছিল না—বুঝছিল না।

কিশোর খেয়ে এসে কল্যাণীকে অগ্রাহ্য করে ঘুমোতে চলে গেল।

ওসমান এসে বললে—দিদিমণি

কল্যাণী নড়ে উঠল।

ওসমান বললে—কত্তারা বোধ হয় কেউ আজ রাতে ফিরবেন না

—কোথায় গেছে?

যাত্রা না পাঁচালী শুনতে হরিবাবুর হাবেলীতে—

কল্যাণী বললে—কে কে গেছেন?

—ছোটবাবু আর আপনি ছাড়া সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—যাও।

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা তুমি যাও।

—খাবেন না?

কল্যাণী বললে—কে?

—চন্দ্রমোহনবাবু—আপনি—

—তিনি কোথায়?

—বাগানে বেড়াচ্ছেন—

—খান নি?

—না

—তাঁর ডেকে খেতে দাও গিয়ে

—এই টেবিলেই দেব?

—দাও

—ডেকে আনি?

—খাবার ঠিক হয়েছে?

—হ্যাঁ

—আন ডেকে

—ওসমান চলে গেল।

কল্যাণী ভাবছিল—সে তেতলায় চলে যাবে—কিম্বা নিজের ঘরে যাবে ঘুমুতে; কিন্তু বসেই রইল সে—মস্ত বড় গোল ডিনার টেবিলটার পাশে একটা চেয়ারে—খাবারের জন্য ও চন্দ্রমোহনের জন্য স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষ করছে যেন সে। কল্যাণীর মনে হচ্ছিল, এ কেমন! কিন্তু এমনই তো হ'ল। জিনিসটাকে খুব বেশি অঘটন বলেও মনে হচ্ছিল না তার।

চন্দ্রমোহন এল।

কল্যাণী বললে—বসুন।

বলেই শিউরে উঠল। নিজের প্রতি বিরূপ কাতর ব্যথিত চোখ দু'টোকে নীলাম্বরীতে ঢেকে তেতলার দিকে ছুটে যাবার ইচ্ছে করল তার। কিম্বা এই মেঝের ইঁট চুণ কাঠের ভিতর মিশে যেতে ইচ্ছা করছিল তার—কেউ কোনো দিন খুঁজে পাবে না তাকে আর।

কিন্তু তবুও সময়বিধাতা তাকে বসিয়েই তো রাখলেন।

চন্দ্রমোহনের ভাত এল; কল্যাণীরও

কল্যাণী বললে—ওসমান

—হুজুর

—এখন না, আমি পরে খাব।

ওসমান থালা তুলে নিয়ে গেল—

চন্দ্রমোহন অত্যন্ত মর্মপীড়িতের মত বললে—কেন? পরে কেন?

কল্যাণী বললে—আপনি খান।

—আপনি কেন খাবেন না?

—খাব তো; পরে

—আমার সামনে খেতে খারাপ লাগে

কল্যাণী বললে—আপনার ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে

—আমি খাচ্ছি

একটু হেসে বললে—আপনি না খেলেও আমি খাচ্ছি—কাউকে কষ্ট দেবার ইচ্ছে আমার নেই।

চন্দ্রমোহনবাবুর কখন কি লাগে ওসমান তদারক করে যাচ্ছিল; কল্যাণী তাকিয়ে দেখছিল মাঝে মাঝে— নিপুণ খানসামার মত এসে বুঝে শুনে দরদ দিয়ে লোকটাকে খাওয়াচ্ছে। মাথাটা একটু কাৎ করে জানালার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে রইল কল্যাণী।

খাওয়া হয়ে গেলে ওসমান টেবিল পরিষ্কার করে নিয়ে গেল—কল্যাণীর মনে হ'ল এখন সে চলে যেতে পারে।

চন্দ্রমোহন মুখ ধুয়ে গামছায় মুখ মুছে টেবিল সাফ শেষ আগেই দাঁড়িয়েছে এসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওসমান চলে যাওয়ার পর চন্দ্রমোহন বললে—আমি কাল পশু তক এখান থেকে চলে যাব—

কল্যাণী মাথা হেঁট করে বসেছিল—

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার বাবার মত পেয়েছি—আমারও কলকাতায় ঢের কাজ আছে ভাই—

কল্যাণীর বুকের ভিতর ঢিব ঢিব করছিল। অস্ফুট স্বরে বললে বাবার মত? কিসের মত?

চন্দ্রমোহন বললে—তা তো আপনি জানেনই—

কল্যাণী বললে—আপনার কাছে একটা অনুরোধ

চন্দ্রমোহন হাসি মুখে তাকাল

কল্যাণী বললে—আপনি যদি মানুষ হন বাবাকে আর বিরক্ত করবেন না—আমাদেরও না

চন্দ্রমোহন ধীরে ধীরে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে অত্যন্ত করুণ হয়ে বললে—আপনার বাবাকে কি আমি বিরক্ত করেছি?

কল্যাণী একটু চুপ থেকে বললে—না হয় সেধেই বাবা আপনাকে ভালো বেসেছেন—কিন্তু—

চন্দ্রমোহন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু আর কেন কল্যাণী

কল্যাণীর আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই এমন কান্না এল তার—অতি কষ্টে কান্না চেপে চন্দ্রমোহনকে বললে—কি চান আপনি?

চন্দ্রমোহন অত্যন্ত কাতর হয়ে বললে—তুমি দয়াময়ী; তোমার মতন দয়া আর কারুর নেই। আমি প্রথম দিন দেখেই বুঝেছি—শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যেন আমার মৃত্যু না হয়—

কল্যাণী ঠোঁটে আঁচল গুঁজে কঠিন আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল—নড়বার চড়বারও শক্তি ছিল না তার।

চন্দ্রমোহন একটু এগিয়ে এসে কল্যাণীর হাত ধরে বললে—তুমি আমাকে ভালোবাস—বল, তুমি আমাকে ভালোবাস—

কল্যাণী হাত খসিয়ে দিয়ে বললে—না, ছাড়ুন—

—বল, আমাকে ভালোবাস তুমি কল্যাণী—বল ভালোবাস—

কল্যাণী চোখের জলে একাকার হয়ে বললে—না—না—না—কোনো দিনও না—কোনো দিনও আপনাকে আমি ভালোবাসি নি—আপনি সরুন—আমাকে যেতে দিন—যেতে দিন—

চন্দ্রমোহন বললে—আমি এখনও জানি তুমি আমাকে ভালোবাস—

কল্যাণী অবোধের মত কাঁদতে কাঁদতে বললে—কে বলেছে সে কথা আপনাকে—আপনি ভুল করেছেন—ভুল করেছেন—ভুল করেছেন—

কল্যাণী চীৎকার করে উঠে বললে—আপনাকে দেখলে ভয় করে—আপনাকে দেখলে ঘেন্না করে আমার—

বলতে বলতে কল্যাণী শোবার ঘরের দিকে ছুটে যেতে লাগল—নিষ্কৃতি নাই—নিষ্কৃতি নাই—একটা ব্যাধের জাল যেন কল্যাণীকে ক্রমে ক্রমে ঘিরে ফেলছে—

চন্দ্রমোহন মেঝের ওপর শুয়ে পড়ে কল্যাণীর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে বললে—আমাকে মেরে ফেল—আমাকে মেরে ফেল কল্যাণী।

সমস্ত শরীর চন্দ্রমোহনের যেন কেমন নিষ্পেষিত পাখির মত—মাছের মত কল্যাণীর পায়ের নিচে লুটিয়ে লুটিয়ে ছটফট করতে লাগল। সে কি কাতরতা—মানুষ কোনোদিন এত কাতর—এমন অনাথ শিশুর চেয়েও ভয়াবহ অথর্বতার পরিক্রমে বোকা মেয়েমানুষকে স্তম্ভিত করতে পারে—কল্পনাও করতে পারেনি কোনো দিন কল্যাণী।

ধীরে ধীরে কান্না থেমে গেল তার। কান্না থামতেই নিজেকে সে ধিক্কার দিতে লাগল; সে বোকা মেয়েলোক ছাড়া আর কি? নইলে এই মানুষটার কাছে এমন করে সে ঠকে যায়!

বিচলিত হয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ে চন্দ্রমোহনের দিকে তাকাল কল্যাণী—এই লোকটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বীভৎসতাও নয় আজ আর—আজকের আকাশ মাঠ জ্যোৎস্না পৃথিবীর কি একটা নিগূঢ় কাতরতা ও নিষ্ফলতার প্রতীক ব্যবসায়ী—না সত্যিই প্রতীক এই চন্দ্রমোহন।

কল্যাণী বললে—উঠুন।

কোনো সাড়া দিল না চন্দ্রমোহন।

কল্যাণী বললে—উঠুন উঠুন—বলেছিলাম ঘেন্না করি, ভয় করি—কিন্তু এখন আর করি না সে সব কিছু—

চন্দ্রমোহন মেঝের ওপর মাথা উপুড় রেখেই বললে—বল ভালোবাস—

কল্যাণী আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বিড়বিড় করে কি বললে, চন্দ্রমোহন ছাড়া কেউ আর তা শুনতে পেল না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুড়ি

চন্দ্রমোহনের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে হবার পর বছর খানেক কেটে গেছে।

কল্যাণীর সাত মাস চলছে—

জরায়ুর শিশুটি যখন তাকে তেমন বিশেষ যন্ত্রণা দিচ্ছিল না, দিনটা মন্দ লাগছিল না, স্বামী কাছে ছিল না—তখন একটু অবসর করে মাকে সে চিঠি লিখতে বসল ঃ

এই এক বছরের মধ্যে তিন চারখানা চিঠি মাত্র তোমাকে লিখেছি মা। বাবাকে এক খানাও লিখতে পারিনি।

বাবার দুইখানা চিঠি আমি ঠিক সময়েই পেয়েছিলাম, কিন্তু সেগুলোর কোনো উত্তর দিয়ে উঠতে পারি না। বাবা কি রাগ করেছেন?

তোমরা তো জানতেই পেরেছ মা যে সাত আট কোটি টাকার কিছু ব্যবসা নয়—ব্যবসাই নয়; ব্যাংকে ওঁর পনের হাজার টাকা আছে মাত্র। তারি সুদে আমাদের চলে। উনি অনেক সময় বলেন, ব্যবসা না করলে এ টাকা বাড়বে কি করে? ব্যবসা করতে চান। কিন্তু আমি জানি—ব্যবসাবুদ্ধি ওঁর একেবারেই নেই। চার দিক থেকে লোকেরা এসে ওঁকে প্রায়ই ফুসলায়—উনি বিচলিত হয়ে যান। আমি এ রকম করে শক্ত করে চেপে না থাকলে এ ক'টি টাকা অনেক আগেই মারা যেত। তখন আমরা দাঁড়াতাম কোথায়, সেই পনেরো হাজার টাকার মধ্যেও সাত হাজার টাকা বাবার দেওয়া—আমার বিয়ের সময় যা যৌতুক দেওয়া হয়েছিল সেই টাকা।

মোট পোনেরো হাজার টাকা আমাদের সম্বল—বিয়ের আগে ওঁর আট হাজার টাকা ছিল মাত্র—কিন্তু ভুল খাতা দেখিয়ে ভাওতা দিয়ে বাবাকে ও মেজদাকে উনি প্রতারিত করেছেন বলে বাবা আজো ওঁর ওপর মর্মে মর্মে চটে আছেন—চিঠিতে লোকের মুখে ক্রমাগত ওঁকে গাল পাড়েন। তুমি তো তা কর না মা। তুমি জান মেয়ে মানুষের স্বামী ছাড়া কি আর থাকতে পারে। তুমি বাবাকে বলে দিও তিনি যেন ওঁকে এরকম করে আর নির্যাতন করতে না যান—তাতে আমার বড় বেশি আঘাত লাগে। আমাকেও যা চিঠি লিখেছেন তাও ওঁকে গাল পেড়ে—আমাকে না জেনে না বুঝে জলে ফেলে দিয়েছেন এই সব কথা লিখেছেন। এই জন্য আমার এত খারাপ লেগেছে যে বাবার চিঠির উত্তরও দেইনি।

বাবাকে বোলো তুমি যে আমাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়নি—আমার স্বামীর কাছেই আমাকে রাখা হয়েছে।

এ সব কথার মর্ম বাবা হয়তো ভালোবাসবেন না—আমার স্বামী তার এমন বিষদৃষ্টিতে! কিন্তু তুমি তো বুঝবে।

এর আগে আমরা বালিগঞ্জের দিকে একটা বাড়িতে ছিলাম: ভাড়া লাগত না। ওঁর দাদার বাড়ি। দু'টো কোঠা আমাদের জন্য আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। বেশ খোলামেলা ছিল—সামনে একটা মস্ত বড় মাঠ; সেখানে ছেলেরা ফুটবল, হকি, ডাণ্ডাগুলি—আরো কত কি খেলত। আমি অনেক সময় জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম।

বেশ মজা লাগত আমার—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা দেখতে। ছোড়দার সঙ্গে—আর ঐ ভূষণ আর আকুশির সঙ্গে ছেলেবেলায় আমিও তো কত খেলেছি!

ভূষণ কোথায় মা এখন? বিয়ে হয়ে গেছে? কোথায় হ'ল? আকুশি কোথায়?

বালিগঞ্জের বাড়িতে বেশ আলো হাওয়া আসত। খুব শান্তি ছিল। বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। একটা ঠিকা ঝি ছিল। সেই সব করে দিত। ওঁর দাদাদের সঙ্গে এক সঙ্গে খেতাম।

সারাদিন সেলাই করতাম—আর মাঝে মাঝে উনি আমার সঙ্গে তাস খেলতে চাইতেন। দু'জনে মিলে খেলতাম—বেশ মজা লাগত।

ওঁর দাদার একটা এস্রাজ ছিল—সন্ধ্যার সময় সেটা বাজাতাম। এস্রাজ বাজাতে জানি না আমি অবিশ্যি। উনিও জানেন না। কিন্তু ঐ এক রকম হত।

কিন্তু সে বাড়িটা আমাদের ছেড়ে দিতে হয়েছে। ওঁর দাদা বললেন যে তাঁর নিজের লোকজন আসবে। শ্যামবাজারের দিকে বাড়ি ভাড়া করতে হয়েছে আমাদের; গোটা বাড়ি অবিশ্য নয়—দু'টো ঘর ভাড়া করেছি—একটা রান্নাঘর আছে; রান্নাঘরটা এক তলায়—ঘর দু'টো দোতলায়—এই সময় ওঠানামা করতে হয়—এই যা কষ্ট—এখন আমার সাত মাস। উনি বলেন একটা রাঁধুনি রেখে দি—কিন্তু তাতে বড় পয়সা খরচ; এখন আমাদের সম্পূর্ণ সুদের টাকায়ই চালাতে হচ্ছে শুধু; পঁচাত্তর না সত্তর কত করে পান মাসে, তার থেকে বাড়ি ভাড়াই দিতে হয় পঁয়ত্রিশ—আর পঁয়ত্রিশে আমাদের চালাতে হয়। কাজেই রাঁধুনি রাখব কি করে? ঠিকা ঝিও রাখি নি। সব কাজ আমিই করি তুমি কিছু ভেবো না মা—ভারী জিনিস কিছু তুলতে হয় না; দু'জন মানুষের রান্না তো মোটে—কত আর ভার হবে?

কল আছে—জলের জন্য বিশেষ কষ্ট পেতে হয় না।

ওঠানামাও বেশি করি না; সেই ভোরে নামি—একেবারে রান্না সেরে—স্নান করে ওঁকে দিয়ে আমি খেয়ে তবে গিয়ে ওপরে উঠি। বেশি হাঙ্গাম পোয়াতে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসাটা গলির ভেতরে। তাই বড্ড অন্ধকার; হাওয়া তেমন খেলে না। আমাদের ঘর দু'টোর দক্ষিণ পূব বন্ধ—উত্তরের দিকে দু'টো জানালা—জানালার পাশেই কাদের বাড়ির সব প্রকাণ্ড দেয়াল—একেবারে আকাশ অব্দি চলে গিয়েছে। আকাশটাকে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না—সেই যেন কেমন লাগে যেন মাঝে মাঝে।

একেবারে হাঁফিয়ে উঠতে হয়। গলির ভেতর আমের খোসা, নেংটি ইঁদুর মরা, পচা বিড়াল, ভাত তরকারী উচ্ছিষ্ট, কাদের একটা গোয়াল, দু'এক জন কুষ্ঠ রোগী এইসব মিলে গন্ধ হয় বড়—কাজেই জানালার দিকে বড় একটা যাই না।

কিন্তু আমার মনে হয় পেটে ছেলে আছে বলেই বোধ হয় মনের এ রকম আঠকানে অবস্থা—শরীরটাও খারাপ লাগে। তাই না মা?

ছেলে হয়ে গেলে আবার বেশ আরাম পাব—উনিও তাই বলেন; শিগগিরই হয়ে যাবে—আর বেশি দেরী নেই; উনি বলেছেন তখন ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে রোজ বিকেলে একটু একটু বেড়াবেন।

বড়দা কি এখনও বিলেতে? তার কোনো চিঠি পাও? বড়দা কি আর দেশে ফিরবে না? কতদিন দেখিনি তাকে। যখন বিলেত চলে যায়—আমার মনে আছে আমি ঘুমুচ্ছিলাম—তুমি আমাকে জানালে। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে প্রণাম করলাম—মেজদা নাকি কলকাতায় এসেছিলেন? আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন না কেন? তিন চার বার কলকাতায় এসেছিলেন—অথচ একবারও এদিকে এলেন না। জানতে পেরে আমি প্রত্যেকবার কত কেঁদেছি—তোমাকে লিখেছি—কিন্তু তবুও মেজদা একবারও দেখা করতে এলেন না। ওঁর ওপর না হয় তাঁর রাগ থাকতে পারে। কিন্তু আমি তাঁর বোন—নই কি? তবে কেন তিনি আমাকে কাঁদালেন? ওরা আর আমাকে বোন বলেও মনে করে না—এই জন্য আমার এত কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে বুক ফেটে যেতে থাকে।

কিন্তু উনি এসে ধীরে ধীরে আমাকে সান্ত্বনা দেন। তাইতে আমার একটু ভালো লাগে।

ছোড়দা মাঝে মাঝে এখানে আসে—কিন্তু ওঁকে দেখলেই নাক খিঁচে উঠে চলে যায়। এতে আমার বড় খারাপ লাগে। ছোড়দা কেন এ রকম করছে? ছোড়দাকে তুমি লিখে দিও এ রকম করে না যেন আর, সব মানুষই মানুষ, বিশেষ করে যে মানুষ ওঁর মত জীবনের কাছ থেকে এত বেদনা বিড়ম্বনা পাচ্ছে তাকে ঘৃণা না করে একটু সমবেদনা দেখালেই মানুষের কাজ হয়।

তুমি কি একবার কলকাতায় আসবে না? তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে; বাবাকেও। কিন্তু তোমরা কেউ আস না কেন?

সন্তান না হলে আমি দেশেও যেতে পারি না। আগে আমাকে দেশে যেতে লিখেছিলে। কিন্তু তখন মেজদা কলকাতায়—অথচ আমাদের সঙ্গে দেখা করলে না, সেই জন্য যাইনি।

কিন্তু এ সব অভিমান এখন আর আমার নেই। আগে নানা জিনিসেই ঢের কষ্ট হত,—কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে সব যেন বুঝতে পারছি—আঘাত ক্রমে ক্রমেই কম অনুভব করি—একদিন হয়তো কোনো রকম আঘাত বোধই থাকবে না।

এই এক বছরের ভিতর আমি ঢের বড় হয়ে গেছি, মা। আসরীতে দেখলে হাসি পায়; উনিও মাঝে মাঝে আমার চেহারা দেখে হাসেন, দুঃখ করেন, কিন্তু ঠাট্টা করেন না, বকেন না। নিজেকে মাঝে মাঝে কেমন আধবয়সী বুড়োমানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু মনটাই যে আস্তে আস্তে ঢের বয়স্ক হয়ে গেছে। বিয়ের আগের সেই ছেলেমানুষী নেই, অভিমান নেই, অহঙ্কার নেই, ডায়েরী লিখবার সাধ নেই, সিনেমা দেখার প্রবৃত্তি নেই, কি সব অদ্ভুত বই পড়তাম—সে সবের কথা মনে পড়লে এখন গায়ে জ্বর আসে। মেয়েদের কাছে চিঠি লিখিনি আর—ইচ্ছে করে না। কি হবে লিখে? তাদের সঙ্গে দেখা করতেও ভয় করে। তারা দিন রাত এত সব বড় বড় কথা বলে—তাদের ভাব, ভাষা, চিন্তা ভালো করে বুঝতে হ'লে ঢের বিদ্যা বুদ্ধি চাই, কিন্তু এই সবই আমার কাছে অসার বলে মনে হয়। এ সব দিয়ে কি হবে? বিয়ের আগের সেই ভালোবাসাও নেই। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা অন্য রকম—সেবা ও শ্রদ্ধার জিনিস। উনি বলেন ভালোবাসারও জিনিস। কিন্তু আমি বুঝি না। হয়তো স্বামীরা ভালোবাসে, স্ত্রীরা শ্রদ্ধা করে। কিম্বা যে মেয়েমানুষদের চরিত্র খারাপ তারা অন্য পুরুষদের সঙ্গে ভালোবাসা করে বেড়ায়। তাই না মা?

ওঁর এক বন্ধু আছেন—ডাক্তার—বুড়োমানুষ—মিডওয়াইফারি খুব ভাল জানেন। তিনি প্রায়ই সন্ধ্যার সময় এসে এখানে চা খান; ও আমাকে দেখে যান। ক'দিন থেকে বিছানার ওপর আমাকে চিৎ করে শুইয়ে পেটের কাপড় উঠিয়ে পেট নেড়ে চেড়ে দেখছেন। কাল পেটের ওপর কান রেখে অনেকক্ষণ কি যেন শুনছিলেন। বুড়ো মানুষ না হ'লে আমার বড় লজ্জা করত।

তারপর বললেন—ছেলে হবে। পেট খুব বড় কিনা, কাজেই সন্তানও খুব বড়—কাজেই ছেলে। তা ছাড়া নড়াচড়ার রকম দেখেও উনি বুঝেছেন যে ছেলেই হবে।....

ছেলেই হ'ল—

যেই দেখে সেই বলে 'একি, এ যে আর এক চন্দ্রমোহন এল—'

ঠিক তেম্নি মেনি বাঁদরের মত মুখ, হলদে রং, চোখ পিটপিট করছে—ভুরু দু'টো রোঁয়ায় ভরা—মুখের ভিতর কেমন একটা নির্মম ধাপ্পাবাজির ইসারা—তারপর কেমন একটা নিঃসহায়তা—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কল্যাণীর চোখে এ সব কিছুই ধরা পড়ে না। সুস্থ সন্তানকে মাই খাইয়ে নিজের বুকের ভিতর জড়িয়ে এমন ভালো লাগে তার। এম্নি করে মাস আষ্টেক কেটে গেল—ছেলের দাদা দিদিমা কেউ তারে দেখতে এল না; কল্যাণীরও দেশে যাওয়া হ'ল না। চিঠিও সে আর পায় না কারুর—লেখেও না কাউকে।

একদিন দুপুরবেলা চন্দ্রমোহন দেখল যে কল্যাণী ঘুমুচ্ছে—সমস্ত শরীরের জামা কাপড় সবই প্রায় খোলা—ছেলেটিকে মাই দিতে দিতে কি এক রকম আদরে ও পিপাসায় নিজের শরীরের সাথে ছেলের শরীর একেবারে মিশিয়ে ফেলেছে যেন সে—মিশ্রণ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই যেন চায় না কল্যাণী—জিনিসটাকে সোজাসুজি বুঝতে পারল না চন্দ্রমোহন। উদ্ভট ভাবে ভাবলে— এই ছেলেটা তো সে নিজেই—দিকবালিকারা মাথা নেড়ে নেড়ে বললে—তুমিই তো।

এই স্বর্গসম্ভবা কল্যাণীর মত মেয়ের জীবনেরও এক বিরাট উচ্ছৃঙ্খলতা—উপহাস, নোংরামি, অধঃপতন, ও নিজের মনের এক অপরিসীম লালসার রসে মন তার উত্তেজিত হয়ে উঠল।

কিন্তু সম্প্রতি উপায় নেই—রাত্রে হবে।

কল্যাণী আবার আট মাস—আর এক চন্দ্রমোহন আসছে।

(গভীর পরাক্রমের সঙ্গে আপাতত নিজেকে সংযত করে নিয়ে চন্দ্রমোহন বেরিয়ে গেল।)

জুলাই ১৯৩২, কলকাতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভা

বিভার মুখের লাবণ্য বেশ উচ্চজাতীয়। সচরাচর এ-রকম সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। খুব অবর্ণীয় সৌন্দর্য নয়—কিন্তু এর বিশেষ ধরনটা আমার কাছে বড্ড চিত্তাকর্ষক।

অনেক নারীই তো দেখেছি, কিন্তু একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে, যার মুখ অনেকটা এই বিভার মত। সেই মেয়েটি ষোল সতের বছরে মারা যায়, মৃত্যু বড় করুণ। তার মৃত্যুর পর আমার মনে হয়েছিল যুবাবয়সের সৌন্দর্যের একটা বিশেষ বিকাশ পৃথিবীর থেকে মুছেই গেল বুঝি বা।

তারপর এই বিভাকে দেখলাম! মনে পড়ে প্রায় সাত বছর আগে বায়োস্কোপে (চার আনার সিটে) বসে রুথ চ্যাটার টমকে দেখেছিলাম। আজ মনে হচ্ছে গঙ্গাসাগরের মেলা দেখতে গিয়ে মৃত সেই পাড়াগাঁর মেয়েটি, বিভা, আর রুথ, এই তিনজনের মুখে একই আদল লেগে রয়েছে যেন। একটা ছিপছিপে নিমীলিত চাঁপাফুল, কিংবা শীর্ণ একটা উন্মুখ চাঁপার কলির মত নারীর আঙুলের দিকে তাকালে এ সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারা যায় যেন।

একদিন সকালবেলা খুব দেরিতে ঘুমের থেকে উঠে দেখলাম বিভা তার সোফার সামনে একটা তেপয়ের ওপর চায়ের সরঞ্জাম দিয়ে বসেছে।

আমার ঠিক পেছন ফিরে বসে নি। একটু তেরছা হয়ে ঘুরে বসেছে। আমি যে আমার ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, এ তার চোখে পড়েও যেতে পারে।

কিন্তু এদিকে সে তাকাচ্ছে না। তাকালেও আমি যে এসে দাঁড়িয়েছি এতে তার বিশেষ কিছু এসে যেত না। সে যেমন খাচ্ছে তেমনি নিজের মনে নিশ্চিন্তে সে চা খেয়ে যেত। আমার সম্বন্ধে হয়তো ভাবত এইটুকু যে, নিজেরই জানালার কাছে এসে দাঁড়াবার অধিকার এ-ভদ্রলোকের আছে, তা সে দাঁড়াক, রহস্যের বিশেষ কিছু নেই এ ঘরের ভেতর। যদিও বা থাকে ত আমি নারীই হয়তো সেই রহস্য কৌতুকের জিনিস।

এইটুকু ভেবে সে হয়তো আড়চোখে একবার ফিরে তাকাত। কিন্তু তক্ষুণি দেখতে পেত যে আমি জানালার থেকে সরে গেছি। আমিই বরং আগে জানালা বন্ধ করব—বিভা নয়। আমিই বরং আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাব। কিন্তু মেসের জানালার থেকে (একদৃষ্টে) বিভার দিকে তাকাচ্ছি বলে সে যে তার ঘর থেকে উঠে চলে যাবে একরকম স্থূলতা যেন আমাদের দু'জনার ভিতর না থাকে। আশা করি তাকাবে না। কিন্তু আশা বা স্বপ্নের চেয়ে বাস্তব নিয়েই আমাদের ঢের বেশি কাজ। কাজেই বিভা যতক্ষণ না বোঝে যে জানালার কাছে আমি ডেক চেয়ারে বসে আছি—ততক্ষণই নিরাপদ। ভাবি, দেখি, কল্পনা করি। চুরুট জ্বালাই-বেশ কাটে সময় আমার। তারপর হঠাৎ দেখি সে সোফার থেকে উঠে দাঁড়াল, কিংবা কাগজ ছিঁড়ছে, বা চুলের ভিতর দিয়ে চিরুনিটা টেনে টেনে একগোছা ঝরা চুল হাতে নিয়ে পশ্চিমের জানালার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি আমি। মেসের বারান্দায় চলে যাই। নিরিবিলি আমার জানালাটার মুখোমুখি তার নিজের পশ্চিমের জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কী করে যেন ভাবে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

এই সব আমার কাছে রহস্য। কিছু টের পাই না আমি। কিন্তু খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি তা না টের পাওয়াই ভাল।

একদিন দেখলাম আমার জানালার রেলিঙে কতকগুলো চুল উড়ে এসে লেগে রয়েছে। ধীরে-ধীরে গোছাটা তুললাম। বিভার চুল নিশ্চয়ই। রেশমের ডিমের মত যেন একটা, রোদের ভিতর দেখায় সোনালি। ছায়ায় কালো। শীতের বাতাসে কেমন ভীরু নিঃসহায়তাকে গড়তে থাকে। কেমন একটা করুণ গন্ধ চার—দিকে যেন জমতে থাকে তার। গঙ্গাসাগরের মেলা দেখতে গিয়ে সেই মৃত মেয়েটির মুখখানা মনে পড়ে যায় আমার।

একা বসে থেকে উত্তরের দরজার দিকে তাকিয়ে অনেক কথা ভাবি আমি। তারপর হঠাৎ তাকিয়ে দেখি চুলের গুটিটাকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি।

এমনি করেই হারিয়ে যায়!

ক্ষোভ হয় একটু সাবধানে রাখলে পারতাম না?

কিন্তু হতই বা কি রেখে? বড় জোর বিভার মাথার কয়েকগাছা চুল তো! মানুষের পায়ের নখ বা মাথার চুলে বা পরনের শাড়ি সিঁদুরের কৌটা বা চিঠি শ্রদ্ধা করে ভালবাসায় জমিয়ে রাখবার একটা সময় ছিল অবিশ্যি আমার জীবনে। কিন্তু সে সময় এখন আর নেই। একটা কথা ভেবে ভারি কৌতুক বোধ হয়। বিভার চুল তো? না, তার মানে? না, পায়রাগুলো কার চুল কোত্থেকে এনে ফেলেছে?

শেষ পর্যন্ত চুল নিয়ে আমাদের জীবনের কারবার নয়। তুচ্ছ একগাছা চুলের মত জিনিস মাঝে-মাঝে উড়ে এসে আমাদের হৃদয়টাকে পরিমাপ করে যায়? এই অব্দি-আর-কিছু নয়।

স্লিপারশুদ্ধ ডান পাটা তুলে বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর রাখি। তাকিয়ে দেখি চুলের গুটিটা এতক্ষণ স্লিপারের নিচে পড়েছিল। থাক। উড়িয়ে দেই। জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে উড়ে একেবারে একতলার নর্দমার ভিতর পড়ে গিয়ে।

বিভা বা খাচ্ছিল। সঙ্গে একটা টোস্ট আর গোটা দুই ডিম খেলে।

এক পেয়ালা চা ফুরিয়ে গেছে। টিপয়ের থেকে আর-এক পেয়ালা আন্দাজ ঢেলে বিভা চিনি দুধ মিশিয়ে নিচ্ছিল। এমন সময় একজন বুড়া মতন ভদ্রলোক দুটো খাঁচা নিয়ে ঢুকলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট খাঁচায় একটা ময়না। বড় খাঁচায় বেশ রঙচঙা একটা কাকাতুয়া। বিভা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে চমকে বললে—'বা!'

চায়ের পেয়ালাটা তেপয়ের ওপর রেখে দিল সে।

বুড়ো বললে—'খান খান, আপনি চা খান।'

না, চা সে খেল না।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'এ পাখি কোথায় পেলেন?'

—'আমি কিনে এনেছি।'

—'কোথেকে?'

—'ও সেই টেরিটি বাজার'—

—'তা, ভারি সুন্দর পাখি তো-আপনি পুষবেন বুঝি?'

বুড়ো চোখ কপালে তুলে বললে—'আরে বাপ রে! আমি পুষব পখি!' একটু কেশে বললে—'এই যে দেখছেন ময়না ইনি হচ্ছেন রানীমা।'

—'রানীমা? কোথাকার?'

—আর এই যে দেখছেন কাকাতুয়া ইনি হচ্ছেন চিনের রাজা।'

বিভা হাসছিল।

বুড়ো বললে—'ছ-সাতশ বছর রাজা হয়েছে-এখন দেশ বেড়াবার সময়।'

—'তাহলে পাখিগুলো বুড়ো?'

—'একটুও না। এদের সাত হাজার বছর পরমায়ু।'

—'বিক্রি করবেন?'

—'চিনের রাজাকে বিক্রি!'

বুড়া খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল। বললে,—'কিন্তু এদের কপালে কর্মভোগ আছে। না হলে টেরিটি বাজারে এসে জোটে?'

খানিকক্ষণ হেসে বুড়ো বললে—'কিন্তু যার তার কাছে মাল ছাড়ি না। পথে এমন বিশ পঁচিশ হাজার লোক শুধিয়েছে আমাকে! ধেতরি তার! তাদের কাছে বেচব এই জিনিস? হ্যাঁ, বেঁচে থাকলে কত রঙ্গই হবে। পাখি চোখে দেখেছে কোনোদিন তারা?' একটু হেসে বললে—'সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।'

বিভা উৎসুক হয়ে বললে—'তা, বাবার কাছে যান না।'

—'তিনি রাখতে চান না।'

—'কী বললেন?'

—'আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।'

—'এই কাকাতুয়াটার কত দাম?'

—'আপনাকে খুব শস্তায় দেব।'

বিভা বুড়োর দিকে তাকালে।

—'এই চিনের রাজাও আপনার কাছে থাকতে চায়।'

—'আমার কাছে?'

—'খুব।' বললে—'আপনি যদিও ইরানের রানী'—একটু কেশে বললে—'কিন্তু সেকালে চিনে ইরানে বিয়ে চলত। এক-একজন জাপানি মেয়ে দেখেছেন বেশ লম্বা ছাঁদের মুখ—নাক টিকলো—সেই সব বিবাহের সন্তান।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে ছিল। মুখ তুলে বললে—'আপনি মুসলমান?'

—হ্যাঁ, মা।'

—'কলকাতায়ই বরাবর?'

—'না, মা, কলকাতায় আমি এই টেরিটি বাজারের সম্পর্কে। সিঙ্গাপুরে কত জায়গায় ঘুরি।'

—'সিঙ্গাপুরে কী?'

—'সেইখানেই তো পাখি। এই তো উজাড় করে ময়না ধরে নিয়ে এলাম।'

—'আপনি?'

—'হ্যাঁ। সেই সিঙ্গাপুর থেকে।'

—'পাখি ধরেন কেন?'

—'চেনা ব্যবসা। বড্ড ফিটফাট। তবে আগে যে-রকম সুবিধা ছিল, এখন তার তা নেই। পাখি মরেও-বা কত।'

—'কীসে মরে?'

—'জাহাজে না-চড়তেই ঝুর ঝুর করে মরে যায়। চড়লে তো কথাই নেই। যে-কটাও-বা বাঁচে টেরিটি বাজারে সাফ করতে গিয়ে দেখি ঠ্যাং উঁচু করে হাঁ করে পড়ে আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'মরে?'

—'মরে কেলিয়ে।'

—'ছি!'

—'তবে আপনার চামড়ার কারবার থেকে ঢের ভাল।'

—'সে আবার কী রকম?'

—'আস্ত-আস্ত গোসাপ ধরে চামড়া খসিয়ে নেয়া হয়ই—'

—'আস্ত আস্ত?'

—'ত আপনি জানেন না বুঝি? সে দেখলে বড় দুঃখ হয়। জ্যান্ত গো-সাপটাকে-প্রাণের ভেতর কৃষ্ণ ছিল বাঁশি বাজাত'—একটু কেশে বললে—'হিঃ হিঃ!' খানিকটা শিকনি ঝেড়ে নিয়ে বললে—'কিন্তু জীবনটা এই রকমই। শুধু গোসাপের বলেই তো নয়। গোসাপের, টিকটিকির, কুমিরের, ঢোড়া, গোখুরো, দুধরাজ, পাঙরাজ, আপনার গিয়ে উট, গরু, মানুষ, ছাগল। আমাদের মানুষের পিঠের চামড়া নিয়েও মানুষে কত ডুগডুগি বাজায় মা। আমাদের জীবনের কথা ভবাতে গেলে, দুর্নীতির আর শেষ নেই মা।'

—'এ কাকাতুয়াটার দাম কত বললে?'

—'ব্যবসা আমাদের বেশ দয়ামায়ার, কিসে পাখিটা বাঁচে, সেই দিকেই হচ্ছে, আমাদের নজর। কৃষ্ণকে আমরা মারতে চাই না। তিনি থাকুন। তাকে তেল দেই, জল দেই, বাঁশি দেই।' ময়নার দিকে ফিরে—'বল তা ময়না রাধে প্রাণেশ্বরী!'

—'রাধে প্রাণেশ্বরী।'

—'দেখলেন—'দেখলেন তো বাঁশি কেমন বাজে।'

বাঁশি শুনে বিভা বিশেষ সুখী হল না।

মুসলমান ভদ্রলোকটি বুঝলেন, বললেন—'সব রকম বুলি করতে পারে—'হেলো'।

—'হেলো।'

-Kissing sweet heart'.

_Kissing sweet heart'.

_'Idiot! To bother a girl like that'.

_'Idiot! To bother a girl like that'.

বিভা হেসে উঠল।

–'You Northumberland rascal'.

–'You Northumberland rascal'.

—'বড়সাহেব তো আতা হ্যায়।'

—'মেরা দিল ঘাবড়াতা হ্যায়।'

—'দেখলেন, না বলতে কতখানি বলে ফেলল।'

ময়নাটার দিকে তাকিয়ে,— 'এই চিনেটাকে ডাক তো—ডাক—হেলো।'

—'হেলো।'

—'তারপর? হেলো।'

—'হেলো।'

—'হেলো বয়!'

—'হেলো বয়!'

—'দেখলেন তো মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলে।'

—'এত কথা কোত্থেকে শিখলে!'

—'কেষ্টধন শেখাই? এর খাঁচায় কি আর থাকে মা। খাঁচায় খাঁচায় ঘোরো।' বললে—'একটা গোরা রেখে ছিল কদ্দিন। যেই বিলেতের দিকে উড়াল দিলে ওমনি পাখিটাকে গেল ফেলে।' একটু কেশে বললে—'তারপর ছিল একটা চোরের আড্ডায়—' বললে 'সেখান থেকে এক মাদ্রাজী বাবুর্চি মুসলমান বাটপাড়ি করে নিয়ে যায়। চোর কি মুসলমান জেতের ভিতরেও নেই? তা আছে।' মাথা নেড়ে বললে—'তা সেটা মাদ্রাজী-চেট্টির থেকে মুসলমান হয়েছে। খাঁটি আরবি মুসলমান চুরিও করে না, গোলামিও করে না, ও ভারি কায়দার জাত। একেবারে পয়গম্বরের নিজের জিনিস কিনা।' হাত ঘুরিয়ে বললে—'এটা ছিল চেট্টি-চুরি করে মরে তার জন্যে এক বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়ি এল, সেখানে একটি বিধবা এই ময়নাটাকে কিনল।'

—'একটা বাঙালি বিধবা?'

—'হ্যাঁ, তার কাছ থেকেই এই রাধা বুলি শিখেছে। রাধাকৃষ্ণ। আপনার গিয়ে একশ আট নাম-তারপর মানভঞ্জন—নিমাই সন্ন্যাস—'

—'এত সব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'সব শিখেছে। পড়িয়েই দেখুন না।'

—'থাক এখন, পরে হবে।'

—'আমার মনে হয় বিধবা ঠাকরুনের কাছে থেকে থেকে পাখিটা জাতে উঠেছে।'

'—এর আগের জাত?'

—'হ্যাঁ, ময়না তো হিন্দুই।'

—'হিন্দু?'

—'হিন্দু বৈ কি। হিন্দু শুধু নয়—বোষ্টম। ময়নার জাতধর্ম হয়েছে রাধা কিষ্টো বুলি শেখা।'

একটু হেসে বললেন—'সে একটা মজা দেখছেন কি-ময়নার জীবনে ভারি একটা মজা আছে!—'জন্মায় তো সিঙ্গাপুরে। তারপর আপনার সিঙ্গাপুরেই পেনাঙ্ডি, চেট্টি, গোরা, মগ, তুর্কমান, ইহুদি, মেড়ো, সব ঘুরে তারপর বাঙালি বোষ্টমির কাছে আসবেই।'

বিভা চুপ করেছিল।

—'এ একেবারে ধরাবাঁধা-এ আসতেই হবে।'

—'কেন?'

—'ধর্মচক্রের এই নিয়ম।'

বিভা একটু বিস্মিত হয়ে বললে—'আপনি মুসলমান?'

—'হ্যাঁ, মা।'

একটু থেমে বললে—'এই পাখিগুলো হচ্ছে জাতবোষ্টম। যৌবনে যতই গোল-মাল করুক না কেন, গোস্ত রুটি, মালাই কারি আর বর্মাই ভাপ্পি যতই খান না কেন আখেরে মতিগতি স্থির হলে বোষ্টমের ঘরে আসবে। নাম শিখবে, নাকে রসকলি আঁকবে-মালপো খাবে—'

বিভা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললে—'আপনি আবার সিঙ্গাপুর যাবেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

—'এই পাখি ধরতে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কি করে ধরেন?'

—'সে বড্ড মস্ত গল্প সিঙ্গাপুরেই কি ধান শুধু?'

—'তবে?'

—'ধরবার ঢের জায়গা আছে।'

—'আপনাদের জালে আটকা পড়েই তো অনেক পাখি মারা যায়।'

—'না, জালেই কি ধরে শুধু?'

—'তবে?'

—'ধরবার রকম আছে ঢের। এ তো আর পাখির চামড়া খসাবার জন্য পাখি ধরি না, মরবেই—বা কেন বলুন?'

—'কিন্তু জাহাজে উঠে তো অনেক মরে।'

—'সে যাদের কর্মভোগ আছে।'

—'কর্মভোগ থাকে না।'

—'তা থাকে।'

—'কী রকম?'

—'যারা পূর্বজন্মে পাপ করেছিল সে-সব পাখ সিঙ্গাপুরের জাহাজেই মরে যায়। মানুষ যেমন হাত জোড়া করে প্রার্থনা করে না, তেমনি ঠ্যাং দুটো উঁচু করে ঠোঁটটা আকাশের দিকে ফিরিয়ে ভগবানের কাছে অপরাধের মাপ চায়। মাপ করেন, বোধ করি করেন না। সব কথা আমরা ভাবতে যাই না। সমুদ্রের ভেতর দেই টি করে ছুঁড়ে ফেলে। হাঙরে সকরে খেয়ে ফেলে। তাই তো 'খায়। খায় না? না হলে যায় কোথায় বলুন? সমুদ্রে নোনাজলে হেজে যায়? তা আশ্চর্য কি? নুনের যা ঝাঁঝ! একটা ময়নাকে বোধ করি এক পাকে সালুন বানিয়ে ফেলতে পারে। এক-একটা টোণ্ডা থাকে জাহাজে, মরা ময়নার মাংস খায়। সে চিনে বলুন আর গোরা বলুন আর মন রসুল আর মুসলমান বলুন এইসব মরা ময়নার মাংস খায়। খায় তারা হারাম ছাড়া কি? জেতে যাই হোক, কাজে তারা টোণ্ডা মুণ্ডাদের চেয়ে হারামী!'

—'সমুদ্রের ভেতর ফেলে দেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আহা।'

—'কী করব তাহলে?'

—'বেশ গাছে-গাছে পহাড়ে-খেতে তো চরত, খাঁচায় ভরবারই-বা দরকার ছিল কি?'

—'ও, আপনার হচ্ছে সেই হিসেব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো একটু হেসে বললে—'কিন্তু বুনোর মত বোকা হয়ে চরে বেড়ালেই তো হয় না-(খুব সুন্দর তো হয় তাহলে) রাধাকৃষ্ণ গান শিখতে হবে তো'।

—না শিখবার এমনই-বা কি দরকার।'

—'বাঃ বাংলাদেশে আসতে হবে না?'

—'কী হবে এদেশে এসে?'

—'এদেশটা হচ্ছে ময়নাদের ধর্মের আখড়া।'

—'আপনি তাই বলছেন।'

—'জিজ্ঞেস করুন গিয়ে গোসাইবাবুকে।'

—'কেন গোঁসাইবাবু?'

—'শ্রীধর গোঁসাই এই তো আপনাদের ইমারতের পর। তিনখানা বাসা ছেড়ে।'

—'না হয় হলই-বা এটা গোঁসাইর মত। কিন্তু পাখিদের নিজেদের মত অবিশ্যি আলাদা' একটু থেমে বললে-—'দুঃখের বিষয় এরা খুবই সুন্দর আর নিরপরাধ বলে এদের মতামতের কোনো মূল্য নেই।'

—'আছে?'

—'মায়ের কাছে সন্তানের মতামতের কোনো মূল্য থাকে না?'

—'তা তো নেই।'

—'এরাও তো ভগবানের সন্তান, ভগবান এদের ভালর জন্যই আমাদের হাত পালটে দেন। এক-একটা বোষ্টম বাড়িতে গিয়ে দেখবেন ময়নাকে কত আদর করে।'

—'কিন্তু তাতে তো বেচারির প্রাণ শুকিয়ে যাবে।'

—'তা শুকোলে কি আর এত বুলি ধরতে পারে।' বুড়ো বললে—'দেখুন তো কেমন মনের আনন্দের সঙ্গে পড়ে। (দেখলেন তো?)— প্রাণে ফুর্তি না থাকলে এরা পড়া শিখতেই-বা পারত কী করে।'

—'কিন্তু শুনেছি যত তাড়াতাড়ি পড়া শেখে তত তাড়াতাড়ি মরে যায়।'

—'লোকে বলে। তা কি আর হয়! তা হয় না!'

—'কিন্তু খাঁচার ভেতর এদের পরমায়ু ঢের কম, যদি বাইরে থাকতে—'

—'আমরা তো এদের বাঁচাতেই চাই; একটা পাখির একটু আণ্ডার মত প্রাণের জন্য যা শিক্ষা দিনরাত। কিন্তু তবুও যদি মরে যায় আমাদের অপরাধ কি? এই সময় হাঁস-মুরগির ব্যবসা করতাম। শতকরা একশটা পাখিই মরে। নিজে মারব, না হয় অন্যকে দেব মারতে। তার চেয়ে এ ব্যবসা ঢের ভাল। কী বলেন? আপনিই ভেবে বলুন না। ধরেছিলেম আণ্ডার ব্যবসা, হাঁসের আণ্ডা, মুরগির আণ্ডা, কিন্তু আণ্ডার ভেতর যে কেষ্ট আছেন তাকে গরম জলে সেদ্ধ করে কিংবা কড়াইয়ে দগ্ধে মারবার জন্যই তো।'

বিভা তেপয়ের ওপর একটা প্লেটের দিকে তাকিয়ে বুড়ো বললে 'এই তো দেখুন আপনিই ডিম খাচ্ছিলেন, বোধ করি হাঁসের ডিম?'

বিভা মাথা নেড়ে বললে—'না।

—'মুরগির তাহলে?' বুড়ো একটু কেশে বললে—'ভেবে দেখুন তো এ ভ্রূণ নষ্ট নয়?'

বিভা অধোমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল।

—'টিয়া চন্দনা ময়নার ব্যবসা ঢের ভাল। মানুষের মনটা বেশ। পরিষ্কার থাকে থাকবেই না বা কেন? কোনো জীবকে তো হত্যা করতে যাচ্ছি না। ময়না চন্দনার যা বুলি, যা ধর্ম, রাধাকৃষ্ণের নামের জন্য যে-আকুলতা তার মনের ভিতর আছে সেইটেকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছি। ফের কলকাতায় আসছি। জানেন মা, আমি পাঠশালায় পড়েছিলাম অনেকদিন।'

—'পাঠশালায়?'

—'হ্যাঁ।'

বিভা চুপ করে রইল।

—'তারপর মাদ্রাসায় পড়েছিলাম। গরু আমি খাই বটে কিন্তু নিজে কাটি না। যে-সব ব্যবসার মধ্যে হিংসা আছে, তা আমি করি না। কাজেই এই পাখির ব্যবসা ধরেছি।'

বিভা তার ম্রিয়মাণ চোখ তুলে বললে—'কীই বা বলব আপনাকে? আমার থেকে শুরু করে ভগবান অবদি অপরাধ তো সকলের। কতদিন আমার মনে হয়েছে এই ডিম ভেঙে-ভেঙে খাই এত বড় মর্মান্তিক জিনিস, কিন্তু তবু তো খেয়েছি, এই রকম সব কত অপরাধ আমার। এক-এক সময় মনে হয়েছে জীবনটা যেন, আমার জীবনই শুধু নয়, অনেকের জীবনের কথা ভেবে দেখেছি আমি। জীবনটা যেন আমাদের সকলের খাঁচার পাখির মতো। কিন্তু তাবুও ভগবান নিস্তার দেননি, অনেকে এই আবদ্ধ অবস্থায় মরে গেলেও তো-আরো কত মরবে, যতদিন জীবন আছে, এই রকম তো হবে। এক—এক সময় মনে হয় এ যেন ভগবানের কেমন একটা অপরাধ। তারপর দেখুন এই পাখিগুলো, এদের কি অপরাধ নেই? কত সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি ফড়িং খেয়ে এরা বেঁচে থাকে? জীবনের নিয়মটাই এই রকম।' বলে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসে কাকাতুয়ার সাতরঙা পালকের নিরবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তেই বিমুগ্ধ হয়ে পড়ল। বললে—'সত্যি কি যে সুন্দর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-সব পাখি যার ঘরে থাকে তারপর কোনোদিন নষ্ট হয় না। মানুষের জীবনটাকে হয় সাজাতে। ভগবান আমাদের জীবন দিয়েছেন—কি সুন্দর! আর এই পাখিগুলো এই কাকাতুয়াটার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে! আমি অনেক ভেবে দেখেছি এইই হচ্ছে বিধি, সৌন্দর্য আর শান্তি। কিন্তু সকলেই তা মনে রাখে কি? কাজেই হয়ে দাঁড়ায় গোলমাল। কিন্তু গোলমালটা পাখি দুটো বিভাব কিনতে চাইল, উদ্দেশ্য যে, না-জীবনের না-বিধাতার। বললে, 'এ পৃথিবীর চারদিককার মানুষদের আমি বেশ চিনি মৌলবিসাহেব। তাদের নিষ্ঠুরতার কথা থাক। কিন্তু আমাদের অদ্ভুত বিধিও এ পাখিগুলো হজম করতে পারবে না। এদের দেহেও তা সইবে না। আমার কাছে থাক, যতদূর সম্ভব শান্তিতে এদের রাখতে চেষ্টা করব আমি।'

বিভা পাখিদুটোর দাম ঠিক না করেই আগেই নিজেকে এ-রকম ভাবে ব্যক্ত করে দিলে!

বোধ করি তার চোখ দুটো খুব বিস্ফারিত, উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠে ছিল, চোখে এক-আধফোঁটা জলও জমে ছিল হয়তো।

কাজেই বুড়ো চেপে দাম চাইলে, এ তার বড় চমৎকার পড়তার সময়। এমন একটা সুন্দর খদ্দের [?] সে ছাড়বে-বা কেন?

পাঁচশ টাকার থেকে দাম কমতে-কমতে সাড়ে তিনশ অবদি নামল। এর চেয়ে নিচে ভদ্রলোক নামকে কিছুতেই রাজি হলেন না। কাজেই কিনলে সাড়ে তিনশতে।

তাকিয়ে দেখলাম পাখিদুটো বুড়ো হয়ে গেছে। খুব শিগগিরই মরে যাবে, খুব শখের মানুষ এ—রকম দুটো পাখির জন্য আশি-নব্বই টাকার বেশি দেয় না। দায়ে পড়ে এ-রকম দুটো পাখি অনেক দশ-পনের টাকায় বিক্রি করে ফেলে। কলকাতার চেট্টিরা সে চোট্টিই হোক বা চিনেই হোক বা গোয়ানি বাঙালি মালাঙ যাই হোক না কেন এ-রকম পাখি বিস্তর চুরি করে চালান দেয়। তখন তাদের কে পয়সাও মূলধন লাগে না। কিন্তু বিভা কিনলে সাড়ে তিনশ টাকা দিয়ে। অবিশ্যি টাকা দিয়ে আমাদের জীবনের হিসেব হয় না। বিশেষত সুন্দর-সুন্দর পাখি-গুলোকে অমূল্য বলেই বোধ হয়। লক্ষ—লক্ষ টাকা খরচ করেও মানুষ রামধনু-দার কাকাতুয়া তৈরি করতে পারে?

কিন্তু এ-সব হল ভাবজগতের কথা! কিংবা বিভা বুড়ো মুসলমানটিকে যা বলেছে; 'এ পৃথিবীর চারদিককার মানুষদের...আমি।' এও হচ্ছে সেই ভাব-প্রবণ হৃদয়ের সুন্দর স্বপ্ন। কুড়বস্তি-তুমি-আমি সকলের অগোচর এ এক অপূর্ব জিনিস। চারদিককার ছিন্নবিচ্ছিন্ন চূর্ণবিচূর্ণ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু বিভা সেখানে চীনের রাজা ও রানীমার শ্রদ্ধাপ্রীতি মাখা মহারানী।

কিন্তু ভাবের চেয়ে বাস্তব যে বিচ্ছিন্ন আমার মত বত্রিশ বছর বয়সের দরিদ্র, সন্দিগ্ধ, জীবনের দুয়ারে-দুয়ারে প্রবঞ্চিত পুরুষ মানুষ তা বিশ্বাস করলেও বিভার মত মেয়েরা তা করে না।

বেশ আশার কথা। জীবন তাহলে আমার মত পুরুষ মানুষ দিয়েই তৈরি নয়। বিভার মত একদল প্রাণী রয়েছে তাহলে। এদের কথা শুনলে কাজ দেখলে, এদের দিকে তাকালেও একটা নতুন রচনা পরিকল্পনার ইশারা পাওয়া যায় যেন। মানুষের জীবনের একান্ত পরিসর ও নিঃসঙ্কোচ বিচিত্রতা বোধ করতে পারি—'বেশ ভাল লাগে।'

ময়নাটার খাঁচা কোন জায়গায় রাখা যায়, কাকাতুয়াটাই-বা কোথায়, কী হলে মানায়, ঘরের শোভা কী করে বাড়ে-দেখলাম এই সব নিয়ে ব্যস্ত।

পুবের জানালাটা খুব বড়। জানালার কপাট আর কাচের শার্সি খুলে দিলে কোনো গরাদের বাধাও থাকে না আর। রোদ আলো অবাধে এসে পড়ে। কলকাতার আধখানা আকাশ ধরা পড়ে যায় যেন। কাকাতুয়ার মস্ত বড় লম্বা খাঁচাটা বিভা ঘরে পুবের জানালার কাছে টাঙিয়ে রাখলে, শীতের সকালে গরম দুধের ফেনার মতন রোদের ভিতর দিয়ে কাকাতুয়াটার চোখে দেখলাম খানিকটা আমেজ এসেছে।

নীল লাল সবজে সোনালি পালকগুলোও ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল পাখিটার। তাকিয়ে-তাকিয়ে মনে হল বিভার এই চমৎকার সাজানো কোণটাকে এই পাখি তাহলে বেশ একটু বিশেষত্ব দিল।

দক্ষিণ দিকের জানালার কাছে ছোট্ট তেপয়ের ওপর একটা ভেলভেট গদি ছিল। ময়নার খাঁচাটা সেই গদির ওপর বসিয়ে রেখে দিল বিভা।

কিন্তু ময়নাটার গায়ে শীতের বাতাস লাগছিল বড়।

বিভা তাড়াতাড়ি নিজের ভুল শুধরে নিল। ময়নাটাকেও সে পুবের জানলার গায়ে রোদের মধ্যে টাঙিয়ে রাখল। তারপর বই খুলে পড়তে বসল। মিনিট দুই পড়ে কী যেন কী ভেবে ময়নার খাঁচাটাকে সে নিজের সোফার ওপর এনে বসাল। তারপর খাঁচার দরজা খুলে পাখিটাকে কোলে নিয়ে খুব করুণভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। পাখিটার দু'পায়ের পিতলের ঘুঙুর খুলে ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা খানিকক্ষণ করলে বিভা। কিন্তু তাতে পাখিটা ব্যথাই পেতে লাগল শুধু, আঙুল বোধ করি মচকে গেছে একবার। ময়নাটা ক্যাঁক করে উঠল। কিন্তু ঘুঙুর খসানো গেল না।

বিভার ইচ্ছে ছিল ময়নাটাকে এই ঘুঙুরের অস্বস্তি ও বেদনার থেকে মুক্ত করে দেবে।

কিন্তু তা হল না। খুব খানিকটা জোর করে সাহস করে টানলে হয়তো বা হয়। কিন্তু ছুঁতে গেলেই পাখিটার পা যেন ভেঙে অবশ হয়ে আসে। পাখিটার কোনো ব্যারাম আছে নাকি! পায়ে হাত দিতে গেলেই পাখিটা যেন কেমন ব্যথা পায়, মুহূর্তেই সমস্ত আঙুলগুলো কেমন কুঁকড়ে যায়, (ময়নাটার) চিড়িক দিয়ে ওঠে। সমস্ত শরীর (ময়নাটার) থর থর কাঁপতে থাকে। যদ্দিন বেঁচে আছে পাখিটা এ-রকম কুঁকড়ে থাকবে? যতদিন বেঁচে আছে ততদিন আর উপায় নেই। বিভা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখিটা ধীরে-ধীরে একটা ডানা তুলে দিলে। সেই ডানার নিচে নরম মাংস ও চোখের মধ্যে বিভা অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখতে লাগল।

তারপর ডাক দিল—'সুদর্শন।'

চারকটি এল।

—'আচ্ছা দেখ তো সুদর্শন, কী হল ময়নাটার?'

—'ফোঁড়া হয়েছে।'

—'কী করা যায়!'

—'যেই ফেটে যাবে, অমিন ঢিস করে মারা পড়বে।'

বিভা নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

সুদর্শন—'এটা কোত্থেকে এল দিদিমণি?'

—'কিনেছি।'

—'কত দিয়ে? চার আনা?'

বিভা বললে—'হ্যাঁ চার আনা! চার আনায় চড়াই পাওয়া যায়। ময়না চন্দা কি আর চার আনায় হয়রে?'

—'এ- যে বুড়ো পাখি দিদিমণি।'

—'এই ময়নাটার—'

—'বুড়োর বাবা যে!'

—'তা কী করে বুঝলি তুই?'

—'সেই কাজলপারা রং নেই আর, রঙে ঠিক নেই, কেমন টসকে গেছে দেখুন না। লোম গেছে মরে, তো পালকে পাক ধরেছে। এই দেখুন পাখানার রং কেমন বুড়ো মানুষের গোঁফের মত হয়ে যাচ্ছে।'

—'যাক, ফোঁড়াটা কী করে সারানো যায় সুদর্শন?'

—'ময়নার ফোঁড়া গালতে জানতেন আমার কাকার বেয়াই, যে-কটাই ময়নার ফোঁড়া লেগেছে একটা ভি মরে নি।'

—'সে বেয়াই কোথায়?'

—'সেভি মরে গেছে।'

—'একটা মলম দিলে হয় না?'

সুদর্শন মাথা নেড়ে বললে—'উহু!'

—'কেন হবে না।'

—'মানুষের মলম তো।'

—'হ্যাঁ, বেশ ভাল, সুন্দর ননীর মত, খুব ঠাণ্ডা, পাখিটা আরাম পাবে বেশ।'

—'ও সব পাখির গায় লাগবে না; রক্ত সাঁ করে বিষ মরিচের মত কাল হয়ে যাবে।'

—'একবার টিরিক করে লাফাবে তো!'

—'না কিছু করবার নেই।'

—'ডাক্তার দেখালে হয় না?'

—'পাখির কি ডাক্তার থাকে আর?'

—'তা থাকে। কিন্তু কোথায় আছে তা তো জানি না।'

সুদর্শন উপলব্ধি করে বলে—'তা, কোথায় পাওয়া যায়। সকলেই নিজের ফুর্তি নিয়ে আছে, পাখি ভি আছে পাখির ডাক্তার ভি আছে। কিন্তু একজনের এলাকার থেকে এমন বিশ পনের মাইল দূরে আর-একজনের এলাকা।'

—'একটা বেলের কাঁটা দিয়ে ফুঁড়ে দিলে হয় না?'

—'তা দেবেন না'

বিভার বাবা ঢুকলেন।

চারদিকে তাকিয়ে বললেন, 'পাখি দুটো কিনেছ তুমি তাহলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কত নিলে?'

বিভা ঈষৎ আড়ষ্ট হবে—'সাড়ে তিনশ টাকা।'

—'সাড়ে তিনশ?' ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন—'কাঁচা টাকা দাও নি তো?'

—'না।'

—'চেক?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেশ। ভালই করেছ। টাকা পাওয়াচ্ছি আমি রাসকেলটাকে। 'বিভা উৎসাহিত হয়ে বললে—'কেন, কী করবে তুমি?'

—'আমি এক্ষুণি ব্যাঙ্কে ফোন করে দিচ্ছি, পেমেন্ট বন্ধ করে দিতে। মকবুল?' নিচের থেকে জবাব এল-হুজুর!'

—'গাড়ি বের করো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচের থেকে জবাব এল-'হুজুর।'

বিভার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—'ফোন করেই আমি ব্যাঙ্কে যাচ্ছি। ভাগ্যিস ব্যাঙ্ক এখনো খোলে নি। না হলে এতক্ষণে টাকা নিয়ে কোথায় সটকে পড়ত হারামজাদা।'

বিভা—'বাবা।'

ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে থামলেন।

—'ফোন তুমি করো না।'

—'কেন?'

—'ব্যাঙ্কেও যেও না।'

—'যাব না?'

—'নিক! সাড়ে তিনশ টাকা নিয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখো এ বেচারা পাখি দুটো যদি আমার কাছে না আসত তাহলে এদের কী রকম বিপদ হত।'

—'বিপদ? কাদের?'

—'পাখিদের।'

—'কী রকম?'

—'এই দেখো, ময়নাটার ডানার নিচে কেমন একটা ফোঁড়া হয়েছে।' বিভা খুব আগ্রহে বেদনায় তার বাবাকে দেখতে লাগল।

ভদ্রলোক একবার তাকিয়ে বললেন—'মরুক সে! ফোঁড়া হয়েছে তো আমার কোন মহাভারত হয়েছে!'

ফোঁড়াটার দিকে তাকিয়ে বিভা—'এতে তোমার কষ্ট হয় না?'

—'এই ময়নার ফোঁড়ার জন্য?'

—'হ্যাঁ?'

ভদ্রলোক একটা সোফায় বসে পড়ে বললেন—'জীবন আমার অতটা শৌখিন এখনো হয়ে ওঠে নি।'

—'এ-রকম করে বিচার করো না বাবা?'

—'আমি জানি এই পাখি দুটো আমার কাছে না থাকলে বড্ড কষ্ট পেত। এই রকম ফোঁড়া নিয়ে শীতের ভিতর পথে-পথে ঘোরা!'

ভদ্রলোক কোনো উত্তর দিলেন না।

কাকাতুয়াটাকে দেখে মনে হয় কতদিন খায় নি যেন।

বিভার বাবা চুপ করে রইলেন।

—'জীবনের নানা কাজেই আমি ভগবানের হাত দেখি। এ দুটো পাখিকে তিনি আমার কাছেই পাঠাতে চেয়েছেন। কেন জানো? তিনি জানেন যে আমি এদের খুব পরিচর্যা করব। যত্ন নেব। বেশ শান্তিতে রাখব এ দুটো পাখিকে।'

—'এই পাখি দুটোর বেলাই তিনি এত কথা ভাবেন! আর কারুর বেলা ভাবনে না কেন?'

—'তা ভাবেন।'

—'কই নমুনা তো দেখি না কিছু!'

বিভা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু একটা কাণ্ড হয়ে গেল। ময়নাটা কোন ফাঁকে বিভার কোল থেকে লাফিয়ে কার্পেটের ওপর গিয়ে বসেছে। সকলেই হঠাৎ তটস্থ হয়ে দেখল একটা বিড়াল এসে এক মুহূর্তের ভেতর পাখিটার ঘাড় মটকে সেটাকে নিয়ে ছুট দিল।

সুদর্শন বিড়ালটাকে তাড়া দিতেই ময়না পাখিটাকে কার্পেটের মাঝপথে ফেলে চলে গেল বিড়ালটা।

বিভার বাবা একটু মুচকি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'ভগবানের বিশেষ প্রিয় ভেবে পাখিটাকে যে ঈর্ষা করেছিলাম সে ঈর্ষার পাত্র তারা নয় শেষ পর্যন্ত?'

বিভা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

—'পাখি হোক মানুষ হোক, আমাদের সকলের জীবনই সেই ছাঁচে ঢালা। আমরা কেউ কাউকেই ঠকাতে পারি না। পারি কি!'

বিভার মা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে বললেন—'শুনছ?'

বিভার বাবা বললেন—'কী হল আবার?'

—'সুদর্শনটা কী!'

—'কেন, কী করল?'

—'পাশের বাড়ির সেই কেঁদো বিড়ালটা, সেই সোহাগিটাকে এমনি করে মাথায় লোহার ডাণ্ডা মারলে যে সেটা কাতরাতে-কাতরাতে গেল মরে।'

বিভার বাবা বিভার দিকে তাকিয়ে বললেন—'তা আমি এখন হয়তো সুদর্শনকে মারব। তারপর বিভা মারবে আমাকে। এই রকমই।' একটা চুরুট জ্বালিয়ে বললেন—'যাই কাজে যাওয়া যাক। যাক গে, ও-চেকটা ফিরিয়ে এনে কী আর হবে? এই সাড়ে তিনশ টাকা খরচ করে আমি অবিশ্যি বিশেষ কিছু শিখি নি, কিন্তু তুমি বিভা অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু শিখলে, এখন থেকে যেখানে-সেখানে ভগবানের হাত বা মঙ্গল উদ্দেশ্য দেখতে যেও না, নিজে যদি শান্তিতে থাকতে পার তাই যথেষ্ট। পরকে আশ্বাস বা সান্ত্বনা দেবার মতন শক্তি আমাদের কারুরই নেই। কারণ, এদের পরম শান্তি কীসে হবে তার ব্যবস্থা একমাত্র ভগবানই করতে পারেন। ময়নাটাকে, বিড়ালটাকে খুব সুন্দর নিখুঁত শান্তি দিয়ে দিলেন তিনি তাই। এই ময়নাটার ফোঁড়ার শুশ্রূষা করে কতটুকুই-বা শান্তি তাকে তুমি দিতে পারবে বিভা? ভেবে দেখো, তুমি যা দিতে পারতে তার তুলনায় যে গভীর শান্তি পাখিটা এখন পাচ্ছে তা কত বৃহৎ, তা কত মহৎ।'

কাকাতুয়াটার ইতিহাস এই রকম।

ময়নাটাকে বিড়ালে মেরে ফেলবার পর—বিভার আগ্রহ অনেকটা কমে গেল। পাখি দিয়ে ঘর সাজানো, পাখিকে বুলি শেখানো, একটা পাখি পরিচর্যা শুশ্রূষা, তাকে শান্তির ভেতর রাখা, এইসব উদ্দেশ্য নিয়ে বিভার যে সুন্দর ঐকান্তিকতাটুকু ফুটে উঠেছিল-মেসের জানালা দিয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলাম আমি, তা যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। ময়নাটা মরে কার্পেটের ওপর পড়েছিল, বিভা সেটাকে আস্তে-আস্তে তুলে এনে নিজের কোলের ওপর রাখল। পালকে পালকে যেখানে যেখানে রক্ত লেগেছিল নিজের হাত দিলে, কুঁজোর ভেতর থেকে একটা কাচের গেলাসে খানিকটা জল গড়িয়ে নিয়ে জমাট রক্তের চাঙড়গুলো ধুয়ে ফেললে, তারপর তার পূর্বদিকের জানালার কাছে গিয়ে গেলাসের বাকিটুকু জলে পাখিটার সমস্ত শরীর খুব আস্তে আস্তে ধুয়ে নিজের গরদের শাড়ির আঁচল দিয়ে খুব মমতার সঙ্গে মুছল। তেপয়ের ওপর ভেলভেটের গদিতে পাখিটাকে রেখে খানিকক্ষণ চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর টেবিলের ওপর একটা প্যাড নিয়ে অনেকক্ষণ বসে কী যেন লিখল।

এই অবসরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

জেগে উঠে দেখলাম সোফার উপর বিভা ঘুমুচ্ছে আর ময়নাকে তেপয়ের থেকে কার্পেটের ওপর নামিয়ে নিয়ে একটা বিড়াল চুপচাপ বসে আছে।

দেখলাম পাখিটার মাথা নেই, যতদূর চোখ যায় ময়নার মাথাটা কোথাও আবিষ্কার করতে পারলাম না।

জানি না কী হয়েছে, ঐ বিড়ালটাই খেয়ে ফেলল নাকি? এটা সেই সোহাগি বিড়ালটা নয়। খুব সম্ভব রাস্তার বিড়াল। সারা শরীর নোংরা, লিকলিকে, মুখে হাঁড়ির কালি লেগে রয়েছে। আমাকে দেখেই বিড়ালটা সন্ত্রস্ত হল, ঝপ করে পাখিটাকে মুখে বাগিয়ে নিয়ে মুহূর্তের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

খুব শীত পড়েছিল, বড্ড বাতাস। ই বি রেলওয়েতে কিছুদিন কেরানির কাজ করেছিলাম একবার। সে প্রায় ছ-সাত বছর আগের কথা। তখন বেশ সস্তায় একটা ওভারকোট কিনেছিলাম চোরাবাজার থেকে। কোটটা গায় দেবার সময় অনেক সময়ই অবাক হয়ে ভাবতাম এ কুষ্ঠরোগীর গায়ের কোট না যক্ষ্মারোগীর। কিন্তু যখনই শীত পড়েছে, বা বাদলের বাতাস বড্ড কনকনে হয়ে উঠেছে, তখনই এই কোটটা গায় দেই আমি। বেশ উপকার পাই। যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ আপাতত হয় নি, কোনোদিন হবে না বলেই আশা করি।

দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের র‍্যাকের থেকে ওভারকোটটা তুলে নিয়ে গায় দিলাম। চুল আঁচড়ে জুতো পায় দিয়ে জানালার ভেতর দিয়ে একবার তাকালাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু বিভা তখনো ঘুমে। বেরিয়ে পড়লাম আমি।

অনেক রাতে ফিরে এসে দেখি বিভা আলো জ্বালিয়ে একটা বই হাতে করে বসে আছে। কিছু প্রায়ই বই-র থেকে চোখ তুলে তেপয়ের দিকে তাকায়। ময়নাটা যেখানে মরেছিল কার্পেটের সেই জায়গাটুকু নজর করে দেখে, সমস্ত ঘরের আনাচেকানাচে বিমূঢ় হয়ে চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর ময়নার শূন্য খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর আবার বই-এর দিকে মন দেয়।

এ চার-পাঁচ ঘণ্টা আমি এখানে ছিলাম না। ঘুমের থেকে উঠে বিভা যখন দেখল ময়নাটা নেই তখন সে কী করল! সুদর্শনকে ডেকেছিল বোধ করি? বিভার বাবাও এসেছিলেন হয়তো। এসে নতুন কিছু উপদেশ দিয়ে গেছেন মনে হয়। বিভার মার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল কি? বিভার? তিনিই বা কী বললেন? মেয়েটি এখনই-বা ঘাড় হেঁট করে ভাবছে কী?

একটা চুরুট জ্বালালাম।

জানালার পাশে আমার ডেকচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসা গেল। অবাক হয়ে ভাবলাম কী করে আজ দুপুরবেলা সেই হাঁড়িপানা নেড়ি বিড়ালটা এসে বিভার মরা পাখিটাকে চুরি করে নিয়ে গেছে, বিভাকে বলব কি তা? থাক।

যদি বলতে যাই-বিভা হয়তো মনে করবে বিধাতার মত অলক্ষ্যে থেকে আমিও তার সমস্ত জীবনের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছি। এ তার ভাল লাগবে না। তার ওদিককার জানালাটাকে হয়তো তাহলে এরপর থেকে সে বন্ধ করেই রাখবে। কিংবা একটু ভেলভেটের পর্দা দেবে টেনে। এতে আমাদের জীবনেরই খুব ক্ষতি হবে। বিভার ক্ষতি হবে এই যে তার সম্বন্ধে ডায়েরি লেখা আমার আর সম্ভব হবে না। এতে সে ক্রমে-ক্রমে অজ্ঞেয়ের অন্ধকার চলে যাবে। পৃথিবীর কাছে হয়ে থাকবে সে মৃত, অসাড়। তার মূল্যবান জীবনের গল্প পড়ে কিছু চিন্তা করবার আনন্দ পাবার সুযোগটুকু কেউ আর লাভ করতে পারবে না। আমার নিজেরও আরো একটা বিশেষ ব্যক্তিগত ক্ষতি হবে। সমস্ত দিন, সমস্ত রাতের ব্যর্থতা ও গ্লানির ফাঁকে-ফাঁকে এই মেয়েটির দিকে আমি তাকাই, তার কথা শুনি। কাজ দেখি। ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ লক্ষ্য করি, যে-সব জীবনের আশ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, স্বপ্ন ভস্মসাৎ, যাদের বেদনার কূলকিনারা নেই, এক সময় ভগবান্ তাদের অমানুষিক অস্তিত্ব দিয়ে মানবজীবনের মেরুদণ্ড তৈরি করে। (তা তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে হয়তো) আমার জীবনের গত পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে বিভার মত মেয়ের সংস্পর্শে আমি আসি নি। একদিনের জন্যও না। কিন্তু এই তিন-চার মাস হল এর সম্পর্কে এসে অব্দি মানবজীবনের মেরুদণ্ডের কথা আমি ভাববার অবসর পাই না আর। জীবন দেবতার অন্ধ খেলা মাঝে-মাঝে মনের ভেতর উঁকি দেয় মাত্র। প্রশ্ন কমে এসেছে, সন্দেহ কমে এসেছে, তিক্ততা তত নেই আর; যে-সব জিনিস জীবনকে কষ্ট দেয়। পীড়িত করে মনকে, ম্রিয়মাণ করে রাখে, এক এক মুহূর্তে সেগুলোকে বড্ড অসত্য বলে মনে হয়। খুব অন্ধকারের ভেতর গভীর শীতের মধ্যে নিজের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবি পাশের বাড়িতে খুব কাছেই বিভাও শুয়ে রয়েছে। একজন ভুঁড়ো মোটা মাড়োয়ারিও তো এখানে শুয়ে থাকতে পারত, কিংবা আর-একটা বুভুক্ষু মেস পারত এখানে আড্ডা গাড়তে। কিন্তু তা করে নি। সে-সবের বদলে এ মেয়েটির দৈনন্দিন জীবন দিনের পর দিন ওখানে গড়ে উঠছে ময়না নিয়ে, কাকাতুয়া নিয়ে, নানারকম ভরসার কথা, আশার কথা, হিসাববিহীন হৃদয়াবেগ, অকুণ্ঠিত বিশ্বাস নিয়ে। একদিন পৃথিবীর সমস্ত বস্তি যদি ক্ষয় হয়ে যায় তাহলে নতুনতর জীবন গড়বার মত পরিকল্পনাকে বিভার মত মেয়েরা খুব সাহায্য করতে পারবে, অন্তত তাদের আগ্রহ ও আশা দিয়ে। এই সব কথা ভাবি আমি, আগে কোনোদিন ভাবি নি। দেখেছি, এরকম চিন্তার খুব প্রয়োজন ছিল আমার জীবনে। এই রকম সব চিন্তা ও কল্পনা ও বিভার মত নারীর নিভৃত পরিচয়, এই সবের খুব প্রয়োজন ছিল।

বিভা অনেক রাত অব্দি আলো জ্বেলে পড়ছিল, সারা দুপুর ঘুমিয়েছে বলেই হয়তো রাতে ঘুমের আর দায় নেই বেশি তার। আমিও সমস্ত দিন ঘুমিয়েছি। ঘুম পাচ্ছিল না, নিচের থেকে গিয়ে ভাত খেয়ে এলাম। ঠাণ্ডা বালাম চালের ভাত, ঠাণ্ডা কড়ায়ের ডাল, পানসে কনকনে ট্যাংরা মাছের ঝোল। কাজেই চুরুটের গরমের দরকার ছিল। জ্বালিয়ে জানালার পাশে ডেকচেয়ারে বসলাম।

সুদর্শন বিভার জন্য গরম কফি নিয়ে এল। আমারও এই জিনিসের দরকার, এমন শীতের রাতে কফি এখন বেশ লাগত, কফির পেয়ালা পাশে রেখে মোম জ্বালিয়ে খবরের কাগজ পড়া যেত। এই মেয়েটির কাছে চাইলে নিশ্চয়ই সেই আমাকে এক পেয়ালা দেয়; দিয়ে কৃতার্থ বোধ করে, হয়তো তার ডায়েরিতে লিখে রাখে, তারপর অনেক রাতে। একটা খুঁটিনাটি জিনিসের বিস্ময়টুকু মন্দ নয়, ডায়েরিতে লিখে রাখবার মত। পাশের বাড়ির গরিব গৃহস্থ ভদ্রলোককে এক পেয়ালা গরম ফকি পাঠিয়েছিলাম, রাত বারটায়। সুদর্শন গিয়ে দিয়ে এসেছিল। যা কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে এবার কলকাতায়; কফি খেতে বেশ আরাম। যারা এত রাত অব্দি জাগে এ জিনিসের খুব একটা বিশেষ দরকার আছে তাদের। ভদ্র-লোকের নিজের কফি হয়তো ফুরিয়ে গিয়েছিল, কিংবা তার স্ত্রী হয়তো এত রাতে করে দিতে রাজি হন নি। কাজেই আমার কাছে তিনি চাইলেন। জিনিসটা বেশ ভাল লাগল আমার। দিয়েও বেশ তৃপ্তি হল। আমাদের পরস্পরের ভেতর কোনো সুযোগ? না থাকই ভাল, যার যা অভাব মুখ ফুটে যদি বলে তাহলে পৃথিবীর গোলমাল ঢের কমে যায়। পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্য আমরা পৃথিবীতে এসেছি। আশা করি কাল রাতেও ফকির দরকার হবে। অত রাতে তার স্ত্রী করে দিতে চাইবেন না হয়তো। সব স্বামী বা সব স্ত্রীই পরস্পরের জীবনের প্রয়োজনীয়-তাকে সব সময় খুব শান্তভাবে উপলব্ধি করে দেখতে চায় না, কিংবা ভদ্রলোক হয়তো কফির টিন কিনতেও ভুলে যেতে পারেন। কিংবা কত রকমই তো হতে পারে। যাইহোক, তার যদি দরকার হয়, আমাকে একটু জানালেই সুদর্শনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারি। এ তাঁর জানানো উচিত। ভদ্রলোকে দেখতে কেমন আমি তাকিয়ে দেখি নি। কিন্তু এত রাতে এক পেয়ালা কফির জন্য একজন মহিলার কাছে তিনি যে নিবেদন জানাতে পেরেছেন সেইজন্য তাকে আমার ভাল লেগেছে। মেয়েদের ওপর এ পুরুষটির যেন বেশ বিশ্বাস আছে তাহলে। আমাদের দেশের পুরুষরা যা সন্দিগ্ধ ও কুণ্ঠিতভাবে, অপরিচিত মেয়েদের কাছে খুব প্রয়োজনীয় প্রার্থনা জানাতে গেলও তারা দিয়ে লাঞ্ছনা করছে শুধু। আমাদের সম্বন্ধে এমনি হীন ধারণা তাদের। এ-রকম স্থলে এ-পুরুষটির সাহস ও বিশ্বাস, মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা বিচার বেশ ভরসার জিনিস। আমার মনে হয়, ইনি বুড়ো মানুষ। আমাদের দেশের যুবকেরা মেয়েদের সম্পর্কে এ-রকম নিঃসঙ্কোচ স্বাধীনতা প্রকাশ করতে ভয় পায়, অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা ভাবে। এর মানে হচ্ছে, তারা নিজেরাই যথেষ্ট ভীরু। মনের ভেতর নানারকম গ্লানি ও কলঙ্কও রয়ে গেছে তাদের। এসবের হাত থেকে আমরা মুক্ত হব কবে? জানি না। কিন্তু এ-রকম হতাশার সুর নিয়ে আজকের ডায়েরি আমি শেষ করতে চাই না। আশা করি শিগগিরই মুক্ত হব। জীবনের নানা কাজেই আমি ভগবানের হাত দেখি; ভগবানের মঙ্গলে আমি বিশ্বাস করি। বাবা যদিও এই নিয়ে আজ আমাকে ঠাট্টা করেছেন, কিন্তু আমি জানি তিনি নিজেও আন্তরিকভাবে আমার মতনই বিশ্বাস করেন যে একদিন সকলেরই সব রকম শুভ হবে। সেদিন খুব দূরে নেই।

রাত বারটা। কলকাতা।

এরকমই হয়তো লিখত মেয়েটি।

কফি খাচ্ছিল, ট্রের একটা টি-পট, পাশেই একটা প্লেটে কয়েকখানা বিস্কুট ও কেক। কেক সে ছুঁলেও না, একখানা বিস্কুটের এক কিনারা কামড়ে রেখে দিল শুধু, কিন্তু এক পেয়ালা কফি ফুরলে আর-এক পেয়ালা ঢেলে নিল। তারপর আরো এক পেয়ালা আন্দাজ ঢেলে নিয়ে পাশে রেখে দিল। কিন্তু সেটুকু খেতে ভুলে গেলে সে, কফির পেয়ালা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, বিভার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল। কেক বিস্কুট পড়ে রইল। এসব জিনিস খাবার কোনো চাড় নেই যেন কারুর এ পৃথিবীতে।

চাইলে সে এ-মুহূর্তেই সমস্ত ধরে দেয়। সারাদিন আজ খেয়েছিই-বা কী? বিকেলে এক কাপ চা খেয়েছিলাম। অযথা পয়সা খরচ হবে বলে এক পয়সার ডালমুট কিনে খেতেও ভরসা পাই নি। রাতে ফিরে এসে মেসের ভাত রুটি খেয়েছি কর্তব্যবোধে। খাবার আনন্দ হচ্ছে আলাদা জিনিস। অনেকদিন তা বোধ করি নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছে হয়, বিভাকে জানাই এসব কথা। তারপর কেক-বিস্কুট আর কফির পেয়ালা আমার এখানে এনে এই জানালাটা আবডাল করে নিরিবিলি একটু বসি কিছুক্ষণ।

পৃথিবীতে এই একটি মেয়েই যেন যে এই কাজে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করত। সবচেয়ে বেশি সমবেদনা দিয়ে ভাবতে গেলেও যে শান্তি। কিন্তু তবুও তাকে বলতে পারা যায় না কিছু।

চুরুট জ্বলতে থাকে।

মেসের বাতি নিভিয়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ, বিভারটা জ্বলছে এখনো। তাকিয়ে দেখলাম কফির পেয়ালাটা তেমনি পড়ে আছে। খেল না আর তাহলে সে? না খেল বিস্কুট, না খেল কেক। সুদর্শন খাবে হয়তো? ভাবতে গেলে বড্ড তামাশা বোধ হয়। বিভাদের বাড়িতে খানসামার কাজ নিয়ে থাকলেও জীবনটা যেন নরম হয়ে উঠত এখন যা আছে তার চেয়ে?

কাকাতুয়াটা কোথায়? চারদিকে তাকাই। কিন্তু না দেখি পাখিটাকে, না দেখতে পাই খাঁচাটা। কাকাতুয়ার খাঁচাটা তো ঐ পুবের জানালার কাছে ছিল। কিন্তু সেখানে নেই। কোনো দিকেই নেই যেন।

এত বড় একটা রঙচঙা পাখি ঘরের একটা অস্পষ্ট কিনারে থাকলেও ধরা পড়ে যেত। কিন্তু কই, পাখিটাকে কোথাও খুঁজে পাই না তো? ময়নার মত এটাও বিড়াল কুকুরের হাতে শেষ হয়ে গেল নাকি? না, বিভা কাউকে দিয়ে দিয়েছে? না, এ বাড়ির অন্য কোনো কোথাও রয়েছে? তাই সম্ভব।

অনেকক্ষণ পরে বিভা উঠে দাঁড়াল।

ধীরে-ধীরে তেপয়ের গদির ওপর একটা স্তূপীকৃত কম্বলের একটুখানি কানাতে উঁচিয়ে খুব মমতার সঙ্গে করুণার সঙ্গে তাকিয়ে দেখল। একটা উজ্জ্বল নীল পালক আমারও চোখে পড়ে গেল। পাশেই বেগুনি গোলাপি দুটো পালক। কাকাতুয়াটা।

গদির ওপর খাঁচা চড়িয়ে কম্বল ঢেকে রেখে দিয়েছে বিভা। শীতের রাত কিনা। একরকম ঢাকা পড়েছিল বলেই এতক্ষণ দেখতে পাই নি।

বিভা চলে গেল ঘুমোতে।

চলে যাবার সময় বাতি নেভাতে গেল ভুলে। এ-রকম মনের ভুল করে সে। এতে এদের কারুর কিছু ক্ষতি নেই, ইলেকট্রিক, কর্পোরেশনের লাভই আছে বরং।

কেক-বিস্কুট কফি পড়ে আছে-যে-কেউ নিয়ে যেতে পারে। চুরুট টানতে-টানতে ভাবি চড়াইয়ের মত হলে বেশ হত। আমার এ জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে উড়ে একেবারে গিয়ে পড়তাম বিভার ছোট্ট টি-টেবিলটুকুর ওপর। তারপর যা নিরবচ্ছিন্ন সার্থকতা তা চড়াইই জানে আর চড়াইর ভুবন-বিধাতাই জানেন।

গোটা দুই ইঁদুর গিয়ে বিভার টি-টেবিলের ওপর উঠেছে। কেক-বিস্কুট কফির পেয়ালা, আশেপাশে সোফার গদি, মেঝের গায় বিচিত্র কার্পেট, মাথার ওপর বিদ্যুতের বাতি, এ সব বিলাস উৎসব শহরের অনেক ইঁদুরদের জীবনে আছে।

দু-তিনটা দিন কেটে গেল।

কাকাতুয়াটা মাঝে-মাঝে বড্ড চিৎকার করে। বিভা ত্রস্ত হয়ে লাফিয়ে উঠে দেখতে যায় কী হল পাখিটার। কিছু হয় নি, এর বন্ধনকে এ পছন্দ করে না।

কাকাতুয়ার চিৎকার জীবনে এই প্রথমই শুনছি এক রকম। এ-রকম বড় জাতের রঙিন কাকাতুয়াও এই প্রথমই দেখছি। শুনেছিলাম আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এ-রকম কতকগুলো বড় বড় উজ্জ্বল, অবর্ণনীয় কাকাতুয়া এসেছে, সেগুলোকে পিভটে করে পায় শিকলি বেঁধে মাঝে-মাঝে একটা গাছের নিচে নাকি আনা হয়। তাছাড়া ছোট-বড় মাঝারি নানা রকম কাকাতুয়া নিয়ে একটি কাকাতুয়ার ঘরই নাকি তৈরি হয়েছে চিড়িয়াখানায়। কিন্তু চিড়িয়াখানায় আমি বছর দশেকের ভেতর যাই নি।

বিভার কাকাতুয়াটা যখন মোলায়েমভাবে নালিশ করে তখনো ডানপিটে শিশুর চিৎকারের চেয়ে একটুও কম নয়। বড্ড অতিষ্ঠ করে তোলে মেয়েটিকে। আর যখন রাগে বিদ্রোহ, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চিৎকার করতে থাকে পাখিটা তখন এক-একবার ভয় খেয়ে চমকে উঠতে হয়। সেই দশ-বার বছর আগে চিড়িয়াখানায় নিবীর্য সিংহের গর্জন শুনে যেমনি হতাশ হয়েছিলাম, এ পাখির নিঃসঙ্কোচ স্পষ্ট প্রতিবাদের বোমাবারুদের মত আওয়াজ শুনে তেমনি বিস্মিত হয়ে বসে থাকি। চিড়িয়াখানার সিংহের গর্জনের যা নমুনা পেয়েছিলাম তার চেয়ে এদের বেশি সতেজ-ঢের বেশি সজীব। অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ শুনলে যে কোনো মানুষের মনে হৃদকম্প জাগতে পারে।

বাস্তবিক পাখির গলা যে এ-রকম হতে পারে এ আমার কোনদিন জানা ছিল না।

বড় পাখিদের মধ্যে দেখেছি চিল, দুপুরের আকাশে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে চিলের আওয়াজ কেমন যেন উদাস ও কাতর। আর শুনেছি শকুনের গলা, সেও খুব ওপরের আকাশ থেকে ডাকছে। পাড়াগাঁর দুপুরে, কেমন একটা বিজন বিভীষিকা মাখানো, কখনো-বা মৃত্যুগন্ধী কাব্যের স্পন্দন, জীবননদীর পারে বৈতরণীর তরঙ্গের প্রতিঘাত এই রকম সব। আভাস পেয়েছি সে-আওয়াজের ভেতর। কিন্তু এদের কারুরই আওয়াজ গর্জনের মত নয়। এ কাকাতুয়া যেন ইউগাণ্ডার জঙ্গলের সিংহের মত।

বিভা স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকত।

তাকিয়ে দেখতাম, কাকাতুয়াটা তার খাঁচার লোহার এক-একটা শলা ঠোঁট দিয়ে কামড়ে কেটে ফেল্যার কী দুর্দান্ত চেষ্টা করছে। যখন কিছুতেই কোনো কিছু কিনারা করতে পারছে না আর গলা ছেড়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ পাখি যদি দেখতে এত সুন্দর না হত, যদি এ প্রাণীটি পাখির মতন এমন সুন্দর জীব না হত তাহলে পৃথিবীর সমস্ত হিংসা, রাগ, বিদ্বেষ ও রক্তাক্ততা যেন এখানে মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে এ মনে করা খুব সহজ হত; এর চেহারা বিকৃত হলে এর সম্বন্ধে ঢের বীভৎস ও ভয়াবহ রোমহর্ষক কথা ভাবতে পারতাম; সে খুব স্বাভাবিক হত। কিন্তু এ পাখি, এবং খুব সুন্দর পাখি বলে একে এক সময় ধর্ষিতা উন্মত্ত মান্দারিন মহিয়সী বলে মনে হয়।

পাখিটা যখন ঠোঁটের ধারে কিংবা পাখনার ঝটপটানিতে কিছুতেই চারদিক-কার লোহার শিকগুলোকে ভেঙেচুরে ঝাড়াঝাপটা করে ফেলতে পারে না, তখন অসীম অন্ধকার রাগে বিদ্রোহে ও হিংসায় নিজের পাখনা নিজেই কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে।

টুকরো টুকরো রঙিন পালক খাঁচার নিচে মেঝের ওপর খুলে পড়ে। কখনো-বা নিজের বুক আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে ফেলে ফোঁটা ফোঁটা রক্তে এর বুকের গোলাপি রোম, মখমলের মত কোমল ননীর রঙের মত পালকগুলো ভিজতে থাকে।

বিভা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বসে থাকে।

কিন্তু কী করবে সে? কোনো উপায় নেই। এর এ-রকম অন্ধতার মুহূর্তে এ পাখিটা কিছু খায় না। কোনো রকম আদরই গ্রাহ্য করে না, এ মেয়েটি ওকে যত-রকম সান্ত্বনা ও আরাম দেবার চেষ্টা করে সবই সে অত্যন্ত কঠিন গর্জনে গর্জনে প্রত্যাখ্যান করে। বিভার আঙুল বা হাত কামড়ে চিরে ফেলতে এই পাখিটি খুব ভালবাসে: মাঝেমাঝে বাগে পেয়ে এই কাকাতুয়া যেন তার জীবনের সমস্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে সাক্ষী রেখে মেয়েটিকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলার জন্য উদগ্রীপ হয়ে এগিয়ে আসে। তারপর আসে কাকাতুয়াটার অবসাদের মুহূর্ত, নড়েও না, চড়েও না, চুপচাপ হয়ে খাঁচার এক কোণে পড়ে থাকে। এই সময়টা বিভা সব চেয়ে কষ্ট পায় বেশি, কিন্তু কাকাতুয়াটাকে নিয়ে সে কী যে করবে বুঝে উঠতে পারে না।

বিভার বাবা এসে এক-একবার বললেন,—'আঃ, এত ঝামেলা কিসের রে বাপু।'

—'কাকাতুয়াটা'—

সোফায় বসে ভদ্রলোক বলেন—'খাঁচার শিক কাটতে চাইছে বুঝি?'

—'তাই চাইবেই তো।'

—'চাইবেই তো, আমিও তো চাই।'

—'তুমি চাও? তোমার আবার খাঁচা কোথায়? এই বাড়িটা?'

বিভা তামাশা পেয়ে হাসে।

—'বাড়িটা নয়—এই জীবনটাই তো আমাদের খাঁচা।'

—'জীবনটা খাঁচা?'

বিভা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে-'কী যে বলো তুমি বাবা!'

এর কোনো উত্তর দেন না।

বিভা—'আচ্ছা সত্যি করে বলো, তুমি কি মনে কর জীবনটা আমাদের, খাঁচা?'

—'খাঁচাই তো।'

বিভা একটু চুপ থেকে বললে—'কিন্তু আমি জানি তুমিও তা বিশ্বাস কর না, আমিও না।'

—'এই কাকাতুয়াটার অবস্থা আগাগোড়া ঠিক আমাদেরই মত।'

—'কী রকম?'

—'এমনি করেই জীবনের বিরুদ্ধে আমরা অসভ্যতার পরিচয় দেই। দেওয়াও উচিত, জীবনটা আমাদের চেয়েও অসভ্য।' ভদ্রলোক প্রতিবাদী মুখ তুলে ভ্রূকুটি করে একবার পাখিটার দিকে তাকান, ভুরু উসকে বিভার দিকে তাকান তারপর। ডান ভুরু কপালে তুলে পাখিটার দিকে তাকান আবার, ভ্রূকুটি করে ফের বিভার দিকে তাকান তারপর।—'তুমি এখনো মানুষ হতে পেরেছ কি বিভা?'

—'তবে কি!'

—'এখনো প্রজাপতিও তো হতে পার নি।'

বিভা কৌতূহল মাখা হাসি নিয়ে বাবার দিকে তাকাল।

—'এখনো তুমি শুঁয়োপোকার মতন রেশমের গুটির ভেতর।'

বিভা একটু হেসে বললে—'অতটা আরাম ঠিক নেই।'

—'কিন্তু আমার চেয়ে আরামে আছ, আর এই পাখিটার চেয়ে?'

—'এই পাখিটার চেয়ে ঢের শান্তি আমার সে কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমার একটুও বেশি শান্তি নেই। সে কথাও আমি স্বীকার করি।'

—'এই পাখিটার চেয়ে তোমার একটুও বেশি শান্তি নেই?'

—'কোনো মানুষেরই নেই।'

—'কোনো মানুষেরই নেই!'

—'কী করে থাকে? এই দেখ, আমরা প্রত্যেকেই এ-রকম শিক কাটতে চেষ্টা করছি, কিছুতেই পারছি না। এমনি গভীর প্রতিবাদ করছি, শুনছে না, এমনি নিজের জীবনটাকে নিষ্ফলতার ফাঁকে-ফাঁকে আঁচড়ে কামড়ে খিঁচড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলছি, অন্য কারুর তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না। তারপর অবসন্ন হয়ে জীবনের এক কোণে ঘাড় হেঁট করে পড়ে থাকছি। পাখিটার বেলা তুমি বরং এইসব তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছ। মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছ। নিজে অন্তত বেদনা পাচ্ছ। কিন্তু আমাদের বেলা তোমার তমন সমবেদনাপরায়ণ বিলাসী শৌখিন তৃতীয় ব্যক্তিকে হাতের কাছে কোথাও হাতড়ে পাচ্ছি না।'

—'দূরে হয়তো থাকতে পারে, কিংবা নাও থাকতে পারে। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? কাছে থাকলেও-বা কী এগত? খাঁচার জীবন কাবার করে দিয়েছি প্রায়, সকলকেই কাবার করতে হয়। কেউ-বা ময়নার মতন টিরিক টিরিক করে নেচে শিস দিয়ে দেয় ফুঁকে, কেউ-বা এই কাকাতুয়াটির মত বড় গভীর ও অজ্ঞান-তার পরিচয় দেয়।' বলেই তিনি উঠে গেলেন।

বিভা বললে—'শোনো বাবা!'

—'কী।'

—'তুমি যে চট করে উঠে গেলে আমাকে একটা জবাব দেবারও অবসর দিলে না। তুমি যে বললে আমাদের জীবন—'

কিন্তু ভদ্রলোক অপেক্ষা করেন না, পিছন ফিরেও তাকান না, মাথা উঁচু করে সটান চলে যান।

এই রকম অবস্থা।

একটু ঘুরে এসে ভদ্রলোক বলেন,—'ওঃ এখনো দেখছি তুমি মনমরা হয়ে পড়ে আছ মেয়ে? এই কাকাতুয়াটার কথা ভেবে বুঝি?'

—'না, কাকাতুয়াটার কথা ভাবছিলাম না।'

—'তবে?' ভদ্রলোক একটা সোফায় বসে বললেন—'অবিশ্যি ভগবান আছেন, তিনি কেন থাকবেন না? তাঁর মঙ্গলও সর্বত্র।'

বিভা মেঝের কার্পেটের থেকে কুণ্ঠিত আঁচল তুলে কাঁধের ওপর আস্তে-আস্তে সাজিয়ে রাখে।—'তবে কেন ঐ কথা বলে দিলে যে—!'

—'ঠাট্টা করে।'

—'তাহলে তুমি বিশ্বাস কর যে—'

—'খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করি। না করে উপায় আছে?'

ভদ্রলোক—'আমাদের প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রতি পদক্ষেপেই তো দেখতে পাই তিনি আমাদের রক্ষা করছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন, শান্তি ও কল্যাণের জগতে আমাদের সকলকে নিয়ে চলেছেন।'

বিভা নড়ে-চড়ে সোফার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসে। বোঝা যায়, মেয়েটি খুশি হয়েছে। এও বোঝা যায়, মেয়েটিকে খুশি করবার জন্যই এ ভদ্রলোকটি এত কথা বললেন। খুব স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি নিজে এসব বিশ্বাস করেন না। ময়না পাখিটার মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে ভদ্রলোকে যে নিবিড় বর্ণচোরা বিদ্রূপ করেছিলেন সেই কথা মনে পড়ে। এর জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল জন্মে। অবাক হয়ে ভাবি এত বিষয় ও বিলাসের অধিকারী হয়ে এর এ তিক্ততা কেন?

ভদ্রলোকে—'এ পাখি বা এর খাঁচার সঙ্গে আমাদের জীবনের কোনো তুলনা চলে না।' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'বিধাতার সৃষ্টিতে জীবনটা হচ্ছে একটা আনন্দের ব্যাপার।' এক পা এগিয়ে বললেন—'বিশেষত মানুষের জীবন।' একটু হেঁটে বললেন, 'এ যেন একটা আশীর্বাদ। হাঁটতে-হাঁটতে বললেন—'মানুষ তার জীবনের এ পরম আশীর্বাদ যেন চারদিককার কুকুর বিড়াল পাখি পতঙ্গের ওপর ছড়াতে পারে। সে যে একটা কত বড় সার্থকতা, বিভা! বলেই মেয়েটির মুখেব দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে তার স্বাভাবিক আশা ও উল্লাস ও আগ্রহের ভেতর দিয়ে এসেছে। ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালবেলা শীত খুব বেশি ছিল। খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়ার দরুনই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, কাকাতুয়াটা পুবের দিকের জানালার কাছে খাঁচার ভিতর নিরিবিলি রোদ পেয়েছিল। বিভা নিস্তব্ধ হয়ে একটা বই পড়ছিল।

মেসের বারান্দায় খানিকক্ষণ পায়চারি করে ফিরে এসে দেখি একটি যুবক বিভার ঘরে ঢুকেছে। হাতে তার একখানা বই। যে কয়জন যুবাকে বিভার কাছে আসতে দেখি তার মধ্যে এই একজন, যতদূর বুঝতে পেরেছি এর নাম মোক্ষদাচরণ, বড্ড সেকেলের নাম, কিন্তু নিজে সে এত বেশি একাল ও আগামীকালের জিনিস যে এক-এক সময় তার নামটাকেও যে-কোনো আধুনিক চিন্তা ও কল্পনার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে সমাদর করতে ইচ্ছে করে। বিভা তাকে মুক্ষিদা বলে ডাকে।

—'তোমাকে এ কদিন দেখি নি কেন মুক্ষিদা?'

—'তা আর জিজ্ঞেস করা কেন?'

—'বসবে না!'

—'বসবার জন্যই তো এসেছি।'

—'দাঁড়িয়ে রইলে যে?'

—'কলকাতার শীত থার্মোমিটারে ফরটি নাইন ডিগ্রিতে নেমেছে।' একটা সোফায় বসল।

—'তাই নাকি? তা হবে, কাল বড্ড শীত শীত লেগেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'রাত্তিরে?'

—'হ্যাঁ, কম্বলে মানাচ্ছিল না যেন।'

—'ভেবে দেখ, কলকাতার পক্ষে ফরটি নাইন ডিগ্রি কী ব্যাপার!' বিভা কোনো জবাব দিল না।

—'সেই নাইনটিন থারটির ডিসেম্বরের কথা মনে পড়ে বিভা?'

—'কী হয়েছিল?'

—'থার্মোমিটার একেবারে ফর্টি সেভেন ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছিল।'

—'তা হবে।'

—'তোমার যেন এসব বিষয়ে কোনো কৌতূহলই নেই। কেমন খবর দিলাম তোমাকে বলো তো দেখি।' বিভা কোনো জবাব দিল না।

—'এই বত্রিশ বছরের মধ্যে এ-রকম শীত পড়ে নি কলকাতায়।'

—'সত্যি?'

—'পড়েছিল শুধু এইটটিন নাইনটি নাইনে।'

—'তা, তখন তো তুমি জন্মাও নি মুক্ষিদা এইটটিন নাইনটি নাইনে?'

—'না জন্মালে কী হয়? এ সবের রেকর্ড থাকে।'

—'তা বটে।'

—'থার্মোমিটার ফরটিফোর ডিগ্রিতে নেমে ছিল।'

—'সত্যি?'

—কলকাতায় মাঝে-মাঝে এ-রকম শীত পড়ে কেন বলো তো দেখি।' বিভা একটু ভেবে বললে—'আমার মনে হয় হিমালয়ে খুব বরফ পড়ে বলে।'

—'কোথায়-বা হিমালয়, কোথায়-বা কলকাতা। হাঃ হাঃ হাঃ।'

—'হেসো না।'

—'এই তোমার কালচার!'

ছেলেটি হাসতে হাসতে বললে—'হিমালয় হল গিয়ে তোমার সেই লছমন-ঝোলার পথে, আর কলকাতা হল আদিগঙ্গার পাশে সুন্দরবনের কাছে ডায়মণ্ড হারবারের—'

—'সে-হিমালয়ের কথা আমি বলি নি তো, আমি বলেছিলাম দার্জিলিঙের হিমালয়ের কথা।'

—'আরে, সে যে—হিমালয়ই হোক না কেন, পাহাড়ে বরফ পড়ে বলে কি এখানে শীত।'

—'তবে?'

—'সেই পাঞ্জাব আর ইউ পি-র থেকে শুরু করে মাঝে-মাঝে এমন একটা ঠাণ্ডা ঝড়ের বাতাস বইতে থাকে যে সমস্ত গ্যাঞ্জেটিক ভ্যালি শীতে ঝালিয়ে যায়, কলকাতাও বাদ পড়ে না।

—'তা হবে।'

—'তা হবে বললে চলবে না। এটা মনে করে রেখো।'

—'কী লাভ মনে করে রেখে?'

—'কেন?'

—'শীতের কথা তো আমরা খুব আরাম করে বলি, খুব আরামে কম্বলের নিচে শুয়েও থাকি; কিন্তু এই শীতে কত লোকের কত কষ্ট!'

—'ওঃ, সেই কথা?'

ছেলেটি চুপ করল। বললে—'হ্যাঁ ঠিকই বলেছে, আমি মাঝে-মাঝে কলকাতার ফুটপাতে বেড়াই—'

—'কখন?'

—'অনেকটা রাত অব্দি। কত জিনিসই দেখি। বাস্তবিক মানুষের জীবনটা বড় দুঃখের।' ছেলেটি মাথা তুলে বললে—'বিলেতের কথা মনে পড়ে।'

—'বিলেতের কথা? কবে সেখানে গেলে আবার তুমি!' বলে বিভা একটু হাসল।

—'না, যাই নি। যেতে চাইও না কোনোদিন, ঘোড়ার ডিম হবে গিয়ে। তবে ফিলমে দেখেছি নভেলেও পড়েছি বিলেতের কথা-সেই সবের থেকে ব্যাপারটা কল্পনা করে নিতে পারা যায়, কী বলো, কল্পনা আমাদের এত কম নয়! ওদের অবস্থা কী জানো, আমাদের চেয়েও খারাপ। ওদের গরিবদের কথাই বলছি আমি, লন্ডনের স্লামে যারা থাকে। কারণ, ওটা নিছক শীতের দেশ কিনা। জীবনের যারা হতভাগ্য, শীত তাদের পক্ষে বিষম।' একটু থেমে বললে—'বাস্তবিক জীবনটাই বিষম!' বিভার দিকে তাকিয়ে বললে—'কী বলো তুমি?'

—'তোমার হাতে এটা কী বই মুক্ষিদা?'

—'আমার হাতে? ফেল্টহ্যাটটা মাথার থেকে নামিয়ে সোফার এক কিনারে রেখে মোক্ষদাচরণ বললে—'তা দিয়ে তুমি কী করবে?'

—'কেন?'

—'আমার বইয়ের সন্ধান তুমি কি রাখ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

বিভা যে একদিন একটা বই ছুঁড়ে ফেলেছিল সেই কথা আমারও মনে পড়ল। এই মোক্ষদারই বই। সেদিন ব্যাপারটা ভাল করে আগাগোড়া দেখতে পারি নি।

বিভা বললে—'তোমার বইয়ের তো অসম্মান করি না!'

—'করই তো?'

—'তুমি নিজে কোনো বই লেখ নি তো।'

—'নাই—বা লিখলাম। কোনোদিন লিখবও না। লিখে ঘোড়ার ডিম হবে। কিন্তু যে-সব বইকে মানুষ নিজের লেখার চেয়েও ভালবাসে—'

বিভা বাধা দিয়ে বললে,—'কিন্তু তোমার সে-বইটা আমার ভাল লাগে নি।'

—'কেন লাগে নি।' ছেলেটি বললে,—'না লাগবার কোনো কারণ তো আমি খুঁজে পেলাম না।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। কোনো জবাব দিল না।

মোক্ষদা বললে—'এলিজাবেথ—এর 'আই হ্যাভ বিন ইয়ং' বইখানা তোমার ভাল লাগে না!'

—'ভাল লাগল না তো।'

—'মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে।'

—'কেমন যেন নোংরা-নোংরা লাগছিল।'

—'নোংরা!'

ছেলেটি চোখ কপালে তুলে দু'মিনিট চুপ করে বসে রইল। তারপর বললে—'এ বছরে সবচেয়ে পরিষ্কার বই ওখানা।'

—'তোমরা তা মনে করতে পার।'

—'না, আমারই শুধু নয়। বিলেতে তোমার চেয়েও ঢের-ঢের ছোট-ছোট মেয়েরা এই কথাই ভাবে।'

—বিলেতে তারা অনেক কথাই ভাবে।'

—'ভাবে যে এখানা এ বছরের সবচেয়ে চমৎকার বই।'

—'ভাবুক।'

—'তাতে তোমার কিছু এসে যায় না।?'

—'না।'

—'কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা যদি প্রশংসা করত? অবিশ্যি তারা কোনোদিন করবে না। তাদের বই হচ্ছে বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর কিংবা শরৎবাবুর....তারপর নভেলের পৃথিবীটা লোপাট হয়ে গেলেও তাদের কিছু ক্ষতি নেই!'

ছেলেটি হাসতে লাগল।

বললে—'যদি দেশের মেয়েরা লোমণ্ডের বইটাকে খুব প্রশংসা করে তাহলে তোমার ভাল লাগে? স্বাদেশিকতার ধরনটা তোমার এই রকম! কিন্তু দেখো, মাই ডিয়ার বলতে কোনো দেশ-বিদেশ নেই। খুব মূল্যবান কল্পনা বা চিন্তাকে সব সময়ই পুজো করতে হয়। এ বইখানা শক্ত ঠিকই। খুবই মূল্যবান। বহুকাল পরে এক-একখানা এই রকম সুন্দর জিনিস তৈরি হয়।'

বিভা প্রথম কথার উত্তর দিয়ে বললে—'আমি খানিকটা পড়ে দেখেছি। আমার ভাল লাগে নি। আমাদের দেশের মেয়েরা যদি এমন বইয়ের প্রশংসা করত তাহলে বুঝতাম যে তাদের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে।'

—'আবার রুচির কথা?'

—'প্রতিবাদ করতাম আমি।'

—'করতে?'

—'রুচি বলতে আমি শ্লীলতা অশ্লীলতা বুঝি না শুধু।'

—'তবে?'

—'যাদের লিখবার খুব গভীর ক্ষমতা আছে তাদের খানিকটা অশ্লীলতাও আমি ক্ষমা করি।'

—'শুনে আরাম হল খানিকটা।'

—'আমি জানি আমাদের দেশের মেয়েরা এটুকুও করে না।'

—'না তা করে না।'

—'কিন্তু আমি ক্ষমা করি। বড়-বড় লেখকদের বিপদ আমি বুঝি। কিন্তু তাদের রচনার মাধুর্য ও গভীরতা এত বেশি যে খানিকটা নোংরামি ও কদর্যতা যেন সমস্তটুকুর সঙ্গে একতারে বাঁধা বলে মনে হয়। হৃদয়কে পীড়া দেয় না। যাদের রুচি এটুকু অব্দিও ক্ষমা না করতে পারে, বুঝতে হবে তাদের উপলব্ধি করবার শক্তিই ঢের কম, বিচার কম, কল্পনা কম [ভবিতব্য] কম।' বিভা চুপ করল।

মোক্ষদাও কোনো কথা বললে না।

বিভা,—'কিন্তু এ বইটার দোষ কী জান'

—'সেক্স-এর বাড়াবাড়ি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'নভেলে, এ সব আমার ভাল লাগে না।'

—'কিন্তু মারি স্টোপস যদি লেখে।'

—'বুঝি যে কোনো আর্টের বই পড়ছি না, ডাক্তারি পড়ছি। কিন্তু নভেলকে ডাক্তারি ডাক্তারি হিজিবিজিতে ভরে থাকতে দেখলে বড্ড বিশ্রি লাগে। আর্ট নষ্ট হয়ে যায়।'

—'এ বইটার আর্ট খুব অক্ষুণ্ন।'

—'আমার তা মনে হয় না।'

—আর্ট সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তোমার নেই।'

—'টুর্গেনিভের বই তো আমার ভাল লাগে।'

ছেলেটি হো হো করে হেসে উঠল। মোক্ষদা হাসতে-হাসতে বললে—'নভেলের ক্ষেত্রে টুর্গেনিভের এখন আর কোনো স্থান নেই।'

—'নেই?'

—'বুড়ো হেডমাস্টাররা পড়ে হয়তো।'

বিভা চুপ করে রইল।

—'কিংবা তোমার মতন মেয়েরা।'

—'এ আমার বেশ লাগে।'

—'এই তোমার আর্ট?'

—'সে আর্টের পৃথিবী কবে ভেঙে গেছে।'

—'তাও যায় নাকি?'

—'ত্রিশ বছর পরে এই বইখানারই-বা কী মূল্য থাকবে?'

—'এই রকম হয়?'

—'অবিশ্যি বাংলাদেশে না হতে পারে। এখানে এখন চণ্ডীদাস চলে।'

—'থাক। আমি চণ্ডীদাসের কথা বলছি না। কিন্তু আমার ধারণা ছিল একখানা সুন্দর বই বা সজীব কল্পনার জিনিস চিরকালই বেঁচে থাকে।'

এ-কথা শুনে উত্তর না দিয়ে মোক্ষদা বললেন—'লোমণ্ডের বইখানা তোমাকে পড়তে দেওয়াই ভুল হয়েছে।'

—'আর এ রকম দিও না।'

—'আগে যদি জানতাম যে আর্টের সম্বন্ধে তুমি এ রকম বেকুবের মত চিন্তা কর, ভাব, কথা বল—'

বিভা চুপ করে রইল।

মোক্ষদা—'কিন্তু তোমার দোষ দিয়েই-বা হবে কী? আমাদের দেশের মেয়েরাই এ রকম। কোনো নতুন জিনিস গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে তোমার মত মেয়েরাই এ বইটাকে কত যে প্রশংসা করবে। কিন্তু তখন ঠিক যে-বইটার প্রশংসা করা দরকার, সেটাকে করবে ঘৃণা। এদের দুর্বুদ্ধি এই রকম।'

বিভা একটু চুপ থেকে বললে,—'এ বইটাকে আর একটা কারণেও আমার ভাল লাগে নি। সেইটেই হচ্ছে আসল কারণ।'

—'কারণটা জানতে পারি কি?'

—'বইটার কোনো উদ্দেশ্য নেই যেন। জীবনটাকে মনে করে অন্ধকারের মত। তারই ফাঁকে-ফাঁকে ফুর্তি করা আবার অবিমিশ্র বেদনার তরঙ্গে ভাসতে থাকা। এ কেমন?'

—'এই রকমই তো জীবন?'

—'এ আমার ভাল লাগে না।'

—'কিন্তু আমাদের জীবন তো এইরকম।'

—'তাও আমি বিশ্বাস করি না।'

—'তুমি তাহলে ভাইকার অব ওয়েকফিল্ড পড়ো।'

বিভা একটু হাসল।

—'আর রবিনস ক্রুশো।'

বিভা—'আমি এক-এক সময় অনেকক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি। আমার মনে হয়—'

—'তুমিও চিন্তা কর?'

—'জাজ বেন লিণ্ডসের সার্জনস লাইফ কিছুদিন আগে পড়ছিলাম।'

—'তাও পড়?'

—'আর মরিস হিণ্ডাসের একখানা বই।'

—'হিউম্যানিটি আপরুটেড বোধ করি।'

—'হ্যাঁ।'

—'এ সব বই আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কেন?'

—'জীবন সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই এদের।'

—'তা তুমি কী করে বল?'

—'তা যদি থাকত তাহলে এরা নীরস মন্তব্যের পাট নিয়ে বসত না নিশ্চয়।'

—'তার মানে?'

—'একখানা সার্থক উপন্যাস লিখত।'

—'সকলেই তো জীবনটাকে গল্পের হিসেবে দেখে না।'

—'কিন্তু জীবনটা গল্প ছাড়া আর কী?'

—'তুমি তা ভাবতে পার। কিন্তু আমি যা বলছিলাম—'

—'অতি দীর্ঘ একটা গল্প। শেষপাতা দুশোয় যখন পড়ি ভগবান নেই, বেদনাই সবচেয়ে বেশি, মাঝে-মাঝে শুধু উপভোগের অবসর, কিংবা মিথ্যা কতকগুলো কল্পনা নিয়ে ফূর্তির সময়, এই নিয়ে যা আনন্দ আমাদের মন্দ নয়। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকা দরকার। জীবনে কৌতুক যে ঢের আছে এই বুঝেই বাঁচতে চাই আমরা। কেউ মরতে চায় না। কীসের জন্য? আমরা সব মরে গেলে সৃষ্টির এই যে নিষ্ঠুর চিরন্তন তামাশার খেলা, এ খেলবে কে? সেজন্যই তার জীবনীশক্তি তাকে বিদ্রূপ করে বাঁচিয়ে রাখে। আমরাও এই রকম করেই বাঁচি।'

বলেই সে খুব গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

বিভা—'আমি যা বলছিলাম। আমি খুব গভীরভাবে ভেবে দেখেছি যেই যা লিখুক যেই যা বলুক জীবন খুব সাধনার জিনিস। ভগবান খুব মঙ্গল উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন সৃষ্টি করেছেন। প্রতিদিন নানা কথায় নানা কাজে এই কথাই আমার মনে হয়।' মোক্ষদা নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়েছিল। বিভা যা বলছিল সে কথায় তার কানও ছিল না বোধ করি।

বিভা—'বেদনা কি নেই? তা আছে! কিন্তু তা লাঘব করবার জন্য জিনিসও ঢের আছে।'

মোক্ষদা কোনো জবাব দিল না। মুখ দেখে মনে হয় বিভা কী বলছে না বলছে, তা তার গ্রাহ্যের বাইরে। সে অন্য কথা ভাবছে।

বিভা বললে,—'এক-একটা উপন্যাস আমাদের খুব নিরাশ করে ফেলে। যে উপন্যাসগুলো হতাশাবাদী সেগুলো আমাদের পড়া উচিত নয়। তাদের ধারণা যে জীবন সম্বন্ধে তারা খুব জানে বুঝি। কিন্তু সেটা ঠিক কথা নয়। লোমণ্ড, কতই-বা বয়স মেয়েটির? বিশেষ তেমন আর বয়স নয় নিশ্চয়ই। এই তো তার প্রথম নভেল! না হয় দ্বিতীয় নভেলই হল। বইখানার নাম রেখেছে তবুও আই হ্যাভ বিন ইয়ং। যেন আটাশ বিশ বছর বয়েসই মানুষের জীবনের সজীবতা চলে যায়। তার সমস্ত আনন্দ ও কল্যাণের জিনিস হয়ে যায় অতীতের স্মৃতি মাত্র। কেমন বিসদৃশ, ভেবে দেখ তো দেখি। জীবন সম্বন্ধে যারা এত নিরাশ, এ সৃষ্টির যুক্তিতে যারা বিধাতার কল্যাণের হতা এত কম আবিষ্কার করতে পারে, জন্যেই যারা যৌবনের জয় হারিয়ে ফেলে, আশা নেই বিশ্বাস নেই, তাদের বই এতটা সফলতাই-বা লাভ করে কী করে? আমি অবাক হয়ে ভাবি।'

মোক্ষদা চুপ করে ছিল।

বিভা—'বুঝলে মুক্ষিদা, এসব বই তুমি আর পড়ো না।' মোক্ষদা কোনো উত্তর দিল না।

বিভা—'এর সেক্স-এর জন্য নয়। এর সেক্সকে আমি সহ্য করতে পারি। কতকগুলো মাতলামির ছবি যা এঁকেছে তাও আমার কাছে অপরাধ মনে হয় না। পৃথিবীতে কি মাতাল নেই? ঢের আছে। এই সবই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে এর ধারণা একেবারেই মিথ্যা। অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল বটে, কিন্তু সে-অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে নি। কারণ বইটা লিখতে গিয়ে একটা ভুল সংস্কার নিয়ে শুরু করল কিনা। বাস্তবিক এর এই সংস্কারটা ভুল। আমাদের জীবন একটা আশার জিনিস।'

বিভা একটু চুপ থেকে—'এই মহিলাটি, এর বয়স কতই-বা হবে? বড় জোর বিশ। আমার মনে হয় তার থেকেও কম। বাবার বয়স পঁচাত্তর। কিন্তু জীবনটাকে আশীর্বাদ বলে মনে করেন।'

বিভা একটু থেমেই বলে,—'তার চেয়ে কি আমরা বেশি জানি? বা এই মহিলাটি লেখিকা বলেই কি বেশি জানেন?'

বিভা মিনিট খানেক পরে—'আমার দুঃখ হয় এই কথা ভেবে যে নারীরাও শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে একটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।' বলে মোক্ষদার দিকে তাকাল। তারপর আবার ঘাড় কাত করে বললে—'কিন্তু এ রকম বই যদি এই একখানাই হত তাহলেও তো হত। কিন্তু তা তো নয়। আজকালকার সাহিত্যই এই সব বইয়ে ভরা। জীবনকে এরা একটা অন্ধ পোকার মত নিঃসহায় করে এঁকে দেখাবে। তার বেদনা করে দেবে অপরিসীম। মাঝে-মাঝে খানিকটা স্থূল উপভোগ দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখবে। ভগবানকে বৈঠকের ভেতর কোথাও রাখবে না, রাখলেও তাকে শয়তানের অধম করে আঁকবে। এই রকম সব। এই হল অভিজ্ঞতা আর প্রতিভা। খুব বেস্ট সেলার আশা করি?'

—'কোন বইটা?'

—'লোমণ্ড-এর আই হ্যাভ বিন ইয়ং।'

—'সব তো বেরল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কিন্তু এরকম বই-ই তো বিক্রি হয়।'

—'হওয়া তো উচিত।'

কাকাতুয়াটা চিৎকার করে উঠল। মোক্ষদা ধড়মড় করে নড়ে ওঠে সবশেষে পাখিটাকে দেখতে পেয়ে,—'তা এই, আমি ভেবেছিলাম না জানি কী?'

—'এই রকমই। বড্ড চেঁচায়।'

—'পাখিটা পেলে কোথায়?'

সুদর্শন চা টোস্ট ডিম আর গোটা কয়েক কমলা নিয়ে এল।

দু'জনেই খাচ্ছিল। মোক্ষদা—'পাখিটা কেউ দিলে নাকি তোমাকে? জন্ম-দিনে?'

—'না। কিনেছি।'

—'এ এরকম শখও ছিল?'

—'বেশ সুন্দর তো পাখিটা।'

—'তা তো দেখছি।'

—'তোমার পছন্দ নয়।'

—'কেন জিজ্ঞেস করছ।'

—'আমি তোমাকে দিয়ে দিতে পারি।'

—'উপহার হিসেবে?'

—'যা মনে করো।'

—'এ রকম জিনিস আমি নেই না।'

—'কেন?'

—'এ পাখি নিয়ে জীবনটাকে কে বিড়ম্বিত করতে যাবে বল? অবিশ্যি তুমি ছাড়া।'

দু'জনেই চুপচাপ খেতে লাগল।

মোক্ষদা—'তাছাড়া আমার সময়ের দামও আছে।' চায়ে এক চুমুক দিয়ে বললে—'অবিশ্যি লিখি না কিছু। কিন্তু পড়ি অনেক। এ পাখির তদ্বির করবে কে বলো?'

—'এ পাখিটাকে নিয়ে কি করি বলো তো দেখি?'

—'কোত্থেকে কিনলে?'

—'টেরিটি বাজার থেকে একটি লোক এসে বিক্রি করে গেল?'

—'দালাল?'

—'তা হবে।'

—'কত দাম নিলে?'

—'একটা ময়না আর এই কাকাতুয়া সাড়ে তিনশ নিলে।'

মোক্ষদা টি-পটের থেকে খানিকটা চা বিভাকে ঢেলে দিতে-দিতে বললে—সাড়ে তিন হাজার তোমার কাছ থেকে নেয় নি তাহলে?'

—'তাও নেয় নাকি?'

—'ধরো যদি বলত যে কাকাতুয়াটা মহাত্মা গন্ধির আশ্রয় থেকে নিয়ে এসেছে, তাহলে কত দিতে?'

বিভা ঘাড় কাত করে হাসল।

মোক্ষদা—'এই রকম বলে অনেক সময়।' টি-পট থেকে নিজের পেয়ালায় খানিকটা চা ঢেলে নিয়ে—'একটা সুন্দর জিনিসেরও নিজস্ব কোনো দাম থাকে না প্রায়ই। যে কিনবে তার অনুভূতিকে আঘাত করে তবে দাম। সৌন্দর্য অনুভূতি অবিশ্যি ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তা খুব সাধারণ জিনিস। অন্যরকম অনুভূতির জায়গায় ঘা দিতে হয়।'

চায়ে একবার চুমুক দিয়ে মোক্ষদা,—'যেমন ধরো যদি বলা যায় গুরুবাবুর?' মন্দিরে এই কাকাতুয়াটা ছিল"। একটা বিস্কুট ভেঙে নিয়ে বললে—'তাহলে অনেক দাম দিয়ে কিনতে চায় এমন ঢের লোক মেলে নাকি?'

বিস্কুটের টুকরোটা কাকাতুয়ার খাঁচার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—'এইরকমই।' কিন্তু বিস্কুট কাকাতুয়াটা খেল না। এ তার খাবার মুহূর্ত নয়। চিৎকার করে উঠল। মোক্ষদা '—এ কাকাতুয়াটা কদিন কিনেছ?'

—'ছ-সাত দিন হল?'

—'এই ঘরেই থাকে বুঝি?'

—'কাকাতুয়াটা? এই ঘরেই থাকে।'

—'আর তুমিও তো সারা দিনরাত এই ঘরেই?'

—'এক রকম।'

—'জীবনটাকে এত কষ্ট দেবে কেন?'

—'এই কাকাতুয়ার জীবনটাকে?'

—'না। তোমার জীবনের কথা বলছিলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এই চিৎকারের মধ্যে জীবনের কাজ কী করে চলে?'

—'পাখিটার জীবন অবিশ্যি বাধা পায়।'

—'আর তোমার জন্য কী সান্ত্বনা থাকে।'

—'আমি হতবুদ্ধি হয়ে ভাবি কী করে বেচারাকে একটু শান্ত করব।'

—'হতবুদ্ধি হয়ে ভাবি? কিন্তু কাজে কিছু করতে পার কী?'

—'প্রথম প্রথম খাবার দিতাম। নানা রকম ভাবে আরামে রাখতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন দেখছি কিছুতেই কিছু হয় না, কাজেই চুপ করে বসে থাকি।'

—'এ রকম অসভ্য জ্যানোয়ার আমাদের কাছে না থাকলেও এমনিই আমরা অনেক সময় চুপ করে বসে থাকি। চুপ কে বসের থাকি মানে ব্যথা পাই। আনন্দে কেউ নিশ্চুপ বসে থাকে না। কিন্তু এই বেদনাকে আরো বাড়ানো কেন, একটা কাকাতুয়া ডেকে এনে?'

—'আমি অবিশ্যি ঠিক এ রকম মনে করি না।'

—'কী ভাব তাহলে?'

—'এই পাখিটা একটা আশ্রয় চায় তো?'

—'সে-সব কথা এর বাপ ভাবুক গিয়ে।'

বিভা একটু হেসে বললে—'কিন্তু এর বাপ-মা কোথায়?'

—'বনের বাপ-মা অবিশ্যি নেই। কিন্তু এর বিধাতা আছেন বিশ্বাস করো না?'

—'নিশ্চয়ই'।

—'তার হাতে ছেড়ে দাও।'

—'কী করে?'

—'খাঁচার থেকে খুলে জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে।'

—'হয়তো পাশের বাড়িতে গিয়ে পড়বে, বিড়ালে খেয়ে ফেলবে।'

—'তাহলে আর বিধাতাকে বিশ্বাস করলে কোথায়?'

বিভা একটু হেসে বললে—'এসব তো হল তোমার ঠাট্টার কথা। কাজে কি করা যায় বলো তো?'

—'এই হলে কী করতাম জান? খাঁচার থেকে খুলে কুকুর লেলিয়ে দিতাম।'

—'এই পাখিটাকে?'

—'কেনই-বা দেব না বলো?'

—'থাক। তামাশা ঢের হল।'

—'না, তামাশা নয়। আমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিতে কেউ ছাড়বে? বিভা কোনো উত্তর দিল না।'

—'এই পাখিটার মত যদি নোংরা ব্যবহার করি তাহলে এ পৃথিবীর কোথাও ক্ষমা পাব?'

বিভা চুপ করে রইল।

—'এমনিই তো কেউ কাউকে করতে চায় না। খুব ভদ্রভাবে চলি, মিষ্টি কথা বলি। কিন্তু ভাল মনে করে একজনকে একটা বই পড়তে দিলাম, সে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানায়। একটা পাখির কর্কশতা ও অসভ্যতা অসহ্য হয়ে উঠলে, তাই সেটা আমাকে উপহার দেবার মত মূল্যবান জিনিস বলে বিবেচিত হল।'

মোক্ষদা একটু হেসে বললে—'কিন্তু উপহার দেবার ঢের জিনিস তো পৃথিবীতে ছিল, যা সবচেয়ে আগ্রহ ও সার্থকতার সঙ্গে গ্রহণ করতাম আমি। কিন্তু সে সবের তো উল্লেখও হয় না।'

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে মোক্ষদা—'এই রকমই।' ফেল্ট হ্যাটটা তুলে ধরে বললে—'এই যে এসব বই পড়ি, যে-বইগুলো তোমার আদৌ পছন্দ হয় না, এই বইগুলোর কাছ থেকেই আমি সবচেয়ে বেশি সহানুভূতি পাই। তুমি বলো এরা জীবনকে চেনে নাই। কিন্তু কোনো কিছু কী হৃদয়ে এমন স্পষ্ট আঘাত করতে পারে? যে-ব্যথা আমি অনুভব করি কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না, এরা তাকে মহিমান্বিত করে তোলো। আমি অবাক হয়ে ভাবি। তুমি বলো এসব বইয়ের পৃষ্ঠা তোমার কাছে একান্তই অসার। আমি তা বিশ্বাস করি। মিথ্যা ভান করবার মেয়ে তুমি নও। কিন্তু অবাক হয়ে ভাবি তোমার জীবনের থেকে আমার জীবন কত পৃথক। কিন্তু আমাদের দু'জনের পারিপার্শ্বিক তো এক রকমই ছিল প্রায়। ছিল না বিভা?'

—'হ্যাটটা হাতে নিলে যে, উঠবে নাকি?'

—'না, আরো কিছুক্ষণ বসেই থাকব ভাবছি।'

—'এই পাখিটাকে নিয়ে কী করি?'

—'আমাকেই দিও।'

—'না, যে জিনিসে আমি নিজেই বিড়ম্বিত—'

—'এক্ষুণি তো দিতে চাচ্ছিলে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ও, ছেলেমানুষি করে ঢের ভুল করে ফেলি। তুমি কিছু মনে করো না।

ভেবো না যে কিছু খারাপ মনে করে তোমাকে আমি দিতে যাচ্ছিলাম। এ পাখিটা যে তোমার ঘাড়েও বোঝা হতে পারে ভুলেই যাচ্ছিলাম।'

জবাব দেবার অনেক ছিল, কিন্তু মোক্ষদা চুপ করে রইল। দেখলাম সে খুব নিবিড়ভাবে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে ভাবছে। ভাবছিল হয়তো এই রকমই ভুলে যাও তুমি বিভা...কিন্তু তোমাকে যখন আমার ঘাড়ের বোঝা করতে চাই তখন তুমি খুব সতর্ক হয়ে ওঠো। একটুও ভুল হয় না তোমার। মোক্ষদা বলে—'একটা কাজ করা যাক বিভা।'

—'কি করবে?'

—'এই পাখিটাকে'—একটু হেসে বললে,—'আমি ফোন করে দেখি।'

—'কোথায়?'

-'চিড়িয়াখানায়।'

—'সেখানে পাখিটাকে রাখবে?'

—'তা রাখতে পারে।'

—'ওঃ, তাহলে তো খুব চমৎকার হয়।'

—'হ্যাঁ, তোমার দিক দিয়ে সে খুব নির্বিবাদ শান্তির জিনিস হয় বটে—।'

—'পাখিটাও।'

—'এর কী হয় তা অবিশ্যি এর বিধাতা জানেন।'

—'সেখানে আরো ঢের কাকাতুয়া আছে তো?'

—'তা আছে অবিশ্যি।'

—'তাহলে এক সঙ্গে সেগুলোর সাথে থাকতে পারে তো?'

—'তা পারে। কিন্তু তাতে এর বেদনা কতখানি কমবে তা আমিও বলতে পারি না, তুমিও পার না।'

—'তা অনেক কমবে।'

—'কীসের জন্য?'

—'এতগুলো সঙ্গী পেলে।'

—'এই শহর ভর্তি তো আমরা সঙ্গী পেয়েছি। পথে নামলেই হাজার হাজার সঙ্গী,' একটু কেশে বললে—'কিন্তু আশ্বাস কোথায়?'

—'কাকাতুয়াটা অবিশ্যি তোমার মতন ভাবে না।'

—'জীবন সম্বন্ধে এর ধারণা আমার চেয়ে ঢের উজ্জ্বল?'

বিভা—'তাই তো মনে হয়।'

—'তা হবে।'

—'চিড়িয়াখানায় একটা কাকাতুয়া-ঘর আছে নাকি?'

—'চিড়িয়াখানায় আমি যাই নি শিগ্‌গির!'

—'আমিও না।'

—'মনে পড়ে যেন বছর তিনেক আগে অনেকগুলো কাকাতুয়া দেখেছিলাম।'

—'একটা ঘরে?'

—'হ্যাঁ, তা ছাড়া বাইরেও আছে।'

—'কোথায়?'

—'এক-একটা গাছের নিচে এনে রাখে। এমনি বড় বড় ওয়ান্ডারফুল কাকাতুয়া সব। মাছরাঙার চেয়েও পালকের রঙের বৈশিষ্ট্য ইন্টারেস্টিং।'

—'গাছের নিচে এনে রাখে?'

—'দিনের বেলা তাই করে।'

—'কিসের জন্য?'

—'যাতে সবাই দেখতে পারে!'

—'তিন বছর আগে দেখেছিলে?'

—'হ্যাঁ, এখন উজাড় হয়ে গেছে কিনা কে জানে?'

—'চিড়িয়াখানায় একবার গেলে হত।'

—'তুমি শিগ্‌গির যাও নি বুঝি?'

—'না।'

—'যেও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বরাবরই মনে হয় কলকাতায় বিশেষত্বহীন কোনো জায়গা যদি থাকে তো এই চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এইসব। ছোটবেলায় বারবার দেখে—দেখে এইরকম একটা ধারণা হয়ে গেছে। কিছুতেই তাই আজকাল আর যেতে চাই না। কতবার কত লোকে সাধল।'

—'যেও।'

—'তবুও এই আট-দশ বছর হল যাই নি।'

—'যেও।'

—'কলকাতার চিরপরিচিত জায়গাগুলোই আবার এক-একবার করে দেখব ভাবছি।'

—'হ্যাঁ, দেখা উচিত।'

—'তুমি যাও?'

—'আমি মাঝে-মঝে ফুটপাতে ঘুরি।'

—'কিসের জন্য?'

—'এই বত্রিশ বছর তো কলকাতায় আছি। তবুও নানারকম নতুন জিনিস চোখে পড়ে যায়।'

—'ফুটপাতে?'

—'ফুটপাতেও?'

—'নতুন জিনিস?'

—'কিংবা পুরনো জিনিসগুলোই যেন কেমন বিচিত্র অনুভূতি জাগায়।'

—'আমিও ঘুরে দেখলে পারতাম।'

—'পারই তো।'

—'একটা মোটর নিয়ে।'

—'না। হেঁটে দেখলেই ভাল।'

—'দুপুরবেলা।'

—'কিংবা রাতে যদি বেড়াতে পার, সাররাত তাহলে।'

—'সে সুবিধা তো আমার নেই।'

—'সুবিধা তৈরি করে নিতে হয়। তুমিও তো আমার মতন মানুষ।'

—'অবিশ্যি আমার বাবা যদি সারারাত আমার সঙ্গে হাঁটতে রাজি হন তাহলে একবার কলকাতার অলিগলি বেড়িয়ে দেখতে পারি।'

—'তোমার বাবার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

—'তা হলে বেশ হয়। এই পৃথিবীতে তোমার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার মতও ঐ একটি লোককেই তো দেখতে পাই। আমরা কারুর দায়িত্ব নেই না, আমরা একা-একা বেড়াই।'

—'নাও না বুঝি?'

—'না।'

—'তোমার ছোট বোন যদি তোমার সঙ্গে বেড়াতে চায়?'

মোক্ষদা একটু আঘাত পেয়ে ঢোক গিলে বললে—'আমার ছোট বোন? না, আমার ছোটবোনও আমার সঙ্গে ও-রকম বেড়াতে চাইবে না।'

—'কেন?'

—'আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা নেই তার।'

বিভা কোনো জবাব দিল না।

মোক্ষদা—'সে কী ভাবে? আমি তাকে পথে ফেলে কোথাও চলে যাব? রক্ষা করতে পারব না? ব্যবহারে আমার সহানুভূতি নেই? না, এ সব কিছু ভাবে না? ভাবে বরং অন্য একটা কথা। কী ভাবে জান বিভা?'

বিভা চুপ করে ছিল।

মোক্ষদা—'ভাবে যে আমাকেই সে সহানুভূতি করতে পারবে না। সারারাত আমার সঙ্গে পথে পথে হেঁটে একটুও জমবে না তার।'

'কিন্তু তোমার তো কোনো ছোট বোন নেই।'

—'যদি থাকত, তা হলে এইরকম ভাবত।'

—'তোমার কল্পনা বেশ আছে।'

—'কিন্তু আমার কল্পনা বাস্তবের ওপর তৈরি।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'যা অসম্ভব, অবান্তর, মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে-সব উপদান আমি দূরে সরিয়ে রাখি।'

—'ছোট বোন নেই অবিশ্যি তোমার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তাই জানি।'

—'কিন্তু অন্যরাও তো তোমার বোনের মত হতে পারে।'

—'নারী মাত্রেই পারে।'

বিভা আবার কাশল।

মোক্ষদা—'একজন পরিচিত পুরুষকে ভাই ডাকা সবচেয়ে সহজ।'

—'একজন নারীর পক্ষে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা খুব স্বাভাবিক অবিশ্যি।'

—'এবং সবচেয়ে নিরাপদ।'

—'নিরাপদ?'

—'সমস্ত গোলমাল সেইখানেই ঢুকে গেল কিনা।'

—'গোলমাল?'

—'নারী-পুরুষের সম্পর্কটাই একটা গোলমালের জিনিস। যে পর্যন্ত না একটা মীমাংসা হয়।'

—'কেউ কেউ তা মনে করে।'

—'কিন্তু যখন বুঝলাম সে আমার বোন, আমি তার ভাই, তখন গোলমাল মিটে একটা মীমাংসা হয়ে গেল।'

—'বেশ সুন্দর মীমাংসা তো।'

—'নিশ্চয়ই। পুরুষদের চেয়েও নারীরা এ মীমাংসাকে আরো সুন্দর মনে করে।'

—'তা ভাল কথা নয় কি?'

—'এবং এইসব মীমাংসার জন্যই তারা সবচেয়ে বেশি করে তৈরি।'

—'কেনই-বা থাকবে না? এ সম্বন্ধ তো খুব নির্মল।'

—'এবং খুবই সাদাসিধে।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'এ সম্বন্ধ পাতাতে গিয়ে কোনো আবিষ্কারেরও দরকার হয় না।'

—'আবিষ্কার? কী রকম আবিষ্কার?'

—'মানুষের জীবনের ভেতর প্রবেশ করে?'

—'কোন মানুষের?'

—'যে পুরুষটির সম্পর্কে সে নারীটি আসছে সেই পুরুষ মানুষের?'

—'কী দরকার তার জীবনটাকে তালাশ করে দেখবার?'

—'নারীরা তা দরকার মনে করে না।'

—'কেনই-বা মনে করবে? মানুষকে সহানুভূতি করতে গিয়ে তার ভেতরের খবর ঢের বেশি জানবার দরকার আছে কিছু?'

—'না, তা দরকার নেই। বোনরা ভাইকে ভাই বলেই সহানুভূতি করে। সে বস্তুত কী তা ভেবে দেখতে যায় না। সে ভাবে এইই যথেষ্ট।'

—'যথেষ্টই তো।'

—'খুব।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'বোন-ভাইয়ের সম্পর্কটা তাই বড় মজার।'

—'কী রকম?'

—'পরস্পর পরস্পরের গোপন যন্ত্রণা বোনরা কোনো খবর রাখে না।'

বিভা চুপ করে রইল।

মোক্ষদা—'কিম্বা, গোপন আনন্দ অমৃতও পরস্পরের নিজেদের জিনিস। কেউ কাউকে জানানোর দরকার মনে করে না।'

বিভা কোনো উত্তর দিল না।

মোক্ষদা—'সহানুভূতির ধারাই হচ্ছে এ রকম। এর ভিতর স্বাভাবিকতা আছে, কিন্তু সাহস নেই।'

—'সান্ত্বনা আছে, আশ্বাস আছে।'

—'কিন্তু স্বপ্ন নেই।'

—'শান্তি তো আছে।'

—'কিন্তু আনন্দ কী? অমৃত কোথায়?'

—'কী চাও তুমি।'

—'আমি?' মোক্ষদা ঘাড় ভরে একটু হাসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

—'হাসছ যে?'

—'আমি আশ্বাস চাই না কারুর কাছ থেকে।'

—'চাও না?'

—'তার বদলে একটু উল্লাস পেলেও হত।'

বিভা তার আঁচলের পাড় ধরে ঘাড় কাত করে ভাবছিল।

মোক্ষদা—'কেউ যদি আমার সঙ্গে কলকাতার খেলা নিয়ে বসত, তার সৌন্দর্যও বেশ চিত্তাকর্ষক হত।'

—'কী যে বলো তুমি।'

—'কিন্তু নারী যখন এল আমার জীবনে, এল যেন আমাকে নিরাশ্রয় পেয়ে রক্ষা করতে। রক্ষা করবার মাধুর্যটুকু তার, সে দাক্ষিণ্যময়ী, স্নেহশীলা। আমার জন্যও তার জীবনের বেদন খুঁজে আর-একটা নীড় সে বের করে দিতে পারে, আমি যেন আবার আর একটা ডানাভাঙা পাখির মত। এ সবের ভিতর ঢের মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু কোনো সাধের কথা নেই তো।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'মানুষকে আশ্বাস দেওয়াই কি তোমার কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস বিভা?'

বিভা চুপ করে রইল।

—'ধরো, আমার মত মানুষকে?'

—'কী জানি!'

—'আঃ আবার কেমন ঘাবড়ে গেলে যেন তুমি?'

—'আমি ভাবছি।'

—'আচ্ছা বেশ, ভেব, বলো।'

—'না, সে কথা ভাবছি না আমি।'

—'তবে কী?'

—থাক। তুমি কী জিজ্ঞেস করছিলে?'

মোক্ষদা বললে—'আমার মতন মানুষের জন্য রয়েছে তোমার সান্ত্বনা?'

—'সে সান্ত্বনা তুমি শেষ পর্যন্ত কত দূর মেনে নেবে তা তোমার জীবনবিধাতাই জানেন।' কিন্তু তোমার আশ্বাস সান্ত্বনা করুণা দয়া আমার জীবনের কাজে খুব লাগবে।'

—'আমার জীবন সম্পর্কে তোমার কাজ এই রকম?'

—'আমরা দিতে রাজি, কিন্তু তোমরা তো গ্রহণ কর না।'

—'কী দাও দেখে নিতে চাই।'

—নারীর কাছ থেকে দয়া দাক্ষিণ্য এ রকম পেতে খুব ঘৃণা কর তো তুমি?'

—'না, মায়ের কাছ থেকে এ সব পেতে ভালইবাসি।'

—'তারপর?'

—'তারপর, আমার কোনো বোন ছিল না।'

—'থাকলে ভাল হত নাকি?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু বত্রিশ বছর বয়সে বোনের আশা করি না। আমার মাও গেছেন মরে।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'বোন যদি আমার থাকত, তাহলে তার স্নেহমমতা জীবন পেতে গ্রহণ করতাম।'

সকলেই তো তা করে।'

—'বাস্তবিক, এই পৃথিবীর কোনো নারীরই মমতা দাক্ষিণ্যকে ঘৃণা করি না। সে বড় মূল্যবান জিনিস।'

—'কিন্তু এতদিন তো বলতে এগুলো উপেক্ষার জিনিস।'

—'তোমার কাছে এসেই বলতাম শুধু, তোমার কাছে এসে মনে হত মায়ের বোনের স্নেহসান্ত্বনার জগৎ পিছে ফেলে এসেছি।'

মোক্ষদা—'তোমার এ ঘরে ঢুকে মনে হত এ জগতের বিচিত্রতা আর-এক রকম।'

বিভা চুপ করে রইল।

মোক্ষদাও নিস্তব্ধ।

একটু পরে সে বললে—'তোমার যে সাহস নেই তা নয়।'

—'কী রকম সাহস?'

—'নারীর যা সচরাচর থাকে।'

—'কেন থাকবে না।'

—'তাই তো বলছি আছে; স্বপ্নও আছে, সাধও আছে, কিন্তু এ সব তোমার বুকের ভেতর প্রতীক্ষা করছে।'

—'না জানি তুমি কি মনে কর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কিন্তু এ সব যখন উদ্‌ঘাটিত হবে, কিংবা হচ্ছে যার কাছে, সে তোমার তখনকার সৌন্দর্য ও প্রাণের অপরূপ রূপান্তর দেখেছে না জানি কতদূর চমৎকৃত হয়।' জানালার দিকে তাকিয়ে বললে,—'যে-সব নারীর জীবনে এই অশ্রুতপূর্ব পরম মুহূ দেখবার জন্য বুভুক্ষু মানুষের কত বেশি সাধ তারা মানুষকে বুভুক্ষুই রেখে দেয়। যাদের কোনো স্বপ্ন নেই সাধ নেই সেই সব মানুষকেই করে জীবনের সঙ্গী।' বললে—'এ ঠিকই করে। এ না হলে জীবনের তামাসা সম্পূর্ণও যে হয় না। কিংবা চমৎকৃত হবার শক্তি কি তার আছে?'

একটু থেমে বললে—'সাধারণত যে-সব পুরুষ নারীর আদরের জিনিস,'হয় তাদের না থাকে কল্পনা, না থাকে কোনো বোধ, না থাকে আনন্দ পাবার অনুভূতি,'একটু কেশে বললে—'আমি ঢের দেখেছি, একটা জানোয়ারের চেয়ে তারা কোথাও পৃথক নয়, সেই জন্যই তাদের নাম পুরুষমানুষ।' বললে—'পৃথিবীর প্রেমিক যারা, তাদের প্রেম থেকে বঞ্চিত করতে হয়। যারা প্রেম চায় না, তাদের লালসার জগৎ থেকে ফিরিয়ে দিতে হয়। নইলে হাহাকারের সৃষ্টি হবে কী করে?' বললে-'আকাশটাকে ব্যথা ও বিড়ম্বনার বিশ্বাসে ভরে দিতে না পারলে সৃষ্টির সার্থকতাই-বা কোথায়?'

—'কিন্তু এই সবের ভিতর থেকেই বড় প্রেমিক, বড় কবি, মহৎ মানুষের সৃষ্টি হয়। আশ্চর্য! এই জিনিস যখন দেখি তখন কল্পনাকে তৃপ্ত করবার জন্যও একজন বিধাতাকে সৃষ্টি করতে ইচ্ছে করে, মনে হয় এত নিষ্ফলতা ও অন্ধতার নিগূঢ় উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত এই ছিল? সমস্ত দিনের সমস্ত গতিবিধি, ন্যায় অন্যায় বিচার অবিচারকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে তারপর।' বলে হ্যাটটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার আঁটল।

বিভা—'যাচ্ছ?'

—'না, যাই না।'

বরং ভাল করে স্থির হয়ে বসল মোক্ষদা। বললে—'সব নারীই অবিশ্যি তোমার মতন নয়।'

—'কী রকম?'

—'এমন একটি মেয়েমানুষ আমি খুব কম দেখেছি।'

বিভা চুপ করে রইল।

—'নারীরা সাধারণত ভান পছন্দ করে।'

—'করে কী লাভ?'

—'তাদের লাভ তারা বোঝে। তোমার কোনো লাভ নেই। জীবনটাকে পথে জয় করবার কোনো সাধ নেই তো তোমার। যথাসময়ে যথাবিধি দাম্পত্যতৃপ্তি, ও তারপর অনেকখানি নির্বিবাদ শান্তি, এই পেলেই তোমার হয়।'

বিভা কোনো কথা বললে না।

মোক্ষদা—'কিন্তু তুমি যদি একটু জয় করতে চাইতে তাহলে আমার লাভ ছিল। কতকগুলো দিন বেশ একটু নেশায় কেটে যেত।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে রইল।

মোক্ষদা—'জীবনে এই নেশার বেশ দরকার, এই বত্রিশ বছর বয়সের জীবনেও।'

'কাকাতুয়াটা খুব মোলায়েমভাবে নালিশ করছিল।'

মোক্ষদা—' কে জানে এই নেশা আমি বুড়ো বয়সেও হয়তো ছাড়তে পারব না। এক একজন মানুষ থাকে নারীকে ঘৃণা করে, তার দয়াদাক্ষিণ্যকে করে বিদ্রূপ। কিন্তু সে যদি প্রেম দিতে চায় তা হলে আজীবনের শেখা বাস্তব জীবনের সমস্ত নির্মম নীরস মূলসূত্র এক মুহূর্তে ভুলে যায়।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'আমার মনে হয় আমিও শেষ পর্যন্ত সেই জাতের পুরুষ হয়ে দাঁড়াব নাকি?' বড় বড় চোখ তুলে বিভার দিকে তাকাল মোক্ষদা। বললে—'হয়তো তাই হব, কিন্তু এখনই তেমন' একটু থেমে বললে—'আমার এ জীবনের ইতিহাস তা হলে নারীর থেকে, নারী ও প্রেমের থেকে প্রেমে বিচরণ করে নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ফতা ও হতাশা। জীবনের আমার মেক্‌আপটা বেশ সুন্দর। কিন্তু এর থেকে যদি বড় কাব্য বড় প্রেম গভীর মনুষ্যত্ব ফুটে বেরয় তাহলে হয়তো হত। কাব্য অবিশ্যি কোনোদিন তৈরি করতে পারব না, কিন্তু বড় প্রেমিক বা মহান মানুষ ইতিহাসের পৃষ্ঠার বাইরে যদি কোথাও থাকে, আমার মনে হয় ঢের ঢের রয়েছে, তাহলে একদিন তাদের দলে যেতে পাব আশা করি।'

ডাকলে—'বিভা!'

—'বলো।'

—'চুপচাপ যে?'

—'এমনিই।'

—'শোনো, তোমাকে ভালবাসার আগে আরো তিন-চারটি নারীকে পর পর ভালবেসে ছিলাম।'

কোনো কথা বললে না মেয়েটি।

একটু চুপ থেকে মোক্ষদা বললে—'প্রত্যেকবারই বুঝতে পেরেছি ভুল ঠিকানায় নেমেছি, যে-মানুষকে তারা চায়, কল্পনার আদর্শ মানবাত্মা তাকে যতই অমানুষ মনে করুক না কেন, নারীদের কাছে সে দেবতা। প্রত্যেক বারই মনে হয়েছে ভালবাসতে গিয়ে যে আঘাত পেলাম এ বুঝি কাটিয়ে উঠতে পারব না আর, এই নারীটির স্বপ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে মৃত্যু অবদি কেটে যাবে আমার। কিন্তু সমস্ত প্রেম স্বপ্ন সৌন্দর্য ও নারীর চেয়ে জীবনের নিরবচ্ছিন্ন অনিয়ন্ত্রিত স্রোতের ধারা ঢের বেশি সজীব। সেই সব নারী কিংবা তাদের ঘিরে যে প্রণয় স্বপ্ন সৌন্দর্য বেদনা জেগে উঠেছিল আজ সে সবের চিহ্নও যেন কোথাও দেখতে পাই না। জীবন এমনি সমুদ্রের মত। এ সমুদ্র এমনি করে ভেঙে ফেলে সব। এ জন্যও বিধাতাকে প্রাণের কল্পনা চরিতার্থ করে তৈরি করতে ইচ্ছা করে, তারপর ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে তাকে।' মোক্ষদা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'তুমি, তোমার সৌন্দর্য, আমার বর্তমান প্রেম ব্যথা, দুদিন পরে আমার নবজীবনের সূচনার প্রান্তে, বা রাত্রিতে, দুঃসহ স্মৃতির মত এসে আমাকে ব্যথা দেবে না আর। মানবজীবনের গতির উপর যদি নির্ভর করি, সকলকেই নির্ভর করতে হয়, তাহলে সে গতি মানুষকে এই ধরনের সাহায্যটুকু সব সময় দেবার জন্য খুবই প্রস্তুত। আমি অবিশ্বাসী, কিন্তু জীবনের এই মধুর বিস্মৃতির মান আমি খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করি। এ আমার খুব উপকারে লাগে।'

—'সকলেরই উপকারে লাগে মোক্ষদা।'

—'তোমারও?'

—'প্রত্যেকেই তো অনেক জিনিস ভুলতে চায়।'

—'বেশ। জীবনের কাছ থেকে ঢের সাহায্য পাবে।'

—'যা আমি জানি।'

—'প্রেম অবিশ্যি আমরা সকলেই করি।'

—'নিশ্চয়।'

—'একবার দুইবার তিনবার—'অনেকবার, কী বলো!'

—'তাই তো ব্যবস্থা।'

—'আঘাতেও পাই? সকলেই?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ,।'

—'এরপর তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করে।'

বিভা একটু হাসল।

—'তোমার সৌন্দর্যের জন্য নয়, তোমার আশা অনিচ্ছা করুণা দক্ষিণার জন্যও নয় বিভা।'

কাকাতুয়ার কোমল নালিশটুকু কারো কানে গেল না।'

মোক্ষদা—'তুমি যে গোপনে গোপনে কতবার কতজনকে ভালবেসেছ, ভালবাসাও পরাজিত হয়েছে, ব্যথা পেয়েছে, তারপর ভুলে গেছ সব, এই সব মাধুর্যের জন্য তোমাকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করে এখন।' এক পা হেঁটে মোক্ষদা—'আমার মনে হয় এই যে শ্রদ্ধা তোমার প্রতি আমার, আমার মনে হয় এ যেন আমার ভালবাসার চেয়েও ঢের বেশি গভীর পূজার জিনিস।'

—'চললে?'

—'না।'

মোক্ষদা কয়েক পা হেঁটে ফিরে এসে—'এখন তুমি আমাকে তাই মনে করতে পারো, আমিও তোমাকে বোন মনে করব, কোনো কুণ্ঠা নেই আজ।'

—'বসো, সোফায় বসো, দাঁড়িয়ে কেন?'

—'না যাই।'

—'বসো।'

—'আসবই তো, আবার আসব ফিরে।'

—'বসো।'

—'একটা নতুন সম্পর্ক নিয়ে ফিরে আসব। যে-মেয়েটিকে এতদিন প্রণয়িনীর মত ভালবেসেছিলাম সে আমার বোনের মত হল এই নূতনত্ব নিয়ে।'

—'বসো।'

মোক্ষদা বসল।

বিভা—'জীবনে আমি ব্যথা পেয়েছি এ কথা তুমি একদিনও বিশ্বাস কর নি?'

—'না।'

—'কী ভেবেছিলে?'

—'ভেবেছিলাম ভালবাস নি কাউকে। বাসলেও তৃপ্তি পেয়েছ শুধু। তুমিও যে আবার বিরহিণী এ কে কল্পনা করেছিল। অবিশ্যি বিচ্ছেদ এখন গতজীবনের জিনিস, ব্যথা আর নেই, কিন্তু পেয়েছিলে তো। বার বার পেয়েছিলে। বারংবার ভালবেসে! আশ্চর্য তুমি বিভা!'

—'যদ্দিন বেদনা পাই নি মনে করেছিলে'—বিভা চুপ করল।

মোক্ষদা—'হ্যাঁ। ততদিন তোমাকে ভালবেসেছি। কিন্তু সহানুভূতি করতে পারি নি।'

—'পার নি তুমি?'

—'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কেন?'

—'তোমাকে বড্ড দূর বলে মনে হত।'

—'কোন হিসেবে।'

—'নারী হিসেবে তোমাকে খুব আকাঙ্ক্ষার জিনিস মনে হত, কিন্তু এক এক সময় তামাসার মুহূর্তে কখন মনে হত তুমি নারীও শুধু নও, জীবনের বিচারে মানুষ বলে প্রমাণ করবারও দরকার আছে তোমার, তখন কেমন যেন অশ্রদ্ধা হত তোমার ওপর।'

—'মনে হত জীবনের কাছে আমার নিজেকে পরের প্রণয়পাত্রী বলে দাঁড় করাবার শক্তি আছে শুধু?'

—'হ্যাঁ। তাই ভাবতাম।'

—'কিন্তু বেদনাতুর মানুষের'—বিভা একটু থামল, বললে—'কিন্তু বেদনাতুর মানুষের সার্থকতা আমি পাই নি; এই মনে হত।'

—'হ্যাঁ।'

—'সেইজন্য ভালবাসার মোহ ছিল বুঝি তোমার মনে! আমার জন্য?'

—'হ্যাঁ বিভা।'

—'কিন্তু বিশেষ কোনো সমবেদনা বোধ করতে না আমার জন্য?'

—'মনে হত আমার ভালবাসার নেশা কেটে গেলে তুমি অপ্রাসঙ্গিত হয়ে দাঁড়াবে। প্রেম নিয়ে নারী নিয়ে আগেও ঢের অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা জীবনে।'

—'তা ঠিক। কিন্তু আমার জন্য কোনো সহানুভূতি বোধ করতে না?'

—'সাধারণ মানুষের জন্য যতটুকু তার বেশি না।'

বিভা চুপ করে রইল।

মোক্ষদা—'সাধারণ মানুষের জন্য আমার যা সহানুভূতি তা অন্য যে কোনো সাংসারিক স্বাভাবিক মানুষের মত। কাজেই বিশেষ কোনো জিনিস নয়, অনেক সময় কোনো কাজেও লাগে না।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা,—'কিন্তু সহানুভূতিটুকুও তোমাকে শিগ্‌গির দিতে পারতাম না। অনেক দিন পর্যন্ত একটা অবজ্ঞার ভাব থাকত।'

এই বলে মোক্ষদা থামল। একটু কেশে বললে—'দেখো, সেই যে একটা মেয়েমানুষের কথা বলেছিলাম তোমাকে তাদের কথা মনে হলে আজও কেমন একটা উপেক্ষা, মাঝে-মাঝে অবজ্ঞার ভাবও, আসে আমার মনে।'

বিভা একটু কাশল।

—'আজও তাদের সাধারণ মানুষের মত সহানুভূতি করতে পারছি না আমি।' মোক্ষদা—'কেন জানো?'

—'বলো।'

—'তাদের ভালবাসতে গিয়ে নিষ্ফলতার আঘাত পেয়েছি বলে নয়।' হ্যাটটা মাথার ওপর থেকে খুলে মোক্ষদা—'না সেইজন্য নয়। কিন্তু বরাবরই মনে হয়েছে এই যে প্রেমকে বরাবরই তারা একটা শৌখিন খেলা খেলল। প্রেমকে পূজার জিনিস বলে বুঝল না কোনোদিন। কিন্তু এসবও ক্ষমা করতে পারা যায়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অপরাধ তাদের এই যে নিবিড়, আন্তরিক বেদনার আঘাত পেল না কোনোদিন। মানুষের জীবনের হাহাকারকে বুঝলে না।'

মোক্ষদা একটু থেমে বললে—'সেইজন্য আজও যখন তাদের কথা মনে হয়, কেমন একটা উপেক্ষার ভাব আসে, পথের পাশের একটা জুতাবুরুশকে আমি যতদূর সহানুভূতি করতে পারি তাদের তা পারি না।'

একটু হেসে মোক্ষদা বললে—'একজন জুতাবুরুশ কিংবা যে কেরানির জুতো সে বুরুশ করে দিচ্ছে, এদের দু'জনকেই যেন ভাল লাগে আমার। কারণ জীবনটাকে পদে পদে একটা আঘাতের জিনিস বলেই তারা জানবার অবসর পায়, বেঁচে থেকে মানুষের জীবনের মর্মান্তিক অবিচারের স্রোতে তারা ভাসতে থাকে, বোঝে যে জীবন মানে এমনি ভেসে চলা—

মোক্ষদা একটা চুরুট বের করল পকেট থেকে।

বিভা—'ভালবেসেছি, ভালবেসে ব্যথাও পেয়েছি, কিন্তু তাই বলে বেদনা অবিচারের স্রোতে ভেসে চলেছি বলে মনে করি না।'

—'কিন্তু ভাল তো বেসেছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'ব্যথাও পেয়েছ, ভালবাসতে গিয়ে?'

—'তাও পেয়েছি।'

—'হয় তো বারবারই পেয়েছ?'

—'তুমি তো শুনলেই।'

—'তবে আর কি? এটুকু বুঝতে পারলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তারপর তোমাকেও আমি অন্ধ জীবনস্রোতের জীব বলে মনে করি। সাধারণ বেদনাতুর মানুষের মহিমা বোধ করি তোমার ভিতর। তোমাকে আমার সমস্ত আন্তরিক সহানুভূতি জানাতে গিয়ে একটুও কুণ্ঠা থাকে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুরুটটা পকেটের ভিতর ফেলে দিয়ে মোক্ষদা—'তুমি অবিশ্যি মনে করতে পার যে—হতাশা ও ব্যথা তুমি পেয়েছ সে-সব হল পায়ের তলে জিনিস-হৃদয় দেখবে নক্ষত্রের স্বপ্ন। বেশ। এ নিয়ে আমিও খানিকটা কবিতা করতে পারি। কিন্তু বাস্তব জীবনে তোমার সঙ্গে ব্যবহারে এ সমস্তই অপ্রসঙ্গিক জিনিস, প্রয়োজনীয় সত্য হচ্ছে তোমার প্রেম ও যাতনার কাহিনী।'

—'প্রেম কি সকলকেই বোধ করতে হবে? পুরুষ নারীর এই প্রেম?'

—'এ তো একটা কর্তব্য নয় বিভা, খুব মহিমার জিনিস। সব সাধারণ অসাধারণ মানুষই তা বোধ করে।'

—'কিন্তু যদি কেউ বোধ না করে।'

—'তাহলে সে আমার সহানুভূতি পা নো।'

—'যদি কোনো পুরুষ বা নারীকে না ভালাবেসে কেউ পৃথিবীর সমস্ত মানুষদের ভালবাসতে যায়।'

—'সেটা একটা অবাস্তব জিনিস।'

—'অনেক বড় বড় লোক তো তাই করেছেন।'

—'সে সব মাতলামির গল্পে আমি বিশ্বাস করি না।'

—'কত সুন্দর সুন্দর কবিতা তো আছে এই নিয়ে।'

—'সেগুলোর যদি ছন্দ ভাষা ঠিক থাকে তাহলে সে সবের ভেতর ঐটুকু মাত্রই সত্য।'

—'কিন্তু এ সব কবিতা আমি তো খুব পড়ি।'

—'পড়ো।'

—'ভাল লাগে খুব।'

—'ভাল কথা।'

—'মুখস্তও করি।'

—'কবিতা আমিও মাঝে-মাঁঝে মুখস্ত করি-আওড়াতে বেশ সুন্দর লাগে বলে।'

—'না, সেজন্য নয়; আমি খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করি।'

—'এসব কবিতা?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার জীবনের সামঞ্জস্য এতে বেশ বজায়ই থাকে।'

—'কী রকম?'

—'কিছু মনে করে না। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার জীবন বিধাতার একটি নিগূঢ় ঠাট্টার জিনিস তুমি। ঠাট্টা তুমি ধরতে পার না বলেই আমার কাছে তা আছে। মর্মান্তিক বলে মনে হয়।'

বিভা একটু কাশল। পরে হাসতে হাসতে বললে,—'কী যে ভাব!'

—'জীবনটাকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে দেখো। একদিন হয়তো বা আমার কথার স্বার্থকতা বুঝতেও পারবে।'

—'তোমার ঠাট্টাটা তো আজই বুঝতে পারছি।'

'আমি অবশ্যি ঠাট্টা করছি না; তোমার জীবনের এই গুরুতর ব্যাপার নিয়ে আমি সত্য কথাই বলছি বিভা।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'যারা বলে জীবন অপরাজেয়, চারদিককার নিষ্ফলতা ও বেদনার ভিতর যারা চলেছে জীবনকে জয় করতে, গঙ্গাফড়িং যেমন সমুদ্রকে জয় করবার জন্য যাত্রা করে, সমস্ত হতাশা ও অন্ধকার ভেদ করে যারা আশার স্বপ্ন দেখছে শুধু, আমার মনে হয় তাদের জীবন বিধাতা তাদের নিয়ে একটা তামাশার খেলা খেলছে শুধু। সূচ দিয়ে প্রজাপতির বুক ফুটো করে সুতো বেঁধে ছোট-ছোট শিশুরা যেমন করে খেলে।'

—'তাও খেলে নাকি?'

—'খুব।'

—'কোথায় দেখলে?'

—'আমি নিজেই তো কত খেলেছি।'

—'তুমি?'

—'হ্যাঁ, যখন ছোট ছিলাম, চারদিককার অন্ধ জীবনের তালে তালে আমার এখনকার মনের স্পন্দনই ছিল সবচেয়ে বেশি সঠিক', মোক্ষদা মাথায় হ্যাট এঁটে বললে—'এখন শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার পেয়ে নিজের হৃদয়টাকেও প্রজাপতির মতন ফুটো করে ফেলতে শিখলাম। চারদিককার বুকের বেদনা দেখে এলাম অস্থির হয়ে।' পকেটের থেকে চুরুট বের করে বললে—'এর কোনো প্রয়োজন ছিল বিভা? সেই ছোটবেলার জীবনই তো বেশ ছিল। চারদিককার গাছপালা পাখি এবং ফড়িং জোনাকির চেয়ে জীবনের কোথাও কোনো প্রভেদ ছিল।' চুরুট জ্বালাল। কিন্তু জ্বালিয়েই নিভিয়ে ফেলে বললে—'আমাকে ক্ষমা কর।'

—'কেন? যাও তুমি, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

চুরুটটা পকেটের ভেতর রেখে দিয়ে মোক্ষদা—'দেখ একটা ঘুঘু পাখির সমানে বসে আমি কখনো ছারপোকাও মারতে যাই না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভা হেসে উঠল।

মোক্ষদা—'সত্যি।' উঠে দাঁড়াল।

বিভা—'চললে?'

—'না। চলব কোথায়? তোমাদের এই পাশের ঘরে একটু যাচ্ছি।'

—'কেন?'

—'ফোন করবার জন্য।'

—'কাকে?'

—'চিড়িয়াখানায়।'

—'ও, ভুলেই গিয়েছিলাম। কাকাতুয়াটাকে তারা নিতে পারে।'

—'তা পারে।'

—'কিন্তু পাখিটাকে ছাড়তে ইচ্ছা হয় না।'

—'এই না বললে এর একটা ব্যবস্থা করতে!'

—'বলেছিলাম তো। কিন্তু এখন তো আর চিৎকার করে বিরক্ত করছে না!'

—'পাঁচ মিনিট পরেই তোমাকে অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে আবার।'

—'দেখো, কেমন করুণভাবে তাকাচ্ছে!'

—'ভেবে দেখো, ফোন করব কিনা?'.

—'পাখিটা ভারি মিষ্টি কী বলো?'

—'তাহলে আমি যাই, উঠি।'

—'বসো-না।'

—'ফোন অবিশ্যি নিজেও করতে পারবে, যদি দরকার হয়।'

—'কিন্তু কেনই-বা চিড়িয়াখানায় এটা দিয়ে দেব? আমি নিজেই কি এটাকে শান্তিতে রাখতে পারব না।'

—'শান্তিতে রাখবার আগ্রহ অবিশ্যি তোমার আছে।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'ভেবে দেখো।'

—'তুমি যেও না।'

মোক্ষদা কাকাতুয়াটার দিকে তাকিয়ে বললে—'আমার মনে হয়, তুমি নিজে শান্তিতে থাকতে পারবে না।'

—'এই পাখিটা কাছে থাকলে?'

—'হ্যাঁ। শুধু চিৎকারেই যে তোমাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে তা তো নয়, তুমি নিজেও বোধ করি নিজেকে খাঁচার কাকাতুয়া মনে করে একটা অপ্রাসঙ্গিক যন্ত্রণা অনেক সময়ই অনুভব করবে', মোক্ষদা—'এও ভাববে, বিধাতা প্রতিটি কোটি কোটি কোটি কীট ফড়িঙের জন্যও কত মঙ্গলের ব্যবস্থা করে রেখেছে। কিন্তু আমি একটা মাত্র পাখির দায়িত্ব নিয়ে একে কোনো তৃপ্তি দিতে পারলাম না।'

—'তা তো মনে হয় মাঝে-মাঝে।'

—'হ্যাঁ, এই সব ভেবে দুঃখ পাবে তুমি।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'এই সব অবান্তর বেদনা কেন পেতে যাও?'

—'কী করব তাহলে?'

—'একে কিছুতেই তো শান্তি তৃপ্তি দিতে পারবে না।'

—'এ রকম অকর্মণ্য হয়ে গেলাম কী করে?'

—'অকর্মণ্য নয়, অনেককে খুব পরিপূর্ণ চরিতার্থতা দেবার শক্তি তোমার আছে। তাদের জীবন এই কাকাতুয়াটার চেয়ে ঢের বেশি জটিল ও গভীর। কিন্তু তবুও তাদেরকে সম্পূর্ণ সার্থকতা দেবার অধিকার তোমার জীবন তোমাকে দিয়েছিল। তুমি অবহেলা করলে। ব্যস্ত রইলে একটা কাকাতুয়া নিয়ে,' একটু থেমে মোক্ষদা—'এ রকমই হয়, নিছক বেদনা যদি কোথাও থাকত তাহলে তাকে পরাজয় করা হয়তো-'বা সম্ভবও হত। কিন্তু সঙ্গে তার সব সময়ই বিড়ম্বনা মিশে রয়েছে যে?'

বিভা একটু চুপ করে থেকে বললে—'তাহলে এই কাকাতুয়া?'

—'এই কাকাতুয়াটার চেয়ে ঢের বড় জীবন নিয়ে তোমার বসে পড়া উচিত ছিল। হয়তো—বা বসেও গেছ। সেদিককার সফলতা তোমার অবধার্য।'

—'কিন্তু এই কাকাতুয়া?'

—'হ্যাঁ, এই কাকাতুয়ার মত ছোট জীবন সামলাবার ভার ছোট মানুষদের হাতে। তোমার হাতে নয়। তুমি একে ভাল করে বুঝবেও না। মমতা মায়ার অপব্যয় করবে শুধু। কিন্তু এর সমস্ত চিনেও খাঁচার জীবনের সম্পর্কে বর্তমানে এর 'কী দরকার, গায় পোক পড়েছে কি না, পালক কেন খসে যাচ্ছে, পা মচকে দেবার প্রয়োজন আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনা, অন্য কোনো কাকাতুয়ার সঙ্গে যাচ্ছে নাকি, ডিম পাড়তে চায় কিনা, হয়তো সন্তানের সাধ বোধ করছে, এ রকম অনেক, মজার জিনিস কিন্তু খুব দরকারি জিনিস। সেইসব ছোট ছোট মানুষদের এলাকায়।'

বিভা মন দিয়ে শুনছিল। বলল—'ঠিকই বলেছ।'

মোক্ষদা ঘাড় হেঁট করে পাইচারি করছিল।

বিভা—'আমরা এ পাখিটার মিষ্টত্বটুকু শুধু বুঝি।'

—'কিংবা বুঝি এ বড্ড হাড় জ্বালায়।'

—'একে নিয়ে মাঝে-মাঝে কবিতা করতে পারি।'

—'কিন্তু এক-এক সময় একে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে ইচ্ছে করে।'

—'তা অবিশ্যি করে না।'

—'আমি ফোন করে দেই।'

—'চিড়িয়াখানায়? দাও।'

মোক্ষদা যাচ্ছিল।

বিভা—'শোনো।'

—'কী মতলব হল আবার?'

—'তাকিয়ে দেখ তো, পাখিটা কেমন মিষ্টি।'

মোক্ষদা সোফায় বসল।

—'মুখে কেমন নিরীহ নিরপরাধ ভাব।'

—'এ রোদের মধ্যে পাখিটাকে দেখতে বেশ ভাল লাগছে। ভাল লাগছে না?

—'এ বেশ একটা সুন্দর জীব তোমার কাছে আছে, এই তো ভাবো?'

—'হ্যাঁ, ভাবি।'

—'এ চলে গেলে তোমার ঘরটা কেমন একটু শ্রীহীন হয়ে পড়বে। তোমার জীবনটাও। এই তো মনে করো তুমি?'

বিভা প্রসন্নভাবে হেসে মোক্ষদার দিকে তাকাল।

মোক্ষদা—'তাছাড়া এই কয়দিন একসাথে থেকে মায়াও ধরে গেছে।'

—'এ কথাও আমি ভেবে দেখেছি যে ভগবান এত দিক ঘুরিয়ে পাখিটাকে যে আমার কাছেই এনে রাখলেন, এর ভেতরেও কেমন যেন সুন্দর মঙ্গল ইঙ্গিত রয়েছে।'

—'সাড়ে তিনশ টাকা দিয়ে কিনেছিলে?'

—'হ্যাঁ, দুটো পাখিই।'

—'আর-একটা কই?'

বিভা একটু চমকে উঠে বললে—'ভুলেই গিয়েছিলাম।'

—'আরো একটা কাকাতুয়া আছে?'

—'না, সেটা ময়না।'

—'ও। তাইতো বলেছিলে, মনে পড়েছে।'

—'কিন্তু সেটা নেই।'

—'কোথায় গেল?'

—'বিড়ালে খেয়ে ফেলেছে।'

মোক্ষদা একটু চুপ করে থেকে বললে—'ইঙ্গিতের কথা বলছিলে, এই তো ইঙ্গিত।'

বিভা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—'আমার বড় দুঃখ করে এই কথা ভেবে যে তুমি ক্রমাগত জীবনের সার্থকতার বিরুদ্ধে কথা বল। যে-পাখিটা মরে গেছে তার কথা ভেবে একবার অপেক্ষা করলে না। তার মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে বিধাতাকে করলে ঠাট্টা।' মোক্ষদা সোফায় নিজের শরীরটা এলিয়ে দিয়ে খুব ভাল ছেলের মতন হাসতে লাগল।

বিভা—'যাও, ফোন করো গিয়ে।'

—'কেন?'

—'না। এসব পাখি আমি আর রাখব না।'

—'থাকুক। তোমার কাছেই এরা থাক।'

—'সত্যি বলছি, আমি আর রাখব না।'

—'আমিও তোমাকে ঠাট্টা করছি না। খুব গভীর বিশ্বাসে আমি বলছি বিভা যে তোমার এই ঘরেই এই কাকাতুয়াটার খুব বেশি ভরসা।'

—'যাই, আমি নিজেই ফোন করি গিয়ে।'

মোক্ষদা সোফার ওপর শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ পরে বিভা ফিরে এসে বললে—'নিতে রাজি হয়েছে, একটা মোটরে করে পৌঁছিয়ে দিলেই হল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'চলো তাহলে।'

—'চলো।—কিন্তু একবার ভেবে দেখ।'

—'না। কোনো কথা ভেবে দেখতেই আমি আর রাজি নই।'

—'ভেবে দেখো, আজ রাতে—'

—'রাতে কী আবার?'

—'কী রকম দারুণ শীত পড়বে।'

—'পড়ুক।'

—'পাখিটার খাঁচাটাকে তুমি কেন কম্বল দিয়ে মুড়ে রাখতে।'

—'তারা কি রাখবে না?'

—'তাদের কত পাখি। ভুলেও তো যেতে পারে। যেখানে এত প্রাণ নিয়ে কারবার, সেখানে সব সময় সকলের প্রতি ঠিক বিচার কি হয়?'

বিভা পোশাক পরতে যাচ্ছিল। কিন্তু চুপ করে দাঁড়াল। সোফায় এসে বসল আবার। বললে—'কেন আমার সঙ্গে এ রকম খেলা কর তুমি?'

—'খেলা করলাম।'

—'জানই তো এরকম কথা শুনলে আমার কষ্ট হয়।'

—'তা তোমার হয়। কিন্তু আমি কী করব? আমার অপরাধ কোথায়?'

—'কেন, মনে করিয়ে দিতে যাও আমাকে?'

—'বিপদ।'

—'আজ রাতে শীত পড়বে-পাখিটা কম্বল না-ও পেতে পারে। সারারাত শীতে কষ্ট পেতে পারে। নিজের বিচার কল্পনাতে এ সব কথা তো আমি বুঝেও দেখি নি, কোনোদিন মনের ভেতর উঠত কিনা তাও সন্দেহ। কেনই-বা সব খুলে দেখাতে গেলে? এ রকম আঘাত করা তোমার কি উচিত?'

—'তাই তো।

—'তা হলে বসো।'

—'কেন?'

—'দাঁড়িয়ে থাকার তো কোনো মানে নেই।'

—'বেরিয়ে যাব না?'

—'কোথায়?'

—'দু-পা যেদিকে চালায়—'

—'চিড়িয়াখানায় যাওয়া আজ আর হবে না।'

—'নাই-বা হল।'

—'কোনোদিনও হবে না।'

—'বেশ কথা।'

—'তাহলে বসতে আপত্তি কি?'

—'আমি ভাবছিলাম বাসায় যাব।'

—'বসো।'

মোক্ষদা আবার সোফায় বসল।

বিভা—'বাস্তবিক তোমাকে বকেছিলাম?'

—'কই?'

—'কিন্তু তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

—'কেন?'

—'তোমার হাতটা আমাকে দাও।'

ডান হাত বাড়িয়ে দিলে। বিভা মোক্ষদার হাতটা তার হাতের ভেতর নিয়ে বললে—'এই পাখিটার তুমি কত উপকারী বন্ধু যে এও তা বুঝেছে বোধ করি, দেখো।'

—'উপকারী বন্ধু?'

—'তোমার হাত এত ঠাণ্ডা কেন?'

—'তোমারটা বেশ গরম তো।'

—'ঠিক কথাই বলেছ। কম্বল না-ও দিতে পারত।' মোক্ষদার হাতটা ছেড়ে দিল বিভা। বললে—'এখন শীতও খুব বেশি। সারারাত পাখিটার কী কষ্ট হত, ভেবে দেখো তো।'

মোক্ষদা কোনো জবাব দিল না।

বিভা—'উঠলে যে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না, আমি একটা কথা ভাবছিলাম।'

—'কী?'

—'এ পাখিটাকে ছেড়ে দিলেও তো হয়।'

—'কোথায় ছেড়ে দেবে?'

—'এই জানালা দিয়ে—'

—'তাহলে হয়তো পাশের বাড়িতে গিয়ে পড়বে, বিড়ালে খেয়ে ফেলবে।'

—'চলো, তাহলে জঙ্গলে ছেড়ে দিই।'

—'জঙ্গল কোথায়?'

—'টালিগঞ্জের ওদিকে।'

বিভা ভাবছিল।

মোক্ষদা—'হ্যাঁ, সেটাই এর পক্ষে সবচেয়ে তৃপ্তির জিনিস হবে। এই যে চিৎকার, এ শুধু আকাশে উড়ে ফিরবার জন্য।'

কাকাতুয়াটার কাছে এগিয়ে গিয়ে মোক্ষদা—'এই দেখো, কেমন নিজের বুকটা কামড়ে জখম করছে।'

—সত্যিই পাখিটার এ-রকম আত্মনির্যাতনের প্রতিকার আমিও করতে পারব না। চিড়িয়াখানার লোকেরাও করতে পারবে না।'

—'একে যদি এক্ষুণি ছেড়ে না দেওয়া যায় তাহলে দুদিন পরে তুমিই হয়তো তোমার বাবার সঙ্গে গিয়ে আলিপুরে দিয়ে আসবে। সেটা কি ঠিক জিনিস হবে?'

বিভা মাথা নেড়ে বললে—'তার চেয়ে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।'

—'যে সংসর্গের কথা বলছিলাম, স্বাধীন অবস্থায়ই তা ঢের বেশি ভোগ করতে পারবে। ডিম পাড়তে পারবে। নীড় তৈরি করবে। সন্তানের সাধ মেটাবে। তার-পর নীল আকাশ রোদ জ্যোৎস্না তো আছেই।'

বিভা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে, 'দাঁড়াও, আমি মোটরটা তৈরি করতে বলি,' ফিরে এসে বললে—'চলো।'

চলছিল। 'হাঁটতে-হাঁটতে বিভা—'সুদর্শনকে সঙ্গে নেয়া যাক।'

—'কেন?'

—'একজন চাকর সঙ্গে থাকা ভাল।'

—'এটুকু চাকরের কাজ আমিও কি করে নিতে পারব না?'

—'সুদর্শনকে ডাকা যাক।

—'শোনো বিভা।'

—'বলো।'

—'তুমিই তো বলেছিলে কলকাতার ফুটপাতে সারারাত হাঁটতে পার, যদি তোমার বাবা সঙ্গে থাকে।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে একটু লজ্জিত হয়ে দাঁড়াল।

মোক্ষদা—'এখনকার প্রস্তাবটাও তোমার ঠিক তেমনি।'

—'কিছু মনে করো না।'

—'মনে করি শুধু এই-যে সাহস তোমার আছে, কিন্তু সাহসটা খরচ করতে ভয় পাও। আচ্ছা বেশ। জমিয়ে রেখো। আমি চললাম।'

—'শোনো।'

—'আবার ডাকলে?'

—'আমার অপরাধ ক্ষমা করো।'

মোক্ষদা একটু হেসে বললে—'বলিহারি তোমার, এ দু'মিনিটের মৌখিক পরীক্ষাটুকু বেশ পাকা মাস্টারের মতই করে নিলে। বেশ বেশ।'

দু'জনে নিচে নেমে গেলে।

এদের অনুসরণ করতে হয়। আমি একটা ট্যাক্সি করলাম। ট্যাক্সি করেছিলাম সে প্রায় বার বছর আগে। সেও আমার কাকার জন্য। কিন্তু আজ আবার করতে হচ্ছে তো। সমস্ত মাসের হাতখরচের পয়সা ড্রয়ার থেকে গুছিয়ে নিয়ে কেরায়া করে যখন বসেছি তখন বিভাদের গাড়ি আস্তে আস্তে চলছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললাম—'টালিগঞ্জে যেতে হবে, এই মোটরটার পেছনে—পেছনে।'

একটা পাড়াগাঁর মত জায়গায় গিয়ে ট্যাক্সি থামল। চারদিকে বাঁশের, আশ-শেওড়া—ভাঁটের বনজঙ্গল, সুপুরি-নারকেলের সার। দু-তিনটে কুঁড়ে ঘর। খানিকটা দূরে একটা একতলা দালান। ট্যাক্সি থেকে যখন নেমেছি কাকাতুয়াটাকে ছেড়ে দেওয়াও হয়েছে। বিভা উড়িয়ে দিলে।

কাকাতুয়াটা উড়ে গিয়ে একটা ছোট নারকেল গাছের ওপর বসল। তাকিয়ে দেখলাম বিভার বড় ফুর্তি। বললে—'এ আমার ডায়রিতে লিখে রাখব।'

মোক্ষদা—'লিখো।'

—'কী শুভ মুহূর্ত-না বলো দেখি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'খুব তো।'

—'একটা চড়াই তো ছেড়ে দিতে পারা যেত, কিন্তু তার ভেতর কি এত চরিতার্থতা?'

—'তা হয় না।'

—'অবিশ্যি প্রাণীই তো সব।'

—'তা ঠিক।'

—'কিন্তু এই কাকাতুয়াটাকে আমার মনে হত যেমন একজন দেবতা, কে যেন অভিশাপ দিলে, রূপান্তরিত হল, ম্রিয়মাণ হয়ে খাঁচার জীবন চালাতে লাগল।'

—'এ কল্পনা তোমার খুব সুন্দর।'

—'কিন্তু এ রকম হওয়া সম্ভবও তো?'

—'সেই সেকালে শোনা যেত।'

—'আচ্ছা, কাছে তো কোথাও কাকাতুয়া নেই, ও কী করে ওর ঘর চিনবে?'

—'ঘর আপাতত নেই, বানাতে হবে।'

—'কোথায়?'

—'হিমালয়ের দিকে এগুলো থাকে নাকি? ঠিক বলতে পারি না। হয়তো সুমাত্রায় জাভায় বোর্নিওতে।'

—'টেরিটিবাজারের লোকটি বলেছিল, সিঙ্গাপুরের কথা।'

—'তাও হতে পারে।'

—'অদ্দুর কী করে যাবে?'

—'কেমন সুন্দর দুটো ডানা রয়েছে তো!'

—'কিন্তু উড়ছে না কেন?'

—'অনেক দিনের অভ্যাস নেই কি না।'

—'তাছাড়া এ যে ছাড়া পেয়েছে আমার মনে হয় তাও ভাল করে বুঝতে পারে নি।'

একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। মোক্ষদার দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে বললে—'আপনারা এখানে কী চান?'

—'কিছু না।'

—'কিছু না কী রকম? আমার মৌজায় ঢুকলেন কাকে বলে?'

—'আপনার মৌজা?'

—'ভেবেছেন সাহেবি পোশাক পরেছেন বলে ব্রাহ্মণের বাগানবাড়িতেও ঢুকতে পারা যায়, না বলে কয়ে? তা এটা ফিরিঙ্গি পাড়াও নয়, কলকাতাও নয়। এমন দশ-বিশটা সাহেব সেক্রেটারিও আছে আমার।'

মোক্ষদা—'বেশ আমরা চলে যাচ্ছি। আমাদের যা দরকার তা হয়ে গেছে। বিভা তুমি আরো থাকতে চাও নাকি?'

বিভা কাকাতুয়াটার দিকে একবার সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে বললে—'থাক, উড়ে তো যাবেই, কিন্তু দেখে গেলে পারতাম।'

মোক্ষদা—'তাহলে দেখো।'

ভদ্রলোকটিকে মোক্ষদা বললে—'আমরা একটা কাকাতুয়া নিয়ে এসেছিলাম, জঙ্গলে উড়িয়ে দেবার জন্যে।'

—'কাকাতুয়া জঙ্গলে উড়িয়ে দেবার জন্য? এ কি লোটন পায়রা নাকি যে উড়িয়ে লুটিয়ে খেলবার জিনিস? খপ করে একটা মিথ্যেকথা বলে ফেললেন।' লোকটির চিৎকার হা হা করে কয়েকজন ছোকরা ছুটে এল।

ভদ্রলোক—'কার কাকাতুয়া মশায়!'

—'আমার কাকাতুয়া।'

—'আপনার কাকাতুয়া? শুনেছ গোবর্ধন, ঐ নারকোল গাছের কাকাতুয়াটা নাকি এই সাহেবের। উড়িয়ে দিতে এসেছিলেন।

গোবর্ধন বললে—"পাগল না ছাগল। যা যা কেলো, গাছে চড়ে কাকাতুয়াটাকে পেড়ে নিয়ে যা।'

—'আচ্ছা বেএক্তার করলে দেখছি। আমার মৌজায় ঢুকে আমারই পাখিকে বাপ ডাকা।'

—'আবার সাহেবি পোশাক পরে এসেছে।'

—'বলে দিয়েছি, অমন দশ-বিশটা সাহেব আমার জুতো বুরুশ করে দেয়।'

—'সঙ্গে আবার একটা মদ্রাজি ছুঁড়ি এনেছে।'

মোক্ষদা—'কাকাতুয়াটাকে আবার বাসায় নিয়ে যাবে বিভা? বলো তো ওটাকে আবার ধরে নিয়ে আসি।'

বিভা—'বড্ড ভুল জায়গায় ছাড়া হয়েছিল।'

—'বেশ তো, ঠিক করে আবার ছাড়ি, না হয় পেড়ে বাসায় নিয়ে যাই, শিগগির যে উড়বে বলে মনে হয় না।'

এমনি সময় কেলোর একটা মস্ত বড় ইটের আঘাতে কাকাতুয়াটার ঝপ করে মাটিতে পড়ে এক-আধ মিনিট ধড়ফড় করে মরে গেল।

ভদ্রলোক—'গোবর্ধন, একটা কাঁচি নিয়ে এসো তো। আর হাড়মাস তুমি এই নারকেল গাছের সঙ্গে বাঁধো। হারামজাদার দুটো কানই আমি কেটে দেব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোবর্ধন মজা পেয়ে কাঁচি আনতে গেল।

—'আহা আপনার নিজের ছেলে, সামান্য একটা কাকাতুয়ার জন্য?'

—'সামান্য কাকাতুয়া! বাঁধো তুমি রাস্কেলকে। ডিসিলভা সাহেবের কাছে এই কাকাতুয়া বেচে আমি দুশ টাকা পেতাম।'

—'একটা বুড়ো কাকাতুয়া তো!'

—'ও কান আমি কাটবই।'

—'আপনার মত মহাজনের কাছে দুশ টাকা কি একটা টাকা হুজুর?'

—'না, না, কান কেটে তবে কথাবার্তা বলব তোমার সঙ্গে।'

তাকিয়ে দেখি মোক্ষদা ও বিভা কাকাতুয়াটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক—'আপনারা কী চান?'

—'এটাকে নিয়ে যাব।'

—'তা পঞ্চাশ টাকার কমে হবে না।'

—'এটা তো আমাদেরই জিনিস।'

—'উকিল লাগান গিয়ে।'

মোক্ষদা কাকাতুয়াটাকে তুলে ধরল।

ভদ্রলোক—'মিছিমিছি ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে মার খেতে চান!'

আশেপাশের গাছে গাছে অনেকগুলো শকুন এসে বসেছিল। মোক্ষদা কাকাতুয়াটাকে সেই শকুনগুলোর দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা বিরাট কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

বিভা হাঁটতে-হাঁটতে বললে—'কি যে ব্যাপার।'

আস্তে আস্তে তাদের পিছে-পিছে হাঁটছিলাম আমি।

—'কেই-বা জানত এরকম হবে?'

—'মরত তো একদিন।'

—'কিন্তু এ রকমভাবে মরা?'

—'শকুনগুলোর কথা ভাবছ বোধ করি। ওরা মাংস ছাড়া খায় না। মাছ খাবে না।'

বিভা নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

মোক্ষদা—'কিন্তু কাকাতুয়াটার তো এখন কোনো বোধ নেই আর, তার কাছে তুমিও যা, শকুনও তা।'

বিভা খানিকক্ষণ চুপ করে বললে—'যাক, সবথেকে বড় স্বাধীনতা পেয়েছে।'

—'হ্যাঁ। কোনো রকম ঝকমারিই নেই এখন আর।'

একটু চুপ থেকে বিভা—'তুমি হয়তো গোড়ার থেকেই ভেবেছিলে যে পাখিটা এই রকম করে মরবে।'

—'আমি? না, তা ভাবি নি অবিশ্যি।'

—'আচ্ছা, ভদ্রলোক আমাকে মাদ্রাজি বললেন কেন?'

—'মেয়েমানুষদের সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট নয় হয়তো।'

—'আমি কি মাদ্রাজি মেয়েদের মত দেখতে?'

—'আমার তো তা মনে হয় না।'

—'না, ঠিক করে বলো।'

—'কী জানি, মাদ্রাজি যুবতীদের আমি ভাল করে দেখি নি।'

—'আমি দেখেছি, কিন্তু আমার ভাল লাগে না তাদের।'

—'কেন?'

—'হয়তো তাদের বেণী বাঁধবার বা কাপড় পরবার ধরনটা পছন্দ হয় না। কিন্তু মুখ তো ভাল। নাক চোখ ঠিকঠাক, কিন্তু তবুও কেন যেন মনে ধরে না আমার।'

মোক্ষদা কোনো জবাব দিল না।

বিভা—'কেন বলো তো?'

মোক্ষদা একটু হেসে—'ঐ ভদ্রলোক তোমাকে মাদ্রাজি বলেছে বলে হয়তো।'

বিভা হেসে বললে—'আচ্ছা এ রকম ভদ্রলোকও থাকে?'

—'দেখলে তো রয়েছে।'

—'ছেলেটার কান কেটে দেবে?'

—'না। মনে হয় না। এদের রাগ খুব সহজে পড়ে যায়। আমাদের মারতেও তো এল না।'

—'অবিশ্যি মাদ্রাজি মেয়েরা খুব বুদ্ধিমতী।'

—'নিশ্চয়ই।'

—'মানুষ হিসেবেও তারা যে-কোনো মানুষের মতই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'খুব।'

—'আমি শুধু তাদের সৌন্দর্যের বিশেষত্বের কথা বলছিলাম।'

—'তা বুঝেছি।'

—'ইহুদি মেয়েদের দেখেছ?'

—'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি।'

বিভা একটু থেমে—'তাদের রূপ তোমার কেমন লাগে?'

—'বেশ তো।'

—'পার্সিদের?'

—'তারাও খুব সুন্দর।'

—'আচ্ছা, কলকাতায় আর্মানি বলে এক জাত আছে?'

—'আছে।'

—'তাদের কথা প্রায়ই শুনি।

—'দেখ নি?'

—'না।'

—'আমিও বড় একটা দেখি নি।' তাকিয়ে দেখলাম বিভা কাঁদছে। মোক্ষদা—'চোখে জল এসে পড়ল তোমার, কাকাতুয়াটার দুঃখে?'

—না না, ও মরে ভালই হয়েছে। বেঁচে থেকে কষ্ট পাচ্ছিল মোক্ষদা।'

—'চলো, এবার তো উঠি। লোকটা তালেবর। কিন্তু মেয়েদের জানে না, চেনে না।'

দিন দুই পরে।

একদিন সকালে উঠে দেখলাম বিভার বাবা একজন পার্সি যুবকের সঙ্গে তার মেয়ের ঘরে ঢুকে বললেন—'এই যে আমার মেয়ে, এই বিভা। আপনি বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন—'এর সঙ্গে আলাপ করুন। বিভা, ইনি, এর নাম রুস্তমজি, ইনি পার্সি হলেও বেশ ভাল বাংলা বলতে পারেন। দেখো-না আলাপ করে।' বলেই চলে গেলেন।

—'আপনি বসুন রুস্তমজি।'

—'এই সোফায়?'

—'নিশ্চয়ই।'

—'আপনার কাজের খুব ক্ষতি করলাম।'

—'মোটেই না, আপনি বাংলা শিখলেন কী করে?'

—'সে অনেকদিন হল শিখেছি।'

—'কলকাতায় আছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'বম্বের পার্সিরা বাংলা জানেন না?'

—'খুব কম।'

—'বাস্তবিক পার্সিরা ভারি চমৎকার জাত।

—'কোন হিসেবে?'

—'সব দিক দিয়েই।'

রুস্তমজি সুন্দর হাসতে লাগল।

বিভা—'বাস্তবিক আমি অনেকদিন ভেবেছি যে পার্সিদের মতন এমন নীরব গুণী জাত ভারতবর্ষে আর-একটাও নেই।'

—'অনেকে এই কথা বলে বটে।'

—'ঠিকই বলে।'

—'কিন্তু আমার খানিকটা সন্দেহ আছে।'

—'সে আপনার বিনয়।'

—'তা নয়।'

বিভা বাধা দিয়ে বললে—'আমরা হিন্দুরা বা মুসলমানরা যদি আপনাদের মত হতে পারতাম তা হলে আমাদের দেশের ঢের লাভ হত।'

রুস্তমজি অবিশ্বাস করে হাসতে লাগল।

বিভা—'যাক, আপনাদের আদর্শ তো আমাদের সামনে আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুস্তমজি তার ছড়ি রাখতে রাখতে বললে—'সেইটে বড্ড ভুল।' বিভা একটু বিস্মিত হয়ে যুবকটির দিকে তাকাল। রুস্তমজি তার হ্যাট খুলে সোফার ওপর রাখল। দিব্যি একমাথা কাল চুল বেরিয়ে পড়ল, এক কিনার দিয়ে পরিপাটি টেরি। বেশ দামি স্যুট, ছেলেটির বয়সও অল্প, পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। বেশ সুন্দর সুগঠিত পুরুষদের চেহারা। বিভার খুব ভাল লাগছিল বোধ করি। রুস্তমজি তার চুলের নিটোল পালিশের ওপর ধীরে ধীরে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে—'রতন টাটার নাম শোনেন নি বোধ করি?'

—'কেন শুনব না।'

—'আপনার একালের মানুষ কিনা। তাছাড়া পার্সিদের খবর কেই-বা রাখে?'

—'বা রে, খুব শুনেছি।'

—'আপনার অবিশ্যি শিক্ষাদীক্ষা ঢের আছে, কিন্তু অনেক বাঙালিই তার নামও জানে না।'

—'স্যার রতনের বিষয় মোটামুটি খুব বেশি আমিও জানি না রুস্তমজি।'

—'তার জীবনের একটা কথা বলছি।'

—'বলুন।'

—'বিলেতের দরিদ্রতা ও বেকার সমস্যা সম্বন্ধে ভাল করে অনুশীলন করে দেখবার জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিকে তিনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন এক সময়।'

—'ও'।

—'রতন সম্বন্ধে এই একটা কথা আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম। আর-কিছু না।' বিভা ঘাড় হেঁট করে রইল।

রুস্তমজি—'জিনিসটাকে কেমন মনে হয় আপনার?'

—'ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

—'সত্যি ভারি মজার।' রুস্তমজি হাসতে লাগল। বললে—'বিলেতের দরিদ্রতা আর আনএমপ্লয়মেন্ট-এর দাম পাঁচ হাজার পাউন্ড, বুঝলেন?' গলার আওয়াজের ভেতর খানিকটা বিদ্রূপ এই ছেলেটির। বিভা কোনো কথা বললে না।

রুস্তমজি—'এটা অবিশ্যি ইতিহাসের পাতায় ছাপা হয়ে থাকবে। কিন্তু আমরা পার্সিরা আমাদের প্রাইভেট জীবনেও এমনি অনেক অবাস্তবতার প্রমাণ দেই।' বলে খুব মিষ্টিভাবে একটু হাসল।

বললে—'টাকা আছে কিন্তু টাকা দিয়ে যে কী করে উঠব বুঝতে পারি না। অবিশ্যি টাকার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিলেত থেকে মার্কহ্যাম সায়েবকে আনিয়া পার্সি ইনস্টিটিউসনগুলোও স্টাডি করে দেখবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। যাক গে—'

—'আপনি পার্সি তো?'

—'কেন, সন্দেহ হয় আপনার?'

—'এমন নিখুঁত বাংলা বলতে পারেন।'

—'আপনি যদি বম্বেতে পঁচিশ বছর থাকতেন তাহলে চমৎকার গুজরাটি শিখে যেতেন।' বলে ছেলেটি মিষ্টি করে হাসল আবার। তাকিয়ে দেখলাম বিভার খুব ভাল লাগছে।

রুস্তমজি—'আরো শুনুন।' বিভা চোখ তুলে ছেলেটির দিকে তাকাল।

রুস্তমজি—'বম্বেতে আমাদের দুটো স্কুল আছে। জামশেদজি জিজিভাই আর জিজিভাই স্কুল। বেশ কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুটো স্কুলেরই সেই এক কোর্স, এক সিলেবাস। কোনো বিচিত্রতা নেই।'

বিভা চুপ করে ছিল।

রুস্তম—'এর ভেতর একটাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল করে দিলেই হত।'

—'আবার ইন্ডাস্ট্রির কথা?'

—'কেন খারাপ লাগছে?'

—'পৃথিবী তো এই নিয়েই আছে।'

ছেলেটি হাসতে লাগল।

বিভা—'ব্যবসার কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না।'

—'কিন্তু দরকার যে।'

—'সমস্ত পৃথিবীটাই এই দরকারটাকেই শুধু মাথায় তুলে নিয়েছে যেন। জীবনে আরো যে কত জিনিসের দরকার ভুলে যায়। যেখানেই যাই, যে বই খুলি, যে কাগজ দেখি, যার সঙ্গে কথা বলি কেবল ইন্ডাস্ট্রি টারিফ, প্রোডাকশন।'

—'আপনারা অবিশ্যি আর্ট ভালবাসেন।'

—'বাঙালি আর্টের জাত।'

—'কিন্তু তাতে জাতির উন্নতি হবে কি?'

—'মিঃ রুস্তম, উন্নতি-অবনতির কথা শুনতে চাই না। যে-জাতের যে-রকম প্রতিভা তার সেদিকেই চলা উচিত। না হলে বিড়ম্বনার আর শেষ থাকে না। উন্নতির নাম যদি হয় লাখ-লাখ টাকার ব্যবসা চালনা, এই শুধু, তা হলে সে রকম উন্নতি আমাদের জাতের কোনোদিন ও যেন না হয়।'

—'আমার এস. নাইডুকে মনে পড়ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বেশ।' বিভা কোনো উত্তর দিল না।

—'তিনিও তো বাঙালি?'

—'হ্যাঁ।'

—'আগে ভাবতাম মদ্রাজি।'

—'নাইডু বলে?'

—'কিন্তু এ রকম কবিতা বা আর্ট মাদ্রাজিদের ভেতর হয় না?'

রুস্তমজি একটু থেমে—'আপনিও একদিন তার মতন হবেন বোধ করি।' বিভা একটু হেসে—'প্রথম চেহারা আমাদের দু'জনের একটুও মেলে না।' দু'জনেই হাসতে লাগল। তার কথা এখানেই শেষ হল।

—'আপনি যাই মনে করুন না কেন আমার যা বলবার তা আমি বলব।'

—'তাই তো বলা নিয়ম। নইলে কথা হবে কী করে?'

—'দেখুন, আমরা ব্যবসায়ের জাত।'

—'সে-কথা আমি জানি না।'

—'আমি বলছি আপনাকে আমাদের প্রতিভা ব্যবসায়েই।'

—'পার্সিদের তো অনেক পুরনো একটা ইতিহাস আছে।'

—'তা আছে বই কি।'

—'সেখানে তো দেখতে পাই তারা কবিতা কলাশিল্পের জন্য রয়েছিল বেঁচে।'

—'আপনি ইরানের কথা বলছেন?'

—'ইরানকে বাদ দিতে চান?'

ছেলেটি একটু গম্ভীর ও বিমর্ষ হয়ে বললে—'না না।'

—'আপনাদের গালিচার থেকে শুরু করে হাফেজ সাদী রুমির সঙ্গে সম্পর্ক কতটুকু, বিধাতাই জানেন।'

ছেলেটি হাসল।

—'আর ওমর খৈয়াম এমন ব্যবসাদারই ছিলেন যে সামান্য একটা জিনিসের [জন্যে] সমরখন্দ বিকিয়ে দিতে চাইলেন।'

ছেলেটি এবার খুব মজা পেয়ে হাসতে লাগল। বললে—'আপনি সবই জানেন দেখছি।'

—'ক্রিয়েটিভ আর্টের নোকর ছিল বলেই জানতে হয়েছে।'

—'কিন্তু সে এক যুগ চলে গিয়েছে, সে আর ফিরে আসবে?' বলে ছেলেটি কার্পেটের ওপর ছড়ি দিয়ে গোটা দুই খোঁচা দিল।

—'আপনারা ফিরিয়ে আনতে পারবেন না?'

—'না। প্রাণের ভেতর কবিতা এত কম বোধ করি!'

—'আপনি?'

—'আমরা সকলেই।

—'মানে বম্বেতে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু ইরানে?'

—'সে-খবর আমি ঠিক বলতে পারি না।' ছেলেটি বললে—'আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে আমাদের এই ক্রিয়েটিভ আর্টকে যে উপেক্ষা করছি সে কথা মনেও জাগে না কোনোদিন। যদিও বা জাগে, ভাবি, এ ভালই করছি। বললে,—

'কেউ যদি আমাদের জাতের এ অভাব দেখতে আসে পুরনো গৌরবের দোহাই দিয়েই চুপচাপ পড়ে থাকি। থাক আমি আপনার সঙ্গে আর্টের কথা বলতে পারব না। কিছু জানি না যে!'

—'আপনাদের প্রতিভা তা হলে এবার ঘুরে গেল?'

—'হ্যাঁ।'

—'ব্যবসার দিকে।'

—'হ্যাঁ, তাই আমাদের আজকের আর্ট।'

—'আমার বাবাও ব্যবসা নিয়ে আছেন, কী পরিতৃপ্তি পান জানি না।'

—'যার যা খেয়াল তাই নিয়েই তার চরিতার্থতা।'

বিভা একটু বিস্মিত হয়ে—'আপনার মুখে 'চরিতার্থতা' শব্দটি শুনব বলে আশা করি নি।'

—'কেন?'

—'এ খুব দামি বাঙালি শব্দ।'

—'বললামই তো পঁচিশ বছর ধরে বাংলা বলছি।'

—'বাংলা বইও পড়েন নিশ্চয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হ্যাঁ।'
—'কার? ঠাকুর স্কুলের?'
—'হ্যাঁ হ্যাঁ।'
—'তাই হবে।'
—'রেডিওতে বাংলা গান শুনি।'
—'বেশ।'
—'বাংলা থিয়েটারেও তো যাই।'
বিভা ভয় পেয়ে উঠল।
রুস্তমজি—'চমকালেন যে!'
—'বাংলা থিয়েটারে গিয়ে আপনার ভাষার সৌন্দর্যটুকু মাটি হয়ে যাক।'
—'সত্যি!'
—'কোনো নাটক নেই সাহিত্য নেই কিছু নেই সেখানে।'
—'তা তো আমি জানতাম না!'
—'ভাল বাংলা বলতে হলে দুটো জিনিস করবেন না।'
—'কী।'
—'বাংলা খবরের কাগজ পড়বেন না।'
রুস্তমজি হাসতে লাগল।
—'আর থিয়েটারে যাবেন না।'
—'অবিশ্যি একটু আমোদের জন্য যাই।'
—'কিন্তু আমোদ আপনার ভাষাকে একেবারে বিগড়ে ফেলবে।'
—'আপনিও যান না বুঝি থিয়েটারে?'
—'যাবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু প্রতীক্ষা করছি।'
—'কীসের জন্য?'
—'কবে সুসময় আসে।'
—'মানে ভাল বই?'
—'মানে বেশ মূল্যবান আর্ট হয় কবে, আশা করি শিগগিরই হবে।'
—'আশা করি।'
—'তখন বয়স যদি পিসিমার মত হয় তাহলেও গিয়ে দেখে আসব।' রুস্তমজি হাসছিল।
বিভা—'যা দেখছি, দিদিমার মত বয়স না হতে সে দিন আসবে না।'
—'আপনিই লিখুন না একখানা বই।'
—'থিয়েটারের জন্য?'
—'হ্যাঁ।'
—'তাহলে নিজেকেই ধিক্কার দিতে হবে যে! এটুকু আত্মগ্লানির হাত থেকে এখনো বেঁচে আছি। তাও এক এক সময় মনে হয় বই না লিখে থিয়েটারে অভিনয় করতে নামলে হত। কিন্তু রুচি ছিল আমার বই লেখার দিকে। শক্তি হয়তো অভিনয়েই ফুটত। কাজেই কিছু হল না।' বলে বিভা চুপ করল।
রুস্তমজি—'এসব আর্টের কথা আমাকে বলে নিজেই হতাশ হচ্ছেন শুধু।'
—'কেন?'
—'অভিনয়ও বুঝি না, বইও বুঝি না, এক জিনিসের ইন্ডাস্ট্রিয়াল দিক বুঝি কিন্তু থিয়েটারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল দিকও আমার কাছে অন্ধকার।'
—'বায়োস্কোপের?'
—'তাও।'
—'পার্সিদের ভেতর তো বড় বড় পিকচার হাউসের মালিক আছেন।'
—'কিন্তু জানি না ফিল্মের বড় বড় ডিরেক্টর আছেন কি না। ফিল্মের ব্যবসায় স্টার আর ডিরেক্টরদের তো লস। যাক, আর্টের কথা থাক।'
—'কিন্তু আর্টের কথা বলছিলেন না তো আপনি।'
—'কী বলছিলাম?'
—'আর্টের সম্পর্কে যে ব্যবসাটুকু তারই হিসেব তো দিচ্ছিলেন।'
—'মানুষ আমরা হিসেব-নিকেশেরই; সেই ধরনের কথাই বলি আবার।'
—'বলুন।'
—'পার্সিদের প্রশংসা করছিলেন আপনি। আমি দেখাচ্ছি আমরা প্রশংসার কত কম যোগ্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমার কাছে নিজেদের জাতকে অযোগ্য প্রমাণ করে আপনার কী লাভ? আপনার ব্যক্তিগত লাভই-বা কি?'

—'লাভ এই, আমাদের দু'জনের কথাবার্তার ভেতর বেশ খানিকটা আন্তরিকতা জমে উঠবে।'

বিভা ঘাড় হেঁট করল—'সেটা কি বড় লাভ? আন্তরিকতা জমাতে গিয়ে নিজেদের জাতকে কি নিন্দা করতে হয়?'

—'যেখানে তারা আযোগ্য তা নিঃসঙ্কোচে দেখাতে হয় না? সে সব চেপে রাখলে আমার সম্বন্ধে কী রকম ধারণা হত আপনার?'

—'কিন্তু নিজের জাতকে না হয় রেহাই দিতেন। নিঃসঙ্কোচের আন্তরিক কথা তো অন্য অনেক বিষয় নিয়েও চলে।'

—'ক্রমে ক্রমে চলবে।'

বিভা যেন সময় বুঝে চুপ করল।

রুস্তমজি—'কলকাতায় ধরুন পার্সিদের সংখ্যা কত কম, কিন্তু তবুও এখানে আমাদের দুটো অগ্নিমন্দির আছে। দুটো রাখবার কী দরকার? এগুলোর পেছনে খরচও কি কম!'

—'আপনাদের সেই আগুনের পুজো এখনো চলে আসছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'ভারি চমৎকার।'

রুস্তমজি-'ঠাট্টা করছেন হয়তো।'

—'না না, এ আমার খুব আন্তরিক কথা মিঃ রুস্তমজি।' বিভা একটু থেমে বললে—'বাস্তবিক মানুষ যখন প্রথম জন্মেছিল তখন আগুন অরুণ এই সব নিজিসই তার কাছে সবচেয়ে বেশি আশীর্বাদের মতন মনে হয়েছিল।' বললে—'আশীর্বাদের মতনই কি শুধু? খু বিস্ময়ের জিনিসও নয় কি রুস্তমজি? ধরুন, একটা পাহাড়ের ওপর আরণি জোগাড় করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, তার ভেতর ঘি ঢালা হচ্ছে, সেই কোন এক ভোরের জগতে, কেমন এক ভোরের বেলা।'

—'কিন্তু আমরা ঢের অগ্রসর হয়েছি।'

—'হ্যাঁ, আগুনের চেয়ে ঢের খারাপ জিনসকে পুজা করতে শিখেছি আমরা।'

রুস্তমজি একটু হেসে বললে—'তা যাই হোক।'

—'ভগবানকে কজনে পুজো করি আমরা?'

—'তা করি না অবিশ্যি।'

—'একটা জিনিসকেও তো আমরা সকলে মিলে পুজো করি আজকাল।'

—'টাকাকে? কী বলেন?'

—'বলেই তো ফেললেন দেখছি।'

—'খুবই সোজা বলা।'

—'মনের ভেতর সব সময়েই বোধ করি এর জন্য একটা জায়গা রয়েছে?'

—'শুধু জায়গা?'

—'তবে?'

—আসন।' রুস্তমজি হাসতে লাগল।

বিভা—'সেই জন্যই আমার মনে হয় পৃথিবীর সব জাত মিলে একটা ধর্মমন্দির গড়া যাক, এই টাকাকে কেন্দ্র করে।'

—'একটা ওয়ালর্ড ব্যাঙ্ক গোছের?'

—'আজকালকার দিনে একটা ওয়ার্লর্ড ব্যাঙ্ক ছাড়া আর কিছু হবে না।' রুস্তমজি একটু চুপ করে থেকে বললে—'আমি যা বলছিলাম, দেখুন দুটো তো ফায়ার টেম্পল আছে কলকাতার শহরে, কিন্তু পার্সিদের জন্য এমন একটা প্রাইমারি স্কুল নেই এখানে, যেখানে গিয়ে পার্সি ছেলেমেয়েরা তাদের ধর্মের গোড়ার মূল সূত্রগুলো শিকতে পারে।'

—'আপনাদের মধ্যে পুরোহিতদের খুব প্রভাব।'

—'হ্যাঁ, অনেকটা আপনাদের ব্রাহ্মণদের মত।'

—'শুনেছি তাদের নাকি খুব প্রতিভা আছে?'

—'হ্যাঁ, শিক্ষাদীক্ষায়ও তারা অনেকই খুব উন্নত।'

—'তাদের ভেতর থেকে এদেশের নেতাও তো অনেকে জন্মেছে?'

—'দাদাভাই নৌরজি, ফিরোজসা মেটা, জামসেদজি। 'উদবাদে''র নাম শুনেছেন?'

বিভা ভুরু কুঁচকে একটু হেসে বললে—'অবশ্যি কোনো মানুষ নয়?'

—'না।'

—'বম্বেতে একটা জায়গা তো।'

—'ঠিকই বলেছেন। বাঙালিরা অবিশ্যি অনেকে এর নামও শোনে নি। কিন্তু আপনাদের বেনারস আর গয়া যেমন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

—'এতটা আমি জানতাম না।'

—'খুব কম লোকেই জানে।'

—'উদবাদা হচ্ছে বুঝি আপনাদের কাশী?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু দেখুন আপনাদের বাড়িতে কত শাস্ত্রচর্চা হয়, হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা হয়, সংস্কারের চর্চা হয়, কিন্তু উদবাদায় পার্সি ফার্স্ট বুক শেখাবার জন্য দুটো সেমিনারির মতন আছে অবিশ্যি। কিন্তু সে সেমিনারি দুটোর একটি শিক্ষকও আবেস্তা জানে না।' ছেলেটি গম্ভীর হয়ে বিভার দিকে তাকাল। বললে—'আপনি কল্পনা করতে পারেন বেনারসে কোনো ব্রাহ্মণ সংস্কৃত জানে না। বললে—'ব্রাহ্মণ কেন, সেখানে মুটেও হয়তো সংস্কৃত জানে।'

—'কোথায়? বানারসীতে?'

—'তবে কি?'

—'অতটা অবিশ্যি নয় মিঃ রুস্তমজি। তবে উদবাদায় কেউই আবেস্তা জানে না বুঝি?'

—'না, পেহলবি অব্দি জানে না।'

—'এ দুটো তো আপনাদের পুরনো ভাষা।'

—'হ্যাঁ, শাস্ত্রের ভাষা, অথচ নেগলেকটেড। কলকাতায় বাংলাদেশের কত পাড়াগাঁয় কত লোক আছে ব্রাহ্মণ নয়, অথচ বেশ সংস্কৃত জানে।'

—'তা আছে অবিশ্যি।'

—'কোন কোনো মুসলমানও তো জানে সংস্কৃত!

—'শুনেছি।'

—'তাছাড়া দেখুন বাঙালি মুসলমানদের তো সব কিছু আরবি-ফারসির মতে নয়, কিন্তু তবুও তাদের ভেতর ঢের ঢের লোক ফারসি জানে, আরবি জানে, এই সব ভাষায় ইসলামের শাস্ত্র স্টাডি করতে পারে।' একটু থেমে ছেলেটি বললে—'কিছুদিন আগেও কোনো লাইব্রেরি ছিল না উদবাদায়। মেয়েদের জন্য সেলাই—ফোঁড়াই শিখবার ব্যবস্থা ছিল না। ছেলেদের খেলা স্পোর্টের জন্য জিমখানা ছিল না। ম্যাজিক লণ্ঠনের এগজিবিশন ছিল না। পার্সিদের স্বদেশী মেলা ছিল না।' ছেলেটি ছড়ি দিয়ে কার্পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বললে—'কল্পনা করতে পারেন, বেনারসে এসব নেই?' বললে—'কলকাতায় কত জায়গায়ই তো রয়েছে।' একটু কেশে বললে—'কিন্তু আমাদের উদবাদার অবস্থা এই রকম।'

কথা শুনতে-শুনতে বিভার শ্রদ্ধা বাড়ে। ছেলেটির এ-রকম পরিষ্কার অকুণ্ঠিত গলা ও আন্তরিকতা তাকে আকৃষ্ট করে রাখে। ছেলেটি বেশ গুরুতর বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলছে বটে। বিভার ভাল লাগল। বললে—'আপনাদের পার্সিদের ভেতর তো ঢের চ্যারিটি আছে।'

—'আছে, কিন্তু আমার মনে হয় সেও আর সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। তাছাড়া চ্যারিটি,' ছেলেটি অবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা নেড়ে জানলার দিকে তাকাল।

—'চ্যারিটি আপনার ভাল লাগে না?' কিন্তু তবুও চ্যারিটির দরকার। খুবই দরকার। আমার মনে হয় ভারতবর্ষে আপনাদের মধ্যেই সে-জিনিসটা সবচেয়ে বেশি আছে।'

—'তা থাক। কিন্তু সেটা আমি বিশেষ অহঙ্কারের জিনিস মনে করি না। এই যে আমাদের চ্যারিটির বেশির ভাগ দিয়েই তো হয় শুধু [ধর্মশালায়]।'

—'এ সব বেশ ভাল কথা মিঃ রুস্তমজি। কিন্তু চ্যারিটির একটা আলাদা উদ্দেশ্য থাকে কি না। সেটা হচ্ছে দুঃস্থদের দুঃখ দূর করা।'

—'বুঝলাম, কিন্তু তাতে কতকগুলো অলস লোকেরই তো সৃষ্টি হয়।'

—'সেটা অবিশ্যি অপরাধের, কিন্তু আপনি যে-সমস্ত স্কিমের কথা বলছেন এগুলো গভমেন্ট বা ইউনিভার্সিটির বিবেচনার জিনিস, চ্যারিটির সঙ্গে এগুলোর সংস্রব আছে?'

বিভা'—'অলস লোক, অলস লোকের তৈরি হচ্ছে নাকি আপনাদের ভেতর?'

—'খুব।'

—'এই চ্যারিটির জন্য?'

—'তা ছাড়া আর কী?'

—'অবিশ্যি আমি জানি না কিন্তু।'

—'চ্যারিটির দরকার আছে বটে, কিন্তু এর নানা রকম গ্লানি ও অপরাধের দিকও যথেষ্ট। আপনারা তা বুঝতে পারবেন না। কোটি কোটি দীন দরিদ্র লোক আপনাদের ভেতর। টাকাও একদম নেই। কিন্তু আমরা খুব ছোট্ট সম্প্রদায় কি—না। অনেক টাকাকড়িও রয়েছে। কাজেই ঢের গাফলতি, ঢের কুঁড়েমি, কর্তব্য-হীনতা, পাপ চোখে এসে পড়ে।' বললে—'আপনাদের কলকাতায় কালীমন্দির কটা আছে শুনি? অথচ আপনাদের সমস্যা আমাদের চেয়ে যে কত বেশি তার কোনো ইয়ত্তাও নেই। ৫০০টা থাকলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আছে কি? একটু থেমে বললে—'যদি আপনাদের ভেতর একদল লোক ক্রমাগত তৈরি করার তালে থাকে তাহলে ব্যথা লাগে নাকি?'

—'সত্যি বড্ড বিশ্রি অপব্যয়।'

—'সেইজন্যই বলছিলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'জনসাধারণের জন্য কয়েকটা মন্দির থাকলেই হল, কিন্তু যারা জীবনটাকে বুঝতে পেরেছে মিঃ রুস্তমজি তাদের একটা মন্দিরেরও দরকার নেই।'

—'না, তা, নেই।'

—'ভোরের বেলা এই পুবের জানালাটা খোলা থাকে। তাকিয়ে দেখি মেঘের রং একেবারে সোনা হয়ে গেছে। কত রোদ। কী আনন্দই—না পাখিদের। আর সরল শিশুর চোখের মত নীল আকাশের গায় পায়রাদের সাদা-সাদা ডানাই তো কী সুন্দর। এই সব ছেড়ে কোন মন্দিরে যাব বলুন। কীই-বা শিখব সেখানে গিয়ে, কার কাছেই-বা।'

—'কাজেই ১০০টা অগ্নি মন্দিরের অপ্রাসঙ্গিকতা বুঝলেন তো?'

বিভা নিজের ভাবে ছিল। রুস্তমজির কথা তার কানেও গেল না বোধ করি। ছেলেটি বললে—'গরিব পার্সিদের জন্য শস্তায় বাড়ি তৈরি করে দেয়া হয়, এগুলোরও তো কোনো মূল্য নেই। দুদিন পরে যাবে নষ্ট হয়ে, ভেঙে। তার চেয়ে বেশ সুন্দর মজবুত বাড়ি তৈরি করলেই তো ভাল, যাতে দেখবার জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। সে সব দিকে লক্ষ্য রাখলেও মন্দ কি? পার্সিরা এতদিন ভারতবর্ষে রইল কিন্তু তবুও তাদের মত একটা জিনিস রেখে যেতে পারল না; কবরও তো কত সুন্দর। আমাদের দেখে লোকে ভয় পায়। একবার দেখলে দ্বিতীয়বার মনে থাকে না', বললে—'এ সব জিনিসের কোনো মনে আছে?' ঘাড়টা ঘুরিয়ে বললে—'সেই জন্যই আমি এই সবের কথা বলছিলাম। তারপর কালচার, আর্কিটেকচার।'

বিভা একটু হেসে বললে—'আস্তে আস্তে হবে। এত তো নিন্দে করলেন নিজেদের, তবুও আমি জানি আপনারও জাত খুব মূল্যবান। ক্রমে-ক্রমে সবই করতে পারবেন।'

—'লোকের মনের থেকে একটা ধারণা কিছুতেই যায় না যে আমরা মূল্যবান জিনিস।'

—'কী করে যাবে, ভিতরে বাইরে সব দিকেই তো আপনাদের অনেকখানি সর্বাঙ্গীণতা দেখি।'

—'সে-সব পঞ্চাশ বছর-একশ বছর আগের কথা, তখন অবিশ্যি আমাদের সম্বন্ধে মানুষেরা বিমুগ্ধ হয়ে যা ভাবে, আমরা অনেক পরিমাণে তাই-ই ছিলাম,' বললে—'কিন্তু এখন সে সব সফলতা চলে গেছে। ব্যবসায় আমাদের প্রাধান্য নেই, না আছে শিক্ষায় দীক্ষায়।' বললে—'তারপর, আমরা আজকাল শিক্ষার যতটুকুই বা ধার ধারি সেটুকুও ব্যবসায়ের সুবিধা হবে বলেই। কালচারের সঙ্গে আমাদের কোনো সংশ্রব নেই। জগদশী বোস বা রমণের মত একজন লোক আমাদের ভেতর নেই, কোনোদিন ছিল কি? এই তো রাধারমণের কথা কতদিন ভাবি, কিন্তু পার্সিদের ভেতর এরকম একজন মনীষী কোনোদিন জন্মাবে? রবিবাবু তো স্বপ্নের জিনিস!' একটু হেসে বললে—'তারপর গোঁড়ামিও ঢের, ম্যালেরিয়া হবে, তবুও বাড়ির কুয়ো বন্ধ করব না, একটা আধুনিক ধরনের কাজের জন্য আমাদের সহানুভূতি নেই। ভাল করে কাজ করতে দেয় না, না জানি কী করে বসে, কোথায় আমাদের ধর্মে সংসারে আঘাত দেয়?'

বিভা—'এরকম করে যদি আপনি বলতে থাকেন তাহলে আমাকে বড্ড অপমান করা হয়।'

—'কেন?'

—'এর চেয়ে ঢের বেশি গলদ, পদে-পদে কলঙ্ক আমাদের ভেতর অসংখ্য পরিমাণে আছে, আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না হয়তো শুনলে শিহরিত হয়ে উঠবেন। কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে এত কথা যখন বললেন তখন—'আমারও তো উচিত আপনাকে সব খুলে বলা?'

—'বলুন।'

—'খুব সরলভাবেই তো বললেন। কিন্তু তবুও আমি পারব না।'

—'কেন?'

—'আপনাদের চেয়ে আমরা ঢের কম মূল্যবান যে!'

—'আমরা যে কী তা তো দেখালামই।'

—'কিন্তু আমাদের তুলনায় এ তো স্বর্গ।'

—'অবাক হয়ে যাই আমাদের সম্বন্ধে লোকের ধারণা কিছুতেই বদলায় না কেন?'

—'এই তো আপনার সঙ্গে পরিচয় হল, আপনাদের সম্বন্ধে আগে যে-ধারণা ছিল আমার, কোথাও তাতে একটুও আঘাত পেলাম না তো।'

—'আচ্ছা, ওঠা যাক।'

কিন্তু বসল।

তারপর কী যেন ভেবে উঠে পড়ল ছেলেটি।

কিন্তু পরদিনই আবার এল।

বললে—'সকালটা আপনার এখানে কাটাতে বেশ লাগে।' বললে—'আপনার কোনো ক্ষতি করি না?'

—'আপনি, আসেন তো নটার সময়, এই সময়ই আমি মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলি।'

—'কটার সময় ওঠেন?'

—'পাঁচটা।'

—'খুব সকালে তো,' বললে—'শীতের ভেতর উঠতে পারেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'উঠে পড়ি।'

—'আপনাদের জন্য এক বাক্স চকোলেট আর দু'টিন টফি এনেছি,' এগিয়ে দিয়ে বললে—'নিশ্চয়ই ভালবাসেন আপনি?'

বিভা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে—'হ্যাঁ, ছোটবেলায় খুব ভালবাসতাম।'

পাঁচ-সাতদিন ছেলেটি ক্রমাগত এল। বিভাকে বই দিলে, বাইনোকুলার দিলে, ছবি দিলে, বায়োস্কোপের নতুন রেকর্ড দিলে, আরো নানা রকম খুঁটিনাটি জিনিস দিলে, সে-সবের নামও আমি জানি না। পরিবর্তে বিভা কিছু দিলে না। আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, এও কেমন? কিন্তু ছেলেটির দেখলাম দিয়েই পরিতৃপ্তি? নেওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কিছু যে পাচ্ছে না সেজন্য মনের ভেতর কোনো আঘাত নেই। এর পর ছেলেটিকে খুব ভাল লাগল আমার। আমার নিজের জীবনের অনেক কথা মনে পড়ল। আমার কিশোরবেলায় আমার ব্যবহার ঠিক এ রকমই ছিল। বেশ হত, আজো যদি তা অক্ষুণ্ণ থাকত। কিন্তু জীবন তা দিলে না যে।

একদিন সকালবেলা ছেলেটি এসে বললে, 'আমাদের পরিচয় তাহলে খুব জমল।'

—'হ্যাঁ।'

—'বাস্তবিক আপনার এখানে এল—'ছেলেটি চুপ করল।

বিভা কোনো কথা বলল না।'

—'আপনার সঙ্গে মিলে ঢের ভাল বাংলা শিখে গেছি আমি।'

—'প্রথম থেকেই তো খুব সুন্দর বাংলা বলতে পরতেন।'

—'কিন্তু আমার বন্ধুরা বলে যে আমার বাংলা অ্যাকসেন্ট আনকালচার্ড বাঙালিদের মত।'

—'বাংলায় কোনো অ্যাকসেন্ট নেই।'

—'নেই?'

—'মাঝে-মাঝে গানের মত একটা রেশ আছে।'

—'ভাষাটা বেশ সুন্দর।'

—'আপনাদের আবেস্তাও তো বেশ।'

—'কিন্তু বাংলায় যত কবিতা গান ছবি রয়েছে—'

—'বলেন, কী, আপনাদের ফার্সিতেও তো কত!'

—'ও ইরান সে তো ঢের আগে ছেড়ে দিয়েছি আমরা।'

—'কিন্তু সেখান থেকে তো এসেছেন।'

—'তা তো বটেই।'

—'সে গৌরব তো আপনাদেরই গৌরব।'

এ সব কথা বলতে বা শুনতে ছেলেটির ভাল লাগছিল না। কার্পেটের ওপর ছড়ি দিয়ে আঁখ কাটতে-কাটতে সে খুনসুড়ি করছিল। মুখ তুলে বললে—'চলুন-না একদিন আমাদের পাড়ায়?'

—'কীসের জন্য?'

—'আমাদের বাড়িটা দেখে আসবেন।'

—'তা যাব একদিন।'

—'বলুন কবে?'

—'ঠিক বলতে পারি না।'

—'যাবেন তো?'

—'হ্যাঁ, যাবার তো ইচ্ছা; তবে বাবাকে মত করাতে পারলে হয়।'

—'ও তাঁর সঙ্গে যেতে চান?'

—'তিনিই নিয়ে যান আমাকে।'

—'আপনি একা বেরন না কোথাও?'

—'বেরুতে আপত্তি নেই, কিন্তু আপনাদের বাড়ি তিনিও না হয় দেখলেন।'

—'কে? আপনার বাবা?'

—'হ্যাঁ।'

—'তিনি দেখেছেন অবিশ্যি।'

—'সে তো একা একা গিয়ে।'

—'তবু দেখেছেন তো।'

—'এবার আমার সঙ্গে না-হয় যাবেন।'

ছেলেটি একটু দমে গেল।

বিভা বুঝেছে। কিন্তু চুপ করে রইল।

ছেলেটি বললে—'তাহলে বাবাকে মত করাতে হবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হ্যাঁ।'

একটু চুপ করে বললে—'আচ্ছা করাবেন একদিন।'

—'তাই করাব।'

—'আশা করি অমত হবে না!'

—'আপনাদের মত মানুষেদের বাসায় যেতে অমত কেন?'

—'ধরুন, আপনাকে নিয়ে?'

—অবিশ্যি ও রকম ধরনের গোঁড়ামি আমাদের নেই।'

ছেলেটি খানিক চুপ করে থেকে বললে—'থাকি বাবা, মা আর আমি।'

—'আপনার কোনো ভাইবোন নেই বুঝি?'

—'বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। পার্কস্ট্রিটের বাড়িটা আমাদের বেশ খোলা-মেলা জায়গায়।'

—'বেশ ভাল।'

—'আপনি যে পুবের আকাশ এত ভালবাসেন—চমৎকার দেখা যায়। কারণ পূর্ব দিকটা অবাধ খোলা কি না।'

বিভা কোনো জবাব দিল না।

—'বাড়িটা আমরা বছর তিনেক হল তৈরি করছি। এমন চমৎকার তৈরি। কাজেই শুধু পুবই নয় দক্ষিণে পশ্চিমে যে-কোনো দিকের যে-কোনো জানলার কাছে গিয়ে আপনি দাঁড়াবেন, প্রাণটা এমন খুলে যাবে!' বললে—'দেখবেন আকাশ, চিল, পায়রা, ময়দান, গাছ-তারপর কলকাতার যা কিছু শোভা আছে।'

ছেলেটি থামল।

—'অবিশ্যি কলকাতার শোভা আপনি পছন্দ করেন না?'

—'কই পাড়াগাঁয়ও তো পালিয়ে যাচ্ছি না, শোভা খুঁজবার জন্য!'

—'নিচের তলায় অফিস আর দোকান', ছেলেটি বললে—'আমাদেরই অফিস, খুব মস্ত বড় আর ওপরের দুটো তলায়ই আমরা থাকি। প্রায় বিশটা কামরা আছে। হলের মত বড়-বড়।'

—'তিনজন মানুষের জন্য?'

ছেলেটি একটু হেসে বললে—'অতিথি মাঝে-মাঝে আসে। তাদের জন্য দুটো কামরা আলাদা পড়ে আছে।' একটু হেসে বললে—'আমার বেডরুমটা পুবের দিকে।' বিভার দিকে তাকিয়ে বললে—'হলের মতন বড়।

দু'জনেই চুপচাপ।

ছেলেটি বললে—'আমার বেডরুমের পাশের হলটাকে বানিয়েছি লাইব্রেরি। বাবার খুব আপত্তি ছিল। তিনি চেয়েছিলেন ওটা গেস্টদের জন্যই রেখে দিতে। কিন্তু আমি বললাম একটা লাইব্রেরি না হলে কিছুতেই চলে না।'

—'সে লাইব্রেরিতে বই আছে তো মিঃ রুস্তমজি?'

—'হাজার পাঁচেক বই যোগাড় করেছি।'

—'কী রকম ধরনের?'

—'আপনি অবিশ্যি ঢের খাপ্পা।'

—'অবিশ্যি লাইব্রেরিটা আমার নয়।'

—'এখন থেকে লিটারেচারের বই আনব ভাবছি।'

—'নভেল-কবিতা আপনি পড়েন?'

—'এখন থেকে পড়ব ভাবছি।'

—'কীসের জন্যই—বা?'

—'দেখলাম তো আপনি এসব বেশ পড়েন।'

বিভা একটু হাসল।

রুস্তমজি—'দু'জনের ভেতর ঘনিষ্ঠতা জমাতে হলে এক রকম ধরনের চিন্তা করতে হয়।'

—'আপনার অভ্যাস চট করে বদলাতে পারবেন না।'

—'খুব পারব।'

—'কিন্তু প্রয়োজন নেই।'

—'আছে।'

—'বাস্তবিক নেই।'

—'আপনার সংস্পর্শেই আমার থাকার দরকার।'

বিভা চুপ করল।

রুস্তমজি—'সাধারণ বাঙালি মেয়েদের মত নন তো আপনি।'

—'কেন তারা কী রকম?'

—'জানি না, কিন্তু তাদের কাছে গিয়ে আমি এত সময় নষ্ট করতাম না।'

—'আমার কাছেও সময় নষ্ট করছেন শুধু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'মোটেই না।'
—'কী লাভ হল আপনার?'
—'আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে।'
—'কোন হিসেবে?'
—'জানেনই তো আপনি খুব সুন্দর।'
বিভার খুব খানিকটা আরক্ত হয়ে উঠল।
রুস্তমজি—'সুন্দর জিনিসকে আমরা খুব যত্ন করে রাখি।'
—'আপনারা পার্সিরা?'
—'হ্যাঁ।'
—'তা অবিশ্যি আমি বিশ্বাস করি।'
—'একটা চমৎকার কার্পেটই হোক বা একজন সুন্দর মেয়েমানুষই হোক, এ সব আমাদের খুব শ্রদ্ধার জিনিস।'
—'খুব আশার কথা।'
—'বাঙালিরা ফেলে নষ্ট করে।'
—'কাকে?'
—'সুন্দরকে।'
—'কিন্তু বাঙালিদের ঘরেই তো আছি; নষ্ট হয়ে গেছি কি?'
এমনি সময় বিভার বাবা ঢুকলেন।
পরদিন রুস্তমজি যখন ঢুকেছিল আমি তখন ছিলাম না। খানিকক্ষণ পরে জানালার কাছে আমার ডেক চেয়ারটা নিয়ে বসে দেখি রুস্তমজি একটু কেমন গম্ভীর হয়ে মেঝের ওপর পায়চারি করছে। বিভা আছে একটা সোফায় বসে।
বিভার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রুস্তমজি—'টবে ওগুলো কী ফুল? বেশ সুন্দর তো।'
—'নেবেন?'
—'এটা কার ফটো?'
—'আমার।'
—'ছোটবেলার বুঝি?'
—'হ্যাঁ।
অনেকক্ষণ ফটোটার দিকে তাকিয়ে রইল। পরে বিভার মুখোমুখি সোফায় এসে বসে বললে—'ভগবান আমাকে যে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন এর একটা উদ্দেশ্য আছে।'
বিভা আস্তে-আস্তে উঠে চলে গেল।
পরদিন সন্ধ্যার সময় দেখলাম বিভা আছে বসে, রুস্তমজি মেয়ের খুব কাছাকাছি একটা কুশনে বসেছে। শুনলাম বলছে,—'আপনাকে না হলে আমার কিছুতেই চলে না।'
—'কিন্তু আমার তো চলে।'
—'এ রকম কথা আপনি কেন বললেন?'
—'যা ঠিক তাই তো বলছি।'
—আমার মনে বেদনা দিতেই কি আপনার ভাল লাগে?'
—'কিন্তু কোনো ভুল ধারণা আপনার মনে ঢুকিয়ে দেয়া কি আমার উচিত?'
—'আপনাকে আমি কত ভালবাসি তা আপনি কল্পনা করতে প্যারবেন না।'
—'যারা ভালবাসে তারা ঐ রকমই বাসে।'
—'কাউকে কোনোদিন আমি এই রকম ভালবাসি নি।'
—'আপনার হৃদয়ের প্রেম খুব গভীর।'
—'তা স্বীকার করেন?'
—'চোখের সামনে এ কদিন করেই তো দেখছি।'
—'দিন রাত আমি যা যাতনা পাচ্ছি!'
—'কিন্তু কী করে আপনাকে আমি সান্ত্বনা দেব বলুন?'
—'বলুন, আমাকে আপনি ভালবাসেন?'
—'কী করে তা বলি?'
—'ভালবাসেন না?'
বিভা চুপ করে রইল।
রুস্তমজি—'মনে করবেন না, পথে-পথে মেয়েদের সঙ্গে আমি ভালবাসা করে বেড়াই।'
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এ নিয়ে একবারও আমি ভাবতে যাই নি রুস্তমজি।'

—'অনেক মেয়ে আছে পুরুষদের ওপর তাদের সন্দেহ।'

—'কিন্তু আমার কাছে এ জিনিস একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।'

—'আমি যে আর-কোনোদিন কোনো নারীকে ভালবাসি নি এর একটা মর্যাদা নেই।'

—'অনেকে তো প্রেমের পর প্রেম করে বেড়ায়।'

—'সেই কি ভাল?'

—'কেউ-বা একটি প্রেম নিয়ে থাকে।'

—'তাই কি উচিত নয়?'

—'কিন্তু যে-নারীকে আপনি ভালবেসেছেন জীবনের কর্তব্য—অকর্তব্য আপনি কতদূর পালন করছেন সেই দেখেই তো সে আপনাকে ভালবাসতে যাবে না।'

—'তবে কী?'

—'খুব দায়িত্বহীন একটা লোককেও তো সে ভালবাসতে পারে।'

—'পারে?'

—'একজন অসচ্চরিত্র মানুষকেও।'

—'নারীরা এই রকমই বলে।'

—'নারীরা নয়, ভালবাসা জিনিসটাই হচ্ছে বিচিত্র, এর কোনো নিয়মপদ্ধতি নেই?'

—'তাই কি?'

—'দেখুন-না কেন, পার্সি সমাজে তো কত মেয়ে ছিল, বলছেন কাউকে কোনোদিন ভালবাসেন নি। আমাকে এসে বললেন, "দিন রাত যাতনা পাচ্ছি" বিস্ময়ের জিনিস নয়?'

—'শুধু কথাই কি বলব আমরা?'

—'অবিশ্যি আমি চুপ করতে পারি।'

—'আপনি বিস্তব্ধ হলে আমার কষ্ট লাগে।'

—'কী করব বলুন?'

—'চলুন আমরা পৃথিবীর একদিকে চলে যাই।'

—'কেন মিছিমিছি যে বেদনা পেতে যাবেন!'

—'আপনাকে নিয়ে একটা কুঁড়ে ঘরে থাকলেও আমরা জীবন সার্থক হবে।'

—'কিন্তু আমার জীবন?'

—'ব্যথা দিতে এত ভালবাসেন আপনি?'

—'চাই তো সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু পথ যে খুঁজে পাই না।'

—'সান্ত্বনা আমি চাই না। মেয়েমানুষের সান্ত্বনা দিয়ে কী হবে আমার!'

—'একটু আস্তে, পাশের ঘরে বাবা আছেন।'

—'আমি চাই ভালবাসা।'

—'একদিন তো পাবেন।'

—'কিন্তু কার কাছ থেকে।'

—'যদি বিধাতার মত বড় হতাম তবে তো বলে দিতে পারতাম।'

—'কিন্তু বিধাতার চেয়ে বড় আপনি।'

—'আমি?'

—'আমার জীবন আপনার হাতে, বলুন, বলে দিন বিভা! বলে, তুমি আমায় ভালবাস?'

বিভা অবিশ্যি কিছু বললে না।

ছেলেটি সোফার ওপর কাত হয়ে চোখ বুজে রইল।

বিভা—'একদিন যেদিন আজকের দিনের কথা আপনার কাছে স্মৃতিমাত্র হয়ে রইবে।'

—'কেন এ রকম বলেন আপনি?'

—'খুব তুচ্ছ স্মৃতিও বটে।'

ছেলেটি ধীরে-ধীরে উঠে বসল।

—'সেদিন বুঝবেন যে কত বড় ভুলের পথে চলেছিলেন।'

ছেলেটির চোখ জলে ভরে উঠল। বললে—'সে-রকম অমানুষ কোনদিনও যেন না হই আমি।'

—'প্রথম যৌবনের একটা সৌন্দর্য কী জানেন?'

ছেলেটি কোনো উত্তর দিল না।

বিভা—'এর সবচেয়ে গভীর সৌন্দর্য হচ্ছে যে এই এর আয়ু তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। মায়ের কোলে যে শিশু তার চরম পরিণতি হচ্ছে গিয়ে এই প্রথম যৌবন। তারপর এরা সব শেষ হয়ে যায়। স্বাভাবিক সাংসারিক মানুষের জীবন শুরু হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটি এর-কথার কোনো জবাব না দিলে বললে—'ভুলের পথ যে বলে-ছিলেন, আপনি কি মনে করেন আপনাকে বিয়ে করলে পার্সি সমাজে আমার জায়গা হবে না?'

—'না, তা নয়।'

—'তবে কী?'

—'তা খুবই জায়গা হতে পারে। বিশেষত আজকালকার দিনে।'

—'তবে সার্থকতার আর জায়গা রইল কী?'

বিভা ব্যথিত হয়ে চুপ করে রইল।

ছেলেটি বললে—'আপনি যে কোনো অ্যাটর্নির নাম করুন, আপনাদের নিজের অ্যাটর্নিই দিন, আমার বাবার তিন লাখ টাকা আর যা কিছু সম্পত্তি আছে সমস্তই আমি আপনার ও আমার নামে তিনদিনের ভেতরেই পাকা উইলে তৈরি করে এনে দিচ্ছি।'

—'কাকে?'

—'আপনাকে।'

বিভা বিক্ষুব্ধ হয়ে ছেলেটির দিকে তাকাল।

রুস্তমজি—'তাহলে আপনার বাবাকে।'

—'না, দরকার নেই।'

—'তাহলে আপনাকে।'

বিভা মাথা নাড়ল।

ছেলেটি বললে—'আচ্ছা বেশ, তাহলে সমস্ত টাকাকড়ি সম্পত্তি আপনার নামেই শুধু লিখিয়ে আনব।'

বিভা অত্যন্ত করুণ চোখ তুলে ছেলের দিকে তাকাল।

রুস্তমজি—'আমার বাবাকে নিয়ে আসব।'

—'কোথায়?'

—'আপনাদের এই বাসায়।'

—'কেন?'

—'আপনাদের অ্যাটর্নির কাছে।'

—'আপনার বাবা খুব বুড়ো মানুষ?'

—'হ্যাঁ।'

—'মাথার চুল পেকে গেছে বোধ করছিলাম।'

—'তা গেছে তো।'

—'তাঁকে এইখানে নিয়ে আসতে চান?'

—'তা তিনি আমার কথা শুনবেন, তাঁকে দিয়ে আমি সব করিয়ে নিতে পারি।'

—'না, এসব কিছু করাতে হবে না আপনার।'

—'আপনি কী চান?'

—'আমাদের দু'জনের সম্পর্কে?'

—'হ্যাঁ।'

—'ভগবানের কাছে থেকে একটা জিনিস ভিক্ষা করছি।'

—'কী ভিক্ষা?'

—'আমার হৃদয় প্রেমে ভরে উঠুক।'

—'কার জন্য?'

—'মোক্ষদা বলে একটি যুবক ছিল, ভালবাসে, কিন্তু ভালবেসে আপনার মত এত বিফল হয়ে পড়ে না, খুব বেদনা বোধ করে। কিন্তু ব্যথাকে পদে পদে জয় করবার আশ্চর্য শক্তি আছে তার। জীবনের মূলসূত্রও তার আমাদের চেয়ে আলাদা।'

—'ও, তাহলে এই ছেলেটিকে আপনি ভালবাসেন?'

—'না।'

—'ভগবানের কাছে থেকে ভালবাসা ভিক্ষা এর জন্য?'

—'এ রকম ভিক্ষার কথা শুনলেও ইনি আমাকে উপহাস করতেন।'

—'কেন?'

—'ইনি ভগবানকে মানেন না।'

—'এমন লোকও থাকে?'

—'আছে তো।'

—'কোনো ধর্মও নেই বোধ করি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'মোক্ষদাবাবুর?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে খুব রহস্যের জগতের মানুষ। আমরা তাকে বুঝতে পারি না।'

—'ভগবানকে বাদ দিয়ে ধর্ম কী রকম?'

—'সে আলোচনা ভগবান নিজেই মোক্ষদাবাবুদের সঙ্গে হয়তো বিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে করবেন, আমাদের সঙ্গে নয়।'

রুস্তমজি খানিকটা করুণ হয়ে বললেন—'এর জন্যই আপনার প্রাণে প্রেমের ভিক্ষা করছেন?'

—'বললামই তো ভিক্ষাকে ইনি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবেন।'

—'তবে কার জন্য?'

—'আপনার জন্য।'

রুস্তমজি উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে—'এই দশ দিনের মধ্যে আজ একটা গভীর আশার কথা শুনলাম। এ নিয়ে সমস্ত জীবন বেঁচে থাকতে পারব আমি! বাস্তবিক কী আনন্দের কথা। সত্যি, আমার জন্য জীবনে আপনার প্রেম ভিক্ষা করছেন?'

—'তাছাড়া কী আর করব? আর সবই তো আপনি অগ্রাহ্য করেছেন?'

—'নিশ্চয়! মেয়েমানুষের কাছ থেকে সান্ত্বনা নিতে যাবে কে?'

—'হৃদয়ে তাহলে প্রেম আসুক।'

—'আমার জন্য?'

—'আপনার জন্যই।'

—'বার বার জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করলেন না?'

—'না, দেখছিই তো ভালবাসার বেদনা আপনাকে অস্থির করে তুলেছে।'

—'সেইজন্য এই দয়া?'

—'কিন্তু আমার দয়া তো আপনি গ্রহণ করবেন না।'

—'আপনার কাছ থেকে প্রেম না পেলে বাকি সমস্ত আমার কাছে মূল্যহীন।'

—'প্রেম তাহলে জন্ম নিক।'

—'কোথায়?'

—'আমার প্রাণে।'

—'কার জন্য?'

গলা খাকরে ছেলেটি বললে—'আমি জানি, শেষ পর্যন্ত বড়-বড় প্রেমিকারাও পরস্পরের কাছ থেকে সুখ আর টাকাকড়ি চায়। প্রেমের চেয়েও টাকাকড়ির সুখকে ঢের প্রেমিক আশীর্বাদের জিনিস মনে করে।'

—'তা আমি জানি।'

—'তবে আর কেন? টাকাকড়ি তো আমার অনেক রয়েছে।'

—'শুধু প্রেমের চেয়েই নয়। শান্তির চেয়েও একদিন আকাঙ্ক্ষার সুখ বেশি কাম্য হতে পারে, সব নারীর পক্ষে। আমার পক্ষেও আমি স্বীকার করি বটে।'

—'সে আকাঙ্ক্ষা ও সুখ আমার কাছে থাকলে আপনি প্রতিনিয়তই তৃপ্ত করতে পারবেন।'

—'একদিন হয়তো খুব আগ্রহের সঙ্গে এই রকম তৃপ্তিই চাইব।'

—'সব স্ত্রীকেই তো চাইতে দেখি; হয়তো তারা যৌবনের বড় বড় প্রণয়িনী ছিল, প্রেমের ধ্যানই খুব বেশি করে করত।'

—'আমাকেও সেই ধারণা করতে দিন। অন্তত প্রেমের আবহাওয়া নিয়ে দাম্পত্যটা শুরু করি। তারপর দিন কেটে গেলে কী হবে না হবে সে ভাবনা এখন ভাবতে যাই কেন?'

—'আ, সে বড় আশীর্বাদের দিন হবে।'

ছেলেটি সোফার গায় মাথা কাত করে চোখ বুজল। খানিকক্ষণ পরে বিভার দিকে তাকিয়ে বললে,—'হৃদয়ে আসে নি কি?'

—'প্রেম?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে কেন আর ভিক্ষে করতে যেতাম?'

—'কিন্তু কবে আসবে?'

—অনেকক্ষণ পরে বললে—'আমাকে অপেক্ষা করতে বলেন!'

—'কদ্দিন অপেক্ষা করবেন?'

—'এক বছর দু'বছর।'

—বিভা একটু হাসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কিন্তু প্রেম আপনি কোথায় পাচ্ছেন?'

—'কেন আমি কি কোনো পুরুষকে ভালবাসতে পারব না?'

অনেকক্ষণ পরে বললে—'আমার কল্যাণই এত চাচ্ছেন তখন আমাকে না ভালবেসে বিয়ে করলেই পারেন।'

—'সেটা কি সুখের হবে সাহেব?'

—'শেষ পর্যন্ত গিয়ে স্বামী-স্ত্রী সুখীই হয়।'

—'কিন্তু উদাসীনতা দিয়ে যে-সম্বন্ধের সূচনা তার ভবিষ্যৎ কি সুবিধার?'

—'কিন্তু অনেক দিনের সংসর্গে পরস্পরের প্রতি একটা গভীর মমতা জন্মায়।'

—'উদাসীনতা কেটে যায়?'

—'নিশ্চয় যায়?'

—'কিন্তু অতৃপ্তি থাকবে।'

—'কেনই-বা থাকবে?'

—'প্রেম চরিতার্থ হল না বলে।'

—'একজনের তো হল?'

—'কিন্তু আর-একজন কী করবে?'

—'সে নারী, মায়ামমতাই তাকে রক্ষা করবে। মায়ামমতা নিয়েই তাদের জীবন।'

বিভা চুপ করে রইল।

—'সন্তানের দল এসে যখন তাকে পাকাপাকি মা করে তুলবে তখন সে হয়তো প্রেমপ্রণয়কে ঠাট্টাও করবে।'

—'এ রকম মা অনেককেই হতে হয় অবিশ্যি।'

—'তবে আর দ্বিধা করছেন কেন?'

—'কিন্তু অন্য কারুর সঙ্গে প্রেমের সার্থকতা নিয়েও তো শুরু করতে পারি।' ছেলেটি চুপ করল।

রুস্তমজি—'জীবনের দাম তাতে মোটামুটি বাড়বেই।'

—'তা কী করে বলি! কোনোদিনও তো না আসতে পারে।'

—'না, না, তা হবে না।'

—'না হলেই ভাল।'

—'ভাল বলছেন? তাহলেই তো আমাকে ভালবাসেন।'

—'না, তা নয়। আপনার কল্যাণ চাই বলে বলছি।'

—'আমার মত এমন আকুলতা আপনার জন্য যদি কেউ দেখাতে আসতে তাহলে তারও এ রকম কল্যাণ চাইতেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে পথের ভিখিরি হলেও?'

—'পথের ভিখিরি হলেও।'

ছেলেটি যথেষ্ট দমে গেল।

ছেলেটি উঠে বসে বললে—'আট-দশ বছর?'

—'যদি মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়?'

—'তাও তো পারি।'

—'কিন্তু বুড়ো বয়সে আপনাকে পেয়ে কী লাভ?'

—'আপনাকে পেয়ে সব সময়ই আমার লাভ।'

—'কিন্তু মাঝখান থেকে জীবনটা তো আপনার নষ্ট হয়ে যাবে।'

—'তা আমি মনে করি না।'

—'আপনার মতন ছেলেরা এই রকম সুন্দর স্বপ্ন দেখে।'

—'আর আপনার মতন মেয়েরা?'

—'যখন ভালবাসি, দেখি।'

—'এখন দেখছেন না?'

—'না, এ জাতীয় স্বপ্ন এখন বিগত জীবনের জিনিস।'

—'একদিন ভালবেসেছিলেন তাহলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কাকে?'

—'একে একে অনেককে।'

—'অনেককে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আশ্চর্য হলেন?'

—'আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।'

—'কী?'

—'এই বুঝি প্রথম ভালবাসতে যাচ্ছিলেন?'

—'আপনাকে?'

—'হ্যাঁ।'

—'যদি ভালবাসতে পারি তাহলে এই আর-একটা প্রেমের স্মৃতি যুক্ত হবে।'

—'অনেককার স্মৃতিগুলোর সঙ্গে? বাঙালি মেয়েরা কি এই রকম?'

—'পৃথিবীর সব ছেলেমেয়েরাই ভালবাসায় সায় দিতে পারে।'

—'কিন্তু বার বার ভালবাসে।'

—'হ্যাঁ। বার বার বিচ্ছেদের ব্যথাও পায়। এমনি করে আমাদের জীবন তৈরি হয়।'

—'জীবনের সম্বন্ধে এই বুঝি আপনার ধারণা?'

—'আপনার অভিমত কী রকম?'

—'আমি একবারই ভালবাসি।'

—'কিন্তু জীবনটা তো আপনার শেষ হয় নি।'

—'কিন্তু শেষ পর্যন্তও এই একটি প্রেমই থাকবে।'

—'এ খুব জোর করে বলছেন।'

—'জীবনে এটুকু জোর যদি না থাকে।'

—'তবেই তো জিনিসটা জোরজবরদস্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।'

—'আমি তা মনে করি না। এ চরিত্রের জোর।'

—'সে তো বড়ি গিলতে যে জোর লাগে, এ তাই। প্রেমকি বড়ির মত তেতো মনে করবেন না।'

—'আমি তা মনে করি না।'

—'কিন্তু যারা ভালবাসা দিয়ে শুরু করেছিল সেই সব নরনারীর নেজেদের, পরস্পরের) সম্পর্কও অনেক সময় তেমনি তিক্ত হয়ে ওঠে।'

ছেলেটি কিছু বললে না।

বিভা—'অন্তত নীরস নিরর্থক শূন্য জিনিস হয়ে দাঁড়ায়।'

—'মানুষ তাহলে বিয়ে করে কেন?'

—'অবিশ্যি একটা কর্তব্যের জগৎ আছে। সমাজের জীবন সৃষ্টিকে চালাতে হবে। গড়ে তুলতে হবে। সমাজের খাতিরে মানুষ তাই একদিন প্রেমের অভি-সারকে বাদ দেয়।'

—'এই সব মনে করে আপনি নিরাশ হয়ে পড়েন না?'

—'নিরাম হবার কী আছে?'

—'জীবনটাকে সুন্দর মনে হয়?'

—'নরনারীর প্রেমই তো শুধু জীবনটাকে বিচিত্র সুন্দর করে তুলছে নায়।'

—'তবে?'

—'চারদিককার জীবনের স্রোত আছে, কাজ আছে, বই আছে, গাছপালা আকাশ রয়েছে। একটি দিনের পর আর-একটি দিনের জন্ম রয়েছে-[...] আছেন।'

—'টেবিলের ওপর ভূমিষ্ঠ হল?'

—'হ্যাঁ।'

—'ভারি চমৎকার।'

—'শিগগিরই কৃষ্ণচূড়া ফুটবে।'

—'খুব সম্ভব ইংরেজিতে গোল্ড মোহর বলে।'

—'এই শীতেই কি ফোটে?'

—'না, শীত শেষ হয়ে গেলে।'

—'আজ বড্ড শীত পড়েছে।'

—'খুব।'

—'কুর্চি নামটা ভারি সুন্দর।'

—'বেশ তো।'

—'আপনার জানালার কাপাটে একটা চড়াই এসে বসেছে।'

—'রোদে বেশ ভাল লাগছে পাখিটার।'

—'ঠোঁটে একটা কুটো রয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হয়তো কোথাও গিয়ে বাসা বাঁধবার মতলব।'
—'ভারি দুষ্টু পাখি।'
—'চড়াই?'
—'টেবিলে লিখছি এমন সময় কাগজপত্রের ওপর তোষকে খানিকটা ধূলো বালি ছিটিয়ে গেল।'
—'সেটুকু ময়লা এক ফুঁয়েই তো উড়ে যায়।'
—'তা যায় বটে।'
—'রুস্তমজি বললে-'মাঝে মাঝে ডিম ভাঙে আমার হ্যাটের ওপর।'
—'এরকমও হয়েছে?'
—'হ্যাঁ।'
—'কিন্তু তাতে আপনার চেয়ে পাখিটারই তো কষ্ট হল বেশি।'
—'কেন?'
—'তার গেল সন্তানই নষ্ট হয়ে। আপনার হ্যাটের একটা কিনার শুধু নোংরা হল।'
বিভা চুপ করল।
রুস্তমজি—'শালেই মেয়েদের সবচেয়ে বেশি সুন্দর দেখায়। আপনি বরাবরই শাল গায় দেন?'
—'এই শীতকালে দিই।'
—'মেমসাহেবি যে করেন না এ খুব ভাল।'
দু'জনেই চুপচাপ।
ছেলেটি ছটফট করছিল। কিছুক্ষণ পরে বললে—'কিন্তু কথা বলুন।'
—'বলছিই তো।'
—'না, ও-রকম কথা নয়।'
—'তবে?'
—'বলুন আমাকে ভালবাসেন।'
বিভা চুপ করে রইল।
—'নিশ্চয়ই বাসেন। নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই বাসেন, আর কিছু আমি মনে করতে পারি না। তাহলে আমি মরে যাব। তোমাকে ছাড়া আমার একদণ্ডও চলবে না। এক মুহূর্তও না।'
বিভা উঠে চলে গেল।
'ছেলেটি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু বিভা ফিরল না আর।'

দিন দুই পরে।
কলকাতার শীত এবার বেশ চলেছে। সমস্ত পৌষ মাসটা বেশ ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কেটে যাচ্ছে।

দুপুরবেলা পায়ে একজোড়া ছেঁড়া মোজা আর গায় একটা কম্বল জড়িয়ে জানালার পাশে ডেক চেয়ারে বসেছিলাম। শব্দ শুনে পাশের বাড়ির দিকে তাকালাম। দেখলাম, ধীরে ধীরে দরজা সরিয়ে একটি যুবক ঢুকল। গায়ে টুইডের সুট, মাথায় ফেল্টহ্যাট, হাতে একটা স্টেথোস্কোপ।

এ সেই ডাক্তার ছোঁড়াটি-সকালবেলা আসে না, রাতেও না, আসে দুপুর-বেলা। বিভার কাছে মাঝে-মাঝে একে অনেকটা সময় কাটিয়ে যেতে দেখি। বিভার স্বাস্থ্য অটুট, তার কোনো অসুখ নেই, ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। এ ছেলেটির সঙ্গে কোনো রকম ডাক্তারি কথা হয় না কোনোদিন। হয় কি? আমি তো শুনি নি।

—'ডাক্তারবাবু!'
—'না, একথা বললে আমি ঘরে ঢুকব না।'
—'তবে, ডাক্তার সাহেব?'

—'তাহলে তো সিভিল সার্জন হয়ে গেলাম মিস রায়, আমরা [...] নেমক কোনোদিন খাব কি? কী দরকার? ও হীন ভীরুদের পথ। জীবনে যদি সাথে থাকে তাহলে কাঁটা পথে চলে না মানুষ। জংলা পথ কেটে। আ। দেখেছেন চড়াইটা?'

—'কোথায়?'
—'আপনারই জানলায় তো?'
—'শীতে বড্ড কাঁপছে!'
—'এ ওর নিজেরই দোষ।'
-'কেন?'
—'সমস্ত আকাশ ভরা রোদ তো রয়েছে, এই ছায়ায় এসে বসবার কীই-বা দরকার ছিল।'
—'হয়তো কোনো খাবারের লোভে এসেছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ডালমুট খাচ্ছিলেন বুঝি?'

—'কে আমি?'

—'তা বেশ; শীতের দুপুরে বসে বসে ডালমুট খাওয়া বেশ—'

—'ডাক্তারেরা বোধহয় এই-ই করে?'

—'না, এটা হল মেয়েদের খাসদখলের নিজস্ব জিনিস। ডালমুট, ঝালচানা, সমস্ত নুন মরিচ, লেবুর জিনিস,' ছেলেটি বললে—'বলুন, ভালবাসেন কি না?'

—'ভালবাসি বই কি।'

—'মেয়েদের সম্বন্ধে ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা এই রকম গভীর!'

—'একটা কথা বেশ মনে করিয়ে দিয়েছেন আপনি।'

—'কী?'

—'দুপুরবেলা তো অনেক সময়ই চুপচাপ বসে থাকি।'

ডাক্তার গলা খাঁকরে বললে—'আচ্ছা।

—'প্রায়ই দেখি, আশেপাশে কার্পেটের ওপর জানালায় টেবিলে কার্নিশে এই চুড়াইগুলো খুনসুড়ি করছে।'

—'খুনসুড়ি শব্দটা বড্ড দুষ্প্রাপ্য মিস রায়। মেয়েরা প্রায়ই ব্যবহার করে না, কাজেই, এমন চমৎকার শোনায় তাদের মুখে! আপনি নিশ্চয়ই কোনো বাংলা গজলে শব্দটা পেয়েছেন?'

—'না না।'

—'তবে?'

—'কবে কোত্থেকে পেয়েছি মনেও নেই।'

বিভা—'যা বলছিলাম, এই চড়াইগুলির করুণ নিরপরাধ আসা যাওয়া দেখে বড্ড ভাল লাগে। কিন্তু প্রায়ই ভুলে যাই ওদের কোনো খাবার দেওয়ারও দরকার।'

—'খাবার এরা বিস্তর পাচ্ছে।'

—'কোথায়?'

—'আমি এক সময় অবাক হয়ে ভাবি কলকাতায় যত খাবার জিনিসের অপচয় হয় সেই অনুপাতে ইঁদুর বা চড়াই নেই এ শহরে।'

বিভা হেসে উঠল।

—'কিন্তু চড়াই আর ইঁদুর ছাড়া প্রার্থী তো আরো ঢের আছে, কত ভিখিরিরা, কুকুর, বেড়াল।'

—'ষাঁড়, কাক, চিল-তা জানি আমি। কিন্তু কতকগুলো বিশেষ জায়গায় মানুষের অন্তঃপুরের খুব আনাচে-কানাচে ইঁদুর আর চড়াই ছাড়া আর-কেউ ঢুকতে পারে না।'

—'স্টেথোস্কোপ হাতে অনেকে ঢুকে পড়ে অবিশ্যি।' ডাক্তার একটু হেসে বললে—'এতক্ষণ তো দাঁড়িয়ে রইলাম, একটু বসতেও বললেন না।'

—'বসুন।'

—'সেধেই বসলাম; ডাক্তারদের সঙ্গে কেউ ভদ্রতা করা উপযুক্ত মনে করেন না। উঠলেন যে!'

—'দেরাজে একটা কেক ছিল।'

—'আমাকে দেবেন?'

—'এই চড়াইটাকে একটু ভেঙে দিচ্ছি।'

চড়াইটার দিকে এক টুকরো কেক ছুঁড়ে ফেলতেই সে উড়ে গেল। ডাক্তার—'এ রকম বেকুব প্রাণীর জন্যও আপনার এত দরদ!' একটু হেসে বললে—'মেয়েদের এই রকমই হয়।'

স্টেথোস্কোপ পকেটে রেখে বললে—'দিন কেকটা আমাকে।'

—'আপনি খাবেন?'

—'সাধারণত খাই না, বিশেষত কেকটা যে-রকম ছানছেন, হাত স্টেরিলাইজডও তো নয়। নখও কাটেন নি। আমাদের ডাক্তারদের এই সব জিনিসে বড্ড আঘাত লাগে। কিন্তু তবুও কেক খাবার রুচি এ সব বিবেচনাকে অগ্রাহ্য করে-করে অপরাজেয় হয়ে উঠল।'

বিভা একটু হেসে—'নিন।'

—'একটু ভদ্রতা করেও দিলেন না তো।'

—'কেন, আপনার গায় ছুঁড়ে ফেলি নি তো; অভদ্রতা বরং চড়াইটার সঙ্গে করেছিলাম।'

—'কিন্তু আমি তো চড়াই নই। আমাকে একটা ডিশে করে দিতে হয়।'

—'ডিশ কোথায়? নেই তো এখানে!'

—'কিন্তু খানশামা তো আছে।'

—'সে কোথায়? রান্নাঘরে।'

—'তাকে ডাকতে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আবার গিয়ে ডাকব—'

—'তাহলে নিজে গিয়ে একটা ডিশ নিয়ে আসতে হয়।'

ডাক্তার উঠলেন!—[বিভা উঠল!]

—'যাচ্ছি।'

—'কোথায়?'

—'ডিশ আনতে।'

—'কিন্তু কেক তো আমি মেরে ফেলেছি প্রায়।'

—'কিন্তু কেক কি আমাদের বাড়িতে নেই?'

—'আমি একটাই চেয়েছিলাম শুধু, বেশি তো চাই নি।'

—'কিন্তু আমি তো দিতে পারি।'

—'কিন্তু আমি না নিতে পারি তো।'

—'কেন নেবেন না?'

—'কেনই বা নেব?'

—'কেন, ডিশে করে এনে দিচ্ছি।'

—'সঙ্গে এক পেয়ালা কফিও আনবেন হয়তো।'

—'বেশ বেশ।'

—'কিংবা এক বোতল লেমনেড।'

—'যা চান আপনি'।

—'কিন্তু আমি আর-কিছুই চাই না মিস রায়।'

বিভা বসল।

ডাক্তার—'শুধু এক গেলাস জল চাই।'

বিভা উঠে দাঁড়াল। বললে—'জল তো এখানেই আছে।'

—'কিংবা টালা ওয়াটার ওয়ার্কসে, যেখানেই থাকুক, আপনি এক গেলাস আমাকে গড়িয়ে এনে দিলেই খুব খুশি হব।'

বিভা ঘরের এক কোণে ছোট্ট একটা তেপয়ের ওপর কালো কুঁজোটার থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে এনে দিল ছেলেটিকে।

জল খেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ডাক্তার,—'এজন্যই বলেছিলাম।'

—'কী রকম?'

—'আপনার কাছ থেকে পেলাম লোকসানে খাওয়া একটা কেক। সঙ্গে একটু সমবেদনা পর্যন্ত না। অন্য কেউ হয়তো কতকগুলো বোবা টাকা দিয়ে দিত। বদলে ভাল টাকা চাইলে মনে মনে পাড়ত গাল', রুমালটা পকেটে রেখে বললে,—

'এই রকম।'

—'বোবা টাকাও দেয়?'

—'তাই দেওয়াই নিয়ম।'

—'বাজিয়ে নেন না?'

—'সেটা অভদ্রতা।'

—'ডাক্তারবাবুর?'

—'না, গোড়ার থেকেই সম্ভাষণটা ঠিক করে নেওয়া উচিত, ডাক্তারবাবুও না, সাহেবও না।'

—'তবে?'

—'ব্যানার্জি।'

—'শুধু ব্যানার্জি?'

—'খুব, খুব।'

—'মিঃ ব্যানার্জি!'

—'কী দরকার আর মিস্টারের।'

—'এমনি ব্যানার্জিটা বড্ড অভদ্র হয়।'

—'আমি তা মনে করি না। কিন্তু আপনি যদি আজ্ঞা করেন।'

—'কিন্তু আমি তা মনে করি।'

—'তাহলে ভেবে নেবেন যে মানুষদের কাছ থেকে অভদ্রতা পাওয়া আমাদের দস্তুর।'

—'কিন্তু তাই বলে আমিই-বা আপনার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করতে যাব কেন?'

—'এ ঘরে ঢুকেছি অব্দি আপনি আমার সঙ্গে খুব অসামাজিক ব্যবহার করছেন!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'প্রথমত আপনার ঘরে এলাম তো, বসতেই বললেন না।'

—'আমি ভেবেছিলাম বাবাকে দেখে বাসায় ফিরে যাবার পথে একটু এসে দাঁড়ালেন বুঝি?'

ডাক্তার একটু ঢোক গিলে বললে—কিন্তু তবু তো এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম তো।'

—'অতটা খেয়াল হয় নি।'

—'কিন্তু দাঁড়িয়েছিলামও অনেকক্ষণ।'

—'ভুল হয়ে গেছে।'

—'কিংবা হয়তো ভেবেছিলেন ডাক্তাররা ও-রকম দাঁড়িয়েই থাকে। তারা বসতে বলবার মানুষ তো নয় বাবা।'

—'না, আমি তা মনে করি না।'

—'আপনি কী মনে করেন না-করেন তা দিয়ে আমি কী করব? একজন ভদ্র মহিলার খাস কামরায় বিস্তর দোলা খাটিয়ে থাকলেও মনের ভেতর আমার ইচ্ছা ছিল, তার নির্দেশ পাওয়া মাত্রই বসব। যেমন সচরাচর হয়, তেমনি আশা করেছিলাম যে সে নির্দেশ মুহূর্তের ভিতরেই পাব কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও পাওয়া গেল না। কাজেই মানুষের আত্মরক্ষার স্বাভাবিক টানে প্রবৃত্তিকে খাটিয়ে বিনা অনুমতিতে নিজেই বললাম।'

—'লেকচারটা খুব মস্ত বড়।'

—'কিন্তু খুব মূল্যবান।'

—'হয়তো সাহেবদের কাছে।'

—'আমরাও তো দিনের পর দিন সাহেব হয়ে যাচ্ছি।'

—'আমি অন্তত না।'

—'যদি বাঙালি থাকতেন, চড়াইটাকে খানিকটা মুড়িচিঁড়ে ছড়িয়ে দিতেন। ড্রয়ারের থেকে কেক বের করতে যেতেন না।'

বিভা হাসতে লাগল।

ডাক্তার—'হাসছেন কি! বসতে বললেন না, তবুও বসলাম, এটা আমি বাঙালির মতোই কাজ করেছি; কোনো সাহেব এ-রকম করত না।'

—'সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

—'এটা আপনার সাহেবি ঢং হল; কোনো খাঁটি বাঙালি ভটচাজ্জি পণ্ডিত বা তার গিন্নি বা মেয়ে আপনার মতন এমন সৌখিন ধন্যবাদ জানাতে যেতেন না।'

—'কিন্তু আমরা ভটচাজ্জি পণ্ডিত নই।'

—'তা তো ননই। তার গিন্নিও নন। হবার আশাও নেই কোনোদিন।'

—'তবুও বাঙালি।'

—'একটা শাল গায় দিয়েছেন বলে?'

বিভা একটু হেসে বললে,—'না, তা নয়।'

—'এ শালের কৃপায় আপনাকে বরং খানিকটা কাশ্মীরি পণ্ডিতানীর মতন দেখাচ্ছে।'

—'সে তো খুব গৌরবের কথা।'

—'কিন্তু তবুও তো বিদেশীয় জিনিস।'

—'কাশ্মীরের পণ্ডিত তো ভারতের লোকই।'

—'পণ্ডিত নয়, পণ্ডিতানী'।

—'সেও তো ভারতবর্ষের নারী।'

—'কিন্তু তবুও বাঙালি নারী নয় তো।'

—'বাঙালি নারীরা কি শাল গায় দেয় না?'

—'বিস্তর দেয়।'

—'তবে?'

—'কিন্তু এরকম কাশ্মীরের শাল নয়', 'ডাক্তার গলা খাকরে নিয়ে বললে—'ভটচাজ্জির স্ত্রীকে গিয়ে দেখুন পাড়াগাঁয়, হয়তো গেরুয়া রঙের খদ্দরের শাল গায় নিয়েছে একটা, কিংবা শুধু শাড়ির খুঁট বুকে জড়িয়ে শীত কাটাচ্ছে।'

—'বেশ ভাল।'

—'কিন্তু খাঁটি বাঙালি, নিছক স্বদেশী হওয়া বড্ড দুষ্কর। আমরা কেউ তা পারব না।'

—'কিন্তু এও আমরা বিশ্বাস করি যে তারই নিছক স্বদেশী।'

—'তবে কি আপনারা আর আমরা।'

—'যাদের কথা বলবেন তারা অনেকটা মোগল যুগের ধারাই বয়ে চলেছে।' ডাক্তার স্টেথোস্কোপটা পকেটের থেকে বের করে সোফার ওপর রাখল। বিভা—'কিন্তু দেশের প্রাণ যুগের পর যুগ বদলে চলেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার—'ঢের নীরস তর্কের অবতারণা করা হল। অন্য সময় বিচার করা যাবে। আপনার কাছে যে সাহেবটি আসত তাকে আজকাল আর দেখছি না কেন?'

—'সাহেব কে আসত আবার?'

—'অবিশ্যি বলতে পারেন যে-যে-কটিতে আমরা আসি আপনার কাছে, দু-চারজন বাদে আর-সকলেই কিছু কম সাহেব নয়।'

বিভা কোনো উত্তর দিল না।

ডাক্তার—'আমাদের সাহেবি শুধু পোশাকে, প্রাণে আপনিও দেশী, আমিও দেশী।'

—'আমার কথা যদি বলেন পোশাকের সায়েবিয়ানা আমি কোনোদিন পছন্দ করি না। এবং নিজেও তার ত্রিসীমানায়ও থাকি না।'

—'কিন্তু পুরুষদের অনেক সময় দায়ে পড়ে পছন্দ করতে হয়।'

—'বাবা তো কোনোদিন হ্যাটকোট পারলেন না।'

—'সেকালের মানুষদের চোগাচাপকনাই ছিল দস্তর।'

—'যাক গে।'

—'যাক।'

ডাক্তার স্টেথোস্কোপটা সোফার থেকে নাড়তে-নাড়তে বললে—'কিন্তু একটি খাঁটি সাহেব আসতে আপনার কাছে।'

বিভা একটু ভেবে—'মোক্ষদাবাবুর কথা বলছেন আপনি?'

—'না, কোনো বাবুটাবু নয়।'

—'তবে?'

—'হয়ত কোনো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান!'

—'না, এমন কেউ আসত না তো।'

—'তাহলে পশ্চিমের কোনো লাল টালা হবে বোধ করি!'

—'আমার কাছে? কবেই-বা দেখলেন আপনি?'

—'খুব কয়েকদিন ঘুরতে দেখেছি, দিন নেই রাত নেই,' ডাক্তার ভুরু দুটো খানিকটা কুঁচকে বললে—'দিল্লি বা লাহোরের ওদিকের কোনো বামুনের ছেলে হতে পারে। কিংবা রাজপুত, কিংবা দিল্লিওয়ালি, মুসলমানের ছেলে।'

—'ও, রুস্তমজির কথা বলছেন? তিনি তো পার্সি।'

—'পার্সি নাকি ছেলেটি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু সেই পার্সি টুপি পরে নি তো।'

—'না ফেল্ট হ্যাট পরত।'

—'আপনার সঙ্গে এত দেখা।'

—'তা হয়েছিল।'

—'কী করেই-বা হয়!'

—'আপনার সঙ্গেই-বা কী করে হল?'

—'বাঙালি পাড়ায় বাঙালি ডাক্তারের গতিবিধি তো খুব স্বাভাবিক। পার্সির গতিবিধি তেমনি অস্বাভাবিক।'

—'তাই বলতে যাচ্ছিলাম, ছেলেটি ডাক্তার?'

—'না।'

—'তাও নয়?'

স্টেথোস্কোপটা শূন্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডাক্তার—'তা হবেই বা কী করে? মেডিকেল কলেজে পার্সি ছেলে কই, বড় একটা দেখি না তো। জাতব্যবসা ছেড়ে অন্য কোনো দিকে বড় একটা মাড়ায় না ওরা। তা ভেবেছিলাম, ডাক্তার বুঝি। কিংবা ব্যারিস্টার, কিংবা ইঞ্জিনিয়ার। আপনার বাবার যা শখ। একটা নেপালি কাকাতুয়া কিনেছিলেন না তিনি কদিন আগে? ভেবেছিলাম, এই ছেলেটিকেও ওরঙ্গাবাদ থেকে জোটালেন বুঝি! আপনাদের এখানেই থাকত?'

—'কে, রুস্তমজি?'

—'হ্যাঁ।'

—'না, পার্কস্ট্রিটে নিজেদের বাসা আছে।'

—'কিন্তু দিনরাত দেখতাম যে।'

—'আসত খুব।'

—'পার্কস্ট্রিটে বাসা?'

—'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ব্যবসা করে বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

একটু চুপ করে থেকে ডাক্তার—'তা আজকাল আর সাহেবকে দেখছি না যে?'

—'তা আমি কী করে বলব?'

—'বেশ তো উঁচুদরের সাহেব।'

বিভা কোনো জবাব দিল না।

—'ইংরেজিতে কথা বলতেন?'

—'বাংলায়।'

—'বাংলাও শিখে গিয়েছে বুঝি?'

—'বেশ বলতে প্যারে।'

—'গরজে, মানুষ অনেকদূর এগিয়ে যায়।'

বিভা চুপ করে রইল। একটু পরে মুখ তুলে বললে—'আপনি পার্সি শিখতে পারবেন।'

—'আপাতত দরকার নেই।'

—'সকলেই চুপচাপ।

ডাক্তার—'একবার জার্মান শিখতে আরম্ভ করেছিলাম।'

—'তারপর?'

—'ছিলাম এডিনবরায়। কিন্তু স্কচের চেয়েও জার্মানের প্রতি হল আসক্তি।'

—'কেন?'

—'কারণটা নাই-বা শুনলেন।'

বিভা ঘাড় হেঁট করল।

—'যাদের-যাদের টাকা আছে এবং নিজেদের সাধারণ শক্তি আছে, সংস্কার নেই, তাদের অনেক রকম সার্থকতা হয় কিনা,' একটু চুপ থেকে বললে—'আপনি যে চুপ?'

—'কী বলব?'

—'আমার কথাটা সত্যি নয়?'

—'আপনি জানেন।'

—'খুবই সত্যি।'

—'অবিশ্যি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা অন্য রকম।'

—'মনে আপনার সংস্কার যে ঢের।'

—'কোনো মিথ্যা সংস্কার নেই।'

—'কিন্তু ভগবানে তো বিশ্বাস করেন?'

—'সেটা কি মিথ্যা সংস্কার?'

—'আমরা তাই মনে করি।'

—'এটা বোধ হয় আপনাদের গৌরবের জিনিস?

—'কোনো কিছু নিয়ে গৌরব করবারও প্রবৃত্তি নেই। এ সংস্কার থেকেও মুক্ত। কিন্তু অনেক গভীরভাবে ভেবে দেখেছি, ভগবান নেই।'

বিভা একটু হেসে—'আপনার গভীর ভাবনা জয়যুক্ত হোক।'

—'কিন্তু আপনি ত বিশ্বাস করেন, ভগবান আছেন?'

—'এ রকম সংস্কার নিয়ে যাত্রা করেছি বটে।'

—'যাত্রার শেষে একটা সংস্কার থাকবে?'

—'অন্তত চাই, যেন থাকে।'

—'সর্বশক্তিমান সব জায়গায়ই আছেন, সকলে মঙ্গল করছেন এই রকম?'

—'হ্যাঁ, এই রকম, এখনো এইই মনে হয়।'

—'তাহলে চিরকালই এই রকম মনে হবে।'

—'আমিও তাই আশা করি।'

—'সে আশা আপনার ঠিকই। আপনার এই বয়সেই মানুষের হতাশা ও অবিশ্বাস শুরু হয় কি না। এ বয়সেও যদি সরল বিশ্বাস অটুট থাকে, তাহলে বুড়ো বয়সে আরো তা গেড়ে বসবে, স্টেথোস্কোপটা নেড়ে—'কেন জানেন?'

বিভা স্টেথোস্কোপটার দিকে তাকাল।

ডাক্তার—'যে মানুষ জীবনটাকে খুব নিরর্থক বলে জানে যৌবনে সেও সাধলালসার ভেতর ডুবে সবই ভুলে থাকে। কিন্তু বুড়ো বয়সে তাকেও প্রার্থনা করতে হয়। জীবনটা সহসা আলোর জিনিস হয়ে চোখে দেখা দিল বলে নয়। কিন্তু দাঁত গেছে ভেঙে, চোখে হয়েছে ক্যাটারেক্ট, শরীরের সমস্ত জায়গাই নানা রকম ভয়াবহ লোকসান হয়ে গেছে বলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

—'জীবনটা আমাদের শরীর নিয়েই শুধু?'

—'তাই তো বললাম এতক্ষণ, একদিন যদি ফুটপাতের পাশে গলিত কুষ্ঠের ব্যারাম নিয়ে বসে থাকেন তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

বিভা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। ডাক্তারও।

ডাক্তার—'পৃথিবীর জীবনে রক্তমাংসই প্রধান।'

—'তাও আমি মনে করি না।'

—'যদি মনে না করেন আপনি?'

—'কুষ্ঠ রুগীরাও তো ভগবানের জয়গান করে নি।'

—'বলেছিই তো বুড়ো বয়সে আমাদের সকলকেই প্রার্থনা করতে হয়।' ডাক্তার স্টেথোস্কোপটা সোফার ওপর একপাশে ঠেলে রেখে দিল, বললে—'যা বললাম, শরীরের সব দিকে সমস্ত রকম লোকসানই এমন হয় তখন ভগবান ছাড়া কে আর পারে বলুন? তার প্রতি যদি নাও বিশ্বাস থাকে তবু তাকে তৈরি করে নিতে হয়।'

কার্পেটের ওপর বাঁ পায়ের জুতোটা একটু ঘষে বললে—'তাকে তৈরি করে নেই, মনের ভেতর বিশেষ কোনো অনুভূতি নেই, তবুও খানিকটা ভাবাবেগ তৈরি করি? এই সব সম্বল নিয়ে পড়ে থাকি। না হলে উপায় নেই যে।' বললে—'কিন্তু আবার যদি কোনো ব্যবস্থায় সেই পঁচিশ-ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর বয়সের জীবনে ফিরে যেতে পারি তাহলে এক মুহূর্তেই প্রার্থনা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ভাবাবেগকে করি ঠাট্টা, ভগবান যে মিথ্যা তাকে সেই মিথ্যা বলেই জানি।'

—'এ সব কাদের জীবনের কথা বলছেন?'

—'আমাদের সকলের জীবনেরই।'

—'আপনি কি মনে করেন সকলেই এই রকম?'

—'কারুর-বা মনের অন্ধতা গুবরেপোকার মত। কিংবা সে যদি সুন্দর জীব হয়, প্রজাপতি হত। তারা অবিশ্যি জীবনটাকে আমাদের মত করে ভাবে না।'

—'থাক।'

—'বলছিলেন, জীবনের অভিজ্ঞতা আপনার অন্য রকম?'

—'হ্যাঁ।'

—'বলেছিলাম মনে আপনার ঢের সংস্কার আছে।'

—'হ্যাঁ।'

—'ভগবান না হয় বিশ্বাস করলেন, কিন্তু পৃথিবীর এই সমাজ ধর্মনীতি সবই কি আপনার শ্রদ্ধার জিনিস।' আমাদের মত অতটা অবজ্ঞার নয়।'

—'পুরোপুরি শ্রদ্ধারও নয়?'

—'না, তাও নয়।'

—'উৎকট সুনীতিকে কৃপা করেন তো?'

—'কৃপারও একটা সীমা রাখি।'

—'নারীরা তা রাখে।'

—'কিন্তু সুনীতিকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে অনেক পুরুষকেই তো দেখেছি সমস্ত শোভন সীমা ডিঙিয়ে যাচ্ছেন।'

—'আমার মনে হয় তাদের ভিতরে নারীস্বভাব বেশি।'

—'নারীরাই কি সবচেয়ে বেশি সশ্রদ্ধ হয়?'

—'আমার তাই মনে হয়।'

—'আমি নিজে নারী বলে নারীর জাতকে সব বিষয়েই যে খুব অস্বাভাবিক-ভাবে শ্রদ্ধা করব তা মনে করবেন না।'

ডাক্তার কোনো জবাব দিল না।

বিভা বললে—'কিন্তু ধর্মের ইতিহাস যদি দেখেন'—

—'আমি কোনো ইতিহাসের ধার ধারি না।'

—'তবে?'

—'ঘরেবাইরে নারীদের সঙ্গে যে আমার পরিচয় তার থেকেই এ বিচারটুকু,' ডাক্তার চুপ করল।

বিভাও কোনো কথা বললে না।

ডাক্তার—'কিন্তু তবুও এ বিচার আমার ভুল নয়, এ তো আমার মনে হয়।' বিভা—'থাক, এ রকম কথা নিয়ে আলোচনা করে আর দরকার নেই।'

—'আমারও তাই মত।'

—'জীবন সম্বন্ধে ধারণা করতে গিয়ে পুরুষ ও নারী যদি ভিন্ন স্বভাবের জীবও হয়, তাহলে এ কথা ঠিক যে এমন অনেক নারী-পুরুষ রয়েছে যারা নিছক নারী বা পুরুষ নয়, কিন্তু বিশেষভাবে ব্যক্তিগত মানুষ।'

—'তা আমি জানি।'

—'নারীদের ভেতর এদের সংখ্যা হয়তো কম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমার তাই মনে হয়।'

—'সেই জন্যই নারীদের মধ্যে নীতি ধর্মান্ধতা এত বেশি।'

—'হ্যাঁ।'

—'আমি তা দেখেছি।'

—'আপনার নিজেরও ঢের সংস্কার আছে, কিন্তু আশাপ্রদ সুন্দর সংস্কারগুলো' যেমন ভগবান আছেন, মঙ্গল আছেন। বিষম কাঠখোট্টা সংস্কার, যেমন ঐ পুড়িয়ে ফেলতে হবে, ঐ মানুষটার মুখ দেখব না, অমন গান শুনলে জাত যাবে, এ লোকগুলো জানোয়ার ও অধম,-এই রকম সব সংস্কার আপনার মনে কিছু নেই। কাজেই আপনার কাছে আমি বসি, ভাল লাগে। কিন্তু এমন অনেক নারী এবং বিস্তর পুরুষও রয়েছে এই রকম সব বিজাতীয় সংস্কার যাদের জীবনটাকে বীভৎস করে তুলেছে।'

ডাক্তার স্টেথোস্কোপ ঘোরাতে-ঘোরাতে বললে—'সবচেয়ে চমৎকার এই তারা মনে করে যে তারাই বুঝি দেবতার বেশি আদরের জিনিস। জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদের কাজ করছে।' বলেই ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠল।

বিভা চুপ করে ছিল।

ডাক্তার—'বলছিলাম, জার্মান শিখছিলাম।'

—'কতদূর শিখেছিলাম?'

—'জার্মান বুঝতে পারা যায়। কিছু-কিছু কথা চালাতে পারা যায় এই অব্দি।'

—'ডাকতারি বই পড়াবার জন্য?'

—'মোটেই না।'

—'তবে?'

—'শুনতে চান?'

—একটু বিব্রত হয়ে ডাক্তার থামল।

—'বলবার কোনো দরকার নেই আপনার, ডাক্তার।'

—'ধারণা করে নিয়েছেন হয়তো?'

বিভা কোনো কথা বললে না।

—'শুনুন একজন মেয়েকে ভালবেসেছিলাম।'

—'জার্মানিতে গিয়েছিলেন?'

—'না, মেয়েটি স্কটল্যান্ডে এসেছিল।'

—'বার্লিন থেকে?'

—'না, হিন্ডেনবুর্গ থেকে।'

দু'জনেই চুপ করল।

ডাক্তার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে শেষে বললো-'কোনো কৌতূহল নেই আপনার?'

বিভা—'তা অবিশ্যি বলি না আমি। যা কোনোদিন ঘটে না এমন অনেক ভালবাসার গল্পও মন দিয়ে পড়ি।'

—'মেয়েটি দেখতে বড্ড কুৎসিত ছিল।'

—'এই হিন্ডেনবুর্গের মেয়েটি?'

—'হ্যাঁ।'

—'তবুও ভালবাসা হল?'

—'বয়স বিশ বছর মাত্র যে, স্বাস্থ্য ভারি নিটোল আর রং পাকা আপেলের মত কিনা। আপনার মুখ চোখ লাল হয়ে গেল যে!'

বিভা মাথা হেঁট করে মুখ ফিরিয়ে রইল।

—'কোথাও আঘাত দিয়েছি নিশ্চয়ই আপনাকে?'

বিভা—'থাক এ গল্প।'

ডাক্তার—'অবিশ্যি ছেলেদের কাছে বলা অভ্যাস কিনা এ সব গল্প আমার, বিশেষত ডাক্তার ছেলেদের কাছে, সব সময় খেয়াল থাকে না।'

অনেকক্ষণ পরে বিভা বললে—'ও, আপনি উঠে যান নি এখনো।'

—'না, তো। আপনার কথা শুনবার জন্যে বসে আছি। আমার ভালবাসার গল্পটা কেমন লাগল আপনার?'

—'ওটা তো মোটা জিনিস।'

—'কিন্তু ওকেই আমরা প্রেম-প্রণয় বলি।'

—'আপনারা মানে?'

—'আমরা পুরুষরা।'

—'আপনারা মেডিকেল কলেজের পুরুষেরা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তাদের সংখ্যাই-বা কম কী?'

—'তাদের ভেতরও সকলে যে এ রকম ভাবে তা আমার মনে হয় না। যাক গে।'

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বিভা—'আপনার তো এত বিচার, এত বিবেচনা আছে, কিন্তু এ সামান্য অনুভূতিটুকু নেই!'

ছেলেটি স্টেথোস্কোপটা নাড়তে-নাড়তে হাসছিল।

বিভা—'আমি অবাক হয়ে যাই আপনার এ ধরনের কথা শুনে।'

ছেলেটি হাসছিল।

বিভা—'বাস্তবিক ডাক্তারবাবু, আমি বুঝতেই পারি না যে নিজেকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রচার করবার জন্যই এ কথাটা আপনি বললেন, না, এ আপনার সত্যিই মনের কথা?'

—'নিতান্তই স্বাভাবিক কথা ছাড়া আর কী?'

—'না জানি আপনাদের অন্তর কি রকম!'

অন্তর বলে কোনো জিনিসই নেই আমাদের।'

—'কেন?'

—'বেশি-বেশি শরীরের সংস্পর্শে থেকে।'

—'এ আপনার বাহাদুরির কথা, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

—'কিন্তু গল্পটা শুনবে না?'

—'না, শুনতে চাই না।'

—'কেন?'

—'আপনাদের ডাক্তারমহলের এ-সব গল্প নিয়ে যত খুশি হাসিতামাশা করুন গিয়ে, আমার একটুও আগ্রহ নেই এ-সব গল্প শুনবার জন্য।'

—'কিন্তু অনেক মেয়েদের কাছেও তো বলেছি।'

—'এই গল্প?'

—'হ্যাঁ, এর সাঙ্গপাঙ্গ।'

বিভা অত্যন্ত পীড়িত হয়ে—'সে মেয়েদের হাত থেকে ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন। আমার জাতকেও।'

—'নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন কিন্তু জাত তো তার স্বাভাবিক পথে যাবে।'

—'স্বাভাবিক পথে মানে?'

—'যে-পথে সাধারণ সংসারের মানুষ যায়।'

—'আপনার এই পথে।'

—'সাধ-আহ্লাদের পথে।'

—'সাধের সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্য রকম।'

—'তাদের ধারণা অন্য রকম আবার।'

—'বেশ। কিন্তু আমাকে তাদের পংক্তিতে ফেলবেন না।'

—'কিন্তু তারা তো আপনার জাতের, জাতকে, রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন যে!'

—'আপনার কথা শুনলে বড্ড অবসন্ন হয়ে পড়তে হয়।'

—'কিন্ত এসব সত্যি কথা।'

—'বাঙালি নারীদের কাছে আপনার এই গল্প করে-করে বেড়ান আপনি? আর তারা তা বরদাস্ত করে?'

—'অনেকেই তো।'

বিভা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললে-'থাক।'

ডাক্তার—'শুধু কি বরদাস্ত-শুনে ফুর্তি পায়!'

—'না জানি তারা কোথায় শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছিল।'

—'এই বাংলায়ই তো।'

—'কিন্তু জীবনে এ রকম ধরনের মেয়েদের সংস্পর্শে আমি কোনোদিন আসি নি, এই সৌভাগ্য'

—'অনেক এসেছেন, কিন্তু খুঁটে দেখতে যান নি।'

বিভা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে নিস্তব্ধ হল।

ডাক্তার-'হিডেনবুর্গের মেয়েটির গল্পটা শেষ করছি?'

—'কোনো দরকার নেই।'

—'সে অবিশ্যি আমাকে যা ভালবাসত তার ভেতর ভুয়ো কবিত্ব ছিল ঢের।' বিভা সোফায় মাথা রেখে চুপ করে রইল।

ডাক্তার—'আপনি তো বলবেন তার ভালবাসাই হচ্ছে প্রেম, আমারটা আকাঙ্ক্ষা মাত্র।'

—'এ গল্পের পার্ট নিয়ে আপনাকে বুঝতে বলি নি তো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'একদিন অবিশ্যি বুঝতে পারবেন যে ভালবাসা বলে কোনো জিনিস নেই। সবই আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি আর অতৃপ্তি।'

—'মোক্ষদাবাবুও এমন কথা বলেন না।'

—'মোক্ষদাবাবুই বা কে?'

—'তিক্ততা তারও আপনার চেয়ে একটুও কম নয় কিন্তু।'

—'তিক্ততা আমার একটুও নেই।'

—'কিন্তু ভালবাসাকে তিনি মর্যাদা দেন।'

—'কোনো ভবঘুরে কবি নিশ্চয়ই।'

—'কে, মোক্ষদাবাবু?'

—'তবে আর কী? ভালবাসাকে প্রাণ ভরে শ্রদ্ধা করে, অথচ জীবন সম্বন্ধে তিক্ত, এর চেয়ে মূর্খ পৃথিবীতে আর আছে?'

—'সুন্দর জিনিসকে যারা শ্রদ্ধা করে তারা হল মূর্খ, আর পাঁকের ভেতর যে সব কেঁচো থাকে তারা হল প্রাণী! জীবন সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই অবিশ্যি একটা স্বাধীন মতামতের অধিকার আছে।'

বাধা দিয়ে ডাক্তার—'প্রেমের কবিতাটুকুই যে সুন্দর জিনিস আর যাকে আপনি স্থূল বলছেন, সেই সাধ-আকাঙ্ক্ষা, কুৎসিত এ-কথা আনকে কে বললে? বিধাতাও তো বলেন না। আপনি, আমি, আমাদের সৃষ্টির ভেতর কতটুকু প্রেম ছিল হিসাব করে যদি দেখেন।' একটু কেশে বললে—'কিন্তু জন্ম নিতে গিয়ে পূর্বপুরুষদের এক খনা কাম-কামনা বাতিল করতে পারলাম না। আপনিও না। পেরেছিলেন?'

বিভা অত্যন্ত আহত হয়ে মুখ ফেরাল।

ডাক্তার—'জীবনটা খুব সরস। আমি এর ভেতর কোথাও একটুও তিক্ততা দেখি না।'

বিভা কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—'বেশ তো, কিন্তু?'

—'কেউ না, কেউই না, অন্তত আমাদের...না। বা রাধাকৃষ্ণদের কখনো কেউ না।'

—'পৃথিবীর সকলের মঙ্গল হচ্ছে তাহলে কী করে?'

—'কে বলে মঙ্গল হচ্ছে?'

—'মঙ্গল না হলে নিজের জীবনটাকে এত সরস মনে করবেন কী উপায়ে?'

—'খুব সহজে, ব্যাঙ্কে লাখ টাকা আছে, সুদ পাচ্ছি। বালিগঞ্জে দিব্যি বাড়ি আছে। বিলেতি ডিগ্রি নিয়ে এলাম, প্র্যাকটিসে পশার জমাচ্ছি। শরীরে অসুস্থতা নেই, কোনোরকম উৎকট আদর্শ দিয়ে জীবনটাকে মাটি করবার সম্ভাবনা নেই, চেহারা সুন্দর, মেয়েরা আমাকে ভালবাসে, আড্ডা জমাবার শক্তি আছে, কারো পরোয়া রাখি না। খোলাখুলিই সব বললাম আপনাকে। আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করি বলে, বলুন বিরসতা কোথায়?'

—'না, বিরসতা নেই অবিশ্যি।'

বিভা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

—'আমাকে হয়তো কৃপার পাত্র মনে করেন।'

—'কে? আমি?'

—'দেখেছি অনেকে করে।'

—'মেয়েরা?'

—'না, মেয়েমহলে আমার ঢের পসার। ঢের প্রেমের চিঠি পাই, ছিঁড়ে, ফেলি।'

—'তাহলে দেখছি তারাই কৃপার পাত্র।'

—'কিন্তু এই মোক্ষদাচরণের মত লোক, এরা আমাকে কৃপার পাত্র মনে করে।'

—'মোক্ষদাকে চেনেন।'

—'না, কিন্তু অনেক সময় আড্ডা মজলিসে এদের মতন একজন ভদ্রলোক এসে পড়েন।'

—'তারপর?'

—'এদের আমি দু-চোখে; দেখতে পারি না।'

—'কেন?'

—'কেমন খেয়ালি, অবান্তর, জীবনটাকে ভোগ করবার খুবই ইচ্ছা আছে, কিন্তু উপায় নেই বলে কবি বা তত্ত্বজ্ঞ সেজে বসেছেন।'

—'উপায় নেই?'

—'কী করেই-বা থাকে।'

—'কেন?'

—'কারুর-বা টাকা নেই।'

—'মানে বাপের টাকা ছিল না?'

—'বাপের টাকাও কি কম জিনিস?'

—'অবিশ্যি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কারুর-বা চেহারা নেই, মেয়েরা মুখ ফিরিয়ে থাকে।'

—'আপনার ধারণা জীবনটাকে ভোগ করতে হলে মেয়েরা সব সময়ই আশেপাশে থাকবে?'

—'কেনই-বা থাকবে না বলুন।'

—'আমাকে তাহলে খুব মূল্যবান মনে করেন।'

—'হ্যাঁ, সবচেয়ে বেশি মূল্যবান আপনারাই।'

—'কিন্তু অনেকে তো আমাদের উপেক্ষা করে।'

—'বুড়োরাও করে না।'

—'যুবকারাও তো করে।'

—'এ আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?'

—'দেখলাম তো।'

—'সে কতকগুলো রোগীসোগী অসচ্ছল জীবন রয়েছে পৃথিবীতে, দায়ে পড়ে যাদের অনেক কঠিন মর্মান্তিক পথে চলতে হয়। চলে অবিশ্যি অনেকে, চলে-চলে মুষড়ে পড়ে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যেই কেউ-কেউ বেশ অপরাজেয়ভাবে চলে। সুন্দর পরিকল্পনা করে।'

—'মর্মান্তিক পথে কোথায়? জীবনটাকে অন্য নানা রকমভাবে আস্বাদ করে।'

—'সে-সব গবেটদের কথা বাদ দিন।'

—'আচ্ছা বাদ দিলাম,' খানিকক্ষণ পরে একটু কৌতুকের সঙ্গে হেসে বিভা,

—'কিন্তু টাকা আপনার কাছে বেশি মূল্যবান, না নারী?'

—'মেয়েরা অনেক জিজ্ঞেসা করে আমাকে।'

—'আমিও তো করলাম।'

—'উত্তর শুনে আঘাত পায় অনেকে; কিন্তু তুবও ডাক্তার মানুষ, চাষার মত জাবাব দেওয়াই রীতি।'

—'উচিতও?'

—'মেয়েদের আর-একটা বিশেষত্ব, তাদের আঘাত করতে পারলেই তারা সচেতন হয়ে ওঠে, বেদনার ভেতর দিয়ে যে-ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে তা অপূর্ব।'

—'কিন্তু আমার প্রশ্নটার উত্তর দিলেন না তো।'

—'সবচেয়ে বেশি মূল্যবান টাকাও নারীও। দুধও খাব, তামাকও খাব।' বিভা তেমনি কৌতুকের সঙ্গে হেসে বললে—'সবচেয়ে বেশি মূল্যবান আর কী-কী জিনিস এ রকম আছে আপনার জীবনে?'

—'এ দুটি শুধু।'

—'আর-কিছু না? দুধ আর তামাক ছাড়া?'

ডাক্তার মাথা নাড়ল।

বিভা আবার পরিহাস কৌতুকে হেসে উঠে বললে—'আমি ভেবেছিলাম সবচেয়ে বেশি মূল্যবান আরো আট-দশটি জিনিস আছে আপনার। মজলিশে যান, আড্ডা জামান, মাঝে-মাঝে হয়তো অবসাদ ও হতাশার মুহূর্ত আসে, একটা খাসা সুট, ছড়ি বা টাই-তখন এক কিনারের সোফা ও সিগারেটকেই বেশি মূল্যবান মনে হয়।'

—'মুহূর্তের খেয়াল নিয়ে তো জীবনের দামি জিনিসের বিচার করা চলে না। যখন একটা অপারেশন করতে চলেছি তখন ফরসেপই হয়তো সবচেয়ে মূল্যবান।'

—'তাই তো বটে।'

—'কিন্তু তাই বলে নারী ও টাকার যে চিরন্তন মূল্য তার কাছে একটা ফল-সেপের সার্থকতা কোথায়?'

—'তা ঠিক।'

—'তারপর বুড়ো বয়সে গিয়ে নারীরও কোনো মূল্য থাকে না।'

—'কেন?'

—'শরীরের সৌন্দর্য যখন নষ্ট, কোনো ইন্দ্রিয়ও যখন কাজ করতে পারে না। তখন কোন নারীরই-বা এমন আগ্রহ থাকবে আমার জন্যে?'

—'আপনার স্ত্রীর?'

—'আগ্রহের চেয়ে কর্তব্যবোধ থাকবে তার বেশি। যদি সে দায়িত্বহীন হয় অনেক কিছু করতে পারে। প্রায়ই দায়িত্বহীন হয়।'

—'বুড়োদেন স্ত্রীরা?'

—'দায়িত্ব তো খুব একটা সুখের জিনিস নয়, তাদের দোষও দিতে পারা যায় না। জীবনের স্বাভাবিক সুখ স্পৃহার নিয়মে চলবে তারা। চলবে না কেন? আমি আজীবনই তো চললাম। চলবেই তো। তখন একমাত্র টাকা থাকে বন্ধু।'

—'কী রকম?'

—'আপনারা যাকে অধম নোংরা বলেন কিন্তু মানুষেরা বলবে স্বর্গীয় এমন অনেক জিনিস টাকার বিনিময়ে সম্ভব হবে। বিগত জীবনের কোনো প্রেমিকা বা বর্তমান জীবনের স্ত্রী, এমন-কি সন্তানেরা চাকরেরা, অব্দি সে-রকম একান্ত ঐকান্তিক সাহায্য করতে পারবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'শেষ পর্যন্ত তাহলে টাকাই টিকে থাকে।'

—'হ্যাঁ, তাই তো থাকে।'

ডাক্তার—'বরফ ভেঙে-ভেঙে সেই মেয়েটি আসত আমার কাছে।'

—'কোন মেয়ে?'

—'সেই হিডেনবুর্গের মেয়েটি।'

ডান পায়ের বুটটা বার দুই কার্পেটে ঘষে নিয়ে ডাক্তার-'দেখতাম তার সমস্ত শরীর শীতে কাঁপছে, র‍্যাকের থেকে আমার একটা ওভারকোট নিয়ে তাকে পরিয়ে দিতাম। চিমনির ধারে গিয়ে বসতাম দু'জনে, তারপর সোডা হুইস্কি ঢেলে ঢেলে দিয়ে তাকে চাঙা করে নিতাম—'তারপর'—'একটু চুপ থেকে ডাক্তার,—'তারপর কী হত আপনার জেনে কোনো দরকার নেই।' বলে বর্বরভাবে একটু হাসল।

বিভা এই অসভ্যতাকে উপেক্ষা করে গেল।

ডাক্তার—'কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলি, এই যে নিদেন বুড়ো বয়সে সমস্ত টাকা হারিয়ে ফেলে আমি যদি জার্মানিতে সেই মেয়েটির কাছে যাই তাহলে সে দিদিমা আমাকে দেখে কাঁদবে না, হাসবে না, পুলিশে খবর দেবে?'

বিভা চুপ করে ছিল।

ডাক্তার—'আমিও সেই খুনখুনে ডাইনিকে দেখে কতখানি প্রেম বোধ করব? এই তো প্রেম।' একটু চুপ থেকে ডাক্তার বললে—'কিন্তু যদি দু-এক কোটি টাকা থাকে আমার তাহলে সতেরটি নাতি-নাতনির মধ্যেই বুড়ি আমার পায়ে পড়ে বলবে এমন দিনের অপেক্ষাই সে করেছিল, বিধাতা এতদিন পরে এ দুটো আত্মাকে যুক্ত করলেন আবার, গভীর মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত হল। এইসব আর কী! আমরা দু'জনেই বুঝব যে কপটতা চূড়ান্তে চলেছে আর মোক্ষদা হয়তো বলবে প্রেম। টাকাকে অবিশ্যি আমরা এমনি আন্তরিকভাবে প্রেম করি, মানুষকে নয়।' ডাক্তার—'কিন্তু সেই হিডেনবুর্গের ছুঁড়িটা মরে গেছে।'

বিভা একটু ব্যথিত হয়ে বললে—'এরকম শব্দ ব্যবহার করবেন না ডাক্তারবাবু।'

—'কোন রকম শব্দ?'

—'হিডেনবুর্গের মেয়েটি বললেন যে মরে গেছে তার প্রতিও শ্রদ্ধা দেখান হত, আমার শিক্ষাসংস্কারের প্রতিও।'

—'আপনার সঙ্গে যে কথা বলছি প্রায়ই তা ভুলে যাই। অন্য মেয়েদের চেয়ে আপনি এত পৃথক!'

—'মেয়েটি মরে গেল!'

—'গেল তো?'

—'কীসে মরল?'

—'নিমোনিয়ায়।'

বিভা—'স্কটল্যান্ডে না জার্মানিতে গিয়ে?'

—'এডিনবরায়ই মরেছিল, এত হুইস্কি খাইয়েও বাঁচাতে পারলাম না।'

—'মানুষ কি হুইস্কিতে বাঁচে?'

—'হুইস্কি সে-দেশের খাবার।'

ডাক্তার—'ছ' মাসে তো আমাদের সংসর্গ, কিন্তু শেষ দিক দিয়ে দেখতাম কী শরীর কী হয়ে গেছে!'

'ছ' মাসের ভেতরেই।'

—'হবে না! অত্যাচার কি কম চলেছে!'

—'বড় মদ খাওয়া পড়ত?'

'মদ দিয়ে অত্যাচারটা শুরু হত, তারপর'—ডাক্তার হি হি করে হাসতে লাগল, বললে—'তারপরের খবর আপনাকে দিয়ে আর দরকার কী!' খিক খিক করে হেসে উঠল আবার, বললে,—'আমাদের দিনকার দিনের কথা শুনলে আপাদমস্তক কাঁটা দিয়ে উঠবে আনপার।'

কথাটাকে চাপা দিয়ে বিভা—'এডিনবরায় পড়িছিলেন তখন বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'পাসও তো করলেন না।'

—'করলাম তো।'

—'অনেকের পড়াশুনা এতে নষ্ট হয়ে যায়।'

—'আমার জমত।'

বিভা কোনো কথা বললে না।'

ডাক্তার—'বাবাকে জীবনে সবসময়ই ধন্যবাদ দেই, সেই সময়ে সবচেয়ে বেশি করে দিতাম।'

—'অনেক টাকা বুঝি পাঠাতেন আপনাকে?'

—'টাকার জন্যে নয় মিস রায়।'

—'তবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এই শরীরটা আমাকে দিয়েছেন বলে, কি বাঁধন দেখেছেন, একটুও টসকায় না। মায়ের পেটের থেকে পড়ে অব্দি এই রকম। জীবনটাকে চষে খাবার মত এমন চমৎকার শরীর আমি খুব কমই দেখেছি। যদি আপনাদের কোনো বিধাতা থাকে এ তার বড় উপভোগ্য আশীর্বাদ।'

বিভা শুনছিল।

ডাক্তার—'দেখুন জার্মানির সেই হাড়ভাঙাটা মেয়েটাও যে অত্যাচারে গুঁড়ো হয়ে গেল, আমার একটা কেশও তা স্পর্শ করল না।' একটু চুপ হয়ে থেকে বললে,—'মেয়েটির মৃত্যুর পর অনেক সময় অবাক হয়ে এই কথাটাই ভাবতুম।'

—'এই কথাটাই শুধু?'

—'এই কথাটাই কি কম?'

—'সে যে মরে গেল সে জন্যে একটুও দুঃখবোধ'—

বাধা দিয়ে ডাক্তার—'তার চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর, ঢের বেশি গুণী মেয়ে দিনরাত পৃথিবীতে মরছে।'

—'কিন্তু তবুও যার সঙ্গে এত বিশেষভাবে পরিচয়—'

—'তাকে বিদায় দেয়া সবচেয়ে সহজ।'

বিভা নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

ডাক্তার—'তারপর একটি নার্স।'

—'থাক আর।'

—'শুনতে গিয়েও আমাদের অবসাদ বোধ হয়।'

—'জীবনকে জীবন বলে বুঝতে এখনো ঢের দেরি যে আপনার।'

—'আমার খুবই সৌভাগ্য এ ঘরে সাতটি আলমারি ভরা যত বই আছে সে সবের সমস্ত লেখকরাও আমারই মতন অন্ধকারে পড়ে আছে।'

—'লেখকদের কথা কেন তোলেন?'

—'অনেকেই তো খুব বড় বড় মনীষী এঁরা।'

—'কিন্তু তবুও মানুষ নয়।'

—'আচ্ছা কবিতার বইগুলোকে না নয় বাদই দিলাম।'

—'তত্ত্বের বইগুলোকেও।'

—'বেশ।'

—'তারপর কী আছে আপনার আলমারিতে?'

—'গল্প-উপন্যাসের বইও তো আছে।'

—'এসব লেখকদের মত আমার চেয়ে বিভিন্ন? জীবন সম্বন্ধে?'

—'তাই তো দেখছি।'

—'একটা কুজ্ঝটিকার আদর্শ খাড়া করেছে হয়তো?'

—'সব সময় অবিশ্যি তা করে না।'

—'একটা সাধারণ জীবনের গল্প স্বাভাবিকভাবে বলেছে? এর কোনো একটা বই?'

—'তাই বলাই তো এদের অনেকটা উদ্দেশ্য।'

—'কিন্তু বলেছে কিনা?'

—'আমাদের তো মনে হয় বলেছে।'

—'তা বলা অসম্ভব।'

—'কেন?'

—'অন্তত ভয়ে।'

বিভা চুপ করল।

ডাক্তার—'কাজেই অনেক মিথ্যা সুন্দর কথা বলতে হয়েছে।' ডাক্তার—'একটা চুরুট জ্বালাব?'

—'জ্বালাতে পারেন।'

—'কোনো আপত্তি নেই?'

—'না।'

—'জীবন সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে কখনো কোনো বইকে সাক্ষী মানবেন না,' চুরুট জ্বালাল। ডাক্তার—'বরং এ সব বইয়ে যে-সব লেখকেরা মনীষী বলে খ্যাতি পেয়েছেন তাঁদের দু-একজনকে কাছে ডেকে আলাপ করবেন?'

—তারপর?'

—'ঢের আঘাত পাবেন।'

—'কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বাধ্য হয়ে বইয়ের ভেতর যে-সমস্ত পরম বিশ্বাস, আশা আর চরম আদর্শ নিয়ে অভিনয় করছিল তারা, সে সব দেখবেন আপনার সঙ্গে দুদণ্ড আলাপ করতে গিয়েই পচা চুনকামের মত খসে পড়ছে।'

বিভা একটু আশ্চর্য হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকাল।

ডাক্তার—'পড়বে না? তা পড়বেই তো খসে। মানুষ না? মানুষকে আমি ঢের বেশি চিনি।' চুরুটে একটান দিয়ে বললে—'বই লিখতে গিয়ে এঁদের উদ্দেশ্য কী করে সাহিত্যে উজ্জ্বল অমরতা পাওয়া যায়, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এসে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলবে, আমি অমুক কবির মত, অটুট প্রেমের গান কে আর গাইতে পেরেছে? মানুষের জীবনের সম্বন্ধে কী গভীর ভরসা দিয়ে গেছেন ইনি, এঁর সাহিত্য কেমন দৃঢ় পুরুষ মানুষের মতন, জীবনের জয়জয়কারে উজ্জ্বল, ব্যথা দারিদ্র্য মৃত্যুকে পরাজয় করে নরনারীর জন্য ইনি কি অমৃতলোকের সাহিত্য তৈরি করে গেলেন। এঁর কাব্যের ভেতর রক্তমাংসের ঘ্রাণ কোথাও নেই, প্রেমকে নিয়ে না আছে ঠাট্টা না আছে তিক্ততা, না আছে নোংরামি কিংবা হতাশা, তিক্ত দার্শনিকতার একটি বিন্দু অব্দি নেই কোথাও। আছে গভীর আন্তরিক অপরিমেয় অটুট প্রেমিক প্রাণ, ব্যক্তিগত জীবনের প্রেমকে ও-রকম উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলেন বলেই কাব্যে এই অতুল অলোকসামান্য প্রেম সম্ভব হয়ে রইল অবিনশ্বর কবিতার ভাষায়-এই রকম সব। কিন্তু এমন অক্ষয় অমৃতলোকের পুত্রদের সঙ্গে দু-চার মিনিট কথা বললেই বুঝতে পারবেন ক্রমে-ক্রমে বোঁটকা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, সাঁ করে নেচে উঠেছে রামছাগলের দাড়ি, পালাবার কোনো পথও খুঁজে পাবেন না আপনি।' চুরুটটাও ডাক্তারের হাতে পুড়ে-পুড়ে যাচ্ছিল। খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলে বললে—'কিন্তু কোনো প্রেসম্যানকে সামনে রাখবেন না। কিংবা প্রেস বা জনসাধারণের খবর দিতে পারে এমন লোককেও না।' চুরুটে এক টান দিয়ে বললে—' কোনো তৃতীয় লোককেই সামনে না রাখলেই ভাল। সুনাম নষ্ট হয়ে যাবার ভয় এদের ঢের। কিন্তু যখন বুঝবে যে নিরাপদ, তখন আপনাকেও বুঝিয়ে দেবে যে বাস্তবিক জীবন বলতে কী বোঝে তারা।'

—'অনেক কথাই তো বললেন।'

—'হ্যাঁ বললাম তো ঢের।'

—'সবই যে একেবারে মিথ্যা তা নয়।'

ডাক্তার চুরুট টানছিল।

বিভা—'যেমন ইতিহাসে, তেমনি সাহিত্যের ইতিহাসে এমন অনেক প্রেম বা প্রেমের কাব্য, সুন্দর পরিকল্পনা বা বিরাট মঙ্গলময় সফলতা আজও অবদি পূজো পেয়ে চলে আসছে, সে সবের কর্মকর্তারা অত্যন্ত জঘন্য জাতীয় মানুষ ছিলেন।'

—'হয়তো প্রেম সম্বন্ধে নানারকম অস্পষ্টতাই ছিল তাদের সাক্ষী।'

—'এর জীবন সব বিষয়েই অবজ্ঞার জিনিস ছিল।'

—'খুব দুর্বল ছিল, সন্দিগ্ধ ছিল, অকৃতজ্ঞ ছিল, মানুষের কাছ থেকে এ-সবের চেয়ে বেশি অপরাধ আর-কী আপনি আশা করতে পারেন?'

—'অপরাধ অবিশ্যি আরো অনেক রকম আছে। নামজাদা লেখকদের মধ্যেও অনেকে আছেন নানা রকম নিচে মর্মান্তিক স্বভাব, অপরাধের মানুষ হয়েও খুব উচ্চ অমৃতের খ্যাতি পেয়ে গেছেন, এই সবই আমি জানি।'

—'অনেকে নয়, সকলেই।'

—'তা নয়।'

—'কী বলছেন আপনি?'

—'এঁদের অনেকে আছেন আমাদের চেয়ে ঢের ভাল জীবন চালিয়ে গেছেন।'

—'কত কম জানেন আপনি?'

চুরুটের খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে ডাক্তার—'আমার চেয়ে ভাল জীবন কারো হয়তো ছিল, কিন্তু আমি কল্পনাই করতে পারি না কোনো লেখিকা বা লেখক তাঁদের বায়োগ্রাফিতে নয় কিন্তু গোপন বাস্তব জীবনে আপনার চেয়ে একটুও সংযত সচ্চরিত্র জীবন কাটিয়ে গেছে।'

—'এ আপনার গভীর অবিচার।'

—'কার প্রতি?'

—'এই লেখকদের প্রতি।'

—'আপনার প্রতি হয়ত খানিকটা। এদের সঙ্গে আপনার পরিষ্কার জীবনের তুলনা দিয়ে যাওয়াও ভুল।'

—'আপনার এ অন্যায় কথা কেউ কি শুনবে।'

—'যারা একটু উপলব্ধি করতে পারে তারাই এর সত্য বুঝবে।'

—'কী যে বলেন আপনি?'

—'আপনার স্বপ্ন অবিশ্যি আমি নষ্ট করব না।'

—'এ আপনার বড্ড ছেলেমানুষের মতন কথা।'

—'কী রকম?'

—'আপনি মনে-মনে ভাবেন যে, আমাদের স্বপ্ন বুঝি একদিনেই; গড়ে ওঠে, কিন্তু তা ভাঙতেও এক জীবন লাগে। এর পর, অন্যদের স্বপ্ন ভাঙবার মত দুঃসাধ্য চেষ্টা করতে যাবেন না আপনি। যে-সব মেয়েরা আপনাকে বলেছে যে আপনি তাদের অনেক স্বপ্নের থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন এদ্দিন তারা অমাবস্যায় ঢুলছিল, আপনি তাদের হাতে পিদিম গেলাশ তুলে দিতেই সব জোৎস্নায় ঝকমকে হয়ে গেল, ওসব কিন্তু নেশা, স্বপ্ন নেই, সত্য নেই, কিছুই নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আপনি আমাকে শেষ পর্যন্ত ডাকলেন। এই লাভটা তো আছে।'

পরদিন দুপুরবেলা ডাক্তার এল আবার।

জানালার কাছে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছিলাম।

ডাক্তার—'পাশের বাড়িটা আপনাদের একটা মেস?'

—'কী জানি, বলতে পারি না তো।'

—'একটুও জানেন না?'

—'বিশেষ কৌতূহল বোধ করি নি।'

—'আপনাদের প্রতিবেশীদের কোনো খবর রাখা দরকার মনে করেন না?'

—'নিজের মনেই তো বেশ রয়েছে তারা।'

—'আপনিও নিজের মনে আছেন বেশ। বেশ কথা, কিন্তু ব্যাপারটা কী জানেন,' বিভা ডাক্তারের দিকে তাকাল—'আমি কয়েকদিন থেকেই লক্ষ্য করে দেখছি, এটা একটা মেস।'

—'তা হতে পারে।'

—'আপনার মা আছেন, আপনি আছেন, এ বাড়িতে নানা রকম মেয়েরা আসে। বাড়ির পাশে এ রকম একটা মেস থাকা তো ভাল নয়।'

—'কেন, কী ক্ষতি?'

—'কোনো গ্লানি বোধ করেন নি?'

—'এই মেসটা রয়েছে সেজন্যে?'

—'মেসের ছেলেদের চেনেন না তো আপনি।'

—'তারা তো আমার কাছে পরিচয় দিতে আসে নি।'

—'এলে আশ্চর্য হতাম।'

—'আমি তো বেশ নিরিবিলি আছি।'

—'বোধ করি মেসটা খুব সবে বসেছে।'

—'তা হতে পারে।'

—'আগে এ বাসায় কারা ছিল?'

—'তা আমি জানি না।'

—'আমার মনে হয়, এখানে নতুন মেস স্টার্ট করা হয়েছে,' বলে ডাক্তার চুরুট জ্বালাল। খানিকক্ষণ টেনে বললে,—'কাজেই এখনো শিকারের সন্ধান পায় নি।'

—'কীসের শিকার?'

—'কথাটা হয়তো পরিষ্কার করে বুঝলেন না?'

—'না।'

—'কিন্তু এদ্দিন কলকাতায় আছেন বোঝা উচিত ছিল আপনার।'

—'বিভার কোনো জবাব ছিল না।'

ডাক্তার—'পৃথিবীর হতভাগ্য হচ্ছে এই মেসের ছেলেরা।'

—'কী রকম?'

—'কেউ-বা পনের টাকার কেরানি, তাই বিয়েও করতে পারে নি,' ডাক্তার চুরুটে এক টান দিয়ে বললে,—'কেউ-বা পঁচিশ টাকার কেরানি, তাই মাগকে নিয়ে বাসা করে থাকতে পারে না,' খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেললে,—'কেউ-বা টিকোতে টিকোতে পঞ্চাশ টাকায় গিয়ে উঠেছে। কিন্তু এর মধ্যে এত সব এড়ি-গেড়ি ছানাপোনা হয়ে গেছে পরিবার নিয়ে কলকাতায় থাকা একটা মর্মান্তিক ব্যাপার। এইসব লোকেরাই মেসে থাকে। শনিবার দিন বাড়ি যায়, কিন্তু সপ্তাহের বাকি কটা দিন এদের জীবনের রোমান্স হচ্ছে আশেপাশের বাড়ির মেয়েদের নিয়ে।'

—'অনেক কথাই তো জানেন দেখছি।'

—'একটা স্কুলের ছেলেও এ সব জানে,' চুরুটে এক টান দিয়ে ডাক্তার,—'নটার সময় ঘুম থেকে ওঠে।'

—'কারা?'

—'এই সব হতভাগারা।'

ডাক্তার আঙুল দিয়ে আমাদের মেসটা দেখিয়ে দিলে বোধকরি। আমি তাকাই নি, খবরের কাগজ পড়ছিলাম।

—'তারপর এক-আধঘন্টা বাংলা খবরের কাগজ পড়ে। এরা খুব স্বদেশী, জানেন?'

—'সেটাই এদের দোষের হল?'

—'অথচ হতভাগ্যদের অর্ধেকই কাজ করে গভরমেন্ট অফিসে, না হয় বিলেতি মার্চেন্ট অফিসে।'

—'কী করবে, পরের টাকা ছিল না তো, যে স্বাধীন ব্যবসা নিয়ে বসবে।'

—'কিন্তু পেটের দায়ে যাকে বাপ ডাকলি তার সঙ্গে নেমোখারামি করে কী লাভ?'

—'বাংলা খবরের কাগজ পড়ে আর খদ্দর পরে বলেই বুঝি এদের নেমোখারামি?'

—'খদ্দর এরা পরে না।'

—'তবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বেশ ফ্যান্সি বিলেতি শার্ট, চিনেবাড়ির ওপেন ব্রেস্ট কোট ছাড়া এদের রোচে না।'

—'তা হলে আর নেমোখারামি হল কোথায়?'

—'না, এটুকু এরা ঠিকই বজায় রেখেছে।'

চুরুটে একটা টান দিয়ে ডাক্তার—'কিন্তু এমন অসঙ্গতি এদের জীবনে যে সকালবেলা একঘণ্টা গড়িমসি করে করে ঐ যে বাংলা কাগজটি পড়বে তখন যদি এদের কথাবার্তা শোনেন তাহলে বুঝবেন, এক-একজন কী নিরেট স্বদেশ প্রেমিক।' ডাক্তার একটু হেসে বললে,—'সে-সব স্বদেশ প্রেমের মাশুল লাগে না কি না। মুখের কথা দিয়ে আরম্ভ হয়, মুখের কথাতেই যায় ফুরিয়ে। গায়ের কোনো জায়গায় একটি ফুঁ-ও লাগে না। হাজার-হাজার লোক জেলে যাচ্ছে সে জন্য এদের কী উৎসাহ। সে-গৌরব যেন এদেরই গৌরব। যেন এরাই কত আত্মত্যাগ করল। কত দুঃখকষ্টকে স্বীকার করে নিল। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে, মুভমেন্টটা তাহলে সফল হল, হবে না? বাঙালি ছেলেরা যে-কাজে হাত দেয়-বলে পরস্পরের পিঠ চাপড়ায়। চোখমুখও রাঙা হয়ে ওঠে বোধকরি। কিন্তু একবার যদি পুলিশে এসে মেসে হানা দেয় অমনি একটা সামান্য কনস্টবলকেও বাপ ডাকতে রাজি,' চুরুটের খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলে ডাক্তার,—'সমস্ত সকালটা সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স ও দেশ-প্রেমের জন্য নিঃসঙ্কোচ নির্বিবাদ সহানুভূতি, তারপর সাবান গামছা নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে খেয়েদেয়ে, বাঙালিও নয় সাহেবও নয়, দো-আঁশলা একটা পোশাক বিলেতি শার্ট, বিলেতি কোট, বিলেতি মাফলার, লরেঞ্জ মেয়োর বাড়ির চশমা তার পর দেশি বাস অগ্রাহ্য করে বিলেতি ট্রামে চড়ে যেখানে বড়-বড় ইংরেজ সাহেবরা বসে ডিভিডেন্ড গুণছে, সেই সব অফিসে হিসেব উদ্ধার করা এই সবের ভিতরেই এদের জীবনেরও পরিণাম। এক-এক সময় ঘৃণার চেয়ে দুঃখ হয় বেশি।'

দু'জনেই চুপ করে বসে ছিল।

—'কিন্তু তবুও যদি এইসব নিয়ে নিজেদের মনে পড়ে থাকত, চুরুট নিভে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিয়ে ডাক্তার,—'কিন্তু বালাই বড় জ্বালা কিনা, বালাই বড় জ্বালা,' চুরুটে এক টান দিয়ে বললে,—'বিকেলে অফিস থেকে এসে চা-বিড়ি শেষ করে ছাদে চড়বেন, কিংবা জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দেবেন পাশের বাড়িতে কোথায় কোন মেয়েটাকে পোশাক-পরিচ্ছদের একটু অসঙ্গত অবস্থায় পাওয়া যায়।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে ছিল।'

ডাক্তার—'কিংবা সঙ্গত অবস্থায় পেলেও হয়। মেয়ে পেলেই বাছারা তৃপ্ত। তা পাশের বাড়ির ঝিই হোক আর বুড়ো গিন্নিই হোক' বলে চুরুটে এক টান দিল। বললে—'মাঝে-মাঝে নিজেরে খড়খড়ির ভেতর দিয়ে বায়নাকুলার দিয়ে দেখে।'

—'মেসের এত তত্ত্ব জানেনই-বা কী করে?'

—'আমি সব জানি।'

—'কোনোদিন মেসে ছিলেন না তো?'

—'তা নাই-বা থাকলাম। কলেজে পড়বার সময় মেসের আড্ডা মজলিসে গিয়েছি ঢের।'

ডাক্তার—'আপনি হয়তো টেরও পাচ্ছেন না, কিন্তু আপনাকে বায়নাকুলার দিয়ে এই মেসের অনেক ছেলেই কি দেখে নেয় নি।'

—'দেখুন।'

—'এতে আপনার কোনো গ্লানি বোধ হয় না?'

—'হয়তো বই পড়ছি, কিংবা লিখছি, চা খাচ্ছি, কিংবা সোফায় বসে ভাবছি এ অবস্থায় যদি আমাকে কেউ দেখে তাহলে আমার অপরাধ? এ রকম প্রশ্ন আমার কাছে বড্ড অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।'

—'কেন?'

—'পাশের বাড়ি যে একটা মেস, সে-মেসে যে ছেলেরা থাকে এদ্দিন বসে এ তো আমি টেরও পেলাম না।'

—'সে আপনার কৌতূহল খুব কম বলে।'

—'ওদের কৌতূহলও আমার চেয়ে একটু বেশি বলে মনে হয় না।'

—'কেন?'

—'যদি হত তাহলে নানা রকম ভাবেই আমাকে ইনটারেস্টেড করতে চেষ্টা করত।'

—'তা করে নি বুঝি?'

—'কই একদিনও তো,' বিভা মাথা নেড়ে বললে,—'না।'

—'তবুও জানালাটা বন্ধ করে রাখা উচিত।'

—'তা আমি দরকার মনে করি না।'

—'কতকগুলো জিনিস এরা বেশ নির্বিবাদে করতে পারে আপনি তা টের পাবেন না।'

—'ওদের নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত জিনিস নিয়ে কেন আমি মাথা ঘামাতে যাব?'

—'কেউ যদি আপনার ফটো তোলে?'

—'তুলুক।'

—'হয়তো কত অসঙ্গত অবস্থায় কত সময় বসে থাকেন। সে-রকম সব ফটোর মর্যাদাই এদের কাছে সবচেয়ে বেশি। মানুষকে তো চেনেন না।'

—'সামান্য পঁচিশ-তিরিশ টাকার কেরানিদের ফটোর শখও এত?'

—'বললামই তো।' এ সবই হচ্ছে ওদের জীবনের দুর্মূল্য সরসতা।' ডাক্তার—'ভাবছেন ক্যামেরাই-বা জোগাড় করে কোত্থেকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না, তা ভাবছিলাম না।'

—'নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে চোরাবাজার থেকে একটা কিনে নিয়ে আসে। এরা কি কম বেল্লিক!'

বিভা কোনো উত্তর দিল না।'

—'আপনার একশ-সোয়াশটা ঘটনার ফটো কি এদের কাছে নেই?'

—'মেসের ছেলেদের সম্বন্ধে এ-রকম সব ধারণা বুঝি আপনার?'

—'যাকেই জিজ্ঞেস করবেন সেই বলবে এদের সম্বন্ধে একটা অন্যায্য কথাও আমি বলি নি।'

—'এরা আর কী করে।'

—'মেসের জানালার খড়খড়ির ভেতর বায়নাকুলার রেখে চারিদিকের মেয়েদের তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে।'

—'একটা বায়নাকুলারের দামও তো কম নয়।'

—'কিন্তু এ হাড়হাভাতেরা তা বেশ যোগাড় করে নিতে জানে,' চুরুটে টান দিয়ে ডাক্তার—'হয়তো চুরি করে আনে।'

—'তারপর?'

—'মাঝে-মাঝে মেয়েদের অন্ধকার ঘরে টর্চ ফেলে।'

—'কেউ কোনোদিন আমার বেডরুমে ফেলে নি তো। কিংবা এই ঘরে যখন অন্ধকারের ভিতর বসে আছি,' বিভা মাথা নেড়ে বললে,—'না।'

—'আপনাকে তাহলে রেহাই দিয়েছে।'

—'আমার মনে হয় তাহলে বায়নাকুলার দিয়ে দেখে না।'

—'তা নয়, আমার মনে হয় টর্চ ফেলতে সাহস পায় নি। কিন্তু যেখানে সাহসের দরকার নেই অথচ ক্ষুধা ও লোভের খুব নিরিবিলি পরিতৃপ্তি হয় এই অভাগার দল ঝাড় বেঁধে সেই সব কাজই করে।'

—'তাহলে আপনি মনে করেন বায়নো দিয়ে দেখে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আর ফটো তোলে?'

—'আকছার।'

—'বললেন তো লোভী তারা, কিন্তু মানুষকে দেখে বা তার ফটো তুলে যে লোভের সূচনা হয় তার একটা পরিণতি থাকবে তো।'

ডাক্তার চুরুটে টান দিল।

বিভা—'শুধু এইটুকু করেই লোভ তৃপ্ত থাকতে পারে না। এই দেখুন না মেসের জানলায় একটি ছেলে খবরের কাগজ পড়ছে, আমার মনে হয় অনেক দিন থেকেই সে এখানে আছে। দেখুন, আমি রাতদিন তার কতখানি কাছাকাছিই থাকি, ইচ্ছে করলে সে আমাকে শুনিয়ে এক-আধটা প্রেমের গান মাঝে-মাঝে গাইতে পারত না কি?'

—'হয়তো ছেলেটির গলা নেই।'

—'কিংবা শিস দিতে পারত।'

—'বাঙালি মেয়েরা শিসে আকৃষ্ট হয় না, সে সব বিলেতের কায়দা।'

—'কিংবা ডেকে কথা বলতে পারত।'

—'তদ্দুর সাহস কোনো বাঙালি ছেলেরই নেই।'

—'কিংবা চিঠি ছুঁড়ে ফেলতে পারত।'

—'সচরাচর সেই জিনিসটাই ঘটে। ভীরু আহম্মকদের একটা হচ্ছে একটা মাত্র আশার পথ।'

—'কিন্তু কেউ ফেলে নি তো ছুঁড়ে। কিংবা আমার ফটো তুলছে?'

—'কিন্তু বাস্তবিক যদি এ সব করে থাকে?' ডাক্তার—'আপনাকে আমি হাতেকলমে লিখে দিতে পারি, এ তারা রোজই করছে, রোজই করবে।'

—'আচ্ছা, সে আমি বুঝব।'

—'জানালাটা বন্ধ করবেন?'

—'না।'

—'কেন?'

—'আমি কোনো গ্লানি বোধ করি না।'

—'আমার বোন হলে'—

—'কী করতেন?'

—'তাকে এ ঘরে থাকতেও দিতাম না।'

—'কিন্তু আমি তো আপনার বোন নই।'

পরদিন দুপুরবেলা ডাক্তার এসে বললে—'সেই সাহেব আর আসে না?'

—'সাহেব কে আবার?'

—'রুস্তমজি না কী নাম তার।'

—'না, আসে নি তো।'

—'আপনি নিষেধ করে দিয়েছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমি কেন নিষেধ করতে যাব?'

—'কিন্তু ভবিষ্যতে আর আসবে না বোধ করি।'

—'কে? রুস্তমজি?'

—'আসবে কি আর আপনার এখানে?'

—'সে তার নিজের খুশির ওপর নির্ভর করে।'

—'নিজের খুশি তো তাকে গত পনেরকুড়ি দিনরাত এই ঘরের দিকেই টেনেছে।'

বিভা চুপ করল।

ডাক্তার—'কিন্তু সে খুশি হঠাৎ তার থমকে গেল যে?'

বিভা কোনো জবাব দিল না।

ডাক্তার—'যাক রুস্তমজির সম্পর্কে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত। ছেলেটির তরফ থেকে কোনো বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা নেই।'

বিভা ঘাড় কাত করে ছিল।

ডাক্তার—'একটা খুব ভারী কল আছে, আচ্ছা উঠি তা হলে।'

চলে গেল।

তিন-চার দিন পরে দুপুরবেলা একদিন ডাক্তার এসে বললে—'এ কয় দিন ভারি ব্যস্ত ছিলাম, আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেবেন?'

—'পাঁচ মিনিট শুধু?'

—'কিন্তু বসব পাঁচটি মিনিট।'

—'বসুন।'

—'না, আমি পায়চারি করে কথা বলছি।'

—'বড্ড ব্যস্ত দেখছি আপনাকে?'

—'না, এখন ব্যস্ত বড় নই। কিন্তু বড্ড নার্ভাস।'

—'কেন বলুন তো?'

—'আস্তে আস্তে বলছি।' ডাক্তার, 'আমার কথা অবিশ্যি পাঁচ মিনিটে ফুরুবে না।'

—'সমস্ত দুপুরই তো পড়ে আছে।'

—'এতটা সময় আমার জন্যে খরচ করতে পারবেন আপনি?'

—'আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোনো কাজ থাকে?'

—'খুবই তো আছে?'

—'তা হলে আমার কুণ্ঠার কোনো তো কারণ নেই।'

—'এত দয়া আমার প্রতি আপনার?'

ডাক্তার খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল—'এত মমতা।'

—'নারীরা পরের কাজের জন্যেই বেঁচে থাকে।'

ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বললে—'তা হলে ফুটপাতে নামুন না গিয়ে।'

—'কেন?'

—'সেখানে তো পরোপকারের ঢের জিনিস আছে।'

—'আপনি কি মনে করেছেন চিরকাল আমি এই সোফায়ই বসে থাকব?

—'পথে নামবারও ইচ্ছা আছে?'

—'ভবিষ্যৎ জীবনের সংকল্প আমার অনেক রকমের।'

ডাক্তার একটু চুপ থেকে বললে—'অনেক ত্যাগ করতে চান বোধ করি?' পাইপ জ্বালিয়ে বললে—'দেশে সমাজ মানুষ এই সব নিয়ে কাজে লেগে যাবেন? নিজের জীবনের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, আপনার কী করম?' খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললে—'বলুন, অনেক বড়-বড় কথা বলবেন তো?'

—'না, খুব ছোটখাট কাজ নিয়ে শুরু করতে চাই।'

-'কিন্তু পরিণতি হবে গিয়ে তো খুব হমৎ।'

—'কই, আপনার কী কাজ বলছিলেন না?'

—'এই যে পাইপ টানছি এর মিক্সচারটা ভারি চমৎকার।'

—'বিলেতি?'

—'আমরা ডাক্তার মানুষ, দেশী মিক্সচার খেয়ে লাঙস খারাপ করতে পারি না। তো। সব ব্যাপারেই পাকা জিনিস বেছে নেই।' সোফায় বসল। ডাক্তার—'চুপ করে রইলেন যে। কেন, ইন্ডিয়ার মিক্সচারটার কথা বললাম, ঠিক বলি নি?'

—'খেয়ে আপনি তৃপ্ত এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

—'কিন্তু মিক্সচারটা বিলেতি যে।'

—'তা আপনি বুঝবেন।'

—'এ খুব অন্যায় উদাসীনতা আপনার।'

পাইপটা নামিয়ে ডাক্তার—'যাতে আমি বিদেশী ছেড়ে স্বদেশী ধরি সেই চেষ্টাই করা উচিত নয় কি আপনার?'

—'আপনার নিজের ব্যাপারটা আপনিই ভাল করে বুঝবেন।'

—'পুরুষেরা সব সময় বোঝে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আপাতত মিষ্টাচারটা শেষ করে নিন।'
—'কেনই-বা?'
—'খুব ভাল লাগছে তো আপনার!'
—'কিন্তু এই জিনিসটা তো খুব অপরাধের।'
—'তাহলে নিভিয়ে ফেলুন।'
—'বলেন আপনি নেভাতে?'
—'যদি মনে করে থাকেন অপরাধের—'
—'কিন্তু আপনার এ অনুরোধের ভেতর না আছে কোনো ঐকান্তিকতা না আছে সর্বপ্রাণ সমর্পণ।'
বিভা হেসে উঠল।
—'বুঝতাম যদি এক মুহূর্তের জন্যও সে-রকম করে অনুরোধ করতে পেরেছেন আমাকে, তাহলে এই পাইপটা ছুঁড়ে ফেলে দিতাম।'
বিভা বিব্রত হয়ে তাকাল।
—'কিন্তু আমার জন্য আপনার হৃদয়ে এ সব জিনিস নেই।'
—'আস্তে-আস্তে, ডাক্তারবাবু!'
—'বলুন।'
কিন্তু বিভা চুপ করে রইল।
ডাক্তার—'জীবনে একে একে অনেককেই ভালবেসেছিলেন হয়তো?'
—'তা দিয়ে কী করবেন আপনি?'
—'আর কোনোই দরকার নেই, শুধু এইটুকুই বলি যে যখন তাদের ভাল-বাসতেন তখন তারা কেউ আপনার রুচিবিরুদ্ধ কোনো কাজ করলে আঘাত পেতেন?'
—'তা পেতাম।'
—'এইটুকুই শুধু বলতে চেয়েছিলাম।'
—'আমি যে আঘাত পেতাম তারাও তা বুঝত, কেনই-বা বুঝবে না? আমি নিঃসঙ্কোচে পাইপ টানছি বলে আপনি একটুও যে আঘাত পাচ্ছেন না। এ জিনিসও তো আমি বুঝি।'
—'অবিশ্যি।'
কিন্তু বিভা কি বলবে না বুঝতে পেরে থেমে রইল।
ডাক্তার—'আপনার রুচিবিরুদ্ধ অনেক কিছু কাজ কথা ইঙ্গিত আপনার সামনে করি আমি কিন্তু সমস্ত অপরাধের বোঝা বইবার ভার আপনি আমার কাঁধে ফেলেই যে খুব নিশ্চিন্ত তাও তো দেখি।'
বিভা ঘাড় হেঁট করে নখ খুঁটছিল।
ডাক্তার—'হয়তো ভাবছেন মনে-মনে ডাক্তারের বোঝা ডাক্তারই বইবে।' পাইপ টানতে-টানতে ডাক্তার—'অবিশ্যি নিজের বোঝা নিজে বইতেই আমি খুব ভালবাসি,' একটু থেমে বললে—'কিন্তু যখন দেখি একজন নারী ধীরে-ধীরে আমার কাছে এসে আমার মুখের থেকে পাইপটা আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে বললে 'খেও না, এতে আমি বড় কষ্ট পাই, তখন তার ঐকান্তিকতা স্বীকার করি।'
এরপর ডাক্তার চুপচাপ পাইপ টানতে-টানতে বিভার দিকে তাকিয়ে রইল। বিভা মাথা হেঁট করে ছিল।
ডাক্তার—'একরকম দু'চারটি নারী আমার জন্যে কষ্ট পায়,' একটু থেমে বললে,—'সেই যে মেয়েটির গল্প বলতে যাচ্ছিলাম তাদের মধ্যে একটি মাত্র মেয়ে শুধু প্রথমেই আমার মুখ চেপে ধরে ছিল, তাকে আমি কিছুতেই বলতে পারি নি, আমি খুবই আশা করেছিলাম আপনি অন্তত গল্পটার প্রারম্ভে আমার মুখ চাপবেন না অবিশ্যি, কিন্তু ঘর থেকে উঠে চলে যাবেন কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত শুনলেন তো।'
একটু চুপচাপ।'
ডাক্তার—'আমার চরিত্রের দুর্গতির কথা ভেবে আপনি একটুও বেদনা অনুভব করেন না নিশ্চয়ই।'
—'আপনার চরিত্রের কোথায় দুর্গতি রয়েছে তা তো আমি জানি না।'
—'কিন্তু দু-একটি মেয়ে এ কথা ভেবে সব সময় খুব সশঙ্ক, তাদের রাতেও বোধ করি ঘুম হয় না,' ডাক্তার বললে—'আমার হিতাহিতের সম্বন্ধে তারা এই রকম ঐকান্তিক। একে হয়তো ভালবাসা বলে।'
—'তাই তো মনে হয়।'
—'সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে আছাড় খেয়ে বিছানায় পড়ে থাকলে এরা খুব সেবা করবে?'
বিভা একটু হেসে বললে—'তা আর বলতে!'
—'দেখতেও তো দুজনেই বেশ রূপসী।'
—'তা হলে আপনার ভাগ্য খুব ভাল।'
—'কিন্তু তাদের ভাগ্যও কি খারাপ?'
—'একজন হয়তো খানিকটা আঘাত পাবে, দু'জনকেই তো গ্রহণ করতে পারবেন না?'
—'খানিকটা নয়, খুব বিষম আঘাতই পাবেন। হয়তো মরেও যেতে পারেন।'
—'যকন এত নারী নিয়ে আপনার জীবন তখন মরতে চাইবে অবিশ্যি অনেকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আপনি অন্তত সে-দলের ভেতর একদম নন।'

ডাক্তার গভীর পর্যবেক্ষণের সঙ্গে বিভার দিকে তাকাল।

দু'জনেই চুপ।

ডাক্তার—'যদি সে-বৃত্তের এক কিনারেও থাকেন তা হলে সব অগ্রাহ্য করে আপনাকেই গ্রহণ করব। আজ পাকা কথার জন্যেই এসেছিলাম।'

বিভা হেসে উঠে বললে—'না, সে বৃত্ত কোনোদিন চোখেও দেখি নি আমি।' মিনিট পাঁচেক ডাক্তার চুপচাপ বসে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—'তাহলে নেমন্তন্নের চিঠি পাবেন। এর চেয়ে বেশি কিছু চাইলেন না তো আর।'

—'কাল দুপুরবেলা তাহলে আসবেন আশা করি।'

—'এখানে?'

—'হ্যাঁ'

—'কেনই-বা মিছেমিছি?'

—'কথাবার্তা বলব।'

—'আর জমবে না মিস রায়।'

মিনিট দশেক দু'জনে চুপ করে বসে রইল।

-'কিন্তু অনেক মজলিসেই তো ঘুরে বেড়ান।'

—'আজকাল আর তত বেড়াই না।'

—'কেন?'

—'ঢের কল।'

—'পৃথিবীতে অলস তাহলে আমি একাই শুধু?'

'কে? আপনি? কেন?'

—'সমস্ত দুপুরটা কার সঙ্গে কথাবার্তা বলব তাই ভাবি।'

—'কিন্তু সমস্ত জীবনটাই তো বলতে পারতেন আমার সঙ্গে।'

না, আমি শুধু দুপুরের কথা ভাবি।'

—'আচ্ছা তাই ভাবুন।'

ডাক্তার—'বই পড়ছিলেন দেখছি।'

—'হ্যাঁ।'

—'কী বই ওটা?'

—'একটা নভেল।'

—'কার লেখা?'

—'টলস্টয়ের।'

—'আবার সেকালের যুগে চলে গেলেন?'

—টলস্টয় বেশ লাগে আমার।'

—'তার মানে ঢের শ্রদ্ধা বিশ্বাসের মানুষ আপনি-'আনা কারেনিনা' বুঝি?'

—'না। "ওয়ার অ্যান্ড পিস"।'

—'পড়ি নি।'

—'আনা কারেনিনা' পড়েছিলেন?'

—'ছ-সাত বার।'

—'কেমন বই?'

—'বেশ, আপনার ভাল লাগে না?'

—'বেশ ভাল আর্ট।'

—'আর্ট হিসেবে আমি দেখি না।'

—'তবে!'

—'বেশ মূল্যবান বই বলে মনে হয়।'

—'কিন্তু ওর চেয়ে মূল্যবান বই এর আরো ঢের আছে। পড়বেন?'

—'আপনার আলমারিতেই আছে বুঝি?'

—'হ্যাঁ, দিচ্ছি খুলে।'

—'থাক।'

—'কেন, পড়ে দেখুন না।'

—'সেই কিশোর বয়স কি আর আছে?'

—'বয়স এতই-বা কি বেশি হল?'

—'কিন্তু তবুও সে-কিশোর আর নেই, একটা গভীর ক্ষতির জিনিস, কী বলেন?'

বিভা কোনো উত্তর দিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃণাল

একদিন বোর্ডিঙের পোস্টবক্সে আমার নামে একখানা পোস্টকার্ড দেখলাম। এলে না যে? মৃণাল। অনেক দিনের পরিচিত হাতের অক্ষর, সেই k. সেই h সেই ম ল—অবাক হয়ে ভাবছিলাম, পৃথিবীর থেকে এসব মুছে যায়নি তাহলে? এখনো রয়েছে?

বিকেলবেলা মৃণালের কাছে যেতে আমার ভরসায় কুলোল না। যাদের বন্ধুবান্ধব খুব বেশি, তাদের কাছে বিকেল বা রাতে গিয়ে কোনো লাভ নেই। সকালবেলাও বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায় না। যেতে হয় দুপুরবেলা।

কিন্তু তবুও পরদিন সকালে উঠে দিনটাকে এমন সুন্দর ও প্রসন্ন মনে হল, এমন একটা গভীর আগ্রহ এল মনের ভিতর যে তখুনি জামা জুতো পরে একটা চাদর কাঁধে ফেলে তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা ট্রাম ধরলাম। এক কাপ চাও খাওয়া হল না।

প্রায় আটটার সময় মৃণালের বাসায় গিয়ে পৌঁছলাম।

নিচে একটি বুড়ো মতন [...] গোছের ভদ্রলোক আমাকে বাধা দিয়ে-'দিদি ঘুমুচ্ছেন, এখন কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না।'

কিন্তু আমি তাকে গ্রাহ্য না করে সোজা তেতলায় চলে গেলাম। কোথাও কোনো লোকজনের নামগন্ধও নেই। সমস্ত বাড়িটা বড় নিঃশব্দ। উঁচু উঁচু দেবদারু ও নারকোলের পাতা বাতাসে নড়ছে। একটা অশ্বত্থ গাছের কয়েকটা ডালপালা এই তেতলার রেলিঙের ওপর এসে পড়েছে প্রায়। কলকাতা শহরের ভিতর কোনোদিন শালিখ দেখিনি। কিন্তু এখানে আম গাছের শাখার ভিতর কয়েকটা শালিখ বসে খুনসুড়ি করছে, দেবদারুর ঘন ডালপালার ভিতর ঘুঘু রয়েছে, একটা ফিঙে উড়ে গেল, একটা লম্বা সরু সুপুরি গাছের গায়ে একটা কাঠ ঠোকরা বসে রয়েছে। কলকাতার একেবারে সীমানায় এই উঁচু বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায় একটা ডেক চেয়ার পেতে কেউ যদি বসে, জীবনের সৌভাগ্য এমনভাবে উপলব্ধি করতে পারে সে। দিনগুলোর এমন চমৎকার সদ্ব্যবহার করতে পারে।

পাশের একটা ঘরের দরজায় পর্দা সরিয়ে একটি মহিলা চলে যাচ্ছিলেন, আমাকে এরকম রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু থমকে সরে গেলেন।

একবার ভিতরে ঢুকে আবার বেরিয়ে এসে বললেন—'আপনি কী চান?'

—'মৃণাল আছে?'

মহিলাটি আমার আপাদমস্তকের দিকে তাকিয়ে একটু সন্দিগ্ধভাবে—'আছে।'

—'তাকে একটু ডেকে দেবেন?'

মেয়েটি মাথা হেঁট করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি—'আমি ড্রইংরুমে গিয়ে বসছি।'

গিয়ে বসলাম।

তিন-চার মিনিট পরে মেয়েটি ফিরে এল—'আসুন।'

—'কোথায়?'

—'মৃণালের ঘরে।'

—'তার চেয়ে এই ড্রইংরুমেই তাকে আসতে বলবেন।'

মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—'বেশ আলো বাতাস আছে, কোনো গোলমাল নেই তো এখানে।'

—'তা সম্ভব হয় না।'

উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—'আবার সেই ঘরের ভিতর? কেউ আছে আর?'

—'না।'

একটু বিরক্ত হয়ে—'কেন, সে বুঝি এখানে আসতে পারল না? কী করছে?'

—'আসুন আপনি।'

মেয়েটির পিছনে পিছনে একটা ফালির মতো লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে—'মৃণালের বড্ড জেদ!'

মহিলাটি আমাকে একটা দরজার কাছে এনে—'আপনি যান' বলে সে নিচে নেমে গেল।

দরজাটা আটকানো ছিল, কিন্তু টান নেই, খুলে গেল। ভিতরে গিয়ে দেখলাম অনেক দূরে একটা ধবধবে বিছানায় সমস্ত গায়ে শাল টেনে কে শুয়ে আছে। চারদিকে দরজা জানালা খোলা, ফটফটে আলো বাতাস রোদ, মুখ দেখা যাচ্ছিল না, হাত পা সমস্ত শালের ভিতর। কাত হয়ে দেওয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে শুয়েছিল, কিন্তু চুল দেখেই বুঝেছি, এ মৃণাল। অনেকগুলো কালো অজগর যেন জড় হয়ে বালিশের ওপর ছড়িয়ে আছে।

কাছে আসতে আসতে বললাম—'আচ্ছা, মৃণাল, তুমি কী?'

কোনো জবাব দিল না। মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাতেও গেল না আমার দিকে। এগোতে এগোতে বললাম—'বেলা প্রায় নটা বাজে, এখনো বিছানায় শুয়ে? একটু ড্রইংরুমেও উঠে আসতে পারলে না তুমি? বড়লোকের মেয়ে বলেই এসব শৌখিনতা তোমার সাজে?'

একটু চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললাম—'আমাদের মতো গরিব ঘরে যদি জন্মাতে তাহলে টের পেতে মানুষের জীবনটা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃণাল তবুও মুখ ফিরাল না।

শালের ভিতর শুয়ে শরীরটাকে বড্ড রোগা দেখাচ্ছিল। বড্ড অস্বাভাবিক রকমের রোগা।

ঘরের ভিতর কেমন যেন একটা গন্ধ, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের ঘরের আবহাওয়ার মতো নয় যেন, একপাশে কতকগুলো টেবিল, টেবিলে নানারকম শিশি বোতল, আঙুর বেদানা।

মৃণাল আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে—'ভয় পেও না।' একটু হেসে বললে—'ভয় পেয়েছ তুমি?' তারপর চুপ করে অনেকক্ষণ জানালার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে পশ্চিমদিকের একটা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম—কাঁদলেও ব্যথা লাঘব হতে চায় না। কিন্তু কাঁদছি যে মৃণাল যেন তা টের না পায়। একটা কুঁজোর থেকে খানিকটা জল গড়িয়ে চোখমুখ ধুয়ে ধুতির খুঁটি দিয়ে খুব পরিষ্কার করে মুছে ধীরে ধীরে চেয়ারে গিয়ে বসলাম আবার।

মৃণাল—'কোথায় গিয়েছিলে?'

—'জানালার কাছে তোমার বইয়ের শেলফ্‌টা দেখছিলাম।'

—'নতুন বই নেই কিছু।'

—'না, দেখলাম না তো।'

—'তোমার মুখে জল লেগে রয়েছে যে?'

—'তাই নাকি?'

ধুতির খুঁট তুলে আবার মুছতে গেলাম।

—'কী করে লাগল?'

ধীরে ধীরে মুখ মুছে নিচ্ছিলাম।

মৃণাল—'ভুরু ভিজে, চোখের পাতা ভিজে।'

মুছতে মুছতে—'এখনো ভিজে রয়েছে?'

—'কাঁদছিলে?'

—'কাঁদলে মানুষের ভুরু ভিজে যায় মৃণাল?'

একটু হেসে বললে—'কী করে ভিজল?'

—'একটু জল খেয়ে চোখমুখ ধুয়ে দিলাম। কেমন তেষ্টা পাচ্ছিল, তোমার এই ঘরে এসে—'

—'জল কোথায় পেলে?'

—'তোমার কুঁজোতে তো ভর্তি জল।'

—'ওই জল খেলে?' মৃণাল একটু নিস্তব্ধ থেকে—'কেন খেলে? থাইসিস হবার ভয় নেই?' মৃণাল একটু চুপ থেকে বললে—'আর একটু দূরে সরে বসো।'

—'কেন?'

—'আমার স্পিটুনটা যে একেবারে তোমার পায়ের কাছে, দেখছ না?'

—'না, এমন পায়ের কাছে কী আর মৃণাল।'

—'তোমার বড্ড জেদ বেশি, একটু ঘুরে বসলে কোনো দোষ হয়?'

—'স্পিটিনগুলো দেখতে সুন্দর নয়। ওর থেকে মাছি উড়ে তোমার কোনো উপকারও করবে না।'

—'কিন্তু এই তো বেশ মুখোমুখি বসেছি।'

—'মুখ আমি এখনো সব দিকে ফেরাতে পারি। মরবার দেরি আছে কয়েকটা দিন।'

একটু পরে—'কই, সরে বসলে না? আচ্ছা—' বলে মৃণাল দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইল।

উঠে দাঁড়িয়ে—'এই পুবের দিকের জানালাটার ওপর গিয়ে বসতে পারি?'

মৃণাল আমার দিকে তাকিয়ে—'এইবার ঠিক হল।'

একটু চুপ থেকে—স্পিটিনের গন্ধ পাচ্ছ?'

—'না।'

—'গায় মাছি বসছে।'

—'মাছি তো এ ঘরে আমি একটাও দেখছি না।'

—'চারদিকে লাইমল ঢালে কিনা। স্পিটিনের গন্ধই বা পাবে কী করে? সমস্ত লাইমলে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে।' বলে সে একটা নিরিবিলি শূন্য নিশ্বাস ফেলল। বললে—'এই ঘরের ভিতর কেমন একটা গন্ধ না?'

—'ওষুধের গন্ধ।'

—'না, শুধু ওষুধের নয়।'

একটু চুপ থেকে মৃণাল—'থাক তোমার জানালার কাছে ওরকম বসে দরকার নেই।'

—'কেন?'

—'পড়েও তো যেতে পার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

—'গেলে মন্দ কি?'

—'না মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করে বা কি শান্তি?'

—'ঢের। আমি তো বাঁচতেই চাই।'

দেবদারু শাখার থেকে ঝির ঝির করে বাতাস আসছিল।

মৃণাল—'কই, জানালার থেকে নেমে বসলে না?'

একটু নেমে মৃণালের দিকে তাকালাম।

মৃণাল—'আমার সমস্ত গা কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে।'

—'কেন?'

—'যদি পড়ে যাও।' হাত ইশারা করে মৃণাল—'এসো।'

তার নিজের বিছানা সে দেখিয়ে দিল। গিয়ে বসলাম।

মৃণাল—'তুমি যখন ঘরে ঢুকলে আমি মুখ লুকিয়েছিলাম, কেন জান?'

—'কেন?'

—'আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছিল।'

—'কীসের জন্য?'

—'আমার এ মুখ যে দেখে তারই আমি কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়াই। আগের সে প্রশংসা ভালোবাসা নিয়ে এ ঘরে ঢোকে না কেউ এখন আর।'

বলে আমার কাছে জবাবের অপেক্ষা করতে লাগল মৃণাল।

আমি চুপ করেছিলাম।

মৃণাল কাতর চোখ বুজে একটা নিশ্বাস ফেলল। আস্তে আস্তে চোখ মেলে বললে—'সেইজন্য আমি মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলাম।'

—'কিন্তু তোমার চুল তো দেখলাম।'

—'হ্যাঁ, এই জিনিসটাই মানুষকে দেখাবার মতন রয়েছে এখনো আমার।' একটা নিশ্বাস ফেলে—'খুব সুন্দর না?'

মাথা নেড়ে বললাম— 'হ্যাঁ, কোথাও এর তুলনা পেলাম না।'

একটু প্রীত হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। বললে— 'অনেকে বলে চুলগুলো কেটে ফেলতে। কিন্তু তা কি কখনো হয়? মৃত্যুর আগে এই আমার একটা ভরসা।' বলে সে খুব অভিভূত হয়ে নিজের রাশিকৃত চুলের দিকে তাকাল। পাকাঠির মতো আঙুল চুলের গোছার ভিতর ঠেলতে ঠেলতে মৃণাল বললে— 'মানুষের কাছে একেবারে কুৎসিত হয়ে মরব না। মৃত্যুর সময় এইগুলো সঙ্গে যাবে।'

—'তোমার কোনো অঙ্গই কুৎসিত নয়।'

—'সে আগে ছিল না। এখন এই চুল ছাড়া আর কোনো সৌন্দর্য নেই।'

—'তোমার চোখ দুটো কি কম সুন্দর?'

মৃণাল একটু অবাক হয়ে—'এই কথা তুমি বলো?'

—'কোনোদিন বলিনি, কিন্তু আজ বলছি।'

—'আজ যখন সৌন্দর্য ভাঁটা পড়ল তখন?'

কিন্তু শুনে সে খুব খুশি হল।

রুগিকে এইরকম করে ভরসার কথা বলতে হয়। কিন্তু এই ঘরে ঢুকে মৃণালকে যতখানি হতশ্রী দেখাচ্ছিল রূপ তার ততদূর নষ্ট হয়ে যায়নি। চেহারার ভিতর প্রশংসা করবার এখনো নানারকম তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য রয়েছে। কিন্তু তবুও এ চেহারা দেখে মুগ্ধতা ভালোবাসার চেয়ে দয়া ঢের বেশি—মনে হয় এই সৃষ্টির কোথায় যেন দয়ার দরিদ্রতা।

মৃণাল—'আচ্ছা আরশিটা আমাকে দাও তো।'

টেবিলের থেকে এনে দিলাম।

কিছুক্ষণ আরশিতে মুখ দেখে মৃণাল অত্যন্ত পীড়িত হয়ে—'রেখে দাও।'

টেবিলের ওপর আরশি রেখে এসে বিছানার পাশে এসে বসলাম আবার।

মৃণাল— 'তুমি বলো আমি এখনো সুন্দর?'

—'চিরকালই তো সুন্দর ছিলে।'

—'কিন্তু এখন?'

—'তোমার চোখ চুল নাক মুখ ঠোঁট সবই তো খুব উঁচু দরের জিনিস, খুব দামি জিনিস।'

শুনে কয়েক মুহূর্ত সান্ত্বনার আত্মতৃপ্তিতে সে জানলার ভিতর দিয়ে নারকোল গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। পরে আমার দিকে তাকিয়ে—হ্যাঁ তাকিয়ে ছিলাম খুব উঁচু দরের জিনিস, কিন্তু এখন নষ্ট হয়ে গেছি।'

নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম।

—'তোমরা ভাব মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়াই উচিত, সেজন্য সাজিয়ে কথা বলো। কিন্তু আরশি তো মিথ্যা কথা বলে না। দিনের মধ্যে পনেরো কুড়ি পঁচিশবার যতবার সেটার দিকে তাকাই ততবারই বুঝতে পারি কেন লোকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ আমাকে শ্রদ্ধা করে, সম্ভ্রম করে, স্নেহ করে, দয়া করে। কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে বিমুগ্ধ হয় না কেউ। এই নারীকে ভালোবাসার প্রবৃত্তি কারুরই নেই আজ।'

চুপ করেছিলাম।

মৃণাল—'কই প্রতিবাদ করলে না তো?'

—'দিনের মধ্যে এতবার করে আরশি দেখতে যাও কেন?'

—'এই হল তোমার উত্তর?'

—'টেম্পারাচারটা নেয়া যাক।'

—'থাক।'

—'ওষুধ খাবে?'

—'সময় হয়নি।'

—'এসো, খানিকটা বেদানা খাওয়া যাক।' টেবিলের থেকে একটা বেদানা এনে ভেঙে মৃণালকে দিচ্ছিলাম, সে একটু করে খাচ্ছিল।

মাঝে মাঝে রোগা হাত তুলে আমার মুখে কতকগুলো দানা তুলে দিচ্ছিল। তার বন্ধু ঢের, সকলের জন্যই এইরকম হৃদয় তার। আমার নিজের কোনো বিশেষত্ব নেই।

কিন্তু তবুও এক একবার অবাক হয়ে ভাবছিলাম, আমিই তো মৃণালের একমাত্র বন্ধু।

মৃণাল—'মানুষেরই বা দোষ কি! পৃথিবীতে কত সুস্থ সুন্দর মেয়েমানুষ রয়েছে, সে সব ছেড়ে আমার এই হাড় কখানাকে মৌখিক ভালোবাসা ছাড়া কি আর জানাবে তারা?'

বেদানা দিচ্ছিলাম, খাচ্ছিল।

মৃণাল—'তা আমি বুঝি তারা ভাবে আমি সব দিক দিয়েই বঞ্চিতা। রূপ রস জীবন, এমনকী মানুষের কথাবার্তা পর্যন্ত কতকগুলো শূন্য খোসা এনে সেগুলোকে সত্যিকারের বলে বোঝাতে চায়। কিন্তু আমি বুঝি, সেগুলো খোসা শুধু।'

—'তোমার সঙ্গে অনেক দিন পরে আমার দেখা হল মৃণাল।'

—'হ্যাঁ, প্রায় পাঁচ বছর পরে।'

—'এর মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ করে ফেলেছ হয়তো।

—'তাদের কথাই বলছিলাম।'

—'তোমার বড় একটা দোষ মৃণাল—'

—'কী বলো তো দেখি?'

—'নিজে তুমি যে কত দামি, তা ভুলে যাও কেন?'

—'না, তা আমি কোনোদিনও ভুলিনি।'

একটু হেসে বললাম—'একটা একটা করে দানা নিচ্ছ যে?'

—'না, ঢের তো খেলাম।'

একটা দানা চুষে বিচিটা ফেলে দিয়ে মৃণাল—'তুমি ভেবেছ, ওদের ভালোবাসা পাবার জন্য আমি খুব উদগ্রীব?' আর একটা দানা আমার হাতের থেকে সে নিল। বললে-'মায়ামমতা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে। কেউ যদি তা দেয়, আমি তা অস্বীকার করি না। না যদি দেয় তাহলেও আকাঙ্ক্ষা করাটা অপরাধের বলে ভাবি না।'

—'বেশ তো।'

—'মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যত হয়, চারদিকের আত্মীয়তা যত বাড়ে, এই পৃথিবীরও তো তত মঙ্গল?'

—'তা ঠিক মৃণাল।'

—'কিন্তু এই গেল স্নেহ মমতার কথা। আমার পরিচিত কোনো মানুষকে এ জিনিস দিতে—বা কারুর কাছ থেকে এসব পেতে আমি কোনোদিন দ্বিধাবোধ করিনি।'

—'তা আমি জানি।'

—'এই যে পাঁচ-ছয় বছর তোমার সঙ্গে দেখা নেই, এর ভেতর ঢের নতুন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেছে, অনেকেই তারা জীবনের নানা দিকে ঢের খ্যাতি পেয়েছে, পদস্খলনও অনেকের খুব।' মৃণাল একটা দানা চুষতে চুষতে—'এদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে, দাক্ষিণ্যপ্রীতি আছে, কিন্তু তাই বলে প্রেম—প্রণয় নিয়ে এদের সঙ্গে খেলা কবি, এই মনে কর তুমি?'

গোটা দুই দানা তার হাতে তুলে দিতে গেলাম, মৃণাল হাঁ করল, মুখের ভেতর ছেড়ে দিলাম।

চিবোতে চিবোতে মৃণাল—'কই, আমার কথার উত্তর দিলে না তো?'

—'এদের এক আধ জনের সঙ্গে তোমার প্রণয়ের সম্বন্ধ হলে ভালোই তো হত।'

—'তা হত হয়তো, কিন্তু—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বিপদ এই যে তুমি যেরকম দয়ামায়ার জীব, নিজেকে নিঃসঙ্কোচে বিলিয়ে দিতে যে রকম তাতে এদের অনেকে হয়তো মনে করেছে, তুমি তাদের ভালোবাস।'

—'তা আমি জানি।'

—'অনেক প্রেমের চিঠি পেয়েছ হয়তো?'

—'চিঠিই শুধু নয়, মুখোমুখিও ঢের নিবেদন শুনলাম।'

—'এই পাঁচ বছর বসে?'

—'হ্যাঁ।'

একটু চুপ থেকে—'অথচ কই, কুমারী হয়েই তো রইলে।'

—'হ্যাঁ, তাই তো রইলাম।'

—'না, বিয়ে করলেই পারতে মৃণাল।

মৃণাল চুপ করেছিল।

—'কোনো আপত্তি আছে?'

—'বাস্তবিকই আমার কোনো আপত্তি নেই বিয়ে করতে।'

—'তবে করলে না যে?'

—'কি যেন, মোটের ওপর হয়ে উঠল না।'

—'এদের কাউকে ভালোবেসেছিলে?'

—'সে খোঁজও আমার কাছে জিজ্ঞেস কর না।'

—'কেন?

—'নিজের মনটাকে আমি আজও বুঝি না।'

চুপ করেছিলাম।

মৃণাল জানালার ভিতর দিয়ে নারকোল গাছগুলোর দিকে তাকিয়েছিল।

একটু চুপ থেকে—'এক সময় খুব লোভ হয়েছে।'

—'কীসের জন্য?'

—'এদেরই এক-আধজনের সঙ্গে নিজেকে ভিড়িয়ে ফেলবার জন্য।'

মৃণাল আর খেতে চাইল না, বেদানাটা বিছানার একপাশে রেখে দিলাম।

মৃণাল—'কিন্তু লোভ তো প্রেম নয়।'

—'কি জানি, অত বাছবিচার করতে যেওনা মৃণাল, তাতে কোনো লাভ নেই।'

—'কী রকম?'

—'প্রেমের জন্য না হয় কবিতার বই পড়। কিন্তু যে মানুষের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয় তোমার, তাকেই গ্রহণ কর।'

—'আমি বললাম লোভ, তুমি বললে আকাঙ্ক্ষা।'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু তাই বলে লোভের দাম বাড়ল না তো।'

—'না, বাড়ল না বটে।'

—'লোভ আকাঙ্ক্ষা কামনা, সবই তো এক জিনিস, প্রেমের থেকে সবই আলাদা।' নিস্তব্ধ ছিলাম।

মৃণাল—'কী বলো তুমি?'

—'এই আকাঙ্ক্ষা টাকা আর সংযম নিয়েই দাম্পত্যজীবন বড় সুখে শান্তিতে চলে যায়, প্রেমের কোনো দরকার নেই।'

—'কী যেন বলো তুমি?'

—'স্নেহ মমতা আর টাকা, স্বামী-স্ত্রীর এই সবচেয়ে বড় সম্বল, প্রেম একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। স্বামীটি যদি কবি হন, প্রেম তার কাগজ কলমের ভিতর। স্ত্রীটি যদি কল্পনাপ্রিয় হয় প্রণয়ের সাধ তাহলে সে গল্প পড়ে মেটাবে, না হয় অতীত জীবনের দু-একটা কথা ভেবে, না হয়—দু-চার মুহূর্ত বাজে কোনো পুরুষমানুষের সঙ্গে কাটিয়ে।'

—'তোমার এই কথাগুলো নতুন নয়, আমি আরো ঢের শুনেছি।'

—'কার কাছে?'

—'যারা আমার কাছে আসে তারা এইরকম অনেক কথা বলে।'

—'হ্যাঁ, এই কথাগুলোও ঢের পুরোনো।' একটু চুপ থেকে—'কিন্তু খুব সত্য।'

মৃণাল মাথা নেড়ে আস্তে—'না।'

মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে—'তা যদি হত, তাহলে ঢের আগেই বিয়ে করতাম।' মৃণাল আমার দিকে তাকিয়ে বললে—'বেদানা খাবে? টেবিলে অনেকগুলো বেদানা রয়েছে খাও না দু-চারটে।'

কোনো উত্তর দিলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃণাল—'আমি তো উঠতে পারি না, না হলে এনে দিতাম।'

—'থাক, যাব এখন।'

—'আমাকে দু-একটা দানা দাও তো আরো।'

দিচ্ছিলাম।

মৃণাল—'অমলা তোমার জন্য চা করতে গেল, ফিরল না যে?'

—'তাকে আমি না করে দিয়েছি।'

—'কেন?'

—'তখন তোমার ওপর আমার কেমন অভিমান হয়েছিল মৃণাল।

—'অভিমান? কীসের জন্য?'

—'তুমি ড্রইংরুমে এলে না বলে, তখন তো বুঝিনি, তুমি এরকম বিছানায় পড়ে। ভেবেছিলাম—'মৃণাল একটু চুপ থেকে আস্তে আস্তে বললে—'কী ভেবেছিলে?'

অমলা চা নিয়ে এল। চা, টোস্ট, ডিম, কেক, কলা, অনেক কিছু। দুটো ডিসে। একটা মৃণালের জন্য। মৃণালের ডিসের সম্পদ খুব কম। একখানা টোস্ট, একটা ডিম পোচ, এক পেয়ালা ওভালটিন, গোটা কয়েক আঙুর।

অমলা দাঁড়িয়েছিল।

মৃণাল হাত নেড়ে বললে—'আচ্ছা যাও তুমি।'

—'এই মেয়েটি কে?'

—'আমার মাসতুতো বোন।' মৃণাল খেতে খেতে—'এখন আমার জায়গা অমলা অধিকার করেছে।'

—'কী রকম?'

—'প্রেমের চিঠি পায়, মুখে মুখে নিবেদনও ঢের।'

—'খাচ্ছিলাম।

'ড্রইংরুম তো আজকাল এর জন্যই।'

—'তোমার হিংসা হয় বুঝি?'

—'কার না হয় বলো, এরকম থাইসিসের বিছানায় পড়ে থেকে?'

—'অমলার বয়স কত?'

—'আমার থেকে তিন-চার বছরের ছোট।'

—'উনিশ-কুড়ি তাহলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বিয়ে করেনি, তার মতামতও তোমার মত নাকি?'

—'জানি না।' মৃণাল মুখ বিকৃত করে বললে—'কারুর মতামতের খবর রাখি না।' ডিসটা ঠেলে ফেলে দিয়ে বিরস মুখে একবার বালিশে মুখ ঘষল, তারপর পাতলা ঠোঁট দুটো চেপে জানালার দিকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে তাকিয়ে রইল। চোখে জল এসে গেছে।

—'কিছুই তো খেলে না তুমি মৃণাল।'

—'খেতে ইচ্ছা করে না।'

—'এই আঙুর কটা খাও।'

দিচ্ছিলাম। খাচ্ছিল।

বালিশে ঠেশ দিয়ে একটু উঠে বসবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, আমার দিকে তাকিয়ে—'ড্রইংরুম থেকে এক এক ফাঁকে সুবিধা করে আমার কাছে আসে এক একজন, এ কর্তব্যবোধ এদের সকলেরই আছে। কেউ বা এ বাড়িতে ঢুকেই আমাকে প্রথম দেখে নিয়ে তারপর ড্রইংরুমে গিয়ে বসে। কেউ বা রাত এগারোটা—বারোটার সময় বিদায় নেবার আগে আমার খবরটা নিয়ে যায় এইরকম।'

—'বেশ তো।'

—'না, এর চেয়ে বেশি কী আর আমি আশা করতে পারি।'

একটা আঙুর খেতে মৃণালের অনেক সময় লাগছিল। চুষতে চুষতে বললে—'কেউ আমার জিভের নিচে থার্মোমিটার রেখে টেম্পারেচার দেখে, কেউ বা শালটা বুকের উপর টেনে দেয়, [...] কেউ বা ওষুধ খাওয়ায়, কেউ বা চেঞ্জে যেতে বলে।'

—'বাস্তবিক, চেঞ্জে গেলে না কেন?'

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মৃণাল—'কেউ বা নানারকম মিষ্টি সান্ত্বনার কথা আমাকে শোনায়। কিন্তু জানি এদের কথা, কাজ সমস্তই অন্তঃসারশূন্য। বড়জোর এরা আমার জন্য বেদনাবোধ করে, আমাকে জীবনের হাতে প্রতারিত জীব ভেবে মনে মনে আক্ষেপ করে হয়তো, কৃপা করে আমাকে, কিন্তু কৃপা কে চায় চলো? যদি বুড়ো হয়ে বেঁচে থাকতাম, তাহলেও কোনোদিন মানুষের কৃপা ভাঙিয়ে নিজের কোনোরকম সুবিধা করতে যাওয়াটাকে আমি সবচেয়ে বেশি ঘেন্না করতাম। আমাদের জীবনে যতরকম অনুভূতি আছে, এই কৃপা, করুণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে সবচেয়ে অধম। একটা কুষ্ঠ রুগির জন্য, একটা মালগাড়ির মহিষের জন্য, একটা ডানাভাঙা ফড়িঙের জন্য তো এর প্রয়োজন আর ব্যবহার কতখানি অপদার্থ জিনিসটি ভেবে দেখো তো একবার।

মৃণাল আঙুরটা মুখের দিকে ফেলে দিল। বিছানার ওপর পড়ে গেল। তুলে নিয়ে দেখলাম এতক্ষণ ধরে চুষছিল, কিন্তু তবুও কত রস আঙুরটার ভিতর রয়ে গেছে এখনো।

—'ওটা ধরলে? ছি ফেলে দাও।'

জানালার ভিতর দিয়ে ফেলে দিলাম।

—'এখানে ফেললে কেন?'

—'কেন কী হবে?'

—'কোনো পাখিটাখিতে হয়তো খাবে। একটা চড়াইয়ের যদি আবার আমার মতো অবস্থা হয় আঙুরটা খেয়ে?' বলে সে একটু হাসল।

—'না, তা হয় না।'

—'ওদের জীবন ঢের শক্ত, কি বলো? তা আমি জানি?' একটা শান্ত নিঃশ্বাস ফেলে মৃণাল—'তোমার হাতটা লাইমল দিয়ে ধুয়ে ফেল।'

—'ধোব এখন।'

-'না, এখুনি ধোও স্পিটিন লেগে রয়েছে, হয়তো অন্যমনস্কভাবে কখন নাকে-মুখে হাত দিলে।'

ধুয়ে এলাম।

-'হ্যাঁ করুণার কথা বলছিলাম, অবিশ্যি যে মানুষ নিজে করুণা পায় না, পরকে দিচ্ছে, তার আশ্বাস সব দিক দিয়েই।'

—'কীরকম?'

—'অভাগাদের সঙ্গে নিজেকে সে প্রথম তুলনা করে, বোঝে নিজের জীবনে দুর্ভাগ্য কত কম, নিস্তার, শান্তি কত বেশি। এই হল তার প্রথম শৌখিনতা। তারপর নিজের প্রতিষ্ঠিত জায়গায় বসে পরের জন্য সে দয়াবোধ করে, বেদনা পায়, জিনিসটা যত বেশি আন্তরিক হয় ততই তার মনের বিলাসিতা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাস্তবিক আন্তরিক অশ্রুর মতো এমন চমৎকার ভোগের জিনিস পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি নিখিলদা? ভগবান নিজেই এ উপভোগকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।'

একটু চুপ থেকে—'যারা তাঁকে করুণাময় বলে তারা অনেক সময় স্বীকার করতে চায় না' যে এ করুণাকে আশ্রয় করে বিধতা কী অসীম রসনিবিড়তা জমিয়ে রেখেছেন নিজের জন্য।'

মৃণাল দেওয়ালের দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে বললে—'এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বেদনা পায় সবচেয়ে বেশি কৃপার পাত্র যারা।'

—'মৃণাল, তুমি চা খাও না?'

—'সকালে একবার খেয়েছিলাম।'

-'আর খাবে না তুমি?'

—'না।'

—'এই ওভালটিনও তো খেলে না।'

—'আমার কেমন বমি আসে খেতে।'

—'আর একটু আঙুর খাও।'

নীরবে হাঁ করল।

ধীরে ধীরে ঠোঁটের ফাঁকের ভিতর আঙুলটা ঢুকিয়ে দিলাম। মৃণাল চুষতে চুষতে—'পাড়াগাঁয় যখন ছিলাম, কার্তিক অঘ্রানের সন্ধ্যায় কুল বাবলার জঙ্গলের ভিতর এক-একটা পাখির ভাঙা বাসা দেখে বড় কষ্ট হত কিন্তু পাখিটার নিজের কষ্ট যে আমার চেয়ে অনেক গুণ বেশি, সেদিন তা বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝছি।' মৃণাল একটু চুপ থেকে—'ভগবানই হোন, বুদ্ধদেবই হোন, আমাদের ড্রইংরুমে যারা আসে তারাই হোক, কাতর মানুষের বা প্রাণীর অবস্থা দেখে এদের মনে যে দয়া তা বাবুগিরি ছাড়া আর কী? সে দয়া তাদের মনে আনন্দবিলাসিতার খোরাক জোগায়, কিন্তু পৃথিবীতে সবচেয়ে সত্যিকারের ব্যথা পায় একটা কলের ভিতরকার ইঁদুর, খাঁচার পাখি, পাখনা কাটা দাঁড়কাক কিংবা আমার মতো এরকম যারা বিছানায় পড়ে থাকে তারা।'

—'তুমি আবার যখন সেরে উঠবে তখন—'

মৃণাল বাধা দিয়ে বললে—'আমার মনের ভিতর এত কথা যে আছে, ওরা তা জানে না, ভাবে যে কোনোরকম প্রবঞ্চনা করে আমাকে বুঝ দেয়া খুব সহজ। আমি চুপ করেই থাকি। কিন্তু তবুও ওদের চেয়ে ঢের বেশি বুঝি।'

আঙুরটা এতক্ষণ গালের এক কিনারে ফেলে রেখেছিল মৃণাল। আবার চুষতে চুষতে—'মরে যাবার আগে আমার একটা তৃপ্তি এই যে কী বিধাতা, কি মানুষ, কেউই আমাকে মিথ্যা ভরসা দিয়ে ঠকাতে পারল না, জীবনটা যে বাস্তবিক কী, ঠিকঠাক বুঝে গেলাম।'

পরদিন বেলা দুটোর সময় মৃণালের কাছে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললে—'হ্যাঁ, তোমাকে এই সময়ই আসতে বলেছিলাম। কষ্ট করে এসেছ তো? হেঁটে এলে?'

—'না ট্রামেই।'

—'এই দুপুরবেলাটা আমার বড্ড খারাপ লাগে।'

—'কাল রাতে বেশ ঘুমোলে?'

—'না, ঘুম আমার বড্ড কম।'

—'এখন ঘুম পাচ্ছে?'

—'না।' মৃণাল একটু চুপ থেকে—'বড্ড গুমোট।'

পাখা ঘুরছিল, জানলা দিয়েও বাতাস খেলা করছিল খুব খানিকটা। গুমোটটা বাইরের কি ভিতরের বুঝতে পারলাম না ঠিক।'

একটু চুপ থেকে—'চেঞ্জে গেলে না যে?'

—'ভাওয়ালি যাওয়ার কথা হয়েছিল।'

—'সে তো খুব ভালো জায়গা।'

—'তুমি দেখেছ?'

—'না, শুনেছি।'

-'তুমি তো একবার কাঠগুদাম, নৈনিতাল, ভীমতাল গিয়েছিলে।'

—'হ্যাঁ, সে কি আজকের কথা।'

—'পায়ে হেঁটে তো গিয়েছিলে একেবারে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে। আচ্ছা মানুষ তুমি।'

—'না, এখন বড্ড ছেলেমানুষি মনে হয় সে-সব।'

—'কেন?'

—'মনের একটু অভিমান নিয়ে তখন নানারকম আজগুবি কাজ করতে যেতাম, কোথায় কে তাচ্ছিল্য করল, কার কাছ থেকে অবহেলা পেলাম, এইজন্য হেঁটে হেঁটে কাঠগুদামে চলে যাওয়া—কি রকম বেকুবিপনা বলো তো দেখি? বাস্তব জীবনের দেনাপাওনার সঙ্গে কত কম পরিচয়।'

—'এখন পরিচয় খুব গভীর হয়েছে?'

মাথা নেড়ে একটু হাসলাম।

—'এখন আর অভিমান কর না?'

—'করি বইকী, কিন্তু সেজন্য কাঠগুদামে চলে যাই না।'

—'হয়তো গোলদিঘিতে গিয়ে একটু ঘুরে আস।'

—'অতও দরকার হয় না মৃণাল, বিছানার ওপরেই শুয়ে থাকি, একটা খবরের কাগজ আর চুরুট হাতে।'

—'অভিমানের ব্যাপারটা কেউ টেরও পায় না?'

—'আমিই কি একা শুধু? পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পেরিয়ে গেল পৃথিবীর সব মানুষই এই রকম।'

—'জীবনের নাড়ীনক্ষত্র ঠিক করে ফেল।'

—'হ্যাঁ।'

—'তাচ্ছিল্যের বদলে তাচ্ছিল্য অবহেলার বদলে অবহেলা, ঘৃণার বদলে ঘৃণা, এই সবই তো ব্যবস্থা এখন তোমাদের জীবনে?'

—'কী করব, আর তো কোনো উপায় নেই।'

—'নতুন করে প্রেম করতে ভয় পাও?'

—'এ জীবনে প্রেম আর সম্ভব হয় না।'

-'জীবন তাহলে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে?'

—'বাস্তবিক, স্বাভাবিক সাধারণ জীবনের খুব গভীর আকর্ষণ মৃণাল। সকলের সঙ্গে মাত্রা রেখে চলতে পারি। এ ভেবে খুব আশ্বাস।'

-'তা ঠিক।'

—'নারীর রূপ বা প্রেমের সঙ্গে একেবারে নিঃসম্পর্ক হয়ে পড়িনি, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বইয়ে সিনেমায় বা নিজের কবিত্বপ্রয়াসের ভিতর। এরকম সম্বন্ধ রাখতে গিয়ে নিজের স্বাভাবিক জীবনটাকে খরচ করে ফেলবার ভয় নেই।'

—'না, কোনো ভয় নেই অবিশ্যি। কবিতায় কামনার গন্ধ বেশি।'

—'না।'

—'সেটাও খুব আশ্বাসের কথা, এখন কী রকম লেখ?'

—'প্রেমের কবিতা এখন লিখিই না প্রায়।'

—'মৃত বিড়াল বা মরা মাছির উদ্দেশ্যে লেখ বোধ করি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু হেসে বললাম—'সেই রকমই।'

—'ছাপাও?'

—'না।'

—'কেন?'

—'কবিতার রকমটা আমার বড় বিদঘুটে হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ কেউ ছাপাবে না।'

—'লিখে শান্তি?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে প্রেমের আস্বাদ মেটাতে বই আর সিনেমা?'

—'সিনেমাও বাদ দাও।'

—'কেন?'

—'যাই না বড় একটা। ছ'মাসে হয়তে একবার। তাছাড়া সিনেমায় নারীর রূপ রয়েছে বটে, কিন্তু প্রেম একেবারেই অরূপ, বাস্তবিক দেহ দিয়েই নানারকম ব্যাপার রয়েছে শুধুমাত্র—তার ভিতরেও কোনো আর্ট নেই।'

মৃণাল একটু চুপ থেকে—'অনেক বই পড় বুঝি? কিন্তু আজকালকার বইগুলোও তোমার কবিতার মতো অনেকটা।'

—'কী রকম?'

—'আমি তো ঢের নামজাদা বই ঘেঁটে দেখলাম, মড়া বেড়াল আর মৃত মাছির কথা লেখে শুধু-প্রেম কই?'

দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম।

মৃণাল—'রোদ তোমার চোখে এসে পড়েছে, ওই জানালাটা বন্ধ করে দাও না।'

—'বরং একটু সরে বসি।'

—'থাক, এই তো আমার পাশে বেশ বসেছ।'

সে আমাকে উঠতে দিল না।

একটু চুপ করে থেকে বললে—'রোদ লাগছে যে তোমার মাথায়, এই বালিশে একটু মাথা পেতে শোও না।' মৃণাল তার বালিশের অনেকখানি আমাকে ছেড়ে দিল।

—'রোদ এখুনি সরে যাবে।'

'তা, যাক, তাহলে—'

—'মুখে আঙুর আছে তোমার?'

—'নেই?'

—'কোথায় ফেলে দিলে?'

—'কী জানি, কোথায় পড়ে গেছে।'

—'এই বিছানায় হয়তো।'

—'থাক, খুঁজতে যেও না। একটু গ্লুকোজ দাও তো আমাকে।' দিলাম।

—'বেদানা খাবে?'

—'না, এখন আর কিছু না।'

দু'জনেই চুপ করে ছিলাম।

মৃণাল—'তোমার স্ত্রীর নাম ঊষা না?'

—'হ্যাঁ।'

—'দেখতে কেমন?'

—'এই শাদামাঠা।'

—'মনটা কেমন?'

—'ঊষার? মন্দ কি।'

মৃণাল একটু চুপ থেকে—'একটি মেয়ে হয়েছে শুনলাম।'

—'হ্যাঁ।'

—'মেয়েটি কী বলে?'

—'খুব স্বাভাবিক সাধারণ একটি নারী হয়ে উঠবে, এই তো আশা করি।'

—'কার মতো দেখতে?'

—'আমার মতন।'

—'মেয়েটি হাঁটতে পারে?

—'হ্যাঁ।'

—'বয়স কত?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ছ' বছর হল।'

মৃণাল চুপ থেকে—'না, ভাওয়ালি যাওয়া হল না আমার।'

—'কেন?'

—'বেডও পাওয়া গিয়েছিল।'

—'বেড পাওয়া তো খুব কষ্ট।'

—'কিন্তু গেলাম না, বিদেশে গিয়ে কে মরবে বল? সেখানে গিয়ে দেখব তো শুধু পাহাড় আর পাইন গাছ, মরার পরে উড়ে উড়ে তা ঢের দেখা যাবে। কিন্তু যে কটা দিন বেঁচে আছি এই রক্তমাংসের জীবনটাকে আমার বাংলাদেশের থেকে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গিয়ে কি লাভ? এই নারকেল গাছগুলো, বুড়ো অশ্বত্থটা-শালিক চড়াই দেশের এ কাকগুলো এদের ভিতর মরে আমার ঢের তৃপ্তি।' বলে মৃণাল চোখ বুজল।

দেখলাম ঘুমিয়েছে।

কুড়ি-বাইশ মিনিট ঘুমল। তারপর হঠাৎ চমকে জেগে উঠে চারদিকে তাকাল বারবার। দু-তিন মিনিট পরে স্বাভাবিকতা ফিরে পেল, ধীর চোখে জানালার দিকে তাকিয়ে মাথার চুল আস্তে আস্তে বুলোতে বুলোতে—'বড় খারাপ স্বপ্ন দেখি।'

চুপ করে ছিলাম।

মৃণাল—'শুনে তোমায় দরকার নেই, দিনের মধ্যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমি মরে যাই, চিতায় পুড়ি, আবার হাত ঠক ঠক করে এই ঘরে হাঁটতে থাকি, অন্ধকারের মধ্যে অনন্তকালের ভিতরেও এ ঘরের দরজা—জানালা খুঁজে পাই না—এক একটা কঙ্কাল কোত্থেকে আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়।'

—'খিদে পেয়েছে?'

—'না।'

—'আচ্ছা, থার্মোমিটারটা দেখি তো।'

—'দেখো, থার্মোমিটারটা বালিশের নিচে না?'

—'দেখছি।'

—'হ্যাঁ, এই জিভের নিচে রাখ!'

মিনিট পাঁচেক পরে থার্মোমিটার তুলে নিয়ে দেখে—'জ্বর কি এই রকমই ওঠে দুপুরে?'

—'কত উঠেছে?'

—'সাড়ে নিরানব্বই।'

—'জ্বরটার রেমিশন হল না একদিনও।'

—'আস্তে আস্তে হবে মৃণাল।'

—'একদিনও তোমাদের মতো গায়ের টেম্পারেচার হল না আমার। এমন দুঃখ করে! আমি ছাড়া আর সকলেরই সাড়ে সাতানব্বই। কী এমন পাপ করেছিলাম যে কোনোদিন সাড়ে সাতানব্বই হবে না? মানুষের গায়ের টেম্পারেচারও আমার লোভের নিজিস হয়ে দাঁড়াল বিধাতা।'

একটা বেদানা নিয়ে এসে ভেঙে দু-চারটে দানা মৃণালকে দিলাম।

চুষতে চুষতে মৃণাল—'না, আর দরকার নেই। আমার মনে হয়, আমার মাথার ভিতর [...] হয়েছে।'

—'কী যে ভাব তুমি।'

—'না হলে এরকম স্বপ্ন দেখি কেন?'

—'স্বপ্নে আমিও তো অনেক সময় ঢের খাপছাড়া জিনিস দেখি।'

—'আমার মতন এইরকম?'

—'হ্যাঁ।'

—'এত বিদঘুটে?'

অমলা ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ঢুকে এসে দাঁড়াল।

মৃণাল—'কী চাও তুমি?'

—'কিছু না।' একটু চুপ থেকে অমলা চেয়ার টেনে বিছানার পাশে বসল।

মৃণাল—'বসলে যে?'

—'থার্মোমিটারটা নেব।'

—'নেয়া হয়েছে।'

-'ওষুধ।'

—'আমি গ্লুকোজ খেয়েছি, আর কিছু খাব না।'

—'একটু ওভালটিন দেই?'

—'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বেদানা?'

মৃণাল—'বললামই তো তোমাকে, এক কথা কতবার বলতে হয় অমলা?'

অমলা আরক্ত মুখে একটু হেসে চুপ করলে। মৃণাল—'বসে রইলে যে?'

—'এখুনি তো ডাক্তার আসবে।'

—'তাতে কি?'

অমলা উঠে দাঁড়িয়ে—'বিছানাটিছানা পরিষ্কার করতে হয়, তোমার কাপড়চোপড় বদলে নিতে হবে না?'

—'সে এখন থাক।'

—'কিন্তু ডাক্তার বড় বিরক্ত হন।'

—'আচ্ছা, তুমি যাও তো এখন।'

আমি—'আমি তো তোমার কোনো সাহায্য করতে পারছি না, অন্য মানুষদেরও বাধা দিচ্ছি। ইনি এঁর কাজ করুন আমি এখন উঠি, কাল সকালেই আবার আসব।' উঠতে যাচ্ছিলাম।

মৃণাল আমার হাত চেপে ধরল, বললে—'অমলার কথায়ও তুমি বিশ্বাস কর, ডাক্তার আসতে এখনো ঝাড়া দু'ঘণ্টা দেরি।

অমলা একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে—'কেন মৃণালদি, এখন সাড়ে তিনটে বেজেছে, তিনি তো চারটের সময় আসবেন।'

—'আসুকই আগে।

—'এর মধ্যে সব ঠিকঠাক করে রাখলে ভালো হত না?'

—'কী আর ঠিক করবে, মানুষটা তো বিছানায় পড়ে আছে, কয়েকদিন পরে বিছানা খালি করে দিয়ে যাব। তখন অনেক ঠিকঠাক করতে হবে। কিন্তু এখন—'

কিন্তু ডাক্তার ঢুকে পড়ল। কোলের ওপর হাতটা রেখে বসে মিনিট পাঁচ সাত নানারকম পরীক্ষা করে একটা প্রেসক্রিপশন লিখল, তারপর অমলার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মৃণাল নিস্তব্ধ হয়েছিল।

আমি—'ডাক্তার তো কোনো কথাই বললে না।'

—'বেশ বড় ডাক্তার।'

—'চেহারা বেশ মানুষের মতো।'

—'এর তো সমস্ত স্যুট বিলেত থেকে তৈরি হয়ে আসে।'

—'তাই নাকি?'

—'কেমন মানায় সাহেবি পোশাকে দেখলে তো?'

—'এর বয়স কত?'

—'তেত্রিশ-চৌত্রিশ হবে।'

-'মোটে?'

—'কেন, বুড়ো মনে হয়?'

—'না, তা নয়, তবে বাড়ন্ত বেশ।'

—'হ্যাঁ খুব পরিপূর্ণভাবেই পুরুষ মানুষ।'

—'তাই তো দেখলাম।'

মৃণাল—'এর সঙ্গে পার্টিতে আলাপ হয়েছিল।'

—'এই ডাক্তারের সঙ্গে?'

—'তারপর দেখ, এই পরিবারে যার যখনই কোনো অসুখ হয় ইনি নিজে সেধে এসে দেখে যান। ডাকলে তো তৎক্ষণাৎ এসে হাজির, সে যেখানে যত বড় কলই থাকুক না কেন।' মৃণাল বললে—'এখন কাপড়চোপড় বদলাতে হবে, তুমি অমলাকে একটু ডেকে দেবে?'

—'কোথায় সে?'

—'ড্রইংরুমে আছে।'

—'আচ্ছা।'

উঠলাম।

—'কাল এসো, খুব সকালেই, সাড়ে সাতটা আটটার সময়।'

—'আচ্ছা।'

যাচ্ছিলাম।

মৃণাল—'শোন।'

বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বসলাম।

মৃণাল—'ডাক্তারকে আজ খুব চুপচাপ দেখলে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হ্যাঁ।'

মৃণাল একটু মর্মাহত হয়ে হেসে—'কেন, বলো তো দেখি?'

—'তা আমি কী করে বলব?'

মৃণাল একটু চুপ থেকে—'আমি বলতে পারি।'

—'কি?'

—'ইনি যখন এ ঘরে ঢুকলেন তখন তোমার হাতের আঙুল নিয়ে আমি খেলা করছিলাম।'

—'ও—কিন্তু তাতে ডাক্তারের কি?

—'ও কোন জিনিস কার হৃদয়ে গিয়ে কী করে যে আঘাত করে।' মৃণাল একটু ব্যথিত হয়ে বালিশে মুখ গুঁজল একটু চুপ থেকে—'ডাক্তারকে আজ আবার ডাকিয়ে আনতে হবে।'

—'কখন?'

—'সন্ধ্যার মুখোমুখি।'

—'শরীরটা খারাপ বোধ করছ?'

—'না, সেজন্য নয়।'

—'তবে, জবাবদিহি দিতে চাও?' একটু হেসে মৃণালের দিকে তাকালাম।

মৃণাল—'কোনো মানুষের মনে মিছিমিছি কষ্ট দিয়ে লাভ কি।'

একটু চুপ থেকে—'আচ্ছা, আমি উঠি।'

আমার হাত খপ করে ধরে ফেলে মৃণাল।

—'তুমি আবার কিছু মনে করলে না তো?' কাতর চোখ তুলে মৃণাল আমার দিকে তাকাল।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম বিধাতা একেই কেড়ে নিতে চাচ্ছেন কেন, জীবনের স্রোতে নিমজ্জিত হয়ে থাকতে যে এত ভালোবাসে!

মৃণাল—'কই, তুমি কথা বলছ না যে?'

—'কথা শুনতে চাও? আমি একটু নীরব হয়ে রয়েছিলাম।'

—'কেন চুপচাপ করে থাকবে? দেখি, তো তোমার হাতটা।' শালের ভিতর থেকে হাতটা বের করে দিল মৃণাল। আমার হাতের ভিতর টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

কিন্তু তবুও মৃণালের সন্দিগ্ধতা গেল না। একটু উশখুশ করে—'তোমার রকম-সকম বুঝি না।'

—'কেন?'

—'কই, কিছু বলে গেলে না তো?'

—'কী আবার বলব, কাল সকালেই আসব।'

—'না, তা নয়।'

—'তবে?'

—'এই যে ডাক্তারের কথা বলছিলাম'—মৃণাল একটু কেশে বললে—'বলেছিলাম সন্ধ্যার মুখোমুখি ডাক্তারকে ডাকব আবার। যাক, দরকার নেই ডেকে। যা কিছু মনে করুক গিয়ে, তাতে আমার কি?'

মৃণাল আবার একটু কেশে বললে—'ঠিকঠাক ওষুধপত্র দিয়ে আমাকে বাঁচালেই আমি বাঁচি। ডাক্তারের সঙ্গে এর চেয়ে আমার কি বিশেষ আর সম্পর্ক!' বলে সে টিটকিরি দিয়ে একটু হাসল।

ঠিক এমনই সময় অমলার ঘাড়ে হাত জড়িয়ে ডাক্তার ঘরের ভিতর ঢুকল আবার। মৃণালের বিছানার পাশে চেয়ার টেনে বসল।

অমলা আমার দিকে তাকিয়ে অমায়িকভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—'আপনি একটু শুনবেন?'

উঠে গেলাম।

অমলা—'চলুন।'

দরজা পেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

অমলা—'আসুন ড্রইংরুমে।'

ড্রইংরুমে ঢুকে অমলা—'একটা কুশনে বসুন।'

বসা গেল।

নিজে সে দাঁড়িয়েছিল, বললে—'কিছু মনে করবেন না ব্যানার্জি সাহেব মৃণালদিকে ভালো করে দেখবেন এবার—বাড়ির মেয়ে টেয়েরা সব আসবে কিনা—তাই'—

—'আচ্ছা আমি যাচ্ছি।'

—'কোথায়?'

—'বাসায়।'

অমলা—'কিছু মনে করবেন না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠে দাঁড়ালাম।

অমলা—'উঠবার কি দরকার আপনার? এইখানেই বসুন না কেন? এখনি বাসায় গিয়ে কী করবেন?' বলে সে মিষ্টি মুখ তুলে হেসে আমার দিকে তাকাল।

আমি—'আমি আবার কাল আসব?'

—'চা খেয়ে যান।'

—'না, থাক।'

—'কেন, এত ব্যস্ততা কীসের? বাসায় আপনার স্ত্রী আছে?' মাথা নেড়ে—'না।'

—'মৃণালদির কাছে শুনলাম, আপনি বোর্ডিঙে থাকেন, কলেজ হস্টেলে?'

—'না।'

—'সে যে হস্টেলেই হোক, কোনো মেয়েমানুষ নেই তো। খানসামা এসে আপনাকে চা দেবে, তা ভালো লাগবে আপনার।' বলে সে আবার তার সমস্ত অনুপম রূপ তার নিজেরই ইচ্ছায় নিজেই জ্ঞাতসারে অনেকখানি স্নিগ্ধ আগ্রহে সরস করে তুলে আমার দিকে তাকাল, ভালো লাগল বেশ। কিন্তু এর ভিতর কতখানি আন্তরিকতা কতখানি খেলা, কারুর বুঝবার সাধ্য নেই। যাইহোক এ খেলা খেলতে সে যে খুব রাজি এ স্পষ্টতাকে অস্বীকার করবার জো নেই।

আমার মুখোমুখি একটা সোফায় বসে বললে—'আমার কথা কেউ কোনোদিন অগ্রাহ্য করতে পারে না, আপনি মনে করেছেন চা না খেয়ে যাবেন? দেখুন, পারেন কিনা?' আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করে—

—'চা কে করবে?'

—'আমি নিজেই। আপনাকে চা খেতে বসিয়ে আমি বাবুর্চি দিয়ে করাব? কেন, এ হাতদুখানা আছে কীসের জন্য তাহলে?'

—'কিন্তু ডাক্তার এখন মৃণালকে দেখছে, এই সময় চা নিয়ে ব্যাপৃত থাকা আপনার উচিত নয়।'

—'মৃণালদির ঘরে এখন অনেক মেয়েমানুষ আছে।'

—'কিন্তু আপনার মতন কাজের মেয়েমানুষ একটিও নেই।'

অমলা একটু হেসে—'কী করে বুঝলেন আপনি?'

—'থাক, সে হল আলাদা কথা। এখন আপনি রুগির কাছে যান।'

—'তা যাব বইকী, আগে চা করে আনি।'

—'আমি খুব তাড়াতাড়ি করে আনছি।'

—'সে অনেক দেরি লাগবে।'

—'সবাই এখন ডাক্তারের কাছে, আপনারও হয়তো দরকার সেখানে, এখন আপনি চা নিয়ে থাকবেন?'

—'সে আমি বুঝব।'

—'চা এনে কী করবেন?'

—'আমরা দু'জনে খাব।'

—'আমি আর আপনি?'

—'হ্যাঁ।'

—'আর সকলে?'

—'তারা খাবে হিড়িকটা কেটে গেলে।'

—'ব্যানার্জি খেয়েছে?'

অমলা মাথা নেড়ে বললে—'না।'

—'তাহলে আমি একটু বসি, সকলে একসঙ্গে খাওয়া যাবে।'

অমলা—'তাই যদি চান তাহলে চলুন ওই ওদিককার সোফায় গিয়ে বসি।'

—'কেন?'

—'বেশ নিরিবিলি আছে গল্প করা যাবে।'

সোফার দিকে তাকিয়ে অমলা—'চলুন।'

—'রুগির ঘরটা একবার ঘুরে আসুন।'

—'কীসের জন্য?'

—'মৃণালের কাপড়চোপড় বদলাতে হবে, বিছানা ঠিকঠাক করতে হবে।'

—'আপনিও যেমন ডাক্তার থাকলে কাপড় বদলায় কী করে?' বলে অমলা খিল খিল করে হাসতে লাগল। কিন্তু সোফার থেকে নড়বার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না তার।

—'গেলে ভালো হত আপনার।'

—'আমার মনে হয় আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আপনার ঢের অসাধ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না, তা নয়।'

—'তবে আবার কি? আমাকে ঠেলে আপনি পাঠাবেনই।'

খটখট করে জুতোর শব্দ শোনা গেল, ডাক্তার ঢুকে বললে—'অমলা।'

—'কেন?'

—'কী করছ এখানেই?'

—'কেন? কী হল?'

ডাক্তার একটা সিগারেট জ্বালিয়ে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে বললে—'মেয়ে মানুষ এখন দুঃসাধ্য জিনিস?'

আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালবেলা মৃণাল—'আমাকে আজ আগের চেয়ে একটু ভালো দেখাচ্ছে না?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'

—'কেন জান, কাল রাতে ঘুম হয়েছিল।' বলে সে হেসে খুব প্রসন্ন হয়ে উঠল।

—'রাতেরবেলা এ ঘরে কাছে কে শোয়?'

—'মা আর মাসিয়া।'

—'অমলা শোয় না?'

—'না, সে কেন শুতে যাবে? বেচারির যা বয়স, এই বয়সেই তো ইনফেকশনে ধরে।' একটু চুপ থেকে—'টেম্পারেচার একটু কমেছে!'

—'কত?'

—'সাড়ে আটানব্বই।' মৃণাল একটু নীরব থেকে—'আজকের দিনটা বড় সুন্দর।'

—'হ্যাঁ, বেশ।'

—'ইচ্ছে করে একটা ডেকচেয়ার নিয়ে বাইরে গিয়ে একটু বসি। অশত্থ গাছটার পাতা সবই প্রায় খসে গেছে দেখছি, এই তিন মাসের শীতে এই রকম হয়েছে। আচ্ছা পাড়াগাঁয় কি এইরকম?'

—'এইরকমই তো।'

—'পাতা আবার কখন হয়?'

—'এই ফাল্গুন চৈত্রের ভিতরেই বেরিয়ে যাবে।'

—'আবার ঝাঁকড়া হয়ে উঠবে গাছ না?'

—'হ্যাঁ।'

মৃণাল একটু চুপ থেকে—'অমলা কাল যে তোমাকে বড় ডেকে নিয়ে গেল

—'ডাক্তার এসেছিল না কিনা—'

—'তাকে কি?'

—'আমারও যাবার সময় হয়ে গিয়েছিল।'

—'কিন্তু থাকলে পারতে।'

—'ডাক্তার কতক্ষণ ছিল?'

—'অনেকক্ষণ, দু'ঘণ্টা।' মৃণাল একটা নিঃশ্বাস ফেলে—'তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেনি, আমিও কিছু বলিনি। কোনো বিষয়েই কিছু বলিনি। কী দরকার আমার?'

একটু চুপ থেকে—'নিজের জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে যে যার বিধাতার বোঝাপড়া করবে, আমি কাকে কী সাহায্য করতে পারি বলো?'

আমার দিকে তাকিয়ে—'পার তুমি কাউকে সাহায্য করতে?'

চুপ করে ছিলাম।

মৃণাল—'ওষুধ আর চেঞ্জের কথা হল ডাক্তারের সঙ্গে।' একটু হেসে—'দুটো বসে, এই আর, কিছু নয়।'

—'চেঞ্জে যাওয়া ঠিক হল?'

—'খেপেছ? ভাওয়ালি যাওয়ার কথা বলছিলেন।'

—'তা গেলেই তো পার।'

—'এখন? এখন সে স্যানিটেরিয়াম বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু যখন যাবার উপায় ছিল, তখনো কেন গেলাম না,—এই নিয়ে [...] মৃণাল একটু হাঁপিয়ে উঠে—'আমাকে শিলং যেতে বলেন।'

—'শিলং তো কাছেই।'

—'ব্যানার্জির খুব ঐকান্তিকতা?'

চুপ করে ছিলাম।

মৃণাল—'যাব শিলং?'

—'ডাক্তারকে কী বললে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমি? না করে দিলাম।'

—'পরিষ্কার না করে দিলে?'

—'হ্যাঁ। তবে কী করব আর?'

—'শিলং গেলে তো বেশ ভালোই হত।'

—'সকালবেলা বেশ ভালো লাগছিল, কিন্তু খানিকক্ষণ ধরে এমন একটা অবসাদ। কেন বলো তো দেখি?'

—'ঘুমুবে?'

—'না।'

—'চেষ্টা করে দেখো না।'

—'মিছিমিছি চেষ্টা করে কী লাভ? সত্যি আমার একটুও পায়নি ঘুম।' মৃণাল বালিশে মুখ গুঁজে খানিকক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল। তারপর ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে—'কার সঙ্গে আমার কীরকম সম্বন্ধ আজও ঠিক বুঝতে পারি না। ডাক্তার দু'ঘণ্টা কাল আমার বিছানার পাশে বসেছিল। পুরুষ মানুষ, কী বলবে? আমারই দু-একটা কথা বলা উচিত ছিল। কি বলো?'

—'প্রত্যাশা করে বসেছিল হয়তো।

—'তুমি তাই মনে কর?'

—'এক-একজন মানুষ আছে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।'

—'ব্যানার্জিও সেইরকম?'

—'আমার তাই মনে হয়।'

—'কাল দু'ঘণ্টা আমার কাছে বসল।'

—'তোমার বিছানায়?'

—'না, বিছানার পাশে, চেয়ারে।'

—'মৃণাল' আমি—'মোটে তো ছ-মাসের আলাপ, তাতে বিছানায় বসা চলে না।'

—'তা ঠিক।'

—'তাছাড়া বিলেত ফেরত বড় ডাক্তার, কতকগুলো প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে হয়। চেয়ারে বসাই নিয়ম, কি বলো?'

—'তাই—ই স্বাভাবিক।'

—'বসায় কি আসে যায়!'

মৃণাল একটু চুপ থেকে—'ছ-বছরের ঘনিষ্ঠতা আলাপ থাকলেও আমার বিছানায় যে বসবেন বা আমার আঙুল চুল নিয়ে খেলা করবেন, তা তুমি ভেবো না। এক এক জন মানুষ এক এক রকম থাকে, কিন্তু তাই বলে হৃদয়ের আগ্রহ আমাদের কারুর চাইতে এর কম নেই।'

—'তাই তো বোধ হল।'

—'দু'ঘণ্টা তো মনের কথা বললাম ওর সঙ্গে। কিন্তু বিশেষ যেন পরিতৃপ্তি পেল না মানুষটা।' একটু চুপ থেকে মৃণাল—'কেন বলো তো দেখি?'

—'কী কথা বললে?'

—'দেশের, বিদেশের, শরীরের, অসুখের, চেঞ্জের রুগি মানুষ আর কি বলবে বল।'

—'তা তো ঠিক।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে মৃণাল—'কার আঙুল নেড়ে খেলা করছিলাম না করছিলাম সেই কৈফিয়ত দিতে হবে?'

—'তা দিলেই তো পারতে।'

—'কেন দিতে যাব?' মৃণাল একটু চুপ থেকে—'ওর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করিনি তো কিছু। একজনের হাত যদি নিজের হাতের ভিতর টেনে নেই তাতে উনি অপ্রীত হলে আমি কী করি বলো?'

কিন্তু মৃণালের হাত আজ কম্বলের ভিতরেই ছিল, বের করছিল না সে আজ আর। হয়তো হাত হিম হয়ে আছে, গরমের দরকার।

মৃণাল—'কৈফিয়ত কীই-বা দিতে পারতাম?'

আমার দিকে সে তাকাল।

একটু হেসে বললাম—'তা তুমি আমার চেয়ে ভালো জান।'

মৃণাল মাথা নেড়ে—'কিছু জানি না।' একটু চুপ থেকে—'কোনো কৈফিয়ত নেই, না আছে অস্তিত্ব, না আছে প্রয়োজনীয়তা।'

বাবুর্চি চা দিয়ে গেল।

আমি—'অমলা কোথায়?'

—'ঘুমুচ্ছে হয়তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এখনো?'

-'ও, বড্ড সুখী শরীর অমলার।'

—'কিন্তু কাজকর্ম করে তো ঢের।'

মৃণাল—'ব্যানার্জি আজও তো আসবে, বারোটার সময় একবার।'

—'দুপুরবেলা আসে নাকি?'

—'তারপর আসবে, চারটেয়।'

একটু চুপ থেকে—'আজও যদি দিনটা গুমরে থাকে তার?'

—'কই, তুমি চা খাচ্ছ কই? আমাকে ওভালটিন দেয়নি বুঝি?'

—'দিয়েছে।'

ওভালটিনের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে মৃণাল—'এইটেই খাওয়া যাক।'

—'সবটুকু খেও।'

—'চেষ্টা করব। তুমি চা খাও। আমি সকালে খেয়েছিলাম কয়েক চামচ চা। ভালো লাগল না।'

—'এখন খাবে?'

—'না, কোনো রুচি নেই।'

টোস্টের এক টুকরো ভেঙে মুখে দিয়ে মৃণাল—'আজ না হয় দু-চারটে কথা বলা যাবে। ব্যানার্জির সঙ্গে।'

—'তা বলো।'

—'কী রকম কথা জান?'

—'কীরকম?'

—'না, অসুখবিসুখ চেঞ্জফেঞ্জের কথা আর নয়, ওতে মানুষের ঘেন্না ধরে যায়, যাতে মানুষের মনের কুয়াশা কেটে যায় সে রকম কথা বলতে হয়।'

চা খাচ্ছিলাম।

মৃণাল—'শিগগিরই তো মরে যাচ্ছি, কোনো মানুষের মনে বেদনা দিয়ে বিদায় নিয়ে কী লাভ?'

চায়ের পেয়ালাটা হাতের কাছের তেপয়ের ওপর রাখলাম।

মৃণাল—'যে যা আমার কাছ থেকে ভালোবেসে গ্রহণ করতে চায় তাই দিয়ে যাব। দু'দিন পরে আমার এ জীবন তো কাদার চেয়েও অধম হয়ে যাবে।'

চায়ের পেয়ালাটা তুলে চুমুক দিলাম।

মৃণাল—'আজ এই দশ-পনেরোটা দিন এ জীবনের তবুও ঢের মূল্য আছে দেখলাম।'

চুপ করে ছিলাম।

মৃণাল একটু হেসে—'আমার দেহের জন্য অবিশ্যি কারুর খিদে নেই, কিন্তু আমার মনের জন্য এখনো অনেকের ঢের লোভ।'

টিপট থেকে চা ঢেলে নিচ্ছিলাম।

মৃণাল—'মেয়েমানুষকে তোমরা মৃত্যুশয্যায়ও নিস্তার দাও না। তার হৃদয় নিয়ে খেলা করতে ভালোবাস। তোমরা কম নও।'

চা ঢালছিলাম।

মৃণাল—'কিন্তু আমাদেরও বলিহারি পুরুষমানুষকে উপেক্ষা করবার শক্তি নেই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা নেই। নিজের হৃদয়কে অন্য অনেকের কামনার জিনিস ভেবে সার্থকতা।'

দেখলাম চা খুব কড়া হয়ে গেছে।

—'সার্থকতাই শুধু? একেবারে চরিতার্থতা।' বলে সে চোখ বুজল দেখলাম চোখের পাতা খুব নিবিড়ভাবে কাঁপছে।

সমস্ত শরীরও থরথর করে কাঁপছে যেন। এমনি করে পাঁচ-দশ মিনিট কেটে গেল। তারপর চোখ মেলে মৃণাল—'বড্ড শীত করছে।'

—'আর একটা কম্বল চাপিয়ে দিই?'

—'দাও।'

ভালো করে গায়ে কম্বল টেনে দিয়ে—'এখন ঘুমোও।'

—'তাই চেষ্টা করছি।' বলে সে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। এক পট চা ওভালটিন আঙুর বেদানা বাবুর্চি যেমন দিয়ে গেছিল মৃণালকে, তেমনই ছড়িয়ে রইল সব।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, মৃণাল বাঁচবে!

দুপুরবেলা মৃণাল—'সকালবেলা তুমি না বলেই চলে গেলে যে?'

—'চলে যাইনি, ড্রইংরুমে গিয়ে বসেছিলাম'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'একা একা?'
—'না, অমলা ছিল?'
-'তার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলে?'
—'হ্যাঁ।'
মৃণাল—'ওর সঙ্গে বেশি আলাপ কোরো না।'
—'কেন?'
—'তাহলে তোমার দাম্পত্যজীবনের শান্তি নষ্ট হবে।
চুপ করে বসেছিলাম।
—'ড্রইংরুম থেকে এখানে ফিরে এলে না কেন?'
—'তুমি তো ঘুমুচ্ছিলে।'
—'না, ঘুমুইনি, চুপচাপ পড়েছিলাম।'
—'আমি তো তা বুঝতে পারিনি।'
—'কিন্তু অমলার বলা উচিত ছিল তোমাকে।'
—'হয়তো টের পায়নি।'
—'সে খুব জানে, খুব বোঝে আমি কখন ঘুমুচ্ছি না ঘুমুচ্ছি। আমাকে দেখে দেখে সে হদ্দ হয়ে গেল। ইচ্ছে করেই তোমাকে জানায়নি।'
—'হয়তো ভেবেছে তুমি একটু চুপ করে পড়ে আছ, তোমাকে বাধা দিয়ে দরকার নেই।'
—'ওর হয়ে কথা বলতে খুব ভালো লাগে তোমার, কি বলো?'
—'না, তা নয়।'
—'এই মেয়েটি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার আর এক কাঁটা।'
একটা বেদানা আস্তে আস্তে ফাড়ছিলাম।
মৃণাল—'আমাকে শাস্তি দিতে চাও?'
একটু হেসে বললাম—'কেন যে ব্যথা পেলে বুঝতে পারলাম না। ব্যথার কিছু ছিল না কিন্তু।'
মৃণাল আস্তে আস্তে আঙুল বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরে একটা শান্ত নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলল—'কয়েকটা বেদানার কোয়া দাও তো আমাকে।'
চার-পাঁচটা দানা মুখের ভিতর ছেড়ে দিলাম।
মৃণাল—'থাক আর দিও না, আগে খেয়েনি।' চুষতে চুষতে—'অমলার সঙ্গে ড্রইংরুমে বসে কোনোদিন কথা বোলো না।'
—'কেন?'
—'তাতে ঢের ক্ষতি হবে।'
—'আমার?'
—'আমারও। সে বেঁচে আছে, আমি মরে যাচ্ছি ভেবে দেখ পার্থক্যটা কত বড়।'
বুঝতে পারলাম।
মৃণাল—'তাকে খুব ভালো লাগে?'
—'অমলাকে?'
—'ভালো তো লাগবেই। কিন্তু এ ভালো জিনিসকে পথ ছেড়ে চলে যেতে দাও।' মৃণাল একটা একটা করে বেদানার বিচি ফেলে দিচ্ছিল।
আমি—'আর খাবে?'
—'দাও।'
এক একটা দানা দিচ্ছিলাম।
মৃণাল—'অনেকদিন পরে তোমার মনে হয়তো ভালোবাসা এসেছে।'
—'কেন?'
—'এই অমলাকে দেখে।'
আরো একটা দানা আমার আঙুলের থেকে ঠোঁট দিয়ে টেনে নিল সে।
দু'জনেই চুপ করে ছিলাম।
মৃণাল—'কোনো উত্তর দিলে না যে?'
—'কয়েকটা মুহূর্ত অমলার সঙ্গে কাটল মন্দ না।'
—'তা আমি জানি, তা কাটবে বেশ।' মৃণাল—'কিন্তু এই মেয়েটির দায়িত্ব বড় কম।'
—'কী রকম?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'রূপ আছে, জীবন সম্পদ আছে কিন্তু তার সঙ্গে যদি দায়িত্ব না থাকে তাহলে সে কী রকম মারাত্মক জীব হয়ে ওঠে ভেবে দেখ তো দেখি।'

চুপ করেছিলাম।

মৃণাল—'ছোটবেলায় প্রজাপতির ডানা ছিঁড়তে ভালোবাসত।'

—'কে?'

'অমলা।'

একটু চুপ থেকে—'ছোটবেলায় অবিশ্যি অনেকেই আমরা ফড়িং প্রজাপতি মেরে খেলা করেছি।'

—'অমলার দিক টেনে কথা বলতে খুব ভালো লেগে উঠল দেখছি যে তোমার।'

—'না, বলছিলাম, সে এখন বড় হয়েছে, এখন অন্যকরম।'

—'মানুষকে ফুসলে বেড়ানোই এখন তার ধর্ম।'

—'আমার সঙ্গে তার সেদিকের কোনো পরিচয় নেই, কোনোদিন হবেও বলে আশা করি না।'

—'হতে কতক্ষণ।'

—'না, তা হয় না।'

—'তোমরা যারা জীবনের স্রোতে খেলা করছ, এতটা নির্ভর নিজেদের ওপর মিছিমিছি করতে যাও কেন? এ সাজে না।'

মৃণাল—'অমলা যদি তোমাকে ড্রইংরুমে ডেকে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে তুমি যেও না।'

—'আমি তো তোমার বিছানার পাশেই বসে আছি। আমাকে ডেকে নেবে কেন?'

—'মাঝে মাঝে আমি ঘুমিয়ে পড়ি তো?' মৃণাল একটু কেশে—তখন হয়তো এসে হাত ইশারা করে বলবে চলুন ড্রইংরুমে গিয়ে একটু গল্পগুজব করা যাক—এখানে কি গুমোট।' মৃণাল—'ঠিক এই রকম বলে।' একটু চুপ থেকে—'যদি ডাকে এসে, তুমি যেও না।'

মৃণালকে আশ্বাস দিয়ে—'আচ্ছা।'

কপালের চুল আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিচ্ছিলাম।

মৃণাল—'কিংবা যখন বাসায় চলে যাচ্ছ হয়তো ড্রইংরুমে খানিকক্ষণ বসতে বলতে। আমার সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠতা তাদের ওপর এই রকম লোভ।'

চুপ করে ছিলাম।

মৃণাল—'কক্ষনো বসেত যেও না।'

—'কী বলব?'

—'কোনো কথাবার্তার দরকার নেই—চুপচাপ চলে যাবে।'

—'সে বড় অভদ্র ব্যবহার হয় না?'

মৃণাল মাথা নেড়ে—'না।'

—'মানুষের সঙ্গে এটুকু সৌজন্যও রাখব না?'

মৃণাল একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে—'সৌজন্য? তোমার মনেও খানিকটা খিদে আছে যেন।'

—'খিদে?'

—'তা আমি আগেই জানতাম। অমলা কি সোজা পাত্র, মানুষের হৃদয়ের ভিতর কামনা না জাগিয়ে সে ছাড়বে?'

—'অমলার সঙ্গে দেখা হলে আমি হাত তুলে নমস্কার করে অমায়িকভাবে কথা বলি। কোথাও একটু শিষ্টতা না হারিয়ে ফেলি এই-ই দেখি তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এইরকম।'

—'এ তো গেল সম্বন্ধের সূচনা।'

—'এবং এইরকম করেই শেষ।'

—'এই হাত তুলে নমস্কার দিয়ে?'

—'হ্যাঁ, সত্তর বছর যদি বাঁচি তখনো।'

—'এই অমলার সঙ্গে?'

—'সমস্ত নারীর সঙ্গেই।'

মৃণাল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—'কি জানি, মৃত্যুর বিছানায় বসে কথা বলছ, আঘাত দিয়ে কথা বলতে পার না তো, মুখরোচক করে বলতে হয়।'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু নিজেকে যে উদাসীন সাজাবার এই-ই তোমার সত্যরূপ?' আমার চোখের দিকে দু-এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে—'মনের ভিতর তোমার কোনো কামনা নেই?'

—'কার জন্য?'

—'অমলার জন্য?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

—'নিরবচ্ছিন্ন সংসর্গে থাকলে কামনা যে না জাগে তা নয়।'

—'এই বার সত্য কথা বলেছ।'

—'তুমি তো জানই আমি কত নিঃসহায়।'

—'কেন?'

—'তোমার অসুখ বলেই এখানে আসি, না হলে মেসে থেকে টিউশন করে মরা মাছি সম্বন্ধে কবিতা লিখে তোমাদের বড় জীবন বড় আবহাওয়ার তুলনায় আমি কত ক্ষুদ্র জীব। তা কি তুমি বোঝ না?'

মৃণাল কম্বলের থেকে হাত বের করে অনেকক্ষণ চুপচাপ আমার হাত ধরে রইল। তারপর বললে—'কিছু মনে কোরো না, যে মরতে বসেছে, তার মনে নানারকম দ্বিধা।'

পরদিন বিকেলে যখন পৌঁছলাম মৃণালের কাছে, তখন প্রায় সাড়ে চারটা পাঁচটা।

মৃণাল—'তোমার সঙ্গে আজ আমার ঢের কথা।' একটু চুপ থেকে বললে—'মৃত্যুকে কীভাবে গ্রহণ করছি জান?'

সমস্ত ঘরে গভীর নিস্তব্ধতা, জানালার পাশে গোটা দুই চড়াই ডাকছিল। জানালার ভিতর দিয়ে বিকেলের রোদ মৃণালের বিছানায়, শালে, চেয়ারে টেবিলে ছড়িয়ে পড়ছিল।

মৃণাল—'মৃত্যুর পর নতুন জীবন, ভগবানের অমৃতলোক, সে বিশ্বাস আমি অনেকদিন হয় হারিয়ে ফেলেছি। সেখানে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই।'

আমি—'আমি অনেক বই পড়ে দেখেছি।'

মৃণাল বাধা দিয়ে—'বলবে তো উপনিষদের অমৃতের কথা।'

—'না, উপনিষদ নয়।'

—'আমার কথা শোনো—ছ-সাত মাস আগে একদিন দুপুরবেলা সার্কুলার রোডের খ্রিস্টানদের গোরস্থান দেখতে গিয়েছিলাম, কত বড় যে নিস্তব্ধতা সেখানে আর কত ক্রুশ আর সমাধি দেখেছ?'

—'দেখেছি।'

—'গোরস্থান থেকে এসেই মনটা উদাস হয়ে যায়, কী বলো?'

—'তা খুব হয়।'

—'সেদিন প্রায় ছ'ঘণ্টা একা একা ঘুরছিলাম সে জায়গায়। প্রায় বছর দুই হল আমার মনে হচ্ছে, কিন্তু যেদিন আমি খুব স্পষ্ট করে বুঝলাম যে মৃত্যুর পর নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ছাড়া আমাদের জন্য আর কিছু নেই—'মৃণাল একটু চুপ থেকে—'হয়তো এ আমার ভুল ধারণা। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনো ধারণাই আমার কাছে সৎ বা সাধু বলে মনে হয় না। কটা দিন তো বাঁচব আর, জীবনের সব আচারেই এখন ঐকান্তিকতা আমার সম্বল, ভগবান, অমৃত—এই সব সাজানো মিথ্যা নিয়ে আমি মরতে চাই না।'

ধীরে ধীরে মৃণালের চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম।

মৃণাল—'কিন্তু তাই বলে আমি ভরসা হারিয়ে ফেলিনি, এই যে মৃত্যু আসছে, আমি তাকে কীভাবে গ্রহণ করতে যাচ্ছি শুনবে?' আমার দিকে সে তাকাল। বললে—'জানালা দিয়ে এই যে রোদ নরম সাদা শালটার ওপর এসে পড়েছে, এর ভেতর এখনো তিনটে মাছি দেখছ?'

দেখছিলাম।

মৃণাল—'এই মাছি তিনটে তোমার কাছে খুব কুৎসিত না?'

একটু হেসে বললাম—'রোদটা কিন্তু খুব সুন্দর।'

—'আর এই মাছি দুটো?'

চুপ করে ছিলাম।

মৃণাল—'রোদের চেয়ে এরা একটুও কি কম সুন্দর?' মৃণাল—'দেখ তো যেখানে ছায়া পড়েছে সেখান থেকেই সরে যাচ্ছে, যেখানে রোদ পালাতে পালাতে থেমে রয়েছে সেই সেই জায়গা খুঁজে খুজে গিয়ে বসছে আবার। একটুও ভুল করে না, একটুও অলসতা নেই। জীবনের স্পৃহা ও আরাম এদের এত সুন্দর, দেখে আমার এত ভালো লাগে! মাছিগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মৃণাল—'রোদের ভিতর পাখনা চালাচ্ছে, উড়ছে, খেলছে, কি সুন্দর।' আমার দিকে তাকিয়ে—'এই সব দেখি আমি, সকালে বিকালে। ঘুমের থেকে উঠতে না উঠতেই চড়াইগুলো জানালায় এসে খেলা করতে থাকে। সমস্ত গায়ে ভোরের রোদ, উঁচু গাছের ডালপালার ভিতর কিংবা অনেক আকাশের পথে উড়ে যাবার কোনো বাধা নেই পাখিগুলোর। নারকেল সারির ভিতর রোদ চিক চিক করতে থাকে। পাতার ভিতর থেকে আলোর মতো তেল ঝরে পড়ে যেন। দেশের বাড়ির আকাশপ্রদীপ দেওয়ার জায়গায় একটা শঙ্খচিল এসে বড় বড় ডানা গুটিয়ে বসে। অশত্থ গাছের ডালপালার ভিতর সাদা সাদা নোটন পায়রাগুলো ছবির মতন বসে থাকে। দূরে ন্যাড়া শিমুলগাছ ফুলে ফুলে লাল, তার ভিতর কতকগুলো কাক খুব কোলাহল ও উৎসাহের সঙ্গে রোজকার ভোরের জীবন শুরু করে তাদের। আমি শিগগিরই চলে যাব এদের ভিতর থেকে। কিন্তু এরা তো বেঁচে থাকবে! পৃথিবীতে সুন্দর কোনোদিনও শেষ হয় না। নীল আকাশ থাকবে, নক্ষত্র থাকবে, ভোর থাকবে, রোদ থাকবে, রোদের মাছি থাকবে, হাজার হাজার বছর পরেও এমনই ফাল্গুনের বিকালের পড়ন্ত রোদের ভিতর হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো যক্ষ্মা রোগীর ঘরে এমনই মাছিগুলো ডানা কাঁপাবে, উড়বে, খেলবে, জীবনের গভীর স্পৃহা ও আনন্দে বিচিত্র হয়ে থাকবে।'

মৃণাল একটু চুপ থেকে—'ভগবান ও অমৃতের জায়গায় এইসব সৌন্দর্য আমার মনকে পেয়ে বসেছে আজকাল।'

একটু কেশে—'কিন্তু অন্ধতাকে কোনো কিছু বিশ্বাস করব না বলে অনেকদিন থেকেই আমি নিজেকে স্থির করে নিয়েছি। কাজেই জীবনের বড় জিনিসগুলো এড়িয়ে গেল আমাকে। কতকগুলো অধম তুচ্ছ সৌন্দর্যের ভরসা বুকে করে মরলাম।'

আমার হাত তার বুকের কাছে তুলে নিয়ে—'ভেবেছিলাম বিয়ে করব, মানুষের মতো একটি সন্তান রেখে যাব।' একটু চুপ থেকে—'কিন্তু পৃথিবীতে কত মানুষ দাম্পত্য জীবন চালিয়ে কত শান্তি পাচ্ছে, কত মানুষের কত সুন্দর শিশু হয়েছে, ভেবে নিলেই হল, আমি সেই বধূ, সেই সব শিশু আমারই।' বলে সে চোখ বুজল। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন দেখলাম ডাক্তারের হাত বুকের ওপর তুলে নিয়ে খুব আগ্রহের সঙ্গে মৃণাল নানারকম ঐকান্তিক কথা বলছে। আমি যে এসেছি তা টেরও পেল না সে। এমনই কয়েকদিন আরো কয়েকজনের হাত ধরে আঙুল নিয়ে খেলা করে অনেক রকম আন্তরিক ঐকান্তিক কথা বললে মৃণাল। কোথাও একটু ভান বা কপটতার গন্ধ পর্যন্ত নেই।

একদিন বিকেলবেলা মৃণালের বিছানায় শালটার ওপর রোদ এসে পড়ছিল, গোটা দুই মাছি সেই রোদের ভিতর উড়তে লাগল। মৃণাল আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে—'দেখলে, রোদের ভিতর দুটো মাছি কেমন।'

আমি তাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলাম।

মৃণাল—'না, উড়িয়ে দিও না।'

—'কী হবে?'

—'যেখানেই রোদ সেখানেই উড়ে উড়ে যাচ্ছে মাছি দুটো, কেন বলো তো দেখি?'

—'কি জানি।'

—'যেখান থেকে রোদ সরে সরে যাচ্ছে সেই ছায়ার ভিতর থাকছে না আর।' মৃণাল অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটু চুপ থেকে বললে—'ছায়া যে নেমে আসছে, সন্ধ্যা হচ্ছে এ তারা কিছুতেই গ্রাহ্য করতে চায় না। রোদটুকুকে আঁকড়ে থাকতে চায়। চারদিকে জীবনের স্পৃহা এমনই নিবিড়, এমনই বিচিত্র।' বলে নিজেও সে নিজের জীবনের সম্বন্ধে খানিকটা ভরসা পেল যেন। খানিকক্ষণ চুপ থেকে মৃণাল—'শিলং যাওয়া ঠিক করে ফেলেছি।'

—'কবে যাবে?'

—'দু-চারদিনের মধ্যেই, ডাক্তারও যাবেন।'

একটু চুপ থেকে—'তুমিও চলো।'

শুনতে পেলাম অনেককেই মৃণাল সঙ্গে নিতে চাচ্ছে।

বাসায় যাবার সময় অমলাকে জিজ্ঞেস করলাম—'মৃণাল চেঞ্জে যাবে নাকি?'

—'কে বলেছে আপনাকে?'

—'সে-ই তো বলে।'

—'আপনি খেপেছেন, আজ বাদে কাল মরে যাবে, সে যাবে আবার চেঞ্জে?' অমলা একটু চুপ থেকে—'সারাদিন ব্যানার্জির কাছে কত কি হাবিজাবি বলে, দিনের মধ্যে একশোবার করে আংটি বদলে বিয়ে করে ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তার আমাকে সব এসে বলে। এই ড্রইংরুমে বসে আমরা দু'জনে হেসে খুন হই।'

অমলা—'উঠলেন।'

—'যাই।'

—'চা খাবেন না?'

—'এখুনি তো গিয়ে ভাত খাব।'

পরদিন সকালে মৃণালের কাছে আর গেলাম না। দুপুরেও না। সমস্ত বিকালটাও বিছানায় বিছানায় কুড়েমিতে বিমূঢ়তায় অবসাদে কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যার সময় মৃণালদের বাসায় গিয়ে অমলার সঙ্গেই প্রথম দেখা—সে বললে—'বেলা বারোটার সময় মৃণালের দাহ শেষ হয়ে গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরুপম যাত্রা

বছর চারেক পরে কলকাতার থেকে দেশে ফিরছে—সম্বল একটা টিনের সুটকেশ, রংচটা শতরঞ্জিতে মোড়া একটা বিছানা এবং মানিব্যাগে তিন টাকা সাড়ে ন আনার পয়সা। একটা বিষয়ে খুব স্বাধীনতা আছে—কলকাতার থেকে চলে যাচ্ছে বলে কোনো উপরওয়ালার অনুমতি দরকার নেই; কোনো উপরওয়ালা নেই, চাকরির বিড়ম্বনার থেকে জীবন নির্মুক্ত—বেশ ঝরঝরে নির্মল দিনগুলো—যতক্ষণ ইচ্ছা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে, ফাল্গুনের সোনালি রোদে মাছির মত ঘুরে বেড়াতে পারে, মেসের বারান্দায় চড়াইদের নির্বিবাদ নিশ্চিন্ত জীবনোপভোগ সমস্ত দীর্ঘ অলস দুপুরবেলা বসে উপলব্ধি করতে পারে। একটি অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় কলেজ স্কোয়ারের একটা বেঞ্চিতে বসে সমস্ত সকাল অশ্বত্থের খড়-খড়ে ডাল-পালার ভিতর বাতাস ও বুলবুলিগুলোর গান শুনতে পায়—শুকনো পাতা ঝরে, সজীব পাতা গজায়, সবুজ বেঞ্চির ওপর খয়েরি রঙের, বাদামি রঙের পাতা উড়ে আসে, খানিকটা দূরে দেবদারু গাছটা ছোট নিটোল, শিমুলের ডালপালার পাতা নেই—অসংখ্য লাল ফুলের নিশান, কৃষ্ণ শিখার মত কাকের পাখাগুলো সাপের ফণার মত সারাদিন ঘুরছে, বিলম্বিত সকাল এখানে নির্বিবাদে কাটিয়ে দিতে পারা যায়—কেউ কোনো কৈফিয়ৎ নিতে আসবে না, রাস্তার ট্রামে-বাসে অফিসমুখী কেরানিদের জীবনের উর্ধ্বশ্বাসকে একটা অবাঞ্ছিত বিকৃত অনিয়ম বলে মনে হবে, দেবদারু গাছের লীলা ও ভঙ্গি, জীবনরচনার প্রণালী মনে হবে গভীর সত্যিকারের জিনিস, অশথ-অশথের বুলবুলিগুলোর জীবন সত্যিকারের মনে হবে, তার নিজের জীবনটাকে সত্যিকারের মনে হবে। সমস্ত রাত মেসের ছাদের ওপর মাদুর পেতে শুয়ে থেকে একটা দূর ভবিষ্যৎ জীবনের আভা পেতে পারে—গোলদিঘির দেবদারু ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাম গাছগুলো যার আভাস পায়, এই শহরের শিশির ভেজা অজস্র কাকের নীড় এমনি গভীর গহন রাতে যে-পরিপূর্ণতার স্পর্শে সুন্দর নিবিড় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দিনগুলোকে এমনিভাবে চালালেও চলে। চালাতে প্রভাতের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিপদ এই যে সামান্য দাড়ি কামাতে, একটা দেশলাই বা ব্যবহার করতেও যার সাহায্যের দরকার, সেই পয়সাই নাই। বয়স ত্রিশ বছর—আরো কুড়ি কি ত্রিশ বছর যদি সে বাঁচে তা হলে তিন টাকা সোয়া ন আনায় হয় না।

নিজে একা মানুষও নয় সে; স্ত্রী আছে—একটি ছেলেও রয়েছে।

এই চার বছর কলকাতায় কবিত্ব করে আর বুলবুলির গান শুনে কাটায় নি সে। শুধু আর্থিক অধঃপতনের অপরাধে আত্মিক জীবনের অমর্যাদা ও গ্লানি সহ্য করতে যারা অভ্যস্ত তাদেরই একজনের মত সারাদিন পথে-পথে ধাক্কা খেয়ে ফিরছে সে। সুখ-সুবিধা-সফলতা এই সব অর্জন করার জিনিস—পুরুষকারের দরকার—প্রতিদিন সকালবেলা এই দুরারোগ্য ছন্দ তাকে পেয়ে বসেছে; কেরোসিন কাঠের টেবিলে ডিটমারের লণ্ঠনটা নিভিয়ে অন্ধকারের ভিতর মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে প্রতিদিন রাতের বেলা মনে হয়েছে, এই অন্ধকারের যেন শেষ না হয় আর, এ বিছানার থেকে কোনোদিন যেন আর তাকে উঠতে না হয়।

সাধারণ বিশেষত্বহীন জীবনের বিশেষত্বহীন সাধারণ বেদনার অসহায় গভীরতায় চারটা বছর আস্তে-আস্তে এমনি করে কেটে গেল তার।

বাড়ির থেকে চিঠিপত্র বেশি কিছু পায় না সে। মা মাঝে-মাঝে লিখেছেন 'অনেক দিন তোমাকে দেখি না, মাঝে-মাঝে দেখতে ইচ্ছা হয়—সময় করে একবার আসতে পার না?'

বৌ-এর চিঠি, পনের-কুড়ি-পঁচিশ দিন অন্তর এক-এক বার আসে। 'কিছু সুবিধা হল? এত দিনেও তুমি যে কিছু করে উঠতে পারলে না এই ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই।'

তাই তো—

প্রভাত লেখে—'খোকা কত বড় হল?'

জবাব আসে—'কুন্দর চিঠি পেলাম আজ; তার স্বামী তো কলকাতায় গিয়ে ছ'মাসের মধ্যেই রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে কত বড় চাকরি জোগাড় করে নিল আর তুমি কিছু পারলে না।'

বেশ কথা। সেই যত উদাসীনতা দেখতে দেশে যেতে ইচ্ছা করে বড়। দেশে সে যাবে একবার—এবার একবার দেশে যাবে না কি? যাবে, যাবে। মার চিঠিতে হয় তো আগ্রহ বেশি নেই—কিন্তু একবার গিয়ে কাছাকাছি দাঁড়ালে তিনি উচ্ছ্বাসে বাঁধন-সম্বিৎহারা যদি না হন। আর এই কমলা- প্রথম দিনটা হয় তো সেই একটু মুখ গোঁজ করে সরে থাকবে—কাছে আসবে না, কথা বলবেও না; কিন্তু তার এ বিরসতা, উচ্ছে-চিবনো রূপ দু-এক দিনের মধ্যেই কেটে যাবে। তার পর চৈত্র-বৈশাখের নির্জন দুপুরবেলা-জামরুল পাতার মর্মর শব্দ, বোলতার গুনগুন, নারকোল গাছে কাঠঠোকরার ঠোকর, কামিনীগাছের ডালপালার ভিতর টুনটুনিগুলোর কিচিরমিচির—মাথার উপর কড়া রৌদ্র মাছরাঙার ডাক—বাতাসে নিদ্রালু মাঠ-প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ও স্বপ্নের হাহাকার! এমনি সময় দুপুরের বাতাসে অক্ষয় বটের প্রান্তরের সীমা পরিসীমায় আরো দূর অসংবদ্ধ প্রান্তর আকাশের বিস্তারকে টিটকারি দিচ্ছে—

আর খোকা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোকাকে ছ'মাসের দেখে কলকাতায় চলে এসেছিল প্রভাত—আজ বয়স তার প্রায় পাঁচ বছরের কাছাকাছি। হাঁটতে পারে—দৌড়াতে পারে—এমন কথা নেই যা সে না বলতে পারে। দেখতে কেমন হয়েছে? তার নিজের মত—না কমলার মত?

খোকা হয় তো কারো কথাই শোনে না; সকালে ঘুমের থেকে উঠে একটা বাঁশের কঞ্চি কুড়িয়ে নেয় নিশ্চয়। তার পর?

নয় তো বিড়াল, কুকুর, শালিক, কাক যা তার নজরে আসে—সমস্ত তাড়িয়ে বেড়াতে খুব ভাল লাগে তার। হয় তো পিঁপড়ে মারে—ফড়িং ধরার জন্য মেহেদি পাতার বেড়ার চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়—দু-একটা গঙ্গা-ফড়িং কিংবা নতুন ঝিঁ ঝিঁ যদি নজরে পড়ে তা হলে তার প্রতি লোভ আরক্তিম হয়ে ওঠে খোকার। এক-একটা প্রজাপতি উড়ে এসে আচমকা তাকে অন্য পথে ভুলিয়ে নিয়ে যায়; নানা রঙের প্রজাপতি; হলদে জর্দা, পাটকিলে নীল—কোনোটা লখনৌ ছিটের মত, চেককাটা, ফুটফুটে, ডোরাদার, কত কী! ফড়িংই-বা কত রকম—কোনগুলো টকটকে লাল, সমস্ত শরীরটা একটা পাকা ধানি লঙ্কার মত চারটি ডানা—আভের তৈরি নিটোল নিখুঁত জিনিসের মত—ভাঙে না, গুঁড়ো হয় না—ফড়িংটাকে মাঠের থেকে মাঠে-প্রান্তরের এ পারে, দিগন্তে, নদীর ধারে, শশার খেতে, বাবলার জঙ্গলে, শ্মশানে কত জায়গায়ই যে নিয়ে যায়!

ঘুরে ফিরে এই প্রজাপতি আর ফড়িংগুলো কানসোনার শিষে, দ্রোণ ফুলের ঝাড়ে, ঢেকি লতায়, আকন্দ ফুলে, ভেরেণ্ডাবনে এসে বসে, কিংবা লাউয়ের ডগায়, কিংবা বাঁশের মাচার একটা কঞ্চির উপরে! খোকা হয় তো এই সব দেখে-দেখে হয়রান—

একটা ফড়িংও ধরতে পারে না সে, তবুও হয় তো বর্ণচ্ছটাময় অজস্র প্রজাপতির জগৎ তার কাছে একটা সুন্দর সুদূর স্বপ্ন—সাম্পানচড়া মলয় নাবিকের চোখে দূর দক্ষিণ সমুদ্রের স্বপ্নের মত তাকে এড়িয়েই চলে, দিন-রাত এড়িয়ে-এড়িয়ে চলে—তার পর বিকেলের পড়ন্ত রোদের ভিতর দিয়ে সন্ধ্যার আবছায়া নেমে আসবার আগে কোনো পরীর রাজ্যে বিলীন হয়ে যায় সে। যাক। এই রকম বিলীন হয়ে যাওয়াই ভাল। একটা প্রজাপতি ধরে পাখনা ছিঁড়ে খোকার কী লাভ? তার চেয়ে এরা যদ্দিন শিশুটিকে মাঠে পথে ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে বেড়ায় বেশ হয়; খোকাকে ধরা দেবে না কখনো—তার মনের ভিতর নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা ও স্বপ্ন জাগিয়ে রাখবে; ভোরের থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে অনেক বহুরূপী রূপের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাবে—উঠানে, বাঁশবাগানে, চালতা তলায়, কিংবা লাল কুচ, সবুজ তেলাকুচা লতার দেশে কিংবা আমের বোলগুলো যেখানে সবুজ কটা ঘাসের ভিতর ঝরে শুকিয়ে মিষ্টি গন্ধ ছাড়ছে সেই রাজ্যে—

অবাক নিস্তব্ধ হয়ে ভাবছিল প্রভাত।

একটা পাতি লেবুর সবুজ পাতার উপর কমলা রঙের একটা প্রজাপতি—আজ এই দুপুরেই হয় তো খোকার কাছে তা জামশিদের মিনারের রাজ্যের চেয়ে ঢের বড় জিনিস। তার নিজের কাছেও ঐ রকমই মনে হত—খোকার বয়সে।

পৃথিবীর সাধারণ হাঁটা-চলার পথ-তুচ্ছ খুঁটিনাটি যতদিন অনাবিষ্কারের বিস্ময় কুয়াশা হয়ে থাকে, ততদিনই খুব গভীরে লাভ—ধীরে-ধীরে কল্পনা শুকিয়ে যায়—স্বপ্নগুলো যায় ভেঙেচুরে—বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি—তৃপ্তি পাই না, শান্তি পাই না, জীবনটা একটা দাঁড়কাকের বাসার মত ছন্নছাড়া জিনিস হয়ে দাঁড়ায়; সকাল থেকে রাত্রি অব্দি একটা ক্ষুধিত কাকের মত সমস্ত রকম কার্যতা, চিত্তপ্রসাদহীন লালসা ও গ্লানির ভিতর নিবৃত্তি খুঁজে মরি, জীবনকে বুঝি জীবনধারণ বলে।

প্রভাত মেসের বিছানায় এ-পাশ ও পাশ করতে লাগল। আজকের গাড়িতেই সে দেশে চলে যাবে। যাওয়া যায় না?

ট্রেন ছাড়ে প্রায় বিকেলে চারটের সময়—এখন বেজেছে দুটো। প্রভাত একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিল। ঘণ্টা দেড়েক সময় আছে আর। যাবে কি সে? আজই যাবে? কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে হেঁটে চলে গেলেই হয়—সময় ঢের বাকি আছে গাড়ি ছাড়বার। কালকে কমলার একটা পোস্টকার্ড এসেছিল—তোশকের নিচের থেকে পোস্টকার্ডটা বের করল প্রভাত—প্রভাত যে দেশে যাবার সংকল্প করেছে এ তাদের কল্পনার ত্রিসীমানায়ও নেই; বরং অনুযোগ করে লিখেছে এতদিনেও কেন সে চাকরি জোগাড় করে উঠতে পারল না? বিয়েই—বা করেছিল কেন? ছেলেও তো হয়েছে দেখি? কী দিয়ে কী হয়? কে কোথায় দাঁড়ায়?

চুরুটে এক টান দিয়ে পোস্টকার্ডটা রেখে দিল প্রভাত—

চুরুটে এক টান দিয়ে ভাবল—পোস্টকার্ডে এ-সব লেখা উচিত হয় নি কমলার। এটা তো একটা মেস—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন মানুষ থাকে। পিয়ন এসে চিঠিপত্র একটা ঢাকনা খোলা টিনের বাক্সে ফেলে দিয়ে যায়—যে খুশি যখন খুশি চিঠি নেড়েচেড়ে দেখে—কার্ড পড়ার অভ্যাস অনেকেরই আছে। একখানা খামে লিখতে পারত কমলা—

যাক—আজ আর যাওয়া হয় না। মেসের হিসেব মিটিয়ে দেওয়া হয় নি সমস্ত; খানিকটা বাকি আছে। ভাড়ার টাকারও জোগাড় নেই। খোকার জন্যও কিছু ছবির বই, খেলনা কেনা দরকার। খেলনা মানে, এঞ্জিন কিংবা মোটর—পুতুল নিয়ে তৃপ্তি থাকার বয়স পেরিয়ে গেছে সে, কমলার জন্যও অন্তত একখানা শাড়ি না নিলে চলে না—আর মায়ের জন্য একখানা গরদের চাদর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ পর্যন্ত এত কিছু সে পারবে না বটে, মায়ের জন্য একখানা কাপড় আর কমলার জন্য একখানা সুতির শাড়ি আর খোকার জন্য একটা বেলুন—শেষ পর্যন্ত সম্ভার এইটুকুতে গিয়েই ঠেকবে হয়তো।

প্রভাত চুরুটের থেকে খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলল। তারাপদর কাছ থেকে গোটা পনের টাকা ধার করে আনবে সে। বড় লজ্জা করে। তারাপদর সঙ্গে কলেজে একসাথে পড়েছিল সে—এক মেসেও ছিল অনেক দিন। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। স্ত্রী-সন্তান চাকরি-বাকরি ও ভাড়াটে ফ্ল্যাট নিয়ে সে আজ সফল মানুষ—প্রভাতের জীবন থেকে সে ঢের দূরে চলে গিয়েছে।

ঘড়িতে তিনটা বাজল ঃ না, আজ আর রওনা হওয়া যায় না, কলকাতা ছাড়বার আগে দাবি-দাওয়া মিটিয়ে রওনা হওয়াই ভাল, চোরের মত পালিয়ে যাবে না সে।

মেসের বাকি টাকা কটা বুঝিয়ে দিয়ে যাবে ম্যানেজারকে। দেশের বাড়িতে গিয়ে যখন উঠবে সেই মুহূর্তেই একেবারে ভিখিরির মত আত্মবিক্রয় করে ফেলবে না সে: কয়েকটা মুহূর্ত অন্তত বেশ মহাজনের মত বাহুল্য থাকবে তার—খোকাকে বেলুন দেবে, লাটিম দেবে—

মাকে থান, কমলাকে খদ্দরের শাড়ি—

প্রভাতের হাতের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিয়ে ধীরে-ধীরে খবরের কাগজটা তুললে সে। সকাল থেকেই বাড়ি যাওয়ার ঝোঁকে আছে—সেই থেকে এই অব্দি খবরের কাগজের একটা লাইনও তার মাথার ভিতর ঢোকে নি—কাগজটাকে নেড়েচেড়ে দলেমুচড়ে তছনছ করে রেখেছে সে। গুছিয়ে নিল।

টেলিগ্রামের পাতাটা খোলে—এডিটরের আর্টিকেল কী, একবার তাকিয়ে দেখে। কিন্তু পড়বার চাড় নেই। কাগজ হাতের থেকে মেঝের উপর পড়ে যায়—চুরুটের থেকে আগুনের ফুলকি কাপড়ের উপর গিয়ে পড়ে—কাপড়ের খানিকটা—খানিকটা জায়গায় আলপিনের মাথার মত ছোট-ছোট ছ্যাঁদা হয়ে যায়—ক্রমে চুরুটও নিভে যায়—

প্রভাত কলকাতার দূর দিগন্তের একটা সুরকিধূলিরক্তাক্ত ঝাউ গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে—

দেশে সে যাবেই। আজ অবিশ্যি যাওয়া হল না। কালও হয় তো হবে না। তারাপদর কাছ থেকে টাকা ধার করে এনে তিন-চার দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই রওনা দেবে সে। বিকেল চারটের সময়ও শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেনের গায় বেশ চড়া রোদ—থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টের থেকে কেমন একটা গন্ধ বেরয়। দেশে যাবার জন্য যখন সে এই ট্রেনে চড়ত এই ঘ্রাণ এত ভাল লাগত তার—পড়ন্ত রোদ ভারী মিঠে মনে হত—

হঠাৎ এক সময় গাড়ি একটা ঝাঁকুনি খেয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে যেত—তার পরই কামরার বেঞ্চিগুলো রোদে যে ভরে—মুখে রোদ, মাথায় রোদ। কেমন নরম রোদ—আঘাত দেয় না—বোনের মত, মায়ের মত সস্নেহে সমস্ত শরীর বুলোতে থাকে যেন—হৃদয়ের ভিতরেও একটা গম্ভীর ভরসা আসে—এখন থেকে আর সংগ্রামের দরকার নেই—চিন্তার প্রয়োজন নেই—উপায় খুঁজবার আবশ্যকতা নেই—জীবন এখন থেকে বেশ নির্বিবাদ নিশ্চিন্ত—নরম রোদ এসে আশীর্বাদ করে, ভালবেসে, এক সুদূর শান্তির দেশে নিয়ে চলেছে—

দেখতে—দেখতে বি-কে, পানের বাগান—নারকেলের সারি—পামবীথি—পশ্চিমের ধোপাদের কাপড় কাচার ঘাট—ধোলাই কাপড়-ঢাকা সবুজ ঘাস-দমদম স্টেশনে ট্রেন ধরে এক বার-তার পরেই হুম হুম করে মুহূর্তের ভিতর খোলা পৃথিবীতে এসে পড়ে—দু'ধারে মাঠ-প্রান্তর—খেজুরের জঙ্গল—আখের খেত, বড়-বড় সোঁদাল গাছ, পাকুড়, ঝরঝরিয়া ও অর্জুনের বন—নিস্তেজ বিকেলবেলার কোল থেকে নেমে পৃথিবী ভরা সোনালি রোদের হুড়োহুড়ি—শূন্য ধান ক্ষেত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাশ, খড়ের স্তূপ, পাঙ শালিখগুলোর ওড়াওড়ি—

তার পর রাত্রি নেমে আসে—অবসন্ন ঝিঁঝির ডাক, কোকিলের গান ও ব্যাঙের কলরবের ভিতর দিয়ে মাঠ-প্রান্তরের সীমানায় জোনাকিমাখা বাতাসের ভিতরে ট্রেন এসে থামে। তার পর স্টিমার—এ এক নিরুপম বিচিত্র যাত্রা—মাঠ আছে, তেপান্তর আছে;

সমস্ত রাত বিচিত্র সরীসৃপের মত একেঁ-বেঁকে নদী যেন তিমিরাবৃত শীতল পাতাল দেশের দিকে চলেছে—

চুরুট নিভে গেল বুঝি?

কিন্তু জ্বালাল না আর প্রভাত—

সকালবেলা গিয়ে স্টিমারে দেশের স্টেশনে পৌছয়। স্টেশনে নেমেই সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটা চোখে পড়ে-ফাল্গুন মাসেই সেটা ফুলে ভরে যায়—

এক দিকে একটা ডালপালায় মস্ত বড় শিমুল গাছ—মাঘের শেষেই নীল আকাশের মাথায় আগুন লাগিয়ে দেয় যেন; এমন রক্তাক্ত শিমুল কোথাও কোনোদিন সে দেখে নি আর ঃ বনে সিন্দুর-মাখা সুন্দরী সধবার লেলিহান চিতা জ্বলে উঠেছে।

স্টেশনের ধারে এই শিমুল গাছটার বয়স ঢের। ছোট বেলার থেকেই দেখে এসেছে প্রভাত—দাঁড়কাক ঠুকরে ফুল ছিঁড়ত—ফুল পাকত—ফল শুকনো হয়ে ফেটে আকাশে বাতাসে তুলো ছড়াত; এক দল ছেলেমেয়ের হাসি-ঝগড়া—কলবর এই ফুল ও তুলোর সঙ্গে কত দিন এসে মিশেছে যে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে যে কবেকার কথা! পনের-কুড়ি বছর আগে একটা পৃথিবী প্রভাতের চোখের সামনে জেগে ওঠে, সেই পৃথিবী আজ মরে গেছে। সেই বালক-বালিকার ভিড় আজ নর-নারীত্বে পর্যবসিত—পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—শিমুলের ফুল ও তুলো আজ তাদের কাছে সবচেয়ে উপেক্ষার জিনিস। কেন এ রকম হয়?

দিঘির পাড়ের অশ্বত্থের সব চেয়ে মোটা ডালগুলো তখন জন্মায়ও নি, কেওড় বাবলার বন কতবার পেকে গেছে তার পর, ঝরে গেছে কতবার, কত জল-মেটুলি সাপ মরে গেছে, কত পুকুর শুকিয়ে গেছে, কত শালিখ কোকিল অন্তর্হিত হয়েছে, বিশ্বম্ভরবাবুর সাদা গোঁফ জোড়া তখন কাচ-পোকার মত নীল ছিল, গায়ে ছিল অসুরের মত শক্তি—এখন তিনি চোখে দেখেন না, লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতে হয়, সেদিন একটা ভেড়ার ঢুঁ খেয়ে রাস্তায় গেলেন পড়ে—

স্টিমারের সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে তার পর সেই জেটি—চটের বস্তার গুদাম—চট ও আলকাতরার গন্ধ সেখানে; কত দিন সে-ঘ্রাণ পায় নি সে; আজ এই মেসের কামরায় বসে তা কত কাছের জিনিস মনে হয়—

জেটির থেকে বেরিয়ে তক্তার সিঁড়ি ধরে তার পর স্টেশনে লাল কাঁকরের রাস্তায়; রাস্তার দু'ধারে কৃষ্ণচূড়া আর ছাতিমের সারি; সবুজ ঘাসের উপর কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুলগুলো ছড়িয়ে থাকে; মস্ত বড় পল্লবিত ছাতার মত কৃষ্ণচূড়ার মাথাগুলো সবুজ পাতার নিবিড় ঘাসে নিরবচ্ছিন্ন রক্তিম ফুলের আভায় নীল আকাশের গায় খেলা করে; ছাতিম গাছের নিচে প্রতিবারই এক দল নিরীহ ভেড়া ও ছাগলের ভিড় সে দেখে-এগুলো কার যে জানে না সে। চুপচাপ বসে থাকে, ফুল খায়, ঘাস চিবোয়, প্রভাতের দিকে মুখ তুলে নিরপরাধ চোখের শান্ত অভ্যর্থনায় তাকায়।

সেই ভেড়া ও ছাগলগুলোকে এবারও গিয়ে দেখতে পাবে না কি সে? গতবারও দেখেছিল; তার আগে আরো কতবার দেখেছে যে সে!

স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি ঢের; প্রভাতকে স্টিমার থেকে নামতে দেখলে ঝিলকান্দি রোডের আস্তাবলের গাড়োয়ান কালিম সবচেয়ে আগে ছুটে আসত; এবারও আসবে নিশ্চয়; মুখে তার ক্রমাগত—'মহারাজ—হুজুর,' 'মহারাজ—হুজুর'। নিজের হাত দুটো জোড়া করে অনবরত কচলাতে থাকে কালিম, কেন এলাম, কেমন আছি, দেশে কদ্দিন থাকব—সে কত জিজ্ঞাসা তার। ঢের উল্লাস; প্রভাতদের বাড়ির সবাই যে ভাল আছে সে কথা আগারি জানিয়ে দেয় প্রভাতকে সে; শ্যামল রঙ—জোয়ান চেহারা—উড্ডীন বাজপাখির মত দিব্যি চমৎকার মুসলমান যুবা; কালিমকে দেখলে মনটা খুব তৃপ্তি পায়—

কিন্তু এবার আর গাড়িতে চড়া যাবে না; কালিমকে নিরাশ করতে হবে; পয়সা বড্ড কম; কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে বাড়িতে যেতে হবে।

চুরুটটা জ্বালাল প্রভাত।

একটা টান না দিয়ে ভাবল সেই কুকুরটা বেঁচে আছে তো? বাবা তার নাম রেখে গিয়েছিলেন 'কেতু'—সেই থেকেই সবাই 'কেতু' 'কেতু' বলে ডাকে। বাবা আজ নেই। কুকুরটাও ঢের বুড়ো হয়ে গিয়েছে বোধ করি—

বেঁচে আছে তো? কমলা এ—সব প্রশ্নের কোনো উত্তরই দেয় না। কুকুর-বিড়ালকে সে জীবনে গ্রাহ্য জিনিসের মধ্যেই ধরে না।

কেতুর যখন দু-তিন মাস বয়স মোটে, সারা রাত এমন চিৎকার করে অস্থির করত মানুষকে—প্রভাত এক দিন রাগ করে বারান্দার থেকে বাচ্চাটাকে উঠানে ছুঁড়ে মেরেছিল। মরে নি; কিন্তু একটা পা ভেঙে গেল। কত রকম ফিকির, চেষ্টা, কিন্তু সে পা আর জোড়া লাগল না। কুকুরটি বড় হয়েও খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে—চার বছর আগে দেখে এসেছিল প্রভাত-কুকুরটার বেশ স্ফূর্তি-আনন্দ—জীবনোচ্ছ্বাস কিন্তু উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে গিয়ে ল্যাং ল্যাং করে—একটা অপ্রীতিকর বাধা সব সময়েই বহন করতে হয় বেচারিকে—

বাড়ি গিয়ে কুকুরটাকে এবার মাছের কাঁটা দুধ-ভাত নিয়মিত দেবে সে; খোঁড়া পায়েরও একটা ব্যবস্থা করা যায় না কি? দেখবে সে। বাস্তবিক, কেতু যেন মাঝে-মাঝে এ মেসের কামরার ভিতর থেকেও প্রভাতকে টানে—কী যেন বোবার কথা জানাতে আসে : হয় তো উচ্ছিষ্টমাখা ভাত আজ-কাল আর জুটছে না তেমন, হয় তো তিন-চার দিন না খেয়েই থাকতে হয়, হয়তো খিদের লোভে মরা বিড়ালের মাংস খায়, শকুনদের ভাগাড়ের চারদিকে ঘোরাঘুরি করে, গরুর ঠ্যাং কুড়িয়ে আনে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ায় বসে সমস্তটা দুপুর চিবোয় তাই—তার পর বিকেলের ছায়া নিস্তব্ধ হয়ে নেমে আসে যখন, তখন বাঁশ ও কাঁঠালের জঙ্গলের কিনারে বসে অবাক হয়ে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকে হয় তো—ঘণ্টার পর ঘণ্টা আশ্চর্য হয়ে ভাবে; কোথায় সে গেল? এই চার বছর ধরেই তাকে খুঁজছি, তবুও দেখা পাই নে কেন? কোথায়?

ধীরে-ধীরে চোখ বোজে হয় তো কেতু; ঘুমায় না; মাটির ওপর শুয়ে জিভ বের করে ভাবতে থাকে হয় তো এত দিন মানুষের কাছ থেকে সে যত অকল্যাণ ও গ্লানি পেল প্রভাত এলে সমস্ত জানাবে তাকে সে—

বাঁশের সবুজ পাতা ঝিরঝির করে বাতাসে বাজতে থাকে; ধূসর আকন্দ ফুলে ভোমরা গুন-গুন করে মরে; সজনে গাছের সাদা ফুলগুলো বাতাসে উড়তে থাকে, শুকনো বন চালতা ও কদমের পাতা ঝরে পড়ে, জঙ্গলের থেকে গোটা দুই বেজি বেরিয়ে আসে, ডাহুকের বাচ্চাগুলো কাঁদতে থাকে—আমের বকুল ঝরে, কেতু গা ঝাড়া দিয়ে তার ব্যথিত বিচ্ছিন্ন নিদ্রার থেকে উঠে বসে—বিহ্বল হয়ে চারিদিকে তাকায়—সন্দিগ্ধ হয়ে ভাবে এ গাঁয়ে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর নেই; কিন্তু এ চার বছরের ভিতর আশেপাশের কত গাঁ খুঁজে এসেছে সে—সে মানুষকে সে কোথাও ত পেল না; খানিকটা দূরে একটা শুকনো কচ্ছপের চাড়া পড়ে আছে—শ্রদ্ধাহীনভাবে সেটার দিকে তাকায় বোধ করি কুকুরটা। একবার হাই তোলে, ভোমরার গুনগুনানি কানে ভেসে ভাসে; হলদে প্রজাপতিটার অক্লান্ত ওড়াউড়ির দিকে অবসাদ ভরে তাকিয়ে দেখে; তার পর খামোকা লাফিয়ে উঠে শুকনো পাতার উপর দিয়ে খামচ-খামচ করে হেঁটে মস্ত বড় যজ্ঞডুমুরের গাছটার পিছনে প্রান্তরের দিকে অন্তর্হিত হয়ে যায়—

কেতুর কথা ভাবতে গিয়ে চুরুটে আর টান দেয় নি প্রভাত; চুরুটটা নিভে গেছে।

সেই নিরঞ্জন ধোপার দিন কাটছে কেমন? সেই চার বছর আগে দেখা। পাটের দর কমে গেছে বলে সে ত বড্ড ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছিল; পাটের চাষ সে অল্প-স্বল্প করত বটে—কিন্তু তা এত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর যে অতখানি ক্ষুব্ধ হবার কোনো কারণ ছিল না তার; অবিশ্যি সমস্ত বাজারই মন্দা—সকলেরই দারিদ্র—জীবন্মৃত অবস্থায় মানুষকে বাঁচতে হয় ঃ সেই-ই হয় তো তার বিক্ষোভের কারণ ছিল। এ জীবনে নিরঞ্জন কত পার্টই যে নিল, ছ'বছর বয়সে পালিয়ে গিয়ে যাত্রার দলে ঢুকল—ভাল গাইতে পারত বলে নবীন অধিকারীর দলে তার খুব আদর হয়েছিল—প্রভাতও লক্ষ্মণবর্জনে নিরঞ্জনের গান শুনেছে; সে প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা; কিন্তু আজও মনে হলে চুপচাপ নীরব হয়ে বসে থাকতে হয়, হয় তো আজই সেই জিনিসের মূল্য সবচেয়ে বেশি।

নিরঞ্জনের গানের গলা দু-তিন বছরের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেল—অভিনয় সে করতে পারত না—যাত্রার দল থেকে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল—এর পর নিরঞ্জন অন্য এক অধিকারীর দলের জল টেনে, বাসন মেজে, কাপড় কেচে, পান বানিয়ে, তামাক সেজে ফোঁপড়-দালালি করে বেড়াত।

কিন্তু এ সব ভাল লাগল না তার।

তবুও যাত্রার দলের গন্ধ সে সহজে ছাড়তে পারল না। কিছু দিন সে দিন আঁকতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে তার জীবনের সবচেয়ে নিরেট ব্যর্থতা। নিজে একটা যাত্রার দল খুলবে বলে ঠিক করল—কিন্তু অতিরিক্ত মোড়লি করতে গিয়ে পণ্ড হয়ে গেল সব।

একবার প্রভাত শুনল—নিরঞ্জন কলকাতায় পালিয়ে গেছে। প্রভাত তখন স্কুলে পড়ে। কলকাতার থেকে যারা আসে তারা খবর দেয়, নিরঞ্জন থিয়েটারে ঢুকেছে। কলকাতা শহরে খুব নাম করে ফেলেছে সে; আধাআধি কলকাতার বাসিন্দা তাকে চিনে নিয়েছে। একদিন হঠাৎ স্কুলে যাবার পথে নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা—পরনে একটা কপাসডাঙার চুড়ি পাড়ের কাপড়—গায়ে গলাবন্ধ আলপাকার কোট—পায়ে নিউকাট [?]-বার্ডসাই মুখে।

নিরঞ্জন খুব চাল দিল না কলকাতার; প্রভাতকে খুব খাতির করল—বার্ডসাই সাধল-বললে, 'লেখাপড়া না করলে মানুষ হতে পারা যায় না—বাস্তবিক!'—'স্কুলে কোন ক্লাসে কী রকম মাইনে দিতে হয় জিজ্ঞেস করল, যে-ক্লাসে সবচেয়ে কম মায়না সেই ক্লাসেই ভর্তি হবে বলল; প্রভাত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি ভর্তি হবে একটা পাড়া-গাঁয়ের স্কুলে—কলকাতায় তোমার এত নাম!' নিরঞ্জন মাথা নেড়ে হেসে বললে—'না, ও ঠাট্টা করছিলাম—এখানে একটা এ্যামেচার থিয়েটার কোম্পানি খুলব ভাবছি।'

এ্যামেচার কথাটির মানে তখন জানত না প্রভাত—অবাক হয়ে নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল; নিরঞ্জন কলকাতায় গিয়ে ইংরেজিও শিখে ফেলেছে ঢের।

স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছে একটা খেজুর গাছের আড়ালে দু'জন গিয়ে দাঁড়াল, প্রভাত বললে—'বাঃ কলকাতায় এত নামগাম করে এসে পাড়া-গাঁয়ে থিয়েটার খুলবে? এ আবার কী ছাই?'

নিরঞ্জন সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলেছিল—'দূর! তোমার সঙ্গে একটু মশকরা করলাম। এখানে আমার এজেন্ট রেখে দেব। আমার নিজের থিয়েটার থাকবে কলকাতায়।'

কয়েকদিন পরে স্কুল থেকে ফিরবার পথে প্রভাত দেখল পিঠে এক বস্তা নিয়ে চলেছে নিরঞ্জন—

অবাক হয়ে সে থমকে দাঁড়াল, নিরঞ্জন না?

—'কী হে, এ কিসের বস্তা তোমার পিঠে?'

—'আর কিসের?'

সেই থেকে ধোপার কাজ সে করছে।

মাঝখানে ইস্টিমারের ডকে একবার কাজ পেয়েছিল—মাসে পনের টাকা মাইনের কাজ পেয়ে নিরঞ্জন আবার গোলাপবাহারি বাবুগিরি আরম্ভ করে দিল।

কিন্তু অতিরিক্ত বাহাদুরি করার অপরাধে ডকের থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর তার বয়স বাড়তে লাগল; বিয়ে করল—ছেলে-পিলে হল; লক্ষ্য করে দেখছিল প্রভাত—নিরঞ্জন ঢের বিজ্ঞ ও নিস্তব্ধ হয়ে উঠছে; মানুষের জীবনটাকে মনে-মনে পর্যালোচনা করে সে—অত্যন্ত গম্ভীর নানারকম সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হয়।

প্রভাত তাকে 'তুই' বলে ডাকে, নিরঞ্জন প্রভাতকে 'হুজুর' বলে সম্মান করে—'আপনি' বলে সম্ভাষণ করে; হাত তুলে নমস্কার জানায়, 'যে আজ্ঞে' বলে আদেশ গ্রহণ করে, এই সমস্ত সম্পর্কে একজনেরও কারো মনে কোনো খটকা নেই—ঘনিষ্ট কথাবার্তাও দু'জনের মধ্যে কম হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর চারেক আগে, দোলের দু-তিন দিন পরে সে এসেছিল, কতকগুলো রং-মাখা জামা বের করে প্রভাত বলেছিল,—'পারো কি এমন রং ওঠাতে—'

'সে নেড়েচেড়ে বললে—'খুব পারব হুজুর।'

—'গায়ে দেবার আমার একটা জামাও নেই কিন্তু, খুব শিগগিরই দিয়ে যাবি।'

—'পরশুই দেব হুজুর।'

দিন পনের পর এসে সে হাজির।

প্রভাতের শর্ট-পাঞ্জাবি—ফতুয়া সব কটিই গাঁটরির থেকে বের করে নির্বিকারভাবে একটা শতরঞ্জির ওপর রাখল নিরঞ্জন।

লাল, নীল, সবুজ রঙের জলুশ জামাগুলো গায়ে যেন আরো সুঠাম হয়ে উঠেছে। প্রভাত চোখ নরম করে—'হারামজাদা এই কাচলে নাকি তুমি?'

—'হুজুর।'

—'হুজুর কী রে শুয়ার, পাজি, উল্লুক, তুমি বললে পরশু দিয়ে যাবে, এনেছ পনর দিন পর, তাও এই রকম—'

—'হুজুর, কাচতে দিয়েছিলাম আমার ভাইপোকে।

—'কেন, তাকে কাচতে দিলে কেন তুমি?'

—'ভাবলাম, ওকে লায়েক করে নেই—আমি মরলে পর ধোপার কারবারটা ওই ত রাখবে—'

—'বেশ এক দফা মিথ্যা কথা বললে যে!'

—'বিশ্বাস হয় না মহারাজ?'

—'ভাইপোকে কাচতে দিলে তুমি, দেখিয়ে দিলে না কেন?'

—'আমি ছিলাম না মহারাজ।'

—'কোথায় গিয়েছিলে!'

—'গতবার জামাইষষ্ঠীর সময় শ্বশুরমশাই আমার তত্ত্ব-তলব নিতে পারেন নি, মনে বড় দুঃখ ছিল তাঁর, এবার তাই জামাই খাওয়ালেন।'

—'জামাইষষ্ঠী এখন কী রে! এত মোটে ফাল্গুন মাস-'

—'তা তিনি খাওয়ালেন ত।'

—'কদ্দিন ছিলে সেখানে?'

—'এই চৌদ্দ দিন ছিলাম—কাল ফিরে এসে ভাইপোকে ঝাঁটা মেরেছি মহারাজ—কী ঝামেলা বলুন তো—রঙের একট পোচড় অব্দি তুলে দিতে পারে নি—'

চুপ করে ছিল প্রভাত।

নিরঞ্জন—'আমাকে দিন—দু'দিনেই ফকফকে সাদা করে এনে দিচ্ছি—'

—'না, তোমাকে আর দেব না নিরঞ্জন।'

—'পরশুই এনে দিচ্ছি মহারাজ—একটা রঙের আঁশও যদি থাকে তবে আমার দুটো কান আমার পায়ের নিচে কেটে রেখে যাব।'

কিন্তু রঙের একটা আঁশও সে ওঠাতে পারে নি।

পরে প্রভাত বলেছিল—'আচ্ছা লেবুর রসে রং ওঠে যে!'

মাথা নাড়ে নিরঞ্জন—'তা কি হয়? রঙ পেকে যায়!'

—'আমরুল পাতার রসে?'

—'টক জিনিসে রং পাকে—দিতে হয় জলের ছিটে; যত বড় বেয়াড়া রঙই হোক না কেন, কড়া রোদে তিন দিন জলের ছিটে দিয়ে ভাটিয়ে ফেললে—আচ্ছা, দেখবেন? আপনার জামাগুলো দিন, আমি তিন দিনেই রং তুলে দিচ্ছি—'

নিরঞ্জন এই রকম।

একবার একটি মশারি কাচতে নিয়ে প্রভাতকে বড্ড বিপাকে ফেলেছিল সে; ভোরের বেলা মশারি নিয়ে গেল, বললে,—সন্ধ্যাসন্ধি দিয়ে যাব। কিন্তু তিন সপ্তাহের ভিতরে তার কোনো দেখাই নেই।

লোকটিকে খুব ভাল লাগে তবুও; কাপড়ের বস্তা নিয়ে যখন সে হাজির হয় দু'দণ্ড বেশি বসিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে তাকে প্রভাতের রং বসতে সেও খুব রাজি...কত রকম গল্পই যে জানে? সামান্য জিনিসও গাঁজিয়ে সরস করে বলবার ক্ষমতা আছে তার। কেন কথক হল না সে? কিংবা মফস্বল কোর্টের মোক্তার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাত্রার দলে কিংবা থিয়েটারে যে-সব চলতি অভিনয়—তার চেয়ে নিরঞ্জনের এই হাট-বাজার ব্যর্থতা-বেদনা জীবন-মৃত্যুর কথা কত বেশি স্পট, মৃত্তিকাগন্ধী, গাজনের রসে ভরপুর—

ধোপার কাজ এর জন্য নয়।

এবার দেশে গিয়ে জামপুরের হাটের পথে নিরঞ্জনকে পাকড়াতে হবে—সেইখানেই সে আনাগোনা করে। তার পর তাকে ডেকে এনে বাড়ির পুব দিকের অশ্বত্থ গাছটার নিচে বসতে হবে এক দিন দুপুরবেলা; এ চার বছরের মধ্যে কোনো নতুন বিমর্ষতা পেয়ে বসেছে না কি তাকে? জীবন কি কায়ক্লেশে চলে না কোনো নতুন আত্মিক অর্থ শিখেছে? কাজে সে কি এখনো ফাঁকি দেয়? যাত্রা—থিয়েটারের জন্য মন উড়ু-উড়ু করে না কি আবার? জীবনটা নেহাত নিশ্বাস ফেলে বেঁচে থাকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে হয় তো। কিংবা, হয় তো কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছে; দাড়ি রেখেছে...বৈরাগী হয়েছে। যাই হোক না কেন, সে যত দিন বেঁচে আছে জীবনের হাট জমানো ব্যাপারের থেকে ফাঁকি দিয়ে সে কোথাও চলে যাবে না। মুখে তার গল্পের রং বদলাতে পারে কিন্তু ছাঁচ বদলাবে না—

নিরঞ্জন এমন সরস মানুষ!

চুরুটটা থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলল প্রভাত; অনেকক্ষণ ধরে নিভে রয়েছে চুরুটটা এবার জ্বালিয়ে নেয়া যাক....

দেশে গিয়ে এবার নানা রকম পুরোন জিনিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাকাতে ইচ্ছা করে। দেশের হাই স্কুলটা প্রায় চল্লিশ বছরের পুরোন। অনেক দিন স্কুলটার কোনো খোঁজ খবর রাখে না প্রভাত; কতকাল স্কুলটার মুখও দেখে নি সে। প্রায় বছর পনের-ষোল আগে সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাস করে সেই যে বেরিয়ে গেছে প্রভাত—এই ষোলটা বছর স্কুলের দিকে আর মাড়ায় নি সে—

দিন—রাত্রির ফাঁকে স্কুলটার কথা যখনই মনে হয় হৃদয়টা এমন নরম হয়ে পড়ে।

স্কুলের সামনের প্রকাণ্ড মাঠটার কথা মনে পড়ে; ছুটির পর বিকেলবেলার সফেন সোনালি রোদের ভিতর অলস মাছির মত তারা কয়েকজন মাঠের এক কিনারে বই ছড়িয়ে বসে থাকত মাঝে-মাঝে; মাঠটার সেই সবুজ কটা ঘাসের গন্ধ ধূসর খড়ির মত মাটির ঘ্রাণ—শুকনো ফুল ও নিম-পাতার স্তূপ—লাল বট ফলের গন্ধ—সেদিন এ-সব বড় একটি গ্রাহ্যের জিনিস ছিল না। কিন্তু আজ এই সবের কিনারে বসে ধীরে-ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেও ভাল লাগে।

এর চেয়ে নিবিড় সুন্দর সফল পরিসমাপ্তি কোথাও নিয়ে যেতে পারে না আর।

মাঠটার কিনারে একটা মস্ত বড় তেঁতুল গাছ ছিল—কী যে মিষ্টি তেতুল—টিফিনের সময় রমেন, অবিনাশ, ইয়ুসুফ আর প্রভাত ঢিল ছুঁড়ে তেঁতুল পেড়ে গাছের ছায়ায়-ছায়ায় চুপচাপ গিয়ে বসত—

সেই তেঁতুল গাছটা আছে আজ?

ড্রিল মাস্টার ছিলেন দ্বিজেনবাবু। লম্বা-চাওড়া জোয়ান চেহারা—পাঞ্জাবি পালোয়ানের মত দেখতে, হাতে সব সময়ই একটা বেত থাকত; ডেঁপো ছেলেদের দু-তিন ঘা লাগাতেন মাঝে-মাঝে—কিন্তু এমন মোলায়েমভাবে যে তাতে চামড়া জ্বলত না কখনো, সুড়সুড় করত শুধু; বেত নিয়ে আস্ফালন করতেন বেশি—ছেলেদের ধরে মারা তার ধাতে একদম ছিল না। ছেলেদের সারিবন্দী সাজিয়ে কুচকাওয়াজ করাতেন—কখনো রাইট টার্ন, কখনো লেফট টার্ন, অ্যাবাউট টার্ন, মাঝে-মাঝে 'হল্ট' বলে চিৎকার করে উঠতেন। চমৎকার আবহাওয়া সৃষ্টি করে ফেলতেন তিনি; প্রত্যেকেই নিজেকে চোস্ত পদাতিক বলে মনে করত—কোথাও একটা সঙ্গীন লড়াই করতে চলেছে। প্রভাত মনে-মনে ভাবত ভবিষ্যৎ জীবনেও সে এমনি কাওয়াজ করবে—কাঁধে বন্দুক ফেলে মার্চ করে চলবে—সৈন্য হবে—কে জানে হয় তো নেপোলিয়ন হবে কিংবা মার্শাল নে—

বেশ দিনগুলো ছিল সব।

আবার সব পেতে ইচ্ছা করে। জীবনটাকে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে পারা যেত যদি।

দ্বিজেনবাবু কি বেঁচে আছেন?

এখনো ছেলেরা সেই মাঠে গিয়ে জড়ো হয়? ড্রিল করে? কী কথা ভাবে তারা? বুনো আনারস খুঁজে বেড়ায়? শুকনো বটপাতার চটের গন্ধ, ভাল লাগে তাদের?

তাদের জীবনের সংস্পর্শে আসতে ইচ্ছা করে বড়; সমস্ত নতুন মুখ—কিন্তু তাদের ভিতরেই সেই পনের বছর আগের স্কুলের ক্যাপ্টেন অবিনাশ বেঁচে রয়েছে, সেই অমূল্য বেঁচে আছে, রমেশ বেঁচে আছে, ইয়ুসুফ বেঁচে আছে—হয় তো তাদের ভিড়ের ভিতর থেকে কোনো গোধূলি নেশাক্রান্ত কলরবহীন স্বপ্নাতুর নিরালা কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রভাত তার পনের বছর আগের জীবনটাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য খুব তীব্রভাবে উদ্ধার করে নিতে পারবে।

চুরুটটা যেমন তেমনি নিভেই আছে। জ্বালানো হয় নি বুঝি? কই, দেশলাইটা কোথায়? দেশলাই বার করে এবার চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল প্রভাত।

দেশে যাবার সময় এবার খানিকটা ভাল চা নিয়ে যাবে সে; কমলাকে চা তৈরি করতে শেখাবে-পাতলা চা খেতে প্রভাত ভালবাসে না—চা একটু কড়া হওয়া চাই-চায়ের পাতাও বেশ চমৎকার হওয়া চাই—তাজা দুধের চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেই ভাল। দিনের মধ্যে যতবার খুশি চা খাবে সে। কমলা হয় তো মাঝে-মাঝে মোড়া নিয়ে বসতে পারে—সে বড় মর্জির মানুষ।

একটা ছোট স্পিরিট স্টোভ কিনে নেবে প্রভাত-একটা ছোট কেটলি আর একটা পেয়ালা।

দেশে গিয়ে দুপুরটা কত রকমভাবে কাটানো যায়?

নবীন মজুমদারের বাড়ি গিয়ে ব্রিজ খেললে কেমন হয়? তাই করবে সে। মজুমদারের মস্ত বড় বাড়ি; টাকা-কড়ির সচ্ছলতা তাদের খুব-বাড়ির বুড়োরা সারা দিন শতরঞ্জ খেলে। আর ছোকরাদের ব্রিজের আড্ডা বার মাস লেগে রয়েছে।

রোজ-রোজ ব্রিজ খেলে অবিশ্যি সে তৃপ্তি পাবে না।

এক-এক দিন দুপুরে বেরিয়ে পড়বে সে—ছোটবেলায় যে-পথ ধরে স্কুলে যেতে সেই পথটা ঘুরে আসবে—দীর্ঘ আঁকাবাঁকা রাস্তা—কোথাও কাঁকারের, কোথাও মাটির—কোথাও এক-একটা রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ মাঠ—তার পরে বাঁশের জঙ্গল-এক-একটা মস্ত বড় অশ্বত্থ—পাকা-পাকা বেত ফলে ভরা নিবিড় বেতের বন—ছোটবেলা স্কুল থেকে ফিরবার সময় থেতলা-থেতলা সাদা ফলগুলো ছিঁড়ে নিত সে—নুন মাখিয়ে খেত।

সে কত দিন হল বেত ফল খায় নি—চোখেও দেখে নি। এবার দেশে গিয়ে এক-একটা দুপুরে খানিকটা নুন নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে—নিস্তব্ধ বেতজঙ্গলের কাছে এসে একটা পল্লবিত হিজল গাছের ছায়ায় বসে বেত ফল খাবে সে। মনে হবে না কি সেই স্কুলের দিনগুলো জীবনের থেকে সাঙ্গ হয় নি এখনো তার? টিফিনের ছুটিতে বেতের ফল খেতে চলছে সে; খাচ্ছে; এক্ষুণি হয় তো অমূল্য আর বিজন এসে হাজির হবে; একটা মোটা গুলঞ্চলতা ছিঁড়ে হাতে জড়াতে-জড়াতে রুক্মিণী একবার দেখা দিয়েই গভীর জঙ্গলের ভিতর কাটা বহরের জন্য ঢুকে পড়বে...

বাবা অনেক বই দিয়েছিলেন—নানারকম ইংরেজি বই—হাক্সলি আছে, হার্বার্ট স্পেন্সার আছে, ডিকেন্সের সম্পূর্ণ সেট রয়েছে—স্কুলে যখন পড়ত প্রভাত, তখন ডিকেন্সকে কেমন কঠিন মনে হয়েছে তার;

—বড্ড দুর্বোধ্য—বুঝে উঠতে পারত না।

কলেজে উঠে ডিকেন্সকে উপেক্ষা করে গেছে; একটা বইও স্পর্শ করতে যায় নি তার; হিউগো পড়েছে, ডুমা পড়েছে, ফ্লবেয়ার পড়েছে,—ফরাসি উপন্যাস না পড়লে মনে উঠত না তখন—কলেজে ছেলেদের কাছে কেমন বাহাদুরিও বজায় থাকত না যেন। তার পর টলস্টয়, চেভখ, টুর্গেনিভ পড়ল—কিন্তু ডিকেন্সকে ছুঁল না। এম-এ পাস করে কলেজের থেকে বেরিয়ে কন্টিনেন্টের ঢের বই পড়ল সে....কিন্তু ডিকেন্স অস্পৃশ্য হয়ে রইল। আজ এই ত্রিশ বছর বয়সে ডিকেন্সের একখানা বইও তার পড়া নেই। ব্যাপারটা হয় তো বিশেষ লজ্জার কিছু নয়...কিন্তু এক-একবার প্রভাত অবাক হয়ে ভাবে বাবা অত সাধ করে ডিকেন্সের সমস্ত বইগুলো কিনলেন, পড়লেন, প্রান্তের মত অজড় অমর সংস্থিতি নিয়ে ডিকেন্সকে করেছিলেন যেন তিনি তার খাদ্য—কথাবার্তায় অনেক সময় ডিকেন্সের গল্প পাড়তেন। এ-রকম কেন? বইগুলো না পড়া পর্যন্ত কেমন যেন একটা কুজ্ঝটিকা কৌতূহল ডানা বিস্তৃতিকে দাবিয়ে রাখে। দেশের বাড়িতে গিয়ে এ কৌতূহল তৃপ্ত করতে হবে এবার...ডিকেন্সের অতগুলো বই, উই-আরশোলা ও চুরি-চামারির হাত থেকে বেঁচেছে: খুব স্থির নিরপেক্ষ বিচার নিয়ে পড়ে দেখবে প্রভাত...

এই বইগুলো নিয়ে কয়েকটা দুপুর বেশ ভরসার সঙ্গে কাটবে আশা করা যায়—

সন্ধ্যা হয়ে গেল—

বিছানার উপর শুয়ে পড়ে চুরুটটা ফুঁকে-ফুঁকে শেষ করতে রাত হয়ে যায়; তারাপদর কাছে আজ আর যাওয়া হল না।

পরদিন সকালবেলা তারাপদ কুড়িটা টাকা দিল—মেসের ম্যানেজার আট টাকা পায়, থার্ড ক্লাসের একটা টিকিটের জন্য সাড়ে চার টাকা রেখে বাকি টাকাগুলো দিয়ে প্রভাত একটা থান কাপড়, সুতির শাড়ি ও লাটিম বেলুন ছবির বই ইত্যাদি কিনে নিল।

ধার করার আগে হাতে তিন টাকা সোয়া ন আনা ছিল—টিকিট কেটেও তাহলে পাঁচ-ছয় টাকা হাতে থাকে—প্রভাত কলেজ স্ট্রিটের ওয়াই-এম-সি-এতে ঢুকে পাঁচ পয়সা দিয়ে চা খেল। ছোট এক কেটলি ভরা চা...প্রায় দু'কাপ আন্দাজ হল—বেশ চা খেতে-খেতে অনেকক্ষণ ফ্যানের নিচে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থেকে এই বিরাট পৃথিবীর জীবন ব্যাপারে চরিতার্থ একজন সার্থক জীব বলে মনে হতে লাগল নিজেকে।

কয়েকটা দামী চুরুট কেনা যায়; কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে গিয়ে একবার বসে, অশ্বত্থ-দেবদারুর দিকে তাকিয়ে দেখে, দিঘির চার কিনার ঘিরে মরশুমি ফুলের গাছগুলো ঢের বড় হয়ে উঠেছে—ফুরের সম্ভার ঢের ত এবার—বিমুগ্ধ হয়ে উপলব্ধি করে নেয়। একটা চুরুট জ্বালায়, ছাঁটা-ছাঁটা মেহেদি গাছের ডালপালার ভিতর চড়াই না কি—তাকিয়ে দেখে একবার—দিঘির পুব-দক্ষিণ কোণে নারকেল গাছটাকে জড়িয়ে-জড়িয়ে লতাটা বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছে এদ্দিনে-কিন্তু দেশের পথেঘাটে এ রকম কত লতা, কত ঝুমকো ফুল! সুইমিং ক্লাবের ছেলেরা ওয়াটার পেলো খেলছে। একটা ভদ্রলোক, তার স্ত্রী ও দু-তিনটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে আছেঃ ভদ্র-লোকের মাথায় ছাতা, স্ত্রীর মাথায় ঘোমটা, ছেলেমেয়েদের মাথায় বাঁদর টুপি। কলকাতায় এরই নাম বোধ হয় মুক্ত বাতাস সেবন। আকাশ—বাতাস আলো-রৌদ্র যেন এখানে লিমিটেড কোম্পানির জিনিস; কাদের বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেয়ার—বড়-বড় ডিভিডেন্ড টানে, বিধাতা জানেন—বিধাতা একাই টানেন হয় তো-কেমন একটা চিমসে দরিদ্রতা ধরা পড়ে যেন এখানে –ভাবতে গেলে দম আটকে আসে যেন—আর তিন-চার দিন পর পাড়া-গাঁর মাঠ প্রান্তরের গভীর দাক্ষিণ্যের ভিতর হাঁটতে-হাঁটতে কলকাতার রাস্তা-ঘাট, ঘরবাড়ি ও জীবনের নিয়ম, অবাঞ্ছিত অনিয়মের রুদ্ধশ্বাস বলে মনে হবে তার কাছে—

দেবদারু মর্মর করে ওঠে; অশ্বত্থের ভিতর দিয়ে ল্যাজঝোলা পাখির মত হু-হু করে দক্ষিণের বাতাস উড়ে যায়—ডালপালা নড়ে—বুলবুলির পাখনা কেঁটে ওঠে—হলদে শুকনো পাতা বেঞ্চির চারদিকে ছড়াতে থাকে—বাতাসের তাড়ায় সূর্যমুখীগুলো প্রভাতের দিকে চোখ ফিরিয়ে কাঁপতে থাকে—

কয়েকটা মিনিট কেমন একটু বিহ্বল হয়ে বেঞ্চিতে বসে থাকেত হয়; কিন্তু ভাবটা কেটে যায় শিগগিরই। সুইমিং ক্লাবের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হয়। আজই বাড়ি যেতে হবে যে তাকে। সব ঠিকঠাক করে তিনটার সময়ই স্টেশনে পৌঁছুনো চাই।

মেসে গিয়ে দেখল কমলার একটা কার্ড এসেছে। বৌয়ের চিঠির সুর লড়াই-বাজ রক্তাক্ত চিলবধূর মুহূর্তের শান্তি [ফুরিয়ে যায় যেন]। মেসের কামরার ভিতর ঢুকে হাতের বস্তাটা বিছানার এক পাশে ফেলে দিয়ে প্রভাত অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়ল।

নাঃ—দেশে যাওয়া আর হবে না, গিয়ে করবে কী সে?

পরদিন সকালবেলা নিজেকে বড্ড বোকা মনে হল; একটা দিন মিছিমিছি মাটি করেছে সে। কমলা যা খুশি তা লিখুক গিয়ে কিন্তু দেশ তো কমলার নয়; মা রয়েছেন—কেতু কুকুরটা আছে—নিরঞ্জন আছে—খোকা আছে—শ্মশানে বাবার ইশারা রয়েছে—পথে-ঘাটে কত চেনা লোক—বাড়ির পুব দিকের অশ্বত্থ গাছটা—

প্রভাত সকালবেলাই তার জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখল, বাকি শুধু বিছানা বাঁধা, খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নিয়ে বেডিংটা বেঁধে ফেলবে সে—আড়াইটার সময় স্টেশনের দিকে রওনা দেবে।

আর বেরুল না কোথাও সে।

চায়ের দোকানে অব্দি গেল না। চাকরকে দিয়ে বাইরে থেকেই চা আনিয়া নিল। বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজটা অনেকক্ষণ ধরে পড়ছিল—হঠাৎ পায়ের শব্দে কাগজ সরিয়ে তাকিয়ে দেখল—চশমা চোখে একটি ছেলে এসে তার চৌকির কাছে দাঁড়িয়েছে।

প্রভাত—'আপনি কাকে চান?'

—'আপনি কি প্রভাববাবু?'

—'হ্যাঁ।'

—'কার্তিক বাবুকে আপনি চেনেন?'

—'চিনি।'

ছেলেটি প্রভাতের চৌকির উপর বসে।

—'আমি থার্ড ইয়ারে পড়ি, তিনি আমাকে পড়াতেন, কয়েক দিন হল দেশে গিয়েছেন, মাস তিনেকের ভিতর বোধ হয় ফিরবেন না আর। সামারটা দেশেই কাটাবেন—'

ছেলেটি একটু চুপ করে বললে—'তা আপনার ঠিকানা দিয়ে গেলেন আমার কাছে। বললেন যে আপনি খালাস মানুষ আছেন—টিউশন খুঁজছেন—পড়ানোর অভ্যাস-টভ্যাস আছে আপনার—'

ছেলেটি মৃদুভাবে একবার গলা খাঁকরে—'তা আছে কি?'

প্রভাত কোনো জবাব দিল না।

—'শুনলাম, আপনি আট-দশ বছর হল এম-এ পাস করেছেন; তাই না কি?' কোনো উত্তর না পেয়ে ছেলেটি বললে—'হ্যাঁ, আমি শুনেছি তাই। ছাত্র পড়াবার অভ্যাস আছে আপনার। ম্যাট্রিক থেকে বি-এ অব্দি অনেক ছেলেই পড়িয়েছেন না কি?'

ছেলেটি কুণ্ঠিত অমায়িক চোখ তুলে প্রভাতের দিকে তাকাল—

প্রভাত বালিসে মাথা রেখেই—'কার্তিক চলে গেছে নাকি?'

'হ্যাঁ দেশে গিছেন।'

—'কেন?'

—'গরমের সময় এই তিন-চারটা মাস দেশেই কাটান তিনি, প্রফেসার মানুষ, ছুটিও তো কম নয়—'

—'আপনাকে তিন মাস পড়াতে হবে।'

—'তারপর?'

—'কার্তিকবাবু আসবেন।'

—'এই তিন মাসের জন্য অনেক টিউটরই তো পেতে পারেন আপনি।' ছেলেটি একটু বিস্মিত হয়ে প্রভাতের দিকে তাকাল; সামান্য একটা টিউশন পাবার জন্য কাঠপিঁপড়ের মতো মানুষের দঙ্গল কতবার তাদের বাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেউড়িতে ধর্না দিয়েছে—কলকাতা শহরের আধা আধি লোকের মাথা তার ভিতর খুঁজে পাওয়া যায়; আর এ মানুষটিকে নিজে যেচে সে কাজ দিতে এসেছে, আর তার এই রকম জবাব?

প্রভাত—'দেখুন, আমার বড্ড অবসন্ন বোধ হয়—'

—'কেন বলুন তো?'

—'আজ আমার দেশে যাবার কথা ছিল।'

—'ও, সেখানে কারো অসুখ করেছে বুঝি?'

প্রভাত—'কারো অসুখ না করলে দেশে যেতে নেই?'

—'না, তা নয় অবিশ্যি, তবে আমি ভেবেছিলাম—'

—'চার বছর আমি বাড়ি যাই নি। খোকা আছেন। মা আছেন। স্ত্রী আছে। কেতু বলে একটা কুকুর আছে। এদের দেখতে ইচ্ছা করে না?'

ছেলেটি একটু হেসে বললে—'তাই তো?'

দুপুরবেলা প্রভাত বিছানা বাঁধাছাঁদা করছিল-কার্তিক এসে ঢুকল। প্রভাত চোখ তুলে—'তুমি? বাঃ, আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গিয়েছ—'

—'দার্জিলিং গিয়েছিলাম, ফিরবার পথে আবার কলকাতা হয়ে বাড়ি যাচ্ছি—'

—'ও, দার্জিলিং গিয়েছিলে বুঝি? তা দার্জিলিং কেমন জায়গা কার্তিক? বেশ চমৎকার, না? একবার গিয়ে দেখতে হবে তো! পয়সাই—বা কোথায়?'

—'তুমি তো আচ্ছা ইডিয়েট।'

—'কী রকম?'

—'সমীরকে পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে—তুমি তাকে ফিরিয়ে দিলে যে!'

—'ও, সে কথা?'

—'এমন আহাম্মক তুমি!'

—'আমি দেশে যাচ্ছি।'

—'কেন, সেখানে কোন উল্লুকের তিন হাত দাড়ি গজিয়েছে যে তোমার না কামালে চলবে না—'

প্রভাত মাথা নেড়ে—'না, সে হয় না কার্তিক—কলকাতায় আর থাকা যায় না—'

—'টাকায় কামড়ায় তোমাকে? ছেলেটা মাসে-মাসে ত্রিশ টাকা করে দেবে তোমাকে—'

—'তা দিলই-বা।'

—'বেশ তো, মেস-এর খচর চলে যাবে তোমার।'

—'তা চলে যাবে বটে। এই চার বছরও তো টিউশন করে মেসের খরচ চালিয়ে এলাম।'

—'বেশ তো, কী আর করবে! চাকরির যা বাজার তাতে এইটুকুও তো ছোট খাটো একটি যজ্ঞ ফল; পিতৃপুণ্য ছাড়া জোটে না।'

—'তা আমি জানি। এ তিন মাস এই টিউশনটা নিয়ে থাকলে চাকরি খুঁজবারও সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু কার্তিক, আকি আর কলকাতায় থাকতে পারি না—'

—'কেন?'

—'চার বছর আমি কাউকে দেখিনি কার্তিক, মাকে না, খোকাকে না, খোকার মাকে না।'

কার্তিক চুপ করে ছিল।

প্রভাত—'কেতু বলে একটা কুকুর আছে—সেটা হয় তো সারা দুপুর চনমন (চুনমুখ?) করে ঘুরে বেড়ায়! আমাকে খোঁজে। কে জানে খেতে পায় কিনা!'

দু'জনেই চুপ।

—'প্রভাত, কেতু বেঁচে আছে কিনা সে খবরও আমাকে কেউ দেয় না—নিজের স্বার্থের বাইরে মানুষ এত উদাসীন।'

কার্তিক কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে জ্বালাল।

প্রভাত—'শ্মশানে বাবার ভস্মের ওপর গোটা দুই ইট আছে; কে জানে জঙ্গলে ভরে গিয়েছে হয় তো! দুটো ইট শুধু তার, নিচে কী, কে জানে? মৃত্যুর পর আমাদের কী হয়? কী হয় কার্তিক? হয় তো এই টেবিলটা, এই দেয়ালটা, এই সিগারেটের ছাইয়ের মতই অস্তিত্ব নিয়ে পড়ে থাকি। কিন্তু তবুও এক-এক দিন কিছুতেই টিকতে পারি না যেনই এখানে; মাঝরাতে বিছানার থেকে ওঠে বসি—মনে হয় বাবা যেন আমাকে দেশে তার ঘরে গিয়ে বসতে বলছেন—শ্মশানে তাঁর চিতা বেড় দিয়ে সাপের বিড়ের মত বনচাঁড়াল আর মনসা-কাটার জল সব—হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো বা তার নিচে মৃতের অস্তিত্ব এই দেয়ালটা, টেবিলটা, এই ধুলো, এই সিগারেটের ছাইয়ের মত কিন্তু তবও— তবুও—কার্তিক।'

কিন্তু কার্তিকের ইচ্ছাই টিকল—

তিন মাসের জন্য সমীরকে পড়বার কাজে প্রভাতকে বহাল করে সে চলে গেলে।

তিনটি মাস বড় সহজে কাটতে চায় না—

এক-এক দিন দুপুরবেলা মনে হয়: কমলার তো বিশেষ কোনো ব্যাকুলতা নেই মনে—সেই কেমন বিমুখ উদাসীনগোছের মেয়েমানুষ—কিন্তু খোকাকে আর কেতুকে বড় ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, কোথায় ফাল্গুন মাসে দেশে যাওয়ার কথা। এখন চৈত্র ফুরুতে চলল, খোকার ছবির বই, লাটিম আর বেলুন বাক্সের ভিতর পচ্ছে। লজেনচুষগুলো গলে গিয়েছে সব, বিস্কুট কেমন মিইয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, ছাতকুড়ো পড়ে গেছে। কেতুকে হয় তো এখনো পচা বিড়াল কাকের মাংস খেতে হয়, সমস্ত দুপুর বাঁশের ঝাড়ের কাছে বসে কচ্ছপের খোলা চিবোয় হয় তো; সমস্ত দিন কুই-কুই করে একা-একা ঘুরে বেড়ায় হয় তো...কোনো কাজ নেই, দাম নেই, উপায় নেই, ভিতরের খবর জানাবার কোনো লোক নেই কোথাও; বাস্তবিক একটা কুকুর যখন একটা সাথীহীন হয়ে পড়ে তখন নিঃসঙ্গ মানুষের চেয়েও ঢের বেশি কষ্ট তার।

কে জানে কেতু বেঁচেই-বা আছে কি না?

এক-এক দিন গোলদিঘিতে ঘুরে-ঘুরে ঘুরে-ঘুরে অবসন্ন হয়ে রাত্তিরবেলা বিছানায় এসে শুয়ে প্রভাতের মনে হয় দেশের বাড়িতে এতক্ষণে মার সঙ্গে আর কমলার সঙ্গে কথা বলে নিস্তার পেয়ে বাঁচত সে; কিংবা নিরঞ্জনকে নিয়ে অশ্বথ গাছের কাছে তামরুল আর ঘাসে ঢাকা বাঁধানো পৈঠার উপর বসে রক্তাক্ত সংগ্রাম থেকে ছুটি নিয়ে বৈতরণী পারের স্তিমিত ও নরম অন্ধকারের মতো শান্তি ও আশ্বাসে পাড়াগাঁর রাত্রি—

মা-র চিঠিতে খবর পেয়েছে প্রভাত, যে উষা দেশে এসেছে, প্রভাতদের পাশের বাড়ির অক্ষয়বাবুর মেয়ে উষা আহা, সে এসেছে! আবাল্য তার সঙ্গে মুখের আলাপ রাখে নি কোনোদিন প্রভাত, এমনই লাজুক। কিন্তু কত দিন ধরে এই মেয়েটিকে দেখে এসেছে প্রভাত নম্র, স্নিগ্ধ, বিচক্ষণ, নিঃশব্দ। অন্ধকার রাতে কাঁঠাল—হিজলের জঙ্গলের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে যেমন ভাল লাগে—এই মেয়েটিকেও তেমনি লাগে—

দু-তিন বছর উষা দেশে ফিরল—অথচ এই সময়ে নিজে সে দেশে থাকতে পারল না। রাতে গান গাওয়ার অভ্যাস এই মেয়েটির—রোজ রাতেই সে গায়; কেমন গভীর আত্মনিবেদন আত্মসমর্পণের গান-নারীর সজীব সাধক হৃদয়ের থেকে উচ্ছিত হয়ে উঠেছে। তাই এমন নিবিড়ভাবে সরস।

এবারও কি উষা গায়?'

এখানে গভীর রাতে মেসের ঝি সৈরভীর গলা খনখন করে ওঠে—ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া না ইয়ার্কি ঠিক বুঝতে পারা যায় না। রাতের অনেক কটা মুহূর্ত—অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই কর্কশ বৈচিত্র্যহীন মূল্যহীন গলা নিজের ঢাক পিটিয়ে চলে।

অবাক হয়ে ভাবে; জীবনের বিচিত্র নিয়ম—এমন রাতে।

এক-এক দিন সন্ধ্যার সময় টালিগঞ্জের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে দেশের শ্মশানের কথা মনে হয়-বাবার মঠের কাছে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করে—

চৈত্রের করুণ বাতাসের ভিতর দিয়ে কে আসে?—উড়ো শুকনো পাতা? সুরকি? কাঁকর? খড়? হ্যাঁ, বাবার গলাও যেন—সেই দূর শ্মশান থেকে যেন ডাকছেন 'খোকা, তুমি আমার কাছে এসে একটু বসো—আমি শান্তি পাই। কলকাতার পথে-পথে হতভাগা ছেলে তুমিই-বা কত দিন এই মনের অশান্তি নিয়ে কাটাবে?'

চৈত্রের বাতাস উড়ে ভেসে চলে যায়; টালিগঞ্জের থেকে পায় হাঁটতে-হাঁটতে ট্রাম-বাস-ট্রাক-গ্যাস লাইটের একটা বিপুল উন্মাদনার ভিতর এসে পড়ে প্রভাত। কী নিয়ে এত উন্মাদ? এতে কার কী লাভ?

দেখতে-দেখতে তিন মাস প্রায় শেষ হয়ে এল।

সমীর একদিন বললে—'আপনি স্কুলের মাস্টারি পেলে নেন?'

—'তা নেই অবিশ্যি।'

—'কোথায়?'

—'আপনার ভয় নেই—কলকাতা ছাড়তে হবে না।'

প্রভাত মাথা নেড়ে—'না, কলকাতা তো আমার এমন একটু প্রিয় জিনিস নয় সমীর—'

প্রভাত একটু চুপ থেকে—'এক-এক সময় পথ ঘাট একেবারে দুঃসহ হয়ে ওঠে—যে কোনো জায়গায় পালিয়ে যেতে পারলে আমি বাঁচি।'

—'মাস্টারিটা কলকাতায় অবিশ্য। বাবার স্কুল—বাবা সেক্রেটারি। তা বসে আছেন, নিন না—'

প্রভাত কোনো উত্তর দিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমীর—'ছ-মাসের জন্য কাজ, ডিসেম্বর অব্দি—করবেন?'

প্রভাত—'ভাবছিলাম দেশে যাব।'

—'দেশে তো সব সময়ই যেতে পারেন।'

—'মনসা কাশীং গচ্ছতি; মনসাবাবু কাশী যায়, না মনে-মনে কাশী যায়।'

—'কেন, ট্রেনে-স্টিমারে করে যেতেই-বা কী বাধা?'

-'বাধা আমি নিজেই।'

—'কী রকম?'

—'নিজেকে যতটা প্রেমিক মনে করি ততটা আমি নই—তাই যদি হতাম তা হলে সেই যে তিন মাস আগে বিছানাপত্র বেঁধে যাচ্ছিলাম, চলেই যেতাম, কেউ আমাকে ঠেকিয়ে রাখকে পারত না—'

সমীর একটু চুপ থেকে—'কিছু মনে করবেন না—আপনার দাম্পত্যজীবন বেশ নির্বিবাদ? মানে সুখের? কী বলেন'?

প্রভাত একটু হেসে—'বাঃ! একথা জিজ্ঞেস কর কেন তুমি?'

—'আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ বেশ শান্তির তো?'

—'যেমন সচরাচর হয়।'

সমীর কেটু চুপ থেকে হেসে বললে—'আপনি বলছিলেন কি না নিজেকে যতটা প্রেমিক মনে করেন ততটা নন—সেই জন্যেই কেমন কৌতূহল হল—জিজ্ঞেস করলাম। পুরুষ-মহিলার সম্বন্ধ নিয়ে আমি একটা আলোচনা করছি-প্রবন্ধও লিখি—'

প্রভাত একটু হেসে—'আজকালকার ছেলেরা আমাদের চেয়ে ঢের প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। এই বয়সে আমরা তেতুলবিচি নিয়ে খেলা করতাম—'

প্রভাত একটু চুপ থেকে—'প্রেম বলতে তোমরা নর-নারীর নানারকম সম্পর্ক বোঝ—কী বলো সমীর? কিন্তু আমি ঢের জিনিস বুঝি—স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধই শুধু নয়; দেশের মাঠ, পথ, সেই স্কুলের বাড়ি, অশত্থ গাছটা, খোকা, বা কেতু।'

স্কুলের কাজ নেবার কোনো ইচ্ছা ছিল না প্রভাতের কিন্তু মানুষের সাংসারিক লাভ-ক্ষতির ব্যাপার প্রভাতের চেয়ে সমীর ঢের বেশি ভাল বোঝে।

প্রভাতকে ছাড়ল না- একেবারে তার বাবার কাছে নিয়ে গেল। তাঁর কথামত কাজটার জন্যে একটা দরখাস্ত করতে হল। পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের কাজ—ছয় ঘণ্টা পড়াতে হয়—পাঁচ-ছয় দিন মাস্টারি করার পর প্রভাত কমলার চিঠি পেল: কেতু মরে গেছে, খোকারও হুপিং কাফ, রক্ত আমাশয়। কিন্তু স্কুলে প্রভাত মাস্টারি পেয়েছে শুনে কমলা খুব খুশি।

কমলার এ চিঠি পাওয়ার পর অনেক কটা দিন প্রভাত স্কুলের থেকে ফিরে নিজের ঘরে অবিশ্রাম পায়চারি করতে-করতে ভাবত ঃ জীবনে ব্যবসাবোধ মেয়েমানুষের কী ভয়াবহ!

এমন অবসাদ বোধ হয়!

সারাটা দিন হাতে খড়িমাটির রং লেপে থাকে—স্কুলের থেকে ফিরে এসে ধীরে-ধীরে সেগুলো ঝেড়ে ফেলে প্রভাত; এক-এক দিন সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেরিয়ে কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেখে দু-তিনটি চকের স্টিক—ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে-লিখতে পকেটেই ফেলে রেখেছিল না জানি কখন—ইতিহাস জিওগ্রাফির কয়েকখানা টেক্সট জোগাড় করে নিতে হয়েছে—দিনরাতের অনেকটা সময়ই এই বইগুলো নেড়ে চেড়ে দেখতে হয় তার; ভাল করে ম্যাপ আঁকা শিখতে হয়, ইতিহাসের সন তারিক মুখস্থ রাখতে হয়।

মাঝে-মাঝে রাস্তার ওপারে পানওয়ালার দোকানের দিকে তাকিয়ে ভাবে—কেতু গেল মরে! কেউ ঠেঙিয়ে মারল না কি? নিজের থেকেই মরে গেল? প্রভাত বাড়িতে না-যেতেই মরে গেল। একটু অপেক্ষাও করতে পারল না? আর ফিরবে না কোনোদিন? কোনোদিনই ফিরবে না? বাস্তবিক কোনোদিনই ফিরবে না আর?

জিওগ্রাফি, ইতিহাস যত সোজা মনে করেছিল সে তা নয়; সেই কবে আঠার-কুড়ি বছর আগে স্কুলের নিচের ক্লাসে এ-সব পড়েছিল সে, এ সবের একটা কথাও কি এখন মনে আছে তার! ইতিহাস ও ভূগোলের অসংখ্য রাশি-রাশি ব্যাপার ও বিষয়ের সমাবেশ বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা করে না, কল্পনার না, কবিত্বের না, স্মরণশক্তির ওপর জুলুম করে শুধু।

বড্ড অবসাদ বোধ হয়।

এক-এক দিন ক্লাসে ভূগোল ও ইতিহাসের নানারকম খুঁটিনাটি ভুল নিজেই সে করে ফেলে; ছেলেরা বড় একটা ধরতে পারে না। কিন্তু নিজের মনের কাছে বড় লজ্জা পায় সে।

কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল অঙ্ক নিয়ে। উপরের ক্লাসের জ্যামিতি পড়াবার ভার তার ওপর। ছেলেরা কঠিন-কঠিন এক্সট্রা নিয়ে এসে হাজির হয়। কাজেই বাড়িতে বসে গত তিন মাস অনেক আঁট-ঘাঁট করে তৈরি হয়ে যেতে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে। ইংরেজির মানুষ প্রভাত। অথচ তাকে ইংরেজি পড়াতে দেওয়া হয় না। এক দিন হেডমাস্টারকে সে- 'আমাকে ইংরেজি পড়াতে দিন।'

—'তা হয় না।'

—'কেন?'

—'আপনি যার জায়গায় এসেছেন তিনি হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি -জিওমেট্রিই পড়াতেন।'

প্রভাত—'তিনি কী পাস করেছিলেন?'

—'এল-টি।'

হেডমাস্টার কাগজপত্র নাড়তে-নাড়তে গম্ভীরভাবে—'তা ছাড়া তিনি টেকনিক্যাল স্কুলেও পড়েছিলেন।'

একবার গলা খাঁকরে নিয়ে—'ড্রিল করাতেও পারতেন।'

হেডমাস্টার প্রভাতের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না—কেমন একটা রাশভারী চাল বজায় রাখেন ও পড়াবার কাজের থেকে অফিসের কাজই তাঁর বেশি; অনেকটা সময় বসে নিজের কী একটা কম্পোজিশনের বইয়ের প্রুফ দেখেন। নতুন ম্যানুয়াল লেখেন, লম্বা কালো দাড়ি, সোনার চশমা, পরেন সাদা পেন্টালুন, গলাবন্ধ তসরের কোট বুক পকেটে থেকে সোনার চেন ঝুলছে। স্কুলের পাঁচিলের কাছে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ—সমস্ত স্কুলটার ভিতর এই যেন একটু জীবন।

আর এই ছেলেরা।

কিন্তু মাঠ প্রান্তরের কুয়াশার বিস্তৃতি, কাঁচপোকানীল কাজলস্নিগ্ধ বট, অসংখ্য ডালপালা গুঁড়ি জড়িয়ে অজগরের মত সহস্রধারা লতা, মৃদু বেগুনি ফুল, লাল বটফলের দিকে সহস্র শালিক কোকিলের কৌমার্যভার, আনন্দ; বির্শালি, অশ্বত্থ, পাকুড়, হিজল, জামের ডালপালার ফাঁকে রাত্রির তারা, জ্যোৎস্নার চাঁদ, দিনের অপরিমেয় আকাশের গন্ধ, চট বাবলার জঙ্গল ও ঝিঁঝির ডাকের ভিতর মানুষ হয়েছিল যারা সেই সব ছেলেদের কথা মনে পড়ে। এদের মুখের দিকে তাকালে তাদের কথা মনে পড়ে কেবল; তারা কত অন্য রকম। দেশের বাড়ির সেই স্কুলটা চোখের সামনে জেগে ওঠে; সেই কুড়ি বছর আগের অমূল্য, বিজন অবিনাশ রুক্মিণী—

দিনের পর দিন কেটে যায়।

মার চিঠিতে জানা যায় হেমন্ত কিছু দিন হল দেশে ফিরে এসেছে; এখনো সে সেই মঠেরই সন্ন্যাসী; অনেক জায়গা ঘুরেছে; মাথা মুড়নো—গেরুয়া কাপড় গায়ে, পায়ে একটি কাঠের খড়ম—

আহা, হেমন্ত তা হলে দেশে ফিরল আবার? সেই সময়ে দেশে থাকলে বেশ হত!

দেশের স্কুলেই তারা দু'জনে পড়েছিল—হেমন্ত এক ক্লাস উপরে পড়ত; কলেজে উঠেই সে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়।—

স্কুলে থাকতে একটা ঘড়ি দিয়েছিল প্রভাতকে সে; রোজ শেষ রাতে অন্ধকার থাকতে প্রভাত হেমন্তকে ডেকে নিয়ে বেরুত সেই এক ক্রোশ দূরে মধুমুখী দিঘির থেকে পদ্মফুল তুলবার জন্য। পথে একটা শেয়াল একদিন রুখে এসেছিল দু'জনকে; সে কী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় প্রভাতের—পিছনে হেমন্ত ছুটতে-ছুটতে চেঁচাচ্ছিল, 'ওরে প্রভাত, থাম-থাম, শেয়ালটা পালিয়ে গেছে-থামবি না রে।'

প্রভাতের মাকে মা বলে ডাকত; কত দিন কত কাজে-অকাজে প্রভাতের কাছে এসেছে সে—।

কলেজে উঠেই খুব টলস্টয় পড়ত হেমন্ত—টলস্টয়ের উপন্যাস নয়—অন্য বইগুলো। দেখে শুনে প্রভাত এমন ঠাট্টা করতে তাকে—

কদম ফুলের মতন চুল ছাঁটত—বিছানার চাদর গায়ে দিত-বিস্তর নিরস নিষ্ঠুর বই পড়তে সে—কিন্তু নিজে খুব হাসি-তামাশা মজলিশের লোক ছিল—একদিন কলেজে তাকে আর দেখা গেল না—সেই থেকে সন্ন্যাসী—

হেমন্তর জীবন একটা শ্মশানের খালের কিনারে রহস্যময় ফণীমসনার জঙ্গলের মত গেল ন্যাড়া হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে।

বছর পাঁচেক আগে হেমন্ত যখন দেশে এসেছিল প্রভাত ওকে কমলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। কমলা প্রণাম করল না। কিন্তু হেমন্ত খুব হৃদয়ের প্রসাদে আশীর্বাদ করল—একেবারে ঘোমটার ওপর পাঁচটি আঙুল চেপে—তার পর বললে—'যাক, নাকের ডগা অব্দি ঘোমটা টানো নি যে এই জন্য তোমাকে ঢের ধন্যবাদ।' কমলার ঘোমটা নিঃসংকোচে ধরে টেনে সিঁথির সিন্দুর অব্দি উঠিয়ে দিল সে—

বললে—'তোমরা যে কথা বলবে মেঝে ফেটে যাবে।'

কমলা বললে না কিছু। কিন্তু বুঝলাম হেমন্ত আবার বাকশক্তি ফিরে পেয়েছে ও শব্দব্রহ্মে তার খুব বিশ্বাস।

হেমন্ত—'তোমাদের এই চিৎপটাং কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ির মত ভাবগতিক দেখে ইচ্ছে হয় যে কোথাও লুকিয়ে যাই!'

গতবার বলেছিল—'পাঞ্জাব-মিরাট-পেশোয়ার-অমরনাথ-বদ্রীনাথের দিকে চললাম রে ভাই! ফিরব কি না শঙ্করী জানেন!'

বাস্তবিক!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে ফিরেছে সে এবার; দেশের চণ্ডীমণ্ডপ, বারোয়ারিতলা, বৈঠকখানা, পথ-ঘাট, মাঠ-প্রান্তর জমিয়ে রাখবে সে কয়েকদিন।

দিনের পর দিন কেটে যায়—

দু'মাস চলে গেল—আরো চার মাস বাকি।'

মা লিখেছেন; খোকা বেশ গাইতে পারে। কমলা লিখেছে; খোকা পড়াশুনা করে না কিছু, ঘরে থাকে না মোটে, সারা দিন কামার পাড়ায় টইটই করে বেড়ায়। নচ্ছার ছেলেদের সঙ্গে মেশে; রোজই পাড়ার ছেলেদের লাথি কানমলা খেয়ে আসে। ছেলেটার যেন মা-বাবা নেই? সেদিন পায়ে একটা মাদার কাঁটা ফুটিয়ে আনল—

পড়তে-পড়তে চিঠিটা রেখে দেয় প্রভাত—

চুরুটটা জ্বালিয়ে নেয়। এই তো বেশ ঃ সেই ছ'মাসের নিঃসহায় শিশু ক্রমে-ক্রমে মানুষ হয়ে উঠছে। মুহূর্তে-মুহূর্তে জীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করছে। প্রায় পাঁচ বছর আগে, যে ছোট্ট টুকটুকে পা দুটো দেখে এসেছিল সে আজ তা |কাঁটা| ফুটিয়ে নেবার মত উপযুক্ত হয়ে উঠল। কে জানে ভবিষ্যতের কোনো এক ভয়ংকর যুদ্ধে এই পা হয় তো ট্রেঞ্চের ভিতর ছুটে বেড়াবে—

এর পর নিজের জীবন সংগ্রামও প্রভাতের কাছে অনেকটা লঘু বোধ হয়। কিন্তু রাতের বেলা মনের ভেতর কেমন যেন করতে থাকে প্রভাতের; কমলা লিখেছে ছেলেটার যেন মা-বাবা নেই। সারা দিন কত ছেলের তত্ত্বাবধান করে প্রভাত—আর নিজের ছেলেটা পথে-পথে ঘুরে মরে।

আরো গভীর রাতে প্রভাতের মনে হল ঃ পাঁচ বছর আগে লাল তুলতুলে ছোট্ট যে দুটো পা সে দেখে এসেছিল—ছোট্ট দুটো হাত-দেশে গিয়ে এবার আর সে সব দেখবে না সে। ছেলেকে কথায়-কথায় কোলে তুলে নেওয়ারও একটা অসভ্য জিনিস হয়ে দাঁড়াবে—খোকা তা প্রত্যাশাও করবে না; বাপও লজ্জিত হবে—ছেলে নিজেই লজ্জা পাবে সবার চেয়ে ঢের বেশি! আদর করতে গেলে এড়িয়ে যাবে, ছুটে পালিয়ে যাবে ছেলেটি। আদর করবেই বা কী—সেই নরম বিচিত্র হাত-পাই বা কোথায় খোকার—সেই রেশমের মত চুল—টুলটুলে গাল—কোথায় গেল সে সব? খোকার জীবনের কে এমন ভয়াবহ মুণ্ডচ্ছেদ করল? প্রভাতের কোনো অনুমতির জন্যও অপেক্ষা করল না?

মানুষের জীবনের গতি বড় তীব্র; কমলার মুখও হয় তো এত দিনে থুবড়ে পড়েছে—

মা-ও না জানি কতখানি বুড়ো হয়ে গেছেন—

সমস্ত রাত মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে একটার পর আর একটা কথা ভাবতে লাগল প্রভাত। একটা কথাও মানুষকে ভরসা দেয় না—কেমন করে তোলে—

পর দিন সকালবেলা কিছুতেই আর উঠতে পারা যায় না যেন—

মস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে—গায়ে কেমন অসহ্য ব্যথা—

কিন্তু তবুও স্কুলের বেলা হতে না-হতেই উঠে বসল প্রভাত; কিছু না খেয়েই বাসে করে স্কুলে চলে গেল। প্রথম দুই ঘণ্টা কর্কাতে-কর্কাতে পড়িয়ে নিজেকে কেমন অমানুষ বলে বোধ হতে লাগল প্রভাতের—নিজের উপর এ কী অত্যাচার তার।

মানুষ কি স্কুল মাস্টারি করবার জন্যই বেঁচে থাকে না কি?

ঘণ্টা বাজাতেই হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে ছুটি চাইল সে!

হেডমাস্টার—'আপনার টেম্পোরারি কাজ, দু'ঘণ্টা পড়িয়েই ছুটি? কেন, কী হল আপনার?'

—'বড্ড অসুখ করেছে।'

—'অসুখ তো করবেই-আমাদের লোক বড্ড কম—এখনই তো অসুখের সময়—অসুখ না করলে চলে। এত কাজ করে কে?'

প্রভাত দাঁড়াতে পারছিল না।

হেডমাস্টার—'কী আর করা; যান—অসুখ যখন করেছে—কাল দু-এক ঘণ্টা বেশি পড়িয়ে দেবেন বরং।'

মেসে ফিরে এসে প্রভাত ঠিক করল আজই সে দেশে চলে যাবে। বাক্স-বিছানা গোছাতে গোছাতে প্রভাত ভাবল মানুষ যদি এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে তা হলে জীবন তাকে মনে করে অপদার্থ সব, সময় আসে শকুনের মত উড়ে, তাই আসে—তাই আসে। এ পাঁচ বছর ধরে কী করে এত অসতর্ক—অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সে—জীবনের হাতে এত প্রতারণা সহ্য করল। এত অসম্ভব অদ্ভুত ব্যাপার কী করে যে ঘটে!

কিন্তু এই সৃষ্টি যার কাছে আঁতুড় ঘরের জননীর মত মমতা প্রত্যাশা করা অসম্ভব, যা অন্ধ অবসাদে চলে-অন্ধকারে ভাঙা সর্পিল সেতুর মত—নিঃসহায়তার নির্মমতায় করে অপপ্রয়োগ, নিরবচ্ছিন্ন অপচেষ্টায় শানিয়ে ওঠে।

বিছানা বাঁধতে-বাঁধতে প্রভাত ভাবল—মানুষ ক দিনই বা বাঁচে, বাঁচে না বেশি দিন। টাকাকড়ি সফলতাও খুব কম মানুষের জীবনেরই হয়। কিন্তু কয়েকটা ভালবাসার জিনিস আমাদের জন্য সে রেখে দেয়। সে সবের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে লাভ কী? অন্ধকার সে অসংস্থিতি, খেয়াল যার এত অন্ধ, সে কখন কী কঠিনতা করে বসে তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আরো একটা দড়ির দরকার; প্রভাত খাটের নিচের থেকে একটা মস্ত বড় লম্বা দড়ি বের করে বিছানাটা বাঁধতে-বাঁধতে ভাবল—এ পাঁচ বছর জীবনটাকে নেড়েচেড়ে দেখলাম, সংসারে যারা সফল হবে তাদের জাত আলাদা ঃ ভালবাসার চেয়ে সফলতাকেই তারা ভালবাসে বেশি—আমার ঠিক উল্টো, প্রেম, দাক্ষিণ্য, মমতার, ঘরানা গন্ধেই তৃপ্তি! যে যা ভালবাসে সেই জিনিসেরই আরাধনা করা উচিত তার। নিজের জীবনটাকে ভুল বুঝে মিছিমিছি অন্ধ হয়ে ঘুরে কী লাভ।

দেশের বাড়িতে একটা মনিহারি দোকান খুলে বসবে সে—কিংবা দেশের স্কুলে একটা মাস্টারির চেষ্টা দেখবে—

বিছানা—বাক্স বাঁধা হয়ে যাবার পর শরীরটা ভাল লাগতে লাগল; জ্বরটা যেন চলে গেছে।

প্রভাতের চিন্তার গতি আবার অন্য পথ ধরল। চেয়ারে সে সুস্থির হয়ে চুপ করে বসল; একটা চুরুট ধরে নড়াচাড়া করতে লাগল—ভাবল; হুজুকে কোনো কাজ করা উচিত নয়। জীবন হচ্ছে লড়াইবাজ বাজপাখির বিশাল আকাশ এবং সংগ্রাম উজ্জ্বল, আশানীলাভ বিরাট পরিবিস্তৃত আকাশের মত এই জীবন। যারা দুর্বল তারা পিছিয়ে পড়ে, মায়া-মমতার দোহাই পাড়ে—জীবনের ভিতর বিধাতার খেলা দেখে শুধু—অনিয়ম দেখে—উচ্ছৃঙ্খলতা, দেখে—তা নয়-তা নয়।

চুরুটটা জ্বালিয়ে এক টান দিয়ে প্রভাতের মনে হল—জীবনকে হয়ত বিধাতার আস্তাকুড় মনে করে চুপ করে থাকে যারা তাদের ক্লান্তি, গ্লানি, বেদনা সমস্তই নিজেদের তৈরি জিনিস; তারা উপলব্ধি করতে ভয় পায়—জীবন্মৃত হয়ে থাকতে ভালবাসে; অলসতাকে তারা ভাবে প্রেম—ভিক্ষাকে ভাবে দাক্ষিণ্য। মানুষের জীবনের আবহমান স্রোতের ভিতর যে সুন্দর নিয়ম আছে তাকে উপেক্ষা করে মাছির ডিমের মত। এই সংসারে কোটি-কোটি জন্মায় তারা কোটি-কোটি গুঁড়িয়ে যায়—

প্রভাত চুরুটে টান দিতেই ভাবল; পাঁচ বছর বসে প্রাণপাত করে—জীবনের সমস্ত অপচয় অপবিন্যাসের থেকে দূরে থেকে জীবনটাকে যেখানে এনে দাঁড় করিয়েছি আমি এ খুব ভরসার পথ। নীলমণি বাবুর স্কুলে চার মাস ধরে বেশ একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করেছি—কখনও কর্তব্য অবহেলা করি নি—বেশ সুনাম হয়েছে আমার—ছেলেরা খুশি—মাস্টাররা খুশি—সেক্রেটারি খুশি-হেডমাস্টারও বিমুখ নন—

চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে প্রভাত স্বীকার করে নিল—কাজ পাকা হয়ে যাবে তার। বিছানা খুলতে-খুলতে ভাবল—পাকা হয়ে গেলে চল্লিশ টাকা মাইনে হবে—চল্লিশ টাকার একটা পাকা কাজ নিয়ে কলকাতায় বসে সে অন্য চেষ্টা করবে—হয় তো আর-একটা এম-এ দেবে—হয় তো থিসিস লিখবে—হয় তো বি-টি পড়বে—

প্রভাত বিছানাটা পুরোপুরি খুলে পেতে নিল—বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সমস্ত দুপুর সমস্ত বিকাল সে ঢের উজ্জ্বলতায় ও জীবনের সুবিন্যাসের স্বপ্ন দেখল। সন্ধ্যার মুখোমুখিই জ্বর এল আবার—

সংসারের বাজপাখি নয়, চড়ুই পাখি—শালিক পাখি এই উদাসী, করুণ, সংসারের কর্তব্য সংগ্রাম নিষ্পেষিত যুবক ক্রমে-ক্রমে জ্বরে বেঁহুশ হয়ে পড়তে লাগল।

খুব ক্ষিদে পেল। খোকার জন্য প্রায় সাত মাস আগে সেই যে কয়েকটা খুচরো বিস্কুট কিনেছিল বাক্সর থেকে সেগুলো বের করে নিল প্রভাত; গুণে দেখল পনের খানা; এখন মিইয়ে তুলোর মত হয়ে গেছে; খেতে কেমন খড়ি মাটির মত লাগে—কোনো স্বাদ নেই কিন্তু তবুও কয়েকখানা খেল সে—বাকিগুলো বিছানার এক পাশে ছড়িয়ে রইল। লজেনচুষগুলো গলতে—গলতে শেষে এক সময় চট বেঁধে শক্ত হয়ে রয়েছে—দু-একটা খুঁটে মুখে দিয়ে ডান কাতে শুয়ে লজেনচুষের মোড়কটা অনেকক্ষণ হাতের ভিতর রেখে দিল সে—লজেনচুষ বিস্কুট খোকা সেই সাত মাস আগের সেই বিছানা বাক্স বাঁধা, বাড়ি যাবার আয়োজন, দেশের বাড়ি, সেই কেতু যে দিল ফাঁকি, সেই খোকা যার শিশুত্ব গেল নষ্ট হয়ে, সেই মা যার নিজের হাতে লেখা চিঠি আর আসে না, তিন মাস ধরে নিয়েছেন বিছানা, বাবার চিতার উপর বিষাক্ত সাপের মত কেলেকাঁটা খেলছে যে—একটা ডগা ছিঁড়ে পরিষ্কার করবার পর্যন্ত কোনো লোক নেই, সেই অশ্বত্থ গাছটায় পর-পর দু'জন লোক গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে বলে সেই গাছটাকেই নাকি কেটে ফেলেছে—অপরাধ হল গাছের? এমন সবুজ ফলন্ত গাছকে কেউ কাটে? এবার গিয়ে ভাল দেখে আবার একটা অশ্বত্থের চারা লাগাতে হবে কিন্তু কত দিনে বাড়বে বিধাতা জানেন—বড় আস্তে বাড়ে। কমলার সামনের মাড়ির পাঁচ-ছটা দাঁত পড়ে গেছে। বাঃ কেমন দেখায় তাকে। ছাই দিয়ে দাঁত মাজে! কত দিন প্রভাত তাকে আমের কচি ডাল দিয়ে দাঁত মাজতে বলেছে।—বাস্তবিক, কেতু আর নেই? মা বিছানার থেকে নামতে পারেন না আর?

নিরঞ্জন ধোপার খবর কেউ লেখে না—মরল না কি? কমলা ফোকলা দাঁতে দিন-রাত কথা বলছে, খোকাকে শাসাচ্ছে, হয় তো—হাসছে-কে জানে—কাঁদছেও হয় তো। এ কী রকম যেন হয়ে গেল। জীবন যেন তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করে দিতে চায় নিজেকে। প্রভাতের বুকের ভিতর কেমন যেন শূন্য বোধহয়, বড্ড কষ্ট লাগে কমলার জন্য। কেতুর সঙ্গে মাঠে জঙ্গলে উঠানে কোথাও কোনোদিন আর দেখা হবে না?

এই সব অনেক কথা ভাবতে-ভাবতে শরীরটা কেমন অবশ হয়ে আসে। লজেনচুষের মোটড়কটা হাতের থেকে খসে পড়ে যায়—লাল-নীল লজেনচুষগুলো বিছানায় গড়াগড়ি খেতে থাকে।

সারারাত ছট-ফট করে সকালবেলা যখন সে মারা গেল তখন তার অসুখের খবরও কেউ জানে না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের মৃত্যু অব্দি প্রভাত নিজের সমস্ত কাজ নিজেই সাঙ্গ করল। কিন্তু এখন থেকে সে অন্যের বোঝা।

দাহের কী হবে? মেসের সকলেই প্রায় অফিসে চাকরি করে; কেউ তেল মেখেছে—কেউ স্নান করে ফেলেছে—কারুর বা খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। অফিসের দিকেই সকলের মন, এ অসময়ে নিমতলায় যাওয়া চলে না—

রামপদর অবিশ্যি অফিস নাই—সে লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্ট—কিন্তু আজ একটা খুব বড় এনগেজমেন্ট আছে তার—ভারী কেস—প্রায় পনের হাজার টাকার পলিসি—না-খেয়েই সে বেরিয়ে পড়ল—

শ্রীপতিও বেকার-কিন্তু মাথা নেড়ে সে বললে-শ্মশানে যাওয়া এখন সম্ভব হবে না তার—কর্পোরেশনের বস্তি ইনস্পেক্টরের একটা কাজ খালি আছে—আজ সকালবেলাই কয়েকজন কাউন্সিলারের সঙ্গে দেখা করবার তার কথা—

হরিদাসবাবু একটু বড় ধরনের মানুষ—দু-এক বছর হল স্ত্রী মারা যাবার পর থেকেই একটি ছোট ছেলে ও মেয়ে নিয়ে মেসের একটা বড় ঘরে একাই থাকেন তিনি—পেনশন পান—শ্মশানে যেতে তাঁর আপত্তি নেই—কিন্তু কেউই যখন যাচ্ছে না তখন একা গিয়ে আর কি হবে?

ম্যানেজার—আমিই বা মেস ছেড়ে যাই কী করে?

অফিসের চাকুরেরা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল আজ। বিষ্ণুপদ থাকলেও থাকতে পারত—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেই যখন চলে গেল তখন কী আর করে সে—বেরিয়ে পানের দোকানের এক পয়সার কেনা কাটা করে।

রাতে দাহ হবে ঠিক হল।

প্রভাতের কামরায় দরজায় ম্যানেজার একটা তালা আটকে চলে গেল।

সমস্ত দুপুর ঠাকুর-চাকরেরা এক-একবার এসে মড়া দেখে যায়—বারান্দায় থুথু ফেলে—ম্যানেজার এক-একবার তেতলার থেকে দোতলায় নামতে-নামতে, দোতলার থেকে তেতলায় উঠতে-উঠতে মড়ার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে—

কলতলায় চাকর-বাকরদের জটলা হয়—থালা-বাটি-গেলাস ঝন-ঝন করে আছাড় খেয়ে পড়ে—

ক্রমে দুপুর আরো নির্জন হয়ে ওঠে; সমস্ত মেস নিস্তব্ধ; রান্না ঘরে চাকর-বাকরদের নাক ডাকার শব্দ, বারান্দায় রেলিঙে কতকগুলো চড়াইয়ের নীরব নির্বিবাদ জীবনোপভোগ—

সমস্ত মেসের ভিতর জনপ্রাণী একটিও নেই—কেবল হরিদাসবাবুর ছোট ছেলে ও ছোট মেয়েটি এক-একবার কৌতূহলের আতিশয্যে প্রভাতের ঘরের দিকে টিপিটিপি খানিকটা এগিয়ে যায়-পর মুহূর্তেই 'ভূত-ভূত' বলে চিৎকার করে উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে আসে; আবার এগিয়ে যায়, আবার পালিয়ে আসে—

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমস্ত দুপুর—তাদের এই চিত্তাকর্ষক খেলা চলে।

প্রভাতের রুদ্ধ ঘরে মাছির ভনভনানি, অসহ্য গুমোট ও মশা এক-এক সময় মৃতের পক্ষেও যেন অসহ্য হয়ে ওঠে—

পৃথিবীর বাজ পাখির নয়—চড়ুই পাখি, শালিক পাখি, এই উদাসী, করুণ, সংসারের কর্তব্য সংগ্রাম নিষ্পেষিত বঞ্চনাখ্যা যুবক কোনোদিন তার প্রমত্ততম কল্পনায়ও মনে করে নি যে এই মেসে সে মরবে—তার মৃত্যুর পর মেসের একটা দিন এইরকম কেটে যাবে—এই মেসের কয়েকটি বাবু সিগারেট আর পানের ডিবে নিয়ে রাতে নিমতলায় তাকে পোড়াতে যাবে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারুবাসনা

আষাঢ় শেষ হয়ে গেছে, শ্রাবণ চলছিল। এই বর্ষায় বইয়ের বড্ড ক্ষতি হয়। কয়েকদিন আগে স্টেশনের বইগুলো দেখেছিলাম—স্টলের সমস্ত বইগুলোই প্রায় পুরনো। ছেঁড়া-খোড়া মালিকের সঙ্গবিহীন গ্রন্থিহীন জীবনের জর্জরতার অপরাধ এদের চোখে মুখে। নতুন বইও কয়েকখানা আছে। গত বছর কলকাতায় যখন পঁচিশ টাকা ট্যুইশান করি, ট্রাম-সিনেমা ও চায়ের পথ এড়িয়ে, খুব একটা সাদাসিধে মেসের জীবন্মৃত অবস্থার ভিতরে থেকে কয়েকখানা বই কিনতে পেরেছিলাম; ইংরেজি কবিতার বই দুটো, একখানা আমেরিকান উপন্যাস গত শতাব্দীর, একখানা নভেল এবং আরো দু-তিন খানা বই। ক্যাটেলগ দেখে কিনি নি; কারো পরামর্শ নিয়েও নয়; ইংরেজি পত্রিকাগুলোর সমালোচনা ও খবরাখবর আমি অনেক দিন ধরে দেখি নি; বই ক-খানা কিনেছিলাম নিজের মনের কর্তৃত্বে আমি। টিনের সুটকেসে করে বইগুলো দেশে নিয়ে এলাম; খড়ের ঘরের জানলার কাছে বসে পড়লাম; বাইরে বিকেলের আলোয় সন্ধ্যার অন্ধকারে কখনো শরৎ কখনো হেমন্তকে দেখেছি; শালিক ঘাসে-ঘাসে পোকা খুঁটে খেয়েছে, ফড়িং উড়েছে, পাতা খসেছে, দাঁড়কাকের দল গভীর কীর্তির অব্যর্থতায় ঘরের দিকে উড়ে গেছে তাদের, সন্ধ্যামণির পাপড়ির মত লাল মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে।

আমাদের এ-ঘরে উঁইয়ের অত্যাচার বড় বেশি; মেঝেটা মাটির—বড্ড স্যাঁত-সেঁতে; বর্ষাকালে উঁইয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য নানা রকম চেষ্টা চলে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নির্জীব নয়—খুব সতেজ ও পরিহাসপ্রিয়। মিশরে যিনি একদিন পঙ্গপাল ছেড়ে দিয়ে মজা দেখেছিলেন, আমাদের কুঁড়ে ঘরে তিনি উঁই ছড়িয়ে দিয়ে তামাসা দেখেন। নানা রকম কষ্টার্জিত বইয়ের, প্রিয় জিনিসের, ছিবড়ে কুড়িয়ে-কুড়িয়ে, তারপর আগুন জ্বালি ও চিন্তা করি; তার গভীর শক্তিকে নমস্কার জানাই।

দু-তিন দিন আগে শেল্‌ফের বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখেছি একবার। আজ আরেকবার দেখা যাক, কিন্তু যাই-যাই করে আর যাওয়া হয় না; জানালার ভিতর দিয়ে বর্ষার দিকে তাকিয়ে মন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। দুপুরবেলা দেখলাম বইয়ের তাক ঠিকই আছে, উঁইয়ে ধরে নি, নতুন বইয়ের লাল-নীল মলাটগুলো কেমন ছাতকুড়োয় সাদা-সাদা হয়ে গেছে।

কল্যাণীকে বললাম—'আমি চলে গেলে এই বইগুলো মাঝে মাঝে দেখো।'

কল্যাণী সেলাই করছিল; কোনো জবাব দিল না। বইগুলো মুছতে-মুছতে—'মাঝে-মাঝে রোদে দিও এগুলো।'

কল্যাণী কোনো কথা বললে না।

সে আমার উপর বিরক্ত; দেশে এসে বলেছিলাম ছ-সাত দিন থাকব; থাকতে-থাকতে তিন মাস হয়ে গেল। প্রায় এক মাস থেকে বলছি, চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় আজকালই যাব। কিন্তু আজও গড়িমসি করে দেশের বাড়িতেই কাটাচ্ছি। এত অপরাধ ও বেদনার জন্য তার জীবন প্রস্তুত ছিল না।

সে একটা অস্টিন মোটরকার চায় না বটে, সুসজ্জিত বাংলোও চায় না, আমাকে যখন প্রথম বিয়ে করেছিল, তিন বছর আগে, মানুষের জীবনের নিদারুণ পরিমাপের টের যখন সে পায় নি, তখন কী চাইত জানি না, কিন্তু আজ একজন সামান্য স্কুলমাস্টারের গৃহস্থালীর ব্যবস্থাও নিজের হাতে যদি সে পায়, জীবনকে ধন্য মনে করে। কিন্তু এমনই ব্যবস্থা, একটা স্কুলমাস্টারি জোটে না। 'আচ্ছা, আমি যদি ট্রাম কন্ডাকটার হই? কী বল কল্যাণী?'

'টি-সি হবার জন্যই এম-এ পাস করেছিলে?'

'কিন্তু সেও তো কাজ—মাসে-মাসে ২৫,২০ কি দেবে না?'

'বেশ তো, তা হলে তাই করো গিয়ে।'

'এবার কলকাতায় গিয়ে যা হয় একটা কিছু করবই।'

কল্যাণী চুপ করে রইল।

'কী করব জানো?'

কোনো সাড়া নেই।

হেমন্তের বিকেলের নিস্তব্ধ ম্লানতার ভিতর একটা রুগ্ন হাঁসের মত শুকনো পাতার উড়াউড়ির মধ্যে হংসগামিনী গতিতে একা-একা অন্ধকারের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে। গলা খাঁকরে-'কী করব, জানো কল্যাণী?'

কল্যাণী আঁতকে উঠে-'বাপরে, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এ-রকম! বেটপকা চেঁচিয়ে ওঠো কেন?'

'না, চেঁচাইনি তো'—

'না, না, এ-রকম আচমকা ভয় পাইয়ে দিও না, ইস, কী রকম ধড়ফড় করছে বুক।'

'এখনো? কী হল?'

'কিছু না, বাপরে, কী রকম চমকে গিয়েছিলাম।'

'নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে?'

কল্যাণী—'কথা বলো না, আমাকে একটু চুপ থাকতে দাও; কথা বলতে গেলে হার্টে কষ্ট হয়।'

'বুকে হাত বুলিয়ে দেব?'

'থাক্'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাছে আসি?'

'না'

'কেন?'

'কেন?'

'আমাকে একটু চুপ করে থাকতে দাও।'

'পাখা নিয়ে এগিয়ে গেলাম—বাতাস দিতেই কল্যাণী—'পাখা রেখে দাও, ঠাণ্ডা লাগে।'

রেখে দিলাম।

'গরম দুধ খাবে?'

'না, দরকার নেই।'

বালিশে খানিকক্ষণ মাথা গুঁজে পড়ে থেকে কল্যাণী—'বাঃ, তুমি আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছ যে?'

'দেখছিলাম'

'না, মরতে এখনো দেরি আছে ঢের।'

'মরার কথা নয়।'

হ্যাঁ, যা বলছিলে, আমাকে একটু গরম দুধ এনে দাও ত।'

'আচ্ছা দিচ্ছি।'

'কিন্তু এখন দুপুরবেলা সব্বায়ের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে; কোত্থেকে এনে দেবে?'

'কেন খুকির দুধই তো আছে।'

'তা হলে খুকি কী খাবে?'

মাথা হেঁট করে একটু ভেবে, 'বেশ, পিসিমার দুধের থেকে এনে দেব তা হলে।'

'কী করে আনবে?'

চুপ করে ছিলাম।

'পিসিমার কাছে গিয়ে চাইবে?'

ঈষৎ হাসতে চেষ্টা করে—'হ্যাঁ, দরকার হয়েছে, চেয়ে আনব।'

'কেন, আমি কি ভিখিরির মেয়ে যে পরের কাছ থেকে দুধ ভিখ করে ছাড়া খেতে পারব না।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'এক গ্লাস দুধ, তা পিসিমা খুশি হয়েই দেবেন।'

কল্যাণী একটা নিশ্বাস ফেলে, 'যাক্ যা কাজ করছিলে তাই করো গিয়ে, দুধ আমার লাগবে না।'

বই মুছতে লাগলাম।

কল্যাণী উঠে বসে, সুচ—সুতো হাতে নিয়ে—'তোমাকে বিশ্বাস নেই।'

'কেন?'

'আধঘণ্টা পর হয় ত পিসিমার কাছ থেকে দুধ চেয়ে এনে বলবে, বিনয় ভট্টাচার্যের চায়ের দোকান থেকে নিয়ে এলাম।'

একটু থেমে, 'না তা আর বলব না।'

'বিনয় ভট্টাচার্যের চায়ের দোকানে খুব ভাল দুধ পাওয়া যায়?'

মাথা নেড়ে, 'তা পাওয়া যায়।'

'কত করে নেয় এক গ্লাস?'

'দু আনা'

'ওঃ, দু আনা বুঝি?'

দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ; কল্যাণী সেলাই করছিল, আমি বই ঝাড়ছিলাম, মুছছিলাম, পাতা উল্টাচ্ছিলাম—কিন্তু দু আনা পয়সার-সম্বল আজ আমার কাছে নেই। এবং আমার বয়স চৌত্রিশ, বার বছর আগে এম-এ পাস করেছিলাম বটে, বিয়ের আগে দু-তিনটে কলেজে অস্থায়ী কাজ করেছি—আরো অনেক কাজ করেছি; কিন্তু সংসার ও সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষদের জীবনের পদ্ধতির সঙ্গে কোথাও না কোথাও সম্পূর্ণ [ভিন্নতা] ও জটিলতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি আমি। কাজেই এম-এ ডিগ্রী ও স্ত্রী সন্তান-সত্ত্বেও এই চৌত্রিশ বছর বয়সে আজও আমি সংসারী হয়ে উঠতে পারলাম না আক্ষেপের কথা হয় ত। কিংবা আক্ষেপের কথাই-বা কেন আর? জীবন তো শুধু স্ত্রী-সন্তান নিয়েই নয়।

বিকেলের ধূসরতার ভিতর যখন সবুজ ঘাসের মাঠের পথে হাঁটতে থাকি, কিংবা হেমন্তের সন্ধ্যায় চড়ুই-শালিক যখন উড়ে চলে গেছে, দিকে-দিকে কুয়াশা জমে ওঠে, লক্ষ্মীপূজোর ধূপের ভিতরেও যখন গন্ধ, কিংবা আরো গভীর রাতে অশ্বত্থের ডালপালা যখন জ্যোৎস্নার বাতাসে ঝিরঝির করে, কত বিহঙ্গম-বিহঙ্গমার নীড় বুকে নিয়ে বিরাট বটগাছ দাঁড়িয়ে থাকে, বটের নিচে উপকথার পথিক গিয়ে দাঁড়ায়—এক মুহূর্তের ভিতরেই সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যতের প্রেম, স্বপ্ন ও সফলতার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক খুঁজে পাই আমি, এই সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে আলো-অন্ধকারের পথে অবিরাম চলতে ইচ্ছা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসারের সঙ্গে সম্পর্কহীন—জীবনের এই আর-এক রূপ। এই রূপের পথে চলতে-চলতে কিশোর বেলার নষ্ট প্রেমের বেদনা ও লাঞ্ছনা ভুলতে চেয়েছিলাম, আজকের সংসারের ক্ষয় ও ক্ষতি নিয়ে আক্ষেপ করব?

অবিশ্যি বাবার কাছে চাইলে দু আনা পয়সা পাওয়া যায়। দু আনা চাইলে তিনি হয় ত চার আনাও দিয়ে দেবেন। আমি মুখ ফুটে বড় একটা চাই না কি-না। সেই জন্য, চাইলেই, তিনি যতদূর সম্ভব দিয়ে দেন। অবিলম্বে অকাতরে আমার কলকাতার খাওয়ার খরচও তিনিই যোগাড় করে দেবেন; তারপর দাদাকে বেরিলিতে লিখে দেবেন আমার কলকাতার মেসের খরচটা কিছুদিন চালাতে—যে পর্যন্ত না আমি ট্যুইশান পাই।

আমি ট্যুইশান পাই বা না পাই, আমি কলকাতায় এলেই দাদা একটা মাস মেসের খচর দেন; তার পর বন্ধ করে দেন—শত অনুনয়-অনুরোধ করলেও কিছুই গ্রাহ্য করেন না, আমার টিকিটের পয়সা খরচ হয় শুধু; কাজেই অনুরোধ করে চিঠি লিখতে যাই না, এক মাসের টাকা দিয়ে তিন মাস চালাতে চেষ্টা করি—দেশের বাড়িতে খরচ যেন তিনি বন্ধ না করেন, ভবিতব্যের কাছে এই প্রার্থনা করি।

বাবা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন বন্ধ করবেন না, কিন্তু বাবা চলে গেলে পর? জীবন যদি তখনো আমার এই পথে চলে? কিন্তু কেনই-বা চলবে? ভবিষ্যতের জন্য আশা করা যাক। না হয়, চরকায় সুতো কেটে কাপড়ের ব্যবস্থা করব, যে-টুকু জমি আছে তাতে লাউ-কুমড়ো-বেগুন-মরিচের গাছ লাগিয়ে দেব; আর চাল? ভাবছিলাম।

কল্যাণী—'খুব বেশি নেয় তো তা হলে?'

'কে বেশি নেয়, কল্যাণী?'

'এক গ্লাস দুধ দু আনা নেয় বললে—'

'হ্যাঁ'

'বেশ টাটকা দুধ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, খুব'

'তুমি খেয়ে দেখেছ?'

'না খাইনি'

'বিনয় ভট্টাচাযের দোকানে শিগগির যাও নি বুঝি?'

'না'

'এক কাপ চা খেতেও যাও নি?'

'না, শিগগির গিয়েছি মনে পড়ে না।'

'সত্যি যাও নি? বারে, এত তো চায়ের ভক্ত ছিলে। কি, বাড়িতে তো চা পাও না, আমি তো ভাবতাম বিনয় ভট্টাচার্যের দোকান থেকে চা খেয়ে আস তুমি।'

'না, মাঝে-মাঝে একটা চুরুট কিনতে যাই'

'চুরুট?'

'হ্যাঁ'

'আর-কিছু না?'

মাথা নাড়লাম—'না'

'চুরুট তো তোমাকে খেতে দেখি না আমি'

'মাসের মধ্যে দু-একটা খাই'

'তাই-বা কখন খাও?'

'খাই রাস্তায়—সন্ধ্যার সময়'

'বেশ লাগে?'

'মন্দ কী!'

'কিন্তু দুধ খেও'

'কে? আমি?'

'হ্যাঁ'

'কেন বলো ত?'

কল্যাণী কোনো জবাব দিল না।

একটু চুপ করে বললে, 'আধ গ্লাস দুধ চার পয়সায় দেবে?'

'তা দিতে পারে, দর কষাকষি করতে হবে।' আরো খানিকক্ষণ ভেবে কল্যাণী, 'তা হলে নিয়েসো তো'। অত্যন্ত জড়সড়ভাবে, যথেষ্ট সময় খচর করে, আঁচলের গাঁটের থেকে একটা এক আনি বের করলে, দেখলাম, খানিকটা তেলা—

আরো কিছু খুচরো পয়সা বেচারির গাঁটে ছিল, কিন্তু এক আনিটা বর্দল করবার ভরসা পেলাম না। না হয় চার পয়সার বাকি দুধ বিনয়ের কাছ থেকে আনা যাবে।

তাই আনলাম।

কিন্তু দুধ নিয়ে হাজির হয়ে দেখি, আর-এক সমস্যা; সে কিছুতেই খাবে না, খেতে হবে আমাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললে, 'তুমি কী বেকুব! তোমাকে দুধ খাবার জন্য চারটে পয়সা দিলাম আমি, হাত-পা রোগা বকের মত হয়ে যাচ্ছে, কোথায় দোকানে বসে খেয়ে আসবে, না, সেই দুধ তুমি এতটা পথ বয়ে আনলে আমার জন্য!'

বিক্ষুব্ধ ঝাঁঝে আমার দিকে আপাদমস্তক তাকাতে লাগল সে।

'কই, তুমি ত একবারও বলো নি কল্যাণী?'

'কী বলি নি।'

'যখন পয়সা দিলে বল্লো নি তো যে—'

কিন্তু খোঁচা দিয়ে ভুল দেখিয়ে এই নারীটিকে পরাস্ত করে কী লাভ?

বাদলের দুপুরে এক-একটা নিরাশ্রয় দাঁড়কাক আমাদের উঠোনের পেয়ারার ডালে বসে ভিজতে থাকে, তাকে দান করতে হয়, কেউ কোনোদিন তার কাছ থেকে গ্রহণ করবার কথা ভাবতে পারে কি?

'আমি এক কাপ চা খেয়ে এসেছি; আর একটা চুরুট।'

'কে? তুমি? দুধ খেলে না কেন? দুধের জন্যই তো পয়সা দেওয়া। তোমার শরীরের দিকে তাকিয়ে দুঃখ হয়। বৃষ্টিতে ভিজে নেয়ে এলে, সব করলে, তবুও আমার কথাটা শুনলে না।'

'দুধ তোমার জুড়িয়ে যাচ্ছে, বক-বক বক-বক বক-বক কথাবার্তা পরে হবে। আগে খেয়ে নাও।'

গ্লাসটা তার হাতে দিলাম।

'বাঃ, এই গ্লাসটা কার?'

'বিনয়ের'

'বেশ সুন্দর কাচের গ্লাস তো'

আমরা চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি খাও।'

চুপ করে বই পড়ছিলাম।

কল্যাণী, 'তুমি নাকি আবার চা খেয়ে এসেছ, চুরুটও?'

গেলাসটা সে ঠোঁট অব্দি তুললে, 'কই কথার উত্তর দাও না যে?'

'কোন কথা?'

'চা-চুরুট খেয়ে পেট ভরিয়ে আস নি?'

'হ্যাঁ'

'তা যদি না-ভরতে, তা হলে নিশ্চয়ই তোমাকে দুধ খেতে হত।'

'তা, তোমার পাল্লায় পড়লে।'

'আমি কি আমার জন্য আনিয়েছি, এটা তুমি বুঝলে না?'

তাকিয়ে দেখি দুধ তখনো অভুক্ত।

কাজেই, রামেশ্বরের ছেঁড়া ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—আমি চলে না গেলে এ বেচারির দুধ আর খাওয়া হবে না।

কল্যাণী—'কোথায় যাচ্ছ?'

'রমনীবাবুর বাড়ি'

'কেন?'

'একটা বই নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'মিনিট পনের পরে ফিরে এসে দেখি গ্লাস যেমনি, তেমনি।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'এখনো খাও নি?'

'নাঃ'

'কেন?'

'ভক্তি হচ্ছে না খেতে'

'কিসের জন্য কল্যাণী? দোকানের দুধ বলে? দাও আমি খেয়ে ফেলি'

হাত বাড়াতেই দুধের গ্লাসটা সরিয়ে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে কল্যাণী, মিনমিন করে হেসে 'ইস্, দোকানের জিনিস আমি খাই না বুঝি?'

আমার দিকে তাকিয়ে কল্যাণী একটু লজ্জিত হয়ে—'ছি, খেতে চেয়েছিলে—

বাধা দিলাম, এই নাও—'

ফিরে চেয়ে দেখলাম সে দুধের দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে আমার দিকে গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে, হাতভরা তার অনিচ্ছা ও অনগ্রসরের অসাড়তা; মুখখানা হেমন্তের সন্ধ্যার মত হিম, বেদনাতুর; মৃত সন্তানের মুখের উপর নিবদ্ধ মৃতবৎসা হরিণীর মত বিহ্বল বিষণ্ন চোখ।

উটের লোম দিয়ে যে—ব্রাশ তৈরি হয়, যার সঙ্গে রং মাখিয়ে মানুষ ছবি আঁকে, সেই ব্রাশই-বা কোথায়? রং-ই বা কোথায়? ছবি আঁকবার শক্তিই বা কোথায়? [রিং-তুলি] নিয়ে একবার যে ছবি এঁকে ছিল আজ এই কল্যাণীর ছবি এঁকে যাক্—

'না, খাও'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কে? আমি খাব?'

আমার স্বরের ভিতর তৃষ্ণা ও আগ্রহের পরিচয় পেয়ে গ্লাসটা সে নিজের দিকে সরিয়ে নিল—

'দুধ কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, কল্যাণী'

'বেশ, গরম করে নিয়ে এলেই হবে?'

'কে গরম করবে?'

'আমিই করে আনব'

'তারপর খাবে কে?'

'কেন? তুমি খেতে চাও নাকি?'

একটা বই তুলে নিয়ে, একটু দূরে সরে যেতেই কল্যাণী গ্লাসটা নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল।

'খাবে, খাও'

'দাও'

'আচ্ছা, একটু গরম করে নিয়ে আসি'

'আনো'

'তা, এই বেশ গরম আছে'

'তবে এই-ই দাও'

'একটু চিনি মিশিয়ে দেব?'

'তা দিতে পারো'

'চিনি হয় ত ওরা দিয়ে দিয়েছে'

'তা দিয়ে থাকবে'

'খাবে?'

'দিলেই খাই'

'কেন? তুমি কি মনে কর একটু দুধের ব্যাপার নিয়ে তোমাকে বঞ্চনা করব?'

'না, সে কথা কে ভাবে কল্যাণী।

'তুমি কী পড়ছ?'

'একটা বই'

'দুধটা মিষ্টি'

'ও, খাচ্ছ বুঝি?'

তাকিয়ে দেখলাম সে লজ্জিত হয়ে আরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম—'কী হল?'

'ভুলে চুমুক দিয়ে ফেললাম যে'

'বেশ করেছ।'

'এখন কী হবে?'

'কেন?'

'তুমি যে আর খেতে পারবে না।'

'তা, আমার খেতে আপত্তি নেই।'

'ছি, আমার মুখেরটা খাবে?'

'তা আমি খেতে পারি'

'কিন্তু আমি কিছুতেই সে অনাচার হতে দিতে পারি না ত।'

আধ ঘণ্টা পরে তাকিয়ে দেখলাম দুধের শূন্য গ্লাসটা পড়ে আছে, কল্যাণী নেই, ঘুমুচ্ছে হয় ত।

গেলাসটা ধুয়ে নিয়ে ফিরিয়ে দেবার জন্য বিনয়ের দোকানের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে কল্যাণীর কথাই ভাবছিলাম। এই কল্যাণী আমার স্ত্রী, তিন বছর আমি বিয়ে করেছি তাকে, কিন্তু এ তিন বছরের ভিতর প্রেমিকের পুলক একদিনও বোধ করেছি? নির্বিকার নিঃসঙ্কোচে আস্বাদান অনুভব করেছে কল্যাণী? ইস্, গ্লাসটা হাতের থেকে পড়ে ভেঙে গেল। কাচের টুকরোগুলো কুড়োতে-কুড়োতে কল্যাণীর কথাই ভাবছিলাম আবার।

আমাদের রক্তমাংসের সার্থকতার খাবার সময়, দাঁড়াবার সময়, হাঁটবার চলবার সময়। আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনার সার্থকতা মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহার কিংবা সন্ধ্যা ও ভোরের আকাশ প্রান্তরের নিরবয়ব, অবাস্তবতার দিকে তাকিয়ে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আমাদের রক্ত-মাংস বুদ্ধি-কল্পনা আত্মা-প্রেম কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। সব জায়গাতেই কি এই রকম?

জানি না।

এই চৌত্রিশ বছরে অনেক চিঠি জমিয়েছি; একটা মস্ত বড় টিনের বাক্সে চিঠিগুলো রেখে দিয়েছিলাম। চিরদিনই মনে করে এসেছি যে ভবিষ্যতে কোনো এক দিন এই চিঠিগুলো একে-একে পড়ব।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কোনো এক বিস্তৃত প্রান্তরে আমার বাংলো তৈরি করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারদিকে বাবলাগাছের ঘন নিবিড় বেড়া দিয়ে মাঠটাকে রাখব ঘিরে। কিংবা বুনো কাঠ দিয়ে; ছোট-খাট নানা ঝুমকো লতা, কুঞ্জ লতা ও অপরাজিতার আলিঙ্গনে আলো-বাতাস কাক-শালিক ও পাখ-পাখালির সাড়া-শব্দে নিতান্তই বাঙালির ঘরোয়া জিনিস, পাশে হয় ত মেঘনা, ধানসিড়ি, জলসিড়ি, কর্ণফুলী, অথবা ইছামতী; মাঠের ভিতর ইতস্তত অশথ গাছ, বাঁশের জঙ্গল, আম-কাঁঠাল, বেতের বন, কাশ, কালসোনা ঘাস, ফড়িং, প্রজাপতি, চোত-বোশেখের দুপুর, শরতের রাত, হেমন্তের বিকাল, অপার্থিব বট।

এমনি আবহাওয়ার ভিতর ঘরের বারান্দায় হরিণের ছাল পেতে বসে কিংবা অন্ধকার রাতে আলোর পাশে একটা মাদুর বিছিয়ে নিয়ে একে-একে চিঠিগুলো পড়ব; এই রকম ভেবেছিলাম আমি। নির্মলার চিঠি আছে, মার অনেকগুলো চিঠি, দাদার চিঠি, তা ছাড়া আরো নানা রকম ঘটনাস্রোতের বুক থেকে জড়ো করা ঢের। দু-পাঁচজন নারীর উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও ক্বচিৎ বিহ্বলতার চিঠি আছে। দু-তিনটি দেশপ্রেমিকের চিঠি আছে, লিখে সাহিত্যে নাম করেছে যারা কিংবা আজও সন্ত্রাস করে চলেছে, তারাও আমাকে তাদের মধ্যে একজন ভেবে চিঠি লিখত। সবই সঞ্চয় করে রেখে দিয়েছি—জীবনের ভাঁটার সময় একদিন ম্লান আলোর পাশে এগুলো পড়ব বলে।

তাও বিশ বছর ধরে এগুলো জমিয়েছি; পোকা, ইঁদুর ও উঁইয়ের হাত থেকে রক্ষা করে এসেছি।

মা অনেকবার বলেছেন এই চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিতে, এই চিঠি বোঝাই বাক্সটা কল্যাণীর চক্ষুশূল; আমি নিজেও, মাঝে-মাঝে ভেবেছি, মানুষের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হচ্ছে তার হৃদয়। সঞ্চয় যদি কিছু করতে হয় তবে সেখানে করা ভাল। টিনের বাক্সের ভিতর কেন? কিন্তু তবুও টিনের বাক্সটা অনেক ঝড় কাটিয়ে টিকে রয়েছে আজও। বাক্সের ভিতর আমার নিজের লেখা কয়েকখানা খাতাও ছিল।

বিনয়কে গেলাসটা ফিরিয়ে দিয়ে এসে বাক্সটা খুললাম।

কিন্তু পাঁচ মিনিটের ভিতরেই মনে হল, কেরোসিন তেল ও দেশলাই ছাড়া আর-উপায় নেই।

আচ্ছা মাধুরীর কি একখানা চিঠিও আস্ত আছে? বিহ্বলভাবে অজস্র চিঠির ছিবড়ের ভিতর খুঁজছিলাম, মাধুরীর চিঠি, মাধুরীর চিঠি, মাধুরীর চিঠি। আঙুলে উঁইয়ের কামড় লাগছে—কাদা মাটি ও গলিত উঁইয়ের রসে হাত যাচ্ছে ভরে, কিন্তু সেই চৌদ্দ পাতা, আঠার পাতা—এক-একখানা চিঠির একটু যদি থাকে।

অবশ্য আঠার পাতা ভরে সে আমার প্রতি তার উপেক্ষাই প্রমাণ করত। সেই স্কুলের কলেজের কথা লিখত, বইয়ের কথা লিখত, তার দিদির ছেলে-মেয়ের কথা লিখত, গরম চা খেতে গিয়ে কী রকম করে তার জিভ পুড়ে গেছে, পিসিমা তার কেমন চমৎকার লেবুর আচার তৈরি করতে পারেন, কাসুন্দি খেতে তার কত ভাল লাগে, কলকাতায় কী রকম গরম পড়েছে, কলেজের বাস কী রকম টিকুর টিকুর করে চলে, তাদের বাড়িতে রোজ দুটো-একটা করে ইঁদুর মরছে, কে জানে বেড়ালে মারে, না, প্লেগ হবে, তাদের গরুটা আজকাল চার সের করে দুধ দেয়, রাস্তার ওপারে ডাস্টবিনের থেকে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ আসে, সেই জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে লেখা হয়েছে, গ্রামোফোনের অনেকগুলো নতুন রেকর্ড কেনা হয়েছে, কলকাতা এবার বৃষ্টিতে তলিয়ে গেল—এই সব।

অনেক চিঠি লিখত মাধুরী, অনেক কথাও লিখত কিন্তু রক্ত-কাঁকরের পথের বুকে যেমন জল পাওয়া যায় না, এই চিঠিগুলোর ভিতরেও তেমনি কোনো দরদ কোনোদিন আবিষ্কার করতে পারি নি। আছে এগুলোর ভিতর একজন সামান্য নারীর অবৈধ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও অসংখ্য ভুল। কিন্তু তবুও এই মেয়েটি আমার জীবনকে করেছিল কী ভীষণ দুরতিক্রম্য। এই নারীটি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল বলেই বৈষ্ণব কবিতা, কিশোরী প্রেম ও অনেক বিদেশী সাহিত্যের অন্ধকার অস্পষ্ট ইঙ্গিত আমার কাছে অপরূপ হয়ে আছে। রূপ ও প্রেমের বেদনা, পাপ ও অভূতপূর্বতা বুঝতে পেরেছি।

পড়তে-পড়তে নির্মলার [?] কয়েকটা ছবি চোখে পড়ল। নির্মলা নিজেও অনেকদিন হয় মারা গেছে; কিন্তু বিধাতা তার কয়েকখানা চিঠি অন্তত আমার কাছে রাখলে পারতেন।

অবিনাশের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গ্যান্ড্‌ট্রাঙ্ক রোডে। সে দশ বছর আগের কথা। পাঁচ বছর ধরে সে আমাকে চিঠি লিখেছে; কখনো দেরাদুন থেকে, কখনো পাহাড় থেকে, কুমায়ুনের থেকে, লক্ষ্ণৌ থেকে, বিলাসপুরের থেকে, রামেশ্বরের সেতুবন্ধের থেকে, চিংল্পিপট্টমের থেকে, ত্রিচিনপল্লির থেকে অনুরাধাপুরের থেকে—পায়ে হেঁটে-হেঁটে ভারতবর্ষ বেড়াচ্ছে সে; একবার ধর্মপুরের থেকে লিখেছিল যে যক্ষ্মায় ভুগে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে।

তার পর আর-কোনো চিঠি পাই নি।

অনেক আগে, ধর্মপুর থেকে তার চিঠি পাবার বছর দুই আগে, গোলদিঘিতে একদিন অবিনাশের সাথে দেখা হয়েছিল। সেও এমনি শ্রাবণ মাস-গিরি মাটির মত অজস্র মেঘে আকাশ ছিল ভরে—কতকগুলো ধুমসো কাল মেঘ গঙ্গপালের মত ইতস্তত ওড়াউড়ি করছিল; দিনের আলো যাচ্ছিল নিভে; দাঁড়কাকগুলো আকাশের গায়ে-গায়ে ইতস্তত মিলিয়ে যাচ্ছিল। ঘোলা সরবতের মত মেঘের এক খণ্ডে বরফের দানার মত সপ্তমীর চাঁদ বিকেল শেষ না-হতেই হাজির—তার নিচে আসন্ন সন্ধ্যার অজস্র কালো বাদুড়ের দল।

হাঁটছিলাম—হঠাৎ দিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণের থেকে কে যেন আমাকে ডাকল; আবছায়ার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম একটা মিলিটারি খাকির শার্ট পরে অশ্বত্থ গাছের নিচের বেঞ্চিতে অবিনাশ বসে আছে।

সেদিন সারারাত ভরে মেঘের...কিন্তু...মন....

অনেক রাতে আমরা স্কোয়ারের বেঞ্চি ছেড়ে ফুটপাতে নামলাম। হাঁটতে-হাঁটতে একবার আমাহার্স্ট স্ট্রিট, করিম চার্চ লেন—আর-একবার মুনমেন্ট, সেন্ট জনের গির্জা—এমনি করে সারাটা রাত কাটালাম।

কী-ই বা করবার ছিল আর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন তখন একটা সমস্যার জিনিস, প্রেমের বেদনা ও জর্জরতার অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু বিচ্ছেদ ও প্রণয়ের গন্ধও যে জীবন থেকে একদিন নিঃশেষে কেটে যায়! বঞ্চিত হলেও বেদনা থাকে না আর। উত্তর জীবনে মানুষের দুঃখ যে-অন্নকষ্ট নিয়ে, নারীকে নিয়ে একেবারেই নয়, সে আশ্বাস তখনো পাই নি। তাই সারা রাত অবিনাশ কবিতা আওড়াল, চুরুট টানল, অসংলগ্ন কথা বলল, একবার নক্ষত্রের মত অমানুষিক দীপ্তির একবার ছাগলের মত আকণ্ঠমজ্জিত লালসার পরিচয় দিতে লাগল।

অবাক হয়ে ভাবি, অবিনাশ আজ কোথায়? ধর্মপুরের স্যানোটোরিয়ামে সে আজ আর নেই, হয় ত আমার মত নির্বিবাদ, নির্জীব গৃহস্থ হয়েছে কিংবা মাটির তলে হাড় পচছে হয় তার তার।

অবিনাশের বড়-বড় চিঠিগুলো একবার পড়েই রেখে দিতাম, কোনো এক দূর ভবিষ্যতে এগুলো সরস নবীন জিনিসের মত আবার আগ্রহে খুলে পড়ব বলে; চিংলিপট্টম ও মাদুরার কয়েকটা দিন কয়েকটা চিঠিতে খুব বিশদভাবে গাঁথা ছিল; অনুরাধাপুরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনখানা চিঠি ছিল।

বারান্দায় হরিণের ছাল পেতে, কিংবা অন্ধকার রাতে প্রদীপের আলোর কাছে মাদুর বিছিয়ে এ সব চিঠি কোনোদিনও পড়তে পারব না, আমি আর। চিঠিগুলো উঁইয়ের পেটের ভেতর গিয়ে তাদের শরীরের মাংস ও রস জোগাচ্ছে, নীড় বাঁধতে সহায়তা করছে তাদের, তাদের ডিম ও সন্তান-সন্ততির কাজে লাগছে।

কিন্তু একটা পচা হোগলার বেড়া দিয়েও ত এই কাজ হত, কিংবা গর্ভস্রাবের রক্তমাখানো রাবিশ ন্যাকড়া দিয়ে? আমার এই বিশ বছরের সঞ্চয়ের উপর হাত দেবার কী দরকার ছিল?

কিন্তু কাকে আমি প্রশ্ন করি? এই অন্ধ পোকাগুলোকে? আমার অবসন্ন হৃদয়কে? জীবনের দিন-রাত্রির নিঃশব্দ সঞ্চারকে?

যে-খাতাগুলোতে নতুন কতকগুলো কবিতা লিখে রেখেছিলাম—তাও নষ্ট হয়ে গেছে।

এ কবিতাগুলো কাউকে দেখাই নি। অনেকক্ষণ সময় কেটে যায়। অবাক হয়ে ভাবি জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে নিজেকে স্থির রাখা। ভাবতে-ভাবতে অনেক মুহূর্ত কেটে যায়, এক সময় নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করি এই ভেবে যে আলেকজানড্রিয়ার লাইব্রেরি যখন ধ্বংস হয়ে যায় তখন এমন অনেক অনেক চিন্তা ও কল্পনার সম্ভার ধোঁয়ায় মিশে গেছে যার তুলনায় আমার এ কতিবাগুলো কিছুই নয়।

শেষ পর্যন্ত শেক্সপিয়রের সমস্ত কাব্যও ত এক দিন বরফের নিচে ধ্বসে যাবে। পৃথিবীতে একটি মানুষও থাকবে না।

কিন্তু তবুও থেকে-থেকে মনে হয় আলেকজানড্রিয়ার লাইব্রেরির সমস্ত লুপ্ত ঐশ্বর্যের চেয়েও আমার কবিতাগুলো ইঙ্গিত ও মূল্য ঢের চমৎকার ছিল, শেক্সপিয়র যা দিতে পারে নি—তাই ত দিয়েছিলাম আমি।

মেজকাকা এসে বললেন, 'উঁইয়ে খেয়ে ফেলেছে?'

'হ্যাঁ'

'সার্টিফিকেট বুঝি?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ'

'কার সার্টিফিকেট ছিল?'

'বর্ধমানের মহারাজার'

'হুঁ, তা হলে চাকরি পেলে না যে বড়?'

চুপ করে ছিলাম।

মেজকাকা—'সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন বটে আমাকে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীমশাই। আমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, সে আজ প্রায় ছেচল্লিশ বছর আগের কথা। সেই সার্টিফিকেট নিয়ে আমি কে-এস শেঠ-এর কাছে যাই। আবগারি ডিপার্টমেন্টে চাকরি আদায় করে নেই।'

'তা শাস্ত্রীমশাই শুনে কী বললেন, হয় ত অপেক্ষা করেছিলেন? সাব ইনস্‌পেক্টর হয়ে ঢুকেছিলেন?'

'হ্যাঁ ফাস্ট হয়ে বেরলাম ইনস্‌পেক্টর।'

গলা খাঁকরে মেজকাকা—'ব্রাহ্ম সমাজে সাধনাশ্রমের সঙ্গে খুব যোগ [?]

ছিল এক সময় আমার—'

'ছিল বুঝি?'

'ভেবেছিলাম জীবনটা ঐখানেই কাটিয়ে দি, কিন্তু,' সাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে বললেন, 'মানুষের জীবনের কত রূপান্তর হয়, ভাবছিলাম এই সমাজের বেদিতে চড়ি-চড়ি বুঝি, কিন্তু বছর দুয়ের মধ্যেই আবগারির মোটা তলব।'

'শক্তি যেখানে যায়, সেখানেই কাজে লাগে।'

'তা বইকি, তোমার বাবারই ত শুধু কিছু হল না। চিরটা জীবন স্কুল মাস্টারি করে কাটালেন; শক্তি আমাদের কারো চাইতে কম ছিল কি তাঁর?' গলা খাঁকরে মেজকাকা—'এই ত তিন দিন হল তোমাদের এখানে এসেছি, 'পরশুই আবার কলকাতায় চলে যাব।'

'পরশুই যাবেন?'

'জরুর, যতবার এখানে আসি, দেখি, কী দুরবস্থার ভিতরেই তোমরা আছো। বাহাত্তর বছর বয়সে দাদা কাদা-বৃষ্টি ভেঙে এখনো হেঁটে এক মাইল দূরের স্কুলে যান, তোমার মা চাকরানির মত খাটে—তোমার চাকরি নেই—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌমার কষ্ট; নিজেকেও ধিক্কার দি একই ভেবে যে তোমাদের কোনোদিন একটি পয়সা সাহায্য করতে পারলাম না। যতদিন সার্ভিসে ছিলাম মেরে-কেটে কিছু সাহায্য করলেও করতে পারতাম। সেই বড় ভুল হয়ে গেছে, কিছু দেওয়া থোওয়া উচিত ছিল দাদাকে তখন। কিন্তু এখন পেনশন খাচ্ছি, কোনো উপায় নেই তো।'

'আপনার কত পেনশন মেজকাকা?'

'পেনশন আর-কী?'

দেশলাইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম।

মেজকাকা—'আমাদের খোঁজখবর তোমরা কিছুই রাখো না দেখছি।'

ঈষৎ হেসে কাকার দিকে তাকালাম।

'কত পেনশন তাও জিজ্ঞেস করলে? জানো না কী নিদারুন টানাটানির ভেতর আছি।'

বলে খাকির হাফ প্যান্টের ভিতর দু'হাত চালিয়ে দিয়ে, 'এক জোড়া জুতো কিনতে পারছি না।'

'কেন?'

'পায়ে লাগে। দাদা যখন কলেজে পড়তেন তখনো, এখনো, নিউ কাট [?]

কিন্তু আমার অক্সফোর্ড না হলে চলে না,' একটা হাত তুলে বললেন।

'জুতোর?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোল কী রকম হওয়া চাই জানো?'

'কী রকম?'

'ম্যাক্সিমাম ওয়েট সোল,' বলে, বিস্ফারিত পরিতৃপ্ত চোখে আমার দিকে তাকালেন কাকা।

বললাম—'বেশ।'

খুব অস্বস্তির সঙ্গে—'মেজকাকা, ক দিন টেকে?'

'সে অনেক দিন, সঙ্গে কতকগুলো চীনে বাজারের জুতো রাখতে হয়। আমি যখন যে স্থলে বেরুই এই জুতো নিয়ে বেরুই। এই তো, যে-জুতোজোড়া পরেছি এ তো অক্সফোর্ড নয়, চিনেম্যানের তৈরি।'

'খুব চরিতার্থতায় দিন কাটছে আপনার।'

'আমার?' ঈষৎ ভ্রুকুটি করে সেজকাকা বললেন, 'কেটে যাচ্ছে এক রকম। অদৃষ্টের দোষ দেই না। কাউকেই গালিগালাজ করবার প্রবৃত্তি হয় না।,'

'কেন দেবেন? সবাই আপনাকে দু'হাত ভরে দিয়েছেন।'

'না, দু'হাত ভরে দেন নি অবিশ্যি। তবে নেমকের চামচের এক চামচে দিয়েছেন বটে।'

হাসছিলাম।

মেজকাকা—'যে যা-দিয়েছেন, সে কৃতজ্ঞতা সব সময় স্বীকার করো। তোমার ত এখানে সকালবেলা মুড়ি খাও। যে-চালের ভাত খাও আমাদের ওখানে চাকর খানশামাও তা খায় না।'

'আপনার জন্য তা বাবা কয়েকসের দাদখানি চাল এনে রেখেছেন।'

'তা এনেছেন বটে; আমাকে দাদখানিই দেওয়া হয়, না হলে আমার অম্বল হয়। বৌঠানও খুব রেঁধে—বেড়ে খাওয়াচ্ছেন আমাকে। কিন্তু এ হল আমার জন্য তোমাদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তোমরা নিজেরা বারমাস যা-খাও তা দেখলে আমাদের ছক্কুর অব্দি চক্ষুস্থির হত।'

'ছক্কু কে?'

'আমাদের বয়; বিহারে বাড়ি, ছাপরা জেলায়, সেখানেও সে তোমাদের চেয়ে ভাল খায়।'

একটু চুপ থেকে—'সাধনাশ্রমে কেমন খাওয়া হত?'

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কাকা—'মুড়ি যে আমি না খাই তা নয়, মাঝে-মাঝে খেতে ভালও লাগে—কিন্তু এই যে সকালবেলা উঠে তোমরা ডাস্ট দিয়ে চা আর মুড়ি নিয়ে বস, দেখে আমার বড় দুঃখ করে। আমার ওখানে ভাল দার্জিলিং চা কিংবা লিপটনের কফি, রোল, মাখন, ডিম এই ত ব্যবস্থা—'একটু চুপ থেকে, 'তার পর নটার সময় আসে,' তাকিয়ে দেখলাম, চোখ পরিতৃপ্তি ও আত্মমর্যাদায় ভরে উঠেছে, বললেন, 'তার পর এগারটার সময় সবচেয়ে টাটকা মাছ-মাংস, ডাল-তরকারি, ভাজি, চাটনি'। দাদার মত মিছিমিছি জীবনটাকে বঞ্চিত করে কী লাভ।

'না, কোনো লাভ নেই।'

'একটা কষ্ট! খেয়ে-খেয়ে আমার গাউট হয়েছে'

একটু চুপ থেকে, 'বৌমাকে তুমি একটু বলো ত—'

'কী?'

'এই রাত্রের দিকে আমার পায়ে একটু লিনিমেন্ট ঘষে দেয়'

'আচ্ছা।'

'কলকাতায় দিত ছক্কু মালিশ করে। কিন্তু এখানে ত তোমাদের কোনো চাকর-বাকর নেই?'

'না, চাকর আর রাখা হয় নি।'

'ভালই করেছ। চাকর পুষতে আমার মাসে নিট পঞ্চাশটি টাকা খরচ হয়ে যায়। অথচ নেমকহারামের ধাড়ি সব, ও-পাপ রাখতে হয় না, তা ছাড়া দাদার যা ইনকাম, চাকর-বাকর রেখে মুখে রক্ত উঠে বুড়ো বয়সে মরবে এ-মানুষটা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমিও দিতে পারি আপনার পায়ে মালিশ করে।'

'আচ্ছা, তুমি কেন দেবে? বৌমা থাকতে—সেটা কি ভাল দেখায়? বৌমার যদি কোনো আপত্তি থাকে—'

'না, আপত্তি কিছুই নেই।'

'হয়ত লজ্জা করতে পারে—নিজের শ্বশুরকে যেমনটি দেখে আমাকে তেমনটি নাও মনে করতে পারে হয় ত।'

'কেন মনে করবে না? আপনি বাবার সহোদর ভাই।'

'আহা, এদের মনের মধ্যে কোথায় কী যে খোঁচ আমরা কি তা বুঝতে পারি?' গম্ভীর করে, 'নিজের স্ত্রীকেও কি ছাই আমি ভাল করে চিনি?'

'আমিই তা হলে মালিশ করে দেব মেজকাকা।'

'তাই দিও। বৌমার নাম যে মুখে এনেছিলাম—বল তো তোমার বাবার কাছে গিয়ে খৎ দিয়ে আসি।'

'গাউট হয়েছে আপনার কত দিন থেকে?'

'ডিম-মাংসের পরিণাম আর কী? তবে বাড়াবাড়ি হয়েছে দু-তিন বছর ধরে।'

'মাংস-ডিম খান এখনো?'

'খুব কম খাই। তবুও ভগবানের আশীর্বাদ বলতে হবে এপেন্ডিসাইটিস হয় নি, স্টোন হয় নি, গলস্টোন হয় নি, ব্লাডপ্রেসার হয় নি, গাউটের উপর দিয়ে আপদ গেছে সব।'

'শুনলাম, সেজকাকার নাকি ব্লাড প্রেসার হয়েছে?'

'কার? রমেশের? তা তুমি আজ শুনলে? গত বছর ত মারা যাবার উপক্রম হয়েছিল।'

'তাই নাকি?'

'জানো না? বাপের ভায়েদেরও খবর রাখো না?' একটা হাত তুলে মেজকাকা—'তোমাদেরই বা বলব কী? দাদাই কি খোঁজখবর রাখেন আমাদের?

কোলের থেকে ছড়িটা তুলে নিয়ে খোঁড়াতে মেজকাকা—'বিধাতার কৃপায় আমি তিন'শ চার 'শ টাকা নেপশান পাচ্ছি। কাঁচা টাকায় অনেক ঝাল মিটে যায় কিন্তু তবুও আমাদের মনে প্রাণে কি কোনো বেদনা থাকতে পারে না? যাক, ভগবান আছেন, তিনিই দেখবেন, বিচারও করবেন তিনিই। বার 'শ টাকা মাইনে পেয়ে ডিম-মাংস, হ্যাম, বেকন, কোকোজ্যামের পিণ্ডি চটকে জীবন কাটিয়ে দিল রমেশ। রেস খেলে, বছর বছর একটা ব্যবসা, দিন-রাত সিগারেট আর ইংরেজি বই, ব্লাডপ্রেসারের কী দোষ?

'পুলিস ইনস্পেক্টর হয়ে এই সব বই পড়েন সেজকাকা?'

একটু আশ্চর্য হয়ে মেজকাকার দিকে তাকালাম।

'ওপেন হাইম, এডগার ওয়ালেস এই সব। অবসর পেলেই দিন-রাত এই সব নিয়ে পড়ে থাকে।'

'ওঃ এইগুলো?'

'এইগুলো অত্যন্ত ম্লেচ্ছ বই।'

'সময় কাটে মন্দ না।'

'চণ্ডাল দিয়ে এই সব বই পোড়াতে হয়।'

'কেন?'

'মানুষকে অন্তঃসার শূন্য করে ছাড়ে,' ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে মেজকাকা, 'সব সময় একটা নিষ্ঠাহীন চঞ্চলতা। রমেশের হয়েছেও তাই। মানুষের জীবনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা নিয়ে আলোচনা করবার মত না-আছে রুচি, না আছে শক্তি—ভগবানকে নিয়ে রোজ দু'দণ্ড বসবার মত অবসর সে খুঁজে পায় না। একখানা ভাল বই হাতে দিলে হাঁপিয়ে ওঠে। পা ছড়িয়ে দিনরাত ক্রাইম নভেল আর সেক্স নভেল নিয়ে।'

'ক্রাইম নভেল অবশ্য আমি পড়তে পারি না।'

'শয়তান ছাড়া কেউ পারে না।'

'কিন্তু সেক্স নভেল পড়েছি ঢের।'

'আর পোড়ো না; তার চেয়ে বরং হকিং পড়ো'

'হকিং?'

'হ্যাঁ আর হাচিংসনের। অবিশ্যি এ সব বই কোনোদিন পড়ব না আমি; পড়লে না-হয় রাস্কিন পড়ব আর-একবার, কিংবা টলস্টয় অথবা—।'

'মেজকাকাকে বললাম, 'নভেল কাড়ে সেজকাকা ইংরেজি লিখতে শিখেছে বেশ।'

'হুম, সাহেবদের সঙ্গে দুটো ইংরেজি বলতে পারে না।'

'পারে না?'

'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে।'

'তা হলে এ উন্নতি হল কী করে? সামান্য পোস্ট থেকে একেবারে গ্রেড?'

'আমড়াগাছি! খোশামুদি! তা ছাড়া আবার কী? পায়ে তেল মেখে-মেখে। আহাপেকেটে ওর সব সময়েই তেল। রমেশের জন্য তেল যোগাড় করতে গিয়ে বি-ও-সি সাবাড় হয়ে গেল।'

হাসছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজকাকা—'অত আমড়াগাছি যদি আমাকে দিয়ে করাতেন ভগবান, তাহলে সাঁ করে কমিশনার হয়ে যেতাম। ডানে-বাঁয়ে তাকাতে হত না আর।'

গলার আওয়াজের ভিতর যেমন বিষ, তেমন ঈর্ষা। তেমনি ক্ষোভ ও যন্ত্রণা।

ছটফট করতে করতে মেজকাকা—'বার'শ তলব মারলেই যদি মানুষ ভাল ইংরেজি বলতে পারত তা হলে সুরেন বাঁড়ুয্যে আনন্দমোহন বোসকে অত কষ্ট করে ইংরেজি শিখতে হত না। একটা দারোগার কাজ নিলেই ল্যাটা চুকে যেত। টেন্স-এর জ্ঞান নেই।'

'কার?'

'রামেশের। একটা থার্ড ক্লাস-এর ছেলেও ত বোঝে যে যদি পাস্ট টেন্স....'

কিন্তু চুপ করে গেলেন মেজকাকা। গ্রামারের অনাবশ্যক আলোচনার কোনো দরকার বোধ করলেন না।

গলা খাঁকরে, 'আই-সি-এস-এর কাছে মেয়ের বিয়ে দিয়েই দেমাক বেড়েছে রমেশের। তোমাদের ডেকে জিজ্ঞেস করে? একখানা চিঠি লিখে শুধোয়? একটা পয়সা পাঠায়? দাদা চিরটাকাল ভেক ধরেই গেলেন—যেন নামাবলি গায়ে বৈরেগি ঠাকুর; রক্ত নেই আঁচ নেই, যেন ঠাণ্ডা শালগ্রামটি। তা না হলে রামেশের এত বাড় বাড়ে? বার'শ টাকা মাইনে পায়, ছ'শ টাকা দাদাকে পাঠাতে পারে না?'

'আমার মেয়ে বি-এ পাস করে টিচারি করছে, বিয়ে করছে না। মদ-গরু-খাওয়া সিভিলিয়ানদের সঙ্গে বিয়ে দেব তাই বলে? রমেশটা ত দিল।'

সন্ধ্যার সময় মেজকাকার পায় লিনিমেন্ট মালিশ করে দিচ্ছিলাম। বললেন, 'মালতীর জন্য একটা ছেলে দেখে দিতে পার? নিতান্ত সারকেল অফিসার, সাব ডেপুটি যেন না হয়। করে খেতে পারে যেন, অন্তত ডেপুটি অ্যাসিসটেন্ট।' খানিকক্ষণ অশোভন বিস্তব্ধতার পর মেজকাকার একটা ব্যথিত দীর্ঘনিশ্বাস। 'মালতী অবিশ্যি নিতান্তই সাদাসিধে মেয়ে। চেহারায় চরিত্রেও।'

'তাহলে এদের একজনকেই বিয়ে করুক না কেন।'

'তা হয় ত করবে না।'

'কেন?'

একটু স্বদেশীর অভিমান আছে কি না আমার মেয়ের। মাঝে-মাঝে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায়।

'সে ত বেশ ভাল কথা।'

'কিন্তু বর পেলে বিয়ে করতে পারে। ধরো, বিলেত-ফিরেত আই-সি-এস যদি ওকে বিয়ে করতে চায়। একজন সাব-ডেপুটির জন্য মালতী তার স্বদেশীকে ত স্যাকরিফাইস করতে পারে না; কিন্তু স্বদেশীর জন্য সিভিলিয়নকে স্যাকরিফাইস করা বাড়াবাড়ি। এক সুভাষ বোষ করতে গিয়েছিল। হত্যা দিয়ে পড়েছে গিয়ে তাই। এ-সব ভগবানের দাড়ি ধরে টানা-হেঁচড়া কি আমাদের মত মানুষের সাজে রে ভাই? তা আমাদের এক রকম ঠিকই আছে সম্বন্ধ।'

'কার সঙ্গে?'

'অঘোরা মজুমদারের ছেলে বিলেত গেছে সিভিলিয়ান হবার জন্য। ফিরে এসে মালতীকে বিয়ে করবে। মালতীও কোনো আপত্তি করবে না। স্বদেশী করে ভাওয়ালি যাবার সাধ হয় নি ত।'

দেখতে-দেখতে এই মাংসপিণ্ড ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার আগে মেজকাকাকে অবিশ্যি জেগে উঠতে হল।

মেজকাকা আমাদের রান্নাঘরে গিয়ে কোনোদিন খান নি—রান্নাঘরে মা কী করে রাঁধে, বা, বাবা ও আমরা কী করে খাই, সে সব ইতিহাস তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

তিনি জানতে চান না, জানবার ইচ্ছেও নেই, প্রয়োজনও নেই। বিশেষত এই বর্ষাকালে, এই কাদামাটির দেশে পাড়াগাঁয়ে এসে পিছল পথে হাঁটতে তিনি রাজি নন। পায়ে কাদা লেগে যেতে পারে, অন্তত ভেলভেটের চটিজুতো নষ্ট হয়ে যাবে; ছাতার আড়ে বগলে ফতুয়া যাবে ভিজে; টর্চ আছে বটে কিন্তু তবুও রাত করে বাইরে নামলে সাপখোপের সম্ভাবনাও নিদারুণ।

বিকেলবেলা আলো ফুরাতে না ফুরাতেই তিনি বেড়িয়ে এসে দক্ষিণ দিকের ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেন।

এসে পিসিমাকে বলেন—'আট আনার পয়সা গাড়ি ভাড়া নিলে। এখানকার গাড়োয়ানেরা কান মলে পয়সা আদায় করে নেয়।'

'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'এলাম নদীর ধার দিয়ে একটু বেড়িয়ে। কাঁহাতক ঘরে বসে থাকা যায়?'

'তা বেশ, ঝাউয়ের বাতাস কেমন লাগল?'

'এদেশে শয়তান আর উল্লুক থাকে বাতাসে,' একটু থেমে, 'বাতাস আলমোড়া পাহাড়ে, পাইনের বনে।'

অনেকে আমরা স্তম্ভিত হয়ে মেজকাকার দিকে তাকাই।

'গত এপ্রিলে গিয়েছিলাম—'

'কোথায়? আলমোড়ায়?'

'আলমোড়া, মুসুরি, দেরাদুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বাড়ির কোনোদিন কেউ এ সব দেখে নি আর। দেখবেও না কোনোদিন।

বাবা একটু বিস্মিত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনো এক বিরাট সাদা মেঘখণ্ডের সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে দূরত্বের সৌন্দর্য ও বিস্ময়কে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন।

'প্রায় সাড়ে বার'শ টাকা খসে পড়ল—'

বাবা চমকে উঠে তাকালেন মেজকাকার দিকে।

'তা কুমায়ুনের পাহাড়ে-পাহাড়ে হোটেলে-হোটেলে থাকবে, টাকা খরচ হবে না?'

পিসিমা ফোড়ন দিয়ে, 'টাকা তো মেজদা নিজেই উপার্জন করেন, কারুর কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হয় না ত'। মেজকাকা আত্মপ্রসাদের অহঙ্কারে পিসিমার দিকে একবার তাকান, আমাদের সকলের দিকে একবার।

বললেন—'নিয়েছি সেকেন্ড ক্লাস রিজার্ভ করে।'

'কেন ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ করে গেলেন না মেজদা?' পিসিমা বললেন।

'যাঃ যাঃ! আমি কি রমেশটার মত বেল্লিক যে ঘুঘু সিভিলিয়ানরা যা করতে ভয় পায় আমি তাই করে বসব।'

'গোঁফে হাত বুলিয়ে নিয়ে মেজকাকা—'মালতী গেল, মালতীর মা গেলেন, বিজয় গেল, একটা বেয়ারাকেও সঙ্গে নিতে হল—'

'আহা, যদি পাশ পেতেন মেজকাকা, আপনার এত টাকা খসল!'

'দেখো, তোমরা এই দরিদ্রতার ভিতর কায়ক্লেশে, থেকে-থেকে বড় প্রবঞ্চিত হয়েছ, মানুষের আত্মাকেই ফেলেছ হারিয়ে; তোমরা ভাব টাকাই সব; কিন্তু সৌন্দর্য ও ভগবানের জন্য আমাদের তেমন পিপাসা থাকলে ডাঙা দিয়ে তিনি যে আমাদের নৌকা চালিয়ে নিতে পারেন তা তোমরা জানো?'

বাবা এই পর্যন্তও বৈঠকে ছিলেন; এবার আস্তে চোখ বুজে নিজের ঘরে গিয়ে উঠলেন; তাকিয়ে দেখলাম একটা টুলে বসে স্কুলের ছেলেদের খাতা দেখছেন নিবিষ্ট একান্ত মনে, যেন কোনো বাধা, কোনো পরাজয়, কোনো দীনতার কুয়াশা কোনোদিনও ছিল না জীবনে।

মেজকাকা—'কুমায়ুনে গিয়ে ভগবানের সত্যকে আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করে আসতে পেরেছি।'

মা বললেন, 'কুমায়ুনে কেন, এখানে বসে পারা যায় না? যেন কুমায়ুনের তেমন এখানে বসেও পারা যায়।'

'সব সময়েই জীবনের জীর্ণতার ছোট নজরের কথা বলো না বৌঠান।'

মেজকাকা—'তোমাদের ভিতরে এলে ভগবানের ভাব নিয়ে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারি না বৌঠান।'

'কেন?'

'না, যেখানে জীবন মানে জীবন্মৃত অবস্থা, অর্থের দুর্গতি যেখানে মানুষকে দিয়েছে সঙ্কুচিত করে, সেখানে সৌন্দর্যের কথাই বা কী ভাবব, আনন্দের, বিধাতার স্পর্শই বা পাব কী করে? তিনি ত আনন্দের শুধু নয়, তিনি ত বেদনা—বললেন রবি ঠাকুর কিন্তু সে বেদনার ভেতরেও একটা রূপ আছে বৌঠান, তোমাদের ব্যথা ত শুধু কুৎসিত'—মা অধোমুখে বসে রইলেন।

'সৌন্দর্য ও ভগবানকে দেখলেন মেজকাকা?'

'হ্যাঁ'

'কোথেকে?'

'কুমায়ুনেই'

'হোটেলের জানালায় বসে?'

মেজকাকা বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

'হোটেলের মেনুই বা কী ছিল? কী আন্দাজ পঞ্চরং চলত?' কে যেন আস্তে বললে।

'[ছেলেমেয়েরা] গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ গিয়েছিল কয়েকজন।'

'বড্ড ঝালাপালা করে তোলে নি?'

'না, শান্তশিষ্টই তো ছিল'

'পরমাত্মা ও পরমেশ্বর তাদেরও বঞ্চিত করেন নি?'

'না, কেনই-বা করবেন? তাদের টাকা আছে বলে? সুচের ছ্যাদা দিয়ে উট খ্রিস্টিনি কথা, ও-সব সেকেলে ঢুকতে পারে, কিন্তু ধনী স্বর্গে যেতে পারে না সে-কথা আমি মানি না। টাকা থাকলে স্ত্রী সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালন করা যায়, ভাল জায়গায় যেতে পারি, ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে থাকা যায়, পরিপাটি খাওয়া-পরা হয়, ঘুম হয় চৌকোশ, মনে শান্তি থাকে আমাদের জীবনের এ-রকম সৎ সচ্ছল ব্যবস্থার ভিতরই ভগবান আমাদের হৃদয়ে নামবার ভরসা পান।'

'হৃদয়টা ভেলভেটের কুশনের মত না হলে তিনি নামেন না বুঝি?'

শুনে মেজকাকার বৈঠকি অন্তরঙ্গতা এক-আধ মিনিট থেমে রইল।

আমার প্রতি বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ শুধু মেজকাকাই হন নি, পিসিমাও হয়েছেন, মা পর্যন্ত।'

তাই ত!

রাত নটার সময় ঘুমের থেকে উঠে মেজকাকা, 'বৌঠান, বৃষ্টিতে ভিজে খাবার নিয়ে এসেছে দেখছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠে বসে একটা হাই তুলে, 'এই অন্ধকার রাত-বিরেতে ঝড়-বাদলে কী করে যে তোমরা চলাফেরা কর বুঝি না, একটা লণ্ঠন নাও!'

'লণ্ঠন? ও বড্ড ঝামেলা ঠাকুরপো'

'চোখ জ্বলে বুঝি? একটা কুপি অব্দি চাই না?'

'কুপি মাঝে-মাঝে ব্যবহার করি বটে ঠাকুরপো'

'আমাকে ঠাকুরপো ডোকো না—'

'ডাকব না?'

'বরং সুরেশবাবু ডেকো।'

'মেজকাকা, মাথা তুলে, 'কিংবা তাতে যদি সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাটা জড়িয়ে গেছে মনে করো, তা হলে সুরেশ দা'

সকলেই চুপচাপ।

মেজকাকা, চশমা চোখে আঁটতে-আঁটতে, 'তোমার শাড়িও দেখছি ভিজে গেছে বৌঠান। একটা ছাতাটাতা ব্যবহার করো না কেন? বাঃ পোলাও রেঁধেছ আজ?'

পোলাও মেজকাকার জন্যই রাঁধা হয়েছিল, ছোট এক ডেকচি আন্দাজ।

'ইলিশ মাছ ভাজাও ত গোটা দশেক দিয়েছ দেখছি—বেশ বেশ!'

খেতে-খেতে, 'আচ্ছা এই তেপয়াটা তোমরা কোথায় পেলে—যেটার ওপর থালা রেখে খাচ্ছি?'

'কেন? অসুবিধা হচ্ছে?'

'না, সে জন্য না, এমন ছবি-ফুল-কাটা তেপয়া তো পাড়াগাঁয় দেশে দেখা যায় না বৌঠান।'

'উনি কোত্থেকে এনেছিলেন।'

'দাদা কি খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওঃ, দাদার খাওয়া হয়ে গেছে বুঝি—'

পিসিমা বললেন, 'দাদা, খেয়েছেন ঐ রান্নাঘরে গিয়ে।'

'কেন, কেন, এ-রকম, ব্যবস্থা কেন বৌঠান? আমি খাব টেবিলে বসে, আর তিনি জল-ঝড়ে ভিজে—তেপয়াটা কি কাঠের, বড় বৌঠান?'

'দেখত খোকা, সেগুনের বোধ করি।'

বললাম, 'হয় ত মেহগিনির।'

মেজকাকা চোখ পাজলে হেসে—'পাগল না ছাগল, হবে বড় জোর জারুলের। দাদা ত কিনেছেন—না হয় কেরোসিন কাঁঠাল কাঠের।'

মা একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে জানলার দিকে তাকালেন। কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

মেজকাকা, 'আমাদের কলকাতার বাড়ির আসবাব পত্র সমস্ত ওক কাঠের কিংবা মেহগিনির। দেখে আসবে গিয়ে বৌ একবার।'

পিসিমা—'মেজদার বাড়ি, কিসে আর কিসে, বাঘে আর রামছাগলে কী আর, ওযে ইন্দ্রের বৈঠকখানা।'

মেজকাকা চশমার ভিতর দিয়ে বিস্ফারিত চোখে আমাদের সকলের দিকে এক-একবার তাকালেন।

খেতে-খেতে, 'তোমরা যে ভরন-কাঁসার থালায় করে ভাত দাও, আমাদের ওখানে ত সে রেওয়াজ নেই, আমরা খাই ডিশে, ড্রেসডেন চায়নার ফুলকাটা ডিশ দেখিস নি? আমাদের চাকর-বাকরও সেখানে থালায় খেতে চায় না। সববায়ের জন্য ডিশ। পোলাওটা কেমন কড়কড়ে হয়েছে, ঘি দিতে কার্পণ্য করেছ বৌঠান।'

পিসিমার দিকে তাকিয়ে মেজকাকা, 'জানলে, পোলাও রাঁধে তোমাদের মেজদিদি—ঘি, কিশমিশ, পেস্তা, বাদাম, জাফরান কত কী যে দেয়। যেমন পোলাও, তেমনি ছানার পায়েস, তেমনি মাংস—সুরেন খাস্তগিরের মেয়ে তো আর যে-সে জীব নয় বাবা।'

'কিন্তু মেজদিদি তো ইদানীং খাটেই শুয়ে থাকেন।'

'হ্যাঁ ইদানীং থাকেন বটে—'

'প্রায় দশ—বার বছর ধরে আমি ত তাকে খাটে শুয়ে-শুয়ে পান জর্দা—'

বাধা দিয়ে মেজকাকা—'সেই ভাল রে; বড়লোকের বৌ, উঠবার কী দরকার বল? আট-দশটা বাবুর্চি খানশামা বরকন্দাজ রয়েছে, গিন্নিরই যদি নিজের হাতে নেড়ে কাজ করতে হল তো এ অনামুখোগুলোকে রাখা কেন?'

মার দিকে তাকিয়ে মেজকাকা, 'তুমি আজ পোলাও রেঁধে বসলে বৌঠান, কড়কড়ে পোলাও। আমি ভেবেছিলাম ঢেঁকির শাক একটু কাসুন্দি দিয়ে খাব।'

মা একটু অপ্রস্তুত হয়ে, 'কাল খাবেন।'

'কাল সকালে?'

'বেশ, তাই হবে।'

'কাল ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে?'

বাজারে আনতে দেব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, গঙ্গার ইলিশের মত স্বাদ ত এতে নেই।'

'যা বর্ষা—এত বৃষ্টিতে এদেশের ইলিশের ঝাঁক ধুয়ে জল হয়ে যায়। ভাল মাছ পাবেন বোশেখ-জ্যৈষ্ঠতে।'

'ভাল হোক, মন্দ হোক, ইলিশই যেন আসে। আর খুব বড় দেখে চিংড়ি, গলদা, আমার জন্য মাছের ডিমের বড়া করো, মুর্গির ছোট ডিম ওমলেটের মত করে ভেজো। কুমড়ো ফুল পাওয়া যায়? ব্যাসন দিয়ে ভেজো তো, বড়ি দিয়ে একটা পালং শাকের তরকারি রেঁধো তো; তোমাদের গেরস্ত ঘরে আমচুর আছে না বৌঠান?'

'আছে।'

'থাকবারই কথা; আমচুরের টক মন্দ লাগে না। যারা বাগিয়ে রাঁধতে পারে তাদের হাতে। আমাদের বাবুর্চিটা শিখেছে—মালতী শিখিয়েছে। মালতী একজন পাকা গিন্নি, বুঝলে!'

'তা হবেই তো, বড় লোকের মেয়ের হাঁটতে-কাশতেও রূপ খুলে যায়।'

'তবে, এসব ধরনের রান্না সে রাঁধে না, কাটলেট, কাস্টার্ড, পুডিং।

মা—'কাস্টার্ড, পুডিং কী?'

মেজকাকা দাঁত বার করে হেসে, 'সে আছে এক রকম মাকাল ফল। যাক্ তুমি, এখন এঁটো পাত কুড়োও বড় বৌ। দাঁড়িয়ে থাকলে তো তোমাদেরই রাত বাড়বে।' এঁটো কুড়িয়ে থামা নিয়ে মা চলে যাচ্ছিলেন। মেজকাকা খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে, 'আবার অন্ধকারের মধ্যে ডুব মারবে বুঝি বৌঠান?'

'হ্যাঁ যাচ্ছি।'

'কোথায় চললে?'

'ঘাটে।'

'থালা বাসন মাজতে?'

'হ্যাঁ'

'এই অন্ধকার ঝড়—বৃষ্টির মধ্যে?'

'এ কি আজ নতুন, ঠাকুরপো।'

'তোমাদের কর্মের ভোগ ভোগো গিয়ে। আশা করি আসছে জন্মে তোমাদের মেজ বৌর মত খোঁচকপাল নিয়ে পৃথিবীতে আসবে।'

'খোঁচকপালে নয়নখান চিরকাল'—বলে হাসতে-হাসতে মা অন্ধকারের মধ্যে নেমে পড়লেন। আমিও চলে যাব ভাবছিলাম; মেজকাকা র‍্যাগটা টেনে নিয়ে গায়ে-পায়ে ভাল করে জড়িয়ে, বালিশে ঠেস, দিয়ে, 'এই অন্ধকারের ভিতরে সিদ্ধ ব্রাহ্মণরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছেন বুঝলি।'

'কোথায় বেড়াচ্ছেন?'

'আঁদারে-বাঁদারে বিলে-জঙ্গলে, বড় বৌ বাসন ধুতে গেলে সেই ঘাটের সিঁড়িতে।'

'পিসিমা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে, 'তার মানে?'

'ও কীরে ভয় পেয়ে গেলি?'

'তুমি ভূতের কথা বলছ?

'ব্রাহ্মণ মানে বুঝি ভূত? আচ্ছা হাবা'

'তবে কী মেজদা?'

'না রে বাবা আমাকে জড়াতে আসিস নি; মেয়ে লোক আর পেত্নির কাণ্ডে ঢের ঘেন্না আমার। ঐ চেয়ারটায় গিয়ে বোস। ব্রাহ্মণের মানে বলে দিচ্ছি।'

পিসিমা গিয়ে বসলেন।

মেজকাকা—'রাতেরবেলা নামটা নেব?'

'ওঃ বুঝেছি, থাক, নিয়ে দরকার নেই।'

'কিংবা রাতেরবেলা 'লতা' বললেই হয়। লতার ভিতর ব্রাহ্মণও আছে জানিস।'

পিসিমা ভুরু কপালে তুলে বললেন, 'থাক মেজদা, এসব থাক এখন।'

'গোখরো সাপ জাতে ব্রাহ্মণ, কালনাগিনী ব্রাহ্মণী।'

আমার ঘুম পাচ্ছিল। ঘাটের সিঁড়িতে অন্ধকার বৃষ্টির মধ্যে মা এত বছর ধরে তো অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পেয়ে আসছেন। গভীর রাতে ঘরের ভিতর একবার নিঃশব্দ পায়ের সঞ্চার শুনি। শুপুরি কাটার শব্দ, গুনগুন করে খানিকটা গান; বুঝি মা সারাদিনের কাজ সেরে ঘরে ফিরেছেন; এমনি করে চৌত্রিশ বছর দেখলাম; একদিন যদি এই স্নিগ্ধ আশ্বাস ও উপলব্ধির পথে অন্ধকার বাধা এসে আঘাত দেয়, তা দিতে পারে; সৃষ্টির নিয়মই ত আঘাত দেওয়া। বেদনা ও অক্ষমতার কী গভীর সমুদ্র চারিদিকে; উপহাসের কী অপরিসীম ধূসর পাণ্ডুর দিনবলয়। এমনি বাদলের অমাবস্যার রাতে (সকলেই তো আর নৈনিতালের উজ্জ্বল হোটেলে ভগবান ও সৌন্দর্যের সন্ধানে যেতে পারে না,) কত চাষি ধানের ক্ষেত্রে ফিরছে, পাটের চারার ভিতর ঘুরছে; কত বধূ খাল-বিলের কাছে বসে।

পর দিন সকালবেলা বাবা, 'এই ত তোমার কাকা এখানে রয়েছেন। ইনি থাকতে-থাকতে এঁকে চাকরি-বাকরির কথা বলো না!'

চুপ করে ছিলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা—'তুমিই বলো, সেটাই ভাল হবে; জানো ত এ সব বিষয় নিয়ে আমি কোনোদিন কথাবার্তা বলি না কারুর সঙ্গে।'

দক্ষিণের ঘরে গেলাম; কাকা চা খাচ্ছিলেন।

কাগজওয়ালা রাস্তা দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল—একটা 'এ্যাডভান্স, রেখে কাকাকে, 'পড়বেন?' হাত বাড়িয়ে কাগজ তুলে নিয়ে—'বেশ, পড়তে আমার আপত্তি নেই; খবর না পেয়ে কত দিন মনে হচ্ছিল (অন্ধকারে) পড়ে আছি। তোমরা এ-রকম জেলখানায় কী করে থাক, বলো ত?'

একটু হেসে, 'আমি ফ্রি রিডিং রুম-এর থেকে নিয়ে পড়ে আসি।'

'আর তোমার বাবা?'

'তিনি কাগজপত্র বড় একটা পড়েন না।'

'মনে-মনে ভাবেন বুঝি কাগজের ভিতর বলাৎকারের গল্প ছাড়া আর-কিছু নেই? চশমাটা, এটাচি কেসে, দেখতে পারছি না, এটা কী কাগজ রাখলে তুমি?'

'এ্যাডভান্স'

'আনন্দবাজার বিক্রি হয় না এখানে?'

'হয়'

'তাই ত রাখলে হত, কিংবা স্টেটস্‌ম্যান, বাসি দুধে চা করা হয়েছে বুঝি?'

'কই না ত।'

'তা হবে, বাসি দুধেই করে দিয়েছে বোধ করি। বৌঠান তো ঠাকুরপোর জন্য টাটকা দুধ-দুধ বলে খুব দহরম-মহরম করছিল।'

'মা রান্না ঘরে থেকে, 'টাটকা দুধেই করা হয়েছে।'

মেজকাকা—'বেশ, আমি রাজা হয়ে গেছি।'

পিসিমা—'হবে; এটুকুর জন্য বৌঠান কি আর বাড়িয়ে কথা বলবে? তবে তোমাকে বলি কি মেজদা, এরা দুধ জাল দিতে জানে না। আঁচ পাকতে দেয় না, কাঁচা আঁচে চড়িয়ে সমস্ত দুধ ধোঁয়ায় নষ্ট করে ফেলে।'

'মরি, চায়ের পেয়ালটারই-বা বাহার কত।'

'দাদা কিনেছিলেন; মোক্তারের পছন্দ।'

কাগজটা তুলে নিলাম।

মেজকাকা—'তা পড়বে? তুমিই পড়—'

'আপনি পড়বেন?'

—'না, খেতে-খেতে পড়তে পারি না আমি।'

দু-চার মিনিট নেড়ে চেড়ে কাগজটা রেখে দিয়ে বললাম, 'বাবা বলছিলেন—'

'কী বলছিলেন?'

'আমার জন্য চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা কোথাও করে দিতে পারেন?'

একটু চুপ থেকে মেজকাকা, 'দাদা আমাকে নিজে এসে বললেই পারতেন—'

—'উনি এসব বিষয়ে কাউকে বলেন না বড় একটা—'

—'তাঁবেদার পাঠিয়ে দিলেন তোমাকে; ছেলের দায় যে বাপেরই দায়—তা জান, আমি আর রমেশ, কখনো ছেলেদের পাঠিয়ে দেই না। মুরুব্বিদের কাছে গিয়ে নিজেই তাঁবেদারি করি। এই ত সংসারের নিয়ম।'

চায়ে এক চুমুক দিয়ে, 'দাদা চিরটাকাল ফাঁকি দিয়েই বললেন।'

'পিসিমা—'সে যাক্; সে কেঁচো খুড়ে কী-আর লাভ হবে মেজদা? আপনাকে যখন এসে ধরেছে হেম, তখন একটা ব্যবস্থা দিন।'

'তোমরা মনে কর আমি একেবারে লাট সাহেব; চাকরি আমার পকেটে।'

পিসিমা গলা খাটো করে—'আজকাল চাকরি-বাকরির যা হা-পিত্যেশ, কপালে অনেক পুণ্যি না থাকলে কেউ পায় না।'

মেজকাকা—'মানুষের চাকরি জুটিয়ে দেয় শ্বশুর কিংবা মামা। তোমার শ্বশুরকে খুঁজেছিলে?'

পিসিমা—'ওর শ্বশুর তো নেই।'

—'নেই? কী হ'ল তার?'

—'অনেকদিন হল মারা গেছেন।'

—'তবে এমন জায়গায় বিয়ে করতে গেল কেন?'

—'সে ভুল হয়ে গেছে, শোধরাবার উপায় নেই তো এখন আর।'

মেজকাকা—'বেঁচে থাকতে তোমার শ্বশুরমশাই করতেন কী?'

—'কোন একটা স্টেটের ম্যানেজার ছিলেন।'

—'ম্যানেজার না, নায়েব?'

—'ম্যানেজার'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তা সেখানে গিয়ে নায়েবি করো না তুমি।'

পিসিমা—'হেম নায়েবি করবে? তা পোষায় না; সে ভুঁড়ি কোথায়? তার চেয়ে মাস্টারি করলে মানায়।'

—'সেখানকার নায়েব এখন কে?'

—'জানি না।'

—'ম্যানেজারই-বা কে?'

—'কী একজন ব্যারিস্টার।'

—'তোমার শ্বশুর কি ব্যারিস্টার ছিলেন?'

—'না।'

—'তবে?'

—'বোধকরি বি-এল পাস করেছিলেন কিংবা—'

—'ফেরেব্বাজ নিয়ে জমিদারি চালিয়ে নিয়েছে তো?'

খানিকটা গলা খাঁকরে—'আর ভুইঞা, তোমার, মাতা তিনি করেন কী?'

—'তিনি পোস্ট অফিসে—'

—'চিঠি সর্ট করেন বুঝি?'

—'রেটিস্ট্রেশন ক্লার্ক বোধ হয়।'

-'যাক, তবুও ভাল।'

—'ছোট-খাটো জমিদার যেমন আছে, তেমনি আমার শালা ছোট-খাটো কাজ করে—'

—'শালা কত টাকা পায়?'

—'পঁচিশ।'

—'এই সব আস্তাকুঁড়ের মধ্যে বিয়ে করলে তুমি?'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে—'অবিশ্যি চাকরির উমেদারির জন্য আমার কাছে এসেছ, দাদা দিয়েছেন পাঠিয়ে—তা অনেক বড়-বড় ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমার মোলাকাৎ আছে বই কি—'

—'তা হলে—'

—'এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার, মিনিস্টার।'

—'তবে তো আপনি চেষ্টা করলেই পারেন।'

—'না, বেঙ্গলে কিছু হবে না।'

—'কেন?'

—'বড় ছেলেটাকে ইউ-পি-তে পুলিশে ঢুকিয়ে দিয়েছি। মেজটা বেহারে আবগারি ইনস্পেক্টর। বিজয়কে নিয়েই একটু মুশকিলে পড়েছি? হারামজাদাটা ম্যাট্রিকও পাস করতে পারত যদি, এক এস-এস-আই কি টি-আই, করে দেব আর কী। আমার আলাপ-পরিচয় সব আগে।'

—'বেশ আগেই হোক।'

—'সে বাঙালির হয় না, আদব-কায়দা জানে পশ্চিমি মুসলমান, বুঝলে? এক-একজন আমাকে নিয়ে কী যে করে উঠবে বুঝতে পারে না। সে আমার পা ধুয়ে জল খেলে যেন কৃতার্থ হয়।'

একটু চুপ থেকে—'কলকাতায় অনেক ডিপার্টমেন্টেও আমার খাতির; সুরেন দাশগুপ্তকে চেনো?'

—'কোন সুরেন দাশগুপ্ত?'

—'আবার কোন সুরেন দাশগুপ্ত—বাংলাদেশে কটা সুরেন দাশগুপ্ত থাকে? তেলের কারবার করে লাখ টাকা করে ফেলেছে।'

—'আমি ভেবেছিলাম সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল।'

—'দূর দূর! সাত ছেলে। এক ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে ইনকামট্যাক্সে চাকরি দেবার জন্য। জুটিয়ে দিয়েছি; এই তো ছ মাস আগে।'

—'আমাকেও দিন না।'

—'ভেকান্সি নেই আর?'

পিসিমা—'সুরেন দাশগুপ্তের ছেলেকে না দিয়ে ও-কাজটা হেমকে দিলে হত মন্দ না।'

—'আহা, সে ছেলে এসে যে আমাকে বাবা ডাকল।'

একটু চুপ থেকে—'বেশ ছেলে! অত বড় তেলের কারবারের মালিক হল বাপ, অথচ ছেলের একটুও ভড়ং নেই। সাদাসিধে। গান্ধী ক্যাপ মাথায় দেয়। মালতীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম—দিব্যি ঝাড়া ঝাপ্টা।'

বললাম—'অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে'

—'আলাপ তো আমার সব ডিপার্টমেন্টেই আছে—'

—'তা হলে কলকাতায় গিয়ে এই সম্পর্কে আপনার সঙ্গে দেখা কবর—'

—'কাকার বাড়িতে গিয়ে দেখা করবে, তাও আবার অনুমতির দরকার হয়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না, এই সম্পর্কে?'

—'এই ডিমটা পচা না কি রে?'

—'কই? না ত।'

—'কেন, ছোট ডিম।'

—'কেমন হাঁস-হাঁস মনে হচ্ছে।'

—'না, না, কাল আবদুল্লার কাছ থেকে রাখল বৌঠান।'

বললাম—'ডিমটা ভালই, তা তোমার? [আপনার) সঙ্গে চাকরির সম্পর্কে কলকাতায় গিয়ে দেখা করব?

—'ছ'মাস আগে যদি দেখা করতে একটা কিছু করা যেতে পারত।'

—'আবার সুযোগ আসবে।'

—'তোমার বাবার যেমন এসেছে।'

—'তদবির করতে দোষ কী?'

—'তুমি গেলে না কেন?'

—'যাওয়া হয়ে ওঠে নি; বিশ বছর আগের কথা, তখন রুচি প্রস্তুতি ছিল অন্য রকম।'

—'কাজ শিখতে পারতে কিংবা প্লামবার অথবা ওয়াটার ট্যাঙ্ক-এর কাজ। এর কত রকম ডিপার্টমেন্ট আছে।'

—'আবগারিরও তো ডিপার্টমেন্ট আছে। সেও মন্দ পুরুস্কার নয়, অন্তত সাধনাশ্রমের থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তো।'

—'আমি ভাবছি আবার সাধনাশ্রমেই ঢুকব। এইবার বেদিতে উঠবে গিয়ে। সমাজের বন্ধু-বান্ধবরাও তাই বলছেন।'

—তুমি না শুনেছিলাম ম্যানেজারি নেবে?'

—'কই? না।'

—'পেলে না?'

—'তোমরা আমার সম্বন্ধে কত অভূতপূর্ব কথাই শোনো, সাহেবের সেক্রেটারি হবার জন্য তদবির করছি, মাদ্রাজে চেষ্টা করছি। কলকাতার ইনসিওরেন্সে বড় চাকরি নিয়েছি।'

—'তোমার সম্বন্ধে কোনো গুজবে আমরা বিশ্বাস করি না মেজদা। সংসারের লোকেদের চিনি না না কি? মানুষকে ঈর্ষা করে তার সম্বন্ধে মিছিমিছি কত কুৎসা রটিয়া বেড়ায়।'

—'অবিশ্যি যা পেনশন পাচ্ছি আমি, তাতে আমার চলে না। চাকরি একটা পেলে ভাল হয়। আমাকে কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু কাজে লাগালেন না। একজনকে নিলেন। ইনসিওরেন্সের মামাবাড়ির খবর জানি রে কিন্তু আমড়াগাছি করতে পারি না বলেই তো আজও পেলাম না। তা, এই পুজোর পর একটা পাবার আশা আছে। একটা বড় কোম্পানিতেই ৫০০ করে মাইনে দেবে।'

পিসিমা, একটু চুপ থেকে, 'হেমকেও একটা কিছু জুটিয়ে দাও না।'

-'ওর হবে ওর বাবার মত।'

—'কী রকম?'

—'থোড় বাড়ি খাড়া— খাড়া বাড়ি থোড়।'

—' তা তোমার একটু চেষ্টা করে—'

—'বেশ তো, ইনসিওরেন্সে একটি এজেন্সি নিক না; নেবে এজেন্সি?'

চুপ করে ছিলাম।

মেজকাকা—'কত ছেলে থার্ড ক্লাস, ফোর্থ ক্লাস অব্দি পড়ে ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর তুমি এম-এ পাস করে নিতে ভয় পাও?'

—'ভয় না মেজকাকা।'

—'তবে? ধরো, বছরে ৫ লাখ টাকার কেস দেবে। আমরণ আওতার থাকবে।'

মা এসে পড়েছিলেন; বললেন, 'তাই তো; এই-ই কর না।'

লেগ পুলিং-এর মানে কী মা জানেন না, মেজকাকার এ পরামর্শের অর্থ কী করে বুঝবেন তিনি আর!

বললাম, 'শুনলাম, কর্পোরেশনের চিফের সঙ্গে তোমার [?আপনার] খুব আলাপ।'

মেজকাকা একটা ধমক দিয়ে—'আবার বাজে কথা বলে!'

—'কর্পোরেশনের একটা চাকরি জুটিয়ে দিন না।'

—'কর্পোরেশন আমাকে বলেছিলেন কয়েকটা বস্তি ইনস্পেক্টরি খালি আছে শুনেছিলাম। বিজয়ের প্রাইভেট মাস্টারটা না খেতে পেয়ে মরছে না কি, তারই জন্য একটা জুটিয়ে দেব ভাবছিলাম।'

—'বেশ তারই একটা দাও না আমাকে—'

—'হ্যাঁ, সে সব কাজ আর বসে থাকে কি না। কলকাতায় একটা চামার মরলেও দু শ গ্রাজুয়েট দরখাস্ত নিয়ে ছুটে আসে।'

—'কী করা যায় তা হলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোঁফে হাত বুলিয়ে 'ও-সব দুরাশা ছাড়ো। তবুও যদি জেল-ফেরৎ হতে, বলে-কয়ে কর্পোরেশনের একটা স্কুলে ঢুকিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু যেমন তুমি, তেমন তোমার বাবা, বায়ুভূত নিরালম্ব জীব। ইহকালটা নমো-নমো করে কাটিয়ে দাও, আর কী, পরকালে কপাল খুলবে।'

কল্যাণী ভাবে কলকাতায় যেতে দেরি করে ফেলছি আমি। কিন্তু দেরি আর কী? দশ দিন আগে গেলেও যা, পিছে গেলেও তাই। কেউ আমার জন্য চাকরি হাতে করে বসে নেই। ফ্রি রিডিং রুমে রোজ গিয়ে খবরের কাগজ পড়ে আসি। প্রায় পাঁচ-ছ খানা কাগজ পাওয়া যায়। নানা রকম চাকরি খালি রয়েছে বটে—রোজই খালি থাকবে, অ্যাকাউন্টট্যান্ট, কম্পাউন্ডার, নার্স, বাজার সরকার, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, স্টেনোগ্রাফার, খানশামা, আয়া ইত্যাদি।

কলকাতায় গিয়েও কাগজপত্রে এই রকম দেখব।

আরো নানা জিনিস দেখেছি, নানা জায়গায় গিয়েছি, অনেকের সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু গত ছ-সাত বছরের মধ্যে এক-আধটা ট্যুইশান পেয়েছি। আর-কিছুই পাই নি। পাবই বা কী করে? আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্রিতা তো আমার নেই, না আছে বিরাট উদ্যমের অপরিমেয়তা।

মরিস বা অস্টিনের মত কোনোদিন আমি মোটর তৈরি করতে পারব? পড়তে পারব? প্রফুল্ল রায় বা নলিনী রঞ্জন সরকারের মত বেঙ্গল কেমিক্যাল কিংবা হিন্দুস্থান-এর মত গড়ে তুলতে পারব? পরিমল গোস্বামীর মত অক্সফোর্ড থেকে ফিরয় জুতো ব্রাশ করত পারব?

কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময়ই শিল্প সৃষ্টি করবার আগ্রহ, তৃষ্ণা, পৃথিবীর সমস্ত সুখ-দুঃখ, লালসা, কলরব, আড়ম্বরের ভিতর কল্পনা ও স্বপ্ন চিন্তার দুচ্ছেদ্য অঙ্কুরের বোঝা বুকে বহন করে বেড়াবার জন্মগত পাপ। কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দিয়েছে। আমার সংসারকে ভরে দিয়েছে ছাই-কালি-ধুলির শূন্যতায়। যে-উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্কোচ সাংসারিকতা ও স্বাভাবিকতা স্বরাজ পার্টি গঠন করতে পারত, কিংবা কংগ্রেস, অথবা একটা মোটর কার, কিংবা একটা নামজাদা বই, বা চায়ের দোকান, অথবা একজন অক্লান্ত কর্মী চেয়ারম্যানকে তৈরি করতে পারে, অসীম অধ্যবসায়ী উকিলকে, কিংবা সচ্চরিত্র হেডমাস্টারকে, মুচিকে, মিস্ত্রিকে [সেই] আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম নেই আমার।

আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের অকুতোভয় স্বাভাবিকতা ও অমিততেজা সাংসারিকতা যদি থাকত তা হলে গত ছ-সাত বছরের মধ্যে কোনো-না-কোনো কাজ আমি নিশ্চয়ই খুঁজে পেতাম; হয় ত কোনো স্কুলে পঁচিশ টাকার মাস্টারি নিতাম, কোনো মেসের সরকার হয়ে যেতাম হয়ত, লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে একদিনে হয় ত প্রদীপ জ্বালিয়ে ফেলতে পরতাম, দর্জির কাজ শিখে ফেলতাম কিংবা স্টেনোগ্রাফার হয়ে যেতাম, নিরবচ্ছিন্ন একাগ্রতায় ক্যানভাস করতমা হয় ত, কিংবা প্রাণপণে শেয়ার বিক্রি করে চলতাম, হয় ত মুদির দোকানের মালিক হয়ে বসতাম, 'কিংবা দু-তিন গ্রুপে এম-এ নিয়ে ফেলতাম, হয় তনিদারুণ একনিষ্ঠতার সঙ্গে জেলে পচতাম, কিংবা ভ্রূক্ষেপহীন অক্লান্তিতে পথে-পথে জুতো সেলাই করে চলতাম।

আলুর আড়ৎ না-খুলে সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাচ্ছি বলে মনের ভিতর কোনো বেদনা থাকত না।

যদি আমি বিবাহ না করতাম, সন্তান না হত আমার, যদি একা থাকতাম আমি—তা হলেও শিল্পসৃষ্টি ভালবেসে, সংসারে বিফল হয়ে, মনের ভিতর কোনো নিরবচ্ছিন্ন বেদনা থাকত না। হয় ত খুব লঘুভাবে থাকত। কিন্তু কল্যাণী ও খুকির ভার এমন একজনের উপর পড়েছে, যে, না-পারে ঐকান্তিকভাবে শেয়ার ক্যানভাস করে বেড়াতে, না-পারে ঘোলের-শরবতের দোকান খুলে লক্ষ্মীকে অধিকার করবার বিন্দু মাত্র আগ্রহ দেখাতে।

সমস্ত কারুতান্ত্রিকই কি সংসারের স্ত্রীর প্রতি এমন বিরাটভাবে উদাসীন?

তা ঠিক নয়; শিল্পযাত্রীও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ হিসেবেই রক্তমাংসের সুখ—সুবিধা সুব্যবস্থা চায় বই কি, কিন্তু তার জীবনের মধ্যে প্রেরণার ভিতর নিরবয়বকে [উপলব্ধি] করে আনন্দ, ও অবয়বসম্পৃক্ত নিষ্ফলতা, আবহমান-কাল থেকে এই মধুর মারাত্মক বীজ রয়ে গেছে।

একখানা গল্পের বইয়ের সাংসারিক দাম যে তেমন কিছু নয়, একখান কবিতার বইয়ের দাম যে আরো ঢের কম তা তাকে বারবার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে সংসার; কিন্তু তবুও সমস্ত কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সংসারের ছককাটা উন্নতির পথে পরিপূর্ণ অন্তর্দান করবার মত স্বাভাবিকতা কোনোদিনই সে অর্জন করতে পারে না। এমনই অস্বাভাবিক অবৈধ মানুষ সে, এই আর্টিস্ট। চণ্ডীদাস একজন, ভিলোঁ আর-একজন হাইনে একজন, আর-একজন ভারতচন্দ্র। শিল্পের সাহিত্যের আর্টের ইতিহাসে এমন আরো অনেক নাম রয়ে গেছে যারা না-খেতে পেয়ে মরেছে, কিংবা যক্ষ্মায়, কিংবা লাঞ্ছিত হয়ে, কিংবা দুর্দিনের তিমিরে স্বল্পতায়।

কিন্তু তবুও শিল্পীর জীবনের নিদারুণ ভবিতব্যতার পথ থেকে সংসারের যক্ষের শান্তিনিকেতনে পালিয়ে যেতে চায় নি, যেতে পারে নি, কেউ কোনোদিনও পারে নি, কোনোদিনও পারবে না।

চারদিকে ছায়া জমে গেছে; বিকেলের ছায়ার সঙ্গে মিশেছে মেঘের গভীর অন্ধকার। নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি আরম্ভ হল। বেশ লাগে আমার এই বৃষ্টি, খড়ের উপর সম-সম শব্দ হয়, ধুলোমাটির নরম সোঁদা গন্ধ ভেসে আসে, কেমন একটু শীত-শীত করে, সুগন্ধি কেয়া-কদমের মত দেহ কাঁটা দিয়ে উঠে। হৃদয় শিহরিত হয়ে ওঠে অবচেতনে। চারদিকে তাকিয়ে দেখি শুধু মৌসুমির কাজলঢালা ছায়া। কিশোরবেলায় যে-কাল মেয়েটিকে ভাববেসেছিলাম কোন এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙিনার নিকটবর্তিনী ছিল, বহু দিন যাকে হারিয়েছি—আজ, সেই যেন, পূর্ণ যৌবনে উত্তর আকাশের দিগঙ্গনা সেজে এসেছে। দক্ষিণ আকাশ সেই যেন দিগবালিকা, পশ্চিম আকাশেও সে-ই বিগত জীবনের কৃষ্ণা মণি, পূর্ব আকাশে আকাশে ঘিরে তারই নিটোল কাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ। নক্ষত্রমাখা রাত্রির কাল দিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মত রূপ তার—প্রিয় পরিত্যক্ত মৌনমুখী চমরীর মত অপরূপ রূপ। মিষ্টি ক্লান্ত অশ্রুমাখা চোখ, নগ্ন শীতল নিরাবরণ দু'খানা হাত ম্লান ঠোঁট, পৃথিবীর নবীন জীবন ও নবলোকের হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনার সেই পুরোন পল্লির দিনগুলোর সমর্পণ করে কোন দূর নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তার যাত্রা।

সেই বনলতা—আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে। কুড়ি-বাইশ বছরের আগের সে এক পৃথিবীতে; বাবার তার লম্বা চেহারা, মাঝ-গড়নের মানুষ—সাদা দাড়ি, স্নিগ্ধ মুসলমান ফকিরের মত দেখতে; বহু দিন হয় তিনিও এ পৃথিবীতে নেই আর; কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানও নেই তাদের আজ; বছর পনের আগে দেখেছি মানুষজন নেই, থমথমে দৃশ্য লেবু ফুল ফোটে, ঝরে যায়, হোগলার বেড়াগুলো উঁইয়ে খেয়ে ফেলেছে। চালের উপর হেমন্তের বিকেলে শালিক আর দাঁড়কাক এসে উদ্দেশহীন কলরব করে। গভীর রাতে জ্যোৎস্নায় লক্ষ্মীপেঁচা ঝুপ করে উড়ে আসে। খানিকটা খড় আর ধুলো ছড়িয়ে যায়। উঠানের ধূসর মুখ জ্যোৎস্নার ভিতর দু-তিন মুহূর্ত ছটফট করে। তার পরেই বনধুঁধুল, মাকাল, বইচি ও হাতিশুঁড়ার অবগুণ্ঠনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললে সে। তার পর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নত মুখে মাঝ পথে গেলে থেমে, তার পর খিড়কির পুকুরের কিনারা দিয়ে শামুক-গুলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নিচে একবার দাঁড়াল, তার পর পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার পর তাকে আর আমি দেখি নি।

অনেক দিন পরে আজ আবার সে এল; মনপবনের নৌকায় চড়ে নীলাম্বরী শাড়ি পরে চিকন চুল ঝাড়তে-ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা নির্জন দু'খানা হাত, ম্লান ঠোঁট শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হায় প্রকৃতি, অন্ধকারে তার যাত্রা—।

খুব মৃদু চটি জুতোর শব্দ।

ঘরের ভিতর বাবা এসে ঢুকেছেন।

—'খোকা।'

—'আমাকে ডাকছ বাবা?'

—'শুয়ে আছিস যে?'

—'এমনিই, তুমি কখন স্কুল থেকে এলে?'

—'অনেকক্ষণ'

—'সাড়াশব্দ পাই নি তো?'

—'বারান্দায় বসে ছেলেদের এক্সাসাইজ খাতা দেখছিলাম। তোর মা কোথায়?'

—'রান্নাঘরেই তো—'

—'তা হবে; দেখলাম এক থালা লুচি ভেজে সুরেশকে দিল; বিকেলে তুই খাস নি?'

—'না। তুমি?'

—'আমি ঐ ছোলা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, একটু গুড় দিয়ে দিয়ে খেলাম। খাবি না কি?'

—'আছে আরো?'

—'ঢের আছে–'

বাবা ছোলা-গুড় আনবার জন্য উঠে যাচ্ছিলেন।

বাধা দিয়ে—'আচ্ছা আমিই নিয়ে আসব এখন, তুমি বসো।'

—'আচ্ছা বেশ'

একটু হাই তুলে, 'বৃষ্টি পড়ছে যে রে, টের পাসনি?'

—'হ্যাঁ পেয়েছি।'

—'তা হলে ঝাঁপি খুলে রেখেছিস কেন?'

—'কী আর হবে?'

—'জানলার জলের ছাট এসে টেবিলের বইগুলো ভিজে যাচ্ছে যে।'

—'যাক। এমন কী আর বই?'

—'কেন, কোনো ভাল বই নেই?'

মাথা নেড়ে—'না।'

বাবা বললেন—'খানিকটা খুচরো চা এনেছি।'

—'মেজকাকার জন্য?'

—'না, সুরেশ কি আর এই ছ-আনা পাউন্ডের চা খাবে?'

—'ছ আনা বুঝি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হ্যাঁ। চা খাবি? তা খাওয়াই ভাল, এই বৃষ্টি-বাদলের দিনে ঠাণ্ডা লাগে, একটু গরম চা বেশ কাজ করে; সর্দি-কাশি নষ্ট হয়, মনের ভিতর একটু আশা-ভরসাও পাওয়া যায়। তোমার মাকে দিও, করে দেবে।'

—'তুমি খাবে না?'

—'চা খাওয়ার অভ্যেস নেই আমার।'

—'নেই অবিশ্যি, কিন্তু—'

—'খেলে ঘুম হবে না যে রে।'

চায়ের মোড়কটা জীর্ণ-বিবর্ণ সাদা খদ্দরের কোটের পকেটের থেকে বের করে বাবা টেবিলের ওপর রাখলেন।

বললেন—'কলকাতায় যাবার টাকাটা জোগাড় করেছি। কবে যাবে?'

—'একদিন গেলেই হয়।'

—'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই ভাল।'

—'এই সাত বছর ধরে কত বারই তো এলাম-গেলাম, বাবা।'

—'কিন্তু এবার তো গত সাত বছরের মত হবে না।'

—'হবে না?' একটু হেসে, 'কী করে তুমি জানলে বাবা?'

—'আমার বিশ্বাস, তোমার মারও বিশ্বাস....'

একটু বিদ্রুপ করে হেসে বললাম, 'কী যেন বলছিলাম...'

বাবাকে আহত হতে দেখে জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে চুপ করে রইলাম।

—'তোমার মেজকাকার সঙ্গে কথা হয়েছিল?

-'হ্যাঁ'

—'চাকরি-বাকরির কথা?'

—'হ্যাঁ, হয়েছিল।'

—'কী বললেন?'

'বললেন, তুমি আর তোমার বাবা ইহকালটা নমো-নমো করে কাটিয়ে দাও, পরকালে হয় ত কপাল খুলে যাবে।' দু-এক মুহূর্ত বাবা শ্রীহীন, জীর্ণ, ক্ষীণ মুখে বসে রইলেন।

তার পরেই হো-হো হেসে—'ও, তা এই বুঝি বললে সুরেশ?'

—'হ্যাঁ'

—'মন্দ বলে নি। কিন্তু পরলোকে আমি তো বিশ্বাস করি।'

—'আমি তো কিছুতেই করে উঠতে পারলাম না।'

-'পারলে না?'

—'মৃত্যুর পর কী আর থাকে?'

—'থাকে নাই কি; সমস্তই থাকে; আরো গভীর অধ্যাত্মভাবে থাকে, উপনিষদের—'

-'উপনিষদ যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা পরলোক থেকে ফিরে এসে রচনা করেন নি তো; রক্ত-মাংসের শরীরে ইহলোকে বসে যে—ধারণা তাদের ভাল লেগেছে তাই ব্যক্ত করে গেছেন; তাঁদের বিশ্বাসে আশ্বস্ত হবার কোনো কারণ দেখি না।'

-'এক দিন হয় ত দেখবে।'

—'আশীর্বাদ করো, দেখতে পারি যেন।'

—'নিজের মনের আন্তরিক অনুসন্ধানে যা সত্য বোধ হয় সেই টেকে। বিশ্বাস করো, এই আশীর্বাদ করি।'

—'তা হলে হয় ত চিরজীবন অবিশ্বাসী হয়েই থাকব।'

—'থাকো।'

—'ভাবতে গেলে তোমার দুঃখ করে না বাবা?'

—'কী দুঃখ? একে-একে যে দুই হয় এ-কথা যদি আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, আমার বুদ্ধি-বিচার কলা সমস্তই যদি সাব্যস্ত করে যে তিন হয়—তা হলে এই অন্ধতার অভিশাপ বুকে নিয়েই জীবনের পথে চলতে হবে; এ অভিশাপ মোচন করবার শক্তি আমার নেই। কোনো মানুষের নেই—বিধাতা যদি দয়া করে আলো দেন তবেই তা ঘুচতে পারে।' সাদা গোঁফ জোড়ায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বাবা বললেন—'কিন্তু এটা মনে করো না হেম, যে একে-একে তিন হয়, দুই হয় না। এই ভুল ধারণা নিয়ে তুমি জীবন চালাচ্ছ। হয় তো আমার এ ভগবানে বিশ্বাস, পরলোকে ঐকান্তিক আস্থা, সেই সব ভুল; জীবন-মৃত্যুতে আমি ধোঁয়ার ধাঁধা নিয়ে কাটালাম।' বলে সাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে হাসতে লাগলেন আবার।

বললেন 'যাক্ দু-তিন বছরের মধ্যেই বুঝতেই পারব সব।'

চোখ তুলে তাকালাম বাবার দিকে।

—'ভগবান ও শান্তির দিকেই যাচ্ছি, এই ভেবে মরব।'

—'কিন্তু এও তো হতে পারে মরে জেগে উঠব না আর।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা বললেন—'কলকাতায় গিয়ে পঁচিশ টাকার স্কুল মাস্টারি নিও না।'

—'কেন?'

—'হেডমাস্টার হয় ত সামান্য বি-এ পাস, ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাসে ইংরেজি পড়াচ্ছেন, আর তোমাকে দেওয়া হবে ভূগোল আর অঙ্ক পড়াতে। এ সব অবিচার চোখ বুজে ক্ষমা করে দেবার মত কোনো প্রয়োজন দেখি না আমি।'

চুপ করে ছিল্যাম।

—'হ্যারিসন রোডের মেসে যদি থাকো তা হলে উল্টোডাঙ্গা, ঢাকুরিয়া বা চেৎলা-ফেৎলায় কোনো টিউশন নিতে যেও না।'

—'নেব না?'

—'না'

—'কেন?'

—'এ সম্বন্ধে আমার মতামত খুব ভাল করেই জানো। হয় তো কুড়ি টাকা-পঁচিশ টাকা দেবে তোমাকে, কিংবা আরো কমই দেবে হয় ত, জীবনে টাকার মুখ তুমিও কম দেখেছ, সে ট্রেন ভাড়া দিতে গিয়ে তোমার অন্তঃকরণ খেঁকিয়ে উঠবে একেবারে। এ বড় দীনতার কথা, মানুষ এতে বড় খাটো হয়, বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে পায়ে হেঁটে যাবে সেই উল্টোডাঙ্গা পায়ে হেঁটে ফিরবে আবার; শরীরের দিক দিয়ে এর ভেতর যত না কষ্ট, আত্মার দিক দিয়ে তার চেয়ে ঢের বেশি অপচয়; কেন এ অপচয় করবে তুমি?'

একটু চুপ থেকে হেসে—'তা না-হলে কী করব?'

—'তা তুমি জান, আমার সন্তান হয়ে যখন জন্মেছ তখন অনেক বেদনা বইতে হবে তোমাকে। কিন্তু প্রাণ যাতে চিমসে হয়ে যায়, ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে, এমন কোনো জিনিস করো না তুমি; বেদনা ও সঙ্কীর্ণতা এক জিনিস নয়। যে-কোনো কাজে বা চিন্তায় জীবনের প্রসার নষ্ট হয়, তার থেকে নিজেকে ঘুচিয়ে নিও। বরং বাড়িতেই চলে আসবে আবার; কী আর করবে? পনের টাকার টিউশনের জন্য, টিউশনের টাকার প্রতিটি কানাকড়িও বাঁচাবার জন্য হ্যারিসন রোড থেকে চেতলায় হেঁটে যাওয়া-আসা জীবনের এত বড় শকুন কোনোদিন সাজতে যেও না তুমি।'

হাসছিলাম।

বাবা বললেন—শকুন; কিন্তু বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে দশ টাকা-পনের টাকার টিউশন এর জন্য যারা চেতলা-উল্টোডাঙা পাড়ি দেয় তাদের দলে ভর্তি না হলে কলকাতায় যুদ্ধ যে আজকাল চলে না বাবা কি তা জানেন? দশ টাকা না হোক, বিশ টাকা পেলে?

বাবা বললেন—'কলকাতায় গিয়ে চা খাও না?'

—'খাই'

—'দোকান থেকে?'

—'হ্যাঁ'

—'বৌমার ঘরে একটা স্পিরিটের স্টোভ পড়ে আছে, খুকি হবার সময় কেনা হয়েছিল, সেইটে নিয়ে নেও।'

—'আচ্ছা'

—'এক বোতল স্পিরিট কিনে নেবে—খানিকটা খুচরো চা, নিজে তৈরি করে খাবে।'

—'তা খাওয়া যায়।'

—'আর খানিকটা বাতাসা, চার সঙ্গে। সন্ধ্যার দিকে কী করো?'

—'যদি টিউশন থাকে তো ছেলে পড়াতে যাই।'

—'আর যদি না—থাকে?'

—'তাহলে ফুটপাতে বেড়িয়ে-বেড়িয়ে, ওল্ড বুক শপের দু-চার খানা বই নেড়ে দেখি, এক-একটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, আবার হাঁটি, চায়ের দোকানের খবরের কাগজ নিয়ে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকি।'

—'বাঃ, এ সব কি মানুষের ভাল লাগে?'

—'না, আগে ভাল লাগত না একদম, কিন্তু কয়েক বছর ধরে তালিম হয়ে গেছে।'

—'কিন্তু তবুও এ ত সত্যিকারের জীবন নয়।'

—'তা হয় ত নয়—আমার কি ইচ্ছে করে জানো?'

বাবা তাকালেন আমার দিকে।

বললাম—'মস্ত বড় একটা মাঠের মধ্যে কুঁড়ে ঘর বানিয়ে থাকি; পাশে মেঘনা কিংবা কর্ণফুলী, অথবা ইছামতী। পেটের জন্য কোনো চিন্তা থাকে না, দিন রাত লিখি আর পড়ি। দিগন্তবিস্তৃত সোনালি খড়ের মাঠের কিনারে বেড়াই, লাল আকাশ ভেঙে সন্ধ্যার দাঁড়কাকগুলোকে ঘরে ফিরে চলে যেতে দেখি।'

বাবা চুপ করে ছিলেন।

বললাম—'কিন্তু এ হয়ত শখ হল, পলায়ন হল, জীবন হল না। জীবন হয়ত ভিড়ের মধ্যে মিশে, যা করতে ইচ্ছা করে না, ভাবতে ভাল লাগে না, সেই অপ্রেমের কাজ ও চিন্তার জন্য সহানুভূতি ও সাহায্যের চেষ্টা।'

খানিকটা সময় কেটে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা এ-সব কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

বললেন—'কলকাতায় তোমার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই?'

—'বছরের পর বছর ক্রমেই কমে যাচ্ছে।'

—'কেন?'

—'মতিগতির পার্থক্য বেড়ে যাচ্ছে হয় ত—'

—'ববা একটু চুপ থেকে-'তারা হয় তো সাংসারিক সফলতা লাভ করছে।'

—'হ্যাঁ, কেউ করেছে, কেউ চেষ্টায় আছে।'

—'যাদের সঙ্গে থাকতে, কলেজে পড়তে, তারা আজ ট্রামে করে সেক্রেটারিয়েটে যায় আর তুমি ঘোরো ফুটপাতে?'

—'অনেকটা তাই'

—'অবিশ্যি এতে ব্যথা পাবারই তো কথা—'

—'না, সেক্রেটারিয়েট আর এমন-কী জিনিস, সেখানে ঢুকতে না পেরে খুব বঞ্চিত হলাম এ-কথা অবিশ্যি মনে করি না।'

—'নিজের মনকে হয় ত সান্ত্বনা দাও এই ভেবে যে এর চেয়ে কংগ্রেস ঢের বড় জিনিস। সেখানে সকলের অবাধ প্রবেশ; হয়ত কোনো এক ভবিষ্যতে সেখানে সে নেতা হয়ে বসবে।'

—'না অতদূর ভাবি না'

—'খানিকটা ভাবো নিশ্চয়ই; ভাবাই স্বাভাবিক। জীবনের আরাম ও বিলাসের জিনিসগুলো যাদের হাত থেকে ফসকে গেছে, অবশেষে তারা ত্যাগ ও মহিমার অকৃত্রিম ভক্ত হেয় ওঠে, না-হলে দাঁড়াবে কোথায়, বলো? ঐশ্বর্য যাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রবঞ্চিত করে, ঐকান্তিক অশ্রু দিয়ে ত্যাগকে পূজা করবার শক্তি তার যেমন হয়, আর কারুর তেমন হয় না।'

—'কই, কংগ্রেসে আমি যাই নি তো!'

—'যাবার দরকার করে না তো; অনেক দিন থেকেই তোমার হৃদয়ে দেশপ্রেমের আসন পেতে রেখেছ হয় ত; সে আসন সব সময়ই চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু এক-এক সময় পড়ে, যখন কলেজের বন্ধু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতায় এসে গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে মোটর চালিয়ে ছুটছে আর তুমি পথের বেকার; যখন ছেলেবেলার খেলার সাথি তার মেমসাহেবকে নিয়ে বক্সে বসেছে আর তুমি চার আনার সিটে মাথা গুঁজে আছ।'

একটু চুপ থেকে—'দেশ, কংগ্রেস, দেশবন্ধু, বিরাট আত্মত্যাগ, অপরিমেয় স্বদেশ প্রেম—এই সবের কথা তখন মানুষের চিত্তকে সজীব করে গেলে তাকে সান্ত্বনা দেয়।'

গোঁফে হাত বুলিয়ে বাবা বললেন,—'পৃথিবীতে টিকে থাকবার নিজের আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও আত্মার কাছে মর্যাদা পেয়ে টিকে থাকবার এই রকম সব বিধি ব্যবস্থা আছে। এ-সব না-থাকলে জীবনের নিঃসম্বলতা বড় ভয়াবহভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠত। শুধু কথা ভাবা, শুধু স্বপ্ন নিয়ে খেলা করা। কিন্তু তবুও এ-সবের ঢের মূল্য আছে।' একটু চুপ থেকে বাবা—'বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে অবিশ্যি মানুষ নিজেকে সান্ত্বনা দেয় আর-এক ভাবে—জীবনের সচ্চরিত পথ ও ভগবান কিংবা ভবিতব্যতা ও মৃত্যুর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে বয়স এখনো তোমার আসে নি। এখনো দেশের মাটি, কংগ্রেস, কবিতা ও সাহিত্যের মর্যাদা, সাহিত্য স্বপ্ন, অবাস্তববাদ এই সব মোহকে আশ্রয় করেই ফুটপাতে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবার জোর পাচ্ছে।'

—'না, মৃত্যুর চিন্তাও মাঝে-মাঝে করি।'

—'করো?'

—'মাঝে-মাঝে মনে হয় বয়স চৌত্রিশ হয়েছে বটে—সত্তর হয় নি, কিন্তু তবুও সবই যেন সমাপ্ত হয়ে গেছে; কেমন একটা গভীর অবসাদ পেয়ে বসে। সন্ধ্যার অন্ধকারে মেসের বিছানার থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না, মনে হয়, সব দেখেছি, জেনেছি, বুঝেছি, সব লিখেছি, তখন ঘুমিয়ে পড়া যাক, অন্ধকার বেড়ে চলুক, কোনোদিনও যেন এই অন্ধকার শেষ হয় না, ঘুম কোনোদিনও ফুরোয় না যেন আর।'

—'আরো কী-রকম চিন্তা কারো?'

চুপ করে ছিলাম।

—'এই সৃষ্টিটাকে একটা পাখির খাঁচার মত তৈরি করে নিতে পারা যায়, তখন মানুষের অবস্থা বড় ভয়াবহ ওঠে। আমার অনেক সময় মনে হয় জীবনটা কলে ধরা ইঁদুরের মত। যেন চারিদিকে শিক আর শিকল শুধু—না আছে রূপ না আছে ফুর্তি—'

বাবা বিশেষ গ্রাহ্য না করে বললেন—'দুপুরবেলা কী করো? মেসে থাকো?'

—'আগে থাকতাম না, আগে বড় নির্বোধ ছিলাম।'

—'কী রকম?'

—'মেসের বিছানায় একা-একা শুয়ে থাকতে বড় খারাপ লাগত।'

—'একা-একা?'

—'হ্যাঁ। সবাই অফিসে চলে যায়; অফিসারদের মেস, সকলেই কোথাও-না-কোথাও কাজ করে-জীবনের জবাবদিহি দেয়, জীবনের কাছ থেকে পুরস্কার পায়। এই সব অনেক দিন ভেবে-ভেবে বিছানায় আর শুয়ে থাকতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারি না আমি আর। মনে হত বেড়িয়ে আমিও হয় ত সৃষ্টির কাছে নিজের জীবনের কৈফিয়ৎ দেবার সুযোগ বের করে নিতে পারব।'

—'কিন্তু আজকাল বেরোও না বুঝি আর?'

—'নাঃ,' একটু হেসে বললাম, 'অবাক হয়ে ভাবি, জীবনের চার-পাঁচটা বছর ধরে সমস্তটা দুপুর কলকাতা শহরের কত জায়গায় টো-টো করে বেড়িয়েছি। ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং, ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিং, ক্যালকাটা কর্পোরেশন, ইন্সিওরেন্স অফিসগুলো। এক-একটা জায়গায় পনের-বিশ বার করেও গিয়েছি। নিজের জবাবদিহি দেবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের এমনই প্রবল, এমনই রুচি তার যে সে মনে করে ইনকাম ট্যাক্স অফিসের এক জন কেরানি হলেও জবাবদিহি দেওয়া হয়, কিন্তু দুটো কবিতার বই বের করলে হয় না। এই চার বছর যদি আমি এক মনে শিল্প সৃষ্টি করতাম, তা হলে অনেকগুলো মূল্যবান রচনা বের করতে পারতাম।'

—'যাক, চার বছর ঘুরেছ ভালই করেছ; না-যদি ঘুরতে তা হলে হয় ত মনে করতে কতকগুলো অসার কবিতা লিখে রাজত্ব তো নষ্ট করলাম, রাজকন্যাও গেল।'

গোঁফে হাত বুলিয়ে বাবা বললেন—'আমাদের মন এই রকমই কেমন যেন রহস্যের জিনিস।'

একটু চুপ থেকে—'আজকাল দুপুরবেলা মেসে কী করো?'

—খবরের কাগজ পড়ি।

—'খবরের কাগজ আর-কতক্ষণ পড়া যায়?'

—'বোর্ডাররা প্রায় চার-পাঁচ খানা খবরের কাগজ রাখে।'

—'পড়বার ভার দিয়ে যায় তোমার উপর?'

—'পড়তে মন্দ লাগে না কিন্তু শেষ পর্যন্ত—'

—'এই তো রচনার কথা বলছিলে, কিন্তু লেখোটেখো না কেন?'

—'লিখতে চেষ্টা করি মাঝে-মাঝে।'

—'তার পর?'

—'পেরে উঠি না—'

—'কেন? দুপুরবেলা মেস তো বেশ নিরিবিলি।'

—'কবিতা লেখার ওপর আগেকার সে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি আমি।'

—'কেন?'

—'মানুষের জীবন নানা রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আস্তে-আস্তে স্থূল হয়ে পড়ে যেন—অবসাদ আসে, সমাপ্তির গন্ধ পাওয়া যায় যেন...।' একটু চুপ থেকে—'নবপর্যায়ের কবিতা লিখবার আগে এই স্থূলতা ও অবসাদটাকে ধীরে-ধীরে আত্মসাৎ করে এর [অংশ] হওয়া দরকার। তাই এই কাগজ পড়ে, যা হয়েছে যা হয় নি সেই কথা ভেবে-ভেবে, জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছি।'

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

—'তা হলে নব পর্যায়ের কবিতা লিখবে তো?'

—'হ্যাঁ লিখব বই কি?'

—'হ্যাঁ, লিখো, একটা কিছুতেই বিশ্বাস রেখো,' বাবা বললেন, 'লাইব্রেরি থেকে বই এনে দুপুরবেলাটা পড়ো।'

—'আচ্ছা'

—'খবরের কাগজ বিশেষ পড়তে যেও না, এই রকম হতাশ পরিশ্রমের কাজ মানুষের জীবনের আর দ্বিতীয়টি নেই।'

বললেন—'লাইব্রেরি থেকে কী বই এনে পড়বে, সে সম্বন্ধে উপদেশ দেবার অধিকার আজ আমার নেই; যে-বই রুচিতে ধরে তাই পড়ো। কিন্তু লাইব্রেরিটা যেন উঁচু জাতের হয়, যেমনটি ধরো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি।' একটু চুপ থেকে—'এতদিন ধরে তুমি যা শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছ, তোমার যা শক্তি ও বিচার আছে, তাতে এ-সব লাইব্রেরির থেকে বই এনে পড়বার অধিকার পেলে নিজের চিন্তা বা কল্পনার অপব্যবহার করবে না তুমি—এই আমি আশা করি,'—বলে উদ্ভাসিত মুখে আমার দিকে তাকালেন।

আবার খানিকক্ষণ চুপ থেকে তার পর বলতে লাগলেন—'আমাদের সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেসে একা ঘরে তুমি দুপুরবেলাটা কাটাবে—যাদের কোনো কাজকর্ম নেই, জীবনে কোনো নিকট সফলতা নেই হয় ত, যারা অনেক দিন ধরে সংসারের কাছে বিড়ম্বিত হয়ে আসছে, যাদের হৃদয় শেষ পর্যন্ত বাস্তবিক স্থূল নয় কিন্তু সত্যিই খুব কুণ্ঠিত, নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চিত করবার শক্তি যাদের ঢের কম, আত্মপীড়িত করবার শক্তি খুব বেশি—এই দুপুরবেলার সময়টা তাদের কাছে কত যে যন্ত্রণার জিনিস হতে পারে আমি তা খুব গভীর ভাবেই বুঝি।'

কিছুক্ষণ থেমে থেকে শেষে বললেন, 'কিন্তু তবুও কয়েকটা কাজ করতে তোমাকে নিষেধ করছি আমি তুমি করতে যেও না। চাকরি-বাকরি না পেয়ে অলস হয়ে থাকতে হচ্ছে বলে মিছিমিছি নিজেকে নির্যাতন করতে যেও না, তোমার চেয়ে অনেক কম শক্তি নিয়ে অজস্র লোক সংসারের কাছ থেকে ঢের বেশি পুরস্কার পাচ্ছে বলে। কলকাতায় অহরহই এই জিনিস দেখবে তুমি, দুঃখ পেতে যেও না, কারুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, ট্রাম-বাস-লরি-মোটর ব্যস্ত-সমস্ত নিরবচ্ছিন্ন ভিড়ের সমাবেশ নিয়ে কলকাতা শহরের কাজের চাকা দিনরাত ঘুরে চলেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে নিজের মনে স্থৈর্য নষ্ট করে বসো না, উত্তেজিত হয়ে সময়ে—অসময়ে ফুটপাতে ঘুরে মরো না; কাজকর্মহীন লোকের পক্ষে কলকাতা থাকা একটা বিড়ম্বনা। ফ্যাকরা হচ্ছে এই যে চারদিকের ঘাত-প্রতিঘাতের সম্পর্কে তারা মুহূর্তে-মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে ঠিকরে বেরোয়; নিজের প্রকৃত পথ ভুলে যায়, আগুনের মুখে দেওয়ালি পোকার মত জীবনের যথার্থ সম্ভাবনাগুলোকে বারংবার অন্ধভাবে নষ্ট করে ফেলে। নিজের শক্তি ও রুচির পরিমাপ খুব গভীরভাবে বিচার করে ঠিক করে নিও। নিজেকে যে-পথের উপযুক্ত মনে করো বস্তুনিষ্ঠ হয়ে সেই পথেই চলো। জীবনের আশা, আশাভঙ্গ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পরিণামের হিসেবে অবঞ্চিত থেকে সূর্যের আলোয় বিশ্বাস করে অগ্রসর হয়ো।'

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর বাবাকে আমি বললাম—' দেখেছ বাবা, কী রকম বৃষ্টি পড়ছে।'

—'হ্যাঁ।'

—'দেশের এই বর্ষাকে জীবনের সত্তর বছর বসেই তো দেখলে।'

—'দেখলাম।'

—'পাড়াগাঁয়ের এই বৃষ্টি আমার খুব ভাল লাগে। বিশেষত এমনি রাতের বেলা।'

—'বেশ জিনিস।'

মনে-মনে ভাবলাম, এই রাত আর বর্ষা যদি চিরকাল থাকত। এই বাঁশের জঙ্গলের বাতাস, ঘরের পাশের লেবু পাতার থেকে চুপ-চুপ জলের শব্দ, মাঠে-মাঠে ব্যাঙের কোলাহল, জাম, তেঁতুল ও কাঁঠালের ঠাণ্ডা ডালপালার অবিরাম শব্দ, কোনো তিমিরচারিণীদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে প্রেতজীবনের প্রতিধ্বনির মত দু-তিনটি দাঁড়কাকের অবশ বিহ্বল কলরব।

—'তুমি শুয়ে পড়েছ বাবা?'

—'না'

—'কী করছ?'

—'না' একটু আলো জ্বালিয়ে পড়ছি।'

—'রাতের বেলা পড়ো না, তোমার তো ক্যাটারেক্ট।'

বাবা একটু হেসে, 'তেমন সিরিয়াস ক্যাটারেক্ট তো নয়। ভগবান শিগগির অন্ধ করবেন বলে মনে হয় না।' একট চুপ থেকে—'এই রাতের আলোতে চোখে তেমন খোঁচা লাগে না তো'। আরো খানিকক্ষণ চুপ থেকে, 'অবশ্য নীল চশমাটা পরেছি, চোখে বেশ আরাম লাগে।'

নীল চশমাটা অবিশ্যি সামান্য একটা এক টাকা দামের বাজারের জিনিস।

কয়েক মিনিট পরে বই বুজিয়ে, বাতি নিলিয়ে, বাবা-জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে—'আহা, অনেক বিরহের পর যেন এই মাঠঘাট, আম-কাঁঠালের জঙ্গল, এই করুণার সমুদ্রকে পেয়েছে।'

অঝোর শ্রাবণের দিকে তাকিয়ে জানলার পাশে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবা। চিমসে রোগা চেহারা—জরাজীর্ণ চোয়াল, গাল, হাত-পা, ত্বক।

'জানলার কাছে দাঁড়িয়েছে, ঠাণ্ডা লাগবে তো তোমার।'

বললেন—'জানলা বন্ধ করে দেব?'

—'আমিই দিচ্ছি।'

নিজেই বন্ধ করলেন।

চেয়ারে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, পরে ধীরে-ধীরে বললেন—'এত বুড়ো বয়সেও স্ত্রী যে আমার বেঁচে আছে, রোজগারের জন্য বিদেশে-বিদেশে ঘুরতে হয় না যে আমাকে, এমনি নিরিবিলি শান্ত শ্রাবণের রাতে দেশের বাড়িতে নিজের বিছানায় যে শুয়ে থাকতে পারি—অনেকবার আমার জীবনের এই সব সমস্যার কথা ভেবেছি আমি; কিন্তু তবুও যতটা শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া উচিত ছিল তা পাই নি।'

দু'জনেই চুপ করে ছিলাম।

—'দেশের বাড়িতে একাদিক্রমে সত্তর বছর কাটানো বড় কঠিন জিনিস,' একটু চুপ থেকে, 'যাক, কাটিয়ে দিয়েছি।'

বললেন—'তোমার মাও কাটিয়ে দিয়েছেন বিধাতা যদি এসে বলেন। জীবনের পুনরভিনয় করতে, বলি না, থাক, এখন ভবিষ্যতে আমাদের জন্য যা সঞ্চিত আছে তাই দাও।'

তেঁতুল গাছের ডালপালার ভিতর কয়েকটা বক বকবক করে ডেকে উঠল। বাবা বললেন—'তোমার মা এখনো আসেন নি?'

—'না,

—'রান্নাঘরে আছেন?'

—'দক্ষিণের ঘরে মেজকাকার সঙ্গে গল্প করছেন বোধ করি'

—'বৌমা কোথায়?'

—'খুকিকে নিয়ে ঘুমিয়েছেন দেখে এসেছি।'

—'তোমার ঘর আজ যে বড় অন্ধকার করে রেখে দিয়েছে, আলো জ্বালো নি যে?'

—'জ্বালি নি, এমনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'রোজই তো আলো জেলে পড়াশোনা করো।'

—'আলোটা মেজকাকার জন্য নিয়ে গেছেন।'

—'কে?'

—'পিসিমা।'

—'কেন?'

—'মেজকাকার ও-ঘরের আলোর চিমনি ফেটে গেছে।'

—'ওঃ, তা হলে আমাকে আগে বলো নি কেন?'

—'আলোর দরকার বোধ করি নি আজ আর।'

—'লাগলে আমার দেরাজ থেকে মোমবাতি নিয়ে এসো।'

—'তা আনব।'

—'তোমার এদিকের জানলা খুলে রেখেছ দেখছি—'

—'দেখো, কেমন লেবু গাছের পাতা জানলার ভিতর দিয়ে এসে ঘরের ভিতর ঢুকেছে, লেবু ফুলের গন্ধ পাচ্ছ, বাবা?'

বাবা একটু চুপ থেকে—'হ্যাঁ, অন্ধকারে কেমন একটু হালকা গন্ধ।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে—'এমনি পাড়াগাঁর এই সব রাত তোমার খুব ভাল লাগে বুঝি?'

মনে-মনে ভাবছিলাম, অলস নিষ্কর্মা লোক, সংসারের পথ থেকে যে ভয় পেয়ে ফিরে এসেছে, এ রাতগুলো তার পক্ষে কী যে পরম সুন্দর আশ্রয়ের জিনিস! জেগে থেকে স্বপ্ন দেখা যায়। যা পাওয়ার জন্য সারা জীবন মিছিমিছি পথে ঘুরেছি, হাতের কাছে কুড়িয়ে পাই—বেঁচে থেকে, বিছানায় শুয়ে গড়িয়ে, উদ্দেশ্যহীন বিড়ম্বনাহীন রহস্যের আস্বাদ ভোগ করি—কী যে অপরূপ।

হেসে বললাম—'যতই বয়স বাড়ছে, এই আটচালা ঘরখানাকে ততই ভাল লাগছে আমার; চারদিকে এই আম-কাঁঠাল-লেবুর বন, জঙ্গল-মাঠ-নিস্তব্ধতা, বিশেষ করে, এই আষাঢ়-শ্রাবণের রাতে, এর মায়া কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারা যায় না যেন।'

—'তা আমি বুঝি—'

বাবা—'এখনই-বা কলকাতা যাবার এত কী তাড়া তোমার?'

কোনো উত্তর দিলাম না।

—'কিছুকাল থাকো এখানে, ভাদ্রমাসে যেও, কিংবা পুজোর পরে।'

মাথা নেড়ে 'না-অনেক দিন দেশে থাকলাম তো। কল্যাণীকে বলেছিলাম চার-পাঁচ দিন থাকব, প্রায় পাঁচ মাস কাবার করে দিলাম। এখন তার মুখের দিকে তাকাতেই ভয় করে। বেচারি আমার ভালর জন্যই আমার উপর রাগ করে।'

—'ভাবে যে কোনোরকমে তোমাকে কলকাতায় পাঠালেই হল?'

—'হ্যাঁ। তার পর চাকরি আমাকে খুঁজে নেবেই।'

—'বহু দিন কলকাতা দেখি না, কে কোথায় বলতে পারো?'

—'না তো'

—'আর বনলতার বাবা সেই কেদারবাবু—আচ্ছা এমন বন্ধু কি মানুষের এক জীবনের তপস্যায় জোটে? চল্লিশটা বছর পাশাপাশি আমরা কাটালাম। লম্বা-চওড়া চেহারা, মাটির মত মন, কত ক্ষণে-অক্ষণে আমার কাছে এসে বসেছেন। এমনি বৃষ্টির রাতেও কত গভীর রাত পর্যন্ত মুখোমুখি বসে আমরা আলাপ করেছি কিংবা চুপচাপ বসে রয়েছি।'

একটু চুপ থেকে—'আর বনলতা?' আমার দিকে তাকিয়ে, 'মনে হয় তার কথা তোমার?'

কোনো উত্তর দিলাম না।

—'না। ভুলেই গেছ হয় ত।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বললেন, 'কিন্তু'—। কিন্তু এই বলেই চুপ করলেন—কথাটা বাবা আর শেষ করলেন না।

বললেন—'খুকি দুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিল?'

—'কী জানি?'

—'ওর মার আবার এদিকে দৃষ্টি নেই একটুও।'

—'দুধ না-খেলে কেঁদেই উঠবে।'

—'সে তো অনেক রাতে।'

—'মেয়ে কাঁদলে ওর মা বড্ড বিরক্ত হয়—মাঝে-মাঝে পাখার ডাট দিয়েও মারে। আমিই গিয়ে দুধ খাইয়ে আসব।'

—'অত রাতে গরম করে খাওয়াবে তো?'

—'হ্যাঁ, তা বইকি, দুধ গরম করে নিতে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তাই কারো; স্পিরিট ফুরিয়ে যায় নি?'

—'গেলে, কাগজ জ্বালিয়ে নেব।'

—'কেমন; গায়ে লাগে না যেন কিছু মেয়েটার; কেমন চিমটে বিড়ালের মত চেহারা; মনে হয় যেন একটা শুকনো পাতা হাঁটছে, বাতাসের এক ফুঁয়ে যাবে উড়ে; আড়াই বছর বয়স হল, অথচ দেখে মনে হয় যেন এক বছরও পেরয় নি। খেতে পায়? না, খেতে পায় না? না কিছু গুরুতর অদৃশ্য অসুখ? তুমি বললে—রাতে মাঝে-মাঝে টেম্পারেচার রাইজ করে?'

—'হ্যাঁ'

—'তা, কালমেঘটা খাওয়াচ্ছ?'

—'খাচ্ছে।'

—'তুমিই খাইয়ে দিও, বৌমার উপর নির্ভর করো না, তা হলে হয় ত গাফিলতি হবে।'

গোঁফে হাত বুলিয়ে—'মথুর ডাক্তার বললেন খাওয়াতে, আমি এনেছি একটা—'

—'আনলে বুঝি?'

—'স্কুল থেকে ফেরবার সময় নিয়ে এলাম, কালমেঘটা ফুরুলে দিও এটা।'

—'আচ্ছা'

—'বৌমা সন্ধ্যের থেকে ঘুমুচ্ছে? খেয়েছিল?'

—'বিকেলে খেয়েছে।'

—'কী খেল?

—'জলের মধ্যে খানিকটা তেঁতুল গুড় গুলে, দু-তিন হাতা পান্তা।'

বলে হাসতে লাগলাম।

—'এই শুধু? আর-কিছু না?'

—'না'

—'রোজ এই রকমই করে,'

—'হ্যাঁ এই রকম।'

বাবা গম্ভীর মুখে—'অসুখ করেছে না কি?'

—'না'

—'তবে?'

—'এই রকমই ওর রুচি কিংবা আমার উপর হয় ত মান।' বাবা একটু চুপ থেকে—'বাঁচবার ইচ্ছে নেই?'

'কী জানি।'

দু-চার দিন কেটে গেছে—কিন্তু তবুও কলকাতায় যাওয়ার কোনো চাড় নেই। কল্যাণী তেঁতুলের জল দিয়ে ভাত খাচ্ছে। মাঝে-মাঝে দু-চারটে মরিচ পুড়িয়ে নেয়, কোনোদিন উপবাস দেয়। কিন্তু তবুও এই সুখ ছেড়ে সহসা যাওয়া হয়ে ওঠে না। খুকি দুপুররাতে রোজ কেঁদে ওঠে।

মা, বাবা, কল্যাণী কেউই কোনো সাড়া শব্দ করে না। তার পর কান্না বাড়তে থাকে, পাখার ডাঁট দিয়ে পিটুনি শুরু হয়—তবুও নড়তে ইচ্ছা করে না বড় একটা।

বাবা বললেন—'খোকা, জেগে আছিস?'

—'আছি'

—'খুকি কাঁদছে—'

—'শুনেছি।'

—'মার খাচ্ছে মেয়েটা, আহা-হা, আহা-হা।'

পাখার আরো কয়েক ঘা পড়ে।

চোখ রগড়াতে-রগড়াতে উঠে গিয়ে—'তুমি যে একেবারে অমানুষ হয়ে গেলে, কল্যাণী।'

কল্যাণী খেঁকিয়ে উঠে—'আমি পরের মেয়ে, আমাকে গাল দিও না বলে রাখছি।'

খুকি থেমে যায়।

আমাকে দেখে বিছানার উপর উঠে বসে। আমি বলি, 'বোস, দুধ গরম করেছি।'

কল্যাণী—'রাত দুপুরে বড় বাপ-মা তুলে গাল! অমানুষ! তোমাদের ঐ ঘরে মানুষ কটা শুনি? ফের গাল দিয়েছ তো তোমার মেয়ের গলা টিপে আমি জলে ফেলে দিয়ে আসব।'

পাশের ঘরে থেকে মা 'ছি ছি' করতে থাকেন; হয় ত কেঁদে ওঠেন, কিংবা নানা রকম কথা বলেন বধূমাতাকে।

বাবা বলেন—'তোমাদের সকলের মাথা খারাপ হল না কি?'

ঘরের মধ্যে শোরগোল—বিষ, ঝাল, মৃদু গুঞ্জন, নালিশ, ফোঁপানি, অশ্রু, অভিমানের জের অনেকক্ষণ চলতে থাকে।

খুকি খাটের এক কিনারে পা ঝুলিয়ে পাথরের মত চুপচাপ বসে থাকে; বয়স আড়াই বছর, দেখায়, এক বছরের মত; বিচার-কল্পনার শক্তি হয় ত চল্লিশ বছরের গৃহিণীর মত; জীবনের আস্বাদ সত্তর বছরের মানুষের মত; এর ভবিষ্যৎ কী, আমি ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারি না কিছু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাগজ জ্বালাবার দরকার হয় না, বাবা স্পিরিটের বোতল কিনে এনে দিয়েছেন! অসতর্কতায় অনেক স্পিরিট মাটিতে পড়ে যায়, স্টোভটা একটু সরিয়ে নিয়ে স্পিরিট ঢেলে দেই, কাঠ ঘসে আগুন জ্বালাই, দুধ গরম করি, খুকি অবাক হয়ে একবার আগুনের দিকে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বেশি গরম করবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তবুও মনের ভুলে অনেক গরম হয়ে যায়, উপযুক্ত মতন ঠাণ্ডা করে নিতে সময় লাগে, মেয়েটি যাদুমন্ত্রে নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসে থাকেঃ বেত ফলের মত চোখ দুটো প্যাট-প্যাট করতে থাকে; হাত-পা, মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত রুদ্ধ নিঃশ্বাস প্রতীক্ষা করছে। এ সংসারের নানা রকম সমস্যার কারণ যে সে, তা সে খুব ভাল করেই বুঝতে পারে।

দুধের বোতলের প্রয়োজন হয় না, ঝিনুকের দরকার নেই, বাটি সেই নিজের হাতে তুলে নেয়, কিন্তু অসাড় দুর্বল হাত এই সামান্য বোঝাটুকুতেই কাঁপতে থাকে।

বাটিটা আমি ধরি—ধীরে-ধীরে চুমুক দিয়ে খায় সে। ধুতির খুট দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেই তার।

একটু জল চায়—এনে দেই।

দেখি, সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে। ধীরে-ধীরে মুছিয়ে দেই। তার পর, আমার সঙ্গে আমার বিছানায় চলে আসে সে।

মশারি তুলে ফেলি, পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকি, এতক্ষণে, আরামে, রুগ্ন অবিশ্বাসী মুখে, খানিকটা ভরসা আসে তার। কৃতজ্ঞতার আলোকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে; তার পর একটু হাসে।

হাসি মুহূর্তের মধ্যেই নিভে যায়, চোখ কেমন অসাড় ব্যথিত হয়ে আসে। বুঝি, বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে সে। হাত বুলিয়ে দেখি হ্যাঁ, ভিজিয়েই দিয়েছে সে অনেকখানি জায়গা। বলি—'বেশ করেছ, ভয় পাচ্ছিস কেন?'

কিন্তু তুবও মুখ-চোখের বিবর্ণতা কাটে না।

—'বিছানা ভিজিয়ে দিলে মা তোমাকে মারে?'

কোনো উত্তর দেয় না।

—'পাখার ডাঁট দিয়ে পেটায়?'

নিশ্চুপ, নিঃসার; সলতের মত হাত দু'খানা তুলে নেই, সমস্ত গায়ে-পিঠে হাত বুলাই, মিঠাইয়ের দোকানের খানিকটা বাসি পরিত্যক্ত ময়দার মত যেন, কারা যেন পিষতে-পিষতে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। হাত-পা-আঙুল কালিয়ে গেছে; কপাল-চুল ঘামে ভিজে গিয়েছে। দাঁড়কাকের ঘাড়ের ভিজে রোমের মত কতকগুলো কাল পাতলা চুল।

ভিজে ইজেরটা খুলে ফেলে দি। বলি—'খুকি, মারব তোমাকে?'

চুপ করে থাকে।

—'পাখা দিয়ে লাগাই এক ঘা?'

মাথা নেড়ে নিষেধ করে।

-'তবে আমার বিছানা ভিজিয়ে দিলে কেন? মারি?' পাখার ডাঁট তুলে ধরি। শিশুর হৃদয়ে কোনো ভাব খেলা করে বিদীর্ণ মুখে বড় একটা ফুটে ওঠে না। পাখার ডাঁটের দিকে একবার তাকায়, আমার মুখের দিকে একবার তাকায়, কপাল ও ভুরুর সরলতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ঠোঁট নড়ে, বেত ফলের মত চোখ তুলে চালের বাতার দিকে নিগূঢ়ভাবে তাকিয়ে থাকে।

—'মার কাছে নিয়ে যাব?'

সহসা কোনো উত্তর দেয় না।

—'মার কাছে যাবি?'

—'না।'

—'এইখানে থাকবি?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা হলে একটু সরে শোও।'

খানিকটা সরে যায়।

—'বালিশ লাগবে না?'

মাথা নেড়ে 'না' বলে।'

—'ভিজের উপর শুলি যে—'

কিন্তু ভিজে জায়গায় শুতে কোনো আপত্তি নেই বেচারির, কোনো রকমে শান্তিতে, নিস্তব্ধতায় রাতটা কাটিয়ে দিতে চায় হয় তো, হয় তো ভবিষ্যতে জীবনটাও এই রকম ভাবেই কাটাতে চাইবে সে, ভবিষ্যৎও কী যে নিগূঢ়?

একে পৃথিবীতে আনবার জবাবদিহি কাকে বহন করতে হবে—আমাকে না বিধাতাকে?

হ্যাঁ, বেছে ভিজে জায়গাটায় গিয়ে শুয়েছে, হয় তো নিজের কৃতকার্যের ফল নিজেই বহন করতে চাইছে; হয় তো আমাকে অযথা অসুবিধায় ফেলবার কোনো ইচ্ছে নেই, হয় তো এই রকম ভয় ও দীনতাই এর রক্ত-মাংসে দিয়েছেন বিধাতাও, হয় তো...

'বিছানা ঠিক করে দিচ্ছি? ওঠ তো—'

বলা মাত্র বিনা দ্বিধায় উঠে বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁজাকোলা করে ধরে তাকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দেই। ভিজে চাদরটা মুড়ে তুলে নিয়ে, তোশকটা উল্টে দিলাম। তার পর আলনার থেকে আমার গায়ের খদ্দরের চাদরটা এনে পাতি।

শোলার পুতুলের মত অন্ধকারের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি, আবার তুলে উঠিয়ে দিলাম। বললাম, 'কেমন রে এখন শুতে বেশ আরাম, না?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ'

তেমন বিশেষ কোনো সজীবতা নেই মুখে।

কেমন কাতরভাবে পা চুলকুচ্ছিল।

—'পায়ে হল কী তোর?'

—'পিঁপড়ে।'

—'পিঁপড়ে কোত্থেকে এল আবার?'

—'মাটিতে।'

দেশলাই জ্বালিয়ে দেখলাম কতকগুলো বিষ-পিঁপড়ে বেচারির গায়ের নানা জায়গায় কামড়াচ্ছে।

—'এত কামড় খেলি? তবুও আগে বলতে পারলি না? কামড়ে যে লাল করে দিয়েছে রে?'

—বাবা বললেন, 'কীসে কামড়েছে রে খোকা?'

—'কিছু নয়, পিঁপড়ে।'

—'পিঁপড়ে? আর-কিছু নয় তো?'

পিঁপড়ে ছাড়াতে-ছাড়াতে—'না।'

মা—'মাকড়সা নয় তো রে, মাকড়সা?'

—'না, গো না।'

—'দেখিল ভাল করে, মাকড়সার কামড়ে বড্ড বিষ।'

তাকিয়ে দেখি, কল্যাণী নিঃশব্দে বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের। চোখের নিদ্রালুতা হঠাৎ যেন গেছে কেটে, খানিকটা ভয়জড়িত কণ্ঠে বললে—'কী হল আবার?'

—'বসো'

—'খুকির কিছু হয়েছে না কি?'

—'এই পিঁপড়ের কামড় খেয়েছে আর কী?'

-'ঠিক দেখেছ তো, পিঁপড়ে?'

—'হ্যাঁ'

—'পিঁপড়ে? আর-কিছু নয়?'

—'না'

—'কই? দেখি—?'

দেশলাইটা জ্বেলে আবার দেখলাম।

—'এঃ লাল-লাল চাকা-চাকা দাগ পড়ে গেছে যে একেবারে।'

—'নরম মাংস কি না।'

গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে—'এ যে অনেক কামড়। কোত্থেকে কামড়াল? আঃ তোমার দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল দেখছি।'

আবার জ্বালালাম।

—'এ পিঁপড়ে? না বিছে?'

—'না, বিছে নয়—'

—'ভাল করে দেখেছ তো? বর্ষাকালে কত কী যে থাকে, আহা বেচারি, কিসে কামড়েছে তোমাকে মা?'

—'তা, ওকে তুমি নিয়ে যাও তা হলে এখন—'

—'কেন দু-দণ্ড রাখতে নিয়ে এতই অসহ্য হয়ে উঠল?'

· 'না, তা নয়—'

—'তা বই-কি! তুমি মনে করো, মেয়ের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।' দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল।

—'নিভিয়ে দিলে?'

—'না, নেভাই নি—'

—'তবে?'

—'এমনি গেল নিভে।'

—'বাতাসে?'

—'না, ছোট্ট একটা কাঠি কতক্ষণ আর জ্বলবে?'

—'মশারি গুটিয়ে রেখেছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বড্ড গরম।'

—'তাই বলে মশারি গুটাতে হয়, খোলা বিছানা পেয়ে রাজ্যের যত পোকা-মাকড় এসে ঢুকবে।'

মশারি সে ফেলে দিতে গেল।

—'আমিই ঠিক করে নেব, কল্যাণী।'

—'তোমার লণ্ঠন কোথায়? নিভিয়ে ফেলেছ?'

—'না—'

—'ঘরে লণ্ঠন রাখো না কেন তা হলে?'

—'বাবার দেরাজে মোম আছে, নিয়ে এসো না লক্ষ্মীটি।'

—'আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে। পা নাড়তে ইচ্ছা করে না আর—সত্যি বলছি।'

বিছানার এক কিনারে পাথরের মত বসে রইল কল্যাণী।

—'তা হলে তোমার ঘরের লণ্ঠনটা দিয়ে যাও।'

—'আর, আমি অন্ধকার ঘরে থাকব? আমার বেলায় এই রকমই তোমার ব্যবস্থা।'

বিছানার আর-এক প্রান্তে বসে চুপ করে ছিলাম।

কল্যাণী—'তা কি আমি আজ থেকে জানি? অনেক দিন থেকেই জানি। এ রকম জানলে—'

মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল সে।

আমি চুপ করে বসে ছিলাম। চটি জুতোর শব্দে চমক ভাঙল।

তাকিয়ে দেখি বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন। ধুতির খুট গায়ে, খুটের ভিতর থেকে একটা মোম বের করে বললেন, 'এই নাও। খুকি কি ঘুমিয়েছে?'

—'ঘুমুচ্ছে বোধ করি।'

—'হ্যাঁ, ঘুমোক মশারিটা ফেলে দিও। ফেলবার আগে মোম জ্বালিয়ে ভাল করে বিছানাটা একবার দেখে নিও।'

কল্যাণীর পিঠে আস্তে-আস্তে দু-তিন বার হাত বুলিয়ে চলে গেলেন তিনি। কল্যাণী চাপা গলায়—'এ কী ভয়ানক অন্যায় তোমার বাবার।'

—'কী রকম?'

—'আমি এখানে আছি। অথচ তিনি এ ঘরে ঢুকলেন।'

—'সহজভাবেই ঢুকিছেন।'

কল্যাণী মাথা নেড়ে—'আমার নিজের বাবা হলে এ-রকম অবস্থায় কিছুতেই ঢুকতেন না।'

—'খুকিকে বড্ড ভালবাসেন কি—না বাবা।'

—'তা হোক—তাই বলে এত রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর ঘরে একজন পুরুষমানুষ হয়ে ঢুকবেন তিনি?'

কল্যাণী চোখ কপালে তুলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

—'সত্তর বছরের বুড়ো মানুষের পক্ষে এ জিনিস এমন কিছু অশোভন নয়।'

—'তুমি তাই মনে করো! রুচি-শোভনতার এর চেয়ে ভাল নমুনা তো কোনোদিন দাও নি।

—'ছি, আস্তে। শুনলে কী মনে করবেন তাঁরা!'

—'আমার বাবা হলে—হোক না মেয়ে-জামাই, তাদের ঘরের ত্রিসীমানায়ও আসত না এত রাত্রে।'

একটু চুপ থেকে, 'আমার বাপের বাড়ির রুচি-সংযম তোমার সে-সবের কল্পনাই বা করবে কী করে। অবাক হয়ে ভাবি, কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি।'

বাবা তার বিছানার থেকে গলা খাঁকরে—'আমার মনে হয় তোমার ঘরে বাতাসা কিংবা গুড়ের টুকরো পড়ে ছিল হেম।'

—'তা হবে।'

—'হ্যাঁ, তার গন্ধে—গন্ধে বিষ-পিঁপড়ে এসে জমেছে।'

—'তাই মনে হয়।'

মা বললেন—'বর্ষাকালে অনেক সময় পোকা-ফড়িং মরে থাকে, দেখিস নি খোকা?'

—'হ্যাঁ, দেখেছি।'

—'সেই জন্য এত পিঁপড়ে হয়।'

—'তা ঠিক। কাল ঘরটা ভাল করে ঝাড় দিয়ে ফেলতে হবে।'

—'হ্যাঁ খুব ভাল করে।'

বাবা—'ও, ঐ যে বাতি নিয়ে পড়ি না আমরা রাত্রে, তখন লণ্ঠনের চার পাশে অনেক পোকা মরে থাকে, সেইজন্যই এত পিঁপড়ে জমে বুঝি?'

মা—হ্যাঁ, বিশেষত এই বর্ষার সময় অন্য কোথাও খাবার পায় না কি-না।'

দু'জনেই বিস্তব্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী হাই তুলে—'বাবা, হাত-পা অবশ হয়ে আসছে ঘুমে। সাপে খেল, না ব্যাঙে খেল দেখতে এলাম। অলক্ষুণে মেয়ে, ওকে কারা কাটবে? সারাটা জীবন মানুষের হাড় চিবিয়ে কে খাবে তবে আর?'

ঘুমের চোখে বিড় বিড় করতে-করতে চলে গেলে কল্যাণী। মিনিট তিন চারের মধ্যে সব চুপচাপ।

বিছানায় খুকির পাশে শুয়ে বললাম—'ব্যথা না কি রে?'

—'হ্যাঁ'

—'কোথায়?'

পিঠের কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে দিল।

—'চুলকে দেব?'

মাথা নেড়ে—'চুককে দাও।'

আস্তে-আস্তে হাত বুলাতে লাগলাম।

—'কিসে কামড়েছে তোমাকে খুকু?'

—'পিঁপড়ে'

—'কেন কামড়াল?'

মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, উত্তর দেবার ইচ্ছে আছে, কিন্তু বাক্য জুগিয়ে ওঠে না।

'পিঁপড়ে কোথায় আছে খুকু?'

—'মাটিতে।'

—'সেখানে কেন গিয়েছিলে তুমি?'

এক পা তুলে চুলকুতে-চুলকুতে বিজ্ঞ মুখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

—'তোমার নাম কী?'

—'কুকুলানি'

—'রাণীও আবার?' চোখ দিয়ে বিরস ব্যথিত মন্তব্য কেটে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

—'কে রেখেছে নাম?'

—'দাদু'

—'লানি নয়, রাণী'

—'লানি'

—'নারে, রাণী'

—'লানি'

ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

পর দিন রাত্রে ঝড়-জল, ভয়ানক।

বিকেল থেকেই শুরু হয়েছে, রাত দশটার সময় বাবা এসে বললেন—

'খেয়েছিস খোকা?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার মেজকাকা খেয়েছেন?'

—'খেয়েছেন।'

—'তার খাবার সময় আমি যেতে পারি নি। খাতা দেখছিলাম। ঢের খাতা, কাল হয় ত ইনস্পেকশন হবে স্কুলে।'

—'ইনস্পেকটর আসবেন বুঝি?'

—'আসবার তো কথা; সন্ধ্যার থেকেই ছেলেদের খাতা-পত্র নিয়ে বিব্রত ছিলাম তাই।'

একটু চপ থেকে-'যা দুর্যোগ আজ! স্কুলের থেকে এসে দক্ষিণের ঘরে আর যেতে পারি নি তাই। তা তুমি তোমার মেজকাকার খাবার সময় ঘরে ছিলে তো?'

—'হ্যাঁ'

—'তত্ত্বাবধান করেছিলে?'

—'করেছিলাম। পিসিমা আসেন, আমার না-থাকলেও চলে।'

—'তবুও থেকো—।'

—'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

—'তিনি তো ঘরে বসেই খেলেন?'

—'হ্যাঁ ঘরেই খান—'

—'টেবিলে?'

—'হ্যাঁ—'

—'কে এনে দিল?'

—'মা।'

—'কী খেলেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'মেজকাকা আজ খিচুড়ি খেতে চেয়ে ছিলেন।'

—'হ্যাঁ, এমনি বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে খিচুড়িই তো খায় মানুষে।'

—'তুমি কী খেলে?'

—'আমি দুটো ভাতই খেলাম।'

—'কী দিয়ে?'

—'এই পুঁই চচ্চড়ি না কী করেছিল আর কাঁচা মুগের ডাল।'

—'রান্নাঘরে গিয়ে খেয়ে এলে?'

—'হ্যাঁ, ছাতা আছে; ব্যাস। এত ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তোমার মা কত দিক টানবেন? সুরেশকে খিচুড়ির সাথে ঘি দিয়েছিল তো?'

—'হ্যাঁ, মার সে-সব ঠিক আছে।'

—'আর, আলু ভাজা বুঝি?'

—'ইলিশ মাছ ভাজা'

—'বেশ গরম-গরম ছিল তো?'

—'খাবার সময় ভেজে দেওয়া হয়েছে, পিসিমার স্টোভে।'

—'বেশ, তা সুরেশ খানিকটা খেতে পারল তো? আমাদের সংসারের রান্না চল্লিশ বছর ধরে সে বড় একটা খায় না—কী দিয়ে রান্না হয় কলকাতায়, পাকা মুসলমান বাবুর্চি রান্না করে দেয়—তাই বড় সঙ্কোচ হয় তাকে খাওয়াতে।'

—'ও, ছোটকাকা প্রায় ছোট এক ডেকচি আন্দাজ খিচুড়ি খেয়ে ফেলেছেন।'

—'খেলেন?'

—'হ্যাঁ। খুব তৃপ্তির সঙ্গে, ইলিশ মাছ ভাজা, ফুল ভাজা, ডিমের ওমলেট, পেপের টক, ছানার পায়েস।'

বাবা একটু হেসে—'যাক্, আজকের রাতের যজ্ঞ শেষ হয়েছে তাহলে তোমার মার।'

—'হ্যাঁ'

—'সুরেশের হজম হয় তো?'

—'হজমের জন্য মেজকাকার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।'

—'কী?'

একটু চুপ থেকে, 'খাওয়ার পর কী যেন খান।'

—'আহা, তা সোডা ওয়াটার এনে দিলেই হত সুরেশকে।'

—'আমি বলেছিলাম, সোডা ওয়াটারের কথা, মেজকাকার বিশ্বাস, কলকাতা ছাড়া আর-কোথাও ভাল সোডা ওয়াটার পাওয়া যায় না।'

বাবা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে—'বৌমা আজও কি সন্ধ্যের থেকে ঘুমুচ্ছে?'

—'হ্যাঁ'

—'খেয়েছে তো?'

—'বিকেলেই খেয়েছে—'

—'কী যেন?'

—'পান্তা ভাত, মরিচ পোড়া, আর সেই তেঁতুল গুড়ের ঝোল।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে, 'বৌ কি আমার চোখের সামনে হত্যা দিয়ে মরতে চায়?'

—'না মরবে না।'

—'মরবে না? এই খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? আমার কী যে কষ্ট হয় হেম।'

—'মানুষের প্রাণ ঢের শক্ত। কলকাতায় কত লোক ফুটপাতের এঁটো কুড়িয়ে খায়।'

—'কিন্তু তাদের যে বাঁচবার আগ্রহ। তারই জোরে বেঁচে থাকে ওরা। এই মেয়েটি যে'—বাবা বললেন—'তোমাকে ভালবাসে না?'

—'জীবনের প্রতিই কেমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে যেন।'

—'তুমিও বীতশ্রদ্ধ হয়েছ না কি?'

—'জীবনের ওপর?'

—'বৌ-এর ওপর?'

—'নাঃ, বড় কষ্ট হয় ওর জন্য আমার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা বললেন—'দেখো, কলকাতায় গিয়ে কোনো রকম একটা চাকরি জোগাড় করতে পারো না কি। না-হলে এই নারীটিকে বাঁচানো বড্ড শক্ত হবে।'

একটু চুপ করে থেকে—'খুকিকে আজ ন-টার সময় দুধ খাইয়ে দিয়েছি।'

—'এখন শোবে?'

—'কে আমি? হ্যাঁ, এই শুয়ে পড়ি আর-কী—'

—'কিছু পড়বে-টড়বে না বুঝি আর?'

—'নাঃ, আর পড়ে কী হবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

—'তা, খুকিকে তোমার কাছে নিয়েই শোও। ওর মাকে একটু সুস্থিরে ঘুমোতে দাও।'
—'যাই, নিয়ে আসি।'
—'তোমার মা কোথায়?'
—'দক্ষিণের ঘরে।'
—'কী করছেন?'
—'মেজকাকার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।'
—'খেয়েছেন?'
—'বোধ করি খেয়েছেন—'
—'ফিরবেনই-বা কখন?'
—'এই বারটা সাড়ে-বারটা—'
—'কেন? এত রাত হবে কেন?'
—'মেজকাকা অনেক রাত অবধি গল্প করতে ভালবাসেন।'
—'তা পিসিমাই তো আছে।'
—'মাকেও চাই।'

কল্যাণী—'কে?'
—'তুমি জেগে আছো?'
—'বাপরে, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—'
আমার দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে, 'না-বলে-কয়ে অন্ধকারের মধ্যে, এই রকম ঢুকতে হয় না কি?'
—'ভেবেছিলাম তুমি ঘুমুচ্ছ—'
—'ঘুমুচ্ছিলামই তো—'
—'এসে তো দেখছি চোখ চেয়ে জেগে রয়েছ—'
—'তোমার পায়ের শব্দে তো জেগে গেলাম।'
—'আচ্ছা, এর পর পা টিপে-টিপে আসব।'
—'না, ঘরে বাতি নিভে গেলে তুমি আর আসতে পারবে না।'
—'সন্ধ্যের থেকেই তো বাতি নিভিয়ে শুয়ে থাকো।'
—'এই আমার খুশি, তুমি এসো না।'
—'সারা রাত এত ঘুমুতে কষ্ট হয় না?'
—'বকবক করো না, কাজে যাও এখন—'
—'কী খেয়েছিলে আজ?'
বালিশে মুখ গুঁজে দাঁত কপাটি হয়ে পড়ে রইল কল্যাণী। দেখলাম, কাঁদছে।
—'একী, কী হল তোমার আবার?'
—'থাক, আমার খোঁজ নিয়ে দরকার নেই।'
বিছানার পাশে বসতেই, কেঁদে ফুলতে-ফুলতে—'তুমি ওঠো'
—'একেবারে ঘামিয়ে গেছ যে—'
—'তবুও কথা বলবে? কথা বলতে বলি নি তোমাকে—'
—'সন্ধ্যার থেকেই কি জেগে আছ?'
—'আমাকে একটু চুপ করে থাকতে দেবে?'
—'কেন মেজকাকারা তো দক্ষিণের ঘরে খুব হৈ-চৈ করছেন, শুনছ না?'
—'করুক। তাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'
—'কই, মেজকাকার খাওয়ার পাশে একদিনও তো তুমি দাঁড়ালে না, কল্যাণী।'
—'আমার দাঁড়ানোর কী প্রয়োজন?'
—'তিনি বললেন বৌমাকে তো বড় একটা দেখা যায় না।'
—'আচ্ছা', ঠোঁট উল্টে কল্যাণী—'হয়েছে।'
—'আমি বলেছি, তপস্যা না করলে বৌমাকে দেখা যায় না।'
—'তোমার পায়ে পড়ি, কথা শুনতে ভাল লাগে না এখন আমার।'
—'আচ্ছা, কথা কইব না আর।'
—'বসে রইলে যে?'
—'চুপচাপই তো বসেছিলাম। তুমি কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?'
—'তুমি এখন যাও।'
—'কোথায়?'
—'তোমার ঘরে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'গিয়ে কী করব?'

—'যা খুশি তাই করে, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও।'

ধীরে-ধীরে তার কপাল থেকে হাত খানা সরিয়ে দিল আমার।

বললাম—'তোমার কপাল তো খুব গরম।'

কোনো উত্তর দিল না।

—'আচ্ছা, বুকটা একটু দেখতে দেবে?'

আবার ঠোঁট কামড়ে কান্না।

অনেকক্ষণ কান্নার পর বললে—'মাথার থেকে হাতটা সরিয়ে নেবে?'

ধীরে-ধীরে চুলের থেকে হাত তুলে নিলাম।

—'এখনো বসে আছে?'

কোনো উত্তর দিলাম না।

মৃদু, অবরুদ্ধ কণ্ঠে—'আচ্ছা এইবার যাও, অনেকক্ষণ তো বসলে।'

ধীরে-ধীরে কল্যাণীর বাঁ হাতটা তুলে নিলাম।

—'কবরেজের মত নাড়ী না দেখলে চলবে না তোমার?'

—'তোমাকে ঢের জ্বালালাম কল্যাণী।'

ঘাড় হেঁট করে চোখ বুজে অনেকক্ষণ বসে রইলাম—কল্যাণীর হাতের ভিতরকার নাড়ীর শব্দ। অন্ধকারে কাশের শব্দ।

—'উঠলে?'

—'হ্যাঁ'

—'বুক দেখতে চেয়েছিলে না?'

মাথা হেঁট করে—'থাক্।'

—'কেন? দেখো, তুমি আমার স্বামী, দেখবেই বা না কেন?'

হাত ধরে বিছানার পাশে আমাকে বসালে ধীরে-ধীরে—'আমি চলে যেতে বললেই কি চলে যেতে হয়?'

একটু চুপ থেকে—'কথা বলছ না যে?'

আমার গালে একটা টোকা দিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করল কল্যাণী।

বললে—শেমিজের সেফটিপিন কটা খুলে—তারপর, 'নাও, বুক নিয়ে কত পরীক্ষা করতে পার দেখো।'

সেপটিপিন খুলে দাঁত কামড়ে—'নাও তোমার বুক।'

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

কল্যাণী, 'কেমন দেখলে? খুব গরম?'

একটু হেসে—'যা দেখলাম তা তোমাকে বলব কেন কল্যাণী?'

—'ভাল কথা; দেখা তো হল, এখন সেফটিপিনটা আটকে দি?'

—'দাও।'

—'তোমাব মাথাটা আমার বুকের ওপর একটু রাখবে?'

—'মিছিমিছি কী আর দরকার?'

—'কিন্তু আমার যদি ভাল লাগে?'

—'আচ্ছা বেশ।'

কল্যাণী মাথাটা সরিয়ে দিয়ে, 'না না থাক্।'

—'কেন?'

—'না, আমার আর প্রবৃত্তি নেই।'

তাড়াতাড়ি সেফটিপিন দিয়ে শেমিজ আটকে ফেলে বললে—'তেঁতুল আর মরিচপোড়া দিয়ে ভাত খাই বটে—কিন্তু অনেকগুলো ভাত খাই। খিদেও আছে—মরব না, ভয় নেই। তুমি এখন ঘরে গিয়ে সুস্থিরে ঘুমোতে পার।'

নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছি দেখে, কল্যাণী, 'আচ্ছা বেশ, কাল থেকে না হয় পান্তা তেঁতুল আর খাব না।'

—'কী খাবে?'

—'যা খাওয়াবে তাই খাব।'

—'পোলাও, মাংস খাওয়াবার শক্তি তো আমার নেই।'

—'চাইও না; কোনোদিন আমাকে মাংস খেতে দেখেছ?'

—'মাংস পেলে তো খাবে।'

—'এ তিন বছরে অন্তত সাত-আট বার এ বাড়িতে মাংস আনা হয়েছে,' কল্যাণী একটু হেসে, 'এমন কোনো ঠাকুর-বাবুর্চি পাবে না তুমি কোনো দেশে, এমন কোনো মশলা পাবে না তুমি পৃথিবীতে যার রান্নার গুণে মাংস আমার কাছে তৃপ্তির জিনিস হয়ে উঠবে কোনোদিন।'

—'ভাল তো, কিন্তু থাক্ সে কথা, কিন্তু আমরা যা খাই তাই খাবে কাল থেকে।'

—'আচ্ছা'

—'একলা খাবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না।'

—'আর একটু দুধ খাবে।'

—'দু'জনে খাব নিশ্চয়ই।'

একটু চুপ থেকে কল্যাণী, 'কিন্তু মাঝে-মাঝে পান্তা আর তেঁতুল খাব।'

—'কেন?'

—'এ প্রশ্নের উত্তর পাবে না তুমি আমার কাছ থেকে।'

—'হয় ত এর উত্তর আমিই জানি।'

—'কেউ জানে না—কারুর জানার সাধ্য নেই।'

একটু চুপ করে থেকে কল্যাণী—'তুমি যদি রাজপুত্র হতে আর আমি যদি তোমার রাজপ্রাসাদে থাকতাম, তা হলেও এই পান্তা আর মরিচ খাওয়া ও অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কান্না ঘুচত না আমার।'

—'কী যেন ভাবছিলাম।'

কল্যাণী—মা এসেছেন?'

—'না'

—'কোথায়?'

—'দক্ষিণের ঘরে'

—'মেজকাকাদের সঙ্গে গল্প করছেন এখনো?'

—'হ্যাঁ'

—'রাত তো কম হয় নি।'

—'না, কম হয় নি।'

—'বাবা শুয়ে পড়েছেন?'

—'হ্যাঁ অনেকক্ষণ।'

—'ঘুমিয়েছেন?'

—'তা বলতে পারব না—হয় তো ঘুমোন নি।'

—'কী করে বুঝলে?'

—'ঘুমোলে একটু মৃদু নাক ডাকার শব্দ পেতাম। খানিক আগে গলা খাঁকরানির শব্দ পেলাম।'

—'আমার মনে হয় বাবা বড্ড একা।'

—'কী রকম?'

—'সারা দিনরাতের মধ্যে মা তার সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না।'

মাথা হেঁট করে চুপ করেছিলাম।

কল্যাণী—'এই তিন বছর ধরেই তো দেখছি আমি, মা বরং পিসিমার সঙ্গে গল্প করবেন, তবুও বাবার সঙ্গে বসে প্রাণ খুলে দুটো কথা বলবেন না।'

—'খুকি ঘুমুচ্ছে?'

—'এই জন্য বাবার মনে কেমন একটা ব্যথা আছে—তুমি যখন কলকাতায় চলে যাও, গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবার স্কুল যায় বন্ধ হয়ে, সারা দিন-রাত কী ভয়াবহ একাকীভাবে তিনি যে কাটান, তা আমি তোমাকে বলে শেষ করতে পারব না। খাঁচার পাখিও এর চেয়ে ঢের আনন্দে থাকে।'

—'আমাদের সকলের জীবনই তো একটা খাঁচা।'

—'তা বলতে পার।'

কল্যাণী বিমর্ষভাবে জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রইল।

—'যাক্, মা তবুও তোমার মত তেঁতুলের অম্বল দিয়ে পান্তা খান না, কিংবা কপালে একটা বোনা দিয়ে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে যখন—তখন কাঁদেন না।'

একটু চুপ থেকে—'আমাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে থাকলেও অন্ধকারে নিজের কোঠায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে? তাই ত বললে—কেন, কী ব্যাপার কী কল্যাণী?'

একটু চুপ থেকে, 'এই নারী—যাক্ শুনতে চেও না বড় কষ্ট পাবে তা হলে।'

—'আমাকে ভালবাস না এই তো কথা; কিংবা অন্য কাউকে ভালবাস।'

কল্যাণী মুখে কপালে কাপড় টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে শুল—কপালের যতটুকু দেখা যাচ্ছিল জরাজীর্ণ মানুষের মত কুঁচকে রয়েছে।

ধীরে-ধীরে খুকিকে তুলে নিয়ে নিজের বিছানায় চলে গেলাম আমি।

বিছানায় আমার পাশে শুইয়ে মুখের দিকে চাইতেই দেখলাম চোখ চেয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

—'তুই জেগে আছিস যে রে?'

—'বিত্তি'

—'হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম, কেমন লাগে?'

—'বাবা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কী মা?'
—'মিছৃছি কোথায়?'
—মিছরি?'
—'মিছৃছি খাব।'
—'এখন খায় না মা।'
—'বোতলে আছে।'
—'হ্যাঁ।'
—'খাব।'
—'কাল সকালে খেও।'
—'মিছৃছি খাব।'
—'সকালবেলা দেব কাল।'
—'বাবা।'
—'কী মা?'
—'মিছৃছি খাব।'
একটু চুপ থেকে—'মিছরি খেলে পিঁপড়ে কামড়ায়।'
জীবনী শক্তি ঢের কম; পিঁপড়ের কথা শুনে নিস্তব্ধ হল।
মাথায় হাত বুলতে-বুলতে—'তোমার নাম কী খুকু?'
মনের অবসাদে সহসা কোনো জবাব দিল না।
—'কী নাম তোমার?'
অন্ধকারের ভিতর দু-তিনটে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ধীরে-ধীরে—'আমাল নাম?'
—'হ্যাঁ'
—'কুকুলানি।'
এমন নিরপরাধ, এমন মিষ্টি অথচ এমন মর্মস্পর্শী।
অন্ধকারের ভিতর আমার চোখের জল দেখল না মেয়েটি। ধীরে-ধীরে বললাম—'খুকুরাণী'
—'কী?'
—'তুমি কাকে ভালবাস?'
—দাদুকে।'
—'আর কাকে?'
—'ঠাকুনকে।'
—'আর কাকে?'
একটু চুপ থেকে—'বাবাকে।'
—'বাবা কোথায়?'
অন্ধকারের ভিতর কচি-কচি হাত আমার চোখ-নাকের উপর বুলিয়ে নিয়ে, 'এই যে বাবা।'
—'মাকে ভালবাস না?'
—'দাদুকে ভালবাসি।'
—'মাকে?'
—'দাদুকে ভালবাসি।'
—'মাকে শেয়ালে নিয়ে যাবে।'
—'না-নিয়ে যাবে না।'
শীর্ণকণ্ঠে উত্তেজনার আওয়াজ বেজে উঠল, 'নিয়ে যাবে না শেয়ালে।'
সন্ত্রস্ত হয়ে বললে—'বাবা—'
—'কী?'
—'মাকে শেয়ালে নিয়ে যাবে না?'
—'না।'
—'মাকে ভালবাসি যে আমি।'
—'বেশ।'
—'রামুকে শেয়ালে নিয়ে যাবে।'
—'রামু কে?'
উদ্ধত হয়ে—'নিয়ে যাবে শিয়ালে রামুকে।'
একটু ভেবে—'নন্দুকে নিয়ে যাবে।'
আর একটু ভেবে—'বুলুকে নিয়ে যাবে।'
শিশুর মনের এই অন্ধকার স্রোত ফিরিয়ে দেবার জন্য—'না, কাউকে নিয়ে যাবে না রে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'নেবে না?'
—'না, শেয়াল নেই।'
—'নেই?'
নিস্তব্ধভাবে জিনিসটা উপলব্ধি করতে লাগল সে।
গায় হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ গরম।
বললাম—'তোমার জুতো কই খুকুরাণী?'
—'নেই?'
—'বাবা কিনে দেয় নি?
—'না।'
—'খালি পায় মাটিতে হাঁটো?'
—'হ্যাঁ।'
—'ঠাণ্ডা লাগে যে?'
—'আমার বোতল ভেঙে গেছে।'
—'কিসের বোতল?'
—'দুধের। দাদু কিনে দেবে আবাল'।
—'জুতো কে কিনে দেবে?'
—'দাদু।'
—'তাই তো, দাদু তোমার জীবনের বড় মূল্যবান জিনিস। যখন বড় হয়ে উঠবে তুমি, না থাকবে দাদু, না থাকবে ঠাকুমা, তখন কী করবে তুমি?'

মেয়েটি প্যাট-প্যাট করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, খানিক যেন বুঝেছে, খানিক বোঝে নি। ভবিতব্যতার অন্ধকারে ঘেরা এই পৃথিবীর পথে চলতে-চলতে এক-একটা ইঁদুরের ছানার অবস্থা মাঝে-মাঝে যে-রকম হয়—তেমনি হয়েছে এই মেয়েটির।

—'খুকু একটা ছড়া শুনবে?'
—'ছড়া কী?'
—'কবিতা।'
—'কোপাতা কী?'
—'শোনো।'
—'খুকুরাণী-খুকুরাণী অন্ধকার রাতে'
—'বাবা'
—'কী মা?'
—'আবার বলো—'
—'আচ্ছা তুমি আমার সঙ্গে-সঙ্গে বলো—খুকুরাণী-খুকুরাণী, বলো'
—'কুকুলানি-কুকুলানি'
—'অন্ধকার রাতে'
অন্ধকার লাতে'
—'অনেক কথা বলেছিস—এখন ঘুমো।'
'জল খাব বাবা।'
একটু জল গড়িয়ে এনে দিলাম।
গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম উষ্ণতা আরো বেড়েছে যেন।
—'খুকু'
—'উঁ?'
—'ব্যথা করে?'
—'বেথা কোলে।'
—'কোথায়?'
—'বাতাস দাও।'
বাতাস দিতে-দিতে—'খুকুরাণী।'
—'উঁ'
—'আমি কলকাতায় চলে যাব যে—'
আমার গলা জড়িয়ে ধরে—'না।'
—'তুমি দাদুর কাছে থাকবে—'
—'না, দাদুকে শেয়ারে খেয়ে ফেলেছে।'
একটু হেসে—'তা হলে ঠাকুমার কাছে থাকবি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'উঁহু না—ঠাকুনকে শেয়ালে নিয়ে গেছে যে।'

—'মার কাছে থাকবি।'

উৎপীড়িত হয়ে—না, থাকব না।'

—'মিছরি দেবে যে মা, দেবে, লবেনচুশ দেবে, বিস্কুট দেবে।'

লুব্ধ চোখ অন্ধকারের ভিতর ঘুরতে লাগল।

—'আমি কলকাতায় চলে গেলে মা তোমাকে মিছরি দেবে, লজেন পাবি, বিস্কুট পাবি।'

—'বিসকুট!'

—'থাকবি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কার কাছে?'

—'মার কাছে।'

—'আমি কলকাতায় চলে যাব যে।'

—'হ্যাঁ তুমি চলে যাবে।'

—'আর আসব না।'

মাথা নেড়ে বললে—'না, আর আসবে না।'

দেখলাম মুখের ভিতর কোনো ভাব পরিবর্তন নেই।

কলকাতায় যাওয়া যে কী, যাওয়া-আসারই বা কী মানে, তা বুঝবার মত বোধ এখনো হয় নি।

—'আর আসব না যে খুকি।'

—'না—'

—'কলকাতায় চলে যাব, আর আসব না।'

মাথা নেড়ে—'না আসবে না। দাদু আছে, ঠাকুন আছে, মা আছে, ভুলু আছে, রবি আছে, খোকন আছে।'

—'আর বাবা?'

—'রবি, ভুলু, খোকন, মিনু আছে, খেলা করবে।

আজকের জন্য এর এই রকম, ভবিষ্যতে এমনি কোনো ভবিতব্যতার বেদনায় কিংবা সফলতার শান্তিতে হারিয়ে যাবে তুমি—কোলাহলে-কোলাহলে দূরের থেকে দূরে তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলব, আমাকে হারিয়ে ফেলবে তুমি—হয় ত পলক ফেলতেই দেখব, জীবনে তুমি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ, পরের ঘরে চলে গেছ, দূরের বন্ধু হয়েছ, বছরের পর বছর ঘুরে গেলেও তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। তাগিদও বোধ কর না, তুমিও না, আমিও না। আজও তুমি রবির কথাটা বল, খুকুরাণী।

ঝম-ঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল।

খুকি ঘুমিয়ে গেছে, মশারির চালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বৃষ্টির আওয়াজ শুনছে।

আরো অনেক গভীর রাতে খুকির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, হয় ত কোনো মেয়েদেরই স্কুলে মাস্টারি করবে কিংবা বিধবাশ্রমে যাবে, কিংবা অবলাশ্রমে, হয় ত কোনো নারী কল্যান সমিতির সাহায্যের জন্য দরকার হবে। কিংবা হিন্দু মিশনের। অথবা পৃথিবীর সমস্ত সাহায্য, সহানুভূতি ও কৃপার অগোচরে জীবনের অন্ধকার সমুদ্রের পরিহাস ও অট্টহাসির ভিতর হাহাকার করে ফিরবে।

পরের দিন রাতে বিছানায় আমার পাশে খুকিকে শুইয়ে দিয়ে—

—'আমি রেলগাড়িতে চড়ে কলকাতায় যাব।'

—'নেলগালি?'

—'হ্যাঁ'

—'নেলগালি কী বাবা?'

—'কোনোদিন দেখিস নি?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'এখান থেকে সন্ধ্যার সময় নৌকায় চড়ে তার পর ইস্টিমারে উঠতে হয়, তার পর কাল সকালে রেলগাড়িতে চড়তে হয়।'

—'খুকি চুপ করে ছিল।'

বললাম—'রেলগাড়িতে চড়ে যাবি?'

—'হ্যাঁ'

—'কোথায়?'

—'ভুলুর কাছে।'

—'ভুলুর কাছে যেতে রেলগাড়ি লাগে না রে।'

—'বাবা আমাল ইজেল ছিলে গেছে।'

—'ছিড়ে গেছে!'

—'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আচ্ছা, আমি নতুন ইজের করে দেব।'

—'দাদু বোতল কিনে এনে দেবে।'

—'বোতল?'

—'হ্যাঁ।'

—'ইজেল কিনে আনবে।'

—'ইজেরও আনবে দাদু?'

—'বিস্কুট আনবে, লজেন আনবে, পুতুল আনবে।'

—'ব্যবা আনবে না।'

মাথা নেড়ে, 'না, দাদু।'

এর পিতা এর জীবনের রক্তমাংসের জন্য দায়ী শুধু, অন্য সমস্ত দাদু।

—'খুকুরাণী?'

—'উঁ?'

—'আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে?'

—'হ্যাঁ'

—'মেসে গিয়ে থাকতে হবে।'

—আগ্রহের সঙ্গে—'আমি যাব তোমাল সঙ্গে বাবা।'

—'মেসের চৌবাচ্চার সমানে দাঁড়িয়ে স্নান করবি, বারান্দায় দৌড়াবি, রাস্তায় ছেলেরা এসে যে-ছাদে ঘুড়ি ওড়ায় সে দলে মিলে যাবি, আমার কোলে বসে থাকবি, পাথর কাঁকর ভরা ভাত আর গোরুর মাসকলাই, ঠাণ্ডা ট্যাঁড়সের তরকারি আর ছিবড়ের মত মাছ: যাবি রে?'

—'যাব।'

—'বেশ, আর আমি যখন কাজে বেরিয়ে যাব তখন তুই কী করবি?'

চুপচাপ।

—'একটা কাঁথা দিয়ে ঢেকে আমার বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেব তোমাকে; না?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'

—'খুব লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমুবে।'

—'হ্যাঁ'

—'মেসের বাবুদের ঝালাপালা করবে না তো?'

চুপ করেছিল; বললাম 'বলো, করব না।'

—'কলব না।'

—'তারা যদি কান মলে দেয়, কাঁদবে না।'

—'না।'

—'তাদের মুখের পানের ছিবড়ে যদি তোমাকে খেতে দেয়, খাবে?'

—'হ্যাঁ, খাব।'

—'মেসের বাবুরা বড় দুষ্টু যে রে খুকি, বিড়ির আঁস দিয়ে তোমার পিঠে ফোশকা ফেলে দেবে, চুরুটের ছাই দেবে তোমার চোখে-নাকে ঝেড়ে, দিন-রাত চুল টেনে-টেনে পাখির বাচ্চার মত মাংস বের করে দেবে তোমার মাথায়। ফড়িঙের মত করে দেবে যে রে।'

অবোধ ভাবে শুনছিল মেয়েটি।

ধীর-ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে—'না, রে, মেসে গিয়ে কাজ নেই।'

একটু চুপ থেকে, 'আমারও আর ইচ্ছে করে না যেতে। তোমাকে নিয়ে এই খড়ের ঘরে সারাটা জীবন যদি কাটাতে পারতাম খুকুরাণী।'

আজ রাতে বৃষ্টি নেই।

কদমগাছে একটা পেঁচা বসে ডাকছিল।

মেয়েটি—'ঐ কে ডাকে বাবা—'

—'লক্ষ্মী পেঁচা'

—'কেন ডাকে? কাঁদে?'

—'না কাঁদে না।'

—'কী কলে?'

—'বেড়াতে বেরিয়েছে।'

—'বেলাতে?'

—'হ্যাঁ, আজ বৃষ্টি নেই কি না।'

—'কোথায় বেলাতে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এই গাছে-গাছে, মাঠে-মাঠে।'

চুপ করে ভাবছিল।

খানিকক্ষণ পরে—'আমি মাঠে যাব।'

—'কাল সকালে যেও'

—'ভুলুর সঙ্গে খেলা কলব না?'

—'হ্যাঁ।'

—'নন্দু আসবে, রবি আসবে...'

তেঁতুল গাছের ভিতর থেকে বক ডেকে উঠল, ঘরের পাশের মস্ত বড় পেয়ারা গাছের নিবিড় ডালপালার উপর গোটা দুই বাদুড় ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঝাড়া খেয়ে খানিকটা শিশির না বৃষ্টি পড়ার শব্দ—খুকুর চোখে ঘুম নেই, পৃথিবীর সমস্ত গন্ধ, রস, স্মৃতি ও শব্দের দিকে হৃদয় রয়েছে যেন জেগে—আজ ওর বেশি জ্বর নেই।

খুকু পাশ ফিরে শুল একবার—পঁচিশ বছরের পুরনো কাঁঠালের খুঁটিটার দিকে তাকিয়ে।

ধীরে-ধীরে শিরদাঁড়ায় আঙুল বুলুচ্ছিলাম—একটা টিকটিকির মত মেরুদণ্ডে যেন—শুকনো বাঁশপাতার মত চিমসে শরীর। মা আছে, বাবা আছে, দাদু আছে, ঠাকুরমা আছে তবুও যেন মনে হয়, ঠিকানাহীন নিরুদ্দেশ রুগ্ন একটা বিড়ালের ছানার মত, ক্ষমাহীন পৃথিবীর পথে-বিপথে, এঁটো ও ঝাঁটা খেয়ে বেড়াবার জন্য এর জন্ম ও জীবন। মেসে যখন থাকি—দুপুরবেলা সমস্ত মেস নির্জন—বিছানায় বসে বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখি, দু-একটা চড়ুই নিঃশব্দে লাফিয়ে—লাফিয়ে সমস্ত বারান্দা ঘুরে দু-এক টুকুরো খুদের সন্ধানে ফিরছে; এর ভিতর বেদনার তো কিছু নেই; কিন্তু তবুও মনে আঘাত লাগে যেন কেমন, আমার মেয়েটির কথা মনে হয়, চড়াইয়ের ছোট্ট নিঃসহায় মুখ, করুণ ঠ্যাং, অসম্পূর্ণ অকৃতকার্য দৃষ্টি ঘুরে-ফিরে একটি আড়াই বছরের শিশুর রূপ মনে জাগায়।

খুকি যখন দেশের বাড়িতে জন্মেছিল, তখনো আমি কলকাতার মেসে ছিলাম। দিনের পর দিন ভয়ে, সন্দেহে বিক্ষুব্ধতায়, পৃথিবীতে এই শিশুটির আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম।

কে জানে, সে হয় তো মৃত হয়ে জন্মাবে; কিংবা তার জীবনের বিনিময়ে জননীকে মৃত্যুর দায় দিতে হবে? কে জানে, অন্ধ হয়ে জন্মায়ে, হয় তো এই শিশু? কিংবা অঙ্গহীন হয়ে? হয় তো মুখ বধির হবে? কিংবা অত্যন্ত অজ্ঞান জড়ের মন নিয়ে পৃথিবীতে আজন্মকাল নিজেকে পরিহাস করে চলে যাবে? হয় তো, মৃত হয়ে জন্মালেই ভাল।

পিতার হৃদয়ের এই রকম অনেক বিবর্ণ হতাশ অমঙ্গল চিন্তার মধ্যে এর জন্ম; গর্ভে যখন ছিল এই মেয়েটি এর মায়ের হৃদয় তখন বর্ণহীন রূপহীন সাদা করবীর একটা শাখার মত, মেহন্তের সন্ধ্যার কুয়াশা ওদিকে তাকিয়ে আছে। গর্ভজাত শিশুর জীবন সম্বন্ধে আশা খুব কম ছিল ভেবেছিলাম, ভেবেছিলাম সন্তান প্রসবের পর একটা টেলিগ্রাম আসবে, আসতও, কিন্তু মেয়ে হয়েছে বলে বাড়ির লোকেরা টেলিগ্রাম করলে না আর। বিলম্ব করে, অবহেলা করে একখানা পোস্টকার্ড লিখে সংবাদটা জানাল আমাকে। টিকটিকির মত মেরুদণ্ডসার এই মেয়েটি বিধাতা ও মানুষের এতই উপেক্ষার জিনিস? সুস্থ, সুগোল, সুন্দর শিশুকেই শুধু সম্ভব করতে হবে—আদর করতে হবে? যে-সন্তান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে সকলের মনে সন্ধিগ্ধতা সৃষ্টি করে, জননীর মন দেয় নিরাশায় ভরে—অন্ধ চোখ নিয়ে যে পৃথিবীতে নেমেছে, কিংবা কথা কইবার শক্তি যে সঙ্গে করে আনতে পারে নি, কিংবা শুনবার, বুঝবার, গ্রহণ-করবার শক্তিকে যে কোন দূরান্তের পথে রেখে এসেছে, কিংবা যার দেহের নির্জীবতা কাদাখোঁচার ছায়ার মত, চড়াইয়ের মত, হেমন্তের বিকেলের শুকনো পাতার রাশের ভিতর বালি-হাসের বিবর্ণ ডিমের মত, পৃথিবীর হৃদয় যেন তাদের সম্বন্ধে নিজেকে সময়ে-অসময়ে অবারিতভাবে ব্যয় করতে কেন এমন কুণ্ঠিত হয়? আনন্দ-উৎসবই কি জীবনের সবচেয়ে বড় কথা? সহানুভূতি—

তাকিয়ে দেখলাম জেগে আছে।

—'কী ভাবছিস রে?'

কোন উত্তর দিল না।'

—'খাবি কিছু?'

—'হ্যাঁ খাব।'

—'কী খাবি?'

—'আমি গুল খাব বাবা।

—'গুড়?'

আকাঙ্ক্ষা খুব সাধারণ। এর চেয়ে ভাল জিনিসের কল্পনা এর জগতে নেই।

—'চকোলেট খাবি রে?'

চুপ করে রইল। চকোলেট কী জানে না অবিশ্যি–

—'টফি?'

এবারও নিস্তব্ধ; ভাবলে, ঠাট্টা করছি।

—'কী খাবি রে?'

কোথার থেকে একটা গঙ্গাফড়িং, তেলাপোকা, চামচিকা, ফড়ফড় করে উড়ে এল—ঘরের ভিতর ক্লান্তিহীনভাবে ঘুরতে লাগল।

চামচিকাটার দিকে তাকিয়ে চোখ ধীরে-ধরে ভারী হয়ে এল মেয়েটির; ঘুমিয়ে পড়ছিল, একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'গুড় খাবি না রে?'

—'কই?' উঠে বসে হাত পেতে বললে।

ধীরে-ধীরে আস্তে-আস্তে শুইয়ে দিয়ে মাথায় আস্তে-আস্তে হাত বুলুতে লাগলাম—'গুড় কাল সকালে খাবে; কেমন?'

—'আচ্ছা।'

—'নলেন গুড না?'

—'হ্যাঁ।'

অন্যমনস্ক হয়ে অবাস্তব কথা ভাবছিলাম, কিছুক্ষণ পর ফিরে তাকিয়ে দেখলাম ঘুমিয়ে যাচ্ছে।

আরো দু-তিন দিন কেটে গেছে।

সকালবেলা বাবা স্কুলের ছেলেদের খাতা দেখছিলেম। ছোট্ট-ছোট্ট টেবিলে বই, ডিকশনারি খাতাপত্র, দোয়াতকালির স্তূপ—

মা এসে বললেন, 'একটা ছোকরা চাকর রেখেছি।'

—'রেখেছ?'

-'হ্যাঁ।'

—'কী নাম চাকরটার?'

—'হরিচরণ।'

—'তুমিই রাখলে?'

—'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবার সময় ছিল না।'

—'কবে রেখেছ?'

—'আজ সকালেই'।

—'কত মাইনে?'

—'পাঁচ টাকা। রাখতে হয়েছে সুরেশবাবুর জন্য। চাকর ছাড়া ওর বড় কষ্ট।'

দেখতে-দেখতে পিসিমা এসে দাঁড়ালেন।

বললেন—'মেজদার জন্য চাকর না রেখে দিলে চলে না তো দাদা।'

বাবা—'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

—'এই তো কাল পায়খানায় যাবেন—আমরা কেউ ঐ দিকে ছিলাম না, কে ঘটিতে জল দেবে, প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হল।'

—'দশ মিনিট? তাই তো চাকর থাকলে এ-রকম বিপত্তি তো হত না।'

—'গাউটটা বেড়েছে কি না, কলকাতায়ও যেতে পারেন না, পায়ে মালিশ করে দেবার লোকেরও নিতান্ত দরকার।'

বাবা—'তা সুরেশ আমাকে আগে বললেই পারত; এসেছে তো দশ দিন, চাকর ছাড়া এত দিন তা হলে খুব কষ্টেই কাটাল।'

পিসিমা—'তা যা হবার তো হয়ে গেছে।'

—'তোমার টানাটানির সংসার দেখে মুখ ফুটে তোমাকে বলতে পারে নি হয় তো।'

—'আমার কিন্তু বারবার মনে হচ্ছিল একটা চাকর ছাড়া বর্ষার মধ্যে ওর হবে কী করে?'

পিসিমা—'মনে হলেই তো শুধু হয় না, ব্যবস্থা করতে হয়।'

—'তা ঠিক; যাক, তুমি না হয় আমার হয়ে বেশ ভাল ব্যবস্থাই করেছ।'

—'এর মাইনে কিন্তু পাঁচ টাকা।'

-'শুনেছি।'

—'একটা কথা কিন্তু দাদা।'

—'বলো।'

—'মেজদা হয় ত টাকাটা আপনাকে দিতে চাইবে কিন্তু আপনি নেবেন না।'

—'ওঃ, সে কথা কি তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে।'

—'তা হলে মেজদাকে আমি একটা কথা গিয়ে বলব?'

—'কী কথা?'

—'বলব যে দাদাকে টাকা নিয়ে সাধতে যাবেন না। তা হলে দাদা বিরক্ত হবেন।'

—'আমি জানি সুরেশ আমাকে টাকা নিয়ে সাধতে আসবে না।'

—'কী রকম?'

—'সে জানে সে তার দাদার বাড়িতে আছে।'

—'কই? দু'ভায়ে বনিবনা কোথায়?'

—'কেন? কী রকম?'

—'তার খাবার সময় তুমি গিয়ে দাঁড়াও?'

বাবা একটু চুপ থেকে—'সকালবেলা তো আমি স্কুলে চলে যাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বেশ, রাতেরবেলা?'

—'আমি খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ি এই আমার চল্লিশ বছরের অভ্যাস—সুরেশের খাবার সময় তদারকের জন্য খোকাকে পাঠিয়ে দি তাই—খোকার মা তো আছেনই—তা তুমি যদি মনে করো আমি না যাওয়াতে সুরেশ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তা হলে আজ থেকে আমি গিয়ে বসব।'

—'বসবার দরকার নেই।'

—'দরকার নেই?'

—'একটু বসে পায়চারি করে চলে আসলেই হবে, আপনি ওখানে গিয়ে বসলে মেজদার কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে।'

—'কেন?'

—'অন্তত কথাবার্তার ধারা বদলে যাবে, আধ্যাত্মিক হয়ে উঠবে।'

—সেটা তোমরা চাও না অবিশ্যি।'

—'না।'

—'আচ্ছা, তা হলে গিয়ে দু-চার মিনিট পায়চারি করা যাবে।'

—'হ্যাঁ, দু-এক মিনিট থেকে, আপনি আপনার ঘরে চলে গেলে, কেউ আপনার পথ আটকাতে যাবে না, লৌকিকতাও বজায় থাকবে।'

—'বেশ কথা, বেশ কথা।'

—'হরিচরণ কিন্তু একান্তই মেজদার।'

—'ত ছাড়া আবার কার? সুরেশের জন্যই তো রাখা।'

—'না, সেই কথাটাই সব সময় যেন আপনাদের খেয়ালে থাকে। সেই জন্যই বলছিলাম।'

মা—'বৌমা হয় তো মাঝে-মাঝে কিছু ফরমাস দিতে পারে।'

—'তা যেন না দেয়।'

একটু কেশে পিসিমা—'রান্নাঘরের কোনো কাজ হরিচরণ করতে পারবে না।'

বাবা—'না, রান্নাঘরের জন্য তাকে তো রাখা নয়।'

—'বাজারে হেম যেমন যাচ্ছিল তেমনি যাবে। আপনারা ওকে জল তুলে বা কাপড় কেচে দিতে বলতে পারবেন না। এ-সব বৌমা আর বৌঠান যেমন করছিল তেমনই করবে। সন্ধ্যার বাতিও বৌমাই জ্বালবে।'

বাবা হেসে, 'কারুর কোনো আপত্তি নেই।'

—'হরিচরণ মেজদার হাত-পা টিপে দেবে, কাপড়-চোপড় সাবান দিয়ে ধুয়ে দেবে। বিছানা পাতবে, ঘর ঝাঁট দেবে, জিনিস পত্র সাজাবে-গোছাবে, পাইখানার জল দেবে, পাকা চুল বেছে দেবে—এই সব আর-কী?'

—'বেশ কথা; এখন চাকরটা কী-রকম হয়' আনাড়ি হলে তো সুরেশের বড্ড কষ্ট।'

—'না, সে বেশ চালাক আছে।'

—'গায়ে-পায়ে কাজ করতে পারবে বেশ?'

—'তা ফুর্তিতে সকাল থেকেই তো কাজে লেগে গেছে।'

—'বেশ।'

-'মেজদার গা টিপছে সেই সকাল থেকে।'

—'সুরেশের গাউট বাড়ল না কি আরো?'

—'বাড়েও নি কমেও নি—যেমন ছিল তেমনি আছে তবে না-টিপলে কষ্ট লাগে।'

—'দেখো, চাকরটা যেন বেশ মোলায়েমভাবে টিপতে পারে, আর হাত, পা, ঘাড় টিপবার আগে কখনো যেন তামাক না খায়।'

—'মেজদা চেয়েছিলেন জমিদারি স্টেটে ম্যানেজারি করতে, ঢের বড়-বড় চাকরি পেয়েছিলেন—আমি বললাম, থাকরে বাপু, হাতে-পায়ে এত, বয়সও তো কম নয়, তোমার এখন সেবা শ্রদ্ধা পাবার বয়স, সুস্থিরে বসে ভগবানের সান্নিধ্যে থাকবে, মানুষকে ধর্ম উপদেশ দেবে, পথ দেখাবে, এই আর-কী।'

মা বললে, 'হরিচরণকে তিন বেলা খাবার দিতে হবে। হ্যাঁ তিন বেলা ভাত দেব কড়ারে নিয়েছি, সুরেশবাবু আচ্ছা ছেলে মানুষ।'

—'খাবে তো! না হলে কাহিল শরীরে কী কাজ করবে?' বাবা সাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে—'যা খেতে পারে, খাবে।' একটু গলা খাঁকরে—'মানুষ তো ক্ষিধের অতিরিক্ত কিছু খায় না।'

মা একটু চিন্তিতভাবে—'তিন বেলা এক জন চাকরের অন্তত দেড় সের চালের ভাত লাগবে।'

—'লাগলে লাগবে? এ নিয়ে তুমি ভাবছ কেন বড় বৌ।'

—'না, টেনে-হিঁচড়ে সংসার চলছে কি না।'

—'তা, আমি না হয় বলব মেজদাকে চালের টাকাটা দিতে। এক টাকা করে তো চালের মণ।'

মা তাড়াতাড়ি পিসিমার মুখে হাত চাপা দিয়ে—'খবরদার, এমন কাজও করো না ঠাকুরঝি।'

—'দাদা বললে অবশ্য মেজদাকে গিয়ে লাগাতাম; তোমার কথার কী-আর মূল্য বৌঠান; তুমি তো বাজারের ঘটি-বাটি।'

খানিক দূর গিয়ে পিসিমা ফিরে এসে বাবার দিকে তাকিয়ে—'আমি কিন্তু মেজদার সঙ্গে কলকাতায় যাব।'

—'তা একবার গিয়ে বেড়িয়ে এলে—বেশ তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বেড়িয়ে আসা শুধু নয়।'

—'তবে?'

—'পুজোর সময় আমাকে আনবার জন্য হেমকে যদি পাঠাও তা হলে আমি আসব না।'

—'কেন?'

—'চালের দর নিয়ে যারা কষাকষি করে সে-সব চামারের বাড়ি আমি থাকি না।'

কিছু না বলে পিসিমা হন হন করে চলে যাচ্ছিলেন। মা ডাক দিলেন—

দাঁড়ালেন না, কিংবা পিছে তাকালেন না।

—'তোমার দাদা তোমাকে ডাকছেন।'

পিসিমা ফিরে এলে, বাবা—'কই আমি তো তোমাকে ডাকি নি।'

মা বিহ্বল হয়ে বললেন—'আচ্ছা বেশ, আমিই ডেকেছি—আমার ডাক বুঝি শুনতে নেই?'

বলে ঝুপ করে পিসিমার থানের আঁচলখানা ধরে নিজের মুটির মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে কানে-কানে কথা বলতে—বলতে গলাগলি হয়ে পেয়ারা গাছটার দিকে চলে গেলেন দু'জনে।

পেয়ারা তলায় দাঁড়িয়ে আধ ঘণ্টা কথাবার্তার পর পিসিমা পাড়ার দিকে চলে গেলেন।

মা এসে বললেন, 'শুনছ?'

বাবা খাতার থেকে মুখ তুলে তাকালেন।

—'চামার বলুক, কসাই বলুক, আমাদের অভদ্র সেজে কী লাভ?'

বাবা চোখ নামিয়ে লিখতে লাগলেন।

—'রাগ করেছ?'

—'ঐ রকমই বলে।'

—'আমাকে বললে বাজারের.................!'

কল্যাণী চলে যাচ্ছিল, মা একটু থমকে থামলেন।

বাবা–'কল্যাণী চলে গেল যাক, এ সব প্রসঙ্গ তুলে কোনো লাভ নেই, আমার স্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

—'আজ যে দুধ খেলে না, ক দিন ধরে দুধ খাচ্ছ না যে?'

—'দুধ হজম হচ্ছে না।'

—'চা আর মুড়ি তো খুব হজম হয়।'

—'আচ্ছা, এর মানে ডিকশনারিতে দেয় নি কেন খোকা?'

—'এটা কার ডিকশনারি?'

—'অক্সফোর্ডই তো'

—'দেয় নি? কী জানি।'

—'কোথায় পাব তবে?'

—'নিউ ইংলিস ডিকশনারিতে আছে হয় তো।'

—'হ্যাঁ। তা কোথায় পাই?'

—'এখানে কারো আছে বলে তো মনে হয় না।'

বাবা একটু চুপ থেকে—'নবাব হামাম মিঞার খুব বড় ডিকশনারি আছে।'

—'আছে না কি?'

—'হ্যাঁ বেশ নামজাদা।'

—'নবাবজাদা কোথায় থাকেন?'

—'সে প্রায় মাইল তিন-চারের পথ।'

—'আগে তো ছিলেন নদীর দক্ষিণ দিকে এক চর, না শকুন চর, কী বলে তারই পাশে।'

বাবা বাধা দিয়ে—'সে বাড়ি নদীতে ভেঙে গেছে। এখন একেবারে নদী এড়িয়ে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে ভিতরের দিকে বাসা করেছেন।'

একটু গলা খাঁকরে, 'তোমাকে—চিনিয়ে দিচ্ছি।'

এক চিলতে সাদা কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—'দেখো।'

মিনিট পাঁচেক পরে—'চিনলে?'

—'হ্যাঁ, ওদিকে আগে তো বন-জঙ্গল ছিল বলে জানতাম।'

—'একটা মস্ত বড় প্রান্তরও ছিল। এখন বসতি হয়েছে অনেক। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বিঘা জমির ওপরে চমৎকার সুন্দর বাড়ি নবাবজাদার।'

—'কী রকম বই আছে লাইব্রেরিতে?'

—'প্রায় হাজার তিরিশেক বই। প্রায়ই ইংরেজি ক্লাসিক।'

—'তুমি গিয়েছ সেই লাইব্রেরিতে?'

—'হ্যাঁ গিয়েছি কয়েকবার।'

—'নতুন বই আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'প্রত্যেক সনেই তো বই কিনছেন। খুব যা-চাও সে-রকম বই পাবে আশা করি।'

—'গেলে হয় এক দিন।'

—'মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের চিঠি নিয়ে যেও।'

বাবা বলতে লাগলেন, 'শব্দটার মানে দেখে এসো, শুধু শব্দার্থ নয়, সেটা আমি জানি খানিকটা, আমি চাই এই শব্দটির আদ্যোপান্ত ইতিহাস, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা।'

বাংলা খবরের কাগজটা পড়ছিলাম। দক্ষিণের ঘরে শুনছিলাম মেজকাকা ও মায়ের হাস্য কলরব বেশ জমে উঠেছে।

পিসিমা গলায় আঁচল জড়িয়ে এসে—'দাদা।'

খাতার থেকে চোখ না তুলেই—'কী, কী মনে করে?'

—'মেজদাকে যে রোজ মিঠাই কিনে দেওয়া হচ্ছে সে কথা তোমাকে বলি নি।'

—'না, শুনি নি আমি।'

—'রোজ বিকেলে, রসগোল্লা, সিঙ্গাড়া, পান্তুয়া, অমৃতি খান।'

—'বেশ তো, বাজারের থেকে না এনে ঘরেই করে দিতে পারত।'

—'তা, পয়সা অনেক জমে গেছে। ক্ষিতীশ আমাকে বললে—বাকিতে আর আমি দিতে পারব না।'

—'ক্ষিতীশকে খাতা নিয়ে আসতে বলো।'

—'আচ্ছা।'

—'আর একটা কথা।'

—'বসে বলো, দাঁড়িয়ে রইলে? হেম একটা মোড়া এনে দাও।'

—'না, না, আমার বসতে হবে না, এক মিনিট শুধু।'

চৌকাঠের ওপর বসে—'মাঝে-মাঝে গাড়িতে বেড়াতে গেছেন, সেই ভাড়াটা।'

—'আচ্ছা।'

—'আর একটা ইংরেজি খবরের কাগজ রোজ দিতে বলবেন।'

—'অমৃত বাজার কি একটা রাখা হয় না হেম?

—'মেজকাকা স্টেটসম্যান চান।'

—'বেশ তাই রেখো; যার যাতে তৃপ্তি হয় তার থেকে তাকে বঞ্চিত করে লাভ নেই ত কিছু।'

পিসিমা—'কাপড় কাচা সাবানের জন্য কিছু পয়সা দেবেন?'

—'এক সের সাবান?'

—'হ্যাঁ, ধরুন, আড়াই সের আন্দাজ।'

—চাবি তো ওর কাছে। বলো গিয়ে, যত পয়সা লাগে দেবেন।'

বাবা গুন-গুন করে গাইতে গাইতে উঠলেন। সংস্কৃত একটা শ্লোক। হয় তো উপনিষদের।

মাইনে অবিশ্যি পঞ্চাশ টাকা। ধার, পাঁচ হাজার পেরিয়ে গেছে।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর খুকিকে ঘুম পাড়িয়ে বাবার কোঠায় গিয়ে বসলাম। সদর রাস্তার দিকের দরজাটা বাবা বন্ধ করে স্কুলে চলে গেছেন, খুলে দিলাম দরজাটা। দিব্যি আলো ঘরের ভিতর ঢুকল, ফুরফুরে মেঘলা বাতাস। কয়েক হাত দূরে সবুজ নিবিড় কৃষ্ণচূড়া গাছটা দাঁড়িয়ে—এখনো ইতস্তত কিছু ফুল ফুটে আছে।

একটা টুল নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বসলাম।

পায়ের শব্দ শুনেই তাকিয়ে দেখি মা পান বিচুতে-চিবুতে দাঁড়িয়েছেন।

—'খাওয়া হয়ে গেল?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী দিয়ে খেলে আজ?'

এ প্রশ্নের উত্তর মা কোনোদিনই দেন না, আজও নিরুত্তর হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

বললাম—'বসো।'

—'না, ঢের কাজ আছে।'

—'কোনো সময়ই তো তুমি বসতে চাও না।'

কোনো জবাব দিলেন না।

—'তোমাকে কখন আমি পাই বলো তো?'

এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর নেই।'

—'সকালবেলা ঘুমের থেকে উঠে দেখি তুমি রান্নাঘরে চলে গেছ। কত সকালে যে যাও তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।'

—'না-গিয়ে উপায় কোথায়?

—'শুধু সেই জন্যই না, আমার মনে হয় যেতে তোমার ভাল লাগে।'

—'তাই তোমার মনে হয় বটে।'

—'তাই না মা? উকিলের যেমন কোর্টে যেতে ভাল লাগে, ডাক্তারের যেমন হ্যাট-কোট পরে স্টেথিস্কোপ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে খুব উৎসাহ, দালাল যেমন নাকে-মুখে গুঁজে ছাতি নিয়ে ছুটতে ভালবাসে, হেঁসেল হয়েছে তোমার তাই।'

নীরব ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এই বৃষ্টির ভোরে বিছানায় একটু শুয়ে থাকতে কত ভাল লাগে মানুষের। তুমি সব অগ্রাহ্য করে অন্ধকার থাকতে একটা গামছা মাথায় ফেলে বৃষ্টি ভেঙে রান্না ঘরে দাও ছুট।'

—'চুনে দেখছি জিব পুড়ে গেছে।'

—'তার পর রান্না ঘরে গিয়ে কী করো?'

—পানটা নিশ্চয়ই বৌমা সেজেছিল আজ।'

—'উনুন জ্বালাও? না আগেকার দিনের বাসন মাজো?'

—'বৌ এত চুন খায়?'

—'হ্যাঁ চুন খেতে খুব ভালবাসে, শরীরে ক্যালসিয়াম খুব কম কি না।'

—'ক্যালসিয়াম কী?'

—'যা দিয়ে হাড় তৈরি হয়; কল্যাণীর সেই জিনিসের খুব অভাব, তার মেয়েরও। দু'জনেরই রিকেট।'

—'রিকেট কাকে বলে?'

—'যাদের শরীরে চুন জাতীয় জিনিস, আরো নানা রকম সার পদার্থ ঢের কম, ভিটামিন কম, ভিটামিন এ-বি-সি-ডি জীবনী শক্তির যত সব মাল-মশলা সবই নিবন্ত প্রদীপের মত জ্বলছে আর কি।'

—'আজ বড্ড চুনা দিয়েছে এই পানে। আমি এক শ বার নিষেধ করে দিয়েছি তবু যদি কানে ঢোকে। এরপর দেখছি একটা পান নিজের তৈরি করে খেতে হবে।'

—'আগের রাতের উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো আগে মেজে নাও?'

—'তোমার বৌ তো আর মেজে দেবে না আমাকে'।

—'তারপর উনুন জ্বালাও?'

—'না, বাসন আগের রাতে মেজে রাখি।'

—'রোজই? সমস্ত?'

—'হ্যাঁ, তবে কি আবার থোক—থোক করে মাজব না কি?'

—'চেপে যে-দিন ঝড়-বৃষ্টি আসে।'

—'বললাম তো, রোজই মেজে রাখি রে। তুইও নিজের চোখে দেখেছিস কত? আজ যে বড় জিজ্ঞাসা?'

—'আগে তো ছাতা নিতে না।'

—'এখনো নেই না।'

—'বৃষ্টিতে এত ভিজতে পারে মানুষ?'

—'ঘাটলার পাশে মস্ত বড় জাম গাছটা আছে রে।'

—'তাতে বৃষ্টি সানায়।'

—'সানিয়েই তো যায় এক রকম দেখি।'

—'সকালবেলা প্রথম উনুন জ্বালাও গিয়ে?'

—'হ্যাঁ রে।'

—'উনুন জ্বালানো কি সোজা ব্যাপার মা, বিশেষত এই বৃষ্টি বাদলের দিনে সমস্তই থাকে স্যাঁতসেঁতে হয়ে। সমস্ত বাড়িঘরে শুকনো ডালপাতা জোগাড়, কয়লা ভাঙা, গোবর দিয়ে মেখে ঘুটে তৈরি করা।'

—'বড় তো ভিজে ন্যাকড়া নিয়ে বসলি রে? খুকি ঘুমিয়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আর বৌমা?'

—'পড়ছে বোধ হয়।'

—'কী বই?'

—'কিংবা লিখছে।'

—'চিঠিই লিখছে বোধ করি।'

—'কাকে?'

—'তা তো আমি জিজ্ঞেস করি নি।'

—'জিজ্ঞেস করলে, বলে কি সব সময়?'

—'কেনই-বা বলবে? আমরা কেউ-বা কাকে জীবনের সব কথাটুকু বলি?'

হাসতে লাগলাম।

মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

বললেন, 'যাই।'

—'দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই তো রইলে এতক্ষণ বসলেও না।'

—'যাই, একটু ঘুমোই গিয়ে।'

—'ঘুমোবে না তুমি নিশ্চয়ই।'

—'কী করব তা হলে?'

—'ঘুমোলেও আধ ঘণ্টার বেশি নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কেন? তার পর কোথায় যাব?'

—'সে সব তুমি জান, তবে দুপুরে আধ ঘন্টা-তিন কোয়াটারের বেশি ঘুমোতে দেখি নি কোনো দিন; কোনো দিন একাগ্রভাবে অনেকক্ষণ বই পড়তেও দেখি নি; পাড়ায় কড়ি খেলা বা বিস্তির মজলিশে পনের মিনিটের বেশি তুমি টিকতে পার না; সেলাইয়ের কলের ইতিহাস তোমার জীবনে নেই; না আছে নকসি কাঁথা, মোজা, টুপি বুনবার।'

—'সমস্ত সময়ই রান্নাঘরে থাকি বুঝি?'

—'না, তা নয়।'

—'তবে?'

—'মানুষকে আপ্যায়িত করতে, কথাবার্তা বলতে, আসর জমাতে, খুবই পার তুমি কিন্তু—'

একটু চুপ থেকে—'সময়ের অভাবে কিছুই হল না তোমার।' মা ঈষৎ প্রসন্ন ও বিমর্ষ মুখে—'যার যেমন ভাগ্য।' ঈষৎ বিরস ও খানিকটা প্রফুল্লভাবে—'অবিশ্যি নিজের ভাগ্যকে দোষ দেই না আমি, বিধাতা আমাকে যা দিয়েছেন'—পরস্পর বিরুদ্ধ কথা কলের মত আউড়ে গেলেন। এখন সময় বিশেষে বিক্ষোভও যাতনা; অন্য সময়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে তৃপ্তি।

ভাবলেন নিজের জীবনের জবাবদিহি দেওয়া হয়ে গেছে।

—'হ্যাঁ সময়ের অভাবে কী হল না তোমার? এই তো তিন মাস ধরে এখানে এসেছি-দিনের ভিতর কতবার তোমাকে চেয়েছি। কিন্তু সব সময় শুনেছি অনেক কাজ। কোনো সময় নেই।'

মা চুপ করেছিলেন।

—'বাবাও তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান' বলতে পারলে ভাল লাগে তার—'

বাধা দিয়ে মা—'এমন মিথ্যা কথা বলো না তুমি।'

—'মিথ্যা নয়, সত্য কথা।'

—'চব্বিশ ঘণ্টা তিনি নিজের কাজ নিয়ে আছেন।'

—'না চব্বিশ ঘণ্টা নয়, অনেকটা সময় তাঁর অবসর।'

—'আমি তো তাঁকে এই পঞ্চাশ বছর ধরে দেখছি।'

—'স্কুল থেকে এসে রাত দশটা-এগারটা, কোনোদিন বারটা অব্দি তিনি কথার মানুষ খুঁজতে থাকেন, আলাপ করতে চান, নিজেকে বড্ড একা বোধ করেন।'

—'বেশ, তো, দাবার আড্ডায় গেলেই পারেন।'

—'বাবা তো ইহজীবনে কোনোদিন তাসও খেলেন নি।'

—'এ-রকম অদ্ভুত লোককে বাধ্য হয়েই একা থাকতে হয়।'

—'বাঃ বাঃ তুমি এই রকম কথা বল, তাস-পাশার মজলিশ ছাড়া, মানুষের আনন্দ পাবার অন্য কোনো জায়গাই নেই এই পৃথিবীতে?'

—'যে লোক বাড়ির থেকে বেরুবে না, সমাজে মিশবে না, আন্তরিক কথাবার্তা বলবার জন্য বন্ধু-বান্ধব কী করে জুটবে তার।"

মা বললেন—'অর্থ সম্পদ নেই; প্রভুত্ব প্রতিপত্তি নেই, কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ নেই।'

—'না, তা নেই।'

—'এ-রকম ধরনের বোবা লোকের কাছে কে এসে বসবে বলো?'

—'না বড় একটা কারুর আসবার কথা নয় বটে।'

—'মাঝে-মাঝে দু-চারটি ছাত্র এসে টিক-টিক করে।'

—'হ্যাঁ তা দেখেছি।'

—'ক্কচিৎ দু-এক জন মাস্টার আসে। তাও যদি হেডমাস্টার হতেন; তাও তো নন তোমার বাবা।'

—'বাবার জীবনটাকে এ-রকমভাবে পর্যালোচনা করা চলে বটে কিন্তু আমি তার জীবনের অন্য রূপ দেখেছি।'

উদাসীন চোখ তুলে মা আমার দিকে তাকালেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে মাথা হেঁট করে রইলাম, কেমন বেদনা বোধ করছিলাম।

—'কোনো অপূর্ব রূপ তোমার চোখে পড়ল?'

—'তোমার চোখেও পড়েছে নিশ্চয় এক দিন, যখন তিনি মরে যাবেন তখন বুঝতে পারবে।'

মা—'ছি, এমন কামনা করো তুমি? জেনো, আমার নোয়া-সিঁন্দুর এক দিন ঘুচে যাবে এই কথা আমাকে শুনিয়ে বলবার প্রবৃত্তি তোমার সংযম মানে না?'

—'বাবার জীবনী বা চরিত্রের কথা বিশদভাবে তোমাকে বলতে যাচ্ছি না, তোমাকে বলার প্রয়োজনও নেই, কিন্তু দেখে না-দেখেও সবই জান তুমি। আজকালকার নানারকম নবীন-তরুণ মানুষদের মধ্যে তিনি এমন একজন সাবেকি লোক, যিনি চলে গেলে আমাদের পরিবারের শাখায়-প্রশাখায় কেউ কোথাও তার স্থান পূর্ণ করতে পারবে না।'

—'আবার তুমি সেই কথাই বলছ; নোয়া-সিঁদুর নিয়ে তার পায়ে মাথা রেখে আমি মরব।'

—'পায় মাথা রাখবার দরকার নেই—দিনের মধ্যে কয়েকবার অন্তত তার মাথার কাছে এসে বসো।'

—'যাই।'

—'কোথায়?'

—'লুচি করতে হবে। তোমার মেজকাকার জন্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তা এত তাড়া কী? এখন তো মোটে দুটো।'

—'উদ্যোগ করতে হবে তো।'

—'না হয় একটু দেরিই হয়ে গেল আজ; বলো হেমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটু বিলম্ব হয়ে গেল; কিছু বলবেন না তিনি।'

—'না, আমার একটু এখন দক্ষিণের ঘরে যেতে হবে।'

—'কেন?'

—'তোমার মেজকাকা বলেন, দুপুরটা বড্ড একা লাগে।'

—'তাই না কি?'

—'সান্নিধ্য তিনি বড় একটা ভালবাসেন না।'

—'পিসিমা ওখানে আছেন?'

—'হ্যাঁ আছে। ওর বকবকানি মেজবাবুর চক্ষুশূল।'

—'মেজকাকা জেগে আছেন এখনো?'

—'আছেন বই কি; সারা দুপুরই কি মানুষ ঘুমোয়?'

—'কী করেন সমস্তটা দুপুরবেলা?'

—'কীই-বা করবেন, তাই তো বলছিলেন, বড্ড একা লাগে, সময় কাটতে চায় না; তুমি এসো বড় বৌ।'

—'বাবা তোমাকে বড় বৌ বলে ডাকেন না।'

মা একটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন।

—'কিংবা কাছে এসে বসতেও বলেন না?'

—'বুড়ো বয়সে কাণ্ডজ্ঞান হারান নি তো'—

—'স্কুল থেকে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেন, খুকিকে আদর করেন, কোলে নেন, খুকির সঙ্গে খেলা করেন, কিন্তু তবুও যেন কেমন একটা অভাব ঘুচতে চায় না, বুঝি অনেক কথা বলবার আছে তাঁর, তিনি অনেক বিনিময়ের মানুষ, আমার কাছে সমস্ত কথা ব্যক্ত করবার তাঁর সুযোগ নেই—অধিকার নেই, নির্দেশ নেই। আর্টিস্ট নন তিনি, লিখে নিজেকে নির্মুক্ত করে নেবার অবসর নেই। সামাজিক লোক নন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে গিয়ে নিজের বোঝা হালকা খালাশ করে নেবার সৌভাগ্য্য নেই। ঘুরে ফিরে আমার কাছেই আসেন। বিছানার অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকেন অনেকক্ষণ, চেয়ারে গিয়ে বসেন, বারান্দায় গিয়ে পায়চারি করতে থাকেন, আমার কোঠায় এসে আবার উঁকি দিয়ে যান, দু-চার মিনিটের জন্য আলো জ্বালেন, আলো নিভিয়ে ফেলেন। তারপর আবার চলে অন্ধকারের মধ্যে পায়চারি—এ-কোঠায়, ও-কোঠায় সে-কোঠায়—বারান্দায়, এ যেন আর ইহকালেও ফুরুবে না, নিজের কোঠায়—চেয়ারে এসে চুপচাপ বসে থাকেন। দক্ষিণের ঘরে পিসিমা, মেজকাকা ও তোমার হাসি—তামাশার কোলাহল ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতে পাই আমরা—কিন্তু এ-ঘরটা খাঁ-খাঁ করতে থাকে। কল্যাণী তার কোঠায়, আমি আমার কোঠায়, বাবা নিজের কোঠায়। জীবনের হাসি-আনন্দকে আমরা কেইউ অপছন্দ করি না, কিন্তু পরস্পর এত কাছে থেকেও সে জিনিস আয়ত্ত করবার অধিকার আমাদের নেই, অনেক রাত বসে খবরের কাগজটা চিবিয়ে-চিবিয়ে শেষ করি, তারপর আবার চিবোই, তারপর আবার চিবোই। বাবা থেকে-থেকে উপনিষদের শ্লোক আওড়ান, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন—কল্যাণী তেঁতুলের ঝোল খেয়ে সন্ধ্যারাতেই বাতি নিভিয়ে জীবনের ক্ষমাহীন জীবনস্রোতের কথা ভাবতে থাকে।

মা—'এই জন্যই তো এই ঘরে আসতে চাই না; এ নিরানন্দের মধ্যে এসে অন্ধকারের ভিতর মুখ গুঁজে কাঁদব—'

—'কিন্তু এটাই তো তোমার ঘর—'

—'সেইজন্যই তো ঘুমোবার সময় এ ঘরে আসি।'

—'আমার ও কল্যাণীর কথা আলাদা। মানুষের জীবনকে তুমিও স্বীকার করেছ, বাবাও স্বীকার করেছেন, তোমাদের বিশ্বাস আছে, ভক্তি আছে, প্রেম আছে, তোমরা প্রার্থনা কর; অথচ তার এক মুহূর্ত আগেও অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক মানুষদের সঙ্গে অবান্তর কথা বল—অথচ তুমি ঘুমোবার সময় এ-ঘরে আসতে চাও শুধু, বাবা না-ঘুমিয়ে ঘুরে মরেন, বুঝি না এ কেমন?'

—'এক দিন বুঝবে; তুমিই তো এক দিন আমাকে চিতায় নিয়ে চড়াবে, সে দিন আমার কপালের সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারবে সব।'

—'স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে শাড়ি-সিঁদুরের আড়ম্বরের কোনো মূল্য দেই না আমি; হয় ত সিঁদুরের দিকে তাকাবই না; জীবনে কে কাকে কেমন আঘাত করেছে সেই কথাই মনে হবে।'

—'যাক, তোমার সঙ্গে মিছিমিছি কথা বলবার কোনো অভিরুচি নেই আমার।'

মা চুলের ভিতর ধীরে-ধীরে চিরুনি নাড়ছিলেন।

—'পৃথিবীতে যদি অনেক দিন বেঁচে থাকতে হয় তা হলে সৎচরিত্র ধার্মিক আদর্শ গৃহস্থ হয়ে যেন জীবনটা না কাটাই—তার চেয়ে তাড়িখানাও ঢের ভাল।'

—'তোমার যা মনে আসছে, তা বলছ দেখছি হেম।'

—'বাবার মত সত্তর-বাহাত্তর বছর যদি বেঁচে থাকতে হয়—কবিতা লিখবার শক্তি যদি হারিয়ে ফেলি, তা হলে, তা হলে চীনাদের মত জুয়ার আড্ডায় কাটাব। কিংবা জাহাজের খালাশি হয়ে বেরিয়ে যাব, মিছিমিছি বাবার মত উঠানে বারান্দায় অন্ধকারে পায়চারি করে শিষ্ট সাধু হয়ে জীবনের সম্ভাবনাটাকে নষ্ট করে কী লাভ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজকাকাও করেন না, সেজকাকাও করেন না; প্রতি মুহূর্তেই জীবনের কাছ থেকে নতুন কিছু পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনায় থাকেন।'

ভিজে শালিকের ঘাড়ের পালকের মত চুল আঁচড়ানো হয়ে গিয়েছিল মার, শাড়ি বদলাতে গেলেন, ফিরে এসে খুকির মাথায় দু-তিন বার হাত বুলিয়ে দক্ষিণের ঘরের দিকে চলে গেলেন। রাত বারটা-একটার আগে এ ঘরে আর পদধ্বনি শোনা যাবে না।

বাবা চমকে উঠে—'কে?'

—'আমি'

—'ও, হেম?'

—'হ্যাঁ'

—'রাত কটা বাজে?'

—'এই দশটা হবে।'

—'ওঃ তবে তো কম রাত হয় নি—কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আরো ঢের বেশি রাত হয়েছে, এই বারটা আন্দাজ,' একটু হেসে, 'অবিশ্যি, আমার মনের ঘড়ি অনুসারে রাত একটা-দুটো হয়ে যাওয়া উচিত এতক্ষণে; কিন্তু তুমি খেয়েছ?'

—'হ্যাঁ অনেকক্ষণ, আপনি খেলেন না কিছু?'

—'এক গ্লাস মিছরির পানা খেয়েছি, আজ আর খাব না।'

—'কিছুই না?'

—'না', একটু চুপ থেকে, 'মাঝে-মাঝে উপোস দেওয়া দরকার; তাতে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না, ভালই হয়, খুকি ঘুমিয়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'দুধ খেয়েছিল?'

—'খেয়েছে।'

—'তোমার বিছানায় নিয়েছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'খুকির আবার পাঁচড়া হচ্ছে দেখলাম।'

—'হ্যাঁ।'

—'সমস্ত হাত-পা, বুক-পিঠ, খুজলিতে ভরে গিয়েছে।'

—'দেখেছি।'

—'এ তো বড় ভাল কথা নয়।'

—'নাঃ ঘুরে-ঘুরে হচ্ছে।'

—'কিন্তু বার-বার এ-রকম পাঁচড়া হয় কেন? এই আড়াই বছরের মধ্যে তিন বার হল?'

মাথা তুলে আমার দিকে তাকালেন।

—'কলকাতায় তুমি চৌদ্দ বছর ধরে আনাগোনা করছ, কখনো কোনো প্রলোভনে পড়ো নি তো? শরীরে কোনো রোগ আছে তোমার?'

—'আছে বলে তো জানি না'

—'এ মেয়ের প্রতি দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করতে পেরেছ বলে মনে হয় না।'

নিস্তব্ধতায় খানিকটা সময় কেটে গেল।

একটু চুপ থেকে—'থাক, এ প্রসঙ্গ থাক। তুমি ঘুমোতে যাবে এখন?'

—'না।'

—'পড়বে?'

—'এখন আব পড়ব না।'

—'ভবিষ্যতে আর—'

কিন্তু না-বলে থামলেন।

বললেন—'অবিনাশকে কাল ডেকে আনব।'

—'এখানে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তিনি তো অ্যাসিসট্যান্ট সারজেন—'

—'ভিজিট দেব, বেশ পাকা ডাক্তার, খুব অমায়িক, ভদ্র মানুষ।'

—'কিসের জন্য আনবে তাকে বাবা?'

—'খুকিকে দেখবে, তাঁকে খুলে সব বলো।'

চুপ করে ছিলাম।

—'আর তোমারও ব্লাড এক্সামিন করবে। ওষুধ দেবে, হয় ত ইনজেকশান-এর দরকার হবে।'

একটু বিব্রত হয়ে—'কিন্তু মেজকাকা যদ্দিন এ বাড়িতে আছেন এখানে অবিনাশ বাবুকে না আনাই ভাল।'

—'কেন সুরেশ কোনোদিন এর জন্য ইনজেকশান নেয় নি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

মাথা হেট করে—'নিলে তো প্রকাশ্যে নেয় নি।'

বাবা—'বছর পনের আগে একবার কলকাতায় গিয়েছিলাম, সুরেশের বাসায় কয়েকদিন ছিলাম; গামছা ছিল না, সুরেশ এক দিন আমাকে তার টার্কিশ তোয়ালেটা দিয়ে বললে, দেখবেন দাদা, এ গামছায় চোখ-মুখ মুছে অন্ধ হয়ে যাবেন না। জিজ্ঞেস করলাম, কেন এ-রকম বলছ? বললে, ডাক্তারের নিষেধ আছে, ছেলেপিলেদের দেই না আমার ব্যবহৃত জিনিস, কারুরই ধরবার উপায় নেই। খানিকটা বিস্মিত হয়ে বললাম, ডাক্তারের এ রকম নিষেধ কেন? সুরেশ বললে, কামনাই বলুন প্রেমই বলুন, সে-সব জিনিসের তাড়া আমার বড্ড বেশি; কাজেই ডাক্তার, লোশন, অনেক কিছুই লাগে। কিন্তু তবুও গামছার এই দুদর্শা; পাশেই ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়েছিল তামাশা পেয়ে হাসতে লাগল। রমেশের মতিগতিও এই রকম। এই পরিবারটা যেন একটা অসুরের। অবাক হয়ে ভাবি, বাবা এমন দেবতার মতন মানুষ ছিলেন অথচ এই রকম হল কী করে।'

একটু চুপ থেকে, 'আজও সুরেশ রোজ সন্ধ্যায় ইনজেকশান করে বেরোয়।'

অনেকক্ষণ বিমূঢ়ভাবে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—'রাত্রে ফিরে এসে, ইনজেকশান করে আবার।'

—'তাই না কি?'

—'নিজেই আমাকে বলে; বলে জীবন এনজয় করছি।'

দু'জনেই চুপ করে অন্ধকারের মধ্যে বসে রইলাম; আকাশে মেঘের ঘন গভীর আয়োজন, পেয়ারা গাছে বাদুড়ের পাখার ঝটপটানি, পশ্চিম দিকের মাঠে একটা বিড়ালছানার অবিশ্রাম কান্না—আমার কোঠার থেকে খুকির শান্ত নিশ্বাস।

আরো অনেকটা সময় কেটে গেল।

বিড়ালের ছানার কান্না থেমে গেলে বাবাকে—'যাক, তুবও খুকিকে নিয়ে যাব আমি।'

—'অবিনাশ বাবুর কাছে?'

—'হ্যাঁ; তিনি এখানে না এলেই ভাল।'

—'তা বেশ তবুও ব্লাড দেখিয়ে এসো।'

—'তা দেখালেও হয়, না দেখালেও হয়।'

—'কেন?'

—'আমার মনে হয়, শরীরে আমার কোনো রোগ নেই।'

—'নেই?'

—'না, আমার বোধ হয়, পেট পরিষ্কার না হয়ে খুকির এই রকম পাঁচড়া হচ্ছে।' একটু চুপ থেকে—'অবশ্য কলকাতায় এ চৌদ্দ বছর যে খুব সুষ্ঠুভাবে কাটিয়েছি তা নয়।'

—'আচ্ছা বেশ।'

—'দৈন্য নানাভাবেই এসেছে।'

—'একটা বিড়ালের ছানা কাঁদছে না।'

—'হ্যাঁ'

—'কোথায়?'

—'পশ্চিম দিকের মাঠে বোধ করি।'

—'নিয়ে এলে হয় না?'

—'ছানাটাকে এনে কোথায় রাখবে?'

—'আমার এই কোঠায় রাখতে পার, ঐ যে বেতের বড় ঝুড়িটা আছে ওরই ভিতর কয়েক টুকরো ন্যাকড়া রেখে শুইয়ে দিলে হয় তো।'

—'কিন্তু কোনো এক জায়গায় তিষ্ঠবে না যে, ঘুরে-ঘুরে কাঁদবে।'

—'কেন?'

—'হয় তো মাকে খুঁজছে।'

—'মা-টা ওর আসে না কেন?'

—'সে বেঁচে আছে, না মরে গেছে, বিধাতা জানেন; বেঁচে থাকলে হয় ত দু-দশটা মাঠ পেরিয়ে। সারা গায়ে উনানের কালি মাখিয়ে। শূন্য ভাতের হাড়ির পাশে বসে জীবনের প্রবঞ্চনার কথা ভাবছে।'

—'আমি আর তোমার মা, তুমি আর কল্যাণী পরস্পরের আরো ঢের কাছে; কিন্তু আমাদের অবস্থাও অনেকটা এই রকম, কী বল হেম?'

টিটকারি দিয়ে বাবা একটু হাসলেন।

পরক্ষণেই—'না, তা নয়, ঐ ছানটার বেদনা যে কী গভীর তা আমরা ধারণাও করতে পারি না।'

বিছানার থেকে নেমে এসে টেবিলের লণ্ঠনটা হাতে তুলে নিলেন।

বললাম—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'দেখি, বাচ্চাটাকে নিয়ে আসি।'

—'কিন্তু আনতে তো কেঁদেকেটে একাকার করবে!'

—'তা করুক, তবুও আশ্রয় পাবে তো।'

—'এ ঘরে কারো যে ঘুম হবে না তা হলে; মা আর কল্যাণী হয় ত বিরক্ত হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লণ্ঠনটা দু-তিনবার দুলিয়ে-দুলিয়ে বাবা—'একটু গরম দুধ দিলে হয় ত কান্না থামবে বাচ্চাটার।'

—'দুধ এত রাত্রে কোথায় পাব?'

—'আচ্ছা, তোমার মাকে জিজ্ঞেস করে এসো দেখি।'

দক্ষিণের ঘরের থেকে ফিরে এসে বললাম—'না, দুধ নেই।' ছানাটার কান্নাও আর শোনা যাচ্ছিল না, খুব চেপে জল এল। জীবনের গভীর উদাসীনতা আমাদের পেয়ে বসল। সৃষ্টির ক্ষমাহীনতার রহস্যময় উপেক্ষার সাথে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে অন্ধকারের ভিতর মাথা গুঁজে দু'জনে ঝিমুতে লাগলাম। গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমের ভিতর বিড়ালছানার শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখলাম বাবার ঘরে আলো জ্বলছে, মানুষের নড়াচড়ার শব্দ ধীরে-ধীরে উঠে গিয়ে দেখলাম, ছানাটাকে কোলে করে চুপচাপ বসে আছেন চোখ বুঁজে।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, পৃথিবী সব সময়ই কি বাস্তবিক অন্ধস্রোতে চলে? নিশ্চিত বেদনা, নিষ্ফলতা ও মৃত্যুর সমুদ্রই কি জীবনকে ঘিরে রয়েছে?

তা নয় হয় তো, অন্তত আবিষ্কারের জায়গা আছে, হয় তো আমারও।

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে গেলাম; এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম তা হলে? কোথাও বিড়ালের ছানা নেই. আলো নেই, কিছু নেই, বাবার স্থূল নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, চারদিকে অন্ধকার শ্রাবণের বাদল ও বাতাসের বীভৎস আমোদ-টিটকারি এতক্ষণে জমল তা হলে?

আরো দুপুর রাতে, রাত তখন প্রায় দুটো-আড়াইটে হবে মনে হল, কল্যাণীর ঘরে আলো জ্বলছে, ধীরে-ধীরে বিছানায় উঠে বসলাম—হ্যাঁ আলোই জ্বলছে।

এত রাতে আলো জ্বালিয়ে কেন?

বরাবরই বাতি নিভিয়ে ঘুমোবার অভ্যাস।

মিনিট পনের বিছানার উপর বসেছিলাম, দেখলাম আলো নিভছেও না, কারুর কোনো সাড়া-শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। কল্যাণী, বা কোনো মানুষ, যে ও-ঘরে আছে তাই বোধ হয় না। আস্তে-আস্তে খুকিকে শুইতে দিয়ে, বাতাস দিয়ে মশারি ফেলে, চটির মধ্যে আস্তে-আস্তে পা ঢুকিয়ে কল্যাণীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম বিছানার এক পাশে, একখানা আনন্দবাজার পত্রিকার উপর লণ্ঠনটা রেখে চুপচাপ বসে আছে। সামনে তিনটে জানলাই খোলা, যতদূর দৃষ্টি যায় কতকগুলো বড়-বড় তাল গাছ, তেঁতুল, হিজল, আম, অশ্বত্থ, বাঁশ, ধানক্ষেত, আরো অনেক দূর গ্রামের প্রান্তর ও শ্মশান।

আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকতেই কল্যাণী—'তুমি এসেছ, ভাল করেছ।'

একটু হেসে বললে—'ভাবছিলাম, আমি তোমাকে ডাকব।'

বিছানার এক কিনার দেখিয়ে দিয়ে—'বসো।'

একটা টিনের চেয়ার ছিল, সেইটে টেনেই বসলাম।

—'কেন, বিছানায় বসতে দোষ কী? আলো দেখে চলে এসেছ? না?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম, তা হলে তো ঘুমোও নি।'

—'ঘুমিয়েছিলাম।'

—'তবে কিছুক্ষণ হল জেগেছ। কেন জাগলে? রাত এখন কটা?'

—'আড়াইটা।'

—'এই সময়ে জেগে উঠলে, কী মনে করে?'

—'এমনি, হয় ত মশার কামড় খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল।'

—'মশারি ফেলে শোও নি বুঝি?'

—'না, এই মাত্র ফেলে দিয়ে এলাম।'

—'খুকি ঘুমুচ্ছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেচারা! আমাকে যে ও পেয়েছে, বোঝা হল না। মনে করো, মাতৃহীন হয়েই পৃথিবীতে এসেছে।'

—'অনেক শিশুই তো আসে। তা নিয়ে এত চোখ ছলছল করবার দরকার কী?'

—'চোখ ছলছল করছে বুঝি আমার?' আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে নিয়ে কল্যাণী—'তুমি না এলে তোমাকে কিন্তু আমি ডাকতে পারতাম না!'

—'তা আমি জানি।'

—'সত্যি জানো না কি? আমার মান-অপমানবোধ বাস্তবিক কিন্তু খুব বেশি।'

আঁচলের খুঁটে আবার চোখ মুছে—'তুমি আমাকে অপমান কর নি বটে, কিন্তু এত রাতে তোমার ঘরে গিয়ে তোমাকে ডাকব—জীবনের মধ্যে আমার না আছে সেই প্রীতি, না আছে তেমন আবেগ।'

একটু চুপ থেকে—'বাস্তবিক, তোমার স্ত্রী হয়ে এসে তোমাকে বড্ড লাঞ্ছনা দিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে-নিজের জীবনের কথা ভেবে দেখ যদি তুমি, তা হলে হয় ত উপলব্ধি করতে পারবে যে লোকসান আমার বেশি হলেও শূন্যতা যেন তোমার বেশি—কারণ সঞ্চয় বলে কোনোদিনই কিছু যেন পাও নি'—

পকেটের থেকে একটা সিগারেট বের করে—'জ্বালাব?'

—'হ্যাঁ, জ্বালাতে পারো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'দেশলাই কোথায়?'

—'আমার বালিশের নিচেই আছে—দিচ্ছি।'

দেশলাই হাতে নিয়ে বললাম—'এত রাতে বাতি জ্বালালে যে?'

—'ঘুম আসছিল না।'

—'কেন, কী হয়েছে?'

—'না, হয় নি বিশেষ কিছু।'

—'আজ ভাত খেয়েছিলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী দিয়ে?'

—'তোমরা যা দিয়ে খেয়েছ।'

—'দু-এক-দিনের মধ্যে আমি কি তোমাকে কিছু বলেছি যাতে মনে আঘাত লাগতে পারে? এমন কিছু বলেছি বা করেছি বলে মনে তো পড়ছে না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে যদি বেদনা দিয়ে থাকি—'

—'না, তুমি তো কোনো বেদনা দাও নি আমাকে, কিছু বল নি; তিন-চার দিন ধরে আমাদের মধ্যে কথাই তো হয় নি।'

—'তিন-চার দিন কথা হয় নি? কেন, কল্যাণী?'

—'এই বর্ষা—বাদলের মধ্যে মাঝে-মাঝে এই রকমই হয়; শুয়ে, ঘুমিয়ে, নিজেদের ভাবে থেকে দিনের পর দিন এমনিভাবেই কেটে যায়।'

সিগারেটটা পকেটে রেখে দিলাম।'

কল্যাণী—'তা ছাড়া আমার রুচি বুদ্ধিকে খুব শ্রদ্ধা কর তুমি?'

একটু হেসে—'কী করম?'

—'তুমি জান, মাঝে-মাঝে আমি চিঠি লিখে ডায়েরি লিখে নিজেকে নিয়ে একটু থাকতে চাই; এ-সময়ে আমার কাছে কেউ আসে তা আমার ভাল লাগে না, এ সব জান তুমি; অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ হিতাকাঙ্ক্ষীর মত দূরে সরে থাক, এক মুহূর্তের জন্যও বাধা দিতে আস না। এ জন্য শ্রদ্ধা করি আমি তোমাকে।'

দেশলাইটা রেখে দিলাম।

কল্যাণী—'কিন্তু চলে যেতে হবে আমাকে কাল।'

—'কাল?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

—'এমন বিশেষ কোথাও না। আলমোড়া-মুসুরি পাহাড়ে নয়, যাব আমি,' একটু থেমে-থেমে—'মেদিনীপুরের একটি পাড়াগাঁয়ে।'

—'কেন?'

—'দরকার আছে।'

—' মেদিনীপুরে তোমার কে আছেন?'

—'আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই।'

—'নেই?'

—'না, হেমন্তবাবু আছেন আর তাঁর স্ত্রী।'

—'কে তাঁরা?'

—'চিনবে না, সেই বাসাতেই যাব। আজ বিকেলে একটা চিঠি এসেছে।'

—'হেমন্তবাবুর?'

—'না, তাঁর স্ত্রীর।'

—'তোমাকে যেতে লিখেছেন?'

—'যেতে অবিশ্যি আমাকে লেখেন নি, কী ভরসায় যেতে লিখবেন! তারা অত্যন্ত ভদ্রমানুষ—নিজেরা সংসার করছেন, পরের সংসারের উপর তাঁদের সহানুভূতি আছে।'

—'তবে তুমিই বুঝি যাওয়া ঠিক করলে?'

—'হ্যাঁ, একটি মানুষ মরছে—তার মৃত্যুশয্যায় তার কাছে আমি না থাকলে চলবে না।'

বলে, কল্যাণী চোখে আঁচল দিয়ে আবার কাঁদতে লাগল। খানিকক্ষণ পর—চোখ মুছতে-মুছতে, 'থাইসিসের রোগী মেদিনীপুরের একটা গ্রামে পড়ে আছে এই বর্ষা বাদলের সময়ে।'

—'বড্ড খারাপ কথা—কেন, বাপ-মা নেই তার?'

—নির্মলদার? কিচ্ছু নেই। আমার উপরেই তার সব নির্ভর করে—'

—'নির্মলদা?'

—'হ্যাঁ'

প্রায় পনের বছর ধরে মুখ চেয়ে থাকার মত একটু বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, কে কার মুখ চেয়ে থেকেছে পনের বছর? কল্যাণী নির্মলের? না নির্মল কল্যাণীর? প্রয়োজন মত অস্পষ্টতা দিয়ে এই সম্পর্কে নিজের বক্তব্যটুকুকে বেশ আবরণ দিয়ে রেখেছে কল্যাণী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হেমন্তবাবুদের কিছু হন না কি?'

—'কে? নির্মলদা? কিছু না, ওরা ভদ্রসদ্র মানুষ, দয়া করে তাকে স্থান দিয়েছেন।'

—'তা নির্মলের এই রকম অবস্থা কেন? পৃথিবীতে সে একেবারেই একা বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'এ-রকম হল কেন? ইতিহাস কী?'

—'দু'জন কাকা আছেন বুঝি, তবে তারা ওর কোনো খোঁজ খবর নেন না। ম্যাট্রিক পাস করেই স্বদেশী করে জেলে যায়।'

—'কে? নির্মল?'

—'হ্যাঁ, সেই থেকেই জেলেই এক-রকম। এক সময় জেলের থেকে বেরিয়ে চামড়া ট্যানিং শিখবার চেষ্টা করেছিল।'

—'তা শিখল না যে?'

—'টাকা নেই, কড়ি নেই, স্বদেশীর দিকে ঝোঁক, কোনো একটা মার্কেট থেকে ধরে নিয়ে গেল।'

—'তোমার সঙ্গে আলাপ হল কোথায়?'

—'আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই ওরা থাকত।'

—'কোথায়?'

—'তখন আমরা মানভূমে ছিলাম। মানভূমে প্রায় দশ বছর থাকা, তার পর বাবা বাগনানে এলেন—বছর দুই-তিন পরে কালীঘাটে একটা বাসা ভাড়া করে ছিলেন—সেইখানেই বাবা মারা যান। সেই রাত্রে যে—'

কল্যাণী জানলার দিকে তাকিয়ে—'তা হলে কালই যাব আমি।'

—'তা যেও; দুখের বিষয় তোমার কোনো টাকাকড়ি নেই।'

—'আমার গয়নার বাক্স সঙ্গে নেব, কলকাতায় বিক্রি করে নেব।'

—'কার সঙ্গে যাবে?'

—'তুমি দিয়ে আসতে পারবে না?'

একটু চিন্তা করে—'রবিকে যদি দেই তা হলে হবে না?'

—'রবি ঠাকুরপোকে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা হলে তো বেশ ভালই হবে, আমার মনে হয় তোমার না—যওয়াই ভাল, আমরা স্বামী-স্ত্রী গিয়ে উঠব, তাতে নির্মলদা আঘাত পাবে। মিছিমিছি তাকে অযথা কষ্ট দিয়ে লাভ কী? তাকে দুঃখ দেবার জন্য যাচ্ছি না তো আমি।'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'যাতে উৎসাহ পায়, ভরসা বোধ করে, জীবনের সম্বন্ধে আশা ফিরে আসে, আলো-বাতাস ভাল লাগে, ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস হয়, সেইজন্যই তো যাওয়া।'

বলে বালিশে মাথা গুঁজে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল কল্যাণী। উঠল যখন, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

বললে—'তুমি এখনো বসে আছ?'

—'হ্যাঁ গোটা তিনেক সিগারেট খেলাম বসে।'

—'তাই না কি?'

—'টেরও পাওনি বুঝি?'

—'না তো!'

—'এক-এক সময় মানুষের মন বড় অপার্থিব হয়ে পড়ে কল্যাণী, পৃথিবীর স্থূল সামান্য কদর্য জিনিসগুলো সম্বন্ধে খেয়ালও থাকে না—মন থাকে জীবনের মহামূল্য মহিমাময় জায়গায় বিচরণ করতে।'

মাথা কাত করে ধীরে-ধীরে কপাল থেকে চুলের গোছা সরিয়ে নিচ্ছিল কল্যাণী, চোখ জানলার ভিতর দিয়ে—দূর প্রান্তরের দিকে, কখনো দু-তিনটি নক্ষত্রের পানে।

বনলতার কথা মনে হয়—এমনি শান্ত ধূসর শ্রাবণের শেষ রাতে সেও কি কোনো দূর দেশে তার স্বামীর ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে কোনো প্রান্তরের চিতার দিকে তাকিয়ে আমার কথা ভাবছে এমন করে?

আমি যদি যক্ষ্মায় বিছানা নি, সে যদি খবর পায়, এমনি করে সেও কী শিয়রের পাশে বসে থাকবার জন্য চলে আসবে?

না, তা আসবে না, এমন কোনো নারী নেই যে তার মৃত্যুশয্যা থেকে আমার সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করবে।

কোনো রূপ নেই, রং নেই, রীতি নেই—কিছুই ঘটে না জীবনে।

আকাশ পরিষ্কার ছিল, ভোরবেলা একটু বেড়িয়ে এলাম। বেশ রোদ, আকাশ চমৎকার নীল! শরৎ আসে নি, তবে কাশ এসেছে।

বেশি দেরি করলাম না, তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে ফিরলাম। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম কল্যাণী চা নিয়ে এসেছে। অবাক হয়ে বললাম—'কোথায় চা পেলে?'

—'কেন, বাবা তো অনেক দিন হয় তোমার জন্য চা কিনে রেখেছেন।'

—'ওঃ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমার কাছেই রেখেছিলাম—কিন্তু এদ্দিন তোমাকে দেওয়া হয়ে ওঠে নি।'

দেখলাম, বেশ দেখে-শুনে বিচার-সহানুভূতি দিয়ে চা করেছে। চা খাওয়ার পরে একটা ঝাঁটা নিয়ে এল, বললে—' তোমার ঘরটা যে কী হয়ে আছে, ভাল করে ঝাঁটও দেয় না কেউ।' অনেকক্ষণ বসে বেশ দরদের সঙ্গে ঝাঁট দিলে, কোণায় যেখানে যা ময়লা ছিল দেখলাম সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।

আমার বইয়ের তাকটা গুছিয়ে দিল। আমার টেবিলট গোছাল। মাঝে-মাঝে এসে হাসিমুখে খুকিকে নিয়ে আদর করা, আমাকে মিষ্টি করে কথা বলা—কল্যাণীর এ-বড় গভীর রূপান্তর।

যে-সব জামা-কাপড় ছিঁড়ে ছিল, বোতাম ছিল না, অনেকক্ষণ বসে সেলাই করে দিল।

এক সের আন্দাজ বাংলা সাবান ও নোংরা কাপড়ের গাদি নিয়ে ঘাটে চলে গেল।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর এসে—'যাক, আমি যাব না।'

—'কোথায়? মেদিনীপুরে? কেন যাবে না?'

—'বছর তিন-চার নির্মলের দেখা নেই, কেমন যেন লজ্জা করে।'

—'রোগীর কাছে আবার লজ্জা-সঙ্কোচ কী কল্যাণী?'

—'কিন্তু সে তো আমাকে যেতে লেখে নি!'

—'কে? নির্মল? মৃত্যুশয্যার থেকে কী করে লিখবে?'

—'কিন্তু যারা লিখেছেন, তাঁরাও তো আমাকে যেতে লেখেন নি।'

—'তাঁরা মনে করেছেন, 'ও-রকম রোগের খবর পেলে তুমি নিজে থেকেই যাবে।'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু আমার তো টাকাকড়ি নেই, শুধু হাতে গিয়ে কী লাভ।'

—'কেন গয়নার বাক্স নিয়ে যাবে—কলকাতায় বিক্রি করে নেবে।'

—'আহা! কেই-বা বিক্রি করে দেবে।'

—'কেন? রবি?'

—'রবি ছেলে মানুষ। সে কি আর পারবে?'

—'তুমি জান না কল্যাণী, রবি এ-বিষয়ে খুব ওস্তাদ, নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়, তোমার চেয়ে ছ-সাত বছরের বড়, ব্যবসাদারের ছেলে।'

একটু থেমে—'তা, যদি তুমি তাই মনে করো, আমি এখানে থেকেই বিক্রি করে দিতে পারি।'

—'না, থাক, এখানে বিক্রি করে দরকার নেই, লোকে কী মনে করবে।'

—'কিংবা কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে গিয়ে—'

—'এই তো একমাত্র গয়নার বাক্স আমার সম্বল, কিন্তু গয়নাগুলো আজ যদি বিক্রি করে ফেলি, এক দিন অভাবের সময়?'

—'আজও তো কম অভাবের দিন নয়।'

—'কি রকম?'

—'নির্মলের মা নেই, বাপ নেই, একটা ভাল চেঞ্জের জায়গায় যায় এমন সঙ্গতি নেই বেচারির—'

—'ভাল চেঞ্জের জায়গায় নিয়ে গেলে কিছু হয় কী? বলো?'

—'হ্যাঁ।'

—'শিমুলতলা, মধুপুর?'

—'কিংবা ধর্মপুর হতে পারে, ভাওয়ালি হতে পারে।'

—'সে ঢের টাকা লাগে তাতে।'

—'টাকা তো লাগবেই।'

—'তা ছাড়া আগের থেকে বেড-এর ব্যবস্থা করে নিতে হয়। আমি মেয়ে-মানুষ কী করে এত সব পারব?'

—'হেমন্তবাবুদের সাথে পরামর্শ করবে, দরকার হলে আমিও সঙ্গে যেতে পারি।'

—'মোটমাট সে ঢের টাকার দরকার, তোমারও কোনো চাকরি-বাকরি নেই, গয়না বিক্রি করলে চার-পাঁচ শ টাকা বড় জোর পাব।'

মাথা নেড়ে—'পাঁচ শ তো খুবই পাবে।'

—'কিন্তু খুকির কথাও তো ভাবতে হয়, মা হিসেবে তার উপর আমার দায়িত্ব রয়েছে।'

চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কল্যাণী—'গয়নার বাক্স তো আমারই জিনিস শুধু নয়—এ তো খুকির জিনিস। বেচারাকে বঞ্চিত করবার কোনো অধিকার আমার আছে কি?'

—'গয়নাগুলো এ-রকম কাজে লাগিয়েছ, ভবিষ্যতে হয় তো এ কথা শুনে খুকি অপ্রসন্ন হবে না।'

—'কিন্তু যদি হয়?'

—'তা হলে তার অপ্রীতিকে উপেক্ষা করলে অধর্ম হবে না আমাদের।'

কল্যাণী, একটু ইতস্তত—'শুধু তো এই নয়, ভগবান না করুন—কিন্তু বাবা চলে গেলে আমাদের কটা দিন অনন্ত দাঁড়াতে হবে তো।'

তর্ক আর বহুদূর চালিয়ে লাভ নেই; এই গয়নার বাক্স সম্পর্কে পরাজয় মানবার ইচ্ছা এই নারীটির নেই।

বললাম—'গয়না বেচে টাকাকড়ি নাই-বা সঙ্গে নিলে, এমনিই যেও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'শুধু হাতে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কত সময়-অসময় নির্মলের কত খরচ দরকার হবে; আমি একটা পয়সাও দিতে পারব না?'

—'তোমার বাবা যে তোমার জন্য কিছু রেখে যেতে পারেন নি সবাই তো তা জানে; তোমার শ্বশুরবাড়িরও কোনো সম্বল নেই।'

—'কিন্তু তাই বলে দুটো বেদানা কেনার জন্যও পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকা!'

—'কুড়ি-পঁচিশ না হয় আমি জোগাড় করে দেব।'

কল্যাণী—'যক্ষ্মারোগীর কেউ কাছে আসে না। হেমন্তবাবুরা হয় তো সেবা করে-করে হয়রান হয়ে গেছেন, এখন সমস্ত সেবার ভার হয় তো পড়বে আমার ওপর।'

—'হ্যাঁ, টাকাকড়ি না থাকাতে যা পারলে না, সেবা দিয়ে তাই শুধরে দেবে। জীবনের এই দুঃসময়ে নির্মল বুঝবে যে, নারী, তার ভালবাসা কত আশীর্বাদের জিনিস।'

কল্যাণী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে-ধীরে বললে—'কিন্তু আমি তো আজ একা নই। সংসারের পাকে জড়িয়ে গেছি যে। আমার দায়িত্ব আজ অনেক দিক দিয়ে। সংসারের বধূ আমি। আমি মা। কোনো একটা রোগ যদি বাধিয়ে আসি তা হলে খুকির কী হবে? তোমাদের এই সংসারের শান্তিও যাবে একেবারে নষ্ট হয়ে। ছেলেবেলার স্বপ্ন, খেলা, স্নেহ, ভালবাসা অবিশ্যি খুব ভাল জিনিস, কিন্তু সজ্ঞানে হোক, অন্ধকারে হোক জীবনের পথে আমি এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছি যে শুধু আমার হৃদয়ের বিলাসের জন্য এতগুলো লোকের অনিষ্ট করা অন্যায় হয়।'

একটু চুপ থেকে—'হরিচরণের কাণ্ড দেখেছ?'

—'কেন? কী করে? কই দেখি নি তো!'

—'কপালে চোখ থাকলে তো দেখবে? গাছের সমস্ত পেয়ারা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে।'

নিস্তব্ধ ছিলাম।

—'পেয়ারা চিবুতে ইচ্ছা করে না অনেক সময় মানুষের? কই? ওর কল্যাণে বাকি আছে কি কিছু?'

—'পেয়ারা গাছ তো তিন-চারটে।'

—'একটা গাছেও একটা কড়াও যদি থাকে! না পাওয়া যায় খাবার সময় একটা লেবু হাতড়ে? একটা জাহাঁবাজ চোর!'

—'লেবু হয়তো কাকার জন্য নিয়ে যায়।'

—'বাবাকে বলে দাও না কেন তুমি?'

—'কী বলে দেব?'

—'এই সব অনাচারের কথা।'

—'তা হলে মেদিনীপুরে তুমি আর যাবে না?'

—'উঁহু। সেদিন দেখলাম খুকুর দুধ চুমুক দিয়ে খাচ্ছে।'

—'কে?'

—'হরিচরণ, আর-কে? রাতেরবেলা আবার ডিবে ভরে-ভরে কেরোসিন নিয়ে পালায়।'

মেদিনীপুরের পাড়াগাঁয়ে যক্ষ্মা রুগীর সন্ধানে সে গেল না আর।

পানের বাটার কাছে বসে ধীরে-ধীরে আট-দশটা পান তৈরি করল, চিবুল-ডিবের মধ্যে ভরে নিল। তার পর ভাল করে সিঁথিপাটি করে টকটকে লাল পাড়ের একটা সুন্দর ধোপদুরস্ত শাড়ি বের করে সেজেগুজে পাড়ায় বিন্তি খেলাতে চলে গেল।

হয় ত বনলতাও আজ এই রকম।

দুপুরবেলা প্রায় আড়াইটের সময় মা ঘরে শুতে এলেন।

আমি—'ঘুমোবে না কি?'

—'হ্যাঁ একটু জিরিয়ে নেই।'

—'তোমার খাওয়া-দাওয়া কখন শেষ হল?'

খাটে বিছানো মাদুরের উপর শুয়ে পড়ে—'এই প্রায় আধ ঘণ্টা আগে।'

—'আজ একটু তাড়াতাড়ি খেয়েছ তা হলে? বিনা বালিশে শুয়ে পড়লে যে?'

—'বালিশটার তুলো বেরিয়ে গেছে।'

—'আমার বালিশটা এনে দেই?'

—'কেন এই তো তোশকে মাথা দিয়ে শুয়েছি।'

বলে, মাথা তুলে ভাঁজ করা তোশকের উপর রাখলেন।

—'দক্ষিণের ঘরে আজ যে কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।'

—'ওরা ঘুমিয়েছে সব।'

একটু হেসে—'তাই আমি ভাবছিলাম।'

—'কী ভাবছিলে হেম?'

—'ভাবছিলাম বৃষ্টি পেয়ে বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে—মার আজ আর কথাবার্তা বলবার লোক নেই।'

—'একটা বাংলা গল্পের বই দিতে পারো হেম?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'নেই কিছু।'

—'তা হলে ঘুমনো যাক।'

—'আমি ভাবছি দু-চার দিনের মধ্যে কলকাতায় যাব'

—'তা গেলেই পারো।'

—'টাকা জোগাড় করেছেন বাবা, কিন্তু গিয়ে কী করব সে বুঝে উঠতে পারি না, এই ছ-সাত বছর যত চেষ্টা করেছি তাতে মানুষ লাটসাহেব হয়ে যায়, আমি হয়ে গেছি পোড়া কাঠ। এখন কলকাতায় মানে একটা থাইসিস-টাইসিস কিছু তৈরি করে বাড়ি ফিরে আসা।'

মা চুপ করেছিলেন।

—'যদি যক্ষ্মা নিয়ে আসি তা হলে তোমরা কী করবে?'

—'উঠোনের এককোণে একটা আটচালা তুলে দেবেন তোমার বাবা, সেইখানে তোমার বৌকে নিয়ে থাকবে।'

—'যক্ষ্মা হলে?'

—'হ্যাঁ; আমরা জোগাড় ওষুধ পথ্য আর বৌমার কাছ থেকে দিন-রাত সেবা পাবে। না—সেটুকু ভরসাও তার কাছ থেকে নেই।'

—'সেবা বরং তুমিই করবে; নাঃ, কলকাতায় আজকাল বড্ড যক্ষ্মা হচ্ছে। আমার যদি হয় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

মা চুপ করেছিলেন।

—'বয়স বেড়ে গেছে, চাকরি নেই, শরীরের ধাত চিরকালই খারাপ; টিকটিক করে মনটা ছিল, সেও গেছে যেন ছিঁড়ে টুকরো হয়ে। তার পর দিনরাত কলকাতার পথে-পথে ঘোরা। শ্রাবণ ভাদ্রের বৃষ্টি ও রোদ। মেস-এর যাচ্ছেতাই খাওয়া। এই বয়সে এ-রকম মনমরা হৃদয় নিয়ে দেখি রোজই অল্প-অল্প জ্বর হচ্ছে?'

মা—'মেসে কী খেতে দেয়?'

—'তা তো তুমি জানোই।'

—'আমাদের বাড়ির চেয়েও খারাপ?'

—'আমরা অন্তত ভাল ডাল পাই আর খানিকটা দুধ।'

—'ওখানে দুধ দেয় না ভাতের সঙ্গে?'

—'দুধ খেতে হলে পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হয়।'

—'অল্প-অল্প জ্বর হয় না কি তোমার?'

—'না, তবে মাঝে-মাঝে মনে হয় যেন শরীর গরম হয়েছে—কেমন অরুচি হয়, কিছু ভাল লাগে না। একটা থার্মোমিটার থাকলে দেখা যেত কী রকম টেম্পারেচার হয়, একটা চার্ট তৈরি করতে পারতাম।'

—'জ্বর-জ্বর বোধ করলে কী করো তখন?'

—'বিছানায় শুয়ে থাকি, আর ভাবি, ভগবান, আর যাই হোক, টি-বি-র বীজ শরীরের থেকে না বেরোয়।'

—'একটা থার্মোমিটার কিনলে পার?'

—কিনব-কিনব করে আর হয়ে ওঠে না।'

—'ডাক্তার দেখালেই পার।'

মাথা নেড়ে—'হয় তো বলে দেবে স্পুটামের মধ্যে যক্ষ্মার বীজ, তখন কী উপায়?

—'তা বলবে কেন; যক্ষ্মা তোমার হয়নি' কেনই-বা হবে? তোমার বাবা তো সত্তর বছরের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে আছেন, আমিও তো এত জলঝড়ে ভিজি, কিচ্ছু হয় না, আমার মনে হয় ডাক্তার দেখিয়ে খানিকটা কুইনিন খেলে ঠিক হয়, কিংবা একটা মিক্সচার।'

—'এবার গিয়ে স্পুটাম পরীক্ষা করাব ভাবছি।'

মা চুপ করেছিলেন।

—'রক্তও পরীক্ষা করাব।'

—'মিছিমিছি টাকা খরচ করবি কেন? তোর মেজকাকার সঙ্গে অনেক ভাল ডাক্তারের জানাশোনা আছে। বিনি পয়সায় করিয়ে দেবে।'

—'কী দরকার, কতই-বা আর নেবে?'

—'আচ্ছা, আমি না হয় সুরেশবাবুকে বলব আজ, তিনি খুব খুশি হয়েই রাজি হবেন।'

—'না, থাক, বলতে যেও না।'

—'সঙ্কোচ করছিস কেন হেম? আমি তো খুব নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি।'

একটু চুপ থেকে—'অন্তত আজ তুমি বলতে যেও না, দু-তিনটে দিন ভেবে দেখি।'

—'বেশ, এখানে তুমি তো ক-দিন আছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'উনিও আছেন ক-দিন।'

একটু চুপ থেকে—'দেখাতে হলে এখানকার অবিনাশবাবুকেও তো দেখাতে পারি। মথুরবাবুও আছেন। এ তিন মাস এখানেই থেকে একটু ভালই বোধ করছি; হজমের গোলমাল তেমন হয় না, রাতেও ঘুম হয়।'

—'সুরেশবাবুও বললেন—বেশ ঘুম হচ্ছে তার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—পেটের গোলমাল হয় মেজকাকার?'

—'না, তাও হয় না।'

—'খান তো মন্দ না!'

—'তবে কলকাতায় যে ঢের কম খান।'

—'কী সব ওষুধও খান বোধ করি খাবার পর?'

—'কয়েকদিন থেকে সোডা ওয়াটার আনছেন।'

একটু চুপ থেকে—'সোডা ওয়াটার কি শুধুই খান?'

মা নিস্তব্ধ ছিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম না আর।

—'সোডার দামটা যেন তোমার বাবা দিয়ে দেন।'

—'বাকিতে আনাচ্ছেন বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে—'মেসে গিয়ে প্রথম দিকটা বড্ড খারাপ লাগে, মা। গিয়ে পৌঁছেই একেবারে দুপুরবেলা, মানুষজন নেই, এমন খাঁ খাঁ করতে থাকে, খুকির জন্য বড্ড কষ্ট লাগে।'

মা............

—'তোমার কথা মনে হয়, বাবার কথা মনে হয়; অবাক হযে ভাবি, তোমাদের সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে কি না?'

—মা........

—'নিচে নেমে দেখি চৌবাচ্চা শূন্য; খানিকটা ঠাণ্ডা ভাত, পুঁয়ের চচ্চড়ি আর ট্যাংরা মাছের ঝোল দিয়ে খেয়ে, উপরে চলে এসে, পথের ধুলো-কালি-মাখা বিছানাটা পাতি। একটু ঘুমোতে চেষ্টা করি, কিন্তু সাধ্য নেই—ছটফট করে উঠে বসতে হয়।'

মা..........

—'বিছানায় উঠে বসে ফুটপাতের ওপাশে মস্ত তেতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকি—দেখি আকাশ প্রদীপ দেওয়া শিকের উপর একটা চিল বসে আছে, কতকগুলো পায়রা; ছাদে তারের ওপর চওড়া লাল পাড়ের, কস্তা কালো পাড়ের কতকগুলো শাড়ি শুকচ্ছে—এক ঝলক শান্ত নিরিবিলি ঘরকন্নার গন্ধ আসে; এমন লাগে!'

মা.........

—'চেয়ে দেখি এক জন বর্ষীয়সী মহিলা ভিজে চুলে সিন্দুর মাথায় লুচি ভাজবার ঝাঁঝরি হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছে—কিংবা এক জন তরুণী স্নান খাওয়ার পর পান চিবুতে-চিবুতে.... ।'

মা.........

—'মেসের ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না আমি আর। চাকরটাকে দু পয়সা বকশিস দিই—বলি, রাস্তার কলে এক বালতি জল তুলে আনতে। তাই দিয়ে স্নান করে পথে বেরিয়ে পড়ি।'

—'কোথায় যাও?'

—'দুপুরবেলা কোথায় আর যাব? সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাই সাত বছর ধরে গিয়ে দেখে এসেছি। ওয়াই-এম-সি-এ-তে গিয়ে কাগজ পড়ি খানিক। রেইনট্রি গাছের নিচে গোলদিঘির বেঞ্চিতে গিয়ে বসি। আকাশ, মেঘ, দিঘির জল, চারপাশের ফুলের কেয়ারি ও দেবদারু ডালপালার দিকে তাকাই। মনে হয় পৃথিবীটা তো সুন্দর ছিল, মানবজীবনের সম্ভাবনাও ছিল চমৎকার। এত সহজে বসে উপলব্ধি উপভোদ করছি এ তো ঢের, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে মাছির মত মনে হবে; অন্ধকারের মধ্যে একটা অন্ধ গুবরে পোকার যতখানি নিস্তার তার চেয়ে একটুও বেশি পথরেখা দেখবার উপায় থাকবে না।'

মা....

—'কয়েক মিনিট বসে থাকতে-থাকতে জীবনটা কেমন ছটফট করে ওঠে, আবার বেঞ্চির থেকে উঠে গিয়ে ফুটপাতে দাঁড়াই। রাস্তা পেরুতে গিয়ে দেখি একটা বাস আর-একটু হলেই আমাকে গিলে ফেলছিল আর কি!'

—'কলকাতার পথে খুব সাবধানে চলতে হয়।'

—'হ্যাঁ সাবধানে বরাবরই চলি। তবে মাঝে-মাঝে মনটা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে।'

—'বাসের ধাক্কা খেলে তো আর রক্ষা নেই।'

—'অবিশ্যি সম্ভাবনটা খুব কম।'

—'ফুটপাত দিয়ে চলো।'

একটু চুপ থেকে—'তারপর চায়ের দোকানে গিয়ে বসি।'

—'দুপুরবেলাও চা পাওয়া যায়?'

—'হ্যাঁ, চব্বিশ ঘণ্টা!'

—'কিন্তু দুপুরবেলা চা খেতে ইচ্ছে হয় তোমার?'

—'ওখানে থাকতে তো মাসের মধ্যে দু-চার দিন যাই।'

একটু হেসে—'তুমি আছ, বাবা আছেন, খুকি আছে, তার মা আছে—চারদিকে আমার কল্যাণের মত রয়েছ তোমরা, এ কথা ভাবতে গিয়েই মন তৃপ্তি হয়ে থাকে। মনকে প্রবোধ দেবার জন্য কোনো অনাবশ্যক কথা বা ঘুমের দরকার হয় না এখানে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা.....

—'কিন্তু কলকাতায় মনটাকে স্থির করবার জন্য এমনি সব ছোটখাটো ঘুষের দরকার হয়ে পড়ে।'

মা...

—'চায়ের দোকানে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি।'

—'দুপুরবেলা আরো অনেকে চা খায়?'

—'হ্যাঁ।'

—'ক্রমাগত মানুষ এসে খেয়ে যাচ্ছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কটা অব্দি?'

—'সে প্রায় রাত বারটা।'

—'সেই এক পেয়ালায়ই হয় তো পর-পর পঁচিশ জন খেল?'

—'প্রায় সেইরকমই হয়; তবে পেয়ালা ধুয়ে নেয়।'

—'ধুয়ে নিলেও তো আমার খেতে প্রবৃত্তি হয় না; আর কেমন করেই-বা ধোয়—দায়সারা গোছের নিশ্চয়ই? তা ছাড়া আর কী? ছি, খেতে ঘেন্না করে না তোমার?'

—'এক কাপ চা সামনে রেখে ভাবি, কলকাতায় এসে এবার প্রবঞ্চিত হয়ে ফিরে যাব না, জীবন এবার পুরস্কার পাবেই; মনে ধীরে-ধীরে আরো উৎসাহের সঞ্চার হয়; খানিকটা বল পাই।'

মা....

—'মনে মনে নানারকম ছক কাটি, কী করব না-করব গতিবিধি ঠিক করি। চায়ের দোকানে অনেকক্ষণ বসে থাকি।'

মা...

—'কিন্তু পথে নেমেই কী রকম শূন্যতা, কোনো উপায় দেখি না যেন। চারদিকে সাজানো—গোছানো দালান-দোকান, সাইন বোর্ড, প্রতিষ্ঠিত জীবনের পরিচয় দেয়। ট্রামে-বাসে মানুষের দল তাদের জীবনের সঙ্কল্প ও কষ্টের কথা প্রচার করে চলে—চড়-বড় অফিস-অদালত কলেজ-স্কুল ইনস্টিটিউশানগুলো জীবনের ব্যস্ত মোহাসক্ত মৌমাছির নির্বিবাদ নিরপরাধ গুঞ্জন; অপরূপ! গ্রামোফোনের দোকান থেকে গান ও টাকার ঝনঝনানি জড়িয়ে মিশিয়ে কানে এসে লাগে। বুঝতে পারি না জীবনের প্রয়োজনে কোনো আওয়াজটার রূপ ও সফলতা বেশি, এগিয়ে যাই—রেডিও তার কাজ করে চলেছে; কাগজওয়ালা সব কাগজ বিক্রি করে ফেলেছে, এখন নাগরাই পায় দিয়ে বাড়ি চলে গেলে পারে, কিংবা সাইকেল চলে আরো একগাদা কাগজ নিয়ে আসবে; পানওয়ালির ভিজে চুল সিথায় সিন্দুর, অফিসের বাবুদের পান জোগাতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে সে। বইয়ের দোকানে বিস্তর ভিড় হয় তো—কলেজে সেশান আরম্ভ হল। হু-হু করে নোট কাটছে। কাটা কাপড়ের দোকানে মৌতাত লেগে গেছে, হয় তা সেলের বিজ্ঞাপন। থিয়েটারে তিনটের সময় থেকেই ম্যাটিনি আরম্ভ হবে, একটা হ্যান্ডবিল হাতে এসে পড়ে, একটা নতুন ব্র্যান্ডের সিগারেটের বড় পোস্টার নিয়ে গাধার টুপি ও সঙের পোষাক এঁটে সারি-সারি কতকগুলো লোক নিঃশব্দে হেঁটে যায়। বালিগঞ্জের দিক থেকে একটি প্রসন্ন প্রদীপ্ত পরিবার অসংখ্য সুটকেস-ট্রাঙ্ক ইত্যাদি নিয়ে শিয়ালদার দিকে ছুটছে। হয় তো দার্জিলিঙে যাবে। খানিকটা বৃষ্টি হয়ে হয়ে গেল, একটা শেড খুঁজে বার করতে-করতে ঢের ভিজে গেলাম। ভিজে ফুটপাতে হাঁটতে-হাঁটতে এক জন রোগীর ছিটানো থু থু আর-একটু হলেই গায় লাগছিল, একটা দোকানের মস্ত বড় পা-পোষ আমার মুখের সামনে ঝেড়ে নিল। একটা মহিষের লেজের বাড়ি খেলাম। বেলিং-ঘেরা এক বারান্দায় এক অনিন্দ্য সুন্দর খুকি দাঁড়িয়ে আছে, সেই একটি আনিন্দ্য সুন্দর খুকির মুখ অনেকক্ষণ মনকে আকর্ষণ করে রাখে। নিরর্থক একটা বেটনের গুঁতো খেলাম। দেখি, বড় রাস্তার মোড়ে একটা উত্তেজিত ভিড়ের কাছে এসে পড়েছি। এগিয়ে চলি, কয়েকটা কাক দেবদারু গাছের ভিজে শাখার দিকে উড়ে গেল। খুপরির মতো স্টলে বসে লুঙ্গিওয়ালা মুসলমান ছোকরারা নিদারুণভাবে শাল পাতা কেটে চলেছে, বিড়ি তৈরি করবে।'

মা...

—'এক-এক দিন রেসের মাঠে যেতে ইচ্ছা করে।'

মা...

—'কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না আর; মাঠটা কোথায় তাও ঠিক জানি না।'

মা...

—'তিন টাকার টোটে এমন চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা পেয়েছে এক-এক দিন খবরের কাগজ খুলে দেখতে পাই, অবাক হয়ে ভাবি দুই-তিন মাসের টিউশানের টাকা পাঁচ মিনিটেই পেয়ে গেল? উৎসাহ ও উত্তেজনার কলরবের ভিতর? প্রলুব্ধ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি খানিকক্ষণ—কিন্তু স্থির হয়ে নিজের স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়—তা না হলে বাঁচতেও পারব না যে!'

মা...

মা অবশ্য রেসকোর্স, রেস বা টোর্টের কোনো মানেও জানেন না।

—'লটারির টিকিট কলকাতায় গিয়ে ইদানিং কিনছি—এক টাকায় চার খানা পাওয়া যায়, আট আনার কিনি।'

—'টিকিট কিনলে কী পাওয়া যায়?'

—'কপালে যদি থাকে আট—দশহাজার টাকাও জুটতে পারে।'

—'আট আনার টিকিটে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'একখানা চার আনার টিকিটেও।'

—'তাই না কি? তাহলে তো সে বড় সৌভাগ্যের কথা।'

—'কিন্তু কয়েকবার কিনে-কিনে দেখেছি—শুধু টিকিটের পয়সাটাই যায়; এখন বিশ্বাস হারিয়ে গেছে, কিনব না আর।'

—'আরো দু-তিন বার কিনলে পার।'

—'মাঝে-মাঝে মনে হয় দু-এক মাড়োয়ারির পকেট কেটে নিলে পারি।'

—'এমন কথাও মনে হয় তোমার?'

—'হ্যাঁ, অত্যন্ত অবসাদ নিরাশার মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য মনে হয় বই-কি; কোনো বড় লোকের বাড়ি, ব্যাঙ্ক বা মাড়োয়ারির টাকার ওপর লোভ জন্মায়; তাদের তো অনেক আছে, অত অতিশয্যের দরকার কী? হৃদয় মনের স্থূলতা ও পাশবিকতায় অর্থ জমিয়ে অর্থ খরচ করেই-বা কী লাভ তাদের? আমাকে কিছু দিক— মানুষের ক্ষমা ও দাক্ষিণ্য বিধাতার হৃদয়-হীনতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাক—দেশে ফিরে যাই, দু'মুঠো খেয়ে বাঁচি, কবিতা লিখি, শার্ট তৈরি করি।'

হাসতে লাগলাম।

—'কিন্তু এ-ভাবে শিগগিরই কেটে যায় আমার। দারিদ্র্যের সংগ্রামের ভিতর অজস্র নিপীড়িত আত্মা ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দেখি। চেয়ে দেখি কুষ্ঠ রোগী জীর্ণশীর্ণ কাঠের ঠেলা গাড়িতে বসে আছে তার। ভিজে ফুটপাতের উপর এক পাশে কাদা-জলের মধ্যে আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ে একটি নারী পড়ে রয়েছে—দেবদারু গাছের ছায়ায় নয়, মেঘের সোনায় নয়, কিন্তু এই পথে-ঘাটে রাস্তায় পৃথিবীর আদি অসীম স্থিররূপ আবিষ্কার করি আমি। নিজের জীবনের বেদনাকে মুকুটের মত মনে হয়। বাদলের বাতাসে, আবছায়ায়, জনমানব, ট্রাম-বাস, গাছের পাতাপল্লব, পাখপাখালির কলরবে এক-একটা সন্ধ্যা বড় চমৎকার কেটে যায় আমার।'

মা..........

'কিন্তু তবুও আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে।'

—'কার? তোমার? কেন?'

—'চৌকাঠের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে যে মরণ, সে রকম মৃত্যু নয়, আউটরাম ঘাটে বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যার সোনালি মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করে; মনে হয় আর যেন পৃথিবীতে ফিরে না আসি।'

—'ও, এই রকম? কিন্তু এ তো কোনো সম্ভবপর কিছু কথা নয়। আউটরাম ঘাট কোথায়?'

—'গঙ্গার একটা ঘাট।'

—'কোন দিকে বলো তো?'

—'তুমি দেখো নি।'

—'ঢের জাহাজ দেখা যায় বুঝি সেখান থেকে?'

—'তা যায়।'

—'রেঙ্গুনে যে-জাহাজগুলো যায় তা দেখেছ?'

—'দেখেছি।'

—'আমি একবার দেখেছিলাম—সে! অতবড় জাহাজ মানুষ বানায় কী করে?'

—'গৈরিক পরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেলে কেমন হয় মা?'

—'কেন? সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা কেন?'

—'কিংবা, খুন করে জেলে গেলে?

—'স্ত্রী-সন্তান আছে, মিছিমিছি জেলে গিয়ে কী লাভ?'

—'জেলের বাইরে থেকেই বা কী করতে পারি?'

—'বাইরে থেকে চেষ্টা তো করতে পারবে।'

মাথা নেড়ে—'হৃদয়ে যদি বিশ্বাস থাকত, তা হলে অনেক আগেই জেলে চলে যেতাম।'

—'কী সে বিশ্বাস?'

—'যে-বিশ্বাসে মানুষ জেলে যায়। সংসার ছেড়ে উদাসীন হয়ে ঘুরে বেড়াতেও ঢের বিশ্বাস লাগে, তাও নেই।'

—'তোমার রকম-সকম দেখে মনে হয় সংসারেও কোনো বিশ্বাস নেই তোমার।'

—'তা বরং খানিকটা আছে।'

—'কই? কোনো নজির তো পাই না।'

—'দেখো না, বিয়ে করেছি, আজকালকার দিনে কোনো বিষয়াসক্ত লোকও বিয়ে করতে চায় না, কিন্তু আমার সংসারাসক্তি তাদের চেয়েও যে কত গভীর, কল্যাণীকে এখানে এনে যে ক্ষয় করছি তাই কি তার প্রমাণ নয়?'

—'এত তো বোঝ তবু অকর্মন্য থাক কেন?'

—'তার পর দেখ, একটি সন্তানেরও জন্ম দিয়েছি। পৃথিবীতে এসে সংসারকে পুজো করবার লোলুপতাই তো অত্যন্ত বীভৎসভাবে দেখালাম।'

—'এখন থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা কর।'

—'চেষ্টা করছি। অন্তত সন্তান সৃষ্টি করব না আর।'

—'বেশ, তা না—করাই ভাল। কোনো কালেও যেন না-হয় আর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'সাজতে চেয়েছিলাম জীবনের সেবায়েৎ, সেজে বসেছি সেবাদাসী। উপভোগ নেই, অন্ধতা ও বেদনার ভোগ্য হয়ে বেড়াচ্ছি।'

—'যাও, কলকাতায় গিয়ে একটা টিউশান জোগাড় করে নাও। এ দুর্যোগ আস্তে-আস্তে ঘুচিয়ে ফেলো।'

—'বাবা বলছিলেন চেতলা কিংবা উল্টোডিঙ্গিতে টিউশান পেলে না-নেওয়াই ভাল।'

মা ভ্রূকুটি করে—'কেন? নেবে না কেন?'

—'এই-বৃষ্টি বাদলা, অনেকটা পথ হাঁটাহাঁটি করতে হয়। মেস থেকে প্রায় দু-তিন মাইল দূরে।'

—'সেই জন্য তোমার বাবার কষ্ট বুঝি? তুমি কি মনে কর পৃথিবীতে তুমি একাই এ-রকম কষ্ট কর? পৃথিবীতে বাপ মায়ের সন্তান তুমি কি শুধু একা? কত কৃতী, মেথরের কাজ করছে, তাদের বাপ নেই? কত ছেলে দেশ-ভুঁই তিন দিনের পথের পিছনে ফেলে, গঞ্জে-গঞ্জে কয়লার কাজ করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, তারা বাপ-মায়ের সন্তান না?'

—'বাবাকে বলো না মা, কিন্তু তোমাকে বলছি, চেতলায় হোক, বা ঢাকুরিয়ার হোক, দশ-দশ টাকার টিউশান পেলেও আমি নেব।'

একটু চুপ থেকে মা—'মেসের থেকে চেতলা কত দূরে?'

—'এই মাইল চারেক।'

—'আর ঢাকুরিয়া?'

—'সেও ঐ রকম।'

—'হেঁটে যাবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেন? ট্রামে গেলে হয় না?'

—'ধরো, যদি দশ টাকা দিতে চায় তা হলে ট্রামে গেলে আর কী থাকে?'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে—'সকালবেলা যেও।'

মাথা নেড়ে—'তাই যাব। কিন্তু ভয়, পৌঁছতে-পৌঁছতে ছেলের স্কুলের বেলা হয়ে যায় যদি।'

—'তাই ত; তা হলে সন্ধ্যার পর যাবে।'

—'তাই তারা যেতে বলবে।'

—'কলকাতার ভিতরে টিউশান পাও না?'

—'পেলে নেব।'

মা আমার মাথার দিকে হাত বাড়িয়ে—'আমি আশীর্বাদ করি, তাই যেন পাও।'

একটু চিন্তিতভাবে—'কিন্তু বাইরে যদি পাও?'

একটু নিস্তব্ধ থেকে—'তা হলে একটা ছাতা কিনে নিও।'

ঘাড় নেড়ে বললাম—'আচ্ছা।'

জননীর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

বললাম—'বাতাসা আছে মা?'

—'কেন?'

—'একটু চিবুতাম।'

—'রাতে ভাতের সঙ্গে খেও।'

একটু চুপ থেকে—'মেজকাকার জন্য আজ লুচি ভাজবে না?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমাকে একখানা দেবে?'

—'গুনে দশখানা ভাজি শুধু।'

—'আজ না-হয় এগারখানা ভাজলে।'

—'কই? তোমার বাবা তো এ-রকম বলেন না?'

—'লুচির জন্য বেগুন ভাজ বুঝি?'

—'হ্যাঁ বেগুন ভাজি, ডিম ভাজি।'

মায়ের হৃদয়—একখানা লুচি নিয়ে আসবেন নিশ্চয়ই আমার জন্য। বিকেলবেলা ভাবছিলাম, লুচিটা পেলে খুকিকে ছিঁড়ে দেবে খানিকটা। বাকিটা দেব কল্যাণীকে। তারা আমাকে রাজা মনে করবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু সন্ধ্যা উতরে রাত হয়ে গেল—তবুও কেউ এল না। জল ধরে গেছে। সন্ধ্যার সময় বিরাজ এসে হাজির হল। ছেঁড়া জুতো পায়, মাথায় অজস্র বেয়াদপ চুল আইনস্টাইনের মত, মাইনাস দশ-নং এর চশমা, উৎক্ষিপ্ত দাঁড়কাকের ডানার মত বিরাট গোঁফ, ছেঁড়া ঢলঢলে নোংরা জামা। যেখানে-সেখানে কালির চ্যাপসা। বুকে নকল সোনার বোতাম। জমকালো জীবনের কাজ অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে—এখন জোর করে বেচারিকে আটকে রাখা শুধু।

মস্ত বড় সাদা ন্যাকড়ার তালিওয়ালা ছাতাটা কয়েকবার ঝেড়ে লম্বা-চওড়া দোহারা শরীর নিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

—'এসো বিরাজ।'

বাজখাই গলায় চিৎকার করে—'যা চেপে জল এল। তোমার এখানেই আস্তানা নিলাম। কী করছ, সন্ধ্যার সময় বসে-বসে? বেরোও না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না, জলের ভিতর আজ আর বেরুলাম না। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই—কত দিন হবে হে? প্রায় বছর তিনেক?'

—'সে-সব মনে আছে কার? হ্যাঁ, বসে-বসে হিসেব-কিতেব করি, আর-কী? তোমাদের বাড়িটা পথের ধারে পড়ল—ঝড়—জল—খেয়াল হল—এলাম চলে।'

—'বেসো।'

একটা চেয়ার এগিয়ে দিলাম।

—'চেয়ার তোমার যা! দেখছি তো, লোহার, কাঠের না কাঁঠালের? ঠাকুদ্দাদা কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন বুঝি? বসলে ভাঙবে না তো?'

—'ভাঙলে না—হয় আর-একখানা চেয়ার দেব।'

—'চেয়ারের দাক্ষিণ্য খুব আছে দেখি, চশমা খুলে হো হো করে হাসতে লাগল।

—'আজকাল প্র্যাকটিশ করছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'এখানকার বারেই? চলছে কেমন?'

—'লগি গুতিয়ে চলেছি।'

—'শুনলাম ওকালতিতে সুবিধা হচ্ছে না কারো আজকাল?'

—'কেন হবে না? যারা ইডিয়েট তাদের হয় না।'

—'তুমি তা হলে পাচ্ছ বেশ?'

একটা হুমকি দিয়ে বললে—'ব্যবসা কি চাকরি নাকি, যে বাঁধাধরা থাকবে? আজ না-হয় মাসে পনের টাকাও না পেলাম—কিন্তু তাই বলে কাল পনের শ টাকা পেতে বাধা কোথায়?'

—'তা নেই অবিশ্যি।'

—'এই তো সাব-ডিভিশনে প্র্যাকটিশ করছি। এরপর সদরে যাব।'

—'কেস নিয়ে?'

—'কেস নিয়ে কেন? সেখানে গিয়ে বসব, হিয়ার করব, সরকারি উকিলকে ইঁদুরের গর্তে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব!'

হা হা করে হেসে উঠল আবার।

বিরাজ অবিশ্যি মেধাবী ছাত্র ছিল, কিন্তু এখন তার পাতলুন, বোতাম ও জামার দিকে তাকিয়ে বোধ হয়, মেধার পুরস্কার সে বিশেষ কিছু পাচ্ছে না।

—'শিগগিরই বসছ গিয়ে তা হলে, সদরে?'

—'কালও যেতে পারি, তিন বছর পরেও।'

চুপ করে ছিলাম।

—'সদর থেকে যাব হাই কোর্টে।'

—'হাই কোর্টে যাবে?'

—'নিশ্চয়ই! বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে—এই সব ডিস্ট্রিক্ট জজদের ঘাড়ে চেপে-চেপে বেড়াব।

—'কী করে?'

—'পনের বছরের মধ্যে উইগ মাথায় দিয়ে গিয়ে বসব; ইয়া টাই ঝুলিয়ে, কাল গাউন পরে—হাই কোর্টে।'

—'হাই কোর্টে ব্যাক করাবার কেউ আছে তোমার?'

—'ব্যাক? স্যার রাসবিহারীর কে ছিল? ঘাড়ের ওপর একটা হেডপিস পেয়েছি কিসের জন্য!'

খুকি বিছানায় ঘুমিয়েছিল, বিরাজের বক্তৃতার গরমে চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল।

বিরাজ খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে—'এটি বুঝি তোমার মেয়ে?'

—'হ্যাঁ।'

আমি—'বসো বিরাজ। ওকে ওর ঠাকুমার কাছে দিয়ে আসি।

রান্নাঘরে খুকিকে রেখে দিয়ে এসে দেখি, বিরাজ চশমাজোড়া কপালে আটকে বাংলা খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছে।'

আমাকে দেখেই চোখ কপালে তুলে বললে—'এই সব সাপ-ব্যাঙ পড়ো না কি তুমি?'

—'কাগজটা আজ রেখেছিলাম। কেন? কী লিখেছে?'

বিরাজ কাগজটা একেবারে চোখের কাছে তুলে নিয়ে বললে—'লিখেছে রালোয়া তহশিল........'

—'সে কোথায়?'

—'তারিখ দিয়েছে, গোয়ালিয়র থেকে।'

—'ও।'

—'রালোয়া তহশিলের মুসনে গ্রামের এক পাল গরু পাঁচদেওলি পাহাড়ের গোচারণ ভূমিতে চরিতেছিল।'

—'বেশ কথা।'

—'চরিতে-চরিতে গাভীর পাল এক বিস্তৃত বনজঙ্গলের প্রান্তদেশে আসিয়া পৌঁছায়।'

—'আচ্ছা।'

—'প্রকাশ, যে সেই সময়ে একটি বৃহদাকার ব্যাঘ্র জঙ্গল হইতে একটি গরুর উপর লাফাইয়া পড়ে।'

—'বটে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'অন্যান্য গরুগুলি পলাইয়া না যাইয়া একযোগে ব্যাঘ্রটিকে আক্রমণ করে।'

—'বাঃ।'

—'গাভীগণের তীক্ষ্ণধার শিঙের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যাঘ্রটি জঙ্গলের ভিতর পলাইয়া যায়।'

—'হুঁ?'

—'বহু গ্রামবাসী দূর হইতে এই গাভীদলের সমবেত আক্রমণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।'

—'বাঃ বাঃ।'

—'এই সব আস্তাকুঁড় পড়ে দিন কাটাচ্ছ বুঝি?'

বিরাজ মর্মান্তিক বিক্ষোভে কাগজটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—'এই কাগজের ব্যবসা, এর চেয়ে পান-বিড়ির ব্যবসাও ভাল—খদ্দের জমাবার জন্য নাকে এমন রসকলি কাটে যারা।' একটা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে—'তোমার এখানে কী বই আছে?'

—'কী রকম বই চাও?'

—'...বই আছে?'

—'না।'

—'রাইমসের কোনো বই আছে? জে-এম-এর? বাঃ, নাম শোনো নি?'

—'শুনেছি। নেহাত চাষাভূষো ছাড়া কে না শুনেছে? তার কোনো বই কি আর এখানে পাবে? না, আমার কাছে সে সব কী আর থাকবে?'

অপ্রতিহত হয়ে বিরাজ—'মানির কোনো বই নেই?'

মাথা নেড়ে—'আমার এখানে? দূর। ইকনমিকস নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত কেন? তোমার কাব্যচর্চা তো ব্রিফ নিয়ে।'

বিরাজ গলা খাঁকরে, ধমক দিয়ে,—'বইখানার নাম শুনেছ!'

—'এই তো এইমাত্র শুনলাম।'

—'এর আগে শোনো নি?'

—'না।'

—'ইডিয়ট! এ সব কী বই তাকে সাজিয়ে রেখেছ তা হলে?'

—'দেখ-না।'

চশমাটা কপালে আটকে নিয়ে বিরাজ একখানা বই তুলে—'পোয়েট্রি।'

আর-একখানা বই তুলে পড়ল-'টেল্‌স্ অফ মিসট্রি!'

আমার দিকে দাঁত খিঁচিয়ে ফিরে তাকিয়ে—এটা কে? এরা শালা-ভায়রা একটা কিছু বুঝি? না মাসতুত ভাই?'

রাগে-বিরক্তিতে গজগজ করতে-করতে বিরাজ বই দুটোকে ঠেলে দিয়ে আর-একখানা বই টেনে নিয়ে পড়ে বললে—'অলিভার টুইস্ট? চার্লস ডিকেন্স?' পরের বইখানা তুলে পড়তে-পড়তে—'ডেভিড কপারফিল্ড। চার্লস ডিকেন্স। এগুলো কী?'

—'নভেল।'

আমার দিকে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে—'এই রত্নটি কে?'

গম্ভীরভাবে—'কার কথা বলছ?'

—'এই-যে, যার ভোগের থালা দিয়ে তাকখানা সাজিয়ে রেখেছ।'

—'ডিকেন্স?'

—'হ্যাঁ, মাই হার্টস সিক্‌নেস।'

—'ডিকেন্সের নাম শোন নি বিরাজ?'

—'মানে তো শয়তান।'

দু-তিন ধাপ পরে গিয়ে বিরাজ আর-একখানা বই হাতে তুলে নিয়ে-'এখানা কী?'

ধীরে-ধীরে পড়ল—আনন্দ মঠ। আরো পড়ল—'বঙ্কিমচন্দ্র।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললে—'হদ্দ করল বাড়ির মধ্যে প্যাদা এসে।'

বইখানা অজ্ঞাতসারেই হাত থেকে পড়ে গেল বিরাজের; বইয়ের উপর দিয়ে পাতলুন চালিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ সে তাকের আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ করে।

—'...এর কোনো খবর রাখো?'

—'অনেকক্ষণ তো বসলে বিরাজ। চা খাবে?'

—'....এর আর...এর মধ্যে বড্ড কষাকষি, চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব এবার বুঝি যায় টেঁশে।'

—'চা এনে দেই?'

বলতে-বলতে অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে জমকালো গোঁফজোড়া একবার শানিয়ে নিয়ে সাদা তালিমারা ছাতাটা মাথায় দিয়ে বিরাজ শ্রাবণের অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। বিরাজের মত এমন অমূল্য জিনিস সাবডিভিশানের কোর্টে নষ্ট হয়ে যায়।

যদুনাথবাবু টাকাপয়সাওয়ালা লোক, বাপের বিপুল জমিদারি ছিল; অনেক খুইয়েছে। তবুও দেদার পড়ে রয়েছে, সারা জীবন এঁর টিকিও এদিকে কেউ দেখে নি; কাশ্মীর থেকে সিমলা, সিমলা থেকে কাশী এই ছিল তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচিতি, এদিকে বড় একটা আসেন নি। বুড়ো বয়সে অবিশ্যি এখন দেশে এসে বসেছেন। সকালবেলা কোনো একটা ইলেকশন সম্পর্কে বাবার কাছ থেকে ভোটের জন্য যদুনাথবাবু এসে হাজির হলেন। বাবার সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর আমার ঘরে ঢুকে বললেন—'কী করছ? কিছু না? বাড়িতে চুপচাপ বসে আছ বুঝি?'

একটা সিল্কের পাঞ্জাবি গায়—সিল্কের উড়ানি, এক মাথা সাদা চুল, তার উপর চিরুনির কোনো ব্যবহার নেই। খুব সাধারণ এলবার্ট জুতো পায়। ভাল করে বুরুশও করা নেই। মুখে আন্তরিকতার চেয়ে আগ্রহ বেশি; চোখ চতুর ও চিন্তাশীল; জীবন পণ্ড হল, না কৃতকার্য হল, সে বিষয়ে সমস্যা এখনো যেন শেষ হয় নি, মুখাবয়বের উপর এ-রকম এক ভাব; হৃদয়ে পরিকল্পনা ও উৎসাহের অভাব নেই।

চেয়ারটা টেনে বসে, আক্ষেপ করে মাথা নেড়ে—'তোমাদের দেখে বড় দুঃখ হয় আমার; এই তো বি-এ পাস করেছ, বি-এ না এম-এ? এম-এ? বেশ-বেশ, তা হলে তো গাজন আরো চমৎকার—কুড়িয়ে -বাড়িয়ে বয়সও, তোমার বাবা বললেন, চৌত্রিশ। বিয়ে করেছ, সন্তান রয়েছে অথচ একটা মুটের যা সম্বল তাও তোমার নেই।'

একটা চুরুট জ্বালিয়ে—'দিনান্তে দুটো পয়সা নিজের বলে খরচ করতে পার? কী আক্ষেপের কথা! চাকরি খুঁজছ?'

—'এবার যাব কলকাতায়।'

—'কবে?'

—'এই সপ্তাহখানেকের মধ্যে।'

—'কী, চাকরি পাবে?'

—'দেখি।'

হাত নেড়ে—'মিছে কেন কলকাতায় ফোপর দালালি করতে যাও? তুমি মনে করেছ আমিই একা এম-এ পাস করে বসে আছি—এমন আশি হাজার ছেলে তোমার মত বাংলাদেশের পথে-ঘাটে ঘুরছে—একটা ছাগল সারাদিন চরে যে ঘাসটুকু পায় তাও জোটে না।'

চুপ করে ছিলাম।

খানিক ধোঁয়া ছেড়ে—'মিছিমিছি নিজেকে ঠকিও না; সে যাদের শ্বশুর—সম্বন্ধী থাকে তাদের চাকরি জোটে—এ কাঠামে তোমার কিছু হবে না—একটা টেকনিক্যাল কিছু শেখো।'

কোনো জবাব দিলাম না।

—'শিখে এসো।'

—'টাকা নেই।'

—'বেশ, তা হলে ব্যাঙ্কিং শেখো-না। তাও টাকা নেই? আচ্ছা, তা হলে নিরিবিলি বসে দর্জিগিরি শেখো না কেন?'

খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—'কিংবা ডিমের ব্যবসা করতে পারে, ছোট ডিমের?'

—'পোলট্রি ফার্মিং।'

—'আঃ, সে তো ঢের বড় কথা হল; এক নিশ্বাসে মগডালে বড়ে বসতে বলি না। আমার অবিশ্যি একটা কথা অনেক সময়ই মনে হয়েছে এই যে যদি কোনো ভদ্রলোকের ছেলে দেশগাঁয়ে এসে দুধের ব্যবসাটা ধরে, তা হলে টাটকা দুধও খেতে পারি, চাকরি সমস্যাও খানিকটা মিটে যায়, কী বলো?'

—'দেখলে হয়।'

ভ্রূকুটি করে হেসে—'আরে দূর! আজকালকার শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে ভদ্রলোকের ছেলেরা যত চশমখোর চামার হয়েছে, ছোট লোকরা কি আর তত রে ভাই? না হয় জোলো দুধ দিচ্ছে কিন্তু তোমরা ব্যবসা শুরু করলে পিটুলি গোলা খেতে হবে।'

চুরুটের খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলে—'তা ছাড়া গরুর যত্ন আমরা জানি কোনো লোক? ধবলী, কমলা, মঙ্গলী বলে যতই আদর করি, বিলেতের একটা কসাইও আমাদের চেয়ে—দেখবে মিল্ক কোম্পানির বিজ্ঞাপনের পাশে গরুর ছবিগুলো? কিংবা যে-কোনো বিলিতি কনডেনসড মিল্ক কোম্পানির ইতিহাস পড়ে দেখলেই পার, আমাদের মত তেঁতুলের খোশা আর হাঁসের ডিমের খোলা দেয় না তো। কী সব প্রাইজ পেয়েছে, শুনেছ?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'খবর কিছু রাখ না দেখছি। কেবল উদয়শঙ্করের নাচ দেখবার জন্য? আরে ধেত্তেরি তার শিবনৃত্য! শিবচক্ষু।'

আমার দিকে তাকিয়ে—'ডারবাইতে যে রয়েল শো হয়। ডারবাই বলতেই ভেবেছ হয় তো রেসের কথা!'

—'না, তা নয়—'

—'রয়েল শো রেসের চেয়ে ঢের বড় জিনিস। সেখানে এবার গাভীগুলো ছটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার চ্যালেঞ্জ কাপ, আরো সাঁইত্রিশটা।'

চক্ষুস্থির করে আমার দিকে তাকালেন।

বললেন—'এখন হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ সের দুধ রোজ দোয়া হচ্ছে। আর সে দুধ কী? খেতে লাগে স্রেফ হুইস্কির মত।'

চুরুটটা নিভে এসেছিল; হাতে রেখে যদুনাথবাবু—'মোটর ভেকেলস্ ডিপার্টমেন্টে কত মোটর পারমিট হয়েছে হিসেব রাখ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না।'

বাঁ-হাতের পাঁচটা আঙুল তুলে—'পাঁচ হাজার প্রাইভেট কার, দু'হাজার ট্যাক্সি, এক হাজার বাস।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে—'বাংলাদেশের পথে-ঘাটে এই সব ছুটছে; কত ড্রাইভার দরকার হয়, ভেবে দেখ তো! মোটর ড্রাইভারি শিখে নাও।'

ভাবছিলাম।

—'যা পাবে, তাতে দশটা মাস্টারমশাইকে গিলে ফেলতে পারবে। এটা হীন কাজ বলে ভাবছ? স্কুল-কলেজের ছেলেদের কাছ থেকে মাস্টারমশায়রা যা সম্মান পান—তার চেয়ে ঢের বেশি সম্মান পাবে।'

ধীরে-ধীরে চুরুট টানতে লাগলেন।

চুরুটে একটা টান দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে—'না-হয় জমি চাষ করো। লাঙল ধরো, হলধরের মত, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটিকে জলে ফেলে দাও।'

—'জমি ঢের কিনতে হয়।'

—'কালেকটরের সঙ্গে গিয়ে দরবার করো। দু শ বিঘে চর লিখে দেবেন চাষবাস করার জন্য।'

—'একবার গিয়েছিলাম।'

—'তার পর?'

—'শুনলাম ডিসট্রিবিউশন হয়ে গেছে।'

—'কুছপরোয়া নেই, তোমাদের এই ঘরদোরের চারিদিকে আধ বিঘে জমি হবে তো? মা সর্বমঙ্গলার নাম নিয়ে শুরু করে দাও।'

চুরুটে এক টান দিয়ে—'দাঁড়াও, তোমাকে বাতলে দিচ্ছি আমি।'

চুরুটটা ফেলে দিয়ে, পকেট থেকে আর-একটা চুরুট বার করে—'পঞ্চাশ বছরই তো এসব করলাম বসে-বসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তোমাকে লাভ নেই বাছা। তুমি আমার বন্ধুর ছেলে—অন্তত পঞ্চাশ একর আবাদি জমি যদি না জোগাড় করতে পার, চাষবাসের কাজে হাত দিয়ে কোনো ফয়শালা নেই।'

বললেন—'তা যদি জোগাড় করতে পার, তা হলে পেটে ভাত খেয়ে থাকতে পারবে।' পকেট থেকে দেশলাই বার করে—'কিন্তু জমি পেলেই তো হল না শুধু, আরো দু'হাজার মূলধন লাগবে।'

দেশলাই-এর গায়ে একটা কাঠি ঘষতে-ঘষতে—'পরে যদি একশ একর জমি আর চার হাজার টাকা ক্যাপিট্যাল জোগাড় করতে পার তা হলে মাথার ঘাম পায় ফেলে উপার্জন করলে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বেশ তোয়াজেই থাকতে পারবে।' কাঠিটা জ্বালতে না-জ্বালতেই নিভে হাতের থেকে পড়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে—'কিন্তু দশ-বিশ একর জমিতে কিছু কাজ হবে না। তা তোমাকে অনেক আগেই বলে রাখছি। দশ একর জমি নিয়ে এক জন আনাড়ি হয় তো বড় জোর পনের-বিশ টাকা সংস্থান করতে পারবে। এক জন ঘুঘু পারবে হদ্দ পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু তাও ধরো যদি বন্যা হয় বা আনাবৃষ্টি-অজন্মা, তা হলে তো সবই গেল। ভগবান আমাদের নিয়ে খেলা করতে ভালবাসেন। এত বড় সৃষ্টি ফাঁদিয়ে বসে কী করবেনই-বা আর। কাজেই কখনো আকাশ থাকে শুকিয়ে, কখনো পৃথিবী যায় ডুবে।' আর-একটা কাঠি জ্বালাতে চেষ্টা করলেন যদুনাথবাবু। সেটাও নিভে গেল।—'কাজেই টাকার জোর থাকা চাই। অন্তত লাখ, দেড় লাখ টাকা মজুদ না থাকলে জমি নিয়ে খেলা করা বিড়ম্বনা; তার চেয়ে পরস্ত্রী নিয়ে ইয়ার্কি করাও ঢের নিরাপদ। এই কথাটা তোমাদের আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।....এক দল ছেলে খেঁকিয়ে উঠেছে ভাদ্র মাসের কুত্তার মতো—জমি চাষ করে তারা বড় লোক হবে। পারবে?'

এইবার ভাল করে কাঠি জ্বালিয়ে চুরুট জ্বালিয়ে নিলেন যদুনাথবাবু।

বললেন, 'রোজ এগার ঘণ্টা কাজ করতে পারবে? যদি বলি লাঙল ধরে ষোল ঘণ্টা, তা হলে তো, আচ্ছা, লাঙল না ধরে ষোল ঘণ্টা। যে-সব কিষান খাটাচ্ছ তাদের কাজকর্ম তদারকি করতে হবে। তাদের কাছ থেকে ষোল আনা কাজ আদায় করে নিতে হবে—অন্তত দশ-পনের বছরের মধ্যে নভেল বা নারীর মুখ দেখতে পারবে না, থিয়েটারে যেতে পারবে না, বায়স্কোপ দেখাবার জো নেই। বাপ, মা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, প্রণয়িনী উচ্ছন্ন গেলেও ভ্রূক্ষেপ করতে পারবে না। সৃষ্টির বিধাতা যেমন হৃদয়হীন ও অনন্যকর্ম, অক্লান্ত ও ধূর্ত, তেমনি করে তোমাকেও জমি পাহারা দিয়ে বেড়াতে হবে।'

নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম দু'জনে।

—'দেখ, যদি পার। অনেক ছোকরাকে দেখেছি বোশেখ-জ্যৈষ্ঠের ঝাঁ ঝাঁ আগুনের মধ্যে দশ-বার ঘণ্টা—একটা শয়তানেও পারে না। কিন্তু সেই ধকলটাই জমির পিছনে খাটাতে বললে তাদের চোখের তারা কপালে ওঠে। এমনই—'

চুরুটে এক টান দিয়ে—'দিন-কাল ছিল তখন আমার, চোত-বোশেখের রোদে দশ ঘণ্টা, বিশ ঘণ্টা করে খেটেছি আমি। থার্মোমিটারে তখন এক শ সত্তর ডিগ্রি।'

চুলের ভিতর আঙুল চালাতে-চালাতে যদুনাথ—'সূর্য না-উঠতেই বেরিয়ে যেতাম, ফিরতাম যখন আকাশে বাদুড় চরে।'

—'কোথায়?'

—'বললাম যে।'

—'সেখানে গিয়ে কী লাভ আপনার?'

—'লাভ ছিল, অমানুষিক ব্যবসায়ীই ছিলাম না শুধু।'

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু চুপ থেকে—'জীবনের মনুষ্যত্বের দিকটাও একেবারে ভুলে যেতে চেষ্টা করি নি আমি।'

চুরুটে টান দিয়ে—'থাক। এই তো সত্তর করলাম, এখন নিদেন বার ঘণ্টা খাটতে পারি'—একটু হেসে—'অবশ্য, বোশেখের রোদ এখন আর সহ্য হয় না।'

আরো খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললেন—'কুমায়ুন পাহাড়ে চলো; যাদের এদিকে রুজি আছে ভারী আনন্দ পাবে তারা।'

নিভে গিয়েছিল চুরুটটা—জ্বালিয়ে নিয়ে, 'কিন্তু এতে ক্যাপিটাল লাগে আরো ঢের বেশি।'

—'কুমায়ুনে কী ফল হয়?'

—'আপেল হয়। পেয়ারা হয়, অবশ্য বিশেষ সুবিধার না, সবচেয়ে কাছে, তাও পাহাড় থেকে প্রায় মাইল চল্লিশেক দূরে, পথ-ঘাট খারাপ। বর্ষাকালে হাপুস চোখে কান্না আসে কিন্তু তবুও ফলের বাগান যখন তৈরি হয়ে ওঠে—বাংলার ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে যা-সুখ, তার চেয়েও ঢের বেশি আনন্দ ও তৃপ্তি।'

—'এ দেশের ধানক্ষেতের শোভাও কি কম?'

—'ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছে, ছেলেবেলার থেকেই দেখেছি কি না।'

—'কিন্তু সেই সময় থেকে—তারও ঢের আগের থেকে এই ধান ক্ষেত-গুলোর রহস্য ও বিচিত্রতা কী যে গভীর হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি তো জন্ম-জন্ম এগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি।'

—'তাই থেকো, তোমাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না।'

যদুনাথ বলে চললেন—'পোস্ট-অফিসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে যদি কুমায়ুন থেকে মোরব্বা করার ফল—যেমন কুলুর থেকে ভি-পি-পি সিস্টেমে করা হয়—তা হলে অবিশ্যি সুবিধা আছে ঢের।'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু এ-সব কাজ বেদখল করে নেবে; বাঙালি তো দূরের কথা, পশ্চিমারাই কিছু করে উঠতে পারে কি না সন্দেহ।'

চুরুটের ছাই খানিকটা ঝেড়ে ফেলে যদুনাথবাবু—'এখানে যেমন চর দিচ্ছিল, কুমায়ুন পাহাড়ে তেমন যদি জমি দেয়, তা হলেও জমি তৈরি করে একটা বাগান খাড়া করতে, খেদ্দায় হাতি ধরার চেয়েও ঢের বেশি টাকা ও হেপাজত।'

খানিকটা নীল ধোঁয়া উড়ছিল।

—'ছোট-খাটো একটা বাগান যদি তৈরি করে নেওয়া যায়, কুড়ি একর মত বেশ তোয়াজ করা যায় যদি, গাছে যদি উপযুক্ত মত ফল ধরে, তা হলে একর বাবদ মাসে দুশ টাকা আসতে থাকে।'

একটু নিস্তব্ধ থেকে—'আবার যাব ভাবছি, টাকার জন্য নয়-তা হলে পাটের ব্যবসায়। [টাকা ঢালতাম]; কুমায়ুনে আমার সেই কাল বিধবার মত বাগানটার গন্ধে-গন্ধে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। দাঁত মুখ খিঁচে, ভেংচি দিয়ে—'আরো তা হলে তো কত জিনিসই করতে হয়। বিধাতা তো পনেরটা জীবন দেন নি, দিয়েছেন একটা, অথচ দুশটা জীবনের কামনা ও চরিতার্থতা এরই ভিতর গুদামজাত কন্নতে হবে-মানুষের কি আর হাঁফ ফেলার সময় আছে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাই আর ধুলো ঃ পথে—পথে ব্যর্থতা মাড়িয়ে চলা।'

চুরুটটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে—'এই তো আবার মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের জন্য ভোট কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি—মাঝে-মাঝে দপ করে মনে হয়, কুমায়ুনে গেলে হত না? আমার সেই বাগানটা...সেই...

মাথা নেড়ে—'ভগবান নির্বাণ দেন নি, দিয়েছেন স্মৃতি; ভালবাসা দিয়েছেন। সমুদ্রের মত আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু দেহটাকে তৈরি করেছেন দুই রত্তি ঘুণ দিয়ে, এই যাঃ চুরুটটা নিভে গেল।'

জ্বালিয়ে নিয়ে—'তা কুমায়ুনে আমি তোমাদের যেতে বলি না, মোটা খাও না, জমিদারিও ভোগ করো না, সহাসনী নদীও নেই, সে ঢের টাকার শ্রাদ্ধ ভাই—সেই বাগানে গিয়ে ফলের বাগান তৈরি করা অন্তত ত্রিশ একর আন্দাজ জমি কিনেত হয়, বাড়ি তৈরি করতে হয়, ক্ষেত তৈরি করতে হয়, কমপক্ষে হাজার দুই অন্তত ফলের চারা লাগিয়ে দিতে হয়।'

চুরুটে এক টান দিয়ে—'তার পর সেই পরান কথার রাজকন্যাকে পোষো, ফল ধরতে—ধরতে আট-দশটা বছর কেটে যাবে। মনে হবে যেন জেলে রয়েছ'-চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—'কিন্তু মনের অবস্থাতে নিজেকে না মুখ করে বাঁচো যদি, তা হলে দুনিয়ার দালাল মুখ তুলে চাইবেন বই কি। ফকিরের কান্নায় তিনি হার্ট ফেল করেন না। ভিটের ঘুঘুর কষ্টে প্রাণ টন-টন করে ওঠে তাঁর। ফকির সাজা না ঘুঘু সাজা, পৃথিবীকে যদি উপভোগ করতে চাও তা হলে সৃষ্টির স্রোতের ভিতরকার অক্লান্ত সুবিধাবাদ ও অশ্রাব্য আত্মপরতাকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে শেখো, ভগবানও আশীর্বাদ করবেন, নারীও হাতের পুতুল হবে।'

[দূর থেকে দূরে সরে যায়—
অন্তর্গত পৃথিবীর সুনিশ্চয় ঘন পরিচয়; প্রত্যাবর্তনের পথ নিঃশেষে মুছে—
কীর্তি সফলতা আর উদ্যমের বিপুলতা দিয়ে।
নির্বাসনের এক নিরন্ধ্র বলয় কাছে আসে।
কারুবাসনের লয়, নিরন্ধ্র বলয়—]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

জীবন প্রণালী

—'আজ আমি বায়স্কোপ দেখতে যাব—'

—'যেও—'

—'তুমি বললেই তো হবে না; এ বাড়িতে তো তুমি শালগ্রাম।' নিস্তব্ধ নীরব ছিলাম।

কিন্তু বায়স্কোপে যাবার জন্য অঞ্জলি আর পীড়াপীড়ি করল না—সন্ধ্যার সময় দেখলাম বালিশের বাঁ পাশে একটা হ্যাছাক লণ্ঠন রেখে একটা বই হাতে নিয়ে শুয়ে আছে।

পেছন থেকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম মার্টিমারের এথিকস পড়ছে। চলে যাচ্ছিলাম।

অঞ্জলি—'কে!'

—'আমি—'

—'চলে যাচ্ছ!

—'হ্যাঁ

—'কিসের জন্যে এসেছিলে?'

—'এমনিই।'

—'এমনিই? ভেবেছ, আমি বুঝি না কিছু? উঁকি দিয়ে দেখতে এসেছিলে আমি কী পড়ছি?'

—'বইখানা কোথায় পেলে তুমি?'

—'এই মার্টিমারের কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'জোগাড় করে নিয়েছি। তোমার মুখাপেক্ষা করে তো আর দিন চালাই না। তা হলে—'

—'বি-এ পড়বে বুঝি?'

—'পড়ব বই কি—'

—'ফিলসফি নেবে?'

—'হ্যাঁ ফিল আর হিস্ট্রি—'

—'ইকনমিকস নিলে পারতে।'

—'বড্ড শক্ত না?'

—'ম্যাথমেটিকস নাও না?'

—'বোটানি নিতে পারলে নিতাম—'

—'আর অ্যাডিশনাল বাংলা? বোটানির সঙ্গে সেটা খাপ খায় বড় ভাল।'

—'পাস আমাকে করতেই হবে—'

—'মাস্টারি করবে তুমি?'

—'তা ছাড়া তো আর কোনো পথ নেই। বিয়ের পর চার বছর হয়ে গেল—'একটু চুপ থেকে—'তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে হাঁড়িতে ভাত ফুটবে না আর—এ-কথা আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল।—পরকাল তো খুইয়েইছি'—খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে—'শালগ্রামকে উঠিয়ে-বসিয়ে ধুইয়ে-মুছিয়ে এ-চার বছর যত ছেলেখেলার পাপ হল, সে-সবের থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচি—'

—'কোথায় যাবে?'

—'যে কোনো দিকে-চাকরি পেলে—'

—'চাকরি পেতে হলে তোমাকে বি-টিও পড়তে হবে বোধ করি—'

—'আচ্ছা। সে আমি বুঝব—'

—'হয় তো এম-এ ডিগ্রিও পাস করতে হবে—মেয়েদেরও আগের মতন সে-রকম সুবিধা এখন নেই। দিনের পর দিন শস্তা হয়ে যাচ্ছে সব—'

—'বি-এ পাস করে আমি মাস্টারি পাব?'

—'হয় তো ত্রিশ টাকার—'

—'পঁচাত্তর টাকার এক পয়সাও কম নয়-একশও পেতে পারি'—অঞ্জলি এই রকম মনে করে। কিন্তু একদিন দেখবে যে চল্লিশ টাকার মাস্টারিও একজন বি-টি পেয়ে গেছে—কিংবা একজন এম-এ....যাক, বেচারিকে মিছিমিছি বকিয়ে কী লাভ! ক্রমে-ক্রমে সবই তো বুঝবে—

বললাম—'মাস্টারিই যখন করবে তোমার ম্যাথমেটিকস নেওয়া উচিত ছিল অঞ্জলি-অঙ্কের গ্রাজুয়েটের তবুও খানিকটা দাম আছে—'

—'অঙ্ক আমার ভাল লাগে না—'

—'কিন্তু নেওয়া উচিত ছিল—তবুও'

—'তোমার বুদ্ধিতে চলে এই চারটে বছর তো আমি খুইয়েছি—এখন আমাকে পরামর্শ দিতে এসো না আর—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু চুপ থেকে-'আমি ম্যাট্রিক ক্লাস থেকেই অঙ্ক ছেড়ে দিয়েছি যে—'

—'ও তাই দিয়েছিলে না কি?'

—'কী করে বি-এ তে অঙ্ক নিই তা হলে?'

—'না, তা হলে তো আর নিতে পারা যায় না—'

বললাম-'কিন্তু সংস্কৃত ছাড়তে চাচ্ছ কেন? স্কুলের কাজে সংস্কৃতেরও খানিকটা মূল্য আছে—'

—'সত্যি বলছি তোমাকে, এ-রকম করে তুমি আমাকে ঘাবড়ে দিও না তো—'

—'সংস্কৃতটা নাও—'

—'আঃ!—এখান থেকে চলে যেতে পার তুমি—'

পরদিন সন্ধ্যার সময় অঞ্জলি—'সংস্কৃতের ব্যাকরণ হাতে নিলে আমার মাথা ধরে—'

—'তাই না কি? কিন্তু ব্যাকরণের এমন কী আর দরকার?'

—'সমাস-সন্ধি ভাঙতে হবে না? সূত্র মুখস্ত লিখতে হবে না? তোমার পায়ে ধরি—এ আমাকে দিয়ে কিছুতেই হবে না—'

—'সংস্কৃতের অক্ষরও বোধ করি চেনো না?'

অঞ্জলি মাথা নেড়ে—'চিনি'; কিন্তু দেখলে ভয় করে, তাকাতে-তাকাতে মাথা ধরে যায়—'

লণ্ঠনটা বিছানার ওপর রেখে মার্টিমার নিয়ে বসেছিল সে। বললাম—'বইটা রেখে দাও।'

—'রেখে দেব? কী করব তা হলে? তোমার সঙ্গে লুডো খেলতে হবে?'

এ সময় তো তুমি রোজ ব্রিজের আড্ডায় যাও—আজ কেন মিছিমিছি আমাকে জ্বালাতে এসেছ?'

'বড়-বড় বইগুলো না পড়ে সুবিধামত নোট পড়লে ভাল হবে—আমি তোমাকে কতকগুলো নোট যোগাড় করে দেব—'

অঞ্জলি—'নোট পড়ে পাস করতে পারে মানুষ?'

—'খুব-মার্টিমার এ-সব ত পড়লে কয়েকদিন,বসে; হয় ত পড়তে ভাল লেগেছে—'

—'না, বিশেষ সুবিধা লাগে নি—'

—'কী লিখেছে বুঝতে পারো নি হয় ত—'

—'কেউ না বুঝিয়ে দিলে কী করে বুঝব?'

—'আচ্ছা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি—'

—'থাক।'

—বাঃ বাঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের টিউটোরিয়ালে আমি চমৎকার নম্বর পেতাম মেটাফিজিকসে।'

—'হয়েছে! এখন আমার বইটা ছাড়ো তো—'

—'এই দেখো, ধরো, চার্লসন আমার মুখস্ত—'

বইটা এক ঝটকায় টেনে নিয়ে অঞ্জলি—'আমি মুখস্ত করতে জানি—।'

একটু বিব্রত হয়ে—'এ সব বই তৈরি করতে গিয়ে আমি শক্তির অপব্যয় করেছি শুধু; সেদিন বুঝি নি-কিন্তু আজ বুঝেছি। তোমাকে কয়েকটা বেশ ভাল দেখে নোট জোগাড় করে দেব। খুব কম সময়ে এমন চমৎকার তৈরি হবে—'

বাধা দিয়ে অঞ্জলি—'ইস, আমি বই পড়ি না বুঝি?'

—'এই বড়-বড় বইগুলো?'

চোখ সে ক'পালে তুললে—'তোমার চেয়ে আমার কম ক্ষমতা?'

—'কিন্তু তোমার শরীর যে বড্ড অসুস্থ; সন্তান হবার পর থেকেই—'

বাধা দিয়ে অঞ্জলি—'বেশি কথা বলো না—আমার মাথা ঘোরে।'

হাত-পাখাটা তুলে নিলাম।

—'না বাতাস দিও না—'

—'মাথায় জল দেবে?'

বাতিটা সরিয়ে রাখো তো'

বাতি কমিয়ে ঘরের একপাশে রেখে দিলাম।

অঞ্জলি বিরস চোখে—'আমার ঘরের ভিতর রাখলে কেন?'

—'একেবারে নিভিয়ে দেব।'

—'কেন?'

অন্ধকারের মধ্যে জানলার ভিতর দিয়ে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না নেমে এল।

অঞ্জলি ধীরে-ধীরে উঠে গিয়ে কলসীর থেকে দু-তিন গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে মাথায় ঢালতে-ঢালতে বললে—'তুমি এখন যাও।'

—'কোথায় যাব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমি একটু নিরিবিলি হয়ে থাকতে চাই।'

—'একটা অ্যাসপিরিন খাবে?'

—'না।'

—'শোও; আমি তোমাকে বাতাস দেই।'

অঞ্জলি একটু হেসে—'তোমাকেই-বা কদিন বাতাস দেই আমি? মাথা কি আমারই ধরে শুধু—তোমার কোনো রোগ হয় না কোনোদিন? একা পড়ে থাকো—আমাকেও একা পড়ে থাকতে দাও।'

বকতে-বকতে বিছানায় এসে বসল। দেখলাম, সমস্ত মাথার জলে শাড়ি ছব ছব করে ভিজছে।

বললাম—'মুছবে না, অঞ্জলি?'

—'না বেশ আরাম লাগছে—'

—'গায়ে জল বসে যাবে তো—'

খানিকক্ষণ মাথা চটকায়। চুপ করে শেষে—হ্যাঁ-বাতিটা জ্বালিয়ে একটু কমিয়ে দিয়ে চলে যাও তুমি। এইবার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ব।'

—'বাতি জ্বালানোর কী দরকার?'

—'আচ্ছা বেশ, আমিই না-হয় জ্বালিয়ে নেব—দেশলাইটা—'

—'খেয়েছ?'

—'না।'

—'খিদে নেই?'

—'না।'

—'একটু কিছু খেতে হয়'

—'আমার জর্দা ফুরিয়ে গেছে—খানিকটা জর্দা দিতে পার?'

—'জর্দা খাবে শুধু?'

—'জর্দা পেলে দুটো পান খেতে পারি—'

—'জর্দা আমি এনে দেব না তোমাকে—'

—'আজ রাতের মতন জর্দা আমার কাছে আছে। কাল সকালে অমলকে দিয়ে আনাব—'

চলে যাচ্ছিলাম—

—'আমাকে একটু জর্দা কিনে এনে দেবে?'

—'বললে না তোমার কাছে রয়েছে—'

—'কোনো জর্দা নেই।'

—'পয়সা দাও।'

—'পয়সা তো আমার কাছে নেই।'

—'আমার কাছেও তো নেই।'

—'কী করে এনে দেবে তা হলে? জর্দা না-হলে তো চলবে না আমার।' ধীর-ধীরে বিছানার উপর উঠে বসে অঞ্জলি-'সত্যি পয়সা নেই? না বিড়ি কিনবার জন্য লুকিয়ে রেখেছ?'

মাথা নেড়ে—'বিড়ি তো না, চুরুট; তা চুরুটও আমি অনেক দিন হয় ছেড়ে দিয়েছি।'

—'বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে-এম-এ পাস করেছ একযুগ আগে, তবুও একটা পয়সা যদি সম্বল নেই তোমার—মেয়েমানুষকে জীবনে আকাঙ্ক্ষা করতে গিয়েছিল কেন?'

অঞ্জলি—'একটা খাঁচার পাখিকে পুষতে হলেও তো নিঃসম্বল হলে চলে না! অথচ সৃষ্টির সব চেয়ে বড় জিনিস নিয়ে খেলা করলে কপর্দকহীন হয়ে'—নিঃশব্দে বাতাস খেতে-খেতে অঞ্জলি—'পরজন্মে বিশ্বাস আছে?'

—'কী জানি, বলতে পারি না।'

—'আজকের এই পাপে পথের পাশে কুকুরটি হয়ে যদি জন্মাও?'

—'তা বলতে পারি, জন্মালে—'

একটু চুপ থেকে অঞ্জলি—'একটা কথা ভেবে বড় সান্ত্বনা পাই। পরস্পরের কাছে অপরিচিত থেকেই আমরা দু'জনে বিয়ে করেছিলাম। আলাপ-পরিচয়ের মধ্যে প্রেমের ভিতর দিয়ে যদি বিয়ে হত আমাদের তা হলে চার বছর পরে প্রেমের এই হার কখনো দেখে কী ভাবতাম বলো তো দেখি—'

নিজেই উত্তর দিল অঞ্জলি, বললে, 'জীবনের জিনিসকে অবজ্ঞা করতে শিখেছি-কিন্তু তবুও প্রেমের ওপর বিশ্বাস রয়েছে এখনও। যদি কাউকে ভালবেসে জীবনে অনেক গ্রহণ করবার সুযোগ পেতাম, তা হলে দু-পয়সার জর্দার জন্য এ বেচারির পরজন্মের অভিশাপের কথা পাড়তে বাস্তবিক বড্ড কষ্ট বোধ করতাম আমি—'

আমার দিকে তাকিয়ে—'আলোটা জ্বালাও—'

—'দেশলাইটা কোথায়?'

—'দেখো না আমার বালিশের নিচে আছে না কি—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালিশের নিচের থেকে নিজেই কী বের করে দিয়ে—'দেখো তো হ্যারিকেনে তেল ভরা আছে না কি!'

দু-একবার ঝাঁকুনি দিয়ে—'আছে—'

—'কোথায় রাখব?'

—'যেখানে আছে সেখানেই থাক—'

—'উশকে দেব?'

—'না, কমানোই থাক—পানের বাটাটা আমাকে দাও তো—'

দিলাম। একটা পান ছিঁড়তে-ছিঁড়তে অঞ্জলি—'না, মানুষের হৃদয়ের স্নেহ-সহানুভূতির বেদনার বন্ধনও হারাই নি আমি।'

—'দু'টুকরো সুপুরি দাও দেখি'—জাঁতি দিয়ে একটা সুপুরি চার ভাগ করে কেটে, দু'খণ্ড আমার দিকে ছুঁড়ে দিল অঞ্জলি।

বললে—'এই যে তুমি অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখ করে আমার—এ কোনো বানানো দুঃখ নয়; বুঝবার ভুল নয়; খাঁটি জিনিস। তুমি মরে গেলে কপালের সিঁদুর মুছবার নিয়ম আমার, বিধবার থান পরতে হবে—তাতে যত না দুঃখ হবে, তুমি বেঁচে থাকতে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে এক-এক সময় তার চেয়ে ঢের বেশি বিচ্ছেদ ও কষ্ট অনুভব করি আমি—ওটা কী ডাকছে গো?'

—'পেঁচা—'

—'লক্ষ্মী পেঁচা?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোথায়?'

—'বোধ করি জাম গাছটায়।'

জানালার ভিতর দিয়ে একবার তাকিয়ে শুধু—'বেশ সুন্দর জ্যোৎস্না, না?'

—'হ্যাঁ—'

—'আজ সন্ধ্যের সময় বৃষ্টি হয়েছিল বুঝি? তেলাকুচোর জঙ্গল—আম-কাঁঠালের ডালপালা সব কেমন ভিজে-ভিজে না? এই চাবিটা নাও তো?'

—'কেন?'

—'দেরাজের ভেতর আমার জর্দার কৌটোটা আছে—এনে দাও না লক্ষ্মীটি।'

—'দেরাজে চাবি লাগাবার দরকার হল?'

—'বিয়ের সময় জেঠামশায় যে হারটা দিয়েছিলেন সেইটে রয়েছে কি না।'

—'কত দাম হবে? পঞ্চাশ?'

—'কী জানি—হার তো আমি বিক্রি করব না।'

—'আমি যদি করি?'

—'কই কৌটো আনলে?'

—'কৌটোর ভিতর আছে কিছু?'

—'না-থাকবারই তো কথা। জর্দা নেই-নেই করে দু-তিন দিন জর্দা খেতে পারছি না।'

দেরাজ খুলে কৌটো এনে অঞ্জলিকে দিলাম।

খুলতে-খুলতে—'না যদি থাকে কিছু—তা হলে বাবার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে চার পয়সার জর্দা কিনে এনে দিতে পারবে আমাকে?'

—'এত রাতে? বাবা জিজ্ঞেস করবেন, কেন, পয়সা কিসের জন্য?'

—'তাও জিজ্ঞেস করবেন বুঝি?'

—'সত্তর টাকা ত মোটে মাইনে—এত বড় সংসার চালাতে হচ্ছে—'

অঞ্জলি একটু থেমে—'যাক পেয়ে গেছি—এই নাও—এইটেই খুঁজছিলাম।'

একটা দোয়ানি সে আমার হাতে তুলে দিল।

দোয়ানিটা নিকেলের নয়—রুপোর।

—'যাও, তুমি চট করে চার পয়সার কিনে এনে দিয়ে ঘুমোও গে—'

—'আমার অবিশ্যি ঘুমোতে দেরি আছে—'

—'তা হলে ব্রিজ খেলো গিয়ে—'

—'ব্রিজ আমি রোজই খেলি তোমাকে কে বললে? মাসের মধ্যে হয় ত বড়-জোর দু-তিন দিন—'

—'নাঃ—দেরি করো না আর; একটা পান মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ব—'

এক-পা দু-পা করে চলে যাচ্ছিলাম—অঞ্জলি পিছন থেকে ডাক দিয়ে—'শোনো,' ফিরে এসে দাঁড়াতে আমার ঘাড়ের উপর একবার ঝাপসা হাত বুলিয়ে নেবার চেষ্টা করে—'তোমার খাট আবার বাইরের ঘরে গেল?'

—'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কেন, বাবার ঘরের পাশে বেশ তো ছিলে—'

—'সেখানে ইন্দিরা থাকবে।'

—'বিছানা পেতেছ তোমার?'

—'পেতে নেব।'

—'মশারি টানিয়েছ?'

—'টান্যানো যাবে।'

—'দেখো, ভুল করে আবার মশারি না খাটিয়ে শুয়ো না।'

আমি—'এই চৌত্রিশ বছর ধরে মেসে-বোর্ডিঙে থাকা আমাদের অভ্যাস-আমাদের ভুল হয় না।'

অঞ্জলি—'খুকি হবার পর এই আড়াই বছর কেটে গেল। এই আড়াইটা বছর কোন দিন কোথায় শোও, বিছানা কে পাতে না পাতে, তোমার কাপড়-চোপড় জামা-জুতো কোনো কিছুরই খোঁজ খবর রাখতে পারি না আমি—আচ্ছা, দু'আনার জর্দাই এনো—'

—'দু'আনার আনব? বললে না চার পয়সার?'

—'দোয়ানিটা জর্দার জন্যই রেখেছিলাম আমি—'

বলে ধোয়া পানগুলো ছিঁড়তে-ছিঁড়তে অঞ্জলি মাথা হেঁট কবে রইল। জর্দার দোকানে গিয়ে বুঝলাম—দোয়ানিটা তেলা, চলবে না।

তিন-চার দিন পর ঘুরে-ফিরে আবার বায়স্কোপ যাবার কথা উঠল।

অঞ্জলি—'আজ আমি যাবই।'

'সেদিনও তো যেতে চেয়েছিলে।'

—'সেদিন তো জর্দা কিনবার পয়সাও দিতে পার নি তুমি, আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলে-বায়স্কোপ দেখবার পয়সা কোথায় পেতে?'

—'আচ্ছা যেও- নিরঞ্জনকে বলে আমি পাশের জোগাড় করতে পারি।'

—'নিরঞ্জন কে?'

—'এই যে-নিরঞ্জন অরোরা বায়স্কোপ চালাচ্ছে।'

—'তাকে চেনো তুমি?'

মাথা নেড়ে—হ্যাঁ, একসঙ্গে পড়েছিলাম স্কুলে—'

—'তোমাকে পাশ দেবে?'

—'কেন দেবে না?'

—'যদিও-বা দেয়, তুমি চাইবে?'

—'নিজে আমি থিয়েটার বায়স্কোপ বড় একটা দেখি না—দেখার রুচিও নেই, সাধ নেই।'

অঞ্জলি আমাকে বাধা দিয়ে—'থাক, আমি বায়স্কোপ দেখতে চাই না।'

—'কেন?'

—'তুমি নিজে মনে-মনে ভাবো তোমার রুচি আমার চেয়ে ঢের বেশি উঁচু দরের?'

—'তা না; কথাটা তুমি বুঝলে না অঞ্জলি—শোনো, চলে যাচ্ছ কোথায়?' ঘরের ভিতর পায়চারি করতে-করতে অঞ্জলি—'যাচ্ছি না—আমার এক জায়গায় বসে থাকতে ভাল লাগে না।'

খানিকটা ঘুরে এসে আঁচল গুটিয়ে এক কোণে বসল।

বললাম—'আমার জীবনের সঙ্গে কেন তোমার নিজের জীবনের তুলনা করো?'

—'কেন? কী হয়েছে তাতে?'

—'অঘ্রাণ মাসে এক-একটা পরিত্যক্ত পাখির নীড় দেখেছ হিজলগাছের ডাল-পালার ভিতর দিয়ে? কতকগুলো খড়পাতার ছিবড়ে শুধু? আর কিছু না? হেমন্তের কুয়াশা আর শীতবাতাসের অবাধ গতি তার ভিতর দিয়ে?'

অঞ্জলি আবার খাট ছেড়ে উঠে চলে গেল।

মাথা হেঁট করে চুপ করে বসেছিলাম।

খানিকক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখলাম অঞ্জলি টেবিলের আরশির কাছে ভিতরে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে পাথরের মত নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে। অনেকক্ষণ বসে রইল।

তারপর এসে বললে—'কী জানি বলছিলে—তোমার জীবনটা যেন কেমনতর?'

—'নাঃ, কিছু না।'

—'ভাবছিলাম, কপালে একটু সিঁদুর দেব।'

—'তা দিলেই পারো।'

—'দেব-দেব বলেই আরশির সামনে বসেছিলাম।'

একটু চুপ থেকে—'যা বলছিলাম, এই যে বললে পাশ যোগাড় করে আনা যায়; অরোরা বায়স্কোপের সেই নাকি এখন পুরোপুরি মালিক হয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললাম—'সে সহৃদয় হুজুগে মানুষ—হয় ত বক্সের পাশ দিয়ে দেবে।'

—'যেতে হলে গাড়িও লাগবে—'

—'তা লাগবে বই-কি।'

—'গাড়িভাড়ার জোগাড় করতে হয় তা হলে?'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে—'না, আস্তাবলেরও পাশ পাওয়া যাবে?'

একটু হেসে—'গাড়িভাড়ার ব্যবস্থা আমি করব—'

—'কাপড়-চোপড় পরি তা হলে?'

—'পরো—'

—'না সে-বন্ধুর সঙ্গে আগে কথাবার্তা বলে আসবে?'

—'কী দরকার?'

—'শেষ মুহূর্তের জন্য ফেলে রাখবে? তখন যদি পাশের কোনো ব্যবস্থা না থাকে?'

—'তা হলে পয়সা দিয়ে যাব।'

অঞ্জলি একটু হেসে আমার হাত চেপে ধরে—'কেন, টাকা কোথায় পেলে বলো তো—'

—'মার সিঁদুরের কৌটোর থেকে।'

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে অঞ্জলি—'ছি, সিঁদুরের কৌটোর টাকা এ-রকম ভাবে খরচ করবে?'

—'নোয়া—সিঁদর সম্বন্ধে আমারও কোনো অন্ধ ধারণা নেই অঞ্জলি, তোমারও নেই কিছু।'

অঞ্জলি ভুরু কুঁচকে—'অন্ধ ধারণা কাকে বলো তুমি?'

—'না হয় বললাম স্বজনশ্রদ্ধা, আছে কি সিঁদুরের প্রতি তোমার? আমার তো নেই।'

—'তুমি কি মনে করো সিঁদুরকে আমি মনে-মনে উপেক্ষা করি?'

একটু হেসে—'এই তো আধ ঘণ্টা ধরে আরশির পাশে বসে সিঁদুর পরবে ভাবছিলে।'

—'তা ভাবছিলাম বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরা হল না—'

—'হ্যাঁ, সাদা কপালে উঠে এলে—'

—'তোমার অভিমান হয়েছে?'

—'ভাল লেগেছে আমার অঞ্জলি।'

—'ভাল লেগেছে ? কেন?'

—'দেখলাম, আমার মতন তোমারও ফোঁটা-তিলকে বিশ্বাস নেই।'

অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'ছ-সাত দিন ধরে আর সিঁদুর পরা হচ্ছে না আমার। আমার সঙ্গে তুমি যাবে?'

—'অন্য কাউকে যদি পাও তা হলে আমাকে বাদ দিলেই ভাল হয়।'

—'অমল যেতে পারে।'

—'কোন অমল? কেদারবাবু মুন্সেফের ছেলে?'

—'হ্যাঁ, বেচারির বড্ড শখ—কিন্তু ওর বাবা একটা পয়সাও দেয় না।'

—'অমল এখনো আছে এখানে? কলকাতায় যায় নি?'

—'নাঃ, থার্ড এম-বি ফেল করে বেচারার মনে বড্ড কষ্ট—কয়েকদিন পরে কলকাতায় যাবে।'

—'সিনেমা হাউস পর্যন্ত আমি তোমাদের পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে পারি—'

—'কীই-বা দরকার?'

—'না, এই নিরঞ্জনকে বলতাম পাশের জন্য—'

—'থাক, টাকা যখন পেয়েছি তখন পাশের জন্য মিছিমিছি বলতে যাবে কেন আর?'

—'তাও তো বটে—'

—'নিরঞ্জন মনে করবে তাকে সুবিধায় পেয়ে তুমি আদায় করে নিচ্ছ—'

—'থাক; পাশ নিয়ে আর দকরার নেই—'

—'পাশ নিয়ে গেলে অমলের কাছে তো মুখ থাকে না—'

—'ঠিক কথাই তো।'

—'একটা টাকাই দাও গাড়িভাড়া আসতে-যেতে আট-আনা-অমল আর আমার টিকিট আট আনা-আট আনা এক টাকা। ফার্স্ট ক্লাস, এই দশ দিন, আট আনায় পাওয়া যাবে।'

—'তাই না কি? কে তোমাকে বললে?'

—'অমল বলেছে। দেড় টাকা খরচ হবে তোমার—'

পোশাক-আশাক পরে বেরুল অঞ্জলি, বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। সিঁদুরহীন চওড়া কপালে রূপসী বিধবার মত। কিংবা কুমারীর মত হয় তো।

সন্ধ্যার অন্ধকারে একা ঘুরতে-ঘুরতে বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম। ঘরে ফিরে এসে দেখলাম রাজেন এসে বসে রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কী, সব কী খবর?'

—'ব্রিজ খেলতে আপনি আর যান না কেন?'

—'আর কাহাতক খেলা যায়, অনেক খেলেছি—'

—'সে কী কথা, এ খেলায় আবার ঘেন্না ধরে যায় বলে শুনি নি তো—'

—'না, ঘেন্না আমি করি না; ব্রিজ একটা চমৎকার খেলা, সুন্দর শিল্প সারাটা জীবন এতে উৎসর্গ করলেও সমুদ্রের পারে পাথর মাত্র কুড়ুচ্ছি ভেবে মনে আক্ষেপ থেকে যায়, রাবার করবার সময় মনে হয় স্যার রোল্যান্ড রস-এর চেয়েও বড় একটা কিছু করলাম—'

রাজেন—'চলুন আজ যাই।'

—'না—না—'

—'বাঃ, আপনার এমন খেলবার চমৎকার কায়দা-আপনাকে আমরা বড্ড মিস করি।'

—'তুমি খেলতে চলেছ বুঝি?'

—'হ্যাঁ, যাচ্ছি; আপনি চলুন না?'

—'না।'

—'ভেবেছিলাম কিন্তু আপনি যাবেন।'

বলে রাজেন বসল আবার।

জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে—'যা বৃষ্টি আসছে—। চুরুট খাবেন?'

—'দাও।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে—'বৌদি কোথায়?'

—'বায়স্কোপ দেখতে গেছে।'

—'এই ঝড়—ঝটকার মধ্যে গেল?'

—'যখন গিয়েছে, তখন আকাশ পরিষ্কার ছিল।'

—'গিয়েছে, ভালই করেছে; আমিও মাঝে-মাঝে আমার বউকে নিয়ে যাই—ঘণ্টা দু-তিন বেশ রঙে কেটে যায়।'

চুরুটে এক টান দিয়ে রাজেন—'আপনার আর-ছেলেপিলে হয় নি?'

—'না।'

—'সেই একটি মেয়ে, না?'

—'হ্যাঁ

—'মেয়েটি কত বড় হল?'

—'আড়াই বছর।'

—'আপনাদের বিয়ে হয়েছে ক-বছর?'

—'বছর চারেক—'

—'আমাদের বিয়ে হল পাঁচ বছর, কিন্তু ছেলেপিলে নেই—ভাববেন হয় তো সে বাঁজা কিংবা আমি কুলধ্বজ। তা নয়।'

—'নয়?'

রাজেন মাথা নাড়ে—'না?'

—'তবে কী রাজেন?'

—'বৌয়ের সম্মতি নেই—'

—'কী রকম?'

—'সে ছেলেপিলে চায় না।'

—'এ-রকম মারী স্টোপসের মত মেয়ে বিয়ে করলে?'

—'বাঃ। চুরুটটা গেল নিভে, আপনি যে জ্বালালেনই না—'

—'জ্বালাব।'

—'বাস্তবিক, কোনোদিনও সন্তান হবে না-এ বড় বিশ্রী। যখনই গিয়ে বলি হৃদয়েই গিয়ে লাগে বেশি?'

—'কিন্তু বন্ধ্যাত্ব মায়ের হৃদয়কেই বেশি আঘাত দেয়।'

—'মা বলছেন কাকে?'

—'তোমার স্ত্রীকে।'

—'সে মা হল কোন হিশেবে?'

—'সব নারীরই মায়ের মত হৃদয় নেই! কী বলো রাজেন?' রাজেন খানিকক্ষণ নীরবে চুরুট টানল।

বললে—'এখন আমার বয়েস ত্রিশ, এখন যদি একটি ছেলে হত, তা হলে পঞ্চান্ন বছরে আমি চাকরি ইস্তফা দিয়ে দু-পা ছড়িয়ে বসতাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ওঃ, সেই জন্য ছেলে চাও বুঝি তুমি?'

—'কে না চায় বলুন; সেই ছেলে—বুড়ো বয়সে বাপকে খাওয়াবে—সেই জন্যই তো বিয়ে করা।'

—'সেই জন্যই কি শুধু বিয়ে করা, রাজেন? তা বেশতো। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে পটাতে পারলে না বুঝি?'

—'না। থাক গে। রিটায়ারমেন্টে পেনশন পাব।'

—'তোমার স্ত্রী কী বলে?'

রাজেন নিস্তব্ধভাবে চুরুট টানতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে—'স্ত্রীকে তো আমি পরিত্যাগ করতে পারি।'

—'তা পারো বটে।'

—'হিন্দু সমাজে আর-এক বিয়ে করলে তো পারি। কিন্তু কিছুই করলাম না আমি। জীবন বিধাতার বিরুদ্ধে যারা লড়াই করতে পারে, তাকে চক্রান্ত করে সাজা দিতে পারে, তাদের জাত আলাদা। আমি শুধু মনুষ্যত্ব, চরিত্র, দাক্ষিণ্য, শুভবুদ্ধির পুরস্কার মাথায় নিয়ে ফিরছি।'

—'এই পুরস্কারগুলো তো ধুলোর মতন—কী বলো রাজেন?'

—'অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদি তাই।'

—'কেন?'

—'কী পেলাম জীবনে?'

—'তুমি অবিশ্যি কম পাও নি রাজেন, এক শ টাকার চাকরি—'

বাধা দিয়ে রাজেন—'ঘরের ভিতর যার অন্তঃসারশূন্য, চাকরি দিয়ে সে কী করবে?'

—'বৌমা তোমাকে ভালবাসে না?'

—'খুব।'

—'কোনো রোগ-শোক নেই তো?'

-'কার? বৌয়ের?'

—'হ্যাঁ।'

—'না, বেশ সুস্থ শরীর; মনে কোনো বিরসতা নেই।'

—'বুদ্ধি-বিচার আছে?'

—'খুব।'

—'শুধু সন্তানবহন করতে চায় না—এই এক অভাব বুঝি?'

—'কিন্তু একজন পুরুষের জীবন এতেই কি পণ্ড হয়ে যায় না?' চুরুট জ্বালিয়ে মানুষের হৃদয়ের তৃষ্ণার কথা ভাবছিলাম—আমিও মাঝে-মাঝে তৃষ্ণা অনুভব করি; তৃষ্ণা জাগে—নারী যে তৃষ্ণাহীন সে কথা বুঝতে পেরে বিস্মিত হই, আঘাত পাই, বিস্মিত হই।

তারপর ধীরে-ধীরে জীবনের অনুকরণ নামে ভয়াবহ দীর্ঘ নদীর পার ঘেঁসে ঘুমিয়ে পড়ি; জ্বলতে হয়—জ্বলে যেতে হয়। কোনো জিনিস নিয়ে চিন্তিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকলে কী করে চলে মানুষের জীবনে?

রাজেন—'ভালবাসা হয়েছিল শাজাহানের'

—'কী রকম?'

—'মমতাজ তাকে ষোলটি সন্তান দিয়েছিল—'

রাজেন এ রকম কথা অনেকক্ষণ ধরে ভাবে হয় তো।'

বললাম—'টলস্টয়-এর অনেক সন্তান ছিল—'

—'তা ছিল বই কি।'

—'কিন্তু তাদের দাম্পত্যজীবন বিশেষ সুখের ছিল না তো।'

—'এনিম্যাল লাইফ তো চমৎকার ছিল।'

নীরব ছিলাম।

রাজেন—'তবে আর চাই কী? মানুষের জীবন একটা গাছের মত হবে না শচীনদা? একটা মস্ত বড় জাম বা বটগাছের মত, যত ইচ্ছে তত ফল ফলিয়ে, আকাশে—বাতাসে ডালপালা বিস্তার করে, দিনরাত পরিতৃপ্তি ও প্রকাশ চলবে না তার?'

—'তুমি না দু-বছর আগে ওয়ালটেয়ার গিয়েছিলে রাজেন?'

—'হ্যাঁ'

—'কিসের জন্য?'

—'থাইসিস হয়েছিল'—

—'বটগাছের মতন জীবন তুমি চালাবে?'

—'না-হয় পেয়ারাগাছের মতই চালাতে দিন না বিধাতা। এ যে একেবারে কাঠফাটা দুপুরে ফোঁপরা বাঁশের মত করে রেখেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুরুট টান দিলাম

রাজেন—'এ স্ত্রীকে দিয়ে আমার কিছু হবে না।'

—'এ-রকম স্ত্রী তো তোমার একার না।'

—'আমার জীবনের সবচেয়ে গভীর মুহূর্তে সে আমাকে বাধা দেয়।'

—'গভীর মুহূর্ত তুমি কাকে বলো রাজেন?'

—'আপনি প্রেমিক মানুষ হয়ে তা বোঝেন না? শাজাহান তো কতবার বুঝেছিলেন।'

—'তাজ পরিকল্পনার মুহূর্তই তো তার সবচেয়ে গভীর মুহূর্ত ছিল।'

—'এটা বাজে ইয়ার্কি হল আপনার।'

—'তাই না কি?'

চুরুটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আগুন নিভে গেছে।

রাজেন—'যে-কটি বছর ধরে তার ষোলটি সন্তান জন্মাল, গভীরতা ও বিহ্বলতায় সে কয় বছরের তুলনা হয় না আর।'

রাজেন এই রকম স্থূল?

কিন্তু তবুও সে বটগাছের কথা বলেছে। শাখাপ্রশাখাবহুল আম ও বটের সবুজে-সবুজে ও ডালপালার উচ্ছ্বাসের কথা ভাবতে ভাল লাগে না। তার-গরমে বৃষ্টির অবিশ্বাস্য ফোঁটা ভাল লাগে হয় তো—সুস্থ নরম মাটির ভিতর থেকে যে নিরবচ্ছিন্ন সোঁদাগন্ধ বেরোয়, নিশ্চয়ই ভাল লাগবে রাজেনের-অফুরন্ত সবুজ ঘাস, অবাধগামিনী পদ্মা ও কর্ণফুলীর গভীর জঘন ও জঙ্ঘা অন্ধকারে ও জ্যোৎস্নায় শ্রাবণের রাতে উচ্ছ্বসিত কলরব; জীবনের উদ্দাম বীজ সঞ্চারণের পালা তাদের—এই রকম ভাল লাগে রাজেনের-চারদিককার নদী-সমুদ্র-অরণ্যের প্রাণধারণের আনন্দ ও প্রাণ জননের প্রসারণের তীব্রতা। জীবনের গভীরতা বলতে এই-ই সে বোঝে—

আমিও কতদিন এই রকম বুঝতাম—তারপর বেদনা ও নিষ্ফলতার পথে চলতে-চলতে হৃদয় ভিন্ন মোড় নিল। শীতের রাতে আমহার্স্ট স্ট্রিটে কুকুর ও ঐ ফুটপাতের ভিতর একজন দাড়িঅলা নিষ্পেষিত খিভারির জীর্ণশীর্ণ মুখ কেমন যেন নিবিড় হয়ে বুকের ভিতর এসে লাগে।

গ্রে স্ট্রিটে অন্ধকারের ভিতর সারি-সারি যে রূপহীনা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখে কেমন একটা খোঁচা একেবারে এড়িয়ে যেতে পারি না। কলেজ স্ট্রিটে হাঁটতে-হাঁটতে দেখি ফুটপাতে ন্যাকড়া জড়ানো পায়ে পা ছড়িয়ে কুষ্ঠ রোগীরা বসে আছে সব। নুলো হাত তুলে অবিশ্রাম সেলাম ঠুকছে, রাস্তার থেকে এদের তাড়িয়ে দেবার জন্য খবরের কাগজে অবিরাম লেখালেখি চলছে। আমার ইচ্ছা করে এদের গুলি করে রাস্তা সাফ করে ফেলি-জীবনের এই সব বীভৎসতা, বিকৃতি ও পরাজয়ের মুখোমুখি এসব হৃদয় কোনো পথ খুঁজে পায় না, মেসের শূন্য ঘরে ফিরে এসে অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে থেকে কোনো বিধাতাকে খুঁজে পাই না। আন্তরিকভাবে আত্মদান করে কোনো প্রার্থনা করতে পারি না। দাঁত ব্যথা করে। একটা রেস্টুরেন্ট থেকে মাংস রান্নার গন্ধ ভেসে আসে, রেডিওর দোকানে মজলিশি পান অক্লান্তভাবে ঝঙ্কার দিয়ে চলে, একটা চুরুট মুখে দিতে গিয়ে দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে।

—মাড়ি ও দাঁতই জীবনের সবচেয়ে কৃতী জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। গবর্মেন্টের ডিপার্টমেন্টে একশ টাকার চাকরি করে রাজেন এ সবের কিছু বুঝবে না। তবুও বললাম-'আমি ঈশোপনিষৎখানা এনে তোমাকে দেখাচ্ছি রাজেন।'

—'কী দেখাবেন?'

—'কয়েকটা শ্লোক পড়ব তোমার কাছে—'

—'হেঃ হেঃ বিশ্বাস করেন আপনি?'

—'মাঝে-মাঝে নিজের মনে অন্ধকারের ভিতর ঝঙ্কার দিয়ে পড়তে গেলে খুব তৃপ্তি পাওয়া যায়।'

চুরুটটা জ্বালাতে-জ্বালাতে—'অবিশ্যি সে তৃপ্তি খুব ক্ষণিক রাজেন-অধিকাংশ সময়ই মনটা গুহার মত অন্ধকারের ভিতর হাঁ করে থাকে।'

রাজেন পকেটের থেকে একটা চুরুট বের করে-'আপনাকে দেখে বড্ড দুঃখ করে আমার।'

—'কেন?'

—'বাস্তবিক চাকরি-বাকরি পাচ্ছেন না; একটা পয়সা নিজের বলে নাড়বার-চাড়বার স্বাধীনতা নেই। বয়স হল ত্রিশ। অথচ আপনি আমাদের চেয়ে কত মেধাবী ছিলেন।'

চুরুট জ্বালাল সে।

বললে—'সেই বাইশ বছর বয়স যদি থাকত তা হলে কম্পিটিটিভ একজাম দিতেন না?'

—'তা দিতাম বলে তো অবিশ্যি মনে হয় রাজেন।'

—'কিন্তু বয়স যখন ছিল তখন দিলেন না কেন?'

—'কেউ-কেউ দেয়, কেউ-কেউ দেয় না-সকলের জীবনের পথ তো এক রকম নয় রাজেন।'

—'আমি তো খোঁজাখুঁজি করে কেরানিগিরি পেলাম-আপনারা নিজের শক্তিতে কত হাকিমি নবাবি পেতে পারতেন। কিন্তু এখন হয় তো আমাকেও ঈর্ষা করেন?'

চুরুটে একটা টান দিল সে, বললে—'দেখুন না আপনার চেহারার দিকেই তাকিয়ে-আরশিতে মাঝে-মাঝে দেখেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা নেড়ে—'দেখি বই কি—'

—'কেমন হাড়হাভাতের মতন চেহারা হয়ে গেছে আপনার।'

হাসতে-হাসতে—'সমীহ করে কথা বলতে হয় রাজেন, স্কুলে যে তোমাকে দু-চার দিন পড়িয়েছিলাম তাও ভুলে গেলে!'

—'চোয়াল বেরিয়ে গেছে-চোক গেছে আড়াই হাত ডেবে, কয়েকদিন পরে লোকে যদি বলে কোন্ ঢেঁকির চাল খেয়ে এ ঘাটের মড়ার রূপ হচ্ছে তোমার, তা হলে কী বলবেন?'

—'রূপ যা-খুশি তাই হোক রাজেন-ফুসফুস তো এখনও যক্ষ্মা প্রচার করে নি।'

—'করে নি বুঝি?'

—'কই না তো—'

—'সারাদিনের মধ্যে টেম্পারেচার একবারও রাইজ করে না?'

—'বুঝি না তো।'

—'যক্ষ্মা রুগীদের আত্মতৃপ্তি বড় মারাত্মক-ভাবে যে তারা সবচেয়ে নীরোগ।'

—'না, যক্ষ্মা আমার হয় নি।'

—'হতেই বা কতক্ষণ? বার মাস স্ত্রীকে কাছে রাখেন-আপনার শরীরের এ-অবস্থায় এটা ভাল নয়।'

—'ভাল নয়?'

—'বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন।'

—'বাপ নেই যে বেচারির, বাপ-মা ভাই-বোন কিছু নেই; একজন কাকা আছেন।'

—'তা হলে সেখানে যেতে চায় না।'

—'সেখানে যেতে চায় না।'

—'তা হলে আপনিই না হয় সরে পড়ুন।'

—'না, স্ত্রীকে আমি অত ভয় পাচ্ছি না রাজেন।'

—'কী রকম!'

—'সে সারাদিনই নিজের ঘরে দোর দিয়ে থাকে—'

—'কেন?'

আমি থেমে—'পড়ে। জীবনের প্রবঞ্চনার কথা ভাবে; দাম্পত্যকে অন্যায্য ভেবে দূরে সরে থাকে। একটি মেয়ে হয়েছিল। আর-কিছু হবে না আমাদের।'

রাজেন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে-'আচ্ছা উঠি তা হলে—'

—'উঠতে পারো—'

—'আপনার সামনের দাঁতটা পড়ে গেল কি করে?'

—'অনেক দিন থেকেই-দাঁত ব্যথা।'

—'কী দিয়ে দাঁত মাজেন?'

—'উনুনের ছাই দিয়ে।'

—'আপনার উচিত একটা পপলাইলার টুথ ব্রাশ কেনা—'

—'দাম কত?'

—'কলকাতায় চৌদ্দ আনা হবে। এখানে এক টাকা পাঁচ সিকা-আর ফরহান্সের টুথপেস্ট কিনবেন-জোনাটইন বা লিস্টারাইন দিয়ে মুখ ধোবেন।'

রাজেন অবিশ্যি জানে এ সব ব্যবহার করবার কোনো সঙ্গতি নেই আমার। হয় তো একটা ঠাট্টা করল।

চুরুট টানছিলাম।

দেখলাম পকেটের থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করেছে।

বললে—'স্কুলে যখন পড়তাম তখন দু'চার দিন পড়িয়েছিলেন-তার গুরু দক্ষিণা নিন।'

—'তা তো হেডমাস্টার দিয়েছেন রাজেন।'

—'শুনেছি, হেডমাস্টার কিছু দেন নি।'

—'কে বললে তোমাকে?'

—'কলেজের ভাল ছেলেদের বিনে পয়সায় খাটিয়ে নেবার বদভ্যাস ছিল তাঁর।'

খানিকটা সময় কেটে গেল।

আমি—'রাজেন একদিন যখন তোমাদের কাছে ভিক্ষে চাইব তখন কিছু দেবে না জানি; কিন্তু আজও যখন ভিখিরি সাজি নি তখন মিছিমিছি আমাকে দিচ্ছ কেন?'

—'আচ্ছা নোটটা তা হলে আপনার বালিশের নিচেই থাক—যাবার সময় নিয়ে যাব—আর একটা চুরুট নিন বরং, মুখে যেটা সেটার তো বাপান্ত হয়ে গেছে—'

চুরুটটা আমার মুখের থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাজেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললে—'এইটে জ্বালান এবার।'

—'এগুলো কোথাকার চুরুট রাজেন!'

—'অবশ্য বার্মিজ নয়; এগুলো এসেছে জাভা থেকে।'

—'বাঃ দিব্যি তো।'

—'জ্বালিয়ে নিন।'

—'না, এটা এখন খাব না।'

—'খাবার পর খাবেন? বেশ, সে খুব ভাল কথা।'

আরো দু-চারটা চুরুট আমার বিছানায় গড়িয়ে দিয়ে—'নিন। কলকাতায় গিয়ে মেসে উঠবেন তো?'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—'একেই বলে ভবিতব্য।'

—'চশমা নেব-নেব করছি।'

—'থাক, আপনার জীবনের নিষ্ফলতা-বেদনার ঢের আলোচনা করা গেল; এখন আমার কথাটা শুনুন।'

—'বলো।'

—'আপনাদের খিড়কির পুকুরের ওপারে মাধব ভট্চাজকে চেনেন?'

—'চিনি বইকি—'

—'তার মেজ মেয়েটিকে দেখেছেন?'

—'কোনটি বল তো?'

—'বছর ষোল বয়স হবে; ছিপছিপে একহারা গড়ন-বেশ ফর্শা চেহারা।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি বই কি, বেশ সুন্দর মেয়েটি—'

—'অসামান্য সুন্দরী-রুক্মিনী নাম—'

রাজেন চুরুটে বড় টান দিয়ে—'এই মেয়েটিকে নিয়ে সাধছে আমাকে—'

—'মাধববাবু?'

—'হ্যাঁ'

—'তারপর?'

—'তারপর আমার সচ্চরিত্র হৃদয়, আমার বিবেক, এটা যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, সারারাত রুক্মিনীর স্বপ্ন দেখি আমি। তারপর সকালবেলা অনেক দেরি করে জেড়ে উঠে দেখি বৌ ধোপার কাছ থেকে কাপড় বুঝে নিচ্ছে-নিজের সুন্দর ধোপদুরস্ত শাড়ি কটির দিকে তাকিয়ে চোখ তার প্রসন্ন পরিতৃপ্ত। অন্য একটি নারীকে এনে এই সুন্দর শান্তিকে নষ্ট করে ফেলতে ইচ্ছে করে না।'

বালিশের নিচে হাত গলিয়ে পাঁচ টাকার নোটটা নিয়ে চলে গেল রাজেন। রাজেন চলে যাবার পর চুপচাপ বসেছিলাম-বাবার ঘর থেকে আস্তে-আস্তে অভয় দত্ত এসে ঢুকল।

নমস্কার তুলে—'ওহো, আপনি কখন এসেছেন?'

একটা চেয়ার টেনে বসে অভয়—'প্রায় আধ-ঘণ্টাটাক।'

—'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?'

—'আপনার বাবার ঘরে বসেছিলাম।'

—'বাবা আছেন?'

—'না—'

—'কোথায় গিয়েছেন তা হলে?'

—'খেতে গিয়েছেন হয় তো-আপনার কাছে কে-এক ছোকরা বসে ডাঁট মারছিল।'

—'ও-রাজেন—'

—'ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন?'

—'হ্যাঁ-সে প্রায় পাঁচ বছর।'

—'ছেলেপিলে হয় নি বুঝি?'

—'না—'

—'কেন হয় নি?'

একটু হেসে—'রাজেন বলে তার বৌ-এর সম্মতি নেই।'

অভয় নাক কুঁচকে—'এই রকম সব জায়গায় বলে বেড়ায় বুঝি?'

—'কী জানি—'

—'এ-রকম এক দল লোক আছে। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করলেন ওর কথা?' চুপ করে ছিলাম—

—'এ কখনও সম্ভবপর কথা? কেউ কোনোদিন শুনেছে এ-রকম? যে লোকটা এক ঘণ্টায় এতগুলো চুরুট টানতে পারে, ব্রিজ খেলবার নেশা যার এত, সে পাঁচ বছর ব্রহ্মচারী হয়ে রয়েছে—'

—'থাক-এ-সব দিয়ে আর কী হবে আমাদের।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আসল কথা কি জানেন? এর স্ত্রীটি বন্ধ্যা।'

—'তা হবে হয় তো—'

—'কিংবা ইনি নিজেই অক্ষম অকৃতী পুরুষ-ইংরেজিতে যাকে বলে—'

—'আপনাদের স্কুল কেমন চলছে?'

—'আর স্কুল! সত্তর টাকা করে খাতায় লিখিয়ে নিচ্ছে, দিচ্ছে পঁয়তাল্লিশ—'

—'তাই না কি?'

—'একটা ফার্স্টক্লাস বি-টি ডিগ্রি মেরে এলাম-তার পরেই এই—'

—'কোনো গবর্নমেন্ট স্কুলে ঢুকতে পারেন না?'

—'বয়স নেই—'

—'কেন, পঁইত্রিশ বছর বয়স অব্দি তো নেয়—'

—'আমার সাঁইত্রিশ, সংসারে কোনো চাচা সঙ্গে করে আনি নি,....শুনেছি গবর্নমেন্ট স্কুলগুলো ডিপ্রোইজেশন করবে। একটা এইডেড স্কুলে হেডমাস্টারি পেলে বর্তে যাই—'

—'আমার মনে হয় একটা বি-টি ডিগ্রি যোগাড় করে আনতে পারি যদি—'

—'কিচ্ছু লাভ নেই, এই দেখুন না, আমি ফার্স্ট ডিভিশান ট্রেনিং ডিগ্রি নিয়ে বসে আছি—'

—'বি-এল পাস করলে কেমন হয়?'

—'ওকালতি করবেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে সম্বন্ধে আমরা মতামত দিতে পারছি না—'

একটু হাই তুলে অভয়-'তবে অনেক উকিল আমাদের স্কুলে মাস্টারির জন্য দরখাস্ত করছে—'

—'এম-এ, বি-এল সব?—'

—'ফার্স্টক্লাস এম-এ, ফার্স্টক্লাস বি-এল,'

—'মুন্সেফ তো হতে পারত—'

—'প্রভিনসিয়াল গভর্নমেন্টের সিনিয়ার করে দিলেই বা মারে কে? খুব গুড বয় হয়ে রাজ্যি চালাতে পারত।'

—'বিছানার ওপর আপনার এই চুরুটগুলোর চেহারা তো বেশ ভালো বোধ হচ্ছে—'অভয় দত্ত বললে।

—হ্যাঁ জাভার চুরুট।'

—'কোথায় পেলেন?'

—'রাজেন রেখে গেছে।'

—'একটা নেওয়া যায়?'

—'খুব—'

—'চুরুট সিগারেট আমি বড় একটা খাই নে শচীনবাবু, স্কুলের মাস্টার-চরিত্রটি হাতে করে নিয়ে বেড়াতে হয়; পৃথিবীর সব ভাল জিনিসই মাস্টার মশায়ের খ্যামা -ঘেন্নার জিনিস—'

চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে অভয়—'বাঃ বেশ! বেশ জিনিস। দেখুন, স্কুল মাস্টারি আমার একদম ভাল লাগে না—'

—'লাগে ন!'

—'না। এর চেয়ে দারোগা হলেও ভাল হত। মানুষের জীবনের স্বাভাবিকতা সহজ আনন্দ-উৎসব যদি কোথাও নষ্ট হয়, বিকৃত হয় তা-আপনার স্কুল আর কলেজ-এর ক্লাস রুমে।'

—'কী রকম?'

—'ক্লাস রুম এই কি শুধু—মাস্টার সেখানেই থাকুক না কেন তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ছেলেদের। সেক্রেটারি, হেডমাস্টার ও স্টাফের মেম্বারদের অদৃশ্য চোখের সামনে একটা অগ্নি-পরীক্ষা।'

চুপ করে ছিলাম।

অভয়—'সাধারণ মানুষের সহজ জীবন চালাবার উপায় তার নেই-সে যেন মঠে প্রবেশ করেছে। কিংবা মাস্টারিতে সেখান থেকে পৃথিবীর নরনারীর দ্বিধাহীন বৈধ জীবনকে অবৈধ মনে করতে হবে তাকে—চারদিককার অন্যের উজ্জ্বল জীবন—স্রোতের দিকে বিরস বিকৃত চোখ নিয়ে তাকাতে হবে-অরুচি অক্ষমা অপ্রেম এ-সব তার দেবতা—এই যে আমি চুরুট খাচ্ছি এতেও আমার ভয়—'

—'কেন?'

—'যদি কোনো ছেলে দেখে ফেলে—'

—'এই রাতে এই বাদলার ভিতর কোনো ছেলের এখানে আসবার সম্ভাবনা নেই—'

—'বলতে পারা যায় না—এই তো রাস্তার দিকে দুটো জানলা উদাস খোলা রয়েছে-রাস্তার কেউ আধ মিনিট দাঁড়ায় যদি—'

—'কেই-বা দাঁড়াবে—'

—'ছেলেরা অত্যন্ত ভয়াবহ জিনিস। চেনেন না আপনি। যদি কাল হেডমাস্টার আমাকে ডেকে বলেন, কাল রাতে তুমি মজলিসে বসে চুরুট খেয়েছিলে কেন? আমি একটুও আশ্চর্য হব না; বুঝব বিধাতা যা দেখেন না, ছেলেরা তা দেখতে পায়—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এই রকম অবস্থা বুঝি?'

অভয় দত্ত মুখ বিকৃত করে বললে—'অখাদ্য!'

—'আপনি চুরুট খেয়েছেন হেডমাস্টারের কাছে সে কথা বলে তাদের কী লাভ?'

—'তারা নিজেদের চরিত্তির জাহির করে—'

—'আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আছে তাদের—?'

—'আমি তাদের মাস্টার এই তো সবচেয়ে বড় অভিযোগ।'

—'বিশ্বাসের জোর আছে তাহলে তাদের?'

—'অন্তত মাস্টারের সম্পর্কে সেটা ব্যবহার করার দরকার বোধ করে তারা—'

কথা বলতে—বলতে চুরুট নিভে গিয়েছিল অভয়ের, সন্তর্পণে জ্বালিয়ে নিয়ে—'সামাজিক ধর্ম ও নীতিতে অচলা বিশ্বাস না নিয়ে কেউ যেন মাস্টারিতে না ঢোকে।'

একটু চুপ থেকে-'জীবনের কোনো সুন্দর প্রয়াসকে শ্রদ্ধা ক'রবার উপায় নেই।'

—'তাই তো দেখছি।'

—'বোদলেয়ারের কবিতা কতকগুলো জায়গা ভাল লেগেছিল আমার। কিন্তু হেডমাস্টার বা স্টাফ-এর কাউকে বললে আর রক্ষে নেই।'

—'বোদলেয়ার, পড়েন?'

—'আছে একখানা—'কিন্তু মাস্টাররা কেউ জানেন না।'

—'জানলেই বা কী এসে যাবে অভয়? বোদলেয়ার হাতি না ঘোড়া বুঝবে কি কিছু?'

—'একেবারে যে না-বুঝবে তা নয়; একটা অপরিচিত বই বা অপরিচিত নামে ঢের সন্দেহ জাগে তাদের।'

—'ভাবে হয় তো সেক্স সম্বন্ধে কিছু?'

—'সেক্স সম্বন্ধে বই-কিংবা ফরাসি উপন্যাস-কিংবা আধুনিক ইংরেজি উপন্যাস পর্যন্ত-ধরুন লরেন্স কিংবা জয়েস-এর বই, অনেক রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দরজা আটকে সাবধান হয়ে পড়তে হয়-তখন এক-আধটা চুরুটও খুব ভয়ে-ভয়ে টানি-তারপর ঘুমোবার আগে সমস্ত ছাই, দেশলাই কাঠি, ঝেড়ে সাফ করে, চুরুটের টুকরা কলাবাগানের দিকে বুনো ওলের ঝোপের দিকে ফেলে দিয়ে, বইগুলো বাক্সে তালা মেরে এঁটে, তবে এসে বিছানায় শুই। বলুন ও জীবন কী খুব কাম্য?'

অভয়—'চুরুট কিনি কি করে জানেন?'

—'কী করে?'

—'নিজে গিয়ে কোনো দোকান থেকে কিনতে ভরসা পাই না।'

—'তবে?'

—'কাউকে দিয়ে কেনাব সে ভরসা নেই— হয় তো গল্প করে বেড়াবে। শনিবার দিন স্কুল ভাঙবার পর ট্রেনে চড়ি তাই- প্রায় ষাট মাইল দূরে গিয়ে তবে চুরুট কিনে আনি। চুরুট, নস্যি, সিগারেট, প্রাণ ভরে পান খাই, জ্যোৎস্নায় নদীর পারে বেড়াই। স্কুলে নেই, দপ্তরি নেই, ছেলেরা নেই, হেডমাস্টার নেই, স্টাফ নেই, গুপ্তচর নেই। সামনে যতদূর চোখ যায় মাঠ আর নদী, ধানের ক্ষেত, বুনো ঝাউ-এর ভিড়ে- ভিড়ে জ্যোৎস্না-এমন অপরূপ লাগে আমার—'

—'যাক, তবু পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে আপনার সম্বল ছিল—'

—'হ্যাঁ, এইটুকু আছে।'

—'আর বিয়েও আপনি করেন নি।'

অভয়—'চুপ করে রইলেন।

—'করবেন না?'

কোনো উত্তর দিলেন না তিনি।'

বেচারির হৃদয়ের আর-এক জায়গায় হয় তো আঘাত দিয়েছি।

বৃষ্টি আরো সর্বগ্রাসী হয়ে উঠল।

অভয়—'রাত কটা বাজে?'

—নটা আন্দাজ।'

—'বেশি রাতেও বাড়ি ফিরতে ভয় পাই।'

-'কেন?'

—'আমার বাসার পাশেই একজন মাস্টার থাকেন; একটু রাতে ফিরলেই তিনি কৈফিয়ত নিতে আসেন।'

—'কেন, কী দরকার তাঁর?'

—'নিজে তিনি স্কুল থেকে এসেই শুয়ে পড়েন। রাত নটার সময় স্ত্রীকে খালাস করে দিয়ে হাতে আর কোনো কাজ খুঁজে পান না-কাজেই এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরে বেড়ান।'

—'এই কি প্রথম পক্ষ?'

—'যোগেশদার? হ্যাঁ, নটা পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে শুয়ে থাকেন ওটা তাঁর অভ্যাস। বার্ধক্যের দোষ নয়। বয়স বেশি নয় তো—উনত্রিশ।'

—'তা হলে সময় আছে।'

—'খুব—'

—'তবে এ-সব লোক তৃতীয় পক্ষের মুনাফা পাওয়া পর্যন্ত বাঁচবে কি না সন্দেহ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না, চেলাকাঠের মত বেশ শক্ত শরীর—। বাঁচবে।'

—'ছেলেপিলে কটি হয়েছে এ পর্যন্ত?'

—'হচ্ছে, মরে যাচ্ছে—গুণবার অবকাশ পাই না। একবার যমজও হয়েছিল—'

—'বেঁচে আছে?'

—'না!'

—'তবুও রক্ষা, না হলে এত ছেলেপিলে নিয়ে কী করতো বেচারা?'

—'লাইন করে তিন-চারটি এখনও মাস্টার বাঁচিয়ে রেখেছেন।'

—'যোগেশবাবুর মাইনে কত?'

—'ত্রিশ টাকা। ঘরের সামনে লাউ, কুমড়ো, বেগুন, মরিচের ক্ষেত আছে—সকালবেলা একটা টুইশন করেন—'

দু'জনেই চুপচাপ বসে ছিলাম।'

অভয়—'এখানে কিছু দিন আগে একটা থিয়েটার এসেছিল জানেন?'

—'হ্যাঁ। কলকাতার থেকে। শুনেছি কয়েকজন আর্টিস্ট এসেছিলেন—যোগেশদা আর আরো আট-দশ জন মাস্টার দিনরাত সত্যাগ্রহ করে সেই থিয়েটারের সিটের সামনে চিৎ হয়ে পড়ে থাকতেন—'

—'তাই না কি?'

—'কাজেই সেই কলকাতার দলটাকে ফিরে যেতে হল—'

একটু চুপ থেকে অভয়—'আমাকেও শোবার জন্য সেধেছিলেন।'

—'তার পর?'

—'হেডমাস্টারও বলেছিলেন গিয়ে শুয়ে থাকতে।'

—'আপনিও শুয়েছিলেন?'

—'না, থিয়েটার পার্টি আমাকে ভারি সুন্দর নিস্তার দিলেন।'

—'কী রকম?'

—'যে-দিন সকাল থেকে আমার শোবার কথা, শুনলাম তার আগের দিন রাত্তিরেই নট-নটীরা চলে গেছে।'

খানিকটা চুপচাপ।

অভয়—'বছর তিনেক আগে কলকাতায় একবার গিয়েছিলাম থিয়েটার দেখবার জন্যই।'

—'তার পর?'

—'কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে সঙ্গে দু-জন মাস্টারও গেলেন।'

—'থিয়েটার দেখবার উদ্দেশ্যে?'

—'উদ্দেশ্য কিছু ভেঙে বলেন নি তাঁরা। কয়েকদিন চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গঙ্গার ঘাট, ইডেন-গার্ডেন ঘুরে বেড়ানো গেল। কার্নিভালেও গেলেন তাঁরা-গ্যাম্বলিং অবিশ্যি খেলেন নি, জয়রাইড-এও চড়েন নি। বায়স্কোপে এডুকেশনাল ফিল্ম কিছু হচ্ছে না কি জানবার জন্য গভীর ঔৎসুক্য দেখলাম তাঁদের; দেখা গেল এডুকেশনাল ফিল্ম কিছু নেই। কাজেই বায়স্কোপও দেখা হয় না। থিয়েটার দেখবার প্রত্যেকেরই ইচ্ছা ছিল আমাদের, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কাউকে কিছু বলতে পারলাম না।'

—'থিয়েটারে যাবার কথা পাড়লেও সেটা অথরিটির কাছে যাবে, এই ভয়!'

—'হ্যাঁ, চাকরিও যাবে।'

—'পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আপনাদের দেখছি খুব গভীর।'

—'এক দিন এদের কাউকে না বলে—কয়েই নাট্যমন্দিরের দিকে গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখলাম দ্বিজেন মাস্টার বুকিং অফিসের থেকে হাত দশ-বার দূরে অত্যন্ত পীড়িত সঙ্কুচিত হয়ে পায়চারি করছেন।'

—'টিকিট কেনেন নি?'

—'শুনুন। আমি পালিয়ে যাবার পথ খুঁজছি, দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল; নিস্তার নেই; দু'জনেই খানিকটা থতমত খেলাম-খানিকটা হি-হি করে হাসলাম, পাঞ্জা লড়লাম, দ্বিজেনবাবু আমাকে চা খাওয়াবেন বলে সাধলেন, আমি তাঁকে পান খাওয়ার বলে পয়সা বের করলাম, কাছেই একটা পানের দোকানে গিয়ে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তারপর ট্রামে চড়ে সটান মেসের দিকে যাত্রা!'

—'থিয়েটার আপনি দেখেন নি কোনোদিন?'

—'না। যখন কলেজে পড়তাম, টাকা-পয়সার অভাবে দেখতে পারি নি, ভাবতাম চাকরি করবার সময় দেখব।'

—'চাকরি তো থিয়েটারের দরজার সত্যাগ্রহ করতে বলছে।'

অভয় খানিকক্ষণ চুরুট টেনে—'এখানে একটা সিনেমা আছে জানেন?'

—'জানি বইকি—'

—'মাসে-মাসে বেশ ভাল ফিল্ম আসে শুনেছি—'

—'এডুকেশনাল?'

—'না—না নন-এডুকেশনাল-কিন্তু দেখবার জো নেই—'

—'ছেলেরা মাস্টারমশাইকে বায়স্কোপে যেতে দেখলে আর আস্ত রাখবে না।'

—'নাঃ! নিজে আমি যা নই ছেলেদের কাছে, টিচারদের কাছে নিজেকে সেই অস্বাভাবিক বিড়াল সাধক বলে যে দিনের চব্বিশ ঘণ্টা প্রমাণ করতে হয়, এর চেয়ে কঠিন বিড়ম্বনা আর কি কিছু আছে শচীনবাবু?'

অভয় একটু চুপ থেকে—'সিনেমায় তো যেতেই পারি না—কোনো ছেলে যদি গিয়েছে এ অভিযোগ কানে আসে, তা হলে তাকে দস্তুরমত শাস্তি দিতে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ওঃ।'

—'নিজের বিশ্বাস ও বিবেককে এ-রকম উল্টো গাধার পিঠে চড়িয়ে পদে-পদে এ-রকম অসত্যের খেলা খেলে কতদিন কাটাতে পারা যায়, বলুন।'

—'বিনে পয়সায় তো খেলছেন না, পঁয়তাল্লিশ টাকা করে পুরস্কার পাচ্ছেন মাসে।'

—'বাস্তবিক। টাকার যে এত দাম কলেজে পড়বার সময় তা একেবারেই বুঝি নি।'

—'ক বছর মাস্টারি করছেন?'

—'ছ-বছর। হেডমাস্টারের তোশামুদি করি। গভর্নিং বডির তোশামুদি করি। তাঁরা যাদের ঘৃণা করেন, তাদের পোঁদে পিচকারি কাটি। জীবনে যা পাই নি, কিন্তু চেয়েছি, সত্য ও সুন্দর, পদে-পদে তার অপমান করি—'

—'আপনি নিজে একটা স্কুল খুললে পারেন?'

—'কী হবে তাতে?'

—'নতুন নিয়ম করবেন—'

—'নতুন নীতি তৈরি করতে বলেন?'

—'এই ধরুন—থিয়েটারের দরজায় আপনাদের স্কুলের মাস্টারদের সত্যাগ্রহ করে পড়ে থাকবার কোনো আবশ্যক হবে না।'

—'এক-আধদিন তারা থিয়েটারে গেলেও পারে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিংবা সিনেমায়?'

—'সেটুকু স্বাধীনতা তাদের থাকবে। কারুর বিরুদ্ধে কোনো তরফ থেকে কোনো নালিশ শুনতে যাবেন না; যে-যার ক্লাসে ঠিক মতন কাজ করছে কি না-স্কুলে কাজ সন্তোষজনক কি না এইটুকু নিজের বুদ্ধি বিচার দিয়ে দেখে নেবেন।'

—'তারপর?'

—'তারপর ঘরে বসে কেউ যদি চুরুট টানে, কিংবা বোদলেয়ার পড়ে, অথবা যোগেশবাবুর মতন প্রথম রাতটা স্ত্রীকে নিয়ে কাটিয়ে দেয়-তা দিক। এ-সব ব্যাপার নিয়ে তাদের নিন্দে করবার কোনো দরকার নেই। মানুষ পৃথিবীতে কতটুকুই-বা চায়? পায়-বা কতটুকু? কতক্ষণের জন্যই-বা পায়?'

—'কিন্তু এ-রকম স্কুল দু'দিনও টিকবে না।'

—'তা টিকবে না জানি।'

—'কোনো টিচারই সিনেমায় যেতে চাইবে না। বোদলেয়ার বা ভিলোঁর নামও তারা শোনেন নি। কর্তৃপক্ষের কাছে কার নামে কেউ কোনোদিন নালিশ করতে পারবেন না-এ-কথা শুনলে তাদের পেট ফুলে উঠবে। পঁয়তাল্লিশ টাকার বিনিময়ে যে কাজগুলোকে আমি অত্যন্ত অখাদ্য বলে বোধ করি-সেই মত কাজই তাদের অত্যন্ত প্রিয়-তারা ভালবেসে সে সব সম্পূর্ণ করে!'

—'আর ছেলেরাও এই জন্যই তাদের ভালবাসে বোধ করি!'

—'হ্যাঁ—ছেলেদের না দিন-রাত ভয়ে-ভয়ে...। অনেক কথা বললাম আপনাকে; কাউকে বলবেন না। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু কোনো বিশ্বাস নেই—'

—'কী রকম?'

—'চাকরি তো কোনোদিন করেন নি—বুঝবেন না। কিন্তু ছ-বছর চাকরি করে বড্ড অমানুষ হয়ে গেছি—'

চুপ করে ছিলাম।

অভয়—'পোর্টের পাকা চাকরি থাকলে আমার রমেনের মত হত। কিন্তু দেশী লোকের কাছে চাকরি করতে-করতে মানুষ, দাক্ষিণ্য, বিশ্বাস, প্রেম সমস্ত হারিয়ে বসে।'

মাথা হেঁট করে কুণ্ঠিত হয়ে হাসতে লাগল অভয়।

অভয়—'হৃদয় বলে কোনো জিনিস নেই আমাদের।'

একটু গলা খাঁকরে—'সাহস বলেও কোনো জিনিস নেই। বললামই তো অমানুষ আমরা—সব সময়ই ভয়, কে চাকরি খোয়ায়—কী করে চাকরি বজায় থাকে।'

—'আমাকেও ভয় পাচ্ছেন তাই?'

—'একেবারে যে নির্ভর পাচ্ছি তাও তো বলতে পারি না। দেখলাম অন্ধকারের মধ্যে জানালার দিকে তাকিয়ে-এই তো আপনি অনেক দিন চাকরি না পেয়ে বসে আছেন। আমি সব কথা বলে ফেললাম আপনাদের কাছে-আপনি হয় তো হেডমাস্টারের কাছে লাগাবেন—'

—'হেডমাস্টার আমার কথা বিশ্বাস করবেন কেন?'

—'রং লাগিয়ে বললে বিশ্বাস করবেন বই কি। এক-এক জনের এমন আন্তরিকভাবে বলবার ক্ষমতা থাকে যে, মানুষকে বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করতে হয়।'

—'তাকে বিশ্বাস করিয়ে আমার লাভ কী?'

—'আমার কাজ যাবে—'

—'এত সহজেই?'

—'যখন যায় তখন কাছা খুলবার আগেই যায়—'

—'আপনার কাজ খেয়ে আমার কী সুবিধা?'

—'আমার জায়গায় আপনি বহাল হলেই বুঝতে পারবেন—'

অভয় এই সব মনে করেন।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললাম—'অনেক রাত হয়েছে, ভাত খাবেন আসুন—'

মাথা নেড়ে অভয়—'না, যোগেশদা একটা নাইটমেয়ারের মত বসে রয়েছে—যত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যায় তত ভাল—'

—'তাড়াতাড়িই খাইয়ে দিচ্ছি—'

—'না, আর দেরি করব না। আমাকে ক্লাস টেনের ইংরেজি পড়াতে দিয়েছে। আপনাদের কাছে এসেছিলাম একখানা বইয়ের জন্য। আছে কি?'

—'কী বই?'

—'আমাকে পড়াতে দিয়েছে ল্যাম্ব—আমাদের স্কুল লাইব্রেরিতে তো ল্যাম্বের কিছুই নেই—'

—'ল্যাম্ব-এর 'এসেজ' এবার ম্যাট্রিকে পড়াতে দিয়েছে? সে তো বড্ড শক্ত, ক্লাস টেনের পক্ষে।'

—'না 'এসে' নয়।'

—'তবে?'

—'রোজামুণ্ড গ্রে।'

—'ওঃ-সেই ছোট্ট একটা নভেলের মত—'

—'এই বইটার সম্বন্ধে কোনো ক্রিটিসিজম কিংবা ল্যাম্ব-এর সম্বন্ধে কোনো বইটই আছে আপনার কাছে?'

—'একখানা 'এসে' অব্দি নেই; কী বলব আপনাকে অভয়বাবু!'

—'যাক চললাম—কাউকে বলবেন না কিন্তু কিছু—'

—'আমার ডায়েরিতে লিখে রাখব শুধু?'

—'নাতও লিখে রাখতে যাবেন না—কেন মিছেমিছি গরিবকে'

—'অন্তত আপনার সম্বন্ধে একটা গল্প লিখব—'

—'আপনি ক্ষেপেছেন? এদের কারো হাতে যদি পড়ে তা হলে আমার মাথা আস্ত থাকবে না—'

—'এদের কারো হাতে পড়বে না-সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে—'

অভয় হাতজোড়া করে আমার কাছে এগিয়ে এসে—'আপনার পায়ে গড় হব?'

—'কেন?'

—'কেন মিছিমিছি আমার পিছনে লেগেছেন?'

—'বসুন—'

—'না, বসব না...আচ্ছা, বসছি—'

চোখাচোখি তাকিয়ে অভয়—'ঐ যে শনিবার দিন চুরুট চিনতে যাই সে কথা কউকে বলবেন না—'

মাথা নেড়ে— 'না, বলব না।'

—'আর ঐ থিয়েটার সিনেমা সম্পর্কে কথাগুলো—ওগুলোও—'

—'বলব না কাউকে—'

—'স্কুলের কিংবা-সামাজিক নীতিধর্মের মতবিরুদ্ধ যে-কথাগুলো বলেছি, সে-সব নিয়েও লোকের কাছে গল্প করতে যাবেন না। 'মাথা নেড়ে—'না—'

—'রোজামুন্ড গ্রে সম্বন্ধে কোন বই আপনার কাছে নেই তা হলে?'

—'না। কলকাতায় লিখে দিন না।'

—'বইয়ের দোকানে?'

—'হ্যাঁ।'

—'পয়সা দিয়ে কিনবার মত সঙ্গতি আমার নেই—'

—'হেডমাস্টারকে বলুন না কেন স্কুল লাইব্রেরির জন্য কিনতে—'

—'তিনি বিরক্ত হবেন। অনধিকার চর্চা ভালবাসেন না তিনি। নিজে ভাল বুঝে একটা করবেনই। আমাদের চাইতে বিদ্যা তো তাঁর ঢের বেশি!'

—'শুনেছি অত্যন্ত সাধারণ বি-এ পাস—তাও তিন বারে—'

জিভ কেটে অভয়—'ছি, আমাকে জড়াবেন না! একটা চুরুট দিন তো, চুরুটগুলো বেশ। অপ্রাসঙ্গিকতা ঢের হল। এর শাস্তি যদি পেতে হয় তা হলে সে আমারই পাপের শাস্তি—'

বিছানার থেকে একটা চুরুট কুড়িয়ে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে গেলেন অভয়।

খানিক গিয়ে ফিরে এসে—'থাক চুরুটটা নিন আপনি, হয় তো যোগেশবাবু আমার বাসায় এসে বসে রয়েছেন; চুরুটটা তাঁর কাছ থেকে সরাতে গিয়ে জঙ্গলে ফেলে দিতে হবে। আপনার জিনিস আপনার কাছেই থাক—'

চুরুটটা বিছানার উপর রেখে দিয়ে অভয়-'আপনার এমন একটা ভাল জিনিস নিয়ে যাচ্ছিলাম আপনার মনেও তো গুমর থাকতে পারে। মিছেমিছি আপনার অপ্রীতিভাজন হয়েই বা কী লাভ?'

—'রোজামুণ্ড গ্রে সম্বন্ধে কোনো বই নেই তা হলে? আচ্ছা চললাম। আমার বাসায় দু-এক দিন গিয়ে চা খাবেন; কী বলেন? চা আর বিস্কুট।'

খাওয়া-দাওয়ার পর মশারি ফেলে ঘুমিয়ে ছিলাম—মনে হল অনেক দূরে মিশরের কোন এক প্রান্তরে চলে গেছি—সেখানে বড়-বড় দু'টো প্রাসাদ-একটা প্রাসাদ আমার; অন্ধকারে অপরূপ নীল বাতাস ভেসে আসছে, একসারি খেজুর গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠেছে, বালির উপর দিয়ে এক পাল উট ধীরে-ধীরে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ অঞ্জলি এসে আমার সামনে দাঁড়াল, কোনো এক বিগত যুগের রানীর বেশে, বললাম—'বোস—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

—'না বসব না—'
—'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'
—'আমার যেখানে খুশি ছিলাম—'
—'কেন রাগ করেছ আমার উপর?'
কোনো উত্তর দিল না
—'কী অপরাধ করেছি বলো?'
নিস্তব্ধ।
পাথরের প্রাসাদ অন্ধকারের ভিতর থম-থম করেছে, একটু চুপ থেকে, 'আমি মামলুকের কাছে যাই—'
—'মামলুক কে?'
—'চেনো না?'
—'কই না নাম তো শুনি নি—'
—'শোনো নি আবার? কতবার দেখেছ তাকে!'
—'দেখেছি? কোথায়? আমার তো মনে পড়ছে না—'
—'যাও যাও—আমার পোষা সিংহটা কোথায়?'
—'কী দরকার সেটাকে দিয়ে তোমার?'
—'বলো, সেটা কোথায়?'

দেখতে-দেখতে সিংহ এসে হাজির হল। কেমন বিভ্রান্ত হয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেলাম-তাকিয়ে দেখলাম, অন্ধকারে জ্যোৎস্নায় বাতাসে ডালপালার ভিতর দু-জনের অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে-নারী আর তার অনুরক্ত সিংহ; বাদামি শরীর, কেশর ফুলে-ফুলে উঠছে। ডান দিকে তাকিয়ে দেখলাম, জানালার ভিতর দিয়ে সেই অবিরল খেজুরের সারি-তাদের দীর্ঘ নীলাভ ছড়ির ফাঁকের ভিতর থেকে চাঁদ এক-এক বার উঁকি দিচ্ছে। চাঁদ, হাতির দাঁতের ধূসর মূর্তিরমত জ্যোৎস্না কেমন নীল, অনেক দূরে এক পিরাপিড, মর্মস্পর্শী অপরূপ বাতাস।

ধীরে-ধীরে একটা বর্শা তুলে নিলাম। সিঁড়ি বেয়ে আস্তে-আস্তে প্রাসাদ থেকে নেমে গেলাম। বালির উপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে মামলুকের প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলাম।

কক্ষের থেকে কক্ষে ঘুরে কোথাও কাউকে দেখলাম না।

কোথাও কেউ নেই। না, নেই কোথাও কেউ। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড সবুজ মখমলের পর্দা সরে গেল; দেখলাম মেহগনি কাঠের একটা টেবিলে খানিকটা ধূসর মেঘে ম্লান ও নরম পূর্ণিমার চাঁদের মতন একটা বাড়ি জ্বলছে-পাশেই মামলুক বসে আর তার স্ত্রী।

এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'অঞ্জলি কোথায়?'
—'জানি না—'
—'সে-সিংহটাই বা কোথায় গেল?'
—'সে-সব খবর রাখি না আমরা কিছু।'
একটু চপ থেকে—'মামলুকের স্ত্রী সেজে বসেছ কেন তুমি অঞ্জলি?'
অঞ্জলি হো-হো করে হেসে উঠল।

রুপার পিলসুজ যেন শ্বেতপাথরের বুকে ভেঙে পড়ে-বুকের সোনালি রঙের বাতিটা যায় নিভে, তাই এমনি আওয়াজ হয় তখন।

—'উঠে এসো অঞ্জলি!'
—'আমাকে তুমি অঞ্জলি মনে কারো? তোমার?'
—'কী মামলুক—আমি কেনো ভুল করি নি তো; আমার স্ত্রী এখানে এসে বসেছে কেন?'
—'যাও যাও; আমরা এখন ঘুমোতে যাই; বিদায় নেবে?'
একটা গভীর ঠাণ্ডা বাতাসে সমস্ত অন্ধকার হয়ে গেল।
জেগে উঠে দেখলাম স্বপ্ন দেখছিলাম, সমস্ত গভীরে কেমন বিচিত্র আস্বাদ;
এমন বিচিত্র স্বপ্ন বড় একটা দেখি নি তো।
এ স্বপ্নের মানেই বা কী?
কাকে জিজ্ঞেস করব?
এ স্বপ্ন নিয়ে অঞ্জলির সঙ্গে আলোচনা করব?
থাক।

একটা গাড়ির শব্দ—আস্তে-আস্তে সদর রাস্তায় সজনে গাছটার কাছে এসে থামল।
অঞ্জলি বায়স্কোপ থেকে ফিরে এল বুঝি?

আস্তে মশারির এক কিনার তুলে আকাশের দিকে তাকালাম; ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা-কালো মেঘ ইতস্তত উড়ছে, বৃষ্টি অনেকক্ষণ হয় থেমে গেছে, একাদশীর চাঁদ আকাশে অনেকখানি উঠে গেছে, চাঁদের মুখ ঘিরে পাতলা ধূসর মেঘের একখানা ঢাকনি, সেই মামলুকের টেবিলের সবুজ বাতিটার মত....

মশারিটা ফেলে দিলাম।
বালিশে ধীরে-ধীরে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানিকটা সিগারেটের গন্ধ। অমল খাচ্ছে বোধ হয়-চারজোড়া লপেটার শব্দ—জামগাছের ঝুঁটি ধরে বাতাস চিড়-চিড় করে খানিকটা আনমনা বক-বক উড়ে চড়ে যাচ্ছে-তাদের করুণ অস্পষ্ট আওয়াজ-ঝিঁ-ঝিঁ-র ডাক-বৃষ্টির অভাবে আখখুটে ব্যাঙের চিৎকার, ঘরের ভিতর বাতাসে ভেসে আসা কয়েকটা জোনাকি।

—'আঃ টর্চটা নিভিয়ে ফেললে যে অমল?'

—'কেন, বেশ জ্যোৎস্নাই তো রয়েছে—'

—'না, এই জায়গাটা বড্ড অন্ধকার।'

—'আমি যদি চর্ট না আনতাম।'

—'আঃ জ্বালো না—'

—'অন্ধকারে কিসের এমন ভয়—আমি তো দিব্যি চোখ বুঝে হেঁটে চলে যেতে পারি।'

—'এ-সব পথে বড় সাপখোপ থাকে।'

—'কামড়াবে?'

—'কামড় দিয়ে ফেললে আর কী করব? আবার নিভিয়ে ফেললে?'

—'মরবার খুব ভয় বুঝি?'

—'মরবার কী দরকার ভাই?'

—'সিগারেটটা ফেলে দেই; শচীনবাবু কী মনে করবেন?'

—'আঃ। প্যাচ করে খানিকটা কাদা ছিটকে গেল যে?'

—'কোথায়? দেখি—'

—'থাক দেখতে হবে না তোমার—'

—'শাড়িটা নষ্ট হয় নি তো?'

—'সে ঘরে গিয়ে বুঝব।'

—'আহা, আমার অপরাধের হল কি বৌদি?'

—'না তোমার আর দোষ কী ঠাকুরপো-'

—'ঠাকুরপো আমাকে বোলো না।'

—'তবে?'

—'অমল বললেই কাজ চলে যায়।'

—'আস্তে; বাড়িসুদ্ধ মানুষ আছে, কাণ্ডজ্ঞান নেই বুঝি তোমার?'

—'সকলেই তো—'

—'কই, অমল চলে যাচ্ছ না কি?'

—'নাঃ, এই তেঁতুলের গাছের ছায়ায় একটু দাঁড়াই।'

—'এসো এ-দিকে—'

—'আমি আসব, না আমার [কাছে তুমি].আসবে?'

—'তুমিই এসো—'

—'কতদূর যেতে হবে?'

—'ঘরেই এসো না—'

—'ভেতরে?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

দু'জনেই অঞ্জলির ঘরের ভিতর ঢুকল।

অঞ্জলি—'এখন এক কাপ চা পেলে তোমার খুব ভাল লাগত, কী বলো অমল?'

—'উপায় থাকলে তো আপনি দিতেনই; সেই জেনেই তৃপ্তি।'

—'তুমি বসো, যদি আমি করে দিতে পারি—'

—'বসতে পারি কিন্তু চা খাবার জন্য নয়—'

—'তবে?'

—'এমনিই—'

—'আহা গাড়ি ভাড়াটা তো দেওয়া হয় নি।'

—'গাড়োয়ান তাই বলে রাস্তায় বসে ঝিমুচ্ছে না।'

—'চলে গেছে?'

—'এতক্ষণে মাটির সরায় আগুন নিয়ে বসেছে।'

—'আমার মাকড়িটা একটু খুলে দেবে অমল?'

—'স্বচ্ছন্দে—'

—'অত আস্তে নয়; আর একটু জোর দাও।'

খানিকটা নিস্তব্ধতা।

অঞ্জলি আস্তে হেসে—'হ্যাঁ হয়েছে—'

—'এই কানেরটাও?

—'নিশ্চয়ই; তবে, এক কানের মাকড়ি খুলবে না কি শুধু?'

—'মাকড়ি বলেন? আমরা বলি দুল—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'যখন যা মুখে আসে; আমরাও কি দুল বলি না অমল?'
—'এই মকরমুখো দুল আপনাকে কে দিল?'
—'মকরের মুখ দেখলে কোথায় তুমি? আংটির মত তো—'
—'না, ঝুমকোর মত—'
—'যাই বল; আমাকে মানায় নি?'
—'খুব। আমার ইচ্ছে করে কি জানেন, আপনার ঐ কানে দুটো অপরাজিতা ঝুলিয়ে দি—'
—'অপরাজিতা?'
—'চমৎকার দেখাবে আপনাকে—'
—'কিন্তু অপরাজিতা তো দু-মুহূর্তেই শুকিয়ে যাবে অমল।'
—'যাক, সে তার কাজ করে যাবে; মানুষের রূপকে তো দুই মুহূর্তের জন্য উপলব্ধি করতে হয় শুধু—'
—'মোটে দুই মুহূর্তের জন্য?'
—'তা ছাড়া আর কী; যারা চব্বিশ ঘণ্টা রূপের দিকে তাকিয়ে থাকতে চায় তারা বড্ড স্থূল—'
—'শুধু দু-মুহূর্তের জন্য আমাদের রূপ?'
—'রূপ নিয়ে আপনারা অনন্ত মুহূর্তই থাকুন না কেন; আমরা দু-মুহূর্তের জন্য শুধু দেখে চোখ বুজে চলে যাব।
—তারপর আমাদের ধ্যানের সময়—'
—'ওঃ, সেই কথা!'
—'বাসি অপরাজিতা ফেলে দিয়ে তাজা দুটো অপরাজিতা তুলে পরবেন। কিংবা কুরচি, ছোট্ট দুটো তোড়া দু-কানে দোলাবেন-কিংবা জাপানি চেরি যদি ভাল লাগে-কিংবা দালিয়া, ক্রিসেনথিমাম, যা খুশি পরুন গিয়ে। আমাদের কাজ অনেক আগে হয়ে গেছে; যত আভরণে নিজেকে আজন্ম সাজাতে পারেন, দু-মুহূর্তেই আমরা সাজিয়ে শেষ করেছি; তারপর নিরাভরণ স্বপ্ন নিয়ে আমাদের পুরুষদের নিস্তব্ধ রহস্যের দিনগুলো চলে—'
—'খুব আনন্দে? আমার মাকড়ি দুটো রাখলে কোথায়?'
—'এই তো বিছানার উপর—'
—'আচ্ছা বেশ, আমি ভাবলাম মাটিতে পড়ে গেল, না কি কোথাও।'
অমল কোনো জবাব দিল না।
—'বললে মকরমুখো?'
—'কিচ্ছু বলি নি—'
—'মাকড়ি দুটো জেঠিমা আমাকে দিয়েছিলেন—' অঞ্জলি বললে—'আমার বিয়ের সময়। ক ভরি সোনা এর ভেতর আছে বলতে পারো?'
—'আমার কোনো আন্দাজ নেই।'
—'বাঃ, হাতে তুলেই দেখ না—'
—'তুলে কী হবে-আমি বুঝতে পারব না—'
—'এই তোমার ডাক্তারি?'
—'আমাদের সোনা-রুপো নিয়ে কারবার নয় তো—'
—'বড় লোকের ছেলে, সোনা-রূপোর কোনো খবর রাখো না?'
—'এখানে দেখলাম পুকুরের কোল ঘেঁষে একেবারে জলের কাছাকাছি দল-ঘাসের ভিতর একরকম নীল ফুল ফোটে।'
—'ফুল নিয়েই আছ তুমি শুধু।'
—'সেগুলোকে কী ফুল বলে অঞ্জলি বৌদি?'
—'জানি না।'
—'খুব ছোট্ট-খুব নীল-? বলতে পারো না?'
—'না।'
—'আচ্ছা টেনিশনের 'ব্রুক' কবিতাটা পড়েছেন?'
—'পড়েছি—'
—'ফরগেট মি নট'-এর উল্লেখ আছে মনে পড়ে? আচ্ছা ওগুলোই কি 'ফরগেট মি নট'?'
—'আমি বুঝেছি তুমি থার্ড এম-বি কী করে ফেল্ল করলে—'
—'না। শুনুন ওগুলো 'ফরগেট মিট' কি না—'
—'পাগল, সেগুলো হল বিলেতের ফুল—'
—'আমাদের বাংলাদেশে হয় না?'
—'কী করে হবে?'
—'পুকুরের কোণে দলঘাসের ভিতর এ-ফুলগুলো তা হলে কী?'
—'কানো আগাছার ফুল হবে নিশ্চয়ই—'
—'যাই হোক বড্ড সুন্দর, আপনি দেখেন নি?'
—'কে দেখতে যায় অত সব—'
—'গোটা দশেক সেই ফুল কুড়িয়ে পাঁচটা-পাঁচটা করে তোড়া বেঁধে আপনার কানে দুলিয়ে রাখলে বেশ হয় কিন্তু।'
—'এই মাকড়ি দুটো গড়তে পঁচিশ টাকা লেগেছিল,' একটু চুপ থেকে অঞ্জলি, 'শুনলাম সোনার দাম এখন বেড়েছে—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'জানি না।'

—'আচ্ছা তা হলে এই গয়না দুটোর দাম ত্রিশ টাকা হয় না?'

—'হতে পারে—তিন শ টাকা দিয়েও তো কেউ কিনে নিতে পারে—'

—'কেন?'

—'হয়তো মনে ধরে গেল; আপনার কানে দুলছে-হয় তো মনে ধরে গেল তার-আমাকে একটু জল দেবেন?'

—'এমনি জল খাবে-না মিষ্টি দিয়ে দেব?'

—'না, শুধু এক গ্লাস জল—'

—'কয়েকটা লেবুপাতা কচলে দেব?'

—'কী যে আজগুবি আপনার—'

—'জলের ভিতর সুন্দর গন্ধ হত—'

—'তেষ্টার সময় মানুষ সুন্দর গন্ধ চায়?'

—'চায় না? তা হলে সুগন্ধি সিরাপ খায় কেন?'

—'কিন্তু রকমফের জানে না যে-হাত সেই নারীহাতের সাধারণ খাঁটি জলের চেয়ে গভীর জিনিস পৃথিবীতে আর কিছু নেই অঞ্জলি বৌদি।'

—'কল্পনা তোমার অনেক দিকেই খেলে দেখছি অমল—'

—'হ্যাঁ, কল্পনা মাত্র; জীবনের অভিজ্ঞতা আমার বড্ড কম।'

—'কম?' তাই না কি?'

—'সেই জন্যই যেমন অবসাদ তেমনি আকাঙ্ক্ষা, তেমনি পরিতৃপ্তি, সবই চূড়ান্তে চলে যায় আমার—'

—'এ ঘরে কিন্তু একটা পাথরের গেলাস আছে শুধু অমল; তাতে জল দিলে হবে?'

—'কাঁসার গ্লাসের চেয়ে সে ঢের ভাল জিনিস হবে অঞ্জলি, পাথরের গ্লাসটা কি সাদা?'

—'কালো'

অমল প্রীত হয়ে—'ঠিক এমন জিনিসটিই এই সময়ে চেয়েছিলাম অঞ্জলি বৌদি।'

—'গেলাসটা কিন্তু নোংরা হয়ে আছে।'

—'এঁটো? ধুয়ে নিন।'

জল গড়িয়ে এনে অঞ্জলি—'কয়েকটা নেবুপাতা কচলে দেই?'

—'আবার নেবুপাতা আনতে যাবেন বাইরে? আনুন। নারীত্বের পূর্ণ পরিচয়ে জিনিসটা নরম হয়ে উঠুক—'

—'বাইরে যাবার কোনো দরকার হবে না অমল—এই তো জানালা দিয়ে হাত বাড়লেই নেবুপাতা পাওয়া যায়।'

—'যায় না কি?'

—'হ্যাঁ এখানে একটা দিব্যি গাছ রয়েছে—লেবুও ফলেছে ঢের—'

—'বেশ, তা হলে একটা লেবুই কেটে দিন—'

অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'দিতে তো আমার খুবই ভাল লাগে অমল-কিন্তু এ আমার শাশুড়ির গোনা লেবু—বুঝলে না—? একটা সামান্য লেবুর জন্য কেন তার মুখ ঝামটা সইতে যাব?'

—'ঠিক কথাই তো।'

—'আ হরি! লেবুপাতাগুলো না ধুয়েই কচলে ফেললাম।'

—'বেশ করেছেন; বৃষ্টির জলে যথেষ্ট স্টেরিলাইজড হয়ে আছে।'

—'আমার হাতও তো ধুই নি।'

—'চাইও না যে আপনি ধোন!'

—'আর এক খুরি দেব?'

—'দিন।'

—'লেবুপাতা কচলে?'

—'তা আর বলতে?'

—'একটু মিষ্টি খেলে হত?'

—'হাতের থেকেই যথেষ্ট মিষ্টি ঝরছে।'

তিন-চার খুরি খেল আমল।

—'আমার কপাল বড্ড ঘামে ভিজে গেছে।'

—'নিঃসঙ্কোচে আঁচল দিয়ে সমস্ত কাপালটা মুছে নিন, শুভ্র ললাটে কোথাও সিঁদুরের বাধাবিঘ্ন নেই-সিঁদুর নেই তো।'

—'আজ আর সিঁদুর পরি নি—'

—'আজকাল এ-জিনিস কুমারীরা পরে; কয়েকদিন পরে বিধবারাও পরবে। আপনাদের না পরলেই ভাল।'

—'না সেজন্য নয়।'

একটু নিস্তব্ধতার পর অঞ্জলি—'আমার শাড়িতে কাদা লাগল কি না বুঝতে পারলাম না তো।'

—'আমি ভেবেছিলাম আমার ধুতি সাফ আছে কি না সেই কথা আগে জিজ্ঞাসা করবেন।'

অঞ্জলি একটু হেসে—'জিজ্ঞেস করি নি বুঝি? এখন অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাববে নারী কী রকম স্বার্থপর!'

—'কাল সকালে হয় তো ধুতিটা কেচে দেবার জন্য চেয়ে পাঠাবেন এই কথা ভাবতে-ভাবতে নারীর ক্ষমা ও প্রেমের মূর্তি হৃদয়ে নিয়ে ঘুমোব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'যা হোক, নির্বিঘ্নে ঘুম হলেই ভাল।'

—'আশীর্বাদ করুন যেন ঘুমের ভিতর কোনো স্বপ্ন না দেখি।'

—'কেন, স্বপ্নের কী অপরাধ? সুন্দর স্বপ্নও তো আছে—'

—'কিন্তু তবুও স্বপ্ন তো বাস্তব নয়—'

—'যতক্ষণ দেখবে ততক্ষণ তো বাস্তব। ঘুম ভেঙে গেলে সংসারের পথে চলতে-চলতে লাখ টাকার বিনিময়েও এমন সুন্দর রূপান্তর খুঁজে পাবে না তো আর—'

অমল—'আশীর্বাদ করুন যেন আপনার শ্বশুরের মত সাদাসিধে ঘুমে সারাটা রাত কাটিয়ে দিতে পারি।'

—'ঠাট্টা কোরো না অমল—তাঁর ঘুমের মধ্যে ঢের বেদনা ও অভাবের জটিলতা রয়েছে। তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না।'

—'যাক্—আমার বাবা যে-রকম নিশ্চিন্তভাবে ঘুমান—সে রকম ঘুমোতে পারি যেন!'

—'তা ঘুমিও—'

—'হ্যাঁ, এই আশীর্বাদই করবেন।'

—'আশীর্বাদ শব্দটা খুব ভাল খুঁজে বের করেছ অমল-'

—'কেন, খাপ খায় না?'

—'ভেবে দেখে তুমি—'

—'তা হলে—আকাঙ্ক্ষা করুন—'

—'তোমার টর্চটা একটু রেখে যাবে?'

—'বিছানার উপর অনেক আগেই তো রেখে দিয়েছি।'

—'কারবাইডে আলো আছে তো?'

—'তিন ঘণ্টার মত আছে।'

—'আমার শাড়িতে কোথায়-কোথায় কাদা লাগল তাই দেখব।'

—'দেখতে কতক্ষণ লাগবে আপনার?'

—'তুমি বাড়ি চলে গেলে তবে তো দেখব।'

—'টর্চ আপনার কাছে রেখে চলে যেতে হবে?'

—'হ্যাঁ, টর্চের আলোয় বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।'

—'আর অন্ধকারে আমাকে সাপ কামড়ালে আমিও অপরিষ্কার করে বুঝব না অঞ্জলি বৌদি।'

অঞ্জলি—'কাকে?'

—'আপনাকে নয়-জীবনটাকেই।'

—'মিছেমিছি অভিমান করো কেন অমল? জীবনটাকে যখন বুঝতে আরম্ভ করবে তখন আমার কথা মনেও থাকবে না তোমার।'

তেঁতুল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে দেশলাই জ্বালাল, খানিকটা সিগারেটের গন্ধ, আস্তে-আস্তে চলে গেল।

দুপুরবেলা ঘুম আসছিল না—ঘুমোতে চেষ্টা করি, কিন্তু কী জানি কেন কোনোদিনও পারি না। শ্রাবণের আকাশ, তবুও বৃষ্টি ছিল না, বেশ খটখটে রোদ—খানিকটা দূরে শুকনো অশ্বথের পাতা, কদমের কেশড় আর বেলের কুঁড়িতে ঘাস রয়েছে ছেয়ে। অনেক দিন পরে ফড়িং আর প্রজাপতি নেমে পড়েছে; ঝি-ঝি প্রাণ খুলে ডাকছে; কয়েকটা শালিখ আর দাঁড়কাক—একটি আগন্তুক বৌ-কথা-কও অশ্বথের নিবিড় ডালপালার ভিতর নিস্তব্ধে খুনসুড়ি করে ফিরছে; আবার যেন জ্যৈষ্ঠের দুপুর ফিরে এল।

তাকিয়ে দেখলাম একটা মোটর এসে থেমেছে; গাড়িটা হিলম্যান উইজার্ড বোধ করি; বেশ নতুন—বোধ হয় দু-তিন মাস হল কেনা হয়েছে—আমাদের এখানে থামল যে?

এ কার মোটর? খানিকটা পেট্রোলের ধোঁয়া উড়ল; গন্ধ পেলাম, এক হালকা গরম বাতাস প্রান্তরের থেকে বয়ে এল।

মোটর কার এখানে এসে থেমেছে; হয় তো পুলিশের নজর পড়েছে এ বাড়িটার ওপর; সুপারিন্টেন্ডেন্ট এখনই হয় তো গাড়ি থেকে নামবেন; সার্চ করবেন? না গ্রেপ্তার করবেন? কাকে!

দেখলাম একজন বাঙালি বাবু নামলেন।'

হয় তো পুলিশের কোনো কর্মচারী; কিংবা কনফিডেনশিয়াল অফিসার, হৃদয়টা কেমন বিরস হয়ে ওঠে, প্রজাপতি, ফড়িং অশ্বথের শুকনো পাতা—সমস্ত দুপুর নিরাসক্ত নারীর মত নিজের মনে খেলা করতে-করতে দূরের রৌদ্র কলরবের ভিতর মিলিয়ে যায়—আমাকে দিয়ে তাদের দরকার নেই যেন আর।

গরদের চাদর, গরদের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম, হাতে ছড়ি, মুখে সিগারেট, পায়ে কেডস—ভদ্রলোকটি আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

দূর থেকে হাসিমুখে নমস্কারও জানালেন—প্রতিনমস্কার দিয়ে মৃদু হেসে বললাম—'আসুন'—ছাতিম গাছ অব্দি পৌঁছে—'কী হে, চুপচাপ বসে আছো যে—'

—'না ঘুমোবার জো নেই—'

—'কেন, ছারপোকায় কামড়ায়?'

—কে, চন্দ্রনাথ না কি? তুমি এ সময় কোত্থেকে ভাই?

—'সত্যিই কি আমি চন্দ্রনাথ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'সেই রকমই তো মনে হয়।'

—'কত বছর পরে দেখা হল তোমার সঙ্গে?'

—'আট বছর, না বেশি?'

—'আচ্ছা এই ডেক চেয়ারটায় আমি বসি।'

—'বোসো, আমি বিছানায় উঠে বসছি।'

—'তোমার সঙ্গে যখন শেষ দেখা হয়েছিল তখন কি একটা খবরের কাগজের স্টাফ ছিলে, না?'

—'হ্যাঁ সে আজ-আট বছর তো নয়—দশ বছরের কথা হবে চন্দ্রনাথ—তার পর আর তোমায় দেখি নি বুঝি?'

—'না। ১৯২৫-এ কলকাতার ধর্মতলার মোড়ে তোমার সঙ্গে শেষ দেখা। মনে পড়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তুমি একটা বর্মা চুরুট ফুঁকছিলে—'

—'কী জানি—'

—'বললে চুরুট ফুঁকতে-ফুঁকতে দাঁত টন-টন করে, রক্ত পড়ে, তবুও বদ-অভ্যাস ছাড়তে পারি না—'

—'তা বলে থাকব; মনে নেই আমার; তবে দাঁতের জন্য চুরুট ছেড়ে দিতে হয়েছে আমাকে—'

—'বলেছিলে বাংলার পলিটিকসে এ-বড় এক আশার জিনিস এসেছে-দেশবন্ধু; দেখো, বছর তিন-চারের মধ্যে আমাদের নেশনের কত প্রেস্টিজ বেড়ে যাবে। জাপানের মত, টার্কির মত—'

—'হ্যাঁ সেই রকম সব ভাবতাম তখন; বড্ড ছেলেমানুষ ছিলাম—'

—'চায়ের দোকানে গেলে আমাকে নিয়ে—'

—'তা মনে আছে।'

—'ধর্মতলার মোড়ে একটা দোকান ছিল—'

—'হ্যাঁ'

—'দোকানে ঢুকে কেবল দেশবন্ধু—আর অবিশ্রাম চুরুট আর চা।'

—'হ্যাঁ, সে এক রকম দিন ছিল বটে।'

—'খবরের কাগজে লিডার লিখতে; হ্যাঁ, কী লিডার লিখেছিলে সেদিন—দাঁড়াও আমি মনে করছি।'

—'সে বছর দশেক আগে কী লিখেছিলাম না-লিখেছিলাম আজ সেই কথা দিয়ে কী হবে চন্দ্রনাথ?'

—'হ্যাঁ মনে পড়েছে; বালগঙ্গাধরের সম্বন্ধে লিখেছিলে-তাঁর মৃত্যুর তারিখ ছিল সেদিন। সে লেখা তোমার আমি পড়েছিলাম—'ইংরাজির ভুল ছিল না-কিন্তু বিচারের চেয়ে কল্পনার চাতুরি ছিল ঢের বেশি; নিজেকে ঢের আত্মপ্রতারিত করেছিলে—'

—'সেই ১৯২৫-এই এ-সব বুঝেছিলে তুমি?'

—'হ্যাঁ'

—'তা হলে তোমার মাথা বরাবরই বেশ ঠাণ্ডা চন্দ্রনাথ—'

—'আর একটা আর্টিকেল লিখেছিলে ভারতবর্ষের সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের প্যারালেলিজেমকে নিয়ে—'

পকেটের থেকে সোনার সিগারেট কেস বের করে চন্দ্রনাথ—'লেখো নি?'

—'লিখেছিলাম তো অনেক কিছুই।'

—'তার পর আকজাল?'

—'সে খবরের কাগজ তো অনেক দিন হয় উঠে গেছে—'

—'চিত্তরঞ্জন মারা যাবার আগে?'

—'না, মারা যাবার আগে নয়, কিন্তু আমি ১৯২৩-এই ছেড়ে দিয়ে এসেছি—

—'কেন ছেড়ে দিলে? টাকা দিত না?'

—'টাকা না-দিত এমন নয়—'

—'তবে?'

—'ভাল লাগছিল না আর; রাত্তির জেগে-জেগে, মেসে থেকে-থেকে শরীরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল-'

—'যা লিখতে বা প্রচার করতে সেই সব জিনিসে সম্পূর্ণ বিশ্বাসও ছিল না বোধ করি?'

একটু হেসে—'সে-সব কথা এখন জিজ্ঞেস করছ কেন চন্দ্রনাথ?'

—'ছিল বিশ্বাস?'

—'আমরা যা ভালবাসি, বিশ্বাস করি, সে পথে চলবার অধিকার আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই আছে—'

—'অধিকার বোলো না-বলো শক্তি।'

—'শক্তিই তো অধিকার সৃষ্টি করে—'

—'একটা সিগারেট খাবে?'

—'তোমার এই গোল্ডকেসটা তো ভারি সুন্দর—'

—'মন্ত্রীর মহারানী আমাকে দিয়েছিলেন—'

—'মন্ত্রীর মহারানী—?'

—'হ্যাঁ, রাজপুতানা স্টেটের।'

—'ওঃ।'

—'দেখো নি ছবি তার?'

—'মন্ত্রীর রানীর? না তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ইলাসট্রেটেড উইকলি রাখো না বুঝি?'
—'নাঃ।'
—'স্টেটসম্যান ও না?'
—'নাঃ।'
—'বেশ সুন্দর দেখতে তিনি।'
—'রাজপুতনারী, দেখতে সুন্দর হবেই তো।'
—'আমাদের একজন বাঙালি আর্টিস্ট রানী ভানুমতীর ছবি এঁকেছে, দেখেছ?'
—'ছাপিয়েছে?'
—'না, ছাপাবার জন্য তো নয়।'
—'তবে?'
—'বিলেতে ইন্ডিয়া-হাউসে পরিশোভন করছেন।'
—'ওয়াল পেইনটিং?'
—'হ্যাঁ, ফ্রেস্কো; বেশ চমৎকার ফ্রেস্কো; বাংলাদেশে এ-রকম রূপসী দেখা যায় না রূপকার যদিও দেখা যায় ঢের; কই, সিগারেট নিলে না তো?'
একটা তুলে নিলাম।
—'ফিটজেরাল্ডের কথা মনে পড়ে?'
—'কী কথা?'
—'পটার্স আর ক্লে, পটুয়া আর তার কাদা; শেষ পর্যন্ত পটুয়াই বড় কাদা, কাদা মাত্র, কী বল শচীন? সিগারেটটা জ্বালালে না? দাঁড়াও আমি জ্বালিয়ে দিচ্ছি—
লাইটার বার করল সে।
—'যাক পরে জ্বালানো যাবে।'
—'আচ্ছা, আমারটা আমি জ্বালিয়ে নি।'
লাইটারের আগুনে সিগারেটটা তার জ্বালিয়ে নিল চন্দ্রনাথ।'
—'ফিটজেরাল্ডের বইখানা খুব ভাল, না?'
—'রুবাইয়াতের কথা বলছ?'
—'হ্যাঁ; আমার মনে হয় ওমর নিজে যা লিখেছিলেন তার চেয়ে ঢের বেশি সুপার্ব; আর দেশ-বিদেশে যে-সব অনুবাদ বেরিয়েছে, সে সবের চেয়ে অনেক বেশি মর্মান্তিক!'
চুপ করে ছিলাম—
—'ভিকটোরিয়ান যুগে এই একখানা বই, আর কোনো বই নেই।'
—'নেই?'
—'ব্রাউনিং আগাগোড়া যা লিখেছেন সমস্ত ফাঁকি; একদিন চোরাই চামড়া খসে যাবে, তার ভিতরের থেকে গাধা বেরিয়ে পড়বে।'
—'তোমার সিগারেটটা জ্বলে যাচ্ছে চন্দ্রনাথ?'
—'প্রথম সিগারেটটা আমি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেই, টানি না।'
—'কেন?'
—'শখ।'
—'তারপর, সেই যে বিদায় নিলে এদ্দিন দেখা হল না যে?'
—'ঠিক করেছিলাম ছেঁড়া চটিজুতো পায় দিয়ে আর-কারো সঙ্গে দেখা করব না—
—'এই মোটরটা কার?'
—'আমারই।'
—'হিলম্যান উইজার্ড?'
—'না, হিলম্যান মিনস্ক।'
—'সেকেন্ডহ্যান্ড কিনেছ?'
—'বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছিল।'
—'ছ-সাত হাজার খরচ লেগেছে বুঝি?'
—'না, চৌদ্দ-পনের হাজার—'
—'মোটর-এর ভেতর কে আছে?'
—'সোফার।'
—'দেশের বাড়িতেই এই দশ বছর পরে এলে?'
—'না, বছর পাঁচেক আগে একবার এসেছিলাম।'
—'কই দেখি নি তো।'
—'তোমাকেও আমি দেখি নি।'
—'হয় তো কলকাতায় ছিলাম আমি।'
—'কোথায় ছিলে, না-ছিলে, ইহলোকে না পরকালে, এক মুহূর্তের জন্যও মনে পড়ে নি আমার।'
—'কেন হুইস্কিতে অভিভূত হয়ে ছিলে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'চায়ের কোটেশান নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

একটু চুপ থেকে—'হিলম্যান মিনস্ক; তা তোমাদের সেই খড়ের ঘরেই আছো?'

—'সেটা অনেক দিন হয় আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছি।'

—'এখন কোথায় থাকো?'

—'রবার্টসন সাহেবের বাংলোতে।'

—'ওঃ, সেই বাড়িটায়; সাহেবের সঙ্গে?'

—'বারর্টসন অনেক দিন হয় সেটা আমার কাছে বিক্রি করে বিলেতে চলে গেছেন।'

বিছানার থেকে দেশলাই কুড়িয়ে সিগারেটটা জ্বালিয়ে-'তা হলে দেশেও বাড়ি করলে একখানা?'

—'হ্যাঁ, নৈনিতালে বাড়ি করার চেয়ে এ ঢের ভাল জিনিস!'

—'কী রকম?'

—'এখানে পথে-ঘাটে গোখরো ঘুরে বেড়াচ্ছে, খানিকটা দূরে বনের ভিতরে বাঘ, সন্ধ্যার সময় ভাটিয়াল গান শুনতেই পাই, ম্যালেরিয়ায় দেশ-গ্রাম উচ্ছন্ন যাচ্ছে দেখি, জে. এম. সেনগুপ্ত আর সুভাষ বোসের সুখের বাংলা কথা শুনে প্রাণ তৃপ্ত হয়, বাপ-মা ভাই-বোন রয়েছে সব। অন্ধকারে কদম গাছের ভিতর থেকে প্যাঁচা ডাকে, সারারাত মাঠে-মাঠে শ্রাবণের জল আর ব্যাঙের কলরব; ঢের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় আমার। ভারী ভাল লাগে, নৈনিতালে আছে কয়েকটা হোটেল, ইডিয়েট পাহাড়ি আর ফেরিয়ালা, সে সবের ঢের হয়ে গেছে আমার।'

—'পথে-ঘাটের গোখরো সাপ ভাল লাগে কোন হিসেবে?'

—'বেশ থ্রিল!'

—'মোটরে তো বেড়াও, থ্রিল উপভোগ করবার সুবিধে কোথায় তোমার চন্দ্রনাথ?'

—'সেই পলাশগঞ্জের রাস্তা মনে আছে?'

—'খুব।'

—'এখান থেকে প্রায় ক্রোশ তিনেক, না শচীন?'

—'স্কুলে পড়বার সময় কত দিন সেই রাস্তা দিয়ে বেড়াতাম আমরা দু'জনে, তুমি গিয়েছ শিগগির সেখানে?'

—'না।'

—'আমি এখানে এসে অব্দি রোজ সন্ধ্যার সময় সেদিকে মোটর চালিয়ে নেই।'

—'একা-একা?'

—'হ্যাঁ, একাই ভাল লাগে, ওধারে অশ্বথ, জাম, তেঁতুল, পলাশ, কতগুলি আমের বন, বাবলা-শ্যাওড়ার জঙ্গল, ধানের ক্ষেত, পাটের ক্ষেত, মানুষ নেই, গরু নেই, গাছের পাতা খসে, বনমোরগ ডাকে, নদীর দিকে বুনো হাঁসের সাড়া পাওয়া যায়, ধানক্ষেতের এদিকে-সেদিকে কয়েকটা স্পাইগেট, গায়ে রেনকোট, হাতে বন্দুক, মোটরটা থামিয়ে নেমে পড়ি, কাঁচা রাস্তায় হাঁটতে থাকি।'

—'শিকার করবার জন্য?

—'না, এমনিই।'

ভস্মীভূত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে চন্দ্রনাথ—'রোজই হাঁটি, সেই স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে; জীবনে পরাজয় তত হয় নি, আত্মবিক্রয়ও তত করি নি, কিন্তু তবুও এমন দুঃখ পাই কেন? আমাদের সেই স্কুলের আটচালাটা কোথায় গেল? মাস্টারমশাইদের কাউকেও দেখি না। সে দিন দেখলাম নির্মলাদের ভিটের উপর একটা কুকুর মরে আছে, রাজ্যের শকুন এসে পড়ে; ভিটে উজাড় করে ঘাস, ভেরেণ্ডা, লজ্জাবতী লতা, তেলাকুচা আর ফণীমনসার জঙ্গল—। নির্মলার কোথায় বিয়ে হয়েছিল শচীন?'

—'ক-দিন হল এখানে এসেছ?'

—'দিন দশেক—'

—'নৈনিতাল থেকে?'

—'না, নৈনিতাল অনেক দিন হয় ছেড়েছি। কলকাতায় ছিলাম।'

—'ব্যবসা করে অনেক টাকা করলে?'

—'না। ব্যবসা আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

—'কেন?'

—'খাঁটি দোকানদার আমি নই।'

—'ব্যবসায় টাকা জমিয়েছ মন্দ না।'

—'সে আমার সৌভাগ্য'

—'এখন কী করছ?'

—'রেওয়া স্টেটে চাকরি করেছিলাম কিছুদিন।'

—'তার পর?'

—'রাজপুতনায় একটা প্রফেসারি নিয়েছি।'

—'এখন তা হলে প্রফেসারি করবে?'

—'বলতে পারি না, তোমার মা কোথায়?'

—'ঘুমিয়েছেন হয় তো।'

—'তাই; না হলে আমাদের গলার আঁচ পেলে নিশ্চয়ই চলে আসতেন। সেই স্কুল ছুটির পর, মনে নেই শচীন?—কতদিন তিনি আমাদের মোহনভোগ রেঁধে খাওয়াতেন, মোহনভোগ, লাল আটার রুটি, চিঁড়ে, নারকোল আর গুড়, মাঝে-মাঝে দুধভাত আর চাঁপাকলা।—তুমি বিয়ে করিছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হ্যাঁ, তুমি কোথায়, তোমাকে নেমন্তন চিঠি দিতে পারি নি।'
—'স্ত্রীর শরীর ভালো?'
—'আছে একরকম।'
—'ছেলেপিলে হয় নি?'
—'একটি মেয়ে হয়েছিল।'
—'হয়েছিল, এখন আর নেই?'
—'না দেড় বছর বয়সে মারা যায়।'
—'কিসে গেল?'
—'শিশুরা অনেক অজুহাতেই এ পৃথিবী থেকে সরে যায় চন্দ্রনাথ।'
কিছুক্ষণ চুপচাপ।
—'তোমার স্ত্রী হয় তো এ শোক উতরে উঠতে পারে নি, কী করেই বা পারবেন? শেষ দিন পর্যন্ত রূপান্তরিত জীবন এ অনুভূতি নিয়ে ফিরতে হবে নারীদের। এই রকমই হয়। অনেক সময়ই হয় তো বিছানায় পড়ে থাকেন?'
আস্তে মাথা নাড়লাম। হ্যাঁ কি না বুঝে নিক যা হয় একটা চন্দ্রনাথ।
—'একটা উপায় করলে হয় তো এ-বেদনা কমে।'
চন্দ্রনাথের দিকে তাকালাম।
—'তোমাদের দু-জনের মধ্যে আর-একটি সন্তান জন্ম নিক।'
একটু হেসে-'না।'
—'কেন?'
—'আমাদের কারুরই ইচ্ছে নেই।'
—'তোমার স্ত্রীরও না?'
—'না।'
খানিকটা চুপ থেকে চন্দ্রনাথ সিগারেট জ্বালাল, বললে—'নির্মলার ভালো বিয়ে হয়েছিল শচীন?'
—'কী জানি, আমি তখন এখানে ছিলাম না।'
—'তার পর আর-কোনো খোঁজ খবর পাও নি?'
—'না।'
—'তাই তো। সেদিন দেখলাম একটা কুকুর মরে আছে আর শকুন চরছে নির্মলাদের ভিটেতে।—আর তিন বছর আগে?'
সিগারেটে এক টান দিয়ে অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করে নিস্তব্ধ হয়ে রইল চন্দ্রনাথ। তার পর ধীরে-ধীরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, 'এক নিশ্বাসেই তিনটে বছর কেটে গেল না?'
—'এই রকমই তো যায়।'
—'সেই রকমই তো মনে হয়।'
—'এখন বিধাতাকে যদি বলি আর একটা নিশ্বাস ফেলব তুমি আমাকে তিন বছরের পৃথিবীতে নিয়ে যাও?'
অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম আমরা।
ধীরে-ধীরে হিলম্যান উইজার্ড চলে গেল।
দু-তিন দিন পরে একদিন চন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনি সে মীরাট চলে গেছে।

শ্রাবণ মাস। অসংখ্য স্কুল-কলেজের গরমের ছুটি চলছে এখন, তাই ছেলেবেলার সকল বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, দেশের পথেই। কেউ গবর্মেন্টি স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার, কেউ নেপালে প্রাইভেট টিউটর, কেউ মফস্বল কলেজের সিনিয়র প্রফেসর অব ইকনমিক্স, কেউ লখনৌ ইউনিভার্সিটির হিস্ট্রির লেকচারার, এলাহাবাদেও ম্যাথমেটিকসের প্রফেসর। শ্রীবিলাস নাগপুরের একটা কলেজের লেকচারার।
বললাম—'লেকচারার?'
—'বাতিটা একটু কমিয়ে দেবে শচীন।'
—'চোখে লাগে বুঝি?'
—'হ্যাঁ, তা ছাড়া এই হ্যারিকেনের ম্যাড়মেড়ে আলো দেখলে আমার একদম মন খারাপ হয়ে যায়।'
—'বাতিটা একেবারে নিভিয়ে দেব?'
—'তাই দাও, বরং একটা মোমবাতি কাছে রাখো, আছে মোম?'
—'বাবার কাছে একটা আছে বোধ করি; আমি নিয়ে আসছি।'
—'থাক, আনবার দরকার নেই এখন; জানালা দিয়ে বেশ জ্যোৎস্না আসছে। যদি মেঘ করে, অন্ধকার হয়, আলোর দরকার বোধ করি, তখন না হয় নিয়েসো।'
—'আচ্ছা।'
বাতিটা আমি নিভিয়ে ফেললাম।
—'না, না, এই টেবিলে রেখো না শচীন-কেরোসিনের গ্যাসে সমস্ত ঘর ভরে যাবে। শিগগির বাইরে রেখে এসো।'
লণ্ঠনটা বারান্দায় রেখে এলাম।
শ্রীবিলাস—'তোমার এই বেডচেয়ারে বড্ড ছারপোকা হে!'
—'তুমি এই বিছানায় বোসো না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'চুরুটের ছাই আর দেশলায়ের কাঠিতে বিছানা যা ভরে রেখেছ।'

—'বেশ বিছানা গুটিয়ে দিচ্ছি, মাদুরে বসবে?'

—'আর চেয়ার নেই?'

—'ছারপোকা সব চেয়ারেই।'

—'এই ডেকচেয়ারটা রিমডেল করো।'

—'ওটাকে একেবারে বিদায় দেব ভাবছি।'

—'দু'টাকার ক্যানভাস কিনে এনে একটা মিস্ত্রি ডেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঠিক করতে পারবে।'

শ্রীবিলাস—'এসব হ্যারিকেনের দস্তুর অনেক দিন হয় আমি উঠিয়ে দিয়েছি।'

—'তোমার ওখানে ইলেকট্রিক আলো বুঝি?'

—'নাঃ, ড্রয়িং রুমে একটা বেবি পেট্রোম্যাক্স থাকে, ডাইনিং রুমে আর একটা; শোবার ঘরে গ্যাস; পড়বার ঘরে ফিলিপ্টেস।'

—'আচ্ছা দেখব।'

—'বেশ নীল রঙের কিনতে পাওয়া যায় বাজারে।'

—'হ্যাঁ।'

—'আমাদের নাগপুরের কথা বলছি, এখানে কী পাওয়া যায় আমি জানি না, ক্যানভাস পাওয়া যায়?'

—'যেতে পারে—'

—'আর এই কাঠের বার্নিশ?'

—'রঙ লাগিয়ে নেওয়া যাবে।'

—'বার্নিশ নেই বুঝি?'

—'এখানকার বাজারে, কী জানি দেখি নি তো কোনোদিন।'

—'আমি সব সময়ই বার্নিশ লাগাই এ-সব জিনিসে।'

—'ছারপোকা কামড়াচ্ছে না তো আর?'

—'কামড়ালে নাচার; উপায় কিছু আছে?'

—'একটা খবরের কাগজ পেতে বসতে পারো।'

—'ভেলভেট দিয়ে মুড়ে দিলেও ছারপোকা মানবে?'

—তবুও খানিকটা রক্ষা পাওয়া যাবে; দেব খবরের কাগজের দু-খানা শিট?'

—'দাও।'

ভাল করে পেতে বসে শ্রীবিলাস—'প্রায় বছর দশেক পরে ক্যানভাসের ডেক চেয়ারে বসলাম।'

—'তোমার ওখানে বেতের আর্মচেয়ার বুঝি?'

—'প্রায় পনের-ষোলটা মেহগিনির চেয়ার রয়েছে; কুড়ি-পঁচিশটা সোফা, ইজি-চেয়ারগুলো বেতেরই প্রায় সব-এর চেয়ার নেই যে তা নয়-তবে তাতে বসা হয়ে ওঠে না আমার; বসলেও ছারপোকার অস্তিত্ব অনুভব করি না।'

—'বেশ ঝরঝরে তো তোমার আসবাবপত্র।'

—'আমার স্ত্রীর সতর্কতায়ই এই রকম; অরুন্ধতী।'

—'স্ত্রীর নাম অরুন্ধতী বুঝি?'

—'আমি বদলে অরুণা করে নিয়েছি।'

—'বেশ।'

—'সুন্দর নয়? একেবারে ও, কে।'

—'নাগপুরে কাজ নিয়ে গেলে কবে?'

—'সে তো প্রায় ছ-সাত বছর হয়ে গেল। ছুটিতে এদিকে আসতাম না।'

—'তোমাকে তো দেখি না অনেকদিন শ্রীবিলাস?'

—দেশে আমার আসা পড়ে না; মাঝে-মাঝে কলকাতা অব্দি আসি।'

—'কলকাতায় তো তোমাকে আমি দেখি না।'

—'কী করে দেখবে? আমি ফুটপাতে হেঁটে বেড়াই না তো।'

—'কোথাও যাও না বুঝি?'

—'যখন বেরোই মোটরেই যাই—'

—'ট্যাক্সিতে?'

—'প্রাইভেট কার আছে।'

—'তোমার নিজের?'

—'হ্যাঁ।'

—'ফোর্ড কিনেছ বুঝি একটা?'

শ্রীবিলাস মাথা নেড়ে—'না, অস্টিন।'

—'কলকাতাতে কোথায় থাকো?'

—'ঠিক নেই; ব্রিস্টল হোটেলে মাঝে-মাঝে গিয়ে থাকি, মাঝে মাঝে বালিগঞ্জে শ্বশুর মশায়ের সংসারে।'

—'আচ্ছা তুমি কি বিলেত গিয়েছিলে শ্রীবিলাস?'

—'না, তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এখানকার পি-এইট-ডি ডিগ্রী নিয়েছিলে?'

শ্রীবিলাস মাথা নাড়ে—'না।'

—'নাগপুরে ছ-সাত বছর ধরে লেকচারার?'

শ্রীবিলাস বাধা দিয়ে-

—'লেকচারার বলা উচিত নয়; আমি সিনিয়ার গ্রেডে। আমাদের গ্রেড হচ্ছে ২৫০ টাকা থেকে ৭৫০ টাকা, তারপর এফিসিয়েন্সি বার, তার পর বার'শ।'

—'বাঃ দিব্যি মাইনে তো।'

—'অনার্স পড়াই, এম-এ ক্লাসও পড়াই।'

—'ফার্স্ট ইয়ার পড়াও না?'

শ্রীবিলাস একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে—'তাও পড়াতে হয়। মোটের মাথায় আমার স্ট্যাটাস লেকচারের নয়, প্রফেসরের।'

—'হয়তো চেয়ার শিগগিরই পাবে?'

—'নাগপুর ইউনিভার্সিটির?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী লাভ তাতে?'

—'লাভ না হোক; সম্মান আছে—'

—'এখন কী কম মর্যাদা আমার? ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মতন স্ট্যাটাস, ওখানে সকলেই আমাকে তেমনি খাতির করে।'

—'ডেপুটির মতন?'

শ্রীবিলাস আত্মতৃপ্তির সঙ্গে মাথা নাড়ে।

বললাম—'একজন ডেপুটির আর কী গৌরব; শেষ পর্যন্ত দেখতে গেলে সামান্য জিনিস; তার চেয়ে তুমি আছে ঢের ভাল; শিক্ষা-দীক্ষা ইউনিভার্সিটির সম্পর্কে; বাঃ, বেশ জীবন তো তোমার!'

—'না, পড়াশোনা অনেক দিন হয় ছেড়ে দিয়েছি—'

—'ছেড়ে দিয়েছ, তা হলে এত সব ক্লাস পড়াও কী করে?'

—হ্যাট কোট টাই ঝুলিয়ে সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে ক্লাসে যাই, পিতৃপুরুষের কৃপায় লম্বা-চওড়া চেহারা ও ভাল গলায় চমকে দেবার মত কথা বলবার এলেম আছে; ছেলেরা ভাবে তাদের অর্ধেক কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমি ক্লাসে বসে-বসে সিগারেট ফুঁকলেই তারা খুশি।'

—'পড়াও না কিছু?'

—'হ্যাঁ, একটা এটাচি কেসে করে কয়েকখানা বই আর নোটের খাতা নিয়ে যাই; কোনো ক্লাসে গিয়ে গল্প করি শুধু; কোনো ক্লাসে মান্ধাতার আমলের লেখা নোট ডিকটেট করি; কোনো ক্লাসেই বা বই নেড়ে চেড়ে রিডিং পড়ে যাই-কিংবা হুমকি দিয়ে দু-চারটে বক্তৃতা দিয়ে আসি।'

—'ছেলেদের কাজ এগোয়?'

—'নিশ্চয়ই, আমাকে তারা বড় ভালোবাসে।'

আমার দিকে তাকিয়ে শ্রীবিলাস—'প্রফেসরের পড়ানোর ওপর নির্ভর করে পরীক্ষায় পাস করব, এরকম আহাম্মক ছেলে কোনো ইউনিভার্সিটিতেই দুটি-চারটির বেশি নেই। তারা হয় তো আমার কুৎসা কাটে; কিন্তু অধিকাংশ ছেলেই আমার চেহারা, আমার বোলচাল, আমার কথাবার্তাকে ফার্স্ট ক্লাস কোচিং মনে করে আবিষ্ট হয়ে আছে।'

—'বিলেত যাবে?

—'কে, আমি? কী দরকার?'

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে শ্রীবলাস, 'গেলেও ডিগ্রি আনতে যাব না অবিশ্যি, বেড়াতে যেতে পারি; ব্রাসেলস, প্যারিস, মন্টিকার্লো, সমস্ত ফ্রেঞ্চ আর ইংলিশ রিভিয়েরা, লেক ডিস্ট্রিক্ট, সুইজারল্যান্ড আলপস, ভেনিশ, ফ্লোরেন্স, রোম।'

—'দেশে ফিরবে ক-বছর পরে?'

—'এই বছর পাঁচেক।'

—'ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন সবই তো এইখানে?

—'এদের সঙ্গে আমার খাপ খয় না।'

—'খাওয়া-দাওয়ার সুবিধে হয় না?'

—'শুদু তাই নয়; এদের জীবন-ধারণ মতামত যুক্তি বিচার সমস্তই কেমন যেন আন্ডারডগিশ, বুঝলে শচীন, একেবারে নিরেট কোম্পানি। এমন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থেকে সাফার করছে এরা।

—'ছুটি তোমার কত দিন?'

—'সাড়ে তিন মাস-দু-মাসতো নাগপুরেই কাটিয়ে এলাম।'

—'ওঃ, ছুটির সময়টা ইউনিভার্সিটিতে বসে নিরিবিলি পড়াশোনা করলে বুঝি? কোনো থিসিস দেবে?'

—'ক্ষেপেছ বুঝি? ব্রিজ খেললাম, ক্লাব, ডিনার, টেনিস, বন্ধুবান্ধব মাঝে-মাঝে দু-চারটা সেক্স নভেল। তার পর আমার স্ত্রীটি। কয়েকটি পরকীয়া হল্লায় হুল্লোড়ে দুটো মাস যেন এক নিশ্বাসে কেটে গেল। কুলকার্নী বলে একজন ব্যারিস্টারের স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন খুব জমে উঠেছে, আমার বৈধ পত্নী আমাকে দেশের কথা মনে করিয়ে দিলেন। এলাম ভাই তাই তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু চুপ করে থেকে শ্রীবিলাস—'কই, সিগারেট দেওয়া হল না তো তোমাকে।'

কেস বের করে নাক কুঁচকে হাসতে-হাসতে—'তুমি খাও তো? না?'

—'সিগারেট? দাও তো।'

—'বেশ, নাও তা হলে; একটা নিলে শুধু? আচ্ছা কেস বন্ধ করি এখন?'

—'কারো।'

—'কতকগুলো টিনের মাংস এনেছিলাম; এরা কেউ খেল না, আমাকেও খেতে দিল না, পড়ে আছে; নিয়ে আসবে?'

—'আমি? কার জন্য আনব?'

—'তুমি নিজে খেতে পারো; তোমার বউ অবিশ্যি খাবে না?'

মাথা নেড়ে—'এই বর্ষায় কোনো জিনিসই পেটে সইছে না শ্রীবিলাস; বাজারের একটা সিঙ্গাড়া খেলেই অম্বল হয়; টিনের মাংস খাব কী করে।'

—'মিল্ক অফ মেগনেসিয়া খেয়ে দেখতে পারো।'

—'দেখা যাবে।'

—'এখানে থিয়েটার নেই?'

—'না। একটা সিমেনা হাউস আছে।'

—'দেখেছি। সেই নিরঞ্জন পাগলাটা চালাচ্ছে। একদিন আমাকে আর গিন্নিকে সেধে নিয়ে বক্স-এর পাশ দিয়ে এল, সন্ধ্যার সময় নিজে এসে নিয়ে গেল, গেলাম, পাঁচ মিনিট বায়স্কোপ দেখিয়েই রিল ছিঁড়ে লোপাট, অবিশ্যি ছ-মিনিটের মধ্যে মেরামত করে নিল আবারণ, কিন্তু আমরা রইলাম না আর-ইডিয়ট!'

শ্রীবিলাস জানলার দিকে তাকিয়ে—'এখানে কোনো ক্লাব টলাব নেই?'

—'কী রকম ক্লাব চাও শ্রীবিলাস?'

—'দু-একটা নমুনা বলো তো।'

—'কংগ্রেসের একটা ক্লাব আছে।'

—'ঠাট্টা? ওসব কংগ্রেসের ক্লাবের খবর শুনতে চাই না আমি।'

—'শ্রীবিলাস, কী এক কোম্পানি, কোথায়, তা বলতে পারি না। তবে তাদের একটা ক্লাব আছে, মাস ছয়েক আগে জে, এম, সেনগুপ্ত এসেছিলেন।'

—'বেশ করেছিলেন।'

—'এই ক্লাবেই তাঁর আড্ডা ছিল।'

—'চুলোয় যাক, আর কী রকম ক্লাব আছে?'

—'সাহিত্য পরিষদের একটা শাখা আছে।'

—'অবনক্সাস! আর?'

—'আর-একটা আছে কয়েকজন সাহিত্যিক মিলে।'

—'সাহিত্যিক তুমি কাদের বল?'

—'অবিশ্যি বিশেষ কিছু সৃষ্ট করে নি এঁরা; তবু দু-তিন খানা বই লিখেছে।'

—'কী বই?'

—'কবিতার; একজনে দু-খানা উপন্যাসও লিখেছে।'

—'তুমি মনে করো এই সব কবিতা [......] এর মতন?'

—'না, তত উচ্চদরের হতে পারে নি।'

—'হিলডা ডুলিটল কিংবা সিউওয়েল যে-রকম কবিতা লিখেছে তা এরা কল্পনাও করতে পারে?'

—'হয় তো নামও শোনে নি—'

—'আর উপন্যাস? জয়েসের ইউলিসিস-এর মতন হবে?'

—'দূর!'

—'কিংবা জয়েসের কোনো একখানা উপন্যাসের মতন?'

—'না, না, তা কী করে হয়।'

—'শ্রীবিলাস ভুরু কুঁচকে হাসতে-হাসতে—'রবিবাবু যখন নাগপুরে গিয়েছিলেন—'

—'[ ] তিনি নাগপুরেও গিয়েছিলেন নাকি?'

—'তখনও আমি তাঁর বক্তৃতা শুনতে যাই নি।'

—'কেন?'

—'অরুণা আমার পিঠের ঘামাচি মেরে দিচ্ছিল; এই জিনিসটাকেই বেশি মূল্যবান মনে হল তখন।'

—'কুলকার্নীর স্ত্রীটি তখনও বুঝি তোমার জীবনে আসে নি শ্রীবিলাস?'

—'তারপর যখন টেনিস খেলবার জন্য নামলাম, শুনলাম রবিবাবুর বক্তৃতা তখনও শুরু হয় নি। আর রবিবাবুর বক্তৃতা! শরীর ঠিক রাখতে হবে তো? টেনিস গ্রাউন্ডে চলে গেলাম।'

আমার হাতের সিগারেটটা জ্বালালাম।

শ্রীবিলাস—'তবুও রবিবাবু সাহিত্যিক, কিন্তু তুমি যে জীবকটির কথা বলছ এরা হয় সোস্যালিস্ট, না হয় অ্যানার্কিস্ট।'

—'কেন, এ রকম কথা তোমার মনে হয় কেন শ্রীবিলাস?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'নইলে মফস্বলে থেকে কেউ কবিতা ছাপায়, উপন্যাস লেখে?'

—'কেন টমাস হার্ডি তো লিখেছিলেন।'

—'কিন্তু টমাস হার্ডি মফস্বলে কোনো ক্লাব তৈরি করতে যান নি।'

—'ক্লাব সংঘ সমিতি এ-সব আধুনিক পৃথিবীর লক্ষণ।'

—'যাক, এসব বাছুরের সমিতিতে গিয়ে আমার কোনো লাভ নেই! এদের আদর্শ হচ্ছে মম কিংবা শরৎ চাটুজ্যে। ক্যাসানোভার নামও শোনে নি-ইডিয়টস!'

আমার দিকে তাকিয়ে—'এখানে ঘোড়দৌড় হয়?'

—'না।'

—'সময়টা কলকাতায় কাটালেই পারতাম।'

—'বেশ, মনগুনে রেস বলতে তো কলকাতায়।'

—'খবরের কাগজে দেখি চমৎকার অ্যাকসেপটান্স সব। আমি যে-ঘোড়াটা ধরেছিলাম কাল, গিন্নিকেও বলেছি, আজকের কাগজে দেখলাম সেই ঘোড়া যারা ধরেছে দশ টাকার টোটে নশ পঁচাত্তর টাকা পেয়েছে।'

—'বাঃ বেশ তো।'

—'চমৎকার সারপ্রাইজ; এবার ইচ্ছে ছিল ছুটিতে পুনায় যাই।'

—'পুনায় তো খুব রেস খেলা হয়?'

—'গিন্নিকে কাল রাতেও বলেছিলাম এবার এথিকস একটা কিছু করবে।'

—'এথিকস?'

—'মাটিমারের এথিকস নয়-স্যান্ডহার্স্ট প্লেটের এথিকস-একটা ঘোড়া-একটা বোমা।'

—'ঘোড়ার নামও এথিকস রাখে নাকি?'

—'চায়নিজ সেইন্ট রাখে, নাইটিংগেল রাখে, মাই মিসটেক, রেয়ার ওয়াইন, লিসিডাস।'

শ্রীবিলাস অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে—'স্যান্ডহার্স্টের খেলায় হাজার-হাজার পান্টারের দফা ঠাণ্ডা হয়েছে কাল।'

—'পান্টার কাকে বলে?'

জবাব না দিয়ে শ্রীবিলাস—'আবু হোসেনের অস্ট্রেলিয়ান ওয়েল্যার জিতল শেষে! অরুণাকে আমি দু-চারবার বলেছিলাম এথিকস কিন্তু আপসেট করতে পারবে।'

—'এখানে বসে বললে আর কী হবে? পুনার মাঠে গিয়ে যদি এথিকসকে ব্যাক করতে শ্রীবিলাস।'

—'আজ না হয় কাল করব; বুকমেকারদের ভারী ফুর্তি হয়েছে কাল।'

—'কেন?'

—'দু-দুটো ফেভারিটকে কড়কে দিয়েছে এথিকস,' নীরবে সিগারেট টানতে লাগল শ্রীবিলাস।'

আমিও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে—'এথিকস এই শব্দটা বললে দর্শন বিজ্ঞান মানুষের বোধ বিচার অনুশীলন সম্পর্কে কোনো কথাই মনে আসে না তোমার এখন আর?'

শ্রীবিলাস মাথা নেড়ে—'না।'

—'একটা ঘোড়াকে মনে হয় শুধু?'

—'হ্যাঁ।'

—'এ ঘোড়াটাকে দেখেছিলে তুমি?'

শ্রীবিলাস উত্তর দিল না—

অবাক হয়ে ভাবছিলাম চাইনিজ সেইন্ট বলতে কনফুসিয়াসের কথা মনে হয় কি ওর? কিংবা লিসিডাস বলতে মিলটনের কবিতার কথা?'

শ্রীবিলাস—'কলকাতায় টার্ফ ক্লাবের মেম্বার হয়েছি আমি।'

—'নাগপুরে ঘোড়াদৌড় হয় কেমন?'

—'বিশেষ না। সেই একটা অভাব রয়ে গেছে। তুমি ডার্বির টিকেট কিনেছিলে?'

—'না।'

—'ট্রান্সন্যাশন্যাল আইরিশ সুইপের টিকিট কিনছ না? আমি তো বরাবর কিনে আসছি, এগুলো আমার কমিটমেন্ট—পার্সেন্টেজ বা ইনকাম ট্যাক্স-এর মত। কিংবা লাইফ ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ামের মত। ভাগ্যবিধাতা, তার মানে দুর্ভাগ্যবিধাতাকে যেমন মাথা পেতে নিতে হয়, এগুলোকেও তেমনি নিয়েছি-হয় তো একদিন দেখব দু-তিন লাখ পেয়ে গেছি।'

—'হ্যাঁ, ও দেশের অনেক জুতাবুরুশ মেথর ধাঙরড়াও পায়; তুমি পাবে না কেন?'

—'এখানে অফিসারদের ক্লাব নেই?'

—'আছে, কেরানিদের একটা আছে।'

—'কী রকম কেরানি?'

—'গবমেন্টের। পঁয়ত্রিশ থেকে একশ পঞ্চাশ অবদি।'

—'সেখানে তো যাওয়া চলে না।'

—'তবে ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট জাজ যে-ক্লাবে যান, সেখানে যাও না।'

—'যেতে হবে একদিন; ব্রিজ খেলা হয় বুঝি? স্টেক থাকে?'

—'গিয়ে দেখলেই পারো।'

—'তুমি এখানে চুপচাপ বসে আছ, একটা ক্লাবের স্টুয়ার্ডও তো হলে পারতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'স্টুয়ার্ড অ্যাংলো ইন্ডিয়ান।'

—'বাঙালিকে করে না?'

—'আমার মত বাঙালিকে না।'

—'বড্ড ঠাণ্ডা বাতাস আসছে।'

—'একটা কম্বল দেই?'

—'আমার ওভারকোটটা, এই পাশের কোঠায় তোমার বাবার ঘর বুঝি-সেখানে ফেলে এসেছি। নিয়েসো তো।'

আনলাম।

ওভারকোট আমার হাতের থেকে জড়িয়ে নিয়ে শ্রীবিলাস—'ঠাণ্ডা লেগে আমার সে-বার নিউমোনিয়া হয়েছিল।'

—'নাগপুরে?'

—'হ্যাঁ, তারপর কানে কেমন পুঁজ জমল; নাকে-কানে কেমন সুড়-সুড় করে মাঝে-মাঝে ব্যথাও। আপাতত সেটা সেরে গেছে; কিন্তু চুলকুনিটা যায় না।'

—'ওঃ, নাক-কান এমনিই চুলকায়-ময়লা জমলে।'

—'না হে না, কানে কম শুনতে আরম্ভ করেছি।'

—'ডাক্তার দেখিয়েছিলে?'

—'হ্যাঁ, নাগপুরে আমার এক ফ্রেন্ড আছে-খাম্বারকার। লন্ডনের এম-আর-সি-পি, ঢের দেখল—টেখল তো, অনেক অষুধ-ফসুদ দিল, কলকাতায় এসেও স্পেশালিস্টদের দেখালাম, এই তো এ-বারও হাজারটি টাকা খসল, কিন্তু ডায়গোনেসিস কেউ করতে পারে না। অবশেষে এখন বললে যে এমনিই সেরে যাবে, আমি একবার বিলেতে গিয়ে দেখিয়ে আসব।'

—'নাক-কান সুড়-সুড় করে, এই তো শুধু?'

—'নাঃ, লন্ডনের ডাক্তারদের দেখিয়ে আসা ভাল।'

—'তোমার স্ত্রীরও বুঝি এই মত?'

—'হ্যাঁ, গিন্নি আবার আমাকে একা ছেড়ে দিতে চান না, নিজেও সঙ্গে যাবেন।'

—'তোমার স্ত্রীকে তো আমি দেখলাম না শ্রীবিলাস।'

—'একদিনও দেখো নি?'

—'না।'

—'বেশ লম্বা চওড়া মোটা। মোটা বলে কোনো লজ্জা নেই তার; আমিও ডিসকারেজ করি না, দিনরাত কফি-চকোলেট-দুধ-ওভালটিন খাচ্ছে, এক-কএটা টিন একদিনেই ফুরিয়ে যায়-ওমলেট, লুচি, কাটলেট নিজেই ভাজে নিজেই খায়, নানারকম ফ্যাট খায়। টিনের মাংস খায়, কলা যা খেতে পারে তা তুমি যদি দেখতে! ফাউল রোস্ট দু-বেলা তার জন্য দুটো চাই, দুটো আস্ত। তা ছাড়া মাটন আর বেকনের কাটলেট তো আছেই। খাচ্ছে, হজম করছে, মোটা হচ্ছে, হোক না, ডিসকারেজ করি না, আই নেভার ড্যাশ এন ওল্ড...'

—'তুমিও তো কম মোটা হও নি?'

—'ছ-বছর আগে আমাকে যারা দেখেছিল তারা তো চিনতেই পারে না'।

—'স্ত্রীটি তাহলে তোমার বেশ।'

—'প্লাম্প অ্যান্ড প্লেজান্ট।'

—'হ্যাঁ বেশ স্থূল!'

—'স্থূল মানে কী? কোর্স? নারীর পক্ষে কোর্স হওয়া তো চমৎকার। শরীরের এক-একটা জায়গা পিন কুশনের মত। চামড়া পালিস বিচ? রক্ত-মাংসের কোথাও কোনো নোংরামি নেই—হাত—পায়ের বগলের নিচের লোমগুলো ভিট সাফ করে ফেলেছে, সমস্ত গায়ে ক্যালিফোর্নিয়ান প্যাপির গন্ধ, সমস্ত শরীরটা যেন মিশরের একটা মাঠের মত-কোনো ফ্যারাও পাট্টা নিয়েছিল, উর্বর শস্য সেখানে জন্মাতে পারে, কিন্তু'

সিগারেটটা মুখে তুলে নিল শ্রীবিলাস।

—'তোমার ছেলেপিলে নেই?'

—'না, কমপ্যাসনেট ম্যারেজ। কনট্রাসেপশনের পদ্ধতি আমাদের দু'জনেরই খুব ভাল লাগে।'

—'গিন্নি এখানে এসেছেন—'

—'হ্যাঁ, এখানে এলে তার বড্ড বিপদ-একটা তো ভয়াবহ।'

—'কী রকম?'

—'সাইকেল নিয়ে এসেছেন; কিন্তু এ যেমন আকাট দেশ-চাঁড়াল চোয়াড় সব চারদিকে-মেয়েদের সাইকেল চড়বার জো নেই।'

—'পলাশগঞ্জের দিকে গিয়ে চড়লে পারে।'

—'নাঃ, এ ঘেন্না ধরে গেছে!'

—'আর কটা দিন-বাং, এর পরে তো নাগপুরে চলে যাবে।'

—'হ্যাঁ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচব—'

—'পনর দিনের জন্য এত লটবহর এখানে আনলে, মোটর অব্দি?'

—'মোটরটাই তো কাজে লাগল শুধু; সাইকেল, ক্যামেরা, টেনিসের সরঞ্জাম সমস্ত পচছে বসে-বসে।'

একটা সিগারেট বার করে শ্রীবিলাস—'নাগপুরে প্রফেসারদের সঙ্গে মিশে চমৎকার টেনিস খেলে অরুণা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বাঃ, টেনিসও খেলে বুঝি?'

—'মিক্সড ডাবলসে ওকে নেবার জন্য লোফালুফি।'

—'তা তোমার সঙ্গেই ভিড়ে যায় বুঝি শেষ পর্যন্ত মিকসড ডাবলসে?'

—'আই ডোন্ট কেয়ার। নাগপুরে কেউ-বা ওকে বেটি নাটহল বলে, কেউ বা উইলস মুডি।'

—'আর তোমাকে বুঝি বোরোট্রা বলে শ্রীবিলাস?'

ধীরে ধীরে মা এসে-'শ্রীবিলাস এসেছে বুঝি? থাক থাক, প্রণাম করতে হবে না, বসো।'

—'আপনিই-বা দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?'

—'তাই তো, কিছুক্ষণ ধরে যেন চেনা-চেনা গলা শুনছিলাম, ভাবলাম কে এল? তা তুমি শ্রীবিলাস। বাঃ, দিব্যি শরীর সেরেছে তো তোমার; কোথায় আছ এখন?'

—'নাগপুরে—'

—'নাগপুরে?' সে তো অনেক দূর!'

— '[ ] সেই আমার ঘরবাড়ি এখন; আপনাদের এ সব দেশকেই বিদেশ মনে হয়।'

—'অনেক দিন পরে তোমাকে দেখলাম শ্রীবিলাস।'

—'আর হয় তো জীবনে দেখবেন না।'

—'কেন শ্রীবিলাস?'

—'এমন হতচ্ছাড়া জায়গায় কেউ আসে; গিন্নি আমার সাইকেল নিয়ে এসেছে; এখানকার এসব || লোকদের জ্বালায় চড়বার জো নেই।'

—'তোমার বৌও এসেছে বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'দেখিনি তো তাকে কোনো দিন।'

—'আমার চেয়ে মাথায় চার ইঞ্চি বেশি লম্বা হবে, একটু বেধড়ক মোটা, ওজন সাড়ে তিনশ পাউন্ড প্রায়, গায়ের চামড়া কালই ছিল, পিয়ার্স্য ঘসে-ঘসে এখন চাইনিজ রেশমের মত হয়েছে-বাদামিও না, বেগুনিও না, তবে রেশমের মতই নরম, তেমনি পালিশ।'

—'একদিন গিয়ে দেখে আসব।'

—'তা যেতে পারেন; কিন্তু প্রণাম না করলে অভিমান করে ফিরে আসবেন না, হয় তো প্রণাম করবে না আপনাকে; হয় তো চিনতেই চাইবে না।

মা একটু হেসে—'অসাক্ষাতে ঢের নিন্দা করছ তো তার।'

—'নিন্দে নয়, এগুলো তার গুণ।'

—'যাক, একদিন গিয়ে আশীর্বাদ করে আসব।'

—'আশীর্বাদ তো করবেন; মাথায় হাত দেবেন কী করে শুনি?'

—'কেন?'

—'ঘাড় টান করে দাঁড়ালে নাগাল পাবেন না, আপনি তো কোমরের নিচে পড়ে থাকবেন।' মা চুপ করে রইলেন।

—'আপনাকে দেখতে গেলেই সে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে।'

—'কেন?'

—'ধান-দুর্বা নিয়ে যাবেন তো?'

—'একটা কিছু নিয়েই যাব।'

—'মনসার কাছে ধুনোর গন্ধ যা আপনাদের, আমার তার কাছে ঠিক তেমনি।'

—'শুনলাম সাইকেলে চড়তে পারেন।'

—'টেনিসও খেলতে পারেন বটে।'

—'নাচ শিখিয়েছ?'

—'বায়না ধরে উদয়শঙ্করকে দিয়ে শেখাতে; কিন্তু আমার মত মানুষের সাধ্যি কি তা? নইলে পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স করি? ছেলে নেই পিলে নেই, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তো, যাই বলুন মা, ভালোবাসার শেষ মাপকাঠি টাকা নয় কি?'

—'শচীনের স্ত্রীকে নিয়ে আসি।'

—'কেন?'

—'তুমি দেখবে।'

—'মাপ করবেন মা।'

—'কেন শ্রীবিলাস? দেখবে না?'

—'আমার স্ত্রীর নিষেধ আছে—'

—'কী রকম?'

—'নাগপুরের কুলকার্নী বলে একজন ব্যারিস্টারের স্ত্রীর সঙ্গে খানিকটা মিশেছিলাম।'

আমি—'থাক শ্রীবিলাস।'

শ্রীবিলাস—'ঘনিষ্ঠতা যখন পাকাপাকি হল আমার গিন্নি বললেন অবৈধ প্রণয় করছি, মিথ্যা বলে নি, সেই থেকে তার কাছে প্রতিজ্ঞা করে নিতে হয়েছে পরের স্ত্রীর মুখও দেখব না আর কোনোদিন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারের মধ্যে মাকে আর দেখা গেল না।

শ্রীবিলাস ওয়াটার-প্রুফ আঁটতে-আঁটতে বললে—'বাস্তবিক, এ আমার খুব আন্তরিক ক্ষোভ শচীন। নিজের ঘর ভাঙলে মানুষের কেমন লাগে! তবে, সে পরের ঘর ভাঙতে যায় কেন ওর স্ত্রীর পেটে যে সন্তান এসেছে, তার মুখের দিকেই-বা বেচারা কুলকার্নী কী করে তাকাবে? হয় তো জ্রূণেই নষ্ট করে ফেলবে! না হয় আঁতুড়ে গলা পিটে মেরে ফেলবে! কী বলো? পৃথিবীটা বাস্তবিকই বড় ভয়াবহ। জীবনের বিধাতা একজন নির্বোধ চামারের চেয়েও অক্ষম—অমানুষ।'

চলে গেল।

পরদিন দুপুরবেলা অঞ্জলি—'কাল তোমার কাছে কে এসেছিল?'

—'কাল সন্ধ্যার সময়? শ্রীবিলাস।'

—'কই, একে তো আর-কোনোদিন দেখি নি।'

—'এই পাঁচ বছর পরে দেশে ফিরেছে।'

—'কেন, এতদিন কোথায় ছিল?'

—নাগপুরে কাজ করে।'

—'কী করে?'

—প্রফেসার।'

—'প্রফেসার? এ-রকম হ্যাট, টাই, ওভারকোট কি প্রফেসাররা পরে?'

—'পরে না? কটা প্রফেসার দেখেছ তুমি অঞ্জলি?'

—'কেন, আমি তো বরাবর জানি তারা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সিল্কের চাদর গায়ে দিয়ে ক্লাসে যান।'

—'নাঃ, শ্রীবিলাস খুব উঁচুদরের প্রফেসার।'

—'মাইনে কত?'

—'এখন পাঁচশ পঞ্চাশ পাচ্ছে।'

—'তবে তো বেশ।'

—'বেশ বই কি—বললে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মত সম্মান পায়, আমি বললাম একটা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আর কতদূর কী মর্যাদা, তার চেয়ে তুমি ঢের ভাল আছ শ্রীবিলাস—'শিক্ষা-দীক্ষা ইউনিভার্সিটি কালচারের সম্পর্কে। যে কোনে ইনস্টিটিউশনে তোমার জীবন প্রণালীকে ঈর্ষা করতে পারবে।'

—'এর সঙ্গে তোমার আলাপ হল কোথায়?'

—'আমরা একসঙ্গে যে পড়েছিলাম অঞ্জলি।'

—'কলেজে?'

—'স্কুলেও, সে আজ প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের কথা। এখন যেখানে টেলিগ্রাফ অফিস পোস্ট অফিসের দালান কোঠা, সেখানে ভারি সুন্দর একটা খোলা মাঠ ছিল-আর তারই এক কিনারে এক সারি খড়ের ঘর। সেই ঘরগুলো কবে ভেঙে গেছে সব! সেই আমাদের স্কুলে ছিল। সে সব কথা মনে হলে চোখ বুঁজে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে।'

—'কেন?'

—'এই সেদিন চন্দ্রকান্ত বলেছিল, এক নিশ্বাসে কুড়িটা বছর কেটে গেল যেন; আবার একটা যদি নিশ্বাস ফেলি-তাহলে সেই বিশ বছর আগের পৃথিবীতে চলে যাওয়া যাবে? এই বলছিল সে। চোখ বুঁজে আমিও অনেক সময় এই কথাই ভাবি। হৃদয়ের এই অনুসন্ধান নিয়েই জীবনের যা একটু আনন্দ জমে ওঠে—জমে ওঠে যা একটু ঐকান্তিক বেদনা।

অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'এক সাথে স্কুলে পড়েছিলে, তিনি এত বড় হয়ে গেলেন?'

—'কে শ্রীবিলাস? হ্যাঁ খুব পরমন্ত ছেলে।'

—'শুধু পরের দোষ দিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না?'

—'আমারও শ্রীবিলাসের মত হতে হবে?'

—'ইচ্ছা করলেই কি আর হতে পারবে? পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা মাইনে পান; এতগুলো টাকা এক সঙ্গে কোনোদিন চোখেও দেখেছ?'

—'না-তা দেখি নি।'

—'উনি তো একমাসেই করেন, কিন্তু এক বছর বসেও এত কটি টাকা অর্জন করবার ক্ষমতা তোমার হবে কোনোদিন?'

—'দেখি, হয়তো ভবিষ্যতে.... ।'

—'থাক, চুপ করো, যা পারবে না, মিছেমিছি সে-কথা বলে মন ফেনাবার মিথ্যা চেষ্টা করো কেন? এতে নিজের হৃদয়ও আত্মগ্লানিতে ভরে উঠবে তোমার। অঞ্জলি চেয়ারে বসবে ভাবছিল, কিন্তু চেয়ারের হাতলের ওপর বসে রইল। বসলও না ঠিক, কেমন আন্তরিকভাবে ঠেশ দিয়ে রইল।

—'উনি কি বিলেত গিয়েছিলেন?'

—'না।'

—'তোমার মতন এম-এ পাস শুধু।'

—'হ্যাঁ।'

—'তবে ওর হল, তোমার হল না কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

—'শ্রীবিলাস এম-এ-তে ফার্স্টক্লাস পেয়েছিল।'
—'তুমি ফার্স্টক্লাস পেলে না কেন?'
—'আমি তো এম-এ দেবই না ভেবেছিলাম, বন্ধু-বান্ধবেরা ধরে বেঁধে—'
—'এ-রকম রুচিবিকার হল কেন তোমার? ইস, নিজের জীবনটাকে এ-রকম করে নষ্ট করে দিতে হয়।'
—'কয়েক নম্বরের জন্য ফার্স্টক্লাস পাই নি। বোধ হয় দশ কি বার—'
—'ছি, মোটে! এই দশটা নম্বরের জন্য তোমাতে আর ওতে এতখানি তফাৎ?'
—'কিন্তু ফার্স্টক্লাস পেলেও শ্রীবিলাসের মত সুস্বাস্থ্য আমার কোনো-দিনই হত না।'
—'কি করে বলো তুমি তা?'
—'শ্রীবিলাসের জ্বলজ্যান্ত চেহারা, সে আত্মতৃপ্তিতে কথা বলে, জীবনের প্রতি অগাধ বিশ্বাস তার; আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকলের চেয়ে ঢের বেশি, কায়ক্লেশে যারা পথে-পথে ঘুরছে তাদের মাড়িয়ে চলতে শ্রীবিলাস খুব ভালবাসে, জীবনটাকে যারা মাৎলার হাটে কিনে চেতলার হাটে চড়িয়ে বিকোতে পারে দিনে দু'শ বার করে, তাদের সঙ্গে শ্রীবিলাসের খুব বন্ধুত্ব-বরাবরই এই রকম।'
—'এ-রকম মানুষ না হলে বেঁচে থেকে লাভই-বা কি! নিজের ভালই যদি মানুষ না বুঝল! একটা ছাগলও গেরস্তের ঘরে ঢুকে ধান-যব খেয়ে যাবার বুদ্ধি রাখে। কিন্তু এক-একজন মানুষ হয় ছাগলের চেয়েও অধম।'
একটা ভারী নিশ্বাস ফেলে জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রইল অঞ্জলি। খানিকক্ষণ পরে আমার দিকে ফিরে—'দশটা নম্বর কম কী করে পেলেই বা-শুনি?'
—'চসারের পেপার খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'
—'এ-রকম হয় কেন? শ্রীবিলাসের তো হয় নি।'
—'সে তো বার বছর আগের কথা।'
—'হলই-বা! এ বার বছর সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো করলে, কিন্তু ভেবেছ ফুরিয়ে গেল! তা ফুরোয় না, কিন্তু সঙ্গে আর-একজন মানুষকে জোয়াল বইতে ডাকলে কোন হিসেবে, আমি অবাক হয়ে তাই ভাবছি—'
একটু চুপ থেকে—'কিন্তু তুমি তো বি-এ পড়ছ। পাস করে।'
—'পড়বার জন্যই কি তোমার এখানে এসেছিলাম?'
—'কিন্তু পড়বার জন্য তোমার আগ্রহের তো কোনো অভাব নেই।'
—'কুকুরের সাথে এঁটোচাটা যে ভিখিরির আর-কোনো উপায় নেই জেলে যাবার জন্যও তার আমার চেয়ে একটুও কম আগ্রহ? জেলে তবুও তার খানিকটা নিশ্চিন্ততা তৃপ্তি।'
—'মশারিকে তুমি যদি জেলের মত মনে করো।'
বাধা দিয়ে অঞ্জলি—'সংসারের লোক মনে করে ভালবেসে আমি তোমার কাছে এসেছি'— মাথা নেড়ে একটু হেসে—'যা খুশি ভাবুক গিয়ে, সত্য যা তা তো আমরা জানি। মনে করো বিয়ে করেছি, বৈধ পত্নী হয়েছি, সমস্ত বেদনার অন্তরালে প্রেম তো রয়েছে হৃদয়ে।'
—'কেই বা এ সব কথা মনে করতে যায়?'
—প্রেম যদি থাকত তাহলে অনেক অভাব-বেদনাকে অন্যথা করতে পারতাম বটে, কিন্তু সংসারের লোকের চোখ তো আর বিধাতার মত অন্তর্যামী নয়, আমার এই নির্বিবাদ কায়ক্লেশকে তারা মনে করে ভালবাসার ঐকান্তিকতা, আমার এই সহিষ্ণুতাকে তারা প্রেম বলে ভুল করে।'
একটু হেসে—'তোমার হৃদয়ে প্রেমের ক্ষমতা আছে একথা যদি তারা ভাবে, তাহলে তো তোমার গৌরব নষ্ট হয় না।'
—'কিন্তু তারা যা ভাবে তা ভুল।'
—'গৌরব বরং বাড়ে।'
—'কিন্তু তারা মিথ্যা কথা ভাবে।'
—'কেন, প্রেমের শক্তি তোমার নেই?'
ধীরে-ধীরে আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে একটু চুপ করে থেকে অঞ্জলি-'হৃদয়ে প্রেমের ক্ষমতা সব মেয়েদেরই আছে, কিন্তু আমাদের মত কয়েকটি দুর্ভাগা নারীই পথ খুঁজে পায় না,' এক-আধ মিনিট চুপ থেকে, 'কেনই-বা এমন জিজ্ঞেস করো তুমি? তোমার চেয়ে কেউ কি বেশি ভাল করে জানে এ চারটা বছর সংসারের পথে কী রকম অন্ধের মত ঘুরছি আমি।'
একটু চুপ থেকে হেসে-'আচ্ছা, আমি যদি বার নম্বর বেশি পেতাম!' অঞ্জলি পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল, কোনো জবাব মিলল না।
—'ধরো শ্রীবিলাসের মত ডিগ্রি নিয়ে শ্রীবিলাসের মত চাকরি করতাম যদি?'
প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে খানিক্ষণ চুপ করে রইলাম।
অঞ্জলি ধীরে-ধীরে মুখ তুলে—'তা তো হয় নি; তোমার জীবনে সে-সব হবার নয় কোনদিন।'
—'কিন্তু হতেও তো পারত; যদি হত?'
—'আমারও এমন ভবিতব্যতা যে যেখানে জীবনের দুঃখ ও আক্ষেপের শূন্যতা শুধু সেখানে আঁজলা হাতে করে এসে মাথা গুঁজবার জন্য হাজির হলাম।'
জানালার দিকে তাকিয়ে বট অশ্বত্থের জঙ্গলের ওপর অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চালিয়ে নিয়ে অঞ্জলি—'কেন, পথ কি আর ছিল না?'
আমি—'হয়তো ভবিষ্যতে শ্রীবিলাসের মতন আমারও কপাল খুলতে পারে।'
—'থাক্।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'খুলে যেতে পারে; বলতে পারা যায় না ভবিষ্যতে কার কখন কী হয়—' আশা-হতাশায় মেশানো এক নিশ্বাস ফেললে নারীটি।

বললে—'ছি, আর দশটা নম্বর যদি বেশি পেতে!'

চুপ করে ছিলাম।

—'শ্রীবিলাসের মতন চাকরিও কি না পেতে পারতে তাহলে?'

—'হ্যাঁ, সৌভাগ্যের জোরে পেতেও পারতাম হয়তো!'

—'নিজেকে যতই অবিশ্বাস কর তুমি-আমি কি জানি না তোমার শক্তি রয়েছে?'

—'তোমার মুখে এ-রকম কথা শুনলে বড় আশ্বাস পই অঞ্জলি'—কেমন ছেঁদো কথার মত শোনালো আমার মুখের কথা। প্রাণের থেকে তো বলি নি। কিন্তু নারীটি অভিনয় করল না।

বললে—'তাহলে আমাদের সংসার কত সুখের হত বলো তো, দেখি?'

—'তা তো ঠিকই।'

—'জীবনকে অন্ধ বলে অশ্রদ্ধা করবার কোনো প্রয়োজনও হত কি?

—'না, তা কী করে হত?'

ধীরে-ধীরে আমার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে অঞ্জলি—'এই যে অনেক সময় তোমাকে ব্যথা দিয়ে কথা বলি, সেই সবেরও কোনো দরকার হত না।'

একটা নিশ্বাস ফেলে সে বললে—'নারীত্ব প্রেম (জীবনের) সমস্ত (গভীর) জিনিসই যেন টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলতে পারা যায় এমনই একটা দীনতা থাকে মনের ভেতর; আমার মনে হয় নিঃসম্বল সংসারের প্রত্যেক বধূর জীবনেই এরকম জীর্ণতা থেকে-থেকে উঁকি দিয়ে যায়। যায় না?' এই রকম বর্ণবিচিত্র পুতুলের মত কথা বলে যেতে লাগল সে। কিন্তু একটা কথাও কলের মত নয়, নারীর সার্বভৌম আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার ঐকান্তিক উক্তি।

প্রেম তার খাদ্য নয়, ঘৃণাও নয়; খাদ্য তার সুব্যবস্থিত সুন্দর সংসার; এই সোনার সিঁড়িতে সে অনন্তকাল হাঁটতে পারে-একটি অজ্ঞান নির্বোধ পুরুষকে সঙ্গী করেও।

—'শ্রীবিলাসকে দেখলাম কাল।'

—'দেখেছিলে বুঝি!'

—'হ্যাঁ।'

—'কী করে?'

—'বেড়ার ফাঁক দিয়ে।'

—'ওঃ, তুমি বেড়ার পেছনে দাঁড়িয়েছিলে?'

—'মানুষের মতন দেখতে বটে।'

—'কে? শ্রীবিলাস? বাংলার বাইরে বাঙালিরা চেহারার গর্ব বজায় রেখেছে। এদের প্রতিনিধিত্বে আমাদের গৌরব মারা যাবে না।'

—'দেখলাম সাহেবি পোশাক পরে এসেছেন।'

—'হ্যাঁ, তসরের স্যুট পরে এসেছেন।'

—'বেশ মানাচ্ছিল।'

—'সব স্যুটেই ওকে মানায়।'

—'মানাবে না-পুরুষমানুষ বটে তো।'

—'হ্যাঁ, প্রায় সাড়ে চার হাত লম্বা, শরীরও আজকাল আগের চেয়ে ঢের সেরেছে।'

—'মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে ভাবি একটা টাইও কি তুমি বাঁধতে পার?'

—'কে, আমি? বাঁধি নি অবিশ্যি কোনোদিন।'

—'কোনোদিনই না?'

—'না।'

—'যখন সেই নিউজ পেপারে কাজ করতে?'

—'ধুতি-চাদর পরে যেতাম।'

—'সাহেবি পোশাক পরবে ইচ্ছা হয় নি কোনোদিন?'

—'সে ইচ্ছে যে কত হাস্যাস্পদ নিজেই স্থিরভাবে চিন্তা করে অনেকবার বুঝেছি তা।'

—'কেন স্যুট কিনবার পয়সা কুলোয় নি?'

—'না, তাই শুধু নয়।'

—'তবে?'

—'সাহেবি পোশাকে আমাকে একেবারেই মানায় না অঞ্জলি—' একটু চুপ থেকে—'হয় তো ফ্লোরিডার নিগ্রোদের মত দেখাবে।'

বলেছিলাম একটু মজা করে, কিন্তু শুনে আঘাত পেল; দেখলাম মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে অঞ্জলির।

একটা ঢোক গিলে—'কেন রং তো তোমার কালো নয়।'

—'না, কালো বিশেষ নয়।'

—'তবে, নিগ্রোদের সঙ্গ নিজের তুলনা দাও কেন?'

—'না তুলনা নয়, একটু আমোদ করে বলেছিলাম।'

—'এ-রকম আমোদ করতে যেও না, নিজেকে নিগ্রো-কান্তি বললে আমার কী রকম খারাপ লাগে বোঝ না কি তুমি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখের মৃদু হাসি ধীরে-ধীরে গুটিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইলাম। অঞ্জলি—'স্যুট কিনবার পয়সা যদি থাকত, তা হলে স্যুটের মত স্যুট পরলে তোমাকেও খাপছাড়া দেখাত না; ঠিকই মানাত।'

খানিকক্ষণ পরে আমার দিকে তাকিয়ে—'চুপ করে রইলে যে!'

—'আসল কথা, ইচ্ছে করে না আমার এই সব পরতে।'

—'সে হলে আলাদা কথা।'

একটু চুপ থেকে বললে—'কিন্তু দরকার হলে পরতে হবে তো!'

—'তা তখন পরব বই-কি।'

—'টাই বাঁধা শিখে নিও।'

—'আচ্ছা।'

—'একটা তসরের স্যুট কেনো, বেশ দেখাবে।'

মাথা নেড়ে—'কিনব।'

—'আর কী ভালো স্যুট আছে?'

—'পামবিচের আছে-পপলিনের আছে—'

—'এই সবের থেকে বেছে-বেছে একটা কেনো, সোলার টুপি মাথায় দিও না। শ্রীবিলাস যে-রকম টুপি পরে এসেছিলেন, সেই রকম টুপি পরো—'

—'ফেল্ট হ্যাট?'

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা!'

—'আমিও অনেক সময় ভাবি আমাদের বাঙালিদের পক্ষে ধুতি-চাদর ভাল-হ্যাঁ খালি গায়ে কাঁধে একটা চাদর ফেলে চলতে আমার সবচেয়ে পরিতৃপ্তি লাগে অঞ্জলি।

অঞ্জলি চুপ করে ছিল।

বললাম—'চাদরটা না হয় সিল্কেরই হল; আমার বেশ ভাল লাগে কিন্তু অঞ্জলি।'

অঞ্জলি একটু হেসে—'হাতে একটা বাঁশের লাঠি থাকবে।'

—'মন্দ কি?'

—'বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভটচার্যির মত মন্ত্র আওড়ে বেড়াবে।'

—'না, ততটা দূর নয়।'

—'কেন?'

—'জীবনটাকে একেবারে জলে ফেলে দেই নি তো!'

—'এ কি জলে ফেলে দেওয়া হল নাকি?'

—'আমি তো তাই বলে মনে করি।'

শুনে ভরসা পেল অঞ্জলি।'

বললে—'দেখ, খবরের কাগজে আবার কোনো চাকরি পাও না কি?'

—'তাই দেখব।'

—'গতবার কত মাইনে ছিল?'

—'পঞ্চাশ!'

—'এবার চল্লিশ পেলেও নিও।'

—'আচ্ছা।'

—'মোট কথা নিতেই হবে; এরকম লাঞ্ছনা নিয়ে আর-বেশিদিন চলে না।'

—'সবই তো বুঝি, আমি সব বুঝি।'

অঞ্জলির আঁচল খসে পড়ে ছিল, উঠিয়ে নিতে-নিতে বললে—'এমন কি পঁয়ত্রিশ টাকা—'

—'হ্যাঁ, তা পেলেও নেব।'

—'বাংলা কাগজে পেলেও ভাল হয়-তাই নিও।'

—'নিশ্চয়ই।'

—'বাংলা আর্টিকেল লিখতে আর কী?'

—'অবিশ্যি ইংরেজি আর্টিকেল লিখতেই সুবিধা পেতাম আমি।'

—'কিন্তু বাঙালির ছেলে বাংলা লিখতে কষ্ট হবে না তো কিছু।'

—'না, কষ্ট আর-কী হবে অঞ্জলি।'

—'নিও।'

—'কেউ যদি দয়া করে সে-কাজ দেয়, নেওয়ার জন্য আমি সব সময়ই প্রস্তুত।'

—'পঁয়ত্রিশের কম দেবে না?'

—'সেই রকমই তো মনে হয়।'

আমি—'কালীঘাটের দিকে একটা ঘরের আর কত ভাড়া হবে-সাত-আট টাকা?'

—'হ্যাঁ-ছ-সাত টাকায়ও পাওয়া যেতে পারে।'

—'ব্যস, আর বাকি আটাশ-উনত্রিশ টাকা রইল; আমাদের দু-জনের বেশ চলে যাবে না তাতে?'

—'সে-রকম গিন্নির মতো চালালে কিছু বাঁচাতে পারবে হয় তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমার গিন্নিপনায় তোমার অবিশ্বাস আছে না কি আবার?'

দেখলাম অভিমান ভরে আমার দিকে তাকিয়েছে।

ধীরে-ধীরে অঞ্জলির মাথায় চুলে হাত বুলাতে বুলাতে—'একবার চাকরি পেলে তুমি আমাকে অনেক পরিপূর্ণতা দেবে; সে কি জানি না আমি?' আঁচলের খুঁট দিয়ে ধীরে ধীরে চোখদুটো মুছে নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অঞ্জলি ইঙ্গিতপূর্ণভাবে একটু হাসল।

কীসের ইঙ্গিত?

অনেক কিছুরই হতে পারে। ঘাড় হেঁট করে ভাবছিলাম। অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম শাড়ির কমলা পাড় তর্জনীতে জড়িয়ে-জড়িয়ে কী যেন ভাবছে, মুখের ভিতর অভিযোগ নেই আর, বেদনা নেই, কেমন একটা বিষণ্ণতা ফুটে বেরচ্ছে যেন, কেমন দুষ্টুমির হাসি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে-'শ্রীবিলাসের স্ত্রী টেনিশ খেলেন বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাই বলছিলেন শুনছিলাম।'

—'খেলবে তুমি?'

—'কে, আমি!'

—'র‍্যাকেট কিনে দিতে পারি।'

—'বড় দায় পড়ে গেছে আমার।'

—'কেন, মেয়েরা তো আজকাল অনেকেই খেলে।'

—'খেলুক গিয়ে; কিন্তু আমার খেলতে গেলে জন্মান্তর নিতে হবে।'

—'না এমন কিছু শক্ত জিনিস নয়, একটা র‍্যাকেট হাতে নিয়ে।'

—'তুমি নিজেই (কি) খেলতে জান?'

—'অভ্যাস করলে পারি।'

অঞ্জলি হো হো করে হেসে উঠল।

—'যখন কলেজে পড়তাম—'

—'একদিনও খেলো নি!'

—'খেলা দেখেছি অবিশ্যি ঢের; মার্কাস স্কোয়ারে, উডবার্ন পার্কে।'

—'দেখেছ তো; কিন্তু নিজের হাতে একখানা র‍্যাকেট তুলে ধরেছ?'

—'বেশ ভারী; খেললে যে দস্তুর মতন একসারসাইজ হয় তা বেশ বোঝা যায়।'

অঞ্জলি একটু মুখ টিপে হেসে-'চিরকাল বই পড়েই গেলে—'

বলে একটু গম্ভীর হয়ে জানালার ভিতর দিয়ে দূর অস্পষ্টতার দিকে তাকাল।

আমার মুখের দিকে আবার তাকিয়ে—'দেখো তো একজন মেয়েমানুষ কেমন সুন্দর টেনিস খেলতে পারে। ভাল টেনিস খেলার জন্য সবাই নাকি তাকে নিয়ে লোফালুফি করে?'

—'হ্যাঁ, মিক্সস ডাবলসে?'

—'মিক্সড ডাবলস কাকে বলে?'

—'একদিকে একজন পুরুষ ও একটি মহিলা, বিপক্ষে আর-একটি পুরুষ ও আর-একজন মহিলা।'

উপলব্ধি করে নিয়ে অঞ্জলি—'নাগপুরে শ্রীবিলাসের স্ত্রীকে কার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয় যেন বললেন উনি?'

—'বেটি নাটহল এর সঙ্গে!'

—'সে কে?'

—'একজন ইংরেজ নারী, বেশ ভালো টেনিস খেলতে পারে।'

—'শ্রীবিলাসের স্ত্রী সাইকেলও চড়তে পারে, না?'

—'হ্যাঁ।'

—'বাবা, আমি তো কল্পনাও করতে পারি না।'

—'তুমিই যদি শ্রীবিলাসের স্ত্রী হতে তোমার আজকের এ অভাব-দুরবস্থার কথা ধারণাও করতে পারতে না।'

অঞ্জলি শিহরিত হয়ে উঠে আমার দিকে তাকাল।

—'টেনিস খেলতে পারতে, সাইকেল চড়তে পারতে, কাটলেট-চকোলেট রাঁধতে পারতে, ফ্যাট খেতে পেতে, টিনের মাংস খেতে।'

—'টিনের মাংসা কী?'

—'গোরু শূয়োর মুরগি পাখির মাংস।'

দেখলাম দুটো হাত কাঁটা দিয়ে উঠেছে, জানালার কাছে থুতু ফেলে এল।

—'এই মোটা মেয়েটিকে শ্রীবিলাস ভালবাসেন?'

বললাম—'সে রকম জীবন পেলে এ রকম ডাঁটিভাঙা শুকনো রজনীগন্ধার মতো হয়ে পড়ে থাকতে না তো, বর্ষাকালের কল্মার ঝাড়ের মত অণুতে পরমাণুতে জীবনকে আদায় করে ছাড়তে-শ্রীবিলাস বললে নারীর পক্ষে স্থূল হওয়া ভারী চমৎকার।'

—'শ্রীবিলাস তো বললে-কিন্তু তুমিও কি তাই বলো?'

—'করবীর করুণ একখানা শাখার পুষ্পিত রূপ; তা নিয়ে কবিতা লেখা যায়, ছবি আঁকা যায়, কিন্তু আটপৌর জীবন চলে কি না-আচ্ছা তোমার কি মনে হয়?'

করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, বললে—'আমাকে ব্যথা দিতে তোমার ভাল লাগে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'জীবনের কবিত্ব ও শিল্পের দিক দিয়ে ঠাট্টার জিনিস তুমি নও তো অঞ্জলি।'

—'যাক, জানি আমার রোগা শরীর তোমার ভালো লাগে না।—আচ্ছা একটা কথা আমাকে বলবে? শ্রীবিলাস আমাকে দেখতে চাইল না কেন?'

—'থাক-সে কথা শুনে তোমার কাজ নেই—'

—'বলবে না?'

—'শুনলে তোমার কোন লাভ হবে না।'

অঞ্জলি একটু হেসে—'কিন্তু না বলে চেপে রাখলে আমিও তো একটা অভাব বোধ করব; সে অভাবের ব্যথা তো কম নয়।'

—'দেখা করে নি; শ্রীবিলাস মর্জির মানুষ-নিজের মর্জি মত চলে।'

—'এই শুধু? আর কিছু নয়?'

—'আবার কী থাকবে!'

—'ঐ যে যাবার সময় কী বলে গেল!'

—' একটু -একটু শুনেছি।'

—'ও-সব সত্যি নয়-বানিয়ে বলেছে।'

—'বানিয়ে বলে কী লাভ?'

—'ঐ একরকম লোক আছে এই ধরনের গল্প বানিয়ে আসর জমাতে খুব ভালবাসে।'

—'কিন্তু তোমার মা তো সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন—'

—'কই শেষ পর্যন্ত ছিলেন না তো—'

—'কিন্তু গোড়ার দিকে ছিলেন তো—তার সামনেও এমনি সব কুৎসিত ইঙ্গিত করতে দ্বিধা করল না?'

—'শ্রীবিলাস আলাদা জগতের মানুষ; বুঝবে না তাকে তোমরা—'

—'কিন্তু যা বললে বাস্তবিক যদি সত্যি হয়!'

—'না। সত্যি নয়।'

জানালার ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইল অঞ্জলি-তার পর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে-'শ্রীবিলাস সত্যি বলেছে কি মিথ্যা বলেছে তা জানি না-কিন্তু সংসারে এ-রকম অনেক হয়-' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে-'আমি এখন ঘুমোব-তুমি যাও—।'

বিরস মুখে চোখ বুজে রইল।

নিজের জীবনের সবটুকু কথা সে আমাকে কোনোদিনও বলে না।

দু-তিন দিন পরে—আমাদের বাসার থেকে দু-তিনখানা বাড়ির পর, রামতারণ ঠাকুরের বাড়িতে, একটা শ্রাদ্ধর আয়োজন চলছিল। বেলা দশটা সাড়ে দশটা হবে। আমাদের বাড়ির সব লোক, অঞ্জলি, এমন কি বাবা পর্যন্ত সেখানে চলে গেছেন।

শ্রীবিলাসের কাছ থেকে দু-তিনখানা বই নিয়ে এসেছিলাম-একখানা কবিতার বই, বাকি দুটো সমালোচনার। বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে কবিতার বইটা পড়ছিলাম।

পড়তে-পড়তে চোখে পড়ল—

Have I a wife? Be damn I have.
But we were badly mated;
I hit her a great dart (?) one night.
And now we are separated.
And mornings going to work
I meet her on a quay:
"Good morning to ye, ma'am". says I.
"To hell with ye"! says she.

পড়ে ভারি আমেজ লেগে গেল।

বইটা বন্ধ করা যাক; আর পড়বার দরকার কী? চুরুটটা জ্বালিয়ে বহুদূরের অশ্বত্থ, আম, বাঁশ, বেতের নীলাভ সবুজের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম—

মিনিট পনের পরে চেয়ে দেখি, খাকির প্যান্ট-কোট পরা পোস্ট-আফিসের পিয়ন আমারই দিকে এগিয়ে আসছে।

চিঠি এল হয়তো। কার?

কাছে এসে দাড়িয়ে—'আপনার নামই তো শচীনবাবু—'

—'হ্যাঁ, চেনই তো।'

—'তবুও-একটু সাবধান হতে হয়—'

—'কেন, বলো তো?'

—'আমার নামে একটা ইনসিওরেন্স আছে—'

—'আমার নামে? না বাবার?'

—'আপনার নামেই।'

খামখানা হাতে তুলে দেখলাম-আমারই নাম, আমারই ঠিকানা বটে।

—'ইনসিওর কে করল আবার?'

—'তা আমি কী করে বলব? পাঁচ টাকার এম-ও-ওতো আসে নি কোনো দিন আপনার নামে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এর ভিতর টাকা? না ইনসিওর করে যামিনী রায়ের ছবি পাঠিয়েছে?'

—'খুলে দেখুন।'

সাইন করে পিয়নকে বিদায় দিলাম।

দশটাকার দশখানা নোট। সঙ্গে একখানা চিঠি।

রাঁচি

স্নেহাস্পদেষু

আমি কয়েকদিন যাবৎ দরকারি হিসাবপত্র মিলাইতেছি। যাহার-যাহা পাওনা চুকাইয়া দিতেছি। খুচরা কাগজপত্র নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলাম কতকগুলি ছোটখাট খুচরা ঋণ মিটাইয়া দেওয়া হয় নাই। লাক্ষার (কিংবা চায়ের) ব্যবসা সম্পর্কে কলকাতায় তোমার নিকট হইতে একবার একশত টাকা নিয়াছিলাম; দেখিতেছি সে টাকাটা তোমাকে এখনও ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। মূল টাকাটা তোমাকে আজ ইনসিওর করিয়া পাঠাইয়া দিলাম। তোমার নিকট হইতে যখন টাকাটা লইয়াছিলাম—সুদ দিবার কোনো কড়ার ছিল না। তবুও, টাকাটা এতদিন ফেলিয়া রাখিব তাহাও তুমি ধারণা করিতে পার নাই। এক্ষেত্রে কিছু সুদ যদি তুমি প্রত্যাশা কর, অন্যায় নয়। লাক্ষার ব্যবসায় আমার লাভ কিছু হয় নাই; বরং লোকসানই গিয়াছে। তবুও বিচার-বিবেচনা করিয়া তোমার এ টাকার বাবদ বৎসরে শতকরা সাড়ে চার টাকা হিসাবে সুদ ধার্য করিলাম। চক্রবৃদ্ধি সুদের কথা যদি উল্লেখ করো, তাহা হইলে আমি এই বলিব যে এক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেওয়া চলে না। তুমি যে আমাকে টাকা দিয়াছিলে তাহার কোনো দলিলপত্রও নাই; আমার বেশ মনে আছে স্ট্যাম্পে সই করিয়া টাকাটা নেওয়া হয় নাই। যাক, সে সব কথার উল্লেখ করিতে চাই না আমি। টাকাটা আট বছর আগে নেওয়া হইয়াছিল; সুদ বাবদ তোমার নিট প্রাপ্য একশত ছত্রিশ টাকা। একশত তোমাকে আজ পাঠাইলাম; আর কয়েকদিন পরে ছত্রিশ টাকা পাঠাইয়া দিব।

আশা করি কুশলে আছ।

ডাক্তাররা বলেন আমার গলস্টোন হইয়াছে। একবার কলিকাতায় গিয়া উত্তমরূপে চিকিৎসা করাইতে হইবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

ইতি তোমাদের রজনীকান্ত খাসনবীশ

'ওঃ রজনীবাবু!—'

লাক্ষা চা—অনেক কিছুর ব্যবসাই করতেন বটে; ব্যবসা করে টাকাও জমিয়েছেন যথেষ্ট; আট-দশ বছর আগে কলকাতায় মাঝে-মাঝে তার সঙ্গে দেখা হত বটে আমার। কিন্তু তাকে কোনোদিন দশ টাকা দিয়েছি বলে তো মনে পড়ল না।

ডেক চেয়ারে বসে আট বছর আগে কলকাতায় দৈনন্দিন জীবনটাকে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খতিয়ে-খতিয়ে দেখলাম, অনেকবার দেখলাম, ঘণ্টা দুই কেটে গেল কিন্তু রজনীকান্ত খাসনবীশের এ-চিঠির কোনো ভাবার্থই আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

বাস্তবিক, একশ টাকা তিনি কোনোদিনও আমার কাছ থেকে নেন নি; রাজনীর ব্যবসার সঙ্গে কোনোভাবেই আমি কোনো দিনও লিপ্ত ছিলাম না।' দু-চার টাকা মানুষকে মাঝে-মাঝে ধার দিয়েছি-নিয়েছি বটে, কিন্তু আমার দেনা-পাওনা এ সংখ্যার উপরে যায় নি কোনো দিন।

চিঠিটা বারবার পড়ে হাসি পেতে লাগল আমার।

এ মানুষটির উদ্দেশ্য কী? তিনি আমাকে এমনিই একশ টাকা দিতে চান? যদি তা আমি না গ্রহণ করি সেই জন্যই এই চিঠির সৃষ্টি? কিন্তু রজনী সে রকম জাতের লোক নন তো। তিনি হিসাবি মানুষ, বিষয়ী। কল্পনা বা হৃদয় নিয়ে খেলা করবার দোষ তার কোনোদিনই নেই। ভুল করেছেন! হয়তো অন্য কারো প্রাপ্য ভুলে আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। তাই হবে হয় তো, কিন্তু খামখানার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—নাম-ঠিকানা সমস্তই অকাট্য, জেলা পোস্ট অফিস, বাবার নাম-কোথাও একটুও খুঁত নেই। সমস্তই পরিষ্কার, নিরেট।

কিন্তু তুবও এ-টাকাটা আমার নিজের অর্জিত জিনিস বা প্রাপ্য সম্পত্তি নয়। টাকাটা ফিরিয়ে দেব?

বাবার কাছে সমস্ত খুলে বলব?'

মার কাছে?

অঞ্জলির কাছে?

রজনীকে একখানা চিঠি লিখে জানাব যে তিনি সম্পূর্ণ ভুল করেছেন, আমার কাছ থেকে কোনো টাকা কোনোদিন তিনি নেন নি—এ টাকাটা আমি তার কাছ থেকে পাই না?

অবিশ্যি একটা কথা ঠিক। এ টাকাটা যদি আমি রেখে দেই, তাহলে ব্যবহার করতে পারি। আইনে কোথাও বাধে না।

অবিশ্যি নীতিতে বাধতে পারে। কিন্তু নীতির মানেও তো বিচিত্র।

রজনীর অজস্র টাকা আছে, একটি টাকা তার কাছে নদীর জলে শিশিরের ফোঁটার মত। আমার এক পয়সাও নেই, অঞ্জলি চার পয়সার জর্দা কিনতে চেয়েছিল, দিতে পারিনি। বায়স্কোপ দেখতে চেয়েছিল—তার সিঁদুরের কৌটোর টাকা দুটো নিয়ে নিতে হয়েছে। এ একশ টাকার মূল্য আমার কাছে অপরিসীমঃ এ টাকা দিয়ে আমি বিচার-কল্পনার অনুশীলন করতে পারব কয়েকখানা বই কিনে, আমার নিজের কঠিন জীবনের জীর্ণতাকে খানিকটা সুস্থ ও সুন্দর করে তুলতে পারব দু-এক জোড়া কাপড়-জামা ও জুতো কিনে, মাকে ও বাবাকে কয়েকখানা নতুন কাপড় কিনে দিলে নিরপরাধ পরিতৃপ্তির কল্যাণ আস্বাদ করতে পারা যাবে। অঞ্জলিকে সেই বুটিদার শাড়িটা কিনে দেওয়া যাবে। কয়েক শিশি জর্দা কিনে দিতে পারব, এক জোড়া [...]-র জন্য প্রায় বার বছর ধরে বলে আসছে, কিনে দেওয়া যাবে—তার মলিন বিরস [জীবন দেখবার] অভ্যাস ও অন্ধকারে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা, কয়েকদিনের জন্য প্রসন্ন জীবনের নিচে ধুলো হয়ে ছাই হয়ে থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীতে চৌত্রিশটা বছর কাটালাম। অনেক বই পড়েছি, অনেক মতামত বুদ্ধিবিচারের সংঘর্ষে এসেছি, অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে—তারপর দেখলাম সাধারণের পক্ষে আমি কোনো দিক দিয়েই চলি না। সকলে বিধাতাকে বিশ্বাস করে, অন্তত তাকে মঙ্গলময় বলে, আমি সৃষ্টির সম্পর্কে আমার ব্যথিত সমস্যা নিয়ে দিন কাটাই। সকলের জন্য সম্পদ রয়েছে, সমাজের নীতি ও ধর্ম রয়েছে অচলপ্রতিম শামুকটির মত। সে অচলতা আমার চোখে পড়ে না। নিষিদ্ধ পথে ফিরি, নিষিদ্ধ কথা ভাবি, অবৈধ প্রশ্ন তুলে বেড়াই।

রজনীর এ টাকা আমার জীবনের সম্পর্কে আমার কাছে বৈধ বলে মনে হল। যেদিন থেকে মানুষ আনন্দ, দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি, মমতা প্রেম, কল্যাণ সমস্তই টাকার বিনিময়ে কিনতে শিখল, বিক্রি করতে শিখল সেদিন থেকেই নারীর হৃদয়ের ঐকান্তিক শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে গেছে। কবি নষ্ট হয়ে গেছে, প্রেমিক নষ্ট হয়ে গেছে—প্রশ্নহীন দ্বিধাহীন ভালবাসা পেতে হলে তাই সভ্যতার বাইরে বহুদূরে গিয়ে কোনো বনের বালিকাকে খুঁজে পেতে নিতে হয় কিংবা চিতা বাঘিনীকে; কিংবা সভ্যতার ভিতরে একটা কুকুরকে

—'কিংবা—'

এরা টাকার মানে জানে না, ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি ও মঙ্গলকে অকল্পিত-ভাবে নিঃসঙ্কোচ সম্পূর্ণতায় জীবনের পথে বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতা এদের আছে তাই। এরা টাকার মানে জানে না। আমাদের অভিসারিকারা, নারীরা, কবিরা, প্রেমিকরা সকলেই জানে। জানতে আমারও বাধা কী? কাউকে কিছু বলতে গেলাম না আমি। একশ টাকা নিজের কাছে রেখে দিলাম। পিয়ন যখন এসেছিল তখন বাবা বা অঞ্জলি ছিল না যে এ বেশ ভরসার কথা। অঞ্জলিকে তবুও একটু বুঝিয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু বাবা থাকলে—এড়াবার কোনো দ্বিতীয় পথ ছিল না। তাকে চিঠি দেখাতে হত, সমস্ত ব্যাখ্যা করতে হত। পরিষ্কার ঝর-ঝরে সাদা ব্যাখ্যা—এক জায়গায় একটুও খুঁত থাকলে চলত না, ঘটনার যথার্থতা বাস্তবিক কী-একবার জেনে নিয়ে তিনি অমনি কাজ করে ফেলতেন;' আজই মনিঅর্ডারে টাকাগুলো রজনীকে পাঠিয়ে দিতে হত। সোস্যালিজম বা কমিউনিজম-এর কোনো কথাই তিনি শুনতে যেতেন না। আধুনিক জীবনের দোহাই পেড়ে একচুলও নড়াতে পারতাম না। তিনি সাবেককালের লোকই শুধু নন—সেকালের যুক্তিনিষ্ঠ সাধু লোক।

সন্ধ্যার সময় অঞ্জলি নিজেই আমার কোঠায় এল।

আন্দাজ করে নিয়ে—'আমার তো হয় নি—'

—'বড় তো জবাব দিলে, কোন সৌভাগ্যের কথা বলছি বল তো?'

—'কিশোর জীবনের চন্দ্রকান্তর মতন একটি প্রেমিক হৃদয়কে অধিকার করার সৌভাগ্য।'

—'হ্যাঁ, সে কথাই বলতে চাচ্ছিলাম; এ সকলের জীবনে হয় না, কী বলো?'

—'বলা বড্ড দুষ্কর; জীবনের রহস্য অনেকখানি?'

—'কিন্তু হলেও-বা কী লাভ? কী লাভ হল? এদ্দিন পরে এসে তিনি দেখলেন তার বাড়ি-ভিটে জঙ্গলে ভরে গেছে, একটা কুকুর মরে আছে তার ওপর; কতকগুলো শকুন চরে বেড়াচ্ছে।'

—'তার হৃদয়ের লাভালাভের আমরা কী বুঝি? প্রেম শুধু মিলন নিয়ে নয় তো; দীর্ঘ বিচ্ছেদ-ব্যথা শূন্যতা, সৃষ্টির অবিচার অন্ধতা নক্ষত্রের থেকে নক্ষত্রে, নক্ষত্রের থেকে নক্ষত্রে আঁকাবাঁকা রহস্যময় বিরাট সিঁড়ির রূপ দেয়, প্রেমকে অপরূপ রূপ দিয়ে যায়।'

—'শেষ পর্যন্ত প্রেমের সার্থকতা পরস্পরের কাছাকাছি বসে নয়?'

—'প্রায়ই না। অনেক দিনের অদর্শন, নিষ্ফলতা, পরিহাস-হয়তো মৃত্যুর মধ্যেই প্রেমের চরিতার্থতা। তুমি আমার চেয়ে ভাল বোঝ এই সব—'

—'কী রকম?'

—'তোমার রূপ ছিল, হৃদয় ছিল তোমাকে ভালবেসে অনেকে তৃপ্তি পেয়েছে।'

আঁচলের চাবিটা অন্ধকারের মধ্যে খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বাজিয়ে-বাজিয়ে অঞ্জলি শেষে-'তা, আমার অবস্থাও এর মতই।'

—'আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

—'এই মেয়েটি জানে না চন্দ্রকান্তর মতন এত বড় এক জন প্রেমিক পৃথিবীর কিনারে তার জন্য রয়ে গেছে। তাদের জঙ্গল-ঢাকা ভিটের ওপর মরা কুকুর ও শকুন দেখে যার হৃদয় ভেঙেচুরে একশেষ হয়ে যায়-কোনো দিনও এ-সব জানবে না সে। হয়তো আজ এইরকম অন্ধকারে বসে আমারই মতন রিঙের চাবি ঘোরাচ্ছে সে-ঘোরাচ্ছে-ঘোরাচ্ছে—। চাবির রিং ঘুরিয়েই দিন কাটে আমাদের-না-ঘষে-মেজে দিন চলে যায়-অথচ দু'দণ্ড যদি চুপ করে ভাবি, বুঝতে পারি, যে এই শাড়ি, সোনার হার, সিঁদুর, দিনরাত এই দেহের পরিচর্যা, মনটাকে ঠকাবার অসংখ্য প্রয়াস সমস্তই কি নিদারুণ ছেলেখেলা'। একটু চুপ থেকে অঞ্জলি বললে-'কোন এক অপোগণ্ড বিধবার ময়নার মত রাধা-কৃষ্ণ নামই আওড়াতে হবে সারা জীবন বসে, এই নিয়ে প্রতি মুহূর্তের কাল্পনিক কৃষ্ণভ্রান্তি, দুটো দানা পেয়ে ইনস্টিঙ্কটকে ঠাণ্ডা রাখা; দিনরাত ময়নার মত খেয়ে, ঘুমিয়ে অর্থহীন অন্ধ কথা নেড়েচেড়ে, সময় কাটিয়ে দেই; অপমানকেও চিনি না, স্মরণ করতেও ভুলে যাই জীবনের উদ্দেশ্য কত গভীর ও সুন্দর ছিল, কত সুদূরে আলোর আয়োজনের ভিতর লুকিয়ে ছিল।'

অঞ্জলি কথা বললে, খানিকটা সময় কেটে গেলে পর—'কী ভাবছ?'

—'অপোগণ্ড বিধবার ময়নার কথা—'

—'আচ্ছা যাও-ঠাট্টা করতে হবে না,' মুখ টিপে হেসে, 'আচ্ছা, সে বিধবা কে বল তো দেখি—'

—'তার একটা ময়না আছে—'

—'বেশ তো, কিন্তু নিজে সে কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'একটি অপোগণ্ড বিধবা—'

—'অপোগণ্ড বিধবা বলতে আমি কাকে বুঝেছি?'

—'ময়নার মালিককে।'

—'বা রে বাঃ খুব রং করতে পার দেখছি! আমি এই সৃষ্টির বিধাতাকে লক্ষ্য করে বলেছি, মানুষ তার হাতে নির্বোধ ময়নার মত, নিজে তিনি অপোগণ্ড বোস্টমী যেন একজন। আচ্ছা চন্দ্রকান্ত বিয়ে করেছেন?'

—'না।'

—'ও-সব মানুষ বিয়ে করে না। তোমার বড়-বড় বন্ধু আর-কজন আছে?'

চন্দ্রকান্তর মত?'

—'আছে আরো দু-চারজন। তাদের অবিশ্যি আমি অনেক দিন দেখি নি; কী রকম ব্যবহার করবে আজ আমার সঙ্গে বলতে পারি না; হয়তো চিনবে না।'

—'কেন? আমারও ও-রকম অনেক বন্ধু আছে। কত চিঠি লেখে আমাকে। উত্তরও দিতে পারি বললে—'আজ তো তোমার বড়-বড় বন্ধুরা কেউ আসবেন না—?

—'কী জানি, তাদের মর্জি।'

—'না, আসবেন না—রোজই কি আসে?'

তাকিয়ে দেখলাম বৌভাতের সময় কেনা সেই হেলিট্রেপ শাড়িটা পরেছে, দু-কানে দুল ঝক-ঝক করছে, বিকেলে সাবান দিয়ে পা ধুয়ে ছিল টের পেলাম। শরীরের থেকে, নিঃশ্বাসের থেকে, স্নিগ্ধ গন্ধ বেরুচ্ছে, চওড়া কপাল, মুখ ঝর ঝরে, অন্ধকারে হাতির দাঁতের গড়া রূপসী মূর্তির সঙ্গে আচমকা কেমন সাদৃশ্য বেরিয়ে পড়ে, সাদৃশ্য হারিয়ে যায়। সিঁথায়, কপালে, সিঁদুর; পান খায় নি—ঠোঁট পরিষ্কার। কথা বললেই দাঁত ঝিকমিক করে উঠে, মুখের থেকে লবঙ্গের গন্ধ বেরয়।

—'বসো অঞ্জলি।'

বিছানার পাশেই বসল।

—'এখন যদি ওঁরা কেউ এসে পড়েন?'

—'কে? শ্রীবিলাস?'

—'কিংবা চন্দ্রকান্তবাবু—'

—'বাঃ চন্দ্রকান্তর নাম তুমি কী করে জানলে?'

—'তিনি এসেছিলেন একদিন দুপুরবেলা।'

—'তুমি তো তখন এ ঘরে ছিলে না।—'

—'ছিলাম না বটে কিন্তু গলার আওয়াজ পেয়ে এসেছিলাম।'

—'চেনা গলা বলে মনেহয়েছিল বুঝি?'

—'দূর। অত চাপা গলায় কে কথা বলে শুনতে এসেছিলাম।'

—'চন্দ্রকান্ত শ্রীবিলাসের মত চেঁচায় না।'

—'কোন্ এ মেয়ের কথা বললে না?'

—'কে? চন্দ্রকান্ত?'

—'হ্যাঁ। কে সেই যে?'

—'ও, সে একটি মেয়ে ছিল—বছর পনের বয়স।'

—'পনের বছর মোটে।'

—'কুড়ি বছর আগে তার তের বছর ছিল।'

—'তাহলে এখন তেত্রিশ হয়েছে।'

—'না, তা হয় নি।'

—'হওয়াই সম্ভব। চন্দ্রকান্ত তার সম্বন্ধে যেমন করে বললেন বাস্তবিক বড় ভাল লাগল আমার।'

—'চন্দ্রকান্ত প্রেমিক মানুষ।'

—'ভারি কৌতূহল হয় মেয়েটিকে দেখবার জন্য।'

—'এখন দেখলে বীতশ্রদ্ধ হতে হবে।'

—'কেম, তুমি দেখেছ নাকি শিগগির?'

—'না দেখতে চাইও না। কুড়ি বছর আগের স্কুল-পথঘাট মাস্টার-ছেলে-মেয়েদের দল এমন হৃদয়ের জিনিস; বাইরের সংসারে তাদের খুঁজতে গেলে একটা কদর্য ধাক্কা খেতে হবে। জীবনের যা কিছু গোপন সৌন্দর্য আছে তা আছে। কিন্তু তাই বলে বাজারে গিয়ে তার লোম ও লেজ দেখে আসবার কৌতূহল নিতান্তই অসঙ্গত!'

অঞ্জলি খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে—'আমি তোমার এ কথায় বিশ্বাস করি না—'

—'কারো না?'

—'চন্দ্রকান্ত করবেন না। আমি অবাক হয়ে ভাবি তাকে যেমন করে খুঁজছেন চন্দ্রকান্ত আমাকেও কেউ তেমন করে খোঁজে নাকি?'

চুপচাপ। অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করে রইল সে।

পরে চোখ তুলে—'কথা বলছ না যে?'

আস্তে-আস্তে আমার হাতখানা তুলে নিয়ে-'সে সৌভাগ্য সকলের জীবনে হয় না-কী বলো?'

—'কোন সৌভাগ্যের কথা বলছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না-তারা আমাকে দেখলেই গলা জড়িয়ে ধরে কত আদর করে। সুলতা একজন-নিজে দেওয়ানের মেয়ে, বেশ ভাল বিয়ে হয়েছে তার, একজন ইন্‌কামটাক্স অফিসারের সঙ্গে,' অঞ্জলি নখ খুঁটতে খুঁটতে-'সাড়ে সাতশ টাকা মায়না পায় ওর বর।'

সতৃষ্ণ মুখে কয়েক মুহূর্ত জানালার বাইরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইল, পরে বললে, 'উমার বিয়ে হয়েছে আরো ভাল, ওর বর জার্মানি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে এসেছে, এখন বারশ টাকা মায়না পায়—'

অন্ধকারের ভিতর দেখলাম চোখ দুটো লোলুপতায় চক্‌চক করছে বধুর। বললে—'বারশ মায়না পায়, দিল্লিতে থাকে, দুটো মোটর আছে ওদের। চিঠি লিখলে অবিশ্যি এখনও উত্তর দেয় উমা। কিন্তু কে যায় চিঠি লিখতে, আছে বড় মানুষ, তাই বলে তার কাছে—'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল।

জানালার বাইরের সজনে গাছটার দিকে তাকিয়ে একটু পরে—'গরিব হোক, ভিখিরি হোক, সকলেরই নিজের মনুষ্যত্ব আছে-দোকানের জিনিসের মত সে সব তো আর টাকা নিয়ে হাত বাড়ালেই বিক্রি করা চলে না।'

এক-আধ ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল।

অঞ্জলি আস্তে-আস্তে—'নইলে দিল্লিতে গিয়ে কয়েকমাস উমার সঙ্গে কাটিয়ে আসি এতে কি তার অসাধ? কিন্তু আমি যাব কেন? আমাকে কি পথের কুকুর বিইয়েছিল?' অনেকক্ষণ অন্ধকারের ভিতর মাথা হেঁট করে বসে থেকে শেষে বললে—'আচ্ছা, তুমি চাঁদা তুলতে পারো না?'

—'কিসের জন্য?'

—'বিলেতে যাবে—'

—'বিলেত!'

—'হ্যাঁ, গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আসবে।'

—'ইঞ্জিনিয়ারিং কী করে পড়ব?'

—'কেন?'

—'আমি তো টেকনিক্যাল লাইনে যাইনি; বি-এ কিংবা এম-এ পড়া যায়।'

—'বেশ, তাই পাস করে আসবে।'

—'সে জন্য চাঁদা? তা কেউ দেবে না।'

—'কেন?'

—'কেউ দেয় না।'

ধীরে ধীরে অন্ধকারের ভিতর আমার পায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় নোংরা জিরজিরে সুতির শাড়ি পরে আমাকে বললে—

'রান্না হয়ে গেছে, খাবে?'

—'না, তুমি রেঁধেছ বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'আজ গা ধোও নি?'

—'নাঃ, অত বড়মানুষি শখ দিয়ে কী হবে!'

—'সাবানটা তোমার আছে, না ফুরিয়ে গেছে?'

—'কাপড়কাচা সাবান?'

—'না, গায়ে মাখবারটা।'

—'আছে খানিকটা।'

—'ওটা আর ব্যবহার করো না তুমি।'

—'কেন?'

—'ও একটা দু-আনা দামের সাবান-মেখে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়।'

—'তুমি নিজে তো কোনো সাবান মাখ না।'

—'না।'

—'দেখি, কাপড়-কাচা সাবান দিয়ে দাড়ি কামাও।'

—'হ্যাঁ, তাতেই চলে যায়।'

একটু বিমর্ষ হয়ে অঞ্জলি—'চলে তো যায়, কিন্তু আমার বাপের বাড়ির প্রসন্ন বিশ্বাসকেও দেখতাম সেভিং স্টিক ব্যবহার করছে-আর আমার স্বামীর এই অবস্থা?'

—'প্রসন্ন বিশ্বাস কে?'

—'তিনি ছিলেন রেলের গুদামের ক্লার্ক।'

একটু হেসে—'তবে কেন ব্যবহার করবেন না?'

—'কিন্তু লোকটা ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল শুধু, তুমিতো এম-এ পাস-কত বড় বড় বই পড়ো, সুন্দর কল্পনা তোমার, ভাল লিখতে পার। মেটে সাবানে গাল জ্বলে না তো।'

—'না, সাবধানে কামালে কোনো অসুবিধা নেই তো।'

—'তোমার ঘরটা আজ ঝাঁট দেওয়া হয়েছিল?'

—'হ্যাঁ-হয়েছিল বই কি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কে দিলে?'
—'কেন, তুমিই তো দিয়েছ।'
—'মিছিমিছি মিথ্যে কথা বলো কেন! আমি শিগগির তোমার ঘরদোর ঘাঁটি নি তো—'
—'কেউ দিয়ে গেছে ঝাঁট—'
—'সত্যিই? না মিথ্যে বলছ?'
—'দেখো না তাকিয়ে-কী রকম পরিষ্কার।'
—'অন্ধকারে কী করে দেখব?'
—'বাতিটা উশকে নাও।'
—'আমি ঝাড়ু নিয়ে আসি।'
আঁচল ধরে আটকে রেখে বললাম—'এখন একটু চুপচাপ বসেছি-এখান ধুলো উড়োতে পারবে না অঞ্জলি।'
—'আচ্ছা বেশ, তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকবে—'
—'তখন ঝাঁট দেবে? ধুলোবালি যে তা হলে আমার মুখোচোখে গিয়ে লাগবে।'
—'তুমি শমারি ফেলে শুয়ে থাকবে তো।'
—'আচ্ছা বেশ, তা করো।'
—'আজ ভেবেছিলাম তোমার ঘরে ধূপ দেব।'
—'ধুনুচিটা তো ভেঙে গেছে।'
—'পিসিমার খাটের নিচে আর-একটা পেয়েছি।'
—'সেটা তো পিসামা ব্যবহার করেন।'
—'ইস, ব্যবহার করেন না ছাই-মাকড়সার জাল জমে গেছে সেটার ভিতর—'
—'তাই না কি?'
—'কতকগুলো টিকটিকির ডিম ছিল, কুমরো পোকার পাখনা, আরশোলা রয়েছে মরে।'
—'হুঁ?'
—'আমি সব ঝেড়েপুড়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি-কিন্তু সারা বাড়ি খুঁজে এক ছিটে ধূপ পেলাম না।'
—'চার পয়সার আনালে হয়।'
—'ভাবছিলাম বাবাকে বলব, কিন্তু বলতে লজ্জা করে আমার।'
—'আচ্ছা, কাল সময় মতন বলব আমি।'
—'আজ তা হলে আর ধূপ দেওয়া হল না।'
দেখলাম মুখখানা বাস্তবিকই চিন্তিত, বিষণ্ণ। অঞ্জলির যে কখন কী হয় বুঝতে পারা যায় না।
—'তোমার বিছানার চাদরই-বা কী হয়েছে? ইস, কী ছিরি!'
—'কেন?'
—'চুরুটের ছাইয়ে, ধুলোয়, তেলে, মরা ছারপোকার রক্তে এ কী করেছ তুমি?'
—'না, এটা ধুয়ে নিতে হবে; শ্রীবিলাস সেদিন বসতেই কুণ্ঠিত বোধ করছিল আমার এ বিছানায়।'
—'ধুয়ে নিতে হবে, কে ধোবে শুনি?'
—'আমিই ধুয়ে নেব এখন; চানের সময় খানিকটা সাবান লাগিয়ে কয়েকটা আছাড় দিলেই তো হবে—'
—'বেশ, তুমি মনের সাধে যা খুশি তাই বলে যাও, কার প্রাণে গিয়ে কী রকম লাগে তার কোনো খোঁজখবরও নিতে যাও না। তুমি তোমার জামা-কাপড় কাচবে—আমি এ বাড়িতে কি সং হয়ে এসেছি? বেশ, তাহলে একটা ফ্রেমে বেঁধে আমাকে বেড়ায় ঝুলিয়ে রাখ না কেন?'
আঁচল দিয়ে হাত মুখ কপাল মুছে নিতে-নিতে অঞ্জলি—'তোমার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। কাল সকালবেলা তোমার বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় আর যা ময়লা কাপড়-গেঞ্জি-শার্ট আছে সব নিয়ে যাব কিন্তু আমি। তুমি সকাল-সকাল উঠে বিছানা খালাশ করে দিও।'
—'এত জিনিস এক দিনে কেচে কী লাভ?'
—'একদিনেই কাচব আমি।'
—'তারপর, ঘুসঘুসে জ্বর হলে—'
—'তাই তো কামনা করো তুমি—'
একটু চুপ থেকে বলি—'তোমার বই জোগাড় হল?'
—'না, কোথায় হল আর?'
—'পড়বে না?'
—'তোমরা তো আকাঙ্ক্ষা করো না। গুদামের একটা বস্তার মত তোমাদের সংসারের এককোণে আরখুটি মেরে পড়ে থাকি, যে খুশি মাড়িয়ে যাক, সকলের পায়ের তলে-তলেই জীবনটা উৎসর্গ করে দেই,' একটা নিঃশ্বাস ফেলে—'কিন্তু আমি তা হতে দেব না-পাস না করলে আমার চলবে না—'
—'পাস করে মাস্টারি করবে?'
—'করব বৈকি। পারলে পেশোয়ারেও মাস্টারি নিয়ে যাব।'
—'তোমার কত টাকার বই-এর দরকার?'
—'কেন মিছেমিছি স্ত্রীর কাছে সাপের মত হাঁচি দিয়ে বেড়াও? টাকা দিয়ে বই কিনে দেবে তুমি? পাড়ার ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন এবার বি-এ-পাস করল। যোগ্যতা যদি থাকে তো ওদের কাছ থেকে জোগাড় করে এনে দাও না!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'পরীক্ষার ফল কবেই তো বেরিয়ে গেছে। এত দিনে বই কি আর আছে ওদের হাতে? নিজের হাতে না করলে কিছুই হয় না-স্বামীও যেন মানুষের পর।'

অঞ্জলিই আবার বললে—'কী গো, চুপ করে যে?'

—'বাতিটা একটু আনো তো।'

—'কেন?'

—'খবরের কাগজ পড়ব।'

—'কাগজ পেলে কোথায়?'

—'বাবা একটা কিনে নিয়ে এসেছেন।'

—'ইংরাজি?'

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা, আমাকে দাও না-আমি পড়ি।'

বাতিটা সে নিয়ে এল।

বললে—'কী লিখেছে, দেখ তো।'

'দাঁড়াও, দেখছি।'

—'কোথাও চাকরি খালি আছে?'

—'সে খবর নিয়ে লাভ কী?'

—'কেন?'

—'চার-পাঁচ বছর ধরে এমনি কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছি।'

—'তারপর?'

—'একটা উত্তরও আসে নি।'

খবরের কাগজটা দেখতে-দেখতে বললাম—'ফ্রান্সি ফিল্ডসের নাম শুনেছ?'

—'সে কে?'

—'একজন ভাল নায়িকা।'

—'ইংরেজ বুঝি?'

—'হ্যাঁ, ল্যাঙ্কাশায়ারে বাড়ি।'

—'তার কী হয়েছে?'

—'একটা সিনেমা কোম্পানির সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছে যে প্রত্যেকটি ছবির জন্য ফ্রান্সিকে তেইশ হাজার পাউন্ড দেবে।'

অঞ্জলি চোখে কপাল তুলে—'তেইশ হাজার?'

—টাকা নয়, পাউন্ড—। একটা ছবির কাজে মিস ফিল্ডসের যতখানি সময় লাগে তাতে হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রত্যেক মিনিটে সে পাঁচ পাউন্ড করে পাবে-মানে ত্রিশ টাকা।'

—'প্রত্যেক মিনিটে ত্রিশ টাকা?'

—'হ্যাঁ।'

—'যাক, এ-সব খবর আমি শুনতে চাই না।'

—'কেন?'

—'গান্ধীর কী হল?'

—'গন্ধীর কোনো খবর এতে নেই।'

—'এটা কী কাগজ?'

—'স্টেটসম্যান।'

—'বাবা স্টেটসম্যান আনলেন যে?'

—'এটা রবিবারের স্টেটসম্যান কি না।'

—'তাতে কি।'

—'মাসে-মাসে এই কাগজটা তিনি কেনেন। নানারকম খবর থাকে, একটা কাগজে তার ছ মাস চলে যায়।'

—'ছ মাস?'

—'হ্যাঁ, অবকাশ মত অল্প-অল্প পড়েন। দিনরাত স্কুলের কাজ করে অবসর পান না আর। এই তো আগস্টে একটা কিনলেন-আবার হয়তো ফেব্রুয়ারিতে একখানা কিনবেন।'

—'কিন্তু তবুও এ কাগজ কেনা উচিত নয় তাঁর।'

—'তা হলে আমার পড়া বারণ?'

—'তুমি পড়ো; কিন্তু আমাকে শোনাতে যেও না—'

—'খবরের কাগজে কাজ করেছি বলে সব খবরের কাগজের প্রতিই আমার একটা মোহ আছে অঞ্জলি? একটা ভালো আর্টিকেল দেখলে খানিকটা পরিতৃপ্তি পাই।'

—'ভালো আর্টিকেল মানে?'

—'আর্টিকেল-এর বক্তব্য বড় বেশি দেখতে যাই না; দেখি লিখবার রীতি।'

অঞ্জলি চুপ করে ছিল।'

বললাম—'এ কাগজে যদি আমার লেখা ছাপাতে পারি হয়তো পনের কুড়িটা টাকা দেবে।'

—'কী লেখা ছাপাবে তুমি এই কাগজে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'অবিশ্যি রাজনীতি নয়-আরো কত রকম বিষয় আছে।'

—'লেখা পাঠালে এরা টাকা দেয়?'

—'লেখা ছাপালে দেয়।'

অঞ্জলি মাথা হেঁট করে নখ খুঁটতে-খুঁটতে, অবশেষে দ্বিধার সঙ্গে, 'দাও না পাঠিয়ে, যদি ছাপায়—'

একটু হেসে—'মাথা খুঁড়ে মরলেও ছাপবে না।'

—'কেন?'

—'বুঝবে যে, যে লেখা পাঠিয়েছে সে মানুষটির ঐকান্তিকতা নেই—নির্বোধ অবসাদে জীবন কাটাচ্ছে।'

অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে-'রবিবারের একটা দেশী কাগজও এনেছেন বাবা।'

—'আচ্ছা দেশী কাগজে লেখা ছাপাতে পারলে টাকা দেয়?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'মাসিকে যারা গল্প লেখে তারা টাকা পায়?'

—'পায় বোধ করি।'

—'কত?'

—'এই কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশ—'

—'তাহলে তুমি গল্প লেখো না—'

—'তা তুমি আমার চেয়ে ভালো লিখতে পার।'

—'একথা তুমি বল কেন? আমি কি কোনোদিন লিখেছি?'

—'লিখবার রুচি আছে হয়ত তো তোমার।'

—'তোমার নেই?'

—'না।'

—'আচ্ছা দেশী কাগজটায় থিয়েটারের বিজ্ঞাপন দিয়েছে?'

—'দেখি।'

—'কী দিয়েছে?'

বিজ্ঞাপন দেখতে-দেখতে—'থিয়েটার মানে আজকাল টকি অঞ্জলি।'

—'কী টকি হচ্ছে?'

—'এই তো দেখছি চণ্ডীদাস হচ্ছে এক জায়গায়—'

—'দেখেছ তুমি এটা?'

—'না।'

—'চণ্ডীদাসের জীবনের ব্যাপারটা কী?'

—'রামী বলে একজন রজকিনীর মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা ছিল।'

—'দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসত?'

—'তাই তো বোধ হয়—'

—'আচ্ছা পদাবলির এই গানগুলো কি এই মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন?'

—'মিলা হার্জলিসের উদ্দেশ্যে গ্যয়টে যে-রকম লিখে গেছেন, এ ঠিক সে জাতের নয় অঞ্জলি। অথচ মিনার নামে সাদের কবিতাগুলো পড়েই আমি তৃপ্তি পাই।'

—'কেন?'

—'সরল সাধু বিশ্বাসের জীবন অনেক দিন হয় হারিয়ে ফেলেছি কি না। বাংলার রূপকেও সব সময় সবচেয়ে গভীর ও সুখের বলে মনে হয় না। আমরা অত্যন্ত চামার হয়ে পৃথিবীর পথে ফিরছি—'

—'কিন্তু চণ্ডীদাস—'

—'আহা, কী যে সরল হৃদয় ছিল মানুষটির! বিধাতায় শিশুর মত বিশ্বাস ছিল-নারীর প্রতিও; মানুষকে সব চেয়ে বড় বলে আখ্যাত করে গেছেন। আমার অনেক সময় কিন্তু মনে হয় একটা শালিক বা চড়াইও অনেক মানুষের চেয়ে ঢের বড়—'

—'আচ্ছা, এই যে নাটক লিখে যারা থিয়েটারে দেয় তারা পয়সা পায় না?'

—'যদি সে নাটক অভিনীত হয়—'

—'কত টাকা পায়?'

—'ঠিক আমি বলতে পারি না; তবে—'

—'তুমি একখানা নাটক লিখলে পারো।'

কোনো জবাব দিলাম না।

একটু চুপ থেকে অঞ্জলি—'আবার যে গম্ভীর হয়ে আছ? কী চিন্তা করছ?'

—'ভাবছি তুমি পুরুষ মানুষ হলে অনেক কিছুই করতে পারতে; আমাকে দিয়ে কিছু হল না।'

—'এখানে কোনো টিউশনি পাওয়া যায়?'

—'যে কটি পাওয়া যায় তা স্কুলের মাস্টারদেরই একচেটে'—

—'স্কুলের মাস্টারির জন্যও তো কত চেষ্টা করলে; থাক, আর চেষ্টা করে দরকার নেই। তারচেয়ে তুমি কলকাতায় কোনো কাগজে ঢুকতে পার না কি সেই দেখ।'

—'তাই চেষ্টা করব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ঝপ করে ওটা কী পড়ল?'
—'একটা ইঁদুর বোধ করি।'
—'মরে গেল না কি?'
—'না, পালিয়ে গেছে।'
—'ঘরে বড্ড বেশি ইঁদুর হয়েছে।'
—'দরমুশ দিয়ে মেরে ফেলতে পার।'
—'ছি, মেরে কী লাভ!'
—'কাল এক-আধটা ধরলে হয়।'
—'কেন?'
—'বেশ সাজা হবে তাতে।'
—'তাতে কি ওদের শিক্ষা হবে?'
—'যাতনা তো পেয়ে নেবে বেশ।'
—'এ-সব ক্ষুদ্র জীবদের যাতনা দিয়ে কী লাভ?'
—'বিধাতা তাতে অপ্রীত হবেন না।'
—'কী করে তা তুমি জানো?'
—'তুমিও তি তা জানো না! নিজের জীবনটার কথাই ভেবে দেখ না কেন?'
অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'বই ক-খানার জোগাড় দেখো তো।'
—'আচ্ছা'
—'তুমি যা বলেছ তাইই ঠিক মনে হয়। নোটগুলোই পড়ব শুধু—কী বলো?'
—'হ্যাঁ, তাতেই সুবিধা।'
—'পাস করতে পারব না?'
—'আশা-আকাঙ্ক্ষা করতে দোষ কী?'
—'কেমন যে উদাসীন তুমি।'
—'কেন?'
—'উৎসাহ দেবার নামগন্ধও নেই।'
—'তোমার হৃদয়েই তো যথেষ্ট রয়েছে।'
—'এই বলেই তুমি খালাশ?'
—'বইও এনে দেব বইকি।'
অঞ্জলি বিছানার এককোণে মাথা কাত করে—'আচ্ছা আমার জীবনটাকে কলে ধরা ইঁদুরের মত বললে কেন?'
—'তেমনি বেদনা পাচ্ছ বলে মনে হয়।'
—'কলের ইঁদুরের মত?'
—'হ্যাঁ।'
—'আচ্ছা আমাদের বেদনায় বিধাতা কষ্ট পান না?'
—'কলের ভিতরকার ইঁদুর দেখে শিশুরা কি কষ্ট পায়?'
—'বিধাতা কি তেমনি না কি?'
—'সৃষ্টির নিদারুণ বেদনা ও নিষ্ফলতার চারদিকে তার আকাশ আলো-জলের প্রসন্ন শিশুর মত হাসি দেখে সেই কথাই তো মনে হয়।'
—'আমাকে টেক্সট ও নোটগুলো কিনে দিতে হবে শিগগিরই।'
—'আচ্ছা।'
—'কী করে কিনে দেবে?'
—'বাবাকে বলব।'
—'তিনি যদি বিরক্ত হন।'
—'আমার আংটিটাও বিক্রি করতে পারি।'
—'ছি, বিয়ের আংটি-কেন বেচবে?'
—'তুমি পাস করে মাস্টারি করলে না-হয় আর-একটা গড়িয়ে দেবে।'
—'কিন্তু এর সঙ্গে একটা স্মৃতি মিশে রয়েছে যে।'
—'কিসের স্মৃতি, অঞ্জলি?'
—'বাঃ, আমাদের বিয়ের!'
—'তা না-হয় আর-একটা বিয়ে করা যাবে—আর-একটা আংটি পাওয়া যাবে।'
—'কে আর একটা বিয়ে করবে?'
—'আমি।'
—'কাকে?'
—'অন্য আর-একজন মেয়েকে—'
—'তা তুমি যা খুশি করো—'
—'করব বই-কি, করাই তো উচিত। প্রেম জিনিসটাকে না বুঝে পৃথিবীর থেকে বিদায় নেওয়া কি ভাল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তা তুমি যা খুশি তাই বলো,' একটু চুপ থেকে, 'তুমি মনে করেছ আর-একটা বিয়ে করলেই প্রেমের সাক্ষাৎ পাবে।'

—'প্রেমের সাক্ষাৎ পেয়ে তবে তাকে বিয়ে করব।'

—'এমনই যদি বুঝেছিলে, তাহলে অপ্রেম নিয়ে আমাকে বিয়ে করলে কেন?'

—'আমি তো অপ্রেম আনি নি।'

—'ও, আমি বুঝি এনেছিলাম?'

একটু চুপ থেকে—'আমি মরলে পর তবে বুঝবে।'

—'কী বুঝব?'

—'বুঝবে যে দ্বিতীয় বার বিয়ে করা কত বেদনার জিনিস।'

—'কেন, বেদনা কিসের অঞ্জলি?'

—'আমি যে চার বছর তোমার সঙ্গে কাটিয়ে গেলাম এ স্মৃতি ইহজীবনেও মুছে ফেলতে পারবে না। দ্বিতীয় কোনো নারীর দিকে তাকানোও তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। স্মৃতিই তো আমাদের ব্যথা দেয়। বাধা দেয়।'

—'যে স্মৃতি বিরস তা ব্যথা দেবে কেন?'

—'কিন্তু আমার স্মৃতি বিরস বলে মনে হবে না তো তোমার?'

—'হবে না?'

—'সেদিন বুঝবে এ চার বছর কত মমতায় ভরে রেখেছিলাম আমি-প্রেম থাকুক আর নাই থাকুক—নারীর অভিমান ও অহঙ্কার এই রকমই।'

—'একশটা টাকা পেয়েছি আমি অঞ্জলি—'

কাত হয়ে শুয়েছিল, হয় তো ঝিমুচ্ছিল, চোখ মেলে উঠে বসে চোখ বিস্তারিত করে বললে—'কী হয়েছে?'

—'কিচ্ছু না।'

—'আ, বড্ড ঘুম আসছিল।'

—'ঘুমোও আবার।'

একটা হাই তুলে ভুরু কুঁচকে—'টাকা পেয়েছ?'

—'স্বপ্ন দেখলে না কি?'

—'কত টাকা পেয়েছ বল?'

—'আলোটা আনো।'

—'এখানে আনতে হবে?'

—'হ্যাঁ, এই বিছানার উপরই নিয়ে এসো।'

লণ্ঠনটা বিছানার উপরে রেখে—'ঘুমের চোখে শুনলাম একশ টাকা পেয়েছ—ফাঁকি দিচ্ছ না তো?'

—'আচ্ছা তুমি ক্ষেপেছ অঞ্জলি। একশ টাকা পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কখনো?'

—'তা হলে হয় তো ঘুমের চোখে নিজের মনেই কী না কী শুনলাম; আচ্ছা, এ-রকম ঘুমের ভিতরেও টাকার কথা মনে হয় কেন?'

—'আমারও তো মনে হয়।'

—'দীনতা আমাদের অনেক দূর পৌঁছেছে।'

—'তাই তো দেখছি।'

খানিকটা শূন্য, খানিকটা লুব্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে অঞ্জলি—'মাগো, আমার মন সায় মানছে না। স্বপ্ন আমি দেখি নি; তোমাকেই আমি বলতে শুনেছি।'

—'কী বলেছি?'

—'একশ টাকা পেয়েছি বললে।'

একটু হেসে—'ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে যখন শুনছিলে তখন লাখ টাকার কথাই বা শুনলে না কেন? ছি, তোমার বড্ড ছোট নজর অঞ্জলি।'

—'স্বপ্ন আমি দেখি নি তো। আমি নিজের মুখেই তোমাকে বলতে শুনেছি। আমি বেঁচে আছি এ যেমন সত্য, শুনেছি যে তাও তেমনি সত্য। টাকা পেয়েছ ভালই; যে যারটা উপভোগ করবে; পরেরটায় কে ভাগ বসাতে যাবে! টাকার বেলা স্ত্রী তো মানুষের পর।' বলে বিমুখভাবে মুখ ফিরিয়ে রইল। খানিকক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়ে—'কে পাঠাল টাকা?'

অন্ধকারের ভিতর চুপ করে ছিলাম।

—'তোমার বাবা তোমাকে দিয়েছেন?'

—'না।'

—'তবে বাইরের থেকে কেউ পাঠাল বুঝি?'

কোনো জবাব দিলাম না—

—'আমার বাপের বাড়ির থেকে পাঠিয়েছে না কি? আমার নামে?'

—'না, তোমাকে কেউ পাঠায় নি।'

একটা শূন্য নিঃশ্বাস ফেলে অঞ্জলি—'তা আমি জানি; বাবা মরে যাবার পর আমার খবর নেওয়ার মতো লোক কেই-বা আছে পৃথিবীতে।'

চুপচাপ বসে রইলাম দু'জনে।

অঞ্জলি—'শ্রীবিলাস চলে গেছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কোথায়? নাগপুরে? না।'
—'এখানেই আছেন?'
—'হ্যাঁ।'
—'তিনিই টাকাটা দিলেন বুঝি তোমাকে?'
—'না, শ্রীবিলাস কেন দেবে? আমিই বা নিতে যাব কেন?'
একটু চুপ থেকে—'তাও তো ঠিক।'
খানিক নিস্তব্ধ থেকে—'শুনেছিলাম চন্দ্র তো এখানে নেই।'
—'না, সে চলে গেছে।'
—'যে-রকম ভালবাসা তোমাদের দু'জনের, সেখান থেকেই পাঠাল বুঝি?'
—'কে? চন্দ্র? না—সে পাঠায় নি।'
—'টাকাটা কি তা হলে আকাশ থেকে পড়ল?'
একটু হেসে—'অনেকের কপালে তাও তো পড়ে। কিন্তু আমাদের কি সে রকম কপাল আছে?'
—'আচ্ছা কলকাতায় খবরের কাগজে যখন কাজ করতে তখন কি কিছু মাইনে বাকি ছিল তোমার?'
—'না তো।'
—'ঠিক মনে আছে তোমার?'
—'ঠিক।'
—'টিউশন তো মাসে-মাসে করতে?'
—'হ্যাঁ।'
—'কেউ টাকা ফেলে রাখে নি?'
—'না।'
—'কোথাও শেয়ার কিনেছিলে?'
—'না।'
—'কেউ টাকা ধার নিয়েছিল?'
—'মনে তো পড়ে না।'
—'লটারিতে চার আনার টিকিট কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলে না কি? এখানে বসে লটারি খেলছ?'
—'এইবার থেকে পাঠাব ভাবছি।'
—'টাকাটা তবে কোত্থেকে এল?'
—'ঘুমোচ্ছ না কি?'
—'না, ভাবছি—'
—'কী, ভাবছ?'
—'ভাবছি তুমি যদি টাকাও পাও তাহলেও আমার ব্যক্তিগত কোনো লাভ নেই।'
—'কী রকম?'
—'তা তোমার নিজের উপভোগের জিনিস শুধু।'
—'আমার বিছানার চাদরের দিকে তাকালেই আমার জীবন উপভোগের কথা বুঝতে পারবে। তোমার চাদর-বালিশ কাপড়-চোপড় আমার চেয়ে ঢের পরিষ্কার-জীবনটাও খানিকটা পরিপাটি। কী বলো তাই না অঞ্জলি?'
—'নাও-টাকাটাও দাও—'
—'তোমাকেই দিতে হবে?'
—'তবে আবার কার কাছে দেবে?' হাত বাড়াল।
পকেট থেকে রজনীকান্তর চিঠিটা বের করে—'এইটে পড়ে দেখো।'
—'কী, এ তো নোট নয়।'
—'না।'
—'চেক্?'
—'না। একখানা চিঠি।'
—'আমি তোমার কাছে একশ টাকা চেয়েছি।'
—'চিঠিখানাই আগে পড়ে দেখো না।'
মনোযোগ দিয়ে চিঠিখানা পড়ে অঞ্জলি—'এতক্ষণ আমাকে বলো নি কেন? তুমি লাক্ষার ব্যবসায় ছিলে?'
—'না।'
—'একশ টাকা ওকে ধার দিয়েছিলে বুঝি?'
—একটু চুপ থেকে—'না, তাও দেই নি।'
—'এই যে লিখেছেন।'
—'ও ভুল লিখেছেন।'
—'আবার রং করতে আরম্ভ করলে বুঝি?'
—'না, এ বেলা আমি ঠিকই বলছি।'
—'কিন্তু এ হাতের লেখা তো তোমার নয়।'
—'হাতের লেখা রজনীকান্তর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এ-রকম ব্যবসায়ী লোক সজ্ঞানে এ-রকম ভুল করবেন?'
—'করেছেন তো।'
—'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।'
—'আসে যায় না কিছু তাতে।'
—'টাকাটা কোথায়?'
—'দিচ্ছি।'
—'আরো ছত্রিশ টাকা পাঠাবেন তো—'
—'তাইতো লিখেছেন।'
—'সেটাও আমাকে দিতে হবে।'
—'পাঠালে দেব বইকি।'
—'এ টাকাগুলো আমি আমার কাছে রেখে দেব।'
—'দিও।'
—'দরকার মত খরচ করব। আমার কতকগুলো দরকারি বই কিনব।'
—'বই তো ছেলেদের কাছ থেকে পেতে পার।'
—'যদি না পাই? তোমার জন্য একটা স্কট ইমালশন কিনতে হবে।'
—'আমার জন্য?'
—'হ্যাঁ, কী চেহারাটা হয়েছে তোমার; একটা টনিক না খেলে চলবে না তো। আমার মনে হয় মাঝে-মাঝে তোমার জ্বর হয়।'
—'একটা থার্মোমিটার কেনো।'
—'তা কিনব বইকি। তোমাকে দুটো-দুটো বালিশ তৈরি করে দিতে হবে, আর একজোড়া কাপড় কিনে আনতে হবে তোমার জন্য। একেবারে অমানুষের মতো দিন কাটছে যে।'
—'জুতো?'
—'জুতো ছিঁড়ে গেছে তোমার?'
—'হ্যাঁ—'
—'আচ্ছা, ছত্রিশ টাকা এলে তা কিনে দেওয়া যাবে।'
একশ টাকা দিলাম।
পরদিন অঞ্জলিকে [দিয়েই বোধকরি] দেখলাম আমার কাপড়, শার্ট, নিজের কতকগুলো বই, নোট, একটা শাড়ি, নাগরাই একজোড়া, ভাল সাবান, পাউডার ও আমার কডলিভার অয়েল ইমালশনটা পর্যন্ত এনে হাজির।'
দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর নিজেই দুধ এনে ইমালশন তৈরি করে আমাকে খাওয়াল।
মাথা হেঁট করে নিস্তব্ধ হয়ে ভাবছিলাম।
তাকিয়ে দেখলাম থার্মোমিটার নিয়ে এসেছে। আমার টেম্পারেচার দেখছে। টেম্পারেচার অবিশ্যি সাতানব্বই ডিগ্রি উঠল।
—'কত টাকা খরচ হল অঞ্জলি?'
—'বেয়াল্লিশ টাকা শোয়া সাত আনা—'
—'তোমার জন্য একটা টনিক কিনেছ?'
—'আমার জন্য আবার কী?'
—'বাঃ, তোমারই তো দরকার-সন্তান হবার পর থেকে সেই যে সূতিকা ধরেছে, কিছু হজম হয় না, দড়ির মতো চেহারা হয়ে গেছে তোমার, যে দেখে সেই আক্ষেপ করে, পয়সা ছিল না, আমি এতদিন চুপচাপ করেই ছিলাম-আজ আমাকে একটু আক্ষেপ করতে দাও অঞ্জলি-বিকেলে বেড়িয়ে ফিরবার সময় একটা টনিক নিয়ে আসব।'
—'আমি যদি না খাই?'
—'তবুও আমি আনব।'
—'এনে পয়সা নষ্ট করবে?'
—'পয়সা নষ্ট হবার ভয়ে-ভয়েই ওষুধটা তুমি খাবে।'
অঞ্জলি মাথা হেঁট করে ছিল।
—'জীবনের সুস্থতা ও আনন্দকে আমরা চিনি না; কিন্তু পয়সাকে তো চিনেছি। ওষুধটা খেলে শরীর ভাল হবে, শরীর ভাল হলে পৃথিবীটাও খানিকটা ভাল লাগবে, এ-সব বিচার আমরা বিলাসীদের জন্য রেখে দিয়েছি। কিন্তু পয়সা দিয়ে ওষুধ কিনে সেটাকে পচে যেতে দেখলে টাকার বেদনা আমাদের কামড়ে আর আস্ত রাখবে না; না খেয়ে ওষুধের শিশি ফেলে রাখার জো আছে আমাদের?'
একটু চুপ থেকে—'আচ্ছা এনো টনিক; কিন্তু এত দুধ কোথায়?'
—'না হয় জল দিয়ে খেও।'
খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে অঞ্জলি—'ঐ জামাটা দেখেছ?'
—'কোথায়?'
—'ঐ যে খাটের ওপর-সাদা খদ্দরের ওপর সবুজ-সবুজ ফুল কাটা?'
—'ওটা, খুকির জামা নয়?'
—'হ্যাঁ-দেড় বছর বয়সের সময় এই জামাটা পরে সারা ঘর সে হেঁটে বেড়াত।'
—'কাঁদছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

—'আমার কাছে কত লজনচুশ চেয়েছে-দিয়েছি শুধু অনাদর আর অক্ষমতা; মাঝে-মাঝে চুরি করে এনে এক-আধ টুকরো গুড়। আজ যখন এত জিনিসের ব্যবস্থা হচ্ছে তখন সে নেই। লক্ষ্মীটি, দেখো তো গিয়ে ঐ জামাটার ভেতর সে আছে কি না।'

চুরুটের ছাই, ধুলোবালি, ছারপোকার রক্তমাখা আমার বিছানার উপর সারাদিন সে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। সারাটা দিন।

যখন জেগে উঠল, তাকিয়ে দেখল জামাটা নেই সেখানে আর।

—[?] ডেলোরোজা যখন বিছানায় পড়েছিল, ধীরে-ধীরে জামাটা তুলে আমি আমার বাক্সের এক কোণে রেখে দিয়েছি। রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকবে-মাঝে-মাঝে জামাটা খুলে এক-একদিন দেখব আমি; জীবনে এই এক গভীর ঐশ্বর্য রয়ে গেছে।

দু-তিন দিন পরে।

অঞ্জলির একখানা বই-এর মধ্যে এই দুখানা চিঠি পেলাম।

দুখানা চিঠিতেই তারিখ দেওয়া আছে, আট-দশ দিন আগের তারিখ।

প্রথম চিঠিখানা অমলের।

লিখেছেঃ

তোমার সঙ্গে প্রায়ই তো দেখা হয়—যখন খুশি তখন যেতে পারি—কথাও অনেক দূর পর্যন্ত চলে।

কিন্তু তবুও এক-একটা ব্যাপারকে আশ্রয় করে মানুষের হৃদয় মাঝে-মাঝে কেমন নিস্তব্ধ হয়ে উঠে—বড় নিগূঢ় হয়ে দাঁড়ায়। সেই জন্যই মানুষ ডায়েরি লেখে; কবিতা লেখে; চিঠি লিখবার প্রয়োজন বোধ করে। পৃথিবীতে অনেক গভীর রচনার ইতিহাসের পেছনেও...।

মুখে না বলে তোমাকে আজ আমি লিখছি তাই।

এ চিঠিখানা পড়ে তুমি কি বিস্মিত হবে—দুঃখিত হবে—কিংবা আঘাত পাবে? যদি পাও তাহলে আমাকে ক্ষমা করো। অনেক বিবেচনার পর তোমাকে আমি লিখেছি। কয়েকদিন সারারাত জেগে-জেগে বিচার করেছি, বসে-বসে একটুও ঘুম হয়নি আমার। আমার পিতাকে দাহ করবার জন্য নিয়ে যাবার সময় তাকে মৃত ছাগল ভেড়া কুকুরের স্তূপের ভিতর ফেলে রেখে যাবার আইন যদি আমার উপর জারি হয়, তাহলে মন যেমন বিচলিত হয়, হৃদয়ের শেষ লঘুত্বটুকুও বাষ্পের মতন মিলিয়ে যায় যেমন, সমস্ত বিরুদ্ধতাকেও উপেক্ষা করে মন যেমন তার গভীর আন্তরিক সম্বন্ধ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে পড়ে, তোমাকে চিঠি লিখবার আগেও হৃদয় আমার সেই নিবিড় আশীর্বাদের আস্বাদ পেয়েছে। সেই আস্বাদের ভিতর থেকেই এই চিঠিখানার জন্ম।

আমি নিবৃত্তিকেই ভালোবাসি; বয়স আমার ত্রিশের কাছাকাছি হয়ে এল প্রায়; কিন্তু মনের স্থিরতা আমার সত্তর বছর বয়সের মানুষের মত, তারই মতন, মনে হয়, আকাঙ্ক্ষার সমস্ত রংই-চেনা হয়ে গেছে যেন।

অখাদ্য মাংস খেয়ে উঠবার পর মনটা যেমন বিগড়ে থাকে, নিরপরাধ বৈরাগীর মুখ দেখতে ভাল লাগে, তাঁর গান শুনে আনন্দ পাওয়া যায়, তাঁর একতারা।

এ জীবনের পথে চলতে গিয়ে আমার অবস্থাও হয়েছে তাই। মনে হয় যেন পূর্বজন্মে রক্তমাংস নিয়ে যথেষ্ট যথেচ্ছাচার হয়ে গেছে-এই জন্মে তাই হৃদয় জীবনের অন্য আর-এক পিঠ দেখবার অবসর পেল।

কোন পিঠ বড়, কোন পিঠ ছোট, আনন্দ ও সৌন্দর্যের পাদপীঠই-বা কোনটা সে সব বলবার ভরসা আমি রাখি না। এই শুধু বলতে পারি যে জীবনের পথে এবার কোনো উত্তেজনা নেই, ধুলা কাঁকরের দীর্ঘ অবৈধ পথে হেঁটে রক্তাক্ততা নেই, সে সব চিন্তা ও কল্পনা মাথার ভিতর কৃমিকীট জন্মায় নি। আমি আছি—আমার লম্বা ছিপছিপে আর্যাবর্তের সন্ন্যাসীর মতো এই শরীরখানা, তাই বলে কেদারের পথে হাঁটবার কোনো প্রবৃত্তি নেই, যদিও ছাদে পাইচারি করেই বুঝি—আমি রয়েছি, ঘাস রয়েছে, উষা রয়েছে, আকাশ রয়েছে, নক্ষত্র রয়েছে; বিধাতাকে বিশ্বাস না করেও মনের শান্তি নষ্ট হয় না, প্রার্থনা না করেও মৃত্যুকে জয় করবার জন্য কোনো অমৃত রচনা করবার দরকার হয় না, অন্ধকারে একদিন ফুরিয়ে যাব যে, এই জেনেই ঢের গভীর আশ্বাস।

নিশ্চিন্তিকেই ভালবাসি আমি। কিন্তু এই যে চোখের সামনে দিনরাত ছেলেদের দেখি—শ্রাবণ রাতের—কী বলব? ব্যাঙের মতন? হ্যাঁ, ব্যাঙের মতনই—শ্রাবণ রাতের প্রান্তরের ভিতর ব্যাঙের মতন তৃষ্ণা ও আসক্তির জয়গান গাইছে একবার, অতৃপ্তি ও বেদনার পরাজয়ের তিক্ততায় তীব্রতায় কলরব করে উঠছে আরেকবার। এদের আমি ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। হয়তো এরাই সত্য-আমিই মিথ্যা।

সত্য কী জানা বড় কঠিন।

কিন্তু তবুও শ্রাবণের প্রান্তরে প্রান্তরে পুকুরের পাড়ে ধানক্ষেতে, উলুঘাসের ভিতর বর্ষার অবিরাম তীব্রতা ও বাদলের মর্মস্পর্শী কুয়াশার ভিতর ক্ষুধা ও খেদ, অধীরতা ও ব্যথা নিয়ে যে—জীবন—যে- জীবনপথের উপর আদিম যুগের চুম্বন রয়েছে, মধ্যযুগেরও, আধুনিক যুগেরও, সেই জীবনের পথে কোনোদিন চলি নি আমি, চলবার রুচি নেই আমার। এর আগে কোনো নারীকে আমি চিঠি লিখি নি, এক সেই মেদিনীপুরের কমললতা ছাড়া। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে কোনো নারীর সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক নেই আমার। কোনো বৈধ সম্পর্কও নেইঃ অনেক আগেই আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল— কিন্তু এখনো তো আমি বিয়ে করি নি।

চেহারার ভিতর আমার শ্রীহীনতা আছে বলে মনে করি না। নিজের চেহারার জন্য আমি লজ্জিত নই। আমার মন বিচার-ও কল্পনাবিমুখ নয় হৃদয় প্রেমহীন নয়।

পৃথিবীতে মানুষের ভিড়ের ভিতর নিঃসঙ্কোচে অনেকবার গিয়ে দাঁড়িয়েছি; যতদিন বেঁচে আছি বার বার গিয়ে দাঁড়াব আশা করি- নিঃসঙ্কোচেই। আমি তাদের মধ্যে গিয়েছি বলে কেউ লজ্জা ও গ্লানি বোধ করে নি কোনোদিন। কিন্তু তবুও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক বারই আমার মনে হয় পৃথিবীর পথে বারবার গিয়ে কী লাভ— যে-জিনিস সত্য সুন্দর জীবনের প্রয়োজনে সবচেয়ে প্রিয়তম ও নিকটতম এমন কোনো জিনিসকে নিয়ে .... কিন্তু এ -রকম জিনিস বড় একটা পাওয়া যায় না।

এক পেয়েছিলাম সেই মেদিনীপুরের ভিখিরিনীর মেয়ে কমললতাকে। যখন তাকে দেখি তখন তার যক্ষ্মা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে রুগির মতন বিছানায় শুয়ে থাকতে না সে। যাক, সে অনেক দিন হয় মারা গেছে।

আর-একবার পেয়েছিলাম আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটা কুকুরকে। শীতের রাতে রাস্তা দিয়ে ফিরছিলাম, এমন সময় দেখি একটা মিশন হাউসের থেকে একটা কুকুরকে ঠেঙিয়ে বের করে দেওয়া হচ্ছে। কুকুরটা বিলিতি নয় অবিশ্যি—পথেরই একটা কুকুর। আমাকে দেখেও সে ভয়ে খ্যাঁক করে পিছিয়ে গেল; চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার পৃথিবীর প্রতি ঘৃণা আক্রোশ বা বিষ কিছুই নেই আর -আছে অবলোকিতেশ্বরের মতো মর্মস্পর্শী করুণা ও কাতরতা। কুকুরটাকে কয়েক পয়সার বিস্কুট ও রুটি কিনে দিলাম-কৃতজ্ঞ।

আমি তাকে সঙ্গে করে আমার বাসায় নিয়ে গেলাম, দিনরাত আমার বাসায়ই থাকত, কুকুরটার গলায় বগলেস দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, বগলেস জিনসটা ভালও বাসি না আমি; একদিন কুকুরটাকে অনেকক্ষণ দেখতে পেলাম না; রাস্তায় পায়চারি করতে-করতে দেখি মিনউনিসিপ্যালিটির একজন ধাঙড় কুকুরটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে— মড়া যে তা বোঝাও যায় না— কিন্তু শুনলাম বগলেস ছিল না বলে গুলি করে মারা হয়েছে।

আর-একবার পেয়েছিলাম মায়ের এক ফটোগ্রাফ- মা অনেক দিন হয় মারা গেছেন। বাবার ঘরে তাঁর যে ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট আছে বাবার সেইটে দেখার অভ্যাস। কাজেই একটা পরিত্যক্ত বাক্সের এক কিনারে এই ফটোটা— মা যবে বিয়ে করে এনেছেন তখন, সেই সময়কার একটা ফটো—ফটোটা যখন পেলাম তখন মনে হল ঠিই এই জিনিসই আমি চেয়েছিলাম; জীবনপথের এই সংগ্রঞ্ঠঅ আমার খুব ভাল হল। যথেষ্ট সাহায্য ও বমবেদনা পাওয়া যাবে, সান্ত্বনা ও শান্তি। আর-একবার লাভ করেছিলাম আমার ছোট বোন-তিন বছর বয়সের সময় সে মারা যায়- তার একজোড়া ছোট্ট জুতো; ঘরের এক কোণে অন্ধকারে খাটের নিচে অনেকদিন হয় পড়েছিল, প্রায় দশ বছর, ধুলো-ময়লায় বিরস, মাকড়সা ও পোকার বাসা, জুতো, না দুটো মরা ছুঁচো, তখন দেখে বুঝবার জো নেই। কিন্তু ঝেড়েপুঁছে আলোর ভিতর এনে যখন রাখলাম তখন অনেকখানি লাভ হল। ঐ ঐশ্বর্যও চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবে। দেখলাম, তারপর এই বিশ বছর পরে, তোমাকে।

তোমাকে দেখলাম। আমার মায়ের ফটোগ্রাফটা, মেদিনীপুরের সেই কমললতা, সেই কুকুরটা, আমার বোনের জুতো জোড়া, তোমাকে দেখে জীবনের এই সব বিগত জিনিস আমার ভেসে যায় নি, কিংবা অর্থহীন হয়ে ওঠে নি, তাদের সান্ত্বনা ও সৌন্দর্য আরো ঢের বেড়ে গেছে বলে মনে হয়।

কাজেই তোমার মূল্য যে কত অকৃত্রিম গভীরভাবেই বুঝতে পারি আমি তা।

তুমি বলতে পারো, সবই তো শুনলাম, তুমি আমার কাছে আসছ-যাচ্ছ, কথা বলছ, বেশ এই রকমই থাক না কেন। আমি তোমাকে বাধা দিচ্ছি না। এ-রকমভাবে চিঠি লিখবার দরকার তবে?'

এই সব তুমি বলতে পারো।

না, তুমি বাধা দিচ্ছ না; যখন খুশি তোমার কাছে যাচ্ছি; অনেক দিন দূর থেকেও তোমাকে দেখতে পাই কার্তিকের সন্ধ্যার ধূসরতার ভিতর পল্লীর দুঃখিনী রূপসীর উনুনের খানিকটা নরম ধোঁয়ার মত শাড়ির আঁচল তোমার ধীরে-ধীরে অনন্ধারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঠিকই এই রকম যদি দেখতে পারতমা চিরকাল—তা হলে এ চিঠি লেখার প্রয়োজন বোধ করতাম না হয়তো। কিন্তু জীবনের অন্ধ ব্যবস্থা বড় কঠিন; ভবিতব্যতা কাউকে কারো কাছে বেশিক্ষণ রাখতে দেয় না; হৃদয় ও হৃদয়ের ভিতর যে, সামান্য সূত্রটি ব্যবধানের মত আছে, দেখতে-দেখতে তা সমুদ্রের মতন অলঙ্ঘ্য ও ক্ষমাহীন হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের জীবনের এই রীতি। অঞ্জলি, তুমি কি জানো না? নিশ্চয়ই জানো। হযতো তুমি বলতে পারো—অধীর হয়ো না, একটু শান্ত হয়ে অপেক্ষা করো। এই মানুষের যত ব্যবধানকেই তারপর একদিন স্বাভাবিক ও নিরাপদ বলে মনে হবে। এই রকম ব্যবধান হয়ে গেছে বলেই শান্তি বোধ করবে, আনন্দ পাবে; জীবন যে- রাস্তায় চলে তার নিগূঢ় মানে বুঝতে পেরে তাকে ক্ষমা করবে, ভালবাসবে এই রতম বলতে পারো তুমি।

তোমার আগেও অনেকে অনেককে এই রকম কথা বলেছে। আমি নিজেও অনেক সময় ভাবি-জীবন যখন এত অদ্ভুত জিনিসই ঘটে গেল তখন এই রকম বিপর্যয়ের মুহূর্তও যে না আসতে পারে তা তো নয়।

একদিন হয়তো এই বিপর্যয়ই হবে।

কিন্তু তবুও সেই শীত, [সেই] অন্ধ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে শান্তি পাব না সেদিন, আনন্দ পাব না; জীবনের ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে নেবার কোনো পথ খুঁজে পাব না।'

আমি তোমাকে বলি অপেক্ষা করে, বিবেচনা করে—এক দিন নয় অনেক দিন বসে—আমার এই কথাগুলো ভাল কবে উপলব্ধি করে দেখো তুমি।

তুমি ভাবতে পারো, বলতেও পারো আমাকে, বেশ তো, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আমরা যা আকাঙ্ক্ষা করি সবই কি পাই? পাওয়া উচিত নয়। অন্ধকারে মাথা হেঁট করে নিস্তব্ধভাবে চলে যাওয়াই তো ভাল, অনেক দূরে চলে যাওয়া। ভাল শুধু নয়-তা খুব সুন্দর। আমার নিজেরও অনেক সময় ইচ্ছা করে এই রকম স্নিগ্ধ উদাস পথে চলতে-চলতে অঘ্রাণের বিকেলে নরম ম্লানতার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর থেকে ফুরিয়ে যাই। এই রকম কথা সব বলতে পারো তুমি।

যদি বলো, অসত্য বলবে না। অনেক মানুষ জীবনের একান্তে গিয়ে এই রকম নিস্তব্ধভাবে দিন কাটাচ্ছে। তাদের বেদনা সুন্দর। কিন্তু তবুও অনেক সময় তাদের নিস্তব্ধতা বড় স্থূল হয়ে ওঠে, কাদার ভিতর শূয়োরের মত নিজেকে নিয়ে বড় ভয়াবহ প্রতারণার খেলা করে তারা।

আমার কেমন ভয় করে।

আমি বড় দ্বিধা বোধ করি। শেষ পর্যন্ত এই পথেই কি ছেড়ে দেবে আমাকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি হয়তো বলতে পারো-আমাকে কেন খুঁজে বার করলে তুমি? (আমি কি জানি না আমি কত অন্তঃসারশূন্য?) তুমি হয়তো আজ জানো না। কিন্তু একদিন বুঝবে—শিগগিরই বুঝবে একদিন সব। ফুটো হাঁড়ির মত আমিই-বা তখন কোথায় যাব? তুমিই-বা যাবে কোথায়?

নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখি নি বটে কোনোদিন; কিন্তু চোখ বুজে হোক, মাথা হেঁট করে হোক এদের পরিচয় ঢের পেয়েছি আমি। একজন সুন্দরীকে দেখে—তার কথাবার্তা অভিমান ও আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করে আমার কেবলই মনে হয়েছে এই যে এর রক্তমাংসের পেছনে যে হাড় ক-খানা খটখট করছে একদিন চিতায় শুয়ে বেরিয়ে পড়বে যা সব, আজও যেন এর সমস্ত আমোদ-আহ্লাদ, আত্মতৃপ্তি-যাকে এ প্রেম বলে, আনন্দ বলে, মমত্বের ভিতর থেকে সেই জিনিসই ফুটে বেরুচ্ছে শুধু; আমি ধারণাই করতে পারি না যে এর ভিতর অন্য কিছু আছে। বাস্তবিক, একদিন আমি এদের দেখে ক্ষুধার উত্তেজনা মাঝে-মাঝে অনুভব করেছি শুধু, কামনার কষ্ট পেয়েছি, অন্ধকারে অবাক হয়ে ভেবেছি এই হাড় ক-খানার এত বিক্রম? যেদিন সে-বিক্রমকে পরাজয় করতে পেরেছি সেদিনও শান্তি পাইনি। যেদিন পরাজিত হয়েছি সেদিন লাথি খাওয়া ঘেয়ো কুকুরের মত জীবনের মাটির পরিমাণের দিকে তাকিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে তো এতদিনের পরিচয়, কোনো অন্ধকার রাতে তোমার হাড়ের কথা মনে হয় নি, তোমার জিভ বের করে দেহকে জয় করবার কোনো কথা উঠে নি, তার কাছে পরাজিত হবার কোনো প্রশ্নও মনে জাগে নি। তোমার কথা মনে করলেই মনে হয়েছে জীবনে মাটির পরিমাণ ঢের কাম্য- হয়তো তখন মাটি ফুরিয়ে গেছে, জীবনটা কিছুতেই কোনো মুহূর্তেই মৃতপ্রায় কুকুরের মত শিঁটিয়ে পড়ে থাকতে পারে নি আর। সম্ভবত আশ্বিন কিংবা কার্তিকের বিকেলের প্রসন্ন টানের মত আমাদের দু'জনের জীবন, কিংবা চৈত্রের সন্ধ্যায় আঙিনার অপরাজিতার জঙ্গলের মধ্যে দুটো জোনাকির মত; চারদিকে তাদের অন্ধকার ও শিশিরের শান্তি, নিরপরাধ শান্তি; জীবনে এর চেয়ে বড় কথা নেই আর।

তুমি বলতে পারো নিরপরাধ হল কী করে? তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে [যাওয়া] যদি নিরপরাধ হয় তা হলে জীবনে অপরাধ কিছু নেই আর, এই বলবে তুমি।

আমাদের সেই সংসারের মানুষদের আগাগোড়া ইতিহাস যদি বিচার করে দেখি সেই আদিমকাল থেকে, বুঝব একটা কুৎসিত মাকড়াসার মত শূন্যের ভিতর দিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে আমাদের জীবন-প্রণালী ভেসে চলেছে। এ জীবন প্রণালীকে আমি কোনোদিনও শ্রদ্ধা করি না যদিও ব্যক্তিগত মানুষের বেদনা ও ক্ষতির কথা কী করে লঘু করা যায়, অনেক সময়ই নিঃসহায়ের মত ভাবি তাই : কিন্তু আমার কোনো কৃতকার্যে কারো ক্ষতি বা ব্যথার বোঝা বাড়াচ্ছি আমি-আমার বা তোমার জীবন সম্পর্কে এ রকম ব্যবস্থা নিয়ে কিছুতেই তৃপ্ত থাকতে পারব না; যে-শান্তির কথা বলেছি আমি তা আমার নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই তোমার অভাবে তোমার স্বামী যদি ক্ষতি ও বেদনা অনুভব করেন- অপর্যাপ্ত ক্ষতি ও ভূলুণ্ঠিত বেদনা—তাহলে এ জিনিসের এই দিকটাকে বিচার করে দেখতে হবে বই কি।

তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার বিশেষ কোনো ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও তাকে আমি উপলব্ধি করে দেখেছি।

'তুমি শুনলে হয়তো ব্যথিত হতে পার, হয়তো হবে না—কিন্তু আমি বুঝেছি, তিনি তোমাকে নিয়ে অতৃপ্ত। আমার মুখে এ কথা শুনে তোমার অভিমান হতে পারে, অহঙ্কারে বিক্ষুব্ধ হতে পারো তুমি, খানিকটা সময়ের জন্য অত্যন্ত বিমুখ হয়ে উঠতে পারে তোমার [মন] আমার প্রতি কিন্তু তবুও তোমার সঙ্গে এই চার বছরের সম্পর্ক রেখে বিয়ের আগের সেই বিশুদ্ধ জীবনের কোনো সজীব আশাপ্রদ রূপান্তর হয়েছে বলে তাঁর মনে হয় না।

তা হবেই বা কী করে? তুমি তার জন্য নির্মিত হও নি—তিনিও তোমার জন্য না। দেখেছি বাইরের ঘরে ঠেলে দিয়েছ তাঁকে, যে বিছানায় তুমি শোও সেখানে বিবাহের পর ছ'মাস মাত্র শুয়েছিলেন তিনি, ঝাড়ু হাতে রোজ তাঁকে নিজের ঘর ঝাঁট দিতে দেখি, নিজেই বিছানা পাতেন, নিজেই কাপড় কাচেন, জামার বোতাম লাগান, ছেঁড়া জামাও সেলাই করতে দেখেছি তাঁকে। তোমার মেয়েটি যতদিন বেঁচেছিল সেও তার বাবার কাছে থাকত। দেখলাম বিচ্ছিন্ন থাকতেই ভাল লাগে তোমার: জীবনের নিষ্ফলতাকে একবার বোঝা বলে মনে হয়, একবার মনে হয়, সুন্দর বিমর্ষতা। যখন স্বামী কাছে আসেন বিষণ্ণতাও তোমার কেমন স্থূল হয়ে ওঠে যেন। দিনান্তের অশ্বত্থের ভাঙা ডালে চাপা পড়া একটা বিকীর্ণ করবীর শাখার মত যখন সরে যান স্বামী, বিমর্ষতা তোমার রূপের মত মর্মস্পর্শী হয়ে ফুঠে ওঠে। বিগত জীবনের স্বপ্ন দেখ তুমি। যা হয় নি, হল না, হয়তো হবেও না কোনোদিন—তাও হবে, কোনো-না-কোনোদিন হবে এই মিথ্যা আশ্বাসে কাল কাটাও তুমি।

তোমাদের দু'জনের সম্বন্ধ এই রকম।

তোমার স্বামী সেদিন এই কটা লাইন পড়ে পড়ে আমাকে শোনাচ্ছিলেন ঃ

I having a wife....says she.

দেখলাম, তৃপ্তি তার আন্তরিক।

তোমরা যদি ইংলন্ডের দিনমজুরের ঘরে জন্মাতে, তা হলে তোমাদের দু'জনের অবস্থা হত ঠিক এই রকম।

কিন্তু এদেশে এই অবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করে তোমরা আজীবন পরস্পরের সাথী থেকে কাটিয়ে দেবে- ডগডগে লাল পাড়ের শাড়ি পরবে, সিঁদুর পরবে, আলতা পরবে, শাঁখা ভাঙলে কষ্ট পাবে, নোয়াকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখবে, অন্তঃপুরের ভেতর স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ করবে, বাইরে ঘোমটা ও নতদৃষ্টিকে নারীত্বের সবচেয়ে গৌরব বলে উপলব্ধি করে চলবে, বারবার শিহরিত হয়ে নিজেকে জননী বলে বুঝবে অথবা বিধবার থান পরবে, পাথরের থালে খাবে, আমিষ খাদ্য বর্জন করবে, একাদশী চলবে, তীর্থে-তীর্থে ঘুরবে। বুড়ো বয়সে রুদ্রাক্ষ ও নামাবলিও কি গলায় জড়াবে না? একটা ময়নাও পুষবে বটে। তারপর বৃদ্ধ বিধবা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে কবিরাজের বড়ি গিলবে হয়তো; একদিন খাটের থেকে উলে কুলের আচার ও আমচুর খাওয়ার ব্যর্থ স্বপ্নে আজীবনের দাম্পত্যের সমস্ত ব্যর্থতা ভুলে যাবে তুমি।

তাই তো, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কাদার ভিতর দিয়ে, ধুলোর ভিতর দিয়ে, অন্ধকারের মধ্যে, কাঁকর ও কাঁটার পথ দিয়ে, সাপের গর্ত মাড়িয়ে, রক্ত ও অশ্রু মুছতে-মুছতে সেই পথ বেয়ে-বেয়েই তো চলেছে-সেই পথ শেষের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদের শিশুটি মরে গেছে; সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে এত কথা লিখবার প্রয়োজন বোধ করতাম না। আমি, কোনো কথাই লিখতে যেতাম না, তার কুয়াশাবাত অস্পষ্ট জীবনের প্রসন্ন বিকাশের পথে কাঁটার মত দাঁড়াতাম না এসে।

কিন্তু সে নেই।

তোমার স্বামীও তোমার জীবনে নেই।

তুমিও তার জীবনে নেই আর।

এক নিকট সান্নিধ্যে থেকেও তোমরা দু'জনে পরস্পরের থেকে দূরে, যেন বহু দূরদূরান্তরে; দু'জন তোমরা দুই বিচিত্র জগতে বাস কর; এক নক্ষত্রের থেকে আর-এক নক্ষত্রে যাওয়াও সহজ, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ের ভিতর কোনো বিনিময়ের পথ নেই। এত কষ্ট দিচ্ছ কেন তাকে? তুমিও-বা কেন কষ্ট পাচ্ছ? মানুষ হয়তো ভাল বুঝেই সব কাজ করে; কিন্তু আকাশে-বাতাসে কারা থাকে-তার সমস্ত শুভবুদ্ধি ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষাকে পণ্ড করে দিয়ে যায়-যেখানে সহানুভূতির প্রত্যাশা করে সেখানে গিয়ে দেখে শুষ্কতা। যেখানে ভালবাসা চায় সেখানে পায় অভিনয়; সেখানে স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা করে সেখানে দেখে অবৈধ কলরবের হাট বসে গেছে-শেষ পর্যন্ত অসার মাটি এসে সমস্ত জীবনটাকে ভরে ফেলতে থাকে।

মাটি এসে তোমার জীবনটাকেও যে ঘিরে ফেলেছে অঞ্জলি, এ কথা ভাবতে গেলে দুঃখ পাওয়ার কোনো জবাব খুঁজে পাই না আমি।

চলো, কোনো এক প্রান্তরে চলে যাব আমরা, গভীর রাতে সবুজ ঘাসের নিঃশ্বাস চারদিকে, মাথার উপর কখনো-বা গাঙশালিখের দল, কখনো শরতের নক্ষত্র। সেইখানে বাসা বাঁধব আমরা—

চিঠিখানা এর পর বাস্তব ঘর-সংসারের হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত।

সাড়ে তিনশ টাকা সম্বল করে অমল আপাতত এই নারীটিকে নিয়ে চলে যেতে যায়; দু-চার মাসের মধ্যে সাড়ে সাত হাজার টাকা আশা করে; ভবিষ্যতে আরো দেড় লাখ টাক প্রাপ্তির সম্ভাবনা রাখে।

অঞ্জলির এই সুন্দর স্বপ্ন—তার ভিতরেও এত টাকা-পয়সার হিসাব? চিঠিখানার শেষের দিকটা মনকে বড় পীড়া দেয়। প্রেমের পথে চলতে গিয়ে এত হিসেবের হুচোট বাদ দিলে হত না কি? বললে হত না কি—সবই তো বলেছি—এখন চলো।

কিন্তু নারীর কাছে বড়-বড় অঙ্কের হিসাবই যে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস, এই প্রেমিক ছেলেটি তাও জানে।

অঞ্জলির চিঠিখানা ঃ

ভাই অমল,

তোমার চিঠিখানা পড়েছি। পড়েই এর এক উত্তর লিখে রেখেছিলাম, কিন্তু তুমি সেদিন আসনি—কাজেই তোমাকে তা দিতে পারিনি। সে চিঠিখানা তারপর আমি ছিঁড়ে ফেলেছি; সে চিঠিখানা গেলে বড্ড আঘাত পেতে। মানুষকে আঘাত দিয়ে কী লাভ? বিশেষত তোমার মত মানুষ, যার দেড় লাখ টাকার পৈত্রিক বিষয়ই শুধু নেই, বিচার-কল্পনাও বেশ আছে, লিখবার শক্তিটুকুও বেশ মানানসই।'

বাস্তবিক শত চেষ্টা করেও তোমার মত লিখতে পারব না আমি। কবির মত লেখ নি তুমি; লিখেছ হিস্টোরিয়ানদের মত; অবিশ্যি রদ্দি হিস্টোরিয়ানদের কথা বলছি না আমি—ফ্রুড নয়, কার্লাইলও নয়-ধরো যেমন গিবন, কিংবা মমসেন। আমার মনে হয়, লিখবার অভ্যাস রাখলে, খুব পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে এ জিনিস অনুশীলন করলে, বেশি বয়সে তুমি কয়েক ভলিউম চমৎকার ইতিহাস রেখে যেতে পারবে-ধরো, আমাদের দেশের বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে কিংবা মুসলমান আমল, কিংবা মারাঠি আমল সম্বন্ধে।

তোমার চিঠিখানা সম্বন্ধে আমি ভাবছি।

তুমি আমাকে অনেকবার পড়তে বলেছ; অনেক দিন বসে, অনেক দিন অপেক্ষা করে উত্তর জানাতে বলেছ।

তোমার এই অনুরোধটুকু আমাকে রাখতে হবে। তুমি অনেক কথা লিখেছ—অনেক ভাববার কথা; আমরা কল্পনা ঢের কম; উপলব্ধিও দুর্বল-তোমার এ চিঠিখানার নানা রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে ঢের দেরি লাগবে। তবে একটা কথা ঠিক। জীবনটাকে যদি গোলকধাঁধার মত মনে হয় কোনোদিন, তাহলে বুঝব সুন্দর শুভ কাম্য ও সহানুভূতির পথ নিয়ে অমল দাঁড়িয়ে আছে—তাকে ডাকলে হয়।

ডেকে বলব শতখানেক টাকার দরকার, ধার দিতে হবে, শোধ দিতে একটু দেরি হয়ে যেতে পারে কিন্তু অমল। কিংবা তুমি ততদিনে ডাক্তার হয়ে বেরুবে, বলব, আমার স্বামীর এই-এই অসুখ, তোমাকে একটু বিনে পয়সায় দেখে দিতে হবে।

আশা করি প্রীত হয়েই এমন করবে তুমি।

কিন্তু তবুও ভবিষ্যৎ তোমার জীবনে কোনো রূপান্তর আনবে বলতে পারি না।

তুমি কোথায় থাক তাই-বা কী করে জানব।

আমার শুভ আশীর্বাদ জেনো।

ইতি
অঞ্জলি

আপাত দেড় লক্ষ টাকার লোভ ছেড়ে দিয়েছে অঞ্জলি; তারও চিঠির বাকি কথাগুলো তার অভিমানের কথা-অভিনয়ও নয়, আন্তরিকতাও নয়। কেন এমন অভিমান করল অঞ্জলি? দারিদ্র্য ও নারীত্ব নিয়ে অহঙ্কার-অভিমান আমাদের এ দেশের এক ধরনের গৃহস্থ বধূদের খুব ভাল লাগে। হয়তো এ চিঠিখানা লিখে বালিশে মুখ গুঁজে সে অনেক কেঁদেছে অমলকে ভালবেসে, আমাকে ঘৃণা করে না, নিজের নিঃসম্বল সংসার ও অজেয় নারীত্বের আড়ম্বরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুদিন পরে রজনীকান্ত খাসনবীশের একখানা চিঠি পেলামঃ

ভুল-প্রমাদ সকলেরই হয়। আমারও তাহা হইয়াছে। আমি কাগজপত্র পুনরায় নাড়াচাড়া করিতে গিয়া দেখিলাম তোমাকে যে একশত টাকা মানি অর্ডার করিয়া পাঠাইয়াছি উহা অমার ত্রুটি বশত প্রেরিত হইয়াছে। লাক্ষার ব্যবসা সম্পর্কে যাহার নিকট একশত টাকা ধার করিয়াছিলাম সে অন্য ব্যক্তি। তুমি নও। তোমার একখানা পুরানো চিঠি আমার দলিলপত্রের ভিতর মিশিয়া যাওয়াতে—এবং বৃদ্ধ বয়সে অনেক রাত্রি জাগিয়া কাজকর্ম করার দরুণ—কোনো কর্মচারী না থাকায়—এই রকম প্রমাদ মাঝে-মাঝে যদি ঘটে তাহাতে বিস্মিত বা অপদস্থ হইবার কিছু নাই।

তুমি পত্রপাঠ সম্পূর্ণ টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবা। কোনো বাধা কবিরা না। 'বিলম্ব হইলে মহাজনী কারবারের খানিকটা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

কিমধিকমিতি

বংশবদ রজনীকান্ত খাসনবীশ

এ চিঠির অবিশ্যি আমি কোনো উত্তর দিতে গেলাম না। বেয়াল্লিশ টাকা সেদিনই অঞ্জলি খরচ করে ফেলেছ। আরো দশ-বার টাকা খরচ হয়ে গেছে। একশ টাকা কোথা থেকে পাঠাব আমি? পাঠালে প্রথম দিনই পাঠিয়ে দিতাম।

এখন রজনীকান্তকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীবিলাসের বইখানা নিয়ে নিজের ঘরে বসেছিলাম।

বাবা এসে—তোমার একখানা চিঠি দেখলাম।'

—'আমার?'

—'হ্যাঁ-তোমারই তো।'

—'কোথায়?'

—'কেন পিয়ন তোমাকে দেয় নি?'

—'ওঃ, পোস্ট অফিসের চিঠির কথা বলছেন?'

—'রাস্তায় পিয়ন আমার কাছে দিয়েছিল-আমি তোমার কাছে দিয়ে আসতে বললাম।'

—'হ্যাঁ, সে চিঠি আমি পেয়েছি।'

—'পোস্ট অফিসের চিঠি আমি পড়ে দেখলাম।'

—'ও, আপনি দেখেছেন বুঝি?'

—'রজনীকান্ত কে? কে তিনি?'

—'লাক্ষা-তিসি-চা নানা রকম ব্যবসায় তার—'

—'তার সঙ্গে তোমার চেনা হল কোথায়?'

—'কলকাতায়।'

—'কী সূত্রে?'

—'এক সময় কয়েকদিনের জন্য আমাদের মেসে এসেছিলেন তিনি-আমার পাশের ঘরেই থাকতেন। তখন আলাপ হয়।'

—'তার ব্যবসায়ে কখনো তুমি সংযুক্ত ছিলে?'

—'না।'

—'একশ টাকা ধার নিয়েছিলেন তিনি তোমার কাছ থেকে?'

—'না।'

—'এ টাকাটা তুমি তার কাছ থেকে কোনো উপায়ে উপার্জন করেছিলে?'

আবার মাথা নেড়ে—'না।'

—'কিছুদিন আগে তিনি তোমাকে একশ টাকা মানিঅর্ডার করে পাঠিয়েছিলেন?'

—'ইনশিওর করে পাঠিয়েছিলেন।'

—'একশ টাকা?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোনো চিঠি লেখেন নি?'

—'কভারের ভেতরে চিঠি ছিল।'

—'কী লিখেছিলেন?'

—'লিখেছিলেন, কলকাতায় লাক্ষার ব্যবসা করবার সময় বছর আটেক আগে আমার কাছ থেকে যে-একশ টাকা ধার নিয়েছিলেন এখন তা পাঠিয়ে দিচ্ছেন।'

—'কিন্তু এ ত তাঁর হিসেবপত্রের ভুল?'

—'হ্যাঁ।'

—'টাকাটা পেয়ে তা হলে পাঠিয়ে দিলে না কেন?'

চুপ করে ছিলাম।

—'টাকাটা কোথায়?'

কোনো উত্তর দিলাম না।

—'টাকাটা আমাকে দাও। আজই আমি পাঠিয়ে দেব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'সে টাকা তো অনেক খরচ হয়ে গেছে?'

বাবা একটু বিস্মিত হয়ে—'কে খরচ করল!'

—'আমিই।'

একটু চুপ থেকে—'বৌমাকে দিয়েছিলে তুমি? সেও জানে তোমার যা-পাওনা নয় সেই জিনিসই তাকে তুমি খরচ করতে দিয়েছ?'

—'না, তা সে জানে না।'

বাবা তারপর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে 'কী কিনেছ?'

—'অঞ্জলি কয়েকখানা বই কিনেছে।'

—'কীসের বই?'

—'বই ঠিক নয়, নোট, বি-এ পড়বে—'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে, 'এই শুধু-আর-কিছু কেনা হয় নি?'

—'না, প্রায় ষাট টাকার মত খরচ হয়ে গেছে।'

—'যে-টাকাটা তোমার উপার্জিত নয়, তা দিয়ে, সেটা, এ-রকম করে খরচ করতে গেলে কেন তুমি?'

একটু চুপ থেকে—'আর কী কিনেছ?'

—'কাপড় দু'জোড়া।'

—'কার জন্য?'

—'আমার জন্য।'

—'পাট ভেঙেছ?'

—'না।'

—'তা আমি ফিরিয়ে দেব।'

—'এক জোড়া জুতোও কিনেছি।'

—'তোমার জন্য?'

—'আমার জন্য, অঞ্জলির জন্যও একজোড়া।'

—'ব্যবহার করা হয়েছে?'

—'না।'

—'ফিরিয়ে দিতে হবে।'

—'শাড়িও পরে নি বোধ করি, কিনেই বাক্সে রেখে দিয়েছি।'

—'এই সমস্তই গুছিয়ে আমার কাছে দিতে হবে। আমি বিকেলেই ফিরিয়ে দিয়ে আসব সব।'

মাথা হেঁট করে বসেছিলাম।

—'বাকি যে—টাকা বৌমার কাছে রেখেছ তাও এনে দিতে হবে আমাকে, আমি কালই রজনীকান্তকে মানিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেব।'

বিকেলে বাবা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে স্কুল থেকে ফিরে এলেন। কিছু না-খেয়ে কাউকে কোনো কথা না বলেই বেরিয়ে গেলেন।

অনেকটা রাত করে ফিরে এসে আমাকে ডেকে, 'শোনো।'

তাঁর ঘরে গেলাম।

—'জিনিসপত্র এনে গুজিয়ে রেখেছ সব?'

মাথা নেড়ে, 'না।'

—'বৌমার কাছে বাকি টাকাটা চেয়েছিলে?'

—'না, তাও চাইনি।'

—'ভালই করেছ। আমার ভয় হচ্ছিল, তোমাকে হলে যাই নি, হয়তো চেয়ে বসবে। যাক, কোনো দরকার নেই। বৌমার কাছ থেকে তুমি শাড়ি বা টাকা ফিরিয়ে আনতে যাও নি যে, ভালই হয়েছে। যদি আমার নাম করে ফিরিয়ে আনতে সে আঘাত এই বুড়ো বয়সে আমি কখনো ভুলতে পারতাম না।

—'কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?'

—'লোন অফিসে!'

—'কেন?'

—'আরো শতখানেক টাকা ধার করতে হবে তার ব্যবস্থা করে এলাম।'

—'আবার ধার করবেন?'

—'ভয় নেই তোমার! সমস্তই আমি শোধ দিয়ে যাব। তোমাদের ঘাড়ে কিছু ফেলে যাব না। তিন হাজার টাকা ঋণ ছিল, এই পনের বছর বসে ষোল শ করে দিয়েছি, বাকি ছিল চৌদ্দ শ, রাজনীকান্তর এই এক শ নিয়ে আবার হল দেড় হাজার, আমার বয়স এখন বাহাত্তর-আমি আট-দশ বছরের মধ্যেই এ টাকাটা শোধ করে দিতে পারব।'

—'আরো আট-দশ বছর কাজ করবেন আপনি?'

—'বৌমা কোথায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'রান্নাঘরে।'

—'রাঁধছে?'

—'খাচ্ছে হয় তো।'

—'তুমি খেয়েছ?'

—'না।'

—'যাই, আমিও খেতে যাই। স্কুল থেকে এসে আর-কিছু খাওয়া হয় নি। সকালবেলা শকুনের মত আমি যে-সব কথা বলেছিলাম বৌমাকে বলেছ না কি?'

—'না।'

—'খবরদার। কোনোদিনও বলো না-এ বুড়ো বয়সে আমি তা হলে বড্ড কষ্ট পাব।'

—'অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন?'

—'না, লণ্ঠন লাগবে না।'

—'বৃষ্টি পড়ছে যে।'

—'এই তো রান্নাঘরে গিয়ে উঠলাম বলে।'

রজনীকান্তর আর-একখানা চিঠিঃ

তুমি মনে করিয়াছ আইন অনুসারে কোনো স্টেপ না নিলে তুমি টাকা পাঠাইবে না। ভাবিয়াছ হয়তো আইনের সুব্যবস্থা আমার হাতে নাই-তোমাকে টাকা পাঠাইয়া দিয়াছি, সঙ্গে তোমার নিকট আমার ধার স্বীকার করিয়া একখানা চিঠির দলিলও দিয়াছি-অতএব তোমার কাজ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা তুমি ভাবিতে পার বটে, তোমার উকিলও তোমাকে নানা রকম কুপরামর্শ দিবে। কিন্তু তবুও জানিও পৃথিবী এত সহজ জায়গা নয়। পরের বিষয় হস্তগত করিয়া খাইতে গিয়া রাজামহারাজারা কুপোকাত হইয়া গেল, তুমি চুনোপুঁটি হইয়া আমার চোখে ধুলো দিতে চাও। সততার কথা না-হয় ছাড়িয়াই দিলাম-বিবেক, চরিত্র, সাধুতা, ভগবান ও ধর্মের দোহাই দিয়া তোমাদের মত মানুষের নিকট অনুরোধ-উপরোধ করিয়া কোনো লাভ নাই।

অন্য বহুবিধ অস্ত্র আমার হাতে আছে। এই যে প্রত্যেকটি চিঠি তোমাকে লিখিতেছিঃ আমার বাঁ পাশে একজন পুলিশ অফিসার এবং দক্ষিণ দিকে একজন উকিল বসিয়া-বসিয়া প্রত্যেকটি চিঠির খশড়া স্ট্যাম্প দিয়া রেজিস্টার করিয়া নিতেছে।

যাক, তোমার উপর অচিরেই নির্দয় হইবার বাসনা করি না। আরো কয়েকদিন সময় দিলাম। ইতোমধ্যে যদি আমার প্রাপ্য এক শত টাকা না পাঠাইয়া দাও তাহা হইলে আর কালক্ষেপ না করিয়া আমাকে নিজের হস্তেই আইন লইতে হইবে।

রজনীকান্ত খাসনবীশ

পরদিন লোন অফিস থেকে বাবা সন্ধ্যার সময় ফিরলেন।

—'টাকা পেয়েছেন?'

—'না।'

—'দেবে না?'

—দেবে বইকি।'

—'তবে?'

—'একটু ঘুরিয়ে দেবে আর-কি।'

—'কিছু মর্টগেজ রাখতে চায় বুঝি?'

—'হ্যাঁ, সেই রকমই ইচ্ছা; কিন্তু মর্টগেট দেবার মত কোনো জিনিস তো আমার নেই।'

—'কেন এই বাড়িটা?'

—'কতটুকুই-বা বাড়ি-আধা-আধি তো মর্টগেজ দেওয়াই হয়ে গেছে।'

—'বাকিটা?'

—'তা হলে তোমরা দাঁড়াবে কোথায়?'

বাবা দেওয়ালের ওপর ছায়া ফেলে খানিকক্ষণ-সেই ছায়ার ভিতর থেকে সঞ্চারিত মানুষের মত বললেন—'না, তা হয় না।'

—'আবার যে চাদর কাঁধে নিলেন?'

—'যাই, একটু তারিণীবাবুর কাছে।'

—'কেন?'

—'দেখি, কোনো বিলিব্যবস্থা হয় কি না। এ বাড়ি আমি মর্টগেজ দিতে পারব না। তা হলে তোমার মাথা গুঁজবে কোথায়?'

—'না খেয়েই যাচ্ছেন?'

কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর অন্ধকারের মধ্যে বাহাত্তর বছরের বুড়ো মানুষ বেরিয়ে পড়লেন সেই মাইল তিনেক দূরে তারিণীবাবুর বাসার উদ্দেশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকেও বেরুতে হয় তা হলে।

আধঘণ্টা পরে শ্রীবিলাসের আস্তানায় গিয়ে হাজির হলাম।

—'কী হে, বই ক খানা ফিরিয়ে দিতে এসেছ বুঝি?'

—'না, বই-এর জন্য না—'

—'বই রেখে দেবার জন্যে?'

—'না। ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

—'আমি ও-সব বই পড়িটড়ি না, তবু মিছিমিছি টাকার মাল হারিয়ে লাভ কী?'

—'তা তো বটেই।'

—'কাল সকালে এসে দিয়ে যেও।'

—'আচ্ছা।'

—'না যদি দাও, তা হলে আমাকেই মোটরে করে নিয়ে আসতে হবে।'

—'না। সে কষ্ট আর করবে কেন?'

—'করতে হয় মাঝে-মাঝে; দেনা-পাওনার ব্যাপারে নানা রকম চামারগিরি।'

—'তাই না কি?'

—'এ ক্ষেত্রে চামার কিন্তু তুমি—'

—'আমি—'কেন, আমি তোমার বই ঠেকিয়ে রেখেছি না কি?'

—'প্রথমত, জোর করে নিয়ে গেছ।'

—'জোর করে?'

—'আমার দেবার ইচ্ছা ছিল না তো।'

—'কই, তা তো বল নি।'

—'কে, তুমি কি মানুষের মুড স্টাডি করতে পার না, সবই কি মুখ ফুটে বলতে হবে।'

—'ওঃ, সেই কথা!'

—'প্রথমে তো বই-এর কেস খুলতে চাইলাম না, তবু জোর করে খোলালে, তার পর-'

—'যাক গে, আজ রাতেই না হয় ফেরত দিয়ে যাব।'

—'চললে?'

—'হ্যাঁ চললাম।'

—'বই আনতে?'

—'হ্যাঁ ফেরত দিয়ে যাব।'

—'দিয়ে যাব বললেই তো হল না-আজ রাতেই চাই আমি।'

—'কেন, আজ তুমি চলে যাচ্ছ না কি?'

একটা পয়েন্টার দিয়ে জানালায় আঘাত করে শ্রীবিলাস—'সে কথা তো হচ্ছে না, আজ রাতেই বই চাই আমি।'

—'একখানা কবিতার আর দু'খানা পলিটিকসের বই, না?' গুম হয়ে একবার আমার দিকে তাকাল শ্রীবিলাস।

—'বেশ বই; কবিতার বইখানা আমি পড়ছিলাম।'

পয়েন্টার দিয়ে জানালার গরাদে একবার আঘাত করল শুধু।

—'আচ্ছা যাই।'

অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু শ্রীবিলাসের কাছে এক শ টাকা ধার না পেলে কার কাছে পাব আর?'

মিনিট পনের পরে ঘুরেফিরে আবার এসে হাজির হলাম শ্রীবিলাসের কাছে-একটা নীল ঢাকনাওয়ালা উজ্জ্বল টেবিল ল্যাম্পের কাছে চুপ করে বসে-বসে সিগারেট খাচ্ছিল।

—'কে?'

—'আমি শচীন।'

—'বই এনেছ তুমি?'

—'না, এখনো আনি নি। এই তো তোমাদের বাড়ির কাছে বটতলায় দাঁড়িয়েছিলাম।'

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সিগারেটটা ঝেড়ে নিয়ে-'কী মতলব তোমার, বলো তো দেখি!'

—'আমি এসেছি এক শ টাকা তোমার কাছ থেকে ধার করতে।'

একটু হেসে—'তোমাকে বিক্রি করলেও এক শ টাকা পাওয়া যায়?'

—'বেশ, তোমার কাছে আমাকে বিক্রি করতেই রাজি আছি।'

—'বেশ, আমার জুতো বুরুশ করে দিতে পারবে?' পা বাড়িয়ে দিল।

একটু হেসে-'বুরুশ কোথায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'জুতোবুরুশকে তো তা বলে দিতে হয় না।'
উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, আবার বসলাম।'
বললাম—'ব্যাপারটা কী হয়েছে শুনবে শ্রীবিলাস?'
—'কোনো দরকার নেই আমার শুনবার।'
—'শুনতে অবিশ্যি তুমি পারতে।'
—'কিছু দরকার নেই, আমি তোমাকে টাকা দেব না।'
—'আচ্ছা চন্দ্রর ঠিকানা কী বলতে পারো?'
—'চন্দ্র কে?'
—'চন্দ্র কে, চেনো না? স্কুলে পড়েছিলাম একসঙ্গে।'
শ্রীবিলাস একবার ভ্রূকুটি করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে—'আমি পড়িনি কোনোদিন।'
—'বাঃ।'
—'আমি নামও শুনিনি তার।'
—'চন্দ্র চৌধুরী।'
—'এখানে কি দালালি নিয়ে বসলে না কি?'
—'চেন না চন্দ্র চৌধুরীকে?'
—'ভদ্রলোকের মত কথা বললে তোমার কানে যায় না? চিরকাল মুখ খিস্তি শুনবার অভ্যাস বুঝি?'
—'যাক-এক শ টাকা তোমাকে দিতেই হবে।'
—'তোমাদের দু'জনকে বিক্রি করে এর সুদও তো উঠবে না—'
—'দু জন কে?'
—'তুমি আর তোমার মানিকজোড়। তোমাদের ছেলেপিলে হয়েছিল?'
—'হ্যাঁ।'
—'কটি?'
—'একটি।'
—'সেই ছেলেটিকে আমাকে দাও-বাপের বদলে সেই না হয় আমার জুতো সাফ করে দেবে।'
—'ছেলে তো হয় নি-মেয়ে।'
শ্রীবিলাস কিছুক্ষণ চুপ থেকে—'আচ্ছা মেয়েটিকেও দাও।'
—'কী করবে তাকে দিয়ে?'
একটু হেসে—'বাড়িউলি বানাব।'
খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে—'আমি তো বেশিক্ষণ বসতে পারব না শ্রীবিলাস।'
—'এখনই উঠে যেতে পারো।'
—'টাকাটা আনো তা হলে?'
—'টাকা আমার পকেটেই আছে।'
—'দাও, আমি তোমাকে তিন-চার মাসে শোধ দিয়ে দেব।'
—'কত সুদ দেবে?'
—'কত চাও?'
—'মাসে আট টাকা করে।'
—'আচ্ছা বেশ, তাই।'
—'গিন্নিকে ডাক দেই তা হলে?'
—'কেন, গিন্নি কেন-তুমি নিজেই দিতে পারো না?'
—'না, গিন্নির আসা দরকার।'
—'তিনি এসে কী করবেন?'
—'প্রথমত পরামর্শ দেবেন।'
—'আচ্ছা, এই ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নাই-বা নিলে।'
—'তা কি কখনো হয়? তার পর চাবিও তো তাঁর কাছে।'
—'বললে না পকেটে টাকা আছে!'
—'এক শ টাকা পকেটে রেখে ঘুরব? আমি কি মগ?'
শ্রীবিলাস একটা শিস দিয়ে, হাত চাপড়ে, ডাকল-'ডালিং।'

দেখতে-দেখতে পাশের ঘরের থেকে একটি লম্বা-চওড়া বিরাটকায় মেয়েমানুষ এসে হাজির।

গায়ে পর্দার পর পর্দা রেশম শুধু-রেশমের দোকানই বাস্তবিক-মুখের থেকে ঘামের সঙ্গে মিশে পাউডার গলে পড়ছে-গলা ঘামে ও পাউডারে বীভৎস; রং মেটে ধরনের; সমস্ত শরীরটা মেদের একটা বিরাট বেলুন-যে-কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তে দুই হাত ছড়িয়ে নক্ষত্রের দিকে যাত্রা করতে পারে। মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়-রক্তমাংসের ব্যবহার এর খুব ভাল লাগেঃ আলো জ্বালিয়ে খাবার টেবিলের থেকেও বটে, বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে লুটিয়ে-লুটিয়েও তেমনি।

শ্রীবিলাস—'বসো অরুণা।'

—'না, বসব না।'

—'কেন?'

—'কিটিকে চিঠি লিখছিলাম।'

—'বাই দি ওয়ে, কিটির খবর কী?'

—'ওরা সব শ্বশুর বাড়িতে আছে।'

—'এই দুটিতে, না-হল পেঁয়াজ, না-হল পয়জারা!'

—'ইনি কে?'

—'এক শ টাকা ধার চাচ্ছেন।'

—'কে? ইনি?'

—'হ্যাঁ।'

—'একে তুমি পিক-আপ করলে কোথায়?'

—'এই ঘরের মধ্যেই?'

—'এত রাতে!'

—'সিঁদেল চোর নয়! বা বার্গলার নয়।'

অরুণা চলে যাচ্ছিল।

শ্রীবিলাস—'দিলে না টাকা!'

—'তুমি ইচ্ছে করলে দিতে পারো-আমি দিতে পারব না।'

—'তার মানে?'

খানিকটা ফিরে এসে অরুণা—'একে তো কোনোদিন চোখে দেখি নি আমি।'

—'আমি তো এই পনের মিনিট ধরে দেখছি।'

—'ইনি কী কাজ করেন?'

—'টাকা ধার করে বেড়ান।'

—' কোনো ব্যবসা আছে?'

—'এই তো ব্যবসা।'

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল সে।

শ্রীবিলাস—'প্রতি এক শ টাকায় মাসে আট টাকা করে সুদ দেবে।' অরুণা দু-তিন পা এগিয়ে এসে—'একশ টাকায় আট টাকা সুদ দেবেন মাসে? বেশ, তা হলে এগ্রিমেন্ট লিখুন।'

কাগজপত্র আনা হল।

শ্রীবিলাস—'সিকিউরিটি কে হবে?'

অরুণা—'সিকিউরিটির দরকার নেই; মর্টগেজ রাখলেই হল।'

শ্রীবিলাস—'কী, সোনার ঘড়ি-টোনার ঘড়ি আছে তোমার কাছে?'

—'না, বন্ধকি রাখবার মতো কিছু নেই।'

করুণা—'বাড়ি ঘর-দোর?'

—'আচ্ছা, মোটরে করে না হয় গিয়ে দেখে আসব সব।'

—'বাড়িঘর তো আমার নয়।'

—'কার?'

—'বাঁধাও দিতে পারব না।'

অরুণা সিগারেটে এক টান দিয়ে—'এতক্ষণে তো কিটির চিঠি শেষ করতে পারতাম।'

চলে গেল সে।

শ্রীবিলাসকে বললাম—'তোমার স্ত্রীর মেজাজ কিন্তু ঢের শান্ত, সময় তো অনেকটা নষ্ট হল; কিন্তু কই কাণ্ডজ্ঞান হারালেন না তো।'

—'উঠলে?'

—'হ্যাঁ, চললাম ভাই।'

—'আমি তোমাকে একটা কথা বলি।'

—'কী বলো।'

—'অ্যানার্কিজমে ভিড়ে পড়ো।'

—'কেন, তাতে কী লাভ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'একটা জবরদস্ত মার্ডার করো।'

—'তার পর?'

—'তোমার মাথার পেছনে ৫০০ টাকা ডিক্লেয়ার্ড হোক।'

—'ও, সেই কথা।'

—'আমার কাছে এসে সারেন্ডার করো। চারশ পঞ্চাশ টাকা ধার দেব তোমায়।'

বড় মজার কথাই বলেছে শ্রীবিলাস-শুনে আমার পক্ষের থেকে হাসিটা আন্তরিকভাবেই ফেটে পড়তে লাগল। শ্রীবিলাসের সঙ্গে একটু পাঞ্জা লড়তে গেলাম, সে আমার হাত দিল জাহান্নম মচকে, টনটনে হাতটা নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে নেমে পড়ে দেখলাম, বেশ বৃষ্টি পড়ছে।

পরদিন সকালবেলা খুব ভাল করে দাড়ি কামিয়ে, সাবান দিয়ে স্নান করে, ঝাড়াঝাপটা হয়ে বাক্সের নিচের থেকে ভাঁজ করা লংক্লথের জামাটা বের করে গায়ে দিয়ে নিলাম। একটা চাদরের অবিশ্যি দরকার! বাবার একখানা চাদর আছে বটে—কিন্তু স্কুলে বেরুবার সময় সেটা তাঁর লাগবে। মার অনেক দিনের পুরোন একখানা সিল্কের চাদর ছিল, ছিঁড়ে ফেঁড়ে যাওয়াতে অঞ্জলির বাক্সের এক কিনারে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু চাদরটা বের করে আমার মনে হল ঢেকেঢুকে নিলে এ চাদর চলে যায়। একটু সতর্কতার সঙ্গে পরতে হয় বটে, পরে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়-অসাবধানতা, বাতাস, ফূর্তি কাউকেই বিশেষ আশকারা দিতে হয় না। চাদরটা গুছিয়ে নিয়ে পরা গেল।

শুনলাম কিছুদিন হল প্রতিমা এসেছে এখানে।

প্রতিমা আমার থেকে বছর তিনেকের ছোট, এখানে মেমের স্কুলে একদিন সে পড়ত, সে আজ প্রায় বছর পঁচিশ আগের কথা। সেই ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে বেরিয়েছে তো প্রায় বার বছর হল; আট-ন বছর হল চাকরি করছে, ইনস্পেকট্রেস, বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমে। এখানে তাদের জায়গা-জমি ঢের আছে, সুন্দর একখানা দালান আছে; মাঝে মাঝে তাই সে আসে। বছর পাঁচেক আগে একবার এসেছিল, তখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

সকালবেলা আকাশটা ঢেকে আছে মেঘে। এই মেঘ-বৃষ্টি মাথায় করে যাব কি না ভাবছিলাম-হয়তো এক ঝোড়ো কাক হয়ে গিয়ে উঠতে হবে। হয়তো বেচারি বাদলের শান্তির ভিতর নিজের মনের সুন্দর খশড়া নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল এমন সময় এডগার এ্যালেন পো-র র‍্যাভেন-এর মত গিয়ে হাজির হবঃ 'নেভার মোর!'

সন্ধ্যার দিকেই গেলাম। আকাশ পরিষ্কার। ভাদ্র মাস-চারদিকে কেমন একটু নরম শরতের আভাস, খালের কিনারে ঘাসের ভিতর সেই নীল ফুল; ইতস্তত ঘ্রাণ থেকে-থেকে ঘাসের ভিতর ফেনিয়ে উঠেছে; উলুখড়ের ওপারে মাছরাঙা প্রিয়ারই বুঝি কেমন শূন্য বেদনার কান্না, বিকেলের শেষে পৃথিবীর ধান সোনালি, খড় বাদামি, খড় সোনালি, আরো ম্লান হয়ে পড়ে; অশ্বত্থের পাতা খসে-থেকে-থেকে ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে যায়।

তাকিয়ে দেখলাম, মাঠের বাঁ পাশে খানিকটা দূরে একটা মরা বাছুরকে ঘিরে কতকগুলো শকুন।

ছেলেবেলাকার কোনো মৃত মুখের স্মৃতির মত পঞ্চমীর জ্যোৎস্না অনেক দূরের বাঁশের জঙ্গলের পিছন থেকে ধীরে-ধীরে উঁকি দিচ্ছে। সে মুখ কি আমারই? না, আমি যে-পৃথিবীকে ভালবেসেছিলাম, তার? যাক-দু'জনেই আজ মৃত।

আরো মনিটি-পনের পরে প্রতিমাদের দালানের সিঁড়ি বেয়ে উঠে ধীরে-ধীরে খাশ কামরার দরজায় ধাক্কা দিলাম। কোথাও কোনো জনমানব নেই; সিকি মাইল দূরে পর্যন্ত না। হিজলের ডালপালার ভিতর কয়েকটা ঘুঘু শুধু অনেকক্ষণ ধরে ডাকছে।

—'কে!'

—'আমি—'

ভিতর থেকে রুক্ষস্বরে জবাব এল—'তুমি কে?'

—'আমি শচীন—'

—'শচীন কে? মিস্ত্রি নাকি? আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি, তুমি কাল সকালে এসো।'

—'না, আমি মিস্ত্রি নই।'

—'কাকে চাও?'

—'মিস সেন আছেন?'

—'আ, জ্বালালে দেখছি!'

—'ধীরে-ধীরে দরজা খুলে দিয়ে আমার দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে প্রতিমা একটু অবাক হয়ে—'কে তুমি?'

—'যাক, আমাকে দেখে দু-হাত পিছিয়ে যাও নি-ঠিক জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছো।'

—'আপনি কী চান?'

—'অন্ধকারের মধ্যে বুঝবে না; এই তোমার বারান্দার এদিকে বেশ জ্যোৎস্না পড়েছে; এই দিকে এসো প্রতিমা, আমাকে তো চিনতেও পারলে না-না পেরেছ?'

প্রতিমা অন্ধকারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল।

—'আলোর ভিতরে একটু আসবে?'

নিস্তব্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বারে, এ-রকম করে দাঁড়িয়ে আছো যে?'

—'অবাক হয়ে ভাবছিলাম কার এত সাহস—'আমাকে নাম ধরে ডাকে।'

—'ভিতরেই এসো।'

—'এই বারান্দায় তো বেশ জ্যোৎস্না ছিল।'

—'ভিতরেও বড় টেবিল ল্যাম্প আছে।'

—'এই তো কামিনী ফুলের গাছের কাছে বেঞ্চ রয়েছে বাইরে, এখানেই বসা যাক, বেশ বড় বেঞ্চ, দু'জনেই বসতে পারব।'

—'না, ওখানে আমি কী করে বসি?'

—'কেন?'

—'তা বলতে পারা যায় না-বাইরে রাস্তা দিয়ে কত লোক যাচ্ছে।'

—'কিন্তু ছেলেবেলায় এ বেঞ্চিতে কত বসেছি আমরা দু'জনে, ঠিক এই রকম রাতে। কামিনী ফুলের গাছে গোখরো আসে এই ভয়ে ঘেঁসতে চাইতাম না, তুমি জোর করে বসাতে আমাকে; বলতে, পুরুষ মানুষের এত ভয়। ভীরু ছিলাম, কিন্তু নাবালকও তো ছিলাম; পুরুষ মানুষের দোহাই তুমি তখন না পাড়লেও পারতে। এরই মধ্যে পঁচিশ বছর চলে গেলে প্রতিমা।'

নিস্তব্ধ।

—'এখন এখানে বসাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।'

এবারও কোনো উত্তর দিল না সে।

—'আচ্ছা, তুমি না হয় এ বেঞ্চির উপরে বসো, আমি একটু দূরে সরে ঘাসের উপর বসব।'

—'ভিতরে এসো, আমি কাজ করছিলাম-উঠে এসেছি। এসো।' অগত্যা যেতে হল।

পিছনে যেতে-যেতে বললাম—'তোমাদের বাড়ির আশেপাশে আধ মাইল দূরেও তো কোনো লোক দেখলাম না আমি। বাইরে বসলে কেই-বা দেখত।'

—'কেন, রামধনিয়াই তো দেখত।'

—'সে কে?'

—'আমার বেয়ারা।'

—'বেহারি বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে দেখলে এমন কীই-বা এসে যেত।'

—'তুমি বুঝতে পার না শচীন, মর্যাদা অনেক জিনিসেই নষ্ট হয়; বিশেষত এই সব চাকরবাকরের সামনে আমাকে সব সময়ই বড্ড সতর্ক থাকতে হয়'-ঘরের ভিতর ঢুকে একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসে প্রতিমা, 'রামধনিয়া—'

রামধনিয়া আসতেই প্রতিমা—'এই বাবুর জন্য একটা কুর্শি নিয়ে এসো তো—' আধ মিনিটের মধ্যেই কুর্শি এল। রামধনিয়া চলে গেলে চেয়ারে বসে—

—'আচ্ছা প্রতিমা—'

—'বলো—'

—'গদি-আঁটা চেয়ারে তুমি বসে নিয়ে তারপর আমার জন্য এই কাঠের চেয়ারটা আনাতে দিলে কেন?'

—'চাকরটাকে বুঝতে দিলাম যে তুমি আমার সাব-অর্ডিনেট।'

—'আমি অবিশ্যি তোমার ডিপার্টমেন্টে কাজ করি না।'

—'এ নিয়ে কথা বললে কিছু লাভ আছে শচীন?'

—'না, লাভ অবিশ্যি কিছু নেই প্রতিমা।'

—'রামধনিয়া যদি আবার আমার ঘরের ভিতর ঢোকে—'

—'হ্যাঁ?'

—'তাহলে কিন্তু প্রতিমা বলে ডেকো না।'

জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম শিরীষগাছের ওপর চাঁদ এসে উঠেছে-মুখখানা যেন এক বিমুগ্ধ দীন বধূর মত করে; কিংবা আমার মৃত সন্তানের মত।

—'রামধনিয়ার সামনে অবিশ্যি তোমাকে নাম ধরে ডাকব না প্রতিমা—'

—'মিস সেনও বলো না।'

—'না, কোনোকিছুই বলার দরকার নেই; এমনি কথাবার্তা বলব।'

ধীরে-ধীরে টেবিলের থেকে তুলে নিয়ে চশমা জোড়া চোখে এঁটে নিল প্রতিমা।

আমি-'বিনে চশমায়, অন্ধকারে, কী করে চিনলে আমাকে তুমি?'

—'গলার আওয়াজে চিনেছিলাম।'

—'ওঃ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু চুপ থেকে—'চেহারা আমার বদলে গেছে বুঝি?'

—'হ্যাঁ, চেনা শক্ত।'

—'বৌ বলে, আমার থাইসিস হয়েছে।'

—'বাস্তবিক, তোমার থাইসিস হয়েছে নাকি?'

গদি-আঁটা চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল, স্প্রিঙের চশমা বুকের উপর ঝুলে পড়ল।

—'না, সে ভাবে, হয়েছে। বাস্তবিক হয় নি।'

—'হয় নি কী করে তুমি তা বুঝলে?'

—'জ্বর নেই। একটা ইমালশন এনে দিয়েছে; কিন্তু আমি তার দরকার বোধ করি না—'

—'তোমাকে একটা কথা বলব শচীন—'

ধীরে ধীরে চশমা পরে নিয়ে—'যদি টিউবারকিউলোসিস হয়ে থাকে তাহলে তো তুমি জানই তার জার্ম কত সাংঘাতিক।'

—'তা জানি বই-কি—'

—'তা হলে এ ব্যারাম নিয়ে যেখানে-সেখানে যাওয়া তো তোমার শোভা পায় না।'

মাথা নেড়ে—'না। অবিশ্যি তোমাদের কাছে আসতে পারি।'

প্রতিমা ধীরে-ধীরে ঘাড় নেড়ে, 'না আমাদের কাছে না; আমরাও তো মানুষ।'

প্রতিমা যে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয় সেটা সে এরকমভাবে মনে করিয়ে না দিলে সন্দিগ্ধ হতাম না।

—'তাও তো বটে প্রতিমা। কিন্তু তবুও মানুষের মনুষ্যত্বে সন্দিগ্ধ না হওয়াই ভাল।'

—'তাহলে—'

—'অবিশ্যি আমি উঠব না। এখানে একটু বসবার জন্যই এসেছি। আমি ভালই আছি। তোমার কোনো ভয় নেই প্রতিমা।'

—'মানুষকে মাঝে-মাঝে বড্ড দুর্দৈব সহ্য করতে হয়।'

—'তা হয় বই-কি; আমি চলে গেলে চেয়ারটা না হয় স্টেরিলাইজ করে নিও।'

—'সমস্ত ঘরটাকেই হাইজিনিক্যালি পরিষ্কার করে নিতে হবে।'

—'বেশ তাই নিও। ছেলেবেলা যে-সব দিন আমরা নিরপরাধ আনন্দে কাটিয়েছি তার স্মৃতিতে এইটুকু অন্তত, কারো।'

ব্যথিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে—'তারপর, কী জন্যেই বা এলে?'

—'শুনলাম তুমি এখানে এসেছ।'

—'কার কাছেই বা শুনতে পেলে?'

—'তোমার সন্ধান এ-কয় বছর আমি বরাবরই রেখেছি; তোমাদের মালতী বলছিল, যে তুমি শিগগিরই আসবে।'

—'ও—'

—'প্রায় ছ'সাত বছর পরে এলে তো।'

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ—'

—'এতদিন দেশে আস নি কেন?'

—'আমি মুসুরিতেই প্রায় থাকি; গত বছর দার্জিলিং অব্দি এসেছিলাম-এ-সব দিক বড় একটা ভাল লাগে না।'

—'তোমার মা কোথায়?'

—'তিনি নৈনিতালেই আছেন; বীরুও সেখানে।'

—'তোমার মা তো অনেকদিন এদিকে আসেন না?'

—'না, তিনি আর আসবেন না।'

—'কেমন আছেন?'

—'ভালই। আমিও এবার নেহাত এলাম এ জায়গাজমিগুলো বিক্রি করে ফেলব বলে।'

—'বারে, এই সব বিক্রি করবে? এমন সুন্দর দালানকোঠা, মাঠ, দিঘি

—'সামনের ঐ মস্তবড় মাঠটা-এটাকে প্রান্তর বলাও চলে প্রতিমা-এর জন্য যে আমি সমস্ত জীবন বিসর্জন দিতে পারি! এই বারান্দায় বসে ঐ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকা-দুপুরবেলায়-এমনি জ্যোৎস্নারাতে—'

বাধা দিয়ে একটু হেসে—'কালিংপং-এ একটা বাড়ি করেছি, নৈনিতালে একটা, আলমোড়ায় একটা, এ জায়গাজমি বিক্রি করে দেব তাই।'

—'আমার কাছে বিক্রি করো না।'

—'চল্লিশ হাজার টাকা দিলেই করি।'

একটু চুপ থেকে-'তাহলে তোমরা এখানে আর আসবে না!'

মাথা নেড়ে—'না'

—'দুঃখ করবে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এখানে এসে যে কটা দিন রয়েছি এতেই আমার মরণান্ত হয়ে উঠেছে। তুমি বোঝো না, এ-সব দেশের ও মানুষের স্বাদ আমরা অনেকদিন হয় হারিয়ে ফেলেছি। এখানকার কিছুই ভাল লাগে না আমার।'

—'তোমার জীবনের পক্ষে এটা মস্ত ক্ষতি নয় প্রতিমা?'

—'আমি তা মনে করি না।'

—'বাংলাদেশের পাড়াগাঁকে তুমি নৈনিতালের কাছে বিক্রি করে ফেললে?'

—'তাতে আমার লাভই তো হল।

—'এই তুমি মনে কর প্রতিমা?'

—'আমি এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি যে!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলাম।

—'তোমাদের এই বাড়িটা কিনবার শক্তি বিধাতা যদি আমায় দিতেন প্রতিমা!'

—'তোমাকে না-হয় সাড়ে উনচল্লিশ হাজার টাকায় ছেড়ে দেব-কেনো না।'

—'সাড়ে উনচল্লিশ পয়সাও তো আমার নেই।'

একটু চুপ থেকে—'একটু অপেক্ষা করবে?'

—'কিসের জন্য?'

—'এই পাঁচ-সাত বছর; তারপর এই বাড়িটাকে বিক্রি করো।'

—তাতে আমার কী লাভ?'

—'তবুও মাঝে-মাঝে এ দেশে আসবে তুমি; তোমাকে—'একটু চুপ থেকে-'হ্যাঁ তোমাকে দেখতে পারব আমরা।' মাথা নেড়ে-'সুদের টাকা কে আমাদের দেবে?'

—'কীসের সুদ?'

—'এই চল্লিশ হাজার টাকার কত সুদ হয় ছ-বছরে?'

—'ও, সেই কথা ভাবছিলে তুমি।'

—'এ টাকাটা যত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ততই ভাল, পেয়েই লয়েডস ব্যাংকে রেখে দেব।'

—'তোমার সঙ্গে এখানে রামধনিয়া এসেছে শুধু?'

—'হ্যাঁ।'

—'এ বাড়িতে আর-কেউ নেই?'

—'না।'

—'বড্ড একা লাগে না তোমার?'

—'আমি তো দু-চার দিনের মধ্যেই পালিয়ে যাব।'

—'বাড়ি বিক্রির কোনো ব্যবস্থা ঠিকঠাক হল!'

—'হ্যাঁ, একজন মুসলমান জমিদার কিনবেন। কাল সকালেই তাঁর আসবার কথা।'

—'এসে কোথায় থাকবেন?'

—'এখানেই। টাকাটা পেলেই আমি চলে যাব।'

—'কালই টাকা পাবে আশা করছ?'

—'হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যায় তা হলে আমি রওনা হব।'

—'ওটা কী ডাকছে?'

—'কই?'

—'ঐ যে শুনছ না?'

—'কী একটা পাখি—'

—'লক্ষ্মী পেঁচা বোধ করি। তোমাদের বকুলগাছে এসে বসেছে। অনেক কথা মনে পড়ে যায় প্রতিমা; সেই পনের বছর আগের-বিশ বছর আগের কথা সব।'

দেখলাম, সে আমার পাঞ্জাবির বোতামগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। বোতামগুলো নকল সোনার-কিন্তু সোনার মতই দেখাচ্ছিল হয় তো।

—'পাঁচ আনা দিয়ে কিনেছি।'

—'কী?'

—'এই বোতামগুলো।'

—'সোনার বোতাম নয়?'

—'না, গিল্‌টি।'

—'দেখাচ্ছিল কিন্তু সোনার মত।'

—'কয়েকদিন সে রকম দেখাবে বটে—'

—'মোটে পাঁচ আনা দাম?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কী লিখছিলে?'

—'একটা আর্টিকেল?'

—'কী বিষয়ে?'

—'শিশুদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে।'

—'তুমি বিলেত থেকে এডুকেশন ডিগ্রি এনেছিলে?'

—'না, বিলেত আমি যাই নি; এখানকারই বি. টি।'

—'যাবে না কি?'

—'বিলেত! যেতে পারি। তবে ডিগ্রি আনতে নয়—'

—'তবে?'

—'বেড়াতে—'

—'কোন জায়গা ভাল লাগে তোমার?'

—'ইউরোপ? ফ্লোরেন্স, ভেনিস, রোম, জেনেভা, স্পেন, সুইজারল্যান্ডে ঘুরতে পারি।'

—'হাইল্যান্ড ভাল লাগে না!'

—'স্কটল্যান্ডের কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ, দেখবে কোনো এক দীর্ঘ হাইল্যান্ডার কোনো এক লেকের কাছে দাঁড়িয়ে বর্নি কাটছে হয় তো, নিরালা দুপুর কিংবা সন্ধ্যা হয়ে আসছে। একটা পিউইট পাখি কাতরভাবে ডেকে যাচ্ছে হয় তো-কিংবা একটা দাঁড়কাকের অলস বিরস আওয়াজ; একটা গুউজ হয়তো হক হক গোব্যাক গোব্যাক বলে চেঁচাচ্ছে-আর সেই কারলিউ পাখি, ইয়েটস-এর এক-একটা ছোট কবিতায় যার বিষণ্ণ আস্বাদ পাওয়া যায়-বাতাসে হয় তো সেই কারলিউ-এর নিরালা মর্মান্তিক গান ভেসে আসছে-আমাদের বিলদিঘির জলপিপির মত হয় তো অনেকটা; কিংবা কে জানে বর্ষার মাঠে বৃষ্টির কুয়াশার ভিতর মাছরাঙার অস্ফুট করুণ গলার মত হয় তো। এক হাঁটু ঘাসের ভেতর দিয়ে ওয়েড করে হাঁটতে হাঁটতে এই সব বেশ লাগবে কিন্তু—'

প্রতিমা মাথা নেড়ে—'না, এডিনবুর্গ ইউনিভার্সিটিতে একবার দেখতে পারি, কিংবা গ্লাসগোয়, তাছাড়া স্কটল্যান্ডে আর-কী আছে!'

—'নেই কিছু?'

—'না।'

—'কী জানি, এক-একটা বই-এ দেখি।'

—'স্কটরা নিজেদের তারিফ করে খুব লেখে। একটা শূন্য মরুভূমি ছাড়া ও-দেশে আর-কিছু নেই।'

—'শিশুর সাইকোলজি সম্বন্ধে লিখছ; ছাপাবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোথায়?'

একটা ইংরেজি কাগজের নাম করল প্রতিমা।

—'শিশুদের খুব ভাল লাগে বুজি তোমার?'

—'ভাল লাগা না-লাগার কিছু নেই এতে; তাদের সম্বন্ধে আমি গবেষণা করছি।'

—'ওঃ-এমনি একটা শিশুকে কেমন লাগে তোমার?'

—'এ সব প্রশ্ন করো না আমাকে।'

—'কেন?'

—'প্রশ্নগুলো বড্ড খাপছাড়া, আমার মনে হয় রুচিহীন, বলতে পারা যায় অবৈধ।'

—'তা ঠিক।'

—'এই আর্টিকেলটা আজকে আমাকে শেষ করতে হবে।'

—'ঐ আর্টিকেলটা তোমার? দু-দিনের জন্য এসেছ তাও এই সব লট-ঘট সঙ্গে করে?'

—'তা আনতে হয় বই-কি; তুমি টাইপ করতে জানো?'

—'জানি একটু-আধটু।'

—'আচ্ছা, আমার এই লেখাগুলো টাইপ করে দাও না।'

—'ক পৃষ্ঠা হবে?'

—'টাইপড পৃষ্ঠা তিনেক হবে বোধ করি; বার আনা পয়সা দেব।'

দেখলাম উৎকর্ণ আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, মুখখানা গম্ভীর। বললে-পারবে না?'

—'না।'

—'কেন?'

—'তুমিই ভেবে দেখো।'

—'এর পর হয় তো বলবে পাঁচ সিকে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না, পাঁচ সিকে বড্ড বেশি হয়ে যায়—', একটু চুপ থেকে, 'করলে আমি-বিনে পয়সায়ই করে দিতাম।'

সমস্ত শরীরে খানিকক্ষণ মোচড় খেয়ে নিয়ে—'আচ্ছা, পাঁচ সিকেই না হয় দেব। আমি নিজেও করলে করতে পারতাম; যাক-কেমন একটা আলসেমি ধরে গেছে। তা তুমিই করো; পয়সা পেলে তোমারও লাভই তো হবে।'

—'তোমার এ শুভ ইচ্ছার কথা কোনোদিন আমি ভুলতে পারব না প্রতিমা; কিন্তু-এ আমাকে দিয়ে উঠবে না।'

প্রতিমা একটু বিরক্ত হয়ে—'থাক। শেষে আমার সঙ্গে দর কষাকষি আরম্ভ করলে তুমি, তোমাদের এ দেশের মানুষ এ-রকমই হয়।'

—'না, দর কষাকষি করতে আমি একদমই চাই না।'

—'তুমি হয়তো ভাবছ, এত কথার পর আমি তোমাকে দু টাকা ছেড়ে দেব!'

—'এই টাইপিঙের জন্য?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমি এক পয়সাও চাই না—

—'চাও না? দর দস্তর তো করছ ফড়ের মতন? করছ না শচীন?'

—'তোমার-আমার সম্বন্ধের মধ্যে কোনোদিন যেন কোনো মূল্যের কথা না আসে প্রতিমা।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ রইল।

পরে একটু হেসে—'আচ্ছা, বিনি পয়সায়ই করে দাও তাহলে।'

—'বেশ তো, এক্ষুণি করে দিতে হবে?'

—'হ্যাঁ, ম্যানাসক্রিপ্ট প্রায় হয়ে গেছে। এসো, আমি ডিকটেট করি।' টাইপ রাইটারের কাছে গিয়ে বসলাম।

প্রতিমা একটু হেসে বললে—'আচ্ছা থাক, তোমার করতে হবে না।'

—'কী হল?'

—'না, মানুষকে আমি বিনে পয়সায় খাটাই না।'

—'সে তোমার দাক্ষিণ্য।'

—'কিন্তু দাক্ষিণ্য আমার দু'টাকার ওপরে উঠবে না। তুমি যতই চাল দাও না কেন-এর ওপর চার আনা পয়সাও আমি দিতে পারব না শচীন।'

চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে মাথা হেঁট করে—'আর-কোনোদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না প্রতিমা?'

—'কবে আবার?

—'এমন কি কোনোদিন কি হবে না যখন আমি নৈনিতালে বাড়ি করতে পারব?'

—'সে বিধাতার ইচ্ছা।'

—'যদি করতে পারি, তাহলে কি তুমি নৈনিতাল থেকে সরে যাবে?'

—'না। কেন? তুমি কি আমার শত্রু?'

—'আজ উঠি তা হলে!'

—'কেন এসেছিলে?'

—'একশটা টাকা ধার নিতে।'

—'এতক্ষণ বলো নি তো কিছু।'

—'এতক্ষণে বলেছি যে সেই জন্যই নিজেকে ধন্যবাদ দেই। টাকাটা পেলে নিজেকে আশীর্বাদ করব-বুঝব যে এসব কথা একটু রয়েসয়েই বলতে হয়-মানুস-হতে পেরেছি।'

একটু চুপ থেকে—'কেন ধার চাচ্ছ?'

—'মদ-গাঁজা কিছু খাব না-ভাল কাজই করব।'

—'কিন্তু কালই তো আমি চলে যাচ্ছি।'

—'টাকাটা তোমাকে নৈনিতালের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব।'

—'বসো।' আমি চার আনা পয়সা তোমাকে একবার দিয়েছিলাম।'

—'কবে?'

—'সে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের কথা।'

—'তাই হবে। তাই নাকি? কিছু মনে নেই আমার।'

—'বয়েস তখন আমার সাত-কি-আট, দশ-পনের আনা পয়সা শুধু জীবনের সম্বল।'

—'এত দরিদ্র তুমি ছিলে একদিন?'

—'হ্যাঁ। আট বছরের সময়ে ছিলাম বই-কি। ভাল মনে করে চার আনা পয়সা তোমাকে দিয়েছিলাম; কিন্তু সে পয়সা তুমি কোনোদিনও ফেরত দিলে না।'

—'দেই নি বুঝি?'

—'ভুলে গেছিলে বোধ করি। কিন্তু তখন ছেলেমানুষ আমি-জীবনের সেই চার আনার শোক অনেক দিন পর্যন্ত ভুলতে পারি নি আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

—'আমাকে বললেই পারতে।'

—'না, আমি বলি নি। এই একশ টাকার বেলাও সেই রকম যদি হয়?'

—'এবার আর ছেলেমানুষ নও; হয় তো এ শোক শুধরে উঠতে পারবে। পারবে না প্রতিমা?'

প্রতিমা চশমাটা খুলে আলোর দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে বসে রইল।

—'বীরু ছাড়া তোমাদের সংসারে পুরুষ আর-কেউ নেই বুঝি?'

—'না, বাবা মরে যাওয়ার পর এ একমাত্র পুরুষমানুষ।'

—'খুব একা লাগে না তোমার?'

—'আমার? কেন?'

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে খানিকটা হেসে নিল প্রতিমা।

—'তোমার মাইনে এখন কত?'

—'তাও জিজ্ঞেস করবে? ছশ টাকা পাচ্ছি।'

—'তুমি বাংলাদেশে এলেই পারতে।'

—'আমি পশ্চিমে হয়ে গেছি।'

—'তোমার সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে পেরেছিলাম বলেই তো বাংলার রূপকে আমি চিনেছি। না-হলে এ পথঘাটে অন্ধের মত ফিরতে হত আমাকে।'

—'বাংলার রূপকে তুমি চিনেছ-সে তোমার হৃদয়ের গৌরবে। আমার তাতে কোনো হাত নেই কিন্তু শচীন।'

চশমা পরে কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে বসল।

—'লিখবে?'

—'হ্যাঁ।'

চলে যাচ্ছিলাম—'আচ্ছা আমি যাই তা হলে।'

—'একটা কথা শুনে যাও শচীন।'

-'বলো—'

—'তোমার থাইসিস হয়েছে বোধ হয়?'

—'মনে তো হয় না।'

—'একজন ডাক্তার দেখিও।'

—'আচ্ছা।'

—'একজন ভাল ডাক্তারই দেখিও শচীন।'

—'চেষ্টা করব।'

—'কোন এক জায়গায় চেঞ্জে তোমার যেতে হতে পারে কিন্তু। যেও। অবহেলা করো না।'

—'না, মিছেমিছি স্ত্রীকে বিধবা করে কী লাভ!' মাঠের পথে খানিকটা নেমে ফিরে এসে, আবার প্রতিমার কাছেই গেলাম।

—'কে, শচীন?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেন?'

—'টাকাটা দিতে ভুলে গেলে যে তুমি।'

—'না, ভুলি নি।'

—'একশ টাকা ধার চেয়েছিলাম।'

—'হ্যাঁ, কিন্তু দিতে পারব না তো।'

বাড়ির কাছে এসে দেখি জ্যোৎস্নার ভিতর জামরুলতলায় অমল পায়চারি করছে।

—'কে, অমল?'

আমাকে দেখে সে সিগারেট জ্বালাল।

—'চলো একটু গল্প করি গিয়ে।'

—'কোথায়?'

—'চলো, আমার ঘরে।'

ইতস্তত করে—'না, এখন—'

—'অঞ্জলি কোথায়?'

—'তার নিজের ঘরে আছে হয় তো—'

—'চলো না সেখানে।'

—'না, থাক।'

সিগারেটে এক টান দিয়ে মাঠের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। দেখলাম অঞ্জলির ঘরের তিনটে দরজা আটকানো। মাঝখানের দরজাটায় আস্তে একটা ধাক্কা দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কে?'

—'আমি—'

ধীরে-ধীরে দরজা খুলে দিয়ে টেবিলে বাতির কাছে গিয়ে বসল।

—'একেবারে দরজাটা বন্ধ করে বসেছ যে-রাত তো বেশি হয় নি।'

—'বাধ্য হয়েই বসতে হয়।'

—'কেন, কী হল?'

— 'কেদারবাবু মুন্সেফের ছেলেকে চেনো?'

—'কে, অমল?'

—'হ্যাঁ, বড্ড বিরক্ত করে এসে।'

—'কী রকম?'

—'আমি তাকে বলেছি তুমি বরং দিনেরবেলা আমার আছে এসো-তবুও সে রাত করে আসবেই-বলে অমলের একখানা বই-এর ভিতর থেকে বের করে দু'খানা চিঠি আমাকে দিল। চিঠিখানা পড়েছিলাম। আস্তে-আস্তে টেবিলের এক কিনারে রেখে দিয়ে—তুমি কী লিখছ?'

—'কতকগুলো হিসেবপত্র নিয়ে বসেছি।'

—'কিসের?'

—'এই টাকাকড়ির'। আচ্ছা বায়স্কোপের জন্য সেদিন দু'টাকা নিয়েছিলাম তোমার কাছ থেকে, না?'

—'হ্যাঁ।'

—'দু'জনের টিকিটে গেল আট আনা-আট আনা এক টাকা; গাড়ি ভাড়া আসা-যাওয়ায় পাঁচ আনা-পাঁচ আনা দশ আনা; এই হল এক টাকা দশ আনা-আর ছ আনা পয়সা বাকি থাকে তো?'

চোখ কপালে তুলে অঞ্জলি আমার দিকে তাকাল, বললে-'এই ছ আনা পয়সা অমল তো আমাকে ফেরত দেয় নি।'

—'হয় তো আর কিছু খরচ করে থাকবে।'

—'আবার কী হবে?'

—'কিছু খেয়েছিলে?'

—'ইন্টারভেলের সময় অমল আমাকে কাটলেট আর লেমনেড দিয়েছিল; কিন্তু তাতেই কি ছ আনা পয়সা খরচ হয়ে যায়?'

—'বেচারি নিজেও হয় তো কাটলেট আর লেমনেড খেয়েছে।'

—'কিন্তু সে কথা আমাকে বলা উচিত ছিল তার।'

—'ভেবেছে হয় তো না বললেও তুমি বুঝে নিয়েছ।'

—'ওসব মিষ্টি কথায় আমি মজি না, আমি তার কাছে ছ আনা পয়সার হিসেব চাইব।'

—'ছি, চাইতে যেও না অঞ্জলি।'

—'কেন চাইব না? ছ-আনা পয়সা ভেসে আসে?'

ধীরে-ধীরে জ্যোৎস্নার পথের মধ্যে বেরিয়ে গেলাম। এ-রকম চিরকাল চলতে পারা যায় না কি? মাঠ-প্রান্তর ভেঙে, জানা-অজানার ওপারে, জ্যোৎস্নার আকাশে-বাতাসে বুনো হাঁসের মতন, যে-পর্যন্ত, যে-পর্যন্ত শেষ গুলি এসে বুকের ভিতর না লাগে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরাজ

বিরাজ একটা হাই তুলে খবরের কাগজটা কুড়িয়ে নিল আবার। খানিকক্ষণ এ পাতায় সে পাতায় চোখ বুলিয়ে, শেষে পড়তে শুরু করল। 'বাংলাদেশে জনসংখ্যা অধিক বলিয়া জনজঙ্গল ক্রমশ ব্যাপ্ত হইতেছে' আমার দিকে অত্যন্ত গুরুতর মুখ নিয়ে তাকিয়ে—'এ কথা কতদূর সত্য?'

কোনো উত্তর দিচ্ছিলাম না।

—'তার পর কী লিখেছে পড়।'

গলা খাকরে নিয়ে বিরাজ আবার শুরু করল—'বনজঙ্গল ক্রমশ লুপ্ত হইতেছে। বাংলাদেশে বিশেষত পূর্ববঙ্গে জ্বালানি কাঠের খুবই অভাব হইতেছে।' কটমট করে আমার দিকে একবার তাকাল বিরাজ। তারপর পড়ে-বলল—'কিন্তু জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়ের ক্ষমতা কমিয়া যাওয়াতে কয়লা তাহার স্থান পূর্ণ করিতে পারিতেছে না। বিরাজ গম্ভীরভাবে মাথা-নাড়ল—'জ্বালানি কাঠের স্থান?'

—'তারপর?'

—'ভবিষ্যতে গৃহস্থালির কাজে কয়লার ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পাইবে, এই সময়ে কয়লা ব্যবসায়ীগণ যদি এমন পোড়া কয়লা বাহির করিতে পারেন, যাহাতে ধুঁয়া হইবে না।'

—'কয়লার ধোঁয়া হবে না? সে বেশ হবে তো তাহলে বিরাজ।'

—'যাহা সহজেই জ্বলিয়া উঠিবে।'

—'বাঃ।'

—'যাহা সহজে ভঙ্গুর হইবে না।'

—'হুঁ।'

—'যাহা হইতে আগাগোড়া সমান উত্তাপ পাওয়া যাইবে।'

—'বেশ বেশ।'

—'যাহাতে ভস্মের পরিমাণ কম হইবে, যাহার আকার সুবিধাজনক হইবে।' খানিকটা শিকনি ঝেড়ে নিয়ে বিরাজ—'আকারে সুবিধাজনক হইবে মানে? কি জানি আকার

—'স্কোয়ার হয়তো।'

—'না অবলঙ্গ।'

—'তা একটা হবে, ওপরে স্বস্তিকা থাকবে।'

—'আচ্ছা স্বস্তিকা কি নর্ডিক?'

—'আমি তো জানি বৈদিক।'

বিরাজ কাগজখানা চোখের কাছে টেনে নিয়ে পড়ল—'তাহা হইলে গৃহস্থালির কাজে কয়লার ব্যবহার খুব বাড়িয়া যাইবে।' বললে—'বেশ ভাববার মতো কথা লিখেছে এরা।'

বিরাজ—'কিছুদিন পূর্বে ইন্ডিয়ান [...] কোক গ্যাস কমিটি রন্ধনকারী কয়লা জ্বালাইবার জন্য একটি সুবিধাজনক উনুন আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।'

আমার দিকে তাকিয়ে—'কত টাকার পুরস্কার?'

—'কমিটির কাছ থেকে জানতে পার।'

বিরাজ একটু ভেংচি কেটে—'ও যারা [...] তে কাজ করে, তারা পাবে, যাককে চুলোয় যাক।' পড়ে বললে—'যদি একটি সুবিধাজনক উনুন আবিষ্কার হয় [...] নির্দেশিত গুণসম্পন্ন কয়লা বাজারে বাহির হয় তাহা হইলে রন্ধনকার্যের জন্য ঘরে ঘরে কয়লার প্রচলন হইবে।'

বিরাজ একটু স্থির হয়ে নিস্তব্ধভাবে চিন্তা করে নিয়ে আবার পড়ল।—'এবং উহার দ্বারা বাঙালি পরিচালিত যত দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লার খনি আছে তাহার মন্দা কাটিয়া যাইবে।'

—'কেন প্রথম শ্রেণীর কয়লার খনি বাঙালি চালায় না?'

—'না বোধ করি।'

বিরাজ কাগজের দিকে তাকিয়ে পড়ল- 'এই বিষয়ে বিশেষভাবে বাঙালি কয়লা ব্যবসায়ীদের উদ্যোগী হওয়া উচিত।'

—'বাংলায় ব্যবসা আরম্ভ করলে কেমন হয় বিরাজ?'

বিরাজ কোনো উত্তর না দিয়ে কাগজখানা নাড়াচাড়া করতে লাগল। বললে—'গুজরাট অঞ্চলে বিরাট প্লাবন।'

—'তাই নাকি?'

—'প্রচুর প্লাবনের ফলে নদীসমূহে অসম্ভব জলবৃদ্ধি।' একবার চোখ তুলে ফিরে—'গুজরাটে কি কি নদী আছে নাম করো।' উত্তর অপেক্ষা না করে—'রেলগাড়ি ও বিমান ডাক চলাচল বন্ধ।' আমার দিকে তাকিয়ে— '[...] যেতে পারছে না, জাম হয়ে আছে সব।' পাতা উলটে নিয়ে বিরাজ—'খেলার মাঠে বাঙালির বীরত্ব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ফুটবল খেলা বুঝি?'

—'রেফারিকে মারিবার জন্য উত্তেজনা।' বিরাজ নাক সিঁটকে ওপরের কলামের দিকে তাকাল। [...]

—'কী লিখেছে?'

—'কারামুক্তির পর মহাত্মার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা—মাতার নিকটে পত্র-পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার মাতাকে লিখিয়াছেন যে, তিনি বিনা আড়ম্বরে কারামুক্তি লাভ করিতে চাহেন।' জমকালো গোঁফে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বিরাজ একটু থেমে তারপর পড়ল—'একান্ত কেহ আসিতে চাহিলে তাঁহার মাতা জন্যা, পত্নী আসিতে পারেন। প্রকাশ তিনি আরো কী লিখিয়াছেন যে কারামুক্তির পর যত শীঘ্র সম্ভব তিনি যারবেদা যাইয়া একবার মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।' বিরাজ পাশের কলামের দিকে তাকাল।—'যারবেদা কারাগারে মহাত্মা গান্ধী অধিকাংশ সময় নিদ্রায় অতিবাহিত করিতেছেন।' বিরাজ গলা খাকরে পড়ল—'মহাত্মার আত্মীয় শ্রীযুক্ত মথুরাদাস ত্রিকমজি'—চোখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে—'চেনো এঁকে?'

—'মথুরাদাস ত্রিকমজি? কই নাম তো কোনোদিন শুনিনি।'

বিরাজ একটু ভেবে—যাগ্‌ গে মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই।—'মথুরাদাস ত্রিকমজি গতকল্য যারবেদা জেলে যাইয়া মহাত্মার সহিত দেখা করিয়াছিলেন।' কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বিরাজ—'জানতাম না আবার যারবেদা জেলে গেছে।'

—'জান না?'

—'প্রেসের প্রতিনিধির নিকট তিনি বলেন, গ্রেপ্তারের পূর্বেকার কয়েক সপ্তাহের গুরুতর শ্রমের পর মহাত্মাকে ক্লান্ত দেখা গেল—ওই ক্লান্তি বিদূরণের জন্য মহাত্মা এখন অধিকাংশ সময় নিদ্রায় অতিবাহিত করিতেছেন। শারীরিক ক্লান্তি ব্যতীত শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইয়ের সাহায্যে মহাত্মাকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল।' বিরাজ অবসন্নভাবে নিশ্বাস ফেলে কাগজের এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে—'কিন্তু অবসাদ তাঁর মুহূর্তের জন্য।' চোখ মুছে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল আবার।—'রাজা। [...] উইকলি গেজেটের লন্ডনস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে বেগম শাহনাওয়াজের কন্যার সহিত কাম্বের রাজা নবাব মির্জা হুসেন জবরের বিবাহ স্থির হইয়াছে।'

—'বেশ আশার কথা বিরাজ।'

—'রাজা মির্জা হুসেনের রাজ্যের আয়তন ৮৫০ বর্গ মাইল, এবং তাহার জনসংখ্যা আশি হাজার। নবাবের বয়স ১২ বৎসর। তিনি পারস্যের পরাক্রান্ত নৃপতিগণের বংশধর।' পৃষ্ঠার একদিকে তাকিয়ে বিরাজ পড়ল—'১০ আগস্ট রবিবার অপরাহ্নের পাঁচ ঘটিকার সময় ৪/২নং কমারডাঙা রোডে ইটালি জীবনিক মিশন শালায় জন্মাষ্টমী বিষয়ে কত কথা হইবে। সাধারণের যোগদান একান্ত বাঞ্ছনীয়। মাতৃজাতির পৃথক আসনের ব্যবস্থা আছে।'

একটু চুপ থেকে—'মাতৃজাতির লিখেছে বুঝি?'

—'মা বোন না লিখে মাতৃজাতি লিখেছে, সাধু ভাষায় এইরকমই লিখতে হয়।'

—'মহিলা লিখলে হত না।'

বিরাজ—'না, সব সময় তা তো হয় না, নারী একটা কাঠখোট্টা ন্যাড়া পদ, নারী বলে গৃহলক্ষ্মী বলি কেন? মেয়েদের একটু আলাদা মর্যাদা দিতে হয়। পুরুষদের সঙ্গে এইখানে তাদের তফাত। আমাদের কেউ গৃহ গোবিন্দ বলে? বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসে কেউ বলে পিতৃজাতির জন্য আড়াই হাজার কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি তৈরি আছে?' কাগজের দিকে তাকিয়ে বিরাজ পড়ল—'প্রতারণার অভিনব বন্দী।'

—'কীরকম?'

—'নিয়াগড় চক নং ৫ নামক একটি গ্রাম হইতে'—

—'সে কোথায়?'

—'তারিখ দিয়েছে সেখপুরার থেকে—'

—'সেই বা কোথায় বিরাজ?'

—'বোধহয় মদ্রাজে।'

—'পাঞ্জাবে নয় তো?'

—'নিয়াগড় চক নং—একটি অদ্ভুত প্রতারণার কাহিনী সংবাদ আসিয়াছে। একটি লোক নাপিতের ছদ্মবেশে উক্ত গ্রামের একটি জাঠ রমণীর কাছে যাইয়া বলে—'

—'জাঠরমণীর—তাহলে হয়তো ইউ পি কিংবা পাঞ্জাব।'

—'জাঠরমণীর নিকট যাইয়া বলে করিয়ল নামক গ্রাম হইতে তাহার ভগ্নি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে পাঠাইয়াছে।'

[অসমাপ্ত]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেতনীর রূপকথা

—'কে?'

—'আমি।'

—'বসো।'

—'না, বসব না; দলিলপত্র নিয়ে সকাল থেকেই ভারি ব্যস্ত আছেন দেখছি; মুরারিবাবুরা এসেছে, চারদিক থেকে লোকজন তাকে ছেঁকে ঘিরে ফেলেছে যে—'

—'আমিও দেখে এসেছি।'

—'কেন, কী হল!'

—'এই বাড়িটা বিক্রি করে ফেলবেন।'

—'বিক্রি!' মুখখানা ছাইয়ের মতো হয়ে গেল। (মালতীর)।

—'কেন, অনেকদিন ধরেই তো কথাবার্তা হচ্ছিল, শোনে নি?'

সে কোনো জবাব না দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। দুপুরবেলা বললে—'শুনেছিলাম জায়গাজমি আছে, জমিদারের ছেলে, ভেবেছিলাম আবার কপাল খুলল বুঝি, কিন্তু বিয়ের আগেই বুঝেছিলাম, অত সুখ কি আমার সইবে। তা সইবে না—'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু এ-রকম মিথ্যা কথা প্রচার করতে দিলে কেন তোমরা?'

—'কী আবার?'

—'সবাই বলেছিল জমিদার বংশের ছেলে—'

—'কয়েক পুরুষ আমাদের অনেক জায়গাজমি ছিল।'

হাতের তেলোয় খানিকটা জর্দা ঢেলে পান চিবুতে-চিবুতে একটা নিঃশ্বাস ফেলে—'আমি তো স্কুলের পণ্ডিতের মেয়ে—সমুদ্রে যার শয্যা শিশিরকে সে কি আর ভয় করে।—কিন্তু—'

একটা গল্পের স্বর ছড়িয়ে নিয়ে বালিশে মাথা রেখে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে—'আচ্ছা, কেন বিক্রি করছেন বাড়ি?'

—'দেনা নাকি হাজার বিশেক হয়েছে।'

—'এই বাড়ি বিক্রি করে তাই থেকে দেবেন।'

—'তাই তো ইচ্ছা।'

—'কত টাকায় বিক্রি করবেন?'

—'মুরারিবাবুরা পঁচিশ হাজার টাকা দেবেন নাকি—'

—'এই সমস্ত জায়গাজমি—দালান পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রি হবে মোটে?'

—'না, জায়গাজমি তো আগেই বিক্রি হয়ে গেছে; এই দালানটা শুধু পঁচিশ হাজার টাকায়—'

ছটফট করে আবার উঠে বসল; গালে হাত রেখে বিবর্ণ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে—

—'জায়গাজমি কিছু আমাদের নেই?'

—'কিচ্ছু না।'

—'কবে বিক্রি হল?'

—'প্রায় বছর তিন-চার আগে।'

আরো অনেকক্ষণ পরে—'আমাকে আমার বাপের বাড়ি চলে যেতে বলো?'

—'সেখানে তোমার কেই-বা আছে?'

—'বাবা নেই অবিশ্যি, কিন্তু কাকারা তো সকলেই আছেন।'

—'সেখানে গিয়ে থাকতে ভাল লাগবে তোমার?'

—'তারা কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে?'

—'হয় তো তাড়াবে না; আমরাও তো তোমাকে তাড়াতে চাচ্ছি না—'

—'অনেক ঘটা করে তো আমাকে তোমাদের বাড়ি এনেছিলে; এখন চুপেচাপে বিদায় করে দাও। একটা পাল্কিতে করে গ্রামের রাস্তায় তুলে দিলেই হবে; কোনে লোকজনের দরকার নেই—দু'জন পাল্কি বেয়ারা হলেই হবে—'

'পাল্কিও তো নেই—'

শিশুর মত কাঁদতে লাগল বেচারি।

বিকেলবেলার দিকে দেখলাম। মালতী চোখ বুজে বড় নিঃসাড়ভাবে পড়ে আছে—হয়তো ঘুমুচ্ছে; কিংবা কে জানে জেগে আছে হয়তো।

সন্ধ্যার সময় ছাদে পায়চারি করছিলাম; মা বললেন—'তুমি নাকি শুনলাম কলকাতায় যাচ্ছ!'

—'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কিসের জন্য?'

—'দেখি চাকরি-বাকরি পাই কি না।'

—'গিয়ে কোথায় উঠবে?'

—'মেসেই।'

—'মেসের খচরই-বা তুমি কোথা থেকে দেবে?'

—'কতই-বা খরচ, দশ-বার টাকা তো মাসে?'

—'ছ-সাত বছর ধরেই তো কলকাতায় যাওয়া-আসা করছ—কই, চাকরি তো পেলে না।'

—'চাকরির জন্য যাব না তো।'

—'তবে?'

—'যাব রোজগারের জন্য।'

—'কোনো কিছুর দালালি করবে না কি?'

শান্ত মাথা নেড়ে—'আমাকে দালাল বানিয়ে মানুষের লোকসানই হবে শুধু।'

—'থাক, না-ই বা করলে, মিছেমিছি হাড় কালি করে কী লাভ! এম. এ. পাস করেছ, একটা মাস্টারি জোগাড় করে নাও গিয়ে-তারপর—'

—'একটা প্রাইভেট মাস্টারি চেষ্টা করলে পেতে পারব আশা করি।'

—'কত দেবে তাতে?'

—'দশ-পনের টাকা-কপাল ভাল হলে বিশ-পঁচিশও দিতে পারে।'

—'কোনো একটা স্কুলে পাকা মাস্টারি নিয়ে বসো; মফস্বলে হলেও হয়।'

—'সে হয় না।'

—'কেন?'

—'আমি অনেকবার চেষ্টা করে দেখেছি। তা আমাকে দেবে না। ছোটবেলায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি কেমন আসক্তি জন্মাল আমার-সেই থেকেই জীবনটা আমার নষ্ট হয়ে গেল।'

মা বিক্ষুব্ধ হয়ে ছাদের এক কোণায় গিয়ে বসলেন। এখন অবিশ্যি বৈষ্ণব কবিতা চাপা পড়ে গেছে; মাঝে-মাঝে ডন ভাল লাগে, মাঝে-মাঝে হুইটম্যান, এ্যালেন, পো, কিংবা শেক্সপিয়ার-এর সনেট-কিন্তু এই সব করেই সাংসারিক জীবনটা খোয়া গেল আমার, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হলেও ভাল হত, কিন্তু পাস করলাম ইংরেজি লিটারেচারে এম. এ। এখন এই বয়সেও আমার জুতো সেলাই শিখতে ইচ্ছা করে।

তাকিয়ে দেখলাম মালতী এসে দাঁড়িয়েছে।

দু-এক দিন পরে একদিন দুপুরের দিকেই ঠিক করলাম, কলকাতায় যেতে হলে আর দেরি করেই বা লাভ কী? রোজগার শিগগির আরম্ভ না করতে পারলে বড্ড মুশ্‌কিল।

আজই কলকাতা যাওয়া ঠিক করে ফেললাম; সন্ধ্যার দিকে স্টিমার। জিনিস-পত্র গোছাতে শুরু করলাম।

—'আজই চললে তা হলে?'

—'হ্যাঁ-মা।'

—'সঙ্গে কী খাবার নেবে?'

—'কিচ্ছু না।'

—'কিছু লুচি ভেজে দেই?'

—'কী আর দরকার।'

—'বৌমা কোথায়?'

—'কই, বলতে তো পারি না।'

—'তুমি যে চলে যাচ্ছ তা সে জানে না?'

—'না বোধ করি।

—'কেন, তাকে জানাও নি কেন?'

—'এই তো যাব ঠিক করলাম।'

—'এই দুপুরবেলার সময় কোথায়ই-বা সে থাকে?'

—'হয় তো ঘুমুচ্ছে।'

—'আমি তাকে জাগিয়ে দেই গিয়ে?'

—'কেন?'

—'এ সব জিনিসপত্র সে এসে গুছোবে না? এ তো তার কাজ।'

—'কী-ই-বা জিনিস; একটা ট্রাঙ্ক নেব শুধু; আর একটা বিছানা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা একটু চুপ থেকে—'কিন্তু তবুও দাঁড়ানো উচিত নয় তার, কাছে এসে? কী? তুমি চলে যাচ্ছ আর সে ঘুমোবে?'

—'যেতে-যেতে আমার সন্ধ্যা; ততক্ষণে সে—'

—'ততক্ষণে তার সঙ্গে একবার দেখা হবে এই সান্ত্বনা নিজেকে দিতে চাও?'

—'হ্যাঁ আসবে বই-কি, 'চুপ করে ট্রাঙ্কের ভিতরটা মুছে নিচ্ছিলাম।'

—'ইস, নিবারণ যখন বিদেশে যেত, দেখতাম বিভা কী ভীষণ কাঁদত, তিন দিন আগের থেকেই কান্না শুরু হত তার।'

—'নিবারণ কাকার কথা বলছ বুঝি?'

—'হ্যাঁ। স্বামী-স্ত্রীর এই রকমই তো হবে। কিন্তু তোমাদের দু'জনের মধ্যে সেই রকম বন্ধন নেই কেন?'

—'সকলেই কি আর বিভা কাকিমার মত কাঁদবে? ভালবাসার পরিচয় কান্নার ভিতরেই নেই শুধু'-একটু হেসে—'এক-একজন মানুষের নতুনত্ব এক-এক রকম।'

—'নাঃ, পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেই ভালবাস তোমরা।'

ট্রাঙ্কের ভিতরে একখানা একখানা করে বই রাখতে আরম্ভ করলাম; কতকগুলো বই নেব; তার ওপর কাগজপত্র খাতা; সব শেষে কাপড়-চোপড়।

—'তোমাদের ভবিষ্যৎ যে কী হবে আমি বুঝতে পারি না।'

—'ভবিষ্যতে রোজগার করতে পারব আশা করি; অন্তত না খেতে পেয়ে মরব বলে মনে হয় না; আমি যতদিন বেঁচে আছি সিঁথিতে সিন্দুরের অভাব হবে না তার; মরে গেলে বিধবার থান পরবে; এর চেয়ে কী বেশি চাও তুমি আর? অনেকে তো এটুকুও পায় না।'

মা জিভ কেটে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাসছিলাম।

—'এমন শ্রদ্ধাহীন কথা বল বুঝি?'

—'স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের ভিতর থেকে আমি অবিশ্যি কোনো বৈকুণ্ঠ প্রত্যাশা করি না, কোনো বিবেচক লোক করে বলেও বোধ করি না।'

—'এইই বুঝি ভাব তুমি।'

—'নিবারণ কাকা মরে যাওয়ার পর বিভা কাকিমা বিষও খেলেন না, গলায়ও দড়ি দিলেন না, স্বামীর মৃত্যুর পর পনের বছর হয়ে গেল—হেসেখেলেই বেঁচে আছেন। সেদিন দেখলাম, মুগের ডালে একটু ঘি কম হয়েছে বলে ভাত না খেয়েই উঠে গেলেন। এই সবই তো স্বাভাবিক। একটা চড়াই চড়াইয়ের শোকে মরে যায়—সে হল আলাদা জগতের কথা। মরে যায় না কি? আমার তো মনে হয় না মরে যায়। কে যেন বলছিল—মরে যায়। যেতে পারে; পাখিদের ভিতর অবিশ্যি অনেক রহস্য আছে।'

পো-র কবিতার বইটার জায়গায়-জায়গায় পোকায় কেটে ফেলেছে—বাক্সের এক কির্নারে[কিনারে বা কর্ণারে] সন্তর্পণে রেখে দিয়ে আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে কোনো এক জন্মে পক্ষীর জীবন পাব; হয় তো সিঙ্গাপুরের এক জঙ্গলে ময়না হয়ে জন্মাব; কিংবা তোমাদেরই এই আম-কাঁঠালের ডালে [টুনি] টুনটুনি হয়ে আসব।

—'দাম্পত্য না হোক, ভালবাসা ও জীবনের এক নতুন আস্বাদ পাব সেদিন।

হার্ডির 'ওয়েসেক্স পোয়েমস্' থেকে ছাতকুড়ো মুছে ফেলি।

—'যাবে না মা?'

তাকিয়ে দেখলাম মা চলে গেছেন।

খানিকক্ষণ পরে ফিরে বলেন—'যা ভেবেছিলাম তাই।'

—'কী।'

—'মালতী ঘুমোয় নি; জেগে বসে আছে।'

—'কোথায়?'

—'একটা বাটা সামনে রেখে পান বানাচ্ছে আর খাচ্ছে—এমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা—কাজ নেই কম্ম নেই হাসি নেই, তামাশা নেই, একটা কথা বললে তার জবাব পর্যন্ত দেওয়া নেই; শুধু পান বানানো আর খাওয়া, এক দুপুরে চার পয়সার পান উড়িয়ে দিল, দেখ গিয়ে।'

—'পান খেতে তো ওর ভাল লাগে না শুনেছিলাম; পান তো বড় একটা খায় না।'

—'বটে! পানের পোকা, দেখে এসো গে যাও।'

—'নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায় বেচারি; জর্দাও খাচ্ছে বুঝি?'

—'জর্দা ছাড়া পান তো কোনোদিনই খায় না।'

—'আমি চলে গেলে পান খেতে ওকে বাধা দিও না, অতিরিক্ত পয়সায় পান লাগলে কিনে দিও—যতক্ষণ খুশি বাটার কাছে বসে নিজেকে নিয়ে থাকতে পারে যেন।'

—'কী রকম?'

চুপচাপ বাক্স গুছাচ্ছিলাম—বইগুলো সাজানো হয়ে গেছে।

—'আমি তাকে বললাম সুকুমার আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছে, গ্রাহ্য করল না, ঘাড় গুঁজে পান ছিঁড়ে সাজাতে লাগল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এত যে বই নিলাম, লাগেজ হবে মনে হচ্ছে!'

—'এত বই নিচ্ছ কেন?'

—'এ সবই আমার পড়া, দু-চার বার—'

—'তবে আর নিচ্ছ কেন?'

—'কলকাতার মেসে আবার যে পড়া হবে তাও মনে হয় না।'

—'তাও নিচ্ছ?'

—'টোমাস মান-এর একখানা বই নিয়েছি বাডেনব্রুক্স—বইটা কেমন লাগে জানো?

—'আমাকে বলে কী আর লাভ?'

—'বইখানা প্রথম পড়েছিলাম বছর খানেক আগে—সেই তেতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটায় বসে, অঘ্রাণ মাস, ভারি মিষ্টি শীত ছিল তখন দেশে। হলুদ ধান আর শীত ভাল লেগেছে বেশি না বইখানা-আজও বুঝে উঠতে পারি না।'

—'যাই, তোমার জন্য লুচি করি গিয়ে।'

—'না, থাক, শোনো।'

—'আমি এ সবের কিছু বুঝব না তো বাছা—আমাকে শুনিয়ে কী লাভ!'

—'বইখানা জার্মান।'

—'ইংরেজি-জার্মান সবই আমার কাছে চাঁদের এপিঠ আর ওপিঠ।'

—'বেশ একটা অভিজাত বংশ কী করে নষ্ট হয়ে গেল, তারই ইতিহাস।'

—'আচ্ছা, ভাল, আমি তো আর দেরি করতে পারি না।'

—'শোনো, আনাতোল ফ্রাঁসের অনেকগুলো বই নিলাম।'

—'তিনি কে?'

—'একজন ফরাসি লেখক।'

—'তাঁর লেখা ভাল লাগে তোমার?'

—'নইলে এত বই নিচ্ছি মা? আজকালকার ছেলেরা পড়ে হার্ডি কিংবা টি. এস. ইলিয়ট। আমি সেই আনাতোল ফ্রাঁস, ভোলতেয়ার, ভিলোঁ, এইসব পড়েই ফুর্তি পাই।'

—'এ সব আলাপ যদি তুমি মালতীর সঙ্গে করতে তা হলেও একটা অর্থ থাকত, সে অন্তত ম্যাট্রিক অব্দি পাস করেছে-কলেজেও নাকি পড়েছিল এক বছর।

—'এই যে আনাতোল ফ্রাঁস-এ লেখককে বড় আস্তে-আস্তে পড়তে হয়, সমস্ত ফরাসি লেখকদের মত এর লেখায় রঙের পিচকিরি ঢের, তোমরা হয় তো অনেক সময় মনে করবে কাদার পিচকিরি।'

—'কে আমরা? এ সব বই কবেই—বা পড়ব!

—'যদি কোনোদিন পড়ো।'

—'কোনদিনও না।'

—'আমি না-হয় একদিন তর্জমা করে শোনাব খানিক?'

—'সে তোমার বৌকে শুনিও।'

—'মান-এর বইয়ের মধ্যে এমন অনেক জায়গা আছে যা তোমাকে শোনাতে ভাল লাগে।'

—'তোমার বাবাকে শুনিও।'

—'তিনি নিজেই ঢের পড়েছেন।'

—'আমার তো এখন সময় নেই।'

—'আজ অবিশ্যি নয়, কলকাতা থেকে ফিরে এসে কোনো এক শীতের রাতে এই জার্মানদের লেখা তোমাকে পড়ে শোনাব।'

—'বলছিলে না, লাগেজ হবে?'

—'হ্যাঁ, অনেক বই তো নিলাম।'

—'তা লাগেজ যদি হয়?'

—'তা হলে কতকগুলো পয়সা নষ্ট হয়ে যাবে বটে—'

—'তার চেয়ে বই কতকগুলো কমিয়ে নাও।'

—'সে হয় না মা; আমি সমস্তটা সকাল বসে ভেবে দেখেছি যা নিতে চাই তার ভেতর থেকে কোন বইগুলো বাদ দেয়া যায়; দেখলাম একখানাও বাদ দিলে চলে না।'

—'অথচ এ বই তো পড়বে না তুমি!'

—'বাক্সের নিচে পড়ে থাকলেও আমার ঢের সান্ত্বনা।'

—'তুমি এখনও বড় ছেলেমানুষ।'

—'পয়সা যা লোকসান হবে তা কলকাতায় গিয়ে আমি শুধরে নেব।'

—'কী করে?'

কয়েকখানা খাতাপত্র সাজাতে-সাজাতে কোনো উত্তর দিলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমার কাছ থেকে চাপতে চাচ্ছ; আমি কি জানি না সব? বার টাকার মেসে থাকো, পাঁচ টাকা তোমার মাসিক হাত খরচ; চৌদ্দ টাকায় চালিয়ে দাও। আমাদের বাজার-সরকারও তো তোমার চেয়ে ঢের ভাল থাকেন।'

—'কষ্ট লাগে যদি তোমার তা হলে বিশ টাকার বোর্ডিঙে গিয়ে থাকতে পারি।'

—'সেই রকম থাকলেই তো ভাল হত।'

—'হ্যাঁ, বাবা যখন কলকাতায় যান, তখন পঞ্চাশ টাকার হোস্টেলে তো থাকেন।'

—'উনি খারাপ জায়গায় থাকতে পারেন না কি না।'

মাথা গুঁজে বাক্সটা গুছোতে লাগলাম।

—'বুড়ো মানুষ, যা-তা খাওয়াও সহ্য হয় না।'

—'তা ঠিক।'

—'তুমি যদি একটা ভাল চাকরি পেতে!'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে—'কত দিনে যে তোমার এই দুর্দশা ঘুচবে।'

—'বাবার কাছ থেকে শত দুই টাকা চেয়ে নিলে হয় না?'

—'কিসের জন্য?'

—'একটি মাস কলকাতায় একটু ভাল করে থাকব।'

—'কিন্তু এত টাকা তিনি এখন কোথায় পাবেন?'

—'আচ্ছা তোমার মোটা [?] অনন্ত দু'টো দাও না মা, বেচে শত দেড়েক টাকা তো পাব নিশ্চয়?'

—'আমাদের দুঃখকষ্টের দিনে এ সব গয়না কি হাতছাড়া করা উচিত, তুমিই বুঝে দেখ।'

—'ধুতি তিনখানা নিলাম, কী বলো, হয়ে যাবে না?'

—'তোমার শার্ট নেই বুঝি?'

—'না। ধোপার বাড়ি দেব না, নিজেই কাচব।'

—'কলকাতার মানুষকে পদেপদেই জীবনের ব্যবস্থা স্বীকার করে নিতে হয় বাবা।'

—'পাঞ্জাবি শার্ট আমার অনেকগুলি আছে।'

—'কটা?'

—'তসরের দুটো পাঞ্জাবি।'

—'ছেঁড়া নয় তো? এগুলো যে প্রায় দশ বছরের পুরনো।'

—'লংক্লথের পাঞ্জাবিও...আছে আর টুইলের শার্ট একটা।'

—'দেখ তো ছিঁড়ে যায় নি তো কোথাও?'

-'না-না—'

—'বোতাম ঠিক আছে তো? না হলে লাগিয়ে দেই, কী বলো।'

চোখ বুজে-'সব বোতাম ঠিক রয়েছে।'

—'এ সব মালতী একটু দেখেশুনে গেলে পারত না?'

—'তুমি বরং আমাকে এক রিল সুতো আর গোটা দুই সূচ যদি পারো দিয়ে দিও।'

—'কিসের জন্য?'

—'কলকাতায় যদি ভবিষ্যতে ছিঁড়ে যায় কিছু তালি দিয়ে নেব।'

—'সুতো হয় তো মালতীর কাছে আছে; চেয়ে আনব?'

—'তোমার কাছে সূচ আছে?'

—'আছে।'

—'তাই দাও।'

—'আর সুতো?'

—'আমি চেয়ে নেব।'

—'মালতীর কাছ থেকে?'

—'হ্যাঁ।'

—'এখনই চেয়ে আনো না কেন, কাপড়-জামা যদি কোথায় ছেঁড়া থাকে সেলাই করে দেই।'

—'কিছু ছেঁড়া নেই, তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।'

মা দু'হাত পিছিয়ে গিয়ে-'এমন পাপ করতে যেও না বাবা।' একটু হেসে—'কেন?'

—'আমাকে ছুঁয়ে তুমি মিথ্যা কথা বলবে?'

মা অবিশ্যি অন্তর্যামি—

মাথা হেঁট করে হাসছিলাম—

—'কই, কোথায় ছেঁড়া আছে দেখি তো।'

বাক্সটা তালা দিয়ে বন্ধ করে ফেললাম—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমাকে দেবে না?'

—'তা হলে আমার কলকাতায় যাওয়া হবে না।'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন; খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে—

—'আচ্ছা নাও, এই অনন্ত-দুটো।'

—'কেউ কোনোদিন তোমার কাছ থেকে নিতে চেয়েছে মা?'

—'কী?'

—'তোমার গায়ের গয়না?'

মা মাথা নেড়ে—'না।'

—'কেউই না? দিদিও না? দাদাও না?'

—'দিদির তো তোমার খুব ভাল বিয়েই হয়েছে; আমার গয়না দিয়ে তার কী দরকার?'

একটু চুপ থেকে—'আমি অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবি কলকাতা তোমার দিদির এত ভাল বাড়ি আছে, অথচ তুমি মেসে থাক কেন?'

—'আর দাদা?'

—'কে, সুরেশ? সে তো কানপুরে মস্ত বড় চাকরি করে; শুনেছি নাকি মেম বিয়ে করেছে; আমার বিশ্বাস হয় না। এই দশ বছর ধরে দেশে আসে না; তোমার বাবা চিঠি লিখলেও উত্তর দেয় না।'

—অধোমুখে শাড়ির পাড় আস্তে ভাঁজ করতে-করতে—'সে বরাবর নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই চলে। সুরেশ এসে আমার কাছে গয়না চাইবে এ কথা তো আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

—'আমাকে কিছু মশলা দিতে হবে মা।'

—'কিসের মশলা?'

—'সুপুরির কুচি, কয়েকটা লবঙ্গ, আর যদি পারো এক টুকরো দারচিনি।'

—'আচ্ছা। তুমি সুরেশকে লিখলেই পারো।'

—'কিসের জন্য?'

—'তোমাকে যাতে কিছু টাকা পাঠায়।'

—'না, তার আজকাল বড় খরচ-সাত-আট বছর হল মেম বিয়ে করেছেন—অনেক ছেলেপিলে হয়ে গেছে নাকি, পোষাতে পারছেন না।'

তাকিয়ে দেখলাম চোখে জল, অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসে থেকে—'বিছানা বেঁধেছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'এখনই যাবার সময় হয়ে এল?'

—'এবার আর ঘোড়ার গাড়িতে করে স্টেশনে যাব না, পায়ে হেঁটেই যাব।'

—'তোমার বাবাকে প্রণাম করে এসো।'

—'যাচ্ছি।'

—'আর মালতীর সঙ্গে দুটো কথা বলে যাবে না?'

—'বলব বই-কি, তোমাদের সকলেরই প্রসন্ন মুখ দেখে যেতে চাই আমি; সে কোথায় আছে?'

—'বিধাতা জানেন; দেখলে তো একবার এদিক মাড়ালও না।'

—'আর এক ঘণ্টা সময় আছে; তাকে খুসি করে যেতে পারব তো?'

—'ছ বছর বসে পারলে না; এক ঘণ্টার মধ্যে পারবে?'

তাকিয়ে দেখলাম নিঃশব্দ পায়ে বধূ এসে দাঁড়িয়েছে।

মা ধীরে-ধীরে উঠে চলে গেলেন।

—'আমাকে দেখেই মা সরে গেলেন যে?'

—'অনেকক্ষণ বসা হয়েছে তাই উঠলেন।'

—'বিছানা বেঁধে ফেলেছে দেখছি।'

—'কলকাতায় যাচ্ছি।'

—'গিয়ে চিঠি দিও।'

—'তা দেব বই কি।'

—'সময় তো হয়ে এসেছে প্রায়।'

—'হ্যাঁ, এক ঘণ্টা বাকি আছে।'

—'বিশুর মাকে গাড়ি ডাকতে বলব?'

—'না, আমি হেঁটেই যাব।'

—'তা হলে কুলি ডেকে আনুক বিশুর মা।'

—'আর-একটু পরে ডেকে আনলেই হবে; সময় আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কুলি তো তোমাদের সেই রামধন, তাকেই ডাকবে তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা হলে তাকে খবর দিয়ে আসুক এখন।'

—'আমি যাবার সময় ডেকে নিয়ে যাব।'

'তখন যদি সে না থাকে?'

—'তা থাকবে।'

—'স্টিমার মিস না করে তুমি ছাড়বে না দেখছি।'

—'আচ্ছা এখুনি আমি উঠছি; আমাকে কয়েকটা সেফটিপিন দিতে পারো?'

—'আমি কোথেকে পাব?' আমাকে কিনে দিয়েছিলে সেফটিপিন?'

—'এই তো তোমার ব্লাউজে কয়েকটা লাগানো আছে দেখছি।'

—'পয়সায় তো দশটা বিকোয়, এও আমার ব্লাউজের থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে?'

—'আমার একটা হলেই চলবে।'

—'কী করবে শুনি?'

—'এই শার্টের হাতের বোতামটা ছিঁড়ে গেছে-এখানে লাগিয়ে নেব।'

—'আস্তিন গুটিয়ে নাও।'

একটু হেসে-'কিছু মশলা দিতে পারো আমাকে?'

—'যাচ্ছ কলকাতায়, মশলা চাচ্ছ আমার কাছে?'

—'কেন কলকাতায় যাচ্ছি তাতে [কী]?'

—'সেখানে তো খুব ভালো মশলা তৈরি হয়।'

—'আমি চাচ্ছি পথে খাবার জন্য খানিকটা সুপুরির কুচি, লবঙ্গ, দারচিনি।

—'পথে তো তোমরা সিগারেটই খাও।'

—'সিগারেট আমি অনেক দিন হল ছেড়ে দিয়েছি।'

—'কেন, বিলেতি বলে?'

—'পয়সায় কুলোয় না।'

—'বিড়ি খাও বুঝি?'

—'কিচ্ছু না।'

তাকিয়ে দেখলাম মা এসেছে—'একটা ছাতা নিলে না?'

—'না কোনো দরকার নেই।'

—'পথে যদি বৃষ্টি হয়?'

—'না, বৃষ্টি হবে না।'

—'বৃষ্টি হবে না—তুমি কি দৈবজ্ঞ?'

মালতীর দিকে তাকিয়ে মা—'শ্রাবণ-মাস, বৃষ্টি হবে না-সুকুমারের জন্য বিধাতা আকাশ শুকনো করে রেখে দেবেন।'

আমাকে বললেন—'রাজমোহনের ভাটভাঙা ছাতাটা নিয়ে যেও।'

—'আচ্ছা।'

—'সেটা রাজমোহনের ঘরেই পাবে।'

—'নিয়ে যাব।'

—'আর আজকাল বৃষ্টি না পড়লে যে-রকম গুমোট হয়, একটা হাত পাখা নেওয়া ভাল।'

—'নদীর পাশে বিছানা করে নেব।'

—'তা কি হয়? ভিজে একাকার হয়ে যাবে যে।'

—'বৃষ্টি পড়লে চটের পর্দা টেনে নেব।'

—'গরমের চোটে মারা যাবে যে তখন সেই জন্যই বলছি একটা হাতপাখা নিতে।'

—'পাখা কোথায় পাওয়া যায়?'

—'বৌমার দু-তিনটা অতিরিক্ত পাখা আছে।'

মালতী মাথা নেড়ে—'যেটা ছিল সেটাই খুঁজে পাচ্ছি না আর মরতে-মরতে ভাঙা কুলোর মতো পড়ে থাকে-টিকটিকির ল্যাজের মতো রয়েছে একটা পাখা।'

মা আমার দিকে তাকিয়ে—'আমার পাখাই নিয়ে যেও, আমাদের পাখা সময় বুঝে হারায় না তো-মানুষের উপকারেই লাগে।'

—'হ্যাঁ, দিন।'

মা উঠতে গিয়ে বসে পড়ে ভ্রুকুটি করে—'স্টেশনে পাখা কিনতে পাওয়া যায় না?'

—'তা পাওয়া যায় বই কি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তা হলে তা কিনে নিও। সুরেশের কথা শুনে অব্দি মন কেমন পাথর চাপা হয়ে আছে—না পারলাম তোমার লুচি ভাজতে, না পারলাম মশলা কুটতে। তোমার বাবাকে প্রণাম করে এসেছ?'

—'যাই।'

কে যে তাকে প্রণাম করল, কোন হিসাবেই বা, তাও বাবা তাকিয়ে দেখতে গেলেন না। চারদিকে অনেক লোকজন বসে রয়েছে তাঁর। খাস অম্বুরির গন্ধ ও অব্যবস্থিত তামাসা ও বচসা চলেছে।

স্টেশনের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে শেষ পর্যন্ত এই বাড়ির নারীদুটির কথাই ঘুরে-ফিরে মনে পড়ে আমার; তাদের জন্য বেদনাও বোধ করি আমি—এমন গভীর বেদনা! একটা জীর্ণ শীর্ণ দাঁড়কাক অমাবস্যার অন্ধ স্রোতের মধ্যে তার অনেক দূরের নিঃসহায় শিশুদের জন্য যেমন অনুভব করে আমিও কি তেমন অনুভব করি না মা-তোমার জন্য; তোমার জন্য মালতী?

স্টিমারে উঠে দেখলাম শ্রাবণের মেঘের সঙ্গে রাতের অন্ধকার এসে হাহাকার করে মিশছে। মাথা হেঁট করে ভাবলাম; আবার ভোর হবে-হবে না কি?

রামধন বললে-দাঁড়িয়ে আছেন যে বাবু, জায়গা করবেন না?'

—'হা। কোথায় বিছানাটা পাতা যায় রামধন?'

—'ভিড় একবারে গিসগিস করছে যে, আজ! হজ [?] নাকি?'

—'কোথাও ফাঁকা জায়গা নেই বুঝি?'

—'না!'

—'আচ্ছা, তা হলে তুমি যাও-এই নাও বকশিশের পয়সা-আমি দেখেশুনে এক সময়—'

—'মনে বড্ড কষ্ট রইল দাদাবাবু!'

—'কেন?'

—'আপনার জন্যে বিছানা পেতে দিয়ে যেতে পারলাম না।'

—'দেখ রামধন, তুমি বড় আহাম্মক-খবরদার বাড়িতে যদি এ সব নিয়ে কথা বল!'

—'আপনার পা ছুঁয়ে বলছি হুজুর আমি বলব না কিছু।'

—'যদি জিজ্ঞেস করে?'

—'বলব যে নদীর ধারে সুন্দর বিছানা পেতে দিয়েছি-দাদাবাবু ঘুমোবার উয্যুগ করছেন।'

—'আর বলিস যে স্টেশন থেকে একটা হাতপাখা কিনে নিয়েছি।'

—'যা হুকুম হয় হুজুর।'

—'খবরদার, ভুলেও যদি এ ভিড়ের কথা বলিস! ভিড়ের ভিতর জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে চলেছি জানতে পারলে রাত্তিরে তাদের ঘুমও হবে না কিন্তু!'

—'যেমনটি বলেছেন হুজুর।'

রামধন চলে।

থার্ড ক্লাস ডেকের একটু ছোট্ট জায়গা রয়েছে দেখলাম—সেকেন্ড ক্লাস কেবিনের দরজাটার বাইরেই একটু উত্তর মুখ ঘেঁষে স্টিমারের চোঙা থেকে বিস্তর কয়লার গুঁড়ো এসে পড়ে সেখানে—কে যেন একটু জলও ঢেলে রেখেছে।

কিন্তু জায়গাটা ডেকের একেবারে এক প্রান্তে-নদীর জলের গন্ধ ও অন্ধকারের বুকের উপর যেন। ঝির ঝির করে বাতাস দিচ্ছে, এই গুমোটের ভিতর এ জায়গাটা একটা নিস্তারের মতো। অবাক হয়ে ভাবছিলাম কেউ এই জায়গায় বিছানা পাতে নি কেন—কয়লার গুঁড়ি নামে বলে?

কিন্তু কয়লার গুঁড়ি চোখে না এলেই তো হল!

বিছানাটা আস্তে-আস্তে পাতলাম, শতরঞ্জিটা মেঝের জলে ভিজে গেল-কিন্তু তোশকটা তত ভিজবে না। এগুলো জল না মানুষের পেচ্ছাপ? যাই হোক, বিছানার চাদরে লাগবে না তো, বালিশেও না; কাল কলকাতায় গিয়ে শতরঞ্জিটা ধুয়ে নেব, তোশকটা রোদে শুকিয়ে নেওয়া যাবে।

প্যাসেঞ্জারদের ভিতর অনেকে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে-পেচ্ছাপের উপরেই বিছানা পেতেছি তা হলে? মনটা কেমন থতমত খায়, উঠে যেতে ইচ্ছা করে, মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু পশ্চিমের আকাশটা মাইলের পর মাইল নবীন মেঘের পাহাড় বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে, পাহাড়ের একধার যেন আকাশের থেকে জন্ম নিয়েছে, তারই নিচে শহরের কিনার ধরে এক শৃঙ্গ চলে গেছে খ্রিস্টানদের গোরস্থান ছাড়িয়ে গির্জা ছাড়িয়ে—

এ আল্পস—নাশমুলি [?], কারকোরাম-না খণ্ডগিরি?

বিকেলের শেষে প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েক মুহূর্তের বিহ্বল জল মাইলের পর মাইল—আকাশে আকাশে হাত বাড়িয়ে—

হৃদয় যেন কিমোনো-অঙ্কে জাপানি বালিকার মতো মুগ্ধ হয়ে সন্ধ্যার বিরাট প্রান্তরের মতো নিস্তব্ধ সীমাহীন সমুদ্রের...

মনে হয় যেন কোনো চমরী কোনো নীল গাই, হিমালয়ের পথ ভেঙে-ভেঙে কোনো দিন আনন্দের এত গতি, এ স্থিরতার এত পরিতৃপ্তি বোধ করে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেনেসাঁসের ইটালির শিল্পীরা নারী প্রেমে ব্যর্থ হয়ে যে সুন্দর দূর বিচ্ছেদের দেশের কথা ভাবত, এই মেঘগুলোর ভিতরেই কি লুকিয়ে আছে সেই জায়গা? সেউত্রি বা ভালোয়া স্বপ্ন দেখত—ঐ খানেই যেন তা। ঐ খানেই যেন দিদোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ইলিয়াসের একটা গুহার মোড়ে অন্ধকারের কুয়াশার ভিতর-যেন পুরুরবার সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীর দিন কেটেছিল এই পাহাড়েরই কোনো এ চূড়ায়—মূর্খ অর্জুন উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গিয়েছিল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-ফ্রা এঞ্জেলিকো ম্যুরিলো মৃত্যুর পর ঐখানে যেন অলস অবসাদে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, নবীন রূপ দেখছে হয়তো, ছবি আঁকছে, ছিঁড়ে ফেলছে, শিকলের শেষে রোদের সোনালি আভার ভিতর পা ছড়িয়ে তরমুজের রস খাচ্ছে হয় তো হেমন্তের টলটলে রক্তাক্ত রৌদ্রে মাছি যেমন...জীবনের রস পান করে, জমাট মোমের মত সাদা এক তরুণীর কাছে হৃদয় হারিয়ে ফেলেছে হয়তো—

মাইলের পর মাইল এই নীলাভ মেঘের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ভারতবর্ষের পর্বতগুলোর কথা মনে হয় না আমার। আজকের জীবনের কথাও, পৃথিবীর জীবনের কথাও পিছে সরে যায়—মনে হয় এগুলো যেন গ্রিক রোম্যান ভূ-মধ্য-সাগরের ওপারের জিনিস, মৃত স্মৃতি ও ছবির দেশ-নীল নরম বাল্টিকের ওপারে একদিন যা রয়ে গেছে-কিংবা ম্যুরিলোর [?] দেশ, ভিঞ্চির মনের ভিতর, র‍্যাফেলের মনে—

দীর্ঘ নগ্ন দুধের মত সাদা শরীর, ঝাউয়ের শাখাপ্রশাখার ফাঁকে জ্যোৎস্নাহীন নক্ষত্রহীন নিস্তব্ধ বনের মতো অজস্র কালো চুল একজন মানষী পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ধূপের গভীর ধবল ধোঁয়ার মতো দাঁড়ায় একা-মিলিয়ে যায়—তাদের প্রেমিকেরা দেবতা না মানুষ? কী রকম মানুষ? থিসিউস-এর মত না মাইকেল এঞ্জেলোর মত? থিসিউস-এর মতই; রক্তমাংসকে আক্রমণ করে কিশোর-যুবক; মাংসরক্তহীন রূপকে আস্বাদ করে এঞ্জেলো; স্বপ্ন ও বেদনা তার একটা বিরাট আকাশের মত ওঠে।

খাকির সুট পরা একজন সাহেব চেকার এসে হাত বাড়াল-আমার টিকিট দেখতে চাচ্ছে।

স্টিমারে সাহেব চেকার এই প্রথম দেখলাম; হয়তো চেকার নয়, কোম্পানির বড় অফিসার—ইনস্পেকশনে বেরিয়েছে।

এক টুকরা চুরুট ছিল পকেটের ভিতর; ধীরে ধীরে জ্বালিয়ে নিলাম। পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সন্ধ্যার ছবি মিলিয়ে গেছে, সেই মেঘের পাহাড় নেই আর, চারদিকে সাদাসিধে বাংলার পাড়াগাঁ।

স্টিমার ছেড়ে দিয়েছে।

মাঠ জঙ্গল খোড়ো ঘর সলতের প্রদীপ একে-একে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দেখা দিয়ে চলে যায়, মনের ভিতর বিক্ষোভ জমে ওঠে কেমনতর যেন এক, মনে হয় যেন স্পেন ও গ্রিস, রেনেসাঁস, এঞ্জেলো, মুরিলো সমস্তই সরে গেল, বাদলভেজা মাঠ অশ্বত্থ ও জঙ্গল যেখানে ময়নামতীর গান ও রূপচাঁদ পক্ষীর জন্ম হয়েছিল একদিন। বৃষ্টির ঘনঘটার ভিতর পথের সঙ্গিনী এই নদী। খোড়ো বনের ভিতর থেকে পাড়াগাঁর দুঃখিনী রূপমতীর উনুনের ধোঁয়া—পাশেই তার-বেল ও বাঁশের জঙ্গলের ভিতর থেকে ধূ ধূ মাঠের আনাচে-কানাচে যুগান্তের প্রেতিনীদের নিরবচ্ছিন্ন রূপকথা, কোথাও একটা চিতা, খানিকটা কাঠমল্লিকার গন্ধ-আশশ্যাওড়ার জঙ্গলে জোনাকি, সজনে গাছের ডালে জোনাকি, লক্ষ্মী প্যাঁচার ডাক; বাংলার মাঠঘাটের পথ দিয়ে অনেক শতাব্দী ঘুরিয়ে আনে আমাকে, প্রান্তর ও নিশুতির ফাঁক থেকে অসংখ্য মুখ উঁকি দেয়, কিশোরী ও পুরলক্ষ্মীদের নিরপরাধ নরম ডৌলের নিবিড় মুখ সব কাছে এসে বলে—'চিনতে পার তো?'

—'হ্যাঁ চিনি বই কি—তোমরা আজ মৃত বুঝি সব?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তোমার এ বেশ কেন ভাই?'

'এই বেশই কি আমার চিরকাল ছিল না!'

'না না তোমার নাম যে সুলক্ষণ ছিল—নয়নপুরের মাঠে তিনশ বছর ধরে তুমি যে একটা ঝাঁকড়া ঝুড়িওয়ালা বটগাছ হয়ে ছিলে!

'কে? আমি!'

'গ্রামের দেবতা হয়ে ছিলে, নিজেকে চিনতে পার না দেবতা?' ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় সব—

অনেকদূর থেকে ডাক আসে-'ওগো গ্রামদেবতা ওগো গ্রামদেবতা!'...

অমাবস্যার মাঠকান্তার আম কাঁঠাল হিজল জামের জঙ্গল হারিয়ে যায় সব। একটা জেটির কামরায় কামরায়...লাইট জ্বলছে। নদীর পারে অনেকগুলো লণ্ঠন ও আলো লোকজন ছুটোছুটি করছে। কলরব। স্টিমার অনেকখানি স্টিম ছেড়ে নিয়ে একটা স্টেশনের ধাপে এসে থামল।

চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিলাম আবার।

খানিকক্ষণ টেনে কেমন পিপাসা বোধ হল। ধীরে ধীরে....ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের দিকে গেলাম। পাগড়ি চাপকান পরে বাটলার দাঁড়িয়ে ছিল-মুখ বসন্তের দাগে বিকৃত, সাদা দাড়ি সাদা চুল।

—'এক গ্লাস জল দিতে পারো।'

আপাদমস্তক আমার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার-বাঁ হাঁটুর পাশে ধূতির ফুটোর উপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার, বোতাম ছেঁড়া শার্টের হাতাটা, অপরিচ্ছন্ন জুতোজোড়া আধময়লা কাপড়-চোপড় সবই দেখতে হয় তাকে—

বললে—'দরজার কাছে এসে দাঁড়াবেন না।'

একটু সরে দাঁড়ালাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আপনি কোন ক্লাসে যাচ্ছেন?'

—'থার্ড ক্লাসে।'

—'ইন্টারে?'

—'না। থার্ডে।'

—'সেখানে তো ট্যাঙ্কে কল আছে।'

—'ফুরিয়ে গেছে।'

—'আপনি কারি-ভাত খাবেন?'

—'কত করে ডিশ?'

—'এই চৌদ্দ আনা বার আনা।'

মাথা নেড়ে—'না, ভাত আর খাব না এবার।'

—'চা চাই?'

—'না চা-ও না—এক গ্লাস জল পেলেই হয়ে যায়।'

—'একটু দেরি হবে—বড় ব্যস্ত আছি।'

—'সহসা ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে কেবিনবয়দের সঙ্গে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গল্প করল।

খানিক, ঝাড়ুদারকে ধমকাল পাঁচ মিনিট বসে, জনমানবহীন অন্ধকার সেলুনের দিকে বার দুই গেল, ফিরে এল, একটা বিড়ি জ্বালাল, মিনিট দুই টেনে আড়মোড়া ভেঙে একটা খানশামা ছোকরাকে বললে এক গ্লাস জল ঢেলে দিতে। জল কাচের গ্লাসে পেলাম অবিশ্যি।

পরিতৃপ্তি মন্দ নয়।

মা সঙ্গে খাবার দিতে ভুলে গেছেন; কী খাওয়া যায়? চুরুটই কিনে নেয়া যাক গোটা চারেক।

বিছানায় শুয়ে ধীরে-ধীরে ঘুম আসে; সমস্ত আকাশ মেঘে ভরে আছে; বৃষ্টি নেই তবু বাতাস আসছে, বড় আরাম। প্রথম রাতেই শীত করতে লাগল—ইচ্ছে করল গায়ে কম্বল টেনে নেই একটা—কিন্তু কম্বল তো আনি নি; জড়সড় হয়ে শুয়ে রইলাম।

মাঝে-মাঝে বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে জেড়ে উঠি-সৃষ্টির ক্ষমাহীন বিরল মুখ চারদিকে ভাসতে থাকে। বিছানার উপর উঠে বসে থাকি। চুরুট টানতেও ইচ্ছে করে না।

ধীরে-ধীরে জুতো পরে ডেকের উপর পায়চারি করতে থাকি-যে যেখানে খুশি আখের ছিবড়ে ও থুতু ছিটিয়ে ফেলছে, কলার বাকল, আমের খোশা সাবধানে এড়িয়ে চলতে হয়; এক-একটি জায়গায় জমাট পেচ্ছাপের গন্ধ; এক-একটি ক্যানভ্যাস পেচ্ছাপের গন্ধে জ্বলে যাচ্ছে যেন; মাথার উপরে দরমার ছাউনির নিচে ইলেকট্রিক বতি কেরোসিনের কুপির চেয়েও অধম, এক-একবার জ্বলছে, এক-একবার নিভে যাচ্ছে প্রায় জোনাকির জেল্লার মত, সমস্ত অভিষিক্ত করে বিড়ির গন্ধ, সব দিকে। সব সময়ই গুমোট।

এক-এক দল মানুষ মৌমাছির মত পাকিয়ে বয়লারের চারপাশে ঘুমুচ্ছে; একনিষ্ঠ ঘুম; ঘুমের ভান নয়-ঐকান্তিক একনিষ্ঠ ঘুম; সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে-মুখ হয়ে আছে হাঁ-কাপড়-চোপড় খসে খুলে—

পাশেই বয়লার। নিচের থেকেও হাপর ও পিস্টনের তাত মেরুদণ্ড সিদ্ধ করতে থাকে, ফ্ল্যাটের ফাঁকে আলকাতরা পুডিং পর্যন্ত গলে যায়। অবাক হয়ে ভাবি এরা কী করে এমন জায়গায় এ রকম ঘুমিয়ে থাকে! আমাকেও মাঝে-মাঝে বয়লারের পাশে শুতে হয়েছে বটে...আবার শ্রাবণের গরমের মধ্যে। কিন্তু ঘুমোতে পারি নি-সারারাত পায়চারি করেছি।

এরা ঘুমুচ্ছে—

গভীর ভাবে এরা মানুষ।

জীর্ণ শীর্ণ ভীত প্রতারিত মুখ তুলে নিজেদের অজ্ঞাতসারে নিজেদের জয়গান করে চলে যাচ্ছে এরা অনেক দিন। বসে এদের দেখলাম আমি; মনে-মনে গভীর শ্রদ্ধা জানালাম!

নিচে চলে যাই। হাঁস-মুরগি খাঁচায় ঘুমিয়ে আছে—আজ বোধহয় গোটা কয়েক বুড়ো মুরগি কাটা হয়েছে শুধু—কিংবা কে জানে একটাও কাটে নি, সেলুনে তো কোনো লোক দেখি নি আজ; তাকিয়ে দেখলাম এদের ঘুম নিরিবিলি নয়, সবাই ঘুমোচ্ছেও না—গলাগলি করে পড়ে আছে-প্রতি মুহূর্তে অন্ধকারও প্রত্যাশা করছে-এদের সঙ্গে যারা এই রকম ব্যবহার করছে একদিন তাদেরও এই খাঁচায় ফিরে আসতে হবে নাকি? না আসলেই ভাল; জীবনের থেকেও এরা যেন তাড়াতাড়ি মুক্তি পায় সেই ভাল। মৃত্যুর পরপার কার জন্য কী রেখেছে কে জানে! কিন্তু এদের জন্য এর চেয়েও অন্ধকার কিছু রাখে নি আবাল্য।

কিন্তু মৃত্যুর পরে নেই তো কোনো স্মৃতিদেশ, নেই তো কোনো অনুভূতি-লোক—

এগিয়ে যাই-খালাশিরা সালুন খাচ্ছে; মাটির থালায় [?] করে খেতে ইচ্ছে করে; বড্ড খিদে পেয়েছে।

পকেট থেকে পোড়া চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নেই; স্টিমারের ঘড়িতে দেখি দশটা বেজে গেছে—আমাদের সাড়ে দশটার মতো তা হলে? নিচের খাঁদলে দুইজন খালাশি স্তূপীকৃত জ্বলন্ত কয়লা বারবার ঠেলে দিচ্ছে; টেনে বার করছে, নানারকম মেলাই খেলছে, দেখে-দেখে হয়রান হয়ে যাই অথচ সারা পথ এরা এই রকমই করবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের সব পর্যায়েই এই রকম সব লোক রয়ে গেছে; এদের দিকে তাকিয়ে নিজের ভিতরের মনুষ্যত্ব ও অমানুষিক সম্ভাবনার কথাও মনে হয়, আমার সেই রকমই মনে হয়, বারবার মনে হয়। এদের কথাই মনে হয় না শুধু?

এগিয়ে চলি-নিচের ফ্লাটেও অনেক বিছানা পড়েছে। কেউ জেগে আছে, কেউ ঢুলছে; চারদিকে কেমন চামসে গন্ধ, শুঁটকি মাছ হয়তো—চটের বস্তায় চালান যাচ্ছে। নুনমাখানো কাটা ইলিশের কয়েকটা বাক্স দেখছি; কলকাতায় যাচ্ছে? মানুষের শখ তো অনেক রকম। অনেকগুলো চিকন পাটি, বেতের কাজ নানা রকম, ঝুড়িতে নানা রকম ফল, কতকগুলো কেরোসিন তেলের টিন ভর্তি অদ্ভুত গন্ধের কী এক জিনিস— অনেকগুলো তিসির বস্তা হয়তো, বস্তা-বস্তা চাল জাহাজ বোঝাই হয়ে চলেছে; পাশেই একটা হিলম্যান কায়-কোন গুদামে গিয়ে থাকবে এ সব জানি না; হয়তো কলকাতায়ই, হয়তো কাছাকাছি কোনো স্টেশনে।

নদীর মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, নিরবচ্ছিন্ন গভীর বাতাস, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, শরীরের ভিতরে রক্ত। হেমন্তের গভীর রাত...স্টিমারের সার্চ লাইটের দিকে চীনা রেশমের মতো নরম ডানাওয়ালা অসংখ্য ধূসর পোকা উড়ে আসছে; এগুলোকে কী পোকা বলে! দু-একটা আমার হাতের উপরে মুখের উপর এসে পড়ছে—ডানার ভিতর থেকে নরম সাদা-সাদা গুঁড়ি-গুঁড়ি ঝরে পড়ছে—আলোর জন্য এরা পাগল—কচি শিশুর বুকের মতন পাখনা ধড়ফড় করছে, ডেকের চারপাশে এই সব মৃত পোকার দল মুহূর্তে-মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে, এক-একটা পাগলা ঢেউয়ের লেলিহান ঝর্ণায় সেই সব মৃত শরীর অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। আবার একটা মৃত পোকা তুলে নেই; মাখনের মতো সাদা পালক পাখনা, ছোট্ট শরীরের মধ্যে চোখ মুখ গলা বুক পা ডানা দেহের কারুকার্যে তাজমহলের শিল্পগুণের চেয়ে একটুও কম সহিষ্ণুতা কৌশল ও যত্ন দেখায় নি তো। লক্ষ লক্ষ বার এই রকম গভীর সাধনার পরিচয় দিয়েছে এই কীটনির্মাতা।

কিন্তু তবুও মৃত্যু ও অন্ধকারের মধ্যে এই অবর্ণনীয় প্রয়াস মুহূর্তে-মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও বিরাম নেই তো শিল্পীর!

উপরে ফিরে এসে দেখি আমার বিছানার উপর দিয়ে জুতো মাড়িয়ে চলতে ভ্রূক্ষেপ করে নি কেউ; যেখানে সেখানে কাদা ও সুরকির ছাপ।

আস্তে-আস্তে ধুলোগুলো ঝেড়ে নিয়ে বসলাম।

তাকিয়ে দেখলাম একজন বুড়ো মানুষ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—'মশাই শুনছেন?'

—'আমাকে বলছেন?'

—'আপনাকেই।'

—'বলুন।'

—'এটা কি আপনার বিছানা?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'এখানে আমি একটু শুতে চাই।'

একটু হেসে—'সে আপনার অনুগ্রহ।'

—'না, ঠাট্টা নয়।'

—'আমিও ঠাট্টা করছি না।'

—'দেখছেন তো কী রকম ভিজে বিড়ালের মতো চেহারা আমার; আজ কম করে সাত ক্রোশ পথ হেঁটেছি—সেই হতচ্ছাড়া মিনসে জনার্দনটার পাল্লায় পড়ে', চোখ কপালে তুলে হাঁসের মতো ফোঁসফোঁস করে বুড়ো, 'মিনসে আবার হয় আমার সম্বন্ধী—মাগের ভাই—কাজেই...'

—'বুড়ো বয়সে অনেক হাঁটিয়ে ছাড়লে দেখছি!'

—'আমার ব্যাপারটা কী শুনুন।'

—'বলুন।'

আমার বিছানায় হাত বুলিয়ে জায়গা খুঁজে নিয়ে বসল। কাঁধে একটা চাদর শুধু—পরনের কাপড় কোমরে জড়ানো আছে বটে, কিন্তু হাঁটু পর্যন্তও নামে নি। শনের মতন সাদা চুল, গালে মাসখানেকের সাদা দাড়ি গজিয়েছে, যেন অনেক দুঃখকষ্ট, শূন্যতা ও ধূসরতার ভিতর দিয়ে; কথা বলতে-বলতে বুড়োর মুখ যখন একটু প্রসন্ন হয়ে ওঠে, মনে হয়, হাঁড়ির থেকে এক থাবা দই নিয়ে মানুষটির গালে খুব বেমালুমভাবে ঘসে দিয়েছে কে যেন। চোখ দুটো থেঁতলানো বেত-ফলের মত-জায়গায় জায়গায় মরিচের রং রয়েছে।

—'ঝাঁ ঝাঁ রোদের ভিতর দুপুরবেলা আমাকে আকড়াপুরের মাঠে নিয়ে গেল।'

—'কেন?'

—'বললে সেখানে একটা তেঁতুল গাছে রোজ দুপুরবেলা নাকি আমার লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়।'

—'কী রকম?'

—'মশাই, আমারও মাথা খারাপ, নইলে ঐ ছাগলের কথা কেউ শোনে? আমার স্ত্রী মরল বীরেন মুখুজ্যেদের পোড়ো বৈঠকখানার কড়িকাঠে ঝুলে, আকড়াপুরের তেঁতুলগাছের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

—'তাই তো?'

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তবে শুনেছি পেত্নিরা নাকি এক-একটা গাছ আশ্রয় করে থাকে।' চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে—'তাই শুনেছেন বুঝি?'

—'আজ্ঞে ধর্মে এই কথাই বলে।'

—'আপনার স্ত্রী পেত্নিও হয়েছেন মনে হয় আপনার?'

—'ভর সন্ধ্যার ডাকিনী সে; ইহলোকের মানবীর সঙ্গে তার কি আজ আর কোনো সম্বন্ধ আছে?'

—'নেই?'

—'নারায়ণ-নারায়ণ।'

বুড়োকে বড় কাতর দেখলাম।

—'কেনই-বা গলায় দড়ি দিলেন?',

—'এ সব আর জিজ্ঞেস করবেন না।'

—'একটা চুরুট খাবেন?'

—'বিড়ি নেই আপনার কাছে?'

—'না।'

—'চুরুটগুলো বড্ড কড়া।'

—'দেখুন একটা খেয়ে।'

—'দিন।'

একটা টিনের বাক্সের মধ্যে চুরুটটা রেখে দিয়ে বুড়ো—'তা সেই আকড়াপুরের তেঁতুল গাছে সে থাকবে কেন? তাকে তো সেখানে দেখলাম না।'

নীরব ছিলাম।

—'মিছিমিছি হেঁটে-হেঁটে আমার কোমার টনটন করছে।'

—'শুয়ে পড়ুন।'

—'আমরা কিন্তু জেতে দ্বাদশ তিলি।'

—'বেশ।'

—'আপনাকে দেখে তো বামুন-বামুন মনে হয়।'

—'আজ্ঞে সে যে নই।'

—'আপনি কায়েত?'

—'বদ্যি।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বুড়ো—'সেও তো আপনার ঘুরেফিরে বামুনই হল।'

—'আমি নিজেকে চাঁড়াল মনে করি।'

—'পৈতে নিয়েছেন?'

—'আজ্ঞে না।'

—'এক বিছানায় শোব; পায়ে-পায়ে ঠেকে যায় যদি?'

—'তবে না হয় নাই-বা শুলেন?'

—'রাধাবল্লভের নাম করে শুয়েই পড়া যাক। আপনিও শোবেন তো?'

—'একটু দেরি আছে আমার।'

টিনের বাক্স থেকে একটা বিড়ি বের করে শুয়ে পড়ে।

—'বুড়ের গলায় যে কণ্ঠীর মালা আছে আমার সেদিকে বুঝি নজর পড়ে নি আপনার? দেশলাই আছে?'

—'আছে।'

—'দিন-বিড়িটা জ্বালিয়ে নেই।'

দিলাম।

—'নামাবলীর বদলে চাদর পিঠে ফেলে বেরিয়েছি আজ—ফোটা-তিলকও কাটি নি—কিন্তু বৈষ্ণব হয়েছি আমি আজ প্রায় ৪০ বছর হল।' লোকটা বলে, 'আমাকে দীক্ষিত করেছিলেন কানুপ্রিয় গোঁসাই বাবাজী—নাম শুনে থাকবেন—এ অঞ্চলে কালা গোঁসাই বললে গরু-বাঘ সকলেই চেনে। সে কি আজকের কথা গোঁসাই?'

বিড়িটা জ্বালিয়ে নিয়ে বুড়ো—'আমার নাম হর্ষনাথ, খুব ভালো খোল বাজাতে পারি। শুনেছেন?'

—'আজ্ঞে না।'

ঈষৎ আহত হয়ে ওঠে-'বাস্তবিকই শোনেন নি? দল করেছিলাম, কত কীর্তনের দলে আমি গেয়ে বেড়াই।'

—'সেটাও পারেন?'

পারি একটু-আধটু, খোলমৃদঙ্গেই আমার হাত বেশি। বাজাতে-বাজাতে দাঁড়িয়ে উঠে নাচতে থাকি; কার মাথা কার লেজ মাড়িয়ে যাই খেয়ালও থাকে না। খেয়ালের দরকারই-বা কি? দ্বাদশ তিলির সন্তান বলে বৃন্দাবনে আমি পরিত্যাজ্য নই তো?'

—'না, তা নন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

—'আপনিও যেমন বৃন্দাবনের অধিকারী আমিও তেমন।' আমি সমর্থন করে মাথা নাড়লাম।

—'কার পা কার গায়ে লেগে যায়, কানুর পাই তো রাধার গায়ে লাগছে—এই তো অবশেষে বিচার; কী বলেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বিড়ি টেনে—'তা হলে আমাদের দু'জনের মধ্যে বৃন্দাবনের সম্বন্ধ হল!'

—'হলে তো ভালই।'

—'রাতেরবেলা আমার পা যদি আপনার গায়ে লেগে যায় বৃন্দাবনের ধুলো এল মনে করে নেবেন তা দাদা?

—'খুব।'

বিড়ি ফুকতে-ফুকতে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে—'আপনার ঘুম পায় নি?'

—'না!'

—'বসেই থাকবেন?'

—'কিছুক্ষণ তো—'

—'আমি তা হলে ঘুমিয়ে পড়ি?'

—'নির্বিঘ্নে।'

—'কোথায় নামব জানেন?'

—'কোথায়?'

—'সেই ট্রেন ধরব গিয়ে; আপনি?'

—'আমাকেও ট্রেন ধরতে হবে।'

—'কলকাতায় যাবেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আমিও কলকাতায়ই চলেছি।'

—'বেশ তো; কোন আখড়ায়?'

—'এই স্টিমারটা ধরবে কখন খুলনায়?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ ভোরবেলায়।'

—'তা হলে সারারাত স্টিমারেই ঘুমোতে পারা যাবে?'

—'আজ্ঞে।'

—'একটা অনুরোধ আপনার কাছে।'

—'বলুন।'

—'আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি—'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তা হলে আমাকে আর জাগাতে যাবেন না।'

—'একটা হাত পাখা থাকলে আমি বরং আপনাকে হাওয়া করেই রাত কাটিয়ে দিতাম, গোঁসাই!'

—'ঘুমোলে পরে গা-গতরও ঠেলবেন না। রাতটা একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই। কাল তো আবার কলকাতায় গিয়ে আখড়ার গোলমাল সব!'

অতি সহজেই ঘুমিয়ে পড়ল।

রেলিঙের কাছে ট্রাঙ্কটার উপর বসলাম গিয়ে; কিন্তু দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই জুতো পায়ে পায়চারি করতে লাগলাম।

স্টিমার বেশ ঝাঁকুনি খেয়ে চলছে—কতকগুলো ফায়ার ব্রিগেডের বালতি একটা লোহার আড়ার গায়ে ঝুলছে, স্টিমারে কোনোদিন আগুন লাগে কি? পর পর অনেকগুলো লাইফবোয় সাজানো; স্টিমার যদি কোনোদিন ডুবতে বসে কিংবা অন্য কোনো রকম দুর্ঘটনা হয় তা হলে প্যাসেঞ্জাররা এই সব বোয়ের আশ্রয়ে জলের ভিতর থেকে সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠতে পারে। ছোটবেলা থেকেই এই সব স্টিমারে আমার যাতায়ত; দেখে এসেছি এই সব।

স্টিমার অবিশ্যি ডোবেও নি কখনো, আগুনও লাগে নি কোনোদিন।

—'সুকুমার নাকি?'

পিছন ফিরে তাকালাম।

—তাই তো। আমি এই আধঘন্টা ধরে তোমাকে নেকনজরে রেখে হয়রান হয়ে গেলুম; কী তমলবটা তোমার বলো তো দেখি।'

একটু এগিয়ে গিয়ে—'চোখে তেমন দেখি না, চিনতে পেরেছ?'

—'বনবিহারী নাকি?'

—'বায়ুচড়ার মতন ঘুরছ যে? বসো।'

—'আমার ধাতই ঐ রকম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'রাত এখন কম হয়।'

—'কটা বলো তো?'

—'গোটা বার বাজে।'

—'তুমিও তো জেগে রয়েছে দেখছি।'

—'কলকাতায় যাচ্ছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমিও।'

একটা বিড়ি জ্বালিয়ে—'আমি অবিশ্যি খুলনায় একদিন হল্ট করব, একটা হোটেলে খেয়ে নেব, কিছু কাজ আছে, তুমি?'

—'আমি সিধেই যাব।'

—'এক্সপ্রেসে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বিছানা করতে পার নি বুঝি? যা ভিড়! এত মোছলমান যাচ্ছে কোথায়? হজ্জে? অনেক বোষ্টমও তো দেখছি-একটা মহোচ্ছব টহচ্ছব আছে না কি হে নবদ্বীপে?'

—'জানি না।'

—'কোথায় যে কী থাকে? তোমার বিছানা কোথায়?'

—'উ-ই দিকে।'

—'পাততে পেরেছ তা হলে।'

—'হ্যাঁ।'

—'চাকির মতন ঘুরছ তা হলে-কী মনে করে?'

—'এমনিই।'

—'ঘুম আসছে না বুঝি?'

—'নাঃ!'

—'যা গুমোট মেঘ করে আছে, অথচ বৃষ্টি হয় না'—বিড়িতে একটা টান দিয়ে—'মনটা আমার থমকে আছে কয়েকদিন ধরে।'

—'কেন?'

—'ফটিকের বৌটা মারা গেছে।'

—'কোন ফটিক?'

—'আমার মাসতুতো ভাই ফটিক; বার্ন কোম্পানিতে কাজ করত।'

—'ও-হোঃ! চারুলতা মারা গেছে।'

—'হ্যাঁ।'

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম; অনেকক্ষণ পর্যন্ত বনহিবারীর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলাম।

—'ভাবছ কী?'

মাথা নেড়ে-'না।'

—'হ্যাঁ, মারা গেল—বড্ড আক্ষেপের কথা; বিয়ের পর তিনটি বছর টিকল মোটে।'

অনেকক্ষণ চুপ থেকে—'আজ সকালেও আমার মনে পড়ছিল, ভাবছিলাম, চৌদ্দ বছর বাড়ির পাশাপাশি রইল, এক সঙ্গে ফড়িং ধরলাম, ফুল কুড়োলাম, সেই চারুলতা আজ কোথায়?'

—'কেন ফটিকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—জানো না!'

—'জানতাম—হবার কথা ছিল আমার সঙ্গেই। অনেকদিন দেখি নি মেয়েটিকে।'

—'মৃত্যুর সময় সে অবিশ্যি তোমার নাম করে নি; তোমাকে দেখতেও চায় নি—'

অনেকক্ষণ চুপ থেকে—'উঠি বনবিহারী।'

—'আরে বসো-না।'

—'আমার একটা ট্রাঙ্ক পড়ে আছে।'

—'থাক না। কার এত মাথা ব্যথা পড়েছে তোমার ফুটো ট্রাঙ্কের জন্যে?'

—'আমাকে আর এখানে বসিয়ে তোমার কী লাভ?'

—'কেন, বিছানায় গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদবে? তোমার কাছে সিকির পয়সা আছে?'

—'না।'

—'এই সিকিটা ভাঙাতে হবে তো; তুমি একটু ভেন্ডারের কাছে গিয়ে ভাঙিয়ে আনবে?'

—'এত রাত্রে সিকি ভাঙিয়ে কী হবে?'

—'কাল খুব ভোরে খুচরো পয়সা চাই যে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তা খুলনায় ভাঙিয়ে নিলেই হবে।'

—'আচ্ছা, দেখ তো, এই সিকিটা তেলা কি না?'

নেড়েচেড়ে—'চলে যাবে।'

—'ভাল করে আলোয় নিয়ে দেখো।'

—'দেখছিলাম।'

—'মহারানীর মুণ্ডুটা মুছে গিয়েছে না?'

সিকিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বনবিহারীকে ফিরিয়ে দিলাম।

—'কী, কোনো উচ্চবাচ্য করছ না যে।'

—'কী জানি, নাও চলতে পারে।'

—'এমনই বেল্লিখ আমি! সাত হাজারবার নাকে দড়ি বেঁধে এই সিকি ঘুরিয়ে আনব আমি।'

বনবিহারী উত্তেজিত হয়ে বিড়ি টানতে লাগল।

উঠেছিলাম; আমার কাঁধে হাত রেখে বসিয়ে দিয়ে—'একটা সিকির দুঃখে মানুষের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে কী লাভ হবে আমার?'

—'কার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করলে তুমি?'

—'তুমি উঠে যাচ্ছ যে!'

—'এমনিই।'

—'গিয়ে ঘুমোবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'ঘুম পেয়েছে?'

—'বড্ড।'

—'কে প্রায় মাস তিনেক হল মরে গেছে; আজ রাতে তার জন্য কেঁদে নিজেকে হাস্যাস্পদ বানাতে যাও কেন সুকমার? আঃ বিড়িটা নিভে গেল'—পকেট থেকে দেশলাই বের করে বনবিহারী।

—'ফটিকের চেয়ে তো নিকটতম কেউ নেই চারুর?'

দেশলাইয়ের কাঠ ঘসতে-ঘসতে—'কী করেই-বা থাকে? যদি থাকে সে মেয়ে নয়, ডাইনি।'

বিড়িটা জ্বালিয়ে নিয়ে বনবিহারী—'সেই ফটিক আজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কথাবার্তা চলছে-আসছে বোশেখেই হয়তো দ্বিতীয় পক্ষে ঘরে আনবে, ছোকরার তো পয়সাকড়ির অভাব নেই, অফিসারের চাকরি তো আছেই-লটারিতেও হাজার দশেক পেয়েছে না কি, গরু মরে নি, বউ মরেছে, ছেলেটির খুব পয়।'

তাকিয়ে দেখলাম খালাশিরা এসে ঝপাঝপ ক্যানভাসের পর্দা টেনে দিচ্ছে—বাইরে বৃষ্টি পড়ছে বোধ করি।

—'একটা বিড়ি নাও।'

—'না, ঘুমোবার মুখে আর খাব না।'

—'শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাও সুকুমার? আমরা কি জানি না? আমরা জানি সব। চারু আর তোমার চৌদ্দ বছর বৃন্দাবন লীলার এক তিলও আমাদের কাছে গোপন নেই। ছেলে প্রসব করতে গিয়ে মারা গেল মেয়েটি; তিন বছরের মধ্যে দুটি সন্তান প্রসব-সব ধাতে প্রসব হয় না। প্রথম ছেলেটি বিয়োবার পরে একেবারে কাঁকলাসের মত হয়ে গেল বৌ-ডাক্তার বললে দশ-বার বছরের মধ্যে এর যেন আর ছেলেপিলে না হয়। কিন্তু ফটকে একটা জানোয়ার!'

বুড়োকে আস্তে-আস্তে খানিকটা একটু সরিয়ে দিয়ে একটু জায়গা করে নিয়ে শুলাম—আজ রাতে হর্ষনাথ আমার সঙ্গী না হলেই ভাল ছিল।

চোখ বুজে চুপ করে পড়ে ছিলাম।

মিনিট পনের পরে মনে হল কে যেন আমার বুকে হাত রেখেছে।

—'কে?'

—'ঘুমোচ্ছ বুঝি?'

—'বনবিহারী?'

—'তোমাকে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম, উপরে-নিচে, তা এই তোমার শয্যা?' উঠে বসলাম।

—'এই বুড়োটি কে?'

—'ইনি বোধহয় তীর্থে যাবেন কোথাও।'

—'তোমাদের দেশের বাড়ি থেকেই এসেছে বুঝি?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'

—'তোমার ঠাকুর্দার তহশিলেই [?] কাজ করতেন?'

—'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তা তোমাদের জায়গাজমি তো সাফ হয়ে গেছে—এখন ইনি চলছেন কোথায়?'

—'বৈষ্ণব মানুষ—কোনো একটা আখড়ায় গিয়ে থাকবেন।'

—'একে তোমার শয্যার সঙ্গী করলে যে?'

বাইরে অন্ধকার বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

—'কই চোখ তো তোমার লাল হয় নি, চারুর জন্যে কাঁদনি তা হলে?'

—'রাত তো অনেক হয়েছে?'

—'তা একটা আন্দাজ বাজে।'

—'আর এই তিনটে ঘণ্টা যে যার জায়গায় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেই, কী বলো? চারটের সময় তো স্টিমার খুলনায় ধরবে।'

—'উঠে বসো।'

—'কেন?'

—'কথা আছে।'

—'কাল সকালে হবে।'

শোবার চেষ্টা করেছিলাম; বনবিহারী আমার ডান হাত ধরে হিঁড়হিড় করে খানিকটা টেনে নিয়ে—

—'বানী হয়েছে নাকি তোমার?'

—'কেন?'

—'পোঁদে হাঁটছ যে, পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে পার না?' 'দাঁড়িয়ে—'কী মতলব তোমার?'

—'চলো আমার বিছানায়।'

—'কেন?'

—'চাঁট হবে।'

—'তুমিও তো কলকাতা চলেছ-একদিন না হয় তোমার বাসায় গিয়ে আড্ডা দেব। এখন আমার কথা বলতে একটুও ইচ্ছে করছে না বনবিহারী।'

—'গানের ডিবেয় ভরে গিন্নি এমন পশ্চিমি পান সেজে দিয়েছেন-কিমাম আছে, জর্দাও আছে, একা-একাই বসে খাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম সুকুমারকে দেওয়া হল না তো?'

—'তোমার সহৃদয়তার কথা মনে থাকবে বনবিহারী; কিন্তু পান আমি ছোটবেলায় খেতাম, তারপর আর খাই নি।'

—'তামাকও খাও না?'

—'না।'

—'বেশ ভাল স্টেট এক্সপ্রেস আছে—'

—'তুমিই খাও।'

—'তা হলে তুমি এসে দেখ আমি কী করে খাই'— আমার হাত ধরে আবার টান দিল বনবিহারী।

—'বাইরে বেশ শনশন করে বৃষ্টি পড়ছে-ফ্ল্যাটও প্রায় অন্ধকার; এর ভিতর একা চোখ বুজে পড়ে থাকতে পারো না তুমি?'

—'আমার বৌ তো কুলত্যাগ করে নি, ছেলেও মরে নি, ঘুম কিন্তু পালিয়ে যায় নি; অন্ধকারের মধ্যে তোমার বিচিত্রতা নিয়ে খেলা করে আমার কী ভাল?'

ডিবের থেকে দুটো পান বের করে মুখে দিয়ে একটা সিগারেট জ্বালাল বনবিহারী।

বললে—'চলো ফার্স্ট ক্লাসের সেলুনে যাওয়া যাক।'

—'কেন?'

—'কিছু হুইস্কি খাওয়া যাক।'

—'এত রাতে? আজ রাতে আমাকে মদ খেতে বল?'

—'কোনোদিনই কি মদ খাও নি তুমি?'

—'খেয়েছি একটু-আধটু।'

—'তবে আর কী? সে-হতভাগিনীর কথা মিছিমিছি কেন ভাবতে যাও? যে কি না দু'বছরের মধ্যে দুটি সন্তান বিয়োতে পারে, সে তোমার সব স্মৃতিই মনের থেকে মুছে ফেলেছিল-কী, এগচ্ছ না যে?'

—'আমি ফিরেই যাই।'

—'আবার আঘাত লাগল?'

সিগারেটটা দাঁতের ফাঁক থেকে নামিয়ে বনবিহারী—'যে মানুষ মরে গেছে তার কাজকর্ম মতিগতি ঘেঁটে আমাদের কী লাভ? শ্মশানের ছাইয়ের ভিতরে সে বেচারি আজ কাদার চেয়েও অধম যে!'

—'এত রাত করে আমি আর কিছু খাব না।'

—'কী করবে তা হলে?'

—'দেখি, হর্ষনাথ গোঁসাই জেগে বসে আছেন হয় তো!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তার সঙ্গে গিয়ে মুখ খিস্তি করবে?'

—'না, গোঁসাইয়ের পাশে একটু ঘুমব।'

—'তার চেয়ে আমার টেবিলের পাশেই এসে বসো-না কেন-মদ বরং নাই-বা খেলে।'

—'এত রাতে সেলুনে গিয়ে বসবে—বাতি জ্বালবে তো?'

—'নাই-বা জ্বালল-একবার দেশলাই জ্বেলে দেখে নেব লেবেল ঠিক আছে কিনা।'

—'ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের ঘুম ভেঙে গেলে বিপত্তি আছে।'

—'ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার নেই।'

—'বাটলারকে ঘুম থেকে জাগাবে?'

—'সে-হারামজাদা পাগড়ি মাথায় দিয়ে ফিরছে, দেখছ না?' সেলুনে গিয়ে বসলাম।

হুইস্কি-সোডার হুকুম দিয়ে বনবিহারী—'চারুর এ দুটি ছেলে তার ইচ্ছার সন্তান নয়। কিন্তু ফটিককে চেনো তো-সুন্দর সবুজ মাঠকেও সে মূলোর খেত না বানিয় ছাড়বে না, এমন!'

সোডা এল।

হুইস্কি এল।

সোডার বোতল ভাঙা হল।

হুইস্কির কর্ক খুলতে-খুলতে বনবিহারী-'জীবনটা এই রকমই উচ্ছৃঙ্খল, কথা ভাবতে গেলে ক্ষোভই জাগে শুধু মনে। মিছিমিছি আত্মপীড়ন করে কী লাভ! প্রতিটি মুহূর্তকেই সুন্দরভাবে এড়িয়ে চলতে শেখো সুকুমার। বারাঙ্গনার মত জীবনটাকে নিয়ে খেলা করবার কৌশল ছকে নাও; সাধু সেজে যদি পৃথিবীর পথে বেড়াতে চাও তা হলে দেখবে হৃদয় ইন্দুরের গর্তের মত শুকনো শিকড়ের [...] নিচে হাঁ করে পড়ে আছে।'

পরদিন ভোর সাড়ে চারটের সময় ওয়েটিং রুমের বারান্দায় স্টিল ট্রাঙ্কের উপর বসে ছিলাম। সমস্ত আকাশ জুড়ে মেঘ আর অন্ধকার।

কাঁধের উপর একটা হাত পড়ল তাকিয়ে দেখলাম বনবিহারী।

—'এখানে বসে আছো বুঝি?'

সিগারেট জ্বালায়ে নিয়ে—'আমার জিনিসপত্তর হোটেলে রেখে এসেছি সব।'

—'আজ তুমি কলকাতায় যাবে না বুঝি?'

—'আমি যাব কাল।'

—'পথেঘাটে আবার একদিন দেখা হয়ে যাবে।'

—'তিনদিন থাকবে মোটে; দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

ওয়েটিং রুমের বারান্দায় নানা জাতের মোটঘাটের ভিতর একটা মোটা বেডিং বেছে নিয়ে বসল বনবিহারী, বললে—'কলকাতায় যাবার আগে তোমাকে একটা কথা বলে দিতে চাই—পকেটের থেকে একটা নোটবুক বের করে নেড়েচেড়ে পকেটের ভেতরেই রেখে দিল আবার।'

বললে—'কাঁকুলিয়া রোড চেন তো?

—'চিনি।'

—'বালিগঞ্জের ট্রেনে চেপেই যেও—তাই তো সুবিধে।'

—'কার কাছে যেতে হবে?'

একটা বাড়ির নম্বর দিয়ে বললে—'চারু আছে সেখানে। তোমার কথা বলছিল একদিন আমাকে। গিয়ে দেখা করো।'

বনবিহারীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

—'কাল রাতে তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ; কিন্তু আজকের পরিতৃপ্তি তোমার কতখানি অটুট, ভেবে দেখ। এক রাতের বেদনার বিনিময়ে এ-রকম চরিতার্থতা কেউ কোনোদিন পায় না, যযাতিও পায় নি, পুরুরবাও না, এ-আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যাচ্ছ, কলকাতা তোমার কাছে অলকা হয়ে উঠবে।'

সিগারেট ফেলে দিয়ে—'কিন্তু মরলেই ছিল ভাল, কী বলো?'

কিছু বললাম না।

—'অস্থিচর্মসার যা পেত্নি হয়ে দাঁড়িয়েছে চারু!'

কেস থেকে আর-একটা সিগারেট বের করে বনবিহারী—'ফটিকের লাঙলে তো মরচে পড়ে গেল; কিন্তু বেচারা যেদিকে তাকায় সে দিকেই বিছুটিবিড়াল আঁচড়ার জঙ্গল।'

সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বনবিহারী—'পুরুষ মানুষের শরীর, বেশি দিন এ সব...সইবে না সুকুমার, দেবে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে শকচুন্নির গর্তে ঠেলে! তারপর চৌদ্দ বছরের পর মনে এলে আবার সেই প্রথম থেকে পুজোপাঠ শুরু।'

বনবিহারী সিগারেট টানতে-টানতে চলে গেল।

কাল রাতে খুব বেধড়ক মদ খেয়েছিল।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম—কাঁকুলিয়া রোডে চারু বেঁচে আছে কি?

একদিন গিয়ে দেখে আসতে হবে তো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্তে-আস্তে চুরুটটা বের করে জ্বালিয়ে নিলাম।

'নাঃ, চারুর সঙ্গে আর দেখা করে কী হবে!'

ট্রেন অনেকক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কিন্তু ছাড়বে সেই সাড়ে ছ-টার সময়। অন্ধকারের মধ্যে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে লাগলাম।

স্টিমারে ফিরে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে এলাম।

ট্রাঙ্কবিছানা নিয়ে ট্রেনের থার্ড ক্লাসের ছোট কম্পার্টমেন্টে এসে বসলাম তারপর।

কম্পার্টমেন্ট এবার নতুন ধরনের—এক কামরা থেকে দরজা দিয়ে আরো বড়-বড় দুটো কামরায় যেতে পারা যায় কিন্তু গাড়ির কাঠকাঠামো সমস্তই ঢের বিবর্ণ ও পুরানো; এ গাড়িগুলো জোগাড় হল কোথেকে?

বৃষ্টি নেই—কিন্তু থমথমে বাদলের মেঘ আকাশ ভরে; সাড়ে পাঁচটা হয়তো বেজেছে-কিন্তু চারদিক অন্ধকার; রাত তিনটের সময় এক-একদিন যখন চাঁদ অস্ত যায়, তেমনি। আশাপ্রত্যাশাহীন শূন্য স্তিমিত মাঠঘাট ছড়িয়ে আছে সব চারদিকে—আবার ঘুমনো যাক তা হলে?

কিন্তু ঘুম আর আসতে চায় না।

বাদলভেজা অন্ধকার মাঠের আকর্ষণ বড় গভীর হয়ে ঘুমের ভিতর এসে লাগে। একটা শেয়াল ধীরে-ধীরে মাঠের উপর দিয়ে চলে গেল; মাঠে দুই জোনাকি উড়ছে।

সব ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারের কুজ্‌ঝটিকামাখা বনপ্রান্তরের দিকে আজীবন চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ঐ বাবলার জঙ্গলে একটা প্রেতের জীবন নিয়ে থাকলে হত না কি? আমার আর-কোনো কাজ থাকত না। [বাংলার] আষাঢ়-শ্রাবণের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম শুধু-আর ঐ নিঃসাড় কান্তারের মুখের দিকে? ঘুমাতাম, স্বপ্ন দেখতাম—গ্রামের তিন শ বছরের পুরানো সাদা পথের দিকে তাকিয়ে থাকতাম; অশ্বত্থের মুখ থেকে পাঁচ শ বছরের আগের কথা শুনতাম—নিস্তব্ধ নক্ষত্রের রাতে পথে-পথে ঠুঁটো ডালের দিকে তাকিয়ে না-জানি কোন অজ্ঞাত কারণে ভয় ও বেদনা অনুভব করতাম আমি; এ বেদনা ও ভয়ের রাজ্যের থেকে বিমুক্ত হতে চাইতাম না তবু; তুলট কাগজের মত ধূসর মেঘে ঢাকা মলিন জ্যোৎস্না রাতে ঝিঁঝির ডাকে-ডাকে ঘুম থেকে জেগে উঠে হয়তো কোনো প্রেতিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত—সে আজও তার চার শ বছর আগের পুরানো পৃথিবীতে বাস করে অতৃপ্ত কিশোরীর মুখ নিয়ে—আমাকেও বাস করতে বলে কিন্তু...তারপর বিবর্ণ জ্যোৎস্নার ভিতর ফড়িঙের পাখার মত মিলিয়ে যায়। তাকিয়ে দেখি আর-এক বুদ্‌বুদ্ ভেসে উঠেছে; কানাড়া ছাঁদের খোঁপা, অপরূপ মুখ, এক বিষণ্ন যুবতী আজকের পৃথিবীর কলরবের কোনো কথাই সে জানে না, সে যে-কাহিনী শোনায় আমাকে তাতে পৃথিবীর সমস্ত ভবিষ্যৎকে প্রীতিহীন বর্ণহীন নীরস ধুলোর মত উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে-স্বপ্ন, প্রেম ও শিহরণের জন্য তিন শ বছর আগের ইছামতীর পারে একটা নিশুতি বটগাছের কাছে গিয়ে গেরুয়া রঙের ইট দিয়ে বাসা বাঁধতে ইচ্ছা করে।

নাকের সামনেই ল্যাট্রিনের অসহ্য দুর্গন্ধ আজকের পৃথিবীর বাস্তবতার দিকে ফিরিয়ে আনে আমাকে।

উঠে গিয়ে আর-একটা দূরের বেঞ্চে বসি আমি; ধীরে-ধীরে চুরুট জ্বালাই; জানালার ভিতর দিয়ে মাঠের দিকে তাকাই আবার; অনেক দূরে মাঠের এক কিনারায় জঙ্গলের কাছাকাছি অন্ধকারের মধ্যে সবুজ মাঠের ভিতর অনেকখানি জল জমেছে—তারই উপর নক্ষত্রের আলো বোধ করি। তাকাতে-তাকাতে হৃদয় আমার বেদনায় টনটন করে ওঠে। আস্তে-আস্তে বেঞ্চের উপর মাথা পেতে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করি।

ঘুমিয়েই ছিলাম; অনেকক্ষণ হয়তো; কিন্তু গলার আওয়াজে জেগে গেলাম। তাকিয়ে দেখলাম বনবিহারী। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলছে—'তুমি এখানে?'

—'কী খবর?'

—'তোমাকেই খুঁজছিলাম।'

—'এসো।'

—'সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে চট করে চলে এসে কখন?'

—'অনেকক্ষণ।'

—'ট্রেন ছাড়তে তো এখনো ঢের দেরি।'

—'কটা বেজেছে?'

—'সোয়া ছটা।'

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম মাঠঘাট অনেকটা ফর্শা হয়েছে।

বনবিহারী—'স্টিমারেই শুয়ে থাকলে পারতে।'

—'স্টিমারটা এখনো ঘাটে আছে বুঝি?'

—'সারা দিনই থাকবে।'

—'তুমি হোটেলেই আছো বুঝি?'

—'হ্যাঁ এগারটার সময় কাছারিতে যাব।'

—'কিসের মোকদ্দমা?'

—'কী একটা খুনি মোকদ্দমায় সাক্ষী মেনেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তোমাকে? তবে কাল কী করে কলকাতায় যাবে?'

—'মোকদ্দমার তারিখের এখনো দেরি আছে।'

—'কে খুন হল?'

—'একজন মেয়েমানুষ।'

—'কোথায়?'

—'এইখানেই।'

—'কী হয়েছিল?'

—'হয়েছিল অনেক কিছুই। কিন্তু ভালবাসা হয় নি। আজ সে যে মরে গেছে বিচ্ছেদও বোধ করে না কেউ। আমার মনটা মাঝে-মাঝে ধোঁয়ায় ভরে যায়। বেচারি ধুনকী!'

—'ধনুকী! ছোটলোকের মেয়ে বুঝি?'

—'না, ডাক নাম তার ধুনকী-ভালো নাম স্বর্ণলতা, ভদ্রলোকের মেয়ে।' দু'জনেই চুপ করে ছিলাম।

বনবিহারী—'আচ্ছা, তুমি যখন কলকাতার কলেজে পড়তে, আমিও পড়তাম-তোমাকে প্রত্যেকবারই দেখতাম পুজোর ছুটি গ্রীষ্মের ছুটির সময় দুটি মেয়েকে এসকর্ট করে নিয়ে যেতে-কারা তারা?'

—'কবেকার কথা বলছ?'

—'তখন তুমি বি. এ. পড়ছ।'

—'ও, সে তোমার প্রায় ষোল-সতের বছর আগের কথা।'

—'ভুলে গেছ?'

—'না ভুলি নি; মনে আছে আমার; এই লাইনেই তাদের নিয়ে অনেকবার যেতে-আসতে হয়েছে।'

—'তাদের মধ্যে একটি মেয়ের কথা তুমি আমাকে প্রায়ই বলতে।'

—'হ্যাঁ, সেই বিনি; বিনতা নাম তার; তাকে ভালবেসে জীবনের গোড়ার দিকে বড় দুঃখ পেয়েছি আমি; আজ মনে হয় প্রেমের চেয়েও বিমূঢ় করে বেদনাই [!] মানুষকে বেশি কষ্ট দেয়। কিন্তু তবুও—'

জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে চুপ করে রইলাম।

—'কী বলতে চাচ্ছিলে?'

—'অনেক সময়ই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তার কথা মনে পড়ে যায় আমার; কাউকে কিছু বলি না-চুপচাপ একান্তে হৃদয়ের ভিতর বিনতার মুখখানা-এ আমার জীবনের খুব একটা গোপন সঞ্চয়ের জিনিস। আজও হয় তো আমাকে দেখলে উপেক্ষা করে উড়িয়ে দেবে সে; কিন্তু তবুও দেখতে ইচ্ছা করে তাকে—অনেকদিন দেখি নি।'

—'সে এখন কোথায়?'

—'শুনেছিলাম বি. এ. পাস করে বিলেত গিয়েছিল।'

—'তারপর?'

—'ফিরে এসে কী করছে ঠিক জানি না।'

—'চাকরি নিয়েছে?'

—'সেই রকমই শুনেছিলাম।'

—'বিয়ে করেছে?'

—'তা-ও বলতে পারি না।'

—'আর-কী করে?'

—'সে পনের-কুড়ি বছর আগে, বিপিনবাবু বলে একজন এ্যাসিসট্যান্ট সার্জেন ছিলেন, তারই দুটি মেয়ে-কলকাতার কলেজে পড়ত।'

—'বিপিনবাবু এখন কোথায়?'

—'জানি না।'

—'বিনতার সঙ্গে আলাপ ছিল তোমার?'

—'একবার একটা চিঠি লিখেছিলাম—তাকে—'

—'তারপর?'

—'উত্তর দেয় নি।'

—'মৌখিক আলাপ ছিল না?'

—'না, কথাবার্তা হয়নি কোনোদিন।'

একটু চুপ থেকে—'এ কথা আজ আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন বনবিহারী?'

—'এই ওয়েটিং রুমটার দিকে তাকিয়ে মনে হল।'

—'ওঃ, তুমিও তো সেই সময় মাঝে-মাঝে যাওয়া আসা করতে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হ্যাঁ, একদনি দেখলাম মেয়ে দুটি ওয়েটিং রুমে বসে আছে, পার্শি ধাঁচে শাড়ি পরা, টেবিলে একটা ক্রিসেনথিমাম না কিসের তোড়া' তুমি এদের দৃষ্টি এড়িয়ে বারান্দায় পায়চারি করছ-এরাও বোধ করি তোমার সান্নিধ্য চাচ্ছে না। চাচ্ছিল?'

—'কী জানি!'

—'আজও তা রহস্য?'

—'চায় নি হয়তো।'

—'স্টিমার সেদিন কুয়াশার জন্য দেরি করে ফেলেছিল এখানে আসতে।'

—'হ্যাঁ—'

—'সাড়ে ছটার ট্রেন ধরতে পারে নি—'

—'না—'

—'কাজেই সেই বেলা বারটার ট্রেন ছাড়া তোমাদের আর-উপায় ছিল না। এতক্ষণ পর্যন্ত এই মেয়েরা চুপচাপ বসে থাকবে? গিয়ে একটু আলাপ করলে হয় না এদের সঙ্গে-চা খাবে তো? নাইবে? ভাত খাবে? এই সব ভাবছিলে বোধ করি? এই সব ভাবনার মধ্যে তোমার ভালবাসা তো ছিলই কিন্তু উদ্বেগ দুশ্চিন্তাও কম ছিল না-আমি দেখছিলাম তাকিয়ে-তাকিয়ে সব, 'বনবিহারী একটা বিড়ি জ্বালিয়ে বললে—'দেখলাম তুমি ঘরে ঢুকতেই তারা মুখ ফেরাল।'

—'হয় তো লজ্জায়—'

—'উপেক্ষায় নয় তো?'

—'তা হবে!'

—'ষোল বছরের মধ্যেও এই ব্যাপার মীমাংসা হল না?'

—'যতি বছর কেটে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে পড়ছে তারা ততই, তাদের হৃদয়ে লজ্জা ক্ষমা মমতা প্রেমের মত জিনিস দিয়ে সাজিয়ে দেখতে ভাল লাগে।

—'ঠিক কথাই—যাদের পায়ের শব্দ বহুদিন শোনা যায় নি, হয়তো কোনো-দিন শোনা যাবে না, আর তাদের স্মৃতিকে বিরসতা দিয়ে ঘিরে রেখে লাভ কী!'

—'বিনতার মত নারীর স্মৃতি কোনোদিন বিরস ছিল না বনবিহারী!'

—'আজ, অবিশ্যি খুব বিচিত্র?'

—'না; তবে সাদাসিধেও নয়।'

একটু চুপ থেকে—'ওয়েটিং রুমের জানালার কাছে কয়েকটা চন্দ্রমল্লিকার গাছ দেখছিলাম সেদিন!-মনে নেই বনবিহারী?'

—'মেয়ে দুটির চন্দ্রমুখই দেখছিলাম সেদিন আমি।'

—'আর ঐ পাম গাছ দুটো সেদিনও ছিল-একটা কাঠমল্লিকার গাছ ফুলে ছিল ভরে; সমস্তটা সকাল বাতাসে সেই গন্ধ। এখনো যখন কাঠমল্লিকার গন্ধ পাই এই ওয়েটিং রুমটার কথা মনে পড়ে আবার, মেয়ে দুটি নাইল না, মাথায় জল পর্যন্ত দিল না; কিছু খেলও না। সারাদিন শুকনো মাথায় শুষ্ক মুখে অনাহারে কাটিয়ে দিল; যেমন পুত্রশোকের প্রথম একলা-ভাবটা কেটে গেছে বলেই বিষণ্নতা এ রকম নিঝুম-নিরবচ্ছিন্ন।'

পকেট থেকে বের করে চুরুটটা জ্বাললাম।

—'হোটেল থেকে যে-ভাত এনেছিলে তাদের জন্যে তাও কুকুরকে দিতে হল, অবশেষে কাকে-কুকুরে ছিটিয়ে গেল।'

—'এত সব কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোমার?'

—'এই তো সেদিন চোখের সামনে হল সব; তুমি ছিলে আমি ছিলাম, ওঁরা ছিলেন-মস্ত বড় একটা মুরগির জোড়া ছিল ওয়েটিং রুমের সেগুন কাঠের গোল টেবিলটার ওপর—এই পামগাছ দুটো ছিল। এই ইঁটের দেয়ালে ও গাছ-পালার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ পুরনো কথাটা মনে পড়ে গেল-আচ্ছা উঠি।'

—'আচ্ছা।'

—'বিনতার মুখ, আমারও বেশ লেগেছিল বই-কি।'

—'তা লাগবারই তো কথা।'

—'নয়, ঘুরেফিরে যতবার এ-লাইনে গিয়েছি এ-মেয়েটির কথা মনে পড়েছে আমার, তিন-চার বছর ধরে এক সঙ্গে যাওয়া আসা করতে-করতে এমনই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে যখন বিধাতা তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেলেন মনে হল এ লাইনটার এই স্টেশনগুলোতে রক্তমাংসের মানুষ একটিও নেই-না আছে কাঁকড়ার বুকের শাঁসটুকু, কড়্‌কড়ে খোলা পড়ে আছে সব চারদিকে।'

—'ওঃ মনে-মনে নারীকে তা হলে এত পুজো করতে পার তুমি?'

—'পুজো আমি নারীকেই করি-ঈশ্বরকে করি না।'

বনবিহারী বললে—'তারপর দশ-বার বছর ধরে এই লাইনে যাওয়া-আসা করতে হয়েছে তো আমায়-মনে হয়েছে চশমা হারিয়ে ক্ষমাহীন অস্পষ্ট পৃথিবীর সঙ্গে দিনরাত ঠোকাঠুকি খেয়ে চলেছি।'

ধীরে-ধীরে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে চুরুটটা নিভে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'মেয়েটি কোথায় এখন?'
—'পশ্চিমে।'
—'আলমোড়ায়?'
—'শুনেছিলাম মিরাটে।'
—'বেশ, ভাল থাকলেই ভাল। এ পারে আর দেখা হবে না?'
—'না।'
—'তারপর ওপার-সে তো অন্ধকার।'
—'কী রকম?'
—'অন্ধকার হোক আলো হোক-হিমানী কল্যাণী অনিতা বিনতাকে দেখবার প্রবৃত্তি সেখানে আর হবে না। এই আজও ওয়েটিং রুমটা দেখেই মনে পড়ল জীবনে যা হয়েছে, যা হয় নি, তারই এক টুকরো দিয়ে পাঁচ মিনিট তোমার কাছে বসে অঙ্কের তবলচাটির মত হৃদয়টাকে নিয়ে একটু খেলা করে নিলাম। মন্দ হল কি?'
—'না মন্দ কী আর?'

হ্যাঁ এ মেয়েটির কথা আমারও অনেক সময় মনে হয়;—এই বিনতার কথা। আমি যখন কলকাতার কলেজে পড়ছিলাম-একবার ছুটিতে দেশে যাবার সময়-এই মেয়ে দুটিকেও তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবার ভার আমার উপর পড়েছিল। এদের দেখি নি তখনও আমি। নারীর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কৌতূহল ছিল না জীবনে। দুটি অপরিচিত জীবনে কথা ভাবছিলাম শুধু যাদের যত্ন করে নিয়ে যেতে হবে। মন বিরসতা ও অনিচ্ছায় উঠেছিল ভরে।

কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে মেয়েদুটিকে দেখলাম-বিনতাকে দেখলাম—সমস্ত অতীত জীবনকে এক মুহূর্তেই সাদা সাধারণ অন্ধ অভ্যাসের আবর্জনা বলে মনে হল। জীবনের এক প্রান্তের থেকে আর-এক প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম যেন। বিষয়ী বিচক্ষণ মানুষ হৃদয়কে সংসারের শত্রু মনে করে যে-তামাশার জীবন কাটিয়ে যায় তার নাগাল না পেলে অগত্যা অবশেষে সিদ্ধপুরুষ না হয়ে বেঁচে থাকার পথ নেই যে পৃথিবীতে সেই দিন থেকে প্রথম বুঝতে শুরু করলাম।

পথে পড়বার জন্য একখানা বই সঙ্গে করে নিয়েছিলাম—ওয়াল্টার পেটার-এর 'রিনাসান্স'—কিন্তু প্রিফেসের দু'লাইন পড়তে পেরেছিলাম শুধু।

অথচ ট্রেনে আট ঘণ্টা কাটাতে হয়েছিল—দুটো লাইন আমাকে আট ঘণ্টা আটকে রেখেছিল। কলকাতায় মাঝে-মাঝে এক-আধটা চুরুট খেতাম তখন। এক বাক্স সিগারেট নিয়েছিলাম সঙ্গে ট্রেনে ব্যবহার করবার জন্য; সমস্ত পথে একটা সিগারেটও বের করে খেতে পারলাম না তবু। ভবিষ্যৎ জীবনে চুরুট আমাকে সৌন্দর্য ও প্রীতির কল্পনা নিয়ে খেলা করতে সাহায্য করেছে অনেক, কিন্তু সেই উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের সময় সেদিনকার সেই ট্রেনে জীবনটাকে সহসা কেমন ঐকান্তিক বলে মনে হয়েছিল, জীবনের বিচিত্র রূপান্তরের পথে সিগারেটের প্যাকেটটা বাধার মতন খচখচ করছিল কেন যেন; বারাসত জংশনে একজন ভিখিরিকে প্যাকেটটা দিয়ে আমি নিস্তার পেয়েছিলাম। বহুদিন আগের এই সব কথা আজ মনে পড়ে আমার। ভাবতে গিয়ে কেমন আঘাত লাগে; জীবন যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পথে চলেছিল একদিন, একটি কুমারীর সংস্পর্শে এসে আবার তা সাধারণ বাজারের পথে ফিরে এল, বিশ্বাসকে অশ্রদ্ধা করতে শিখল, দেহকে জীবনের পরম সুন্দর পুরস্কার বলে মনে করে নিল, হৃদয়কে প্রত্যাশী ভিখারির মত সরিয়ে রাখবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সেই ষোল-সতের বছর আগে কলকাতার থেকে ট্রেন ঠিক এই স্টেশনে এসেই দাঁড়িয়েছিল। তখন সন্ধ্যা। স্টেশনের পাশেই কয়েকটা কেরোসিনের মশাল জলছিল-আজকাল আর জ্বলে না তা। এখন গ্যাসের আলো এসে পড়েছে; কিন্তু সেই অন্ধকারের ভিতর কেরোসিনের মশালের ম্লান রহস্যমাখা আলোর জগতে অপরূপ প্রেতিনীর মত সেই সতের বছর আগে সেই যে দাঁড়িয়েছিল বিনতা কয়েক মুহূর্তের জন্য, সে-ছবি ইহজীবনেও কোনো দিন ভুলতে পারব না আমি; পশ্চিমের আকাশে সূর্য একেবারে নিভে যায় নি তখন। অজস্র রক্তাক্ত...মতন থরে থরে মেঘ; বিষণ্ণ দাঁড়কাকগুলো ঘরে ফিরছে; প্রান্তরের থেকে খানিকটা মুখর চঞ্চল বাতাস পথহারা বিভাগামিনীর [?] মত করুণ প্রতিধ্বনি তুলে দিগন্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে, বন-জঙ্গল ঘেরা অপূর্ব দিগন্ত; দূরে অশ্বত্থ...অশরীরী দেবতার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে; তেলাকুচোর বনে-বনে জোনাকি; নদীর জলের স্নিগ্ধ ঘ্রাণ; কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ; ইঞ্জিনের সান্টিং লাইনসম্যানের চিৎকার, সবুজ নিশান; লণ্ঠন হাতে-হাতে এলোমেলো জোনাকির মত কুলিদের ছোটাছুটি; একটা বাঁকা নম্র মেঠো পথ বেয়ে বিনতাদের নিয়ে স্টিমার ঘাটের দিকে যাওয়া-তাদের ফিমেল ইন্টার ক্লাসে উঠিয়ে দেওয়া, থার্ড ক্লাস ডেকে গিয়ে নিজের বিছানা পাতা।

একদিন কলকাতার থেকে এ-স্টেশনে সন্ধ্যার সময় একা-একা এসে পৌঁছেছি-সেই কেরোসিনের মশালগুলো ধূ ধূ করে জ্বলে গেছে; কিন্তু এদের পাশে সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন নারী মূর্তিটিকে খুঁজে পাইনি আমি আর। মশালগুলোর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হৃদয় ধুম্রকালিমায় নিহত সূর্যের মত নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে; ঘন অন্ধকার-মাখা অলৌকিক অরণ্যের ভিতর যার হাতির দাঁতের মত হলুদ ম্লান মুখখানাকে সবচেয়ে মানাত, যাকে এই বাংলার মাঠের কাঁচপোকা অন্ধকার ও জোনাকির ভিতর থেকে কোন এক যুগ জন্মে কুড়িয়ে নিয়ে বিধাতা আবার এক নদীমাঠের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশেই ফিরিয়ে দিয়েছিল, এই অশ্বত্থ বট জাম বকুলে, কাল মুকুলে, মাখা বাংলার বুকের থেকে যুগে-যুগে যে জন্ম নেবে, যার গায়ে রূপশালি ধান ও চালতা ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে থাকবে চিরকাল-সে আজ কোথায় চলে গেল?

কেরোসিনের মশালগুলোর দিনও শেষ হয়ে গেছে-গ্যাসের বাতি বসেছে-কিন্তু সে আর ফেরে নি, কোনোদিনও ফিরবে না আর সে। দশ-বার বছর আগে একদিন কলকাতার ট্রেনের থেকে নেমে কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে এই স্টেশনের পাশ দিয়ে সেই বাঁকা নরম মাঠের পথ বেয়ে স্টিমার ঘাটের দিকে চলতে-চলতে সন্ধ্যার বিষণ্ন দাঁড়কাকের কলরবের ভিতর যা হয়ে গেছে—যা হতে পারল না সেই সব কথা ভেবে-ভেবে অবসাদে গভীর ঘুম পেয়ে গেছে আমার-মরণের ঘুম কামনা করেছি আমি।

স্টিমারে থার্ড ক্লাস ফ্ল্যাটে বিছানা পেতে কতদিন সেকেন্ড ক্লাসের সেই ছোট্ট মেয়েদের কেবিনটা ঘুরে এসেছি যেখানে বিনতারা কতদিন আগে রাত কাটিয়ে গিয়েছে। একটা ছোটখাটো ইলেকট্রিক পাখা কেবিনের কাঠের দেয়ালে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। পাশেই মাকড়সার জাল। নদীর দিকে জালিকাটা একটা জানালা; খোলাও যায় না, বন্ধও করা যায় না। বৃষ্টির ছাঁটাও গায়ে লাগে না, বাতাসও বড় একটা আসে না—ভারি অনতিপরিসর বেঞ্চি। এরই উপর বিছানা পাতত তারা। একটা মস্ত বড় আরশি, একটা তাক। সমস্ত ঘরটা গুমোট, পরিসর বড় কম, পুরনো কাঠ ও বিবর্ণ রঙের গন্ধ।

এইখানে তারা থাকত। কিন্তু সে-স্টিমার নেই এখন আর; তার জায়গায় বড় নতুন স্টিমার এসেছে; সেকেন্ড ক্লাস এখন ঢের বেশি প্রশস্ত ও সুন্দর-অনেকগুলো ক্যাবিন রয়েছে। কিন্তু সে-সব দেখতে যাই না আজ আমি আর। ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাসের কথা মনেও হয় না। থার্ড ক্লাসের ফ্ল্যাটে বিছানা পেতে শুয়ে বিড়ি টানি-বাজারের কথা ভাবি। মাঝে-মাঝে ডেকে পায়চারি করতে-করতে অনেক দিন আগের কথা মনে হয় আমার, যখন এ-স্টিমারটা ছিল না,ম আর-একটা স্টিমার ছিল, সেকেন্ড ক্লাসে একটা ছোট্ট ফিমেল ক্যাবিন ছিল, কলকাতার থেকে যেতে-আসতে দুটি বোন মাঝে-মাঝে সেখানে উঠত কিন্তু সে-স্টিমারটি নেই এখন আর, সে-ক্যাবিনটিও নেই; জীবনের আলাপহীন ধ্বনিহীন অন্ধকার স্রোতের ভিতর তারাও হারিয়ে গিয়েছে আজ।

একটি কথা মনে হয় আরো। বিনতাকে দেখবার আগে কলকাতার এক পানওয়ালিকে আস্তে-আস্তে চিনছিলাম। মেয়েমানুষ বলতে স্বজ্ঞানে তার কথাই মনে হত আমার। পানওয়ালিটি খুব অল্পদিন হয় আমাদের মেসের পাশে এসে বসেছিল। বয়স বেশি নয়; মেয়েটি দেখতে মন্দ ছিল না একরকম। যেদিন সে আমার দিকে তাকিয়ে প্রীতির সঙ্গে কথা বলত, মনে হত, ভালবাসার পরিচয় পেয়ে গেছি। কাজে সে নিজেকে বিকিয়ে দিত না সেইজন্যই মিষ্টি লাগত তাকে। তাকে নিয়ে হৃদয়ে একটু ঈর্ষাও জেগেছিল আমার; আমাকে উপেক্ষা করে অন্য কারো প্রতি যখন তার ঢের বেশি মমতা ও প্রসন্নতা গড়িয়ে পড়ছে দেখতাম; ব্যথা বোধ করতাম। তখন আমার বয়স ছিল আঠার। তারপর বিনতা এসে হৃদয়ের দৃষ্টিশক্তিকে কোথা থেকে কোথায় যে তুলে নিয়ে গেল।

বিনতার পরিচয় লাভ করে কলকাতায় ফিরলাম যখন—এই পানওয়ালির মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন দুঃখ করত আমার; তাকাতে-তাকাতে দেখতাম মুখের থেকে তার কদর্য রেখা বেরিয়ে আসছে সব; মনে হত বিধাতা যেন হিংসা করে টেনে-টেনে বের করে দেখাতেন সব; কোথাও একটু গোপনতার চেষ্টা নেই—ক্ষমা নেই কিছু নেই—মেয়েটি অনেক কথা বলত। এক কামনালুব্ধা দুঃখিনীর পরিচয় পেতাম—জীবনে যে কোনো দিন প্রেম পাবে না; চাবেও না হয়ত। ধীরে-ধীরে জীবন থেকে বিদায় দিয়েছিলাম তাকে।

হ্যাঁ, এই স্টেশনটার কথা ঘুরে ফিরে মনে পড়ে; আমার কলকাতার থেকে দেশে যাতায়াতের পথে মধ্যবর্তী এই স্টেশনটা।

তখনকার দিনে স্টিমারে একটা কি দুটো পিস্টন ছিল—বেশি জোরে চলতে পারত না-কুয়াশায় প্রায়ই দেরিতে এসে পৌঁছাত। ভোরের ট্রেন ধরতে পারতাম না আমার—বারটার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে হত। এই ওয়েটিং রুমে বিনতারা কতদিন পার্শি শাড়ি ও সৌন্দর্যের তীব্রতা নিয়ে দেয়ালের মাকড়সার জাল ঘেঁষে শেষ রাতের স্তিমিত অন্ধকারের মধ্যে বসে রয়েছে। বাইরে কুয়াশা ও কনকনে ঠাণ্ডা; অন্ধকারের ভিতর শেয়ালের কান্না; অনেক দূরে সন্ধ্যামণির লাল পাপড়ির মত চিতার আগুন-না জানি কোন অভাগিনীর; হলদে ছড়ি ছড়িয়ে খেজুর গাছগুলো অন্ধকারের মধ্যে বিস্মৃত যুগের গাঁয়ের মোড়লের মতন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে সব; জিজ্ঞেস করলেই অনেক রূপকথা বলে দিতে পারে।

এই সবের ভিতর আমি পায়চারি করতাম, আজও করি। কিন্তু যে-আশা একদিন বুকে বেঁধেছিলাম—সেই মেয়েটিকে সঙ্গিনী করে ভবিষ্যতে একদিন এই সব কুয়াশা অন্ধকার মাঠের মধ্যে বাংলার প্রাণকে আমরা খুঁজে বের করব এই স্বপ্ন দেখতাম-সে মেয়েটি আজ আর নেই। আমার এই স্বপ্নের কথাও সে কোনো দিন শুনবে না। জীর্ণ বাদামি তালের পাতা, ঠুঁটো তালগাছ, ফণিমনসার জঙ্গল ও বঁইচির ঝোপ নিয়ে বাংলার গ্রামে মাঠে মাঠে অন্ধকার পড়ে রয়েছে আজও—

জীবনের বিগত ষোল বছর ধরে শেষরাতের নিশুতিতে যখনই এই স্টেশনে এসে পৌঁছেছি, ট্রেনে উঠে জানালার ভিতর দিয়ে মাঠ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে-অনেকক্ষণ তাকাতে হয়েছে-আরো অনেকক্ষণ-তারপর অনেকক্ষণ আবার। অবাক হয়ে ভেবেছি এতক্ষণ তাকিয়ে-তাকিয়ে যা দেখছি, তা কি অতীত জন্মে হয়ে গেছে কোনোদিন? না, ভবিষ্যতে হবে? যাই হোক, তাকিয়ে দেখবার বেদনার হাত থেকে আজও রক্ষা পেলাম না আমি; আজও অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষেও দেশের প্রান্তর ও মাঠ আমাকে ছাড়ল না—না ছাড়ল বিনতা আমাকে। এই সব দিগন্ত নিশুতির বুকের ভিতরেই সে যেন শরীরী হয়ে ওঠে; মাঠের ষঠি ফুলের মতন ফিকে গোলাপি মুখখানা তার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয়ে তেমনি নরম নিভৃত গন্ধ, সোঁদা ঘাস মাড়িয়ে চলেছে সে, সাপের গর্ত এড়িয়ে, সাদা শাড়ি চোর কাঁটায় ভরে যাচ্ছে, আঁচলের বাতাসে কাশ দুলছে, একটা বিষণ্ণ হলুদ কলাপাতার পিছনে গ্রামের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আহা, এই রকম যদি হত!

কোনোদিন হয়েছিল কি, কোনো বিগত জীবনে?

কে জানে? কিন্তু আজ স্মৃতি ও বেদনা নিয়ে কাল কাটিয়ে যেতে হবে। যদি পারা যায় এ স্টেশনে আসব না আর—তুমি চলে গেছো—এই শুনকো বাদামি তালের পাতা, জীর্ণ বাঁশের জঙ্গলের মড়মড় শব্দ, চিলের পাখনার মত গেরুয়া শূন্য ধানের ক্ষেত; এই সবের ভিতর আমার চোখ ও হৃদয়কে নামিয়ে দিয়ে মিছেমিছি ব্যথা ও অশ্রুর খেলা খেলে কী লাভ!

কিন্তু তবুও বারবার ফিরে ফিরে আসতে হয়েছে; ব্যথিত প্রেতও এমনি করে কবরের কাছে বার বার ফিরে আসে।

অনেক দিন পর্যন্ত ওয়েটিং রুমের পাশে সেই কাঠমল্লিকার গাছটা ছিল; প্রত্যেকবারই কয়েকটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যেতাম আমি; কলকাতায় যেতে যেতে ফুলগুলো শুকিয়ে যেত; কিন্তু তবুও দু-তিন দিন পরেও সেই শুকনো ফুলের অতর্কিত গন্ধে হঠাৎ এক-একবার সেই ষোল বছরের আগের পৃথিবীর আবছায়া রূপ ভেসে আসত-গ্রামের এক প্রান্তে শুষ্কপ্রায় পদ্মদিঘির জলে মৃত মায়ের মুখের মত।

ফার্স্ট-সেকেন্ড ক্লাসের ওয়েটিং রুম বছর ভরে শূন্য হয়েই পড়ে থাকত; মাঝে মাঝে ভিতরে ঢুকে পড়তাম আমি; জানালার কাছে একটা বেতের ইজিচেয়ার নিয়ে বসতাম, ধীরে-ধীরে কাঠফুলের গন্ধে চোখ বুজে থাকতে হত। কোনোদিন গাছের ডালে এক-একটা ভোর রাতের দয়েল এসে বসত। কখনো গোছো মাছি চিড়বিড় করত। কখনো শীত, কখনো কুয়াশা; শূন্য শাখার থেকে অনেক দিন পর্যন্ত একটা চড়াই না কিসের বাসা ঝুলছিল—

একদিন দেখলাম সেই কাঠমল্লিকা গাছটা নাই আর।

একদিন কুয়াশার জন্য স্টিমার দেরি করে এসেছিল আবার; ট্রেন মিস করলাম। স্টেশনের বারান্দায় একটা বেঞ্চির উপার বসে-বসে মনে হচ্ছিল কয়েক বছর আগে ঠিক এই রকম শীতের শেষরাতে ঐ পাশের ওয়েটিং রুমটায় তারাও বসেছিল-আজ সে ঘরটা শূন্য-[একেবারেই শূন্য]—দু-চারটা টিকটিকি ও কয়েকটা মাড়কসা আছে শুধু। সেদিনও এই স্টেশন মাস্টারকে এই রকম ব্যস্ত দেখেছি—এই রকম টেলিফোন করছেন; স্টেশনের টেলিগ্রাফ অফিসের কেরানি এই রকমই টকটক করছিল—স্টেশনের সেই মোটা ডাক্তার—আজও সে বেঁচে আছে-তার বিটে যাবার জন্য এমনি কলরব করে আয়োজন করছিল—এক-একটা ডাউন ট্রেন, গুদাম গাড়ি আসছিল, যাচ্ছিল, নীল জামা গায়ে কুলির দল হৈ রৈ করছিল এমনি আজকেরই মতন;—নিত্যদিনকার কাজকর্মের প্রতিটি অসাড় কলকজা ঘুরানোর জন্য আজও এদের কী গভীর উৎসাহ-কী অকৃত্রিম ব্যবস্থা; এরা কি জানে না, এখানে কতদিন যে প্রিয় জিনিস এসেছিল নিজের জীবনের নবীন গৌরব ও চরিতার্থতার কাজে যখন সে দূর দিকে আজীবনের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায় তখন আমাদের খুব দীন দরিদ্র হয়ে পড়তে হয়। আমাদের নিজেদের জীর্ণ নবীনতাকে উৎসাহহীন প্রয়াসহীন হয়ে অন্ধকারের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে, থাকতে হয়। রাত্রিশেষের আবহাওয়ার ভিতর বেঞ্চির এক কিনারে বসে এই সব ভাবছিলাম আমি। কিন্তু এরা বিচিত্র জগতের লোক; যেন আর-এক উপগ্রহে বাস করে; কেরোসিন তেলের মশাল, বিড়ির গন্ধ, পার্শেলের হিসাব, টিকিট বিক্রি, খেঁকিয়ে চিৎকার ও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দৌড়োদৌড়ি এই এদের মব বিনতার সান্নিধ্যে বসে এই সবও একদিন ভাল লেগেছিল আমার—' কিন্তু আর ভাল লাগবে না।

কোনোদিনও ভাল লাগবে না আর।

ঐশ্বর্যময়ী রাত্রির মত এদের কথাবার্তা কাজকর্ম সমস্ত কিছুকে ঘিরে গোপন চারিণী নারীর বর্তমানতা ছিল সেদিন—নারীর জন্য পুরুষের হৃদয়ে ভালবাসা ছিল; গুদামের একটা সামান্য কেরোসিন কাঠের বাক্সও জোনাকির খেতের সহজ রূপ পেছিল তাই সেই বিভবময়ী রাত্রির স্রোতের ভিতরে এসে এই স্টেশন মাস্টার, টেলিগ্রাফ কেরানি, সিগন্যালম্যান, স্টেশনের ডাক্তার নক্ষত্রের মত অভিনবত্ব যদি পেয়ে থাকে তো পেয়ে থাকবে সেদিন; কিন্তু আজ এরা গুদামের বাক্সমাত্র—সংসারের বারোয়ারিতলার ভিখিরির দল সব।

ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে গেল। বেঞ্চির উপর থেকে উঠে বারান্দায় কতক্ষণ পায়চারি করলাম। চারিদিকে শূন্য খাবারের ঠোঙা, চীনে বাদামের খোলা, আখের ছিবড়ে, বিড়ির টুকরো; কতকগুলো কুকুর ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে—খাচ্ছে, শুঁকছে, লালসার উত্তেজনায় পরস্পরকে বিপর্যস্ত করে ছাড়ছে; এই তাদের ঋতুর সময়। লোম ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে, শরীরের নানারকম নিভৃত জায়গার মর্মান্তিক ঘা রোদের ভিতর দগদগ করছে, ল্যাংল্যাং শরীর, ভিখিরির মত মুখ, কিন্তু পুষ্ট মোহন্তের মত কামনা। কয়েকটা মাদি কুকুরের ঘাড় মুখ বুক পা নলীর মতন কিন্তু পেট জয়ঢাকের মত ফুলে উঠেছে—প্লীহাতে নয়, নেমন্তন্নের পাত চেটেও নয়, সন্তান—ধারণের আমায়িকতা ও সহিষ্ণুতায়। এদের দীনতা ও দাক্ষিণ্য, কাতরতা ও উর্বরতা এমনি রোহহর্ষক একটা লেড়ির [একটা নেড়ির] খুলির মত মাথায় একবার ঢাউসের মতন পেটে একবার একজন পয়েন্টসম্যানের লাথি এসে পড়ল; কেঁউ কেঁউ করতে-করতে জানোয়ারটা একটা মালগাড়ির নিচে গিয়ে ঢুকল—সেখানেই হয়তো রক্তারক্তি হয়ে গেছে, হয়তো আধা সিদ্ধ ছানা কয়টি বেরিয়েও এসেছে পেটের থেকে।

একটা চুরুট জ্বালালাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেশনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম লাল কাঁকরের পথটা রৌদ্রে ভরে গেছে, স্টেশনের রাস্তা ইঁটের দেয়ালের উপরেও ভোরের বেলার খটখটে রোদ অপর্যাপ্ত হয়ে এসে পড়েছে, অনেক দিন আগে যখন বিনতাদের নিয়ে ট্রেন মিস্‌ করে ছিলাম সেদিনও ঠিক অন্ধকার কুয়াশার পর এই রকম গভীর রোদ উঠেছিল। স্টেশনের নির্জন দেয়ালের গায়ে বিমর্ষ মাছিদের গুঞ্জনভরা নিঃসঙ্গ রোদের দিকে তাকাতে-তাকাতে হৃদয় আজ শুষ্ক শূন্য হয়ে ওঠে—মালগাড়ির নিচের কুকুরটার চেয়েও গাঢ় বেদনা বোধ করে যেন হৃদয়।

আর-এক দিনের কথা মনে পড়ে। বিনতাদের নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিলাম; বর্ষাকাল তখন। রাত্রির একটা সময় ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হল। বিছানা ছিল আমার থার্ড ক্লাসের ফ্ল্যাটে-একেবারে এক কিনারে-নদীর কাছাকাছি। ক্যান-ভ্যাস টেনে দিতে একটু দেরি হয়েছিল, আর ক্যানভ্যাস টেনে দিলেই বা কি-দারুণ বৃষ্টিতে সমস্ত বিছানাপত্র ভিজে গেল—কাপড়চোপড় পর্যন্ত। অবশেষে এক-জন ভদ্রলোকের একটা টিনের স্যুটকেসের উপর গিয়ে বসে রইলাম।

আমি যেখানে বসেছিলাম সেকেন্ড ক্লাস ক্যাবিন সেখানে থেকে ঢের দূরে—দেখতেও পাওয়া যায় না। অত রাতে মেয়ে দুটি ঘুমিয়ে পড়েছে এই-ই তো প্রত্যাশা করবার জিনিস। সেকেন্ড ক্লাস ক্যাবিনে ঝড়জলে কিছু এসে যায় না, বৃষ্টিতে ঘুম জমে ভাল। বসে-বসে ঝিমুচ্ছিলাম। এমন সময়ে কাঁধে একটা হাত পড়ল। তাকিয়ে দেখি স্টিমারের কেরানিবাবু। জিজ্ঞেস করলাম; 'কী ব্যাপার, টিকিট চেক করতে এসেছেন?'

—'আজ্ঞে না।'

—'তবে?'

ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক।

—'আমাকে দিয়ে আপনার দরকার? ভুল করছেন না তো?'

—'হ্যাঁ, আপনাকে দিয়েই—আপনার নাম সুকুমার মজুমদার, না?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ভাবলাম ট্রাফিকের আইনকানুন কিছু অগুলাম নাকি, অতিরিক্ত লাগেজ নিয়ে এসেছি নাকি, নাকি আফিং কোকেন চালান দিচ্ছি এই সন্দেহ এদের।

—'আপনি সেকেন্ড ক্লাস ক্যাবিনে যান!'

—'কেন?'

—'সেখানে আপনাকে যেতে বললেন।'

—'কে?'

—'সেকেন্ড ক্লাস ক্যাবিনের একটি মহিলা।'

—'ওদের বিছানাপত্র বৃষ্টিতে ভিজে গেছে না কি?'

—'না না।'

—'কিছু অসুখবিসুখ করেছে?'

—'না—আপনি এ-রকম ভিজে গেছেন বলে আপনাকে যেতে বলেছে।'

—'ওঃ সেই কথা, কিন্তু মেয়েদের ক্যাবিনে আমি কী করে যাব।'

—'মেয়েদের ক্যাবিনে নয়-মেল ক্যাবিনে চলুন।'

গিয়ে দেখলাম মেল ক্যাবিনের একটা বেঞ্চিতে দুধের মত সাদা ধবধবে একটা বিছানা পেতে ঠিক করছে বিনতা। আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি বালিশ দুটো সাজিয়ে একটা বিচিত্র মোলায়েম রাগ গুছিয়ে দিয়ে চট করে চলে গেল সে।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কী করে বুঝল আমার বিছানাপত্র ভিজে গেছে? কেরানিকেই-বা এত রাতে কোথায় খুঁজে পেল? নিচে গিয়েছিল? এ সুন্দর বিছানাটাও সে আমার জন্য ছেড়ে দিল, এ জন্য তার দিদি তাকে ক্ষমা করবে বলে বোধ হয় না। পাটাতনের উপরেই শতরঞ্জি পেতে আজ রাতে বোধ করি তার শয্যা?

কিন্তু তবুও নিবিড় চমৎকার ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। ঘুমিয়ে এত শান্তি ও আশ্বাস কোনোদিনও পাই নি আর জীবনে।

পর দিন ট্রেনে যখন গিয়ে উঠলাম, আমি থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টেই চড়ে-ছিলাম, কিন্তু মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কোত্থেকে কেরানিবাবু এসে হাজির হলেন, বললেন—'আপনার জন্যে কলকাতা অব্দি সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট করা হয়েছে তো।'

—'কে করলে?'

—'এই তো এইমাত্র সেই মহিলাটি আমাকে করতে বললেন।'

—'কে?' কে করতে বললেন?'

—'ঐ যে কাল রাতে যিনি আপনার বিছানা তৈরি করে দিয়েছিলেন।'

—'তার দিদিও কি জানে?'

—'নাঃ, তিনি ঘুমুচ্ছেন।'

—'আপনাকেই-বা মেয়েটি কোথায় এমন সময়ে অসময়ে খুঁজে পায় কেরানিবাবু?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা চুলকে স্টেশনের কেরানি বললেন—'আমি এমনিই একটু প্ল্যাটফর্মে এসে ঘুরছিলাম; বাস্তবিক পাঁচ মিনিট ওঁর সঙ্গে আলাপ হলে চিরজীবন বাঁধা হয়ে থাকতে হয়। যতক্ষণ না ট্রেন ছাড়বে, এখান থেকে আমি নড়তেও পারব না।'

শেয়ালদায় অবিশ্যি ভাড়াটা চুকিয়ে দেবার জন্য বিনতার কাছে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমার হাতের ব্যাগের দিকে নজর পড়তেই আচমকা আমার দিকে পিছ ফিরে সে একটা ট্রেন দেখে উঠে বসল, যেন ইহজীবনেও আমাকে চেনে না কোনো দিন।

একদিন বড়দিনের ছুটির পর কলকাতায় যাচ্ছি। ওরা দু'জনও যাচ্ছে। যেমন অন্ধকার, তেমনি কুয়াশা, তেমনি শীত। এই ওয়েটিং রুমে এদের পৌঁছে দিয়ে স্টেশনের বারান্দার একটা বেঞ্চিতে আমি বসেছিলাম। ভুল করে আমার গায়ের আলোয়ানটা আমার বিছানার সঙ্গে বেঁধে ফেলেছিলাম। বেডিংটা আমার পায়ের কাছেই ছিল, কিন্তু খুলে নিতে ইচ্ছে করছিল না আর।

ঝুপ করে আমার কাঁধের উপর একটা মস্ত বড় শাল পড়ল। ছুঁড়ে ফেলেই ওয়েটিং রুমের পর্দার আড়ালে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম না কে ফেলেছে, বিনতা না মমতা? মেয়েটির সাদা নগ্ন হাতের পাঁচটি আঙুল ও কব্জি চোখে পড়েছিল শুধু। কব্জির পাতলা সোনার চুড়ি দু'গাছি। এই চকোলেট রঙের শালটা অবিশ্যি মমতার গায়ে দেখেছি। আমার উপরে সহানুভূতি অবশেষে এই বড় মেয়েটিও করল?

শালটা গায়ে টেনে নিয়ে পরিতৃপ্তি পাচ্ছিলাম না তবু, অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে—পাঁচটি আঙুল ও কব্জি চোখে পড়েছে তা বাস্তবিক কার? এ জীবনে শীতের ব্যথাই সবচেয়ে বড় কথা নয়, তার চেয়েও ঢের বেশি ব্যথা ও অস্বস্তি আছে। এক-একবার ইচ্ছে হচ্ছিল ওয়েটিং রুমের ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করি এ দাক্ষিণ্য বাস্তবিক কার কল্পনায় এসেছিল? সেই অপরূপ দক্ষিণ হাতের কব্জিটুকুই কার? বিনতার নয় কি?

যদি না হয়, এ শাল যেন তারা ফিরিয়ে নেয়।

চুপচাপ বসে থাকতে পারা যায় না। চারিদিককার কনকনে হিমকে অবান্তর মনে হয়। এই শালটাকে নিয়ে কী করব বুঝে উঠতে পারি না।

শীতের বাতাসে অশ্বত্থের পাতা থরথর করে কাঁপছিল। বুনো ট্যাঁড়শের শাখায় একটা চড়াইয়ে সমস্ত শরীরের পালক ও রোম তুলোর বলের মতন খুলে-খুলে খসে আসছিল যেন, ছোট্ট জামগাছটার ডালে অনেকক্ষণ ধরে কয়েকটা শালিখের কুয়াশাচঞ্চরীর মত কলরব।

ওয়েটিং রুমের পর্দাটা উড়ে-উড়ে মাঝে-মাঝে ভিতরের নারীদুটির খবর বাইরের পৃথিবীর কাছে দিয়ে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলাম। একবার পর্দা উড়ে যাওয়াতে ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঘিয়ের রঙের একটা শাল গায়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে মমতা রয়েছে ঘুমিয়ে আর নিরাভরণা বিনতা শাড়ির খুট গলায় জড়িয়ে থুতনিতে হাত রেখে পুবের জানলার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে আছে।

এর পর শালটা গায়ে দেওয়া যায়। সমস্ত মন আত্মতৃপ্তিতে কেটে যায়। আরো এক দিন! একটা খুব সামান্য জিনিস মনে পড়ে।

সান্তাহার স্টেশনে গাড়ি থেমে ছিল। প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখলাম বিনতা তাদের গাড়ির জানলায় চুপচাপ বসে আছে। কিন্তু আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি সে একটা বই হাতে তুলে নিল। দেখলাম বইয়ের মলাট একটা ইংরেজি খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া। কিন্তু ধীরে-ধীরে সেই কাগজের মলাটটা খসিয়ে ফেলল সে। তারপর বইখানা এমনভাবে ঘুরিয়ে ধরল যে বইয়ের নামটা সহজেই আমার চোখে পড়ে যায়। দেখলাম বইখানা 'টেস': টমাস হার্ডির।

শিয়ালদা স্টেশনে ওরা ট্যাক্সি করল, আমি একটা রিক্সা করেছিলাম। ট্যাক্সিটা চলে গেল। রিক্সাঅলা আমার হাতে একখানা বই এনে দিল।-'আপকো ওয়াস্তে উ মোটর গাড়িকা মাইজি দিয়া।' দেখলাম বইখানা 'টেস'। 'টেস' আমি তখনও পড়ি নি। কিন্তু সেদিন কলকাতা গিয়েই সারাদিন সারা রাত জেগে বইখানা পড়লাম। ভোর চারটার সময় শেষ হল বইখানা।

ভাবছিলাম, তাই তো!

আর-একটা দিনের কথা। দেশের স্টেশন, বিনতারা তাদের গাড়িতে গিয়ে চাপল, আমি একটা ঠিকা গাড়ি ভাড়া করে নিলাম।

মালপত্র উঠিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য পথের পরিচিত কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

ফিরে এসে দেখি আমার গাড়িতে মস্ত বড় এক বেতের ঝুড়ি ভরা ফল আর সন্দেশ। অবাক হয়ে গাড়োয়ানকে বললাম—'এ কোত্থেকে এল রে ইয়াসিন?

বিনতাদের চলন্ত গাড়িটাকে দেখিয়ে দিল সে।

বললাম—'কোন মেয়েটি দিয়েছে?'

—'নীল কুর্তা গায়ে খপসুরাৎ মেয়েটি হুজুর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ও নীল ব্লাউজ গায়?' নীল শাটিনের ব্লাউজ ছিল তার গায়ে, তার দিদির গায়ে লাল শাটিনের। সন্দেশের ভিতর থেকে আতরের গন্ধ আসছে। আম সন্দেশ, কমলা লেবুর সন্দেশ....পাতায় মোড়া-সবুজ পাতায় মোড়া কত রকম কী?

পরদিন নদীর পাড়ে বিনতার মামার সঙ্গে দেখা, বললে—'আপনি এত হুঁশিয়ার লোক, কিন্তু মেয়েদেরই অপরাধ।'

—'কেন? কী হয়েছে?'

—'ফলের ঝুড়িটা পথে খোয়া গেল।'

—'কে বললে?'

—'বিনতা। ট্রেনেই খোয়া গেছে। স্টিমারে সেটাকে সে দেখেও নি নাকি?'

'টেস'—এর সঙ্গে জড়িত করেছি তাকে শেষে। আমার নিজেরই মনের কল্পনার বিহ্বলতায় এক-এক সময় মনে হত 'টেস'-এর মতন বোধ করি সে। হয়তো তাই-ই হবে। হয়ত নয়। কিন্তু প্রথম যখন বিনতাকে দেখেছিলাম দেহ ও মন সব দিক দিয়েই পদাবলির কিশোরীর কথা বারবার মনে পড়ত আমার। সজনি ও ধনি, কী কর বাটে...গোরচনা গোরী....

প্রথম সাক্ষাতের ছ মাস পরেই আমার সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল বিনতার। সম্বন্ধ এনেছিলেন তার মামা। জিনিসটা ও-পক্ষের থেকে কত দূর ঐকান্তিক, ঠিক বুঝতে পারি নি। আজও ও-ব্যাপারটাকেও বিনতার অন্য সব জিনিসের মতই রহস্যে ডেকে রাখতে ভাল লাগে।

এদিকে আমার কাকারা এ সম্বন্ধে আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন বিপিনবাবু গুরু মানে না, বিশেষ কোনো ধর্মও নেই নাকি তার।

এ সব কথা আমি কিন্তু শুনি নি তখন, সম্বন্ধের কথা পর্যন্ত না। অনেক পরে শুনেছিলাম। জীবন এই রকমই অন্ধকারের হোঁচট খেয়ে চলেছে।

তারপর অনেক দিন কেটে গেল। বিনতারা অনেক দিন হয় দার্জিলিং না জলপাইগুড়ি না কোথায় উঠে গেছে। সে খোঁজও কারো কাছ থেকে জানবার অবকাশ পাই নি। নিতেও যাই নি।

একদিন আমাদের দেশের রাজমোহন বোস আমার মেসে এসে বললেন—'বিনতার কথা মনে পড়ে তোমার?'

রাজমোহনের মুখের দিকে নিস্তব্ধভাবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

—'তার সঙ্গে কাল দেখা হল।'

—'কোথায়?'

—'বালিগঞ্জে পরেশের বাসায়।'

—'সেইখানেই উঠেছেন, বুঝি?'

—'হ্যাঁ! মেয়েটি বি. এ. পড়েছে। পরেশের মেয়েদের সঙ্গে খুব ভাব। বিনতা বলছিল কাল। তোমরা তো পরস্পরকে খুব চেনো?'

একটু হেসে—'কী করে?'

—'বাঃ বহুবার তো একসঙ্গে যাওয়া-আসা করলে। তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম তাকে।'

—'কে? আপনি? মিছেমিছি জিজ্ঞেস করতে গেলেন কেন দাদামশায়?'

—'দেখলাম তোমার কথা মনে আছে তার।'

—'স্টেশন মাস্টার ও কুলিদের কথাও মনে আছে। যাকে একবার দেখা যায় তাকে মনে করে রাখাই সবচেয়ে সহজ। যে ভুলে যায় তাকেই আমি বাহাদুরি দেই।'

কর্ণপাত না করে রাজমোহন—'কাল রবিবার আছে, পরেশের বাসায় আবার আসবে সে। আমি বলে ঠিক করে রেখেছি। তুমি অবিশ্যি—অবিশ্যি সেখানে যেও কাল। এই কথাই তোমাকে বলতে এলাম। তোমাদের দু'জনের মিলনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।'

রাজমোহন চলে গেলেন।

প্রাণের টানেই এসেছিলেন? শুভ ইচ্ছা নিয়ে? না, কারুর হয়ে দালালি করতে? ব্যাপারটা যে-দিক দিয়েই ভেবে দেখা যায়!

সন্ধ্যার দিকে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম বিনতা সারাদিন ছিল, সন্ধ্যার মুখোমুখি চলে গেছে।

রাজমোহন—'যাক, শেষ পর্যন্ত এসেছিলে। এ কথাটি অন্তত তাকে বলা যেতে পারবে। আমরা সকলেই ভেবেছিলাম এ ক্ষেত্রে আসতেই তোমার অনিচ্ছা।'

—'তার দিক থেকেও বিশেষ কিছু ইচ্ছার পরিচয় পেয়েছে? [পেয়েছেন?]'

—'কী জানি, তাকে বোঝা বড় কঠিন।'

যে-বোর্ডিঙে বিনতা থাকত, সেখানে থেকে কমলা বলে আমার একটি আত্মীয়াও কলেজে পড়ছিল। একদিন কমলাদের বোর্ডিঙে গেলাম। আমাকে দেখে সে খুব খুশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললে-'আপনি আসেনই না একেবারে, আমরা যেন আপনার কেউ নই, পর! কেন এ রকম ব্যবহার বলুন দেখি তো।'

অনেক দেঁতো হাসি ও পালিশ কথাবার্তার পর একটু ভরসা করে বললাম—'আমার নাম বোর্ডিঙের কোনো মেয়ের কাছ থেকে শুনেছ?'

চোখ কপালে তুলে কমলা—'তার মানে?'

একটু দম নিয়ে—'না, এমন কিছু নয়। অবাক হয়ে ভাবছিলাম আমার পরিচিত কেউ এখানে আছে কি না?'

—'তা কী করে থাকে?'

—'কেউই নেই বুঝি?'

—'আমি তো থাকি।'

—'তুমি ছাড়া আর কেউ!'

—'এই বোর্ডিঙে? আপনার মন যে মাঝে-মাঝে কোন জগতে চলে যায়?'

—'সত্যিই নেই কেউ? কী বলো কমলা?'

—'ঠাট্টা রাখুন-আমাকে একটু লজিক বুঝিয়ে দেবেন?'

—'লজিক? আর-এক দিন। এই বিষ্যুদবার।'

একটু চুপ থেকে বললাম 'আচ্ছা উঠি।'

—'আচ্ছা। আর-এক দিন আসবেন কিন্তু!'

উঠবার আগে সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম—'বিনতা বলে কোনো মেয়ে থাকে এই বোর্ডিঙে?'

-'বি, রায়?'

—'হ্যাঁ।'

—'হ্যাঁ আছেন। থার্ড ইয়ারের মেয়ে। অদ্ভুত রূপসী। কলেজে এ-রকম একটি মেয়েও নেই আর। টেবলোতে বিনতাদি মিশরের রানী সাজেন।'

—'মিশরের রাজা সাজে কে?'

—'সে আর-একটি মেয়ে, জাঁদরেল।'

অনেকখানি সাহস জুগিয়ে নিয়ে—'মিশরের রানীকে একটু ডেকে দিতে পারবে আমার কাছে?'

খানিকটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অবশেষে কমলা—'নিয়মের কড়াকড়ি বিশেষ নেই, কিন্তু অপনাকে চেনেন তো তিনি?'

—'চেনেন বলেই তো মনে হয়।'

মিনিট পাঁচেক পরে কমলা ফিরে এসে বলল—'এই আধ ঘণ্টা হল তিনি মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে বেরিয়ে গেছেন! আচ্ছা আপনার কথা বলব আমি তাকে।'

—'খবরদার, ভুল করেও কিছু বলতে যেও না কমলা।'

ঐকান্তিকভাবে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে—'বলো, বলবে না?'

একটু হেসে—'কেন?'

—'না। বলবার মত কিছু জিনিস নয়।'

পাঁচ-ছয় দিন পরে বিনতাকে একখানা চিঠি লিখলাম। বেশি কিছু নয়, দশ-বার লাইন সাদাসিধে কথা শুধু। বক্তব্য; বোর্ডিঙে দেখা করা সম্ভব হবে?

চিঠির কোনো উত্তর এলো না। পনের-কুড়ি দিন চলে গেল। হঠাৎ একদিন মনে হল, যাঃ চলে! কী করেই-বা উত্তর আসে? আমার মেসের ঠিকানা দিতেই ভুলে গেছি।

আর-একখানা চিঠি তৈরি করলাম। এবার ঠিকানা দেওয়া গেল। কিন্তু অনেক ভেবে চিঠিখানা শেষ পর্যন্ত পোস্ট করলাম না আর। ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। মাসখানেক পরে কমলার কাছে গেলাম আবার।

—'বিনতাদির বড্ড অসুখ।'

—'তাই নাকি?'

—'আজ সকালেও ভাল ছিল। কিন্তু দুপুরবেলা কয়েকবার বমি হল। তার-পর থেকেই জ্বর এখন তো বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে।'

—'কেউ দেখছে না?'

—'সব মেয়েরাই তো তার কোঠায়। বাতাস দিচ্ছে, মাথা ধুইয়ে দিচ্ছে, অডিকোলন দিয়ে জলপটি দিচ্ছে, আমিও তো এতক্ষণ ছিলাম।'

—'ডাক্তার?'

—'তিন-চার জন ডাক্তার এসে গেছে। ওর বাবাও এসেছিল।'

—'আমার অবিশ্যি এখন আর যাওয়া সম্ভব নয়?'

—'কোথায়?'

—'বিনতার কাছে?'

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমলা মুখে কাপড় দিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে হাসতে লাগল।

—'আচ্ছা, কাল আসব।'

—'এসো।'

—'তোমাকে লজিক পড়াতে নয় কিন্তু, একদিনও পড়ানো হল না কমলা, আমি একটু বিনতার খোঁজ নিতে আসব।'

—'বুঝেছি।'

পর দিন গিয়ে শুনলাম আজ সকালেই জ্বর ছেড়ে গেছে, বিনতা ভালই আছে। তবে নিচে নামতে নিষেধ।

খানিকক্ষণ নীরবে থেকে—'আমি উপরে যেতে পারি কি?'

—'সেখানে যে অনেক মেয়ের ভিড়।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে—'ভিড়ের ভিতর যথেষ্ট মজলিশ হয় তোমাদের, না?'

—'হ্যাঁ, সাতরাজ্যের গল্পগুজব চলে। পাঁচালি মেয়েদের মতো কেউ কুটতে পারে না।'

—'মানুষের কলঙ্কের কথা খুব বলে বেড়াও না তো?'

—'যারা কেলেঙ্কারি করে তাদের কথা বলব না কেন?'

—'আচ্ছা তোমাদের বোর্ডিঙের কোনো মেয়েকে কিছুদিন আগে কেউ চিঠি লিখেছিল?'

—'কী রকম?'

—'লিখে নিজের ঠিকানা দেয় নি, এমন একখানা চিঠির কথা শুনেছ?'

—'কই না তো?'

—'একেবারেই শোন নি?'

—'নাঃ। আমাদের নামে অনেক গুজবের সৃষ্টি হয়। সব মিথ্যা। সে-রকম যদি চিঠি আসত তা হলে বিভার কাছে থেকেই শুনতে পেতাম। বোর্ডিঙে একটা কুটো পড়লেও সে-খবর তার কাছ থেকে পাওয়া যায়।'

—'বিভা কে?'

—'বিনতাদির ফার্স্ট ফ্রেন্ড।'

—'কিন্তু তোমাকে সব কথা সে বলবে কেন?'

—'বা রে, আমি যে ফার্স্ট ফ্রেন্ড তার।'

বুঝলাম চিঠিখানা বিনতা চেপে গেছে। বিভার কাছেও বলে নি। এ নিয়ে সে মুহূর্তের মজলিশ করতে চায়নি। মনে-মনে ধন্যবাদ দিলাম নারীকে। ছ-সাত দিন পরে কমলার কাছে গিয়ে—'এতদিনে বিনতা ভাল হয়েছে নিশ্চয়।'

—'আপনি কালও যদি আসতেন।'

—'কেন?'

—'কাল সে তার বাবার সঙ্গে দার্জিলিং চলে গেল।'

—'কবে আসবে আবার?'

—'কী জানি! দু-তিন মাসের আগে আসবে বলে তো মনে হয় না।'

মাস ছয়েক পর রাজমোহন আবার একদিন আমার মেসে এসে হাজির হলেন। বললেন—'এখুনি চলো।'

—'কোথায়?'

—'পরেশবাবুর বাসায় এনেছি তাকে।'

—'কাকে রাজমোহনদা?'

—'বিনতাকে, আজ সারা দিনই থাকবে সে সেখানে। তোমাকেও থাকতে হবে সেখানে। তোমাদের দু'জনের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হোক এটা বিধাতার ইচ্ছা।'

—'কিন্তু আমি বিছানার থেকেও তো নামতে পারি না।'

—'কেন?'

—'কাল সিঁড়ির থেকে পড়ে পা ভেঙে গেছে।'

—'সে কি?'

—'এই দেখুন, নাড়তে গেলেও ব্যথা, মাটিতে পা রাখতে গেলেই টনটন করে ওঠে।'

—'একটা ট্যাক্সি করে চলো তা হলে।'

—'মেসের ছেলেদের কোলে তুলে চড়ে ট্যাক্সিতে না হয় গিয়ে বসলাম, কিন্তু পরেশবাবুর তেতলায় উঠব কী করে?'

—'বিপত্তি!'

একটু চুপ থেকে—'যাক, সেখানেও কোলে তুলে নেবার অভাব হবে না। চাকরবাকর ছেলেছোকরা ঢের আছে।'

—'আমি একজন সামান্য মানুষ, এ-রকম অসামান্যতার ভিতর দিয়ে পরেশ-বাবুর বাড়িতে গিয়ে উঠব গ্রহ নক্ষত্রের এই রকমই বিপর্যয় হয়েছে না কি?'

রাজমোহন নাছোড়বান্দার মত—'তা হলে যাওয়া সম্ভব হবে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

—'গোটা দুই হাড় ভেঙে গেছে নাকি, আজ সকালে সার্জেন এসেছিলেন, আজই আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে হয়তো! আজ আর—'

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রাজমোহন—'আচ্ছা তা হলে সেরে উঠলে যেও। কিন্তু—'

তিনি চলে গেলেন।

ভাঙা হাড় ধীরে-ধীরে জোড়া লাগল বটে, কিন্তু রাজমোহন আর এলেন না। আমিও বিনতাদের বাড়িতে গেলাম না আর। বোর্ডিঙেও না।

অনেক দিন পরে তার কথা মনে পড়ল আবার। সেই বিনতার কথা। কলকাতায় তখন ফাল্গুন মাস, কতকগুলো নতুন ইংরেজি কবিতার বই পড়ে, নিজের পুরনো ডায়রি নেড়েচেড়ে, বিনতার দেওয়া সেই 'টেস'টার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছিলাম। মেয়েটি কোথায় গেল?

ফার্স্ট ইয়ারের কমলা তখন ফোর্থ ইয়ারে উঠেছে। বছর দুই পরে তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া।

—'বিনতা কোথায় আছে বলতে পার?'

—'হ্যাঁ, বিভার কাছে একখানা চিঠি এসেছে সেদিন তার।'

—'কোত্থেকে?'

—'তারা পুরীতে।'

—'বি. এ. পাস করেছিল বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'এখন কী করে?'

—'ঠিক বলতে পারিনা।'

—'স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পুরীতে বুঝি?'

মুখে কাপড় তুলেছিল কমলা—'কই, বিনতাদি তো বিয়ে করে নি।' পাঁচ-ছয় দিন পর পুরীতে চলে গেলাম। সমস্তটা দিন, অনেক রাত অব্দি সমুদ্রের পারে ঘুরলাম। কিন্তু তাদের কাউকে দেখলাম না। অবাক হয়ে ভাবছিলাম কমলার কাছ থেকে বিনতার ঠিকানাটা জেনে এলে হত।

চার-পাঁচ দিন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের কোনো হিসাব-নিকাশ পেলাম না। বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, আছে কি এখানে?

নাঃ নেই। থাকলে—ঐ পাশের বনের ভিতর বা সমুদ্রের পারে একদিনও কি আসত না? কমলার কাছে একটা টেলিগ্রাম করে দিলে কিংবা চিঠি লিখে দিলেও এতদিনে খবর আনতে পারতাম। অন্তত ঠিকানাটা তো পেতাম।

কিন্তু কিছুই করি নি।

পুরীতে আর অন্তত থাকা চলে না। যেখানে নীড় ছিল সেখানে শূন্য মগডালে শুকনো খড় ঝুলছে শুধু, হলুদ ঘাসের ভিতর ডিমের খোলা ছড়িয়ে রয়েছে, চারি-দিকে কুয়াশা, হিম, নিস্তব্ধতা।

রাজহংসের বধূ এখানে থাকে না, ডাক-পায়রাকে উড়ে চলে যেতে হয়। কলকাতায় গিয়ে শুনলাম পুরীতেই তারা রয়েছে। বাড়িতে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে বলে মোটেই ক দিন বেরয় নি। আরো দু-তিন মাস থাকবে। ঠিকানা পাওয়া গেল।

পুরী যেতে-যেতে একবার একমাস হয়ে গেল আমার।

একজন লোককে দিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম তারা দু-এক দিনের মধ্যেই কলকাতায় যাবে; হয়তো সেই সব আয়োজনেই ব্যস্ত ছিল, সমুদ্রের পারে দেখলাম না আর তাই। মনের ভিতরে কেমন একটা নিবৃত্তি ও অবসাদ এল। এই সমুদ্রের পারে অন্ধকারের ভিতর ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে-একা। আমার পাশে কেউ এসে যেন কোনোদিন দাঁড়ায় নি।

কিন্তু একদিন দুপুরবেলা একা-একা নিজের ঘরে বসে থেকে-থেকে কিছুই ভাল লাগছিল না আর। ভাবলাম, একেবারে দেশের বাড়িতে চলে যাওয়া যাক। সেখানে এখন হেমন্ত, ধান ঝরছে-মাঠ হয়ে আছে হলুদ-শুকনো পাতা উলটিয়ে দোয়েলগুলো পোকা খুঁটে খায়। খয়েরের রঙের ডানা মেলে বিকালের বিষণ্ণ চিল উড়ে-উড়ে কাঁদতে থাকে। বেতের জঙ্গলের ভিতর থেকে কোরার অর্থপূর্ণ ডাক ভেসে আসে। অপরাহ্নের রোদের ভিতর বিমর্ষ মাছির দল গুঞ্জন করে ধীরে-ধীরে অন্ধকারের ভিতর হারিয়ে যায়। দিগন্ত নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। শুধু হাতের কাছে ফেরে দু-চারটা শালিক ও চড়াই, মাঠের ঘাসে-ঘাসে ঠ্যাং ভাঙা দুঃখী ভিখিরির মত লাফিয়ে লাফিয়ে—

বিছানা বেঁধে সুটকেস নিয়ে স্টেশনে চলে গেলাম।

গিয়ে দেখলাম বিনতা ডান হাত দিয়ে হাতল ধরে বাঁ পা বাড়িয়ে একটা সেকেন্ড ক্লাস ক্যাবিনের ভিতর ঢুকেছে। বাকি সব আগেই ঢুকেছে বোধ করি।

আমাকে সে দেখতে পেল না।

থার্ড ক্লাসের কিটিক কেটে গাড়িতে চড়ে ভাবলাম একেবারে সেই হাওড়ায় গিয়ে নামব। আর-কোনো স্টেশনে নামবার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু হাওড়ায় নেমে মাথা ঈষৎ অমায়িকভাবে নত করে হেসে বিনতাকে একটা নমস্কার জানাব। তারপর বলব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু পরদিন সকালে হাওয়াড় নেমে তাদের কাউকেই কোথাও দেখতে গেলাম না। সমস্ত লোকজন ভিড় প্রতিটি নারীর মুখ কঠিন উদ্বেগে খুঁজে বেড়ালাম; অনেকক্ষণ ধরে।

কিন্তু কোথাও বিনতাদের দেখতে পেলাম না। বিনতা কোথাও নেই। পরে শুনেছিলাম তারা খড়গপুরে নেমে গিয়েছিল-স্যাত-আট দিন পরে আবার পুরীতে ফিরবে বলে।

বিনতাকে আমি আর দেখি নি।

কয়েক বছর কেটে গেলে। শুনলাম সে নাকি বিলেত গেছে। সেখান থেকে এডুকেশনে ডিগ্রি নিয়ে এল। পশ্চিমে কোথায় এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে। সেখান থেকে কলকাতায় আমার এক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর কাছে অনেক চিঠি এসেছে তার। এক-একটা চিঠি আট-ন পৃষ্ঠা দীর্ঘ। পড়েছি, প্রথম-প্রথম পড়ে বিমূঢ় হয়ে থাকতে হয় (জীবনের অতীত দিনগুলো তাদের অন্ধ আক্ষেপ নিয়ে হৃদয়ের মধ্যে পিতৃমাতৃহীন পাখির ছানার মত হাহাকার করে ভেসে বেড়াতে থাকে)।

কিন্তু ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে দেখি, তারপর, বিমূঢ় হবার কিছু নেই। চিঠিগুলো কাজের কথায় ভরা শুধু, হৃদয়ের দিক থেকে কোনোই সাড়া নেই তো। যদিও-বা থাকত, আমিও-বা কী করব? জীবন পরিবর্তিত হয়। অনেক জীর্ণ পুরনো দলিলপত্র বাক্সে বোঝাই করে রেখে জমির উপস্বত্ব ভোগ করা চলে কিন্তু হৃদয়ের বেলা সে নিয়ম খাটে না তো।

বিনতাকে হয়তো আর-কোনোদিন দেখব না।

অনেকদিন দেখি নি। প্রায় সতের বছর।

কিন্তু তার সম্বন্ধে একটা কথা মনে হয়েছে আমার এই যে সে মেয়েটিকে একদিন পদাবলীর কিশোরীর মত মনে হয়েছিল আমার।

সে ক্রমে-ক্রমে যেন প্রেমহীন ক্ষমাহীন কঠিন...মতন হয়ে উঠেছে।

তার সঙ্গে-সঙ্গে সেই রকম সব হৃদয়হীন কঠিন অপ্রসন্ন এক দল মানুষ, প্রেম ও ক্ষমা, স্মৃতি ও দুঃখের চেয়ে কাজ ও ব্যস্ততা সফলতা ও জীবনের বিচিত্র সমারোহ সাড়ম্বরকে যারা ঢের বড় জিনিস বলে মনে করে নিয়েছে।

তবুও আজকাল পদাবলী পড়ে, 'টেস' পড়ে, পুরনো ও আধুনিক সাহিত্য যেখানেই মানুষের হৃদয়ে এসে হাত দিতে পেরেছে সেই সব পড়তে-পড়তে আমার সেই বিনতাকেই মনে পড়ে। সেই সতের বছর আগে বাংলার একটা অখ্যাত স্টেশনে কোনো এক নির্জন সন্ধ্যায় কেরোসিনের মশালের বিচিত্র আলোর ভিতর যে হাতির দাঁতের মত হলুদ, ম্লান, পথ ক্লান্ত মুখখানা দেখেছিলাম আমি, সেই প্রেয়সীকে আমার। ছ-সাত বছর আগেও এই রকমই মনে হত আমার।

কিন্তু আজকাল কিছু মনে হয় না।

যদি কোনো ভবিষ্যৎ জন্ম থাকে, এই নক্ষত্রেই ফিরে আসতে যদি হয় আবার, ইছামতীর পারে, কোনো একটা নিশুতি বহুগাছের পাশে গেরুয়া রঙের ইঁটের একখানা বাড়ির ভিতর বিনতাকে নিয়ে আমাকে একটা জীবন কাটিয়ে দিতে দিও বিধাতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলপাই হাটি

'কে, কে, দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে?' আস্তে বললে জিতেন দাশগুপ্ত। আবার বললে, 'কে?'

বলে, টেবিলের ওপরকার নীল শেডের বাতিটার আলো খুব বেশি পড়েছে যেখানে, সেখানে, চোখ রাখল বেশ নিবিষ্টভাবে–দলিলপত্রগুলো দেখে নিতে লাগল, দরজায় ধাক্কা পড়ছে, কড়া নাড়া হচ্ছে সেদিকে খেয়াল থাকলেও ঝোঁকটা কাগজপত্রের দিকে বেশি। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ফাইল দেখছিল দাশগুপ্ত। বললে 'কে? কলিং বেল টিপলেই হত, কড়া নাড়ছে কে? ওরে মহিম'–বলতে-বলতে নিজেই দরজা খুলে দিয়ে, সুইচ টিপে ঘরের ভিতরে দু-তিনটে কড়া আলো পটাপট জ্বালিয়ে দিয়ে, বললে, 'কেন? তুমি–'

'হ্যাঁ আমি। চিনতে পারছ? হয় তো পার নি। এবার অনেক দিন পরে তোমার এখানে এলুম। রাত বারটা বেজে গেছে। বড্ড দেরি হয়ে গেল। নিচে কী করছিলে? দাশগুপ্ত, তুমি বিয়ে করো নি তো? করেছ? একটা গুজব শুনেছিলুম। বিয়ে যদি করে থাকো, তোমার এখানে দু-চার দিনের বেশি থাকব না আমি।'

'কেন?'

'ওসব মানুষ আমার ধাতে সয় না।'

'তুমি নিজে তো করেছ বিয়ে।'

নিশীথ বললে, 'রাত দশটার সময় ট্রেন শেয়ালদা এসে পৌঁছুল। স্টেশনের কাছেই একটা বোর্ডিঙে খেয়ে নিলুম। তারপর বাসে গড়িয়াহাট; সেখান থেকে বাসে ঐ মোড়ে নামিয়ে দিল–কুলি পেলুম না, তবে সঙ্গে জিনিস বেশি নেই–একটা সুটকেস আর–'

'তোমার পরিবার কোথায়? বাপের বাড়িতে?'

'না, আমার ওখানেই আছে, জলপাইহাটিতে।'

'কলেজ কি বন্ধ হয়ে গেল তোমার?'

'হয়নি এখনও; এক মাস ছুটি নিয়ে এসেছি। এ ছুটিটা তোমার এখানেই কাটবে, তুমি এ বাড়িতে একা আছো তো? আমি একটু নিরিবিলি চাচ্ছি জিতেন। তুমি এত রাতে নিচে কী করছিলে? দোতলার দাক্ষিণদিকের সেই ঘরটায় থাকো না আজকাল?'

'হ্যাঁ। আমি ওপরে শুয়ে পড়েছিলুম। কড়া নাড়ার শব্দে নিচে নেমে এসেছি। এমনিও আসতুম। ঘুম হচ্ছিল না, কয়েকটা দরকারি ফাইল নিচে পড়ে ছিল–ওপরে নিয়ে যেতে হবে।' জিতেন দাশগুপ্ত ফাইলগুলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে বললে, 'কাল সাতটার সময় অফিসে যেতে হবে, এখন রাত একটা। নিরিবিলি চাচ্ছে নিশীথ!'

জিতেন দাশগুপ্তের সমীচীন মুখ বেশ ভাল মানুষের মতন দেখাচ্ছিল। মুখের গাম্ভীর্যের ভিতর থেকে একটু হাসি চলকে উঠল।

'যত মফস্বলের মানুষ কলকাতায় এসে আজকাল [নিরিবিলি] খোঁজে–'

নিশীথ সেন বারান্দার থেকে সুটকেসটা টেনে ঘরের ভিতরে এক কিনারে ফেলে রেখে বেডিংটা নিয়ে এল, বললে, 'না না আজকাল নয়, মানুষের সঙ্গে চলব, ফিরব, মিশব, কিন্তু তবুও নিজের মনে নিজে থাকব।'

'হ্যাঁ, তারই মানে তাই। আমার বাড়িটা'–জিতেন দাশগুপ্ত ফাইল উল্টেপাল্টে বললে–'ভারি গলদ তো, বড্ড Irregular। তরফদারের কাজ। কাল অফিসে এলেই ওকে আমি–'

ফাইলগুলো ঠেলে একপাশে সাজিয়ে রেখে নিশীথের দিকে তাকাল দাশগুপ্ত। চোখের থেকে চশমাজোড়া খুলে নিয়ে আধো অন্ধ চোখে নিশীথের দিকে খুব ভরসা ভরে তাকিয়ে জিতেন বললে, 'যা চাও তাই পাবে, আমার বাড়িটা খুব ঠাণ্ডা। লোকজন নেই–আমি আর আমার স্ত্রী।'

'তোমার স্ত্রী!' নিশীথ যেন অন্ধকারে বুকে কিল খেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে সিধে মুখে বসে রইল নিজের সুটকেসটার দিকে তাকিয়ে। অন্য কোথাও চলে যাবে কি সে?

'দাঁতকপাটি মারলে সে নিশীথ। আমি বিয়ে করব না? বয়স আমার সাতচল্লিশ। আজ যদি না করি তো কবে করব আর? স্ত্রীলোক না হলে চলে পুরুষমানুষের? তুমি নিজে চালাতে পেরেছ?' যে-দরজাটা দিয়ে ঢুকেছে সেটা খোলাই আছে, তাকিয়ে দেখল নিশীথ। টং টং করতে একটা রিকশা চলে যাচ্ছে। মাল চাপিয়ে সেও চলে যাবে নাকি? সাতচল্লিশ বছরে জিতেন দাশগুপ্ত বিয়ে করল। একে-একে সকলেই তো করেছে। বাকি ছিল জিতেন; লেক রোডের এ বাড়িটা জিতেনের। চমৎকার একটা আস্তানা ছিল এটা নিশীথের–কলকাতায় এলেই। জিতেন যে ভাবুক মানুষ নয়, তা নয়–কিন্তু ভাবগ্রাহী বেশি বুঝদার বেশি; মানুষের কোথায় খোঁচা লেগেছে, কী করে তা ঘুচিয়ে দেওয়া যায়, কি করে সুবিধে করে দেওয়া যায় মানুষকে, জিতেন যেন তাড়াতাড়ি ধরে ফেলতে পারত, নিজেরই গরজে যেন সুব্যবস্থা করে দেবার ক্ষমতা রাখত; কিন্তু জিতেন তো বিয়ে করেছে। নির্মল, সোমেন, রথীন, মুকুটমণি, অনিমেষ ঘটক, বিজয় মিত্তির, পরেশ দত্ত–একে-একে সকলেই তো গেল, সে নিজেও তো প্রায় বছর ত্রিশ আগে। বাকি ছিল জিতেন দাশগুপ্ত।

'কোনো খবর পেলুম না তো। কবে বিয়ে করলে?'

'কাউকেই খবর দিই নি। অফিসে গিয়ে রেজিস্টারি করে বিয়ে, এস-সি মুখার্জির মেয়ে। চল, দেখবে এসো–'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত ইশারা করে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, 'না, এখন নয়। বড্ড ঘুম পেয়েছে। ভারি ক্লান্ত লাগছে জিতেন, হাত পা না-ছড়িয়ে পারছি না আর। এই যে একটা খাট পড়ে আছে—এটা কার? ভারী চমৎকার নেয়ারের খাট তো; আমি শুয়ে পড়ি।'

জিতেন শান্ত, সেয়ানা মুখে হাসি ছুঁয়ে নিয়ে একে-এক ঘরের কড়া বাতিগুলো নিভিয়ে দিল সব; টেবিলের ওপর নীল শেডের বাতিটা জ্বলছিল। জিতেন চেয়ারে ফিরে এসে বললে, 'যেন আমার স্ত্রী তোমার বিজোড়।'

চশমা খুলে নিয়ে আড়ষ্ট চোখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে উত্তরের প্রতীক্ষায় হয় তো এমনিই-বসে রইল সে। নিশীথ হোল্ড-অল খুলে বিছানার তোশক বালিশ চাদর বার করে নিয়ে একটা ময়লা কাপড় দিয়ে ঝেড়ে নিচ্ছিল।

'না বিজোড় হবে কেন? এখানে মশাটশা আছে?'

'আছে।'

'মশারি আনি নি তো—'

'তা হলে ওপরে চলো। রাতে বেশ বাতাস খেলে সেখানে। মশারি না টানালেও চলে।'

নিশীথ খাটের ওপর তোশক পেতে ফেলেছিল—একটা বালিশ খাটের এক কিনারে লক্ষ্যহীনভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জিতেন দাশগুপ্তকে আশ্বস্ত করতে-করতে বললে, 'মশা তো আর বাঘ নয়, উড়বে এখানে। আমরা পদ্মার পারের দেশ থেকে এসেছি। পদ্মার ওপারে ফেলে এসেছি যে-সব, কলকাতায় সে-রকম জানোয়ার থাকে না।' বলতে-বলতে একটা সাদা পাতলা গায়ের চাদর বেশ করে একটু ঝেড়ে, প্রজাপতির মত ছোট সাদা পোকার মরা ডানা ও ডানার গুঁড়ি, উড়িয়ে নিশীথ বললে, 'কাল তোমাকে সকালেই অফিসে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, সাতটার সময়। উঠতে হবে পাঁচটায়। দাড়ি কামিয়ে ল্যাট্রিন সেরে চান করে কফি, আলু ভাজা আর ডিম সেদ্ধ খেয়ে বেরিয়ে যেতে হবে—'

কফি আলুভাজা আর ডিম সেদ্ধ। ল্যাট্রিন সেরে। কী সব কথা জিতেন দাশগুপ্তের মুখে। এ-রকম ধরনের কথা, একটা আত্মতুষ্টি জিতেনের নাকে চোখেঃ এসব কী দেখেছ শুনেছে আগে নিশীথ যখন জিতেনের এখানে আসত?

'কফি আলুভাজা আর ডিম সেদ্ধ?'

'হ্যাঁ।'

'রোজ।'

'হ্যাঁ। যেদিনই সকাল-সকাল অফিস থাকে—'

'রোজই অলুভাজা কেন দাশগুপ্ত সাহেব? রোজই ডিম সেদ্ধ?'

'আমার ভাল লাগে।'

ঢং করে একটা শব্দ হল। পাশের কামরায় বড় ঘড়ি আছে। দেড়টা বেজেছে হয়ত। নিশীথ এক-আধটা মশা টের পাচ্ছিল। পাতলা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলেই চলবে। বিশেষ ঘুম হবে না আজ রাতে। কাল সকালবেলা কোন দিকে যাবে সে? জিতেন তো বেরিয়ে যাবে। নতুন জায়গায় এলে অদ্ভুত অবোলা হরবোলা জিনিসগুলোর ভিতর ঘুম আসতে চায় না তার। পাশের কামরায় দেয়ালে আবার কিন্নরের বাচ্চা আছে, দেড়টা বাজিয়েছে এরপর দুটো আড়াইটে তিনটে সাড়ে তিনটে করে পাঁচটা অব্দি বাজিয়ে যাবে—শুনতে হবে নিশীথকে। খুব সম্ভব পাঁটার সময় ঘুম আসবে (জিতেন দাশগুপ্ত বেরিয়ে যাবে তখন)।

পাঁচটায় ঘুমলে আটার আগে উঠতে পারবে সে? ওপরে যে-মহিলা আছে জিতেন তাকে কী পরামর্শ দিয়ে যাবে? বারবার নিশীথের নিদালি দেখবার জন্যে ওপরের থেকে নেমে আসবে কি সে? তারপর ঠিক যখন আটটা-সোয়া আটটার সময় জেগে উঠে নিশীথ সুড়সুড় করে বেরিয়ে যাবে পূর্ব দক্ষিণ কলকাতার কোনো ঘাঁটির উদ্দেশে, কিংবা আরো দূরে উত্তর কলকাতার দিকে, তখন কি 'চা হয়েছে, চা হয়েছে, না-খেয়ে যাচ্ছেন? চা এনেছি—' পিছু ডাক শুনতে হবে মেয়েটির?

না, না, তা হবে না। সে সব মেয়ে আজকাল আর নেই, দশ-বার বছর আগে কলকাতায় সে-রকম দু-একজনকে দেখেছিল নিশীথ, আজকালকার এ-সব স্ত্রীলোকেরা আদিমানবের মত রোমাঞ্চে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আগুনের ব্যবহার যারা প্রথম শিখেছিল।

'এস-সি মুখার্জি কে?'

'কে এক মুখুজ্যে'—জিতেন দাশগুপ্ত বললে।

তারপর বললে, 'সলিল মুখুজ্যের স্ত্রী বার্মিজ; ওরা রেঙ্গুনে ছিল অনেকদিন। সলিলবাবুর স্ত্রীর নাম মা থিন। রং খুব ফর্শা, লম্বা পুরুষদের মত দেখতে। আমি ওকে মার্টিন সাহেব বলি।' শুনতে-শুনতে নিশীতের ঘুমের আবেশ কেটে যাচ্ছিল।

'তোমার শাশুড়ি–মা-থিন কোথায় আছেন জিতেন দাশগুপ্ত?'

'ওরা আজকাল কলকাতায়ই আছে, পার্ক সার্কাসে থাকে। বড় দাঙ্গাটার সময়েও এখানেই ছিল। হেঁটে বেড়িয়েছে, হামলা দেখেছে; পুলিশের ট্রাকে ছুটে, রেডক্রশের গাড়িতে চড়ে দিনরাত একঠাঁই করে দিয়েছে। ঐ ওদের রকম। মানুষকে মানুষ খুন করেছে, ম্যানহোল থেকে আধকাটা মানুষ টেনে বের করে হাসপাতালে দৌড়ানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যে, মার্টিন মুখুজ্যে এই তো করেছে দাঙ্গার সময়। মরা মানুষ আধ-মরা মানুষ, ডাক্তার আর হাসপাতাল, টেলিফোন আর ট্রাক চার্টার; মনে কোনো বিষ নেই, বেকুবি নেই, বজ্জাতি নেই, যারা মারছে তাদের ওপর হামলা নেই, ভয় নেই, লোভ লুট চঞ্চলতা নেই, মার্টিন সাহেব যে আমার শাশুড়ি এ কথা ভেবে মাঝে-মাঝে আমি খুব ঝুম হয়ে থাকি, হ্যাঁ বেশ লাগে।'

নিশীথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'বেশ ভালো, মহৎ শাশুড়ি পেয়েছ তো। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

জিতেন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ঘুম পাচ্ছে? তাহলে ঘুমোও।'

সাদা পাতলা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিশীথ বললে, 'লম্বা ফর্শা তোমার শাশুড়ি? অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের মতন দেখতে? মা-থিন তো রেঙ্গুনের মেয়ে।

অথচ মেমের মতন–'

'ওর বাবা খাঁটি বার্মিজ, রেঙ্গুনের খুব বড় ব্যারিস্টার ছিলেন। মা-থিনের মা নরওয়ের মেয়ে–'

'ওঃ!' নিশীথ বললে, 'তোমার স্ত্রী দেখতে কেমন?'

'চলো দেখবে।'

'এখন তো রাত দুটো।'

'চলো ওপরে। পাঁচটার সময় অফিসে যেতে হবে। এ তিন ঘণ্টা জেগেই কাটিয়ে দিই। চলো, আমার স্ত্রী বাংলা বলতে পারে খাঁটি বাঙালি গিন্নির মতন, তোমার বাংলা লেখাটাও পড়েছে, পোলিটিকসেই উৎসাহ বেশি, তবে–' জিতেনের ঠোঁট গাল চোয়াল একটু বেঁকে কুঁচকে স্বাভাবিক হয়ে আসতেই সে বললে 'সাহিত্যেও নজর আছে নমিতার–'

'নমিতার?'

'নমিতার। চলো যাই, তুমি সিগারেট খাও?'

'এক-আধটা, দলে পড়লে'

'আমারও তাই। ওপরে টিন আছে। শব্দ শুনছ?'

'কোথায়?'

জিতেন দাশগুপ্ত তার একহারা লম্বা কালো শরীরটা কেমন একটা উৎসাহের দুর্দমনীয়তায় আড়ষ্ট কঠিন করে চশমার ফাঁক দিয়ে সিলিঙের দিকে চোখ মেরে বললে, 'ঐ ঐ কি টক টক ডুব ডুক চক চক–'

'তার মানে?'

'পাঁয়তাড়া কষছে–'

'কেন?'

'ঘুম হচ্ছে না, ব্রোমাইড দিয়ে এসেছি।'

'অসুখ?'

'না, এমনিই–বিছানার একজন না-থাকলে আর-একজনের ঘুম ফেঁসে যায়। কয়েকটা মাস ধরে এই রকমই হচ্ছে। পরের কয়েকটা বছর হবে।'

খুব আশ্বাসের সঙ্গে বললে জিতেন দাশগুপ্ত। নিশীথ আড়চোখে জিতেনের দিকে তাকাল। জিতেন মানুষ খুব স্থির। বলছেও স্থিরতার কথা; কিন্তু কোনোদিনই মেয়েঘেষা ছিল না সে। আগুনের মতন মেয়েদের কাছ থেকেও অনায়াসে কেটে পড়ে অনেক দূরে একটা নির্বিকার গাছের মত আকাশে বাতাসে স্বয়ম্ভূ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার আশ্চর্য সহজশক্তি ছিল। কী বলছে আজ রাতে জিতেন দাশ? কেমন বসন্ত রাতে ধনেশ পাখির মতন দেখাচ্ছে তার চোখ। মথা ঘেমে না-উঠলে হেসে ফেলত নিশীথ।

'হাসছ? নিশীথ?'

'ওপরে যাও তুমি দাশগুপ্ত।'

'তুমি যাবে না?'

'আমি ঘুমে ভেঙে পড়ছি, বসতে পারছি না। এ-রকম অবস্থায় ওপরে গিয়ে দাঁড়ালে সেটা ঠিক হবে না জিতেন।'

নিশীথ বিছানায় শুয়ে পড়ল।

'এক মাস তোমাদের এখানে আছি। কথাবার্তা হবে। খুব জমবে আলাপ।' ঘুমের চোখে জিতেনকে বলল।

'বেশ বেশ। মশারি আনো নি?'

'না।'

'অবস্থা দেখছি, ওপরের থেকে পাঠিয়ে দিতে পারি কি না–'

'না না এত রাতে আর ওপর-নিচ চলে না।'

'আমি সবই চালু করে রেখেছি, ভাই নিশীথ।'

'আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছি। মশারির চেয়ে ঢের ভালো। ভারী আরাম লাগছে। ওপরে যাবার সময় বাতিটা নিভিয়ে দেবে?'

'পেয়েছি,' জিতেন বললেন, 'এই যে সঙ্গে-সঙ্গে লম্বা দড়ি। তোমার নেয়ারের খাটের চারিদিকে চারটে লম্বা রড দেখেছ তো, বেঁধে ঠিক করে নাও'–ঘরের এক কোণে একটা মস্ত বড় আলমারি খুলে ধপধপে নেটের মশারিটাকে বড় একলতি সমুদ্রফেনার মত নিশীথের বিছানার দিকে ছুঁড়ে মারল জিতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি ভেবেছিলে আমার স্ত্রীকে দিয়ে মশারি পাঠিয়ে দেব!'

'এত রাতে মিছেমিছি কাউকে বিরক্ত করা ভাল হত না। ভারি খাসা মশারিটা তো তোমার, চমৎকার লাকসের গন্ধ আসছে–' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিতেন দাশগুপ্ত। বিয়ে করেছে বলে সে দূরে সরে গিয়েছে–সরে যাচ্ছে–তার অনেকদিনের অন্তরঙ্গ মানুষরাও তাই মনে করে। এক কাপ চা চাইল না নিশীথ, একটা সিগারেট চাইল না। বোর্ডিঙে খেয়ে এসেছে মিথ্যা কথা বলে, না-খেয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল–এর আগে যতবার নিশীথ কলকাতায় এসেছে নিশীথের দাবিদাওয়া মেটাতে গিয়ে ভালবাসার নেবুর কচলানিতে প্রায় তিতো হয়ে উঠত জিতেনের মন। কী রকম অনির্বচন হয়–রানির দিন গিয়েছে সে সব। আর এখন?

'কিছু খাবে নিশীথ? এক কাপ চা?'

'তুমি ওপরে যাবে না জিতেন?'

'যাচ্ছি। একটা সিগারেট?'

সিগারেট পেলে হত নিশীথের। কিন্তু সিগারেট চাওয়া মানে জিতেনকে ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে রাত দুটোর সময় আমার চক্ষুস্থির, জিতেনের স্ত্রীরও। 'সিগারেট? না এখন খাব না দাশগুপ্ত। দলে পড়ে এক-আধটা খাই। খাওয়ার অভ্যেস নেই তো আমার।'

'মশারিটা টানিয়ে নাও? দিচ্ছি টানিয়ে–'

'আমি নিচ্ছি টানিয়ে।'

'তোমার বিছানার পাশেই সুইচ। বিছানায় শুয়ে হাত বাড়িয়েই পাবে; এ কামরার সবচেয়ে চড়া আলো জ্বলে উঠবে; দিনের মতন দেখাবে ঘরটাকে। নীল শেডের আলো জ্বলুক। দরকার হলে নিভিয়ে দিও। সুইচটা উত্তর দিকের দেয়ালে–ঐ যে হোঁৎকা টিকটিকিটা যেখানে–ঐ যে–আঃ–বাস–পোকাটাকে সাবড়ে দিল–'

'দেখেছি। জিতেন দাশগুপ্ত কলকাতায়?'

'না।'

'ঋতেন?'

'না।'

'ওদের স্ত্রীরা কোথায়?'

'ওরা সব ভাগলপুরে–'

'এখানে তুমি আর নমিতা, আর কে আছে?'

জিতেন দাশগুপ্ত চশমা খুলে জন্মান্ধের মত কেমন যেন নির্লিপ্ত নিরালোক চোখের মৃদু ঝলসানিতে নিশীথের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললে, 'ঋতেন শিগগির এখানে আসবে না, তার স্ত্রীও না। হিতেন হয় ত একা একবার আসবে, কিন্তু মাস দেড়েকের আগে না। এখানে রইবে, না আর শ্বশুর বাড়িতে, বলতে পারি না। ওরা আজকাল আমার এখানে বড় একটা থাকে না। কলকাতায় এসে আমার এখানে উঠলেও তারপরে ছিটকে পড়ে।'

ওপরে ঢক-ঢক টাক-টিক ডক-ক্রক শব্দ হচ্ছিল; ওয়াকিসুরে তো বটেই ঃ এক অধীর চেয়ার টানা, দেরাজ খোলা, লাথিয়ে সুটকেস ঠেলে দেওয়া, দোজ বন্ধ করা, ক্যাম্প খাট সরিয়ে ফোল্ডেবল চেয়ার গুটিয়ে মেঝের ওপর দড়াম ফোটানো, নিশীথ ওপরের কোজাগরী আওয়াজগুলোর রকমারি কৈফিয়ত ঠিক করে নিচ্ছিল খুব স্থির দৃষ্টিতে জিতেন দাশগুপ্তের অন্ধ চোখের দিকে, অন্ধকারে মাথার ওপরের বড় বিমটার চারিদিককার স্কাইলাইটগুলোর দিকে তাকিয়ে। চোখে চশমা আঁটছে, খুলছে, সাঁটছে, খুলছে জিতেন; এইবার সেঁটে নিল।

'ওপরে যাও জিতেন। রাত এখন আড়াইটে।'

'ঋতেনের তো এইরকম ভাব–'নিরাশায় হাত ঘুরিয়ে শূন্য অন্ধকারের ভিতর ছেড়ে দিয়ে জিতেন বললে, 'আগে তো দাদাই ছিল ওদের সব। এখন দাদাকে মজন্তালি সরকার বানিয়ে বড়-বড় হাতি পাঠিয়ে দিচ্ছে, যেন নিজের পেট ফাঁসিয়ে বেড়ালটা হাসবে আর ওরা হুলো বেড়ালের গল্প পড়ে হাসবে। দুশো মজা হবে, সাতশ হাসি, কী বল হে নিশীথ'–জিতেনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, 'কিন্তু ঋতেনের ঘানির তেল খেয়ে তো আর রম্যচক ঘুরছে না। ঘুরছে নিজের নিয়মে।'

জিতেন দাশগুপ্ত কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললে, 'আমার ভাইদের আমি খুব ভালবাসি, ওরা তা বুঝবে না। আমার মত ভালবাসতে পারবে না। মাঝে-মাঝে কেমন কঠিন হয়ে ওঠে মন ওদের কথা ভাবতে গিয়ে। থাক, মনটা নরম হোক, মৃদু হোক, স্নিগ্ধ হোক। নমিতা খুব সাঁচা মেয়েমানুষ। মশারি টানিয়ে নাও নিশীথ।' নীল শেডের বাতিটা জ্বলছিল। জিতেন দাশগুপ্ত চলে গেছে। নিশীথ দাঁড়াল। ঘরের ভিতর কয়েকবার পায়চারি করে বারান্দার দিকে খোলা দরজাটা বন্ধ করে, এল জিতেনের টেবিলের কাছে। কোথাও বাথরুম আছে কি না জিতেনকে জিজ্ঞেস করা হয় না। নিচের তলায় কোথাও চাকর-বাকর বা অন্য কেউ আছে কি না বলে যায় নি জিতেন। তাহলে এখন ঘুমোতে হবে। কিন্তু কী করে আসবে ঘুম। জিতেন বিয়ে করেছে শুনেই ঘুমের চটকা (এসেছিল একসময়) একেবারেই ভেঙে গেছে। বিয়েই শুধু করে নি। একটা ফিরিঙ্গি মেয়েকে বিয়ে করেছে। এরপর জিতেন দাশগুপ্তকে দিয়ে কিছু আর করে উঠতে পারবে না নিশীথ ঃ ও নাগালের বাইরে চলে গেছে। লেক-রোডে বাড়ি ছিল জিতেনের–হৃদয় ছিল মানুষটার–ভারি অন্তরঙ্গতা ছিল নিশীথের সঙ্গে। নিজেদের ভাইদেরও ভালবাসত জিতেন, কিন্তু ওর ভাইয়েরা উচ্চণ্ডে গোছের, দাদার কাছ ঘেঁষতে চায় না। নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে গেছে সব অনেকদিন থেকেই। বেশ বড়-বড় চাকরি ব্যবসা করছে তারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-রকম অবস্থায়–জীবনের শেষ কটা বছর জিতেন দাশগুপ্তের এখানে এসে কাটিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল নিশীথের। পদ্মার ওপারের দেশটাকে তার খারাপ লাগে না, যেখানে একটা বড় প্রাইভেট কলেজে কাজ করছে সে, এ কাজে ভুয়ো মর্যাদা আছে, টাকাকড়ি নেই ঃ কুড়ি বাইশ বছর কলেজে কাজ করবার পর এখনও দেড়শ টাকা মাইনে।

কলেজের কাজটাকে মজুরির কথা বাদ দিয়ে, এমনি কাজ বা রুচি-রচনার দিক দিয়ে দেখতে গেলে, কোনোদিনই ভাল লাগেনি তার ঃ সঙ্গে-সঙ্গে লাইব্রেরিতে নতুন কিছু-কিছু বই, প্রকৃতিতে এসে পড়ত রৌদ্রের ফোয়ারা, নীল উজ্জ্বল চক্রবাল, আকাশে হরিয়াল, ফিঙে, বক, বড়-বড় সুন্দরী ওয়াক পাখি, কলেজের ময়দান পেরিয়ে খানিকটা দূরে গেঁয়ো রাস্তা ঘেঁষে টি টি তেপান্তর, ঝিল, কানসোনা মধুকূপী পরথুপি ঘাস, শরের বন, শনের হোগলার ক্ষেত, অপরিমেয় কাশ, হঠাৎ এক-আধটি নিখুঁত মুখসৌষ্ঠব, স্ত্রীলোকেরই, আরো দূরে বুনো হাঁসের জলা মাঠ, স্নাইপ, সকালের উড়িসুড়ি নিস্তব্ধতা তখন ভাল লাগত নিশীথের। ভাল লাগত বটে, কিন্তু কলেজের বিশেষত মফস্বল কলেজের অধ্যাপকের পক্ষে বনের বেড়াল, ভাম, ভোঁদড়, সজারুর চরায়-চরায় ঘুরে বেড়ানো, বালিহাঁস, মরাল, ওয়াক পাখিদের ওড়াউড়ি আসা-যাওয়া, ভালবাসা দেখবার জন্য হাঁটুজল ভেঙে, সারাটা দিন ডুবজল গলাজলের দিকে ভেসে যাওয়া, সমস্তটা শরৎরৌদ্রের–শালিধানের–বরোজের উড়ু -উড়ু পান বনের ঝরঝরে দিনটাকে, রাতের নক্ষত্রনির্ঝরে এসে নিস্তন করে রাখা, এ সব কাজ মোটেই সম্মানজনক নয়, এ সব নিয়ে সচেষ্ট থাকলে অধঃপতিত, বিবেচিত হবে সে; কারুরই সায় পাবে না। এ সব কাজ মানুষের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু ওরা বলে অধ্যাপকের কাজ আলাদা, রুচি, ভিন্ন, দায়িত্ব আর এক রকম। অধ্যাপক যে মানুষ নয় তা তো নয়। কিন্তু ছাঁকা মানুষ, পরিস্রুত জলের মত কুঁজো, কলসি বা ওয়াটার কুলারের ভিতর। কী হবে ও-রকম জল হয়ে; নিশীথ হতে চাচ্ছিল নির্ঝরের জল, কিংবা জল, সময়সীমার অব্যক্ত থেকে নিঃসৃত সাগরের। কলেজের কাজ ছেড়ে দেবে সে।

কলকাতার চেয়ে মফস্বলের প্রকৃতিলোক ঢের ভাল লাগে তার। সেই সব মানুষদেরও ভাল লাগে–মফস্বলের গ্রামপ্রান্তর থেকে উপচে পড়ে যে-সব মানুষ–কার্তিকের বিকেলের রোদে, চোত-বোশেখের শেষ রাতের ফটিক জলের মত জ্যোৎস্নায়। এসব মানুষ সব ঋতুতে সব সময়েই ভাল। এদের অসুস্থতা নেই যে তা নয়, অভাব অনেক। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার বিষক্রিয়া অনেক দূর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছে ওরা। যে-প্রণালীতে রুখেছে তা বিজ্ঞানসম্মত নয়; কিন্তু বিজ্ঞান কত দিনে মানুষকে কত বেশি আর দান করতে? দেহের সুবিধা ছাড়া কিছু কি পারছে আর, দান করতে? পারবে কি কোনোদিন? মানুষের হৃদয়েরও শুভ সংহতির কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। সেটা হবে কি? সেটা হবে বলে মনে হয় না। নিশীথ ঘরের ভিতর পায়চারি করছিল। ঘন্টাখানেক হল জিতেন দাশগুপ্ত ওপরে চলে গেছে। নিজের মনের–এমন-কি মাঝে-মাঝে পৃথিবীর মনের সমস্যা নিয়ে এমন নিমগ্ন হয়ে পড়ছিল নিশীথ যে ঘরের বাইরের অন্য কোনো দিকেই খেয়াল ছিল না। মশারিটা টানাতে হবে। ঘুম হবে না। রক্তের কোনো কণিকায়ই ঘুম নেই, কিংবা অনুভূতির, কিন্তু ঘুমুতে পারলে ভাল হত। সঙ্গে ব্রোমাইড থাকলে ভাল হত। বেরিয়ে পড়বে না কি? কোনো একটা ফার্মাসিতে গিয়ে ঘুমের ওষুধ কিনে আনবে? জলপাইহাটির ডাক্তার ঘোষের প্রেসক্রিপশনটা আছে সুটকেসের ভিতর; সেটা দেখিয়ে ওষুধ আনা চলে–এমনি যদি না দিতে চায়। নাঃ শুয়ে পড়া যাক, মশারিটা টানিয়ে নিতে হবে। বেশ মশা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে-মশার কামড় খাচ্ছিল নিশীথ।

জিতেন দাশগুপ্তের দিকে মন ঘুরে গেল তার–ওপরে নমিতা রয়েছে; মাথার ওপর সাদা ধবধবে কংক্রিটের গাঁথুনি, মোটা বড় বিম দুটোর দিকে তাকাল নিশীথ। টের পেল ঘট ঘট ডক ঠক টাক টকাস শব্দ হচ্ছে এখনো ওপরে। জিতেন কি জেগে আছে এখনও? কী করছে? ঘুমিয়েছে জিতেন? এতক্ষণ তো নিশীথ মফস্বলের কথা, কলেজের কথা, পদ্মার পারের দেশের প্রকৃতি, মানুষ, স্ত্রীলোকের কথা ভাবছিল, ভাবছিল পৃথিবীর রোগের কথা, রোগের উপশম সম্ভব কি না;–হঠাৎ উপলব্ধি করল নিশীথ যে তার সমস্ত ভাবনার ভিতরেই এই একঘণ্টা-দেড়ঘণ্টা ধরে ওপরের তলার ঠক ঠক ঘট ঘট গিট ঘাট শব্দ শুনে এসেছে সে; এ শব্দ কমে নি তো কখনও, তবে জোর কমে গিয়েছে, কিন্তু তবুও আছে, রয়ে গেছে এখনও, শব্দ হচ্ছে খুব আওয়াজ করে নয়, কিন্তু কক্ষে ফুলের পাপড়ি ঝরার মত হৃদয়গ্রাহিতারও নয়।

নমিতা ছাড়া আর কেউ আছে কি ওপরে? জিতেন দাশগুপ্তের বেশি রাতের খিদমৎ চলেছে? জিতেন তো কোনো দিন সিগারেট বা পানও খেত না। এখন কি গেলাস ঠুকছে?

পিপাসা পেয়ে গেল নিশীথের। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে কোথাও জলের ঘড়া কুঁজো কিছুই দেখতে পেল না। এক গ্লাস জল চাই, খুব ঠাণ্ডা জল; দু'গেলাস, তিন গেলাস, দশ গেলাস–ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা কেমন যেন বোশেখ মাসের পোড়া মাটির মত লাগছে শরীরটাকে, জিভটাকে; কে যেন ভিয়েনে চড়িয়েছে, আঙুরের মত যত রক্ত ছিল শরীরের ভিতর শুকিয়ে বালি হয়ে যাচ্ছে সব। নিশীথ তাকিয়ে দেখল ঘরের দিকের বাফ রঙের খোলা দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি ঘুরে বেঁকে দোতলার দিকে চলে গেছে। উঠে গেলেই হল; দোতলার ঘর-দোর অনাচ-কানাচ সবই তো জানা আছে তার। জানে রেফ্রিজারেটার কোথায় থাকত–রেফ্রিজারেটারের ভিতর বড় কাচের গাগরীতে জল, কমলালেবু, ক্ষীরের সন্দেশ, পুডিং, ফালি করা বাতাবি লেবু, পেঁপে, অরেঞ্জ স্কোয়াশ, লেমন স্কোয়াশ।

কিন্তু তখন তো জিতেন একা ছিল। নিজে সেধে নিশীথকে ফল মিষ্টি শরবৎ খাওয়াত গরমের রাতে।

নিচের তলায় পায়চারি করতে-করতে নিশীথ মনে-মনে হাসছিল। জল যে ভাল জিনিস–ভারী ঠাণ্ডা–জল আর ঘুম, দোতলার খোলা ঘরের দক্ষিণা বাতাস আর সিলিঙ ফ্যানের হাওয়ার চেয়ে স্নিগ্ধ জিনিস যে পৃথিবীতে কোথাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীপ্রেমেও নেই–জিতেন দাশগুপ্ত তা বুঝিয়ে দিয়েছিল একদিন। সেই জিতেনের বাড়িতেই সামান্য এক গ্লাস জলের অভাবে আজ মারা পড়ছে নিশীথ।

মার্টিন সাহেব তো খুব ভাল মানুষ–নমিতা খারাপ মোটেই নয়, কিন্তু তবু একটি নারী যখন একজন পুরুষকে দখল করে বসে, বিয়ে হয় তখন, দুটো ভাল জিনিসের থেকে তাদের অজ্ঞান্তেই বুঝি বেরিয়ে আসতে থাকে। বিবাহিতেরা সেটা বোঝে না। তারা পরস্পরকে বুকে কোলে টেনে দৈবী স্ফটিকের কাজ করে বহিঃপৃথিবীর নিশীথ অসিত পরভৃৎ প্রভৃতির চোখে, ক্রিস্ট্যালের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে চোখ মুড়োতে থাকে জীবনের মরুভূমিকে চেরাপুঞ্জি বলে ভুল না হলেও। এ না হলে এই গরমের রাতে নিশীথের জন্য এক কুঁজো জলের ব্যবস্থা না-করে ওপরে চলে গেল জিতেন। দু-চারটে সিগারেট পর্যন্ত রেখে গেল না। জিতেনকে বলেছিল বটে নিশীথ যে দলে পড়লে এক-আধটা সিগারেট খায় সে; কিন্তু তার মানে কি তাই? ওপরে সিগারেটের টিন রয়েছে জিতেনের! উচিত ছিল না একটা টিন নিচে নিশীথকে দিয়ে যাওয়া–এ-রকম হাঁপ-ধরা গা-পোড়া রাতে অন্ধকারটাকে পুড়িয়ে-পুড়িয়ে একটু–

কে?'

নিশীথ খানিকক্ষণ সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। না, কেউ নয়। এত রাতে কে আর আসবে। কর্তা গিন্নি সর্পকুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছে দোতলায়, কয়েকটা ছুঁচো আর ইঁদুর দাঁত খিঁচিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, নিচে চাকর-বাকর কেউ নেই, কেউই নেই জিতেনের, এখানে যতবার এসেছে, থেকেছে, নিশীথ নিচের তলাটাকে ঘাটিয়ে দেখতে যায়নি একবারও। সবই ছিল তার দোতলায়। নিচে কী আছে, না আছে, জানেও না সে। এ ঘরে কোনো ফ্যানও নেই। নিশীথকে সারারাত এখানে উঠে, বসে, শুয়ে কাটাতে হবে। অথচ ফ্যানের কোনো ব্যবস্থা নেই। নিশীথ ঘরের কোণ একটা ময়লা নড়বড়ে ড্রেসিং টেবিলের কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে জিতেনের নতুন অদ্ভুত পতঙ্গজীবনের কথা ভাবছিল। না কি পাখা খুঁচিয়ে শুঁয়োপোকা হয়ে গেল? ওপরের থেকে একটা টেবল ফ্যান পাঠানো যেত না? কিন্তু ভেবে লাভ নেই। এ হবেই। একটা ভাল কথা মনে পড়েছে; কলকাতায় আসবার আগে আসামের দিকে গিয়েছিল নিশীথ। হাফলঙে গাড়ি থেমেছিল অনেক্ষণ; একজন আসামি ভদ্রলোক নেমে গেলেন, চলে যাবার সময় নিশীথকে ধন্যবাদ জানিয়ে, (কেন, যে, ভুলে যাচ্ছে নিশীথ), তার পকেটে এক প্যাকেট ভাল সিগারেট গুঁজে দিয়ে, চলে গেলেন। সে সিগারেট কোথায় রাখল নিশীথ?

নিশ্চয়ই ফেলে দেয় নি। নিজে খায়নি, কাউকে খেতেও দেয়নি–মনেই ছিল না তার প্যাকেটটার কথা। কিন্তু কোথায় রয়েছে? বার কয়েক পকেট হাতড়ে, বিছানা-বালিশ উলটে-পালটে, হোল্ডঅলটাকে তচনচ করে, দেখল। নেই কোথাও। টস-টস করে ঘাম ঝরে পড়ছে, মাথাটাই ঘামিয়েছে সবচেয়ে বেশি। কেমন গা বমি-বমি করছে। ঘরের জানলাগুলো খুলে দিল। সুটকেসটা খুলে ভাল করে খুঁজে দেখতেই বেরিয়ে পড়ল প্যাকেটটা–

সিগারেট হাতে করে বিছানায় এসে বসল সে। কিন্তু দেশলাই তো নেই, দেশলাই কোথাও নেই এটা হলপ করে বলতে পারে সে। জলপাইহাটি ছাড়ার পর দেশলাইয়ের কোনো রকম প্রয়োজন হয় নি; জলপাইহাটিতে দু'মাসের ভিতর দেশলাই ধরেছে সে; দেশলাইয়ের অভাবে তাহলে সিগারেটও খাওয়া যাবে না; অথচ এটা জিতেন দাশগুপ্তের বাড়ি; ওপরের ঘরে জিতেন যদি এ রকম নিঃসাড় হয়ে পড়ে না থাকত তা হলে টেবল ফ্যান, ঠাণ্ডা জল, দেশলাই সবই তো জুটে যেত তার। সিগারেটের প্যাকেটা জানালার ভিতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

ওপরের সে সব শব্দ থেমে গেছে একেবারে; এইবারে চণ্ডীফুলের পাপড়িও ঝরছে না আর; এখন তাহলে লাল ঝুমকোর ঘুম কণ্টিকারীকে বুকে জড়িয়ে। সময় হয়েছে তা হলে, ওপরে চলে যাবে নিশীথ।

জিতেন দাশগুপ্তরা দরজা খোলাই রেখেছে নিশ্চয়ই; একবার উঁকি মেরে দেখে নেবে। তারপর খুঁজে বার করতে হবে মিটসেফ; সেটা যদি বন্ধ থাকে তা হলে চাবিটা বের করে নিতে হবে, দেখতে হবে রেফ্রিজারেটরে কী কী রয়েছে। নিশ্চয়ই নতুন কিছু আমদানি হয়েছে। পুরনো হালচাল বাতিল হয়েছে কিছু তো বটেই; অদলবদল কতদূর গিয়ে দাঁড়াল দেখা যাক। খুব ঠাণ্ডা জল-বরফ দেওয়া সাধারণ কলের জল। কার্লসবার্ড সোয়াপ্পের জল পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, আগে যে-সব জায়গায় এগুলো থাকত, এখনও যদি সেখানেই রাখা হয়, তা হলে অন্ধকারে চোখ বুজে টেনে নেবে বোতলের পর বোতল। এতটা পিপাসা না পেলে, নিচে জলের পাথার ব্যবস্থা থাকলে নমিতা দাশগুপ্তের দোতলার ফ্ল্যাটে ঢোকবার কোনো দরকারই বোধ করতে না নিশীথ। কিন্তু জলের তাড়না তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। জলের তেষ্টা মিটলে মিটসেফ খুলে ক্ষিধে মেটাতে হবে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে দাঁড়াল নিশীথ। যেদিকে তাকায় সেদিকেই কার্পেট–দোতলার আদিগন্ত ভিত্তিচিত্রগুলোকে ঢেকে ফেলে পরিকল্পনা ও রঙের বাহারে নক্সায় অভিভূত করে রেখেছে সব। জয়পুরী গালিচা হয় ত এগুলো? ওগুলো মির্জাপুরী। দোতলায় সিঁড়ির মুখে মস্ত বড় হল ঘরটা। হল ঘরে একটু এগিয়ে পিছিয়ে বাঁ হাতি ডান হাতি করলেই ড্রেসিংরুম, ড্রয়িংরুম, খাবার ঘর, দুটো শোবার ঘর, গোশলখানা সবই চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় নিশীথকে। নিশীথও দেখে তাদের। এদের যদি গলা থাকত, কী বলত নিশীথকে? এ সব ঘর দোর তো নিশীথের পোশমানা জিনিস ছিল, তার জীবনের সেই সব বেতালসিদ্ধির দিনে। হলঘরে মাথার ওপরে বেশ একটা প্রকাণ্ড চৌকো সন্দেশের মত বাতি জ্বলছে। বেশ দেখাচ্ছে ঘরটাকে। গালিচার সমারোহ, সোফা, কুশন, এনসাইক্লোপিডিয়া মোটা-মোটা দামি বই-ঠাসা আলমারি–কিন্তু বাতিটা জ্বালিয়ে রাখবার কী দরকার ছিল সারারাত। কেউ দেখবে না, অথচ ঠাটটা জ্বলে যাবে, এই জন্যে? গোটা দুই বড়-বড় ফ্যান রয়েছে এই ঘরে। বাতি নিভিয়ে ফ্যান খুলে নিশীথ তা হলে এবার সোফায় শুয়ে থাকবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে জল চাই। খাবার ঘরে ঢুকলেই জল, ওয়াটার কুলারে—অঢেল জল। ভাবতে গিয়ে জলের তেষ্টা অনেকটা কমে গেছল নিশীথের। জল খাবে বটে কিন্তু জিতেন দাশগুপ্ত কী করছে? কিন্তু জল খেতে হল। রেফ্রিজারেটরের থেকে বোতল বের করে নয়—এমনিই খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল নিশীথ। ঘরটা খোলাই ছিল, সব দরজাগুলোই খোলা। খোলা সব জানালা, জিতেনের চোরের ভয় নেই—নমিতারও না। জানে না কি কলকাতার জানালা-ভাঙা চোরেরা, যে এখানে শিক ভাঙতে হবে না, কপাট ছুটিয়ে দিতে হবে না, দেয়ালের পাইপ বেয়ে উঠলেই আর-কোন সমস্যা থাকে না। মাল নিয়ে সারারাত চালানির কারবার চলতে পারে?

হাওয়া খেলছে ঘরে, ফ্যানও ঘুরছে। নিশীথ একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

গরমের রাতে দরকার বুঝে ব্যবস্থা করছে তারা। নমিতা অবিশ্যি আমেরিকান স্ন্যাকসটা পরতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু ঘুমে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। জিতেন ঝাড়াঝাপটা, শুধু চশমাটা খুলতে ভুলে গেছে। কয়েকটা মদের বোতল আর ডিকান্টার রয়েছে ঘরের একটা ঠাণ্ডা কোণে। জিতেন খায় না এ সব। নাতিমাও না। হয় তো নমিতার কোনো-কোনো বন্ধুদের জন্য রাখতে হয়, কিংবা মার্টিন সাহেব এসে খেয়ে যায়। কিংবা মুখুজ্যে সাহেব। নিশীথ এগিয়ে দেখল দামি হুইস্কি, ব্রানডি, শ্যাম্পেনের বোতল সব, নামজাদা বিলিতি ফরাসি জিনিস। কার্লসবাডের জলও রয়েছে ওখানে, সোয়াপ্পেরও। আজকাল অবিশ্যি এ সব নামের নেশা নষ্ট হয়ে গেছে। সে সব আগের জিনিস নেই এখন আর। তবুও দুটো জলের বোতল আর একটা গ্লাস নিচে নিয়ে যাবে ভাবছিল নিশীথ।

এত সমৃদ্ধি থাকতে জিতেন দাশগুপ্ত আলু ভাজা খেয়ে মরে। দেখ, কেমন হাঁ করে পড়ে আছে লম্বা থুরকিসা মাছের মত। নাকে চশমা আঁটা, বাকি সমস্তটা—মন নয়, শরীরবৃত্তিও নয়; অচেতন ওষধির মত যেন—রাতের বাতাসে স্নিগ্ধ হচ্ছে। নিশীথ দুটো জলের বোতল তুলে নিল। মদের বোতলগুলো পাশে, এক গোছা চাবি চকচক করছিল। ঘরের সব দেরাজ বাকস আলমারির চাবি হয় তো এই গোছার ভিতর রয়েছে। অথচ এরকম হ্যাঁচকা পড়ে আছে। চাবি হাতে তুলে বোতল দুটো রেখে দিল নিশীথ। কয়েকটা দেরাজ খোলবার পর মানিব্যাগ পাওয়া গেল। তিন-চারটে ওয়ালেট, একশ টাকার সিলমারা নোট সব প্রতিটি ব্যাগেই। দুই-একটা টাকা তুলে নেবে সে? টাকার খুব দরকার নিশীথের। কলেজের কাজ ছেড়ে দিতে হবে। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে পরিবার আনা দরকার। এই লেকপ্রদেশের দিকেই থাকলে, অথচ চাকরি করবার দরকার নেই। করেছে আজীবন মফস্বলে অধ্যাপনা, কলকাতায় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কী করে বড় চাকরি দেবে তাকে? বয়সবৃদ্ধি থাকলেই তো হল না, শিক্ষা-সংস্কৃতিও ভুইচাঁপার মত বিমুগ্ধ করে বটে। কিন্তু সুশিক্ষিতকে, অন্যদের কাছেও তো ভুঁইফোঁড় ব্যাঙের ছাতা ছাড়া আর-কিছু নয়। এমনি বিদ্যে থাকলে হবে না, বিলিতি ডিগ্রি কোথায় তার—দিশি-বিলিতি এটা-ওটা টেকনিক্যাল জ্ঞানের অভিজ্ঞান কোথায়, বয়স কোথায় নিশীথের যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে—দাঁড়াতেও যদি অনুমতি দেয় তারা? কী করবে নিশীথ তা হলে? প্রাইভেট কলেজে মাস্টারি? দেড়শ টাকার জায়গায় দুশ বা আড়াইশ টাকা মাইনের? ওকে লেক—কলকাতায় পোষায় না, উত্তর কলকাতায়ও না। তাছাড়া মাইনের জন্যেই শুধু নয়, অন্য নানা কারণেই কোনো কলেজে কাজ করবে না আর সে। ছেলে, অধ্যাপক বা গভর্নিং বডিগুলোকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। দোষ বাংলাদেশের বিশ শতকের ভিতরে যে-ধ্বংসের কীট রয়েছে—দিনের পর দিন তা শ্রীবৃদ্ধির। কিন্তু তবুও অদৃষ্টের দোষে নয়—খুব সম্ভব। কিন্তু কী করবে নিশীথ? সে তো ডাক্তারি, আইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা কোনো-রকম শিল্প-ব্যবসায়ের দিকেই যায় নি। দেশের ভিতর মাস্টারির চিতে জ্বলছে আজ দিকেদিকে। মাস্টারদের কোনো বন্ধু নেই আজ আর। ছেলেরা গ্রাহ্য করে না মাস্টারদের ঃ খুব সম্ভব তারা কম মাইনে পায় বলে। গভর্নিং বডি চোখ উল্টে কথা বলে ঃ খুব সম্ভব কম মাইনে দিয়ে এইসব নিরীহ তালকানাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এত সহজ এত চমৎকার বলে। যারা ধর্মঘট চালিয়ে গরিব মানুষের খাওয়া-পরা-মাইনের সুবিধা করে দিতে চায় তাদের নজর, ফ্যাকটরির মজুর, কিষানদের দিকে। খুব ভাল জিনিস। কিন্তু একজন ওস্তাদ বাবুর্চি বা মোটর ড্রাইভার যে-টাকা পায় ইউনিভার্সিটির একজন লেকচারার যদি তার চেয়ে কম পায়, তাহলে সাধারণ স্কুল-কলেজের মাস্টাররা কী পায়, কী খায়, সেদিকে কি নজর পড়বে না মার্ক্সিস্ট বা কংগ্রেসি বিপ্লবীদের—কিংবা, যেখানে বসেই হোক না কেন, দেশের মানুষের মঙ্গলচিন্তা যাঁরা করেন সেইসব স্বচ্ছ অনুধ্যায়ীদের? সরকারি চাকরিতে যে যেখানে আছে তাদের চাকরির মেয়াদ ও চুক্তি যে-রকমই হোক না কেন, তাদের ছাঁটাই করা চলবে না। খবরের কাগজগুলো এদের সমর্থন করে লিখছে। খুব ভালো কাজ করছে। কিন্তু এই দারুণ বিশৃঙ্খলার দিনে স্কুল-কলেজের মাস্টাররা যে ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হয়ে চাকরি পাচ্ছে না, অন্ন পাচ্ছে না, বাড়ি পাচ্ছে না, তাদের প্রতিষ্ঠানের কোনো মর্যাদাশীল কেউই যে তাদের রক্ষা করছে না, আশ্রয় দিচ্ছে না এ নিয়ে লিখতে হবে না?

পে-কমিশনের টাকা পেয়ে গভর্নমেন্টের জোয়ান পেয়াদারা ম্যাগনোলিয়া খাচ্ছে, এগবিজশিনে যাচ্ছে। মেয়েমানুষকে চোরা বাজারের মাল পৌঁছিয়ে দিয়ে, স্ত্রীকে, শেয়ালদার বাজারের মাছ-তরকারি। লাইফ ইনসিওরেন্স করছে, সেভিংস ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলছে। বেশ ভাল কাজ করছে, এরা যদি এখন সমস্ত না-করতে পারে এদের ওপরওয়ালারাই কি বরাবর এ সব করবে? কিন্তু ছেলেমেয়েদের জন্যে গরু-মহিষের দুধ কিনে দেবার ক্ষমতা নেই, না-খেতে পেয়ে দুধের বোঁটা শুকিয়ে গেছে স্ত্রীদের, ঘর নেই, চাল নেই, কাপড়ের পেছনের দিকে ছিঁড়ে গেছে মাস্টারদের, তাদের স্ত্রীদের, এরা বেসরকারি জীব বলেই এদের জন্যে কোনো কমিশন নেই—এ-রকম হতভাগ্য দেশে কোনো স্কুল-কলেজ না থাকাই ভাল। সব পুলিশ হয়ে থাক, সেপাই হয়ে যাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় হাজার দশ-পনের টাকা জিতেন দাশগুপ্তের ব্যাগ খুলে সে নিয়ে যেতে পারে। কাল যদি টের পায় জিতেন, নিশীথকে সন্দেহ নাও করতে পারে। সোনার হীরের গয়নার কতকগুলি বাক্স আছে, এও যদি সরিয়ে নিয়ে যায়, নিশীথ দেরাজগুলো খুলে চাবি ঝুলিয়ে রেখে যায়। তা হলে কাল রাতে যে কলকাতার কালাকারদের হাতে জিতেনের খোয়া গেছে সব, এ বিষয়ে ওদের কারুর মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না। নিশীথকে সন্দেহ করেও তাকে ধরতে পারবে না। চাবিও হাওয়া করে দেবে সে, ব্যাগ-ট্যাগ সব। কোথাও হাতের ছাপ রাখতে যাবে না। টাকাকড়ি এখুনি সরিয়ে ফেলবে সে। রসা রোডের দ্বারকা সাঁতরার জিম্মায় রেখে আসবে। সাঁতরা হয়ত এতক্ষণে ঘুম থেকে জেগেও গেছে, সংসারের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। এই তো পনের কুড়ি মিনিটের পথ এখান থেকে, ভোলা গিরির শিষ্য সাঁতরার বাড়ি। আশ্চর্য রকমের সৎ মানুষ দ্বারকা। তাকে গিয়ে বলবে। দেশের থেকে এলুম, শেয়ালদা থেকে সোজা তোমার এখানে, চাকরি-বাকরি স্ত্রীর গয়না এই গচ্ছিত টাকাগুলো তোমার কাছে রাখো দাদা। মেসে উঠেছি, আজ-কাল এক সময় তোমার কাছে এসে টাকাগুলো নিয়ে যাব। এসব টাকার কথা কাউকে কিছু বলবে না। বরং ব্যাঙ্কের লোহার সিন্দুক কথা বলে, কিন্তু দ্বারকা সাঁতরা কখনোও না।

ভাবতে ভাবতে নিশীথ একশ টাকার নোটের মোটা-মোটা তাড়াগুলো সব কটা মানিব্যাগের ভিতর যেমন ছিল, ভরে ফেলতে লাগল। কী হবে এ সব টাকা নিয়ে? এ সব টাকা দিয়ে কী করবে সে? কলকাতার বাংলাদেশের বেকার মাস্টার গরিব মাস্টার অধ্যাপকদের জন্যে দানপত্র খুলবে? কিন্তু এ ত শিশির বিন্দু, সমুদ্রের প্রয়োজন। কোটি-কোটি টাকার দরকার এ দেশের শিক্ষাকে সম্মান ও শক্তি দিতে হলে, যারা শিক্ষা দেবে প্রাণশক্তি ও মর্যাদায় তাদের স্বাধীন ও সরস সফল করে তুলতে হলে।

জিতেনের টাকা সে নিতে পারে–উটপাখির মত চোখ বুজে নিতান্ত নিজের দরকার। পৃথিবীর কথা ভাবতে গেলে চলবে না; পৃথিবী এর, ওর, তার, নয়–ইতিহাসের সকলেরই নিজের জিনিস। যে-সূর্য নিভে যাচ্ছে, যে-সময় মানুষকে ধ্বংস করে ফেলবে একদিন–এইসব বড়-বড় ব্যক্তির লীলার জিনিস পৃথিবী। একজন মানুষ, একটা দল একটা দেশ, বা মহাদেশ কী করে সুনিয়ন্ত্রিত শক্তি পাবে পৃথিবীকে। মানুষের মন উন্নত হয়ে উঠতে পারে কিন্তু দু-পাঁচ দুশ-পাঁচশ বছরের মধ্যে তো নয়ই, কত সময় লাগবে কে জানে–কিন্তু সে সফলতা নাও লাভ করা যেতে পারে–মানুষের পৃথিবীতে কোনো দিনই। আজকের পৃথিবীর এ-রকম ভয়ঙ্কর বিস্রস্ত প্রস্থানের ভিতর ব্যক্তি নিজের শুভার্থ ছাড়া আর কী কামনা করতে পারে–কী মানে আছে অন্য কোনো কামনার? নিশীথ ভাবছিল, ব্যক্তি সে, অতিস্তনিত সমুদ্রের ভিতর ফেনার গুঁড়ির মতন অনেকটা, প্রতিটি ফেনার গুঁড়িকে যদি দান করা যায় ভেবে দেখবার শক্তি, তা হলে ব্যাপারটা যেরকম চাঁছাছোলা নিষ্ঠুর হয় পৃথিবীতে প্রতিটি ব্যক্তির জীবন আজ সেই রকমই তো। এ অবস্থায় কী করতে পারে, ফেনার গুঁড়ির মত মানুষ, প্রতি মুহূর্তেই টালমাটাল সমুদ্রের রাক্ষুসে শক্তির আক্রোশ থেকে নিজেকে নিজের পরিবারকে সামলানো ছাড়া? সেটুকুও কি পারবে মানুষ? কে পারছে? কত কম লোক পারছে? কত কম ব্যক্তি নিজেকে বাঁচাতে, অন্নবিস্তর সুস্থ রাখতে পারছে–পৃথিবীর বা রাষ্ট্রের টাল সামলে সেটাকে সুস্থ করে তোলবার শক্তি তার আছে এ যদি সে মনে করে থাকে তবে মিথ্যে তার মন। কে শুনবে এই বোকা মিথ্যার্থীকে। নিশীথের মনে হচ্ছিল একটা বিষম শিংশপা সমুদ্রের ঘূর্ণির অন্ধকার রাতে ফেনার গুঁড়ির মত উড়ছে যেন সে–এই তো এখনই উড়ছে; মফস্বলের সেই কলেজের কাজ নেই (ওটা ছেড়ে দেবে সে, না হয় তাকে ছাড়িয়ে দেবে) কলকাতায় কোনো কাজের জোগাড় নেই, সম্ভাবনা নেই। নিশীথের একটি মেয়ে কোথায় যে, কেউই তো বলতে পারে না, ঘর ছেড়ে গেছে, না হাওয়া হয়ে গেছে এমনিই নিজেকে নিকেশ করে ফেলার জন্যে, না অন্য কেউ সাবড়ে ল্যাশ গুম করে ফেলল–ষোল বছরের চমৎকার নিরপরাধ অসংসারী মেয়েটি–কেউই কোনো খোঁজ-খবর দিতে পারলে না। অথচ মেয়ে ঘর-ছেড়ে গেছে বলে একটা গ্লানি লেগে রয়েছে নিশীথের পরিবারে, মুখে বিশেষ কিছু না বললেও বলি-বলি চোখ তুলে নিশীথকে আর তার স্ত্রীকে জানিয়ে দিয়ে যায় ব্যাপারটা, যে যখন যে-কোনো কারণেই কিছুটা বিমুখতা বোধ করে, একটু ঠাসাবার দরকার বোধ করে নিশীথ আর তার স্ত্রীকে। আর-একটি মেয়ে দেশের বাড়িতে মরছিল; থাইসিস হয়েছে; নিশীথ তাকে অনেক হিম্মৎ করে কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে কলেজের প্রফেসর মহিমবাবুর মারফৎ; নিজে যেতে পারে নি, নিউমোনিয়া হয়েছিল তখন নিশীথের। বাইশ বছর বয়স নিশীথের ছেলের; মানুষ হল না। শক্তি ছিল কিন্তু বি-এ পাস করে আর পড়ল না, ইয়ারদের সঙ্গেই কাটায় দিনরাত; চেনস্মোকিঙ করে; সিগারেট ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ধোঁয়া ওড়ায় কিনা জানা নেই; মাঝে-মাঝে অনেক জায়গা থেকে নালিশ এসেছে যদিও, তা হবে; নিশীথের চোখে পড়েনি। কিন্তু উত্তেজিত জলরস যে খায় হারীত, নিশীথ জানে তা। কী করবে? উপায় নেই। ছেলের ওপর কোনো হাত নেই এখন আর। যথাসময়ে ছিল; বেশ ঠিক ভাবেই তো। কিন্তু তাতে ছেলে বিগড়ে গেল কেন, বলতে পারে না নিশীথ। তার নিজের পিতৃপুরুষের দিক দিয়ে (চারপুরুষ অন্তত–যতদূর জানা আছে তার) বেগড়াবার কোনো ইতিহাস নেই। হারীত প্রায়ই বাড়িতে থাকে না, দেশেই থাকে না। নানা রকম জাতের ইয়ার আছে তার, নানা চক্রের। কিছুদিন থেকে সে একদলের সঙ্গে কলকাতায় আছে, রেভল্যুশনের তোড়জোড় করছে কিন্তু কোথায় আছে জানা নেই। নিশীথের স্ত্রী মফস্বলের বাড়িতে এখন একেবারেই একা; অবিশ্যি এক দিকে কলেজের ফিলসফির লেকচারার মহিম ঘোষাল সপরিবারে থাকে মহিম ঠিক তত্ত্বগ্রাহী নয়। সাংসারিক পলেস্তারায় খুব সম্ভব ভিতরেরও সাত্ত্বিক নিশীথের স্ত্রী সুমনা চালিয়ে নিতে পারবে–এই একটা মাস–মহিম ঘোষালের পরিবারকে, অপরূপ সেই অর্চিতা ঘোষালকে, কাছে-কাছে রেখে। খুব শক্ত এনিমিয়া হয়েছে সুমনার। নিশীথের প্রভিডেন্ড ফান্ডের বাকি সাতশ টাকা খসিয়েছে; প্রভিডেন্ড ফান্ডে নেই কিছু এখন আর। দেখে এসেছে উকিল প্রকাশ মিত্তিরের ছেলে নরেন ছেলেটা বেশ সুস্থ–সমর্থ, মতি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতি অবিশ্যি ভালো নয়, খুব সম্ভব সিফিলিস নেই, ডাক্তার মজুমদারের মত স্বচ্ছ ডাক্তারের হাত থেকে বেরিয়ে তবে রক্ত দেওয়া তো; আরো কেউ-কেউ রক্ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মজুমদারের পরীক্ষায় টেঁকেনি। যে-সব কাজে মাদকতা ও অনাছিষ্টি পরের কেবলই অপকার—মাঝে-মাঝে উপকারও হয়, সে-সব ব্যাপারে নরেনকে পাওয়া যাবে। মফস্বলের বাড়িতে আগুন নেভানো, কলকাতায় এসে হারা-উদ্দেশে দমকল লেলিয়ে দেওয়া, বিনাটিকিটে রেলের ফার্স্ট ক্লাসে চড়া, যেখানে-সেখানে শেকল টেনে-টেনে থামানো, কলেরা-বসন্ত রোগির ডিউটি নেওয়া, চেক জাল করা, টাকা চুরি করা, শহর-গ্রামের ভদ্র-অভদ্র ঘরের ভিত ভাঙা। নরেন দিলদ রিয়াই, নারিকেলের খুব শক্ত কালো মালায় সিদ্ধির রস, পর্পটির রস, রক্তের রস, সুমনাকে রক্ত দিচ্ছে। কিন্তু নরেনের নামে বিশেষ বদনাম শুনে এসেছে নিশীথ এবার জলপাইহাটির থেকে। রাণুর ব্যাপারে নরেন দাগি। লোকেরা বলছে। সুমনা দেখতে ভাল ছিল, রোগে-রোগে কিছু নেই যদিও এখন, একটা গা-ঝাড়া দিলেই এখনও কেমন একটা ঝিলিক বেরোয়। নরেনের রক্তে কাজ যে না-হচ্ছে তা নয়। তবে পার্নিসাস এনিমিয়ার খুব দীর্ঘ পথ—অনেক বাঁক—নানারকম ছোবল—প্রতিনিয়তই নির্বিষ নির্মল করে রাখার প্রয়োজন। ডাক্তার মজুমদার ও তার কম্পাউন্ডারকে টাকা দিয়ে এসেছে নিশীথ, মহিম ঘোষাল আর তার গিন্নিকে, দেখবার-শোনবার ভার।

কলেজের একটি ছেলে হিতেনকেও বলে এসেছে রোজ গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে। দরকার হলে নিশীথকে লিখে জানাবে ওরা। জিতেন দাশগুপ্তের হাজার বার-চৌদ্দ টাকায়—টাকার দিক দিয়ে অন্তত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না নিশীথের। ঝড়ের সমুদ্রে একফোঁটা পদার্থের মত এই যে সে ছিটকে-লটকে ফিরছে, তার একটা উপায় হয়। যে-মেয়েটার যক্ষা হয়েছে, কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতালে আছে—বাঁচবে না মেয়েটা—তবুও যতদিন বেঁচে থাকে ভানু, তার খরচ পোষাতে পারে, নিশীথ, মাঝে-মাঝে কলকাতার থেকে ফল ওষুধ নিয়ে ভানুকে দেখে আসতে পারা যায়, স্ত্রীকে আনতে পারা যায় কলিকাতায়। হয় ত গিডনি ঝাড়গ্রামেও পাঠানো যেতে পারে কিছুটা সময়ের জন্যে। নিজেও সে কয়েকটা বছর হাঁফ ছেড়ে বসতে পারে—কোনো চাকরি নয়, কিন্তু তবুও টাকা আছে, স্বাধীনতা আছে, মনের স্বস্তি আছে, এমন কোনো ব্যাপারে হাত দিয়ে—ধরো, ইংরেজি-বাংলা প্রবন্ধ লিখে, দরকার হয় গল্প-উপন্যাস লিখে—প্রয়োজন হলে ইংরেজিতে লিখে—ধীরে-সুস্থে সুশৃঙ্খল হয়ে বসবার সময় পায়। ইতোমধ্যে মেয়েটা মরে যাবে খুব সম্ভব; স্ত্রীও মরে যাবে; কিন্তু তাদের মৃত্যু শয্যাকে খানিকটা স্নিগ্ধ করা যাবে এ টাকা হাতে থাকলে—মনে হচ্ছিল নিশীথের। নিজের ছেলেকে—হারী তকে, ফিরে পাবে না বটে কিছুতেই কোনোদিনও আর, কিন্তু স্বাধীনভাবে যথেষ্ট রোজগারের উপায় যদি পাকাপাকি করে নিতে পারে, তাহলে চেনাজানা কয়েকটা দুঃস্থ পরিবারকে দাঁড় করিয়ে দেবার পক্ষে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারে সে। চারটে পরিবারের কথা মনে হচ্ছিল তার, কলকাতার বুকের ওপরে বসেই ধনেপ্রাণে মরছে। এরা কি মরে যাবে? এদের মরতে দেওয়া সহজ। নিশীথ অবিশ্যি এদের খয়রাতির নেশা ধরিয়ে মাথা খেতে যাবে না, কিন্তু সে নিজে যদি শক্ত স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে, তাহলে এ পরিবার কটি যাতে ঠিক পথে চলে দাঁড়াতে পারে সে ভাবে ব্যবস্থা করা সহজ হতে পারে—নিশীথের পক্ষে। মফস্বল কলেজটার কাজে নিশীথের ফিরে যাবার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। সে কাজটার ওপর—সত্যি বলতে কি—যবনিকা পড়ে গেছে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আর কলেজের গভর্নিঙ বডির সেক্রেটারি হরিলাল বাবুকে নিশীথ বলেছিলঃ দেড়শ টাকা মাইনের এ চাকরিতে পোষাচ্ছে না তার, অন্তত দুশ পঁচিশ-আড়াইশ না করে দিলে কী করে চালাবে সে? শুনে হরিলালবাবু আর জি-বির কয়েকজন মেম্বার বলেছিল, আপনার যদি কাজ করবার ইচ্ছে না থাকে করবেন না—কলেজের কাজ ফলারের হাঁড়ি নয়, এখানে টাকাকড়ির কথা নেই। নিশীথ বলেছিল, 'বাইশ বছর তো হল সে সব; হয়রান হয়ে পড়েছি। এক মাসের ছুটি নিচ্ছি। দরখাস্ত লিখে দিলাম। কালই—যদি সম্ভব হয় আজ রাতের গাড়িতেই, কলকাতায় যাব।' হরিলালবাবুরা বললে, 'চাইলেই কি ছুটি পাওয়া যায়? কী গ্রাউনডে ছুটি নিচ্ছেন আপনি? আপনার তো কোন অসুখ-বিসুখ নেই, আপনার শরীর তো সুস্থ।' নিশীথ বলেছিল, 'আমার স্ত্রীর এনিমিয়ার জন্যে রক্তের দরকার হল, আমিই তো রক্ত দিতে চেয়েছিলাম, ডাক্তার মজুমদার আমাকে দেখেশুনে বললেন ঃ আপনি যদি রক্ত দেন আপনাকে রক্ত দেবে কে নিশীথবাবু? পাণা চার্য অমিয়রতন চট্টখণ্ডী ভালমানুষ—সুস্থ মানুষ—মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়স—তেষ্টা পেয়েছিল—কাঁচের গেলাসে জল খাচ্ছিল—হাতে গেলাস, মুখে জল, মরে গেল। স্ত্রীকে রক্ত দিতে-দিতেই মরে যাবেন আপনি। অবিশ্যি চট্টখণ্ডী মরে ছিল বলে মরবেন না। কিন্তু আপনি অসুস্থ। বিশ্রাম নিন।' হরিলালবাবু বললেনঃ 'এ তো কোন মেডিকেল সার্টিফিকেট হল না। তা ছাড়া ডাঃ মজুমদারের সার্টিফিকেট আমরা গ্রাহ্য করব না। তিনি সিভিল সার্জেন আছেন। তাতে আমাদের কী? আমাদের স্বাধীন কলেজ। আমাদের নিজেদের ডাক্তার দেখে দেবে আপনাকে—যদি ছুটির দরকার হয়।' কোনো সার্টিফিকেট জুড়ো না-দিয়ে এমনিই দরখাস্ত করে কলকাতায় চলে এসেছে নিশীথ। কলেজেরও কাজ থাকবে না তার। কলেজ কমিটির পরের মিটিঙেই চটকে যাবে। একটা রেজিগনেশন দিয়ে চলে এলেই ভালো হত, কারুর মনেই কারুর প্রতি কোনো বিষ থাকত না তাতে।

প্রভিডেন্ড ফান্ডে কোনো টাকা নেই আর নিশীথের; হাতে কোনো টাকা নেই, কলকাতায় চাকরি নেই; কলকাতায় চাকরির চেষ্টা অনেকবার হয়েছে; আর এ বয়সে তার মত লোকের জন্যে বাস্তবিকই কোনো সঠিক চাকরি নেই কলকাতায়। চারদিককার তাড়াতাড়ি কাড়াকাড়ির ভিতর অবিলম্বেই কিছু নেই—হয় ত স্থায়ীভাবে কিছুই নেই, কোনো দিনই নেই, অন্ধকার বায়ুভূত সমুদ্রের সেই অচেতন ফেনার গুঁড়িটা ছিটকে পড়ছে; মনে হচ্ছে যেন খুব আনন্দ পাচ্ছে। কিন্তু ওটা ফেনা নয়—মানুষ—ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—পথ চায়, ঘর চায় ওর যে মন আছে স্থির স্বাধীন হয়ে একান্ত বসে তার ব্যবহার চায়। অনেক দূরে—সৈকতের কী এক বিচিত্র সাধনোচিত ধামে জমানো ফেনার মত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নিগ্ধ হয়ে মিশে আছে জিতেন দাশগুপ্ত আর তার স্ত্রী; মিশে থাকবে চিরদিন। ওরা পিতৃমাতৃযানের মানুষ লোকায়ত হয়ে রয়েছে এই বিছানায়—ওদের সঙ্গেই কারুর কথা হয় না। সব নোটের তাল ব্যাগে চলে গেছে—দেরাজে ব্যাগগুলো যেখানে ছিল সেখানে রেখে, দেরাজে চাবি মেরে, মদের বোতলগুলোর একপাশে চাবির গোছা রেখে দিয়ে খালি হাতে বেরিয়ে গেল নিশীথ।

টাকা নেবার খুব দরকার ছিল তার। পঁচিশ-ত্রিশ হাজার সরিয়ে ফেললে জিতেনের কিছু এসে যেত না। দেড় হাজার-দু'হাজার টাকা মাইনে পায় সে, পরামর্শ দিয়ে আরো হাজার-দুই। এ ছাড়া ঘুষ খেয়ে নেয়, এমনিই অন্য নানা রকম উপার্জন আছে তার, ব্যবসা আছে। জিতেনের ক্ষতি হত না, নিজের খুব উপকার হত। এ বিশৃঙ্খলার যুগে পৃথিবীকে উদ্ধার করা দূরের কথা সমবায়কে ত্রাণ করাও খুব শক্ত, অন্ধভাবে চালিত হয়ে সমবায়সুদ্ধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কাজেই ব্যক্তির আত্মত্রাণের পথ খোলা রাখা দরকার। না-হলে সে যেখানে যে-অবস্থায় আছে একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে। কিন্তু এ সব সফল মীমাংসার পরেও জিতেনের টাকাটা নিতে পারল না নিশীথ। তবুও মনে হল, টাকা না-নিয়ে ভুল করল সে, ও জিনিসটা চুরি মনে করে ব্যর্থ সংস্কারের প্রশ্রয় দিল। সংস্কারগুলো কিছুতেই মরতে চায় না, কিছুতেই আসতে চায় না সত্য উপলব্ধি, যদি আসেও-বা, কথা ভেবে নিয়ে আলোকিত হয়ে ওঠে মন, তবুও কাজে অগ্রসর হতে গেলে অন্ধকারে অন্ধ সৈনিক আমরা সব যে যাকে মারছি, যে যাকে খাচ্ছি। পথ খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও। সব আলো নিভে গেছে।

জিতেনের ঘর থেকে বেরিয়ে একতলায় না-গিয়ে খাবার ঘরে ঢুকল। ক্ষিদে পেয়েছে, বড্ড তেষ্টাও পেয়েছে নতুন করে আবার। খাবার ঘরে ঢুকে ডিনার টেবিলের ওপরেই জিনিস পেল নিশীথ। জিতেনের খাবার ঢাকা আছে, চারটে ডিম সেদ্ধ, অনেকগুলো আলুভাজা। ঠাণ্ডা আলুভাজা খেয়ে যাবে জিতেন। খেতে বসবার সময় ফ্রাইপ্যানে চড়িয়ে গরম করে দেবে মিসেস দাশগুপ্ত। এ সব আলু কাল রাতেই ভাজিয়ে রেখেছে তা হলে; স্বামিনী কি আগে-ভাগে কাজ সেরে রাখতে চায়? জিতেন কি বাসি আলুভাজা চায়? কাঁচা খেকো নাকি জিতেন? কফি তৈরি করে রাখে নি অবিশ্যি। টোমাটো সস রয়েছে। নিশীথ আর দেরি না-করে খেতে আরম্ভ করল। চারটে ডিমই খেল সে। জিতেনের ডিশে ডিমের সঙ্গে মাখন রাখা হয় নি বটে। কিন্তু নিশীথ মাখনের টিন পেড়ে এনে মিলিয়ে নিল, গোটা পাউরুটিটাই শেষ করে ফেলল, শিশিতে মাস্টার্ড ছিল, ঢেলে নিল বেশ ঢালাও হাতে, আলুভাজা, ডিম মাস্টার্ড মিশিয়ে; বেশ ঝাঁঝাল রাই-ক্ষিদের পেটে সবই ভারী চমৎকার লাগছিল নিশীথের। আর কী খাবার আছে? মাখন আছে, পাউরুটি আরো আছে, মর্মালেড আছে, সস আছে, খেল যতটা পারল সব, টিনের মাছ মাংস আছে, টিন খুলবার হাঙ্গামার মধ্যে গেল না সে। জল খেল। সব জলই বরফ মেশানো যেন। খেতে-খেতে একেবারে অন্তঃস্থল তলিয়ে স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে থাকে, কেবলই খেতে ইচ্ছে করে, কেবলই স্নিগ্ধ হয়ে পড়তে। খেল সে, জল খেতে লাগল অতল জলের মত যেন। কারলসবাড, সোয়াপ্পে, বায়রনের জল হয়ে গিয়ে বরফ গালিয়ে। বসন্তের রাতে সাদা বরফে ঢাকা হিমানীর মত লাগল নিজের শরীরটাকে, নিজের অন্তরাত্মাকে।

নিচে চলে গেল নিশীথ। মশারি টানিয়ে শুয়ে পড়ল।

জিতেন পাঁচটার সময় তার ঘুমের মেয়াদ কাটিয়ে উঠল। যেন জেগেই ছিল সে। না তা নয়, খুব বেঁহুশ হয়েই ঘুমুচ্ছিল। কিন্তু এ সব লোককে ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করতে হয়। পাঁচটার সময় ঘুম না-ভেঙে পারে না তার। সাতটার সময় অফিসে যেতে হবে আজ; জিতেন একটা হাই তুলতে না তুলতেই দেয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। ঘরে মৃদু স্নিগ্ধ সবুজ বাতি জ্বলছে। সমস্ত শরীর বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল জিতেনের। রাত তিনটে-চারটের সময় মখমলের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলে হত, কিন্তু ঘুম ভাঙে নি। সমস্ত লম্বা আঁট ঠাণ্ডা শরীরটার দিকে নজর পড়ল। পাশে ছিমছাম দীর্ঘ ফর্শা শরীরটার দিকে তাকিয়ে দেখল।

নাঃ, আর দেরি করা যায় না। স্ত্রীকে জাগানো চলে না। ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক। অনেক রাত জেগেছে। ডাইনিং হলে একটা শব্দ হচ্ছে না? ইঁদুর ছোটাছুটি করছে বটে। ইঁদুর মারবার জার্মান মেশিনের কথা ভাবছিল দাশগুপ্ত। ছোটবেলার তার না-কাকা দুরমুস দিয়ে ইঁদুর সাবাড় করে ফেলত। জিতেনের বাবার চোখে সে সব পড়লে ন-কাকাকে বড্ড নাকাল হতে হত; মাছ-মাংস খেতেন না বাবা, কোনো প্রাণীকেই মৃত্যুব্যথা দিতে রাজি ছিলেন না। মাঝে-মাঝে কেবলমাত্র ছারপোকা মারতেন। তাও নিজের হাতে না। বাবাকে চেয়ার, কুশন, খাট, ক্যাম্পখাটের থেকে ছারপোকা ঝেড়ে ফেলতে দেখলেই জিতেন, হিতেন, ঋতেন গিয়ে হাজির হত সেখানে; এর চেয়ে মজার জিনিস তখনকার জীবনে খুব বেশি ছিল না তাদের; ছারপোকা ঝেড়ে খসিয়ে বার করে দিতেন তিনি, মারার পালা ছেলেদের হাতে।

'খাবারের ঘরে বেড়াল,' বললে জিতেন দাশগুপ্ত তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে, 'বেড়াল ছাড়া ও রকম শব্দ হয় না। ইঁদুরগুলোও খুব ধাড়ি হয়ে গেছে এ বাড়িতে।'

উঠে দাঁড়াল জিতেন। সোয়া পাঁচটা। বাথরুমে চলে গেল। পৌনে ছ'টার সময় ফিরে এল। ছ-টার ভেতর স্যুট-টাই এঁটে ফিট হয়ে গেছে সে। নমিতা উঠে নি এখনও; স্ত্রী স্লাকসটাকে টেনে দিল কোমর অবধি। হ্যাঁ ঐ রকম থাক। আশেপাশের বাড়িতে সাধু বাবাজীরাই থাকে। দাশগুপ্তের কামরার জানালা সব খোলা বটে, তবে, নমিতা যেখানে শুয়ে আছে চারদিক-কার কোনো বাড়িরই কোনো দৃষ্টিকোণ এখানে ঠিক মতন কান্নিক মারতে পারে না। যাকগে—দাশগুপ্ত জানালার পর্দাগুলো টেনে দিল। বন্ধ করে দিল দু-একটা জানালা—না হলে রোদ পড়বে নমিতার মুখে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে ও। না, জাগিয়ে দেবে না। খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল জিতেন। হাত বাড়িয়ে খেতে গিয়ে দেখল, কোথাও কিছু নেই। বাঃ, টেবিলের ওপরেই ত খাবার ঢাকা থাকে তার। দু-তিনটে ডিশ পড়ে আছে। কিন্তু জিনিস কোথায়? ডিম কোথায়? চারটে ডিম? আলুভাজা কোথায়? ছটা নৈনিতাল কুচিয়ে ভাজা, ঘানির তেলে? ইঁদুর খেয়ে ফেলল সব?

কানাইবাবুর বাড়ির হুলো বেড়ালটা ঢুকেছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলের উপর এলোমেলো ডিশগুলো ভাল করে সমঝে দেখবার জন্য জিতেন তার ঢ্যাঙা ঢিলে শরীরটা তাড়াতাড়ি নোয়াল। লম্বা-লম্বা ঠ্যাং ও ওপরের ধড়ের মাঝখানে তলপেটের দিকে নব্বই ডিগ্রিই সার্কিট বেশ টাইট করে দেখতে লাগল জিতেন। চশমা-আঁটা মুখ ডিশগুলোর এত কাছে ঘনিয়ে এল, মনে হল ওগুলো শুঁকছে যেন সে। ক্ষীণ চোখ দিয়ে দেখে নিচ্ছিল ডিশগুলোর একেবারে গায়ের ওপর ডিম সেদ্ধ বা আলুভাজার কোনো ছন্নাংশ কোথাও পড়ে আছে কিনা; নেই যদি তাহলে এসব হলুদ দাগ কিসের, ওসব লাল দাগ বাদামি দাগ? রাই খেয়েছে কেউ? মর্মালেড খেয়েছে? টোমাটো খেয়েছে? দাশগুপ্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। চশমা খুলে অন্ধচোখে চারিদিকে তাকাল একবার। চশমা এঁটে ঘুরে-ঘুরে খুঁজে পেতে দেখল জোড়া-তাড়া দিয়ে পেটে চালাবার মত কোনো জিনিস কোথাও আছে কিনা।

নেই কিছু। গ্যাসের স্টোভ রয়েছে। কফি তৈরি করবে? না, সময় হয়ে গেছে। সিঁড়ি ভাঙতে লাগল জিতেন। অফিসে গিয়ে খাবার আনিয়ে নেবে। নিশীথ কী করছে? ঘুমুচ্ছে? ভিতরে ঢুকে দেখে এল জিতেন, মশারি টানিয়ে বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে। গ্যারেজ থেকে মোটর বার করে নিজেই চালিয়ে নিয়ে অফিসে চলে গেল জিতেন।

সাড়ে আটটার সময় নিশীথের ঘুম ভাঙল। ঘুম আগেও বারবার ভেঙে যাচ্ছিল। অদ্ভুত-উদ্ভুটে স্বপ্ন দেখে। ঘুম ভাঙছিল, ঘুমিয়ে পড়ছিল আবার। ঘুমিয়ে পড়ছিল, ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল আবার। স্বপ্নে জিতেন দাশগুপ্তকে জার্মান সিলভারের কাঁটা-চামচ নেড়ে-চেড়ে মুখভরা শয়তানি ঘনিয়ে তুলে হাসি-হাসি মুখে ডিম খেতে দেখেছে নিশীথ। নিশীথের সমস্ত চালাকি ধরে ফেলেছে, বোতলের পর বোতল জেলি খেল, মর্মালেড খেল, আচার খেল, কিছুই খাওয়া হয় না, বলে প্যাকিং পেপারে আলুভাজাগুলো মুড়ে, পকেটে ফেলে অফিসে চলে গেল। স্ল্যাকস কোমর অব্দি উঠে গেল—খুব টাইট করে পরল, ঢল-ঢল হড়-হড় করে খসে পড়তে লাগল আবার—মেয়েটি কে? শ্যামলী? শ্যামলী স্ল্যাকস পরছে? শ্যামলীই তো। কিন্তু মিসেস দাসগুপ্ত কী করে শ্যামলী হল? কী করে হল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তাগিদ নেই স্বপ্নের নিশীথ রাজ্যে, হয়েছে যে তা নিয়ে বিস্ময়ের বাষ্পও নেই; সবই ছায়া, আবছায়া, দিনের আলোর পৃথিবীর কাঠামোটার রেখে দিয়ে তাকে ঢেলে সাজিয়ে নেওয়া খুব ভরা আলোর ভিতরে—আর-এক দেশের, রাত্রির দেয়াল মেঝে ভিত্তিচিত্রের ক্ষেত-মাঠের বধির স্নিগ্ধতার ভিতর দিয়ে, বোশেখের ভরপুর রোদের সিঁড়ি জানালা বাতাস মির্জা-পুরী গালিচার পথ ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে। 'খোঁপা খসে যাচ্ছে তোমার—খসে যাচ্ছে তোমার, উঠিয়ে নাও নমিতা—কী বলবে দাশগুপ্ত এরকম দেখলে?' 'তুলে নিচ্ছি নিশীথ—এই তো আঁট করে বেঁধেছি— হয় নি? না ঢিলে হয়ে গেল? তুমি কবে এলে নিশীথ? কবে এলে? বলছে শ্যামলী। হু হু করে বাতাস বইছে, কেমন অন্ধকার হয়ে গেল যেন সব। কেঁদে উঠছে ভানু। এই কি কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতাল-যক্ষ্মার? কাঁচড়াপাড়ার বেড? শোনো বলি, কে বলে দেবে আমায় এটা কাঁচড়াপাড়ার যক্ষ্মার হাসপাতারের বেড? ভানু কোথায়? অন্ধকারের মধ্যে দেখছি না তো। ভানু? এই যে বাবা, আমি এইখানে। ঐখানে ভানু? কোনখানে? কোন যে সুদূর মেঘ-আঁধারের প্রত্যন্তর থেকে সুর ভেসে এসেছিল ভানুর। কে আপনি? কী চাচ্ছেন? কথা বলবার অবসর নেই মশাই, নাকেদমে দৌড়াচ্ছি; না না মশাই এটা যাদবপুরের টিবি হসপিটাল; এখানে বেড খালি নেই। ভানু? সে তো কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতালে—সে তো মরে গেছে কাল রাতে। ধড়মড়িয়ে জেড়ে উঠল নিশীথ। কোথায় সে? জলপাইহাটিতে? লামডিঙে নেমে ট্রেন ধরেছে যাবার। না ওয়েটিং রুমে শুয়ে আছে? জলপাইহাটিতে? সুমনা কোথায়? নরেন রক্ত দিয়েছিল আজ? ওঃ, শহর কলকাতায়, লেক রোডে জিতেন দাশগুপ্তের বাড়িতে বুঝি? ভোর হয়ে গেছে।

ভোর হয়ে গেছে। জিতেন অফিসে চলে গেছে নিশ্চয়। ওর স্ত্রী ঘুমুচ্ছে। হয় তো ওপরে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই তো। কী হবে এখন জেগে উঠে। জিতেন ফিরুক। কিন্তু বারটার আগে ফিরবে কি জিতেন। কিন্তু ফিরুক জিতেন। কিন্তু দুপুরের আগে ফিরবে না তো। কিন্তু না ফিরলে কী করতে পারে নিশীথ? কোথায় যাবে সে? দেখা করবার মত লোকজন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু আছে কিছু কলকাতায়। মনটা কঠিন হতে থাকলে সংখ্যায় কমে যায় এরা, মনটা নরম হতে থাকলে বেড়ে যায়। কিন্তু মন যখন নরম কঠিন কিছুই নয়—শূন্য আচ্ছন্ন—তখন একটা বা অনেক শূন্যকে অনেক অস্তি দিয়ে পূরণ করে পূরণফলের অফুরন্ত নাস্তিকে কী দিয়ে ধ্বংস করবে মানুষ? কে আশ্বাস দেবে, সাহায্য করবে, বাস্তব সফলতার নিটোল নিপট ক্ষমতা দিয়ে ধ্বংস করতে দিতে, ভাবছিল নিশীথ।

ওপরে খাবার ঘরে ডিম খুঁজছিল জিতেন। ডিশগুলো ঘেষে ঘেষে নুয়ে, নিছিয়ে, হেঁদিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে ব্যাপারটা বুঝে দেখতে চেষ্টা করছিল। ডিশের গায়ে এসব হলুদ গাদ কিসের? গেরুয়া বাদামি বাসন্তী লাল রঙের কিসের পোচড় এসব ঃ ডোরা ফুটকি? লোকটা দু'হাজার টাকা মাইনে পায়, আরো দু'হাজার কুড়িয়ে নেয় পরামর্শ দিয়ে। কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে বুঝে নিল ব্যাপারটা; কিন্তু সে যে বুঝেছে কে তা বুঝবে? ঠাণ্ডা চোখে নিঃসন্দেহে মেজাজ নীরবতার। জানে সব। বুঝেছে, নিশীথ ঘুমিয়ে পড়েছে আবার। অফিসে যাবার মুখে নিশীথকে দেখে গেল জিতেন; বললে ঃ 'খুব আরামে ঘুমুচ্ছে নিশীথ।'

কে যেন সিঁড়ির কিনারে দাঁড়িয়ে বলছে ঃ আপনার ঘুম ভাঙলে ওপরে আসুন। ঘুম তখনো ভাঙে নি নিশীথের। আধা ঘুমের ভিতরেই কথা বলছিল, কে যেন অব্যক্ত শীর্ষ থেকে বলছে ঃ আপনার কি ঘুম ভেঙেছে? আপনি জেগে উঠেছেন? উনি আপনাকে ওপরে আসতে বলেছেন। কোথায় কোন সিঁড়ির ওপর থেকে কে যেন কথা বলছে। জিনিসটা স্বপ্নের না বাস্তবের তা নিয়ে প্রশ্ন করার মত মনের অবস্থা ছিল না নিশীথের। ঘুম ভাঙে নি তার, স্বপ্ন দেখছে সেটা টের পাচ্ছে, টের পেতে পেতে ঘুম পাতলা হয়ে আসতেই সিঁড়ির কিনার থেকে কে যেন আবেদন জানাচ্ছে—হয় তো সত্যি পৃথিবীর দেশ থেকে—হয় তো স্বপ্নের নীড় অনীড়ের কুয়াশা থেকে ঠিক করে উপলব্ধি করে নিতে না—নিতেই ঘুমিয়ে পড়ছে নিশীথ আবার। ঘুম বেশ গাঢ় হয়ে গেছে ঃ জমানো বরফের আরো নিচে যে-বরফ জমেছিল গত বছরের শীতে, যে-বরফের মার নেই, যার জন্য দিন নেই, রাত্রির অবসান নেই—তেমনিভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরফের ভাঙন দেখা দিচ্ছে, আবার চিড় খাচ্ছে, নড়-নড় করে উঠছে চাঙড়। গুঁড়ি বরফের ফোয়ারা ছিটকে পড়ছে, মুখে এসে পড়ছে এপ্রিলের নীল, কোকিল নীলকণ্ঠ, পিউ কাঁহা তড়পানো আকাশ–বড় রোদ, মেঝো রোদ, ছোট-ছোট ফুটকির রোদ...

ঘুম ভাঙলে আপনি ওপরে চলে আসুন–একেবারে সিঁড়ির নিচের ধাপ থেকে কে যেন বলছে নিশীথকে।

গা ঝাড়া দিয়ে জেগে গেল প্রায়—জেগে-জেগে—ঘুমোতে-ঘুমোতে জেগে উঠল নিশীথ। বাস্তবিকই জেগে উঠল আবার। বেশ খোলা গলায় বড় শব্দ তার কানে এসে পৌঁছেছিল–এই তো এখুনি–মিনিট দুই আগে? নিশীথকে ওপরে যেতে বলেছে। ডেকেছে মিসেস দাশগুপ্ত তা হলে।

নিশীথ উঠে মশারি গুটিয়ে বিছানা ঝেড়ে সাজিয়ে এক-আধ মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল খাটের কাছে। চারিদিকে নিস্তব্ধতা, কোথাও কথা বলেছে, কাউকে আহ্বান করেছে কোনদিনও মনেই হয় না। কেউ যেন নেই এ বাড়িতে। ঐ পেয়ারাগাছের ডালপালা পাতা রোদের ফাঁকে যে-কয়টা চড়ুই ঝাঁপাঝাঁপি করে ধ্বনির ফোয়ারা ফেনা ছুঁড়ে মারছে অনর্গল, এ ছাড়া এ বাড়িতে কোনো প্রাণী আছে বলে মনেই করতে পারছে না নিশীথ। কিন্তু তবুও মানুষের সম্পূর্ণ স্পষ্ট ভাষার মত এখুনি কে যেন ডেকে গেল নিশীথকে–কানে লেগে আছে–রক্তের বিমের ভিতর ঘুম ভাঙলে আপনি ওপরের কেমন একটা স্ফটিক নির্মলদ্যোতনা নিঃশব্দে সংক্রামিত হয়ে আছে। একতলার গোসলখানায় ঢুকে; হাত-পা-মুখ ধুয়ে, কী ভেবে চান করে নিল, পরিষ্কার কাপড়জামা পরে নিশীথ সটান ওপরে চলে গেল। নমিতা ড্রয়িংরুমে বসেছিল। চকোলেট রঙের গদি-মোড়া একটা সোফায় গিয়ে বসল নিশীথ–

'আপনাকে ডাকছিলুম–'

'আপনি, কই শুনিনি তো।'

'ঘুমুচ্ছিলেন।'

'নিচে গিয়েছিলেন আপনি মিসেস দাশগুপ্ত?'

'যাচ্ছিলুম। আপনার ঘরেই যেতুম একবার। কয়েকবার সিঁড়ির ওপর থেকে ডেকেছি।'

'সিঁড়ির থেকে?'

'শুনতে পেয়েছিলেন? প্রত্যেকবারই দু-এক ধাপ নেমে, শেষের বার সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপ থেকে ডাকছিলুম। ঘুমুচ্ছিলেন। শোনেন নি। কাল রাতে অনেক জেগেছেন আপনি। উনি বলছিলেন আপনি জেগে উঠলে–'

কখন গেলেন অফিসে–'

'সাড়ে ছটায়। আমি তখন জেড়ে উঠতে পারি নি।'

'ও'–নিশীথ বললে।

'গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে স্টার্ট দিচ্ছেন, ঘুমের ভিতর কানে গেল যেন আওয়াজটা–তবে আমাদের মোটর–না অন্য কারুর–কোনো শিখ ড্রাইভার হয়তো গেটের পাশে এসে–কলকাতার ড্রাইভারগুলো বড্ড জ্বালাতন করে; ঘ্যাড়-ড়-ড়-ড়-ড়-ড়–এত সহজেই তাদের গাড়ির কল বিগড়ে যায়–আর শেষ রাতে যখন মানুষ ঘুমুচ্ছে তাদের চড়াও করে ফুঁড়তে-ফাড়তে না পারলে চলে না যেন আর। সাদাওয়ালা পিলাগ–আর–'

'পিলাগ?'

'মানে প্লাগ–সাদা প্লাগ–সাদা প্লাগে কিছু বিগড়েছে আর কি? বেশ তো বাবা বিগড়েছে, আমাদের কান টানছিস কি রে?'

'পি-সি রায়', নিশীথ শুরু করলে 'মাড়োয়ারিদের ঠিক ধরেছিলেন। ঠিকই বলেছিলেন, ঠিকই লিখেছিলেন আচার্য রায়, বাংলাদেশের অনেক কিছুই মড়োয়ারিদের কবলে চলে গেল। সকলেই নিচ্ছে খাচ্ছে। পুরনো ফিরিস্তি সব। তবে দিনরাত আমাদের বাসে চড়তে হচ্ছে, মাড়োয়ারি-ফাড়োয়ারির চেয়ে এ সব ড্রাইভার-কনডাকটারদের সঙ্গেই ঘেঁষাঘেঁষি। এক-একটা পদ্মার ইলিশ সাজিয়ে পাটাতন আটকে দেয়, খণ্ড-খণ্ড নুন বরফ মাখিয়ে চালান দিতে হবে। শক্তের হাতে নরম আমরা–এ-রকম অসাড়; এ-রকম অসাড় অপদার্থ বলেই দিনের পর দিন ওরা বড্ড বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এর একটা বিহিত করা উচিত।'

নমিতা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বাংলা খুব ভাল জানে সে। ভাল বাংলা বলতে পারে–ইংরেজির মতনই সহজে, তেমনি তরতর করে। কিন্তু নিশীথ কী বলতে চাচ্ছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, বুদ্ধি-অনুভূতি দিয়ে খানিকটা ধারণা করে নিতে চেষ্টা করল। বিশেষ সফল না-হলেও, মোটামুটি বুঝেছে সমর্থন করতে পেরেছে, মনে হচ্ছিল তার। পি-সি রায়কে জানে না নমিতা। অনেকদিন রেঙ্গুনে, ইউ-পি, পাঞ্জাবে থেকেছে। তা ছাড়া আচার্য রায়ের সূর্য যখন শূন্যে শীর্ষে তখন নমিতার জন্ম হয় নি, আচার্য যখন বাংলাদেশেই আবছা হয়ে পড়েছেন, তখন নমিতা পাঞ্জাবে।

'আপনি ঠিক বলেছেন মিঃ সেন।'

নিশীথ কথা ভাবছিল।

'পি-সি কে?' নমিতা জিজ্ঞেস করল।

'পি-সি?' ওঃ নিশীথ নিবিষ্টভাবে নমিতার দিকে একবার তাকিয়ে বললে,

'ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। না, কেউ নয়।'

'তিনি মাড়োয়ারীদ্রের কথা কী বলেছিলেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু বেকুব মনে হচ্ছিল নিজেকে নিশীথের। সহসা উত্তর দিচ্ছিল না সে। মাথা হেঁট করে মেঝের কার্পেটের দিকে তাকিয়ে ছিল। মাথা তুলতেই দেখল একটা দেশলাই নিয়ে এসেছে নমিতা, এক টিন সিগারেট। 'খান আপনি?' একটা সিগারেট মুখে নিয়ে নিশীথকে জিজ্ঞেস করল নমিতা। জ্বালিতে নিল নিজের সিগারেট। নিশীথের দিকে টিনটা এগিয়ে দিল।

'খান?' জিজ্ঞেস করল নমিতা।'

কোনো কথা না-বলে হাত বাড়িয়ে টিনটা কুড়িয়ে নিল নিশীথ।

'মাড়োয়ারিরা কী করেছিল?'

নিশীথ সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'না, কিছু করে নি।'

'পি-সি কী বলেছিলেন ওদের কথা?'

'সি সব কথা ছকে গেছে; ও অনেক আগের কথা।'

'কিন্তু কী বলছিলেন?'

'জিতেন কি কোন দিন বলে নি কিছু এ সম্বন্ধে আপনাকে?'

'না'। নিঃশব্দ নিটোল কারসাজিতে ফিকে নীল অজস্র ধোঁয়া নাক মুখ দিয়ে বের করতে-করতে মিসেস দাশগুপ্ত বললে।

'না। বলে নি তো আমাকে জিতেন।'

নমিতা একটু হেসে নিশীথের দিকে তাকাল। 'বলতে বাধছে আপনার। দেখছি তো। আচ্ছা জিতেনকে জিজ্ঞেস করব। পি-সি...' নমিতা হাসতে-হাসতে বললেন, 'পি-সি। জিতেনের এলেকার জিনিস কি পি-সি–'

'অনেকটা। জিতেন তো ব্যবসা পাড়ায়ই ঘোরে ফেরে–ওর কাজ করে, সদাগরি পরামর্শ দেয়। মাড়োয়ারিদের সঙ্গে তো ওর দিনরাত ঠোকাঠুকি।

নমিতা উঠে দাঁড়িয়ে কোত্থেকে একখণ্ড চকখড়ি তুলে নিয়ে কালো টি-পয়ের উপর লিখল :

OPCADKSO.

'এই যে টি-পয়ের ওপর কী লিখেছি বলুন তো।'

'আচ্ছা ত্রিশ বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে বলব।'

'তার মানে?'

'সেই চৌদ্দ পনের বছরের নিশীথ বলছে, ও পি- সি এদিকে এসো।'

'মওকা' নমিতা হাসতে-হাসতে বলছে, 'আচ্ছা, আচ্ছা জিতেন এলেই ধরব তাকে আমি। আমার ভারী কৌতূহল বোধ হচ্ছে', নমিতার সিগারেটটা ফুরিয়ে গিয়েছিল প্রায়। সেটাকে অ্যাশ-ট্রের ভিতর ফেলে দিয়ে নমিতা বললে, 'বাসে চড়েন আপনি খুব নিশীথবাবু?'

'খুব।'

'জিতেন আর আমি গাড়িতেই বেরুই। অফিস একটা গাড়ি দিয়েছে ওকে; সব সময়ের জন্যে, অফিসের কাজে অবিশ্যি। সে গাড়িটা আমাদের এখানেই থাকবার কথা। কিন্তু ও একটু বেশি খুঁতখুঁতে, সেটা অফিসেই রেখে দেয়। অফিসে গিয়ে কাজে লাগায়। বাড়ির জন্য একটা আলাদা সানবিম কিনেছে। নিশীথ শুনছিল। বেশ আত্মতুষ্টভাবে কথা বলছিল নমিতা কিন্তু কথাবার্তায় প্রসাদের স্নিগ্ধতা ততটা ছিল না। কেমন একটা মর্যাদাবোধে ফুলে-ফুলে উঠছিল নমিতার নাকের ফোকা। আকাশ-বাতাসে স্বাধীনতা ও বেশি টাকার বিশেষ মর্যাদা পান করে খুব ভাল লাগছিল যেন মেয়েটির।

ঠিক ছিপছিপে নয়, একটু মুটিয়েছে। তবু বেশ ছিমছাম, গায়ের রং চীনে বা বার্মিজদের মতন হলদে, হলদেটে নয়, ইংরেজ মেয়েদের মত লাগছে। বা দিশি মেয়েদের মত ফর্শা ঠিক নয়, তবে খুব বেশি ফর্শা দিশি মেয়ের মতই যেন, মাঝে-মাঝে বিলিতি বলে ভুল হয়, শীতের দেশে থাকলে ওদেরই মতন হয়ে যেত, সুয্যিমামার দেশে থাকতে-থাকতে এ-দেশী গৌরী হয়ে যাবে একদিন। নমিতার বেশ লম্বা চুলগুলো, সোনালি প্রায়। নাক খাড়া, মুখে মঙ্গোল ছাঁচ নেই বলেই মনে হয়। যেটুকু আছে, তা বিশেষ একটা সৌষ্ঠব দিয়েছে তার মুখশ্রীকে; যেমন চোখ দুটো ঈষৎ বাঁকাভাবে বসানো নমিতার মুখে– কিন্তু এমনই আর্য-ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে ওর সমস্ত মঙ্গোল ধোঁয়া কেটে, কেমন একটা কুহকে অথচ পরিচ্ছন্নতায় মর্মস্পর্শী হয়ে আছে সমস্ত মুখের ছাঁচ–নাক-মুখের প্রতিভা। কাল রাতে ভাল করে তাকিয়ে দেখে নি নমিতার দিকে নিশীথ। আজ গোড়ার থেকেই–ভোরের আলোর রোদে–দেখছিল; কথা বলছিল কম, দেখে নিচ্ছিল বেশি। দেখা হয়ে গেছে। ব্যবহারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভাল জিনিসই পেয়েছে জিতেন; মেয়েটির ভিতরের সার্থকতা কেমন জানা নেই নিশীথের। দু-চারটে কথা বলে এখনো ও কিছু বুঝে উঠতে পারে নি।

'সেই সানবিমটা নিয়ে বেরিয়ে গেল বুঝি সকালে?'

'না। অফিসের গাড়িটা কাল রাতে এনে রেখেছিল– খুব সকাল-সকাল অফিসে যেতে হবে বলে। জিতেনের অফিসে যাবার আগে ওরা গাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আমাদের সানবিমটা গ্যারেজে আছে, বেড়াতে যাবেন?'

'এখন?'

'এই তো বেড়াবার সময়।'

'কোন দিকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চলুন লেকের ও-দিকটায়। তারপর সেখান থেকে ডায়মন্ডহারবার।'

'ডায়মন্ডহারবার'—নিশীথ তাকিয়ে বললে, 'জিতেন ফিরবে কটার সময়।'

'আজ? চারটের আগে না। আমরা দুটো-আড়াইটের মধ্যেই ফিরে আসব। এখন সাড়ে আটটা। সাড়ে দশটা অব্দি এগিয়ে যাব যেখানে গিয়ে পৌঁছুই—বজবজ—ক্যানিং—'

টিনের থেকে একটা সিগারেট বের করে নিয়ে নমিতা বললে, 'যশোর রোডে গিয়েছেন?— ব্যারাকপুরে?'

ট্রেনে ব্যারাকপুরে গিয়েছে নিশীথ, বাসেও। পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছে যশোর রোডে। কয়েক বছর আগে শীতকালে। জাপানিরা তখন কলকাতা আক্রমণ করে-করে। বেশ লাগত একা-একা বেড়াতে। দমদমে এক খুড়তুতো ভাইয়ের বাংলোতে থাকত। খুড়তুতো ভাই অয়ারলেসে কাজ করত।

'না, মোটরে চেপে বেড়াই নি যশোর রোডে—'

'যাবেন?'

'জিতেন এসে নিক।'

'জিতেন বেড়াতে যাবে না।'

'কেন?'

'অফিসের কাজের চাপ বেশি'—নমিতা ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেটের দিকে তাকিয়েছিল, জ্বালায় নি এখনো।

'বাড়িতে এসেও অফিস? সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতে পারবে না?'

'এ সাতদিন কাজের চাপ খুব বেশি। অনেক রাত অব্দি জাগতে হবে। চলুন'—নিশীথের দিকে তাকাল নমিতা—'সাড়ে দশটা অব্দি ছুটে তারপর ফিরে আসব, একটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে যাব।'

নিশীথের হাতের সিগারেট নিভে-গিয়েছিল—অনেকক্ষণ। সিগারেটটা হাতেই রয়ে গেছিল তবু। অর্ধেক পুড়েছে শুধু। জ্বালিয়ে নিলে হয়, কিন্তু অ্যাশ-ট্রের ভিতর ফেলে দিয়ে নমিতার দিকে সাত-পাঁচ ভেবে তাকাল নিশীথ। নমিতার চোখে নিরপরাধ প্রাণোচ্ছ্বাসের তাগিদ উপচে পড়ছে, খারাপ লাগল না তার কিছু। তবুও একটু ছিটেফোঁটা কিসের বাষ্প খেলে যাচ্ছে যেন, কিংবা নিশীথের নিজের চোখ থেকে প্রতিফলিত হল কি নমিতার চোখে?

'বাঃ, সিগারেটটা ফুঁকতে না-ফুঁকতেই ফেলে দিলুম। কেমন ভুলো মন আমার—'

টিন এগিয়ে দিল নমিতা। টিনের ঢাকনি এঁটে গিয়েছিল। জোর দিয়ে, মুগ্ধভাবে ঠোঁট-কুঁচকে, খুলে দিল।

সিগারেট—সিগারেটের টিনটাও, নিশীথের হাতে রয়ে গেল। তার অন্যমনস্ক হাতে কে যেন গছিয়ে দিয়েছে। নিজের সোফার পাশে রেখে দিল টিনটা।

কফি আর কেক নিয়ে দাঁড়াল এসে বাবুর্চি। তিন জনের আন্দাজ জিনিস। নমিতা নিশীথ—আর-কে খাবে? একটা বড় তেপয়ের ওপর সাজিয়ে দিতে লাগল।

'তিনটে পেয়ালা, জিতেন যদি এসে পড়ে—'

'বলেছিলেন চারটের আগে আসবেন না—'

'তাই তো কথা। তবে বিশেষ বন্ধু কেউ বাড়ি এলে আচমকা উড়ে আসে জিতেন—বন্ধুকে ভালবাসে বলে—'

নমিতা বাবুর্চির দিকে তাকিয়ে বললে—'যাও, আর-কোনো দরকার নেই। বন্ধুকে ভালবাসে বলে। আমাকে দিয়ে হোস্টের কাজ করিয়ে খুশি নয় জিতেন। ও অনেকদিন আইবুড়ো ছিল কিনা, ধাঁচটা রয়ে গেছে—'

মধু ও দুধের মত একটা মধুরতা নড়ছিল নমিতার ঠোঁটের কোণায় যেন-হাসির; ফোটে নি হাসি; মাথা এক-আধবার নেড়ে নিল; কিন্তু আক্ষেপ খুব সম্ভব নয়; এমনিই—একটা সুন্দর মুদ্রাদোষের প্রেরণায়। নমিতাকে দেখাচ্ছিল শোনাচ্ছিল কেমন চমৎকার, যেন আর্যসুষমার কী-একটা রূঢ়তাকে ধুয়ে স্নিগ্ধ করে দিচ্ছি—আকাশের হাওয়া।

'কই, আপনি ওয়াশিং বেসিনে গেলেন না তো!'

'আমি নিচের থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসেছি।'

'নিচের থেকে?' সুন্দর কালো চোখ পাকিয়ে গোল হয়ে গেল; বিক্ষুব্ধ হয়ে নিশীথের দিকে জবাব দিল নমিতা।

'জিতেন বলে দিয়েছে আমাকে, আপনার ঘুম ভাঙলেই দোতলায় বাথরুমে আপনাকে পাঠিয়ে দিতে। সব ব্যবস্থাই তো করে রেখেছি সেখানে।'

'ব্যবস্থা কখনো মারা যায় না,' নিশীথ বললে, 'আপনার কথা শুনতে-শুনতে গ্রহণ করেছি। আরো একটু পরে আরো স্পষ্টভাবে কাজে লাগাবার দরকার হবে হয় তো। ধন্য হয়েছি। অনেক ধন্যবাদ।'

কফি ঢালতে-ঢালতে একবার নিশীথের দিকে দ্রুত চোখে তাকিয়ে নিয়ে নমিতা বললে, 'নিচের জল ঠাণ্ডা ছিল?'

'হ্যাঁ!'

'ভাল লেগেছে? ডাইনিং রুমে গিয়ে খাবেন?'

'এখানে অসুবিধে হচ্ছে আপনার?'

'না। জিতেন আর আমি মাঝে-মাঝে ড্রয়িং রুমে বসেই খাই।'

'কী খেয়ে গেল জিতেন, অফিসে যাবার আগে?'

'চারটে ডিম—আলু ভাজা—কফিও খেয়েছে নিশ্চয়। আমি উঠবার আগেই বেরিয়ে গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'চারটে ডিম? সেদ্ধ? এত ডিম খায় কেন?'

'আপরুচি খানা। ও নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। খেতে ভাল লাগছে। খাচ্ছে তো কয়েক হপ্তা ধরে। এর পর অরুচি এলে মুখ বদলাবেই। চিনি লাগবে আপনার কফিতে?'

'না।'

'কফি না খেয়ে চা খেতেন হয় তো, কিংবা সরবত—এই গরমে।'

'কফি বেশ জিনিস। বেশ জিনিস।'

'ফ্যানের হাওয়া লাগছে তো ঠিক মত আপনার গায়ে? বড্ড গরম আজ। হাওয়া নেই। লাগছে তো হাওয়া?'

'ঠিক আছে।'

'একটু এগিয়ে বসুন—এই কৌচটায়, এখানে বেশি হাওয়া লাগবে। আমি আপনার কফির পেয়ালা ধরছি, আসুন; হ্যাঁ এইটায়ই, বেশ লাগছে না হাওয়া? স্পিড বাড়িয়ে দেব আরো?'

কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে যাচ্ছিল নিশীথ, মাথা নেড়ে বললে—'না-না সব ঠিক আছে। এর চেয়ে বেশি হাওয়া—বেশি ভাল কোথাও নেই কলকাতা শহরে।'

নমিতার দিকে না তাকিয়ে, খানিকটা বিভোর অথচ বিচ্ছিন্ন, অন্য বৃত্তান্তের পুরুষ মানুষের মত নমিতার সামনে নিজেকে বসিয়ে রেখে কফি খেতে লাগল নিশীথ—ড্রয়িং রুমের একটা ঘোরানো শেলফের মোটা-মোটা বইগুলোর সোনার জলের দিকে, ঘরের আনাচে-কানাচে রোদে একটা-আধটা, ফিনফিনে ওড়নার বহতা বাতাসের দিকে তাকিয়ে থেকে।

'জিতেন আজ অফিসে যাবার আগে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করেছে।'

'কি করেছে?' ধীরে-ধীরে নমিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে সমাহিত ঋষি-পুরুষের গলায় জিজ্ঞেস করল নিশীথ।

আজ ভোরে খাবার ঘরে ঢুকে জিতেন কী করেছে, না-করেছে, নিজের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সবই তো জেনে ফেলেছে নিশীথ। তবুও জিজ্ঞেস করল নমিতাকে, খড়খড়ে গিন্নিবাজের মত নমিতাকে বলল, 'কী করল আবার?'

পাউরুটি, মাখন, জ্যাম, মর্মালেড, মিনারেল ওয়াটার, এমন-কি কুঁজোর জল অব্দি চেঁচে খেয়ে গেছে সব। এতটা হা-পিত্যেশ জিতেনের দেখি নি আমি কোনো দিন। আপনি দেখেছেন?'

বলতে-বলতে তরতাজা কৌতুকে তাকাল নমিতা।

তাকিয়ে দেখছিল নিশীথ—নমিতার দিকে নয়—বিষয়ের এই অপর অবতারণার দিকে; নিশীথই যে খেয়েছে সব, সেটা জানা না-থাকাতে ভারী তাজ্জব বিষয়েই বটে : বোতলকে বোতল জেলি, জ্যাম, আচার উড়িয়ে দিয়ে অফিসে চলে গেছে দাশগুপ্ত!

'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল তাই খেয়েছে। জলও খেয়েছে বুঝি খুব?'

'খাবার ঘরের সব বোতল খালি করে গেছে। আজ সকালে একটু মিনারেল ওয়াটারের দরকার হয়েছিল আমার। পেলুম না। সব খালি। আপনি কেক খাচ্ছেন না? খান্দদার ভালো কেক, বাবুর্চিকে দিয়ে আনিয়েছি। কফির সঙ্গে কী খাওয়া যায়? এক টুকরো পাউরুটি অব্দি নেই—'

'নেই?'

'নেই।'

'ভারি বিপদ তো। তাই বলে দিনে বাড়ি এলে ওকে বলবেন না কিছু লজ্জা পাবে। খিদে পেয়েছে, খেয়েছে, চুকে গেছে। তবে, একটা কাজ করতে পারেন—'

কেকের ক্রিম খেতে-খেতে নমিতা তাকাল নিশীথের দিকে।

'আজ রাতে যেন ভালো করে জোলাপ নেয়। তারপর, দু-চার দিন পরে কলেরার ইনজেকশন নিলে ভালো হয়।'

'আজকাল খুব বাড়াবাড়ি শুনেছি কলকাতায় রোগটার।'

'এখনও উঠতির মুখে, বাড়াবাড়ি শুরু হয় নি। কলেরার প্রতিষেধ খুব ভাল কাজ করবে।'

'আপনি নেবেন না টিকে?'

'আমার দরকার নেই।'

নমিতা কফির পেয়ালা শেষ করে তেপয়ের ওপরে রেখে দিয়ে বললে, 'কলকাতায় এপিডেমিকের ভিতর এসে পড়েছেন, কেন নেবেন না?'

'আমার দরকার নেই।'

'আমি নেব?'

নিশীথ উত্তর দেবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। জিতেনের শোবার ঘর দুটো; অফিসের যে-সব কাজ বাড়িতে বসে করা দরকার হয়ে পড়ে, তার জন্য ওরই একটা ঘর আলাদা করে রেখেছেন। নিচের তলায়ও অফিসের কাগজপত্র মজুত থাকে কিছু। টেলিফোন, দোতলার অফিস ঘরে।

মিনিট পাঁচেক পরে নমিতা ফিরে এসে বললে, 'উনি টেলিফোন করেছিলেন।'

'কী হল?'

'অফিসের জরুরি কাজে জামসেদপুর যাচ্ছেন।'

'কবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আজই—এখনই। চলে গেছেন।'

'জরুরি বটে। কবে ফিরবে?'

'বললেন, চার-পাঁচদিন হবে' আপনাকে থাকতে বলেছেন। ফিরে এসে বিশেষ কথা আছে আপনার সঙ্গে, জানাতে বললেন।'

পটে আরো বেশ খানিকটা কফি ছিল। নিশীথের পেয়ালায় ঢেলে দিতে দিতে বললে, 'কলেরার টিকে কবে দেওয়া হবে?'

'জামসেদপুর থেকে ফিরে এলে।'

'আর আমার?'

'আজই নিয়ে নিন। আপনাদের ডাক্তার কে?'

'চক্রবর্তী।'

'ফোন করে দিন।'

'এখনই!'

'বিকেলের দিকে হলে ভাল হয়।'

'আপনি নেবেন না?'

'আপনি নেবেন?'

কী করতে নেবে কলেরার ইনজেকশন নিশীথ? কোনোদিন নেয় নি। নেবেও না কোনোদিন। এ সব রোগ খারাপ বটে, কিন্তু যেমন দূরে তেমনি নিরাকার—নিশীথের ভাবনা-কল্পনায় আঁচড় কাটতে আসে না মৃত্যু, অবান্তর—তার ক্রমশ জীবনবিমুখ নিস্পৃহ মনের কাছে আজ পর্যন্তও।

'কলেরার ইনজেকশন খুব বিশ্রী জিনিস, বড্ড ব্যথা হয়। সইবে না নিশীথবাবু আপনার?'

'হ্যাঁ, বেশ টানাটানি ওঠে নমিতা দেবী। আমার হাত ফুলে গিয়েছিল। কেমন বেজ্জৎ করে দেয়।'

'আপনি নিয়েছিলেন? কবে?' নমিতা কফির কাপ সরিয়ে রেখে, নিশীথকে নয়—তার ভিতর দিয়ে অন্য কিছুকে, দেয়ালকে আলোকে শূন্যটাকে যেন পর্যবেক্ষণ করতে-করতে জিজ্ঞেস করল।

'কলকাতায় আসবার আগে, আট-দশদিন হল। আবার ইনজেকশন কী দরকার হবে?'

'না, তাহলে আর-দরকার নেই।'

কোনো কথা নেই মুখে, বসে রইল কিছুক্ষণ। নমিতা নিজের বাঁ হাতের দিকে তাকাচ্ছিল। হাতটা প্রসারিত করে। কিন্তু হাতের দিকে নয়, অন্য কোথাও তাকিয়ে ছিল যেন তার মন। কোথায়—ধরতে চাচ্ছিল নিশ্চয়। ওকে না-জিজ্ঞেস করে—ওকে না-জানতে দিয়ে ওর মনের লেখন জানতে যাওয়ার ভেতর চৈতন্যের ঘনতা রয়েছে খুব: অনুভূতিটাকে ঠিক পথে চালিয়ে মাথা খাটিয়ে কাজ করতে হয়। কিন্তু তবুও ধরতে ছুঁতে পারা যায় না। আমি চোখ বুঁজে আছি, আমার এই হাতের তাসগুলোর ভিতর থেকে একটা তাস তুলে নাও তুমি—আমি বলে দেব কী নিয়েছ তুমি। কী নিয়েছ? নিয়েছ হরতনের টেক্কা। তাসের এ খেলায় দিব্যচক্ষু লাভ করেছিল নিশীথ। যা বলে দিত তাই হত। নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে যেত বড় বড় সজ্বর মাস্টাররা। কিন্তু তাই বলে সব বিষয়ের দিব্যজ্ঞান লাভ করা কঠিন। নমিতার হাতে চিড়েতন না হরতন? হরতনের কোন তাসটা?

'আমি উঠি নমিতা দেবী।'

'কোথায় চললেন?'

'এই কাছেই কয়েকটা জায়গায় যাব—ডোভার লেনে, একদালিয়া রোডে, বালিগঞ্জ স্টেশনে। আজ আর উত্তর কলিকতায় যাওয়া হবে না।'

'ফিরবেন কখন?'

'দুপুরবেলা খেতে ফিরব।'

'কটার সময়?'

'কটার সময় সুবিধা আনপার?'

'দেড়টা না পেরুলেই ভাল—'

'আমি সাড়ে বারটার সময় এসে চান করব।'

'আমি পার্কসার্কাসে যাচ্ছি আমাদের গাড়িতে। চলুন আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই একদালিয়ায়?'

'বালিগঞ্জ স্টেশনে চলুন। পার্কসার্কাসে কোথায় যাচ্ছেন?'

'কাজ আছে সেখানে; নাম শুনেছেন হয় তো, মুখুজ্যে, সলিল মুখুজ্যে।'

নমিতা নিশীথের দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, জিতেন বলছিল।'

'যাঁর নাম মা-থিন'।

নমিতা তার হাতের সিগারেটটা টিনের ভেতর ঢুকিয়ে রাখতে গেল। এখন খাবে না; খেতে ইচ্ছে করছে না।

'মা এখন ওখানে আছে কি না বলতে পারছি না। একটা মুশকিলের ব্যাপার হয়েছে। বাবা বেশ বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন; অবিশ্যি বিলিতি ডিগ্রি নেই; কিন্তু এ দেশে ট্রেনিং নিয়ে তিনি খুব ঝাড়া ওস্তাদ হয়েছিলেন। অনেক, অনেক রোজগার করেছেন, উড়িয়েছেন। এখন আর কিছু করতে পারেন না। প্যারালিসিসের মত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিছানায়ই পড়ে থাকতে হয়। নামতেও পারেন না। নড়াচড়াও কঠিন,' নমিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমার মা মা-থিন নরওয়েজিয়ান মায়ের মেয়ে। শুনেছেন আপনি?'

টিনের ভিতর সিগারেটটা ঢুকিয়ে রেখে ঢাকনি এঁটে দিল। তেপয়ের ওপর রেখে দিল টিনটা।

'জিতেন তো তাঁকে মার্টিন সাহেব বলে ডাকে। বাবা নাম রেখেছিলেন মার্জারিন অর্থাৎ মার্জারিণী–কিন্তু সংস্কৃতে তো মার্জারী? কখনো-কখনো মার্গারিন–মানে আমাদের মাখন–' নমিতা কথা বলতে-বলতে থেমে গিয়ে জানালার বাইরে অনেক দূরে বিশেষ কোনো কিছুর দিকে না-চেয়ে তবুও এমন ঠায় তাকিয়ে রইল যে মনে হচ্ছিল সমস্ত তাকাবার ভার গ্রহণ করেছে তার অন্তশ্চক্ষু; কী প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে–নমিতার বাইরের চোখের দিকে তাকিয়ে নিশীথ তার কোনো কিছু কিনারা করে উঠতে পারল না। নিশীথকে আধখানা কথা বলে ছেড়ে দিল নমিতা। একটা মুশকিলের ব্যাপার হয়েছে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কী সে মুশকিল-সলিল মুখুজ্যে সাহেবের প্যারালিসিস। না সেই পক্ষাঘাতটাকে জড়িয়ে আরো কিছু; পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা গেল না কিছুই।

'চলুন আপনাকে বালিগঞ্জ স্টেশনে নামিয়ে দিচ্ছি।'

'চলুন।'

গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে চলল নমিতা। পথে কোনো কথা হল না। বালিগঞ্জ স্টেশনে নিশীথকে নামিয়ে দিল।

'আপনি সাড়ে বারটায় ফিরবেন?'

'তাই তো ভাবছি।'

চান সেরে যখন খেতে বসল দু-জনে, তখন দেড়টা বেজে গেল। খাওয়া হচ্ছিল খাবার ঘরে। টেবিলটা খুব বড়। বাবুর্চি, ডিশ-গেলাস কাঁটা চামচ লাগিয়ে, টেবিলের এক পাশে, নমিতার হাতের কাছেই খাবার জিনিসগুলো নামিয়ে গেল সব। বাবুর্চিকে ছুটি দিয়ে দিল নমিতা।

'পার্কসার্কাসে মুখার্জি সাহেব কেমন আছেন?'

'ভাল না।'

'প্যারালিসিস হয়েছে?'

'হ্যাঁ, খুব শক্ত।'

'দেখছে কে?'

'একজন জার্মান ডাক্তার।'

'কেন, জার্মান কেন? দিশি ডাক্তার নেই?'

'উনি স্পেশালিস্ট। রোজেনবুর্গ নাম। জার্মান ইহুদি।'

'ইহুদি?'

'উনি ভাল বলছেন না। সুবিধে করতে পারছেন না। বাবার বয়স বেশি নয়তো, মোটে বায়ান্ন। খুব তাগড়া শরীর ছিল–ভেবেছিলুম টপকে যাবেন।'

আজ ডাল-ভাতই রান্না হয়েছিল, চপ ছিল, ফ্রাই ছিল, মুরগি নয়–কী-একটা পাখির মাংস রান্না হয়েছিল। আলাদা একটা ডিশে টোমাটো শসা পেঁয়াজের কুচি, কাঁচা লঙ্কা, লেবুর সালাদ, মটরশুঁটি ছিল। আজ সকালে নিশীথ বনাম জিতেন দাশগুপ্ত সব সাবাড় করে গেছে বলে আচার, চাটনি, সসের নতুন তিন-চারটে শিশি, আনা হয়েছে। খুলে, টেবিলের ওপর রেখে গেছে বাবুর্চি।

দই-মিষ্টি আনা হয়েছে নিশীথের জন্যে; খুব সম্ভব জিনেতের পরামর্শে; ফোনে পাঁচ মিনিটের সব বলে গেছে; ভাবছিল নিশীথ। কিংবা হতে পারে নমিতা নিজেই সব ঠিক করেছে।

সংস্কারের জট খসাতে সময় লাগে নিশীথের–অথচ নিজেকে যে স্পষ্ট চৈতন্যের মানুষ বলে মনে করে। সচেতন হয়ে পড়ল হঠাৎ যেন তারপর;

এই চেতনাই তার নিজস্ব।

'আপনার মাকে দেখলেন?'

'পার্কসার্কাসের বাড়িতে?' অন্যমনস্কভাবে কাঁটা দিয়ে একটা ফ্রাই টেনে নিয়ে একটা ঢোঁক গিলে নমিতা বললে, 'মা-থিন সেখানে নেই।'

'কোথায় গেছেন তা হলে?'

'কী জানি–বাবা বলতে পারছেন না। মা হচ্ছে ঝড় কি বাতাসের মেয়ে, একজন প্যারালিটিক রুগির সঙ্গে দু-বছর কাটানো বড্ড শক্ত তার পক্ষে। আমি বুঝেছি তিনি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। কোথাও তাস খেলতে চলে যান হয় তো। কিংবা এ্যাম্বুলেন্সের কাজে। টহল মারতে খুব ভালবাসেন; তাতে অনেক লোকের উপকার হয়। ওঁর উদ্দেশ্য অবিশ্যি বাঁই-বাঁই করে ছুটে বেড়ানো রেড ক্রসের গাড়িতে, স্ট্রেচারে মানুষ টেনে। দাঙ্গার সময়, বাপ রে, কী হুজ্জোতি! কাউকে মারা বা বাঁচানো লক্ষ্য নয়, যারা বড়-বড় ট্রাক চার্টার করেছে, তাদের সঙ্গে দিক্-বিদিকে ছোটা, রেডক্রসের গাড়িতে নরওয়ে-স্টারের মত ছুটে বেড়ানো'–

'আপনি কিছু খাচ্ছেন না মিসেস দাশগুপ্ত।'

'ফ্রাই খাচ্ছি।'

ছুরি-কাঁটা দিয়ে সেই একটা ফ্রাই-ই ছিঁড়ে চিরকুট্টি করছিল নমিতা; মনটা যেন কেমন জোশ হারিয়ে ফেলেছে, পার্কসার্কাস থেকে ফিরে এসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভাত নিলেন না?'

'নিচ্ছি। ভাত খুব কম খাই আমি। এই যে একটু সালাদ খাওয়া যাক। সকালবেলা বলছিলেন পাটাতনের নিচে পদ্মার ইলিশের মত ঠেসে রাখে–

কলকাতার বাস কন্ডাকটার কলকাতার বাঙালি প্যাসেঞ্জারদের। কেটে কুচিয়ে নুন বরফে চালান দেবার মতলব আর-কি। একটা বিহিত করতে বলছিলেন। সেই থেকে কথাটা ভাবছি আমি।'

নিশীথ কাঁটা চামচ দিয়ে ডালভাত খাচ্ছিল। চামচটা রেখে ছুরি তুলে নিল, কাঁটা দিয়ে মাছের ফ্রাইটা তুলে নিয়ে বললেন, 'মনে করে রেখেছেন। অনেকে ভুলে যায়। কিন্তু ওটা তো আমাদের একটা ছোটখাট আপদ। বড়-বড় বিপদগুলো পড়ে রয়েছে।'

'ছোটখাট? আজ মোটরে ঘুরেছি ঘন্টাখানেক নানা জায়গায়। দেখেছি বাসগুলো খুব ভাল করে নজর দিয়ে। এ যদি ছোটখাট ছিচকে হয়, তাহলে আমি খাচার নিশীথবাবু।'

নিশীথের খিদে নেই বেশি আজ? কী খাবে? মাংস খাবে?

'এ কি বালি হাঁসের মাংস মিসেস দাশগুপ্ত?'

'না। ঘুঘুর। খেতে ইচ্ছে করছে না? আপনি মাংস খান না? আচ্ছা দেখুন আজ খেয়ে–'

নিশীথ দেখতে লাগল খেয়ে। রান্না ভাল, মাংস নরম মাখনের মত; স্বাদ আছে। কিন্তু এ জন্যে পাখিটাকে মারা কি ঠিক হয়েছে। একটা কি দুটো ঘুঘুকে মেরে এই মাংস–এই ডিশ–এই রক্তের ফল ঝলসানি খেয়ে তৃপ্তি। এরপর মানুষের জীবনের ছোট-বড় নানারকম অতৃপ্তির কথা পেড়ে নমিতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কেমন যেন অবাস্তবতা এসে পড়ে। মাংস খাচ্ছে নমিতাও। সেও কি এই রকম কথাই ভাবছে? নিশীথ একটু ব্যাহত হয়ে তাকিয়ে দেখল মাংস খেয়ে নমিতার মুখে যে-তৃপ্তি সেটা আশ্চর্যরকমে সৎ। নমিতা মৃত ঘুঘুর কথা ভাবছে না; মাংসটা নির্বিকারভাবে ভোগ করছে। বাস কন্ডাকটার ও প্যাসেঞ্জারদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সে খুব নিখুঁত লোকায়ত।

'আপনাদের বড়-বড় বিপদগুলো কী বলবেন নিশীথবাবু?'

'আর-এক সময় বলব।'

দু'জনেই খেয়ে চলছিল নিঃশব্দে–কাঁটা চামচ খটখট করে, কাঁটা ছুরি ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ।

'কাল রাতে আপনার ঘুম হয়েছিল নিশীথবাবু?'

'পাঁচটার পর হয়েছিল।'

'ওঃ, এত দেরিতে? জিতেন তো একটা-দুটোর সময় ওপরে এল–পাঁচটা অব্দি জেগেছিলেন নিচে?'

নিশীথকে টোমাটো সসের শিশিটা এগিয়ে দিল নমিতা। শিশিটার দিকে তাকাল একবার নিশীথ।

'নিচে তো ফ্যান ছিল না; মশারি টানাতে হল; ওপরে চলে এলেই পারতেন অত গরমে? জিতেনের খেয়াল হয় নি, মাথায় সব জিনিস সব সময় খেলা করে না। তা হলে ড্রয়িংরুমে বা হলে শোবার জায়গা করে দিত আপনার'–বলতে বলতে নমিতা ওয়াটার কুলারের জলভর্তি কাঁচের কুঁজোটার দিকে তাকাল একবার। জল খাবে।

জল খাবে। তেষ্টা পেয়েছে বেশ। কিন্তু থাক, এখন না, পরে খাবে। এমনি জল খাবে, না রেফ্রিজারেটারের ভিতর থেকে বার করে এনে স্কোয়াশ খাবে? 'জল খাচ্ছেন না? দু গ্লাস ভর্তি জল রয়েছে। কিন্তু আমরা কেউই ধরছি ছুঁচ্ছি না নিশীথবাবু। কেন এ–রকম?'

'তেষ্টার অভাব হয়েছে আমাদের।'

নমিতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে এল হাসিতে; নিশীথের কথা শুনে নয়–এমনিই। হাসলে কেমন একটি ঝিলিক এসে পড়ে নমিতার চোখে-ঠোঁট শানিয়ে ওঠে; ছুরির মতন; কেটে নিশীথের রক্ত বার করে দেবে মনে হয়। কিন্তু তা নয়, বুকে রক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে, স্নিগ্ধ হয়ে থাকে। জল খাবে কি নিশীথ? মাঝে-মাঝে কী এক সংস্পর্শে এসে প্রকৃতির বড়-বড় সনাতন পাথরের আড়ালে তাদের ছায়ার মত যেন মন নিরাশ হয়ে থাকে। শরীরের পিপাসা চাপা পড়ে যায়।

'এই দু'গ্লাস জল ওয়াটার কুলারের ভিতরে ছিল।' নমিতা বললে। তুলে নিল একটা গ্লাস সে; ঢক-ঢক করে খেতে লাগল।

'জিতেন জামসেদপুরে পৌছে গেছে হয় তো?'

'এইবারে পৌছবে।'

'গিয়ে টেলিগ্রাম করবে না?'

'কেন?'

'আপনার মা কি রাতেরবেলা ফেরেন?'

'কে? মা–থিন? আমার বাবার কাছে? নমিতা জল খাবার ছলে গেলাসের ঠাণ্ডা কাচ গালিয়ে খেয়ে ফেলছে যেন, মনে হচ্ছিল। গেলাসটা টেবিলে রেখে একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে গেল।

'ইহুদিদের ভিতর বড় ডাক্তার থাকে? আমি ভেবেছিলুম ওরা ব্যবসায়েই জমাতে পারে। ওদের মধ্যে বিশিষ্ট বড় বিজ্ঞানী সাহিত্যিক রয়েছে।'

'ভারী বিচিত্র একটা জাত ইহুদিরা, বেশ বড় হাতে তৈরি। কী বলেন নমিতা দেবী?'

'তা ঠিক। কিন্তু ওদের মনের মধ্যে মোচড় রয়েছে, ঘুণ ধরে যায়। ওরা যা হতে পারত, তা হল না। ইহুদিদের ওপর আমি অবিচার করলাম?' নমিতা জিজ্ঞেস করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না। ইহুদিরা অনেক বড়-বড় জিনিস দিয়েছে। কিন্তু অন্য সব জাতিকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে আহরণ করতে হয়েছে সে-সব জিনিস। ইহুদিরা যা দিয়েছে তার অনেক কিছুর ওপরই কেমন একটা বিষণ্নতা, মৃত্যুর গন্ধ যেন।'

'ভালবাসেন সেটা আপনি?'

'আমি ভালবাসি। কিন্তু ইতিহাস তা ভালবাসবে কেন?'

'মৃত্যুকে কী রকম মনে হয়?'

'এগুচ্ছি মৃত্যুর দিকে। এইবারে আমি জল খাব।'

'অরেঞ্জ স্কোয়াশ আছে রেফ্রিজারেটরে। এনে দিই।'

'আমি নির্ঝরের জল খেতে ভালবাসি।'

'নির্ঝরের?'

'স্কোয়াশ তো ফ্যাকটরির জিনিস।'

নিশীথ হাত বাড়িয়ে, চোখ বুজে, ঠাণ্ডা কাচ স্পর্শ করে, এক ঢোঁকে গেলাসের সমস্তটা জল খেয়ে ফেলল।

'এটা কি নির্ঝরের জল?'

'নির্ঝরের খুব কাছে!'

শুনে নমিতা ডিশ, গেলাস, অনুভূতির দিকে তাকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে নিশীথের কথাটা আন্দাজ করে নিচ্ছিল।

'সেই জার্মান ইহুদি ডাক্তার রোজেনবুর্গ; তার সঙ্গে কি দেখা হল যখন গিয়েছিলেন মুখুজ্যে সাহেবের বাড়িতে?'

'না। তিনি রোজ আসেন না।'

'বায়ান্ন বছর মত বয়স আপনার বাবার। জাঁদরেল মানুষ। এ রকম শক্ত প্যারালিসিস হল। প্যারালিসিস হয় কেন মানুষের?'

নমিতা, অনিমেষ, জলে ভর্তি ঠাণ্ডা একটা কাচের গেলাসের দিকে, তাকিয়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে গালে চেপে ধরল। তার পর আরো ওপরে বাঁ দিকের রগের ডানদিকের রগের ওপর গেলাসটা চেপে রেখে নির্মিমেষ চোখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'শরীরটাকে বেশি কবুল করলে হয়ে যায়। কিংবা মনটাকে।'

নিশীথ হাত বাড়িয়ে দিল আর-এক গ্লাস জল খাবে বলে। তাকিয়ে দেখল, সব গ্লাসের জল ফুরিয়ে গেছে। নমিতার হাতে জলভর্তি একটা গ্লাস আছে শুধু। নমিতার কপালের ডানদিকের বাঁদিকের রগ স্নিগ্ধ হয়েছে, ঠাণ্ডা হয়েছে কপাল, মাথা; ঠাণ্ডা জলের গেলাসটা গালে ছুঁইয়ে টেবিলের ওপরে রেখে দিল।

'জল খাবেন আপনি?'

'আছে জল ঐ গেলাসটায়?'

'আছে। আপনি তো স্কোয়াশ খাবেন না। এই যে গেলাসটা রাখলুম এটা কি নির্ঝরের জল?'

'আঃ, কী ঠাণ্ডা।' গেলাসটা হাতে তুলে বললে, নিশীথ।

'রেফ্রিজারেটরে ছিল। তবুও এই গেলাসটার ভেতরে অনেকখানি বরফের গুঁড়ি ঢেলে দিয়েছে বাবুর্চি। দেখছেন কত বরফ—গলে নি বেশি।'

নিশীথ জল শেষ করে গেলাসের বরফের তলানির দিকে তাকিয়ে দেখল।

গেলাসের ভিতরে হাত ডুবিয়ে বরফের টুকরোগুলো তুলে নিল নমিতা; কপালে রগে ঘষতে-ঘষতে উঠে দাঁড়াল। নাকে-চোখে ঘষতে লাগল। টেলিফোন ডাকছে নাকি? তাড়াতাড়ি গেল নমিতা। কেমন যেন মনপবনের মাঠে চড়িভাতির মত খাওয়া ওদের হয়ে গেছে।

নিশীথ ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসল, বেসিনে প্রায় মিনিট পনের ধরে ভাল করে হাত-মুখ ধুয়েছে।

নমিতা টেলিফোন ধরতে সেই যে চলে গেছে নিজেদের ঘরের দিকে—তারপর এ দিকে আসে নি।

নরওয়েজীয় কুলকিনারা থেকে নেমে এসেছে নমিতা—ও ঠিক এ দেশী মেয়ের মত নয়—দেখতেও নয়, খুব সম্ভব ভঙ্গি কিংবা অর্থতাৎপর্যেও নয়, যে-গেলাসে মুখ দিয়ে জল খেয়ে ফেলেছে নিশীথ, তার তলানির বরফের কুচিগুলো হাত গলিয়ে তুলে নিল, রগে ঘষল—ঠোঁটে-চোখে রগড়ে নিল। আমাদের দেশের মেয়েরা এ-রকম করত না। যদি করত, তা হলে সে একটা খেলা হত, সে খেলার নাম আছে। কিন্তু নমিতা নিশীথকে কোনো খেলায় আহ্বান করে নিশীথের এঁটো গেলাসের বরফ নিজের চোখে ঠোঁটে ঘষতে যায় নি; ঘষেছে এমনিই—কানের পাশের রগ দপদপ করছিল বলে। গেলাসে হাত ঢুকিয়ে বরফের গুঁড়ো তুলে নেবার সময় মনেও ছিল না নমিতার যে ওটা এঁটো গেলাস, কিংবা খেয়ালে থাকলেও ও মানে যে বরফ এটো হয় না; কিংবা কোনো জিনিস এঁটো হলেও কিছু হয় না। শিশুর মনে, বালিকার মনে তুলে ঘষে নিয়েছে। রগড়াতে-রগড়াতে ভুলেই গেছে কী করছে না-করেছে।

নিশীথ ড্রয়িংরুমের ফ্যানটা খুলে দিল। চোতের বাতাস আসছিল বেশ ফুরফুর করে বাইরের থেকে, কিন্তু কিছুক্ষণ হল থেমে গেছে; কেমন গুমোট।

'আপনাকে খাবারের ঘরে খুঁজছিলুম, কখন এলেন আপনি?'

'অনেকক্ষণ।'

'খাওয়া না-হতেই টেলিফোন ধরতে উঠে গেলাম আমি।'

'খাওয়া তো শেষ হয়ে গেছল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শেষ হয়েছিল?' নমিতা দূরে দাঁড়িয়ে বইয়ের শেলফের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বলল, 'আমি ভেবেছিলুম শেষ না-হতেই উঠে গেলেন আপনি।'

'কে টেলিফোন করল?'

'মা করেছেন'-নমিতা নিশীথের মুখোমুখি খাকি রঙের একটা সোফায় এসে বসল, 'মা আমাকে দুপুরে নেমন্তন্ন করেছিলেন-'

'খেতে? আপনার তো খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে-'

'না খেতে নয়, তাঁর ওখানে তাস খেলতে যেতে। দুপুর, মানে আড়াইটে-তিনটে,' নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নমিতা বললে, 'এখন দুটো পঁয়ত্রিশ, আপনি তাস খেলতে জানেন?'

'খেলি মাঝে-মাঝে।'

নমিতা মাথা কাত করে একটু ভেবে নিয়ে বললে, 'মা ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে আছে।'

'কে ইফতিকারউদ্দিন?'

'একজন বড় ব্যারিস্টার তিনি। বড় মানে অনেক টাকা আছে। ব্যারিস্টারি করেন না তিনি।'

'দুপুরবেলা তাস খেলেন?'

'মার নেমন্তন্ন ছিল ওখানে, তাই তাস খেলবার ব্যবস্থা হয়েছে হয় তো?' বলে ঘরের ঝকঝকে কাঁচের শার্শিগুলোর উপর তাকিয়ে দেখল, গরম উজ্জ্বল দুপুরের সূর্যখণ্ডগুলো এসে পড়ছে সব-পরিচিত আস্বাদের মত যেন, 'মাকে বলে দিয়েছি যে আমি এখন যেতে পারব না, পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটায় যাব। বলেছি জিতেন এখানে নেই, জামশেদপুরে গেছে।-এই যে টিন,' বললে নমিতা।

নিশীথ তুলে নিল একটা। হাতের কাছে ছোট তেপয়র উপর রেখে দিল নমিতা টিনটা, নিজে সিগারেট নিল না। দেশলাই দিল নিশীথকে। শার্টের বুক পকেটে দেশলাইটা রেখে দিল নিশীথ-জ্বালাল না।

'ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের বাড়ি গিয়ে তাস লেখব দুপুরবেলা আমি-সে হয় না। যদি কোথাও যাই দুপুরে-বাবার কাছে যাব। দু'জন নার্স ঠিক করে দিয়েছি বাবার জন্যে-তারা আছে ওখানে, তবে আমি মাঝে-মাঝে গেলে-বাবা চান যে আমি যাই। আমিও চাই যেতে।'

'যাবেন নাকি আজ দুপুরবেলা?'

'না।'

'কেন?'

'এই তো ইয়ুসুফ সাহেবের কাছে টেলিফোন করে এলাম।'

'ইয়ুসুফ কে?'

'বাবা যে ফ্ল্যাটে থাকেন, পার্কসার্কাসে, তারই আর-এক দিকে থাকে ইয়ুসুফ আর তার স্ত্রী, খুবই ভাল লোক ওরা। কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে আয়েসা। ফোন ধরল ইয়ুসুফ নিজে, বললে, মুখুজ্যে সাহেব ঘুমিয়ে আছেন, বাবা জেগে উঠলে-ওখানে আমার যাবার দরকার হলে, ইয়ুসুফ আমাকে জানাবে।'

'দরকার যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে!'

'সে সব তো নার্সদের হাতে। বেশি দরকার হলে ডাক্তার আছেন। ইয়ুসুফের ভাই জুলফিকার তো সারাদিন বাড়িতেই থাকে। বাড়িতেই তার অফিস। দরকার হলে ডাক্তারকে ফোন করে দেবে জুলফিকার। বাবা দুপুর-বেলা আমাকে চান না।'-নমিতা বললে।

বুক পকেট থেকে দেশলাই বার করে সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল নিশীথ।

দুপুরবেলা মোটর ড্রাইভ করে তার ওখানে যে আমি যাই সে হুজ্জোতি মোটেই পছন্দ করেন না তিনি, বলেন এ-রকম করলে তোমার প্যারালিসিস হবে'-বলে বালিকার মত, মুখ-দুষ্ট নির্দোষ যুবতীর মত মুখে, একটু চোখ টিপল, হেসে নিল নমিতা, 'আজ সাড়ে পাঁচটার আগে বেরুব না।'

'কোথায় যাবেন?'

'মার ওখানে তাসের আড্ডা ভেঙে যাবে তখন না ভাঙলেও তাস খেলব না আমি। ওরা ফ্ল্যাশ খেলে।'

'ফ্ল্যাশ?'

'ফ্ল্যাশ খেলতে শুরু করে মার বার-ফটকা ভাবটা কেটে গেছে খানিকটা। বসে থেকেও যে নেশা করা যায় টের পেয়েছে; পান জর্দা কিমামও খাচ্ছে আজকাল। ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে বেশি 'মেলামেশা হচ্ছে-'

নিশীথ খুব আস্তে-আস্তে সিগারেট টানছিল।

'আপনি হলে শোবেন আজ রাত থেকে।'

হলে শোবে আজ রাত থেকে নিশীথ? কী করবে? সিগারেটের ছাই ঝেড়ে উত্তর দিতে যাচ্ছিল। নিশীথ কিছু বলবার আগে নমিতা বুঝিয়ে দিল জিনিসটা তাকে, 'নিচে তো ফ্যান নেই, খুব বাতাস খেলে হলে-ফ্যাকটরির বাতাস নয়-নির্ঝরের।'-বলে হাসল নমিতা, টিনের থেকে একটা সিগারেট বার করে নিল-'আর যদি ফ্যাকটরির জিনিস চান, তা হলে হলের দুটো পাখা খুলে শুয়ে থাকতে পারেন।'

নিশীথ, কথা ভাবছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি ভাবছিলাম আমাদের শোবার ঘরের পাশে যে-ঘরটা আছে সেখানে ঠিক করে দিলে হয়। জিতেন মাঝে-মাঝে ওখানে বাড়ির অফিস করে–রাতে শোয়। ভারি চমৎকার হাওয়া ঐ ঘরে। মাথার উপর ফ্যান-টেবল ফ্যানও আছে। স্কাইলাইট অনেক। দরজা-জানালা বন্ধ করে শুলেও কোনো অসুবিধা হবে না।

'বন্ধ করার কী দরকার?'

'আমরা করি না। কিন্তু কেউ-কেউ ভাবে দোর আটকে না-রাখলে চোর আসে–'

'তা আসে বটে। অফিসের দরকারি কাগজপত্র বুঝি সব? টাকা আছে?'

–নমিতাকে জিজ্ঞেস করল নিশীথ। নমিতা নিজের পা ঘেঁষে কার্পেটের নক্সার দিকে তাকিয়েছিল, নিশীথের চোখে চোখ পড়ল তার।

'ক্রশড চেক। চেক ছাড়া টাকা কে বাড়িতে রেখে দেয় আজকাল'

সিগারেটের খানিকটা ছাই অন্যমনস্কভাবে কার্পেটের ওপরই ঝেড়ে ফেলে বললে নিশীথ, 'টাকা তো ব্যাঙ্কে থাকে।'

'কোন ঘরে শোবেন আপনি?'

'হলটা বড্ড বড় হয়ে পড়ে–ল্যাটা মাছকে সাগরে পাঠিয়ে লাভ কী?'

'লাভ আছে বই কি'–হাতের সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিয়ে নমিতা বললে–

'সেখানে তার হাঙর হয়ে পড়বার সম্ভাবনা।'

'আমি জিতেনের ওখানেই শোব।'

'জিতেন ফিরে এলে?'

'হলে।'

নমিতা নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'তিনটে বেজেছে। আপনার তো বিশ্রাম হল না–'

'ঘুম? ঘুমের সময় আছে, হাত-পা ছড়িয়ে সোফায় বসে আছি, পাখা ঘুরছে, আপনার সঙ্গে কথা বলছি, ড্রয়িংরুমে বসে খুব ভাল লাগছে আমার।'

নমিতা সিগারেটের ধোঁয়া শেষ পর্যন্ত আত্মসাৎ করে কেমন একটা স্তম্ভনের ঘোরে নিশীথের দিকে তাকিয়েছিল।

'ঘুমোতে যাবেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল নিশীথ।

'না। এখন না।'

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। নিভে যাচ্ছিল নিশীথের সিগারেট। কিছু-কিছু ধোঁয়ার ভগ্নাংশ ধীরে-ধীরে বেরুচ্ছিল নমিতার মুখের ভিতর থেকে। 'হানিফকে বলব জিতেনের ও-ঘরটায় আপনার জিনিসপত্তর রেখে দিতে?'

'হানিফ কে?'

'আমাদের বেয়ারার।'

'জিতেনের এ বাড়িতে আর্দালি চাপরাশি তো খুব কম।'

'হানিফ আছে, রফিক আছে, বিশু, মহিম আছে, বাবু-বিবি আছে। আমরা দু'জন লোক তো শুধু, আপনার সঙ্গের লাগেজ সবই তো নিচে?'

'এই হানিফ!' ড্রয়িংরুমের জানালার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাক দিল নমিতা।

'হুজুর!' বলতে না-বলতেই দুড়দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে কুড়ি-পঁচিশ বছরের একজন পাঞ্জাবি মুসলমান ছোকরা ড্রয়িংরুমের দরজায় এসে হাজির হল। নিশীথের বিছানা, স্যুটকেস, সাহেবের দুসরি কামরায় রেখে আসতে বলা হল। 'লেকপাড়ায় দু'জন মুসলমান আর্দালি রেখেছে দেখেছি জিতেন।

কোথাকার মুসলমান?'

'পাঞ্জাবের।'

'বিপদে পড়বে না তো?'

'না, এখন আর কিচ্ছু হবে না।'

'ওদের নিজেদের মনে কোনো ভয়ডর নেই?'

'কিচ্ছু না।' নমিতা বললে, 'একটা কথা আগের থেকে আপনাকে জানিয়ে রাখা দরকার, যে-ঘরে আপনি শোবেন'–দরজায় ছায়া পড়তেই চোখ খুলে তাকাল সে। হানিফ এসে বললে জিনিসপত্তর রেখে দেওয়া হয়েছে বড়–সাহেবের ঘরে। সে একটু পার্কসার্কাস যেতে চাইল ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের ওখানে। পাঁচটার সময় ফিরবে।

'কেন? সেখানে কী আছে? সাদি? যিতনা কুছ কোশিশ করো হানিফ–'

'হুজুর, কুছ নেই–লেকিন–হামেশা–'

'আচ্ছা যাও।'

যে-কথা পাড়ছিল নমিতা, হানিফ এসে পড়াতে ভেঙে গেল, কথাটি যেন পাড়বে না আর নমিতা–মনে হল নিশীথের। জানালার ভিতর দিয়ে অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে আছে সে, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় যা-দেখার তা ছাড়া আর-কিছু দেখছে না যেন। কোনো ব্যথা নয়, দুরাশা নয়, ক্লান্তি নয়; কিন্তু নানারকম কথা বলার অবক্ষয়ে যে-নিস্তব্ধতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে পড়ে মানুষের চোখে-মুখে—পৃথিবীর সমস্ত জিনিসেরই অবসান যে-রকম নিস্তব্ধ (হয়তো নিষ্ফল) তেমনি নির্বাণ চক্রের মতো তাকিয়েছিল যেন—কোন জিনিসের দিকে নয়, অফুরন্ত সময়-কণিকাগুলোর দিকে।

'জিতেনের ঘরে শোবেন আপনি আজ রাতে, কিন্তু ঘুমুতে পারবেন তো?'

'কেন কী হবে?'

'সে ঘরে টেলিফোন বাজে!'

'তা বাজতে থাকবে।'

'ধরতে হবে তো।'

'জিতেন জামশেদপুরে আছে—টেলিফোন ধরে কী লাভ?'

'বড় ব্যবসায়ী মানুষের কাছে নানারকম জরুরি খবর আসে। জিতেন জামশেদপুর—সবাই কি তা জানে। সাহেব চলে গেলে তার স্ত্রী নেই? সাহেব তো হল। আমার নিজের প্রাইভেট টেলিফোনও আছে; রাতে, অনেক রাতেও আসে।'

'অনেক রাতে যে প্রাইভেট ফোন আসে সেটা আমার ধরা উচিত নয়।'

'সে ফোন আমার অনেক রাতের নিজের জিনিস; যদি অনুচিত হয় আমি নিজে বলে দেব,' নমিতা হেসে বললে—

নিশীথ সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'জিতেন ধরে?'

'আমার ফোন?'

'হ্যাঁ'

'ওর ঘুম বেশি।'

নিশীথ চিমটের মত করে ডান পায়ের আঙুল দিয়ে টেনে তেপয়টা আস্তে-আস্তে নিজের দিকে নিয়ে এল। সিগারেটের কিছুটা ছাই তেপয়ের অ্যাশ-ট্রের ভিতর ঝেড়ে ফেলে তেপয়টা আঙুলে ঠেলে আস্তে-আস্তে সরিয়ে দিল আবার, 'রাত-বিরেতের সমস্ত টেলিফোনই আপনার ধরতে হয়?'

'বেশি রাতে জিতেনের কাছে ফোন আসে না।'

'আমি যদি ধরি আপনার ফোন'—বলে নিশীথ চুপ করল। আরো কিছু বলবে হয় তো সে। কী বলবে, বলে নিক; শোনা যাক। নমিতা নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, নিশীথ কিছু বললে না আর।

'আপনি ফোন ধরে যদি ওদের কথাটা জেনে রাখতে চান ওরা তাতে ভড়কাবে না।'

'আপনি তখন ঘুমুচ্ছেন?'

'ঘুমুচ্ছি হয় তো—'

'আপনার কানের কথা আমাকে বলবে?'

'শোনার অনুমতি রয়েছে বলেই তো কান পেতে আছেন-জানবে না তারা?'

'কী ভাববে তারা? নমিতা দেবীর সেক্রেটারি?'

'হয় তো জিতেন দাশগুপ্তকে বলছে। কিংবা—'

'কিংবা?'

'নিশীথ সেনকে।'

সিগারেটটা জ্বলে-জ্বলে নিশীথের আঙুল পুড়িয়ে ফেলছিল প্রায়। তবুও সেটাকে ফেলে না দিয়ে আঙুলে আটকে রাখল নিশীথ। বেশি দগ্ধাচ্ছিল বলেই, নাকি অন্যমনস্কতায়, হাতের থেকে খসে পড়ে গেল সিগারেটটা—কার্পেটের উপর। তুলে নিয়ে অ্যাশ-ট্রের ভিতর ধীরে-ধীরে ডুবিয়ে রাখল নিশীথ।

'বেশি রাতে ফোন আসে আপনার—রোজ রাতেই?'

'না, রোজ রাতে নয়—তবে কোনো-কোনো সময় রোজ রাতেই।'

'আপনার ফোন ধরব আমি; জেগে উঠি যদি।'

'ফোন এলেও ঘুমোতে পারবেন?'

কোনো-কোনো ফোন খুব ভয়কাতুরে—দু-একবার ডেকেই ছেড়ে দেয়।'

'অত রাতে যারা চায় তারা ভয়কাতুরে নয়'; আমাকে না পেয়ে তারা ছাড়বে?'

'আপনাকে না পেয়ে? কোথায় আপনি তখন? ঘুমিয়ে তো আছেন—'

'ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু কেউ না জাগলেও, আমাকে না-জাগিয়ে ছাড়বে না ওরা।'

নিশীথ ব্যাহত হয়ে বললে, 'এই রকম ডাকসাইটে?'

'কেন দুপুর রাতের ঘুমে এত কী মায়া?'

'মানুষের দুটো নিস্তব্ধতা আছে পৃথিবীতে—মৃত্যু আর ঘুম, এ ছাড়া আর-সবাই শেষ পর্যন্ত অজ্ঞেয়।'

অনিমেষভাবে চুপ করে থেকে কিছুক্ষণ পরে নমিতা বলল—'নিস্তব্ধতা আছে মানুষের জীবনে। কিন্তু তা ঘুম? মৃত্যু?' ঘরের ভিতর কোথায় যেন শব্দ হল—বেড়ালের? বাতাসের? লোকজনের?—'আমি তা মনে করি না।' নমিতা বললে যেন ঘুমের থেকে জেগে উঠে। তা মনে না-করাই স্বাভাবিক। সাদা সাধারণ পথে চলতে-চলতে সহজ কথাবার্তার ভিতর দিয়েই জটিলতা এসে পড়ে, কথাবার্তা বলতে-বলতে আজ নিবিড়তা এসেও পড়েছিল হয় তো—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোজা সহজ পথে, কিন্তু সব গহনতাই নেশার মতন জিনিস। নেশায় ধরলে মন ব্যক্তিগত হয়ে উঠতে চায়, নিস্তব্ধতা আছে ঘুম আর মৃত্যুর-অগ্রসর হচ্ছে সেই দিক নিশীথের জীবন। অগ্রসরের সীমানায় পৌঁছুলেই সমাধি, যে-সংস্কৃতি ও বৃদ্ধির ভিতর থেকে জেগেছিল নিশীথের জীবন চল্লিশ বছরেরও আগে, নৈষ্ফল্য ভেদ করে সার্থকতায় পৌঁছুবার আশা সে পোষণ করেছিল বারবার। আশাকে সফল করে তুলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টাও করেছে কতবার সে। কিন্তু কিছুতেই ভেদ করা সম্ভব হল না। কিন্তু নমিতা আর-এক পৃথিবীর। তার সফলতা কিংবা ব্যর্থতা অন্য রকম। ঘুম বা মৃত্যুর বাইরে সে এক অন্য কৈবল্যের স্তর। টাকা রয়েছে সেখানে-টাকাই সব; মিলন রয়েছে সেখানে, মিলনই সব; দেহ রয়েছে-নানা রকম সুধা, ফেনা, সৈন্ধবের স্বাধ উপলব্ধির ভিতরে পৃথিবীর মাটিকে নিকটতমের মত পায় শরীর। আকাশের নক্ষত্রলোকের ব্যক্তির ভিতরে কামশরীরের মত আলোকিত হয়ে ফেরে মন। কেন ঘুমোতে চাইবে ও জগতের মানুষ? কেন মৃত্যু চাইবে? নমিতার মতন জীবন পাওয়া-কিংবা জিতেন দাশগুপ্তের মতন; সম্ভব কি নিশীথের পক্ষে?

'খুব বেশি রাতে আসে টেলিফোন আপনার। হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারের ভিতর কান পেতে শোনেন? মানুষ মানুষের অন্তরঙ্গ বলেই মেশিনের স্বাদ এত বেশি।'

'মেশিনের?'

'হ্যাঁ টেলিফোনের'-নিশীথ বললে-' টেলিফোনের ঘরেই শোব আমি।'

'অন্য সব দিক দিয়েই ঘরটা খুব ভাল। বেশ নিরিবিলি ঠাণ্ডা। কলকাতার চারিদিকের হাওয়া এসে কথা বলে যায় যেন; কিন্তু মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার জন্য। জেগে-জেগে ঘুমিয়ে যাবে মানুষ, তার পর সাত ভাই চম্পার মত ঘুমিয়ে পড়ে-কেঁচে গুণ্ডুষ করে।'

'ও ঘরে জল আছে?'

'জল রেখে দেব'-বললে নমিতা যে জলসত্রের মত মূর্তি ধরে।

ঘোমটা নেই, তবুও রয়েছে অনেক দূরে গলা অব্দি ঘোমটা টেনে-রাতের ঠাণ্ডা ভবন্ত নদীর জল-ওর ঐ গলার স্বরের ভিতর, 'জল রেখে দেব বলে' ডাকছে-জোনাকিকে, নক্ষত্রকে।

'যদি বলেন, হানিফকে বলব আপনার ঘরে ওয়াটার কুলারটা রেখে আসতে।'

নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, 'কিছু বরফ রেখে দেয় যেন, ওয়াটার কুলারের দরকার নেই।'

'অনেক রাতে টেলিফোন এলে-ঘুম ভেঙে গেলে-বিরক্ত হবেন না তো?'

'অসময়ে ঘুম ভেঙে দিলে খুব খুশি হব না, তবে অন্ধকার ঘরে জেগে উঠে পৃথিবীর অন্ধকার, পৃথিবীর হাওয়া, পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে আবেদন আসছে টের পেয়ে খারাপ লাগবে না।' নিশীথ পায়ের আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ ঠুকল কার্পেট। অ্যাশ-ট্রেটা হাতে তুলে নিয়ে রেখে দিল।

সিগারেটের টিনের ঢাকনি খুলে ভিতরের সিগারেটগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঢাকনি এঁটে বললে নমিতা, 'ভাল কথা খুব ভালভাবে আপনি বলতে পারেন নিশীথবাবু।'

'আমাদের কলেজের জয়মাধববাবু পারতেন, আমি পারি না। আজ সকাল থেকেই মন দিয়ে আপনার কথা শুনছি আমি। এতদিন বাইরে-বাইরে থেকেও নিখুঁত বলে যাচ্ছেন কত সহজে; অনেক বাঙালিও এ-রকম পারে না।' নিশীথ নমিতার দিকে তাকাল।

যেন নিশীথের কথা শোনে নি নমিতা, এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে আছে, সিগারেট জ্বালিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল-'আপনি কোথাও বেরুবেন বিকেলবেলা?'

'না, কোথাও না।'

'কেন?'

'আজ সকালে খানিকটা ঘুরে এসছি। কাল বেরুব। কোনো ভাল বই আছে?'

'আছে। আমি পছন্দ করে দিয়ে যাব। পড়ে আমাকে বলতে হবে কেমন লাগল। আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন?'

'না।'

'খবর জানবার তাগিদ নেই আপনার, দেখছিলুম আমি। জিতেনের খুব আছে। আমার মাঝে-মাঝে থাকে-'মাঝে-মাঝে হারিয়ে ফেলি। পড়বেন খবরের কাগজ?'

'না'-বললে নিশীথ-'বিকেলবেলা ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের বাড়ি বেড়াতে যাবেন?'

'ভাবছি কী করব, নমিতা বললে, 'দু-একদিন ফ্ল্যাশ খেলেছি ওদের সঙ্গে। ভাল লাগে না, টাকা নষ্ট হয় বলে নয়; ওদের ওখানে কেউ নেই যেন মনে হয়, কিছু নেই যেন; ভারী ফাঁকা লাগে। অথচ খুব হৈ চৈ দিনরাত। আমি শান্তি ভালবাসি কিন্তু বোকার মতো নয়। তার চেয়ে অশান্তি ঢের ভাল। কিন্তু ওদের ওখানে-যারা নিদরাত সরগরম হয়ে থাকতে ভালবাসে তাদের খুব ভাল লাগবে।'

'জিতেন যায় না ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের বাড়ি?'

'না।'

'সলিল মুখুজ্যে সাহেবের ওখানে?'

'ক্বচিৎ যায়। নানারকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।'

'খুব বেশি রাতে কারা টেলিফোন করে আপনাকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কয়েকটা রাত ধরলেই তো বুঝতে পারবেন।'

'আমি ধরব? আপনি তো ঘুমিয়ে থাকবেন।'

'আমাকে যা জানাবার আপনাকে তা জানিয়ে দেবে।'

'যেন জানালেই হল, বড় বাজারের মাড়োয়ারিয়া নাক রগড়ে কোটেশন জানাচ্ছে; সেই রকম বুঝি? কিন্তু তা তো নয়–'ভাবছিল নিশীথ।'

নমিতাকে ডাকলে নিশীথ সেন যদি হাজির হয়–'

'তা হলে এক মণ তুলোর থেকে এক মণ লোহা বেশি ভারী হবে বুঝি?–' নমিতা হাসতে-হাসতে বললে।

'বাইরে পড়ন্ত রোদ, সমস্ত ড্রয়িংরুম চৈত্রের বিকেলের বাতাসে ভরে গিয়েছে, দু-একটা খোলা পাতলা বইয়ের পাতা ফরফর করে উড়ছে। মস্ত বড় দেওয়াল-ক্যালেন্ডার দুটো উল্টে-পাল্টে শিলাবৃষ্টির মত ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ছলাৎ-ছলাৎ করে দেওয়ালের উপর। বাইরে পটকা ফলের মত আলোর রং যেন–গাছ, পাখি, আকাশ ছুঁয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ছে; যেন কেউ ছিল না এখানে, তাকে তারা সুজাতার মূর্তি দিয়েছে, অন্যমনস্ক হয়েছিল পুরুষ, তাকে তারা বিপ্রতিভ করে তুলেছে; কনে-দেখা আলোর কণিকারাশিকে জ্বালিয়ে তুলে বিচলিত করে দিয়ে পুরুষটিকে, নিমেষনিহত করে রেখে নারীকে হু হু করে ছুটে আসছে চৈত্রের অবলায়িত বাতাস; ডানার পালক ছিঁড়ে সাদা পায়রার, উড়ন্ত কাকটাকে ধাক্কা দিয়ে কার্নিশে কাত করে, শিমূলের তুলো উড়িয়ে কোথায় ছুটে চলে গেল তারা সব কমলা রঙের ঐ মেঘ–সুমাত্রা, শ্যাম, মালয়ের মত ছেঁড়াফোঁড়া মেঘের আঁশ নিভিয়ে-নিভিয়ে ফেলে।

'না, আজ আর বেরুব না নিশীথবাবু।'

'কী করবেন তা হলে?

'চলুন আপনাকে সেই বইটা দেব। আমিও একটা বই পড়ব এখানে ড্রয়িংরুমে বসে।'

বই আনা হল। বাতি জ্বালানো হল। পড়তে বসল দু'জনে দুটো সোফায়। খুব কাছাকাছি নয়, দূরে নয়, নেহাত মুখোমুখি নয়, আড়াআড়ি-ভাবে মুখোমুখি।

'ভাগ বসালাম না তো আপনার নিরিবিলি বই পড়ার উপর নিশীথবাবু?' কোনো উত্তর দিল না নিশীথ। নিঃশব্দে পড়তে লাগল দু'জনে, প্রায় দু'ঘণ্টা উতরে গেল। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের টিন থেকে বের করে নিয়ে সিগারেট জ্বাললে–খেল–মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখল নীল ধোঁয়ার সরু ফালির দিকে-দেখল, বেড়ে বড় হয়ে সাদা নীল ধোঁয়া মিলিয়ে যাচ্ছে সব। নড়ে-চড়ে বসল তারা–মাথা তুলে তাকিয়ে নেয়; পরের বার চোখাচোখির সময় ক্ষতিপূরণ করে কী যে বীতাশোক তিমিরাতীতভাবে, কিন্তু তার পরের বার চোখকে এড়িয়ে চলে চোখ, কোনো কিছু হয়েছিল স্বীকার করতে চায় না; উপলব্ধি করেছিল তাদের ভিতর একজন–নাকি দু'জনেই তারা? কিন্তু তাও একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরল না কারো; নিজের সোফা ছেড়ে দু'মুহূর্তের বাইরের সন্ধানেও উঠে গেল না কেউ। কতদূর পড়া হল বই? শিখণ্ডীর মতন নয় বই, মনীষীদের লেখা; খুব ভাল জিনিস,–'কিন্তু ভাল জিনিসেরও বেশি খুব ভাল নয়,' বললে নিশীথ অনেকক্ষণের নিস্তব্ধতা ভেঙে।

তার মানে? হাতের বইটা বন্ধ করে সরিয়ে রাখল নমিতা, ধিকি-ধিকি ভস্মস্নিগ্ধ হাসিতে, বই, নয়, কী-যেন অন্য কোনো কিছুর সময় অতীত হয়ে যাচ্ছে অনুভব করে উঠে, ফিরে এল নিজের সোফায় নমিতা, হাতের বইটা বন্ধ করে রাখল নিশীথ।

কলকাতায় আসবার আগে নিশীথের জলপাইহাটিতে কয়েকটা দিন কী রকমভাবে কেটেছিল? জলপাইহাটি ছেড়ে নিশীথের কলকাতায় রওনা হওয়ার আগে সুমনার শরীরের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। জলপাইহাটি কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনেছে না নিশীথের–এখানে থেকে গড়িমসি করে লাভ নেই তার–কলেজের কাজ ছেড়ে দেবে ঠিক করেছিল নিশীথ–না-ছেড়ে দিলেও অবিলম্বে ছুটি তো নেবেই, দুটি না দিলে কলেজে যাবে না সংকল্প করেছিল সে। এ রকম অবস্থায় দেশে পড়ে থেকে লাভ নেই কিছু–নিশীথের মন কলকাতায়–ঘুরে দেখে আসুক নিশীথ ঃ ভাবছিল সুমনা। নিশীথকে সুমনা নিজেই আশা-ভরসার কথা বলে পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছিল কলকাতায়। সপরিবারে থাকা কলকাতায় গিয়ে? কোথায় পরিবার নিশীথের? কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতালে ভানু বাঁচবে না। ভানুর দিদি বেঁচে মরে আছে কোথাও, কোথায় যে বের করতে পারবে না কোনোদিন। কেউ কেউ বলে পদ্মা মেঘনার গ্রাম-জঙ্গলে বকের দ্বীপে, চিলের দ্বীপে মেয়েদের কান্নার সুর শোনা যায়–অনেক গভীর রাতে, কেউ-কেউ আরও দূরের খবর দেয়–করাচিতে, শিয়ালকোটে, পেশোয়ারে, লাহোরে, নিজামের দেশে হায়দ্রাবাদে? কোথায় নিয়ে গেছে রানুকে–অতদূরে নিশ্চয়ই নয়। কে কারা নিয়ে গেছে–তাও তো বলতে পারা যায় না। জলপাইহাটিতে কোনো চেনাজানা মানুষ সেই সঙ্গে সেই রাত্রে যে সরে পড়েছে তা তো শোনা যায়নি। কলকাতায় তখন দাঙ্গা হচ্ছিল বটে। কিন্তু কলকাতার দাঙ্গা জলপাইহাটিতে ছিটকে পড়ে নি তো; কেউ শোনে নি। মনটা ছটফট করছিল সুমনার; কাঁচড়াপাড়ার ভানুর জন্যে; বাঁচবে না হয় তো; মরবে না হয় তো; কিন্তু ভানু এলাকার ভিতর আছে। মরে গেলেও ছাই হাড়, যে-জায়গাটায় দাহ করা হবে, নাগালের ভিতর চিহ্নের দেশে থেকে যাবে সব। কিন্তু বড়সড় সুন্দর মেয়েটি কেমন সুস্থ ছিল সূর্যতারার আগুনের মত, তার জন্যে দেশ নেই, সমাজ নেই, কেউ নেই, জীবন নেই তার–মৃত্যু নেই।

কলকাতায় যাবার দু-একদিন আগে নিশীথকে বলেছিল, সুমনা, 'তুমি তো যাচ্ছো কলকাতায়, রানুকে খুঁজে দেখো তো।'

'আচ্ছা দেখব'–বলেছিল নিশীথ। কিন্তু দেখবে না, খুব সমীচীন লোক নিশীথ, খুব আত্মস্থও বটে; মিছিমিছি মসজিদে ঢোকবার লোক নয় সে। ঢুকে কোনো লাভ নেই জানে সে ঃ নিশীথ সত্যই জানে যে রানু নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি কলকাতায় চললাম, সুমনা।'

'কোথায় গিয়ে উঠবে?'

'জিতেন দাশগুপ্তের বাড়ি।'

'জিতেনবাবু বিয়ে করেছে শুনলাম–'

'কই আমি তো শুনিনি। কার কাছে শুনলে? ও বিয়ে করবে, আমাকে খবর দেবে না?'

'আমাকে যতীন হালদার বলেছিল। মগরাহাটির যতীন। কলকাতায় নানা রকম টুকিটাকি কাঁচামালের ব্যবসা করে; তা ছাড়া আরও কী বলছিল আমাকে'–সুমনা ছড়ানো ডান হাতের উপর কপাল ঠেকিয়ে মাথা হেঁট করে মনে করে নিয়ে বললে–'মনে পড়েছে, বলছিল ব্যাকেলাইটের ব্যবসা করে, ব্যাকেলাইট কী?'

'ব্যাকেলাইট। জানি না। তো যতীন কী করে জানল জিতেন বিয়ে করেছে?'

'দাশগুপ্ত সাহেবের অফিসে যেতে হয় যতীনকে ব্যবসার কাজে। অফিসের লোকেদের কাছে শুনেছে হয় তো।'

শুনে, নিশীথ নিজেকে কেমন একটু কাবু বোধ করল যেন। কলকাতায় যাবার উৎসাহে একটু পোড় লাগল। জিতেন তা হলে বিয়ে করল–যেন। ভরতের বাটুল খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে হনুমান।

'আগে ভাল করে দেখেশুনে নাও।'

'খারাপ খবর কখনো মিথ্যে হয় না, লোকটি বিয়ে করেছে এত দিন পরে, শত্রুর ভালর জন্যে নয় নিশ্চয়ই।'

'সেটা খারাপ খবর হল। ভাল বন্ধুই বটে তুমি জিতেনবাবুর–'

অনেক যুদ্ধ করেছে জীবনে নিশীথ, কোনো যুদ্ধেই জয়ী হতে পারে নি। এখন আর লড়াইয়ে জেতবার আশা নেই তার। আচ্ছা শেষবারের মতো লড়ে দেখা যাক, এবার না-জিতে ছাড়াছাড়ি নেই। এ রকম কোনো সংকল্প উৎসাহ এখন নিশীথের হৃদয়ে নেই আর। কিন্তু স্বাভাবিক প্রাণোচ্ছ্বাস রয়েছে; তা রয়েছে, সুযোগ পেলেই উপচে উঠতে চায়। নিশীথ সুমনার কাছে থেকে ঘুঙুর চেয়ে নিল; রানুর জন্যে কেনা হয়েছিল, রানু যখন ন-দশ বছরের। রানুর ঘুঙুর কোনো রকমে জোড়াতাড়া দিয়ে পায়ে এঁটে নিয়ে নিশীথ, কলকাতার এম্পায়ারে কী এক রাবণনৃত্য দেখেছিল এক-সময়, তেমনি দুর্দমনীয়ভাবে নাচতে–নাচতে বললে– 'সুমনা, যাবে বিবাহে চলিলা বিলোচন।'

'কে, বিলোচন কে? বিলোচন কে! নিশ্চয় দাশগুপ্ত সাহেব! তাই না? যবে বিবাহে চলিয়া বিলোচন–দেবে না দেবে না যবে বিবাহে–বিবাহে–চলিয়া...দ্রুম দ্রুম–চোখে ঘুরিয়ে বাবরি উড়িয়ে রাবণনৃত্যে বাসুকির মাথা না থেঁৎলে ছাড়ছিল না নিশীথ; কলেজের ফিলসফির প্রফেসর মহিম ঘোষাল এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। মহিমবাবুর সঙ্গে কথা সেরে এসে দরজা বন্ধ করে আবার নাচতে লাগল নিশীথ। সুমনাকে আচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে দেখে নাচ থামাল। বললে, 'পারনিসাস এনিমিয়ার রুগি। এদের সঙ্গে ঘর করে মজাও করতে পারা যায় না একটু।'

'মজা কলকাতায় গিয়ে করো, দাশগুপ্ত সাহেবের বৌয়ের কাছে। তোমার এ-রকম নাচ দেখলে আমার মাথা যেন কেমন করে ওঠে।'

'কেমন আছে শরীরটা আজ?'

'বড় খারাপ লাগছে।'

'খারাপ!'

'খারাপ। মনে হচ্ছে যেন মরে যেতে বাকি নেই বেশি–'

নিশীথের হাত ধরে সুমনা তাকে নিজের বিছানার পাশে টেনে বসাল। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে বসল নিশীথ। অনিচ্ছাটাকে অতর্কীতভাবে চেপে রেখেছে ঠিক-কিন্তু তবুও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিয়ে স্বামীকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝে নিতে পারে কোনো-কোনো স্ত্রী। সুন্দর ছিল বটে সুমনা একদিন-কিন্তু কেমন হাড়-ফ্যাকাসে রঙ হয়ে গেছে–শরীরে হাড়গোড় ছাড়া কিচ্ছু নেই আজ তার। নিশীথ পণ্ডিত লোক, কিন্তু তবুও বিলাসী মানুষ, দেহরসিক আরো বেশি। কী করবে সুমনাকে নিয়ে আজ? স্ত্রীর শরীর একেবারে বাতিল। হাড়ের ভিতর দিয়ে চি চি করে যে-শব্দ বেরয়, নিশীথের মত মানুষের মনে খোরাক মেটাতে গিয়ে জাউয়ের মত কাজ করে তা, ভুসির মত ভুর হয়ে পড়ে থাকে।

'তোমাকে চেঞ্জে যেতে বলেছে ডাক্তার মজুমদার।'

'কোথায় যাব?'

'কোনো শুকনো জায়গায় ঃ কাছেই; দেওঘর, গিরিডি যেতে পারো, মিহিজাম, জামতাড়া, বাড়গ্রাম–'

'টাকা আছে চেঞ্জে যাবার?'

'ধার করে নিতে হবে।'

'প্রভিডেন্ড ফান্ডে টাকা নেই?'

'সব নিয়েছি, আর নেই।'

'কার কাছ থেকে ধার করব?'

'নিশীথ একটু ভেবে বললে, 'জিতেনকে বলে দেখব।'

'কিন্তু জিতেনবাবু তো টাকা ধার দেন না।'

'সুমনার দিকে খানিকটা সরস বিস্ময়ে তাকিয়ে নিশীথ বললে, 'কে বললে তোমাকে?'

'তুমিই তো বলেছ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি বলেছি?' সুমনার মরুগুঞ্জে শালিখের মতো চোখের ঘোলাটে ভাবটা ভাল লাগছিল না নিশীথের। একটা বেড়াল...ভারী ধবধবে সুন্দর তিব্বতি বেড়ালের মত মোটাসোটা সাদা ফনফনে লোমে লোমাচ্ছন্ন; বেড়ালটা মাদি; অর্জুন গাছের ছায়াকাটা রোদে বসেছিল; বেড়ালটার সুন্দর মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ সচকিত তাকিয়ে রইল নিশীথ; মুখটা বেড়ালের, না নারীর ছিল কোনোদিন! জীবনে সৌন্দর্যের প্রবেশ, নারীদরে সঙ্গে অলিতে-গলিতে ঘেঁষাঘেঁষি, নিশীথের জীবনে যে খুব বেশি ছিল কোনোদিন তা নয়–কিন্তু সম্ভাবনা ছিল, আবহাওয়া ছিল, প্রতিশ্রুতি ছিল।

'জিতেনের কাছে ভাল করে চেয়ে দেখি নি তো আমি কোনোদিন।'

'এবার দেখবে।'

'না দেখে উপায় কী?'

পাবে?

দেখা যাক, প্রভিডেন্ড ফান্ডের আরো সাতশ টাকা তুলে নিয়েছি। আরো তিনশ-চারশ আছে পি-এফ-এ' রেজিগনেশন না দিলে ও টাকা পাওয়া যাবে না। রিজাইন করলেও পাওয়া যাবে না। কলেজের লোন অফিসে আমার আটশ টাকা ধার আছে সুমনা।'

'সাতশ টাকা তুলেছ?'

'হ্যাঁ'

'কোথায় সে টাকা?'

'তোমাকে দেড়শ দিয়ে যাব। মজুমদার আর তার কম্পাউন্ডারকে পাঁচশ, আমি পঞ্চাশ টাকা নিয়ে কলকাতায় রওনা দেব।'

'ডাক্তারকে পাঁচশ দিতে হবে।'–কর্ণের চাকার মতো সুমনা আরো যেন বসে গেল খানিকটা মাটির ভিতর। এই চাকাটাকে উদ্ধার করে রথ চালিয়ে নিজেকে রক্ষা করবে নিশীথ? চারিদিক থেকে সমাজ সময়ের শয়তানরা যা চোখা-চোখা বাণ মারছে! কয়েকটা হাড়গোড় শুধু, কপালে সিন্দুর ঃ সুমনা জিভ কেটে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এ-রকম জিনিস খাটে চড়ে আসে! কত লক্ষবার দেখেছে তো নিশীথঃ আগুন জ্বলে ওঠে, সৎকার করে ওরা বাড়ি ফিরে যায়। খাটে বেঁধে নিতে হবে; আগুন জ্বালাতে হবে; দাহ শেষ হলে কলসি-কলসি জল ঢেলে দু-চারটে হাড় কুড়িয়ে এনে চান করে বাড়ি ফিরতে হবে। হাতভরা কাজ পড়ে রয়েছে সব। কিন্তু এ-সবের আগে সেই কাজও রয়েছে ঢের-যাকে বেশি দিন বাঁচালে বেশি টাকা খরচ হবে শুধু কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যাবে না কিছুতেই, তাকে যতদিন সম্ভব বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এটা যে ভুয়ো সংস্কার নিশীথ জানে তা; কিন্তু তবু এ অসার জিনিসটার কাছে সেও জব্দ হয়ে আছে। রানু, ভানু, হারীত তিনজনেই শেষ করে গেছে সুমনাকে। তারপরে তত্ত্বাবধান করতে রেখে গেছে নিশীথকে। ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে নিশীথের আজ বেয়াইবাড়ি গিয়ে দুটো মিষ্টি কথা শুনবার সময় হয়েছিল কি–এদের দিকে না তাকিয়ে, জিতেনের কাছ থেকে ঋণ চাওয়ার ভাবনা মনের ত্রিসীমার থেকে তাড়িয়ে দিয়ে হারীতের রোজগার খাওয়ার সময় হয়েছিল। কোথায় হারীত, কোথায় রানু-ভানুর শ্বশুড়বাড়ির ইসিইয়ার্কি ইষ্টকুটুম্ব সব, যে-পেঁচা ইষ্ট টুকুম ঢুটুম ঢুটুম বলে উড়ে যায় সেই কুয়াশা শ্মশানের ভিতরে।

'তোমার ওষুধপত্র ইনজেকশন ডাক্তারের ভিজিট সমস্তই মুজমদার আর তার কম্পাউন্ডার জ্যোৎস্না সিকদার ঠিক করে দেবে। জ্যোৎস্না ছেলে ভাল, আমাদের কলেজে আই-এস-সি পড়ছিল, ছেড়ে দিয়ে কম্পাউন্ডারি করছে। মজুমদার খুব–'

'সাধু মানুষ। ঘোড়েল মানুষও বটে–'

' কেন বলছ সুমনা?'

'না হলে পাঁচশ টাকা নেয়–'

নিশীথ কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিসেব কষে দেখাতে গেল সুমনাকে, পেন্সিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুমনা বললে,–'কোনো দরকার নেই হিসেবে আমার? জোচ্চোর যত সব–'

'তা হলে কি, টাকাটা ফিরিয়ে আনব?'

'দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে–সেই মুখে উল্কি কেটে শেয়ালের মতন?'

'তা মুখে উল্কি কেটেছি বটে। কী করব! কলকাতায় যাওয়া বন্ধ করে দিই।'

সুমনা কিছুক্ষণ ঘরের কোণে-কোণে আট-দশ বছর আগের পুরনো শিশি বোতলগুলোর উপর মাকড়সার পাতা জালের রাশি-রাশি নির্লিপ্তির দিকে তাকিয়ে থেকে অবসন্ন হয়ে বললে, 'কলকাতায় না-গিয়ে কী করবে এখানে বসে? কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়েছ না?'

'না দিইনি এখনো। ছুটি নিয়েছি।'

—'নিয়েছ? মঞ্জুর করেছে?'

'এখনো জানতে পারিনি কিছু। দরখাস্ত দিয়েছি।'

'তোমাকে ওরা তাড়িয়ে দেবে।'

'দিক।'

'তা হলে এখানে বসে করবে কী? ভানুকে তো কাঁচড়াপাড়ায় পাঠিয়ে দিলে। সে খরচ পোষাবে কী করে?'

'টাকা দিয়ে দিয়েছি কিছু। মাসখানেকের ভিতর দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

'আমার দেড়শ টাকা আমাকে দাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকাটা হাতে নিয়ে একটু হাসি ফুটে উঠল সুমনার মুখে।—'কেন পড়ে থাকবে তুমি জলপাইহাটিতে। মুজমদার ডাক্তার ভাল, বুড়ো মানুষ অসৎ হবে না। পাঁচশ টাকা পেয়েছে—আমার একটা হিল্লে করবেই। আমার জন্যে ভেবো না। মহিমবাবুর স্ত্রী, ছেলে, ঘোষালমশাই নিজে, জ্যোৎস্না সিকদার, জিতেন সবাই তো রইল, তুমি কলকাতায় চলে যাও কালই। সুবিধে হবে সব দিক দিয়েই দাশগুপ্তের বাড়িতে। ওখানেই ওঠো। জিতেন দাশ-গুপ্তকে বলে একটা চাকরি বাগিয়ে নিতে হবে—যত তাড়াতাড়ি পারো। ইচ্ছে করলে ও খুব বড় পোস্টে বসিয়ে দিতে পারে তোমাকে। ওর নিজের অফিসই তো আছে।'

নিশীথ পেটে-পেটে হাসছিল—আজকের পৃথিবীর লোকায়তের বল্গা রুখে তালপাতার সেপাইয়ের একই কথামৃত শুনতে-শুনতে। কিন্তু সম্প্রতি চোখ বুঝে স্ত্রীর দিকেই তাকিয়েছিল। বিন্দু-বিন্দু বিষণ্ন হাসিতে অন্তঃস্থল ঘামিয়ে উঠছিল তার, মৃত্যুশয্যায় মাথা পাতা সাদামাটা এই ঘোর বিশ্বাসী মানুষটির কথা শুনে।

'কলকাতায় গিয়ে আর-একটি কাজ করো তুমি। রানুকে খুঁজে বার করতে হবে'—সুমনা বললে।

রানু যে কলকাতায় নেই, কোথাও নেই যদিও-বা কোথাও থেকে থাকে সেখানে যে মনপবন ছাড়া আর কারোরই প্রবেশ নেই এ কথা সুমনাকে কী করে বোঝাবে নিশীথ।

'খুঁজে দেখব রানুকে।'

'আমাকে ছুঁয়ে বলো, বাপ যেমন মেয়েকে খোঁজে তেমনি করে খুঁজে বার করবে।'

'ছুঁয়ে বলছি বটে কিন্তু বাপের চেয়ে মায়ের মনই তো ছেলেমেয়েকে খোঁজে বেশি, মা যেমন মেয়েকে খোঁজে তেমনি করে, তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, রানুকে খুঁজে দেখব আমি।'

কেমন একটা আশ্চর্য হাসি-হাসির ভিতরে এক-আধছিটে রক্তের কণাও যেন এল সুমনার ফ্যাকাশে মুখে—

'নাখোদা মসজিদে দেখবে।'

'কাকে?'

'রানুকে।'

'কে বললে সে সেখানে আছে?'

'অনেকে বলছে'।

নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, 'ভুল বলেছে। কথা বলে নেশা জমিয়ে দিতে চায় ওরা। বড় সর্বনেশে লোক। ওদের চেয়ে আমি বেশি জানি।

'কী জানো তুমি। রানু কোথায় আছে জানো?'

'আমি খুঁজে দেখব।'

সুমনা একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমি কিছু জানি না। মেয়েকে হাত ধরে নিয়ে আসতে হবে দেশে। স্টেশন থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসতে তুমি ওকে রোজ সন্ধ্যায়; চোত মাসের মেলার থেকে হাতে ধরে বড়-বাতাসের, কু-বাতাসের থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে। আমি বলতাম মোমের আলো নাকি যে অত সন্তর্পণ। ও তো চাঁদ-কু-বাতাসে ওর করবে কী—' কিছুক্ষণ চুপ থেকে সুমনা বলল—'কিছু করেছে বটে কু-বাতাসে। ভানুর খবর কী?'

'এই তো যাচ্ছি কলকাতায়, কাঁচড়াপাড়ায় নামব একবার।'

'শনিবার-শনিবার যেও কিন্তু কাঁচড়াপাড়ায়। বরবারটা থেকে এসো, ওর মামা আছে বটে ওখানে। কিন্তু সে তো কোনোদিন ডেকে জিজ্ঞেস করত না; এখন কি গা দেবে?' নিশীথ চলে গেল একটু বাইরের হাওয়া খেয়ে আসতে। কলেজের ফিলসফি—লজিকের অধ্যাপক মহিম ঘোষাল তার পরিবার নিয়ে নিশীথদের ভাড়াটে বাড়িটার একটা অংশে রয়েছে। বাড়িটা এক তলা। ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে। সব নিয়ে ছটা ঘর—দুটো রান্নাঘর, দুটো স্নানের ঘর আছে। রান্না ও স্নানের একটা-একটা ঘরই ছিল। বাড়িটার দক্ষিণ দিকের অংশে নিশীথরা দু'বছর থাকে—উত্তরের ভিটেয় মহিমরা। দু'বছর কেটে গেলে নিশীথদের উত্তরে যেতে হয়, মহিমদের তখন দক্ষিণায়ন।

এমনি করে বার বছর এ-বাড়িতে বেশ অজ্ঞাতবাসে কেটেছে নিশীথের। দিনগুলো মন্দ ছিল না। কলেজের কাজে মাইনে বেশি ছিল না, ঝঞ্ঝাটও তেমনি কি ছিল না। স্বাধীনতা ছিল এক রকম। মফস্বলের উঠানের-মাঠের ঘাসের মতন একটা সহজ দিব্যতা ছিল হৃদয় শরীরের নির্লিপ্তি ও শান্তিকে পরিব্যাপ্ত করে। উত্তেজনা, উৎসব, মহৎ আকাঙ্ক্ষার দূরতায় ভাবুক নিশীথকে দিয়ে কথা ভাবাত, মাঝে-মাঝে দু-চারটে লিপি লিখিয়ে নিত—খুব সংক্ষেপেই। তারপর লৌকিক পৃথিবীর ব্যক্তিগত তুচ্ছতার মৃদু সংঘর্ষের দেশে সে সব বড়-বড় বাতাসের আক্ষেপ কোথাও কিছু আশ্রয় না পেয়ে নষ্ট হয়ে যেত। জলপাইহাটি ছেড়ে কলকাতায় যাবার সময় এহ কথাগুলো ভাবছিল নিশীথ। জলপাইহাটিতে আর ফিরে আসা হবে না। সুমনা হয় তো মরে যাবে। রানুকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; ভানুও যে ফুরিয়ে যাবে সেটাও নির্দোষ সত্য-কথনের অপর পিঠের মতনই সত্য ও নির্মল। অথচ জলপাইহাটিতে এদের সকলকে নিয়ে, হারীতকে নিয়ে একটা যুগ—মানুষের জীবনের এক পুরুষ-কালই যেন কেটে গেছে নিশীথের। এরা আজ সকলেই প্রায় বিদায় নিয়েছে-নিচ্ছে; জলপাইহাটির বাড়িও বিদায় নিয়ে গেল নিশীথের মন থেকে। বিদায়ের ভান করেছিল এর আগে কয়েকবার। কিন্তু সে সব ভান ভেঙে ফেলবার মত তোড়জোড় ছিল তখন চারিদিককার আবহাওয়ায়, জলপাইহাটিতে, পৃথিবীতে, নিশীথের জীবনের ইতিহাসে। কিন্তু উনিশ শ আটত্রিশ উনচল্লিশ থেকে ইতিহাস যে-মোড় ধরেছে, চল্লিশ-একচল্লিশ-বেয়াল্লিশ—তেতাল্লিশ-ছেচল্লিশে এসে কেমন যেন অস্বাভাবিক দ্রুততায় পুরনো পৃথিবীও স্বভাব শেষ করে দিল সব। রানু যে হারিয়ে গেছে, সুমনা যে মরছে, ভানুর যে এই অবস্থা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারীত যে অলাতচক্রে ঘুরছে, এগুলো কোনো একটি বিশেষ পরিবারের বিচিত্র ব্যক্তিসর্বস্ব জিনিস নয়–আকস্মিক ঘটনা নয় এ সব–এ-রকম না হয়ে পারত না। নিশীথের নিজের জীবনদৃষ্টিও গত দু-তিন বছরের ভিতর, সময়ের আগুনের ভিতর নিজেকে ক্ষালন করে নিতে-নিতে অনুভব করেছে পৃথিবীর স্থির সত্যগুলো। স্থির হয় তো, কিন্তু কেবলি নতুন ধারাপ্রপাতের দ্রুততার ভিতর দিয়ে, নিজেদের স্থিরভাবে আবিষ্কার করে নিতে ভালবেসে তারা–দ্রুত বিদ্যুতের চূড়োয়-চূড়োয় আকাশও যে বিদ্যুৎ ও ঝড়–এ-রকম বিভ্রম বিলাস জাগিয়ে তোলে আত্মহারা মানুষের মনে। কিন্তু ঝড়, বিদ্যুৎ, অন্ধকার যখন সমস্ত শেষ করে দিয়ে যাচ্ছে–তখন লক্ষ-লক্ষ মানুষের দেশভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া উপায় নেই–হত, নিহত, নির্বাপিত হওয়া ছাড়া পথ নেই–ইতিহাসের দু-তিন পুরুষ, ছ-পুরুষ, এক-পুরুষ যারা এ-রকমভাবে ক্ষয়িত হয়ে যায় তারা ভবিষ্যৎ মানুষের মনে জ্ঞান, হৃদয়ে অনুতাপ, শুদ্ধতা বাড়িয়ে দেয় কিনা বলা কঠিন–কিন্তু নিজেদের জ্ঞান সম্পূর্ণ করে যায় এই জেনে যে মানুষের বিদ্যা বাড়লেও তার জ্ঞান বাড়ে না, বাড়াতে গেলেও তা জ্ঞানপাপে দাঁড়ায় গিয়ে। মানুষের মন আলোকিত করতে পারে না (দু-একজন সৎ মনীষীর মন ছাড়া) মানুষকে আশা, ভরসা, প্রতিশ্রুতি, শান্তি দিতে পারে না কিছুই। এ-রকম উপলব্ধির কোনো যথার্থ আছে বলে মনে করত না দু-চার বছর আগে নিশীথ। কিন্তু এখন করে। এখন সে মানে যে এ যুগে এর চেয়ে যথার্থ আর-কিছু নেই। এ যুগে ক্ষয়িত হওয়াই স্বাভাবিক–মৃত হওয়া, নির্বাপিত হওয়া–অবক্ষয় উত্তীর্ণ করে ক্ষেম সূর্যের মুখ দেখাকে অপর যুগের সুস্থির সত্য বলে গ্রহণ করা চলতে পারে। কিন্তু সেই অপর যুগ কি এমনি-এমনি আসবে? ক জন লোক চেষ্টা করছে সেই যুগকে লাভ করতে? কী প্রণালী তাদের? কোথায় সেই পদ্ধতি একটা শুদ্ধ বড় শতাব্দীকে নিয়ে আসতে হলে, পৃথিবীব্যাপী যে-সাড়া পড়ে যায়। কোথায় সেই আশা ভরসা নিঃস্বার্থতা? আসল বোমাটা এর হাতে আছে বটে, কিন্তু ওর হাতে আছে কিনা এই তাড়নায় তো আজকের পৃথিবী পঙ্গু। শুধু আমেরিকা বা রাশিয়া নয়–এশিয়ার–আমাদের দেশেও পদ্মানদীর এপারে-ওপারে, রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে 'ম'-কে ব্যাহত করবার কৌশল জানা আছে 'ক'-এর। জানা আছে কি 'খ'-এর-'ক'-কে বেচাল করবার কৌশল শুধু নয় অস্ত্রসিদ্ধি? মনের তপঃ-শক্তিতে মেশিনকে চালাতে পারত হয় তো মানুষ, কিন্তু মানুষকে ছুটিয়ে চালাল মেশিন, মানুষকেই চালাল সে, যন্ত্রকে ব্যবহার করবার মত সততা ও মনীষা হারিয়ে ফেলেছে মানুষ। এই সবই আজকের পৃথিবীর নিহিত সত্য, কত কাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে থাকবে কে জানে।

তাই যদি হল তা হলে ইতিহাসে যে-সব আলোড়নের যুগ কেটে গেছে, বিলোড়নের দিনকাল আসবে বলে মনে হয়, সবই শেষ পর্যন্ত মৃত্যু, দ্বেষ ও পতিতের ধর্মেই আবর্তিত হচ্ছে শুধু, তখন ইতিহাসের বিষ ও সোমরসের দিকে তাকিয়ে অতীত বা ভবিষ্যৎ সমাজের অমৃতত্ব ঘোষণা করে কী লাভ? কোনো বড় ঘোষণারই কোনো মানে নেই।

মনীষীরা অবিশ্যি ভাল বই লিখবে, নেতারা বিমিশ্র ভাষার কাঁচা বিবৃতি দেবে–পাকাতে পারবে, কবি-বিজ্ঞানীদের একটা বড় স্বৈরী অংশ সুখ-স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ মরে যাচ্ছে; পৃথিবীর থেকে শেষ বিদায় নেবার আগে হিংসার পরিবর্তে হিংসা ফিরিয়ে দেবার বিজাতীয় লোভে দুর্বল ঠোঁট কেঁপে উঠছে কারুর; রিরংসাকেই জীবনে সফল করে ভয়াবহ বৃষ-গর্দানের দোষে রক্তের চাপে মরে যাচ্ছে কেউ। আশেপাশ, 'এই তো তাকে দেখে ছিলুম, তাকে দেখছি না আর,' কারা যে বলে যাচ্ছে, দিনরাত দেয়ালে অনর্গল ছায়ার চারণায় তোমাকে আমাকে সকলকে মুহূর্তের মধ্যে ছায়ায় দাঁড় করিয়ে আছে, আলো আছে, ইতিহাসে কত বিখ্যাত যুগ কেটে গেছে, উদয় হবে না কি অতীতকে ভালো করে চিনে নিয়ে আরো বিশ্রুত সময়ে আরো ভালো আলোর। কিন্তু তবে আজকের যুগের ইতিহাসের খাতায় যে-অঙ্ক লেখা আছে এর নিরেট সিদ্ধান্ত কৌমুদীর পথে গরমিল লাগিয়ে ফূর্তি করতে গেলে, সেটা ফূর্তির ভুল–অঙ্কের ভুল নয়। তাই না কি নিশীথ?

ঠিক করে অঙ্ক কষেও কে তবু উৎসব আনতে পারবে? কোথায় সেই মহানুভব দিকনির্ণয়ীরা। সেই শিব অনির্বচনীয় প্রাণঘন আন্দোলন? কোথাও আছে বলে মনে হচ্ছিল না নিশীথের। কবি সে; বিজ্ঞানী মনের অতল উৎসের শ্রী ছাড়া কী আর কবির মন? নির্ভুলভাবে এ শতাব্দীর এ আবর্তের শোকাবহ অঙ্ক কষে–এরই ভিতর, যে-উৎসব রয়েছে তবুও, তাতে মজা করে জীবনের পথ থেকে একদিন সরে যেতে হবে তাকে।

জলপাইহাটি থেকে চলে যাচ্ছে নিশীথ, এখানে ফেরার কথা নেই আর। জিতেনের ওখানে মাসখানেক থাকবে। জিতেনকে বলে ভাল চাকরি পাওয়া গেলে ভাল; পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। মোটা রকমের ধার পাওয়া যাবে না। দেখা যাক কী হয়। ডাক্তার মজুমদারের চিকিৎসার মেয়াদ কাটিয়ে সুমনা যদি বেঁচে থাকে তা হলে ফিরে এসে তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। না হলে স্ত্রীর শ্রাদ্ধশান্তির জন্য হয় তো বা জলপাইহাটিতে দু-চারদিনের জন্য আসবে নিশীথ–হয় তো আসবে না।

এ-রকম অন্তিম অবস্থায় স্ত্রীকে ফেলে চলে যাচ্ছে কেন নিশীথ? এটা কি এ যুগের শোকাবহ অঙ্ক কষবার পথে একটা নিতান্তই ছোটখাট ধাপ নিকেশ করে নির্ভুল একটা যোগ কি বিয়োগ? ঠিক তাই।

কলকাতায় যাওয়া ছাড়া নিশীথের আর-কোন উপায় নেই। নিশীথের হাতের সব টাকা ফুরিয়ে গেছে, জলপাইহাটিতে কারুর কাছে তেমন কিছু ঢালাও ধার পাওয়া যাবে না, পেলেও শোধ করে দেবে কী করে সে? কলেজের উপর নির্ভর করা চলে না এখন আর। অনেক দিন থেকেই কলেজের কর্তৃপক্ষকে সে কথা সে বলবে ভেবেছিল–কিন্তু দু'পক্ষেরই শান্তি ও মেধাবৃত্তি ভাঙবার ভয়ে কিছুটা অবিচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করেও ব্যাপারটা চেপে-চেপে যাচ্ছে–সে কথাটা বাস্তবিকই এত দিন পরে তাদের বলে ফেলেছে সে–হয় তো অতিরিক্ত জোর দিয়ে। বলেছে ও দেড় শ টাকা মাইনেতে পোষাবে না তার, সোয়া দুশ–আড়াইশ, অন্তত দুশ কি দিতে পারবেন ওঁরা? না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে পারলে দুঃসময়ে নিজের পথ দেখা ছাড়া কী করবে নিশীথ? নিশীথ ছুটির দরখাস্ত দিয়েছে, কী কারণে দরখাস্ত, পরিষ্কার করে ব্যক্ত করে নি; ডাক্তার সার্টিফিকেটও জুড়ে দেয়নি। কর্তৃপক্ষ মুখফোঁড় নিশীথকে কোনোকালেই বিশেষ পছন্দ করে না। এবারে নাকচ করে দেবে। দিক। যা করেছে ঠিকই করেছে নিশীথ।

সুমনাকে দেখবার জন্যে রইল ডাক্তার মজুমদার আর তার কম্পাউন্ডার জ্যোৎস্না। ডাক্তারি করে মোটা টাকা পাচ্ছে বলে নয়, এমনিই ওর মন খুব পরিষ্কার–বেশ প্রশান্ত। ডাক্তারটি নিশীথের নিজের দাদার মত, কম্পাউন্ডার জ্যোৎস্নার উপর ষোল আনা নির্ভর করতে পারা যায়; মজুমদার প্রায়ই বলে। সুপারিশটাকে নিশীথ খতিয়ে দেখেছে; অনুভব করেছে; হ্যাঁ; এতেই হয়ে যাবে আর-কী।

মহিম ঘোষাল আর তার পরিবার তো সুমনার সঙ্গেই রইল এ বাড়িতে। মহিমের মাথাটা লজিক-মানে কলেজের লজিক দিয়ে, শানানো–বুদ্ধি দিয়ে নয়; বেকুব নয় তাই বলে মহিম; বিবেচনা শক্তি–মনে হয় যেন আছে বেশ; খুব হাতে-কলমে না থাকলেও; ভিতরটা ভাল–তবুও সেটাকে যেন আরো ভাল করতে চাচ্ছে মহিম; এ জিনিসটা ফিটফাট ভালর চেয়ে ভাল।

মফস্বল কলেজের কর্তৃপক্ষ এ-রকম খানদানি মানুষকে ঠকিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিল–পনের বছরের সার্ভিস; মোটে একশ তিরিশ টাকা মাইনে। এ সব জিনিসের একটা বিধান হবে না এখনো? মহিমের মত বিবেচনা না-থাকলেও এর চেয়ে বেশি বুদ্ধি হবে না এখনো? মহিমের মত বিবেচনা না-থাকলেও এর চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে মহিমের স্ত্রী অর্চনার (তাকে অর্চিতা ডাকে নিশীথ), বুদ্ধিটা নিজের স্বার্থকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু তাই বলে পরের ক্ষতি করবার কোনো মতলব নেই; পরের উন্নতি দেখলে তার খারাপ লাগে না। কুঁড়ে মানুষ; মাঝে-মাঝে কেমন গোরু-হরিণের মত চোখ তুলে তাকায়; কেমন একটা বিসদৃশ সাদৃশ্য এসে পড়ে। কিন্তু একটা ঠিক–নিশীথের মত গাই-গোরু দেখার ছলে অবিনশ্বর কৌতুকে অর্চিতার দিকে তাকাবার মত লোক এ পৃথিবীতে কেউ নেই–কেউই নেই আর। অর্চিতাকে ভাল করে বলে দিয়েছে নিশীথ সুমনার কথা; সুমনাকে দেখতে-শুনতে বলে দিয়েছে।

'কিন্তু তবুও এ সময়ে তুমি থাকলে ভাল হত নিশীথদা।'

'আমি তো আছিই।'

'কেন, তুমি কলকাতায় যাচ্ছ শুনলাম?'

'তোমরা চিঠি লিখলেই চলে আসব। দরকার হলে মহিম যেন টেলিগ্রাম করে–'

'বলেছ ওকে?'

'বলব।'

'কিন্তু কলকাতায় কেন যাচ্ছ?'

'এখানকার কলেজের সঙ্গে বনল না।'

'ছুটি নিয়ে যাচ্ছ?'

'খুব সম্ভব কাজ ছেড়ে দিতে হবে।'

ছেড়ে দেবে? তা হলে আমাদের কী হবে? জলপাইহাটিতে সুমনাদি, হারীত–তোমরা থাকবে না আর!'

এর উত্তর কী দেবে নিশীথ? এতক্ষণ একটা ধূরস গোরুর, হয় তো হরিণীর সান্নিধ্য অনুভব করছিল; গোরুটা বছরের পর বছর ধূসরতর হয়ে যাবে। নিশীথ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, অর্চিতার সঙ্গে কথা বলবার সময় তার মুখের দিকে তাকায় নি। মাঠের উপর শুয়ে আছি; শুয়ে আছি চোখ বুজে; কেতন একটা গন্ধ পাওয়াতেই টের পাওয়া গেছে সাদাটে গোরুটা এসেছে–গোলাম কিউব্রিয়ার; কাছের। পুকুরে জল খাচ্ছে; কেমন একটা ফোঁস-ফোঁস শব্দ হচ্ছে; মাঠ-পুকুরে গায়ের গন্ধ শব্দ–সবই যেন একটি মানুষের মধ্যে দানা বেঁধে কাছে দাঁড়িয়ে আছে; ভূ-তত্ত্বের প্রাণবিজ্ঞানের লক্ষ-কোটি বছরের ইতিহাস সত্ত্বেও জানিয়ে দিচ্ছে; মাটি মাঠ গোরু মানুষ একই জিনিস–একই সূর্যখণ্ডের থেকে জেগে উঠে একই বরফের দেশে লীন হয়ে আছে সব।

'একই জিনিস অর্চিতা।'

'কিসের কথা বলছ?'

'না, এমনিই, আমি ভেবে দেখলাম।'

অর্চনা একটু কাছে এগিয়ে এসে দু-এক পা পিছে সরে গিয়ে বললে–'কলকাতায় যাওয়া আর না-যাওয়া? একই জিনিস। তা বটে তো। কেন যাচ্ছ তা হলে সে গাঁটকাটার দেশে। চার হাত পায়ে যেতে, ফিরে আসতে, কম-সে-কম পঁচাত্তর তো বটেই।'

'একই তো জিনিস, মাঠ আর গোরু।'

'মাঠ আর গোরু? নতুন শাস্তর বার করলে বুঝি। না, যাও তুমি, কলকাতায় ঘুরে এসো, মাথায় একটু হাওয়া লাগিয়ে এসো।'

অর্চিতার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল নিশীথ। এতক্ষণ অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে ছিল সে, এইবারে মাঠ দেখেছে, গোরু দেখে ফেলেছে। অর্চিতা নিশীথকে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল প্রায়–হাসির হল্লায় দু-তিন পা পিছিয়ে গেল। ভাসা-ভাসা বড় চোখে গরাক্ষ পথ দিয়ে নিশীথের দিকে তাকাল, ঠোঁটের উপর একটু আঁচল টেনে, কি না-টেনে।

'হাসছ যে! হাসবার কথা কী হল। হেসে উড়ে গেলে দেখছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশীথের হাসি থেমে গেল, বললে—'এই মাঠ ঘাট আকাশ বাতাস আর দেখব না' এখানে চল্লিশ বছর ছিলাম। চেনো কি গোলাম কিউব্রিয়াকে অর্চিতা?'

'সে কে?'

'আছে'—বললে নিশীথ, 'আছে একজন মুসলমান মহামন, পদা-এপারের দেশে সম্প্রতি এসেছে—ওপারের থেকে—'

অর্চিতা নিশীথের কথার ধারা লক্ষ্য করছিল; কী যে বলছে? কী না বলছে! তার অধ্যাপক স্বামীর সঙ্গে অনেক দিন ধরে থাকতে-থাকতে দু-চারটে ইংরেজি কথা সে শিখে ফেলেছে। এমনি অর্চিতা ক্লাস নাইন অব্দি পড়েছিল। ভাবছিল লেগপুলিং করছে না তো নিশীথ। মহিমের চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে অর্চিতা।

'কালিজিরা নদীর তীরে একটা মাঠ আছে, মাঠে একটা ধুলো রঙের গোরু থাকে। গোলাম কিউব্রিয়ার গোরু। মাঝে-মাঝে মাঠের উপর একজন মানুষ শুয়ে থাকে'—বলে নিশীথ অর্চিতার দিকে তাকাল। মনে হল, নিশীথের ইঙ্গিত ধরে ফেলেছে যেন এই ক্ষমাহীনভাবে বুদ্ধিহীন মেয়েটি। কিন্তু তবুও ধরে ফেলেছে কি? গোরু দেখার ছলে সারাৎসার কৌতুকে মাঝে-মাঝে অর্চিতার দিকে তাকায় নিশীথ—আহা; জলপাইহাটির এর একটা কী রকম চমৎকার ফলসানির জিনিস ছিল। অথচ বার মাস এ দেশের আকাশ-বাতাস নদী-নক্ষত্র, কলেজের কাজ, কথাবার্তা বাড়িতে। ফিরে এসে সুমনা রানু ভানুর সঙ্গে আলাপাচারি, তারপরে ইংরেজি-ফারসি বই-নভেল নিয়ে ডেকচেয়ারে পড়ে থাকার সঙ্গে নিখুঁতভাবে বিমিশ্রিত হয়ে। কী অপরূপ, কী অপরূপ গভীর ছিল সব—একই অন্তঃসারের, তবু অনেক। বর্ণালির বার মাসের সব; নিরবচ্ছিন্ন। সারাৎসার। একে একে ছিঁড়ে গেল সব। শুকিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল। নিশীথ ইচ্ছে করেই ঘটিয়েছে কি সব? না, ইতিহাস ঘটিয়েছে? সময়ের হাতে আঁকিবুকি, অবোলা বাতাস, ধুলোর গুঁড়ো—নিশীথ আর তার পরিবার-সকলের পরিবার সমস্ত ব্যক্তির। সমস্ত পৃথিবীর।

কিন্তু তবুও নিজে যতটা সে লুণ্ঠিত হয়েছে, নির্মূল হয়েছে, আবর্তিত-পরিবর্তিত হয়েছে, মহিম-অর্চিতাদের, বা কলেজের বা বাইরের জন্য সব নর-নারীদের বেলা সময় ততখানি অশ্লীল অস্থিরপনায় সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। এখনো যেন আট-দশ বছর আগের পৃথিবীতে পড়ে আছে মহিম; সেই যুদ্ধের আগের জলপাইহাটিটাকে খুঁজে বার করে ঢেলে সাজাচ্ছে অর্চিতা। স্যজাবারও দরকার নেই; কোনো প্রয়াসের প্রয়োজন নেই যেন, নেই কোনো উদ্ভাবনা, এমনিই হয়ে যাচ্ছে সব।

নিজে নিশীথ এদের মতন অচেতন থাকলেই তো পারত। কেন দেখতে, বুঝতে, অনুভব করে নিতে গেল। সময়ের আঙুলের নির্দেশে সেই বিম্বিসারের থেকে আজকের স্ট্যালিন-ট্রুম্যানের কবলিত মানুষের মত পথ থেকে পথান্তরে স্ফুরিত, বিবর্তিত, নীত, নিহত হতে রাজি হয়ে গেল সে—যা নেই, সেই অমৃতের নিরবচ্ছিন্ন বধিরতার বিনিময়ে, ব্যক্তিকে বিক্রি করে, অচেতন অন্ধকার সময়কে মর্যদা দেবার জন্যে।

'তুমি দাঁড়িয়ে আছো অর্চিতা এখনো। চলে গেছ ভেবেছিলুম।'

'কী যেন ভাবছিলে তুমি।'

'খুব লক্ষ্মী মানুষ তুমি'—নিশীথ বললে, 'আমি কলকাতায় চললুম, সুমনাকে দেখো তুমি আর মহিম। হারীত যদি আসে'—থেমে গেল নিশীথ।

'হারীত আসবে? কোথায় সে?'

'কোনো খোঁজখবর পাই নি। যদি আসে এখানেই থাকতে বলো তাকে। সুমনার একটা এসপার-ওসপার কিছু হয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত।' নিশীথ একটু ভেবে বললে, 'অন্তত আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত—'

'কোথায় আছে হারীত?'

'জানি না। তবে আমি বাড়ির থেকে-বেরিয়ে গেলে সে বাড়িতে ফিরবেই এক বার। কত দিন আস্তানা গেড়ে থাকবে বলতে পারছি না। তবে আসবেই—আমি বেরিয়ে গেলে—শীতের শেষে কুমোর পোকার মতো একটা ছ্যাঁদা খুঁজে নিতে এ দেশে। ওকে বলে-কয়ে রেখে দিও তো ওর মার কাছে—'অর্চিতার দিক তাকিয়ে নিশীথ বললে।

'মার এ-রকম অবস্থা দেখলে এমনিই থাকবে। তুমি চলে না-গেলে ও ঘরে ফিরবে না, বাপে-ছেলেতে এই রকম সম্বন্ধ! আজীবন মাস্টারি করে কী শেখালে—কী হল তোমার? কী ছেলে তুমি নিশীথদা।'

'এই তো হল, যা দেখছ সব হল।'

শুনে সুবিধার লাগল না অর্চিতার; অর্চিতার দুটো ভুরুর নিচে দুটো ভাসা-ভাসা শফরীকৃত পথে চারিদিককার আকাশ-বাতাস, ঝাউ, জারুল, শিশু, শিমুল তুলোর সাদা আকাশযান জ্যামিতির বাধা উপচে পড়া কেঁশরাশির মত ঘরদোর পুকুরের টলটলানি। চারিদিকে কাকের ডাক, কেবলই হাত থেকে ফসকে দোয়াতে কালি ছিটকে-পড়ার মত নষ্ট দিন। মৃত ভাঁড়ার, নতুন ফসল, সার্থক ঋজু অন্ধ রাত্রি, খেলে যেতে লাগল।

'ভানু কাঁচড়াপাড়ায় কেমন আছে?'

'নাঃ বিশেষ ভাল না। বেঁচে উঠলেও আশান হওয়া কঠিন, আঠার ঘা লেগে থাকবে। যক্ষ্মা রুগি তো।'—নিশীথ কথা বলতে-বলতে আধো হাঁ করে রইল—একটা ভরদুপুরের দাঁড়কাকের মত।

'যক্ষ্মার নতুন-নতুন ওষুধ বেরুচ্ছে, আগের মতন নেই—ও ঠিক হয়ে যাবে সব।'

নিশীথ কোনো কথা বললে না।

'তোমাদের তো কারো এই রোগ ছিল না কোনোদিন। বৌদির বাপের বাড়ি ছিল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'কই জানি না তো।'

'রানুর কোনো খবর পেলে?'

'না।'

ঘাস খেতে-খেতে হঠাৎ চুনাপাথরের মত রঙের এক-একটা গাভী যেমন নাড়ীর টানে চোখ তুলে, মুখ তুলে, দাঁড়ায়, খুঁটোয় টান পড়ে, গলায় টান পড়ে দড়িটা একেবারে টান-টান হয়ে গেছে বলে, অর্চিতা তেমনি কেমন একটা নিস্তব্ধ অব্যক্তভাবে দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। গলায় দড়িতে টান পড়েছে প্রায়–খুঁটোটা মাটির ভিতরে অনেক দূর ডোবানো, খুব শক্ত; মুহূর্তের মধ্যেই এই বিদঘুটে অস্বস্তির ভাবটা ঢিলে হয়ে গেল–নিজের সহজ সত্তায় ফিরে এসে অর্চিতা বললে, 'আশ্চর্য–একেই বলে হাওয়া হয়ে যাওয়া। তুমি, আমি, কাকের ডানা, ঘাসের শিস কেউ কিছু জানল না, পুলিশে কোনো কিনারা করতে পারল না। জলপাইহাটি থেকে বেরুবার দুটো তো পথ–একটা স্টিমার লাইনে, একটা ট্রেন লাইনে। উনি বলেছেন এ দুটো দিয়ে স্টেশনের কোনো লোকই রানুকে বেরিয়ে যেতে দেখে নি। রানু স্টেশন দিয়ে যদি যায় সে তো দেখার জিনিস; নদীর শুশুকগুলো অব্দি ঝুপঝুপুর করে চোখ পালটে দেখে যায়। কিন্তু কেউ দেখল না–'

'কে জানে গেছে কিনা। গেলে কি আর স্টেশন দিয়ে যাবে। নদীতে ডুবে গেলে কে খুঁজে পাবে তারে–'

'উঠবে তো গিয়ে কোথাও দেহটা।'

'কে জানে।'

আমি অবিশ্যি একটা কথা শুনেছি, কাউকে বলবে না বলো।'

'কার? রানুর কথা? কী শুনেছ?'

'এদিকে এসো–এই করমচা গাছগুলোর জঙ্গলের ভিতর–ঐ দেয়ালটার পিছনে, নিরিবিলি কথা বলবার জায়গা, কেউ দেখবে না।'

সামনে ঝুপসি তেপান্তর–নিশীথ নিস্পৃহ মুখে রোদের বেলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না গো, কী বলবে এখানেই দাঁড়িয়ে বলো।'

'ওখানে কি কাঁটা ফুটবে। না গোখরো আছে?'

এখানেই দাঁড়িয়ে বলো–'

'আমার কথা তুমি শুনবে না? কাল তো কলকাতায় যাচ্ছ চলে।

'আর-তো–'

দূরে মহিমের ছায়া দেখা গেল, লম্বা-চওড়া, খালি গায়ে, পিঠে পৈতে–লজিক হাতে। মহিম এদিকে আসতেও পারে–নাও আসতে পারে। নিশীথের দিকে পিঠ ফিরিয়ে–একটা অদৃশ্য শুঁড় তুলে আছে যেন বাতাসের ভিতর। হাতির কায়দা। দল ছাড়া হাতিও বটে। নিশীথদের গন্ধ নাকে গেলে কী করবে বলা যায় না। তবুও এমনই বেকুব নিশীথ যে করমচা জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে দেবার কথা ভাবতেও গেল না।

নিশীথ এখানেই দাঁড়িয়ে আছে, মহিম ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। চমৎকার-চমৎকার স্যান্ডউইচের মশলা মনে করতে লাগল অর্চিতা নিজেকে (সুমনা তাকে বছর দুই আগে ডিম-পাউরুটির স্যান্ডউইচ বানাতে শিখিয়েছিল)। জিনিসটাকে খুব ক্ষমার চোখে দেখলে নিজেকে মশলার পুর মনে করে একটা উড়ুঞ্চে তামাসা বোধ করা চলে বটে। কিন্তু সে-চোখে সে দেখছে না। সমস্ত দোষ নিশীথেরই। বিষাক্ত চোখে সে নিশীথের দিকে তাকাল। টের পেল নিশীথ।

মহিমের শুঁড়ও গন্ধ পেয়েছে যেন। অর্চনাও শাড়িটা ভাল করে জড়িয়ে-সড়িয়ে সাবধান হয়ে সরে দাঁড়াল।

'যেন তুমি সাপ বৌমা।'—অর্চিতার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে।

'তার মানে? আমাকে বৌমা বলছ কেন?'

'সাপও তো বলেছি। তার চেয়ে বড় গাল হল বৌমা বলা?'

'সাপ?'

'সাপ।' চমকে গিয়ে-তেজ বেঁধে সরে দাঁড়ালে তো সাপের মত খুব হুঁশিয়ার হয়ে? যেন ধুলো উড়ে আসছে অনেক দূরের থেকে? 'মহিম! ও মহিম।'—নিশীথ গলা ছেড়ে ডাক দিল।

কিন্তু অর্চিতা ও নিশীথ কেউই দেখেনি—লজিকের বই হাতে নিয়ে মহিম অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। এই বারে মোড় ঘুরে বিশুদের কুল-তেঁতুলগাছের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল; খুব সম্ভব বনবিহারীবাবুর ছেলেকে লজিক বুঝিয়ে দিতে যাচ্ছে। বনবিহারীবাবু কলেজের কমিটির খুব ঠাঁটারি মেম্বার। তাঁর ছেলেকে লজিক-সিভিকস পড়িয়ে দেবার সুবুদ্ধি মাঝে-মাঝে চেপে বসে মহিমের মাথায়; বিনি পয়সায় পড়ায়। বিনিময়ে সে কোনো পুরস্কার আশা করে না। পায়ও না। অনেক বছর চাকরির পরে মাইনে এখনো। এক শ ত্রিশ টাকা!

পড়িয়ে তৃপ্তি মহিমের—কলেজ কমিটির ঘোড়েল মেম্বারের ছেলে নিত্যেনকে পড়িয়ে তৃপ্তিটা নাভির ভিতর থেকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যেন সমস্ত শরীরে অনেকক্ষণ টিকে থাকে। বড়লোকেরা কাউকে কিছু দেয় না, জানে নাকি মহিম? তবুও ও-সব মানুষকে নিষ্কাম খোশামোদ করতে খুব ভাল লাগে।

'ওঁকে ও-রকম হাঁকডাক করে ডাকলে যে তুমি?' অর্চিতা বললে।

'তুমি আমি আকাশ বাতাস মহিম-এর ভিতর ডুকরে উঠতে ভাল লাগে ঐ নীল জলজঙ্গলের ডাকপাখিটার মত। শুনেছ সে ডাক; চকচকে রোদে, বেশি রাত্রের নক্ষত্রে? কোথায় গেল মহিম?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নিত্যেনদের বাড়ি।'

'লজিক পড়াবে?'

'পড়াবার তারিখ কাল। আজ হয় তো এমনিই গেল। আগের থেকে না জানিয়ে রাখলে নিত্যেন অনেক সময়ে ভুলে যায়, তাই মনে করিয়ে দিতে গেল হয় তো। গেল যখন, দু-এক পাতা পড়িয়েও আসতে পারে। তোমাকে রানুর কথা বলব বলেছিলাম।'

'বলো।'

'রোদ চড়েছে এখানে। চলো; করমচার বনে।'

নিশীথ গড়িমসি করতে লাগল আবার। বললে, 'আচ্ছা, যাচ্ছি। এসো এ ছায়ায় বসা যাক। জাম-তেঁতুলের ছায়া পড়েছে এখানে। লোকজন চলছে-ফিরছে বটে সব চারদিকে—কিন্তু আমাদের কথায় কান দেবার কে আছে। শান-বাঁধানো রোয়াকের উপর বসো তুমি, আমি এই গাছের গুঁড়িটায়—অ্যাঁ—হ্যাঁ।'—বলে, একটা শব্দ করে নিশীথ গুঁড়িটার উপর বসে পড়ল, 'নাও ন-বৌ, এখন বৌনি কর।'

'অর্চিতা গোঁজ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।—'ন-বৌ কেন?'

'মহিম তো আমার চেয়ে ছোট। যেন মহিম আমার ছোটভাইয়ের ন-দাদা। তাহলে তুমি ন-বৌ হবে না আমার?'

'ও'—অর্চিতা একটু তেরছা কান্নিক মেরে বললে, 'কিন্তু লোকে দেখলে তোমাকেই ন-ভাই বলবে বড় দাদার।'—মধুবিষ দৃষ্টিতে অর্চনা তাকাল নিশীথের দিকে।

'কী হয়েছে রানুর। কী শুনেছ তুমি বলো।'

'আমি শুনেছি—'

'চলো করমচা বনেই যাই। ধসা দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘাসের উপর বেশ আরাম করে বসা যাবে। কোথাও কেউ নেই—থমথম থিমথিম করছে তেপান্তর।'

গাছের গুঁড়িরা নিশীথকে বিঁধছিল; নারকোলের গুঁড়ি, খোঁচা-খোঁচা এবড়ো-খেবড়ো, কোথাও এমন একটু জায়গা নেই যেখানে বসে স্বস্তি পাওয়া যায় একটু—

'না, যাব না'—খুব বীতকাম দৃঢ়তায় অর্চিতা বললে।

'কেন যাবে না? চলো যাই'—নিশীথ উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করল।

'সে হয় না। তুমি যেতে পারো, আমি যাব না' সংকল্পের চেয়ে ওর গলার কঠিনতাটা—নিশীথের মনে হল—এমন অন্তিমে ঠেকেছে যে এবার আঁট শোনাপাপড়ির মতো চুর চুর করে ভেঙে পড়বে সব।

গুঁড়িটার উপর একটু সুবিধে করে বসবার চেষ্টা করে নিয়ে নিশীথ বললে, 'বলো দেখি, কার কাছে কী শুনলে?'

'স্টেশন দিয়ে যায় নি। রানুকে ওরা ফুসলেফাসলে গঙ্গাসাগরের মেলায় নিয়ে গেছল। অন্ধকার রাতে গা ঢাকা দিয়ে নৌকোয় বকচরের খাল দিয়ে। বলে পীরবদরের কুদরতিতে পালিয়েছে।'

'ওরা?—ওরা কারা?' নিশীথ চারিদিকে তাকিয়ে অর্চিতার কাছ ঘেঁসে এসে বসল রোয়াকের উপর।

'সেই গঙ্গাসাগরের মেলার থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল কলকাতায়। কলকাতায় তখন দাঙ্গা—বড়। দাঙ্গাটা—আগস্ট মাসের। রানু কাটা পড়ে নি। রাজাবাজার জানবাজার বেকবাগান চিৎপুর হয়ে এখন কোথায় আছে তা কেউ জানে না। কিন্তু আছে।'

নিশীথ খানিকটা সরে বসে, হেসে, বললে, 'এ-সব কে বললে তোমাকে?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'নাম বললে না তো কারো।'

'যে বলেছে তার নাম দিয়ে কি হবে। কে করেছে দেখ।'

'কে করেছে? কার কথা বলে ওরা?'

অর্চিতা যেন তার দুটো চোখ সামদান করে তাকাল নিশীথের দিকে, বললে, 'বলব তোমাকে। তোমার কাছে তো না-বলার কিছু নেই আমার। জানি তুমি বলবে না কাউকে। কোনো কিছু কুলকিনারা না করে আমলা-হামলা করবার মানুষ তুমি নও। নাম বলছি—চলো করমচাতলায় যাই—বড্ড রোদের হল্কা এখানে।'

দূরে মহিমের ছায়া দেখা দিল—লজিকের বই হাতে নিয়ে ফিরছে। লজিক কী, লজিক কেন, সমস্তই যথাসাধ্য বুঝিয়ে দিয়ে আসবার চেষ্টা করেছে।

'উনি এসে পড়েছে।'—অর্চিতা পা বাড়িয়েছিল করমচা বনে যাবার জন্যে, ফিরে এল; রোয়াকের উপর বসল।

'উনি এসেছেন তো কী হয়েছে। চলো—।'

'না। ওঁর চোখে লাগে।'

'ঐ তো মহিমা মোড় ঘুরল দেখছি। বাড়ি এল না। কোথায় যাচ্ছে?'

'মুরলীবাবুর লাল ইঁটের বাড়ো দালানটার দিকে যাচ্ছে। তুমিও তো দেখছ। এলাহাবাদ থেকে করালীবাবুর মেয়ে এসেছে—এখানে কাকার বাড়িতে থাকে; প্রাইভেট বি-এ দেবে এবার—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাকে ফিলসফি পড়াতে হবে?'

'তা তো হবে। কিন্তু এটাও খুব সম্ভব অনাহারী; আচ্ছা মানুষই বটে। আমার কপালে আর ওঁর কপালে; একেবারে ধুলোর আটা দিয়ে। কোন খণ্ডন নেই।'

নিশীথ একটু হেসে বললে, 'গঙ্গাসাগরে কে নিয়ে গেছল রানুকে?'

'বরেন মিত্তির।'

'বরেন মিত্তির! নরেনের ভাই?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নরেন মিত্তিরের মেজ ভাই।'

'কোন নরেন মিত্তির? যে সুমনাকে রক্ত দেয়।'

'আস্তে-আস্তে। হ্যাঁ, সেই নরেন। কেউ-কেউ বলে বরেন-টরেন নয়। এ নরেন মিত্তিরের নিজের কাজ।'

নিশীথ হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল। হাঁ-টা বুজে দাঁতে দাঁতে খিল লেগে গেল যেন; চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। ঢিলে করে দিতে চাইল চোয়াল, দাঁত। কিন্তু আরো শক্ত আরো সমগ্র হয়ে উঠতে লাগল সব; সমস্ত শরীর ছেয়ে পড়তে লাগল।

অর্চিতা এসে তার হাত ধরে টেনে বললে, 'কী হল তোমার। আচ্ছা মানুষ তো তুমি, নাও ধুলো ঝেড়ে ওঠো তো এখন।'

'কিছু হয় নি। ঠিক আছে। বসো তুমি।'

'এখনি তুমি কিছু করতে যেও না। এখন রাগ করলে ভেস্তে যাবে সব। পুলিশটুলিশ সব ওদের হাতে। নরেনের বাবা বড় উকিল মানুষ। গর্নমেন্টের পি-পি'।

নিশীথ যেন আরেক রাজ্যে চলে গিয়েছে; ডুবুরির মত সমুদ্রের অনেক নিচের থেকে অন্ধকারের থেকে, যেন বললে, 'পি-পি-পি নয়তো?'

'সে আবার কী?'

'পারফোরেটেড পাবলিক প্রসিকিউটর।'

জানালার ভিতর দিয়ে উঁকি মারে সুমনা বলে 'কারা কথা বলছ গো এতক্ষণ ধরে। যেন টাপুর টুপপুর টুপুর টাপপুর টোপাকুল পড়ছে তো পড়ছেই—পড়ছেই—পড়ছেই, বোস মল্লিকদের খিড়কির পুকুরে। কে গো? ও তুমি আর অর্চিতা, মহিমবাবু কোথায়?

'মহিম পড়াতে গেছে। কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?'

'আমি মন্তুর মার ওখানে গিয়েছিলাম—'

'বাপস, হেঁটে না রণপায়? নরেনের রক্তের জোর আছে বলতে হবে, কোথায় যাচ্ছ?'

'চান করতে যাচ্ছি, বিশুবাবুর দিঘিতে। তিনদিন চান করি নি...হাত পিঠ মুখে খড়ি উড়ছে'—চি চিয়ে-চিঁচিয়ে বলতে-বলতে চান করতেই বোধ হয় বেরিয়ে গেল সুমনা—উত্তরের দরজা দিয়ে—

নিশীথ গলা ছেড়ে চিৎকার করে বললে, 'দেখো আবার, বিশুবাবুর দিঘির চিংড়ি মাছে খেয়ে না ফেলে যেন।'

অর্চিতা চেঁচিয়ে বলল, 'দেখো সুমনাদি, আবার জলপিপিতে ভাসিয়া না নিয়ে যায় যেন। আমরা এখানে স্থলপিপির কথা বলছি।'

সুমনা চলে গেছে। এসব হাঁক-হাঁকড় তার কানে পৌঁচেছে কি না সন্দেহ।

'নরেনের কলকাতার ঠিকানা তোমাকে আমি দিয়ে দেব। কোথায়, ফরডাইস লেনে, না কোথায় থাকত—গিরিবাবুর লেনে গিয়েছে। নাকি আগের জায়গাতেই আছে। আমি টুকে এনেছি সব—নরেনের কালুখুড়োর কাছ থেকে। নরেনের বাপটা যেমন জোচ্চোর—ওর খুড়ো তেমনি ভদ্র ভাল বিশ্বাসী মানুষ—'

'কলকাতায় যাবার আগে দিও নরেনের ঠিকানা আমাকে, কিন্তু কী হবে। যা নয়, তাই অর্চিতা। নরেনরা এর মধ্যে নেই। রানুর আর-কিছু একটা হয়েছে। তাকে ফিরে পাওয়ার কোনো কথা নেই।'

নিশীথের ও-সব বোকা কথা, ভাল কথা শুনবার কোনো প্রয়োজন আছে স্বীকার না—করে, অর্চিতা বললে, 'বোশেখ মাসে নরেন কলকাতায় যাচ্ছে। ঠিক কবে যাবে, গিয়ে ক-দিন থাকবে তোমাকে পরে জানাব আমি। কার বাড়িতে উঠবে তুমি কলকাতায়?'

'আমি খুব সম্ভব বালিগঞ্জে থাকব। জিতেনের ওখানে। মস্ত বড় সাহেব তো আকজাল জিতেন। বিয়েও করেছে। জিতেনের বাড়ি ক-দিন থাকা হয় বলতে পারি না।'

'কলকাতায় নরেনের বাড়িতে গিয়ে জিনিসটা নিয়ে কোনো হই-হল্লা করো না। জিতেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে তোড়জোড় করে লোকজন মোতায়েন রেখে নরেনকে চা খাওয়াতে ডেকে নিয়ে যেও তোমাদের বাড়িতে।'

'কী করা যাবে তারপর?'

'তারপর কথা বের করে নিতেই হবে—যে-করেই হোক। ও সব জানে, ব্যাটা ছুঁচোর ব্যাটা। হাড় ক-খানা আস্ত থাকতে দেবে না। কথা না-বার করে ছেড়ে দেবে না।'

'আমার সঙ্গে তুমিও কলকাতায় চলো অর্চিতা।'

'চলো করমচাতলায়, উঃ বড্ড রোদ এখানে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লজিক হাতে মানুষটি কোনোদিকে নেই তো। না নেই। চারিদিকে ভাল করে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল তারা। নিশীথরা এগিয়ে পড়ছিল; কিন্তু খানিকটা দূর যেতে না-যেতেই অর্চিতাকে কেটে পড়তে দেখে নিশীথ পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখল জাম, তেঁতুল, সরবতি লেবুর ঝাড়ের ভিতর গিয়ে বেরিয়ে আসছে মহিম; নিশীথকে দেখে নি, অর্চিতাকে দেখে নি। না [?] দেখবার আগে পাশাপাশি দুটো অর্জুন গাছের পিছনে সরে গেল অর্চিতা। তারপর সময় হলে বেরিয়ে নিরালা পথ দিয়ে সাঁ করে চলে গেল কেমন যেন অপরূপ পিয়াসিনীর মতন। নিশীথ ছাড়া কেউ দেখল না তাকে।

নিশীথ নরেনদের বাড়ির দিকে যাবে কি না ভাবছিল। কলকাতা রওয়ানা হবার আগে রানুর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সন্দেহ মনের মধ্যে দানা বেঁধে না উঠলেই ভাল। এ সম্বন্ধে সে পরিষ্কার হয়ে নিতে চাচ্ছিল। বারবার নিজের মনকে বলেছে সে, তার স্ত্রীকে, আরো দু-চারজন লোককেও বলেছে যে, রানুকে কোথাও পাওয়া যাবে না, এ-রকম উপলব্ধি দিয়ে মনটাকে শক্ত করে বেঁধে নেওয়া ভাল, কারণ, যা নেই তাকে কী করে পাওয়া যাবে। এ পৃথিবীর নিয়মই হচ্ছে এই যে, এখানে ক্ষুরধারে শ্রীছাঁদের মনের সব স্নিগ্ধ জিনিস হারিয়ে যায়; হারিয়ে গেলে আর আসে না, কোনো সুবলয়িত সৎ প্রশ্নেরই সদুত্তর পাওয়া যায় না মানুষের জীবনে। কেউ বলে উত্তর পাওয়া যাবে সেবায়েতদের কাছ থেকে। কিন্তু এরা বা বিজ্ঞানীরা যে উদ্দেশ্যের ভিতর কাজ করে তার বাইরে অনেক দরকারি নির্দেশের কোনো খোঁজ রাখে না তারা; বলে জানি না; অলৌকিকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলে তারা বলে, আমরা নেই। নেই, এই কথাই ঠিক। নেই, কোনো উত্তর নেই। যা চাই তা নেই, যা শুভ্র ও শূন্য তাকে আহ্বান করে নিজের মনকে সুস্থ করে নেওয়া দরকার সুমনার-অর্চিতার; কিন্তু নিশীথের মনের সুস্থতার দাবি আর-এক রকম। ভাবতে-ভাবতে হাসি পাচ্ছিল নিশীথের। গা ঝাড়া দিয়ে নরেনদের বাড়ির রাস্তা ধরে চলল নিশীথ।

'কে আছে বাড়িতে? নরেন আছে?'

'নিশীথবাবু যে। আসুন। আজ কলেজ ছুটি বুঝি?' নরেনের কাকা কালু মিত্তির নিশীথকে বাড়ির ছোট বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। আর-কেউ ছিল না সেখানে,' কলেজ আজ ছুটি?'

'জানি না তো আমি। নিজে ছুটি নিয়েছি আমি।'

'ছারপোকার চেয়ারে বসেছেন। বেতের ইজিচেয়ারটায় বসুন। ওটাকে দু'দিন ধরে ডিডিটি দিয়ে ঠিক করে নেওয়া হয়েছে।

'বেশ ফরাশেই বসা যাক না কেন। চমৎকার ধপধপে ফরাশ কালুবাবু, দিব্যি বসেছেন আপনি—'

'বসুন বসুন—তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বসুন। ভেবেছিলুম ইজিচেয়ারে বেশি আরাম পাবেন।'

তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসল নিশীথ। এ ভাবে বসবার প্রয়োজন হয় নি কোনো দিন। কেমন একটা নবাবি জমিদারির তেলচিটে ঠেকারের ফেনায়, ফেনিলতায় ফরাশ তাকিয়ে উপচে উঠত তার মনে, যখনই এ জিনিসগুলোর উপর দৃষ্টি পড়ত।

'আরাম পাচ্ছেন নিশীথবাবু?'

'পাচ্ছি। প্রকাশবাবু বাড়ি আছেন?'

'না। কেন বলুন তো'।

'পাবলিক প্রসিকিউটার হয়েছেন না তিনি?'

'সে তো প্রায় দু'বছর হতে চলল—'

'বরেন কোথায়?'

'বরেন বাড়িতে নেই—জলপাইহাটিতেও নেই' গোল্ডফ্লেক টিনের মাথায় দেশলাই চড়িয়ে নিশীথের দিকে এগিয়ে দিয়ে কালুবাবু বিদরির নলটা মুখের কাছে নাড়তে-নাড়তে বললে, 'বরেন মেহেরপুর গেছে দিন দুই হল।'

'কবে ফিরবে?'

'বলতে পারি না তো।'

'ও তো কলেজে পড়ছিল—'

'হ্যাঁ, বি-এ ফেল করল এবার।'

'কী করে আজকাল?'

নিশীথের দিকে সুস্থ ধীর চিলের মত চোখে তাকিয়ে এক-আধ মুহূর্ত নল টেনে নিয়ে চুপ করে কথা ভাবল যেন কালবাবু। 'করে? হিঁয়াকা মাটি হুঁয়া ফিকো, হুঁয়াকা মাটি হিঁয়া—এই করে আর-কি।'

নিশীথ হেসে বললে 'তা বটে। কলেজে পড়বে না আর?'

'পড়ে কী করবে? আপনাদের চোখে ধুলো দিয়ে কত তোড়জোড় করে বি-এ পরীক্ষা দিল। আঙুলের বড়-বড় চওড়া নখে মিনে কেটে প্রশ্নের উত্তর লিখে নিল, ঢাকাই মসলিনের মতন এক রকম কাগজ খুঁজে বের করেছে কোত্থেকে—হয় তো অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছে—একটা আফিমের গুলির মত পুটুলিতে এক মাইল কাগজ আঁটে—তাইতে আপনাদের বি-এ একজামিনে দরকারি যত শাস্ত্র ঘোঁটিয়ে লিখে নিল—ধরতে পেরেছিলেন আপনারা?'

নিশীথ অভিনিবিষ্ট হয়ে শুনছিল, জানাশোনা কথা তো সব; যে-ছেলেরা বছরের পর বছর পরীক্ষা দেয়, বাইশ-চব্বিশ বছর ধরে তাঁদের তো ঘাঁটিয়ে আসছে নিশীথ, তবুও একেবারে হালে যে-রকম রকমারি বাড়ছে ছেলেদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তারপরে ঘণ্টায় একশ বার করে জল খেতে আর ফেলতে বাইরে গিয়ে নোট আর তোতাপুরী ছুটিয়ে জয়হিন্দ বলে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ত—কী করতে পেরেছিলেন আপনারা। পরীক্ষার সময়ে গার্ড দিয়েছিলেন তো এদের বডিগার্ড হিসেবে।'

কালুবাবু নলটা মুখে নিতে গিয়ে সরিয়ে রেখে বললে, 'আমাকেও গার্ড দিতে হয়েছিল আপনাদের কলেজের বি-এ পরীক্ষায়। আপনাদের প্রিন্সিপ্যাল লিখে পাঠালে, আসুন একটু পাবলিক সার্ভিস করে যান। টাকা দিতে পারব না। কিন্তু, মিষ্টি খেতে দেব রোজকার ইনভিজিলেশনের পারিশ্রমিক হিসেবে। ওকালতি করে খাই, আজকাল মন্দা পড়ে এসেছে, ভাবলুম যাই-ই, একটু পাবলিক সার্ভিস করে আসি গে। যে-রুমে বরেন পরীক্ষা দিচ্ছিল সেখানেই গার্ড দেবার জন্যে ফেললে আমাকে। মিনিট পঁচিশেক পায়চারি করে দেখছিলুম। দেখলুম, সকলেই টুকছে, সকলেই গাঁট কাটছে, আমাকে দেখে চক্ষুলজ্জার খাতিরে বরেন সুবিধা করতে পারছে না। তবে হ্যাঁ, নখগুলো বার করে দেখছে, ঢাকাই মসলিনও মাঝে মাঝে বেরুচ্ছে।'

'কী করলেন আপনি?'

'কী আর করব। এক ছোঁয়ে দশ-বারোটা ছেলেকে বার করে দিতে হয়। এদের তাড়িয়ে দিলে বরেনকে বাদ দেওয়া চলে না। ঘরের বারান্দার দিকে দরজার কাছে বেয়ারাকে বললুম চেয়ারটা রেখে দিতে। খবরের কাগজে মুখ ঢেকে চেয়ারে গিয়ে বসলুম'—নিশীথ বিষণ্ণ নিস্তব্ধভাবে কালুবাবুর চোখের নাকের আদলে পরিস্ফুট রোগা রোঁ ঝরা চিলের দিকে তাকিয়ে রইল। যা বললেন কালুবাবু নিশীথ জানে সব। জেনে-জেনে এত ঘাগি হয়ে গেছে যে কালুবাবুকেই দেখছিল নিশীথ, তার কথাগুলোকে ততটা আর নয়।

'আপনাদের কলেজের একজন অধ্যাপককে দেওয়া হয়েছিল আমার সহযোগী হিসেবে। তিনিও ঐ রকম জোড়াতাড়া দিয়ে তিন ঘন্টা কাটিয়ে দিলেন আর কি—'

কালুবাবু নল মুখের থেকে নামিয়ে নিয়ে বললে, 'জানেনই তো নিশীথবাবু, সব। সে ঘরে প্রায় দেড়শ ছেলে ছিল—আমি ঘুরে-ঘুরে দেখলুম, ওদের মধ্যে সত্তর-পঁচাত্তর জনকে বের করে দিতে হয়, সার্জারির কাঁচি দিয়ে কান কেটে পাছার উপর ট্রেইটর লিখে। কে করবে তা? গোবেচারি প্রফেসররা না তাদের প্রিন্সিপ্যাল? তবেই হয়েছে! জানেন না, কী ভীষণ ট্রেড ইউনিয়ন ওদের।'

'ট্রেড ইউনিয়ন?'

'সবচেয়ে দুর্বার ট্রেড ইউনিয়ন। ওদের ব্যাপারে বেশি নাক ডোবাতে গেলে ঘরে-বাইরে রাস্তাঘাটে হারান করে ছাড়বে মাস্টারমশাইকে—'

'সেঁটে ঘুষি জমিয়ে দেবে'—একটি বারো-চৌদ্দ বছরের ছেলে দোর—গোড়ার থেকে বললে।

'ওরে হরেন'—সেই ছেলেটিকে লক্ষ্য করে কালুবাবু বললে, 'তোর নরেনদা বাড়িতে আছে নাকি রে?'

'না নেই'—ছেলেটি ফেঁসে খসে পড়তে-পড়তে বললে।

'কখন আসবে? কখন ফিরবে বাড়ি?'

নাগালের বাইরে চলে যেতে-যেতে গলা বাজিয়ে হরেন বললে, 'গোরাচাঁদ কখন বাড়ি ফিরবে, শুধোচ্ছে আমাকে। ভকত ভবনের হেঁদোয় পাম্প না ঢুকিয়ে, পেট না ফুলিয়ে ও ফিরছে আর।'

'দেখলেন তো নমুনা'—কালুবাবু বললেন।

'প্রকাশবাবুর ছেলে বুঝি?'

'হ্যাঁ পিণ্টির ছেলে বুঝি। পাম্প ঢোকাবার কথা বলছে।'

'ওর সাহস তো কম নয়। এ বাড়িতে কেউ নেই আর?'

কালুবাবু হাতের নলটার দিকে তরাসে পাখির মত খুব তাড়াতাড়ি তেরছা তীক্ষ্ণ চোখ মেরে বললে, 'আপনি মাস্টারমশাইয়ের মত কথা বললেন নিশীথবাবু। আজীবন ছেলে নিয়ে আপনাদের কারবার, অথচ চিনলেন না ওদের। বরেনের কথা কী বলছিলুম আপনাকে? আপনাদের প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর—কে পেরেছেন তার সঙ্গে? হরেন তো তার ভাই—'

নল মুখে টেনে নিয়ে গোল্ডফ্লেকের টিনটা নিশীথের দিকে এগিয়ে দিয়ে কালুবাবু চোখ বুজে নল টানতে লাগল। টিনের থেকে একটা সিগারেট বের করে নিল নিশীথ।

'এ বাড়িতে আপনি বসে আছেন, প্রফেসর মানুষ। আমি আছি—তবুও হরেন মুখ খিস্তি করে গেল। আপনারা যখন ছোট ছিলেন। এ-রকম হত?'

সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল নিশীথ। তাদের ছোটবেলাকার কথাই। পৃথিবীতে তখন নানা রকম অভাব-অসঙ্গতি ছিল বটে। কিন্তু মানুষের মন ঢের বেশি স্নিগ্ধ ছিল; কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল নিশীথের।

'বরেনকে দিয়ে কী দরকার আপনার?'—কালুবাবু জিজ্ঞেস করল।

'বরেন কী করছে সেটা আরো খুলে বলুন কালুবাবু।'

'ঐ তো এখানের মাটি ওখানে রাখছে—'

'মেহেরপুরে গেছে কিসের জন্যে? কিসের ব্যবসা ওর?'

'ব্যবসা তা বাবার হোটেলে খাওয়ার। পাড়ার মেয়ে দেখে বেড়াবার—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল নিশীথের রক্তের ভিতর।

'মেহেরপুরে কেন গেছে বলতে পারি না' কালুবাবু একটা ঢেকুর তুলে বললে।

'পাড়ার মেয়েদের দেখেই কি শুধু?'

'না, নিরেমিষ দেখে চোখ জুড়োবার দিন নেই এখন বরেনের, নরেনের। সেটা হরেনের এলেম হয়ে আসছে।'

'সিগারেটের ছাই কোথায় ঝাড়ি—অ্যাশ-ট্রে দেখছি না।'

'চোখের সামনেই রয়েছে আপনার।'

'কোথায়?'

'এই যে আমার কলকেটা, এরই ভিতর ছাই ঢেলে দিন। বরেন মেয়ে দেখতে মেহেরপুর গেছে কিনা আমি বলতে পারি না। তবে এদের ভাগ্যে নানারকম শিকে ছেঁড়ে বটে—'

'কী রকম?'

'টাকা পায়, আদর পায়। হ্যাঁ, উকিল সরকারের ছেলে বলে খানিকটা বটে। তবে নিজেদেরও কেরামৎ আছে—'

'মেয়েরা ওদের আমল দেয়?'

কালুবাবু নল টানছিল। কলকেটার দিকে একবার তাকিয়ে খানিকটা মিঠে ধোঁয়া মুখ দিয়ে বার করতে-করতে ফেলে দিল নলটা ফরাশের উপর। সেটা আবার তুলে ধরে বললে, 'পৃথিবীতে সব জিনিসেরই জুড়ি রয়েছে। বিয়ে করবার দরকার নেই, নরেনকে নিয়ে একটু ফূর্তি করবে, এ-রকম মেয়ের অভাব এই জলপাইহাটিতে নেই, কলকাতার কথা ছেড়ে দিন? সে তো সোনার দেশ। ওরে হুকুম।'

হুকুম করে উঠতেই চাকর এসে হাজির হল। কালুবাবুর দিকে, নিশীথের দিকে কোনোদিকেই তাকালে না সে, নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে কলকেটা খসিয়ে নিয়ে গেল।

'জলপাইহাটিতে নেই।'

'বাংলাদেশের কোনো গাঁ-মহকুমায় নেই। মেয়ে দরকার আপনার?'

'হ্যাঁ, স্ত্রী মরছে—এইবারে এক-আধটি দেখে রাখলে হত,' নিশীথ তার নিস্তব্ধ নিস্পৃহা মুখে একটু হাসির আঁচ ফুটিয়ে বললে, 'নরেনের সঙ্গে এই দরকার ছিল—'

'কখন ফিরবে তা তো বলতে পারি না।—'

'এ বেলা ফিরবে তো?'

'সেটা বোতল না দেখলে বলতে পারি না। ড্রাই জিনটিন হলে শীগগিরই ফিরবে, বেশি কিছু হলে দু-একদিন দেরি হতে পারে।'—কালুবাবু বললে, টিনের থেকে একটা সিগারেট বার করে তার সিগারেট জ্বালিয়ে নিতে-নিতে।

জলপাইহাটিতে আছে?'

'হ্যাঁ এখানেই।'

হুকুম কলকেটা সাজিয়ে এনে বসিয়ে দিয়ে গেল। সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে নল টেনে নিয়ে কালুবাবু বললে, 'একটা মোকদ্দমায় আটকে পড়েছে। সই জাল করে একটা মোটা চেক ভাঙিয়ে নেবার চেষ্টায় ছিল—ব্যাংক ধরে ফেলেছে। কিন্তু বড়লোকের ছেলে। জিনিসটা চাপা পড়ে যাবে। সে ব্যাঙ্কে দাদার প্রায় দু লাখ টাকা আছে। ডিরেক্টারদের মধ্যেও দাদা আছেন, তবুও তো ওকে ধরল ব্যাঙ্কের ছেলেরা। মোকদ্দমা অবধি করল। দাদা রোজগেরে মানুষ বটে কিন্তু হুঁশিয়ার নন। ওর ছেলেমেয়েরা ওকে নাকানি-চোবানি দিয়ে, একশেষ করল। কখন যে কোনদিকে ঢুঁসি মারবে—ভাবতে-ভাবতে ওর ইউরিন তে অমৃত হয়ে উঠল। ইনসুলিনে কিছু হচ্ছে না—ঘুম হচ্ছে না—রোজ করা ওষুধ খেয়ে ঘুমুতে হয়।'

মুখের সিগারেটটা ফেলে দিল নিশীথ। কালুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোক একটু চিন্তিত। অর্চিতা বলেছে, খুব সৎ সত্যাশ্রয়ী মানুষ কালুবাবু, সেই যাই হোক। এর ভাইপোরা অন্য রকম, প্রকাশবাবুও।

'নরেনকে তো পাওয়া যাবে না এ বেলা—'

'কেন, আপনার স্ত্রীর জন্যে তো? তাকে রক্ত দিচ্ছে নরেন—'

কথাটা ভুলেই গেছল প্রায় নিশীথ, মনে পড়ে গেল। তবুও এমন একটা কী বিশুষ্কতায় মন ভরে গেছে তার—সে রক্তের বদলে নরেন যেন তার স্ত্রীকে রক্তশূন্যতা দিচ্ছে। কেবলই, এমনই একটা অদ্ভুত উপলব্ধিতে মুখটা কেমন যেন দেখাতে লাগল নিশীথের। কালুবাবু তাকিয়ে দেখল।

'হ্যাঁ, রক্ত দিচ্ছে বটে। কিন্তু আপনি কাউকে বলবেন না, দু-একটা কথা জানতে চাই আপনার কাছে—'

'খুব গোপন কথা? এদিকে একটু সরে বসুন। বলুন।'

'নরেনের রক্তে কোনো দোষ নেই তো?'

'সে তো ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছেন। দোষ থাকলেও ওর রক্তে চলল তো। ডাক্তার কে? সিভিল সার্জন? মজুমদার?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি দেখছেন, ঠিক আছে। না দেখেশুনে কিছু করবার মানুষ তিনি নন।

তা তো ঠিক। কিন্তু নরেন এত আঘাটা ঘাঁটিয়ে বেড়ায়—ডাক্তার যখন রক্ত পরীক্ষা করে নিয়েছেন তখন আমাদের কিছু বলার নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না না রক্তের কথা নয়। কথাটা হচ্ছে কি—নিশীথ একটা সিগারেট বার করে নিয়ে বললে, 'আপনার ভাইপোরা কেমন তালেবর তা আপনার চেয়ে বেশি কে আর জানে। সবই তো জানেন আপনি। কিন্তু তবুও বলছি আপনাকে—নরেনদের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা কানে আসে যা সত্যিই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, মেয়েদের ব্যাপার নিয়ে কোনো মোকদ্দমায় জড়িত হয়ে পড়ে নি ওদের কেউ কোনো দিন?'

কালুবাবু নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে 'পড়েছিল।'

'কেন, কী করেছিল?—'

'খুড়োর কী রটিয়ে বেড়ানো উচিত ভাইপোদের গুখখুরি'—কালুবাবু কিছু বলবে কি না—বলতে ইতস্তত করতে লাগল কিছুক্ষণ। পরে নিশীথকে এ সব জিনিসের থেকে আলগা গোবেচারি মাস্টার অনুভ করে নিয়ে বললে,—'গাঁয়ের মেয়েদের নিয়ে ধানক্ষেতে ছেলে কী করছে না—করছে জানি না। তা নিয়ে মোকদ্দমা হতে পারে নি। গোঁফ চেঁচে পিছলে এসেছে। জলপাইহাটিতে মেয়েদের অনুমতিতে তাদের সঙ্গে কাজকর্ম করে ওরা, জোর-জবরদস্তি করে না। কাজ শেষ হলে যে যার নিজের ঘর আলো করে বসে থাকে গিয়ে, আত্মীয়-স্বজনেরো, কখনো-কখনো সন্দেহ করে বটে, কিন্তু হাতে-হাতে ধরতে পারে না। এখানকার ভদ্রলোকেরা আজকাল খুব হুঁশিয়ার হয়ে গেছে—প্রায় কোনো বাড়িতেই ঢোকবার উপায় নেই নরেনদের,' চোখ তুলে কালুবাবু জিজ্ঞেস করলেন নিশীথকে, 'আপনাদের বাড়িতে যেত?'

'যেত একসময়'—কিন্তু যখন যেত তখন তো কিছু শুনতে পায় নি নিশীথ। রানুকে ওদের সঙ্গে মিশতে তো দেখে নি কোনোদিন। কী জানি, কলেজের কাজে, লাইব্রেরির নতুন নতুন বই-জার্নালে, লেখায়-পড়ায়, নিজের মনে ভাবাবেগে এতই কি বিমুগ্ধ হয়ে ছিল নিশীথ যে কিছু টের পায় নি? চোখে পড়ে নি তো কিছু ওর কোনো দিন। তা ছাড়া কালুবাবুকে আসল কথা বলতে আসে নি তো নিশীথ। কালুবাবুকে সে জানতে দেবে না, ঠিক কী সে জানতে চায়।

'নরেনরা যেত এক সময়। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারত না।'

'কেন?'

'মেয়েরা ভিতরে থাকত। বড্ড লাজুক। ছেলেদের দিকে ঘেঁষত না।'

'ও! দু-একটি মেয়েকে সরিয়ে ফেলবার চার্জে মোকদ্দমা হয়েছিল' কালুবাবু গর্দানে হাত বুলোতে-বুলোতে আস্তে-আস্তে বললে।

'কবে?'

'বছর দেড়েক আগে—'

'একটি বারুণীপুরের আর একটি জলপাইহাটির'—

'জলপাইহাটির? শুনি নি তো—'

'শুনবেন যদি তাহলে পাবলিক প্রসিকিউটার আছে কী করতে।'

নিশীথের হাতের সিগারেটের আগুনটুকু নিভে গেল নিশীথ টান দিতেই। দেশলাইটা কুড়িয়ে নিয়ে নিশীথ বললেন, 'এই সব চালানির কারবার করে নরেন?'

'এখন করে কি না জানি না। তবে এক সময় ঐ করে লাল হবার চেষ্টায় ছিল।'

শুনে হৃদপিণ্ডটা যেন বসে গেল নিশীথের। কিছুক্ষণ সে কোনো কথাই বলতে পারল না। ডান হাত তুলে বুকের উপর রেখে চেপে বসে থেকে বাঁ হাতের উপর ভর রেখে কাত হয়ে রইল। কিন্তু এ-রকমে তো চলবে না। শক্তি সঞ্চয় করে নেবার একটা অসাধ্য-সাধন সাঙ্গ করতে-করতে নিশীথ বললে—

'গঙ্গাসাগরের চরে গিয়েছিল গত বছর?'

'নরেনরা? মনে নেই তো। সব জায়গায়েই তো যায়।'

'কলকাতার বড় দাঙ্গার সময় কোথায় ছিল?'

'কলকাতায় ছিল।'

হৃদয়টা কেমন করে উঠল যেন আবার, একটু সামলে নিয়ে সে বললে, 'গঙ্গাসাগরের মেলা ছিল না তখন। মেলা হয় কী মাসে? না, মেলার ভীড়ে নয়, তখন চেনা লোক চোখে পড়ে যেতে পারে। শুনেছি নরেনরা'—নিশীথ চুপ করল। শার্টের পকেট থেকে বের করে একটা ক্যাকটিনা পিল খেল। দু-তিন বছর খায় নি, গত কয়েকদিন থেকে পিলগুলো খেতে হচ্ছে আবার। হার্টে অসুবিধে।

কালুবাবু বললে, 'মাঝে-মাঝে সাগর দ্বীপে নৌকা করে যায় নরেনের দল। সেটা আমি জানি। মেলা থাকে, মেলা থাকে না। খুব হৈ হৈ করে গিয়ে সেখানে গা ঢাকা দিয়ে।'

'গা ঢাকা দেবার খুব ভালো ঘাঁটি বুঝি?'

'মেয়ে-টেয়ে ছিনিয়ে আনলে কত দ্বীপ আছে—কত ঘাঁটি আছে সমুদ্রে। সেখানে দিনকে রাত করে দেওয়া যায়।'

কালু নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কোনো খোঁজখবর পেলেন?'

'কিসের?'

'রানু কোথায় আছে বের করতে পারলেন না এখনো?'

'কেউই বলতে পারে না।'

'নরেন হয় তো জানতে পারে—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনাকে কে বললে?'

'আমি নিজেই অনেক বার ভেবেছি। আপনি নানা দিকে তদবিরে ছিলেন—'

তামাক টানতে লাগল কালুবাবু। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে হৃদযন্ত্রটা। নিশীথের সিগারেট খাওয়া ভাল নয়। সিগারেট খাবার কোনো রুচিও নেই তার।

'গভীর জলের মাছ। আবার বেন্দাবনের ঘাটের কচ্ছপজিও বটে নরেন, নরেন-রানুর ব্যাপার নিয়েই অনেকদিন থেকে ওকে প্যাঁচে ফেলবার চেষ্টা করছি। কিছুতেই পারছি না।'

'রানু কি বেঁচে আছে?'

'আছে হয় তো।'

'কী করে বুঝলেন?'

'ওকে তো কারুর মেরে ফেলবার কথা নয়—'

'ও সেই কথা,' নিশীথ হেসে বললে, 'কিন্তু মানুষ মুখ দিয়ে কথা বলে না আজকাল, চোঙে মুখ রেখে কথা বলে। যারা মেয়েটাকে এ-রকমভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, তারা কী না পারে। আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। আমি অনেক আগেই বুঝেছি যে শূন্যকে কোটি কোটি দিয়ে গুণ করে সেই অদ্ভুত শূন্যের ভিতর থেকে কোটিকে ফিরে পেতে চাইছি। কিন্তু শূন্য কী করে কোটিকে দেবে? সে তো শূন্য।

মনোযোগ দিয়ে নিশীথের কথা শুনে কালুবাবু বললেন, 'আমি তো এককে কোটি দিয়ে গুণ করেছি, কোটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে একা। নরেনের বাবা কুড়িকে কোটি দিয়ে গুণ করছে কুড়ি কোটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে কুড়ি। নরেন তো পঞ্চাশকে কোটি দিয়ে গুণ করছে, পঞ্চাশ কোটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে পঞ্চাশ। শূন্য নয়, এক, দুই, কুড়ি, চল্লিশ, 'আছে' 'হবে', এগুলোকে স্বীকার করে নিয়ে কাজে নামতে হবে। রানুকে পেতে হলে নরেনকে লোভী হতে দিতে হবে। আমি ওকে পাঁকালে আটকাব।'

'আমি কলকাতায় যাচ্ছি—'

'কবে?'

'দু-একদিনের মধ্যেই।'

'কদিন থাকবেন?'

'সম্প্রতি এক মাস তো বটে—'

'কালুবাবু, ঠোঁট নল ছুঁইয়ে রাখল, তামাক টানছিল না, বললে, 'আমি আপনাকে জানাব। দিন পনের-কুড়ির ভিতরেই—'

এক বছরের মধ্যে যে-জিনিসের কোন কূল-কিনারা হল না, পনের-কুড়ি দিনের মধ্যে কালুবাবু তার একটা কিনারা করে ফেলবেন—এ-রকম কত প্রতিশ্রুতি কত মানুষের কাছে পেয়েছে নিশীথ জীবনের কত পথে বাঁকে। প্রতিশ্রুতি পেয়ে ফলের জন্য অপেক্ষা করে-করে টের পেয়েছে ফল আর-এক জিনিস। মানুষের, বড় মানুষের, সৎ মানুষের মুখের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কেন মানুষ এটা করে দেব, সেটা করে দেব, এ-রকম আশ্বাস দেয় মানুষকে? আশ্চর্য, অনায়াসে, আরামে প্রতিশ্রুতি ভেঙে ফেলে। তাকিয়েও দেখতে যায় না কী বিষম আলাখোলা সরলতায় তারা বসে আছে যারা প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল।

'আমি উঠি কালুবাবু।'

'আচ্ছা আসুন'—নিশীথের দিকে না তাকিয়ে ফরাসের উপর ছড়ানো কতগুলো নথিপত্রের দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্কভাবে হাত তুলে নিশীথকে বিদায় দিল কালুবাবু।

বাড়ির দিকে ফিরে যেতে-যেতে নিশীথের মনে হল রানুর সম্পর্কে নরেনকে সন্দেহ করে কথাটা কালুবাবুকে বলে মোটেই ভাল করে নি সে। অর্চিতা বলেছিল, কালুবাবু খুব খাঁটি মানুষ। অর্চিতা নিজেও কি খাঁটি? এই দুই খাঁটিতে মিলে নিশীথকে কেমন নিভূম নিঝঝুম করে রাখে নি কি—হৃদয়ের ভিতর কোটি দিয়ে গুণ করা শূন্য বললে তাকে।

পথ দিয়ে ফিরতে-ফিরতে মনে হল চোতের বাতাসের মত তাকে ব্যজন করে চলেছে যেন সমস্ত ব্যক্ত নীলাকাশ; শেফালির জঙ্গলে বড়-বড় বোলতার চাক সোনালি রোদে ছায়ার নক্ষত্রের মত যেন; কত শত পতঙ্গ কেমন মিলে-মিশে প্রেম, পরিকল্পনায়, সমবেদনায় উৎসারিত হয়ে মানুষের হাতে চূর্ণ নগরগুলোকে, মানুষের হাতে নিহত মানুষরাশিকে ঠাট্টা করছে। আকাশে ফিঙে উড়ছে, হরিয়ালেরা চলেছে চোখে ঠোঁটে জলের গন্ধ নিয়ে কোনো নিকটতম জলের মহানুভব শান্তির দিকে, যদি না, মানুষেরা গুলি-গুলতি এসে কাউকে-কাউকে উপড়ে অন্ধকারের দিকে ফেলে দেয়। মাথার উপরের সূর্যের দিকে তাকায় নি নিশীথ কিন্তু দিঘির পাড়ের খই রঙের হাঁসটা চোখ পাঁজলে দেখে নিচ্ছে সূর্যকে; অপরূপ নারীকামিতার মতো যেন; মস্ত বড় শিমুল গাছের থই থই পাতার ভিতর কতগুলো স্নিগ্ধ নিঃশব্দ কবুতর বসে আছে, হঠাৎ ধপধপে সাদা একটা কবুতর উড়ে গেল। পাখিটার ডানার আলোর ঝিলিক নিশীথের চোখে এসে লাগল—টের পেল সে, মহত্তর সূর্য কোথাও অদৃশ্য থেকে সেবা করে যাচ্ছে, সুধা দিচ্ছে, অমেয়, শালীন আলোক দান করে চলেছে।

'তুমি কোত্থেকে এলে?'—হাসি মুখে বললে অর্চিতা।

'কালুবাবুর কাছে গিয়েছিলাম।'

'কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রানুর কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম—'

'আর নরেনের?' অর্চিতা বিরক্ত হয়ে বললে, 'এক্ষুণি জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন?'

'কেন কী হয়েছে?' তুমি না বললে খুব ভালমানুষ কালুবাবু—'

'অর্চিতা ভ্রুকুটি করে হেসে বললে, 'তোমার চেয়ে ভালমানুষ তল্লাটে নেই। আচ্ছা যাও, যা-হবার হয়েছে—আমাকে গিয়ে ঠিক করে দিত হবে। কিছু জানতে পারলে রানুর কথা?'

'না।'

গোরু, তবে যে সব গাইগরুর মুখ হরিণীর মত, অর্চিতা অনেকটা সেই রকম। তাকিয়ে দেখছিল নিশীথ, একটা হরিণী সেমিজ পরে মহিষের শরীরের ভিতর দিয়ে, দেয়ালের ভিতর দিয়ে, অদৃশ্য হয়ে গেল যেন কোথায়। না, অদৃশ্য হয়নি তো, এই তো দাঁড়িয়ে আছে; হরিণীর শরীরের ভিতর দিয়ে ছল-ছল করে উঠছে জল, শরীর, রাত্রির, যেখানে সূর্য নেই, শুদ্ধ দেশের রাত্রির জল ছল-ছল করে উঠছে—তারার ফাঁকে-ফাঁকে যে-অন্ধকার আছে সেগুলোকে জলোচ্ছ্বসিত করে—কত শত তারার শরীর, কত শত অন্ধকার নদীর এলোপাথাড়ির ভিতর জল শুধু এখন, রাত্রি শুধু—শ্বাশত রাত্রি।

নিশীথের কলেজ কমিটির সেক্রেটারি হরিলালবাবুর বাড়িতে কলেজ কমিটির প্রায় সব মেম্বারই এসে জড়ো হয়েছিলেন। কলেজের গভর্নিং বডির কোনো মিটিং নেই আজ। চার-পাঁচদিন পরে মিটিং। হরিলালবাবু এঁদের ডেকে আনেন নি। এমনি সারাদিনের কাজকর্মের পর বেড়াতে-বেড়াতে হরিলালবাবুর বাড়িতে এসে জুটেছেন তাঁরা।

হরিলালবাবুর সুন্দর চালতে ফুলের রঙের নতুন বড় দালানটার দোতলার হল ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। হরিলালবাবু এখানকার বার লাইব্রেরির এক জন বড় বুড়োটে উকিল। যখন এ দেশে উকিল-টুকিল বেশি ছিল না, তখন প্র্যাকটিস শুরু করে, সঙ্গে-সঙ্গে নানারকম হোসিয়ারি ব্যবসা চালিয়ে অনেকটা কামিয়ে নিয়েছেন। কলকাতায় বাড়ি আছে হরিলালবাবুর, ভুবনেশ্বরে আছে। হরিলালবাবু যদি আজকের দিনে ওকালতি শুরু করতেন তা হলে—লোকে বলে—এঁটোকাটাও জুটত না তাঁর, শামলা এঁটে বটতলায় দাঁড়িয়ে দিন কাটিয়ে দিতে হত। কিন্তু যে-লোকটা ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করে গুছিয়ে নিয়ে সকলের ঘাড়ে পা লটকে বেড়াচ্ছে তার সম্বন্ধে ধোঁয়াটে কথা পেড়ে কী লাভ এখন আর।

কলেজ কমিটির সেক্রেটারি হবার কথা কলেজের প্রিন্সিপ্যালের। কিন্তু জলপাইহাটিতে কলেজের প্রিন্সিপাল কালীশঙ্করবাবু এখানকার লোক নন। কিন্তু এখানকার মানী মানুষকে মর্যাদা দেবার জন্যে আগ বাড়িয়ে হাত কচলাবার মতো জুড়ি নেই এ দেশে কালীশঙ্করের। কী করে হরিলালকে একটু সুবিধে করে দেওয়া যায়, কী করে এখন একটু পিছিয়ে থেকে নিজের আখেরের সুবিধা করে নেওয়া যায়, এ-জন্যে সব সময় চোখ কান খাড়া কালীশঙ্করবাবুর। বছর তিনেক আগে ছ-মাসের জন্যে কলেজ কমিটির সেক্রেটারির কাজ চাপিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু দেখেছিলেন যে কমিটির মিটিঙে গভর্নিং বডির মেম্বারেরা সকলেই প্রায় হরিলালের দোহাই দিয়ে কথা বলে, মুখ চেয়ে থাকে হরিলাল চাটুর্য্যের। মেম্বারেরা সকলেই প্রায় ষাটের কাছাকাছি—কেউ কেউ সত্তর ঘেঁষে। ইয়ং ব্লাডের অভাব বোধ করছিলেন কি কালীশঙ্করবাবু? কী-জানি, এ বিষয়ে তিনি মনে-মনে কিছু স্থির করে উঠতে পারেন নি। ভাবছিলেন হয় তো কমিটিতে উকিল ছোকরারা এলে অবস্থা আরো খারাপ হবে। বাংলাদেশে মফস্বল কলেজ কমিটিতে অন্তত বার আনি-চৌদ্দ আনি জায়গা উকিলদের ছেড়ে দিতে হবে। তুমি-আমি দিচ্ছি না, এটা অলিখিত চুক্তি অনেক দিনের—কিন্তু কার সঙ্গে? জানা নেই। কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে। কে চালাবে দেশ, উকিলরা ছাড়া? উকিলদের মামলা মিটিয়ে কলেজ কমিটির বাকি জায়গাটা মুখ চেনা ডাক্তার বা জমিদারের ঝাড়-বংশের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপার—কিন্তু শিক্ষাদাতাদের জায়গা কোথায়, কলেজ কমিটিতে? ওদের? ওদের নিয়ে কী হবে? ওরা তো সোয়াশ-দেড়শ টাকার মাস্টার। ওরা আর হোমিওপ্যাথ ডাক্তাররাই তো স্বাধীন ব্যবসা চালাচ্ছে দেশে—সব ঘাটের জল খেয়ে তারপর ছোট শিশির জল ধরেছে। কেউ-কেউ কলেজে ঢুকে পড়ছে।

যখন একা চুপচাপ বসে থাকেন নিজের বাড়িতে দোতলার করিডোরে—ইজিচেয়ারে—তখন তাঁর মনে এ-রকম দু-চারটে কথা নড়াচড়া করে বটে, কিন্তু তিনি নিজে তো চারশ টাকা মাইনে পাচ্ছেন—শিগগিরই পাঁচশ, হরিলালবাবুকে একটু তাঁবে রাখলে সাড়ে পাঁচশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা—সোয়া পাঁচশ হয়ে যাবে এই মে মাসের গভর্নিং বডির বাসন্তী-নিদাঘ বৈঠকে। কথা দিয়েছেন হরিলালবাবু। বোকা হ্যাঁচকা ইশারাগুলোর গলা টিপে শেষ করে ফেলেন কালীশঙ্করবাবু। প্রিন্সিপ্যাল তার নিজের নিরালা কোয়ার্টাসও পাবেন—মস্ত বড় কলেজ ময়দানের একটেরে- নিম ঝাউ আমলকী জামগাছের ছায়া-রোদের ভিতর বেশ বড়-বড় সুন্দর একটা কাঠের বাংলা বাড়িতে। অ্যাসবেসটরের ছাদ। এক তলা বাড়ি—অনেক উঁচুতে মেঝের পাটাতন। চমৎকার চোঙের মত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়-যেন সুখী স্বস্তিকাম শান্তিপ্রাণ শ্রমণ তার নির্জন আশ্রমমন্দিরে প্রবেশ করছে। আঃ আ-হ্-হ্-হা-হ্রা-হা। চোতের বাতাসে পিঠ-বুক জুড়িয়ে নিতে-নিতে ভাবছিলাম। কালীবাবু তো এই পদ্মার পারের দেশের লোক নন। তিনি এসেছেন বেহার-বাংলার প্রত্যন্ত থেকে, অথচ এ দেশের লোকের মন মজিয়ে তিনি এদেরই মামা-মেসোর চেয়েও গলায়-গলায় আজ। সব সময়ই জলপাইহাটিতে নিঃশ্রেয়স (শব্দটি সম্প্রতি কলকাতার তাস-সিগারেট-বই-বুকনির দু-চারজন বৃত্তান্ত পণ্ডিতের কাছ থেকে শিখে এসেছেন) নিঃশ্রেয়সের চিন্তা. মানে ঠিক কল্যাণকামনা করেন। কিছু নয়—বোকা হরিলালকে হাতে রাখতে হয়। একটু তাইয়ে দিলেই টোপ গেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিলাল। টাকা করে নিয়েছিস, এখন তার বড় কথা হচ্ছে মান। মানী হবি? বেশ তো হ না; কে তোকে বাধা দিচ্ছে হরিলাল। আমি পথ ছেড়ে তোকে কলেজের সেক্রেটারি করে দিয়েছি। তুই যদি নামে 'প্রিন্সিপ্যাল হতে চাস, বেশ তো হবি; আমার কোনো আপত্তি নেই; সপ্তাহে এক-আধ ঘণ্টা এসে হিন্দু-ল পড়িয়ে যাবি ফোর্থ ইয়ারের ছেলেদের; সে ঘণ্টায় আমার ইংরেজির ক্লাসটা আমি বা দিয়ে দেব; প্রিন্সিপ্যালের কামরায় ইজিচেয়ারে বসে থাকব—ফ্যান টিপে দিয়ে; আমাকে পাঁচশ টাকা মাসোয়ারা দিলেই হবে।

মান! মানকচুপাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে কত মানের কাজই তুমি করেছ হরিলাল! কোন কোন সধবা-বিধবার কোন ছেলেটি-মেয়েটি তোমার, জানা নেই বুঝি আমাদের?

'হ্যাঁ, কালীশঙ্করবাবু—'

'আজ্ঞে বলুন।'

কালীশঙ্কর ভেনেস্তার চেয়ারটা একটু কাছে টেনে নিয়ে, হরিলালের দিকে এগিয়ে, খুব বেশি ঘেঁষে নয়-চেয়ারটাকে পেতে নিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে—কেন ছোট ছেঁদো কাঠের চেয়ারে বসেছেন আপনি। প্রিন্সিপ্যাল মানুষ—আপনার জন্যে একটা কেম্বিসের ডেকচেয়ার জুটল না। মতিলাল! ওরে এই মোতে হারামজাদা!'

'না-না—কিছু দরকার নেই হরিলালবাবু—বেশ ভাল চেয়ার—বিলিতি ভেনেস্তা—'

'ভেনেস্তা আবার দিশি-বিলিতি আছে নাকি—'

'আছে দিশিও এক রকম! পাইন কাঠের মতন; তবে খুব খেলো জিনিস'—জলপাইহাটি কোর্টের হাজার-দেড় হাজার বাদীর উকিল হিমাংশু চক্রবর্তী বললে। হিমাংশুর বয়স পঞ্চাশের নিচে। কলেজ কমিটির মেম্বার হিমাংশু। 'আমার ডেকচেয়ারটা আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি স্যার'—বললে হিমাংশু কালীশঙ্করবাবুকে।

'না-না—ঠিক আছে, ঠিক আছে'—কালীশঙ্কর ডান হাতের পাঁচটা আঙুল উচিয়ে থামিয়ে দিলেন।

'আমরা সবাই তো সোফা-সেটিতে ইজিচেয়ারে বসেছি হরিলালদা'—উকিল ব্রজমাধববাবু বললেন, 'কালীবাবু কেন ভেনেস্তা বেছে নিলেন'—

'ভেনেস্তা হবার জন্যে হে-হে-হে'—হরিলাল তার নাক-ঠোঁটের কোণা খামচি খিঁচিয়ে হেসে ফেলে বললেন, 'মতিলাল! ওরে হারামজাদা হারামিকা'—

শিবলাল এসে বললে—'বাবা বাড়ি নেই, ইস্টিশনে গেছে দাদাবাবুর মাল খালাস করে দিতে'—

'হারামিকা—শিগগির একটা সোফা নিয়ে আয়!' শিবনলাল অন্দরের থেকে সোফা আনতে গেল।

'সোফা—সেটি তো ছিল চারদিকে; আপনি নিজে কেন উটকো চেয়ারে বসতে গেলেন কালীবাবু?'

'বড্ড ছারপোকা কামড়াচ্ছে হরিলালবাবু'—হিমাংশু চক্রবর্তী বললে।

'সত্যি, ছারপোকা হরিলালদা—বসা দায়'— ব্রজমাধব বললেন।

'ঐ নতুন ভেনেস্তা চেয়ারটায় ছারপোকা নেই। কালীবাবু ঠিকই বসেছেন।'—হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা- হাসতে লাগলেন।

'যা ছারপোকা দাদা, কী হবে সোফায় বসে। বেশ আছেন আপনি যা হোক কালীবাবু'—ঘোষমল্লিক স্টেটের উকিল বঙ্কিম দত্ত বললে।

শিবলাল ও পূর্ণ ধরাধরি করে একটা চমৎকার নতুন সোফা হল ঘরে এনে বসাতেই সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে গটগট করে হেঁটে সোফাটার উপর ধপাস করে বসে পড়লেন বারের উকিল, কলেজ কমিটির মেম্বার, ওয়াজেদ আলী সাহেব। কালীশঙ্করবাবু নিজের চেয়ার থেকে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন সোফায়। হঠাৎ আলী মিঞাকে চোখে পড়ায় ভেনেস্তায় ফিরে এলেন। সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

'কেন কী হল—হাসবার কী হল'—জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলী।

'কিছু হয় নি।'

শিবলালকে একটা ডেক চেয়ার আনতে বললেন হরিলালবাবু 'না কি সোফা আছে আরো অন্দরে?' চলে গেল শিবলাল।

'ভাল তো মিঃ ওয়াজেদ আলী?'

'ভাল, ওয়াজদ আলী সাহেব?'

'সেলাম ওয়াজেদ আলী সাহেব, তবিয়ৎ ভাল তো। আজ বার লাইব্রেরিতে দেখলুম না তো আপনাকে—'

'আদাব, মিঃ ওয়াজেদ আলী। মিঃ ইমাম হোসেন বেড়াতে-বেড়াতে আসবেন কি এদিকে এক বার?'

'এই যে জনাব ওয়াজেদ আলী সাহেব; আপনার কথাই ভাবছিলাম। আমি গেছলুম কাল আপনার ওখানে। বাড়িতে পেলুম না; শুনেছিলুম আপনার নিউরালজিক পেন হয়েছে—'

ওয়াজেদ আলী অত্যন্ত আপ্যায়িত বোধ করছিলেন। আপ্যায়িত করে যদিও ব্যতিব্যস্ত করে ফেলছে, তাঁকে সব, কিন্তু তবুও খারাপ লাগছিল না তাঁর। তাঁর চারিদিককার এ সব মানুষদের মৌখিক আন্তরিকতা তো খুব নিখুঁত—এই হলেই হল যেন ওয়াজেদ আলী সাহেবের; ভিতরের আন্তরিকতা অন্ধকারে ভুট্টার মত পুড়িয়ে খায় ভুট্টার ক্ষেতের পাশে বসে সাদামাটা দেহাতি লোকেরা; উপরের স্তরে এ জিনিসটা খুব কম। উপমাটা প্রকৃতির থেকে নেওয়া—বেহার অঞ্চলে। ওয়াজেদ আলী সাহেব বাঙালি মুসলমান—পদ্মার ওপারের; কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন থেকে বেহারের কথা ভাবছিলেন—খুব বেশি। ভুট্টা নয়—জওয়ার জওয়ার—ওয়াজেদ আলী ভাবছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জনাব ইমাম হোসেন সাহেব? না তিনি আজ এ দিকে আসবেন বলে মনে হয় না। বার লাইব্রেরিতে আমাকে দেখেন নি? গেছলুম—খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছি। পুলিশ সাহেবের মোটর লঞ্চে একটু ঘুরে বেড়ালুম। খানাপিনা খেয়ে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল'—বললেন আর-একজনকে, 'নিউরালজিক পেন? হ্যাঁ, বড্ড কষ্ট পেয়েছি চার-পাঁচদিন—দুটো মাড়ির দাঁত—মাড়ির দাঁতে বদ রক্ত জমে টনটনিয়ে উঠেছিল মনে হয়। কনস্টিপেশনও আছে। ডাক্তার জোলাপ নিতে বলেছিলেন। কিন্তু আজ এ বাড়িতে ম্যাজবান, ও বাড়িতে গিন্নি-পাগল চালের পোলাও, আর মুর্গির কালিয়া রেঁধে বড় বিবিসাহেব যেতে লিখে পাঠিয়েছিল—কী করি, সামাজিক মানুষ হয়ে থাকতে হলে দুর্ভোগ ভুগতেই হয়—'

'জোলাপ নেওয়া হল না?'

'না।'

'গিন্নি-পাগল চাল কাকে বলে আলী সাহেব?'

'খুব চমৎকার চাল।'

'বাসমতির মতন?'

'না না, খাবেন একদিন হরিলালবাবু?'—'জিজ্ঞাসু ব্রজমাধবকে টপকে হরিলালবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলী।

স্নিগ্ধতা ও আত্মমর্যাদায় হরিলাল আস্তে-আস্তে বললেন, 'আমার আর খাওয়া-দাওয়া, দাঁত নেই, কী খাব আমি। মাংস খেতে পারি না, কুচিয়ে কিমা রেঁধে দেয়, সেটাই খাই রোজ'—

'রোজ?'—কে যেন জিজ্ঞেস করল। হরিলাল নিজের কথা বলতে-বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যে রোজ মাংস খান এ কথা শুনে ও-রকম দাঁত কেলিয়ে 'রোজ' বলে উঠল কে? নিজে কথা বলছিলেন, নিজের কথার দিকেই কান পেতে ছিলেন তিনি। অন্যদিকে মন ছিল না তাঁর। কে মানুষটা বলে উঠল, 'রোজ'? হরিলালের কানের ভিতর দিয়ে মনে ঢুকে তাঁকে সচকিত করতে একটু দেরি করেছে বলেই হরিলাল বুঝতে পারছেন না, কে বলেছে। চোখ তুলে চারিদিকে তাকিয়ে সহাস্যে সমীচীনভাবে খতিয়ে দেখছিলেন, 'হ্যাঁ রোজ খাই', হরিলালবাবু দৃঢ়ভাবে বললেন।

'কেউ কোনো কথা বলতে গেল না।

'রোজই আমার মাংস না খেলে চলে না! রোজ! আমি মাংস খাই, কিমা মাংস কুচিয়ে কিমা করে খাই। এ বেলা ও বেলা ঘিয়ে রসিয়ে। রোজ। কে জিজ্ঞেস করেছিল আমি রোজ মাংস খাই কি না?'

কেউ কোনো উত্তর দিল না।

কে জিজ্ঞেস করেছিল? কেমন হাসিহাসি অমায়িক মুখে এর ওর, ওর তার, কালীশঙ্করের, সকলের দিকেই হরিলালবাবু চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছিলেন কেমন একটা কঠিনতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে তবুও। 'আমি রোজ মাংস খাই কি না, জিজ্ঞেস করল কে?'

'ক্ষ্যামা দিন হরিলালবাবু। যে জিজ্ঞেস করেছে সে যখন নাচার, তখন একটা কথা নিয়ে এ-রকম বাঘা তেঁতুলের সিন্নি পাকিয়ে তো কোনো লাভ নেই'—ওয়াজেদ আলী বললেন।

'ঠিক বলেছেন আপনি আলী মিঞা'—হরিলাল বললেন—'রোজ মাংস খাওয়া যে কী, হিন্দুর বাচ্চারা তা বুঝবে কী করে?'

ওয়াজেদ আলী জিভ কেটে হাত জোড় করে হরিলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না না, ওটা ঠিক হল না। কোনো রকম কম্যুনাল কথা বলবেন না হরিলালবাবু। হিন্দু মুসলমান কি আলাদা কিছু?'

'তা নয়,' ব্রজমাধববাবু বললেন, 'আলাদা হতেই পারে না।'

'মুসলমানদের একতা আছে; তারা জানে যে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে কী রকম চমৎকার বিসমাল্লা বাদাম উড়িয়ে নেওয়া যায়'—স্টিমার অফিসের উকিল অন্তিম দত্ত বললে।

'ঠিক কথা। আমরা এক'—আড় চোখে ওয়াজেদ আলীর দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে বললেন নবকৃষ্ণবাবু। তাঁর অবশ্য অন্য নানা রকম কথা বলবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এ জায়গায় নয়—এখন নয়।

'আমাকে কাল ফকরুদ্দিন সাহেব বলছিলেন যে, এ দেশটা যদি মুসলমানের দেশ হয়, তাহলে হিন্দুরও দেশ, মুসলমান, হিন্দু—সব আলাদা-আলাদা নাম বটে, কিন্তু আসলে দেশটাকে ভাল উন্নত করার চেষ্টা-চরিত্রের ভিতর দিয়ে মুসলমান আর হিন্দু তো এক'—হিমাংশু চক্রবর্তী বললে।

'এক, এক'—একটু অসহিষ্ণুভাবে বললেন নবকৃষ্ণবাবু। কেন যে এই নিরেশ ব্যাপারটা নিয়ে এরা এত কথা কপচাচ্ছে ভাল লাগছিল না তার। অন্য কত কাজের কথা পড়ে আছে। এত বেশি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন নবকৃষ্ণবাবু যে এক দমক হেসে উঠে ওয়াজেদ আলীর দিকে তাকিয়ে নিলেন। ঢোঁক গিলে একটু কথা ভেবে নিলেন।

'কথাবার্তা বড্ড কম্যুনাল হয়ে পড়ছে হরিলালবাবুর'—বললেন ওয়াজেদ আলী।

'তাই তো দেখছি, সেই জন্যেই এই ফষ্টিনষ্টিতে যোগ দিই নি আমি'—হরিলালবাবু পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে বললেন।

'কেন? কম্যুনাল হল কী করে?' বিস্মিত হয়ে নবকৃষ্ণ হরিলালবাবুর দিকে তাকালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবকৃষ্ণের জিজ্ঞাসায় কোনো কান না-দিয়ে হরিলালবাবু ওয়াজেদ মিঞার দিকে চোখ তুলে বললেন, 'ওরাই কথা বলে যাচ্ছিল, ওদের কথায় আমি যোগ দিই নি। ব্যাপারটা কম্যুনাল বটেই তো: হিন্দু আর মুসলমান এক কি আলাদা, তারা দুই জাতি কিনা, তাদের ধর্মের মত তাদের কালচারও আলাদা কি না—এ নিয়ে বড়-বড় লোকেরা কথা ভাববেন। ও-সব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার তো কোনো কথা নেই'—চুরুটটা জ্বালিয়ে নিলেন হরিলালবাবু,—'অবিশ্যি ওয়াজেদ আলী সাহেব বড় মানুষ। কিন্তু এ-সব বিষয়ে তাঁর কী মতামত সেটা তিনি পরিষ্কার করে বলে আসছেন অনেক দিন থেকে অন্য জায়গায়। কিন্তু আমার এ বাড়িটা তো কোনো পলিটিক্সের হাট নয়: এখানে আমরা মিলেছি-মিশেছি—শিক্ষা-দীক্ষা, কলেজ-স্কুল, দু-চারটে ব্যাংক ফেলে, জালিয়াতি, পার্টিশন সুট নিয়ে আলোচনা করতে। আমার সিগারেটের টিনটা ফুরিয়ে গেছে। আপনারা কেউ সিগারেট খাচ্ছেন না যে'—হরিলালবাবু চুরুটে দু-একটা টান মেরে, সেটাকে দাঁত থেকে খসিয়ে ছাই ঝেড়ে নিয়ে বললেন।

পকেট থেকে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট বের করে ব্রজমাধববাবু দেশলাই বার করলেন—'এই যে ওয়াজেদ আলী সাহেব, সিগারেট নিন।'

ব্রজমাধববাবুর কাঁচি সিগারেট একটা খসিয়ে নিয়ে জ্বালিয়ে, দু-একটা টান দিয়ে ওয়াজেদ আলী পকেট থেকে নিকেলের সিগারেট কেস বের করে ব্রজমাধব, হিমাংশু সকলের ভিতর বিলি করে দিতে-দিতে বললেন—'আপনি চুরুট খাচ্ছেন হরিলালবাবু তাই সাধলুম না, দেখবেন খেয়ে?'

'কী সিগারেট ওটা?'

'নেভি কাট।'

'পরে দেখব। চুরুটটা খেয়ে নিই।'

ব্রজমাধববাবুও কাঁচি বিলি করছিলেন। এ দু-জন মানুষের সিগারেট জ্বলে উঠল সকলের মুখেই—কালীশঙ্কর ছাড়া; সিগারেট খান না তিনি।

'ফকরুদ্দিন সাহেবের কথা বলছিলেন আপনি হিমাংশুবাবু, কিন্তু তিনি তো লিগের মুসলমান নন।'

'ফকরুদ্দিন সাহেব লিগের নন?'

'আমি জানি তিনি লিগের নন।'

'তিনি কি লিগের নন?'

'তিনি কি কংগ্রেসের মুসলমান?'

'ফকরুদ্দিন সাহেব লিগে ঢুকেছেন শুনেছিলুম—'

''ফকরুদ্দিন সাহেব কংগ্রেসের নন, কৃষক-প্রজার নন। আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে। আমার চেয়ে বেশি এ-বিষয়ে কেউ জানে না।'

'কে বলেছে 'ফকরুদ্দিন সাহেব লিগের? লিগে তিনি নেই।'

'ফকরুদ্দিন সাহেব কি মজায়েৎ-উল-উলেমার?'

'খাকসার পার্টিতে তিনি আছেন বলে মনে হয় না। না, না, মোমিন নন।'

'না না, কংগ্রেসের নন ফকরুদ্দিন সাহেব, কী বলছেন আপনি?'

'ফকরুদ্দিন কি কম্যুনিস্ট?'

'কম্যুনিস্ট ঠিক নয়। সোস্যালিস্ট পার্টির, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট নয়। আরো অনেক সোস্যালিস্ট পার্টি বেরিয়েছে আজকাল।'

'ফকরুদ্দিন কম্যুনিস্ট, আমি জানি।'

ওয়াজেদ আলী বিক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'ফকরুদ্দিন সাহেবের নিয়ে এত কথা। একজন মানুষকে নিয়ে বড্ড কাটা-ছেঁড়া হচ্ছে কিন্তু হরিলালবাবু। জিনিসটা কম্যুনাল হয়ে যাচ্ছে হরিলালবাবু'—

'আমিও তো তাই দেখছি। সেই জন্যই ওদের ডামাঢোল আমি যোগ দিই নি। আমি কোনো কথা বলি নি। 'ফকরুদ্দিন সাহেব এটা কী, ওটা কী সেটা, একজন মানুষকে নিয়ে এত কথা হবে কেন? হেঁজিপেঁজি কথা সব! হরিলালবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন।

'যদিও এটা পার্টিশন স্যুটের দেশ'—কে যেন শুরু করলেন।

'পলিটিক্স থাক'—হরিলালবাবু থামিয়ে দিলেন।

'মুসলিম লিগ বলছিল কিনা যে শরিয়ত অনুসারে দেশ শাসন।'

আবার পলিটিক্স!' ধমক দিয়ে ফেলেই হরিলালবাবু একটু হকচকিয়ে উঠলেন। শরিয়তের কথা ওয়াজেদ আলী আরম্ভ করছিলেন চাপা গলায়—ওয়াজেদের গলা থেকে দু-তিন রকমের সুর বেরোয়। চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন হরিলালবাবু, মনে হয়েছিল তাঁর, যেন ব্রজমাধববাবু শরিয়ত অনুসারে রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারটা নিয়ে উত্তেজিত হবার পূর্বাভাস দেখাচ্ছে। বেপরোয়া ব্রজমাধব। ব্রজমাধবকে কড়কে দেবার জন্য ধমক দিয়ে চোখ খুলেই দেখলেন, ওয়াজেদ আলী কথা বলতে—বলতে হরিলালকে কঠিন, সাদা বরফের মত দাঁত দেখিয়ে থেমে গেলেন।

'ব্রজমাধববাবু, আপনি শরিয়তের কথা-টথা বলবেন না। এ সব বিষয়ে মুসলিম লিগের নেতারাই ভাল বোঝেন, ঠিক বোঝেন। তাঁরা যদি কিছু বলতে চান আমরা শুনব। ওয়াজেদ আলী সাহেব রাষ্ট্রশাসনের কথা বলুন, আমরা শুনি। খুব মন দিয়েই শুনি। কিন্তু ব্রজমাধববাবু কালীশঙ্করবাবু, এঁরা এ সব শাসন-শরিয়তের জানেন কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন ফোঁপরদালালি করতে যান'—বললেন হরিলালবাবু বেশ স্থির গলায়, ব্রজমাধববাবু ও কালীশঙ্করবাবুকে খুব ধমকে, কড়কে দিয়ে, ওয়াজেদ আলীর দিকে আশ্রয়ার্থী জুনিয়র উকিলের মতন আস্তে চোখ মেরে।

হরিলালের এ দৃষ্টির নিস্তব্ধ মাহাত্মকে—সাত-পাঁচ না ভেবে—ভাল জিনিস বলে মনে করলেন ওয়াজেদ। জলের মতন গলে গেলেন তিনি। বললেন, 'না-না, ব্রজমাধববাবু কিন্তু বলেন নি। শরিয়তের কথা আমিই পেড়েছিলাম।'

'রাষ্ট্রশাসন-শরিয়তের কথা আমি তো কিছু বলতে যাইনি হরিলালবাবু'—কালীশঙ্কর বিচলিত হয়ে বললেন, 'আমাকে কেন—'

কিন্তু কালীশঙ্করের কথাগুলো চিলে খাচ্ছে—খেয়ে যাক—গ্রাহ্য না করে হরিলালবাবু তাজ্জব বনে গেলেন, যেন ওয়াজেদ আলীর কথা শুনে 'ওঃ, আপনি! আপনি বলছিলেন শরিয়তের কথা। আমি ভেবেছিলুম ঠিক যেন ব্রজমাধববাবুর গলা: নাকি কালীশঙ্করবাবুর। ভাবলুম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, তুমি ছেলেদের নিয়ে থেকো হে, এ সব উজির-বাদশার ব্যাপার নিয়ে তোমার কী? ওঃ, আপনি বলছিলেন ওয়াজেদ আলী সাহেব! আপনি বলছিলেন কোরান শরিয়ত শাসন-টাসনের কথা! বলুন, শুনি, আমরা সকলে মিলে শুনি: কেমন একটা আবছা ভাব আছে আমাদের মনের ভিতর, জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যাবে সব'—কথাগুলো হরিলালবাবু পেটের থেকে ওগরাচ্ছেন বলে মনে হল না ওয়াজেদ আলীর।

খুশিই হলেন ওয়াজেদ সাহেব। হাত জোড় করে বললেন হরিলালবাবুকে—'আজ থাক। আজ কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে সব, কম্যুনাল হয়ে যাচ্ছে। আর একদিন হবে। ইমাম হোসেন সাহেব, মুস্তাক সাহেব, রফিক সাহেব ওঁদের সঙ্গে নিয়ে আসব।'

'বেশ তাই হবে। আমাদের জানিয়ে দেবেন কবে আসবেন। আমরা সকলে মিলে শুনব আপনাদের কথা'—হরিলালবাবু বললেন।

'পকেট থেকে একটা ভাল চুরুট বের করে ওয়াজেদ আলীর হাতে তুলে দিয়ে হরিলাল বললেন, 'আপনার কেসের সব সিগারেট ত বিলিয়ে দিয়েছেন। চুরুটটা জ্বালিয়ে নিন, ভাল জিনিস। আজ তো মঙ্গলবার, আগামী রববার কলেজ কমিটির মিটিং, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোতে। দুটো ভারী কথা আপনাদের সকলকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি আমি। গভর্নিং বড়ির প্রায় সব মেম্বারই তো এখানে হাজির আছেন। মুসলিম মেম্বার অবশ্য চার-পাঁচজন নেই এখানে, কিন্তু তাঁদের মুখপাত্র ওয়াজেদ আলী সাহেব নিজেই আছেন—'

তারিফ জানিয়ে অনেকেই হাততালি দিয়ে উঠল।

আলী সাহেব কিছু খুশি হয়ে, গোলাপছড়ির মত পোড় খেয়ে, মুখ কুঁচকে বললেন, 'ও সম্মানটা জনাব ইমাম হোসেনের—জনাব সৈয়দ আলী—জনাব'—থেমে গেলেন আলী সাহেব।

'আপনি যে খুব ইমানদার তা তো দেখলুম। খুব ভাল কথা। আমরা সকলে অবিশ্যি জনাব ওয়াজেদ আলী সাহেবের কথাই সবচেয়ে আগে মনে করি।'

হরিলালবাবু বললেন, 'আমাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কালীশঙ্করবাবু চারশ টাকা মাইনে পাচ্ছেন। উকিলদের একজন জুনিয়র মুখফোঁড়ও তো এর চেয়ে বেশি পায়। অথচ উনি দশ বছর ধরে কলেজে প্যাঁদাচ্ছেন। এত বড় একটা কলেজ, এত ছেলে, প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে এত কম মাইনে দিলে চলে না ত'—

'তা তো ঠিকই'—ওয়াজেদ আলী বললেন, 'আমিও ভেবেছি এ সব কথা। আমার মনে হয়—আচ্ছা ওকে—সাতশ টাকা করে দিলে কেমন হয়।'

'এ-রকম কথা আর কারুর মুখ থেকে বেরুলে তার গালেই চড় মারতেন হরিলাল। সাতশ টাকা! বটে! সাতশ টাকা এক সঙ্গে কোনো দিন দেখেছে কি কালীশঙ্করের মুক্ষি পায়রার বাচ্চারা, ধনা আর জনা? ওদের ধাড়ি বাপ দেখুক গে: ওরা দেখেছে! আমার ছেলেরা নাতিরা তো হাজার-হাজার টাকার গিলে চটকাচ্ছে রোজ। ওয়াজেদ আলী কথাটথা বলে বেশ, তর্কবিতর্ক করতে পারে। কিন্তু ফিনান্সের জ্ঞান নেই; না কি, আমাকে একটু জব্দ করতে যাচ্ছে? ফিচেল ওয়াজেদ আলী?

'না আলী সাহেব। আমি ভেবেছি সাড়ে চারশ টাকা করে দেব।'

'মোটে!'-আলী সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, হাসতে-হাসতে বসে পড়লেন।

'আহা, আপনাদের খানদানি চাল দিয়ে কালীশঙ্করকে বিচার করলে চলবে কেন, ও ত মাস্টার।'

'মাস্টার, ততে কী! খাবে না? পরবে না? একজন গোয়ানিজ বাবুর্চির মাইনে—'

'আরে ছেড়ে দিন আপনার বাবুর্চির কথা। কালীমাস্টারকে কোয়ার্টার্স দেওয়া হচ্ছে—'

'কোয়ার্টার্স?'

'হ্যাঁ। লিখবে, পড়বে, খাবে, আরামে থাকবে। ওঁদের অত বেশি টাকাও লাগে না। তিনশ-আড়াইশ হলেও হয়। তবে এত বড় একটা কলেজ, এত ছেলে, কম মাইনে পেলে ছেলেদের কাছে মর্যাদা থাকে না। মর্যাদা না থাকলে কাজ খারাপ হয়। কলেজের ক্ষতি হয়। ছেলেরা আজকাল মাস্টারমশাইদের মাইনে খতিয়ে দেখে। বলে, একশ টাকার বকনা, একশ পঁচিশ টাকার বকরি, একশ ত্রিশের বইল যাচ্ছে ঐ, এক-একজন মাস্টারকে দেখিয়ে—'

'বইল। বইল বলে?'

'বইল। বইল বলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জনাব ওয়াজেদ আলী সাহেব হরিলালের দেওয়া চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন। বসে-বসে টানছিলেন। রাতে আজ ফকরুদ্দিন সাহেবের ওখানে যেতে হবে। প্রায় বছর খানেক কলকতায় থেকে চার-পাঁচদিন হল জলপাইহাটিতে ফিরে এসেছেন ফকরুদ্দিন। লিগে ঢুকছেন হয় তো।

'আপনার চুরুটটা হরিলালবাবু, টেনে আরাম আছে। বাঃ। খাশা। কোথায় পেলেন আপনি?'

'কোথায় পেলেম। কলকাতায়, আবার কোথায়। কালবাজার ধুনে ধোনাদা করে তবে জুটল। আড়কাঠিদের কেষ্ট-বিষ্টুর সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে। খান চুরুট আপনি?'

'আলবৎ।'

'দেখি। কিছু আনিয়ে দেব তাহলে কালীশঙ্করের সাড়ে চারশই ঠিক' ওয়াজেদের দিকে তাকিয়ে বললেন হরিলাল।

'কালীবাবু কী মনে করেন'—সিকিটাক সহানুভূতি-সমবেদনায় কালীশঙ্করের দিকে ওয়াজেদ আলী সাহেব তাকালেন।

হেসে হাত কচলাতে-কচলাতে কালীশঙ্কর বললেন, 'আপনারা ভাল বুঝে যা ঠিক করবেন, তাই তো মাথা পেতে নেব।'

'আচ্ছা, সাড়ে চারশই হোক'—ওয়াজেদ আলী রায় দিলেন। ওয়াজেদের চুরুটের পুরু ছাইয়ের মুখোমুখি হরিলালবাবু বসে আছেন। ছাইটা ঝেড়ে ফেললেন ওয়াজেদ। ছাইয়ের ফুলকি-টুলকি কারুর চোখে গেল নাকি?

'সাড়ে চারশই হল তাহলে'—সকলের দিকে তাকিয়ে হরিলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'সাড়ে চারশ ডি-এ নিয়ে? না, এমনি?'

'ওসব ছেঁদো কথা বলবেন না। চারশ ছিল, পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এক ডাকে'—বললেন, সেক্রেটারি হরিলাল।

'আমার একটা কথা আছে।'

'কী কথা আছে ব্রজমাধববাবু?'

'যে বেশি পাচ্ছে তাকেই কি আরো বেশি দেবেন আপনারা? চারশ পাচ্ছেন কালীবাবু, বেশ তো পাচ্ছেন। মাগগি বাজার বটে, কিন্তু সাদা-সিধে মাস্টার, খাঁই কম, একটা সিগারেটও তো খান না। এই দশ-পনের বছর তিনশয় চলেছে, আজ আবার একদিনেই ডিলিক মেরে—'

বাধা দিয়ে হরিলালবাবু বললেন, 'ব্রজমাধববাবু বড় বেশি বকেন। কত চারশ টাকা পাচ্ছেন আপনি আজকাল আর, ফৌজদারির আখমাড়াই মাড়িয়ে? নিজের পশার কমে যাচ্ছে বলে আর-একজনের ভাল হচ্ছে দেখে আপনার চোখ টাটাবে ব্রজমাধববাবু?'

ব্রজমাধববাবু ওৎ পাতছেন মনে হচ্ছিল। এখুনি কথা বলবেন? সিগারেটের দু-একটা টান দিয়ে। ওয়াজেদ আলী সাহেব একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, সহজ কথা আপনি বড় কঠিন করে বলেন হরিলালবাবু?'

'আমি বলছিলাম ওঁকে পঞ্চাশ টাকা বেশি না দিয়ে নিচের দিকের যে-সব প্রফেসররা কম টাকা পাচ্ছেন তাঁদের পাঁচ-দশ-পনের করে বাড়িয়ে দিতে'—ব্রজমাধববাবু নাছোড়বান্দার মত বললেন।

'ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন প্রফেসর। তাদের ভিতর পঞ্চাশ টাকার একটা লাড্ডু ছেড়ে দিলে কে খাবে? খেতে গিয়ে কামড়াকামড়ি করবে নাকি ব্রজমাধববাবু? আর যদি না করে, মাথা পিছু কে কত পাবে?'—খুব স্পষ্ট পুরুষ্টু ঠাণ্ডা গলায় বললেন হরিলালবাবু।

ব্রজমাধববাবু একটু ভেবে বললেন, 'কেন পঞ্চাশ টাকার চেয়ে বেশি বরাদ্দ হতে পারে না এদের জন্যে? পঁয়ত্রিশজন প্রফেসর, তিনশ পঞ্চাশ-সাতশ, ধরুন চৌদ্দশ টাকার ব্যবস্থা, করতে পারি না আমরা মাসে-মাসে এঁদের জন্য ওয়াজেদ আলী সাহেব?'

'সে রকম আয় নেই তো কলেজের, ডোনেশন নেই বাইরের থেকে, সরকার থেকেও বেশি কিছু সাহায্য নেই—ভাল ফান্ড নেই—

'এ সব যাতে থাকে তার ব্যবস্থা করা উচিত নয়?

'কে করবে? এ নিয়ে কে মাথা ঘামাবে। সব দিকেই ঝামেলা হামলা। কারুর মনে শান্তি নেই—ঘর নেই—বাড়ি নেই—না খেয়ে মরছে, ভেসে যাচ্ছে সব—কে কাকে দেবে? কে আদায় করতে বেরবে? কার কাছ থেকে আদায় করবে? কতগুলো কালবাজারের বজ্জাত ছাড়া টাকা আছে কারুর কাছে? কালবাজারের পাজিগুলো টাকা দেবে কলেজকে? কেন, কলেজে খুব সুন্দর মেয়েমানুষ পয়দা হয় নাকি?'

জনাব ওয়াজেদ আলী সাহেব সকলের মুখের দিকে তাকাতে-তাকাতে বললেন, 'সরকারের টাকা নেই? কাগজের টাকা নেই যে তা নয়। কোটি-কোটি বেরুচ্ছে রোজ। আরো কোটি-কোটি বেরতে-বেরতে এমন হবে যে, এ সব কাগজ জ্বালিয়ে চায়ের জল গরম করবে মানুষ। এগুলোর হিম্মতে কিছুই পাওয়া যাবে না খাওয়ার, পরবার।'

'বেশ রং চড়িয়ে তো বললেন ওয়াজেদ আলী সাহেব। সরকারের অবস্থা এত খারাপ নয়, সরকারের কাগজের নোট এখনও দিব্যি কথা বলে। যারা মোটা রোজগার করে তারা কী রকম খাচ্ছে, পরছে, ফুর্তি লুটছে আমাদের চেয়ে ভাল জানেন আপনি। টাকার তেজ আছে। তবে ঝোঁক নানা জিনিসের দিকে—স্কুল-কলেজের দিকে নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনকাল খারাপ হয়েছে—এ রকম তো হবেই। পরকে লুটে খাওয়া, নিজের ঘর সামলানো—এই দুটো কাজেই নিজেকে খরচ করে ফেলছে মানুষ; কাজেই পুলিশ চাই, সৈন্য চাই। আত্মরক্ষা করবার জন্যেও পরকে মারবার জন্যেও। কলেজে স্কুলে পড়ে, পড়িয়ে কী হবে? সেখানে কবিতা তারিফ করতে শেখায়, আকাশে নক্ষত্রদের জন্ম-মৃত্যু-আলোকবর্ষের ইতিহাস জানিয়ে দেয় মাস্টাররা। এ সব শিখে জেনে যা পৃথিবীর সকলেই চাইছে সেই সবের উপরে আমিকে, সব দেশের উপরে আমার দেশকে, সকলের শক্তির চেয়ে বড়—আমার লেত্তির শক্তিশেলকে পাওয়া যাবে কি? এ সব পেতে হলে এনতার সোনা কুঁকড়ো আর ধোনা মুর্গি চাই—'

'মুর্গি চাই? কেন মুর্গি কী হবে?'

'খাবে, একটাকে আর-একটা, লাখটাকে লাখটা। ভ্যালা চলছে মুর্গির লড়াই বটে, রাস্তা-ঘাটে, দেশ-বিদেশে, আকাশে-বাতাসে—'

চুপ করে বসেছিলেন হরিলালবাবু। কথা শুনছিলেন বটে মাঝে-মাঝে চোখ বুজে বা মেলে, চুরুট টানতে-টানতে-যারা বলছিল তাদের বুদ্ধি—নির্বুদ্ধিতাকে ক্ষমা করে।

'আপনাদের কথা শেষ হল?'

হরিলালবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে গেল না কেউ। যে-কথা চলছিল এতক্ষণ তার জের টেনে কথা বা অন্য কোনো নতুন কথাও পাড়া হচ্ছিল না।

'প্রিন্সিপ্যালের মাইনে তো ঠিক হল। এখন আর-একটা ছোট জিনিস আছে। জলপাইহাটি কলেজে নিশীথ সেন বলে একজন প্রফেসর আছে, নাম শুনেছেন ওয়াজেদ আলী সাহেব?'

'নিশীথ সেন? নিশীথ সেন তো ব্যারিস্টার ছিলেন, না?'

'না, সে নিশীথ সেন নয়।'

'তা আর কে? কিসের প্রফেসর?'

'ইংরিজির। নাম শোনেন নি তার। শুনবেন কী করে? আপনি তো নতুন এসেছেন এখানে। কলেজের মাস্টারদের নামের ফিরিস্তি তালিম করা ছাড়া ঢের দরকারি কাজ আছে আপনার—'

'নিশীথ সেন মানে এন—এস?'—ব্রজমাধববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, এম-এস'—বললেন হরিলাল।

'এন-এসকে চিনলেন কী করে আপনি ব্রজমাধববাবু?'

'এন-এসকে আমি চিনি'—বঙ্কিম দত্ত বললে।

'এন-এসকে আমি চিনি'—বললে অন্তিম দত্ত।

'নিশীথ সেন প্রফেসরকে আমি খুব ভাল করেই জানি'—নবকৃষ্ণবাবু বললেন।

'কে, নিশীথ প্রফেসর? ও তো কত তাস পিটেছে আমাদের বাড়িতে'—বলে হিমাংশু আরো কিছু ফাঁদবে ভাবছিল।

'আচ্ছা, নিশীথ সেন বলতে বুঝল না, এন-এস বলতেই ধরে ফেলল সবাই, ব্যাপারটা কী রকম হল?'—হরিলালবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলী একটু খটকায় পড়ে।

'ও আছে এক কায়দা আলী সাহেব। একদিন কলেজে বেড়িয়ে আসুন না, বুঝতে পারবেন। করিডর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে শুনবেন টি-বি, টি-বি করে কান ঝালাপালা করছে। ব্যাপারটা টিউবারকিউলিসিস সম্পর্কে নয়, টি-বি মানে প্রফেস তারিণী বাড়ুজ্যের কথা-হচ্ছে। দু-চার পা এগিয়ে আর-এক ক্লাসের ছেলেরা বি-বিকে নিয়ে পড়েছে, কোনো বিবি সাহেবের দিকে লক্ষ্য নয়, ছেলেরা বিনোদ বোস প্রফেসরকে ঠুকছে। এমনি এ-এম, পি-এম, ডি-ডি-টি, এল-সি-এম, ডি-ডি-টি, এম-জি-সি এ সবই আছে।'

ভারী তামাসা বোধ করছিলেন ওয়াজেদ আলী সাহেব। হরিলালবাবুর কাছে আর-একটা চুরুট নিলেন। জ্বালিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সাহেব, 'জি-এম আছে।'

সকলে হো হো করে হেসে উঠল, ব্রজমাধব আর কালীশঙ্কর ছাড়া।

'আলবৎ আছে। গৌরী মিস্তির তো!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুড মরো।'

'সকলে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল আবার। ব্রজমাধব ছাড়া।

জনাব ওয়াজেদ আলী সাহেব এবারে তার স্ল্যাকসের পকেট থেকে একটা রুপোর সিগারেট কেস বের করে সকলকে সিগারেট বিলিয়ে দিলেন।

'এন-এসের কী হয়েছে?'

'নিশীথ সেন এ-কলেজের ইংরেজির প্রফেসর। দেড়শ টাকা মাইনে পাচ্ছে। বেশ তো আছে; এর চেয়ে বেশি আর কী পাবে মফস্বল কলেজে? এ তো কলকাতা নয় যে টাকার উপর পোকা পড়বার ফাঁক নেই। যা পাচ্ছে অমনি রাবণের চিতেয় ঢালো। দেড়শ টাকার বেশি যে-মাস্টার চায় মফস্বলে, তার বদখেয়াল আছে। এখানে টাকায় দু-তিন সের দুধ পাওয়া যাচ্ছে।'

'কিন্তু চৌদ্দ সের পাওয়া যেত। তিন টাক ছিল চালের মণ—এখন পঁচিশ-ত্রিশ টাকা হয়েছে। কী যে দইবড়া বলছেন আপনি হরিলালবাবু? দেড়শ টাকায় কী হয় একটা পরিবারের?' ব্রজমাধববাবু বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হয়ে তো যাচ্ছে। সোয়াশ টাকায় তো হচ্ছে। একশ টাকায় হচ্ছে না? এ কলেজের যে-সব মাস্টার একশ টাকা পায় তারা কি আপনার কাছে থেকে বুদ্ধি ধার করে খাচ্ছে—দাচ্ছে? ছেলেদের পড়াচ্ছে?'—হরিলালবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন।

'খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে ছেলেদের কাছে উপস্থিত হওয়া চাই তো। মনে একটা সুস্থিরতা থাকা চাই, না-হলে কী করে ভাল করে পড়াবেন মাস্টারেরা? কী করে উপকার হবে কলেজের?' ব্রজমাধব বললেন।

'কলেজের কোনো অপকার হচ্ছে না। স্টাফে যে-টিচারেরা আছেন, তাঁরা ঠিকমতই পড়াচ্ছেন,' প্রিন্সিপ্যাল কালীশঙ্করবাবু বললেন,'একশ-সোয়াশ টাকায় খাচ্ছেন—দাচ্ছেন, কলেজ গুঁতোচ্ছেন হাঁড়িচাচা পাখির মতো চেঁচিয়ে। বেশ বেশ আছেন। কেন মাইনে বাড়িয়ে আমড়াগাছি শিখিয়ে মাথা খারাপ করে দেবেন তাঁদের?'

হরিলালবাবু হেসে মাথা নেড়ে ওয়াজেদ আলীর দিকে তাকালেন, 'শুনলেন তো প্রিন্সিপ্যালের নিজের মুখের কথা, কিন্তু ব্রজমাধববাবুকে কে বোঝাবে'। আক্ষেপ করে হাত ঘুরিয়ে, আঙুল নাড়িয়ে কয়েকটা রেখার আঁচড়ে-পোচড়ে কেমন কিম্ভূতকিমাকার করে রাখলেন মুখটাকে।

ওয়াজেদ আলী চুরুটে একটি টান দিয়ে বললেন, 'কলেজ কমিটিতে ব্রজমাধববাবু একটা হেলদি অপোজিশনের মত। এ না-থাকলে চলে না'। ব্রজমাধববাবুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে ওয়াজেদ আলী বললেন, 'আচ্ছা ব্রজমাধববাবু, মেঠো ইঁদুর কি সোনামুগের ডাল খায়?'

'কথার ধার ধারি না আমি। বোবা হয়ে থাকতে রাজি আছি যদি বুঝি'—ব্রজমাধববাবুর মুখে যে-কথাগুলো এসে পড়েছিল সে সব তোড় থামিয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে বললেন, 'মাস্টারদের হয়ে কথা বলবার লোক থাকা চাই তো। আছে বটে একজন স্টাফ রিপ্রেজেনটেটিভ, কিন্তু ওরকম ন্যাতা-জোবরা ভালমানুষ দিয়ে কাজ হয় না।'

'হয় না বুঝি তাকে দিয়ে,' ধোঁয়াটে দীনাত্মা চোখ তুলে হরিলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কাদের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে কলেজ কমিটিতে ঢুকেছিলেন ব্রজমাধববাবু?'

'কোনো উত্তর দিলেন না তিনি।

'গার্জেনদের তো?'

'এ রকম প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন স্বীকার করলেন না ব্রজমাধব। কিন্তু তবুও হরিলাল বড় বোয়ালমাছের মত তাকিয়ে আছে যেন, পুকুরের নরম মাটির কিনারা-ঘেঁষা কোনো কচি কেঁচো দেখে ফেলেছে যেন মনে হচ্ছিল ব্রজমাধবের। তাই বটে কি? তাই বটে হরিলাল?

'হ্যাঁ গার্জেনদের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে এসেছি আমি। কী হল তাতে?'

'না, হয় নি কিছু—এর পরের কলেজ কমিটির ইলেকশনে—'

ব্রজমাধববাবু, 'অভিভাবকদের প্রতিনিধি হয়ে আমি দাঁড়াব ইলেকশনে—কলেজ কমিটি আমি ছাড়ছি না, যতদিন আপনি আছেন, আমিও আছি হরিলালবাবু'।

হরিলালবাবু হেসে ফেললেন। জানে না যে কার সঙ্গে কে দেয়ালা করতে চাচ্ছে। হাতের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে চুরুটের মুখ লাল করে নিচ্ছিলেন, হাসছিলেন। কেউ কিছু বলছিল না কোনো দিক থেকে। হরিলালবাবুর হয়ে দুটো কথা বলা উচিত নয় কি কারো? কালীশঙ্করবাবুও ঘাপটি মেরে চুপ করে আছেন, যেন তার পঞ্চাশ টাকা এমনি-এমনি আদর করে বাড়িয়ে দেওয়া হল, কালীবাবু, হরিলালের নাতজামাই বলে।

'আপনি বড় তিরিক্ষে হয়ে উঠছেন ব্রজমাধববাবু'—ওয়াজেদ আলী বললেন। ব্রজমাধববাবুকে এখন এ কথা বলার জন্য যেন বায়না দিয়ে রাখা হয়েছিল ওয়াজেদ আলীকে—প্রিন্সিপ্যাল সকলের অজান্তে বাইরে শূন্যের দিকে চোখ দিয়ে গাঁট্টা মেরে ভাবছিলেন।

'বড্ড বেঁকে আছেন ব্রজবাবু; ওটা হেলদি অপোজিশনের হতে হয়। নাহলে চুষিকাঠি কে দেবে? কোথায় পাবে?' চিপটেন কেটে বললে হিমাংশু চক্রবর্তী।

পথে এসো দাদারা-ভাবছিলেন হরিলাল, কই, অন্তিম দত্ত, বঙ্কিম দত্ত কিছু বলছেন না যে।

কেউ কিছু বলবার আগে ব্রজমাধববাবু বললেন, 'কলেজ ফান্ডে কত টাকা আছে?'

'সেটা ফিনান্স কমিটি বুঝবে। এখানে সে কথা কে জানে-কে বলবে আপনাকে?'

'আপনি সেক্রেটারি—আপনিই তো জানেন সব।'

ওয়াজেদ আলী সাহেব ব্রজমাধববাবুর কাঁধে হাত রেখে চেপে দিয়ে বললেন, এখানে হরিলালবাবুর বাড়িতে এসে ও-সব কথা জিজ্ঞেস করা তো ঠিক নয়। যদি দরকার হয়—সাব কমিটিতে ফিনান্স কমিটিতে, আলোচনা করবেন'।

'ফিনান্স কমিটিতে একবারও আমি জায়গা পাই না!'—ব্রজমাধববাবু খানিকটা তিক্ত, পীড়িত হয়ে বললেন।

'কেন?'

'হরিলালবাবু জানেন—'

'সবই তো জানে হরিলাল। হাঁসের পেটে কেন ডিম আসে, ব্রজবাবুর পশার যত কমে যাচ্ছে মেজাজ তত বেগড়াচ্ছে—পাছার কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে—সবই হরিলালের কারসাজি'—বলে হরিলালবাবু চুরুটটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে টানতে আরম্ভ করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'এবারকার ফিনান্স কমিটিতে আপনাকে নেব ব্রজমাধববাবু'—ওয়াজেদ আলী আশ্বাস দিয়ে বললেন।

'আমি একা গিয়ে করব কী—সবই তো আমার বিপক্ষে।'

'যাবেন, আবার যাবেনও না,সে-কীকরে হয়। চলে যান ফিনান্স কমিটিতে, গিয়ে লড়বেন, একা লড়বেন। নিজেকে, সকলকে, আবহাওয়াকে বেশ পরিষ্কার ঝর্ঝরে করে দিয়ে আসবেন—'

'আপনি যাবেন আলী সাহেব ফিনান্স কমিটিতে?'

'আমি? না, আমি না—'

'কেন?'

'ও—সবের বুঝি না কিছু আমি। হরিলালবাবু মনে করেন আমি কলেজ ফিনান্সের হদিশ পাই না। প্রিন্সিপ্যালের মাইনে সাতশত টাকা করে দিতে বলেছিলুম, প্রফেসরদের তো চারশ-পাঁচশ দিতে চাই। ওতে হয় না। হরিলালবাবুর মতন একজন জানেওয়ালা মানুষ ব্রেক কষে না—ধরে থাকলে তা টেঁকে না।'

'ঠিক কথা বলেছেন ওয়াজেদ আলী সাহেব'—অন্তিম দত্ত বললেন।

'হরিলালবাবুকে বুঝবার মতন আলী সাহেবের মতন একজন দরাজ, দরবারি মানুষ থাকা চাই। না হলে কী করে জোর পাবেন হরিলালবাবু'—সহজভাবেই কথাটা বললেন বঙ্কিম দত্ত। ভাব গ্রহণ করে খুশিও হলেন হরিলাল। তবে বেশি নয়। কথাটাকে আরো গুছিয়ে বাড়িয়ে আস্ফোট করে বলা উচিত ছিল।

'ব্রজমাধববাবু যেন সব ভেঙে ফেলতে চান। জানেন না একটা জিনিস গড়ে তোলা কী রকম শক্ত। ত্রিশটা বছর ধরে, প্রাণপাত করে এই কলেজটা সৃষ্টি করেছেন হরিবাবু। ছাগল দিয়ে ধান মাড়িয়ে খান তো ব্রজবাবু, মানুষের পৃথিবীর খবর রাখেন না'—হিমাংশুবাবু বললেন।

চুপ করে বসে আছে কালীশঙ্কর, কোনো কথা বলছে না। আমার কলেজের নুন খেয়ে ওর পেট জাম্বুবানের মত, কিন্তু বাপের হাত-তোলা তুমি শুধু খাবেই বুঝি কালীশঙ্কর; বাপের সম্মুখে বসে দুটো ভাল কথা শোনাতে পারবে না তাকে?

হরিলালবাবু প্রিন্সিপ্যালের দিকে তাকালেন। হরিলালবাবুর ও-রকম চোখে চাউনির মানে জানা আছে কালীশঙ্করের। গলাটা খাকরে নিয়ে তিনি বললেন, 'ব্রজমাধববাবু গার্জেনদের নমিনেশন পেয়েছেন বলেই আমাদের মাথা কিছু কিনে ফেলেন নি। ফিনান্সের কিছু বোঝেন না তিনি। আমি তাঁকে ও-কমিটিতে ঢুকতে দিচ্ছি না। হরিলালবাবুর কোনো দোষ নেই। হরিবাবুর মত উদার মানুষ জলপাইহাটিতে নেই। বাংলাদেশে খুব কমই আছে। অনেক দেশে তো ঘুরেছি, অনেক লোক দেখেছি আমি ওয়াজেদ আলী সাহেব। জেনে শুনেই কথা বলছি। আমাদের ভাগ্য আমাদের মধ্যে ছিলেন উনি, ওঁকে আমরা পেয়েছি, সেই জন্যই এত গুলো লেকচারার প্রফেসরী করে খাচ্ছে। এ না হলে এদের গতি ছিল কী? কে পুছতে এদের? তিনি যা করেন ভালর জন্যই করেন। বুদ্ধি প্রতিভা হরিবাবুর তো বাংলাদেশের সেরা মানুষদের মত। কলকাতায় থাকলে তিনি বড় মেজ মন্ত্রী হতে পারতেন। আমাদের জন্যেই স্বার্থত্যাগ করে এখানে আছেন। ব্রজমাধববাবু উড়ে এসে জুড়ে বসে আজ অনেক বারফটকা কথা বলেছেন। কিন্তু এ-রকম ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার বুদ্ধি নিয়ে তিনি নিজেরও উপকার করবেন না, কলেজেরও না। যিনি ত্রিশ বছর ধরে হিতব্রত নিয়ে এখানে আছেন জলপাইহাটির কলেজের মানবতার কিসে উপকার হয় তার মতন কেউ তো তা বুঝবে না। হরিলালবাবুর প্রতিভা ও মহানুভবতা যে কতদূর অপূরণীয় তিনি একদিন মরে গেলেই জলপাইহাটি আর বাংলাদেশ তা বুঝবে।'

কালীশঙ্করের এ-সব কথায় কালীশঙ্করের নিজের বা অন্য কারো আন্তরিক সায় ছিল না। কথাগুলো অর্ধসত্য, হয়ত দশ আনি মিথ্যে, ছয় আনি সত্য।

হরিলালবাবু কী ভাবছিলেন জানা নেই, কিন্তু ভাষণ আর-কারো প্রাণেই বিশেষ কোনো সাড়া জাগাতে পারল না। প্রিন্সিপ্যালের বাংলা ভাষাও যে বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর ছুঁয়ে আজকালকার 'ডি পি আইয়ি' স্কুল-টেক্সটের প্রবন্ধের ভাষায় কক্ষে খুঁজছে! এরা কেউ ভাষা নিয়ে মাথা না ঘামালেও এদের ভিতর এক-আধ জন অন্তত—নবকৃষ্ণ অন্তত-সেটা টের পাচ্ছিলেন। নবকৃষ্ণের মনে হচ্ছিল বাংলাটা কেমন জোলো, মাঠো, কেমন বোকাপানা পাত-মাস্টারি বাংলা যেন।

'আমি জানি কলেজের খুব মোটা ফান্ড আছে। প্রফেসরদের জন্যে মাসে-মাসে চৌদ্দশ টাকা বরাদ্দ অনায়াসেই করা যেতে পারে।'

'সেটা আপনি ফিনান্স কমিটিতে ঠিক করে নেবেন ব্রজমাধববাবু। ওয়াজেদ আলী সাহেব তো ঢোকাচ্ছেন আপনাকে সাব-কমিটিতে, আপনার কোনো আফশোস থাকবে না'—ধীর স্থির গলায় সুভাষিতের মতন হরিলালবাবু বললেন।

'আমি আরো জানি যে কলেজের সেই ফান্ডের টাকা থেকে হরিলালবাবু নিজের খরচের জন্যে—,' ওয়াজেদ আলী মুখ চেপে ধরলেন ব্রজমাধববাবুর।

'কমিটিতে, কমিটিতে-ও-সব কমিটিতে হবে বজ্রবাবু, এখানে ভদ্রলোকের বাড়িতে কি এই করতে এসেছি—'

'কমিটিতে কী হবে?' 'কমিটিতে কি রাহাজানি হবে?' হিমাংশু চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলীকে।

'এই যে হন্যে কুকুরের মতন আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে আমাদেরও, তাতে কাউন্সিলে না পাঠিয়ে ছাড়বে না ব্রজমাধববাবু। এ-সব পাগলামি আবার কমিটিতে সেধিয়ে লেলিয়ে দিতে হবে বুঝি'—বঙ্কিম দত্ত; অন্তিম দত্ত বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হে হে হে, হাইড্রোফোবিয়ার ভয়?' হাসতে-হাসতে বললেন ওয়াজেদ আলী সাহেব, 'নিন রাত হয়েছে, ওঠা যাক।'

হরিলালবাবু বললেন 'সেই নিশীথ সেনের কথা বলছিলুম, দেড়শ টাকা পাচ্ছে আমাদের কলেজে, বললে সোয়া দুশ-আড়াইশ, অন্তত দুশ না-করে দিলে কাজ করতে পারবে না সে। কী করে আতি তাকে দুশ আড়াইশ করে দিই আলী সাহেব?'

'কোন প্রফেসর? কী রকম পড়ায়?'

'আছে, পাঁচ-পাঁচিরি মতন আর কি, তা যেমনই হোক না কেন, দেড়শ থেকে সোয়া দুশ-আড়াইশ কী করে হয়। এত দিন পরে প্রিন্সিপ্যালের টাকা, পঞ্চাশ টাকা বাড়ল মোটে—না, তা হয় কী করে, প্রিন্সিপ্যালের ইনক্রিমেন্টের অনুপাত ডিঙিয়ে বাড়তে পারে না।'

'সে অনুপাতের আধা-আধিও বাড়াতে পারে না। সিকিটাও না। প্রিন্সিপ্যালের পঞ্চাশ বাড়লে দশ-বার টাকার বেশি বাড়তে পারে না অধ্যাপকের'—'হিমাংশু চক্রবর্তী বললে।

'তা ছাড়া একজন মাস্টারের মাইনে যদি বাড়ানো যায় তা হলে অন্যেরা কী দোষ করল?' বঙ্কিম দত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

ব্রজমাধববাবু বললেন, 'এমন দশ-পনেরটা কেস আমার জানা আছে হরিলালবাবু যে আপনার পেটোয়া প্রফেসরদের মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছেন আপনি, অন্যদের দাবি উপেক্ষা করে।'

'তাই নাকি?' ওয়াজেদ আলী সাহেব হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'লিস্ট আছে আপনার কাছে?'

'আছে। চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট টাকা করে বাড়িয়েছেন, যারা ওর পেটোয়া নয় তাদের গলা কেটে দিনদুপুরে রাহাজানি করে। অনুপাত কষছেন হিমাংশু চক্রবর্তী প্রিন্সিপ্যালের ইনক্রিমেন্টের সিকির ভাগ দেওয়া হবে বলে এক-একজন প্রফেসরকে। কেন? হরিলালবাবুর জামাই কামাখ্যা ঘোষালকে ষাট টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল এক লাফে এক ডাকে। আপনার শালা ধরণী মুজমদারকে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল কেন হরিবাবুর এক কথায়, সেটা আমাদের খুলে জানাবেন কি চক্কোত্তি মশাই। হরিলালবাবুর গোমূত্র পান করার জন্য আপনারা মানুষ খুন করতে পারেন দিনে-দুপুরে—পৌষমাস করে বেড়াতে পারেন কার্তিক মাসের কুকুরগুলোর মত।' এক মিনিট-দু মিনিট নিস্তব্ধ হয়ে রইল সব।

'অত কাছে ঘেঁষে বসবেন না ব্রজমাধববাবুর। ওর মুখে লালা কুকুরের লালা হয়ে গেছে, আলী সাহেব। লাগিয়ে দিলে জলাতঙ্কে বিশ্বসংসার ঘুরেও জল তেষ্টার এক ফোঁটা জল পাবেন না। এ কুকুর কি এখনও গভর্নিং বডির মেম্বার থাকবে?' হিমাংশু চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করল হরিলালবাবুকে।

'সে জানে সরমার বাচ্চাকে যারা পাঠিয়েছে তারা—'

ওয়াজেদ আলী সাহেব একটু বিচলিত হয়ে বললেন, 'এ-রকম কথা বলছেন কেন আপনারা? কথাগুলো ভাল হচ্ছে না। এত গালাগালিতেও মোক্ষম হাড়ে বাতাস লাগিয়ে বসে আছেন ব্রজমাধববাবু'—ওয়াজেদ আলী ব্রজমাধব-বাবুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন—

'নিশীথ সেন বলেছে যে, সোয়া দুশ-আড়াইশ টাকা মাইনে না-দিলে কলেজে কাজ করবে না সে। দেড়শ পাচ্ছে, দশ টাকা বাড়ানোও সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। নিশীথবাবু মাইনে বাড়বার কোন সম্ভাবনা না দেখে এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করেছে। কিসের জন্যে ছুটি চাচ্ছে সেটা দরখাস্তে খুলে জানায় নি, কোনো ডাক্তারের সার্টিফিকেটও দেয় নি, ক্লাস নিচ্ছে না, ঘুরে বেড়াচ্ছে'—হরিলালবাবু বললেন।

'দরখাস্ত কি মঞ্জুর হয়েছে?'

'না'।

'মঞ্জুর যে হয় নি তা কি সে জানে?'

'সে তো কলেজেই আসে না, কে জানাবে তাকে?'

'কী মতলব নিশীথ সেনের? 'আলী সাহেব বললেন।

'কে জানে। কলেজে কাজ করবে না হয় তো আর। আমরা তার দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলেছি—'

'কেন?' ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্রজমাধববাবু।

'ও-রকমভাবে কে কবে দরখাস্ত দেয়? সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার না করে বোকার মত দরখাস্ত লিখলে—অন্তত ডাক্তারের সার্টিফিকেট না দিয়ে সেটা পেশ করবার মানে কী?'

'তাই বলে দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলবেন আপনি! মামুলি দরখাস্ত করেছে, কী তার মানে, সেটা আপনার বোধগম্য হয়েছে কি না, কমিটিকে না দেখিয়ে কী করে ঠিক করবেন তা? সেটা কমিটিতে পেশ করতে হবে। কমিটি বিচার করবে। আপনি কে? নিজেকে কী ভাবছেন আপনি?'

'কিছু মনে করি নি। ওটা ছিঁড়ে ফেলেছি আমি।'

'ছিঁড়ে ফেলেছেন? কমিটির মিটিঙে পোষ্টাম্ব বাবার খাসির মত ছিঁড়ে ফেলা হবে।'

'কাকে?'

'আপনার এই বেকুবিটাকে।'...

'নিশীথবাবুকে ছুটি দেওয়া হবে না। ছুটি যে দেওয়া হবে না সে কথা সে নিজে এসে জানতে না চাইলে জানানো হবে না তাকে'—কালীশঙ্কর বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী করে জানবে? সে তো কলকাতায় চলে গেছে।'

'জানি না। আমাদের জিজ্ঞেস করে যায় নি।'

'দরখাস্ত তো দিয়ে গেছল।'

'কতবার বলব আপনাকে ব্রজমাধববাবু, যে সেটা কানকাটা দরখাস্ত—'

'কার কানকাটা—দরখাস্তের, না যাকে দরখাস্ত করা হয়েছে তার, সেটা কমিটি দেখেশুনে ঠিক করবে'—ব্রজমাধব বললেন।

'নিশীথ সেনকে ছুটি দেওয়া হবে না ওয়াজেদ আলী সাহেব। ছুটি না পেয়েও যদি কলেজে না আসে তা হলে তার চাকরি থাকবে না।'

'চাকরি থাকবে না? কুড়ি-বাইশ বছর এ কলেজে কাজ করছেন তো নিশীথবাবু চাকরির উপর হাত দেয়া—ওটা জবরদস্তি হল'—ওয়াজেদ আলী বললেন, 'নিশীথবাবু যদি কলকাতায় গিয়ে থকেন তা হলে তাঁকে ব্যাপারটা খুলে জানিয়ে দেওয়া হোক। লিখে নিন আপনি কলীশঙ্করবাবু। নিশীথবাবুর চিঠি না পেয়ে কিছু করতে যাবেন না।'

'কমিটির মিটিং হলে তবে তো লিখব। নিশীথবাবুর দরখাস্ত দেখে কমিটি কী ঠিক করে কে জানে। হয় তো সাসপেন্ড করবে। হয় তো বরখাস্ত করবে। ছুটি না-নিয়ে কলকাতায় চলে গেল জবরদস্তি কে করছে—নিশীথবাবু না আমরা? কালীশঙ্করবাবু বললেন।

'সেটা কলেজ কমিটির মিটিঙে বোঝা যাবে'-অমায়িক মুখে তবুও গম্ভীরভাবে বললেন ওয়াজেদ আলী, 'রববার তো মিটিং, হরিলালবাবু?'

'হ্যাঁ, ওয়াজেদ আলী সাহেব, আপনাদের কাছে দরকারি চিঠিপত্র আজকালই যাবে।'

'কিন্তু এ রববার তো এখানে থাকা হবে না আমার—'

'কেন?'

'শুক্রুরবার ঢাকা যাচ্ছি। দিন সাতেক থাকব। ফিরে আসতে শুক্কুর-শনি হয়ে যাবে। এর পরের রববার মিটিং করলে হয় না?'

'সব ঠিক হয়ে গেছে তো। কালেক্টর সাহেব তাঁর বাংলোতেই মিটিং বসাবেন বলে দিয়েছেন। এ রববারের পরের রববারে তো তিনি থাকবেন না জলপাইহাটিতে। ওঁর তো মোটেও ফুরসুৎ নেই—মোটেই পাওয়া যায় না মকবুল চৌধুরী সাহেবকে। ওঁকে বাদ দিয়ে—'

'না, না, সাহেবকে বাদ দিয়ে হয় কি? থাকেন তো না বেশি মিটিঙে। যখন, নিজে রাজি হয়েছেন নিজের বাংলোতে, আচ্ছা দেখি আমি, দু'দিন পিছিয়ে ঢাকায় গেলে চলে কি না, আচ্ছা দেখি—'

সবাইকে আদাব জানিয়ে, হেসে, ছাই বেশ জমে উঠেছে চুরুটে দেখতে-দেখতে বেরিয়ে গেলেন ওয়াজেদ আলী সাহেব।

নিশীথ বিকেলের স্টিমারে কলকাতায় রওনা হয়ে গেছে সেই রাতেই। সাড়ে দশটা এগারোটার সময় হারীত আস্তে-আস্তে এসে নিজেদের জলপাইহাটির বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে দু-চারবার আলগোছে কড়া নেড়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

'কে? কড়া নাড়ছে কে?' ভিতর থেকে বলল সুমনা।

'আমি, খুলে দাও।'

সে কথা কানে গেল না সুমনার। বললেন, 'মানুষ বিদেশে চলে গেল, আর রাত দুপুরে এসে দরজায় কড়া-নাড়া-কে তুমি?'

'আমি। খুলে দাও না দরজা।'

'আমি কে রে?'

'আমি হারীত।'

'কী বলছে পরিষ্কার শুনতে না পেয়ে সুমনা বললেন, 'হারীতের গলা পাচ্ছি না? হারীত এসেছে না কি? কে রে বাইরে—হারীত না কি?' বলতে-বলতে দরজা খুলে দিলেন সুমনা।

'বাপরে, এ যে হারীত। কোত্থেকে এলি তুই?'

'বাবা বাড়ি আছেন?'

'এই তো চলে গেলেন আজ।'

'কোথায়?'

'কলকাতায়। অনেক চিন্তা মাথায় নিয়ে চলে গেলেন আজ।'

'কেন, কলকাতায় কেন? কিছু খাবার আছে?'

'কিছু নেই'—সুমনা অসহায়ের মত চারদিকে তাকিয়ে বললেন।

'কিচ্ছু না?'

'না। খুব ক্ষিদে পেয়েছে কি তোর? আমি মহিমবাবুদের ওখানে থেকে কিছু—'

'না না, না, সে-রকম ক্ষিদে-টিদে পায়নি কিছু। ওদের ঘুম ভাঙাবার দরকার নেই। এ-রকম চেহারা হয়ে গেছে কেন তোমার? অঘ্রাণ-পৌষ মাসের দিঘির জলের উপর দিয়ে তরতর করে হেঁটে যায় যে এক রকম বড়-বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকড়সা, হাত্তু-পা সব আঁশের মত, এত ফিনফিনে সেই মাকড়গুলো যে মনে হয় এদের পায়ের নিচের জল মলিদার মত পুরু, ভারী, সেই মাকড়সা হয়ে গেলে তো তুমি মা'—বলে হারীত সুমনার কাঁধে হাত রেখে বিছানার উপর বসিয়ে দিল তাকে, নিজে বসল, বসে মায়ের বুকে মুখ গুজে রাখল।

আস্তে-আস্তে ছেলের মাথাটা সরিয়ে দিলেন সুমনা। বললেন; 'কেমন ধড়ফড় করছে আমার শরীর। ছেলেমেয়েদের দেখলে তাদের কথা ভাবতে গেলে, কেমন হয়ে যায় যেন সব-হার্টে গিয়ে লাগে।'

'তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে কলকাতায় গেলেন বাবা?'

'তুমি তো এসেছ।'

'আমার তো আসার কথা ছিল না।'

'বাবা চলে গেলেন, তুমিও এলে; কোথায় ছিলে তুমি হারীত; জলপাইহাটিতে?'

'এই তো আজ জলপাইহাটিতে এলুম। এতদিন কলকাতায় ছিলুম।'

'কলকাতায় ছিলে?'

'এই তো আজ এলুম।'

'সত্যি কলকাতায় ছিলি তুই? এমন টাইম-ঠিক করে এলি কী করে? উনি গেলেন, তুই এলি,' সুমনা বললেন, 'আমার বিশ্বাস হয় না, তুই এখানে ছিলি না' গলা ছেড়ে হেসে উঠতে চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু হাসি হল না। কেমন একটা বিষময় আওয়াজ বেরুল। সে স্বর শুনে আশেপাশে কেউ থাকলে লাফ দিয়ে উঠে এসে বলত, ওরে বাবা এ আবার কী হল?

'আস্তে মা, সোর করো না। মহিমদের ঘুম ভেঙে যাবে। আমি জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছি স্ত্রীকে জড়িয়ে ঘুমিয়েছে মহিম।'

'আরে নচ্ছার, তুই কত কী দেখলি, কত চুকলি কাটলি। নে হাত-পা ধুয়ে আয়। এখন ঘুমোবি তো? না কিছু খাবি?'

'এই যে বললে কিছু খাবার নেই—'

'নেই তো কিন্তু মতিলালের দোকানে কিছু মুড়ি-বাতাসা পাবি?'

'এত রাতে?'

'টেমি জ্বলছে না, এই তো দেখছিলুম?'

'ঝাঁপ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি দেখে এসেছি।'

'কী হবে তা হলে?'

'কিচ্ছু হবে না, জল খাব।'

পকেট থেকে সিগারেট বের করে নিয়ে হারীত বললে, 'এটা খেতে দেবে?'

'কিছু যখন নেই খাবার, তখন না খাবি তো করবি কী রে বাছা—'

'তোমার সমুখে তামাক খাই নি কোনো দিন আমি। তুমি এ-সব পছন্দ কর না জানি। কিন্তু আজ তো ধোঁয়া ছাড়া খাবার কিছু নেই। এটা খেতেই হবে—' কিন্তু তবুও সিগারেট না-জ্বালিয়ে পকেটের ভিতর ফেলে রেখে দিল হারীত। সুমনা তাকিয়ে দেখলেন, কিছু বললেন না। একটা কাঁসার গেলাস দিয়ে জলের কুঁজো ঢাকা ছিল, তিন-চার গেলাস জল খেয়ে কুঁজোয় একটা ঝাকুনি দিয়ে হারীত বললে, 'কিচ্ছু নেই তো আর, এর পর জলতেষ্টা পেলে কী হবে? তুমি কী খাবে?'

'আমার তেষ্টা পায় না, তোর তেষ্টা পেলে মহিমবাবুদের কলসির জল খেয়ে নিস—শোবার ঘরের দরজা আবজানো আছে ওদের।'

শুনে মহিমবাবুদের জলভরা কলসিটা নিয়ে এল হারীত। বললে, 'এতেই হবে। কাল খুব ভোরবেলা দোয়েল শিষ দেবার আগে শ্যাওড়া তলায় আছাড় মেরে ফেলে আসব কলসিটা। সারাটা দিন অর্চিতা মাসির মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব কী ভাবে। কী নাম ওর অর্চিতা না অর্চনা?'

'অর্চনা!'

'তবে অর্চিতা ডাকে কেন?'

'সে তোমার বাবা ডাকে।'

'কেন?'

'নানা ফিকিরে মানুষের সঙ্গে একটু টিটকিরি-পিচকিরি কেটে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রাখে, কথা বলে, কথা বলে, কথা বলে, বাপরে! কাজ করে বটে কথা থামিয়ে, না হলে মাস্টার বলে? মেশে মেয়েদের সঙ্গে, কিন্তু আর-একটু বেশি মেয়ে-ঘেঁষা হলেই অর্চনা ওকে ধরে ফেলেছিল।'

'কলকাতায় গিয়ে থাকবেন কোথায়?'

'জিতেন দাশগুপ্তের ওখানে।'

'কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে গেছেন?'

'ছুটির দরখাস্ত করে গেছেন। বলেছেন জলপাইহাটিতে ফিরবেন না আর, কলেজে কাজ করবেন না আর।'

'কাজ করবেন না, ফিরবেন না, তা হলে তোমার কী হবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার কী হবে ঠিক করবার জন্যেই তো তুমি এখানে এসেছ হারীত। কে তোমাকে টেনে আনল? যে-রাতে উনি চলে গেলেন, সেই রাতেই তুমি এলে এটা কেমন হল?'

এটা ঠিকই হল, তবে জিনিসটা আশ্চর্য কিছু নয়, তুমি তা মনে করতে পার, কিন্তু নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। অসাধারণ কিছু নেই পৃথিবীতে, থাকলে মন্দ হত না। কিন্তু, তার [?] চিন্তার সম্পর্কে বেশি কথা বলতে রাজি ছিল না তার মন আজ এই রাতে, সুমনার মত অসুস্থ সেকেলে আই-এ পাস স্ত্রীলোকের সঙ্গে। 'আমি এসে পড়েছি বটে, কিন্তু দু-তিন দিন মাত্র থাকবার জন্যে এসেছিলুম, কলকাতায় এখন আমাদের খুব কাজ,' হারীত বললে।

'কিসের কাজ? তুমি চাকরি কর?'

'না, আমরা একটা পার্টি গঠন করেছি—'

'কিসের পার্টি? দেশ তো স্বাধীন হয়েছে—'

'সুমনাকে সব কথা বলবার দরকার নেই হারীতের; সুমনা শুনতেও চায় না। বলছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। হারীত অঘ্রাণ-পোষ মাসের দিঘির মলিদার মতন টলটলে জলের উপর সেই বড়-বড় ফিনফিনে মাকড়ের হাত-পা-মাথা-পেট দেখতে লাগল মার দিকে তাকাতে-তাকাতে। স্বাধীন হয়ে মার তো এই হয়েছে! স্বাধীনতার জল-বাতাস লাগতেই হরিলালবাবুর কলেজের কাজে হয়ে গেল বাবার, একটা দরখাস্ত মেরেই ছুটলেন তিনি কলকাতায়। কলকাতায় স্বাধীনতার আড়ে-দিঘে, সমস্তটা বালি-ধুলো হলকা-হাঁফের মিঠে চাকলি খেতে-খেতে, ঐ লোকটার হাড়গোড় যদি কালচে হয়ে পড়ে না থাকে সেই দুর্দান্ত মরুভূমিতে, তবে কী বলবে হারীত। এতো স্বাধীনতার কলির সন্ধ্যে।

সুমনার হাত-পায়ে কেমন একটা শাঁখচুন্নি যেন নড়ে-চড়ে উঠছে ঘরের ভিতর। ঘরে কোনো রেডি-কেরোসিনের আলো নেই, চাঁদের আলো আছে, দেওয়ালের উপরের দিকে ভাঙা খলফার বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে। এত গরমের রাতে ঘরের দরজা-জানালা সুমনা বন্ধ করে দিয়েছে সব।

'শরীরে রক্ত নেই তোমার, তাই ঠাণ্ডা লাগে বুঝি সব সময়?'

'কেন? কী হয়েছে? ঠাণ্ডা দেখলে কোথায়!'

'দরজা জানালা সব বন্ধ করে বসে আছ কেন? আমি জানালা খুলে দিচ্ছি—'

'চোর আসতে পারে কিন্তু হারীত।'

'আসুক। কী নেবে?'

সুমনাকে নিশীথ দেড়শ টাকা দিয়ে গেছে, তা দিয়ে দু-তিন মাস সংসার চালাতে হবে। সে-টাকাটা সে লুকিয়ে রেখেছে ঘরের কোনো এক জায়গায়। চোর ঢুকলে অবিশ্যি বার না করে ছাড়বে না। বলবে কি সুমনা হারীতকে সেই টাকাগুলোর কথা? আজ থাক; রাতের বেলা টাকাকড়ির কথা বলতে নেই।

'তুমি কম্যুনিস্ট হয়ে গেছ হারীত?'

তিন-চারটে জানালা খুলে হাওয়ায় একটু ঢুলছিল হারীতের বিছানার এক কোণায়; সব কথা কানে গেল না তার।

'বলি, ও হারীত। হারীত।'

'কেন, বল।'

'শুদোচ্ছিলুম তুমি কি কম্যুনিস্ট হয়ে গেলে?'

'কম্যুনিস্ট? না। আমাদের আর-এক পার্টি।'

'কী নাম তার?'

'কোনো নাম নেই,' হারীত বললে, 'বলতে পর সোস্যালিস্ট, কিন্তু কংগ্রেস সোস্যালিস্ট না। আরো আট-দশ রকমের সোস্যালিস্ট পার্টি দেখা দিয়েছে 'এ'র থেকে 'জেড' অব্দি ইংরেজি অক্ষর সাবাড় হয়ে গেছে পার্টিগুলোর নাম দিতে-দিতে। কাজে-কাজেই আমরা আর-কোনো বর্ণমালা ব্যবহার করব না, কোনো নাম দিচ্ছি না পার্টির—'

'পার্টি শব্দটাও উঠিয়ে দাও। ও শব্দটা শুনলেই আমার কেমন লাগে। আমাদের গণেশ দিনরাত পার্টি-পাটি বলে মাথার পোকা খসিয়ে ছাড়ত মানুষদের। বিভাকে নিয়ে পালাল। টাকার খাঁকতি পড়তেই বিভা আর ছেলেকে ফেলে পার্টি ক্যাম্পে আছে, অনুকণা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে সহবাস করছে, কেউ কিছু বলছে না।'

'তুমি এত কথা জানলে কি করে?'

'অর্চনা আমাকে বলেছেন।'

'অর্চনামাসি জানল কী করে?'

'আমি জানি না। তুমি শুনেছ এ-সব?'

'না।'

'রাজনীতি করছ, টাকা পাচ্ছ কোথায়? খেতে পরতে দেয় কে?' সুমনা বললে, 'বলি অ হারীত, হারীত, হারীত!'

'কী গো?'

'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? চাকরি করছ না, টাকা পাচ্ছ কোথায়? খাওয়াচ্ছে কে?'

'আমার একা খাওয়ার জন্য আমি কিছু রোজগার করি। ছেলে পড়াই, লিখি, মাঝে-মাঝে বাস কন্ডাক্টারি করি, মোটর ড্রাইভারি শিখছি। কেরানিগিরি গোলাম-টোলামি করব না আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সুমনা বললে, 'গোলামি করেই তো তোমার বাবার এই দশা হল। এর চেয়ে ঠিক সময়ে কলকাতায় গিয়ে মোটর ড্রাইভারিও যদি শিখতেন। নিজে, পরে, ট্যাক্সি চালিয়ে ও যদি থাকতেন কলকাতায়, কত স্বাধীনতায় মর্যাদায় কলকাতায় থাকতে পারতাম আমরা।'

'তুমি কী করে জানলে এ-সব,' হারীত একটু তামাসা বোধ করে। সুমনার দিকে তাকাল।

'মাঝে-মাঝে হিতেন এসে বলে; এই কলেজের ফোর্থ ইয়ারের হিতেন। তোমার বাবার খুব ভক্ত। আমাদের ভালটা দেখে, ভাল করে, ভাল চায়, হিতেন, তা ট্যাক্সি চালালে ঐ রকমই নাকি, হারীত?'

'হ্যাঁ, প্রফেসারির থেকে ঢের বেশি পাওয়া যায়। হরিলালের মুখনাড়া খেতে হয় না—'

'কি ছেলে, হবে নাকি তুমি ট্যাক্সি ড্রাইভার? না গভর্নমেন্টের বড় চাকরি করবে? দেশ তো স্বাধীন। তোমার বাবাকে রেহাই দেবে কে?'

হারীত দেয়ালে ঠেস দিয়ে জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। একটা সাদা বেড়াল চলে গেল; সজনে গাছে, আমলকী গাছে বেশ দেখাচ্ছে বাইরের জ্যোৎস্না; বেশ ভারী, খুব বড়, ওটার চাপ বোধ করতে পারা যায় যেন, সাদা স্নিগ্ধ ওর রোঁয়ার হৃদয়ে চোখ বুজে ঘষে সাদা কাবলি বেড়ালের অনাদি প্রতীকের মত ওর উজ্জ্বল সত্তাকে বেশ ভাল লাগে।

'আমাদের কলকাতায় নিয়ে যাবে কবে? হারীত?'

মার কথার কোনো জবাব দিচ্ছিল না, হারীতের মুখে এ-সবের কোনো উত্তর জোগাচ্ছিল না। বাবাকে রেহাই দেবে, মা-দের কলকাতায় নিয়ে যাবে, এ-জন্য তো তার জীবন নয়। তার মা-বাবার চেয়েও ঢের হয়রান লোক আছে পৃথিবীতে। ব্যক্তিবিশেষকে নিস্তার দিতে হলে সেই সব ব্যক্তিদেরই প্রথম সুবিধা করে দিতে হয়। তার মার চেয়ে তাদের কি বেশি ভালবাসে সে? ভাল সে কাউকেই বড় একটা বাসে না, মানুষের কষ্ট দেখেও প্রায়ই সে বিচলিত হয় না, তবে ছোটদের উপর বড়-বড় ধিঙ্গি লোকদের অত্যাচার সে হজম করতে পারে না। বোকা দুর্বল মানুষ কষ্ট পাচ্ছে বলে ততটা নয়, কিন্তু কেবলি টাকাকড়ি, ভুয়ো প্রসার-প্রতিপত্তি, কতকগুলো লোককে লুটতরাজে মাতিয়ে রাখছে অন্যদের থেঁতলে ফেলে—এ-সব সে সহ্য করতে পারে না। পৃথিবীতে ভাল রক্ত আসুক—দরকার হলে খুব কঠিনভাবে নিকেশ করে দিয়ে যা খারাপ আছে তাকে। আসুক ভাল তেজ, সহনশীলতা, আলো।

'বলি, তোমার বাবাকে রেহাই দেবে না?'

'তাঁর নিজেরই হাত-পা আছে—'

'তা তো আছে। তা দিয়ে জলপাইহাটির কলেজ করা হল অ্যাদ্দিন। এখন এ বয়সে কলকাতায় গিয়ে গাড়ি চাপা পড়বে, না, চাকরি করে পরিবার খাওয়াবে?'

'তা পারবে। দেশ স্বাধীন হয়েছে,' কেমন কঠিনভাবে বললে যেন হারীত; কথার মধ্যে রসকষ, বিবেচনা, দয়া কিছুই নেই যেন। অথচ এও মনে হয় যে বয়ে যাওয়া খারাপ ছেলে নয়, জিনিস আছে, কিন্তু খুব দূরের জিনিস-সুমনা, নিশীথ বা এই পুরুষেরও কাজে লাগবার জিনিস নয়, কোন পুরুষে লাগে কে জানে, এক-আধজন ব্যক্তি নয়, সমস্ত ব্যক্তিরই যাতে সুবিধা সক্ষমতা হয় সেই দৃঢ়তার আবছা কাজে মন ডুবে গেছে তার, ঈশ্বর থেকে আরম্ভ করে মহাত্মা মোহনদাস পর্যন্ত যা পারলেন না সেই ভীষণ কাজে আরো কত শত-সহস্র বছরের ধোঁয়া-শূন্যতার ভিতর এক ফোঁটা রক্ত, এক কণা শিশিরের মত হারীত। সাজিয়ে গুছিয়ে না, কেমন বিশৃঙ্খল ভাসা-ভাসা ভাব এই কথাগুলো বোধ করতে লাগল।

হারীত এসেছে, কিন্তু মার জন্যে কোনো টান নেই তার, ভানুর কথা জিজ্ঞেস করছে না, রানুর কথা না। লিকলিকে রেখায় দাগড়া-দাগড়া খাঁজে কপালটাকে অন্ধ করে, কালো মুখে, জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে। এর চেয়ে ওর বাবাকেও তো বেশি সরেস, বেশি তরুণ দেখায়।

'ভানুর খোঁজ খবর রাখিস?'

'ভানুর তো থাইসিস হয়েছিল।'

'হ্যাঁ। তারপর কী হয়েছিল বলতে পারিস?'

'না তো। কোথায় আছে ভানু? মরে গেছে বুঝি?'

সুমনা কিছুক্ষণ নিরেট হয়ে বসে থেকে বললে, 'তাই বুঝি মনে হয় তোর?'

অনেক চিন্তা করছিল এতক্ষণ হারীত। সুইচ পড়ে যাওয়া বাল্বের মত হয়ে গেছে সে সব; সেটাকে খসিয়ে ফেলে দিয়ে মার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ভানু মরে যায় যদি, কী করতে পারবে তোমরা। কলকাতায় কত থাইসিসের রোগী—কেবলই তো মরছে। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না তো।'

'তা তো পারছে না। কিন্তু ভানু বেঁচে উঠছে।'

'বেঁচে উঠছে? কোথায়?'

'কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে—'

'ও, সেই থাইসিস হোমে। বেঁচে উঠল বুঝি? কে বললে তোমাকে?'

'কেউ না। আমার মন বলছে।'

'তোমার মন বলছে। তবেই হয়েছে,' হেসে উঠল হারীত।

যেন কিছু হয় নি, কিছু হলেও কিছুই হয় না এমনি অস্বাভাবিকভাবে হারীত হাসছে, কথা বলছে।

সুমনার নাড়ী ছিঁড়ে হারীত একদিন বেরিয়েছিল। সেই ছেঁড়ার ব্যথাটাকে টেনে হিঁচড়ে টনটনিয়ে দিতে এসেছে হারীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রানু-ভানুর কথা বলিস? ভাবিস? যে ওরা তোকে আসকে পিঠে পুড়িয়ে এনে খেতে দিয়েছে? কোনো দিনই ভালবাসতি না তো আসকে পিঠে। কিন্তু রানু-ভানু কি তোর নিজের নয়?'

'রানু কোথায়?'

'কোনো খোঁজ নেই?'

'আর-কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না তাহলে—'

'তুই তো কলকাতায় থাকিস, খুঁজে দেখছিস না?'

'কলকাতায় আছে তোমাকে কে বললে? যদিও বা থাকে এক কণা ভুষি হারিয়ে গেলে কি এক মাঠ ভুষির ভিতর থেকে তা তুমি-খুঁজে বের করতে পারবে?'

হারীতের কথা শুনে ব্যাপারটার অদ্ভুত রকমটা সুমনার চোখে ভেসে উঠল। একটা ছেঁড়া ঠ্যাঙের মত পড়ে থেকে আস্তে-আস্তে বুকের কঙ্কালে হাত বুলোতে-বুলোতে থেমে রইল।

'মসজিদে দেখেছিস?'

'কোথাকার মসজিদে?'

'কলকাতায়—'

'কোন মসজিদে?'

'নাখোদায়—'

শুনে ঝুম মেরে হারীত সুমনার দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ। 'কে বোকা বলে তোমাকে এই সব হিতেন বলেছে?'

'না, অর্চনা—

'অর্চনামাসি', হারীত একটু চুপ করে থেকে বললে, 'ঐ মহিমের সঙ্গে থেকে-থেকে মাসি মরছে। না হলে কখনো এই রকম কথা বলে?'

'কোথায় আছে রানু তাহলে?'

'ঐ তো ভুষির কথা বললাম।'

'সুমনা একটু ক্ষেপে উঠে যেন বললে, 'তোর এত বড় বাড়! তুই কি হয়েছিস কী? যা তুই বেরিয়ে যা। তোর মুখ দেখতে ভাল লাগে না আমার। বেরিয়ে যা তুই। বেরিয়ে যা। বেরো আমার বাড়ির থেকে। জোচ্চোর বেল্লিক শয়তান কোথাকার।'

মুখে রক্ত উঠবার উপক্রম হল সুমনার। কিন্তু মাকে শান্ত ঠাণ্ডা করবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না হারীতের দিক থেকে।

সে বিছানার থেকে সরে দাঁড়াল—দরজা খুলে বেরিয়েই গেল—অন্ধকারের ভিতর—যে-পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে।

সারা রাত একা কাতরাতে-কাতরাতে শেষ রাতে বাস্তবিকই যেন দিঘির ঠাণ্ডা মাংসের মত জলের উপর দিয়ে ফিনফিনে হাত-পায়ের একটা মাকড়ের মত চলে গেল, মিশে গেল, বন-জঙ্গলের অন্ধকারের কবেকার কী সে, পৃথিবীর অখণ্ড মাকড়ের জালের মত সুমনা।

শেষ রাতে জল খেতে উঠে অর্চনা দেখল যে জলের কলসি ঘরে নেই; রান্নাঘর ঘুরে এল। কোথাও নেই কলসি। তবে কি চোর ঢুকেছিল ঘরে? শুধু কি কলসির জল খাবার জন্যই ঢুকেছিল, তাই নিয়ে পালিয়ে গেছে?

সুমনার ঘরের দিকে গেল অর্চনা। আজ বিকেলে নিশীথ চলে যাওয়ার পর সুমনার ঘরে অনেক্ষণ ছিল সে; প্রায় রাত এগারটা অব্দি ছিল। তারপরে মহিম তাকে ডেকে নিয়ে গেছে। কথা ছিল মহিমের সঙ্গে প্রথম রাতটা অর্চনা নিজের ঘরে ঘুমিয়ে নিয়ে, রাত একটা-দেড়টার সময়ে সুমনার কাছে ফিরে আসবে। একা মানুষ, রোগী মানুষ সুমনা, তার কাছে লোক থাকা চাই। নিশীথও বলে দিয়ে গেছে, সুমনা যেন রাতে একা না থাকে অর্চনা, তুমি থেকো, যদি মহিম তোমাকে মাঝে-মাঝে ছেড়ে দেয়। না হলে রাজেনের মাকে রেখো। অবসর পেলেই অর্চনা নিজের বালিশটা কাঁধে করে এনে সুমনার খাটে শুয়ে থাকবে—ফাঁকে-ফাঁকে শোবে; যতদূর সম্ভব দুপুর রাতের পাড়িটা সুমনাদির সঙ্গে কাটিয়ে দেবে সে। রাজেনের মার সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে; পাঁচ টাকা চেয়ে ছিল এ জন্যে, তিন টাকায় রাজি করানো গেছে। কাল থেকে শোবে। রাজেনের মা থাকলে অর্চনার নিজের ঝুঁকিটা অনেক কমে যাবে; নিজের সুবিধা মত তা হলে সুমনার কাছে আসবে সে। কোনো-কোনো রাতে একেবারে না এলেও চলবে হয় তো। আজ রাতে অবিশ্যি রাজেনের মাও ছিল না, সে নিজেও কেমন বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়েছে প্রায় সমস্তটা রাত; কোথায় জলের কলসি-কী হল সুমনাদির—অর্চনা ঘুমের আবেশ থেকে নিজেকে খসাতে-খসাতে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সুমনার ঘরের ভিতর গেল। ঘরের ভিতর ঢুকে বিছানার কাছে গিয়ে দেখল মানুষটা কেমন নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে, হাত-চুল-কাপড়-ঠ্যাঙের দিকে তাকালে মনে হয় মরে গেছে যেন। কেমন ভেঙে গেছে নাক। মরে গেছে কি? অর্চনা আস্তে-আস্তে সুমনার হাতটা তুলে নিল—উঃ কী ভীষণ ঠাণ্ডা, লিকলিকে সাপে ছোবল দিয়ে ঠাণ্ডা বিষ ঢেলে দিয়েছে সুমনার প্রাণের ভিতর।

'মরে গেল দিদি। মরাই ভাল। বড় কষ্ট পাচ্ছিল। নিশীথদার থাকা উচিত ছিল জলপাইহাটিতে। সুমনাদির এ-রকম অবস্থায় কলকাতায় যাওয়ার কোনো মানেই হয় না তাঁর।'

অর্চনা হয় তো কাতর না হয়ে বিছানার পাশে বসে ভাল করে বুঝে নিচ্ছিল সুমনার নাড়ী। না, মরেছে বলে মনে হচ্ছে না, অনেকক্ষণ নাড়ী হাতে বসে থেকে মনে হল যেন অর্চনার। তিরতির করছে নাড়ী। মেয়ে মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাণ, কি সহজে যায়? যাবেই বা কেন? 'নিশীথ চলে যাবে আর সুমনা মরে যাবে—সেই রাত্রেই? একটা কথা হল? কী ভাববে নিশীথ। তাড়াতাড়ি অর্চনা কাজের দিশপাশ স্থির করে ফেলল—মহিমকে অবলিম্বেই পাঠিয়ে দিল মজুমদার ডাক্তারের কাছে। তাঁকে না পেলে যে-কোনো কেজো ডাক্তারকে নিয়ে আসবে। তাড়াতাড়ি স্টোভ জ্বালিয়ে সেঁক দিতে লাগল, কী একটা কবিরাজি ওষুধ ব্যবহার করল অর্চনা (জিনিসটা হাতুড়ে হয়ে যাচ্ছেঃ নিশীথ, হারীত, বা সুমনা নিজেও, পায়ে দাঁড়ানো থাকলে, বলে দিত অর্চনাকে)। সাড়া পাওয়া গেল, স্টোভে দুধ গরম করে দু-চামচ দেওয়া গেল।

সাড়া পাওয়া গেল বটে, কিন্তু কোনো শব্দ নেই, চোখ মেলানো যাচ্ছে না, শরীরের ঠাণ্ডা ভাবটা যেমন তেমনই।

মরে কি যাচ্ছে? এখনও মরে নি, কিন্তু আস্তে-আস্তে মরে যাচ্ছে কি?

ডাক্তার মজুমদার এসে তাড়াতাড়ি নানা রকম পরীক্ষা করে বললেন, 'না, ভয়ের নেই কিছু। কিছু না, কিছু হবে না। ঠিক আছে।

ঐ রকম কথাই সব সময়েই বলেন মজুমদার সাহেব। যে রোগী পাঁচ মিনিট পরে মরে যাবে তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়েও বলবেন ঠিক আছে সব, কিছু হয় নি, ঠিক আছে। এ রকম কত বার কত জায়গায় অর্চনা দেখেছে ডাক্তার মজুমদারকে 'ঠিক আছে' বাৎলাতে; বিশেষত সদর হাসপাতালে। জলপাইহাটির সদর হাসপাতাল সংক্রান্ত মেয়েদের একটা বড় কমিটির মেম্বার অর্চনা। অনেক সময় তাকে সভা সমিতি তত্ত্বাবধান, তদারকের ব্যাপারে হাসপাতালে যেতে হয়। দশ-বার বছর ধরে যাচ্ছে সে। কত রোগীকে কত ওয়ার্ডে মরতে দেখল সে ডাক্তার মজুমদারের 'ঠিক আছে' কথামত কানপ্রাণ ভিজিয়ে নিয়ে। মৃত্যুর সময় কোনো মন্ত্র হিসাবে ডাক্তার সাহেবের 'ঠিক আছে' খুব একটা মূল্য আছে বটে, বেশ একটা আশ্বাস উপকার আছে মরুঞ্চে রোগীর পাশে মজুমদারের দাঁড়িয়ে থাকা শান্ত ব্যক্তিসত্তার; অর্চনা নিজেও যেন এই ভদ্রলোকটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে মরতে পারে।

'ঠিক আছে?' ঠোঁটে আচল রেখে জিজ্ঞেস করে অর্চনা।

ডাক্তারের কী সব প্রক্রিয়া চলছিল—ইনজেকশন দিয়েছে নাকি? না, কী করেছে? করছে? ডাক্তার তার সাত ফুট লম্বা শরীরের চওড়া পিঠ ও নিচে প্যান্টের পাহাড় প্রমাণ মাংস দিয়ে সুমনাকে একেবারেই আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল; ডাক্তারের পিছে দাঁড়িয়ে কিছু দেখছিল না অর্চনা। বাইরে খড়মের শব্দ হচ্ছিল মহিমের ঃ পায়চারি করছে। ভিতরে ঢুকতে সাহস যে নেই তার তা নয়, রুচি যে নাই তা নয়, তবে কী হবে ঢুকে—মজুমদার আছে—কাছে অর্চনা আছে; একা এক-শর মত। ডাক পড়ে যদি ভিতরে তা হলে ভিতরে যাবে মহিম; ওষুধ আনতে হলে মন্টুকে পাঠাবে; গুরুতর কিছু ঘটে থাকলে—

যদি সত্যিই তেমন কিছু হয় তা হলে আজ আর কলেজে যাওয়া হবে না। এমনও হতে পারে যে কিছুক্ষণ পরে খাট নামাতে হবে বাইরে, লোকজন, জিনিসপত্র, কাঠ-চন্দনের ব্যবস্থা করতে হবে।

জেগে উঠে হাত-মুখ ধোয়ার অবসর পায় নি মহিম, ঘাটের দিকে যাবার সুযোগ নেই এখনো; কখন কী হয়ে যায়। যদি খারাপ কিছু না হয় তাহলে ঐ নিমগাছটার থেকে, ঐ যে কাকে বাসা বেঁধেছে ঐটের থেকে, একটা কচি ডাল পেড়ে দাঁতন করবে সে, নিমের পাতাগুলো অর্চনাকে ভাজতে দেবে—

কলেজের কাজে ও-রকম নিরুৎসাহ হয়ে পড়াটা ঠিক হয়েছিল কী? ছুটি যখন কিছুতেই দিতে চায় না ওরা তখন ছুটির দরখাস্ত দিয়ে কালীশঙ্কর আর হরিলালকে চটানো, সুমনাকে এ-রকম অবস্থায় ফেলে কলকাতায় যাওয়া ঠিক হয় নি নিশীর। হারীত কোথায়? গাল ফুলিয়ে নিশীথের জীবনের গোলকধাঁধার ভিতর নিজে মনপবনটাকে ফুঁসিয়ে-ফাঁসিয়ে দিতে গিয়ে চোখের পিচুটি পরিষ্কার করতে-করতে, পাইচারি করতে-করতে—কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সে।

'ঠিক আছে'—ডাক্তার মজুমদার এইবারে নিজেকে টানটান দাঁড় করিয়ে নিয়ে বললেন।

'ঠিক আছে?'

'কিছু ভয় নেই, চোক মেলেছে; এক্ষুণি কথা বলবেন, ঠিক আছে'—মজুমদার বললেন, 'আমি প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি, এই ওষুধগুলো দেবেন। বুঝবেন তো আমার নির্দেশ?'

'বুঝব বৈকি—আমি হাসপাতালের—'

'মেয়েদের কমিটির মেম্বার। হে হে হে। আচ্ছা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি—'

প্রেসক্রিপশন লিখতে-লিখতেই বুঝিয়ে দিতে লাগলেন তিনি, অর্চনা ঝুঁকে পড়ে ঠিক করে নিচ্ছিল।

'নিশীথবাবু কি চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। মহিমবাবু কোথায়?'

'বাইরে। ডাকব?'

'দরকার নেই। ঠিক আছে। বুঝলেন, উপরে লিখে দিয়েছি যে-ওষুধটা, সেটা একটা মিকশ্চার, আনিয়েই একবার দেবেন, তার পর চার ঘণ্টা অন্তর, দু'বারের বেশি নয়।'

'মোট তিন বার তা হলে?'

'ঠিক আছে। আর এই যে-পাউডারটা দিচ্ছি—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মোট তিন বার তা হলে?'

'পাউডার?' উৎকণ্ঠিত হয়ে মজুমদার তাকালেন অর্চনার দিকে—

'না মিকশ্চার।'

'সে তো মিটে গেছে, ঠিক আছে। এই পাউডারটা দু'বার দেবেন মিকশ্চার দেওয়া হয়ে গেলে এক ঘণ্টা পর পর—'

মজুমদারের ভাষাটা খুব পরিষ্কার নয়, তবে হেঁয়ালির ভাষা নয়, অর্চনা বুঝে নিল; বুঝে নিয়েছে কি না অর্চনার মুখে চোখ বুলিয়ে সেটা বিদ্যুৎক্ষিপ্রতায় একবার খতিয়ে নিলেন কি না-নিলেন ডাক্তার মজুমদার, 'এক ঘণ্টা পর পর—দু'বার—বেশি হয় না যেন। ঠিক আছে। আর এই পিলটা—রাতের ঘুমের আগে—একটা শুধু।

'একটা?'

'ঠিক আছে।'

'আজকের রাতের জন্যে শুধু?'

'আজকের রাত শুধু'।

'কালকে মিকশ্চার দেব?'

'কাল সকালে এসে ব্যবস্থা করব আমি।'

'মিকশ্চার পাউডার দেব না তা হলে কাল?'

অর্চনার কাঁধে নিজের হাত কি হাতের ছায়ার, একটা আলতো চাপ দিয়ে ডাক্তার বড় বসন্তবাউরি পাখির মত অমায়িকভাবে হেসে বললেন, 'কালকের কথা কাল। আজকে এই ওষুধগুলো দিন।'

'কী খাবে?'

'দুধ, ফলের রস। কমলা। গ্লুকোজ। যেমন খাচ্ছিলেন—'

'ভাত খেতে পারে?'

'যদি খেতে চান?' নরম চাট্টি, মাখন, মাছের ঝোল, দুধ দিয়ে—

'ঠিক আছে',—অর্চনা বললে।

ঠিক আছে-টা মজুমদার নিজেই বলতে যাচ্ছিলেন, অর্চনা সেটা ঠিক সময়েই বলে ফেলাতে ডাক্তার মজুমদারের চিন্তা ও অনুভূতির প্রবাহ একটা সদগতি পেল, ভাল লাগে না তার। সদাশয় মুখে অর্চনার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'নিশীথবাবু যাবার বেলায় বলে গেলেন কিছু আপনাদের?'

'কী কথা?'

'ওষুধপত্র আমার জ্যোৎস্নার ডিসপেন্সারির থেকেই আনিয়ে দেবেন।'

'সেখান থেকেই তো আনানো হয়।'

'ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না—নিশীথবাবু ভিজিটের টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন—এক মাস-দেড় মাসের—' অর্চনা শুনছিল। ডাক্তারের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশনটা হাতে নিয়ে তাকিয়ে ছিল সেটার দিকে; কোনো কথা বললে না।

'ওষুধপত্রের দাম দিয়ে গেছেন নিশীথবাবু।'

'শুনেছি।'

'আমার মনে হয় ছ মাসের ভিজিট, ওষুধ, পেটেন্ট ওষুধ সব চলবে যা-টাকা দিয়ে গেছেন, তাতে। পাঁচশ টাকা তো কম নয়।'

অর্চনা প্রেসক্রিপশন দেখছিল—আড়চোখে; চোখ তুলে তাকাল সে।

'তাছাড়া ওঁর আজ যে-রকম হয়েছে রোজই তো এ-রকম স্ট্রোক—স্ট্রোক ঠিক নয়—রোজই তো আর এ-রকম ইয়ে—আরে-কী বলে ওকে—কার্ডিয়াক গোলমাল হবে না, ঘন-ঘন ডাকতে হবে না আমাকে। তা ও পাঁচশ টাকায়—বেশ—'

'ঠিক আছে'—অর্চনা বললে।

ডাক্তার প্রায় চোখ বুজে কথা বলছিলেন। একটু বিস্মিত, ব্যাহত হয়ে চোখ দুটো পুরোপুরি খুলে ফেলে অর্চনার দিকে তাকালেন।

একটু চুপ থেকে সুমনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে চোখ মেলেছেন; কথা বলছেন। কী বলছেন শুনুন তো। আমি কানে খাটো হয়ে পড়ছি, যা বয়েস। এক রকম আমেরিকান ইয়ারফোন বেরিয়েছে—খুব ছোট—আফিমের গুলির মত—না, সে আগের জিনিস নয়—কানে রাখলে সব অমন পরিষ্কারভাবে—কী বলছেন—হারীত?—হারীত কী?—ও—ওর ছেলে হারীত ঠিক আছে। হারীতকে দেখতে চাচ্ছেন? ঠিক আছে। এখন কথা বলবেন সব। ওষুধগুলো এখুনি আনিয়ে নিন। জ্যোৎস্নার ওখান থেকে। ভিজিটের, ওষুধের সব টাকা দিয়ে গেছেন নিশীথবাবু'। মজুমদার লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলে যেতে-যেতে বললেন, 'বেশ পাকা কাজই করেছেন নিশীথবাবু—দু মাসের দাদন দিয়ে আমাকে লটকে রেখে গেছেন। হে-হে—তা দেড় মাসের তো হবেই।'

'আজ সন্ধ্যের সময় আসবেন আপনি এক বার?'

'আমি? না, আজ আর কী হবে। কাল সকালে আসব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিক আছে।'

'হারীত কোথায়?' সুমনা বললে।

'হারীত? আছে। আছে।'

'কোথায়?'

'কলকতায় হয় তো। ঝুপ করে এসে পড়বে এক দিন।'

'না না, এসেছিল সে এখানে। কাল রাতে এসেছিল। তোমাদের খবর দিতে পারি নি। তোমরা তখন ঘুমুচ্ছিলে। তোমাদের ঘরের থেকে জলের কলসিটা নিয়ে এসছিল, কিছু খেতে দিতে পারি নি, খুব তেষ্টাও পেয়েছিল হারীতের। ঐ দেখ কলসিটা।'

কলসিটা দেখবার জন্যেই শেষ রাতে পা দিয়েছিল এই ঘরে অর্চনা। এতক্ষণে দেখা হল।

'হারীত এসে চলে গেল যে?'

'কোথায় গেল?'

'তোমাকে বলে যায় নি? বা রে! কেমন যেন এক রকম উচ্ছন্নে হয়ে গেছে হারীত। তোমার কথা না-শুনে চলে গেল দেখেই বোধ হয় তোমার এই হার্টের গোলমালটা হয়েছে সুমনাদি। তোমার এ রকম অবস্থা দেখে চলে গেল?' সুমনার কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল— কথাটা হারীতকে নিয়ে সেই জন্যে-হার্টের জন্যেও কিছু বটে, 'কেমন যেন হয়ে গেছে এক রকম আজ-কালকার ছেলেরা মেয়েরা সব। কী করবে এরা? দেশ স্বাধীন করবে? দেশ তো স্বাধীন হয়েছে।'

'আমিও তো বলেছিলাম হারীতকে, এখন আবার ও-সব কী হারীত? এখন আবার ক্ষুদিরাম, গণেশ, অনন্ত সিং, মাস্টারদা কী যে! দেশ তো স্বাধীন হয়েছে।', 'হ্যাঁ, দেশ তো স্বাধীন হয়েছে'—সন্দিগ্ধভাবে ডান হাতের আঙুল মটকাতে-মটকাতে বললে অর্চনা।

'উনিশশ বেয়াল্লিশে তো হারীত কলেজে ছিল। দিনরাত সাইকেলে আর পায়দলে মেরে দিয়ে কত কাণ্ডই না করেছে। তখন বিশেষ কিছু বলতাম না ওকে, ওর বাবাও ওকে রেহাই দিয়েছিল. বলেছিল, আমি নিজে অবিশ্যি ঠিক ও রকম করতাম না, তবে, সকলের সঙ্গে মিলে বেশ একটা কাজ হাতে নিয়েছে বটে হারীত, করুক। জিজ্ঞেস করেছিলাম, যদি মরে? বলেছিল, মরতে হবে জেনেই তো এ কাজে নামা, মরছেও তো অনেকে। শুধু একা হারীত বেঁচে যাবে। বলেছিল। হারীত তো তখন কংগ্রেস ছিল। কত করেছে কংগ্রেসের জন্যে। ক্রিপসের সঙ্গে কথাবার্তার সময় থেকেই ওর কংগ্রেসিতে ভাঙন ধরে, বলে, কী হবে কংগ্রেস দিয়ে?'

'ঘুমোও সুমনাদি।'

'ঘুমোচ্ছি।'

'ওঁকে ওষুধ আনতে পাঠিয়েছি। এক দাগ মিকশ্চার দেব, এক ঘণ্টা পরে পাউডার।'

'আর যে-সব ওষুধ আছে?'

'কিছু বললেন না তো, সে-সবের কথা। আজ লাগবে না, পরে খাবে। কাল আসবেন উনি।'

'হারীত চলে গেল—তার পর থেকেই কী যেন হল। মরে গেলেই তো ঠিক হত। ভেবেছিলাম। মরে গেছি ঐ বিমটা ঐ খোঁটাটার সঙ্গে গলায় দড়ি বেঁধে। কে যেন আমায় ধরে গলায় দড়ির প্যাঁচ কষে ঝুলিয়ে দিল—আমি তোমাকে ছুঁয়ে বলছি অর্চনা।—সাদা বিচ্ছিরি একটা লোক—।'

'নিজেই প্যাঁচ কষছিলে', হেসে বললে অর্চনা, 'মজুমদার বোধ হয় বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন। কেমন লাগছে।'

'একটু একটু ভাল।'

'ক্রমেই ভাল হবে।'

'এত বছর কংগ্রেসের কাজ করে তারপর যখন দেশ স্বাধীন হল তখন সটকে পড়ল হারীত। আবার নতুন করে আরেক নতুন কংগ্রেসের জন্যে কাজ করতে হবে না কি—'

'নতুন কংগ্রেস? কোথায়?'

'হারীতের মনের মধ্যে। আর কোথায়?'

সুমনা বললে, 'আবার সেই বারীণ ঘোষ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন, বাঘা, গান্ধীজির সেই ডাণ্ডি সত্যাগ্রহ, চৌরিচোরা, জালিয়ানওয়ালাবাগ-আবার সেই ক্রিপস ক্যাবিনেট মিশন—আবার সব'।

'না, তা আর কী করে হয়?'

'তা হলে নতুন কংগ্রেসের মানে কী?'

'নতুন যা, তা নতুন। তার ভিতর এ সবের কিছু ছায়া কিছু ছক-টক থাকতে পারে, কিন্তু তবুও তা আলাদা জিনিস। দিন বদলাচ্ছে, দেশ বদলাচ্ছে, মানুষ বদলাচ্ছে—'

'ঠিকই তো'—অনেকক্ষণ পরে সুমনা বললে, 'কিন্তু যে জিনিসের জন্যে অনেকটা বছর ধরে কাজ করা যায় সেটার একটা সুভালাভালি হলেও তাকে ব্যর্থ মনে করতে হবে এ কী রকম?'

'কিসের?' কী যেন কোনো এক নিহিত পৃথিবীর থেকে টলমল দুটো কালো চোখ ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল অর্চনা। পলিটিক্সের কথা সে ভাবছিল না, সুমনার কথার দিকে আধখানা কান ছিল কি না ছিল। কান মন সরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছিল তার, অন্ধকার, অনেক জল এসে জীবনের সব চিন্তা ও ধ্বনির তাগিদগুলি থামিয়ে মানুষের মনটাকে জলের মতন অচেতনে নিস্তব্ধ নিশীথ করে রাখছে যেখানে।

'সফল পরিণতি নয়? দিন রাত রক্ত ঢেলে লড়েছিল বটে কংগ্রেস, কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে—থাকতেই যে দেশটাকে স্বাধীন করে দেবে তা ভাবতে পারি নি।'

'দেশটাকে স্বাধীন করে দিয়েছে'—অর্চনা বললে।

'স্বাধীন করে দিয়েছে দেশটাকে।'

'প্যাটেল সেদিন বলছিলেন জওয়ার ক্ষেতের থেকে হাততালি দিয়ে পাখি তাড়িয়ে দেবার মতন করে ইংরেজদের খেদিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস?'

'তা তো বটেই, তা তো দিয়েছেই তো।'

'চলে গেছে ইংরেজরা?'

'আছে গুটিকতক দালালি করবার জন্যে?'—সুমনা বললে, কিন্তু তবুও ঠিক বলা হল না মনে ভেবে উশখুস করে বললে, 'ও চলে গেছে সব। ইংরেজরা চলে গেছে। ইউনিয়নে নেই ওরা আর।'

'না, নেই ওরা আর। ব্রিটিশ চলে গেছে।'

'ব্রিটিশ গেছে।'

'দেশটা স্বাধীন হয়েছে আমাদের।'

'দেশটা আমাদের স্বাধীন হয়েছে, ইস!'

'কী হল।'

'মাথাটা ঘুরে গেল কেমন, আমার তাহটা চেপে ধরো। একটু কাছে এগিয়ে এসো, অর্চনা।'

খানিকক্ষণ পর ওষুধ, কমলালেবু, দুধ খেয়ে একটু জোর পেল যেন সুমনা। 'কাল রাতে হারীতকে বকেছিলুম।'

'কেন?'

'পনেরই আগস্টের পর দেশে যে আমাদের লক্ষ্মীর মত সূর্য জ্বলছে এ ও স্বীকার করতে চায় না।'

'ওর বাবা স্বীকার করেন, নিশীথবাবু?'

'তিনি কী করেন, না করেন, আমরা জানি না। তাঁকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। ওর বাবার মতন তো নয়, হারীতকে ধরা ছোঁয়া যায়। পনেরই আগস্টের পরেও ওর মনটা কেমন কালি মেরে আছে।'

'কেন?'

'কেন? যা-হয়েছে তাতে খুশি হয় নি।'

'কী চায় হারীত?'

'আবার পলিটিক্স করছে।'

'কী রকম পলিটিক্স? রিভলভার ধরবে?'

'কী জানি। স্বাধীন হয়েও শান্তি নেই। ছেলেমেয়েগুলোর এই দশা। উনি কলেজটাকে এক পাশে ফেলে জলপাইহাটির ঘর ভেঙে চলে গেলেন যা-নেই তার ভিতর হারিয়ে যেতে। আমার অসুখের জন্যে পরের রক্ত খেতে হয় আমাকে, তবুও শরীরে রক্ত থাকে না, তিল-তিল করে মরে তবুও ফুরোতে চায় না। বড্ড বেকায়দায় পেয়েছে দেশের স্বাধীনতা আমাদের ক-জনকে। তবুও'—সুমনা একটু আঁটসাঁট হবার চেষ্টা করে বললে, 'ইংরেজদের শাসন নেই সেটা আমি বোধ করছি। তুমি আর মহিমবাবু তো ভাল আছ, স্বাধীনতাটাকে বেশ—খুব—উপভোগ করছ না তোমরা।'

'হ্যাঁ আমরা বেশ ভাল আছি, খুব মাল টেনে খাচ্ছি দেশের স্বাধীনতাটাকে'—হাসতে-হাসতে বললে অর্চনা।

বেলা তিনটের সময় হারীত ফিরে এল। মুখ-চোখ-চুল ভারী খারাপ দেখাচ্ছিল তার। যারা আগে কোনোদিন দেখে নি তাকে, এ চেহারার দিকে তাকিয়ে মোটেই ভাল লাগবে না তাদের। চেহারার জন্যেই যদি মানুষকে আমল দিতে হয় তা হলে এ চেহারাকে এক ডাকে ফিরিয়ে দিতে হয়, কানে তুলতে হয় না এর কোনো কথা।

খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে, ওষুধ দেবার, দেখবার, শুনবার, তদারক করবার জন্যে সুমনার ঘরে এসেছিল অর্চনা! ওষুধ, কমলালেবু খাওয়া হয়ে গেছে সুমনার। অর্চনা বিছানার পাশে বসে নিজেকে খানিক, সুমনাকে কিছু হাওয়া খাওয়াবার জন্যে হাতপাখাটা নাড়ছিল, মাঝে-মাঝে দু-চারটে কথা বলছিল—স্বাধীনতা হল তবু সুখ হল না, শান্তি এল না। নতুন কি পলিটিক্স করা যায়, শাড়ি-কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না, খাবার জিনিস না-পাওয়ার মত, সকলেই সহজেই ভাত কাপড় স্বস্তি পেতে পারে কী করে, ঐ নিম-জাম-বকুলের পাখিগুলোর মত দেশের জল-ফলফলি খেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে শান্তিতে কল্যাণে থাকতে পারে কী এই সুন্দর চোতের বাতাসে—কী সে টাকাকড়ির ব্যবস্থা, জননীতি, স্বাধীন দেশের সর্বভূমির জন্য কল্যাণনীতি—এই সব নিয়ে আলোচনা করছিল তারা। যে-গাইগোরু হরিণীর মত যেন অনেকটা, অর্চনাকে তেমনি দেখাচ্ছিল।

'কে রে বাপু, দুপুরবেলা ঘরের ভিতর, কে তুমি!'

'আমি এসেছি, ঘুমিয়ে আছো মা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কে, হারীত নাকি?' অর্চনা তৃতীয় চক্ষু বার করবার চেষ্টা করে যেন বললে, 'কেমন বদলে গেছে হারীত! এ কী হয়েছে হারীত!'

সুমনা শুয়ে-শুয়ে প্রায় চোখ বুজে কথা বলছিল; চোখ মেলে উঠে বসবার চেষ্টা করে বলল, 'কে হারীত, ও হারীত'।

হারীত এগিয়ে এসে একটা টুল টেনে নিয়ে বসে বললে, 'আমি এসেছিলাম কাল রাতে জানো অর্চনা-মাসি?'

'শুনেছি। কোত্থেকে এলে?'

'কলকাতার থেকে।'

'কাল রাতেই যে? কাল তো নিশীথবাবু কলকাতায় গেলেন—তিনি যাওয়া মাত্র তুমি এলে। কী করে এ যোগাযোগ ঘটালে হারীত।'

'মাঝে-মাঝে ঘটে যায় তো দেখছি।'

'কলকাতায় ছিলে তো তুমি, না আশেপাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছিলে, নিশীথবাবু চলে গেলে দেখা দেবে মনে করে?'

'তা মনে করতে পার। তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে।'

'আমাকে?'

ঠাট্টা করে বলছে হারীত, হারীত যখন ঘরে ঢুকেছিল তখন তাকে না-চিনতে পেরে কেমন কটমটিয়ে তাকিয়েছিলাম সেজন্য কেমন একটু তামাসা করে কথা বলছে হারীত, অর্চনা ভাবছিল।

'আমি যখন জলপাইহাটি ছেড়েছিলাম তখন তো তোমাকে এত সুন্দর দেখি নি!'

'কী বলছে হারীত? কাকে বলছে?'—সুমনা আবার শুয়ে পড়ে চোখ প্রায় বুজে ফেলে বললে।

'অর্চনামাসিকে বলছি।'

'অর্চনা তো সুন্দরই, কিন্তু—'

'সেই কথাই বলছিলুম, দেখে খুব ভাল লাগল, যেন দশ-পনের বছর বয়স কমে গেছে অর্চনামাসির।'

অর্চনার হাতে একটা বই ছিল। সুমনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার ফাঁকে-ফাঁকে পড়বে ভাবছিল, এতক্ষণ বন্ধ ছিল বইটা, এবার খুলে দেখছিল।

'শোনো অর্চনামাসি—'

'খেয়ে এসেছ?' সুমনা বললে।

'হ্যাঁ।'

'চান করেছিলে?' অর্চনা জিজ্ঞেস করলে।

'আমায় দেখে কী মনে হয়?'

'দেখে কিছু বুঝতে পারছি না আমি। অনেক দিন পরে দেখছি।'

'চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে?'

'খারাপ তো হয়েছেই' অর্চনা বললে, 'ঘরদোর ছেড়ে দিনরাত বাইরে হুজ্জোতি করলে ভাল হবে চেহারা?'

'আমাকে কি ঘুমের ওষুধ দিয়েছে অর্চনা?'

'কে? ডাক্তার? জানি না তো। কেন, ঘুম পাচ্ছে?'

'কেমন ঘুম-ঘুম লাগছে আমার।'

'ঘুমিয়ে পড়ো।'

'তোমরা কথা বলো। হারীত চান করেছিলি? খেয়ে এসেছিলি?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় খেলি?'

'আমাদের পার্টির এক বন্ধুর বাড়িতে।'

জলপাইহাটিতে তোদের পার্টি আছে নাকি? ওরে বাবা রে। তুমি কম্যুনিস্ট নাকি হারীত?'

'বলেছি তো তোমাকে, আমরা একেবারে নতুন স্বাধীন সব কর্মী। কম্যুনিস্ট কংগ্রেস কোনো কারুর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।'

সুমনা তবু জিজ্ঞেস করল, 'তুই কি কম্যুনিস্ট?'

হারীত কথা না—বাড়িয়ে সোজাসুজি উত্তর দিয়ে বললে, 'না!'

'তবে যা! পার্টি—পার্টি করছিস কেন কম্যুনিস্টদের মত।'

'বাবা!'—হারীত যেন ধন্য মেনে বললে, 'মেয়ে লোকের এত তো দেখি নি আমি কোনোদিন।'

কিন্তু তবুও হারীত তর্ক করতে গেল না। সুমনার এই নির্বিবেকে জাত ক্রোধটাকে নিয়ে ঘাঁটাতে গেল না আর।

'বেশ পেট ভরে খেয়েছিল তো?'

'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাল রাতের—কাল রাতে তো তোমাকে দিতে পারলুম না কিছু হারীত—কাল রাতের না খাওয়ার শোধ তুলে একেবারে পেটে গলায় খেয়ে এসেছ বুঝি?'

'ও-রকম শোধ তুলে খাওয়ার অভ্যেস নেই আমার, যেটুকু দরকার তাই খেয়েছি।'

'চান করেছ কোথায়?'

'জুলেখা বেগমের দিঘিতে।'

'জুলেখা বেগমের দিঘি? সে কোথায়?'

'এই তো এখান থেকে মাইল পনের হবে।'

'অদ্দুরে গিয়েছিলে চান করতে?'

'বাসে গিয়েছিলুম।'

'নাম শুনেছ জুলেখা বেগমের দিঘির, অর্চনা? আমাকে চান করতে নিয়ে যাবে একদিন হারীত? কত বড় দিঘি হবে? অর্চনা?'—ঘুমিয়ে পড়তে লাগল সুমনা। আবিষ্টভাবে কী যেন ভাবছিল, নিজের মনের ভিতর থেকে উঠে এসে অর্চনা বললে, 'হ্যাঁ, বেশ বড় দিঘি। তা দেখে এসো গিয়ে একদিন হারীতের সঙ্গে। আমি দেখেছি—চার পাঁচ বছর আগেও গিয়েছিলাম একবার। জুলেখা বেগমের দিঘি এখান থেকে কুড়ি মাইলটাক তো হবেই—লালপুরের পথে—বেশ সুন্দর জায়গায়—প্রান্তরের ভিতর, চারদিকে, উঁচু-উঁচু গাছপালা, ওরা কী বলে হারীত—হ্যাঁ হ্যাঁ পহরিঘাসের দেশে, সুমনাদি, সুমনাদি—'

সুমনা ঘুমিয়ে পড়েছে।

'ঘুমিয়েছে মা?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, ঘুমোক।'

'আমি উঠি।'

'বোসো। মহিমবাবু কি কলেজ থেকে ফিরেছেন?'

'না।'

'তা হলে বোসো তুমি। কথা বলা যাক। বসতে পার নিশ্চয় তুমি'—হারীতের চোখে কেমন একটা সমীহ ও আকাঙ্ক্ষার আন্তরিকতা। তাকিয়ে দেখল অর্চনা। কী রকম এই ছেলে? কী চায়।

'কাল রাতে রানুর কথা বলছিলুম; মা বিরক্ত হলেন—'

'কে, রানু? কোথায় সে? কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে রানুর?'

'না। সেই কথাই মাকে বলছিলুম। এক কণা ভুষিকে কী করে খুঁজে পাওয়া যাবে এক মাঠ ভুষির ভিতর, বলছিলুম মাকে। শুনে, ক্ষেপে উঠে, আমাকে বাড়ির বার না করে ছাড়বেন না তিনি—'

'তাই বলে বেরিয়ে যেতে হয়,ও-রকমভাবে ক্ষেপিয়ে দিয়ে এ-রকম মরার মতন রোগীকে একলা ঘরে ফেলে? তোমার যে কবে কাণ্ডজ্ঞান হবে হারীত?'

—বকছে বটে, কিন্তু তবুও বকুনির হুল নেই হুলটা খাসিয়ে নিজের গলা থেকে আওয়াজ আর কথা অর্চনা বার করছে।

'ও-রকম মারমুখো হয়ে উঠলে আমি কী করতে পারি?'

'কিছু করতে পার না? অথচ তুমি রিভলবার ধরে কংগ্রেসকে মারতে চলেছ?'

'কংগ্রেসকে মারতে চলেছি মানে? কী যে বল তুমি অর্চনামাসি। মা তোমাকে যা বুঝিয়েছে তাই বিশ্বাস করেছ তুমি। কংগ্রেসের ভিতর একদিন ছিলুম আমি। এখন আর নেই। দেশ তো বিমুক্তি পেল, কেন এ-রকম হচ্ছে এ নিয়ে আন্দোলন করছি, একটা নতুন পলিটিক্সের সাধনা করছি আমরা।'

'এও কি প্রফুল্ল চাকী, বিনয় বোস, মাস্টারদার মত?'

'না। তা হবে কেন। সে ইতিহাস এত বেশি আমাদের চোখের সামনে যে এক্ষুণি ফিরে-ফিরতি হবে না। আর তা ছাড়া—'

'এত বেশি কচলানো থ্যাৎলানো হয়ে গেছে যে আন্দোলনের, যে বিরতি এসেছে।'

'হ্যাঁ। তাছাড়া ইতিহাস একই জিনিসকে একই রকমভাবে প্রশ্রয় দেয় না। মানুষের মনও চায় না, সমাজের ও ইতিহাসের দাবিও তাতে মেটে না।'

'মার্কস কি এই কথা বলেছেন?'

'আমি মার্কস পড়ি নি।'

'তবে কোথেকে বলছ?'

'আমার নিজেরই যা মনে হয়েছে তাই বলছি। মার্কস পড়ে দেখতে হবে। ইংরেজিতে পড়লেও হয়, তবুও হাইনের কবিতা পড়বার জন্য জার্মান শিখছিলুম; এখন দেখছি 'ডাস কাপিটাল' ঐ ভাষায়ই পড়া ভাল—'

মার্কস পড়েছে হারীত—আগাগোড়া ইংরেজি অনুবাদটা—কিন্তু অর্চনার কাছে সে কথা কেমন একটা অব্যয় খামখেয়ালির ঝোঁকে চেপে গেল হারীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জার্মান শিখে ফেলেছ?'

'শিখছি। মার্কসকে নিয়ে যত নাচানাচি করা হয় সেটা তাঁর প্রাপ্য নয়—'

'তুমি এই কথা বল?'

'অনেক নতুন কথাই বলি আমি। কংগ্রেস ভাল লাগছে না। আমাদের দেশ স্বাধীন হল বলে কয়েকটি লোক ছাড়া আর-কেউ কিছু সত্যি টের পেল না, এই কথা যে আমাদের দেশের আজকের প্রাঞ্জল সত্য, এই আমি বলছি; বেশ বিচারক্ষম পণ্ডিত লোকরাও আমাদের দেশের প্রায় সব কিছু জিনিসকেই রাশিয়ার নিকটে ঘষে খাঁটি কিনা যাচাই করে দেখেন। এটা আমাদের কাছে গুরু নিপাতকী বলে মনে হয়; ফ্রয়েডের স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা তাঁর কাজের ব্যাখ্যার চেয়ে অবিশ্যি বেশি ঠিক, কিন্তু তবুও আট আনির বেশি ঠিক নয়। আইন-স্টাইনের রিলেটিভিটির—'

'আমার কাছে কেন এ সব, আমার কাছে কেন,' কাতরভাবে অনুনয় করে বললে অর্চনা।

'যার কাছে মন খোলে তার কাছে বলি আমি, তোমাকে ভাল লাগে তাই বলি।'

হারীতের গলায় ঘেরাটোপ ও সঙ্কোচ ঘুচে যাচ্ছে যেন। কী করবে অর্চনা? হারীতের তাকে ভাল লাগে সে তো ভাল কথা। নিশীথ সেনের মত মানুষকে ভাল লাগে না যার, অর্চনাকে তার ভাল লাগে; কেমন যেন একটু অসঙ্গত কথা বটে। কিন্তু কোন দিক দিয়ে কী রকম চেতনা বৃত্ত হচ্ছে বলে অর্চনাকে হারীতের ভাল লাগে? হয় তো কিছু নয় জিনিসটা—অস্বাভাবিক কিছু নয়—সরল সহজ স্নেহ-মমতার ব্যাপার। কলকাতার কাশি রক্তে আর পলিটিক্সের বত্রিশ তাতে ঝলসে গিয়ে—এখানে মায়ের কাছে এসে মাতৃত্ব না পেয়ে, অর্চনাকে পেয়ে বসেছে যেন—মা মাসি রানু ভানু—এমন কি পাড়ার বৌদি—দিদির দাবিও 'একা অর্চনার মেটাতে হবে। পাতানো বৌদি বা দিদি আছে কেউ হারীতের—জলপাইহাটিতে? না নেই তো। নেই। অর্চনা খুব নিবিড়ভাবে সমস্ত জলপাইহাটিতে জাল ফেলে কাউকে ধরে আনবার চেষ্টা করছিল, কোনো নারীকে—বয়সে বড়, সমান, ছোট-হারীতকে যে টানে। না কাউকেই মনে করতে পারছে না সে। ভাবতে, ভাবতে হারীতের উপর কেমন একটা মমতা বোধ হল অর্চনার।

'কতদিন থাকবে এখানে?'

'বেশি দিন না। মা একটু ভাল হয়ে উঠলেই চলে যাব।'

'সময় নেবে অনেক একটু ভাল হয়ে উঠতেও।'

'তাই মনে কর তুমি?' হারীত তার চুলের ভিতর যেন মুক্তির জাঙ্গাল নেড়ে-চেড়ে ভেঙে আঙুল চালিয়ে নিয়ে বললে।

'আমি কিছু মনে করি না, ডাক্তার বলছেন।'

'কিন্তু অত দিন আমি কী করে থাকব জলপাইহাটিতে?'

'অর্চনা কোনো কথা বললেন না; হারীতের দিকে তার চোখ ছিল না, কলকাতায় কোথায় গিয়েছে নিশীথ, কী করছে, এরও অতিরিক্ত একটা ধীর নিস্তট ভাবনায় মনটা ভরে ছিল তার।

'চলে যাবে কলকাতায়? জলপাইহাটিতে থাকবে না?'

'এইখানেই তো থাকবার আমার ইচ্ছা।'

'তবে?'

'কলকাতায় ঢের কাজ—'

'জার্মান শিখছ—'

হারীত হেসে বললে, 'সে তো রাতে ঘুমের আগে শেখা। সারাটা দিন—মুশকিল হয়েছে খোলাখুলিভাবে কিছু করবার নেই—কাউকে মন খুলে কোনো কথা বলবার সাধ্য নেই। যে-কাজে হাত দিয়েছি সেটা মোটেই জনপ্রিয় নয়। উনিশশ বেয়াল্লিশ তখনকার সরকারের ঘর-বাড়ি উচ্ছেদ করে লোকলস্কর ভাগিয়ে দিয়ে, টেলিগ্রাফ ছিঁড়ে, রেল লাইন উলটে-পালটে, সরকারের নানা-রকম দপ্তরখানা কানা করে করে দিয়ে যা করেছিলুম আমরা, আমাদের কাজে সমস্ত দেশটারই তো প্রায় সমর্থন পেয়েছিলুম, কত উৎসাহ দিয়েছিলে তুমি। বাবাও বিষ নজরে দেখেন নি; উপর-উপর দেখে কিছু বোঝা যেত না তাঁর, কিন্তু তবুও উপলব্ধি করে বুঝেছিলুম মোটামুটি সায় আছে বাবার; মা তো নিজেকে ঢেলেই দিয়েছিলেন'—বলতে-বলতে থেমে গেল হারীত—হ্যাঁ সবাই সেদিন আমাদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এখন যা করতে চাচ্ছি তা তো উনিশশ বেয়াল্লিশের পরিণতি নয়, এ একেবারেই নতুন জিনিস, কারুরই উৎসাহ নির্দেশ নেই।'

'না আমারও নেই।'

'কেন?'

জওহরলাল খুব বিপন্ন মানুষ। শক্তিশালী বড় মানুষ, কিন্তু তবুও তোমরা তাঁকে শক্তি দাও। তোমরা তাঁকে ক্ষমতাময় করে তোলো।'

কেমনভাবে বলে অর্চনা কী—বা বলে—যা খুশি বলুক, তবুও তো নিরেস নয়। নিজের কী এক সংকল্পসাপেক্ষ প্রাণের নিয়মে সজীব—সেই সজীবতাটাকে অনুভব করছিল হারীত।

'আমার মনে হয় তিনি যা করবেন, চোখ বুজে অনুসরণ করতে হবে তাই। খুব ভুল করবেন না তিনি। দেশের এখন যে-রকম টলমল অবস্থা, ধস্তাধস্তির সময় নেই; জওহরলালের মতন নেতাকে চাঁদ পেড়ে দিতে বলে—না-পারলে সাবড়ে দিতে গেলে যে কোটালের বান ডাক দেবে তাতে এত দিকচিহ্ন উড়ে যাবে, এত বেশি অন্ধকার এসে পড়বে যে আমাদের পিতারা—আমরা শেষ হয়ে যাব সব; আমাদের সন্তানদের মাথা তুলে দাঁড়াতে কত বছর লাগবে কে জানে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্চনার কথা শুনে হারীত হাসি মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কথা বলবার উপক্রম করতেই টের পেল হাসি নিভে গেল।

'তুমি যা বলছ তার ভিতর ঢের খিঁচ আছে। কিন্তু সবচেয়ে আগে আমরা যে মুভমেন্টটা চালাতে যাচ্ছি সেটা কী রকম তুমি তো তা বিচার করে দেখলে না!'

'কেউই তো তোমাদের সহ্য করে না। আমি বিচার না করেই তোমাদের পছন্দ করি না।'

'কেন?'

'কেবলই ভাঙবার চেষ্টা ভাল না।'

হারীত হেসে ফেলল, হাসিটা ভিতর থেকেই এসেছে, ভিতরের টানেই ফুরিয়ে গেল আবার। হারীত আস্তে-আস্তে বললে, 'গড়ব বলেই কোথাও-কোথাও ভাঙার দরকার দেখছি, কে বলে আমরা ভাঙছি শুধু?'

'না-ভাঙো তো ওদের সঙ্গে মিলে সৃষ্টি করো। পড়বার কাজে ওরা এখন খুব ব্যস্ত, অনেক লোক দরকার ওদের।'

'জলপাইহাটিতে আছ বলেই তুমি এই কথা বলছ। মহিমবাবু একশ তিরিশ টাকায় চাকরি করছেন, তাকে নেবে ওরা? তোমাকে নেবে? আমাকে নেবে?'

'আমরা তো এক্সপার্ট নই। কী হবে আমাদের নিয়ে?'

'তা হলে ওদের সঙ্গে মিলে সৃষ্টি করব কী করে, ওদের বড়-বড় মালিক, মালিকানার তাঁবে তাদের পেটোয়া লোকেরা গা ঘেঁষে। মহামানুষরা থেকে-থেকে দেশটা চালাতে চাচ্ছে বটে, কিন্তু ধাড়ি মনিবরাই তো চালাচ্ছে আজকাল। এদের, এদের সাঙ্গপাঙ্গদের সুবিধাবাদে, শিল্পাদরপনার চূড়ান্তে দেশের স্বাধীনতার কোনো মানেই খুঁজে পাওয়া গেল না আজ পর্যন্ত। ব্রিটিশ ভারতের অধীনতা-স্বাধীনতার পলিটিক্স উড়িয়ে দিয়ে আমাদের জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তান্ত্রিক ডাইনির হাতে বানানো গাছের মত এমনই এক জায়গায় যেখানে শিখড় নেই, দেশ নেই, নেতাদের শক্তি নেই, পলিটিক্স নেই, কিছু নেই, সমস্ত পৃথিবী সমস্ত পৃথিবীকে গিলছে শুধু। অন্ধকার অন্ধকারকে খাচ্ছে—'

হারীত থেমে গেল। অর্চনা শুনে যাচ্ছিল। হারীতের শেষ হয়ে গেলে, অর্চনা তার মস্ত বড় কাল খোঁপায় হাত রেখে, একবার চাপ দিয়ে নিয়ে, হারীতের চোখে চোখ রেখে বললে, 'আমাদের দেশে কেন, সব দেশেই এ রকম; আজ কেন—অনেকদিন থেকে। নিশীথবাবু সব বলেছেন আমাকে। তাঁর কাছে শিখেছি—জেনেছি অনেক কথা। তিনি বলেছেন, এই রকমই ছিল—এই রকমই প্রায় থাকবে। বরাবর এক দল লোক পৃথিবীকে শোধরাবার চেষ্টা করবে, বরাবরই খুব নির্দোষ মন নিয়ে—যেমন তুমি করতে চাচ্ছ—কিন্তু তা বলে অন্যের তো নির্দোষ নয়, তাদের জ্ঞানপাপ খণ্ডানোও শক্ত; আজকের এখনকারই সুখ চায় তারা; নিজের সুবিধে সুখই চায় প্রতিটি ব্যক্তিই, যে-কোনো উপায়ে হোক; আজ যদি প্রায় সকলে মিলে ভাল হওয়া যায়, আত্মত্যাগ করা যায়, তা হলে তিন পুরুষ, ধরো, বড় জোর দশ পুরুষ, পরে যে বেশ সুস্থির শুভ ব্যবস্থা হতে পারে পৃথিবীর সকলের জন্যেই, এ প্রস্তাবে সায় দেবার মতন ব্যক্তি বা জাতিমন এত কম যে তা নিয়ে কোনো রকম বড় চূড়ান্ত কাজ কিছুতেই চলতে পারে না। চোখের সামনে সব সময়েই সৎ দৃষ্টান্ত জিইয়ে রাখা দরকার। সেখানে সবই প্রায় সহজ ও সরল—সেখানে স্বর্গের জন্যে অসাধ্য সাধনের সত্যিই বিশেষ মূল্য আছে; পৃথিবীকে একেবারে অন্ধকারে গড়িয়ে পড়তে কেবলি বাধা দিয়ে চলেছে চার হাজার পাঁচ হাজার বছর আগের জানা ইতিহাসের সময় থেকে আজ পর্যন্ত।'

'বাবা এই সব কথা বলেন, আমি, জানি,' হারীত বললে, 'আর তুমি তো তা-পড়ার মত সে সব বলে যাও আর বিশ্বাস করো?' অর্চনার দিকে সুসন্দিগ্ধ চোখ তুলে তাকিয়ে হারীত বললে।

'নিশীথবাবুর চেয়ে বেশি ভাল, বেশি নির্ভর করা যায়, এ রকম কারো সঙ্গে দেখা হয় নি আমার।'

'কী হিসেবে ভাল?'

'তোমার কাছে অত খুলে বলতে পারব না আমি।'

'ভাল মানে ভাল মানুষ?'

'তা তো নয়ই। তোমাকে এক হাটে বেচে হারীত, আর এক হাটে কিনে আনতে পারেন তিনি।'

হারীত তাকিয়ে দেখল, কথা বলতে-বলতে কেমন একটা আভা এসে পড়েছে যেন অর্চনামাসির মুখে। তা হলে সেই পুরুষ মানুষটিকে কি ভালবাসে অর্চনামাসি? না তাকে কামরিক্ত চোখে তাকিয়ে দেখতে পৃথিবীর সব বস্তুর চেয়ে সব চেয়ে বেশি ভালবাসে? এই শেষের জিনিসটার ভিতর থেকেও তো কামনার জন্ম হয়। মুখ, কপাল, কেমন যেন গৌরী রৌদ্রে রক্তিক হয়ে আছে অর্চনামাসির—ছায়ার ভিতর বসে আছে অথচ। অনির্বাণ এই জিনিস। অর্চনার দিকে তাকিয়ে রইল হারীত। তাকিয়ে রয়েছে যে টের পেল অর্চনা। তার মুখে যে রক্তসন্ধ্যার কী এক শোভা এনেছিল—যে কোনো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দেশ থেকে—খুব তাড়াতাড়িই যেন মিলিয়ে গেল তা।

কেন অর্চনার সঙ্গে এ রকম তির্যক ব্যবহার করছে হারীত? জলপাইহাটির কোনো যুবতী কি এ পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে হারীতকে? না তো, এখানকার প্রায় কোনো মেয়ের সঙ্গেই তো তার আলাপ নেই! কলকাতার মেসে-মেসে থাকে সে—রাস্তায় আড্ডায় বস্তিতে ঘুরে বেড়ায়—সেখানে চোখে পড়ার মত কাউকে দেখে নি; মাঝে-মাঝে ক্যাম্পে যায় বটে, হারীতের ধর্মে বিশ্বাসী মেয়েরা আছে সেখানে; কিন্তু সেখানে হারীতের মোটামুটি কর্মী নাম; ভাল করে তাকিয়ে দেখে না কোনো মেয়ের দিকে; কিন্তু তাকিয়ে দেখবার মত ছিলও কি কেউ? ভাবছিল হারীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারীতের যা বয়স, মনের যে অপূর্ব অস্বচ্ছ রুচিত, এতে কোনো দিকের প্রায় কোনো মেয়েই মনে ধরল না তার; জলপাইহাটিতে এসে নজর পড়ল একজন বড় বিবাহিত মহিম ঘোষালের ভাঁড়ার সংসারের এই দেবযানটির দিকে। না, না এটা কিছু নয়। ভাল লেগেছে দিদির মত—হয় ত বন্ধুর মতই অর্চনামাসিকে। তার জীবনের আসল জিনিস হচ্ছে, কলকাতায় ফিরে যাওয়া, সেখানে গিয়ে কতগুলো দরকারি বই পড়া, কথা ভাবা—যা বইয়ের অতিরিক্ত, সুস্থতা সুবিধা আনা যারা তা পাচ্ছে না কোনোদিন সেই সব মানুষের জন্যে. খানিকটা ভাল করতে চেষ্টা করা—পৃথিবীকে, মানুষের নীতিকে—খুব সম্ভব, মানুষের মনটাকেও। অসম্ভবই সব—তবুও চেষ্টা করা দরকার। হাস্যকরই সব। কিন্তু তবুও হাসি গম্ভীর হয়ে ওঠে।

'কলকাতায় তুমি সঙ্ঘের কাজ ছাড়া আর-কী করছ হারীত?'

'এ ছাড়া কী আর করবার আছে?'

'ওরা তোমাকে টাকা দেয়?'

'ওরা কারা? আমার কর্মীরা? কোত্থেকে টাকা পাবে?'

'তা হলে কী করে চলে তাদের? কী করে চলে তোমার?'

'ওরা এখনো বাড়ি খেয়ে,' হারীত একটু হেসে বললে, 'আমাকে অবিশ্যি এটা-ওটা করতে হয়। পড়াচ্ছিলুম একটা স্কুলে—ছেড়ে দিয়েছি। একটা কোচিং ক্লাস খুলেছিলুম কলেজের ছেলেদের নিয়ে। তাও ছেড়ে দিলাম। এক-আধটা প্রাইভেট ট্যুইশন ছিল, আর করব না ভাবছি।'

'কেন, মাস্টারের ছেলে মাস্টারি করবে না?'

'না! নানা রকম ছেলে ঘেঁটে দেখলাম। ওরা পরীক্ষায় পাস করতে চায় শুধু, শিখতে চায় না, জানতে চায় না। পরের মুখের ঝাল খেয়ে ঝেড়ে আসতে চায়—ম্যাট্রিক থেকে আই-সি-এস অব্দি। কী হবে এদের পড়িয়ে? মাস্টারির বদ রক্ত বের করে দিয়েছি সব। কলকাতায় এখন আমি মোটর মেরামতি, ড্রাইভারি শিখছি,' হারীত বললে।

অর্চনা হারীতের দিকে তাকিয়ে, এক-আধ মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললে, 'শিখতে পারলে ও-সব জিনিসে পয়সা আছে বটে। কিন্তু তোমার শরীরে কি সইবে? এক সঙ্গে অনেকগুলো কাজ নিয়ে বসেছ তো হারীত।'

'গতবার যখন আমাকে দেখেছিলে তার চেয়ে ঢের খারাপ হয়ে গেছে আমার চেহারা?'

'ঢের খারাপ।'

'কবে এসেছিলাম জলপাইহাটিতে; কত দিন আগে?'

অর্চনা একটু ঘাড় কাত করে হিসেব করে নিয়ে বললে, 'প্রায় দেড় বছর আগে। গত বছর আশ্বিন মাসে এসেছিলে। এখন তো চোত মাস।'

'বাপ রে! সব হিসেব ঠিক। আমারও তো মনে ছিল না।'

হলেও হতে পারে রক্তের প্রতিভা গাণিতিক রামানুজমের মত—ভাবছিল হারীত; কিন্তু তারও অতীত কিছু রয়েছে অর্চনার। কেমন একটা সহানুভূতি এসে পড়েছিল অর্চনার মুখে, একজন বিশেষ মানুষের জন্যে প্রায় তলদেশ থেকে সহানুভূতি। সে জিনিসের থেকে আলাদা, ঢের নিকটতর, একটা অনুভবে আলোকিত হয়ে বসে থেকে অর্চনার মুখের সহানুভূতিটাকে এমন নির্দোষ নির্মল মনে হল হারীতের যে, তার মাধব গোয়ালার কথা মনে পড়ল, এমনই ট্যাকটেকে টলটলে দুধ দিয়ে যেত মাধব, রোজ সকালবেলা, নিশীথ খেত নির্বিকার মুখে, কিন্তু দু-এক চুমুক দিয়ে সরিয়ে রাখতে হারীত।

একটা ভারী নিশ্বাস ফেলে হারীত বললে, 'শরীর এত খারাপ হয়েছে, চেনা যায় না আমাকে?'

'কলকাতায় নামলেই দানোয় পায় তোমাদের। কী করে শরীর ভাল থাকবে সেখানে? কী খাওয়া হয়? কী খাওয়া হয় মেসে?'

হারীত একটা ফিরিস্তি দিল; যা নেই, খাওয়ানো হয় না সেই সব মাছ মাংস ডিমের তালিকাও ঢুকিয়ে দিল। অর্চনার বিশ্বাস হল না।

'দুধ খাও না?'

'হ্যাঁ। কিনে খেতে হয়?'

'কী রকম দুধ?'

'জলপাইহাটির মাধব গোয়ালাকে মনে আছে তোমার?'

'হ্যাঁ। ঐ যে ট্যাকটেকে দুধ দিত।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ তুমি'—হাসতে-হাসতে বললে হারীত। কিন্তু হাসিটার উৎস যে মাধব নয়, অর্চনা নিজে, কে বলে দেবে তা অর্চনাকে—আলোকবর্ষের পথে—কবে কোন দিন?

'ও মা—কেন ও-রকম জোলো দুধ। পয়সা দিয়ে কেন তুমি? খুঁজে বার করতে পারলে কলকাতায় খুব ভাল-ভাল দুধ পাওয়া যায়। মাধবের দুধ তো একেবারে জল ছিল। সেই রকম জল—'

'দুধ খেতে চাইলে পৃথিবীর প্রায় সব লোকই তো জল দেয়,' বললে হারীত। হারীতের কথায় কোনো নিভৃত ইঙ্গিত আছে সেটা মনেও হচ্ছিল না অর্চনার। এমনি সে সাতপাঁচ ভাবছিল। অর্চনাকে নিস্তব্ধ দেখে হারীত বললে, 'সুলেখা কোথায় আছে বলতে পারো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কে সুলেখা?' কেমন একটা ঘুম-বিঘুমের ভিতর থেকে উঠে যেন বললে অর্চনা।

'জলপাইহাটির শশাঙ্কবাবুর মেয়ে।'

'ও', অর্চনা একটু ভেবে বললে, 'ঐ যে লালপুরের রাস্তার দিকে থাকে যারা?'

'হ্যাঁ। এখানে আছে?'

'সুলেখাকে চেনো তুমি?'

'বিয়ে হয়ে গেছে কি সুলেখার?'

'কই শুনি নি তো।'

'তোমাকে সঙ্গে করে যাব একদিন সুলেখার কাছে।'

অর্চনা উড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আমি কোনোদিন যাই নি ওদের বাড়িতে। শশাঙ্কবাবুর স্ত্রীকেও আমি চিনি না।'

'তা হলে যাবে না তুমি?'

'আমি কী করে যাই হারীত?'

ঘুমের ঘোরে সুমনা কেমন যেন গোন-গোন গোন-গোন শব্দ করছিল; শব্দটা মিইয়ে অস্ফুট হয়ে উঠল; ঘুমের ভিতরে খানিকটা তৃপ্তি পেলেও কেমন একটা ব্যথার আক্ষেপ যেন বোধ করছিল তার শরীর। হারীত আর অর্চনা নিস্তাপ নিঃস্বত্ব চোখে তাকিয়ে ছিল সুমনার দিকে, দু'জনেই। সুমনা পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল আবার; নিঃশব্দিত হয়ে গেল সব।

'মাধব গোয়ালা কোথায় আছে আজকাল?'

'বলতে পারি না তো। জলপাইহাটিতে কিছু দিন এবার থাকছ তো হারীত?'

'হারীত কী করবে না-করবে, কী ইচ্ছা অনিচ্ছা, মনের কথাটা ভাল করে স্থির করতে পারে নি এখনো; বললে, 'মার অসুখটা ভালর দিক না গেলে কলকাতায় যাওয়া হয় না। তুমি বলছ সময় লাগবে। এর ভিতর বাবা এসে পড়বেন?

দূরের একটা জামরুল গাছের সাদা-সাদা ফলের দিকে তাকিয়ে অর্চনা বললে, 'তা তোমার বাবা জানেন। আমি কী করে বলব, আমার জানার কথা হারীত?'

'কে আর জানবে—আমি ভাবছিলুম-তুমি যদি না জান—'

সাদা-সাদা ফল, বাতাসে উড়ু -উড়ু জামরুলের বড়-বড় সবুজ পাতা, সৃষ্টির আগুনের উৎস থেকে যেন সদ্য উঠে আসা একটা তরতাজা হলুদ পাখির দিকে তাকিয়ে ছিল অর্চনা।

'তোমার বাবা চিঠি লিখতে বলে গেছেন।'

'কাকে—তোমাকে?'

'যখন খুব বেশি দরকার হয়, জানাতে বলেছেন। কিন্তু আমি লিখব না।'

'কেন?'

অর্চনা তাকিয়ে দেখছিল জামরুলের ঘন সবুজের ভিতর সেই পাখিটা ডালের থেকে ডালে লাফিয়ে যাচ্ছে, উড়ন্ত পাতার ঝালরে ঢাকা পড়ছে, বেরিয়ে আসছে আবার—

'দরকারের টানে নিজেই তো চলে আসবেন নিশীথবাবু। যদি না আসেন—'

পাতা আর বাতাসের আকাশের ফাঁকে কেমন যে জ্বলজ্বলন্ত প্রাণের হলুদ—ও-রকম হলুদ হয়ে চোতমাসের বৃহৎ বাতাসের ভিতরে নিজের শরীরকে পালকরণিত প্রাণের আধার বলে অনুভব করে নিতে পারত যদি মানুষ। উড়ে চলে যেত যেদিকে ইচ্ছা-

'না আসেন যদি?'

'তা হলে'—অর্চনা হারীতের মুখের দিকে তাকিয়ে না-তাকিয় বললে, 'কাঁঠাল পিটিয়ে পাকা করবার ভার তো আমার উপর নয়, সে তোমার মার উপর' বলে অর্চনা ঠোঁটে দাঁতে হাসি মাখিয়ে একটু হাসতেই বুজে এল হাসি।

'তার মানে?'

'কলকাতায় যে গেছে তাকে চিঠি লিখে টেনে আনব কেন আমি?'

'কেন কলকাতায় কে উজিরি পেতে গেছেন? হারীত হেসে বললে, 'এখানে ঘরদোরে নাজিরি ভাল ছিল না?'

'এই যা-পাখিটা উড়ে গেল,' জামরুলের গাছের দিকে তাকিয়ে বললে অর্চনা। 'কী বলতে চাও তুমি?' ঘাড় ফিরিয়ে হারীতের মুখের দিকে চেয়ে অর্চনা বললে, 'কিসের উজিরি হারীত? নাজিরি কিসের?'

'আমার কথার মানে ধরা গেল না বুঝি?'

ধরা গেছে হারীতের কথার মানে, কিংবা ধরা যায় নি, কী যে হয়েছে ধরা না দিয়ে অর্চনা পড়ন্ত বেলার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে উঠি-উঠি করবে কি না ভাবছিল। উঠল না, বসে রইল সে।

'সুলেখাদের ওখানে যাবে?'

'হ্যাঁ। কবে যাবে?' হারীত বললে।

'কে। আমি? আমার যাবার কথা নেই তো।'

'কেন, ওরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে নি তো। বিনে নিমন্ত্রণেই যাব দু'জনে। জলপাইহাটিতে এসেছি। চারদিকে একটু ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বেশ তো, বেড়াও।'

'একা? একা?'

'একা দরকার হলে একা। সঙ্গী পেলে তাই-ই সই। এই তো ছিল ওঁর হাল—'

'ওঁর কার? মহিমবাবুর?'

'না, নিশীথবাবুর।'

'অ'—হারীত বললে।

'কেন, তুমি ওঁর সঙ্গে বাইরে যেতে না মাঝে-মাঝে?' শুধোল হারীত।

'কেন আমি? আমাকে—কেন আমাকে সঙ্গে নেবেন তিনি?'

'তা নেবেন না। তা জানি আমি। ওকে চিনি না আমি? কিন্তু মাঝে-মাঝে মা যেতেন, মাঝে-মাঝে তুমি যেতে সঙ্গ ধরে—প্রথম-প্রথম একটু পিছে থেকে। যেতে না? উনি যে রাত একটা-দেড়টা অব্দি বেড়াতে ভালবাসেন—তেপান্তরের দিকেই যেতে ভালবাসেন—একাই বেড়াতে যান—মোটের উপর এ সব মিলে বেশ একটা চৌখুপি ছক ছিল বটে।'

হারীত কোন এক দূরের দিকে চেয়েছিল,—অর্চনার দিকে না তাকিয়ে দৃষ্টিটাকে তবুও নিকটতর পদার্থগুলোর দিকে ফিরিয়ে এনে হারীত বললে, 'যার-যার জীবনে যা হয় তাই-ই হয় তার-তার জীবনে। অন্য কারুর জীবনে অন্য রকম হয়।'

বাইরে ভিতরে বাতাস ছিল খুব এতক্ষণ, বাতাসের তোড় কমে গেছে। ঘরের ভিতরটা একটু গুমোট হয়ে উঠেছে। অর্চনা কান পেতেছিল বটে হারীতের কথায়। কিন্তু ও-সব কথায় যোগ দিয়ে কিছু বলতে গেল না সে।

'জলপাইহাটিতে এসেছ এত দিন পরে, ইচ্ছে করবেই তো বেড়াতে। হিতেনদের সঙ্গে বেড়াতে পারো।'

'হিতেনদের সঙ্গে?' হারীত হেসে বললে, 'ওরা তো খোকা।'

'খোকা?'

'কী আমার কাছে আর হিতেনরা?'

'অর্চনা কেমন একটু মৃদু তামাসা বোধ করে ভাবছিল, জিজ্ঞেস করবে হারীতকে—অর্চনার কাছে হারীত কী? খোকা? না. কর্তাব্যক্তি? জিজ্ঞেস করবে করবে করে, তবুও করতে গেল না আর। হারীত ও তার সঙ্গে কেমন সেতু তৈরি হয়ে গেছে যেন ধোঁয়ার মতন; কাটা-ছাঁটা কথার ভাবনার বিচারের ছোঁয়ায় সে-ধোঁয়াটাকে অর্চনা একেবারে উড়িয়ে মুছে ফেলতে চায় না। হারীতকে সুমনাদির ছেলে বলেই মনে করতে পারছে না, নিশীথের ছেলে বলে তো মোটেই না; হিতেন পড়ে ফোর্থ ইয়ারে। 'তুমি বি-এ পাস করেছিলে কবে না।'

'উনিশশ আটত্রিশে।'

'ও মা দশ-এগার বছর আগে! তোমার বয়স এখন কত হারীত?'

'ত্রিশ-একত্রিশ।'

'নিশীথবাবুর কত?'

'আটচল্লিশ—উনপঞ্চাশ।'

'ওঁর আঠার—উনিশ বছরের সময়ে তুমি হয়েছিলে?'

'অঙ্ক কষে তাই তো বেরয়।'

অর্চনা হাত পাখাটা তুলে নিয়ে একটু বাতাস খেয়ে রেখে দিল সেটা। ঘরের ভিতর বাতাস এসে পড়েছিল জামরুল বনের বুকের ভিতর থেকে উছলে উঠে ঃ আ!—ভারি আরাম লাগছিল ঘরের ভিতরের জাগা ঘুমোনো মানুষ তিনটির। একটু মুখ আড়াল করে কিছু একটা ভেবে নেবার জন্যে অর্চনা হাত পাখাটা তুলে নিয়েছিল।

'তা হলে সুমনাদির বয়স ছিল কত তখন?'

'পনের-ষোলো—'

'মাত্র?' বললে অর্চনা, 'কী রকম ভীষণ অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলেন নিশীথবাবু।'

'সেই জন্যেই আমি বিয়ে করে ফেলতে দেরি করছি। তোমার বয়স কত?'

'আমার চৌত্রিশ। নিশীথবাবুর থেকে চৌদ্দ বছরের ছোট আমি।'

'তুমি আমার তিন বছরের বড়' হারীত বললে. 'আমি যদি ছ-বছর আগে জন্মাতাম তা হলে আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট হতে তুমি।'

সুমনা ঘুমের আকুতিতে কেমন কেঁদে উঠল, হেসে উঠল, বিড়-বিড় করছিল, ভোন-ভোন ভোঁ-ওঁ-ওঁ-করতে লাগল।

তারপর ঘরভরা অনেক আশ্রয়দাতা আগলা বাতাসের ভিতর স্থাপিত হয়ে স্নিগ্ধ সমুদ্রের নিচে কানকোর ফুলকোর নিঃসাড়তা নিয়ে ডুবে রইল যেন মাছের মতন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস এ দেশে থাকো তুমি হারীত।'

'থাকব। একটু জিরিয়ে নেওয়া দকরার। কী বলো?'

'হ্যাঁ, ভারি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে তোমার। কলকাতায় ও-রকম করে থাকলে—'

অর্চনা শরীর দিয়ে বাতাস পান করছিল—ঘরের ভিতর এসে পড়েছে সব। কী যে নুন, ফেনা, আগাছার মত কত শত কথা অর্চনা ভাবছিল। ঘুমিয়ে পড়তে চায় শরীর। ঘুমের ভিতর থেকে জেগে-জেগে স্থবির স্বপ্নের সংকল্পর প্যাঁচে জড়িয়ে যেতে থাকে একটা আবছা সমুদ্রের ঘনাল অন্ধকারের ভিতর।

'কেমন থাইসিসের রুগির মত চেহারা হয়ে গেছে আমার। যে দেখে সেই বলে।'

'অর্চনা অন্য দিকে তাকিয়েছিল; হারীতের শরীরের উপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার; বাতাসের মত বাহিত হয়ে চলে গেল আবার অন্য দিকে তার চোখ। 'তুমি এখানেই থাকো; আমি হাতে নিচ্ছি।'

'কী জিনিস?' হারীত বললে।'

'তোমার শরীরটাকে সারিয়ে দেবার ভার।'

দিনগুলো যেন নিদাঘের দিকে চলে যাচ্ছে; বাতাস আসছে চারদিককার বিকালের নিস্তেজ রোদ পাখপাখালি বনবনানীর উজান বেয়ে—কোথায় চলে যাচ্ছে আবার। কাকের চেয়েও কাল কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি সুগঠিত পাখিগুলো চারদিক থেকে জানিয়ে দিতে আসছে; যা বাতাস, রোদ, জল, জামরুল, শিমুলের বন, মানুষেরও মনের অবলম্বন, একাকী জানিয়ে দিতে পারে না।

'জলপাইহাটিতে শরীর ভাল করে কলকাতায় গিয়ে আবার ভেঙে ফেলে দেওয়া। আবার ফিরে আসা জলপাইহাটিতে। এই টানা-পোড়েনে কী তৈরি হবে? আমার কলকাতার থাইসিসের শরীর আর বড়, বলবৎ সব স্ট্রাইক? না, আমার জলপাইহাটির সুস্থ মানুষের মত শরীর আর চারদিককার ভরা মৃগয়ার চিৎকার সারাদিন—মানুষের মাংস খাবার জন্য মানুষের?'

'স্ট্রাইক করবে না কখনো; স্ট্রাইক কিছুতেই করতে পারবে না। মোটেই করবে না।'

'না, এখন করবে না। আমি করব না, অন্য দশজনে করবে। তাতে তোমার কী লাভ?'

'তোমার কি রাতে-রাতে জ্বর হয়?'

'না তো?'

'স্লো ফিভারের মত হচ্ছে? টের পাচ্ছ না?'

'টের পাই জ্বর নেই।'

'অর্চনা থুতনির উপর হাতের মুঠো রেখে হারীতের কথা শুনছিল। বললে, 'আমি তোমাকে একটা থার্মোমিটার দেব, যখন দরকার মনে কর, টেম্পারেচার নিয়ে দেখো; আমাকে জানিও; চার্ট করে রেখো।'

'কই দাও থার্মোমিটার'।

'এখন নয়, পরে দেব। জলপাইহাটিতে তুমি থাকো। এ দেশটাকে ভালবেসে এইখানেই কাজ করো তুমি। চৈত্রের শেষ দিনগুলোর ঘরভরা বাতাসের ভিতর বসে থেকে এ দেশটাকে দেখছ তো তুমি, আমিও দেখছি, কেমন চমৎকার ঘাস, আকাশ, জল, ফসলের দেশ। এখানে কাজ করার অনেক কিছু আছে। অনেক প্রায়মরা-আধমরা মানুষদের উপকার হয় তাতে। স্ট্রাইকের দরকার নেই। আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

এই দুই তিন চার পাঁচ সাত আট দশ বারো গুনতে পারা যায় যেন, অনেক ঝাঁকড়া চুলের উজ্জ্বল শিশুদের মত অনেকগুলো বাতাস ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে। জামা-কাপড়-আঁচল নিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করছে। ভাঙ-ভাঙ করে অর্চনার খোঁপাটা ভেঙে পড়ল প্রায়। না, অতবড়, জমাট, কাল খোঁপা কি ভাঙে, কিন্তু অনেকগুলো সাপের জিভের মত শকশকে চুল উড়ে-উড়ে অর্চনার কপাল চোখ কেমন বিষকালি করে দিয়ে যাচ্ছে। অর্চনা নিজেকে সামলে নিচ্ছিল।

'তুমি সঙ্গে থাকবে? কী রকম ভাবে সঙ্গে থাকবে?'

'তা দেখবে তুমি। পৃথিবীর ভাল করা কঠিন। পৃথিবীর ভাল করা যায় না।'

'কে বলেছে তোমাকে? তোমার গুরু?'

'গুরু বলেছে বটে'—অর্চনা অল্পসল্প হাসতে গিয়ে না-হেসে উড়িয়ে দিল বাতাসের ভিতর হাসির অদৃশ্য গুঁড়োগুলোকে। নিশীথবাবুকে অর্চনার গুরু বলছে হারীত? বাতাসে অর্চনার খোঁপাটা ভেঙেই পড়ল প্রায়। এত বাতাস এ দেশে—অথচ ঝড়ের বাতাস নয়—নীল আকাশে রৌদ্রে কোনো মেঘ নেই। দক্ষিণের ঐ জামরুল শিমুল জাম ঝাউয়ের কোকিল ফিঙে নীলকণ্ঠ মাছরাঙাদের পাখার ঝিলিক ডানার সূর্য ইতস্তত নিক্ষেপ করে; কোনো বিরাম নেই—বাতাসের আস্বাদনের কোনো বিরাম নেই।

হারীত একটু ভেবে বললে, 'পৃথিবীর ভাল যে হয় না, সেটা বাবা পঞ্চাশ বছর বয়সে বুঝতে পেরেছেন। আমার তো একত্রিশ। আমি কেন তা স্বীকার করব।'

'আমি স্বীকার করেছি।'

'তা করেছ তুমি ওঁর শিষ্য বলে।'

অর্চনা খোঁপায় হাত দিয়ে সেটাকে ঠিক করে নিল। আলগা বেঁধেছিল অনেক ভারী চুলের মস্ত বড় খোঁপাটা। ঠিক করতে-করতে সেটাকে আলগা করেই রেখে দিল তবু। কোনো কথা বললে না।

'আমি ভেবেছিলুম—'

'থাম, তোমার বাবার কথা এখন থাক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নিশীথের কথাই পাড়ল অর্চনা; বললে, 'তিনি তো কলকাতায় চলে গেছেন; চিঠি লিখলে আসবেন বলেছেন। তা তিনি আসবেন না।'

'কী করে জানলে?'

'এ যদি না-জানলাম—'

'না, এর পর আর নিশীথবাবুর কথা পাড়বার দরকার নেই অর্চনার কাছে। বাতাসে-বাতাসে হারীতের মাথার চুলগুলো কাকের বাসা হয়ে গেছে। অর্চনা তার খোঁপা ঠিক করে নিচ্ছে। হারীত তাকিয়ে দেখল। খোঁপা জুত করে নেবার ছলে নিজের মুখ হারীতকে দেখতে দিচ্ছে না। কেমন যেন সেই মুখ নাকে ঘাম জমেছে, চোখে শিশির; সামনে একটা চনচনে উনুন রয়েছে যেন। 'তোমার স্লো ফিভার হয়, তুমি নিজে বুঝতে পারছ না, কিন্তু আমি টের পেয়েছি।'

'থার্মোমিটার দিলেই মিটে যাবে, কী হয় না-হয়।'

'তুমি জলপাইহাটিতে থাকবার ব্যবস্থা করে ফেলো।'

'থাকব ভাবছি। কত দিন থাকব?'

'রাতে-রাতে জ্বর হলে অনেক দিন থাকতে হবে।'

'কেন, এর বুঝি ওষুধ নেই কলকাতায়?'

'নেই।'

'নেই?'

'তোমার মতন লোকদের নেই—'

হারীত সুমনার অসাড় ঘুমের থেকে বাইরের পাতা, পাখি, বাতাস, সজীবতার দিকে চোখ ফিরিয়ে কেমন যেন এক রকম মনের হঠাৎ উজ্জ্বল্যে বললে, 'ঠিক, শরীরটাকে ভাল করে নেওয়া দরকার। কেমন অবসন্ন হয়ে পড়েছি। ভারী অসুখবিসুখ হয় নি, তবে দুর্বল হয়ে পড়েছি খুব। ভাল হতে হবে।'

'এইখানে থাকো। সেরে ওঠো, এ দেশটাকে যদি ভাল লাগে—থেকে যাও, কাজ করো—'

'ক দিন থাকবে তুমি এখানে?'

'আমি? মৃত্যু অব্দি।'

হারীত একটু চুপ করে থেকে বললে, 'তা হলে আমি যদি থাকি, তা হলে একজন লোক হাতের কাছে পাওয়া যাবে তো আমার মৃত্যু পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, কাজে হাত দিলে আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমার যত দিন কাজ করবার ক্ষমতা আছে।'

'যেন তুমি ভালবাসো না কাউকে।'

হারীত জামরুলের অগণন পাতার ভিতর সাদা-সাদা ফলের দেশে বাতাসের আসা-যাওয়ার এখন খানিকটা নিঃশব্দ, তবুও সমুজ্জ্বল, ব্যবহারের দিকে তাকিয়েছিল। পাতাদের গুপ্ত রাজ্যে একটা ফিঙে বসেছিল; উড়ে গেল।

শিমুল জামরুলের ঘন ঘেঁষাঘেঁষির ভিতর কোকিলটাকে দেখেছিল একবার হারীত। আর দেখছে না।

'কিন্তু একজন মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত; সে তো অনেক দিনের কথা। আমি মরব কিংবা তুমি মরবে—' অনেক দিন পরে হয় তো। কিন্তু সেইদিন পর্যন্ত কি এই রকমই থাকবে সব?'

অর্চনা উঠে দাঁড়াল—'অত দূরের কথা ভাবি না আমি। মরার কথাও ভাবি না। এটা যেন নতুন দেশ, তাও ভাবি না। শরীরটাকে ঠিক করে নাও। থাকো এখানে, কাজ করো। ভালবেসেছ কি কিছু?'

'ভালবেসেছি'—আরো খুলে পরিষ্কার করে বলতে গিয়ে, হারীত অনুভব করল অর্চনা জানতে চাচ্ছে না। উড়ো মরালের স্বৈরী আগ্রহে নয়, সেটাকে শান্ত করে নিবিড় নিবিষ্ট হয়ে হারীত যা বলতে চাচ্ছে সেটা বুঝে দেখতে চাচ্ছে না অর্চনা।

'সে যে জিনিসই হোক, ভালবেসে থাকলে কাজে প্রাণ পাবে, শান্তি পাবে কাজ করে।'

'শান্তি-টান্তি চাই না আমি। তবে মাঝে-মাঝেই করমচার বনে গিয়ে বসতে চাই—তেপান্তরের দিকে মুখ রেখে—ওখানে গিয়ে কথা বললে কেমন হয়।'

'ওঃ। নিশীথবাবু যা চাইতেন না।'

'চাইতেন না বুঝি তিনি?'

'না।'

'কিন্তু আমি তো চাই।'

'তুমি চাও?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আজকালই—'

অর্চনা যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে এ-রকমভাবে বললে, 'কেনো তাড়াহুড়ো নেই এ দেশে।'

কলকাতায় পৌঁছে জিতেন দাশগুপ্তের বাড়িতে এক রাত কাটিয়েছে নিশীথ। সে রাতে জিতেন ছিল তার বাড়িতে। পর দিন সকালেই অফিসে চলে গেল জিতেন। তারপর জামসেদপুর। সকালবেলার থেকে দুপুর অব্দি কেটে গেল নিশীথের জিতেনের বাড়িতে প্রথম দিনটা। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ড্রয়িংরুমে বসে কথাবার্তা হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নমিতার সঙ্গে—তার পর দু'জনেই নিজ মনে বই পড়ে নিল ঘণ্টা দুই-আড়াই। বাইরের দিকে অবিশ্যি মন ছিল না কারুরই; অন্য অনেক কথা ভাবছিল তারা; দু-এক পাতার বেশি পড়া হল না। বই বন্ধ করে সরিয়ে রেখে দিল; ঠিক হয়ে বসল; মুখোমুখি বসেছিল কেমন যেন নিঝঝুম হয়ে। ঠিক বুঝতে পারছিল না। কী কথা বলতে চায়—হয় তো কোনো কথার দরকার নেই তা হলে এখন আর; বাইরের অন্ধকারে থেকে এমন একটা আশ্চর্য পরিভাষায় অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে চৈত্রের বাতাস ঘরের ভিতরে-ফিতরে আনাচে-কানাচে, দেয়াল-ক্যালেন্ডারকে ঠক-ঠক করে কাঁপিয়ে, খোলা বইয়ের পাতা উল্টিয়ে-লড়িয়ে, যেখানে যা রেশমের মত উর্ণা ছিল, মানুষের সোনালি চুল, কাল চুল, শার্টের কলার, শরীরের স্নায়ু হৃদয় জিনিসটাকে বিস্রস্ত বিচলিত করে নিস্তব্ধতার ভিতর শুক্তি প্রসবের মত কী এক অন্তশীল সাড়া নিয়ে উড়ে আসছিল—চলে যাচ্ছিল রাত্রির বাতাস।

'জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। আপনি পড়বেন?'

বাইরের আকাশে সাদা মেঘে কেমন আলো—'না পড়ব না, বাতিটা নিভিয়ে দেওয়া যাক।'

বাতি নেভাতেই চারদিক থেকে ছুটে এসে স্থির হয়ে রইল নানা রকম জ্যোতির্ময় জ্যামিতিক খণ্ডের মত ভিতরের জ্যোৎস্নাগুলো।

'চাঁদটাকে তো দেখছি না।'

'উপরে উঠে গেছে।'

'উপরে? বেশি কি রাত হল?'

'না, আজ সপ্তমী তিথি কিনা। বিকেলবেলার থেতকেই টঙে চড়ে আছে চাঁদ। কী খুঁজছেন; সিগারেটের টিনটা? এই যে আমার সোফায় আমার কোলের উপর'—কোনো কথা না-বলতেই নিজের সোফার থেকে উঠে একটু এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে টিনটা তুলে নিয়ে বললে 'কিছু মনে করবেন না, একটা সিগারেট খাচ্ছি। নিন আপনি একটা।'

'দেশলাই নিন।'

দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে দুটো সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়ল; দুটো কাঠি জ্বালালেও তো হত একটার পর একটা ধীরে সুস্থে—দু'জনের দুটো সোফার দূরত্বের ভিতর বসে থেকে; এ-রকম কথা ভাবতে গেল না কেউ। মনের অবস্থা তাদের পরস্পরকে কেমন যেন কাছে টেনে এনেছে।

টেলিফোন বেজে উঠল, নিশীথ শুনতে পেল প্রথম। বললে না কিছু। নমিতাও না শুনেছে যে তা নয়; সহসা সাড়া দিচ্ছে না।

'আপনার টেলিফোন নমিতা দেবী।'

'শুনেছি। যাচ্ছি। বেরুবেন কি আজ?'

'না।'

'চলুন, মোটরে বেরিয়ে আসি।'

'কোন দিকে?'

'চৌরঙ্গিতে চলুন। আমার একটু মার্কেটিং করতে হবে'—নমিতা বললে।

'এত রাতে?'

'না, রাত তো বেশি নয়। কিছু পাখি আনা যাবে নিউ মার্কেট থেকে কিনে। বাবুর্চি ভাল জিনিস আনে না। পয়সা চুরি করে। মাখন আনতে হবে; প্যাস্ট্রি; কি পাখি ভালবাসেন আপনি?'

'সব পাখিই?'

'ভালবাসেন—সব পাখি?'

'ও, খেতে? না—না—?'

'তবে কি শুয়োরের মাংস? পর্ক?'

'শুয়োরের মাংস আমি খাই নি কোনোদিন—'

'খুব ভাল জিনিস। আপনি হয়তো মিষ্টি খেতে ভালবাসেন—'

নিশীথ এত সব কথাবার্তার বহর করছিল না নমিতার কাছ থেকে। বই পড়ে না-পড়ে দু'ঘণ্টা নিস্তব্ধ হয়ে থেকে—তার পরে বই বন্ধ করে, বাতি নিভিয়ে, তাদের দু'জনে নিরবসন্ন নিঃশব্দ নিবিড়তার ভিতর রয়ে গেছে। নিশীথ মননঘানের সেই বিদূর চৈত্ররজনীর নেপথ্যে থেকে শুয়োরের মাংসের দেশের অবিমিশ্র বাচালতায় নেমে পড়েছে; দেখে, কি সহজ মানুষের মন, এই নারীটির মন।

'টেলিফোন,' নিশীথ বললে, 'অনেকক্ষণ থেকে ডাকছে; কিতেনকে?'

'শুনেছি।'

'এটা অবিশ্যি প্রথম রাতের ফোন।'

'বৌনি হল'—নমিতা একটু হেসে বললে।

'বেশি রাতে ভাল জিনিস আসবে। এখনকার এ ডাকটাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন।'

'বুঝেছি।'

নমিতা উঠে ঘাড় কাত করে হাসতে হাসতে চলে গেল। কলিং বেল বেজে উঠল। নিশীথ বাতি নেভানো ঘরে একা বসে সিগারেট টানছিল। কে ডাকছে কলিং বেলে? কাকে ডাকছে? উঠে যাবে নাকি ভাবছিল। নিচে নেমে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশু এসে বললে—'একজন ভদ্রলোক এসেছেন।'

'মেম সাহেবের কাছে?'

'না, আপনার কাছে। আপনি সেন সাহেব?'

'সেন সাহেন নয়—সেনবাবু। হ্যাঁ।' নিশীথ উঠবার উপক্রম করছিল।

'বিশু বললে, 'ডেকে আনব তাঁকে?'

'আনবে?' নিশীথ চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'আচ্ছা নিয়েসো।' ড্রয়িং রুমের বাতিটা জ্বালিয়ে নিল নিশীথ। বিশু সঙ্গে করে নিয়ে এল; খোলা গলা, হাফ শার্ট, ট্রাউজার পরা ত্রিশ-একত্রিশ বছরের একজন ছোকরা। ভাল করে তাকিয়ে দেখল নিশীথ। এ কে? এ লোকটিকে তো দেখে নি সে কোনোদিন; বিশু চলে গেল। ভদ্রলোক হাসি মুখে নমস্কার জানাল নিশীথকে, প্রতিনমস্কার করে নিশীথ একটু অবাক হয়ে বললে, 'আমাকে চাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকেই।'

'আমি তো নিশীথ সেন।'

'হ্যাঁ, প্রফেসর নিশীথ সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি—'

'আমি তো প্রফেসর নই। বসুন।'

ভদ্রলোক নমিতার খালি করে দেওয়া কৌচে বসে পড়ে বললে, 'আপনি জলপাইহাটি কলেজের ইংরেজির প্রফেসর নন?'

'ওটা কি একটা কলেজ। ওখানে প্রফেসর বলে না।'

'সে সব বিচার করবার ভার তো আমাদের উপর নয়। ছোকরাটি বললে, আমার নাম সুবল মুখুজ্যে, আমি এম-বি পাস ডাক্তার। আমার স্টেথোস্কোপটা হল ঘরে রেকে এসেছি, হারিয়ে যাবে না তো?'

'হল ঘরের বসুন, আমি নিয়ে আসছি।'

'আপনি বসুন, আমি আনছি।'

স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে-দুলিয়ে এবারে আর-একটা কৌচ বেছে নিয়ে বসে সুবল বললে, 'আমি কলকাতার মেডিক্যাল এম-বি, ট্রপিক্যাল ডিজিজেরও রিসার্চ করছি, আমি টিউবারকুলোসিসেরও স্পেশ্যালিস্ট—'

মানুষটির গুণপনা তা হলে কম নয়, দেখতেও মন্দ না। বেশ সুস্থ, সবল, সফল; একটা নির্দোষ ভাবও রয়েছে মুখের মধ্যে; রয়েছে বিবেচনা শক্তির কেমন একটা সহজ সজাগ সাধুতা যেন, নিশীথ অবহিত চোখে সুবলের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

'সিগারেট নিন।'

হাত জোড় করে সুবল বললে, 'মাফ করবেন, আমি খাই না।'

'জলপাইহাটি থেকে এসেছেন বুঝি? নাকি সাব-ডিভিশন থেকে—'

'না। আমি কলকাতায় প্র্যাকটিস করি—'

'ও,' নিশীথ বললে; কী যে অন্যমনস্ক মন তার; এই তো ভদ্রলোক বলছিলেন ট্রপিক্যাল ডিজিজের রিসার্চ করছেন—

'আমি আগে কাঁচড়াপাড়ায় ডাক্তারি করতুম। আজকালও যাই মাঝে-মাঝে সেখানে—'

'ও শিগগির গিয়েছেন?'

'সেখান থেকেই ফিরেছি কাল কলকাতায়।'

'কলকাতায় কোথায় থাকেন আপনি?'

'আমি পার্কসার্কাসে থাকি।'

'সেখানে কি সুবিধে হয়?'

'বড্ড গোলমাল চলছিল। দাঙ্গার সময় পার্কসার্কাসে ছিলুম। খুন করে ফেললেও করতে পরত। কয়েকবার চেষ্টাও করেছিল। ডাক্তার বলে কেউ কেউ আমার উপর সদয় ছিল। কিন্তু ম্যাস-হিস্টিরিয়ার সময় মানুষ তো আর কাণ্ডজ্ঞানে চলে না,'। সুবল বললে, 'পার্কসার্কাসের শাহাদৎ হোসেনের পরিবারই আমাকে রক্ষা করেছে; বিশেষত, মেয়েদের হিম্মতেই বাঁচা সম্ভব হয়েছে—সে এক ফিরিস্তিই বটে—'

'কী হয়েছিল, বলুন।'

সুবল হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আর-এক সময় বলব, নিশীথের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'কাঁচড়াপাড়ার কথা বলছি।'

'সেখানে তো যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে।'

'আছে। দেখেছেন হয় তো।'

'নাঃ যাই নি। সেখানে আমার শালা আছেন, শঙ্কর গুপ্ত, বড় ব্যবসায়ী লোক, কয়েক লাখ টাকা আছে।'

'তাঁকে চিনি আমি, কাল দেখা হয়েছিল গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে। আপনার মেয়েকে কার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন কাঁচড়াপাড়ায় আপনি?'

'আমার মেয়েকে? ভানুকে?' নিশীথের বুকটা দুর দুর করে উঠল, বললে, 'ভানুর খবর কী? আপনি দেখে এসেছেন তাকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বলছি,' স্টেথোস্কোপটা সোফার উপর থেকে তুলে হাতে দুলিয়ে সুবল বললে, 'কিন্তু আপনি বললেন না তো, মেয়েকে কার সঙ্গে পাঠিয়েছেন?'

'কেন, কী হয়েছে, আমি নিজে যেতে পারি নি, আমার নিউমোনিয়া হয়েছিল তখন, জলপাইহাটি কলেজের প্রফেসর মহিমবাবু ভানুকে কাঁচপাড়ায় তার মামার বাড়িতে রেখে এসেছিল। মহিম ফিরে এসে বলেছিল আমাকে, যে ভানুর মামা তাকে যক্ষ্মা হাসপাতালে রেখে দেবেন। ব্যবস্থা করছেন।'

সুবল বললে, 'তারপর আর-কোনো খোঁজখবর নেন নি আপনারা?'

'নিতে পারি নি। নিউমোনিয়া থেকে সেরে উঠতে সময় লাগল। স্ত্রীর খুব বেশি অসুখ হল। চলছে এখনো, বাঁচবে কি না কে জানে। আমার ছেলে তো কলকাতা রানাঘাট, রানাঘাট কলকাতার বাঁশবনে পলিটিক্স করে বেড়াচ্ছে। মফস্বলে মাস্টারি করে সব দিক সামলানো বড় কঠিন সুবলবাবু।'

'একটা চিঠিও তো লেখেন নি?'

'কাকে? শঙ্করবাবুকে? আমার স্ত্রী লিখেছিলেন। কোনো উত্তর পান নি।'

'শঙ্করদা তো বললেন না কিছু চিঠির কথা—'

'বলেন নি? নিজেও আমাদের জানান নি কিছু। কেমন আছে ভানু?'

'বেড পায়নি কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে—'

'বেড পায়নি; নিশীথ আকাট অন্ধকারে সুবলের দিকে তাকিয়ে রইল। 'কোথায় আছে তা হলে?'

নমিতা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে সুবলকে দেখে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে, 'আমি যাচ্ছি, নিশীথবাবু।'

'কোথায়?'

'পার্কসার্কাসে।'

'আপনার বাবা ডাকছেন বুঝি? কেমন আছেন তিনি?'

'নমিতা একটু থেমে বললে, 'আছেন এক রকম। আগের চেয়ে যে খারাপ তা নয়। কিন্তু মা ডেকেছেন ও—ফ্ল্যাটে, মার বড্ড অসুখ হয়ে পড়েছে।'

'কী হয়েছে?'

'মাথায় যন্ত্রণা খুব, জুলফিকার ফোন করেছিল। আমাকে যেতে বলেছে,' আড়চোখে সুবলের দিকে তাকিয়ে নমিতা বললে, 'ইনি কে?'

'ইনি হলেন সুবলবাবু, ডাক্তার সুবলবাবু।'

'আজ্ঞে—'

'ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত নমিতা দাশগুপ্ত, আমার বন্ধু গ্রাহাম অ্যান্ড গ্রাহামের শ্রীযুক্ত জিতেন দাশগুপ্তের স্ত্রী'—হাসির ঝিলিক, নমস্কার দেয়া-নেয়া শেষ হয়ে গেলে নমিতা বললে, 'আচ্ছা আমি উঠি। জুলফিকার আমাকে ডাকছে—'

'জুলফিকারের অসুখ?'

'না, সে ভাল আছে। অসুখ শুধু মার।'

'আপনার বাবার অবস্থাও একই রকম?'

নমিতার জ্রূ দুটোর মাঝখানে একটু খিঁচ এসে পড়েই মিলিয়ে গেল, বললে 'প্রায় সেই রকমই। একটু খারাপ হয়েছে হয় তো। ডাক্তারবাবু আসবেন।'

'ডাক্তার রোজেনবুর্গ?'

'রোজেনবুর্গ!'

'জুলফিকার'—নিশীথ থেমে গেল।

'জুলফিকারের কথা কী বলছিলেন? জুলফিকার দুবার ফোন করেছিল, আমাকে বললে। এবারে যে করেছে তার আধ ঘণ্টা আগে আরেক বার।'

'কই শুনি নি তো। আপনি শুনেছিলেন?'

'না। শুনি নি তো। কী হল?'

'জুলফিকার নিজে বলেছে যে ফোন করেছিল?'

'নিজের মুখে বলেছে জুলফিকার'—নমিতা বললে।

'তা হলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয় না,' নিশীথ বললে।

নিশীথের মুখের গম্ভীর নিস্তব্ধতার দিকে তাকিয়েই কেমন যেন একটু হাসি পেল সুবলের। সুবলের মুখে যে-হাসির ভাব এসে পড়েছে নমিতার সেদিকে দৃষ্টি ছিল না; নিশীথ আন্দাজ করছিল হয় তো যে সুবল হাসছে। কিন্তু সে সুবলের দিকে ফিরে তাকাচ্ছিল না।

'জুলফিকার শব্দের মানে কী?' নিশীথ জিজ্ঞেস করল। নমিতা মানে জানে না। কোনো ইংরেজির থেকে ইংরেজি, বাংলার থেকে বাংলা কোনো অভিধানেই শব্দটির মানে পাওয়া যাবে না, সুবলও বলে দিতে পারে না। কোনো রকম ডিকশনারিই নেই এ বাড়িতে; কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল নিশীথ।'

'জুলফিকার—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কি বলছিলেন জুলফিকার'—সচকিত হয়ে মুখ তুলে তাকাল নমিতা।

'জুলফিকার হয় তো ভুল করেছেন? আধঘণ্টা আগে ফোন সে করে নি।'

'তবুও বলেছে ফোন করেছে এটা কি রকম ভুল?'

নিশীথ তার চোখ দুটো সুমুখের দেয়ালের ওপর—তারও উপরে বিমের দিকে তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললে, 'এ ধরনেরও এক রকম ভুল আছে বটে।'

'তা থাকতে পারে,' নমিতা তেরছা মাথায় আড় চোখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু কোনো রকম ভুল করবার ছেলে নয় তো জুলফিকার।'

'কখনো ভুল হয় না তার?'

'এ বয়সে কেন হবে?' নমিতা বললে, 'কোনো বয়সেই হয় না ওর মতন মানুষের।'

'সকলেরই ভুল হয়, শয়তান ছাড়া,' নিশীথ একটু দুষ্টুমি করে হেসে বললে। নমিতা ডোরাকাটা স্ল্যাকস পরে এসে ছিল, পায়ে উইমেনজ ওকসিলারি কোরের মিলিটারি জুতো, কিউই দিয়ে পালিশ করতে-করতে নিজের মুখ তাতে দেখে ফেলেছে হানিফ। বুট সমেত ডান পাটা খানিকটা উঁচিয়ে স্ল্যাকসের ডোরাগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে নমিতা বললে, তা হলে শয়তান হবে জুলফিকার। কী মানে আছ স্বর্গের, যদি সেখানে জুলফিকারের মত শয়তান না থাকে।

হাদিসের কথা। সন্ধেবেলা মাঝদিঘির ঘাপটিতে যে-সব রুই-চিতল চরে বেড়ায় তাদের মুড়ো ল্যাজের তেল-চকচকে কথা।

'নিশীথ নিজের হাতের নেবানো সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল আবার।'

নমিতা সিগারেট জ্বালিয়ে নিল—'টেলিফোনে জুলফিকারের গলা রিসিভার ধরলেই আমি বুঝতে পারি। জিতেনের গলার চেয়ে ভাল করে চিনি আমি জুলফিকারের গলা।'

'কেমন ফ্যাসফ্যাস করে যেন টেলিফোনে জিতেনের গলা'—নমিতার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে।

'না তা নয়; জিতেন পেটে আধখানা কথা রেখে দেয় কি না, সেই জন্যেই অস্পষ্ট। বেশ পরিষ্কার করে বলে সব জুলফিকার। আমি উঠি। আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

'কে? মা?'

'না, জুলফিকার।' নমিতা চলে যাচ্ছিল, নিশীথ ডাক দিয়ে বললে, 'শুনুন নমিতা দেবী।'

নমিতা ফিরে এসে খুব অভিনিবেশের সঙ্গে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কি?'

'আমি বলছিলুম জুলফিকার'—নিশীথ বললেন না কিছু; নমিতা দাঁড়িয়ে রইল। নিশীথ বললে না আর-কিছু। কী বলবে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল নিমতা।

'জুলফিকার কি? কি বলছিলেন জুলফিকার?' নমিতা জিজ্ঞেস করল।

'আমি বলছিলুম, জুলফিকার কী সিরেফ জুলফিকার?'

'আচ্ছা', সুবলের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি চারিয়ে নিশীথের পিঠে টোকা মেরে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল নমিতা। যাবার সময়ে বলে গেল, 'খেয়ে নেবেন নিশীথবাবু। নটা-দশটার সময়, আজ রাতে যদি বাড়ি না ফিরি। ফিরব না হয় তো।'

'জুলফিকার কি সিরেফ জুলফিকার?' বেশ গলা ছেড়ে বলে উঠল নমিতা হল ঘরটা পেরিয়ে যাবার সময়। হো হো করে হেসে উঠল। 'My!' নেমে হানিফের স্ল্যাঙ, খানিকটা জোর উর্দু ঝেড়ে মোটর বার করে নিয়ে চলে গেল। খুব চিন্তিত মুখে সুবলের দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে, 'কাঁচড়াপাড়ায় বেড পায় নি। কোথায় আছে ভানু তা হলে? একটা চিঠি লিখেও জানালেন না আমাদের শঙ্করবাবু—তা হলে তো আমি নিজেই কাঁচড়াপাড়ায় গিয়ে ব্যবস্থা করতাম।'

'তিনি তো আপনাদের দুষছেন। কোনো খোঁজ খবরই নিলেন না আপনারা।'

তা দুষতে পারেন বটে, আমাদেরই দোষ, স্বীকার করে নিল নিশীথ, কোথায় আছে ভানু?

'এত দিন তো শঙ্করবাবুর বাড়িতেই ছিল—তাঁর মোটেই ইচ্ছে নয় যে তাঁর ওখানে থাকে, নিজের বাড়িতে যক্ষ্মা রুগিকে রাখতে চান না তিনি।'

'তা জানি। ভানুর মামা হন তিনি, কিন্তু আমাদের কারুর সঙ্গেই কোনো আত্মীয়তা রাখতে চান না। ডেকেও জিজ্ঞেস করেন না তাঁর সহোদর বোনকে, আমার স্ত্রীকে।'

সুবল স্টেথোস্কোপটা একবার শূন্যে নাচিয়ে নিয়ে বললে, 'বড় বিচ্ছিরি রোগ। কেউ, রাখতে চায় না থাইসিসের রুগিকে নিজের বাড়িতে, নিজের বাচ্চা হলেও রাখতে চায় না।'

নিশীথ তার হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল। পকেটের থেকে একটা কৌটো বার করে ক্যাকটিনা পিল গিলে ফেলে বললে, 'ঠিকই তো। কিন্তু এত বড় এক জন লোক শঙ্করবাবু, কাঁচড়াপাড়ায় একটা বেড যোগাড় করে দিতে পারলেন না। কেবিনও তো পারতেন ঠিক করে দিতে।'

'ভর্তি যে হাসপাতাল।'

'আর যাদবপুরে?'

'আমি নিজে গিয়ে চেষ্টা করেছি যাদবপুরে—'

'ভানুর জন্যে?'

'হ্যাঁ। ভর্তি একেবারে হাসপাতাল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশীথ বললে, 'আদ্যিকাল থেকেই ভর্তি হয়ে আছে? নতুন রুগি আর আসছে না? কথা হচ্ছে আমাদের রুগির জন্য বেড নেই। শঙ্করবাবু গা দিলে কোথাও না কোথাও বেড পাওয়া যেত। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে কি আর বেড জোটে? অবিশ্যি আমার মেয়ে, দায়িত্বটা আমারই। কিন্তু আমি জানতে পারি নি তো এই রকম হয়েছে—'

'শুধু চিঠিফিটিতে হয় না, আপনি একবার গেলে পারতেন নিজে কাঁচড়াপাড়ায়, নিউমোনিয়া থেকে উঠে—'

'ভুল হয়ে গেছে। আমি উঠে দাঁড়াতে না—দাঁড়াতেই কঠিন রোগ হল আমার স্ত্রীর। কিন্তু তবুও আমার যাওয়া উচিত ছিল। কেমন আছে ভানু?'

'শঙ্করদা আর রাখতে চাচ্ছেন না ভানুকে।'

'রাখতে চাচ্ছেন না? কেন, মরে যাচ্ছে ভানু?'

'আপনি কলকাতায় এনে রাখতে পারবেন না?'

'ভানুকে? কাঁচড়াপাড়ায় কি বেড পাওয়াই যাবে না?'

সুবল দেখে এসেছে, জেনেছে, সতর্কিতভাবে মাথা নেড়ে বললে, না 'শিগগির নয়।'

'যাদবপুরেও না!'

'বড়লোক দিয়ে বড়লোককে খোশামুদি না করিয়ে নিতে পারলে পাওয়া কঠিন। জানাশোনা আছে মন্ত্রীদের কারুর সঙ্গে আপনার?'

নিশীথ অনেক জলে পড়া স্নিগ্ধ হাঁসের মত সফলতার, ঘরের অবিরাম বাতাসের মধ্যে বসে থেকে বললে, 'মন্ত্রীদের সঙ্গে আমার? না সে সব নেই কিছু।'

'ভেবে দেখুন তো ভাল করে। আজ কাল তো স্বাধীনতার নানা সুবিধে সব দিক দিয়েই।'

'স্বাধীন মন্ত্রীদের কাউকে চিনিনে আমি। কাউকেই না।' নিশীথ সুবলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'না, ব্যোমকেশ চক্কোত্তি গয়নভি গজচক্র বলত সেই মিনিস্ট্রিতে সে সময়। গজচক্রের আমল থেকে আজ অব্দি কত মিনিস্ট্রি এল গেল, আমার বাবাও চেনেন নি কাউকে, আমিও না। স্কুল কলেজে পড়ি নি এদের কারুর সঙ্গে। বড় মানুষ হলে স্কুলে কলেজের ইয়ারদের কথা মনেও থাকে না কারুর।'

'অ্যাসেম্বলি কোনো হোমড়াচোমড়াকে চেনেন?'

'কাউকেই চিনি নে।'

'কর্পোরেশনের—?'

'কিংবা বি-পি-সি-সি, অভয়াশ্রম সোদপুর—কাউকেই চিনি নে দাদা। থাকি জলপাইহাটিতে, কী করে চিনব? কলকাতায় এলে বড়লোক ঘেঁষি না। জিতেন আমারই মতন ফর্দা লোক ছিল যুদ্ধের সময়ও; ওর সঙ্গে মিশতে-মিশতে দেখতে-দেখতে ও বড় লোক হয়ে গেল।'

'দাশগুপ্ত সাহেব হয় তো চেনেন অনেককে?'

'তা চিনতে পারেন', চিন্তিত মুখে, কোথাও কোনো সমাধান আছে কি না সন্ধান করতে-করতে বললে নিশীথ, 'দাশগুপ্ত নেই তো এখানে।'

'নেই?'

'জামসেদপুরে গিয়েছেন।'

'মিসেস দাশগুপ্তকে বলে দেখলে হয়। অনেক বড়-বড়, চক্রে চলাফেরা, মানুষটিও বেশ দরদি, দরাজ, তাই তো মনে হল।'

নিশীথ সোফায় ঠেস দিয়ে ঘাড়ে একটা ভাঁজ ফেলে ডান হাতটা তুলে আঙুলের নখের দিকে তাকিয়ে সাত-পাঁচ ভাবছিল; নমিতাকে কী বলতে হবে নিশীথের, কাঁচড়াপাড়া যাদবপুরের টি-বি হাসপাতালের বেড বুক করা যায় যাতে কাউকে ধরে-টরে খুব তাড়াতাড়ি? আজ তো এই প্রথম দেখা নমিতার সঙ্গে। এ নামে কোনো স্ত্রীলোক আছে গতকালও তো জানত না সে। নিশীথকে যে কে ভাল করে জানত না নমিতা। নিশীথের পারিবারিক কথা জিজ্ঞেস করে নি, নমিতাকে বলেও নি কিছু সে। জিতেন দাশগুপ্তও তো জানে না রানু হারিয়ে গেছে, ভানুর যক্ষ্মা, সুমনা এই রকম, হারীত ঐ রকম, নিশীথের নিজের ব্যারপারটাও সব রকম; এ তো জিতেন জানে না, জানতে চায়ও না। যে-সৌহার্দ ভাঙিয়ে খেয়ে জিতেনের বাড়িতে এবারেও উঠেছে নিশীথ সে জিনিসের চেহারা এতদিনে কী রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক করে বুঝবার অবসর না দিয়েই জিতেন তো জামসেদপুরে চলে গেছে।

যদি নিশীথ বোঝে যে ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না, তা হলে নিজেকে জোর করে এ বাড়িতে গছিয়ে দিয়ে থাকবে না সে। কলকাতায় আজ-কাল বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না, গোয়াল পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও কোনো গোয়ালে গ্যারেজে জোটে কি না আস্তানা খুঁজে দেখবে। না হলে জলপাইহাটি ফিরে যেতে হবে। মিছে কারুর উপর অবিচার করতে চায় না নিশীথ। জিতেন ও নমিতা দু'জনেই—যা দেখছে নিশীথ—লোক ভাল, কিন্তু এখানে অনাহ্বানে রবাহুত অতিথির মত এসে বেচারিদের পারিবারিক স্বাধীনতা নষ্ট করার কোনো অধিকার নেই তো নিশীথের।

'ভানুকে অবিলম্বেই কলকাতা আনতে হবে?'

'আজ তো হবে না, কাল আনলেই ভাল হবে।'

'নিশীথ চক্ষুস্থির করে থাকল—'দুটো দিনও আর সবুর সইবে না?'

ঘড়ির ডায়ারের মত স্টেথোস্কোপটা দোলাতে-দোলাতে সুবল বললে, 'না, আর পারবেন না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি যদি কলকাতায় না আসতাম এখন? আমি যে এখানে এসেছি তাঁকে তা কে বললে?'

'অনেক দিন থেকেই তো লোক পাঠাচ্ছেন এখানে আপনার খোঁজে। কলকাতায় এলে যে এখানে থাকেন আপনি, শঙ্করদা জানেন তো। শুনেছিলেন আপনার আজ-কাল কলকাতায় আসবার কথা।'

শঙ্করবাবুর কাছ থেকে এসে এ বাড়িতে আমার খোঁজ করত ভানুর ব্যাপার নিয়ে? একটু অসুস্থ বোধ করল নিশীথ—'কাকে পাঠানো হত?'

'আমিই তো এসেছি বরাবর।'

'কার কাছে খোঁজ নিয়েছেন আপনি?'

'দাশগুপ্ত সাহেবের কাছে। হানিফের কাছে।'

'মিসেস দাশগুপ্তের কাছে?'

'না, ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি! দাশগুপ্তকে আমি জিজ্ঞেস করে যেতাম কলকাতায় আপনি এসেছেন কিনা। এ ছাড়া আর-কিছু বলার দরকার হয় নি তাঁকে, তিনিও জিজ্ঞেস করেন নি কিছু।'

এই তো এইমাত্র ক্যাকটিনা পিল খেল, বুকের ভিতর কেমন ধড়ফড় করছিল বলে। হার্টে অসুবিধা, নিশ্বাসে কষ্ট। একটু ভাল বোধ করতেই সিগারেটের টিনটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল আবার নিশীথ।

'কোথায় আনি ভানুকে। কী করি?' ক্লিষ্ট মুখে সিগারেটের টিন হাতে করে নিশীথ বসে রইল।

'এ বাড়িতে তো আনা যেতে পারে?'

'এটা তো আমার নিজের বাড়ি নয়—'

'নিচের তলায় দূরে একটা আলাদা ঘরে থাকতে পারে।'

'ও রকম রুগিকে নিজের বাড়িতে কেন রাখবে জিতেন? আমি কেন রাখতে দেব? জিতেন হয় তো রাজি হয়েও যেতে পারে—কিন্তু না,' নিশীথ ঘাড় নেড়ে বললে, 'আপনি ডাক্তার মানুষ, সুচিন্তাও করছেন। বোঝেন তো 'তা দিক দিয়েই জিনিসটা খারাপ—খুব খারাপ হবে।'

'তা হলে শঙ্করবাবুকে বেশি দোষ দিতে পারেন না। তিনি তো এতদিন রেখেছেন।'

নিশীথ বললে, 'তা ঠিক। যারা উপকার করে তারা একটু চাঁট মারলেই আমরা হেলে পড়ি। অবিচার করি। শঙ্করবাবু আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। কে কার জন্যে করে? কিন্তু তিনি করেছেন।'

'কিন্তু একন কী করবেন?'

'কলকাতায় যে-সব আত্মীয় বন্ধু আছে আমার তাদের বাড়িতে, উঠে বা এক বেলা থাকতে আমি নিজেই সঙ্কোচ বোধ করি। ভানু কী করে—'

'কালকের ভিতরেই একটা কিছু ঠিক করে ফেলতে হবে তো। অজই গিয়ে বলতে হবে শঙ্করবাবুকে।'

নিশীথ মরীয়া হয়ে বললে, 'চার পাঁচদিন পরে জিতেন ফিরে আসবে। এ কটা দিন অপেক্ষা করতে পারবেন না শঙ্করবাবু?'

'ওঁরা কালই পুরী চলে যাচ্ছেন।'

'কালই।'

নিশীথের শার্টের গলার বোতাম খোলা ছিল, কেমন একটা হাঁফ বোধ করে আর-একটা বোতাম খুলে দিল সে; বললে, 'মিসেস দাশগুপ্ত আজ রাতে আর ফিরবেন বলে মনে হয় না। না হলে তাকে বলে এই বাড়িতে কয়েকটা দিনের জন্যে একটা ব্যবস্থা করে নেয়া যেত—'

'একটা ফোন করে দিন মিসেস দাশগুপ্তকে—'

'এখন এ বিষয় নিয়ে তাকে ফোন করা চলে না।'

'কেন?'

'মিসেস দাশগুপ্ত জুলফিকারদের সঙ্গে একটু মজলিস করতে গেছেন।'

বলে ফেলে কেমন একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। কথাটা বোধ হয়, (ঠিক জানে না নিশীথ) 'মিসেস দাশগুপ্ত জুলফিকারের সঙ্গে রাত কাটাতে গেছে। কিন্তু সে কথা সুবলকে সে তো বলতে পারে না। যা বলেছে সেটাও বলা উচিত হয়নি হয় তো। মা-বাবাকে দেখতে গেছে। আজ ওখানেই থাকবে—এইটুকু কথা বলা উচিত ছিল সুবলকে।

'মজলিসে কি মদ খাওয়া হবে?'

নিশীথ মাথা নেড়ে শান্ত অব্যয় মুখে সুবলের দিকে তাকাল—'না মদ নয়। মিসেস দাশগুপ্তের বাবার প্যারালিসিস। মারও হঠাৎ অসুখ করেছে। তাঁদের দেখতে গেছেন মিসেস দাশগুপ্ত। জুলফিকারের স্ত্রী আগের থেকেই ওঁকে নেমন্তন্ন করেছিল। যদি সম্ভব হয় এক ফাঁকে সেটা রক্ষা করে মা-বাবার তদারকের জন্য যেতে হবে। ওঁরা পার্কসার্কাসে দুটো পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকে।'

সুবলকে গোটা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে সুবলের মুখের দিকে নিশীথ তাকাল আর-একবার।

'তা হলে উনি আজ রাতে আর আসবেন না। কাল সকালে কি আসবেন?'

'তা আসতে পারেন।'

'যদি না আসেন, কাল নিশ্চয়ই ফোন করতে পারবেন আপনি।'

'কাল ফোন করে একটা ব্যবস্থা করে যদি পরশু ভানুকে এখানে আনা যায়, তা হলে চলবে সুবলবাবু?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সুবল একটু নরম হয়ে বললে, 'তা বরং হতে পারে। বলে-কয়ে এক দিন তারিখ সরানো যেতে পারে। পরশু পুরী যাবেন।'

'কিংবা কাল ওঁরা পুরী চলে যাবার আগে যদি আমি কাঁচড়াপাড়া গিয়ে শঙ্করবাবুর কাছ থেকে তদারকি বুঝে নিয়ে চার-পাঁচটা রাত থাকি কাঁচড়াপাড়ায়, তারপর জিতেন এলে ভানুকে নিয়ে এখানে চলে আসি?'

'সব ঘর-দোর বন্ধ করে যাবেন ওঁরা পুরী যাবার আগে।'

'ভানু যে-ঘরে থাকে সেটাও?'

'হ্যাঁ। সেটা তো একটা ছোট খড়ের ঘর, ওদের দরদালানের থেকে চারশ হাত দূরে। সেটা পুড়িয়ে দিয়ে যাবে। ডিজইনফেক্ট করে যাবে সব।'

মুখ-চোক কেমন কঠিন নিশব্দ হয়ে রইল। নিশীথের কথা বলা দরকার। কী ব্যবস্থা করবে তার একটা পরিষ্কার নির্দেশ, কিন্তু নিশীথ নির্দায় নির্বর্ণ হয়ে বসে রইল।

'আমি একটা কথা বলি আপনাকে। সেইজন্যেই এখানে এসেছিলুম। পার্কসার্কাসের ফ্ল্যাটে আমি আর মা আছি, আর কেউ নেই। ভানুর চিকিচ্ছে আমিই করেছি কাঁচড়াপাড়ায়। আমার মনে হয় না, দুটো লাঙ্গসেই ধরেছে। আবার এক্সরে করতে হবে। রোগ কঠিন খুব। কিন্তু আশা ছেড়ে দেওয়া যায় না। ভানুকে আমার ওখানে রাখতে চাই। আমার মার আপত্তি নেই। আপনার অনুমতি আছে?'

নিশীথ নিজের চিন্তা-সকল্পের ছেঁড়া-ছেঁড়া খড়গুলোর ভিতর থেকে অন্ধকারে অন্ধ চোখে কিছু গ্রথিত করে নেবার চেষ্টা করছিল—খুবই এক মনে দেয়াল, কার্পেট, সোফা, বই, বাতাস, বাতি, সুবলেরও অস্তিত্বের উপর চার-আনি মনের-ক্রমায়ত নির্মনের সিট আবরণ টেনে দিয়ে যেন। সুবল কথা বলে যাচ্ছে টের পাচ্ছিল সে, কী বলছে সেটা শুনে, না শুনে, বুঝে, না বুঝে সুবলের কথা শেষ হল যখন তার স্বরূপ অনুভব করে নিতে পারল; বাতাসে আলোয় চিন্তার সুস্থিরতার ভিতর নিশীথ ফিরে এসেছে যেন প্রায়।

'হ্যাঁ আছে'—নিশীথ বললে।

'তা হলে আজ রাতেই নিয়ে আসবে ভানুকে?'

'আজ রাতেই। তা কী করে হয়?'

'আমার মোটরে।'

ও মোটরও কাছে তা হল সুবলের। নিশীথ একটু ভেবে বললে, 'আজ থাক। অত তাড়াহুড়ো—'

'আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। মাও জানে যে আজ রাতেই ভানু আসবে।'

'ভানুকে দেখেছেন আপনার মা?'

'না।'

'আপনার ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?'

'মা ছাড়া কেউ নেই।'

নিশীথ ইলেকট্রিক আলোর বাল্বের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চোখ থেকে সেই ঝাঁপটা ঝেড়ে ফেলতে-ফেলতে বললে, 'কিন্তু রুগির ছেঁড়া-ছানার ভিতর এ-রকম ভাবে লেপ্টে পড়াটা ঠিক হবে না সুবলবাবু। আপনি তো ডাক্তার, এরই স্পেশালিস্ট বটে, কিন্তু তাই বলে কি এ জিনিস নিজের ঘরের ভিতর এনে রাখতে হবে?'

'ভানুর কাছে মা যাবেন না।'

'কিন্তু একই ফ্ল্যাটে তো। কী করে এ কাজে সায় দিলেন আপনার মা? তিনি কি আপনার হাল ছেড়ে দিয়েছেন?'

সুবল স্টেথোস্কোপটাকে ছড়িয়ে বিছিয়ে বললে, 'মা আমার ছোটবেলার থেকে যা চেয়েছেন আমি সব সময়ই তা করেছি। এখন এমন একটা অন্যায় বিশ্বাস হয়েছে আমার উপর যে, আমি যা দাবি করি তাতেই তিনি রাজি হন—'

'বিশ্বাসটা অন্যায় আপনিই তো বলেছেন।'

'হ্যাঁ অন্যায় বই-কি'—সুবল বললে, 'এ-রকম যক্ষ্মা রুগি নিজের বাড়িতে রাখা বড্ড নিরেস।'

'তবে?'

সুবল স্টেথোস্কোপ ঘাড়ে ঝুলিয়ে কথা ভাবছিল, কিছু বললে না।

'ভানুকে, আমাকে বিপন্ন দেখে এ-রকম ব্যবস্থা করবার মত মেজাজ-টেজাজ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে তো আপনার বয়সের মানুষের। কিন্তু তবুও ভাল জিনিস আছে কিছু পৃতিবীতে। থাকে সব সময়ই।'

এবারও নিজের মনে স্টোথোস্কোপ নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল সুবল; বাতাসে শার্টের কলারটাই উড়ে ঘুরে মিহি আওয়াজ করছে; আর কোনো শব্দ নেই কোনোদিকে; নীরবতা ভাঙবার কোনো উপক্রম দেখা গেল না।

'কারো-কারো জীবনের।'—বললে নিশীথ আবার

'আমি উঠি, রাত হয়েছে।'

'ভানুকে আপনাদের বাড়িতে রাখলে আপনাদের ক্ষতি হতে পারে সেটা স্বীকার করেন তো?'

সুবল বললে, 'রোগ যে-রকম গড়ে বসেছে, তাতে খুব সাবধানে থাকলেও আমার না হোক, মার হয় তো হতে পারে।'

'খুব সাবধানে থাকলেও?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভানুকে দেখতে মা দিনে দু-চারবার যাবেনই, ঠেকানো যাবে না। আমি বাড়ি না-থাকলে আরো কী করবেন, না করবেন, বলা যায় না। খুব বেশি স্নেহআর্তি—মাকে ভালবাসি আমি। এই পৃথিবীতে মা ছাড়া কেউ তো আমার নেই।'

'সুবলবাবু, জেনেশুনে কেন কেউটে ঢোকাচ্ছেন ঘরের ভিতর?'

পৃথিবীতে আহ্নিক গতির একটি ধ্বনিকণার মত বিলীন হয়ে যাবার আগে বললে নিশীথ। সুবল উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে দিল নিশীথকে—'এই যে আমার ঠিকানা। ফোন নম্বরও আছে। কার্ড আপনি হারিয়ে ফেলবেন, ঠিকানা আপনার বইয়ে এক্ষুণি টুকে রাখুন নিশীথবাবু—' বলে, চলে যাবার আগে ঘরের ভিতর রাতের ভরপুর বাতাসের ভিতর দাঁড়িয়ে সুবল বলবে ভাবছিল, ভানুকে আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু তবুও নিশীথকে বললে না কিছু।

প্রায় আন্দাজ করে ফেলেছিল যেন নিশীথ। কিন্তু বিশেষ কোনো তথ্য নেই তার হাতে—ক্রমেই বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছে তার মন। তেমন কোনো স্পষ্ট সম্বন্ধচিহ্নের অভাবে সুবলের মনের ভিতর প্রবেশ করতে চেষ্টা করল না সে। ছেলেটি অনেকক্ষণ হয় চলে গেছে। বাতি নিভিয়ে রাখল। অন্ধকার। দমকা বাতাসে মেঝের আনাচে-কানাকে মাথা কুটে মরছে ফোন নম্বর—নাম—কার্ড—

রাত দশটা—সাড়ে দশটার সময়েও নমিতা ফিরল না। তা হলে ফিরবে না আর আজ রাত অনুভব করে নিয়ে নিশীথ চান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে জিতেনের শোয়ার ঘরের পাশে তার বাড়ির অফিস ঘরে ঢুকল। দিব্যি বিছানা তৈরি আছে। সোফা, কুশন, ইজিচেয়ার রয়েছে। সিলিং ফ্যান, টেবল ফ্যানও। ঘরে যেরকম বাতাস লেখছে তাতে ফ্যানের দরকার হয় না। ধবধপে মশারি খাটের এক দিককার দুটো রডের সঙ্গে আটকানো রয়েছে। দরকার হলে টানিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এত বাতাসে মশা আসবে কোত্থেকে। নমিতা জলের কথা ভোলে নি। দুটো বড়-বড় সোরাই ভর্তি করে জল রেখে গেছে, এ জল ওয়াটারকুলারে ছিল, তা হলেও বড় আইস প্রুফ কাচের পাত্রে বরফের কুচি রেখে গেছে ঢের, রেফ্রিজারেটরের থেকে বার করে আট দশ বোতল স্কোয়াশ, মিনারেল ওয়াটার ইত্যাদি। এত বাতাস, এত জল, এত ঠাণ্ডা, এখন শরীরে একটা জিনিসের দরকার শুধু, ঘুমের আবেশ। আজ রাতে খুব লম্বা চৌকশ ঘুম না দিলে চলবে না নিশীথের। কাল সে ঘুমোতেই পারে নি ভাল করে। শরীরটাকে কেমন দুর্বল লাগছে। বয়স বেশি হয়েছে। অনাচার চলছে। হার্টের অসুখে অতিরিক্ত চা-কফি-সিগারেট খেয়ে চলছে সে। নিশীথের মনে হল, তার শরীরের যে-রকম অবস্থা তাতে ডাক্তার না দেখালেও খাওয়া-দাওয়া চলাফেরার সংযমের দরকার। কিন্তু জিতেনের এ বাড়ি থেকে শরীর মনকে নির্লিপ্তি দান করা কঠিন। নমিতার বয়স ঢের কম, জীবনবোদ একেবারেই অন্য রকম। রয়েছে কেমন যেন এক অখল অবনমিত উত্তেজ নমিতার হৃদয়ে শরীরে; কখনো ঝর্ণার মত ঠাণ্ডা, কখনো কড়া লবণের ঝাঁঝের মত, যেন নিঃসাগরিক দেশ থেকে আগত পথিকের চোখে মুখে।

নমিতার সঙ্গে তাল রেখে চলা শক্ত নিশীথের পক্ষে। জিতেনের টাকা আছে, স্নায়ু ও আয়োজন আড়ম্বরে অক্লান্তি, সে নমিতার পৃথিবীতে না চরলেও সেখানে মাথা ঠিক রেখে ঢোকে, নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলাফেরা করে, দরকার মত বেরিয়ে পড়তে পারে। তবুও জিতেন হয় তো ঠিক এ-রকম জিনিস চায় নি, নমিতার চেয়ে বেশি আত্মস্থ, নিজের চিন্তা আকাঙ্ক্ষার নিকট নিকটতম আত্মীয়ের মত কোনো স্ত্রীলোককে পেলে ভাল হত তার?

এক গেলাস জল খেল নিশীথ। কোনো বোতল ভাঙতে গেল না। তেপয়ের উপর দু-তিনটে সিগারেটের টিন, একটা টিন হাতে তুলে নিয়ে দেখল; ওয়েস্টমিনিস্টার। সিগারেট ঠাসা, চমকার গন্ধ বেরুচ্ছে। ক্যাকটিনা পিলও খেতে হয়, সিগারেট তবুও খাবে সে? দুটো সিগারেট বার করে নিল নিশীথ। বড় তেপয়াটার উপর কতকগুলো বই; ইংরেজি উপন্যাসও আছে; বাংলা নেভল একখানা দেখল সে, বইটা পড়েছে সে; এ বইটা তা হলে গ্র্যাহাম অ্যান্ড গ্র্যাহামের বড় সাহেব জিতেন দাশগুপ্তের অফিস ঘরেও ঢুকে পড়েছে। বেহুলার লৌহগৃহ ভেঙে কালনাগের মতন বুঝি? নাকি এ এই বেহুলা নিজেই সেঁধিয়েছে? কে দিয়েছিল? জুলফিকার? জওহরলালের একখানা বই আছে; অরবিন্দর ইংরেজি বই একটা, আর-একটা ইংরেজি অনুবাদ। ইংরেজির বাংলা অনুবাদও পড়ে। কে পড়ে, নমিতা না জিতেন? না নিশীথের দরকার হতে পারে সেই জন্য সকালবেলা যে বেড়িয়েছিল নমিতা, কুড়িয়ে এনেছে চার দিক থেকে? একটা বাংলা বই তুলে নিল জিতেন; দু-চার পাতা পড়ে রেখে দিল। ফয়েকটভাঙ্গেরের উপন্যাসটা তুলে নিয়ে দেখল ওটা ইংরেজি অনুবাদ নয়—মূল জার্মান, জার্মান ফরাসি শিখবার ইচ্ছা অনেকদিন থেকে নিশীথের, কিন্তু জীবনের অনেক ইচ্ছার মতই এও উথায় হৃদি লায়ন্তে; একটা নিঃশ্বাস ফেলে, দুর্বল শরীরে হার্টের অসুবিধা বোধ করে বইটা রেখে দিল সে, দুহামেলের একখানা বই, জিদের একখানা। অনুবাদ? না, সনাতন ফরাসি। যত পাতা ওলটানো যায় সবই অমর পরিষদের ফরাসি। ইংরেজি বই যে-গুলোকে ভেবেছিল নিশীথ, তা হলে সেই বইগুলো এ-রকম; এই রকম ইংরেজি বর্ণমালায় লেখা শুধু? চার দিকে জল, বরফ, বাতাস, বই, তবুও কেমন একটা অদ্ভুত তেষ্টায় শুকিয়ে উঠেছে যেন প্রাণ, খাঁটি ইংরেজি ভাষায় লেখা একটা উপন্যাস, গল্প, কবিতার বই নেই এই বইয়ের স্তূপের ভিতর? জওহরলালের বই আছে, লুই ফিশারের, এডগারসের, এডগার ওয়ালেসেরও, না, ঠিক এ বইগুলো আজ এ সময়ে চাচ্ছে না নিশীথ।

এ-সব বিদেশী ভাষায় লেখা উপন্যাস এখানে এনে জড়ো করেছে কে? নমিতা না জিতেন দাশগুপ্ত নমিতা জার্মান জানে? ফরাসি জানে জিতেন? এরা জার্মান ফরাসি জানে নাকি দু-জনেই? শুধু জানা নয়; জেনে সাহিত্যও পড়া। জিতেনকে কোনোদিন ভাল একখানা ইংরেজি-বাংলা বই শুঁকতে দেখে নি নিশীথ। ব্যবসার বিষয়ে নিত্য-নতুন টেকনিক বার করা ছাড়া আর প্রায় কোনো দিকেই কোনো দিনই মন খেলা করত না তার। জিতেনের তেপয়ের উপর তার অফিস ঘরের ভিতর ব্যবসা তো আজ কেঁচে গণ্ডুস করছে। তবে জিতেন থাকতে এই বইগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে ছিল না হয় তো। আজই এনেছে নমিতা খুব সম্ভব। জিতেন দুহামেলের নাম শোনে নি, জিদের নাম শোনে নি, ফয়েকটভাঙ্গেরের না; টমাস মানের না; জার্মান সে জানে না নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায়; ফরাসি না, ইংরেজি বলতে-লিখতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের ইংরেজি না। সাহিত্য কাকে বলে জানে না জিতেন। জানতে চায়ও না। নমিতা কতদূর কী জানে? একটা সিগারেট জ্বালল নিশীথ। ঘুম আসছে না। ফরাসি জার্মান বইগুলো নিয়েই বিছানায় গিয়ে শুল সে। বইগুলোই নেড়ে চেড়ে বিচিত্র অক্ষর ও শব্দ বাক্যের আবছায়া হাতড়ে কেমন একটা সরস-কঠিন অজ্ঞাতকুলশীল আমেজে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে তাকে। সোয়া এগারটা বেজে গেছে, দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। নিচের তলায় হানিফকে শুতে বলেছে, অনেক রাতে নমিতা যদি আসে, কলিং বেল টেপে, হানিফ দরজা খুলে দেবে।

জিদের বইয়ের ফরাসি পড়ে দেখছিল, ইংরেজি অক্ষর জানা আছে বলে পড়তে পারা যাচ্ছে, উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে না, দু-চারটে শব্দের মানে ধরতে পারা যাচ্ছে; অনেক আগে—কলেজে থাকতে এক সময় ফরাসি প্রাইমার কিনে দু-একদিনেই হারিয়ে ফেলেছিল নিশীথ। তাই মনে হচ্ছে ফরাসির সঙ্গে একেবারে যে মুখ চেনা নেই তা নয়। রেখে দিল বইটা। টমাস মানের জোসেফ বিষয়ক উপন্যাস এটা নয়। সেটা আমেরিকায় বসে লেখা, জার্মান, তাই না? কেমন আছে সুমনা? একাকী রয়েছে এত রাতে? অর্চিতাকে বলে এসেছে সব; ছেড়ে দিতে পারা যায় অর্চিতার উপর সব; জলপাইহাটির থেকে চলে আসবার আগে করমচার বনে ঢুকে, ভাঙা লোনাধরা গাঁথুনির সিঁড়ির উপর পা ছড়িয়ে বসে, তেপান্তরের দিকে চেয়ে থেকে দু-চার ঘণ্টা কাটিয়ে এলে পারত নিশীথ। কলেজে কাজ তো করবে না সে। কলকাতায় কোথাও কিছু না-জুটলেও—চাকরি না-পেলে, বাড়ি না পেলেও কলেজের কাজে ফিরে যাবে না। কলেজের কাজে না ফিরলেও জলপাইহাটিতেও কি যাবে না আর? অর্চিতার সঙ্গে সেদিনই শেষ কথা সেরে এল বুঝি? সুমনার সঙ্গে দেখা হবে না আর? রানু কোথায়? পাওয়া যাবে কি সত্যিই রানুকে কোনো দিন? নরেনদের কোনো হাত আছে কি বাস্তবিক ব্যাপারটায়? এ-রকম আশ্চর্য ভাল ছেলে সুবল? ভানু বেঁচে যাবে হয় তো। ভানু বেঁচে উঠলে সুবল কি বিয়ে করতে চাইবে তাকে? তা হতে পারে; অসম্ভব নয়, তা হতে পারে, সিগারেটটা নিভে যাচ্ছে বুঝি? না নেভে নি, সিগারেট নেভে নি, এখুনি না টানলে নিভে যাবে তবু। ভানুকে বিয়ে করবে সুবল? খুব ভাল হবে তা হলে, কিন্তু খুব গেড়ে বসেছে রোগটা—দুটো লাঙ্গস হয় তো—সুবল ভালবেসে মন দিয়ে চিকিৎসা করবে। কিন্তু ধন্বন্তরি নয় তো। মজুমদার ধন্বন্তরি নয়, অর্চিতার টান আছে নিশীথদের জন্যে। কী অপরাধ হত জলপাইহাটিতে ছোট আশা, সাদামাটা কাজ, খাঁটি শান্তি, বৃহৎ মমতার ভিতরে পড়ে থেকে এক দিন পৃথিবী থেকে অনুর মত রেণুর মত একটুখানি নাম মুছে ফেলে সময়ের নিরবচ্ছিন্ন গতি-অগতিসাগরের অচেতনায় হারিয়ে গেলে?

আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, বিছানার কাছেই দেয়ালে সুইচ, ডান হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচ নিভিয়ে ফ্যানের সুইচ চালিয়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল নিশীথ। পৌনে বারটা বেজেছে।

দেড়টার সময়ে নমিতার মোটর আসে থামল। মোটর, গ্যারেজে ঢুকিয়ে কলিংবেল টিপতেই, হানিফ বেরিয়ে এল। গ্যারেজের দরজায় হানিফকে তালা মারতে বলে, নিচের তলায় সদর দরজা আটকে দিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে উপরে চলে গেল নমিতা। ঘুম পায়নি তার। নমিতার মা'র মাথার যন্ত্রণা সারিডন খেতে খেতেই কমে গেছে। বাবার অবস্থা একই রকম। একটু খারাপ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। নমিতার সঙ্গে কথা বলতে-বলতেই খারাপ ভাবটা কাটিয়ে উঠেছিল যে সলিল মুখুজ্জে। রোজেনবুর্গ এসেছিল। নমিতার মা, মার চেয়ে নমিতার দিকে ঝোঁক বেশি ছিল তার, কথাবার্তা মিসেস দাশগুপ্তের সঙ্গেই বেশি হয়েছে; অনেক দূরের থেকে নমিতার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছে, চশমা লাগবে আপনার, তবে চশমা না নিলেও হয়, একটা ওষুধ দিচ্ছি আপনাকে। প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে বলেছে, এই ওষুধটা খাবেন রোজ। এক মাস খেলেই চোখ ঠিক হয়ে যাবে। নমিতার কাছে এগিয়ে এসে তাকে বিছানার উপর চিত করে শুইয়ে দিয়ে স্টেথোস্কোপ বাগিয়ে সব কিছু পরীক্ষা করে, খুব গম্ভীর মুখে ভাল করে সব দেখে নিয়েছে ডাক্তার; নমিতার মাই দুটোর কাছে বুকের ফালিটুকুর থেকে শুরু করে নাভি তলপেট অব্দি সব টিপে ঠেসে ঠুকে দেখেছে রোজেনবুর্গ; এমন সুড়সুড়ি লেগেছে নমিতার, কেমন কাতুকুতু বোধ করেছে সে,... হিহিহি গ্লিব গ্লিব, গ্লিবল ক্লবল ক্লিব ক্লিব, বু বু বু... হেসেছে সে, হেসেছে ডাক্তার। বলেছে, আছে মোটের উপর মন্দ নয়, তবে লিভারের দোষ আছে, কিডনিটাও খুব ঝরঝরে নয়। একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছে। তিন মাস সে ওষুধ খেতে হবে; তা হলে আর কোনো গলদ থাকবে না। ব্রান্ডেনবুর্গের হের ব্রকমানের সাদা ঘুড়ির মত হাওয়া-ঝড় পিটিয়ে ছুটে বেড়াতে পারবে নমিতা। ব্রান্ডেনবুর্গের হের ব্রকমানের ঘুড়ির কথাটা অবশ্য নিতান্তই ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতার ব্যাপার, ডাক্তারের জার্মানি বাসকালের জীবনের। কী সে ব্যাপারটা রোজেনবুর্গকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছে নমিতা, মাথায় নানা রকম তাগিদ ছিল তার। রোজেনবুর্গ ওষুধের খুব ভক্ত নয়, বার বার বলেছে নমিতাকে, ওষুধ বেশি কিছু ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিয়েছে, একেবারেই কোনো ওষুধ দিত না, জল বাতাস-রোদ প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিত। তবে মুশকিল, কলকাতা সমুদ্রের পারে নয়, চমৎকার খোলা সৈকত নেই এখানে; নিসর্গের নিজের ঝর্ণাও নেই, কলকাতার জলবাতাস ভিজে বিশ্রী বিষাক্ত, এখানেও ও-রকম চিকিৎসা চালানো কঠিন; এখানে ন্যুডিস্টদের মত খোলা খালি শরীর নিয়ে, রোদে নদীতে হাওয়ার ভিতর ফিরে বেড়ানোর তেমন কোনো মানে হয় না। তা যদি হত, নমিতাকে তা হলে প্রকৃতির সব পবিত্র উপাদনগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঘুরে বেড়াতে বলত রোজেনবুর্গ। কথাটা বেশ মনে ধরেছিল নমিতার। কলকাতা যদি নীল সমুদ্রের পারে রৌদ্রালোকিত প্রদেশ হত, ঝাউ শাল প্রিয়াল পিয়াশাল সিসু পাইন পপলারের বন উপবন থাকত যদি সে সমুদ্রের এপাশে-ওপাশে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বলয়ে কাছে-দূরে, বলয়পরাৎপরে, তা হলে সে গাছের বীথির ভিতরে, রোদে, ছায়াগুচ্ছের দেশে, খোলা সৈকতের অফুরন্ত সূর্যে—কোথায় কে আছে, না-আছে উপেক্ষা করে ঘুরে বেড়াত—সুস্থ সম্পূর্ণাঙ্গ মেয়েশরীর নিয়ে—সমস্ত জামাকাপড়ের আবরণের ভিতর থেকে নিজেকে খুলে ফেলে।

রোজেনবুর্গ এ-রকম একটা আশ্চর্য উজ্জ্বল আকৃতি ফলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তার রক্তের ভিতর; রাত সাড়ে দশটার সময় চলে গেল ডাক্তার। তারপর জুলফিকারদের ওখানে গিয়েছিল সে। একটার সময় পাট শেষ করে মোটর নিয়ে একা-একা একটু ঘুরপথে ফিরেছে।

বাড়িতে ফিরবার ইচ্ছা ছিল কি তার? সংকল্প, স্বপ্ন, প্রাণে নিয়ে গিয়েছিল কি সে পার্কসার্কাসের ফ্ল্যাটে রাত কাটাবার? মাথা ধরেছে, ঘুম আসবার কথা নয়, যদি না ঘুমের ওষুধটা খাওয়া যায়। ঘুম নেই শরীর, নিজের ঘরের ভিতর ঢুকে, জুতো খুলে, ফ্যান চালিয়ে দিয়ে বিছানার উপর লাফ দিয়ে পড়ে দু-তিনটে বালিশ আঁকড়ে চেপে ধরে, ছিটকে ফেলে, খানিকটা গড়াগড়ি খেয়ে নিল, তারপর নিঃসাড়ভাবে মিনিট পনের বিছানায় পড়ে থেকে কী ভাবল সে, কী করল, তা অন্ধকার জানে, আস্তে-আস্তে স্থিরতা এল মনে, শরীরটা ঠাণ্ডা লাগল, জামা-কাপড় সব খুলে ফেলে একেবারে উদল শরীরে বাথরুমে চলে গেল সে—প্রায় আধ ঘণ্টা পরে জলের ভিতর থেকে উঠে এল যেন জলদেবীর মত, একটা মস্ত বড় টার্কিশ তোয়ালে গলায় জড়িয়ে, সম্পূর্ণ শূন্যাম্বর আকাশ-বাতাসের মত শরীরে। বাথরুম থেকে ফিরতে-ফিরতে সেই অবস্থায়ই, বড় তোয়ালে জড়িয়ে নিশীথের ঘরে ঢুকে নিজে দেখতে গেল লোকটা এ ঘরে আছে কি না, ঘুমিয়েছে কি না, ঘর অন্ধকার, ফ্যান চলছে; নিশীথ ঘুমিয়ে আছে। নমিতা কুঁজোর থেকে এক গেলাস জল ঢেলে বরফকুচি মিশিয়ে খেয়ে নিল; মাথায়, নাকে, চোখে, ঘাড়ে, পিঠে ঘষে নিতে লাগল বরফের কুচিগুলো, তাকাল নিশীথের দিকে একবার-দুবার; পাশ ফিরে শুয়ে আছে নমিতারই মুখোমুখি। চোখ মেললেই ভূত দেখে বোবা বনে যাবে হয় তো এই নিরেট মানুষের দেশের লোকটা কিন্তু চোখ মেলবার কথা নয়—আইসক্রিমের বোতলের ছিপির মত—লোহার চাবি দিয়ে চাড় না দিলে—এই ঘুমন্ত লোকের। চাড় দেবে কি সে? কুঁজোর থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এন্তার বরফকুচি মিলিয়ে নিশীথের মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে? হাসি পেল নমিতার। গঁ গঁ গঁ গঁ করে উঠল যেন ঘুমের ভিতরে নিশীথ। তোড়ে হাসি ছুটে এল নমিতার বুকে মুখে সমস্ত উদল শরীরের জলের ঝিরঝিরানির ভিতর; খিল খিল করে হেসে উঠল সে। নিশীথ কি চোখ মেলেছে? সে দিকে, কোনোদিকে, না-তাকিয়ে তেপয়ের উপর থেকে একটা সিগারেটের টিন ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে গেল সে।

নিজের ঘরে ঢুকে টিনটা রেখে দিয়ে বড় একটা শুকনো, সাদা, চৌখুপি, পুরুষদের মত তোয়ালে বের করে সমস্ত শরীরটাকে ভাল করে রগড়ে মুছে নিল। একেবারে জলে জলসত্র হয়ে আছে। সমস্ত শরীরটাই জল; বাথরুমের থেকে নাইতে-নাইতে জলের ভিতর থেকেই উঠে এসেছে সে। গা মোছা তো দূরের কথা, তোয়ালেটা অব্দি নিংড়ে নেয় নি। একবারে ভিজিয়ে তিতিয়ে এসেছে নিশীথের ঘরটাকে নিশীথ যদি জেগে ওঠে—ভিজে ঘর-দোর, ভিজে বই-কাগজপত্র দেখে কোনো জলজিনী নারীর কথা ভাববে কি সে—ঢাকুরিয়া হ্রদ থেকে উঠে এসে রাতে হানা দিয়েছিল, নাকি ছাদ চুইয়ে বৃষ্টি পড়ছিল—জানালা দিয়ে জলদেয়াসিনী ঢুকেছিল ঘরের ভিতর বিশ পঁচিশটা জল পায়রা উড়িয়ে? এই সব মিলিয়ে যা হয়, নমিতা একাই সে জল, জলপায়রা, জলদেয়াসিনী, জলবৃষ্টি, হ্রদের জল। ঘষে রগড়ে ভাল করে নিজেকে মুছে নিয়ে পাউডার মেখে স্ল্যাক্স, লেডিস কোট পরে নিল নমিতা। চুল ব্রাশ করে নিল—আয়নার কাছে না দাঁড়িয়ে—ডান হাতে বাঁ হাতে আন্দাজে ব্রাশ চিরুনি চালিয়ে। ঠিকই হল, ঠিকই হল সব। কেমন হল দেখবার জন্য আয়নার কাছে দাঁড়াল না সে।

সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে নিশীথের ঘরে ঢুকল সে, ঘড়িতে পৌনে তিনটে বেজেছে। ঢুকে দেখল নিশীথ ঘুমিয়ে আছে। বাতি জ্বালিয়ে পড়বে কি সে টমাস মানের জার্মান উপন্যাসটা? পড়লে ড্রয়িংরুমে গিয়ে পড়তে হয়, কিংবা হলে, অথবা তার নিজের ঘরে। এই ঘুমন্ত মানুষের উপর উপদ্রব করার কোনো অর্থ হয় না—এই শান্ত অন্ধকার ঘরটায় চড়াবাতি জ্বালিয়ে বই পড়ার অছিলায়। নিশীথবাবু জেগে উঠেছে মনে করে এই ঘরে নমিতা ঢুকেছিল। স্ল্যাক্স কোট সেই জন্যেই পরেছিল সে, নিশীথবাবু ঘুমিয়ে আছেন জানলে এ-সব জিনিস পরার দরকার হত না তার, আদুড় গায়ে নিজের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ত সে। ঘুম আসবে না, কিছুতেই আসবে না আজ আর-কাজে-কাজেই ঘুমের ওষুধ—সব চেয়ে কড়া পিলটা খেয়ে...। কিন্তু জেগে ওঠে নি তো—ঘুমিয়ে আছে নিশীথ। নমিতার বাথরুম থেকে সোজাসুজি ও ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে যাবার সময় অনুভব করছিল, চোখ মেলেছে যেন মানুষটা। ঠিক সেই মুহূর্তে বাস্তবিকই যদি চোখ মেলে ফেলত নিশীথ তা হলে এখন এমন ঘোরে ঘুমুতে পারত না কিছুতেই। ঘুমুচ্ছে নিশীথ, মনের থেকে সব ময়লা কেটে গেছে যেন, এমনই নির্দোষভাবে। এ রকম পারত না কিছুতেই।

ও, নিশীথ জাগে নি, দেখে নি কিছু তবে। সিগারেটে তিনটে টান দিয়ে নমিতা ভাবছিল, ভেবেছিলুম নিশীথ দেখে ফেলেছে, কেমন একটা অভিমান শুরু হয়েছে, নাকি শেষ হয়েছে, মনে ভেবে বুকটা কেমন দুর-দুর করে উঠেছিল ওর ঘরের থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল সে যখন। গা মুছতে-মুছতে, পাউডার ছিটিয়ে, জামা-কাপড় পরবার, চুল আঁচড়াবার সময় কেমন মজার একটা নেশা, ব্যথায় টুকুর-টুকুর করছিল যেন বুকের ভিতর, একটা জিনিস শুরু না-হতেই শেষ হয়ে ভালই হয়েছে বলে—নাকি কিছুক্ষণ পরে শুরু হবে বলে?

বুঝে উঠতে পারছিল না যেন নমিতা। আস্তে-আস্তে খুব মৃদু প্রাণনায় সিগারেট টানতে লাগল। কোনো হেতু ছিল না। চানের ঘর থেকে সটান নিশীথের ঘরে ঢুকেছিল এমনিই সরল সরেস প্রাণের নির্লক্ষ্যে। নিশীথ জেগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে কি না—জেগে আছে—জেগে থাকলে ও-অবস্থায় তার ঘরে ঢোকা উচিত নয়, ঘুমিয়ে থাকলে ঢুকলেও ঢোকা যেতে পারে; এ সব কথা ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না তার, এমনই বেগে ও আবেগের ঘন আগুন ছুটে এসেছিল প্রাণের ভিতর নির্দোষ প্রকৃতির থেকে। কিন্তু তার পর থেকেই মনে কেমন একটু দোষ এসে ঢুকেছে যেন। সেই জন্যেই সতর্ক হয়ে পড়েছে সে। বেশ সাবধানে সাধুতায় সতর্কতায় উইমেনজ অকসিলিয়ারি কোরের মিলিটারি পোশাক পরে এসেছে সে। যুদ্ধের সময় ওয়াকেতে কাজ করত সে, সেই থেকে এ-রকম পোশাক পরার রেওয়াজটা রয়ে গেছে, আজকালও অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নেয় এই পোশাক।

সিগারেটটা শেষ হয়ে গেছে। অচেতন হয়ে ঘুমুচ্ছে নিশীথ। মনের মধ্যে নমিতার আফিমের গুলির মত একটা খুঁত এসে ঢুকেছে যেন, অনেক রাত-অব্দি-জাগা ডাক্তারের নির্গলিত নগ্নকান্তিবাদের লেকচার শোনা, পার্ক-সার্কাসের পেঁজপোলাও মাংস মদ খাওয়ার উত্তেজনায় প্রশ্রয় পেয়ে। এ ছাড়াও প্রশ্রয় পেয়েছে মন, এমনিই কোনো একটা সময়ে কোনো একটা জিনিস পেতে ভাল লাগে মনের। মনই যদি এ-কথা বলে, শরীর খোঁচা না-পেয়েও যদি শারীরিক হয়ে উঠতে চায়—যেমন আজ সন্ধ্যার সময় ড্রয়িংরুমে বসে বই পড়তে-পড়তে হয়ে উঠেছিল প্রায়, তা হলে—কঠিন। নমিতা আর-একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিল। নিশীথ ঘুমুচ্ছে নাক না-ডাকিয়ে বেশ নিবিড়-ভাবে, বাইরে রাত দুটো-আড়াইটে অব্দি দুর্দান্ত বাতাস খেলে গেছে আজ ঘরের ভিতরটাকেও কাঁপিয়ে, নাচিয়ে, তৃপ্ত, স্নিগ্ধ করে গেছে। কিছুক্ষণ হল বাতাস থেমে গেছে বাইরে-ভিতরে, একটা গাছের পাতাও নড়ছে না, গরমের হল্কা ঠিকরে পড়ছে যেন সাদা মেঘগুলোর ভিতর থেকে। অন্দরে ভীষণ গরম-যে ঘরের ফ্যান নেই। এ ঘরটাকে বড় জোরালো ফ্যানটা ঠাণ্ডা করে রেখেছে। ঘুমিয়ে আরাম পাচ্ছে তাই ঘুমানো মানুষ। কাল ভোরের আগে নিশীথ জেগে উঠবে বলে মনে হয় না। টমাস মানের জার্মান বই নিয়ে নিজের ঘরে চলে যাবে ভাবছিল নমিতা। মাঝে-মাঝে দোষ ঢুকে পড়ে তার মনে, শরীরটাকে মুখিয়ে রাখে-মাঝে-মাঝে আত্মদানও করে বটে সে—আবার নির্দোষভাবেও নিজেকে অর্পণ করে, ঝর্ণার জলকণিকারা যেমন পরস্পরকে করে—প্রকৃতির কোনো এক বৃহৎ আদিম নাদের ভিতর জেগে ওঠে, পটভূমির নিঃশব্দতাকে প্রাণবীজ দান করে নাদের নীল নির্দোষ আনন্ত্যে পৌঁছবার জন্যে। নিশীথকে ডেকে জাগানো যায় অবশ্য কিংবা ঠেলে; কিংবা ফ্যানটা বন্ধ করে দিলে গরমে ভেপসে উঠে পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই না-জেগে পারবে কি সে এই দারুণ গুমোটের রাতে? তা হলে মানের বই দুটো তুলে নিয়ে ফ্যানটা বন্ধ করেই চলে যাওয়া যাক-তার পরে নিজের ঘরে গিয়ে ফ্যান, খুলে, পোশাক ছেড়ে, শুয়ে পড়বে সে। ঘুমিয়ে পড়লে, ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম না-পেলে নমিতা এ দিকে আবার খোঁজ নিতে আসবে—ঘুমের ওষুধ খাওয়ার মর্জিটাও যদি মরে যায়।

বই দুটো হাতে তুলে নিয়ে ফ্যানটা বন্ধ করে দিল সে। এইবারে ঘর থেকে স্রেফ বেরিয়ে পড়বে, কেমন তামাসা বোধ হল, ঘরের আবছা আলোর ভিতরে আস্তে, ধীরে-সুস্থে, হাঁটতে গিয়েও কেমন যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল হঠাৎ, তেপয়-বই-টিন-গেলাস নিয়ে একেবারে মেঝের উপর। বালিশের থেকে মাথা তুলে ঘাড়টা ফিরিয়ে আচ্ছন্নভাবে তাকিয়ে দেখল নিশীথ, নমিতা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

'কে?'

'আমি।'

'আমি! আমি মানে?'—ধোঁয়াটে চোখে বললে নিশীথ।

'ওঃ এই যে।' ভাল করে নমিতার দিকে তাকিয়ে দেখল নিশীথ, আবার তাকাল। আর-একবার তাকিয়ে দেখার দরকার অনুভব করে, নির্মল দৃষ্টি-শক্তিই যেন ফিরে গেল, উঠে বসল সে—'ভোর হয়ে গেছে?'

'এই হচ্ছে।'

'কিসের যেন একটা শব্দ হল। আমি স্বপ্ন দেখছিলুম, মনে হল, ধ্বসে ভেঙে গেল কী যেন সব।'

'না'—নমিতা ঘাড় নেড়ে বললে, 'আওয়াজটা স্বপ্নে নয়, এমনিই হয়েছে। দুটো তেপয়ই হুড়মুড় করে পড়ে গেছে ধাক্কা খেয়ে—'

'বইটই-গেলাস-টিন সব ছিটকে পড়েছে দেখছি।'

দু'জনে মিলে কুড়িয়ে গুছিয়ে ঠিক করে নিচ্ছিল সব। ঘরের ভিতর জল ছড়িয়ে আছে চারদিকে। নমিতা হয় তো নিশীথকে জিজ্ঞেস করবে, কেন এই জল—ভেবে নিয়ে নিশীথ জলের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেল না নমিতাকে। কোনো কুঁজো ভাঙে নি, বোতল ফাটে নি, কেমন করে সমস্ত ঘরটাকে নিশীথ তবুও জলময় করে রেখেছে বুঝে উঠতে পারছিল না নিশীথ। তেপয় দুটো দাঁড় করিয়ে বইটই গুছিয়ে ঠিক করে নমিতা একটা সোফায় গিয়ে বসল-নিশীথ আর-একটায়।

'ফ্যান না খুলেই ঘুমোচ্ছিলেন নিশীথবাবু।'

'নিশ্চল পাখাটার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে—'হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়লুম, মানের নভেলটা নাড়াচাড়া করতে-করতে।

ফ্যানটা খুলে দিল সে।

'জার্মান জানেন আপনি?'

'না।'

'তা হল পড়ছিলেন?'

'দেখছিলুম। এ-সব জার্মান—ফরাসি বই পড়েন আপনি?'

'হ্যাঁ, পড়ার জন্যে এনেছি।'

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খুব ভাল রপ্ত হয়েছে জার্মান হয় তো?'

'না। ফরাসিটা হয়েছে খানিক। দেখলুম রোজেনবুর্গও ভালো জার্মান জানেন না।'

'তিনি তো জার্মান?'

'জার্মান ইহুদি।'

'কী করে আপনি শিখেছেন তা হলে জার্মান? নিজে-নিজে?'

'না রে বাবা!'—নমিতা একটু উত্তেজিত হয়ে হেসে বললে, 'স্কুল কলেজের পোড়োদের মত উবু হয়ে বসে কোনো কিছু শেখাটেখার সাধ্যি নেই আমার। মাস্টার দেখলেও ভয় করে। আমি ভাষা শিখি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে।'

'কোথায় জার্মান পাবেন কলকাতায় আজকাল?'

'সেজন্যে একটু মুশকিল হচ্ছে।'

'কোথায় পেলেন খাঁটি ফরাসি, কলকাতায়?'

'দু'জন ফরাসি মেমসাহেব পেয়েছিলুম পার্কস্ট্রিটের দিকে। তাঁরা এখনো আছেন কিনা জানি না। তবে শিখে নিয়েছি, বইটই পড়তে পারি। কিন্তু ফ্রান্সে—প্যারিসে না গেলে, লোকজনের সঙ্গে কথা না বললে এ ভাষায়—'

'চেকনাই থাকে না?'

'চেকনাইয়ের ভাষা কি ফরাসি?'

'চিপটেন কাটার ভাষা তো।'

'পড়েছেন ভিলোঁ আপনি?'

'না খুঁজেছিলুম বটে। পাই নি কোথাও। বদনাম আছে ভিলোঁর।'

'আমার কাছে আছে ভিলোঁ—'

'সে তো শাহি ফরাসিতে'

'কানে শুনে নেবেন সেই ফরাসি, বাধলে দেব জ্যামিতিক ইংরেজিতে—'দীর্ঘছন্দ শরীরে একটু কুঁজো হয়ে হেসে বললে নমিতা।

নমিতা+ গ্রিক=ন্যামিতিক? ভাবছিল নিশীথ।

'সাহিত্যটা জ্যামিতিক হয়ে যাবে না তো?'—নিশীথ বললে।

'কেন?'

'ইংরেজিটা ন্যামিতিক বলছেন?'

'টিন খসিয়ে সিগারেট বার করে নিল একটা।'

জ্বালিয়ে নিয়ে বললে,' এটা তো চিপটেনের ভাষা হল আপনার। জিতেন কি আর সাহিত্যের খোঁজ-খবর নেয়? সময় কোথায় তার? তা ছাড়া সুকুমার বিদ্যের পথ দিয়ে ও মানুষ হয়ে ওঠে নি। তবুও মনটা কুঁকড়ে যায় নি ওর, বেশ সরস আছে। ভিলোঁ অবিশ্যি তর্জমা করে শোনাই নি ওকে, তবে আনাতোল ফ্রাঁসের কড়া ভিয়েনে মাঝে-মাঝে চড়িয়েছি।'

বলতে-বলতে নিশীথের দিকে বড়, ভরা চোখ মেলে তাকাল নমিতা। আনাতোল ফ্রাঁসের প্রায় সব বই-ই পড়েছে নিশীথ। ফ্রাঁসের কড়া ভিয়েন এটা ওটা সেটা অনেক কিছুই তো হতে পারে। কিন্তু এ-গুলোর মধ্যে কোনটা সম্প্রতি লক্ষ্যস্থল নমিতার, উপলব্ধি করে নিশীথ টিনের দিকে হাত বাড়িয়ে সিগারেট বার করবার, জ্বালিয়ে নেবার কাজে একটু নিমগ্ন হয়ে থাকতে চাইল।

কোনো ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে নিশীথ বললে, 'আরো বেশি অন্ধকার হয়ে পড়ছে যেন। বাইরে কি মেঘ?'

জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে নমিতা বললে, 'মেঘ নেই।'

'নেই?'

'সাদা মেঘ আছে। ওতে কি অন্ধকার হয়?'

'না। কেমন গুমোট। বাইরে মেঘ নেই, ঝড়ের লক্ষণ নেই?'

'নেই তো। গুমোট কেন? ফ্যান চলছে তো!'

'বলছিলেন না ভোর হচ্ছে, কটা বেজেছে?'

'চারটে বাজতে দশ মিনিট। ঘড়িটা তো আপনার মুখোমুখি দেয়ালে।'

'একটার সময় ঘর আলো হয়েছিল, চারটের সময় অন্ধকার হল কী করে?' জ্বালি-জ্বালি করে সিগারেট না-জ্বালিয়ে জিজ্ঞেস করল নিশীথ।

'চাঁদ ডুবে গেছে বলে অন্ধকার।'

'এত তাড়াতাড়ি ডুবে গেল?' নিশীথ জ্বালিয়ে নিল সিগারেটটা।

'আজ তো ডুববার কথাই তাড়াতাড়ি। দ্বাদশী চতুর্দশীর চাঁদ নয় তো। বাতাস ছেড়েছে। অনেক দূরে একটা কালো মেঘ। সপ্তমীর রত।'

ঘাড় তুলে নমিতার ডব্লিউ-এ-সি-র পোশাকের উপর চোখ বুলিয়ে নিল নিশীথ। নমিতার চোখের উপর চোখ রেখে বললে, 'এই কি এলেন নাকি আপনি পার্কসার্কাস থেকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'আমি দেড়টার সময় এসেছি।'

'দেড়টার সময়? তা হলে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন বুঝি পাশের ঘরে? কিন্তু এই পোশাকে গরম লাগছিল না? জুতো পরে?'

'হ্যাঁ জুতো পরেই ঘুমোই আমি।' নমিতা বললে, 'মিলিটারি ধড়াচূড়ো পরেই তো ঘুমোই আমি। না হলে ঘুম হয় না আমার।' নমিতা কুজোর থেকে জল গড়িয়ে নিল গেলাসে, বরফের এই মুঠো কুচি মিশিয়ে জলের ভরা গেলাসটা হাতে ধরে কৌচে এসে বসল।

'জল খাচ্ছেন?'

'খাবেন আপনি?'

নিশীথ সিগারেটে একটা লম্বা টান শেষ করে কথা বলার আগেই নমিতা বরফ-জলের গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে বললে—'এই নিন।'

'না, না, ওটা আপনি খান—আমি নিচ্ছি।'

'আপনি নিন নিশীথবাবু-আমি ঢেলে নিচ্ছি।'

'আপ পিজিয়ে মেমসাহেব।'

'আপ পিজিয়ে সেন সাহাব।'

গেলাসটা হাতে তুলে নিশীথ এক চুমুকেই শেষ করে ফেলবে ভাবছিল, তেষ্টা পেয়েছিল তার। কিন্তু এক টানে গেলাস সাবাড় করে দিলে আর-এক গেলাস বরফ-জল অবিলম্বেই হাজির হবে, তার পরে বরফ স্কোয়াশ;—শেষ রাতের আবছায়ায় হাওয়া, বরফ আর নীরবতার ভিতর অন্তরঙ্গতার এই খেলা মন্দ নয়! কিন্তু খেলা ছাড়া আর-কিছু নয়, দু'দিনের জন্যেও বটে' জিতেন এলেই কেটে যাবে; জুলফিকারদের মতন আরো অনেক মাঝখানে এসে পড়লেই মোড় ঘুরে যাবে, উবে যাবে সব। নিশীথকেও এমনিই শিগগিরই তো চলে যেতে হবে একদিন জিতেনের বাসা ছেড়ে দিয়ে। নমিতার হাতের খোবানি তার প্রাপ্য নয়, তার ঠিক জায়গা হচ্ছে জলপাইহাটির করমচা বনের ভাঙা সিঁড়ির উপর পা ছড়িয়ে বসে অর্চিতার কিংবা বারুণীদেবীর (কোথায় গেছে সে আজকাল?) কথা শোনা তেপান্তরমুখো হয়ে। নিশীথ আলতো চুমুক দিয়ে রসিয়ে-রসিয়ে খাওয়ার ভান করে খাচ্ছিল বরফজল, যেন যখন কাল মেঘ আসে একখণ্ড, মরুভূমি তাকে জাপটে ধরতে চায় না, ভদ্রতা বাঁচিয়ে আস্তে-আস্তে ঝিনুকে মেরে-মেরে খায়। জিতেনের এ বাড়িতে কাল মেয়ের উদয় হলেও নিশীথ যে মরুভূমি নয়—বরং চেরাপুঞ্জি, নমিতাকে সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে ভরা গেলাসের বরফ ফোঁটা-ফোঁটা খেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা গ্রহণ করে নিশীথের জীবনের এই আধো সত্য আধো মিথ্যে আশ্চর্য উত্তর-মেঘটাকে।

'কাল মেঘ করেছে?'

'হ্যাঁ। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। বেশি বড় নয়।'

'ঝড় হবে মনে হচ্ছে?'

'খুব চেপে জল এলে ভাল হয়। যা গুমোট।'

'ঝড় বিদ্যুৎ বেশি করে ঘনিয়ে এলে ভাল হয়; বৃষ্টি বেশি চাই না। অন্ধকার থাকবে, ঝড় থাকবে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সব। বৃষ্টি কিছু-কিছু পড়ছে, সব সময়েই যেন আসছে-আসছে। কিন্তু বেহায়া বৃষ্টির নাকানি-চোবানি নেই।'

'ঝমঝম করে খুব বৃষ্টি পড়ে অন্ধকার রাতে; ভাল লাগে না আপনার?'

'লাগে, কিন্তু আজ নয়, এখন নয়, মনের অবস্থা এখন যে-রকম তাতে কেবলি অন্ধকার ভাল লাগে; মেঘের বাতাসের আর বিদ্যুতের জিত ভাল লাগে জলের উপর।'

'মানে ঝড় চাই?'

নিশীথ কোনো উত্তর দিল না।

'জল চাই না?'

'না।'

'ঝড়, অন্ধকার, বিদ্যুৎ চাই। যদি শিলাবৃষ্টি হয়? এখন চোত মাস তো।'

'কেমন হত সেই ঝড় তাহলে?'—কে যেন জিজ্ঞেস করল।

কেমন হত সেই অন্ধকার? অনেকদিন পরে জেগে উঠে তার পর সূর্যের মুখ? বাতাস নেই, মেঘ নেই, সমতল ভূমিতে অনেক পাহাড় এসে পড়েছে যেন চারি-দিকে-নিঃশব্দ অন্ধকারের। একটা আরশোলা সোঁ করে মাঝশূন্য দিয়ে উড়ে কোথায় দেয়ালের আবছায়ায় ঠিকরে পড়ল। দেখল দু'জনে। আরশোলাটা আবার উড়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারের ভিতর, কোথায়। চুপ করে চুপ করে উত্তরোত্তর নিস্তব্ধতায় আঁকিবুকির শব্দহীন অসমতল ছড়ানো অনর্গল পাহাড়ের অন্ধকারের ভিতর তারা বসেছিল।

'ঝড় হচ্ছে না আজ রাতে। রাত কি ফুরিয়ে যাচ্ছে? কটা বেজেছে?'

'সোয়া চারটে। সেই কাল মেঘটাকে দেখছি না তো এখন আর।'

'আকাশে মেঘ নেই তা হলে? আকাশে কি তারা জ্বল জ্বল করছে?'

'হ্যাঁ, সমস্ত আকাশটাকে কেমন চমৎকার দেখাচ্ছে নিশীথবাবু। এক টুকরো মেঘ নেই কোনোদিকে, কেবলি আলো, কেবলি জ্যোতিষ্ক—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চলুন ছাদে উঠে গিয়ে, নক্ষত্র দেখব।'

'চলুন।'

'জিতেনের টেলিস্কোপ আছে?'

'নেই। জিতেনকে ছাদে নিয়ে গিয়েছিলাম দু-তিনদিন রাতে। ডেক চেয়ারে বসেছিলাম আমরা, ব্যবসা-টাকা কড়ি-ইনকামট্যাক্সের কথাই বললে জিতেন। আমি দু-একটা তারা দেখাচ্ছিলাম তাকে, কিন্তু উৎসাহ দেখলাম না। আকাশে নক্ষত্রগুলো যে আছে সেটা সে জানে বটে, কিন্তু কখনো অনুভব করেছে বলে মনে হয় না।'

'জিতেন অনুভব করেছে কিন্তু আপনাকে বলে নি।'

'কী করে জানলেন আপনি?'—নমিতা উঁচু তালবীথির কাঠকুড়োনির মত চোখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

নিশীথ কোনো উত্তর দিতে পারল না। অন্ধকারের ভিতর জলের মতন সহজ সত্য কোনো একটা জবাব হাতড়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু সে রকম স্বাভাবিক ও স্বীকার্য কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না।

'কী করে জানলেন আপনি?'

'আমি নিজে তো অনুভব করি...রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে।'

নমিতা জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়েছিল। বাইরে সমস্ত বাতাস নিঃশেষিত হয়ে গেছে। মেঘ নেই, অনেক তারা আছে। ঘরের ভিতরে খানিকটা বাতাস আলোড়িত করে তুলবার জন্যে মেশিন যথাশক্তি দানবীর কাজ করে চলেছে তার।

'পৃথিবীর প্রথম মানুষ এক রকমভাবে বুঝেছিল নক্ষত্রগুলোকে—শেষ মানুষেরা আর-এক রকম ভাবে বুঝবে। আকাশ-রাত্রি ও নক্ষত্রেরা রয়েছে তবুও সকলকেই সব কিছু দেখবার সুযোগ দিয়ে। আমরা দেখতে পারি শুধু, তার চেয়ে খুব বেশি আর নয়। কিন্তু যা দেখছি, হৃদয় যা দেখাচ্ছে তার চেয়ে আশ্চর্য কিছু নেই—এই অনুভব করি।'

'আপনি তো করেন নিশীথবাবু। বলছেন। কিন্তু কথা হচ্ছিল জুলফিকারের, জুলফিকার কি অনুভব করে?'

নিশীথ সোজা হয়ে বসতে-বসতে বললে, 'জুলফিকার নয় তো জিতেনের কথা হচ্ছিল।'

নমিতা ভুল শুধরে হেসে বললে, 'যাচ্চলে—জিতেনের কথাই তো হচ্ছিল।'

'পির সাহেব কি জিতেনের মত?'

'পির সাহেব?'—নমিতা নিশীথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার পর বললে, 'না, তার নিজেরই মত। একদিন দেখনে তাকে, চলুন।'

'চলুন।'

'আচ্ছা, আমি ফোনে জুলফিকারের সঙ্গে দিন ঠিক করে জানাব আপনাকে।'

—যেন জুলফিকারই পির সাহেব। খুব সেয়ানা নমিতা। ধরে ফেলেছে নিশীথের ইশারা। যেখানে সপ্তর্ষি তারাগুলো ঘুরে এসে স্থির হয়েছে, নিশীথ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, জানালার ভিতর দিয়ে সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে নমিতা। কিন্তু নিশীথ নিস্তব্ধ হয়ে আছে অনুভব করে পৃথিবীতে ফিরে এসে মাটির গন্ধে আসক্ত মৃত্তিকার নারীর মত ধুঁলোমাটির খোঁজে তাকাল।'

'ছাদে চলুন।'

'সিঁড়ি কোনদিকে? এর আগে যখন এ বাড়িতে এসেছি তখন ছাদে উঠবার কথা মনেই হয় নি কোনো দিন। জিতেনও বলে নি কিছু। ছাদ যে আছে খেয়ালই ছিল না আমাদের কারো।' নিশীথ বললে।

কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল নমিতা। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'সাড়ে চার। চলুন। আমি নিয়ে যাচ্ছি। চোখ বুজে চলুন।'—বললে নিশীথকে। কিন্তু নিশীথ বসেই রইল সোফার উপর। ছাদে না গিয়েও এ ঘরেও এই মুহূর্তে মন যে-সব অন্তিম জিনিস চাচ্ছে, শরীরকেও সুপাত্র হিসেবে আহ্বান করে মনের সে সব দাবি মেটানো কেন যেন এখন আর দুঃসাধ্য বলে মনে হচ্ছে না নিশীথের। কথা অনেক বলা হয়েছে; কথা বলতে চাইবে না নারী আর, চাইবে না পুরুষ আর, একটু নিস্তব্ধ হয়ে থাকতে চাইবে মানুষের যা প্রাপ্য নয় সেই নিঃসময়ের ভিতর, মানুষের যা প্রাপ্য সেই খণ্ড সময়কে অনুনয় করে সরে যেতে বলে। জানে তো নমিতা। নিশীথ যে জানে তাও জানে। কিন্তু তাও কথাই বলবে নিশীথ, নমিতাকে দিয়ে কথাই বলাবে, ছাদে যাবে-না, কিছু করবে না।

জল খাবে বলে উঠে দাঁড়াল নিশীথ।

'দিচ্ছি।'—নমিত বললে।

যে গেলাসে এইমাত্র নিজে জল খেয়েছিল, না-ধুয়ে সেই গেলাসেই জল বরফ ভর্তি করে নিশীথকে দিল নমিতা। পৃথিবীর কোনো দেবতা-দেবীরও এঁটো জল খায় না নিশীথ। কিন্তু আজ এই রাতে, এখন, সে-পৃথিবী ফুরিয়ে গেছে যেন। নমিতার হাতের থেকে বরফের গেলাসটা তুলে নিয়ে সোফায় ফিরে গেল।

'আপনি তো খুব বসে, জিরিয়ে খাচ্ছেন। ছাদে যেতে দেরি করে ফেলছেন নিশীথবাবু।'

'স্কোয়াশ দিয়েছেন দেখছি। কখন খুললেন বোতল? টের তো পাই নি।' নিশীথ বললে।

'পান নি?—নমিতা নিজের জন্যে এক গেলাস ভরে আনতে-আনতে বললে, কিন্তু তবুও খুলেছি তো। এবারে টের পাচ্ছেন?'

নমিতা সোফায় ফিরে এসে বরফ মেশানো ক্রাশড় রসের গেলাসটায় একটা চুমুক দিয়ে বললে, 'আমিও তা হলে তাড়াহুড়ো করে খুব না। ছাদে উঠবার সিঁড়িটা দেখেন নি বুঝি কোনো দিন? স্পাইরাল সিঁড়ি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পাইরাল? নিশীথের মনে পড়ে গেল এইবার, 'ওঃ'!

'চড়েন নি? সিঁড়িটা বাইরের দিকে, দালানটার পশ্চিমদিকের দেয়াল ঘেঁসে, সদর দরজা দিয়ে ঢুকবার সময় বড় একটা নজর পড়ে না। গাছপালার আড়ালে থেকে যায়—'

'হ্যাঁ। ও-দিক দিয়ে দিন-রাত চাকর-বাকর ঝাড়ুদার জমাদারদের তো চলাফেরা করতে দেখতাম—'

'নিশীথ স্কোয়াশের গেলাসের বরফ নাড়ল খানিকক্ষণ গেলাসটা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে।

'ওদেরই তো সিঁড়ি ওটা।'

'ছাদে ওঠে গিয়ে?'

'উঠলে উঠবে। কোথায় যাই আমি আর জিতেন ছাদে? যাক না ওরা ছাদে—জমাদার, রফিক, হানিফ।'

নিশীথ সায় দিয়ে বললে, 'তা নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু গিয়ে বিশেষ ভাল লাগবে না ওদের।'

'কেন?'

'সমাজ-সংসারে ভিত্তি নেই, ছাদে দাঁড়িয়ে কী সুখ পাবে আর? কতক্ষণ পাবে? ওদের সাংসারিক গাঁথুনিটাকে শক্ত করে দেওয়া দরকার। জিতেনরা তাই করছে।'

নিশীথের ভাল মানুষি শ্লেষটা ভাল মনে গ্রহণ করে নমিতা বললে, 'একটা কিছু করা দরকার আমাদের। সমাজে নিচের দিকে যারা আছে, দিন রাত বেশি টাকার, বেশি সুখের থাঁই মিটিয়ে তাদের আমরা গণ্যই করছি না। মাড়িয়ে, গালিয়ে, থেৎলে ছুটেছি, এই অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে নানা রকম পলিটিক্যাল কর্মীদের।'

নিশীথ চুপ করেছিল। নমিতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করছে দেখে গেলাসের বরফগুলোকে একটা নাড়া খাইয়ে দিয়ে বললে, 'ঠিক তো বলে কর্মীরা। তাদের অভিযোগ আমার মত নিম্ন মধ্যশ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধেও। ঠিকই বলে তারা।'

'বলে আমরা ক্যাপিটালিস্ট।'

'আপনারা তো ক্যাপিটালিস্ট।'

'আপনিও তো।'

'নিশীথ গেলাসের বরফ গলানির দিকে তাকিয়ে বললে, 'না, আমি ক্যাপিটালিস্ট কী করে বলি নিজেকে? জিতেন হতে পেরেছে। জীবনের যুদ্ধে কী করব, না করব, কিছু ঠিক না করতে পেরে গা ভাসিয়ে অনেক দূর এসে পড়েছি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আজ ক্যাপিটালিস্টের বন্ধু। অবিশ্যি জিতেনের ক্যাপিটালিজমের খোঁচা আমাকে দিতে আসে না সে। আমিও তার সঙ্গে বেশি মিশে-মিশে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আজ পর্যন্ত জিতেনের সঙ্গে মিলে-মিশে চলেছি।'

'তা হলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কী করে হল? ও, আমার সঙ্গে হল বুঝি? অনিচ্ছায়?'

নিশীথ হেসে ফেলল, কোনো কথা বললে না। এ-রকম সহজ কথার কী উত্তর দেবে সে? কোনো রকম জলের মতন সোজা উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না; নেইও বুঝি সে রকম জিনিস কোথাও? নমিতা কেমন চিন্তিত দেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। হাতে গেলাসটা ধরে; বেশি বরফের ঠাণ্ডার গেলাসটা।

'ছাদে যাওয়া হল না।'

'না নমিতা বললে।

'চলুন যাই'—নিশীথ বললে।

'না, পাঁচটা বাজে'—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে নমিতা।

'কী, হবে পাঁচটা বেজেছে বলে?'

'লোকজন উঠে পড়েছে।'

'আমরা ছাদে বেড়াব। ওরা দেখবে। দেখুক। কী হবে দেখলে?'

'না, সে জন্যে নয়। রাত দেড়টা-দুটো-আড়াইটের সময় ছাদে যেতে হয়; সব জিনিসের একটা সময় আছে; নক্ষত্র দেখবার, ঘুমিয়ে থাকবার, ছাদে ঘুমিয়ে থাকবার।' নিজের হাতের গেলাসের ফলের রস এক চুমুক শেষ করে তেপয়ের উপর রেখে দিল নমিতা। কী একটা ফিকে কথা বলে ফেলেছে নমিতাকে, কোনো স্বাভাবিক সার্থক কথা ভাবতে-ভাবতে কেমন অস্বস্তিবোধ করেছিল নিশীথ।

আলো এসে পড়ছে। চারদিকে লোকজন জেগে উঠেছে। হানিফ এসে পড়ল। কাজেই রাতটাকে সার্থক করে তোলবার শেষ চেষ্টায় মনটা আলোড়িত হয়ে উঠলেও মাঝ পথেই অর্ধসমাপ্ত হয়ে রইল সব।

'কী চাই হানিফ?'

'জুলফিকার সাহেব আপনাকে যেতে বলেছেন।'

'কোথায়?'

'তাঁর বাড়িতে—পার্কস্যার্কাসের ফ্ল্যাটে।'

'আজ? কখন?'

'আজ ছোট হাজরি খেয়ে যাবার সময়ে হবে আপনার?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে নমিতা বলবে, 'কাকে দিয়ে খবর পাঠালে জুলফিকার?'

'তিনি নিজে এসেছিলেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এ বাড়িতে? কখন?'

'ভোর পাঁচটার সময়ে।'

'তারপর?'

'উপরে চলে এলেন আমার সঙ্গে।'

'উপরে এসেছিল?' কেমন যেন ঝোড়ো হাওয়ায় ফিঙের মত শূন্যে হঠাৎ ডাক পেড়ে উঠে বললে নমিতা।

নমিতার মুখের দিকে নিঃস্বার্থ চোখ ফিরিয়ে হানিফের দিকে একবার তাকিয়ে ঘর-বাইরের আলো-রোদের দিকে তাকাল নিশীথ।

'উপরে কোথায় এল পাঁচটার সময়, কী আমি তো টের পেলুম না হানিফ।'

'ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসেছিলেন।'

'কেন?'

'কী উত্তর দেবে? একটু ধাঁধায় পড়ে ঢোক গিলে চুপ করে রইল হানিফ।'

'জুলফিকার কি জানে না যে দাশগুপ্ত সাহেব বাড়িতে নেই?'

'তা জানেন, জরুর।'

'তবে? আমি যে জেগে আমি তা বলো নি তাকে?'

'বলেছিলুম, কিন্তু সাহেবের সঙ্গে আপনি কথা বলছেন সেইজন্যে চলে গেলেন।'

নমিতা ঝনঝনিয়ে উঠে বললে, 'আচ্ছা।'

নিশীথ আর-একটা সোফার কাছেই বসে আছে।'

কাতরে উঠে নমিতা বললে, 'আচ্ছা।'

'আচ্ছা! আচ্ছা!-বলতে বলতে সিগারেট বার করে নিয়ে ঘরটার চারদিকে ঘুরে এল একবার নমিতা, কিছুক্ষণ পরে বললে, 'আচ্ছা যাও, তুমি হানিফ। আমি চা খেয়েই ফোন করে দেব জুলফিকার সাহেবকে।' চলে গেল হানিফ। 'কী হয়েছে জুলফিকারের?'

'জানি না তো।'

'আজ খুব ভোরে আসবার কথা ছিল তার?'

'আমাকে বলে নি তো'।

'দাশগুপ্ত সাহেব থাকলে এ ঘরে আসে না বুকি জুলফিকার? হাতের সিগারেটটা তেপয়ের উপর গড়িয়ে, সরিয়ে রেখে, নমিতা তেরছা কান্নিক মেরে নিশীথের দিকে একবার দ্রুত তাকিয়ে, সিগারেটের দুটো তিনটে থেকে ওয়েস্ট মিনিস্টারেরটা বেছে নিয়ে, সিগারেট বার করে টিনটা সরিয়ে রাখল খোলা মুখে—ঢাকনি আটকাবার কোনো চেষ্টা না করে।

'কেন আসে না এদিকে জুলফিকার; দাশগুপ্ত সাহেব বাড়িতে থাকলে?'

'ও-সব কথার কোনো খেই পাবেন না নিশীথবাবু।'

'কোনো কথারই খেই নেই পৃথিবীতে, জানেন কি?'

'কিন্তু, নমিতার মন অন্য কোথাও যেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, নিশীথের কথার দিকে তার লক্ষ্য ছিল না। সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল নমিতা।

'জুলফিকারকে চেনেন আপনি?'

'একজন মুসলমান অফিসার তো? পার্কসার্কাসে থাকে।' নিশীথ বললে।

'এই কি একজন মানুষের পরিচয় হল?'

নিশীথ নিজের ভুল ধরতে পারে, রুমালে সিকনি ঝেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে বললে, 'মোটামুটি হল।'

'নামটা পেলাম, এখন মুখস্থ করলেই হয়ে যায়। প্রায় মানুষের এইই বুঝি পরিচয় নিশীথবাবু?'

নমিতার দিকে তাকাল নিশীথ—স্নিগ্ধ শ্রদ্ধায়; জ্ঞানের কথা বলেছে নমিতা। 'দাশগুপ্ত সাহেব জুলফিকারকে পছন্দ করেন না। কিন্তু দু-জনের মধ্যে বড় সাহেব কে?'

'তিনি মনে করেন জুলফিকারের সঙ্গে আমি বেশি মিশি?'

'কিন্তু দাশগুপ্ত তো বড় সাহেব?'

'এটা, জীবনের কথা নয়—ব্যক্তিগত জীবনবেদের কথা'—নিশীথের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নমিতা বলল।

'কী করেছে জুলফিকার?'

'কী করেছেন আপনি নিশীথবাবু?'

'আমি? কী করেছি আমি?'

'ভাব করে ফেলছেন আমার সঙ্গে। কী বলবেন আপনার স্ত্রী জানতে পারেন যদি। কী মনে করছে হানিফ? কী ভেবে গেল জুলফিকার?'

কী মনে করত অর্চিতা এখানে থাকলে? নমিতাকে ভাল লাগে নিশীথের, তাই সে মিশেছে; জুলফিকারেরও ভাল লাগে নমিতাকে, আরো বেশি মিশেছে তাই নমিতার সঙ্গে।

'আপনার মা কেমন আছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মাথার যন্ত্রণাটা কমে গেছে সারিডন খেয়ে। মুঘুচ্ছিলেন, যখন আমি চলে আসি। রোজেনবুর্গ একটা ওষুধ দিয়ে গেছেন—যদি দরকার হয়।'

'কেমন আছেন মুখার্জি সাহেব?'

'বাবার একটু খারাপ হচ্ছিল। সামলে নিয়েছেন। আমি যেতেই দেখলাম প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন।'

'মুশকিল এই বয়সে এ রকম করিৎকর্মা মানুষের এ রকমভাবে টিকে থাকা।'

'কী হবে, চারা নেই' নিজের দোষেই হয়। বাবার তো সিফিলিস হয়েছিল,' নমিতা বললে, আমার জন্মাবার আগে'।

চোখে-মুখে বিশেষ কোনো ভাব দেখা গেল না নিশীথের; কিছু হয়েছে বা হয় নি—তা নয়; যা আছে তাই যেন রয়েছে সব, সমস্ত প্রস্থানের ভিতরে। 'মারও হল তাই।'

'কেন, রক্ত পরীক্ষা করে ইনজেকশন নেন নি? মুখার্জি সাহেব তো এত বড় তালেবর লোক। কিন্তু এটা করেন নি কেন? করেন নি?' আস্তে-আস্তে বললে নিশীথ।

'না, ইনজেকশন নেন নি' তিনি মনে করেছিলেন কোনো রোগই তাঁকে খেতে পারে না, তিনিই রোগ খেয়ে ফেলেন। এক-একটা লোকের কেমন ম্যানিয়া থাকে নিশীথবাবু। শত বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও জীবনের ভিতরে কলি ঢোকবার ছ্যাঁদাটা ঠিক করে রেখে দেন তারা। কারুর সাধ্যি নেই ছ্যাঁদা বোজাবে। মাও ইনজেকশন নেন নি।'

'কেন?'

'বাবা তো রোগ স্বীকার করতেন না। মাও ব্যাধিটা পেলেন, আরো চার-পাঁচ-জনকে তো দিয়েছেনই, আট-দশজনও হতে পারে।'

ভোরের আলোয় মনে হচ্ছিল যেন কোনো নির্মল মেয়েমানুষের মত আত্মস্থ হয়ে নচিকেতার মত, বৃষ্টির মত, পাখির মত, আওয়াজে কথা বলছে নমিতা। বাবা-মা কী করছে সবই জানে, সবই সকলকে বলতে কোনো দ্বিধা নেই তার, বোধ বিচারের এমনই একটা সত্য ও কল্যাণে যেন সে পৌঁছেছে।

'মা যাঁদের খেয়েছেন তাঁরা সেরে যান। রোজই সাপের কামড় খেয়ে বেজির ওষুধ খেতে হয় তাদের। তাঁরা ঠিক আছেন। কিন্তু আমার রক্তে তো জন্ম থেকেই বিষ। কোনো ওষুধ আছে কি না বলতে পারছি না। আমার বাবার জন্যে'—নমিতা বললে।

সিগারেটের টিনের লেবেলের উপরকার ক্ষুদে অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে দূর থেকে পড়বার চেষ্টা করছিল নিশীথ; চোখের শক্তি পরীক্ষা করে দেখছিল।

'আপনার কথা বলেছিলেন আপনাকে বাবা?'

'কাকে?'

'ডাক্তারকে।'

'না, আমাকেও বলেন নি' আমি নিজে অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতে পাবি নি কিছু।'

'অনেক দিন?'

জিতেনের সঙ্গে বিয়ের দেড় বছর আগে বুঝেছি।'

'ও।'

'ইনজেকশন নিচ্ছি। বিয়ে তো ছ মাস আগে হয়েছে।'

'জিতেন জানে?'

'আমি বলি নি কোনোদিন,' নমিতা বললে, 'জিতেনকে বলবেন না যেন নিশীথবাবু।'

কী করে বলবে নিশীথ। এ সব ব্যাপারে নিজের স্ত্রীর চেয়ে কর্তা তো কেউ নেই। কেষ্ট নিজে যদি মারে কেউ রাখতে পারবে না। যদি রাখে কে মারবে তবে আর?

'ইনজেকশন দিয়ে সেরে গেছে রোগ?'

'না, সারে নি এখনো। ট্রিটমেন্ট চলছে। সময় লাগবে সারতে।'

'রোজেনবুর্গ দেখছেন?'

'না। বিনয় কাহালি।'

'সে কে?'

'খুব বড় স্পেশালিস্ট; আমাদের কাউকেই চেনেন না। জানেন না আমি কে। জিতেন দাশগুপ্তের নাম শোনেন নি কোনো দিন।'

'আশ্চর্য, দাশগুপ্তের নাম শোনে নি এমন বাঙালি ডাক্তারও আছে কলকাতা শহরে?'

'বিনয় কাহালি?'

সিগারেটের টিনের লেবেলের উপরে লেখা কিছুতেই পড়তে পারছিল না নিশীথ; চোখ খারাপ হয়েছে; দেখানো দরকার; ছানি পড়তে আরম্ভ করল না তো?

'জিতেন তো ফাঁদে পড়তে পারে—না, জেনে?'

'কিন্তু অন্য কাউকে নাশ করবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নমিতা একটা সিগারেটের টিনের ঢাকনি খুব টাইট করে এঁটে নিতে-নিতে বললে, জিতেন খুব ভাল ছেলে।'

'কিন্তু রোগ হলে নিজের পরিণাম তো ভাল নয়।'

'সেদিকে আমার দৃষ্টি আছে নিশীথবাবু, জিতেনের নুন খাচ্ছি বলে রক্তও খাব?' টাইট ঢাকনির সিগারেটের টিনটা দু-একবার খুলবার চেষ্টা করে, খুলে ফেলে আবার টাইট করে এঁটে দিতে-দিতে বললে নমিতা, 'এ সব বিষয়ে সব কথা আপনাকে কী করে বলি বলুন?'

নমিতা সব কথাই তো নিশীথকে বলে ফেলেছে।

ইয়ুসুফকে বলেছে হয় তো, জুলফিকারকে আরো বেশি বলেছে? আরো বেশি কী কথা থাকতে পারে যা সত্যিই বলবার মত? নিশীথ সে সব অন্তিম আর্যসত্যগুলোকে ভেবে দেখছিল। নাঃ, কিছু নেই আর; বাবা-মার সিফিলিস। নিজেও দূষিত বলেছে-সে একজন পুরুষকে সবই তো বলেছে। হয় তো কথা বলা শুধু, হয় তো সত্য কথা বলা, কিন্তু সব থিতিয়ে শেষ পর্যন্ত অমৃত রয়েছে; নমিতার সুস্থ সফল সুন্দর শরীরের দিকে তাকিয়ে অনুভব করছিল নিশীথ। 'যাবেন আজ পার্কসার্কাসে?'

'যাব'।

'কখন?'

'খেয়ে-দেয়ে দুপুরবেলা। আপনি কি কম্যুনিস্ট নিশীথবাবু?'

'না তো। আমার ছেলে একটা নতুন সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ছে, আমি কোনো দিকেই ভিড়লুম না।'

'আমি তো ক্যাপিটালিস্ট—'

'দেখছি, তো।'

'আমাদের কি উচ্ছেদ করে দেয়া হবে?'

'চেষ্টা চলছে। তবে শিগগির সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।'

'এ চেষ্টায় আপনি কোন দলে?'

'সকলের যাতে ভাল হয়, সবার উপর সুবিচার হয়; আমি, আমার সেপাই, আমার রাধাচক্রের জয় হল কি না অন্য সব কাপ্তেনদের উপর—সেদিকে লক্ষ্য না রেখে—এ রকম একটা শিব সুস্থ, প্রাণঘান পরিণতিতে আজকের কোনো বিপ্লবই আমাদের নিয়ে যাবে বলে মনে হয় না' বলতে-বলতে থেমে গিয়ে, খানিকক্ষণ থেমে থেকে নিশীথ বললে, 'তা হলেও যারা মনে করছে তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য সকলের ভাল, কল্যাণের পথ সত্যিই সুগম করে দেয়া সকলের জন্যে—আমার ঝোঁক তাদের দিকে।'

'অনেক ক্যাপিটালিস্টই তো আজকাল এই রকম কথা বলছে,' নমিতা বললে।

'তা বলছে বটে। সে জন্য এ সব কথার মর্যদা কমে যাচ্ছে। কথা চাচ্ছে না এখন আর মানুষ কোনো শ্রেণীর কোনো নেতার মুখ থেকে। সব কথা শোনা হয়ে গেছে। এখন নমুনা চাই'—নিশীথ বললে, 'যারা সত্যিই পৃথিবীর ভাল হবে মেনে নিয়ে ভেবেচিন্তে কাজ করে আমার ঝোঁক তাদের দিকে। কিন্তু পৃথিবী কোনোদিন শুদ্ধ হবে না আমি জানি। যে-কোনো বিপ্লব শেষ পর্যন্ত বিপ্লবে গিয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎ মানবের ভাল করতে গিয়ে সমসাময়িক মানুষকে শেষ করে দিয়ে যায়। কিন্তু তবুও ভবিষ্যৎ মানুষের ভাল হয় না। তিন হাজার বছর ধরে এই তো চলছে। আরো তিন-চার হাজার বছর এই রকমই চলবে।'

'এই কি আপনার ধারণা?'

'এর চেয়ে শ্রেয় ধারণায় আমাকে দাঁড় করিয়ে দিন না, আপনাকে শিরোপা দেব।'

'এক-একজন বড় মানুষের মৃত্যু হলে ওরা লেখে, সভা সমিতিতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বলে যে শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রতি আস্থা কোনোদিনও হারিয়ে ফেলেন নি তিনি। মানুষ যে অমানুষ সেটা তিনি দিন-রাত্তির দেখেছেন চারিদিকে বটে, কিন্তু স্বীকার করতে চান নি। চারদিকে সব ভেঙে পড়ছে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে মানুষের হাতে, সেটা দেখতে পেলেও তিনি জানতেন মানুষের হৃদয় ঠিক জায়গায়ই আছে, মানবতার প্রতি বিশ্বাস শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল তাঁর,' নমিতা বললে, 'কেন এ রকম বলে, লেখে, যে-কোনো বিশেষ করিৎকর্মা বা চিন্তাশীল লোকের মৃত্যু হলে?' নিশীথকে জিজ্ঞেস করল নমিতা।

'এ ছাড়া কী আর বলবে? এ ছাড়া কী আর লিখবে?' বললে নিশীথ, 'পৃথিবীর উন্নতি হবে, মানুষের ভাল হবে, মানুষ ভাল—এটা ক্যাপিটালিস্ট বা কম্যুনিস্টদেরই নিজেদের কথা নয়, সকলেরই, পৃথিবীর মানুষ সাধারণেরই, এই ধারণা।'

'ধারণাটা দুর্বার?' নমিতা হেসে বললে, 'তবেই হয়েছে,' তবে একটা কথা নিশীথকে বললে, 'মানুষ যদি সত্যিই ভাল না হয় তা হলে সে যে ভাল, তার পৃথিবীর যে ভাল হবে, এ ধারণা এমন গেড়ে বসে কী করে তার মনের ভিতর?'

'কই আমার তো বসে নি।'

'আপনার কথা আলাদা—'

'খুব ভাল হবে মানুষের; মনে হয় আপনার? আজ কংগ্রেস, কাল কম্যুনিস্ট, পরশু সোস্যালিস্টরা সত্যিই সিদ্ধির স্তরে পৌঁছিয়ে দেবে পৃথিবীটাকে?'

'হতে পারে। অসম্ভব কী? কংগ্রেস তো প্রাণান্ত চেষ্টা করেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কম্যুনিস্টরাও তো প্রাণান্ত চেষ্টা করছে।'

'কম্যুনিষ্টরা? কোথায়?'

'কেন, তাদের দেশে রাশিয়ায়। আরো অনেক দেশে। আমাদের দেশেও তো।'

নমিতা তা জানে বটে।

'জিজ্ঞেস করেছিলুম আপনি কম্যুনিস্ট কি না।'

'আমি কোনো কিছুই নই।'

'ঐ কথাই বলে কম্যুনিস্টরা; বলে ওরা কোনো দলেরই নয়।'

'কোনো কম্যুনিস্টরা তো বলে না?'

'আধা কম্যুনিস্টরা তো বলে?'

'কাকে বলে আধা কম্যুনিস্ট নমিতা দেবী?'

নমিতা একটা সিগারেট নিল।—'কাকে বলে আমি ঠিক বলতে পারছি না। আমি নিজেই হয় তো একজন। জুলফিকারও হয় তো। সে তো মার্কস পড়ছে—'

'বড় বইটা? দাস ক্যাপিটাল?'

'হ্যাঁ, মূল জার্মান থেকে, মাঝে-মাঝে আমি বুঝিয়ে দিই তাকে। ইংরেজি অনুবাদটা পড়তে চাচ্ছে না তাই।'

জুলফিকার হয় তো ভেবেছে কায়কোবাদের উক্তি তার নিজের ভাষায়ই পড়া ভাল। 'ঠিকই ভেবেছে'—নিশীথ বললে।

'বেশ লিখেছে তো মার্কস। ঠিক কথাই লিখেছে। আপনি পড়েছেন দাস ক্যাপিটাল?'—নিশীথের দিকে আন্তরিক অমায়িক ঘাড় ফিরিয়ে নমিতা বললে।

'এইবারে পড়ব ভাবছি—'

'আমার জার্মান বইটা জুলফিকারের কাছে আছে। মাঝে-মাঝে নিয়ে আসতে পারি। তর্জমা করে শোনাতে পারি আপনাকে। আলোচনা চলতে পারে। তারপর আপনাতে-আমাতে-জিতেন থাকলে সেও বলবে যা বলবার। ক্যাপিটালিস্টদের পক্ষ থেকে কিছু আত্ম-সমর্থনের উপায় আছে হয় তো জিতেনের। নিজেদের বারটা বেজে গেছে এ কথা সে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইবে না।'

'কে, জিতেন?' সিগারেট জ্বালাতে জ্বালাতে বললে নিশীথ।

'বড্ড ঘোড়েল লোক' নমিতা হাতের সিগারেটটা ঠোঁটে আটকে নিয়ে বললে।

'খুব পরিব্যাপ্তি আছে আপনার মনের নমিতা দেবী। প্রায় কোনো স্ত্রীলোককেই এ রকম দেখি নি আমি, আপনার মতন এ রকম—'

'আমার মতন?' নমিতা সাত-পাঁচ ভেবে নিশীথের দিকে তাকাল।

'জার্মান দাস ক্যাপিটাল আর ফরাসি ভিলোঁ, কী করে একই মানুষের মনে প্রায় সমান ঠাঁই করে নেয়, সেটা আন্দাজ করছিলুম। মার্কসের কারণ-সাগরে যারা ডুবে আছে, তাদের আমি খুব শ্রদ্ধা করি কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাদের ভিতর কেউ যদি ভিলোঁর মতন শয়তানের কবিতার রস গ্রহণ করবার দুঃসাহস দেখায়, তা হলে—'

'কী হয় তা হলে?'

'তা হলে সে লোকের মনের চারণভূমির প্রসার দেখে বাস্তবিকই খুব আশ্বাস পাওয়া যায়।'

নমিতা নিজের মনের এ দিককার শ্রী সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল না, এবারেও বিশেষ কোন সম্ভ্রমবোধ করল না সে নিজের চিত্তবৃত্তির জন্যে। মার্কসের চিন্তাকূট অনুসরণ করে নিদারুণ জার্মান বাক্যগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে লেগেছে মন্দ না। ভিলোঁর ফরাসি কবিতা ভাল লেগেছে; এ কোনো বৃহৎ মনের পরিচয় নয়, মহৎ মনের তো নয়ই; তবে মনের রসিকতা আছে তার হয় তো, রসিকতায় উদারতা আছে বটে।

'ভিলোঁর কবিতার কথা ভুলেই গিয়েছিলুম।'

'ভিলোঁর ফরাসি আবৃত্তি করে পড়বেন, শুনতে চাই। পড়ে তারপর তর্জনা। কবে সম্ভব হবে?'

নমিতা মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বললে, 'আজ, কাল, যে-কোনোদিন। যখনই সুবিধে হয় আপনার।'

'যে কোনোদিন—যখনই সুবিধে—আচ্ছা তা হলে—বইটা জুলফিকারের কাছে আছে। আনিয়ে নিতে হবে।'

নিশীথ কী যেন বলতে যাচ্ছিল—না বলে কুঁড়েমি অনুভব করে নমিতার ডান পায়ের উপর চড়ানো বাঁ পায়ের যুগল শোভার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

'ভিলোঁ ফরাসিতে আরো ভাল লাগবে আপনার।'—নমিতা বললে। বলে সে নিশীথের চোখ অনুসরণ করে নিজের ডান পায়ের উপর চড়ানো বাঁ পায়ের অনড় আবদ্ধতার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার।

'কিন্তু আমার তর্জমায় তেমন জুত লাগবে না আপনার নিশীথবাবু।'

বাবুর্চি এই ঘরে বড়-বড় তেপয় এনে সাজিয়ে ঠিক করে গেল। চা, প্যাস্ট্রি, ডিম, জ্যাম, মার্মালেডের শিশি একে-একে রেখে গেল সব। দুপুর রাতে বেশ সাধ মিটিয়ে ঘষে মেজে রগড়ে সাফ করেছে নমিতা। হাত-মুখ ধুতে গেল না আর। নিশীথ মুখ ধোবার বেসিন থেকে পাঁচ মিনিটেই কাজ সেরে ফিরে এল। পাউরুটির কাঁচা স্লাইসে মাখন মার্মালেড মাখাচ্ছিল নমিতা। হয়ে গেছে। নিশীথকে ফিরে এসে কৌচে বসতে দেখে বড় ঘন নীল টি-পট থেকে চা ঢালতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চা দিয়েছে আজ। নমিতা বললে, 'খাবেন কফি?' নিশীথকে জিজ্ঞেস করল।

'না, বেশ চমৎকার চা।'

'বিকেলে কফি হলে ভাল হয়?'

'বিকেলে কি থাকবেন আপনি এখানে?'

'না থাকলে বাবুর্চিকে বলে যাব।'

'পার্কসার্কাসে যাবেন?'

'হ্যাঁ, জুলফিকার বলে দিয়েছে।'

'আমিও বেরিয়ে পড়ব হয় তো বিকেলে।'

'জুলফিকার ইয়ুসুফের ভাই'—একটা প্যাস্ট্রিতে কামড় দিয়ে বললে নমিতা। 'পশ্চিমবাংলা সরকারের একটা কী পজিশন অকুপাই করে আছে। দাঙ্গার সময়ে সোরাবর্দি সাহেবের গভর্নমেন্টের একটা কী-পজিশন ধরেছিল। লোক ভাল। আমার বাবা-মাকে তো দাঙ্গার সময়ে কেটেই ফেলত পার্কসার্কাসে, বাঁচিয়েছে জুলফিকার ইয়ুসুফ—'

চা খাচ্ছিল নিশীথ, খানিক খেয়েছে; চায়ের পেয়ালাটা তেপয়ের উপর রেখে দিয়ে একটা প্যাস্ট্রি বেছে নিতে-নিতে বললে, 'আপনাকেও তো বাঁচিয়েছে. ছিলেন না পার্কস্যার্কাস সেই সময়ে?'

'ছিলুম।'

'কে ইয়ুসুফ? ইয়ুসুফ বাঁচাল বুঝি আপনাকে?'

'না। তার ভাই। জুলফিকার নিজের ঘরে হাওয়া করে রেখে দিয়েছিল আমাকে দশ রাত—'

'ক বছর ছিলেন ওদের ফ্ল্যাটে বিয়ের আগে?'

'পার্কসার্কাসে? বছর তিনেক ছিলুম।'

'নিশীথ বললে, 'কোথায় দেখল আপনাকে জিতেন?'

নিশীথ খাচ্ছে না কিছু, চা খাচ্ছে শুধু, প্যাস্ট্রি খাচ্ছে না, পাউরুটি স্যান্ডউইচ যা হোক না, ডিম পোচ একটা খেয়েছে শুধু। নিশীথকে ডিম প্যাস্টি স্যান্ডউইচ খেতে বললে নমিতা। 'গ্র্যাহাম অ্যান্ড গ্র্যাহামে জিতেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার।'

'একেবারে সিংহের নিজের গহ্বরে?'

'একটা ব্যবসা চালাচ্ছিলুম ইয়ুসুফ আর আমি।'

'কিসের ব্যবসা?'

'সেটা আপনাকে বলব না নিশীথবাবু।

'মিটে গেছে বুঝি ব্যবসা?'

'মিটিয়ে—চুকিয়ে-বুকিয়েই দিয়েছি বলে জানে জিতেন।'

খানিকটা স্যান্ডউইচ কেটে, ডিম পোচের খানিকটা মিশিয়ে নিয়ে, মুখে তুলবার আগে বলে নিল নমিতা; খেতে-খেতে বললে, 'কিন্তু চলছে ব্যবসাটা। সেটা নিয়ে, নয়, অন্য দু-দশটা ফাঁক-ফিকির সম্পর্ক দাশগুপ্ত সাহেবের পরামর্শ নেবার জন্য কয়েক দিন তাঁর অফিসে গিয়েছিলুম আমি আর ইয়ুসুফ—আরো চা খাচ্ছেন নিশীথবাবু? ডিম, মাখন, জেলি, কেক কিছু খাচ্ছে না। ও-সব খোকারা খায় বুঝি? দিন, আমি ঢেলে দিচ্ছি।'

'দিন।'

টি-পটটা স্বামিনী নিজের হাত নিয়ে নিশীথের পেয়ালায় চা ঢেলে দিতে লাগল।

'কথা হচ্ছিল ক্যাপিটালিস্ট, কম্যুনিস্ট, সেস্যালিস্টদের নিয়ে। কথা বলতে-বলতে খেই হারিয়ে ফেলেছি আমরা। কয়েকজন বড় ঘরের মেয়ে ইদানীং আমার বাড়ি প্রায়ই আসছে।'

'কেন?'

'চেনাজানা ছিল না তাদের সঙ্গে' নাম শুনি নি কোনো দিন। দেখছি তারা সকলেই বেশ ভাল-ভাল সমিতির মেম্বার, সেক্রেটারি, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ট্রেজারার। সমিতিগুলো সবই প্রায় দেশ সেবার ব্যাপার নিয়ে; কিন্তু দেশ সেবার চেয়েও মানুষের সেবার দিকে ঝোঁকে তাদের ঢের বেশি। ঝাড়ুদার—জমাদার হানিফ, কৃষাণ, ট্রাম-বাস, ফ্যাক্টরির মজদুর; এদের নিয়েই তাদের সমিতিসভাগুলো ঢের বেশি ব্যস্ত।'

'আপনিও মেম্বার হয়েছেন বুঝি?' নিশীথ বললে।

টি-পট থেকে নিজের পেয়ালায় চা ঢেলে নিতে-নিতে নমিতা বললে, 'হতে চাই নি আমি প্রথমে।'

'কেন?'

'আমি তো ক্যাপিটালিস্ট।'

'তাতে কি? যে-সব মহিলারা এসেছিলেন আপনার কাছে তাঁদের ভিতর অনেকেই তো বুর্জোয়া ক্যাপিটালিস্ট।'

নমিতা চায়ে চুমুক দিতে যাচ্ছিল, পেয়ালাটা সরিয়ে নিয়ে বললে, 'কে বললে আপনাকে?'

'আপনিই তো বললেন বড় ঘরের মেয়েরা সব এসেছিল, আপনার কাছে। বড় ঘরের মেয়েরা কী করে কৃষাণ মজদুররাজ হয়?'

খেল না, চায়ের পেয়ালাটা হাতেও রাখল না নমিতা। তেপয়ের উপর বসিয়ে রেখে বললে, 'দেখলাম বেশ ভাল চেহারা, সুস্থ শাড়ি-কাপড় ঠিক-ঠিক। স্বামীরা বড়-বড় অফিসার, তাই বলেছি বড় ঘরের মেয়ে। কিন্তু তাই বলে এঁরা কি প্রলেতারিয়েতদের বিপ্লব আনতে পারবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা আনতে পারবে'—নিশীথ বললে, চা-ই খাচ্ছিল শুধু; একটা স্যান্ডইউচ কেটে নিচ্ছিল।

'আপনি ভর্তি হয়ে গেলেন বুঝি ওদের দলে?'

'হয়েছি তো।'

স্যান্ডউইচের ছোট একটা টুকরো মুখে নিল নিশীথ। আর খাবে না।

'ওরা কি শুধু চাঁদা নিয়েই ছেড়ে দেবে আমাকে? মাঝে-মাঝে স্ট্রাইকের দরকার হবে?'

'স্ট্রাইক দাঁড় করাতে হবে, পরিচালনা করতে হবে। আপনার যদি ঝোঁক থাকে, সেদিকে দিব্যি পারবেন আপনি।'

নমিতার ওয়াকি পোশাক ও সুস্থ সফলতার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে, 'চমৎকার এলেম আছে মিসেস দাশগুপ্ত আপনার; গড়বার ভাঙবার। কী করবেন? ভাঙবেন?'

'একটা কিছু করতে হবে নিশীথবাবু। কী যে করব ঠিক পাচ্ছি না। ভাঙবেন বলছেন কেন? কেন, স্ট্রাইকের দরকার নেই কি কোনোদিকেই একেবারে আর? স্ট্রাইক করা মানেই কি ভাঙা? যে-যে জিনিস খারাপ হয়ে গেছে সেগুলো না-ভেঙে ভাল সৃষ্টি করা যাবে কী করে? সেগুলোকে জুড়ে বসে থাকতে দিলে চলবে কেন?'

'পলিটিক্সের আমি কিছু বুঝি না মিসেস দাশগুপ্ত।'

'অথচ আপনি পলিটিক্সের প্রফেসর নিশীথবাবু—'

'আমি ইংরেজির প্রফেসর।'

'বেশ তো ইংরেজির, ফিলসফির, কিন্তু আজকালকার দিনে পলিটিক্সের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে থাকবার উপায় নেই কারুর।'

'জিতেন কী বলে? স্ট্রাইক করতে বলে?'

'সে কেন স্ট্রাইক করতে বলবে।'

'গ্র্যাহাম অ্যান্ড গ্র্যাহাম তো মস্ত বড় একটা বজ্জাত জায়গা। ওটাকে সব চেয়ে আগে ভেঙে ফেলা দরকার; যদি স্ট্রাইক করতে চান আপনি। জিতেনের অফিস ছেড়ে দিয়ে স্ট্রাইক করার কোনো অর্থ হয় না—'

হানিফ একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে এসে নমিতাকে দিল। দু'জনকেই সেলাম ঠুকে চলে গেল সে। নিশীথ ভাবছিল এই হানিফদের কথা হচ্ছিল; এ রকম সেলাম ঠুকবার কী দরকার ছিল তার, এ রকম শশব্যস্তভাবে? কেমন করে ঘাড় বেঁকিয়ে মাথা হেঁট করে চলে যাচ্ছে; যেন মাটির থেকে ওঠাতেই পারছে না মাথা। কৃষাণ কামিনদের অবস্থা বুঝি হানিফদের চেয়েও খারাপ?'

'কে করেছে টেলিগ্রাম?'

'জিতেন।'

'কী খবর?'

'জামসেদপুর থেকে দিল্লি চলে যাচ্ছে জিতেন, দশ-পনের দিনের জন্য। আপনাকে থাকতে বলেছে এখানে। জিতেন ফিরে না আসা পর্যন্ত কোথাও যেতে নিষেধ করেছে।'

'কেন যাচ্ছে দিল্লি?'

'ব্যবসায়ের দরকারে।'

'নিজের ব্যবসায়ের কাজে, না অফিসের?'

'গ্র্যাহাম অ্যান্ড গ্র্যাহাম তো জিতেনের নিজের জিনিস হয়ে যাচ্ছে।'

নিশীথ ভারী আশ্চর্য, কেমন আলোড়িত বোধ করে বলল, 'সত্যি? কই শুনি নি তো। বলে নি তো কোনো দিন আমাকে জিতেন।'

বিশেষ উৎসাহ বোধ না করে নমিতা বলল, 'বলবার সময় পায়নি। গ্র্যাহাম অ্যান্ড গ্র্যাহাম তো ওর নিজের—'

'কেন? সাহেব পার্টনাররা কোথায় গেল?'

'বিলেত চলে যাচ্ছে গুডইউল বিক্রি করে দিয়ে।'

'একা জিতেনকে?'

'জিতেনকে।'

হানিফ এসে চায়ের পেয়ালা, ডিস, সরঞ্জামগুলো সরিয়ে নিয়ে গেল সব। চা খাওয়া হয়ে গেছে। নমিতা দুপুরে এ বাড়িতে খাবে, না অন্য কোথাও, জিজ্ঞেস করল হানিফ।

'হানিফ, তুমি জুলফিকারকে ফোন করে দাও যে আমি আজ দুপুরে পার্ক-সার্কাসে যাব। একটা-দেড়টার সময় যাব।'

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর।'

ফোনটা নমিতার হাতের কাছেই ছিল, ইচ্ছে করলে নিজেই করতে পারত কিন্তু কেন যেন গড়িমসি করে উদাসভাবে ঘরবারের দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে রইল সে। হানিফ রিসিভার ধরে দাঁড়িয়েছিল; কানেকশন হয় নি এখনো। 'হানিফ, জুলফিকার যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি ফোন করছ কেন, মেমসাহেব বাড়িতে নেই নাকি।' তা হলে বলে দিও যে মেমসাহেব বেরিয়ে গেছেন।

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যদি জিজ্ঞেস করে যে বাড়িতে আর-কেউ আছে কি না, তবে বলে দিও যে সেনসাহেবে আছেন, মেমসাহেব কোথায় আছেন, কী বলেছেন, না বলেছেন, সব জানেন সেনসাহেব। জুলফিকার সাহেব যদি চান সেনসাহেবকে ডেকে দিতে পার হানিফ,—বলো।'

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর।'

জুলফিকার ডাকল না কাউকে। হানিফ ফোন করে চলে গেল।—'হানিফকে দিয়ে ফোন করালেন কেন?'

'আমি ফোনে গেলে কথায় কথা বেড়ে যেত ঢের জুলফিকারের।'

'ভালই তো হত।'

'যাচ্ছিই তো পার্কসার্কাসে।'

আটটার সময়ে চা খাওয়া শেষ হয়ে গেল। নিশীথ উঠে গেল, চান করে বেরিয়ে পড়তে হবে। নমিতা নিজের ঘরে ঘুমোতে গেল। এগারটা-বারটার সময় ঘুমের থেকে উঠে স্নান করে পার্কসার্কাসে চলে যাবে। নিশীথ বাথরুমে চলে গেলে হানিফকে ডাকল নমিতা, বললে, সে ঘুমোতে যাচ্ছে, বারটায়ও যদি না জাগে তা হলে হানিফ তাকে জাগিয়ে দিয়ে যায় যেন।

জাগিয়ে দিয়ে যাবে? কিন্তু কাপড়-জামা খুলে ফেলে শুয়ে পড়বে তো নমিতা। অন্দরের দিকের দরজা-জানলা সব বন্ধ করে, বাইরের দিকে জানলাগুলোর উপর পর্দা টেনে দিয়ে ফ্যান খুলে ঘুমিয়ে পড়বে সে, খুবই হুঁশিয়ারি আছে তার; নানা জায়গায় নানা রকম কাজকর্ম তত্ত্ব-তদারক তদ্বির-আমন্ত্রণ থাকে তার; এখান থেকে ওখানে—ওখানে থেকে সেখানে যাওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝে ঘুমিয়ে নেয় সে; কিন্তু বেকুবের মত ঘুমোয় না, সব জায়গাতেই সময় মত হাজির হয় গিয়ে। নিশীথের সঙ্গে কথা বলে সারাটা রাতই আজ জেগে কাটিয়ে দিল। নমিতার এখন ঘুম পেয়েছে, ঘড়িতে আটটা বেজে দশ মিনিট-সাড়ে এগারটার সময় কিংবা মিনিট পনের-কুড়ি আগে বা দশ-পনের মিনিট পিছিয়ে জেগে উঠবে সে এই সংকল্প নিয়ে ঘুমোতে গেল। নিতান্ত যদি না-জাগে, হানিফ কলিং বেল টিপবে নিচের তলার থেকে-বেজে উঠবে তার ঘরের ভিতর; হানিফ সাড়ে এগারটার অ্যালার্ম ঠিক করে গেছে বিছানার কাছে তেপয়ের উপর ঘড়িটাতে, বেজে উঠবে; এতেও না জাগলে দরজায় ধাক্কা দেবে হানিফ। খুব জোরে কড়া নাড়বে, দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়বার দরকার হবে না হানিফের। হানিফ ঘড়ি ঠিক করে চলে গেছে। অন্দরের দিকের দরজা জানলাগুলো বন্ধ করে দিল নমিতা, ফ্যান খুলে ও-দিককার জানলাগুলোর পর্দা টেনে ম্যাক্স কোট খুলে ফেলে শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ওষুধ লাগে নি আজ।

বাথরুম থেকে স্নান সেরে ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবি ধুতি পরে বেরিয়ে পড়ল নিশীথ। কাছেই একটা সেলুনে দাড়ি কামিয়ে নিল। জলপাইহাটির থেকে পঞ্চাশ টাকা হাতে নিয়ে নেমেছিল, এখন কুড়ি-পঁচিশ টাকা হাতে আছে। সুমনাকে শিগগির টাকা পাঠাবার দরকার নেই, দেড়শ টাকায় মাস তিনেক চালাতে পারবে একা মানুষ; ডাক্তারকে পাঁচশ টাকা দিয়ে এসেছে। মাস তিনেক চলবে ওষুধ, পথ্য, ভিজিট, ইনজেকশন। ভানুর জন্য টাকা দেওয়া দরকার নিশ্চয়ই সুবলকে, কিন্তু সেটা অবিলম্বে না দিলেও চলবে; কিন্তু ফলটল কিনে দেওয়া দরকার বটে ভানুকে। কিন্তু খানিকটা টাকার যোগাড় না করে কোনো দিক দিয়েই কিছু করবার ভরসা পাচ্ছে না নিশীথ।

কোথায় টাকা পাবে সে? চারদিককার ট্রাম, বাস, মোটর, ট্রাকের দুর্নিবার পৃথিবীতে অর্থসঞ্চয়ের কলাকৌশলটা দ্রুত, আয়ত্ত করে ফেলা দরকার তার, খুব তাড়াতাড়ি; তা হলেই সেও দ্রুত, একাত্ম হয়ে যাবে এই অপ্রকৃতিস্থ মহানগরীর এই অনর্গল অপরিস্রুত উল্লাসকে আশ্চর্য পরিস্রুত তাণ্ডবে পরিণত করবার দুর্দান্ত সময়যন্ত্রের সঙ্গে। কিন্তু আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ বছরেও টেংকুর তুলে হাঁটতে-হাঁটতে যদি তাকে নিজের কায়দা-কানুন ঠিক করে নেবার কথা ভাবতে হয়, তা হলেই হয়েছে। চারদিকে কুড়ি-বাইশ বছরের ছোকরারা জিপে ছুটে যাচ্ছে, ব্যাংক লুটছে, কালবাজার চিবিয়ে খাচ্ছে, বড়-বড় মনসবদারি জোগাড় করছে নতুন ইউনিয়নে, জায়গা জমি কিনছে যাদবপুর বেহালায়, টালিগঞ্জ রিজেন্টপার্কে, বালিগঞ্জে দিব্যি ভিলা তুলে ফেলছে সব, মেয়েমানুষ নিয়ে কৃতকৃতার্থ হয়ে ফিরছে।

এই কলকাতায় চাকরি জোগাড় করতে হবে তাকে আটচল্লিশ বছর বয়সে? চাকরি করে পরিবার আনতে হবে। যেখানে ফুটপাতেও মাথা পাতবার জায়গার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যাচ্ছে, একটা গোয়াল, ভঁইষের আগাড়, শুয়োরের খোঁয়াড়, গ্যারেজ-কিছু খালি নেই, সেখানে বাড়ি খুঁজে নিতে হবে তার—বাড়ি, ফ্ল্যাট, রুম-রুম দু-চারটে এক-আধটা, একটা রুমের আধখানা—সিকিটাক অন্তত। দাশগুপ্ত সাহেবের ভিলার সোফা-কৌচে নমিতার হাত তোলায় থেকে-খেয়ে কী নিদারুণ অর্থব হয়ে পড়েছে সে একটা দিনেই; যুক্তিকে সরিয়ে দিয়ে সে বসিয়েছে স্বপ্নকে; সংকল্পকে সরিয়ে দিয়ে বাসনাকে। যেখানে কাজ করবার কথা তার, মুখে রক্ত চাগিয়ে তুলে দেড়শ-দুশ টাকা মাসোহারা হাতড়ে পাবার জন্য, সেখানে সে লক্ষপতির রূপসীকে সময়ের বুক থেকে খসিয়ে সব সময়ের আশ্চর্য শূন্যে সৃষ্টির সাদা মরালীর মত ছেড়ে দিয়েছে যেন; পাখিদের পরিভাষামদির অধীর কথোপকথনে বিলোড়িত হয়ে নিষ্পেষিত আহত ঝিলের জলকণিকার মত ছুটেছে সে আকাশ-হংসীর পিছনে নীলিমার থেকে দূর অগম নীলিমার দিকে।

কুড়ি-পঁচিশ টাকা হাতে আছে মাত্র। দু-তিন মাস পরিবারকে কিছু পাঠাতে হবে না তার বটে, কোনো কিছু অদ্ভুত আকস্মিক ব্যত্যয় না ঘটলে তার টাকার উপর দাবি জানাতে আসবে না কেউ শিগগির। কিন্তু যে-মানুষের আয় মাসে আট-দশ হাজার, তার বাড়িতে পঁচিশ-তিরিশ টাকা সম্বল করে আট ঘণ্টাও কী করে থাকে সে? একটা পয়সাও অবিশ্যি খরচ করতে হবে না নিশীথকে—থাকা-খাওয়া আপ্যায়িত হওয়ার নানা রকম ফেলাছড়ার ব্যাপার-গুলোতে। কিন্তু অনুভব করবে নাকি নমিতা অন্দরে-বাইরে, বাজারে, নানা রকম ব্যাপারে যে এ লোকটার হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হানিফের মতন সচ্ছলতাও নেই? জিতেন এসে কী বুঝে নেবে, কী আন্দাজ করবে? থাকতে দেবে কি নিজের বাড়িতে নিশীথকে এক মাস ফুরিয়ে গেলে আরো কিছু দিন—তার পরে আরো কিছু দিন, এত বড় একটা দিকপাল মানুষের বিবাহিত জীবনের সুখ স্বাধীনতা সুবিধেগুলোয় নিশীথের মত একটা ইঁদুরকে দাঁত বসাতে দিয়ে।

না রাখলেও হয় তো স্থির করে নিয়ে জিতেন তবুও রাখবে হয় তো নিশীথকে; জিতেন কী স্থির করছে উপলব্ধি করে নিশীথকে অনুভব করে নেবে নমিতা। আজও তো অনুভব করেছে নমিতা-সে দিনও করবে। কিন্তু এত দিন কি জিতেনের বাড়িতে থাকবে নিশীথ নমিতাকে তিলে-তিলে সেই আর-এক অনুভূতির নিরেস নাস্তিলোকের দিকে ঠেলে ফেলবার জন্যে?

হয় তো কিছুই, বিশেষ কিছুই, মনে করবে না এরা দু'জন। গ্র্যাহাম অ্যান্ড গ্র্যাহামের সর্বগ্রাসী প্রতাপে এত আলোড়িত হতে থাকবে জিতেন যে নমিতার দিকেও মন দেওয়ার অবসর পাবে না সে, তাগিদ থাকবে না তার। এখনই তো পাওয়া যাচ্ছে সেই ইঙ্গিত। এ ইশারা গ্রহণ করে ক্রমেই বিমোহিত হতে থাকবে হয় তো নমিতা, আইনের মারফৎ নয়, এমনিই তার সাধ-সাধনার দেশে, চেতনার দেশে তার, বিবাহিত জীবনের জাত, কুলশীল, সব নিয়ম নির্দেশের থাকে। আভাস-আভাসের চেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া যাচ্ছে নমিতার অস্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর থেকে এখনই যেন, সেই অনলোজ্জ্বল লিঙ্গ শরীরের নিজেকে বিমুক্ত করে নেওয়ার পিপাসার।

হয় তো এ রকমও হবে না কিছু। জিতেনকে নমিতাকে ঠিক করে বুঝতে পার নি এখনো নিশীথ। মিষ্টি অপভ্রংশে ভাতার হয়ে ভেঙে পড়তে না চাইলেও, আদি শব্দের মর্যাদার ভর্তা হয় তো থাকবে জিতেন, স্বামিনী হয়ে থেকে যাবে নমিতা জিতেনের বাড়িতে পরস্পরের মৃত্যু পর্যন্ত।

ছক যেদিক দিয়েই ঘোরানো যাক না কেন, আসল কথা হচ্ছে মাসে দেড় হাজার, দু'হাজার, আট শ, ছ শ টাকা অন্তত রোজগার না-থাকলে, একটা ভদ্রলোকের মতন বাড়ি-হোক না ভাড়াটে-নিজের জন্যে যোগাড় করে উঠতে না পারলে, নমিতাদের আবহের ভিতর নিজেকে একটি আবির্ভূত প্রদীপের মতই মনে হবে যেন নিশীথের—আলাদিনের আমলে জেল্লা থাকলেও এই গ্যাস-বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের যুগে কোনো সঙ্গতি নেই, কোনো ব্যবহার নেই সে জিনিসের আর।

নাঃ, নমিতাদের সঙ্গে বড় জোর এক মাসের বেশি থাকা যায় না আর। এক মাসও না-থাকতে হলেই ভাল। পনের দিন, দশ দিন, সাত দিনই পরেও যদি সে নিজের মাথা গোঁজবার মত কোনো একটা আস্তানায় সরে যেতে পারে সেইটেই ভাল হবে। দুটো জিনিসের দরকার এখন অবিলম্বেই; একটা ফ্ল্যাট, একটা রুম কিংবা আধখানা রুম হলেও হয়; একটা চাকরি কিংবা রোজগারের যে-কোনো একটা উপায় বের করে নেওয়া, আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে।

বাইশ-তেইশ বছর জলপাইহাটি কলেজে কাজ করেছে নিশীথ, তার আগে দু-তিন বছর কলকাতায় একটা কলেজে কাজ করেছিল, স্কুলে মাস্টারি করেছে। এখন যখন পেনশন নেওয়ার সময় এসেছে জীবনে, হার্ট খারাপ হয়ে গেছে, রক্তের চাপ বেড়ে গেছে তখন নিশীথকে খালি হাতেই কাজ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, ও-কাজে পেনশন নেই, ও-অনটনের কাজে সংসারের টাল সামলাতে-সামলাতে প্রভিডেন্ড ফান্ডের সব টাকাই খরচ হয়ে গেছে, হাতে কিছুই নেই আর-জীবনের। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর অক্লান্তভাবে চাকরি করার পর-তেইশ টাকা সাড়ে ছ আনা ছাড়া। করি-করি করে একটা লাইফ ইনসিওরেন্সও করতে পারে নি সে। বয়স বেশি হয়ে গেল, মোটা টাকা প্রিমিয়াম দিতে হবে বলে খুব বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও লাইফ ইনসিওরেন্স করতেই পারল না আর নিশীথ।

জলপাইহাটি কলেজ ছেড়ে এসেছে, কলকাতার কোনো একটা কলেজে অবিলম্বেই-যদি কাজ জুটে যেত তা হলে মন্দ হত না। চব্বিশ-পঁচিশ বছর সে প্রফেসরি করেছে বটে, কিন্তু তাই বলে সরকারি কলেজে করে নি তো। সরকার তার নিজের কলেজগুলোর জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেছে, পেনশন আছে, ভাল প্রভিডেন্ড ফান্ডের ব্যবস্থা আছে; মোটা মাইনে আছে, এক কলেজে থেকে অন্য কলেজে বদলি হয়ে যাওয়ার পথ খোলা আছে' চব্বিশ বছর কোনো সরকারি কলেজে কাজ করলে কী অবস্থা হত এখন নিশীথের। লম্বা ছুটি নিয়ে, তার পর পেনশন নিয়ে, কলকাতার এ সব জায়গায় কিংবা আরো দূরে টালিগঞ্জে, বেহালায়, যাদবপুরে, সোনারপুরে, লক্ষ্মীকান্তপুরে একটা রুম অন্তত যোগাড় করে নিরিবিলিতে থেকে যেত সে; বেঁচে থাকলে সুমনাকে নিয়ে আসত; লিখত-পড়ত, দেশ-দশের কাজে নিজের মনের আলোর নির্দেশ পেয়ে যতদূর সম্ভব করতে সে। এ রকম সুযোগ, অবকাশ, খানিকটা স্বস্তি, সম্ভব হত জীবনে। কিন্তু চব্বিশ বছর প্রাইভেট কলেজে কাজ করেছে বলে এখন সে পথে দাঁড়াল। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়—যৌবনের প্রৌঢ়তার চব্বিশটা বছর—যাদের জন্যে ভাল মনে দান করেছে নিশীথ, কোথায় সেই সব ছেলেরা আজ? কী করবে তারা—কী দেবে নিশীথকে? কোথায় সেই সব মনিবেরা যাদের কলেজের জন্যে প্রাণ ঢেলে, অন্য কোনো দিকে না-তাকিয়ে, অন্য সব জিনিসের প্ররোচনা প্রলোভন এড়িয়ে, জীবনটাকে একটা নির্দোষ কঠিন নিয়মাচরণের শান্তি ও স্বল্প দৃষ্টির নিখিলে পরিণত করেছিল নিশীথ? একটা সামান্য দরখাস্ত কী রকম হবে, না-হবে হরিলালবাবুদের সঙ্গে নিশীথের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এতেই গিয়ে ঠেকল তবুও? নিশীথের যদি ভুল হয়ে থাকে তাকে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারতেন তাঁরা, যদি অবসাদ এসে থাকে উৎসাহিত করতে পারতেন না কি তাঁরা নিশীথকে, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা করে মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছেন, কিছু টাকা বাড়িয়ে দিতে পারতেন না নিশীথকে, মহিমকে, মুরুব্বির অভাবে যারা উপেক্ষিত হয়ে আছে তাদের সকলকে? কলেজের মোটা ফান্ড আছে, লাখ-লাখ টাকা আছে হরিলালবাবুর নিজের।

অন্য যে-সব সাধ ছিল যৌবনে, পড়বার-পড়াবার, অধ্যাপনা করবার, রাবণের চিতায় জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে সে সব; মাস্টারি করবার শক্তি ছাড়া কিছু নেই এখন আর নিশীথের, অন্য কোনো দিকে রুচি নেই। এর জন্যেই কি টাকার বেকায়দায় ফেলে মাস্টারদের পথে দাঁড় করিয়ে দিতে হয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই তো দেওয়া হয়েছে। পথেই তো দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা যে করা হয়েছে—এতক্ষণ পরে যেন হুঁশ হল নিশীথের। যারা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তারাও যেন কেউ নয়, শূন্যের ভিতরে শূন্য, যে-সব ছেলেদের চব্বিশ বছর ধরে পড়িয়েছে সেই সব শূন্য। নিশীথ আর নিশীথের মতন যে-মাস্টাররা আজ পথে-পথে ফিরছে, তারা যদি সে-সব শূন্যকে আঘাত করে গিয়ে একটা বিধি-ব্যবস্থা করে দেখার জন্য তা হলে শূন্য ঋণী ও ঋণী শূন্য ঋণী ও ঋণী শূন্য হয়ে মহাশূন্যের ভানুমতীর খেলা দেখাবে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত।

গভর্নমেন্ট তার নিজের স্কুল-কলেজের শিক্ষক-অধ্যাপকদের স্বার্থ সংরক্ষণের ভার স্বীকার করে নিয়েছে। খুবই উত্তমরূপে সংরক্ষণ যে করা হচ্ছে তা নয়। তবে সরকারের স্কুলে কলেজে পনের-কুড়ি বছর কাজ করলে সে সব মাস্টারদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাষ্ট্রের যে দায়িত্ব আছে সেটা মেনে নিয়ে সে দায়িত্ব পালন করে আসছে গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্ট কলেজে কুড়ি-পঁচিশ বছর কাজ করলে যা-হোক একটা ভাল ভাল গ্রেডেই পৌঁছে যায় মাস্টার, গভর্নমেন্ট তাকে পেনশন দিতে প্রতিশ্রুত, যে-প্রতিশ্রুতি ইংরেজের আমলেও গভর্নমেন্ট কোথাও ভেঙেছে বলে জানা নেই; পঁচিশ বছর গভর্নমেন্ট কলেজে বা স্কুলে কাজ করবার পর নিশীথেরই মতন হাত ঝেড়ে বেরিয়ে আসে মানুষ, তার জন্যে কোনো ব্যবস্থা নেই, সে পেনশন পাবে না তাকে নতুন করে চাকরি খুঁজে নিতে হবে—কলেজ হোক, অন্য কোথাও হোক—এ রকম কোনো সাধু দৃষ্টান্ত গভর্নমেন্টের হাতে নেই। কিন্তু কোনো প্রাইভেট কলেজে বিশ-পঁচিশ বছর চাকরি করলে। (ভাঙা হার্ট আর ব্লাড প্রেসার নিয়ে) সে মানুষ তো লায়েক হয়ে গেছে। তার সম্বন্ধে তার নিজের কলেজের কোনো দায়িত্ব নেই আর; অন্য প্রাইভেট কলেজগুলো তার সম্বন্ধে কোনো চিন্তা করবে না, পারত পক্ষে স্থান দেবে না তাকে নিজেদের কলেজে, কিছুতেই দেবে না বলে অগত্যা পেটের চিন্তায় মাস্টারি লাইনটাই ছেড়ে দিয়ে তাকে চলে যেতে হবে অন্য কোথাও—অন্য কোনো রকম কাজের সন্ধানে—পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বয়সে। খবরের কাগজে ঢুকতে চেষ্টা করতে হবে হয় তো—কিন্তু সেখানে তারা বলবে, আপনার তো এ-লাইনে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কী করে পারবেন আপনি; অর্থাৎ মাস্টার নিতান্তই যদি পারতে চায়, তা হলে ভেকেন্সি থাকলে সাব-এডিটরি একটা দিতে পারা যায় তাকে আশি, নব্বই, একশ কুড়ি টাকায় টেনে-মেনে, কিংবা অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরের কাজ-নিচের দিকে—দিতে পারা যায় সে কাজ খালি থাকলে, মাস্টারের মুরুব্বির জোর থাকলে। ভাল খবরের কাগজের সম্পাদনার কাজ ভাল মাইনেয় কে দেবে তাকে? দেওয়া হলেও সে দায়িত্ব খবরের কাগজের এ-পক্ষ সে-পক্ষ সব পক্ষের মন পেয়ে মান রেখে মেটাতে পারবে কি সে নিজের মান বাঁচিয়ে। টাকার জন্য সবই পারতে হবে। না-পেরে যাবে কোথায় সে; এই হয় তো ভাবছে নিশীথ। সবই পারবে বটে সে, কিন্তু খবরের কাগজে ঢুকলে নিজের মান বাঁচাতে পারবে না। না-পারলে না-পারবে, কী হবে মান দিয়ে? কলেজ কি তার মান রেখেছে? কিন্তু খবরের কাগজের কাজটাও কে দিচ্ছে তাকে? খবরের কাগজের সাব এডিটরি একশ-সোয়াশ টাকায় কিংবা জুনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরি দেড়শ-দুশ টাকায় করবে কি সে নিজের ছাত্রদের অধীনে (তাদের কারুর-কারুর চৌদ্দ-পনের বছরের চাকরি হয়ে গেছে সংবাদপত্রে, প্রধান অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হব-হব করছে কেউ-কেউ) দৈনিক কিংবা কোনো পত্রিকায়? করবার ইচ্ছা আছে কি না নিশীথ ভেবে দেখছিল। যদি করতে চায়, তাহলে অমুক ঘোষ কিংবা তমুক মিত্তিরকে ধরলে হয়। কিন্তু তাদের তো চেনে না সে। তাদের ধরবে কাকে ধরে? তাদের ধরতে পারা যায় অমুক বোস বা তমুক দত্তকে ধরে। আর তাদের ধরবে কী করে। বোস বা দত্তকে কী করে ধরবে? ধরবে দাঁ, দে, শুঁই, হুই—কে ধরে। ভারী দীর্ঘ পথ তা হলে খবরের কাগজের ঘোষের কাছে পৌঁছুনো, তারপর জুনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরি পাওয়া তার নিজের ছাত্রদের নেকনজরে বসে থেকে, কিংবা সাব-এডিটরি? নিশীথ ভাবতে-ভাবতে থেমে দাঁড়িয়েছিল, আবার চলতে শুরু করল।

কলেজ, খবরের কাগজ, আর-কোথায় কাজ করতে পারে সে? গভর্নমেন্টের চাকরির বয়স নেই তার; কোনো কর্মাসিয়াল ফার্মে নেবে না তাকে, অভিজ্ঞতা নেই; কোনো ব্যবসা ফেঁদে বসা শক্ত, পুঁজি নেই কিছুই; ফাটকার বাজারে ঘুরবে কি সে; সেখানে খালি হাতে হয় তো ঘুরতে পারা যায়; কিন্তু এই আটচল্লিশ বছরে একদিনও সে স্টক এক্সচেঞ্জে, লায়ন্স রেঞ্জে, ক্লাইভ স্ট্রিটে, ক্যানিং স্ট্রিটে বা বড়বাজারের হল্লাটায় যায় নি; যখন সে কলেজে পড়ত তখন এক-আধ দিন ঘুরে দেখেছিল বটে; কলকাতা শহরের নতুন-নতুন জায়গাগুলো চিনে নিচ্ছিল যেন।

'কে, আপনাকে চিনি যেন মনে হয়'—একজন সাহেবি পোশাকের ভদ্রলোক নিশীথকে বললে।

'আমাকে?'—নিশীথ আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখলে মানুষটিকে। বেশ সুস্থ সুগঠিত চেহারা, ভাল খায়, থাকে, পরে, মনে কোনো দুশ্চিন্তা নেই, মুখে তাই বড় সফলতাকে ভেদ করে অমায়িকতার ছোট হাসি।

আপনাকে চিনি-চিনি মনে হচ্ছে, ভুল করলুম না তো'

'না ঠিকই আছে। মনে পড়েছে।'

'চিনতে পেরেছেন আমাকে? কোথায় দেখেছিলুম আপনাকে বলুন তো।'

'কলেজে। স্কটিশে—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি স্কটিশের ছেলে। স্কটিশে পড়তেন আপনি। তাই ভাবছিলুম চিনি-চিনি, কোথায় দেখেছি যেন।'

'আপনার নাম মনে আছে আমার।'

'মনে আছে?'

তসরের সুটের লম্বা শরীরটা একটু নুয়ে এল, খাড়া হয়ে ঠিক হল তারপর। খাড়া মানদণ্ডের মতন নিশীথের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল সুট, বুট, মানুষ। কী নাম, তার নিজের, সেটা জানতে চায় সে।

'রবিশঙ্কর মজুমদার তো—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবিশঙ্কর হাততালি দিয়ে হেসে বললে 'Hit! আপনারা কাঁচা খান নাকি? একেবারে র-বি-শ-ঙ্ক-র-ম-জু-ম-দা-র—lock, stock, barrel! Terrible লোক তো আপনি। স্কটিশে পড়েছিলাম কি আজ?'

'ত্রিশ বছর আগে।'

'সে যেন মহাসরীসৃপদের দিন ছিল এ পৃথিবীতে তখন, লক্ষ বছর আগের কথা। বললেন তো ত্রিশ বছর,' বললে রবিশঙ্কর, 'মনের অনুভূতিতে ত্রিশ বছর আর লক্ষ বছর একই জিনিস হয়ে দাঁড়ায়, যা-অতীত একটু বেশি দিন কেটে গেলেই কোটি বছর আগের অতীত বলে মনে হয়। নিন—'

'সিগারেট কেস বের করে খুলে নিশীথকে এগিয়ে দিল, 'আপনার নাম তো ভুলে গেছি। বেশ মনে করে রেখেছেন আমার নাম কিন্তু।'

'আমি নিশীথ সেন।'

'নিশীথ সেন। বা বেশ তো। সংক্ষেপে অনেকখানি। কিছুটা মেয়েদের নামের মত যেন। আঃ-হাঃ-হা হা'—হাসতে লাগল রবিশঙ্কর, কোমরটা ভেঙে ধনুকের মতন খানিকটা বাঁকা হয়ে গেল—'আ-হা-হাঃ-হাঃ। কলকাতায় থাকেন?'

'বেড়াতে এসেছি। আপনি তো এখানেই আছেন রবিবাবু?'

'আমি মদ্রাজে আছি এখন।'

'মদ্রাজে? সেখানে কী?'

'স্কটিশ থেকে সি-এ পাস করেই তো বিলেত চলে গেলুম। বি-এ-তে অনার্স পাই নি। বিলেতে গিয়ে আই-সি-এস দিলুম। হল না, অ্যাকাউন্টসে গেলুম—ইনকরপোরেট-এখন মদ্রাজে ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের পোস্টে আছি।'

রবিশঙ্কর তো একটা বোকা ছেলে ছিল। লম্বা-চওড়া মানানসই চেহারার নিরেট বালখিল্যতাই তো ওকে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ করে রেখেছিল। স্কটিশ চার্চ কলেজ; ত্রিশ বছর আগে। স্ক্রিমজার সাহেব ক্লাসে এসেছেন, লেকচার দিচ্ছেন, চটাপট ব্ল্যাকবোর্ডে সাহেবের লেকচার লিখে ফেলতে লাগল রবিশঙ্কর শর্টহ্যান্ডে। ও তখন শর্টহ্যান্ড শিখছিল। মাঝে-মাঝে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। সাহেব দেখতে পেয়ে বের করে দিলেন রবিশঙ্করকে। খানিকক্ষণ পরে ঢ্যাঙা দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়ে বললে, May I come in, sir। স্ক্রিমজার ঢুকতে অনুমতি দিলেন। হাঁ করে স্ক্রিমজার সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে মিনিট দশেক কেমন গম্ভীর অনৈসর্গিক মূর্ততায় বসে রইল নিজের জায়গায়, তারপর কেমন একটা চাড় দিয়ে উঠে দাঁড়াল সাড়ে ছ ফুট উঁচু শরীরটা নিয়ে। পাঁচ সাত মিনিট এর ওর, তার, প্রফেসারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নিশব্দ নিরীহ কৌতুকরিক্ত মুখে। সাঁ করে এগিয়ে গিয়ে বোর্ডের শর্টহ্যান্ড লেখাগুলো মুছে ফেলে নিজের জায়গায় ফিরে এসে মাথা টান করে ঝিমুতে লাগল, টপ করে খানিকটা লালা ঝরে পড়ল ওর জিভের থেকে বইয়ের উপর, ভেঙে গেল ঘুমের চটকা, আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল কেউ দেখে ফেলেছে কি না রবি মজুমদারের মুখ থেকে লালা ঝরে পড়েছে। সে সময়ে, যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, ওর দিকে যে ফিরে তাকাত, তাকেই আঙুল দিয়ে নিজের ভিজ আর বই দেখিয়ে হি-হি করে হাসতে থাকত রবি।

এই সব কারণেই তো রবিকে চিনে রেখেছিল নিশীথ—ত্রিশ বছর পরে আজও ভুলতে পারে নি। সেই রবি আজ ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল। কী করে নিজেকে শুধরে নিল রবি? রবি যদি ডেপুটি অ্যাকউন্টেন্ট জেনারেল হয়, তা হলে তো নিশীথের বিলেতের কনজারভেটিভ পার্টির প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার কথা। যে-সিগারেটটা দিয়েছিল নিশীথকে, পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালিয়ে দিয়ে, নিজের হাতের সিগারেটটাও জ্বালিয়ে নিল রবি। ভূ-তত্ত্বের লক্ষ-কোটি বছরের কথা বলছিল। লক্ষ বছরই কেটে গেল যেন, তা না হলে সে মানুস কখনো এই রবিতে দাঁড়ায়।

'স্ক্রিমজারের কথা মনে আছে?'

'কে স্ক্রিমজার?'

'স্কটিশের ইংরেজির প্রফেসর ছিলেন—'

'খেয়াল নেই ভাই। আমি তো ফোর্থ ইয়ারে স্কটিশে এসেছিলুম, থার্ড ইয়ারে রিপনে ছিলুম।'

'শর্টহ্যান্ড শিখছিলেন তো কলেজের পড়বার সময়ে।'

'হ্যাঁ, কী করে জানলেন আপনি?' রবি মজুমদার নাদা পেটে দু-এক পা এগিয়ে-পেছিয়ে হাস-হাস কৌতুকে নিশীথের দিকে তাকাল।

'স্ক্রিমজারের একটা ক্লাসের কথাও কি মনে নেই আপনার?'

'বললুমই তো লক্ষ বছর আগে হয়ে গেছে সব।'

তা হয়ে গেছে বটে। স্কটিশের দিনগুলো।—একটা নিশ্বাস ফেলে ভাবছিল নিশীথ। কোথায় সেই সব ছেলে—সেই হস্টেলগুলো, ডাভাজ ওয়ান, অগিলভি, টমরি...সেই সব প্রফেসর? সেই ত্রিশ বছর আগের কলকাতা; এ হস্টেল সে হস্টেলে রাতে-রাতে মজলিস করে বেড়ানো, পরে মিনার্ভা-মনোমোহনে যাওয়া; সুরেন বাঁড়ুয্যে, বিপিন পাল, অ্যানি বেসান্ত, তিলক, গোখলের বক্তৃতা, পলিটিক্স, রবীন্দ্রনাথের আলো, আলোকোত্তর হিরন আনন্ত্য, সত্যেন দত্তের নিরবচ্ছিন্ন নিজের টাল সমালানো; ভোর বেলা ডাভাজ হস্টেলের তিন তলার রুমে সারা রাতের বেশ একটা চৌকশ ঘুম থেকে শীতের রোদ মুখে মাখিয়ে জেগে উঠতে না—উঠতেই বিনয়েন্দ্র মুখুয্যের গলা শোনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেত, করিডরে দাঁড়িয়ে গরম চা খেতে-খেতে বলছে—কাল সারাটা রাত মনোমোহনে ছিলুম। কী গলার আমেজ, কী বলবার দোরস্ত চাল। কাকে বলছে বিনয়? শুভ্রাংশুকে হয় তো। হয় তো নিশীথকেই শুনিয়ে-শুনিয়ে বলছে। বিছানা ছেড়ে, নেমে বাইরে করিডরে আসতে দেরি হয়ে যেত নিশীথের? যখন সে এসে পৌঁছেছে, বিনয় নেই, শুভ্রাংশু নেই, কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে সব, আজ ত্রিশ বছর পরেও তাদের দেখা কোথাও মিলল না। বেঁচে আছে? কী করছে? কোথায় গেছে আর-সব? আরো অনেকে। অনেক অনেক—বলে শেষ করা যায় না কত যে সব ছিল। এত সবের কোনো ছত্রাংশও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বিনয়ের থিয়েটারে রাত কাটানোর রেশ কানে নিয়ে সন্ধ্যার সময়েই শোভনলাল ভটচাজের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত নিশীথ, তারাসুন্দরীর অভিনয় দেখবার জন্যে। স্টারেই তো। বাংলা স্টেজে তখন গিরিশ ঘোষের আত্মাই কথা বলছে। শিশির ভাদুড়ী আসেন নি তখনো। সিনেমা বলে বিশেষ কোনো একটা জিনিসই ছিল না তখন। সিনেমা আজ থিয়েটারকে কোথায় যে ঠেসে রেখেছে।

'কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন। কোথায় থাকেন নিশীথবাবু?'

'জলপাইহাটিতে।'

'জমিদারি আছে বুঝি? ওটা তো পাকিস্তানে গেল।'

'হ্যাঁ, পাকিস্তানে।'

'তা কী রকম হবে নিশীথবাবু? ট্যাকবে কি জমিদারি? না ওরা উৎখাত করে দেবে জমিদারি-টমিদারি? কী রকম মুনাফা আপনাদের?'

'না, আমার নিজের কোনো জমিদারি নেই।'

'Oh! রবি মজুমদার সিগারেটে দু-চারটে টান দিয়ে বললে, 'আমি করাচি গিয়েছিলুম, ওয়েস্ট পাঞ্জাব গিয়েছিলুম—'

'কবে?'

'এই তো, তখনো দাঙ্গা চলছে, দাঙ্গা তো এখনো চলছে। একজন সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম। একজন আমেরিকান জার্নালিস্টও সঙ্গে ছিলেন। তিনি মহিলা; বছর চব্বিশ পঁচিশ বয়স হবে, এঃ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে—'

দু-চারটে লাথি মেরে নিল রবি মজুমদার, হাত দুটো কোমরে ছিল, তুলে নিয়ে দু-দিকের দাবনার দিকের চালিয়ে চেপে মালিশ করে নিল।

'চলুন না এ-চায়ের দোকানটায় গিয়ে বসি—' নিশীথ বললে।

'না। এ সব রাস্তার—কী নাম এটার?-রাসবিহারী এভেন্যু—না, এ সব পাড়ার চায়ে-টায়ে ঢুকি না আমি। মাঝে-মাঝে ফার্পোতে গিয়ে খাই। মন্দ নয় গ্রেট ইস্টার্ন, গ্র্যান্ড হোটেল—আসুন আমার গাড়িতে।'

'কোথায়?'

'এই যে মিনার্ভা কার—রাস্তায় পার্ক করে রেখেছি। এই যে এই! আপনার দাবনার কাছে; ও দিকে তাকাচ্ছেন কেন নিশীথবাবু?'

'ওঃ, এই তো।'

'এই তো? তাই তো। এত বড় মিনার্ভা গাড়ি আপনার চোখেই পড়ল না যেন মশা খুঁজছিলেন আঁকু-পাঁকু করে? দেখতে পেয়েছেন মশাটা?'

ফিকে নীল রঙের আশ্চর্য গাড়ি-দানবটার ঝর্ঝরে শরীরটার দিকে এবং তার চেয়েও বেশি তার কেমন একটা অটল মহানুভবতাকে অনুভব করে নিয়ে নিশীথ বললে, 'এই গাড়িটা তো এতক্ষণ এখানে ছিল না মজুমদার সাহেব।'

'সেই জন্যই তো ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পাপক্ষয় করছিলুম। এই তো এল। গাড়িটাকে একটু হাওয়া খেতে পাঠিয়েছিলুম। আসুন।'

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'আমি গ্র্যান্ড হোটেলে উঠেছি—'

'সেখানে যাবেন এখন?'

'না। এ পাড়ায় একটু কাজ আছে। কি হে হরদাস, দেখা হল মেমসাহেবের সঙ্গে?'—ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল রবিশঙ্কর।

'না হুজুর। এখনো ঘুমের থেকে ওঠেন নি।'

শুনে ডান চোখের ভুরু নাচিয়ে শিকেয় চড়িয়ে, বাঁ চোখের ভুরুটাকে নিচে স্থির নিরেট অবস্থায় রেখে হরিদাসের দিকে তাকাল রবিশঙ্কর। ভুরু দুটোর আশ্চর্য রকমারি দেখে নিচ্ছিল নিশীথ। ঠিক রবিশঙ্করের মত পারে কি না চেষ্টা করে দেখছিল। কিন্তু সে কি হয়, ও অনেক-অনেক বছর অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে হিসেবে-নিকেশ সাহেব-মেমসাহেব চষে চেখে যোগসাধনা করার ফল।

'বড্ড মুশকিলেই ফেলেছে। কখন উঠবে ঘুমের থেকে?'

'আর কত ঘুমোবেন। এখুনি উঠবেন।' হরিদাস আশ্বাস দিয়ে বললে।

'ওখানে আর কে আছে?' জিজ্ঞেস করল রবিশঙ্কর।

'বেয়ারা আছে একজন—আর কেউ নেই,' হরিদাস বললে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সাহেব তো কলকাতায় নেই।'

'না, তিনি বম্বে গেছেন।' হরিদাস বললে।

'দিল্লি গেছেন।' রবিশঙ্কর বললে।

'চলুন না, আপনি নিজেই মেমসাহেবের বাড়িতে চলুন—এই তো কাছেই। সেখানে গিয়ে বসলেই তো ভাল হয়; নিশীথের দিকে একটু তাকিয়ে ওজন করে হরিদাস বললে, 'আপনার চিঠি দিয়ে এসেছি বেয়ারার কাছে।'

'না, আমি যাব না। আমি তাকে লিখে দিয়েছি গাড়ি দিয়ে ভাইপো হরিদাসকে পাঠালুম, কাছেই আছি।'

নিশীথের দিকে তাকিয়ে রবিশঙ্কর বললে, 'আসুন আপনি।' গাড়ির ভিতর ঢুকে ব্যাক সিটে গিয়ে বসল নিশীথ, রবিশঙ্কর ঠাকরুনকে নিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলে যাবেন? নিশীথের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে একটু দেখে নিল হরিদাস।

'সম্প্রতি সেখানে যাচ্ছি, তারপর'—রবিশঙ্কর বেশি কথা বলে ফেলেছে অনুভব করে কথা বাড়াতে গেল না আর সংক্ষেপে বললে, 'দেখা যাবে। আর—একবার দেখে এসো তো তুমি হরিদাস। কোন করলুম, কে এক ছোকরা ধরলে। বললে ঘুমুচ্ছেন, কখন উঠবেন বলতে পারে না' ড্যাম-নটা-দশটা অব্দি ঘুমোয় কলকাতার এই পচা ভ্যাপসা-কাছেই তো? একটু নোলা সেঁধিয়ে দেখে এসো তো। পা চালিয়ে যাও, মিনিট কুড়ি বসে দেখে এসো, জাগিয়ে নিয়ে এসো। আমি বসে আছি গাড়িতে।'

'নিয়ে আসব পায় হাঁটিয়ে?'

'আরে মল যা! এসে খবর দিলেই তো গাড়ি যাবে।'

হরিদাস চলে গেল।

'একটা ইডিয়ট!' রবিশঙ্কর বললে।

'ত্রিশ বছর আগে রবিশঙ্করকে ইডিয়ট বলতে স্কটিশের ফোর্থ ইয়ারের ছেলেরা। কিন্তু সে তো সময় প্রস্থানের লক্ষ বছর আগের কথা, এর ভিতর কত পরিবর্তন হয়েছে প্রাণপ্রবাহের, মনের গতির।

'হরিদাসকে যে-মেমসাহেবের কাছে পাঠানো হল, কে সে?'

'কোথায় গেল হরিদাস?'

জবাব দেবার কোনো দরকার নেই; হরিদাস খবর নিয়ে এলে নিশীথকে গাড়ির থেকে নামিয়ে বিদায় দিয়ে নিজেই এবার গাড়ি নিয়ে যাবে সে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকবে না আর, মনে-মনে ঠিক করে নিচ্ছিল রবিশঙ্কর।

ট্রাউজারের পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বের করে তামাক পাতা পাইপে ভরে নিতে-নিতে বলল,—'করাচি আর ওয়েস্ট পাঞ্জাবে গেছলুম। সঙ্গে বেন্থাম সাহেব ছিলেন; মিস মিলফোর্ড সেই আমেরিকান জার্নালিস্ট মেয়েটির নাম। মিস মিলফোর্ড—মিলি—ওকে পেলে সেই সে কালের হোলকার-টোলকার বর্তে যেত—'পাইপ জ্বালিয়ে নিয়ে রবিশঙ্কর বললে, 'আচ্ছা সেন, বাওনা মার্ডার কেসের সেই মেয়েটার নাম মনে আছে তোমার?'

'না।'

'মনে নেই, বাওনাকে খুন করা হয়েছিল?'

'কী হবে ও-সব জিনিস মজুমদার সাহেব; ও-সব তো ভূতেত্ত্বরে লক্ষ বছর আগের কথা।'

পাইপ টানতে-টানেত একটু ফিকে হেসে হাসির মুহব্বতে মনটাকে একটু চাঙ্গা করে নিয়ে রবি মজুমদার বললে, 'মিলফোর্ডকে পেলে বর্তে যেত হোলকার। আমেরিকানরা বড্ড হুজুগে মাতে, মিলিকে আমি রাজি করিয়েছিলুম আমাকে বিয়ে করতে—'

'নিশীথের হাতের সিগারেটটা পুড়ে-পুড়ে গাঁজের মত হয়ে গেছল, জানলার ভিতর দিয়ে ফেল দিল সে।

'কিন্তু আমি তো বিয়ে করেছি। আমার ছেলেপুলে আছে।'

'কবে বিয়ে করেছেন?'

'বছর কুড়ি আগে। স্কটিশ মেয়ে। ডান্ডির মেয়ে।'

'বিলেতে থাকতেই বিয়ে করেছিলেন বুঝি?'

'ছটি ছেলেমেয়ে আমার। কী করে মিলিকে বিয়ে করি আমি?' রবিশঙ্করের একটা ভুরু নেবে উপরে উঠে গেল, নিচে সানুদেশের শান্ত রোমাঞ্চ নিয়ে রয়ে গেল আর-একটি, 'কিন্তু মিলি মুখিয়ে ছিল—'

'জানত, ছটি ছেলেপুলে আপনার?'

'খুব ভাল করেই। আমার স্কচ স্ত্রীকে দেখেছে সে তো। দেখে ঠোঁট উল্টেছে।'

'কেন?'

'বেঁটে তো, বেঁটে স্কচ।'

রবিশঙ্কর বড় চাকরি করে, বেশ সুখেও আছে বটে কিন্তু মুখে বিশেষ কোনো স্বস্তি দেখা গেল না তার, কেমন যেন কর্তিত, সোমকীটদষ্ট, বিষণ্ণ; ভূতত্ত্বের লক্ষ যুগ কেটে না-গেলে আগে কোনো পট পরিবর্তন আসবে না যেন বহু-প্রসবিনী ডান্ডিনীকে সরিয়ে দিয়ে মিলফোর্ডকে কোলে তুলে নেবার মত।

'আমেরিকানরা ও-সব গ্রাহ্য করে না। যদি আমার মন ঠিক করে মিলফোর্ডকে ঘরে নিয়ে আসি, তা হলে ওদের সবাইকে স্কটল্যান্ডে পাঠিয়ে দেবে সে।'

'অনেক টাকা কড়ির ব্যাপার তো। কে দেবে টাকা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'স্কটল্যান্ডে পাঠাতে?'

'পাঠাতে। খোরপোষ দিতে।'

রবিশঙ্কর কাঁধ নাচিয়ে একটু হাসল। বললে, 'খেই পেলেন না আপনি জিনিসটার। কথা হচ্ছে মিলফোর্ডকে আমি আনব কি না। সেটা যদি ঠিক হয়ে যায় ডান্ডি সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে যাবে।'

'ডান্ডি চলে যাবে স্ত্রী? নিজের থেকেই?'

রবিশঙ্কর উদ্দীপ্ত হয়ে পাইপ টেনে যাচ্ছিল। বললে, 'কী হয়েছিল গান্ধীজির ডান্ডি সত্যাগ্রহে?'

'তখন কিছু হয় নি অবিশ্যি, কিন্তু—'

নিশীথকে কথা শেষ না—করতে দিয়ে রবিশঙ্কর বিলোড়িত হয়ে বললে—'কী হবে এদের ডান্ডি সত্যাগ্রহের ফলে?'

সেটা কী হবে, জানে না নিশীথ। সেটাকে সত্যাগ্রহ বলা যায় কিনা, তাও জানে না। গান্ধীর ডান্ডি সত্যাগ্রহের ব্যাপারটাকে নেহাতই একটা অনুপ্রাসের ভোজবাজিতে এ জিনিসটার সঙ্গে জড়িয়ে কী রকম হল, অনুভব করে নিচ্ছিল নিশীথ; এ যেন স্ক্রিমজারের ক্লাসের শর্টহ্যান্ড ঝাড়ার মতই হল; প্রফেসরের পিছনে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে।

'বিয়োতে-বিয়োতে বারটা বেজে গেল ওর। বছর-বিয়োনি বৌ। বেঁটে। ক্যাড। ঘর যাও, ঘর যাও গে, যাও পাকিস্তানের পাটের আঁশ বাছো মিসেস গ্র্যান্ডিদের সঙ্গে এক গাট্টা বসে। ও যাক। ওর জন্য আমি ভাবি না। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের জন্য মনটা কেমন করে। কিন্তু'-নিশীথের ঘাড়ের উপর এক হাতের কেঁদো থাবাটা চড়িয়ে দিয়ে, দু-এক দমক পাইপ টেনে নিয়ে, রবিশঙ্কর বললে, 'ও'রা সবাই আমারই ছেলে-মেয়ে কি না তাতে সন্দেহ আছে।'

রবিশঙ্করের কথাটা যেন শোনে নি নিশীথ, অন্য কথা পেড়ে বললে, 'হরিদাস আপনার ভাইপো?'

'হ্যাঁ!'

'নিজের ভাইয়ের ছেলে?'

'আমার সহোদর ভাইয়ের। আমার দাদার ছেলে হরিদাস।'

'আপনার নিজের দাদার ছেলে, তা হলে আপনাকে হুজুর বলে কেন?'

'হুজুর বলেছে বুঝি? ঐ ওর এক রকম, বোধনার ছেলে তো!' রবিশঙ্কর নিজের পাড়া কথাটার দিকে ফিরে গিয়ে বললে, 'আমার ছেলেপুলেরা কে কার ছেলে-মেয়ে বুঝে উঠতে পারছি না। আমার সঙ্গে কারুরই তো চোখ-নাকের মিল নেই'—কেমন একটা সমস্যার চোরাবালিতে ঠেকে কাতর হয়ে বললে রবিশঙ্কর।

নিশীথ তাকিয়ে দেখল কেমন যেন ছোট শুকনো মুখে বসে আছে।

'আমার সঙ্গে আমার ছেলে-মেয়েদের চেহারা-ফেয়ারার কোনো মিল নেই। মতি-গতি বোধ-বিচারেও নেই'—রবিশঙ্কর বললে।

সাদৃশ্য যদি না থাকে তা হলে ফুরিয়ে গেল, এর পরের ছেলেপুলেগুলোর যাতে সেটা থাকে সেই ব্যবস্থা করা উচিত রবির, ভাবছিল নিশীথ।

'চেহারায় মায়ের আদল আছে কিন্তু কম বেশ সকলেরই—কিন্তু বাকিটা অন্য সহ সাহেবদের মত।'

শুনে সমঝোতা হল নিশীথের। রবিশঙ্কর যা বলেছে মিথ্যে হতে পারে, সত্য হতে পারে। যাই হোক না কেন, জিনিসটা মজুমদারকে স্বস্তি দিচ্ছে না। তলিয়ে কথা ভাবতে গেলেই কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে হয় রবিশঙ্করকে। নিশীথ তার স্কটিশ চার্চ কলেজের সহপাঠীর গাড়িতে পাশে বসে উপলব্ধি করছিল। টাকা আছে, কিন্তু স্বাদ নেই যেন। সুখ আছে, কিন্তু সাহচর্য নেই, শান্তির অভাব, পদমর্যাদা আছে কিন্তু এই তো অপমান। অপমানের উৎসটা সত্যি কি মিথ্যে ঠিক করে বুঝে নেবার পথ নেই রবি মজুমদারের। কিন্তু বুঝে উঠতে না পেরে জিনিসটাকে গায়ে মেখে নিয়েছে সে—এতদূর পর্যন্ত—যে সে বলে যে তার কোনো সন্তানই তার নিজের নয়। তা হয় তো ঠিক নয়। কিন্তু মানা নামছে না রবিশঙ্করের মনটা, যেন কিছু দোর্দণ্ড সৌখিনতা ও সুখে উপচে পড়ছে মানুষটার শরীর। শরীরে এত সুখ নিয়ে কি মনে এত অসুখ থাকতে পারে? রবিশঙ্করের আঁতের একটা কথা ভাবতে গিয়ে নিজের মনে যে অসুখের ছোঁয়াচটুকু লেগেছিল, সেটা ঝেড়ে ফেলল নিশীথ। একটা পেটমোটা গন্ধগোকুলের কাছে নিজেকে নীলকণ্ঠ পাখির মত মনে হচ্ছিল নিশীথের।

'ভার্জিনিয়া এখানকার স্কচ আইরিশ সাহেবদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করছে। আমি অফিসে যাবার মুখে টুক করে ঢুকে পড়ছে এক-একজন, অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি আর-একজনের সঙ্গে গল্পগুজব করছে। যতক্ষণ অফিসে ছিলুম ততক্ষণ কী করেছে?'

'ওদের দেশের যে-সব মেয়েরা আমাদের এ দেশি ছেলেদের বিয়ে করে, সাহেবরা সে-সব মেয়েদের দিকে ঘেঁষে না বলেই তো জানতুম মজুমদার সাহেব।'

'না তা নয়, ওটা আপনার ভুল নিশীথ সেন, বড্ড খচ্চর ঐ আইরিশগুলো। কী করেছে ওদের সঙ্গে ভার্জিনিয়া, কী না করেছে!'—পাইপ কামড়াতে-কামড়াতে রবিশঙ্কর বললে। পাইপটা জ্বলছিল না; সেটাকে দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ে ধরে পাতলুনের পকেটে ডানহাতটা ঢোকাল, হয় তো দেশলাই কিংবা পাউচ বার করবার জন্যে।

'আইরিশ না, স্কচরা?'

'আইরিশরা'—রবিশঙ্কর বললে।

'কিন্তু আপনার স্ত্রী তো স্কচ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'হ্যাঁ। কিন্তু আইরিশরা—'

'এ দেশে এত—ওরা তো—'

'ওরা তো আয়ারেই থাকে না সব।'

'এখন তো এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে সব।'

'অনেকগুলো বাঁদর এখনো আছে নিশীথ। কিন্তু'—রবিশঙ্কর দেশলাই বার করে বললে, 'আমি তো অনেকের কথা বলছি না। আমার বড় ছেলের বয়স দশ বছর। এগার-বার বছর আগের থেকেই শুরু হয়েছে, চোখ বুজে, একেবারে মুখে পাথর বেঁধে, ধুনে সাফ করে দেবার খেলা।'

'বরাবর মদ্রাজে ছিলেন?'

'কিছুদিন বোম্বেতে ছিলুম। বেশ ভাল ছিলুম বোম্বেতে। তারপর দিল্লিতে আসতেই মূলে হাভাত করে দেয় আর-কি। আবার বোম্বে গেলুম। সেখানে আরো বেশি শুরু হল। ম্যারিন ড্রাইভে একটা খাসা ফ্ল্যাটে থাকুতম তিন-তলায়। একদিন রাতে,' দেশলাই জ্বালিয়ে নিয়ে রবিশঙ্কর পাইপ ধরাল, 'একদিন রাতে অফিস থেকে ফ্ল্যাটে ফিরে দেখি আমাকে দেখে কেমন হক-চকিয়ে গেছে ভার্জিনিয়া। কেমন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি যেই বাথরুমের দিকে চলেছি, অমনি ছোঁ মেরে আমাকে ধরে খাবার ঘরের দিকে নিয়ে গেল। খাবার ঘরে আমাকে বসিয়ে রেখে বললে, বোম্বেতে থাকো, এ যেন তোমার বিলেতে থাকার সামিল; বাংলাদেশের কোনো জিনিসই তো পাও না, এই দেখ, তোমার জন্যে কেমন বেঙ্গলি সুইটস তৈরি করেছি। বলে একটা ডিশ ভর্তি পুডিং-কেক-প্যাস্ট্রি দিয়ে গেল; এই হল বেঙ্গলি সুইটস। বললে, 'খাও, আমি একটু আসছি।' খুব খিদে পেয়েছিল; কাঁটা চামচ বাগিয়ে খাচ্ছিলাম, কিন্তু খানিক খেয়ে কেমন সন্দেহ হল আমার, আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাথরুমের দিকে যেতেই দেখি একটা আইরিশ বাথরুমের জানালায় হাঁসের নলি গলিয়ে স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে ভোঁ ভোঁ।'

'কী করে বুঝলেন আইরিশ?'

'আমি চিনি সেটাকে। একেবারে বাজ পাখির মত থুবড়ে পড়লাম গিয়ে স্ত্রীর গায়ের উপর,' রবিশঙ্কর বললে, পাইপ নিভে গিয়েছিল জ্বালিয়ে নিতে-নিতে বললে, 'বার্লিতে ক্যাত ক্যাত করছে—'

'কী?'

'আর কী! স্কটল্যান্ডের ওট সেদ্ধ করে রেখেছে কে যেন কেভেন্টারের দুধ দিয়ে,' রবিশঙ্কর মরীয়া হয়ে পাইপ টানতে-টানতে বললে—'কোথায় পেলে এই পরিজ, তোমার গায়ে—জিজ্ঞেস করলাম আমার স্ত্রীকে'—বলে হো হো করে হেসে উঠল রবিশঙ্কর—'পরিজ বানিয়ে রাখলে কী করে? কে দিল পরিজ পয়দা করে তোমাকে? ও-হোঃ-হোঃ-হোঃ—'গাড়ির গদি নেচে উঠতে লাগল। রবিশঙ্করের আপাদমস্তকের, পশ্চাদ্দেশেরও, কেমন একটা উন্মাত্ত প্রফুল্লতায়। বেসামাল ভাবটা কেটে গেলে পাইপটা মুখে দিতে গিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিলে গদির এক দিকে, পকেট থেকে পাউচ বার করে নিয়ে বললে, 'আর-একদিন সাঁ করে দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে এলুম অফিস থেকে'—পাইপের ভিতরে যা কিছু ছিল জানলা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে-ফেলতে রবিশঙ্কর বললে, 'কোনোদিন দুপুরবেলা তো অফিস থেকে ফিরতুম না আমি। একেবারে বমাল ধরা পড়ে গেল।'

'কী হল?'

'একেবারে বমাল ধরা পড়ে গেল'—উত্তেজিত হয়ে বললে রবিশঙ্কর।'

নিশীথ বললে,—'স্ত্রী যদি এ রকম হয়, কী করে তাকে নিয়ে ঘর করা যায়।'

পাউচের থেকে তামাক বার করে পাইপে ভরতে-ভরতে রবিশঙ্কর বললে, 'পাঁচদিনের ছুটি নিয়ে বম্বের থেকে সান্টাক্রুজে গেলুম, ভার্জিনিয়াকে বললুম, সান্টাক্রুজে জুহুর সমুদ্রে বেড়িয়ে চান করে লোনাভালা যাব, লোনাভালা থেকে বোম্বে ফিরতে আমার সাত দিনও দেরি হতে পারে। কিন্তু সান্টাক্রুজে না গিয়ে বোম্বের একটা ইরানি হোটেলে বিরিয়ানি মাংস, মদ, কিছুটা খেয়ে একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, খানকি ঠিক নয়, খুশকির সঙ্গে, অনেক রাত কাটিয়ে, বোম্বের সেই পার্শি ছেনাল মেয়েটা-কী নাম ওর—পেরিন—পেরিন, পেরিনের বাবার মখমলের জুতোটা পায়ে দিয়ে টিপিটিপি আমার ফ্ল্যাটে ঢুকতেই দেখি দরজা-জানালা বন্ধও করে নি, খানিকটা আবজে অন্ধকারের মধ্যে তিন জোড়া মানুষ আসকে পিঠে আর চাসকে পায়েসের ভিতর হুটোপুটি খাচ্ছে। সব আইরিশ স্কচ ছোঁড়াছুঁড়ি। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে—এনতার মদ খেয়েছে।'

পাইপটা জ্বালিয়ে নিয়ে দু-চারটে ফুরফুরে টান দিয়ে রবিশঙ্কর বললে, 'এর ভিতর থেকে আমার নিজের স্ত্রীকে খুঁজে বার করবার কোনো প্রবৃত্তি হল না। তার চেয়ে ঢের ভাল জিনিস সেখানে ছিল—একেবারে মদে মালেতে একাকার হলে লুটিয়ে, মরিন, সেই মেয়েটির নাম—আইরিশ মেয়ে—নিশীথবাবু এমন জিনিস আর হয় না, মরিনকে পাঁজাকোলা করে তুলে আমার ঘরে বিছানায় নিয়ে বাকিটা রাত তার সঙ্গেই কাটিয়ে দিলুম—'

'সে তো বেহুঁশ হয়ে ছিল—'

'কিন্তু সদরে খিড়কিতে কোথাও কুলুপ মেরে যায় নি তো।'

'কিন্তু মনের যোগাযোগ না থাকলে ওতে কী লাভ?'

'যে মদ খেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে, তার মন তো গোঁসাইকে সাক্ষী রেখে গুরুভাইয়ের ভোগে লাগাবার জন্যেই এমন চাদানির মালপো হয়ে আছে। না হলে এমন গ্যাঁজ হয়ে পড়ে থাকে? এটা করি, ওটা করি, সেটা করি, যেন ব্রহ্মত্ববোধ স্তরের থেকে স্তরে উঠে যাচ্ছে মরিণের। আঃ, সে কী ব্রহ্মস্বাদ নিশীথ! সারাটা রাত। আমি দেখেছি ব্রহ্মাকে, আমি চিনেছি।'—কেমন যেন একটা দ্রিমি দ্রিমিকি হুঙ্কারে বলে উঠল রবিশঙ্কর। পাইপ টানতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল না আর। কোনো দিকে তাকাতে গেল না। কোনো কথা বললে না। কেমন একটা যোগনিদ্রায় যেন নিবিষ্ট নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে তার মন—মনে হল, রবিশঙ্কর অনুভব করছে যেন।

রবিশঙ্করকে দেখে নিশীথ কী ভাবছিল বুঝতে পারা গেল না,—'মরিন কি মিলফোর্ডের মত?'

'না, মিলফোর্ড আলাদা।'

'কী হল তারপর মিলফোর্ডের?'

'হয় নি এখনো। হবে। খোদ ডেলিভারির আগে মেল ডেলিভারি চলছে নিশীথ। রোজ চিঠি পাচ্ছি।'

'কোথায় আছে এখন সে?'

'করাচিতে। পাকিস্তান স্টেট কী করম হল দেখছে, শুনছে, ঘুরছে। আমেরিকায় কতকগুলো পেপারের করেসপন্ডেন্ট সে। করাচি পাঞ্জাব হয়ে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানটা লেইড মেরে ঘুরে দেখবে। তারপর দিল্লি ফিরবে, কলকাতায় আসবে, মাদ্রাজে যাবে বড় বৃষ্টির সময়, আমি তখন মাদ্রাজে থাকব,' রবিশঙ্কর বললে, 'ডার্জিনিয়াকে নিয়ে পারা যাচ্ছে না। দেখছেন তো, শুনলেন তো, কেমন পরিজের কারবার করে।'

'মজুমদার নিজেও কম যান না,' নিশীথ চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালাতে-চালাতে বললে।

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে রবিশঙ্কর বললে—'ও আমার ব্রহ্মত্ববোধের পথটা খুলে দিয়েছে বটে। কিন্তু ওকে স্কটল্যান্ডে চলে যেতেই হবে। একবার ভেবেছিলুম অনেক দিন তো ঘর করেছি এক সঙ্গে, থেকে যাক, আমরা ভারত-বাসীরা নির্বেদী লোক, থেকে যাক যা-খুশি করুক, ওকে দিয়ে আর কুইট ইন্ডিয়া করিয়ে কী হবে—ইউরোপিয়ান চেম্বার অব কর্মাসের বড়-বড় চাঁইরা তো এখনো চুষছেন আমাদের দেশটা, কিন্তু,' কেস থেকে বার করে নিশীথকে একটা সিগারেট দিল রবিশঙ্কর, 'করাচিতে এক দিন বিকেলে কনে-দেখা-আলোত মিলফোর্ডকে দেখে আমার জীবনটাই বদলে গেল নিশীথ—'

'কিন্তু বেশি ব্রহ্মস্বাদ মানুষের জন্যে নয় রবিশঙ্কর—'

'সেটা মিলফোর্ড বুঝবে।'

'কী বলে সে? আমেরিকানদের তো মূলধন ঢের; তাকে বিয়ে করলে, সুচের ছ্যাঁদার ভিতর দিয়ে গলিয়ে ধনীর স্বর্গে নিয়ে যেতে পারবে তোমাকে?'

'নানা রকম কথা হয়েছে। মিলফোর্ডের তো এ দেশেই থাকবার কথা আমেরিকান পেপারগুলোর ইন্ডিয়ার করেসপন্ডেন্ট হিসেবে—কয়েকটা বছর। আমি মিলিকে বলেছিলুম যে স্ত্রীধন নিয়ে আমার স্ত্রী বাড়িতেই থাকুক, ছেলেপুলেরা নানা বাপের হলেও এক মায়ের তো, মাকে ঘিরেই থাকুক আমার বাড়িতেই, ঘর ভাঙা ঝামেলার ভিতর গিয়ে লাভ কী; মিলি যে-কটা বছর এ-দেশে আছে তার সঙ্গে সহবাস করব, বিস্তর টাকা দেব সে জন্যে তাকে—প্রস্তাব করেছিলুম।'

'কী বলে?'

'তাতে সে রাজি নয়। বলে, ও-সব করে নি সে কোনোদিন—করবে না। বললে, আমার মুখে ও-রকম প্রস্তাব শুনে তার কী যে খারাপ লেগেছে। ভারতবর্ষের ভগবৎগীতার দেশের মানুষ এ-রকম কথা বলে? আমার দিকে বিতিকিচ্ছিরিভাবে তাকিয়ে বললে সে—বুঝলে নিশীথ?'

সিগারেটটা হাতেই ছিল; জ্বালিয়ে নিয়ে মুখ থেকে নামিয়ে চুপ করে রইল নিশীথ।

নিশীথ সিগারেট টানছিল, কথা ভাবছিল, সিগারেটটাকে মুখ থেকে নামিয়ে নিয়ে বললে, 'মেয়েটি তা হলে খুব ভাল। খুব ভাল তো মিলফোর্ড।'

'ভাল। মোটামুটি ভাল বটে। অবিশ্যি আমার স্ত্রীকে সরাতে চায়, ছেলে-পুলেদের কথা ভাবতে দেবে না আমাকে; চারিদিকে দেখে শুনে ভেবে খুব স্পষ্ট করে কথা বলে সব সময়ই। আমার চেয়ে উঁচু স্তরের লোক সে। আমার পরিবারের একটা সুব্যবস্থা কী করে হয় সে বিষয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছে সে'—রবিশঙ্কর বললে।

'মিলফোর্ড তোমাকে বেশ ভালবাসে তো রবিশঙ্কর।

'ভালবাসে? আমেরিকার মেয়েরা মাঝে-মাঝে নিগ্রোদেরও তো ভজাতে চায়। ওরা তো জলমুর্গির মত আখখুটে, যা চায় আর না-চায় সে সব ব্যাপার নিয়ে।'

নিশীথ একটু হেসে বললে, 'হ্যাঁচকা নিগ্রো ভজানো, সে আলাদা জিনিস—এটা হচ্ছে—'

'শুনুন, হঠাৎ কোনো একটা জিনিসকে কোনো অজ্ঞেয় কারণে মনে ধরে যায় তাদের,' বাধা দিয়ে রবিশঙ্কর বললে, 'ঝোঁকটা যত দিন থাকে তত দিন সে জিনিস, ডলার, হলিউড, চীন, শিবলিঙ্গ, রবিশঙ্কর, যাই হোক না কেন সেটাকে নিয়ে ওদের উদোবুদো। আমাদের দেশের কোনো পোষা মুর্গিও গেরস্তের ধান খেয়ে এতটা কবুল করে না,' গাড়ির উইন্ড গ্লাসের দিকে তাকিয়ে তর্জনী ও মধ্যমায় আটকানো সিগারেটটা একবার নাচিয়ে নিয়ে রবিশঙ্কর বললে, 'কিন্তু ঝোঁক কেটে যায়।'

'কেন, নিবেদিতার তো কাটে নি।'

'তিনি অন্য রকম ছিলেন। মিলফোর্ড কি সে জাতের?' ভুরুটাকে উসকে দিয়ে স্টিয়ারিং হুইলের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল রবিশঙ্কর, 'নিবেদিতা চোখ খুলেই এসেছিলেন এরা চোখে নেশা লাগিয়ে মনে ভাবে যে তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং? এটা কি গীতার শ্লোক, নিশীথ?'

'না। উপনিষদের,' নিশীথ বললে, 'মিলফোর্ডের মুখে শুনেছ এটা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না। কোথায় যেন শুনেছি; অনেক আগে; বাবার কাছে বোধ হয়; এ শ্লোকটার মানে খুব ভাল করে বুঝি না আমি।'

'গীতা পড়েছ?'

'কিছু-কিছু। মিলফোর্ডের মতন ও-রকম সাত সাগরের পারের বেজাত কী করে এত গীতার ভক্ত হয়? একটা কি ভাল নিশীথ?'

'নিশীথ রবিশঙ্করের হাতের রিস্টওয়াচে কটা বাজল দেখে নিতে চেষ্টা করছিল; কিন্তু হাতটা কেবলি ঘুরছে, কোটের হাতা কেবলি ঝাঁকুনি দিয়ে হটিয়ে দিচ্ছে, রবিশঙ্কর, মুহূর্তের মধ্যে পড়ে ঝুলে ঘড়িটাকে গ্রাস করছে। সময় কত বুঝতে পারা গেল না। রবিশঙ্করকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে গেল না নিশীথ।

'ইউরোপ-আমেরিকা বেজায় কেমন একটা দুর্দান্ত তেজস্ক্রিয় মশালের ভিতরে, ঘুরে অতিশ্রান্ত শলভের মাংসে উজ্জ্বল এই অদ্ভুত অগ্নিসভ্যতার থেকে ছিটকে পড়তে চাচ্ছে। কিন্তু তবুও তাদের ভিতরে অনেকে একটা কিছু চাচ্ছে তারা, একটা স্থিতি ভিত্তিও চাচ্ছে যা মৃত্যু নয়, জীবন। উঠতির মুখে বিজ্ঞান যে-সব বড়-বড়- আশা দিয়েছিল প্রায় সবই আজ ধূলিসাৎ। আমেরিকায় উইরোপে যারা দিনরাত লোকায়ত চক্রে উড়ে বেড়াতে না ভালবেসে একটু সুস্থিরতা চায়, লোকায়েতেরই গভীরতর ব্যাপ্ত আস্বাদ চায়, তারা গীতার ভিতর, কেমন একটা স্নিগ্ধ সুপরিসর নিশ্চয়তা উপলব্ধি করে।' আস্তে-আস্তে বলছিল নিশীথ, নিজের মুখের ভাষাবৈগুণ্য নিজের কানে বাধছিল তার, ধরতাই বুলি ব্যবহার করে মনটা খারাপ লাগছিল।

'মিলফোর্ড এই নিশ্চয়তা চায়?'

'সে কী চায় আমি জানি না। দেখি নি তো তাকে। তবে তাদের দেশের কেউ-কেউ এ রকম ঝুঁকে পড়ছে গীতা, চীন সভ্যতা, তিব্বতে নিসর্গ ও মানুষ, আমাদের দেশের পটের ছবি এই সব নানা রকম জিনিসের দিকে।'

'এ-সবের কিছুই আমাকে টানে না তো।'

'টানে না?'

'কী আছে কালীঘাটের পটে?'

'সেটা ভাল করে উপলব্ধি করে দেখতে হয়। চোখ উল্টে দেখলে চলবে না তো।'

'ও আমি ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি। পটের মা দিদিমা সকলেরই যেন দশমাস চলছে। ঢুলি ঢালা বাঁদর—হোক না পুরুষ—সকলেরই যেন পেট হয়েছে—দশমাসি পেট। অবিশ্যি ভুঁড়ির অশ্লীলতাকে স্নিগ্ধ করেছে পেট, রেখার নমনীয়তা আছে, খুঁটে-খুটে দেখতে গেলে কটমটায় না কিছু। কিন্তু কেমন একটা যেন নির্দোষ জলপ্রদ মঙ্গল উদরি রোগে ভুগছে পটের ছবিগুলো। কী হিসেবে এ গুলো আমেরিকানদের পেটোয়া? কথাটা কি সত্যি? মিলফোর্ড পটের কথা বলে নি, চীনাদের কথা না, লামাদের কথাও না। গীতার একটা ভাল সংস্করণ বেছে নিতে হবে। জানাটানা আছে?'

'কার গীতা আছে তোমার কাছে?'

'গীতাটিতা কিছু নেই। বেদ-উপনিষদ আমি কোনোদিন রাখি নি তো ভাই। জানি না কী আছে ও-সবের ভিতর। মিলফোর্ডের সঙ্গে মিষ্টি সম্বন্ধ পাতাতে গিয়ে ভগবৎগীতার যদি দরকার হয়ে পড়ে তা হলে তুমি আমাকে একটা ভাল তিলক-টিলক-রাধাকিষণ-গঙ্গারাম মুন্সী-টুন্সির এডিশন জোগাড় করে দাও।'

'গঙ্গারাম মুন্সী কে?'

'কেউ নয়, তবে ঐ ধরনের মানুষেরা বেশ ফসকা গেরোয় বাজের আটুনি মেরে ব্যাখ্যা করতে পারে।'

'না, রাধিকিষণের তো গীতা নেই,' নিশীথ বললে, 'করাচিতে কী দেখলে?'

'যা আছে তাই দেখলুম। মুশকিলে পড়েছিলুম ওয়েস্ট পাঞ্জাবে। তখনো দাঙ্গা চলছে সেখানে। রোজই আমি বেন্থাম কিংবা মেরি মিলফোর্ডের সঙ্গে বেরতুম, আমাদের কেউ রোখে নি। কিন্তু মুসলমান বনে গেছি ভেবে একদিন একটা পামবিচের সুট পরে বেরোলুম—পথে হেঁটে; দু'জন মুসলমান এসে আমাকে চ্যালেঞ্জ করলে—আমি যতই বলি যে আমি বাঙালি মুসলমান, আমার নাম লালন ফকির, কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, তখন একটা কথা মনে পড়ে গেল—একবারে নির্ঘাত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হাসি পেল। বললুম, আমি সারকামসিশন মানে সুন্নৎ করেছি, সেটা দেখালে বিশ্বাস হবে তো? কিছুটা নরম হল বটে কিন্তু তবুও দেখতে চাইল—'

'দেখতে চাইল? ভোগা দিয়েছে বুঝতে পারল, খুব সেয়ানা–বলতে হবে, লালন ফকিরের মত চেহারা তো তোমার নয়।'

'যদি অগ্রভাগ কাটা না থাকে আমার মাথা কাটবে। দু'জনের হাতেই ছুরির কী দুর্গন্ধ, রক্ত টসটস করছে; কয়েকটা তরতাজা খুন করে এসেছে', রবিশঙ্কর বললে 'আমাকে একটা পাশের বাড়িতে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে একটা চোরা কুঠরির ভিতরে ঢোকাল–'

'তারপর?'

'তারপর আমার স্ল্যাক্স খুলতে বললে', একটু কাঁধ নাচিয়ে হেসে রবিশঙ্কর বললে, 'তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আমাকে যাতে ছেড়ে দেয় রোখ চেতিয়ে দিলুম তাদের। লক্ষ্ণৌয়ান্নের মত সেঁটে উর্দু ঝেড়ে বললুম, আমার হাতে সময় নেই, জিন্না সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে করাচি, সুবে বাংলার খুব জরুরি খবর পৌঁছিয়ে দিতে হবে–জিন্নার চেয়েও সুন্নতের কথা শুনেই মাথা ঠাণ্ডা হল তাদের। বললে, 'আলবৎ আলবৎ জরুর–'

'সুন্নৎ করলে কবে তুমি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'করেছিলুম। দশ বছর আগে আমার ফাইমসিস হয়েছিল'–

'ফাইমসিস?'

'ফাইমসিস।'

'কাকে বলে ফাইমসিস?'

'জায়গাটার মুখের দিকের মাংস বেড়ে যেতে-যেতে এমন হয় যে ছ্যাঁদাটা একেবারে বুজে আসে, ভারি কষ্ট হয় জল খালাস করতে; অপারেশন না করলে, ছ্যাঁদাটা একেবারেই বুজে যায়।' রবিশঙ্কর কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে নিশীথকে দিল, দেশলাইয়ের মুখে সিগারেটটা জ্বলে উঠল নিশীথের। ঠোঁট চেপে ধরে নিজেরটা জ্বালিয়ে নিল রবিশঙ্কর।

'অপারেশন করতে হয়েছিল। ডাক্তার অবিনাশলিঙ্গম–এ সব ব্যাপারে স্পেশালিস্ট–তাকেই ডাকলুম। তখন ভারী গরম পড়ে গেছে মাদ্রাজে; অবিনাশলিঙ্গম বললে যে এ সব অপারেশনের ব্যাপারে শীতকালেই ভাল হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে বেগ এলে সেটা শীতকাল অব্দি মুলতুবি রাখব–সে-রকম অবিনাশলিঙ্গম নেই তো আমার। বললাম ডাক্তারকে। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হাজির হলেন। ক্লোরোফর্ম করিয়ে অপারেশন করেছিলেন। তারপর থেকেই এই দশ বছর কী যে নিস্তার পাচ্ছি। এটা করছি, ওটা করছি, সুন্নৎ করে কী যে নিস্তার তা আপনি বুঝবেন না নিশীথবাবু।'

রবিশঙ্কর কখনো আপনি, কখনো তুমি বলছে নিশীথকে, কখনো তুমি, কখনও আপনি বলছে রবিশঙ্করকে নিশীথ।

'ঠিক সময়েই ঠিক জিনিসটা করা থাকে আপনার মজুমদার–যখন যে এসে হাঁক দেয়া অমনি নজির বার করে দেখান। ওনারা খিচড়ে-উঠতেই এক পাসপোর্ট ঠুকে দিলেন আপনি।'

রবিশঙ্কর হাসতে-হাসতে বললে, 'অবিনাশলিঙ্গ যখন দশ বছর আগে অপারেশন করেছিল মাদ্রাজে, কে ভেবেছিল ওটা কাজে লেগে যাবে পাঞ্জাবে। আনডারওয়্যার খুলতেই একটু নেড়ে-চেড়ে সমঝে দেখে তোবা তোবা বলে ছেড়ে দিল,' রবিশঙ্কর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার মুখ দেখে হিন্দু মনে করে ওরা জান উড়িয়ে দিতে এসেছিল, কিন্তু বাস্তবিকই জিনিসটার মুখ নেই দেখে ঠাণ্ডা হয়ে আদাব-আদাব করতে-করতে চলে গেল। কেমন যেন আমাদের এই পৃথিবী–ক্ষুরঘর্ষণে ক্ষুরবর্ষণ চিড়িক-চিড়িক পানি। এই পৃথিবীর মতিগতির কান টেনে মাথা পাকড়ে কাজ না করতে পারলে রক্ষা নেই মানুষের। সব সময়েই বান মাছের মত সটকে যাচ্ছে পৃথিবীটা, লেজে টেনে হাতের মুঠোর ভিতর রেখে দিতে হবে।'

রবিশঙ্কর কথাগুলো বলে ফেলে খুব একটা লম্বা টানে প্রায় আদ্ধেকটা সিগারেট শুষে নিয়ে ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় ল্যাট করে ফেলল গাড়ির ভিতরটা।

'এই তো গেল পূর্বপক্ষের কথা, এখন উত্তর পক্ষের কথা শোনো নিশীথ, দিল্লীতে যখন খুব গোলমাল চলছিল তখন প্রায়ই আমায় দিল্লী যেতে হত', রবিশঙ্কর বললে, 'আমার হেড-কোয়ার্টার্স ছিল আগ্রায়, কিন্তু রোজই প্রায় ট্রেনে চড়ে দিল্লী গিয়ে টাঙ্গায় ঘুরে বেড়াতে হত অফিসের নানা কাজে। আমার নিজের মিনার্ভা গাড়িটা তখন মাদ্রাজে পড়েছিল, ট্রেনে দিল্লীতে অবিশ্রাম হিন্দুদের মধ্যেই চলতে-ফিরতে হত আমার, কিন্তু নিজেকে মোটেই নিরাপদ মনে করতে পারতুম না, অবিনাশলিঙ্গের মুণ্ডপাত করতে-করতে দুর্গা বলে ঝুলে পড়তুম রোজ।

'কেন? হিন্দুদের ভিতর ঘুরে-ফিরে কী ভয়?'

'দুটো মাস আমার জান খেয়ে নিয়েছে হিন্দুরা।'

'হিন্দুরা? হিন্দুর বাচ্চাকে?'

'কিন্তু অবিনাশলিঙ্গের কারসাজির ফলে আমার হিন্দু অভিজ্ঞান তো পাচার হয়ে গেছে নিশীথ। একেবারে মরীয়া হয়ে ছুটে আসত গুণ্ডাদের দল। এই খেলে–এই বুঝি খেয়ে নিলে–যদি মুখিয়ে জাপটে ধরত জয়হিন্দ হাকড়ে, এই শালা হারামিকা বাচ্চা মুসলমান, কী বলে বোঝাতাম আমি মুসলমান নই। লাহোরে তো বুঝিয়ে এসেছি আমি হিন্দু নই, দিল্লীতে বোঝাতে হবে আমি মুসলমান নই। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান দুটো জাত বলা হচ্ছে আজকাল; কিন্তু চেহারা তো একই রকম, এ দু'জাতের পার্থক্য শুধু এক-আধটা জায়গায়। তা তো লাহোর জয় করে এসেছে।'

রবিশঙ্কর সিগারেটে একটা টান মেরে সেটাকে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বললে, 'লাহোর জয় করে এসেছে, দিল্লীও জয় করতে হবে তাকে, একটা বেচারি কত পারবে? ওকে ঘুমোবার আগে আগ্রাওয়ালিদের জন্য রিজার্ভ ফোর্স হিসাবে রেখে আমি কপালে ত্রিশূল তিলক কাটতে আরম্ভ করে দিলুম মাদ্রাজিদের মত, মাদ্রাজি পাগড়ি আঁটতে শুরু করলুম–ভেবেছিলুম বেশিদিন দিল্লীর দিকে থাকতে হলে দক্ষিণী খোঁপাটাও রপ্ত করে নেব, তা হলে আর মার নেই–লুঙ্গি পরলেও মার নেই। কিন্তু আগ্রাওয়ালিরা উত্তুরে মেয়ে, দক্ষিণী পুরুষ বলে যেতে দেবে না আমাকে, রোজ রাতে থুতু দিয়ে আমার ফোঁটা তিলক উল্কি চিতিয়ে ঘষে তুলে ফেলল সব। থুতুতে এ রকম আশ্চর্য চন্দনের গন্ধ পেয়েছ তুমি কোথাও?'

'থুতুতে?' নিশীথ গাড়ির থেকে নেমে পড়ে নিজের চরকায় তেল দিতে যাবে কি না ভাবতে-ভাবতে জিজ্ঞেস করল, 'আগ্রাওয়ালি মানে?'

'আগ্রার হিন্দু শিখ মুসলমান মেয়ে।'

'মুসলমান মেয়ে? ঐ দাঙ্গার সময়?'

'হ্যাঁ হে নিশীথ, তাদের মুখে জিভে কেমন একটা হরিচন্দনের গন্ধ যেন'–রবিশঙ্কর বললে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর সে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ল এমনি যে, কোনো কথা বলে বা ঠেলা দিয়ে তাকে জাগিয়ে দিতে ইতস্তত বোধ করতে লাগল নিশীথ।

'এখনো ফিরে এল না ড্রাইভার; আমাকেই যেতে হবে তা হলে।'

'ড্রাইভার কি তোমার দাদার ছেলে, রবিশঙ্কর?'

'আমার দাদার ছেলে। ড্রাইভারি করছে। ওর নিজের ছ্যাকড়া মোটর আছে। মন্দ নয়। দু'পয়সা—আমি এবার তা হলে স্টার্ট দিই নিশীথ সেন! তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে?'

'কোথায়? গ্র্যান্ড হোটেলে?'

'না, ড্রাইভার যেখানে গিয়েছে, এই তো কাছেই—'

'কার বাড়ি?'

'চলো, দেখো-না এসে।'

'কার কাছে যাচ্ছ?'

'বাড়ির মেমসাহেবের কাছে। সাহেব বাড়ি নেই।'

'কোথায় গেছে সাহেব?'

'দিল্লীতে।'

'কী হবে মেমসাহেবকে দিয়ে?'

'আজ কিছু হবে না। তবে একটা-দুটো দিন—সময় ঠিক করে নিতে হবে?'

নিশীথ পা বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'আজ বুঝি মুখেভাত শুধু?'

'ওকে নিয়ে একটা বজবজ-ব্যারাকপুর-ডায়মন্ডহারবারের দিকে—সমুদ্রের দিকে যেতে হবে।'

হরিদাসকে অনেকক্ষণ আগে একটা অজ্ঞাত বার্তা নিয়ে চলে যেতে দেখেছে নিশীথ। ব্যাপারটা সম্পর্কে মাঝে-মাঝে ভেবে দেখেছে। মেমসাহেবটা কে তাও ধরে ফেলেছে যেন; বললে, 'তোমরা দু'জনে যাবে বেড়াতে ডারমন্ডহারবারের সমুদ্রে?'

'হ্যাঁ বেড়াতে। তা ছাড়া এক জন ছেলে এক জন মেয়ে দু'জনে সারাদিন বিভূঁয়ে বিদেশে মোটরে ঘুরে কী করে আর? নিশীথ সেন?'

নিশীথ একটু গলা খাঁকরে বললে, 'কী করে আর রবিশঙ্কর, ভাগীরথীর বাঁধ ঠিক করে, ইঞ্জিনিয়ারিং করে, জুড়ি মিলবে তাদের?'

রবিশঙ্কর স্টার্ট দিচ্ছিল, নিশীথ দরজা খুলে রাস্তায় নামল, রবিশঙ্কর হেসে বললে, 'কোথায় মিলবে আর তাদের জুড়ি, চালের কন্ট্রোল, কাপড়ের কন্ট্রোল, ঘোষ মিনিস্ট্রি, রায় মিনিস্ট্রি—দুনিয়ার হালচালের হদিস কোথায় মিলবে আর, যে-সমস্যাটা হাঁ করে তার ভিতর ঢুকে পড়তে না পারলে। ঢোকবার তারিখটা—হেঁই এই—এঁই রে হই হোঁই হোঁই—ব্যাড়ড়ড়—ড় ড় ড় ড় মোটর কী রকম তড়পাচ্ছে দেখছ—কোথায় যাচ্ছ নিশীথ—'

'অনেক দিকে যেতে হবে।'

'তা যেও এখন। গাড়িতে চলো।'

'কোথায়?'

'মেমসাহেবকে দেখে আসবে।'

'আমার মুখ চেনা আছে।'

'বটে! বাড়িটা দেখে রাখবে, চলো। আখেরে কাজ দিতে পারে।'

'দেখা আছে বাড়ি' নিশীথ হাসতে-হাসতে বললে 'সেই বাড়ির থেকেই তো বেরিয়ে এলুম আমি।'

'বাড়ির গোমস্তা বুঝি'—ঠাট্টা করে বললে রবিশঙ্কর।

'গোমস্তা নিয়েই তো পড়ল মিলফোর্ড,' হাসতে-হাসতে বললে নিশীথ, 'নায়েব মশাইকে বাদ দিয়ে।'

'নায়েব মশাই কে?'

'কেন। কত তো আছে করাচিতে; কত তো ওয়েস্ট পাঞ্জাবে।'

রবিশঙ্কর তা হলে জিতেন দাশগুপ্তর বাড়ি যাচ্ছে নমিতার খোঁজে? অবিশ্যি অন্য কোথাও যে না-যেতে পারে তা নয়; মেমসাহেব যে নমিতাই তা নাও হতে পারে। রবিশঙ্করকে জিজ্ঞেস করলেই নিশীথ জানতে পারত কার বাড়িতে যাচ্ছে সে, কিন্তু কিছুই জানবার দরকার নেই। নমিতা সম্বন্ধে যা জানে, যা অনুভব করছে নিশীথ, তার নিজের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। চল্লিশ বছর পেরিয়ে প্রায় পঞ্চাশের কাছে এসেছে পৌঁছেছে—মানুষের জীবনের ঢের কিছু না-দেখলেও কিছু-কিছু জেনেছে সে—উপলব্ধি করতে হয়েছে। না দেখে, বই পড়ে, অনুভব করে, মানুষের সঙ্গে মিশে, জলপাইহাটিতে যে-সব সিদ্ধান্ত করে রেখেছিল, কলকাতায় বৃহৎ ক্ষেত্রে এসে এ পথ থেকে সে পথে ফিরে সেই সবেরই সমর্থন কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে সে। মূল তত্ত্বগুলো জানা ছিল মোটামুটি। উদাহরণগুলো মিলছে এখন কেমন সহজ সজীব কৌতূকপ্রভব রক্তে আঁধারে কৌমুদীতে। নমিতার তো আজ বেলা বারটা অব্দি ঘুমোবার কথা হানিফ বলছিল। হরিদাস বসে আছে হয় তো নমিতার ড্রয়িংরুমে, কখন মেমসাহেব জাগবে। জাগলে কাকা যে মোটর নিয়ে হাজির সে-কথা জানাবে তাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবিশঙ্কর নিজেই তৎক্ষণে পৌঁছে গেছে জিতেনের বাড়িতে। জাগিয়ে তুলেছে নমিতাকে? জুলফিকারের ওখানে যাবে না নমিতা? রবিশঙ্করের সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবার যাবে? কাঁচা ঘুমে জেগে কেমন লাগছে নমিতার? রবিশঙ্করের সঙ্গে কোথায় দেখা হল নমিতার? সম্পর্কটা কী রকম? রবি মজুমদারের চেহারা দেখেই ভাল লেগেছে নমিতার? বেশ লম্বাই-চওড়াই পুরুষালি আছে বটে মজুমদারের। মজুমদার সাহেবের মনটাও বেশ ভালই প্রতিভাত হয়েছে নমিতার কাছে। মজুমদার তার মনটাকে একেবারেই অন্য এক ভঙ্গিতে নতুন করে খুলে দেখিয়েছে নমিতাকে। নিশীথের চোখ দিয়ে দেখার কথা নয় তো নমিতার, ভার্জিনিয়া, মিলফোর্ড বা লাহোর দিল্লীর দাঙ্গার গল্পগুলো নয়, অন্য সব। বিচিত্র গল্প পাড়বে রবিশঙ্কর, অনেক দিন আগের থেকেই ভজিয়েছে হয় তো; গল্পে, রসিকতায়, কথা বলার, ঠাটে, প্রাণের খোলাখুলিতে মানুষের জীবনের তিন বিস্তার ছাড়িয়ে একটু চতুর্থ বিস্তারেরও অবতারণা করতে পারে যেন রবিশঙ্কর। সে যাই পারুক আর না-পারুক, শেষ পর্যন্ত স্ক্রিমজারের ক্লাসের সেই বিমূঢ় বেতাল ছাড়া রবিশঙ্কর কিছুই নয় আর। কিন্তু কে বুঝবে তা? রবিশঙ্কর সম্পর্কে ত্রিশ বছরের হিসেব কার হাতে আছে? অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে রবিশঙ্করকে তলিয়ে দেখবার অবকাশ, রুচি আছে কার। দশটা বেজে গেছে। চার-পাঁচ দিন কলেজ ছুটি, গভর্নমেন্ট অফিসগুলোও ছুটি। ছুটির দিনে নানারকম মানুষের কাছে যাওয়া যায়। বাড়ি বা চাকরির সুবিধে করে দিতে পারবে নিশীথের জন্য—এমন কোনো লোক অবশ্য কলকাতায় কোথাও নেই।

তবুও কলকাতায় থাকতে হবে নিশীথের। সে পুরুষ। কাজেই তার কাছ থেকে যে পুরুষার্থ প্রত্যাশা করে নারীরা ও পুরুষেরা, সে তো স্বাভাবিক; তার নিজের নিঃসংস্কারী মনও যে তাকে সুস্থির থাকতে দিচ্ছে না, কোথাও কারুর কাছে গিয়ে কোনো একটা কিছু সংঘঠিত করে নেবার জন্যে ক্রমাগত তাগিদ দিচ্ছে সেটাই কৌতুককর।

তিন-চার বছর ধরে কলকাতার কলেজগুলোতে চাকরির চেষ্টা করছে সে। প্রথম বছর প্রাণান্ত প্রয়াস করেছিল, অতটা হয়রানি চাকরির দিক থেকে কোনো ব্যবসার দিকে ঘুরিয়ে দিলে দাঁড়িয়ে যেত ব্যবসাটা। শেষ পর্যন্ত নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। ফলে কলকাতার ডাক্তার বেশ মোটা টাকা মেরে নিল নিশীথের কাছ থেকে, কিন্তু কলেজের চাকরি হল না।

প্রথম বারের অত চেষ্টা-তদ্বিরে হতে-হতেও হল না যখন, প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না যখন নানা রকম কলেজ প্রতিষ্ঠানের নামী লোকেরাও কেমন একটা অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, নিরাশায় পীড়িত হয়ে উঠল তার মন। এর পরে দু-তিন বার মন খোলা চোখেই সে চেষ্টা করছে—কিন্তু হবে না জেনে, তবুও মনের মারাত্মক মুদ্রাদোষে, কলকাতার কলেজে উপযুক্ত অধ্যাপনার কাজ পাবার জন্যে। সঙ্গে-সঙ্গে খবরের কাগজে চেষ্টা করেছে, অন্য কয়েকটা দিকেও, কোথাও হয় নি কিছু। ভাল কিছু নেই কোথাও—তার জন্যে নেই। কলকাতায় চাকরি কেন চাচ্ছে নিশীথ? জলপাইহাটি-ত না হোক, মফস্বলের অন্য কোনো কলেজে কাজের চেষ্টা করলেই পারে; পেয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু না। মফস্বলের প্রকৃতি সে ভালবাসে, লোকজনদেরও ভাল লাগে তার। কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে নানা রকম প্রাণবনতা ও গহনতার ভিতর অন্তঃপ্রবেশ করতে চায় সে, অনেক দিন একা থেকেছে, এককও থেকেছে, এবার নিজেকে সরিয়ে নিয়ে জনমানুষদের আলোড়ন দেখবে সে, যদি পারে। মর্যাদা দিতে চেষ্টা করবে সে জিনিসটাকে, যেখানে-যেখানে সুযোগ হয়, সম্ভব হয়, যে-জিনিসের সহজাত শ্রী ও সত্তার ও প্রতিভা দেখে নতুন করে হয় তো কিছু শিক্ষা করতে পারবে তার মন। একটা মহানগরের বিন্দু-বিন্দু অনন্ত মৃত্যুর থেকে জাত নিরবচ্ছিন্ন অব্যয় জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আগুনের থেকে আলোর দিকে, হয় তো কৃষ্ণতর অন্ধকারের ঘূর্ণির ভিতর, পথ খুঁজছে, খুঁজে দিতে সাহায্য করছে অন্যদের; চারদিকের জন-জনতার থেকে নিরবচ্ছিন্ন প্রক্ষিপ্ত ইতিহাসের আশ্চর্য জননীগ্রন্থির সঙ্গে এক হয়ে চলতে চায় তার মানবাত্মা। সে যদি কলকাতার এত বড় মানব সমাজের ভিতরেও নিজেকে একা, নিরালম্ব, ক্ষিণ্ন মনে করত তা হলে বলতে পারা যেত যে একান্তে বসে ধীরে-সুস্থে কলকাতা নগরীকে দুধ, মধু, মদের মত ব্যবহার করবার জন্যে এসেছে সে এখানে।

কিন্তু সেটা কী রকম হাস্যকর ব্যাপার? সেটা রবিশঙ্কর পারে, নিশীথ কী করে পারবে তার নিঃসার্থতার মন নিয়ে জীবনের ও উপলব্ধির এই প্রায় নিঃস্বত্ব অবস্থায়?

চলতে-চলতে নিশীথ কংক্রিট সিমেন্ট শক্তি সাহস নীরবতা বিবর্ণতায় কেমন যেন পরাৎপর একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল সে, ঘুরে দেখল এক তলায়; ঢের বই, লাইব্রেরি, মানুষ নেই; আরো ভিতরে ঢুকবার জন্যে দোতলায় সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল।

'কে আপনি? কী চান? কোথায় যাচ্ছেন?' একটি ছেলে এসে বাধা দিল নিশীথকে।

'উপরে যাচ্ছিলাম, প্রফেসর ঘোষ কি ঘুমের থেকে জেগেছেন?' নিশীথ জিজ্ঞেস করল।

'এখন সোয়া দশটা বেজেছে, এখনও ঘুমোবেন?'

'আজ ছুটির দিন, তাই মনে হচ্ছিল—'

'ছুটির দিন বলে বেলা এগারটা অব্দি ঘুমোবেন?'

'দেখা হতে পারে কি সাহেবের সঙ্গে?'

'কোত্থেকে এসেছেন আপনি?'

ঘুমের থেকে এখুনি ওঠে নি হয় তো কিন্তু তবুও ঘোর-ঘোর চোখে নিশীথকে একটু মজুত করবার ঠাটে উর্দিপরা ছেলেটি জিজ্ঞেস করল। এ কি এ-বাড়ির ছেলে, সৌখিন বাবুটি স্টেনোগ্রাফার, ছেলেদের টিউটর, প্রফেসর সাহেবের কোনো গরিব আশ্রিত আত্মীয়? কে এ?—'আমি হাটখোলার থেকে এসেছি,' নিশীথ বললে।

'হাটখোলার থেকে বালিগঞ্জ। কী দরকার আপনার প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দেখা হবে কি?'

'কী দরকার বলুন?'

'উনি আছেন কি বাড়িতে?'

'আপনার দরকারটা না জানালে কী করে কী হবে?'

'উনি উঠেছেন কি ঘুমের থেকে?'

ছেলেটি একটু পিছে সরে হদ্দ মেনে নিশীথের দিকে তাকাল। বললে, 'উঠেছেন সাড়ে আটটার সময়। দাড়ি কামানো হয়েছে, চান করছেন। কী বলব গিয়ে ঘোষ সাহেবকে? কে এসেছেন বলব?'

'উনি দোতলায় বসে চা খাচ্ছেন বুঝি?'

'চা খাওয়া হয়ে গেছে। চান করছেন।'

'এক তলায় তো থাকতেন আগে। বাড়িতে ঢুকেই সোজা চলে যেতুম ওঁর কামরায়—'

'সে আপনি আট-দশ বছর আগের কথা বলছেন। তখন তো ইনি'—ছেলেটি একটু থেমে গিয়ে বললে, 'উনি আজকাল দোতলায়ই থাকেন। এ সমস্ত বাড়িটাই তো ওঁর।'

'আচ্ছা তা হলে আমি উঠি দোতলায়।'

'কী দরকার আপনার বলুন।'

'দেখা করতে চাই ওঁর সঙ্গে, এই তো দরকার।'

'এই শুধু? কোনো বিশেষ দরকার নেই?' ছেলেটি চোখ ঘুরিয়ে নিশীথের হাত-পা মাথার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল।

'হ্যাঁ, বিশেষ দরকার আছে বই কি।' নিশীথ একটা দম নিয়ে বললে, আস্তে আস্তে দম ছাড়তে-ছাড়তে।

'কী দরকার সেটা?'

'ওঁর অসুবিধা হবে না তাতে।'

'ওঁকে গিয়ে জানাতে হবে তো আমার।'

'আচ্ছা, আমি নিজে গিয়েই জানাব। চলুন উপরে।'

'কী নাম আপনার?'

'নিশীথ সেন।'

'হাটখোলার থেকে এসেছেন কলেজের কোনো কাজে?'

'ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'ওঁর কলেজ-টলেজের কোনো ব্যাপার নাকি?'

'ওঁকে কি কার্ড পাঠিয়ে দেব আমার? যাঁরা দেখা করতে আসেন ঘোষ সাহেবের সঙ্গে কার্ড পাঠিয়ে দিতে হয় ওঁকে?'

ছেলেটি এক পা পিছিয়ে গিয়ে নিশীথের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বললে, 'না, সব সময়ে কার্ডের দরকার হয় না। কেউ-কেউ অবিশ্যি কার্ড দিয়ে দেখা করেন, কিন্তু ঘোষ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হলে কার্ড তো একটা কিছু কথা নয়, কিন্তু জানতে চান কে দেখা করতে চাচ্ছে, কেন দেখা করতে চাচ্ছে।'

নিশীথ বললে, 'শ্লেট পেন্সিল আছে এখানে?'

'না। স্লিপ চাইলে দিতে পারি। লিখে জানাবেন আপনার দরকারটা?'

'হ্যাঁ, সেইটেই ভাল। কাজের মানুষ ঘোষ সাহেব অযথা ওঁর সময় নষ্ট করে লাভ কি? আমার যা দরকার সেটা ওকে লিখে জানিয়ে দিই, যদি মনে করেন আমাকে ডাকবেন, না হলে চলে যাব আমার সেই হাটখোলায়।'

নিশীথকে একটা স্লিপ পেন্সিল দিয়ে ছেলেটি বললে, 'হাটখোলার থেকে এসেছেন শুধু ঘোষ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ। না দেখা হলে ফিরে যেতে। এই দশ-বার আনা পয়সার মামলা তো শুধু, আর দশ-বার ঘণ্টা টাইমের। সে জন্যে ওঁর টাইম নষ্ট করা ঠিক হবে না। ওঁর পাঁচ মিনিট তো আমাদের পাঁচদিনের সমান; কোনো-কোনো সময়ে মাসেও কামিয়ে নিতে পারি না, তুকতাক করে পাঁচ মিনিটে যা সেরে দেন ঘোষ।'

স্লিপ লিখছিল নিশীথ, নিজের নামটাই লিখল শুধু, আর-আর কী লিখবে? লিখল যে প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কী লিখবে আর? লিখল যে, সে জন্য বেলগাছিয়া থেকে এসেছে বালিগঞ্জ অব্দি। ব্যাস। ছেলেটির হাতে স্লিপ তুলে দিয়ে নিশীথ জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম আপনার?'

'আমার নাম রিপেন।'

'রিপেন?'

'হ্যাঁ, রিপেন।'

'রিপেন, নিশীথ দু-এক মুহূর্ত মাথা খুঁড়ে ভেবে নিয়ে রিপেন, রীপেন, ঋপেন, কোনো কিছুর ভিতরেই কূলকিনারা না পেয়ে হয় তো রিপন ছেলেটির নাম, কিংবা রিপু+ইন্দ্র=রিপেন্দ্র—রিপেন ছেলেটির নাম—রিপেন—রিপেন-রিপেনের থেকে রিপেন হয়েছে—রিপেন—রিপেন ভেবে খানিকটা নিস্তার বোধ করতে লাগল।

'রিপেন আপনার নাম?'

'আমার নাম রিপেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটি স্লিপ পড়ে নিশীথকে বললে, 'প্রফেসর সাহেবের সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছেন তা তো লেখেন নি আপনি, আমাকে বলেছিলেন হাটখোলার থেকে এসেছেন কিন্তু এখানে তো লিখেছেন বেলগাছিয়ার কথা।'

'হাটখোলার থেকেই এসেছি আমি, বেলগাছিয়ায় আমি থাকি।' রিপেন নিশীথের দিকে আড়চোখে একটু খটকায় বেধে তাকিয়ে থেকে বললে, 'কী দরকারটা আপনার লিখলেন না, ঘোষ সাহেব বড়-বড় প্রফেসর, অ্যাসেম্বলি মেম্বার, খানদানি অফিসার, মিনিস্টার ছাড়া কারুরই সঙ্গে দেখা করেন না আজকাল। বড্ড ব্যস্ত কাজ নিয়ে—'

'কী কাজ?'

'কী কাজ তা আমি কী করে বলব; অনেক বই ঘাঁটছেন, পড়ছেন লিখছেন। লিখছেন—'

'ও-সব তো বরাবরই লেগে আছে।'

'না বারবর নয়। এক নাগাড়ে লিখছেন। আগে তো পড়তেন শুধু; কোথায় লিখতেন?'

'বই লিখছেন?'

'না, শিক্ষা সম্বন্ধে কী একটা পরিকল্পনা লিখে দিতে হচ্ছে, চেয়েছে গভর্নমেন্ট থেকে।'

'এই গভর্নমেন্ট থেকে?'

'না, বোধ হয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে।'

'টাকা দেবে বুঝি ওঁকে?'

'রিপেন মাথা নেড়ে বললে, 'না মশাই, টাকা দিয়ে কী হবে ঘোষ সাহেবের? মোটা রকম টাকার জন্যেও ও কাজ কে করে? তবে হ্যাঁ, বড় পদ পেয়ে যাবেন হয় তো। কত মান তাতে! কত মান। টাকা কী হবে? টাকা!'

'কোথায় পাবেন বড় পদ?'

'সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে—'

'ও তা হলে চলি আজ আমি রিপেন দা।'

'আপনি কি বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। কলেজের হাউস ফিজিসিয়ান আমি—বায়োকেমিস্ট্রির লেকচারার। ট্রপিক্যাল।'

'ওঃ—ওঃ—ওঃ,' রিপেন হাত জোড় করে বললে, 'ঘাট হয়ে গেছে ডক্টর সেন, আপনার ধুতি-পাঞ্জাবি দেখে বুঝতেই পারি নি আমি। চলুন-চলুন—অনেক সময় নষ্ট হল আপনার। নানা রকম লোক একে বিরক্ত করে প্রফেসরকে, সে জন্য আমার উপর কড়া হুকুম যে গোলা লোককে যেন পাশ না করে দিই'—

'আমাকে ফর্দা মনে হয়েছিল বুঝি?'

'হাউস ফিজিসিয়ান ট্রপিক্যালের প্রফেসর, সুট পরে এলেই তো হত। আজকাল অবিশ্যি পনেরই আগস্টের পর থেকে ধুতি-চাদর পরছে অনেকেই, গভর্নর মন্ত্রী সবাই প্রায়—কিন্তু—যাদের কাজই হাসিল হয় নি এখনো তাদের সুট পরে বেরনোই সুবিধে, রাজাজির সঙ্গে ধুতি নিয়ে টেক্কা দিলে তো চলবে না। রাজাজির তো সব ফল পাড়া হয়ে গেছে, এখন বসে-বসে কাস্টার্ড পুডিং বানাবার সময়। চলুন, চলুন ডক্টর সেন—'

'ঘোষ সাহেব লিখছেন—'

'চলুন কোনো ক্ষতি হবে না।'

'ক্ষতি হবে না?'

'চলুন, আপনার সময় নষ্ট হচ্ছে।'

'স্লিপটা রিপেন দা?'।

'ওটা ছিঁড়ে ফেলেছি লাগবে না।'

নিশীথ পকেট থেকে ক্যাকটিনা পিলের কৌটো বের করে কয়েকটা বড়ি খেয়ে ফেলে বললে, 'বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই রিপেন। আমি বেলগাছিয়ায় থাকি বটে কিন্তু কলেজে নয়, অন্য জায়গায়। আমি কলকাতায় বেড়াতে এসেছি, আমি জলপাইহাটিতে থাকি। সেখানকার কলেজের ইংরেজির লেকচারার আমি। ঘোষ সাহেবের সঙ্গে আমার কি দেখা হবে রিপেন?'

শুনে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল রিপেন। সিঁড়ির উপরে দু-তিন ধাপ উঠে গিয়েছিল সে, নিচে নেমে এসে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'আপনি কী যে তাই আমি বুঝতে পারছি না। বললেন, হাটখোলার থেকে এসেছি, পরে লিখলেন, বেলগাছিয়া থেকে আসা হয়েছে। নিজেকে বেলগাছিয়া মেডিকেল কলজের হাউস ফিজিসিয়ান, ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের প্রফেসর, বলে চালিয়ে দিয়ে পরে বললে ও-সব কলেজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, অন্যত্র থাকেন।'

নিশীথের দিকে তাকিয়ে রিপেন বললে, 'কলকাতায় থাকেন না?'

'না।'

'বিশ্বেস করতে হবে? কোথায় জলপাইহাটি?'

'পদ্মার পারে।'

'পাকিস্তানে?'

'হ্যাঁ।'

'জলপাইহাটি কলেজের লেকচারার আপনি?'

'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বিশ্বেস করতে হবে?' রিপেন বললে, 'আর এক সময়ে আসবেন নিশীথবাবু। ঘোষ সাহেবকে আজ বিরক্ত না করাই ভাল। উনি সত্যিই আজ সকাল থেকে খুব ব্যস্ত আছেন।'

'আমার শুধু পাঁচ মিনিটের মামলা রিপেন।'

'কলেজ আজ ছুটি আছে। উনি সকাল থেকেই দোর বন্ধ করে লিখছেন। বলে দিয়েছেন কেউ যেন কাছে না ঘেঁষে। আজ উপরে না যাওয়াই ভাল। আপনি আর-একদিন সময় করে'—

'আমি আর একদিন আসব রিপেন।' নিজের মনেই খুশিতেই কেমন একটা সৌজন্য এসে পড়ল নিশীথের মুখে, বললে, 'আজ শুধু দোতলা হয়ে ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করে চলে যাব।'

'এত করে বলছি, তবুও মানছেন না আপনি, বড্ড নাছোড়বান্দা আপনি নিশীথবাবু, সত্যিই উনি বিরক্ত হবেন আপনি গেলে। দু-কলম লিখতেই গাদাগাদা রেফারেন্স ডিকশনারি দেখতে হয় ওঁর। এখন লোকজন গেলে খেই হারিয়ে ফেলবেন।'

নিশীথ উপরে যাবার পথে পা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আমি এক জন কলেজ টিচার, আর একজন কলেজ টিচারের সঙ্গে দেখা করতে পারব না?'

রিপেন মরীয়া হয়ে বললে, 'কিন্তু দেখা করবার জন্যে ঠিক সময় বেছে না এলে চলবে কেন? এখন উনি—'

'বেলগাছিয়ার থেকে পাকা দেখার সময় বেছে কেউ কখনো বালিগঞ্জে আসতে পারে? আমি বেশি কিছু করব না শুধু একটু বুড়ি ছুঁয়ে চলে যাব।'

'যাবেন না, যাবেন না। কী দরকার আপনার ঘোষ সাহেবের সঙ্গে বলে যান। আসুন স্লিপ লিখে দিন।'

নিশীথ রিপেনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বললে, 'আমি একজন কলেজের টিচার, আর-একজন কলেজের টিচারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তিনি বাড়িতেই আছেন, ঘুমের থেকে উঠেছেন, দাড়ি কামিয়ে চা খেয়ে চান সেরে পড়ছেন, কিংবা লিখছেন একটা খসড়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জন্যে। আমার কাজ পাঁচ মিনিটের কিংবা মিনিট পনের-কুড়ি, বড় জোর। আমিও ঐ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের খসড়া সম্পর্কেই এসেছি।'

রিপেন কেমন নিরেট কটমট মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। নিশীথের মুখে শেষ কথাটা শুনে খানিকটা ধোঁয়া কেটে গেল যেন তার মুখ থেকে। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারছিল না সে।

'ঘোষ সাহেব তো দেশের এখনকার শিক্ষাব্যবস্থা বদলে সব দিক দিয়ে কী সব সুব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারা যায় সেই সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করবেন। জিনিসটার পক্ষে আমি খুব ওতপ্রোতোভাবে জড়িয়ে রয়েছি রিপেন। নতুন শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে ঘোষ সাহেবকে কিছু বলতে হবে আমার। কিছুই হবে না হয় তো; ঘোষ হয় তো বুঝবেন না, কিংবা কেন্দ্র গ্রাহ্য করতে চাইবেন না। কিন্তু তবুও বলে যাই কথাটা।' নিশীথ উপরে চলে গেল।

'কাকে খুঁজছেন আপনি?' প্রফেসরের স্ত্রী মোহিতা জিজ্ঞেস করল নিশীথকে।

'আমার নাম নিশীথ সেন। প্রফেসর ঘোষ কি বাড়িতে আছেন?'

'আছেন।'

'দেখা হতে পারে তাঁর সঙ্গে?'

'কোত্থেকে এসেছেন আপনি?'

'বেলগাছিয়া থেকে।'

'ও, বহু দূর থেকে। উনি একটু ব্যস্ত আছেন আজ।' মোহিতা নিশীথকে ওর নৈতিক কর্তব্য বুঝে উঠবার জন্য বললে, বেশ লাগসই কমনীয়ভাবে।

'তা হলে'—নিশীথ নিজের কামানো দাড়ির গালে একটু হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'তা হলে উঠতে হয় আমাকে মিস ঘোষ।'

মোহিতা নিশীথের ভেতর দিয়ে দেয়ালের ভেতর দিয়ে চোখ চালিয়ে একটু হেসে উঠে বললে, 'কী ভেবেছেন আমাকে আপনি। ও মা আমি কেন তা হব?'

নিশীথ মনের ভুলে নয়, মনের কী এক আকস্মিক সমুচ্চারণে কী বলে ফেলেছিল সেটা যে মোহিতা কানে তুলবে তা সে মনে করে নি। সে ভেবেছিল মিস ঘোষ সে বলবে বটে, কিন্তু উনি তা শুনেও শুনেন না। ঘোষ সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না এই বলেই গা-ছাড়া নমস্কার জানিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তা তো হল না। মোহিতা শুনে স্বীকার করলেন যে শুনেছেন। নিশীথ একটু তামাশা বোধ করে দাঁড়িয়ে, মোহিত তার দিকে নয়—দেওয়ালের কয়েকটি দেশী-বিদেশী ছবি, ঘোষ পরিবারের দু-একটি (খুব সম্ভব পরলোকগত) পুরুষ মহিলার ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট, দেখছিল।

'বসুন আপনি।'

'না, চলি। বেলগাছিয়া যেতে হবে।'

'বসুন। ওঁর সঙ্গে দেখা হবে আপনার।'

'উনি খুব ব্যস্ত আছেন বললেন।'

'ব্যস্ত আছেন। কাজের চাপ বেশি। লিখছেন হয় তো।'

'কলেজের নোট?'

'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বই লিখছেন বুঝি? ঘোষ সাহেব কোনো বই লিখলেন না এটা আমাদের অনেক দিনের আফশোষ। লিখুন, দু-একটা বই লিখুন উনি। ওঁর লেখার সময় এসে পড়লুম।'

নিশীথ সোফা থেকে উঠবার আগেই মোহিতা বলে ওঠেন, 'বসুন, ঠিক আছে। বেলগাছিয়ার থেকে বালিগঞ্জ এসেছেন প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করতে। তা না-দেখা করে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। অন্য কোনো কাজ ছিল আপনার এ পাড়ায়?'

নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, 'অন্য কাজ কী থাকবে আর এ পাড়ায়, এই একটা 'কাজই তো একশখানা।'

'তা হলে? উঠবেন না আপনি। ওঁকে বলছি আমি।'

'আচ্ছা—বসছি আমি—তবে—'

'ভিতরে দু'জন লোক আছেন তাঁরা চলে গেলেই আপনার কথা জানাব।'

'কারা আছেন ভিতরে?' জিজ্ঞেস করেই নিশীথ নিজের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা চাপা দিয়ে বললে, 'লিখুন, বই লিখুন প্রফেসর। ওঁর এক-আধখানা বই অনেক আগেই প্রত্যাশা করেছিলাম আমরা। তবে এই বয়সের লেখা আরো ভাল হবে। সমস্ত জীবনের বিদ্যে অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা তো।'

'বিদ্যে কি জ্ঞান?' মোহিতা জিজ্ঞেস করে।

'বিদ্বান মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের জন্ম হয়।'

'সব সময়েই হয়?'

'না তা হয় না। জ্ঞান বিদ্যের চেয়ে ঢের বড় জিনিস বলেই জানি। হৃদয়ে জ্ঞানের কোনো অবস্থান না থাকলে মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো কেমন যেন অচল হয়ে পড়ে থাকে অদ্ভুত মূল্যনাশের ভিতর।'

'শুধু বিদ্যে থাকলেই হয় না বলছেন তো?'

'কী হয় না?' নিশীথ একটু আগ্রহভরেই জিজ্ঞেস করে মোহিতাকে।

'জিনিসের ঠিক মূল্য বোঝা যায় না।'

'না, তা বুঝতে বিদ্যের কী দরকার?'

'বিদ্যের চেয়ে বেশি কিছুর তো দরকার।'

'সেইটেই বলেছি আমি, তাকে আমি জ্ঞান বলেছি,' বলে নিশীথ বললে, 'কেমন বিমূঢ়ের মত কথা বলছি আমি।'

'কেন? ঠিকই তো বলছিলেন।'

'এমনভাবে কথা বলছিলুম যে জ্ঞান কাকে বলে সে জিনিসটা আমিই প্রথম আবিষ্কার করেছি যেন। যেন উপনিষদের ঋষিদের মত বাণী।'

নিবিষ্ট ভাবে শুনে নিয়ে বোধগম্য হল কথাগুলোর অর্থ, মানুষটির আত্ম-দর্শনের রকমটি তো বেশ নতুন—ভেবেছিল মোহিতা। বেশ সরল গহন আত্মবিশ্লেষণ।

নিশীথের দিকে তাকিয়ে মোহিতা বললে, 'উপনিষদের ঋষিদের বেশ আত্মস্থতা ছিল।'

'ছিল', নিশীথ বললে, বলে মুখ তুলে মোহিতার দিকে তাকিয়ে দেখল সে নিশীথের দিকে তাকিয়ে আছে, 'আজকালকার দিনে সে রকম আত্মস্থতা ফিরে পাওয়া কঠিন।'

'কেন? কিসের জন্যে এ রকম হল?'

'দু-একজনের মধ্যে অবিশ্যি বেশ একটা মনের প্রশান্তি আছে আজকালও, কিছুতেই তাদের অন্তিম মনের সুছন্দ নষ্ট হয়ে যায় না, নিজের ও চারদিককার জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অনেক পরিমাণে ধ্বংস হয়ে গেলেও,' মোহিতার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে একবার-আধবার চোখে চোখ রেখে বললে নিশীথ, 'প্রফেসর ঘোষ এ রকম একজন মানুষ।'

'প্রফেসর ঘোষ এ রকম মানুষ?' সচকিত হয়ে নিশীথের দিকে তাকাল মোহিতা।

'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়।'

'অনেক দিনের চেনা পরিচয় আপনার সঙ্গে প্রফেসরের?'

'না। মাঝে-মাঝে এসেছি আমি তাঁর কাছে দু-বছর চার-বছর অন্তর। তিনি হয় তো প্রথম নজরেই আমাকে চিনতে পারবেন না। প্রতিবারই জিজ্ঞেস করেন কে আপনি?'

তারপর হেসে বললে, 'মানুষের মুখ মনে রাখার কথা তাঁর নয়। তাঁর কাজ হচ্ছে অতীতে কী বিদ্যা ছিল, আজকাল, ভবিষ্যতকে সে সম্বন্ধে সজাগ করে রাখা। আমাদের মুখ মনে রেখে ও-রকম কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। কিন্তু তবুও লোকজনের মুখ বারবার দেখলে ভোলো কঠিন, কিন্তু প্রফেসরের পক্ষে মনে রাখা কঠিন। মনের কোনো দোষ নেই । এটা গুণ। প্রফেসর ঘোষের মতন হয় না।'

মোহিতা শুনছিল, একটু হেসে বললে, 'তাই তো। নতুন কিছুর ভিতরে এসেই প্রফেসরের গোলমাল হয়ে যায়। তিনি অতীতের পক্ষে চলতেই অভ্যস্ত। কোনো কিছুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে দেখবার প্রশ্ন উঠলে তিনি বলেন যে তা অন্তত ত্রিশ বছর আগের অতীতের জিনিস হওয়া চাই, ত্রিশ বছর আগেকার সামাজিক সংস্থান বা রাজনীতি বা ধর্মের আন্দোলন।' মোহিতা প্রফেসরের ঘরের অটকানো দরজাটার দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে বললে, 'আর সাহিত্যের ব্যাপার হলে তা অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের কবিতা প্রবন্ধ সাহিত্য হওয়া চাই। একশ বছর আগের হলেই যেন ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আজকাল একটু-আধটু দেখছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আজকাল–খুব হালে?'

'হ্যাঁ, মানে উনিশশ সাতচল্লিশের সেপ্টেম্বর থেকে।'

'এর আগে ওঁর সাহিত্য তিনি পড়েন নি?'

'মন দিয়ে পড়েন নি, বলতেন জিনিসটা পাকুক–পাকতে থাকুক, পেকে নিক, পঞ্চাশ-ষাট বছর লাগে এক বোতল মদেরও তো ধাতস্থ হতে। রবীন্দ্রনাথ আজ যা লিখলেন আজই কি তাই পড়তে হবে!'

'ঠিকই বলেছেন, সাহিত্যের অধ্যাপক তো উনি।'

'ইংরেজি সাহিত্যের।'

'ঠিকই বলেছেন প্রফেসর। আমাদের মৃত্যুর পঞ্চাশ-ষাট বছর পর যারা পড়তে আসবে আমরা ধারণাও করতে পারি না এমনই একটা আশ্চর্য আস্বাদ পাবে তারা কবির সাহিত্যের থেকে। কেমন একটা অন্ধকার কোণে যেন পড়ে আছে মদের বোতলগুলো, মাকড়ের জালে ঢাকা পড়ে, একটা মস্ত ভাঁড়ারের দেশে নিরবচ্ছিন্ন ফুসলানি, খুনোখুনি, চশমখুরির ভিতর। বোতল টেনে-টেনে খাচ্ছে বটে, যারই মর্জি হচ্ছে। কিন্তু সৎ-অসৎ সনাতনী নিপাতনী উল্লুক জিরিয়ে নেবে খানিক–পঞ্চাশ–ষাট বছর পরে, মদের বোতলগুলো পেকে উঠবে–ভাঁড়ারের ঠাণ্ডা কোণে; যারা খাবে তখন–আঃ!'

নিশীথও ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রসাহিত্য পড়ছে না আজকাল। মাঝে-মাঝে চেষ্টা করে দেখেছে। কয়েকটা কবিতা ছাড়া আর-কিছু ভাল লাগে না। তবে পঞ্চাশ-ষাট বছর পর ভাল লাগবে। কিন্তু তখন বেঁচে থাকবে না। প্রফেসর থাকবেন না। মোহিতাও নয়।

পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে—প্রফেসর তো চলে গেছেন তখন।–কেমন একটা ভারী নিঃশ্বাস পড়ল মোহিতার।

'আপনি নাগাল পাবেন নিশীথবাবু পঞ্চাশ বছর পরে?'

'আমার বয়স তো পঞ্চাশ বছরই প্রায়, উনপঞ্চাশ তো ওঁর?'

'উনপঞ্চাশ পেরিয়ে ছ মাস হল।'

'সাড়ে উনপঞ্চাশ, আমার আটচল্লিশ।' হারীত বলে, তার বাবার বয়স উনপঞ্চাশ; নিশীথের হিসেবে আটচল্লিশ, সাতচল্লিশও হতে পারে, খুব সম্ভব আটচল্লিশই।

মোহিতা নিশীথকে দেখেছে এর আগে। এই ভদ্রলোকটির নাম যে নিশীথ, নিশীথ সেন, তাও জানা আছে তার। এ বাড়িতেই দেখেছে প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল নিশীথ শেষবার যখন–উনিশশ ছেচল্লিশে, মে মাসে। মনে আছে মোহিতার। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ঘোষ সাহেবের ঘরে বসে ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছিল সেবারে নিশীথ, সকালবেলা তখন, আর কেউ ছিল না তখন ঘোষ সাহেবের ঘরে। মোহিতা ছিল, নিশীথ ছিল, ঘোষ ছিলেন। কলেজে গরমের ছুটি তখন। প্রফেসরের লাগেজ বাঁধাছাঁদা চলছে। দু-তিনদিনের মধ্যেই মুসৌরি যাবেন সপরিবারে। মোহিতা মাঝে-মাঝে ঘোষের ঘরে ঢুকছে, মাঝে-মাঝে বেরিয়ে পড়ছে; আবার এসে মিনিট পনের কুড়ি বসে যাচ্ছে, মোহিতা প্রফেসরের ঘরে ঢুকে সোফায় বসলেই ঘোষের নজরটা মোহিতার দিকে হেলে পড়ছে। নিশীথ যেন নেই। এই স্ত্রী-ঘেঁষা ভাব, বড়লোক-ঘেঁষা ভাবও বটে। মোহিতা ডিরেক্টর জেনারেলের মেয়ে আর নিশীথ মফস্বল কলেজের লেকচারার। এ সব বিষয়ে বেশ ওয়াকিবহাল ঘোষ। কিন্তু জিনিসটা ভাল না। মোটেই ভাল না। একজন কৃতী মানুষ টাকাকড়ির দিক থেকে অকৃতী বলে তাকে উপেক্ষা করা ঘোষের মত অধ্যাপকের উচিত কি? কিন্তু তিনি তো তা করেন। নিশীথের মুমুক্ষু চোখ ঘোষ সাহেবের দিকেই শিকেয় তোলা, তবু, অতি ক্বচিৎ কোনো কথার উত্তর দিতে মোহিতার দিকে ঘাড় ফেরাচ্ছে নিশীথ, চোখ ফেরাচ্ছে না; কেমন একটা সম্ভ্রমের বোধে মোহিতার চেয়ে নিজেকেই হয় তো বেশি সম্ভ্রান্ত করে তুলবার চেষ্টা করে। সেটা যে রীতির ভুল, মনেরও অসঙ্গতির পরিচয় বুঝেছিল কি তা নিশীথ? নাকি বুঝেও যা করেছে ইচ্ছে করেই করেছে। ঘোষ সাহেব সে প্রতিবারেই নিশীথের পরিচয় জানতে চান, এমন ভাব দেখান যে তিনি নিশীথের মুখ চেনেন না, সেটা নিশীথের পক্ষে বাস্তবিকই একটা অত্যাচার। এটাকে কী নাম দেবে মোহিতা? এর কি কোনো সুনাম আছে? ভাঁড়ামো ছাড়া একে কী আর বলবে সে। ভণ্ডামিটাকে আড়াল করে প্রফেসরের আশ্চর্য অধ্যাপকীয় সুসস্মিৎ।

ঘোষের আত্মস্থতার কথা বলছিল নিশীথ। সে কী রকম আত্মস্থ। সত্যিই কতদূর মহৎ বোঝে হয় তোন নিশীথ, জানে সব, কিন্তু না-জানার ভানটাকে ঢেকে কেমন একটা মানানসই দীনতার আলো ছড়িয়ে। এ বিষয়ে প্রফেসর ঘোষের ঠিক উল্টো নিশীথ। না কি নিজেই অধীনস্থদের কাছে সে নিজেও একটি ঘোষ। না, তা হয় তো না। নিশীথকে দেখে তা মনে হচ্ছিল না মোহিতার।

'আপনাকে তো এর আগে এ বাড়িতে দেখেছি আমি।'

'মাঝে-মাঝে ঘোষ সাহেবের কাছে আসি আমি। আমাকে দেখেছেন আপনি, মনে আছে আপনার?'

'বেশি তো আসেন না।'

'আমি তো কলকাতায় থাকি না।'

'গেল বছর আসেন নি। ঘণ্টা দেড়েক ছিলেন প্রফেসরের ঘরে তার আগের বছর। আমরা তখন মুসৌরি যাচ্ছি, বাঁধাছাঁদার পাঠ চলছে। ঘোষ অবিশ্যি শালগ্রামের মত বসে আছেন তাঁর ঘরে। মোটরের পা-দানিতে একবার পা রাখবেন, রিজার্ভ গাড়ির ফুটবোর্ডে আর-একবার–'

'খুব বড় জ্ঞানস্থবির মানুষ–সকলে ধন্য বোধ করেন'–নিশীথ একটু নুনের ছিটে মেখে সদন্তঃকরণে হেসে বললে, 'প্রফেসরের এ-বাড়িতে ঢুকলেই যেন সেই আগেকার প্রাচীন সভ্যতা খুঁজে পেয়েছি মনে হয়। কেমন একটা স্তব্ধতা প্রশান্তি এখানে; চারিদিককার বর্বরতার থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করে রেখেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সেটা বেশি মিশলে বুঝতে পারবেন। বছরে, চার-বছরে একবার উঁকি দিয়ে কী করে—' কিন্তু কথাটা শেষ করল না মোহিতা, হাসির ফোঁড় ঠোঁটের কোণায় আটকে রইল।

'উনিশশ চুয়াল্লিশেও আপনি এসেছিলেন প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করতে'—

'চুয়াল্লিশে?' নিশীথ, মোহিতার সুচিমুখ হাসি মিলিয়ে যাচ্ছিল-তাকিয়ে দেখতে-দেখতে বললে, 'হ্যাঁ চুয়াল্লিশেও এসেছিলাম আমি।'

'মে মাসে?'

'হ্যাঁ মে মাসে। কী করে তারিখটা মনে রইল আপনার?'

'প্রফেসরেরও মনে আছে বটে, কিন্তু তিনি তা স্বীকার করতে চান না।'

'মনে আছে? তা থাকতে পারে। গত চার বছরে আমি দু'বার এসেছি এ বাড়িতে, দু'বারেই দেখা হয়েছে প্রফেসরের সঙ্গে। আপনি তো দু'বারই ছিলেন প্রফেসরের নিজের ঘরে বসে। সকালবেলাই উনি পড়ছিলেন, লিখছিলেন। কলেজের গরমের ছুটি তখন।'

'হ্যাঁ আমরা তখন নিচের তলায় থাকতুম।'

'উপরে এলেন কবে?'

'গত বছরে।'

নিশীথ বললে, 'এবারেও নিচে খুঁজেছিলাম'—

'নিচে আজকাল জিনিসপত্রের গুদাম; ওঁর লাইব্রেরির বেশির ভাগই নিচে এখন।'

'খুব বড় লাইব্রেরি দেখলুম।'

'খুব সম্ভব বেনারস ইউনিভার্সিটিকে দিয়ে দেবেন।'

'সব বইগুলো? আমাদের বাংলাদেশে থাকবে না?'

'সেটা বলেছিলুম ওঁকে, উনি নারাজ। অনেক বলতে শেষে বললেন, মাল-বীয়াকে কথা দিয়ে এসেছি, কোনো লেখাপড়া নেই, মুখের কথা। পণ্ডিত মালবীয়া আর ঘোষ সাহেব ছাড়া জানেও না কেউ। মালবীয়াজি তো মরে গেছেন। কিন্তু উনি কথার খেলাপ করতে পারবেন না।'

'কিন্তু উনি তো কলকাতা ইউনিভার্সিটির লোক।'

'কিন্তু বেনারসকে দেবেন।'

'কিন্তু উনি তো বাঙালি?'

'কিন্তু হিন্দুস্থানী প্রদেশগুলোর দিকেই দেখেছি ওঁর ঝোঁকটা বেশি।'

'কিন্তু ওঁরা কি পড়বে বই? পড়ে বই?'

'আজকাল পড়ছে শুনছি।'

'কোথায় পড়ছে আর?' একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে নিশীথ বললে।

'ঘোষ সাহেব নিজের মনকে পড়াচ্ছেন।'

'আপনি একটা কাজ করুন,' নিশীথ বললে, 'মোহিতার দিকে তাকিয়ে, 'কলকাতা ইউনিভার্সিটিকে যদি উনি না দিতে চান ওঁর বইগুলো, ওঁর বাবার বা আপনার নামে এই লাইব্রেরিটা রেখে দিন না কেন, আপনাদের বাড়ির নিচের তলায়। এমন কোনো কোনো বই আছে ওঁর লাইব্রেরিতে যা আমাদের দেশে নেই, ভারতবর্ষে নেই, কোথাও নেই। তা ছাড়া এমনিই লাইব্রেরিটা সারালো, অন্তঃসারালো জিনিসে ভরপুর। বাঙালি কি উপকার পাবে না?'

'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি তো এখন কলকাতাতেই আছে নিশীথবাবু। পড়ে নিক বাঙালি,' মোহিতা বললে, 'আপনি যান ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে?'

'আমি কলকাতায় থাকি না।'

'যখন আসেন, গরমের ছুটি কাটাতে।'

'ও,' নিশীথ বললে, 'ঘোষ সাহেবের সঙ্গে আপনার ভারি মজার সাঁট রয়েছে দেখছি তো।'

'কেন?' বড় হাসিটা আরো ছড়িয়ে পড়তে গিয়ে খানিকটা বাধা পেল মোহিতার মুখে।

'বাঙালির জন্যে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির দোহাই পেড়ে সরিয়ে ফেলতে চাচ্ছেন ঘোষ লাইব্রেরি বাংলার বাইরে—আপনার স্বামীর সঙ্গে জোট পাকিয়ে?'

'তা হবে। আমাদের মনস্তাপ আছে।'

'কিসের?'

'ঘোষ সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন।'

'কেন, কলকাতা ইউনিভার্সিটি কোথাও কিছু কার্পণ্য করেছে কি, খুব ধনী ইউনিভার্সিটি তো নয়। কী দেবে আর এর চেয়ে বেশি, দেবার সামর্থ নেই।'

'টাকাকড়ির কথা বলছি না আমি।'

'ওঃ!' নিশীথ চুপ করে রইল। টাকাকড়ির কথা নয়, মান-সম্মানের কথা তা হলে, পদমর্যাদার ব্যাপার। ভাল আমির-ওমরাহের পদ জুটছে না হয় তো সাহেবের।

ঘোষকে ভাইস চ্যান্সেলার করে দিলে হত? ভাবছিল নিশীথ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনাকে যা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কথার কোনো উত্তর দিলেন না তো?'

'কে আমি? কী জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির কথা।'

'ওঃ, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি–'

কলকাতায় থাকতে পড়ত মাঝে-মাঝে সে। কিন্তু অনেক দিন তো কলকাতা ছাড়া। বই-টই পড়ার চাড়ও কমে যাচ্ছে। নিশীথ মাথা নেড়ে বললে,–'না' ওখানে আমি অনেক দিন যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিয়েছি। আমি বই পড়ি না, পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাকে দিয়ে বাংলার পাঠকসমাজকে বিচার করলে তো চলবে না। তারা পড়ে। আপনাদের লাইব্রেরিটা এ দেশের লোকের কাছে কলকাতা শহরে থেকে গেলে ভাল হাত।'

মোহিতা একটু ভেবে চুপ করে থেকে তার প্রশ্নে নিশীথকে, পিছনের দেয়ালকে, সচ্ছ কাচের মত যেন মনে করে, অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে থেকে নিশীথের চোখের ভিতর নিজের চোখ ফিরিয়ে আনল যেন, হঠাৎ কোনো এক সময় বললে, 'কেন তা সম্ভব হচ্ছে না বুঝতে পেরেছেন হয় তো?'

নিশীথ চিন্তিত মুখে বললে, 'হ্যাঁ পেরেছি, ঘোষ সাহেব যা চাচ্ছেন তা পাচ্ছেন না। কেন তিনি অন্যদের দিকে যাবেন যা তারা চাচ্ছে।'

'এই-ই তো কথা। ওঁর মনের কথা এই। এই মনের ভিতরই ঘোষ সাহেবের আত্মস্থতা।'

নিশীথ এক-আধ মিনিট চুপ করে থেকে বললে, 'টাকাকড়ি তো চাচ্ছেন না ঘোষ; সেটা আমি বুঝেছি–'

'বলেছিলুম টাকাকড়ি ততটা চান না,' মোহিতা কী বলবে না-বলবে একটু ইতস্তত করে অবশেষে বলে ফেলল, 'চান। কিন্তু মান বেশি চান।'

'সম্মান তো প্রচুর পাচ্ছেন ঘোষ।'

'পাচ্ছেন', মোহিতা একটু থেমে বললে, 'সে রকম পাচ্ছেন না, ইউনিভার্সিটি সার্কেলেও–তেমন পাচ্ছেন কই আর।'

'নিজের কাজ নিয়ে নিমগ্ন হয়ে থাকবেন নাকি অধ্যাপক সাংসারিক অভাব অনটন মিটে গেলে?'

'আমি তো তাই ভাবতুম।'

'আমরাও তো তাই ভাবতাম, অধ্যাপক ঘোষ সম্পর্কে।'

'তিনি তো আত্মসমাহিত নন।'

'আজকালকার পৃথিবীতে সে রকম আত্মসমাধি ফিরে পাওয়া কঠিন।'

নিশীথ মোহিতার দিকে তাকিয়েছিল। এমন ভাবে যে মোহিতা হয় তো ভাবতে পারত, কেমন যেন অস্বাভাবিকভাবে তাকিয়ে আছে নিশীথ।

'পুরনো পৃথিবীর সেই অধিকার ফিরে পাওয়া কঠিন এখন।'

'সেই চীন সভ্যতার দিন নেই এখন, আর সব রকম বিশৃঙ্খলার থেকে মানুষের মনটাকে সংবরণ করতে জানা, সৌম্য চৈতন্যে সব সময়েই স্থির হয়ে থাকতে পারা; চীনের মতন আমাদেরও যা ছিল, নেই এখন আর।'

নিশীথ একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'নেই। কলকাতা ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে কোনো ডেপুটেশন এসেছিল ঘোষের কাছে?'

'না তো। কেন? আসবার কথা ছিল?'

'কেন আসবে? কী জিনিস সম্পর্কে?'

'আপনাদের এই লাইব্রেরির ব্যাপারটা নিয়ে।'

মোহিতা তার মুখোমুখি দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'না আসে নি। এলেও কিছু হত না। ওরা তা জানে।'

'ভাইস চ্যান্সেলার হতে চেয়েছিলেন কি ঘোষ?'

'কী চেয়েছিলেন তা জানা নেই ঠিক, মানুষ তো চ্যান্সেলার হতেও চায়'–

'সে জিনিস অবিশ্যি ইউনিভার্সিটি কাউকে দিতে পারে না।'

'বড় জোর কনভোকেশনের গাউন দিতে পারে চ্যান্সেলারকে। তাঁর লেখা বক্তৃতা পড়িয়ে শোনাবার জন্য মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে,' মোহিতা হাসতে-হাসতে বললে, হাসি নিবে এলে বললে, 'একটা কিছু হতে চাচ্ছিলেন ঘোষ, কিন্তু এখন কিছু চাচ্ছেন না আর।'

নিশীথ বললে, 'কেমন যেন হ্যাঁচকা মনে হয় আমার–এই ব্যাপারটার সঙ্গে ঘোষ সাহেব লাইব্রেরির ব্যাপারটা কেন জড়িয়ে ফেললেন–'

'তা তো করলেন। ঠিকই করেছেন হয় তো,' মোহিতা সত্যিই যেন নিজের মতের ভিত্তি থেকে একটু না নড়েচড়েই বললে।

'এর একটা বিহিত করুন।'

'আমার শক্তি নেই।'

'দু-কাপ চা নিয়ে এল রিপেন। দুখানা-দুখানা বিস্কুট। নিশীথের মুখের দিকে তাকালই না সে। প্রফেসর সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কথা বলছে লোকটা, যাকে সে নিচের তলায় রুখে রেখেছিল অনেকক্ষণ। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিপেনের মুখে বেকুবির কোনো লক্ষণই দেখতে পেল না নিশীথ। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ছেলেটি। দুটো ছোটো তেপয় দু'জনের সামনে রেখে বেরিয়ে গেল আবার।

'কে এই ছেলেটি?'

'ও নৃপেন।'

'নৃপেন? আমাকে তো বলেছিল ওর নাম রিপেন।'

'নিজের নাম সংক্ষেপ করে নিয়েছে। এম-এ পাস করেছে নৃপেন।'

নিশীথ একটু চকিত হয়ে বললে, 'তাই নাকি? কী বিষয়ে?'

'ইকনমিকসে, ছেচল্লিশে, সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে, সেই জন্যেই মুশকিল।'

'কিসের মুশকিল?'

'কোনো কলেজে ঢুকে পড়তে চাচ্ছে।'

'ঢুকিয়ে দিতে পারেন তো প্রসেফর?'

'ঢুকিয়ে তো দিয়েছিল। পর-পর তিনটে কলেজে। দুটো গভর্নমেন্ট কলেজে, একটা প্রাইভেটে।'

'তারপর'

'কোথাও পাকাপাকি হল না কিছু।'

'কেন?'

'কী জানি। পড়াতে সুবিধা পায় না হয় তো। এখন মোটর ড্রাইভিং শিখছে।'

'সেটা শিখতে পারলে ছোটখাট প্রফেসরের থেকে ভাল হবে,' নিশীথ চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'প্রফেসর গভর্নমেন্ট কলেজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন রিপেনকে! বেশ তো সুযোগ তা হলে পেয়েছিল ছেলেটি। প্রফেসরের মত একজন মুরুব্বি ছিলেন। বাঃ।'

দুটো বিস্কুটই খেয়ে ফেলেছে নিশীথ।

'দেখা হবে আজ প্রফেসরের সঙ্গে?'

'হবে।'

'কটা বাজল আপনার ঘড়িতে?'

মোহিতা কব্জি ঘুরিয়ে বলল, 'সাড়ে এগারটা।'

'কটার সময় উঠবেন প্রফেসর?'

'তিনটে নাগাদ। আজ ছুটির দিন তো।'

নিশীথ চায়ের পেয়ালাটা দু-তিনটে চুমুক দিয়ে শূন্য পেয়ালাটা তেপয়ের উপর রেখে দিল।

'আমি গত আট-দশ বছরের ভিতরে কয়েকবার বলেছিলাম প্রফেসরকে' নিশীথ বললে, 'কলকাতার কোনো কলেজে আমার একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে।'

'কী বললেন উনি?'

'প্রত্যেকবার বললেন, আমি দেখছি। জলপাইহাটিতে ফিরে গিয়ে প্রফেসরকে মনে করিয়ে দিয়ে চিঠি লিখেছি, দরখাস্তের কপি পাঠিয়েছি কিন্তু কিছুই তো হল না।'

'কেন?'

নিশীথ হাসতে-হাসতে বললে, 'আমার মুখই তো চেনা হল না। অথচ আমরা একসঙ্গে পড়েছি।'

'একসঙ্গে। কোথায়?' মোহিতা একটু চমকে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে।

'একসঙ্গে পড়েছি বলেই তো কলকাতায় এলেই ঘোষের এখানে একবার আসি। খুব মিশুক নই বটে আমি। বেছে-বেছে মানুষ দেখে মেলামেশা করি যে তা ঠিক নয়। আমার সহপাঠিদের মধ্যে অনেকেই খুব বড়-বড় কাজ করে, তাদের কারো কাছেই যাই না আমি। ঘোষ কলেজ-ইউনিভার্সিটির কাছেই আছেন বলে তাঁর কাছে আমি আসি। ভারী উৎসাহ ছিল ঘোষ সম্পর্কে এক সময় আমার। খুব কম লোককেই এমন শ্রদ্ধা করেছি'—

'একসঙ্গে পড়েছেন অথচ ওঁকে সেটা মনে করিয়ে না দিলে মনে থাকে না? তাই?'

প্রফেসরের ঘরের আবদ্ধ দরজাটার দিকে মোহিতা তাকিয়েছিল, মোহিতার দিকে তাকিয়েছিল নিশীথ। বললে নিশীথ, 'ওর সঙ্গেই স্কটিশ পড়েছিলুম—ফোর্থ ইয়ারে। এক বছর। আগের তিন বছর ঘোষ হয় তো প্রেসিডেন্সিতে পড়েছিলেন। স্কটিশ থেকে বি-এ পাস করে আবার প্রেসিডেন্সিতে চলে যান। এক বছর পড়েছিলুম এক সঙ্গে। সেই জন্যেই হয় তো কেমন বাঁধো-বাঁধো ঠেকছে ঘোষের। তবে স্কটিশে থাকতে বেশ মেলামেশা হয়েছিল আমাদের সঙ্গে। বিনয়েন্দ্র মুখুজ্যে, শুভ্রাংশু বরুন দত্ত, সীতেশ ভটচাশ, সোমেন মহলানবিশ, আমি—খুব মিশেছিলেন তো ঘোষ আমাদের সঙ্গে।'

'এই তো তিনবারের বার দেখা আমার সঙ্গে'—মোহিতা বললে।

'কার?'

'আপনার।'

'সোজাসুজি মোহিতার দিকে না তাকিয়ে, তার মিহি ঘোমটার আড়ালে খোঁপার দিকে তাকাল। তার ভুরুর দিকে, টিকলো নাকের দিকে। সমুদ্রফেনার মত শাড়িটাকে প্রকৃতির সাদা জিনিসের মত দেখাচ্ছিল, মানুষটির অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকম রঙের প্রেতপরায়ণতার পাশে, প্রকৃতিতে এ রঙ নেই। 'হ্যাঁ গতবার ঘোষের ঘরে বসেছিলুম আমরা। অনেক কথা বলেছিলেন আপনি। ঘোষের স্ত্রী যে তা আমি বুঝতে পারি নি, অবাক হয়ে ভাবছিলুম ভারী চমৎকার; জমিয়ে রেখেছে সব-স্নিগ্ধ করে দিচ্ছে; কেমন সুন্দর বাড়ন্ত গড়ন। বিশেষ কোনো কথা বলছিলেন না ঘোষ। চিনতে পারছিলেন না যেন আমাকে। আমতা-আমতা করছিলেন। বুঝেছিলেন সব আপনি, নিজের কলেজি সতীর্থের মুখোমুখি বসে যে-অস্বস্তি বোধ করছিলাম সেটাকে সহজ করে রাখবার জন্য সজ্জলতার ঘের পরিয়ে দিলেন তো সে দিন আপনি। কথা বলে, হেসে, গল্প করে।'

'এর আগেরবার উনিশশ চুয়াল্লিশে, মে মাসে,' নিশীথ বললে, 'ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম, ওঁর ঘরেই বসেছিলুম আমরা তিনজনে। সে দিন বেশি কথা বলেন নি আপনি। খুব চওড়া একটা বই-এর পাশে-পাশে মার্জিনে নোট টুকছিলেন। মাঝে-মাঝে প্রফেসরের কাছে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছিলেন। ভেবেছিলুম প্রফেসরের মেয়ে, কলেজে পড়েন। সকালবেলা বেশ ঝড়বিদ্যুৎ, অনেক ঠাণ্ডাকালের মেঘ ছিল সে দিন। বৃষ্টি বেশি হয় নি।'

মোহিতা বললে, 'একটা কথা আমি ভাবছি নিশীথবাবু।'

নিশীথের মনে হচ্ছিল, বড় বেশি কথা বলে ফেলেছে সে। কী দরকার ছিল এত কথা বলবার? ঘোষের সহপাঠী যে নিশীথ সে কথা ঘোষ জানলেও তাকে তো এতদিনের ভিতরও একবার জানাতে যায় নি নিশীথ। যে-মানুষ মগডালে উঠে গেছে তার লেজটা নিয়ে সামলাতে পারছে না বলেই কি তার লেজে হাত দিতে হবে; লেজে মোচড় দিয়ে তাকে টেনে আনতে হবে নিচের দিকে। ঘোষকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না নিশীথের। কেন বারবার করে স্কটিশে একসঙ্গে পড়েছিল সেই অছিলায় তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্ত্রীকেও চমকিত করে দিতে আসে নিশীথ? এটা মানুষটাকে বেকায়দায় ফেলে দেওয়া।

যারা পাঁয়ে হেঁটে বড় লোকের বাড়িতে গিয়ে ঢুঁ মারে তাদের মত কেমন একটা বেকুব বেআব্রু অন্যায়ের ভিতর ধরা পড়ে গেছে যেন নিশীথ।

'একটা কথা আমি ভাবছি নিশীথবাবু।'

পকেট থেকে ক্যাকটিনা পিলের কৌটা বের করেছিল নিশীথ। মোহিতা এমন ভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে যে ঢাকনি খুলতে ইতস্তত করছিল, পিল এখন খাবে না সে। কৌটাটা তেপয়ের উপর রেখে দিয়ে মোহিতার দিকে তাকাল নিশীথ।

'আপনি কলকাতার কলেজে কাজ চান?'

'চাচ্ছিলাম তো।'

'গভর্নমেন্ট কলেজে?'

'গভর্নমেন্ট কলেজে পাওয়া যাবে না এখন।'

'কেন?'

'বয়স বেশি হয়ে গেছে।'

'কত বয়স?' সাতচল্লিশ? তাতে ঠেকবে না।'

'না, গভর্নমেন্ট কলেজে কাজ নেব না এখন আর।'

'কেন? এখন তো দেশ স্বাধীন। বিদেশী সরকারের গোলামি একে তো বলতে পারেন না আর।'

'বাকি যে-কটা দিন বাঁচি একটু নিজের মনে থাকতে চাই। গভর্নমেন্টের চাকরিতে এখনো মানুষের হাত-পা ঢের বাঁধা। কলকাতার কোনো প্রাইভেট কলেজে হলেও চলবে। কিন্তু সেটাও দুর্ঘট।'

'যদি বলেন গভর্নমেন্ট কলেজে কাজ নেবেন, তা হলে প্রফেসরকে বলে দেখতে পারি।'

'প্রফেসর প্রাইভেট কলেজে পারে না কিছু?'

মোহিতা আঙুল মটকাতে-মটকাতে বললে, 'চেনেন তো অনককে। নৃপেনের জন্যে বলেছিলেন। কিন্তু কেন, গভর্নমেন্ট কলেজে ভাল চাকরি পেলে আপনি নেবেন না?'

'ভাল চাকরি কী রকম মিসেস ঘোষ?'

'সুপিরিয়র গ্রেডে।'

'পাওয়া যাবে কি?'

'প্রফেসর চেষ্টা করলে না-পারার কিছু নেই তো। গভর্নমেন্ট কলেজে চাকরিতে পেনশন আছে, চাকরির নিশ্চয়ত রয়েছে। একবার ঢুকতে পারলে সাংসারিক দিক থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে মানুষ।'

নিশীথ তেপয়ের উপর থেকে ক্যাকটিনা পিলের কৌটাটা তুলে নিয়ে বললে, 'তা তো ঠিকই,' ঢাকনি খুলে একটি পিল খেয়ে নিয়ে নিশীথ বললে, 'কিন্তু আমি তো সেকেন্ড ক্লাস মিসেস ঘোষ।'

'কিন্তু আপনি তো প্রফেসরের ক্লাসফেলো—অনেক অভিজ্ঞতা আপনার। সেকেন্ড ক্লাসেও ঠেকবে না।'

'গভর্নমেন্ট কলেজে চাকরি পাওয়া দুষ্কর।'

'প্রফেসরকে আমি বলবই আপনাকে একটা জুটিয়ে দিতে।'

'প্রফেসরের নিজের কলেজ তো নয়।' নিশীথ হেসে বললে।

'মিনিস্ট্রিতে বিশেষ খাতিরের লোক আছে।'

'প্রফেসরের?'

'প্রফেসরের। অ্যাসেম্বলিতে আছে। উপরে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাকটিনা পিলের কৌটোটা তেপয়ের উপর রেখে দিয়েছিল নিশীথ। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে, 'কিন্তু এটা কি ভাল হবে, মুরুব্বি জুটিয়ে দরবার করে খাতিরের ব্যাপারে পিছু দুয়ার দিয়ে কলেজের সুপিরিয়র গ্রেডে ঢোকা? আর, কী ভাববে তারা, যাদের সঙ্গে কাজ করব আমি? কী মনে করবে প্রিন্সিপ্যাল–কী বলাবলি করবে ছেলেরা?'

মোহিতার চোখে কাচের আবরণের মতই যেন প্রতীয়মান হল ঘরের দেওয়ালগুলোই শুধু নয়, নিশীথ যে বাধা-বিপত্তিগুলোর কথা তুলেছে সেই সবও। সব ভেদ করে মর্মদৃষ্টি তার অনেকদূর চলে গেছে।

'জলপাইহাটির মনের জড়িবড়ি এ সব ভুলে যাবেন নিশীথবাবু।'

'এটা কি জলপাইহাটির মনোভাব?'

'পঁচিশ বছর দেশগাঁয়ের শান্তিতে কাজ করে এসেছেন, আপনি বুঝতে পারছেন না কলকাতা দিল্লীর রকমটা। কলকাতায় যদি কাজ করতে চান তা হলে সোজা নাকবরাবর মুখিয়ে চলতে হবে। যা পাওয়া দরকার-টাকাকড়ির কথা বলছি–সেটা পেতেই হবে। দরকার হলেও দশজনের হাত থেকে ছিনিয়ে। নিজেকে রক্ষা করে পরিবারকে রক্ষা করতে হবে। অন্য পাঁচজনের কথা তো পড়েই রইল। নিজের স্ত্রী-সন্তানের চেয়ে নিজেকে বাঁচাতে হবে আগে। এ না হলে কোথায় তলিয়ে যাবেন আপনি নিশীথবাবু।'

নিশীথ বিস্মিত হয়ে মোহিতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ কি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অর্জুনের জড় মারবার–'

দরজা খুলে এ ঘরে ঢুকে দাঁড়ালেন প্রফেসর। মোহিতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি এখানে বসে আছ মোহিতা, আমি ভাবছিলুম কোথায় গেলে, বড্ড ব্যস্ত আছি।'

'লিখছ?'

'না, লেখায় এখনো হাত দিতে পারি নি।'

'এখনো রেফারেন্স ঘাঁটছ বুঝি?'

'হ্যাঁ, সারাদিনই আজ এই সব চলবে আর-কি।'

'চা?'

'হ্যাঁ চা। তাই ভাবছিলুম, মোহিতা কী করছে? মোটে তো দু'কাপ চাপ খেয়েছি, আরো দু-চার কাপ দাও, ছুটির দিন, তিনটের আগে দরবার ভাঙবে না।'

'কারা আছেন ভিতরে?'

'আছেন, খুব শাঁশাল লোক আছেন। কৈকেয়ী আছেন, কিন্তু নন্দীগ্রামের ভরতও আছেন বাবা, শায়েস্তা করতে তাকে। রামচন্দ্রের চটিজোড়াও আছেন।'

প্রফেসর একবার আড় চোখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'কী যে এক রামধনু গান বার করেছে,' স্ত্রীর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে একটু পিছিয়ে গেলেন প্রফেসর ঘোষ।

'এই যে নিশীথবাবু এসেছিলেন তোমার কাছে,' মোহিতা বললে।

'কে, নিশীথবাবু', নিশীথের দিকে মুখোমুখি না তাকিয়ে ঘোষ সাহেব বললেন।

'এঁকে চেনো না তুমি, নিশীথ সেন এর নাম, মাঝে-মাঝে আসেন তোমার কাছে। ইনি জলপাইহাটি কলেজের প্রফেসর।'

'ও–'

'বসো, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

'না, আমার বসবার সময় নেই। এখুনি যেতে হবে। তা কী আপনার? আমার কাছে কেন?' নিশীথের দিকে না-ফিরলে না-তাকালেও চলে, স্ত্রীর দিকে ফিরেই বললেন ঘোষ।

মোহিতা বললেন, 'তোমার আগে বসতে হবে, বলতে হবে এঁকে তুমি চেনো কি না।'

'এঁকে আমি দেখি নি তো কোথাও,' ঘোষ একটা সোফার এক কিনারে বসলেন, 'কী নাম আপনার?'

'নিশীথ সেন।'

'নিশীথ সেন?'

'এই নামে কেউ কোনো দিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে?'

'আমার তো মনে পড়ছে না,' ঘোষ মোহিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় কপালে-মুখে দু-চারটে খিচ জাগিয়ে তুলে বললেন।

মোহিতা স্কটিশ চার্চ কলেজের কথা পাড়তে গেল না আর। বিনয়েন্দ্র মুখুজ্জে, শুভ্রাংশু, সীতেশ ভট্টাচার্যের কথা বলতে গেল না। এদের কথা যদি মনে না থাকে ঘোষের, নিশীথকে সে যদি কোনোদিন দেখে না থাকে তা হলে, একচোখা হরিণের লাটের দিকে দাঁড়িয়েছিল পৃথিবীর এ সব জিনিস; দেখে নি এ সব ঘোষ।

মোহিতা বললে, নিশীথবাবু কলকাতায় আসতে চাচ্ছেন। কোনো একটা গভর্নমেন্ট কলেজে এঁকে ঢুকিয়ে দিতে হবে।'

'কাকে বলছ তুমি মোহিতা?'

'তোমাকে'।

'কাউকে কোনো কলেজে ঢুকিয়ে দেবার আমি কে?'

'এটা তোমার অতিরিক্ত বিনয়।'

'আমার নিজের কোনো কলেজ আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সে কথার উত্তর না দিয়ে মোহিতা বললে, 'এঁর জন্য কারুর কাছে তোমার খোশামোদ করতে হবে না। নিশীথবাবু কৃতী মানুষ।'

নিশীথ বললে, 'আমি সেকেন্ড ক্লাস এম-এ–'

প্রফেসর উঠবার উপক্রম করে বললেন, 'কলেজে কাজ করতে গেলে তো

আমাদের ইউনিভার্সিটির ফার্স্টক্লাস ডিগ্রি থাকা চাই-ই, তা ছাড়া–'

মোহিতা বাধা দিয়ে প্রফেসরের কথা কেটে ফেলবার চেষ্টা করে বললে, 'কোন ক্লাস পেয়েছে তা দিয়ে টিচারের গুণ যাচাই করবার মত মনের ঢিলেমি তোমার নিশ্চয়ই নেই।'

বাধা দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'আছে।'

'আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

মোহিতা বিক্ষুব্ধ হয়ে বললে, 'নিশীথবাবুর পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে কলেজের কাজ করবার–'

প্রফেসর মোহিতার কথা শেষ না-করতে দিয়েই বললেন, 'বেশ ভাল জিনিস, কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস পেলে আরো ভাল হত।'

'এ কেমন কথা হল? এ কথা আমাদের কোন দিকে নিয়ে যায়?'

'ফার্স্টক্লাস ডিগ্রি থাকলেই ঠিক হত,' প্রফেসর বললেন, 'শুধু পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের বিশেষ কোনো দিকে নিয়ে যায় না।'

'কী মূল্য আছে এ সব ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাসের?' মোহিতা যেন সিংহের উপর লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'যেন মহিষাসুর এ সব ইউনিভার্সিটির ফাস্টক্লাস ডিগ্রিগুলো।'

প্রফেসর হেসে বললেন, 'নেই? সেকেন্ড ক্লাসের বুঝি বেশি জেল্লা?'

'মূল্যের কোনো যাচাই হয় না আমাদের দেশে।'

প্রফেসর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার ভিতরে কাজ আছে।'

'নিশীথবাবুকে তো তুমি কোনো কথা দিলে না।'

নিশীথবাবু আর-একটা এম-এ দিন। ইংরেজির টিচার, হ্যাঁ, তবে ইংরেজিতেই দিন। একটা ফার্স্টক্লাস জোগাড় করুন, ফার্স্ট না হলেও হবে।'

প্রফেসর কারুর দিকে না-তাকিয়ে নিজেরই জ্ঞান-শালীনতার হিম্মতে তৈরি বাড়ির চিবিত্র গালচেগুলোর দিকে, মেঝের ভিত্তিরেখাগুলোর স্বর্গীয় জ্যামিতির দিকে, তাকাতে-তাকাতে বললেন।

মোহিতা আগে একটু উত্তেজিত হয়েছিল, এইবারে ঠাণ্ডা স্থিরতায় ফিরে এসেছে; আস্তে-আস্তে বললে, 'উনি কৌটো খুলে ক্যাকটিনা পিল খাচ্ছেন, আমি দেখলুম। হার্টে অসুখ নিশীথবাবুর। এই বয়েসে এই শরীর নিয়ে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্টক্লাস পেলে তবে তোমরা ওঁর সম্বন্ধে চিন্তা করবার সুযোগ পাবে? তোমরা এক-একটা বড়-বড় প্রতিষ্ঠান অধিকার করে আছ বলেই এত অবাস্তব হয়ে পড়েছ?'

প্রফেসর মোহিতার কথা শুনছেন বলে মনে হল না।

আজকাল ইংরেজির দাম কমে যাচ্ছে,' প্রফেসর বললেন, 'কয়েক বছরের মধ্যেই ইংরেজির বিশেষ কোনো দরকার থাকবে না। বাংলা তো রাষ্ট্রভাষা হল পশ্চিমবাংলায়, নিশীথবাবু যদি সাহিত্যের টিচার থাকতে চান তা হলে বাংলায় এম-এ দিয়ে ফার্স্টক্লাস পেলে সুবিধে হবে তাঁর।'

নিশীথ খুব একটা তামাসা বোধ করে বলে, 'আমার নিজের জন্য আপনার কাছে আসি নি প্রফেসর ঘোষ। এসেছিলুম আর-একজনের জন্য। আমাদের কলেজের নয়ন দত্ত ইংরেজিতে ফার্স্টক্লাস! কলকাতার কোনো কলেজে কাজ চাচ্ছে সে; আপনি তাকে ঢুকিয়ে দিলে বড্ড উপকার হয়।'

প্রফেসর মোহিতার দিকে তাকালেন; মোহিতার মুখে থমথমে প্যাঁচ কষার বা লেগ পুলিঙের কোনো আভাস দেখতে পেলেন না; নিশীথের দিকে তাকাতে গেলেন না তিনি। একটু তাল কেটে গেছে যেন; প্রফেসর একটা হাই তুলে বললেন, 'ফার্স্টক্লাস, কী পজিশন'?

'সেকেন্ড।'

'ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হলেই তো ভাল হত নয়ন দত্তের,' মোহিতা একটু সুড়সুড়ি দিয়ে যেন বললে।

'ওদের বারে যে ফার্স্ট হয়েছিল সে সুসাইড করেছে,' নিশীথ আক্ষেপ করে।

'কেন, সে ট্রাভেলিং ফেলোশিপ পায় নি বলে?' কে যেন বললে।

'না ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল সেই উত্তেজনায়।'

মোহিতা বললে, 'যে ফার্স্ট হয়েছিল সে এখন নেই আর। নয়ন দত্ত তা হলে সত্যিই ফার্স্ট এখন। ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট নয়ন দত্ত। ওকে চোখ বুজে চাকরি দিতে পার তুমি। নিশীথবাবুকে কথা দাও তা হলে।'

প্রফেসর মাথা নেড়ে বললেন, 'না, নয়ন দত্তকে ফার্স্ট বলতে পারা যায় না, যে ফার্স্ট, সে মরে গেলেও সেই তো ফার্স্ট হয়েছিল। নয়ন দত্ত সেকেন্ড। নয়ন দত্ত যদি ফার্স্ট হতে চায়, তা-হলে আবার এম-এ দেবার দরকার তাঁর।'

মোহিতা নিঃসহায়ভাবে হাসতে-হাসতে বললে 'মানুষ এই করবে বসে–বসে? কেবল এম-এই দেবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রফেসর কারুর কথা কানে না তুলে কিছুই গায়ে না মেখে, কারুর দিকে না তাকিয়ে, চোখ দুটো সিলিঙের দিকে তুলে গম্ভীরভাবে, আস্তে-আস্তে বললেন, 'নয়ন দত্ত ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস। কিন্তু ইংরেজির গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। কয়েক বছরের মধ্যে ইংরেজির আর-কোনো টিচারের দরকার হবে না কলেজে। কলেজে কাজ করতে হলে নয়ন দত্ত ইকনমিক্সে কিংবা বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে নিক।'

'তা হবে নয়ন দত্তর,' মোহিতা বললে, 'কিন্তু ইংরেজি নাকচ হতে এখনো দেরি আছে, নয়ন দত্তকে কলকাতার কলেজে একটা ভাল কাজ দাও তুমি।'

'নয়ন দত্ত ক বছর কাজ করেছে নিশীথবাবুদের কলেজে?'

'একুশ বছর।'

'এতদিন পড়েছিল কেন ও-রকম একটা কলেজে?'

'মফস্বলে শান্তি সুস্থিরতা আছে। ভাল মনে হয়েছিল সেটা।'

'কলকাতায় আসতে চাচ্ছে কেন?'

'মফস্বলে উন্নতি হচ্ছে না। জীবন বড্ড খোড় বড়ি খাড়া হয়ে পড়েছে। কলকাতায় নানা রকম সম্ভাবনা আছে। বড়-বড় লাইব্রেরি, স্টাডি সার্কেল, সভা-সমিতি আছে—জীবনটাকে জ্ঞান, সংকল্প, সামাজিকতার দিক দিয়ে—'

'বাধা দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'ভাইস চ্যান্সেলারকে গিয়ে ধরুক।'

'কে?'

'নয়ন দত্ত।'

'কিসের জন্য?'

'কলকাতার কোনো কলেজে কাজ ঠিক করে নেবার জন্য। আমি তো ভাইস চ্যান্সেলার নই।'

'বেশ তো নয়ন দত্ত, যাবে নয়ন দত্ত ভাইস চ্যান্সেল্যারের কাছে, তুমি নিশীথ-বাবুর জন্যে একটা কিছু ঠিক করে দাও।'

'নিশীথবাবু তো সেকেন্ড ক্লাস এম-এ।'

'কত সেকেন্ড ক্লাস এম-এ প্রফেসরি করছে, থার্ড ক্লাস এম-এদের ভিতর প্রিন্সিপ্যাল আছে।' মোহিতা বললে।

'নিশীথবাবু তো সেকেন্ড ক্লাস এ-ম,' বললেন প্রফেসর।

এর চেয়ে বেশি কিছু বলার মিছে পুনরুক্তির ভিতর গেলেন না তিনি। তারপর প্রফেসর উঠে দাঁড়ালেন।

'কিন্তু নৃপেনও তো সেকেন্ড ক্লাস ছিল, তাকে তুমি কী করে ঢোকালে কলেজে?'

'আমি ঢুকিয়েছি? নৃপেনকে তো মিসেস কেসি কাজ ঠিক করে দিয়েছিলেন গভর্নমেন্ট কলেজে। নৃপেন মিসেস কেসিকে তো সেকালের পট ও অবন ঠাকুর আর তার স্কুল বাদ দিয়ে আধুনিক বাংলা ছবির পটল-চেরা পীঠস্থানে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ফলে তিনি ঢুকিয়ে দিলেন বড় কলেজে নৃপেনকে।'

'সে কলেজের কাজ যখন গেল নৃপেনের, তখন তো মিসেস চলে গেছেন ভারতবর্ষ থেকে। নৃপেনকে আর-একটা গভর্নমেন্ট কলেজে ঢুকিয়েছিল কে?'

প্রফেসর একটা ঢেকুর তুলে বললেন, 'সেটা নিজের চেষ্টা-তদ্বিরে জোগাড় করে নিয়েছে নৃপেন।'

'নিজের তদ্বিরের জোরেই ঢোকে সকলে,' মোহিতা বিমুগ্ধ হয়ে বললে, 'যদি ঘোষ সাহেবের সঙ্গে চুক্তি করা থাকে। কী, হবে নাকি চুক্তি আমাদের সঙ্গে?'

'কিসের চুক্তি?'

'নৃপেনের সঙ্গে যা হয়েছিল'—

প্রফেসর স্পষ্ট শান্ত মেজাজে বললেন, 'ভাইস চ্যান্সেলারের সঙ্গে দেখা করুক নয়ন দত্ত।'

'আর নিশীথবাবু?'

'নিশীথবাবু তো সেকেন্ড ক্লাস এম-এ।'

'তুমিও তো সেকেন্ড ক্লাস এম-এ', মরীয়া হয়ে বললেন মোহিতা।

'নিশীথবাবু তো সেকেন্ড ক্লাস এম-এ,' প্রফেসর একটু কাঁধ নাচিয়ে হেসে নিজের ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন।

'উনি কি সেকেন্ড ক্লাস? প্রফেসর ঘোষ সেকেন্ড ক্লাস? জড়বুদ্ধির মত নিশীথ মোহিতাকে জিজ্ঞেস করল।

'আপনারা তো একসঙ্গে পড়েছিলেন; জানেন না?'

'উনি আমাদের সঙ্গে এম এ পরীক্ষা দেন নি। সেবার কী অসুবিধা হয়েছিল। তৈরি করে উঠতে পারেন নি। আমাদের পরের বার, নাকি তার পরের বার দিয়েছিলেন। আমি তখন কলকাতা ছেড়ে চলে গেছি। তার পর থেকে ইউনিভার্সিটির কোনো খোঁজখবর রাখি নি আমি। সেকেন্ড ক্লাস। আচ্ছা উঠি মোহিতা দেবী, দুপুর হয়ে গেছে। বেঁচে থাকলে আবার আসব। যারা নিচে পড়ে আছে, ঠিক সময় ঠিক কাজ করতে পারে নি, দেরি করে ফেলেছে, সময়ের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে নি, তারা কুড়ি-পঁচিশ বচর পরে আজ একটা অদ্ভুত পৃথিবীতে পাক খাচ্ছে।'

'সে পৃথিবীটাকে কি ভাল করতে হবে?'

নিশীথ একটু চমকিত হয়ে মিসেস ঘোষের দিকে তাকাল। এ রকম কথা উনি জিজ্ঞেস করছেন মনের বিলাসিতায় নয়, স্বাভাবিকতায়। মোহিতা দেবীর চোখ, মুখ, গলার আওয়াজ অনুভব করছিল নিশীথ। মোহিতাকে ঘোষ হয় তো বলবেন প্যাথলজির কেস। কিন্তু তা নয়। তা নয়। প্যাথলজির কেস ঘোষ নিজেই হয় তো। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মল রাষ্ট্রসমাজের দিকে চোখ রেখে শুদ্ধ মন নিয়ে কোথায় সে বিজ্ঞানী, ঘোষ সাহেবেদের যে পরীক্ষা করে দেখবে। দেখলে হত। ঘোষ ঘোষই থেকে যাবে হয় তো, শিক্ষা-দীক্ষা কলেজ-ইউনিভার্সিটির শীর্ষে বসে থেকে। কিন্তু শীর্ষে বসে থাকবার জোর কমে যাবে ভবিষ্যৎ ঘোষদের। জোর বেড়ে যাবে ভবিষ্যৎ নিশীথ সেনদের। ক্রমে-ক্রমে রাষ্ট্রের গ্লানি কেটে যেতে থাকবে উত্তরোত্তর এই পরিচ্ছন্নতার পথে চলে; সত্যিই প্রাণ ঘন হয়ে উঠবে জীবন।

'পৃথিবীটাকে ভাল করা কঠিন। সময় সাপেক্ষ। পাঁচ, সাত, এক হাজার বছর তো লাগবেই। তারপর কী হবে বলতে পারা যায় না। আমার ছেলে হারীত তো বিপ্লবের চেষ্টা করছে।'

'কত বড় ছেলে আপনার?'

'উনত্রিশ-ত্রিশ হবে।'

'কী কাজ করছে?'

'আন্ডারগ্রাউন্ড কাজ।'

'ও কোনো চাকরি করছে না?'

'না।'

'আন্ডারগ্রাউন্ড আপনার বাড়িতে বসে?'

'না, আমার সঙ্গে থাকে না।'

'কোথায় আছে?'

'কলকাতায়ই। জানি না। আমার সঙ্গে দেখা করে না।'

'কেন করবে? রক্ত বিপ্লব করছে। নিজেই মারা পড়বে রক্তে রক্তাক্ত হয়ে?'—মোহিতা গলা নামিয়ে নিয়ে বললে, 'ও-সব বারীন ঘোষ কানাইলালের দিন নেই তো আজকাল, দেশ স্বাধীন হয়েছে। বিপ্লবের দরকার নিশীথবাবু। দেখছেন তো ভাবগতিক সব চারদিকে। দরকার বিপ্লবের, বেশ বড় রকমের। কিন্তু মহাত্মাজির মত অহিংস বিপ্লব করুক হারীত।'

'কোথায় পাচ্ছি হারীতকে মোহিতা দেবী?'

'দেখাই দেয় না?'

'না।'

'দেখা হলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন তো?'

'নিশ্চয়। নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব,' নিশীথ বললে।

'পৃথিবীর ভাল হবে না নিশীথবাবু?'

'ঘোষ কী বলেন?'

'উনি বড় ব্যস্ত আছেন ক্যাবিনেটে কাজ পাবার জন্যে।'

'কোন ক্যাবিনেটে?'

'কোনো একটায়—'

নিশীথের পাঞ্জাবির গলা খোলা ছিল এতক্ষণ। গলার বোতাম আঁটতে-আঁটতে বললে, 'আমার মনে হয় মানবসমষ্টির মঙ্গল হবে, এ রকম একটা ধারণা নিয়ে ব্যক্তির দুঃখ কষ্ট দুর্দশা চলবে আরো অনেকদিন নানা রকম, তেজি মন্দি গভর্নমেন্টের মারফৎ, বিপ্লবের রক্ত বিপ্লবের মারফৎ। মানবের ভাল মুখে-মুখে চাইবে হয় তো অনেকে। মনে চাইবে না মুখেও চাইবে না কেউ-কেউ। ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যেতে থাকবে অনেক দিন।'

'নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না ব্যক্তি?'

'অসম্ভব অসম্ভব।'

'কেন?'

'কী সে চায় তা জানে না' অব্যবস্থিত মন; তার প্রতিনিধি হয়ে কেউ দাঁড়ায় না; অন্যদের প্রতিনিধিকে ভোট দিয়ে আসতে হয়। এ তো গেল স্থিতিভিত্তির সময়ে। রক্ত বিপ্লবের সময়ে ব্যক্তিও বিপ্লব করে; আগুন দেখে মাছি যেমন করে। দিনরাত ব্যক্তি নিপাত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের শেষদিন পর্যন্ত যদি একরম হয় তবে আশ্চর্য হব না।'

মোহিতা দ্বিধা প্রকাশ করে বললে, 'আপনি যা বলেছেন সেটা হয় তো সত্য, হয় তো তা নয়। কিন্তু সত্য হলেও সেটাকে এ রকম কালি মাড়িয়ে দেখানো কি উচিত?'

'আপনার কাছে জিনিসটা অন্ধকারবাদ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তবুও চোখের সামনে অনবরত তো ব্যক্তি নষ্ট হচ্ছে; শেষ হয়ে যাচ্ছে। দেখে শোক করবার মত লোক কই। সেও তো রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে।'

'আমি আছি আর ঘোষ আছে; রক্তাক্ত হই নি এখনো,' মোহিতা হাসতে গিয়ে ভিতর থেকে আটকে রাখতে-রাখতে বললে, 'ব্যক্তি মানে কি ব্যক্তিসাধারণ?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো পার্টিতে নেই তারা?'

'কোন পার্টিতে, নেই, থাকতে নেই।'

'এ রকম ব্যক্তি হিসেবেই তো দাঁড়িয়ে আছেন আপনি?'

'হ্যাঁ,' নিশীথ বললে, 'আমাদের সংখ্যা পৃথিবীতে শতকরা পঁচানব্বই জন।'

'এ রকম ভাবে নিজেকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেবেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শতকরা পাঁচ জন তো বাঁচছে,' নিশীথ বললে, 'বেঁচে থাকবার চেষ্টা করব খুব। আমার এ চেষ্টা ব্যক্তিসাধারণেরই চেষ্টা সেটা অনুভব করি। বেঁচে থাকলে কাজ করবার সুযোগ পাওয়া যাবে, হারীতের মত নয়, অন্য ভাবে, দরকার হলে দৃঢ়ভাবে, কিন্তু রক্তারক্তি করে নয়; গান্ধীজির মত মনের মূল নির্মলতা ও নিরন্তর সৎ প্রেরণার দিকে বেশি ঝোঁক না দিয়ে। ও জিনিস অনেকেরই নেই, কোনো দিন হবে না। কিন্তু তবুও,' নিশীথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'ভাল জিনিস হতে পারে পৃথিবীতে।'

মোহিতা বলছিল না কিছু, নিশীথ আরো কিছু বলবে ভেবে প্রতীক্ষা করছিল।

'কিন্তু সময় লাগবে, আমরা বেঁচে থাকতে কিছু দেখে যেতে পারব না।'

'আপনি তো বলছেন এক হাজার বছরও লেগে যেতে পারে মানুষের ভাল হতে-'

'এক হাজার-দু হাজার-মিশরের ফ্যারাওদের সময় যে-লোকগুলো কষ্ট পাচ্ছিল তারা আজকের উনিশশ আটচল্লিশের পৃথিবীটাকে দেখবার সুযোগ পেলে ভাবত না কি! হাজার-হাজার বছর পরেও এ রকম। কী হবে তবে মানুষের, কবে হবে?'

'কবে হবে তা হলে?'

বলবার ইচ্ছে ছিল, কথা বলবার ইচ্ছে ছিল আরো ঢের, কিন্তু নিশীথকে উঠে দাঁড়াতে দেখে অগত্যা উঠে দাঁড়িয়ে মোহিতা বলল, 'হবে-হবে, আজই হবে এই কথাই ভাবে মানুষ, এই কথা ভেবেই জোর পেয়ে কাজ করে।'

প্রফেসর ঘোষের বাড়ির থেকে নিশীথ যখন বেরিয়েছে তখন প্রায় একটা বাজে। কলকাতায় অনেকগুলো ভাল-ভাল বড়-বড় কলেজ। ইচ্ছে করলে ঘোষ তাকে কোনো একটা ভাল কলেজে ঢুকিয়ে দিতে পারত, খুব বেশি বেগ পেতে হত না ঘোষের। পুরনো সহপাঠী হিসেবে নয়, কোনো বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আশা করে নয়, এমনিই নিশীথের নিজের কলেজি অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্বের গুণে প্রফেসর অভয়েন্দ্র মোহন ঘোষের দক্ষিণমুখ নিশীথের দিকে ফেরানো হোক এটা আশা করেছিল নিশীথ।

খুব বড় ফার্স্ট ক্লাস বা বিলেতি ডিগ্রি না থাকলে শুধু পড়াবার গুণপনায় কলকাতার কোনো কলেজে ভাল কাজে ঢোকা কঠিন-অসম্ভব-প্রফেসর ঘোষের মতন মুরুব্বি ছাড়া। কিন্তু প্রফেসর কিছু করবেন না। আর কোনা দিকপাল সহপাঠী নেই নিশীথের কলেজ ইউনিভার্সিটি লাইনে। মামা নেই, শ্বশুর নেই-কোনো মুরুব্বি নেই এ দিকে; কলেজে ঢোকা কঠিন, অসম্ভব। ভবানীপুরের দিকে একটা বাস যাচ্ছিল, চড়ে কুলদাপ্রসাদের বাড়ির কাছে গিয়ে নামল নিশীথ। ঢুকে গেল বাড়ির ভিতরে; কুলদাকে ডেকে পাঠাল।

'কে তুমি, নিশীথ নাকি? কলকাতায় এলে কবে?' একটা আধময়লা সোফায় আঁট হয়ে বসে কুলদা বললে।'

'এই তো কয়েক দিন।'

'কোথায় আছ আজকাল? কোন কলেজে?'

'মফস্বলের কলেজের কাজ ছেড়ে দিয়েছি। কলকাতার কোনো একটা কলেজে কাজ পেলে ভাল হয় কুলদা।'

কুলদাপ্রসাদ নিশীথের সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে নি কোনোদিন, কুলদার সঙ্গে নিশীথের আলাপ অনেকদিন-অন্য সূত্রে। নিশীথের চেয়ে দু'বছরের ছোট কুলদা। কলকাতার একটা বড় কলেজে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সে। কলেজের কলকাঠি সব কুলদার হাতে। প্রিন্সিপ্যাল হবার সম্ভাবনা আছে কুলদার, গভর্নিংবডির খুব ঘোড়েল মেম্বার সে।

কুলদা হতচকিত হয়ে বললে, 'কেন কলকাতায় আসতে হচ্ছে কেন, বেশ তো ভাল ছিলে মফস্বলে।'

'যাবে তুমি মফস্বলে কুলদা?'

'কেন, আমার যাবার কী?'

'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কুলদা? বেলা করে তোমার বাড়িতে এসেছি, দেড়টা বাজে।'

'এই তো খেলুম, ছুটির দিন আজ, দেরি হয়ে গেল।

নিশীথ খেয়েদেয়ে এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেল কুলদা। কলকাতার এ সব লোক কতকগুলো বিশেষ জিনিস এই রকমই ভুলে যায়-জানে নিশীথ। 'অথচ, ঠিক টাইম মত খাওয়া না হলে চলে না আমার।'

নিশীথ বললে, কুলদার অনাতিথেয়তাকে বেশ সেয়ানার মত তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে, 'সাড়ে দশটার সময় বেরিয়েছি, বাড়ি থেকে, ডাল, ভাত, মাছের ঝোল, মাংসের চচ্চড়ি, আবার আমসত্ত্বের টক-আর ছ্যাঁচড়া খেয়ে। ভাল খাওয়া-দাওয়া চাই, চব্বিশ-পঁচিশ বছর তো প্রফেসরি করলুম-'

কুলদা একটা ওজন করে নিশীথের দিকে তাকাল, আগাপাশতলা তাকিয়ে দেখল, লোকটা কিছু জমিয়েছে বটে মফস্বল কলেজে ভিটকেলেমি করে টিকে থেকে। মফস্বলে টাকা জমাবার সুবিধে ঢের, ভাবছিল কুলদা; কলকাতায় কত খরচ। মোটে সাতচল্লিশ হাজার টাকা আছে কুলদার ব্যাঙ্কে। তিনটে লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি আছে পঁচিশ হাজার টাকার। প্রভিডেন্ড ফান্ডে আছে বটে কিছু টাকা। সব টাকাই তো কলেজের মাইনে থেকে নেওয়া নয়-আরো কত রকম ধড়িবাজি করতে হয়েছে তাকে।

'সাড়ে দশটার সময় বেরিয়েছে বদ্রিনাথের খ্যাঁট মেরে,' বললে কুলদা,' ঐ ইজি-চেয়ারটায় উঠে বসো, দুদিন ধরে ডি-ডি-টি দিয়ে ছারপোকা মেরে চেয়ারটা ঠিক করেছি। কোথায় আছো কলকাতায়?'

ইজিচেয়ারে বসে নিশীথ বললে, 'আছি বৌবাজারে ফিয়ার্স লেনে।'

'ফিয়ার্স লেনে? জায়গাটা বেছে নিয়েছ বটে।'

'এখন তো দাঙ্গা নেই।'

'কী রকম হালচাল এখন ফিয়ার্স লেনে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখন আর-কী' সব সাপ কেঁচো হয়েছে।'

'আর যারা কেঁচো ছিল?'

'খুরকিনা মাছ হয়ে গেছে?'

'হয়েছেই তো। দেশ স্বাধীন হয়েছে।'

'স্বাধীন বলে স্বাধীন,' নিশীথ পায়ের উপর পা চড়িয়ে দিয়ে বললে, 'বৌবাজারের বাজারে যা কিনি তাই ঝাল, যা রাঁধে তাই খ্যাঁট। এমন খ্যাঁটনদার করে দিয়েছে আমাকে আমার বাবুর্চিরা।'

কুলদা একটা সিগারেট মুখে দিয়ে বললে, 'এই তো ভাল, মফস্বলে কাজ করে গরমের ছুটিতে কলকাতায় এসে ফুর্তি করা। কেন বার মাস কলকাতায় এসে পচে মরতে চাইছ?' মুখের সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল কুলদা।

নিশীথের দিকে টিনটা এগিয়ে দিয়ে কুলদা বললে, 'কী রকম বাঁধলে-টাঁধলে মফস্বলে কাজ করে?'

'পঁচিশ হাজার।'

'বাঃ, বাঃ, মওকা! বেশ ফেঁদেছ বেটাচ্ছেলে। কোথায় রেখেছ টাকা, পাকিস্তান ব্যাঙ্কে?'

'না, কলকাতায়। লয়েডসে।'

'লয়েডসে!' কুলদা একটা মিহি ছুঁচ ফুঁড়ে নিশীথের দিকে তাকায়, 'কেন, বিলিতি ব্যাঙ্কে রাখতে গেলে কেন? কী ইন্টারেস্ট দেয় ওরা? সুদের জন্যেই আমাদের এত বড়-বড় দিশি ব্যাঙ্ক রয়েছে সব।' কুলদা সিগারেটে চোঁ-চোঁ টান মেরে ধোঁয়ার হুড়োহুড়ির থেকে নিজের চোখ দুটোকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে-করতে বললে।

'লয়েডসে রেখেছি তার একটা কারণ আছে। ওতে টাকাটা জমা থাকবে, টাকায় হাত পড়বে না সহজে।'

'কেন?'

'ও-সব ব্যাঙ্কে ঢুকে টাকা তুলবার মত মনের জোর আমার নেই। ঢুকতেই ভয় করে। কী যেন কী মনে ভাবে, ব্যাঙ্ক লুট করতে এসেছি নাকি। থমথমে ভাব। আমি আট-দশ বছর আগের কথা বলছি। এর ভেতরে আর ঢুকিনি লয়েডসে। খুব বেশি মরীয়া না হলে ও-সব ব্যাঙ্কে ঢুকে টাকা তুলবার কোনো তাগিদ থাকে না। টাকাটা বাঁচে,' নিশীথ নিজের হাতের সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল,' এই রকম করে পঁচিশ হাজার টাকা জমিয়েছি। না হলে পঁচিশ টাকাও আমার থাকত না। বড্ড খরচের হাত আমার। পথে দাঁড়াতে হত আমাকে।'

কুলদা বললে, 'ক-বছর চাকরি হল তোমার কলেজে?'

'চব্বিশ-পঁচিশ বছর।'

'কী-ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয়েছ নাকি?'

'এইবারে হব।'

'কত মাইনে ওখানে ভাইস প্রিন্সিপ্যালের?'

'তিনশ, ডি-এ পঞ্চাশ।'

'বেশ তো, খুব ভাল তো, বেশ ঢালাও হাত তো তোমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষের?' কুলদা আড় চোখে তাকিয়ে বললে। কেমন যেন একটু মফস্বলিদের শ্রীসচ্ছলতায় কাতর বোধ করে। সিগারেট টানতে লাগল।

'এইবারে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হবে?'

'হ্যাঁ।'

'তার পরে প্রিন্সিপ্যাল?'

'সেটা বলতে পারি না।'

'কেন বলতে পারবে না নিশীথ? ভাইস হতে পারলে আপসে হয়ে যাবে; কে ঠেকাবে তোমাকে? কত মাইনে প্রিন্সিপ্যালের?'

'পাঁচশ টাকা—'

'ডি-এ?'

'পঞ্চাশ—'

'থাকো, মফস্বল কলেজে থাকো; কলকাতায় এসে কোনো লাভ নেই। আমি তো ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয়েছি, মোটে চারশ পঁচাত্তর টাকা মাইনে আর একশ টাকা আন্দাজ অ্যালাউন্স আছে কলেজ পেটান দু-চারটে বকলম সেঁটে দিই বলে। ওতে কি আর চলে কলকাতার মত শহরে'—

'চালাচ্ছ তো বেশ তুমি, বাড়ি তো করেছ ভবানীপুরে।'

'এটা ভাড়াটে বাড়ি, আমার নিজের বাড়ি টালিগঞ্জে।'

'বাড়ি তো করেছ।'

'তা এতদিন কলকাতায় আছি, বাড়ি এমনিই হয়ে যায়, চারশ পঁচাত্তর টাকা করে কাঠা কিনেছিলুম টালিগঞ্জে উনিশশ বত্রিশে, সে কাঠা এখন চার হাজার সাতশ বিরানব্বই টাকায় বিকোচ্ছে। বার হাজার টাকা লেগেছিল আমার বাড়ি করতে।'

'কেন, নিজের বাড়ি ছেড়ে এ বাড়িতে আছ?'

'আছি, কলকাতায় থাকতে হচ্ছে বলে।'

'তার মানে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বদমায়েসি না করে কলকাতায় টিকে থাকা যায় না'–

'এ বাড়িতে বদমায়েসি করার সুবিধে কুলদাপ্রসাদ?'

'লোচ্চামি? না, আমি সে কথা বলছি না, সে আলাদা; সে হবে এখন পরে; এই যে ললিতা'–

'কী বলছ কুলদা?'

'একজন ফর্শা, লম্বা, ভারী নিখুঁত শরীরিনী ঘরে ঢুকে কুলদাকে ঘেঁষে দাঁড়াল; দাঁড়িয়েই কুলদার মাথার চুলের ভিতর হাত চলে গেল ললিতার; পাকা চুল বাছবার চেষ্টা হয় তো; নাকি বিলি কাটা হচ্ছে? নিশীথের দিকে তাকিয়ে দেখছিল ললিতা, মেয়েটি সপ্রতিভ তো নিশ্চয়ই-বেশ সহজও বটে।

কুলদাও কম স্বাভাবিক নয়, 'আমাদের দু'জনকে দুটো পান এনে দাও তো ললিতা।'

'ইনি কে?' নিশীথের দিকে তাকিয়ে লতিতা বললে।

'আমিও ভাইস, ইনিও ভাইস।'

'ভাইস? কোন কলেজের?'

'মফস্বলের।'

'মফস্বলের? কোথায়, কেষ্টনগরের?'

'আহা, না ললিতা, সবাই কি কেষ্টনগরের জিনিস হবে, তুমি নিজে কেষ্টনগরের পুতুল বলে। আহা, চুলে টান মারছ কেন? আঃ ললিতা!'

'মফস্বলের কোন কলেজের?'

'আছে এক কলেজের। পদ্মার পারে। পাকিস্তানে। তুমি দেখেছ কোনোদিন পাকিস্তান?'

'আমি কি করে দেখব পাকিস্তান কুলদা? আমি ঘুঘুডাঙ্গা পেরিয়ে গেলুম না কোনোদিন। আমার খুব ইচ্ছে করছে, আমাকে নিয়ে যাবে পাকিস্তানে? এই ঝিমিয়ে পড়েছে–এই কুলদা।'

কুলদার কানের ওপর একটা মিঠে ঘুঁষি মেরে ললিতা বললে, 'চুল বিলি কাটছি আর ঘুমিয়ে পড়ছে, এই কালনাগ! বেহুলার ঘরে ঢুকে–'

'আমাকে দুধরাজ বলো ললিতা।'

'এই দুধরাজ। বেহুলার ঘরে ঢুকে–'

নিশীথ বললে, 'আপনি ঘুঘুডাঙ্গার বাইরে কোনোদিন যান নি?'

'আমি কেষ্টনগরের মেয়ে, কলকাতায় আছি আজ বিশ বছর ধরে। কোথাও যাব না আমি কলকাতা ছেড়ে।'

'পাকিস্তানে যাবে ললিতা?'

'তুমি নিয়ে যাবে?'

'নিশীথবাবু নিয়ে যাবেন। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, চাও তো ভোগবতী, ঘুরিয়ে আনবেন। ঝুলে পড় নিশীথবাবুর সঙ্গে।' কুলদা ঘাড় হেঁট করে মাথার চুল সব ছেড়ে দিয়েছিল ললিতার হাতে, 'মাথাটাকে ফিঙের ঠ্যাং ঝিঙের ক্ষেত করে ফেলেছে ললিতা।'

ধীরে-ধীরে মাথা তুলে খোঁয়ার ভাণ্ডার মত চারিদিকে তাকাতে লাগল কুলদা। চার-পাঁচদিন কলেজ ছুটি; এর পর গরমের ছুটি এসে পড়বে। কেমন যে ছুটির, ঢিলেমির, সোহাগের রেশ কোকেনের মত কঁকিয়ে–ঝিমিয়ে কথা বলতে চাচ্ছে কুলদার শরীরে ও তার রক্তের কণিকাগুলোতে।

'এই দুধরাজ।' আর-একটা ফিনফিনে ঘুঁষির ফিনকি ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের কানের উপর গিয়ে পড়ল। একেবারে ভিরমি খেয়ে পড়বার গতিক হতে-হতে সত্যই ভিরমি খেয়ে পড়ল যেন কুলদা, গ্যাঁজাখোরের মত চোখ লাল করে, গোল করে, নক্সা করে নিশীথের দিকে ঠিকরে মারতে-মারতে।

'যাও প্যান ন্যোসো ন্যে সো ললিতা' বললে কুলদা শরীরটাকে একটু ছাউ নাচ নাচিয়ে, বর্ষাকালের মিষ্টি কুমড়ো ক্ষেতের চিংড়ির চোখ মেরে ললিতার দিকে।

'না আমি পান আনব না, তুমি বলো পাকিস্তানে নিয়ে যাবে আমাকে।'

'নিয়ে যাব।'

'কবে?'

'কলেজ ছুটি হলেই।'

'নিশীথবাবু আমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন তো? সান্তাহার পেরিয়ে গেছ কোনোদিন ও লাইনে?'

'সান্তাহার নয়, বনগাঁ দিয়ে, নাকি নিশীথবাবু? এ লাইনে বনগাঁর পরই তো পাকিস্তান আরম্ভ হল?'

'হ্যাঁ। বনগাঁ লাইনে না গিয়ে–'

'না। আমরা বনগাঁ লাইন দিয়ে যাব' কুলদার চুলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে কেমন যেন হঠাৎ হাওয়ার ঘর্ষণে বাঁশপাতার তরঙ্গ তুলে ললিতা বললে, 'নিশীথবাবু আমাদের পথ দেখাবেন। তুমি আমাকে ভোগবতী দেখাবে।'

'ঠিক আছে, 'কুলদা বললে, 'পান দেবে না?'

'দিচ্ছি।'

'কটা পাকা চুল হল ললিতা?'

'একটাও না, তোমার মাথায় সব পাকা চুল কেঁচে আমার মাথায় যাচ্ছে–'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পাকা চুল নেই তোমার মাথায় নিশীথ?' কুলদা জিজ্ঞেস করল।

'এই তো রয়েছে রগের ধারে কয়েকটা—'

ললিতা কুলদার চুল বাছতে-বাছতে বললে, 'পান এনে দেব, কিন্তু সেই রকম করে বল তো সেই—'

'য়্যাও, প্যান ন্যাসো, প্যান ন্যাসো ললিতা,' কুলদা ব্যাঙবাজির মত গলাটাকে বাজিয়ে নিয়ে বললে। খুব মজা লাগছিল বটে নিশীথের। রাজা-রাজড়াদের তাকিয়ে তাউসে গড়িয়ে একটু বেসামাল হয়ে আছে যেন, কলেজের গভর্নিংবডির জাস্টিস তরফদারের মোটরের হর্ণ গেটের কাছে বেজে উঠলেই বেশ ঝেড়ে ঝর্ঝরে হয়ে যাবে কুলদা; ঝেড়ে ঝর্ঝরে হয়ে উঠে দাঁড়াবে। লোকটার সর্বাঙ্গের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সেটা—বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, কিছু না, মাস্টারমশাই ছুটির দিনে একটু ঘোড়া-ঘোড়া খেলছেন।

'তুমি কেন প্রিন্সিপ্যাল হলে না কুলদা?' ললিতা বললে।

'আমি প্রিন্সিপ্যাল হলে কী হবে তোমার?'

'তোমার কলেজে পড়ব আমি।'

'আমার কলেজে মেয়েরা পড়ে না।'

'কেন, যে-কলেজে মেয়েরা পড়ে,' একরাশ রোদে বাতাসে ফুলন্ত শেফালির ডাঁটের মত ঝরে ঝাঁকুনি খেয়ে ললিতা বললে, 'কেন সে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হলে না তুমি।'

'সে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তো হয়েছি।'

'কোথায়?'

'আমার বাড়িতে।'

'এই দুধরাজ,' কুলদার থুতনির ওপর, গালের ওপর, টোপাকুলের মত ছিটকে পড়তে লাগল ঘুঁষি, ঘুঁষির পর ঘুঁষি। ললিতা সাঁ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'কে এই মেয়েটি?' জিজ্ঞেস করল নিশীথ।

টিন থেকে সিগারেট বার করে নিয়ে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'আমার বিধবা শালি ললিতা।'

'তোমার এখানেই থাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কবে বিধবা হল?'

'বছর তিনেক হয়েছে।'

'খুব যে কচি মনে হচ্ছে।'

'আমার চেয়ে আটাশ বছরের ছোট ললিতা।'

'তোমাকে কুলদা ডাকে কেন? নাম ধরে ডাকে?'

'ঠিকই ডাকে, কুলে-দাদা ডাকত আগে, তার থেকেই কুলদা হয়েছে।'

'ঠিকই হয়েছে। দাদা ডাকে কি ঠাকুর্দা সম্বন্ধে? নাতনির মত ব্যবহার করল তো তোমার সঙ্গে'—

কুলদা একটা সিগারেট বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'মফস্বল কলেজে থেকে সব কিছু একেবারে গোগ্রাসে গিলে রেখেছ নিশীথ। তোমার কি শালি-টালি নেই? কী করে কাটে তা হলে ছুটির দুপুর? শীত রাত কাটে কী করে?' মাথার চুলের অপর্যাপ্ত এলোমেলো কাল স্বাস্থ্য নিয়ে নিশীথের দিকে তাকাল কুলদা।

'বিধবা শালি নেই।'

'সধবা?'

'নেই।'

'কে আছে তা হলে?'

নিশীথ আস্তে টান দিয়ে সিগারেটটা নামিয়ে এনে বললে, 'মফস্বলে প্রফেসরদের আর-এক রকম। মেয়েদের দিকে ঘেঁষতে পারে না। যারা ঘেঁষে তাদের বদনাম হয়। সিনেমা-থিয়েটার বেশি দেখা যায় না।'

'এ সব দিক দিয়ে খুব লাট মাহিন্দারি তা হলে তোমার।'

'আছে বলেই তো মনে হয়।'

'বেশ চুটিয়ে পড়াও ক্লাসে?'

' সেটা হয় না। দম রেখে পড়াই।'

'নিজে টের পাও না কিছু, কেমন পড়াচ্ছ?'

কুলদাপ্রসাদ ঘাড় কাত করে কিছুক্ষণ টেনে—এইবারে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললে, 'মফস্বলে মাস্টারকে চব্বিশ ঘণ্টা মাস্টারই থাকতে হয়। ঐটে বড় অসুবিধে। পেট ফুলে মরে যেতে হত আমার। কলকাতা একটা মহাদেশ, কোনো ঘুপসি ঘাপটিতে কে কী করছে, কে খোঁজ রাখে তার। নাঃ, মফস্বল আমার চলত না। সাড়ে পাঁচশ টাকায় সেধেছিল আমাকে—'

'কোথায়?'

'একটা প্রিন্সিপ্যালের কাজ নিয়ে সেধেছিল-কোয়ার্টার্স দেবে—হ্যান করবে ত্যান করবে—, গেলুম না আমি। কলকাতা ছেড়ে কে যায়? চব্বিশ ঘণ্টা মাস্টার সেজে টঙে চড়ে বসে থাকব? পাহারা দিতে হবে বুঝি কে কোথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বজ্জাতি করছে তাকে শায়েস্তা করবার জন্যে? ঘি খেলে লোম পড়ে যাবে বুঝি? রেড়ির তেল খেতে হবে, কিন্তু ভদ্দর-অভদ্দর দু-চারটে রাঁড়ি থাকবে না?'

'রাঁড়ি?'

'এখানে সে সব বালাই নেই গো; দিনেরবেলা কলকাতার উত্তর দিকে জয়হিন্দ বলে ধর্মতলার ম্যাজিনো লাইন পেরিয়ে—ব্যাস—কে টের পাবে গান্ধী টুপি জহর কোট পিঠে কোন কলকাতায় তুমি তলিয়ে আছে—'

'ব্ল্যাক মার্কেটিং করতে?'

'সব রকম বাপ্ণোতি।'

'করছ? কত কাল ধার?'

'চিরটা কাল। কড়ায়া, চীনে টাউন, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট—'

'জুতো বাইরে রেখে মন্দিরে প্রবেশ বুঝি? মাস্টার মশাইয়ের জুতোরও নাগাল পায় না ছেলেরা? ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে, চীনে টাউনে, মোঙ্গল নাক-চোখ ভাল লাগে তোমার?'

'সব ভাল লাগে, সব দেখতে হয়। আমাদের ইউনিভার্সিটির খোদা বক্স সাহেব বলতেন।'

পান নিয়ে ঘরে ঢুকল ললিতা।'

'সিক্সটিন ডিফারেন্ট ন্যাশ্যনালিটিজ।'

'কী বললে কুলদা, কী ইংরেজি কথাটা বললে?' ললিতা পান বনের বাতাসের মত শাড়িতে শরীরে নির্ঝরিত হয়ে বললে।

বললাম, 'সিক্সটিন ডিফারেন্ট ন্যাশন্যালিটিজ,' চোখ পাকিয়ে গর্জন করে বলল কুলদা।'

মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে-হাসতে ললিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খোদা বক্সের ব্যাপারটা ললিতারও জানা আছে তবে?

'তোমার টালিগঞ্জের বাড়ির কথা হচ্ছিল; সেটি ভাড়া খাটিয়ে পরের বাড়িতে পড়ে আছে কেন?'

'এ বাড়িতে আমি ত্রিশ টাকা ভাড়া দিচ্ছি মাত্র।'

'মাত্র?'

'সেই জাপানি বোমা হিড়িকের সময় এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলুম আমি কুড়ি টাকায়। হিড়িক কেটে যাবার পর থেকেই আমাকে উৎখাত করতে চেষ্টা করছে, কিছুই করতে পারে নি। পারবেও না। তবে দোতলা বাড়ি—দুটো তলাই আমার, দয়া করে দশটি টাকা বাড়িয়ে দিয়েছি। কেন ছাড়ব এ বাড়ি?'

'টালিগঞ্জের বাড়িতে কারা আছে?'

'যারা ছিল তাদের বার করে দিয়েছি।'

'করেছ? কিন্তু নিজে হাঁসের নলি কামড়ে আছ বোকা বাড়িওলার, একেই বুঝি যুযুৎসু প্যাঁচ বলে। মাস্টাররাও এটা পারে?'

'না হলে কী করে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয় মাস্টার?'

মাথার ওপর ফ্যান রয়েছে, সেটা খুলে দেওয়া হয় নি। বাইরের হাওয়ায় উড়ে যায় ঘরটা মাঝে-মাঝে, ঘর গরম হয়ে উঠছে বটে। এখন হাওয়া নেই। এই এবারেই এসে পড়বে।

'কত সেলামি নিলে নতুন ভাড়াটের কাছ থেকে?'

ফ্যানটা খুলতে ভুলে গেছে কুলদা।

'পাঁচ হাজার টাকা।'

'তা হলে বেশ ভাল বাড়ি তোমার।'

'হ্যাঁ, দোতলা, ভেনেশ্যান পেন্টের বড় বাড়ি; খোলা জায়গা চারদিকে।'

'কত ভাড়া?'

'সাড়ে তিনশ টাকা-গোটা বাড়ির।'

'সাড়ে তিনশ!' নিশীথ চোখ খাড়া করে কুলদার দিকে তাকাল।

'চারশ, সাড়ে চারশ, পেতে পারতুম; কুমড়ো কেটে দু'ফালি হবার মুখে তোবা-তোবা করে তুলে দিলে—'

'কুমড়ো কেটে দু'ফালি হওয়া কাকে বলে কুলদা?'

'কুলদার কথা শেষ হতে না-হতেই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে ললিতা বললে, 'এক ফালি হল পশ্চিমবাংলা, আর এক ফালি পাকিস্তান ও—আমি ভেবেছিলুম,' ললিতা বললে।

'কী ভেবেছিলে?'

'বলতে লজ্জা করে,' কুলদার গা ঘেঁষে তন্বী উমার মত মুখে ঠোঁটে পাঁচি পটলির পোঁচড় মেরে কেমন বেঢপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন ললিতা।

'লজ্জা করে, তা হলে থাক এখন। তোমাতে আমাতে তোমার দিদিতে রাতের বেলা শুনব এখন।'

'আমি বলি কুলদা? যা ভেবেছিলুম বলে ফেলি?'

কুলদা একটু বিব্রত হয়ে বললে, 'না থাক, দরকার নেই। তোমার শ্বশুর-বাড়ির লোক মুখোমুখি বসে আছেন, তোমার ভাসুর ঠাকুরের বড় শালা, ওদের সামনে এয়োতি হয়ে সরে থাকতে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ললিতা বললে, 'তোমার ইউনিভার্সিটির খাতার নম্বর গুনছিলাম আমি— দুটো ভুল বেরিয়েছে।'

'কটা খাতার ভেতর?'

'চারটে দেখেছি। ভুল শুধরে দেব?'

'তুমি একটা দাগ দিয়ে রাখো, আমি দেখব গিয়ে।'

'আমাকে বিশ্বাস হয় না?'

'কিন্তু ইউনিভার্সিটির খাতায় তুমি আঁক কাটবে?'

'পাকিস্তান ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের থেকে ফাঁক হয়ে কুমড়োর মত গড়িয়ে পড়েছে, সেটা বনগাঁ গেলে টের পাওয়া যাবে? চলো আজই যাই, দুটো ফালি দু'দিকে কেমন গড়াচ্ছে দেখে আসি,' ললিতা কুলদার থেকে খানিকটা দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললে।

'গড়াচ্ছে তো আমাদের মনে-মনে। কোথাও কিছু দেখবার নেই ললিতা।'

একটা পান মুখে দিয়ে ললিতা, 'তা ঠিক। পৃথিবীর বুকে কোনো চিড় নেই। আমি চললুম।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'তোমার খাতার নম্বর গুনতে।'

'হ্যাঁ। বেশ যোগ বসাতে পার তুমি ললিতা'—

'যোগবল আছে আমার তা হলে—শিবকে পটিয়ে নেবার মত?'

'শিব তো পায়ে পড়ে আছে, 'কুলদা গলার আওয়াজে ময়াম মাখিয়ে বললে।

'কটা খাতা দেখেছ তুমি?'

'তা দেড়শ হবে।'

'দেখি, নম্বরগুলো মিলিয়ে দেখি, তুমি যোগ দিতে বড় ভুল কর কুলদা।'

ললিতা চলে গেলে নিশীথ বললে, 'বাড়ি ভাড়া পেয়েই তো তোমার কলকাতার খরচ পুষিয়ে যায়, কেন মিছিমিছি চাকরি কর?'

'তা হতে পারত যদি সাড়ে চার শ টাকার দাঁওটা মারতে পারমুত। ব্যাঙ্কে তো জমেছে হাজার পঞ্চাশেক, টেনেমেনে হয়ে যেত। গরিবানা চালে থাকতে হত। কী দরকার সে রকম থাকবার। কলেজের কাজ জলভাত হয়ে গেছে, ওটা না করলেই খারাপ লাগে। ওটা তো গোলামি নয়। ইয়ার্কি আড্ডা মেরে সাড়ে পাঁচশ টাকা পাওয়া।'

এতই সহজ? নিশীথ অবাক হয়ে ভাবছিল। কোন জিনিসে দাঁড় করিয়েছে ওরা প্রফেসরিকে? পড়াশুনো করতে হয় না? কোন আদিকালে একটা নোট লিখেছিল ইকনমিকসের, সেইটেই কপচে চব্বিশ-পঁচিশ বছর কলেজ চালাচ্ছে, আর আছে। চেহারার ভারিক্কেপনা আছে, গলার জোর আছে। কাছেই ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কড়ায়া, টীনে টাউন, ললিতা, কলেজ সবই এদের দ্রাক্ষাক্ষেত্র—বিনে প্রতিভায়, বিনে পরিশ্রমে। আশ্চর্য, আশ্চর্য, কী আকাশ-পাতাল তফাত কুলদাপ্রসাদ আর নিশীথের জীবনে। কুলদা লক্ষ্মীর ঝাঁপি কোলে করে বসে আছে। মরীচিকার মত যার আঁচলের পিছে ছুটেছে নিশীথ, সে লক্ষ্মী নয়ই, সরস্বতী নয়, প্রফেসর ঘোষের নিশীথবাবু তো সেকেন্ড ক্লাসের নিরবচ্ছিন্ন একটা দেয়ালের মত যেন। বিপ্লব, রক্তবিপ্লব, হারীত, অর্চনা, মোহিতা, নমিতা থিওজফির এস্ট্র্যাল প্লেনের মত যেন। হাতের কুড়ি-বাইশটা টাকা চব্বিশ বছর কলেজে কাজ করার পর উনিশ-কুড়িটা এক টাকার নোটে, বেশ খানিকটা দলে ভারী হয়ে শেষ রক্ষা করছে—এই যা রক্ষা।

'আমাকে কলকাতার কলেজের একটা কাজ দিতে হবে কুলদা।'

'এত দিন পরে এ বয়সে কলকাতায় কাজ নিলে সেই প্রথম থেকে শুরু করতে হবে তো তোমাকে নিশীথ। ডুবে মরবে।'

'প্রথম থেকে কী রকম?'

'মফস্বলে তো তুমি ভাইস প্রিন্সিপ্যাল।'

'তা তো আছি।'

'পাচ্ছ সাড়ে তিনশ। এখানে কত আশা কর তুমি?'

'কত দেবে?'

'কোন ক্লাস এম-এ তুমি?'

'সেকেন্ড ক্লাস।'

কুলদা একটু দমে গিয়ে বললে, 'সেকেন্ড ক্লাস—'

'তুমিও তো সেকেন্ড ক্লাস কুলদা—'

কুলদা খানিকটা কৌতুক বোধ করে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার সেকেন্ড ক্লাস নিয়ে চব্বিশ বছর আগে এ কলেজে ঢুকেছি। ফার্স্ট ক্লাসের বাবা তো আম কাজ। কিন্তু তুমি তো সেকেন্ড ক্লাস'—

'কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসের বাবা হলাম না কেন আমি। আমিও তো চব্বিশ বছর কলেজে কাজ করেছি।'

'তা করেছ, কিন্তু আমাদের কলেজে কর নি তো।'

'ওঃ, তুমি আমির, নিজেদের কলেজে তোমাদের?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বুঝেছ তুমি', কুলদা সিগারেটের ধোঁয়া ঘনিয়ে ছাড়তে-ছাড়তে বললে।

'রিপনে না, প্রেসিডেন্সিতে না, স্কটিসে না?'

'ও-সব জায়গায় আলাদা উজির-আমির সব।'

'সেকেন্ড ক্লাস ডিগ্রি নিয়ে?'

'সেকেন্ড ক্লাস—থার্ড ক্লাস—ফার্স্ট ক্লাসও আছে না।'

'ও-তা এই রকম বুঝি,' নিশীথ বললে, 'এর চেয়ে ঢের ভাল হতে পারত, কিন্তু এ যা হয়েছে এও খুব বেশি খারাপ নয়।'

টিনের থেকে একটা সিগারেট খসিয়ে নিয়ে দেশলাই খুঁজছিল; সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে নিশীথ বললে, 'এ কলেজের ভাসুর ও-কলেজে কাজ নিতে গেলে ও-কলেজের ভদ্রবৌদের মধ্যে ওরা ভিড়িয়ে দেবে বুঝি তাকে।'

'তাই তো দেবে, মফস্বলের ভাসুরদের একেবারে ন-বৌরা এসে চেপে ধরবে। নেবে নাকি কলকাতার কলেজে কাজ?'

'কী রকম মাইনে পাওয়া যাবে?'

'সকালে নেবে, না রাত্তিরে?'

'তার মানে?'

'মানে আমাদের কর্মাস ডিপার্টমেন্টের কথা বলছি।'

নিশীথ বিরক্ত হয়ে বললে, 'কমার্স ডিপার্টমেন্টে কেন কাজ করব আমি। এমনি জেনারেল ডিপার্টমেন্টে চাই।'

কুলদা বাটার থেকে একটা পান তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে বললে, 'জেনারেল ডিপার্টমেন্টে কোনো ভেকেন্সি হয় না। হলেও ফার্স্ট ক্লাস, বিলিতি ডিগ্রি, ডক্টর এ ছাড়া নেওয়া হয় না কাউকে।'

'কলেজের এক্স-স্টুডেন্টদের নেওয়া হয় না?'

'ফার্স্ট ক্লাস না পেলে—'

'গভর্নিং বডির শালা ভায়রা-ভাইদের নেওয়া হয় না?'

'সেকেন্ড ক্লাস পেলে?'

'থার্ড ক্লাস না পেলে?'

'তা নেওয়া হবে বইকি। নানা রকম কোড আছে কলেজে। কলেজ তো একটা উচ্ছৃঙ্খল জায়গা নয়। তোমাকে এখন দুশ টাকায় আমাদের কলেজে ঢোকালে সেটা বিশৃঙ্খলা হবে।'

'কেন?'

'তুমি তো সেকেন্ড ক্লাস এম-এ নিশীথ।'

'তুমিও তো সেকেন্ড ক্লাস কুলদা।'

'আ মল যা!' কুলদা একটু ঝেঁজে উঠে, 'তোমাকে এতক্ষণ তা হলে বোঝালুম কী।'

নিশীথ এক খিলি পান তুলে নিয়ে পানের লঙ্গটা খসিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে বললে, 'মানে তুমি মাগ-ভাসুর হয়ে গেছ কলেজের আর আমি যমপুকুরের ব্রত করছি—সেই কথাটা।'

কুলদা পান চিবুতে-চিবুতে একটি চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'সেই কথাটা। তাছাড়া কলেজের গভর্নিং বডির লাডলি চাটুজ্যে, লর্ড মুখুজ্যে, বোকা বাঁড়ুজ্যের কেউ নও তো তুমি? নাকি, কেউ হও তুমি?'

'ওদের কে আমি?'

'তবে কী করে দু'শ টাকায় ঢোকাব তোমাকে?'

'কত টাকায় ঢোকা যেতে পারে?'

'একশ টাকায়।'

'দেবে? জেনারেলে?'

'না। নাইটে; কমার্সে। টেম্পরারি হিসেবে।'

নিশীথ একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে থেকে, তারপর বললে, 'সব জায়গায়ই এই রকম কুলদা? কলকাতার সব কলেজেই?'

'সব কলেজেই। তোমাকে রেখে-ঢেকে কথা বলে ধোঁকা দিয়ে কী লাভ। একই দেশের মানুষ তো আমরা। আমি আজ করে খাচ্ছি কলকাতায়। তুমি গোঁফ চুমড়ে পথ খুঁজছ। কোনো পথ পাবে না কলেজে—একশ টাকায় কমার্সে কাজ নিয়ে মান খোয়াবে তুমি নিশীথ?'

কুলদা পান তুলে নিয়ে চিবুতে লাগল। বেশ পান বানিয়েছে ললিতা। ললিতার দিদি, কুলদার স্ত্রী, গেছে নর্থ ক্যালকাটায় ভাইয়ের বাড়িতে। আজ রাতে ফিরবে না হয় তো। শ্যালিকাকে গল্প শোনাতে হবে আজ বেশি রাত অব্দি। বেশ ছাই জমেছে চুরুটের মুখে; ভাবি আমেজ লাগছিল কুলদার।

'খবরের কাগজের অফিসে দেখ তুমি নিশীথ। দেড়শ-দুশ পেলে ঢুকে যাও। নাঃ পাকিস্তানে গিয়ে আর কী করবে। কলকাতায় থাকো, কলকাতায় থেকে যাও।

কুলদাপ্রসাদের বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছে নিশীথ তখন চারটে বেজে গেছে। সকালবেলা চা, দু-একটা স্যান্ডউইচ-ডিম ছাড়া কিছু খায় নি; প্রফেসর ঘোষের বাড়িতে এক কাপ চা, দুটো বিস্কুট, কুলদার এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতকগুলো পান খেল নিশীথ। বেশি সিগারেট খেয়ে, চা খেয়ে, ভাত না খেয়ে শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করছিল নিশীথের। এখন শুয়ে পড়তে হয়, কোথাও দাঁড়াতে পারা যাচ্ছে না যেন আর; কেউ যদি কিছু না মনে করে তা হলে ফুটপাতেও শুয়ে পড়তে রাজি সে। একটা বেশ ঝাঁকড়া গাছ দেখে নিয়ে তারই তলায় ফুটপাতের ওপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল, গায়ের থেকে পাঞ্জাবিটা খুলে একটু বিছিয়ে নিয়ে তার ওপর মাথাটা রেখে। কিন্তু মুশকিল, তাকে কেউ ভিখিরিও মনে করবে না, পাগলও ভাববে না; কেন সে এ রকমভাবে শুয়ে পড়ল বুঝে দেখবার জন্য তার চারিদিকে লোক জড়ো হয়ে যাবে। শুলেই ভাল হত কিন্তু এটা সেটা ভেবে নিশীথ ফুটপাতের একটা গাছের গুঁড়ির উপর গিয়ে বসল। গুঁড়ি বলে ঠিক জোনো জিনিস নেই, দু-চারটে বেশ মোটা শেকড় ওপরে জাগিয়ে আছে; মাটি শেকড়ের ওপর বসে জিরিয়ে নিতে লাগল। গাছে ঠেস দিতেই ঘুম এল। মিনিট পনের-কুড়ির মধ্যেই ঘুমের চটকা ভেঙে গেল নিশীথের। নানা রকম লোকজন ফুটপাতে গাছের চারদিকে এসে হল্লা করছে, কোত্থেকে একটা চারপাই নিয়ে এসেছে, সেখানে গড়াচ্ছে দেশোয়ালি দু-চারজন; নিচে ময়লা কাঁথা-কাপড় ছড়িয়ে দোসাদ, কাহার, মাহাতো মেয়ে, বুড়ি, ছোট ছেলেপিলেরা বসেছে, কাঁদছে, গড়াচ্ছে, ল্যাং মারছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, পেটে গিঁট মাজায় গিঁট মেরে বিশ্বকর্মা পূজোর ঘুড়ির মত পাতা ফচ্‌ফচ্‌ বন্‌বন্‌ করে তোলপাড় করে তুলছে সব। কেউ-কেউ শুকনো ডাল-পালা, রাস্তার এঁটো কাগজ, রাবিশ জোগাড় করে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করছে। বোধ হয় রান্নাবান্না চড়বে এখন।

নিশীথ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রফেসর ঘোষকে দেখা হল, কুলদাপ্রসাদকে দেখা হল, এখন কার কাছে যাওয়া যায়? কলেজের চাকরির কথা এখন আর ভাবা উচিত নয়। চার-পাঁচ বছর ধরে কলকাতার কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ঘুরে দেখেছে তো সে। বিশেষ কোনো আশা-আশ্বাস পাওয়া যায় নি। কোথাও; দু-একজন গাছে চড়িয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত মই টেনে নিয়েছে; নিদারুণভাবে আশা ভঙ্গ করেছে।

ঠিকই বলেছে কুলদাপ্রসাদ, সেকেন্ড ক্লাস ডিগ্রি নিয়ে কোনো মুরুব্বির কেউ না হয় কলকাতার কলেজে ভাল চাকরি পাওয়া অসম্ভব; পেতে পারে একশ টাকায়, কর্মাস ডিপার্টমেন্টে, রাতেরবেলা। কুলদা কলকাতার সব কলেজের সব খবরও জানে। এ দিক দিয়ে কলকাতায় সত্যিই কিছু হবে না নিশীথের। কলেজে কাজ করতে হলে জলপাইহাটি ফিরে যেতে হয়, কলকাতায় থাকতে হলে অন্য কোনো চাকরির জোগাড় দেখতে হয়। কুলদা খবরের কাগজের কথা বলছে। কিন্তু কলকাতার খবরের কাগজের চাকরিতে মন উঠছে না নিশীথের। পলিটিক্সে তার কৌতূহল আছে বটে, কিন্তু রোজকার পলিটিক্স নিয়ে এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মাথা ঘামাতে পারে না সে; যারা ঘামায় তাদের কথাবার্তা শুনে বমি আসে তার। তা ছাড়া কাগজের সম্পাদনার ভার কে দিচ্ছে নিশীথকে? কে দেবে তাকে সত্যি স্বাধীনভাবে সম্পাদকীয় লিখতে? সহযোগী, না কি সহকারী, সম্পাদকের কাজ পেতে পারে সে নিচের দিকে-মুরুব্বির জোর থাকলে। সেই জন্য দিন-রাত তাকে গলা জলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে-পলিটিক্সের পতরি পুকুরে-উদয়াস্ত কাঁথাকাচার গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে। বিদেশী ইউরোপ-আমেরিকার পলিটিক্সও নয়, একেবারেই ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে কলকাতার কলতলার নিরেট আসর জমিয়ে বসতে হবে তাকে। রোজ যেতে হবে কাগজের অফিসে, রোজ লিখতে হবে; বাংলাদেশের রামহোমন-লালমোহন কী করছে, পদিপিসি কী ঘুম্বল দিচ্ছে-যাদের কথা দিনান্তেও একবার প্রবেশ লাভ করতে পারে না নিশীথের জনে-নির্জনে বাস্তবে, আখ্যানিক জীবনে, তারাই হবে নিশীথের নিত্যনৈমিত্তিক লেখার বিষয়। তাদের তারিফ করতে হবে, যেটা কাগজের পলিসি।

নিজেরা খাওয়াখায়ি করে মরে রামমোহনরা কাগজের পলিসি বদলে দেয়। কিন্তু জন-প্রয়োজন রামমোহনদের উৎখাত করতে পারে না, এ দেশে অন্তত না, আজ পর্যন্ত না। খবরের কাগজও জনসাধারণের বিশেষ কেউ নয় আমাদের দেশে। এ হেন জিনিসের সেবা হবে কয়েকটা টাকার জন্যে। লালমোহন-রামমোহন যদি সহচর হয় শূন্য-শূন্যান্তের অভিযানে তা হলে তাদের ঘোড়ার পিঠে মখমলের বালামাটির কাজ করতে হবে নিশীথকে-লালমোহনদের স্থূল পশ্চাদ্দেশকে প্রভূত আরাম দেওয়ার জন্যে সারগর্ভ সম্পাদকীয় লিখে। গম্ভীর হয়ে ভাবছিল নিশীথ। কটা টাকা দেবে এ জন্যে নিশীথকে ওরা? দেড়শ দুশ সোয়া দুশ। দেড় হাজার-দুহাজার টাকা পেলেও এ কাজে মন বসবে না নিশীথের। এ তার নিজের কাজ নয়, এ সব কাজের জন্য জন্মাতে হয় মায়ের পেটে থাকতে-থাকতেই; পেটের থেকে পড়ে শিখলে চলবে না।

নিশীথ পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া দরকার। খুব তাড়াতাড়ি কিছু করে নিতে না পারলে পকেটের কুড়ি-বাইশ টাকা দিয়ে কত দিন চলবে তার কলকাতায়-কত দিন চালাবে সে মানব জীবনটাকে, সপরিবারে?

একবার শেষ চেষ্টার মত অমুক কলেজের সত্যিকারের বাবা জয়নাথের সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়? জয়নাথের সঙ্গে এর আগেও কয়েকবার দেখা করেছিল নিশীথ গত পাঁচ-সাত বছরে। কলেজের কাজের ব্যাপার নিয়ে। জয়নাথ আশা দিয়েছে সব সময়েই, কিন্তু আসল কাজের সময় হয় নি। সই করে দিয়েছে, মুখে বলেছে, কিছু করে উঠতে পারি নি দাদা। বাবার হোটেলে বাবাই, যদি কিছু করে উঠতে না পারে তা হলে দুগ্ধপোষ্য শিশুরাও দাঁড়াবে কোথায়, এ রকম মুখের ভাব নিয়ে সে কলেজের প্রফেসররা জয়নাথকে ঘিরে থাকে সব সময়। তাদের সেই বাবা নিজের নিশীথকে বারবার 'এই হচ্ছে' 'এই হল আর-কি' বলে, অবশেষে জয়নাথবাবুর নিতান্তই সঙ্কটাবস্থার সময় তাকে গোরু খোঁজ করে বার করতে পারলে আক্ষেপ করে বলত, আমার হাতে তো কিছু নেই, মতিমোহনবাবুর ছেলেকে নিতে হল কিংবা জস্টিস ভড় নিজে তাঁর মিনার্ভা কার হাঁকিয়ে এসে বললেন, আমি ধরণী ভড়কে না নিয়ে করি কী; ইদানীং বলেছিলেন, শহীদ বটব্যালের জামাই ফাঁসির রসিকলালের শালা এসে ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েছিল, কী করি, শহিদদের ওপর তো একটা কর্তব্য আছে আমাদের (পনের আগস্টের পর থেকে), তোমাদের না দিয়ে ভল্টুকেই দিলুম। সেকেন্ড ক্লাস, তা যাক, হোক ফাঁসির রশির উবগার, একসঙ্গে তো পড়েছিলুম আমি আর রমি। কিন্তু ভল্টুকে ষাট-সত্তর টাকা মাইনেয় পাওয়া গেছে, নিশীথকে তো একশ সত্তর দিতে হত, কিংবা দেড়শ অন্তত; ফাঁসির রশি তো আসল কথা নয়। আসল কথা হত যদি সেটা, জয়নাথকে কুলদার চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করত নিশীথ। কিন্তু এমনই মিনমিনে মিটমিটে জিনিস জয়নাথ যে তাকে প্রফেসর ঘোষের চেয়েও শ্রদ্ধা করে নিশীথ।

কিন্তু তবুও তার, তার বাবার এবং তার আধ্যাত্মিক খুড়ো-জ্যাঠাদের চেষ্টায় কলেজটির উৎপত্তি। এতগুলো লোকের হাতে একটা জিনিসের জন্ম হলে সেটার ভেতরে খানিকটা অসঙ্গতির দোষ বুঝি না বর্তে পারে না, ভাবছিল নিশীথ। কিন্তু সে দোষকে ধোশিত করে নিচ্ছে অহরহ জয়নাথ, কলেজের জন্য নানা দিক থেকে চাঁদা তুলে, ডোনেশন সংগ্রহ করে, গভর্নমেন্ট ও ইউনিভার্সিটির আর্থিক ও পারমার্থিক সাহায্যে ও পরামর্শে, পরামর্শগুলো যদি বাতাসার মত বোধ হয় তা হলে আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় সেগুলো বাতাবি লেবুতে পরিণত করে সরবৎ বানিয়ে খেয়ে ফেলে। এখন জয়নাথই কলেজের একমাত্র পিতা। আগেকার পিতারা অনেকেই মৃত; যারা আছে তারা নিজেদের ঔরসের পূর্বস্মৃতি সম্বন্ধে সন্দিহান।

আজকাল পাকিস্তানের হিন্দু ছেলেরা দল বেঁধে কলকাতায় পালিয়ে এসে জয়নাথের বড় সুবিধে করে দিয়েছে। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অধ্যাপকদের নিয়ে মাথা ঘামাবার খুব ইচ্ছে জয়নাথের; কিন্তু পথ পাচ্ছে না এবং হাজার-হাজার ছেলে বাড়ছে, পুরোন কলেজ-বাড়িতে আঁটছে না কোথাও আর, নতুন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি হচ্ছে কলেজের; হাঁটতে-হাঁটতে রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখছিল নিশীথ। রাজমিস্ত্রিদের দেখতে-দেখতে নিজের অজান্তেই যেন জয়নাথের ঘরে এসে ঢুকল নিশীথ; কলেজের থেকে ঢের দূরেই তো জয়নাথের বাড়ি—ঢের নিভৃতে; একটা কলকাতার উত্তর দিকে, আর-একটা দক্ষিণে বালিগঞ্জে। এত তাড়াতাড়ি কী করে এল সে!

বালিগঞ্জের বাড়ির নিচের তলায় একটা কার্পেট—বেছানো সোফা—ছড়ানো চমৎকার কামরায় বড় গদি-আঁটা ইজিচেয়ারে বসেছিল জয়নাথ।

জয়নাথ চার-পাঁচ বছরের বড় নিশীথের চেয়ে। একান্ন-বায়ান্ন হবে জয়নাথের। জয়নাথের কাছে বছর খানেক পড়েছিল নিশীথ—কোন কলেজে তা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে এই কলেজটায় নয়। এ কলেজে নিশীথ পড়ে নি কোনো দিন।

জয়নাথ একটা তাঁতের ধুতি পরে, স্যামুয়েল ফিটজের বাড়ির রেডিমেট শার্ট গায়ে দিয়ে বসেছিল, মুখে চুরুট, চুরুট আজকাল জয়নাথ চব্বিশ ঘণ্টাই প্রায় খায়; নেড়েচেড়ে দেখছিল একটা মস্ত বড় ঢাউস বাংলা দৈনিক; স্টেটসম্যানও আছে, ভাঁজ এখানো খোলা হয় নি; অমৃতবাজারও আছে।

'কে আপনি?' কাগজের শিটটা মুখের ওপর থেকে একটু সরিয়ে জয়নাথ বললে।

'রাতে কাগজ পড়ছেন?

'দিনেরবেলা সময় হয় নি। সারা দিন বড্ড ব্যস্ত ছিলুম।'

'আজ তো কলেজ ছুটি ছিল।'

'হ্যাঁ, কলকাতায় ছিলুম না। খুব ভোরেই বসিরহাট যেতে হল; গাড়িটার সব্বনাশ হল আর কী। গাড়িটা না নিলেই পারতুম, বাসই তো ছিল। এই তো এলুম বসিরহাট থেকে'—

'বসিরহাট গিয়েছিলেন', নিশীথ শুরু করতেই সে দিকে কান না দিয়ে নিজের কথার জের টেনে জয়নাথ বললে, 'ওরাই গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবে বলেছিল, গরজ তো ওদেরই। কেন আর গরিব-গুরবোদের কষ্ট দেওয়া, নিজের গাড়িতেই গেলুম, পেট্রোল খরচটা দিয়েছে, জোর করে গছিয়ে দিল।'

'বসিরহাটে টিচারদের মিটিঙে'—

'না, না, ও-সব অনেকবার করেছি। না, দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন সকলেরই পায়া বাড়বে। অনেক মিটিঙ-ফিটিঙ হবে। আমরাও মিটিঙ করব। কিন্তু কিছু হবে না শিগগির।'

জয়নাথ চুরুটে একটা টান মেরে বললে, 'আসল জিনিসটা তো হয়েছে। আমরা স্বাধীন হয়েছি। এখন ও-সব ফিচেল জিনিসগুলো ধরে টিচারদের স্টেটাস, টিচারদের মাইনে বাড়ানো, টিচারদের বেড়ানো-টেড়ানো, বিয়ের বাদ্যি বাজনা ও-সব কিছুদিনের জন্য মুলতুবি থাকুক গে বাবা—'

জয়নাথ কিছুক্ষণ নিজের মনে চুরুট টেনে নিল। খবরের কাগজের শিট পড়ে গেল কার্পেটের ওপর।

'না, বসিরহাট গেছলুম মেজ শালির মেয়ের বিয়েতে। আমরা বদ্যি। মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে মোড়লের ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি যদি বড় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হত তা হলে বিশেষ কোনো গোলমাল ছিল না। কিন্তু স্বদেশী আমলে স্বদেশী করেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখনো স্বদেশী করছে সোদপুরে আর নোয়াখালিতে। এ যাবৎ কানাকড়ি রোজগার করছে না, ও দিকে জেতে চাঁড়াল। শালি তো কেঁদেই আকুল। বলে রমলার বিয়েতে এ যাবৎ প্লেগের ইঁদুরের মাছিও পড়ছে না আমার বাড়িতে। সব ভোঁ-ভোঁ! তুমি এস, তুমি এস, তুমি এলে সব সুড়সুড় করে-একটা কলেজের মাথায় তুমি, বড় বড় মর‍্যাল সাপোর্ট তোমার। কেউ না এলে শুধু তুমি এলেই আমাদের মর‍্যাল ভিক্টরি হবে।'

জয়নাথ চুরুটটা দাঁতে কামড়ে নিয়ে বললে, 'এই তো মর‍্যাল সাপোর্ট দিয়ে ফিরলুম বসিরহাট থেকে।'

'হয়ে গেছে বিয়ে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ। মোস্ট ডিসাইসিভ মর‍্যাল ভিক্টরি। আমি গিয়ে দেখলুম আট-দশজন ফ্যা-ফ্যা করছে বিয়ে বাড়িতে। আমি যেতেই সোরগোল পড়ে গেল। দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই লোকে তলিয়ে গেল বিয়ের আসর। ওরাই করল-কম্মাল সব, জিনিস কিনল, ভোজ লাগাল; দলে-দলে কুকুরের মত পাত চেটে জিগির দিচ্ছে-এখনো তো।'

'বেশ ভালই হল।' নিশীথ বললে।

'আপনি বদ্যি তো?'

'হ্যাঁ।

জয়নাথ মুখের চুরুট নামিয়ে ঠোঁট চেটে একটু হেসে বললে, 'আমরাও বদ্যি। মজুমদার বদ্যি। লোকে বলে হ্যাঁঃ, ওরাও আবার বদ্যি, ওরা তো মহেশ্বরদির, ওরা তো চাটগাঁ সিলেটের, কালীকচ্ছের, সেখানে বদ্যি-কায়েতে বদ্যি-চাঁড়ালে, প্রতিলোম বিয়ে হয়।'

'হলে হবে,' নিশীথ বললে, 'জাত-ফাত দিয়ে কী হবে।'

'কিছু হবে না,' জয়নাথ চুরুট কামড়ে ধরে বললে, 'তবে জেনে রাখুন, যার সঙ্গে দেখা হবে, কথায়-কথায় ফাঁসিয়ে দেবার ইচ্ছে যদি হয় তবে দেবেন। বলবেন জয়নাথবাবুরা মহেশ্বরদির বদ্যি নয়। ওদের এক সঙ্গে সেনহাটির এক সঙ্গে ভট্টপ্রতাপের'-জয়নাথ বংশের গরিমায় রক্তের চাপ প্রায় দুশর দিকে পাঠিয়ে দিয়ে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে নেবার প্রয়োজনে বয়ে-সয়ে আস্তে-আস্তে চুরুট টানতে লাগল, পেঁচার মত বড়-বড় বিষয়ী বিশেষিত চোখের কেমন একটা চিৎপ্রকটে নিশীথের দিকে তাকিয়ে।

'আপনার নাম আমার মনে আছে।'

'মনে আছে? এসেছিলাম কয়েকবার আপনার কাছে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সব মনে আছে আমার,'কার্পেটের ওপর থেকে কাগজের একটা শিট কুড়িয়ে এনে পাশে একটা মোড়ার ওপর রেখে দিয়ে জয়নাথ বললে, 'আপনার নাম তো নিশীথ সেনগুপ্ত।'

'হ্যাঁ, নিশীথ সেন।'

'সেন? গুপ্তটা কেটে কি বাহাদুরি হল? এমনি সেন তো ছোটকায়েত, শুদ্দুর, সোনার বেনে'-

'আমি ও-সব জাত-টাত নিয়ে মাথা ঘামাই নে, সবই তো সামান্য; অন্তত একই রকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত সকলের। মানুষকে ছোট জাত বানিয়ে চেপে রেখে কী হবে?'

'না, ওতে কিছু হবে না। আমরা অন্তত মানছি না। মোড়লের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি। দিয়েছেন আপনারা?'

নিশীথ পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'আমার কোনো মেয়েরই বিয়ে হয়নি এখনো। ভাল পাত্র পেলে দেব বই কি-মোড়লে আটকাবে না।'

জয়নাথ চুরুটের ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ মুখে বললে, 'সমাজ এই রকমই হচ্ছে। ভালই। আমিও তো ব্রহ্মসমাজ ঘেঁষা এ সব বিষয়ে; আমার বাবা তো ব্রাহ্মই ছিলেন। আপনি বদ্যি তো নিশীথবাবু?' কেমন একটা খটকায় বেঁধে নিশীথকে জিজ্ঞেস করলে জয়নাথ।

'জন্মেছিলুম তো বদ্যির ঘরে।'

'কোথাকার বদ্যি? সেনহাটির?'

'না।'

'মহেশ্বরদির?'

'না। আমরা কোথাকার বদ্যি আপনার বাবা গয়ানাথবাবু তো জানতেন।'

জানে জয়নাথ নিজেও। নিশীথদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে জয়নাথদের বাবাদের কী নিকট সম্বন্ধ ছিল সেটা গয়ানাথবাবুর মুখেই শুনেছেন এরা। শুনে ভুলে গেছে। (ও-সব কথা মনে করে রাখার দায়িত্ব অনেক)। এখন কিংবদন্তী হিসেবে মাঝে-মাঝে মনে পড়ে।

জয়নাথ একটু সতর্ক হয়ে সামলে নিয়ে অন্য কথা পেড়ে বললে, 'আপনারও সিগারেট খাওয়া অভ্যেস আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, খাই মাঝে-মাঝে।'

'আমি তো প্রিন্সিপ্যাল মানুষ, 'জয়নাথ বেশ সদাশয়ের মত হেসে বললে, 'খান আমার সামনেও?'

নিশীথের খেয়াল ছিল না বটে, একবারে আত্মীয়ের মত জয়নাথ এমন ঘিরে বসতে থাকে যে এ সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে হুঁস থাকে না যেন মুহূর্তের তরে। মনে হয় যেন সমানে-সমানে বসা হয়েছে প্রায়-দু'জন ঘাগি মাস্টার। কিন্তু জয়নাথ তো উঁচুআলা, সদরালা।

'আমার কলেজের প্রফেসররা আমার সুমুখে সিগারেট খান না।'

'আচ্ছা আমি রেখে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে নিশীথবাবু।'

'কোথায় অ্যাসট্রে আপনার? দেখছি না ত?'

'ঠিক আছে নিশীথবাবু, ঠিক আছে, খান সিগারেট খান আপনি।'

জয়নাথের মুখের দিকে না তাকিয়েই নিশীথ উপলব্ধি করল যে বেশ সদন্তঃকরণে কথা বলছে জয়নাথ। এ রকম সনির্বন্ধ আশ্বাস পেয়ে বশে ভরপুর আত্মিকভাবে টান দিল সিগারেটটায় নিশীথ।

'এটা তো আমার কলেজের, প্রিন্সিপ্যালের কামরা নয় নিশীথবাবু, আপনিও আমাদের কলেজের মাস্টার নন। কেন খাবেন না সিগারেট?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পড়েছিলুম এক বছর আপনার কাছে।'

'কে আপনি? কোন কলেজে?'

নিশীথের মনে পড়ছিল না। নিশীথ সিগারেটে আর-একটা মোটা টান মারবার ইচ্ছাটাকে দমিয়ে রেখে মুখ এড়িয়ে ভেবে দেখছিল।

'এ কলেজে?'

'না, এ কলেজে না।' নিশীথ বললে।

'আপনি তো স্কটিশের ছেলে।'

'তা কী করে জানলেন আপনি?'

'বাঃ, জানব না। আপনার থেকে তো মাত্র বছর তিন-চারের সিনিয়র আমি। আপনি ইউনিভার্সিটির ফিফথ ইয়ারে যখন-তখন তো ইন্টারমিডিয়েট ল পড়ছি আমি, আমি নিজে তো স্কটিশ চার্চ কলেজের ছেলে। আমাদের পরে-পর-পর তিন-চার বছর কারা স্কটিশ চার্চ থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে এল সে সব নতুন-নতুন ছেলেদের মুখ চিনে রাখতুম না আমি কলেজে পড়বার সময়?'

'সেটা কি সম্ভব?' নিশীথ একটু অবাক হয়ে ভাবছিল।

'তা ছাড়া' জয়নাথ কী যেন বলতে গিয়ে, না বলে, মুখে চুরুট গুঁজে দিয়ে দেয়ালের একটা নন্দলাল বোসের ছবির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

পরপর তিন-চার বছর স্কটিশ চার্চ কলেজের থেকে ক্রমাগত পোস্ট গ্র্যাজুয়েটি ছেলেদের মুখ চিনে রেখেছে জয়নাথবাবু এম-এ পাস করে বেরিয়ে ইউনিভার্সিটির করিডরে বেড়াতে-বেড়াতে, এও বিশ্বেস করতে হবে? থাকতে পারে খানিকটা মুখ চেনা জয়নাথবাবুর।

নিশীথের সিগারেট নিভে যাচ্ছিল, আস্তে দুটো টান দিয়ে জয়নাথের বাবা গয়ানাথবাবুর কথা ভাবছিল, যিনি নিশীথকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন উত্তর কলকাতায় গয়ানাথবাবুর দোস্ত মহম্মদ লেনের বাড়িতে সকলের সঙ্গে তার আলাপ করাতে গিয়েছিলেন প্রায় সাতাশ-আটাশ বছর আগে। দোস্ত মহম্মদ লেনের আধোভাঙ্গা গলির গয়ানাথবাবুর বাড়িতে তারপরেও দু-তিনবার গিয়েছিল নিশীথ। গয়ানাথবাবুর মৃত্যুর পর সে বাড়িতে আর যায় নি সে। একুশ কাঠা জমির ওপর বালিগঞ্জ প্লেসের এই অনির্বচন বাড়ি যে দোস্ত মহম্মদ লেনের গয়ানাথের ছেলেরা একদিন সম্ভব করে তুলবে এমন দুঃস্বপ্ন গয়ানাথের ধারণার ত্রিসীমানায়ও কোনোদিন ছিল না। কিন্তু তা তো হল। গয়ানাথ বেঁচে থাকতে হল না। সেটা হলে খুব খুশি হত নিশীথ। গয়ানাথবাবু তাঁর স্ত্রীর পরিচয় ঝালিয়ে দিয়েছিলেন নিশীথের; তাঁর মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর ছেলেদের সঙ্গেও। গয়ানাথবাবুর স্ত্রী স্বামীর আগেই মারা যান, মেয়েদের কথা বিশেষ কিছু মনে নেই নিশীথের, ছেলেদের প্রকোপ এখনো কিছু-কিছু চোখে পড়ে; জয়নাথ, অজয়নাথ, বিজয়নাথ, সুজয়নাথ—এই চার ছেলেই তো গয়ানাথের। না আর-কেউ আছে?

'আপনার বাবা গয়ানাথবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল।'

জয়নাথ চুরুটের মোটা ছাইটা ঝেড়ে ফেলে দিল। চুরুট নিভে যায় নি, জ্বলছে। 'তা শুনেছি আমি'—

'শুনেছ শুধু? চোখে দেখে নি? চোখে দেখা জিনিস মনে নেই জয়নাথবাবুর? আপনারা তখন দোস্ত মহম্মদ লেনের একটা বাড়িতে ছিলেন।'

ও-সব পুরনো কথা শুনতে ভাল লাগে না জয়নাথের। চার ভাইয়ে মিলে তারা রাতকে দিন করে দিয়েছে; জলের ওপর দিয়ে নৌকা চালিয়ে নিয়ে গেছে; বালিগঞ্জে পঁচিশ-ত্রিশ কাঠা জমি কিনেছে, ডি-কে ব্যানার্জি কন্ট্রাক্টরকে লাগিয়ে চমৎকার জ্যামিতিক প্রাসাদ তুলেছে, চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে; পুরনো কলেজটাকে চার ভায়ে মিলে হাতড়ে নিয়ে সেটাকে নবরক্ত দান করেছে—এখনই সেই দোস্ত মহম্মদ লেনের কথা পাড়া?

'তা ছিলুম আমরা,' ক্ষোভ, বিক্ষোভ, খানিকটা ভর্ৎসনার বশে আগুনে গনগন করছিল জয়নাথের মনটা। ছাইচাপা আগুনের মত অস্পষ্ট চোখ নিয়ে নিশীথের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল জয়নাথ।

'অজয়নাথ কী করছে এখন?'

'আপনার চেয়ে ছোট বুঝি অজয়?'

'আমার সমান; বিজয় আর সুজয় আমার ছোট।'

'অজয় ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে এসেছে বিলেত থেকে। 'বিয়ে করে শ্বশুরের টাকায় বিলেত গিয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারি, ফার্ম খুলে বসেছে।'

'বিজয়নাথও তো ইঞ্জিনিয়ার?

'না, সে ডাক্তার, এখানকার এম-বি, বিলেত যায় নি। পসার জমিয়ে বসিয়েছে। বিলেত যাবার দরকার করে না। কোনো-কোনো মাসে আট হাজারও তো পায়। বোকামি করেছে। যুদ্ধে গিয়ে নার্স বিয়ে করে এসেছে। গ্রীক-ইহুদি! দেখতে বেশ সুন্দর, বেশ ছিমছাম, বেশ ঘরজোড়া; হেলেসপন্ট সমুদ্রের মত। কিন্তু ও-সব ফিরিঙ্গি কি আমাদের ঘরে মানাবে। আমরা চার ভাইয়ে মাগ নিয়ে এক সংসারে থাকতে চাই তো এক হাঁড়িতে।

'ফিরিঙ্গি কি করে হল? গ্রীক তো! গ্রীস তো আমাদের ইংরেজির প্রফেসরদের গয়াতীর্থ জয়নাথবাবু।'

'গ্রীক-ইহুদি।' জয়নাথবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বললে। গয়ানাথবাবুর ছেলে তিনি। নিশীথের গয়াতীর্থের কথাটা কানে বেজেছে তাঁর।

'ইহুদি তো ফিরিঙ্গি নয়,' জয়নাথকে বলতে গিয়ে নিজেকেই যেন বললে নিশীথ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সুজয় ব্যারিস্টারি পাস করে এসেছে বছর দশেক হল।'

'হাতযশ জমিয়েছে হাইকোর্টে?'

'না। হ্যাঁ, যায় হাইকোর্টে। তবে হচ্ছে না কিছু হাইকোর্টে, পেটিকোটে একটু বেশি আটকে গেছে কিনা। আমি ওকে আমাদের কলেজের হিস্ট্রির প্রফেসর বানিয়ে দিয়েছি। সাড়ে চারশ মাইনে।'

'ল পাস তো সুজয়নাথ।'

'ভাল পড়াতে পারে হিস্ট্রি।'

'হিস্ট্রিতে ট্রাইপসও তো বটে?'

'না, ওখানকার বার-অ্যাট-ল সুজয়, আর-কোনো পরীক্ষা দেয় নি। ও কলকাতা ইউনিভার্সিটির এম-এ, হিস্ট্রিতে।'

'গোল্ড মেডেলিস্ট তো হিস্ট্রিতে?'

'কে?'

'সুজয়।'

'সুজয়নাথ পড়ায় ভাল।' জয়নাথ বললে।

'ঈশান স্কলার তো হিস্ট্রিতে?'

'কে?'

'সুজয়নাথ।'

'বেশ পড়ায় সুজয়। বেশ পড়ায়। স্যাডলার কমিশন এখন এলে বড় সুবিধে হত সুজয়নাথের। পরে মাইকেল স্যাডলার', চুরুটের আগুন নিভে গেছে জয়নাথের, চুরুটটাও শেষ হয়ে গেছে আর, সেটাকে অ্যাশট্রের ভিতর ফেলে দিয়ে একটা কড়কড়ে জাভা চুরুট বের করে ফেলে জয়নাথ।

'বেশ জমিয়ে রাখতে পারে ক্লাসটাকে সুজয়নাথ,' সুজয়নাথ ঈশান স্কলার কিংবা গোল্ড মেডেলিস্ট কি না সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করতে গেল না জয়নাথ। নিশীথও খোঁচাতে গেল না আর; প্রফেসর ঘোষকে খুঁচিয়েছে, কুলদাকে খুঁচিয়েছে, কেন খোঁচাতে যাবে জয়নাথকে মিছিমিছি আর। সুজয়নাথ হয় তো ফার্স্ট ক্লাস থার্ড কিংবা থার্ড ক্লাস ফার্স্ট; একই তো কথা, আর এসব আমাদের দেশে ডিগ্রিদার মাল পয়দার ব্যাপারে। তবে আর কেন মিছিমিছি সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস কি না জিজ্ঞেস করা। সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে প্রফেসর ঘোষ, কুলদারা তো জাঁকিয়ে আছে। কত ফার্স্ট ক্লাস তো মোটা মাইনে পেয়ে মজতে-মজতেই কাটাল চিরটা কাল।

'গয়ানাথবাবুর সঙ্গে আমার বাবার খুব ভাব ছিল।'

জয়নাথবাবু টানতে-টানতে অস্ফুট স্বরে বললে, 'শুনেছি।'

'গয়ানাথবাবু যখন সস্ত্রীক ব্রাহ্ম হলেন তখন হিন্দু সমাজের আত্মীয়েরা তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল গয়ানাথবাবুকে। পথে বেরুলেই দুয়ো দিত স্বামী-স্ত্রীকে সেকালের হিন্দুরা। কোনো চাকরি নেই বাকরি নেই, এক বস্ত্রে বেরিয়ে যেতে হল। আমার ঠাকুর্দা তখন হালিশহরে চাকরি করতেন; তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন গয়ানাথবাবু, শুনেছি বাবার কাছে। গয়ানাথবাবুর আত্মীয়েরা হালিশহর পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল গয়ানাথবাবুকে, হানাবাড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠাকুর্দার ঘর কখানা। তেড়িয়া হয়ে ছুটে এসে আত্মীয়েরা পচা মুর্গির ডিম নাকে-মুখে ছুঁড়ে গয়ানাথবাবুকে নাকাল করত; বলত, বেম্মো হয়েছিল, নে খা হোমাপাখির ডিম খা; একদিন একশটা পচা ডিম দিয়ে গয়ানাথবাবুকে গঙ্গাস্নান করিয়ে দিলে; তিনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সহ্য করলেন সব। ঠাকুর্দা সে দিন বাড়ি ছিলেন না। আশ্চর্য, মহানুভব মানুষ বটে গয়ানাথবাবু। অহিংসা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রচার করেছিলেন গান্ধীজিও সেকালের ব্রাহ্মরাও নিজেদের জীবনে এ সব খুব দেখিয়ে গেলেন বটে।'

'কী হবে এ সব কথা বলে এখন?'

'শহিদদের অগ্নিযুগের কথা বলা হয়, এও আর-এক রকম অগ্নিযুগের কথা-নানা রকম সমাজ ও ধর্মসংস্কারের দিক দিয়ে।'

'কী হবে এ সব কথা এখন আমাকে শুনিয়ে নিশীথবাবু?'

নিশীথ এক টিপ নস্যি নিয়ে বললে, 'গয়ানাথবাবুর কথা বলছিলাম। এমন লোক অনেক দিন দেখি নি।'

'আমি যা বললাম সে কথার উত্তর দিন, 'জয়নাথ চুরুটটা তার মুখের কাছে তুলতে-তুলতে বললে, 'আমার বাড়িতে এসে এ সব কথার পাট নিয়ে বসেছেন, নিশীথবাবু আপনি।'

'দু'বছর রুখেছিলেন ঠাকুর্দা আর বাবা, গয়ানাথবাবুর ড্যাঁকরা আত্মীয়দের। পচা ডিম, পাঁকাল মাছ, কুকুর-শুয়োরের, মানুষের বিষ্টা ছোঁড়া দেহজ্জিপনা একা হাতে লড়ে শায়েস্তা করেছিলেন ঠাকুর্দা। সযুৎ হল, ঠাণ্ডা হল সব। দু'বছর গয়ানাথবাবুদের ভাত, কাপড় সব কিছুর ব্যবস্থা করলেন ঠাকুর্দা তাঁর নিজের বাড়িতে। আস্তে-আস্তে শান্তি এল তার পর। গয়াবাবু আর তাঁর স্ত্রী ব্রাহ্ম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেন। আপনি, অজয়নাথ, মনোরমাদি, আপনার বাবা-মার সঙ্গে আমার ঠাকুর্দার বাড়িতেই ছিলেন তখন। দু'বছর আমাদের বাড়িতে থেকে গয়াবাবুরা কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজে চলে যান। কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজে ঢুকে খুব নাম করেন গয়াবাবু। দোস্ত মহম্মদ লেনে থেকে খুব কঠিন সংগ্রাম করেন দারিদ্রের সঙ্গে। একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে হয়েছে তখন। দোর্দণ্ড লড়াই করেন জীবনের সঙ্গে গয়াবাবুরা। সে সব ছেলেমেয়েরা বেশ বড়সড় হয়ে খুব লায়েক হবার আগে মরে গেলেন তিনি আর তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রী। বাঙালি কি সত্তর-পঁচাত্তর বছর বাঁচে না? না মরে গেলে বালিগঞ্জ প্লেসের এ বাড়িতে এসে কত ভাল লাগত তাঁর। অজয়নাথের গ্রীক-ইহুদি বৌকে দেখে তিনি অখুশি হতেন না, কক্ষনো না। ভারী একটা দামাল অহ্লাদে জাক্কর দিয়ে উঠতেন গয়াবাবু। ওঁকে চিনি না আমি?'

নিশীথ ঘাড় হেঁট করে নিজের মনে বলে যাচ্ছিলেন, সোফার ওপর আসন কেটে সে সাত্ত্বিক সরলপ্রাণাদের মত ভঙ্গিতে। শত্যার্থী আশ্রমে মানুষদের তো এমনি করেই কথা বলতে দেখেছিল নিশীথ। সে ভঙ্গি অনুকরণ করে নি নিশীথ, আশ্রমের সে সব সরল সত্যাগ্রাহীদের দেখবার-শোনার আগে এ রকম চালে সে আরো অনেক কথা বলেছে। নিজেরই একান্ত ধরন সবই তার। গয়াবাবুদের কথা আরো বলতে যাচ্ছিল নিশীথ, জয়নাথের কয়েকবার মোটা গলা খাঁকারি শুনে ঘাড় তুলে প্রিন্সিপ্যালের চোখে বাঘের চোখে কেমন যেন মগডালের ময়ূরের চোখের মত তাকিয়ে রইল সে।

'তারপর, নিশীথবাবু। কী মনে করে?' খানিকটা লেজ নেড়ে চাপা গর্জ্জন করে বললে যেন জয়নাথ।

'আমি জলপাইহাটি কলেজে কাজ করছি,' ওপরের থেকে বললে যেন ময়ূর।

'তা জানি আমি।'

'কুড়ি-বাইশ বছর কাজ করেছি—সেখানে।'

'জানি আমি জানি সব।'

'কলকাতায় এলুম, মফস্বলে এখন আর মন টিকছে না।'

'কেন, সেটা পাকিস্তান হয়ে গেছে বলে?'

'না। চার-পাঁচ বছর ধরেই তো কলকাতার কলেজে কাজের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ হাতড়ে দেখছি। তখন তো পাকিস্তানের কোনো সম্ভাবনাও ছিল না।'

'আমার কলেজে কাজ চাচ্ছেন আপনি?' জয়নাথ বললে।

'শুনলুম পাকিস্তান থেকে পারানি পাখির ঝাঁকের মত ছেলে আসছে আপনার কলেজে। কলেজের নতুন ঘরদোর তৈরি করছে রাজমিস্ত্রিরা, দেখে এলুম তো'—

'এই-ই বুঝি দেখছে পাকিস্তানের ছেলেরা আর প্রফেসররা', জয়নাথবাবু চুরুটে ধীরে-ধীরে দুটো নিট নিঃঝুম টান মেরে বললে, 'নাঃ, বেশি কী আর ছেলে এসেছে পাকিস্তান থেকে আমাদের কলেজে; যত রব বটে তার আঁশ বাতাসে কিছু এসেছে। না, সে সব কিছু না।'

'কত এল?'

'বেশি হলে হাজার দুই-আড়াই। তাতে কি আর মাল হয়?'

'কত ছেলে আছে কলেজে?'

'কী হবে তা জেনে? ভাইস চ্যান্সেলারকে গিয়ে বলবেন যে পাকিস্তান থেকে চলে এসেছি, সঙ্গে দু'হাজার ছেলে ঝেঁটিয়ে এনে জয়নাথের কলেজে ঢুকিয়েছি; ওকে কাজ দিতে বলুন, এই তো বলবেন?'

নিশীথ পকেট থেকে নস্যির কৌটোটা বার করে এক টিপ নস্যি নেবার জোগাড়ে ছিল। জয়নাথ নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে এক বার নিজের চুরুটের দিকে তাকান, এ চুরুটটারও বারটা বাজাচ্ছে প্রায়।

'না, ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে আমি যাব না।'

'হয়ে এসেছেন তো তাঁর কাছ থেকে।'

'না। আমি যাই নি।'

জয়নাথের সন্দেহ হচ্ছিল। অবিশ্যি ভাইস চ্যান্সেলার কিংবা অন্য বড়-বড় লোক—এমন কি অ্যাসেম্বলির—এমন কি মিনিস্ট্রির—জয়নাথের কলেজের ভেতরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আসবেন না। দূর থেকে সামান্য একটু চাপ দিতে পারেন হয় তো। দূর থেকে। সে চাপের কোনো অর্থ হয় না। জয়নাথের কলেজ তার নিজের কলেজ। আর-এক রকম চাপ আছে বটে। দুয়ারে মোটর দাঁড় করিয়ে, বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়ে, ওপরওয়ালারা যা ছিনিয়ে নেন। কিন্তু সে প্যাঁচ নিশীথের হয়ে কষতে আসবে বুঝি কেউ? ও জানে কি কলকাতার! পোছে কে ওকে? ও তো মফস্বলে কুড়ি-চব্বিশ বছর পড়েছিল। নিশীথ আড়াই চাল মারবে ভেবেছে জয়নাথকে গয়ানাথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে! খাজা। চারপেয়ে খাজা। মফস্বলেরই। নিশীথের ঠাকুর্দার বাড়ি দুটো বছর খেয়েছে-পড়েছে বটে জয়নাথের বাবা গয়ানাথ মজুমদার আর তাঁর পরিবার, তাঁদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল যখন। সেটা মিথ্যে কথা নয়। কিন্তু জয়নাথরা ব্রাহ্ম সমাজে আছে কি নেই ঠিক বলতে পারে না জয়নাথ। বিশ-চল্লিশ বছর আগে বাবার সেই আদর্শ, যেমন পচা ডিমের পিচকিরিতে পোঁদ ভিজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, নিশীথের ঠাকুর্দার বাড়িতে খেয়ে-পরে ধর্ম্মের লড়াই করা, এ সব জিনিসের বিষ মরে গেছে আজকাল; বাবা যদি আজ বেঁচেও থাকতেন তা হলে নিশীথকে জয়নাথের কলেজের কাজে ঢুকিয়ে দিতে বলবার মত মুখ থাকত কি আর তার? কিন্তু তিনি তো বেঁচে নেই, সমাজে জীবনে কলেজে কোথাও কোনা প্রতিপত্তি আছে কি তাঁর? দেখছে না তো কোনো দিকে তাঁর কোনো প্রভাব। দিন-রাত চুরুট সিগারেট টানছে জয়নাথ, নিয়মিতভাবে মদ খাচ্ছে জয়নাথ, কলেজের টাকা তিন ভাইয়ে মিলে পাচার করছে, তবুও জাঁকিয়ে রয়েছে কলেজটা। খুব বাহবা পাচ্ছে তাই তারা। পুব বাংলার কলেজগুলো ফতুর হয়ে পশ্চিমবাংলার কলেজগুলোকে ছেলেতে-ছেলেতে ফাঁপিয়ে তুলল, খুব ঢাকে কাঠি নাচছে জয়নাথদের; জয়নাথের মেজ শালির বড় মেয়ে, মোড়লের সঙ্গে বিয়ে হল যার, সে মেয়েটির বাবা তো জয়নাথ, মেসোও বটে, কিন্তু মেসোর চেয়ে বাবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বেশি বলেই নিজের কাজ, ঘরের কাজ, গুষ্টির কাজ, কলেজের একশ রকম দাঁও মারবার কাজ ফেলে, সেই ভোরে বাসি মুখে নিজের মোটর হাঁকিয়ে বসিরহাট গিয়েছিল তো সে। বিয়েটা ভাঙবার চেষ্টায়ই গিয়েছিল, পারল না, মেজো শালি সুনয়নী কিছুতেই দিল না। নানা কথা ভেবে দেখছিল জয়নাথ। জয়নাথের নিজের পরিবারের, সমাজের, কলেজের এ সব কোনো রকম ব্যাপারে বাবার কোনো গাঁউখুরি টের পাচ্ছে না আর জয়নাথ। নেই। নেই-ই তো। কিছুই নেই আর।

'গত বছরে আপনার কলেজে মাস্টারি কাজটা পেয়ে যাব ভেবেছিলুম।'

'পেলেন কোথায় আর', একটু চিন্তিতভাবে জয়নাথ বললে। নিশীথের বিষয়ে নয়, অন্য কথা ভাবছে জয়নাথবাবু। সুনয়নী কেমন বুড়ো হয়ে গেছে; তবুও মন্দ নয়। কিন্তু বালিগঞ্জ প্লেসে কিছুতেই আসতে চায় না। কিছুতেই এল না। এক রাতের জন্যেও না। রমলা কার মেয়ে সেটা একেবারেই ভুলে গেছে সু। 'সে কাজটা মতিমোহনবাবুর ছেলেকে দিতে হল।'

'মহিতমোহনবাবু কে?'

'আমার মাথা আর মুণ্ডু। শোরহাওয়ার্দি মিনিস্ট্রির সময় একটা বড় চাঁই ছিলেন। এখন তো গড়াচ্ছেন। দশ বাঁও জলের নিচে তলিয়ে গেছেন।'

'মতিমোহনবাবুর ছেলেকে রেখেছেন আপনাদের কলেজে?'

'নাঃ। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, পনেরই আগস্টের আগেই স্যাডো মিনিস্ট্রি হতে না-হতেই।'

'তাড়িয়ে দিতে হল!' নিশীথ একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে বললে।

'সেকেন্ড ক্লাস তো।'

'ঢুকেছিল কি ফার্স্ট ক্লাস ভাঁওতা দিয়ে?'

'চোখ মেলেই ঢুকিয়েছিলুম। কিন্তু স্যাডো মিনিস্ট্রির রাজ্যি; আর-একজন লোককে নিতে হল তার শাশুড়িকে খুশি করবার জন্যে।'

'শাশুড়ি?' নিশীথ জয়নাথকে না বলে নিজেকেই যেন বললে আস্তে-কোনো উত্তর দাবি না করে-শাশুড়ির সঙ্গে স্যাডো মিনিস্ট্রির কী সম্পর্ক?'

'তা হলে কি শ্বশুরের সঙ্গে হবে?' জয়নাথ চুরুটে আস্তে টান দিয়ে বললে, 'পিসশ্বশুর তো সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, মাসিশাশুড়ির পেছনে।' নিশীথ নস্যির কৌটোটা খুলে নাকের বাঁ ছ্যাঁদায় ডান ছ্যাঁদায়, ডান ছ্যাঁদায় বাঁ ছ্যাঁদায়, বিদ্যুৎক্ষিপ্রতায় ঘন-ঘন খানিকটা সাঁটিয়ে নিয়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথাটাকে খাড়া করে, লালচে চোখ পাকিয়ে, চারদিকে এক বার তাকিয়ে, রুমালে মুখ-নাক ঝেড়ে নিল।

'ছায়া মিনিস্ট্রি তো বাস্তব হল, ঘোষ মিনিস্ট্রি গিয়ে রায় মিনিস্ট্রি এল। কী হল এই সব এলোমেলো ব্যাপারে সেই প্রফেসর লোকটির?'

'এক জন কি আর, কত প্রফেসর বহাল করছি, বিদায় দিচ্ছি আমরা। আপনার ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের কথা বলছিলুম, ইংরেজির সেই প্রফেসরটি ভাল কাজ পেয়ে চলে গেছে ঘোষের আমলেই।'

'কেউ এসেছে সে জায়গায়?'

'রাখতে হয়েছে। লোক রাখতে হয়েছে।'

'আরো তো লাগবে প্রফেসর আপনাদের।'

'ছেলে বেড়ে গেছে, টিউটোরিয়াল ক্লাসও বেড়েছে,' নতুন আর-একটা চুরুট হাতে নিয়ে জয়নাথ বললে। এখন তার একটু ড্রাই জিন খাবার সময়।

'তা ছাড়া জেনারেল ক্লাসে এক-এক সেকশনে দুশ মেয়ে দুশ ছেলে, এটাও কি ঠিক?'

'দেখা যাক দেড়শ-দেড়শ করে বাড়িয়ে দিতে পারা যায় কিনা। আরো প্রফেসর লাগে তাতে। বড্ড খরচ।' জয়নাথ চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে।

'আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন আপনার কলেজে।'

'সত্যিই আসছেন কলকাতায়?' চুরুটে টান দিয়ে সহানুভূতি সাজিয়ে বললে জয়নাথ।

'আপনার কলেজে কাজ পেলে তো গত বছরেই আসতুম।'

তাই মনে করে বুঝি লোকটা? ড্রাই জিনের কটা বোতল তো ফুরিয়ে গেছে, না কি একটা আছে? হুইস্কি আছে-খুব ভাল স্কচ। সুজয়নাথ আসে নি এখনো, হয় তো রাতের বারফট্টাই শেষ করে। এই পাড়ার, জয়নাথের নিজের এলেকার, কয়েকটি মেয়েকে যে লেত্তির মত হাতে বাগিয়ে রাখতে চাচ্ছে সুজয়নাথ সেটার কী হবে? তাকে কী দেওয়া হবে তা? রাষ্ট্র, সমাজ, কলেজ সব তো সব। সম্প্রতি খাগড়ার কথা ভাবছিল জয়নাথ।

'আপনি তো সেকেন্ড ক্লাস নিশীথবাবু।'

বাক্স থেকে সিগারেট বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে নিশীথ বললে, 'কত তো সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস রয়েছে কলকাতার প্রফেসরদের মধ্যে। চারশ-পাঁচশ টাকাও তো পায় তারা।'

'অনেক আগে ঢুকেছিল তারা।'

'এখনো তো ঢুকছে।'

'জুতে দিতে পারে এ রকম মানুষ সঙ্গে করে নিয়ে আসুন আপনি, আমি আমার কলেজে আপনাকে ঢুকিয়ে দেব। ঘোষকে আনুন না, চাকলাদারকে আনুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রফেসর ঘোষকে?' প্রফেসর অভয়েন্দ্রমোহন'—

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তিনি মোটরে এসে একটু চেপে ধরলেই তাঁকে চেপে ধরব আমি। আপনারও হয়ে যাবে, আমারও হবে।'

নিশীথ সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, 'ঘোষ কি ভাইস চ্যান্সেলার হচ্ছেন?'

'বেনারস ইউনিভার্সিটির?'

'কোন ইউনিভার্সিটির জানি না'—

'তা হতে পারেন। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে যেতে পারেন।'

'কে পাচ্ছে ঘোষকে?' তাঁকে আমি পাব কী করে?'

'মোহিতা ঘোষকে বলে দেখতে পারেন।'

'কে মোহিতা ঘোষ?'

'জানেন না? ঘোষের স্ত্রী!'

নিশীথের হাতে সিগারেট জ্বলে যাচ্ছিল, একটু ঝাঁকি দিয়ে ছাই ঝেড়ে ফেলে বললে, 'অনেক ওপরের লোক তো এঁরা এঁদের নাগাল পাওয়ার সাধ্যি আমার নেই।'

জয়নাথের এখন নিতান্তই এটা-ওটার দরকার—তামাকের ধোঁয়ায় সুঁটকি মাছের গন্ধ পাচ্ছে সে।

জয়নাথ কয়েকবার জোরে শুষে চুরুটটা টেনে নিয়ে রাশি-রাশি ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললে, 'প্রফেসর ঘোষের চেয়ে মোহিতা ঢের কঠিন। কিন্তু কেউ-কেউ তাকে বেশ হাত করে নিতে পারে। ওদের বাড়িতে নৃপেন বলে একটা ছোকরা থাকে। শুনেছি তার সঙ্গে মোহিতার কী সব অদ্ভুত সম্বন্ধ।'

জয়নাথ একটু চোখ টিপে, হেসে, মুখ ভার করে, চুরুট টানতে গিয়ে চুরুটটা নামিয়ে, কেমন নিঃশব্দ মাংসলোলুপ মুখে বসে রইল।

'কে বলেছে, কোথায় শুনলেন এ কথা জয়নাথবাবু?' নিশীথ তার পাঞ্জাবির গলার বোতামটা খুলতে আর-একটা বোতামও খুলে ফেলল।

'আপনি তো কলকাতায় থাকেন না। কী করে জানবেন। আমরা কেউ-কেউ জানতে পারি সব।'

এইবার জয়নাথ উঠবে হয় তো। নাকি আরো গেড়ে বসবে। কিন্তু নিশীথকে উঠতে হবে বোধ হয়। জয়নাথের এখন অন্য নানা রকম আয়োজনের সময় এসে পড়েছে। ধরাছোঁয়ার ভেতরে কিছু নেই যেন চারিদিকের আবহাওয়ার ভেতর, কিন্তু তবুও ধোঁয়াটা কেমন ফলাও করে পেকে উঠছে জয়নাথের চুরুটে। রাত বাড়ছে। ধোঁয়া পাকছে। একটা চুরুট চেয়ে নিলে হত জয়নাথের কাছ থেকে। চাকরি সে নিশীথকে কিছুতেই দেবে না, প্রফেসর ঘোষ বা মহিলাদের কাউকে সঙ্গে করে এনে তাকে দিয়ে জয়নাথকে বেশ ভাল করে মকরধ্বজ না মাড়িয়ে দিলে। খুব সম্ভব চেষ্টা করলে মিসেস ঘোষকে আনা যায় এ বাড়িতে নিশীথের কাজের সুরাহা করে দেবার জন্যে?

'না, না, মোহিতা ঘোষের সঙ্গে আর দেখাই করবে না হয় তো নিশীথ। দেখা করলেও অন্য অনেক দূরের জিনিস নিয়ে। চাকরি-বাকরির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

'আমিও একটা সম্বন্ধ পাকাতে চেষ্টা করেছিলুম মোহিতা ঘোষের সঙ্গে, জয়নাথ বললে, 'কিন্তু কিছুতেই পারলুম না। ভারী চমৎকার মেয়ে। কিন্তু বড় কঠিন।' মোহিতার সঙ্গে বেশি মেশে নি নিশীথ। প্রফেসর ঘোষের চেয়ে উঁচুদরের মেয়ে মোহিতা। কিন্তু জয়নাথ তাকে নিচের দিকে ঠেলতে চাচ্ছে বুঝি? সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলে কঠিন মনে হচ্ছে মোহিতাকে? নৃপেনের সঙ্গে মোহিতার কোনো সম্বন্ধের কথা সেই জন্যেই বুঝি জুড়ে দিচ্ছে জয়নাথ!

'একটা কাজ দিতে হবে আমাকে আপনার কলেজে।'

'আপনি তো সেকেন্ড ক্লাস এম-এ নিশীথবাবু।'

'কত সেকেন্ড ক্লাস তো কলেজে প্রিন্সিপ্যালি করছে—'

'অনেক আগে ঢুকেছিলেন ওঁরা। আমাদের কলেজে কমার্সে কাজ নেবেন?'

'কত, মাইনে হবে জয়নাথবাবু? দুশ পাওয়া যাবে?'

'না, একশর বেশি দিতে পারব না আমরা; টেম্পরারি বেসিসে। তবে এখন কোনো ভেকেন্সি নেই। হতে পারে, শকুনের বাচ্চারা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে খোঁজ নেবেন আপনি, আচ্ছা?'

জয়নাথবাবু উঠে ভেতরে চলে গেল। সুজয়নাথ ঢুকে পড়ে নিশীথকে বাইরে যাবার জন্যে অনুরোধ জানাল, ঘরে মেয়েরা আসবেন। নিশীথকে চেনে বটে সুজয়নাথ, কিন্তু চিনতে চাইল না। জয়নাথের মত বোকা সে নয়। দোস্ত মহম্মদ লেনের আবহাওয়াটা এখনো ভাল করে কাটিয়ে উঠতে পারে নি জয়নাথ, কিন্তু কোনো মা ছিল না যেন কোনো দিন, জয়নাথের বৌয়ের মত, সুজয়নাথের। বালিগঞ্জ প্লেসের হল-ড্রয়িংরুমের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে যেন সে। একে দিয়ে অন্তত 'কি নিশীথবাবু কেমন আছে, বসুন', বলিয়ে নেবার জন্যে মোহিতা ঘোষকে সঙ্গে করে এ-বাড়িতে এক দিন ঢুকতে ইচ্ছে করে নিশীথের। এই ছেলেটিকে দেখলে এমনই ছেলেমানুষ হয়ে পড়ে মানুষের মন। কিন্তু তবুও মিসেস ঘোষ ছেলেমানুষ নন, নিশীথও নয়, সুজয়নাথও টেস্ট টিউব নয় এখন তার-জয়নাথের কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল।

'দাদা ওপরে চলে গেছেন। এইবারে দরজা বন্ধ করব,' সুজয়নাথ বললে। 'হ্যাঁ যাচ্ছি,' নিশীথ বললে।

জলপাইহাটি মন্দ লাগছিল না হারীতের। কলকাতায় হারীতের মন যে-দিকে ঝুঁকেছিল সে সব বিপ্লবের, রক্ত-বিপ্লবের কোনো কাজ যে এখানে নেই তা নয়। তবে কোনো দল নেই, এমন কোনো বিশেষ লোককে সে দেখছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না যার কাছে গিয়ে নিজের মনের আগুনের ওপর আলোর কথাগুলো পাড়তে পারে হারীত। কলকাতায়ই হারীতের মনটাকে বুঝে দেখবার মত, মতটাকে অনুসরণ করবার মত মানুষ খুব কম ছিল। অনেক কষ্ট করে তাদের খুঁজে বের করতে হয়েছে, কোনো-কোনো জায়গায় বেশ সহজেই যেন হারীতের বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছে তারা, অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য সাধন করতে হয়েছে হারীতকে—একে, ওকে, তাকে, নিজের কথাটা ধরিয়ে দেবার জন্যে। কাজে অবিশ্যি হয় নি কিছু, কবে কোনো দূর ভবিষ্যতে খুব বৃহৎভাবে কাজ হবে সেই জন্যে অল্প-অল্প সংগঠন চলছিল কলকাতায়। হারীতের অভাবে কলকাতায় তার হাতে গড়া মানুষগুলোর অবস্থা কী রকম দাঁড়িয়েছে কে জানে? ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে হয়ে তো সব। আজ কাল কেউই আর দেশের, ঠিক বলতে গেলে মানুষের, খাঁটি স্বাধীনতা ও শান্তির জন্যে নতুন করে স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। অনেকেরই মনের ভাব এই যে, স্বাধীনতা পাওয়া হয়ে গেছে, আবার কী, এবার সকলেই সবচেয়ে আগে যে-যাকে পারে, পায়ে মাড়িয়ে মুখে রক্ত তুলে, ছুটে আস্বাদ করবে, উপভোগ করবে চারদিককার সাতসুতরোর ভেতর অফুরন্ত ভালুকের মত। কিন্তু সেটা কি কোনো ভাল রাষ্ট্রব্যবস্থা হল? কিন্তু এও তো হচ্ছে না। আমাদের দেশে, আমেরিকায়, হয় তো এ রকম, কিন্তু পৃথিবীর প্রায় অন্য কোনো জায়গায়ই এ টুকু মজা লুটবারও অবসর নেই। বিশৃঙ্খল অপ্রতুলতায় মরছে না তারা, উচ্ছৃঙ্খল অত্যাভাবে নিকেশ হয়ে যাচ্ছে। দেখে এসেছে সে কলকাতায়-পশ্চিমবাংলায়-ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে। থামাবে কে এ সব? মানুষকে বোঝার সোজা পথটা নয় কঠিন, নইলে পথটা দেখিয়ে দেবে কারা? সত্যিই সুবিচার তৃপ্তি, শান্তি স্বাধীনতা এনে দেবে? জানা যাবে সেই জলপাইহাটিকে, যাকে নিজের আশা ভরসার পীঠস্থান বানানো সম্ভব নয় হারীতের পক্ষে। তাকে চলে যেতে হবে আবার কলকাতায়, কিংবা আরো দূরে ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের অন্তস্তলের আবহাওয়ার ভেতরে, যা ভাল হয় তাকে শোধিত, বিদূরিত করবার জন্যে, যা ভাল তাকে সঞ্চারিত করে দেবার জন্যে। এখানে জলপাইহাটিতে কেমন একটা অদ্ভুত অনিশ্চয়তার ভেতর নিরবচ্ছিন্ন নিঃস্ব হয়ে ঘুরে ফিরছে সমস্ত অবুঝ ও বুদ্ধিমান। এদের অনেকেই দেশ ছেড়ে চলে গেছে, রোজই যাচ্ছে-এখনো যাচ্ছে। এদের এখানে থাকতে বলেছে হারীত—রোজই একবার তার রোঁদে ঘুরে আসবার সময় এইখানেই এদের থেকে যেতে বলছে। হারীতের কথা শোনবার মত মনের অবস্থা এদের নয়। মন পশ্চিমের দিকে ছুটছে, এখন কি এরা আর পদ্মার পাড়ে পড়ে থাকবে? কি আশ্চর্য অবর্ণন সমৃদ্ধি আছে এই পদ্মা-মেঘনার দেশে, মানুষ যদি আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে একটু সুস্থিরভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা করত, কাজ করতে শুরু করে দিত, এ দেশের ও দশের নয়, পৃথিবীর আশ্চর্য মানবধন্য নাট্যটাকে ভালবেসে; কিন্তু এরা আছে কি নেই, সেই হুঙ্কার শুনে, ছিটের ফতুয়া-জামা পরে, দেখ, ডোরাকাটা জেব্রার মত ছিটিয়ে-ছিটিকে হাওয়া দিচ্ছে সব। দুরন্ত জেব্রার মত এরাই না, না, সে রকম প্রাণবন্তভাবে ছুটে গিয়েছিল আমেরিকা—অস্ট্রেলিয়ার ওজস্বী উপনিবেশীরা, এরা কীটপতঙ্গের মত আগুনের থেকে বড় আগুনের দিকে ঝাঁপিয়ে চলেছে। কলকাতায় বাড়ি নেই, চাকরি নেই, খাদ্য নেই। মৃত্যু আছে—তবুও পেঁচোয় পাওয়া বাচ্চাদের মত মুখ থুবড়ে পড়ছে গিয়ে কলকাতার অলিতে-গলিতে ফুটপাতে।

তা হলে জলপাইহাটিতে হারীতের সবচেয়ে বড় কাজ কি এখন এদের থামিয়ে রাখা? হারীত ভেবে দেখছিল কিছু কাল থেকে। এ কাজটা সে নিলেও নিতে পারত তার হাতে। কিন্তু তবুও নিচ্ছিল না। কলকাতায় যেন সবচেয়ে ভাল কাজ নিয়ে ডুবে ছিল সে। দেশ স্বাধীন হলেও তাকে সত্যিই স্বাধীন ও সফল করে তোলা বড় বিপ্লবের ভেতর দিয়ে, দরকার হলে বিপ্লবকে অব্দি শুধরে সফল করে আশ-পাশে নিয়ে আসা। এখানে এসে বিশ্রাম করছে হারীত, কথা ভেবে নিচ্ছে, সবচেয়ে ছোট-ছোট জিনিসে হাত দিচ্ছে সে। সবচেয়ে প্রথম ছোট জিনিস, নিজের শরীরটিকে সারিয়ে নিতে হবে, মাকে সারিয়ে তোলার চেয়েও বেশি সনির্বন্ধ হয়ে। পরিশ্রমে, অখাদ্যে, রোগে হারীতের শরীর ভেঙে পড়েছিল কলকাতায়। প্লুরিসি হয়েছিল কয়েকবার। যক্ষ্মা হয়েছে বলে মনে হয় না। রোজই রাতে জ্বর হয় এখনো যদিও, তবুও এ উপসর্গটা কমে এসেছে, শরীরে আগের চেয়ে বেশি স্বাদ পাচ্ছে সে। কাল রাতে জ্বর হয় নি। অর্চনা যে থার্মোমিটারটা দিয়েছিল বার-বার জিভের গোড়ায় ঠেলে বেশ হুঁশিয়ার হয়ে দেখে নিয়েছে সেটার টেম্পারেচার কয়েকবার কাল রাতে জ্বর হয় নি। টিউবারকুলোসিস হয়েছে কি না, এ বিষয়ে নিজের মনে সন্দেহ হয়ে গিয়েছিল তার, নরেন ডাক্তারেরও; কিন্তু দু-একদিন হল হারীতের মনে হচ্ছে যে টি-বি সত্যিই হয় নি তার; হয় নি যে এ বিষয়ে তার নিঃসন্দেহ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ভাল লাগছে তার। কথা ভাবতে-ভাবতে হাঁটতে-হাঁটতে অনেক দূরে চলে গেল সে—লালপুরের রাস্তার পাশে মস্ত বড় একটা দেশে, কাছেই ঘনিয়ে আসছে সুলেখাদের বাড়ি। কৃষ্ণচূড়ার গাছ আগুন জ্বালিয়ে উড়ছে রোদের বোশেখের বাতাসে। এক রাশি বোলতা ভীমরুল মৌমাছি রোদে ঝিকমিক করে জিন পরীদের মত উড়ে বেড়াচ্ছে যেন; এদেরই রক্তের বিষাক্ত সুধার উষ্ণতা উছলে উঠে যেন অবাধ অঝোর রক্তিম ক্যানাফুলের উজ্জ্বলতায় সুলেখাদের বাড়ির সামনের অনেকখানি সবুজ ঘাসকে নিবিড় করে রেখেছে। আঃ, কী চমৎকার এ পৃথিবীর বসন্ত ঋতু, গ্রীষ্ম ঋতু, কী চমৎকার ঐ খণ্ড নীলে সাদা মেঘ। বড়-বড় সাদা মেঘ ডাবের জলে মেশানো দুধের উষ্ণতার মত এই রৌদ্রের ভেতর—দুপুর এসে পড়েছে, জমে উঠেছে, দুপুর ফুরিয়ে যাচ্ছে যেন, বিকেল কথা বলছে যেন কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার ভিতর। কোনো বেদনা নেই, মানুষের হৃদয়কে সৌরভ দিয়ে মৃত্যুর যে-ধ্বংসকীট রেখে যায়, সময়, থেকে-থেকে তার ছায়াপাত ছাড়া। শুঁড় আছে এই কীটের; শুঁড় আছে, ছায়া পড়ে। কোনো বেদনা নেই, এই সরস নিঃশব্দ বিপদের কালিমা ছাড়া।

'তুমি যে আসছ আমি দেখছিলুম হারীত—'

'আমি ক্যানাফুল দেখছিলুম তোমাদের বাগানের। কী চমৎকার সবুজ ঘাস ঘিরে বোলতা-মৌমাছির হুলের জ্বলুনি-পুড়ুনির ভেতর থেকে ফুটে বেরিয়েছে যেন এই সব ক্যানাফুল—ইস! কী লাল।'

'রক্ত রঙই ভাল লাগে তোমার হারীত। বিপ্লব করছ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ক্যানাফুল খুব ভাল লাগে তোমার?' সুলেখা বললে।

'কিন্তু দেখা গেছে যে অনেক মানুষই বিশেষত যারা গেড়ে বসেছে, সমাজ চালাচ্ছে, রাষ্ট্র চালাচ্ছে, লুটছে, তারা এত অবোধ যে তাদের হৃদয়ের মোড় ঘুরিয়ে ঠিক দিকে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কী করে উন্নতি হতে পারে তাদের ধ্বংস না করে?'

'বাবা, কেমন মারমুখ হয়ে কথা বলছে, ছেনি-টেনি সঙ্গে নিয়ে এসেছ নাকি, হারীত?'

সুলেখার দু'বছরের বড় বোন মনোলেখা ওরফে জুলেখা এসে বললে, 'হরির মত দুটি বোন। ভাই নেই, বাবা নেই, নেই কোনো আত্মীয়-স্বজন, শুধু মা আছেন, এক-আধটি চাকর আছে।'

'আমি আসছি হারীত, এখুনি আসছি, তুমি কিন্তু পালিয়ে যেও না,' বলতে-বলতে জুলেখা পাশের ঘরে চলে গেল। পাশের ঘরের কিনারা দিয়ে সিঁড়ি চলে গেছে দোতলার দিকে—ছাদের দিকে; সেই দিকে চলে গেল নাকি জুলেখা? চোত-বোশেখের রোদ বাতাস, বাতাস রোদের ঝাঁঝের সঙ্গে সত্যিই কেমন মানিয়েছে এই ফুলগুলো। পাশে সবুজ ঘাস রয়েছে, মাথার ওপরে নরম নীল, সব সময়ই হুড়-হুড় করে ছুটে আসছে অশরীরী বাতাস। বেশ দেখায় কিন্তু এ সবের ভেতর এই আগুনের জাত ফুলগুলো—

'কলকাতায় এত বড় একটা দাঙ্গা হয়ে গেল বছর দেড়েক আগে। আমরা ছিলুম সে সময় কলকাতায়। মা, জুলেখা, আমি'—

'জুলেখা তোমার দিদি তো'—

'ওকে আমি জুলেখা ডাকি,' সুলেখা বললে, 'তোমাকে তো হারীত ডাকি, জুলেখা আর আমি। কত বয়স তোমার?'

'আমার ত্রিশের কাছাছিল—'

'দিদির তো একুশ, আমার উনিশ। তুমি কি আমাদের চেয়ে অনেক বড় হারীত?'

'কী মনে হয় তোমার?'

'তোমাকে যদি খুব বড় মনে হত, কাছে ঘেঁষতে বাধো-বাধো ঠেকত, তা হলে তোমাকে হারীত কাকা ডাকতুম। কিন্তু তা তো নয়। তবে, তুমি যদি চাও তোমাকে হারীতদা ডাকতে পারি, জুলেখা তো মনে-মনে ডাকে,' সুলেখা বললে, 'কিন্তু তোমাকে হারীত ডাকি বলে তুমি আমাদের ভিতর এক জন হয়ে গেছ মনে করো না কিন্তু'—

'তোমাদের ভেতর এক জন হয়ে গেছি? মানেটা ঠিক বুঝলাম না সুলেখা!'

'তোমাকে হারীত ডেকে খেলা করছি না। তোমাকে আমরা মর্যাদা দিচ্ছি।'

'জোর করে?' হারীত মুখ ভারী করে হেসে বললে।

'না। যা প্রাপ্য তার চেয়ে কম দিচ্ছি; আমি অনেক কম, জুলেখা আমার চেয়ে বেশি দিচ্ছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'তুমিও তো দাঁড়িয়ে আছ।'

'চল, ঘরের ভেতরে যাই।'

'এই বারান্দায়ই ভাল, বেশ বাতাস, আলো, ঘাস, আকাশ, ক্যানাফুল। গোটা তিনেক বেতের চেয়ার এনে বসলে হয় এখানে।'

'তিনটে কেন? আমরা তো দু-জন।'

'জুলেখা তো আসছে বলে গেল।'

'সুলেখা একটু ঘাড় কাত করে দু-তিনটে লম্বা কাল চুল মাথার থেকে মুখের, গালের, ওপর দিয়ে নিচের দিকে টেনে বীণার তারের মত টান করে রাখতে-রাখতে বললে, 'ও, তার কথা ভাবছ বুঝি তুমি?'

'কোথায় গেল তোমার দিদি?'

'আমি দেখি নি তো!'

'এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও?'

'আমি দেখি নি'—বীণার তারের মত টান-টান রেশমি চুল কটা ছেড়ে দিয়ে মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সুলেখা বললে।

'আসবে তো জুলেখা।'

'তুমি যদি সকালবেলা আসতে—জুলেখা তো ছিল বাড়ি সমস্তটা সকাল।'

কেমন যেন অত্যধিক সারল্যে জুলেখার কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল হারীত; ঠিক ততটা সরল না হয়ে উত্তর দিয়ে হারীতের অতীত ঐ বাইরের পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল সুলেখা।

হারীত তাকিয়ে দেখল, অনেকগুলো বোলতা ওড়াউড়ি করছে রোদের ভেতর। বাতাসে টাল সামলাতে না পেরে হিল্লোলিত হচ্ছে, ছটকে যাচ্ছে, ছিটকে পড়ছে, একেবারে সুলেখার মুখের ওপরেই এসে পড়েছে যেন একটা; ঠিকরে পড়ল বাতাসে আর-একটা ঝটকায় সুলেখার গালের ওপর—

'ধরো না ধরো না সুলেখা, কিছু বলবে না, টিপে ধরো না।'

'উ-হু-হু-উ-উ—আমাকে হুল ফুটিয়েছে হারীতদা।'

'কেন ধরতে গেলে?'

'আ-আ, বড্ড জ্বালা করছে। আঙুলে কামড়েছে,' গালে আঙুল ঝাড়তে ঝাড়তে সুলেখা বললে, 'না, বেশি কামড়ায় নি, আমি একটা পাতার রস ঘষে আসি—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'স্পিরিট আছে?'

'কেরোসিন আছে। আমি একটু পাতা ছেঁচে ঘষব, আচ্ছা ঐ ক্যানাফুলের ঝাড়ের পাশে এমন সুন্দর ঘাস-ঘষলে আরাম পাওয়া যাবে না? পাওয়া তো উচিত। ও-রকম স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা জিনিস কেন মানুষের জ্বালা জুড়িয়ে দেবে না?'

'কেরোসিন আছে বললে?'

'আমার ব্যথা কমে গেছে। আচ্ছা দেখো তো, আঙুলটায় হুল ফুটিয়েছে না কি?'

সুলেখার ডান হাতের অনামিকাটা ধরতে গেল না হারীত। মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠ তিনটেকেই হারীতের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল সে, যে-আঙুলে বিষ ঝেড়েছে সেটাকেই নির্দেশের মত ঝাড়ছে।

হারীত এগিয়ে এল না, মাথাটাও একটুও ঝুঁকে পড়ল না তার, যেখানে দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে সুলেখার আঙুলের ওপর চোখটাকে ঝুলিয়ে বিঁধিয়ে রেখে বললে 'না, হুল ফোটায় নি।'

'তোমার কি চিলের মত চোখ হারীত?'

'বেশি ফোটায় নি—'

'আঙুলটা ফুলেছে—'

'বেশি ফোলে নি।'

'কম ফুরেছে?'

'তোমার কি ব্যথা আছে?'

সুলেখা হাত সরিয়ে নিয়ে গ্লিব প্লিব ক্লিবল্ ক্লিবল খিখি ক্লিখি ক রে হাসতে লাগল।

'তোমার ব্যথা কমে গেছে', হারীত যেন নিজেকে, কলকাতার ও বাইরের ব্যথিত পৃথিবীটাকেও, আশ্বস্ত করে শান্ত স্নিগ্ধ গলায় সুলেখাকে বললে। হাসি পেল সুলেখার।

সুলেখার ব্যথা কমে গেছে, বলছে কী হারীত? হারীতের কণ্ঠস্বরের ও মনের বড় বিচ্ছিন্ন ব্যাসভূমিটাকে উপলব্ধি করে সুলেখার আঙুলের প্রতীকভূমিতে কথাটা লেগে আছে যেন, রক্তমাংসের আঙুলে ব্যথাটা কমে বাড়ে বটে।

'চলো, ঘাসের ওপর গিয়ে বসি।'

'কোথায়? ঐ সব থোকা-থোকা রাধাফুলের পাশে?'

'কোথায় গিয়েছে জুলেখা? হ্যাঁ, ক্যানাফুলের ঝাড়ের কাছে বাগানের ঘাসে। চলো।'

চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে ভাল করে তাকিয়ে দেখে সুলেখা বললে, 'সকলের চোখ পড়বে ওখানে বসলে। ওটা তো একেবারে খোলা জায়গা। লালপুরের পথ এ দিকে। পূবে সদর রাস্তা। চারদিকে নানা ধাঁচের লোকের ঘরবাড়ি। দিন-কাল বড় খারাপ হারীত।'

'তা তো জানি,' হারীত বললে, 'মানুষ চাইলে কী হবে, মানুষই তাকে কিছু করতে দিচ্ছে না।'

'কোথায় বসবে তা হলে, বারান্দায়?'

'চলো, ভিতরে যাই,' ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে সুলেখা বললে, 'তুমি কি এখানেই থাকবে, জলপাইহাটিতেই থাকবে হারীত?'

'আমার আসল কাজ তো কলকাতায়—'

'ছোট কাজগুলো হয়ে গেছে?'

'না, শুরুও তো হল না।'

'সেগুলো শেষ করে কলকাতায় যাবে তো?'

'তাই তো হচ্ছে—'

'এই দিকে এসো—'

'ঐদিকে? দোতলায় যাবে?'

'হ্যাঁ, চলো, দোতলার চিলেকোঠায় বসি গে।'

'জুলেখাকে দেখেছিলাম দোতলায় যেতে? দেখেছিলে তুমি?' সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে-উঠতে হারীত বললে।

'না, দিদি অবনী খাস্তগিরের বাড়িতে গেছে'—

'অবনী খাস্তগির কে?'

'নাম শোনো নি? অনেক দিন তো দেশ ছাড়া! অবনীবাবুর কলকাতায় বাড়ি আছে, ভুবনেশ্বরে আছে, রাঁচিতে আছে, জামতাড়ায় আছে। পরিবারের লোকজন ওঁর সবই কলকাতায়, রাঁচিতে, জামতাড়ায় আর ভুবনেশ্বরে। উনি নিজেও কলকাতায়ই থাকেন, এখানে মাঝে-মাঝে আট-দশ দিনের জন্যে এসে নেতাগিরি করে যান। সবাইকে আশ্বাস দেন, ভয়ের কিছু নেই বলেন, স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করবার উপদেশ দেন-সত্য পথে চলে, শান্ত অহিংস হয়ে, নির্ভীক মনে, সকলেরই যাতে উপকার হয় সকলকেই সে দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে বলেন। ঘর-বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় বা ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে সরে যেতে দু-হাত তুলে নিষেধ করছেন সবাইকে অবনী খাস্তগির। সঙ্গে ওঁর সেক্রেটারি আছে। রোজই প্রায় খাস্তগিরের বিবৃতি পাঠানো হচ্ছে কলকাতার প্রেসে, প্রাণ ভরে ছাপাচ্ছেও তো প্রেস,' সুলেখা হাসতে-হাসতে বললে, 'কেন ছাপাচ্ছে হারীত?'

'ভাল কথাই তো বলছে খাস্তগির, কেন ছাপবে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভাল কথাই বটে হারীত!' সুলেখা চিলেকোঠায় ঢুকে একটা বেতের চেয়ার হারীতকে এগিয়ে দিয়ে বললে, ভাল কথা হলে উনি নিজে থাকলে না কেন এখানে? দু-চারটে ঝোলচাল ঝেড়ে আট-দশ দিনেই তো হয়ে যায় খাস্তগিরের। কেন এ রকম? কেন এ রকম হারীত?'

হারীত চেয়ারে বসে বললে, 'ওদের কথা নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাও কেন? ওদের ওপর নির্ভর করলে কি আমাদের চলে? জুলেখা কি খাস্তগিরের ওখানে গেছে?'

'কাদের ওপর নির্ভর করতে হবে?'

'আমাদের নিজেদের ওপর।'

একটা কাঠের চেয়ার টেনে জানালার কাছে বসল সুলেখা। চিলেকোঠা এর নাম বটে কিন্তু ছাদের ওপরে এই ঘরটা বেশ বড়, আলো হাওয়ায় ভরপুর, আকাশের কাছে যেন। বোশেখ আকাশের চিলের মত, খণ্ড নীল সাদা মেঘের ভেতরে হারীত এসে পড়েছে, যেন সময়ের আরো কাছে এসে পড়েছে।

'জলপাইহাটির ছোট-ছোট কাজগুলো শেষ করে নিতে তোমার বছরখানেক লাগবে?'

'লাগবে।'

'কাজ না সেরে তুমি তো যাবে না?'

'না।'

'কেমন আছেন তোমার মা?'

'আগের চেয়ে ভাল।'

'শুনেছিলাম নরেন মিস্তিরের রক্ত নেওয়া হচ্ছে।'

'সেটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি।'

'কেন?'

'লোকটার সম্বন্ধে অনেক খারাপ কথা শুনেছি। আমি দেখেছিও নিজের চোখে। আমি আর-এক জন লোক ঠিক করেছি।'

'রক্তের জন্যে?'

'হ্যাঁ। এ দেশে একটা ব্লাড ব্যাঙ্ক করলে হত। কত লোকের দরকার তো রক্তের। পথে-ঘাটে চাষাভুষোদের ভিড়ে কত লোক হাঁস-হাঁস চেহারা নিয়ে ধুকধুক করছে। মরা ব্যাঙের সাদা পেটের মত হয়ে গেছে মুখ-চোখ; কত দেখলুম এ দেশের দুটো জাতের মধ্যেই, একটার মধ্যে তো খুবই বেশি। কে করে ব্লাড ব্যাঙ্ক। কোথায় টাকা? কোথায় কী?'

'হারীত জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বললে, 'দুটো জাত নাকি সুলেখা?'

'বলছে তো।'

'বেশি রক্ত লাগবে না আর মার।'

'কী করেছিল নরেন মিস্তির? দিচ্ছে না তো রক্ত—'

সুলেখার চোখে চোখ রেখে হারীত বললে, 'চেনো নাকি নরেন মিস্তিরকে?'

'নরেন মিস্তিরকে চিনতে হচ্ছে সুলেখার। ইদানিং নরেন, বরেন মিস্তির—দু-জাতের অনেকেই, একটু বেশি ঘোরাফেরা করছে সুলেখাদের বাড়ির আশে-পাশে। কোনো পুরুষমানুষ নেই তো সুলেখাদের বাড়িতে। তবে অনেক দিনের পুরোন বাবুরাম আছে—সুলেখাদের বাবার আমলের লোক—লোকটি বাড়ি করে নি, বয়স ষাটের কাছাকাছি; যেন কেউ নেই এখন তার; এখানেই সে থাকবে, এখানেই মরবে। বাস্তবিকই যাদের কোনো দরকার থাকতে পারে না বাড়ির ভেতরে—বাবুরামকে না ডিঙিয়ে তারা ঢুকতে পারে না; নরেনরাও পারছিল না; এ ছাড়া কলেজ কমিটির ব্রজমাধববাবুর খোঁজখবর নেন রোজই প্রায় সুলেখাদের। একবারে লাগাও বাড়ি ব্রজমাধববাবুদের। ডাক দিলেই শোনা যায়। এ বাড়ির খবরদারি করেন নবকৃষ্ণবাবুও, তার চেয়েও বেশি ওয়াজেদ আলী সাহেব। কাজেই নরেনরা বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না।

'চিনি নরেন মিস্তিরকে আমি। দিদিকে চিঠি লিখেছিল।'

শুনে একটু অবাক হয়ে হারীত বললে, 'কবে?'

'এই তো কয়েক দিন হল—'

'কী লিখেছিল?'

'আমি দেখি নি। ছিঁড়ে ফেলেছে চিঠি দিদি।'

'কাকে দিয়ে পাঠাল চিঠি?'

'পোস্টে পাঠিয়েছে।'

'এইবারে লোক মারফৎ পাঠাবে,' হারীত জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বললে, 'হয় তো নিজেই ঢুকে পড়বে। একটু দেখেশুনে চলতে বলো জুলেখাকে। অবনী খাস্তগিরের সঙ্গে দেখা করতে গেল?'

'তোমাকে বসিয়ে গেছে, হারীত। ও না এলে তুমি উঠবে না কিন্তু। কেন গেছে অবনীবাবুর কাছে কী করে বলব আমি। দিদির ঢের সন্দারি আছে, কলকাতা থেকে নেতা এসেছে, ব্যাস হয়ে গেল। নেতা কী না জেনে নাও আগে, কী বলে বুঝে দেখো, কী করে চেয়ে দেখো; নাকি নেতা এলেই নোলা সককস করতে থাকবে?'

'নেতাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। নেতারা যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। কোথায় এখন আর নেতা,' হারীত একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'জুলেখা তো নেতা হয়েছিল বিয়াল্লিশে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমিও হয়েছিলুম,' হারীত একটু আত্মধিক্কার দিয়ে হেসে বললে, 'ওটাকেই একটা বড় রুশ রেভুল্যুশনের মত দাঁড় করানো উচিত ছিল, শুধু ইংরেজ তাড়াবার জন্যেই নয়, আমাদের দেশে যারা ইংরেজের চেয়েও অধিক তাদের নিঃশেষ করে ফেলবার জন্যে। ইংরেজ গেছে, তারা আছে; তারা তো জাঁকিয়ে বসেছে! কেবলই সন্দেহ চারদিকে, কেবলই বিদ্বেষ, কেবলই তিক্ততা; যেটুকু সুবাতাস ছিল একেবারে কাল হয়ে উঠল তো স্বায়ত্তশাসন আসতে না-আসতেই–কী হল কয়েকটা সরকারি ঘরবাড়ি পুড়িয়ে, টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে, রেলওয়ে ব্রিজ ভেঙে ফেলে'–

'তুমি কোন পার্টির?'

'কোনো পার্টির না।'

'তুমি যে কম্যুনিস্ট তা আর বলে দিতে হবে?'

'কম্যুনিস্টদের কেউ আমাকে চেনে না।'

'তবে কি একলব্যের মত তাদের পূজো করছ?'

'আমি কি স্ট্যালিনের মত কথা বলছি সুলেখা?'

'কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কথা বলছ তুমি।'

হারীত সুলেখার দিকে তাকিয়ে অবসন্ন হয়ে বললে, 'ছিলাম তো কংগ্রেসে অনেক দিন। অহিংসার দিনেও হিংসে করেছি। রিভলভার হাতে নিয়ে ঘুরেছি-ফিরেছি তো অনেক দিন, বোমা তখনও আসে নি। অণু ফাটে নি। কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তিটা যে অ্যাটম বোমার মতই, রিভলভারের মুখে সেটা উপলব্ধি করেছিলাম দশ-বার বছর আগেই। কিন্তু তবুও কি নিরেট আত্মশ্রদ্ধা ছিল। এইটেই দরকার–চোখ মেলে চেয়ে, সব বুঝে-শুনেও, বেহেড আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া-নিজের জীবনটাকে পায়ের নিচে রেখে; না হলে আজকের দিকচিহ্ন ডিঙিয়ে, কালকের বড় কাজ কিছুতেই ঘটতে পারে না ইতিহাসে : যারা ঘটাচ্ছে তারা এই রকম লোক।'

'ইতিহাস তো নিজের বেগে চলেছে।'

'কে বলেছে তোমাকে? নিজের বেগে–মানুষকে বাদ দিয়ে?'

'ইতিহাস তো অ্যাটম বোমার মত। কী করত মানুষ রিভলভার নিয়ে?'

হারীত হেসে বললে, 'তুমি আমার বাবার মত কথা বলছ সুলেখা,' হারীতের বাবা–নিশীথবাবুর কথা বলছে হারীত। এ কলেজে নিশীথবাবুর ছাত্রী ছিল সুলেখা। প্রফেসরের মনোভাব যতটা সম্ভব অনুচিন্তন করে দেখেছে সুলেখা। কিছু প্রভাব পড়েছে বটে তার জীবনে নিশীথবাবুর।

'বাবা চিন্তা করে উপলব্ধি করেন, কিন্তু চিন্তাই করেন শুধু, এত বেশি তলিয়ে ভেবে করেন যে শূন্যতা ছাড়া কোনো মীমাংসাই নেই তাঁর পৃথিবীতে।'

'নিশীথবাবু–সুলেখা একটু অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে তাকালে, 'শুনলুম নিশীথবাবু আমাদের কলেজ ছেড়ে চলে গেছেন।'

'তাই তো দেখছি।'

'খুব ভাল পড়াতেন আমাদের, কথাবার্তা তাঁর তোমার চেয়ে নরম ছিল হারীত।'

'তা হবে, তিনি বিদগ্ধ মানুষ, আমি তো'–

'প্রলেটারিয়েট?' সুলেখা হেমন্ত-শীতের, প্রফেসর সেনের, সেই আশ্চর্য ক্লাস-গুলোর কথা ভাবতে-ভাবতে চিন্তিত চোখে হারীতের দিকে ফিরে তাকাল।

'না না, তা হলে তো হতই। আমি হচ্ছি, ফরাসীরা যাকে upasle বলে তাই।'

'কী করে এত বেশি আত্মভজা হতে পার তুমি, সেইটেই আশ্চর্য। বিশেষত এই যুগে। বই পড়ছ না আর, বলছ। চিন্তা-টিন্তা করে লাভ নেই, এইটেই তোমার মনের কথা দেখছি তো। এর সুফল তুমি পাচ্ছ–দশ কাহন বিশ্বাস, তোমার নিজের ওপরে। হাড় কালিয়ে দিচ্ছে কিন্তু তোমার বিশ্বাস।'

'হাড় কালিয়ে দিচ্ছে আমার?'

'দিচ্ছে ছাড়া আর কী?'

'খুব বিচ্ছিরি চেহারা হয়ে গেছে আমার?'

সুলেখা ঘাড় কাত করে জানালার ভেতর দিয়ে মাঠের রক্ত ক্যানাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু ক্যানার দাউ-দাউ আগুন তার চোখের মণির ভেতরে মণিকর্ণিকা জ্বাললেও মনে কোনো দাগ কাটছিল না। কী ভাবছিল সুলেখা? হারীতের কথা নয়, হারীতের কথাটা মাটির নিচে পাইপের ভেতর জলের মত তার অজান্তেই যেন কানে ঢুকল তার, জলের মত কোনো দিক দিয়ে কোনো দিকে চলে গেল তার পর, টের পেল না সে। পাইপের মত হয়েছিল মনটা তার।

'কিছু বলছিলে আমাকে?'

'কী ভাবছিলে তুমি?'

'দেখছি তো ভেঙে পড়ছে তোমার শরীর।'

'আগের চেয়ে ভাল হচ্ছে জলপাইহাটিতে এসে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভাল হলেই ভাল,' হারীতের শরীর নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করছিল না সুলেখার, 'বিশ্বাস তোমার দৃঢ়। কিন্তু বিশ্বাসটা কী? আমাদের দেশে স্বায়ত্ত শাসন কিছু হচ্ছে না, কিছু নেই আর কংগ্রেসে। ফোঁপরা হয়ে গেছে কংগ্রেস–এই তো।'

সুলেখার কথার কোনো উত্তর দিতে গেল না হারীত। এ মেয়েটি একান্তই একবগ্‌গা পলিটিক্সের। যদি কোনো দিন নির্বিশেষে মরে যায় কংগ্রেস, তা হলে তার শেষকৃত্য করবার জন্যে যারা রয়ে যাবে তাদের মধ্যে থাকবে, পাশে কোনো বৃহৎ বিরাট জীবনের দার্ঢ্যকেও জীবন বলে স্বীকার করবে না, মনে হয় যেন ঠিক এই রকম সুলেখা। তবে ভাবে বোঝা কঠিন। কথা বলতে-বলতে কোথায় চলে যায় সুলেখা, কী বলে, কী ভাবে, যা ভাবে এই কি বলে, হোয়াইট হেডের ঈশ্বরের চেয়েও মাঝে-মাঝে অবতার মনে হয় সুলেখাকে।

'কংগ্রেস পথ খুঁজে পাচ্ছে না এখন আর,' হারীত বললে, 'কোন দিকে তোমার নিজের পথ?'

'সময় আমাদের যতটা জানতে, বুঝতে দেয়, তার চেয়েও বেশি উপলব্ধি করে পাবার মত কিছু হবে না। জিরিয়ে নাও, তাকিয়ে দেখো, প্রকৃতিকে আস্বাদ করো, যেমন ঐ ক্যানাফুল, সবুজ মাঠ, সাদা বাতাস, রোদ, বোলতা, মৌমাছিগুলোকে, মানুষকেও যেমন–ইতিহাসের তোড়ে মানুষ কেমন তলিয়ে যাচ্ছে কলকাতার কত জায়গায় নিঃসম্পর্ক হয়ে, তাকিয়ে দেখো।'

'এ সবের দিকেই আমার ঝোঁক এসে পড়ে মাঝে-মাঝে, টের পাই রক্তের সহজ টান কোন দিকে। কিন্তু এ সব, মু[illegible] মানুষকে হটিয়ে দেবার জন্যে সময়ের আশ্চর্য চোখঠার ছাড়া আর-কিছু নয়, এটা স্বীকার করে নিয়ে এটাকেই শ্রেয় চিন্তা হিসেবে বুঝে নিতে হবে, মানুষের ভাল হবে বিশ্বাস করতে হবে; কাজ করতে হবে, পরিগঠন করতে হবে।'

'কিসের পরিগঠন হারীত? বাংলার গ্রামগুলোর?'

'না। এখন নয়।'

'তবে?'

'বলেছিই তো তোমাকে বড় আয়োজনটা চালাতে হবে বিপ্লবের জন্যে।'

'খুব একটা বড় বিপ্লবের জন্যে তো বটেই।'

'তাতে রক্ত এসে পড়বে না? এসে পড়বে তো প্রপাতধারায়।'

'পড়ে যদি তা হলে পড়বে। মানুষের উপকারই চাই আমরা। খুব বড় বীতরক্ত বিপ্লবে যদি সেটা হয় তা হলে তাইই চাই। রক্তের ওপর কে জোর দেয়, রক্তের দিকে মানুষের কোনো স্বাভাবিক ঝোঁক নেই।'

'বিপ্লবটা হবে ফরাসি ধরনে?'

'রুশ ধরনে বলো।'

'রুশ বড় ফরাসির চেয়ে?'

'বেশি সংহত; বেশি আধুনিক বলেও মনে হয় আমার।'

'তুমি কম্যুনিস্ট হারীত।'

'আমি কম্যুনিস্ট নই, যোশীর থেকে মুজাফফর আহমদ অব্দি কেউ আমাকে চেনে না, আমার নামও শোনে নি, আমাকে চোখেও দেখে নি।'

'তোমাকে স্ট্যালিনিস্ট বলেই তো মনে হচ্ছে?'

'স্ট্যালিনিস্ট আছে নাকি? জানি না তো। তাদের কাউকেই কোনোদিন দেখি নি আমি'–

'দেখো নি? কী তবে তুমি?'

'নিজেকে খাঁটি ভারতীয় বলতে পারি না আমি। আজকালকার দিনে কেউই কোনো দেশের নেহাৎ স্বদেশবাসী হয়ে থাকতে পরে না। পৃথিবীর সাধারণ একজন মানুষ আমি–তুমিও সুলেখা; সকলের ভাল চাচ্ছি আমরা, একটা বড় বিপ্লবে হাত দিচ্ছি–'

সুলেখা সবেগে হাত নেড়ে হারীতের কথা হটিয়ে দিয়ে বললে, 'না, না, আমি না। আমি ও-সবে নেই।'

'নেই তুমি?'

'না। নেই। কংগ্রেসে। আমি কংগ্রেসে।'

'হারীত একটু হেসে বললে, 'কংগ্রেস যদি বিপ্লব করতে বলে?'

'তা বলবে না কখনো।'

'বলবে না?'

'খুব সুচিন্তিতভাবে কাজ করে কংগ্রেস। আমরা নতুন স্বাধীনতা পেয়েছি। প্রথম দিক দিয়ে একটু গোলমাল হবে, খানিকটা বিশৃঙ্খলা আসবেই তো। কিন্তু সে জন্যে আবার ঘোষ ব্রাদার্সের মত রিভলভার বোমা নিয়ে খেপে উঠতে হবে নাকি?'

'কে ঘোষ ব্রাদার্স?' একটু বিস্মিত হয়ে বললে হারীত।

'এই তো আজকালকার ঘোষেরা; হালে মিনিস্ট্রি গেছে যাদের–আবার আসছে; সেই সব ঘোষ–'

হারীতের খুব কাছে এগিয়ে গেলে তার চোখের তারায় সুলেখার মুখ দেখা যেতে পারে। কিন্তু তবুও সে শখ মেটানো খুব কঠিন কিন্তু তবুও কেমন দেখাচ্ছে তার মুখ হারীতের চোখের মণির ভেতরে–ঘোষেদের কথা বলতে কী বলছে ভুলে গিয়ে আবার কথার খেইটা মনে পড়ল তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এঁরা তো গান্ধীজির উত্তরমীমাংসার দেশের; পূর্বমীমাংসার কথা বলছ তো তুমি। তুমি বলছ লালমোহন ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষের কথা,' দাঁত বের করে হেসে বললে হারীত। সোজা হাসি। কিন্তু হারীতের খাঁড়া নাকের ওপর একটা বাঁকা ভাঁজ এসে পড়ল। দেখল সুলেখা।

'কে ঘোষ ব্রাদার্স তবে হারীত?'

বাইরের প্রজ্জ্বলন্ত ক্যানাফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে হারীত একটু চুপ থেকে বললে, 'নাঃ অরবিন্দ, বারীনের সে সব জিনিস ওদের সময়ে হয়ে গেছে। এখন অন্য জিনিস হবে।'

বাতাসে চুল উড়ছিল সুলেখার. খোঁপা বাঁধে নি; স্নান করা ঠাণ্ডা জলদেবীদের মাথার অফুরন্ত কাল সোনালি সাপ যেন তার মাথার চুল সব। পৃথিবীর বাতাসে রোদে এখন ক্রমেই স্থলদেবীর চুলের মতন দেখাচ্ছে। গোছার চুল গালের দিকে টেনে এনে মুখের উপর বুকের ওপর দিয়ে কাল চুলের অমৃতের দিকে তাকিয়ে সুলেখা বললে. 'ও-সব কোনো জিনিস হবে না আমাদের দেশে। এটা আমাদের ভারতবর্ষ. এর প্রাণ আলাদা। এখানে রোবস্পিয়েরের ছাঁদে লেনিন. স্তালিন, বুখারিনের জিনিস চলবে না। স্বায়ত্তশাসন পেয়েছি; অনেক কাজ এখন দেশের মানুষের হাতে। কোনো একটা গড়বার কাজ হাতে নিতে হবে তোমায় হারীত। কোম্পানি বাগানে মাস্টারদার, অনন্ত সিংদের, উনিশশ বেয়াল্লিশের ভাঙনের দিন নেই এখন আর, সত্যিই নেই। কংগ্রেস চারদিক থেকে গঠন করবার, নির্মাণ করবার জন্যে, শীতের শেষে কুমোর পোকার মত কেমন বুঁ বুঁ করছে শুনছ না?'

'হাসছ কেন সুলেখা?'

'হাসছি, তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছ কেন হারীত?'

'শীতের শেষে কুমোর পোকার মত বুঁ বুঁ করছে?' হাসতে-হাসতে চোখ ঠিকরে ঠিকরে উঠছিল হারীতের. 'ভারী মজার কথাই বলেছে সুলেখা: শীতের শেষে কুমোর'–

'বড় বিপদেই পড়েছে কংগ্রেস,' সুলেখা বললে, 'এমনি তো ভালই হচ্ছিল সব, জোয়ার ক্ষেতের থেকে ব্রিটিশদের পাখির মত তাড়িয়ে উড়িয়ে দেওয়া হল.

প্যাটেল বললেন, কিন্তু কাশ্মীর বড্ড গোলমালে ফেলল'

'কেন ইউনোর কাছে ধরে দেওয়া হল কাশ্মীরকে?'

'তার পরে হায়দ্রাবাদ–'

'এর মীমাংসা কি হওয়া উচিত ছিল না এত দিনে?'

তোর পরে হায়দ্রাবাদ–'

'তার পরে এই কম্যুনিস্টদের লঙ্কা বজ্জাতি।'

হারীত চুপ করে ছিল।

সুলেখা বললে, 'এই ব'রে আঁতে ঘা পড়েছে হারীতের। যেই কম্যুনিস্টদের কথা বলেছি অমনি মুখে বড়াপিঠে গুঁজে বসে রইল। তুমি তো কম্যুনিস্ট হারীত।'

'আমি নই। কিন্তু কম্যুনিজমের দিকে চলেছে কংগ্রেস–'

'কংগ্রেস? কে বললে তোমাকে?'

'জয়প্রকাশ নারায়ণ সে দিন সি-এস-পি-কে–'

বাধা দিয়ে সুলেখা বললে, 'ও-সব কংগ্রেসি জিনিস নয়।'

'জওহরলাল মনেপ্রাণে কম্যুনিজমকে সার্থক করে তুলতে চান। কিন্তু চারদিক থেকেই সবাই আটকে রাখছে তাকে। কিন্তু তবুও বিশোধিত হয়ে আজ হোক কাল হোক মার্কসিজমের দিকে না গিয়ে পারে না কোনো দেশের কোনো সৎ প্রতিষ্ঠান'–

'কম্যুনিস্টদের কথা হচ্ছিল, তুমি চলে গেলে কম্যুনিজমে, দুটো এক জিনিস নয়; এখন মার্কসিজমের কথা বলছ। ওটা আরো আলাদা ধরনের। জওহরলাল মনে প্রাণে কী তা আমি জানি না; এলাহাবাদ যাই নি কোনোদিন। কৃষ্ণা হাতী সিং-এর সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল, জিজ্ঞেস করি নি পণ্ডিতজির কথা; তিনি তো অনেক দিন থেকে দিল্লীতে; কিন্তু আমি যখন গিয়েছিলুম পাই নি তাঁকে। দিল্লীতে আছেন, না বাইরে গেছেন, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছলুম। কম্যুনিজমের দিকে কংগ্রেস চলেছে বড়-বড় শিল্পপতিরা বেঁচে থাকতে? নেহরুর স্বয়ংসম্পূর্ণ নেতৃত্ব পাচ্ছে না তো কংগ্রেস। পেলেও রুশ কম্যুনিজম বা যোশী কম্যুনিজম আসত না কোনোদিন কংগ্রেসে। ক'গ্রেস নেতাদের ভেতর মহানুভব লোক আছেন এখনো, যেমন...যেমন,' সুলেখা একটু ঢোঁক গিলে বললে, 'যেমন...এঁরা শ্রেণীবৈষম্য চান না। মালিক-মনিবদের বদমায়েসি সত্যিই ভালবাসেন না। যারা বড়দের পায়ে চাপা পড়ে নিচে পড়ে আছে তাদের বাঁচিয়ে উন্নত করে সকলের জন্যে সুবিচার, সুব্যবস্থা, কল্যাণ, আলো আনতে চান। কংগ্রেসের প্রকৃত প্রাণ এইই তো চায়। এটা কি রুশ কম্যুনিজম-সংগীত। না। তার ভেতর আরো অনেক ঝাঁঝালো খামির রয়ে গেছে।'

'কাজের প্রণালীও আলাদা। একটা ক্যাবিনেট মিশনের কাছ থেকে তারা স্বাধীনতা পায় নি, বড়-বড় রাষ্ট্র-বিপ্লবের আগ্নেয়গিরি ঠেলে বেরুতে হয়েছে।'

'ওর কোনো মানে নেই।'

'নেই?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না। স্বাধীনতার কী সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে, না হচ্ছে, সেইটেই আসল। কংগ্রেস তা হলে রুশ কম্যুনিজমের থেকে ঢের দূরে তো হারীত?'

'ঢের দূরে।'

'কংগ্রেসের সদাত্মা এ-দেশী কম্যুনিজমের থেকেও দূরে তো?'

হারীত একটু ভেবে বললে, 'কংগ্রেসের সদাত্মা? সেটা মার্কসিজমের খুব কাছাকাছি।'

'গান্ধীবাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তবুও?'

দুই জনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। হারীতের এ কথাটায় সুলেখারও সায় আছে মনে হচ্ছিল।

'মার্কসিজম। পড়েছ ডাস কাপিটাল তুমি?'

'পড়েছি.' হারীত বললে।

'ঐ গোটা বইটা? আমিও পড়েছি বটে। বিশ্বজ্ঞান মার্কস যা লিখেছেন।'

দর্শন। আমাদের আদি ভারতীয়দের থেকে শুরু করে কারুর কোনো দর্শনই আজ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারলুম না আমি।'

'ঠিকই তো। যে ভাবতে শিখেছে, এমন কি যে মনে করে যে সে ভাবতে শিখেছে, তার দর্শন তার নিজের কাছে, কিন্তু নিজের দর্শনটা পৃথিবীর ওপর আরোপ করে লাভ নেই। পৃথিবীটাকে গান্ধীর মত, কিংবা মার্কসের মত, এক জন বড় মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল?'

'কিছু দিনের জন্যে অন্তত।'

'কিছু দিনের জন্যে।'

'এর পরে কী হবে?'

'জীবনের ইতিহাসের আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা হবে মনে হয়। আরো স্পষ্টতর জ্ঞানীর হাতে। কিন্তু তাই বলে সাধারণ মানুষের জীবনের আরো উন্নতি হবে কি না আমি বলতে পারি না, হারীত চকিত হয়ে বললে, 'শ্রীযুক্ত সেনের মত কথা বলছি আমি।'

'সেন কে?'

'আমার কথাটা প্রত্যাহার করছি। বলেছি সাধারণ মানুষের উন্নতি হবে কি না বলতে পারি না।'

'বলেছ তো।'

'উন্নতি হবে। ইতিহাসের ব্যাসকূট নিরসন হোক, বা না হোক, সৎ কর্মীদের হাতেই উন্নতি হবে।'

'সেন কে? তোমার বাবা নিশীথবাবু?'

'হ্যাঁ।

'কোথায় তিনি?'

'কলকাতায়।'

'কলকাতার কলেজে চাকরি করছেন? আমাদের কলেজ ছেড়ে চলে গেলেন কেন?'

'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনে নি শুনেছিলাম।'

'কেন বনে নি?'

'টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে। বাবা আরো পঞ্চাশ টাকা বেশি চেয়েছিলেন।'

সুলেখা বলল, 'হরিলালবাবুরা দিলেই তো পারতেন। কলেজের তো অনেক টাকা আছে। হরিলালবাবুর জামাই কামাখ্যাবাবুকে তো পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কলেজ কমিটির হিমাংশু চক্রবর্তীর শালাকেও চল্লিশ-পঞ্চাশ। প্রিন্সিপ্যাল কালীশঙ্করবাবু যদি পাঁচশ পান তা হলে নিশীথ-বাবুও তো পেতে পারেন। না-দেওয়া হয় যদি, তিন শ সাড়ে তিন শ দেওয়া হোক। দেড় শ পাচ্ছিলেন, দু শ চাচ্ছিলেন তাও দেওয়া হল না। ওয়াজেদ আলী সাহেবের এটা করে দেওয়া উচিত ছিল।'

হারীত বললে, 'কে কী করবে কার জন্যে? কলেজ তো একটা দৃষ্টান্তস্থল শুধু। যে আচার-ব্যবস্থায় কালীবাবু পাঁচ শ টাকা পান, আর সবাইকে এক শ দেড় শ টাকায় গড়াতে হয় সেটার গিঁট কোথায়? কলকাতায়ও ঠিক এ রকম, সব জায়গাতেই তো। গেঁড়টাকে উৎখাত না করতে পারলে এখানে ওয়াজেদ আলী সাহেব কী করবেন?'

'কলকাতার কলেজে ঢুকেছেন নিশীথবাবু?'

'কী জানি বলতে পারি না।'

'চিঠিপত্র পাচ্ছ না?'

'না।'

সুলেখা মাঠের ঘাস, ক্যানাফুল, বোলতা, রৌদ্র সমস্ত চক্রবলয়টা পেরিয়ে অনেক দূর তাকিয়ে রইল। কলেজের ক্লাসে তিন বছর পড়েছে সে নিশীথবাবুর কাছে। নানা রকম কথা–কথিকা মনে পড়ে লেকচার রুমের, রুমের বাইরের নিশীথ সেনের। এই সে দিন তো, কিন্তু এক হাজার বছর আগে যেন–আজ দুপুরে কত শত নিঃশব্দতার ভেতরে এসে পড়ে মনে হচ্ছে।.

'কে কত মাইনে পায়, কার কত বেড়েছে না-বেড়েছে এত বৃত্তান্ত জানলে কী করে তুমি?'

'জেনে ফেলেছি তো,' সুলেখা জিভ দিয়ে একটু টাগরা টিপে হেসে বললে, জানেওয়ালা মানুষের মত রহস্যের কৌটো নিজের আঁচলের আঁধারে লুকিয়ে রেখেছে যেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কে বলে যায়, ওয়াজেদ আলী?'

সুলেখার দৃষ্টি অবাক দূরের থেকে গুটিয়ে কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল ডালপালার বাতাসের ভেতর ঘুরছিল, 'ওয়াজেদ আলী, ইয়ুসুফ, সেরাজুল হক, নুরুল হুদা, সুজন খাঁ, বসিরুদ্দিন, মুনার গাজি, মমতাজ আলী, মহম্মদ ইসমাইল, গোলাম হোসেন, আবদুস সাত্তার, আবদুল করিম–অনেকেই তো এখানে আসেন। এঁদের কাছ থেকে নানা রকম খবর পাওয়া যায়।'

কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকাল হারীত চোখ তুলে-কেমন থলো–থলো সারৎ সার রক্তের অবদানের মত ফুলের রাশি সব–বাতাসের অবিরাম শুশ্রূষার ভেতর।

'তোমার তো এবার ফোর্থ ইয়ার সুলেখা? কলেজ ছেড়ে দিলে যে?'

'নাঃ, আর যাব না কলেজে, কেমন ভাঙন ধরেছে যেন।'

'কোথায়? কলেজের প্রফেসরদের ভেতর? নাকি তোমার মনে?'

'প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে দেব। এবার যদি না হয়, পরের বার দেব।'

'এক তো বাবা চলে গিয়েছেন, এ ছাড়া প্রায় সব প্রফেসরই তো আছেন কলেজে।'

'জানি না। যাই না কলেজে,' বিরসভাবে বললে সুলেখা, 'নিশীথবাবুর এটা বড় অন্যায় হল।'

'কেন?'

'পাকিস্তান হতে না-হতেই তিনি ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে চলে গেছেন।'

'একটা চিঠি লিখে দাও বাবাকে।'

'কে, আমি?'

'লিখে দাও আপনি না এলে আমি ক্লাসে যেতে পারছি না, চলে আসুন।'

পৃথিবীর চারদিকের সমস্ত রোদ শুষে এনেছে যেন কৃষ্ণচূড়া গাছটা, ঝিলমিল করছে ফুলগুলো কড়া দুপুরের রোদের ভেতর। রোদের ঝিলিক এসে পড়েছে ঘরের আনাচে-কানাচে মানুষের বুকে কানে, মেয়েলোকের হাতে চুলে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ মাঠে, বাড়িতে, জলের শব্দে, ভীমরুলের চাকে, তেপান্তরের ধোঁয়ার মত আকাশটার মাথায়–মাথায় উড়ন্ত বক, ফিঙে, হরিয়াল, ওয়াক পাখিদের ডানা-ঠ্যাঙের অফুরন্ত আঁকিবুকির ভেতর। সুলেখা টেবিলের থেকে তার সানগ্লাসটা পেড়ে এনে বললে, 'চোখে পরবে হারীত?'

'তুমি পারো। যে জায়গায় বসেছ সুলেখা সেখানে সূর্যের তাপ বেশি।'

ধোঁয়া রঙের চশমাটা চোখে এঁটে নিয়ে সুলেখা বললে, 'মা-ও গিয়েছেন অবনী খাস্তগিরের বাড়ি। দিদি যাব-যাব করছিল। আমাকে একা ফেলে যেতে পারে না তো, বাবুরাম বাড়ি নেই। তোমাকে আসতে দেখে কেমন বান মাছের মত সটকে পড়ল, দেখলে তো!'

'তোমারও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, আটকে রাখছি।'

'ক্ষ্যাপা নাকি! আমি যাব অবনী খাস্তগিরের বাড়ি! ওদের দানোয় পেয়েছে। দুড়দাড় করে ছুটে যায় আর আসে। আসে আর যায়, মনকে বলে, সাবাস। অবনীবাবু স্ত্রীকে এনেছেন শুনলাম।'

'ক-দিন হল এসেছেন?'

'দিন ছ-সাত। পাঁচ-ছয় দিন থাকবেন আরো হয় তো।'

'দুপুরে কি ফ্ল্যাশ খেলা হয় অবনীদার বাড়িতে?'

'হতে পারে। কী করে না হলে সময় কাটাবে।'

'কাটাচ্ছি তো।' সুলেখার মুখ খুঁজে নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে হারীত বললে।

'এ রকম করেই রক্তবিপ্লব করবে তুমি হারীত?' এ রকম একটা প্রশ্ন তুলে হারীতকে যে জব্দ করে দেওয়া যায় সে খেয়ালটার বিশেষ কোনো মূল্য রইল না হঠাৎ যেন সুলেখার কাছে, নিমেষে মুছে গেল তার মনের ভিতর থেকে, চারদিকের পৃথিবীর থেকে নির্লিপ্ত হয়ে রইল না হঠাৎ যেন সুলেখার কাছে, নিমেষে মুছে গেল তার মনের ভিতর থেকে, চারদিকের পৃথিবীর থেকে নির্লিপ্ত হয়ে রইল এর চোখ ওর চোখকে বিষয়াসক্তির জিনিস বলে মনে করে আধ মিনিট, এক মিনিট, দেড় মিনিট–

সানগ্লাস খুলে ফেলল সুলেখা, টেবিলের কেসে আটকে রেখে এল।

'রোদ সরে গেছে এখান থেকে হারীত। বাইরে কেমন?'

'খুব ঝাঁঝ বাইরে।'

'ঘরের ভেতরটা এখন ঠাণ্ডা।'

'জুলেখারা বাজি রেখে বসে খেলছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। বেশ কড়কে জুয়ো না খেললে ভাল লাগে কি এমন দুপুরে। একটা মোটা নেশা চাই তো, বিকেলে চা খেয়ে মহড়া দেবে সকলে মিলে। আজ বিকেলে মিটিঙ তো হবে। রোজই তো হচ্ছে। যাও না তুমি? মিটিঙে কে কী বলবে, কী বলা উচিত, তার আলোচনা চলবে চায়ের বৈঠকে।'

'কোথায় হবে মিটিঙ?'

'মহম্মদ মতিজেদ হলে।'

'যাবে নাকি সুলেখা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইচ্ছে করে না মিটিঙে যেতে আমার। খাস্তগির মশাই তো ডামাডোল করে আমাদের এখানে থাকতে বলে চার-পাঁচ দিন পরেই সস্ত্রীক কলকাতায় চলে যাবেন, সুবিধে বুঝে ফিরবেন হয় তো আবার ন-মাস ছ-মাস পরে; না হলে ফেরবার দরকার নেই। এ সব লোকের মিটিঙ তো চেঁচিয়ে কথা বলা। অনায়াসেই বলে যায় কিছু তেজী, কিছু ভারিক্কে, ডারডেলার কত কথা সব। কিন্তু শুধু কথা বললে তো হয় না-চরিত্র কোথায়?'

'অবনী খাস্তগিরের স্ত্রীও বলবেন নাকি?'

'জানি না, ওয়াজেদ আলী সাহেব হয় তো বলবেন। খাস্তগিরের চেয়ে বেশি জিনিস আছে জনাব ওয়াজেদ আলীর ভেতর।'

হারীত চোখ বুঁজে সায় দিয়ে, চোখ মেলতে, হুড়হুড় করে বেশ বাতাস ঘরের ভেতর ঢুকে পড়তেই, চোখ বুঁজে-বুঁজে বললে, 'কী করে আলাপ হল ওয়াজেদ আলীর সঙ্গে তোমার?'

'এলেন তো এক দিন আমাদের বাড়িতে; এসে আলাপ করলেন আমাদের সকলের সঙ্গে। পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে নিষেধ করলেন, কোনো মুশকিল হবে না আশ্বাস দিলেন, কোনো রকম অসুবিধে হলে তাঁকে, মহম্মদ ইয়ুসুফকে, আমির আলী সাহেবকে জানাতে বললেন। অনেক মানুষকে বিশ্বাস করা কঠিন,' সুলেখা বললে, 'কিন্তু আলী সাহেব ওদের মতন নন।'

'ওয়াজেদ আলী সাহেব? তাঁকে দেখি নি আমি কোনো দিন।'

'এ দেশে ছিলেন না।'

'কেন? এখানকার মানুষ নন?'

'না। কলকাতার ওদিক থেকে এসেছেন।'

'ওয়াজেদ আলী সাহেবের সঙ্গে এক দিন আলাপ করতে হবে আমার।'

'জনাব মহম্মদ ইদরিসের সঙ্গের করো, জনাব ইয়ুসুফ আলীর সঙ্গে, জনাব সাহাদাত হোসেন সাহেবের সঙ্গে, জনাব বরকতুল্লা সাহেবের সঙ্গে, জনাব মোবারক আলীর সঙ্গে, জনাব আমির চৌধুরীর সঙ্গে, চাঁদ মিঞা সাহেবের সঙ্গে, মানিক মিঞা, লাল মিঞা, সোনা মিঞা সাহেবের সঙ্গে; জনাব–'

হারীত উঠে দাঁড়াল।

'উঠছ তুমি?'

'এইবারে উঠি, বাবুরাম এসে বসে আছে রোয়াকে। আধ-ঘণ্টাটাক হল এসেছে; আমি দেখছিলুম। দেখ নি তুমি?'

'বসো তুমি। তোমায় বসতে হবে। কোথায় যাবে এই ঝাঁ ঝাঁ রোদে। এ বাড়িটা তোমার খুব নির্জন লাগছে না কি হারীত?'

'নির্জন?'

'মা নেই, জুলেখা নেই। জুলেখা নেই–সে জন্যে একটু ফাঁকা লাগছে হয় তো তোমার হারীত।'

'হারীত ঘরের ভেতর দু-চারবার পায়চারি করে বেরিয়ে চলে যাবে ভাবতে-ভাবতে চুপচাপ আটকে বসে রইল তবু।

'নির্জনতাই আমার ভাল লাগে। কলকাতায় এটা একেবারেই নেই। কত-জনকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেছি আমিই তো, কত মানুষের শান্তিভঙ্গ করেছি। এমন একটা জায়গা খুঁজে পাই নি কলকাতায়, এমন এক জন মানুষ পাই নি, যার কাছে বসে সময় নেই জেনেই সময়টাকে ভাল লাগে। শেষ পর্যন্ত সময় নেই তো সুলেখা, সময় নেই কোথাও–এই বাড়িতে এ রকম দু'পুরের নিঃশব্দতায় এসে বুঝতে পারি যে বহতা সময়ের বয়ে যাবার চেয়ে তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পরিসর কত বেশি, আস্বাদ কত বেশি উজ্জ্বল। তবুও যতটা দিন বেঁচে আছে মানুষ, প্রতি মুহূর্তে সময় আছে, ছুটে চলেছে এ রকম একটা উদ্বেগে অতিষ্ঠ হয়ে ভয়াবহভাবে ধ্বংস করে ফেলছে সময়কে, নিজেকেও।'

সুলেখা একটু হেসে বললে, 'এ কি তোমার নিজের কথা হারীত?'

'তবে কার কথা বলছি আমি?'

'নিশীথবাবু তো এই রকম বলতেন।'

'হারীত নিজের চুলের ভেতর দু-একবার আঙুল চালিয়ে নিয়ে বললে, 'বলতেন বুঝি? বলবেনই তো, আমার বাবা তো। সন্তান যা ভাবে, পিতাতেও তা বর্তায় না।'

'কথা তো। কিন্তু দেখছিলুম তো তাঁর চেয়ে তুমি একেবারেই আর-এক রকম। এখন আবার দেখছি তুমি অনেকটা তাঁরই মতন?'

'আমরা দু'জনেই এ রকম। দু'জনেরই মনে দুটো ধারা আছে, বাবা একটার ওপর ঝোঁক দিয়েছেন আমি অন্যটার ওপর। কোন দিকের ঝোঁকটা ভাল লাগে তোমার?'

'আমার মনের মিল মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে–তাঁর কাছে থেকে সব শিখেছি, যা শিখেছি ভালবেসেছি।'

'কেন? তা তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।'

'কলকাতায় তুমি যে রেভল্যুশন ফাঁদছ, সেটা সফল হবে?'

'সফল হবে।'

'নিশীথবাবু কুড়ি-পঁচিশ বছর আমাদের যা পড়ালেন, আজীবন যা করলেন, সেটা ব্যর্থ?'

'ব্যর্থ।'

'এত সহজেই মীমাংসা হয়ে যায় সব কিছুর?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, সহজেই,' হারীত বললে, 'জুলেখাও কি নিশীথবাবুকে'–কথাটা শেষ করল না হারীত।

'আমি উঠি সুলেখা।'

'তোমায় বসতেই হবে।'

'এখন তোমার বই পড়ার সময়।'

'আমি এবার বি-এ এগজামিন দিচ্ছি না।'

'সে সব বই নয়, বাইরের বই পড়বে তো তুমি এখন–'

'আমি রুটিন করে পড়ি বুঝি হারীত? এটা আমার পড়বার সময় কে বললে তোমাকে?'

হারীত বাইরের বাতাসের বড় সাড়া শুনছিল, অনেক পাতার গুচ্ছে অনেক পাখির ডানার পালকে, নিচে, দিকে-দিকে জলের রাশির ভেতর পৃথিবীর টনক নাড়িয়ে আঘাত করছে, বাতাস যেন নীলিমার বুকে গিয়ে ফেটে পড়ছে দক্ষিণ পূর্ব উত্তর বাতাসের আনন্দে, পৃথিবীরই জননীনিকুঞ্জের ভেতরে আবার।

'তোমার সানগ্লাসটা আমাকে একটু দাও তো।'

'কেন, এটা চোখে এঁটে খাঁ-খাঁ রোদের মধ্যে বেরিয়ে পড়বে তো?'

'না, আমি এখানেই রয়েছি। বাইরের কড়া রোদের দিকে তাকিয়ে চোখ কেমন ধাঁধিয়ে উঠছে। সাদা-সাদা বড় মেঘগুলোও কী ভীষণ জ্বলন্ত কাচের মত উজ্জ্বল।'

'এদের পেছনে সূর্য রয়েছে।'

'ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু মেঘগুলোকে। যেন ভেঙে গেছে সূয্যি রাশি-রাশি সাদা মেঘে জ্বল-জ্বল করে বেড়াচ্ছে। আমাদের ছেলেবেলায় দেখছি এ রকম। আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলেও থাকে ওরা। দেশ থেকে দেশে চলে যায়; কেমন অতিমানবের মত মনে হয় যেমন সব। আমরা ওদের মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়ে আমরাই মিথ্যে হয়ে উড়ে যাই; ওরা টিকে থাকে কী রকম স্বচ্ছ আগুনের অন্তঃশীল আনন্দে।'

সুলেখা ভর্ৎসনার সুরে হেসে উঠে বললে, 'এ কেমন স্ট্যালিনের মত কথা হল?'

'স্ট্যালিন?'

'এ কেমন বুখারিনের মত কথা বললে তুমি হারীত?' নিজেকে শুধরে নিয়ে সুলেখা বললে।

'বুখারিনের মত? কথাটা বলেছি হোরেন্ডের নিজের মত নিশীথ সেনের মত, লুক্রোসিয়সের মত; এরা বুখারিনদের এলাকার বাইরে। সে যা হোক, বুখারিনের কথায় অন্য কথা মনে পড়ে গেল–বিপ্লব করতে গিয়ে একটা মস্ত ট্র্যাপের পাকে জড়িয়ে পড়তে হয় বুঝি মানুষকে সব দেশে সব কালেই?'

সুলেখা কথা বলবার আগে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখল এক–আধ মুহূর্ত, তার পর ঘুরিয়ে এনে একটু চুপ থেকে পরে বললে, 'সব কালেই সব দেশেই। ভারতবর্ষেও তুমি যদি বিপ্লব কর, সবাই যদি বিপ্লবী হয়েও যায়, তা হলেও ওদেরই হাতে তোমার, তোমাদের মত লোকের বিচার হবে। তাতে তুমি টিকে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না।'

হারীত আকাশের চিলের ডানার সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে, চোখটাকে স্থির করে আনতে-আনতে বললে, 'তা হবে খুব সম্ভব। তা আমি জানি। বুখারিনদের ভাগ্যের জন্য আমি প্রস্তুত আছি।'

'তা তো প্রস্তুত আছ। সানগ্লাসের দরকার?'

'না।'

'মেঘ দেখছ তো।'

'মেঘ আরো জমাট বেঁধেছে।'

'সূর্য আছেন মেঘের পেছনে?'

'মেঘের সামনে তো সূর্য, একটা মস্ত বড় সাদা মেঘের মতন।'

'কে মেঘ, কে সূর্য বুঝতে পারছি না–'

'আকাশের এ-পার ও-পার জুড়ে মেঘটা সূর্যের মতন,' বললে হারীত।

'এত জ্বলন্ত?'

'তুমি নিজে উঠে দেখ সুলেখা,' হারীত বলে উঠল।

'আমি তো সূর্য পূজারী নই হারীত।'

'চোখ বুঁজলে যে?'

'ভেতরে সূর্যটাকে দেখছি। তুমি সানগ্লাস নাও হারীত।'

হাত বাড়িয়ে চশমাটা সুলেখার হাত থেকে তুলে নিয়ে হাতেই রেখে দিল হারীত; ক্যানাফুল, কৃষ্ণচূড়া, বোলতা, মৌমাছি, হরিয়াল, ওয়াক, রৌদ্র-নীলের দিকে খোলা চোখেই তাকিয়ে রইল সে। এর পরে কলকাতায় গিয়ে বড় মুশকিলে পড়তে হবে, হারীত ভাবছিল। খুব ভাল লাগছিল তার, খুবই খারাপ লাগছিল। সুলেখার কাছে বসে থেকে চোত-বোশেখ বসন্ত ঋতুর এই সুদূর নীলিমার বাতাস, রোদ, পাখি, ছাদ, নিস্তব্ধতার ভেতর-ঘড়ির থেকে সময়কেই খসিয়ে নিয়ে এ রকম অমৃত হয়ে বসে থাকবার কী অধিকার আছে তার। সময় যে বাস্তবিকই একটা ওতপ্রোত নিরবচ্ছিন্ন বাধাবিমুখ বিরাট ঘড়ির আবর্তন, কী অধিকার আছে হারীতের–নিজেকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর দীন-দুর্বল মানুষগুলোকে সেই অকৃতার্থ সমরোৎসবের ভেতরে ছেড়ে দেবার? যে-লোকগুলোকে কলকাতায় সে জড়ো করেছিল তার আত্মার সহোদর হিসেবে–কিংবা সৎ ভাই সৎ বোন হিসেবে হয় তো তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের আত্মার-বিপ্লবের সেই সব কর্মীরা কী করছে এখন এমন দুপুরে, তার অভাবে? জোট পাকাচ্ছে কি তারা আগের মতন এখনো, আলোচনা করছে, কথা ভাবছে, দল বাড়াতে পারছে ঠিক করতে পারছে কার্যসূচি, নেতার অভাব বোধ করছে, না কি তারা ছত্রখান হয়ে ভেঙে পড়ছে?

একটা দুটো তিনটে চারটে বালি হাঁসের মত হারীত নিজেই যখন উড়ে চলে এল জলপাইহাটিতে, তখন বাকি হাঁসগুলো কেমন অদ্ভুত যূথসংস্কারের বশে ঘুরে উড়ে হারিয়ে যাবে না কেন শূন্যের ভেতর? হারিয়ে গেছে হয় তো সব। এত দিন বসে যা সে ঠিক-ঠাক করে আনছিল, কলকাতায় ফিরে গেলে—এক বছর পরে ফিরে যাবার কথা তো তার—সে সবের খড় উড়ছে, মাটি ঝরছে, দেখতে পাবে সে। কোথাও কোনো মানুষ খুঁজে পাবে না। কলকাতায় গিয়ে তা হলে নতুন করে আরম্ভ করতে হবে আবার সব—এক বছর পরে। তাই হোক।

হারীতের অনুভূতি মননের দুটো ধারার যে-দিকটার ওপর নিশীথ সেন ঝোঁক দিয়েছিল—ও-দিকে হঠাৎ নীল আকাশকে নাকচ করে দিয়ে আরো বড় আশ্চর্য আকাশ, এই দিকে রৌদ্র, ভীমরুল, ক্যানাফুল গাছের ছাদের এই নিটোল মণিকা-দুপুরের ভেতর বসে থেকে প্রকৃতি, ও প্রকৃতির চেয়ে এক তিল বেশি বিশোধিত আরোপিত জিনিসের মতন নারীর, আবহাওয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে, সেই দিকেই ঝোঁক পড়ল হারীতের।

আরো পঁচিশ-ত্রিশ বছর বাঁচবে হয় তো সে, কিংবা পনের, দশ। বছরগুলো জাবদা খাতায় হাড়ের কালি দিয়ে কালো করে লিখতে-লিখতে মাঝে-মাঝে রক্ত দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে; এই রকম সব বছর পড়ে আছে হারীতের সামনে। জলপাইহাটির এই একটা বছর শুধু অন্য রকম হবে। যা হচ্ছে এখানে এখন তাই হবে। সাদা মেঘের দিকে তাকাল হারীত, ঘাস, রোদ, কৃষ্ণচূড়ার দিকে। খারাপ ভাবটা কেটে যাচ্ছে—চোখ বুঁজে আসছে তার, মনের ওপর শরীরেই যেন বেশি ভাল লাগা তর্কাতীত তার।

'তুমি গগ্‌ল্‌স পরছ না হারীত?'

'না। এখন আর দরকার নেই।'

'সূর্যের আচ খুব ভাল লাগে তোমার। স্কাইলাইটের ভেতর থেকে রোদ আসছে এবার—'

'একটা পুরু মেঘের নিচে চাপা পড়েছে সূর্য। নিচের মেঘের ওপরে আর-একটা পাতলা মেঘ ছড়ানো রয়েছে তোমার এই চশমার রঙের মত।'

'কী করে টের পেলে তুমি? জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না তো।'

'জানালার ভেতর দিয়ে সাদা মেঘের পাকিস্তানের দিকটাকে দেখা যাচ্ছে, ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের দিকটা ছাদের ওপরে,' হারীত বললে।

'ইউনিয়নকে ছায়ায় ঘিরেছে?'

'বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।'

'এক টুকরোও কালো মেঘ নেই তো আকাশে। গুমোট নেই। নীল আকাশ থেকে বাতাস লাফিয়ে-লাফিয়ে বেশি নীল, বেশি মধুর করে ফেলছে যেন সব। কী করে বৃষ্টি হয়,' সুলেখা বলতে-বলতে চোখ বুঁজে কথা বলা শেষ করল। 'আজ হবে না বৃষ্টি। অবনী খাস্তগিরের মিটিংও তো রয়েছে।'

'আকাশ যদি কালো করে আসে সেটা ভাল লাগে, কিন্তু এখন নয়।'

'কেন এখন নয়?'

'এখন এই রোদ, বাতাস, ঘন নীলের হরিয়াল ভীমরুলদের নিঝুম দুপুরটাকে ভাল লাগছে আমার। ক্যানাফুলদের দুপুর এমন আশ্চর্য নিরালা—এখন যদি ডেকে ওঠেন তিনি—'

'তিনি?'

'আর কে? যিনি কালো মেঘ ফাটিয়ে কথা বলেন—'

'ডাকবেন না। আজ ওয়াজেদ আলী সাহেবের কথা বলবার কথা।'

হারীতের কথাটা কানে গেল না যেন সুলেখার। সে অন্যমনস্ক হয়ে অনেক দূরের একরাশি জলের দিকে তাকিয়েছিল। উঁচু-উঁচু গাছের ফাঁকের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে—বাতাসে-বাতাসে ছুটে চলেছে জলগুলো, কোনোদিন যেন শেষ হবে না এমনি একটা শাশ্বত ইশারার ঝিলিক, কোনোদিন যেন নিভে যাবে না এমনি এক অবিনশ্বর সূর্যের। সূর্য নয়, সূর্যদেবীরই যেন প্রেমিক হারীত। তার নিজের মনও তো, ভাবছিল সুলেখা, এমন উজ্জ্বলন্ত দিনের সঙ্গে—দিনের নক্ষত্র আগুন জল সূর্য নীলিমার সঙ্গে মিশে যেতে চায় যেন মানুষের মন।

'কটা বেজেছে সুলেখা?'

'একটা হয় তো।'

'আন্দাজে বলছ? ঘড়ি নেই তোমাদের বাড়িতে?'

'কেন, সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেলা বলে দিতে পার না তুমি?'

'হাঁসেদের মত? পার তুমি? দেশ গাঁয়ের লোকেরা পারে। আমিও কলকাতার লোক নই।'

'শালিধানের চিড়ের মত ধূসর ডানা-পালকের একটা গেরস্তের হাঁসের মত আকাশের দিকে চোখ তাকিয়ে হারীত বললে, 'দেড়টা তো বেজেছেই, বেশিও হতে পারে।'

'তাকালে তো ওপরের দিকে, সূর্যটাকে দেখলে কোথায়? এ জানালা ও জানালা কোনোদিক দিয়েই তো সূর্য দেখা যাচ্ছে না। কী করে বেলা ঠিক করলে তুমি হাঁসের মত ঘাড় কাত করে আকাশের দিকে চোখ মেরে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সূর্য দেখা যাচ্ছে না বলেই তো বুঝতে পারলুম দেড়টা বেজেছে। দুটো আড়াইটে হলে, পশ্চিম দিকের কৃষ্ণচূড়ার ওপরে দেখা যেত সূর্যটাকে।'

'মেঘে ঢাকা পড়ে নি তো সূর্য?'

'মেঘ তো সব পুবদিকে এখন। এ দিকে যা ছিল সব সরে গিয়েছে।'

জানালার ভেতর দিকে তাকিয়ে সুলেখা বললে, 'পশ্চিম-দক্ষিণেও তো মেঘ আছে–'

'আছে, অনেক দূরে। ও-দিকে যাবে না তো সূর্য।'

সুলেখা আবার আকাশের দিকে তাকাতে-তাকাতে বললে, 'বাঃ, এই তো কত মেঘ পশ্চিমের দিকে, কত সাদা মেঘ–প্যাঁটরাভরা মেঘ সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলছে পশ্চিমের দিকে। পুবের দিকের মেঘগুলো তো সাদা ঠাণ্ডা।'

'আর মাথার ওপরের মেঘগুলো?'

'সাদা, চুপচাপ।'

'হ্যাঁ,' হারীত ভাল করে তাকাতে-তাকাতে বললে, 'ঐ মেঘগুলো, আমরা কথা বলতে-বলতে, এই মাত্র এসে পড়েছে। হ্যাঁ, আছে সূর্য এ দিকেই। খুব জ্বলছে তো অনেকখানি আকাশের মেঘ।'

'সূর্য তা হলে পশ্চিমে এসে পড়েছে?'

'ঠিক পশ্চিমের নয়।'

'মাথার ওপরও নয়।'

'এই দেড়টা-দুটো বাজাল পশ্চিমে এসে পড়েছে বটে সূর্য,' সুলেখা একটু টিটকারি দিয়ে হেসে বললে 'আকাশ-ঘড়ি দেখে টাইম বলে দিল বুঝি পাখি?'

'কে পাখি?'

'কত পাখিই তো টাইম বলে দেয় দাঁড়িয়ে থেকে, উড়ে যেতে-যেতে, সূর্যকে চোখ ঠার দিয়ে।'

'কিন্তু হাঁস যেমন টাইম বলে কেউ আর তা বলতে পারে না ভাবছ বুঝি সুলেখা? আমি একটা পাখির কথা বলব তোমাকে, সে পাখি–হাঁস, কিন্তু দময়ন্তীর হাঁস নয়। কিন্তু দময়ন্তীর হাঁস যদি বল তাকে, তা হলে বলব সে জুলেখার হাঁস, সুলেখার হাঁস নয়।'

'মানে? কেমন ভাঁড়ের মত কথা বলছ তুমি হারীত,' খুব মনোযোগ দিয়ে হারীতের মুখের দিকে তাকিয়ে হারীতের কথার তাৎপর্যটা বুঝে নিতে চেষ্টা করছিল সুলেখা। কথা-ভাবা চোখ নিয়ে মশালের আগুনের মত ক্যানাফুল-গুলোর দিকে তাকাল সে।

'দময়ন্তী হাঁসটাকে ভালবেসেছিল বটে, কিন্তু বেশি ভালবেসেছে কাকে?'

'যে হাঁস নয় তাকে,' ক্যানাফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বললে সুলেখা, 'সব ক্যানাফুলগুলোই লাল কেন, এ রকম মানুষের ছুরি-বসানো মানুষের বুকের রক্তের মত লাল, গত আগস্টের আগের আগস্টের কলকাতার? তার আগের এক আগস্টের বাংলাদেশের?'

কিন্তু এ কী ভাবছে সুলেখা–মানুষের মারাকাটা বোকা রক্তের সঙ্গে এর কখনো তুলনা হয়? এ বড় ভাল জিনিস, বড় জিনিস, সৃষ্টির নিহিত অর্থের কাছের জিনিস এই লাল, এক দিন মানুষ রক্ত শোধিক হয়ে-হয়ে এই স্থির পবিত্র রূপ পাবে।

'জুলেখাও হাঁসটাকে দরকারি মনে করে, কিন্তু তবুও ভালবেসে কাকে?' বললে হারীত।

'অবনী খাস্তগিরকে তো নয়। কী হবে তাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট ব্রিজ খেললে? মিলেমিশে বক্তৃতা দিলে? কী হবে অবনীবাবু জুলেখাকে সত্যিই ভালবাসলে?' জীবনের চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর যে দেখেছে তেমনি একটি বয়স্ক মহিলার অভিজ্ঞতার আঁটসাঁটের ভেতর থেকে বললে যেন সুলেখা, খুব স্থির মনোভাবে অল্পস্বল্প হেসে।

'অবনীবাবু জুলেখাকে ভালবাসে কে বলেছে তোমাকে?'

'ইয়ুসুফ বলেছে।'

'ক্যানাফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে হারীতের মনে হচ্ছিল, হলদে ফিকে গোলাপি ফুটফুটে ক্যানার ঝাড় চার দিকে থাকলে কেমন হত? নিস্তার পেত না কি তাতে চোখ? সঙ্গতি অনুভব করত না কি সুলেখা, জুলেখা, তাদের মা আর হারীতের অনুভূতি? কেবল এক বগগা জিনিসই থাকবে?

'আর ওয়াজেদ আলী সাহেব কী বলেছে?'

'কী বললেবন তিনি? তাড়াহুড়ো নেই আলী সাহেবের। চার-পাঁচদিনেই কলকাতার গাড়িতে চড়বার কথা নয়। এখানকার মানুষ তিনি।'

'আসছেন যাচ্ছেন?'

সুলেখা একটু গালে টোল ফেলে হেসে বললে, 'কে, উড়ে গেল নাকি দময়ন্তীর হাঁস, তার কথা বলছিলে না?'

'বলেছিলাম দয়মন্তীর মতনই জুলেখা হাঁসটাকে পিঠ চাপড়াচ্ছে। কাজ তার অন্য মানুষকে নিয়ে। কিন্তু সুলেখার কোনো হাঁসটাস নেই, কাজ তার মানুষটাকে নিয়ে।'

'কী মানে হতে পারে তার?'

'কী মানে হতে পারে?'

'এ সব হচ্ছে রাতের–বেশি শীতের রাতের হেঁয়ালি-জেয়ালির মত; এখন কোনো মানে বেরুবে না।'

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শীত এসে নিক পৃথিবীতে, তার পর মানে বোঝা যাবে?'

'বেশি শীত বেশি রাত হয়ে গেলে এ সব কথা ভাবা যাবে এক দিন হারীত।'

'এখন তো গরমের কাল, চোত-বোশেখ। একেবারে অঘ্রাণ-পৌষ না এলে কথাটার তল পাওয়া যাবে না বুঝি সুলেখা?'

'আরো দেরি হতে পারে।'

'আরো দেরি? কত দেরি?'

'ঢের দেরি। এক একটা জিনিস বুঝে ওঠা বড় কঠিন।'

'সানগ্লাসটা সুলেখাকে ফিরিয়ে দিয়ে হারীত বললে, 'আসছে শীতে বোঝা যাবে?'

সুলেখা কেমন যেন উৎসাহ হারিয়ে ফেলে আস্তে-আস্তে বললে, 'আসছে শীত কী আজই এল দেশে?'

'কিংবা তার পরের শীত?'

'সে তো আরো পরের কথা। আজ তা দিয়ে কী হবে,' সানগ্লাস চোখে এঁটে বললে সুলেখা, 'তুমি তো চান করে এসেছ দেখছি। খেয়ে এসেছ?'

'না, আমি তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি গিয়ে খাব।'

'তার মানে?'

তার মানে, রাতে আর খাবে না হারীত। এক বেলা ভাত খাচ্ছে; রাতে দুধ খায়, দু-একটা দেশী ফলপাকড় যোগাড় করে আনে। কোনো রোজগার করছে না হারীত। নিশীথ তো দেড়শ টাকা দিয়ে গেছেন সুমনাকে। তাই দিয়ে মাস তিনেক অন্তত চালাতে হবে তো। কোনো একটা উপায়ের পথও দেখতে হবে জলপাইহাটিতে। বছরখানেক থাকবে তো সে এখানে। দিনে একবার খেয়ে শরীর ভালও আছে তার, টাকাও কম খরচ হচ্ছে।

'কলকাতার নিয়মটা ভাঙি নি। কলকাতার আস্তানায় ফিরে খেতে-খেতে সাড়ে তিনটে-চারটে বেজে যেত। কেমন হয়েছে, তার আগে ক্ষিদেও পায় না। নিয়মটা বদলাতে সময় লাগবে।'

'ক্ষিদে পায় না তিনটের আগে?' কেমন একটু আস্বাদ বোধ করে বললে সুলেখা।

'না।'

'তা হলে রাত কটার সময় ভাত খাও?'

'এগারটা-বারটা।'

'অত দেরি? তা হলে খুব দেরিতে রান্না চড়ে তো!'

'হ্যাঁ। বাতিও অনেকক্ষণ জ্বালিয়ে রাখতে হয়।'

শুনে সুবিধে বোধ করছিল না সুলেখা। সকালবেলা তাদের সাড়ে দশটা-এগারটায় খাওয়া শেষ হয়ে যায়, রাতে সাড়ে আটটা-নটায়। এর ব্যতিক্রম কি স্বাস্থ্যেরও ব্যতিক্রম নয়? বিশৃঙ্খলা তো খুব। কেমন শরীর ভেঙে পড়েছে হারীতের; নিশীথবাবুর চেয়েও বয়স্ক দেখায় যেন হারীতকে আচমকা তাকিয়ে দেখলে, নিশীথবাবুর দাদার মত মনে হয় পৌঢ়তায়, জীর্ণতায়। অথচ চার বছর আগে কী আশ্চর্য চেহারা ছিল হারীতের।

'এই সব অনিয়মে শরীরটা খারাপ হয়ে পড়েছে তোমার।'

'এখন ভাল হবে।'

'কলকাতায় মদও খেতে তুমি?'

'কে বলেছে?'

সুলেখা হেসে চিপটেন কেটে বলল, 'সব কথাই তো আমাকে ওয়াজেদ আলী সাহেবেরা বলে। কিন্তু এটা বলে নি।'

'মদ খাব ভাবছিলাম কলকাতায়, কিন্তু পয়সায় কুলল না। ইকবালের হিন্দুস্তান হামারা, সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা গানটা বেশ একটা নাম করা পাড়ার মেয়ে গাইছিল, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে শুনেছিলাম। পয়সা ছিল না বলে বাড়িতে ঢুকে সে মেয়েটার সঙ্গে রাত কাটাতে পারলাম না।'

'খুব ইচ্ছে করছিল?'

'গানটা গাইতে পার তুমি?'

'লক্ষ্মৌর মুসলমানিদের মত পারি না,' সুলেখা নিজের অন্তকর্ণকে শুনিয়ে গানটা গাইবার চেষ্টা করতে-করতে একবার হারীতের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললে, 'এখানে গলা ছেড়ে গাইতে হলে হিন্দুস্তানের জায়গায় পাকিস্তান বলতে হবে।'

হারীত কুঁড়েমি ভাঙতে-ভাঙতে বললে, 'গানটা লিখেছেন তো পাকিস্তানের কবিগুরু ইকবাল, তিনি কী বুঝে হিন্দুস্তান লিখেছেন তিনিই জানেন, তুমি জনাব ওয়াজেদ আলী সাহেবকে না জিজ্ঞেস করে পাকিস্তান করে দিও না।'

সুলেখা গুনগুন করে অন্য একটা উর্দু গানের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে থেমে গেল। 'বোস তুমি, চা করে আনছি।'

'তুমি খাও। আমি এখন খাব না। তিনটে সাড়ে তিনটের সময় তো ভাত খেতে হবে। এমনি ক্ষিদে কম। চা খেলে ক্ষিদে একেবারে মরে যাবে। কত বাকি তিনটে বাজবার বলতে পার?'

'নিচের বড় ঘড়িটা তো বন্ধ হয়ে আছে। হাতঘড়ি দুটো ওরা নিয়ে গেছে। আমাদের চেয়ে তো ওদের দরকার বেশি, ওরা মিটিঙ করছে। তোমাকে বলব আমি সময় হলে। কেন সাড়ে তিনটের সময় ভাত খাওয়া; ব্যবস্থাটা বদলে ফেল হারীত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আস্তে-আস্তে বদলাচ্ছি।'

'ভেবেছিলুম রাত অব্দি এখানে থাকবে।'

'কটায় ফিরবে ওরা?'

'মিটিঙ হবে, মিটিঙ আরো টেনেটেনে হবে, ভেঙে গেলে ওখানে বসেই আরেকটা বৈঠক হবে; অবনীবাবুর বাড়িতে ফিরে আসা হবে, কথা হবে, খাওয়া-দাওয়া হবে, আবার কথা হবে, তার পর বাড়িতে ফিরে আসার কথা। রাত বারটার এ দিকে হবে বলে মনে হয় না।'

হারীত মাথা হেঁট করে একটু চিন্তা করে বললে, 'তা হলে আমি অবনীবাবুর বাড়িতে তোমাকে দিয়ে আসি, চলো।'

'না। ওখানে আমি যাচ্ছি না তো।'

'কোথায় যাবে তা হলে?'

'এখানেই থাকব।'

'একা থাকবে?'

'ভাত খেয়ে ফিরে আসবে তুমি এখানে?'

'কে, আমি? হারীত একটু চিন্তিতভাবে হেসে বললে, 'আজ আর ফিরতে পারব না। আমার একটু কাজ আছে বাইরে।'

'কী কাজ?'

'কিছু-কিছু ছোট কাজ করতে এসেছি জলপাইহাটিতে আমি। আজ বড়িতেও ফিরতে পারব না।'

'কী কাজ হারীত?'

'আমি একটু সাহাদের আড়তে যাব চালের জোগাড় করতে। শুনলাম চামার-পট্টির ও-দিকে ছোটলোক ভদ্রলোক অনেকেই না খেয়ে আছে। দেখি কতদূর কী করা যায়'—

'কেন, সাহাদের ওখানে যাবে কেন, ডিস্ট্রিক্ট অফিসারকে বললে না কেন?'

'বলেছি। গভর্নমেন্টের তো সব ফাইল, পোর্টফোলিও ব্যাপার। সময় লাগে। বিরাজ সাহার কাছ থেকে বোধ হয় চট করে জিনিস পাওয়া যাবে।'

'টাকা দিতে হবে না?'

'সে পরে বোঝা যাবে।'

'কে দেবে টাকা?'

যতটা ভাল হারীত নয়, সুলেখাও নয়, সে সবের চেয়েও যথার্থই একটা ভাল নিরপরাধ হাসি হেসে হারীত বললে, 'পরে বোঝা যাবে।'

'তা ছাড়া আর-একটা জিনিস ভুলেই যাচ্ছিলাম,' হারীত সুলেখার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এখানে তো শাড়ি কাপড় একদম পাওয়া যাচ্ছে না, ইউনিয়ন থেকে জিনিস এনে ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছে। কিন্তু কালবাজারে কাপড় কিনবার শক্তি আমার নেই, রুচিও নেই, এখানকার কালজাবার শায়েস্তা করতে গেলে যে অনেক বড় জাল-বেড়াজালে গিয়ে হাত পড়বে। এক দিনের কাজ নয়, এক জন মানুষেরও নয়, ক'জন মানুষের কত দিনের কাজ সেটা অঙ্ক কষে বার করো তুমি; এক জীবন বসে কষতে হবে। শুনলাম, অনেক ছোট ঘরের মেয়েরা কাপড়ের অভাবে হেঁসেলে ঢুকে থাকে কোথাও যেতে পারছে না, লোপাট হবার জোগাড় সব'—

'ছোট ঘরের মেয়েরা? আর ভদ্রদের কী?'

'ভদ্রঘরের মেয়েদের কে আর হাতে পাচ্ছে,' সুলেখার বেনারসির দিকে তাকিয়ে চোখটা একটু ঝিকিয়ে নিয়ে হারীত বললে।

'ছোট ঘর বলছ কাদের, মাস্টারদের বৌদের ঝিদের?'

'তা তো আছে। আরো নিচে—'

'তার নিচে তো মুচি, মুদ্দফরাস, কামার, চামার, জোলা, তাঁতি, ধোপা, নাপিত, জেলে, চাষাভুষো। এদের অনেকে মাস্টারদের চেয়ে বেশি কামায়। মাস্টারদের মত অত ভব্যতা রক্ষা করবার দরকারও হয় না এদের ঝি-বৌদের। কাদের শাড়ি দেবে তুমি হারীত?'

'চাষা-চামারদের পরিবারদের দেব।'

'আর মাস্টারদের ঝি-বৌদের কী হবে?'

'সেটা পরে দেখা যাবে।'

'চাল কাদের জন্যে যোগাড় করছ?'

'যাদের কাপড় দেওয়া হবে তাদের জন্যেই।

'খুব ভাল কথা তো। কিন্তু নিশীথবাবুর দেড়'শ টাকা ফুরিয়ে গেলে তুমি নিজে কী খাবে?'

কোনো উত্তর দিল না হারীত। একটা উত্তরের জন্যে হারীতের দিকে শক্ত কপালে থুতনি কঠিন করে তাকিয়ে থেকে সুলেখা বললে, 'এ তো গেল কলেজের মাস্টারদের কথা। কিন্তু স্কুলের মাস্টারদের কী হচ্ছে না হচ্ছে, কী খায় কী করে, সে হিসেব রেখে আর কী হবে তোমাদের; কিষাণ-মজদুরের বন্ধু তোমরা। কলকাতার মত বড়-বড় শহরের মজদুরদের চেয়ে মফস্বলের বেসরকারি সেকেন্ডারি প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারদের অবস্থা ঢের খারাপ। অথচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশ তাদের কাছ থেকে, খাওয়ার না হোক, পরার ভদ্রতো বেশি দাবি করে, আর পড়াবার মর্যাদার পাণ্ডিত্যের। এত বড় বেইজ্জতের জিনিস পনেরই আগস্টের পরেও টিকে আছে ইউনিয়নে আর পাকিস্তানে। মাস্টারদের শিক্ষা-দীক্ষা চরিত্র স্বার্থত্যাগের সঙ্গে যাদের কোনো তুলনাই হয় না তারা তো তারা, তাদের পিওন পেয়াদারা পে-কমিশনের দৌওলতে ডার্বি টিকিট কিনছে, রেঞ্জার্স টিকিট কিনছে, রেসে বাজি ধরছে, ইনসিওরেন্স করছে, ক্যাশ সেভিং সার্টিফিকেট কিনছে, কলকাতার সেক্রেটারিয়েটের ক্যান্টিনে মেয়েমানুষ নিয়ে ঢুকে খেয়ে ডিসপোজল থেকে শখের জিনিস কিনে দিচ্ছে তাকে—আমি নিজের চোখে দেখেছি হারীত—হয় তো কোনো মাস্টার কেরানির মেয়ে বা শালি হবে—পিওনের পে-কমিশন খাচ্ছে এমন; ব্ল্যাক মার্কেট থেকে শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ-ফল্না-দফনা কিনে দিয়ে পেয়াদারা স্ত্রী ভজাতে ছাড়বে কেন, দেখছে টাকায় ভাল স্ত্রীদেরও ভজানো যায়, হাতিবাগান আর শেয়ালদা বাজার থেকে ডাল-মাছ-তরকারি-দুধ খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিলে পে-কমিশন পিঠ চাপড়ে লেলিয়ে দিলে কেন সে সব স্ত্রীলোকদের হাতড়াবে না তারা, এদের স্বামীরা শিক্ষিত উন্নত হলেও টাকার অভাবে বৌকে খাওয়াতে পারছে না, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরতে দিচ্ছে। এ তো গেল পেয়াদা পিওনের পে-কমিশন। তাদের মাথার ওপরে যারা পে-কমিশন পাচ্ছে তারা তো মাচায় চড়ে খাচ্ছে। কে পে-কমিশন বসাল? কেন বেসরকারি স্কুল-কলেজের মাস্টাররা পে-কমিশনের সুবিধে পাচ্ছে না। কেন বেসকারি স্কুল-কলেজ আজও টিকে আছে? সেগুলোকে হামান-দিস্তায় ছেঁচে ফেলা হচ্ছে না কেন? কেন সব স্কুল-কলেজে স্টেটের হাতে নেওয়া হচ্ছে না? গভর্নমেন্টের কেরানি তো ভাল, গভর্নমেন্টের পিওন-পেয়াদাদেরও আজ ধনে-মানে মাস্টারদের চেয়ে বড় করে দেওয়া হচ্ছে। কী প্রমাণ করা হচ্ছে? ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চলে যাবার পর এ কাদের হাতে রাজত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা লোকের সামনে মুখ দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু ভাল করে তাদের মুখ দেখে নেবে সে রকম লোক নেই বুঝি দেশে? সব স্কুল-কলেজ ভেঙে ফেলে পুলিশ হয়ে যাওয়া উচিত তোমার বাবাদের। সমস্ত ইউনিয়ন ভরে পুলিশ আর সেপায়ের ছাউনি উঠুক, বরবাদ হয়ে যাক সমস্ত স্কুল-কলেজ।'

'সে হবে। সে সবের তোড়জোড় চলেছে। আমরা আছি সব; মেশিনগান ভেঙে ট্রাক্টর বানিয়ে হলায়ুধের মত চষে ফেলব সব; সব সব—স্কুল-কলেজ সব চেয়ে আগে। ট্রাক্টর ভেঙে মেশিনগান বানিয়ে উড়িয়ে দেব সব; স্কুল-কলেজ সব চেয়ে আগে। চেনো না আমাদের। তোমার কাছে কয়েকটা শাড়ি চাই,' হারীত বললে।

সুলেখা কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে শেষে হাসতে-হাসতে বললে, 'লেভিটা ঠিক ধরে আছে হারীত। মাস্টারের ছেলে হয়ে আজ-কাল পিতৃরক্তে তর্পণ করার দিন; এ যদি তুমি না করবে হারীত!'

'কাটা শাড়ি দিতে পারবে সুলেখা?'

সুলেখা মাথা নেড়ে বললে, 'শুধু কিষাণ মজদুরের হবে না; কিষাণ মজদুর মাস্টার এদের জন্য আমাদের লড়াই—এ জিনিসটা সি-পি-আই-এর হাই কমান্ডের থেকে পাস করিয়ে দস্তুর মত কাজে না লাগালে তোমাকে আমি কিছু দেব না।'

'সি-পি-আই-এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তবে তুমি কোথাকার?'

'আমি কোথাওর নই। কলকাতায় একটা সঙ্ঘর মতন গড়েছিলাম, সেটা ভেঙে গেছে হয় তো আমি চলে আসার পর। এখানে আমি লিগ, কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি সুস্থ অবস্থায় যেটা যে-রকম দাঁড়িয়ে আছে নেড়েচেড়ে দেখতে পারি—সত্যিই তাতে যদি কিছু উপকার করতে পারা যায় বাস্তবিকই যাদের উপকারের দরকার তাদেরকে। বড় চালে কিছু করতে পারা যাবে না। এখানে-ওখানে তালি মারা কাজ চলবে কিছু-কিছু।'

'এখানে তালি মারার ঘুনচি চাই না, কেন বিপ্লব করছ না? এখানে নয়, ইউনিয়নের বড় বিরাট ভাগাড় পড়ে রয়েছে। পে-কমিশন যারা ফাঁদল তারা মাস্টারদের পথে ছেড়ে দিল—সরকারি আই-সি-এস থেকে পিওন অব্দি যারা রক্ত জল করে পুষছে, বেসরকারি স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠানের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না, তারা কি পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে?'

'সেটা তারা জুতো না খুললে কী করে বোঝা যাবে সুলেখা?'

সুলেখাদের ওখান থেকে ফিরে হারীত বাড়ি পৌঁছাল প্রায় চারটের সময়।

সুমনা বললে, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ, সেই তো সাত-সকালে বেরিয়েছ।'

'কত রকম কাজ থাকে।'

'কাজ থাকে! নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—'

'চান করে বেরিয়েছি তো। ক্ষিদে পায় না, খাব কী?'

'তোমার ক্ষিদে পায় না, আমার তো পায়। কী রোগ হয়েছে তোমার যে ক্ষিদে পায় না?'

'তুমি খেয়েছ? কী খেয়েছ মা? রাঁধল কে?'

'কী রোগ হয়েছে তোমার, হারীত, যে বেলা চারটে না বাজলে ক্ষিদে পাবে না। এতে মানুষ বাঁচে?' সুমনা অপ্রীত হয়ে বললে, 'এখন ভাত খেলে রাত্তেরবেলা ক-টার সময় খাবে?'

'রাতে খাব না।'

'সারা দিন রাতে শুধু এক বার খেয়ে বেঁচে থাকবে তুমি? এই করতে তুমি কলকাতায়?'

'আজ শরীরটা কেমন লাগছে তোমার? আগের চেয়ে ভাল লাগছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুমনা বললে, 'আমি যা জিজ্ঞেস করলাম সে কথার উত্তর দিলে কোথায়? একবার করে খাচ্ছ কেন? এখন কি তোমার রমজান মাস চলছে হারীত? কলকাতায় এ রকম ছিল? কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার কিছু নয়', হারীত তার বাবার পুরনো চেয়ারটা টেনে বসে বললে, 'আমার ক্ষিদে পায় না। পেলে খাব।'

'ক্ষিদে পায় না। এ তো বিষম রোগ। কেন ক্ষিদে পায় না? সোমত্ত বয়স তো তোমার, এ বয়সে ক্ষিদে পায় না? তোমারও কি ন্যাবা হল নাকি হারীত? দেখিয়েছিলে ডাক্তারকে?'

'ন্যাবা হয় নি, ন্যাবা হয় নি, আমি নয়নবাবুকে দেখিয়েছিলাম তাঁর ডিসপেন্সারিতে গিয়ে। তিনি বললেন,' হারীত কথা শেষ না করে সুমনার খাটের থেকে হাতপাখাটা খুঁজে নিয়ে বাতাস খেতে লাগল, 'কেমন গুমোট হয়েছে মা, বৃষ্টি পড়লে বাঁচি।'

'কী বলেছে নয়ন ডাক্তার?'

'বলেছে, ও কিছু না, ও-রকম হয় মাঝে-মাঝে, তার নিজেরও তো হয়েছে কত বার। বলেছে বাঙালির আবার ক্ষিদে!'

'কেন, বাঙালির ক্ষিদে পেতে নেই? দেখ না গিয়ে নরেন্দ্র মিত্তিররা কী রকম খায়। এই মহিমবাবু আর তার ছেলে আর অর্চনা কী রকম গুষ্টির পিণ্ডি গিলছে দেখ না গিয়ে। তোমার বাবাও খেতে পারতেন বেশ; তোমার এ রকম হল কেন?'

'হল তো,' হাতপাখাটা রেখে দিয়ে বললে হারীত। নিম, জাম, জামরুল নাচানো চোত-বোখেশের বাতাসে ঘরদোর ভরে গিয়েছে হারীতদের। হারীত উঠে গিয়ে ঠাণ্ডা ভাত, ডাল আর খানিকটা উচ্ছে-আলুর তরকারি খেয়ে এল।

'দুধ খেয়েছিলে হারীত?'

'না, রাতে খাব।'

'কী দিয়ে?'

'এমনি গরম করে খেয়ে নেব। রাতে খিদে পায় না একদম।'

'অর্চনা একটা পেঁপে দিয়ে গেছে, সেটা কেটে খাস দুধের সঙ্গে।'

'আচ্ছা।'

'তোমার বাবার তো কোনো চিঠি পেলুম না।'

'লেখেন নি বুঝি তোমাকে?'

'আমাকে না, অর্চনাকে না।'

'তা হলে আর-কাকে লিখবেন?'

সুলেখাকে হয় তো লিখলেও লিখতে পারতেন নিশীথ সেন। হারীত কাঠের চেয়ারে বসে জামরুল বনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, যদি তিনি জানতে পারতেন যে তাঁর এ রকম এক জন মহাজন জলপাইহাটিতে লালপুলের রাস্তার পথে সেই আশ্চর্য দেড় তলা ঠাণ্ডা চালতে ফুলের রঙের বাড়িটার ভেতর রয়ে গেছে। কী নির্জনতা সেখানে, কী সান্ত্বনা। পৃথিবীর রক্তে, ইতিহাসের রক্তে, নিজের ব্যক্তিজীবনের মূর্খতায়, আর মহাজনদের কৃতঘ্নতায় যারা পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তাদের যেতে হয় কলকাতায়? তারা এখানে ফিরে আসুক, এখানে ফিরে আসুক; উপলব্ধি, বেশি উপলব্ধি বেশি নিষ্প্রিয়তা, কেমন একটা নিষ্কাম স্বস্তিকামনার হাতে আত্মদান, খানিকটা শান্তি—এই সব সাধ সিদ্ধির জন্যেই তো নির্মিত তাদের জীবন। কোথায় পাবে এ সব কলকাতায় নিশীথ সেন? কী করছে সেখানে সে? খুব সম্ভব ভাল নেই। নাকি ভাল আছে? কাজ পেয়েছে এবং কোনো মহিলাকে? বাবাকে চেনে নি বুঝি হারীত? কপাল ফুঁড়ে হঠাৎ আর-একটা চোখ বেরিয়ে পড়তে পারে এ রকম একটা প্রচ্ছন্ন আভাস নিয়ে-নিয়ে নিশীথ সেন যেন সব সময়ই ঘুরে বেড়াত ঃ নিম আর জামবনের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবছিল হারীত। সুলেখাকে বলে এসেছে হারীত, সে একটু চামারপট্টির দিকে যাবে যাহাদের ওখান থেকে কিছু চালের জোগাড় করবার জন্যে। যেতে ইচ্ছে করছে না আজ; শরীরটা ভাল নেই। ভাল নেই। কিন্তু গত তিন বছরের ভেতর কবে ভাল ছিল শরীর? এই প্রায় টি-বি রুগির মত শরীর নিয়ে কত দুর্দান্ত কাজ সে করেছে। যাবে চামারপট্টিতে সে, আগে বিরাজ সাহার কাছে যাবে, জোগাড় করে নেবে চাল ডালের। একটু রাত হবে যেতে। বেশি বেলায় বাসি জিনিসগুলো খেয়ে কেমন যেন অম্বল হয়েছে হারীতের। ঢেঁকুর তুলছিল।

পিওন পেয়াদা পে-কমিশন মাস্টারদের সম্বন্ধে যা বলেছে সুলেখা সেটা কেমন হিংস্র বাঘিনীর মত লাফিয়ে উঠে বলেছে, অথচ সুলেখাকে বিপ্লব করতে বললে কংগ্রেসের শান্তি আর সংহতির ভেতর গা-ঢাকা দিয়ে হারিয়ে যাবে সে। মিথ্যে কথা বলে নি সুলেখা, কিন্তু সত্যি কাজ করবে কি সে?

'উনি চিঠি লিখছেন না কেন হারীত?'

'তোড়জোড় করছেন।'

'কী বলছ বুঝছি না।'

'কোথায় আছেন কলকাতায়?' একটা ঢেকুর তুলে জিজ্ঞেস করল হারীত।

'বলেছিলেন তো জিতেন দাশগুপ্তের ওখানে থাকবেন কিছু দিন। গিয়ে একটা পৌঁছ-সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল না? কী হল, কলকাতায় যেতে পারলেন কী না?'

হারীত বললে, কলকাতা ছাড়া এ গাড়ি বেশি জিরোয় না কোথাও। বেশি না জিরোলে তিনি কি গাড়ি থেকে নামেন?' হারীত বললে, 'কলকাতায় জিতেন দাশগুপ্তের বাড়িতেই আছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'লিখছেন না কেন?'

'লিখবেন। কলেজে কাজ জোগাড় হলেই লিখবেন।'

'কোন কলেজে?'

'যে-কোন কলেজে, কলকাতার যে-কোনো কলেজে।'

'হবে কাজ?'

'উঠে-পড়ে লেগেছে বলে মনে হয়। হওয়া আশ্চর্য নয়! না হওয়াও অস্বাভাবিক নয়,' হারীত বিকেলের বড় আকাশের মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বললে।

'কী যে হেঁয়ালিতে তুমি কথা বলছ হারীত।'

'আচ্ছা তা হলে ভেঙে বলছি,' হারীত বললেন, 'কলকাতার কোনো কলেজে বাবাকে ভাল কাজ জুটিয়ে দেবার মত কোনো মুরুব্বি নেই, খবরের কাগজে পারবেন না, সরকারি চাকরির বয়স কই, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ডাকবে না বাবাকে, দাশগুপ্ত সাহেব পিঠ চাপড়ে বিদায় দেবেন—না, হবে না কিছু।'

'বড্ড কুবাতাস ছড়াচ্ছ হারীত।'

'জলপাইহাটিতে ফিরে আসতে হবে বাবাকে।'

'হরিলালবাবুদের কলেজে?'

'হরিলাল, কালীশঙ্কর, হিমাংশু চক্রবর্তী, এই নিয়েই তো দেশ। কলকাতায় গিয়ে এদের এড়াবেন? সেখানে তো আরো চেকনাই বেড়ে গেছে এদের। এদের বিশেষ কোনো দোষ নেই। অনেক সময়ই সজ্ঞানে পাপ করে না এরা। অনেক দিনের বাসি রক্ত জমেছে এদের—চারিদিকে এত দিন ধরে এত অসদ্ব্যবস্থা বলে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে তাই। নাকে কাপড় দিয়ে সরে গেলে লাভ নেই; বদ রক্তগুলো বের করে দিতে হবে।'

'বের করে দিতে হয়? রক্ত?' সুমনা বিরক্ত হয়ে বললে, 'ও-সব কথা আমাকে বলো না। কলকাতায় থেকে কেমন গুণ্ডার মত হয়ে গেছ যেন তুমি।'

হারীত অবাক হয়ে ভাবছিল এই লোককে নিয়ে ঘর করতে হয় নিশীথ সেনের মত মানুষকে। একটা অদ্ভুত অনিন্দ্য কুয়াশার ঘুমের ভেতর দিয়ে যেন বিশ-পঁচিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে তার বাবা তার মাকে নিয়ে জলপাইহাটিতে; এখন নিস্তার চাচ্ছে, কিন্তু যে-পথে গিয়েছে সেখানে নিস্তার নেই, সেখানে এক রাত্তিরের সুলতানি থাকতে পারে হয় তো, কিন্তু আজীবনের শান্তি তৃপ্তি নেই; নিস্তার যে-পথে আছে সেটা ভারি ভয় ও নিমূঢ়তা ও শোকের পথ মনে হবে নিশীথের মত মানুষের কাছে এই বয়সে আজ।

'এখানে আসতে বলছ, তুমি তোমার বাবাকে খাওয়াবে?'

'কলকাতায় পথ কেটে নিতে পারলে, বেশ তাই হোক; এখানে যে আসতেই হবে এমন কিছু নয়। এখানে যে-ভাবে ঘোরে বাইশ-চব্বিশ বছর কেটে গেছে তাঁর, সেটা টেঁসে গেল যেন। নতুন করে এখানে মন বসানো কঠিন। ওসব মানুষের টনক সহজে নড়ে না, কিন্তু একবার টলে উঠলে মনের মতন কোনো নতুন আশ্রয় না পেলে মৃত্যুকেও ভাল মনে হয় জীবনের চেয়ে। বেশি বিদারক বিশৃঙ্খল অশান্তিকেও ভাল মনে হয়, জলপাইহাটির বোকা নিরেস শান্তির চেয়ে।'

'আমি তোমার কোনো কথার কোনো মানে বুঝি না হারীত। তুমি পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল। বলি, তুমি খাওয়াবে আমাদের—কলকাতায় তোমার বাবার সুরাহা না হলে?'

'হ্যাঁ। খাওয়াব বইকি?' হারীত আস্তে-আস্তে বললে।

'এখানকার কলেজে একটা চাকরি জুটিয়ে নাও তুমি। দেখা করো হরিলাল-বাবুদের সঙ্গে।'

'দেখা করব।'

'কী রকম চাকরি পেতে পার?'

'আমি তো এম-এ দিই নি। একটা লাইব্রেরিয়ানের কাজ হয় তো দিতে পারে। কিংবা টিউটরের কাজ।'

'দেখা করো, দেখা করে ফেল হারীত মেম্বারদের সঙ্গে, প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে।'

'এই তো যাচ্ছি', হারীত বললে, 'তোমাকে বাবা দেড়শ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, সোয়াশ আছে এখনো। আমিও কিছু এনেছিলাম টাকা, কিন্তু গচ্ছা দিচ্ছি।'

'কী করে গচ্ছা গেল?'

'এই চাষাভুষো মেথরদের দিয়ে দিয়েছি।'

সুমনা ক্লান্ত হয়ে বললে, 'আমার টাকাটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।'

'আমার বাক্সে আছে; এক্ষুণি দেব?'

'হ্যাঁ। এখনই।'

টাকা হাতে নিয়ে, সোয়াশ টাকা গুনে, নোটগুলো আঁচলের খুঁটে বাঁধতে-বাঁধতে সুমনা বললে, 'তুমি নাকি ডাক্তার মজুমদারের কাছে কী একটা রফা করতে গিয়েছিলে?'

'কে বলেছে তোমাকে?'

'কানে আসে। নরেন বলছিল।'

'কোন নরেন? নরেন মিত্তির?'

সুমনা মাথা নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ'।

'নরেন আবার এখানে এসেছিল। এত বড় পায়া বেড়েছে তার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন আসবে না? আমাকে যে-রক্ত দিয়ে ঋণে বেঁধে রেখেছে। আমার পেটের সন্তানরা যা করে নি আমার জন্যে, সে তা করেছে। কী করছ তোমরা আমার জন্যে, গেটের ছেলেমেয়েরা? কী করছ তোমার বাবার জন্যে, তিনি তো কলকাতায় খুবড়ি খেয়ে একশেষ হচ্ছেন। নরেনের মত ছেলে থাকলে ও-রকম হত তাঁর?'

অম্বলই হয়েয়ে হারীতের, পেট জ্বলছিল, বুক জ্বলছিল, গলা জ্বলছিল। ডাল খাওয়াটা উচিত হয় নি, বেশি খেয়ে ফেলেছে, উচ্ছের তরকারিটায় একটু ঝাল ছিল। নিজেই তো রেঁধে গিয়েছে তরকারিটা সকালবেলা। কেন ঝাল দিতে গেল হারীত? নাকি, অর্চনা এক ফাঁকে এসে ঝাল মিশিয়ে গেছে রান্নায়?

'কী বলেছে নরেন?'

'যা বলবার তাই বলেছে,' সুমনা বললে, 'আগেই শুধোই তোমাকে, কেন নরেনের রক্ত নিচ্ছে না?'

হারীত একটু অবাক হয়ে বললে, 'কেন, রক্ত দেবার কথা বলছিল নাকি? রক্ত দিতে চাচ্ছে? সেধে দিতে চাচ্ছে?'

'তা চাচ্ছেই তো। কেন চাইবে না। সে তো দিচ্ছিল। তোমার বাবা ঠিক করে গেছলেন। আমার উপকার হচ্ছিল। তুমি বদলাবার কে হারীত?'

হারীত সুমনার দিকে তাকিয়ে বললে, 'উপকার হচ্ছিল? এখন যে দিচ্ছে তার রক্তে কোনো জোশ নেই মনে হচ্ছে তোমার? উপকার বোধ করছ না?'

'কেন নরেনের রক্ত বন্ধ করা হল? সে আমার কাছে এসে বলে গেছে। শুনছ হারীত? নরেনের রক্ত নেয়া হোক। সে আমাকে নিজের দিদির মত মনে করে।'

'কিসের মত মনে করে?' একটু খোঁচা খেয়ে বলল হারীত।

'আমার এই খাটে এসে বসেছিল, বললে, আমাকে আপনার নিজের দেওরের মত মনে করবেন বৌদি। নিশীথদা ঠিক করে গেলেন সব। আর হারীত এসে পাল্টে দিলে—'

'কখন এসেছিল নরেন?'

'দুপুরবেলা।'

'আজ?'

'হ্যাঁ। তুমি তখন জুলেখাদের বাড়ি গিয়েছিলে।'

'জুলেখাদের বাড়ি গিয়েছি কে বললে তোমাকে?'

'নরেন দেখে এসে বলে গেছে। নরেন, আজিজুদ্দিন, আব্দুল গনি, বরকত আলী, রজ্জক মিঞা, ইসমাইল, চাঁদ মিঞা, মোনতাজ সব্বাই দেখছে কদিন ধরে ওদের বাড়িতে তুমি ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করছ হারীত। এই তোমার কাজ জলপাইহাটিতে এসে? এর চেয়ে ভাল কাজ ছিল তোমার কলকাতায়। জুলেখাকে মুখোমুখি বসিয়ে মাকে ফাঁক দিয়ে তুমি তোমার সব আগড়মবাগড়ম মনুষ্যত্বের কাজ হাসিল করে ফিরছ বুঝি এই রকম, জলপাইহাটিতে এসে?'

শুনে চিন্তিত হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল হারীত। নিস্তব্ধ হয়ে আরো বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ছিল সে। শোক নেই, দুঃখ নেই, ভয় নেই, রাগ নেই, কেমন একটা গহ্বরের মতন অবস্থা মনের ভিতর, বাইরের লোকচলাচলের দেশে; বাইরের প্রকৃতিকেও যেন নষ্ট করে দিতে চাচ্ছে। নিম, জাম, জামরুল বন, ছোট-ছোট পাখি, চোত-বোশেখের বাতাস-অনবচ্ছিন্ন বাতাসের ভিতর মাঝে-মাঝে একটা মৌমাছির মত উড়ে যেতে দেওয়া মানুষকে; সব সময়ই যে সে মানুষের মত বসে থেকে জীবনের সমস্যাগুলো ঘাঁটাবে সেটা ঠিক কথা নয়। চারদিককার অবচেতনার আকাশ-পৃথিবীকে তবুও তার পর কী এক সুচেতা নারীজিনিসের মত লক্ষ্য করে যেন রসিয়ে উঠল তার মন আনন্দে, কেমন একটা তামাসারত চেতনায়। ঠোঁটের কোণায় হাসির রেখা দেখা দিল হারীতের।

'আমি ঠিক করে ফেলেছি নরেনের সঙ্গে।' সুমনা বললে।

'কী ঠিক করেছ?'

'আমাকে রক্ত দেবে।'

'রক্ত চাইলে বুঝি তার কাছ থেকে?'

'না, সে নিজেই এসেছিল, আমি তো ডাকি নি তাকে। মনটা আমার কেমন কেমন করছিল যেন; নরেন এল না, নরেন এল না, হারীত এসে বড় অন্যায় করল নরেনের ওপর। ভেবেছিলুম মনটা ভাবছিল ছেলেটাকে। এল তো!'

'টেলিপ্যাথি বলে একে,' মনের পীড়িত ভাবটাকে চাপা দিয়ে একটু হেসে নেবার চেষ্টা করে হারীত বললে, 'কিন্তু—'

'তা হলে কথাটা রইল?'

'কোন কথাটা?'

'নরেনের সঙ্গে আমি ঠিক করে ফেলেছি।'

কেমন একটা লোলুপতা যেন সুমনার চোখে। নাকি অনির্মল দৃষ্টি তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখছে হারীত। সমীচীনতা নেই সুমনার কোনোদিন, মনের দিক দিয়ে বিকাশের বৃত্তান্ত বিশেষ কিছু নেই। হৃদয়ের বিশৃঙ্খলার তাড়না রয়েছে সব, নিশীথের জীবনটাকে কেমন পিছনের দিকে টেনে হয়রান করে ফেলে। কিন্তু এ ছাড়া আর-কিছু বাড়াবাড়ি নেই। না, ওটা নেই, ওটা কিছু নয়।

'তুমি একা কী করে ঠিক করু কাউকে জিজ্ঞেস না করে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ডাক্তারকে বলে এসেছে নরেন।'
'রক্ত দেবে আবার?'
'কাল থেকে দেবে।'
'ওরই রক্ত চাই তোমার?'
'তাতে ভাল হবে। তাড়াতাড়ি সেরে উঠব। কেমন তাগড়া ছেলে তো নরেন। নতুন যেটিকে জুটিয়েছ তুমি সে তো ভিজে বেড়ালের মত, হারীত। যাকে যার ভাল লাগে তার জিনিসেই তার তিলে তাল মিলে যায়, শাকের কণায় পঞ্চশস্য।'
'কী বলেছেন ডাক্তার?'
'তার সায় আছে।'
'জিজ্ঞেস করে দেখব এক বার ডাক্তারকে।'
'কাল তো রক্ত লাগবে।'
'আজ যাব ডাক্তারের কাছে।'
'নরেনকে আমি কথা দিয়েছি।'
'আজ যাব ডাক্তারের কাছে।'
'যেখানেই যাও খোদার ওর খোদকারি করতে পারবে না। ব্যবস্থা উনি করে দিয়ে গেছেন। ব্যবস্থা আমি করছি। তুমি কে হে?'
কোথাকার একটা নিচু ঝোপের থেকে উড়ে এসে বেশি বাতাসে-বাতাসে বড় শিমুল গাছটার লম্বা পাতা আঁকড়ে ধরবার জন্যে দুটো বুলবুলি কী রকম উড়ছে-ঘুরছে, তাকিয়ে দেখছিল হারীত।
'নরেনের সঙ্গে যে-সব হিন্দু-মুসলমান ভাইরা এসেছিল তারা কি আমাদের ঘরে ঢুকেছিল?'
'ঢুকেছিল।'
'আমি ছিলাম না, তবুও ঢুকল?'
'আমি তো ছিলাম।'
'কোথায় বসল তারা?'
'আমার খাটে এসে বসেছিল চার-পাঁচজন, বাকিরা তোমার বাবার তিন-চারটে চেয়ারে বসেছিল।'
'এত লোক সব? গনি বসেছিল কোথায়? আব্দুল গনি?'
'গনি খাটে এসে বসেছিল, আমার পাশেই তো; বড্ড প্যাঁজের গন্ধ পাচ্ছিলাম।'
'জলপাইহাটি কলেজের বেয়ারা তো গনি।'
'তা জানি আমি। তোমার বাবা থাকতে গনি আমাদের ঘরে ঢুকত না। কিন্তু এখন ঘরে ঢুকে আমার খাটে এসে বসল তো।'
'কেমন হল সেটা? তুমি খাটে বসে আছ, অথচ-অবিশ্যি সব মানুষই এক,' হারীত বললে, 'বসলে বই কি, কিন্তু পুরুষরা চিরকাল পুরুষদের সঙ্গে বসলেই ভাল। বিড়ি-টিড়ি চাইল গনি?'
'আমার কাছে? না, তা চায় নি তো।'
'অর্চনা মাসির কাছে চেয়েছিল–'
'কে? গনি?'
'না, মোনতাজ।'
'কোন মোনতাজ? ঐ যে ঘড়ি-আলা আস্তাবলের গাড়োয়ান?'
'ইস। মহিমবাবু তখন কলেজে গেছেন, ছেলে স্কুলে গেছে–মোনতাজ সজনে গাছের পাশের সদর রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে, সওয়ার নামিয়ে দিয়ে, এদিকে চলে এল, সোজা মহিমবাবুর ঘরে ঢুকে, চেয়ারে বসে, জিজ্ঞেস করল বিড়ি আছে কি না'–
'জিজ্ঞেস করল মোনতাজ?'
'কেন জিজ্ঞেস করবে না, বিড়ির দরকার তার।'
'চেয়ারে চড়ে বসেছিল?'
'চেয়ার তো মানুষের জন্যে, মানুষ তো চেয়ারের জন্যে নয়'। এটা বুঝতে চাচ্ছে না সুমনা, বোঝানো বড় কঠিন, ভাবছিল হারীত।
'কী করল অর্চনা?'
'বলছি তোমাকে,' হারীত একটা বিড়ি জ্বালিয়ে তৎক্ষণাৎ সেটা নিভিয়ে সরিয়ে রাখল। কী বলছে, কী করছে, কোথায় আছে–খেয়ালই ছিল না। কিছু তার।
'কবে হল এ সব?'
'এই তো পরশু দুপুরবেলা। আমি বাড়ি ছিলাম না, তুমি ঘুমুচ্ছিলে'–
'কী হল তার পর-বিড়ি চাইল মোনতাজ?'
'মহিমবাবু তো তামাক খান না। কিন্তু মহিমবাবুর ছেলে ক্লাস সিক্সে পড়ে, সে একতাল চাঁদ-তারা মার্কা বিড়ি কিনে এনে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে ব্যাঙের আধুলির মত বার করে খেয়ে নেয়, বাপ তো টেরই পায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, মা সেটা বুঝতে পেরেছে, বামাল ধরেও ফেলেছে। তবে পয়সার মাল, ফেলে দেয় নি, নিজের হেফাজতে লুকিয়ে রেখেছে। সেখান থেকে বের করে দুটো বিড়ি দিয়ে দিল মোনতাজকে।'

'এ রকম দিচ্ছে আজকাল ভদ্রঘরের বৌরা, শুনছি তো!' সুমনা জানালা দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ফুরফুর করে যে-বাতাস আসছিল সেটার দিকে তাকিয়ে নিল যেন একবার, 'কী করলে মোনতাজ?'

'বিড়ি জ্বালিয়ে ধোঁয়া ওড়াল, অর্চনা মাসিকে জিজ্ঞেস করল তার কোনো বোন-টোন আছে না কি মোনতাজের ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার মত।'

'ও মা। ও মা! তাই বললে মোনতাজ? ও মা! এ আবার কী রকম ঘটকালির ছিরি!'

'এ রকম ঢের সম্বন্ধ হচ্ছে তো আজকাল।'

'ও মা! জলপাইহাটিতে?'

'সব জায়গায়। অর্চনা মাসির মেয়ে-বোন-টোন কেউ নেই বলাতে মোনতাজ বিড়ির ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় মনসার মুখে-চোখে ধুনো সুগন্ধ ছড়াতে-ছড়াতে বেরিয়ে গেল। জিনিসটা মকবুল চৌধুরী সাহেব কিংবা শাহাদাৎ হোসেন সাহেবকে জানাবে কি না জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে অর্চনা মাসি। আমি "না" করে দিয়েছি। মোনতাজরা ছেলেমানুষ। স্বাধীনতা পেয়ে ছেলেমানুষি একটু বেড়ে গিয়েছে হয় তো, কিন্তু সে সব শুনা-টুনা নিয়ে রাও করে কোনো লাভ নেই। যখন দেখা যাবে যে যারা ভদ্র-টদ্র শিক্ষিত সমীচীন, তারাও গোলমাল করছে, তখন অবিশ্যি চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। কিন্তু তারা কিছু করবে না। সত্যিই শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে দেশটাকে সব দিক দিয়ে উন্নত সভ্য করে তোলবার জন্যে তাদের চেষ্টা খুব আন্তরিক, তা আমি জানি।'

'কিন্তু দুপুরবেলা ভদ্রবৌদির ঘরে ঢুকে বিয়ের সম্বন্ধ পাড়া—এটা চৌধুরী সাহেবকে জানালেই ভাল হত।'

'মোনতাজদের হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে, কিন্তু আর-এক দল আছে মোনতাজ গনির চেয়ে বেশি ভারে কাটে, বুদ্ধিও আছে খানিকটা, কিন্তু বিশেষ কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই; হোসেন সাহেব চৌধুরী সাহেবদের মত বিজ্ঞতা প্রবীণতা নেই, তারা যদি একটু বেসামাল হয়ে উঠতে থাকে তা হলে চৌধুরী সাহেব, আমির আলী সাহেব, শাহাদাৎ হোসেন সাহেবকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। গনির কাছে বিড়ি ছিল? খেলে খাটে বসে-বসে?'

'দেশলাই চেয়েছিল আমার কাছে।'

'কে, গনি?'

'হ্যাঁ গনি আর চাঁদ মিঞা।'

'চাঁদ মিঞা?' হারীত একটু ভেবে বললে, 'ওঃ, দপ্তরির দোকান আছে চক বাজারে। কী এন্তেলা ছিল এদের তোমার কাছে?'

'দু-দফা ছিল। এক হচ্ছে নরেনের রক্ত নিতে হবে—'

'চাঁদ মিঞাও তা চায়?' কেমন একটু কৌতুক বোধ করে বললে হারীত।

চাঁদ মিঞা, গনি, ইসমাইল, সুজন খাঁ সব্বাই তাই চায়।'

'কেন, এতে তাদের কী স্বার্থ?' হারীত কোনো কিনারা না চেয়ে সুমনার ডান হাতের মুঠোর দিকে তেরছা চোখে তাকিয়ে থেকে বললে।

'নরেন, বরেন, চাঁদ মিঞা, বরকত আলী, সুজন খাঁ, গনি ওদের একটা দল তো। নরেনের কোনো অমান্যি হলে ওদেরও অমান্যি, দোলো ব্যাপার; এত দিন পলিটিক্সে থেকে সে তোমার বোঝা উচিত ছিল হারীত। দশের খাতিরে এসেছিল ওরা সব।'

'রক্ত দেওয়াটা একটা মানের ব্যাপার; না দিলে অমান্যি হয়? মান-অপমানের বেশ চেকনাই বেরুচ্ছে নরেনের—সুনজ খাঁ, চাঁদ মিঞা, আশু দত্ত, নিমাই হাওলাদারদের সঙ্গে মিশে।'

'মেলা চেঁচিও না হারীত। আগের সে দেশ-গাঁ নেই, কিন্তু লোক বদলেছে, হাওয়া বদলেছে। তুমি শত্রু বানাচ্ছ খুব হারীত।'

'বানাচ্ছি, তা তো দেখছিই। কী করতে হবে? যা ভাল বুঝি তাই তো করি। কারুর সাতে-পাঁচে অনিষ্টে থাকি না। মানুষের ইষ্ট করতে চেষ্টা করছি, দু'জাতের মানুষেরই। আমাকে নাকে ধরে ঘুরিয়ে দেখাবে নাকি নরেন, আশু দত্ত, চাঁদ মিঞা, সুজন খাঁ?'

'আঃ, কী করছিস, ঝামেলা কেন করছিস হারীত। ওদের আক্রোশ, তুই জুলেখাকে হাত করতে চেষ্টা করছিস। কেন করছিস? কী দরকার তোর? আমার গা-ছুঁয়ে বল, যাবি না আর জুলেখাদের ওখানে।'

'কেন যাবে না জুলেখাদের ওখানে হারীত?' বললে অর্চনা; এই মাত্র কখন ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে অর্চনা টের পায়নি হারীত। সে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিল, দেখছিল, খুঁজছিল খুব উঁচু শিমুল গাছটার হাজার-হাজার বাতাসি পাতারাশির ভেতর থেকে সেই উত্তপ্ত বুলবুলি দুটোকে; নেই এদিকে তারা; কোথায় চলে গেছে; জামরুল বনের ভেতর দিয়ে ওড়া একটা মাছ-রাঙা যদি রেডিওতে পাখির স্বর নেওয়া হত, তেমন একটা তানের সুস্থতা দিয়ে শুরু করে, সমস্ত মেশিনের এরিয়ালের অতীত কী একটা প্রাকৃতিক নিবিড় শব্দের অনন্তের ভেতর দিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল।

'বসো অর্চনা,' সুমনা বললে।

'জুলেখাদের বাড়ি গিয়েছিল হারীত?'

'হ্যাঁ, সমস্তটা দুপুর সেইখানে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আজ প্রথম গেল বুঝি?' জেনেশুনেও জিজ্ঞেস করল অর্চনা।

'না, ক দিন ধরেই তো যাচ্ছে। যাওয়াও যাওয়া, সমস্তটা দুপুর সেখানে মেরে দিয়ে চারটে সাড়ে-চারটের সময় ভাত খেয়ে আসা হয়।'

হারীত অর্চনার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে বলেছিলাম, কিন্তু তুমি তো যেতে চাইলে না।'

'তোমার সঙ্গে গেলে এক রকম ছিল ভাল, কিন্তু হারীত একা গিয়ে শত্রু বাড়াচ্ছে,' সুমনা বললে।

'কে শত্রু হল সুমনাদি?'

'নরেনরা শত্রুতা করছে। সুজন খাঁ, চাঁদ মিঞা, গনি, ইসমাইল, আশু দত্ত, গণেশ সব নরেনের দলে। আমাদের বাড়ি এসেছিল ওরা আজ দুপুরবেলা, তখন তুমি কোথায় ছিলে অর্চনা!'

'দুপুরবেলা আমি বাড়ি ছিলুম না। একটু হাসপাতালে গিয়েছিলুম। মেয়েদের হাসপাতাল কমিটির একটা মিটিং ছিল আজ। এই তো এলুম।'

'হাসপাতালে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল তোমার?'

'মজুমদারের সঙ্গে? হ্যাঁ হয়েছে।'

'নরেন কিছু বলেছে তাকে?'

'তা তো আমি জিজ্ঞেস করি নি। কিছু বলবার কথা ছিল'

'নরেন আমাকে রক্ত দেবে কাল থেকে আবার। ঠিক হয়ে গেছে। ছেলেটাকে যাই বল তাই বল, খুব মনে ধরেছে ওকে আমার। বৌদি সম্বন্ধ পাতাল তো আমার সঙ্গে। নাঃ, ওর রক্ত ছাড়া আমার ভাল লাগবে না, ভাল হবে না। হারীতকে রাজি করিয়েছি।'

'অর্চনা হারীতের মুখের দিকে তাকাল, 'রাজি হয়েছ নাকি?'

'কী করব–না হলে রুগি টেকে না।'

'মজুমদারও রাজি?'

'আজ জিজ্ঞেস করে আসব। বেরুতে হবে রাতে নানা কাজে।'

'এটা কেমন হল হারীত। আবার নরেন রক্ত দিচ্ছে?'

'দিচ্ছে তো। বেশি দিন দিতে হবে না।'

'কেন?'

'না। বেশি রক্ত লাগবে না আর। মা ভাল হয়ে উঠেছেন। নিশীথ সেন নাকি নরেনকে ঠিক করে গেছলেন?'

অর্চনা সুমনার দিকে তাকাল। সুমনা পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছে। চোখমুখ দেখা যাচ্ছে না তার। হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছে, কিংবা এগিয়ে গেছে ঘুমের পথে খানিকটা দূর।

'নিশীথবাবু তাড়াতাড়ি কলকাতায় চলে গেলেন। এ দিকটার কোনো ব্যবস্থা করে যেতে পারেন নি। কিন্তু তিনি তো নরেনের ওপর বরাত দিয়ে যায় নি–আমি যতদূর জানি,' অর্চনা বললে।

সুমনা এড়িয়ে-এড়িয়ে বললে, 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে, ঘরের মেয়ে ঘরে। এখন তোমরা দু-জনে কথা বল, আমি একটু ঘুমোচ্ছি,' বলতে-বলতে ঘুমিয়েই পড়ল সুমনা।

'জুলেখা না কি, ওর নাম?'

'ওর নাম মনোলেখা। ওর বাবা ওকে জুলেখা ডাকত, সুলেখার সঙ্গে মিল দেবার জন্য; না কি জুলেখার সঙ্গে মিল দেবার জন্যে সুলেখা নাম রাখল ওর বোনের।'

'ওদের বাবা তো নেই এখন?'

'না, তিন-চার বছর হল মারা গেছেন।'

'ভাই-টাই নেই তো শুনেছি।'

'নেই বলেই তো জানি, মা ছাড়া কেউ নেই।'

'কী করে চলে তা হলে ওদের?'

'এখানে বাড়ি রেখে গেছেন ওদের বাবা, লাখ দেড় লাখ টাকা ব্যাঙ্কে আছে। কলকাতায়ও ওদের বাড়ি আছে শুনেছি–পার্কসার্কাসে। অনেক দিন সে বাড়িটা বেহাতের মত হয়ে ছিল, এই বারে হাতে এসেছে। ভাড়া পাচ্ছে।'

'জুলেখাদের বাড়িতে রোজই যাচ্ছ?'

'তোমাকে তো নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম গেলে না কেন?'

'আমার তো এক দিন যাবার কথা ছিল, রোজ তো নয়। তুমি তো'–বলতে গিয়ে থেমে গেল অর্চনা উঁচু শিমুল গাছটার উড়ু-উড়ু পাতার দিকে তাকিয়ে। বুলবুলি দুটো আবার এসেছে বাতাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রাণচারণার বিচরণার সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে শিমুল গাছটার ভেতরে।

'আমি তো–কী?' হারীত বললে।

'রোজ দুপুরেই তো সুলেখাদের ওখানে কাটাচ্ছ।'

'সেটা ঠিক। আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে। একটা নিয়মের ভেতরেও আসতে পারছি না'–ঠিক এই জন্যে–অন্য কোনো একটা অব্যক্ত কারণেও, অর্চনার মুখোমুখি বসে একটু অস্বস্তি বোধ করে হারীত বললে।

'কী কাজ করবে ঠিক করেছ জলপাইহাটিতে?'

'তোমাকে তো বলেছি সব। কোনো বিপ্লবের কাজ এখানে হবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন, কাজের ক্ষতি হচ্ছে কেন সুলেখাদের ওখানে গিয়ে? সুলেখা তো বেশ বড়-বড় লেখাপড়া জানা, এবার তো বি-এ দিচ্ছে। নানা রকম ভাল সহজ মিহি পরামর্শ দিতে পারে সে।'

হারীত একটু অবাক হয়ে অর্চনার দিকে তাকিয়েই সুমনার দিকে তাকাল, ঘুমিয়ে আছে; বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকাল; ঘরে ঘুমিয়ে আছে লোক, কথা বলছে লোক, বাইরে অবাধ প্রকৃতি—কী গভীর আহ্লাদে অপর্যাপ্ত চৈত্র-বৈশাখ, বিকেলের শেষ রোদ-বাতাসে, ছিটে মেঘের মত উড়ন্ত শিমুল তুলোয়, বড় তুলোর মত উড়ন্ত ধূসর মেঘে, বাতাসে, আরো আকুল অনাকুল চৌষট্টি বাতাসে, সাদা কালো পাখির ডানাগুলোকে ছিটকে ফেলে। ভীমরুল উড়িয়ে, উঁচু-উঁচু গাছের বনের ভিতর কোথাও হারিয়ে গিয়ে কোথায় চলে গেছে প্রকৃতি, সময় নেই, দেশ নেই, জলপাইহাটি নেই এমন এক স্থির বিনিড় পদার্থের ভিতরে তবুও।

'রোজ যাই না আমি সুলেখার কাছে।'

'রোজ যেতে না করে নি তো কেউ তোমাকে। কেন যাবে না হারীত?' হারীতের দিকে তাকিয়ে অর্চনা বললে।

'তুমি তো যেতে নিষেধ কর না। কিন্তু মা আমাকে তার গা ছুঁয়ে শপথ করতে বলছিল। সুলেখাদের বাড়ি যাই সেটা মা পছন্দ করে না।'

'মায়ের প্রাণ, তা তো হবেই,' অর্চনা হাত পাখাটা তুলে নিয়ে আঁচলে বাতাস লাগিয়ে বললে, 'ঘরের ছেলেকে ঘরেই রাখতে চান তিনি।'

'ছেলে থাকবে। কী হিসেবে তোমাকে এ কথাটা বললে মা? শুনেছিলে তুমি?'

'অর্চনা দিই-দিই করে তবুও এ জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর দিল না—'বি-এ দিচ্ছে না সুলেখা এবার?'

'না।' হারীত বললে।

'কেন?'

'তৈরি হয় নি।'

'আসছে বার দেবে?'

'সেই রকমই তো ইচ্ছে।'

'কেন, তুমি পড়িয়ে তালিম করে দাও না। এবারই দিক। কেন মিছিমিছি একটা বছর নষ্ট করবে?'

'নষ্ট আর কী', হারীত চিন্তিতভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওরা তো আর পাস করে চাকরি নিচ্ছে না। বাঃ, আমি পড়াব সুলেখাকে? সে কত পড়াতে পারে আমাকে।'

'কী যে বল তুমি হারীত।'

'সত্যি বলছি তোমাকে। আমি পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছি অনেক দিন। ও তো রোজ বই কিনছে, পড়ছে।'

'কেমন লাগে সুলেখার মাকে তোমার হারীত?'

'হারীত একটু বিচক্ষণভাবে অর্চনার দিকে তাকিয়ে বললে, 'সুলেখার দিদির মত দেখায় অর মাকে। বয়স বছর চল্লিশের বেশি হবে না। কিন্তু সুলেখার চেয়ে বড় মনে হয় না। আশ্চর্য সব পটের মত ওরা।' এ রকম নাকি কলকাতায়, ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে কোথাও দেখে নি, কে কার চেয়ে বেশি সুন্দর হঠাৎ দেখে বলা কঠিন, আস্তে-আস্তে বুঝতে পারা যায় সুলেখাই সবচেয়ে বেশি, নাকি জুলেখা? জুলেখা আর তার মা একই রকম।

বলতে-বলতে অনেক কথা অর্চনার মত মেয়েমানুষকে বলে ফেলেছে হারীত। যা বলা দরকার ছিল তার চেয়ে বেশিই বলেছে যেন, নিজেকে সামলে নিয়ে হারীত বললে, 'সুলেখার মার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হয় নি আমার। কেমন লোক বুঝতে পারছি না। প্রায়ই তো বাইরে থাকেন।'

'বাইরে থাকেন। কেন বাইরে থাকেন?'

'নানা কাজ নিয়ে ফেরেন। সংসারের ভার তো তাঁর ওপর। নানা রকম মেয়েদের কমিটির মেম্বার তো তিনি। হাঁসপাতাল কমিটিতে আছেন সুলেখার মা?'

'না।'

'ওঁর কথা জিজ্ঞেস করলে কেন তুমি?'

'এমনিই।'

হারীত তাকিয়ে দেখল সুমনা ঘুমিয়ে আছে, ও-পাশ ফিরে আছে, ঘুমের নিশ্বাসে শরীর আস্তে-আস্তে উঠছে পড়ছে। ঘুমনো জিনিসটির দিকে তাকিয়ে হারীত বললে 'আমি যেমন চেয়েছিলুম, আমার নিজের মাকে তেমন করে পেলাম না কোনো দিন। মার ভেতরে প্রকৃতির সরসতা, সবলতা বা মানুষের হৃদ্যতা, নিপুণতা নেই। আজকের এ যুগে খাড়া বড়ি থোড়ের ওপর খাঁড়ার ঘা পড়ছে সব সময়ই যেন মার মাথার ভেতরে, কিন্তু থোড় বাড়ি খাড়া হয়ে ছিটকে পড়ছে তবুও সব। তোমার ছেলে ঠিক ষোল আনা মায়ের মত করে পেয়েছে তোমায়।'

'কেন এ কথা বলছ?' হারীতের চোখে চোখ রেখে বললে অর্চনা। অর্চনা সুমনার পাশে বসেছিল খাটের ওপর পা ছড়িয়ে—হারীত একটা কাঠের চেয়ারে বসেছিল। পা দুটো আস্তে-আস্তে টেনে নিয়ে উড়ন্ত সারসের পায়ের মত পিছনের দিকে গুটিয়ে নিয়ে বসল অর্চনা।

'এমনিই বললাম,' হারীত বললে। পরে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'তোমার বাবার চিঠি পাও নি?'

'এখনও আসেনি তো।'

'তোমার মাকে লেখেন নি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না। তোমাকেই তো লেখবার কথা।'

'দাশগুপ্ত সাহেবের বাড়িতেই আছেন তো?'

'থাকার তো কথা। তোমাকে তো বালিগঞ্জের ঠিকানাই দিয়ে গেছেন। কেন চিঠি লেখ না তাঁকে তুমি।'

অর্চনা একটু ঠোঁট কাঁপিয়ে উঠন্তি হাসিটাকে নিভিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমারে বাবা যদি কলকাতায় চাকরি পান, তা হলে তোমরা এখানকার পাট উঠিয়ে চলে যাবে না কি হারীত?'

'মা যাবেন। আমি থাকব।'

'থাকবে? কতদিন?'

'চুক্তি করেছিলাম তো তোমার মৃত্যু পর্যন্ত, মা কি আমার মৃত্যু পর্যন্ত, ঠিক মনে পড়ছে না–'

'আমার মৃত্যু পর্যন্ত–'

'তাই করেছিলাম বুঝি, কিন্তু সেটা কি হবে? অত দিন জলপাইহাটিতে থাকতে পারবে তুমি?'

'আমার যাবার কথা উঠল? আমি থাকব না কে থাকবে?' অর্চনা তার আকাশের উড়ো সারসীর প্রণালীতে বিন্যস্ত পা দুটি নিয়ে সুমনার একটু গা-ঘেঁষে বসে বললে।

'না, কেউই অত দিন এখানে থাকব না। আমাদের মৃত্যু জলপাইহাটিতে হবে না তো।'

'হবে না? যেন মানুষের হাতের রেখা পড়তে পার তুমি,' অর্চনার মুখ থেকে একটু ছোট্ট আবিষ্ট হাসির শব্দ বেরুল, 'মানুষের কপাল দেখেই বলে দিতে পার না কি হারীত।'

'আমার মৃত্যু ইউনিয়নে হবে–কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে। হাতের রেখা দেখতে হয় নি, কপাল দেখতে হয় নি। এটা আমি, যে বাঁচে যে মরে সেই মানুষেরই নিজ গুণে, অনুভব করেছি। পাখিরা অক্লান্তভাবে সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে অনেক দূর থেকেই মাটির গন্ধ পায়–'

'পায় বুঝি? তা পেতে পারে। কিন্তু শেষ কাজ তোমার ইউনিয়নে হবে বলছ: কেন?'

'আমি জানি কাশী মিস্ত্রিরের ঘাটে গিয়ে আমার মাথা রাখতে হবে। ঘাটের বালিশ তৈরি হতে-হতে কুড়ি-পঁচিশ বছর কেটে যাবে।'

'বালিশ পছন্দ না হলে পঞ্চাশও তো হতে পারে?'

'না। নিজের কাজ ফুরিয়ে গেলে তার পর বেঁচে থেকে কী আর লাভ। পঁচিশ বছর তো বেশ খানিকটা সময়। এর ভেতর যা হবার হয়ে যাবে।'

অর্চনা বড় বেশি ঘেঁষে বসে সুমনার দিকে। নিজকে আস্তে-আস্তে খসিয়ে নিয়ে সরে বসল সে, আরো একটু সরে বসল। ঘুমের ভেতর সুমনা আস্তে-আস্তে আলগোছে নড়েচড়ে উঠে আগের মতন নিশ্বাসের নিয়মিত ওঠপাড়ার ভেতর স্থির হয়ে আরো স্থিরতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

'তুমি আমার চেয়ে ক বছরের ছোট?'

'তিন-চার বছরের।'

'আমি ভেবেছিলুম বেশি।'

'তিন-চার বছরের ছোট-বড়র কোনো মানে হয় না। হয় অর্চনা?'

'অর্চনা কোনো কথা বললে না।

'তোমাকে আমি অর্চনা মাসি ডাকব না।'

'ডাকবে না তো,' অর্চনা বললে, 'কিন্তু এ সব কী রকম কথা হচ্ছে হারীত। কথা বলতে-বলতে কোন শাখায় কোন পাতায় এসে পড়েছি, পাতারও আবার শিরা থাকে; থাক, দেখে কাজ নেই; আমি এখন উঠি।'

'বসো-বসো', হারীত বললে।

'না, মা, উঠি আমি।'

'বসো।'

'না, উঠতে হয় এখন,' অর্চনা উঠতে-উঠতেও বসে রইল তবু, 'সুলেখাদের বাড়ি আছে পার্কসার্কাসে–কেমন বাড়ি?'

'বেশ বড় দোতলা বাড়ি–সুন্দর।'

'দেখেছ বুঝি?'

'বাড়ির ফোটোগ্রাফ আমাকে দেখিয়েছে সুলেখা।'

অর্চনার মাথাটা খালি ছিল, ঘোমটা খোঁপার ওপর ঠেকেছিল অনেকক্ষণ, সেটাকে খোঁপার থেকে খসিয়ে নিয়ে গলার আঁচলের মত অর্চনা জড়িয়ে নিল।

'পার্কসার্কাসের বাড়িটা ওদের নিজেদের?'

'হ্যাঁ। ওদের বাবা করে গেছেন।'

'কী ছিলেন তিনি?'

'ইঞ্জিনিয়ার।'

অর্চনা বললে, 'কলকাতায় এমন চমৎকার বাড়ি থাকতে সুলেখারা এখানে আছে যে!'

'কলকাতায় পার্কসার্কাসে গোলমাল দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে তো অনেক দিন। এখন সব ঠাণ্ডা হয়েছে বটে। এটা নিজেদের দেশ তো সুলেখাদের।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু এখন তো পাকিস্তান হয়ে গেল এ দেশ।'

'তা তো হল,' হারীত তাকিয়ে দেখল বাইরের পৃথিবীর থেকে আলো যেন কাক, চিল, মৌমাছির পাখা উসকে উড়িয়ে ফালি তরমুজের রঙের মত নিঃশব্দে বর্ণে এক-আধ মুহূর্ত স্থির হয়ে আছে, টনক নড়ছে না, কোনোদিকে ঠিকরাচ্ছে না কিছু, মন্ত্রসিদ্ধির মত নিজেকে ধরে আছে সময়ঃ বিকেলের রোদ নেমে এসে জারুল, হিজল, জামরুলের বনের এই মায়াঘন তবুও সৃষ্টির অন্তিম প্রতিভায় স্বচ্ছ দেশের ভেতর।

'পাকিস্তান হয়েছে এ দেশ। মানিয়ে নিয়েছে সুলেখারা। তাদের এ জায়গাটা ভাল লাগে।'

'ভাল লাগে। কিন্তু আজ হোক, কাল হোক কলকতায় চলেই যেতে হবে।' অর্চনা বললে।

কী করে জানলে তুমি?'

'কী বলে সুলেখা?'

'সে তো এখানে থাকতে চায়।'

'আমিও তো থাকতে চাই। কিন্তু দুটো কি এক রকম?'

সুমনা ঘুমের মধ্যে কাতরে-কাতরে চুপচাপ হয়ে পড়ছিল আবার। হারীতের চোখের দিকে তাকিয়েছি অর্চনা, শেষ বিকেলের ছায়ার ভেতর একটা বড় জামফলের নীলিমা, কালিমার মত যেন অর্চনার চোখের তারায়, অর্চনার সমস্ত সত্তায়, পরিব্যাপ্ত হয়ে ছায়া-বিকেলের জামবনানীর মত, কোনো এক নিস্তব্ধ নদীর পারের, ছেলেবেলায় সে-সব নদী, ছায়া, নীরবতা, জামের বন দেখেছিল হারীত। তার পর আর দেখে নি অনেক দিন। আছে যে তাও ভুলে গিয়েছিল। যে-জ্ঞান বিদ্যামাত্র, যে-বিদ্যা শুধুই শব্দের ব্যসন, যে-শব্দ বাক্য-প্রগতি অফুরন্ত বিশৃঙ্খলার সর্বব্যাপ্ত বুদ্ধিনাশের একটা বিরাট বিনাশ প্রস্থানের দিকে টানছে মানুষকে, কলকাতা তাকেই মনে করিয়ে দেয় শুধু; বলে, দেশ নগর হবে; নগর হবে কলকাতা; কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, হারিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে, অন্ধকারের রক্তহিমানীর দিকে যাচ্ছে সব; বলে এইই সভ্যতা, এই উপগ্রহে এইই অন্তিম অবরোহণ মানুষের। হারীত নিজেও নির্জন সন্ধ্যার নদীর পারের শাল, জামরুল, শিশু বনানীর শান্তি, সত্যতা, মহানুভবতাকে স্বীকার করে নি তো, সে কলকাতার মানুষ, সভ্যতার মানুষ, কলকাতা ভেঙে কলকাতাকে সৃষ্টি করবে আবার, এই বিষ সভ্যতাকে বিনাশ করে নতুন সভ্যতা আনবে-যদি হয় তাও বিষ-মানুষের সৃষ্টিরই মর্মকুহরে কীট রয়ে গেছে বলে-তা হলে কী করবে সে? না, না কীট নেই, কাজ ছাড়া কোনো কথা নেই, বেশি ভাবার কোনো দরকার নেই, নদী জাম বন সন্ধ্যার বিস্তব্ধতা বলে কোনো জিনিস নেই; নিশীথ সেন আর হোরুস্তেরলিন আর লুক্রেসিয়সের বিষণ্ন নিঃশব্দতার ভেতরে নিজেকে ছেড়ে দিলে চলবে না। পৃথিবীটা মহাভারতের পৃথিবী, কিংবা দান্তের নরকের নরকাতীত একটা আশ্চর্য শুদ্ধশীল প্রবাহের অজান্তে জনতাসংস্থান, কেমন আধো আলোকিত কেমন.রক্তের রাত্রির রঙে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে বিশাল দিনের রং পেতে যাচ্ছে।

'আমার কথার কোনো উত্তর দিলে না তো হারীত।'

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যেন।'

'দেখছিলুম তো।'

'কী দেখছিলে?'

'যেন বাইরে তাকিয়ে উষা-অনিরুদ্ধের আকাশ আলো দেখছ; তোমার দিকে দেখছিলুম আমি।'

'অনেকটা সময় কেটে গেছে?'

'হ্যাঁ-মিনিট পনের-কুড়ি হবে-'

'কেমন একটা তন্দ্রার মতন এসে পড়েছিল। নিজেকে কাজের মানুষ করে তুলতে চাই, অথচ কাজ ফেলে কথাই ভাবি।'

'আমিও তো ভাবি; ভেবে নিলে কাজের সুবিধে হয়।'

হারীত বললে, 'তোমার মনে হয় সুলেখারা এখান থেকে চলে যাবে?'

'তোমাকে বলে নি তারা কলকাতায় যাচ্ছে?'

'না তো। যাচ্ছে, কারো কাছে শুনেছ বুঝি?'

'অনেকেই তো চলে যাচ্ছে,' অর্চনা বললে।

'ওঃ, সেই কথা,' হারীত একটু নিস্তার বোধ করে হেসে বললে, 'না, অনেকের সঙ্গে সুলেখাদের মা তলিয়ে যাবার লোক নন। চলে যাবে হয় তো এক দিন, কিন্তু দেরি আছে। আজ নয়, কাল নয়, কথাটাই তো উঠে নি এখন।'

'তোমার কাছে জুলেখার মা পাড়ে নি কথাটা, বলতে চাও তুমি হারীত?'

'জুলেখার মার সঙ্গে কথাবার্তা হয় না আমার-'

'তা হলে কী করে পাড়বে?'

হারীত সুমনার একফালি জ্বালানি কাঠের মত শুকনো জুলজুলে শরীরের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে,' তোমার কাছে বলেছে বুঝি জুলেখার মা?'

'আমার সঙ্গে দেখা হয় না, আলাপ নেই বনলেখার সঙ্গে আমার।'

হারীত একটা নিশ্বাস ফেলে বাইরের দিকে তাকিয়ে, ঘরের ভেতরে ছায়ায় কোথায় অর্চনা বসে আছে চোখ দিয়ে তাকে খুঁজে বার করে, বললে, 'তা হবে। মন ঠিক করতে পারে নি হয় তো এখনো। কাউকে বলছে না কিছু তাই। চলে যাবে হয় তো তিন বোন। কিন্তু তুমি তো এখানে আছ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তিন বোন?' অর্চনা ঘাড় কাত করে, মুখ এড়িয়ে, মাথার মস্ত বড় খোঁপাটা ভেঙে ফেলে বললে, 'সুলেখার বোন বলছ সুলেখার মাকে? বোন হল? মানুষের সম্বন্ধ-টম্বন্ধ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সব।'

হারীত তাকিয়ে দেখল আরো আবছায়া হয়ে পড়েছে জামরুল বনটা; এ দিকের ফালি আকাশটা, ও-দিকের ও আকাশটা। যারা পাখায় ভর দিয়ে উড়ছিল এতক্ষণ সেই চিলের থেকে কুমোর পোকা অব্দি সকলেই প্রায় সোঁদা আকাশটাকে একা ফেলে গেছে, চলে যাচ্ছে।

মানুষের সম্বন্ধ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বলেছে অর্চনা। অর্চনার দিকে তাকিয়ে হারীত বললে, 'চেয়ে দেখ বাইরে, কেমন আশ্চর্য এখন শান্তির সময়। এই সময়েই সত্য উদঘাটিত হয়। মানুষের ঠিক সম্বন্ধ স্থির হয় এই সময়–'

'কী স্থির হল?'

হারীত কোনো কথা বললে না, একটা বোলতা বাইরের বাতাসের ভেতর মিলিয়ে যাচ্ছে-একটা দোয়েল সেটাকে ধরতে গিয়ে তাক ভুল করে সজনে গাছের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল–তাকিয়ে রইল সেই দিকে।

'কী স্থির হল সুলেখা আর তার মার সম্বন্ধ?'

'সুলেখার কথা বলছিলুম না।'

'তবে কার?'

'তোমার আমার।'

'ওঃ, এইবারে আমি–সুমনাদি ঘুমের থেকে জাগল না তো, আমি উঠি এবারে।'

হারীত বাধা দিতে গেল না, সুমনার দিকে চোখ নেই তার, অর্চনার দিকে নেই, বাইরে পাখিদের ভেতর একটা ঘুমতাড়া বসে পড়েছে, পতঙ্গদের ভেতরেও, কেমন ছায়া এসে পড়েছে, দেখছিল হারীত।

'না, চলে যায় নি অর্চনা। বসে আছে। কেন যেন বিমুগ্ধ বিষধরের মত বিড় পাকিয়ে বসে আছে কেমন ঘনিল, নিবিড়, শ্বেতাঞ্জনের মতন। কিন্তু বিষ নেই, ভেতরে সুধা আছে, সুধা ক্রমে-ক্রমে বেশি জমে উঠেছে যেন অর্চনাকে ছাপিয়ে, হারীতের আত্মাকে অতিক্রম করে, হারীতের শরীরের ভেতরেও যেন। এবং বিষ নয়, কলকাতায়, ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে বিংশ শতকে, ইতিহাসের অনেক স্তরে অনেক বিষ দেখেছে সে। অমৃত উপলব্ধি করা যাক বাইরের প্রকৃতির দিকে চোখ রেখে, সে চোখ না ফিরিয়ে, আর মানুষ মানুষকে যা কোনোদিন দিতে পারে না শরীরে একটা অবাধ বিলোড়ন ছাড়া, সেই ব্যথিত সুধা, শরীরকে গ্রহণ করতে না দিয়ে চোখের ভিতরে সঞ্চিত করে।

অর্চনা বসে আছে খাটের দূরের কিনারে, সুমনা ঘুমিয়ে আছে, চেয়ারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে হারীত। যে সুধা মানুষের স্নায়ুর অবলম্বন চাচ্ছিল, তাকে আজকের এই অসুস্থ সংস্কার, কীটনষ্ট সমাজ সংস্থিত আধার, গ্রহণ করতে পারবে না বলে, মননের বৃহৎ সুস্থতার দেশে একটা প্রকাণ্ড সাদা পাখির মত সঞ্চারিত করে দিল হারীত। কেমন অদ্ভুত স্বর্গীয় বিমোহ। এ পাখির আসা-যাওয়া আত্মার (যদি তা বলে কোনো জিনিস থাকে); আত্মার থেকে মনে; মনের থেকে শরীর থেকেও মাঝে-মাঝে–শরীরকে ছেড়ে দিয়ে শুক্র সূর্যে আবার, অনুগত স্বচ্ছতায় স্পর্শতায়, অনন্ত যেখানে নেই তার সুধার সেই অন্তিম নির্জনতার দেশে।

'কী ঠিক হল?' অর্চনা বললে, 'কী ঠিক হল?'

'কিসের?' কোথায় ছিল যেন সে, যেখানে এখন বসে আছে সেখানে নয়, চমকে উঠে বললে হারীত।

যে খোঁপাটা ভেঙে ফেলেছিল সেটাকে ঠিক করতে-করতে, যে-কথা সোজাসুজি বলতে ইচ্ছা করছিল অর্চনা সেটাকে গড়িমসি করে, প্রায় সোজাভাবেই বললে অর্চনা, 'এখন তো শান্তির সময় বলছিলে তুমি, সত্য উদঘাটনের সময়। মানুষের সম্বন্ধে এলোমেলো হয়ে যায় না এই সময়, বলেছিলে তুমি? সত্য সম্বন্ধ স্থির হয় বলছিলে। কী সম্বন্ধ তা হলে'–বলতে-বলতে নিজেকে শুধরে নিয়ে অর্চনা বললে, 'আচ্ছা, ঐ যে নারকোল গাছে পাখি দুটো থাকে–রাতে প্রহরে-প্রহরে ডেকে ওঠে–ওরা কি বাজকুড়ুল?'

'কী সম্বন্ধ ঠিক হল অর্চনা?'

'তুমি অর্চনা ডাকলে আমাকে।'

'হ্যাঁ, পাখি দুটো বাজকুড়ুল,' হারীত বললে, 'একশ বছর বাঁচে। এক সঙ্গে থাকে।'

দু'জনেই চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ।

'পা দুটোকে বুক পালঙ্কের কাছে টেনে মরাল-সারস-বক-বাজপাখি যে-রকম আকাশ দিয়ে উড়ে যায় সেই রকম পা গুটিয়ে বসেছিল অর্চন; ডান পায়ের ওপর পা চড়িয়ে বসেছিল হারীত আকাশ-বাতাসের দিকে তাকিয়ে।

'তুমি এক বছর এখানে থাকা ঠিক করেছ হারীত?'

'হ্যাঁ, ঠিক করেছি।'

'কবের থেকে এক বছর?'

'এই আজ থেকে–'

'তারপর, বছর ফুরিয়ে গেলে থাকবে না আর?'

'এই তো সবে শুরু হল,' হারীত বললে, 'এক বছর ফুরোবার আগে তুমিই তো এখান থেকে চলে যাবে।'

'কে বললে?' বিশেষ কোনো মনোযোগ না দিয়ে অর্চনা বললে।

'কলকাতায় মাস্টারি জোটাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন তো মহিমবাবু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অর্চনার ঘুম পাচ্ছিল যেন, সুমনার ঘুম শেষ হচ্ছে না, বাইরে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ঘুম পাচ্ছে না হারীতের। কেমন সোজা খাড়া হয়ে বসে আছে সে।

'মহিমবাবু পেয়ে যেতে পারেন। তিনি তো ফার্স্ট ক্লাস। ঢাকা ইউনিভার্সিটির অবিশ্যি। হোক তা ঢাকা ইউনিভার্সিটির, ফার্স্ট ক্লাস তো; কলেজের কর্তৃপক্ষরা ফার্স্ট ক্লাসটাই দেখে। ফার্স্ট ক্লাস থার্ড তো মহিমবাবু? নাকি থার্ড ক্লাস ফার্স্ট? তোমার ঘুম পাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়ছ অর্চনা।'

'তোমার ঘুম পাচ্ছে না হারীত?'

'না। আমার বেরুতে হবে রাতে। সারা রাতই বাইরে থাকতে হবে। বাড়িতে ফেরা হবে না বোধ হয় আজ রাতে আর।'

'কোথায় যাবে?' ঘুমে জড়িয়ে যেতে-যেতে অর্চনা বললে।

'যাব বিরাজ সাহার আড়তে। সেখান থেকে চালের জোগাড় করে চামারপট্টির দিকে যেতে হবে।'

'চাল? কী চাল? আমি বলছি কত মণ চাল?'

'পনের-কুড়ি মণ।'

'কে দেবে তোমাকে অত চাল?' 'অর্চনা ঘুমোতে-ঘুমোতে জেগে উঠে বললে।

'ঠিক করে এসেছি।'

'কালবাজারের দরে? খুব গলাকাটা দরে ঠিক করেছ তুমি? আজ কাল চাল পাওয়া যাচ্ছে না এখানে।'

'পাচ্ছি তো।'

অর্চনা চোখ রগড়াতে-রগড়াতে হেসে বললে, 'দেখ কেমন পাও-রাত-বিরেতে আড়তে-আড়তে ঘুরে। টাকা কিছু আগাম দিয়েছ? নিয়েছে টাকা কিছু?'

'না, দিই নি।'

'তা হলে আর পেয়েছ তুমি চাল।'

'না পেয়ে আমি ছাড়ব না অর্চনা। আজ রাতে কিনে আজই বিলি-ব্যবস্থা করে দিয়ে আসব সব।'

'এত চালের টাকা পেলে কোত্থেকে?'

'কলকাতা থেকে কিছু টাকা এনেছিলাম আমি, তাই দেব; বাকি-বকেয়াটা বিরাজদাকে পরে এক সময় দিলেই হবে!'

'পরে মানে কবে?'

'দিন পনের কুড়ির মধ্যেই।'

'কোত্থেকে পাবে এত টাকা এত অল্প সময়ে?'

'কেন, দরকার হলে তুমি দেবে।'

অর্চনা গায়ের থেকে আরো খানিকটা ঘুম ঝেড়ে ফেলে বললে, 'কেমন ঘুম পাচ্ছিল, ঘুম পাচ্ছিল, ভারী মিঠে বাতাস দিচ্ছে। সন্ধে হয়ে গেছে। কাদের ভেতর বিলোবে চাল তুমি?'

'চামারপট্টিতে অনেকেই আট-দশ দিন ধরে জাউ-টাউ খেয়ে আছে। তাও পাচ্ছে না। তিন-চারদিন কিছুই পাচ্ছে না। এ কিস্তিটা তাদের মধ্যে চারিয়ে দেব।'

'চালের জন্য কত টাকা দিয়েছে সুলেখা তোমাকে?'

'চাই নি সুলেখার কাছে আমি?'

'কেন, তাদের দেড় লাখ টাকা ব্যাঙ্কে আছে, পার্কসার্কাসে বাড়ি আছে, তাই বুঝি চাওয়া হল না তোমার?'

'তোমার কিছু নেই। তোমার কাছে তো চেয়েছি। আমাকে যদি থাকতে বল এখানে তোমার মৃত্যু পর্যন্ত, তা হলে এ রকম চাইতে হবে অনেক বার আমায়। তা নয় তো, সুলেখার কাছে টাকা চেয়ে, তোমার কাছে রাতে-রাতে নিরিবিলি বৃত্তান্ত বর্ণনা করে, তোমার মৃত্যু পর্যন্ত পঁচিশটা বছর কাটিয়ে দিতে হবে জলপাইহাটিতে আমার?'

অর্চনা ঘুমোচ্ছিল, জেগে ঘুমোচ্ছিল, ঘুমিয়ে জাগছিল—আধা শোয়া অবস্থায়। তেমনিভাবেই জামরুল বন, জাম বন পেরিয়ে গেল তার চোখ; কোথাও লগ্ন হল না—দূর থেকে—দূরতার দিকে—আকাশ নয়—শূন্য নয়—কেউ থামাতে পারে না তাকে। তবুও ঘুমের ভিতর ককিয়ে ওঠে সুমনা, খেপে যায়। ঘুমিয়ে পড়ে আবার।

অর্চনার দিকে তাকিয়ে আছে হারীত। কী করে টের পেল অর্চনা, সে তো এ সময় পেরিয়ে চলে গিয়েছিল স্রোতের ভেতর—সৃষ্টির সনাতন সময়ের। উঠে বসল অর্চনা।

'আমার ঘুম একেবারে ভেঙে গেছে,' অর্চনা বললে, 'এই রাতের বেলা বেশ ঘুম আসে। খোকা আর উনি ফিরেছেন টের পেয়েছ?'

'না তো। কোথায় গেছেন মহিমবাবু?'

'কলেজের ছেলেরা একটা থিয়েটার করছে। রাত দশটার আগে ফিরবেন না হয় তো। এখন কটা রাত?'

'সাতটা হয় তো। কলেজে থিয়েটার হচ্ছে। অবনী খাস্তগিরের লেকচার আছে মতিজেদ হলে। রাত-বিরেতে সাহাপট্টির থেকে চামারপট্টি, চামারপট্টি থেকে সাহাপট্টি, পায়ে হেঁটে মেরে দিতে হচ্ছে আমাকে। বাইরের দিকে তাকালে মনে হয় মফস্বল শহরটা যেন চিতে নিবিয়ে খেংড়াখেংড়ির শ্মশানে থুবড়ি খেয়ে পড়ে আছে রাত দুপুরে। কিন্তু তবুও বেশ জম-জম করছে, বেশ মরে বেঁচে আছে টাউনটা, যাই বল তুমি অর্চনা। মরতে-মরতেও যে-জিনিস মরে না সেটাকে খুব ভাল লাগে আমার, খুব ভাল লাগে বাঁচাতে সে জিনিসটাকে—আশার আলোয় লক্ষ্মীমন্ত করে তুলতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'উনি আর আমি কলকাতায় চলে যাব, মাথায় ঢুকেছে তোমার?'

'উনি কাজ নিয়ে কলকাতায় গেলে তুমি যাবে না?'

'উনি কলকাতায় যাবার আগে তুমিই তো জলপাইহাটি ছেড়ে চলে যাবে হারীত?'

'কোথায়, পরলোকে?' বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল হারীত।

'উঠলে?'

'হ্যাঁ, বেরিয়ে পড়ছি আমি। সারা রাত আমার কাজ অনেক দিকে আজ। বাড়ি ফেরা হবে না আজ রাতে আর। তোমাদের ঘরদোর বন্ধ করে এসে মার কাছে একটু বসে থাকো তুমি। আজ রাতে মার সঙ্গেই শুয়ো। তোমার কর্তা ফিরে এলে তাঁকে সেটা বুঝিয়ে বলবার দরকার হবে না,' জুতো আঁটতে-আঁটতে বললে হারীত, 'এক কথায়ই বুঝে যাবেন তিনি।'

হারীত অর্চনার দিকে হাসির স্বচ্ছ শুশ্রূষায় তাকিয়ে অন্ধকারের ভেতর বেরিয়ে গেল।

মিনিট পনের পরেই হারীত ফিরে এসে দেখল, অর্চনা তেমনি হাঁটু ভেঙে গুটিয়ে চুপচাপ করে আছে। শরীরের সমস্ত সাদা শাড়িটা বাতাসে কাঁপছে উড়ছে ঃ এখুনি যেন একটা বড় পাখির মত উড়ে যাবে অর্চনা রাত্রির আকাশের অভিজিৎ, লুব্ধক, সপ্তর্ষি নক্ষত্রগুলোর দিকে।

'তুমি ফিরলে যে?'

'পিছু ডাকলে, না ফিরে কী করি?'

'টাকা ফেলে গেছ তো?'

'কী করে বুঝলে তুমি?'

'যাবার বেলায় তোমাকে টাকা নিতে দেখলাম না তো।'

'সে টাকা ট্যাঁকে বেঁধে রেখেছি ভেবেই তো রওনা দিয়েছিলাম। খানিক পথ গিয়ে দেখি টাকা নেই—'

অর্চনা একটু ঠিক হয়ে বসে বললে, 'ট্যাঁকে যে টাকা নেই তা তো আমি দেখছিলাম—'

'তুমি দেখছিলে? কী করে দেখলে?'

'ঐ যে সুমনাদির বালিশের নিচে নোটের তোড়া, বালিশ সরে গেছে, নোটগুলো বেরিয়ে আছে; ঘণ্টাখানেক ধরে তো এই রকম। তোমার চোখে পড়ে নি? তুমি যে দেখ নি, তা কী করে বুঝব আমি?'

'আমি দেখি নি, তুমি দেখেছ। বেরিয়ে যাবার সময় আমাকে বললে হত না অর্চনা?'

'তোমাকে কি আমি বেরিয়ে যেতে বলেছি?'

বালিশের নিচের থেকে নোটের তাড়া খসিয়ে এনে সাজিয়ে নিচ্ছিল হারীত।

'টাকাটা গুনে দেখো।'

'আবার কি গুনব?'

'টাকার ব্যাপার, গুনে দেখবে না?' অর্চনা আঁটোসাঁটো করে স্নিগ্ধ চোখে বললে।

না গুনে নোটের তাড়া পকেটে রেখে হারীত বললে, 'সব টাকাই বাক্সে ছিল, মা যখন বিকেলে তাঁর টাকাটা ফিরিয়ে দিতে বললেন, তখন সব টাকাই বের করেছিলাম, মার টাকা মাকে দিয়ে চালের টাকাটা বালিশের নিচে রেখে দিয়েছি।'

'বেরুবার সময় কী ভেবেছিলে?'

'ভেবেছিলাম টাকা সঙ্গে নিয়েছি।'

অর্চনা হেসে বললে, 'এ রকম ভুল বড়-বড় বিষয়ী মানুষেরও হয়। মনটা এলোমেলো হয়ে থাকলে এ রকম হয়।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে এলোমেলো হয়ে উঠল বুঝি আমার মন? বেশ, শান্তির সময় তো এসেছিল সন্ধের সময়। জানা গেল সত্যি কী। তোমার সঙ্গে তো স্থির সম্বন্ধই পাতানো হল। তারপরেও এলোমেলো হয়ে থাকে কী করে আমার মন?'

'একটা কথা হারীত—'

'কী, বলো?'

'সত্যিই তোমার-আমার স্থির সম্বন্ধ—'

অর্চনাকে থেমে যেতে দেখে হারীত বললে, 'তোমার সুমনাদির কাছে যা পেলাম না, সুলেখা যা আমাকে দিতে পারবে না, তার চেয়ে স্থির।'

'স্থির?' অর্চনা চারিদিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'রাত হয়েছে, কেউ কোথাও নেই। চলো আমার ঘরে—সেখানে বেশি অন্ধকার।'

'কিন্তু হারীত নিজের ঘরেই বসে রইল। হারীতকে বসে থাকতে দেখে বসে রইল অর্চনা।

'আমার ভাঙা শরীরটাকে একটু তালি মেরে ঠিক করে দেবে তুমি?' হারীত বললে, 'জলপাইহাটিতে ছোটখাট নানা রকম কাজে আমাকে সাহায্য করবে—টাকার সাহায্য চাই না, পরামর্শ দেবে তুমি। যদি বল আমাকে, তা হলে এক বছর পেরিয়ে গেলেও এখানে থাকব আমি—তুমি বলছ থাকব—কেন দরকার তা জিজ্ঞেস করব না—এই সব স্থিরতা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারীতকে নিয়ে নিজের অন্ধকার ঘরে যেতে চেয়েছিল অর্চনা। বোকার মতন চেয়ারে বসে থেকে বেকুবের মতন কথা বলছে হারীত। সমস্ত মন গ্লানিতে ভরে গেল অর্চনার; উঠে চলে যেতে ইচ্ছা করছিল; কিন্তু চুম্বকে আটকে আছে যেন তার প্রকৃতির দৃঢ় মিহি সব স্নায়ু এই ঘরেরও অন্ধকারের ভেতর। কিন্তু যে-আলো এসেছিল, আস্তে-আস্তে কেটে যেতে লাগল, মনের অস্তিত্ব ফিরে পেতে পেতে আর-এক রকমভাবে ভাল লাগল তার। নিস্তার অনুভব করে, শান্তি অনুভব করে, তবুও সৃষ্টির অন্ধকারের অন্তর্লীন সোমরসের দিকে আর-এক বার তাকিয়ে অর্চনা বললে, 'কে জানবে আমাদের সম্বন্ধের কথা?'

'কাউকে জানাবার দরকার নেই। নিশীথবাবুকে জানতে চাও অর্চনা?'

'তাঁকে চিঠি লিখে দেবে?'

'সেটা দরকার মনে কর?' ঘরের ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে হারীত বলল। অর্চনা কিছুক্ষণ সুমনার দিকে তাকিয়ে রইল। কী রকম অকাতরে ঘুমুচ্ছে। কী মনে করে নিশীথ সেনকে বিয়ে করেছিল এক দিন এই স্ত্রীলোকটি—হারীতের জন্ম দিয়েছিল?

'না,' অর্চনা বললে, 'নিশীথবাবুকে জানাবার মত আশ্চর্য কিছু ঘটে নিতো। কোনো দরকার নেই তাঁকে জানাবার।'

'আশ্চর্য জিনিস ছাড়া তিনি আর-কিছু জানতে চান না?'

'তাঁর ছেলের শরীর সারিয়ে দেব, তাঁর ছেলেকে বলে কয়ে এক-আধ বছর জলপাইহাটিতে রেখে দেব, এ শুনে খুশি হলেন তিনি। কোনো সংবাদ দিয়ে তিনি তো আমাকে খুশি করেন নি, কেন খুশি করতে যাব তাঁকে আমি। নাঃ, এ নিয়ে তাঁকে চিঠি লিখে তাঁর কাছে নিজেকে সুমনাদির মত ভাল মানুষ বানিয়ে তুলে কোনো লাভ নেই।'

হারীত টের পেল অর্চনার সঙ্গে যে-স্থির সম্বন্ধ ঠিক করেছে সে, সেটাকে অর্চনা সম্বন্ধ বলে স্থির বলে মনে করে নিতে পারছে না, স্থিরতর কিছু চায়, জিনিসটার নিজের গুণের জন্যেই খানিকটা হয় তো, খানিকটা নিশীথ সেনকে আহত করবার জন্যে। খানিকটা সুলেখাকেও ব্যাহত করবার জন্যে হয় তো। তেমন স্থির জিনিস অর্চনাকে দিতে পারবে কি হারীত?

হারীত জুতোর ফিতে খুলতে-খুলতে বললে, 'আজ রাতের কাজটা থাক, আজ থাক। কী বল অর্চনা?'

'কেন, সাহাপট্টির দিকে যাবে না?'

'ইচ্ছে করছে না। শরীরটা ভাল লাগছে না', হারীত বললে।

'এই তো বেশ বেরিয়ে পড়েছিলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শরীর খারাপ হয়ে গেল?'

হারীত জুতোর ফিতে খুলে জুতো দুটো ঠেলে সরিয়ে রেখে বলল, 'কাল রাত একটার সময় বাড়ি ফিরেছি, সকালবেলার থেকে রাত বারটা অব্দি ঢাউস ঘুড়ির নাটাইয়ের মত পাক খেয়েছি চামারপট্টি, কামারপট্টি, চকবাজার, খ্যাংড়াখেংড়ির শ্মশান—অনেক জায়গায়। নানা রকম সুরাহা হয়েছে কাল। কিন্তু ঘুম হল না আর রাতে।'

'দিনেরবেলা ঘুমুলে পারতে আজ।'

'গেলুম সুলেখাদের ওখানে।'

'তোমার মায়ের পাশ দিয়ে শুয়ে পড় এখানে হারীত। খেয়েছ?'

'বাতিটা জ্বেলে দেবে?'

বাতি জ্বেলে সলতেটা ডিম করে তেপয়ের ওপর রেখে দিয়ে অর্চনা বললে, 'কী খাবে তুমি?'

'পেঁপে দিয়েছ তো তুমি। সেটা কেটে খাওয়া যাবে কিছু, গরম দুধ খাব এক পেয়ালা। এখন নয়, রাত দশটা-এগারোটায়। বসো তুমি।'

'টেম্পারেচার ওঠে তোমার মুখে আজকাল কিছু? নিজের জায়গায় বসে পা গুটিয়ে নিয়ে অর্চনা বললে।'

'উঠত রোজই। একশ, একশ পয়েন্ট চার, ছয়। তবে বগলে ওঠে নি।'

'কাল তো সারারাত বাইরে ছিলে, দেখলে কখন?'

'থার্মোমিটার আমি সঙ্গে নিয়ে ফিরি।'

'তুমি তো কাজে ঘোর। থার্মোমিটার তো না শুয়ে-বসে নেওয়া যায় না। কাজের ধাঁধায় ঘুরতে-ঘুরতে থার্মোমিটার জিভে সাঁটাবার ফিকিরটা কী তোমার হারীত?'

'দেখে নিই টুক করে!' হারীত অল্পে সেরে দিয়ে বললে, 'পরশু জ্বর হয় নি। পরশু রাতে বাড়ি ছিলুম আমি।'

হারীত একটু ভেবে বললে, 'বাবাকে লিখে দিতে পার; তোমার ছেলের শরীর মেরামত করে দিচ্ছি আমি'—অর্চনার দিকে তাকিয়ে হারীত বললে, 'কিন্তু কোনো ভেলকি না ঘটলে বাবাকে তো তুমি চিঠি লিখবে না। এ চেয়ারে তো বাবার বসবার কথা ছিল, আমি বসে তোমার সঙ্গে কথা বলছি এর চেয়েও বড় ভানুমতীর খেলা চাও তুমি?'

বলে হারীতের মনে হল অপূর্ণ কথা বলেছে সে, কথাটাকে সম্পূর্ণ করে দেওয়া উচিত ছিল। অর্চনা হারীতের থেকে তিন-চার বছরেরই বড় নয় শুধু, এক শতাব্দীর বড় যেন; কী করে সে তৃপ্ত হবে সম্পূর্ণ জিনিস ছাড়া? কিন্তু তবুও যে-কথাটা বলেছে সে, সেটাকে চাপা না দিয়ে অর্চনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কী বলে সে তাই শুনবার জন্যে। তাকাতে-তাকাতে হারীতের মনে হল ভেঙে যায়, বদলে যায়, নতুন হয়ে ওঠে সব, অর্চনার চেয়ে হারীত নিজেই বড় যেন; হয় তো এক শতকের; দিদিমার মত মনে হয়েছিল অর্চনাকে এক সময়, তার পর মাসির মত, বোনের মত, তার পর কেমন নাতনির মত মনে হচ্ছে, শিশুর মত তাকিয়ে আছে, থই পাচ্ছে না। যেন পৃথিবীতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী ভয়াবহ, সরল দৃষ্টিতে সুমনার দিকে একবার, হারীতের দিকে একবার, তাকিয়ে দেখছে। মনটাকে ঝাড়া দিয়ে বাস্তব পৃথিবীতে হারীত ফিরে এল; ঠিক আছে; অর্চনা ঠিকই আছে। দিদিমা, মাসিমা, নাতনি নয়—নিজের প্রতিভা ফিরে পেয়েছে অর্চনার মুখ, দৃষ্টি, আঁচল, কাল বেণীর খোঁপা তার।

'আমি চেয়েছিলুম তুমি বরাবর এখানে থাকবে।'

'বরাবর? আমার কলকাতার বিপ্লবের কাজগুলো কে করবে তা হলে?'

'কলকাতায় গিয়ে বিপ্লব করবার কোনো দরকার নেই তোমার।'

'কেন?'

'ও-সব জিনিসে কিছু হয় না কোনোদিন। বুখারিন, বরোডিন, কামেনেভ, রাইকভ তো মাঝপথে সরে গেল। স্ট্যালিন শেষ পর্যন্ত রইল, কিন্তু আমেরিকা বোমা দিয়ে সমস্ত রাশিয়া শেষ করে ফেলবে, না, রাশিয়া সমস্ত আমেরিকাটাকে উৎখাত করে দেবে এতেই এসে দাঁড়াল তো সব বিপ্লব। ওতে নেই, কিছু নেই।' হারীত শার্টের পটেক থেকে নোটগুলো বের করে খাটের তোশকের নিচে ঠেলে দিতে-দিতে বললে, 'পলিটিক্সের কথা বলো না তুমি। ও-সব তোমার মুখে শুনতে চাই না। সমস্ত পলিটিক্সের থেকে তোমাদের কাছে আসি, ওরা যা পারে না, তুমি তাই দিতে পার বলে। তুমি তা দিতে পার বলে বরাবর জলপাইহাটিতে থাকব আমি।'

হারীত দরজার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে চোখের স্নায়ুগুলোকে একবার ঘুরিয়ে এনে ঘরের ভেতরে ছেড়ে দিল, স্নায়ুর অতীত দৃষ্টির আলোর ভেতর।

'বাবা আর ফিরে আসবেন না জলপাইহাটিতে।'

'এ কলেজে তিনি আর কাজ করবেন না। আসতে পারেন তোমার মাকে নিয়ে যেতে। কলকাতায় চলে যাবার সময় আমাকে বলেছিলেন, সুমনাদি যদি মারা যান তা হলে শ্রাদ্ধশান্তি করতে এখানে ফিরতেও পারেন তিনি, নাও পারেন।'

আকাশের একরাশি শান্ত নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে হারীত বললে, 'আশ্চর্য, আমি দেখেছি তো, তোমরা পরস্পরকে কী রকম শ্রদ্ধা করতে। তার পরে কী করে একজনকে ফেলে আর-একজন এ রকম ভাবে চলে যায়। যারা তো তুখোড় রসিক মানুষ, জ্ঞানীও, জ্ঞানপাপীও—বোকা তো নয়, স্থূল ওঁচা রক্তাক্ত তো নয়—একটা আধা ভুয়ো বিপ্লবীর মত! আশ্চর্য, ফিরবেন না আর?'

'না!'

'তুমিও যাবে না, মহিমবাবু যদি কলকাতায় চাকরি পান তা হলে নিশীথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ, সোম গ্রহে মানুষ যদি থাকে, তা হলে যেতে হবে সেখানে এক দিন পৃথিবীর মানুষকে। সোম বলছি—আমি মঙ্গল বলতে চাইছিলুম হারীত।'

হারীত আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল, একটু হেসে কোথায় মঙ্গল তারাটি আছে আস্তে-আস্তে চোখ ঘুরিয়ে খুঁজে নেবার চেষ্টা করছিল এমনিই। কিন্তু জানালা-দরজা দিয়ে যে-খণ্ড আকাশ দেখা যায় তাতে সে গ্রহ খুঁজে পাওয়া গেল না।

'বাবা ফিরে আসবেন এ দেশে।'

'কে বললে?'

'আমি জানি।'

'যেন তোমাকে ট্রাঙ্ককল করে জানিয়ে দিয়েছেন হারীত,' রাতের বাতাসের ভেতর অর্চনার নিশ্বাস মিশে গেল অন্ধকারের ভেতর এই সব মানুষের নিশ্বাস মেদুর করে রাখতে রাতের বাতাসকে: অনুভব করছিল হারীত; কিন্তু থাকছে না কিছু; দূর অন্ধকার অনন্তের দিকে চলে যাচ্ছে মানুষের নিশ্বাস, মানুষের বসে থাকা, রাতের বাতাস।

'ফিরে আসবেন, এ দেশে।'

'কে?'

'নারকেল গাছে বাজকুড়ুল পাখি ডাকছে। শুনছ অর্চনা?'

'শুনেছি। কটা পাখি?'

'দুটো।'

'অনেক দিন থেকেই ওদের ডাক শুনছি।'

'একশ বছর বাঁচে। এক সঙ্গে থাকে।'

'একশটা শীত ঋতু?' খুব গভীর তো হারীত।'

'খুব গভীর।'

'যাবে ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে তুমি?'

'কে, আমি?' হারীত বললে, 'না। আমি আছি এখানে।'

'এক বছর?' তার পর?'

'তার পরেও থাকব?'

'কত দিন থাকবে? বাজকুড়ুলের মত একশ বছর? অর্চনা হাসতে-হাসতে বললে।

'মা আজকের রাতের মতন ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'তোমার চোখে আলো লাগছে। বাতিটা নিভিয়ে দিই। এই যে নিভিয়ে দিয়েছি।'

'এখন বেশ অন্ধকার। শান্তি।'

চার দিক ঘিরে অন্ধকার, মাইলের পর মাইল, পৃথিবীতে মৃত্যু ঘটে প্রতিফলিত হয় যে অমৃত্যুর দূর অপৃথিবী লোকে, সেই নিবিড় নিস্তব্ধতা ও শান্তি।

'এখন ঘুমোও—আমি চললাম—'

'কোথায়? ওরা তো কেউ আসে নি। আজ রাতে আসবে না।'

'হারীত,' অনেকক্ষণ পরে অর্চনা বললে।

'আর এক বছর কেটে গেল?'

'হ্যাঁ, বাজকুড়ুল ডাকছে। যেন একশ বছরের ভেতর চলে গেছি আমরা।'

রাত আড়াইটায় মহিমবাবু আর তাঁর ছেলে ফিরে এলে, সুমনার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, তাকে ঘর-দোর বন্ধ করতে বলে, অর্চনাকে জানান দিয়ে, বেরিয়ে গেল হারীত সাহাপট্টির দিকে।

টেরই পেল না সুমনা, কোথায় চলে যাচ্ছে হারীত। আটটা সাড়ে আটার সময় ঘুমের থেকে জেগে উঠেছে তো সুমনা, তার পর খেয়েদেয়ে ওষুধ খেয়ে রাত দুটো-আড়াইটে অব্দি ঘুমিয়ে, একটু জেগে, আবার ঘুম পেয়ে গেছে তার। কী বলছে হারীত, কোথায় যাচ্ছে, ঘুমের চোখে, জ্ঞানচেতনারও কেমন একটা বিহ্বলতায় বুঝে উঠতে পারছিল না কিছু সুমনা। হারীত চলে গেল। অর্চনা দুটো দরজা একটা জানালা আটকে দিয়ে, বাতাসের আসা-যাওয়ার জন্য দুটো জানালা খোলা রেখে, চলে গেল। খেয়ে এসে সুমনাদির সঙ্গে সে শোবে।

'হারীত আজ রাতে আর ফিরবে না এই কথাই তো বলে গেল অর্চনা!' 'বলে গেল না?' জিজ্ঞেস করল সুমনা কেমন যেন অজ্ঞানে আবছায়ায় ডুবে যেতে-যেতে। ব্যথা-ভর্ৎসনা-অচেতনার অন্ধকার আঁকিবুকির ভেতর স্বপ্ন দেখতে লাগল সুমনা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে—তারপর স্বপ্নেরাও সরে গেল তার মাথা আর রক্তের ভেতর থেকে কেমন একটা জড়িবড়ির মত বহতা ঠাণ্ডার দেশে।

এ রকম চার-পাঁচ রাত কেটে গেল সুমনার, হারীতের, অর্চনার, তার পর আরো এক রাত বাইরে-বাইরেই কাটিয়ে দিল হারীত।

পরদিন বেলা বারটার সময় হারীত ফিরল। হারীতের দিকে তাকিয়ে সুমনার মনে হচ্ছিল সারারাত কড়িকাঠে ফাঁসিতে ঝুলে, মরে হেজে, অনেক বেলায় প্রাণ পেয়ে ফিরে এসেছে ছেলেটা।

'কোথায় ছিলে তুমি সারারাত? এতটা বেলা?'

'খুন করে এসেছি নরেনকে, আশুকে, গনিকে, মোনতাজকে, সুজন খাঁকে।' হারীত হাসতে-হাসতে বললে।

'খুন করেছি বেশ করেছি, চার হাত-পা নিয়ে ফিরেছিস তো বাড়িতে। এখন একটু চান করে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়।'

'আগে রান্নাটা সেরে নিই—'

তোমার জন্যে বসে আছে রান্না। সব হয়ে গেছে—যা এখন চট করে চান করে আয়। অবিনাশবাবুদের দিঘিতে যাস নি; সে দূর পাল্লা। মহেশসাগর থেকে চান করে আয়।'

'কে রেঁধেছে?'

'অর্চনা, আবার কে?'

'কী রেঁধেছে?'

'পাঠ মুখস্থ করে রেখেছি আমি। খেতে বসে দেখবি।'

'হারীত মাথায় তেল মাখতে-মাখতে বললে, 'কেন আবার তাকে রাঁধতে বললে তুমি—'

'বলার দরকার করে না। আটটার মধ্যেও তুমি বাড়িতে ফিরলে না দেখে নিজেই তো মাছ-তরকারি বঁটি নিয়ে বসল।'

হারীত চান করে ফিরে এসে দেখল সুমনা কেমন দাঁত বার করে হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। বাতাস নেই, দু-একটা মাছি তাড়না করছে। কপালে আস্তে একটা টোকা দিতেই জেগে যাবে মা। কিন্তু থাক; জাগিয়ে দিয়ে লাভ নেই। বিশ্রাম চাচ্ছে হয় তো—চাচ্ছে হয় তো শরীর। দিন নেই, রাত নেই, কেবলই যে ঘুমিয়ে পড়ছে মানুষটা। এ জিনিস ভাল কি খারাপ, জাগিয়ে দেয়া উচিত না ঘুমোতে দেয়াই ঠিক, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখবে সে, ভাবতে-ভাবতে সন্দিগ্ধ মনে রান্নাঘরের দিকে গেল।

অর্চনা কোথায়, নেই বুঝি বাড়িতে। কিংবা গরমের ছুটিতে নিরালা দুপুর মহিমবাবুর কবলে আছে হয় তো।

রান্না ঘরে ঢুকে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিয়ে ধীরে সুস্থে খেল সে। নানা রকম জিনিস বেঁধেছে অর্চনা, নিজের পয়সা খরচ করে নিশ্চয়ই, ভাল রেঁধেছে, ঝাল কম দিয়ে ভাল করেছে; বেশ ক্ষিধে আছে আজ হারীতের। অনেক কিছু খেল সে, খুব বেশি করে খেল। হারীতের সাড়া পায় নি অর্চনা হয় তো, ঘুমিয়ে আছে, বাড়িতে নেই বোধ হয়। অনেকক্ষণ বসে খেল যদিও হারীত, কিন্তু তার খাওয়ার ভেতর হঠাৎ এসে পড়ল না সুমনা কিংবা অর্চনা তদারক করবার জন্যে। ভালই হয়েছে। যখন ক্ষিদে পায় একা খেতে ভাল লাগে, নিজের ক্ষিধের রাক্ষসটাকে অন্যের কাছে ফলাও করে না দেখানো ভাল; যখন ক্ষিদে থাকে না, কেউ কাছে থাকুক, দেখুক মানুষটা কেমন কঠিন, কেমন সাত্ত্বিক ঃ ভাবতে-ভাবতে দেবতাদের থেকে অনেক দূরে গড়িয়ে সত্যিই বেশ সেঁটে-সাপটে রাক্ষসের খোরাক খেয়ে ফেলল যেন সে।

হারীত তার ক্যাম্প খাটে তার বাবার ঘরে গিয়ে শুল—দরজা-জানালা খুলে দিয়ে এক দিককার এই বোশেখ দুপুর পৃথিবীর নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গচারী বাতাসের ভেতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে পাঁচটার সময় ঘুমের থেকে উঠে—কেমন অসাড় অনিঃশেষ ঘুম পেয়ে বসেছিল তাকে, নড়ে নি চড়ে নি, একবারও ঘুম ভাঙে নি, স্বপ্ন দেখে নি কিছু, কোনো অভাব-আক্ষেপ, ব্যথা-খিঁচ অনুভব করে নি ঘুমন্ত শরীর তার—পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে, হারীত তাকিয়ে দেখল, ক্যাম্প খাটের কাছেই তার বাবার কাঠের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, বাঁ পায়ের ওপর জয়পুরী চটি মোড়া ডান পা চড়িয়ে দিয়ে, একটা খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে চলেছে জুলেখা। জুলেখা? কখন এসেছে? জুলেখা, তাদের বাড়িতে? হারীত চোখ রগড়াতে-রগড়াতে ভাল করে তাকিয়ে দেখছিল; হারীতের যে ঘুম ভেঙেছে টের পায় নি জুলেখা। হারীতের খাট থেকে হাত-তিন-চার দূরে ক্যাম্প খাটের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে বসে আছে। মুখের পাশের দিকটা দেখা যাচ্ছে তার; খাড়া নাক আরো খাড়া মনে হচ্ছে; খোঁপা দেখা যাচ্ছে; মুখের সামনেটা দেখা যাচ্ছে না। জুলেখা ঘুরে না বসলে হারীতের সঙ্গে চোখাচোখি হয় না।

নিশীথবাবু তো জুলেখাদের মাস্টার ছিলেন, কিন্তু তাঁর আমলেও দু-চার দিনের বেশি এ বাড়িতে আসে নি জুলেখারা। অবিশ্যি কয়েক বছর এখানে ছিল না হারীত। তখন কী রকম এসেছে না এসেছে জানে না সে? কী করবে হারীত? ঘুমের নিকেশ হয় নি তার—আরো ঘুম চাইছে শরীর। ঘুমোবে? পাশে এক জন বিশেষ দরকার নিয়ে বসে আছে বলে ঘুম যদি না আসে হারীতের চোখে, তা হলে মটকা মেরে পড়ে থাকবে? জুলেখা যেন খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে একটা আলতো ঝাকুনি দিয়ে হারীতের দিকে মুখ ফেরাবার উপক্রম করল, অমনি চোখ বুজে ফেলল হারীত। চোখ বুজে সে ভাবছিল, বড় অতিথি এসেছে তার ঘরে অথচ কাছে কেউ নেই, সুমনা নেই, অর্চনা নেই; সামান্য একটু সৌজন্য দেখাবার জন্যেও ওরা কেউ আসতে পারল না এ ঘরে, কাছে এসে বসতে পারল না ওর—ভাবতে-ভাবতে চোখ মেলে হারীত বললে, 'তুমি!'

'হ্যাঁ আমি। আরো ব্রোমাইড চাই তোমার হারীত?'

'ব্রোমাইড? বড্ড বেশি ঘুমিয়ে পড়েছি আজ, হারীত বালিশের থেকে তুলে ডান হাতের ওপর মাথাটা রেখে দিয়ে বললে।

লেডিজ ব্যাগের থেকে একটা শিশি বার করে জুলেখা বললে, 'এর ভেতর ঘুমের ওষুধ আছে, ব্রোমাইডের চেয়ে অনেক ভাল, জার্মান ওষুধ, বেশ কনসেনট্রেটেড। তুমি কাল সন্ধের থেকে আজ পাঁচটা অব্দি ঘুমোলে। কিন্তু ও ওষুধ খেলে আর ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারবে চার-পাঁচ দিন।'

'এতই কি ঘুমোবার দরকার তোমার জুলেখা?'

'কেন, আমার কেন? আমার কথা বলছি?'

'ব্যাগে তো ঘুমের ওষুধ সঙ্গে-সঙ্গে নিয়ে ফিরছ তুমি। নিজের জন্যে নয়? মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে বেড়াবার জন্যে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে ঘুমতাড়ানি বুড়ি ঠাওরালে না কি। সে হব এক দিন যখন দেখব সকলেই ঠাণ্ডা মেরে ঘুমিয়ে আছে। আজ কাল অনেকেই জেগে ঘুমোচ্ছে, ইউনিয়নে, পাকিস্তানে কোথাও কলকে পাচ্ছে না—আহা বেচারি সব!...আমি তাদের ঘুমের মাসি।'

'কলকে তোমরা আমাকে না দিয়ে ছাড়বে না জুলেখা—পাকিস্তানে যখন এসেই পড়েছি,' হারীত বিছানায় উঠে বসে বললে, 'কখন এলে তুমি?'

'ঘণ্টাখানেক হল।'

'বাবা, তা হলে তো এসেছই। মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ হয়েছে। খুব অসুস্থ দেখলাম তাঁকে। কী, অ্যানিমিয়া বুঝি? বেশি কথা-টথা বলতে পারলেন না। শুয়ে আছেন। খুব খারাপ দেখলাম তো শরীর।'

'কী কথা বললেন?'

'না, বললেন না কিছু।'

'কিছুই না?'

'এক-আধটা কথা কী বলতে গেলেন—জিভ জড়িয়ে গেল। বড্ড এলিয়ে পড়েছে শরীর দেখলাম তোমার মার। কে দেখছে?'

'মজুমদার নিজেই দেখছে।'

'ভাল ডাক্তার তো মজুমদার, এই দিককার সবচেয়ে বড় ডাক্তার—কোনো উপকার হচ্ছে না?'

'হচ্ছে কিছু-কিছু। যা দেখেছ তুমি, এর চেয়ে খারাপ ছিল।'

'খুব তো খারাপ দেখলাম আমি,' জুলেখা খবরের কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'আজকের স্টেটসম্যান কিনেছিলুম। পড়েছ আজকের স্টেটসম্যান, হারীত? পড়ে দেখ। রেখে গেলুম তোমার জন্যে। তোমার মার পার্নিশাস অ্যানিমিয়া মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তাই বলেছে তো ডাক্তার। চেঞ্জে গেলে ভাল হত। রক্ত দেওয়া হচ্ছে।'

'খুব দরকার রক্তের', জুলেখা ঘর-দোরের বেশি বাতাসের ভেতর শাড়ির আঁচলটা আঁট করে জড়িয়ে নিয়ে বললে, 'কে দিচ্ছে রক্ত?'

'দিচ্ছিল তো নরেন মিত্তির। মাঝখানে তো আর-এক জনকে ঠিক করেছিলাম। আবার নরেন দেবে। আজ দেবার কথা ছিল, ডাক্তার বললেন আজ নয়, কাল নেওয়া হবে।'

'নরেন মিত্তির?' জুলেখা কেমন একটু চমকে নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে-আস্তে বললে, 'ছেলেটি কেমন যেন—শুনেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমিও শুনেছি, দেখেছিও। কিন্তু তার রক্ত পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছেন ডাক্তার। ভাল আছে, মার কাজে লাগবে।'

'বড্ড খারাপ রোগ অ্যানিমিয়া—এই পার্নিশাসগুলো মার একবার হয়েছিল। দশ-বার হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল বাবার। পুরীতে নিলেন, রাঁচিতে নিলেন, শেষে মুসৌরি পাহাড়ে গিয়ে ভাল হল।'

হারীতের দিকে তাকিয়ে জুলেখা বললে, 'নিশীথবাবু কোথায়?'

'তিনি তো কলকাতায়।'

'সুলেখা আমাকে বলছিল। পনের-কুড়ি দিন হয় গিয়েছেন শুনলুম। কলেজ তো ছুটি হয় নি। ছুটি নিলেন প্রফেসর সেন?'

'না, কাজ ছেড়ে গেছেন।'

কাজ ছেড়ে? শুনেছিল জুলেখা বটে, কিন্তু অন্য লোকের কাছে। হারীতের মুখে শোনে নি, একটু বেটাল ধাক্কা খেয়ে বললে, 'ছেড়ে দিয়ে গেলেন!' হাতের ব্যাগটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুরিয়ে সেটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে হারীতকে বললে, 'কোনো কাজ পেলেন কলকাতায়?'

'না।'

'এটা ছেড়ে গেলেন কি এ দেশ পাকিস্তান হয়ে গেছে বলে? ইউনিয়নে যেতে চান?'

'না, বোধ হয় তা নয়, ইউনিয়নে যাবার জন্যে নয়।' চার-পাঁচ বছর ধরেই কলকাতায় কাজ খুঁজছেন তো তিনি, ভাবছিল হারীত, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। চুপ করে রইল।

'কে ভেবেছিল এ রকম পাকিস্তান আর ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন—এত সব হবে। হয়ে পড়ল তো সব। ভালই হল। অনেকে মনে করছে নিশীথবাবু ছেড়ে গেলেন, আমাদের একটু জিজ্ঞেস করে গেলেন না।'

'কী করতে তোমরা?'

'রেখে দিতাম তাঁকে।'

'কে, তুমি আর অবনী খাস্তগির?'

'খাস্তগিরকে নিয়ে হারীতও টিটকিরি দিচ্ছে তাকে, কিন্তু মিছেই দিচ্ছে। গায়ে মাখতে গেল না জুলেখা; ভাল মনে হেসে বললে, 'হ্যাঁ আমি, ওয়াজেদ আলী, মকবুল চৌধুরী, ইদরিশ, ইয়ুসুফ—'

জুলেখা অনেক দূরের একটা সিসু গাছের ওপরের ডালপালার ভেতর পাখি, পাতা, বাতাস, বিভুঁয়ের সূর্যোজ্জ্বল লুটোপুটির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

'আমাদের চার বছর তো পড়িয়েছে নিশীথবাবু এ কলেজে। বেশ ভাল পড়াতেন তিনি। নিশির ডাকে একটা স্নিগ্ধ তনুবাত পরিমণ্ডলের দিকে চলে-ছিলুম যেন সে চার বছর। ওপরের কথাটা কিন্তু নিশীথবাবুর মুখে শুনে-ছিলুম ঠিক এই রকম বলেছিলেন? না, বলতে গিয়ে অদল-বদল ভুল করে ফেললুম। আমাকে শুধরে দাও তো হারীত।'

'ঠিক আছে।'

'আজকাল তো অনেক বই কিনছি-পড়ছি-দেখছি-শুনছি। কিন্তু এই তো দু-এক বছর আগে কলেজ জীবনের যে পাট ফুরিয়ে গেল, সবচেয়ে সেইটাই ভাল ছিল। একটা পুরোপুরি জীবনবেদের মত, সে আর আসছে না।'

সেই সিসু গাছটার দিকেই তাকাল আবার জুলেখা। এ ঘর থেকে নিম, জাম, জামরুল বনটা দেখা যায় না। তা দেখতে গেলে সুমনার ঘরে যেতে হয়। কিন্তু একটা আশ্চর্য তেপান্তর, বেশ সুন্দর সরবতি লেবুর ঝাড়, চার-পাঁচটা বৃন্তনিবিড় তালগাছ, দেখা যায় এ ঘর থেকে-অনেক দূরের উঁচু-উঁচু গাছগুলো দেখা যায়।

'একটা অন্যায় করেছেন নিশীথবাবু।'

'অন্যায় অনেকগুলো করে ফেলেছেন তিনি,' হারীত বললে।

'তোমার মাকে এ অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া ঠিক হয়-নি তাঁর।'

'আমার ওপর ভার দিয়ে গেছেন।'

'ভার দিয়ে গেছেন। কবে ফিরবেন?'

'তিনি ফেরবার আগে তোমরা কলকাতায় চলে যাবে।'

হারীতের কথা শুনে জুলেখার মুখ সংকল্প সক্রিয়তায় ভরে উঠতে লাগল; সে বললে, 'আমরা কলকাতায় যাব কে বলেছে তোমাকে? আমার তো মানুষদের এ দেশে থাকতে বলছি। আমাদের কথা শুনছে না, অনেকেই চলে যাচ্ছে। হারীতদা, তুমি ক-দিন থাকছ জলপাইহাটিতে?'

'বাবা বলে গেছেন আমাকে মার শ্রাদ্ধশান্ত অব্দি এখানে থাকতে।'

হারীতের, মুখে না হোক, অন্যদের মুখে এ ধরনের কথা শোনার অভ্যেস আছে জুলেখার। তবুও কথাটা সুবিধের লাগল না তার। এ রকম কথা হারতী না বললেই পারত, ভেবেছিল জুলেখা।

'নিশীথবাবুকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি,' জুলেখা বললে, 'কিন্তু আমার দুটো নালিশ তাঁর কাছে।'

বাইরে তালপাতার দিকে তাকিয়েছিল হারীত, দুটো প্রজাপতি উড়তে-উড়তে সেই সবুজ নীলিমার ভেতরে ঢুকে পড়ছিল প্রায়; বাতাসের ঝটকায় কোথায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'হারীতদা, তিনি স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে সত্যিই চলে গেলেন। যার সঙ্গে জীবনের পঁচিশ-ত্রিশটা বছর কাটল তাঁকে এ রকম অবস্থায় ফেলে চলে যায় বটে কেউ-কেউ, কিন্তু-চলে গেলেন প্রফেসরের মতন মানুষও। এটা কি তাঁর অপরাধ, এ দেশের অপরাধ, না কি এ যুগেরই—ঠিক বুঝতে পারছি না আমি। ঢের রক্ত, গ্লানি, বিশৃঙ্খলায় ভরে আছে এ যুগ, এ যুগে প্রফেসর সেনের মতন ও-রকম মানুষকেও হয়তো তাই এই রকম হতে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলেখা আলোড়িত মুখে হারীতের দিকে তাকাল, খুব আন্তরিকতা না থাকলে মানুষের মুখ, চোখ, মূল্যবিনাশের চেতনায় নিপীড়িত হয়েও এ রকম স্পষ্ট, স্নিগ্ধ দেখায় না, মনে হচ্ছিল হারীতের।

'ঠিকই বলেছ জুলেখা, এ শতাব্দীটা ব্যাধিতে ভরে আছে, মানুষ কী করে সুস্থ থাকবে। কিন্তু তোমাদের মাস্টারমশাই স্ট্রেচারে বেড়াচ্ছেন মনে হয় না; সমুদ্রে শোয়া অভ্যাস আছে, সম্প্রতি শিশিরে শুয়েছেন। স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গেছেন বলে মনে হয় না। তোমাদের জলপাইহাটি কলেজটাই ওঁকে মেরেছে; ভেতরের খবর সুলেখার কাছে জিজ্ঞেস কোরো। যে মানুষ আজীবন দর্শনের মত করে, তার চেয়েও বেশি ধর্মের মত করে একটা কলেজ সংস্থান নিয়ে কাটাল সেটা যে বাস্তবিকই কোনো সত্য দর্শন প্রস্থান নয়, তাতে ঠাণ্ডা থাকে না, মনের খাদ্য নেই, পেটের খোরাকও পাওয়া যায় না, মনের চেয়ে পেটের দাবিই বেশি হয়ে ওঠে, এত যে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে, এই সব অধঃপতনের থেকে সরে পড়বার জন্য তিনি চলে গেছেন, মাকে—ডাক্তার-অর্চনা-মহিমবাবুর কাছে রেখে গেছেন; ঠিক ফেলে গেছেন বলতে পারা যায় না।'

পর দিনও জুলেখা এল।

কথায়-কথায় নিশীথের কথা এসেছে আবার।

জুলেখার দিকে তাকিয়ে হারীত বললে, 'বলতেও পার নিশীথবাবু তাঁর স্ত্রীকে ফেলে চলে গেছেন। আজীবন গোলকধাঁধায় ঘুরে তার পর যখন সত্যি একটা বেরুবার পথ খুঁজে পাওয়া গেছে তখন তিনি তাজ্জব কাণ্ডই করলেন, বেরিয়েই গেলেন দেশ থেকে, কলেজ থেকে, স্ত্রীর কাছ থেকে। বেরুবার পথ খুঁজে পেলেও অনেকে তো গোলকধাঁধায় ঢোকে আবার,' হারীত জুলেখার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু সেনমশাই বাজকুড়ুলের মত দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে চলে গেলেন।'

'তার মানে?'

'মানে জীবনের একশটা বছর কেটে গেছে তার। ফুরিয়ে গেছে—ব্যস।'

'তাঁর স্ত্রীও গোলকধাঁধার মতন ছিল?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'বাপকে সাফাই করবার জন্যে বলছ বুঝি?'

'না, আমি জেনেই বলছি, আমি তো তাঁর স্ত্রীর ছেলে।'

'ও, দক্ষিণ সমুদ্রে যাবে পুরুষ কোড়াল আর কোড়ালি পিছে পড়ে থাকবে। স্ত্রীরা কি গোলকধাঁধার মত?'

'সব স্ত্রীরা?' হারীত বাঁ চোখটা প্রায় বুঁজিয়ে ডান চোখ দিয়ে জুলেখার দিকে তাকিয়ে বললে, 'না তো। তা কী করে হয়। স্ত্রী-বিদ্বেষী নই আমি। স্ত্রীলোকের প্রতি বিদ্বেষে পুরুষ মানুষকে সমর্থন করা হয়েছিল, তাই বুঝি মনে করেছ তুমি। না, তা নয়। আমি স্ত্রীলোকের ভক্ত। আমার বাবা খুব সম্ভব আমার চেয়েও বেশি ভক্ত, কিন্তু তবুও টিকতে পারলেন না তিনি।'

জুলেখা তার ব্যাগের ভেতর থেকে একটা কৌটো বের করে কয়েকটা খুব ছোট-ছোট পিল খেয়ে নিল।

হয় তো ক্যাকটিনা পিল খাচ্ছে, হারীত ভাবছিল। বেশ সুস্থ তো দেখায় জুলেখাকে, হার্টের একটু-আধটু অসুখ আছে হয় তো। বসে থাকে না বড় একটা, খুব দৌড়ঝাঁপ করে; আজ গুটিয়ে বসে আছে দেখছি। না, ওগুলো ক্যাকটিনা পিল নয়, কেমন একটা সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে।

'খাবে হারীতদা?' কৌটোটা এগিয়ে দিয়ে জুলেখা বললে।

'কী জিনিস?'

'এলাচি দানার মত, কিন্তু আরো অনেক মসলা মেশান হয়েছে। পাকিস্তান থেকে বের করেছে। ওয়াজেদ আলী সাহেব দিলেন সে দিন।'

কয়েকটা দানা মুখে দিয়ে হারীত বললে, 'বেশ তো লাগছে।'

'ভাল লাগছে? কৌটোটা রেখে গেলাম তোমার টেবিলে।'

'কেন?'

'খাবে তুমি।'

'হ্যাঁ, তা রেখে যাও জুলেখা। স্বচ্ছন্দে। যখনই দরকার হয় খাব, বিলোব, বেশ বড় কৌটো তো। এটা রূপোর কৌটো মনে হচ্ছে।'

'জার্মান সিলভার।'

'এ জিনিস পাওয়াই তো যায় না আজ কাল। কবে কিনেছিলে?'

'আমাকে মহম্মদ ইদরিশ সাহেব দিয়েছিলেন।'

'কে সাহেব? ঠিক পেলুম না।'

'পাকিস্তানের এক জন বড় অফিসার কৌটোটা নাও তুমি। ওটায় করে দানা খেতে ভাল লাগবে।'

'ইদরিশ তো তোমাকে দিয়েছিল।'

'আমি তোমাকে দিলুম।'

'কিন্তু আমি কাউকে দেব না। সুলেখাকে দিতে পারি।'

'তা হলে তো ইদরিশের কাছেই ঘুরে যাবে জিনিসটা আবার।'

'কেন?' তেরছা চোখে একবার জুলেখার দিকে তাকিয়ে নিয়ে হারীত বললে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারীতের চকিত ভাবটা লক্ষ্য করছে জুলেখা; ভেবে দেখছিল সে, সুলেখা টানে বুঝি হারীতকে? টানুক, ভালই তো, কোনো ঈর্ষা নেই তার মনের ভেতর। নিজে কি টানে হারীতকে সে? কী রকম টানে? কিন্তু এ সব বিষয়ে বেশি কথা ভাববার ইচ্ছা ছিল না তার। অনেক কাজ তার হাতে। সুলেখার মত ভাবুনে মেয়েমানুষ সে নয়।

'তা দিয়ে দিতে পারে ইদরিশকে। যে যে-রকম জিনিস দেয় সেই জিনিসই তাকে ফিরিয়ে দেবার অভ্যেস ওর। যারা নতুন, অভ্যাগত, দূরের, তাদের এটা-ওটা-সেটা না দিয়ে পারে না। যারা একটু কাছের হয়ে গেছে, কিছু দেয় না তাদের। বাপের মেয়ে ও। আমি এ বিষয়ে মায়ের মেজাজ পেয়েছি।'

'তা হলে আমি এই কৌটোটা তোমার মাকে দেব।'

'আমার মাকে? তাঁর সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হয়? হাসছ কেন হারীত?'

'কথাবার্তা হলে ভাল হত। এ কৌটোটা সুমনাকে না দিয়ে বনলেখা দেবীকে দিতাম আমি। এ বিষয়ে আমি আমার বাড়ির মেজাজ পেয়েছি জুলেখা।'

শুনে ঘাড় কাত করে হারীতের ডাঁটো রসিকতায় একটু গলা ছেড়ে হেসে নিল জুলেখা।

'আচ্ছা মানুষই তুমি হারীত। নিশীথবাবুর বিরুদ্ধে আমার প্রথম নালিশটা তেমন টিকল না। টিকেছে কিছু। বৌও যদি মানুষের গোলকধাঁধা হয়, তা হলেও বৌয়ের এত বড় অসুখে জলপাইহাটিতে থেকে একটা কিছু হয়ে-টয়ে গেলে তার পর তিনি চলে গেলে ভাল করতেন। কিন্তু আমার দ্বিতীয় নালিশটার কী উত্তর দেবে হারীত?'

'কী তেমার নালিশ?'

'এ দেশ পাকিস্তান হতে না-হতেই তিনি ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে চলে গেলেন কেন?'

'তোমরাও তো চলে যাচ্ছ।'

'আমরা যাচ্ছি? কে বললে? কলকাতায় আমাদের বাড়ি আছে তবুও যাচ্ছি না।'

'বাড়ির ভাড়াটেদের তাড়াতে পেরেছ?'

'কেন, তাড়াতে যাব কেন?'

'ইউনিয়নে ভাড়াটে তাড়ানো অসম্ভব। তাড়াতে পার নি, কী করে নিজেদের বাড়িতে গিয়ে থাকবে কলকাতায়?'

'সেই জন্যেই আমরা কলকাতায় যাচ্ছি না, এখানেই থাকছি, কে বলে তোমাকে এ সব কথা? অবনীবাবুরা অর্গানাইজ করেছিলেন, আমি তো তিন দিন সে সব মিটিঙে সবাইকে বলেছি তোমরা এ দেশ ছেড়ে যেও না, বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে বলেছি। এত সব বলা-কওয়া, সবাইকে ধোঁকা দিয়ে কলকাতায় পালিয়ে যাবার জন্যে? কী খাচ্ছ আজ কাল তুমি হারীত? কোন ঘানির তেল খাচ্ছ?'

'এত সব বলা-কওয়ার পর অবনীবাবু তো চলেছেন।'

'তিনি তো এখানকার লোক নন।'

'এখানকার লোক নন, তা হলে ওপর-পড়া হয়ে ইয়ার্কি দিতে আসেন কেন? কে শুনতে চায় তাঁর কথা। মানুষ দেখতে চায় তার কাজ।'

জুলেখা একটু কাঁধ নাচিয়ে হেসে বললে, 'তাঁর বাড়ি, ঘর, ব্যবসা, সব ইউনিয়নে। সব ছেড়ে দিয়ে তিনি এখানে বসে থাকবেন এটা আশা করা অন্যায়; কিন্তু এ দেশের লোক হয়ে, একটা নেতার মত মানুষ, নিশীথবাবু চলে গেলেন কেন ইউনিয়নে?'

হারীত জুলেখার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি ও-দিক ফেরো, একটা কথা বলব তোমাকে জুলেখা।'

'বল।'

'নিশীথবাবু যে পাকিস্তান ছেড়ে ইউনিয়নে চলে গেছেন এটা আমাদের আবিষ্কার, তিনি নিজে জানলেন না যে তিনি ইউনিয়নে গেছেন, তিনি যে পাকিস্তানে ছিলেন সে ধারণাও তাঁর নেই। পাকিস্তান বা উইনিয়ন বা কোনো পলিটিক্স নয়, অন্য জিনিস তাঁকে বায়ুভূত করেছে। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার অনেক আগে গত চার-পাঁচ বছর ধরেই তিনি কলকাতায় কাজের চেষ্টায় আছেন। তাঁর কলেজ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দেয় নি, তাঁর পরিবারও তাঁকে ঠকিয়েছে, এ সব বিষয়ে শেষের দিকে তিনি খুব হদ্দ হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতায় কেউ তাঁর ঢেঁকি কলে পাড় দিতে আসবে না—পড়ে থাকেব ঢেঁকিটা। এখানে বসে আমরা তাঁকে ইউনিয়নের শ্রীখোল মনে করে তবলায় চাঁটি মারছি। এ সব মানুষ আজকের পৃথিবীতে প্রাপ্য তো দূরের কথা কোনো পথই খুঁজে পান না। কী ধারণা ছিল নিজের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে নিশীথবাবুর? দেড়শ টাকা মাইনে পাচ্ছিলেন, দুশ টাকা চাচ্ছিলেন, সাতশ টাকা দাবি করতে পারলেন না? কি দোষ হত তাতে? কিন্তু তবুও পৃথিবীর দেনেওয়ালারা সব সময়েই ভাল মানুষ। তাই তাঁকে দেড়শ টাকাই দেওয়া হচ্ছিল তো; ছেলেমানুষি করে এত বড় টাকাটা ফেলে তিনি ইউনিয়নে চলে গেলেন আরো বেশি টাকা পাবার আশায়? না কি কম পেয়ে বেশি মর্যাদা চাইছেন বলে?'

'কী ঠিকানা নিশীথবাবুর?'

'চিঠি লিখবে তাঁকে তুমি?'

'এ কলেজে তাঁর জন্যে অবিলম্বেই বেশ ভাল পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করে তাঁকে জানাতে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কে ব্যবস্থা করবে?'

'আমরাই।'

'তোমরা? ওয়াজেদ আলী সাহেবরা। হরিলালবাবুদের তো কলেজ।'

'সে হবে। দুশ টাকা চাচ্ছিলেন তো? সে ব্যবস্থা করা হবে। তুমি ঠিকানা দাও তো ওঁর। তিনশ চারশ পেলেই তো ঠিক হত আমাদের দেশে; ও-দেশে হলে হাজার-দেড় হাজার পাওয়া যেত, বেশিও পাওয়া যেত হয় তো। ইস, কি বিশ্রী মাইনে প্রফেসরদের।'

ব্যাপের ভেতর থেকে একটা ছোট নোট বুক আর ছোট চেকনাই আমেরিকান পেনসিল বের করে জুলেখা বললে, 'প্রফেসরদের এই রকম। আমি অনেক দিন থেকেই ভেবে আসছি অসামাজিক বেসামাজিক কাজ ইংরেজের আমলে হয়ে গেছে। এখনো যদি কর্তৃপক্ষরা কিছু না করে তা হলে মাস্টার-প্রফেসরদের খুব শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন গড়া দরকার।' নোট বুকটা কোলের ওপর রেখে পেনসিলটা বাগিয়ে নিয়ে জুলেখা বললে 'আমাকে ঠিকানা দাও নিশীথবাবুর–'

'কিছু হবে না।'

'কেন, মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হবে তাঁর।'

'তিনি আসবেন না আর এ কলেজে।'

'যা চাচ্ছিলেন তাই তো দেওয়া হবে তাঁকে।'

'হারীত কোনো উত্তর দিল না, নোটবুক-পেনসিল ধরে খুব বিশেষ আগ্রহে বলেছিল জুলেখা, কিন্তু ঠিকানা জানাবার মত কোনো তাগিদ ছিল না হারীতের।

সত্যিই আসবে না?'

'অর্চনাকে বলে গেছেন আসবেন না আর।'

'অর্চনা কে?' জিজ্ঞেস করল জুলেখা, 'ও, বুঝেছি, চিনি আমি।'

'প্রফেসর ঘোষালের স্ত্রী।'

'হ্যাঁ, জানি,' জুলেখা বললে, 'ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করতে হয়। কলেজ তা করছে না বলেই এই সব হচ্ছে।'

'কলেজের গভর্নিং বডিতে তুমি গিয়েছ না কি জুলেখা?' হারীত বললে, 'মনে হচ্ছে কলেজ কমিটিতে ঢুকেছ তুমি। কর্তৃপক্ষের কানে কিছু জল ঢুকবে তুমি থাকলে।'

জুলেখা মাথা নেড়ে বললে, 'ওয়াজেদ আলীরা আছেন। তাদের দিয়ে একটা কিছু করানো যেতে পারত। না, আমি নেই কলেজ কমিটিতে। ঢুকে পড়তে পারা যায় হরিলালের এক জন নমিনি হয়ে, কিন্তু সে রকম ভাবে গিয়ে কোনো লাভ নেই, হাত-পা বাঁধা থাকবে। কেমন পেটে-পেটে কচ্ছপের মত যেন হরিলাল, পিঠের খোলা চিড়িয়ে রোদে আরাম খাচ্ছে, পাশে-পাশে গুগ্‌লি শামুকদের নিচ্ছে সব, হিমাংশু চক্কোত্তি, অন্তিম দত্ত। গার্জেনদের প্রতিনিধি হয়ে ঢুকতে পারা যায় কলেজের গভর্নিং বডিতে, কিন্তু?' জুলেখা একটু থেমে বললে, 'আমার হাতে এমনিই ঢের কাজ, ও-দিকে যাব না আমি আর'–হারীতের দিকে তাকিয়ে জুলেখা বললে, 'ঠিকানাটা তবু তুমি দাও আমাকে।'

'লিখতে পারবে না তাঁকে যে আমার কাছ থেকে ঠিকানা পেয়েছ।'

'ক্ষ্যাপা তুমি হারীত, সে কথা সেধে তাঁকে লিখতে যাব কেন?'

হারীত চোখ ছোট করে নিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে ভাবতে-ভাবতে বললে, 'মনে পড়ছে না ঠিকানা, সুলেখাকে জিজ্ঞেস করো তুমি, সে জানে।'

'তুমি জান না? চিঠি লেখেন না তোমাকে নিশীথবাবু?'

'না।'

'তুমি লেখ না তাঁকে?'

'না। কী লিখব?'

'অর্চনা লিখছে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'অর্চনার কাছে চিঠি এসেছে তাঁর?'

'দেখি নি তো? চেন তো তুমি অর্চনাকে! মুখ চেনা শুধু? না কি মেলামেশা হয়েছে বেশ?'

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে জুলেখা বললে, 'শুনেছি অর্চনা নিশীথবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করে। কিন্তু নিশীথবাবুর বিশেষ কোনো ভাব নেই স্ত্রীলোকটির ওপর।'

'শুনেছ?'

'জুলেখা শুনেছে, আরো অনেকে হয় তো, কিন্তু সে নিজে বিশেষ কিছু শোনে নি অনুভব করে আস্তে-আস্তে বললে হারীত।

'শুনেছি তো। কাদের কাছে শুনেছি সেটা তোমাকে জানাতে পারি, কিন্তু জানবার আগ্রহ নেই তোমার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব আস্তে-আস্তে কথা চলছিল তাদের। ইচ্ছে করে নয়, চেষ্টা করে নয়, স্বাভাবিকভাবে নিচু ঠাণ্ডা গলায় জুলেখা কথা বলে, তেমনি গলায় উত্তর পাচ্ছিল হারীতের কাছ থেকে।

'অর্চনা মাসি বাবাকে শ্রদ্ধা করে এটা আর এমন-কি আশ্চর্য ঘটনা জুলেখা।'

'অর্চনা–মাসি বল না কি তাকে তুমি?'

'হ্যা, অর্চনা মাসি বলে ডাকি।'

'কেন, বেশি বয়স তো নয় অর্চনার। তোমার সমান তো অর্চনা। না তোমার চেয়ে ছোট?'

'অর্চনা মাসি বলেই তো ডাকি আমি,' হারীত মুখ ভারী করে দূর সিসুবনের দিকে তাকিয়ে বললে।

'শুধু শ্রদ্ধা করে বলেই তো নয়'–ঝাউ সিসুবনের দিকে জুলেখাও তাকাতে-তাকাতে বললে, 'অর্চনা নিশীথবাবুকে কী যেন করে–কী বলব তোমাকে হারীত–জিনিসটা একটু আশ্চর্য ঠেকেছে অর্চনার কাছে।'

কাঠের চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে, নিশীথবাবুর একটা ভাঁজ করা ক্যানভাসের ডেক চেয়ার খুলে, দামি শাড়ির আঁচল দিয়ে ক্যানভাস ঝেড়ে নিয়ে, জুলেখা বললে, 'বসো তুমি এখানে হারীত। কিছুক্ষণ বসো তুমি এখন ওটায়, পরে দরকার হলে আমি বসব।'

'আমি এখন তোমার চেয়ারটাতে বসছি জুলেখা।'

ডেক চেয়ারটাকে তেপান্তর মুখে ঘুরিয়ে নেওয়া হল, চেয়ারটাকেও খানিকটা, কিন্তু তবুও প্রায় মুখোমুখি বসল দু-জনে। প্রায় আড়াআড়িভাবে মুখোমুখি। 'অনেকের কথা বলছ। অনেকেরই চোখে পড়েছে বাবা আর অর্চনার ব্যাপার?'

'খুব বেশি ছড়িয়ে পড়ে নি হারীত, তবে ব্যাপারটা একটু দশ কান ঘুরেছে বটে।'

'সুলেখা শুনছে?'

'জানি না আমি। কিন্তু এমন তো কিছু খারাপ জিনিস নয়, অর্চনা ভালবেসেছে নিশীথবাবুকে–দরজাটা আবজে দিচ্ছ কেন? কেউ আড়ি পাতবে?'

'না, ও-ঘরে মা শুয়ে আছেন।'

'ঘুমুচ্ছেন তো তিনি।'

'পাতলা ঘুম, মার কান খুব পরিষ্কার। আরো ও-দিকে অর্চনা মাসিরা আছে।'

'তাদের কান খুব নিশপিশ বুঝি, এতদূর থেকে শুনে ফেলবে? কানের চেয়ে মনের টেলিপ্যাথিই বেশি, দরজা আটকালে কী হবে–'

দরজাটা তবুও খিল এঁটে আটকে ডেক চেয়ারে ফিরে এসে বসল জুলেখা।

'দরজা বন্ধ করে ফেললে?'

'আবজে রেখেছিলে তো তুমি। খুলতে দেবে না যখন–ভেবে দেখলুম একে–বারে আটকে ফেললেই ঠিক হবে।'

'আমি একটা সিগারেট খাব। অর্চনা মাসি ভালবেসেছে নাকি বাবাকে?'

'সেটা মাসিকে জিজ্ঞেস করো। আমি যা শুনেছি তাই বলছি।'

টেবিলের দেরাজের থেকে সিগারেটের বাক্স-দেশলাই বের করে নিয়ে হারীত বললে 'নাম খারাপ হয়েছে নিশীথবাবুর এ জন্যেই।'

'নিশীথবাবু তো ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে চলে গেছেন।'

'ইউনিয়নে চলে গেলে মানুষের সুনাম বাড়ে?' সিগারেট ঠোঁটে আটকে নিয়ে হারীত মুখের আনাচে-কানাচে ভেঙে একটু হেসে বললে। সিগারেটটা পকেটে রেখে দিল সে, রেখে দিল টেবিলের ওপর দেশলাইটা, বাক্সটা।

'ইউনিয়নে চলে গেছেন, ভুলে গেছে মানুষ। তা ছাড়া এতে নাম-খারাপের কী আছে। একটু ঘুরপথের মানুষ নিশীথবাবু। ভালবাসেন। কিন্তু কাকে ভালবাসেন বোঝা কঠিন। হয় তো যাকে ভালবাসেন, সে নারীকে দেখেন নি এখনো। না-দেখে আপসোসও নেই, খুব অশান্তিও নেই মনে, বিশেষ শান্তিও নেই। যাকে ভালবাসে, সে পুরুষকে দেখেছে বটে অর্চনা; সোজাসুজি চলেছে, কাজ করেছে, কথা বলেছে। কেমন লাগে অর্চনাকে তোমার হারীত?'

হারীত আকাশের চার-পাঁচটা সাদা ঝলমলে উড়ন্ত বকের দিকে তাকিয়ে, সেগুলো অনেক দূরে প্রায় মিলিয়ে গেলে, জুলেখার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললে, 'আমাকেও তো ভালবাসে অর্চনা।'

'তোমাকেও? অর্চনা?'

'বাবার মতন অতটা নয়, কিন্তু,' হারীত শব্দ খুঁজে পাচ্ছিল না।

'আমি বুঝেছি হারীত, তোমাকে ভালবাসে তোমার বাবার কান টেনে তাঁর মাথাটাকে খুঁজে বার করবার জন্যে,' জুলেখা হাসতে লাগল।

'সেই জন্যে?' হারীত চোখের সামনে, শূন্যে, এক ফিনকি, রোদের ভেতর এক আধটা মাছির ওড়া-উড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'ও-ছাড়া এমনিই টানে; এমনিই টান আছে।'

'আছে। কিন্তু কী মূল্য–কী রকম–পেতে চাও তুমি তোমার মাসির কাছে থেকে?'

'আমার মাসি নয়।'

'অর্চনামাসি তো।'

'ডেকেছি তাকে মাসি আমি, কিন্তু আজকাল আর ডাকি না।'

'ডান না? এই তো খানিক আগে বলছিলে ওকে। আমার সঙ্গে খেলা চলেছিল কথা চেপে রেখে?' জুলেখা খানিকটা নিভৃত হয়ে বললে, 'চেপে রাখলেই ভাল করতে হয় তো হারীত, কিন্তু তুমি তো সব বলে ফেল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকটা দূরে একটা গাছের কোটরে একটা পেঁচাকে নিয়ে কাকগুলো মেতে উঠেছে, সে দিকে চোখ ফিরিয়ে জুলেখা বললে, 'অর্চনাকে ভাল লেগেছে তোমার: এ ঘাটে, সে-ঘাটে তার ঘাটেও কথা বাঁধছ হারীত?'

কাকগুলো উড়ে চলে যাচ্ছে, নিজের নীড় খুঁজে পেয়েছে ঠোকর-খাওয়া পাখিটা হয় তো; দেখছিল দু-জনে।

'তা হবে,' হারীত বললে, 'কথা যদি বেনেতি হয়, তা হলে বেনেতি জিনিসের মতই তার চারদিকে ঝরতি-পড়তি হবে।'

পকেট থেকে সিগারেট বার করে টেবিলের থেকে দেশলাই হাতড়ে নিয়ে জ্বালতে গিয়ে না-জ্বালিয়ে হারীত সরিয়ে রাখল দেশলাই, পকেটে সিগারেট রেখে দিল।

'সিগারেট খাবে?'

'তুমি বসে আছ তো সামনে।'

'ওঃ, বসে আছি,' জুলেখা একটু হেসে বললে,' 'এ সব ধুনোর গন্ধ রপ্ত হয় নি বুঝি অর্চনা মাসির? কিন্তু সুমনা মাসির ছেলে তো চাঁদ সদাগর'–

'চাঁদ তো বটেই,' হারীত হেসে বললে, 'কিন্তু ধুনোর গন্ধে কিছুই বলে না সনকা। তুমি মিছেই বদনামটা করলে জুলেখা।'

জুলেখা একটু ঠাট্টা করে বলতে চেয়েছিল, অর্চনা কালী মনসার মত; হারীত অর্চনাকে একেবারে সনকা বানিয়ে ফেলেছে তাই। হারীতের কথাগুলো কানেই গেল না জুলেখার–উষ্মার কথা বলেছে হারীত, অন্তরের থেকে নয়। উপলব্ধি করে, অবিচলিত মনে বাইরের অনন্তব্রহ্মাণ্ডের ওপর দিনের আলোর অসৎ আবরণীর দিকে সোজা সাদা চোখে তাকিয়ে রইল জুলেখা।

'খেলে না সিগারেট?'

'না।'

'আমি বসে আছি–তাই?'

'না, এমনিই ইচ্ছে করছে না।'

'মনসা আর চাঁদের কথা বলছিলাম–একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, সনকার কথা পেড়ে আমিই ছেড়েছিলাম। কিন্তু, জিনিসটা ও-রকম ঠিক নয়। কী রকম–তুমি বুঝবে জুলেখা। শেষ পর্যন্ত তোমাকেই সব কথা বলি–আর কাউকে নয়।'

'অর্চনার কথাটা বল নি?'

'কাকে? সুলেখাকে?' বাইরে তালপাতার ব্যজনের শব্দ হচ্ছিল, আকাশ-বাতাস তালবৃন্তের দিকে হারীতে চোখ চালিয়ে নিয়ে বললে, 'না।'

'অর্চনাকে বলেছ সুলেখার কথা?'

'ভাবে-প্রকারে বুঝে নিয়েছে কিছু হয় তো, আমি খুলে বলি নি।'

নীল তালপাতাগুলোর দিকে জুলেখা তাকিয়েছিল, শুনছিল কেমন বাতাসে নড়ে-চড়ে পাতাগুলো দিকবিদিকের কথা বলে, দৃষ্টি ঘরের ভেতর ফিরিয়ে এনে, আবার বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বললে, 'কী চায় তোমার কাছে অর্চনা?'

'সে আমাকে এখানে থাকতে বলে।'

'বেশ ভাল কথাই তো। আমরাও তো সবাইকে থাকতে বলছি। কিন্তু অর্চনা শুধু তোমার ব্যবাকে থাকতে বলেছিল, তিনি চলে গেলে তোমাকে শুধু থাকতে বলছে। আমাদের মিটিং-ফিটিঙে আসে না তো অর্চনা। ইউনিয়নে যেও না, পাকিস্তানে থাকো, পাকিস্তানে কাজ করো, ঠিক এটাই যে তার লক্ষ্য আমার তা মনে হয় না।'

'মৃত্যু পর্যন্ত সে এখানেই থাকবে ঠিক করেছে। আমাকেও থাকতে বলছে; আর সঙ্গে-সঙ্গে থেকে কাজ করতে বলছে।'

'মৃত্যু পর্যন্ত?' জুলেখা ভুরু তুলে হেসে বললে, 'এ বড় দূর পাল্লা দাবি, যাই বল হারীত। কে কবে মরবে–পাঁচশ-ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে'–বলতে-বলতে গম্ভীর হয়ে হারীতের দিকে তাকিয়ে জুলেখা বললে, 'ঠিক বলেছে অর্চনা। যেন দেখেছি আমি সব মনে হয়, তোমাদের মৃত্যু হল, তার পর আমাদের মৃত্যু হল এই জলপাইহাটিতেই।'

শুনে কেমন যেন লাগল হারীতের, বললে, 'জিনিসটাকে তুমি বড় বাড়ের ভেতর নিয়ে চলেছ।'

'অর্চনার খেইটা তো বড় হারীত। তার চেয়ে বড় ভাবছি তাকে?'

'না, ওরটা বড় নয়, যে-রকম হাত ছড়িয়ে তুমি মেঘনার এ পার ও-পার ধরছ-সে রকম নয়, অন্য রকম। তোমারটা বড়।'

জুলেখা একটু হেসে বললে, 'আমারটা বড়? কে–কে আর আমার বড় চৌহদ্দির ভেতর? অর্চনার একেবারে ছোট, তারই-ব্যা কে আছে?'

সাঁই-সাঁই সোঁ-সোঁ শব্দ হতেই হারীত আর জুলেখা আকাশের দিতে তাকিয়ে দেখল, অনেক ওপরে মেঘেরও ওপরে, যেন কী রকম বিদ্যুতের গতিতে অসংখ্য পাখি। হয় তো হরিয়াল, বুনো হাঁস, নানাশির মরালী, ছুটে চলেছে।

পাখিগুলো শূন্যে মিলিয়ে গেলে জুলেখা বললে, 'আমার মনে হয় অর্চনা তোমার বন্ধুর মত নয় হারীত।'

'কী করে বলছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি টের পাচ্ছি।'

'পাখিদের মত বুঝি?'

'কুবাতাস দেখতে পায় তারা দূর থেকে বুঝি?'

'হ্যাঁ, সে আকাশ ছেড়ে দিয়ে চলে যায় তারা।'

'তুমিও ছেড়ে দিয়ে চলে যাও হারীত।'

হারীত দুটো বোলতার আপ্রাণ ওড়াউড়ি ছোটাছুটির দিকে তাকিয়েছিল। এক বার ঘুরে ঢুকে বাতাসে উৎক্ষিপ্ত হয়ে হয় তো, এমনিই, বিদ্যুতের গতিতে সমস্ত ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা যে-পথ দিয়ে ছুটছে-ঘুরছে সে সব স্থান নির্দেশ করে যদি আলোর রেখা টেনে দেয়া যেত, তা হলে আশ্চর্য বিদ্যুতের আঁকি-ঝুঁকিতে সমস্ত ঘরটা কী রকম ঝলমল করে উঠত। বাইরে ছুটে যাচ্ছিল বোলতাগুলো, সরবতি লেবুর ঝাড়ের ভেতর ঢুকে সাঁ করে করমচা বনের দিকে–তেপান্তরের পানে।

'মেয়ে মানুষের কর্তৃত্বপ্রীতি নিয়ে সে তোমাকে আশ্বস্ত করেছে হারীত। যে-সব ছেলেরা দূর বিদেশ থেকে অবসন্ন হয়ে ফিরে আসে তারা মাকেই আগে ভালবাসে, বন্ধুকে পরে। সুমনা মাসি বিশেষ কেউ নয় নিশীথবাবুর কিংবা তোমার জীবনে। অর্চনা অনেকটা দ্রৌপদীর মত হতে চাচ্ছিল নিশীথবাবুর, হতে পারে নি; অনেকটা মায়ের মত সে তোমার, তবুও মুনির বৌটি অনেকটা অহল্যার মত, হারীত।'

বোলতাগুলো তেপান্তর থেকে, করমচা বন থেকে, সরবতি লেবুর ঝাড়জঙ্গলের ভেরত থেকে, জুলেখা অনিবার্চনীয় হলুদ জিনিসের মত ঝট করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে আবার; কিন্তু বোশেখের পড়ন্ত বিকেলের শেষ আলো-বাতাসের ভেতর বসে থেকে প্রকৃতি সে সব ছোট্ট শ্রীমতীদের দিকে ফিরে তাকাতে গেল না এবারে আর হারীত; যে-মেয়েটি তার ঘরের ভেতরে এসে বসেছে সে সব সময়ই এখানে বসে থাকবে, সব সময়ই তাকে কাছে পাওয়া যাবে, মনে ভেবে হারীত নিজের চিন্তার ও প্রকৃতির আলো-নিরালোর ভেতরে চলতে-চলতে জুলেখার থেকে অনেকখানি দূরে যেন সরে গিয়েছিল; তাড়াতাড়ি ফিরে এসে জুলেখার কথা শেষ না হতে–তার ঠোঁট-মুখ-চোখের ইঙ্গিত, জিহ্বা ও দাঁতের পরিষ্কার নির্ঝরের মত উচ্চারণের দিকে, শরীরের দিকে মেয়েটির, বিমুগ্ধ হয়ে ঝুঁকে রইল যেন খানিক-তার মনের ভেতরে প্রবেশ করতে-করতে।

জুলেখা তাড়াহুড়ো করে কথা বলবার দরকার অনুভব করে নি, যদিও কাজের মানুষ সে। এখন, কাজের মানুষ ও অবসরের মানুষ একই সঙ্গে, একটি মধ্য-রাত্রির নক্ষত্রের মত, অকৃত্রিমভাবে।

কথা শেষ করে থেমে থেকে জুলেখা হারীতের দিকে তাকাল; বিকেল শেষ হয়ে আসছে, এ যুগের জীবনও বিকেলের বড় ছায়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

'অর্চনা আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়, তুমি আমার চেয়ে ঠিক যেটুকু দরকার ততটুকু ছোট। আমাদের দেশে পুরুষের সঙ্গে মেয়েমানুষের সম্পর্কের দিক দিয়ে অর্চনার চেয়ে তুমি ভাল জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাল কথা বলছ। তোমার কথা ভাল লাগছে আমার।'

যে-বোলতাগুলো প্রকৃতির ভেতর হারিয়ে গেছে তাদেরই এক-আধটা হুল যেন হারীতের কথার ভেতর জুলেখাকে বিঁধবার জন্যে, হয় তো নিজের মনের সবচেয়ে আন্তরিক কথাগুলো হুলেবিষে জড়িয়ে পড়ে হারীতের এমনিই; ভেবে দেখছিল জুলেখা।

'তোমার মা কে, চিনেছ তো তাকে তুমি?'

হারীত সচকিত হয়ে জুলেখার দিকে তাকাল। সুলেখার ঈষৎ মোলায়েম নাকের তুলনায় কী তীব্র উন্নত নাক জুলেখার, থুতনি কড়ির মত সাদা, কঠিন। কিন্তু স্নেহগুণ সব সময়ই ছিল, বাইরের বাতাস পেয়ে আস্তে-আস্তে স্নিগ্ধই হয়ে উঠছে। কেমন বিচিত্র বিতিকিচ্ছিরি কথা প্রয়োগ করবার পরও কী করম আশ্চর্য সরসতা; পৃথিবীর সব দিকেই তো রাত এখন–তবুও যেন ভোর হল এমনই আলোকপ্রসবী আলোর মতন মুখ।

'মাকে চিনেছি জুলেখা। কিন্তু চৌদ্দ-পনেরতে এই মাকে তো পাওয়া উচিত ছিল আমার। এখন বয়স আমার ত্রিশের কাছাকাছি, অর্চনারও কাছাকাছি ত্রিশের, কী করে পাব আমি অর্চনাকে?'

শুনে কোনো কথা বললে না জুলেখা। কথা বলবার কোনো আয়োজন নেই তার হৃদয়ে–কেমন একটা অস্পষ্ট ঝোঁক লেগে ছিল জুলেখার মুখে–স্বাভাবিক হয়ে গেছে চোখমুখ–বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমাকে পথ দেখিয়ে দিতে হবে,' হারীত বললে।

'আমার হাতে কোনো পথ নেই।'

'পাকিস্তানে আমার এক বছর থাকার কথা ছিল। অর্চনা বলেছিল আরো অনেক দিন থাকতে। কিন্তু ইউনিয়নে যাদের আমি জড়ো করেছিলাম তারা তো ছিটকে পড়বে চারদিকে, আমি এত দিন এখানে পড়ে থাকলে। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে। সেখানে গিয়ে–দশ-পনের বছর পরে সফল হলেও–এখন থেকে কাজকর্মের আয়োজন করতে হবে আমাকে।'

'তা হবে। কিন্তু নিশীথবাবু সরে যেতে না যেতেই যা ফেঁদেছ তোমরা দু-জন–আগে তার মীমাংসা না হলে কী করে বিপ্লব করবে তুমি।'

'আমার বিপ্লবে আসবে তুমি?'

'কোথায় ইউনিয়নে? না, আমি এখানকার মানুষ, আমি কোনো বড় রেভল্যুশনের প্রয়োজন দেখছি না এখন, কংগ্রেসও তা চাচ্ছে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি কম্যুনিস্ট নই।'

'জানি, কিন্তু আমি কংগ্রেসের। কোনো মরণান্ত রেভল্যুশনের দরকার দেখছি না আমরা।'

'কংগ্রেস তো পাকিস্তানে থাকছে না?'

'তাই বলে ইউনিয়নে গিয়ে আমি তোমার সঙ্গে বিপ্লব করব? কেন, ও-দেশে চিঁড়ে খেতে কালীঠাকুরের দল ছাড়া আর কেউ নেই?' একটু নিশ্বাস নিয়ে জুলেখা বললে, 'তুমি ইউনিয়নে গিয়ে রেভল্যুশন করছ, আর এখানে জলপাইহাটিতে এসে যা তোমার দরকার নয়, যে-জিনিস তোমার বাবা পর্যন্ত ভয় করতেন তার ভেতর জড়িয়ে পড়ছ। তোমার মাকে চিনেছ তুমি হারীত!'

'ও-রকম অধীর হয়ে তুমি কথা বলছ, একটু থেমে থাক, ভাল করে ভেবে দেখ,' আস্তে-আস্তে বললে হারীত। জুলেখার দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বুজতে গিয়ে, মেলে দিয়ে, মাথা নাড়তে গিয়ে অনড় হয়ে থেকে তবু হারীত বললে, 'মাকে চিনেছি আমি। কিন্তু চিনে ফেলে বুঝতে পেরেছি যে তার জীবনে যে-রকম বিপত্তি এসেছে আমার জীবনে তা তো আসে নি।'

'কেন, তোমার জীবনেই তো বেশি সঙ্কট।'

'কী, করে জুলেখা?' হারীত ঘরের ভেতর পায়চারি করতে-করতে বললে। তার পর ঘাড় হেঁট করে দু-চার পা এগিয়ে দূরে একটা জানালার গরাদের কাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি তো আমার সঙ্কটে তোমার অমূল্য পরামর্শ পাচ্ছি, অর্চনা কী পাচ্ছে?'

'আমার অমূল্য জিনিস নিয়ে আমি তোমাদের বাড়ি ঢোকবার আগে নিশীথবাবুকে চিঠি লিখেছে তো অর্চনা। জান না তুমি?'

'হ্যাঁ, সব চিঠিই পাশ করে দিই আমি। কিন্তু এটা ধরা পড়ে নি,' হারীত চোয়ালের থেকে হাতের মুঠো সরিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে বললে, 'কী লিখেছে?'

'লিখেছে হারীতকে নিয়ে পারছি না আর, তুমি এসে একটা ব্যবস্থা করো।'

হারীত ঘাড় হেঁট করে পায়চারি করতে-করতে এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে বাইরের উড়ন্ত পাখিদের সাদা-কাল-খয়েরি-খইরঙা ডানাগুলোর দিকে অবহিত হয়ে থেকে অনেকটা সময় কেটে গেলে ঘরের বেশি আবছায়ার ভেতর জুলেখার খাড়া নাকটাকে প্রথম দেখতে পেয়ে তার চোখের দিকে তাকাল তারপর।

'অর্চনার সঙ্গট হচ্ছে এই যে নিজের দায়ে সে তো আসে নি, তা সে আসতও না কোনোদিন, হয় তো নিশীথবাবুর দিকে তেমনি ভাবে গিয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে আমার দিকে তাড়িয়ে এনেছি, কলকাতার থেকে এসে কেমন অব্যবস্থিত হয়ে ছিল জীবন যেন। সে পরে সাড়া দিয়েছে; বেশি সাড়া দিচ্ছে এখন। কিন্তু ঠিকই বলেছ-তৃতীয় পাণ্ডবের দ্রৌপদীই সে; তাদের জন্যে তৈরি হতে-হতে অর্চনার যখন উপচে উঠবার সময় তখন তারা কেউ নেই, আমি দৈবক্রমে উপস্থিত।'

বলতে-বলতে চেয়ারে এসে হারীত দু-এক মুহূর্ত বসে রইল। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে হারীত বললে, 'কিন্তু নিজেরই পথ ধরে যা ত্রিগঙ্গা, তার ভোগবতীর জলও আমার ভাল লাগে। সে জিনিস সহজে নিজের টানে চলে আসে এ রকম কিছু-এ রকম কোনো জল'—

জুলেখা আবছায়ার ভেতর নিজের ডান হাতটা ছড়িয়ে সে দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'ভোগবতীর জলও—'

হারীত ফিরে তাকাল জুলেখার দিকে, জুলেখা চোখ ফিরিয়ে নিল, নী-কালো তালপাতাগুলোর ওপর অনেক অঝোর বাতাসের দিকে—প্রকৃতির ধ্বনি নানা রকম সব আশ্চর্য নিমিত্তের পানে।

'কোনো বিবাহিত পুরুষকে কোনো দিন তোমার নিজের দিকে টেনে নিতে চেষ্টা করেছ?'

'এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছ তুমি?'

হারীত পায়চারি করতে-করতে জানালার কাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তা থাকলে আমার ব্যাপারটা বুঝতে পারবে তুমি।'

'ঘরটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।'

'বাতি জ্বালাতে হবে।'

'ল্যাম্প কোথায় এ ঘরে?'

'মার কোঠায় আছে।'

'তা হলে দরজা খুলে ও কামরায় যেতে হবে? থাক। এখন আটকানো থাক। আমি চলে গেলে খুলে দিও।'

'অন্ধকারে থাকবে?

'আমাদের তো কোনো দলিল পড়াবার দরকার নেই।'

'আমার জীবনটাকে খুলে ধরেছি তোমার সামনে, অর্চনার কথা বলেছি তোমাকে, সুলেখাকে বলি নি, কাউকে বলি নি, সুলেখার কথা বলেছি তোমাকে, অর্চনাকে বলি নি; তোমার জীবনের পুরুষদের কথা আমাকে বললে না তো তুমি—'

'আমার জীবনে কোনো অর্চনা নেই। থাকলে কোনো জুলেখা আগাগোড়া সব নাড়ী টিপে বুঝে নিয়ে আমার জীবনে এসে পড়ত, হারীত?'

'কারো স্বামী-টামিকে ভাঙিয়ে তোমার দিকে টেনে নাও নি তুমি, তারা এমনিই তোমার দিকে গিয়েছে?'

'ওরা তো বয়সে আমার চেয়ে ছোট নয়।'

'ওরা সকলেই তোমার চেয়ে বয়সে বড় বুঝি? কিন্তু—'

'আমার চেয়ে বয়সে ছোট কোনো ভাগনে বা ভাইপো,' জুলেখা বলতে আরম্ভ করেছিল।

'বুঝেছি,' হারীত বললে, 'তাদের মাসি তুমি, যেমন অর্চনা আমার মাসি—সেই হিসেবে ভালবেসেছে। স্ত্রীলোকের মন নিয়ে ভালবাসনি সে সব পুরুষকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অর্চনার তো স্ত্রীলোকের মন তোমার সম্পর্কে?'

হারীত বললে, 'এক-এক জন স্ত্রীলোকের মনের প্রসার খুব বেশি। সেই হিসেবে। না হলে আমি কে?'

'তোমার কি পুরুষের মন জেগে উঠেছে?'

তালপাতার টড়-টড় টড়ক-টড় শব্দ হচ্ছিল আবার অফুরন্ত বাতাসের ভেতর; বড়-বড় ছড়ানো প্রাণয়ন বৃন্তগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকাল হারীত।

'তোমার পুরুষের মন? জিজ্ঞেস করল জুলেখা।

হারীত চিন্তিত মুখে কিন্তু তবু যেন খানিকটা নিস্তার বোধ করে বাইরের কীট-পতঙ্গ আকাশ-বাতাসের দিকে তাকিয়ে কোনো কিছুকেই গ্রহণ না করে জুলেখার প্রশ্নের সৎ উচ্চারণের বলয়স্পর্শে বিমুগ্ধ হয়ে চুপ করে রইল।

'কে জাগিয়েছে তোমার মন তা হলে?'

কোনো উত্তর দিল না হারীত।

চলন্ত আত্মস্থ এক মেঘের মত বেশি আলোর দিকে এগিয়ে হারীত বললে, 'সরবতি লেবুর ফুলের ভেতর কারা নিবিষ্ট হয়ে আছে সেই ভোরবেলার থেকে, দেখেছ জুলেখা?'

'ওরা তো মৌমাছিই ওগুলো মৌমাছি নয় হারীত?'

'হ্যাঁ, মৌমাছিই তো। এতদিন জলপাইহাটির কোলে মানুষ হয়ে তুমি মৌমাছি চিনছ না?'

'চিনেছি তো, বলেছিই তো মৌমাছি।'

হারীত একটু হেসে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'কতকগুলো কালো মেঘে বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, ঘরের ভেতরটা এত বেশি অন্ধকার দেখিয়াছিল, ভেবেছিলাম সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বাতি জ্বালাবার কথা বলছিলাম। মেঘগুলো সরে গেছে। বাইরে আলো কী রকম দেখেছ জুলেখা?'

'ঘরের ভেতরেও তো আলো। এ আরো নিভে যাবে শিগগিরই। বোলতাগুলো কোথায় চলে গেল।'

বোলতাগুলো কোথায় চলে গেল খুঁজছিল দু-জনে; কোথাও নেই বোলতা, বাতাস নেই; ছায়া জমেছে। এতক্ষণ আকাশ ছিল চার দিক ঘিরে। আকাশ মুছে যাচ্ছে। তারপর নেমে এসেছে আকাশ–সময়ের দেয়াল–যেন অনবরত দেয়াল ও অবাধ পরিসরের ভেতর দু-জনকে নিবিষ্ট করে রেখে।

এইবার অন্ধকার হচ্ছে। মৌমাছিরা উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু মধু নিয়ে চলে গেল, ওরাই তো মৌচাক সৃষ্টি করবে। আজকাল যে সব স্টেট গড়ছি আমরা, উড়িয়ে দিচ্ছি, তার চেয়ে বেশি স্নিগ্ধ, পরিষ্কার। বেশ প্রিয় জিনিস মানুষের জ্ঞানের চেয়ে প্রকৃতির সফলতা, সাধ বেশি উজ্জ্বল হল তো–

'কোথায় উড়ে গেছে মৌমাছিরা?'

'কালো মেঘ নেই কোথাও আর। কিন্তু তবুও অন্ধকার হয়ে আসছে।'

'এইবারে সন্ধ্যে হল। বাতি জ্বালানো হবে?'

'কোথায় হারিকেন তোমার? তোমার মার ঘরে? দরজা-খুলে নিয়ে আসি আমি হারীত।'

'থাক, খুলো না দরজা, বন্ধ থাক।'

'না, এখন আর আটকানো থাকবে না; আমি খুব একটা নিস্তার বোধ করছি। খুব ভাল লাগছে আমার।' জুলেখা বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে এল।

আমাদের পৃথিবীতে অনেক দিন আগে, অনেক সাগর ঘুরে তার পর সমুদ্র প্রবাসীদের জাহাজ অন্ধকারে ধর্মাশোকের নির্জন চক্রস্নিগ্ধ সৈকতে–ঢের দূরে প্যালেস্টাইনের পাশে স্বাতী পুনর্বসু নক্ষত্রের নিচে এসে থামত। রাতের বাতাসের ভেতর বসে থেকে তেমনি একটা আশ্চর্য শান্তি অনুভব করছিল হারীত।

কিন্তু তাই বলে হারীত অতীত পৃথিবীর মানুষ নয়–আজকের পৃথিবীর অশান্তি ও অপশান্তির চেয়ে আগেকার পৃথিবীর কোনো-কোনো সময়ে শান্তি অনেক ভাল হলেও প্রবীণোত্তর কল্যাণ ও শান্তির মর্ম পাওয়া যায় কি না, ভাবছিল সে নিজের, নিকট সাময়িক পৃথিবীর জন্যে।

'আমার খুব ভাল লাগছে; কেমন নিশব্দ হয়ে আছে মানুষের পৃথিবী এখন। মানুষ মানুষের ভাল চাচ্ছে যেন এমনই গভীর সহানুভূতি, শান্তি, এই রাত্রির বাতাসে হারীত–'

'কোনো অতীত পৃথিবীর কথা মনে পড়ছে তোমার?'

'অতীতে এ রকম শান্তি ছিল বুদ্ধদেবের সময়–আমাদের দেশের কোনো কোনো জায়গায়। তারো আগে–চীনে। জেরুজালেমে–'

'এখনকার পৃথিবীর চেয়ে সে সব দেশ বিদ্যায় পিছিয়ে থাকলেও জ্ঞানে বড় ছিল, বেশি শান্তি ছিল তাই–'

'পৃথিবী তো এখন বিদ্যায়ও পিছিয়ে পড়ছে–চালাকি বেড়ে যাচ্ছে।'

'এই রকমই কি থাকবে মনে হয় তোমার?'

'কিছুকাল থাকবে,' বাতাস ও রাত্রির অন্ধকার স্নিগ্ধতার দিকে তাকিয়ে থেকে জুলেখা বললে।

চমৎকার এই রাত্রির বাতাস। দুঃখ লোপ করা কঠিন, হয় তো অসম্ভব। কিন্তু দুঃখবাদ–হারীত অন্ধকার ও বাতাসের অক্লান্ত অমিতাভ নৈরাজ্যের দিকে তাকিয়ে রইল; অসাধ্য সাধনের যুগ পৃথিবীর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে কি না অবাক হয়ে ভাবছিল।

জুলেখা মনে-মনে ভাবছিল, কী অনির্বচনীয় এই রাত্রির বাতাস, আমি অদিতি যেন-অনেক দেবতার মা, হাতে অনেক কাজ আমার, আমার প্রেমিকের, আমার সন্তানদের আমাদের পৃথিবীর।

'পৃথিবী আমাদের চেয়ে বড়, সময় আরো বড়, তবুও আমরা আছি, চিন্তা করছি, ভাল চাচ্ছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নিগ্ধ বাতাসের ভেতর বসে থেকে নিরবচ্ছিন্ন আকাশের অনেক তারার ভেতর কাকে খুঁজছিল জুলেখা? স্বাতীর দিকে যেন তাকিয়ে আছে হারীত; অত বড় আকাশের পথে জীবনের অকিঞ্চিৎকর কণিকার মত স্বাতী তারাটাকে খুঁজে পেয়েছে হারীত?

মানব সফল হতে চাচ্ছে বলেই মানুষকে সফল করবার জন্যে আছে একটা ইচ্ছা, চেষ্টা, জুলেখা বললে, 'খুব সম্ভব হাজারে এক জন কি দু-জন হলেও এটা চাচ্ছে মানুষ, আমাদের মতন এ রকম ভয়ঙ্কর পতনের যুগেও। ওরা দু-এক জন হতে পারলে বাকি আরো অনেকে হতে পারবে হারীত?'

'অনেকে? যা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি হবে। দেরিতে হবে। সময় দেরি করিয়ে দেয় মানুষকে। কিন্তু সময় ঢের বড় হলে সুসময়ের সাধ রয়েছে মানুষের হৃদয়ে'—হারীত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তার পর বললে, 'সেটা খুব সম্ভব সময়ের চেয়ে বড়।'

বলে মনকে চোখ ঠার দিচ্ছে মনে হল হারীতের। মানুষের ভেতরের চেহারা তো আবছা, খুব সম্ভব সেখানে কোনো আলো নেই; এইই বলা উচিত ছিল, সত্য তো এই। কিন্তু আজকে এ রকম রাতে জুলেখাকে এ ধরনের কথা বলতে চাইল না হারীত।

'মানুষের ভেতরের আলো ঘিরে মাছি অনেক, হারীত। আজকাল ঢের বেশি মাছি পড়ছে—'

'মাছি?'

'হ্যাঁ?' অন্ধকার হয়ে পড়ছে আমাদের দিনকালের মানুষদের ভেতর-বার এসব—'

'ও!' বললে হারীত।

ঘোর কেটে যাবে, তবুও, জুলেখা বললে, 'মানুষদের কথা আর বলতে গেল না কেউ তার পর-রাত্রি, নক্ষত্র, বাতাসের ভেতর বসে থেকে। বাতাস আসছে,' জুলেখা বললে, 'প্রান্তরের থেকে, প্রান্তরের ওপরের এক সমুদ্রের থেকে। কেমন গভীর, গভীর।'

'বাইরে কে হোঁচট খেল অন্ধকারে, শব্দ হল না জুলেখা? কে মানুষ এই রাতে। কে?' অনেকক্ষণ পরে বললে হারীত।

'আমি নিশীথ এসেছি—ওঃ, তুমি হারীত,' ঘরের ভেতরে ঢুকে নিশীথ বললে।

'কলকাতার থেকে এলে বাবা?'

'ভানু মরে গেছে। তোমার মা কেমন আছে?'

'এইমাত্র মারা গেছেন,' অন্ধকারের ভেতর থেকে বললে অর্চনা, নিশীথের দিকে তাকিয়ে। মারা যাবার পর খবর হারীতকে দিতে এসেছিল সে, এসে দেখল নিশীথ এসেছে।

'জুলেখা তুমি এখানে:' রাস্তার দিকের দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে বললে।

'আমার খোঁজে কী করব এখানে এলে তুমি?'

'আমার সঙ্গে ওয়াজেদ আলী সাহেবও এসেছেন। আমি তাঁকে মত দিয়েছি। কথাটা তোমাকে জানাতে এসেছি আমরা।'

'আচ্ছা, বাড়ি যাও,' জুলেখা আস্তে-আস্তে বললে, 'আমি যাব না। আমার এখন এ বাড়িতে অনেক কাজ।'

'সুলেখারও এ বাড়িতে খুব কম কাজ ছিল না, কিন্তু অর্চনাকে, হারীতকে—হঠাৎ নিশীথের মতন এক জন প্রামাণিক মানুষকে, চোখের সামনে দেখতে পেয়ে হক-চকিয়ে উঠে এক কোণায় সরে দাঁড়িয়ে, তাঁর পর আস্তে-আস্তে চলে গেল সুলেখা।

'সুলেখা ওয়াজেদ আলীকে বিয়ে করছে?' নিশীথ জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'আমাকেও তো বিয়ে করতে পারত,' একটু হেসে বললে নিশীথ, 'এই তো মরে গেল আমার স্ত্রী।'

'আশ্চর্য মানুষ আপনি নিশীথবাবু'—রাতের বাতাস খুব বেশি শব্দ করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ছে শুনতে-শুনতে জুলেখা খুব নিচু গলায় বললে।

'নিশীথের কথা শুনতে পেল সুলেখা, দরজা পেরিয়ে অন্ধকারে যাব যাব কি না-যাব করছিল সে। ফিরে এল।

'ওয়াজেদ আলী সাহেবকে আর রাত করতে দিলুম না। সাহেবকে চলে যেতে বলেছি। আজকেই সৎকার হবে?' নিশীথের দিকে তাকিয়ে সুলেখা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আজ রাতেই। থাকবে তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি আলী সাহেবকে দাঁড় করিয়ে রাখলুম না আর।'

'তা হলে আমি বাড়ি যাই সুলেখা-মা একা আছেন,' জুলেখা বললে।

নিশীথের কাছে এগিয়ে গিয়ে বসল সুলেখা, জুলেখা বাড়ি গেল না। অর্চনা দাঁড়িয়ে রইল।

এ সব জিন-পরীদের ব্যাপার দেখবার জন্য ঘরানা মেয়ে সুমনা কোথাও নেই—নিশীথ নিবিষ্ট হয়ে ভাবছিল। খুবই নিবিষ্ট হয়ে ভাবছিল—তাকিয়ে দেখল ওয়াজেদ আলী সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে আছে নিশীথের; সারা রাতই হয় তো; দরকার হলে চির রাত। কে কার জন্যে থেকে যাচ্ছে সেটা বলা কঠিন, কিন্তু এরা সকলেই যেন সময়ের শেষ হিরণ্যগর্ভ রাত অব্দি রয়ে যেতে পারে এ ঘরে—জীবনের মানে নিয়ে। সুমনাও।

নিশীথ সুমনাকে দেখবার জন্যে ভেতরে ঢুকে গেল। নিশীথের সঙ্গে-সঙ্গেই সুলেখাকে ভেতরে চলে যেতে দেখে অর্চনা বাইরের ঘরেই দাঁড়িয়ে রইল। হারীত এ ঘরে—এক কিনারে; কেমন যেন লেপটে রয়েছে জুলেখা আছে বলে-টের পেয়ে সে নীরবাসীন গাছের দিকে তাকাতে গেল না আর অর্চনা। যেন চেনা সময়র মৃত্যু হচ্ছে অন্ধকার পৃথিবীতে; কিন্তু তবুও রাতের বাতাসে সারাৎসার তারার আলো উজ্জ্বল, চোখ বুঁজে মহিমান্বিত দার্শনিকের মত ওয়াজেদ আলী সাহেব দাঁড়িয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতীর্থ

এক

লেখা-টেখা সুতীর্থ অনেকদিন হয় ছেড়ে দিয়েছে। এর মানে এ নয় যে লেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের ইতিহাস নেড়ে-চেড়ে দেখলে অবিশ্যি জানা যায় যে বিখ্যাত লেখকরাও তাঁদের প্রতিভার তুষ-তাপও আজীবন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি–কয়েক বছর লিখে অনেকেই হার মেনে কলম থামিয়েছেন, কিংবা যা লিখেছেন তাকে সাহিত্যলেখা বলা চলে না। সুতীর্থ এ জিনিসটার মানে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার ধারণা সৎ লেখক অবসর খুঁজে নিয়ে নিজের ভাবে বসবার সুযোগ পেলেই (জীবনের যে কোনো অধ্যায়ে) ধীরে ধীরে বড় জাতের লেখা সৃষ্টি করতে পারে।

নিজে অনেক দিন থেকে কিছু লিখছে না বটে কিন্তু সেটা অক্ষমতার জন্যে নয়, অবসরের অভাবে। অর্থের সচ্ছলতা নেই। এই নিরেট পৃথিবীতে টাকা রোজগার করতে গিয়ে মূর্খ ও বেকুবদের সঙ্গে দিন-রাত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মনের শান্তিসমতা যায় নষ্ট হয়ে; চাকরির থেকে ফিরে এসে হাতে সময় যে না থাকে তা নয়, কিন্তু তখন শরীর অবসন্ন, মন ধাতে নেই। সে মনকে আস্তে আস্তে জাগিয়ে তোলা অসম্ভব নয়, কিন্তু সময় লাগে, সহিষ্ণুতা চাই, সুযোগেরও প্রয়োজন; পিতৃপুরুষ কোনো দিক দিয়েই এমন কোনো সংস্থান করে যাননি সুতীর্থের জন্যে যে অফিস থেকে সন্ধ্যায় ভাড়াটে ফ্ল্যাটে ফিরে মন তার সমস্ত দিনের অপব্যবহার ও সমস্ত রাতের দুশ্চিন্তার সংযোগলোকে দু-চার মুহূর্তের জন্যে এমন একটা সহজ স্বাভাবিক আশ্রয় খুঁজে পাবে যেখানে শিল্প-সাহিত্যের আলো আসে মনে, লিখলেও তা হয়ে দাঁড়ায় যা চাওয়া যায় মোটামুটি তাই। এ কি সম্ভব কখনও? এক-আধবার অবশ্য চেষ্টা করে দেখেছে সে, টের পেয়েছে ক্ষমতা আছে কিন্তু অনেক সহিষ্ণুতার সুযোগ তৈরি করে নিয়ে দু-চার লাইন লিখবার পরেই তাকে অনুভব করতে হয়েছে যে সে একা মানুষ নয় আজ আর, যা লিখেছে সে তা আত্মরতি, কুঁড়ে গোরুর গল্প, এতে চলবে না, এরকম অপবাদ শুনতে হবে তাকে সাহিত্যের নানারকম অপ্রাসঙ্গিক দ্বারপালদের কাছ থেকে; ওসব অবিশ্যি গ্রাহ্য করে না সে, কিন্তু তার নিজের মনও গ্রাহ্য করছে না যেন আজকাল তার নিজের লেখাকে। তার নিবিদ মন কি বলছে? বুঝতে পারছে না সে। কোনো জিনিস রয়েছে সারাৎসার মন বলে?

'কি হয়েছে, সুতীর্থ?'

'এই যে চা খাচ্ছি।'

'চা তো ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে রয়েছে। গালে হাত দিয়ে বসে আছ যে–'

চায়ে এক চুমুক দিয়ে সুতীর্থ বললে, 'একটু গরম চা পেলেই ভাল হত মণিকা দেবী, গলায় একটু ব্যথা মনে হচ্ছে–'

'ঠাণ্ডা লেগেছে বুঝি। আচ্ছা, আমি চা গরম করে দিতে বলছি। তুমি এই চা-টাই খাবে তো।'

এক আধ মুহূর্ত ইতস্তত করে সুতীর্থ বললে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খাব। কাপসুদ্ধ চা ফেলে দিয়ে আমাকে নতুন চা তৈরি করে দেবে রামচরণ; আজকাল এক পেয়ালা চায়ের দাম তো–'

'আচ্ছা, আমিই উঠি, নিয়ে আসি ঠিক ক'রে। উনুনে কিছু চড়েছে নিশ্চয়, সেই তো মুশকিল; তুমি বড় দেরি করে ফেল ঘুম থেকে জেগে উঠতে–' বলে মণিকা দেবী বসেই রইলেন তবু।

বললেন, 'আমার বাড়ির ভাড়াটা, সুতীর্থ–'

'দিচ্ছি। আমারই দোষ হয়েছে। ও মাসেরটা দেয়া হয়নি বুঝি। এ মাসও তো ফুরিয়ে এল প্রায়। তা ছাড়া আগের আট দশ মাসেরও বাকি আছে, সেগুলো পরে দেব। টাকা যে নেই তা নয়, কিন্তু–'

চায়ের কাপটা ছিল পুরোনো একটা খুব সম্ভব টিক কাঠের চেয়ারে; কাপটাকে মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে মণিকা বললেন, 'এইখানেই বসি। গিঁট ধ'রে গেছে রে বাবা, কতক্ষণ দাঁড়িবে থাকব। বড্ড শীত পড়েছে আজ–'

বসে পড়তে পড়তে কিছুটা সময় লাগল দোহারা বিলাসী শরীরের মানুষটির। চেয়ার উল্টে পড়েছিল প্রায়, সামলে নিতে গিয়ে চায়ের কাপট হঠাৎ মণিকা মজুমদারের পায়ের ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে গড়াতে লাগল।

'ও কিছু না, হকচকিয়ে যেও না তুমি। ঠিক করছি–আমি ঠিক করছি সব–' বলে সুতীর্থ পা বাড়িয়ে পেয়ালাটাকে একটু দূরে ঠেলে সরিয়ে দিল মাত্র। কাপটা আগে ভাঙে নি, এবারেও ভাঙল না, ভাঙলেও কারুর কিছু এসে যেত না ঃ এমনই চা চায়ের কাপ চায়ের নেশার শীতের সকাল সুতীর্থ গুপ্তের ভাড়াটে ঘরে।

'তোমার কপালে চা নেই, সুতীর্থ–'

মণিকা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন-সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চুপ হয়ে গেলেন। বয়স তাঁর চল্লিশ হয়েছে; চেহারা অনির্বচনীয় তবু, যেন চল্লিশ ফিরে যাচ্ছে ত্রিশে, ত্রিশ ঠেকছে গিয়ে কুড়ি-পঁচিশে। অথচ সত্যিই বয়স হয়েছে ঃ তেমনি মর্যাদা; চল্লিশটাই ঠিক, কুড়ি-পঁচিশের ইচ্ছাস্বর্গ যেন ঘিরে রয়েছে তাঁকে–খুশিমতন ঢুকে পড়লেই হয়।

'আগের দশ মাসের হিসেব পরে হবে, তা ছাড়া তোমার তিন মাসের ভাড়া বাকি।'

সুতীর্থ মেঝের ওপর চায়ের ছড়াছড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে বললে, 'তা বুঝি। তা হবে। হিসেব তোমারই ঠিক তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন, তোমার খেয়াল নেই? কাকে কি দিতে হবে সেটা ভুলে গেলে মন অবিশ্যি বেশ ঝাড়াঝাপ্টা থাকে। কেউ কেউ স্বভাবতই ভুলে যায়–তারাই জ্ঞানী কবি। অন্যদের টনটনে বুদ্ধি আছে বলেই তারা ভোলে। সুতীর্থ, তুমি যে তিন মাসের ভাড়া দাও নি সেটা যে লুকোচুরি করে দাওনি তা' আমি বলতে চাই না। সত্যিই তোমার খেয়ালই নেই হয়তো। কিন্তু–'

'মণিকা সুতীর্থের শার্টের বোতামের দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন; বোতামের ওপরের মানুষটির মুখের দিকে সহসা তাকাতে গেলেন না আর।

'কবি, জ্ঞানীর জাত আলাদা, তোমার মতন নয়।'

'কি রকম?'

'সে আরেক দিন বুঝিয়ে দেব।'

তোমার মুখে শুনে ভালো লাগবে, জ্ঞান বাড়বে; বোলো একদিন; এখন এই হিসেবটা বুঝে নাও।' বলতে বলতে সুতীর্থ ক্যাশ বাক্স খুলে যে টাকাটা মণিকার হাতে দিল, তাতে পুরো দু'মাসের ভাড়াও দেয়া হয় না।

'এখুনি রসিদ দিতে হবে?'

'দিয়ে দেবে যখন সুবিধে হবে, এখুনি কি দকার।'

'দু'মাসের ভাড়ার রসিদ দেব? পনেরো টাকা বাকি রইল যে।'

'দিয়ে দেব টাকাটা–আজ কালই–'

'উঠি সুতীর্থ।'

'আচ্ছা, এসো।'

দু'পা এগিয়ে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে সুতীর্থের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মণিকা বললেন, 'সুতীর্থ, আজকাল লিখছ-টিকছ না?'

'না তো।'

'কেন?'

'যখন আবার লিখব–তখন বলব তোমাকে।'

'কবে লিখবে আর?'

'এই পালাটা শেষ হলে।'

'হেঁয়ালির মত কথা বলছ। পালা? কিসের পালা?'

'আছে একটা,' সুতীর্থ বললে, 'সেও পরে বলব তোমাকে মণিকা-দি।'

'আমি দিদি হলাম কি হিসেবে–আমি তো তোমার চেয়ে ছোট।'

'বয়সের উনিশ-বিশ আছে আমাদের। কিন্তু বয়সটা তো খুব সামান্য জিনিস। অন্য সব দিক রয়েছে।'

মণিকা সোজা সুতীর্থের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। তুমি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছ যে তুমি আইবুড়ো, তোমার বয়স পঁচিশ, অফিসের মাইনে পাঁচশো টাকা। কিন্তু মিছে কথা তো সব সুতীর্থ। তোমার শ্বশুরবাড়ি তো পাশগাঁয়ে।'

সুতীর্থ ছেঁড়া সোফাটার এক কিনারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'পাশগাঁ আমাকে টানে না তা তো তোমাকে বলেছি।'

'টানে না, ফি মাসে অফিসের মাইনেটা সেখানে যাচ্ছে তো।'

'টাকা না পাঠালে কি খাবে তারা?'

'তারা ক'জন?'

'আমার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে দুটি–'

মণিকা কোনো কথা বললেন না কিছুক্ষণ, দেয়ালে হাত লাগিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, 'কোথায় চলেছি? বড় অন্ধকার তোমার ঘরটা–'

'জানালা খুলে দিচ্ছি; বসো, মণিকা দি।'

'না, থাক।'

'কাল সারারাত হাঁপানির বাড়াবাড়ি হয়েছিল বুঝি অংশুবাবুর?

'না, কেন।'

'ভাবছিলুম রুগীর শিয়রে বসে বসে শরীর এলিয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন কাহিল দেখাচ্ছে–'

'ভাল আছেন। এমনিই ঘুম হয়নি আমার।'

'ঘুমের ওষুধ আছে তোমার কাছে।'

'দেখি আরো দু-এক দিন; না হলে ওষুধ খাব। কি ওষুধ আছে তোমার কাছে ঃ খুব কড়া? বিলিতী?'

মণিকা ওপরে চলে যাবেন, না কিছুক্ষণ বসে কাটাবেন ভেবে দেখছিলেন।

'রসিদ পাঠিয়ে দেব, কিন্তু পুরো দু'মাসের হিসাব দিতে পারব না।'

'পনেরো টাকা বাকি; আচ্ছা, এক মাসের রসিদ দিলেই হবে।'

চলতে চলতে মণিকা বললেন, 'একটা কথা আমি ভাবছি। পঁয়তাল্লিশ টাকায় চারখানা ঘর তোমাকে আমি দিয়েছি। তিন বছর তুমি আছ। এ চারখানা ঘরের জন্যে দুশো আড়াই শো টাকা পেতে পারি আমি আজ; তা ছাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার চারেক টাকা সেলামী তো দেবেই।' মণিকা কথা বলতে বলতে থেমে দাঁড়ালেন। 'বুঝলে, সুতীর্থ? এত কমে তোমায় আমি কেন দেব? চার চারটে ঘর তুমি আমার আটকে রেখেছ। অন্য কোথাও দেখ তুমি এখন। আমার কি টাকার দরকার নেই?'

'বাড়ি পাচ্ছি না তো কোথাও।'

'খুঁজে দেখেছ?'

'আমার নিজের বড় দুধের গাইটা হারিয়ে গেছে আমি খুঁজব না? দিন রাত তো এই নিয়েই আছি।'

'ভাড়ার টাকা ছাড়া আমাদের তো আর কোনো আয় নেই। লেনদেনের কারবার নেই। বাজার খরচ চলছে না। বাড়ির অভাবে মানুষ কলকাতার ফুটপাতে নাকে খৎ দিচ্ছে আজ। ডাশা ভেঙে যাচ্ছে নাকের। হাঘরে কুষ্ঠে খসে পড়ছে।'

বলতে বলতে মণিকা ওপরে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে বাড়ি ভাড়ার রসিদ এল—পুরো দু'মাসেরই রসিদ কেটেছেন পনেরো টাকা বকেয়া নেই। রসিদটা হাতে নিয়ে সুতীর্থ পা দুটো টেবিলের ওপর চড়িয়ে দিয়ে দূরে একটা তেতলা বাড়ির ছাদে লাল ট্যাঙ্কের ওপর এক ঝাঁক কাকের ওড়াউড়ির দিকে তাকিয়ে বসে রইল। মণিকা দেবীর চাকর রসিদগুলো পৌঁছে দিয়ে গেছে, আগের মত, অমলাকে পাঠায় নি সে।

দুই

বিকেলটা কাটছিল বিরূপাক্ষদের আড্ডায়। বিরূপাক্ষ লোহালক্কড় কাপড় চাল কাগজ ঘড়ি পেন থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপনের লেখা সম্পাদকীয় লেখা—সব জিনিসই সরবরাহ করে (যে চায় তাকেই) তবে তার দরদাম ঠিক করা আছে; কালো বাজারের চেয়ে কম রেটে ব্যবসা চালাতে জানে সে; কাজেই তার ব্যবসা চলছে মন্দ না।

'বিরূপাক্ষ, কি ক'রে হাতিকে হাঁটিয়ে নেয়া যায়?' সুতীর্থ বললেন।

'সর্দার হাতি? কোথায়? করাতীদের কাঠ মাথায় চাপিয়ে নদীর দিকে?' বিরূপাক্ষ সিগারেটের শেষ টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশট্রের ভেতর রেখে দিতে দিতে বললে।

'হ্যাঁ, নদীর দিকে, উজানে ভাসিয়ে দেবে।'

'তোমার দুয়োরে গিয়ে ঠেকবে, আর তুমি কাঠের সওদা ক'রে লাল হয়ে যাবে, সে কি আর রাতারাতি হয় দাদা।'

'তোমার পাঞ্জার ছাপ পড়লে রাতারাতি হয় বৈকি', সুতীর্থ বললে, 'একটা বাড়ি চাই আমার—নিজের; তিন কাঠা জমির ওপর হলেই চলে-পাঁচ সাত কাঠা হলে ভাল হয়, বালিগঞ্জে টালিগঞ্জে বেহালা চেতলা যাদবপুর সোনারপুরে—'

বিরূপাক্ষ আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'কোথায় পাবে তুমি অত টাকা?'

'কত টাকা?'

'তা চাই কিছু; বেশ ধবধবে ভাগলপুরী চাই—একবার বিইয়েছে।' বিরূপাক্ষ বললে। সুতীর্থ এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে বললেন, 'তা হোক, লাখ খানেক লাখ দেড়েকই হোক না হয়। কি ক'রে টাকা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা তুমি ক'রে দাও, বাড়ির ব্যবস্থা কর।'

বিরূপাক্ষ চার জনের জন্যে কফি তৈরি করছিল। ডিশ ভরতি মাখন রয়েছে। আর তিন চারটে ডিশে প্যাস্ট্রি। পাউরুটি স্লাইস ক'রে কাটতে কাটতে বিরূপাক্ষ বললে, 'তুই এত সব চাচ্ছিস তো সুতীর্থ, কিন্তু কোন বাজারেই তো তোর নাম নেই রে—'

অসিত একটা বিড়ি জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'একটা বদনাম থাকলেও হত সুতীর্থবাবু। লোকে এক ভাবে মানুষটাকে চিনে ফেলত।'

বিজন একটু মাচার কুমড়োর মত বিকেলের রোদে গা এলিয়ে বসেছিল। চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে কিছু বললে না সে।

'আমাকে তুমি বাজারে নামতে বল বিরূপাক্ষ?'

'হ্যাঁ, টাকা পেতে হ'লে।'

'কিসের বাজারে?'

'তিলের ভিসির, তামাকের টিকের। তোতাপুরী আম চেন? তোতাপুরী আমের।'

'মাটির ভাঁড়ের, টিনের, ক্যানেস্তারার' অসিত বললে 'পুরোনো কোম্পানির কাগজের-সের দরে—'

'কিম্বা রতি হিসেবে বেনামী খবরের,' বিজন তার চুরুটটাকে একটু জিরোতে দিয়ে বললে, 'না হয় ভরি হিসেবে ছাড়বেন, সুতীর্থবাবু, সোনার চেয়ে ঢের বেশি পড়তা।'

'সরকারের পেটের খবর ফাঁসিয়ে দেবার ব্যবসাটাই সবচেয়ে ভাল,' বিরূপাক্ষ বললে, 'আর লাইমজুস, মৌসম্বির রস আর জিন-ড্রাই জিনের—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতীর্থ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'ব্যবসার ঘাঁৎঘোঁৎ এমন জলের মত সোজা করে বুঝিয়ে দিলে তোমরা—আমার আর তর সইছে না, তা' একটু রয়ে সয়ে চলতে হবে তবুও—সম্প্রতি আমাকে কিছু জমি কিনে দাও বিরূপাক্ষ, বালিগঞ্জে না হোক ঢাকুরিয়া, বিতান্ত না পাওয়া গেলে বেহালা যাদবপুর হলেও চলবে। টাকা আমি কিস্তি হিসেবে দেব।'

বিরূপাক্ষ চার পেয়ালা কফি প্যাস্ট্রি মুচমুচে টোস্ট সবাইকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিস্তি-বন্দিতে টাকা নিতে আমি অবিশ্যি রাজি আছি। আর কেউ ও সব কথায় কানও দিতে যাবে না। এই হাঙ্গামাটার পর থেকে কলকাতার এ সব জায়গা জমির ওপর সোনার মাকড়ি কানে এঁটে দিনরাত গিন্নীশকুন লাফাচ্ছে।'

'কয় কিস্তিতে টাকাটা দিয়ে দেবে, সুতীর্থ?' বিরূপাক্ষ বললে, 'কলকাতার থেকে দশ-পনেরো মাইল দূরে জায়গার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি সুবিধে দরে।'

'তা হয় না বিরূপাক্ষ, ট্রাম বাসের শেষ ডিপো পেরিয়ে এক মাইল দু'মাইলের বেশি যেতে পারব না।'

'বিজনের নিভু নিভু চুরুটটা নিভে যাচ্ছিল, এক টান দিয়ে বললে, 'জমি কিনবার, বাড়ি তৈরি করবার এত শখ কেন আপনার, সুতীর্থবাবু?'

'আমি ভাড়াটে হয়ে আর লেপটে থাকতে চাই না,—বড্ড দেমাক আমার বাড়িউলির।'

'তা দেমাক থাকবেই তো। কলকাতার দক্ষিণ পাড়ায় বাড়ি, অথচ বন্ধকী নয়—' বিজন বললে, 'আমাদের বাড়ি আছে বটে, কিন্তু এমন কিছু ভাল বাড়ি তো নয়। করতে চেয়েছিলুম বালিগঞ্জে, কিন্তু স'রে যেতে হ'ল ঢাকুরিয়ায়। অসিতের বাড়ি অবিশ্যি টালিগঞ্জে, ভালো জায়গায়। বিরূপাক্ষের তিনখানা বাড়ি, দুখানা গাড়ি ঃ একখানা কি জীপ না কি তোমার, বিরূপাক্ষ?'

বিজন নেভা চুরুটে টান দিচ্ছিল; চুরুটটা ভাল করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললেন, 'এ সবের ভেতর এখন আর তুমি নাক ডোবাতে পারবে না, সুতীর্থ। সে সুযোগও নেই আজ আর, সে শক্তিও তোমার নেই। তুমি তো ছড়া লিখেছ এক সময়। হ্যাঁ, বিরূপাক্ষ, সুতীর্থ যখন ছড়া লিখত, তখন আমরা কলেজে পড়তুম না? সুতীর্থের ছড়া পড়েছ তো?'

'পড়েছি,' বিরূপাক্ষ বললে, 'ছড়া নয় ও কবিতা লিখত। লিখে-টিখে ও সুবিধে করতে পারেনি। কে পড়ে ওর পদ্য আজ? ও সব কবিতার লেখক হিসেবে কে চেনে ওকে?'

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'আমার নিজের অবিশ্যি ভাল লেগেছিল ওর কয়েকটা কবিতা।'

'আমারও ভালো লেগেছিল,' বিজন বললে, 'লেখার চর্চাটা রাখলে পারতে তুমি সুতীর্থ; কবিতা নয়, গল্প লিখলে মন্দ হত না। ব্যবসাবিলির ফাঁকে ফাঁকে আমি মাঝে মাঝে গল্প পড়ি। হ্যাঁ হে বিরূপাক্ষ, তুমি পড় না?'

'আমি পড়ি,' বললে বিরূপাক্ষ।

'আমিও পড়ি।' কফির শূন্য পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে অসিত বললে।

'সুতীর্থ, তোমার শ্বশুরবাড়ির খবর কি? শুনেছিলাম তোমার স্ত্রীর খুব কঠিন অসুখ, কি হয়েছিল?'

'কিছুই হয়নি, বেশ ভালোই আছেন।'

'ছেলেপুলে সেই দুটিই তো, না আরও হয়েছে?'

'ওরা তো বলে আর হয়নি।' সুতীর্থ কফি টোস্ট প্যাস্টি বেশ নিজের হাতে ছেনে ছিঁড়ে ঢেলে চিবিয়ে খেতে খেতে বললে।

শুনে বিজন বিরূপাক্ষ অসিত চোখ টেনে একবার তাকিয়ে দেখে নিল সুতীর্থকে। মুখে কেউ কিছু বললে না, কফি খাচ্ছিল, বারবার তৈরি করছিল, ঢালছিল, খাচ্ছিল।

'কফি আরো খাবে অসিত? ঠাণ্ডার দিনে লাগে বেশ। অভয় এলে আরো রসিয়ে ঝালিয়ে ক'রে দিত। সিনেমায় গেছে 'রোটি' দেখতে। আজকাল ঠাকুরচাকরের গোলাম আমরা বিজন, ওরা আমাদের মুনিব। তিন বছর ধ'রে তুমি কলকাতায় আছ সুতীর্থ; পরিবার আনছ না কেন?'

'আমার পরিবারকে দেখেছ, বিরূপাক্ষ?'

'না, কেমন দেখতে?'

'তুমি দেখেছ, অসিত?'

'না, কি রকম দেখতে তোমার স্ত্রী? সুন্দর? দেখাও আমাদের।'

'তুমি দেখেছ, বিজন?'

'তোমার স্ত্রীকে দেখিনি আমি, কবে বিয়ে করেছ?'

'আমার স্ত্রী ঠিক বলতে পারবে।'

'কাকে বিয়ে করেছে, তাও বলতে পারবে বটে।' বিরূপাক্ষ পটের থেকে কফি ঢালতে ঢালতে বললে।

কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে অসিত বললে, 'তবুও আমরা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে থাকি—কিন্তু সুতীর্থবাবু শুধু তাঁর পুরুষার্থক কেবল টেনে বেশ ফুঁকে দিলেন দশটা বছর।'

'কোথায় আছে সুতীর্থ?' বিজন জিজ্ঞেস করল বিরূপাক্ষকে।

'কাছেই লেক রোডে না কি লেক ভিউ রোডে—কোথায় সুতীর্থ?'

'গুলজারটা বাঁচিয়েছিলুম তো মন্দ না, কিন্তু এখন তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে।'

'তা তো দেবেই, আজকাল সেলামীর বাজার। দুশো তিনশো টাকায় এদিককার এক একটা ফ্ল্যাট। তুমি কত দিচ্ছ? দু'কুড়ি টাকা। তুমি এক কাজ কর সুতীর্থ'—বলতে বলতে থেমে গেল বিরূপাক্ষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'কোথায় আছে পরিবার?'

'পাশগাঁয়ে।'

'কেন আনো নি কলকাতায়? শ্বশুর বড়লোক?'

'এক সময় তালুকদার ছিল বটে, এখন প'ড়ে গেছে–'

'শ্বশুরবাড়ি যাও না, বউকে কলকাতায় আনো না, মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছ কেন মিছেমিছি আর? তোমার টাক তারা পৌচে? মন কষাকষির টাকা তো।' বিরূপাক্ষ সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে।

বিজন হেসে বললে, 'আমি এক বাটিতে চিনি আর এক বাটিতে টাকা রেখে দেখেছি পিঁপড়েগুলো চিনি ফেলে টাকা খাচ্ছে। সুতীর্থের টাকা তার স্ত্রী খাবে না? কি বল তুমি বিরূপাক্ষ? কি হ'ল তোমার মাথা ভালো বাজার চোলাই ধোলাই করে? ধুন্দুলের বিচির মত হড় হড় করছে বুঝি মাথার ভেতর, হড় হড় করছে?'

'পৌচে তোমার টাকা তোমার স্ত্রী?' বিরূপাক্ষ চুরুটের ছাইয়ে টোকা মেরে বললে। খানিকটা ছাই উড়ে বিজনের চোখে গিয়ে পড়ল। ঘুষি জমিয়ে দেবে বিরূপাক্ষের চোয়ালে কপালে বিজন? জমিয়ে দেবে? সাত পাঁচ ভেবে চুপ করে রইল সে। রুমাল বার করে চোখে ভাপ দিতে লাগল।

'পৌচে।-রসিদ তো পাওয়া যাচ্ছে ঠিক মতনই। আমার স্ত্রীর সই। স্ত্রীকে কলকাতায় আনা সম্ভব হবে না। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসব এক সময়। জান বিরূপাক্ষ আমার স্ত্রী আমাকে কী যে ভালবাসে–' বলে বিরূপাক্ষকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সুতীর্থ।

'লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে–'

'সুতীর্থের সমস্ত উত্তাল উল্লোল শরীরের কঠিন বাঁধন থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে খুলে নিতে গিয়ে আরো বেশি লটকে প'ড়ে বিরূপাক্ষ, বার বার বলতে লাগল, 'কী আশ্চর্য, তোমার স্ত্রী তো তোমাকে ভালবাসবেই। এর ভেতর মজার কি আছে বলো তো দেখি। তোমার স্ত্রী-অন্য কারুর তো নয়। কী মুশকিল ও রকম আছড়ে পিছড়ে গোঁত্তা মারছ কেন হা হা ষাঁটের বাছুরের মত হাসছে না কাঁদছে, শোন বলি–দেখ না বিজন অসিত–ছাড়বে না তুমি আমায়, ছাড়বে না, সুতীর্থ! তু-মি-আ-মা-য়-ছা-ড়-ড়-ড়-ছা-ড়-যে-না-আ-আ-আ-খুব একটা প্রবল ঝটকায় বিরূপাক্ষ ছিটকে পড়ল সমস্ত তেপয় ও কফির পেয়ালা পিরিচ নিয়ে আলমারিটার ওপর;-সুতীর্থ তার মস্ত বড় লম্বা শরীর ও এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলের ফিঙের ঠ্যাং ডানার ঝটপটানি নিয়ে টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু-এক মুহূর্ত। ওদের তিন জনের দিকে তাকিয়ে বিষম শীতে আক্রান্ত মানুষের মত হি হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

তিন

দু-তিন দিন পরে সন্ধ্যের সময় বেশ শীত পড়ছে; একটা ছেঁড়া পুরোনো ওভারকোট গায়ে দিয়ে সুতীর্থ ব্যাগ হাতে করে চলছিল। লোকে দেখে মনে করতে পারে খুব ব্যস্ত ডাক্তার হয়তো চলেছে জরুরি কেসে; গলায় একটা স্টেথোস্কোপ জড়িয়ে নিলেই হত। চেহারাটা ভারিক্কের চেয়েও বিষণ্ণই দেখাচ্ছিল। ওভারকোট কাঁধে ফেলে অফিস থেকে বেরিয়েছে তিনটের সময়। বিকেলেই কোট গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। সন্ধ্যে হয়ে গেল–তবুও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। কী সে চায়? ব্যাগের ভেতর কী আছে তার?

'এত ঘুরছ কেন, ট্রামে উঠে পড়ে সুতীর্থ। কে যেন ভিড়ের ভেতর থেকে বললে তাকে।

'ওঃ তুমি–ঘুরেফিরে তোমার সঙ্গেই আজ বারবার দেখা হচ্ছে কেন, ভবতোষ।'

'আমিও তোমারি মতন ঘুরছি যে–'

'এই যে বললে সিনেমায় যাচ্ছ–'

'না ভাই, যাওয়া হল না।'

'টিকিট তো কেটেছিল–'

'চলো একটা চায়ের দোকানে ঢুকি গিয়ে–'

'আমার সময় নেই, দাদা।'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'কোথাও না, এমনি ঘুরছি।'

'তবে সময়ের অভাব কি হল–'ভবতোষ সুতীর্থের ওভারকোটের কলারে টান মেরে বললে, 'চলো, শেফালীদের কাছে যাই।'

সুতীর্থ কটাক্ষে ভবতোষের দিকে তাকিয়ে সংবেদিত করে নিচ্ছিল ভবতোষকে নিজেকে সমস্ত পৃথিবীটাকেই যেনঃ কাদের কাছে নিয়ে যাবে ভবতোষ? কারা তারা? কোথায় থাকে? সে তো তাদের কথা ভাবছিল না। ইহ পৃথিবীর কারো কোনো কথা মনেই ছিল না তারঃ এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

'হল তো? এইজন্যই তো রাতবিরেতে তোমাদের ঘোরাফেরা। রাতচরা রকমারি সে একদিন ছিল, সুতীর্থ, কোথাও গেলে কি আজ আর পাওয়া যায়–নখদর্পণ ছিল আমাদের মত জলি ওল্ড ডাভাজদের–'

'জলি ওল্ড ডাভাজ?'

'আরে ডাভাজ হস্টেল–উনিশ শো ষোলো-সতেরো–ভুলে গেছ সব?'

'উনিশ শো ছেচল্লিশ তো এখন–'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা হোক, ত্রিশটা বছর কেটে গেছে বুঝি হে। কেটে যাক–কাটুক, আমার কাটেনি–আমার কাটবে না; একটা চুল পাকেনি, দাঁত নড়েনি। সময় আসছে যাচ্ছে, কিন্তু আরো একটা সময় আছে যা দাঁড়িয়ে থাকে সব সময়–যেমন তেল সিঁদুর আসছে যাচ্ছে মুখে যাচ্ছে; কিন্তু শিবলিঙ্গ–যেদিন চাও যখন চাও তখনই। চলো, ট্রামে উঠি–'

'কোথায় যাবে, ভবতোষ–'

'কফি হাউসে চলো–'

'কোনটায়?'

'বড়টায়–চৌরঙ্গী প্লেসে–'

'না, অত দূর যেতে পারব না। মাফ করতে হবে। কাছেই একটা চা-কফির দোকানে–'

'সে হয় না,–ওরা সব আসবে কফি হাউসে, আমার আর তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে সব। স্কার্ফ, শাল, কাশ্মীরী, মির্জাপুরী-সিগারেট খায় কেউ কেউ-ক্যামেল সিগারেট-আমরা গিয়ে বসলেই হল–'

সুতীর্থ তামাশা বোধ করছিল। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আচ্ছা, চলো।'

'চলো ট্রাম এসে নিক।'

'কিন্তু কফি হাউসে রাত হয়ে যাবে, ট্রামে বাসে ফেরবার উপায় থাকবে না তো। সাড়ে সাতটা আটটার সময় তো ট্রাম বন্ধ হয়ে যায়–'

'কফি হাউস থেকে ফেরবার দরকার হবে না। ওদিকে ওদেরি কারুর বাড়িতে কাটিয়ে দেব রাতটা। বেশি রাতে ট্যাক্সি...ফিটনে...করে বালিগঞ্জে ফেরবার কি দরকার। আসবে না কি ফিরে?'

ভবতোষ গলা খাঁকরে বললে, 'কই টিন বার কর।'

'সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, ভবতোষ।'

'আচ্ছা, তবে এই নাও–' বলে নিজের মুখের থেকে ব্রায়ার পাইপটা নামিয়ে সুতীর্থের হাতে গুঁজে দিতে গেল ভবতোষ। জিনিসটা প্রত্যাখ্যান করলে সেটা রাস্তায় পড়াগড়ি খেত, কাজেই পাইপটা হাতে তুলে নিল সে।

'খাও, তামাক খাও, সুতীর্থ।'

'নিভে গেছে যে।'

'জ্বালিয়ে নাও, এই যে দেশলাই–'

'এই যে ট্রাম এসে পড়েছে–'

পাখিদের ডানা গজায় যেখানে সুতীর্থদের শরীরের সেই জায়গাটা আঁকড়ে টেনে ফুটপাতে তাকে চড়িয়ে দিয়ে ভবতোষ বললে, 'নাও, পাইপটা জ্বালিয়ে নাও আগে। ঘাবড়ে যেও না–আকচার ট্রাম আসছে; পালিয়ে যাচ্ছে না। ধাঁই করে একটায় চড়ে পড়লেই হবে।'

ট্রামটা চলে গেল।

'তোমার মুখের পাইপ আমি কি করে খাই?'

'দাও তাহলে', ভবতোষ ঘনবর্ষার কুমড়ো ক্ষেতের কাঁকড়ার মত গাঢ় চোখে তাকিয়ে বললে, 'তুমি দেখবে আমার মুখের কফি তিনি কি করে খান।'

পাইপটা জ্বালিয়ে নিল সে। দ্বিতীয় ট্রামটাও চলে গেল, দু-তিনটে বাসও।

'যাবে যদি তবে চলো।'

'সবুর–' পাইপ টানতে টানতে ভবতোষ কথা বলবার সময় পাচ্ছিল না। নিজেকে চাঙ্গা করে নিচ্ছিল, কথা ভাবছিল।

'এই যে বাস–' সুতীর্থ বললে।

'ট্যাক্সিতে যাওয়া যাবে,' মুখের থেকে পাইপ নামিয়ে বললে ভবতোষ, 'বাসে-ট্রামে চড়ে কেউ কখনো দক্ষকন্যাদের সভায় যায়?'

'জলি ওল্ড ভবতোষ–'

'জলি ওল্ড সুতীর্থ, ত্রিশটা বছর কেটে গেছে, একটি মুহূর্তও কেটে যায়নি। আমরা এই ছিলাম ডাভাজ হোস্টেলে, অগিল্‌ভিতে ওয়ানে–চোখের পলক না পড়তেই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কথা বলছি রাসবিহারী এভেন্যুতে। একই তো সময়, একই প্রবাহ ঃ রয়ে গেছে, রইছে ; আমরাও আছি সমস্ত সময়ের সঙ্গে চিৎ হয়ে, কাৎ হয়ে, তেরছা কান্নিক মেরে।'

ভবতোষ পাইপটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে টানতে আরম্ভ করল।

'কবে তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল, সুতীর্থ? স্কটিশ থেকে বেরিয়ে দেখা হয়েছিল কি আর?'

'মনে পড়ে না তো।'

'আমাকে চিনলে কি করে-চেহারার কোন বিষটিষ মরেনি তো? এখনও বেশ লেজে দাঁড়ায়?'

'হ্যাঁ, পুরনো মানুষ দেখলেই চিনতে পারি। এই যে ট্যাক্সি–'

'এনতার আসবে ট্যাক্সি–' ভবতোষ সুতীর্থের আস্তিন ধরে টেনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে, 'এনতার আসবে জিপ–ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন!'

'রাত হয়ে যাচ্ছে।'

''মেয়েরা উড়ে যাবে কফি হাউস থেকে বেশি রাত হলে? এই ভয়? সুতীর্থ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি তো কাজে যাচ্ছিলুম, মিছিমিছি ঠেকালে কেন আমাকে।'

সুতীর্থ ভবতোষের চোখ এড়িয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিল; কোথাও সেলুনে কামিয়ে নেবে কি না ভাবছিল।

'কাজে যাচ্ছিলে, আমি ল্যাং মারলুম আর পেঁচোয় পেল বুঝি লাল-গোপালকে-হেঃ হেঃ ধনগোপালকে-বেশ তো আমি সরে দাঁড়াচ্ছি-যেখানে খুশি চলে যাও-' সুতীর্থ লম্বা শরীরে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সাত-পাঁচ ভাবছিল।

'কী কাজ তোমার-কী কাজ আছে এই ব্যাগের ভেতর? পরিবার নিয়ে আছ কলকাতায়? যাচ্ছিলে কোথায় শীত-রাতের লক্ষ্মীপেঁচার মত ঃ কলকাতার কালপেঁচারা ধাড়ি ইঁদুরের ঘ্যাট রেঁধে রেখেছে বুঝি? লে ঝপাঝপ করে ঝাঁপিয়ে না পড়লে মূলে হাভাত করে দেবে?'

পাইপটা নিভে গিয়েছিল ভবতোষের, ফুটপাতের ওপর খানিকটা তামাকের ছাই ঝেড়ে ফেলল সে।

'আমি চলি, ভবতোষ।'

'যাও।'

'নাকি ট্যাক্সি করব?'

'করতে পার।'

'বাঃ, বেশ চুকলি কাটছ তুমি, ভবতোষ।'

পকেট থেকে পাউচ বার করে খানিকটা তামাকপাতা পাইপের ভেতর ভরতে ভরতে ভবতোষ বললে, 'সাধনা করে ও-সব জিনিস পেতে হয়, আমি তোমাকে এমনিই দিয়ে দেব? ট্যাক্সি করবে কর; বেড়িয়ে আসতে চাচ্ছি-চলো। কিন্তু মেয়েদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে না।'

'চলো একদিকে-বেড়িয়ে আসি-' নিজের গলার শিথিল অনিশ্চয়তা অনুভব করে একটু অপ্রীত হয়ে সুতীর্থ বললে।

'চলো, তোমার স্ত্রীর কাছে যাই।'

সুতীর্থ ভবতোষের চোখ ছুঁয়ে একবার তাকাল, একটা চলন্ত ট্রামের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সে তো এখানে নেই।'

'কোথায় গেছে তা হলে?'

'বাপের বাড়িতেই থাকে। এখানে আসে না।'

'এখানে আসে না? কেন, ছেলেপুলে নেই তোমাদের?'

'এক ছেলে, এক মেয়ে!'

'তবে?'

'সে আমাকে ভালবাসে না।'

ভবতোষ পাইপ জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'বুঝেছি আমি। আমারও ওই রকমই। তবে আমি শ্বশুরবাড়ি ফেলে রাখিনি, এখানেই আছে; আছে বটে তবুও না রাত চরলে চলে না আমার। তোমার তো চলবেই না-কি করে চলবে তোমার। চলো, ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে যাই-'

'যাবে কফি হাউসে?'

'যেতে পারি,' ভবতোষ পাইপ টানতে টানতে বললে, 'কিন্তু সেখানে ওরা অপেক্ষা করবে না আমাদের জন্যে এত রাতে-ওই হামলাটার পর।'

সুতীর্থের কাঁধের ওপর হাত রেখে তার বুকের ওপর আঙুল বুলোতে বুলোতে ভবতোষ বললে, 'তা ছাড়া, ওদের দিয়ে এখন আমাদের চলবে না। আমরা চাই সহৃদয় মহিলা। তোমার কথা শুনে আমার মন ভিজে গেছে। ডাকো ঐ ট্যাক্সিটাকে। ভালো ঘরের সুন্দর প্রকৃতিস্থ মহিলার সঙ্গে মুখোমুখি বসে যাতে রাত জমানো যায় সে ব্যবস্থা আমি তোমায় করে দিচ্ছি, ওই যে ট্যাক্সি-'

ট্যাক্সিটা দূরে ছিল-তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে গিয়ে সেটাকে ডেকে এনে সুতীর্থ এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখল যে ভবতোষ নেই কোথাও; পাইপের ধোঁয়ার গন্ধ হাওয়ার থেকে মিলিয়ে যায়নি যদিও, তবুও মানুষটাকে খুঁজে পেতে হলে আবার তিরিশটা বছর অপেক্ষা করা প্রয়োজন।

চার

ব্যাগ হাতে করে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল সে-কোন পথিক তাকে দেখলে বুঝবে লোকটা অন্যমনস্ক। কিন্তু কি নিয়ে যে সে কথা ভাবছিল তাকে জিজ্ঞেস করলে নিজেই সে তার কোন সদুত্তর দিতে পারত না। একটা শূন্যতা আধো-শূন্যতায় নিমেষনিহত হয়েছিল তার মন, সেখানে বিশেষ কিছু নেই। বিশেষ কিছু থাকবার প্রয়োজনও নেই। মনটাকে স্থিরভাবে আচ্ছন্ন করেছিল তবুও কেমন যেন একটা বিষণ্ন বলয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলের কাছেই সে বলে বেড়ায় যে সে বিয়ে করেছে, তার ছেলেমেয়েও আছে, তার বয়সও চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু পাশগাঁয়ে তার শ্বশুরবাড়ি আছে বলে মানুষকে যে সে অহরহ ভাঁওতা দিয়ে চলেছে সে নামে কোন গ্রাম আছে পৃথিবীতে? আছে তার স্ত্রী? কবে সে বিয়ে করল যে তার স্ত্রী সন্তান থাকবে?

ভাবতে ভাবতে সুতীর্থ কেমন যেন একটা ধ্বান্যলোক বোধ করছিল, চারদিক থেকে তাকে ঘিরে আছে;—সেটা না আলো, না অন্ধকার কেমন একটা আবছায়ার দেশে মৃত্যুকে তার আধো প্রবঞ্চিত করতে ইচ্ছে করছে—জীবনটাকে ভাল লাগছে আধাআধি। হাঁটতে হাঁটতে এমনই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে, কোন গলির ভেতর দিয়ে কোন সুড়ঙ্গের দিকে চলেছে খেয়ালই ছিল না তার ঃ ট্রামের শব্দ অনেক দূরে, বাসও কাছে কোথাও নেই। কোথাও ইঞ্জিনের হুইসল শোনা যাচ্ছে—মহিষ ডাকছে—এক-আধটা মোটর হু হু করে উড়ে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে ট্রামের রাস্তায় গিয়ে পড়ল সে আবার। অন্যমনস্কভাবে যে হাতটা চেপে ধরল সেটা রোগা নোংরা মড়ার মত ঠাণ্ডা।

'কে রে তুই?'

ছেলেটা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করাতে সুতীর্থের সম্পূর্ণ মনোযোগ ফিরে এল তার দিকে।

'ছেড়ে দিন বাবু, আমি করব না আর তোমার পায়ে পড়ছি বাবু।'

'কি নাম তোমার?'

'আমার নাম হারান্।'

'বাপের নাম কি?'

'শোভান।'

'শোভান? মুসলমান? আবদুস শোভান?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?'

'শোভান ঘোষ।'

'শোভান? শোভন বল, শোভনলাল। শোভনলাল ঘোষ।'

'ছেলেটা কেঁচোর মতো পাক খেতে খেতে বললে, 'শোভান ঘোষ।'

'পকেটে হাত দিয়েছিলে কেন?'

'সুতীর্থ ছেলেটির হাত চেপে ধ'রে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলছিল; পোয়াটাক মাইল হেঁটে চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল নিজের বাড়ির কাছেই সে এসে পড়েছে।

'তোর বাবা কোথায়?'

'নেই।'

'কেন, কি হ'ল তার?'

'ছুরি মেরেছিল বাবাকে, ম'রে গেছে।'

'কে মারল?'

'ঐ দাঙ্গার সময় বেরিয়েছিল একদিন শেয়ালদ'র বাজার থেকে মাছ কিনে বৌবাজারে বিক্রি করবে বলে, আমরা সবাই না করেছিনু, শুনল না—'

'তোরা ক' ভাই?'

'এক বোন আছে আমার, আর কিছু নেই। মুকে ছেড়ে দাও বাবু, পায়ে পড়ি তোমার, কলকাতার মনিষদের ভয় লাগে আমার। আতি মো তাদের কোনো অমান্যি করিনি, আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আজ রাতেই মজিলপুর চলে যাব, আর কারুর পকেটে হাত দেব না। কজনকার কাটনু পকেট আমি? বাবু?'

'এই দশ-বারো জনের কেটেছিস। মজিলপুর যাবি আজ রাতেই? পায়ে হেঁটে?'

'হ্যাঁ কত্তা, সেখানে আমার মা বাবা আছে?'

'এই যে বললি তোর বাবা মরে গেছে।'

ছেলেটি কেমন একটু ভয় পেয়ে বললে, 'বাবা তো ম'রে গেছে, মজিলপুরে আমার মা আর বাবা থাকে।'

'তার মানে?'

তার মানে অনেক কিছুই হতে পারে। ছেলেটি কিছুই বোঝাতে পারল না, কোন কথাই সে বলতে পারল না আর।

'কাঁদছিস? তোর বোন কোথায়?'

'তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।'

সুতীর্থ যে রকম ছেলেটির মাংসের ভেতর আঙুল বসিয়ে দিয়ে তার হাত চেপে ধরেছিল সেটাকে ঢিলে ক'রে নিয়ে বললে,' তোর সবটাই আজগুবি হারান। তোর বাপ মরেছে, তবুও মা বাবা মজিলপুরে। বোনকে কে চুরি করলে রে?'

'আমার বোনকে মনুবাবু।'

'সে কে?'

'মনুবাবু।'

সুতীর্থ একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আচ্ছা, বুঝেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মনুবাবু এল মেদিনীপুর থেকে। মন্ত্র পড়ে কড়ি উড়িয়ে দিল, কড়ি মাথায় আটকে গেল আমার বোনের। গোখরো সাপের মত কড়ি মাথায় মনুবাবুর সঙ্গে চলে গেল বোন মেদিনীপুর'।

'তারপর কি হল?'

'দিন ছেড়ে। আপনার পায়ে পড়ি হুজুর। আমার হাতটা ছেড়ে দিন, একটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি আপনাকে–'

সুতীর্থ তাকে ছেড়ে দিতেই ছেলেটা ভোঁ দৌড় দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল প্রায়; ছেলেটার পিছু পিছু ছুটে তাকে ধ'রে এনে দাঁড় করিয়ে সুতীর্থ বললে, 'তুই এই রকম হারান?' ছেলেটির পিচুটি ও চোখের জলে অবসাদ ও নিরাশা এসে পড়েছে ঃ একটা লিকলিকে ছিপছিপে বানরের বাচ্চাকে কেউ যেন মানুষের শাবকে পরিণত করতে গিয়ে হয়রান হয়ে ফেলে রেখেছে।

'তুই ঘুমুচ্ছিস, হারান?'

'মাথা নেড়ে সে ইশারায় জানাল জেগে আছে।

'ঘুমুবি?'

'না।'

'খাবি?'

'না।'

'কি করবি তা হ'লে?'

'আমাকে ছেড়ে দিন, এখন যাব আমি মিঞা সাহেবের ওখানে।'

'মিঞা সাহেব? সে আবার কে রে?' সুতীর্থ কৌতুক বোধ করে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হারান একটা ঢোক গিয়ে বলে, 'শোভান মিঞা।'

সুতীর্থ দাঁড়িয়েছিল, চলতে চলতে বললে, 'শোভন ঘোষ না বললি?'

'মিঞাও বলে কেউ কেউ।'

'কোথায় থাকে?'

'আগে মদনপুর থাকতুম আমরা, তারপর আলিপুরে তারপরে বেকবাগানে টালিগঞ্জে, এখন থাকি জানবাজারে–'

মনে মনে এই সব নিরবচ্ছিন্ন ব্যাসকূটের মীমাংসা করতে করতে সুতীর্থ বললে, 'তবে মজিলপুরের কথা বলেছিলে কেন?'

'সেখানে আমার মা থাকে; মা বাবা।'

'আর জানবাজারে?'

'বাবা।'

সুরসাল এই পৃথিবী; পাঁচমিশেলি সব আলোড়ন এসে বিধ্বস্ত করে একে; প্যাচালো মানুষের মন; বিচিত্র এই পৃথিবীর শিশুরা; ভাবছিল সুতীর্থ।

'আমার হাত ছাড়ুন, পকেট থেকে পয়সা বের করছি।'

'পয়সা কোথায় পেলি?'

'গীট কেটে দু'টাকা মতন হয়েছে।'

সুতীর্থ ছেলেটির হাত ধ'রে থেকে বললে, 'আজ কদিন বসে এই রোজগার হ'ল? আজ একদিনেই সব পেলি বুঝি?'

'হুঁ' বলে সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি বললে, 'পাঁচ সিকে দিতে হবে শোভান মিঞাকে, আর বারো আনা মার জন্য রেখেছি এই বারো আনা তোমাকে দেব বাবু?'

হারান সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।

হারান-যদি কোনো প্রাণের গভীর থেকে থাকে তার, তা হলে সেই গভীর থেকেই কথা বলছে, (সুতীর্থের চোখের দিকে তাকিয়ে) মনে হচ্ছিল সুতীর্থের। কোনো নারী পুরুষ বা শিশুর কাছ থেকে এরকম আশ্চর্য, অকপট তলদেশ থেকে আবেদন এসেছিল কি সুতীর্থের কাছে? এসেছিল একবার-একটা ইঁদুরকে কলে আটকে যখন সে নদীর জলে ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিল; একটি শিশু তাকে বাধা দিয়েছিল, একটি নারী পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল; ইঁদুরটা নিজেও শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সকলকেই ব্যর্থ করেছিল সুতীর্থ।

সুতীর্থ 'বারো আনা পয়সা তোর মাকেই দিস, হারান', বললেও হারানের বিশ্বাস হ'ল না। সে আবার কবুল করল।

সুতীর্থ বললে, 'আমার পকেটে তো হাত দিয়েছিলি, ওখানেও কিছু ছিল, যাঃ তোর মাকে দিস্–'

'দেব মাকে?' অবুঝ অবিশ্বাসী ঠোঁট কাঁপতে কাঁপতে কেমন নাক মুখ চোখের বিশ্বস্ততায় পরিণত হতে লাগল হারানের।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে চল, আমি তোকে পুষব। তুই তো বানরের সঙ্গে বানরের বিয়ে দেখেছিস; দেখতে দেখতেই শোভান ঘোষের ঘরে জন্মালি। এবার আয়, আরো কিছু দেখবি–' বলতে বলতে সুতীর্থের মন পরিবেশ ছেড়ে অনেক দূরের প্রত্যন্তে চলে গিয়েছিল হাত আলগা হয়ে গিয়েছিল তার, ছেলেটি দাঁড়াল না আর; বান মাছের মত সাঁ করে সটকে হঠাৎ কখন ঘাই মেরে অন্ধকারের সময় প্রসূতির ভেতর ডুবে গেল-সুতীর্থ আর খুঁজে পেল না তাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাক, চলে যাক।' সেই যে সে একদিন কলে আটকে ইঁদুরটাকে নদীর জলে ডুবিয়ে মেরেছিল সেটা এমন কিছু বৃহৎ নিষ্ঠুরতার কাজ নয়; সেই শিশু যে বাধা দিয়েছিল, সেই বয়স্ক মেয়েটি যে শোভন বিষণ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল, তারাও এমন কিছু প্রেমাত্মা পুণ্যাত্মা নয়; এই হারান—এও বা কি। এরা চলে যায়।

তোমরা তোমাদের আধুনিক ও যা আধুনিক নয়—সময় ও কাজ নিয়ে শেষ পর্যন্ত সফল হও বা না হও সেটা তোমাদের নিজেদের জিনিস। সেই সুন্দর ক্ষুরধার নিশীথ পথে এরা কে? কেউ তো নয়। কেউই কি নয়।

পাঁচ

কয়েকদিন কেটে গেছে।

সুতীর্থ সেলুনে ঢুকতেই হেড নাপিত তাকে 'আসুন' বলেই আবার তার দিকে তাকিয়ে তৃতীয়বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'বসুন আপনি, এই এখুনি হয়ে যাবে।

রৌদ্রের দিনে হঠাৎ এক ঝাঁক ধাধাবর কাকাতুয়া উড়ে এসে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লে যে রকম বুক ধড়ফড় করে তেমনি কেমন একটা আশ্চর্য স্পর্শে চমকিত হয়ে হেড নাপিত মধুমঙ্গল ভাবছিল ঃ

'এ সুতীর্থ না? এর সঙ্গে তো গালিফপুর স্কুলে পড়েছিলুম। এতদিন পরে এর সঙ্গে আবার দেখা হ'ল। হয়তো চিনতে পারছে না আজ আমায়; আমিও ধরা দেব না।'

সেলুনে আটটা সিটের সাতটাই খালি ছিল—কিন্তু অসময়ে নাপিতরা কেউই প্রায় হাতের কাছে ছিল না। একজন বাজারে—একজন টাকা ভাঙাতে—একজন চা খেতে গেছে। ব্রাশ ক্ষুর কাঁচি পাউডারের বাটি লাইমজুস তেল, পাফ, চুল ছাঁটবার ক্লিপের ছড়াছড়ির ভেতর একটা বড় আয়নার সামনে গিয়ে বসল সে। সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে 'বলব না আপনি অসময়ে এসেছেন,' বলে ফেলে নিজের মনের গহনে একটু জিভ কেটে কি না কেটে মধুমঙ্গল চৌধুরীবাবুদের বাড়ির ছেলেটির টাক মাথার চুলে আরো কিছু কারসাজি প্রায় শেষ করে আনতে লাগল।

'অসময় বই কি তোমাদের খাওয়া-দাওয়া আছে তো—' সুতীর্থ বললে।

'আমরা জোট বেঁধে খাই না। ঐ যে সুবোধ এসে পড়েছে। কি রে, চলতে ফিরতে বুড়ো হয়ে গেলি যে। টাকা ভাঙিয়েছিস? নে হাত চালা, চৌধুরীবাবুর ড্রেসিংটা রে দে, আমি এই বাবুকে দেখছি।'

সুতীর্থের কাছে এসে হেড নাপিত বললে, 'আমার নাম মধুমঙ্গল।'

'ওঃ।'

'কেমন নাম?'

'ভালই তো।'

মধুমঙ্গল সুতীর্থের সঙ্গে গালিফপুর স্কুলে পড়েছে, এমনিও ফক্কুড়ি করতে ভালোবাসে খুব, মাঝে মাঝে ঠোঁট কাটা হয়ে পড়ে—যার তার সঙ্গে। সুতীর্থ মধুমঙ্গলের সহপাঠী ছিল, কিন্তু সে সব স্কুলী ইয়ার্কি এখন আর চলে না। টেনে মেনে যা চলে যতটা চলে হিসেবে রেখে মধুমঙ্গল বললে, 'কেমন নাম মধুমঙ্গল বললেন?'

'কিন্তু তোমার মুখে বিড়ির গন্ধ মধুমঙ্গল।'

মধুমঙ্গল সুবোধের দিকে ফিরে বললে, 'একটা কথা সুবোধ, বিপিন যদি বাজারে না গিয়ে থাকে তাহলে তাকে বলিস—' বলে সুবোধের কানের ভেতর একটা কথা ছেড়ে দিয়ে মধু সুতীর্থকে বললে, 'তামাক টানি দিনরাত, বড় বদ অভ্যেস—কিন্তু বিড়ির গন্ধটা খুব নিরেস লাগছিল আপনার?'

'তোমার কাজে মন দাও, মধু।'

'এগুলো তো সুগন্ধি বিড়ি, নাপতেনীরা খুব পছন্দ করে; সুখটান দিয়ে যে যায় তাকে আর ফেরায়না, স্বর্গের গলা জলে দাঁড় করিয়ে গোন্ বেঁগোনের জল হয়ে ছলছল করে ঘিরে থাকে সারা রাত। আপনার চুল ছাঁটতে হবে?'

'কথাই তো বলছ তুমি। বেলা চড়ে গেছে, চারদিককার সেলুনগুলো বন্ধ, সেই জন্যেই তোমার খুব পায়া ভারি—চুল ছাঁট, চুল ছাঁট—'

বেশ নিপুণ ও মোলায়েম হাতে সুতীর্থের বুক পিঠ ঘাড় চাদর দিয়ে মুড়ে নিল, ঘাড় ঘেঁষে কান ঘেঁষে পাউডার পাফের আঘাত করতে করতে মধুমঙ্গল বললে, 'এখন আমাদের নাওয়া খাওয়ার সময়, এ সময় মুরুব্বিরা কেউ আসে না। দোকানটা এখন বন্ধ করেই রাখতুম, তা আপনি এসেছেন বলেই খুলে রেখেছি। ফাউ কাজে কথা বলবার সময় সারা দিনরাতের ভেতর নাই, কিন্তু এই সময়টিতে মুখ নেড়ে বড্ড সুখ, আ হা হা। মুখ নাড়লেই পব্বত।'

'চুল ছাঁটবে?'

'ছাঁটছি।'

'দেখো।'

'দেখছি।'

'কেমন যেন মেজাজ বিগড়ে আছে তোমার।'

মধুমঙ্গল কোন কথা না বলে প্রথমে কাঁচি চালাতে চেষ্টা করল, নিল ক্লিপ হাতে, সেটাকে এক আধ মিনিট চালিয়েই আবার কাঁচি, এবার একটা নতুন ঝকঝকে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোন স্কুলে পড়েছিলেন?'

'আমি? গালিফপুর স্কুলে। কেন স্কুলের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'এমনই–' মধুমঙ্গল বললে।

গালিফপুর স্কুল! রোদের ভেতরে পালকের ঝাড়ে এক ঝাঁক আশ্চর্য চন্দনা পাখি আগেই তার ঘরের ভেতরে এসে পড়েছে–এবারে পক্ষীমাতা নিজে এল যেন অনেক রোদ ছড়িয়ে বাতাস উড়িয়ে। গালিফপুর স্কুলের সেই সুতীর্থ না, এই যার চুল ছাঁটছে সে? মধুমঙ্গলকে চিনছে না সে, কিন্তু তবুও সেই স্কুলের কবেকার সূর্য বাতাস আসা ভালোবাসা শয়তানী চিপটেনীর নিদেন মানুষটা তো কাছেই বসে আছে;–সুতীর্থ এল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘুমের ভেতর থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে, আজকের দিনগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে, যা অনেক আগে ছিল এখন নেই, সে সবের চমৎকার আখখুটে কোলাহলে উনিশ শো এগারো উনিশ শো বারো উনিশ শো তেরো-কেই পৃথিবীর শেষ সত্য বলে প্রবাহিত করে। একটা দুটো তিনটে অভিভূত নিঃশ্বাসে মধুমঙ্গল যা গ্রহণ করল তা মাটি ঘাস রৌদ্র মাস্টার লক্ষ্মী ছেলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের সুরভিত এক পঁয়ত্রিশ বছর আগের পৃথিবী, পঁয়ত্রিশ হাজার বছর বেঁচে থাকলেও উজ্জ্বলভাবে সমসাময়িক হয়ে থাকবে যার সঙ্গে মধুমঙ্গলের মন।

'মধুমঙ্গল।'

'বলুন।'

'বেশ ছাঁটছ তুমি।'

'হুজুর খুশি হলেই ভালো।'

'কি মিঠে তোমার হাত, কোন নাপিতটাপিত নয়, আমার মাথার চুল যেন হিজল শিরীষের পাতা চোত মাসের বাতাসে। চোতের বাতাস তুমি মধুমঙ্গল–'

হেড নাপিত কোন কথা বললে না। চৌধুরীবাবু কিছুক্ষণ হয় চলে গেছে। সুবোধও বেরিয়ে গেছে। ঘরের ভেতর কেউ ছিল না আর। মধুমঙ্গল এক মনে চুর ছেঁটে যাচ্ছিল ঃ যার সঙ্গে সে পড়েছে একদিন, যে তাকে চেনে না আজ সেই মানুষটির। এত অবেলায়, কিংবা কোন সুবেলায়ও এত ভাল করে এত মন দিয়ে কারুর চুল সে রকম ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে ছেঁটেছে মনে পড়ছিল না মধুমঙ্গলের।

'একটা সিগারেট বের করে নিতে দাও তো হেড নাপিত। এতদিন পরে তোমার কাছে চুল ছেঁটে আমার পাড়াগাঁর কথা মনে পড়ল। সেখানে ছিল আমাদের উমাচরণ নাপিত। তার হাত, চিরুনির আশ্চর্য যাদু–সে জিনিস উনিশ শো দশ সালেই নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের পৃথিবীর থেকে–এখনো যেন আমার চুলে লেগে আছে। ওস্তাদের পোকে খুঁজে না পেয়ে ঘুমিয়েছিল যাদুটা–পঁয়ত্রিশ বছর; তুমি এসে তাকে উমাচরণের মত জাগিয়ে দিয়েছ আবার। তোমার হাতে আমার রগের চুল আর চাঁদির চুল, আমার আজিডাঙার চুল কাজিডাঙার চুল কথা বলে উঠছে মধুমঙ্গল–'

'কি হল উমাচরণের?'

'উমাচরণ নেই।'

'কোথায় গেল?'

'মরে যেতে দেখি নি তাকে, তবে উনিশ শো দশেই আমাদের গাঁ ছেড়ে কোথায় যে সে চলে গেছল, আমরা দেশে থাকতে আর ফেরে নি। এখন কোথায় আছে কে জানে। উমাচরণ আমাকে সুতীর্থ বলে ডাকত।'

'আপনার নাম–'

'হ্যাঁ। সুতীর্থ।'

'আপনি আরশির দিকে তাকিয়ে দেখুন তো কেমন হল।'

'দরকার নেই, আমার ভেতরে হয়েছে।'

মধুমঙ্গল বোধ হয় চিরুনির ছুঁইয়েই চুল ছাঁটছিল বিনে কাঁচিতে, মনে হচ্ছিল সুতীর্থের।

'আপনার চুল ছাঁটতে বেলা শেষ হয়ে যাবে আমার দেখছি।'

'তা হোক, উমাচরণেরও হাত। তুমি ছাঁটছ, মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের পারে অশোক স্তম্ভের পাশে ত্রৈলোক্যচিন্তামণির মন্দিরে একা বসে আছি খুব বেশি রাতে; আমাকে ঘিরে দেবদাসীদের নাচ, চুপচাপ, তাদের চুল নিঃশ্বাস নানা মাংস তাদের হাত–'

'বিড়ির গন্ধটা,' গলা খাকরে নিয়ে মধুমঙ্গল বললে, 'মিইয়ে এসেছে বুঝি, সুতীর্থবাবু?'

'কই, পাচ্ছি না তো আর।'

পাবেন না মধুমঙ্গল চুলে হাত দিলেই বাবুদের সিদ্ধির নেশা চড়তে থাকবে।'

'মধুমঙ্গল।'

'ঠিক আছে।' সুতীর্থের ঠোঁটের সিগারেটটা জ্বালিয়ে দিয়ে মধুমঙ্গল বললে, 'একটা কথা আপনার কাছে।'

'সুতীর্থ সিগারেট টানছিল, কিছু বললে না।

বলছি আপনাকে, মধুমঙ্গল বললে, সুতীর্থের মাথার চুলের দিকে নিজেকে সে ন্যস্ত করে রাখল কিছুক্ষণ, কাঁচি নেই; চিরুনিই নেই যেন, হাত দিয়ে বিলি কেটে চুল ছাঁটছে মধুমঙ্গল। মনে হচ্ছিল সুতীর্থের।

'মধুমঙ্গল–এই নামটা আপনার চেনা চেনা লাগছে?'

'সুতীর্থ দু-এক মুহূর্ত সিগারেট টেনে, নাপিতের চাদরের ভেতর থেকে হাত বার করে ছাই ঝেড়ে সিগারেট টানতে লাগল, কোন কথা বললে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শোনেন নি এ নাম আগে কোনদিন?'

'তোমার কাছেই তো শুনলাম আজ।'

ভুলে গেছে সুতীর্থ। মধুমঙ্গল বুকের ভেতরে একটা ভারি নিঃশ্বাস পাতলা করে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভারি হয়ে বেরিয়ে এল। তার এই নাম নিয়ে সুতীর্থও যে তাকে ঠাট্টা করত, ঠাট্টা করে সকলের সামনে তাকে ছিঁড়ে ফেলে তারপরে কি মনে করে কাছে ডেকে প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিতে পুকুরের পাড়ের গাছ থেকে তার জন্যে অহেতুক অকপট পাৎ বাদাম পেড়ে আর জলের ভেতর থেকে পানফল উপড়ে এনে সে সব পুকুর দীঘির দেবাংশী মাছ আর জলঠাকরুণদের মত চোখে মধুমঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তাকে হাতের কাছে টেনে নিত। এ সব আজ ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগের কথা। সময় ও সংসারের হাতে নিরবচ্ছিন্ন মার খেয়ে মধুমঙ্গলের নামের এই ঠাণ্ডা জল ফলের মত ছিটেটুকু ছাড়া কি আর আছে সেই সাবেক কালের? সেই স্কুলের ছোকরা মধুমঙ্গলকে যদি এখানে এনে দাঁড় করানো যেত, কপালের ডান দিকের আবটা দেখেও এই হেড নাপিতকে সে চিনতে পারত না আজ। এইটেই দুঃখ কষ্টের কথা—এই কুশ্রী কঠিন পরিবর্তন—বালকের কাছে প্রৌঢ়ের এই নিরেট উৎখাত। মনটা ঠিকই আছে মধুমঙ্গলের হৃদয় ঠিক জায়গায় আছে, কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে শ্রীচেহারার কোন মিল নেই যে। এদিক দিয়ে বেশ খানিকটা মিল মিশ রয়েছে সুতীর্থের ভেতরের ও বাইরের। সুতীর্থ বড় হয়েছে বটে, বুড়ো হয়েছে, কিন্তু তবুও সে নিজের যৌবন নিজের কৈশোরের থেকেই বেড়েই বড় হয়েছে; এরা চেনে সুতীর্থকে; কিশোর সুতীর্থকে ধরে আনলে আজকের এই বড়টাকে সে মুহূর্তের মধ্যেই নিজের প্রতিচ্ছবি বলে চিনে নিতে পারত কিন্তু মধুমঙ্গল তো নিজের যৌবন কৈশোরকে কাল নাগের দাঁতে কেটে ফেলে ভেলায় করে পাঠিয়ে দিয়েছে ত্রিস্রোতায়—পচা মাংসের ঢোল নিয়ে ফিরে এসেছে ভেলা। কোথায় গেল পঁচিশ ত্রিশ বত্রিশ বছর আগের পৃথিবী? মনটা তো ঠিকই আছে, কিন্তু, আহা, সেদিনকার সমাজ সংসার দিন ক্ষণ রূপ যৌবন এ রকম পচে ছিবড়ে হয়ে গেল।

'তুমি রসিয়ে রসিয়ে চুল ছাঁটছ হেড নাপিত, আস্তে আস্তে। ভালো। কিন্তু আমার উঠতে হবে তো।'

'বসুন, সন্ধ্যের সময় গিয়ে নাইবেন। চৌবাচ্চায় ধরা জল আছে?'

'না।'

'পাম্পে জল আসে?' ইলেকট্রিক পাম্প?'

হ্যাঁ।'

'পাম্প কার?'

'বাড়িওলার—সুতীর্থ বললে।'

'বসুন তাহলে,' মধুমঙ্গল বললে, 'চুল ছাঁটি আপনার। এত বেলায় কলকাতার বাড়িওলা পাম্প চালাতে দেবে না।'

'যদি বাড়িউলি হয় সে!'

'নাঃ', মধুমঙ্গল কাঁচিটা রেখে দিয়ে আর একটা কাঁচি তুলে নিয়ে বললে, 'সে সৎগুষ্টির মেয়েও দেবে না। বসুন। এই যে চেঁদো মাথার ভদ্রলোক বসেছিলেন ওর নাম মহীন চৌধুরী, ওর টাকা সুদে আসলে পুষিয়ে দিয়েছেন আপনি। এত চুল আপনার, অথচ পাকা চুল কোথায়। বয়স কত হল?'

'চল্লিশ পেরিয়ে গেছি,' সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বললে, তোমার নিজের খাওয়াদাওয়া নেই, মধুমঙ্গল—কেমন লটকে পড়লে যে তুমিও আমার চুল ছাঁটার অছিলায় মধুমঙ্গল? মধুমঙ্গল অনেকক্ষণ হয় ক্লিপ ছেড়ে দিয়েছে। ক্লিপ সে বড় একটা ব্যবহারই করে নি আজ। পাড়াগাঁয়ের উমাচরণের মতন কাঁচি দিয়ে ছেঁটে যাচ্ছিল—ধীরে ধীরে—শান্ত মোলায়েম নিপুণতার সঙ্গে।

'দাড়িটা আপনার না কামিয়ে ছেঁটে দিলে ভালো হয়?'

'কেন?'

'এ তো এক মাসের দাড়ি আপনার গালে। সবুর করুন, কাঁচি দিয়ে ঢঙের দাড়ি বানিয়ে দিই।'

'না, না, নূর নয় তো কামাতে হবে। আমি দাড়ি রাখি না কখনো।' সুতীর্থ একটু ঝেঁঝে উঠে বললে।

'কলকাতার নাপিতের ক্ষুরে দাড়ি কামাবেন?'

'কি হবে?'

'আজই তো দিন চারটে গরমির রুগীকে কামিয়েছি।'

'কে তুমি?' সুতীর্থ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললে, কি করে জানলে, তুমি তাদের ও রোগ হয়েছে?'

'সে আমার জানা আছে। আমিও তো রুগী। আমাদের নিজেদের মুখ চেনাচিনি আছে।'

সুতীর্থ আরশির ভেতরে মধুমঙ্গলের কালো নীল মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওটা বুঝি বাস্তু সাপ, ঘরে ঘরেই আছে?'

'আছে বই কি, আমার সাপ আমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু আপনাকে কাটতে পারে। ক্লিপের আঁচড়ে ছিঁড়ে যেতে পারে, ক্লিপ ধরিনি তাই; ঘাড়ের ক্ষুর লাগাব না আপনার। দাড়ি এখানে আপনি বরং নাই বা কামালেন।

সুতীর্থ সেলুনের দেয়ালের চারদিকের কিমাকৃতি সব ছবিগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল, ক্যালেন্ডারের ছবি আছে, বিলিতি আর্ট আছে, দিশী মহাভারত ও ভাগবত যে সব ছবিতে বিকন্টকিত হয়ে উঠেছে তাও মনের ভেতর নেশা কেলাসিত করতে না পারলেও উথলে তুলতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে, তন্ত্রে, সুতীর্থ ভাবছিল, সারাৎসারের উপমা প্রতীক হিসেবে প্রথম ও অন্তিম বাস কেমন সনির্বন্ধে এসে দাঁড়িয়েছে।

'মধুমঙ্গল আমি দাড়ি কামাব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নাপিতের ক্ষুরে? যদি রক্তে দাঁত হয়?

'হোক। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।'

'এটা বোকার মত কথা বলা হল।'

'সুতীর্থ দেয়ালের একটা ছবিতে মেয়ে পুরুষের খোলাখুলি কেমন একটা আকাট তাৎপর্যের দিকে দু-এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললে, 'বোকা তুমি আমাকে বলতে পার। কিন্তু সম্প্রতি আমি কোনোদিকেই মন দিতে পারছি না। চলো আমাকে নিয়ে কোন জায়গার-চলো, আমি টাকা দেব। এখানে চানের সুবিধে আছে?'

'আছে বই কি।'

'ভালো সাবান আছে? ক্ষিধেও পেয়েছে। খেয়ে-দেয়ে কোথাও ঢুকে পড়ে দিনটা কাটিয়ে দেওয়া যাক্-রাতটাও। দু-তিন দিন থাকতে পারলে তো তো ভালোই। খুব অন্ধকার চাই-খুব চুপ চাপ। যেন জীবনটা একটা শীতের ঘুমটানা রাত ছাড়া আর কিছু নয়-দেশ গাঁয়ের শীতের চারদিকে খেজুর গাছ কুয়াশা পেঁচা; রাত কোনদিন ফুরুবে না। ঘুমের থেকে অন্য ঘুমের ভেতর চলে যাবার পথে মাঝে মাঝে একটু জেগে ওঠা-এই স্বাদ; এ ছাড়া ঘুমের কোন শেষ নেই। এই সব-যা চাচ্ছি-কয়েকটা দিনের জন্যে দেবে তুমি আমাকে।'

সুতীর্থ তার কথা শেষ না করতেই ভেতরের ঘর থেকে খন খন করে বেজে উঠল যেন কার গলা ঃ 'হো রে মদু মঙ্গইলা, হো মউধ্যা, তর হইল কী রে-'

'এতক্ষণে বুঝি তোর ঘুম ভাঙ্গল' মধুমঙ্গল গায়ের জ্বালা ঝেড়ে বললে।

'তর সঙ্গে কথা কয় ক্যাডা রে?'

মধুমঙ্গল মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করে চুল ছাঁটতে ছাঁটতে বললে, 'তুই ভাত খেয়েছিস বিপনে?'

'তুই খাইলে তবে তো খাইমু।'

'যা, যা চান করে আয় গে যা, দিক করিস নি-'

'তর লোগ পাগলের লাহান কথা কইছে ক্যাডা? কথার লওন আছে থোওন নাই মানুষটা ক্যাডা? এই দুফুইরডার সময় নি চুল ছাঁটে। চুল ছাঁটতে আইছে না চুলের আঁটি বাঁধতে-দল ঘাসের আঁটি-ছলিমদ্দি সইসের লাহান?'

'তুই যদি ফের কথা বলিস বিপনে-তা হলে ক্ষুর নিয়ে আসছি।'

'কি করবি তুই' আমার। রোজই তো ক্যাল্লা ছুটাস। তুই আমার বাপ কর্ণ, আমি হইলাম গিয়া রঞ্জাবতীর ছাওয়াল। আর আয় দাতা কর্ণ আয়, করাত দাও, কুড়াল যা হাতের কাছে পাস হেইয়া দিয়া দে গলা দু'ফাঁক কইরা। বাইচ্যা থাইকা আর সুখ নাই।' কাঁচি চিরুনি দেরাজের ওপর ছুঁড়ে ফেলে মধুমঙ্গল ঝট করে ও ঘরে ঢুকতেই লোকটা আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে কিল চড় ঘুষি লাথি হজম করতে লাগল-একটা টু শব্দও করল না।

ফিরে এসে মধুমঙ্গল দেখল, সুতীর্থ একটা ঝকঝকে কাঁচি তুলে নিয়ে তার হাঁটা চুলের ওপর বাহার কাটবার চেষ্টা করছে।

'এটা ভাল করছেন না, সুতীর্থবাবু।'

'কেমন একটা ঝুঁটি রেখেছ তুমি সমস্ত মাথা জুড়ে। এই কি ভাল চুল ছাঁটা হল, মধুমঙ্গল-'

মধু একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে বললে, 'লোকে দেখে কি বলে সেটা আমাকে শুনিয়ে যাবেন-'

'লোকে কি বলে? আর আমি কি মনে করি সেটা কিছু নয়?'

চুলে ড্রেস করতে করতে মধুমঙ্গল বললে, 'দাড়ি থাক তা হলে আজ।'

'দাড়ি কামাতেই তো এখানে এসেছি মধু! যে আফিং খায় তাকে খেলে কাল-দাগ 'লাল' হয়ে যায়-' সুতীর্থ লালের ওপর জোর দিয়ে ঠাট্টা করে এক আধ ফোটা হাসি ছিটিয়ে বললে, 'কী করবে আমাকে তোমার রোগ?'

'না, পঞ্চ রং-এ মাতাল আর সাপের বিষে কি করবে।'

নাও, ড্রেসিং চটপট সেরে নাও। দাড়ি কামাও। তারপর যাব।'

'কোথায়?'

'ঐ যে বললুম।'

'সে গুড়ে অনেক দিন বালি প'ড়ে গেছে, স্যার। আমাদের কোনো চেনা বাড়িউলি নেই, বাড়িই নেই, লোকের মাথা পাতবার জায়গাই নেই। মন্বন্তর দাঙ্গা হাঙ্গামা দুটো যুদ্ধ কালোবাজার মিলিটারিরা সেঁটে চিবিয়ে খেয়ে গেছে সব; হাড়গোড়ের ছিঁবড়ে শুঁকতে আরশোলারা শুঁড় নাড়ছে, তাদের ঠ্যাং ফড়ফড় করছে, ফড়-ফড় করছে। চান সেই ঠ্যাং? দিতে পারি তবে। সে ঠ্যাং তো আপনার নিজেরি। কার রক্ত-মাংস চাইছেন আপনি? কার আছে? কে দেবে আপনাকে?'

দাড়ি কামানো শেষ হলে মধুমঙ্গল বললে, 'দশ বছর ধরে এখানে কাজ করছি, আপনাকে তো দেখিনি কোনোদিন। এ পাড়ায় থাকেন নিশ্চয়ই সেলুনে চুল কাটাবার দাড়ি কামিয়ে নেবার বেশ এলেম তো আপনার; এ পাড়ায় সবাই তো আমার সেলুনেই আসে-'

'এখানে আমি আসিনি আগে আর।'

'এখন থেকে আসবেন তা হলে-'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কি মনে করেই আজ শোভাবাজারে এসে পড়েছিলুম, মধুমঙ্গল ভূতেই টেনে এনেছে মনে হয়। আমি থাকি বালিগঞ্জে; ওদিকে একটা ব্রাঞ্চ খুলতে পার তোমার ঘাট-কামানোর দোকানের?'

সুতীর্থ পালিশ গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'পয়মন্ত নাপতেনীর হাত গো তোমার,–সুবিধে পেলেই আসব; মোক্ষম; আমার আর কিছু সুবিধে করে দাও না, যা বলছিলুম–'

'মানে উমাচরণকে চাই?'

'না, উমাকে!'

'সে হয় না। মধুমঙ্গল কিছুতেই ধরা দিল না!

সুতীর্থ চলে গেল। দাম দিতে ভুলে গেল মধুমঙ্গলকে। সেও চাইল না। দামের জন্যে নয়, দামতে, কিছুই নয় লোকটার জন্যেই তার ঠিকানাটা জেনে রাখলে পারত মধুমঙ্গল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও জিজ্ঞেস করতে পারল না। বালিগঞ্জে যাবে? উত্তরে মানুষ সে-সমস্ত দক্ষিণ দিকটার নামই তো বালিগঞ্জ; ওখানে কে কাকে খুঁজে পাবে? দশ বছরের মধ্যে একবারও গিয়েছে ও মুল্লুকে মধুমঙ্গল? পঁচিশ ত্রিশ বছর আগের স্কুলের সেই সব ফোর্থ থার্ড সেকেন্ড ক্লাসের ইয়ারদের কথা মনে করে ঝুম হয়ে থাকবার মত মন মধুমঙ্গলের নয়! কিন্তু তবুও চান নাই-খাওয়া দাওয়া নেই-মেঝের ওপর কম্বল পেতে শুয়ে পড়ল সে। ঘুমোতে দেরী হ'ল।

ট্রামে উঠে সুতীর্থ ভাবল, মধুমঙ্গলের দামটা দেওয়া হল না, আর একদিন এসে দিয়ে যেতে হবে; ওকে চিনি আমি ও তো সেই গালিফপুর স্কুলের মধুমঙ্গল চক্রবর্তী, ওকে ভাল লাগত আমার খুব খেয়ালী ছেলে ছিল, পড়াশুনো তাস ক্রিকেট অ্যাক্টিং যাতে হাত দিত–বেশ সেঁটে–পাঞ্জা জাঁকিয়ে। ভারি ডাঁটের মাথায় চলত ফিরত, কথা বলত, ভারি তালেবর ছেলে ছিল; নাপিত হয়েও তাই আজ হয়েছে হেডনাপিত, মধুমঙ্গল কি অ্যাসেম্বলির স্পিকার হতে পারত না, কিংবা মন্ত্রী? দু'মাস তালিম করে নেবার সময় দিলে ও সে সব কাজ ঠিক চালাতে পারবে; ও সবই পাইয়ে দিত আমাকে স্কুলে পড়তাম যখন। সব জানে সব পারে; এখনও ওর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হচ্ছিল সর্বসিদ্ধিদাতার হাতীর শুঁড় নড়ছে যেন–এমনই নাড়া দিয়েছিল আমাকে যে ওকে বলেছিলাম বেশ একটা নিরবলীন অন্ধকারের দেশে আমাকে কয়েকদিন কাটিয়ে দেখার সুযোগ দিতে পারে কি না। সেখানে কিছুকাল থাকলে ফিরে এসে তারপর এই সব বাতাসে রোদে কী উৎসাহ পেতুম আমি, কী আলোকোৎসারিত মনে হত এই পৃথিবীকে। কিন্তু মধুমঙ্গল তা হতে দেবে না; ওর বিশ্বাস, যে তা হলে রোগ হবে, নষ্ট হয়ে যেতে হবে; তা হয় বই কি, কিন্তু সে রোগ হতে দেব কেন, আজ না হয় অকৃতী সমাজের দোষে নেশার সঙ্গে রোগের নিরেট নিষ্ফলতা মিশে আছে, কিন্তু একদিন এমন নিয়ন্ত্রণ আসবে না কি যখন অন্ধকার ও আলো, মৃত্যু ও জীবন ব্যবহারের সে ঢের অতল গভীর আনন্দের প্রবাহকে কোনো রোগ কোনো অনারোগ্য অপদর্শন এসে অসফল করে দিতে পারবে না আর। আজই তো সতর্কতা আছে, ওষধি আছে; নিরেস গণিকাবৃত্তিও আছে। ওরা যে নারী মা বোন এ রকম মন–সাফাই মনোভাবও আছে। এ সব পথে নয়, কোনো ওষুধের প্রয়োজন হবে না শরীরের বা মনের জন্যে, শরীরই শুধু তাগিদ রোধ করবে না, হৃদয়ও-দু'জনেরই; কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট জীবনকালের জন্যে নয়–হয়তো এক রাত্রির জন্যে, কিংবা সাতটি আলোকিত দিনের জন্যে। কিন্তু মানুষের মন ঢের বেশি নির্দোষ–রাষ্ট্র খুব বিশেষভাবে উজ্জ্বল না হলে এ জিনিস সম্ভব নয়। কি, অসাধ্যসাধনের জিনিস মধুমঙ্গলের মত বেচারার কাছে চেয়েছিল সে। যে মাত্রাবোধ চাপা পড়ে গিয়েছিল–ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। সাদা চেতনায় মন স্থির হয়ে উঠলে আরো বেশি স্থির হয়ে পড়ে–আজকের এই অপজাত পৃথিবীতে সে স্থিরতা বিষণ্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়; সুতীর্থের মুখের প্রতিফলিত কেমন যেন তপঃকৃশহাসির পেছনে প্রকৃত মুখটাকে অর্থস্থলকে দেখা যাচ্ছিল তার; কিন্তু ট্রামের কোন যাত্রীরা দেখতে পেল না কিছু।

ছয়

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠতে সুতীর্থের সঙ্গে প্রায় গা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। মণিকা সিঁড়ির কিনারেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, চাকরটাকে পাঠিয়েছিলেন একটা ওষুধ কিনতে, কিন্তু সে বড় দেরি করে ফেলেছিল; মণিকা নিজেই একবার নিচে গিয়ে দেখে এসেছেন, ফিরছে না চাকব; ওষুধ নিয়ে না ফিরলে ওপরে যেতে পারছেন না তিনি।

'এই যে মানুষ যে–' সুতীর্থ বললে।

'তাই তো দেখছি, এত রাতে তোমার উদয় যে!'

'চোখ বুজে চলেছিলাম, তোমার গায়ে লেগে গেল বুঝি।'

'তুমি ভেবেছিলে পাথর দাঁড়িয়ে আছে বুঝি।'

'রাত কটা হবে?'

চাকর ওষুধ নিয়ে সর সর করে ওপরে চলে গেল, মণিকা দেখলেন; সুতীর্থের চোখে পড়ল না। সুতীর্থ সিঁড়ির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

'দয়া করে যে রাস্তার দরজাটা বন্ধ করে দাও নি, ওটা আটকে রাখলে আমাকে দেয়ালের পাইপ বেয়ে উঠতে হত। বড্ড রাত হয়ে গেছে আজ। চলো আমার ঘরে। ঘর খোলা যে?' দু' এক পা এগিয়ে গিয়ে সুতীর্থ বললে।

'খোলা রেখে গিয়েছিলে বলেই এতক্ষণ আমাকে আগলে বসে থাকতে হল, এবার আমি চলি–'

'কোথায় যাচ্ছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওপরে।'

অংশুবাবু কি ফিরেছেন?'

'খেয়ে-দেবে ওর এক ঘুম হয়ে গেছে।'

সুতীর্থ হঠাৎ প্যাসেজের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বললে, 'রাত হয়েছে তবে। আচ্ছা, ওপরে যাচ্ছিলে যাও। অংশুবাবুর হয়তো কিছু দরকার হতে পারে।'

'কি আর দরকার হবে এত রাতে।'

'এক ঘুম তো হয়ে এল প্রায়, তারপরেই তো দরকার।'

মণিকা দাঁড়িয়েছিলেন, মাথার ওপর থেকে ঘোমটা ঠিক নয়, আঁচলটা খসে গেছে খোঁপার ওপর, আঁচল চড়াতেই বাতাসে খসে গেল আবার; গলায় জড়িয়ে নিলেন আঁচল; সুতীর্থের সামনে ঘোমটা দেবার কি দরকার তাঁর; সুতীর্থ দু-এক বছরের বড় হতে পারে মণিকার চেয়ে, কিন্তু নিজের ছোটর মতনই তো তাকে দেখেন তিনি। তাই অনুভব করেন না? ভাবছিলেন।

সুতীর্থ নিজের ঘরের ভেতরে ঢুকে বললে, 'বোস।'

'বসব না, ভয় আমার মেয়েটার জন্যে।'

'কে অমলা? ঘুমোয়নি?'

'ঘুমিয়েছে, কিন্তু ছ্যাঁৎ করে জেগে ওঠে তখন আমাকে কাছে না পেলে কাণ্ড করবে।'

'নিশির ডাকেও হেঁটে চলে না কি অমলা?'

'কাকে বলে নিশির ডাক?'

'ঘুম চোখে যে মানুষ হেঁটে বেড়ায়, মাঠ, ঘাট, প্রান্তর পেরিয়ে যায়, তবুও ঘুম ভাঙে না, জান না, শোন নি?'

মণিকা গালে হাত দিয়ে বললেন, আশ্চর্য, তেমন ঘুম থাকে না কি আবার। কই, শুনি নি তো কখনো দেখি নি তো কাউকে। তুমি দেখেছ?'

মণিকার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'নিশিতে পাওয়া মানুষ? কত কত দেখেছি। আমি নিজেই তো হেঁটে চলে যেতাম এক সময় মাঠ, ঘাট, ঝিল, জঙ্গল তেপান্তর ভেঙে—পাড়াগাঁয়ে থাকতাম তখন—'

'তারপর কি হ'ত?'

'হঠাৎ ঘুমের ঘোরটা ভেঙে গেলে টের পেতুম সব।'

'বড্ড ভয়ঙ্কর জিনিস তো; ঘুমের নেশায় হেঁটে চলা; এখনো নাকি এ রোগ তোমার?'

'না, কলকাতায় এসে সেরে গেছে, পনেরো বিশ বছর আগে দেশ গাঁয়ে থাকতে নিশির ডাকে চ'রে বেড়াতুম। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছ মণিকাদি বোস—জলচকীতে কেন কুশনে বোস।'

কুশনে নয়, একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে প'ড়ে মণিকা বললেন, 'চা খাবে?'

'না।'

'টিনটা তো বের করেছ সিগারেটের অনেকক্ষণ। খাও, আমি উঠি।'

'বোস, সিগারেট রেখে দিচ্ছি। ও আমি খাই না, এমনিই নাড়ছিলুম টিনটা।' সুতীর্থ সিগারেট বের করল না, দেশলাইটা সরিয়ে রাখল, লঙ কোটের দু পকেটে হাত ডুবিয়ে মাথা হেঁট করে কি যেন ভাবতে লাগল।

'শীত করছে না তোমার?'

'কই না তো, গরম হয়ে আছি।'

'কলকাতায় বেশ একটু শীত পড়েছে এবার।'

'কলকাতায় শীত নেই' সুতীর্থ পকেটের ভেতর থেকে হাত বার করে এনে বললে।

'কোটের নিচে শার্ট নেই তোমার?'

'না এ লঙ কোট।'

'গরম?'

'গরমের দিনে পরা যায়।' সুতীর্থ বললে।

মণিকা বেতের চেয়ার থেকে উঠে একটা সোফায় ঠিক হয়ে বসে বললেন, 'হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়ে সর্বনাশ ঘটাতে পার। তুমি অন্তত একটা চাদর গায়ে দাও না কেন? বোস, তোমার জন্যে একটা ধোসা নিয়ে আসছি।'

'এখন তো ঘরে ফিরেছি। বেশ গরম লাগছে ঘরের ভেতর। যখন বাইরে বেরুব তখন দিও ধোসা।'

'তোমার লেপ নেই?'

'কম্বল আছে।'

'লেপ তৈরি করাও না কেন?'

'আগে পরিবার এসে নিক।' সুতীর্থ সিগারেট বের করে জ্বালিয়ে নিল।

'রাত হয়ে গেল উঠি।'

'অংশুবাবু তো ডাকবেন জেগে উঠেই, তখন গেলেই হবে। পৌছে দেব তোমাকে—'

'তার মানে?'

সুতীর্থ সিগারেট জ্বালিয়েছিল, কিন্তু না টেনেই নিভিয়ে রাখল, টানবার ইচ্ছে ছিল না তার, মণিকা দেবীও মুখোমুখি বসে আছেন; টানবার রুচি নেই; সিগারেটটা কোটের পকেটে রেখে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মণিকা বললেন, 'মুটিয়ে গেছি, শরীরে বাত ধরেছে, ওঠানামার পথে একজন লোক চাই বুঝি আমার? তোমার আগে কুতবমিনারের মাথায় চড়ব গিয়ে আমি, সুতীর্থ তুমি নিচে পড়ে হাঁপাতে থাকবে। চলো, যাবে নাকি!'

'কোথায়-কুতবে?'

'চলো অক্টারলোনিতে।'

'ওঠা যায় নাকি ওটায়?'

'চলো দেখে আসি–কে আগে ওপরে ওঠে–মোটা না রোগা, ঢেমনা না লাউডগা; কে কাকে ছাদে পৌঁছিয়ে দেয়, মাটিতে নামিয়ে আনে-রকমটা দেখে আসা যাক আশ মিটিয়ে-'

'চলো, দেখে আসি,' সুতীর্থ বললে, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে মণিকা মজুমদার। তুমি ভেবেছ, আমি তোমাকে বেতো বলেছি, তা নয়; তোমার বাত নেই, বেশ সুন্দর ছেঁচো শরীর, বেশ লম্বা ছাঁদ। ছিপছিপে চেহারা হলেই অনেকের ভালো লাগে। আমার দেখে শুনে রয়ে সয়ে লাগে: খুব খারাপ হতে পারে, আমাদের দেশে প্রায়ই মড়াদের ওরকম চেহারা হয়। সুস্থতা না থাকলে সুন্দরী হওয়া যায় না কোনো দেশেই, আমাদের এ দেশে তো নয়ই। তোমাকে ওপরে পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলুম-অন্য কারণে। চলো, তাহলে–'

'কোথায়?'

'অক্টারলোনি মনুমেন্টে–'

'এত রাতে?'

'তুমি যাবে বলছিলে?'

'ট্রাম বাস তো চলছে না এত রাতে।'

'ট্যাক্সিতে চলো।'

'ওপরে একটা শব্দ শুনছ না?'

'কই না তো।'

'আমার মনে হয় জেগে উঠেছেন–'

সুতীর্থ মণিকার চোখের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করে নিচ্ছিল সে চোখে ঘুম ঘনিয়েছে না আরো কিছুক্ষণ জেগে থাকার ইচ্ছে–ওপরে না গিয়ে সুতীর্থের এই নিচের ঘরে বসে থেকে।

'নাকি অমলাই দুঃস্বপ্ন থেকে কেঁদে উঠল। শুনলে না তুমি?' মণিকা বললেন।

'ও কিছু নয়, তোমার মনে বাঁধা। এই বারে শীত পড়েছে।' সুতীর্থ র‍্যাকের থেকে একটা জহর কোট নামিয়ে গায়ে চড়াল।

'সারা রাত তোমাকে জাগাতে হয় বুঝি মণিকা দেবী, অংশুবাবুর হাঁপানির টান, তোমার মেয়ের–'

'মেয়ের জন্যেই আমার ভাবনা বেশি। কি যে সব বাজে বকে ঘুমের ঘোরে সারা রাত। তা ছাড়া ওর হার্ট ভাল না লাংসও খারাপ। একটুতেই সর্দি-কাশি ধরে যায়, একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না, অ্যাঞ্জার্স খাওয়াচ্ছি।'

'অ্যাঞ্জার্স তো পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল। পেলে আমিও খেতাম।'

'তুমি? কি রোগ হল তোমার? সর্দি–কাশির ধাত নয় তো। অ্যাঞ্জার্স কালো বাজারে পাওয়া যায়। আমি অবিশ্যি কন্ট্রোল যোগাড় করে দিতে পারি। তোমার চাই?'

'অংশুবাবুর ধরে অ্যাঞ্জার্সে?'

'ধরা ধরি' একটা ক্লান্ত রক্তকণিকা যেন আস্তে মোচড় খেতে না খেতেই নিটোল দিব্য হয়ে বেরিয়ে এল মণিকার নিঃশ্বাসে; বললেন, 'উনি ও-সবের বাইরে চলে গেছেন।'

'ওর হাঁপানি কি কিছুতেই সারানো যাবে না?'

'এ তো সারবার রোগ নয়। ও'র যা বয়স, ও বয়সে এ রোগ সারে না আর। সব রকম চিকিৎসাই হয়েছে, দৈবী ওষুধও যেখানে যা খোঁজ পাওয়া গেছে–মানুষ সেধে দিয়ে গেছে। মানুষের হাত পা ধরেও কত কি যোগাড় করে নিতে হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, তিতিয়ে গেছে সব–' বলতে বলতে কেশে উঠলেন মণিকা। মনে হল, পাঁজরের ভেতর থেকে একটা গলিত ব্যাং হাঁকড়ে উঠেছে; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই গায়েব হয়ে গেল সেই কুৎসিত ক্লিষ্ট প্রাণী, পটের সৌন্দর্য নিয়ে বাংলার পটের অন্তঃকৌমুদীর আলো নিয়ে ফিরে তাকালেন মণিকা দেবী।

'তোমারও ঠাণ্ডা লাগল'–সুতীর্থ বললে।

'না, এটা ঠাণ্ডার কাশি নয়।'

'তা নয় হয়তো; অংশুবাবুর জন্যে বা আর কারো জন্যে সত্যমিথ্যা আবেগে অভিভূত হতে থাকলে শরীরের ভেতর কাজকর্মে একটু বাধা পড়ে, বুক ভারি হয়ে ওঠে কিছুটা গলায় শ্লেষ্মা আটকে যায়, কাশতে হয়, ভাবছিল সুতীর্থ।

'আমার এই কম্বলটা গায়ে দিয়ে বসো।'

'দাও, কিন্তু তুমি,'–কম্বল জড়িয়ে নিয়ে মণিকা বললেন, 'তোমার শীত করছে না? লং কোট জহর কোটে মানাচ্ছে?'

'খুব। আমি তো এখন ঘুমুচ্ছি না,' সুতীর্থ বললে, 'তোমার মেয়ে অমলাকে আমি একদিন দেখেছিলুম। তুমি কিছু মনে করবে না চমৎকার চেহারা ওর, কিন্তু ভেতরে যে জিনিস থাকলে পাঁচী পটলীও ছোকরাদের গুণ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখে–' সুতীর্থ কোটের পকেট থেকে সিগারেট বার করে নিয়ে বললে, 'অমলার তা নেই। ওর বাপের কাছ থেকেই এ সব পায়নি বলে মনে হয়।'

মণিকা দমে গেছেন মনে হল না, অপ্রীতও কি হয়েছেন? সুতীর্থের এসব কথা গায়ে মাখবার মতো মনে করেন বলে মনে হয় না। বললেন, 'ওর বাবা আমার চেয়ে ঢের উঁচুদরের মানী লোক; যা জান না সে বিষয়ে কথা বলতে যাও কেন?'

'সিগারেটটা কোটের পকেটে ফেলে দিয়ে সুতীর্থ একদৃষ্টে মেঝের একটা অকিঞ্চিৎকর ছকের দিকে তাকিয়ে ছিল।

'তুমি উঠলে?'

'তোমার কম্বলে বড্ড বেশি গরম।'

'তাই তো এরই মধ্যে ঘামিয়ে উঠেছ দেখছি।'

কম্বলটা সরিয়ে রেখে কপালের ঘাম মুছতে মণিকা বললেন, 'মেয়ে কি মার কিছু পায়নি?'

'পেয়েছে বই কি।'

'কি পেল?'

'তোমার রূপের অনেকটা। সবটা নয়। গোড়ার দিকটা অন্তত। ভবিষ্যতে এ রূপ কেমন হয়ে ওঠে দেখবার জন্যে আমি থাকব না। সত্যি গরম লাগছে। বড় নচ্ছার এই কলকাতার শীত। শীত যাকে বলে তা তো নেই–'

'কোটটা খুলে ফেলল?'

'আমাকে এক কাপ চা করে দিতে হবে।'

'এত রাতে? কিছু খাবে না?'

'না।'

'আমি তো তোমার জন্যে খাবার করে রেখেছি।'

'কোথায়?'

'আমাদের রান্নাঘরে; চাপা আঁচে চড়িয়ে রেখে এসেছি সব। বেশ গরম আছে।'

'কি আছে খাবার?'

'ভাত ডাল মাছের তরকারী–সবই–'

হাত পা খানিকটা কালিয়ে আসছে অনুভব করে সুতীর্থ কোটটা আবার এঁটে নিতে নিতে বললে, 'না, খাব না বেশি জিনিস কিছু। দেরাজে কমলা লেবু আছে; এক কাপ চা চাই।'

দই আর চা খেলে হয় না, সুতীর্থ?'

'কম্বল গায়ে দিচ্ছ যে আবার? শীত করছে?'

'কটা বাজল?'

'সাড়ে এগারো। একটার সময় চা হলে চলবে।'

'অত রাত অব্দি কার উনুনে আঁচ থাকে?'

'ইলেকট্রিক স্টোভটা–'

'কিচেনে নেই। সেটাকে তো সরিয়ে নিয়েছি।'

'কোথায়?'

'অমলার বাবার বিছানার কাছেই একটা তেপয়ের ওপর রেখে দিয়েছি। রাতে ও'র পিঠে কোমরে সেঁক দিতে হয়; সারা রাতই। একটার সময় তুমি কেন চা খাবে?'

'তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করা যাক। একটা দেড়টা নাগাদ।'

'আমাকে এখুনি উঠতে হবে–'মণিকা বললেন। সুতীর্থ তাকিয়ে দেখছিল মণিকা দেবীর চোখের ভেতর কতখানি উঠবার উপক্রম রয়েছে, কতটুকু আরো দু-চার মুহূর্তে বসে থাকার সঙ্কল্প–

'ভাড়ার কথা বলব ভাবছিলুম তোমাকে। পনেরো টাকা বাদ দিয়ে দু-মাসের ভাড়া দিয়েছ তুমি। কিন্তু আগেকার আরো কয়েক মাসের ভাড়া বাকি আছে।' মণিকা বললেন।

'এই রকমই বাকি পড়ে থাকবে আমার।' সুতীর্থ মণিকার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'দু শো আড়াই শো টাকার ভাড়াটে বসাতে পারি সেলামী পেতে পারি। আজকাল আমাদের টাকার দরকার। ওঁর ভালো চিকিৎসা করাতে হবে-হয়তো চেঞ্জে যেতে হবে। ভাড়ার টাকা ছাড়া আমাদের তো উপায় নেই কিছু; কোনো দিক দিয়ে কোন আয় নেই আর।'

এবারেও সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলবার জন্যেই যেন জ্বালিয়েছিল সুতীর্থ, কিন্তু নিভিয়ে দিল না, ধীরে ধীরে টেনে যেতে লাগল। মণিকা বসেই ছিলেন–সুতীর্থ কোনো কথা বলবে কি না বলবে সে সবের প্রতীক্ষায় নয় হয়তো–এমনিই একটা অপরূপ হেতুপ্রভব অহেতুকতার পরিমণ্ডলের ভেতর।

'আমি তা হলে চলে যাই মণিকা দেবী–'

'কোথায়?'

'কলকাতা ছেড়ে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কলকাতা ছাড়তে হবে কেন? চাকরি ছেড়ে দিয়েছ নাকি? দেও নি? তা হলে কি—বাড়ির অভাব? তা কলকাতায় কে বাড়ি পায় আজকাল। একটা কাজ কর তুমি। মণিকা হাতের পাশের কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললেন, উনি আজকালই অমলার বিয়ে দিতে চান, তুমি একটি ছেলে যোগাড় করে দাও।'

সুতীর্থ সিগারেটে দু-চারটে টান দিয়ে চুপ করে ছিল, নিষ্ক্রিয়তায় রাতের ঠাণ্ডায় নিভে গেছে সিগারেটটা। সেটাকে হাতের কাছে দেরাজের ভেতর ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বললে, 'ও রকম ঘটকালি করে কি ভালো বিয়ে হয়?'

'আমাদের তো হয়েছিল।'

তা হয়নি যে তা সুতীর্থ জানে; মনকে চোখ ঠার দিয়ে অংশুবাবুর সঙ্গে বনিবনাও করে নিয়েছেন মণিকা দেবী। এঁদের দু'জনের বিবাহ মিলন তাসের বাড়ি নয়, তবে খুব শক্ত বাড়িও নয়। নানারকম ভূমিকায় চিড় খেয়ে আসছে; সে রকম কোন বিষম ধাক্কায় কি হয় কে জানে। সে সব ধাক্কা আসে না অবিশ্যি আমাদের দেশের এই সব ঘরানা মহিলাদের জীবনে। এলেও তা নিয়ে আড়ালে ভাপে রান্না তৈরি হয়—মৃত্যুঞ্জয় সূর্যে কোন শস্য ফলায় না।

'তোমার আর অংশুবাবুর বেলায় খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে, মানতে হবে; কিন্তু আগেকার সে সব দিন কোথায় এখন আর? তারপরে তো আরেক পৃথিবী এসে পড়েছে—'

সুতীর্থের কথায় কান না দিয়ে মণিকা বললেন, 'অমলার জন্যে ভালো বর জুটিয়ে দেবে। পারবে তুমি। এ বিয়েতে উনি এত খুশী হবেন যে, এ তিনটে ঘর তোমাকে আগেকার প্রি-ওয়ার রেটে ছেড়ে দেবেন; দু-চার মাসের ভাড়া বাকি পড়ে থাকলেও খুঁৎ-খুঁৎ করবেন বলে মনে হয় না।'

জানালা দিয়ে হু-হু ঠাণ্ডা আসছিল—শীতের রাতের হাঁ করা মুখ থেকে উদগারিত ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক। কখন যে খুলে ফেলেছে গায়ে কোট ছিল না সুতীর্থের হাড়ে কাঁপুনি লেগে গেল যেন তার; বললে, 'আমি কি করে অমলাকে বিয়ে করি মণিকা দেবি, সে কি আমাকে ভালোবাসে?'

উত্তর দিকের দুটো জানালাই বন্ধ করে দিতে গেল সুতীর্থ। ফিরে এসে মণিকার মুখোমুখি দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'ভালোবাসে না যে তার কোন প্রমাণ পেয়েছ সুতীর্থ?'

'ওর বয়স কুড়ি আমার চল্লিশ বেয়াল্লিশ পেরুল। কি করে ও আমাকে ভালোবাসবে?'

'তুমি তো ওকে ভালোবাস।'

'তাও তো বলতে পারি না। আমার পরিবার রয়েছে।'

ঘণ্টা খানেক পরে সুতীর্থের জন্যে চা এল ওপর থেকে খুব ভাল চা অবিশ্যি; টি-পট সুদ্ধু পাঠিয়ে দিয়েছে: দুধ চিনিও যা চাই সবই আছে। কিন্তু যে চাকরটা দিয়ে গেল তাকে হয়তো লাথি মেরে ঘুম থেকে ওঠানো হয়েছে—এমনই বিরস বেপরোয়া মুখ তার।

কী করবে সুতীর্থ। সারা রাত বসে চা খেল সে। ঘুমিয়ে পড়ল বেলা সাতটায়।

সাত

বেলা দুটোর সময় সুতীর্থ জেগে উঠল।

অফিসে যেতে হবে। বেশ চেপে দাড়ি গড়িয়েছে, কিন্তু সে সব গ্যাঁজ ট্যাজ কামানো দরকার মনে করল না। চান করল না। মাথা ধুয়ে মুছে চুল আঁচড়ে কাপড়-চোপড় বদলে নিল; ঘরদোর খোলা রেখেই বেরিয়ে যাবে ঠিক করল : কী আছে তার ঘরে। দু'একটা লেখার খাতা ছাড়া; আর যদি কিছু চুরি যায়, বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে সে সব, কিন্তু মাঝে মাঝে মন স্থির করে জীবনের খুব পরিষ্কার মুহূর্তে যা সব লিখেছে সুতীর্থ সেগুলোকে কেউ সরিয়ে নিয়ে গেলে—কিন্তু কে সরাবে—কিন্তু কেউ সরিয়ে নিয়ে—কিন্তু কেউ সরাবে না—কিন্তু কেউ সরিয়ে যদি নেয় তাহলে ওরকম সব পরিচ্ছন্ন প্রকাশের সুযোগ আসবে কি তার জীবনে আবার; আসতে পারে হয়তো; কিন্তু যা হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে; সেটা আর ফিরে আসবে না; নতুন কিছু আসবে; কিন্তু পুরোনোটারও দরকার ছিল।

নিচে নামবার সময় বারান্দায় বেরিয়ে এসে সিঁড়ির দিকে চলেছে, এমনিই তেতলার দিকে চোখ পড়তেই অমলাকে দেখা গেল—রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে; —সুতীর্থকে দেখেও সরে গেল না; চোখে চোখ পড়ল; মেয়েটির অবসর ছিল-হয়তো ফুরোবার নয়। কিন্তু সুতীর্থকে কাজে যেতে হবে; মেয়েটির মা যদি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে কাজে ফাঁকি দেবার কথা ভেবে দেখতে পারা যেত। কিন্তু মণিকা কোথায়, সে কি আর শিগগির দেখা দেবে। সংসার ও সময়ের নিয়মে স্ত্রীলোকটি আজ মা, অংশুবাবুর স্ত্রীও, কিন্তু বয়সে মনের গড়নে সুতীর্থের নিকটতম আত্মীয় তো মণিকা; সময়ের কণিকাগুলো ঠিকই আছে, কিন্তু প্রবাহে খানিকটা তাল কেটেছে, তা না কাটলে কুড়ি বছর আগে মণিকাকে আরেক নির্ণয়ের ভেতর পাওয়া যেত খুব সম্ভব—সময়ের সব রকম সমাবেশ একই আনন্ত্যে নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে যদিও। অমলাকে কেন গেঁথে দিতে চায় সুতীর্থের সঙ্গে মণিকা? আঠারো উনিশও হয়নি অমলার; আঠারো উনিশের অনেক মেয়ে অবিশ্যি ষাট বছরের প্রবীণ পুরুষকেও হাঁচিয়ে ছাড়ে; অব্যর্থ, অলজ্ঘ্য বিষয়বুদ্ধি তাদের; কিন্তু অমলা সে জাতের মেয়ে নয়, ওর মন দশ-বারো বছরের শিশুর মত।

অমলার সঙ্গে কথা বলে দেখেছে সুতীর্থ? না, তা দেখেনি। দরকার বোধ করেনি। সহমিলনের জন্যে এ মেয়েটিকে খানিকটা স্পষ্ট মাঝে মাঝে মনে হতে পারে, কিন্তু অন্য কোন অন্তরঙ্গতার জন্যে নয়। কিন্তু সবরকম মিলনের স্পৃহা যে চরিতার্থ করতে না পারে তার সঙ্গে কি করে প্রেম হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস ধরতে হবে। পোয়াটাক মাইল পথ হেঁটে যেতে হবে। সুতীর্থ হন হন করে হাঁটতে লাগল। কাল অফিসে সে যায় নি, আজ যাবার কথা ছিল এগারোটার সময়, কিন্তু এরি মধ্যে আড়াইটে বাজিয়ে দিয়েছে। যেখানে বাস দাঁড়ায় সে জায়গাটা কি যে অখাদ্য; পাশের ফুটপ্যাতে সিমেন্ট নেই, সবই কাদামাটির; কাছেই একটা মস্ত বড় বিশ্রী সরকারি কিচেনের উটের মত উনুনগুলো দিনরাত জ্বলছে, কিংবা ক্রমাগত নতুন কয়লা খেয়ে ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। ফুটপাতের ওপর টিনের চেয়ারে বসে চব্বিশ ঘণ্টা শিখদের আড্ডা, চা খাওয়া, সৎ শ্রীআকালের একান্ত উপলব্ধির মত স্থিরতা কখনো-সেটার জিগিরের মত কেমন একটা বিদঘুটে কটকটে ভাব মুখে চোখে অন্য অন্য সময়; দড়ির খাটিয়ায় বসে শুয়ে এদিকে শিখদের ওদিকে পশ্চিমাদের হল্লা। অনবরত কিচেন থেকে ফেন নোংরা জল পচা রাবিশ গড়িয়ে ছিটকে সমস্ত জায়গাটাকে প্যাচপেচে আস্তাকুড় করে রেখেছে। কলকাতার বিরাট হিক্কার থেকে ওগরানো গরু মহিষ ষাঁড়ের নিরবচ্ছিন্নতা এখানে প্রবল। এই ভাগাড়ের ভেতর দাঁড়াবার মত কোনো একটা জায়গা বেছে নিলেও এদের তাড়নায় সেখান থেকে হড়কে পড়তে হয়–নোংরা বাঁচিয়ে কাদা বাঁচিয়ে। অথচ বাসগুলো ঠিক এই জায়গায় এসেই দাঁড়ায়। এই সব রাবিশ ভেঙ্গে একটা মস্ত বড় গলগলে নর্দমা টপকে বাসে উঠতে হবে।

সমস্ত কলকাতা শরহটাকে খুব ভাল করে ঢেলে সাজানো দরকার; কলকাতার সব কিছুই তো হচ্ছে, কিন্তু একটা খাণ্ডবগ্রাসী অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে না–লন্ডনে যেমন হয়েছিল; তারপর উদয় হল ক্রিস্টোফার রেণের নতুন শহরের। এখানে অগ্নিকাণ্ড অতিবিলম্বিত হচ্ছে; স্বাধীনতা আসছে হয়তো, কিন্তু খুব বড় আগুন বা বড় বিপ্লব না এলে রেণ আসবে না কলকাতার রাস্তা ঘাট অলিগলি ঘরবাড়ির ব্রণ খচিত এই বিরাট দুর্মুখেরও পতন হবে না তা হলে। বীথি–ঝাউ দেওদার শাল বকুল সিসু শিরীস অর্জুন সাগুদানার গাছের বীথি–পরিচ্ছন্নতা দেখার নিঃশ্বাস ফেলার ব্যাপ্তি নিরিবিলিভাব শত শত মাইল জায়গা নিয়ে বিভিন্ন ঝর্ঝরে নির্থল নগরীগুচ্ছের ভেতর বিতরণ একটি নগরীর,–এ রকম হলে হত, (মন্দের ভাল হিসেবে অন্তত) মনে হচ্ছিল তার। বাসস্ট্যান্ডের নিঘৃণ আবর্জনার থেকে দূরে সরে একটা চলন্ত বাসে উঠতে চেষ্টা করল সে। পড়েই যেত–চাপা পড়ে হাড় মাংস ছিবড়ে হয়ে যেত, কিন্তু হাতল চেপে ধরে ছুটন্ত বাসটার সঙ্গে কায়দা বেকায়দায় অদ্ভুতভাবে লড়ে হঠাৎ কখন সার্কাসের ওস্তাদের ডিগবাজিতে শরীরটা তার বাসের ভেতর ঢুকে গেল–কতগুলো প্যাসেঞ্জার হা হা করে তার পিঠ চাপড়ে তাকে সব বুঝবারই অবসরই দিল না।

'বড্ড বেঁচে গেছেন ভট্টচার্য্যি মশাই।'

'এই যে আসুন, যাত্রামোহনবাবু।'

'যাত্রাভঙ্গবাবু বল।'

'পরমাইর জোর আছে–'

'তা আছে বটে, তবে একটু অদলবদল হল।'

'লালমোহনের আগা কেটে মোহনলাল হল।'

বাস হু হু করে ছুটে চলল; হু হু করে ছুটে চলল।

বাসে ক্বচিৎ বসবার সুযোগ পায় সুতীর্থ। আজও হন্তদন্ত গলদঘর্ম ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হল তাকে। বাসে যারা দাঁড়িয়ে থাকে সে সব মানুষদের সকলেরই তিনটে হাতের প্রয়োজন। এক হাতে মাথার ওপর রড ধরে আছে, আর এক হাতে হ্যান্ডব্যাগ পোটলা সিগারেট খাওয়া, কিম্বা সে হাত নিজের জামা, চাদর, বিশেষ করে, পকেট বাঁচাতে ব্যস্ত; তৃতীয় হাতে তবু যথাস্থানে ঢুকিয়ে যথাসময়ে পয়সা বের করে দিতে হয় কন্ডাক্টারকে টিকিটের জন্যে। বিড়ির গন্ধ, সিগারেটের ধোঁয়া, আগুনের দানা কণা–ভাল চাদরটা বুঝি গেল, পাঞ্জাবিটাকে ঝরঝরে করে দেবার ফুটকি ফুলকি জ্বলছে চারদিকে। ও লোকটার সমস্ত মুখে সদ্য বসন্তের দাগ–খোসা উড়ছে। এ লোকটার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো যায় না, এমনই দুর্গন্ধ মুখে না গায়ে না কোথায়, তবুও লেপটে দাঁড়াতে হচ্ছে লোকটার মাংস ঠেসে-পেছন থেকে ঠেলা খেয়ে, মানুষের গায়ের ঘষায়। ভারী আরাম পেয়ে শিব দৃষ্টিতে বাসের চাতালের দিকে তাকিয়ে আছে ও লোকটা। ডান দিকের মানুষটার গরমির রোগ, সমস্ত গায়ে মুখে দাঁতের মাড়িতে কি সব চাকা চাকা দাগ; মাড়ি কেলিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছে লোকটা, হাসলেই মাড়ি বেরিয়ে পড়ে, হাসছে কারুর কথার ফোড়নে নয় হয়তো–এমনিই, জীবনের সৌকর্য উপলব্ধি করে; বাসের মেয়েমানুষদের শ্রী ছন্দও হাসি জোগাল তার? এ পাশের এই ফড়ফড়ে টিকি ওড়ানো লম্বা বেহারী কুর্মী না মাহাতোর সমস্ত শরীরটা কম্প জ্বরে ভেঙে পড়ছে; পুরু কালো ঠোঁট, ইঁদুরের মত ব্যাঙের মত কালো দাঁতগুলো উঁচিয়ে আছে, কোনোটা আছে, কোনোটা নেই, জিভ বেরিয়ে পড়েছে, লালা ঝরছে–কী রোগ এই মানুষটার?

দেহাত ছেড়ে কেন কলকাতায়? কেন বাসে চড়েছে?

মেয়েদের সিটে মেয়ে দুটিকে অসুন্দর বলা যায় না। এদের ভেতরে একজনের অন্তত চেহারার গড়নে ভারী মনোরম মোড় রয়ে গেছে; চোখে লাগে; তাকিয়ে থাকলে কিছুটা চঞ্চল হয়ে ওঠে মানুষের নাড়ী, মানুষের মন। কিন্তু এই মেয়েটিকে অন্তশ্চক্ষে সত্যিই অবদানের মত পাওয়া সহজ হলেও এর সঙ্গে মৌখিক আলাপ করা কঠিন–এমনই অন্তর্বিরোধ রয়ে গেছে সমাজের–মানুষের মনের লেনদেন বিনিময় বিশ্বাস ও ব্যাপ্তির দিক দিয়ে। এ মেয়েটির সঙ্গে কোনোদিন আর দেখা হবে না। মণিকা দেবীর চেয়ে মেয়েটি বরনীয়া নয় অবিশ্যি, অমলার চেয়ে সুন্দর নয়, পথে ঘাটে যে নারীর সঙ্গে দেখা হয় তাকেই ভালো লাগে, সে রকম আবেগ সাচ্ছল্যের একেবারে উল্টো অন্য এক পৃথিবীর মানুষ হয়েও এই মেয়েটিকে দেখে সুতীর্থের ভালো লেগেছে–সত্যিই, মনে হয়েছে এর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধে এলে জীবনের দু-একটা আবছায়ার ঘোরে আলো এসে পড়ত। অন্য কারুর কারুর নানারকম সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোড়লে, খিচে আলো ফেলছে হয়তো মেয়েটি। সেখান থেকে যুগপৎ সুতীর্থকেও আলো দেবে? সমাজসম্মত হবে না, সুসঙ্গত হবে না। সব মানুষের সঙ্গেই সব মানুষের কথা বলবার নিয়ম নেই। ভাবতে ভাবতে মেয়েটিকে ছেড়ে অন্য দিকে তাকাল সুতীর্থ। আরো ভিড়, ঠেলাঠেলির ভেতরে এমন জায়গায় গিয়ে পড়ল যে মেয়েটি বাসে আছে কি নেই বুঝবারও উপায় রইল না তার। মেয়েটি চোখের আড়ালে যেতেই চুম্বকের টান কমে গেল বুঝি তার; তা হলে বয়সই হয়েছে সুতীর্থের; মেয়েটির সম্পর্কে বিতর্কশক্তিও ঢিলে হয়ে যেতে লাগল সুতীর্থের মনে। এ মেয়েটি কিছু নয়, মনে হল তার; একে এখুনি ভুলে যাবে সে। চলাফেরার মত সহজ স্বাভাবিকতা ছাড়া আর যে কোথাও কিছু ছিল সে কথা মনেই পড়ে না। কে যেন পা মাড়িয়ে দিল, আরো চেপে মাড়িয়ে দিয়ে গেল সুতীর্থের বাঁ পায়ের গেড়টা; পাঁজরের ওপর কনুইটা এসে পড়ছে যেন কার বারবার; আস্তে সরিয়ে দিতে গেলে সে লোকটাই চোখ রাঙায়; পিছু থেকে যারা ঠেলছে সুতীর্থকে তারা মেয়েমানুস নয়, কিন্তু সুতীর্থের সামনে যে কালো ঢ্যাঙা বদমায়েশটা সুট পরে দাঁড়িয়ে আছে (অফিস পাড়ার একজন খানদানী অফিসার হবে) সুতীর্থ ছাড়া কেউই আর তাকে ঠেলছে না যেন এমনই ভাবে দাঁত কিড়মিড় করছে সে; লোকটার বিরাট পশ্চাদ্দেশে বলাৎকারজনিত উল্লাস দেওয়া ছাড়া সুতীর্থের আর কোন কাজই নেই যেন পৃথিবীতে অনুভব করে কী ভীষণ মরীয়া হয়ে উঠেছে লোকটা।

কয়েকজন লোক নেমে গেল, সুট পরা ধুমনো সামনের সিটে জায়গা পেল। বাসটা পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের কাছাকাছি থামতেই মেয়ে দুটো নেমে গেল। দুপুরবেলা এই বাঙালি মেয়েরা এদিকে কোথায় যাচ্ছে? যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, বিদেশী সৈনিক ও নাবিকেরাও আজ সরে পড়েছে অনেকেই–হয়তো সকলেই–নিজেদের সাগর পারে। মন্বন্তর মিলিটারী ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রায় সব ব্যাপারেই মৌতাত অনেকদিন হয় মিইয়ে গেছে। মেয়ে দুটো পার্ক স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে চলছিল। তাদের চলে যাওয়ার স্ট্রিম লাইনের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল নিতান্ত জীবনমরণের কাজের ব্যাপারেই চলেছে, কোন নিরবলম্ব চারণায় নয়।

মেয়ে দুটির পরিত্যক্ত জায়গায় সুতীর্থ গিয়ে বসেছিল। বাস কন্টিনেন্টাল হোটেলের পাশে এসে দাঁড়াতেই–এইখানেই বাস প্রতিদিন দাঁড়ায় কিছুক্ষণের জন্যে–এই ভীষণ মানুষঠাসা গাড়ির ভেতর যাত্রী প্রবেশ করতে লাগল–একজন সাহেবও ঢুকল। সাহেবটি যুবক, বোধ হয় স্কচ–ছিপছিপে ছোট মানুষ-সুট টাই হ্যাট সবই রয়েছে, ক্লাইভ স্ট্রিটের মহাজন না ভেবে সুতীর্থ একে পাদ্রী বলে ঠিক করল তবুও–স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রফেসর–একে সুতীর্থ আগেও দেখেছে যেন কোথাও। অধ্যাপক পাদ্রীর মত মুখে একটা সঙ্কুল স্বয়ংতুষ্টির ভাব এর সম্প্রতি কেমন যেন একটা বিমর্ষ নিষ্ফলতার ধরন-ধারণে নিঃশব্দ হয়ে আছে। এর কারণ সুতীর্থের কাছে অস্পষ্ট মনে হল না। আজ সকালবেলার খবরের কাগজেই সে পড়েছিল যে বিলেতের শ্রমিক গভর্নমেন্ট জওহরলাল ও জিন্নাকে মেলাতে পারল না। কংগ্রেস ও লীগ যে পরস্পরের অমৃতত্ব নিয়ে সমান্তরাল সেটা টের পেয়ে তারা থ হয়ে গেছে; রয়টার খবর দিয়েছে যে,

দ্য ব্রিটিশ ফীল হেল্পলেস অ্যান্ড থরোলি ডিজঅ্যাপয়েন্টেড; সেই অন্তর্বেদী বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যের সৎ সহজ সুচিমুখ নিয়ে হাজির এই সাহেব। কিছুক্ষণ আগেই এই বাসের ভেতরেই একটি মেয়ে ঈষৎ অভিনিবিষ্ট করে রেখেছিল সুতীর্থকে, এইবারে এই সাহেবের দুটো কটকটে রাঙা কান থিতোনো কেমন একটা বিমর্ষতায় বিভোর হয়ে আগেকার কথা একেবারেই ভুলে গেল সুতীর্থ। হোটেল কন্টিনেন্টালের কিনার ঘেঁষে উঠেছে সাহেব-চলেছে ডালহৌসি স্কোয়ারে–অথচ কাজ তার স্কটিশ চার্চ কলেজে নয় কি?

'আপনাকে আমি এগজামিনার্স মিটিঙে দেখেছি হয়তো'–সাহেবকে বললে সুতীর্থ–' ইংরেজিতে।

'আমাকে!' সাহেবটি বিস্মিত হয়ে আপাদমস্তক সুতীর্থের দিকে তাকাল, বাংলায় কথা বললে, উচ্চারণও অস্পষ্ট নয়–

'আপনি ভুল করেছেন–' সাহেব বললে।

এগজামিনার্স মিটিঙ কাকে বলে সুতীর্থকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এগজামিনার্সদের মিটিঙ,' বললে সুতীর্থ।

'ওঃ, সেই কথা' কানের নাকের গালের মুলো পীচ টোমোটোর মত রক্তাক্ততার কণিকাগুলোকে আস্তে মুচড়ে হাসিয়ে সাহেব বললে, 'আমার ভ্রাটা স্কটল্যান্ডের গ্ল্যাসগো ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার, আমি নই, আমার ভ্রাটার সঙ্গে হনেকে আমার আকৃটির ভুল করে ঠাকে।'

'আপনি কি স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক নন?'

'আমি নই, আমার ভ্রাটা গ্ল্যাসগো ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার, বর্টমানে গ্ল্যাসগোটে আছেন।'

'আপনি কি ফাদার ফরদিঙ্গেল ফার্গুসন ম্যাক কার্কম্যান নন?'

'আমি নই, আমার ভ্রাটা–'

সাহেব সুতীর্থকে অবিলম্বেই বললে, 'ফাদার কার্গুসন নামে কোনো ফাদার কলিকাতায় আছে বা ছিল বলিয়া আমি জানি না। আমর ভ্রাটার নাম হোরেস উইলিয়ামসন, তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক নন, তবে অধ্যাপক বটেন–'

'আপনি কি অধ্যাপক নন মিঃ উইলিয়ামসন?'

'আমি অধ্যাপক নহি, উইলিয়ামসন নহি, হামার নাম র‍্যামসে ম্যাকগ্রেগর।'

'ম্যাকগ্রেগর?' সুতীর্থ ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে বললে, 'তা হলে আপনার ভাই কি করে উইলিয়ামসন হন?'

'বাই দ্য বাই, স্কটিশচার্চ কলেজ আজকাল কি রকম চলছে?'

'বেশ ভালোই।'

'আপনি অধ্যাপক আছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সুতীর্থ বললে, সে ক্লাইভ স্ট্রীটে যাচ্ছে, সেখানেই কাজ করে।

'আমিও ক্লাইভ স্ট্রীটে যাচ্ছি। By the by, these professors–I mean British professors in Indian colleges—'

'Are you one of them?'

'Of course, not. I have already told you as much. There's is a peculiar lot—'

'The British feel helpless & thoroughly disappointed.'

yes, they do.'

'I hope you have seen today's paper.'

'I have. The British have done all that they had to do in the circumstances. They cna't do any more.'

সহসা একটা প্রবল ধাক্কায় সমস্ত বাসটা ধেনে-কেটে ধিড়িঙ্গেটড়ে উঠল কেন–বাঁই বাঁই, করে ঘুরে নেচে শূন্যে লাফিয়ে কি যে হয়ে গেল বুঝবার আগে সাহেবের সঙ্গে সুতীর্থের আলিঙ্গন সহমরণ শীৎকার দুর্দান্ত হামলার আকার ধারণ করল। টুপি ছিটকে পড়েছে–চশমা উড়ে গেছে–

ফুটন্ত গরম জলের ডেকচিটা যেন জীবন্ত হাঁস মুরগি হরিয়াল মরাল নিয়ে আট খেয়ে চীৎকার ক'রে উঠছে–একটা বাস হয়ে গেছে ডেকচিটা; ঝলসে পুড়ে সেদ্ধ হয়ে চিৎকার করে উঠছে মানুষের মাংস রক্ত কঙ্কাল সৃষ্টির অপর পিঠের বিরাট অন্ধকারে মিশে যেতে যেতে। সুতীর্থ গলা ছেড়ে রোল করে উঠল, 'পাকড়ো পাকড়ো–'

'পাকড়ো পাকড়ো শালা শূয়ারকা বাচ্চাকে পাকড়ো'–ম্যাকগ্রেগর সাহেবের গলা কেমন যেন বিকট বখাটের মত হাউ-মাউ করে উঠতে লাগল। মনে হচ্ছিল ম্যাকগ্রেগর ভয় যা পেয়েছে তার চেয়ে তামাশা অনুভব করছে ঢের বেশি; বাসে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ব্যাপারটাকে মোটামুটিভাবে বুঝে নেবার কোন তাগিদ তার না থাকলেও জিনিসটাকে পুরোপুরিভাবেই স্বায়ত্ত করে ফেলেছে সে; কিন্তু তবুও নিজের মনের খেয়াল-খুশিতেই যেন জিনিসটাকে নিয়ে শেয়াল বেড়াল হায়নার রগড়ে গর্জন করে উঠবার সাধ জেগেছে তার স্কচ কেল্টিক হৃদয়ে–

একটা দুর্বার দামাল খোকার মত ম্যাকগ্রেগরের চিৎকার শুনতে শুনতে সুতীর্থ হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছিল ঃ ব্রিটিশের স্বভাব তো এরকম নয়, এ রকম কি? এ লোকটা কি খাঁটি ব্রিটিশ? মজা করছে? বিপদের মুখে এমন ফূর্তিবজ্জাতি হয়তো স্পেনিশরা করে কিংবা ফরাসীরা–ব্রিটিশরা থাকে তো একটা দানবীর নৈঃশব্দ্যে পাথরের সানুর মতন উচিয়ে।

একটা মিলিটারি লরীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল সুতীর্থদের বাসটার। দু'জন লোক মারা গেছে; জখম হয়েছে কজন এখনও তার হিসেব পাওয়া যায়নি। আর্তের মতন চিৎকার করে উঠেছে অনেকেই; কাঁদছে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে–ভয়ে না বিভীষিকার অভিজ্ঞতায়, না হাড়গোড় হৃদয়, ভেঙে গেছে বলে–বোঝা কঠিন।

ম্যাকগ্রেগরের কিছু হয় নি–সুতীর্থেরও না। সাহেব সুতীর্থের বগলের ভেতর তার নিজের হাত ঠেলে চালিয়ে দিয়ে বললে, 'চলো–'

'কোথায়?'

'হেঁটে যাওয়া যাক। বাস ঠেকে হামরা খি করে বাহিরে এলাম'-এডের মট আমরাও টো মরে যেটে পারটাম–'

'দু'জন মরেছে শুধু, মরেছে কিনা ডাক্তার না এলে বোঝা যাবে না। আপনার হাড় মাংস কার্টিলেজ সব ঠিক আছে তো ম্যাকগ্রেগর?'

'ঠিক আছে–'

'ডুজন প্রাণী মরে গেছে আই বিলিত'–ম্যাকগ্রেগর 'মৃত' লোক দুটিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ভয়ে–হার্ট খারাপ ছিল–শক-মে বি ব্রেণ মেহারেজ–'

'এ গাড়িতে কোন মেয়ে ছিল না?'

'না।'

'কোন শিশুও নেই?'

'থ্যাঙ্ক গড, নো।'

'আগুন জ্বলে উঠেছে!'

'এখনি ফায়ার ব্রিগেড আসবে।'

'এইসব লোকদের কি হবে?'

'নন অব আওয়ার কনসার্ন–রেডক্রস টেকস আপ–'

সুতীর্থকে তবুও অনর্থক এইসব মড়া আধমড়াদের সেবা শুশ্রূষা সঙ্গতির একটা বিমূঢ় প্রয়াসের ভেতর জড়িয়ে পড়তে দেখে ম্যাকগ্রেগর সাহেব চলে গেল; যাবার আগে সুতীর্থকে নিজের কার্ড দিয়ে গেল, সেই ঠিকানায় যে কোনোদিন–সনডে একসেপটেড–সুতীর্থের সঙ্গে রাত আটটার পর সে দেখা করতে রাজি।

অতএব আজ আর অফিসে যাওয়া হল না। পরদিন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে অফিসে গিয়ে নিজের টেবিলে বসতেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুতীর্থের ঘরে ঢুকে বললে, 'আপনি আজ এসেছেন দেখছি।'

'ঠিক সময়েই এসেছি; না আজও দেরি হয়ে গেল? বসুন।'

'বসব না আমি।'

'সিগারেট?'

'সিগারেট সাধছেন আপনি আমাকে, বেয়াদবী হচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বেকুবি হচ্ছে আমার মল্লিক সাহেব।'

'তার মানে?'

'এ ঘরে এত চেয়ার থাকতে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন?'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর চারদিকে তাকিয়ে একখানা চেয়ারও দেখল না, বসবে না বটে সে, দাঁড়িয়ে থাকবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যাঁচ কষবে আর বাগড়া দেবে ব্যাটাচ্ছেলে—কিন্তু তবুও—চেয়ার নেই কেন?

সুতীর্থ উপলব্ধি করে কলিং বেল টিপতেই বেয়ারা এল।

'বেছে একটা ছারপোকা-টারপোকা নেই এরকম একটা চেয়ার নিয়েসো তো হে মনোমোহন।'

'চেয়ার নেই কেন এ ঘরে সুতীর্থবাবু?'

'আনছে মনোমোহন।'

'চেয়ার নেই কেন আট দশটা এই ঘরে!' হাঁকড়ে উঠল মল্লিক।

'আনছে মনোমোহন।'

'মনোমোহন কটা আনছে?'

'কটা চাই আপনার?'

'কটা চাই আমার? আমার চাই কটা?' মল্লিক টেবিলের ওপর দমাদম ঘুষি মারতে মারতে বললে, 'আমার কটা চাই? এটা আপনার অফিস? আপনি দিচ্ছেন?'

'অফিস আপনার। আপনি আমাকে দিচ্ছেন।'

'পথে আসুন। তাহলে কী করে আপনি আমাকে চেয়ার দিচ্ছেন?'

'আমি দিলুম কোথায় মনোমোহন দিচ্ছে।'

'মনোমোহন দিচ্ছে?' কেদোর মত চোখে সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে মল্লিক দাঁতে দাঁত ঘষার ভাব দেখিয়ে বললে, 'আর আপনি কি করছেন?'

'আমি আপনাকে বসতে বলেছি।'

'আমাকে বসতে? আপনি?'

'এই যে মনোমোহন চেয়ার এনেছে। বসুন। খুব বেশি ছারপোকা আছে এই চেয়ারে মনোমোহন?'

'হুজুর না—' গালে হাত দিয়ে মাথা কাৎ করে হেসে ভেঙে পড়ল মনোমোহন।

সুতীর্থ বললে, 'মনোমোহন তুমি যাও, অত হেসো না তুমি। মনোমোহন। কি আছে হাসবার? আমরা বড্ড গলদঘর্ম হচ্ছি। যাও যাও যাও—'

মনোমোহন চলে গেলে সুতীর্থ বললে, 'দাঁড়িয়েই তো রইলেন মল্লিক সাহেব—'

'মনোমোহনকে বরখাস্ত করব আমি।'

'কেন?'

'এটা আমার অফিস, মুখ সামলে কথা বলবেন সুতীর্থবাবু—'

'কি বলেছি আমি?'

'মুখ সামলে কথা বলতে বলেছি আপনাকে।'

'মনোমোহনকে বরখাস্ত করবার—'

'এ কথা এখন থাক, ওটা আমার জিনিস—'

মনোমোহনকে বরখাস্ত করবেন, তা করুন, কাল আবার তাকে কাজে বহাল করে দিলেই হবে।'

'কে করবে?'

'আপনার অফিস, আপনিই করবেন। বসুন।'

ঘরের ভেতর একবার পায়চারি করে নিয়ে সুতীর্থের টেবিল থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বললে, 'যাকে আমার অফিস থেকে তাড়িয়ে দিই, তার কান কেটে তাড়িয়ে দিই। সে দু'কান কাটাকে আবার কাজে বহাল করব আমি? কে দু'কান কাটা আছে এই অফিসে মনোমোহনের সঙ্গে এক জোয়ালে না যুতে দিলে পেট ফুলে ওঠে?'

'মনোমোহনকে তাড়িয়ে দেবেন?'

'ওর সঙ্গে যোগসাজসে কাজ না করলে যার পেট ফুলে ওঠে তার কটা কান কাটা সুতীর্থবাবু?'

'দুটো কান।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর পকেট থেকে চুরুট বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'আর তার যদি গণেশের মত ছটা মুখ থাকত, তাহলে কটা কান কাটা হত সুতীর্থবাবু?'

'বারোটা। রাবণের মত দশটা মুখ থাকত যদি তার তাহলে কটা কান কাটা হত?'

সুতীর্থের এ প্রশ্ন যেন বাতাসে উড়ে গেছে কানে পৌঁছয়নি এমনিভাবে চুরুট টানতে টানতে মনোমোহনের চেয়ারটার কাছে এসে দাঁড়াল মল্লিক।'

'এটা আমার অফিস, আমি যাকে খুশি রাখব, তাড়াব, যখন খুশি বসব, দাঁড়িয়ে থাকব। এসব বিষয়ে কারুর কোন হাত দেবার অধিকার নেই আমার অফিসে।'

'আপনি তাহলে দাঁড়িয়েই থাকবেন?'

'আমার খুশি আমি দাঁড়াব। আমার যখন নিজের মর্জি তখন বসব। আপনি আমাকে বসতে বলতে পারেন না তো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বসুন।'

'সুতীর্থবাবু।'

'আজ্ঞে-'

'কি বললেন আপনি এইমাত্র?'

'মনোমোহনকে তাড়িয়েই দেবেন? তাই জিজ্ঞেস করছিলুম-'

'আমাকে বসতে বলছিলেন না?'

'হ্যাঁ, বসুন।'

মল্লিক কব্জি ঘুরিয়ে হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নিল। চুরুট টানছিল, চুরুটের মুখে পুরু ছাই জমেছে সেটাকে টোকা মেরে ফেলে দিয়ে ফেটে পড়ে বলল, 'ভদ্রতা করে আপনাকে আমি আপনি বলি। আপনি আমার অফিসে আমার তাঁবে কাজ করেন। আমার তাঁবেদার-আমার অফিসের গোলাম আপনি।' বলতে বলতে খানিকটা রক্তের চাপ বেড়ে যাচ্ছে অনুভব করে, আর বাড়তে দেয়া উচিত নয় বুঝতে পেরে মল্লিক সংক্ষেপে সেরে দিয়ে বলল, 'সাব-অর্ডিনেট আপনি, মুখ ছোট আপনার, গালবাদ্যি বাজবে না। অথচ সেটাই বাজাতে চান আপনি। রড্ড বদ রোগ আপনার। বিদ্বান মানুষ হতে পারেন, কিন্তু আমার অফিসের গোলাম ছাড়া কিছু নন তো আপনি। বিদ্যে ধুয়ে বাইরে গিয়ে জল খাবেন, এ অফিসে নয়-'

সুতীর্থ নানারকম ফাইল নিয়ে বসেছিল। ফাইল নাড়ছে, চাড়ছে, লিখছে, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথা তবুও তার কানে যাচ্ছিল, কিছু বলতে গেল না সে। মল্লিক চুরুট টানতে টানতে পায়চারি করছিল ঘরের ভেতর; কি যেন বলবে বলবে ভাবছিল, কিন্তু বলা হয়ে উঠছিল না তার। চিঠি লিখতে লিখতে মুখ তুলে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'এই যে মিঃ মল্লিক, আপনি আছেন এখনও, আমি ভেবেছিলুম চলে গেছেন-'

'আমার সামনে আপনি সিগারেট খাবেন না সুতীর্থবাবু।'

ছাইদানিতে ছাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বললে 'এই তো-হয়ে এল।'

'দেখছেন আমি দাঁড়িয়ে আছি?'

'দাঁড়িয়ে আছেন, জীউকে কেন কষ্ট দিচ্ছেন মিঃ মল্লিক। বসুন।'

'সিগারেটটা ফেলে দিন।'

'দিতে পারি ফেলে, কিন্তু ফেলে দেয়ার চেয়ে মনোমোহনকে দিলেই তো ভাল হয়। আস্ত সিগারেটটা ফেলে দেব?'

'আপনার মুখের সিগারেট খাবে কেন মনোমোহন?'

'খাবে না মনোমোহন? মনোমোহন যদি না খায় তাহলে আর কাউকে তো দেখছি, না, কে খাবে আমার মুখের সিগারেট আমার নিজের মুখ ছাড়া?'

'সুতীর্থ কথার ফাঁকে ফাঁকে-হুশ হুশ করে নয়, বেশ আস্তে, আরাম করে পেটের ভেতরে শিবের জটায় ঘুরিয়ে এনে নাকমুখ দিয়ে জোরে ধোঁয়া বার করতে করতে সিগারেট টানছিল। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দেবার সময় এসে পড়েছে।

'আসুন, চলুন-'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

'আমার ঘরে; কথা আছে।'

সুতীর্থ গড়িমসি করে বললে 'বেয়ারা না পাঠিয়ে নিজে এসেই আমাকে তলব করছেন। ফলাফল যাই হোক না কেন, আপনার এই-'

'আসুন, কথা বলবেন না।'

'আপনি আপনার খাস কামরায় যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'যান তাহলে-' সুতীর্থ নিজের কাগজপত্র নিয়ে বসল।

নয়

সুতীর্থ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাজল সাড়ে এগারোটা। যান আপনার ঘরে গিয়ে অবসর মত একজন বেয়ারা পাঠিয়ে দেবেন আড়াইটার পর-'

'আড়াইটার পর?' বিজনহরির চোখে আগুন ঠিকরে উঠল, নিজেকে তবু সামলে নিল সে, চেয়ারটা নিয়ে বসে পড়ে বললে, 'এটা কি তোমার শ্বশুরবাড়ি সুতীর্থ?'

'সুতীর্থ কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, 'আমাকে তুমি বলে ডাকে আমার বড় সম্বন্ধী-বেয়াইও তুমি বলে-বেয়ানও-আমার কানে খুব মিষ্টি লাগে। কিন্তু পারবেন বেয়ানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে?'

মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠল মল্লিকের।

'এই তো আমাকে আপনি বলছিলেন-'

'বিজনহরিবাবু, আপনাকে আমি তো আপনি বলছি।'

'আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতীর্থ টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললে–'সকলেই সকলকে আপনি বললে ঠিক হয়, কিংবা সকলেই সকলকে তুমি। তুমি-আপনির পার্থক্যটা রাখা ঠিক নয়। তুমি আমাকে তুমি বলতে পার মল্লিক, কিংবা আপনি আমাকে আপনি বলতে পারেন। মনোমোহন তোমাকে তুমি বলতে পারে বিজনবাবু, কিংবা মনোমোহনকে আপনি বলতে পারেন আপনি। আমার মনে হয় আপনি বাদ দিয়ে স্রেফ তুমি চালানোই ভাল হয়, আয় পিজিয়ের দিন চলে গেছে–তুমি এসে পড়েছে।'

ডাইরেক্টরির একটা পৃষ্ঠায় এসে থেমে সুতীর্থ বললে, 'আমি অবশ্য আপনাকে আপনিই বলব মিঃ মল্লিক, তবে মাঝে মাঝে তুমি এসে পড়বে–যেমন এই একটু আগে এসে পড়েছিল তোমার। বাস্তবিক তুমির দিন এসে পড়েছে, তাই মনে হয় না তোমার?'

'ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো হচ্ছে, এই তো মনে হচ্ছে আমার–'

'রামছাগল খাবে বলে গোল্লায় যাচ্ছে যব।'

'গোল্লায় যাচ্ছে যব?'

'হুঁ।'

'জবারির কাঁধে চড়ে গোল্লায় গিয়ে উঠেছে যব?'

'জবারির কাঁধে?'

'সব রকম হারামজাদারা জড়ো হয় যেখানে সেখানেই জাল পেতে বসে জব্যরি।'

'জাল পেতে বসে?'

মিঃ মল্লিক চুরুট টেনে যাচ্ছিল, সুতীর্থ কি বলেছে তা সে উপলব্ধি করেছে মেজাজ গরম করতে গেলে, একটা কিছু হয়েই যাবে।–এক্ষুণি এই মুহূর্তেই।

–কিন্তু ছুঁচোবাজির মতনও মেজাজ দেখাতে গেল না মল্লিক।

চুরুটে আরো দু-চারটে টান দিয়ে বললে, 'অফিসের কাজে আপনার হাত আছে। বেশ সাফাই আছে মনে করেন আপনি। আপনাকে পেয়ে সুবিধা হয়েছে অফিসের, মাথায় ঢুকেছে আপনার। এ বিষয়ে পরে কথা হবে। কিন্তু অফিসের বাইরে আপনার কথা নিয়ে বলাবলি করে ওরা। বলে চরিত্র নেই।'

সুতীর্থ একটা ডেমি অফিসিয়াল চিঠি ফেঁদে বসেছিল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে না তাকিয়ে বললে, 'ওরা কারা?'

প্যাডের থেকে একটা পেনসিল তুলে নিয়ে দু-চারবার খট খট করে টেবিলটা ঠুকে মল্লিক চুপ করে রইল, বললে, না কিছু।

'চিঠিটি খামে ভরতে ভরতে সুতীর্থ বললে, 'ওরা মানে ওরা। ওরা আর কেউ নয়। আমি অফিসের কাজে গাফিলতি করি বলে আমার চরিত্র খারাপ বলে ওরা?'

'অফিসের কাজে আপনি কি খেসারত করছেন তার মীমাংসা আমার ঘরে গিয়ে হবে। ওরা বলে যে আপনার ক্যারেকটর খারাপ।'

'মদ আমি কিনে খাই না, কোনদিন খাইনি, কবে স্বব নিউজ এজেন্সির ধরণী মজুমদার, উনি, মতিস্থির, মতামত কাগজেরও সম্পাদক, মাঝে মাঝে আমাকে বিলিতি হোটেলে নেমন্তন্ন করে দেখিয়ে দেন কি করে পাঁচ পাগড়ী মদ মেরে মাথা ঠিক রাখতে হয়। ওরকম মাথা না হলে খোকা খুকুর কাঁথার নিচে ঠেসে দেবার মত এরকম সম্পাদকীয় পেতাম না আমরা।'

সুতীর্থ আর একটা ডেমি–অফিসিয়াল চিঠি শুরু করতে করতে বললে, 'রকমটা হচ্ছে–পাঁচটে সাদা-গেরুয়া-বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবি পাগড়ী ভরা মদ থাকবে-মজুমদার বান পারতেই পাগড়ী শুদ্ধু মদ পেটের ভিতর চলে যাবে মজুমদারের, কিন্তু তক্ষুণি স্বর্গদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আবার টেবিলে এসে হাজির হবে পাঁচটে কড়কড়ে পাগড়ী–আরো পাচ পাইট মদের জন্য। মদে ভর্তি হয়ে মুখের ফাঁদল দিয়ে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসবে স্বর্গদ্বার দিয়ে। এই রকম খেলা চলবে সারাদিন–কচ দেবযানীর খেলা।'

'মতামতের ধরণীবাবু মদ খান তা আমি জানতুম, কিন্তু মাতলামো করেন না।'

'না, বলেছিই তো আমি কচের মত ব্রহ্মচারী।'

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে সুতীর্থ বললে, 'ধরণীবাবুর মতন লোকের কাছ থেকে আমরা মনুষ্যত্ব চাই, সত্যি উনি অমানুষ নন, অত মদ মানুষ ছাড়া কেউ খেতে পারে না।'

'কেন, ভামকে মদ খাওয়াতে দেখলে সঙ্গে মদ ছাড়া আর কিছু খাবে না। মাছ ফেলে মদ খাবে।'

'ভাম কি?'

'ভাম, ভোঁদড়, জানেন না আপনি'?

'মাছ ফেলে মদ খাবে ভাব?'

'তবে কি?'

'মাছ ফেলে মদ খাবে ভাম?'

'তবে কি?'

'মাছ ফেলেও?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নোলা ডুবিয়ে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভাম, বেড়াল খাবে ওরকম? তাহলে ধরণী আর খেলেন কি? কিন্তু'– সিগারেটে দু-চারটে টান দিয়ে সুতীর্থ বললে–'আছে একদল মেয়েরা মজুমদারকেই পুরুষ মানুষ বলে মনে করে ভাম-বেড়ালকে নয়।'

'ভাম বেড়ালকে তো দেখেনি সে সব মেয়েরা, শুধু মজুমদারকে দেখেছে যে গো।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর খানিকটা দূরত্বের ব্যবধান রেখে চুরুট টানছিল, তেমনি টেনে যেতে লাগল; সুতীর্থের ঘরে ঢুকবার আগে দু-চার বোতল হয়ত নিড়িয়ে এসেছে–রসটা কাজে দিচ্ছে এখন।

ভামের কথা, মদের কথা, মাছের মেয়ে পুরুষ মানুষের কথা বেশ রসিয়ে বলছে বিজনহরি।

'বাংলাদেশে আজকাল বড় মানুষ নেই।'

'নেই।'

'সাহিত্যেও নেই হয়তো।'

'সাহিত্য তো পাত নাড়া, জীবনের সঙ্গে কি সম্পর্ক ওর, কি করে থাকবে সাহিত্য 'ঝি, ঠাকুরঝি, বরফ চাই বাবু বাড়িউলি, বাসড়াদের পাত নাড়া ছাড়া আর কিছু?'

'ম্যানেজিং ডিরেক্টর বললে, 'আপনি বড় খেই হারিয়ে ফেলেন সুতীর্থবাবু। কথা হচ্ছিল-চরিত্র নিয়ে, আপনার ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে। সাহিত্য, মেয়েমানুষ, মদ, মজুমদারের কথা এল কোত্থেকে?'

মল্লিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'মদ খাওয়া কাকে বলে জানেন?'

'আমি মজুমদারের সঙ্গে হোটেলে হোটেলে ফিরি। জানি না।'

'হোটেলবয় আপনি! ও কোন ছার। আমার সঙ্গে একদিন আসবেন।'

'আচ্ছা যাব।'

সুতীর্থ ফোন করবার জন্যে হাত বাড়াতেই তার হাতটা খপ করে ধরে ফেলে ঘুরিয়ে দিয়ে মল্লিক বললে, 'কোথায় ফোন হবে।'

'হনুমান প্রসাদের কাছে।'

'কিসের জন্যে?'

'সেই হুন্ডিটা সম্বন্ধে।

'আরো কোথাও হবে?'

'হ্যাঁ শ-ওয়ালেসে।'

'কেন?'

'সেই পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিয়ে।'

'কি বলে ওরা?'

সুতীর্থ ভ্রূকুটি করে বললে, 'ফোন করে বিশেষ কিছু হবে না অবিশ্যি। আমার নিজেরই একবার যেতে হবে।'

'দরকার নেই।'

'সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়েছিল, চেয়ারের হাতল ধরে ঝুঁকে পড়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেন?'

'কদিন অফিস কামাই করা হয়েছে?'

'চারদিন।'

'আমাকে জানানো হয়েছিল?'

'সময় পাইনি।

'সময় পাননি–কাজে ফাঁকি দেবার সময় আছে গোলামের মালিককে কৈফিয়ৎ দেবার সময় নেই?'

'হাতে অনেক কাজ আমার মিঃ মল্লিক, সময় নষ্ট করতে পারি না।'

সুতীর্থ কাজে মন দিতে দিতে বললে, 'যে গরু সত্যিই দুধ দেয়, ওস্তাদ গয়লাকে চাঁট মারে না সে, কিন্তু আমাকে মারছে কেন?'

'কে গরু?'

'দুধ শুকিয়ে যাচ্ছে গরুটার, ফুকোর ব্যবস্থা হচ্ছে?'

'কার গরু? কোথায় গরু? কে–গরু কে?'

'এই অফিসটাই।'

মল্লিক বাঘ হলে সুতীর্থকে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলত ডান বাঁয়ে না তাকিয়ে এই মুহূর্তেই। অত ব্লাড প্রেসার না থাকলে নির্ঘাৎ বাঘ হয়ে যেত সে। কিন্তু ব্লাড প্রেসার খুব বেড়ে গেছে–রক্ত তো নয়, মৃত্যুরক্ত চড়ে গেছে মাথায়। মল্লিক নিজেকে ঠাণ্ডা করে নিতে গেল।

'ম্যানেজিং ডিরেক্টরই তো অফিস?' মল্লিক বললে, 'আমিই তো অফিস। অফিস আমি। অফিসটা গরু? ফুকো দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে? গরুটা যে এঁড়ে বাছুর বিইয়েছিল, সেই বুঝি ফুকো দেবে তার মাকে? এঁড়ে বাছুর কি ধর্মের ষাঁড় হয় কখনও, সুতীর্থবাবু, না বলদ হয়ে ঘানিগাছে ঘোরে?'

সুতীর্থ অফিসের প্যাডে দু'পাতা লিখে শেষ করেছে, আরো লিখছিল, একটা জরুরি অফিসী চিঠি; লিখে টাইপ করিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে অবিলম্বেই–তিন কপি–তিন ঠিকানায়।

লিখতে লিখতে সুতীর্থ বললে, 'আবার চার ঠ্যাঙে দাঁড় করাতে চাই আমি গরুটাকে। ফুকো-টুকো দিয়ে নয়–আলো, বাতাস, ঘাস, ভাল বাজনা খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠুক। অফিসটাকে দাঁড় করাব আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতীর্থ চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে ডানদিকের র‍্যাকের থেকে একটা ব্লু-বুক নিয়ে এল।

'আমিও দাঁড় করাব আপনাকে। কার্ত্তিক মাসের কুকুরের মত দু'ঠ্যাঙে দাঁড় করাব। কাল থেকে এ অফিসে আসতে হবে না আর; আজই চলে যেতে পারেন-ইচ্ছে হলে-এক্ষুণি।'

'তাই আজ্ঞা হোক-' সুতীর্থ চেয়ারে ফিরে এসে ফাইল নাড়তে নাড়তে বললে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই উঠে দাঁড়াল সে। কলমটা পকেটে নিয়ে ম্যাকিনটোসটা কাঁধের ওপর ফেলে, ঘাড় কাৎ করে বিনে বাক্যব্যয়ে সে চলে যাচ্ছিল।

'ব্যাপারটা বড় রাজকীয় হচ্ছে হে,' মল্লিক বললে।

সুতীর্থকে কোন উত্তর না দিয়ে চলে যেতে দেখে মল্লিক গলা খাঁকরে বললে 'সুতীর্থবাবু।,'

'এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা-মধ্যিখানে চর-' সুতীর্থ এগিয়ে চলছিল।

'চাকরির হল কি আপনার?'

'কাল আসব একবার বিজনহরিবাবু।'

'কাল কেন, আজ কি হল? চাকরি করছেন, কাজ করবেন না? বাকি পড়ে আছে দশ বিশজন ইন-চার্জের কাজ-একা সামলাতে হবে আপনাকে-দেখুন তো ফাইলের ডাঁই। পাওয়ার অব অ্যাটর্নির ব্যাপার আমি নিজে গিয়েই ঠিক করেছিলাম। আসুন।'

'না, আজ আর নয়।'

'আজ নয়? আজ কি সাঁইবাবা কাজ করে দিয়ে যাবে? এটা কি চীনে চনুর গুল্লিচা বাড়ি নাকি সুতীর্থাবাবু, কমার্শিয়াল ফার্ম নয়? আসুন, সব ঠিক করে দিচ্ছি- একটা বোতল চাই আপনার?'

'একটায় হবে আপনার?'

'কেন? আছে আমার কাছে। অফিসেই আছে।'

'হুইস্কি?'

'খুব পুরোনো স্কচ।'

সুতীর্থ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'না-আমি মাঝে মাঝে একটু মোসুম্বীর রস খাই, ড্রাই জিন দিয়ে।'

'ডিমটো খান আপনি-খোকা আমার। আসুন, আমাতে আপনাতে দোর বন্ধ করে-এই ঘরে বসে।'

'আপনি খান, 'সুতীর্থ সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বললে।

'আমি আন্দাজ মত মিশিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।'

মল্লিক কলিং বেল টিপতেই বেয়ারা এল, হুজুরকে সেলাম করতেই তিনি বললেন, 'দু'গ্লাস জল চাই।'

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল। মল্লিক ডেকে বললে দুটো সোডাই বরং নিয়ে এসো।

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল, সুতীর্থ বললে, 'সোডা নয়, জল দু'গ্লাস।'

দুটো সোডা এনেই হাজির করল বেয়ারা, দরকার মত গ্লাস, পেগ।

'ছিপি খুলব?'

'না, যাও।'

লোকটা চলে গেলে মল্লিক বলে, 'কাজ ঢের আছে, কিন্তু আগে মৌতাতটা হয়ে নিক।'

'কাজ হোক তবে, মৌতাতটা থাক।'

'আগে মৌতাত হয়ে নিক।'

'তাহলে মৌতাত হোক, কাজ হবে না।'

'জোর মৌতাত হবে, জোর কাজ হবে।'

'জোর মৌতাত?'

'দশ বারো পেগ হবে-বছর চৌদ্দ আগে বড়দিনের সময় কিনেছিলাম বোতলগুলো, অফিসেই আছে সেই উনিশশো বত্রিশ থেকে। বেশ পেকে উঠেছে এখন।'

'বেশ, মৌতাত হোক তাহলে' সুতীর্থ বললে, 'কাজ চুলোয় যাক। দুটো ঘাঁৎ সামলাবার ক্ষমতা আমার নেই, আমি একটা দিক দেখতে পারি। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে-আপনি একটু সরে যাবেন বিজনহরিবাবু, আমাকে কাজ করতে দেবেন?'

সুতীর্থ নিজেই চেয়ারে এসে বসে বেল টিপতেই মনোমোহন এল।

'এই যে মনোমোহন এই সোডার বোতলগুলো নিয়ে যাও তো।' সুতীর্থ বললে।

'তুমি এখান থেকে চলে যাও মনোমোহন, সোডার বোতলগুলো এই টেবিলেই থাকবে।'

মনোমোহন চলে গেল। সুতীর্থ কাগজ পত্র টেনে নিয়ে গুছিয়ে বসতে গিয়ে টের পেল কাজে মন নেই তার, কোনদিকেই মন নেই, কিছুই ভাল লাগছে না। যখন অফিসে এসে ঢুকেছিল আজ সাড়ে দশটার সময়, তখন তো এরকম ছিল না, খুব বিশেষ উৎসাহ নিয়ে কাজে বসেছিল আজ, সন্ধ্যে অব্দি-দরকার হলে বেশি রাত অব্দি-রুদ্ধশ্বাসে একটানা কাজ করবার সংকল্প নিয়ে এসেছিল সে-করত সে-পারত সে-অনেক অফিসি দায়িত্বের বোঝা লাঘব করবার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল তার। কিন্তু হল না কিছু। সুতীর্থ কলমটার ক্লিপ বুকপকেটে আটকে নিয়ে, কাগজপত্র দেরাজে ফেলে দিয়ে চাবি মেরে উঠে দাঁড়াল।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যাচ্ছি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে–'

'অফিসের কাজে?'

'তারপর পাবলিক লাইব্রেরিতে যাব।'

'এই অফিসের কাজে?'

'আমার মনপবনের অফিস করবার সময় হয়ে গেছে বিজনহরিবাবু,' ম্যাকিনটোসটা কাঁধে চড়িয়ে 'সুতীর্থ বললে, 'চলি।'

'আজ আর কাজ হবে না?'

সুতীর্থ দেরাজ খুলে দরকারী প্রাইভেট চিঠিপত্রগুলো পকেটে ফেলে দেরাজ বন্ধ করে দিল।

'এত জিনিস যে বাকি পড়ে রইল–'

'সব কাল এসে ঠিক করে দিয়ে যাব।'

'আপনি মনে করেছেন আপনাকে না হলে আমাদের চলে না!' মাঝপথে টায়ার ফাটিয়ে দুরন্ত ট্রাকের মত ফেটে পড়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলল।

সুতীর্থ কোন কথা না বলে, কোন দিকে না তাকিয়ে ঘাড় কাৎ করে চলে যাচ্ছিল। সোডার বোতল আর একটু হলেই তার মাথার ওপর পড়ত গিয়ে। কিন্তু সেটা–দ্বিতীয় বোতলটাও দেওয়ালের ওপর এসে ভেঙে চুরচুর হয়ে পড়ল। সুতীর্থ চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়েছিল। ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে বললে, 'এইবারে আমি কাজ শুরু করতে পারি মল্লিক।'

'আপনি কি মনে করেছেন আপনাকে ছাড়া এ ফার্মের কোন গতি নেই?'

'তা আছে। বোতলভাঙা কাঁচ সরিয়ে নে রে মনোমোহন–'

সুতীর্থ বেল না টিপে পাড়াগাঁর নদীর এপার থেকে ওপারের পথিক মনোমোহনকে ডাকল যেন, কেমন একটা আশ্চর্য হুঙ্কার তুলে। সমস্ত অফিস স্তম্ভিত হয়ে শুনল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর লর্ড কোর্টের দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে–আস্তে আস্তে বের হয়ে গেল।

দশ

যুদ্ধের বাজারে বিরূপাক্ষ বেশ লাভ করেছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে সকলেই যখন সতর্ক হয়ে গেল, তখন তার মাথায় আরো বেশি লাভের খেয়াল চেপে বসতে সে ইদানীং লোকসান দিয়ে যাচ্ছিল। লোকসানের হার খুব বেশি নয়–নিয়মিত লোকসানও নয়। তবুও প্রায় সব রকম ব্যবসায়েই তার মন্দা পড়েছিল। কলকাতায় ও আশেপাশে বেশ কিছু জমি কিনে ফেলেছে সে। বালিগঞ্জে তার একটা বাড়ি, লেকের কাছাকাছি আর একটা; দুটোই দোতলা। টালিগঞ্জের বাড়িটা বড় বেশ সুরূপা, ভারি স্নিগ্ধ, অনেকখানি জায়গা নিয়ে; বাড়িটা একতলাই, কিন্তু ছাদে যে ঘরটা আছে সেটাকে চিলে কোঠা বলা যায় না। চমৎকার কারু কারসাজির কামরা সেটা। পরিসরেও খুব বড়, সোফাসেটির অভাব নেই। একটা খাকী রং-এর সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল বিরূপাক্ষ। হাত পাঁচেক দূরে একটা কমলা রং-এর গদীআলা কোচে ছিল জয়তী।

জয়তী বললে, 'আমার এ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছ তুমি, ভালো করে জিজ্ঞেসও করিনি কোনোদিন,–স্কুলেই কি তোমার বিদ্যে শেষ, কলেজে ঢোকনি কোনদিন?'

'কি ক্ষতি হয়েছে না ঢুকে?'

'না, ক্ষতি আর কি। যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা দাঁতে খড়কে দিয়ে তোমার পা চেটে বেড়াচ্ছে কমার্শিয়াল ফার্মে সিধুবার জন্যে। কিন্তু তবুও তোমার নিজেরও একটা ডিগ্রি থাকলে ভালো হত।'

'আমার নেই, আমার ছেলের থাকবে।' সামনের একটা গদীর ওপর পা চড়িয়ে দিয়ে ডাহা আরামে বললে বিরূপাক্ষ।

'তুমি তো ইউনিভার্সিটির সামনে থুবড়ি খেয়ে পড়লে, কলেজে যেতে পারলে না ম্যাট্রিক পাস করলে না–'

'কিন্তু আমি তো এম এ এফ পাস করেছি জয়তী।'

'এম এ এফ কি? আমেরিকান ডিগ্রি? যে টাকা দেয় তাকেই দেবে–সেই?'

'না, এ দেশেরই ডিগ্রি।'

'এ দেশেরই? কি এম এ এফ?'

'ম্যাট্রিক অ্যাপিয়ার্ড বার্ট ফেইলড!' বললে বিরূপাক্ষ।

শুনে জয়তীর হেসে উঠবার কথা, কিন্তু হাসল বিরূপাক্ষ নিজেই, জয়তী অনড় হয়ে রইল।

বিরূপাক্ষ বললে–'ম্যাট্রিক দিইনি আমি, কিন্তু উঠেছিলুম বেশ খানিকটা দূর-ক্লাস এইট অব্দি। তবে, ইংরেজি খবরের কাগজ ফি রোজ পড়ে বি-এ এম-এর ইংরেজি আমার রপ্ত হয়ে গেছে।'

'সেই জন্যেই তো এত টাকা করেছ। কত লাখ টাকা হল?'

'এই পঁচিশ লাখ, লেবেনচুষ হল আর কি–হি-হি হি হিহি'–

'তা হল বটে। তা হল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়তী টাকার মর্ম জানে। কিন্তু বিরূপাক্ষ যে প্রায়ই belongs to বা belong to না বলে is belonged to বলে, বিরূপাক্ষের সেই ব্যাকরণ সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার আছে কিনা তা জানতে চাইল।

বিরূপাক্ষের মনে কোনো খটকা ছিল না। ইংরেজি যা সে বলে তা বলে বটে এমনই একটা সেয়ানা মাহাত্ম্যে জয়তীর দিকে তাকাল সে, 'Is belonged সিঙ্গুলার হলে যেমন–This house is belonged to me–প্লুরাল হলে are–'

'আমি ভাবছি যারা লেখাপড়া শেখে তারা প্রামাণিকও বটে কিন্তু অসারও বটে। বানান ঠিক রেখে দলিল লিখতে জানে তারা, অফিসে ড্রাফট তৈরি লেখে খবরের কাগজে বড় জোর বই বার করে–' জয়তী বলছিল।

'বই? সে বই পড়ে কে?'

'আমি অবিশ্যি তাদেরই বই পড়ি মাঝে মাঝে। কবিতা, গল্প, ইতিহাস, মেসমেরিজম, আইনকানুন, ইকনমিকস, দর্শন, কত কি। পড়ে খারাপ লাগে না। তবুও ওসব মানুষদের আমি চাই না।'

আকৃষ্ট হয়ে জয়তীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'বই লিখলে হবে কি–ওরা পরের বাড়ির ভাড়াটে। নিজেদের বাড়ি নেই-গাড়ি নেই।'

'না, ওরকম গরীব মানুষ দিয়ে কি হবে? লেখাপড়া কি হবে কাপড়ে ফুটো বেরুতে থাকলে? তালি মেরে মেরে মরে যায় মানুষের মন। তার চেয়ে is belonged ঢের ভালো। ব্যাঙ্কে তো লাখ পনের কুড়ি আছে–' জয়তী একটু ঝাল মিটিয়ে হেসে বললে।

সেটা সে কিসের ঝাল বিরূপাক্ষের খেয়াল ছিল না সম্প্রতি।

'কিন্তু লেখাপড়া-অলাদের সকলেই কি গরীব জয়তী?'

'খুব বেশি গরীব হয়তো ওদের সবাই নয়। কিন্তু তোমার মতন বড়লোক ওদের ভেতরে কজন?'

জয়তী ভাবছিল; এ লোকটা সকাল থেকেই মদ খাচ্ছে। ভোরবেলা মাটির ভাঁড়ে দিশি মদ দিয়েই শুরু করেছে। ঘরে হুইস্কি ছিল, পোর্ট ব্রান্ডি ছিল, কিন্তু নির্বিঘ্নে মন ওর কঞ্জুষ ওর আত্মা–ও তো সবদিক দিয়েই একটা গাড়োল–বেওয়ারিশ–শুধু টাকার দিক দিয়ে নয়। টাকা ওর লক্ষ্মী, ও হাত পাতলেই ওর এঁটো কাঁটা আস্তাকুড় লক্ষ্মীর ঘড়ায় ভরে ওঠে।

'তুমি বড়লোক দেখেই তো তোমাকে আমি বিয়ে করেছি,' জয়তী বলল।

'বিয়ে করেছ?' বিরূপাক্ষ বলল, 'বিয়ে করেছ জয়তী তুমি আমাকে? সব সময় সব কথা খেয়াল থাকে না। আমাদের বিয়ে হয়েছিল ওতোরপাড়ায়-না? গঙ্গার ধারে? সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে? যেন মাঘ মাস–না জয়তী? সেটা মন্বন্তরের বছর। কালোবাজারে চাল ছেড়ে বড়লোক হচ্ছিলুম–কিন্তু আমি তোমাকে কি করে বিয়ে করলুম?'

পরদিন বিরূপাক্ষের মদের নেশা কেটে গেছে। মাথা অনেকটা পরিষ্কার। টালিগঞ্জের বাড়ির দোতলার ঘরে জয়তীকে নিয়ে বসেছিল সে।

'আজ আমার মনে পড়েছে। তুমি এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজিতে এম এ পড়ছিলে–সেটা মন্বন্তরের সময়। অত পড়াশুনো করেও ডানাকাটা পরীর মত চেহারা ছিল তোমার। আমি পড়েছিলুম ক্লাস এইট অব্দি–চেহারা আমার বেশি লম্বাচৌড়া নয়, এই কোঁৎকামাছের মত-খুব কালোকালো নয়, ঘাড়ে গর্দানে খানিকটা–যাকে বলে হোঁৎকা–সেই জন্যই আমার বেগ পেতে হয়েছিল–'

জয়তী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে আর্ট ও থিয়েটার সম্বন্ধে একটা বিশেষ বই কিনে এনেছিল আজই, পড়ছিল; খুব মন দিয়ে পড়েছিল; বইটা ভাল লাগবার কথা। কিন্তু বুকের ভেতর কেমন ঢিবঢিব করছিল তার।

'কিন্তু জয়তী–'

জয়তী বইটা বন্ধ করল।

'আজকে কেন এসব কথা মনে পড়ছে আমার?' বিরূপাক্ষ বললে।

জয়তী বই খুলে পাতার দিকে তাকিয়ে রইল।

'শোন বলি জয়তী–'

'বই রাখ শোন–' বিরূপাক্ষ বললে।

'আমি শুনেছি তোমার কথা।'

'আমি একটা জিনিস প্রমাণ করতে চাই।'

'সে আমি জানি–সে তো অনেকবার প্রমাণিত হয়ে গেছে–'

'তুমি আমার স্ত্রী–'

'কুড়ি পঁচিশ লাখ তোমার ব্যাঙ্কে, ইনসিওরেন্সে। আমার স্ত্রীত্বের প্রমাণ তো সে সব দলিলেই আছে। কটা ইনসিওরেন্স? ছটা তো? না নতুন করেছ আরো?'

'না, ছটাই।'

'পাঁচটা অ্যাসাইন করেছ আমাকে। কিন্তু পঁচিশ হাজার টাকার ইনসিওরেন্সটা তো অ্যাসাইন করা হল না এখনো। কাকে করবে?'

'তোমাকে।'

'আমি চাপ দিচ্ছি না তোমাকে।'

'চাপ খাওয়ার ছেলে আমি? ব্যাঙ্কে সব টাকা তোমার নামে জমা দিয়ে রাখতে বিয়ের পরই তো বলেছিলে তুমি; গত বছরও বলেছিলে; কিন্তু এ বছর আর বলছ না কেন?'

'ব্যবসা তোমার, ব্যাঙ্ক তোমার, ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফট তোমার, আমার কাছে চেক বই রেখে কি হবে?'

'পাঁচ লাখ টাকার অ্যাকাউন্ট তো তোমার নামে রয়েছে লয়েডসে।'

'কিন্তু পঁচিশ লাখ তো তোমার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সে তো লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকাগুলো ধরে। ব্যবসা মার খাচ্ছে, ব্যবসা চালাতে হচ্ছে আমার; ইনসিওরেন্সের মোটা মোটা প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে। ব্যবসাগুলো তোমার হাতে গুছিয়ে নিলে সব ব্যাঙ্কের সব টাকাগুলো তোমার হিসেবে লিখিয়ে নিও–' বিরূপাক্ষ একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি যে আমার স্ত্রী ব্যাঙ্ক ইনসিওরেন্সের দলিলে তাঁর প্রমাণ রয়েছে তুমি বলছ আমরা হিন্দুমতে বিয়ে করেছিলুম, হিন্দু আইন কি বলে তোমার স্ত্রীত্বের কথা?'

'যা বলবার তাই বলে।'

বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'ইনসিওরেন্সের চেয়ে বড় দলিল হিন্দু আইন?'

'বড়ই তো।'

'ব্যাঙ্কের চেয়ে?'

'হ্যাঁ–বড়।'

'বিরূপাক্ষ এই সব কথা শুনতে চায় শুনে কেমন একটা পরিতৃপ্তির সপ্তমে গিয়ে বসে থাকতে চায় সে–নিবিড় ও সিস্তব্ধ হয়ে নয় সে শক্তি বিরূপাক্ষের নেই–কিন্তু এমনিই নড়ে চড়ে, কাত হয়ে উবু উটকো হয়ে জয়তী যে তার স্ত্রী সেই স্ত্রীত্বের কি যেন একটা মর্মান্তিকভাবে গোপন মধুর মন্ত্রসিদ্ধিকে দুরপনেয় কীটশক্তিমত্তায়–একা কীট সৃষ্টির ভেতরে, একা কীটই যেন সে–একাই পান করতে চায় সে। জয়তীকে যখন সে প্রথম বিয়ে করেছিল বছর তিনেক আগে তখন জয়তী ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের কথাও ভাবতে পারত না বিরূপাক্ষ। এ তিন বছরে নানারকম স্ত্রীলোকের কাছে গিয়েছে বটে সে, কিন্তু তিন বছরের ভেতর দু'বছরেরও বেশি নিজের বাপের বাড়িতে কাটিয়েছে জয়তী; গত ছ'মাসও জয়তী বাপের বাড়িতে ছিল, মাত্র তিন-চার দিন হল বিরূপাক্ষের এখানে এসেছে। দুর্দমনীয় আসক্তি শক্তি ফিরে পেয়েছে কীট আবার–অমেয় উল্লোল সৃষ্টির।

'তুমি হিন্দু স্ত্রী, আমাকে ছেড়ে যাবার কোন ক্ষমতা আছে তোমার?'

জয়তী বইয়ের দু-এক পাতা উলটে বললে, 'আমি কি ছেড়ে যেতে চাচ্ছি?'

'বাপের বাড়িতেই তো থাকছ, আড়াইটে বছর কাটালে–'

'এখন তো এসেছি।'

'এসেছ তো আসছ যাচ্ছ। চলে যেতে বাধা কি তোমার?'

'কোথায় চলে যাব?'

'কেন, তোমার বাপের আস্তানায়। গরীবের মেয়ে তো তুমি নও যে আমার টাকা তোমাকে ঠেকিয়ে রাখবে। তোমার বাবা শুনলুম ও-বি-ই পেয়েছেন–'

'হ্যাঁ।'

'ও-বি-ই মানে কি?'

'মানে ওব্।' জয়তীর ঠোঁটের কোণে দু-চারটে রেখা–হাসি নয়–দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

'ওব্?'

'এন-আই-ও-বি ই কি হয়?' সেই গ্রীক মহামারের নাম মনে পড়াতে জয়তী বলল বিরূপাক্ষকেই।

'দাঁড়াও বলছি তোমাকে–' দাঁড়াও–কি বললে, 'এন-আই? তারপর?'

'এন আই ও বি ই।'

'বলছি তোমাকে–এন আই ও জি ই–নিয়োগী তো নিয়োগী।'

'জি নয় বি, নিয়োগী নয়–। তোমার কুড়ি লক্ষ যদি আমার জন্যে খানিকটা কথা বলে তা হলেই হবে, এটাকে নিয়ে আর ঘাঁটিও না। কি বলছিলে তুমি হিন্দু আইনের কথা?'

'বলেছিলুম তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাইতে পার–ঘাঁতঘোৎ তোমার সবই জানা;–কিন্তু প্রত্যেক ঘাটে আইনে ঠেকবে।'

'ঠেকবে, না ঠেকবে জানি না কিছু আমি। কিন্তু আমি বিয়ে ভেঙে দিতে চাচ্ছি কে বললে তোমাকে?'

জয়তীর মুখ চোখ প্রশ্ন সত্য স্বচ্ছ ঠেকল বিরূপাক্ষের কাছে। মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে না–এখন তো নয়; বিরূপাক্ষের টাকার জন্য–বিরূপাক্ষের নিজের জন্যেই হয়তো টান আছে জয়তীর। স্ত্রীর মুখের দিকে আবার তাকাল বিরূপাক্ষ! মুখের ওপর কেমন একটা সত্যার্থের আভাস দেখে ভরসা পেল সে।

'তুমি এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজিতে এম এ পড়ছিলে, বি-এ-তে ইংরেজিতে সেকেন্ড ক্লাস অনার্স পেয়েছিলে। তুমি উত্তর কলকাতার বনেদী ঘরের মেয়ে, দক্ষিণ কলকাতার বড়লোকের ভাগনী, তোমাকে কে পায় বলো তো দেখি–'

হাতের সিগারেটের আগুনে আর একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে নিতে গিয়ে এক আধ মুহূর্ত চুপ করে রইল বিরূপাক্ষ। বাইরে রোদ, নীলিমা, ঘরের ভেতরে মেঝের ওপর দেওয়ালের গায়ে ডানার ছায়া ফেলে অদূর দিগন্তের পুরুষ চিল ও মহিলা পাখির চংক্রমণ; অনেক দূরে একটা অ্যাকেশিয়া গাছে ফুল ধরেছে। অ্যাকেশিয়া না চেরী অবাক হয়ে ভাবছিল জয়তী। হয়তো অন্য কোন গাছ। এত শীতে তো অ্যাকেশিয়ার ফুল ধরবার কথা নয়। কবে ফুল ফুটবে, সাদা মেঘ আর নীল মেঘের মত নীল আকাশের গায়ে বিছানো সবুজ কৃষ্ণচূড়ায়? বাইরে অপরিমেয় রোদ, প্রিয় মহানুভবের মত মুখচ্ছবি কত বড় বিশাল আকাশের পৃথক নিঃশব্দতার মত; মহাপ্রলয়ের সৃষ্টিতে উৎসারিত করে চলেছে মুহূর্তের পর মুহূর্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য কোন সংস্রবই নেই যেন বিরূপাক্ষের ঘরে ভেতরের মানুষদের সঙ্গে বাইরের সচ্ছল স্বাধীনের; তিল ধারণের তিল অধিকার করে চারদিককার তিলাতীত যত তিল-আলো-মেঘ-পাখি এখানে-ওখানে-সবখানে; ভাবছিল জয়তী।

আমি তোমাকে পেয়েছি। পেয়েছি বই কি। আইনেও পেয়েছি—এমনিও। তোমার সঙ্গ—টঙ্গ চাই। তুমি আইনত স্ত্রী তো, দিচ্ছ টিচ্ছ কিছু ভালবাসাও চাই। কিন্তু চাইলেই হল? তুমি হওয়ালে তো।'

বিরূপাক্ষ আজো যে এনতার জল খেয়েছে শুধু, মদ খায়নি, বিশ্বাস হচ্ছিল না জয়তীর। পেটে নির্মল জল ভজভজ করে না কোনদিন এই লোকটার; আজ একটু বেশি গেঁজে উঠেছে। কোন দিশপাশ খুঁজে পাচ্ছিল না জয়তী। নিজের হাতের বইয়ের দিকে ফিরে তাকাল সে।

'আমার মন বলেছে আমি তোমাকে পেয়েছি।'

'দিশী মদ চাচ্ছে তো তোমার মন; এখন?'

'আজ আমি মদ খাব না।'

'কেন? খোঁয়ারি ভাঙতে হবে?'

'তুমি আবার বাপের বাড়ি চলে যাবে না তো?'

'তা আমি এখন কি করে বলি?'

'কি বলতে চাচ্ছ বুঝিয়ে বল।'

'দরকার হলে চলে যাব।'

'তিন বছর তো আমাদের বিয়ে, আড়াই বছর তো কাটালে শশধরবাবুর নেকনজরে। এই তো ছ'মাস কাটিয়ে এলে আবার চলে যেতে চাচ্ছ আবার। কেন, আমি কি তোমাকে বিয়ে করিনি?'

বিরূপাক্ষ সিগারেটে টান মেরে ঘর ভর্তি ধোঁয়া জমিয়ে তুলে বললে, 'তুমি হাঁপাচ্ছ কেন?'

'আমি?'

জয়তী নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'কৈ না তো।'

'মনে হচ্ছিল, তোমাকে হাঁপাতে দেখলে আমার ভয় করে।'

'মিছে ভয়।'

'আমি সিগারেট খাই তাতে কি তুমি দুঃখ পাও?'

'কেন পাব?'

'প্রথম প্রথম তো বাধা দিতে আমাকে সিগারেট খেতে দেখলেও। তাড়ি তো খাচ্ছি; বিলিতি দিশি জল সবই; আজকাল যে মুখ বুজে থাক তুমি সব দেখে শুনেও? এটা ভাল লাগছে না আমার। মেঘ যখন জমতে থাকে, আকাশ চুপ করে থাকে। চুপ করে আছ তুমি, মদ খাচ্ছি আমি, মদ খাওয়া ছাড়ব না। কিন্তু মদ খাওয়ার সময় তুমি এনে নথ নেড়ে বাধা দেবে সেটা আমি প্রত্যাশা করি। মদ খাওয়ার সময় তোমার খ্যাংরা খেতে ভাল লাগে আমার—এ হে-হে-হে-হে।'

বিরূপাক্ষ হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটাকে শেষ দু'চারটে টানের থেকে রেহাই দিল, অ্যাশট্রেতে না ফেলে মেঝের কার্পেটের ওপর ফেলে পা দিয়ে পিষতে লাগল। এ ঘরের এই চমৎকার জয়পুরী কার্পেটের ওপর ধুলো, সিগারেটের ছাই তো দূরের কথা, এক চিলতে পরিষ্কার কাগজও উড়ে এসে পড়তে দিত না জয়তী একদিন,—আড়াই বছর আগে। কিন্তু সিগারেটের আগুন দিয়ে গালচেটাকে পুড়িয়ে নেয়া হচ্ছে সিগারেটের কালি মেড়ে দেয়া হচ্ছে? কি বলতে চায় জয়তী? কিছুই বলছে না। বিরূপাক্ষের আগের কথারও কোন উত্তর দিল না সে। একটার পর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে গালচের ওপর ছুঁড়ে ফেলতে লাগল বিরূপাক্ষ।

'মদ খেয়ে শরীর সুস্থ আছে তো তোমার।' জয়তী বললে।

'তা আছে। এ কার্পেটটা ইনসিওর করিনি আমি।'

দুটো দেশলাইয়ের কাঠি একসঙ্গে জ্বালিয়ে কার্পেটে ছড়িয়ে দিল বিরূপাক্ষ।

'বাতাসে নিভে যাচ্ছে তো তোমার দেশলাইয়ের আগুন।'

'অনেক জায়গায় পুড়ে গেছে গালচে, কেমন দেখাচ্ছে?'

'বেশ নতুন ধরনের একরকম হল।'

'পুড়িয়ে ফেলব কার্পেটটাকে?'

'কেরোসিন ঢেলে নিতে হবে দু'চার টিন।'

'তাহলে তো বাড়িটাও পুড়তে থাকবে। ফায়ার ব্রিগেড আসবে। পুলিশ আসবে।'

'আসুক, আসবে।'

'কিছু হবে না তাতে?' জিজ্ঞেস করে একটু থেমে বিরূপাক্ষ বললে, 'বাড়ি তো ইনসিওর করা নয়। বাড়ি তো ইনসিওর করিনি এখওন।'

না করেছে, মিটে গেছে। বাড়িটাকে ইনসিওর করলেও হয়, না করলেও হয়, সেটা বিরূপাক্ষ বুঝবে; জয়তীর মনের প্রেম যেন অন্য কোথাও, অন্য কোন পুরুষ বা বাড়ি আশ্রয় করে না হলেও, এই পুরুষটি ও তার বাড়ির ত্রিসীমার নয় যেন, অনুভব করতে করতে মনের প্রশান্তি ফিরে পেল জয়তী। কিন্তু এও সে জানে, এ বাড়িটা পুড়বে না, গালচেটাও না। বাড়িটা পুড়লেও বীমা করে রেখেছে বিরূপাক্ষ। করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মদ খাচ্ছি। খাওয়াটা খারাপ নয়?'

'তোমার শরীর তো সুস্থ থাকছে। কেন খারাপ হবে?'

'সুস্থতার কথা নয়; এম্নিই ওটা ভালো?'

'খুব সম্ভব ভালো-তোমার পক্ষে।'

'কেন?'

জয়তীর কিছু বলবার ছিল না। বইটাও পড়া হচ্ছে না। বুজিয়ে রেখেছে হাতের ভেতর। খুলে পড়বে কিনা ভাবছিল।

'মদ খেয়ে আমার লিভার পেকে উঠবে, এই তো চাও তুমি।'

'তোমার লিভার আছে? না থাকলে তা পাকবে কি করে?'

বিরূপাক্ষ একটু হেসে বললে, 'হাঁ জী, হাঁ হাঁ জী, হাঁ, ইয়ে আচ্ছি বাৎ হ্যায়। যে সব মেয়ের জ্ঞান পবন আছে, তারা স্বামীর মদের গেলাস ভাঙতে যায় না, কিন্তু মোলায়েম হাতে কান টেনে মাথা নিয়ে আসে। তুমি আমার কর্ণমূল ধরে টান দিয়েছ জয়তী। আমি বুঝেছি তুমি আমার মদ খাওয়া পছন্দ কর না। আমি বুঝেছি। গুরুমা তার ছেলেদের ধমকে পিটিয়ে একরকম কথা বলে। মা গোঁসাই তার বড় চেলাকে নিজের ঘরে আড়ালে ডেকে নিয়ে আর এক ধাঁজে কথা বলে-এই যেমন তুমি বললে। বুঝেছি আমি। কিন্তু মদ ছাড়া খুব কঠিন, কিন্তু মদ ছাড়ব আমি। ছাড়ব আমি। মন্মথ, অ-মন্মথ!' বিরূপাক্ষ গলা ছেড়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

'হুজুর!' বলে মন্মথ হাজির হতেই বিরূপাক্ষ বললে 'দু বোতল সোডা, গেলাস ডিকান্টার, পেগ আর ঐ একেবারে কোণার ঘরটার থেকে খুব ভাল বিলিতি যা হাতের কাছে পাও-বিয়ার, ভেরমুথ, জিন, রাম আর রামছাগল ছাড়া-নিয়েসো তো চট করে। আমি আজ খাব মদ কাল খাব, পশু খাব, তারপর খোঁয়াড়ি ভাঙব, তারপর থেকে আস্তে আস্তে মদ খাওয়া ছেড়ে দেব ভাবছি মন্মথ। জয়তী চাচ্ছে তাই। মদ দিয়ে ধোলাই করে আমার লিভার পাকিয়ে দিচ্ছে জয়তী। বুঝলে মন্মথ-বলি বুঝলে হে মিটমিটে মন্মথ-'

বিরূপাক্ষ মন্মথের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে চোখ নাচাল-ডানে বাঁয়ে কান্নি মেরে দুমড়ে তুবড়ে ঠাস করে একটা চড় মারল মন্মথকে।

মন্মথ ভিরমি খেয়ে-নাকি সুরে কাঁদতে কাঁদতে দোরগোড়ায় গিয়ে হো হো করে হাসতে লাগল : হা হা হা হা করে হেসে উঠল বিরূপাক্ষ।

এটা বিরূপাক্ষ মন্মথর একটা খেলা ভালো লাগছে না-জীবনটা কেমন যেন লিম্বু হয়ে গেছে মনে হল-হো হো হো হো করে একদল হায়েনার মত হেসে ওঠে এরা দুইজন।

এগারো

পরদিন সকালবেলা ছাদের ঘরে বসেছিল বিরূপাক্ষ। কালকের সেই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের আর্ট ও থিয়েটারের ওপর বইটা পড়ছিল জয়তী; গ্রীক থিয়েটার সম্পর্কে কি লিখেছে দেখছিল।

বিরূপাক্ষ দূরে একটা কৌচে বসে সিগারেট টানছিল; বললে, আমি তোমাকে যা বলছিলুম-'

মন্মথ গড়গড়ায় তামাক সাজিয়ে দিয়ে গেল বিরূপাক্ষকে। সিগারেটটা ফেলে দিল বিরূপাক্ষ জানলার ভেতর দিয়ে বাইরের রাস্তায়। গড়গড়ায় নলটা আড়ষ্টভাবে টেনে নিয়ে মুখে ছুঁইয়ে দু-একটা আলতো টান মেরে জয়তীর দিকে ভাল মনে করে তাকাতে গেল সে;-কামনার চেয়ে শুভেচ্ছার প্রেরণায়। কিন্তু সে চোখে ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে বোবা রসিকতায় লিপ্ত-পাড়াগাঁর বাড়ির আত্মপ্রসাদ ছাড়া আর কোনো রংই ধরা পড়ল না...অনুভব করে কেমন যেন লাগল জয়তীর, ঘাড় ফিরিয়ে জানালার ভেতর দিয়ে দূরের রৌদ্র প্রাণবত্তার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'আমি তোমাকে আমার পেড়াপেড়ির গল্পটা শোনাতে চাচ্ছিলুম আবার। গল্পটা যতবার বলা যায়-পুরোনো হয় না-শোন তুমি বি-এতে সেকেন্ড ক্লাস অর্নাস পেলে। আমি অত শত জানতুম না। আমি কলকাতা ইউনিভার্সিটির ছেলেদের ফেডারেশনে না কি-তারি একটা মজলিসে তোমাকে দেখতে পেয়েছিলুম-' বলে তামাক টানতে লাগল বিরূপাক্ষ।

গড়গড়ায় জলতরঙ্গ, হাওয়ায় অম্বুরি তামাকের গন্ধ।

'আমাকে নিয়ে গিয়েছিল শৈলেন। শৈলেনের কথা মনে আছে? তোমাদের সভাসমিতির ছাত্র-ছাত্রীদের সে তো একজন বড় স্পনসর ছিল-'?

'স্পনসর?'

'না, কি বলে ওকে? স্পনসর নয়?'

'সভাসমিতির স্পনসর হতে পারে-ছাত্র-ছাত্রীদের নয়-'

'তা হলে চাই বলব?'

'বলতে পার।'

'চাঁই আর স্পনসর এক নয়?'

'না। তুমি বরং ইংরেজি শব্দ নাই ব্যবহার করলে, আমি তো বাংলা জানি-'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিক বলেছ।' গড়গড়ার নল মুখে না দিয়ে সেটাকে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত সাপছেনালি খেলিয়ে নিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'তুমি এত ইংরেজিনবিশ, অথচ আমি কিছুই জানি না। আমাকে শেখাবে? তোমার মত শেখাতে পারে কে আর বল?'

'ও জিনিস শেখানো যায় না।-' জয়তী এক কথায় সেরে দিয়ে বললে, তার পরে কথা একটু বাড়িয়ে ফেলে বললে, 'যে নিজেই মুন্সী তাকে শেখানো যায় না।'

বিরূপাক্ষ তামাক টানছিল, একটা চাপা হুঙ্কার দিয়ে তামাক টানতে লাগল আবার ঃ যেন হোঁদড় হরিণীতে শীত-সকালের কথিকা তৈরি হচ্ছে নদীর এপার-ওপার থেকে।

'শৈলেন আমাকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে গেছল বলেই তো তোমাকে দেখতে পেলুম। পরে জানতে পেরেছিলুম তুমি ইউনিভার্সিটির জয়তী পণ্ডিত। কিন্তু সেজন্যে নয়, তোমাদের বনেদী ঘরের জন্যেও নয়, তোমার নিছক নিজের জন্যেই তোমাকে আমি দেখেই ভালবেসেছিলুম। সেদিনই সঙ্কল্প করেছিলাম পৃথিবীতে যদি বেঁচে থাকতে হয় তা তোমার মত মেয়েমানুষের মিষ্টি জুতো খেয়ে। সে সঙ্কল্প আমি কাজে ফলিয়েছি।'

'কিন্তু যেরকম চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি করতে চেয়েছিলাম', জয়তী একটু হেসে বললে, 'সে চামড়া তো গোরু-ছাগলের পিঠে পাওয়া গেল না-একটু নিরেস লাগছে না জুতোটাকে তাই?'

জয়তীর বাঁকা কোঁকড়ানো কথাটা একটু সোজা সরল করে নিয়ে বুঝে দেখতে চাইল, কিন্তু কি বলতে চাইল জয়তী ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না বিরূপাক্ষ।

'কিন্তু মানুষের চামড়ায় তো জুতো বানানো নিষেধ'-জয়তী বললে।

জয়তীর মুখ চাপা আঁচের অঙ্গারের মত হয়ে উঠল। বিরূপাক্ষ তা টের পেল না। তার অনুভূতি উত্তাল লিঙ্গশক্তির প্রকর্ষে জায়গাজমি ঘরদোর গাড়ি তৈরি হয়, মেয়েমানুষও দখল হয়, কিন্তু সে সব মেয়েমানুষের আত্মা যে শরীরটাকে খোলসের মত ফেলে বিদায় নেয়। যখনই বিরূপাক্ষের মত একজন লোকের সংস্পর্শে তাদের আসতে হয়-তা জানে না বিরূপাক্ষ। না জেনে লাভই তার।

শীতের এ কটা রাত শুয়োরের মত সঙ্গ সুখ খুঁজেছে বিরূপাক্ষ ঃ না পেলে আহত হয়েছে-শুয়োরের মত, মানুষের মত নয়।

'তুমি সাইকোলজিতে এম-এ পড়ছিলে। আমাদের দেশে এত রূপ থাকে? তা থাকে-আমাদের দেশেই থাকে-অন্য কোথাও না, বাঙালিঘরের সেই রূপ তোমার। সকলে বলছিল তুমি ফার্স্ট ক্লাস পাবে। তোমার ছাঁচি মিছরি খেতে মাছি মশা বোলতা বিষ পিঁপড়ে গাঁধিপোকা ফড় ফড় করছে, কিন্তু-তবুও কি করে মাইফেলে তোমাকে আমি পেলুম জয়তী। এ সংসারে এরকম সফলতা পেতে দুটো জিনিসের দরকার-এক টাকা, আর এক জুঁকের নাগান লাইগ্যা থাকা-'

বিরূপাক্ষ বলতে লাগল, 'টাকা অবিশ্যি আমার চেয়ে কারুর-কারুর আরো ঢের বেশি ছিল। কিন্তু কালোবাজারে আমি কামিয়ে নিচ্ছিলুম। মন্বন্তরের সময় তখন, কিন্তু তোমাকে দেখে আমার মাথায় খুন চড়ে গেল; মানুষের হাড়ের-' বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে এক টান মেরে সেটা ফেলে দিল লোক কোলাহলের চলাচলের রাস্তা তাক করে।

'কিন্তু শুধু টাকা দিয়ে তোমাকে তো আমি কিনে নিতে পারিনি। ওয়ার কন্ট্রাক্টে, ব্ল্যাক-মার্কেটে যত টাকাই করি না কেন, আমি তো ভাগাড়ের শুকনির বাচ্চা-মফঃস্বলে জমিদার সেরেস্তার মুহুরী ছিলেন-মাসে ত্রিশ টাকা মাইনে পেতেন। বাবার কথা বলছি।'

নল মুখে দিল বিরূপাক্ষ।

'তোমার সে সব ধর্মভাইদের ভেতরে এমন অনেক বনেদি ছোকরা ছিল যে আমার আজকের সমস্ত ব্যবসার গুডউইল কড়ে আঙুল দিয়ে কিনে নিতে পারে।'

'কে ছিল সে রকম?'

'তুমি জানতে না?'

'আমি শুনিনি তো কোনোদিন-শমীন, রবি, মনোতোষ, সুব্রত, নীরেন-কার কথা তুমি বলছ?'

'এদের কারুর আমার চেয়ে বেশি টাকা আছে জানলে তাকে বিয়ে করতে তুমি?'

'কার আছে সেরকম টাকা এদের ভেতর?'

'এদের সকলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জানা আছে তোমার?'

'চার-পাঁচ লাখের বেশি নেই শমীনদের। স্থাবর-অস্থাবর সব নিয়ে লাখ দশের বেশি হবে না। কিন্তু শরিক তো অনেক। শরিক সকলেরই।'

'বাস্তবিক, একেবারে প্লাগে এসে হাত দিয়েছেন শশধরবাবু-যাই বল তুমি। মা বাপ ভাই বোন কেউই তো নেই আমার। আমি ভেবেছিলুম সেইটে আমার দোষ বিয়ের বাজারে। কিন্তু সেইটে আমার গুণ হল। আমার সম্পত্তিটা যে এজমালী নয়। আমার যে শরিক নেই সেটা আমার চেয়েও আগে বুঝে ফেলেছেন শশধরবাবু আর তার মেয়ে। সত্যিই এদিকে মাথা খেলেনি এতদিন আমার। তাই তো-' বিরূপাক্ষ নল মুখে দিয়ে বললে, 'আমি তো একা, কোন শরিক নেই তো আমার।'

'আমি তো আছি।'

'তুমি তো আমার স্ত্রী-শরিক তুমি? শরিক নও তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার ভাই থাকলে শরিক হত? স্ত্রী হিসেবে সম্পত্তির শরিক-টরিক আমি নই, ঢের বেশি; ওটা আমারও-পুরোপুরি।'

'তা তো ঠিক'? তামাক টানতে টানতে বিরূপাক্ষ বললে, 'আমি মরে গেলে আমার কোন ওয়ারিশ না থাকলে আমার সমস্ত সম্পত্তি হয়তো তুমিই পাবে-'

'কারো বাঁচামরার কথা হচ্ছে না; কিন্তু আর কোন ওয়ারিশ নেই, আমিই পাব সব।'

জয়তী প্রাণের গরমে কথা বলছে টের পাচ্ছিল বিরূপাক্ষ; এরকম নতুন টাকার মত চনচন করে বেজে উঠে জয়তীকে কথা বলতে প্রায়ই শোনা যায় না-আজকাল তো একেবারেই না; কিন্তু তবুও আজ বেশ বোল তুলে কথা বলছে জয়তী। টাকা মানুষকে কথা বলায়, প্রেম নয়, প্রণয় নয়, লালসাও নয়। বিরূপাক্ষ চোখ বুজে নল টানছিল, বললে, 'না কেউ পাবে না আর তুমি ছাড়া। তবে ভারি গোলমেলে এই সংসারটা, ভারি গোলমেলে আইন আদালতগুলো-'

'কি করবে আইন-আদালত আমার নামে সব লিখে ঠিক করে রাখলে-'

'হয়তো পঁচিশ লাখের পনের কুড়ি লাখ তোমাকে দিল, বাকি টাকা আটকে রাখল-'

'কি করে আটকাবে?'

'নানারকম ফ্যাকড়া বেরিয়ে পড়ে আইনের। যে মানুষ বেঁচে থেকে লাখ লাখ টাকা জমিয়ে মরে যায়, সে মরে গিয়ে আর বেঁচে উঠতে পারে না তো। কিন্তু সে বেঁচে ফিরে না এলে আইন খানিকটা গোলমাল করবেই-'

'করবেই? তুমি লিখে দিয়েছ কাউকে সম্পত্তির কিছু?'

'কাউকে না।'

'আমি ছাড়া তোমার ওয়ারিশ আছে কেউ?'

'কেউ না। আমাদের ছেলেপুলেও তো নেই।'

জয়তী বললে, 'শমীন, মনোতোষ, নীরেন-ওদের সকলেরই তো ভাগের টাকাকড়ি, সম্পত্তি; ভাগ তো বেড়েই যাচ্ছে, শরিক বাড়ছে কেবলই। ওরা তো চাকরি করে, ভাল ব্যবসা নেই কারুর, যা ছিল যুদ্ধের বাজারে সে সব গুটিয়ে ফেলতে হল, এমন-ই বাঁচার কারবারি সব। না, ওদের টাকা নেই, কিছু, দু-তিন লাখের বেশি মাথা পিছু কারুর নেই, অথচ তুমি বলে দিলে তোমার ব্যবসা মেরে নিতে পারে ওদের যে কেউ। মদ তো খাচ্ছ, কিন্তু কোন আড়তের চাল খাচ্ছ বল তো দেখি?'

'বিরূপাক্ষ বললে, 'ওরা যদি আমার চেয়ে বড়লোক হত, তাহলে ওদের কাউকে বিয়ে করতে তুমি?'

জয়তী নিজের ঘাড়ের ওপর একটা আঁচিল খুঁটতে খুঁটতে বললে, 'শুধু বকলম সেঁটে এত বড় বেনে হয়ে ওঠোনি তুমি, এ ধাঁধাটা তুমি কষে দেখবে।'

'আমি দেখেছি'-বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে।

'কি বার হল কষে?'

'তুমি শমীনকে বিয়ে করতে তার ত্রিশ লাখ থাকলে।'

'এটা বোকার মত কথা হল।'

বিরূপাক্ষ সিগারেটে একটা দুটো টান মেরে জানালার ভেতর দিয়ে বাজার গুলজারের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটা-কিন্তু গুলজার তাতে আরো বেড়ে উঠলো বলে মনে হল না। কারুর চেঁদো মাথায় গিয়ে পড়েনি সিগারেট, কারুর সিল্কের শাড়ি পুড়িয়ে দেয়নি।

'বোকা কথা বলেছি?'

'তোমার তো পঁচিশ লাখ আছে। শমীনের যদি পঁচিশ লাখ থাকত, চব্বিশ লাখ, কুড়ি লাখ থাকত তাহলে আমি কি করতাম এই হল ধাঁধা।'

'আর আমার যদি কুড়ি লাখ থাকত, শমীনের পঁচিশ লাখ?'

'কি করতাম তাহলে আমি?'

'কি করতে?'

'কষে বার কর', জয়তী বললে।

'বার করেছি'-বিরূপাক্ষ নতুন আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে। 'তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল টাকার জোরে, আমার জোরে নয়। আমাকে শিখণ্ডীর মত দাঁড় করিয়ে তুমি বাপের বাড়ি গিয়ে কি করেছ এ দু'বছর আড়াই বছর, বলবে আমাকে?'

জয়তী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের বইটা তেপয়ের ওপর থেকে তুলে নিয়েছিল; সেটাকে বন্ধ করে সরিয়ে রেখে বললে, 'আমাকে বিয়ে করার পর থেকে এ তিন বছর তোমার হালচাল কি রকম জিজ্ঞেস করিনি তো তোমাকে কিছু আমি।'

'না, তা করনি বটে।' বিরূপাক্ষ ঠোঁট চেপে হেসে ভেতরে তেজ দমিয়ে রাখতে রাখতে বললে।

'টাকা তোমাকে শিকেয় টেনে নিয়েছে। আমাকেও দু'কান কাটা করেছে তো টাকার লোভ।' জয়তী বললে।

বিরূপাক্ষ আর তর্কবিতর্ক করতে গেল না, ব্যাপারটা বুঝল সে। বুঝে বিশেস কোন অস্বস্তি এল না তার মনে। বিয়ে করার আগের থেকে পরের থেকে জয়তীকে বুঝে আসছে সে। জয়তী বিরূপাক্ষকে ভালবাসা বা শ্রদ্ধা করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধার দিয়ে চলাচল করবে না। কালক্রমে করবে কিনা বলা কঠিন। বিরূপাক্ষকে সমীহ করে–মনে মনে একটা দিক দিয়ে প্রশংসা করে খুব জয়তী; একা হাতে লড়ে নিজেরি হিম্মতে পঁচিশ লাখ টাকা বিরূপাক্ষ কামিয়ে ফেলেছে বলে;–কিন্তু বিরূপাক্ষের টাকার চেয়ে শমীনদের টাকাকেও ভালবাসে জয়তী-একই কাগজের গভর্নমেন্টি প্রমিসরি নোট যদিও টাকাগুলো। শামীনদের দোষ এই যে তাদের হিসেব চার পাঁচ লাখ টাকার বেশি উঠতে পারল না। তা যদি উঠত–একটু বেশ্মিই যদি হত–সবই তো হতে পারত তবে। পারল না। হল না সেটা।

'ওরা আসে-টাসে আজকাল তোমার বাবার বাড়িতে?'

'আসে মাঝে মাঝে।'

'কে কে আসে?'

'মনোতোষ, সুব্রত, শমীন–সকলেই।'

'প্রায়ই আসে বুঝি?'

'কেউ না কেউ রোজই।'

'সিগারেটটা খাচ্ছিল বিরূপাক্ষ, গড়গড়ার, নলটা হাতে ছিল, নলটা নেড়ে-চেড়ে বললে, সময় বেছে কখন আসে তারা?'

'সন্ধ্যার পরে।'

'তারপর কতক্ষণ কেটে যায়?'

'অনেক রাত অব্দি গল্পগুজব চলে–'

বিরূপাক্ষ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'এই রকমই চলবে?'

জয়তী আকাশের রোদ্দের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাকে বিয়ে করেছি বলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপ করতে পারব না–একটা কথা হল। আজকাল এরকম কড়াকড়ি কিছু নেই।'

'তুমি কি চাও?'

'তা তো বলেছি। কোন ওয়ারিশ নেই; বেঁচে থাকলে সম্পত্তিটা আমি পাব।'

বিরূপাক্ষ দু-তিন ঘণ্টার ভেতরেই একটিন সিগারেট ফুরিয়ে ফেলেছে; যে সিগারেটটা পুড়ে গেছে তার আগুনে আর একটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'ওটা তো বিষয়-আসয়ের কথা হল। তবে সব কথাই অবিশ্যি টাকাকড়ির কথা।'

বিরূপাক্ষ একটা ঢেকুর তুলে বললে, 'টাকাকাড়ির কথা ছাড়। আর কি কথা থাকতে পারে?'

'আছে।'

'আছে?'

'আমি বেঁচে থাকতে চাই–বিষয়-টিষয় আছে, বেশ;–কিন্তু আরো কিছু নিয়ে, তা পেতেই হবে।'

বিরূপাক্ষ দু-এক মুহূর্ত হতবোধের মত চেয়ে থেকে তারপর জয়তীর কথার ভাবটা বুঝে নিল।

'কিরকমভাবে বেঁচে থাকতে চাও?'

'যেরকম চলেছে।'

'শতকরা নব্বই দিন বাপের বাড়িতে থেকে?'

'সেটা থাকা দরকার তো।'

'বিয়ে করেছে শমীনরা?'

'করেছে কেউ কেউ।'

'তবুও আসে তোমার কাছে? কেন? বিরূপাক্ষকে তুমি বিয়ে করেছ বলে?'

'তাতে তাদের কি লাভ?'

'পঁচিশ লাখের কিছু কিছু তো লাভ।'

জয়তী বললে, 'বেশ ল্যাজে গোবরে কথা বলা হল–'

'তা তো হল, বিরূপাক্ষ সিগারেটটা জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে 'কত রাত অব্দি থাকে তারা?'

'আমি কত রাত অব্দি থাকি তোমার ঘরে?'

'তার মানে?'

'তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করলে, আমিও করলুম তোমাকে একটা। এসব ধাঁধার এ ছাড়া কোন উত্তর নেই। এসো–ওঠো–'

'কোথায় যেতে হবে?' চিতল মাছের ঘাই মেরে অন্ধকারে জলের মত পাক খেয়ে বিহ্বল হয়ে বললে যেন বিরূপাক্ষ।

'চলো নিউ মার্কেটে যাই–অনেক জিনিস কিনতে হবে।'

বিরূপাক্ষ মোটরটাকে ঠিক করবার জন্যে নিচে চলে গেল। নিজেই মোটর চালিয়ে নিল বিরূপাক্ষ, জয়তীকে নিজের পাশে বসবার জন্যে অনুরোধ করল সে। কিন্তু পেছনের সীটে, একা–বেশ আরাম করে গিয়ে বসল জয়তী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার

পরদিনও জয়তীকে সেই ঘরে দেখা গেল। কমলা রঙের গদী আঁটা সোফায় বসে। বিরূপাক্ষ তেমনি খাটের ওপর শুয়েছিল।

'আজকাল আর স্টক এক্সচেঞ্জে যাই না বড় একটা।'

'এক্ষুণি গিয়ে লাভ নেই,' জয়তী বললে, 'বাজার অবিশ্যি খুব খারাপ নয়–তবে রাই কুড়িয়ে তাল পাকাতে হবে আর কি।'

'কি হবে চুনোপুঁটির দলে ভিড়ে। আমার হাঙরের খাঁইও মিটে গেল বুঝি। বাজারের ভাল আর মন্দ। আর কেন?'

'আমার টাকা চাই।'

'তোমার নামে উইল করতে বল: সে তো রেজিস্টার্ড হয়েছে।'

'ক'লাখ হল?'

'বেশি নয়, লাখ দশেক। বাকি পনেরো লাখ আমি কয়েকটা স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ইউনিভার্সিটিকে দেব ঠিক করেছি।'

'দশ লাখ ক্যাশ? স্কুল, কলেজ, হাসপাতালে যা দেবে ভালোই–'

'না ক্যাশ নয়, জমি, জমা, বাড়ি, মোটরকার সব নিয়ে–'

'অ্যাটর্নির সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই–'

'তা বলো, উইল তো আমি তোমাকে দেখিয়েছি।'

'দেখেছি। একটু আধটু বদলানো দরকার।'

'কি রকম? কোন দিক দিয়ে?'

খাটের ওপর গা ছড়িয়ে বসে ঘাড় কাৎ করে বিরূপাক্ষ সিলিঙের দিকে তাকিয়েছিল।

'দশ লাখকে পঁচিশ লাখ করতে হবে।'

'কি করে তা সম্ভব হবে জয়তী?'

'যে দশ পয়সাকে দশ লাখে উঠিয়েছে সে তা পারবে।'

'তা বটে', বিরূপাক্ষ বললে, 'তা দেখব আমি। কিন্তু তাহলে তো আমার দিনরাত বাজার ঘুরতে হয়–'

বিরূপাক্ষ জয়তীর দিকে তাকাল, সে তাকাল হাতের বইটার দিকে। নিজেকে বললে জয়তী, 'ও নিজের পায় দাঁড়িয়ে মানুষ কিনা সেটা, ঠিক বলতে পারা যায় না; তবে, অনেকটা তাই বটে। ওর টাকার সৌভাগ্য আছে। ও ভাবে ওর জীবনে পরীভাগ্যেও আছে, কিন্তু তা নেই। কিছুটা দিতে হয়েছিল বটে ওকে–কিন্তু আর দেব না। আমার হৃদয়ও কোন দিনই পায়নি–এখন তা সবচেয়ে দূরে চলে গেছে। তবুও ওকে আহত করা ঠিক হবে। ওকে টাকার বাজারে নামিয়ে দেওয়া উচিত আমার; লোকসান দেবে, লাভে হাবুডুবু খাবে, ভাল লাগবে বিরূপাক্ষের সেই তো ওর পৃথিবী। ও যার উইল রেজিস্টারি করেছে বলছে তাতে আমার বিশ্বাস নেই। হাসপাতাল, স্কুল, কলেজকে পনেরো লাখ টাকা দেবে বলছে বিরূপাক্ষ; পনেরো টাকা ও দেবে কিনা সন্দেহ। ও দেবে ইউনিভার্সিটিকে টাকা, হাসপাতালকে? তবেই হয়েছে। সে টাকা খেতে গেলে হাসপাতালে রুগী বাঁচবে না আর–ছেলেদের মাস্টারদের আর ভাত খেতে হবে না বিরূপাক্ষের টাকা চিবিয়ে খেয়ে। ও আমাকে একটা জাল উইল দেখিয়েছে জানি আমি। ওর নিজের অ্যাটর্নি যে কে–আসল উইলটা যে কোথায় জানাবে না আমাকে–জানতে পারাও যাবে না। খুবই সন্দেহ বিরূপাক্ষ কোনো টাকা দেবে কিনা আমাকে; জানতে পারাও যাবে না। খুবই সন্দেহ ওর টাকা পেতে হলে বারো মাস ওর বাড়িতে থাকতে হবে, হবে ওর সঙ্গে শুতে বসতে। কিন্তু তারপরেও জানতে পারা যাবে যে বেশ কয়েকটি হস্তেল ঘুঘুনীর ভোগে উইলের টাকাটা বিলি করে দিয়েছে বিরূপাক্ষ। অনেক ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদের কাছে যাওয়া-আসা করে তো বিরূপাক্ষ–বেশ বড়ঘরের মেয়েদের সঙ্গে ওর কারবার। বিরূপাক্ষকে বিয়ে করবার সময় এসব কথা ভেবে দেখিনি। টাকার কথাই ভেবেছিলুম শুধু। কিন্তু যে মানুষ পাই পয়সার থেকে পঁচিশ লাখে উঠতে পারে তার টাকা যে তার স্ত্রীরও প্রাপ্য নয়, সেটা বুঝে উঠতে পারিনি। এসব লোকের স্ত্রী থাকে না তো; কাউর স্ন্যাকস খুলতে হয় আঁটতে হয় শুধু–সারাদিন নানা রকমারি জায়গায়।

জিভ আর পেটের ব্যবহার রয়েছে। অন্য সব লোকের বেলায় বলা হয় চিন্তা ভাবনার চালনা রয়েছে: সূত্র সংকল্পের সন্ধান রয়েছে, কিন্তু জিভ ও পেটেরই নিত্যনিমিত্ত রয়েছে এ কথা বিরূপাক্ষদের দাড়ি কামিয়ে মুখ পালিশ করে ঘুরতে ফিরতে দেখলেই মনে হয়। অন্য কারো বেলা এমন বেয়াড়াভাবে মনে হয় না। মাথারও ব্যবহার আছে বিরূপাক্ষদের; স্টক এক্সচেঞ্জের সেই বাড়িটায় ঢুকে একটা অব্যক্ত পরিভাষায় চিৎকারের ভেতর; বাঘের গর্জন সিংহের গর্জনও নয়; যেন নিরবচ্ছিন্ন মড়ার দেশে কালে কালে শেয়াল হায়নার হুল্লোড়। খুবই খাটুনি বটে এতে মানুষের মাথার। খুবই।

ওর সঙ্গে বেশি দিন থাকব না আমি। তবে চলে যাবার আগে কিছু টাকা নিয়ে যাব; ও দিতে চাইবে না কিছুই। তবুও নিতেই হবে। ওকে বিয়ে করে অসাধ অরুচি ঘেঁটেছি। ওর টাকা নিয়ে চলে যাওয়া সেই জিনিসেরই জের। কিন্তু কি করব, একটা জিনিস আরম্ভ করে মাঝপথ অবধি এসেছি; মাঝপথেও ছাড়িয়ে গেছি, এখন মুড়ো দেখে নিতে হবে; না হলে কোনো ভালো নতুন সূচনার দিকে চলে যাওয়া সম্ভব হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শুধু টাকার জোরেই নয়, ধূনোর গন্ধের মত মা মনসার মুখে আমি লেগে লেগে থেকে তবে তোমাকে দখল করেছি। দু'বছর তুমি আমাকে কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়েছ যেখানে সেখানে যখন তখন যার তার সামনে-মনে নেই তোমার?'

জয়তী কুরুশ কাঁটা দিয়ে কার্পেট বুনছিল, হাতের নকশাটার দিকে তাকিয়ে থেকে কাজ করতে করতে বললে, 'কেন থাকবে না বিরূপাক্ষ–'

'তুমি আমাকে বিরূপাক্ষ বলছ যে–'

'ও কিছু না, সুবিধের জন্য বলেছি।'

'তুমি তো আমার চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট।'

'বেশ, ডাকব না বিরূপাক্ষ তাহলে।'

'না, না, একা ঘরে ঐ নামেই ডেকো যখনই দরকার হয়। জিনিসটা তুচ্ছ নয়। জয়তী আমাকে ডাকছে বিরূপাক্ষ–আমরা স্বামী-স্ত্রী তো বটেই, কিন্তু তুমি যখন আমাকে বিরূপাক্ষ ডাক, মনে হয় গোরানী ফিরিঙ্গি, মানিক জোড়া আমরা। সেবার এক গোরানী পর্তুগীজ ছুঁড়িকে ধরেছিলুম–'

–বলতে বলতে বিরূপাক্ষ টের পেল বেফাঁস হাওয়া সৃষ্টি করতে যাচ্ছে সে, কোনো দরকার নেই তো তার।

জয়তী কোনো কৌতূহল বোধ করল না, মনটা আরো বেশি হাতের কার্পেটের নমুনার দিকে ঝুঁকে পড়েছে তার, জিনিসটাকে খুব সুন্দর জটিল শুভ্র করে তুলতে হবে।

'একটানা দু-দুটো বছর আমার ছায়া মাড়ালেও তোমার বমি আসত। মানুষ মানুষকে তাড়িয়ে দেয় যেটুকু দম খরচ করে, সেটুকু তাদিগও তোমার ছিল না।–আ হা হা হা হা–?' বিরূপাক্ষ বললে।

'তোমাকে বিয়ে করেছি তো তবুও–?' নিজের জীবনের ফাঁকা কথাটাকে একটু মুখের রস দিয়ে ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করে জয়তী মনে মনে হাসতে হাসতে বললে।

'আমি করিয়েছি।'

'তা হবে; তোমার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলুম আমি–ঘড়ির দোলক যেমন একদিক থেকে আর একদিকে দোলে।'

'ঘড়ির দোলক: তোমার কথাটা বুঝলুম না–'

'আচ্ছা, তেজী মন্দা বাজারের উপমা দিই নইলে, তুমি ক্লাইভ স্ট্রীটের মানুষ।'

'উপমা থাক,' বিরূপাক্ষ জানালার বাইরের কলকাতার হায়রানি–কলতানির দিকে তাকিয়ে বললে, 'এমনি মুখের ভাষায় পরিষ্কার করে বল।'

'আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

একটা কথা তবুও বলতে চাই আমি, অনেকবার বলেছি, তবুও বলি। কিছু মনে কোরো না। মনে যা ভাবি মুখে তা না বলতে পারি না। তুমি ভয় পেতে আমাকে দেখে–ঘেন্না করতে। রাত দুটোর সময় তোমাদের বাড়ির দেয়ালের পাইপ বেয়ে তোমার ঘরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তুমি ঘুমোচ্ছ। তোমার সমস্ত ঘরের ভেতর জ্যোৎস্না, জানালার শিক না ভেঙে ভেতরে ঢোকা যায় না; কিন্তু আমি তো রাহাজানের মত ছেনি হাতে ঢুকিনি ভেতরে ঢোকাও আমার উদ্দেশ্য নয়। তখনও ভাবতুম ও জিনিস আমার মত মুহুরার ছেলের জন্য নয়। তোমাকে ছোঁয়াটোয়া নয়, কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে ত।'

শুনে জয়তী কেমন একটা সেঁকো তিক্ততায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

'তুমি জেগে উঠলে জানালার খড়খড়িতে বিশ্রী শব্দ হচ্ছে বলে; চোখ চেয়ে দেখলে–ভাবলে চোর নাকি চিমড়ে, চীৎকার দেবার ক্ষমতাও হারিয়েছে, এমনই ভয়। তারপর যখন বুঝলে আমি তখন তোমার কোদার নাহান ভয় দোগার নাহান ঘেন্নায় গিয়ে দাঁড়াইল–হ্যা হ্যা হ্যা ঝয়োথি। কিন্তু তবুও–

বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললেন, 'যখন তোমাকে বললুম জানালার ভেতর দিয়ে একটা চেক রেখে যাচ্ছি আপনার জন্যে, তুমি ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করেছিলে–কত টাকার?'

সিগারেটটা হাতে রগড়াতে রগড়াতে বিরূপাক্ষ বললে, 'বলেছিলুম পাঁচ হাজার টাকার–'

জয়তী নিজের মনে নিজেকে বললে, 'সেইজন্যই আমি নিয়েছিলুম। কিন্তু নিয়ে হাত পুড়ছিলো আমার। কিন্তু থেকে অতগুলো টাকা পেলে নেব না? আমার কি দোষ? আমি কি দোষী নারী? একজন অঢেল টাকা নিয়ে দিনরাত গ্রহণে চড়াতে চাইলে কোথায় সে চাঁদ সূর্য যে এড়িয়ে যেতে পারবে...'

বিরূপাক্ষ বললে, 'চেকটা ভালো করে দেখে নিলে ক্রসড চেক নয় দেখে খুশী হলে ডিজঅনার্ড হবে না তো ঐ উচ্চিংড়ীর মত চোখের ড্যালা নেড়ে জিজ্ঞেস করলে; ক্যাশ দিতে পারি কিনা তখুনি, সেই অনুরোধও জানালে; আমি শুধু তোমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। এক্কেকবারে তাজ্জব মাইরা ভাবছিলাম যে আমিত্তির নাহান প্যাচে প্যাচে রস সেই জিনিসের হেইয়ার নাম ট্যাহা।'

বিরূপাক্ষ এই পূর্ববঙ্গীয় ভাষার অর্থ জয়তীকে ব্যাখ্যা করতে যেত না, বুঝতেও চাইত না জয়তী এ ভাষাটা বিরূপাক্ষের নিজের জন্যে, স্বগত, একান্তই আত্মরক্ষার ভাষা।

'সেদিন পঞ্চাশ হাজার টাকার চেকও দিতে পারতুম। ক্যাশও দিত পারতুম। তোমার ঘরে কেউ ছিল না। পড়ি কি মরি করে দোতলার শিক ধরে, দেয়ালের পাইপ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম–যে কোন মুহূর্তে টপকে পড়ে যেতে পারতুম-কাছেই ও দেয়ালে একটা দরজা ছিল, তুমি খুলে দিতে এলে না। ভালোই করেছিলে। টাকা তো পাঁচ হাজার দিয়েছিলাম মাত্র। পঁচিশ হাজার দিলেই দরজা খুলে যেত–তোমার বিছানায়ও জায়গা পেতুম–'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'ছি! ছি!'

'তুমি আমার স্ত্রী জয়তী।'

'ওখান থেকে উঠতে হবে না তোমার। কাছে এসো না। এসো না বলছি। তাহলে এই জানালার ভেতর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব—'

'লাফ দেবে? জানালার তো শিক রয়েছে। কী হল তোমার!' জয়তী গালে হাত দিয়ে ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। সমস্ত শরীর মন তার লেলিহান আগুনে কঠিন ধাতু পদার্থের মত গলে গিয়ে, বিশুদ্ধতর বরফের গহ্বরে কঠিন নিঃস্পন্দ হয়ে পাথর হয়ে গিয়েছে আবার।

'ও, মুখ হাঁড়ি হয়ে গেল বুঝি। আমি তো কোন অন্যায় কথা বলিনি। তুমি যদি আমার স্ত্রী না হতে কথাটা তাহলে বলে ফেলে লজ্জায় আমি ইঁদুরের গর্তে সেঁধুতাম গো। কিন্তু এখন তো তা হতে পারে না, তুমি যে আমার ঘরের বউ গো।'

বিরূপাক্ষ হেলে দুলে ভঙ্গি করে বরফের দেশের সাদা ভালুকের মত উল্লাস করতে গিয়ে কালো ভালুকের কবলিত ভালুকীর মত হাউমাউ করে উঠল। এ একটা বিশেষ বিশ্রুত খেলা তার বটে–অবসরের সময় চিত্ত তোষণের জন্যে। কিন্তু তবুও জয়তীর কোনো মন বা মুখের পরিবর্তন দেখা গেল না। বিরূপাক্ষের কথা–লীলালাস্য কি তার কানে পৌঁছুচ্ছে না? কিসের ভেতর ডুবে গিয়েছে সে?

'এ তিন বছরে তোমার সঙ্গে বসবাস করে আমার তিনটি ছেলেপুলে হেসেখেলে হতে পারত। আমিও ভাবছিলুম একে একে হবে সব–কিন্তু তুমি কি করছ কে জানে, যাক, ওসব আমি গ্রাহ্য করি না। তবে ছেলেপুলে হলে ভাল হত। আমার পাওনা ছিল–খুব মোটা সুদেই। কসুর তো কিছু করা হয়নি–কোনো পক্ষের থেকেই।'

জয়তী বেরিয়ে যাচ্ছিল।

'আমিও যাচ্ছি–ক্লাইভ স্ট্রীটের দিকে। যাবার আগে তোমাকে একটা চেক দিলে নেবে–'

জয়তী পাশ কাটিয়ে সরে যাচ্ছিল।

'পঁচিশ হাজার টাকার চেক–'

কানে তুলল না জয়তী। নিশির ডাকে বিমূঢ়ের মত কোথাও এগিয়ে যাচ্ছিল সে।

'আচ্ছা পঞ্চাশ হাজার টাকারই কেটে দিচ্ছি। আমার চেক কোনো দিন মার যায় না। এখুনি ক্যাশ করে নিতে পারবে চ্যাটার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। অস্ট্রেলিয়া চায়নার–যদি চাও।'

বিরূপাক্ষ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল জয়তীর গতিপথের সীমারেখা দেখা দিয়েছে–সে আর চলছে না, থেমে আছে।

চেক বই হাতে নিয়ে কাটতে কাটতে বিরূপাক্ষ বললে, 'এই নাও পঞ্চাশ হাজার, কিন্তু একটা কথা আছে–'

জয়তী হাঁটতে হাঁটতে ছাদের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আরো হাঁটতে গেলে ছাদ থেকে পড়ে যেতে হয়; অন্য দিকেও মাড় ঘুরতে গেল না সে ঃ চেকটা নেবে কি সে; জয়তী কিছু মীমাংসা করবার আগেই তার হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছে–এমনভাবে যে হাত ঢিল করে ছেড়ে দিলে রাস্তায় উড়ে গিয়ে পড়বে চেকটা গুঁজে দিয়েই সরে গেছে বিরূপাক্ষ; পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক–বেয়ারার চেক–

'আজ রাতে আমার ঘরে শুতে হবে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'তুমি আমাকে জাল উইল দেখিয়েছ।'

'কে বললে?'

'পাকা উইলে কি আছে আমি দেখতে চাই–তোমার অ্যাটর্নি আর আমার অ্যাটর্নির সামনে বসে। দরকার হলে বদলে দিতে চাই।'

'বাদলাবে তুমি?–কেন তোমাকে তো দশ লাখ লিখে দিয়েছি।'

পাঁচশ লাখ পেলেই যথেষ্ট, কিন্তু পাওয়াটা পাকা কিনা সেটা বুঝে দেখতে হবে। আমার অ্যাটর্নির সামনে।'

'আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না? পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক যে এক্ষুণি দিলুম তোমাকে; মিথ্যে চেক? চলো ক্যাশ নিয়ে আসি।'

'আমি নিজেই ক্যাশ করে আনতে পারব।'

'আচ্ছা বেশ, খেয়েদেয়ে মন্মথকে সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চায়না থেকে ভাঙিয়ে আনো। যদি চেক ডিজঅনার না করে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয় তাহলে আজ রাতে আলাদা ঘরে না শুয়ে, আমার ঘরেই ঘুমোবে।'

জয়তী বললে, 'কাল আমার অ্যাটর্নি আনব, তোমার অ্যাটর্নি থাকবে, পাকা উইলের কোথায় কি বদলানো দরকার ঠিক করে নেয়া যাবে।'

তেরো

রাত দশটার আগে সব দিকের সব ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে শেষ হয়ে গেল, বিরূপাক্ষ দেখলে জয়তী তার ঘরে এসে কুশনে বসে আছে; ঘুমোয়নি; কোনো সঙ্কল্প নেই জয়তীর মুখে।

গত ছ'মাস ধরে এ জিনিস ঘটিয়ে ওঠানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাপের বাড়ির থেকে তিন চার দিন হল ফিরে এসেছে, কিন্তু এ তিন চার দিন জয়তী নিচে একটা আলাদা কামরার ভেতর থেকে সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়েছে। বিরূপাক্ষ কেমন একটা ছায়া ছায়া মর্যাদায় আচ্ছাদিত হয়ে কিছু করে নি–কিছু বলেনি জয়তীকে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ টাকা দিয়ে কথা বলিয়েছে; এত রাতে বিরূপাক্ষের ঘরে আজ, কাল, একটানা মাস ছয়েক তো খুবই থেকে যাবে জয়তী। মাঝে মাঝে ধনবৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ না দেখালে মানুষ কি করে স্ত্রীধন পায় ক্লাইভ স্ট্রীটে একটা মোটা রকমের লোকসান দিয়ে এসে চিন্তিত ও চমৎকৃত হয়ে ভাবছিল বিরূপাক্ষ। শুয়ে পড়ল সে।

পরদিন বিরূপাক্ষ আর ক্লাইভ স্ট্রীটে গেল না।

দুপুরবেলা আজ সে একটা মাছরাঙা রঙের সোফায় বসেছিল–জয়তী মুখোমুখি কমলা রঙের সোফায়।

জয়তী, কি বই পড়ছ?'

'আর্ট আর থিয়েটারের একটা বই।'

'ইংরেজি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বুঝব?'

'এরকম বই কি সকলে পড়ে?'

'ইংরেজি জানি না বলে বলছ?'

'না তা নয়', জয়তী বললে, 'ভাষা জানা না জানার জন্যে নয়–' বলতে বলতে থেমে গেল।

'আমাকে বুঝিয়ে দিলে বুঝব না?'

জয়তী বইটার দিকে তাকাল। কোথায় পড়ছিল সে? গোড়ার দিকেই তো; বেশি এগোতে পারেনি; সেই গ্রীক থিয়েটার–

'তর্জমা করে শোনাবে আমাকে?'

'শোনাতে পারা যায়। কিন্তু আমি যা বলছিলাম-এ বইয়ের ভাষায় তোমার বাধবে না তর্জমা করে দিলে। কিন্তু ভাষা কাকে নিয়ে?'

'মানে? কি বলছ, বুঝিয়ে দিল।'

'একটা বইয়ের ভাষাই কি সব?'

'তোমার এ প্রশ্নের মানে কি হল?'

জয়তী দূরে শেলফের ওপর সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের ওপর একখানা আর অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস দুটো পাশাপাশি বইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বই দুটো। এগুলো এখানে এল কি করে? নিজেই এনেছে সে হাতে করে কোনো এক সময়–এবারে নয়, এর আগের বারে যখন এ বাড়িতে ছিল। কিন্তু বিরূপাক্ষের সাহিত্যিক স্থূলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আলঙ্কারিক, অ্যারিস্টটলদের দিকে তাকানো দরকার ছিল না। অ্যারিস্টটল: এ যেন মশা মারতে কামান দাগানো হল। কিন্তু কামান ওখানে নির্গুণভাবে পাতা রয়েছে; সগুণ হচ্ছে মশাটা। চক্কর মেরে মেরে কি যে ধুম্বন দিচ্ছে। ভনভন করে বলছে বিরূপাক্ষ, 'ও উপন্যাসটা এখন থাক।'

'পাতা থাকুক।'

'যে কোন পুরুষ মানুষ যে কোন স্ত্রীলোক পেতে পারে, জানো জয়তী, দুটো জিনিস থাকা চাই সে পুরুষের–'

অগত্যা বইটা খুলতে হল আবার জয়তীকে।

চাকর তামাক সেজে দিয়ে গেল।

মেয়েটি দেখতে শুনতে খুবই ভাল হতে পারে; একটা হ্যাংলা ফোকলা মিনসে তবু তাকে লটকাবে, খুব বড় পণ্ডিত মেয়েকে একটা বোকা পাঁঠা এসে চার দিয়ে খসিয়ে নিয়ে যাবে জয়তী, বড় জাতের মেয়েকে ছোট জাতের ন্যাকা ক্যাবলা এসে গুণ করে ফেলবে, এমন কি সে রূপসী বয়সেও বড়–গুরুস্থানীয়–শিং ভেঙে এঁড়ে বাছুরের সঙ্গে ভিড়ে যাবে সে। না গিয়ে করবে কি সে। কোনো মানুষ যদি কড়া তাগিদে একটি মেয়েমানুষের ছায়ায় ছায়ায় দিনরাত ঘোরে, তাহলে নিত্য নধর মাছ কাটতে কাটতে এমনই জেল্লা খুলে যাবে আঁশবটির যে পরস্পরকে ছাড়া তাদের আর চলবে না–চলবেই না–'

বিরূপাক্ষ নলটা মুখে তুলে নিয়ে টেনে হাত ঝেড়ে পর্বতের মত সেটাকে মেঝের ওপর ফেলে দিল।–শরীরটা সাপ খেলিয়ে নাচিয়ে নিল বেশ এক দমক; কেমন একটা আমেজ বোধ করেছে যেন, ভারি ভাল লাগছে। স্নিগ্ধ, রসিক উল্লুক পুরুষের মত চোখ দুটো ঘুরিয়ে নাচিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'প্রেম ছাড়া আর কি শিবরাত্তিরে জয়তীর বিরূপাক্ষের মন্দিরে যাওয়া? ডাকবে পাখি, ডাক ডাক–ডেকে ওঠে। গা রে পাখি, গান গা, গান গা; কোন গান ভালো লাগে তোর?–গু-গু-গুণমণি দ্-দা-দাসী তব পায়! গুণমণি দাসী তব পায়।'

বিরূপাক্ষ মাথায় একটা প্রবল ঝাঁকি দিয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে বসে নল তুলে নিয়ে তামাক টানল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে আস্তে আস্তে বললে, 'একটা পাখি লক্ষ্য বছরে একবার এসে একটা পাথরে ঠোঁট ঘসে যেত। কিন্তু কোটি কোটি বছর পরে দেখা গেল পাখির ঠোঁট ঘষায় সে পাহাড় ক্ষয়ে গেছে। তাই যদি হয় তাহলে আজ একটা–কাল একটা–পশু একটা-তারপর দিন একটা–ছোট ছোট প্রমিসরি নোটের ঘষায় মেয়েমানুষের বিমুখতার ক্ষয় হবে না কেন? তোমাকে বিয়ে করবার আগেও আমি জানতুম যে কোন একজন স্ত্রীলোকের পেছনে লেগে থাকলে মেগে খেতে হবে না–সেই মেয়ে লোকটিই হবে আমানি। কিন্তু জেনেও ওয়াকিবহাল ছিলুম না। কিন্তু তোমার বাবা মত দিলেন, তুমি মত দিলে আমাদের বিয়ে হল, হিন্দু মতে হল, হিন্দু আইনে হল, হিন্দু নারীর বিয়ে হল, সবই মুঠোর ভেতর এল, আমি বুঝতে পারলুম আমি যা ভেবেছিলুম তাই-ই ঠিক'–বলে মেয়েটির দেবী শরীরের চেয়েও অপরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কাম শরীরের দিকে তাকাতে তাকাতে চোখ দুটো লুব্ধ হয়ে উঠল বিরূপাক্ষের। লোলুপ চোখে গড়গড়ায় নল কুড়িয়ে নিয়ে চোখ বুজে নিজের স্নায়ু শিরায় রক্তের তিরতির ঝিরঝির তিরতির ঝিরঝির স্রোত অনুভব করতে করতে বিরূপাক্ষ আস্তে আস্তে তামাক টানতে লাগল।

'বর্ণভেদ আমি মানি, তুমি অবিশ্যি মান না। কিন্তু তুমি ধনী বামুনের ঘরের মেয়ে, আমি হচ্ছি শূদ্রের ছেলে: তবুও তোমাকে পেতে হল আমার।'

নল ফেলে দিয়ে বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালাল। গড়গড়ার কলকিতে তামাক হয় তো পুড়ে নিভে গিয়েছিল।

বিরূপাক্ষ সিগারেটে দু'একটা টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশট্রের ভেতর চেপে দুমড়ে ঠেলে দিয়ে বললে, 'তোমার বাবা জানতেন আমি শুদ্দুর তুমিও জানতে, কিন্তু আমার উপাধি রায়, আমাকে সকলের কাছে বামুন বলে ভাঁড়িয়ে হিন্দু মতে বিয়ে দেওয়া হল। এটা যে কী ল্যাজে গোবর হল বুঝতে পারলুম না। কেন, রেজিস্ট্রারি করে করলেই হত। আমি তো তাই বলেছিলুম। আমি ইস্ট বেঙ্গলের লোক, নমঃশূদ্র, তোমরা এদিককার বনেদী বড় ঘরের বামুন, তোমাদের আত্মীয় বন্ধুরা আমাকে দেখেননি কোনদিন চেনেন না জানেন না-জানতেও চাইলন না, তোমরাও ভোগা দিলে বেশ কিন্তু-কালোবাজারের পঁচিশ লাখ ট্যাহা এমন ঘন বাইয়্যার খানালোর ব্যাঙের নাহান জাইদ্দর দিয়া কথা কর ঝোয়থি!'

চাকর ঘরে ঢুকল।

'হুজুর'।

'তামাক সেজে নিয়ে আয়।'

'হুজুর' বলে সে গড়গড়া নিয়ে চলে গেল!

'অবিশ্যি আজকাল বর্ণভেদের কোন মানে নেই। এ যুগটাও সব দিক দিয়েই মথিয়ে চলেছে। দাও ধোলাই চোলাই করে সব: একটা ফলাও বিপ্লবের কত্তা আমি। রুধিরের গন্ধে বাঘের মত হয়ে গেছে মন, একটা দুর্দান্ত দিকশূল না ছেড়ে আমি ছাড়ব না। এই পচা সমাজকে পচিয়ে দিতে হবে আরো-লাথি মেরে লৌলাট করে দিতে হবে-শুরু হবে এইটিনথ ইন্টারন্যাশনাল। থার্ড ফোর্থ ফিফথে কিছু হবে না-এইটিনথ।'

চাকর তামাক দিয়ে গেল।

'দোরটা বন্ধ করে যা। মন্মথ কোথায়? বাজারে? দোরটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিস শশী।'

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করা কাকে বলে শশী তা জানে। সে কুলুপ এঁটে চলে গেল।

'এরকম আটকানো থাকবে?' জয়তী বললে।

'থাকুক না।'

'এখন তো দিনের বেলা। আমার বেরুতে হবে তো।'

'কোথা যাবে? এ বাড়িতে কে আছে?'

জয়তী জানালার ভেতর দিয়ে দূর কৃষ্ণচূড়া দেবদারু কলকাতার রাস্তার বড় ধোঁয়াটে চক্ষুস্থির গাছগাছালির দিকে তাকিয়ে রইল। যা খুশি বিরূপাক্ষ করুক-করে যাক। কিন্তু এ সব আর বেশিদিন চলবে না। অ্যাটর্নি অবিনাশবাবু খুব বুঝদার মানুষ। বিরূপাক্ষ লোকসান দিয়ে দেউলে হবার আগেই অবিনাশবাবুর দপ্তরে বসে আইন ঠিক করে নিয়ে গুছিয়ে সরে পড়বে সে। ভাবছিল এই সব জয়তী। কিন্তু তবুও বাইরের পৃথিবীতে নিজের প্রাণের ত্রিসীমায়ও কোথাও কোন উৎসাহ খুঁজে পেল না সে। কী হবে জীবন চালিয়ে। টাকা দিয়েই বা কী হবে। বয়সের সবচেয়ে ভালো সময়টাকেই একটা পাখি বানিয়ে আকাশে ছেড়ে না দিয়ে চোখ উপড়ে মাটিতে ফেলে দিল জয়তী; গাইয়ে পাখিটাকে খুপরীতে ঠেলে দিল তারপর; অন্ধকারে ভাল গান হবে বলে। ভালো গান হবে বটে- কিন্তু অধিকতর অন্ধকারের দরকার- মনস্থিরতর শূন্যতার; বিরূপাক্ষের ছোঁয়াচের থেকে অনেক দূর; তার বাবার ওখানেও নয়; অন্য কোথাও; মৃত্যু এসে মানুষকে তার মনস্থিরতম শূন্যতা দান করবার আগে।

'দেয়ালের পাইপ বেয়ে প্রথমবার তোমার সঙ্গে সেলামী দিয়ে দেখা করতে হয়েছিল। তারপর আরও দশ বারো বার উঠতে হয়েছিল আমাকে ঐ পথ ধরেই। অথচ এমনি দুর্দান্ত তুমি যে একদিনের জন্যেও দোর খুলে দাও নি। তোমার এই বুনো ওলের মত ঠেকার দেখেই আমার এই বাঘা তেঁতুলের মত কামড়। জানোয়ারের মতন কিংবা দেবতার মত। দেবতার মতই-তাই তোমার মত দেবীকে-মানে, ইয়ে-দেবিকা রাণীকে লাভ করেছি আমি। নাও এসো বিছানায়।'

বলে খুব সুভদ্রতা বজায় রাখবার চেষ্টা করে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল বিরূপাক্ষ। অশ্লীল আগোছালো সে হবে না-যদিও তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার অজ্ঞাতসারেই শালীনতার নিগূঢ় অভাবের ভেতর থেকেই জন্মলাভ করেছে-মনকে জন্ম দিয়েছে তার।

'তোমার পরমাইদের কথা মনে পড়ছে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'পরমাই' মানে, প্রেমিক-বিরূপাক্ষের ভাষায়; জয়তী শব্দটা শোনেনি; মনে পড়ল তার; অর্থও মনে পড়ল।

শশী দরজায় তালা মেরে গেছে-রাত আটটা-ন'টার আগে খুলবে কিনা সন্দেহ। আফিং খাওয়া সিংহীর মত ঐ শেয়ালের লালসায় জারিত হওয়ার সময় তার এখন; সিংহীর মতই প্রতিরোধ করবার সময়।

'তোমার পরমাইদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সুতীর্থ মনে পড়ে?'

সুতীর্থের কথা মাঝে মাঝে ভেবেছে জয়তী। বিরূপাক্ষের মুখে সুতীর্থের কথা শুনে মনে পড়ে গেল আবার। নিজের মনকে বললে জয়তী ঃ আমার চেয়ে বয়সে এত বড় সুতীর্থ? কী করে তা হলে তার সঙ্গে আমার-থেমে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠেকে থেকে, জয়তী তারপর আবার ভাবছিল ঃ আমি তো ইউনিভার্সিটির ছেলেদের সঙ্গেই মিশতুম, কেউ কেউ আমার থেকে ছোট, কেউ কেউ দু'চার বছরের বড়। কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগত সুতীর্থের কাছে বসে থাকতে, কথা বলা হত, চুপচাপ বসে থাকা হত, সত্যি সে সব নিস্তব্ধতার ভেতর ওর মাতৃ আর আমার পিতৃগ্রন্থি আর সব নীড়, নক্ষত্র কথা বলে উঠত যেন–সে সব অভিজিৎ চিত্রা সপ্তর্ষির ভাষা এ পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে আজ। কোথাও নেই আর। আমি বুঝতাম একদিন, সুতীর্থ বুঝত।

'আমি তো তোমার চেয়ে কুড়ি বছরের বড়। আমি অবিশ্যি তোমার পরমাই ছিলুম না জয়তী, ওসব ড্রিটকেলেমি আমার ছিল না; খোকার বাবা হতে চেয়েছিলুম কিনা।' বলে বিরূপাক্ষ একটু চুপ করে থেকে যেন বললে, 'কিন্তু সুতীর্থ তোমার জন্মে জন্মে ধান খেয়েছে জয়তী; ওর এক আলাদা মায়া। বছর পনেরো কুড়ির বড় হলেও সে যেন তোমার বাপের চেয়ে ভাইয়ের চেয়ে গর্ভের ছেলের চেয়ে বেশি এমনিভাবেই মিশেছে তার সঙ্গে। সুতীর্থ কবিতা লিখত।' বিরূপাক্ষ বললে।

'লিখত তা কি হত। ছড়া কবিতা দিয়ে কি হবে।' 'আমার কিছু হবে না, কিন্তু পরমাইয়ের তো হয়। আজকালকার পৃথিবীতে বোলতা, পিঁপড়ে, মৌমাছি সকলেই প্রমিসরি নোট খায়, চেক খায়, চিনি মিশ্রি খেতে চায় না, তবুও মাঝে মাঝে গায়েন বায়েনদের ওখানে উড়ে যায় একটু আধটু সরুচাকলি খাবার জন্য–'

'সুতীর্থের কথা হঠাৎ জিজ্ঞেস করছি কেন তোমাকে জান জয়তী?'

জয়তীর দিকে তাকাল না বিরূপাক্ষ। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে অবশেষে ঘরের ভেতর বিচ্ছুরিত সূর্যকিরণের একটা সুদীর্ঘ ফলার দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, ভাবছি তাকে নেমন্তন্ন করে একদিন আনব এখানে। অনেক দিন তোমার পুলক দেখিনি। সুতীর্থের সঙ্গে কথায় কথায় লেগে গেলে বুলবুলির লড়াই করে কি রকম লাল হয়ে উঠতে তুমি–সে লাল এই তিন বছরের ভেতর কই একদিনও তো দেখি নি আর। অবিশ্যি সেটা ছিল ঝগড়ার–ইয়ে, বিবিছাড় ঝগড়ার পুলক ঝুটিয়াল বুলবুলের সঙ্গে। আমার সঙ্গে তোমাকে পুলকিত হতে হয়েছে বর্ষাকালের নাউক্ষেতের কাঁকড়ানীর মত, আমি ক্যাঁকড়াদের রাজা গো।'

বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালাল।

চৌদ্দ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুতীর্থকে ডেকে বললে, 'বসুন'

'আমার ঘরেই চলুন।'

'না, সেদিন গিয়েছিলুম।'

'হাতে অনেক কাজ বিজনহরিবাবু, চলুন আমার ঘরে, কাজ করতে করতে আপনার সঙ্গে কথা হবে।'

'কাজের মালিক কে বলুন'ঃ–নিজেরই চেষ্টায় এখন গলার স্বর স্থিত, ঠাণ্ডা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের।

'মালিক অবিশ্যি আমি নই, আপনিও নন, মজুর, মুদ্দোফরাস আর্দালি বেয়ারা থেকে শুরু করে আমরা সকলেই মালিক। এটা মেনে না নিলে কাজ করতে পারব না।'

'পারবেন না? এই তো সম্প্রতি একটা স্ট্রাইক চলছে'–

'স্ট্রাইক? কোথায়? সুতীর্থ চেয়ার টেনে টেবিলের ওপর কুনই পেতে মনোযোগ দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে তাকাল।

'অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই', ম্যানেজিং ডিরেক্টর সতর্কভাবে বললে, 'আমাদের কারুর কিছু লাভ-ক্ষতি নেই তাতে। এই তো সেদিন ট্রাম স্ট্রাইক হল–'

'ট্রাম স্ট্রাইক–ও!'

'আবার হচ্ছে। ওতো গৃহিণী রোগ, ও সারবে না। ও-সব রাজ-রাজড়ার কারবার–আমরা তো–কিন্তু শুনেছেন কি আমাদের ফার্মে স্ট্রাইকের সম্ভাবনা–'

সুতীর্থ শুনেছিল বইকি। সে তো এ নিয়ে বক্তৃতাও দিয়েছে, পরামর্শ দিয়েছে, ধর্মঘটের দাবিদাওয়া ঠিক করেছে কিছু কিছু।

'নিন সুতীর্থবাবু।' সিগারেটের টিন এগিয়ে দিল সুতীর্থকে।

'শুনেছি বইকি। তা শুনলাম নাকি শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট হবে না–' সুতীর্থ সিগরেটটা জ্বালিয়ে নিল।

'কে বললে?'

'যারা স্ট্রাইক করবে তারাই বলছিল–'

'শুনলাম আপনার পরামর্শে ওরা ওঠে বসে।'

সুতীর্থ মাথা নেড়ে বললে, 'না অতটা নয়, আমি তো ট্রেড ইউনিয়নের কেউ নই। কোনোরকম পোলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গেও আমার কোন সংস্রব নেই। আমি একজন নিতান্তই বাইরের মানুষ। আমার কথা কে শুনবে?

'কিন্তু আপনি কথা বলতে যান তো।'

'যা দরকার মনে করি তা বলি।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর বেল টিপতেই বেয়ারা এল। 'হুইস্কি–'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও আমি খাব না–' সুতীর্থ বললে।

'আপনাকে আমি তো ঘুষ দিচ্ছি না যে খাবেন না। ঘুষ খাবার লোক আপনি নন। তবে মল্ট হুইস্কি খেতে পারেন।'

সুতীর্থ জ্বলন্ত সিগারেটটা সিলিঙের দিকে ছুঁড়ে মেরে বললে, 'না, ও আমি খাব না।'

মল্লিক একটু চকিত হয়ে বললে, ওটা ওদিকে ছিটকে ছুঁড়লেন যে। এই তো অ্যাশট্রে ছিল। এই তো চায়ের পেয়ালা ছিল–'

'একটু মজা দেখলুম–'

'ওদিকে অনেক কাগজপত্র–অগ্নিকাণ্ড না হয়, দেখুন তো সিগারেটটা কোথায় গিয়ে পড়ল–'

'পড়েছে কোথাও। আগুন লাগবে না। লাগতেও পারে!'

'আমি কি এ ফর্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নই?'

সুতীর্থ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের টিন থেকে আর একটা সিগারেট বার করে নিয়ে দেশলাই খুঁজছিল। কোনো কথা বললে না।

'আপনি ধর্মঘটিদের কি পরামর্শ দিয়েছেন?'

'বলেছি তোমাদের খাওয়া পরা থাকার যা দুরবস্থা, তাতে ধর্মঘট করে এই নচ্ছার ফার্মটাকে ন্যাজে মুচড়ে আছাড় মারা ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপায় নেই–'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফুটন্ত নলেন গুড়ের পায়সের মত মুখে ধ্বকটা দমিয়ে রাখতে রাখতে বললে, 'এর জন্যে তো আপনার এই মুহূর্তেই চাকরি যেতে পারে।'

'যাক।'

চন করে মাথায় রক্ত উঠেছে বলেই মাথাটা ঠাণ্ডা করে নেয়া দরকার। কিছুটা ঠাণ্ডা করে নিল; দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে, তারপরে আস্তে আস্তে মল্লিক বললে, 'স্থিরভাবে কাজ করবেন, সব দিক থেকে দেখে শুনে স্থির হয়ে–'

'তাই তো করছি তা না হলে রিসিভিং এন্ডে বসে এখানে কি বসে থাকা সম্ভব হত আজো আমাদের। আমরা তো বেশ সুখাসনে বসে আছি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

'ওদের কোনো কিছু পরামর্শ দেবার আগে ডিরেক্টর বোর্ডের সঙ্গে আপনার কথা বলে দেখা উচিত ছিল। আপনি তা করেন নি, আমাকেও কিছু বলেন নি। অথচ দাবি-দাওয়া ঠিক করেছেন স্ট্রাইকারদের। আপনি এই ফার্মের একজন অফিসার নন?'

সুতীর্থ বললে, 'এ সব প্রশ্নের কোনো মানে হয় না মিস্টার মল্লিক। আমি তিনশো টাকা মাইনে পাই বটে, কিন্তু এই শীতের রাতে আমার চাকরিটাকে গরম কোটের মত গায়ে দিয়ে বেড়াবার শখ আমার নেই। যত দিন এই ফার্মের কুড়ি-পঁচিশ টাকা মাইনের লোকগুলোর কোন সুরাহা না হয়, ততদিন আমার চাকরি–'

বাধা দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বললে, 'এ-সব কথা আমাকে আগে বলা উচিত ছিল আপনার।'

'আমি কেন বলব? ওদের ডেপুটেশন কি সারাটা বছর আপনাকে বলেনি?'

'তা বলেছে।' মল্লিক কিছুক্ষণ চুপ করে ব্লু-বুকগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে তারপরে বললে, 'কিন্তু ওদের সঙ্গে, এ নিয়ে বোঝাপড়ার সময় কেটে যায় নি আমাদের–আপনি মাঝখান থেকে ওপর-পড়া হয়ে কি করে এলেন? এলেন কোত্থেকে? আপনি তো টি-ইউ-সির মেম্বারও নন। কোনো পোলিটিক্যাল পার্টির ধার ধারেন না। অথচ চাকরি ছাড়া চলে না। বিনে চাকরিতে তটের ওপর দিয়ে আপনার নৌকো চালিয়ে নেবে আপনার শ্বশুরের মেয়ে?

মল্লিক চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিতে লাগল; কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করে জ্বালিয়ে নিতে সময় লেগে গেল; দেশলাইয়ের আগুনে ছোলা মাংসের চাঙড়ের মত দেখাচ্ছিল মল্লিকের মুখটাকে। মেজাজ সহজ স্বাভাবিক করে নিতে হবে, উত্তেজিত না হয়ে শান্তভাবে কথা বলতে চেষ্টা করার ইতিহাস তার দশ বারো বছর ধরে চলেছে, কিন্তু এখনও সময়ে অসময়ে বারুদে আগুন লাগিয়ে বসে বুদ্ধি সুদ্ধি গলার আওয়াজ। নানা ওরকম করে হবে না।

'আপনার এসব চলবে না সুতীর্থবাবু।'

'না যদি চলে কাজ ছেড়ে দেব।'

'ছাড়িয়ে দেব।'

'আমি ওদের দলে–'

'বেশ। চলে যান।'

'সুতীর্থ উঠে দাঁড়াল।'

'কিন্তু চলে যাবার আগে'–

ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিজের শরীরটাকে একটু বাঁকিয়ে ঘুরিয়ে খেজুরের রসে পাকানো গোলাপছড়ির মত মোচড় খাইয়ে নিল বার কয়েক; চোখ দুটো ভাসিয়ে, ঘুরপাক খাইয়ে নিল সমস্ত মুখে-কানে কপালেও যেন বিদ্যুতের গতিতে।

হঠাৎ একটা গা ঝাড়া দিয়ে মল্লিক বললে, 'আপনি মি: ম্যাক গ্রেগরকে চেনেন?'

'কোন্ ম্যাকগ্রেগর?'

'কোনো ম্যাকগ্রেগর?'

সুতীর্থ দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে প্রায় দেয়ালে পিঠ রেখে কপালের চামড়ায় চামড়ায় একটু ভেবে বললে, কৈ, না তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মনে করতে পারছেন না। আজ হল শুক্কুরবার। মঙ্গলবার রাত আটটার পর রাসেল স্ট্রিটে যে সাহেবের সঙ্গে আপনি ডিনার খেয়েছেন, দু'চার পিপে হুইস্কি বরবাদ করেছেন তার নাম কি?'

'ওঃ' সুতীর্থের মনে পড়ল। 'আ, আপনি কি করে জানলেন?'

'সে সব আমাদের জেনে নিতে হয়।'

'হ্যাঁ, ওর নাম ম্যাকগ্রেগরই তো। দেখি, ওর কার্ড তো ছিল আমার পকেটে।'

সুতীর্থ তার ওভার কোটের অগুণতি পকেট খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে লাগল।

কনকনে শীতের ভেতরেও মুখচোখ কপাল ঘেমে গেছে দেখে মল্লিক নরম গলায় বললে, 'যাক যাক, সুতীর্থবাবু কার্ড কি হবে। ও আমাদের দেখা আছে। শুনুন, ম্যাকগ্রেগারের সঙ্গে আপনার বেশ দহরম আছে শুনলাম।

'না এমন কিছু নয়।'

'ওর মেমসাহেবের সঙ্গে?'

'মেম সেদিন ছিল বটে টেবিলে। ভালো মানুষ। এর চেয়ে বেশি আর কি। এর বেশি পরিচয় ওদের সঙ্গে আমার নেই।'

'শুনলাম আপনাকে আবার ডিনারে ডেকেছেন ওঁরা।'

'ওটা ভদ্রতা–কিংবা বেশি কিছু–হতেও পারে। মানুষ ওরা গুড সর্ট। আমিই পাল্টা ডিনার দিতে ভুলে গেলুম। বড্ড বেকুবিই হয়েছে–'

সুতীর্থ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আনাচে কানাচে চোখ বুলিয়ে শানিয়ে এক আধ মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললে, 'কিন্তু চালচুলো নেই, কোথায়ই বা ডাকি ওদের।'

'বেশ তো, ফার্মের হোটেলে ডাকুন না। আমিও যাব–আমি টাকা দেব–আমি যত লাগে দেব আপনার নাম করে–'

'কেন ব্যাপার কি?'

'বসুন।'

বেয়ারা হুইস্কি নিয়ে এল।

'ভাণ্ডব? খাবেন?'

সুতীর্থ বিরক্ত হয়ে হেসে মল্লিকের চোখ এড়িয়ে দেওয়ালের একটা ক্যালেন্ডারের চিত্রিত সমুদ্র–নীলিমার এপার-ওপারের দিকে তাকিয়ে–ওপার এপারের দিকে বেশি নিবিষ্ট হয়ে তাকাতে যাচ্ছিল যখন, মল্লিক বললে, মানে ম্যাকগ্রেগর সাহেবকে ধরে খুব একটা বড় কন্ট্রাক্ট নেব।'

'কন্ট্রাক্ট? কিসের?'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাকি সুরে বললে, 'ধনা চোরের আর মনা চোরের। হাঁ করে দাঁড়িয়ে তেলো চাটলেই কি আর সব কথার–ইয়ে–আসুন–চলুন–ফার্পোতে যাই, খাওয়া-দাওয়া মদ মালের ভেতর কি হবে না হবে নিজের চোখেই তো সব দেখতে পাবেন।'

'মদ, মাল?'

'এল কোত্থেকে?'

'ও কিছু নয়; কথার প্যাঁচ। আগামী মাস থেকে আপনার মাইনে হবে পাঁচশো টাকা। যান–কাজ করুন গিয়ে। ভেরি হেভি ডে। বাই দা বাই জয়তীকে চেনেন আপনি?'

'জয়তী? কে সে?'

'বিরূপাক্ষকে চেনেন?'

সুতীর্থ উত্তর দিতে একটু দেরী করে ফেলল, 'এক বিরূপাক্ষকে চিনতুম বৈকি।'

'তারই স্ত্রী।'

'না, তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ নেই।'

'স্টক এক্সচেঞ্জে দেখা হয়েছিল বিরূপাক্ষের সঙ্গে সেদিন। আপনার কথা বললে অনেক। ওর স্ত্রীর সঙ্গে আপনার মিষ্টি সম্পর্ক ছিল বললে।'

'ওর স্ত্রীকে কোনদিন দেখিনি আমি।'

কারুর স্ত্রীর কথা নয়–আকাশ বাতাস চারিদিককার এপক্ষের কথা ভাবতে চিন্তিত ও বিষণ্নভাবে সুতীর্থ নিজের কামরার দিকে চলে গেল।

পনেরো

'কে তুমি সুতীর্থ? এতদিন ছিলে কোথায়?'

সুতীর্থের কুশনে বসেছিলেন মণিকা। সন্ধ্যে উতরে গেছে, বাতি জ্বালানো হয়নি। শীত কমেছিল বটে, কিন্তু আজ আবার পড়েছে বেশ। মণিকার গায়ে সুতীর্থের র‍্যাগ।

'বাঃ বেশ তো তুমি, এতদিন কোন ঘাপটিতে ছিলে? আসনি কেন সুতীর্থ?'

আগন্তুক সহসা কোনো উত্তর দিচ্ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এতদিন কি কলকাতার বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন নাকি? দেখ, তোমার চরিত্রে সন্দেহ হয় আমার–তুমি এরকম করছ কেন সুতীর্থ–তুমি কি জান না–?'

কেমন একটু অস্পষ্ট প্রেরণায় টলমল করে উঠে কোনো এক কথা বুদ্ধিকে ঠকাচ্ছে বলে প্রাণকে ঠকাতে চেষ্টা করে মণিকা ঢোঁক গিলে বললেন, 'বয়স হয়েছে আমার। বাড়িতে অসুখ-বিসুখ আছে। কাঁহাতক তোমার হয়ে ঘরদোর সামলাতে পারি আমি। তুমি যে কোথায় বেরিয়ে যাও–'

'আমি–'

'ওমা, এ কে?' ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন মণিকা, তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা টেনে নিয়ে অস্ফুটে বললেন 'এ তো সুতীর্থ নয়। কে আবার এল।'

সাঁ করে উঠে দাঁড়িয়ে সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে বিরূপাক্ষের মুখোমুখি এসে স্তম্ভিত হয়ে মণিকা বললেন, 'কে? কে আপনি?'

'আমি–বিরূপাক্ষ–সুতীর্থের খোঁজে এসেছিলাম–'

বিরূপাক্ষের আগাগোড়ার দিকে তাকিয়ে মণিকার মনটা কেমন একটা বিরক্তি, উপেক্ষা নৈরাশ্যে ভরে উঠল।

'তাই তো আমি মনে করেছিলুম সুতীর্থ এসেছে বুঝি। কিন্তু কে–'

বিছানার কিনারে সরে দাঁড়িয়ে মণিকা বললেন, 'সুতীর্থ তো সাত-আটদিন ধরে বাড়িতে আসেনি।'

'বসুন।'

'না, আমি এখন ঘরে যাব। আপনার কি দরকার বলুন তো–' মণিকা বললেন।

'কোথায় গিয়েছে সুতীর্থ?'

'বলে যায় না।'

'এখানে থাকে তো?'

'আজকাল? হ্যাঁ, থাকে অবিশ্যি, তবে চালা বেঁধে থাকে না। কোথায় উবে যায়–দশ-পনেরো দিনের ভেতর দেখাই পাওয়া যায় না। কোথায় যায়–কোথায় থাকে–কি করে–কিছুই জানতে পারি না। আপনি কে? দেনদার?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?'

'আমি সুতীর্থের অনেক কাল আগের পরিচিত মানুষ।'

'বন্ধু? বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন যে।'

'বসব বলেই তো এসেছিলুম।'

ঘরের একটা কৌচের ওপর বসে বিরূপাক্ষ বললে, 'বন্ধু আমি নিজেকে বলতে পারি না। ওরা হল বিদ্বান মানুষ–ওদের সঙ্গে কি আমাদের মত দ্বারপণ্ডিতের বন্ধুত্ব সাজে।'

বিরূপাক্ষের গলায় কেন যেন কেমন একটা আন্তরিক নালিশের আমেজ পাওয়া যাচ্ছিল। সুতীর্থ যদি এখানে থাকত তাহলে অবিশ্যি অনুভব করত কিরকম অহেতুক ও অসার বিরূপাক্ষের এ গলার আওয়াজ–কথাবার্তা।

'গত তিন-চার বছরের মধ্যে ও আমার বাড়ি মাড়ায়নি। এই মাস তিনেক আগে মিনিট কুড়ি পঁচিশের জন্যে একবার পায়ের ধুলো দিয়েছিল মাত্র; তাও রাস্তায় দেখা হয়েছিল–ঘাড় ধরে নিয়ে গেছলুম বলে। ভেবেছিলুম আমার স্ত্রীর সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেব–'

'আপনি পরিবার নিয়ে এখানে থাকেন বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'আজকাল কলকাতায় ছেলেপুলে সংসার নিয়ে থাকা। বাড়ি পাবেন কোথা? এও তো ব্ল্যাকমার্কেটে চড়েছে! মুদি-মোদ্দাফরাসের না, ওটা হচ্ছে কসায়ের কালোবাজার–' আস্তে করে বললেন মণিকা।

সে কথায় কান না দিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে তার সঙ্গে সুতীর্থের আগের আলাপ খাতির-টাতির ছিল। কিন্তু ও জানে না যে জয়তী আমার স্ত্রী। ওকে তা জানিয়ে দেবার জন্যেই ধরে বেঁধে নিয়ে গেছলুম, কিন্তু ওর সবুর সইল না। একটা কেলেঙ্কারী করে বেড়িয়ে গেল সেদিন। আর দেখা নেই–'

মণিকা খানিকটা নিবাদ হয়ে বললেন, 'কি কেলেঙ্কারি?'

'আমার মনে হয়েছিল মদ খেয়েছিল।'

'মদ? সুতীর্থ? মদ তো ও খায় না।'

'তা হবে। আমাকে তেড়ে এসে জড়িয়ে ধরলে–বললে, আমার স্ত্রী আমাকে কী যে ভালবাসে বিরূপাক্ষ–'

'কার স্ত্রী?' বিচক্ষণভাবে বিরূপাক্ষের দিকে তাকিয়ে মণিকা জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওর স্ত্রী; সুতীর্থের স্ত্রী।'

'সুতীর্থ কি বিয়ে করেছে?'

'তা না হলে স্ত্রীর কথা বলবে কেন? বিরূপাক্ষ আস্তে আস্তে বললে–নম্র সুজন চোখে ঠোঁটে একটু হাসি ছড়িয়ে।

মণিকা খোঁপার ওপরে আটকানো ঘোমটা মাথার দিকে–কপালের দিকে খানিকটা টেনে নিয়ে আবার কিছুটা সরিয়ে দিয়ে কি যেন বলবেন মনে করেও বললেন না। তৎক্ষণাৎ–কিন্তু তবুও বললেন 'আপনারা তার ছেলেবেলার বন্ধু জানেন না সুতীর্থ বিয়ে করেছে কিনা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গত তিন-চার বছরের মধ্যে ওর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। কি করেছে না করেছে জানি না। এর আগে বিয়ে করেনি।'

'ঠিক জানেন?'

'জানি বৈকি।'

'তাহলে আর করেনি।'

মণিকার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে বিরূপাক্ষ তার মুখের দিকে ভালো করে তাকাল। প্রথম দেখেই তাক লেগে গিয়েছিল বিরূপাক্ষের, এখন সে 'হয়নি, এরকম হতে পারে না' অনুভব করতে করতে নিমেশ নিহত হয়ে বসে রইল। সুতীর্থের খোঁজে এসেছিল বিরূপাক্ষ। জয়তীকে যে বিয়ে করেছে বিরূপাক্ষ সে যে বাস্তবিকই তার ঘরের বৌ, এই সত্যের ময়ূরপুচ্ছ তার কাকের পালকে গুঁজে সুতীর্থের সঙ্গে কোনোদিন সাক্ষাৎ করবার সুযোগ পায়নি। সেটা দরকার। মেনে যখন চারদিক দিয়ে ফুর্তিতে ভাঁটা এসে পড়েছে তখন যাদের জীবনে সম্ভাবনা ছিল ঢের, কিন্তু হল না কিছু সেই সব লোকগুলোকে নিজের টাকা এবং অনির্বচন স্ত্রীর গল্পে একটু মাথা গুলিয়ে দেবার শখ জেগেছিল বিরূপাক্ষের। শখটা দু'চার মুহূর্তের কর্পূরের মতন টেঁকসই। কিন্তু তবুও শখের মানুষ বিরূপাক্ষ। সেই জন্যই সুতীর্থের কাছে আসে। এসেছে সে। ভালোও বাসে সুতীর্থকে এত বেশি যে জয়তী যদি স্বামীকে সত্যিই ছেড়ে যেতে চায়–তাহলে সুতীর্থের নির্দেশ–যাই হোক না কেন–বিরূপাক্ষ ও জয়তীর পথ কেটে দিক।

কিন্তু কে এই নারী? বিরূপাক্ষ অনড় অতল হয়ে ভাবছিল। এর বয়স কত হবে? সুতীর্থের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? সুতীর্থের সোফায়; অন্ধকার–শীতের সন্ধ্যায়–রাগ গায় দিয়ে; ভাবতে ভাবতে বিরূপাক্ষের শিশু ও প্রৌঢ় মনের সন্ধিসত্তায়–যেখানে সংসর্গদানের সম্ভাবনা হিসাবে স্ত্রীলোকের ওপর চোখ পড়ে–কেমন যেন বাড়াবাড়ি হচ্ছে টের পেয়ে নিজেকে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে ঠিক করে নিতে হল বিরূপাক্ষের।

ভাবছিল: জয়তীকে আমি কোনোদিনই পাইনি। সবচেয়ে বেশি করে পেয়েছি বলে ভুল করেছিলুম যখন তখনই যদি জয়তী আমার ভুল ভেঙ্গে দিত, তাহলে পরস্পরের শরীরের ওপর যে আকাট অধিকার করেছি আমরা তার কোনো প্রয়োজন হত না তো।

বিরূপাক্ষর সাদা অনুভূতি সিধে চেতনা এরকমভাবে ব্যাপারটার মীমাংসা করে নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ সমস্যার ছক অন্য রকম; জয়তী প্রতি মুহূর্তেই বিরূপাক্ষের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না, সে প্রথম থেকেই বিরূপাক্ষের থেকে এত বেশি দূরে যে প্রকৃতির অথবা হৃদয়লোকের আইনজ্ঞানী বিশ্বের সেইটেই শেষ সীমা। (বাহির বা অন্তরের) বিশ্ব যেখানে আপেক্ষিক মণ্ডল নয় আর–সেখানে অবিশ্যি এদের দু'জনের দূরত্ব ক্রমশই দূরতর হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমাদের চেনাজানা নিসর্গ ও সংসারের প্রয়োজন সম্পর্কে সময়ও দেশ যে অশেষ, অনিঃশেষ, কে এসে তা প্রমাণ করে পরিষ্কার করে দেবে বিরূপাক্ষকে; খুব সজাগ চেতনায় নয় একটা সংস্কারের আবেগে সে ধরে নিয়েছে অবিশ্যি যে জয়তী ও তার যোগাযোগের ব্যবধান এত বেশি নয় যে কোনো দূরত্বের মাপক স্পান দিয়ে তাকে মাপা চলে না।

'আপনি কে?' সোজা প্রশ্ন করে বসল বিরূপাক্ষ।

'আমি? কেন?' মণিকা চলে যাবেন না দাঁড়াবেন ভাবছিলেন। 'আমি কেউ নই।'

'আমি ভেবেছিলুম সুতীর্থের নিকট আত্মীয়–'

মণিকা বিরূপাক্ষের দামী শিল্কের কাপড়-চোপড় সোনার ঘড়ি বোতাম মির্জাপুরী শাল জুতোর চামড়া ও রকমারি তলিয়ে দেখছিলেন। এত সব চটক আছে বলেই খানিকটা ভদ্রতা অন্তত করতে হয়–মধ্যবিত্ত মেয়েদের এই রক্তের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে না পেরে এতক্ষণ তিনি আছেন। এ না হলে হয়তো আগেই উঠে চলে যেতেন।

মণিকা একটু সাপের মন্ত্রের ধূলো উড়িয়ে হেসে বললেন, 'সুতীর্থ; না, তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'আমি ভেবেছিলুম আপনি তার বিশেষ আত্মীয়।'

'যারা ঘাড়ে চড়ে থাকে সেইরকম একজন?'

'মানে?'

'সাপ্লায়ের ছোকরাদের, কন্ট্রাক্টের ছোঁড়াদের হাতে জল খেয়ে, যাদের দিন কাটে; এমন কত মেয়ে-পুরুষ কলকাতায় আছে–'

'না, না, তা কেন?–তা নয় সুতীর্থের বন্ধু আপনি। আপনি অনেকক্ষণ বসে আছেন। আপনাকে চা দেওয়া হল না তো।'

'না, না, আমি চা খাই না। আপনি বসুন।'

মনের ভুলে সিগারেট কেস বার করে পকেটে তখুনি ঢুকিয়ে রাখল বিরূপাক্ষ। মণিকা জিনিসটা দেখলেন; সিগারেটের প্রয়োজন লোকটার, কিন্তু তবুও কোন উচ্চাবাচ্য করতে গেলেন না তিনি। কেন করবেন? কেন এই মানুষ সামনে বসে তামাক টেনে বেয়াদবি করবে?

'সুতীর্থের কোন পাত্তাই নেই?'

'না।'

'কোথায় গেলে পাওয়া যেতে পারে কোন রকম একটা আন্দাজ দিতে পারেন কি?'

'আমাকে বলে না কিছু।'

'অফিস করে আজকাল?'

'জানি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সেদিন বিজনহরি মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি সুতীর্থকে চেনেন বললেন, মল্লিকের অফিসেই কাজ করতে নাকি, কিন্তু অফিস ছেড়ে চলে গিয়েছে বললেন। অন্য কোনো অফিসে গেছে?'

মণিকা অবিশ্যি একটা অফিসের ঠিকানা জানতেন, ফোন নম্বরও জানা ছিল তাঁর, ফোনও করেছেন কয়েকবার; কিন্তু কোন সদুত্তর পাননি। অন্য কোথাও গেল সুতীর্থ? সুতীর্থের অফিসে আজকাল নাকি স্ট্রাইক চলেছে। এ মানুষটাকে এ সব কথা বলে কী হবে; ভাবছিলেন মণিকা। সুতীর্থকে তিনি ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু এটা কত দূর মমতা, কত দূর সুপ্রিয়তার আকর্ষণ সহসা ঠিক করে উঠতে পারেননি। জিনিসটা ঠিক করে ফেললে আজ হোক, কাল হোক কিছুটা ছাঁদ কেটে যাবে, ছক মুছে যাবার ঘরানা পৃথিবীর আর ঘরণী মানুষের। সেটা কি হতে দিতে হবে? হলে ভাল হবে?

'আপনি সুতীর্থের শুভানুধ্যায়ী—'

'শুধু তাই যদি হতাম তা হলে সব কাজ ফেলে এখানে আসতাম? আমাদের সম্পর্ক আরো—'

বিরূপাক্ষ ভাষা খুঁজছিল, কিন্তু যে রকম শব্দ বা পরিভাষা যে চাচ্ছিল তা পাচ্ছিল না; 'আমাদের সম্পর্ক জল ঠিক নয়, জলের সঙ্গে স্পিরিট মিশিয়ে', এই রকম বুঝি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এই মহিলার সামনে ও সব বুলি অব্যবহার্য।

'আরো বেশি কিছু; অনেক বেশি। জানি আমি।' মণিকা বললেন, 'সেই জন্যেই, বলছি; একটা কথা বলতে চাই আপনাকে।'

'বলুন।'

'সুতীর্থ হয়তো দেনার পাকে জাড়িয়ে গেছে।'

'কেন?'

'বে-থা করেনি বটে, সংসার পোষণ নেই, কিছু নেই, কিন্তু বেহিবেসী বড্ড-তা ছাড়া অফিসে স্ট্রাইক চলেছে।'

'স্ট্রাইক? কোন ফ্যাক্টরী বলুন তো?'

'ফ্যাক্টরী নয়। কি একটা ফার্ম। ওদের নিজেদের ফ্যাক্টরী আছে কিনা আমি জানি না। সুতীর্থ ধর্মঘটীদের দলে ভিড়ে গেছে নিশ্চয়ই। চাকরি গেছে ওর-ভাত জুটেছে কিনা সন্দেহ—'

বিরূপাক্ষ সিগারেট-কেসটা আবার বার করে বললে, 'বটে, তা হলে তো বড় মুশকিল হল। ও এখানে চলে আসে না কেন? আপনি তো ওর নিজের মানুষ।'

'ভাত খেতে সে এখানে আসবে না। খিদিরপুরে মেটেবুরুজে মজুরদের সঙ্গে মিশে খাবে।' 'আপনি বাস্তবিক সুতীর্থের কে হন?'

'কেউ নয়। আমি বাড়িউলি—' বলে বিরূপাক্ষের তেরছা চোখ এড়িয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় হেঁট করে সাতপাঁচ চিন্তা করতে লাগলেন মণিকা। বিরূপাক্ষ এইবার একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে আটকে নিল।

দক্ষিণ কলকাতার এ পাড়ায় কোনো বাড়িউলি থাকে না, থাকে বাড়ির মালিক। ইনি মেয়েমানুষ নন—মহিলা; তবুও ঐ বিচিত্র শব্দটা ব্যবহার করলেন কেন। হয়তো অজ্ঞতায় অসতর্কতায় অজ্ঞাতসারে শব্দটা বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে। কাজেই বিরূপাক্ষের সিগারেটও আর দেরি না করেই জ্বলে উঠল।

'বেশ ভাল বাড়ি; সুতীর্থ দোতলার সমস্ত ফ্ল্যাটটা ভাড়া করে আছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। ভাড়া দিচ্ছে না।'

কণ্ঠে নালিশের সুর, কিন্তু ততটা জমেনি; নালিশটা যেন সুতীর্থের বিরুদ্ধে নয় ঠিক, নিজের অদৃষ্টের বিরুদ্ধে, আজকালকার দিনকালের—হয়তো বিরূপাক্ষেরও বিরুদ্ধে।

'আহা কেন—ভাড়া দিচ্ছে না কেন? আপনি কি ছেড়ে দিয়েছেন?'

'না, না, আমি ছেড়ে দেব কেন। সেলামী ভাড়া নিয়ে কত হাজার হাজার টাকা পাওয়া যায় এ বাজারে। আমি ছাড়ব কেন। আমার টাকার বড্ড দরকার।'

বিরূপাক্ষের মনে হল, এই কথাটার জন্যেই এতক্ষণ যেন সে অপেক্ষা করছিল; 'টাকার বড় দরকার' এই আওয়াজটার জন্যে। কলকাতার যে কোনো ফটফটে ঝরঝরে বা এঁদো ঘিঞ্জি আস্তানায়ই যাওয়া যাক না কেন, যে কোনো দেবা-পিশাচীর সঙ্গেই দেখা হোক, 'টাকার বড় দরকার' শেষ পর্যন্ত এই আবেদনেই কান শানিয়ে ওঠে তার, হৃদয়ে দোলা লাগে, কর্তব্য পথ ঠিক করে নেয় সে; রক্ত যদি বাস্তবিকই খোঁটা দিয়ে ওঠে বাস্তবিকই চেক কাটে সে। 'কত টাকা চাই? ক' মাসের ভাড়া?'

মণিকা দেবী একটু চমকে চেয়ে দেখলেন বিরূপাক্ষ পকেট থেকে চেক বই বের করছে—

'না, না, আপনি দেবেন কেন? আপনাকে আমি দিতে বলিনি তো।'

'সুতীর্থের জন্যে আমি দিয়েই থাকি। ও তো আমার-এক হাজার টাকায় হবে, না আরো বেশি?' ফাউন্টেনপেন বার করে মণিকাকে জিজ্ঞেস করল বিরূপাক্ষ।

বিরূপাক্ষের দিকে তীক্ষ্ণ আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মণিকা হতমান মলিনতার কেমন বেমানানো ভাবে যেন দাঁড়িয়ে রইলেন।

'এক হাজারে মন উঠছে না হয়তো—'

'মন উঠছে না' বলছে লোকটা; বেল্লিক, আহম্মক হয়তো, আনাড়ি, ভাষার ব্যবহার জানে না। সে যা হোক, অত্যন্ত বেয়াদবির কথা বলা হয়েছে; এর পর আর এক মুহূর্তও এই ঘরে থাকা উচিত মণিকার? কি যেন বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়ে কথা আটকে গেল তবুও তাঁর; নড়ি-নড়ি করে কেমন একটা শীতকম্পে কেঁপে উঠল তার পায়ের নখ থেকে মাথার তালু অবধি; কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন না তিনি।

'তিন হাজার করে দিলুম।'

বিরূপাক্ষ উঠে দাঁড়াল। মণিকার দিকে তাকিয়ে বা না তাকিয়ে এতক্ষণে সিগারেট জ্বালাবার অবসর হল তার। চেকটা সে মণিকার হাতে দিল না। বিছানার ওপর রেখে দিল। বললে, 'এই চেক' তাই বলে চেকটা হাতে তুলে যে নিতে হবে বিরূপাক্ষের সাক্ষাতেই তার কোন প্রয়োজন নেই। মণিকাকে সে রকম দীন-দৈনতার ভেতর নামিয়ে রসগ্রহণ করবার মানুষ বিরূপাক্ষ নয়। এখন নয়। মণিকার বেলা নয়। মানুষের আত্মা আছে-আত্মার দক্ষিণ মুখ-খুব সম্ভব অনেক দিনের জন্যে-মণিকার মত এরকম নারীর সম্পর্কে।

'আজ বড্ড শীত।'

চেক বইটার দিকে আড়চোখে তাকিয়েছিলেন মণিকা, বিরূপাক্ষ তার দিকে ফিরে তাকাবার আগেই চোখ আর একদিকে সরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি; বললেন, 'শীত খুব।'

'আমি তো সিল্কের পাঞ্জাবি পরে এসেছি, ভেবেছিলুম এইবার কলকাতায় বসন্তের হাওয়া ছেড়েছে বুঝি-'

'মাঘ মাস তো শেষ হতে চলল।'

'রাত ন'টা।'

'চললেন?'

'হ্যাঁ, সুতীর্থের কোনো খোঁজখবর পেলুম না তো।'

'শুনুন-মণিকা চেকটা ফিরিয়ে দেবার জন্য হাত বাড়ালেন।

'ওটা সুতীর্থের-'

'কিন্তু সে তো আসবে না।'

'দরকার নেই। ভাড়ার টাকা নিয়ে নেবেন। চেক ডিজঅনার্ড হবে না। কালই ক্যাশ করে নেবেন। বেয়ারার চেক দেব?'

'ওটা কি ক্রসড?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ব্যাঙ্কে তো কোনো অ্যাকাউন্ট নেই আমাদের-'

'কোন ব্যাঙ্কেই নেই? এটা অবিশ্যি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের।'

মণিকা ঘাড় নেড়ে বললেন-'না।'

'ও হোঃ'-বিরূপাক্ষ বললে, 'চেকটাতো সুতীর্থের নামে লিখে দিয়েছি'-চেক বই বার করে বিরূপাক্ষ লিখতে লিখতে বললে, 'আপনার নাম?

ওঃ মণিকা মজুমদার, এই যে আপনার আঁচলে সোনালি জরি দিয়ে লেখা আছে দেখছি-'

মণিকা আঁচল সামনে নিয়ে ঠিক হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বিরূপাক্ষ চেক কেটে মণিকাকে বললে, 'এই যে তিন হাজার টাকার-আপনার নামে-'বিছানার ওপর রেখে দিল চেকটা বিরূপাক্ষ।

'এটা চাটার্ড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড চায়নার-খুব বড় ব্যাঙ্ক এশিয়ার। ক্লাইভ স্ট্রিটে পাঠিয়ে দেবেন আপনাদের বেয়ারাকে।'

বিরূপাক্ষ হেসে উঠে বললে, 'আমিও যেমন! এবারও ক্রসড চেক কেটেছি। বেয়ারার চেক দেব-বেয়ারার চেক দেব মণিকা মজুমদারকে।'

ক্রসড চেকটা বিছানার ওপর থেকে তুলে নেবার জন্যে হাত বাড়াবার আগেই মণিকা আলগোছে কুড়িয়ে নিয়ে যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে গায়ের শালটা বেশ আঁট করে জড়িয়ে নিতে লাগলেন।

ষোল

বাঃ, কী অপরূপই দেখাচ্ছে মণিকাকে; ভাবছিল বিরূপাক্ষ; যেন ভরা নদীর তীরে জঙ্গলের অন্ধকারে রাতের বাঘিনী সহসা অনির্বাণ মানুষী হয়ে দাঁড়িয়েছে-অথচ বাঘিনীও বটে সে, তেমনি সাহসিকা সুদৃঢ়া মহিয়সী। এরই মমতা ষোলকলায় পেয়েছে সুতীর্থ; অথচ দামাল হয়ে ফিরছে বুঝি বাইরে? আহাম্মক, দামাল হয়ে ধর্মঘটে নাচাচ্ছে।

'চেকটা আমি সুতীর্থকে দিয়ে দেব।'

'কেন, আপনার নামে তো কেটেছি।'

'সই করে দিয়ে দেব।'

'আচ্ছা।' বিরূপাক্ষ বললে, 'কিন্তু আপনাকে ভাড়া দিচ্ছে না, ওকে দেবেন? আপনার নামেই জমা করে নিন না।'

'বললুমই তো ব্যাংকে আমার কোন কারবার নেই, সুতীর্থেরও নেই। কিন্তু ওকে দিলে সে ভাঙিয়ে সমস্ত টাকাটাই আমাকে এনে দেবে। যদি না-'

বিরূপাক্ষ চোখ তুলে তাকাল মণিকার দিকে। ডান চোখের ভুরু উঠে গেছে-যত দূর ভুরুদের ওঠার শক্তি-বেশ পরিপূর্ণ সন্নির্বন্ধে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'স্ট্রাইকে যদি মেতে থাকে তা হলে ও চেক সুতীর্থকে দেব না আমি–'

'তা দেওয়াও উচিত নয়। এটা আপনারই। আমি কি ভাবছিলুম জানেন?'

সিগারেট জ্বালিয়েছিল বটে; কিন্তু টানার অবসর পায়নি বিরূপাক্ষ। নিভে গিয়েছিল সেটা। পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করে বিরূপাক্ষ বললে, 'আমি ক্যাশ নিয়েও ফিরি। এই দেখুন না–' বলে পোর্টফোলিও ব্যাগের ভেতর থেকে একশো টাকার নোটের কয়েকটা তাড়া বের করে বললে, 'বরং এগুলোই রেখে যাই–'

মণিকা খানিকটা বিপর্যস্ত হয়ে ঘরব্যারের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তারপর বিরূপাক্ষের চোখের ভেতর দিয়ে তার আতলস্বচ্ছ অন্তরাত্মাকে দেখে নিতে লাগল এমনি নীরব নির্মমভাবে যে বিরূপাক্ষ দাঁড়াবে কি চলে যাবে কথা বলবে না থ হয়ে থাকবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে এই মেয়েমানুষটিকে–এই দেবাংশ উজ্জ্বল চিতল মাছটাকে হায়রান করবার আগে বেশ কিছু কাল সুতো ছাড়বার প্রয়োজন বটে উপলব্ধি করে বলে উঠল, 'আমি চলি।'

'বসুন। এই টাকাগুলো?'

'সুতীর্থকে দেবেন!'

'এই চেক?'

'চেকটাও।'

'কোথায় পাব তাকে?'

'পাওয়ার দরকার নেই তার পাওনা তো আপনার প্রাপ্য।'

মণিকা হেসে বললেন, 'বেশ। মেনে নিলুম। কত টাকা আছে? আপনি কে? এত টাকার ছড়াছড়ি–'

'আমি উঠি।'

'কটা বেজেছে আপনার ঘড়িতে?'

'প্রায় দশটা।'

'কত দূর যেতে হবে?'

'ও–সেই রিজেন্ট পার্কের দিকে–'

'রিজেন্ট পার্কের বিখ্যাত মানুষকেই অতিথি করেছি আজ আমার ঘরে।'

'আমি কালোবাজারে বড় মানুষ।'

'হলেনই বা। বড় মানুষ তো। কালোবাজারে সবাই কি বড় হতে পেরেছে? রিজেন্ট পার্কে কি আপনার নিজের বাড়ি?'

'আছে একটা।'

'চোরাবাজারে চুরি করে বড় হয়েছেন স্বীকার করছেন। সকলে তো কবুল করে না। কেউই করে না!'

'যার কাছে খাঁটি থাকা দরকার সেখানে ভাঁড়িয়ে লাভ কি?'

–শুনে–সামলে নিয়ে মণিকা কথা বাড়াতে গেলেন না।

দরজার দিকে যেতে যেতে এক-আধ পা ফিরে এসে বিরূপাক্ষ বললে, 'আজ বেশি রাত হয়ে গেছে।'

'দেখছি তো।'

'গাড়ি আনিনি, ভুল হয়ে গেছে। সুতীর্থের বিছানায় রাতটা যদি কাটিয়ে দিই তাহলে তেতলায় আপনাদের কোন আপত্তি হবে না তো? বাড়িটা তো আপনার–'

'আমার নয় ওঁর। কিন্তু উনি কোন আপত্তি করবেন। আপনি থাকুন।'

'আপনি এক্ষুণি চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ, আপনার খাবার ব্যবস্থা করতে হয়।'

'আমি খেয়ে বেরিয়েছি; শীতের সন্ধ্যায় আমি খেয়ে দেয়ে সফরে নামি।'

'চাও খাবেন না?'

'না', বিরূপাক্ষ বাতিটা নিভিয়ে দিল।

মণিকা সন্ত্রস্ত হলেন না, অপ্রতিভ হলেন না। সহজ গলায় বললেন, 'নিভিয়ে দিলেন, আমার একটু কাজ বাকি আছে।'

বলেই বাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে বিরূপাক্ষের একশো টাকার কুড়িটা নোট সুতীর্থের বালিশের ওপর থেকে গুছিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে ওপরে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে বিরূপাক্ষের জন্যে চা ফল মিষ্টি নিয়ে চাকর এসে হাজির হল। মণিকার অবিশ্যি নিচে নামবার কথা নয়। কিন্তু তবুও অনেক রাত উসখুশ করে উচাটন হয়ে রইল বিরূপাক্ষের মন–উৎখাত–উৎসাদিত হয়ে যেতে লাগল বিরূপাক্ষের শরীর ও মন। কিন্তু বিরূপাক্ষ তো আজকের নয়াল পাখি নয়, অনেক দিনের পুরোনো ভিটের হস্তেল ঘুঘু, কিন্তু তবুও ঘুমিয়ে পড়তে বেগ পেতে হল তার।

রাত পাঁচটার সময়ে মণিকা টের পেলেন যে এতক্ষণে দোতলার মানুষটি হোঁস হোঁস ঠোঁস ঠোঁস ফোঁস ফোঁস করছে; নাকই ডাকাচ্ছে বটে; এ কি মানুষ না পাঁকাল গজালের নাক ডাকানো? আস্তে আস্তে নিচে নেমে চক্ষুস্থির করে দেখে গেলেন একবার। সুতীর্থের ঘরে ঘুমন্ত বিরূপাক্ষের পালঙ্কের পাশ দিয়ে এক আধবার পায়চারি করে গেলেন। তেতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ভাবছিলেন–না চাইতেই লোকটা টাকা ঢেলে দেবে–কত যে ওগরাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর কুমিরের টাকা;–কিন্তু বিনিময়ে কিছু তো দিতে পারবেন না মণিকা। না দিয়ে টাকা নেওয়া কি উচিত হবে তাঁর? টাকা নেবেন মণিকা অথচ কিছু দেবেন না, এ একবগগা খেলা কতদিন চলবে?

বিরূপাক্ষের সঙ্গে দেখা হবার পনেরো কুড়ি বছর আগের থেকেই নিজের মূল্য মণিকা খুব ভাল করে জানতেন। বাইরের ভালো পৃথিবীর বড় পৃথিবীর নানারকম ভালো–মাঝারি জায়গায়ও যদি তিনি নামতেন–বাজে খারাপ জায়গা না মাড়িয়ে–তাহলে–

তেতলায় উঠতে আর দু'এক ধাপ বাকি–মণিকা একটু থেমে দাঁড়ালেন।

তাহলে কি হত? কি যে হত না সেই কথাই ভাবছিলেন তিনি। ভেবে ভয়াবহভাবে লোভার্ত হয়ে উঠতে পারত তাঁর মুখ। কিন্তু তেমন কিছু হল না। বুকের ভেতর অবিশ্যি কেমন একটা ঢিবঢিব করতে লাগল। কিন্তু কি যে শীতের দেশের দেবদারু মাংসের মতন দৃঢ়তা তাঁর নিজের চরিত্রের; বিমুগ্ধ হয়ে ভাবছিলেন মণিকা, নিজের বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে কোন দিনও যান নি কোথাও–বিরূপাক্ষের মতন মানুষেরা এসে সেধে-বিনিময়ে কিছুই পাবে না জেনে তবুও উজাড় করে ঢেলে দিতে চায়। বাংলার নদীর ধারে আম-জাম-নিম-জামরুলের গ্রামে একদিন জন্মেছিলেন তিনি, কিন্তু আজকে হয়ে দাঁড়িয়েছেন শিলঙ-টিলঙের পাইন গাছদের মত উঁচু, ঝাড়াঝাপটা, কঠিন, নিরবচ্ছিন্ন নক্ষত্রের নিচে বারান্দায় হিম রাতের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করছিলেন মণিকা।

পরদিন সন্ধ্যের সময় বিরূপাক্ষ এল।

সুতীর্থ আসবে কিনা সেই অপেক্ষায় হয়তো মণিকা দোতলার ঘরে বসেছিলেন। ঘরটাকে পরিষ্কার করে সাজিয়েও রেখেছিলেন সেই জন্যে। সন্ধ্যে হয়েছে–বাতি জ্বালানো হয়নি।

'কে?'

'আমি।'

বিরূপাক্ষ বললে, 'বিরূপাক্ষ. আমি বিরূপাক্ষ।'

'বাবা, আমি ভয় পেয়ে গেছিলুম। আপনি কি বেড়ালের থাবার জুতো পায় দিয়ে হাঁটেন নাকি?'

'আমার থাবা ভিজে বাঘের মত, জুতো আমার বাছুরের চামড়ার। কেন এসেছি জানেন?'

মণিকা বাতি জ্বাললেন সুইচ টিপে। বিরূপাক্ষ তাকিয়ে দেখল; প্রসাধন যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু এ সাজগোজের ভেতর কোনদিক দিয়েই কোথাও কোন ইঙ্গিত নেই; নিজেকে ধুয়ে নির্মল করেছেন; মনটা যেন কোন ধোঁয়াটে জিনিসের সংস্পর্শে এসেছিল–তাকে ধুয়ে পাখলে মণিকা নিজেকে সফল, ঝরঝরে করে তুলেছেন।

'সুতীর্থ এসেছে?'

'না।'

'কোনো খোঁজখবর পাওয়া গেল তার?'

'না।'

'না? বড় মুশকিলেই পড়েছি।'

'বসুন।'

'কাল কি এই সোফাটা দেখেছিলাম?'

'ওটা এক কিনারে ছিল। আমি যে কৌচে বসেছি সেটা নতুন; তেতলার থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে।'

ইলেকট্রিক বাল্‌বের চারদিক ঘিরে একটা রাত প্রজাপতি উড়ছিল সেদিকে এক আধ মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বিরূপাক্ষ বললে, 'আপনার সময় হবে?'

'কিসের জন্যে?'

'গোটা কতক কথা আপনাকে বলতে চাই মণিকা দেবী।'

মণিকা হাত ঘুরিয়ে রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাত দশটা অবধি সময় আছে আমার। তারপর ওপরে যেতে হবে। এখন সাতটা। আপনি আজ গাড়ি এনেছেন?'

'গাড়ি এনেছিলুম কিন্তু মোড়ে বিদায় দিয়েছি।'

'দশটা নাগাদ এসে হাজির হবে?'

'না, কিছু বলে দিইনি। তা ছাড়া এ বাড়িতে যে আছি তাতো জানে না ড্রাইভার। না জানানোই ভালো। নানা রকম ফিচেল আছে চারিদিকে–সবাইকে সব জিনিস'–বিরূপাক্ষ পাউচ বার করল; পরে পাইপটা বের করবে হয়তো– কিন্তু কি যেন ভেবে রেখে দিল পাউচ পকেটের ভেতর। 'দশটা অব্দি? তারপরে ওপরে যাবেন বুঝি খাওয়া-দাওয়া করতে?'

'আমি রাতে বিশেষ কিছু খাই না। ওদের খাওয়া হয়ে গেছে।'

'তেতলাটা খুব নির্জন মনে হচ্ছে। ওরা কারা?'

'আমার স্বামী, আমার মেয়ে। ওরা ঘুমুচ্ছে, তাই চুপচাপ সব; দোতলায়ও সুতীর্থ নেই। সুতীর্থ হইচই করত না বটে, কিন্তু তবুও সারা রাত এটা-ওটা সেটা নিয়ে জেগেই থাকত।'

'সবে তো শীতের রাত শুরু। এখনই ঘুমুচ্ছেন ওরা; এই সোয়া সাতটার সময়?'

বিরূপাক্ষ সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট টেনে নিল।

'উনি অসুখের মানুষ–'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওঃ।'

'এই সময়েই একটু ঘুম হয়। রাত দশটার পর থেকেই টান উঠতে থাকে।'

বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, 'তা হলে তো বড়–' সিগারেটে এক টান দিয়ে বললে, 'সারা রাত জাগতে হয় আপনাকে?'

'আমি হাঁপানির খুব ভালো ওষুধ পেয়েছিলুম' বিরূপাক্ষ বললে। 'এক সন্ন্যাসীর কাছে–অরুণাচলে। ওঁকে দিন। সেরে যাবে।'

'অরুণাচলে?' মণিকা একটু জেগে উঠে যেন তাকালেন, 'কার অসুখ সারল সে ওষুধে?'

'আমার নিজেরি।'

'হাঁপানি ছিল বুঝি?'

'খুব মরাত্মক ধরনের ছিল; কার্ডিয়াক হাঁপানি।'

মণিকা নিজের মনে নিজেকে বললেন, দেখ এই লোকটা কেমন চমৎকার মাইফেল মিথ্যে কথা বলছে। ওর টাকা আছে সেই জন্যে ওর হাঁপানি ছিল ওর আরও টাকা আছে, অরুণাচলের ওষুধে কার্ডিয়াক হাঁপানি সারাতে পেরেছে তাই, তার চেয়েও বেশি টাকা আছে ওর, সেই জন্যে আমার স্বামীর অসুখ সারিয়ে দিতে পারবে বলছে, এই সমস্ত কিছুর চেয়ে ঢের বেশি টাকা বিরূপাক্ষের এত বেশি টাকা যে, যে কোনো রকম ছকের যে কোনো পথে পথে ও বুঝি আমাকে হাত করবে; সব দুয়োরেই ওর সঙ্গে আমার নাকি দেখা হবে, আমাকে হাত করে, 'এসো, খুকি' বলে নিয়ে যাবে বিরূপাক্ষ।

ভাবতে ভাবতে ধ্যান নিরেট রসিকতায় মুখের আনাচকানাচ ছিটেফোঁটা হাসিতে কুঁচকে উঠছিল মণিকার।

'সে ওষুধ আপনার কাছে আছে বিরূপাক্ষবাবু?'

'আছে বলেই তো মনে হয়, আমি খুঁজে দেখব।'

'কিন্তু এ রুগীর বয়স তো পঞ্চাশ পেরিয়েছে। কোন জ্ঞানবিজ্ঞান দৈবী ওষুধ কিছুতেই তো কিছু হল না–বিরূপাক্ষবাবু–'

বিরূপাক্ষের মনে হল মেয়েমানুষের এ ঢং তার চেনা–এত ভড়কাবার কিছু নেই।

'ঠিক আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে–' বিরূপাক্ষ বললে।

মণিকার মনে হল, লোকটা টাকার জন্য কেয়ার করে না বটে কিন্তু নিজের কাজ গোছানো হলে পৃথিবীতে কারুর মূর্তিই বিশেষ সৌম্য থাকে না আর; এরও থাকবে না; কার কাছে কি বলেছে না বলেছে সে সব নিয়ে কেউ খুঁট বেঁধে থাকে না তখন আর। কাজ হাসিল হলে এও দু-চারটে পালক খসিয়ে ডানা মেলে দেবে ধাড়ি লক্কার মত। কিন্তু দেব কি হাসিল হতে? এ লোকের কাজ হাসিল করে দেব আমি? ভেবে ভাঙা কাঁচের করাতে মত হাসিতে মুখ ভরে উঠল মণিকার। অথচ বিরূপাক্ষ যে মুখের দিকে তাকিয়েছিল, মণিকার সে মুখ হাসির কম্পহীন সমুদ্রপারের ঘন বুনোনো ফর্সা শঙ্খের মত নিটোল।

'চেকটা ক্যাশ করা হয়েছে, বিরূপাক্ষবাবু।'

'উনি ভাঙালেন বুঝি; আপনার স্বামী? তিন হাজার টাকার চেক ছিল তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওটা ক্রসড চেক ছিল–'

'তাতে কিছু বেগ পেতে হয়নি। আমাদের এখানকার ব্যাঙ্কের শিশিরবাবু তাঁর নিজের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে নিয়েছেন।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'আমাকে?' মণিকা বললেন, 'কেন?'

'একটা ঋণ শোধ করবার দাবি মঞ্জুর করলেন বলে। সকলে তো করে না।'

বিরূপাক্ষের কথা শুনে এক আধ মুহূর্তের জন্য একটু স্তিমিত মন্থর হাসি এল মণিকার মুখে; যেন কেমন হাসি? প্রশ্রয় দিচ্ছে যেন অবোধ বালককে, কৃপা করছে যেন অধম মুখফোঁড়িকে। মণিকাকে টাকা দিয়ে–যারা অনেক দূরের থেকে আসে মানুষকে টাকা গছিয়ে দেবার জন্য, মানুষের মুখ্যত গায়ের গন্ধ শুঁকবার জন্যে সেই সব শুয়োরদের ভেতর নিজেকে খুঁজে পেল যেন বিরূপাক্ষ।

উঠে গিয়ে বিরূপাক্ষ দক্ষিণ দিকের জানালা দুটো বন্ধ করে দিয়ে এল; ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

'জানালা দুটো ও বাড়ির ঠিক মুখে ওপর।'

'ওঃ, ওদের জানালাও বুঝি খোলা ছিল? মানুষ ছিল ও ঘরে–ওদের ঐ জানালার ঘরে?' মণিকা জিজ্ঞেস করলেন।

'দু-চারজন তাকিয়েই থাকে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'কলকাতার মানুষের এরকম চোখ মারার অভ্যেস আছে-খুব বেশি। ভারি নিঘিন্নে মানুষ সব'–বলতে বলতে সিগারেট জ্বালাল বিরূপাক্ষ।

'ভালই করেছেন জানালা বন্ধ করে।' মণিকা বললেন, 'ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। খুব শীত করছিল।'

'শীত? শীত তো বটেই। তা ছাড়া বাড়ির খোলা জানালা, মানুষের চোখের নজরে আপনি বিশ্বাস করেন না বুঝি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শালটা ভুলে ফেলে এসেছি।'

আলনার থেকে সুতীর্থের একটি ধোসা টেনে ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মণিকা বললেন, 'আমার মত মেয়েমানুষের শীতবোধ বড় বেশি বিরূপাক্ষবাবু, শীত ছাড়া আর কিছুতেই আমার এসে যায় না। পাড়াপড়শীর চোখ তো আমার লক্ষ্মী।'

'কোথা যাচ্ছেন?'

'জানালা খুলে দিই।'

'কি দরকার? থাক।'

'এখন কটা রাত।'

'সাড়ে আটটা।'

'বিরূপাক্ষ সিগারেটটা ঘরের ভেতর কোনো একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পকেট থেকে পাউচ বার করল, পাইপ বার করল। পাইপে তামাকের পাতা ভরতে ভরতে বললে, 'কলকাতায় আমার তিনটে বাড়ি আছে–'

কলকাতা যখন বাড়ির শহর, তখন সে সব বাড়ির মালিকও রয়ে গেছে। কারুর তিনটে বাড়ি আছে–কারুর ত্রিশটে বাড়ি। কিন্তু এ সব বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে নিজের ঘরে আটক মণিকার বড় একটা দেখা হয় না। দেখা হলেও এমন কিছু হয়েছে এমন কেউ এসেছে মনে হয় না তার।

'কোথায় বাড়ি আপনার বিরূপাক্ষবাবু? রিজেন্ট পার্কে তো একটা–'

'হ্যাঁ, ঐ টালিগঞ্জে, বালিগঞ্জে, ঢাকুরিয়ার।'

'বাঃ, বেশ ভালো জায়গাই তো সব।'

'ব্যাঙ্কে লাখ পনেরো-কুড়ি টাকা আছে।'

বিরূপাক্ষ তাকিয়ে দেখল মণিকা শুনলেন, কিন্তু শুনে কিছু হল না যেন পৃথিবীতে এল গেল না কারুর কিছু। ব্যাঙ্কের টাকার কথা যেন মণিকা দেবীকে না বললেই ভালো হত। আমার একটা মাটির ঘোড়া আছে, একটা সোলার বাঁদর আছে, বাবা মেলার থেকে কিনে দিয়েছেন; এইসব কেচ্ছা আরম্ভ করেছে যেন বাচ্চা, এমনই নির্বিকার বয়স্কার আত্মস্থ মুখে প্রতিভা। তবুও ঝুড়ির সব জিনিসই দেখাতে হবে, না দেখালে হচ্ছে না বিরূপাক্ষের; বললে, 'পছন্দ করে বিয়ে করেছিলুম।

'ভালোই হয়েছিল', মণিকা শীতের জন্যে ধোসাটা একটু আঁট করে নিয়ে বললেন, 'দেখে শুনে কাজ করলে বেশ ভালো।'

'বাঁজা কিনা তা তখনও যে রূপ ছিল, এখনও তাই আছে, কিন্তু–'

বিরূপাক্ষ পাইপটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'মনে কোন শান্তি নেই আমার।'

পাইপ টানতে টানতে নীরব হয়ে নিবিদ হয়ে মণিকার দিকে তাকিয়ে রইল সে। মণিকা উঠে যেতে পারতেন, কিন্তু বসে রইলেন বিরূপাক্ষের দিকে তাকিয়ে নয়, বিরূপাক্ষ যে আছে সে কথাটা থেকে থেকে ভুলে যাচ্ছিলেন তিনি। বিগত পনেরো কুড়ি বছরের জীবনের নানা রকম ঘটনা উঁকি মেরে যাচ্ছিল মণিকার মনে। যে পুরুষ যে স্ত্রীলোককে ভালোবাসে, যে স্ত্রীলোক যে পুরুষকে–তাদের মিলনামিলন কি মহাশূন্যের অন্তহীন নির্মোহের অন্ধকারে ফেঁসে গিয়ে শীতের রাতের শহরের ঘরে এই বিরূপাক্ষের মতন কৃকলাসদের জন্ম দেয়? মণিকা নিজে এখন এখানে বসে আছেন কেন–উঠে যাচ্ছেন না কেন? পরিভাষা শিখে ফেলেছে সে কাকলাসদের? স্বর্গীয় অনবনমন ভালো নয়, মাঝে মাঝে অবনমিত হয়ে সৃষ্টির সামলানো টালটাকে টালিয়ে দেবার ভেতর যে নির্জন রস আছে সেটা উপলব্ধি করে দেখতে হয়–সেই জন্যেই মণিকা এখানে বসে আছেন এখন; মুখোমুখি বিরূপাক্ষ। কথা বলছে–

দু'জনেই মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে বসে রইল। তারপরে বাতি নিভিয়ে মণিকা ওপরে চলে গেলেন–তাড়াহুড়ো করে নয়, স্বাভাবিক সুস্থতার যেমনই করে বাতি নিভিয়ে মানুষ বসবার ঘর থেকে খাবার ঘরে শোবার ঘরে চলে যায়।

ওপরে যাবার আগে মণিকা আলো নিভিয়ে গেলেন কেন ভোর পাঁচটা অবধি শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে ঝিমিয়ে আকচার প্যাঁচ কষে এ সমস্যার যখন কোন জট খসল না তখন একটা ভেরামন, তারপরে আর একটা ভেরামন খেয়ে অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ল বিরূপাক্ষ।

শেষ রাতে জেগে উঠে তেতলার বারান্দায় পায়চারি করতে করতে বিরূপাক্ষ ঘুমিয়ে পড়েছে টের পেলেন মণিকা। নিচে নেমে এসে লোকটার গায়ে সুতীর্থের কম্বলটা আলগোছে ছড়িয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেলেন তিনি।

সতেরো

কেমন যেন কি যেন একটা মিলে গেছে–ঘুরে ফিরে পরদিন সন্ধ্যায় আসতে হল বিরূপাক্ষকে আবার। সন্ধ্যা উতরে গেছে–খানিকটা রাত হয়েছে। মোটরটা মোড়ে বিদায় দিয়ে তাকিয়ে দেখল ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে সরাসরি চলে যাচ্ছে, না গড়িমসি করছে। গাড়িটা যখন অনেক দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, তখন বিরূপাক্ষ তাড়াতাড়ি তার চেনা পথ ধরে সুতীর্থের ঘরে এসে হাজির হল।

'ভেবেছিলুম আপনি এখানে থাকবেন না–'মণিকাকে বললে বিরূপাক্ষ।

'ছিলুম না, এই এক্ষুণি এসেছি। সুতীর্থের একটা খবর না পাওয়া পর্যন্ত বড্ড অস্বস্তি বোধ করছি। শুনলুম পুলিশ গুলি চালিয়েছে–'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোথায়?'

'কলকাতার নানা জায়গায়-'

বিরূপাক্ষ অতশত খবর রাখে না। সারাটা দুপুর সে ঘুমিয়েছে, নেশা করেছে, মদের নেশা কিছু কিছু আছেই। আরো নানারকম নেশা। চৈতন্য তারা সারাদিনই আচ্ছন্ন হয়েছিল। অনেক দিন থেকেই সে আধো চেতনা-অচেতনার ভাগাড়ে কবরে হায়নার মত অন্ধকারে অন্ধকারে দিন কাটায়।

'গুলি চালিয়েছে? কই আমি তো শুনিনি।'

'আমি শুনেছি।'

'গুলির শব্দ? এ পাড়ায়?'

'কোন্ পাড়ায় জানে। মারাত্মক শব্দ কানে এসে পৌঁছয়-মানুষ কি স্থির থাকতে পারে। কেমন লাগে যেন।'

'ঠিক কথাই তো'-ভাবছিল বিরূপাক্ষ কিন্তু মুখে এই কথা মণিকার; সেই মুখেই আবার সাজগোজের ছিটে একেবারেই যে কিছু পড়েনি তা নয়।

বাতিটা জ্বালানো ছিল-তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে। কোথাও পাউডার-ক্রিমের আঁচ পাওয়া যায় না অবিশ্যি, কিন্তু কেমন ঘন কালো চুলে কি সিঁথিই বটে-ওরই ফাঁকে একরত্তি সিন্দুরের বিন্দুটুকু দেখ; কী ত্রৈলোক্যচিন্তনীয়।

'আমার মনে হয় দিশি পটকার শব্দ শুনেছেন।'

'কেন, আমি? কি যে বলছেন বিরূপাক্ষবাবু।'

'অনেক নচ্ছার ছেলেছোকরা থাকে লুকিয়ে পটকা ফাটিয়ে মানুষকে ভয় দেখায়।'

'কোন্‌টা গুলির শব্দ, কোন্‌টা ভুঁই পটকার সে তো শিশুও বোঝে। আমি আশ্চর্য হলুম কলকাতায় এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল-আপনি কোথায় ছিলেন।

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালাল আজ। মাথা নেড়ে ভারিক্কি চালে চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল আবার; ভালো করে ধরেছিল না।

বললে, 'না, কিছু হয়নি। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। কলকাতায় দিনরাত কত রকম শব্দ হয়। কে আপনাকে বলেছে পুলিশ গুলি চালিয়েছে। আপনার স্বামী অবিশ্যি বাইরে যান নি। কোনো ছেলে-ছোকরাও নেই এ বাড়িতে রাস্তার সোরগোল হই হল্লায় কত গুজবের-

'না হলেই ভালো। সুতীর্থ কোথায়?'

'সুতীর্থ খুব সেয়ানা ছেলে। এতদিন তো খুব ভালো জায়গায়ই ছিল?

'কোথায়?'

'আপনার এখানে।'

'আমার এখানে-আমি তার কি উপকার করতে পেরেছি?'

মণিকার গলা কেঁপে উঠল; এটা ভান-না সাচ্চা-চুরুট টানতে টানতে সহসা কিছু ঠাহর করে উঠত পারল না বিরূপাক্ষ। হয়তো সত্যি-সৎ-কিন্তু কি আসে যায় তাতে। সুতীর্থ যা না চাইতেই পেয়েছে বিরূপাক্ষ তা চেয়ে আদায় করে নেবে; এর ভেতর ভেবে দেখবার কি আছে যদি সে হাত পেতে নিতে চায়; সুতীর্থের চেয়ে ভাগে কিছু কম পাবে হয়তো-নির্মলতায়ও কিন্তু বস্তু হিসেবে বস্তা ওজনে বেশিই পাবে; কালোবাজারের কারবারী সে, এই জিনিসই তো সে চায়। এ নারীটিকে বশে আনতে হলে আরো ঢের সাধনার দরকার-না আজ রাতের ভেতরেই কোন একটা রফা হয়ে যাবে?

পুরুষ ও মেয়েমানুষ সম্পর্কে এসে কাজে কারবারে হামেশা মিথ্যে কথা বলতে হয় বিরূপাক্ষকে। কখনো সাজিয়ে মিছে কথা বলে, কখনো সোজা সিধে মিথ্যে কাজ দেয় বেশি। কিন্তু কি নিয়ে আর সম্পর্কে কি রকম মিথ্যে বলবে সে এখন? যাতে মণিকার মন গলে যাবে? কি বলবে এখন কোন বলাবলিরই দর নেই যেন, মিথ্যে কথার কোন প্রশ্নই ওঠে না-মিথ্যে হোক, সত্য হোক, খানদানী কারবার করতে হবে বটে, রাত হচ্ছে, প্রথমেই পাথমিক কাজ সেরে ফেলবার জন্যে বিরূপাক্ষ বললে, 'সুতীর্থদের অফিসে খোঁজ নিয়েছিলুম আমি-' এটা মিছে কথা।

'গিয়েছিলেন সেখানে?'

'হ্যাঁ।'

'ওর কোনো পাত্তা পাওয়া গেল?'

'স্ট্রাইক হয়নি।'

'আমি যে শুনেছিলুম সুতীর্থই স্ট্রাইকের ব্যবস্থা করছে।'

'সুতীর্থ কলকাতার বাইরে চলে গেছে।' মিছে কথা সব বিরূপাক্ষের; মণিকা দেবী ধরি ধরি করেও ধরতে পারলেন না।

'কেন? গ্রেফতারী পরোয়ানা আছে নাকি?'

'আমি জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু, আছে বলেই বোধ হচ্ছে-'

অনেক দূরে কিছু ঘনিয়েছে বোধ করে ডাকপাখিনীর মত সূর্যের ঝিলিকের ভেতর অস্বস্তি বোধ করে মণিকা এটকু ডাক পেড়ে বললেন, 'ও পাগল বাইরে চলে গেল কেন?'

'এ ছাড়া কী করবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার এখানে এলে আমিই তো তাকে লুকিয়ে রাখতে পারতাম–'

'সুতীর্থের নিজের ঠিকানায় তাকে লুকিয়ে রাখবেন আপনি?'

'না, না, এখানে নয়–অন্য জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করতুম–'

'ও সব এখানে বসে বলছেন তো, ওতে কাজ হয় না। নাঃ, সুতীর্থ যা করেছে ভালোই করেছে।'

'যাক, বেঁচে থাকলেই সব। ভেবেছিলুম কোনো অঘটন হয়ে গেল নাকি–কলকাতার বাইরে কোথায়?'

'টালিগঞ্জে।'

'টালিগঞ্জে। সব্বোনাশ। সেটা হল কলকাতার বাইরে?'

'কি হবে টালিগঞ্জে থাকলে? এমন কি দোষ করেছে? খুন জখম তো করেনি? যদি জেলে যায় দু'চার মাসের জন্যে যাবে হয়তো–'

মণিকা কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপরে নিজের বাঁ হাতের কররেখার দিকে তাকিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে বললেন, 'জেলে যাবে–কেন খাবার কি দরকার? কি করেছে যে যাবে? একজন মানুষের দু'চার মাস জেল কিছু নয়–দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়?'

দু'চার বছরেরও হতে পারত–'

'করেছিল কি?'

'ধর্মঘটীদের নাচাচ্ছিল।'

'কি করতে?'

'মারামারি হয়েছিল। খুন হয়নি।'

চুরুটের মুখে বেশ খানিকটা ছাই জমে উঠেছিল বিরূপাক্ষের। সেদিকে তাকাতে তাকাতে বিরূপাক্ষ বললে, 'খুন হয়নি তাই বাঁচোয়া। কয়েক দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকুক, তারপর বেরিয়ে এলেই হবে। কিছু হবে না। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে আমি নিজেই বলে দেব–'

'ভালোই করেছিল। বিরূপাক্ষ চুরুটের ধোঁয়ার মিহি ঘুরপাকের দিকে তাকিয়ে বললে স্ট্রাইক করবে না কেন? আমাদের দেশটা যা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি বলেই তো কেষক-টেষকের এই দুর্দশা–'

শুনে মণিকা বললে নিজেকে ঃ এই লোকটা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে অন্য রকম কথা বলে এসেছে। ধর্মঘটীদের গাল দিয়েছে, কর্তৃপক্ষকে তাতিয়ে এসেছে। আমার এখানে এসে ঝাড়ছে দেশিকতা ও গণসাম্যের চাল। এদের চিনি আমি–এদের কি উদ্দেশ্য তাও জানি। এঁটিলির মতন লেগে থাকে মানুষটা রাতের পর রাত। টাকার দরকার অবিশ্যি আমার। এ সব মানুষের কাছে না নিলে কোথায় পাব? নেব–কিন্তু যা চায় ও কি জানে যে কিছুতেই তা পাওয়া সম্ভব নয়।

'আমি এইবারে একটা ফার্ম খুলব ভাবছি। খুলে সুতীর্থকে করব ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর আপনাকে–'

এ লোকটা কি রকম যে গ্রহতিথির মত এসে পড়েছে কোত্থেকে যে আমার জীবনে। আমি চাঁদ হতে পারি; আমি সূর্য হতে পারি আমি সূর্য দেবী–আঃ, কী জ্বলন্ত রোদ চারদিকে আমার–মকর সংক্রান্তির ভোরের–কিন্তু–, মণিকা দেবী ভাবতে ভাবতে কোথায় চলে গিয়েছিলেন যে, কিন্তু বিরূপাক্ষ তাকে চমকে জাগিয়ে দিয়ে যেন বললে, 'সুতীর্থ ঠিক কোথায় আছে শুনুন তাহলে, আছে–টালিগঞ্জে–আমার–'

কিন্তু টালিগঞ্জ কি কলকাতার বাইরে হল? সে তো বিপদের এলাকা।'

'কে অত খোঁজখবর নেয়। আম বকুল ঝাউ দেবদারু নিম জামরুলের একটা উপবনের ভেতর টালিগঞ্জে আমার বাড়ি। তাই বলে আকাশ রোদ বাতাসের অভাব নেই। কিন্তু ওখানে কে যাবে–কে সন্দেহ করবে?'

'কিন্তু ঘাপটির ভেতর লুকিয়ে থাকবার মানুষ নয় তো সুতীর্থ। আপনার বাড়িতে আছে ভালো মানুষ সেজে?'

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর হেপাজতে।'

উৎসুক হয়ে তাকাল মণিকা।

ওরা, দু'জন অনেক দিন থেকেই এ-ওকে চেনে। প্রায় কুড়ি বছরের আলাপ। জয়তীর জন্ম থেকেই তো। ভাই-বোনের মত গা ঘেঁষে চলেছে। এখন অবিশ্যি অন্য রকম। সুতীর্থের মতন লোকের কাছে আমার স্ত্রীকে আমি ছেড়ে দিতে রাজি আছি, যতদূর যায় ওরা দু'জনে যাক, আমার কোন আফসোস নেই–' চুরুটের আগুন নিভে গেছে বিরূপাক্ষের, কথা বলা শেষ হয় নি। ঃ দু'একবার হ্যাঁচকা টেনে দেশলাই বার করল।

'নাঃ, ওত আমার কোন খিঁচ নেই', বিরূপাক্ষ বললে, 'একটা জিনিসের ভালো মীমাংসা হয় ওতে। অন্য পাঁচ রকম না হয়ে সুতীর্থকে যদি জয়তী নিয়ে নেয়, তাহলে মন্দের ভালো হয়–নাকি ভালোই হল।'

মণিকা ঘাড় কাত করে পায়ের নিচে মেঝের একটা ভারি সুকুশল কালো স্বস্তিকা ছকের দিকে–মহাশূন্যের দিকে যেন চিরনারীর মত তাকিয়ে ছিলেন–কোনো কথা বললেন না।

বিরূপাক্ষ দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে নিল চুরুট জ্বালাবার জন্যে। কিন্তু চুরুট না জ্বালিয়ে মণিকার মুখের দিকে নিজের চোখের মণির নিঃশব্দতায় নিষ্কম্পতায় কয়লাখনির সমস্ত অন্ধকার আর্তির মত যেন কোন অদেখা সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইল। দেশলাইয়ের আগুন নিভে গেল।

মণিকার মোমের মত নেই কিছু–সীসের মত নেই–কেমন যেন কঠিন গোমেদ মণির মত অন্তরাত্মার দিকে তাকিয়ে রইল বিরূপাক্ষ, কিছু ভেদ করতে চাইল যেন সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'আমার আজ শরীর খারাপ,' মণিকা বললেন।

'আচ্ছা, আমি উঠি।' বললে বিরূপাক্ষ।

'না। আপনি বসুন।'

'মাথা ঝিমঝিম করছে? আমার কাছে ওষুধ আছে–শরীরের যে কোনো রকম অসুবিধে অস্বস্তি দূর করে দেবে এ ওষুধ–ওয়ারের আগের–খুব ভালো–জার্মান–' বিরূপাক্ষ পোর্টফোলিও ব্যাগের দিকে হাত বাড়াল।

যেন কিছু হয়নি এমনিভাবে মুখ করে–এ ভান ধরা পড়লে পড়বে, কি আর করা যাবে–এমনই মুখভঙ্গিতে হেসে ফেলে মণিকা বললেন, 'একটা সংসার সঙ্গে ফেরে–ওষুধ-বিষুধ সব কিছু? আমার ওষুধের কোন দরকার নেই বিরূপাক্ষবাবু–'

'একটা বড়ি শুধু খেয়ে দেখুন–'

'না।'

'থাক তাহলে।' চুরুটটা জ্বালানো দরকার। কিন্তু না জ্বালিয়ে নিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'উঠি। মানুষ নেই। কোথাও কোন প্রাণ নেই।'

মণিকার প্রাণে বেশ বড়, ফলসা উজ্জ্বলতা আছে। শরীরে আছে রূপ। রূপের অহঙ্কার আছে। মাঝে মাঝে মণিকার এই নির্বিশেষে তীক্ষ্ণ জ্ঞান যে কোন মানুষের জন্যে হৃদয়ের যে কোন কোমল সক্রিয়তাকে কেটে ফেলে আত্মস্বাতন্ত্র্যে এমনই একাকী করে তোলে তাকে–সব কিছুর আর সকলের মনে এমন একক–যে এই পৃথিবীতে নারীসত্তমা বলতে তিনি ছাড়া যে আর কেউ আছেন সে কথা স্বীকার করতে চান না মণিকা–বিশেষত তাঁর স্তাবক পুরুষমানুষদের সামনে।

মণিকা আহত হয়ে সুতীর্থের স্খলন বৃত্তান্তের কথা ভেবে দেখেছিলেন। ব্যথাকে তিনি ব্যথার পথে গভীরে না নামতে দিয়ে পাশ কাটিয়ে ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলেন অন্য কোথাও–হয়তো অস্বস্তিতে, ক্ষয়ভঙ্গুর ক্ষণিক অস্বস্তির ভেতরে। তবুও ব্যথাই বড়, কিন্তু তবুও তিনি বয়সী মেয়েমানুষ কাঁচা নন। ব্যথাকে তিনি স্তম্ভিত করে রাখতে পারেন, যেন ব্যথা নেই অন্য কোন মুহূর্তের জন্যে; আছে; তারপরে সময় আছে ঃ মানুষকে রেহাই দেয়–চুম্বকের মত টেনে নেয় সব ব্যথা নিজের বুকে সময়। অস্বস্তি বোধ করছিলেন, বাধা পাচ্ছিলেন, ভাবছিলেন সব মণিকা। হঠাৎ বিরূপাক্ষের কথা শুনে তিনি আরেক পৃথিবীতে নেমে এলেন, দুঃখ যেন মুহূর্তেই সরে গেল মর্যাদাকে স্থান দেবার জন্যে, ব্যথা লঘু, ফিকে হয়ে গেল বিরক্তিতে। নিজের মনকে বললেন মণিকা ঃ কোথাও প্রাণ নেই যাবার জায়গা নেই ঃ এ কথা আমাকে শোনাতে আসে কেন বিরূপাক্ষ। প্রাণ যে সমুদ্র তা সুতীর্থ টের পেয়েছিল, কিন্তু ধনুক তুলে শাসন করল না, মর্কটের মত শিলা জলে ভাসল কে জানে। প্রাণ নেই–বলছে বিরূপাক্ষ, কোথাও যাবার জায়গা নেই–আমার কান ছারপোকা খসাবার মত আর কোন জায়গা নেই বুঝি মানুষটার।

'সুতীর্থকে ভালোবাসতুম বলেই আজ ক'রাত ধরে এখানে আসছি–' বক্তব্য শেষ করবার আগে চুরুটের দিকে নজর পড়ল বিরূপাক্ষের।

'কিন্তু আজ রাতে সুতীর্থ তো আপনার বাড়িতে'–মণিকা বললেন।

তবুও কেন বিরূপাক্ষের এ বাড়িতে আসা? মণিকার মনে হল, বিরূপাক্ষ এবার মণিকাপীঠে ঢেলে দিয়ে ঢের মর্মভেদী কথা বলবে ঃ সে সব কথা মণিকার গ্রহণযোগ্য না হলেও বেশ চমৎকার শোনাবে কিন্তু।

'কিন্তু সুতীর্থের সঙ্গে আমার স্ত্রীর এই সব হল আর কি।' বললে বিরূপাক্ষ।

মণিকাপীঠে মাথা খুঁড়ে কোনো কথা বললে না সে–কোনো কথাই বললে না–নিজের স্ত্রী কি করেছে না করেছে সেই গুমরে অভিভূত হয়ে জড়বুদ্ধির মত যেন বিরূপাক্ষ ঃ মণিকা যে সামনে বসে আছেন খেয়ালই নেই যেন। নিজেকে এক আধ মুহূর্তের জন্যে কেমন ছেঁদো মনে হল মণিকার, ওপরে গিয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করছিল তার। শীত বেড়েছে–ঘুমও পেয়েছে। ঘুমের ভেতরে চিন্তার কোনো স্থান নেই–কোনো বিক্ষোভ নেই–মণিকা নেই, মণিকাপীঠে নেই, পীঠে এসে যে তান্ত্রিক সেবক নিজের মূঢ়তার জন্যে দেবীকে তৃপ্ত করতে পারল না সেই অপরিতৃপ্তির কোনো তিতকুট নেই শীতের রাতের সমস্ত বর্ণালির শেষে এক, নিঃশব্দ অন্ধকার বর্ণের ঘুমের ভেতর।

'আপনার স্ত্রীকে চিনি না আমি, কি করেছে জানি না। আপনি দেখুন শুনুন সুতীর্থ যদি এদিকে আসে কোনো দিন তা হলে আমি এ সব বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলা দরকার মনে করি না তার সঙ্গে–আপনার সঙ্গেও না। হুজুকে মেতে খুন করে নি তো সুতীর্থ?'

'না।'

'আপনার বাড়িতে আছে তা কেউ জানে?'

'কেউ জানে না।'

'কেউ জানে না, ভালো কথা। জানতে পারে হয়তো কেউ। স্ট্রাইকে বা অফিসে, কোথাও আর কাজ করবার ফাঁক নেই সুতীর্থের–শিগগির নেই। মণিকা এখন হাত ঝেড়ে বাতাসে হাত ধুয়ে ওপরে চলে যাবেন ভাবছিলেন। পা বাড়াচ্ছিলেন প্রায় যাবার জন্যে; বিরূপাক্ষকে কিছু না বলে, নাক উঁচু করে ওপরে চলে যাওয়াটা হয়তো অভদ্রতা হয়; অনেকে ঐ রকমই সটান চলে যায়–ভদ্রতার বালাই নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, কিন্তু তবুও চলে যাওয়ার ওরকম ঢঙটা পছন্দ করেন না মণিকা। বিরূপাক্ষ অপরাধ নেবে কি না নেবে–মণিকা শালীন ঘরের মেয়ে না অন্য রকম ঘরের–এ সব কারণে নয়, এমনিই বিরূপাক্ষের মতন একজন আলপটকা আপাতভদ্র মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রেখে শিষ্টাচারে সুস্থতার কথা বলে বিদায় হওয়ার রকমটা ঠিক; এটাই ঠিক মনে হয় তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে হেসে ভদ্রতা করে মণিকা বললেন–'আচ্ছা, উঠি আমি–'

'আমার বাড়ি তিনটের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে চাই।'

'বাড়ি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা–' মণিকা অন্য কথা ভাবছিলেন।

'আমি নিজের জীবনটাকে ঢেলে সাজাতে চাই মণিকা দেবী–আপনার সহায়তা ছাড়া কি করে চলবে আমার। চারদিককার এই বিশৃঙ্খলার ভেতর আর একজন মানুষকেও আমি দেখছি না।' বললে বিরূপাক্ষ।

মণিকা জানালার বাইরের রাত্রির দিকে তাকিয়েছিলেন–লোকটা তাঁর খোশামুদি করছে–সমগ্র মন দিয়ে বোঝাই যায়, কিন্তু তবুও সে মননের উৎপত্তি মন, নয়, মাটি–বিরূপাক্ষ নলিনাক্ষ কমলাক্ষের হযবরল সত্তার। তবুও মন যে ভিজল মণিকার তা নয়, কিন্তু দু'এক মুহূর্ত আগেই যে আত্মমূল্যকে সবচেয়ে বড় জিনিস মনে হয়েছিল–এখন কেমন যেন ফাঁকা মনে হল সেটাকে। হল নাকি? মনের দ্রুত পরিবর্তন; কিন্তু কোনো পরিবর্তনই তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। মণিকা আয়ত্তের ভেতর আসতে চাচ্ছিলেন–সুতীর্থের–এমনকি বিরূপাক্ষের মত মানুষেরও মনের কোন নারীকূট নারীজননীকূটের নির্মল ঐকান্তিকতার সূত্র ধরে।

'এই তিনটে বাড়ির ট্রাস্টি করতে চাই আপনাকে।'

'বাড়ির ট্রাস্টি?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ির ট্রাস্টি আমাকে? তাতে আপনার কি লাভ?'

'আপনি নিজে রয়েছেন আমার জিনিস দেখে শুনে ঠিক রেখে,–বুঝে দেখবার জন্যে ট্রাস্টিদের বোর্ড ডিরেক্টরদের বোর্ড গলদঘর্ম হচ্ছে না, কোনো বোর্ড নেই কিছু নেই–শুধু আপনি আর আমি–'

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালতে গিয়ে দেখল তার হাত কাঁপছে, সমস্ত শরীর একটা আশ্চর্য শীত উত্তেজনায় কাঁটা দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার।

'আপনি আমাকে এতটা বিশ্বাস করবেন না বিরূপাক্ষবাবু।'

'আপনাকে ছাড়া কাউকেই–বড্ড শীত–'

'সুতীর্থের কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিন।'

'না কম্বল লাগবে না আমার।'

'আজ শীত নেই তো।'

'শীত নেই তো, শীত করছে বড্ড।'

'দিনটা তো আজ গরম–'

'কিন্তু আপনি তো শীত পুকুরের বর্ত করেছেন বিরূপাক্ষবাবু।'

'শীতটা কমছে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'কমবে, বাড়বে, ওটা শীতরাতের শীত নয়।'

'তবে?'

'ওটা নাভীর শীত।'

বিরূপাক্ষ বিস্ময়ে একটা বেড়াল শেয়ালের মত অবোল মিনি মণিকা দেবীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে বললে, 'শীতটা যে ভেতরের সেটা সত্যি।'

শীতের কাঁপুনি কমে গেল বিরূপাক্ষের। কিন্তু বিরূপাক্ষের মুখে যে কথা এসেছিল, কিছুক্ষণের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে গেল–জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল তার।

মণিকা দয়াপরবশ হয়ে বললেন বাতিটা আপনার চোখে লাগছে।'

কোনো সাড়াশব্দ করল না বিরূপাক্ষ বাতিটা নিভিয়ে দিলেন না মণিকা, এমনিই ওপরে চলে গেলেন।

আঠারো

পরদিন রাতে সুতীর্থের ঘরে ঢুকে চড়া বাতিটায় বড্ড অস্বস্তি বোধ করল বিরূপাক্ষ।

'সুতীর্থের যা রকম, একটা নব্বই ওয়াটের বাতি এনে রেখেছে ঘরে। কি দরকার এটা জ্বালিয়ে রাখার?' বললে বিরূপাক্ষ।

'জ্বলছে তো' মণিকা বললেন, 'মানুষ আলোই ভালোবাসে।' 'হ্যাঁ। মানুষ তো বেড়াল নয়–' বলে বিরূপাক্ষ একটা সাদা কথা বলে ছেড়ে দিল; আরো ঘোরালো করতে পারত বুঝি কথাটাকে।

'দশ পনেরো ওয়াটের একটা সবুজ বাল্‌ব দেয়া যাবে এই ঘরে–সুতীর্থ যতদিন না ফেরে–'

'কোথায় ফিরছে। ওকে তো গুণ করে বেঁধে রেখেছে।'

'কে?'

'জয়তী।'

'জয়তী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার স্ত্রী। গুণী মেয়েমানুষ। সুতীর্থ বড়সড় হলে হবে কী–ওর নাকে এখনও ছেলেবেলার দুধ।'

নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকালেন মণিকা; কাঁটা–ঘড়ির সময়–থেকে থেকে ভেসে উঠছিল তাঁর চোখে; এতটা বেজেছে; একটা বেজে এত মিনিট। কিন্তু মানুষের ছোট্ট সময়টা তলিয়ে যাচ্ছে যেই সময়ের ভেতর, সেইখানে মনোনিবিষ্ট হয়ে থেকে আবার ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল তাঁর।

'জোর বরাতে মানুষ এরকম এয়োতি পায়, আমিও পেয়েছিলুম।' বিরূপাক্ষ বললে, আশ্চর্য, কী করে রং ছুট হয়ে গেল। দু'জনের মন দু'দিকে হেলে পড়ল।'

'তাই কি হয় কখনও?' মণিকা বললেন, 'দুঘাটে বসে স্বামী-স্ত্রী কখনও নিজেদের মজা দেখে?'

'আপনি ভদ্রলোকের স্ত্রী, সেইজন্যই এই কথা বলছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে।' বললে বিরূপাক্ষ; বলবে কি না বলবে–কিন্তু তবুও এরপর আস্তে আস্তে বললে, 'কিন্তু কথা বলার মধুরতাও তলানির দিকে তিতো হয়ে আসে, তখন চুপ করে থাকাই ভালো।'

মণিকা কব্জি ঘুরিয়ে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালেন আবার। সেকেন্ডের কাঁটা কেমন মৃদুকম্পনে ঘুরে চলেছে; কাঁচ কাঁটা সোনা, সব উজ্জ্বলতার অতীত একটা সময় ও সমাধির খোঁজ পাওয়া যাবে বিরূপাক্ষ এ ঘর থেকে চলে গেলে;–একে তাড়িয়ে দেবেন না মণিকা–যতক্ষণ আছে অভদ্রতাও করবেন না; মাঝে মাঝে আলাপচারিতে একটু আস্বাদও আছে।

'আমি ভেবেছিলুম তলানির দিকেই মধুরতা বেশি', মণিকা বললেন, 'তা নয়'।

'তা হলে সে তিতো মদ। অদ্যোপান্তই তিতো,'

'তা হবে।'

বিরূপাক্ষের চোখ আমেজে কুঁকড়ে আসছিল, বললে 'আহা, বড় সুন্দর কথা তো; কি বলছিলেন?'

মণিকা পাঠ অপাঠের ওপারের থেকে যে কল ঘোরাতে জানেন তাই ঘুরিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আমি ভেবেছিলুম তলানির দিকেই মানুষের কথাবার্তার মধুরতা বেশি–' মণিকা ভাবছিলেন ঃ বিরূপাক্ষের কাছ থেকে আমি কয়েক হাজার টাকা নিয়েছি; আমার খুবই দায়ের সময় টাকা দিয়েছে। টাকাটা ওকে ফিরিয়ে দিতে পারব কিনা বলতে পারছি না। ওঁর সময় নেই, আমাদের কোন আয় নেই, সুতীর্থের কাছ থেকে ঘর ভাড়া পাচ্ছি না। নিচের তলায় যাঁরা আছেন জাপানী বোমার হিড়িকের সময় ভাড়া নিয়েছিলেন, মোটে ষাট টাকা পাওয়া যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে; এতে কি সংসার চলে আজকাল? রোগের চিকিৎসে হয়? ভদ্রভাবে থাকতে পারে মানুষ? বিরূপাক্ষ বিপদের সময় টাকা দিয়েছে, দিয়ে কোন দলিল পর্যন্ত রাখেনি, টাকা সে ফেরৎ চায়ও না; কী চায়? শীত রাতে স্ত্রীলোকের মুখে কথিকা শুনে তৃপ্ত হয় ওর মন, কিন্তু এর চেয়েও বেশি কিছু ও চায়; সে সব পাবে না কিছু, কিন্তু যা দিচ্ছি, সে সব ভালো কথা সাজিয়ে দিচ্ছি আমি–যেন একজন বিশেষ স্ত্রীলোকের মত–এটা দেব বিরূপাক্ষকে–যদি চায় আরো কুড়িয়ে বাড়িয়ে দেব। শীতের খুব বেশি রাতে মনে পড়ে আমাদের ছেলেবেলার বনঝাউ গ্রামে কোকিল ডাকত; গত বছরও গিয়েছিলাম গাঁয়ে, তেমনি ডাকছে কোকিল পউষের মাঝরাতে কোকিল যখন ডাকে তখন তার চারদিকে লোচ্চারা কান পেতে শুনছে বলে কোকিলের চরিত্র নষ্ট হয় না। কোকিলের কথা কথিকা শোনাব আমি (কাকে চাচ্ছে কোকিল, কোথায়; বিরূপাক্ষের সম্পর্কে সেটা অবান্তর) শীতের বেশি রাত অব্দি বিরূপাক্ষকে; কিন্তু পাঁচ সাত হাত দূরে থাকবে ওর নিজের কৌচে, আমি এই পূর্বদিকের সোফাটায়। ও যদি উঠবার উপক্রম করে কিংবা এগিয়ে আসে আমার দিকে–ওপরে চলে যাব আমি। ওর স্ত্রীকে ও কি করে পেয়েছে সেটা বোঝা শিবের অসাধ্য–কিন্তু বিরূপাক্ষের ঘাট বুঝে টাকা ওড়াবার বাতিক থাকলেও ও বড়জাতের মানুষ নয়–কোনো স্বাভাবিক মহত্বই নেই–ওর হালচাল; ধাষ্টামো আছে, শরীরের তাগদ–তেল যাকে বলে–হেঁড়ে বেল্লিকপনা এইসব আছে; এই সবের থেকেই টাকার উৎপত্তি হয়, আমাদের ব্যাঙ্কগুলো বেঁচে থাকে।

'আমি ভেবেছিলুম তলানির দিকেই কথাবার্তার মধুরতা বেশি' বলছিলেন মণিকা দেবী। কিন্তু শুধু কথাবার্তা।–আরে কিছু নয়? কিরে এসে ঠেকে কথাবার্তা।'

'নিজের নামে।'

বিরূপাক্ষ অস্বস্তি বোধ করে বললে, 'না না, আর কিছু নেই কথাবার্তার পরে?'

'আর কিছুতে তলানি নেই।'

'মধুরতা তো আছে?'

পৌঁছে গেলে মধুরতা কোথায়? কখনো পৌঁছতে হয় না, সব সময় চলেছি মনে করে–রণপায়ে নয়–এমনিই সহজ পায় চলতে হয়। আজ নয়–আর একদিন–একটু একা বসবার সুবিধে হলে কার্তিক পৌষ মাসে আমার কথা ভেবে দেখবেন; সত্য বলেছি–এইসব বলতে চাচ্ছিলেন মণিকা;–কিন্তু বিরূপাক্ষকে ঠিক নয়–অন্য কাউকে।

'তলানি?' ভারি গলায় কেমন বিকৃতভাবে বললেন বিরূপাক্ষ।

'প্রথমে ভূমিকা দিয়ে শুরু। তারপরে পরিচয়ের সময়। পরিচয় ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকে। তখন কথা জমে।'

'সেটা হল তলানি? কাদের কথাবার্তার?'

'পুরুষদের মেয়েদের?'

'সুতীর্থের আর জয়তীর?'

'যে অন্যদের কথা ভাবে সে পরলোকে পুরস্কার পাবে, কিন্তু ইহকাল তো আমাদের নিজেদের নিয়ে; আমরা নেই?' বলে মনে হল যেন বিরূপাক্ষের কয়েক হাজারের ঋণ শোধ হয়ে গেল তাঁর। মণিকা দেবী তিনি। তেতলার থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোতলায় নেমে বিরূপাক্ষের মতন একজন লোককে নিজের মুখে শীত রাতের পরম আশ্চর্য, নব ময়ূরী কথা ও মরালী রলরোল কথিকা শুনিয়েছেন তিনি। অবিশ্যি মুজরো দিয়ে শুনেছে বিরূপাক্ষ; সুতীর্থ এমনিই শুনেছে; বয়সে কথা আরো দু'চারজনকে নিজেরই তাগিদে শুনিয়েছেন; কাজেই টাকার তাগিদে বিরূপাক্ষকে শোনাতে গিয়ে একটু তাল কেটে গিয়েছে। কিন্তু তবুও কেমন বিলোড়িত হয়ে উঠেছে বিরূপাক্ষ। সে যেন ব্যাটারি খুইয়ে অন্ধকারে ঝিমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ কী যে অনির্বচনীয় ভোল্টেজে আলো বিদ্যুতের ভেতর জেগে উঠল। মানুষটার দিকে তাকিয়ে টের পেলেন মণিকা যে এর ভেতর আবছা অজগর মোচড় দিয়ে উঠেছে। সেটাকে মুহূর্তেই পাটের দড়িতে বদলে ফেলতে ফেলতে মণিকা বললেন, 'আপনার তিনটে বাড়ির ট্রাস্টি যদি আমাকে করতে চান তাহলে আমার জন্য একটা অফিস তৈরি করে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'কোথায় হবে অফিস?'

'যেখানে চান আপনি–ধাকুড়িয়ার বাড়িতে।'

'বাড়িগুলো কি খালি?'

'না, দুটো ভাড়া দিয়েছে, আর একটায় আমি থাকি।'

'অ্যাটর্নিকে নিয়ে আসবেন তাহলে কাল?'

'নিশ্চয়ই। কিংবা আপনাকে নিয়ে যাব গাড়িতে করে। কিন্তু আজ?'

'আজ তো সময় নেই আইন আদালতের?' কেমন যেন নাক্ষত্রিক দূরত্বে মাটিকাদার মানুষকে এড়িয়ে গিয়ে মণিকা বললেন, 'আপনার স্ত্রীর কথা ভেবে খারাপ লাগল।'

মণিকা ধরা দিচ্ছেন না আর। চাঁদে চড়তে চড়তে মই পিছলে যেন পড়ে গেল বিরূপাক্ষ; 'আস্তে আস্তে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'কেন, বাড়ি তিনটের ট্রাস্টি আমার স্ত্রীকে করলে ভালো হত?'

'সেটা বিচার করে দেখবেন। আমি অবিশ্যি এসব ভাবছিলুম না'। মণিকা থেমে গিয়ে বললেন, 'আপনার স্ত্রীর ভরণপোষণের বেশি খুব কিছু দিলেন বলে মনে হচ্ছে না। দিয়েছেন খুব বেশি কিছু?'

বিরূপাক্ষ অস্বস্তি বোধ করেছিল, এতদিন সাধ্যসাধনা করে সে যা পারেনি সেই প্রত্যক্ষ নিজেরই অন্তিম মাধুর্যে বিরূপাক্ষকে ডাক দিয়েই ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মণিকা আবার। এই সব ট্রাস্টিফস্টি টাকাকড়ি ভাগ-বাঁটোয়ারায় ছিঁচকে কথা দিয়ে কী হবে। একেবারে বুকে হাত দিয়ে মোক্ষম কথা তো একটু আগেই পেড়েছিলেন মণিকা। তারপরেই ঘুষি বসিয়ে দিলেন বুকের ওপরে! বিরূপাক্ষ ঘামিয়ে উঠে কেমন যেন তলিয়ে যেতে যেতে বললে, 'আমার পনের লাখ থেকে তাকে দেব কয়েক লাখ–'

'কয়েক লাখ!'

'কেন? কি?–'

'আমি ভাবছিলুম টাকাটা কি আপনার স্ত্রীর ভোগে লাগবে? না যার সঙ্গে–'

'যার সঙ্গে কেটে পড়েছে তার ভোগে? সে তো সুতীর্থ।'

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালাল।

'হ্যাঁ। সতীনকাঁটা সেঁধিয়ে দিয়ে সতী বটে জয়তী ঃ না হলে এ রকমভাবে আদায় করে নিতে পারে? ওর ঢের অপরাধ, তবুও আমি ভালোবাসি আমার স্ত্রীকে। ছাড়াছাড়ি হবে। লোকেরা বলাবলি করবে 'ডিভোর্স' লিগ্যাল সেপারেশন' যার যা মুখে আসে; ঐ জিনিসটাকে ভয় করছিলুম। যাক গে লোকের বলা–হেহে–কিন্তু ছাড়াছাড়ি তো হবে, এক সঙ্গে থাকবো না; কি করে দিন কাটাব ভাবছি; কেটে যাবে।'

বিরূপাক্ষ একটা বড়, অবসন্ন হাই তুলে বললে, 'যত বড় বোয়ালই হোক না কেন জয়তী, আমার মতন বড়শীর কেঁচোর কাছেও তাকে আসতে হয়েছিল–ভালোবেসেছিলুম বলে।'

কয়েকটা বেপরোয়া বেশ বড় রকমের হাই ছাড়ল বিরূপাক্ষ; 'আ!–আ–আ! মা-মা!-মা!' বলে চারদিককার চাতাল কাঁপিয়ে ডুকরে উঠল কয়েকবার।

'ক লাখ দেবেন তাকে?'

'এখনো ঠিক করিনি কিছু। তবে সবচেয়ে শাঁসালো মুড়োটা নিজের বিয়োতি স্ত্রীর পাতে পড়া উচিত নয় কি–ন্যাজার দিকটা আর পাঁচ রকমের জন্যে?'

মণিকা সায় দিলেন কিংবা সেই ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন; বিরূপাক্ষের মনে হল মাথাটা কেমন মন কালো সোয়ানা খোঁপায় সাজিয়ে রেখেছেন মণিকা।

'বাকি টাকা কোথায় কোথায় দেবেন?'

'সেটা বুঝে দেখতে হবে।'

হাঁসমুর্গির ঘ্রাণে নিবিড় অন্ধকারের ভেতর শেয়ালের মতন, চিমসে দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'বাতিটা নেভানো যায়?'

'না।'

'কেন?'

'আর একটু অপেক্ষা করুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিসের জন্যে?'

'বেজেছে সাড়ে নটা। আপনার ঘুম পেয়েছে বিরূপাক্ষবাবু?'

'না। আমি বলছিলুম।'

'চোখে লাগছে নাকি?'

'আপনার লাগছে ভাবছিলুম।'

'না তো।'

'ঘরটাকে অন্ধকার রাখলে ভালো হত না?'

'আমি এক্ষুণি উঠব। আচ্ছা উঠছি। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

'না না, বসুন। দশটার সময়ে উপরে যাবেন বলেছিলেন।'

'ওঃ' বিরূপাক্ষ বসলে, 'আপনাকে উইল দেখানো হয়নি; আলোয় আলোয় দেখিয়ে নিই।'

বিরূপাক্ষ ব্যাগের ভেতর হাত ঢোকাল; মণিকা বললেন, 'কাকে কি দেবেন ভালো করে ঠিক করার আগেই উইল করছেন?'

'এটা খসড়া।'

'এটা খসড়ার দরকার কি—অদল বদল যখন করতেই হবে?'

'হ্যাঁ, আজকালই করব। আপনাকে চিনতাম না তো; দেখা হল, ভালো হল, উইলের সম্বন্ধে আমি অন্যরকমভাবে চিন্তা করছি। আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করব না আর।'

'কত টাকার উইল?'

'পনের লাখ টকার—পঁচিশ লাখও বলতে পারেন।'

'অত টাকার ব্যাপারে আমার ফোড়ন না কাটাই ভালো।'

'সে কথা যদি বলেন—'বিরূপাক্ষ বললে, 'এক বোতল সোডা আনিয়ে দিতে পারেন? এখানে এক আধটা বোতল আছে? সুতীর্থ রাখে না?'

'না, ও রাখে না, সুতীর্থ খায় না কিছু। মুশকিল যা চাচ্ছেন তা আমাদের এখানে খেয়ে দেখেনি কেউ, রসদ নেই। এত রাতে আনিয়ে দেওয়াও অসম্ভব। চাকরকে দিয়ে সোডা আনিয়ে দিতে পারি, কিন্তু অন্য জিনিসটা কোথায় পাবে সে। এ পাড়ায় কে রাখে এসব জিনিস।'

'কিন্তু আমার না হলে চলবে না।'

মণিকা জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন।

'অন্তত বাতিটা নেভাতে হয়।'

মণিকা বসেছিলেন। এক্ষুণি বাতিটা নেভাতে গেল না বিরূপাক্ষ। বের করে ফেলে বললে, এই নিন—'

মণিকা বললেন, 'এবার ওপরে যাব।'

'হ্যাঁ আটকে রেখেছি অনেকক্ষণ—আমার নিজের দিকটাই দেখছি শুধু—কষ্ট দিলাম ঢের—'

বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালিয়ে দু'একটা টান মেরে আবার একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে প্রথমটাকে জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এখুনি ঘুমিয়ে পড়ব আমি। কিন্তু ঘরে কোন মানুষ নেই—একটা বোতল অব্দি নেই—এ এরকমভাবে ঘুমোবার অভ্যেস নেই তো আমার?'

'অভ্যেসকে চাবুক মেরে শেখাবার দরকার যাদের তারা তা করে। লাখ লাখ টাকার মালিক আপনি, ও সব দরকার আপনার নেই।'

বিরূপাক্ষ উঠে গিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল। মণিকা মনে মনে ভাবলেন, 'আমি এক্ষুণি উঠে যেতে পারি। কিন্তু বসে আছি তো। বিরূপাক্ষ যা ভাবে তা যে নয় সেটা বুঝিয়ে দেখার জন্য আলোয় নয়—এই অন্ধকারের ভেতরেই কিছুক্ষণ বসে থাকা দরকার আমার।'

'কটা বাজল?' বিরূপাক্ষ বললে।

'ঘড়ি দেখে বলতে হয়—'

'ঘড়ি হাতে?'

'আছে।'

'রেডিয়াম ডায়াল তো?'

'একবার অন্ধকার হয়ে পড়লে আমি আর ঘড়ি দেখি না।'

চমকিত হয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'দেখবার দরকারই বা কি?'

অন্ধকারের ভেতর, শীতের ভেতর মণিকা কোন কথা বলতে গেলেন না আর। বিরূপাক্ষ বলছিল না কিছু।

মণিকা নিজেকে ঠিকভাবে গুছিয়ে বসে বললেন, 'এমন অন্ধকার যেন কোনদিন দেখিনি আমি। মনে হয় অন্ধকার যেন বিরাজ করছে।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিল বিরূপাক্ষ। আস্তে আস্তে টানতে লাগল, মানুষটার চেয়ে বেশি আগুনটা, আগুনের চেয়ে বেশি মানুষটা জ্বলছিল যেন অন্ধকারের ভেতর। মণিকার থেকে হাত পাঁচেক দূরে একটা সোফায় বসে বিরূপাক্ষের মনে হচ্ছিল ব্যবধান রয়েছে;—কিন্তু থাকবে? মণিকার হাতে ঘড়ি আছে; অন্ধকারে—ঘড়ি দেখবার ছলে এগিয়ে যাওয়া যাবে; ঘড়ি দেখবার আগে কাঠিটা নিভে যাবে; আর একবার জ্বালাবার আগে সোফায় ওর পাশাপাশি বসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলবে হয়তো-দেশলাই জ্বালাবার-ঝুঁকে পড়ে ঘড়ি দেখবার অজুহাতে? মানুষ তো কুকুর নয়-দেবতাও নয়-, মানুষ; অন্ধকারের ভেতর বিরূপাক্ষের চুরুট জ্বলতে লাগল।

'সোডা চাই?'

শুনে বিরূপাক্ষের বুক ঢিবঢিব করতে লাগল-তামাশার-ঢের বেশি উত্তেজে, কিন্তু উত্তেজক প্রশ্রয় দেবে না সে। যা আসছে তা স্বাভাবিকভাবে এলেই সবচেয়ে ভালো।

'সোডার কথা বলছিলেম আপনি'-মণিকা বললে।

'হ্যাঁ, আছে বুঝি মজুদ অংশুদার ঘরে-ঐ সব বোতলও আছে?'

'কোনো কিছুই নেই-সোডা চান তো বায়রনের সোডা আনিয়ে দিতে পারি-আমি তা হলে চাকরকে পাঠিয়ে দিই।'

'আপনি ওপরে যাচ্ছেন?'

'এখান থেকে চাকরকে ডাকাডাকি করা চলে না তো-'

'না, সোডার দরকার নেই আমার।' বিরূপাক্ষের পায়ের গুমরে জুতোটা মচমচিয়ে উঠলো। 'হুইস্কি তো পাব না। আপনিও চলে যাবেন। আমি তো সাধুবাবা নই, গোঁসাইও নই, ওরকম গোমসা অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকব কী করে?'

মণিকা মনে মনে ভাবছিলেন ঃ জানালা সব বন্ধ, ঘরটায় কোনো দিক দিয়েই আলো ঢোকে না। বড় রাস্তার গ্যাসের আলো এর ওর বাড়ির আলো সব দিক থেকেই বেগতিকভাবে নিজেকে রক্ষা করে অন্ধকারের ভেতর থুবড়ি খেয়ে পড়ে আছে। আমার নিজের সাদা হাত দেখা যাচ্ছে। আমার ফর্সা মুখ দেখছে হয়তো বিরূপাক্ষ-ওর চুরুটের আগুন দেখছি আমি-এ ছাড়া কি আর দেখা যাচ্ছে।

বিরূপাক্ষ খুব তালেবর বটে, কিন্তু মণিকার সম্পর্কে কতদূর সেয়ানা হয়ে ওঠা সম্ভব তার? না, বিরূপাক্ষের সংক্রান্ত কোনো কথা ভাবছিলেন না তিনি এখন আর; কাল সারাটা রাত জেগেছেন মণিকা, আজ সারাদিন নাকে দমে খাটতে হয়েছে, শরীর ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছিল তাঁর প্রবলভাবে। বিরূপাক্ষের স্ত্রীর, সুতীর্থের নতুন খবরটা শুনে মনটা ঝিমিয়ে পড়েছে, কথা ভাবতে ভাবতে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল-নিজে টের পাবার আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন মণিকা, সোফার এক দিকে ধীরে ধীরে মাথা কাত হয়ে পড়ল তার; থুতনিতে হাত লাগানো ছিল-হাতটা ঢিলে হয়ে বুকে পড়ে গেল।

বিরূপাক্ষের মনে হল-কেমন যেন এলিয়ে আছে শরীর, আর একটু নিজেকে মানিয়ে নেয়া উচিত ছিল মণিকার,-কি ভাবছেন মণিকা? সম্ভ্রম হারিয়ে ফেললেন? এই রকমই কি?

চুরুট শেষ হয়ে এসেছিল তার; আরো কিছু টানলেও হয়; কিন্তু টানতে গেল না, আলগোছে মেঝের ওপর ফেলে দিল, জুতো দিয়ে আগুনটা পিষে ফেলে বিরূপাক্ষ শুধাল-'আমি বলছিলুম-মিসেস মজুমদার-'

কোনো উত্তর এলো না।

'মণিকা দেবী?'

কোনো সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু মানুষটা ঘুমোয়নি নিশ্চয়। এ সব মানুষ ঘুমোয় কি কখনও?

'একটা কথা আপনার সঙ্গে-' বর্ষারাতে পাড়াগাঁর খাটালে বেড়ালের চোখ যেমন জ্বলে ওঠে, তেমনি বিরেট নিঃসৃত চোখে মণিকার দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বসে রইল, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

'উইলটা কি আপনাকে দিয়েছি?'

জবাব দিল না কেউ। ঘুমিয়েছে? এত সহজে এরকম অসাধারণ মানুষ ঘুমিয়ে পড়তে পারে কখনও? আবেশে কিসের আবেশে-ডুবে আছে মণিকা ঃ বিরূপাক্ষ ভাবছিল।

যেন কোনো আকস্মিক উত্তুরে বাতাসে বেতসতন্বী আত্মার আঘাত সমস্ত স্থূল মাংসকালিমাকে ধুয়ে পাখলে উজ্জ্বল করতে গিয়ে বিরূপাক্ষ টের পেল অঙ্গার সে-রিরংসার আগুন ছাড়া আর কিছুতেই মুখ উজ্জ্বল হয় না তার।

'আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করবার মত মানুষ আমি নই। আশা করি মার্জনা করবেন। এর চেয়ে কি বেশি ভরসা করতে পারি আপনার কাছ থেকে-'

মণিকা যদি জেগে থাকতেন বিরূপাক্ষের এ সব কথা শুনে কি করতেন তিনি? কি বলতেন? বলা কঠিন। কিন্তু ঘুমিয়ে আছেন। বিরূপাক্ষ তা টের পেল না; স্বীকারও করল না; এ সব নারীদের চেনে সে; নিরবচ্ছিন্ন ভান আর ভাঁড়ামোয় প্রায় কোন পুরুষের কাছেই এরা শিং ভাঙে না, কিন্তু সে ব্যাটাচ্ছেলের টাকাটা টাকার মত হলে বেশ এলিয়ে আগ বাড়িয়ে থাকে।

মণিকাকে সে সবটা চেনে না-কিন্তু তবুও এতক্ষণ পাম্পের জলের তোড়ে তেতলায় চলে যাওয়া উচিত ছিল মণিকার। কিন্তু যখন তা করেনি, তখন ছক কেটে কাজ করেছে-বিরূপাক্ষের সব টাকাটাই নেবে মণিকা-নেয় যদি মণিকাকেই দিয়ে দেবে সেঃ টাকাকড়ি জায়গাজমি ঘরদোর; এ শীতে দেবে তো; তারপর সামনের শীত; এক আধ মাঘে পালাবে, বলে মনে হয় না, বেশ জাপটে ধরেছে শীতটা-কথা আর নয়, কথা ভাবা নয় আর, এখন কাজ করার সময় বিরূপাক্ষের। বিরূপাক্ষ উঠে মণিকার পাশাপাশি সোফায় গিয়ে বসল। এখুনি মণিকার গায়ের ওপর হাত দিতে ভরসা হল না তার। কিন্তু অন্ধকারের ভেতর বিরূপাক্ষের মনে হল খানিকটা গা ঘেঁষেই যেন বসা হয়েছে-ভারি একটা সুন্দর দামী শাড়ির চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছিল। শাড়ি ঘেঁষে বসেছে সে-এই শাড়ির ফাঁসে যে মানুষ আছে তারই রূপে বাসে বাসমতী যেন এই শাড়ি।

বিরূপাক্ষ টের পেল মণিকা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের কাতরতায় অন্ধভাবে অন্ধকারের ভেতর কালো কালো কড়ির মত মাথা খোঁপা-ঠাণ্ডা শক্ত-জবাকুসুমের গন্ধ-বিরূপাক্ষের কাঁধে এসে ঠেকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি করবে বিরূপাক্ষ? মণিকাকে জাগিয়ে দেবে? কেন জাগাতে যাবে? জাগাতে তো হবে এক সময়।

আপাতত এই অনির্বচন ভূমিকার ভেতর নিমগ্ন হয়ে রইল সে। এরপর অন্য রকম সময় আসবে; কিন্তু তার জন্যে সমস্ত রাতটাই তো পড়ে আছে। এমনই নিবিষ্ট হয়ে রইল যে শীতের রাতে তার বুকের ওপর ছড়ানো শালের অনুভূতির নিস্তব্ধতারও খানিকটা ব্যবধানে যে ঘুমিয়ে আছে তাঁকে নিয়ে কি করা যায় এই নিদারুণ মাথা ঘামানো–অশক্তি ও অসাড়তার আবেশে অসংখ্য রাতের ভূমিকা হিসেবে এ রাতটাকে গ্রহণ করে কেমন যেন কুঁড়েমির ভেতর তলিয়ে গিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল টেরই পেল না সে।

উনিশ

রাত একটা বেজে গেছে। নিচের দরজা খোলা ছিল। নিচের ভাড়াটেদের দু'জন চাকর সিনেমা না কোথায় থেকে ফিরে রোয়াকে বসে সিগারেট টানছিল, সুতীর্থকে দেখে একেবারে তাজ্জব মেরে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল তারা।

সুতীর্থ দোতলার সিঁড়ির শো ধাপ পৌঁছে দেখল যে কোলাপসিবল গেটে তালা মারা নেই–খোলা আছে। এত রাত অব্দি ঘরদোর খোলা পড়ে থাকে সব? দিন পনেরো যে তার এ ফ্ল্যাটে ফেরেনি; ফিরে হয়তো দেখবে খাটখানা ছাড়া আর কিছু নেই; অবিশ্যি মণিকা দেবী আছেন, তিনি একটা ব্যবস্থা হয়তো করে রাখতেও পারেন।

সুতীর্থের পায়ে জুতো ছিল না, চান করেনি তিনদিন, পরনের জামাকাপড় ছেঁড়া, ময়লা, রক্ত মাখানো; মারপিট সে অবিশ্যি করেনি, কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় এ ছাড়া আর কিছুই করেনি সে, অনেক লোকের সঙ্গে অনেক রাত ধরে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করেছে।

সুতীর্থ প্রায় বেড়াল পায়ের নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল তার ঘর শূন্য নয়, শূন্য তো নয়ই বেশ সরগরম। দু'জন মানুষ পাশাপাশি এক সোফায়ই বসে আছে–ঘুমিয়েই আছে হয়তো–কিংবা আমেজে আড়ষ্ট হয়ে আছে। হয়তো ঘুমিয়ে আছে। এমন শীতের রাতে কতখানি আবেগের দুধ মেরে মেরে সর করতে পারলে–উতরোল রক্তকে খোরাক জুগিয়ে জুগিয়ে অবশেষে শান্ত করে নিতে পারলে মানুষ এমন অদ্ভুত নিঃঝুম হয়ে পরস্পরের গা ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়তে পারে সোফার ওপর!

ঘরের ভেতর ঢুকে গেল না সুতীর্থ; তার ঘরে অপরের নীড় নিজে সে বাতনীড় আজ। অন্ধকারের ভেতর একবার চোখ বুলিয়ে সুতীর্থ অনুভব করল টেবিল চেয়ার বাক্স বিছানা সবই ঠিক জায়গায় রয়েছে। নতুন ভাড়াটে কেউ আসেনি।

দুয়ারে দাঁড়িয়ে থেকেই সে বুঝতে পারল মণিকা দেবীর মাথা ঘুমে না কিসের তাড়সে এসে পড়েছে। পুরুষটির বুকের ওপর প্রায়-কার হাত কার হাতে মিশে গেছে–কোন আঙুলের সঙ্গে মিশে গেছে নারীটির শাড়ির ভাঁজ, নারীটির চুলের সঙ্গে পুরুষের শালের জরি ঃ কে তার হিসেব করবে। মণিকা এখানে এরকম অবস্থায় এত রাতে? সুতীর্থের অনেকদিনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হয়তো এই ঘরটাকে তার নিজের কাজে ব্যবহার করবার জন্যে ঠিক করে রেখেছেন তিনি। বেশি বিরক্ত বা বীতশ্রদ্ধ বোধ করল না তবুও সুতীর্থ। কিন্তু তবুও মনের ভেতর কেমন একটা কৌতুকের সুড়সুড়ি এসে পড়লেও হাসতে পারছিল না; আজ রাতে সুতীর্থও মণিকাকে লক্ষ্য করেই এখানে এসেছে–এত রাতে পায়ে হেঁটে সেই চেতলা থেকে। দশটার আগেই এসে পৌঁছবে ঠিক করেছিল। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে দেরি হয়ে গেল। মণিকাকে আজ রাতে সুতীর্থও খুব হৃদ্যতার সঙ্গে চেয়েছিল বটে; কিন্তু ঠিক এরকমভাবে চায়নি। কিংবা এরকমভাবে পেলেও মন্দ হত কি? কিন্তু কে এই লোকটা সুতীর্থের ইচ্ছাস্বর্গের অপরিসর ধোঁয়া কেটে ফেলে নিজের সপরিসর বস্তুস্বর্গ রচনা করে বসেছে এমন রাতে–এমন পাপরিক্ত অতল অনিমেষ শীতের রাতে। মানুষটাকে দেখে ফিরে এসে সুতীর্থ স্তম্ভিত হয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। বিরূপাক্ষের মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ছে মণিকার ব্লাউজের ওপর। কেউ কাউকেই টের পাচ্ছে না, কিছুই টের পাচ্ছে না, দু'জনেই ঘুমে কাঠ হয়ে আছে।

দোতলার বারান্দা থেকে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। আকাশ ভর্তি আগুনের গুঁড়ির মত নক্ষত্ররাজ্যের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে–ফাঁকা জায়গা থেকে ভেসে আসা খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া পান করে নিল সুতীর্থ।

ঘুমিয়ে আছে বটে–এমনি নিঃস্পন্দ ঘুম যে সুতীর্থ চেঁচালেও জেগে উঠবে না ওরা। কিন্তু এ ঘুম তো একটা অতল উপসংহার–এর আগে যে আশ্চর্য অগম অভিনয় হয়ে গেছে কি খোঁজ রাখে সুতীর্থ সে সবের? কিন্তু বিরূপাক্ষকে নিয়ে? মণিকার মতন একজন? পুলিশের হাতে হতভাগা সেবকদের মরে যেতে দেখেও শরীর ও অন্তঃশীল মনে বোধ এরকম উৎখাত হয়ে মোচড় দিয়ে ওঠেনি কোনোদিন বুঝি তার। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না, ঘরের ভেতর ঢুকল সে আবার; লাইট জ্বেলে দিল; বিরূপাক্ষই তো; চেহারা আরো খারাপ হয়ে গেছে; কেমন চোয়াড়ের মত দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু তবুও লালা ঝরে গেছে–ফুরিয়ে গেছে–শুকিয়ে গেছে; মুখের ভেতর যে কেমন একটা সুধীর সুস্থির জীবনবেদই যেন ফুটে বেরুচ্ছে ওর। এ দুঃসাধ্য জিনিস বিরূপাক্ষ কোথায় পেল যদি মণিকা ওকে দিয়ে থাকে।

মণিকার দিকে ফিরে তাকাল সুতীর্থ। ভাবতে ভাবতে মনে হল অতি বিষম অঘটন ঘটে যাবে হয়তো যে কোনো মুহূর্তে ঃ বিরূপাক্ষের লাস লুটিয়ে থাকবে এই মেয়েমানুষটির পায়ের নিচে, আর নিজের বিছানায় কি নিদারুণ রিরংসার আলিঙ্গনের ভেতর খুঁজে পাবে না সে মণিকাকে ও নিজেকে কি ভীষণ মৃত্যুর নাগপাশের ভেতর শেষ হয়ে যাবে সব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মানুষকে আশ্বাস দেওয়াই ভালো; হিংসা করে কি আর হবে; যে যাতে সান্ত্বনা পায় তাই পেতে থাকুক; মজুমদায়র দেবীকে অবিচার করে কোনো লাভ নেই। বাতিটা নিভিয়ে দিল সে।

বারান্দার পায়চারি করছিল সুতীর্থ ঃ ভাড়ার টাকা দিইনি, ঘর আটকে রেখেছি, সেলামী বন্ধ করেছি। বিরূপাক্ষ অনেক দিয়েছে নিশ্চয়; সবই বিকিয়ে দিয়েছে হয়তো; কেন নেবে না মণিকা।

যেন বিরূপাক্ষ মণিকার জীবনে নেই, বিরূপাক্ষের টাকা মণিকা গ্রহণ করেনি, কোনরকম রাত্রিবাস হয়নি বিরূপাক্ষের সঙ্গে মণিকার–ভাবতে ভাবতে সুতীর্থ তার টালমারা বইয়ের ঘরের ভেতরে ঢুকল। এ, ঘরটা তার বসবার, শোবার ঘরের চেয়ে অনেক দূরে; এখানে কোন খাট ছিল না; অন্ধকারে আরসোলা ইন্দুরের আনাগোনার ভেতর খানিকটা জায়গা ঠিক করে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে। আজ তারো খুব ঘুম পেয়েছে–গত সাত-আট রাত সে ঘুমোতেই পারেনি।

এমন নিখাদ নিঃস্বপ্ন ঘুম অনেকদিন ঘুমোয়নি মণিকা। রাত দশটার পর থেকেই তার স্বামীকে পরিচর্যা করতে হয়। সারা রাতের মধ্যে ঘুম হয়েই ওঠে না। দিনেরবেলা একটানা ঘুমের বাধা অনেক–সব কিছু দেখবার শোনবার তত্ত্বাবধান করবার মানুষ বাড়ির ভেতর সে-ই তো একা। আজ বিরূপাক্ষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত দশটা পেরিয়ে গেল। ঘুম তাকে অতর্কিত আক্রান্ত করেছিল। অতর্কিত, কিন্তু খুব স্বাভাবিক ঘুম, সমস্ত দিনের অত পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর ঘুম না এসে পারে না। এ জন্যে বিরূপাক্ষ দায়ী নয়; বিরূপাক্ষের কথাবার্তার অসারতায় ঘুম যে না পায় তা নয়, কিন্তু জেগেও থাকতে পারা যায়–কিন্তু কেমন একটা হ্যাঁচকা ঘুমে চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠল তার; তারপর কী হল কিছুই মনে নেই। এরকম ঘুম আগেও সে মাঝে মাঝে ঘুমিয়েছে বটে, কিন্তু সে সব পরিবেশে বিরূপাক্ষের মত কোন মানুষ কোনদিন বর্তমান থাকেনি। মণিকা হঠাৎ যখন ঘুমের ভেতর থেকে জেগে উঠলেন, তখন রাত দুটো বেজে গেছে। সে স্থিরই করতে পারল না কোথায় সে রয়েছে–এরকম গভীর নিঃসাড় অন্ধকারের মানেই বুঝে উঠতে পারল না। তেতলায় তাদের ঘরে সারারাত সবুজ শেডের নিচে একটা খুবই মৃদুশক্তি শান্ত বাতি জ্বেলে–ঘরটাকে অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা করে মিহি মৃদু জ্যোৎস্নার মতন ছড়িয়ে থাকে সারারাত। কিন্তু এখানে সে জ্যোৎস্না নেই তো; এ তো মুখে চোখে শরীর অন্তহীন কাটাকুটি মেঘডুমুরের পাক, সর্ষের ঝাঁক কালো কালো রাশি রাশি বেড়ালের ছোটাছুটির মত অন্ধকার।

সে তার নিজের ঘরে নেই–অন্য কোথাও আছে–কোথায়? কোনো নেমন্তন্ন বাড়িতে, না কোনো দূর আত্মীয়ের রোগশয্যার পাশে অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে সে? নাকি এটা হাসপাতাল–কোনো অঘটন ঘটেছে তার? স্ট্রেচারে করে এখানে এনেছে তাকে সবাই মিলে? মণিকার চেতনা এত বেশি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে পর পর সব কিছু বুঝে নিতে কিছুটা সময় লাগল তার জেগে উঠে অনেকক্ষণ পরে তার কাছে একজন মানুষের সান্নিধ্য অনুভব করল মণিকা। এমন কি প্রথমে সে বিরূপাক্ষকে মনে করেছিল সুতীর্থ বুঝি–শালটা ভালো করে জড়িয়ে দিল তার গায়ে–চুলের ওপর হাত বুলোতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে থেমে গেল–এ তো সুতীর্থ নয়। আগাগোড়া ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে এল তার কাছে।

কিন্তু বিরূপাক্ষ কখন এসে সোফায় তার পাশে বসেছে? মণিকা তো ওকে বসতে বলেনি। গা ঘেঁষে বসেছে, ব্লাউজটা যে একদিক দিয়ে ভিজে গিয়েছে সে কি ঘামে না ওর মুখের ঝরানিতে?

ঘামেনি তো মণিকা–এত বেশি শীতের রাতে কি করে ঘামবে? মণিকার মন রি রি রি রি করে উঠল।–কিন্তু তবুও নিজেকে ধিকৃত করল না সে–বিরূপাক্ষকেও না। এমন অনেক কিছুই ঘটে থাকে পৃথিবীতে যার জন্য আমাদের তোলা সংসার-সমাজের মধ্যে একটা বিরাট ভূমিবিপ্লব হয়ে গেল বলে মনে হয়–ধসে গেছে পৃথিবীর মাটি যেন পায়ের নিচে থেকে; কিন্তু ভূমিকম্পটা কি মানুষ ইচ্ছে করে করে। কিন্তু তবুও কেউ কাতরে পড়ে ভূমিকম্পে–বিশেষত, যাতে দোলা লাগে, কিন্তু চাপা পড়তে হয় না? ভাবছিল মণিকা।

দশটা থেকে দুটো অব্দি আমি বেহুঁশের মত ঘুমিয়েছিলুম। আমাকে নিস্তব্ধ দেখে বিরূপাক্ষ হয়তো মনে করেছিল আমার কাছে এসে বসা চলে। বসেছে তাই। কিংবা কে জানে ঘুমিয়ে পড়েছি বলেই এসেছে। জাগা মানুষের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় না, তার ঘুমন্ত শরীরের কাছে আবেদন করে তা পাওয়া যায় ভেবেছিল? ভেজা ব্লাউজটা শীতের ভেতরে বড় ঠাণ্ডা লাগছিল মণিকার; গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল তার।

মণিকা ভাবছিল; পাওয়া যায় হয়তো; কিন্তু একজন ঘুমোনো মানুষের শরীরের ওপর দিয়ে পিঁপড়ে উঠে যায়, ইঁদুর চলে যায়, মাছি ওড়ে, মানুষ সেখানে হাত দিলে সে মানুষ মাছি আর পিঁপড়ে। কে জানে বিরূপাক্ষ কি করেছে।

মণিকা ওপরে চলে গেল।

ওপরে উঠে দেখল অমলা অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে বটে, কিন্তু অংশু টানে কষ্ট পাচ্ছেন।

'কোথায় ছিলে তুমি মণিকা এতক্ষণ?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'এমন তো ঘুমিয়ে পড়না কোনোদিন।'

'তুমি কখন জেগে উঠেছ?'

'অনেকক্ষণ–অনেক–'

'আমাকে খুঁজেছিলে বুঝি।

'হ্যাঁ। অমলাকে ডাকলুম, কিন্তু সে কোন সাড়া দিলে না। ভাবলুম, যাক গে, আমার তো বাঁধা এ জিনিস, কে কি করবে এর, মাঝখান থেকে মানুষকে কষ্ট দেওয়া। কোথায় ছিলে তুমি মণিকা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম–'

'কোথায়?'

'নিচে।'

দোতলায়?'

'হ্যাঁ।'

'সেই সুতীর্থ ছোকরা কি আজো ফেরেনি?'

'না।

'ওকে তুমি এত টান কেন।'

'কই, না তো। তার ঘরদোর খোলা রেখে গেছে। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে একটু দেখে আসি।'

'আমি মাঝে মাঝে গিয়ে একটু দেখে আসি? হে-হে-হে–'

হ্যা হ্যা-হা-হা করে হেসে উঠল অংশুবাবুঃ কপাল নাক চোখের চার-দিকের ঢিলে মাংস বার বার কুঁচকে উঠতে লাগল তার।

'আমাদেরও সময় ছিল মণিকা; আমরাও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে-টেখে আসতুম। সে সব দিন কোথায় গেল?'

পর পর গোটা তিনেক বালিশ সাজিয়ে বুকে করে বসে আছে লোকটা। জানালা দিয়ে কলকাতার রাতের কালো ফর্সা ডোরাকাটা আদিম টিকটিকির ঝলমলামির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললে, কি চাও তুমি বলো তো?'

'আমি? কেন?'

'দরকার আছে। মুখে কিসের যেন জড় মরছে না–মণিকার দিকে তাকাল অংশুবাবু।'

'যা চেয়েছি, তা তো পেয়েছি।'

'ও সব ঠোঁটনাড়া মৌচুষকির কথা আমি শুনতে পাই না।'

'তার মানে? কি বলছ তুমি?'

'মানে, খোলাখুলি কথা বলতে হবে।'

'সব সময়ই তাই বলি আমি।'

'আমি কিন্তু বেশি দিন বাঁচব না–মরবার আগে তোমার নিজের মন–যে মনটা দশ বাঁও জলের নিচে লুকিয়ে থেকে তোমার নিজেরই সত্য মন–তাকে আমি দেখে যেতে চাই। আমাকে ধোঁকা দিয়ে ঠকাবে কেন তুমি?'

'আমি ঠকাচ্ছি বুঝি?'

'হাঁপানি রুগীর অন্তিমকাল এলে কে না ঠকায় তাকে?'

'তাই যদি হয় কি আর করবে তুমি?'–মণিকা টেবিল থেকে একটা কাঁচের গেলাস তুলে সোরাইয়ের থেকে জল গড়িয়ে খেতে লাগল।

শরীর ঠাণ্ডা হল তাঁর, বললে, 'আমার ইচ্ছে সুতীর্থ তার নিজের ঘরে ফিরে আসুক।'

'কোথায় গিয়েছে সুতীর্থ?'

'জানি না।'

'ফিরে আসবে কেন?'

'ওর জীবনটাকে নিয়মের ভেতর আনা দরকার। শুনলুম ধর্মঘট করছে–করুক, যদি দরকার হয়। শুনেছি আর একজন ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু যে জিনিসটাকে আমি সবচেয়ে কম বুঝি তা হচ্ছে মিছেমিছি এ-পথে সে-পথে–কোন স্ট্রাইক নয়, কারুর স্ত্রীর ব্যাপার নয়–এমনি কলকাতার গলিঘুঁজি রাস্তা বাগানে ঘুরে বেড়ানো। ও ঘুরে বেড়ায়।'

'কে সেই ভদ্রলোক, যার স্ত্রীর সঙ্গে–'

'সে ভদ্রলোক অংশুবাবু ছাড়া আর কে'–বললে মণিকা, গলার আওয়াজে শ্লেষ ও হাসির বিন্দু বিন্দু খামির ছড়িয়ে আন্তরিকতারওঃ–অতএব খানিকটা আশ্বাস অনুভব করতে দিয়ে অংশুবাবুকে; ঘরের ভেতরে কেমন একটা গ্রহণ-তিপি-উত্তীর্ণ গ্রাসযুক্ত চাঁদের মত হেঁটে বেড়াচ্ছিল মণিকা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল অংশু; তেপয়ের থেকে ছোট শিশিটা তুলে নিয়ে মণিকা বললে 'এর মধ্যেই খেয়ে ফেলেছ দেখছি এফিড্রিনঃ একটা আস্ত বড়িই খেয়ে ফেললে–'

কোন জবাব দিল না অংশুবাবু।

'আমি বলেছিলুম তো তোমাকে আধখানা করে খাবে।'

মণিকার সাধু মননে ও সত্যার্থে আশ্বাস–আরো খানিকটা আশ্বাস বেড়ে গেল অংশুবাবুর? না, তা একই জায়গায় রয়েছে, তার কোন বাড়া কমা নেই? গান্ধীর কাছে মণিকা হয়তো সাধু ও তার স্রষ্টার কাছে সত্য; কিন্তু ওরকম প্রেম ও ক্ষমায় জ্ঞানী হলে মানুষের ক্লান্তির অতীত হতে পারত অংশুবাবুঃ তা হতে পারেনি। তবুও খানিকটা ভালো লাগছিল, কেমন বিষণ্ণতা বিলাসে নিজেকে ছেড়ে দিল সে, মণিকার দিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে জানালার ভেতর দিয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে রইল।

প্রকৃতি সময় ও নারী যদি এ সবের প্রতীক হয়–সকলেরই অন্তর্ভেদী এই মূর্তি। কিন্তু এসব দেখে অভ্যস্ত বলেই হোক, কিংবা নিজেকে সব কিছুর জন্যেই প্রস্তুত করে রেখেছে সেই জন্যেই হোক, মণিকা অংশুবাবুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিছানার পাশে বসে ধীরে ধীরে তার পিঠ বলিয়ে দিতে লাগল, পিঠের আড়ালে মুখ নুইয়ে রেখে উপলব্ধির নদীর ভেতর ছিটেফোঁটা ঢিল ছুঁড়তে লাগল সে-হাসির, পরিহাসের, বৈরাজ্যের সহানুভূতির, সংকল্পের, ব্যথা মহত্ত্ব ও ক্ষমার কেমন একটা যোগনিদ্রার যেন-সমস্ত পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকে যেন।

অংশুবাবু অনর্গল বকে যেকে লাগলেন আবার-

'মিছেমিছি কথা বলছ কেন?' মণিকা শাসাল তার স্বামীকে, 'কথা বললেই তো শ্লেষ্মা ওঠে তোমার, কাশির ধকল বেড়ে যায়।'

'টাকা দিয়ে বকনার দুধও পাওয়া যায়। টাকা আজকাল সবারই হাতে। যাদের নেই তাদেরও পেতে হবে। কে মাথা ঠিক রাখবে।'

'তোমাকে ওষুধ দেব?'

'সুতীর্থ ফিরেছে?'

'না।'

'কদিন হল?'

'দিন পনেরো।'

'আজো ফিরল না? তবে এই রাত দুটো অব্দি নিচে কোথায় ঘুমিয়েছিলে তুমি?'

'ওর ঘরে।'

'খালি ঘরে একা ঘুমোবার কি মানে হতে পারে বুঝি না আমি। ও ভাড়া দিয়েছে?'

'না, দেবে হয়তো শিগগিরই।'

'ক' মাসের বাকি?'

'আমি হিসেব করে বলছি-ছ'মাসের অন্তত।'

মণিকা বিছানার কিনার থেকে উঠে ঘরের ভেতর পায়চারি করে, ঘুমন্ত অমলার চুলের ওপর হাত বুলিয়ে, অবশেষে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ভেব না তুমি, ও বিপদে পড়েছে। টাকা দিয়ে দেবে।'

'নিচে কার গলা শুনছিলুম?' অংশুবাবু তার সুন্দর অথচ কিছুটা বেখাপ্পা কটা চোখ তুলে মণিকাকে জিজ্ঞেস করল।

'কখন?'

'রাত দশটা সাড়ে দশটা অব্দি।'

'ও-বিরূপাক্ষের।'

'বিরূপাক্ষ কে?'

'সুতীর্থের চেনা লোক-তার খোঁজে এসেছিল।'

'এত রাত অব্দি ছিল কেন?'

এরকম প্রশ্নের কয়েক রকম জবাবের মধ্যে কোনটা বেছে নেবে। আন্দাজ করতে করতে মণিকা বিছানায় গিয়ে বসল আবার। অংশুবাবুর মনই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল যে ভুল বুঝবার সুযোগ মণিকার কথার যে-কোন রকম মার-প্যাঁচের ভেতর থেকেই বের করে নেবে। ঠিক এই জন্যেই নয়-এমনিই সত্যি কথাটা বলে দিতে চাইল মণিকা-সহজভঙ্গিতে। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত অংশুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে হিং টিং ছট ছড়িয়ে দিয়ে বললে 'ভদ্রলোক আজ আসাম মেলে এসেছেন।'

'ওঃ, আমি ভেবেছিলুম বাঙালি।'

'তা বাংলা কথা বলতে পারেন।'

'সে যাক গে। তারপর?'

'এসে কোথায় এক হোটেলে উঠেছিলেন। কিন্তু সেখানে সুবিধে হল না, তাই সুতীর্থের এখানে এসেছিলেন; এসে গেলেনও না, আমি ছিলুম তখন দোতলায়। সুতীর্থের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্তেও অনেক দরকার ছিল ওর-সমস্ত শুনে বুঝে নিতে হল। সুতীর্থ ফিরে এলে তাকে জানাতে হবে সব।'

'ভদ্রলোক চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কটার সময়?'

'এই দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ-'

'কোথায় গেলেন?'

'বড়লোক মানুষ গাড়ি হাঁকিয়ে কোথায় গেলেন আমি তাকে তা জিজ্ঞেস করিনি।'

'সুতীর্থ তোমার কে জিজ্ঞেস করেছিল?'

'না।'

'এমনই খাজা আহাম্মক? এই মাথা নিয়ে ব্যবসা করে ও।' অংশুবাবু হঠাৎ একটা সুন্দর ভিন জঙ্গলের বাঘিনীকে দেখে বুড়ো দক্ষিণ রায়ের মত চোখ তুলে মণিকার দিকে তাকাল। মণিকার কথা কতদূর বিশ্বাস করেছে অংশুবাবু বুঝতে পারা গেল না। করেছে হয়তো পুরোপুরিই বিশ্বাস মনের ভেতর একা তেতো ঝাঁঝ-আর্সেনিকের মত-যতই মিইয়ে আসতে লাগল অংশুবাবুর ততই ঝিমিয়ে পড়তে লাগল সে। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

অংশুর পাশেই দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চিত হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল মণিকা। পৃথিবীটা কি এমন হতে পারত না যে, ভালো মনে করে যে কাজ করে যে কথা বলে তেমনি শুদ্ধচিত্তেই অন্যকে তা জানানো যায়? মণিকা একজন নিবিড় নিশীথচুটী স্বর্গীয় পাখির মত নিমেষনিহত হয়ে ভাবছিল যে তাই যদি হত, তা হলে কি এ ঘরে থাকবার প্রয়োজন হত তার-কিংবা এই নগরীতে-এই পৃথিবীতে-এই গ্রহে? মহাশূন্যের অন্ধকারের ভেতর দূর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্য পেরিয়ে অপর কোন আলো ঋতুর দেশে হয়তো চলে যেতে হত তাকে। বাইরে গিয়ে আকণ্ঠ ঠাণ্ডা বাতাস পান করবার ইচ্ছে হল তার—এই শীতের রাতেও। মাঘঋতুর শিশির পাখলানো নক্ষত্রতন্বী নিস্তব্ধ আকাশটাকে দেখে আসবার সাধ জেগে উঠল।

'ওঠো ওঠো মণিকা, এসো, কত কোটি কোটি তারা জ্বলছে, দেখ এসে ঃ কত সাদা কালো কমলা ডানার লাল নীল ঠোঁটের পাখিরা যেন বাইরের শূন্য পাখনার ঝাপটায় বলছে তাকে ঃ এখনই সব মাঘ শেষের ফাগুনের বাতাস ফুর ফুর উড় উড় করে ঢুকে পড়তে লাগল ঘরের ভেতর। কিন্তু তৎক্ষণাৎই নিচের—মাটির সংসারগ্রন্থিতে ফিরে আসতে হল তাকে; অংশুবাবু শিগগিরই মরে যাবে, মেয়েটার রূপ থাকলেও সে উৎরোবে না, এ বাড়িটা মর্টগেজে বাঁধা আর একজন লোলুপ মাড়োয়ারী কালোবাজারীর কাছে (বিরূপাক্ষ তাকে চেনেও না) ঃ সুতীর্থের দায়িত্ব সুতীর্থের নিজের চেতনা প্রেরণার কাছে শুধু ঃ সেগুলোকে সে জ্যামিতি ট্যামিতির মতন অব্যর্থ মনে করে। কিন্তু জ্যামিতি নিজেই ছিল; মানুষ হাতড়ে পেয়েছে তাকে ঃ মানুষ দুর্বল, জ্যামিতি অব্যর্থ। এটাই বোঝে না সুতীর্থ?

বিরূপাক্ষের সঙ্গে মণিকার সবচেয়ে বড় ফাঁড়া আজ রাতেই কেটে গেছে আশা করা যায়। বিরূপাক্ষ ঘুমিয়েছিল। তার ব্যাগের ভেতর তার উইলের খসড়া সেদিনকার চেক ও টাকা সব ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে মণিকা। বিরূপাক্ষকে মণিকা ঘৃণা করে না, বিষাক্ত ব্যবসায়ী হলেও ওর হৃদয় হয়তো ঠিক সে অনুপাতে কঠিন নয়, মনটা সর্দার, কিন্তু সমীচীন নয়—স্থির নয়, এখনও রাধাচক্রে ঘুরছে। যদি বুঝতে পারা যেত ও সত্যিই ঘোড়েল, ওর হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই, তাহলে মণিকা কি ওর জন্যে এত কটা রাত খরচ করত? ওকে দেখা মাত্র বিদায় করে দিত, না হলে হয়রানি বেড়ে যেত,—এর চেয়ে ঢের বেশি হয়রানি।

অংশুবাবু হঠাৎ জেগে উঠল কেমন জ্বলজ্বলন্ত দুটো কটা চোখ মেলে, গির জঙ্গলে চিতে বাঘ জেগে উঠেছে যেন দিনের আলোয় দিনের আলোর ঘুম থেকে যেন ঃ মনে হচ্ছিল মণিকার বেশি শীতের অন্ধকারের ভেতর বসে থেকে।

'কোথায় তুমি?'

'এই তো আমি—তোমার কাছেই।'

'হ্যাঁ। মণিকাকে সাপ-বেজীর ভেল্কিতে নামিয়েই ছাড়ত তাহলে বিরূপাক্ষ। কিন্তু বিরূপাক্ষ সে জাতের মানুষ ঠিক নয়; শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি নিজের চাওয়া জিনিসকে অধিকার না করে ও-ও ছাড়তে চায় না। কিন্তু আমি জাত-বেজী হই না হই ও জাত-সাপও নয়—অন্তত আমার সম্পর্কে সে সব কিছু হবারই ক্ষমতা যে ওর নেই—সেটা বুঝেই ঢুঁটো বাস্তুসাপের মত ওকে আসতে দেখে ছেড়ে দিচ্ছি আমি। ও যদি ওর জন্য আরো কয়েকটা রাত খরচ করতে রাজি আমি; কিন্তু আলো নেভাবার কোন অধিকার থাকবে না, রাত 'দশটার পরে বসে থাকবার কোন তাগিদ থাকবে না কারুণ। এ বাড়িটা যেন কেমন ছমছম করে। আমার একজন নিতান্ত গুরুমুখী ও মোটামুটি নিরীহ স্তাবকের সঙ্গে প্রথম রাতটা আড্ডা মেরে নিলে মন্দ লাগবে না। লোকসমাজে বেরুলে অবিশ্যি অনেক পারিষদ উপাসক জুটে যায়; আরো কত কি। কিন্তু বাইরের বড় সমাজের ঘেঁষাঘেঁষিতে বেরুবার রেওয়াজ তাদের বংশে নেই, অংশুবাবুর বংশেও না। যারা দেউড়ি পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে তাদের সঙ্গেই কারবার করতে হয়। এখানে কৃতিত্বের অভাব হয় তো—যদি না একটি বালুকণার ভেতর ব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনা লুকিয়ে থাকে। থাকে নাকি?

'কোথায়! কোথায়!!' বাজপাখি যেন চিতেবাঘকে মেরে ফেলছে এমনই একটা অদ্ভুত বিকট চীৎকার করে উঠল অংশু।

'এই তো আমি তোমার কাছেই আছি।'

মণিকা উঠে বসল। অংশুবাবু একটু ঝিমিয়ে পড়লে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগল সে।

মুখার্জির সঙ্গে অবিশ্যি পনেরো বছর আগে এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল মণিকার। কিন্তু তাকে দ্বিতীয় রাতেই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল মণিকা; সে ঘরে একটা চাবুক ছিল বিভূতি রায়ের; সেই চাবুক মুখের ওপর কষেছিল মুখার্জির। ওটা বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। এখন মানুষকে হাসিমুখে মিষ্টি সরুচাকলি খাইয়ে মানে মানে বিদায় করে দেওয়াটাই ঠিক মনে করে মণিকা। কেননা মানুষ সব—শেষ পর্যন্ত; মানুষ; মানুষ—; ভাবনা বেদনা আছে; মানুষকে মানুষ বলে গ্রহণ করলেই সবচেয়ে ভালো।

কুড়ি

সুতীর্থ ঘুম থেকে জেগে উঠল প্রায় গোটা দশেকের সময়। তাকে বুঝে নিতে হল কোথায় সে আছে। কালকে রাতে কি হয়েছিল জেগে উঠেও সহসা সে সব কথা মনে পড়েনি তার; আস্তে আস্তে স্মৃতি ফিরে এল;—একে একে সব পরিষ্কার; বিচারবোধ ফিরে এল। কিন্তু এজন্য মনে খুব বেশি খোঁচা লাগছিল না তার। সমস্ত শরীরটা কেমন একটা ব্যথায় টাটিয়ে উঠেছিল। দিন পনেরো ধরে নানারকম অত্যাচার চলেছে শরীরের ওপর; কালকের দিনটা সব চেয়ে বেশি হাঙ্গামার ভেতর কেটেছে; তারপরে অনেক রাতে এসে এই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়েছে। খুব ভালো করে চান করে নিতে হবে—বেশ করে তেল মেখে—না হয় সাবান রগড়ে।

সুতীর্থ আস্তে আস্তে নিজের শোবার ঘরে চলে গেল। এ ঘরটা গোছানো ঝকঝক তকতক করছে। মিসেস মজুমদারই করেছে সব। একটা নতুন তেপয় এসেছে—একটা কুশনে আঁটা বড় ইজিচেয়ার, নতুন একটা আতরদান, ওয়াল ক্লক, ক্যালেন্ডার দুটো মাত্র, কিন্তু খুব বড় এবং বড় জাতের, এদের আভিজাত্যের দিকে তাকালে বেশ লাগে মোটামুটি; দুটো সোফাই বেশ কোলভরা, ঘরজোড়া নতুন বৌয়ের মত—পরিপাটি, দুটোই আনকোরা।

বিরূপাক্ষের জন্যেই কি এত সব। সুতীর্থের মন কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। মণিকাকে—এতদিনেও যদি সে না চিনে থাকে তাহলে কবে চিনবে আর? এক-একটা বড় ফ্যাক্টরিতে দেখেছে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে চাকার ভেতর কত যে চাকা খাঁজ নাট কাজ করে যাচ্ছে, সমস্ত মেশিনটা কেমন সহজে স্বাভাবিকতায় নড়ছে ঘুরছে ঃ-মেশিনের সম্পূর্ণতাকে ধ্যান করা যাক-একটা বিসদৃশ খাঁজের দিকে তাকিয়ে থেকে কি হবে? সুতীর্থকে সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে মহিলার-মণিকার।

মণিকাকে চেনেনি কি সে? না যদি তার সম্পূর্ণ নারী সত্যার্থকে উপলব্ধি করে থাকে সুতীর্থ তাহলে কার অপরাধ?-মণিকার?-না সুতীর্থের নিজের যুক্তি ও ধ্যানের?

ঘরের ভেতর মাঝ মাঘের সকালের আশ্চর্য রোদের চুমকি এসে পড়েছে বড় রোদের সঙ্গে সঙ্গে-দেয়ালে জানালার মেঝের মোজেয়িকে স্বস্তিকা আল্পনায়-উড়ু উড়ু উড়ুক্কু সব চিল চড়াই শালিখের পায়রার পাখনায়। পুবের দিকে প্রকাণ্ড দুটো জানালা খোলা; তাকালেই সূর্যকে দেখা যায়-যদিও সে দূর দক্ষিণশ্রেয়ী এখন; কোনো উজ্জ্বল অনুভূতির মত সূর্য ঐ মানুষের সময় ও ইতিহাসবৃত্তান্তের সারাৎসার আলোকশীর্ষের মত; যারা আগুন বাঁচিয়ে রেখেছে-যারা আগুন-যারা আগুন নয়, বিকেলের নদীর মত স্নিগ্ধ, যারা আগুন নিভিয়ে ফেলে নক্ষত্রের রাত্রির মত দীনাত্মা-মানবসত্তার সেই সব আত্মার মত সূর্য ঐ। কাটা সুতোর অবিরল এলোমেলো পাঁজের মত নদী চলেছে-সেই নদীর জলের ভেতর থেকে মাঘের দুপুরে রাজহাঁস যেমন করে তাকায় তেমনি করে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখতে হয় সূর্যকে-কিংবা আদি মানবের মত-কিংবা নিঃস্বত্ব, বিশুদ্ধ করে নিতে পারে যদি আজকের মানব নিজেকে তাহলে তার গভীর বোধিশক্তির দৃষ্টি নিয়ে সূর্যের দিকে-সূর্যের ইঙ্গিতের দিকে নিজেকে ফিরিয়ে নিতে হয়।

সুতীর্থ যে তার নিজের ঘরে ফিরে এসেছে টের পেয়েছে ঐ সুদূর সূর্য। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের সঙ্গে নিজের প্রাণশক্তির নিবিড় পানিপীড়ন বোধ করেছে সুতীর্থ-চারদিকে মাঘনীলিমার সমস্ত পরিমণ্ডলের নীল ঝরে পড়ছে-শূন্যে শূন্যে-কন্যা পৃথিবীর কোলে-আলোর নির্ঝরে। একি প্রকৃতির শক্তি না সূর্য দেবী নিজে? সুতীর্থের সমস্ত শরীরকে ঝিমানো বাঘের মত পড়ে আছে দেখে দাউ দাউ করে উঠছে, ঝর্ঝরে ঝাউবনানীর মত আলোর চারদিকে পৃথিবীর প্রথম বাঘিনীর দুর্বার স্নিগ্ধতা।

স্বর...শরীরই শুধু নয় আত্মার প্রতিটি স্নায়ু শিশুসূর্যদীপ্ত হয়ে নিজেকে পিতার মত মনে করছে-মিশে যেতে চাচ্ছে কোন মহান নারীর সঙ্গে। সাদা আগুনের প্রবাহের ভেতর গান ঝরে ধোঁয়ায় ধবল হয়ে উঠে উজ্জ্বলন্ত জলস্রোতের মত চোখ বুজে বসে রইল সুতীর্থ।

ঘরের ভেতর এসে মণিকা যে দাঁড়িয়েছিল সে খেয়াল ছিল না তার। 'রোদ পোয়াচ্ছ?' বললে মণিকা।

কোন কথা বললে না সুতীর্থ, কাপড় পর্দা বইয়ের মলাটে ছোকছোক ছাক খটাস হওয়ার কোন কথা বললে না সুতীর্থ, আওয়াজে মণিকার গলা হয় তো তার কানেও পৌঁছয়নি।

'কখন ফিরলে?' মণিকা আবার বললে, 'চোখ বুজে আছ?'

কাল রাতে নিজে যে সোফায় বসেছিল, সেইখানেই গিয়ে বসল মণিকা। সুতীর্থের কাছ থেকে কোন উত্তরের প্রতীক্ষা করে এক আধ মিনিট চুপ করে বসে থেকে নিজেই সে নিস্তব্ধতা ভেঙে বললে, 'কখন এলে সুতীর্থ?'

'কে,-তুমি-'

মণিকা বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল-সুতীর্থও-তাদের দু'জনের দৃষ্টি অনেক দূরে একটা ছোট টিপের ভেতর এক হয়ে মিশে গেছে-উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধির ভেতর নিস্তব্ধ হয়ে থেকে।

'এইমাত্র এলে সুতীর্থ?'

'হ্যাঁ, এই তো; এই ঘরে।'

'এ কি চেহারা হয়েছে? কোথায় ছিলে?'

'অনেক জায়গায়।'

'কোথায়? খুব মার খেয়েছ মনে হচ্ছে।'

'দেখাচ্ছি তোমাকে।' সুতীর্থ বললে।

'থাক থাক কি দক্ষিণা দিয়েছ পেয়েছি দেখাবার জন্যে ছেঁড়া জামা খুলতে হবে না আর।'

'জামাটা খুলতে হবে, এখন খুলব কিনা ভাবছি। আমার ট্রাঙ্কে আর জামা আছে?'

'আমি কি করে বলব?'

'নেই। বড্ড গরীব হয়ে পড়েছি।'

'যত টাকা পেটায় তত গরীব-অফিসের ধাড়ি আইবুড়ো।'

'আইবুড়ো ছিলাম ছেলেবেলায়', সুতীর্থ বললে, 'তারপরে আর এক রকম হল-'

'ও-সব রূপকথা এখন আর চলবে না।'

'পাশগাঁয়ে তুমি যাবে আমার সঙ্গে?' সুতীর্থ বললে, 'চলো নিজের চোখে দেখে আসবে।'

'কি আছে সেখানে?'

'স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ী ছেলেপুলে-'

'বেয়ান নেই? শালী? শালাবউ?-স্ত্রী আর শাশুড়ী আছে বুঝি শুধু?' নদীর মত গলায় মণিকা বললে।

'তোমার চেয়ে শাশুড়ীর বয়স কমই হবে হয়তো।'

সুতীর্থ পুবের দিকের একটা জানালা বন্ধ করবার জন্যে উঠে গেল।

'ওটা আবজে দিলে কেন?'

'বড্ড কড়া রোদ আসছে।'

'তোমার চোখের ওপর?'

'তোমার মুখ টসটস করছে-যেন জ্বর-জ্বালা হল-'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হল, বেশ হল', মণিকা চোখ বুজে বললে, 'সূর্যের ছ্যাঁকা জ্বর-জ্বালায় আরাম। বেশ ছিল তো-কেন জানালাটা টেনে দিলে বাপু-'

'সব জানালাই খোলা আছে, একটা ছাড়া-'সুতীর্থ নিজের মনের স্বাদে প্রীত, খানিকটা উদগত ও সমাহিত হয়ে বললে, 'প্রাচীন মিশরীয় মেয়েদের কথা মনে পড়ছে আমার। এও যেন সেই মিশরের নীলিমা। নীল নদের পারে শেষ শীতের রৌদ্রে বসে আছি আমি-' জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থ' হয়ে রইল সুতীর্থ।

'আর আমি?'

'তুমি। তুমিও বসে আছ, সেই গীজের মূর্তির কাছে যেন,' ঢোক গিলে বললে সুতীর্থ; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই গলায় মিশর রোদের ডাকপাখি ডেকে উঠল যেন তার-'কোন এক ভোরের, কোন নীলের বাতাস পাচ্ছি আমি ঃ তিন হাজার বছর যে পাটে চলে গিয়েছিল সেই সূর্য আবার ফিরে এলে যে রকম বাতাস ভেসে আসে; কি গভীর সেই নীল আকাশ, সত্যিই খুব বেশি নীল-সেই সাধ-সংসর্গের মত রোদ আশ্চর্য নদী ক্ষেত প্রান্তর জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত রক্তপাতের মতন সেই আলো; নীলের অনেক নিচে বড় বড় সহজের কালি ব্যথা উদ্যম নিষ্ফলতার কত শত প্রবঞ্চের ফাঁকে ফাঁকে নীল-ব্যাজন শুনছ না মণিকা? ওগুলো কি খেজুর গাছ গান গাইছে? তরতর করে জল চলে যাচ্ছে চারদিকে-'তিন হাজার বছর আগের রোদের সঙ্গে হুড়হুড় করে ছুটে চলেছে আজকের দিনের ভেতর' সুতীর্থ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল, কলকাতা-পৃথিবীর দিকে।

'তিন হাজার বছর আগের আজকের দিন ঃ বলেছ তুমি', মণিকা বললে, বাইরে অনেক দূরে যেখানে দু'জনের দৃষ্টি একটা তিলের মতন বিন্দুতে মিশেছে গিয়ে সেই একাত্মতার ভেতর থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে মণিকা বললে, 'সময় বলে কেউ যে নেই আমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।'

'সময় কেটে যায়, তবুও কাটে না?'

'না, না। তা নয়, আমার মনে হয় সেকালের একালের সব সময়ের সমস্ত ইতিহাসই এক সাময়িক।'

কথাটা শুনে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন, খুব আশ্চর্য লাগল সুতীর্থের-মণিকার দিকে খুব মন দিয়ে তাকিয়ে রইল সে; বললে, 'আমার তো অনেক সময় মনে হয়েছে এরকম। কিন্তু গণিতের হিসেবে এ কি টেঁকে?'

'গণিত কি বলে জানি না, কিন্তু গাণিতিক তুমি বটে; তার চেয়েও বেশি একটা জিনিস তুমি সুতীর্থ-এই তো বললে তিন হাজার বছর আগের আজকের দিনের ভেতর। তা হলে সব সময় সমসাময়িক। তুমিও তো তাই বললে।'

তুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে চলে গিয়ে বললে, 'কিন্তু বিজ্ঞান অন্য কথা বলে। বিজ্ঞানকে অমান্য করে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?'

'বিজ্ঞানকে সত্যিই জ্ঞানে দাঁড় করাবে। বিজ্ঞান তো এখনও আধা সত্য। সত্য হবে হেঁয়ালিকে সেই তো গিয়ে ধরবে একদিন। বলে মণিকা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

মণিকা বললে, 'কিন্তু আমাদের জন্যে অনেক কিছুই হেঁয়ালি রইল।'

সুতীর্থ আলো আবছায়া চোখে তাকিয়ে নিজের সোফায় ফিরে এল।

সুতীর্থের দিকে তাকালো না মণিকা। সুতীর্থ তাকিয়েছিল দূর আকাশের শাখা আগুনের দিকে ঃ সেটা কি সূর্যের, না সূর্য সরে গেছে তার শূন্য স্থানের? মণিকার মুখে কোন আলো পড়ল কিনা-কিংবা ছায়া-কোন ইঙ্গিত এসে মিলিয়ে গেল কিনা তাকিয়ে দেখবার কথা হয়তো সুতীর্থের; কিন্তু বিদ্যুৎ নেই-তবুও বিদ্যুৎ রয়েছে-নারী নেই তবুও দুর্বার রেতঃক্ষরণ ঐ সকালের, দুপুরের নীলিমায়-অনুভব করতে করতে অপর কোন মানবের মত হয়ে গিয়েছিল সুতীর্থ ঃ অনেকক্ষণ পরে উঠে সে বাকি জানালাটা খুলে দিল।

'ঐ জানালাটা আবজে রাখলেই ভালো হত সুতীর্থ।'

'সরে গেছে সূর্য। এখন আর তোমার মুখে রোদ পড়বে না।'

'না সে জন্যে নয়, আমি সরে বসেছি-'

'সোফাটাকে আরো ভালো জায়গায় ঘুরিয়ে দিই?'

'দাও।'

'সমস্ত আকাশটাকে দেখা যায়। কী ভীষণ দানবীয় চেয়ে দেখ-'

'দানবীয়?'

'উর্বশী লক্ষ্মীর চেয়েও সুন্দর; ঐ আকাশের মত।'

কথা বললে না কেউ-অনেকক্ষণ।

'তুমি আমার এই সোফায় এসে বস সুতীর্থ।'

'আসছি।'

'আমার পাশে বস।'

রোদের ভেতর দূর আকাশে চিলের কান্নাও শোনা গেল। কেমন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতে চায় মানুষের মন; অথচ প্রকৃতি সুপরিসরের ভেতর সুস্থির, কেমন আশ্চর্য প্রাণবত্তায় সূচালিত; মহানুভব।

'কি দেখছ তুমি?'

'এই রোদ নীল আকাশ শহরের মিনার দালান সাদা বিছানা বস্তি ব্যথা জন্ম-মৃত্যু ভেদ করে উজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ডের দীপ্তি রোজই থাকে। তুমিই তো বলেছিলে একদিন-বেবিলনেও ছিল। বেবিলনে ছিল, আমরাও দেখেছি। কিন্তু তবুও দু'জনে মিলে দেখবার সময় বেশি পাই না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতীর্থ মণিকার সোফায় এসে বসল; পাশাপাশি, কিন্তু গা ঘেঁষে নয়। ঘেঁষাঘেঁষি যাতে না হয় সেই জন্যেই একটু সরেই বসল এদের ভেতর একজন।

'সবই আছে, অথচ কিছুই নেই. মহানগরীর ওপরেও এত বড় আকাশ, এরকম রৌদ্র, অথচ সমাজ নষ্ট, রাষ্ট্র পণ্ড, মানুষের হাতে মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে, বোন মরছে ভায়ের হাতে।'

সুতীর্থের কাঁধের ওপর হাত রেখে মণিকা বললে, 'চান করে এসো, এখন গেলে কলে জল পাবে। চৌবাচ্চায়ও আছে। আমি জ্যোতিকে বলে দিচ্ছি, দু'বালতি জল এনে তোমার চানের ঘরে রাখতে। হবে দু' বালতিতে?'

'ধ্বস্তাধ্বস্তিতে তোমার জামা ছিঁড়ে গেছে হয়তো। কিন্তু জামায় রক্তের দাগ কিসের?' মণিকা জামার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে।

মণিকা বললে, 'এ তো অনেক রক্ত; তোমার নিজের গায়ের? না অন্য কারুর–'

সুতীর্থ শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বললে, 'না আমার না। কি করে শার্টটা মাড়াল তাই ভাবছি।'

'বোতাম খুলতে খুলতে থেমে গিয়ে ভ্রূকুটি করে মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে, রক্তটা কালি মেরে গেছে। তাজা রক্ত নয় নিশ্চয়ই। এ কবে হল। সত্যিই রক্ত তো?'

'আঃ ছি, নাকের কাছে নিয়ে শুঁকছো কেন?'

সুতীর্থ শার্ট খুলে ফেলল, বারান্দার দিকে ছুঁড়ে ফেলে বললে, মনে পড়েছে।'

'তোমারই তো রক্ত?'

'সে গল্প শুনবে? তাহলে বসো তুমি।'

সুতীর্থ ইজিচেয়ারটা মণিকার সোফার দিকে ঘুরিয়ে একটু কাছে টেনে এনে বললে, শার্টে যা রক্ত দেখছ, এই নিচের গেঞ্জিতেও তেমনি,–তার নিচেও–'

'মানে তুমি জখম হয়েছ; কখন হলে?'

'কাল রাতে।'

'কাল রাতে! হাসপাতালে যাওনি কেন?'

এখানে কি হাসপাতাল নেই ঃ তোমার এ বাড়িতে?'

'কাল রাতে তক্ষুণি হাসপাতালে যেতে পারতে তো তুমি'–

দাঁত কড়মড় করে বললে মণিকা, 'ওঠো। জ্যোতিকে গাড়ি ডাকতে বলছি; এক্ষুণি চল।'

সুতীর্থ কুঁড়েমি ভাঙতে ভাঙতে আস্তে হেসে বললে, 'যে ফেরারী সে যাবে হাসপাতালে। কী ডায়েরী করব আমি বল তো দেখি।'

'ফেরারী! কাকে খুন করলে!'

মণিকা জ্যোতিকে ডাকবার জন্যে তেতলার দিকে যাচ্ছিল ফিরে এসে খাটের কিনারে দাঁড়িয়ে সুতীর্থের দিকে তাকাল কিন্তু কি মনে করে তৎক্ষণাৎ তেতলায় চলে গেল। মুহূর্তেই অনেক কিছু ওষুধপত্র ব্যান্ডেজ ইত্যাদির সাজসরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে এসে বললে, 'কই জামাটা খোলো দেখি।'

কিন্তু জামা খুলে দেখা গেল সুতীর্থের গা একেবারে পরিষ্কার–একটা মশার কামড়ও নেই কোনদিকে–

মণিকা গালে হাত দিয়ে সোফার এক কিনারে বসে বললে, 'তাহলে বিরূপাক্ষ যা বলেছিল সেই কথাই ঠিক?'

'বিরূপাক্ষ? তার সঙ্গে কোথায় দেখা হল তোমার?'

'দেখা হয়েছিল। তুমি ফেরারী কাকে খুক করলে?'

'তাকে কি করে চিনবে তুমি?'

'কোন বড়মানুষকে করোনি তো?'

এ প্রশ্ন শুনে মূলো কলা আর ঘণ্টা নাড়ার পূজোর পুরুতের মত মনে হল মণিকাকে–নিজেকেও–নিজের সংগ্রামটাকে। এক আধ মিনিট চুপ করে থেকে বড় কাজকর্মের আসরে অগ্রদানী বামুনের মত যেন–একটু বিষদাঁত ঘষে সুতীর্থ বললে, 'বড় মানুষ তো আমাদের দলে।'

'ও কি, রক্তমাখা জামাটা কখন তুলে আনলে? জানালার গরাদে বেঁধে কি করছ সুতীর্থ ঃ রক্তের নিশান ওড়াচ্ছো?' বলতে বলতে খুব বিরক্ত, পীড়িত হয়ে মণিকা দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল, রাস্তার দিকের দুটো জানালাও।

'না, কোন বড় মানুষকে খুন করিনি।'

'করো না।'

'কেন করব না বল তো দেখি? আমি হেঁয়ালি সাধছি; তুমি কষে বলো। তুমি ছাড়া কেউ প্যাঁচ খুলতে পারবে না।'

'হেঁয়ালি টেঁয়ালি নয়–যেন মিছিমিছি বিপদ বাড়াতে যাবে?' 'বিপদ আছেই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কুলিকামিন এক আধটাকে খুন করলেই হয়ে যায়, ওতেই বেশ গেঁজে ওঠে; বেশ খাসা লপসি লিসপিস পয়দা হয়। ওরা বিপ্লব করতে জানে না, ওদের সকলকে কেটে ফেললেও না। কিন্তু কী হবে একটা মল্লিক, মুখার্জি, হীরাচাঁদ, হুকুমচাঁদকে মেরে।'

সুতীর্থের কথাবার্তা রকমসকমের কেমন একটা বেচাল বিসদৃশতায় মণিকার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয়ের মধ্যে আস্তে আস্তে বিষ সঞ্চিত হচ্ছিল যেন ঃ টন টন করে উঠল তার।

'হীরাচাঁদ কে?'

'তাকে তুমি চিনবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কি করেছিল সে?'

'কিছু না।'

'এ রক্তের দাগ কিসের?'

'তা পরে শুনবে। আগে বল আজকের এই যুগে আমাদের মতন লোকের পক্ষে ধরে ধরে হেঁসো দিয়ে ঝাড় সাফ করে ফেলাই ভালো–'

'না, তা আমি কি করে বলি। আমার মতে খুন করাই খারাপ।'

'কিন্তু যদি খুন করতে হয় তাহলে কাকে করব?'

'কাউকেই না।'

'বরং গয়ানাথ মালোকেই, তাই না মণিকা?'

'গয়ানাথ মালো কে?'

'নাম শুনতেই তো বুঝেছে একটা কেষ্টো-বিষ্টু কেউ নয়। কিন্তু তবুও ছেলেপুলে নিয়ে ওর একটা মস্ত পরিবার। পরিবারটা স্বামী স্ত্রীরই এক জোটে না, আরো কেউ নাক ঢুকিয়ে বংশ বাড়িয়ে গেছে তা জানি না। যা হোক, পরিবারটা না খেতে পেয়ে মরছে।'

'আমরা কি করব', মণিকা বললে, 'আমরা তো নিঃসহায়।'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়াল; পায়চারি করতে করতে বললে, 'ঠিকই বলেছ তুমি।'

মণিকার দিকে ফিরে সুতীর্থ বললে, 'আমি গয়ানাথ মালোকে মেরেছি। এ তারই রক্ত।'

'তার রক্ত?'

সুতীর্থ জানালা দুটো খুলে দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, বড়দের কারো নয়; ভয় করবার কিছু নেই।'

'স্ট্রাইক হয়েছিল?'

'কিছুটা হয়েছিল।'

'তোমাদের ফার্মে?'

'আমাদের ফার্মে নয়।'

'তাহলে?'

'এই শহরেই–কেন কোন জায়গায়।'

'তুমি কি কলকাতার বাইরে ছিলে এতদিন?'

'না।'

'ধর্মঘটের ব্যাপারে কিছু করেছিলে তুমি?'

'যাতে জেল হয় এমন কিছু করিনি হয়তো।'

সুতীর্থ উঠে গিয়ে বন্ধ দরজাটা খুলে দিল। ফিরে এসে বললে, 'কিংবা করে থাকিই যদি, জানবে কে? এই তো এই লোকটাকে খুন করেছি আমি। কি হয়েছে তাতে? খুন যে করা হয়েছে তা বের হবে একদিন। কিন্তু এ নিয়ে গাঁইগুঁই করবার মত একটা কুত্তাও থাকে না এসব লোকের।'

একুশ

চান করে খেয়ে দেয়ে সুতীর্থ বেরিয়ে পড়বার যোগাড় করছিল। খাবার অবিশ্যি ওপরের থেকে এসেছিল। সুতীর্থের চাকর চলে গিয়েছিল–এরকম উড়নচণ্ডে লোকের চাকর কদিন টিকে থাকে। খাবার দিয়ে গেল জ্যোতি। কিন্তু মণিকা আর এল না। বাসে করে সুতীর্থ যে জায়গায় নামল সেখান থেকে হেঁটে আরো মাইলটাক যেতে হয়; জায়গাটা কলকাতার বাইরে। তবে বেশি দূর নয়। নানারকম ফ্যাক্টরি রয়েছে, অনেক কুলিমজুর খাটছে। এরই ভেতর একটা ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট চলছিল। সুতীর্থকে দেখতে পেয়েই কতকগুলো লোক হইহই করে উঠল–হয়তো মারবেই তাকে–কিংবা হতে পারে তার কাছ থেকে সান্ত্বা কিছু পাবে বলে কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কি যে হবে কিছু বলা যায় না। জনতা যখন উত্তেজিত তখন সে কোনো মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মৃতদেহ আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। ওরা দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই সম্রাটও বানিয়ে ফেলতে পারে মানুষকে; সম্রাট যদি মনের ভুলে কথা বলে কিংবা বেকুবি করে, তাহলে তার গর্দান নিতে সময় লাগে না, লাগা উচিত নয় সেটাও হাড়ে হাড়ে জেনে নিয়েছে।

'আজ আমি তোমাদের কাছে বক্তৃতা করব না।' সুতীর্থ বললে।

'ও সবের দরকার নেই দাদা', হৃদয় ভৌমিক বললে, 'বালি খুব তেতে আছে। আকাশের সূর্যের চেয়ে তার ঝাঁঝ বেশি। আর কত ঝাঁঝালো করে তুলবেন তাকে সুতীর্থবাবু–'

'তোমাদের ফ্যাক্টরিতে ফিরিঙ্গি মজদুর আছে নাকি শুনলুম–'

'আছে বইকি, মজদুর নয়', বঙ্কু বললে।

'মজদুর নয়, ইঞ্জিনিয়ার,' বলে বিহারী।

'কজন আছে?'

'ইঞ্জিনিয়ার, ফোরম্যান, অ্যাসিসটেন্ট–সে আছে অনেক। কেন বলুন তো সুতীর্থবাবু?'

'তারাও তো ধর্মঘট করছে।'

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা করবে না। কেন করবে? এদের-'.

ইয়াসিন একটু সতর্ক হয়ে বললে, 'তাদের না করলেও চলে। দিন কেটে যায়।'

'তোমাদের মতলব কি?'

'আমরা চালাব' সকলেই প্রায় সমরোলে বলে উঠল।

'কেমন চিমসে হয়ে যাচ্ছে-গোলগাল চেহারা ছিল ইয়াকুবের এ হল কী। বিড়িই বুঝি টানছে সারাদিন মকবুল। দানাপানি পেয়েছে আজ? শুধু জল খেয়ে আছে?'

'ফতিমা আপনাকে ডেকেছে।' মকবুল বললে।

'আমাকে?' জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।'

'হ্যাঁ, আপনাকেই।'

'কেন বলো তো?'

'যান, গিয়ে দেখে আসবেন।'

'আজ যাব না-সময় হবে না।'

'কবে সময় পাবেন তাহলে?'

সুতীর্থ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আজ আর হবে না। সময় নেই।' মকবুল মুখ বেজার করে চলে যাচ্ছিল।

'কোথায় যাচ্ছ মকবুল?'

একটা বিড়ি জ্বালিয়ে মকবুল বললে, 'আরে রাখুন মশাই।'

'কি হল রে তোর মকবুল'-ইয়াসিন বললে।

'এই সুতীর্থবাবু প্রমিস করেছিলেন, আমার কাছে যে একবেলা আমাদের সঙ্গে বসে নুন ভাত খাবেন-'

'কিন্তু এখন কি করে খায়। এখন তো তোরাই খেতে পাচ্ছিস না।' হামিদ বললে।

'খেতে যে পাচ্ছি না, পরতে পারছি না তাই নিয়ে গিদ্ধোরের মত ফেউ ফেউ করবি-না চোখ তারিয়ে বেটাচ্ছেলেরা দেখবি সব, নগদানগদি যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিবি ফেউ ফেউ না করে-'

'ঠিকই বলেছে, মকবুল মোক্ষম বলেছে ইয়াসিন। তোমাদের ধর্মঘটের ক'দিন হল?'

'এই দশ দিন আজ নিয়ে।

'কর্তাদের মন উঠছে না।'

'অত সহজে কি আর তা হবে। দেখুন সুতীর্থবাবু, আমার মনে হয় এই ধর্মঘট জিনিসটার বিশেষ কোন ভবিষ্যৎ নেই আমাদের দেশে।' বঙ্কু বললে।

সুতীর্থ বিষ ঝাড়বার ওঝার মত চোখে ক্ষতটার দিকে তাকাল যেন বঙ্কুর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু সে দৃষ্টির আবেদন শাসন সব অগ্রাহ্য করে বঙ্কু বরং হামিদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কত পার্টি আছে। আমাদের দেশে. কত পোলিটিক্যাল পার্টি ও সব পার্টির সুনাম যে নেই তা নয়। সুনাম আছে। সুনাম ছিল একদিন। কিন্তু সে সব ভাঙিয়ে খাবার মত পেটোয়া লোকের অভাব আমাদের এই সোনার দেশে নেই সাহেব। এরা আসে যায়-সভা করে-বক্তৃতা দেয়-কাগজে লেখে-নিজেদের ভেতর কথা কাটাকাটি-পরে কামড়াকামড়িও করে। এদের ভেতর কে ছোট-কে বড়-কে আমাদের সত্যিই ভালো করল-কার বা ভালো করার প্রয়াসটা স্রেফ বদমায়েসি-এ সব পাঁচরকম দশরকম সব ভিয়েনে চড়িয়ে কারো ঘোড়ার সঙ্গে সাদা ঘুড়ী মিশিয়ে লেলিয়ে দেয় ওরা, ঘুড়ীর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ঘোড়াগুলো, আবার আস্ত রেখেও খায়-ঘুড়ীটাকে বেশ ঝড়ে গোছে ফনফনে রেখে। এ সবের মানে কি হে হামিদ-এ সবের মানে কী আপ বাতাইয়ে মুঝকো-' বঙ্কু বিড়ি জ্বালাল।

হামিদ বললে, 'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন সুতীর্থবাবু?'

'এই মাটির ওপরেই বসে পড়ুন; এ ছাড়া আমাদের আর কোন ফরাস নেই দাদা।' বঙ্কু বিড়িতে টান দিয়ে বললে।

সুতীর্থ বললে তোমার কথার উত্তর আর একদিন দেব বঙ্কু। মোটামুটি তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমরা নিজেদের ভেতরই মন কষাকষি করি-'

'আমরা বলছেন, আমরা কারা? ধর্মঘটীদের কথা বলছি না তো সুতীর্থবাবু।'

'তা বলছ না অবিশ্যি তা আমি জানি, কিন্তু-' অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়ে বঙ্কু বললে, 'আমি বলছি তাদের কথা যাদের ফুসলানিতে আমাদের ধর্মঘট করতে হয়-'

যা রে, তুই বড় ভালো মানুষ হামিদ, তুই জানিস না আমাদের দেশে কতগুলো কালো পাঁটা আর ধলো পাঁটা আছে।'

'হিন্দু পাঁটা আর মুসলিমের নয়াল মুরগির আন্ডা আছে ইয়া ইয়া।'

'লালপাগড়ি লকলক করছে মোরগটার যে ভিজিয়ে তিতিয়ে ডিম পাড়ায়-

'আর সাদা ডিম সকসক করছে মুরগিটা যে ভিজে পুড়ে ডিম পাড়ে-

'হে-হে-হে-'

সুতীর্থ দাঁড়িয়েছিল-পায়চারি করছিল, একটা মরা গাছের গুঁড়ির ওপর বসল এবার। বসেই তার মনে হল ওরা সব মাটিতে বসেছে-এরকম গুঁড়ির ওপর বসা তার ঠিক হবে না, ওরা হয়তো ভাববে এইটুকুর ভেতরেও সুতীর্থবাবু ভেদভেদ করছেন। সে মাটিতে গিয়ে বসল একেবারে অনন্ত আর গোলাম মহম্মদের গা ঘেষে-

সুতীর্থ বললে 'হামিদ, ইয়াসিন, মকবুল, বিপিন শোন তোমরা। বঙ্কু বলতে চায় যে ধর্মঘটের অছিলায় আমাদের মতন বাবুরা নাম কিনি। আশ মিটিয়ে কথা বলবার খবরের কাগজে লিখবার শখ মেটাই। এত সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বজ্জাতি করেও আমাদের তেল মরে না, শখ মেটে না, নিজেদের ভেতর এঁটোর ভাগ নিয়ে কুকুর বেড়ালের লড়াই শুরু করে দিই। ঠিকই তো। বঙ্কু যা বলেছে একেবারে মিথ্যে নয়।'

'একেবারে শব্দটা বাদ দিন সুতীর্থবাবু।' বঙ্কু বলল।

'বলব : মিথ্যে নয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হবে। কিন্তু তুমি যা বলেছ বঙ্কু, একেবারে সত্যও নয়।'

বঙ্কু তার জ্বলন্ত বিড়িটা সুতীর্থকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারবে ঠিক করেছিল। কিন্তু টের পেল হামিদ এবং টের পেয়ে ইশারা করে বঙ্কুকে উত্তেজিত হতে বারণ করছে। কাজেই নিস্তব্ধ হয়ে রক্তাক্ত মুখে বিড়ি টেনে চলল সে।

সুতীর্থ বললে, 'বঙ্কুর বক্তব্য হচ্ছে পোলিটিক্যাল পার্টির লোকরা এসে নিজেদের লাভ লোকসান হিসেব করে একরোখা বোকাদের তাতিয়ে ধর্মঘট বাধায়। ধর্মঘটীরা নিজেদের তাগিদে ধর্মঘট করে না–এই তো?'

কথা শেষ করে বঙ্কুর দিকে তাকাল সুতীর্থ। বঙ্কু বাস্তবিকই এবার বিড়িটা ছুড়ে মারল, কিন্তু ঠিক সুতীর্থকে তাক করে নয়; কিন্তু কোন এক বিশেষ ব্যক্তিকে অসম্মান করতে হলে যেরকমভাবে মারা উচিত তা তার অব্যর্থ হয়েছে–যে যার মুখ চাওয়াচায়ি করে সকলেই সেটা জেনে নিল। ব্যাপার মেনে নিল না অবিশ্যি সকলে।

'নিজেদের তাগিদে আমরা ধর্মঘট করি না, একথা খুসকি খানকিরা বলে–

'হতে পারে আমি খুস–'

কষে একটা গাট্টা মারল অনন্তরাম বঙ্কুর মাথায়। সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল বঙ্কু ঘুরে পড়েছে।

'ওটা কি হল তোমার অনন্ত? এ কি করলে তুমি? তোমরা নিজেদের ভেতরেই যদি এরকম কর–'

বঙ্কু মুখের মাথার ঘাস ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দুপাটি পানসে দাঁতের খানিকটা রক্ত থুতুর পিচকি কাটল, আরো দু-তিনবার পিচকি কেটে বললে, 'আমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক আছে। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে, কোথায় থাকেন আপনি?'

'বালিগঞ্জে।'

'কোন রাস্তায়?'

'লেক রোডে।'

'লেকের পারে আইভরি টাওয়ার সুতীর্থবাবুর–' কে যেন কিছুটা শিক্ষিত সাহিত্য-পড়া ওদের মধ্যের থেকে একজন বললে।

'গজদন্ত মিনারে–লেকের পারে–' সেই বললে আবার।

এসব জিনিস নিয়ে সাহিত্য পত্রিকার প্রবন্ধটবন্ধ লিখেছে হয়তো মানুষটি।

'আমার নিজের বাড়ি নেই, আমি ভাড়াটে।' সুতীর্থ বললে।

'কোন তলায়?'

'দোতলায়।'

'কটা কামরা?'

'তিন-চারটে–'

'তিন-চারটে কামরা বালিগঞ্জের এক পরিবারের জন্যে। এটা খুব নবাবী হচ্ছে তো সুতীর্থবাবু। আমরা তো গোয়ালে আস্তাবলে গ্যারাজে যারা আজি তারা ভালো আছি। গোসলখানায় পায়খানায় আরসোলার মত ফড়ফড় করে উড়ছি যারা নুন-চিনির বদলে আপনাদের ডি ডি টির গুঁড়ি খেয়ে তাদের দেখেছেন কোনদিন আপনি? ভালো আছে তারা, আরসোলারা বেশ আছে। কিন্তু আমাদের বস্তিতে এসে দেখেছেন কি আমরা কেমন আছি?'

'আমি তো এসব সাতসতেরোর ভেতর নতুন এসেছি ভাই, ভালো করে দেখবার শোনবার সময় হয়নি আমার।' সুতীর্থ বললে।

'সময় হয়নি! মধু আর মকরধ্বজ দিয়ে মেড়ে না দিলে এসব লোকের সময় হয় না কোনো কিছু করবার–কথা বেচে নেতাগিরি করা ছাড়া।'

'বস্তির ফোটো দেখলেই সুতীর্থবাবুদের হয়ে যায়।',

'শ্রমিকভার বুবুক দেখেই সুতীর্থবাবুদের–' নিকুঞ্জ শুরু করলে।

'বুবুক নয়, বুবুক নয়–আমাদের কোন বুবুক নেই নিকুঞ্জ–' রতন বললে।

'আমি বলছিলুম'–নিকুঞ্জ একটু গলা খাকড়ে নিয়ে বললে 'আমরা একটা বিষম ভুল করেছি। প্রলিটারিয়েটদের নেতা প্রলিটারিয়েটদের ভেতর থেকেই হওয়া উচিত। বুর্জোয়ারা আসে কেন আমাদের কাপ্তেনী করতে? সুতীর্থবাবু তো বালিগঞ্জের লন্ড্রির ইস্ত্রি করা বুর্জোয়া; বস্তি দেখেননি কোন দিন, শ্রমিকদের চেনেন না, কিষাণদের চেনেন না, আন্দোলনের ইতিহাস জানা নেই, মানুষকেই দেখেননি তিনি এমনই মহামানুষ–' নিকুঞ্জ একটা বিড়ি জ্বালিয়ে হামিদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এইসব পাতিমানুষ কেন ফোঁপরদালালি করতে আসে হে হামিদ?'

হামিদ ঘাড় কাত করে কথা ভাবছিল, বললে, 'প্রাণে সাড়া পেয়েছেন বলেই এসেছেন সুতীর্থবাবু। এসে একদিনে অনেক কাজ করেছেন। পরামর্শের মূল্য আছে সুতীর্থবাবুর, মাথা ঠাণ্ডা আছে : তোমরা যা চাচ্ছ প্রলিটারিটেরা সবি হবে–কিন্তু রাতারাতি হবে না। এই তো এলেন সুতীর্থবাবু। বুর্জোয়া ছিলেন, এখনও আছেন, কিন্তু বোঁটকা গন্ধটা নেই তেমন আর–দুদিন সবুর ভাই সব–ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক হয়ে যাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরসোলা রাতারাতি কাঁচপোকা হয়ে যায় না হামিদ?' বন্ধু বললে, 'তা হতে পারে।'

'কিন্তু তবুও মানুষ হয় না। কি বল? একটু সবুর করতে হবে সুতীর্থবাবুর জন্যে আমাদের?' বন্ধু বললে।

'একটু ভোমরাগাছি করতে হবে।' নিকুঞ্জ বন্ধুর দাবনায় ছোট একটা ঘুষি মেরে হেসে বললে।

মকবুল অনেকক্ষণ ধরে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। কে কি বলছিল না বলছিল সেদিকে কান ছিল না তার; সুতীর্থকে বললে, 'আপনি চলুন–'

'কোথায়?'

'আমার বাড়ি।'

'যাব আমি।'

'আজই যেতে হয়।'

'আজ পারা যাবে না মকবুল।'

'এই এতক্ষণে কি হয়ে আসতে পারতেন না?'

'তোমার বাড়ি তো এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে। সেখানে বাস যায় না। আমার মোটর নেই–'

শুনে কয়েকজনে হো হো হো করে হেসে উঠল।

'আপনার মোটর শালিমার গিয়েছে।'

'সেখান থেকে শালী নিয়ে আসতে।'

'আমার কাছে মবিল অয়েলের টিন আছে সুতীর্থবাবু, তিন গ্যালন, দু-গ্যালন। আপনার মোটর এলেই ভক করে ঢেলে দেব–'

'কিন্তু আসবে কি করে, আপনার গাড়ির স্পেয়ার পার্টি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ভুশণ্ডির মাঠে বানচাল হয়ে পড়ে আছে তাই মোটর-রিষড়ে পেরিয়ে।'

'ভুশণ্ডির মাঠে কি খাচ্ছে মোটর?'

'মানুষ খাচ্ছে গোরু খাচ্ছে; আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে যে পাখিগুলো হেগে যায় তাই দিয়ে পানচুন বানিয়ে খাচ্ছে আর কি।'

একটা হাসির হল্লা পড়ে গেল। সুতীর্থের 'আমার মোটর নেই' সম্প্রতি ভুলে গেল তারা। এক একজনে এক একটা পার্টির নাম ও তাদের চাঁইদের নিয়ে কেচ্ছা খিস্তি শুরু করে দিল। সকলেই অবিশ্যি এ উদ্দীপনায় যোগ দিল না।

কেউ দাঁত দিয়ে কেটে কুটো ছিঁড়ছিল, কেউ বিড়ি টানছিল, মাথা হেঁট করে বা ঘাড় কাত করে অথবা শূন্যের দিকে চেয়ে নিরুত্তর থেকে; কেউ বা হাত গুটিয়ে বসেছিল, সাত চড়ে মুখে কোন রা নেই এমনি মুখ করে; অতি অথর্ব যারা তারা ঝিমুচ্ছিল, অল্পবয়সীদের ভেতরে একরকম কয়েকজন অতি স্থবির ছিল ঃ আবার বুড়োদের মধ্যেও দুশমন গোছের কয়েকজন কেউ কোনদিকে লেলিয়ে দিলেই দুনিয়া ছাতু করে দিতে পারে এমনিভাবে একবার ফ্যাক্টরির দিকে–সুতীর্থের দিকে–নিজেদের পরস্পরের পানে তাকাচ্ছিল কমটম করে। ধর্মঘটীদের সকলেই যে এই দলটার ভেতরে যোগ দিয়েছে তা নয়; অনেকে আসেইনি। বিচ্ছিন্ন হয়ে মাঠের এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে আছে অনেকে।

পরদিনও ধর্মঘটীরা সেই জায়গায়ই সেইরকমভাবে বসে শুয়ে দাঁড়িয়ে ছড়িয়েছিল। সুতীর্থকে দেখে বিশেষ কিছু বললে না কেউ আজ আর। কাল অনেক রাত অব্দি সুতীর্থ ছিল এখানে, আজ হয়তো সারা রাতই থাকবে। সুতীর্থের বিশেষ কাজগুলো (সলা-পরামর্শের চেয়ে ঢের বেশি দামী যেগুলো) হামিদ অনন্ত রামদের সঙ্গেই নিষ্পন্ন হয়, নিকুঞ্জদের সঙ্গে নয়। একই দলে যে দু-তিনটে চিড় থাকবে সেটা সুতীর্থ বা হামিদ কেউই ভালোবাসে না, কিন্তু সম্প্রতি বন্ধুদের না চটালেও একেবারে কোলে টেনে নিয়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কে জানে হামিদ অনন্তরামও হয়তো সুতীর্থকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে অন্যরকম সুর ধরতে পারে–যে কোন মুহূর্তে–আজো হয়তো–কাল পরশু হয়তো।

'আমি যাব তোমাদের বাড়ি মকবুল।' সুতীর্থ বললে।

'আজই?'

'জরুর।'

'শুনে ভবেশ সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'ও পাড়াটা যে সবই তোমাদের মকবুল?'

'তার মানে?'

'মানে ওখানে সবাই তো মুসলমান।'

'কী হল তাতে?'

'মানে দাঙ্গা কিছুদিন হয় থেমে গেছে বটে। কিন্তু তবুও বলা যায় না কিছু। লাগ লাগ করে লাগে যদি আবার–'

'সুতীর্থবাবুকে আমাদের পাড়ায় নিয়ে লাশ গুম করে ফেলবে সেই কথা বলতে চাও তুমি ভবেশ?'

মকবুল বললে, 'বাঁট দেখে বলে দেবে বুঝি কোনটা কোন্ ধর্মের গোরু? হিন্দু গোরুর বাঁট কেটে রেখে দেবে মুসলমানদের এলেকায় গেলে?'

শুনে ভবেশের আগে সুতীর্থ হেসে উঠল ঃ 'গোরুই বটে, গোরুই আমি মকবুল। গোরু ছাড়া কি আর। কিন্তু রাস্তার বড় বড় ভাগলপুরী গাইগুলোকে দেখে কলকাতার আর্দ্ধেক মানুষকেই বকনা বাছুর বলে মনে হয়। আমি নিজে অবিশ্যি কলুর বলদ ছিলুম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ কোন কথা বলছিল না। সুতীর্থের এ সব কথার রস সঠিকভাবে আস্বাদ করবার মত মনোযোগ, মনের মর্জি ছিল না তাদের। এমন কি বক্কুও বিশেষ উৎসাহিত বোধ করল না।

'ধর্মঘট তোমাদের এই দশদিন ধরে চলছে। দিন আনা দিন খাওয়া যাদের বিধান এই দশটা দিনে তাদের যে কি অবস্থা হয়েছে তা তো চোখের সামনেই দেখছি। কিন্তু তবুও কি নিরেট প্রাণশক্তি তোমাদের। তোমাদের সকলেই যে এক পার্টির তা নয়। তোমাদের মধ্যে নানা পার্টির লোকই হয় তো আছে; এমন কেউ কেউ আছে যে কোন পার্টির সঙ্গেই তাদের কোন সম্পর্ক নেই; তারা জানে তবুও ভাত কাপড়ের মনের স্বাধীনতার মর্যাদা—সকলের জন্যেই স্বাধীনতার রুজি রোজগারের সচ্ছলতায় দরকার এটা বেপরোয়াভাবে জানে তারা।'

(বলে ফেলেই সুতীর্থ মনে মনে অপছন্দ করতে লাগল; এই শব্দ, এই ভাষণ, ভাষণের এই রীতি তার মুখে ঠিক খাপ খাচ্ছে না যেন); 'কাজেই কোন বিশেষ নিশানের নিচে দাঁড়িয়ে সকলে মিলে মানুষের মত সকলের হয়ে আকাশের নিচে দাঁড়াতে হবে তোমাদের—অনাথ আর্ত—আহম্মকদের ভিড় যাতে সফল হয়—'

বাধা দিয়ে বক্কু বললে, 'আর বক্তৃতা দেবেন না সুতীর্থবাবু বক্তৃতা আমরা চাই না। ওটা আপনার রোগ হয়ে দাঁড়াল দেখছি।'

শুনে দাঁত কেলিয়ে রইল অনেকে; হাসছে, না কাঁদছে, না টিটকারি দিচ্ছে বুঝতে পারা গেল না। গলা ছেড়ে হাসির শব্দ নেই কোনোদিকে।

'বেল্লিক তুমি বক্কু, ভদ্রলোক বলছেন, শুনতে দিচ্ছ না।'

'আমি কি তোমাকে কানে আঙুল দিয়ে থাকতে বলেছি হামিদ। যা বলছে সুতীর্থবাবু এই যদি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলত, সে মাইক পয়দা করে দিতুম আমি। কিন্তু আমি তো তোমাকে ছ্যাঁদায় তুলো দিয়ে মটকা মেরে পড়ে থাকতে বলিনি হামিদ। শোন যা বলছেন। কই বলছেন না তো কিছু আর আমাদের ভাগ্যিদাদা। বারোটা তেরোটা বেজে গেল বুঝি। দাও তো হে দেশলাইটা সিপতি।'

'আমার ভুল হয়ে গেছে বক্কু কথা বলতে গেলে এক সের লোহায় এক মণ হয়ে গুলিয়ে যায় সব।' সুতীর্থ বললে।

'হ্যাঁ, মনে হয় যেন মুখটা লাউডস্পীকার, কথাটাও ভাড়া খাচ্ছে। কে খাওয়াচ্ছে ভাড়া?' মকবুল বললে।

ঘনশ্যাম বললে, 'বড় রাম খাওয়াচ্ছে পাতিরামকে। চলবে না ও সব ছেঁদো বাকচাল সুতীর্থবাবু। কাজ কি করেছেন তার হিসেব দিন। আপনি তো সব পোলিটিক্যাল পার্টি ভেঙে ঝাণ্ডা গুটিয়ে মানুষের মত একঠায়ে আমাদের দাঁড় করাতে চান। কিন্তু কে দাঁড় করাবে শুনি? যে হড়বড় কথা বলে যাবে সে? এ ক'দিন কথা আর কথা আর কথা বলা ছাড়া কি জোটালেন আমাদের জন্যে? আমি আই এস-সি পাস করে যাদবপুরে কিছুদিন পড়েছিলুম, আজ এখানে মিস্ত্রি, আমাদের ভেতর কেউ কংগ্রেসের, কেউ সোস্যালিস্ট, কেউ কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, ডিমোক্রাট, রেভল্যুশনারি, রিপাবলিকান—কিন্তু আজকের এই ধর্মঘটে আমাদের সকলের সব আলাদা আলাদা পোলিটিক্স মিলেমিশে এক ভোগান্তি ইকনমিকস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিক দিয়ে কি করতে পারেন অবিলম্বে সেই চেষ্টা করুন। আছে কতকগুলো চ্যাংড়া—মজুরের গায়ের গন্ধ শুঁকবে আর জিভ চুকচুক করবে—অমানুষ যে মানুষকে শোষণ করছে, সাম্রাজ্যবাদ—যে বড় বালাই, দুনিয়ার সর্বহারাদের গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠতে হবে—শালা ওলাউঠো যত সব—আপনারা কি কেবল মুখ নাড়বেন, কাজ করবেন না?'

'এ মুখ নাড়ার চেয়ে মেয়েদের নথনাড়াও ভালো। তাতে ঢের পাকা কাজ হাঁসিল হয়।' অনন্তরাম বললে।

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমিও তো ওই মিটিংই করলে ঘনশ্যাম।' বক্কু বললে, 'কি পথ বাতলালে তুমি নিজে? কথা ছাড়া আছে কিছু ট্যাকে?'

'আছে বইকি। দেখবি চ। গয়ানাথ মালোর কি হল বল তো দেখি—'

শুনে অনেকে একসঙ্গে ঘনশ্যামকে ছেঁকে ধরল।

'কী হল বল তো—গয়ানাথ কোথায়?'

'গয়ানাথ খুন হয়ে গেছে।'

'খুন হয়ে গেছে! কোথায়?'

'লাস পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পাওয়া যাচ্ছে না? লাসটা অব্দি পাওয়া যাচ্ছে না।'

যারা উঠে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বসে পড়ল আবার।

'কে খুন করল?'

'পুলিশ কোন কিনারা করতে পারছে না।'

'তা তো পারবেই না।'

'কে খুব করল?'

'সে জানে চৌধুরীসাহেব আর তার শ্বশুর। আলবৎ জানে।'

'কে খুন করল! কে খুন করল!!' অনেকগুলো গলা দশ আনি উত্তেজিত ছ' আনি উৎকণ্ঠিত, নাকি ছ' আনি উৎসুকিত দশ আনি উদ্দীপ্তি—ছ' আনি চার আনি ব্যথিত হয়ে উঠল,—মনে হল সুতীর্থের।

সুতীর্থ জিজ্ঞেস করল, 'গয়ানাথ কি করেছিল যে খুন হল?'

'সে আমাদের সর্দার ছিল তাই।'

'মোটরে জীপে চড়ে সব পার্টির লোক আসে, ফিরিস্তি গেয়ে জীপে করে ফিরে যায় আবার। না, না, গয়ানাথ ও-সব ভজভজে বাঁজা আঁটকুড়ের বাচ্চাদের মত নেতা ছিল না। মুখে খই ফুটত না, সে গাঁইতি নিয়ে কাজ করত।'

'গাঁইতি?' জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওটা হল রূপক ঃ কাস্তে হাতুড়ি গাঁইতি। কাস্তে হাতুড়ির তো দশ মাস চলছে, একটু কষ্ট হচ্ছে। এবার গাঁইতি একটু কাজ চালিয়ে দিক–গাঁইতি, তুরপুন, করাত, কুড়ুল। গয়ানাথ মালোর মত লোক যদি কর্তাদের নেকনজরে না পড়ে তা হলে পড়বে কে। আচ্ছা, আমরাও দেখে নেব!'

'তোমরা বড় তড়পাচ্ছ হে ঘনশ্যাম–' সুতীর্থ বললে।

'আমরা গুম হয়ে যাচ্ছি–আর ওরা এর ওর মা-বোন নিয়ে স্ট্রিমলাইন হাঁকাচ্ছে। ওদের ধান খেয়ে ওদের পাঁশগাদার হোঁৎকা মুর্গির মত কথা বলবেন না সুতীর্থবাবু।'

'ছোলা মুর্গি হয়ে পড়ে থাকব আমি ঘনশ্যাম, ওদের ধান খেয়ে কথা বলি যদি।'

'বেশ মানলুম। এখন গয়ানাথের একটা কিনারা করুন। কর্তাদেরও জানান দিন যে ফ্যাক্টরি কুঁকড়ে চামকিচের ছা হয়ে যাবে, তবু একজন ধর্ম–ঘটীকেও বাগে পাবে না তারা যদি আমাদের পঁচিশ দফা দাবি অক্ষরে অক্ষরে মেনে না নেয়।'

ঘনশ্যাম বললে, 'এটাও জানিয়ে দেবেন যে সব দল একজোট হয়েছে। ভাঙানি চলবে না। মরিয়া হয়ে চালাতে চাচ্ছে। কিন্তু কি হচ্ছে চোখের সামনে দেখছেন তো।'

'না ভাঙাচি-টাঙাচি চলবে না', সুতীর্থ বললে, 'আজকাল ধর্মঘটের জোর বাড়ছে। মানুষকে মানুষ বলে মনে করে প্রায় সকলেই। কাজে তার প্রমাণ দিতে না গেলেও একটা ট্যাকটেকে চক্ষুলজ্জার খাতিরে ভাঙানি দিতে সকলেই দ্বিধা বোধ করে। কিন্তু তবুও তোমাদের সত্যাগ্রহ চলতে থাকুক।'

'তা চলবে। কিন্তু পুলিশ তো সত্যাগ্রহী নয়। ধর্মঘটীরা জেলে যাচ্ছে, মার খাচ্ছে।'

'আজ কি পুলিশ আসবে?'

'আসবে বই কি।'

'কখন?'

'এক আধ ঘণ্টার ভেতরেই।'

'আচ্ছা বেশ, ধর্না দেব সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে। মার খাব, কিন্তু এখুনি জেলে যেতে রাজী নই–'

'কেন?'

'তা হলে গয়ানাথের ব্যাপারে গিঁট খসানো শক্ত হবে।'

'সুতোগুলো জড়িয়ে জড়িবড়ি পাকিয়ে গেছে বুঝি সুতীর্থবাবু? কত বড় ন'টাই বেবাক সুতো লাট খেয়ে গেল? গিঁট খসাবেন তো? গিঁট খসাবেন সুতীর্থবাবু হ্যাঁ হে করালীচরণ–'

'হ্যাঁ হ্যাঁ খসাবেন।'

'তা খসাবেন, তার আর কি–'

'সুতীর্থ বললে, 'কর্তাদের সঙ্গে দাবি-দাওয়া সুপারিশের ব্যাপারটা তোমরা কি খুব ভালো করে চালাতে পারবে? যদি পার তা হলে বল আমি কয়েকদিন জেলে দাড়ি গজিয়ে আসি–এখানে ফিরে এসে ঘাট কামাবার আগে।' সুতীর্থ তার গালের পাঁচ-সাত দিনো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সকলের দিকে তাকাচ্ছিল।

'আর আমাদের ঘর আর বার–আমাদের জল আর জেল; এ সব একঠাঁই হয়ে গেছে আমাদের–' খুব একটা কালো নিশ্বাস ফেলে পীতাম্বর বললে।

'হাঁড়িতে ভাত নেই বলে ঘরে গিয়ে দেখব পরিবার মুখ হাঁড়ি করে বসে আছে, তার ফাঁড়ি যাওয়াই ভালো। আমরাই যাই–পেটে কিছু চামচিকের দানা পড়বে তো ফাঁড়িতে গেলে–' একবার মুখ তুলে আবার তিন-চার ঘণ্টার জন্যে মুখ বুজে রইল খোসাল দত্ত।

'আপনি সুতীর্থবাবু চালু হয়ে যান।' অন্তরাম বললে, 'যা করবার করুন। হয় আমাদের সঙ্গে মিশে বেধড়ক মার খেতে শিখুন–জেলে চলুন। না হয় অ্যাডজুডিকেশন বোর্ডকে শায়েস্তা করে দিয়ে জেনে আসুন গলায়নাথকে কে মারর আর আমাদের পঁচিশ দফা অক্ষরে অক্ষরে দু-হপ্তার মধ্যে মেটানোর কদ্দূর কি হচ্ছে, কি হবে।'

বাইশ

সুতীর্থ ধর্মঘটীদের সঙ্গে মিশে সত্যাগ্রহ শুরু করে দিল। শীতের অপরাহ্নের রোদের তেজ কমে যাচ্ছিল ক্রমেই। এই পিঠে রোদে মুখ–পিঠ পুড়িয়ে ধুলোয় ঘাসে চিত কাত উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে মন্দ লাগছিল না। একেই কি বলে ধর্মঘটের তাড়সে ধর্না দেওয়া। কিন্তু পিকেটিঙের এ তো কলির সন্ধ্যে সবে। তা ছাড়া সে আইবুড়ো মানুষ, শরীরও শক্ত আছে তার, মনেও বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা নেই, বড় একটা দায়িত্ব নেই এক-রক্ত-দাবি করা কোনো গলগ্রহীদের কাছে।

'কি গো, হামিদ, শুয়ে বসে লাভ কি যদি ওরা না আসে?'

'ওরা কি আজ আসবে?'

'ওরা কারা? পুলিশ?'

'না। যারা তোমাদের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে ফ্যাক্টরিতে কাজ করবে–'

'আজ আর আসবে না।'

'কাল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সে সব বলা যায় না কিছু। তবে এখন থেকে ক্রমে ক্রমে কিছু আসবে। ক্রমেই ওরা দলে ভারি হবে।'

'কারা? যে সব কামিন স্ট্রাইক ভেঙে দিতে চায়?'

'হ্যাঁ, এই দশ দিন হয়ে গেল, অনেকেরই শিরদাঁড়া বেঁকে পড়ছে।'

'তোমরা শুয়ে থাকলে তোমাদের গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে ওরা; তোমাদের সত্যাগ্রহ ওরা মানবে না; ওরা আর স্ট্রাইক করবে না—কাজে যাবে—তোমাদের বুকের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে যাবে। ওদের চোখ মুখ হাত ঠ্যাং তো মাকড়সার মত হয়ে পড়ছে ইয়াসিন; মাকড় যাবে মাকড়সার জালের ওপর দিয়ে ধেই ধেই করে নেচে।'

'আমরা হলাম মাকড়ার জাল?'

'মাকড়ার জাল ছাড়া আর কি আমরা? মানুষ তো নয়—মানুষের পিত্তি। শরীরের পিত্তি কফ বায়ু ঠিকরে যে আঁশ বেরিয়ে আসে তার ফ্যাকড়া তুমি আমি অনন্তরাম, ঘনশ্যাম—'

'আর ওরা হল মাকড়সা?'

'মাকড়সা। ওদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আমাদের। ওদের পেটের থেকে সূতোর মত বেরিয়ে এইছি—' হ্যাচ হ্যাচ করে হাসতে লাগল কালু ওস্তাগর। হেসে মজা পেয়ে একসময় এমনই গয়ের খালাস করতে লাগল যে তার চারদিকটা মাছি নোংরামীতে ঘিনঘিন করতে লাগল।

'সূতোর লালায় লেপটে রইছি ডিম কি বলিস ভূপাল—'

'তাই তো বংছ বিদ্ধি হল ওদের; তুই ঘুমোচ্ছিছ ইয়াসিন?'

'আরে না—'

'মকবুল কোথায় গেল?'

'ও চলে গেছে?'

'সুতীর্থবাবু কোথায়?'

'ওই যে মড়া গুঁড়িটা ঠেস দিয়ে শুয়ে আছে—'

'ও থাকবে তো?'

'কি জানি, ওর ঢং আছে; ঢঙের মানুষ। কখনো এখানে এসে বসে—কখনো ওখানে গিয়ে শোয়। আকাশ পাতাল ভাবে। ঐ একরকম। ঐ যে আসছে।'

'মকবুল কোথায় গেল ইয়াসিন? সুতীর্থ এসে জিজ্ঞেস করল।'

'ও চলে গেছে।'

'যাবার সময় আমাকে জানিয়ে গেল না?' সুতীর্থ ইয়াসিনের দুটো ছড়ানো ঠ্যাঙের ফাঁকের ভেতরেই এসে যেন বসল। দেখে ইয়াসিন মাথাটা ওপরের দিকে চাড় দিয়ে ঠেলে ঠ্যাং গুটোতে গুটোতে বললে, 'কী আর জানাবে?'

'আমায় নাকি ফতিমা ডেকেছিল?'

'কী আর হবে ঃ আপনি তো পিকেটিং করছেন।'

'তা বটে, কিন্তু মকবুল আফশোস করছিল। ও ভেবেছে আমি ওদের সঙ্গে ফ্যানভাত খেতে নারাজ।'

'ওতে কিছু হয় না দাদা। ও কিছু মনে করেনি। ভাত খেতে নারাজ মানে? ভাত কোথায় পাবে যে আপনি গিয়ে খাবেন?'

'আমাদের কারুর-ঘরেই ভাত নেই।' বিশ্বম্ভর বললে।

'ফ্যান আছে, নুন আছে।।' বললে নেপাল।

'কিন্তু কদিন থাকবে আর? কিন্তু তাই বলে লুকিয়ে চৌধুরীসাহেবদের খিড়কী দিয়ে ঢুকে কবুল করতে যাবে না বিনোদ সরখেলের মত কেউ।'

'আর বিনদে সরখেল; ওর পরিবার হাঁচি দিলে ও তো কাপড় নোংরা করে ফেলে—' বললে অনন্তরাম।

শুনে হাসল কেউ কেউ; হাসি মুখে ফুটে উঠতে না উঠতেই মিশিয়ে গেল—শুকিয়ে গেল। বিড়ি যে নেই তা নয়, কারুর কারুর ট্যাঁকে কিছু কিছু আছে, কিন্তু দেশলাই-এরই বড্ড অভাব। একটা মাত্র দেশলাই হাতে হাতে ঘুরে ফিরছিল। দু-চারটে কাঠি বাকি আছে তার। ফুরিয়ে গেলে দেশলাই পাওয়ার জো নেই—এ মুল্লুকে—খাস কলকাতায়ও সহসা কোনো দোকানে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু দেশলাই আনবার জন্যে কলকাতায় যাবে কে? বাস-ট্রাম আর একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে। এ তল্লাট থেকে ট্রাম বাস ধরতে হলেও বেশ খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। ফ্যাক্টরির ভেতর অবিশ্যি আগুনের অভাব নেই—আছে অঢেল দেশলাইও। কিন্তু কোনো মানেই হয় না। তবুও বিড়ি জ্বলে উঠলো অনেকের।

'আর চারটে কাঠি আছে কিন্তু রসুল।'

'মাত্র চারটে। এই নিয়ে সারা রাত কাটাতে হবে। আর কারুর কাছে মাচিস আছে নাকি ধর্মঘটীরা—' হামিদ কলকী বাজিয়ে হুঙ্কার দিয়ে শুধোল।

'আছে আমার কাছে—' অনেক দূর থেকে জানান ছিল বিশ্বম্ভর।

একটা মরা গুঁড়ির আড়ালে বসে পেচ্ছাপ করছিল সে। কিন্তু ভালো মানুষ, জল খালাস করবার অবস্থাতেই হামিদের ডাকের জবাব না দিয়ে পারল না।

সুতীর্থ মিহি সুরে ভাবছিল ঃ বিশ্বম্ভরের কাছে থাকবে না? ও তো বিশ্বকেই ভরে রেখেছে। সুতীর্থ অবাক হয়ে ভাবছিল ঃ এ কি ভাবছি আমি, এ কি বোকার মত কথা ভাবছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খুব মাটির মানুষ বিশ্বম্ভর। কালো-রোগা-ঢ্যাঙাখোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি সব সময়েই গাল জুড়ে থাকে। আট দশটি ছেলেপুলের বাপ-স্ত্রী আবার পোয়াতি। পরিবারসুদ্ধ সকলেই ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। এত কাচ্চাবাচ্চার মালিকানা অবিশ্যি বিশ্বম্ভরের-কিন্তু এদের সকলেরই জন্ম দেওয়ার দায়িত্ব যে তার একার নয় সেটা সকলেই প্রায় জানে। জানুক, তাতে বিশ্বম্ভরের এসে যায় না কিছু। সে তার স্ত্রীকে অবিশ্বাস করে না; সে জানে, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে তার শোয়াবসা-রোজ রাতের; ছেলেপুলে অপরের হতে যাবে কি করে? অনেকে তার স্ত্রীকে রাঁড়ি বলে খোঁটা দেয়-বিশ্বম্ভরের মুখের ওপর রাঁড়ি আর ফড়ে বলে জেরবার করে দেয় তাদের দু'জনকে। দিকগে, তাতে স্ত্রীর ওপর আসক্তি তার বেড়েছে বই কমেনি; এই তো এই মাঘ ফাল্গুনেই বিশ্বম্ভরের স্ত্রীর হয়ে যাবে একটা কিছু। সুতীর্থ জানে এই সব। তাকিয়ে দেখল বিশ্বম্ভর পেল্লাপ করে ফিরে আসছে।

'আমার কাছে দেশলাই আছে হামিদ-' হেঁটে আসতে আসতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছিল বিশ্বম্ভর।

'আহা, এই সব বেচারী মানুষের ভিড়। কি অবিস্মরণীয় এদের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের ভেতর প্রাণপাত; পাড়াগাঁর বিশ্রী বিদঘুটে বর্ষায় খালুয়ের ভেতর ল্যাটামাছের মতন। কোনো সূর্য নেই, নক্ষত্র নেই।' সুতীর্থের মনে হল।

'ক'টা দেশলাই আছে বিশ্বম্ভর?'

'একটা শুধু।'

'ক'টা কাঠি হবে?'

'গুণে দেখতে হয়-'

বিশ্বম্ভর কাঠিগুলো বাঁহাতের চাটির ওপর ঝেড়ে নিয়ে এক এক করে গুনছিল।

'আরে দূর দূর! আন্দাজে বলতে পার না? রেখে দাও-রেখে দাও বাক্সর ভেতর-হিমে মিইয়ে যাবে বিশ্বম্ভর-' চীৎকার করে উঠল অনন্তরাম।

'এই গোটা পঁচিশেক কাঠি হবে হামিদ-' হেসে মাড়ি বের করে বললে বিশ্বম্ভর।

'আচ্ছা বেশ, চটপট ভরে ফেল সব। নাও, এখন দাও বাক্সটা আমাকে।' বললে অনন্তরাম।

'তোমাকে দেব অনন্তরাম?' হামিদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে কি নির্দেশ আসে না আসে, কি করবে না করবে-এ জীবনে কেঁচোমাটি ওগরানো ছাড়ানো ছাড়া আর কিছুই যেন করা যায় না-এমনিভাবে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বম্ভর।

'দিয়ে দাও অনন্তরামকে।' ফতোয়া এল হামিদের।

'চট করে দিয়ে দাও অনন্তরামকে, না হলে তুমি লগ্‌গি করেই মাচিসের জান খেয়ে নেবে-' বঙ্কু বললে।

'আর কার কাছে মাচিস আছে?' হাঁক দিল হামিদ।

আর কারুর কাছে নেই।

সুতীর্থ বললে, 'এ জানলে আমিই তো কলকাতার থেকে আসবার সময় দু'ডজন নিয়ে আসতে পারতুম।'

'ঠিক আছে সুতীর্থবাবু।' ইয়াসিন বললে, 'বিলকুল।'

'সুতীর্থ বললে, 'তোমরা কি সারা রাত এখানে থাকবে হামিদ?'

'হ্যাঁ।'

'এই খোলা মাঠে?'

'থাকব।'

'সারা রাত থাকবার কি দরকার?

'দরকার নেই অবিশ্যি, আমরা একটু বাড়াবাড়িই করছি। তবে ফ্যাক্টরির কাজ তো সারারাত চলে। নাইট শিফটে কাজ করবার জন্যে আমাদেরই কেউ কেউ হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে ঝুলে পড়ব কিনা আন্দাজ করে নেবার জন্যেই সারারাত থাকা দরকার। আমরাই আমাদের নজরবন্দী করে রাখছি।'

'ওঃ-' সুতীর্থ বললে। পকেটের থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে হামিদের দিকে ছুঁড়ে মেরে বললে, 'বিলিয়ে দাও হামিদ।'

'আপনি চলে যেতে পারেন সুতীর্থবাবু।'

'না। আমি থাকব।'

'পুলিশ আজ রাতে আসবে না আর।'

'তা আসবে না হয়তো।'

'আপনি কেন আমাদের খাতায় নাম লেখালেন সুতীর্থবাবু? আপনি তো কুলিকামিন নন-মিস্ত্রি প্লাম্বার নন-'

'আমি খেয়ালী মানুষও নই। অবিশ্যি আমি নাম লেখাইনি। নাম লিখিয়েছে বিশ্বম্ভর, লিখিয়েছ তোমরা সকলেই। আমার আজকাল হাতে খড়ি।'

ঘনশ্যাম (আই এস-সি পাস, যাবদপুরেও কিছুদিন পড়েছে) বললে, এটা সুতীর্থবাবুর তা দেবার সময়। সেটা ভালো কথা। কিন্তু আপনি তো আমাদের মেসো-পিসে চাচা ফুপো নন, আপনি আমাদের নিজের বীটের লোক আমাদের এখানে বক্তৃতা করতে আসেন বক্তৃতা ফলাও হলে বক্তারা চলে যায়, কিন্তু আপনি এখানে থেকে যান মশাই। কেন থাকেন? আমাদের টানে নয়, নামডাকের জন্যেও নয়, আপনি এখানে থাকলেই স্ট্রাইকটা উতরে যাবে সে ভরসায়ও নয়। এখানে খুব ভালো লাগে না আপনার ঃ কেন মিছিমিছি মার খাচ্ছেন নিজের মনের কাছে? কেন ঘুরছেন? কেন ত্রিশঙ্কুর মতন কড়িকাঠের সঙ্গে হাওয়ায় দুলছেন-'

কেউ কোন কথা বললে না। কিন্তু সুতীর্থকে তারা হামিদ আত্তরাম ঘনশ্যাম ইয়াসিনের মাথার ওপরে পাণ্ডা মনে করে নিতে কেউই রাজি ছিল না কিছুতেই। ত্রিশঙ্কুর মানে এরা কেউ কেউ জানে, অনেকেই জানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা ভাবছিল ঃ ত্রিশঙ্কু তো বটেই, এ লোকটা স্পাইও হতে পারে। এ মানুষ স্পাই নয় হয়তো, কিন্তু ঘোড়েলও নয়। একজন বদমাশ শাঁসালো লোকের দরকার আমাদের—এ সব গান্ধীগিরি দিয়ে আমাদের হবে না কিছু।

সুতীর্থ অবিশ্যি গান্ধীধর্মী নয়—বিশেষ কোন বাঁধা ছক নেই তার, কেবলি জীবনটাকে বুঝে দেখতে চায় সে সুতীর্থ এ ধর্মঘটীরা তারই একটা উপলক্ষ্যে, দার্শনিকতায় বিস্তৃতর হয়ে উঠলে বস্তুপুঞ্জের এসব অস্পষ্ট বিমূঢ়তাকে যে পায়ে পিষে চলে যাবে সে—হামিদ প্রভৃতি সামান্য মানুষও যেন সুতীর্থের এই চালাকি ধরে ফেলেছে। এই বিরূপ বিমুখ ভিড়ের সামনে বসে—তবুও বসে থাকতে হবে তাকে, বসে থাকতে হবে, শুয়ে থাকতে হবে, মটকা মেরে পড়ে থাকতে হবে, জেগে উঠতে হবে, মরে যেতে হবে। এ না-হলে একজন হতে পারবে না সে। হামিদ অনন্তরামরা 'হতে পারত' চেষ্টা করছে না, তারা 'হচ্ছে', সুতীর্থের মত সংকল্প করে তারা আবর্তের ভেতর এসে পড়ছে না, ছোট থেকে বড় হোক, অসার হোক নিষ্ফল হোক, সময় যেখানে তাদের এনে দাঁড় করিয়েছে সেখানে আজকের এই ধর্মঘটের (কালকের বৃহত্তর বিপ্লবের) সব চেয়ে স্বাভাবিক নায়ক তারা; সমাজের সময়ের যে স্তরে যেরকম-ভাবে লালিত হয়েছে সুতীর্থ তাতে ওরকম নিদারুণ স্বাভাবিকতার তাগিদ নেই তার ঃ আজকের এই ক্ষুদ্র আলোড়ন কিংবা কালকের বড়—বেশি বড় সব রক্ত বিপ্লবের সূচনা ও পরিণতি সম্পর্কে ঃ সে রকম বিপ্লবের সম্পূর্ণ প্রয়োজন অনুভব করছে না সে, সে রক্তোৎসবের সহজ দৈন্য হয়ে দাঁড়াবার মত বিশেষ কোন প্রেরণা নেই তার, তার বুদ্ধি ও জিনিস সমর্থন করে না। অবিশ্যি বুদ্ধি প্রেরণা সমবেদনা সংকল্প সবই তার, যারা বিপ্লব না ঘটিয়ে পারছে না তাদের জন্যে—মনে মনে; একটা দার্শনিক প্রস্থানে দাঁড়িয়ে। কিন্তু স্থূলে বিপ্লব না ঘটিয়েও মানুষের ভালো হতে পারে; জনসাধারণ হয়ে উঠতে পারে সত্যই সফল মহাসাধারণ; বিপ্লবটা শান্তিতে শান্তভাবে পরিচালিত হতে পারে, পরে নাকি? সে রকম হলেই বুদ্ধি স্বপ্ন সংকল্পের একটা স্বাভাবিক ভূমিকা মিলত সুতীর্থের, নিতান্তই দর্শন প্রস্থানের একটু বেসামাজিক উচ্চভূমি থেকে নেমে শান্ত অথচ অনবনমনীয় সমাজবিপ্লবের স্বাভাবিক কাজে সোজাসুজি হাত দিতে পারত সে; কবি নয় দার্শনিক নয় শুধু আর—অক্লান্ত অপরিমেয় কর্মী হয়ে উঠতে পারত সে।

কিন্তু আজকের অব্যবস্থার মানুষ—সব মানুষই শুভার্থী মানুষেরাও এখনও খুব স্থূল, ভালো কাজ করতে গিয়েও রিরংসা খুযু স্বাভাবিক, কল্যাণের জানালা খুলতে গিয়ে জননীকে নিরবচ্ছিন্ন হত্যা করা শোকাবহ বা অপ্রাকৃত মনে হয় না কিছু, সোজা চোরকাঁটা বেছে ফেলবার কাজ যেন ঃ আজকের পৃথিবীর ইচ্ছা ও কর্মের মর্মার্থ তো এই। ইচ্ছা ও কর্মকে লালিত করা নয়, এ পৃথিবীতে চিন্তা ও অনুধ্যান ছাড়া বিশেষ কিছু সে করতে পারবে বলে মনে হয় না। কাজ করতে পারে সে—কিন্তু আরো একশো দেড়শো সুতীর্থকে সঙ্গে নিয়ে, ঘনশ্যাম, বঙ্কু অনন্তরামদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নয়। ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েও কাজ করবার চেষ্টা করতে পারে সে—যেমন করছে; কিন্তু এ পরিবেশের আশ্চর্য দুর্বোধ্যতা ও প্রতিকূলতার জন্যে নিজের সবচেয়ে উত্তম জিনিসগুলো দান করা সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে। যে তথ্যকে সে সত্য বলে স্বীকার করে না, যে অনুমানকে ভুল বলে জানে, যে প্রণালীকে সমর্থন করে না—মনকে চোখ ঠার দিয়ে আজকের কালকের আরো পরের ভবিষ্যতের একটা অস্পষ্ট কল্যাণের, প্রত্যাশায় সেই অস্বীকার্য অপমানবীয় জিনিসগুলো গ্রহণ করেছে সে। এ ছাড়া এ যুগে সকলের সঙ্গে মিলে কাজ করবার উপায় নেই—উপায় নেই আর; কাজ করা ছাড়া পথও নেই এ যুগে; নিজের সত্তা যুক্তিতর্কের চিন্তা অনুশীলনের প্রভাবে অপরদের যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ করে নেবার চেষ্টা করে (ব্যর্থ সে চেষ্টা) নিদারুণ অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার বলয়ের ভেতর কাজ করা ছাড়া উপায় নেই—উপায় নেই এ যুগে।

তেইশ

এর পর সুতীর্থের চিন্তার মোড় ঘুরে গেল ঃ চিন্তা রইল না আর কেমন নিদ্রালু ভাবালু হয়ে পড়ল সে ঃ ওদের একজন হয়ে পড়ার ভেতর বিশেষ কোন মানে নেই। কি হবে অনন্তরাম হামিদ ঘনশ্যামের মতন হয়ে? মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গীন ব্যবহার ও লক্ষের কাছে এরা ও এদের এই প্রাণান্তকর ধর্মঘটের সার্থকতা নিতান্তই স্থূল—ম্যাড়মেড়ে। কিন্তু তবুও নানারকম আঘাটার ভেতর দিয়ে চলতে হয় মানুষকে দৃষ্টি শুদ্ধ করে নেবার জন্যে, জীবন ঠিক করে তৈরি করে নেবার জন্যে। এই দার্শনিক সত্যের জন্যেও—কিন্তু তার চেয়ে বেশি ব্যক্তির কল্যাণের চেয়ে অর্থনৈতিক কল্যাণস্থাপনার কেমন যেন একটা অব্যয় উত্তেজনায় এই ধর্মঘট নিয়ে পড়েছে সে। প্রাণকল্যাণের সমুদ্র রচনা করতে গিয়ে এখানকার এই ছোট্ট সংগ্রামটুকু তো এক ঝিনুক জল; ঝিনুকটাকে স্বাতীর শিশিরের মত সেই জলে ভরে ফেলতে হবে। সৃষ্টির বড় সময়ের পারে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর ছোট সময়ের দিকে তাকালে পৃথিবীর বেড় সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিককার প্রাদেশিক ছোট সময়ের ছিটোফোঁটার দিকে চাইলে, ওদের ভেতর একজন হয়ে পড়ার কোন মানে নেই ঃ কি হবে হামিদ ঘনশ্যাম ইয়াসিন অনন্তরামের মত হয়ে?

কিন্তু তবুও এখানকার এই এক ঝিনুক প্রাণপ্রবাহী জল সংরক্ষণ উৎসারণ করা দরকার প্রাণকল্যাণের সমুদ্র সৃষ্টি করতে গিয়ে। দরকার? এইসব এক কড়ির ছাঁদার ভেতর থেকে সমুদ্রে বেরুবে বুঝি?

'আপনি শুয়ে পড়লেন সুতীর্থবাবু?' হামিদ বললে।

'একেবারে চিত হয়ে মাটির ওপরে যে, একটা চাটাই এনে দিই—'

বঙ্কু বললে।

'তোমার তো সর্দি হয়েছে বঙ্কু—'সুতীর্থ অন্ধকারের ভেতর চোখ বুজে থেকে বললে, 'গলা ভারি হয়েছে তোমার। নাক ফোঁসফোঁস করছে। ক'রাত জাগলে?'

বঙ্কু কোনো কথা না বলে উঠে চলে গেল। সত্যিই সর্দিতে ঠাণ্ডায় সে বড় কাবু হয়ে পড়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঘুমিয়ে পড়লেন সুতীর্থবাবু।'

'আকাশের তারা দেখছি।'

'যদি ঘুমিয়ে পড়েন হোথা ঐ ক্যাম্পে রেখে আসব আপনাকে পাঁজাকোলা করে—'

'ওটা কাদের ক্যাম্প?'

'আমাদেরই; ধর্মঘটীদের।'

'না। এইখানেই থাকব আমি।'

'নিমুনিয়া হবে—ঠাণ্ডা লেগে—শিশিরে শুয়ে—

'সমুদ্রে যার শয্যা, তার আবার শিশিরে ভয়,' দূরের থেকে বললে বঙ্কু। চুপচাপ পড়েছিল। সকলেই—রাত আর একটু থমথমে হলে একজন দু'জন করে উঠে চলে যেতে লাগল, কে কোনদিকে যায় অনন্তরাম আর হামিদ কড়া নড়রে পাহারা দিয়ে দেখছিল।

সুতীর্থ ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আধঘণ্টা পরে দূরে টর্চলাইট দেখা গেল।

'হ্যাঁ পুলিশই আসছে হামিদ', অনন্ত বললে।

'ঘনশ্যাম কোথায়?' হামিদ জিজ্ঞেস করল।

'দেখছি না তো। এই বঙ্কু। বঙ্কু!'

'অত জোরে ডাকিসনেরে অনন্ত।'

'আমরা কি লম্বা দেব নাকি হামিদ?'

হামিদ মাথা নেড়ে বললে, 'গ্যাঁট হয়ে বসে থাক যে যার জায়গায় আছিস।'

'তারপর?'

'পেটালে পড়ে পড়ে মার খাবি; গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলে যাবি সঙ্গে চলে, কাঁদুনে গ্যাস যদি ছাড়ে তবে কাঁদবি—'

'আর গুলি করে যদি—'

'তাহলে পিস্তুত থাকবি—'

'পিস্তুত?'

'স্ট্রেচার আছে, হাসপাতাল আছে, মরলে আধপোড়া হয়ে গঙ্গা পাবি তো;—মোচলমানকে মাটি দেওয়া হবে; এ সবের জন্যে ভাবনা করিসনে। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।'

কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ গ্যাস—গুলির ধার দিয়েও গেল না। হেসে খেলে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল শুধু, সুতীর্থকেও।

বাকি সবাইকে পুলিশের হেপাজতে চালান দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুখার্জি সুতীর্থকে নিয়ে ফ্যাক্টরির তেতলায় তার খাস কামরায় গিয়ে উঠল।

'আসুন, বসুন, আপনিই তো সুতীর্থবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি তো কমার্শ্যাল ফার্মে কাজ করেন?'

'কাজ করতুম—'

'আপনার চাকরি তো বহাল আছে—'

'আমি ছেড়ে দিয়েছি—'

'নিজে ইচ্ছে করে ছেড়ে দিলে আমি নাচার। কিন্তু আজো ফোনে মল্লিক আপনার কথা বলছিলেন—'

'কি বলেছিলেন জিজ্ঞেস করতে গেল না সুতীর্থ। কোন ঔৎসুক্য ছিল না তার।

'আপনি অফিস অ্যাটেন্ড করলেই পুরো মাইনেতে আপনাকে এ কদিনের ছুটি দিতে রাজি। মল্লিক বললেন। আসুন—'

সিগারেটের টিনের ঢাকনি খুলে সুতীর্থের দিকে এগিয়ে দিয়ে মুখার্জি বললেন—'আসুন, নিন, আপনিই বেঙ্গল সাপ্লাই কর্পোরেশনের সুতীর্থবাবু। সাপ্লাই কর্পোরেশনের সঙ্গে আমাদের এই ফ্যাক্টরির কি সম্পর্ক সুতীর্থবাবু?'

'আমি তা জানব কি করে বলুন।'

'ওটা হল কলকাতার এক প্রান্তে, এটা হল আর এক কিনারে। প্রায় মাইল দশেকের ব্যবধান দুটোর মধ্যে। আপনি হলেন সাপ্লাই কর্পোরেশনের একজন ডিপার্টমেন্টাল হেড-ম্যানেজিং ডিরেক্টর মল্লিক সাহেবের—ইয়ে—মার্গ সঙ্গীত; আবার আপনিই এখানকার কুলিকামিন হামিদ অনন্তরামের গোঁসাই। এ সব দশঘাটের জল এক পীরের ঘাটে কি করে আনলেন দাশগুপ্ত মশাই?'

'জল নেমেছে বলে এক হয়ে গেল সব।'

মুখার্জি একটু চুপ করে থেকে বললে, 'মল্লিক সাহেব আপনাকে সমীহ করেন কেন জানেন? আপনার কাজের নিপুণতার জন্যেও বটে, তাছাড়া গভর্নমেন্টের একজন মিনিস্টার আপনার ডাকসাইটে ইয়ার। মুখার্জি বললে।

'আমার ইয়ার? না তো কোন ডাকসাইটে পৃথিবীতে আমার লোক্ত নেই। কোনো মিনিস্টারকে আমি চিনি না; তাদের কেরানীদেরও কৃপার পাত্র আমি মুখার্জি সাহেব। এগুলো কি?'

'বোতল। হোয়াইট লেবেল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হোয়াইট লেবেল? এ সব ডুমুরফুল পেলেন কোথায় আপনি? এ বাজারে তো এ অপয়াগুলোকে চোখেই দেখা যায় না। দু'জনের জন্যে সরঞ্জাম দেখছি–'

'আপনি আর আমি–'

'আমি না–আমি ও সব খাইনে কোনোদিন।'

'এখন নয়–এক্ষুণি নয় সুতীর্থবাবু। গলা শুকিয়ে এলে ভিজিয়ে নেবেন গলা। যদি না শুকোয় নাই বা ভেজালেন। বমি হবে না, বন্দোবস্ত করে দেব। যদি তিতো লাগে, ম্যাজম্যাজ করে, মানুষ কি মেয়েমানুষকেও ছুঁতে যায়? এ তো হোয়াইট লেবেল শুধু। ভোগের জিনিস আনন্দ দেবে বইকি।'

মুখার্জি বললে, দু'হপ্তা ধরে এই স্ট্রাইক নিয়ে কুঁদছেন কেন আপনি–'

'বেছে বেছে আপনাদের ফ্যাক্টরির ওপরই যে আমার বিদ্বেষ তা নয় মুখার্জি সাহেব। আমাদের নিজেদের ফার্মেই ধর্মঘট হবার কথা ছিল। কিন্তু সেটা হল না।'

'কেন?'

'সেটা পরে হবে। দৈবচক্রে এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম আমি–'

'কবে বলুন তো?'

দিন পনেরো ষোল আগে।'

'সাহেবী পোশাক?'

'হ্যাঁ, বেশ জাঁকালো সুট পরে।'

'মাথায় হ্যাট ছিল তো? বলুন তারপর' মুখার্জি বললে।

সুতীর্থ সিগারেটটা পুরোপুরি না খেয়েই অ্যাশট্রের ভেতর ফেলে দিল।

'একটা জিনিস হয়তো আপনি লক্ষ্য করেননি সুতীর্থবাবু।'

'কি, বলুন তো।'

'আপনি আমার মতন লম্বা।'

সুতীর্থ আপাদমস্তক মুখার্জির দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'ঘাড়েগর্দানে একটু বেখাপ্পা হয়েও আপনি লম্বা বইকি মুখার্জিসাহেব–খুব লম্বা। মুখার্জিসাহেব–খুব লম্বা।'

'আমি সব সময়েই সাহেবি পোশাকে চলিফিরি। আপনি হ্যাটকোট পরে যখন ঠাঁটে চলেন পেছন থেকে ঠিক আমারই মতন দেখায় আপনাকে।'

'কবে দেখলেন?'

'মুখের ছাঁদও আপনার কতকটা আমার মত। কিন্তু তাকালেই পার্থক্য ধরা প'ড়ে। কারুর মতে আপনার মুখ বেশি সুন্দর, আমার বেশি পুরুষোচিত। এই দেখুন আমার ফোটো।'

সুতীর্থ ফোটোর দিকে তাকাল না। 'আপনাকেই তো দেখছি।'

'নানা মানুষের নানারকম মত থাকে বইকি। কিন্তু সে যাকগে আসল কথা হচ্ছে সাহেবী পোশাকে মেজাজী চালে চললে আপনাকে যদি কেউ মুখার্জি সাহেব বলে ভুল করে থাকে, তবে তাকে দোষ দেয়া যায় না। নিন, আসুন, এইবারে শুরু করা যাক।' মদের বোতলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মুখার্জি।

সুতীর্থ মাথা নেড়ে বললে, 'না খাই যে তা নয়, কিন্তু খোঁয়াড়ি ভেঙে খাই নেই আজ আর।'

'নেই আজ? সাধব না তবে। আমি যদি একা পেরে না উঠি দয়া করে সাহায্য করবেন এই ভরসায় থাকব।'

বোতল ভেঙে খানিকটা মদ ঢেলে নিল সাহেব, খেল না, রেখে দিল এক পাশে সরিয়ে। 'সাপ্লাই কর্পোরেশনের একজন অফিসার আপনি। এখানে এসে মুদ্দোফরাসদের সঙ্গে মিশে তাদের মড়ার ফ্যান খেয়ে বাড়ির ইজ্জৎ বাঁচিয়ে স্ট্রাইক করছেন আপনি। লোকে শুনলে বলবে কি!'

সিগারেটের খোলা টিনটা টেবিলের ওপর কাত হয়ে পড়েছিল। একটা সিগারেট খসিয়ে নিয়ে সুতীর্থ বললে, 'আমি ওদের ধর্মঘটে যোগ দেওয়াতে এটার খুব জোর বেড়েছে মনে করেন?'

যারা সব সময়েই নিজেদের গা বাঁচিয়ে চলতে চায় সে সব বিজ্ঞ ভদ্রলোকদের চারদিকে বসিয়ে বেশ ঘোড়া ঘোড়া খেলা দেখাচ্ছেন আপনি। কিন্তু আপনার মাথা আছে–আবেগ আছে–আপনি ঝামেলা যে না বাধাতে পারেন তা নয়।'

'দুর্ঘটনার কোনো লক্ষণ দেখছেন? ফ্যাক্টরির ক্ষতি হবে মনে করছেন?'

'ক্ষতি! ফ্যাক্টরির জীবনমরণ নির্ভর করছে এই স্ট্রাইকের মীমাংসার ওপর।'

মুখার্জি বললে, 'এ সব গুহ্য তত্ত্ব আপনার জানবার কথা নয়। কিন্তু আপনি তো আমাদের লোক। আপনার কাছে রেখে ঢেকে কি আর লাভ।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে মুখার্জি বললে, 'অনন্তরাম, হামিদ ইয়াসিনও জানে।'

'কি করে?'

'ওরা সব জানে।'

'শুনে সুতীর্থ ভরসা পেল খানিকটা, দেশলাইয়ে সিগারেটটা জ্বেলে নিল।'

'ঘুষ কবুল করছি, কিন্তু বাগে আনতে পারছি ন কাউকে?'

'কাকে চান বাগে আনতে?'

'মুখার্জি মদের গেলাসটা মুখের কাছে নিয়ে না খেয়ে নামিয়ে রেখে বললে, 'একে একে সকলকেই। আপনাকেও। আপনাকেই প্রথম। কান টানলে তবে তো মাথাশুদ্ধু চলে আসবে। মারপিট করব না, মন মেজাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে দিতে যাব না। চেষ্টা করলে দুটোই পারি; কিন্তু সেরকমভাবে কতগুলো ন্যাঙন্যাঙে মানুষকে দিয়ে ফ্যাক্টরি চালানোও যা অন্ধকার রাতে একটা বালিশকে ধানজমি ভেবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করাও তাই। সে সব করে কে আর সোনার সন্তানদের বাপদাদা হতে পেরেছে—'

এবারে এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে ফেলে মুখার্জি বললে, 'তাছাড়া আধুনিক যুগের মানুষ মানে মানুষবাদ আমার ভালো লেগেছে। ওরাও মানুষ। তাই তো।'

'কি করবেন তাহলে?'

'ওদের বাইশ দফা দাবি আপনিই বেঁধে ঠিক করে দিয়েছিলেন?'

'ওদের সবায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে খসড়া তৈরি করেছি।'

'ওদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে শীলমোহর সেঁটে রেখে দিন।'

'তাহলে কি করে স্ট্রাইক ভাঙে?'

'ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলো আমরা মেটাব, কিন্তু অনেক দাবিই অন্যায়।'

'এ আমরা মনে করি না। আমরা ভালো করে বিচার-বিবেচনা করেই দাবিগুলো ঠিক করেছি।'

'কিন্তু বাইশটা দাবি থাকলে যদি এগারোটা মেটে সেই কি যথেষ্ট নয়?'

সুতীর্থ বললে, 'আখখুটে ছেলের বায়না হলে তা হত, আমি বুঝি মুখার্জি; কিন্তু এতো তা নয়, নুন-ভাতের—বাঁচা মরার জিনিস—'

'তাহলে আমাদের কি করতে বলেন সুতীর্থবাবু?'

সুতীর্থ তৎ নগদ কোন উত্তর দিল না।

মুখার্জি কিছুক্ষণ চুরুট টেনে তার পরে বললে, 'কোন পথে যাব আপনি দয়া করে নির্দেশ দেবেন নাকি? ওদের যারা মা গোঁসাই তারাই আমাদের গুরু গোঁসাই। তাই বলছি একটা পথ বলুন।'

'পথ চান, মেনে নিন দাবিগুলো।'

'কটা?'

'সব কটাই।'

'এই মন নিয়ে আপনি পলিটিক্স করছেন সুতীর্থবাবু?

'আমি পলিটিক্সের বাইরে।'

'তাই বুঝি? খিড়কীর ছ্যাঁচা দিয়ে একেবারে সদরে প্রবেশ করেও এই কথা? হেঃ হেঃ হেঃ—' মুখার্জি পাইপ বের করে বললে, 'অগত্যা এটা আপনার না বুঝলে চলবে না যে কিছু খেতে হলে কিছু ছেড়ে দিতে হয়। কমপ্রোমাইজ ছাড়া পলিটিক্স ইকনমিক্স সামাজিক জীবন কিছুই চলে না।'

'একথা আমি মনে প্রাণে স্বীকার করি মুখার্জি। কিন্তু ঐ বাইশটে দফাই তো কমপ্রোমাইজ—দাবিগুলোকে পঞ্চাশের কোঠায় ওঠাতে পারতুম।'

পঞ্চাশের কোঠায়—একশোর কোঠায়—মানে ইয়াসিন হামিদ অনন্তরাম বিশ্বম্ভর—সকলের জন্যেই এক একটা বাগানবাড়ি করে দিতে হবে, সাতটা করে বাঁদী রেখে দিতে হবে, চৌদ্দটা করে বেশ ফর্সা রায়বেঁশে দাবনা—ভদ্দরঘরের থেকে যোগাড় করে—'

'আমি উঠলুম।'

'শুনুন আরো কথা আছে।'

চব্বিশ

মুখার্জিসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত পেছনে বেঁধে গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে করতে বলেন, 'শীত পড়েছে।' ফিরে এসে গেলাসে ভর্তি করে মদ ঢেলে নিয়ে এক-আধ চুমুক খেয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল গেলাসটা। 'উঠছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবেন ভাবছিলেন? স্ট্রাইকের চাঁইরা তো সব চলে গেছে। এখন একা গিয়ে মাঠে শুয়ে থেকে কি লাভ?'

'না শুলে ঘুমোব কি করে?'

'এইখানে ঘুমের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। গয়ানাথ মালোকে আপনি চেনেন?'

শুনে সুতীর্থ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

'গয়ানাথ মালোর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, শুনেছি বইকি।' সুতীর্থ আর একটা সিগারেট বার করে নিল টিনের থেকে।

'গয়ানাথ মালো খুন হয়ে গেছে?' মুখার্জি জিজ্ঞেস করল।

'হতে পারে। তার খুনের খবর তো আমাকে দিয়ে যায় নি।'

'মানুষটাকে চিনতেন তো আপনি?'

'ঘটনাচক্রে চেনা হয়ে গিয়েছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শুনে সুখী হলুম যে, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন না। আপনি কি করে গয়ানাথকে চিনলেন ওরা—মানে ধর্মঘটীরা তো মনে করে যে, সে খুন হয়েছে—আমরাই করেছি তাকে খুন।'

সুতীর্থ চুপ করে সিগারেট টানতে লাগল।

'গয়ানাথের সঙ্গে শেষবারের মত দেখা কার হয়েছিল?'

কোনো কথা বললে না সুতীর্থ; কথা বলার মাছি হয়ে মাকড়সার জালের দিকে উড়ে গেলেই যে সে আটকে পড়বে, কিংবা আটকে পড়লেই যে আকাশ ভেঙে পড়বে মাথার ওপর—তা কিছু নয়; সুতীর্থ এমনিই কথা বলবে না এখন আর। কথা যা বলার তা বলাও হয়ে গেছে; কথা বাড়াবার কোন প্রয়োজন নেই আর।

'বলুন।'

'বলবার কিছু নেই আমার।'

মিঃ মুখার্জি পায়চারী করতে করতে কথা বলছিল; চেয়ারে এসে বসে বললেন, 'কোর্টে; তো জবাব না দিয়ে পারবেন না।'

'আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে সুতীর্থবাবু। জলের মত পরিষ্কার সব। আজ থেকে ষোলো দিন আগে আপনি একটু সকাল সকাল অফিস থেকে বেরিয়ে হ্যাট কোট পরে একেবারে এই এলাকায় এসে হাজির হয়েছিলেন।'

সুতীর্থ শুনছিল।

'কেন এসেছিলেন তাও জানি। তখন বেলা চারটে হবে। আপনি এসেছিলেন হামিদ আর সত্যকিঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে। হামিদের কাছ থেকে খবর পেয়েছিলেন যে, আমাদের ফ্যাক্টরিতে স্ট্রাইক চলেছে। আপনার কাছে কিছু টাকার সাহায্যের জন্যে গিয়েছিল হামিদ। সে ভাবতেও পারেনি যে, গায়েপড়ে এরকমভাবে সাহায্য করতে আসবেন ওদের। আপনি একেবারে দড়িটড়ি ছিঁড়ে বাছুরদের ভেতর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে স্ট্রাইক করবেন—এতে ওরা নিশপিশ নিশপিশ করছিল।' বলতে বলতে মুখার্জি উঠে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর পায়চারী করতে করতে বললে, 'হামিদের সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?'

'অনেক দিনের।'

'কি করে হল—আলাপ?'

'হামিদ কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো বইয়ের দোকানদার আলতাফের ছেলে। সে দোকানে প্রায়ই যেতুম আমি বই নিতে। কুড়ি পঁচিশ বছর আগের কথা সব; হামিদ তখন ছোট ছিল।'

'আমাদের ফ্যাক্টরিতে যে ও কাজ করছে তা জানতেন?'

'শুনেছিলুম ভালো মিস্ত্রি হয়েছে। কিন্তু কোথায় কাজ করছে জানা ছিল না আমার। অনেকদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। আমি কোন খোঁজখবর নিতে পারিনি।'

'আপনি যে সাপ্লাই কর্পোরেশনে কাজ করছেন কি করে জানল হামিদ?'

'অনেকদিন আগে বাসে দেখা হয়ে গিয়েছিল একবার। তখন বলেছিলুম।'

মুখার্জি টেবিলে ফিরে এসে এক চুমুকে গেলাস শেষ করে ফেলে দেরাজ থেকে একটা চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিল। ইজিচেয়ারে বসে বললে, 'আপনি যে আমাকে এ সব কথা বলছেন এ কোন কোর্টেই আপনার প্রামাণ্য বক্তব্য বলে স্বীকৃত হবে না। কোন সাক্ষীসাবুদ তো—কেউই নেই; আপনি আর আমি শুধু। মনে হয়, অবিশ্যি যে জেরা করছি আমি ব্যারিস্টারের মত, আবহটা হাইকোর্টের মতই। কিন্তু হাতে-কলমে নথিপত্রে সেঁধুচ্ছে না কিছুই। আমার কাছে বলছেন একরকম; যদি বলেন গিয়ে আরেক রকম আর এক জায়গায়, বাধা দেবার কেউ থাকবে না তা হলে—কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যে তার কোনো সাধু প্রমাণ থাকবে না।'

'সত্য কথা ছাড়া আমি বলি না কিছু।'

'মিথ্যে কথা বলার প্রয়োজন হলে বরং চুপ করে থাকেন। তা আমি জানি। সে যা হোক, এখানে আপনার দ্বিধার কোন কারণ নেই। আপনার কোন কথাই আপনারি বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার মতলব নেই আমার। আপনি আপনার খাঁটি গল্পটা পরিষ্কার করে বলে গেলেই আমি খালাস—আপনিও। তারপর ঘুমোবেন গিয়ে পাশের ঘরে।'

'পাশের ঘরে কেন?'

'কোথায় যাবেন তবে এত রাতে?'

'বাড়ি গিয়েই ঘুমোব।'

'কোথায় আপনার বাড়ি? বালিগঞ্জে। ওঃ, আমি নিজেই গাড়ি করে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব আপনাকে।'

মুখার্জি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দিন ষোলো আগে আপনি বিকেল চারটে নাগাদ—এ পাড়ায় এসেছিলেন?'

'এসেছিলুম।'

'হামিদের সঙ্গে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে কিছু টাকা দেবেন ভেবেছিলেন?'

'ভেবেছিলুম। তাকে শুধু নয়, সমস্ত ধর্মঘটীদের সাহায্য করবার জন্যে—'

'স্ট্রাইকটা যাতে খুব জোর চলে?'

'সেই জন্যেই তো টাকা দিলুম, নিজে এলুম—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখার্জি বললে, 'এ জন্যে কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করতেও ছাড়েননি আপনি। মল্লিক সাহেবের দেরাজ ভেঙে পাঁচশো টাকা নিয়েছিলেন—'

'ভেঙে নয়, তার দেরাজ খোলাই ছিল—'

'খোলা ছিল? না, চাবি দিয়ে খুলেছিলেন?'

'খোলা ছিল।'

'দেরাজ খুলে সোদপুরে গিয়েছিলেন তিনি আশ্রম দেখতে?'

'তিনি কাছেই বসেছিলেন। আমি তাকে দেখিয়েই বলেছিলুম যে আমার মাইনে—দু'দিন বাকি ছিল মাস শেষ হতে—দু'দিন আগেই নিচ্ছি। স্যালারি বিল তৈরি হয়েছিল; আমি তাতে সই করে টাকা নিয়েছিলুম—'

'উনি রাজি হলেন?'

'তক্ষুণি, এক কথায়।'

'মানে গররাজি হলেন না।'

স্যালারি বিলে সই করে উনিই আমাকে টাকা নিতে বললেন।'

আপনার মাইনে তিনশো টকা তো ছিল—'

'পাঁচশো টাকা হয়েছে গত মাস থেকে—'

'মল্লিক আমাদের কাছে বলেছেন যে, আপনি টাকা চুরি করেছেন ওর দেরাজ থেকে—'

'চোর তো ও নিজেই।'

'আমিও জোচ্চোর নিশ্চয়ই?'

মুখার্জি সাহেব টেবিলের ওপর থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিল। নিভে গিয়েছিল, চুরুটের মুখে ছাই জমে গেছে; টোকা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে, 'চারটে নাগাদ এদিকে এলেন। পরনে অফিসের স্যুট—স্যামুয়েল ফিটজের বাড়ির!'

সুতীর্থ একটা মশা তাড়িয়ে বললে, 'একরকম চীনে ধূপ দিয়ে মাঝে মাঝে মশা মেরেছি আমরা। আজকাল নানা রকম স্প্রে বেরিয়েছে। এ ঘরে মশা নেই বললেই হয়, তবে একেবারেই যে নেই তা নয়।'

'সেদিন বিকেলবেলাই দিকবিদিক অন্ধকার হয়েছিল। সমস্ত আকাশ ছিল মেঘে ভরে; অনেকক্ষণ ধরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল—একনাগাড়ে। পথঘাট বেশ পেছল হয়েছিল।'

বেশ তো বলে যাচ্ছে মুখার্জি। কী করে বলছে? কোথায় ছিল সে সেদিন? সুতীর্থের খটকার ঘোরটা কেটে উঠছিল না। অবাক হয়ে সে একবার তাকাল, কিন্তু হতবাক হল না। কিন্তু তবুও বললে না কিছু—বলবার ছিল না কিছু তার; মুখার্জি তো নিজেই সাফ কথা বলে যাচ্ছে।

'নিন, এইবার আসুন।' আর একটা বোতল ভাঙল মুখার্জি।

'আর একদিন এসে খেয়ে যাব—'

মুখার্জি গেলাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বললে, 'কথা রইল তা হলে, মনে যেন থাকে।' গেলাসে একটু ছোট্ট চুমুক দিয়ে বললেন, 'আপনি সেই মেঘলা অন্ধকারে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ভেতর পেছল পথ ভেঙে যাচ্ছিলেন হামিদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে। ফ্যাক্টরিটা বন্ধ ছিল সেদিন। এখন চলছে দ্বিতীয় দফার স্ট্রাইক দশ দিন ধরে তখন চলছিল প্রথম দফার ধর্মঘট; ধর্মঘটীদের সঙ্গে আমাদের মিটমাটও হয়ে গিয়েছিল প্রায়। স্ট্রাইকাররা কাজেও এসেছিল শেষ পর্যন্ত কাজ চলেও ছিল দু-তিন দিন। কিন্তু আপনার নির্দেশে এই দফার ধর্মঘটটা শুরু হল।'

মুখার্জি গেলাসে আর এক চুমুক দিয়ে বললে, 'কিন্তু সেদিন হামিদের দেখা পাননি আপনি। ফ্যাক্টরি বন্ধ ছিল, হামিদ চলে গেছল মেটেবুরুজে নাকি খিদিরপুরে—দু'জায়গায়ই ও রাঁড় আছে।'

'রাঁড়?'

'ও তো সিফিলিসের রুগী ঃ সিফিলিস হয়, ইনজেকশন নেয়। সেই জন্যেই তো ওদের এত ধর্মঘটের ঘটা। বাজারের স্ত্রীলোকদের ধর্ম রক্ষা করছে ওরা, তারা ধর্মপুত্র দিচ্ছে, সিফিলিসের ডাক্তারকে দিয়ে সে সব সারিয়ে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে এসে ধর্মঘট; ঘুরছে ধর্মচক্র।'

মুখার্জি চুরুট জ্বালিয়ে নিল।

'মালিকের গলা টিপে ধর্মের নামে এই যে টাকা আদায় করে নেওয়া একেই বলে ধর্মঘট—'

মুখার্জির মুখে কোন হাসি নেই, বিষও নেই। সংকল্প আঁটা হচ্ছে, আঁটা হচ্ছে, ফেঁসে যাচ্ছে এমনিই একটা ভাব তার মাথার ভেতর খুব কেজো বটে; কিন্তু চোখে মুখে কোন বাষ্প নেই সে সবের, কোন জঞ্জাল নেই।

'হামিদের দেখা না পেয়ে আপনি পেছল পথ দিয়ে হনহন করে হেঁটে চলেছিলেন।'

'চলেছিলুম বটে, কাউকে হাতের কাছে পাবার জন্যে।

'কিন্তু জনমানব কোনদিকেই কেউ ছিল না। দু-চারজন মজুর মিস্ত্রি অবিশ্যি তক্কে তক্কে ছিল আমাকে খুন করবার জন্যে নয় ঠিক—তবে বাগে পেয়ে একটা কিছু করে ফেলবার জন্যে। এদের মধ্যে গয়ানাথ মালোই ছিল সবচেয়ে বেশি কাপ্তেন। দেখতে ভিজে বেড়ালের মত, বেঁটে চুঁচো লিকলিকে; হাতে পায়ে মাথায় গিজগিজ করছে ভাল্লুকের মত চুল, মাংস নেই, হাড্ডি নেই, রক্ত নেই, দাঁতের মাড়ি অবধি নেই; চামড়া ফুঁড়ে রাশি রাশি যেন সাদা শনের জঙ্গল বেরিয়েছে। ময়মনসিং-এর ম্যাস্তা ক্ষেতের ভূত।'

'শুনেছি গয়ানাথ মালো—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল—সাত বছর ধরে ম্যালেরিয়া। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় ভুগে মানুষ এ রকম ভোম হয়ে যায়! ওকে দিনের বেলা দেখলেও আমার মন খারাপ হয়ে যেত। কেমন যেন প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকত খিড়কির পুকুরের উদবেড়ালের মত; হ্যাঁচকা চোখে পড়ে গেলেই সেদিনটা বেশ শুভে লাভে কেটে যেত দাদা—আঁদাড় পাঁদাড় তুকতাক দিয়ে জেরবার করার মতলব মশাই চব্বিশটা ঘণ্টা।'

মুখার্জি চুরুটের মুখে ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে রেখে দিল টেবিলের ওপর চুরুটটা; টেবিলের কিনারে এসে দাঁড়াল।

সুতীর্থ বললে, 'যদি বলি গয়ানাথ আপনাদের ফ্যাক্টরিরই তৈরি জিনিস—আপনাদের কমটাটকা মাল—তা হলে ঠিক বলা হবে না। কিন্তু তবুও ওর চেহারা ছাপিয়েই আপনাদের ফ্যাক্টরির গালামোহর তৈরি করা উচিত; আমি যদি এখানে কাজ করতুম এই মোহরই বুকে লটকে ফিরতুম—'

'আপনাদের ফার্মের কি মোহর?'

'এইটেই। এই সব কারখানা ডক কুলি মজুর নিয়ে যে পৃথিবী সেটার হুন্ডি হ্যান্ডনোট হ্যান্ডবিলের ফাঁদলে আঁটবার মত মোহর এ ছাড়া আর নেই।'

'সেই মেঘলা অন্ধকারের ভেতর পেছল পথে বেশ ডাঁটের মাথায় হেঁটে চলেছিলেন আপনি। এ পাড়ার যে কেউ তখন আপনাকে দেখলেই মনে করত মুখার্জি সাহেব চলেছেন। গয়ানাথ মালো আপনার পেছনে ছিল, হিসেব আছে আপনার?'

'বাসিমুখে হেঁটে চলেছিলুম মনে আছে আমার। গয়ানাথ পেছনে ছিল?'

'গয়ানাথ মালো চলছিল আপনাকে খুন করতে—ভেবেছিল মুখার্জি সাহেবকে বানাতে চলেছে। আর একটু হলেই হয়ে গিছল—'

সুতীর্থ বললে, 'কেমন বোঁটকা গন্ধ পাচ্ছিলুম সেদিন।'

'কি রকম?'

'মনে হচ্ছিল আমি চলেছি গয়ানাথ পেছনে পেছনে আসছে আমার—আর উয়ের ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের আর বোঁটকা গন্ধ ছাড়ছে চৌধুরী ফ্যাক্টরির রামছাগলটা।'

মুখার্জি বসেছিল। চুরুটে টান দেওয়া হয়নি শিগগির। এইবারে টান দিয়ে দিয়ে চুরুটের মুখে আগুনের ফুলকি বার করে বেশ একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে আমেজ লাগিয়ে বললে, 'গয়ানাথ সাঁ করে আপনাকে ছোঁরা মারতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের একটা খাদের মধ্যে। কিন্তু তাই বলে সে ছোরা তার নিজের পেটের ভেতর সাঁধল কি করে?' মুখার্জি একটা ঝাড়াঝাপটা উত্তর চেয়ে সুতীর্থের দিকে তাকাল।'

'পেটে সেঁধেছিল?'

'পেটে না কলজেয় না হৃৎপিণ্ডে; কোথায় সেঁধেছিল সুতীর্থবাবু? আপনিই তো সবচেয়ে ভালো করে জানেন—'

'রাত হয়ে গেছে মুখার্জি সাহেব—'

'আপনি তো ওর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছিলেন। আপনার কোট শার্ট টাই রক্তে ভিজে গিয়েছিল সব।'

সুতীর্থ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে আন্দাজ করছিল। গয়ানাথ মালোর খুনের দায়িত্ব তার ঘাড়েই চাপাবার যে চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা স্পষ্ট; এ চেষ্টা আইনেও টিকবে হয়তো। টিকুক—যদি টেঁকে। কিন্তু সে তো খুন করেনি।

'গয়ানাথ মালোকে আমি দেখিনি কোন দিন—নামও শুনিনি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ দেখলাম একটা লোক দৌড়ে এসে হুমড়ি খেয়ে আমার সামনে একটা খাদের ভেতর পড়ে গেল। এমনই অদ্ভুত বেকায়দায় পড়েছিল যে, ওর হাতের ছোরাটা ঘ্যাস-ঘ্যাস করে ঢুকে গেল ওর পেটের ভেতর—'

'পেটের ভেতর ঃ বুকে নয়?'

'শরীরের নিচের দিকে ঢুকেছিল। কিন্তু লোকটার খুব বাহাদুরী বলতে হবে। আমাকে এগোতে দেখেই ছোরাটা সে অসাধ্যসাধনে টেনে বের করল।'

'টেনে বের করল? চোখে দেখেছিলেন?'

'তাই তো মনে হল।'

'ছোরাকে পেটে ঢুকতেও দেখেছিলেন আপনি?'

'দেখেছিলুম বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'আর কি দেখেছিলেন?' মুখার্জি হাসতে হাসতে বললে।

'আমাকে বিশ্বাস করুন আপনি—আমি যা দেখেছি তাই বলছি।'

'চর্মচক্ষে দেখেছিলেন সুতীর্থবাবু? পেট থেকে ছোরা খসিয়ে আপনাকে মারবার জন্যে রুখে এল বুঝি?' মুখার্জি ঘাড় হেঁট করে হেসে চুরুটটা জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল।

'আমাকে রোখেনি। কি করে রুখবে ও? তবে চেয়েছিল তাই। ও আমাকে মুখার্জি সাহেব কিংবা তার দলের কোন ত্যাঁদড় মনে করেছিল হয়তো কিন্তু ওর নাড়ী ছেড়ে যাচ্ছিল। আমি যখন ওকে কোলে তুলে নিলুম—'

'কেন? কোলে নিলেন কেন?'

'কোথাও ডাক্তার হাসপাতাল রেডক্রস টেলিফোন—যা হোক কাছাকাছি কোথাও নিয়ে যাবার জন্যে। তখন ও ছটফট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি তো এই ফ্যাক্টরির কেউ নন—' বললুম, 'না তো—আমি এ পাড়ার লোক না,' বললে, 'আমার নাম গয়ানাথ মালো, যদি দয়া করে সত্য—কিঙ্করের কাছে আমার কথা বলেন, আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেপুলে পরিবারকে যদি দয়া করে আগলে থাকতে বলেন। আমাকে বললে, অনেক দয়া আপনার, আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম ওদের সব—'

'ওর পরিবারকে আপনার হাতে দেওয়া হল?'

'সত্যকিঙ্কর কে?'

'জেলে আছে।'

গয়ানাথ মালো কথা বলতে পারল না আর। কাৎরাতে লাগল। আমি তাকে খুব আলগোছে আগলে চলেছিলুম। সমস্ত জামাকাপড় আমার রক্তে ভিজে চটচট করছিল। একটা জনপ্রাণী দেখলুম না কোথাও।'

'না দেখে ভালোই হয়েছিল।'

'আর এগোতেও পারা গেল না। মানুষটা মরছিল—ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছিল। আমি তাকে ঘাসের ওপর শুইয়ে রাখলুম। তখনই সে মরে গেল। আমার কোলে থাকতেই মরেছে বোধ করি।'

'তারপর?'

'এ খবর আমি দেব—কে বিশ্বাস করবে—যে মরেছে সে তো মরেই গেছে—পরে এসে এক সময় তা পরিবারের জন্যে ব্যবস্থা করা যাবে। ভাবতে ভাবতে আমি কলকাতার দিকে ফিরে গেলুম।'

'যদি বলা যায়, গয়ানাথ মালোকে আপনি খুন করেছেন!'

'তা বলা যেতে পারে অবিশ্যি। মোকদ্দমা সাজালে পেরে ওঠা কঠিন আমার পক্ষে।'

'হ্যাঁ, জলজ্যান্ত প্রমাণ সবই আমার কাছে রয়েছে। আপনার কোট নেকটাই জুতো রক্তে কাঁই কাঁই করছে সব। সবই আমাদের কাছে। সবই আপনার নিজের জিনিস। সবই গয়ানাথ মালোর রক্ত। অস্বীকার করবেন আপনি?'

'এখন তো অনেক রাত হয়ে গেল।'

'কিন্তু খুনের দায়ে পড়েছেন যে।'

'গয়ানাথ মালোকে আমি খুন করিনি!' সুতীর্থ বললে, 'সে তো নিজের হাতেই নিজে মরেছে।'

'তা হতে পারে। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে আপনাকে?' মুখার্জি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পায়চারী করতে করতে বললে, 'বড় জঞ্জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন মশাই—'

'কোট টাই সবই আমার। কিন্তু রক্ত যে গয়ানাত মালোর তার প্রমাণ কি?'

মুখার্জি হে হে হে হে করে হেসে চুরুট জ্বালাল। 'কার রক্ত তা হলে?'

'যে কোন জীবিত মানুষের।'

'তা হলেও তো ব্যাপারটা রাহাজানি।

'আমার নিজের গায়ের রক্ত।'

'নিজের গায়ের?' কিন্তু সেজন্যে এখন যদি নিজেকে কেটে ছিঁড়ে ফেলেন তা হলে ডাক্তারী পরীক্ষায় টিকবে কি? নাকি আগেই শরীরে ছুরি মেরে ঠিক করেছিলেন? তাও টিকবে না।'

'উঠি এখন।'

'বসুন। আপনার কোট টাই সবই গয়ানাথ মালোর লাসটার কাছে পড়েছিল। আমরা এসে দেখলুম সব। যাদের দেখবার দরকার একে একে সকলেই দেখেছি। অনেক ফটো উঠে গেছে—প্লেট আছে সব আমাদের কাছে।'

সুতীর্থ বললে, 'ফটোগ্রাফের প্লেট কি মানুষকে খুনী বানায়। সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'তা বানাতে পারে—আইনের চোখে। আমার নিজের চোখে তো আমি খুনী নই।'

'চোখ তো আইনেরই। মানুষ কে? আইনের পয়জার। মানুষের কোন চোখ নেই।' মুখার্জি চুরুট টানতে টানতে বললে।

চুরুটটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে মুখার্জি বললে, 'কোঁন খুনী বলেছে কোনদিন যে সে খুন করেছে? আপনি খুন করে কবুল করবেন?'

'খুন করে এতদিন রেহাই পেলুম কি করে আমি, সাহেব?'

'আমরা চাপা দিয়ে রেখেছি এ কেসটা।'

'কি মতলবে?'

'আপনি এসব ছেড়ে চলে যান। মল্লিক সাহেবের ডিপার্টমেন্টাল চেয়ারে গিয়ে বসুন। যা নিয়েছিলেন চিরদিন তারই চর্চা করুন গে যান। আমরা আপনাকে বলব না কিছু আর।'

সুতীর্থ কথা ভাবছিল, কিন্তু কথা ভাবতে গিয়ে সিগারেটটা পুড়ে যাচ্ছিল শুধু কোন মীমাংসা হচ্ছিল না; সুতীর্থ সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে, কিন্তু গয়ানাথ মালোকে তো আমি খুন করিনি।'

'আমরা তা জানি। আপনি নিজেও বলেছেন, অন্য লোকের কাছ থেকেও শুনেছি আপনি মারেন নি।'

'কে বললে? কেউ তো সেখানে ছিল না।'

'ছিল, আপনি দেখেন নি। বঙ্কুকে চেনেন?'

'বঙ্কু তো ধর্মঘটীদের সর্দার—'

মুখার্জি হাঁটতে হাঁটতে ট্রাউজারের পকেট থেকে ছোট্ট একটা শিশি বার করে দুটো পিল ঢেলে নিয়ে বললে, 'সর্দারও বটে, আমাদের প্যোদ্দারও বটে। ও যাতে সর্দার হতে পারে এই কড়াবে ওকে আমাদের দালাল করেছি। বঙ্কু সেদিন গয়ানাথ মালোকে পাহারা দিচ্ছিল। গয়ানাথের কাছ থেকে অনেক আগেই জেনে নিয়েছিল যে, আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুন করার তক্কে আছে সে। ছোরা ছিল না মালোর। আমরা বঙ্কুকে বললুম তকে তকে থাকতে। আমার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। কিন্তু আপনি এসে গয়াসুরটিকে নিকেশ করে যা সাজিয়ে দিলেন ব্যাপারটা ওরকম করেও বিছানা সাজিয়ে বসে থাকে নতুন বউ।'

মুখার্জি বললে, 'মড়াটার গায়ের ওপর আপনার কোট টাই জুতো পড়ে রইল, আপনি চলে গেলেন কলকাতায়–'

সুতীর্থ দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'আপনাদের মতে এটা বেকুবি।'

'আমাদের কোন মতটত নেই।' পিল দুটো সোডা দিয়ে গিলে ফেলল মুখার্জি। খানিকটা সোডায় মদে মিশিয়ে গেলাসটা সরিয়ে রাখল।

'কেমন যেন নিশির ডাকে হেঁটে চলেছিলুম।'

'কেউ কি ওরকমভাবে চলে? চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও চলে?'

'সচরাচর চলে না।'

'তবে কেন চলেছিলেন আপনি?'

'গয়ানাথকে কে খুন করেছে?'

'আপনি।'

সুতীর্থ হেসে বললে, 'গয়ানাথের ভূত যদি উঠে এসে আপনাকে বলে যে, আমি তাকে মেরেছি তা হলে বিশ্বাস করবেন আপনি? আপনি তো জানেন আমি গয়ানাথকে মারিনি, কে খুন করেছে তাও জানেন আপনি।'

সুতীর্থ যখন কথা বলছিল মুখার্জি জল খাচ্ছিল। জলের গেলাসটা তেপয়ের ওপর রেখে দিয়ে মুখার্জি বললে, 'কিন্তু আইন বলছে সুতীর্থ গুপ্তের জামা জুতো রক্তে ভিজে ক্বাথ হয়ে গয়ারামের লাসের ওপর পড়েছিল। কি বলবেন আইনকে আপনি?'

'কিছু বলবার নেই আমার।'

'আমাদেরও বলবার নেই কিছু। যা বলবার গয়ানাথ এসে বলবে।' টেবিলে ঠাণ্ডা জল ছিল কুঁজোর ভেতর। খেতে ইচ্ছে করছিল সুতীর্থের মুখার্জিরও তেষ্টা পেয়েছিল; জল। কুঁজোর থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে নিয়ে খাচ্ছিল সুতীর্থ।

মুখার্জি বললে, 'ভুল সকলেরই হয়। শয়তানের হয় না অবিশ্য। কিন্তু জামা জুতো লাস সব ছত্রখান করে ফেলে গেলেন এত ভুল আপনার।'

সুতীর্থ জলের গেলাসটা শেষ করে মেঝের ওপর পায়ের কাছে রেখে দিয়ে বললে, 'অনেক দিন পর্যন্ত আমার নিশিতে পাওয়া রোগ ছিল। এ কয় বছর ভালো ছিলুম। রোগটা আবার ফিরে আসছে মনে হচ্ছে। গয়ানাথ যেদিন মারা যায় তার মৃত্যু অবদি হুঁস ছিল আমার তার মরবার পর কি করেছি না করেছি কি হয়েছে না হয়েছে কিছুই মনে করতে পারছি না। অনেক ট্রাম বাস বদলে–অনেকবার ঠিকানা ভুল করে খুব বেশি রাতে বাড়ি পৌঁছেছিলাম–'

'তা হবে' মুখার্জি বললে, 'সব কিছুরই সব রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু তাই বলে সবগুলোই কি আর আইন আদালতে টেঁকে। শাশুড়ীর কাছে রামকানাইয়ের বায়নাও টেঁকে–রামকানাই তার জামাই বলে। কিন্তু আদালত কার শাশুড়ি।'

ভর্তি গেলাসটা পড়েছিল টেবিলে; মদটা খেয়ে নিল মুখার্জি।

'বঙ্কু আপনাদের স্পাই?'

'এ কথা বলে বেড়াবার কোনো অনুমতি নেই। তবে আপনাকে বলা যেতে পারে আপনি আমাদের হাতের মুঠোর ভেতর এবার। ঘনশ্যামও আমাদের স্পাই।'

'ঘনশ্যামও?' সুতীর্থ একটু চমকে উঠল। 'আর কে কে?'

'আরো আছে কেউ কেউ।'

'হামিদ?'

'না হামিদ নয়।'

সুতীর্থ বললে, 'আমি তাহলে উঠি এবার–'

'কলকাতায় যাবেন?'

'হ্যাঁ অনেক রাত হয়েছে–'

'চলুন, গাড়ি ঠিক আছে। আমারও একটু যাবার দরকার আছে ওদিকে।'

'এত রাতে।'

'আমাদের রাত বিরেত নেই।'

মোটরে উঠে সুতীর্থ বললে, 'আমার জামা জুতোর ব্যাপার আপনি একা জানেন শুধু?'

'বঙ্কু জানে। সে তো কাছেই ছিল।'

'আর কেউ?'

'না।'

'ফটো তোলা হয়েছে বুঝি ও সবের?'

'তুলে রাখতে হয়। ফটোর বিশেষ কোন মানে নেই।'

'বঙ্কু বলে বেড়াবে?'

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে তার সর্বনাশ হবে বলে দিয়েছি।'

'জামা জুতো ফিরে পাওয়া যেতে পারে?'

'বেশ দামী নতুন জিনিস তো ওগুলো? মুখার্জি একটু ভেবে বললে, 'ব্যবহার করবেন?'

'না এমনই।'

'এখন পাবেন না।'

গাড়ি সাঁ সাঁ করে চলছিল। চালাচ্ছিল মুখার্জি নিজেই।

সুতীর্থ বললে, 'আমি যদি স্ট্রাইকে আবার এসে যোগ দিই কি করবেন?'

'গয়ানাথ মাল্লোর খুনের খবর বেরিয়ে পড়বে—ওরা আপনাকে ধরে জরাসন্ধের মত ছিঁড়ে ফেলবে দুই দাবনার মাঝখান দিয়ে।'

'একটা মিথ্যে কথা রটিয়ে দিয়ে আমাকে ঠেকাবেন আপনারা?'

'আপনাকে ঠেকাবার দরকার যে।'

'বাইশ দফা দাবির কটা মেনে নিতে রাজি আপনারা?'

'না মেনে নিলেও চলে। না হয় এক আধটা মেনে নেব।'

'ভাঙবে স্ট্রাইক তাহলে?'

'হামিদকে হাত করতে পারলে হবে সব।'

'পারবেন করতে?'

'টাকা দিয়ে পারব না, কিন্তু আপনি সরে গেলে পারব।'

সুতীর্থকে তার আস্তানায় নামিয়ে দিয়ে মুখার্জি যেন বিদ্যুতের তারে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে বললে, 'ও এই বাড়ি।'

'হ্যাঁ। এই তো।'

'এটা কার বাড়ি?'

'অংশুবাবুর।'

'অংশুবাবুর?' মুখার্জির মুখটা কেমন ছুঁচোলো হয়ে উঠল—নাকটা আরো লম্বা আরো ছুঁচোলো—শীত রাতের অন্ধকারের ভেতর—সুতীর্থকে বললে, 'এখানে মণিকা দেবী বলে কেউ থাকতেন না?'

'অংশুবাবুরই তো স্ত্রী তিনি।'

'অংশুবাবুর স্ত্রী?' মুখার্জি সুতীর্থের আগাপাস্তলা সবদিকে ভালো করে চোখ ছানিয়ে নিয়ে মোটর ঘুরিয়ে চলে গেল।

পঁচিশ

জয়তীর স্তাবক ও প্রেমিকের মধ্যে ক্ষেমেশ চৌধুরী ও আরো দু-একজন এখনো অবিবাহিত ছিল; বাকি সকলেই বিয়ে করে সংসারে তলিয়ে গেছে এরা কেউই বিরূপক্ষের বাড়িতে জয়তীর সঙ্গে দেখা করতে যায় না বড় একটা।

বিরূপাক্ষের সঙ্গে জয়তীর বিয়ের ঠিক পরেই—মাঝে মাঝে যেত বটে, কিন্তু ইদানীং দু-এক বছর মোটেই আসা যাওয়া নেই আর। বিরূপাক্ষের টালিগঞ্জের বাড়ির থেকে ক্ষেমেশ চৌধুরীর বাড়ি অনেক দূরে—বেলগাছিয়ায়। বেলগাছিয়ার বাড়িতে ক্ষেমেশ একাই থাকে; ক্ষেমেশের আত্মীয়স্বজন নেই বিশেষ কেউ, যারা আছে কেউ কলকাতায় থাকে না বড় একটা। ক্ষেমেশের বাবা বেঁচে নেই, মা দেশের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় আসা-যাওয়া ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন, এবারের শীতে কলকাতায় আসেননি আর ফাল্গুনের বাতাস ছাড়লে আসতে পারেন হয়তো, কিংবা আসবেন বর্ষাকালে।

নিজের বাড়িতে ক্ষেমেশ আজকাল একাই ছিল। জয়তীর সেসব দিনের পরমাইরা আজ যখন সম্পত্তি ও সন্তানের বহর বাড়িয়ে চলেছে, ক্ষেমেশই তখন আধবুড়ো একা, সাংসারিক চালচলনও ক্রমে পড়ে যাচ্ছে তার সংসারের।

'ভালো করেছ জয়তী তুমি এখানে এসে।'

'চা খাচ্ছ তুমি। আজ সকালটা কিরকম রোদে বাতাসে ঝরঝরে দেখছ।'

'মাঘ মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'তোমার এ বাড়িটা তো ঝাড়জঙ্গলের মত বানিয়ে রেখেছ তুমি—'

'হ্যাঁ, খুব চুপচাপ; গাছগাছালি ঢের, নানারকম পাখি আসে।'

'আমি পাখি খুব ভালোবাসি।'

'কিন্তু কটা পাখির নাম বলতে পার? নানারকম নতুন পাখি আসে—নিবেশী পাখি—উপনিবেশী—ঝাঁকে ঝাঁকে—আমি ওদের চিনি—কিন্তু ওদের অনেকেরই কোন দিশি নাম আছে বলে জানি না—কেন দাঁড়িয়ে? বোস—বোস।'

'বসব বইকি। তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ—'

'আমি?' ক্ষেমেশ একটু হেসে বললে, 'পরে বলছি। নানারকম লতাপাতা' উঁচু উঁচু গাছ দেখা যায়। সে সবের দিশি নাম কি বলতে পারি না আমি। তুমি জান?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

চশমার ভেতর দিয়ে খানিকটা চুম্বকের টানে যেন জয়তীর দিকে তাকাল ক্ষেমেশ।

'একেবারে না জানি তা নয়।'

'আমাকে বলে দাও তো ঐ গাছটার নাক কি- ঐ যে উঁচু হয়ে উঠেছে-যার ডালপালার ফাঁক দিয়ে বাইরের সাদা মেঘ দেখা যাচ্ছে। দেখেছ?'

'অনেক উঁচু উঁচু গাছ তো আছে।'

'আমার আঙুলের সোজাসুজি যেটা-ডালপালা বেশি-পাতা কম-কাজেই জাফরি কাটার কথা এল-মেঘ থাকলে কেন সাদা-না হলে নীল জানালাটা চোখে পড়ে বড় আকাশের।'

জয়তী খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'কি জানি, নাম তো আমি বলতে পারব না।'

চোখ ঘুরে গেল জয়তী পরম্বাৎ অন্য একদিকে ক্ষেমেশের, ঠোঁটে তার হাসি লেগে ছিল।

'তোমারও আমার মত দেখছি। আমার মনে হয় আমাদের দেশের অনেকেই নানারকম গাছপাখির দিশি নাম জানে না।'

'এত নাম নেইও হয় তো।'

আমাদের দেশের লোকেরা কেবল ভেতরের দিকেই তাকিয়ে থাকতে ভালোবাসে বলতে চাও তুমি? গাছপালা পাখপাখালির দিকে তাকিয়েই নিজের ভেতরটাই দেখে-ওদের দেখে না ঃ এই বুঝি?'

'অনেকটা তো তাই।'

'তাই তো। ম্যাক্সমূলার থেকে কীথ অলডজ হক্সলি, ইশার উড এই নিয়েই তো আটখানা। কিন্তু ভেতরে ডুব দিয়ে রেশমী জাল বানায় তো আমাদের দেশের লোকেরা-রেশমী জাল-ইন্দ্রজাল-মাকড়সার জাল-বাইরের পৃথিবীর খোঁজখবর বড় একটা রাখে না?'

'তুমি আজ পাখিটাখির খুব ভক্ত হয়ে পড়েছ দেখছি ক্ষেমেশ। এও তো বহিরাশ্রয় নয়-বারফটটা কেমন একটা জিনিস যেন এত পৃথিবীর কল্যাণে লাগে না, তোমার নিজের মন খুশি-'

'না, না, আমি যা বলতে যাচ্ছি তুমি সেটা এড়িয়ে গেলে।'

'বুঝেছি।' জয়তী সোফায় এসে বসল। 'কিন্তু কোন জিনিসের কি নাম না জেনেও জিনিসের আস্বাদ পাওয়া যায়-'

'তা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নাম জানা থাকলে মন চরিতার্থ হয় বেশি। তোমাকে চা দেয়া হয়নি তো-'

'আমি চা নিজেই বানিয়ে খাব। তোমার মা কি এখানে?'

'না।'

'দেশের বাড়িতে?'

'কাল চিঠি পেলুম তিনি বর্ধমান থেকে এলাহাবাদে গেছেন বুড়ো সরকারের সঙ্গে প্রয়োগে চান করবার জন্যে। এত শীতে যাওয়া ভালো হয়নি-'

'কে আছেন এখানে?'

'কেউ না।

'একেবারে একা তুমি?'

'রঞ্জন আছে।'

'সে কে?'

'আমার চাকর।'

'ওঃ আমি ভেবেছিলুম-। খুব মালদার নাম, হরির চেয়ে তুলসী পাতার হরির নামের দাম বেশি। সেই রূপচাঁদ পক্ষীর গান ঃ মনে আছে তোমার? আমি তোমার এখানে কয়েকদিন থাকব ক্ষেমেশ।'

'বেশ থেকে যাও, ওদের মতামত-তোমার বাবুর মত আছে তো?' যেন সবই আছে ঠিক, সবই ভালো-এরকম স্থির সুনিশ্চয় চোখে জয়তীর দিকে একবার তাকিয়ে নিল ক্ষেমেশ।

'তুমি কোথা থেকে এসেছ জয়তী?'

'সেইটেই তোমার প্রথম জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। আমাকে দেখেও তুমি পাখি আর তিত্তিরাজ গাছ নিয়ে পড়লে-'

ক্ষেমেশ ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিয়ে বললে 'তুমি তো বিরূপাক্ষ রায়কে বিয়ে করেছিলে?'

'কেন, বিয়ের আসরে তুমি উপস্থিত ছিলে না?'

'তোমার স্বামী আজকাল কোথায়? কলকাতায় তো? তোমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়িতে আমি কয়েকবার গিয়েছিলুম। এখনও কি সেইখানেই আছ তোমরা?'

'টালিগঞ্জে উঠে গেছে।'

'তোমার স্বামী কোথায়? তাকে দেখছি না তো'-ক্ষেমেশ বললেন, 'কলকাতায় নেই বিরূপাক্ষবাবু?'

'আছে বইকি। তুমি কোনদিন বাড়ির চৌকাঠ মাড়িয়েছ বিরূপাক্ষ রায়ের, যে সে তোমার এখানে আসবে?'

'বললুমই তোমাকে। বার চারেক তো খুবই গিয়েছি তোমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়িতে, কিন্তু বিরূপাক্ষবাবু তো একদিনও আমার এখানে আসেন নি-'

'এলে তুমি খুশিও হতে না ক্ষেমেশ। তুমি ঢাকুরিয়ায় গেছ কয়েকবার কিন্তু বিরূপাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে ঠিক নয়, তার সঙ্গে একটা কথা বলেছ কোনদিন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না'। নিশ্চিত সত্যকথনের মত নির্ভাবনায় বললে ক্ষেমেশ। ক্ষেমেশ ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালাটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি কিছু মনে কোরো না জয়তী। ঐ লোকটাকে আমি চিনতে চাইও না।'

'মনে করবার কিছু নেই আমার।'

'তুমি কার সঙ্গে এলে?'

'একাই।'

'এখন তো ট্রাম স্ট্রাইক চলছে।'

'বাস তো বাদুড় ঝুলিয়ে উড়ে বেড়ায় দিন রাত। সেই টালিগঞ্জ থেকে দশ পাড়া ভেঙে অ্যাদ্দুর আমার মতন কোন মেয়েমানুষের একা বাসে চলাফেরা করা অন্যায়–'

'অন্যায় কেন হবে?' ক্ষেমেশ চশমাটা খুলতে চেয়ে তবুও না খুলেই জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তবে বাঙালি মেয়েদের পক্ষে পেরে ওঠা কঠিন।'

ক্ষেমেশ তার ডানহাতের মুঠো সম্পূর্ণ খুলে প্রসারিত করে কররেখার কুটিল বিন্যাসের দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে জয়তীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'বাসে এসেছ? ট্রাম স্ট্রাইকটাকে বাঁচিয়ে দিয়ে? তুমি সবই পার। তুমি কি না পার আমাকে বলে দেবে জয়তী?'–সাত আট বছরের আগের সেই চাঁদ নক্ষত্রাবিষ্ট মানুষের স্বর শোনা গেল যেন ক্ষেমেশের গলায়। কিন্তু তবুও গলা আজ কত অভিজ্ঞ ও আত্মস্থ।

'বিরূপাক্ষবাবুর দুটো গাড়ি আছে?' বললে ক্ষেমেশ।

'আছে।'

'আমি একটা ক্যাডিলাক কিনেছিলুম, বিক্রি করে দিতে হল–'

'কেন?'

'খরচ পোষায় না। আমি তো বাস্তবিক কিছু করছি না–'

'কিছু করছ না? আজকাল তো সমস্ত পৃথিবীই মুখ চেয়ে আছে। দুটো দুটো যুদ্ধে সব ঘাঁটি উড়ে গেল–ভাবুক লোকেরা কাজের লোকেরা কোথায়–এসো; যা ভালো হবে খুব ভাঙবে না আর, সেই সব সৃষ্টি করে যাও,–তাতে সকলেরই তো হাত দিতে হবে। তোমাদের তো বিশেষ করে। তুমি তো গিফটেড ক্ষেমেশ–'

'আমি?' আড়চোখে জয়তীর দিকে একবার তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'উৎখাতের জের চলছে এখনও। তৈরিটৈরি কিছু আরম্ভ হয়নি। সে সবের পরিকল্পনাও ধোঁয়াটে। এখনও কে কোথায় ভাগ বসাবে,–কে কার গ্রাস কেড়ে খাবে–এ নিয়েই হাটরা হাটরি।

'তোমার ঘরে এত সব বই ক্ষেমেশ–চোখে ধাঁধা লেগে যায়।'

'বইগুলো কিনেছিলুম,–আমার বাবার কোন লাইব্রেরী ছিল না। তিনি আজীবন জমিদারি ঘেঁটে গৌসাই মালপো কেত্তনের কুদরতি করে শেষে টের পেলেন ওটা তাঁর নিজের জমিদারি নয়–'

'কি রকম?'

'সে অনেক আইনের মার প্যাঁচ আছে। আমিও বুঝি না–তুমিও বুঝবে না। সমস্ত সম্পত্তিই ছেড়ে দিতে হল তাঁর সৎভাইয়ের নামে। এক ফাঁকে কলকাতার এ জায়গাটা কিনে রেখেছিলেন, তাই মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা আছে।'

'দেশের বাড়িও তো আছে?'

'সেটা বাবার সব নয়–সিকিভাগ বাবার–'

'তিন চার বিঘে?'

'বিঘে দশেক হবে; একটা দেড়তলা বালিরঙরে–বালিহাঁস রঙের দালান আছে–এ ছাড়া মফঃস্বলে আমাদের আর কোথাও কোন জায়গা জমি নেই। ছিল ঢের, বাবার তত্ত্বতদারকে বেড়েও ছিল খুব, কিন্তু মোকদ্দমায় টিকল না কিছু।'

'এই নিয়ে আফসোস?'

'আফসোস কোথায়?' বড় বড় চুলের ভেতর হাত চালিয়ে সমস্ত মাথাকে বসন্ত বাউরার বাসা বানিয়ে স্থির চোখে জয়তীর দিকে একবার তাকিয়ে পলকের মত মাথার চুলগুলো পাট করতে করতে ক্ষেমেশ আকাশ বাতাসের দিকে চোখ ফেরাল আবার; 'তুমি জিনিসটা ঠিক ধরতে পারলে না। বাবা যা যা করে গেছেন সেটায় মশকরার কোন মানে হয় না; করতেও হচ্ছে না; ভালোই হল, আমি বেশি স্পষ্ট কিছু করবার সুবিধা পেয়েছি।'

'সেটাই মিথ্যে কথা।'

'কেন?'

'দশ বিঘে জমি দরদালান মফঃস্বলে–কলকাতায় এত জায়গা জমি ঢালাও ইট সিমেন্টের এই পুরী–এটা সামন্তি আমলের ধ্বংস? সকলের সঙ্গে মিলে যাবার এইটেই যদি সোজা রাস্তা হয় তা হলে অস্পষ্ট অসাধ্য রাস্তাটা কোথায় ক্ষেমেশ? তোমার দেশটা খুব স্নিগ্ধ। স্বপ্ন ভালো; কিন্তু ভিয়েনে চড়লেও সত্যের দরকার বেশি। আমাদের মনে লোকের পক্ষে সত্যেরই দরকার সবচেয়ে বেশি।'

'সত্য কি?' জানতে চাইল ক্ষেমেশ। চোখে চশমায় কেমন একটা ভাবনা সন্তাপে খানিকটা আলোড়িত হয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'তুমি কোন্ পার্টির জয়তী?'

'কিচ্ছুর না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নও? হওয়া তো উচিত ছিল, তেতলার ড্রয়িং রুমে বসে যারা বস্তির লোকেদের জন্যে লড়াই করছে তাদের মতনই তো কথা বলছ তুমি। বিরূপাক্ষবাবুর তিনটে বাড়ি আছে–দুটো গাড়ি–কলকাতার চেম্বার অব কমার্সের তিনি চাঁই। মাথায় খদ্দরের টুপি–হাতে হুন্ডী–রাজনীতিক সভাসমিতিতে গেলে মাইকেও যেতে হয় না, মুখের মুচকি হাসি দেখেই সকলে হাসি মুখে মটকা মেরে থাকে ঃ এ হেন লোকের টাকায় খেয়ে–দেয়ে মুখ মুছে তুমি যদি না এ সব কথা বল তা হলে কে বলবে?'

'কি সব কথা?'

'এই যে সব সত্য অসত্যের কথা আমি অসত্যের পথ ধরে চলেছি বলছিলে–'

'নির্জলা সত্যের পথ ধরে চলেছ কি তুমি ক্ষেমেশ? আমি কি চলেছি?'

'সত্য কি? বললে না তো। বলতে পার?'

'সত্য কি তা তুমি জান ক্ষেমেশ।'

'যা জানি তারই দিকে নাক বরাবর চলেছি। এ ছাড়া কোন উপায় আছে?'

'বাপের টাকায় খাও-দাও পাখি দেখ।'

ক্ষেমেশ তাকাল জয়তীর দিকে। জয়তীর মনে হল ক্ষেমেশ হয়তো বাস্তবিকই নিজের পথ বেছে নিয়েছে। যখন নিজের সবচেয়ে ভালো সাধনার ফলগুলোকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে মানুষের নিজেরই বিজ্ঞান বা সভ্যতা, তখন দু-চারটে লোক যদি এই আত্মমন্থন ও আত্মলোপাটের হইচই ও আহাম্মকির থেকে খানিকটা দূরে সরে তাসের বাড়ির পৃথিবীতে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে তা হলে সত্য কোন দিকে আছে–কিই বা সত্য–আমাদের আজকের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে–সেটা নির্ণয় করা কঠিন–বলা কঠিন। কিন্তু তবুও এ উদঘাতী সভ্যতাকে নিজের ভুল বুঝিয়ে দিয়ে ঠিক পথে চালিয়ে নেবার চেষ্টা করা উচিত। ক্ষেমেশ হয়তো মনে করে ভুলটা স্বাভাবিক; শোধরাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না; সেই বিরাট টিকটিকিরা যেমন করে মরে গেল, নিজের মৃত্যুবীজের স্বতসিদ্ধতায় মানুষও মরতে চলেছে–খুব শিগগির মরতে চলেছে হয়তো। সে যা বিশ্বাস করে সেইটেই তার কাছেও সত্য নয়, হয়তো–কিন্তু ক্ষেমেশের মন খুবই শিক্ষিত স্বাধীন মন যা সত্যিই বিশ্বাস করে সেইটেই তার কাছে সত্য হয়তো?

জয়তীর চোখে মুখে সকালবেলার রোদের ঝলক এসে পড়েছিল। কেমন একটা আলোর সাগরে বারুণীর শাশ্বতী রূপসীর মত দেখাচ্ছিল তাকে। শাড়ির নিচের দিকটায় যে অংশে ছায়া পড়েছে–নীল সাগর শঙ্খ বুদবুদ ফেনা গন্ধ আলো গতি সচ্ছলতার কেমন ভেজা, ঠাণ্ডা, নিরবচ্ছিন্ন অনিমেষ–দেশ সৃষ্টি করেছে–উপলব্ধি করছিল ক্ষেমেশ।

'পাঁচমিশেলি নিয়ে আমাদের জীবন,' ক্ষেমেশ বললে, 'কেউ কি ছাঁকা পলিটিক্স করছে, কিংবা নিছক সাহিত্য? যে যার নিজের দলের মোটামুটি নিয়মগুলোর কাছেও কি সত্য ও সার্থক? তা নয়–সবই সুবিধের ব্যাপার–তাড়াহুড়োর জোড়া তাড়ার জিনিস। কোথাও কারুর হাতে সময় নেই–সব দিকেই দিনরাত পড়ি কি মরি হুড্ডোতে–তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে নিতে হবে– এই হল আজকের যুগের ঘরপোড়া গোরুদের কথা। এখনও চারদিকে তাদের সিঁদুরে মেঘ। মেঘটা ঘনাতেও পারে।'

'তুমিও ঘরপোড়া ক্ষেমেশ এত বড় ঘরবাড়ি নিয়ে?'

'ঘরবাড়ি এক্ষুনি পুড়ে যাবে। যেটুকু সময় আছে আমি পাখি দেখেই দিন কাটাচ্ছি।'

'এর পর তেল মেখে বাঁশের লাঠি পাকাবে হয়তো সমস্তটা শীতকাল।' জয়তী একটু হেসে বললে।

'বাঁশের কাজ করলে আড়বাঁশী তৈরি করব, কিংবা বেত আর বাঁশ দিয়ে চেয়ার টেবিল, চায়ের টেবিল, আরামচেয়ার বানাব। তুমি তালপাতার ব্যাগ তৈরি করতে পার?'

'তুমি পার?'

'দেখছিলুম সেদিন–'

'একা মানুষ; এত জিনিস তোমার। কিন্তু কি সদ্ব্যবহার করছ এদের? তালপাতার ব্যাগ নয়–মানুষ তৈরি হবে না?'

'মানুষ ঃ মানে যারা মারণমন্ত্র, শেল তৈরি করতে পারে? তার চেয়ে যারা তালপাতার ব্যাগ তৈরি করতে পারে তারা বেশি মানুষ। যারা একশোবার করে ইউরোপ আমেরিকায় এশিয়ায় কনফারেন্স পাতায় আর ভাঙে, পরস্পরকে বজ্জাৎ বলে গালাগাল দেয়–একেবারে উৎখাত করে ফেলবার ফিকিরে থাকে, তারাই তো মানুষ এখনকার পৃথিবীতে;–আর তাদের তাঁবেদাররা–ব্যাঙ্ক অফিসে–ডিপার্টমেন্টাল চেয়ারে বসে পৃথিবীর সর্বত্র। এর চেয়ে বেশি মানুষ মনে করি আমি যারা নদীর পারে হোগলার ক্ষেতের পাশে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কি করে বাবুই পাখিগুলো বাসা তৈরি করে, তেমনি শান্তিতে তেমনি নীড় মানুষের জন্যেও তৈরি করবার প্রেরণা পায় তারা, কিন্তু তারপরেই উপলব্ধি করে মানুষ তো মারীবীজ হাঁকিয়ে চলেছে পৃথিবীতে–বাবুইদের সঙ্গে মানুষের তো কোনো মিল নেই–কি করে স্থিরতা পাবে মানুষ পৃথিবীতে–কি করে শান্তি পাবে?'

ক্ষেমেশ বললে, 'এত জিনিস আমার? তা বলতে পার। এই বাড়িটাকে তুমি প্রাসাদ বলেছ ঃ তা হতে পারে। কিন্তু বাড়িটা তো ধ্বংসে পড়ছে। খুব বেশি দিন অবিশ্যি বাঁচব না আমি, মরবার আগে বাড়িটা ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে যাবে মনে হয় না; প্রকৃতির দোহাত্তা মার বাংলাদেশে হয় না; সমাজে রাষ্ট্রে হবে কিনা সন্দেহ; আমার নিজের মনেও ঘরবাড়ি ফাঁসাবার তেমন কিছু ডাকসাইটে নেশা আছে বলে টের পাচ্ছি না। তা হলেও একটা বড়–কিন্তু বড় ভাঙা বাড়িতে আছি–এ বাড়ির কোন অংশও কাউকে ভাড়া দিচ্ছি না আমি। কেন দিচ্ছি না? কেন? কেন দু'বিঘে জমি নিয়ে কলকাতায় আছি? আমিও অবাক হয়ে ভাবি কেন করছি–এ সব? অনেকে দশ বিঘে একশো বিঘে জমি নিয়ে আছে বলে? দশ জায়গায় দশখানা বাড়ি ফেঁদে রয়েছে বলে? পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সভ্য লোকেরা সবচেয়ে বেশি সুখে লালসায় মত্ত বলে? চারদিকে সবাই সকলকে উচ্ছন্ন করছে বলে? হ্যাঁ হ্যাঁ তাই; তাই। আমি ওসব মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাল্টা ঘরের মানুষের মত মৃত্যু হিংসা কামে নয়–খানিকটা পরিসর ও শান্তি খুঁজছি প্রকৃতির ভেতর; এটা কি অন্যায়? খুব বেশি আত্মপরতার প্রমাণ দিচ্ছি আমি! আমারও মনে মাঝে মাঝে খটকা বেধেছে জয়তী। এতদিন নিজের ধর্ম বলে বিশ্বাস করেছি যেটাকে–সেই পাখি আকাশ ঘাসের ওপর শুয়ে থাকাকে সত্যিই অবিশ্বাস করব যখন তখন সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব আমি।'

ক্ষেমেশের এ সব দূর, অব্যয় কথা জয়তীর কানে ঢুকল না হয়তো। জয়তীর মনের ধাঁচ অন্য রকম ঃ তাতে নিবিড়তা আছে হয়তো কিন্তু পরিসর নেই, নিবিড়তাও বেশি নেই, সেটা নলকূপের; অর্জুনের বাতা বাণমুখের নয় যা ভোগবতীকে এনেছিল; কপিল সাগরের মত নয় যাদের বড় কোলাহলের ভেতর থেকে গভীরতার আনন্দ নিয়ে সাগরের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তবুও খুব খাঁটি কথা বললে জয়তী।

'কলকাতায় এমন জায়গা আছে,' জয়তী বললে, 'যেখানে একটা কলে একশো পরিবারের জল সংস্থান করতে হয়; তুমি যে ঘরে বসে একা একা চা খেয়ে লম্বা ছাড়ছ এরকম কামরা পেলে পঁচিশটে পরিবার হাটে হাঁড়ি ভেঙে হেঁসেলে হাঁসফাঁস হয়ে মড়কের ইঁদুরের মত সাবাড় হতে হতে ভাগাড়ের শকুনের মত ঝাপটা মেরে নেচে ওঠে আবার। এ তো মৃত্যু–কিন্তু তবুও জীবনও বটে। জীবন ছাড়া এ আর কী? এ জীবনকে জায়গা দিতে হবে।'

'তা দিতে হবে; কিন্তু এ কেমন ভাষা ব্যবহার করছ তুমি–যা মুখে আসছে তা-ই বলছ। কেমন বাংলা রপ্ত করে নিলে তুমি?'

'বাংলা আমার ঠিকই আছে–ওর জন্যে আমি মাথা ঘামাইনে।'

'কাদের সঙ্গে মিশছ আজকাল তুমি?'

'যারা মানুষের সঙ্গে মেশে তাদের সঙ্গে।'

'তারা কি এ রকমভাবে কথা বলে?'

'তুমি অনেকদিন কারুর সঙ্গেই মেশনি। ভাষা ও চিন্তা কি রকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে টের পাও না তুমি। পরে হবে সে কথা। আমি তোমার বাবার জমিদারির কথা বলছিলুম–'

'মড়াটাকে তো ঘেঁটেছ ঢের–আর কি হবে?'

'কোথায় আর মরল। তেলও কি মরেছে খুব? অনেক আগেই নিকেশ হবে কথা ছিল–তোমার আমার শুধু নয়–সকলের সব জমিদারি–'

'নিকেশ হোক। আমিও তো তাই চাচ্ছিলুম। জমিদারেরা দুঃখ করছে না কি করছে জানিনে। কিন্তু আমি জমিদার নই, দুঃখ নেই আমার।'

'সুখ নেই। তোমাকে দেখে মনে হয়, ক্ষেমেশ, তুমি যদি লুক্রেশিয়সের মত কবিতা লিখতে পারতে, কিংবা রিলকের মত, আমাদের দেশের কৃষ্ণ মজুমদারের মত, কিন্তু কিছুই লিখতে পার না। যদি পারতে তা হলে এই বিষয়সম্পত্তি নিয়ে তোমাকে গাল দিতে যেতুম না আমি। ও সব জিনিস তোমার কাছেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠত তখন, মনে অন্য বোধ আসত, বিষাদ বেড়ে যেত হয়তো, কিন্তু আরেক মূর্তি নিত। মরা জমিদারির জন্যে দুঃখ করতে না তুমি। এমনি মানুষের যা দুঃখ সেখানে তোমার দর্শনের আলো পড়ত–হয়তো তোমার কবিতার–সহজ ভাষায়, তবুও তোমার নিজেরই ভাষায়; সেই জন্যেই তোমার মৃত্যু হত না। লোকেরা পাত না নেড়ে পড়ত ওষধির মত শান্তি দিতে তুমি, শান্তি পেতে।'

দু'কাপ বেশ ঘন চা দিয়ে গেল রঞ্জন।

'তোমার চাকর আমাকে ঠকিয়েছে ক্ষেমেশ।

'কিছু বিস্কুট দাও রঞ্জন। সন্দেশ নিয়ে এসো–এক হাঁড়ি এনো–বড় হাঁড়ি। রকমারি আনবে; এসব নাম তো তোমার মুখস্থ। কি একটা আছে রঞ্জন যা বেলগাছিওয়ালা। খাওয়ায় বালিগঞ্জিনীর প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, নাকি টালিগঞ্জওয়ালী জয়তী তুমি? মফস্বলের জায়গা জমি বাড়ি মা রামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়ে দিয়েছেন। তোমাকে বলেছি কলকাতার এ বাড়ির কোন অংশই কাউকে ভাড়া দিই না আমি।'

'কেন?'

'দিলে ভাড়া দেব না, এমনিই ছেড়ে দেব।'

'কাকে?'

'যাদের খুব দরকারী বেশি।'

'এমন বহু লোক তো আছে কলকাতায়–'

'আছে। মানুষকে ভালোও বাসি আমি। কিন্তু ভেবে দেখছি কয়েকটি পরিবার এনে আমার এখানে বসালে আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'কেন?'

'যে রকম জীবন আমি চালাচ্ছি সেটা সম্ভব হবে না আর।'

'তুমি কি একেবারেই একা থাকতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'একেবারেই একা?' জয়তী আবার জিজ্ঞেস করল–ক্ষেমেশেরই শুধু নয়–'পৃথিবীর সমস্ত নিঃসঙ্গ লোকদেরই প্রাণের কাছে এসে পড়ে কেমন দায়ভাগিনীর মত যেন।

'কেঃ আমি?' ক্ষেমেশ একটা আকাশগামী হাঁসের মত বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতায় পাশের মরালীকে দেখে নিল যেন একবার, তার পরে ডানার বেগে উড়ে যেতে লাগল আবার ঃ নীলিমা-কণিকা রাশির ভেতর দিয়ে সোঁ সোঁ করে চলেছিল যেন তারা দু'জনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়তী বললে, 'আছে মানুষ আছে খুব শ্রদ্ধা করবার ভালোবাসবার মত। তবে এও একরকম মন্দ করনি তুমি, পাখি দেখছ, আকাশ নক্ষত্র দেখছ। কিন্তু কোন সময়ই কি কাছে গিয়ে বসবার মত একজন মানুষের সঙ্গে দেখা হয় না?'

'এই তো হয়েছে; আজ হল, অনেকদিন পরে।' ক্ষেমেশ বললে। কথাটাকে একবার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তার পরিণতি অনুসরণ করতে গেল না ক্ষেমেশ, জয়তীর মুখের দিকেও তাকাতে গেল না; দূরের ঝাউগাছে একেবারে উঁচু ডালপালায় একটা কাককেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছিল—অবাক হয়ে দেখছিল।

'শুনেছি তুমি তোমার বাবার বাড়িতেই বেশি থাকতে? বিয়ের পরেও?'

'হ্যাঁ, এবারেও যেতুম বাবার ওখানে, কিন্তু চলে এলুম তো বেলগাছিয়ায়।'

'বিয়ে তো তোমার বছর তিনেক হল হয়েছে?'

'তা তুমি গুণে ঠিক কর ক্ষেমেশ।'

'কতদিন ঘর করলে বিরূপাক্ষের সঙ্গে?'

'মাস পাঁচ-ছয়।'

'মোটে? কেন?' ক্ষেমেশ বললে, 'সেদিন গান্ধী কলকাতায় এসেছিলেন। আমাকে ঘাড় ধরে নিয়ে গেল রঞ্জন। গেছলুম। দর্শনের জন্যে যে ভিড় জমেছিল তার ভেতর তোমাকে দেখলুম মনে হল, গিয়েছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ গিয়েছিলুম, তুমি কোথায় ছিলে? দেখিনি তো তোমাকে। ওমা, আমাকে দেখেছিলে! আমাকে দেখলে তো কাছে এলে না কেন? কোথায় বসেছিলে তুমি?'

'গান্ধীকে দেখতে যেতুম না, রঞ্জন আমাকে টেনে নিলে। না হলে সেদিন আমার ডায়মন্ডহারবারের দিকে যাবার কথা ছিল। শুনেছিলুম নতুন পাখি এসেছে ওদিককার জঙ্গলে।'

'পাখি দেখা হল না তবে?'

'না। গান্ধীকে দেখাবেই রঞ্জন। আমি তো দেখেছি একবার এর আগে। আবার কেন? বলছিলুম রঞ্জনকে। কিন্তু যেতে হল।'

'একবার দেখেছ মাত্র?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'কোথায়?'

'ক্ষেমেশ মনে করতে চেষ্টা করে বললে, 'অনেক জায়গায় দেখেছি, কোথায় ঠিক মনে পড়ছে না।'

'ছবিতে দেখেছ ক্ষেমেশ।'

'তা হবে। সেদিন গেলে সোদপুরে; আলো পেলে জয়তী?'

'আমি তো তোমার মতন বলছি না যে, কোথাও মানুষ নেই। মানুষ আছে, অনেক আছে।'

'সোদপুরে আলো পেলে?'

'মাঝে মাঝে আলোর উৎসের কাছে যেতে হয়। আমাদের নিজেদের বিচার হয়তো অন্য রকম, কাজ আলাদা প্রকৃতি আলাদা। কিন্তু তবুও যে সব মানুষ এরকম অশান্ত পৃথিবীতে এতদূর শান্তি, সত্য পেয়েছে তাদের কাছে গেলে ভালো হয়। হয়তো কিছু পাওয়া যায় কিংবা পাওয়া যায় না। কিন্তু গান্ধী নিজে উপকার পেয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর পথে চলে অনেকে;—বুঝতে পেরে আশা আসে মনে। সেটা লাভ। চারদিককার পৃথিবী তো বলছে আশা নেই। সেটা ক্ষতি।'

'বিরূপাক্ষকে বিয়ে করেছিলে বলে সোদপুরে যাওয়ার দরকার হয়েছিল তোমার।'

ঝাউগাছের অনেক উঁচুর ঝিরঝিরানির দিকে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'কোনো পাখি নেই সেখানে এখন আর।'

'তার মানে?'

'তা না হলে তুমি যেতে না যে তা নয়, কিন্তু এতটা তাড়া থাকত না। বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছিল সব, এত বেশি ভালো লাগল তাই।'

'যেন মহাত্মার নিজের কোনো আকর্ষণ নেই?'

'তা আছে। প্রভাব আছে। সব আছে। সোরহাবর্দিও তা বোধ করছেন। আমি যা বলেছি তা অস্পষ্ট নয়।'

ছাব্বিশ

জয়তী ক্ষেমেশের বাড়িতেই কিছুদিন থাকবে ঠিক করেছে। একদিন তো কাটল। পরদিন সকালবেলা ক্ষেমেশের পড়ার ঘরে, (এইটেই বসার ঘরও ক্ষেমেশের) বসে চা খাচ্ছিল জয়তী আর ক্ষেমেশ।

'বাড়ি ভাড়া দাও না, তোমার কোন আয় নেই তা হলে?'

'না।'

'চলে কি করে?'

'ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে এখনও।'

চাকর বিস্কুট ও সন্দেশের হাঁড়ি ও দুটো বড় দুটো ছোট চীনেমাটির রেকাবি একটা তেপয়ের ওপর সাজিয়ে জয়তীর কাছে রেখে গেল। চায়ে টাগরা গলা টনসিল পুড়িয়ে (ভালো লাগল জয়তীর, ঠাণ্ডায় কেমন ব্যথা করছিল গলার ভেতরটা) একটা দুটো চুমুক দিয়ে জয়তী বললে, 'ব্যাঙ্কে কত টাকা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হাজার পঞ্চাশেক হবে।'

'সুদ খাচ্ছ?'

'আসলে হাত দিতে হয়।'

'প্রতি মাসেই।'

'হ্যাঁ। বিরূপাক্ষের তো পঁচিশ লাখ আছে।'

'কি জানি।' অনেক দূরে যে নির্ঝর ঝরে পড়ছে সে তো রক্তের, আমি জলের খোঁজে যাচ্ছি ঃ মনে হল যেন জয়তীর কণ্ঠ শুনে।

'ক্ষেমেশ, তোমার নিজের রোজগারের কোনো পথ নেই?'

'না, কোন ব্যবসা-ট্যাবসা করছি না। চাকরি করব না।'

'ইচ্ছে ক'রে কি মানুষ চাকরি করে? তোমার চেয়েও অনেক বড় প্রতিভাবান মানুষের চাকরি করে খেতে হচ্ছে। অবোধ অবুঝের গোলামী করে জীবন পণ্ড হয়ে যাচ্ছে তাদের। ইশাকেও ভেড়ার পাল চরাতে হয়েছিল। কি করবে—এ ছাড়া উপায় নেই তো। খাওয়া-পরার স্বাধীনতা চাই তো মানুষের।'

'স্বাধীনতা আছে আমার', ক্ষেমেশ জয়তীর মনকে ঠেক ধার দিয়ে বললে, 'ব্যাঙ্কের টাকা আছে। দায় পড়লে আমারও চাকরি করতে হত। সে রকম দায়ে এখনও পড়িনি আমি। পড়তে হবে একদিন; তখন ঠিক করে নেব পথ। চা খাচ্ছ না? সন্দেশ রেকাবিতে সাজিয়ে দাও।'

'তুমি খাবে?'

'খাব বইকি! তুমি কি একাই খাবে সব?'

'কটা এনেছে?'

'গোটা পঞ্চাশেক হবে। একা খেতে পারবে?'

'এত সন্দেশ কি হবে?'

'ও-বেলা খাব, রঞ্জনকে দেয়া যাবে, কালও খেতে পারা যাবে, এক-আধ দিনে সন্দেশ নষ্ট হবে না!'

রেকাবিতে সন্দেশ সাজাতে সাজাতে জয়তী মনে মনে ভাবছিল ঃ কেমন একটা ভাঙা সোঁদা সোঁদা জমিদারি মেজাজ এখানকার সবদিকেই। বড় হাঁড়ি-অঢেল সন্দেশ-নিঃসাড় ঘরদোর পুরী-মুনাফা নেই, ব্যাঙ্কের টাকা আছে, তবুও নেই; ব্যবসা নেই, চাকরির মত গোলামী কে করে; পাখি উড়ছে; বাড়িটা এত বেশি বন-জঙ্গল আগাছায় ভরে আছে যে, সে সবের ভেতর দিয়ে একটা গোরু বা বাছুর চলে গেলে বিদ্‌ঘুটে সবজির গন্ধ ছড়ায় চারদিকে, বিশৃঙ্খলভাবে জন্মেছে সব গাছপালা, এবড়ো-খেবড়ো ফসল, অদ্ভুত সব আগাছার চাঁদয়ারি; সবুজ বটে, কিন্তু তবুও এগুলো সত্যিই কি সেই সবুজ? প্রকৃতি বটে, কিন্তু তবুও কি প্রকৃতি? ক-খ লাহার বা গ-ঘ পালচৌধুরীর সাজানো বাগানবাড়ির প্রকৃতির ভক্ত নয় অবিশ্যি জয়তী, কিংবা শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের, কিন্তু তবুও ক্ষেমেশের বাড়িতে কোনো সুযোগই দেওয়া হয়নি যেন প্রকৃতিকে; অরণ্যের মাহাত্ম্য নেই এখানে, বাগানবাড়ির কাঁচিছাঁটা শৌখিনতা নেই। প্রকৃতি নেই। আছে? ভালো করে তাকাল আবার অনেক গাছ, অনেক লতা, আগাছার বিস্তর সমৃদ্ধির ভয়াবহতার শোকাবহতার দিকে; কেমন যেন মনটা লাগল জয়তীর। জীবনের গল্প ফুরিয়ে গেলে এ-সব ঝোপ-জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে এদেরই ভেতর মিশে যেতে হয় একদিন; সময় কাজ করতে থাকে তারপর, নিওলিথ মানুষের কথা আর মনে থাকে না কারুর।....ক্ষেমেশ তো আট বছর আগেও অক্‌সফোর্ড যাবে ঠিক করেছিল, ডিগ্রী আনবার জন্য। গ্র্যাজুয়েট হয়ে ফিরে এসে একটা কলেজে প্রফেসারি পেত হয়তো। সেও তো এই জিনিসেরই রকমফের; কিংবা ব্যারিস্টারি পাস করে এলে ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ হাজার হয়তো বড় জোর পাঁচ লাখে দাঁড়াত। কী হত তাতে। জীবনে একটু অদ্ভুত বলাধান হত হয়তো; মন আকাশের বিদ্যুতের মত নয়—এ-সি ডি-সি কারেন্টের মত চমকে হুমকি দিয়ে বসত; বেশি দৌড়-ঝাঁপ করলে করিতকর্মা পুরুষ হয়তো ওরা বলত ক্ষেমেশকে; কেউ কেউ বলত লোচ্চা বদমায়েশ—ক্ষেমেশের ব্যক্তিক জীবনের এক ঝুড়ি কেলেঙ্কারি রটিয়ে বেড়াতে ওরা। কী হত এই সবে।

পরের দিনের সকালবেলা এল। ক্ষেমেশের বসবার ঘরেই বসেছিল দু'জনে। বিশেষ কোনো ব্যক্তির হতচ্ছাড়া নষ্টচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে নয়—এই অনেক দিনকার উইয়ে কাটা ঘৃণে খাওয়া ভালো খারাপ সুন্দর কাতর পৃথিবীটার কথা মনে করে নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এসেছে। ক্ষেমেশ যাতে টের না পায় এমনি করে হাল্কা নিঃশ্বাস ছাড়তে চেষ্টা করল জয়তী; কিছু পারল, কিছু পারল না।

'তোমাকে কেমন গম্ভীর দেখছি।'

'আমি কথা ভাবছিলাম ক্ষেমেশ; এক-আধটা কথা এসে পড়ল—দেখছি—হাসিমুখে ভাবতে পারি না।'

'কথা ভেবে কোনো কিনারা পাবে না দেখ কেমন চমৎকার রূপশালি ধান-দূবোর পাড়াগাঁর মত রোদ চারদিকে; আকাশে কত যে সাদা মেঘের পাল চিকচিক করছে। সূয্যির হাতে থোকা থোকা বকফুলের পাপড়ির মত ছিঁড়ে পড়ছে লোটন পায়রাগুলো। ভোগবতী দেখনি কোনোদিন, দেখবে না। কিন্তু আকাশ-গঙ্গা দেখ। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ জয়তী। কবেকার কথা মনে পড়িয়ে দেয় এজন্মের ওজন্মের কত দেশের দূর দেশের।'

'কই, তুমি তো অক্‌সফোর্ডে গেলে না?'

'না, সে আর যাওয়া হল না। বাবা মোকদ্দমায় আটকে গেলেন—'

'চাকরি না কর ব্যবসায় আপত্তি কি?'

'টাকা নেই।'

'পঞ্চাশ হাজার তো রয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আজকালকার বাজারে ওতো চণ্ডুর পাশে তামাকের ছিলিম, ওতে কোন কাজ হয় না। ব্যবসার কথা পাড়লে যখন, আমি একটা কথা তোমাকে বলি–'

ক্ষেমেশের মস্ত বড় সোফাটার এক কিনারে গিয়ে বসল জয়তী, দু' রেকাবি সন্দেশ সাজিয়ে তে-পয়টায় রাখল দু'জনের মাঝখানে। সন্দেশ নিয়ে সাধতে গেল না সে ক্ষেমেশকে। নিজে তুলে নিল গোটা দুই। চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, আমি বুঝেছি কি করতে হবে আমাকে। বিরূপাক্ষের লাখ পাঁচেক টাকা বার করে ক্যাপিটালের জোগাড় করে দিতে হবে তো?'

ক্ষেমেশ এক সঙ্গে দুটো সন্দেশ মুখে পুরে একটা উড়ন্ত পাখির পানে–পাখি ফুরিয়ে গেলে–নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। 'তোমার তো দু'তিন বছর ধরে এ জিনিসটাই চাচ্ছ।'

'আমরা কারা?'

'আমার বিয়ের আগে আমাদের বাড়ি যারা আনাগোনা করত, তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে মাঝে মাঝে; কিন্তু তাদের সমস্ত কথাবার্তাই শেষ পর্যন্ত বিরূপাক্ষের তিন-চার-পাঁচ লাখে গিয়ে দাঁড়ায়, পঁচিশ লাখের ভেতর পাঁচ লাখের দাবি তাদের; বিরূপাক্ষের ভাণ্ডারী আমি; আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্কে খাজাঞ্চির সঙ্গে মাছির যা। মাছি মধু খায়? না খাজাঞ্চিকে?'

ক্ষেমেশ একটা সন্দেশ মুখে গলিয়ে দিল (আগের দুটো হয়ে গেছে তার), একটু সময় কাটিয়ে আর একটা; বললে, 'খাজাঞ্চিকে খায় মাছি।'

জয়তী মুখ 'বেঁকিয়ে হেসে বললে, 'কেন?'

'তবে কি খাজাঞ্চিকে ছেড়ে মধু খাবে মাছি? মাছি কখনো টাকা ছেড়ে মধু খায় শুনেছি কি?'

ঘরের পাশেই বুনো বেগুনের ছড়ানো পাতার ওপর একটা ছোট্ট পাখি এসে বসেছিল ঃ এত হাল্কা যে পাতাটা নুয়ে পড়ছিল না, কাঁপছিল না। পাখিটার দিকে তাকিয়েছিল ক্ষেমেশ ঃ কি নাম পাখিটার? খুব গাঢ় সবুজ, লাটিমের মত ছোট; শীতের সকালে খুব চমৎকার আনকোরা সবুজ মখমলের জামা পরে এসেছে মনে হয়। কি নাম? উড়ে গেল পাখিটা।

ক্ষেমেশ বললে, তুমি বিরূপাক্ষের খাজাঞ্চি হয়ে দাঁড়িয়েছিলে বুঝি? ওরা সেইজন্যেই তোমার কাছে যেত? যেত, একেবারে কেটে পড়েনি তো; সম্পর্ক একটা রেখেছে শেষদিন পর্যন্ত তোমার সঙ্গে।'

'তা রেখেছে ক্ষেমেশ। রঞ্জনকে আর এক কাপ চা করে দিতে বলবে?'

'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে?' ক্ষেমেশ এক টি-পট চায়ের হুকুম দিল।

'এক টি-পট বলেছি আমি? চাকর বাকরের সামনে গেঁজেল বানিয়ে ছাড়বে দেখছি।'

'রঞ্জন গেঁজেলদের খুব শ্রদ্ধা করে।'

'খুব বড় টি–পট তো তোমার। ওরকম তাউস টি-পটের গেঁজেল আমি নই।'

'তুমি খাবে, আমি খাব, বাকি থাকলে রঞ্জন খাবে। চা-খাও, চা-খাও। শীতের সকালে চা।'

'চা এল। জয়তী ক্ষেমেশের কাপে ভরে দিল, নিজের পেয়ালাও ভরে নিল।'

'টি-পটে অনেক চা আছে ক্ষেমেশ।'

'খাচ্ছি। ওটা পরে খাব।'

চায়ে দু'বার চুমুক দিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'রোজগার করবই এরকম একটা হস্তদন্তভাবে না চলে মানুষ যদি খুব স্থির মনে ধীরে সুস্থে টাকা উপায়ের পথে যায়, তাহলে তার অভাব হয় না। মন দিয়ে ভালো করে লিখে একটা ইংরেজি আর্টিকেল তৈরি করতে আমার তিন-চার দিনের বেশি সময় লাগে না। এজন্যে আমি পঞ্চাশ, পঁচাত্তর, একশো টাকাও পাই, বেশিও পাই।'

'ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখ, বাংলায় লেখ না?'

'লিখব ভাবছি।'

'এইবার শুরু করে দাও। বিরূপাক্ষের কাছ থেকে কি পাঁচ লাখ চাইছ তুমিও।'

'যোগাড় করে দিতে পারলে সুবিধে হত।'

'কি করতে?'

'গোটা চারেক প্রেস কিনতাম।'

'এত টাকা লাগে তাতে?'

'শুধু জব প্রিন্টিঙের প্রেস তা নয়।'

'ওঃ বির্লাটির্লার চালে; খবরের কাগজও বেরুত একটা?'

'ক্ষেমেশ চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে পেয়ালাটা ডান হাতে ধরে রেখে বললে, 'না, না, খবরের কাগজ আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। আমি পড়ি না ও-সব।' তাচ্ছিল্য বেদনা করুণা ঘেন্নায় কেমন কঠিন হয়ে উঠল যেন তার মুখ। ক্ষেমেশের পেয়ালার চা ফুরিয়ে গেছে টের পেয়ে জয়তী টি-পট থেকে চা ঢেলে দিতে দিতে বললে, 'বল কি হে খবরের কাগজ পড় না, আমি তো চায়ের পেয়ালা মুখেই তুলতে পারব না একদিন কাগজ না পেলে।'

'পৃথিবীর সব খবরই আমার জানা। মানুষ সভ্যতা গড়ছে ভাঙছে; ক্রমেই বেশি ভাঙার দিকে তার রোখ, অশান্তির দিকেই ঝুঁকে পড়ছে বেশি। তবুও উৎরে যাবে–হয়তো শ্মশানের শান্তিতে কিংবা অন্য কোনো এক ঠাণ্ডা–আগেরটার চেয়েও ঢের ঠাণ্ডা ইন্ডাস্ ভ্যালির সভ্যতায়। মানে মৃত্যুতে? না, জীবনেই; ভালো সত্য শান্ত স্নিগ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে ও-সব হবে না কিছু। আমাদের আজকের হইচই যা নিমেষে চোখ ধাঁধিয়ে মনে হয়, সে সভ্যতার কোন রং নেই–অর্থ নেই–কিন্তু শান্তি আছে।'

নিজের পেয়ালার চা ঢালতে ঢালতে জয়ন্তী বললে, 'কাগজও বের করবে না, এত প্রেস কিনতে চাচ্ছ?–'

'পাঁচ লাখ যোগাড় করে যদি দিতে পার আমাকে–'

'না অসম্ভব। কাউকে দিই না।'

'তাহলে–'

'তোমার এখানে থাকব বলেই আমি এসেছি।'

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে ক্ষেমেশ বললে, 'বিরূপাক্ষ কলকাতায় আছে? তুমি যে এখানে এসেছ তা জানে? না কি না জানিয়ে এলে। অবিশ্যি তোমার নিজের ব্যাপারে কেমন যেন শিশুর মতন ঠেকছে ভদ্রলোককে আজকাল।'

'তুমি ওকে আমল দিতে না, তবুও বিয়ে করলে। বিয়ে করে ঘর সংসারে ঢুকে গেলে বলেই তো মনে হল; একদিন নয়–কটা বছর। এ-সব কি করে সম্ভব হল আমাদের কুশপুতুলের মত গ্লাথা ঘামিয়ে যদি তা বুঝে দেখতে চেষ্টা করতুম–' বললে, ক্ষেমেশ।

আরো বলত, 'কিন্তু বাইরে শূন্যের ভেতরে কি যে কি দেখে চুপ করে থেমে গেল।

'কি হত তাহলে?'

'সমস্ত রাত ভয়ে যেখানে ছায়াপথ ছিল–ক্ষেমেশ জানালার ফাঁক দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সেই কোটি কোটি শতাব্দীর কোটি কোটি মাইল আকাশের দিকে চেয়ে থেকে পৃথিবীর–জয়তীর দিকে ফিরে বললে তারপর, 'জয়তী এসেছ।'

ক্ষেমেশের গলায় অনেকদিনকার আগের মোমশিখার কাঁপুনি যেন–কেমন যেন গম্ভীর, স্নিগ্ধ শাদ্বল এবং সংকল্প উজ্জ্বল; কিন্তু অভিজ্ঞ ও সমাহিত বটে; তবুও একটু চিড় খেতে খেতে আপত্তি নেই। সেই ছ্যাঁদার পথ ধরে যে বালি ঢুকে পড়তে পারে সেদিকেও লক্ষ্য যে নেই তা নয়।

জয়তীর চোখ ঠোঁট থুতনি আঁটিসাঁটি হয়ে উঠল খানিকটা।

'আমি এ বাড়িতে এসেছি।'

'তা তো দেখছি।'

'ও-পাড়ায় বিরূপাক্ষ আছে তার নানান গরম নিয়ে; আমি চলে এসেছি বলে যে সে আমাকে ছেড়ে দেবে তা মনে হয় না। দেখে নেবে সে। ব্যাপারটা মোটেই সোজা নয়। তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না আমি। তুমি না থেকে কোন শক্ত লোক যদি এ বাড়ির ছেলে হত, তাহলেই স্বস্তি পেতাম।'

জয়তীর কথা শুনে ক্ষেমেশ ভালো বোধ করল না, কেমন একটা আক্ষেপের হাসি ফুটে উঠল তার মুখের ভেতরে। ক্ষেমেশ যে শক্ত মানুষ নয়–নরম মানুষ নয়–তা জানে জয়তী। অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে (এক সুতীর্থ ছাড়া) মিতভাষী জয়তী। কিন্তু ক্ষেমেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে ক্ষেমেশের মত মিতভাষী নয়। এই মেয়েটি যদি ক্ষেমেশের যৌন ও জীবন সাহচর্যে এসে পড়ে–যেমন ক্ষেমেশের মা এসেছিল তার বাবার জীবনে তার চেয়েও প্রাণঘন ও ধীসরস গভীরতায়–তাহলে তা আর কি–ভালোই হয়–খুব ভালো হয়। এর চেয়ে বেশি ভালো–এক ঝাঁক সাগরগামী হরিয়াল সারস যদি আজ সকালবেলা এখানে এসে পড়ে, তাতেও হবে না। ক্ষেমেশ কে কি বিয়ে করবে–শুধু কাঁচা শুধু কালো–রাত্রির অপরিমেয় প্রহরের মত চুলের গুচ্ছ নিয়ে যে মেয়েটি বসে আছে রাত্রিকে যা দেবার দিনের উজ্জ্বলতাকে যা দেবার ঃ কারণ শরীরে ভেতর থেকে যা দান করে? ভাবতে ভাবতে সাগযানী হাওয়া আলোর–হরিয়ালদের কথা মনে পড়ল আবার ক্ষেমেশের। সে সব হরিয়ালের রৌদ্র কোলাহল যদি এসে পড়ে এখন–

'তোমাকে একটা আলাদা ঘর ছেড়ে দিচ্ছি জয়তী; যেটা খুশি। কিন্তু কি করে একা থাকবে তুমি; একজন ঝি আনিয়ে নেবে? আমি তোমাকে যোগাড় করে দেব?'

'ঝির ব্যবস্থা পরে করা যাবে। এক্ষুণি না পেলে জলে পড়ব না আমি। জ্যান্ত বা মড়া ভূত চিমড়ে মামদোর ভয় নেই আমার। সন্দেশ খাচ্ছ না তো?'

'আমার গোটাদশেক হয়ে গেছে। তুমি এখানে থাকছ তবে?'

'হ্যাঁ। বেশ কিছুদিন–'

'বুঝেছি।'

'বসবাস করতে এসেছি তোমার এখানে। বিরূপাক্ষের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছে ক্ষেমেশ।'

'কেন হল?'

'হয়ে গেল।'

'আর যাবে না ওখানে?'

'বোকার মত কথা বলছ কেন ক্ষেমেশ?'

'একেবারেই ছেড়ে এলে, অথচ বিয়ে করেছিলে। বিয়ে করবার সময় মানুষের মন সমুদ্রের ফিনফিনে কাঁকড়ার মত পথ খুঁজে পায় না–ফেনাবাতাস ওড়ে?'

'সেই রকমই উড়েছিল ক্ষেমেশ, দেখছ তো।'

'টি-পট থেকে খানিকটা চা ঢেলে নিয়ে জয়তী বললে, 'চলে এসেছি। চলে এসেছি কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু আইনের মারপ্যাঁচ আপাতত সম্ভব হয়ে উঠছে না। কিন্তু আইন বেআইন সবের ওপরেই মানুষের মন। আমি ওখানে আর যাব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেমেশ চায়ের পেয়ালা একবার ঠোঁটের কাছে নিয়ে আবার কি মনে করে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে জানালার বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রইল। মাথায় ঘুরছিল যেন অনেক পাখি, অনেক ছবি ক্ষেমেশের। সেই সাত সকালে রানী সারসদের কথা মনে পড়েছিল তার। মনে হতেই কেমন বোশেখী বিদ্যুতের মত মিলিয়ে গেছিল তারা, অন্য সাংসারিক দশ কথার চাপে পড়ে। ছ্যাঁৎ করে রাজসারসদের কথা মনে পড়ল ক্ষেমেশের আবার। এখানে যদি একপাল রানীসারস চলে আসে এখন! তা যদি হয়, তাহলে আর কিছুই চায় না, কেমন যেন এক মন্ত্রসিদ্ধি জানা আছে ক্ষেমেশের যাতে সে সমুদ্র হতে পারে, হতে পারে সিন্ধু ফেনা, উজ্জ্বল সূর্যের দিন, কত শত সারস শরীর মনের কত বিশ্বন্তর আগুনে বাতাসে নক্ষত্রে বর্ণালিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

জয়তী চা খাচ্ছিল—টি-পটের থেকে শেষের তলানিটুকু ঢেলে নিয়ে—মাথা হেঁট করে। ক্ষেমেশের মুখের দিকে তাকাবার কথা মনেই ছিল না তার। নিজেরই নিতান্ত সব—কি যেন ভাবছিল জয়তী। ক্ষেমেশ এখনও সারসদের কথা ধ্যান করছিল—জয়তীরও কথা। ও সব রানী সারস বাংলার পাখি নয়, কিন্তু আলোকসামান্য পাখি ঃ জঙ্গল পাহাড় ভেদ করে যে সব বহতা নদীর জল ছলকে জলছানি দিয়ে নীলিমাকণিকা সূর্যগুড়ির উচ্ছ্বাসে উৎফলিত হয়ে পাথর উল্টে, শ্যাওলা ছিঁড়ে পায়রাচাঁদা চাপেলী নাচিয়ে শরবন কাঁপিয়ে কলরোল করে চলেছে, সে সব অবিরল জলঠাণ্ডার দেশে জলগন্ধের দেশে—জলঠাকুরাণীর—জলদেবীর—নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ প্রবাহের ভেতর এই সব পাখি থাকে। ভাবতে ভাবতে ভাবনার মোড় ঘুরে গেল ক্ষেমেশের অর্থ অন্তঃস্রাবার বলদে গেল, এতক্ষণ যে ক্ষেমেশের ভাবনা—তন্ময়তা অবাস্তব ছিল তা নয়, কিন্তু আমরা যাকে বাস্তব বলি প্রায় সেই প্রদেশে ফিরে এল ক্ষেমেশের মন। সাগর সূর্য পালক পশম কি এক দিব্যি ফোকাসের আলো অন্ধকার থেকে উদগত হয়ে যে জয়তীর সঙ্গেও মিশে যাচ্ছে হঠাৎ তা টের পেয়ে মনের ভাবনার খেইয়ে একটা ঝাঁকুনি লাগল—একটু শব্দ করে হেসে ফেলল ক্ষেমেশ।

জয়তী ঘাড় হেঁট করে নিজের মনের পথে হেঁটে অনেক দূর চলে গিয়েছিল যেন—ক্ষেমেশের হাসির শব্দ শুনতে পেল না সে হয়তো ক্ষেমেশের দিকে ফিরে তাকাল না। কেমন সুন্দর সব পাঁচটিকে—এমন কি ছটিকে ছাড়িয়েও কেমন যেন এক সপ্তম ইন্দ্রিয় দেখাচ্ছিল যা এতক্ষণ ক্ষেমেশকে সুন্দর জয়তীও; ভাবছিল ক্ষেমেশ; কিন্তু তবুও দুটো মনচ্ছবি যদি ওরকম ওতপ্রোতোভাবে মিশে যায় (জয়তীর শাড়িটা রোদে ছায়ায় যে রকম কমলা বাসন্তী সাদা গেরুয়া আভার দেখাচ্ছে তাতে না মিশে পারে না আর।) জয়তীকে তাহলে পাখিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার শক্তি থাকে না আর—দৃষ্টিভঙ্গির গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায় ক্ষেমেশের এমনই স্খলন হয় সে সুন্দর জিনিস দেখেও হাসি পায় তার, হাসি মুছে যায় আস্তে আস্তে ছায়া পড়ে হৃদয়ে—কেমন যেন করুণার পাত্র মাঠ বন পাহাড় মৃত্যুর পাখি—আর এই জয়তী পাখি—দেখ, কেমন মাথা উপুড় করে চুপচাপ কথা ভাবছে। হাসল না এবার ক্ষেমেশ, মন করুণ স্নিগ্ধ হয়ে উঠল তার। তবুও তারপর আগাগোড়া এই সব পাত্রপাত্রীর দিকে এবং এই সকলের দিকে তাকিয়ে আছে যে ক্ষেমেশ তার দিকে তাকিয়ে পরিহাস বিশুদ্ধি পেল তার—দুর্নিবার ব্যাপ্তি পেল হাসির বলয়। এই সচ্ছল, অনুপম বিমুক্তি না থাকলে করুণ। এসে মানুষকে বেশি নিস্তব্ধ করে ফেলে—নিজেকে এই পৃথিবী গ্রহের উপযুক্ত মনে হয় না আর।

'আমি মাকে এলাহাবাদ থেকে এখানে নিয়ে আসব। তোমরা এক সঙ্গে থাকবে। আমি আজই যদি এলাহাবাদে যাই রঞ্জন তোমার ঘরের রোয়াকে শোবে।'

'না, মাসিমাকে এখানে আনতে পারবে না।'

'কেন?'

'ওঁরা হলেন সেকালের লোক। মুখ দেখাতে পারব না।'

'কিন্তু মুখ দেখাবার দরকার হবে তো—পৃথিবীতে থাকতে হলে। চেড়ী—রাজ্যে অশোকবনে ছিলে—চলে এসেছ। তোমাকে ঘিরেছে কেমন একটা আচ্ছন্ন অশোকবনগ্রন্থি—সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।'

জয়তী একটু হেসে বললে, 'সত্যি কোনো গ্রন্থি নেই আমার—পণ্ডিতরা যেই বলুন না কেন। মাসিমাকে এখন এলাহাবাদ থেকে আনার দরকার নেই।'

'এক-একটা পুরোনো দালানে নাগকন্যা থাকে। চোখে না দেখলে বুঝতে পারা যায় না যে রূপ মানে কত রূপ। কিন্তু চোখে তাকে দেখা যায় না। জয়তী, তোমাকে তো দেখেছি। তুমি কি করে মানুষের চোখ এড়িয়ে নাগকন্যা হয়ে থাকবে?'

'চোখে তো দেখছ,' রোদের ভেতর ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে ঘুম এল না—আলাদা পটভূমি এল আলাদা সূর্য জেগে উঠল জয়তীর মনে; কিন্তু পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের থেকে সেটা বিচ্ছিন্ন নয়, এই সূর্যেই তো; আকাশের দক্ষিণ কিনারে—দূরত্বে—কাছেই; জয়তী আস্তে আস্তে বললে, 'সুতীর্থ কোথায়?'

'সুতীর্থ কে?'

'সুতীর্থ গুপ্ত—চেন না?'

'ওঃ, তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কয়েকদিন আগে। কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলুম।'

'বিরূপাক্ষের একটা বাড়ি আমার নামে লিখিয়ে নিয়েছি।'

'কটা বাড়ি ওর?'

'গোটা তিনেক।'

'এর ভেতর একটা তোমার?'

'হু, আইনত, দলিলপত্র আমার কাছে আছে।'

কথাটা ক্ষেমেশের কানেই গেল না যেন—কাছেই একটা সজনে গাছের হাল্কা ডালে ঘাসের চেয়েও বেশি গাঢ় সবুজ একটা পাখি বসেছিল। সচরাচর এরকম পাখি দেখা যায় না—কেমন একটা হেমন্তগভীর দৃষ্টিলাবণ্য নিয়ে পাখিটার দিকে তাকিয়েছিল ক্ষেমেশ; কি নাম এই পাখিটার? বাংলা নাম কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পাঁচ লাখ টাকা ক্যাশ নিয়ে এসেছি।'

'ব্যাঙ্কে তোমার নামে রেখেছিল বিরূপাক্ষ?'

'রাখিয়েছিলুম।'

'কোন ব্যাঙ্কে? গিয়ে খতিয়ে দেখেছ তো নিজের চোখে–'

'লয়েডসে, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়ায়, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে আরো আছে এদিকে সেদিকে। ঠিক আছে।'

ক্ষেমেশ চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'বাড়িটা ভাড়া দিয়েছ?'

'না। ভেকেন্ট পজেশন।'

'বাড়িটা কোথায়?'

'বালিগঞ্জে। ভাড়াটে বসাব নিচের তলায়। ওপরে তিনটে কোঠা আছে–আমি থাকব।'

ক্ষেমেশ জানালার ফাঁক দিয়ে একটা উড়ন্ত আগন্তুক পাখির দিকে নিঝুম হয়ে তাকিয়েছিল; কি প্রগাঢ় নীলের তেজ কেমন ফিকে নীলে মিশে গেছে; কমলা লেবুর রং সোনালী হয়ে যাচ্ছে; বুকের কাছে দুধের মত সাদা পালক। কী নাম এই পাখির?

'বিরূপাক্ষের টাকা তুমি না নিলেও পারতে হয়তো জয়তী।'

'কেন?'

'টাকাই কি সব?'

'সব নয়? মাস্টারি করে খেতে বলছ হয়তো আমাকে, অথচ নিজে তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে তোমার বাবার পঞ্চাশ হাজারে তো চালাচ্ছ।'

বিরূপাক্ষের মতন একটা মানুষ–ওর টাকা তো ভদ্র তো অভদ্র সব ঘরের বাঁট টেনে আদায় করা।'

'তার মানে?'

'মানে–ওটা আমার একটা উপমা।'

'উপমাটা বেল্লিকের মত হল। বিরূপাক্ষের টাকা ছুলে আমার কুষ্ঠ হবে না। পঁচিশ লাখ টাকা–তিনটে বাড়ি–বাড়িগুলো–সমস্ত সম্পত্তিই তো আমার প্রাপ্য। টিকে থাকলে পেতুম সব–কিন্তু সবই প্রায় ছেড়ে দিয়েছি; মানুষের প্রাণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চায় বলে।'

জয়তীর কথা শুনে সেই পাখিটার দিকে ক্ষেমেশ ফিরে তাকাল আবার। পাখিটা একা কেন? ক্ষেমেশের বাড়িতে-সমস্ত বেলগাছিয়া তল্লাটে-সময়ের প্রবাহের ভেতরেই কেমন একটা অপরিচিত যেন পাখিটা। এসব পাখি তাহলে জন্মলাভ করে। হাওয়ার ভেতর থেকে? কেউ আছে? কাছে লুকিয়ে? সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

'তুমি বড় ভালোগার ক্ষেমেশ।'

ক্ষেমেশ চমকে উঠে জয়তীর দিকে তাকাল। 'আমি? কেন, কি করেছি বলতো জয়তী'?

'কি করেছ তুমি? যা করতে পার তাই করেছ। ভেবেছিলুম বড় হবে,–এড়িয়ে যাবে। ছি, ছি, বড্ড নোংরা। গা ঘিন ঘিন করছে আমার।'

'কিন্তু কয়েকটা বছর বিরূপাক্ষের সঙ্গে কাটিয়ে এলে তো তুমি। তা যদি সম্ভব হল–'

জয়তীর কান্নার সাড়া–খুব অস্ফুট–টের পেয়ে ক্ষেমেশ কথা বলতে বলতে থেমে গেল।

সাতাশ

অনেক রাতে মুখার্জি সুতীর্থকে তার বাড়ির ফটকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। নিচের সদর দরজা খোলাই ছিল–দোতলার কোলাপসিবল গেটও। ওপরে উঠে সুতীর্থ দেখল তার ঘরে বাতি জ্বলছে। ভেতরে ঢুকে দেখা গেল মণিকা সুতীর্থের সোফায় বসে আছেন।

'এতো রাতে তুমি এখানে।' সুতীর্থ বললে।

'তুমি খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেলে; মণিকা বললে, 'একবার বললেও না কোথায় যাচ্ছ–'

'আমি তো গ্রেফতার হয়েছিলুম–'

'পালিয়ে এলে বুঝি তারপর?'

মনটা কেমন জোর হারিয়ে ফেলেছে; কেমন হয়ে গেছে যেন–'

'তা তো দেখছিই। মুখ পুড়ে কালি হয়ে গেছে, খুব কড়া রোদে ধর্মঘট করেছিলে বুঝি।'

'অনেক কথা আছে। জ্যোতি কি জেগে আছে?'

'না।'

'অংশুবাবুর টান ওঠেনি তো?'

'আজ রাতে একটু ঘুমুচ্ছেন।'

'ব্রোমাইড দিয়েছিল বুঝি?'

'না, ডাক্তার এসে একটা মিক্সচার দিয়ে গেছেন। তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াচ্ছি। আগে ইনজেকশন দিয়ে গেছলেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাড়াবাড়ি হয়েছিল কি আমি চলে যাবার পর?'

'ডাক্তার তো ডাকতে হল।'

'সারারাত তুমি জেগে আছ?'

'রোজই তো জাগি। চা দিতে বলব জ্যোতিকে। যাই উপরে। বলি–'

'অংশুবাবুকে ওষুধ দেবার সময় হয়েছে?'

'না। এই দিয়ে এলুম। আর তিন ঘণ্টা পরে।'

'তাহলে এইখানে তোমাকে বসতে হবে। আমার চায়ের দরকার নেই।'

মণিকা উঠে দাঁড়িয়েছিল–সোফার এক কিনারে–শীত ধরেছে বলেই খুব সম্ভব আঁট-সাঁট হয়ে বসে বললে বসছি। তুমি ওদিককার সোফায় বস। উনি যদি জেগে ওঠেন, টের পাবে তুমি। আমি কানে কম শুনতে শুরু করেছি। তাছাড়া, তুমি আমার চেয়ে হুঁশিয়ার সুতীর্থ। উনি জেগে উঠলে আমাকে খবর দেবে। তুমি মোটরে এলে বুঝি?'

'হ্যাঁ, তুমি তো এই ঘরেই ছিলে?

'না। দরজায় মোটর থামল, তাই নেমে এলুম। ওপর থেকে দেখেছি আমি সব। ও লোকটাকে তুমি কোত্থেকে জোটালে সুতীর্থ?'

'কার কথা বলছ?'

'যে তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল।'

'ও তো মিঃ মুখার্জি।'

'চিনি আমি।'

'তুমি চেন!'

'এ বাড়িতে ভাড়াটে ছিল–'

সুতীর্থ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'তাই তো তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

'জিজ্ঞেস করবেই তো; ওর মুখে আমি চাবুক মেরেছিলুম।'

'বটে? কেন?'

'চাবুক হাতে ছিল–তাই।'

সুতীর্থ মণিকার নিরবচ্ছিন্ন চুলের কালকেউটে জড়ানো মাথার দিকে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ক বছর আগে হল এসব?'

'বছর পনেরো হবে।'

'তখন তুমি না জানি কি রকম ছিলে, মুখার্জির কি অন্যায়?'

সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে সুতীর্থ বললে, 'আজো তোমার কথা জিজ্ঞেস করে। অংশুবাবু তোমার স্বামী শুনে কেমন কেমন যেন হয়ে গেল। কেন, ও কি জানে না যে অংশুবাবুকে বিয়ে করেছ তুমি?'

'কেন, কি বলছিল?'

'অংশুবাবুকে চেনে না মনে হল।'

'তা না চেনারই কথা।'

'কেন, এ বাড়ির ভাড়াটে তোমাকে চেনে, চিনে চাবুকও খেয়েছে। আর অংশুবাবুকে চিনবে না?'

মণিকা বললে, এত রাতে মুখার্জির সঙ্গে মোটরে ঘুরে কোথায় কি কাণ্ড বাধিয়ে ফিরলে সুতীর্থ?'

'আমি যা জিজ্ঞেস করলুম–'

'অংশুবাবুকেও দেখেনি? না যদি দেখে থাকে সেটা আমার বরাত। ওঃ তাকে না চিনলে আমি করব বল।'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এটা কোন উত্তর হল না। পুবের জানালা দুটো খুলে দিই। বড় গুমোট।'

'তাহলে তো রাস্তার লোক টের পাবে এত রাতে ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাতে এখানে বসে থাকা–কথা বলা–চারদিকে নানা রকম নমুনার লোক আছে–'

'যা খুশি বলুক গে, আমার কিছু এসে যায় না।'

'তুমি তো স্বয়ংসিদ্ধ, কিন্তু আমি তো আমার কথা না ভেবে পারি না।'

'বাঃ, বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে রাতে তিনটেয়; মাঘ গেল–ফাল্গুন এসে পড়েছে–

'মুখার্জির মত একটা বদমায়েসের সঙ্গে মোটরে টহল দিয়ে বেড়ানো হচ্ছিল রাতবিরেতে। মুখার্জির বাঙালিয়ানা তো অনেক দিন হয় ঘুচে গেছে। ও তো দালাল–সাহেবপাড়ার দালাল।' মণিকা জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বললে, 'এ বাড়িতে ভাড়াটে থাকতে ছত্তিরশগড়িয়া ভাষায় কথা বলত কে একটা মেয়েকে নিয়ে–'

'ওর বউ?'

'না। মেয়েটার ধবল ছিল।'

'ধবল? ধবলকুষ্ঠ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'মুখে নয়–অন্য কোন জায়গায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও, ধবল ছিল বুঝি,' সুতীর্থের জানালার কাছে গিয়ে বাইরের কলকাতার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'তোমাকে দেখিয়ে গেল বুঝি সেই ছত্তিরশগড়িয়া মেয়েটি?'

'আমাকে দেখাবে না? আমাকে না দেখালে চাবুক খাবে কি করে তার মিনসে?'

'সুতীর্থ মোটা সোজা রাস্তাটায় দুধারি ঘন গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে শেষ গ্যাস লাইটগুলোর দিকে তাকিয়েছিল, কোন কথা বললে না।

'ফিরিঙ্গি মেয়েরা আনাগোনা করত এ বাসায় তখন। মদ খেতে গোরু শূয়োরের মাংসের মৌতাতে ড্যাকরা মিনসেগুলোর সঙ্গে মিশে। কথা বলত চিড়িয়াখানার টিয়ে চন্নাগুলোর মত ডাকসাইটে চীৎকার পেড়ে–'

সুতীর্থ জানালার পাশেই বসেছিল, মণিকার কথা শুনছে কিনা বুঝতে পারা গেল না, কোন উত্তর দিল না; চিন্তিত হয়ে নেহাতই কোন মন্ত্রগুপ্তির সাত পাঁচ ভাবছিল মনে হচ্ছিল।

'সুতীর্থ, তোমার স্ট্রাইক বুঝি এখন পাতালে ভোগবতী?'

'কি করতে বল স্ট্রাইক সম্বন্ধে তুমি?'

'আমি কিছু বলি না।'

'পরামর্শ দেবে না?'

'আমি কি দেব?'

'স্ট্রাইকফাইক ভেঙে ফেলে আমাকে আবার কুণ্ডু মল্লিকের সাপ্লাই কর্পোরেশনের ডিপার্টমেন্টাল ইন-চার্জ হয়ে বসতে বল তুমি?'

'আমি? কেন? তোমার যা ভালো মনে হবে তাই করবে।

'কেন, মুখার্জির সঙ্গে রাতে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগে তো আমার। কফি হাউসে গেলুম, ফার্পোতে গেলুম, চীনে টাউনে টহল দিলুম, হুমায়ুন প্লেসে গিয়ে ক্যাসানোভা হয়ে তারপর অলিগলিতে ঘোরা গেল। নানারকম নিউম্যাটিক বুননে গিয়ে বসলুম বাঙালি চীনে ইহুদি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েদের–বেশ ভালো লাগল আমার–'

সুতীর্থ ঝোঁকের মাথায় কথা বলছে টের পেল মণিকা; কিসের থেকেই বা থিতিয়ে উঠছে এই ঝোঁক? সুতীর্থের মনের নির্থিতির থেকে? কিন্তু সেই নির্থিত মনকেই নির্মাণ করছে সুতীর্থ আবার। ঢেলে সাজিয়ে যা ইচ্ছে তাতে ওর মনের আগেকার সেই বর্তমান দৃঢ় বয়স্কতা ভেঙে যাচ্ছে, সেই সময়কার দু'চারটে বিহ্বলতারও জড় মরছে না। বলছে বটে, কিন্তু তবুও মুখার্জির সঙ্গে অবিশ্যি মিশ খেতে পারেনি সুতীর্থ; সেটা অসম্ভব।... কথা বলতে বলতে সুতীর্থ নিজের সোফায় এসে বসল।

মণিকা কিছু বলতে যাচ্ছিল সুতীর্থকে, কিন্তু বলা হল না, গায়ের লেডিজ কোটটার বোতাম আঁটতে আঁটতে মণিকা বললে, 'আমার সময় নেই। কি কথা তোমার বলে ফেলো। রুগী মানুষ ওপরে রেখে এসেছি।'

'স্ট্রাইকটা হামিদের হাতে ছেড়ে দিলে কেমন হয়?'

'তুমি বেরিয়ে আসবে?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা তুমি বুঝে দেখ।'

'মনটা তোমার কেমন ভারি হয়ে আছে মনে হচ্ছে মণিকা দেবী।'

সুতীর্থ বললে, 'আমি অফিসে অনেক দিন কামাই করেছি। কিন্তু আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মল্লিক আবার কাজে ডেকেছেন আমাকে। তাঁর অফিসের চাকরিটা নেব আবার? কি বল তুমি?'

মণিকা কোন কথা না বলে আলস্টার খুলে কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে রেখে আবার উঠবার উপক্রম করল। কিন্তু বসে থেকে বললে, 'সারা রাত বিছানায় শুয়ে বসে মীমাংসা করতে পারবে সুতীর্থ তুমি? শীতের রাত আছে–লম্বা রাত আছে–?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল মণিকা–

'বিরূপাক্ষ আজ রাতে এসেছিল?'

'বিরূপাক্ষ?' মণিকা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, বিরূপাক্ষ কে?'

'কেন, আমার বন্ধু; তার কথা বলিনি আমি তোমাকে?'

'কার স্বামী বিরূপাক্ষ?'

'পত্নী পরিচয় তো জানা নেই। কিন্তু পরশু রাতে ক'টার সময় সে চলে গেল?'

'মণিকা এক নিমেষের জন্যে নিজের মহৎ সম্বিতের ভাবটা হারিয়ে ফেলল। দু'চার মুহূর্ত কেটে গেলে পরেও স্বাভাবিক অবস্থা আসতে সময় লাগছিল তার; মণিকা উপলব্ধি করল যে দু'মিনিট আগেও মনের যে অবস্থা ছিল তার সেটা ফিরে পেতে কত সময় লাগবে তা সুতীর্থের ওপর নির্ভর করে অনেকটা ঃ কী দেখেছে সুতীর্থ? দেখে কী ভেবেছে? বিরূপাক্ষ ও মণিকাকে পাশাপাশি একই সোফায় অত রাতে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে সুতীর্থ যে মতামতে পৌঁছেছে সেটা ছেলেমানুষী হবে না–ভালো জিনিসই হবে ক্রমে ক্রমে আস্তে সুতীর্থের দিকে চোখ তুলে তাকাল মণিকা।

'তুমি দেখেছ?' সুতীর্থকে বললে। 'কটার সময়ে এসেছিলে রাতে?'

'অনেক রাতে।' সুতীর্থ বললে।

'কোন কথা বলবার নেই আমার', মণিকা দাঁড়িয়েছিল; সোফার এক কিনারে বসে বললে, 'তুমি তো দেখেছ; আমি শুধু এই–' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মণিকা বললে, 'না, কিছু আর বলবার নেই আমার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পরশু রাতে ঐ জায়গায় ঐ সময়ে আমি না এলেও পারতুম। মানুষকে অপ্রস্তুত করে যে জ্ঞান-তাতে আলোর চেয়ে আলোর মাছি ঢের বেশি।'

'তুমি এসে পড়াতে-সেদিন অত রাতে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে এসে পড়াতে-' মণিকা উঠে দাঁড়িয়ে আলস্টারের পকেট থেকে একটা লবঙ্গ বের করে দাঁত দিয়ে কেটে ফেলতে ফেলতে বললে, 'তোমাদের কাছে আমি খালাস হয়েছি।'

'হয়েছ?' সুতীর্থ আড়চোখে মণিকার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে।

কোটের পকেট থেকে কয়েকটা এলাচ ও লবঙ্গ তুলে দিল সুতীর্থকে মণিকা। সেগুলো জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সুতীর্থ।

মণিকা একটু হেসে বললে, 'বিরূপাক্ষ নাক ঢেকে খেলা করতে চায় মানুষের বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে। কিন্তু তবুও বাইরের সমাজে তার বিবেক বলে কোন জিনিস নেই; যা তা রটিয়ে বেড়াতে পারে যেখানে সেখানে-কিন্তু তুমি এসে নিজের চোখে দেখলে তো সত্য কি? তুমি পরশু রাতে ছিলে-দেখেছিলে-ও জানে? না জানলে ওকে জানিয়ে দেবে।'

সুতীর্থ ঘাড় হেঁট করে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে কোন এক জায়গায় এসে থেসে দাঁড়িয়ে বললে, 'বিরূপাক্ষ কাউকে কিছু বলতে যাবে না। বিদ্বান বুদ্ধিমান নয়-কিন্তু নাড়ীজ্ঞান আছে। ওর টাকা তো এই সবের জন্যেই, নিজের আসল ভাঙিয়ে খেতে যাবে বিরূপাক্ষ?'

'তুমি কি বলছ সুতীর্থ?'

'আমার কিছু বলার দরকার নেই। বিরূপাক্ষ আমার কাছ থেকে হুঁশিয়ারি শিখবে? তবেই হয়েছে। সে নিজে জানে কত।'

'কটকটে সূর্যের ঝাঁঝ যেন হঠাৎ চোখে এসে লেগেছে এরকম মাছের মত সচকিত হয়ে সুতীর্থ জলের ভেতর ডুব দিল আবার নিস্তব্ধতার ভেতর।

'তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর?'

'করি যদি কি এসে যায় তোমার?'

'তোমার নিজের কিছু এসে যায়?'

সুতীর্থ মাথা হেঁট করে বললে, 'আমি তো পাশগাঁয়ের সুতীর্থ গুপ্ত। আমার স্ত্রী আছে, দুটি ছেলেমেয়ে আছে। এইবারে তাদের কলকাতায় আনতে হবে। কিন্তু এ বাড়িতে কি থাকব আমি? এ বাড়িতে তো গন্ধগোকুল ঢুকেছিল; জুঁই ফুলের পাপড়ি শুঁকে সেটা বোঝা শক্ত হবে; কিন্তু মুশকিল হবে ঘেঁটু ফুলের বেলা। তার তিতো গন্ধটা তার নিজের না পরের কে কবে কতবার করে তা ঠিক করে দেবে?'

'এ কি কথা-কি হিজিবিজি পরিভাষা তোমার সুতীর্থ?'

'কথার ভেতর ডুবে যেতে হবে তোমাকে। তুমি-'

মণিকা বাধা দিয়ে বললে, 'ধোঁয়ার মত কথা বানিয়ে বলো না। তুমি বিরূপাক্ষকে জিজ্ঞেস করো।'

সুতীর্থ হাঁটতে হাঁটতে জানালার দিকে সরে গিয়ে বললে, 'কি দরকার আমার জিজ্ঞেস করবার। তুমি যা বলেছ তার চেয়ে বেশি কি বলবে বিরূপাক্ষ আমাকে? সব শুনে বিরূপাক্ষ কি বলে শুনতে হবে আমাকে?'

'কি শুনেছ তুমি। আমি যা বলেছি তা যদি শুনে থাক, তা হলে তো আমাদের কথা ফুরিয়ে গেল। এখন অন্য কথা পাড়।'

সুতীর্থ নিজের সোফায় ফিরে এসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে দু-চার পা হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল আবার।

'তুমি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছ না সুতীর্থ।'

সুতীর্থ পুবের দিকের জানালা ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল; শীত রাতে কোন বাতাসের প্রত্যাশায় নয়; এমনিই। বসতে পারছিল না সে।

'ওটা কি তোমার অভ্যেস? ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

'বসে আছ তুমি মণিকা দেবী; বেশ তো বসে আছ তুমি। আমি পিরালি বামুনদের পরিবেশন করছি। বসে বসে কি করে তা করব?'

'কি পরিবেশন করছ; মনের সন্দেহ? সন্দেহ ছাড়া কি আর দেবে তুমি কাকে। তোমার মনের সন্দেহ ঘুচল না-'

'এইবারে ঘুচিয়ে ফেলছি', সুতীর্থ বললে। 'বিরূপাক্ষের চোখে লাগছিল বলে সে আলো নিভিয়ে দেবে-আর সেই অন্ধকারের ভেতর বসে থাকবে দু'জনে রাত দুটো অবধি?'

'বলেছিল তার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমোবার আগে ঘরটাতে অন্ধকার থাকলেই ভালো। আর ভালো মন্দতে অবিশ্যি এসে যাচ্ছিল না আমার। সুতীর্থ-'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠাশ

সুতীর্থ যেন ঘুমিয়ে পড়ছিল, অস্পষ্ট চোখ তুলে মণিকার দিকে তাকাতে তাকাতে পরিষ্কার হয়ে উঠল যেন তার চোখ– সন্দেহে না সাহসে পৃথিবী মিথ্যে এই ব্রহ্মপলব্ধিতে–না সবই সত্য এই সঙ্কল্প স্থিরতায়?

'খুব বেয়াদবি হল বাতি নিভিয়ে দিয়ে বিরূপাক্ষের। কিন্তু মানুষকে কখনো শিশুর মতন মনে হয়। আমরা নারীরা মায়ের মতন–' মণিকা বললে, 'বিরূপাক্ষ যে মতলব নিয়ে আমার কাছে এসেছে সেটা প্রথম রাতেই তার চেহারা দেখে বুঝেছি আমি। বাতিটা নেভাও সুতীর্থ।'

বাতি নেভাতে গেল না সে।

ঘরের বারান্দার সবদিকের সব বাতি নিভিয়ে সোফায় ফিরে এসে খুব বেশি অন্ধকারের ভেতর মণিকা বললে, 'আমি তোমাকে সেদিনকার কথা বলব শোন। এর ভেতর কিছুই নেই বলেই না বললেই ভাল হত; কিন্তু তবুও তোমার শোনা দরকার। তুমি সে রাতে এমন সময়ে এসে এমন অবস্থা দেখেছ যে, নিজের কাণ্ডজ্ঞান বা মর্মজ্ঞানে যখন কিছুই বুঝলে না–অগত্যা সবই তোমাকে পরিষ্কার করে বলতে হচ্ছে আমার।'

সেদিনকার ব্যাপারটা সত্যিই জলের মত পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল মণিকা। মণিকা যে সত্য কথা বলছে উপলব্ধি করল সুতীর্থ। কোথাও কোন খিচ রইল না আর।

মণিকা তারপরে বললে, 'আমায় উইল দেখিয়েছে, উইল শুধরে দিতে বলেছে, ওর বিষয়সম্পত্তির ট্রাস্টি হতে বলেছে বিরূপাক্ষ। চেক কেটেছে, ভাঙিয়ে টাকা পেয়েছি। আমি মানুষকে সহজে বিশ্বাস করি না। কিন্তু বিরূপাক্ষ নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারে। আমরা বলি ঃ চাকরটা খুব বিশ্বাস, নায়েবমশাই বেশ বিশ্বাসী মানুষ। বিরূপাক্ষের কথাবার্তা কাজকর্ম দেখে সব সময়ই প্রায় আমার মনে হয়েছে চাকরটা খুব বিশ্বাসী। কিন্তু তবুও বুঝেছি চাকরটা মোটেই বিশ্বাসী নয়।'

মণিকা হাই তুলে কুঁড়েমি ভেঙে বললে, 'আমাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলে ছিল ওসব। যেমন নীলু চাকর–বলতুম নীলু খুব বিশ্বাসী, রামচরণ খুব ধর্মভীরু। কোথায় গেছে সে সব।'

মণিকা আগে তুড়ি দিয়ে তারপর আলসেমি ভাঙতে লাগল; হাই ছাড়তে লাগল একটার পর একটা; অনেক আলসেমি জড়ো হয়েছে শরীরে।

'তুমি ঘুমোলে তোমার সোফায়, গেল বিরূপাক্ষ?'

'তাই তো গেল, না হলে এল কখন? আমি জেগে থাকতে আসেনি তো।'

'ঘুমোলে কেন?'

'ওকে দিয়ে কোন পাপ হবে না জেনেই ঘুমিয়েছিলুম। হঠাৎ ঘুম এসে পড়ে আমার, সেদিনও তাই হয়েছিল। কিন্তু বিরূপাক্ষ মুখার্জির মত হলে ঘুমের আগে ওপরে উঠে যেতুম আমি।'

'যে পাপী তাকে দিয়ে পাপ হবে না নিষ্পাপিনীরা কি তাই মনে করে? কে বললে, তাই মনে করে?'

'তুমি ওরকমভাবে প্রশ্ন করলে আমি কথা বলব না।'

'অনেক নিরপরাধিনী তো আমি দেখেছি।'

কোনো কথা বলল না মণিকা।

'তারা তোমার মতনই সতর্ক।'

সুতীর্থ অপোগণ্ডের মত কথা বলে ভাবছে সেটা শ্লেষ–ভাবছিল মণিকা; কি উত্তর দেবে–মিছে উত্তর খুঁজে মরছিল না তার মন।

'তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে কেন?'

অন্ধকারের ভেতর ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না মণিকাকে। সে জেগে আছে, না ঘুমিয়ে আছে? সুতীর্থের প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে গেল না, বলেছে যা বলবার। আর কিছু বলবার নেই।

'বিরূপাক্ষকে সামনে রেখে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে।' মণিকা উঠে দাঁড়াল।

'বিরূপাক্ষের লালা তোমার ব্লাউজের ওপর লেপটে পড়েছিল সেদিন। তার মাথা তোমার বুকের ওপর গড়িয়ে পড়েছিল।'

'কিন্তু ঘুমন্তকে যদি ঘুমন্ত বিষ খাওয়ায় কিংবা অমৃত তাতে কার কি অপরাধ?'

'দেখেছি আমি–তুমি খুব বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিলে সেদিন।' মণিকা দাঁড়িয়ে রইল। মণিকা উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ঘরের ভেতর নিঃশব্দে নিজ মনে পায়চারি করছিল–

'এত ঘুমের ভেতর কেউ যদি কিছু করে ঘুমন্তের সেটা অজ্ঞাত থেকে যায়। থেকে যায়?'

'আর কিছু বলবে না ভেবেছিল সুতীর্থ, কিন্তু তবুও মুখ দিয়ে তার এই কেমন একটা প্রশ্ন বেরিয়ে গেল বলে একটু কুঁকড়ে গেল সে। সে জানে, মণিকা কিছু করে নি। তার স্বচ্ছ ধারালো অন্তর্ভেদী চোখ সত্য দেখেছে; সে সত্য সৎ। মিছিমিছি তবু কথা বাড়াচ্ছে সুতীর্থ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কি করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমার কোর জ্ঞান নেই। আমার কাছে বেশি কথা শুনতে চাও তুমি, বারবার শুনতে চাও। কিন্তু যা বললুম এর চেয়ে বেশি কিছু বলবার নেই আমার।' বলতে বলতে মণিকা শীতের রাত ভেঙে বনঝাউয়ের মত শিশিরে পাতায় কেঁপে উঠে অভিজিৎ নক্ষত্রের দিকে উঠে গেল যেন যেখানে কোনো অভিজিৎ নক্ষত্র নেই সে তেতলার অন্ধকারের ভেতর।

হাতের সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল সুতীর্থের –অনেকক্ষণ আগে। সে জ্বালাল না আর। অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আড়ষ্ট করুণার সদ্যোজাত শিশুর মত, শীতাক্রান্ত জননীর মত সেই শিশুর, বসে রইল সে। মোটামুটি এইরকমভাবে বসে রইল সে অনেকক্ষণ। তারপর আর খারাপ লাগছিল না তার। ভালো না লাগবার কথা নয়। থেকে থেকে মনে হচ্ছিল সুতীর্থের ঘরের ভেতর যেন একটা রাধাঠুটী পাখি ঘিয়ের মত ডানা পালক মেলে ঝরঝর জলজল ঝরঝর জলজল বসন্ত রাতের হিজল বনের নদী নির্ঝরের মত শব্দে কথা বলে গেল। স্বচ্ছ জল সেই নদীর নির্ঝরের শব্দ–নির্মল, শাশ্বত।

তন্দ্রায় ঢুলে ঢুলে পড়ছিল সুতীর্থ। যেমন আমরা বলি, মাস্টার মশাই খুব বিশ্বাসী মানুষ–চাকরটা খুব বিশ্বাসী। যেমন বলতুম নীলু খুব বিশ্বাসী; রামচরণ খুব ধর্মভীরু; কোথায় গেছে সে সব? অনেক ওপরের হাওয়ার থেকে কে যেন বলছে এই সব তন্দ্রায় ঢুলে মনে হল সুতীর্থের। মস্ত বড় রাত্রির ময়দানে–নিশুথির তারাটা স্বাতী সপ্তর্ষি অভিজিৎ লুব্ধক বিশাখা–কী স্থিত দাঢ্য নিবিড় অনন্ত আকাশ সন্ধির অবিরল হাওয়া–অনেক স্বর্গীয় পাখি উড়ছে ঢের ওপরে–তার মধ্যে সবচেয়ে অনির্বচন পাখিটিই মানুষী। কি অসংস্থিত পৃথিবীর নিচের কয়লার গুঁড়ি উড়িয়ে ঘুরছে। কিন্তু সুতীর্থ যেখানে বসেছে সেখানে বাতাস ঠাণ্ডা নয়, কিন্তু বরফের মত সাদা, বেলফুলের মত ঝর্ঝরে পাখিদের পালক, জুঁয়ের মতন গন্ধ স্নিগ্ধতা, অথচ কোন রক্ত নেই এমনই আশ্চর্য পরমাত্মার এক মেয়েমানুষের নিবিড়তর বাতাসের ভেতর বাতাসের মত যেন মিশে গেছে সুতীর্থ–কোন শরীর নেই সেই নির্ঝরের ভেতর–কোন সময় নেই সেই অপরিমেয় আলোয়–অনালোকিত অনন্ত বাতাসের ভেতর।

পরদিন সকালবেলাও নিজের ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলে রোদের ভেতর নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল সুতীর্থ।

'কটা বাজে সুতীর্থ?' মণিকা জিজ্ঞেস করল।

সুতীর্থকে নিরুত্তর দেখে মণিকা বললে, 'তোমার হাতঘড়িটা দেখছি না তো।'

'আছে।'

'কোথায়?' মণিকা দেরাজ খুলে বললে, এখানেও তো নেই।

'তাহলে চুরি হয়ে গেছে।'

'স্ট্রাইক ফন্ড ছাড়া আর কোথাও চুরি হবার জায়গা তো দেখছি না। অমন দামী জিনিসটা দিয়ে দিলে?'

মণিকা কাল রাত্রের সেই সোফার ঠিক নির্দিষ্ট কিনারা দখল করে বসল। আকাশ পৃথিবীর সমস্ত রৌদ্রের অদ্ভুত জেল্লায় ঘর বার ভরে গিয়েছিল সব। ফাগুন আসেনি এখনও–তবুও বাতাসে তার অস্পষ্ট দিব্যতা–কেমন স্নিগ্ধ আগুনের ঘ্রাণ–মাঝে মাঝে করুণ আগুন। রোদ এড়িয়ে কিছুটা ছায়ার কিনারা বেছে বসেছিল মণিকা। কিন্তু তবুও রোদের অনেকগুলো চুমকি শাড়িতে গালে চুলে ছড়িয়ে ছিল। যার অর্ধেক নারী সেই মূর্তির নারীর দিকটার মত দেখাচ্ছিল মণিকাকে–বাকি সব বিশ্বম্ভর প্রকৃতির; রৌদ্রের বাতাসের নীল শাড়ীর নীলাম্বর যেন।

'হাতঘড়ি মানুষের কব্জিতে খুঁজতে হয় নাকি?'

'সুতীর্থের ঘড়ি তার শার্টের আস্তিনের নিচে হারিয়ে গেছে, সেদিকে তাকিয়ে মণিকা বললে, 'কাল রাত থেকে বড় মনের ধাঁধায় আছি সুতীর্থ। সবই কেমন বেভুল হয়ে যাচ্ছে।'

'কি ধাঁধা?'

'এখন কটা বেজেছে?'

'নটা।'

'এই ঘুমের থেকে উঠলে বুঝি?'

শার্টের হাতার বোতাম খুলে ফেলে আস্তিন গুটিয়ে নিতে লাগল আস্তে আস্তে সুতীর্থ। 'সাত মিনিট বাকি আছে নটা বাজতে।'

'আমি তো দেখেছি, তুমি সারারাত ঘুমোওনি। আমি চলে গেলুম। তুমি ঠায় বসে রইলে; এখনো বসে আছ। কেন?'

'তোমার কথায় মনে পড়ে গেল ঃ ঘড়িটা খাঁটি সোনার–অনেক দাম হবে এখনকার বাজারে। দেব ধর্মঘটীদের?'

'ওটা কোন কাজের স্ট্রাইক নয়–'

'ওরা বোকা, তা আমি জানি। কিন্তু ওদের পরিবার তো না খেতে পেয়ে মরছে–'

'সে সব ভাবনা মুখার্জির হাতে ছেড়ে দাও। ও-ই তো ফ্যাক্টরির মালিক। মানুষ নয়, কিন্তু মিটমাট করবার শক্তি মুখার্জির আছে, তোমার নেই।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তার মানে?'

'তুমি তো চাঁদের বুড়ীর চরকার বাতাস—'

'রূপকের কথা বলছ মণিকা—'

'এ রূপকের কোনো মানে নেই বুঝি?'

'কি মানে?'

'তুমি যা চাও তা কি করে পাবে? কেউ কস্মিনকালেও তা পায় না। স্থান কাল জিনিস বিচার করে কাজ করতে হবে তো। এ সব ধর্মঘটীরা কে? কেমন হৃদয় মন? কি শিখেছে তারা? কতদূর জানে? না খেতে পেয়ে সুকটি মরেছে, তবুও কথা বলে বলে ওদের মন মজানো হচ্ছে এমনিই, যেন কথা খেয়েই থাকতে পারবে এই-ই মনে করে ওরা। মুখুজ্যে যদি আরো কিছুদিন গোঁ ধরে থাকে, কিংবা ওদের পিঠে হাত বুলিয়ে এখুনি যদি কিছু রফা করে নেয় তাহলে কথা-গেলা হাড়গিলের বাচ্চারা ঝাঁপিয়ে পড়বে মুখুজ্যের কোলে আদর খাবার জন্যে। মুখুজ্যে ছাড়া ওদের কোনো মিটমাট হতে পারে না।' মণিকা বললে, 'মিমেমিছি কেন বক্তৃতা দিতে যাও?'

উঠে গিয়ে একটা জানালা বন্ধ করে এল। কড়া রোদ এসে পড়েছিল তার মুখে। 'তোমার বক্তৃতা শুনিনি কোনদিন আমি। কেমন দাও?'

'আমার নিজের কানে তো মন্দ শোনায় না।'

'মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বল?'

'এমনি, খালি গলায়। থাকে মাইক মাঝে মাঝে—'

'বক্তৃতা দিতে পার, কোনো পার্টিতে ভিড়ে গেলেই তো হয়। যদি বিশেষ কোন বালাই না থাকে তোমার মনে তাহলে তো সুড়সুড় করে ওপরে উঠে যাবে। সেই-ই তো সবচেয়ে সোজা পথ—টিট পাখিদের পক্ষে। কাজ করবে চাকরবাকর চেলা চেংড়ীরা; পল্লী-সংগঠন, ধর্মঘট, শিল্পবিপ্লব, রক্তবিপ্লব—ওদের হাতে ছেড়ে দাও সব। কথা বলে হদ্দো মাত করে রাখ।'

তোমার চেয়ে ভালো কথা আমি বলতে পারি?'

'তোমরা বাইরের পৃথিবীর মানুষ।'

'তুমিও বাইরে চলো না আমার সঙ্গে।'

'সে রকম একটা রক্তবিপ্লব হলে আমাকেও নামতে হবে।'

'বড় বিপ্লব হবেই তো।'

'হলে হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে সে বিপ্লব আমি নাল ঠুকতে যাব কেন?'

'না আমার সঙ্গে নয়—আমি ভাড়াটে—' সুতীর্থ হেসে বললে। 'বিপ্লব হলে আমিও কারো ভাড়াটে হতে যাব না। নিজে একটা দিক নিয়ে দাঁড়াব।'

সুতীর্থ তাকিয়ে দেখছিল মেঝের রোদে দক্ষিণ দিকের জানলার লোহার গরাদের বিচিত্র নকশার ছায়া পড়েছে। সূর্যকে মা বলে অনুভব করে তারি স্বচ্ছ শিশু সন্তানদের মত যেন রোদ। কত মাছি উড়ছে রোদে। সুতীর্থ আবার তাকিয়ে দেখল চায়ের পেয়ালার সোনালি কিনার ঘিরে মাছি; রোদের ভেতর পেয়ালাগুলো হ'রেকষের ধূসরতা পেরিয়ে হঠাৎ হীরে হয়ে ঝিকমিক করে উঠছে।

'কোন পার্টিতে যাবে বললে?'

'সে তুমি জান। এটা নিজের ঠিক করে নিতে হয়।'

'আমার তো মনে হয় আমি কংগ্রেসেরই চার আনা সদস্যা হতে পারতুম যদি—'

সুতীর্থের যদিটা শস্যের মত ফলে উঠছিল যেন, কিন্তু বুলবুলিরা এসে খেয়ে গেল; কিছু বললে না সে আর, চুপ করে বসে রইল সতৃষ্ণ বিষণ্নভাবে অনেক দূরের একটা গ্যাসের বেলুন—হাওয়া অফিস থেকে ছেড়েছে হয়তো—সেই দিকে তাকিয়ে।

'সোসালিস্ট পার্টিতে যেতে পার।'

'আমার মনে হয় আমার কোন পার্টিই সইবে না।'

মণিকা রোদের ভেতর ঝিমুতে ঝিমুতে জেগে উঠতে উঠতে বললে, 'তা সয় না আত্মারাম চিড়িয়ার। কোন পার্টিই ধাতে সয় না, অথচ সবই সয়ে যায়। পার্কে ময়দানে একটা ভিড় জমলেই হাতের ভেতর একটা লেত্তি খুঁজে পাওয়া যায়—পৃথিবীটাকে চমৎকার লাট্টু ঘোরাবার জায়গা বলে মনে হয়; পাঁচটা পার্টির স্বতোবিরোধের ওপরে উঠে নিজের মর্যাদায় দাঁড়িয়ে কথা বলা বক্তৃতা দেওয়া—'

জ্যোতি চা নিয়ে এল।

আপাদমস্তক জ্যোতির দিকে চায়ের ট্রের দিকে বিরস কটাক্ষে তাকাল মণিকা; কেমন অশ্রদ্ধার ব্রন ফুটে উঠল যেন সমস্ত মুখ ভরে।

'এত দেরিতে চা এল যে মণিকা দেবী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চা তো ও এনেছে। আমি তো ওকে চা তৈরি করতে বলিনি; জানতে বলিনি।'

'কেন?'

'কেন, তোমার চাকর নেই?'

'তুমি জান না সে পালিয়ে গেছে?'

'আমাকে বলে পালিয়ে গেছে, আমাকে না জানিয়ে তোমার কুটুম্ব পালায়?'

জ্যোতি দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে মণিকা বললে, 'চায়ের সঙ্গে পাঁপড় এনেছিস কেন? একশোবার তো তোকে বলেছি ওসব কাশ্মীর পাঁপড় ডাক্তারবাবুর জন্যে রেখে দিয়েছি। সুতীর্থবাবু তো পাঁপড় খেতে ভালোবাসে না।'

'পাঁপর এনেছে জ্যোতি—এটা খেতে ভালোবাসি আমি—' সুতীর্থ একটু মুখ মিঠিয়ে হেসে চায়ের পেয়ালা তুলে নিল।

'নিয়ে যা এসব পাঁপড় জ্যোতি। নাকি তুমি খাবে সুতীর্থ? জ্যোতিকে পই পই করে বলেছি এসব পাঁপড় কাশ্মীর ডাক্তারের জন্যে।'

'ডাক্তার কাশ্মীর?'

'না না, কাশ্মীর পাঁপড় ডাক্তারকে খাওয়াব ভেবেছিলুম।'

'আরো তো আছে, সব পাঁপড়ই কি ভেজে নিয়ে এসেছে জ্যোতি? ডাক্তারটি কে? চাটুয্যে? অংশুবাবুকে দেখছেন যিনি?'

'হ্যাঁ।'

'ভিজিট নিচ্ছেন না?'

'কেন নেবেন না? আমরা প্রত্যেকটি কলে ভিজিট দিই; দিনে চারবার এলে চারবার—'

'তবে আর পাঁপড় কেন?'

'মণিকার ঠোঁটের কোন মুচড়ে উঠল কেমন একটা হুলে বিঁধে যেন; গম্ভীর হয়ে মণিকা বললে, 'আমরা ডাক্তারকে দিতে ভালোবাসি।'

'দিচ্ছই তো ভিজিট দিনে চারবার করে।'

'যার যা বরাত। কই আর দিতে পারলুম, ডাক্তারের পাঁপড় তুমিই তো খাচ্ছ।'

জ্যোতি চলে গিয়েছিল, হয়তো বিড়ি টানতে; আবার এল—কেউ তাকে ডাকেনি যদিও।

মণিকা বললে, 'বাবু কি ঘুমুচ্ছেন জ্যোতি?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।'

'আর দিদি?'

'ঘুমুচ্ছে।'

'এখনও!' সামনের শূন্যতাকে চোখ দিয়ে একটু আস্তে ঠোকর দিয়ে সুতীর্থ বললে।

জ্যোতি চলে গেল।

'ঘুমুচ্ছে তো। জীউ নিয়ে শুধু বেঁচে থাকা যেমন আমার স্বামীর, তেমন আমার মেয়ের।'

সুতীর্থ চায়ের পেয়ালায় চুমুক না দিয়ে পিরিচের ওপর সেটা রেখে দিল। মণিকার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার মেয়েকে তো বেশ ভালোই দেখায়। অসুখ আছে? কি অসুখ?'

'হার্ট খারাপ, মণিকা বললে, 'এই অল্প বয়সে এতটা যে খারাপ হতে পারে,—হল তো।'

'কে বললে?'

'কেউ বলেনি, মনে হয় আমার।'

'মনে হলে মনেই রেখে দিও মণিকা ঘোষাল! পাঁপড়ের একটা কিনার ভেঙে টোকা দিয়ে সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে সুতীর্থ বললে।

'ঘোষাল কেন?'

'অংশু মজুমদাররা নাকি আগে ঘোষাল ছিলেন; তোমার নিজের হার্ট কেমন?'

সুতীর্থের এ প্রশ্নের একটা বাঁকা উত্তর দেবে ঠিক করেছিল মণিকা, অপারেশন টেবিলে ছুরির মত কাজ করে এমনি একটা জবাব মুখে এসে পড়েছিল প্রায় মণিকার, কিন্তু ভালো লাগে না, চোখ বুজে আসে, উৎসাহ বুতে যায়, মণিকা বললে, 'আমাকে তো থিওগার্গিনাল খেতে হয়। যখন তখন। হার্টের জন্যে।'

'দেখিনি তো খেতে তোমাকে কোনদিন।'

'খাই। হার্ট খারাপ।'

'তোমার চেয়ে ভালো হার্ট মুখার্জির আছে?'

'মুখার্জির চেয়ে সুস্থ মানুষ বুঝি তোমার চোখে পড়েনি আর?'

'ও তো ঢ্যাপসা নয়—দোহারা। সুতীর্থ বললে, কিন্তু তোমার পায়ের নখে ওগুলো কি পড়ে আছে? চাঁদ? কিন্তু মুখার্জি চাঁদ নয় বলেই ওখানে নেই। ওখানেও নেই।'

যে শিশু মাকে চাঁদ পেড়ে দিতে বলে—এবং যে মা জানে যে চাঁদ পেড়ে দেওয়া যায় না, তাদের আকুতি ও অভিজ্ঞতায় কয়েক মুহূর্ত জড়িত হয়ে থেকে তারপরে আস্তে আস্তে নিজের স্বতন্ত্র জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় ফিরে এল সুতীর্থ।

মণিকা একটা পাঁপড় তুলে নিয়ে কামড়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল আধাআধি, চায়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বললে, 'মুখুজ্যের গাড়িতে চড়ে আমাদের ফ্লটকে নামলে রাত তিনটের সময়। কি ব্যাপার বল তো সুতীর্থ—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওরা স্ট্রাইকটা ভেঙে দিয়েছে।'

'জবরদস্তি করে?'

'হ্যাঁ। আমি দলের সর্দার নই অবিশ্যি-তবুও আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওদের মুখপাত্র হিসেবেই। ওদের অনেককেই গ্রেপ্তার করে হাজতে নিয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলুম আমারও জেল হবে-কিন্তু তা হল না আপাতত-'

মণিকার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'বড্ড বিশ্রী বেকায়দা যাচ্ছে।'

'কি হয়েছে?'

'গয়ানাথ মালোর কথা তোমাকে বলেছিলুম?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে ধর্মঘটী খুন হয়েছে?'

'প্রমাণিত হয়েছে আমিই নাকি ওকে খুন করেছি।'

মণিকার চোখেমুখে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ পেল না। মনে হচ্ছিল যেন একটু দমে গিয়ে মুহূর্তের ভেতরেই সাব্যস্ত হয়েছে। ওর শরীরের ভেতরেই যেন সঞ্চিত আছে সে জিনিস যাতে নিজেই নিজেকে শুশ্রূষা করে স্থির করে নেয়-স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

'কিন্তু তুমি তো তাকে খুন করনি। করেছ?'

সুতীর্থ বললে, 'ব্যাপারটা আমি তোমাকে বলছি মণিকা দেবী-'

'গয়ানাথ মালোর মৃত্যু সংক্রান্ত আগাগোড়া ঘটনাটা খুলে বললে মণিকাকে সে। এর ভেতর মুখার্জির কতখানি হাত, মুখার্জির চেহারার সঙ্গে সৌসাদৃশ্য মানুষ যা ভাবে বলে করে সে সমস্তকে অতিক্রম করে সময়পুরুষের ভিন্ন রকমের সিদ্ধি সমস্তই মণিকার কাছে পরিষ্কারভাবে আনুপূর্বিক বিবৃত করল।

'কিন্তু এ তো বড় অদ্ভুত।'

'মনে হয় যেন বানিয়ে বলছি।'

'না, তা নয়। তবে-'

'গয়ানাথকে কি আমিই খুব করেছি মণিকা?'

'কথা বলছ সহজভাবে-কিন্তু মনটা তোমার আড় ভাঙছে না। একটা কথা তোমাকে বলব আমি-' মণিকা সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে।

'বল।'

'গয়ানাথ তোমাকে খুন করতে যাচ্ছিল না।'

'কি করে বুঝলে?'

'গয়ানাথ তোমাকে মুখুজ্যে বলেও মনে করেনি, মুখুজ্যের চেহারার সঙ্গে তোমার কোন সাদৃশ্য নেই-'

'নেই?' সুতীর্থ মণিকার চোখে চোখে তাকিয়ে বললে, 'আমার নিজের চেহারা আমি নিজে তো দেখি না, আরশিও নেই আমার ঘরে। মুখার্জির সঙ্গে আমার কোন দিক দিয়ে কতদূর কি সাদৃশ্য বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি বলছ আমাদের চেহারায় কোন মিল নেই-'

'নেই,' মণিকা বললে, 'আছে মনে করে ছোরা বাগিয়ে তোমার দিকে সে ছুটেছিল একথা যারা বলে তাদের বেকুবির সঙ্গে পারবে না তুমি। কিন্তু বেকুবি নয়-' মণিকা একটু থেমে বললে, 'অভিসন্ধি স্পষ্ট না হলেও সোজা ধরা পড়ে যায়। তোমার কাছে আবছা ঠেকছে?'

'কেন ছুটেছিল তবে গয়ানাথ।'

'তুমি বলেছিলে না বঙ্কু ওর পেছনে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'বঙ্কুই ছোরা মেরেছে ওকে-তোমার সামনে খাদের ভেতর থুবড়ি খেয়ে পড়ে গেছে তাই লোকটা-'

'কি যে বল তুমি। তা হলে বঙ্কুকে দেখতুম না আমি-'

'তুমি পেছনে ফিরে তাকিয়েছিলে?'

'কোন দিকেই তাকাইনি আমি-যে খাদে পড়ে গেল তার দিকে ছুটে গেলুম আমি-'

'জায়গাটার আশেপাশে ঝাড়জঙ্গল ছিল?'

'দেখিনি আমি-তবে মাঠজঙ্গল নিয়েই জায়গাটা। আচ্ছা আমি আরেকবার ঘুরে দেখে আসব। তুমি যা বললে তার-কিন্তু জায়গাটা দেখে আসব আমি।'

'গেলে হবে কি? যে জায়গায় হয়েছিল এসব তো তুমি খুঁজে বের করতে পারবে না; সব জায়গাই একই রকম মনে হবে তোমার কাছে; চেলেটেলে বের করতে পারবে না কিছু-গুলিয়ে যাবে সব। কাচাছাড়া ভাবের মানুষ তুমি, মুখুজ্যের মতন কাজের মানুষ তো নয়-'

'কিংবা বিরূপাক্ষের মতন। না, তা নই।'

'বিরূপাক্ষ কাজের লোক বইকি; বাড়ি-মোটর পঁচিশ ত্রিশ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে তার। তোমার মতন ভাড়া না দিয়ে পরের বাড়িতে থাকার অভ্যেস নেই তো তার-'

মণিকার কথাটা যে তার পেটের থেকে বেরুচ্ছে, হৃদয়ের থেকে নয়, মাথার থেকে নয়-উপলব্ধি করেও পাল্টা রগড় করতে গেল না, কেমন নিঃশব্দ হয়ে রইল সুতীর্থ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ক' মাসের ভাড়া বাকি তোমার?'

'সাত-আট মাসের তো বটেই-'

'তোমাকে দশ মাসের ভাড়া দিয়ে দেব আমি-'

'অতটা পাওনা কিনা বলতে পারি না।'

'সেলামিও দিয়ে দেব।'

'দেবে তো বেশ করবে-' মণিকা বললে, 'কিন্তু মুখ লম্বা করে আছ কেন? তুমি যখন এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলে তখন সেলামির রেওয়াজ ছিল না তো। তবুও দেবে-এক কান কাটলেই দু-কান কাটা হয়-নিজেরই হয়। আর কার কি হবে। তা দিও-দিয়ে দিও দশ মাসের ভাড়া-সেলামী-' মণিকা হাসতে হাসতে বললে। 'ভাড়া দেও না বলে অবিশ্যি তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারা যেত; নতুন ভাড়াটে বসানো যেত। কিন্তু অংশুবাবু আর আমি তো চড়কের গাজন গেয়ে গেয়ে মাথা খারাপ করিনি-আমাদের ঠাণ্ডা মাথা; তুমি এরকম বিগড়ে যাচ্ছ কেন?'

মণিকার কথা, গলার আওয়াজ কানের পটহে গিয়ে আঘাত করে, আঘাত করবার অনুমতি দিলে মনে হয় মর্মেও। কিন্তু কারুর এনুমতিসাপেক্ষ মেয়ে মণিকা নয়, যদি হত তা হলে এরকম ষোলো আনা মানুষ হতে পারত না সে। মণিকা নিট ষোলো আনা নয়, তবুও খাদ আছে বলেই নিখাদ সোনার মত। সুতীর্থ যা চায় ঠিক সেরকমভাবে কথা বলছে না। বটে মণিকা, কিন্তু তবুও খুব খারাপ লাগছে সুতীর্থের?

ঊনত্রিশ

'জানালাটা খুলে দাও সুতীর্থ, রোদ পড়ে গেছে, এখন একটু হাওয়া আসুক।'

জানালাটা কে খুলে দিল টেরই পাওয়া গেল না যেন। হাওয়া আসছিল। শীত কমে গেছে একেবারে; হাওয়া না থাকলে ঘরের ভেতরটা কেমন গুমোট।

ফুরফুরে হাওয়ার ভেতর বসে থেকে মণিকা বললে, 'দেবে তো বলেছ, কিন্তু কবে দেবে ভাড়া?'

'আজ কালই দিয়ে দেব।'

'দশ মাসের নয়, তবে মাস আটেকের নিশ্চয়-আট মাসের ভাড়া পাওনা আছে তোমার কাছে।'

'আমি পরশুই দিয়ে দেব।'

'পরশু পেতে আমার আপত্তি নেই। টাকার ব্যথায়, টনটনিয়ে ওঠেনি আমার মন, কিন্তু পরশু তুমি ভাড়ার টাকাটা দেবে না জানি। তুমি তো ওয়াদা দিচ্ছ-'

'ওয়াদা?' সুতীর্থ একটু হাঁফের অসুবিধা বোধ করে যেন বললে, 'আমি পরশুই তোমাকে টাকা দিয়ে দেব।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

'আচ্ছা আমি এক্ষুণি তোমাকে চেক দিচ্ছি-একটা সিগারেট জ্বালিয়ে সুতীর্থ বললে।'

'চেক নেব না আমি।'

'কেন?'

'ক্যাশ চাই। কেমন যেন বাজে মনে হচ্ছে তোমার চেক বইটাকে-'

শুনে সুতীর্থ কলকাতার একটা বড় সিডিউলড ব্যাঙ্কের চেক বইটা সরিয়ে রেখে দিল।

'ধর্মঘট করছ সত্যকে ছাপাতে না দাঁড় করাতে! দাঁড় করাতে তো! কিন্তু জীবনের অন্য সব ব্যাপারে মিথ্যে ফেঁদে স্ট্রাইকটাকে সত্য করবে তুমি। তা কি করে হয়?' মণিকা বললে, 'এখানে ধর্মঘট করছ মুখুজ্যের সঙ্গে ওখানে বড় হাতের পোলিটিক্স চালাচ্ছ সিঙ্গি রুখে-ধর্মের ওপর নির্ভর করে, সত্যকে সহায় করে, যেন সব সত্যেই তোমাদের দিকে এরকম প্রাণবল সংগ্রহ করে। কিন্তু সব সত্যই কি তোমাদের দিকে? যে বাড়িতে থাকা হয় সেখানে আট দশ মাসের ভাড়া বাকি পড়ে থাকলে ছ্যাঁচড়ের সঙ্গে কোথায় প্রভেদ কর্মকর্তার? সমাজের, অফিসের শাসনের বড় বড় ব্যাপারে তো বটেই, সাংসারিক খুঁটিনাটিতেও এ সব বিষে বিষিয়ে উঠল সব।'

যা অনুভব করেছে এইটেই জোর দিয়ে বলতে চেয়েছে মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল সুতীর্থের। কেমন অমৃতের পুত্রের মত তাকিয়ে আছে মণিকা জানালার ভেতর দিয়ে সুতীর্থের মত বিষ কন্যার সম্পর্কের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

'তোমার দশ মাসের ভাড়া মিটিয়ে দিতে পারি সে টাকা আমার কাছে আছে।'

'আছে? এইখানেই?'

'এইখানে-এই ক্যাশ বাক্সে। কিন্তু তবুও তোমার বক্তৃতায় মন ভিজল না আমার। এ টাকা তোমাকে আমি দেব না।'

মণিকা নিরুপায়ের মত হাসতে লাগল, হাসতে লাগল আজকের বিশৃঙ্খল লৌকিক পৃথিবীর ক্ষতের ছ্যাঁদাটার গভীরতার দিকে তাকিয়ে নিঃসহায়ের মত। কিন্তু তবুও হাসিটা নিষ্ফল নিরুজ্জ্বল নয়।

'হাসছ?'

'তোমাকে একটা খৎ লিখে দিতে হবে; তোমার হয়ে লিখে দিচ্ছি আমি।' মণিকা বললে।

'কিসের খৎ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার মনিবকে লিখে দেব। লিখে দেব ঃ কুকুরটা এইখানেই থাকবে খাবে–এঁটিলি কামড়াবে–আঁশটে গন্ধ ছড়িয়ে বেড়াবে;–বেড়াক–কোনো চারা নেই।'

'লিখে দিও কুকুরের বাচ্চা পাঠিয়ে দেব সামনের শীতে।'

মণিকা গম্ভীর হয়ে বললে, 'ক্যাশ বাক্সে টাকা আছে, আমাকে দেবে না. ও টাকাটা দিয়ে কি করবে?'

'যাদের দিতে হয় তাদের দেব।'

'ধর্মঘটীদের পরিবারদের? কিন্তু স্ট্রাইক তো ভেঙে গেছে–'

'জেনে গেছে ওরা। কিন্তু ধর্মঘট চালাতে হবে, পরিবারদের খেতে পরতে হবে–' সুতীর্থ কেমন যেন নালার ওপারের চিতেবাঘের মত তাকাল মণিকার দিকে।

নালার এপারের সেয়ানা হরিণীর মত তাকিয়ে মণিকা বললে, 'তা হবে বইকি। কিন্তু আমার খয়রাতের টাকা দিয়ে ওদের খাওয়ানো? আমি তো মুখুজ্যের দিকে। আমি কেন টাকা দেব মুখুজ্যেকে যারা রুখছে সে সব মিনসে মাগীদের ফ্যানভাতের জন্যে?'–ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠল মণিকার দৃষ্টি; জ্যোৎস্না রাতের নদী বনের ভেতর কালো ডোরাকাটা সোনালী রঙের সুন্দর জিনিস যেন তার প্রিয়কে না দেখে একটা ইতর বাঘকে দেখেছে এমনই নিদারুণ হয়ে উঠল মণিকার ঠোঁট। 'কোনো পুরুষমানুষ এমন করে! বিরূপাক্ষ করত না নিশ্চয়ই, মিঃ মুখার্জিও না।'

সুতীর্থ ক্যাশ-বাক্স খুলে এক হাজার টাকার একটা চেক লিখে দিল মণিকাকে। মণিকা তাকিয়ে দেখল ক্যাশ বাক্সের আনাচে-কানাচে একতলায় দোতলায় দু'চার টাকার খুচরো ছাড়া ক্যাশ আর কিছু নেই–একটা পাঁচ টাকার নোট অবধি না। চেক সে সুতীর্থের কাছ থেকে নেবে না ঠিক করেছিল, কিন্তু না নিয়েই বা করবে কি? কাঁচা টাকা দেবে কোত্থেকে সুতীর্থ। টাকা ও জমায়নি কোনদিনই–সেটা জানে মণিকা; সম্প্রতি চাকরিও নেই; যে চেক দিয়েছে সেটা হয়তো কোন সমিতি বা পরিষদের ফান্ডের টাকা; পরিষদের সম্পাদক সুতীর্থের হোক না হোক, চেক কাটবার পরোয়ানা আছে তার। এ চেক ডিজঅনার্ড হবে না। চেকটা ব্যাঙ্কে নির্ঘাত মার খাবেই জেনেশুনে মণিকাকে তা গছিয়ে দেওয়া–, অত দূর অধঃপতন হয়নি সুতীর্থের। অধঃপতন তার হয়ইনি, কিছুটা চন্দ্র চাঞ্চল্য হয়েছে ভাবছিল মণিকা; তুয়োলে–বুয়োলে কিছু হবে না, যখন সারবে নিজের থেকেই সেরে যাবে। আর যদি না সারেঃ–মণিকার নিঃশ্বাস খুব ভেতরের থেকে এল গাছের পাতার থেকে না এসে সমুদ্রের রাত্রির নিজের নিঃসুপ্তি কোটরের থেকে চলে আসে যেমন বাতাস।

'এটা তো বেয়ারার চেক, এটাকে ক্রসড করে দাও।'

'কেন, তাতে তোমার কি সুবিধে?'

'কখন ভাঙাব তা তো জানা নেই, চেকটা হারিয়ে যেতে পারে।'

'এক্ষুণি ক্যাশ করে নাও, ঐ তো রাস্তার ওপারেই তো ব্যাঙ্ক।'

'আমিই ক্রস করে নেব।' চেকটা ব্লাউজের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল মণিকা।

'মুখার্জি তোমাকে খুনে প্রমাণ করে ছেড়ে দিল যে তবুও?'

'কড়ার করে নিয়েছে। আমাকে ধর্মঘটের সংস্পর্শে থাকতে দেখলে স্ট্রাইকারদের বলে দেবে যে, আমি গয়ানাথ মালোকে খুন করেছি। ওরাই তখন খুন করবে আমাকে।'

'ওরা কি বিশ্বাস করবে?'

'হাতে হাতে প্রমাণ দেখিয়ে দেবে বিশ্বাস করবে না?' বিশ্বাস না করলে পুলিশ তো আছেই; আমার জামাজুতো গয়ানাথের লাসের কাছে পড়েছিল রক্তাক্ত অবস্থায়। কেন, তা তুমি জানো। সমস্ত রকম দরকারী ফটোগ্রাফ ওদের আছে। ফটো তোলবার আগে কর্তারা স্বচক্ষে দেখে গেছে সব–ডায়রি করে রেখেছে।'

'মোকর্দমা করবে তুমি?'

'না। কি লাভ করে। করব না আমি।'

'স্ট্রাইকের নেশা ঘুচল তা হলে এবার তোমার?'

'দেখা যাক ওরা কি করে।'

'ওরা? কারা?'

'মুখার্জি আমাকে খুনে প্রমাণ করলে হামিদরা কি চষে ফেলবে আমাকে?'

'কিংবা সরকার কি ফাঁসি দেবে? বড় বেল্লিক তুমি?'

মণিকা বললে, 'তোমার জীবনের একটা পর্ব শেষ হয়ে গেছে। আর একটা আরম্ভ করবার জন্যে তোমার বেঁচে থাকা দরকার। দেখ, দেশের হাওয়া কোনদিকে যাচ্ছে। স্ট্রাইকের দরকার হবে–বিপ্লবেরও–হয়তো খুব বড় বিপ্লবের–হয়তো শান্তভাবে নয়, ফ্রান্সের মত, রাশিয়ার মত। কিন্তু তার আগে নিজেকে উপযুক্ত করে নাও। বয়স তো তোমার কম হয়নি। কিন্তু এখনও তুমি মোটেই তৈরি হতে পারনি।'

সুতীর্থ বিড়ি জ্বালিয়ে বললে, 'আমার তো লেখার দিকে, সাহিত্যের দিকেই বেশি নজর দেবার কথা ছিল। তুমিই তো আমাকে হল্লায় নামালে।'

'আমি?'

'তোমাকে আমি চাই।'

'আমাকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখন নয়। বড় বিপ্লবের সময়।'

শুনে মরুভূমির মতন কেমন একটা লু-চলাচলের রূঢ়তা এসে পড়ল যেন মণিকার নিবিড় মাতা পৃথিবীর মত মুখে; সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বিড়ি খাচ্ছ কেন? দিশি বলে? কিন্তু বিড়ির গন্ধে আমার বমি আসে, চলি তা হলে এখন।'

তেতলা যেন মহা নেপথ্য; যাত্রিনীকে দ্রুত নিবিড়তায় উঠে যেতে দেখল সুতীর্থ।

'কোথায় ছিলে কাল সারাটা দিন-সমস্তটা রাত?' জিজ্ঞেস করল মণিকা।

'নানা জায়গায়। এক্ষুণি মুখার্জির কাছ থেকে এলুম।'

'মিটমাট হল কিছু?'

'না।'

'কোনো ভরসাও দিল না মুখুজ্যে?'

'কি করে দেবে, আমার তো বাইশ দফা দাবি।'

'ওগুলো কমিয়ে দাও, কেটেছেঁটে ফেলো তেজও গুটিয়ে নাও। ওরকম মারমুখো হয়ে সংসারে কোনো কাজই চলে না। তুমি দিনের পর দিন বড় লোহার কার্তিক হয়ে পড়ছ।'

'তোমার লক্ষ্মীর মূর্তি খুলছে তো দিনের পর দিন-'

'কেন খুলবে না? নাভির বদলে মৃগ নাভি নেই তো আমার-'

'আমাদের আছে। সেটা মানি। সেই জন্যেই বিশৃঙ্খল হয়ে গেল জীবন, কোন শান্তি নেই, দিকনির্ণয় নেই, ধরবার মত কিছু পাচ্ছি না।' কিন্তু এ খুনের সমস্ত প্রয়াস রক্তাক্ততা নিস্ফলতা কিছুই ছোঁয়নি বুঝি ওকে, প্রশান্তির মত দাঁড়িয়ে আছে, মৃগনাভি তো ইতর মানুষদের নষ্ট করছে; নিজের সমাহিত নিয়ে কতশত সাগরতীরের সভ্যতার উষানারীদের দিব্যতায় জেগে রয়েছে মণিকা-ভাবছিল সুতীর্থ।

সুতীর্থ বললে, 'যে দেখে তার চোখেই এত ভালো লেগে যায় তোমাকে।'

সুতীর্থ ঠোঁটে হেসে বললে, 'তোমার কাছে খবর পৌঁছিয়ে দেবার নির্দেশ পেয়েছি-'

'কার কাছ থেকে?'

'মুখুজ্যে বলছিল-'

মণিকার সমস্ত শরীর ঘিরে একটা ফণা জেগে উঠছিল-দেখছিল সুতীর্থ।

'আমি ধর্মঘট করতে চাই-ই-'

'করবে। তাতে আমার কী।'

'করলে আমার খুন ধরিয়ে দেবে মুখার্জি।'

'দিক, আমার কী এসে যায়।'

'কিন্তু একটা কড়ার করে নিতে চায় মুখার্জি।'

মণিকা আঁচল দিয়ে গলায় বেড়ি পরতে গিয়ে আঁচলের চাবিটা ঝনঝন করে বাজাল একবার। সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে আছে, নাকের ছ্যাঁদা কাঁপছে না এখনও, কিন্তু মণিকার সমস্ত ফর্সা সুন্দর সত্তা কালকেউটের মতন কালো আগুন হয়ে রয়েছে যেন; সে ঝাঁঝের দিকে তাকানো যায় না যেন; সুতীর্থ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'সেদিন মুখার্জি এসে দেখে গেছে আমি এই বাড়িতে থাকি। এ বাড়ির ভাড়াটে ছিল সে একদিন। তখন তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার। বললে আমাকে।'

'বললে বুঝি? ভগবান ঠাকুরের মত পণ্ডিত এ তল্লাটে আর পেলে না বুঝি মুখুজ্যে-কাকে বলবে ভগা ঠাকুরকে ছাড়া?'

'কিন্তু কাজ হাঁসিল করতে হবে তো-'

'কোন কাজ?'

'স্ট্রাইকটা-'

'তার সঙ্গে ওর পূর্বশ্রমের খবর নেওয়ার কী সম্পর্ক?'

'তা আছে।'

'আছে?'

চড়িয়ে দাঁত ভাঙতে এগিয়ে এসে মাথায় খুব বেশি রক্ত চড়ে গেছে অনুভব করে মণিকা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনের ভেতর আগুন পুড়ে গেছে। বরফও গলে গেছে মণিকার-একটা সুস্থ, ঠাণ্ডা আত্মস্থতায় সে পৌঁছে যাচ্ছে।

'তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছ ঠিকই?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে কি করছ এখন?'

'চাকরি-বাকরি শিগগির কিছু করব না আর।'

'কি করে চলবে তা হলে?'

'ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি তোমাকে খাবার দিতে পারব না।'

'দিও না।'

'মাঝে মাঝে তুমি এমন পান্তবুড়ো হয়ে এ বাড়িতে ফিরে আস যে ছেলেমেয়ের মা হয়েছিলুম বলে তোমার তত্ত্বতলব না করে আমি পারিনে। কোন উচ্ছন্নে জিনিস দেখতে আমার ভালো লাগে না। তুমি ফের যখন এ বাড়িতে ঢুকবে ভদ্রলোকের ছেলের মতন ঠাঁট রেখে ঢুকতে হবে তোমাকে–'

'তোমার এ বাড়িতে আরো কিছুদিন থাকব আমি।'

'ভাড়া না দিলে থাকতে দেব না।'

'ভাড়া দেব।'

'এক সঙ্গে কতগুলো ভজাবে, তারপর দেবে, তা হলে চলবে না। ফী মাসে চাই; গোড়ার দিকে দিতে হবে।'

'বেশ তো, মাস পয়লাই দেব। আমাকে মুখার্জি সাহেব বলেছে ধর্মঘট যদি করতেই চাই এমন, তাতে তার আপত্তি নেই। আমি খুন করেছি তা প্রমাণ করতে পারলেও ও নিয়ে প্যাঁচে ফেলে স্ট্রাইক পণ্ড করতে যাবে না। এমনি লড়বে আমার সঙ্গে–সোজাসুজি কোন আকস্মিক উটকো ঘটনার সুবিধা নিয়ে নয়–'

'ওর সঙ্গে এই চুক্তি ঠিক করে এলে?'

'আপাতত।'

'ওকে মানুষ বিশ্বাস করে?'

'এত বড় ফ্যাক্টরির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়েছে তো; অনেকেই বিশ্বাস করেছে বলে।'

'ও তোমায় ডেকেছিল বুঝি?'

'আমি নিজেই গিয়েছিলুম।'

'গরজ তোমারই বেশি–'

'আমাকে আজকালই ডাকত অবিশ্যি'–সুতীর্থ বললে, 'কই জ্যোতিকে দেখছি না।'

'কি দরকার?'

'চা দিয়ে যাবে।'

'আমি তাকে বারণ করে দিয়েছি।'

'ও, তা বেশ করেছ। আমি একটা চুরুট জ্বালাই তা হলে। চা দুপুরে খাওয়া যাবে; বাইরে।'

'সুতীর্থ চুরুট বের করে ধরিয়ে নিয়ে মণিকাকে বললে, 'লড়তে যখন নেমেছি তখন শেষ না করে ছাড়ব না, এরকম কথা বলতে পারতুম, কিন্তু ওসব জেদের কথা কাজের কথা নয়।'

'কাজ করতে নামলেই জেদ বেড়ে যায়–পেট থেকে চাঁচাছোলা কথা বেরুতে থাকে। সে কথা ঠেকাবে কার সাধ্যি। বাছুরের মা গোসাই মার মত তেরিয়া হয়ে উঠলে খাটালের লোকদের যেমন হয় আর কি–তোমার সঙ্গে ঠোকাঠুকি করতে গিয়ে তেমনি ঝামেলা হয়েছে মুখুজ্যেদের।'

সুতীর্থ চুরুট টানছিল, কোনো কথা বললে না।

মণিকা সোফায় বসে বললে, 'এ ধর্মঘটে জিতে যদি তুমি মুখার্জিকে কাবু করতে পার, সেটাও বিশেষ কোনো কাজের কথা হবে না।'

'আবার প্যাঁচ কষবে, তা জানি, ভাবছিল সুতীর্থ।

'আজ ঘাড় নোয়ালে ওরা কালই গর্দান উঁচু করতে জানে আবার।'

'আমরাই করতে দিই বলে।'

'বুদ্ধি–সুদ্ধির সঙ্গে আহম্মকির লড়াই তো। কেন জিতবে না মুখুজ্যে?'

সুতীর্থের চুরুটটা নিভে যায়নি একেবারে, কিন্তু যে আগুন আছে তা নিয়ে ফোঁকা অসম্ভব। ছাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চুরুটটাকে ভালো করে জ্বালিয়ে নিতে লাগল।

ত্রিশ

'তোমার বাইশ দফার দশ দফা মেনে না নিলে যদি খুশি না হও, বাইশ দফাই মেনে নেবে, কিন্তু কালই প্রমাণ করে দেবে যে আইন ওদের দিকে–তোমার দিকে নয়।'

'বড় বেগতিক জীবন আমাদের–রাষ্ট্রে সমাজে সব দিকেই। এ অবস্থায় কিসের দরকার?'

'বিপ্লবের। যা কোনোদিন ভারতবর্ষ দেখেনি এমনি একটা বিপ্লবের।'

'জলের, না রক্তের?'

'রক্তের যাতে না হয় সেই চেষ্টা করাই দরকার। খুব বড় বিপ্লব, অথচ খুব শান্তভাবে হচ্ছে–এ জিনিসটা যে একেবারে অসম্ভব তা নয়। কিন্তু কে করবে? উপকরণ কোথায়? গান্ধীজী নিরাশ নন। কিন্তু তিনি একা ছাড়া কেউই তো আর গান্ধীজী নন।'

'এসব লোক একক থেকেই বেশি কাজ করতে পারে। পথে ঘাটে গান্ধী জন্মালে কারুর কোন লাভ নেই। তা ছাড়া খুব বড় কেজো রেভল্যুশান গান্ধীদের দিয়ে হবে না। ওঁরা সে সবের ঢের ওপরে–মানুষ ওঁদের চেয়ে নিচে বলতে পার, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে মানুষ ওঁদের চেয়ে ঢের আলাদা রকমের।'

জ্যোতি চা নিয়ে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কে চা আনতে বলেছে জ্যোতি?' জ্যোতি ইতস্তত করছিল।

'বাবু কি করছেন?'

'ঘুমুচ্ছেন।'

'ডাক্তারবাবুর ওখানে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ—হয়ে এলুম তো এই।'

'কখন আসবেন?'

'একটা নাগাদ।' জ্যোতি চলে গেল।

'তোমার ঘড়িতে কটা বেজেছে সুতীর্থ?'

'ঘড়িটা আমি বিক্রি করে ফেলেছি।'

'মণিকা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল; তরল গরম জিনিসে গলা পুড়িয়ে নিতে ভালো লাগছিল; টনসিলে কেমন ব্যথা। গলায় আঁচলের পাক জড়িয়ে নিতে নিতে বললে, 'আমার কাছে বিক্রি করলেই পারতে—'

'তোমার ঘড়ি কি হবে—তোমার তো টাকার দরকার।'

'তোমার ঘড়িটাকে আরো চড়া দামে বিক্রি করে কিছু কাঁচা টাকা পাওয়া যেত।'

নাও হতে পারে খাঁই, সত্যিই কেবলই টাকার দরকার মণিকার ভাবতে ভাবতে সুতীর্থ বললে, 'চেকটা ভাঙিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। ওষুধ আর ডাক্তারের ভিজিটের বড় বাড়াবাড়ি চলছে আজকাল। আমাদের তো রোজদার নেই, ব্যাঙ্কেও টাকা নেই। নিচের তলার ভাড়াটেদের টাকাই খেতে হয়।'

সুতীর্থ চিন্তিতভাবে চুরুট টানতে টানতে বললে, 'তোমার কথা কয়েকবার জিজ্ঞেস করলে মুখার্জি। আমার সঙ্গে যাবে একদিন ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আসতে?'

'আমি? কেন?'

'আমরা তিনজনে মিলে কথাবার্তা বলব—আমার সঙ্গে চলে আসবে আবার।'

আজকাল পৃথিবীটাই এমন অন্ধকার, আঁশটে যে নির্মল মন খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে; তা পুড়ে যাবার আগে খুব উজ্জ্বলতা ফলিয়ে যায়, খুব তেজস্ক্রিয় তাপ; কিন্তু তারপরে কালো ছাই পড়ে থাকে। কালো ছাই ছড়াবে না মণিকা, মনকে উত্তেজিত করবে না, মূর্খদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করাই লিখন যখন এই ভীষণ দুর্ঘটনার গ্রহে তখন নিজেকে জ্বালিয়ে চড়িয়ে মনটাকে পীড়ন করতে যাবে না সে। শান্ত ঠাণ্ডা হয়ে থাকার চেয়ে ভালো জিনিস এই অন্ধকার আঁশটে পৃথিবীতে থাকতে পারে না কিছু আর; বেশ তিরিক্ষে তামাসাবোধ ছাড়া কেউ শান্ত স্নিগ্ধ হয়ে থাকতে পারে না এই কাদা রক্ত আগুন বিষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

'মুখার্জির গাড়ি তোমাকে নিতে আসবে তাহলে মণিকাদি?'

গাড়ি আসবে না—মণিকাকে যেতে হবে না; গাড়ি এলেও যেতে হবে না; জানে মণিকা। আগে বেশ পরিষ্কারভাবে চিন্তা করত সুতীর্থ, কিন্তু স্পষ্টভাবে আবার চিন্তা করতে পারবে সুতীর্থ,—এ যুগের বাঙালি ও ঠিক নয়—আগেকার যুগের বাঙালির বেশি ভালো জিনিস আছে ওর ভেতর।

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে। আমাদের শিগগিরই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে—'

'কি কথাবার্তা হবে?'

'এমনি—ধর্মঘট সংক্রান্ত—'

'ওখানে কে কে থাকবে?'

'আমরা তিনজন—'

'অ্যাডজুডিকেটর কারা?'

'অনেকেই আছে—কিন্তু মুখার্জিই সব।'

'তুমি কথাবার্তা চালাবে তোমার নিজের প্রতিনিধি হয়ে?'

'না, না, তুমি আর আমি ধর্মঘটীদের প্রতিনিধি—'

'আমার কথা ছেড়ে দাও—স্ট্রাইকাররা তোমাকে তাদের সর্দার মেনে নিয়েছে?'

'মেনে নিয়েছে বলেই তো মনে হয়।'

'মনে হয়? তারা সব জেলে, আর তুমি জেলের বাইরে; তাদের স্ত্রী—সন্তান খেতে পাচ্ছে না, আর তুমি খ্যাঁট মেরে প্রতিনিধিত্ব করছ। এ তো চারপেয়েদের প্রতিনিধি। হামিদ যদি ওখানে থাকে তা হলে তো তোমার জুতো ছিঁড়ে খুর বার করে নাল ঠুকে দেবে—'

সুতীর্থ ঈষৎ মুখ ফাঁক করে হেসে বাগেশ্বরীর দিকে তাকাল—ভাবের আশ্চর্য ঈশ্বরীর দিকে; মণিকা মুখ চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে চুপ করেছিল। অনেকক্ষণ পরে সুতীর্থ বললে, 'আমাকেই ওরা প্রতিনিধি সাব্যস্ত করেছে—'

'মুখার্জির ওখানে মদের ব্যবস্থাও থাকবে?'

'তুমি গেলে মুখার্জি মদ খাবে না।'

'এসব স্ট্রাইকভাইক ব্যাপারের কিছু বুঝি না আমি। অ্যাডজুডিকেটরের সঙ্গে আমি কি কথা বলব।'

'তুমি যতক্ষণ থাকবে তোমার ইচ্ছে না হলে স্ট্রাইকের কথা বলব না আমরা—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তবে?'

'পৃথিবীর যে কোনো বিষয়ে তোমার রুচি আছে তাই নিয়ে কথাবার্তা হবে। বেশি কিছু বলবার ইচ্ছে না যদি থাকে তোমার, বসেই থাকবে না হয়, আমাদের কথা শুনবে।'

'তোমাদের কথা তো বেড়ালেও শোনে না−'

'সোফার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সুতীর্থ বললে, 'চলো আমার সঙ্গে ওর এখানে;−দিনখন ঠিক করে নেয়া যাক।'

'তোমার মেয়েকে স্ত্রীকে নিয়ে যেও সুতীর্থ।'

'আমি বিয়ে করলে তো নিয়েই যেতুম আমার পরিবারকে।'

'তুমি বিয়ে করনি?'

'কবে করলুম?'

'এতদিন তো বলে আসছ তোমার শ্বশুরবাড়ি পাশগাঁয়ে−'

'পাশগাঁ বলে কোনো জায়গা আছে পৃথিবীতে?'

'নেই?'

'তুমি জান যে তা নেই।'

'নেই? মা, মেয়ে, স্ত্রী নেই?'

'নেই।'

'কিন্তু ছিল একদিন সব। আমরা যে জায়গার থেকে রওনা হই চলতে চলতে সে জায়গাতেই গিয়ে পৌছই আবার। পৃথিবীটা গোল বলে নয়−আমাদের সমস্ত আশা−ভরসা বাঁকিয়ে চলে বলে যা ভোগ করেছে−অনুভব করেছে সেই জায়গাতেই ফিরে আসতে চায়। তুমি সুমুখে তো চলেছ সুতীর্থ−কিন্তু ক্রমেই কাছে ঘনিয়ে আসছঃ যা দেখেছিলে বুঝেছিলে সেই সীতা−নাকি সেই সোনার সীতার দিকে।'

সুতীর্থ পায়চারি করতে করতে থেমে গিয়েছিল; আবার পায়চারি শুরু করে বললে, 'খুব আশ্চর্য কথা বলেছ তুমি। এরকম কথা সেকালের গ্রীসে সিবিলিয়া বলত। সফিংস বলত। ঈডিপাস ছাড়া কেউ সফিংসের হেঁয়ালির উত্তর দিতে পারেনি। তুমি যা বললে তার মানে বার করতে হলে অনেক দিন বসে চিন্তা করতে হবে।'

'কর চিন্তা।' মণিকা আস্তে আস্তে বললে।

'কিন্তু আমি কি ঈডিপাস?'

'তা তুমি জান।'

সুতীর্থ সোফায় এসে বসে যে সব বই অনেক আগে সে পড়েছিল, যে সব ছবি প্রতিনিয়তই চোখে এক সময় ভাসত তার, ইসকাইলাস সোফোক্লেসের যে সমস্ত কোরাস প্রবহমান রোদসীর সবচেয়ে বড় বিশেষত্বের মত তার কানে ক্রন্দন করে বেজে উঠত, তার চিন্তা চেতনাকে প্রসৃতি ও সুগভীরতা দান করতে এক সময় সেই সব কথা ভাবছিল। কোথায় থেকে সে কোথায় চলে এসেছে। অন্তরপীঠ ছেড়ে সে বাইরে এসেছে−বস্তু পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে? সত্তার বেশি বিকাশ হচ্ছে তার? বেশি সত্যকে পাচ্ছে সে? না তা নয়। বরং আগেকার সেই অধ্যয়ন ভাবনা সংকল্পনার পৃথিবীতেই বস্তুকে বুঝি পেয়েছিল সে−বস্তুর অবচ থেকে একেবারে অন্তিম উঁচু অব্দি সমস্ত নিরতিশয় বিকাশের ভেতর; বস্তুর উচ্চ, নিচ, নিচকে মনে রেখে উঁচু মর্মমঙ্গলা ভিত্তিই যে যথার্থ সত্য ও উপলব্ধিকে ধারণ করবার মত নির্মল ও নিবিদ আধার হিসেবে নিজের মনকে পেয়েছিল সে; এ মন নিয়ে এতদিন মহাভারতের বড় অব্যয় গল্পকার হয়ে উঠবার কথা তার, সোক্রাতেস, সোফোক্লেস ও প্লেটো আইনস্টাইনের বিমিশ্র এক আশ্চর্য আত্মা হয়ে উঠবার কথা। কি হয়েছে সে? কি বলছে? কি করছে?

'যেতে হবে কখন?' জিজ্ঞেস করল মণিকা।

'কোথায়?' চারদিককার সময় ও পরিসরের ভাসমান বিশৃঙ্খলার ভেতর একজন নারী একটি কথা জিজ্ঞেস করেছে ওকে টের পেল সুতীর্থ যেন হঠাৎ।

'মুখুর্জ্যের ওখানে।' মণিকা বললে।

'যাবে তুমি?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

সুতীর্থ উপলব্ধি করল যে আবার যেন সে ধুলোর পৃথিবীতে এসে পড়েছে; ধুলো কাদা রক্ত পৃথিবীকে জয় করে আলোর পৃথিবী বার করবার জন্যে কে তাকে বাছের বাছ মর্দ চিনে এনেছে। কোঁৎকা গাছে হেলান দিয়ে এই তালপাতার সেপাইগিরিই ভালো লাগছে তার, এই একটু আগের আশ্চর্য হিরণ মেঘগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে মাটি পৃথিবীতে নেমে তিতুমীরের তাড়স লাভ করতে লাগল আস্তে আস্তে সে; মনে হয় স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে।

'হ্যাঁ চলো মুখার্জির ওখানে, কি করবে, বেড়ালের পায়েও তো ধরতে হয়।' সুতীর্থ বললে।

'কেন?'

'গলায় কাঁটা ফোটে যদি বেড়ালের পায়ে ধরতে হয়।'

'আমার গলায় কোথায় ফুটল?'

'আমার ফুটেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গয়ানাথ মালোর খুনের ব্যাপার নিয়ে স্ট্রাইক চালানো নিয়ে সুতীর্থের গলায় কাঁটা ফুটেছে, উপলব্ধি করছিল মণিকা; চৈতন তো সুতীর্থ; মুখুজ্যে হয়তো চৈতনকে বলেছে, মণিকা দেবীকে মুখুজ্যের রাতের বৈঠকে নিয়ে গেলে সুতীর্থের গলার কাঁটা বের করে দেবে সে। যাবে কি সে? চৈতন বটে–তবুও চৈতনকে ভালোবাসে মণিকা; ভালোবাসে কি সুতীর্থকে? সত্যিই গলায় কাঁটা ফুটেছে–তুলে দেবে কি মুখুজ্যে? কাঁটা তোলবার অন্য কোনো উপায় নেই? বেড়ালের পায়েই ধরতে হবে গিয়ে?

'কখন যেতে হবে মুখুজ্যের ওখানে?'

'রাতের বেলায়।'

'দিনে হবে না?'

'না। বড্ড ব্যস্ত থাকে সারাদিন। অনেক লোকজনের হল্লা। রাত দশটা অব্দি নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পায় না।'

'কটা আন্দাজ যেতে হবে?'

'এই সাড়ে দশটা এগারোটা–'

'ফিরব কখন?'

'আড়াইটে তিনটের সময়–ওর গাড়ি নেই।'

মণিকার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আছে। নিজের অনুভূতিকে বিদ্যুতের বাহক বানালে রক্ষা নেই আজকের এ পৃথিবীতে। প্ররোচনা ও উত্তেজনার হাত এড়িয়ে, সৎ রসিকতার আশ্রয় নিয়ে কখনও কখনও বা নিজেরই স্থিরতায় সহিষ্ণুতায় শান্ত হয়ে থাকতে হবে–সিদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

'তোমার সঙ্গে আমি যদি যাই মুখুজ্যের ওখানে যা চাচ্ছ পাবে তুমি সুতীর্থ?'

'গয়ানাথ মালোর ব্যাপার চাপা পড়ে যাবে। কথা দিয়েছে আমাকে মুখার্জি।'

'যে মানুষকে তুমি খুন করনি, খুন করেছে মুখুজ্যে, সেই ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য তুমি দেবে ঘুষ?'

'তুমি তো ইতুপুজোর ঘট ভাসিয়ে দিয়ে কথা বললে, 'কিন্তু ব্যাপারটা কিরকম গড়িয়েছে দেখছ না–'

'আমি কেন দেখতে যাব? আমি কে? আমি এ সবের ভেতর নেই তো।'

'নেই? মুখার্জিকে এখানেও ডেকে আনতে পারি। আনব? এ বাড়ির থেকে তুমি অবিশ্যি তাড়িয়ে দিয়েছিলে তাকে।' সুতীর্থ বললে।

সুতীর্থের কথার মর্মভেদী ছেলে–মানুষী শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে চোখ বুজল মণিকা। কিন্তু বিষয়ই বিষ, বিষয় মাতায় মানুষকে, বিষয় নিয়ে মেতে দেখ, কেমন বড় গড়নের মানুষ কি রকম চিমসে হয়ে যায়–কি বলে, কিভাবে, কি করে।

'এ-স্ট্রাইক আমার চালাতেই হবে। তুমি সাহায্য করলে ভালোই হত। হয়তো কুড়ি দফাতেই রাজি হয়ে যাবে মুখার্জি। কিংবা তুমি যদি আর কিছু বেশি খুশি করতে পার তাকে–'

মণিকা সোফায় এক কিনারে মাথা কাত করে চোখ বুজে ছিল। ধীরে ধীরে মুখ তুলে সুতীর্থকে স্বচ্ছ জিনিসের মত দৃষ্টি দিয়ে ভেদ করে দূরতর কোনো কিছুর দিকে যেন তাকিয়ে মণিকা বললে, 'খুশি করতে পারি যদি? কি দিয়ে?'

'বিরূপাক্ষকে কি দিয়ে করেছিলে অন্ধকারের ভেতর? আমি তো সেখানে ছিলুম না।'

'কিছু যে করেনি, কিছু যে হয়নি, বিরূপাক্ষের ব্যাপারটা যে কিছু নয় সেটা খুব ভালো করে জেনেও সুতীর্থের রক্তে গোত্রান্তরের বিষ ঢুকেছে বলেই সে যা বললে সেই কথাটা বলা সম্ভব হল তার পক্ষে। কিন্তু নিজের রক্ত নির্মল–শুদ্ধ ছিল মণিকারও স্নিগ্ধ ছিল–ঠাণ্ডা ছিল; সে চুপ করে রইল।

'সেদিন সেই বেশি রাতের অন্ধকারের ভেতরে কি হয়েছিল–কিনা হয়েছিল তুমি হয়তো জান না, কিন্তু তোমার সুপ্ত শরীর জানে। এবারেও আধার–আধেয় নয়। তোমাকে নিজেকে কিছু জানতে হবে না।' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল সুতীর্থ।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে দেখল মণিকা সেই জায়গাতেই সেইরকম ভাবেই কেমন যেন একটা সাদা নারী সারসের ছায়ার মতন নিঃশব্দ হয়ে বড়, গোল, রৌদ্র পরিবেষ্টনীর ভেতর বসে আছে।

'এখনও বসে আছ তুমি।' মণিকাকে বললে সুতীর্থ। মণিকার মুখোমুখি সোফায় বসে সুতীর্থ বললে, 'ছেড়ে দেব এসব। মল্লিকের কাছে যাব আজ–আমাদের ফার্মের। তাকে গিয়ে আমি বলব আমাকে কাজে বহাল করে নিতে। নেবে বলেই মনে হয়। না, যদি নেয় তাহলে কোনো একটা কলেজে ঢুকে পড়ব।'

'স্ট্রাইক হয়ে গেল?'

'যারা বড় লীডার ব্যক্তিকে নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার সময় নেই। কিন্তু আমার মতন চুনোপুঁটির তো সব সময় স্ট্রেচার নিয়ে হাজির থাকবার কথা ঃ ওটা কে গেল? ইয়াসিন বুঝি, এটা? লছমন, আর ওটা বড়নাম সেটা মাকুরাম, এই লাসটা। পাঁচীর, ওটা খোকনার। কিন্তু মানবকে তরাতে গিয়ে মানুষগুলোকে গণ্যই করছি না আমি আজকাল। এটা খারাপ হচ্ছে। অবিশ্যি একটা বেশ ঘনিয়ে ফাটিয়ে বিপ্লব এলে কেউ বা থাকবে ব্যক্তি, কোথায় থাকবে মানব। কিন্তু সেরকম বিপ্লবের একটা মাছিকেও তো উড়তে দেখা যাচ্ছে না এখনও; মিছে-মিছি তবে কতগুলো ঘরপোড়া গরু নাচিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে আজকের হাতের কাছের মানুষগুলোর দুঃখ দরদ সম্বন্ধে কাঠ হয়ে থাকলে চলবে কেন। বিমিনয়ে সে বিপ্লবের উজ্জ্বল উপকারগুলো পাওয়া যাবে না।'

সুতীর্থ বললে, 'সত্যিই কাঠ হয়ে যাচ্ছি আমি। এই ধর্মঘটীদের বা তাদের জেনানাদের ছেলেপুলেদের দিনরাত্রির বস্তির দুঃখ–কষ্টের ওপরে চলে গেছি যেন,– কিংবা নিচে তলিয়ে গেছি; সেখানে মানুষ মরলে বাঁচলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু এসে যায় না, কিন্তু মানুষের ভালোর জন্যে চিন্তা–মানে ভাবনা গ্রন্থির সরসতাটা ঠিক থাকা চাই নিতান্তই নিজে চরিতার্থ করবার জন্যে। দেখলাম ও আমার ধাতে সয় না। হওয়া উচিত ছিল হয় তো অন্য কিছু, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি মানুষ আমি মানুষ, আমরা মানুষ মণিকা।'

সুতীর্থ চুরুট জ্বালাচ্ছিল–একটা দুটো তিনটে দেশলাই কাঠিতেও কিছু হল না।

'তুমি, গয়ানাথ। ইয়াসিন, হামিদ, মকবুল, বিশ্বম্ভর–সব–'

'তুমি নিজেও তো?'

হ্যাঁ, সে নিজেও তো ব্যক্তি মানুষ। চুরুট জ্বালিয়ে দিয়ে কিছু বললে না সুতীর্থ, যা বলবার একটু আগেই তা বলেছে।

'এদের সকলকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে? একথা যদি মনে করে থাক তুমি তাহলে থুক কেটে চলে যাবে বুঝি?' মণিকা বললে।

'হ্যাঁ, মানুষদের নিকেশ করে মানবতাকে মঙ্গল করবার মত ফরাসী রুশ বিপ্লবের নায়ক হবার সে দাবী আমার নেই; মহাত্মার অপর পথ আমি মোটেই ধ্যান–সাধ্য মনে করতে পারছি না। কোনো তৃতীয় পথ দেখছি না। মানুষ নিয়েই থাকতে হবে আমাকে। মানবতাকে এগিয়ে কিংবা তলিয়ে দেবার জন্যে লোহার কার্তিকের দরকার কিংবা মায়া কাজলের ঃ লেনিন গান্ধী কবীর।'

একত্রিশ

দু'তিন দিন পরে মণিকা সুতীর্থকে বললে, 'তোমার কোনো সুবিধে হত তোমার সঙ্গে আমি মুখুজ্যের বাড়ি গেলে?'

'মনের এরকম অবস্থা নিয়ে তুমি ওসব জায়গায় যেওনা।'

'মনকে আমি তৈরি করে নিতে পারি।'

সুতীর্থ কাজে ব্যস্ত ছিল, বললে, 'আচ্ছা, আরেক সময়ে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হবে।'

পরদিন মণিকা বললে, 'চাকরি ছেড়ে দিয়েছ?'

'ছেড়ে দিয়েছি, বলেছিই তো তোমাকে।'

'আর এটা?'

'স্ট্রাইক? হামিদের হাতে ছেড়ে দেব।'

'তারপর কি করবে তুমি?'

'কিছু টাকা হাতে আছে–কয়েকদিন লিখব পড়ব, ঘুরে বেড়াব, চিন্তা করব। এক সময় আমি আদি গ্রীকদের লেখা খুব পড়তুম আর আমাদের দেশের জীবন মনীষীদের, পড়তে হবে আবার এই সব। আজকাল অনেক নতুন বই বেরুচ্ছে ঃ দেখব কিছু কিছু নেড়ে; ফ্রয়েড ওপর ওপর পড়েছি, মার্ক্স দেখেছি, ফরাসী শিখছিলুম, বোদেলেয়র, ভিলো, প্রুস্ত, ভার্লের ফরাসীতে পড়া দরকার। অনেক দিন হয় লেখা ছেড়ে দিয়েছি, কিছু লিখব।'

'তোমার লেখা পড়িনি আমি কোনোদিন।'

'পুরনো পাণ্ডুলিপি হাতের কাছে কিছু নেই। নতুন কিছু লিখলে শোনাব তোমাকে।'

'কোথায় যাচ্ছ? বেরুবার যোগাড় করছ বুঝি?'

'বেলগাছিয়ায় যেতে হবে ঃ ক্ষেমেশ চৌধুরীর কাছে।'

'সে কে?'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়েছিল; সোফার হাতলের ওপরে বসে বললে, 'বিরূপাক্ষ আর আসেনি এখানে?'

'এলেও পারত। আমি নিষেধ করিনি।'

'না এলেই তো ভালো হত।'

'সেটা যেদিন সে বুঝবে সেদিন আসবে না।'

'বুঝবে কি?'

'ও বুঝে ফেলেছে, সেই জন্যেই ভিড়ছে না আর। আসবে না আর। আমার কথাবার্তা হাবভাব মিষ্টি চারের মত জলের ভেতর ঝরে পড়েছিল। ও তো বোয়াল–গন্ধে গন্ধে টোপ খেতে এসে দেখল হ্যাঁচকা খাওয়ার মত কিছু নেই–মৃত্যু ছাড়া খাদ্য নেই–কেঁচোটা বঁড়শিতে গাঁথা।'

'কেঁচো কে?'

'ও যা চাচ্ছিল সেটা।'

'ন জিনিসকে ভিলোঁ কেঁচো বলে না।' সুতীর্থ একটু হেসে বললে।

'ভিলোঁ কে?'

'একজন ফরাসী কবি।'

'ফরাসী কবিদের পড়া নেই আমার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পড়লে পারতে ভিলোঁ অবিশ্যি যদি ফরাসী জানতে।'

'তুমি তো কেঁচো মনে কর?'

সুতীর্থ চুরুট টানছিল; কোনো উত্তর দিল না।

চুরুট নামিয়ে বললে, সেই দশ-বারো বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি যেন আবার-সেই গ্রীকদের, ফরাসীদের আমলের সেই নাবিকে, ও তার পরের সময়ের মনীষীদের, এই সেদিনকার বাংলার পটের আমলের পৃথিবীতেও-কিন্তু আগের চেয়ে খানিকটা বেশি অভিজ্ঞতা নিয়ে। আমার মনের একগুঁয়েমি-প্রাণের সেই এখন আর-মনটা জল, চিলের ডানা, আগুনের মত হয়ে উঠেছে।

'তুমি তো কেঁচো মনে কর জিনিসটাকে।'

'তা করি।' সুতীর্থ বললে।

'বিরূপাক্ষ টোপ খেতে এসে দেখল কেঁচোটা বঁড়শীতে গাঁথা। ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে কানকো কাঁপিয়ে লেজ নেড়ে জল গিলে বুড়বুড়ি কেটে উপুড় চিত ফলিকাত প্যাঁচ কষে যখন দেখল কোনো ফয়সালা নেই, তখন ভুস করে বারো বাঁও জলে ডুব দিয়ে গেল বোয়ালটা।'

'এত বেশি জল ওর পৃথিবীতে?'

'বেশি টাকায় বেশি জল, বেশি তেল, বেশি হাঁসফাঁস; ও এক আশ্চর্য নিদেন পৃথিবীতে থাকে।'

'বিরূপাক্ষের স্ত্রী কোথায় গেছে? নিজেই তো বলছিল যে ছেড়ে গেছে না যাচ্ছে?'

'ক্ষেমেশ চৌধুরীর ওখানে আছে। বিরূপাক্ষ কাকে বিয়ে করেছে আমি জানতুম না। ক্ষেমেশ বললে জয়তীকে বিয়ে করেছে।'

সুতীর্থ চুরুটে দু-তিনটে টান দিয়ে বললে, 'আমি জয়তীকে চিনি।'

'বেলগাছিয়া থেকে কখন ফিরবে?'

'রাত হয়ে যাবে। নাও ফিরতে পারি।'

'তোমার ঘর সংসারের জন্যে একটা চাকর যোগাড় করবে না?'

'আমি টাকা দেব-আমার খাওয়ার ব্যবস্থাটা তোমাদের সঙ্গেই হোক।'

'কত দেবে?'

'যা চাও।'

'আজ রাতে ফিরবে? ফেরবার সময় একটা চেক আনতে পারবে?'

'কত টাকার।'

'চেক বই তো এখানেই আছে তোমার? ক্যাশ আনলেই ভালো হয়।'

সুতীর্থ একটু ভেবে বললে, 'এক্ষুণি পাঁচশো টাকা দিচ্ছি তোমাকে।'

সুতীর্থ ক্যাশ বাক্স খুলছিল; মণিকা বললে, 'এত টাকা পেলে কোথায়? ঘড়ি বিক্রি করে?'

'আমার উপায়ের কি অন্ত আছে? কাল আর পাঁচশো টাকা দেব।' টাকাগুলো হাতে নিয়ে মণিকা বললে, 'কিন্তু ওদের ছেলেপুলেদের জেনানাদের কি ব্যবস্থা হবে?'

'এ নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাব না'

'গয়ানাথ মালোকে যে মেরেছে সে তোমাকেও মেরেছে বটে।'

'হামিদ ইয়াসিন সত্যকিঙ্কর বিশ্বনাথ-লোক ঢের ভিড়ে গেছে ওদিকে। আমি কিছুদিন আত্মবিচারের-'

'আত্মবিচার-' মণিকা নদীর জলে কুল জলপাই পড়ার মতো এক ধরনের শব্দে হেসে বললে, 'ওটা বোধ হয় মনের অগোচরে পাপ-নাকি ধর্ম সুতীর্থ-অনেক দিন ধরে বাঙালির ছেলেদের? তাহলে মুখুজ্যেই জিতল! কত টাকা ঘুষ দিয়েছে তোমাকে?'

'সবই ক্যাশ বাক্সে আছে-খুলে দেখ।'

'আমাকে যে পাঁচশো টাকা দিলে তাও তো ঘুষের টাকা?'

'সিদ্ধার্থের মত গাম্ভীর্যে ও আন্তরিকতায় মাথা নেড়ে সারিপুত্রকে যেন বললে 'না না, ও আলাদা টাকা।'

'কেন ঘুষ দিয়েছে তোমাকে? কেন ঘুষ খেলে?'

সুতীর্থ নেবা নেবা চুরুটটা ভালো করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'তোমার তাতে কি ক্ষতি হয়েছে? তোমাকে তো যেতে হচ্ছে না মুখার্জি সাহেবের ডিনারে।'

'কত টাকা দিয়েছে আপাতত?'

'পাঁচ হাজার। এ টাকার সঙ্গে তোমার যাওয়া-আসার কোনো সম্পর্ক নেই। তোমার কথা মুখার্জি কোনদিন বলেওনি আমাকে।'

'আমরা ভাবুকরা' সুতীর্থ বললে, 'কাজের মানুষদের মত সোজা মোটা পথে চলতে পারি না। এই স্ট্রাইকের ব্যাপারটা হাতে নিয়ে তোমাকেও জড়িয়ে নিতে চাচ্ছিলুম; থাকতে তুমি আমার সংগ্রামটাকে ঘিরে। কিন্তু মসলিন যারা তৈরি করত, যে সব রূপসীরা তা পরত কেউই অশুদ্ধ নয়-যাদের চোখ টাটাত সেই লোকগুলো ছাড়া। হয়তো আমাদের পৃথিবীই খারাপ-কোনো চিন্তা বা কাজের মিহি মসলিন জমিন এখানে স্বাভাবিক নয় তাই ভালো নয়, ঠিক নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মণিকা সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়েছিল বটে, কিন্তু কথার দিকে নয়, কোনো কথা শুনেছে' বলে মনে হল না।

'কি হিসেবে ভাঙল স্ট্রাইক?'

'ভাঙেনি এখনও। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মুখার্জি আমাকে সরিয়ে দিয়েছে।'

সুতীর্থ সোফায় বসেছিল উঠে গেল, চুরুট টানতে টানতে ফিরে এসে বললে, 'কোনটা চাকরির টাকা, কোনটা ব্যবসার আর কোনটাই বা ঘুষের সেকালের মানুষেরা টাকার উপর একটা পাঁচনের বাড়ি মেরে সেটা ঠিক করে নিতে পারতেন। ঘুষের টাকাটা সরিয়ে রাখতেন তাঁরা মদ, মালাই ইত্যাদি সাঁইত্রিশ রকম মাধুরীর জন্যে। সে পাঁচন এখনও আমাদের আছে, কিন্তু পাঁচন দিয়ে টাকার ওপর বাড়ি মারলে পাঁচন বলে যে সব টাকা ঘুষের আর জোচ্চোরির–সব সব টাকা; রসের মালপো হবে–দেশ দশের পাল চরানো হবে এ টাকা দিয়ে; স্কুল-কলেজ সাহিত্য জ্ঞান জিজ্ঞাসা নিরীক্ষা–ও সব কোনো জিনিসই হবে না। ও সব জিনিস হয়ে গেছে–আর হবে না। এখন থেকে টাকা হবে শুধু–না হলে মানুষের মৃত্যু হবে।'

'সে টাকাটা নিলে তুমি?' মণিকা বললে। 'ঘুষ হিসেবে?' সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'ঘুষ ছাড়া টাকার চলাচল নেই; আজ কেউ কাউকে টাকা নিয়ে গুরুদক্ষিণা দেয় মণিকা?'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'বেলগাছিয়ায়।'

খুব আস্তে আস্তে চাপা গলায় কথা বললে মণিকা মিনিট চারেক; তারপর গলা খাকরি দিয়ে সহজ গলায় বলতে আরম্ভ করল। শুনে সুতীর্থ সাবধান হয়ে বললে, 'ওঃ–'

'কখন কি হয় বলা যেতে পারে না।'

'আমাকে আগে বলনি কেন তুমি?'

'না, না, এখন তখন কিছু নয় তবে বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষের থাকা দরকার।'

সুতীর্থের চুরুট নিভে গিয়েছিল। জানালার ভেতর দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছিল; মাঘ শেষ হয়ে যাচ্ছে; অনেক দূরে পাড়াগাঁর পানবন খই মৌরীর ক্ষেত, রঙ বেরঙের পালক কলমী কাঞ্চন নতুন দুধ সোনামণি শরৎকালের ফুল চারদিককার চাঁদাকাঁটা কেয়াকাঁটা দল ঘাসের জল উচ্ছল করে উড়ে যাচ্ছে নীলের থেকে নীলের দিকে, রোদের থেকে মেঘের কণাকণিকার উজ্জ্বলতা ভেদ করে কোন দিগন্তের মাতৃগণের দিকে ফাগুনের বাতাস। এদিকে ট্রাম লাইন চকচক করে উঠছে, কোনো ট্রাম নেই, ফুটপাতে চীৎকার করে উঠছে গাধাটা; গায় তার একজন ইমানদার নেতার নাম চক দিয়ে লিখে গিয়েছে কে যেন, রাস্তায় জিলিপি কচুরি ছড়িয়ে পড়ল ছোট ছেলেটার ঠোঙায় চিলে ছোঁ মেরে গেছে বলে, সামনের লাল রঙের বাড়িটার ছাদে সাদা সাদা জামা কাপড় উড়ে পড়ছে, ছাদের দড়িতে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল সব, ইলেকট্রিক তার কাঁপছে, পাশের বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠল, কি একটা আশ্চর্য সম্ভাবনা আছে যেন; ঘোড়েল নেতাটির নাম পিঠে ঝাঁকিয়ে গাধাটা হাঁকড়াচ্ছে আবার, যেন নামটা মুছে না দিলে বেচারী ককিয়ে কূল পাবে না আর। বেঘোর হুল্লোড়ে ফাল্গুনের বাতাস উড়ে এসে পড়ছে মণিকার চোখে চুলে, সুতীর্থের দেশলাইয়ের আগুনে, যে ট্রামটা হুস করে ছুটে গেল তার আগে কোথায় উধাও হয়ে চলে গেল–থেমে গেল বাতাস। পর মুহূর্তেই ফিরে এল আবার।

সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল তার দেশলাইয়ে শুধু একটা কাঠি আছে। ঘরের দরজা জানালা সবই বন্ধ করে দিতে লাগল সে তাই।

চোখ বুজে কুমারী ধ্যানের মত শান্তিতে বসেছিল মণিকা। শীত প্রথম যখন আসে দেশে তেমনই একটা আশা আমেজ চমকিত ভাবে টের পাওয়া যায় শীত প্রথম যখন ছেড়ে যায় দেশ থেকে।

অন্ধকারের ভেতর দেশলাইটা জ্বলে উঠল সুতীর্থের; আগুনের ধ্বকে লাল হয়ে উঠতে লাগল চুরুটের মুখ। ভালো করে চুরুট জ্বলে উঠলে দরজা জানালা খুলে দিতে দিতে সুতীর্থ বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?'

'না।'

'মনে হচ্ছিল ঘুমোচ্ছ।'

মণিকা সেন স্বর্গের থেকে হারিয়ে স্বর্গে ফিরে এসেছে আবার, এমনই চোখে সুতীর্থের দিকে একবার তাকিয়েই ওপরে চলে গেল।

নাঃ, বেলগাছিয়ায় যাওয়া হবে না আজ আর। সুতীর্থ ঘণ্টাখানেক পরে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে একটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই নিয়ে বসল, তারপরে একটা ইকনমিকসের–একটা উপন্যাস টেনে নিল–একটা চিঠি লিখতে চেষ্টা করল–কিন্তু কাকে?

একটা দীর্ঘ কবিতা ফেঁদে বসল–কিন্তু কেন?–ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুই হল না তার।

স্ট্রাইক অনেক দূরে কাঁদছিল। মণিকা তেতলার ঘরে নাক ডাকাচ্ছিল।

কয়েকদিন পরে ক্ষেমেশের বেলগাছিয়ার বাড়িতে আকাশে বাতাসে পাখির পালকে সকালবেলার রোদ এসে উজ্জ্বল হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সুতীর্থ গিয়ে পৌঁছল।

'এই যে তুমি এসেছ সুতীর্থ–বোস–বোস–'

'আমি তোমার চেয়ে পনেরো বছরের বড় ক্ষেমেশ–'

'তাই কি? আমি তো ভেবেছিলুম, তুমি আর আমি শিবের গুরু রাম'–ক্ষেমেশ একটু তেরচা কান্নিক মেরে বললে, 'রামের গুরু শিব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি আমাকে সুতীর্থ বলে ডাকবে আমার চেয়ে এত ছোট হয়ে, তা ডেকো। আমাকে সেদিন তুমি বলেছিলে বেলগাছিয়ার এই বাড়িতে আছ—নিরিবিলিতে-এর চেয়ে বেশি কোনো দাবি তোমার নেই, চাকরি-বাকরি করবার দরকার নেই, অবসর আছে, রোদ পাখি মাটি ঘাসের কোলে সময় কেটে যায়; এমনি নির্লিপ্ত নিকাজের ভেতর দিয়ে যদি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়—শান্তিতে—তা হলে আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই তোমার—বলেছিলে—'

'এর চেয়ে বেশি সাধ কার আছে?'

'সকলেরি প্রায়—তোমার মত দু-একজন ছাড়া।'

'থাকা কি উচিত?'

সুতীর্থ গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আকাশের নীল ফিকে ধূসরতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ তো থিসিয়ুসের এথেনস নয়—এমন কি পট এঁকেছিল যে খুশি মানুষেরা আমাদের দেশে—সে দিনও নেই। তুমি দেখছ তো কি রকম পৃথিবীতে আছ। তোমার বাবার বাড়ি ব্যাঙ্কের টাকা আকাশ আলো পাখি ফড়িঙের ভেতর ঘুরে ফিরে জীবন কাটানো খারাপ নয়। খারাপ নয়, খুব ভালো। কিন্তু চারদিকের পৃথিবী এমনই বেয়াড়া যে এ রকমভাবে মৌচুষকির নীড় বানিয়ে শান্তি চর্চা করতে দেবে না তোমাকে—'

'কি করবে? নীড় ভেঙে দেবে?'

'শিগগিরই। এখুনি তো' ভেঙে পড়ছে—'

'ভেঙে পড়ছে, আমি টের পাচ্ছি না তো।'

'এক-আধটা পাখি থাকে, তাদের বাসার থেকে ডিম চুরি গেলে কিংবা পিছলে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেলেও টের পায় না।'

'কি ভেঙে যাচ্ছে আমার?'

'এই তো আমিই এসে তোমার মনের শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছি। আমার মতন আরো অনেকে অনেক দিন থেকে তোমার পেছনে লেগে আছে। ভবিষ্যতে আমরা সবাই মিলে এমন দল বেঁধে আসব যে এখন থেকেই নিজেকে যদি তুমি তৈরি করে না নাও বড় অঘটন হবে তোমার।'

'অঘটন? মরে যেতে হবে?'

'মরে যাওয়া সহজ জিনিস যদি শান্তিতে মরা যায়। কিন্তু খুব অশান্তিতে মরতে হবে। কত ভালো মানুষ রুশ বিপ্লবে জার্মানীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মরেছে, আমরা বাঙালিরা মন্বন্তরে যাচ্ছি। খুব খারাপ। কিন্তু এর চেয়েও সব বিকট রকমের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে চারদিক থেকে। এদিকেও আসবে।'

সুতীর্থ পকেট থেকে চুরুট বার করে জ্বালিয়ে নিল।

'ফেরারি যদি না হতে চাও তা হলে মানুষের ভেতর মিশে যেতে হবে তোমার, গঠন করতে হবে; একদিকে বিরূপাক্ষের মতন ভাম আর একদিকে তোমার মতন খরগোশকে দেখে সুন্দরবনের পরীরা তামাশা বোধ করতে পারে, কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে গুলি খেয়ে মরতে হবে তোমাদের—'

'ভামটাকে মারা কঠিন।'

'কেন?'

'কি করে মারবে তুমি নিজেকে?'

'তা হবে। কিন্তু তুমি তো খরগোশ।'

'তা হবে। কিন্তু খুব লম্বা কান নেড়ে নেড়ে কথা বলছ তুমি আজ সকালবেলা থেকে ধোপাবাড়ির ছাঁদন দড়িটা গলায় ঝুলিয়ে। তুমি তো এ রকম ছিলে না। রুচি বিকার হয়েছে তোমার; চরিত্রে বিকার দেখা দিয়েছে। আমাকে গুলি করবার কথা বলছিলে তুমি—'

'হ্যাঁ বলেছিলুম—'

'নিজের হাতে করবে?'

'দরকার হলে করব।'

.'তোমার চাকর কাকে গুলি করবে?'

'আমার চাকর নেই—'

'আমার আছে। আমার কুকুরও আছে কিন্তু আমার কুকুরও আমার গুণীমানী বন্ধুকে গুলি করতে লজ্জা বোধ করে।'

'কুকুরটা আশ্রমে থাকে বুঝি? মোহনভোগ খায়?'

'হ্যাঁ, কিন্তু পূর্বাশ্রমের কথা আমাকে বলতে চায় না তোমার কাছেও ঘেঁষে না; কি ছিলে তুমি ওর? শুনেছি খুব মিষ্টি সম্বন্ধ ছিল নাকি?'

'ও যতদিন বাচ্চা ছিল ততদিন ছিল; একটু সোমত্থ হতেই তোমার ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি ক্ষেমেশ—'

নরম, স্নিগ্ধ গলায় বলছিল সুতীর্থ; গলায় আরো আন্তরিক আকুতি এসে পড়ল; সুতীর্থ বললে, 'এটা তোমার বাড়ি ছিল একদিন, এখন আমার বাড়ি। আমি যাদের থাকতে বলব এখানে তাদের বাড়ি। এখানে ছ'হাজার লোক অনায়াসেই থাকতে পারবে। কলকাতার পথে ঘাটে ফুটপাতে ভাগাড়ে লেজ খসবার আগে ব্যাঙাচির মত কাতরাচ্ছে তারা। এইখানে জায়গা দিতে হবে তাদের'—সুতীর্থ বললে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দেখ। পুলিশ কমিশনার কি বলে?'

'পুলিশ কমিশনারের দোহাই দিচ্ছ?'

'দেখ। মন্ত্রীরা কি বলে–'

'মন্ত্রীরা?'–

'জনসাধারণের প্রতিনিধি তো তারা।'

'বাড়ি রেকুইজিশনের অফিসার হিসেবে আমি আসিনি ক্ষেমেশ।'

'এসেছ স্বাধীনভাবে, কিন্তু শাসন কর্তাদের ডিঙিয়ে তো কিছু করতে পারবে না। কলকাতার প্রায় সব লোকই তো আজ সাদা দাঁত কেলিয়ে ঘোড়া হয়ে গেছে–ছ্যাকড়া গাড়ির। দিন রাত ছুটছে–নাদছে–কর্পোরেশনের চামচ দিয়ে শায়েস্তা করতে পারছে কি ঘোড়ার নাদগুলো ঝাড়ুদার? কর্পোরেশন ভেঙে পড়ছে–দানা পাচ্ছে না ঘোড়াগুলো। আমার বাড়িতে তো ঢের ঘাস, কিন্তু রি-হ্যাবিলিটেশন অফিসারকে ডিঙিয়ে ঘাস পাবে সেই ঘোড়াগুলো? কই, নোলা দেখা যাচ্ছে না তো সে সব ঘোড়ার। আসুক না অফিসার সাহেবের সার্টিফিকেট নিয়ে। আমি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে দেহাতে চলে যাব–'

সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে চুরুটের মুখে বেশ অনেকখানি ছাই জমিয়ে ফেলেছে; চুপ করে বসেছিল সে, কোনো কথা বললে না।

'তুমি উদমহরের ঘোড়ার মত এসে দাবনা ঝাপটালে কি হবে সুতীর্থ–তোমার ডমফাই ঘোড়ারা কোথায়? পথে পথে না চেঁচিয়ে না নেদে, দলঘাস আর বুটের বদলে হাওয়া না চিবিয়ে সমস্ত ঘোড়াগুলো যদি একটা নিদারুণ হ্রেষাগর্জনে জেগে উঠত, তা হলে বেছে বেছে আমাকে এসে গুলি করতে চাইতে না তুমি, কাদের গুলি খেয়ে তুমি নিজেই লাট মেরে পড়ে থাকতে ভেবে দেখেছে নিশ্চয়ই। তুমি বোকা বলেই আজ সকালবেলা আমার বেলগাছিয়ার বাড়িতে এসে লেজ নাড়ছ। তোমার মাথায় আগে ঢের জিনিস ছিল সুতীর্থ–কিন্তু আজকাল এই রকম হয়ে যাচ্ছ? যারা কাজের মানুষ তারা অন্য জায়গায় অন্যভাবে কাজ করছে।'

'রক্ত ছাড়া বিপ্লব করতে পারলে খুব ভালো হত। কিন্তু সে রুচি বা ওজন শক্তি এখনও লাভ করেনি তো মানুষ।'

সুতীর্থ চুরুটটা জ্বালিয়ে নিতে নিতে বাতাসে বাতাসে কয়েকটা কাঠি পুড়ে গেল–বাতাস থেমে গেলে বললে, 'কিন্তু কিই বা হবে রক্ত বিপ্লব করে। অনেকবার তো সে সব করা হল। কিছু হল না তো। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, স্পেন চীনের বড় বড় বিপ্লব সব এল গেল–কিন্তু কোনো দিকনিরূপণ মন পরিবর্তন হল না তো মানুষের। আরো খারাপ হল তো। এর চেয়ে আগেকার পৃথিবী ঢের ভালো ছিল ঃ লাওৎ-সে, কনফুচ, মিঙ যুগের চীন, অশোক চক্র, হোয়েন সঙ ফা হিয়েন শ্রীজ্ঞানের ভারত আরো আগেকার স্নিগ্ধ ভাত কাপড়ের, মিহি চেতনার মহৎ চিন্তার ভারতবর্ষ থিসিয়ুস পেরিক্লিসের গ্রীস–মানুষ তখন পৃথিবীর আকাশ বাতাস আলোতেই খেলা করত, কাজ করত, কথা ভাবত; মাটি খুঁড়ে ইঁদুর ছুঁচো শেয়াল ভোঁদড়ের মত থাকবার দরকার হয়নি তো তার মারণ শিল্পের ভয়ে।'

'হ্যাঁ, মৃত্যুশিল্পী হয়ে দাঁড়াল মানুষ; ভয়ের আকর সে শিল্প বটে সুতীর্থ, কিন্তু তবুও পরস্পরের ভয়। মারণশিল্প খারিজ করলেও মানুষকে মাটি খুঁড়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে মানুষেরি ভয়ে–'ক্ষেমেশ বললে, 'তোমার চুরুটটা বড্ড কড়া সুতীর্থ; অত ধোঁয়া ছেড়ো না; গ্যাঁজা না কি?'

'মিঠে গ্যাঁজা; কড়া বলেই মিঠে।'

'চা খাবে?'

'দাও–নেবুর রস দিয়ে।'

'রঞ্জন এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি হয়তো। উঠলে চা হবে। একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

'রঞ্জন কে?'

'আমার চাকর।'

'এত বেলা অব্দি ঘুমুচ্ছে যে?'

'রাত জাগতে হয়।'

'তুমি তো একা মানুষ। অনেক রাত অব্দি জাগিয়ে রাখ চাকরকে?'

'না, তা নয়। ও রোজই প্রায় সিনেমা–থিয়েটারে যায়। ন'টার শোতে যায়। ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করে। আমি অবিশ্যি আগেই খেয়ে নিই। ও এসে গন গায়, গাজন গায়, ডালপাতায় পিরভু কাঁপে দেখে, তারাবনের তারা দেখে রাতের আকাশে, শিন্তাইয়ের কথা ভাবে–'

'শিন্তাই কে?'

'ওর আছে একজন। রাঁঢ় বলে ও। মেয়েটা বাঙালি নয়, বেহারীও নয় ঠিক–'

'যায় তার কাছে?'

'যায়, সে আসে; প্রায়ই তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বত্রিশ

'ও, এই সব বুঝি? এই সব রকমারি বুঝি?'

'এই হচ্ছে একরকম–'

'তা, এর চেয়েও ভালো হবে। সবুর কর না তুমি।'

সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে বললে. 'এই যা হচ্ছে একেবারে তটের ওপর দিয়ে নৌকা চালিয়ে নিতে পারবে।'

'আমি নিজে সিনেমা থিয়েটারে যাই না, ও যায়, আমি টিকিটের পয়সা দিই; সীজন টিকিট কিনে দিই ওকে নাচগান জলসা আসরে মজলিস দেখবার জন্যে–'

সুতীর্থ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে–পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'যেখানে তোমার অন্তত একটা নাইট স্কুল খোলা উচিত তোমার বাড়িতে, সেখানে তুমি এই সব করছ, ক্ষেমেশ–রঞ্জনকে নিয়ে। সেখানে কলকাতার বনেদী ঘরের বাবুরা বেড়ালের সঙ্গে বেড়ালের বিয়ে দিত খুব ঘটা করে। তুমিও তাই-ই করছ দেখছি। রক্তটা রয়ে গেছে এখনও তোমার নাড়ে–'

সুতীর্থের বুদ্ধিবিবেকের দৌড়ে কেমন যেন তমাশা অনুভব করছিল ক্ষেমেশ, ক্লান্ত লাগছিল, করুণা বোধ করে বললে, 'মিছেই তুমি কথা বলছ সুতীর্থ। রঞ্জন তুচ্ছ, ছোটলোক মানুষ হতে পারে, কিন্তু তাই বলে শখ থাকবে না তার?'

'থাকবে বই কি। শখ না থাকলে বেঁচে থেকে লাভ কি। আমার তো মাঝে মাঝে শখ হয় রাশিয়ায় আবার জারের এলেম ফিরিয়ে আনি–'

'স্ট্যালিনই তো জার–'

'খাঁটি জার নয়। ইচ্ছে করে আমি জার হই, রাসপুটিন হয়ে মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করি, এদের সকলকে রুখবার জন্যে হয়ে দাঁড়াই লেনিন, চার্চিল হয়ে বলশেভিক শায়েস্তা করি, রুজভেল্ট ট্রুম্যান হয়ে শাঁখের করাতে কেটে ফেলি চার্চিলকে ইংরেজদের–এই সবই তো শখ, কিন্তু কিছুই তো হচ্ছে না:–কিন্তু এইবার হবে; শখের খিদমতদারদের সঙ্গে আমার বেশ লটকাচ্ছে–'

জয়তী কখন ঘরের ভেতর ঢুকেছিল সুতীর্থ দেখেনি। ঘরের ভেতরে সোফা সেটি কৌচ কুশনের ঠাসাঠাসি; এরই একটায় গিয়ে বসেছিল জয়তী। সুতীর্থ ঘাড় কাত করে অন্য দিকে তাকিয়েছিল, জয়তীকে দেখল না; সুতীর্থের থেকে খানিকটা দূরে–আড়াআড়িভাবে–একটু পিছিয়ে বসেছিল জয়তী।

'খুব বেশি কথা বলা অভ্যেস নয় তোমার–' জয়তী বললে। ঘরে যে আরেকজন লোক এসেছে বুঝল সুতীর্থ। কিন্তু জয়তীর দিকে মুখ না ফিরিয়ে যেমনিভাবে জানালার ভিতর দিয়ে আকাশ পাতা পালক আলোর দিকে তাকিয়েছিল তেমনিভাবে চেয়ে থেকে সুতীর্থ বললে, 'বেশি কথা বলছি আজকাল। কম কাজ করছি–।'

'বাটখারাটাকে টায়টোয় রাখতে পেরেছ তাই!'

'হ্যাঁ। তুমি বেশি কাজের বহর দেখতে চাও জয়তী?'

'তোমার তরফ থেকে? আমাকে দেখিয়ে লাভ কি?'

জয়তী বললে, 'কি কাজ করছ তুমি আজকাল?'

'কিচ্ছু না।'

'দেশের কাজ করছ?'

'দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে।'

'স্বাধীনতা এল–অথচ তুমি–আমি–খানিকটা নিরাশ হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে।' জয়তী একটু হেসে বললে। গালে টোল পড়তে না পড়তেই হাসি ফুরিয়ে গেল তার।

'স্বাধীনতা এল–অথচ তুমি আমি আমরা ভেল্কি লাগাতে পেরেছি বলে এল না। এল কতকগুলো লোক প্রাণপাত করেছে বলে। স্বাধীনতার জন্যে যারা লড়েছে তারা অনেকেই আজ মৃত। দেশ দু'ভাগ হয়ে যাবে খুব সম্ভব। স্বাধীন গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তারাই মোটা মাইনে মুনাফা পাবে–আজ পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তারাই মোটা মাইনে ও বড় বড় সিধে পাচ্ছে। দেশ যতদিন অধীন ছিল এরা ব্রিটিশদের যেমন রাজভক্তি দেখিয়ে এসেছে–দেশ স্বাধীন হলে স্বাধীনতা নিয়ে এরা ঠিক তেমনই মাতামাতি করবে। স্বাধীনতা ও তার নিয়মানুগত্য নিয়ে এদের মাতামাতির কেলেঙ্কারিতে কোনো ভদ্রলোক রাস্তায় মুখ দেখাতে পারবে না আর।'

'এই সব হবে?' জয়তী বললে।

'আমি দিব্যচক্ষে দেখছি।'

'স্বাধীনতা তো উনিশ শো আটচল্লিশের জুনে আসবে।'

'শুনেছি আগেই আসবে– সাতচল্লিশের আগস্টেই', ক্ষেমেশ বললে।

'কে বলেছে তোমাকে ক্ষেমেশ?'

'আমি খবরের কাগজ পড়ি না, তবুও আমার কানে আসে।'

'তাহলে এ বছরই আসছে স্বাধীনতা? সুতীর্থ?'

'আসছে। জওয়ার ক্ষেতের থেকে পাখি তাড়িয়ে দিচ্ছে নাকি নেতারা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার নিরাশার একটা কারণ হচ্ছে এ স্বাধীনতায় তোমার কোনো লেনদেন নেই; পাচ্ছ অথচ দাওনি কিছু; এই তো বলতে চাও তুমি? কিন্তু আমাদের কারুরই কোন দান নেই। ক্ষেমেশের আছে? নেই। আমার নেই। কোটি কোটি লোকের নেই। তাই বলে যারা এ জিনিস সম্ভব করে তুলেছে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে খুব কৃতার্থ তো আমরা।'

'জয়তী সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে, 'স্বাধীনতায় তোমার কোনো দান নেই? কিন্তু তুমি তো কয়েকবার জেলে গিয়েছ সুতীর্থ?'

'শখের জেলে যাওয়া। কোনদিন পিস্তল না ধরেই জেলে গিয়েছি আমি।'

'গিয়েছ তো। উদ্দেশ্যও মারাত্মক ছিল তো?'

'শুধু উদ্দেশ্য দিয়েই কি আমাদের যাচাই হবে ক্ষেমেশ?' সুতীর্থ জিজ্ঞেস করল।

'ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি ওরকমভাবে যাচাই করত, তা হলে মুনিদের মধ্যে বেছে বেছে জরৎকারু মুনি আমার বেলগাছিয়ার বাড়িতে এরকম ঢুকে পড়তে পারত কি আজ?' ক্ষেমেশ বললে সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে; 'পনেরো কুড়ি বছর আগে খতম হয়ে যেতে।'

'দিশী সরকারও অগাধ জলের মীন নিয়ে মাথা ঘামাবে না—তাদের অনেক সরকারি শহীদ আছে।'

'শহীদ হতে চায়নি কোনদিন,' জয়তী বললে, 'হতেও পারল না, সেই-জন্যেই তো ক্ষেমেশ খুব স্বাধীনতা বোধ করছে।'

'হ্যাঁ, তুমি আমি বিরূপাক্ষ—আমাদের এইরকম ধাত জয়তী। আমরা গোড়ার থেকেই স্বাধীন—সবরকম ফসকা গেরোর পায়জামায়ঃ-পাঁচ দরজিতে মিলে আমাদের কি আর নতুন স্বাধীনতা দেবে।'

'সাতচল্লিশের আগস্টে স্বাধীনতা আসছে তুমি তো বললে ক্ষেমেশ।'

'সেইরকমই শুনেছি আমি।'

সুতীর্থ বললে, 'প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন কানাইলালের মত শহীদ হতে চেয়েছিলুম আমি, কে তোমাকে বলেছে জয়তী? ঘোষ কতবার আমাকে পিস্তল দিতে চেয়েছিল—সেই বারীন-অরবিন্দদের সময়ের কথা—মহাত্মা গান্ধীর নামও শোনেনি কেউ তখন—কিন্তু আমি কিছুতেই পিস্তল নিলুম না। কিছুতেই মন উঠল না আমার। ওরকম ধরনের বিপ্লবের জন্য কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করতে পারিনি। আশ্চর্য পিস্তল না ছুঁড়ে দু-চারটে সাহেব না মেরে দেশ কি করে স্বাধীন করতে পারা যায় সে কথা ভাবতেই পারত না কেউ তখন। এমনই, একটা দুর্বার সন্তাপ ছিল—এত মুখিয়ে চলছিল সব যে, কেউই না ভেবেই পারত না যে, দু-চারশ পুলিশ জজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের (চা-বাগানের ক্লাইভ স্ট্রীটের বা মিলিটারির সাহেবদের কে চায় কে পায় এইরকম ভাব) খুনের সরগরম পথেই স্বাধীনতার রণপায়ে ছুটে আসবার কথা। কিন্তু তবুও আমি পিস্তলের-অপূর্ব-জেল্লা-স্বীকার করতে পারিনি সেই দিনও।'

'তারপরে পেরেছ?'

'না।'

'কোনদিন পারবে না আর?'

'সে কথা বলতে পারছি না এখন।'

'তখন তোমার বয়স কত?

'সাত আট।'

'এত অল্প বয়সে এসবের ভেতর জড়িয়ে পড়েছিলে?'

'আমার বাড়ন্ত গড়ন ছিল; তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলের মত দেখাত আমাকে। বারীন ঘোষ তো তাই মনে করেছিল। আমি পিস্তল সরবরাহ করতুম। নানারকম জায়গা থেকে চুরি বাটপাড়ি, মাঝে মাঝে জবরদস্তি করেও পিস্তল যোগাড় করতে হয়েছে। ভারী জিনিস তো পিস্তল। বেশ গায়ে জোর ছিল তখন আমার এক একটা ধু-ধু ফাঁকা জায়গার চখাচখীর ধানী জমিতে গলায় দড়ির মাঠে বৌবাতাসির চরে গাছগাছালি চাঁদমারি তাক করে পিস্তল ছুঁড়ে ছুঁড়ে বেশ হাত পাকিয়ে নিয়েছিলুম। কিন্তু তবুও কোন প্রাণী মারিনি, মানুষ খুন করিনি। যে-সব ইংরেজরা তখন আমাদের দেশ শাসন করতে আসত, তাদের দু-চারজনকে মেরে গভর্নমেন্টকে তরাসে বানিয়ে দিয়ে কিছু ধকল হয় বটে—কিন্তু যুদ্ধ না করে, স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব এই আমার ধারণা ছিল—'

'এই ধারণার জোরে সুতীর্থ শহীদ হতে পারল না আর,' ক্ষেমেশ সরতে সরতে লম্বা সোফাটার কিনারে সরে গিয়ে বললে, 'দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে কিন্তু সরকারি শহীদদের ভেতর সুতীর্থের নাম নেই।'

'কাদের নাম আছে সেখানে?'

'প্রায় সবারই আছে—অনেক পর্ব—অনেক পর্যায়—তোমাকে দেখাব জয়তী একদিন।' ক্ষেমেশ বললে।

'শহীদদের অনেকেই তো মরে গেছে—' জয়তী বললে।

'সকলেই,' একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে ক্ষেমেশ বললে; 'মেয়ে মরা চাই, না হলে শহীদ হয় না কখনো—'

'কেন, বারীন ঘোষ তো বেঁচে আছেন, উল্লাসকর আছেন। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী আছেন। শহীদ কাকে বলে সুতীর্থ?' জিজ্ঞেস করল জয়তী।

'খুব সম্ভব অধীন দেশে যারা দেশের প্রভুভক্তদের নষ্ট করবার জন্য লড়াই করে মরে, কিংবা বেঁচে থাকে, মরে বেঁচে থাকে—তাদের শহীদ বলে। যেসব শহীদ মরে গেছে দেশ স্বাধীন হলে তাদের লিস্টি তৈরি করা হয়—খুব ভালো করে চেক করা হয় যাতে কারুর নাম বাদ না পড়ে; পুরোপুরি তালিকা তৈরি হলে তাদের ফটো, ছবি, অস্থি পাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

গেলে অস্থি চিতের ছাই এটা-ওটা সংগ্রহ করা হয়। সভাসমিতি মিছিল-টিছিল বেশ জাঁকিয়ে তুলতে পারা যায় শহীদদের নিয়ে। স্বাধীনতা পেলে আমাদের দিশী সরকার তাই করবে মনে হচ্ছে।

'বেশ আঁটঘাট বেঁধে করবে সব; দেখে আমাদের খুব ভালো লাগবে।' ক্ষেমেশ বললে।

'কিন্তু যেসব শহীদ বেঁচে আছে তাদের সম্বন্ধে কি হয়?' জয়তী বললে, 'তাদের নাম লিস্টিতে থাকে খুব সম্ভব। থাকে না ক্ষেমেশ?'

'তা তো তুমি জানো সুতীর্থ। নেই তোমার নাম লিস্টিতে?'

সুতীর্থ জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তাদের নামও থাকে, কিন্তু তারা বেঁচে আছে বলে দেশ তাদের সম্বন্ধে খানিকটা চক্ষুলজ্জা বোধ করে–দেশের জন্য রিভলভার হাতে লড়েছিল এইসব শহীদরা; দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে; এসব শহীদরাও বেঁচে আছে। বেঁচে থেকে কি করছে? ঘিয়ের ব্যবসা করছে; কিম্বা পুরানো ক্যানেস্তারা বিক্রির কাজ; করুক; মরে যাবে তো একদিন। তারপর সব হবে।'

সুতীর্থ চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'শহীদ কাকে বলে জিজ্ঞেস করছিলে জয়তী। এইসব লোকদের শহীদ বলে।'

'তা হলে ভারী বিচিত্র তো।'

জয়তীর কথা কানে গেল না সুতীর্থের চুরুট টানতে টানতে নিজের কথার জের টেনে সুতীর্থ বললে, 'এরা শহীদ।'

'শহীদের লিস্টিতে তোমার নাম নেই সুতীর্থ?'

'না'। সুতীর্থ বললে।

জয়তী বললে, 'নেই কেন? তুমি তো কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে লড়াই করছ। কয়েকবার জেলে গেলে দমদম সেন্ট্রাল জেলে ছিলে–প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলে–হিজলী ক্যাম্পে ছিলে–বক্সার ক্যাম্পে ছিলে–'

সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে বললে, 'আমি নিজের মনের খুশিতে লড়াই করেছি, ওরা ভালো বুঝে আমাকে জেলে দিয়েছে। রিভলভার চুরি করেছি, পৌঁছে দিয়েছি ঢের, কিন্তু রিভলভার উঁচিয়ে মানুষ মারি নি, চেষ্টাও করিনি। তখনকার সেসব দিনে কিরকম দিনকাল ছিল তা তুমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবে না। পিপাসা পেলে আমরা জল খাই, ঠিক সেরকমভাবে চোঁ চোঁ বোমা পিস্তল ছুটত তখন। পিপাসায় ওদের গলা শুকিয়ে কাঠ হত, অথচ আমার কোন তেষ্টা নেই–এক ফোঁটা জল খাওয়া নেই তখন। বোমা দালান দিচ্ছি, রিভলভার যোগান দিচ্ছি খুব সাত্ত্বিকভাবে, কাউকে মারছি না দেখেশুনে ষড়যন্ত্রীদের ভেতরে কেউ কেউ আমাকে মারতে চেষ্টা করেছিল, আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিনি বিশেষ কিছু, কিন্তু তবুও তো বেঁচে আছি আজ পর্যন্ত–'

সুতীর্থ চুরুটের দিকে মন দিল, বার কয়েক টেনে জয়তীকে বললে, 'কেন মরিনি কেন মরিনি–এতগুলো বছর নিশির ডাকের ভেতর দিয়ে বারীন ঘোষের আমল থেকে বিনয় বোশ দীনেশ গুপ্তদের চাটগাঁ আমারি রেড–তারপর গান্ধীজির–তোমার তো সোদপুর নোয়াখালির কথা বলবে–আমি বলছি সেই অদ্ভুত-ডাভি-চৌরি-চৌরার ভেতর দিয়ে কোথায় থেকে কোথায় চলে এলুম–কিসে বিশ্বাস ছিল আমার–কিসে অবিশ্বাস ছিল–ভালো করে বুঝবারও সময় পাইনি।'

বলতে বলতে হঠাৎ মনে হল সুতীর্থের বেশি কথা বলে চলেছে সে, এটা তার স্বভাব নয় ঃ অনেকদিন পরে জয়তীকে দেখে এইরকম হচ্ছে; সুতীর্থ নিজেকে থামিয়ে ফেলে আস্তে আস্তে বললে, 'এইবারে বুঝে দেখতে হবে সব।' তারপর চুপ করল।

'কি বুঝে দেখবে?'

'এক বছর আমি বিদায় নেব সব কিছুর থেকে।'

'তার মানে?'

'আমার গত তিরিশ বছরের বৃত্তান্ত তুমি তো জান।'

'এইবারে ভালো করে শুনতে হবে সব।' জয়তী বললে।

'সুতীর্থের বৃত্তান্ত আমার চেয়ে বেশি জানা ছিল তোমার জয়তী। আমি বিশেষ কিছু জানি না। তুমি?' ক্ষেমেশ চশমা খুলে নিয়ে জয়তীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললে।

'কিছু কিছু জানি।'

তেত্রিশ

সুতীর্থ ঠাণ্ডা চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'প্রায় সাত-আট বছর বয়সে আমি কাজে নেমেছি। নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য সব জায়গায় চলে যেতুম। আমার বাপ-মা ভাই-বোন নয়, আমাকে ঘিরে অন্য যেসব ছেলেমেয়েরা থাকত তাদের কাছ থেকে আমি মন্ত্রগুপ্তি পেলুম যে, স্কুল কলেজ কিছু নয়–বাঙালি ছেলের পক্ষে দেশ স্বাধীন করার চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। আমাদের দলের তিরিক্ষে সরপুটির মত রূপমতী একজন মেয়েও এই কথা বলেছিল আমাকে –বলবার কি ঠাট! কি ওজন! আহা! প্রায় বত্রিশ তেত্রিশ বছর আগে গুলি খেয়ে সেই মেয়েটি মরে গেছে–আজো যখন তার কথা মনে হয়–' সুতীর্থ ক্ষেমেশের জয়তীর চার চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে টের পেয়েও আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে বললে, 'আমি তখন খুব ছোট ছিলুম, আট নয় বছর বয়স হবে, সেই মেয়েটির পনেরো ষোল, আমাকে চুমো খেয়ে খেয়ে পুদিনা পাতা মরীচ তেঁতুল আর লবণের যে পাঞ্জাবী চাটনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানাত–উফ! যখনি এর পরে একা পড়ে যেতুম, আমাকে কোলে টেনে মাইয়ের ওপর নিয়ে যেত সে; এমনই ন্যাতা জোবড়া মনে হত, এত বিরক্তি লাগত, এত রাগ হয়েছিল একবার–যে নখ দিয়ে ছিঁড়ে গিয়েছিলুম তার নাক মুখ–'

সুতীর্থ একটা ঢোক গিলে বললে, 'মানুষের ইচ্ছা খুব দেরিতে আসে, তার ভালোবাসাও; আট ন' বছরের একটা কুকুর তো ছেলেপুলের ঠাকুর্দা, কিন্তু ন' বছর বয়সে সেই মেয়েটিকে আমি ভালোবাসলেও ওরকম টানাহেঁচড়া পছন্দ করতুম না। শিবের মাথায় সিন্দুর ছিলুম। তিন-চারজন বেশ রায় রায়ান গোছের পুরুষও ছিল সেই বিপ্লবীদের দলে, খুবই শ্রদ্ধা করতুম তাদের; ভালোবাসতুম মেয়েটিকে, কিন্তু তবুও লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রিভলভার চালিয়ে ইংরেজ খুন করে দেশকে স্বাধীন করবার যে সব পথ দেখিয়ে দিত তারা, যে সব মোক্ষম জবানী ঝাড়ত–আমি সে সব মোটামুটি বিশ্বাস করলেও প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করিনি কিছু ক্ষেমেশ–'

'সেই মেয়েটির কি নাম ছিল?'

'দুটো নাম ছিল; একটা রন্তা, আর একটা কিনা গোমতী। অদ্ভুত নাম। গোমতী বলে ডাকত তাকে কেউ কেউ। কেউ কেউ কিশা বলত।'

'কে গুলি করেছিল তাকে?'

'বিপ্লবীদেরই কেউ।'

'কেন?'

'সন্দেহ করেছিল কিশাকে। যে একজন ছোকরা ডেপুটিকে ভালোবেসে ছিল–বটে গিয়েছিল বিপ্লবীদের মধ্যে। কথাটা সত্যি কিনা আমি জানি না। কিশা ষড়যন্ত্র সব ফাঁস করে দেবে আশঙ্কা করেছিল ওরা।'

'নাগার্জুনের মত স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে, কোনদিকেই কোন পিঠ খুঁজে পেলে না বুঝি সুতীর্থ? তবুও তো দলে ভিড়লে তাদেরই।' জয়তী বললে।

'হ্যাঁ, কিন্তু দলের জন্যে সব দিলুম না তো, স্কুল কলেজ তো ছাড়লুম না।'

'জেলে তো গেলে বারবার।'

'কিন্তু পরীক্ষায়ও পাস করতে লাগলুম। হিজলী ক্যাম্পেও গিয়েছি, বি-এ অনার্সও যুতেছি, ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে রিভলভারও জুগিয়েছি, খুব মন দিয়ে পড়ে এম-এ পাসও করা গেল–কিন্তু রিভলভারে বিশ্বাস ছিল না আমার–ইউনিভার্সিটিতেও না। এক সময় আমি ছড়া কবিতা গল্প লিখতুম; বেশ সাড়া পড়ে যাচ্ছে আমার লেখা নিয়ে–দেখছিলুম। তবুও অনেক দিন হয় লেখাটেখা ছেড়ে দিয়েছি। সাহিত্যে আমার বিশ্বাস যদি থাকত তাহলে এরকম হত না।'

'বিপ্লব করলে, জেলে গেলে, ইউনিভার্সিটি ডিগ্রী নিলে, সাহিত্য করলে, কিন্তু কিছু হল না বলতে চাও?'

'কিছু হল না জয়তী, আমার ধর্ম নেই বলে।'

'ধর্ম নেই মানে? ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই? ঈশ্বরে বিশ্বাস তো আমারও নেই।'

সুতীর্থ বললে, 'পৃথিবী যে খারাপ নয়, মানুষ যে সত্যিই ভালো, প্রাণের গঙ্গা যে রক্তে নাওয়াবে না মানুষকে আর, কোনো বিপ্লবেরই দরকার হবে না একদিন সমাজ যে সুস্থ ও শুভ হয়ে উঠবে সকলের জন্যে, জীবন যে বাস্তবিকই আশা–ভরসার, এসব জিনিসে কোন আপ্ত বিশ্বাস নেই আমার। সেটা থাকলেই ভালো হত; এ যুগে বিশ্বাস কাঁচিয়ে গেলে অভিজ্ঞতা ও যুক্তি দিয়ে তাকে ফিরে পাওয়া যায় না আর।'

আজকালকার বাজারে দিনরাত লেনদেন চলছে যে সব ব্যাপারের ব্যাঙ্কগুলিকে সাক্ষী রেখে–গাদা বাজারকে ঘুষ দিয়ে ওপরওয়ালাদের সার্টিফিকেট যোগাড় করে, দরকার মত অসংখ্য মেয়েমানুষের মাংস খেয়ে নতুন মাংসের জন্যে বেড়াজাল পেতে রেখে; এসব যখন একটা মস্ত বড় কালান্তক ঢেউয়ের মত উনিশশো সাতচল্লিশ আগস্টের পিঠের ওপর গিয়ে থুবড়ি খেয়ে পড়বে তখন তো আমরা স্বাধীনতা পাব। মানুষ যদি খুব ভালো মনে কাজ করে তাহলে পঞ্চাশ বছর লেগে যাবে এতকালের ঘোলা আঁশটে মলমাংস ঝেড়ে কিছু নিরালতা লাভ করতে। কিন্তু মানুষ কি ভালো বুদ্ধি প্রেরণার কাজ করবে–একটানা পঞ্চাশ বছর করবে? আমি শুনিনি তো কোনদিন কোন ইতিহাসে এরকম হয়েছে–' সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে।

'হয়তো খুব দূর ভবিষ্যতে করতে পারে, কিন্তু এক্ষুণি করবে বলে মনে হয় না।' জয়তী সুতীর্থকে বললে।

'তাহলে কি দলিলে স্বাধীনতা পেয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পাবে মানুষ?' ক্ষেমেশ তার পোড়া সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে।

'দেখা যাক। –উনিশশো সাতচল্লিশ এসে নিক।'

দশ বারো বছর আগে আমি শবরমতীতে গিয়েছিলুম একবার,' সুতীর্থ বললে, 'মনে কোন প্রত্যাশা, সংকল্প কিছুই ছিল না আমার; কঠিন মন নিয়ে গিয়েছিলুম ভেবেছিলুম, গান্ধীজীকে কেউ কিছু বলে না, কিন্তু নিতান্ত অন্ধ ভক্তি ছাড়া কেউই বিশেষ কিছু ভাবে না তাঁর সম্বন্ধে মানুষটার খুব বাইরের সুখ্যাতি আছে বটে, কিন্তু এত বড় সুখ্যাতি কেন এ সন্দেহ বাইরের পৃথিবীতেই শুধু নয়, খুব সম্ভব ভারতবর্ষেও সব জায়গায় প্রায় দানা বেঁধে আছে–একটু আঁচড়ালেই টের পাওয়া যাবে। এই সব ভাবতে ভাবতে দেখা করতে গেলাম তাঁর সঙ্গে। তিন-চার দিন ছিলুম আশ্রমে। সত্যিই একটা আশ্চর্য বিশ্বাস জাগল মনের ভেতর–মন নয় আত্মার ভেতরেই যেন–ভারতবর্ষের, পৃথিবীর আজ না হোক, কাল পরশু যে ভালো হবে মানুষের মানে যে খারাপ নয়, সত্যিই ভালোঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটার প্রতি। তারপরে কলকাতায় ফিরে ছ'মাস খুব বিশ্বাসের সঙ্গে কংগ্রেসের কাজ করেছিলুম আমি; গ্রামে গ্রামে দিয়েছিলুম গান্ধীজীর নির্দেশ অনুসারে কাজ করবার জন্যে। কিন্তু টিকল না; কাজেই শুধু অবিশ্বাস হল না; মানুষকেই শুধু না, মোহনদাস করমচাঁদকেও বিশেষ কোনো সারাৎসার হিসেবে উপলব্ধি করতে পারলুম না আমি।'

'সে রকম সারাৎসার কে আর থাকে পৃথিবীতে?' জয়তী বললে।

'কে আর থাকে পৃথিবীতে ঃ পৃথিবীর মানুষ তো সব।' ক্ষেমেশ ভুরুর উস্কানিতে জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললে।

ক্ষেমেশের মুখ ভুরুর দিকে তাকিয়ে দেখল জয়তী, হাসলেও হাসতে পারত; কিন্তু গম্ভীর হয়েছিল তার মন, সুতীর্থ ঠিকই বলেছে, হয়তো সারাৎসর কেউ নেই, কিছু নেই, খুব ছোট তিলের মত পরিসরেরও ভেতর প্রতি মানুষের নিকটতম পরিজনটি ছাড়া।

'কিন্তু ছ'মাস–এত অল্প সময়ের মধ্যে–এত বড় একটা প্রভাব–তোমার মনে বেল কুড়িয়ে রাইয়ের সামিল হয়ে গেল– এটাও খুব আশ্চর্য সুতীর্থ।'

'বেল কুড়িয়ে রাইই বটে', বললে সুতীর্থ, 'বেশ বলেছ তুমি ক্ষেমেশ।'

'তুমি গিয়েছিলে আর শবরমতীতে?'

'না, আর যাইনি।'

'শুনেছিলুম তুমি পর্ণকুটিরে গিয়েছিলে বছর কয়েক আগে–' ক্ষেমেশ বাইরের চারদিককার উজ্জ্বল ঝলসানির আর ঘরের ভেতরের একজন নারীর কোথায় যেন সৃষ্টির ঢলের ভেতর রোদে স্পর্শে শব্দে মিল হয়ে গেছে অনুভব করে আলোবাতাসে চোখ বুজে বসে থেকে সুতীর্থকে বললে।

'না, যাইনি।'

'এই তো সেদিন সোদপুরে এসেছিলেন–গিয়েছিলে?'

'না।'

'কেন?'

'বিশ্বাস নিজের ভেতর থেকেই সংগ্রহ করে নিতে হয়–বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস; চলাফেরা চিন্তা অর্থের আমার মনে হয় আমার জীবনের ছোট আধারের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা জমিয়েছি সব। এখন ব্রহ্মাণ্ডের ঝাঁপি এলেও ফিরিয়ে দিতে হবে তাকে। কী দেবে তা? যা দেবে জানা আছে আমার। মোহনদাস করমচাঁদজীকেও আবার দেখবার দরকার নেই। দেখেছি। এখন বছরখানেকের জন্যে তোমাকে বলছিলুম জয়তী, গ্রামে চলে যাব আমি। ভেবে দেখব সব। অভিজ্ঞতার থেকে কি বেরুবে আমার? বিশ্বাস না অবিশ্বাস? দেখব, বুঝব, এর পরে কি করতে হবে ঠিক করব।'

'কোথায় কোন গ্রামে যাবে তুমি?'

'ঠিক করিনি।'

'কবে যাবে?'

'আজকালই।'

'তুমি তো অফিসে চাকরি করতে?'

'ছেড়ে দিয়েছি।'

'শুনেছিলুম একটা স্ট্রাইক নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলে?'

'ছিলুম। আমার চেয়ে ভালো হাতে তুলে দিয়েছি বিধান ব্যবস্থা সব।'

'স্ট্রাইকটা ক'দিন চালিয়েছিলে?'

'মাসখানেক।'

'ও, তারপর ব্যাঙের আধুলি দেখিয়ে চলে এলে বুঝি। তোমার বয়স হয়েছে সুতীর্থ–এখন চুপচাপ বসে ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের কঙ্কাবতী পড়া উচিত তোমার।' ক্ষেমেশ বললে।

'একত্রিশটা দাঁত আছে তোমার ক্ষেমেশ', সুতীর্থ বললে, 'আমি যদি কঙ্কাবতী পড়ি–'

'তাহলে বত্রিশটা দাঁত হবে ক্ষেমেশের?' জয়তী একটু তামাশা বোধ করে বললে, 'ভারি মজার কথাই তুমি বলতে চাচ্ছ সুতীর্থ।'

'ক্ষেমেশের লাইব্রেরী থেকে ও বইগুলো যোগাড় করে দেবে আমাকে জয়তী', সুতীর্থ বললে, 'ক্ষেমেশের লাইব্রেরীটা বেশ ভালো, অনেক রকম বইই নেই, কিন্তু যা আছে রঞ্জনেরও ভালো লাগবে।'

'তুমি কোথায় থাক আজকাল?' জয়তী হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল।

'লেক বাজারের দিকে।' সুতীর্থ বললে।

'ফ্ল্যাট ভাড়া করে? ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে গ্রামে? তাহলে ফিরে এসে তো বাড়ি পাবে না আর কলকাতায়।'

'কলকাতায়ই যে ফিরে আসব এমন তো কোনো কথা নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখানে না ফিরলে কাজ করবে কোথায়?'

'কাজের জায়গা দেশগাঁয়ে নেই?' সুতীর্থ একটু তেরছা চোখে জয়তীর দিকে তাকাল।

'কিন্তু তোমরা তো বড় কাজ করবে। গাঁয়ে কাকে নিয়ে কাজ করবে? গাঁয়ে লোক কোথায়?'

সুতীর্থ পকেট থেকে একটা নতুন চুরুট বার করে বললে, 'তুমি পাড়াগাঁ দেখনি কোনো দিন জয়তী—'

চৌত্রিশ

'আমি হালিশহর, সোনারপুর, মজিলপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর—গিয়েছি তো অনেক জায়গায়।'

ক্ষেমেশ—চা আসছে না রঞ্জন আসছে না, দাড়ি কামাবার ক্ষুরটুর আসছে না, একটু বিরক্ত হয়ে, 'এই রঞ্জন—এ-ই-এই-ই' বলে গলাজলে দাঁড়িয়ে গানের গলা সাধবার মত চিৎকার করতে করতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে, 'বালিগঞ্জ গিয়েছি, টালিগঞ্জ গিয়েছি, ঢাকুরিয়া গিয়েছি, চেতলা গিয়েছি, বেহালা গিয়েছি—তুমি কার গাড়ি হে বুইক? আমি আগে ছিলাম মহারাজ বিক্রমাদিত্যের; এখন কার? এখন বিরূপাক্ষ রাজবংশীর; আরে কার গোরব্যাটা! কার? আজ্ঞে জয়তী দেবীর। তবে চল, চল, আমাকে খিদিরপুর, মেটেরবুরুজ, আলিপুর, পাকপাড়া নিয়ে চল—আমি বাংলাদেশের গ্রামগ্রামালি দেখব—আমি গাঁয়ের ডাক শুনেছি—আমার হিলম্যান মিংকস—এর ডাক—দশ গ্যালন পেট্রলে হবে?—না বেশি লাগবে ধনদা ঠাকুর?-বেশি লাগবে?—আবার কালোবাজারের শেয়ারের ডাক শুনিয়ে ছাড়বে দেখছি—'

ক্ষেমেশ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি একটু ওপরের থেকে আসছি জয়তী।'

'কেন?'

'আমার ভোরাইটা সেরে আসি।'

'তোমার ঘড়িতে কটা ক্ষেমেশ?'

'সাড়ে আটটা, এইবারে মুখ ধোব, দাড়ি কামাব, বাথরুমে যাব, রঞ্জনকে ওঠাব ঘুমের থেকে, চায়ের ব্যবস্থা হবে—'

'ক্ষেমেশ, কাল রাত চারটা অবধি বাইরে ছিল রঞ্জন?' জয়তী জিজ্ঞেস করল?'

'কড়া নাড়ার শব্দে তোমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বুঝি? তখন পাঁচটা। এই তো সবে বারান্দার শান চেলে সাত পাক খেয়ে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছ—চলো জয়তী আমার সঙ্গে ওপরে—'

'কেন?'

'বারোটার আগে রঞ্জন ঘুম থেকে জাগবে বলে মনে হয় না—হিটারে চা করে নেবে চল।'

'আমি চা খেয়ে এসেছি।' সুতীর্থ বললে।

'তোমাকে তো ভোর পাঁচটায় চা করে দিলুম—তুমিও এসো ক্ষেমেশ, আমি যাচ্ছি। মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে ঠিক হয়ে নিতে তোমার ঘণ্টা দেড়েক তো লাগবে—তারপরে নিচে এসো—আমি চা ঠিক করে রাখব।'

ক্ষেমেশ চলে গেল।

'বিরূপাক্ষের সঙ্গে কয়েক দিন আগে আমার দেখা হয়েছিল।'

'কোথায়?'

'তার বাড়িতে—সে যে তোমাকে বিয়ে করেছে তা তো আমি জানতুম না। কবে বিয়ে হল?'

'বছর তিনেক আগে।'

খানিকটা চুরুটের ছাই সুতীর্থের শার্টের ওপর ঝরে পড়ল; জামার ছাইটা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা না করে, চুরুট না টেনে—কথা ভাবছিল সুতীর্থ—কি কথা সে নিজেও ঠাহর করে উঠতে পারছিল না। অনেক দূরে একটা বটগাছের ডালপালার ভেতর একটা কালো পাখিকে আবিষ্কার করল তার চোখ। সুতীর্থ ভাবছিল, আমার চোখের বাহাদুরি আছে বটে; কিন্তু তবুও কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল সে, কেমন একটা ব্যথা ঃ স্নায়ুর ভেতরে না মনোময়তার রক্তে না হিরন্ময়তায় রক্তে না হিরন্ময় কোষে? জয়তী তাকিয়ে আছে সুতীর্থের দিকে। চোখ জয়তীর দিকে ফিরিয়ে নেবার উপক্রম করে তবুও কালো পাখিটার দিকে তাকিয়ে থেকে সুতীর্থ বললে, 'ক্ষেমেশের এখানে বেড়াতে এসেছ?'

'না।'

'তবে?'

'আমি বিরূপাক্ষকে ছেড়ে এসেছি। আইন আদালতে তো যেতে হবে এ জন্যে।' জয়তী বললে।

'কেন?'

'বিরূপাক্ষকে ছেড়ে এসেছি—বললাম তোমাকে—শোননি?'

'শুনেছি।'

'আমি আলাদা থাকতে চাই এখন থেকে। সেটা আইন দিয়ে ঠিক করিয়ে নিতে হবে না?'

'তা হলে তো ক্রিশ্চান হয়ে নিতে হয়; ক্রিশ্চান—মুসলমান—'

'হতে রাজি আছি আমি।'

'কি জানি, আইনের মারপ্যাঁচ আমার জানা নেই। খুব কঠিন হবে', সুতীর্থ বললে; ডান হাতটা খানিকটা তুলে নিয়ে দেখল চুরুট নিভে গিয়েছে, জ্বালাতে গেল না, চোখ দিয়ে দেশলাই খুঁজল দু'চারবার; চোখে পড়ল দেশলাই সুতীর্থের কিন্তু চোখে যে পড়েছে সেটা টের পেয়ে দেশলাইটা কুড়িয়ে নেবার আগে অন্য বিষয়ের দিকে চলে গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ–জয়তীর দিকে নয়; স্ট্রাইক, মণিকা, মল্লিক, মুখার্জির কথা ভাবতে ভাবতে জয়তীর কথা মনে পড়ল আবার। সুতীর্থ, বললে, মন যখন তোমার বিরূপাক্ষের দিকে নেই, আইন ওর দিকে থাকলেও কি আর হবে।'

'কিছু করতে পারবে না?'

'কিছু করতে চাইবে না।'

'আমার ওপর সব সত্ত্ব ছেড়ে দেবে ও?'

চুরুট নিভে গিয়েছে টের পেল সুতীর্থ।

সোফাগুলোর আনাচে কানাচে কি যেন খুঁজে তাকাতেই দেশলাইটা চোখে পড়ল তার; জ্বালিয়ে নিল চুরুট।

'পাঁচ লাখ টাকা আমি নিয়ে এসেছি। বালিগঞ্জের বাড়িটাও আমার নামে লিখিয়ে নিয়েছি। আইনে পাকাপাকি করে নিয়েছি।'

'ভালোই তো।' সুতীর্থ বললে। বটগাছটার দিকে তাকিয়ে চুরুট টানতে লাগল সে। পাতা–অনেক ঘন পাতা ছায়ার আড়ালের কালো পাখিটাকে কোনো অনুমান বলে ঠিক করে নিতে পারছে না, বুঝতে পারছে না ওটা কি পাখি ঃ কোকিল না নীলকণ্ঠ না কি; কোকিল যদি হয় মকর সংক্রান্তি কেটে গেলেও এমন চুপ করে আছে কেন? ওটা পাখি তো? একটা ছোট কালো মেরজাই নয় তো দেশোয়ালীদের? পাখী না হয়ে মেরজাই? পাখি হোক।

'আমি এখন কি করব?'

'কে–জয়তী কথা বলছে? সুতীর্থ চুরুট ফুঁকছিল। ঘাড় ফিরিয়ে জয়তীর দিকে তাকাল।'

'আমি ভেবেছিলুম তুমি ওপরে চলে গেছ স্টোভ জ্বালতে।' স্টোভ তো নিচেও জ্বালানো যায়; সুতীর্থ ঘরের চারদিকের প্লাগের ছ্যাঁদাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে, চলো তুমি আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'গ্রামে যাবে চলো।'

গ্রামে কোনদিন যায়নি জয়তী; গ্রামের নিমিত্ত নিধান কাকে বলে জানে না। গ্রামগুলো মরছে, তুইয়ে বুইয়ে নতুন গ্রাম নির্মাণের ব্যাপারটা ভেবে দেখতে যায়নি। গ্রাম কোথায়–কি রকম–কি করতে হবে এই সব গ্রাম নিয়ে–এ সম্বন্ধে কোনো স্বভাব–কৌতূহল কোনদিন ছিল না, তার। কিন্তু সুতীর্থ তাকে গ্রামে যেতে বলেছে। হঠাৎ যেন অনেক চাপা জলোচ্ছ্বাসে শুকনো ফাঁকা একটা প্রান্তর ভরে উঠল। এটা কি প্রান্তর? না সমুদ্র?

'কোন গ্রামে যাবে সুতীর্থ?'

'ঠিক করিনি এখনো।–তবে কোনো একটা গাঁয়ে নয়–অনেক গ্রামে যাব।'

'ভারতবর্ষকে তো এখনও দু'ভাগ করা হয়নি। কিন্তু হবে শুনছি। ওদের ভাগে যে অংশ পড়বে সে সব গ্রামেও যাবে?'

জয়তী বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'শুধু বেড়াতে যাওয়া নয়, অনেক কঠিন কাজ করতে হবে গ্রামে গিয়ে। শহরে তো অনেক বোকা লোক আছে; তার চেয়ে ঢের বেশি বোকা মানুষ গ্রামে থাকে। কিন্তু বোকা বলে বজ্জাতির কসুর নেই। তাদের ওপরয়ালা আছে, আরো খারাপ। আরো ওপরে–সমস্ত দেশ জুড়েই কেমন একটা নিরেস অর্থহীন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে দেখবে এরা সকলে মিলে আমাদের দু'জনকে পালে চাপা দিয়ে লাট করে ফেলতে চেষ্টা করছে–'

'এরা সকলে মিলে নয় এদের অনেকে–'

'কলকাতা দিল্লিরও চাঁই লোক আছে ওদের মধ্যে।'

আমরা তো কোনো খারাপ কিছু করতে যাচ্ছি না–ভালো কাজ করব।

আমাদের দিকেও লোক থাকবে। আমি যাব গ্রামে।

'কদিন থাকবে?'

'যতদিন তুমি থাকতে বল।'

'সুতীর্থ চুরুটে টান দিয়ে শেষে বললেন, 'এতদিন তুমি থাকতে পারবে না।'

'কেন?'

'গ্রামে গ্রামেই থেকে যাব–কলকাতায় ফিরব না আর। মহা সরীসৃপের মত বিরাট পাথরের গায়ে আঘাত করে জল নিজের জলের দেশে ফিরে যাচ্ছে এমনই একটা আশ্চর্য আদি পৃথিবীরই নাদ যেন বেজে উঠক সুতীর্থের কথায়।

সেই জলের শব্দ শুনল জয়তী।

'কলকাতায় তোমার বাড়ি আছে, টাকা আছে, মানুষ আছে, যারা তোমাকে টানে।' সুতীর্থ বললে, 'গ্রামে গিয়ে বরাবর তুমি থাকতে পারবে না।'

'সুতীর্থ চুরুটের মুখের আগুনের দিকে তাকিয়ে নিল একবার–টানবার আগে। আস্তে আস্তে টানছিল।

মাঝে মাঝে এক–আধ মাসের জন্যে যদি আমি কলকাতায় আসি তাতে তোমার আপত্তি আছে?' সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে জয়তী বললে।

'ঠিক করেছ গ্রামে যাবে?'

'আমি কিছু রেখে ঢেকে বলেছি সুতীর্থ?'

'আমাদের সঙ্গে গেলে দু-চারটে শর্ত আছে।'

'বললেই তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব শর্তগুলোর কথা কি বলেছি তোমাকে?'

'কেন? বলবার কি দরকার? এটা কি দু'পক্ষের ব্যাপার।'

'তাহলে বুঝেছ তুমি সব।' খুব বিশ্বাসভরে বললে সুতীর্থ। মানুষের গুলি এড়িয়ে আকাশের অন্তহীন নিরাপদের ভেতর বুনো হাঁস-দম্পতির মত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল জয়তীর বুকের ভেতর থেকে।

'গ্রামে গিয়ে আমি বিয়ে করব তো জয়তী'–সুতীর্থ চুরুটের আগুনের দিকে তাকাল আবার চুরুটটা অনেকখানি ক্ষয় হয়ে গেছে; জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'কেন, বিয়ে করবে কেন এত বয়সে?'

মাথার ওপরে দোতলার ঘরে ড্রররর-ঠটক টক ঠক ঠট্রাক ট্রাক-শব্দ হচ্ছিল; কেউ চেয়ার টেবিল টানাটানি করছে মনে হল।

জয়তী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে না থাকলে কোন কিছুতেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে না তুমি। সেরকম বিশ্বাস না থাকলে, সুতীর্থ এ যুগকে সাহায্য করতে পারবে না তুমি। খুব বিপন্ন আমাদের এই যুগ, তোমার মতন লোকের সাহায্য চায়।'

'তা চাইতে পারে, কিন্তু আত্মবিশ্বাস আমার নেই।'

'জানি, বললে তুমি কোনো রকম বিশ্বাসই নেই তো?'

সুতীর্থ হাল্কা চোখে আলো রোদের দিকে তাকিয়েছিল, চোখে গভীরতা আসছিল তার ক্রমে ক্রমে। জয়তী দেখছিল মস্ত বড় ঝাড়নটা পুব দিকের দেয়ালে কাঠ হয়ে আছে; আনাচে কানাচে ময়লা আছে; অনেকদিন ঝাড় সাফ করা হয়নি।

পঁয়ত্রিশ

'আছে।' জয়তী বললে, 'না হলে ওরকম স্ট্রাইকটায় হাত দিতে যেতে না তুমি।'

'স্ট্রাইক। আমি তো ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় কাজ করতে সুতীর্থ?'

'সাপ্লাই কর্পোরেশনে।'

'কত মাইনে পেতে?'

'পাঁচশো।'

'আরো উন্নতি হচ্ছিল নাকি?'

'টাকাকড়ির? তা হত।'

'কেন ছেড়ে দিলে সব?'

'আমরা জোট পাকিয়ে পরিশ্রম করে মল্লিকদের ফার্ম দাঁড় করিয়ে দিলে ধনী-মানী লোকদের তো সুবিধে হবে, যারা না খেতে পেয়ে মরছে সে-সব কেরানি মজুর মাস্টার বেকারদের কোন লাভ হবে না।'

'এই তোমার বিশ্বাস?'

'চুরুট খেতে গিয়ে–চুরুটটা ফেলে দিয়েছে মনে পড়ল সুতীর্থের। আর একটা চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিল, কোথায় রেখে দিল যেন তারপর দেশলাইটা জয়তীর কথা শুনেছে বলে মনে হল না, চুরুট না টেনে বাইরের রৌদ্রের বড় ঝিলিকটার দিকে তাকিয়ে রইল।

'ধন্য সত্য তোমার সুতীর্থ। অথচ সত্যে অবিশ্বাসীর বদনাম তোমার?'

যে হাঁস আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তার মত চোখে যে গহন জলে সাঁতার কেটে চলেছে মাঝগাঙের সেই গৃহ বলিভূক রাজ-হাঁসিনের দিকে তাকাল সুতীর্থ।

নিভে গেছে চুরুট, সুতীর্থের চোখ দেশলাই খুঁজে ফিরছিল; নেই; আছে নিশ্চয়ই–কিন্তু সহজ চোখের পথে কোথাও নেই; আচ্ছা পরে দেখা যাবে।

'কলকাতায় একটা লোককেও তুমি খুঁজে পাবে যে এ-জন্য পাঁচশো টাকার চাকরি ছেড়ে দেয়?'

'কেন, তুমিই তো ছেড়ে দিচ্ছ জয়তী।'

'আমি?' সুতীর্থের নেভা চুরুটটার দিকে তাকিয়ে জয়তী বললে, 'তুমি দেশলাই খুঁজছিলে? পেয়েছ?'

'না।'

'কোথায় গেল দেশলাইটা?'

'লাখ টাকার চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ তো তুমি; আমার সঙ্গে গ্রামে যাবে বলছ। এত শ্রদ্ধা তোমার পৃথিবীর ওপর? এত বিশ্বাস মানুষকে?'

জয়তীর চোখ দেশলাই খুঁজছিল; কোনো কোণে খামচি–কোনো দিকে দেখতে পেল না সেটা।

'অথচ আমার কি মারাত্মক অবিশ্বাস দেখ। আমি জানি যে তুমি আমার সঙ্গে যাবে না।' বলে আস্তে আস্তে চুরুটটাকে মুখে তুলে টানতে গিয়ে সুতীর্থ টের পেল নিভে গেছে; অনেক আগেই নিভে গেছে, দেশলাই খোঁজা হচ্ছে, এত সব ভুলে গিয়েছিল সে। দেশলাই পেল কি জয়তী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়তী রোদের ভেতর চোখ বুজে কেমন গাঢ় লাল বর্ণের সুধা স্রোতটাকে খানিকটা তিতোর মত অনুভব করে চোখ মেলে বললে, 'আমি এই ক্ষেমেশের বাড়িতেই থাকব তবে?'

'থাকো। এ বাড়িটা খুব ভালো।'

'হ্যাঁ, ইঁটের ওপর ইঁট চড়িয়ে বেশ গেঁথেছে, কিন্তু আমার মাটির দেয়াল হলেই হবে।'

'কোথায়?'

গ্রামে। আজই চলো।'

'আজই?'

দেশলাইটা খুঁজে পেয়েছে জয়তী, দিই দিই করে সুতীর্থকে দেওয়া হল না। চুরুট নাই বা জ্বালাল সুতীর্থ। না; জ্বালাবার কোনো তাড়া নেই। দেশলাইটার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'পেলে খুঁজে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ছিল?'

'গদির কিনারে; ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল।'

সুতীর্থ নেভা চুরুটের ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'আজ হবে না, তবে আজ-কালই যাব গ্রামে।'

'কোন্ গ্রামে যাবে ঠিক করেছ?'

'স্টেশনে গেলে ঠিক হবে।'

'তা হবে। সব গ্রামই গ্রাম, একরকম অন্ধকার, একটা সম্ভাবনা, একই রকম শূন্যতা। আলোও আছে?' জয়তী বললে, 'সুতীর্থ, ওদিকে পাকিস্তান হচ্ছে নাকি?—আমাদের যশোর খুলনা চাটগাঁ নোয়াখালির দিকে যাবে?'

'চলো!' সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল জয়তী হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা দিচ্ছে। হাতের থেকে দেশলাইটা কুড়িয়ে নিয়ে সুতীর্থ বললে, 'একটি কি দুটি সন্তানের দরকার আমার।'

কোন কথা বললে না জয়তী; মুখের ভেতর তার কোনো ভাব নেই; যেন কেউ নেই, কিছু নেই, কেউ কোনো কথা বলেনি যেন।

সুতীর্থ চুরুটের মুখের থেকে সাদা ঠাণ্ডা ছাই ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে, 'আচ্ছা থাক, কেন দরকার নেই।

'কেন?'

'এক-আধটা চাষাভুষোর ছেলেকে আমাদের ঘরে এনে মানুষ করলেই হবে।'

চুরুট জ্বালাল সুতীর্থ।

জয়তী একটু হেসে বললে, 'পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক চাষাভুষোর ছেলেগুলোকে নিজেদের ঘরে নিয়ে সন্তানের সাধ মেটাচ্ছে বুঝি? তাই যদি করে তাহলে আমরাও তা করব। কিন্তু না করে যদি তাহলে পৃথিবীর লোকেরা যা করে সেই নিয়মে চলব আমরা। সেই নিয়মে চলবে তুমি সুতীর্থ?'

'পৃথিবীর শীত ঋতুতে খুব গভীর তো সেই নিয়ম—।' সুতীর্থ কিছুক্ষণ চুরুট হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল। বললে, 'তুমি আমার সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে গ্রামে?'

'পৃথিবীর শীত ঋতুতে গভীর সেই নিয়ম। কি যে গভীর। পৃথিবীতে আরো চল্লিশটা শীত ঋতু বাঁচব আমরা—তুমি আর আমি।'

জয়তীর মুখে একথা শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সুতীর্থ, তারপর অন্য চিন্তা এল, সুতীর্থের মনে—অন্য ভাব; চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রোদের বেলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'পৃথিবীটা আজকাল খুব খারাপ, আমার মতন মানুষের মন সেই পৃথিবীর মতই খারাপ। মনটাকে স্নিগ্ধ, সত্য করে নিতে হলে চাষাভুষো হয়ে থাকতে হবে গিয়ে গ্রামে। আমরা একটু বড়-প্রামাণিক চাষা হব বলে, বেশি সাহস, বেশি বুদ্ধি, বেশি সহানুভূতি নিয়ে কাজ করব—যত বেশি লোকের জন্যে সম্ভব করব। কিন্তু কোনো নতুন সূর্য সমাজ আর পুরোনো সমাজের আকাট ভাঁওতার কেলেঙ্কারি থাকবে না আমাদের রক্তের ভেতর কোনো বিষ থাকবে না কোনো কিছুর বিরুদ্ধে; কাজ করব, উপলব্ধি করব—সেবা করব—সন্তানেরা আসবে—শেখাব তাদের; ফুরিয়ে যাব পৃথিবীর থেকে।'

'এই তো পৃথিবীর কথা।' জয়তী বললে।

'না, পৃথিবীর কথা এর চেয়ে ঢের খারাপ।'

'সব সময় না; যা বলেছ তুমি এইরকম ভালো অনেক সময়—'

জয়তীর শরীরে রোদ এসে পড়েছে তার ভেতরে বসে থেকে সে বললে, বলে ভালো লাগল তার; কথা ভেবে, বলে, ভালো লেগেছে মুখে হাসি রয়ে গেছে তাই জয়তী বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে এসেছি এবার; যা এত চেষ্টা করে পারনি এতদিন—আমি এসেছি বলে সব পারবে।'

শুনে মন খানিকটা আতস কাঁচের রোদের মত স্থিত, অক্ষুণ্ণ হয়ে এল, কাঁচে সূর্য ফলিত হয়ে চলেছে, সুতীর্থ বললে, 'আমরা যদি পারি—' বলতে বলতে তবুও চুপ করে রইল সে।

'তুমি পৃথিবীকে ভালো মনে কর সুতীর্থ। আমার চেয়ে বেশি বিশ্বাসী তুমি।'

'আমি?'

'কেউ তোমাকে বলেনি এই কথা এতদিনেও, তেমনভাবে বলেনি।' জয়তী নিজেকেই আস্তে আস্তে বলছিল যেন। 'জীবনের ভালো জিনিসগুলো আমি তোমাকে দিয়ে প্রমাণ করাব।' বললে জয়তী—এত চাপা গলায়—যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ফিসফিস শব্দ হল শুধু; নিজেকেই বলতে চাচ্ছিল জয়তী, আর কাউকে নয়। কিন্তু তবুও শুনতে পেল সুতীর্থ; বললে, 'আমাদের জীবন প্রমাণ নিয়ে নয়। প্রমাণ ট্রুমান নিয়ে নয়। না।'

'তবে?'

'যে জিনিস নিজের থেকে হয় তাই নিয়ে।'

'কি জিনিস?'

বিরূপাক্ষের টাকাকড়ি, বাড়ি যা তুমি নিয়েছ তার কাছ থেকে, ফিরিয়ে দিতে হবে তাকে। চলো ফিরিয়ে দিয়ে আসি আজ-' জয়তী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'কি ফিরিয়ে দেবে?'

'দলিলপত্র সব।'

'তোমার নিজের হাতে টাকা আছে?' অনেকক্ষণ পরে বললে জয়তী।

'না। নেই।'

'কি করে চলবে তবে সব?'

সুতীর্থ হাসতে লাগল। 'আমি একা মানুষ। তুমি তো নেই জয়তী-সে সব গাঁয়ে। আমি একা তো।'

অনেক ভেবেচিন্তে অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও জয়তী বিরূপাক্ষের সব জিনিসই তাকে ফিরিয়ে দিতে রাজি হতে পারল না। অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা সে রাখতে চাইল, আর বালিগঞ্জের বাড়িটা। এ বিষয়ে জয়তীর মতামত স্থির তো। আরো ভালো করে বুঝে দেখবার জন্যে একমাস বা অনন্তকাল সময় চায় না সে; তাতে মত বদলাবে না। সে জানে তা; সুতীর্থও জানে। মানুষের জীবনের এইরকম সব ধরণ ধারণ, নির্ধারণ।

'সুতীর্থ, কিছু হাতে রেখে তোমার সঙ্গে চলি আমি;-তেমন বেশি কিছু নয়, আমি বলছি তোমাকে-'

'তা হতে পারে না,' সুতীর্থ বললে।

কিন্তু বিরূপাক্ষকে টাকাকড়ি সব ঝেড়েপুছে দিয়ে আপোসে আসতে হবে সুতীর্থের সঙ্গে? বিরূপাক্ষকে সেরকম করে সব ফিরিয়ে দিতে পারবে না জয়তী।

'তুমি ক্ষেমেশের এ বাড়িতে থাকো। ক্ষেমেশের তাঁবে নয়-নিজের মনে। সেটা সম্ভব হবে। পাখিটাখি নিয়ে ক্ষেমেশের ঘর-বার। যেন সব মানুষ পাখি হয়ে গেলে ভালো হত, স্বচ্ছমনের সাদা পাখি সব-' বলতে বলতে জানালা আলো বাতাস সূর্যে চমৎকার দিঙমণ্ডলের দিকে তাকাল সুতীর্থ।

সুতীর্থ আবার দেশলাই হারিয়ে ফেলেছে। কোথায় রেখেছে সেটা? নিভে গেছে চুরুট। নিজের সোফা জয়তীর সোফা চারদিকে তাকাচ্ছিল সে। পেল না দেশলাই। পেল না যে সেটা টের পেল না জয়তী; সে মেঝের দিকে ঘাড় হেঁট করে তাকিয়েছিল।

দেশলাই উড়ে যায়নি, ছিল; খুঁজে পেল সুতীর্থ; চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'না, বিয়ে করব না আমি। শীতকালে গাঁয়ে একা থাকাই সব থেকে ভালো। একা থাকা। শীতকালে। পাড়াগাঁয়ে।'-চোখের সামনে যেন সবুজ ঘাস-ফর্সা ধুলোর পথ-ফসল-শীতের আমেজ-বিকেলের সূর্য দেখা যাচ্ছে-এমনিভাবে বলল সুতীর্থ। কিন্তু চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল তার; গ্রাম মানে-গ্রামের নাড়ীনক্ষত্র-যা অন্ধকারে ও হালকা ও অতল-সেই সব নিয়েই তার কাজ-যতদূর সম্ভব সঙ্গতি আনতে পারা যায়-সেইজন্যেই যাচ্ছে সে।

'ক্ষেমেশের এখানে আমি থাকব না।' জয়তী বললে।

'কোথায় যাবে তাহলে?'

'বাবার ওখানে গিয়ে থাকব। আমি টিচারি করব।'

'ও-সুতীর্থ যেন লিকলিকে ট্রাম লাইনের পৃথিবীতে ফিরে ফিরে এসে বললে, আচ্ছা উঠি জয়তী।'

'আজই তুমি গ্রামে যাবে?'

'হ্যাঁ, আজই।'

'আজই?' জয়তী কি যেন এক ভাবনার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে পেয়েও পাচ্ছে না এমনি চোখে দেয়াল মেঝে চারিদিককার ঘাস গাছ পৃথিবীর মানুষের শেষ আশার মত সমস্ত সূর্যের পিণ্ডের দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'জিনিস-টিনিস কোথায় তোমার?'

'গাঁয়ে গিয়ে যোগাড় করব।'

'এখন বুঝি টিকিটের টাকা হাতে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

সুতীর্থ চলে গেল।

মানুষের চোখ সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতে পারে না। চোখ ঝলসে পুড়ে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল জয়তীর সূর্যের দিকে তাকাতে তাকাতে। কিন্তু তবুও তাকিয়ে রইল সে; কোন অশেষ প্রণিধান, অজেয় অমেয় স্থিরতা অমর আশা লাভ করবার জন্যে নয়; কেউ কারো কাছ থেকে কিছু লাভ করতে পারে না-পৃথিবী বলছে, সুতীর্থ চলেছে-সূর্য জ্বলে-এইসব মেধাবী গভীর মর্ত্যের থেকে কয়েক বছরে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল তার মন; ফিরে আসতে চাচ্ছিল এসবের দিকে;-কিন্তু পারছে না-সূর্যের চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার-।

ঠাণ্ডা হাত এসে লাগল জয়তীর চোখের ওপর। কারা যেন ঢুকে পড়েছে ঘরে-ক্ষেমেশ-সঙ্গে কে-বিরূপাক্ষ-কী করেছিলে জয়তী-সূর্যের দিকে তাকাচ্ছিলে যে!-'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছত্রিশ

'আমি কিছু দেখছি না ক্ষেমেশ।'

'ঝলসে গেছে তোমার চোখ। খানিকক্ষণ পরে দেখতে পারবে।'

'কে হাত রেখেছিল আমার চোখের ওপর?'

'আমি।'

'ওদিকে দাঁড়িয়ে কে?'

'রঞ্জন।'

'আর কে?'

'আর কেউ নেই।'

'ও-' না বিরূপাক্ষ নেই। এক ঝলক স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল জয়তীর।

'আমাকে দেখতে পাচ্ছ? জয়তী?' খানিকটা দূরে একটা সোফায় বসে ক্ষেমেশ বললে।

'ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। একটু দেরি হবে-'

'তোমার তো গ্লুকোমা ছিল। ওরকম কটকটে সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলে জয়তী-'

'আকাশে মেঘ করেছে ক্ষেমেশ?'

'মেঘ? না তো, খুব কড়া রোদ; মেঘ নেই, খুব নীল।'

'ও-' জয়তী বললে, 'হ্যাঁ, রোদ গায় লাগছে-কিন্তু-'

ক্ষেমেশ জয়তীর গরম রসস্থ চোখের দিকে তাকিয়ে রইল-সূর্যের দিকে-কয়েকটা পাখির দিকে তারপর। ভুলেই গিয়েছিল জয়তী ঘরের ভেতরে বসে আছে; অনেকক্ষণ পরে ফিরে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে, তোমার খুব পুরু লেন্স চাই।'

শাড়ির আঁচল মাটিতে পড়েছিল, উঠিয়ে নিয়ে একটু ধুলো ঝেড়ে জয়তী বললে, 'অনেকদিন থেকেই চশমার দরকার। কিন্তু খুব পুরু না হলেও চলবে।'

'চশমা নাও নি কেন এতদিন?'

'এইবারে নেব।'

'মোটা পাথর লাগবে তোমার।'

'কেন, আমি ছানি কাটিনি তো। পুরু লেন্স কেন লাগবে?'

'ছানি নয়-'

'চোখের শিরা শুকিয়ে যাচ্ছে আমার-'

'তারপরে অন্ধ হয়ে যায়। 'ক্ষেমেশ বললে; 'এর কোন ওষুধ নেই জয়তী?'

'না। ক্ষেমেশ।'

'আমি ভাবছি কোন ওষুধ আছে কিনা-'

'তোমার ঘড়িতে কটা?'

'একটা বেজেছে।'

'আমি গ্রামে যাব ভেবেছিলাম।' জয়তী বললে।

'সময় হলে যাবে-'

'রঞ্জন চা নিয়ে এল।

'বড্ড রসিয়ে চা করেছি আজ-' রঞ্জন বললে, 'সুতীর্থবাবু গরম গরম চেখে গেলে পারতেন। এ জিনিস হবে কি আর কোনদিন।'

চা সাজিয়ে রেখে রঞ্জন চলে গেল। চায়ের কাপ শেষ করে টিপইয়ের ওপর সরিয়ে রেখে ক্ষেমেশ খুব তৃপ্তির সঙ্গে মুখ মুছছিল।

'লিপটন বুঝি?'

'না খুচরো সব-এ পাতা সে পাতা মেশানো-কোত্থেকে বেছে আনে রঞ্জন।'

দুপুর। ফিকে নীল ছিল, এইবারে গাঢ় নীল হয়ে পড়েছে সমস্ত আকাশ-কানায় কানায়; সাদা মেঘগুলো আরো বেশি সাদা, ফুরফুরে বাতাস ভেসে আসছে।

দু-এক চুমুক খেয়ে জয়তী আর চা খাচ্ছে না দেখে ক্ষেমেশ জয়তীর পেয়ালাটা তুলে নিয়ে আকাশ রোদের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ভুলে যেতে লাগল সব-কোথায় সে আছে, ওদিককার সোফায় কে বসে আছে-হাতের তার ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালা জয়তীর না তার নিজের। হঠাৎ তার মনে হল পেয়ালার ডাঁট খুব শক্ত করে ধরে আছে সে-পেয়ালার ভেতরে চা নেই আর। সমস্ত চা খেয়েছে সে? কখন খেল?

'আমার পাইয়োরিয়া আছে।'

'তোমার?' ক্ষেমেশ চোখ তুলে একবার তাকিয়ে বললে 'মাড়ির দাঁতে?'

'হ্যাঁ, বিয়ের পর থেকে। আমার মুখের চা তুমি না খেলেই পারতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চাই তো খাই আমি–চেছে বেছে মুখ সম্বন্ধে খেয়াল রেখে।' হাতের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে ক্ষেমেশ বললে।

চারদিকে খুব বেশি নিঃশব্দতা। মেঝের ওপর দিয়ে মড় মড় করে এক চিলতি কাগজ বাতাসে উড়ছে–ঘুরছে–

'আমার পাইয়োরিয়া নেই–' জয়তী চোখ তারিয়ে হেসে উঠে বললে। এবার সে আগের চেয়ে পরিষ্কার দেখছে।

'একটা দাঁতে পোকা কুরছে। তামাকের ছাই দিয়ে দাঁত মাজলে ভালো হবে–'

'খেয়ো দাঁতটা নড়ছে?'

'স্টপ করিয়ে নিলেও খাবে ক্ষেমে?'

'আর একটা দাঁত ধরবে।'

'আমি তো বেশি মিষ্টি খাই না। কেন পোকা হচ্ছে?'

'তা হয়।'

'স্বভাব?'

ক্ষেমেশ উঠবে ভাবছিল; রঞ্জনকে বলে আসতে হবে–আরো চা করে দিতে। কি জিজ্ঞেস করেছে জয়তী ঠিক শুনতে পেল না; উঠল না; রঞ্জনকে কিছু বলবার দরকার নেই ভাবছিল ক্ষেমেশ, যা করবার নিজেই করবে ও, চা দিতে হলে দেবে।

দাঁতের কথা হচ্ছিল, স্বভাবেরও কথা, অন্য এক আধটা কথা মনে হল; জয়তী বললে, 'কেউ আমাকে বলেনি যে মানুষের স্বভাব ভালো–তাই শেষ পর্যন্ত ভালোই হবে মানুষের–'

ক্ষেমেশ বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, ঘরের ভেতরে চোখ ফিরিয়ে টেনে বললে, 'এর পরে বলবে।'

'পরে?–কবে?–'

যে প্রশ্নের দু'রকম উত্তর চলে আসছে অনেকদিন থেকে, সেইটে জিজ্ঞেস করেছে জয়তী; কোন উত্তরটা বেশি সত্য এখনও ঠিক করেনি ক্ষেমেশ; তবুও এটা ঠিক যে এখন কিছু হবে না, পরে হবে; ক্ষেমেশ আস্তে আস্তে বললে, 'আমাদের মৃত্যুর পরে।'

'কটা বেজেছে?'

'চা খাবে?'

'আমাদের মৃত্যু–আমাদের এই যুগের?'

'আরো আসছে কয়েকটা যুগের-'

'ও–' জয়তী বললে, 'কিন্তু তখনও ক্ষেমেশের মত হয়তো কেউ বলবে, এখনও হল না, আরো কয়েক যুগ পরে হবে।'

'বুঝেছ তুমি।' বলে ক্ষেমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, চশমা খুলে নিয়ে চোখের ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে নিল; 'একেই জানা বলে', বোজা চোখের ওপর আঙুলের আলতো চাপ রেখে ক্ষেমেশ বললে, 'কিন্তু তবুও তুমি জ্ঞানী নও।'

'জ্ঞানীর দুঃখ সুতীর্থ অনুভব করেছে? কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দিতে পারছি না।' বলতে বলতে চশমা পরে নিল ক্ষেমেশ।

'ওর কথা আর না বলাই ভালো।'

'কেন?'

'কেন নেই।' জয়তী বললে, 'চায়ের কথা বলেছিলে–'

চায়ের জল চাপিয়েছে হয় তো রঞ্জন।

সুতীর্থ স্টেশনে পৌঁছে গেছে? পূর্ববঙ্গের দিকে যাবে হয় তো; আসামের দিকে যাবে, নাকি ঢাকার দিকে, না খুলনা রূপসা পেরিয়ে–

'মৈত্রেয়ীর কথা মনে হচ্ছে আমার–' জয়তী বললে, 'তোমার কাছে উপনিষদ আছে?'

'না। চায়ে মাঝে মাঝে বেশি মিষ্টি দেয় রঞ্জন। কিন্তু সব সময়ই দেখছি তোমার মিষ্টির হাত ঠিক থাকে–'

'কেউ কেউ বিনে চিনিতে চা খায়–'

'আমি নেবুর রস দিয়ে চা খাচ্ছি মাঝে মাঝে–বেশ ভালো লাগছে।'

'নেবুর রস দিয়ে কাঁচা চা? চিনি নেই?'

'জয়তী কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে আস্তে আস্তে বললে, 'সুভাষ বোস কি সত্যিই নেই আর ক্ষেমেশ?'

'হ্যাঁ, কালো রঙের চা; চিনি কম; মৈত্রেয়ীর কথা কেন মনে পড়ল তোমার জয়তী?'

'নেবুর রস দিয়ে চা বানিয়ে দেখিনি কোনদিন আমি।'

'কিছুই না–শুধু নেবুর রস দিয়ে চা বানানোভ'

'সহজ–কিন্তু নেবুর রস উনিশ–বিশে নষ্ট হয়ে যেতে পারে চা।'

'তোমার হাতে চায়ের চিনির কোন উনিশ-বিশ হয় না তো জয়তী; কেন নেবুর রসের হবে?'

'কটা বেজেছে ক্ষেমেশ?'

কিন্তু ক্ষেমেশ ঘড়ি না দেখে দূর পাঁচিলের শ্যাওলার দিকে তাকিয়েছিল; সবুজ মখমলের মত পুরু হয়ে উঠেছে; রোদ এসে পড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এটা কার চুরুট?'

'সুতীর্থ ফেলে গেছে–'

ক্ষেমেশ বললে, 'আমি জ্বালিয়ে নিচ্ছি!'

ক্ষেমেশ চুরুট খাচ্ছিল নিঃশব্দে। কোনো কথা বলবার ছিল না জয়তীর।

'চুরুটের মুখে সাদা ছাই জমেছে সেগুলো–'

'সেগুলো? ফেলে দেব না আমি–যদি নিজের থেকে পড়ে না যায়।'

'নিজের থেকেই পড়ে যাবে–কিন্তু অনেকক্ষণ পরে পরে।'

'ও'–ক্ষেমেশ বললে।

'ব্যাঙ্কে যাবার সময় আছে?'

'না–' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে। 'ব্যাংকে যেতে তুমি জয়তী?'

'দরকার ছিল–'

'আগে বলা উচিত ছিল তোমার।'

'কেন আজই উঠে যাবে বুঝি সব, কোনো ব্যাঙ্ক থাকবে না আর কাল?'

ক্ষেমেশ চশমা খুলে মুছছিল, মুছতে মুছতে বললে, 'যারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখে তাদের অদল-বদল হবে খানিকটা; কিন্তু মানুষের হাতে টাকার কোনো মানহানি হবে না কোনদিন। জান তুমি। খুব জ্ঞানের কথা আর শান্তির কথা এইসব।'

চশমা মুছে ঠিক করেছে, পরল ক্ষেমেশ।

'আমিও তাই বলছিলাম ক্ষেমেশ। বেশ শান্তিতে আছি। আজো আমাদের চীনের মত অবস্থা হয়নি।'

'প্রথমে দেশ স্বাধীন হবে।'

'তারপরে?'

'চীনের মত অবস্থা? ভাবছি আমি তাই। কিন্তু কি হবে চীনের মতন হলে? যারা মানুষকে মেরেছে সেই সব মানুষ শায়েস্তা হবে হয় তো। কিন্তু টাকা মার খাবে না কোনোদিন। এই দেবতাই ব্যাধি। মানুষের বিদ্যা বাড়ছে কিন্তু জ্ঞান নেই।'

'কিন্তু প্রতিটি শতকই আশা করে যে এইভাবে জ্ঞান হবে। চীন কি আশা করছে না? তোমার চুরুট নিভে গেছে ক্ষেমেশ–' কিছু করতে পারবে না। কিন্তু সত্যি একটা আশ্চর্য উপলক্ষ্যের মত। গিয়েছে। মরুভূমির বালিতে যে ঘাস গজায় না এই থাক টিপাইয়ের ওপর–এখন জ্বালাব না আর।'

'আমরা আশা করছি? সুতীর্থ নিজে কিছু করতে পারবে না। কিন্তু সত্যি একটা আশ্চর্য উপলক্ষ্যের মত মরুভূমির বালিতে যে ঘাস গজায় না এই জ্ঞান নিয়ে ঘাস গজাতে গেল–' জয়তী বললে, 'আমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী তাই সুতীর্থ আমরা দু'একদিনের হিসেবে জিনিসের দিকে তাকিয়ে দেখি ও হাজার বছরের হিসেবে।'

'খানিকটা চাপা আগুন রয়েছে চুরুটের ভেতর, এখুনি নিভে যাবে।' চুরুট হাতে নিয়ে ক্ষেমেশ বললে।

'জ্বালাবে?'

'তুমি উঠলে–?'

'হ্যাঁ, এইবারে–'

জয়তী আস্তে অত্রস্তভাবে বললে, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়?' ক্ষেমেশ বললে, বিরূপাক্ষের ওখানে নয়; সুতীর্থের কোনো ঠিকানা নেই–'

'না। বাবার ওখানেও যাব না আর; আমি নিজে কিছু কাজ করব, নিজে যা ভালো বুঝি সেই হিসেবে।'

'কি কাজ?'

'এই যে তোমার চুরুট–'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম–'

'দেশলাই পাচ্ছ না ক্ষেমেশ–'

'কাজ নিয়ে কলকাতায় থাকবে?'

'তা ঠিক বলতে পারি না। তবে গ্রামে যাবার দরকার নেই। আমার কাজ অন্যরকম; একজন মানুষের নিয়ে শুধু, কিন্তু তবুও সঙ্গি করতে সময় লাগবে–'

'ও–' জয়তীর হাত থেকে দেশলাই তুলে নিল ক্ষেমেশ।

'বিরূপাক্ষের বাড়ি টাকাকড়ি সব ফিরিয়ে দেব। আজই ফিরিয়ে দিলে ভালো হত–কিন্তু কোনদিন দিতে পারব কিনা সেই নিয়েই সংগ্রাম–একজন মানুষের; সাহায্য করবার কেউ নেই; এতে সমাজের কোনো উপকার হবে না, পৃথিবীর তো দূরের কথা। কিন্তু আমার মনে হয় আমার নিজের উপকার হবে। মানুষের জীবনের ওপর এখন মানুষদের নানারকম দাবি; কিন্তু আমি টাকাওলা মানুষ বলে এই একটা পরীক্ষা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবার সুযোগ আমার আছে। তাড়াতাড়ি এর একটা রফা হতে পারলেই ভালো হয়; অন্য কাজ করবার অবসর পাওয়া যাবে। কিন্তু জানি না কতদূর কি হবে। হয় তো সত্তর বছর টাকাকড়ি আঁকড়ে থাকতে পারি–হয়তো সত্তর দিন'–জয়তীর চোখ অনেকটা ঠিক হয়ে এসেছে এখন। 'দেশলাইটা মাটিতে পড়ে গেছে ক্ষেমেশ–'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সুতীর্থের সঙ্গে এই সব কথা হয়েছিল বুঝি তোমার?'

'ক্ষেমেশ বললে; মেঝের ওপর দেশলাইটার দিকে তাকাল সে, তুলল না।'

'চীন আমাদের চেয়ে বেশি জেগে উঠেছে।' বলে বাঁ-হাতি জানালার শার্সিগুলোর দিকে তাকাল ক্ষেমেশ। রোদ ছিল ওখানে, নেই এখন আর।

'তা হতে পরে–'

'সমস্ত এশিয়াই জেগে উঠবে।'

'কিন্তু কিরকমভাবে? কি হিসেবে?–'

'সেটা ভারতবর্ষ স্থির করবে? ক্ষেমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে 'এই বেলা বোধ হয় ভারতবর্ষেরই স্থির করা উচিত। কিন্তু এ সব আন্দোলন থেকে আমি ঢের দূরে সরে রয়েছি।'

'আন্দোলনও এখনও ঢের দূরে। চীন আজকাল দুঃখের দেশ। অবশ্য পুরস্কার পাবে শিগগিরই–আমার মনে হয়। কিন্তু রাশিয়ার হাতে পুরস্কার না নিলেই ভালো হত–' জয়তী বললে।

একটু থেমে বললে, 'মানুষের খাঁটি মঙ্গল মানুষের হাতে মানুষ যদি নেয়–আমার বলবার কিছু নেই অবশ্য তাহলে–'

'চীনের নিজেরও 'আত্মা আছে।' জয়তী বললে।

'ছিল একদিন।'

'আমাদেরও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৃথিবী এক হয়ে যাবে হয় তো।'

জয়তী বললে, 'চীন রাশিয়ার কাছ থেকে কি নিচ্ছে–রাশিয়া ভারতের কাছ থেকে কোনো জিনিস–তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা থাকবে না তখন। কিন্তু খুব দেরিতে হবে এ সব জিনিস–যদি হয়। আমাদের মাথা ব্যথা সত্যিই রাশিয়া বা আমেরিকা বা অন্য কেউ–কে আমাদের বিপদগ্রস্ত করবে তাই নিয়ে। কেমন একটা অন্ধকারের যুগে আছি আমরা–'

'রাশিয়া আলো পেয়েছে, চীন পাচ্ছে তার কাছে। আমেরিকা নিজেই আলোকিত।' বলে, চশমাটা খুলে ফেলল ক্ষেমেশ; চশমার পাথরের ওপর রোদ ঝলসাচ্ছে–তাকিয়ে দেখছিল।

'ভারতবর্ষও'–জয়তী হেসে বললে, 'অন্ধকারটা এইরকম।'

মেঝের থেকে কুড়িয়ে ক্ষেমেশের হাতে দেশলাই তুলে দিয়ে জয়তী বললে, 'এটা খেয়ো, চুরুট; এক বাক্স ভালো কিনে নিও তুমি।'

দেশলাই নেবার সময় জয়তীর হাতটা নিজের হাতের ভেতর আটকে নিবিড়ভাবে চেপে দিল ক্ষেমেশ।

জয়তী ঘনিয়ে এসে ক্ষেমেশের হাত তুলে নিয়ে চাপ দিয়ে গেল।

চুরুট জ্বালাল ক্ষেমেশ।

জয়তী চলে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাল্যবান

সারাদিন মাল্যবানের মনেও ছিল না; কিন্তু রাতের বেলা বিছনায় শুয়ে অনেক কথার মধ্যে মনে হল বেয়াল্লিশ বছর আগে ঠিক এইদিনেই সে জন্মেছিল–বিশে অঘ্রাণ আজ।

জীবনের বেয়াল্লিশটা বছর তা হলে চলে গেল।

রাত প্রায় একটা। কলকাতার শহরে বেশ শীত, খেয়ে-দেয়ে কম্বলের নিচে গিয়েছে সে প্রায় গোটা দশেকের সময়; এতক্ষণে ঘুম আসা উচিত ছিল, কিন্তু এল না; মাঝে-মাঝে কিছুতেই চোখে ঘুম আসে না। কলেজ স্ট্রিটের বড় রাস্তার পাশেই মাল্যবানের এই দোতলা ভাড়াটে বাড়িটুকু; বাড়িটা দেখতে মন্দ নয়–কিন্তু খুব বড়-সড় নয়–পরিসর নেহাত কমও নয়। ওপরে চারটে ঘর আছে–তিনটে ঘরেই অন্য ভাড়াটে পরিবার থাকে–চিক দিয়ে ঘেরাও করে নিজেদের জন্যে তারা একটা আলাদা ব্লক তৈরি করে নিয়েছে–নিজেদের নিয়েই তারা স্বয়ংতুষ্ট–এ দিককার খবর বড় একটা রাখতে যায় না।

ওপরের বাকি ঘরটি মাল্যবানদের; স্ত্রী উৎপলা ঘরটিকে গুছিয়ে এমন সুন্দর করে রেখেছে যে দেখলে ভাল লাগে। ধবধবে দেওয়ালে গোটা কয়েক ছবি টাঙানো; একটা ব্রোমাইড এনালার্জমেন্ট; প্রৌঢ়ের, উৎপলার বাবার হয়ত, তার মা-র একটা অয়েলপেন্টিং; মাল্যবানের শ্বশুর পরিবারের আরো কয়েকটি লোকের ফটোগ্রাফ–কয়েকটা হাতে–আঁকা ছবি। (কে এঁকেছে?)–ঘরের ভেতর একটা পালিশ মেহগনি কাঠের খাট, খাটের পুরু গদির ওপর তোশকে বকপালকের মতো সাদা বিছানার চাদর সব সময়েই ছড়িয়ে আছে। দু'জন মানুষ এই বিছানায় শোয়; উৎপলা (তাকে 'পলা' ডাকে তার সমবয়সীরা আর বড়রা প্রায় সকলেই) আর তার মেয়ে মনু। মেয়েটির বয়স প্রায় নয় বছর। মাল্যবান ও উৎপলার এই বার বছরের দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে এই একটি মেয়েই হয়েছে। কোনোদিন আর-কিছু হবে না যে তাও ঠিক। দোতলার এই ঘরটা বেশ বড়, মেঝে সব সময়েই ঝরঝরে, এক টুকরো কাগজ, ফিতে, সেফটি-পিন, পাউডারের গুঁড়ি পড়ে থাকে না কখনো; ঘরের ভেতর টেবিল চেয়ার সোফা কৌচ রয়েছে কতকগুলো; সবই বেশ পরিপাটি নয়, ছিঁড়ে গেছে, ময়লা হয়ে গেছে, কিন্তু উৎপলার যত্নের গুণে খারাপ দেখাচ্ছে না। এক কোণে একটা অর্গ্যান রয়েছে; তারই পাশে একটা সেতার আর একটা এস্রাজ; উৎপলার আলোর জিনিস; গাইতে ভালবাসে, বাজাবারও সাধ খুব, প্রায় গুনগুন করে সব সকর্মতার ভেতর কোনো-না-কোনো একটা সুর ভাঁজছে, মাঝে-মাঝে কীর্তনের সুরও; এক-এক সময়, বিশেষত বাথরুমে ধারাস্নানের সময়, বেশ জোরে গান গায় পলা। গান-টান মাল্যবান কিছুই জানে না, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত খুব সহিষ্ণুভাবে স্ত্রীর ষড়জ ঋষভ গান্ধার-টান্ধার সহ্য করে যাওয়াই তার অভ্যাস, না হলে তা হয়ে উঠবে দুষ্ট সরস্বতী, তখন রক্ষা থাকবে না আর। কিন্তু তবুও বড় একঘেয়ে লাগে তার, স্ত্রীর গান বলেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত গান–বাজনার ওপর অত্যন্ত হতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে তার মন; কী করবে যে সে কিছুই ঠিক পায় না। মুখ চুন করবে, সঙ্গে-সঙ্গেই কান ঝাঁ ঝাঁ করবে, চোখ জ্বলে উঠবে উৎপলার তাকে থামতে বললে, গান থামাতে বললে। এমনিতেই বৌয়ের বিশেষ স্নেহশ্রদ্ধার মানুষ নিজেকে সে করে তুলতে পারে নি। মাল্যবানের স্বভাব ফটফটে ফিটকিরির মতন; সে নিজের মনে থাকা মানুষ, মানুষকে ক্ষমা করে যাওয়া অভ্যাস, অযথা হৈ রৈ হিংসার ছোব ভাল লাগে না তার। শান্তি ভালবাসে; নিজের সুখ-সুবিধে অনেকখানি ছেড়ে দিয়েও। গানের সম্পর্কে সে স্ত্রীকে কোনোদিন কিছু বলে না বড়–একটা; বেশি ঝালাপালা বোধ করলে অবিশ্যি 'গান খুব ভাল করে শিখতে হয়,' 'অনেকে খুব মন খুলে গায়, ভাল লাগে; মন খুলেছে বলে ভাল লাগে–' এ-রকম এক-আধটা ইশারায় অনুযোগ জানায় মাল্যবান। এ ধরনের ইঙ্গিতের জন্যে স্ত্রীর কাছ থেকে সে সত্যিই শাস্তি পায়; কাজেই পারতপক্ষে স্ত্রীকে কিছুই বড় একটা বলতে যায় না। নিজে মাল্যবান গানমুঞ্জরো না ভালবাসে তা নয়। যখন সে কলকাতার চাকরিতে বাঁধা পড়ে নি, পাড়াগাঁয়ে ছিল, সেই ছোটবেলা এক-এক দিন শীতের শেষ রাতে বাউলের গান শুনতে তার খুব ভাল লাগত; কোনো দূর হিজল বনের ওপার থেকে অন্ধকারের মধ্যে সে-সুর ভেসে এসে তার কিশোর আঁতে ব্যথা দিয়ে যেত। কত দিন–যখন দিন শেষ হয়–দাণ্ডাগুলি খেলে যখন সে কাঁচা-কাঁচা কালিজিরা ধানশালি রুপশালির খেতের আলপথ দিয়ে বাড়ি ফিরছে, ভাটিয়াল গান শুনে মনটা তার কেমন করে উঠত যেন; সারা দিনের সমস্ত কথা কাজ অবসন্ন শোল-বোয়ালের মত দিঘির অতলে তলিয়ে যেত যেন, ঝির-ঝির ফটিক–ফটিক ঝিক-ঝিক ঝর-ঝর করে উঠত ওপরের জল; যে-জল গানের মত, যে-গান জলের মত চারদিককার খেজুরছড়ি, নারকোলঝিরঝিরি ঝাউয়ের শনশনানি ছায়া অন্ধকার একটি তারার ভেতর; এক কিনারে চুপ করে বসে থাকত সে। বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে কত রাত সে যাত্রা শুনতে গেছে–তারপর সেই সব গানের সুর এমন পেয়ে বসেছে তাকে যে পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করতে-করতে এক-একবার টেবিলের ওপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ নিঝঝুম হয়ে পড়ে থাকত; কোথাও মেঘ নেই, বৈশাখ-আকাশের বিদ্যুৎচমকানির মত ভরে যেত মন এ-কানা থেকে সে-কানায়; বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠবার পূর্বাভাসের মত; কিন্তু তার আগেই সে মাথা খাড়া করে অন্য পৃথিবীতে চলে যেতে চেষ্টা করত, ফোঁপাতে যেত না। মণিভূপকণ্ঠ চক্রবর্তী বলে একজন ভদ্রলোক ছিলেন-সত্যিই কি তাঁর নাম মণিভূপকণ্ঠ–কী মানে এই নামের?–কিন্তু তবুও সকলেই তো তাঁকে এই নামে ডাকত; মণিভূপের গানের কথা মনে পড়ে; শমনহরা বোস–ঝুনু–ঝুনু বোস–চৌধুরাণী নামেই বেশি খ্যাত–তার গান; সে-সব দিন কোথায় গেছে যে আজ! পাড়ায়-পাড়ায় গানের বৈঠকের লোভে পড়াশুনো ফেলে যেমনি সে আসরের এক কিনারে গিয়ে বসেছে, অমনি কাকা তাকে কান টেনে-হিঁচড়ে বাসায় নিয়ে গেছেন; তবুও তার মায়ের সঙ্গে ষাট করে ফের আবার পালিয়ে যেতে ইতস্তত করে নি সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলাকে এ সব কথা কোনোদিন বলে নি মাল্যবান।

ওপরের ঘরটায় পলা (উৎপলা) আর মনু শোয়। একতলার ঘরে মাল্যবানের বিছানা বৈঠক-সমস্ত। এখানেই সে থাকে, কথা বলে, কাজ করে, বই পড়ে, লেখে, শোয়, ঘুমোয়। নিজে ইচ্ছা করে স্ত্রীর কাছ থেকে এ-রকম ভাবে বিচ্ছিন্ন হয় নি সে। দোতলার ঐ একটা ঘরেই পলার ভাল করে কুলিয়ে ওঠে না তেমন, কাজেই সে স্বামীকে নিচের ঘরে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করতে বলেছে। অথচ দোতলার ঘরটা একতলার ঘরের চেয়ে ঢের বড়-আলো-বাতাস, রৌদ্র, নীল আকাশের আনাচ-কানাচ-কিনারা, মূল আকাশেরও বড় নীলিমার বেশ মুখোমুখি প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে; একতলার পাশেই প্রকাণ্ড ছাদের একটা আশ্চর্য প্রসৃতি রয়েছে, সিঁড়িটার দু'ধাপ মাত্র গেলেই একতলার সমস্ত ছাদটা, আকাশ রোদ, কলকাতার শহরটাই তোমার; যদি ভেবে নিতে পারো, তা হলে পৃথিবীর নগরনাগরের ইতিহাস বারণাবত বেবিলনও তোমার চোখে ফুটে উঠেছে।

দুটি প্রাণী-ওপরে নিচে এই দুটি ঘরে আলাদা রয়েছে। মাল্যবানের বিয়ে হয়েছে প্রায় বার বছর হল। বিয়ের পর দু-তিন বছর পলা ঘুরেফিরে বাপের বাড়িতেই প্রায়ই থাকত; তার পর শ্বশুরবাড়িতে বছরখানেক থাকে, মনু হয়, মনুর ছ'মাস বয়েসের সময়েই বাপের বাড়ি চলে যায় আবার, সেখানে বাবার মৃত্যু পর্যন্ত বছর-দুই আরো কাটিয়ে এই বছর-সাতেক ধরে কলকাতায় স্বামীর কাছেই রয়েছে।

রাত একটা। ডান কাত ফিরে মাল্যবান একটু ঘুমুতে চেষ্টা করল; নানা রকম কথা মনে হয়-ঘুম দূরে সরে থাকে। তারপর আস্তে-আস্তে বাঁ কাত ফিরে মনে হল এইবারে ঘুম এলে বেশ ভাল লাগবে। কিন্তু ঘড়িতে দেড়টা বাজল, তারপরে দুটো, ঘুম এল না; এক-একটা রাত এ-রকম হয়।

কম্বলটা ঠোঁট অব্দি টেনে নিয়ে চোখ বুজে আবার পাশ ফেরা গেল। কলকাতার রাস্তার নানা রকম শব্দ কানে আসে; রাত তো দুটো, শীতও খুব হুজ্জুতে, কিন্তু কাদের ফিটন যেন রাস্তার ওপর দিয়ে খটখট করে চলেছে; গাড়ির ভেতর মেয়েদের হাসি, বুড়ো মানুষের মোটা গলা, ছোটদের চেঁচামেচি। মাল্যবান কম্বলের নিচে ফলি-কাত হয়ে থাকতে-থাকতে ভাবছিল; তাই তো, কোথায় যাচ্ছ তোমরা মুনশিরা, ফিরছ কোত্থেকে? ঘোড়ার খুরের আওয়াজ অনেক দূর অব্দি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল, এমন সময় ইঞ্জিনের বিকট তড়পানিতে চারদিকের সমস্ত শব্দ গিলে খেল। এল, চলে গেল একটা লরি। মাল্যবানের মনে হল লরির এই লবেজান আওয়াজেরও একটা সার্থকতা আছে; যেমন বালির থেকে তেল বার করতে পারা যায়, সে-রকম; একে যদি চাকা-টায়ারের শব্দ না মনে করে বাদল রাতের ঝমঝম আওয়াজ ভেবে নেওয়া যায় তবে বেশ লাগে লরির-খানিকটা চুনবালি খসে পড়ল চাতালের থেকে মাল্যবানের নাকে-মুখে; বাড়িটার ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে, বাপ রে, একেবারে নিপ্পনের টাইডাল ওয়েভের মত ছুটে গেছে লরিটা; নাকমুখ থেকে চুনকাম ঝেড়ে ফেলতে-ফেলতে মাল্যবান ভাবছিল। রাস্তা দিয়ে কাহার-মাহাতোরা একটা মড়া নিয়ে যাচ্ছে। কার যেন প্রাইভেট মোটর মাল্যবানদের বাড়ির কাছেই এসে থামল-গাড়িটা কী-রকম বিগড়ে গেছে যেন; দু-চারজন মিস্ত্রি সেটা মেরামতের চেষ্টায় আছে; মবিল-অয়েলের গন্ধ মাল্যবানের নাকে ঢুকল, মন্দ লাগল না তার; একটা ষাঁড় ফুটপাত দিয়ে যেতে-যেতে ঘঁগ-ঘড়ম করে উঠল এবার; সামনেই কাদের যেন দোতলার থেকে একটা বড় অস্পষ্ট কান্না ও ঝগড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, মাল্যবানের ঘরের পাশেই ড্রেনের কাছে একটা নেড়ি কুকুর ঘুর-ঘুর করে রাবিশের ভেতর থাবা নখ চালিয়ে বালি-ঘড়ির বাজনা বাজিয়ে চলেছে যেন অনেকক্ষণ থেকে; কী চায় সে? কী পাবে? খানিকটা দূরে একটা বাড়ির ভেতর মহলে-হয়ত কলতলায়, ভাঁড়ার ঘরে, গুদোমে দুটো বেড়াল মরিয়া হয়ে ঝগড়া করছে অনেকক্ষণ ধরে; তাদের একটি নর ও একটি মাদি নিশ্চয়ই; এই শীত রাতে এই আশ্চর্য শীতে নিদারুণ কপট ঝগড়ার আড়ালে হুলো আর মেনির এই অত্যদ্ভুত রক্তোচ্ছ্বাস কাম নিয়ে জীবনের যৌনঋতুর, যৌন আগুনের এই প্রাণান্তকর দৌরাত্ম্যে-মাল্যবান দাঁত ফাঁক করে ভাবছিল, বেড়ালেরা লুটোপুটি ঝুটোপুটি কান্নাকাটি করে; বেশি বয়সে বিয়ে করেছিল একজন সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো প্রফেসরকে ঠিক এই রকমই করতে দেখেছিল মাল্যবান প্রায় বছর-সাতেক আগে-সন্ধ্যারাতেই; গলাখাকারি না দিয়ে প্রফেসরমশাই-এর ঘরে রবারসোল জুতো-পায়ে ঢুকে পড়েছিল মাল্যবান; কিন্তু এ-রকম মইমারণ হইমারণ ব্যাপার যে হবে তা তো ধারণা করতে পারে নি সে; কিন্তু সেই থেকে উপলব্ধি করছে মাল্যবান যে সমস্ত ইতর প্রাণীকে বিশ্লেষণ করে যে-মহৎ সংশ্লেষে উপস্থিত হওয়া যায় তারই আশ্চর্য সন্তাপ, উচ্ছ্বাস ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতরতাকে ভাড়িয়ে চারিয়ে জ্বালিয়ে নাচিয়েই মানুষ তো হয়েছে মানুষ। ভাবতে-ভাবতে অবসন্ন হয়ে মাল্যবান কাত হয়ে শুয়ে পড়ল আবার। ঘড়িতে বাজল আড়াইটে, কিন্তু ঘুম তো এল না।

আজ ছিল তার জন্মদিনের তারিখ। বেয়াল্লিশ বছর আগে-এমনি অঘ্রাণ মাসের বিশ তারিখে কলকাতার থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে বাংলাদেশের একটা পাড়াগাঁয়ে সে জন্মেছিল। সেখানে খেজুরের জাঙ্গাল বেশি, তালের বন কম, সুপুরির গন্ধ হয়তো সবচেয়ে বেশি। এমনি শীতে খেজুরগাছের মাথা চেঁছে একটা নল বসিয়ে গলায় হাঁড়ি বেঁধে দেওয়া হয়, সমস্ত শীতের রাতে ফোঁটা-ফোঁটা রস ঝরতে থাকে, মাছি-মৌমাছি ছোট ছোট রেতো প্রজাপতি, বড়গুলোও, সেই হাঁড়ির রসে সাঁতার কাটছে, পাখনা নাড়ছে, মরে আছে; কুয়াশানির্জন ঠাণ্ডানিবিড় শেষে রাতে দেখা যায় এই সব। এমনি শীতের রাতে ধানের খেত শূন্য হয়ে পড়ে আছে-হলদে নাড়ার গ্যাঁজে সমস্ত মাঠ রয়েছে ছেয়ে, শীত পেয়ে দু-একটা বাঘ নেমে আসে; এমনি উদাস রাতে ফেউগুলো অন্তত খুব হাঁকড়ায়; শ্মশানে 'হরিবোল' যেন কোন দূর কুয়াশাপুরুষদের রলরোল বলে মনে হয়; লক্ষ্মীপেঁচা ডাকতে থাকে, ঘুম ভেঙে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় শীতের কুয়াশার সে কোন অন্তিম পোচড়ের ফাঁকে-ফাঁকে বৃহস্পতি কালপুরুষ অভিজিৎ সিরিয়াস যেন লণ্ঠন হাতে করে এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে কোন সুদূরযানের পথে চলেছে, কেমন একটা আশ্চর্য দূর পরলোকের নিক্কণ শোনা যায় যেন। কোনোদিন কুয়াশা কম-সাদা মেঘ আছে-একফালি গড়ানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঘের পাশে—নিজের কেমন যেন একটা বৃহৎ আলোর শরীর নিয়ে থেমে আছে চাঁদ। পঁচিশ সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত পাড়াগাঁয়ে সে ফিরে ফিরে যেত, এই সব তার দেখবার শোনবার জিনিস ছিল, কিন্তু তার পর পনেরটা বছর কেটে গেল, এই শহরই হল তার আস্তানা, একটা কাঁচপোকা, মৌমাছি শামকল মৌচুষকি জোনাকির কথা মনেও পড়ে না তার, আকাশের নক্ষত্রগুঁড়িগুলোর দিকে ফিরেও তাকায় না সে।

ভাবতে-ভাবতে আকাশের রুপালি সবুজালি আগুনগুঁড়িগুলোর কথা ভুলে গেল সে। পনের বছর চাকরির পর গত মাসে আড়াইশ টাকা মাইনে হয়েছে, এর আগে মাইনে ছিল একশ পঁচানব্বই; প্রায় পাঁচ বছর ধরে একশ পঁচানব্বই টাকাই মাইনে ছিল; তার আগে মাইনের ব্যাপারে বড় গরমিল ছিল। শাহেবদের অফিস বটে, কিন্তু এক সময় অফিসের অবস্থা এত খারাপ ছিল যে, যে-নামমাত্র মাইনেয় মাল্যবান ঢুকেছিল অনেক বছর পর্যন্ত তার দুর্ভোগ তাকে সহ্য করতে হয়েছে। এই সময় কোনো-কোনো কেরানি অফিস ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু মাল্যবান যায় নি; বরং যত্ন করে এই অফিসেই খেটেছে সে; আজ রাতে তার মনে হয় তার অনেক দিনের খিদমদগারির পুরস্কার সে পেয়েছে।

খিদমদগারি? কী আর বলবে সে। পূর্বপুরুষেরা তাকে যেমন শক্তি সুযোগ দিয়েছেন তাতে দেশের, মানুষের, আইনের, চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্যে, এমন-কি পড়াশোনায়ও নিজেকে উৎসর্গ করবার কোনো পথ তার নেই। সে-সব পথে যদি যেত কেউই তাকে মানত না; মানত কি? লক্ষ্য উঁচু রাখলেও যে নিচে পড়ে ল্যাংচায় কে মানে তাকে? কাজেই এই পনেরটি বছর বসে ধীরে-ধীরে বটমলি বিগল্যান্ড ব্রাদার্সের অফিসের জন্যে খেটেছে; কী করবে সে আর, কী করতে পারে?

বি-এ পাস করে আইন পড়েছিল, কিন্তু তখনই এই অফিসের চাকরিটা পায়; চাকরিটা নিল সে।

মাঝে-মাঝে মনটা ঝুমুর দিয়ে ওঠে বটে; উকিল হলে মন্দ হত না, হয়ত, বেশ স্বাধীনভাবে থাকতে পারত, কারু তক্কাই রাখতে হত না, ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পারলে মানুষের কাছ থেকে ঢের মর্যাদাও পাওয়া যেত। মনে হয় এক-এক সময়ে এই সব। কিন্তু মফস্বলের বার লাইব্রেরিগুলোর দিকে তাকিয়ে... কলকাতার বড়-বড় এম-এল, ডি-এল কী করে টাকা রোজগারের ব্যাপারে জেলা শহরের কমিটিপাশ পি-এল এর কাছে হেরে যাচ্ছে কোথাও কোথাও—দেখে-শুনে মনে-মনে মাঝে-মাঝে হাসে—অহঙ্কারে নয়, আত্মসৌকর্যে নয়, কিন্তু নিজের ক্ষমতার খর্বতা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করে। মাল্যবান বুঝতে পেরেছে যে-কাজ সে করছে এর চেয়ে খুব বেশি ভাল কিছু কোনোদিনই সে করতে পারত না; হয়ত নিমকির দারোগা হত কিংবা সুপারিনটেন্ডেন্ট, গভর্নমেন্টের চাকরির ছকে পড়ে গেলে একেবারে সবচেয়ে বড় কেরানি সাহেবও যে সে না হতে পারত না নয়; টাকার দিক দিয়ে খানিকটা লাভ হত বটে, টাকা সে চায়ও, খুবই চায়, কিন্তু আরো অনেক জিনিস চেয়েছিল সে; বিদ্যা সবচেয়ে আগে। অনেক দূর পর্যন্ত লেখাপড়া করবার সাধ ছিল, অনেক জিনিস শিখতে ইচ্ছা, বুঝতে ইচ্ছা; নিজের মনটা যে নেহাত কেরানির ডেস্কে-আঁটা নিখেট, নিরেস কিছু নয়, মানুষকে সেটা বোঝাবার ইচ্ছা। নানা রকম ইচ্ছা-মনে অনেক রকম ভাল সুশৃঙ্খল কাঠকাঠামোর কথা জেগে ওঠে যে তার, মানুষকে সে তা জানাতে চায়; এক-এক সময় মনে হয় অফিসের কাজ ছেড়ে নিজের জীবনটাকে সে কোনো মহৎ কাজের ফেনশীর্ষে—ধরো কোনো উত্তেজনাময় কর্মীসংঘের মধ্যে নিয়ে ফেলুক; জীবনটাকে এ রকম অফিসে চেপে সাপটে মেরে লাভ কী? টাকা—পারিবারিক সচ্ছলতা—এগুলোকে এমন ঘাসের বিচি, ধুন্দলের বিচি, রামকাপাসের আঁটি বলে মনে হয় এক-এক সময়। স্টিক হাতে নিয়ে গোলদিঘিতে ঘুরতে-ঘুরতে মনে হয়, একটা বড় বাজপেয়ে সভায় বেশ মার্জিত ভঙ্গিতে আবেগের বিরাট অকূলপাথারে নিজেকে আশ্চর্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করে বক্তৃতা দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার; পলিটিক্সে বাঙালিরা আকজাল গুজরাটি মারাঠি মাদ্রাজি ইউ-পিঅলাদের কাছে পদে-পদে ভুড্ডু খেয়ে ফিরছে—ভাবতে-ভাবতে রক্ত কেমন যেন হয়ে ওঠে তার, বাঙালির মান-সম্মান ফিরিয়ে আনবার জন্যে বড় নয়াল আগুনের মত দাউ-দাউ করে উঠতে ইচ্ছা করে তার—বিপ্লবের থেকে বিপ্লবে—ফ্রান্স, রুশ, স্পেন, চীন সমস্ত বিপ্লবের—ইয়ে-স্তনাগ্রচূড়ায় নতুন দুগ্ধের উল্লাসে নবীন পৃথিবীর জন্যে। ভাবতে-ভাবতে বাঙালির কথা ভুলে যায় সে। অনেকক্ষণ পরে মাল্যবানের মাথা ঠাণ্ডা হয়; গোলদিঘির একটা বেঞ্চিতে ধীরে-ধীরে চুপ করে গিয়ে বসে সে তখন; একটা বিড়ি জ্বালায়। খিদে পেয়ে ওঠে, বাড়ির দিকে রওনা হয়।

একটা কথা ঠিক; মাটির নিচে গেঁড় আর কন্দ খাওয়া শুয়োরের মত (আপার গ্রেডের) অফিসগিরিই তার সব নয়, এক জোড়া রেশমি স্টকিঙ, বার্নিশ করা নিউ কাট, তসরের কোট, পরিপাটি টেরি, সিগারেট কেস ও ফুটবল গ্রাউন্ডের বেঞ্চি দিয়ে নিজেকে চোখ ঠার দিতে সে ভালবাসে না। এই সবের চেয়ে সে আলাদা।

খবরের কাগজ সে রোজই পড়ে; কিন্তু স্পোর্টস রেস রাহাজানির দিকে একটু বেশি ঝুঁকে পড়ে নয়; কোথাকার অন্তঃপুরে, আদালতে কী রকম হাঁড়ি ভাঙল, বায়োস্কোপে কী থিয়েটারে কী আছে—এ সব সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ বা আস্বাদ এ বেয়াল্লিশ বছরের মধ্যে এখনও সে তৈরি কর নিতে পারেনি। খবরের কাগজে তবুও সে আশাতীত প্রয়োজনীয় নানা জিনিস খুঁজে পায়; অফিসের থেকে ফিরে চুরুট জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ সে খবরের কাগজ নিয়ে বসে থাকে; একে-একে মনের ভেতর নানা রকম সাধ—সংকল্প খেলা করে যায়; ভেঙে চুরমার হয়। তারপর অবসন্ন হয়ে পেপারটা সে রেখে দেয়; মনে থাকে না বিশেষ কিছু; কোনো কিছু সত্যিই শিখেছে বলে উপলব্ধি করতে পারে না। বিছানায় শুয়ে—শুয়ে ভাবে নিজে সে অবিশ্যি পার্নেল বা চিত্তরঞ্জন হতে পারবে না—কোনোদিনও না—কোনো প্রক্রিয়ায়ও না—কিন্তু পার্নেল বা চিত্তরঞ্জন বাঙালির মধ্যে আজকালই যদি না জন্মায় তা হলে এ জাতের ভরসা খুব কম। উনিশশ উনত্রিশ সালের একটা রাত্তির; শুয়ে-শুয়ে এই সব কথা ভাবছিল যখন মাল্যবান; সেই জন্যেই সে এই রকম ভাবছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘড়িতে প্রায় সাড়ে তিনটে বাজল; মাল্যবান দেখল বিছানায় চিত কাত হয়ে ভেবেই চলেছে ক্রমাগত; এত ভাবায় হৃদয় শুকিয়ে যায় শুধু, কোনো তীরতট পাওয়া যায় না, আসে না চোখে এক পলক ঘুম। আস্তে-আস্তে সে উঠে বসল; বিছানায় ছারপোকা আছে—কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত ছারপোকার জন্যে নয়; এর চেয়ে ঢের বেশি আরশোলা, ইঁদুর, মশা, পিসুর ঘাঁটিতে লম্বা নির্বিবাদ চৌকশ ঘুমে কত রাত কাটিয়ে দিয়েছে। রাস্তার একটা গ্যাসল্যাম্পের আলো ঘরে ছিটকে পড়েছিল খানিকটা; স্লিপার খুঁজে নেওয়া গেল, পায়ে দিয়ে লাল-নীল-চেককাটা কম্বলে সমস্ত শরীরটা মুড়ে সে ধীরে-ধীরে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে উঠল—নিঃশব্দে খানিকটা এগিয়ে, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখল, নেটের মশারির ভেতর মনু ও পলা কেমন নিশ্চিন্তভাবে ঘুমুচ্ছে—কেমন শান্ত, প্রীত নিশ্বাস তাদের। একটা ভারী নিশ্বাস প্রাণের ভেতর প্রচুর চুম্বনে টেনে নিল সে, সমস্ত শরীরকে আস্বাদস্নিগ্ধ করে আস্তে-আস্তে নিশ্বাস ছাড়তে লাগল সে; ভাল লাগল তার। ভালই লাগল তার ঘুমন্তদের দিকে তাকিয়ে; স্ত্রী সন্তানকে সচ্ছলতায় রাখা তাদের জীবনে খানিকটা সুখ-সুবিধে-শান্তির ব্যবস্থা করা—মাঝারি জীবনের এ উদ্দেশ্য এ শীত রাতে মাল্যবান সিদ্ধ দেখছে বলে। নিজের ঘুম হচ্ছিল না তার—এরাই-বা এই শীতের মধ্যে কী করছেঃ ঘুমিয়ে? জেগে? দেখবার জন্যেই সে ওপরে এসেছিল। দেখা হল। মাল্যবান সুস্বাদ পেল, কেমন স্নিগ্ধ শারীরিক মনে হল তার রাত্রিটাকে, রাত্রির এই নিঝোর সময়টাকে। এখন নিচের ঘরে যেতে হয়। কিন্তু তবুও মাল্যবান গেল না সহসা। মশারির খুঁট তুলে এদের খাটের পাশে পাড়াগাঁর পৌষরাতের নিশ্চুপ ডানার পাখির মত এসে স্নিগ্ধ নৈঃশব্দে—এদের জাগিয়ে?—বসে থাকতে চায়। কিংবা বসবেও না; মনুর কপালে আলতো হাত বুলিয়ে দেবে—কম্বলটা স্ত্রীর বুক থেকে সরে গেছে, তুলে গুছিয়ে দেবে আলতো। তারপর নিজের ঘরে চলে যাবে সে।

কিন্তু নেটের মশারি তুলতেই ব্যাপারটা হল অন্য রকম। উৎপলা জেগে উঠে প্রথম খুব খানিকটা ভয় খেলে; তারপর বিছানার ওপর উঠে বসে তার সমস্ত সুন্দর মুখের বিপর্যয়ে—মুহূর্তেই সে-ভাবটা কাটিয়ে উঠে মরা নদীর বালির চেয়েও বেশি বিরসতায় বললে, 'তুমি!'

'এসেছিলাম।'

'এ সময় তোমাকে কে আসতে বললে।'

'দেখতে এলাম, তোমরা কী করছ।'

'যাও, তোমার মেয়ে নিয়ে যাও, কাল থেকে এ আমার সঙ্গে আর শোবে না। মেয়েটার দাবনা ঘেঁষে, বাপ রে, একটা ডান যেন।'

'কে, আমি?' মাল্যবান দাঁড়িয়ে থেকে বললে। খাটে বসল না, একটা কৌচে বসে বললে, 'না, মেয়েটিকে শুধু দেখতে আসি নি, আমি—'

'আ, গেল যা! বসলে! রাত দুপুরে ন্যাকড়া করতে এল গায়েন। হাত পা পেটে সেঁধিয়ে কম্বল জড়িয়ে এ কোন ঢঙের বলির কুমড়ো সেজে বসেছে দেখ। ও মা। ও মা!—ও মা! বেরোও! বেরোও বলছি!'

'তুমি ঘুমুচ্ছিলে—তোমার ঘুম ভাঙাতে আসি নি তো আমি—'

'বলি, বলির কুমড়ো, দু-ফাঁক হবে, না এখানে থাকবে?'

'ঘুমুচ্ছিলে, ঘুমোও।'

'ঘুমুচ্ছিলে, ঘুমোও! আর, গোঁসাইয়ের কুমড়ো—'

'কেন কুমড়ো—কুমড়ো করছ, উৎপলা—'

'এখানে বসে থাকা চলবে না এখন।'

'আমি একটু বসে আছি, তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। আমি এই কৌচে বসে আছি, মনু ঘুমুচ্ছে; ঘুমিয়ে পড়ো।'

উৎপলা গলাটা পরিষ্কার করে নিল, একটানা ছ'ঘণ্টা ঘুমিয়ে বেশ সজীব সুস্বাদ হয়েছে শরীর, সরস কঠিন গলায় বললে, 'দরমুজ দিয়ে ইঁদুর মেরে ফেলেছি সব আমার ঘরের। তবুও যদি এক-আধটা থাকে জার্মান কল পেতে রেখেছি। ও-সব চালাকি চলবে না। ঘুম বড় বালাই আমার। চাও তো নিচে চলে যাও।'

মাল্যবান চুপ করে বসেছিল। সে চলে গেছে না কৌচে বসে আছে সে দিকে না তাকিয়ে অন্ধকারে কিছু না বুঝতে পেরে উৎপলা বললে, 'ইশ, একেবারে ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখি মস্ত বড় একটা ড্যাকরা মিনসে কম্বল জড়িয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমস্ত বুকের রক্ত ঝিম-ঝিম ঝাকর-ঝিম করে উঠল আমার।'

'কিন্তু দেখলে তো, আমি দাঁড়িয়ে আছি।'

'এ রকম ভাবে ফের যদি আমাকে ভয় দেখাতে আস—'

'ভয় দেখাতে তো আমি আসি নি, উৎ—'

'না, এসেছেন রূপ দেখাতে। ফের আমার ঘরের ভেতর ঢুকছ কি রাত বিরেতে—' দাঁতের ওপর দাঁত চেপে কেমন একটা অদ্ভুত নিরেট নিগ্রহময়তায় বললে উৎপলা।

মাল্যবান শীতের রাতের নিঃশব্দতা ও অতিদীর্ঘতা, যে-দীর্ঘতা নিঃশব্দতা, যে-নিঃশব্দতা স্নিগ্ধতা হতে পারত (কতবার পাড়াগাঁর রাতে হয়েছি) সে-সব সুর কেটে যাচ্ছে উপলব্ধি করে, উৎপলা যে-গুমোটের সৃষ্টি করেছে সেটাকে হাল্কা করে দেবার জন্যে সরু গোঁফে তা দিয়ে একটু হেসে বললে, 'রাত বিরেতে ওপরে চলে এলে উচ্চিংড়ের কাবাব বানিয়ে দেবে নাকি আমাকে, পলা!' বলে নিজেই হাসল মাল্যবান; হাসিটা এক-বগ্‌গা টের পেয়ে থেমে গেল; খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললে, 'আমি আজ এসেছিলাম-আমার আজ কেমন ঘুম চটে গেল—ঘুম চটে গেল—আমার আজ ঘুম হচ্ছিল না কিনা—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'ঘুম হচ্ছিল না বলে পরের ঘুমের নিকুচি করতে হবে?'

'তা নয়।'

'তবে আবার কী।'

'আমি এসেছিলাম–' মাল্যবান মাথা হেঁট করে খতিয়ে, কী বলবে অনায়াসে সেটা স্থির করতে না পেরে কিছু বলতে গেল না আর।

উৎপলা বললে, 'এই যে আমার ঘুমটুকু নষ্ট করে গেলে এর ঝক্কি পোয়াতে আমি বেলা আটটা–নটার আগে উঠতে পারব না।'

'তা উঠো। যখন ঘুম পোষাবে তখন উঠবে, এর আর কী কথা।'

'কাল সমস্তটা দিন মাথা ধরে থাকবে।'

'সকালে উঠে গরম-গরম চা খেয়ো।'

'চা খেলেই মাথা ধরা সেরে যায়? এমন বেকুব!'

'তোমার তো স্মেলিং সল্ট আর মেনথল রয়েছে–'

'তাইতেই মাথা ধরা সারে! হুঃ! ঘানিগাছে ঘুরতে–ঘুরতে মুখ ফাঁক করে বলেছে বুঝি জয়নাথের বলদটা?'

উৎপলার গায়ের ঝালে মশারির ভেতরটা বেশ গরম হয়ে আছে, খড়ের উমের ভেতর যেন শুয়ে আছে মনু আর পলা; মানুষ না হয়ে সে যদি সারস হত তা হলে কৌচে না বসে কোন যুগে ওদের ঐ নীড়ে ঝাপটে বসে থাকত সে; ভাবছিল মাল্যবান।

'এক-আধটা অ্যাসপিরিন খেও; কিন্তু ওগুলো বিশেষ ভাল জিনিস নয়, না খেলেই ভাল।'

'এই যে ঠাণ্ডা লাগল আমার তরাসে রাতে জেগে উঠে, কতকগুলো ন্যাকড়া ছিঁড়ে ছোট-ছোট সলতের মত পাকিয়ে নাকের ভেতর সেঁধিয়ে হাঁচতে হবে; কাল সমস্তটা দিন এই আমার কাজ; ভাবতে গেলেও মনটা খিঁচড়ে যায়; ছোঃ!'

মাল্যবান কৌচের থেকে উঠে এসে খাটের পাশে ভাঙা হাতলের হাল্কা চেয়ারটা টেনে চুপ করে বসল গিয়ে।

'অ্যাসিপিরিনের শিশিটাও তো ফুরিয়ে গেছে, একটা পিলও যদি থাকে–'

'কাল এক ফাইল কিনে আনতে হবে।'

'কাল সকালে চা আমাকে করে দিতে হবে।'

'করে দেব।'

'তিন-চার কাপ চা লাগবে আমার।'

'গরম-গরম চা সর্দি-মাথাধরায় বেশ কাজ করে।'

'হ্যাঁ, সর্দি জমেই তো এই মাথাধরা।'

'এখনই ধরল?'

'না, তত ধরে নি; তবে ভোরের বেলা হবে, খোয়া-পাথরের ওপর হাতুড়ি পেটাচ্ছে যেন ঝগড়ুর বৌ–সেই কালো হয়ে লম্বা হয়ে সোমথ মাগিটা। বাবারে!' আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে আশ্চর্য আরাম বোধ করে আক্ষেপে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে উঠে উৎপলা বললে, 'হাতুড়ি পেটাবে মাথার ভেতরে, এই হয়ে এল আর-কী। আমি বিছানার থেকে উঠতে পারব না। তুমি চা এনে আমার খাটের পাশে, রেখে দিও তো বাপু।'

'মনু কি ঘুমিয়ে আছে?'

'ঘুমিয়ে আছে ওর ঠাকুরের থানে।'

'তার মানে?'

'ঠাকুরের থানে দশায় পড়ে আছে।'

'জেগে আছে?' মাল্যবান বললে, 'ডাকব মনুকে?' কিন্তু মনুকে ডেকে দেখবার কোনো চেষ্টা না করে মাল্যবান বললে, 'আজ সারারাত ঘুমের টিপই এল না আমার চোখে; কেমন যেন হয়ে গেল; এক ফোঁটা ঘুম হল না।'

'কাল তোমার কটার সময় অফিস?'

'সাড়ে–দশটায়।'

'আমি তো উঠব খুব দেরি করে; হয়তো আটটা-নটা; তখন আমাকে চা করে দিতে পারবে?'

'ঠাকুর দেবে। আমি দেব না-হয়।'

উৎপলা সমস্ত শরীরে লেপ মুড়ি দিয়ে বালিশে মাথা পেতে বললে, 'নাও, মশারিটা গুঁজে দাও তো মনুর পায়ের দিকে।'

'মশা তো নেই, মশারি টাঙাবার এক বাতিক তোমার।'

'মশা নেই, ইঁদুর আছে, মশারি না গুঁজলে পা কেটে খেয়ে যাবে।'

'মশারি ঠিক করে দিয়ে মাল্যবান চেয়ার থেকে উঠে দূরে একটা ময়লা তেলচিটে সোফায় গিয়ে বসল। উৎপলা বালিশে মাথা গুঁজে হাত-পা খিঁচিয়ে আলসেমি ঝেড়ে হাই তুলল, তুড়ি দিল, লেপটা ভাল করে জড়িয়ে নিল সর্বাঙ্গে। তারপর মাল্যবানের দিকে আন্দাজি নজরে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'বসলে? বসলে যে বড়?'

'কী করব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যাও, নিচে যাও।'

'সেখানে গিয়ে কী হবে?'

'এ রকম কতক্ষণ বসে থাকবে শুনি–'

তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলব–'

'দাঁতে ঠেকে যাবে জিভ, বেশি কথা বলতে গেলে। দাঁতকপাটি হয়ে যাবে। দাঁতে চামচে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে–ঢেঁকির প্যাড় দিয়েও খুলতে পারা যাবে না আর–নাও, সুড়-সুড় করে সরে পড় দিকিন–' উৎপলা পাশ ফিরে শুল।

মাল্যবান বসে রইল কনকনে ভিজে শীতে কেমন ন্যাতাজোবরার মত। কাজ নেই, কথা নেই, চোখ বোজা নেই, নড়াচড়া নেই, কোনো কথা সে ভাবছিল বলেও মনে হচ্ছিল না।

'কী রকম মানুষ তুমি।'

'বসে তো রয়েছি শুধু।'

'এতে আমার ঢের অস্বস্তি।'

'কী করতে হবে তা হলে?'

'চলে যাও।'

'ঘুমোবে এখন?'

'মুখে নুড়ো ফেলে দেব আমি বেহায়া মড়াদের! ঘুমোবে? ঘুমোবে! রাত তিনটের সময়–' কেঁদে ফেলল হয়তো উৎপলা। কিন্তু হবুও সে তো বালিকা বধূ নয়–প্রায় তিরিশ পেরিয়ে গেছে। মাল্যবান একটা দমে যাওয়া নিশ্বাস ফেলে বললে, 'যা–ই।'

একটু পরে ফিরে তাকিয়ে চড় খেয়ে সেঁটে চড়িয়ে দেবার মত গলায় উৎপলা বললে, 'তবুও বসে রইলে!'

'কই, তোমার চোখেও তো ঘুম নেই আর।'

'তোমার জিভে আছে; নিচে নেমে যাও শিগগির; যাও–নামো–'

'যাচ্ছি, কিন্তু রাত তো ফুরিয়ে গিয়েছিল প্রায়।'

উৎপলা বিছানার ওপর উঠে বসল। এবার সে কথা বলবে না আর, একটা বিষম কিছু করে বসবে মনে হল। কিন্তু মাল্যবান নিজের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল; উত্তরপক্ষ কী করছে, না-করছে দেখল না সে, চোখেই পড়ল না তার কিছু। বললে মাল্যবান, 'কাল তো বিশে অঘ্রাণ গেল; ঠিক এই অঘ্রাণ মাসের বিশ তারিখে আমার জন্ম হয়েছিল। তোমাকে হয়ত এক-আধবার বলেছি–মনে আছে তোমার? নিজেরই বলে কিছু মনে থাকে না। এই দিনটায় ঢের ভাববার কথা ছিল; বেয়াল্লিশটা বছর চলে গেল জীবনে। সুবাতাস আর কুবাতাসের কত কাটাকাটি হল। কাটাকাটি এখনও চলছে–চলবে যে-পর্যন্ত না মাটিতে মাথা রাখি। কিন্তু লালকমল নীলকমল কালোবাতাস সাদাবাতাস মনপবন আর চাঁদের বুড়ি মিলে কেমন যেন অপার্থিব করে তুলেছে জীবনটাকে। আমি মাটির মানুষ তো–মাটি ছাড়া টাল সামলাতে পারব না–হাওয়ার চেয়ে সোনার শরীর ভাল, তার চেয়ে মাটির শরীর; চালে গুড়ে, নারকোলের ঝাঁঝে, কঙ্কুরে ফোঁপড়ায় নবান্নের গন্ধে নবান্নের মত তুমি আর আমি; তোমার কাছে এসেছি তাই, বসেছি তাই। দাও। দেবে না?'

একেবারেই দিতে যে না পারে উৎপলা তাও নয়, দিয়েছে মাঝে-মাঝে, গোড়ার দিকে খুব মন মজিয়েও দিয়েছে বটে, কিন্তু তারপরে টান কমে গেছে, খুব বেশি কমে গেছে–দুদিক থেকে সমান অনুপাতে যদিও নয়; উৎপলা জানে সব; মাল্যবানও জানে দাম্পত্যজীবনের অনেকগুলো দিক না হলেও চলে আজ উৎপলার, শাড়ি-গয়না খাওয়া-দাওয়া আরামবিরাম ফেল্না-ছড়া বিলাস-স্বাধীনতা হলেই হল তার, মাল্যবানের কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ দিক এখনও চাই-ই যেন, অনেক দিনের ভেতরে এক-আধ দিন অন্তত চাই, মাটির দিকটাই চাই, সোনার দিকটাও নয়, মাটিই চাই, কিন্তু নিজের সোনার ঝিলিক মাঝে-মাঝে মাল্যবানকে দেখালেও গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে মাটির সঙ্গে কোনো যোগ নেই উৎপলার–সে তো আকাশের মেঘ, জলভারানত নীল মেঘ নয়–সাদা কড়কড়ে মেঘ–দূরতম আকাশের।

উৎপলা চুলের সিঁথি অব্দি লেপ টেনে শুয়ে পড়ল। মাথায় রক্ত উঠেছিল তার, কিন্তু মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে হবে–ঘুমোতে হবে; নায়েব, গোমস্তা চাকর-বাকর রাক্ষস-খোক্কস লালকমল–নীলকমল ভ্যাক-ভ্যাক করেছে–তার ভেতর সে ঘুমিয়ে পড়েছে–এ রকম ব্যাপার কতবার তো ঘটেছে তার জীবনে, আজ ঘুমোতে হবে।

'আজ বিশে অঘ্রাণ' মাল্যবান বললে, 'পিতৃলোক মাতৃলোক মিলে জন্ম তো দিলেন; ঢের ভাল ব্যবহার হতে তো পারে জীবনের; তা হয়েছে; হয়নি? হবে? বোঝা কঠিন; মাঝে-মাঝে তুচ্ছ বেনে-বৌ পাখির চেয়েও বেশি বেনেতি বলে মনে হয় সব, খাচ্ছি-দাচ্ছি সংসারের বেনেগিরি করছি। আছে অনেক ফাঁক, আলো, নানা রকম বড় আকাশ ঘাস ও-সব পাখিদেরও; কিন্তু সালতামামি আর সালপাহলির গোলকধাঁধা ছাড়া কিছু কি আছে মানুষের?'... এই সব, আরো অনেক সব বলতে চাইল মাল্যবান; কিন্তু বলাটা তার না হল সাহিত্যের ভাষা, না হল নিজেদের মুখের ভাষা; মানুষের জল রক্ত অশ্রু ঘামের মধুসুধার ভাষা তো এ-রকম নয়। মাল্যবান টের পেল। এবারে সে না সাজিয়ে-গুছিয়ে একেবারে রক্ত ঘাম সুধা স্বাভাবিক প্রাণের ভাষায় কথা বলবে। কিছুক্ষণ দেঁতো কথা ছেঁদো কথার পর সত্যিই যখন বারোয়ারি বাজারের বাসরঘরের কথা মুখে এল তার, নাক ডাকার শব্দ শুনে মাল্যবান টের পেল উৎপলাকে নিয়ে তার চলবে না কিছুতেই, তবুও চালাতে হবে মৃত্যু পর্যন্তই। বাংলাদেশের শতকরা নব্বই জন স্বামী-স্ত্রীর জীবনেই এই নিস্ফলতা, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রীরাই সেটা ঠিক মাল্যবানের মত উপলব্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারে না; যে-সব স্ত্রী-স্বামীরা সেটা করে, একটা ভাঙা গেলাসের কাচগুলোকে জড়ো করে জোড়াতাড়া দিয়ে প্রত্যেকবারই জল খেতে হয় তাদের; নারী-পুরুষের সম্বন্ধ, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, বিয়ে জিনিসটা, শ্রেষ্ঠ কারিগরের কাচের গেলাসের মতই সহজ ও কঠিন, ভাঙবেই; জল খেতে হবেই; একটার বেশি গেলাস কাউকে দেওয়া হবে না; সে যদি তা জোর করে বা চুরি করে নেয় সেটা অসামাজিকতা হল। দর্শনী বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়ে বিয়ে রদ, বিয়ে খণ্ডন করে আবার বিয়ে, যদৃচ্ছা বিয়ে করবার কথা পেড়ে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু টাকাওয়ালা জাতিগুলোর টাকাওয়ালা মানুষদের সম্পর্কে এ-সব সমাধানের কিছু-কিছু মানে থাকলেও বেশি কোনো মানে নেই, মাল্যবানদের মত গরিব জাতির গরিবদের পক্ষে কোনো মানেই নেই কেবলই বিয়ে-খণ্ডন ও যদৃচ্ছা বিয়ের। গরিব জাতিদের সমাজগুলো মজন্তালি সরকারের মত হেসে পেট ফাটিয়েই মরে যাবে কেবলি বিয়ে খসিয়ে নতুন বিয়ে সম্পর্কের ভেতর মানুষকে ঢুকে পড়তে দেখলে, কিংবা বিবাহ সম্পর্ক তুলে দিয়ে মেয়ে-পুরুষের স্বাধীন সেয়ানা মেলামেশায় রাষ্ট্রকে হিতার্থী বিজ্ঞানধর্মী পরিচালক হিসাবে ঘুরে বেড়াতে দেখলে। সেয়ানা স্বাধীন মেলামেশার অন্ত খুঁজে পাবে কি বিজ্ঞান–আকাশের তারা, পাতালের বালি যদিও গুণে ঠিক করেছে বিজ্ঞান। সেয়ানা স্বাধীন মেলামেশার কল্যাণের অন্ত খুঁজে পাবে হিতার্থী বিজ্ঞানী রাষ্ট্র? কোনোদিনও না। কিন্তু সে-রকম হিতার্থী বিজ্ঞানী রাষ্ট্রই-বা আসছে কোথায়? কোনোদিকেই না। খুব একটা গরিব জাতির মানুষ মাল্যবান। তার চেয়ে ঢের দুঃস্থ নিষ্পেষিত মানুষ আছে; তাদের অবস্থা আরো ঢের খারাপ–কিন্তু তাদের পেটের সমস্যা এ-সব সমস্যাকে অনেকটা চেপে রেখেছে; এ-সব সমস্যার সমাধানেও তাদের বেশি বেপরোয়া বা মরিয়া বা সাহসিকতা সচ্ছলতা আছে–যেমন অন্য এক হিসেবে উঁচু শ্রেণীর ভেতরে আছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মাল্যবানের মত মধ্যশ্রেণীর মানুষদের নিয়ে। মাল্যবান কি নিম্নমধ্যশ্রেণীর–না, মধ্যমশ্রেণীর? খুব সম্ভব নিম্নমধ্য বিভাগের লোক সে। কিন্তু সমস্যাটা সমস্ত মধ্য শ্রেণীতেই কেমন দুর্বিসহভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, অথচ বাঙালি মধ্যশ্রেণীরা অন্তত ভাতকাপড় পেলে কেমন সুখে-শান্তিতে ঘরকন্না করতে পারে দেখবার জিনিস। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ তো দূরের কথা–স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ সম্পর্কেও সৃষ্টির কারণকরণশালিকার ভেতর কোনো সুখ-শান্তির নির্দেশ নেই তো। কিন্তু বাঙালি স্বামী--স্ত্রীদের প্রেম ও যৌন জীবনে সুখ আছে, শান্তি আছে, শতকরা একশ জনেরই তো; ভাবছিল মাল্যবান একটু বিষণ্ণ শ্লেষে হেসে উঠে। উৎপলা শীত রাতের কী এক পরমতত্ত্বের ভেতর ডুবে গিয়ে নাক ডাকাচ্ছে–মাল্যবানকে কেমন সহজ দিব্যতায় বিদায় দিয়ে, অথচ মাল্যবানকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রুচির বিরুদ্ধে, অপ্রেমে, কামনার টানে, বেশি লালসায় রিরংসায় উৎপলার মতন একজন ভাল বংশের সুন্দর শরীরের নিচু কাণ্ডজ্ঞানের নিরেস মেয়েমানুষের কাছে ঘুরে-ফিরে আসতে হবে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত কী নিদারুণ ভাবে, কেমন অধমের মত, কেমন হাতে-পায়ে ধরে মেয়েটির কখনো-বা ঘরের শান্তি কখনো বা বাইরের সুনাম রক্ষা করবার জন্যে, কখনো-বা লালসা অতিরঞ্চিৎ প্রণয় এসে উৎপলার দিকে মাল্যবানকে হিঁচড়ে টানছে বলে।

আকাশে অনেক তারা, বাইরে অনেক শীত, ঘরের ভেতর প্রচুর নিঃশব্দতা, সময়ের কালো শেরওয়ানির গন্ধের মত অন্ধকার; বাইরে শিশির পড়ার শব্দ, না কি সময় বয়ে যাচ্ছে; কোথাও বালুঘড়ি নেই, সেই বালুঘড়ির ঝিরি-ঝিরি শিরি-শিরি ঝিরি-ঝিরি শব্দ; উৎপলার ঠাণ্ডা সমুদ্রশঙ্খের মত কান থেকে ঠিকরে–মাল্যবানের অন্তরাত্মায়।

দোতলার ঘরটার লাগাও বাথরুম ছিল। বাথরুমটার থেকে বেরিয়ে বেশ খানিকটা ছাদ পাওয়া যায়। সমস্ত ছাদটা বড় মন্দ নয়। কিন্তু অন্য ভাড়াটে পরিবারটি ছাদের বেশির ভাগটাই প্রায় নিজেদের জন্যে আলাদা করে রেখে দেওয়া দরকার মনে করেছে। কয়েকটা বেশ সুন্দর সবুজ তার্পুলিন টাঙিয়ে ভারি চমৎকার একটা পার্টিশন করা হয়েছে। পার্টিশনের ও-দিকে থাকে ওরা; এ-দিকে একটা ডেকচেয়ার, গোটা-দুই বেতের চেয়ার, তেপয়, জলচৌকি, সেলাইয়ের কল, মনুর পড়াশুনোর বই। কোনোদিন-বা একটা হারমোনিয়ম বা সেতার নিয়ে সমস্ত সকালবেলাটা গড়িমসি করে কাটিয়ে দেয় উৎপলা।

এ-জায়গাটা তার খুব ভাল লাগে।

দুপুরবেলা রোদ খুব চড়চড় করে ওঠে বলে খানিকটা সময় বাধ্য হয়ে তাকে ঘরের ভেতর থাকতে হয়। কিন্তু সূর্যটা যেই একটু হেলে পড়তে থাকে, তার্পুনিলের ছায়ায় ডেকচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে গিয়ে উৎপলা; গুনগুন করে, অথবা সেলাই; পড়ে নভেল, মনুকে পড়ায়, এস্রাজ বাজায়।

মাল্যবান সন্ধের সময় মাঝে-মাঝে ছাদে আসে; একটা চেয়ারে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। মাঝে-মাঝে মনুকে ডেকে ইতিহাস-ভূগোল-পৃথিবীর কথা, ধর্মের কথা, মনুষ্যত্ব, মানুষের জীবনের মানে–প্রথম মানে–মাঝারি মানে–বিশেষ করে অন্তিম অর্থ সম্পর্কে অনেক জিনিস একে-একে শেখাতে যায় সে। মেয়েটির সব সময়ই সে-সব খুব ভাল লাগে না–মেয়েটিকেও ভাল লাগে না মাল্যবানের; কিন্তু অনেক সময় মেয়েটি খুব নিরিবিলি শোনে; ভাসা ভরা চোখ তুলে কী ভাবে কেউ কি তা বলতে পারে। উৎপলা বলেঃ মেয়েটা একেবারে বাপের গোঁ পেয়েছে। শুনে ভাল লাগে মনুর। কিন্তু নিজে মাল্যবান মেয়েকে যে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসে তা নয়; স্ত্রীর জন্যেও প্রমাণ শ্রদ্ধা ভালবাসা রয়েছে তার। কিন্তু এদের জন্যেই সে প্রাণে বেঁচে ফিট সার্থক হয়ে রয়েছে, সে কথা ভাবা হয় তো ভুল। মনটা তার অনেক সময়ই একটা মুনিয়ার বা মেঠো ইঁদুরের মত আকাশে-আকাশে ফসলে-ফসলে ভেসে যেতে চায়। বেশিক্ষণ এ-ছাদে বসে না সে; ধুতি-চাদর পরে বেরিয়ে যায়–ময়দানে গেলেই ভাল হত; কিন্তু গোলদিঘিতেই যায়; ছড়ি হাতে করে অনেক রাত অব্দি পাক খায় সে–অনেক কথা ভাবে–কেরানির ডেস্ক ও উৎপলার স্বামিত্ব থেকে নিজেকে ঘুচিয়ে–(কিন্তু কোনোটাই খুব নির্বিশেষে দানা বাঁধা নয়)–সে অনেক রকম আলতো জীবন যাপন করে। তার পর অবসন্ন হয়ে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে, একটা চুরুট জ্বালায়; খিদে পায়; বাড়িতে ফিরে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোতলার বাথরুমে মাল্যবানকে চান করতে দেয় না উৎপলা।

'অফিসে যাবার সময় সাত-তাড়াতাড়ি চান করে তুমি জল ময়লা করে ফেল—তুমি বাবু নিচের চৌবাচ্চায়ই নাইবে—'

'কিন্তু যে-দিন অফিস নেই?'

'হ্যাঁ, সে-দিনও।'

অতএব নিচেই চান করে মাল্যবান; এক-এক দিন তবু গামছা-কাপড় নিয়ে দোতলার স্নানের ঘরের দিকে যায়।

'এক টব আন্দাজ জল ধরে রেখেছি—ও-সব ফুরিয়ে যাবে—'

'এখনও তো কলে জল আছে,' বলে মাল্যবান।

'এই তো এখুনি মনু চান করতে যাবে।'

'আচ্ছা, বেশ, সে তৈরি হয়ে নিক, ওর মধ্যেই আমার হয়ে যাবে।'

'নিচের চৌবাচ্চার কী হল?'

'কেন, পাশের ভাড়াটেরাও তো সেখানে চান করে না, দোতলায় তাদের একটা বাথরুম আছে, সেখানেই তো তাদের সকলের কুলিয়ে যায়।' 'আরে বাবা, ঢেঁকির সঙ্গে তর্ক। তাদের তো পুকুরের মত বাথরুম। তাদের আর আমাদের—'

'লোকও তো তাদের অনেক; কিন্তু, নিচের চৌবাচ্চায় তবুও তো কেউ চান করতে যান না।'

'ওদের বাড়িতে পুরুষ মানুষ আছে যে যাবে? যে-কটি আছে, তাও তো মেয়েদের পাশে-পাশে ফেরে। না হলে মেয়েমানুষের গোসলখানায় কখনো মিনসেরা ঢোকে?'

মাল্যবান একটু উইচুই করে নিচের চৌবাচ্চায় চলে গেল।

একদিন আবার স্নানের সময় উৎপলাকে বললে, 'দেখ, নিচের জল বড় ঠাণ্ডা।'

'এত শীতে জল গরম পাবে কোথায় তুমি,' বললে উৎপলা, 'ঠাকুরই তো রয়েছে, তাকে দিয়ে এক কেটলি জল গরম করিয়ে নিতে পার না?'

'তা পারি বটে,' মাল্যবান অবসর মত একটু ভেবে নিয়ে বললে, 'কিন্তু ও-রকম ভাবে গরম জলে চান করলে বড্ড বদ-অভ্যেস হয়ে যায়। শরীরও খারাপ হয়।'

'কী চাও তা হলে।'

'তোমাদের টবের জল একটুও ছোঁব না, ট্যাপের নিচে একটু বসব।'

'দিক করো না বাপু, মনু এই চানে যাচ্ছে—'

'তা আসুক-না, আমার সঙ্গেই আসুক।'

'তোমার সঙ্গে আসবে!' উৎপলার চোখদুটো পাক খেয়ে ঠিকরে উঠল, 'বুড়ো ধাড়ির দেইজিপনা দেখ। না, না, ও-সব হবে না। নিচে যাও—নিচে যও তুমি?

'এই কথা বলো তুমি?'

মাল্যবান একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে নিচ চলে গেল। অফিস যাওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে একটা কথা বলতে গেল না—অফিস থেকে ফিরে এসেও না। কিন্তু দেখা গেল তাতে কারুরই কিছু এসে যায় না। কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে আড়ি ভাঙতে হল। আড়ি ভাঙতে গিয়েও দেখে স্ত্রীর মানই বেশি। কাজেই আড় ভাঙবারও প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

মাল্যবানের তবুও পথ কাটা হয় না।

ছুটির দিন একদিন বললে, 'নাঃ, নিচে আমি আর চান করতে পারব না।'

উৎপলা সে-কথায় কানও দিতে গেল না।

'পঁচিশ দিনের মধ্যেও একদিনও যদি জল বদলানো হয় নিচের চৌবাচ্চার? পচা জলে চান করে অসুখ করবে আমার!'

'শালগ্রামের কথা শোন,' উৎপলা বললে, 'কানে ধরে কাজ করিয়ে না নিলে পচা জল বেনো জল, সাতঘাটের জল এসে খায় মানুষকে। চোখ-কান বুজে ঠাকুর-চাকরের ঘাড়ে চান করা চলে কি? ফাঁকি দেওয়ার অভ্যেস তো ওদের আঁতুড়ের থেকে। জল কেন বদলাবে, কী দায় ওদের।'

'আমি নিজে তবে বাসি জল খালাস করে চৌবাচ্চায় ঝাড়ু লাগাব রোজ? নতুন জল রাখব?'

'চাকরকে নাই দিলে তাই করতে হয়। এটা তো কোনো অপমানের কাজ নয়—' উৎপলা সেলাই করতে-করতে বললে, 'তোমার নিজেরই তো সুবিধে।'

'কিন্তু এ দু-বাড়ির এত চাকর-ঝির সামনে চৌবাচ্চার বাসি জল নিকেশ করব আমি চৌবাচ্চার ছ্যাঁদার ন্যাতা খসিয়ে?' মাল্যবান পায়চারি করতে-করতে থেমে দাঁড়িয়ে একটু বিলোড়িত হয়ে উঠে বললে।

'খসাবে তো।'

'ঝিগুলো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসবে?'

'কেন, বল তো? এ-রকম হ্যাংলা ঝি কোথায় দেখলে তুমি?'

'আমি দেখেছি। তুমি দেখবে কী করে। সংসারের তুমি বড় জান কি না। কত রকম জীবন আছে! কী দেখেছ তুমি।'

'থাক, ও-সব জেনে আমার কী দরকার!'

মাল্যবান বললে, 'তাই বুঝি? সংসারের বার তুমি?'

উৎপলা শেমিজ ঢাকতে-ঢাকতে কোনো উত্তর দিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই যে আমি চান করি', মাল্যবান আবার পায়চারি করতে-করতে বললে, 'তুমি মনে কর এতে তোমার খুব নামডাক?'

উৎপলা ঠোঁটের ভেতর সুচ গুঁজে শেমিজটা নেড়ে-চেড়ে দেখছিল; বললে, 'বড্ড ছিঁচকে তুমি।'

'আমি?'

একটা কথা নিয়ে এত বাড়াতে পার–'

'ওপরে কল রয়েছে, বাথরুম রয়েছে, অথচ আমি চৌবাচ্চায় চাকর–বাকরদের মত দিনের পর দিন চান করি–ওদিকের ভাড়াটেরাই–বা কী মনে করে।'

উৎপলা ঠোঁটের থেকে সুচ নামিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'এ সব ন্যাকড়া তারা দেখতেও যায় না। বড় মন নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছে। একটা ঢ্যাঙা মিনসেকে চৌবাচ্চার সামনে দাঁড়াতে দেখলেই তারা হেসে শুয়ে পড়বে? নিজের বাপকে দেখে চোখ ওল্টাবে?'

মাল্যবান পায়চারি করতে-করতে এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে বললে, 'সে-দিন শুনলাম মেজগিন্নি বলছেন, 'চাকরবাকরদের চৌবাচ্চয় কেরানিবাবুটি চান করেন, জল কি কলকাতায় সোনার দরে বিকোয় না কি মেজদি–এই সব, এই সব, ছ্যাঃ, শুনে চন করে উঠে মাথার লোম খাড়া হয়ে পড়ে–'

'কে বলছিল এই কথা?'

'মেজঠাকরুন।'

'তা সৎগুষ্টির মেয়ে তো এই রকমই বলবে।'

'ঠিকই তো বলেছিল।'

'ঠিকই যদি বলেছিল, তুমি মুখে কোঁচা গুঁজে চোরের মতন চলে এলে যে?'

'আমি কী করতে পারি। পরের বাড়ির ঝি-বৌদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব? কী বল তুমি উৎপলা?'

উৎপলা সেলাই করে চলেছিল, সুচটা আবার ঠোঁটে-দাঁতে আটকে নিয়েছে, বললে, 'পরের বাড়ির বৌ তো বললে, কিন্তু বাড়ির ভাতার-ভাসুরদের শুনিয়ে-শুনিয়ে যারা এই রকম কথা বলে–'

মুখের কথা না শেষ করে থেকে গেল উৎপলা।

মাল্যবান এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল, একটা ছেঁড়া তেলেময়লায় ঘামানো-চেমানো কৌচে বসল সে, আস্তে-আস্তে বললে, 'যাক। আসল কথা হচ্ছে এক গা লোক নিয়ে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বৌ-ঝিদের আনাগোনা চোখমারা মুখটেপার ভেতর চান করতে জুত লাগছে না আমার। এক-একটা বৌ ওপরের রেলিঙে ভর দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আমার চান দেখে–যেন শিবলিঙ্গের কাকস্নান হচ্ছে–সমুদ্রস্নান হচ্ছে।'

উৎপলা কল চালাতে-চালাতে বললে, 'তা হলে তুমি কি বলতে চাও, দরজা-জানালা বন্ধ করে এক হাত ঘোমটা টেনে তুমি ওপরের বাথরুমে গিয়ে ঢুকবে আর মেয়েমানুষ হয়ে আমি নিচের চৌবাচ্চায় যাব–ওপরের বারান্দায় ভিড় জমিয়ে দিয়ে ওদের মিনসেগুলোকে কামিখ্যে দেখিয়ে দিতে?'

'না, তা কেন?' ছেঁড়া কৌচের ছারপোকার কামড় খেতে-খেতে একটা বেশি কামড়ে যেন অস্বস্তি বোধ করে মাল্যবান বললে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই রকম হলেই তো ভাল হত।'

'আমার কথাটা তুমি বুঝলে না।'

'আরে বাবা, সব বুঝি আমি। দেখেছি অনেক জমিদারের ছেলেদের আমি, আঘন-পোষের শীতে একটা পুকুর-ডোবা পেলেই ঝাঁপিয়ে জাপটে চান করছে। চোখ জুড়িয়ে গেছে দেখে। এক ফোঁটা জলের জন্যে মেয়েমানুষের কাছে এসে হামলা!'

মাল্যবান উসখুস করে উঠে গেল।

ছুটির দিন ছিল; চৌবাচ্চা ছাড়া আরো অনেক কথা বলবার ছিল। কিন্তু বলবে কাকে? শোনবার লোক কই? অনুভূতির সমাত নেই, সরসতা নেই; ছাদে খানিকক্ষণ টুইমুই-টুইমুই করে হেঁটে, থেমে, বসে থেকে মাল্যবান ঘরের ভেতর ঢুকল; একটা চেয়ারে বসে বললে, 'জীবনের সাতাশ-আটাশ বছর আমিও তো পুকুরে চান করেছি।'

'বেশ করেছ।'

'জমিদারের ছেলেদের কথা বললে কি না। কিন্তু কলকাতায় পুকুর পাব কোথায় বল তো দেখি।'

'চৌবাচ্চাই কলকাতার পুকুর।'

'বলেছ। কিন্তু গামছা পরে চান করতে হয়–চারদিকে মেয়েরা থাকে–'

হাঁচতে–কাশতে রূপও বেরিয়ে পড়ে রূপলালবাবুর। মেয়েরা হেঁসেলের ছ্যাঁচড়া পুড়িয়ে আড়ি পেতে থাকে রূপলালবাবুকে দেখবার জন্যে। হেঁসেলে দুধ ধরে যায়–গায়ে-গায়ে ঠাসাঠাসি মাছপাতরি হয়ে রূপই দেখে মেয়েরা রূপসাগরের–'

মাল্যবান আস্তে-আস্তে নিচে নেমে গেল। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবল; আজ অফিস ছুটি ছিল, কথা বলবার ছিল ঢের, কিন্তু উৎপলা মনে করবে, ঝুড়ি খুলে বসেছি–পুরুষমানুষ হয়ে। মেয়েমানুষ-পুরুষমানুষের অন্তঃসার ও ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে ধারণাও বটে এই মেয়েটির! কোথায় পেল সে এ-ধারণা? কে শিক্ষা দিয়েছে তাকে? আপ্রেম–হয়তো অপ্রেমই শিখিয়েছে উৎপলাকে।

একটা চুরুট জ্বালিয়ে মাল্যবান ভাবল, 'পুরুষমানুষ' হয়ে এ-সব মেয়েদের কাছে জীবনের বড়-সড় হ্যাড়ামদ্দাম কথা ছাড়া কোনো মিহি কথা বলতে যাওয়া ভুল; কোনোদিন যদি তারা সেধে শুনতে আসে সেই অপেক্ষায় থাকতে হয়। সেটা সুফলা জিনিস হয়? চুরুটে কয়েকবার টান দিয়েই মাল্যবান ভাবল–কিন্তু সে রকম ভাবে উৎপলা আসবে না কোনোদিন। বারটা বছর তো দেখা গেল। এই স্ত্রীলোকটি মিষ্টি হোক, বিষ হোক, ঠাণ্ডা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোক, আমার জীবনের রাখা-ঢাকা সবুজ বনে আতার ক্ষীরের মত কথাগুলো শুনতে আসবে, সে পাখি ও নয়। ওর চেহারা যদি কালো, খারাপ হত, তা হলে তো চামারের মেয়েরও অযোগ্য হত। একটা মোদ্দাফরাসকে নিয়ে ঘর করছি আতাবনের পাখির মত—নেই-সেই পাখিনীকে চেয়ে আমি—

কিন্তু নিজের চিন্তাধারণা ও উপমার কেমন একটা আলঙ্কারিক অসহজতায়—অস্বাভাবিকতায়ও বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল মাল্যবানের মন। জিনিসটা ঠিক এই রকম নয়, অন্য রকম। কিন্তু কী রকম? যে-রকমই হোক, কোনো সহজ স্বাদ নেই জীবনে—খাওয়া-দাওয়া শোওয়া ঘুমনোর স্থূল স্বাদগুলোও সূক্ষ্ম হতে চেয়ে গোলমাল করে ফেলল।

'তোমার মাইনে তো আড়াইশ টাকা হল—এমন একটা কেলেঙ্কারি ঘোচাও তো।'

'কী করতে হবে?'

'ছাদে পাতপিঁড়ি পেতে খাওয়ার পক্ষপাতী আমি নই;' উৎপলা বললে।

'দিব্যি তো গায়ে বাতাস লাগিয়ে আলোয়-আলোয় মাছের কাঁটা বেছে খাওয়া হয়', মাল্যবান যেন নাকের আগায় চশমা ঝুলছে তার, এমনিভাবে একদৃষ্টে, সনির্বন্ধতায় উৎপলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আন্ধি ঘুপসির থেকে বাঁচোয়া না? ছাদের আলোয়? ছাদে খাওয়াটা তো বেশ। আমার তো বেশ ভাল লাগে।'

'ছাদটা একটা আঁস্তাকুড় হয়ে থাকে।'

'সে আর কতক্ষণ?'

'নিজে তো অফিসের মুখে দিব্যি চাকলা গিলে হুট করে গাছের মাথায় চড় গিয়ে কি না—কী দিয়ে কী হয়—ঝামেলা হামলা আমি একা বসে পোয়াই আর কী।'

'এঁটো গড়াতে থাকে অনেকক্ষণ?'

'ঠাকুরের সঙ্গে ঝি পিরিত করবে, ঝির হাতে ঠাকুর খইনি টিপবে—তারপরে তো এঁটোর কথা মনে পড়ে—'

'এই রকম?' মাল্যবান মুখে দু-একটা কালমেঘ ঘনিয়ে এনে বললে, 'কতক্ষণ ফেলে রাখে? দু-তিন ঘণ্টা?' একটু চুপ থেকে মাল্যবান বললে 'বড় বেয়াদব তো তা হলে—' আবার খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কথা ভেবে ঠিক করে নিয়ে মাল্যবান বললে, 'এ-ঝিটাকে উঠিয়ে দিতে হয়।'

'না, সে-সবের কোনো দরকার নেই।'

'এই না বললে ঠাকুরের সাথে পিরিত করে?'

'তা করুক, আমাদের তাতে ক্ষতি কী?'

'কিন্তু সে সব ভাল নয় তো।'

'আমাদের কাজ নিয়ে কথা; ওদের অন্তর্জলীর ভেতর নাক ঢোকাতে যাব কেন?'

'কিন্তু ভাদুরানীর স্বামী রয়েছে—তবুও ঠাকুরের সঙ্গে এই রকম।'

'তুমি তো আচ্ছা বেকুব দেখছি!'

'কেন?'

'ছোট জাতের ভেতর কত রকম কাণ্ড হয়!'

'ছোটোজাত? ভাদুরানী তো বামুনের মেয়ে।'

'তা হবে। বেশ তো—ঠাকুরও তো বামুন—'

ঠাকুরও বামুন ঃ মাল্যবানের কাছে ব্যাপারটা এক মুহূর্তের জন্যে চীনে প্রবাহের মত সরল অথচ কঠিন, কঠিন অথচ সরল বলে মনে হল; কী যে এই সহজ ব্যাপারটা—কী এর মানে কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারল না। তামাকের ধোঁয়ায় নোংরা দাঁতগুলো বের করে—সেই দাঁতগুলোর মত আকাট অবর্ণনীয়তায় উৎপলার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

ছাঁদে না খেয়ে এখন থেকে ছাদের উত্তরদিকের ঘরটায় খেলে হয়—বেশ ফটফটে ঝরঝরে ঘরটা—'

'কিন্তু ওটা তো ও-ভাড়াটেদের—'

'না গো, ওরা ও-ঘরটা ছেড়ে দিয়েছে।'

'কবে ছেড়ে দিল?'

'কাল।'

মাল্যবান একটু ভেবে বললে, 'ওটার ভাড়া তো কম হবে না—'

'পঁচিশ টাকা চায়—আমি বলে কয়ে কুড়ি টাকা করতে পারব,' বলে একটু ঝিকমিক করে হেসে মাল্যবানের দিকে তাকাল।

মাল্যবান ভুরু উঁচকে বললে, 'কুড়ি টাকা অতিরিক্ত খরচ আবার?'

'কিন্তু তোমার মাইনেও তো বেড়েছে।'

'কিন্তু দশ রকম খরচও তো বেড়েছে। এটা আবার কেন?'

'কিন্তু ছাদে খাওয়া অসম্ভব—'

মাল্যবান ভাবছিল ঃ নাকের আগায় যেন তার চশমা ঝুলে পড়েছে, এ-রকম কেমন এক অথৈ শূন্যতার ভেতর থেকে নিশ্চুপ একনিষ্ঠতায় ও সনির্বন্ধতায় উৎপলার দিকে তাকিয়ে।

'খেয়ে উঠতে-না-উঠতেই কাক চড়াই এসে সমস্ত এঁটো চারদিকে ছড়াবে, ছাদে যে-কাপড়গুলো শুকোতে দিই তার ওপর মাছের কাঁটা, আলু-মশলার হলুদের ছোপ, পাখির বিষ্ঠা; রাধার কলঙ্কের চেয়ে কেষ্টোর কলঙ্ক বেশি ঃ ন্যাকড়ার গাঁধি, চিংড়ির দাঁড়া, ছিবড়ে পিঁপড়ে, মাছি সমস্ত ছাদে মই-মই করছে রে বাবা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রান্নাঘরে গিয়ে খেলে হয় না?'

উৎপলা ডান হাতের চাঁটি মেরে বাঁ গালের জুলপির ভেতরে একটা মশা না কী পিষে ফেলে বললে, 'কুড়ি টাকা ভাড়া চাচ্ছে, ঝনাৎ করে টাকাটা ফেলে দেবে, না কি ফড়ের মত কথা বলছ তুমি। রান্নাঘর হয়ে এসেছ কোনোদিন?'

'না, কী আছে ওখানে?'

'আমার বাজু আছে আর তোমার পায়ের মল।'

এক সারি নোংরা দাঁত কেলিয়েই মুখ বুজে ফেলল তৎক্ষণাৎ মাল্যবান; হাসল এক ঝিলিক, না, ন্যাক সিঁটকাল, বুঝতে পারা গেল না।

ছাদের উত্তরের দিকের ঘরটা ভাড়া করা গেল। চুনকাম করা ধবধবে সুন্দর দেয়াল, নতুন সবুজ রঙ মাখানো জানলা দরজা-দিব্যি।

'তোমার মেজশালার তো কলকাতায় আসবার কথা; যদি আসে, তা হলে এই ঘরটায় আমি আর মনু থাকতে পারি-বড়ঘরটা তাদের ছেড়ে দিতে পারি-'

মাল্যবান ঠোঁটের ওপর ছাঁটা গোঁফের গ্যাজে আঙুল বুলিয়ে কথা ভেবে নিচ্ছিল, কোনো উত্তর দিল না।

আপাতত একটা লম্বা টেবিল এই ঘরটার মাঝখানে এনে রাখা হল-চারদিকে তিন-চারটে চেয়ার। সকালের চায়ের থেকে শুরু করে রাতের খাওয়া অব্দি সবই এই টেবিলে চলছিল।

উৎপলা একদিন একটা চিলতি চিঠি পড়তে-পড়তে বললে, 'মেজদা আসবেন।'

'কবে?'

'আসতে অবিশ্যি দেরি আছে।'

'এ-মাসে?'

'চিরকুটটা রেখে দিয়ে উৎপলা বললে, 'মাস দেড়েকের মধ্যেই; পরিবার নিয়ে।'

'মেজশালার ছেলেমেয়ে কটি না?'

'তিনটি।'

'তিনটিই তো বেশ বড়-বড়।'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে জায়গার টানাটানি হবে তো।'

'ঐ খাবার ঘরটায় গিয়ে আমরা থাকব।'

'তুমি আর মনু?'

'আমরা দু'জন তো বটেই,' উৎপলা সমীচীন কচ্ছপের চামড়ার মত কঠিন একটা ভাব দেখিয়ে তবুও বললে, 'তুমিও আসতে পার, দেখি কী হয়।'

মাল্যবান খুব আগ্রহে একটা কথা পাড়তে গিয়ে নিজেকে শুধরে নিয়ে অন্য কথা পেড়ে বললে, 'অতটুকু ঘরে তিনজন কী করে আঁটবে?'

'তা আমি বন্দোবস্ত করে দেব। দুটো খাট পড়লেই তো আমাদের তিনটি প্রাণীর হয়ে যায়। আমাদের একটা সেলের মত ঘর হলেই হয়ে যায়। দেখেছ তো দমদম জেলে।'

সত্যাগ্রহের আসামী মনে করে একটা বিশৃঙ্খল ভিড়ের ভেতর থেকে অন্য অনেকের সঙ্গে মাল্যবান ও উৎপলাকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রাখা হয়েছিল-দিন দুই-মাস ছয়েক আগে।

'দেখেছি তো,' মাল্যবান বললে, কিন্তু দোতলার বড় ঘরটায় এতদিন মাল্যবানকে চৌকি-একটা ক্যাম্পখাট অব্দি, পাততে দেওয়া হয় নি কেন? না হোক, উৎপলার অত বড় খাটে মাল্যবানকে শুতে দেওয়া হয় নি কেন?

মাল্যবান নিজের দাম্পত্যজীবনের আকাশ প্রমাণ ব্যর্থতাকে তিলপ্রমাণের ভেতর মজিয়ে এনে তিলের ভেতরে তবুও ব্রহ্মাণ্ড দেখতে-দেখতে একটু বিষণ্ণভাবে হেসে ভাবছিল, কাঁকড়েশ্বরী, পরমেশ্বরী জেলে তো ক্যাঁকড়ার গর্তেও আমাদের এঁটে গেছে। তোমার মেজদা এলে খাবারের ঘরটায়ই হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি আর আমি শুধু থাকি যখন এ-বাড়িতে, দোতলার এ বড় ঘরটায় আমার জায়গা হয় না কেন, নিচের ঘরে বকনাবাছুর রামছাগলের কান টানে, কান-টানের না প্রাণ-টানের খুঁটে আমাকে না বেঁধে রাখলে আমার রাখালি ঘুমটা পাকে না বুঝি ওপরের তলায়?

ঠিক হয়ে গেল ছাদের উত্তর দিকের খাবারের ঘরে এরা তিন জনে থাকবে, বাকি দুটো বড়-বড় ঘরই মেজদা আর তার পরিবারকে ছেড়ে দেবে।

'মেজবৌঠান মানুষ মন্দ নয়' উৎপলা বললে, 'কিন্তু আমি ভাবি, মেজদার জন্যে। মেজদা একটু সুখী মানুষ কি না-'

'পদ্মার ইলিশের মত সুখী বটে তোমার মেজদা।'

'কী রকম?'

'সূর্যের একটা ঝিলিক দেখলেই লাট খেয়ে পড়ে মাছ-'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে' উৎপলা বললে, 'আমি যা বলছিলাম, একটা আড়ে-দিঘে প্রমাণ ঘর নিজের জন্যে না পেলে মেজদার চলবে না।'

মাল্যবান বললে, 'ঐ দোতলার বড় ঘরটায় তিনি একাই থাকবেন বুঝি? ঘরটা বেশ বড়-আলো-হাওয়াও খুব। থাকুন।'

'ঐ ঘরটাই দেব দাদাকে-'

'তোমার বৌঠান থাকবেন কোথায়?'

'তিনিও ঐ ঘরেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার দাদার সঙ্গেই?'

'শোন কথা, রামকানাইয়ের সঙ্গে তবে?'

'মেজদি তো নিচের ঘরে থাকলেও–'

'বৌঠান নিচের ঘরে থাকবেন? কেন? তোমার খচখচ করছে কোথায়?

মাল্যবান বললে, 'যে-রকম সুখী মানুষ তোমার দাদা, তাতে একটা ঘর ছেড়ে দিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে অন্য এক ঘরে শোবার ব্যবস্থা যদি করেন বৌঠান, তা হলেও সারাটা দিন দাদা তো তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে পারেন, কিংবা তিনি দাদার কাছে এসে বসতে পারেন। এতে তো কোনো অসুবিধে হয় না কারুর–'

'কিন্তু রাতেরবেলা?'

'তখন অবিশ্যি যে যাঁর ঘরে গিয়ে শোবেন।'

'তা হয় না।'

'কেন?'

'বৌঠান কাছে না থাকলে মেজদার ঘুম হয় না। এ নিয়ে মেজদার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে ঠাট্টা করে।'

'ঠাট্টা চলে বটে।'

'কী রকম?' বললে উৎপলা। তার মুখের আত্মতুষ্টির ঝিলিক নিভে গেল।

'কোনো অসুখ আছে মেজদার?'

'কিছু নেই।'

'সুস্থ মানুষ?'

'মেজদা-মেজদি দু'জনেই। ওরা এক জোড়া প্রথম থেকেই হয়ে এসেছে। তুমি এখন ভাঙবে?'

'খুব ভাল শাঁখার ব্যবসায়ী ছিলাম আমি,' মাল্যবান একটু হেসে বললে, 'তোমার হাতও ননীর মতন নরম ছিল, কিন্তু কোনো শাঁখাই পরাতে পারলাম না কেন?'

মাল্যবানের কথা উৎপলার কানে অপ্রাসঙ্গিক চরিত্রের স্বগতোক্তির মত শোনাল; ও-রকম গোপনীয়তার ছায়া মাড়াতে চাইল না সে। শোনে নি যেন মাল্যবানকে, নিজেরই কথার জের টেনে উৎপলা বললে, 'এক চিলতি চিঠি এসেছে তো মেজদির কাছ থেকে পণ্ডিচারির থেকে। দেড় মাস পরে পণ্ডিচারির থেকে আসবেন মেজদা-মেজদি; ছেলেমেয়েরা পণ্ডিচারি নেই–কাছেই আছে–সেখান থেকে তাদের কুড়িয়ে নিয়ে আসবেন। আমাদের বাড়িঘর চুনকাম করিয়ে নিলে কেমন হয়।'

মাল্যবান চুপ করে ছিল; তার খুব তাজা কথাটির কোনো উত্তরই দিল না উৎপলা; কথাটা শুনেছে বলেও স্বীকার করল না।

'জানালা দরজা সব আগে থাকতেই বেশ রঙ করিয়ে নিলে ঠিক হবে,' উৎপলা বললে।

'আমাদের নিজেদের খরচে?'

'তবে আবার কার খরচে? বাড়িওয়ালার?'

'না, না, সে তো তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখবে আর হাসবে।'

'হাসবে?'

'জামাই-এর শালা আসছে বলে শালার বোনাই গরাদে রঙ মাখাচ্ছে; হাসবে না?'

চুনকাম রঙ করিয়ে নিতে খরচের ঠ্যালা আছে। ও-সব জিনিসের দরকারও নেই এখন। দেয়ালগুলো বেশ পরিষ্কার, দরজা-কপাটও খারাপ নয়। এ-সব জিনিস নিয়ে মাথা খারাপ করবার মত বেশি টাকার রস মাল্যবানের নেই এখন, কিন্তু উৎপলাকে কিছু বলতে গেল না সে। বললে, বুঝবে না। মেজদা এলে তাঁকে দিয়ে বলালে বুঝবে বটে কিংবা মেজদিকে দিয়ে; তাদের মাথা ঠাণ্ডা আছে; প্লাগ-টাগও বেশ ভালই কাজ করছে তাদের অন্তরেন্দ্রিয়ের এঞ্জিনের। বেশ চমৎকার দাম্পত্যজীবনই জমিয়ে বসেছে বটে মাল্যবানরা; কুয়াশার ভেতর থেকে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে যেন উৎপলার দিকে তাকিয়ে রইল মাল্যবান।

'তা হলে এরা দু'জনেই এই বড় ঘরে থাকবে শোবে?'

'হ্যাঁ।'

'আর ছেলেমেয়েরা?'

'নিচে শোবে।'

'একা-একা নিচে থাকবে?'

'দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলে ভয় নেই কিছু।'

মাল্যবান কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি গিয়ে সেখানে শুতে পারি না?'

'ছেলেপুলেদের মধ্যে?'

উৎপলার মুখের অসাধ দেখা দিল সময়ের শূন্যতার ভেতর একটা ছ্যাঁদার মত যেন।

'না, অত আঁটবে কী করে? অত ঘুজিঘুজিতে ওদের কষ্ট হবে।'

'তা হলে তুমি তো পার শুতে ওদের সঙ্গে', মাল্যবান বললে।

'আমি অবিশ্যি শুতে পারি গিয়ে। তাই করতে হবে হয়তো। বৌঠান তো রাত হলে ওপরের থেকে আর নামতে পারবেন না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কীর্তনের সুর গাইতে-গাইতে উৎপলা ছাদের দিকে চলে গেল। মাল্যবান খানিকটা হতচকিত, আড়ষ্ট, তারপরে অবহিত হয়ে অনেকক্ষণ ঘরের ভেতর বসে রইল; দুটো কীর্তন সাঙ্গ হল; তারপরে মাল্যবানের বাঁশ-বনে-ডোম-কানা ভাবটা কেটে গেল অনেকখানি। কীর্তন শুনে অবিশ্যি নয়। এমনিই।

একটা ভারি নিশ্বাস ফেলে সে গোলদিঘির দিকে চলে গেল।

দিঘির চারপাশে পাক খেতে-খেতে সে অনেক কথা ভাবল, তারপর বেশি কথা ভাবতে-ভাবতে চারদিকের নটেগাছগুলোকে ঠুঁটো হয়ে মুড়োতে দেখে একটা বেঞ্চিতে এসে চুরুট জ্বালাল।

দু-তিন দিন পরে মাল্যবান বললে, 'তোমার মেজদারা তো থাকবেন অনেক দিন।'

'হ্যাঁ।'

'বছর খানেক?'

'না, মাস ছয়েক।'

'একটা কথা আমার মনে হয়', মাল্যবান বললে, 'এ-বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে একটা নতুন বাড়ি দেখলে মন্দ হয় না। দোতলা কিংবা তেতলায় বড়-বড় কয়েকখানা ঘর থাকবে।'

শুনে উৎপলা নাকে-চোখে খুব খুশি হয়ে বললে, 'তা হলে তো খুব ভাল হয়।' গুনগুন করে গাইতে-গাইতে বললে, 'তুমি সে-রকম বাড়ি দেখেছ কোথাও?'

'না?'

'পাওয়া বড্ড শক্ত।'

'আমি খুঁজছি।'

'পঞ্চাশ টাকা ভাড়ার মধ্যে পেতে হবে তো?'

'ধরো, গোটাদশেক বেশিই না হয় দিলাম।'

কয়েক দিন পরে মাল্যবান এসে বললে, 'একটা বাড়ির খোঁজ পেয়েছি।'

'কোথায়?'

'পাথুরেঘাটার দিকে।'

'বাবা, অদ্দুরে গেলে?'

'কিন্তু বাড়িটা বেশ।'

'কটা ঘর আছে?'

'পাঁচটা। দোতলায় চারটে, তিনতলায় একটা।'

'বেশ বড়?'

'হ্যাঁ।'

'কত চায়?'

'পঞ্চাশ।'

'তা পঞ্চাশ টাকা বড্ড বেশি।'

'কিন্তু পাঁচটা ঘর।'

'তা বুঝলাম—'

'ঠোঁটে পানের রঙ শুকিয়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল উৎপলার ঠোঁট। ঠোঁট নেড়ে সে বললে, 'কিন্তু মেজদার কাছ থেকে কিছু তো চাওয়া যায় না।'

'তা আমি জানি।'

'এমন-কি সেধেও যদি কিছু দেন, তা হলেও তা নিতে পারি না আমরা।' সে-বিষয়ে মাল্যবানের খানিকটা মতভেদ ছিল।

একটা হাই তুলে মাল্যবান বললে, 'তাই তো, আড়াইশ টাকায় চলে কী করে, পঞ্চাশ টাকাই যদি বাড়িভাড়ায় দিয়ে ফেলি—'

উৎপলা চাপা গলায় ভরসা দিয়ে বললে, 'চালাতে পারি আমি অবিশ্যি—'

'নাঃ, সে আর তুমি কী করে পার! লোকও তো কম নয়—'

'তোমার সোনার ঘড়িটা যদি বিক্রি করে ফেল, তা হলে টেনে-মেনে এক রকম চলে—'

'আমার সোনার ঘড়িটা বিক্রি করে ফেলব!' মাল্যবান দম ছাড়বার আগে, দম ছাড়তেই পারবে না যেন সে আর, এমনি ভাবে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'ঐ, বিয়ের সময় যেটা পেয়েছিলে—' মাল্যবানের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে উৎপলা।

কিন্তু মাল্যবানের আর-এক রকম—কেমন যেন, পাট ভেঙে গেছে, এই ছিল এই এখুনি ইস্ত্রি লাট হয়ে গেছে—এরকম মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্রী লাগল উৎপলার—বিরক্তি বোধ করল সে।

'বাবা তিনশ টাকা দিয়ে তোমাকে ওটা কিনে দিয়েছিলেন। সেই বাপের জন্যে আমি তোমাকে বিক্রি করতে বলছি, আমার ভাইয়ের সুবিধের জন্যে এ না করে এ-ঘড়ি দিয়ে কাঁচাপোকা টিপ পরবে তুমি!'

'আয় রোদ্দুর হেনে ছাগল দেব মেনে'-র মত একটা বিলোড়িত মন্ত্রে যেন উৎপলার চোখ রৌদ্রের মত হেনে পড়ল মাল্যবানের চোখে' কথা বলতে-বলতে এগোতে-এগোতে মাল্যবানের মুখের ওপর প্রায় পড়ল গিয়ে উৎপলা। আস্তে-আস্তে নিচে নেমে গেল, পরটা-চা খাবার জন্যেও ওপরে ফিরে এল না আর মাল্যবান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানিকক্ষণ পরে মনু নিচের থেকে ফিরে এসে বললে, 'বাবা বেরিয়ে গেছেন, মা।'

'চা না-খেয়েই গেল যে', বলে চায়ের বাটিটা একটু কাত করে চাটুকু ছাদের এক কিনারে ঢেলে দিল। মনুকে বললে, 'পরটা খাবি?'

'না, মা, আমার কেমন অম্বল হয়েছে।'

'এতটুকু বয়সেই তোদের অম্বল হয় শুনলেও হাসি পায়,' পরটা দুটো ছাদের ওপরে গোটা তিনেক কাকের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল উৎপলা, মনুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'অম্বল! কথাটা শেখাল কে তোকে–'

'বুক জ্বলে যে।'

'তাকে অম্বল বলে তা ঠিক। কিন্তু কার কাছে শুনলে?'

'কেন তোমরাই তো অনেক সময় বল।'

'আমি বলেছি?'

মনুর দিকে চোখ শানিয়ে তাকিয়ে উৎপলা বললে, 'আমার বাপের বাড়ি কারো কোনোদিন অম্বল হয়েছে যে, বলব?'

মনু চুপ করে রইল।

'ঠিক করে বল তো কোথায় শুনেছিস কথাটা?'

'ধ্যাৎ আমার অত মনে নেই–'

'মনে নেই। এলি গেলি, বাপের বিদ্যেয় বর্তালি, মনে নেই। যেমন দেখতে, তেমন লিখতে, কী যে বাপের গোঁই পেয়েছ বাছা।'

মাল্যবান যতই অভিমান করুক না কেন, রাতে খাবার সময় ঠিক হাজির হল। উৎপলা তিন জনের ভাত সাজাতে-সাজাতে বললে, 'তোমার বড্ড ক্ষুদে মন–ক্ষুদিরামের মত–ফাঁসির ক্ষুদিরাম নয়–ভারি নচ্ছার মন তোমার–'

'আমার?'

'চা না-খেয়ে বেরিয়ে গেলে যে বড়?'

'ওঃ–চা–' মাল্যবান নাকের ভেতর দিয়ে খানিকটা হাসল–যেন কিছুই হয় নি; চায়ের কথাটা কিছুই মনে ছিল না যেন তার।

'চা পরাটা পড়ে রইল–শেষে কুকুর-বেড়ালে খায়–গতর খায় গতরখেকোর রাগ।'

'না, না, রাগ নয়–খাবারের ওপর মানুষে আবার রাগ করে না কি–অত আহাম্মক আমি নই!' বলে মাল্যবান বুদ্ধিমান নিরাগীর মত ভাব দেখিয়ে পাঞ্জাবির আস্তিন খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে বললে, 'দেখি ভাতের থালাটা–'

উৎপলা ছুরি দিয়ে একটা লেবু কাটতে-কাটতে বললে, 'আহাম্মক হবার বাকিও রাখ নি কিছু–'

মনুর মাথায় একটা চাঁটি মেরে উৎপলা বললে, 'ট্যালার মত এই খাবারের জিনিসগুলোর কাছে থুবড়ি খেয়ে পড়ে আছিস যে! হাভাতে মেয়ে, বোস গিয়ে–ট্যাক-ট্যাক করে তাকিয়ে আছে। গুষ্টির খাঁই এখন থেকেই দমকে-দমকে চাড় দিয়ে উঠছে পেটে।'

মাল্যবানের ইচ্ছা হচ্ছিল এবারও সে উঠে যায়। কিন্তু তাতে কারো শিক্ষা হবে না। যে যা হবে না, তাকে তা করা যাবে না। মাঝখানে থেকে না খেয়ে উঠে গেলে খিদের পেটে নিজেরও কোনো লাভ হবে না। মাল্যবানের সঙ্গে উৎপলা যদি টিকে থাকে মাল্যবানের মৃত্যু পর্যন্ত–এই রকম ভাবেই টিকে থাকবে; কোনো সংশোধনী বিজ্ঞানী বিদ্যে নেই এ-সব স্ত্রীলোকদের শোধরাবে–আমেরিকা বা রাশিয়ার হাতেও; কোনো লক্ষ কোটি অব্যয় কাল নেই ব্যক্তি মানুষের হাতে কয়লাকে যা হীরে করে দিতে পারে।

মনু চেয়ারে এসে বসল বাপের মুখোমুখি। মাল্যবান তাকে সান্ত্বনা দেবার কোনো ভরসা পাচ্ছিল না। মেয়েটির দিকে তাকাতেও গেল না সে। মেয়েটির পাশে বসে আছে–কেমন কানাভাঙা খোনা খেমটা উত্তেজনা অবসাদে মাল্যবানের মন ভারি হয়ে উঠতে লাগল। নিজে সে বাপ হয়েছিল–বিয়ে করেছিল–হীন কুৎসিত উঞ্ছপুঞ্জে জীবনবীজ ছড়িয়েছিল ভাবতে-ভাবতে মন তার চড়-চড় করে উঠল। একটা পাখি সৃষ্টি করে তাকে যদি ইঁদারার অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হয়–কেমন ছটফট করে উঠতে লাগল মাল্যবানের ভেতরটা। মাল্যবান ভাবছিল; উচিত ছিল তার একা থাকা, খবরের কাগজ পড়ত, অফিসে যেত, গোলদিঘিতে বেড়াত, সভা-সমিতিতে সামনের বেঞ্চে গিয়ে বসত, বেশি করে যেত থিওজফির সভায়, ফ্রিম্যাসনস হত, রাত জেগে ডিটেকটিভ উপন্যাসের থেকে কলকাতা উইনিভার্সিটির মিনিট, নানা রকম কমিশনের রিপোর্ট, ব্লু বুক, হাতের কাছে যা-কিছু আসত, তাই পড়ত, ভাবত, উপলব্ধি করত–কেমন চমৎকার হত জীবন তা হলে।

জীবনের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোককে জড়িয়ে নিয়ে–এ জড়িয়ে নেওয়ার সমস্ত নিহিতার্থের ছোব-পোচড় গায়ে মেখে দধিতে কাদায় মূর্খতায় ওগরানো অম্বলে আগুনে অতৃপ্তিতে মণ্ডিত হয়ে কী হল সে।

খানিকক্ষণ থালায়-বাটিতে চুপচাপ ভাত-ডাল-তরকারি সাজিয়ে উৎপলা পরে বললে, 'ছোটবেলায় বাপ-মা তোমাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছিল বেশ–'

'কেন, কী হয়েছে, কী দেখলে তুমি?'

'না হলে এ-রকম হ্যাংলামো কেউ করে?'

'হ্যাংলামো?' ভাতের থালাটা উৎপলার গায়ে ছুঁড়ে মারতে গিয়ে কোন বৈষ্ণবী শক্তির জোরে যে বিরত হল মাল্যবান, দু-এক মিনিট খুন-চাপা রক্ত-চড়া মাথায় কিছুই বুঝতে পারল না সে।

আস্তে-আস্তে ঠাণ্ডা হচ্ছিল তার মন।

'তা নয় তো কী–' উৎপলা বললে।

'কী করেছি আমি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খুব যে আস্তিন টেনে ভাতের থালা কিলিয়ে পাকাচ্ছিলে-দেখছিলেই তো ভাত-ডাল-তরকারি মাছের বাটি তখনো তৈরি হয় নি। ঘাড়ের রোঁ সাদাটে মেরে গেল, এখনও ন্যালা কুকুরের মত খুব যে গুঁই-গাঁই-খুব যে গুঁই-গাঁই!' মাল্যবানের এক রাশি কথা বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু খুব অল্পে সেরে দিয়ে সে বললে, 'আমার খিদে পেয়েছিল, থালাটা চেয়েছিলাম তাই।' 'খিদে তো ঘোড়ারও পায়; তাই বলে মানুষের টেবিলটাকে আস্তাবল করে তুলতে হবে', ভাতের থালাটা মাল্যবানের দিকে ঠেলে দিয়ে উৎপলা বললে, 'কুড়ি-পঁচিশ পেরিয়ে গেলেই সব কাণ্ডেনি ফুরিয়ে যায়-ব্যাটাছেলেরা দিব্যি পুরুষ মানুষ হয়ে ওঠে-দিব্যি। সতের-আঠার বছর বয়সেই মেয়েরা স্ত্রীলোক হয়-কিন্তু বেয়াল্লিশ বছর বয়সেও ঢেকেলে কী থাকবে আর, ঢেঁকি ছাড়া?'

মাল্যবান ঘাড় ঝুঁকিয়ে খানিকটা দক্ষিণায়নে রেখে খাচ্ছিল।

উৎপলা এক গেরাস মুখে তুলে বললে, 'কপালে যদি হবার নয় লেখা থাকে, তা হলে সে-লেখা কপালের ঘামে মুছে যাবার নয় তো, ও-সব লেখা ঘামে-রক্তে মোছে না।'

মনু বুঝছিল না বিশেষ কিছু; মাল্যবান বলছিল না কথা কিছু; খাবার ঘরে নিস্তব্ধতা খানিকক্ষণ; যে যার মনে নুন মাখিয়ে, লেবু টিপে, জলের গেলাস মুখে তুলে, তরকারির বাটি কাত করে খেয়ে যাচ্ছিল।

'কিন্তু অফিস থেকে এসে কী হয়েছিল শুনি?' বললে উৎপলা; গায়ের ঝালটা কিছুতেই মরছিল না যেন তার।

মাল্যবান খাওয়ার ধরন-ধারণ খানিকটা বদলে ফেলে একটু ভদ্রভাবে খেতে-খেতে বললে, 'কিছু হয় নি।'

'ঝপ করে অমনি মিথ্যে কথা!'

'কী হবে আবার।'

'চা না খেয়ে চলে যাওয়া হয়েছিল যে।'

'চা আমি বাইরে খেয়েছিলাম।'

'কোথায়?'

'দোকানে।'

'কে খাওয়াল?'

'কে খাওয়াবে আবার-'

'গাঁটের পয়সা ভেঙে খেলে তো?'

'সেই রকম খেতেই আমি ভালবাসি-'

'তোমার বন্ধুদেরও আশান হয়। কে আবার ট্যাকের পয়সা খরচ করে ডিমের বড়া খাওয়াবে ধরা- গণেশকে,' উৎপলা বললে, 'পয়সা খরচ করে তারা-খুব খরচ করে-কিন্তু মানুষ বুঝে-মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে-'

উৎপলা কঠিন নিঃশব্দ দৃষ্টিতে মাল্যবানের আপাদমস্তক কিছুক্ষণ প্রদক্ষিণ করে দেখল।

'এক পেয়ালা চা নিয়ে সাধে না; কেন, ঘরের বাইরে জলচল নেই তোমার?'

'চা নিয়ে সাধে না বাবাকে', মনু বললে, 'দই-মিষ্টি?'

মাল্যবান নিঃশব্দে একটা আলু টিপছিল।

'আহ্বান যা আসে তাও শ্বশুরবাড়ির থেকে। লোচনা ডোমেরও জামাইষষ্ঠী হয়-সেই রকম আর-কি। বেয়াল্লিশটা বছর বসে এত বড় পৃথিবীর ভেতরে থেকে মানুষসমাজে মানুষটা কানা-একেবারে ছুঁচো-চামচিকের পারা-'

উৎপলা খানিকটা জলে গলা ভিজিয়ে নিল, 'কোথাও ডাক নেই, কেউ পোছে না, হৈ-হল্লা নেই, ঘরে আড্ডা-মজলিশ নেই-খোল-করতাল কেত্তন-মুজরোর বালাই নেই-কোনো মানুষই আসে না-ডাকলেও আসে না। কিন্তু বয়ড়াকে কানে শোনাবে কে? ড্যাবড়াকে ডান হাত দেখিয়ে দিলে লাভ আছে?'

মাল্যবান খাচ্ছিল। মনু শুনছিল, হাসছিল, ভুলে যাচ্ছিল, মানে বুঝছিল না, ফেলা ছড়া করে অরুচি মুখে মাঝে-মাঝে আবার খুঁটছিল খাচ্ছিল-'

'সেই বিয়ের পর থেকেই দেখছি কেরানিবাবুর নিচের তলার ঘরটিতে দুটো চেয়ার; একটাতে তিনি নিজে বসেন, আর একটাতেও তিনি নিজে বসেন। হাফ-আখড়াই কে যেন আসত মাঝে-মাঝে-ওঃ অভিরাম সরখেল; হামলা হচ্ছে বলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।'

একটা ঘোলা নিশ্বাস ফেলল উৎপলা। কিন্তু ব্যথাটা লাগল মাল্যবানের বুকে গিয়ে বেশি-বন্ধুবান্ধব নেই বলে নয়-মাল্যবানের জীবনের নিঃশব্দতার খানিকটা যে সূক্ষ্ম মানে আছে, তার ওপর এ রকম খিঁচুনি-খোঁচা এসে পড়ল বলে। অথচ উৎপলা মেজাজে থাকে না যখন আর, স্থির হয়-তখন আজীবন যে-সব বিচিত্র বেচাল কথা বকে গেছে সে সবের বেকুবি তাকে নিঃশব্দ করে রাখে-এমনই নিঃশব্দ, মনে হয় যেন সমুদ্রের ওপারে পৃথিবীর পারে সকলের নাগালের বাইরে অন্তহীন 'হচ্ছি' 'হব' পেরিয়ে, কেমন শাশ্বত 'হয়েছি'র নিবিড়তার ভেতর বসে আছে সে। কিন্তু এখন অন্য রকম উৎপলার, দুঃখের বিষয়, এইটেই তার আটপৌরে রকম।

একটা কাচের রেকাবি থেকে এক টুকরো লেবু নিয়ে ডালের সঙ্গে টিপতে-টিপতে অসাধ অসফলতার বাহনের মত কেমন একটা নিশ্বাস ফেলল উৎপলা; নিশ্বাসটা নিজের নিয়মে ঠিক-এত নিরাভরণ ভাবে ঠিক, যে মনে হয় অনেক অতল থেকে উঠে এসে নিজেকে মোটা ব্যবহারে খরচ করবার আগেই মিলিয়ে যায় সে; শুনলে মানুষের প্রাণ কেঁপে ওঠে।

পাতের কিনারে কাঁচা লঙ্কাটা ফেঁড়ে ঘষে-ঘষে ডালের স্বাদ বাড়াবার চেষ্টা করতে গেল না মাল্যবান আর। খাওয়া এখন অপ্রাসঙ্গিক। এই নারীটিকে নিয়ে কি সে করবে। উৎপলার এই সব ফাড়ন-ফোড়ন, শূন্যতা, দীর্ঘশ্বাস, আড়াআড়ি মাল্যবানের নিষ্ফলতা ও অব্যয় নিশ্বাস (মাল্যবানের মারাত্মক কফের মত বুকের ভেতর বসে গেছে, বাইরে তার প্রকাশ নেই, উৎপলা কোনো সময়ও টের পায় না) ঘরদোরের নিশ্চুপ বাতাসে ঘাই মেরে ফিরছে। কী হবে এই বাতাস ঘরদোর দিয়ে। এই নারী নিয়ে কী করবে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যে দু-চারজন লোক তোমার কাছে আসে, তাদের মুখের দিকে তাকাতে পারা যায় না।'

'কেন?'

'দেখতে তারা খুব খারাপ নয়, কিন্তু চুনো গন্ধ আসে রক্তের ভেতর থেকে। কোনো বিহিত-টিহিত নেই?'

'জানি না।'

'আমি তাদের সঙ্গে কথা বলি না তাই।'

'মানকচুর পাতার আড়'লে বসে আমার সঙ্গে কথা বলে ওরা। তোমাকে কোনোদিন দেখেছে বলে মনে হয় না।'

উৎপলা বললে, 'মানকচুর পাতার আড়ালেই বর্ষাকালটা তোমার জমে বেশ দু-চারটে ক্যাকড়া চড়িয়ে। ওদেরই মত তুমি। নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?'

'কী হবে আলাপ করে?'

'আমি তা জানতাম। তোমার বন্ধুদের সম্পর্কে আমি যা ভাবি, পরের স্ত্রীরাও হয়তো তোমার সম্বন্ধে সেই কথাই ভাবে', বলে উৎপলা এঁটো হাত দিয়ে জলের গেলাসটা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বললে, 'ছি, কী ঘেন্না!'

'না, এমন ঘেন্নার কিছু নয়-আমাদের দু'জনের জীবন দুই রকম, এই যা।'

'এত বড় পৃথিবীতে একজন মেয়েলোকও তোমার সঙ্গে খাতির করা দরকার মনে করল না, না ভালবাসা, না স্নেহশ্রদ্ধা, না মমতা-সহানুভূতি-কোনো কিছু কেরানিবাবুটিকে দেবার মত নেই কারো। ওঃ, আমার একারই বুঝি দিতে হবে সব। লক্ষ্মীর ঝাঁপি!' উৎপলা বললে। বলতে-বলতে বলার মাথায় উৎপলা গলা চড়িয়ে দিয়ে বললে, 'এক জন বেশ্যার সঙ্গেও যদি সমানভাগে তোমার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারতাম, তা হলে একটা দম আটকে আসত না আমার-'

শুনে মাল্যবান চমকে উঠল না, হেসেও উঠল না; খিদে ছিল; মাল্যবানকে খেতে না দিতে চায় না উৎপলা; কিন্তু অবস্থা তো এই রকম। টেবিলে যা জিনিস আছে, তাতে চার-পাঁচ জনে খেতে পারে, কিন্তু মনু নিজেরটুকুই খেয়ে উঠতে পারছে না; আর দু'জনের তো খাওয়া বন্ধ; চমৎকার কবিয়ালি লড়াই শুরু করেছে সময় বুঝে তারা।

টেবিলে মাথা রেখে মনু ঘুমিয়ে পড়ছিল। মাল্যবান একটা লেবুর খোসা নিয়ে আঁক কাটছিল থালার ওপর চুপচাপ।

'আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, বাধ্য হয়ে অনেক কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হয়-'

মাল্যবান লেবুর খোসা দিয়ে থালার ওপর স্বস্তিকা আঁকছিল-একটা-দুটো-তিনটে-কোনো কথা বললে না।

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারে সব মানুষই স্বাধীন-কিন্তু এমন পাকা ঘরে জন্মে বেটপকা ঘরে পড়েছি যে সে-স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছি-'

'বাধ্য হয়ে কী বিশ্বাস করতে হয় তোমাকে?'

'এ বিয়ে আমার হত, কিছুতেই ঠেকাতে পারতাম না, এই বিশ্বাস-'

'ওঃ, এই বিশ্বাস-' থালার স্বস্তিকাগুলো মুছে ফেলে জেঙ্গিস খাঁর নিশানের বারটা পুচ্ছ-ইয়াকের উদ্যত পুচ্ছ, আঁকবার চেষ্টা করছিল মাল্যবান।

'কিন্তু এটা সংস্কার,' উৎপলা বললে, 'সত্য নয়। কিছুতেই সত্য নয়।'

'যেন গ্যালিলিও বলছে, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না পৃথিবীটা চৌকো, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না পৃথিবীটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জেঙ্গিসের ইয়াকের লেজ আঁকতে-আঁকতে একবার মুখ তুলে অবনমিত গ্যালিলিওর দিকে তাকিয়ে চমৎকৃত লাগল মাল্যবানের-কেমন একটা আভা যেন উৎপলাকে ঘিরে-বিজ্ঞানের পরাসত্যের জন্যে তপস্যা করছে সে-সংগ্রাম করছে।

'তোমাকে আমি না বিয়ে করেও পারতাম। সেইটেই সত্য।' উৎপলা বললে।

'আমারও তো তাই মনে হয়। পাখিটাকে ফাঁদে ফেলে সেই ফাঁদটাকে সত্য বলে নির্দেশ দেবার কোনো অর্থ হয় না। আকাশ সত্য নীড় সত্য পাখির আছে-'

উৎপলা এবার ভাত-তরকারির দিকে মন দিয়ে বললে, 'আমি তাই বলছিলাম-' দুই-এক গ্রাস খেয়ে সে বললে, 'অনুপম মহলানবিশকে তো বিয়ে করতে পারতাম আমি-'

লেবুর খোসা দিয়ে নখ দিয়ে, জেঙ্গিসের ইয়াকলাঙ্গুললাঞ্ছিত নিশান এঁকে ফেলেছে মাল্যবান-বারটা লেজই এঁকেছে-থালার ওপর; চোখ তুলে তাকিয়ে বললে, 'কে অনুপম মহলানবিশ?'

'ঐ রকম এক জন লোককেই বিয়ে করার কথা আমার। সেইটেই সত্য হত কিন্তু পৃথিবীতে সত্যের মুখ দেখতে পাওয়া কঠিন।'

থালার ওপর জেঙ্গিসের লাঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে মাল্যবান বললে, 'ও, হ্যাঁ, অনুপম মহলানবিশ; মহলানবিশের কথা শুনেছি আমি। অনুপম মহলানবিশ, ধীরেন ঘোষাল, নসু চৌধুরী-যেন বালেশ্বর যুদ্ধের, মেছোবাজার বোমার, কাকোরি মামলার, চাঁটগাঁ আরমারি রেডের শহিদ সব; কিন্তু তা নয়, এরা অন্য লোক, বিষয়ী লোক-এদের কথা আমাকে অনেক বার বলেছ তুমি। এদের কারুর সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হত, দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু তা হয় নি। কিন্তু তাই বলে, তুমি হিন্দুঘরের মেয়ে বলে যা হল না সেটা সংস্কার, যা হয়েছে সেটা সত্য-এটা তুমি না মেনে পারছ না বলছ?'

খাবার থালার থেকে মুখ তুলে উৎপলার দিকে তাকিয়ে মাল্যবান বললে, 'না মেনে পারছ না বলছ। কিন্তু সত্যিই মানছ না। তোমার রক্তের ব্যাধি-জীবাণুগুলো হয়ত মানছে, কিন্তু শ্বেতকণিকাগুলো মানছে না, তোমার আত্মা মানছে না।'

উৎপলা একটা ভাল নিশ্বাস ছেড়ে বলতে-বলতে গিয়ে বললে না কিছু। মাল্যবান পার্শে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত চটকে লেবুর রস নিংড়ে নিচ্ছিল, লেবুর খোসাটা ফেলে দিয়ে বললে, 'হিন্দু বৌদের বোঝাবে কে যে এর চেয়ে স্থির বৈজ্ঞানিক সত্য নেই কিছু আর। এক হাজার বছর কেটে গেলেও বুঝবে কি তারা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীমাংসাটা ভাল লাগল উৎপলার, বললে, 'টেররিস্ট বলত সবাই অনুপম মহালানবিশকে। ডাকগাড়ি রেলগাড়ি লুট, ব্যাংক লুট, আর্মারি লুট, কত কী করেছে অনুপম–কত জেলে পচেছে দেশকে স্বাধীন করতে; একবার ফাঁসির হুকুম হয়ে গিয়েছিল অনুপমের, কিন্তু কী করে তা বাতিল হল টেররিস্টদের দলে থেকে আমিও তা টের পেলাম না।'

জেঙ্গিস খুব বড় খাঁ ছিল, ভাবছিল মাল্যবান, দুর্দান্ত লোক ছিল মোঙ্গলগুলো, কিন্তু কারণকর্দমের ভেতর মৃণালের মত ছিল কুবলাই খাঁ।

'কই, কখনো বল নি তো আমাকে তুমি সন্ত্রাস-ষড়যন্ত্রের ভেতরে ছিলে।'

'বলে কী হবে,' উৎপলা বললে, 'এখন তো আর নেই। ছিলাম অনেক আগে।'

'ফাঁসি বাতিল হয়ে গেল অনুপমবাবুর? আন্দামান হল?'

'না।'

'তাও হল না? তা কী করে হয়?'

'তা ইন্ডিয়া–সেক্রেটারি বলতে পারেন। জেলও তো হল না।'

'জেলও হল না?' থালার ওপর থেকে সমস্ত লাঞ্ছনা মুছে ফেলে পার্শে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে-খেয়ে শেষ করে এনেছিল প্রায় মাল্যবান; থালাটা আবার পরিষ্কার হয়ে এসেছে প্রায়; আবার ছবি আঁকা যাবে–আর-এক জন বড় খাঁর বড় আঁকবে সে–কুবলাইয়ের ছবি।

'জেলও হল না, অ্যাপ্রুভার হয়েছিল বোধ হয় অনুপমবাবু?'

'আমি জানি না।'

'কিন্তু অ্যাপ্রুভার হয়েছিল বলে তার জন্যে টান কমে নি তোমার?'

উৎপলা ঘাড় বাঁকিয়ে ছুরি দিয়ে একটা লেবু কাটতে-কাটতে বললে, 'টেররিস্টরা বলেছে অনুপম স্পাই ছিল। হয়তো ছিল। হয়তো ফাঁসি হলে না বল ঐ কথা বলেছে।'

স্পাই?' মাল্যবান একটু বিলোড়িত হয়ে বললে, 'সে তো অ্যাপ্রুভারের চেয়েও খারাপ। না কি অ্যাপ্রুভার স্পাইয়ের চেয়ে খারাপ। স্পাই?'

'অনুপম স্বদেশী করছে, না স্বদেশীদের লাটের কিস্তিতে চড়াচ্ছে, সে সব ভেবে তাকে ভালবাসি নি আমি। সে স্পাই বুঝি?' উৎপলা নিজের দৃষ্টির ভেতর থেকে কুয়াশা সরিয়ে নিয়ে পরিষ্কার চোখে মাল্যবানের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে একটু ঠাট্টা, বিষণ্ণতা ছিটিয়ে হেসে বললে, 'হবে স্পাই। অ্যাপ্রুভার হলে হবে। আমার তাতে কিছু এসে যায় না। মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানোর নিয়ম আমার আর-এক রকম। জল নিয়ে কথা নয়, পুকুর, নদী, সাগরে, ডাউস জল তো আছে; কিন্তু সেই জল কি আছে–ফটিক জল?'

না, তা নেই। অনুপম অ্যাপ্রুভার বলে নয়, অনুপম বলেই মেঘজল। মাল্যবান মাথার উপরে খুব বেশি পাওয়ারের আলোটার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে ভাবছিল, বাঙালি হিন্দু পরিবারের উৎপলা আর সে রয়েছিল বলে দু'জনের এই দাম্পত্য সম্পর্ক টিকল বার বছর। এই বারটা বছর উৎপলার অনিচ্ছা-অরুচির বঁইচি-কাঁটা চাঁদা-কাঁটা বেত-কাঁটার ঠাসবুনোন জঙ্গলে নিজের কাজকামনাকে অন্ধ পাখির মত নাকেদমে উড়িয়েছে মাল্যবান। কত যে সজারুর ধাষ্টামো, কাকাতুয়ার নষ্টামি, ভোঁদড়ের কাতরতা, বেড়ালের ভেংচি, কেউটের ছোবল আর বাঘিনীর থাবা এই নারীটির। কিন্তু সে-থাবার সামনে হরিণ বা বনগোরু না হয়ে রায়বাঘের মত রুখে দাঁড়ালে ময়ূরীর মত উড়ে যায় ডাল থেকে ডালে অদৃশ্যলোকের ঘরপাতার ভেতর কোনো এক জাদুর জঙ্গলে এই মেয়েটি; না হলে ময়নার মত পায়ের কাছে মরে পড়ে থাকে–হলুদ ঠ্যাং দুটো আকাশের দিকে। জীবনটা আমার যা চেয়েছিলাম তা হল না, যা ভয় করেছিলাম তার চেয়ে বেশি ভয়ে, বেশি শোকে গড়িয়ে পড়ল–ভাবছিল মাল্যবান। কিন্তু আমি–ভেবে-চিন্তে–আমি পুরুষমানুষ একটা পথ কেটে নিতে পারি, কিন্তু একটা দার্শনিক প্রস্থানে আমি পৌঁছতে পারি বলেই নয়,– এমনিই, উৎপলার জীবনের বিতিকিচ্ছিরি নিষ্ফলতা, ব্যথা আমি পাই নি। মনু ও উৎপলা খেয়ে মুখ ধুয়ে টেবিল পরিষ্কার করে চলে গেল। মাল্যবান একটা চুরুট জ্বালল। খাবার ঘর ছেড়ে হাঁটতে-হাঁটতে–ছাদের ওপর দু-মুহূর্ত দাঁড়িয়ে, শীত রাতের আকাশের আগ্নেয় গুঁড়িগুলোকে এক নজরে একটা সুপরিসর চিলদৃষ্টির ভেতর কবলিত করে–উৎপলার ঘরে গিয়ে ঢুকল। টানতে-টানতে চুরুটটা যখন বেশ জ্বলে উঠেছে, খুব ধোঁয়া উড়ছে, রাশি-রাশি ধোঁয়া বেরুচ্ছে মাল্যবানের নাকমুখের ভেতর থেকে–মাল্যবানের মন কোথায় যেন চলে গিয়েছিল, এখন আবার অব্যাহত হয়ে উঠল। দেখল স্ত্রীর ঘরের বাতি নিভে গেছে–চারদিক অন্ধকার; মশারি টাঙিয়ে উৎপলা শুয়ে পড়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছেও হয়তো। উৎপলার মশারির ভেতর লেপের ভেতর শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল মাল্যবানের। কিন্তু এ-ঘরের চমৎকার শীত ও অন্ধকার ছেড়ে নিচেই যেতে হবে তাকে।

চুরুটের মুখে ছাই জমেছে, টোকা দিয়ে ঝেড়ে নিচে নেমে গেল।

পরদিন সকালে টেবিলে চা খাওয়ার সময় উৎপলা মাল্যবানকে বললে, 'কাল চায়ের দোকানে কী খেলে?'

'চা আর বিস্কুট।'

'আর কিছু না?'

'না।'

'বাবা যে সোনার ঘড়িটা তোমাকে দিয়েছিলেন, তার দাম তিনশ নয়–চারশ টাকা, আমার নোটবুকে লেখা ছিল দামটা, দেখছিলাম। আজকাল সোনার দাম বেড়ে গেছে–হয়ত দুশ টাকায় বিকোবে। টাকাগুলো হাতে থাকলে–মেজদারা আসছেন–সুবিধে হত তাদেরও, আমাদেরও। কিন্তু তবুও তুমি তো নিজের ঢেঁকি ছাড়া পাড় দেবে না।'

উৎপলা এতক্ষণ চায়ে চুমুক দেয় নি। এবার চার-পাঁচটা চুমুকে আধ পেয়ালা চা শেষ করে পেয়ালাটা একটু সরিয়ে রেখে বললে, 'শুধু কি তাই, ঘড়িটা তোমাকে বেচে দিতে বলেছিলাম, তাই রাগ করে চায়ের দোকানে গিয়ে খেলে। এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার কী রকম-হিগলে পিগলে-হিগলে পিগলে-মেয়ে-মানুষের মত নোলা ছব-ছব করছে ঘড়িটা বিক্রি করার কথা পেড়েছিলাম বলে-এ আবার পুরুষ? কী রকম পুরুষ তা হলে। এ সব পুরুষ মানুষের ভরার মেয়ে বিয়ে করা উচিত।'

ঠাণ্ডা শান্ত করুণভাবে কথা বলছিল উৎপলা। একটা চাপা ঝাঁঝ যে না ছিল তা নয়। মাল্যবানের চোখে ভাব এলঃ উৎপলার হৃদয়টা বাস্তবিকই বেশ, ভাইয়ের জন্যে এই সুচিন্তাটুকু আগাগোড়াই সৎ; আমার বদলে অন্য কোনো মানুষকে-উৎপলার সাদা রক্তকণিকা যাকে চায়, তাকে যদি পেত সে, তা হলে নারীটির মনের প্রাণের স্পষ্ট প্রবণতাগুলো শত পথ খুলে যেত যেন-সরলতায়, সরলতায়-

ভাবতে-ভাবতে মাল্যবান চোখ বুজে কেমন একটা শামকল পাখির মত মুখে নিগূঢ় হয়ে বসে রইল; অনেক মন্ত্রগুপ্তি রয়েছে যার, সোনার ঘড়িটা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না সে। নিজেকে যে এই রকম দেখাচ্ছে, তাও টের পেল মাল্যবান।

'আমার সোনার নেকলেসটাই বিক্রি করতে হবে। বাপের বাড়ির মানুষদের আমাদের রকম এই যে, দশ জনের কাজে লাগলে কোনো জিনিসকে পুঁজি করে রাখি না আমরা-ছড়িয়ে দিই চারিয়ে দিই। কিন্তু অন্য রকম হয়ে যাচ্ছি। বার বছর বাপের ঘর ছাড়া। গোরুর মুত লেগেছে দুধে-কেন কাটবে না?'

মাল্যবানের ভাবপ্রাধান্য-যা তাকে আবেশ দিয়েছিল-সময় মত ভাটার টানে সেটা পড়ে যাচ্ছিল আবার; উৎপলা যা বলছিল, কিছু তার কানে ঢুকছিল শব্দতরঙ্গের মত; মন উৎকর্ণ হয়েছিল-উৎপলা নয়, মাল্যবান নিজেও নয়, কিন্তু মাল্যবানের মনের অবচেতনা নির্ঘুমের দিকে; কী বলছে সে? ঘড়িটা বিক্রি করো না, ঘড়িটা বিক্রি করো, করো না বিক্রি, করে দাও; করো না করে দাও, করে দাও। ঘড়িটা কি আজ বিক্রি করেছে সে? প্রায় তিন বছর আগে উৎপলারই একটা টাকার খাঁই মেটাবার জন্যে বিক্রি করতে হয়েছিল ঘড়িটাকে। খুব ভাল করেই জানত তা। কিন্তু তবুও না-জানবার ভান করে-সোনার দর বাড়লেই সেই সোনার ঘড়িটাকে বিক্রি করবার জন্যে তোলপাড় করে; অন্য কোনো মানিকজোড়ের থেকে বিচ্ছিন্ন পাখিনীর মত এমনই বিজোড় এই মেয়েমানুষটি মাল্যবানের জীবনে।

হাতে আর-একটা ঘড়ি আছে বটে মাল্যবানের, সেটা সোনার নয়। সেটা বিক্রি করাতে হবে? না তা ঠিক নয়। শ্বশুর যে সোনার ঘড়ি দিয়েছিল জামাইকে, সেটাই বারবার বিক্রি করে, শ্বশুরের ছেলে-পরিবারকে একটু তরিবতে রাখতে হবে মাল্যবানের বাড়িতে, শ্বশুরের মেয়ের বাপের টাকাতেই যে সব হচ্ছে, সে-উপলব্ধি নির্বিশেষে ভোগ করতে দিতে হবে শ্বশুরের মেয়েকে।

ব্যাপারটা এই রকম তো? একে কী বলে? পিতৃগ্রন্থি? না কি, জোড়ভাঙা পাখি কূল পাচ্ছে না অথৈ শূন্যের ভেতর, তাই সামাজিক সাক্ষীগোপালটির চেয়ে ভাইকে নিকট মনে হয়-পিতৃগ্রন্থি সক্রিয় হয় ওঠে? না, তা ঠিক নয়, মাল্যবান ভাবছিল, কোনো বিজ্ঞানের ছকে ধরা যায় না। উৎপলা বিজ্ঞানাতীত।

পাথুরেঘাটার বাড়িটা উৎপলা নিজেই একদিন মাল্যবানের সঙ্গে গাড়িতে চড়ে দেখতে গেল। দেখে পছন্দ হল না তার। অন্য কোনো বাড়িও সুবিধে মত পাওয়া যাচ্ছিল না। কাজেই ঠিক হল, মেজদার পরিবার এলে মাল্যবান নিজে কিছুকাল মেসে গিয়ে থাকবে।

মাল্যবান তার হাতের অবশিষ্ট ঘড়িটা, কতকগুলো সোনার বোতাম (লুকিয়ে রেখেছিল বাক্সের ভেতর) বিক্রি করে শ-চারেক টাকা উৎপলাকে দিল। সোনার নেকলেসটা তাই আর বিক্রি করতে হল না।

এই সব নানা ব্যাপারে উৎপলার মনটা খুশি হয়েছিল। এক দিন রবিবার সে মাল্যবানকে বললে, 'মনু অনেক দিন থেকেই বলছে চিড়িয়াখানা দেখতে খুব ইচ্ছে করে তার। আমিও তো শিগগির যাই নি। চলো-না, আজ যাই।'

তিন জনে ট্রামে উঠল। খিদিরপুরের ব্রিজের কাছে এসে মাল্যবান তার পরিবার নিয়ে ট্রাম থেকে নামল।

'বাঃ, আলিপুর-বা কোথায়, তুমি পথের মাঝখানে নেমে পড়লে যে-'

'এই বাজারটুকুর ভেতর দিয়ে যেতে হবে, মিনিট তিনেকের পথ।'

খিদিরপুর বাজারের পথ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে উৎপলা নাক সিঁটকে বললে, 'ছি, মুরগি-খাসির বাজারের ভেতর দিয়ে-। কলকাতা শহরে কি আর-পথ ছিল না!'

মনু বললে, 'রামছাগলের বোঁটকা গন্ধ বেরুচ্ছে, বাবা। ইস, কী পেচ্ছাপের গন্ধ, ছ্যাঃ! ঐ দেখ একটা ছাগল কাটছে-'

'ও-দিকে তাকিও না মনু-'

'আমাদের যদি একটি ছোট অস্টিন গাড়িও থাকত, তা হলে এই নালা-নর্দমা পচা কাদা আর মুতের গন্ধ কি আমাদের নাগাল পেত, মনু?'

'আমি বড় হলে বাবা গাড়ি কিনবে,' মনু বললে।

'একেবারে চিড়িয়াখানার গেটের কাছে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াত,' উৎপলা বলল, 'সেইখানে নামতাম।' উৎপলা একটা নিশ্বাস ফেলল, কিন্তু এ-নিশ্বাসটা চিংড়ি মাছ ঠোকরালে ফাতনা যে-রকম করে নড়ে, তেমনি হালকা আলতো উদ্দেশ্যহীন। চিড়িয়াখানার ভেতর ঢুকে উৎপলা বললে, 'এমন ঠাণ্ডা কেন গো, একবারে হাড়গোড় কেঁপে ওঠে যেন।'

'শালের ভাঁজ খুলে ভাল করে জড়িয়ে নাও, পলা।'

'না, এ পাট করা শালটা হাতেই থাক। শাল গায়ে দেবার মত শীত দুপুরবেলা কলকাতায় কোথাও পড়ে নি,' হাঁটতে বললে, 'এ-সব জিনিসের বাজে খরচ করতে হয় না। কেনই-বা এনেছিলাম, হারিয়ে যায় যদি!'

'আমার হাতে দাও।

'না, থাক আমার কাছে।'

মনুর দিকে ফিরে উৎপলা বললে, 'বাঁদর দেখবি, মনু-'

'ঝাঁকড়া মাথাটা নেড়ে উঠল, 'হ্যাঁ, দেখব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুই নিজেই তো একটা বাঁদর। তোকে এবার খাঁচায় আটকে রাখতে হবে। মনু, তুই আমার মেয়ে হয়ে জন্মালি রে!'

মাল্যবানকে বললে, 'চলো, বাঁদরের ঘরে যাই।'

গেল সকলে মিলে সেখানে।

মনু বললে, 'দেখেছ মা, কলার জন্যে হাত পাতছে; মা, কিনে দাও।'

'কলা দেবে না হাতি। যা খাচ্ছে, তাই হজম করে নিক।'

'কেন, হজম করতে পারে না? অম্বল হয়?'

উৎপলা মাল্যবানকে বললে, 'এ জানোয়ারগুলোর মুখ তো নড়ছেই–নড়ছেই, পেটে আলসার-টালসার হয় না?'

'কী জানি!'

মনু খুব অনুভাবাক্রান্ত হয়ে বাঁদরের খাঁচাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল; হঠাৎ উৎপলা মেয়েটার চুলের ঝুঁটি ধরে টান মেরে বললে, 'তোকে এর মধ্যে পুরে দিলে বেশ ভাল হয়।'

আর-একবার একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'মানুষের পেটে জন্মেছিলি কেন বল তো দেখি।'

মাল্যবানের দিকে ফিরে উৎপলা বললে, 'চলো, বাঘ দেখতে যাই।'

কিন্তু, দুর্গন্ধে বাঘের খাঁচার থেকে অনেক দূরে পিছিয়ে থাকল সে। বাঘগুলোর দিকে তাকাতেও গেল না। নাড়ি উল্টে বমি আসছিল উৎপলার। বললে, 'চিড়িয়াখানার ঢের হয়েছে। চলো, এখন বেরিয়ে যাই।'

মনু বললে, 'বাঘ আমার মোটেই দেখা হল না। বাঘ দেখতেই তো এসছিলাম চিড়িয়াখানায়।'

'কিন্তু, তার কথা কেউই গ্রাহ্য করল না।

মাল্যবান স্ত্রীকে বললে, 'এই তো এলে চিড়িয়াখানায়; এখুনি বেরিয়ে যাবে? চলো, পাখি দেখে আসি।'

'পাখি আবার একটা দেখে না কি। ও তো দিন রাত দেখছি।'

'না, না, সে-রকম পাখি নয়–'

'পাখি আমি সব দেখে ফেলেছি। ও আমার দেখবার পিবিত্তি নেই।

'কলকাতায় তো দেখ কাক আর চড়াই; সরাল, তিতির, কাকাতুয়া, ম্যাক্, কত রকম হাঁস, বক, ফ্ল্যামিঙ্গো, ধনেশ, শামকল–দেখবে এসো–দেখবে এসো–'

'যে-ধনেশ দেখাচ্ছ তুমি দিন–রাত।'

'আমি?'

'আরশোলা যে-রকম কাচপোকা হয়, তেমনি শামকল হয়ে যাচ্ছে তো ধনেশটা–' বলে ফির-ফির ফুর-ফুর ফিঃ ফিঃ ফুঃ-ফুঃ করে হেসে উঠল উৎপলা।

তিনজনে মিলে সিন্দুঘোটক দেখতে গেল।

মনু অত্যন্ত কাতর হয়ে বললে, 'সিংহ দেখা হল না আমার', বার বার মরিয়া হয়ে বাপ-মাকে সে তার আবেদন জানাতে লাগল, 'সিংহ দেখব। সিংহ কোথায়? ঐ যে সিঙ্গি ডাকছে!'

কিন্তু কেউ তার কথা কানেও তুলতে গেল না।

সিন্ধুঘোটকগুলো রয়েছে একটা পুকুরের মধ্যে–ঢের নিচে। চারদিকে দেয়াল। একজন সাহের ছুঁড়ে-ছুঁড়ে হেরিং মাছ, না কী, দিচ্ছিল তাদের। উৎপলা চেঁচিয়ে বললে, 'উঃ, কত মাছ খাচ্ছে।'

'তা খাবে না-হাতির মত গতর।'

'গা কেমন–কেমন করে ওঠে যেন।'

'কেন?'

'এ যে বালতি-বালতি মাছ খেয়ে ফেলল।'

'তা খাবে বৈকি।'

'ডিসপেপসিয়া হবে না।'

মাল্যবান ঠোঁট চুমড়ে একটু হেসে বললে, 'হ্যাঁঃ ডিসপেপসিয়া!'

মনুর মাথা দেয়ালের নিচে পড়ে থাকে; সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। বারবার নাকিসুরে বাবা-মাকে ডেকে-ডেকে বলছিল, 'কই, মাছ কোথায়? কী রকম করে মাছ খায়? কুমিরের মতন নাকি সিন্ধুঘোটক? কই, সিন্ধুঘোটক কোথায়?'

কিন্তু, রাজযোটকে যাদের বিয়ে হয়েছিল, সেই বাপ-মা এই মেয়েটির কোনো কথা খেয়ালের ভেতর আনল না।

উৎপলার কপালে গালে এমন সব খাঁজ ফুটে উঠল যে, কুৎসিত দেখাতে লাগল তার সুন্দর মুখটাকে; বোঝা গেল, তার বয়সে হয়েছে; অবসাদে বললে, 'এই তোমার চিড়িয়াখানা!'

'কেন, মন্দ কী।'

'নাঃ, এখানে আর-কোনোদিনও আসা হবে না।'

'আমার তো বেশ লাগে।'

'দেখবার ভেতর দেখতে চেয়েছিলাম তো বাঘ আর সিংহ। তাও, বাবা কী ভক-ভক করে গন্ধ আসে–কে এগোতে পারে!'

'বাঘ কেন, দেখতে হয় পাখি।'

'তোমার রুচি তো আমার নয়। শামকল পাখির চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখব আমি? তা হলে তো পাখিই সবচেয়ে ভাল মনে হত–সবচেয়ে ভাল লাগত শামকল পাখি–'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা হলে মন্দ হত কি?' প্রতীক পৃথিবীর সে-এক আলাদা নিগূঢ়তার ভেতরে যেন দাঁড়িয়ে বললে মাল্যবান বস্তুপৃথিবীর নারীকে।

'হল না তো।'

'আসছে জন্মে হবে।'

'আসছে জন্মে আবার শামকল! ওরে বাবা!' উৎপলা ধড়-ফড় কেঁপে উঠে বললে, 'না রে বাবা, তার চেয়ে কোনো জন্ম না-পাওয়াও ভাল। জন্ম দিলে ময়ূর হয়ে উড়ে যাব আমি সেই গোরক্ষপুরের দিকে জঙ্গলে—'

'সেখানে সরবতি দই বিক্রি করছে বুঝি মহলানবিশ মশাই। বেশ, বেশ, যেও, চলো, চন্দনা, তিতির দেখে আসি—'

মনু বললে, 'তিতির কী বাবা?'

মাল্যবান কোনো উত্তর দিল না, উৎপলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'চলো, দাঁড়িয়ে যে, চলো। ডাকপাখি, বাজ, শিকরে বাজ, খানদানি শামকল দেখে আসি সব—দেখে আসি সব।'

কিন্তু একেবারেই কোনো তাড়া ছিল না উৎপলার। মাল্যবানের দিকেও তাকাতে গেল না সে, 'আমার একটু জিরোতে হবে রে বাবা। পাদুটো ধরে গেছে—মাজা ভেঙে গেছে—বাপরে!'

তিনজনে একটা গাছের নিচে ঘাসের চাবড়ার ওপর বসল।

বসতেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ঘাসের ওপর যে বড় বসলে সবাইকে নিয়ে; ঐ তো বেঞ্চি ছিল।'

'বেঞ্চির চেয়ে ঘাসে বসতে ভাল লাগে আমার।'

মনু বললে, 'বঞ্চির চেয়ে ঘাসে ভাল লাগে আমার।'

'ঘাসে আমার কুট-কুট করে,' উৎপলা বললে, বেঞ্চিতে গিয়ে একাই বসল সে, বসে বললে, 'কত লোক তো বেঞ্চিতে বসে আছে; বসতে ভাল লাগে বলেই তো,' উৎপলা নিজের মনেই তারপর বললে, 'এত সব লোক চারদিকে; তাদের সঙ্গে বেশ তো খাপ খায় আমার, অথচ ঘরের মানুষদের সঙ্গে ষাঁড়াষাঁড়ির কোটাল। ঘাসে গা ছড়ে যায়, আমার শাড়ি নোংরা হয়, মুচি-মোচলমানের চন্নামৃতে গড়াগড়ি খেতে হয়—অথচ ঘেসুড়ে সেজে বসেছেন সব ওঁরা—ঘাষ!—ঘাস না হলে হবে না। আঁটি-আঁটি ঘাস বাঁধবে না কি তোমরা বাপ-বেটিতে মিলে—' কথা বলে যেতে লাগল উৎপলা।

মাল্যবানের থেকে উৎপলা হাত দশেক দূরে একটা বেঞ্চিতে বসেছিল, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই মাল্যবানের মনে হতে লাগল ঃ এইটুকু ব্যবধান ঘোচাতে—সত্যিই যদি ঘোচাতে পারা যায়—উৎপলার তরফ থেকে আহ্বান আসবে না কোনোদিন। তা ছাড়া, বেঞ্চিতে তো ঘাসের ভেতরে ঘাস নয়, মনু আর আমি ঘাস—ঘাসের ঢেউয়ে; বেঞ্চিটা ঘাসগাছের কাঠেও তৈরি নয়—ধানগাছের কাঠেও নয়; সে-রকম কাঠ নেই কোথাও; কেঠো কাঠ আছে; এত ঘাস থাকতে কী ভীষণ কেঠো কাঠের বেঞ্চি চারদিকে সব।

উৎপলা বললে, 'চলো, এই বেলা বেরিয়ে পড়ি; প্রকাশবাবুর আজ সন্ধ্যের সময়ে আসার কথা ছিল।'

'পাখি দেখবে না।'

'আমি সিংহ না দেখে যাব না,' মনু বললে।

'আচ্ছা, ঐ যে একটা টেবিলের চারদিকে বসে কয়েকটি লঙ্কা মেয়ে চা খাচ্ছে, ওরা কারা?'

'চিনি না তো, দেখি নি কোনোদিন!' মেয়েদের দিকে না অকিয়েই মাল্যবান বললে।

'কেমন এক বিঘত পেট বার করে শাড়ি পরেছে; কেমন কানের পাশে জুলপি ঝোলাবার কায়দাটুকু। নিশ্চয়ই আইবুড়ো এরা সব। বাস্তবিক, যারা বিয়ে করে নি, তাদেরই রগড়—' বলে উৎপলা মুখ ফিরিয়ে চোখ দিয়ে গিলতে লাগল যেন মেয়েকটিকে।

মাল্যবানের ভাল লাগল না, 'ওদের দিকে চোখ দিও না, বাপু। ওরা চা আর স্কোন খাচ্ছে। কেন চোখ লাগাচ্ছ পলা।'

মাল্যবান কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে ঘাসের শিষের সাদার দিকে তাকিয়ে রইল; কিছুক্ষণ মনুর কোঁকড়া চুল নিয়ে খেলা করল; তারপর উৎপলার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখল, তেমনি করেই মেয়েকটির দিকে গোগ্রাসে চেয়ে আছে সে!

'এখানে এসে বসো তুমি—এই নরম ঘাসে।'

'চলো, এখন উঠি।'

'কোথায় যাবে?'

'এখানে বসে কী আর লাভ।'

'তোমার পা ব্যথা করছে, বলছিলে—চা খাবে?'

'না। ব্যথা কমে গেছে।'

'চলো-না, ঐ মেয়েদের পাশে আর-একটা টেবিল খালি আছে—'

'না। ব্যথা কমে গেছে।'

'চলো-না, ঐ মেয়েদের পাশে আর-একটা টেবিল খালি আছে—'

'না, তুমি আমাকে আর-এক দিকে নিয়ে চলো।'

মেয়েকটির দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে-হাঁটতে উৎপলা বললে, 'ভেবেছিলাম, আজ কপালে সিঁদুর-টিপ পরে আসব না—'

'কেন?

'সব সময়েই এ-সবের কী দরকার।'

'হ্যাঃ, রেওয়াজ উঠে গেছে,' মাল্যবান বললে 'ও-সবের টিপ-টাপ ফেঁদে কী হবে।'

'যদি না সিঁদুর ধেবড়ে আসতাম, তা হলে এই মেয়েরা কী মনে করত, বল তো দেখি—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

মাল্যবান এ-কথা সে-কথা ভাবছিল, বললে, 'মনে করত একটা কিছু। মনে করার বালাই নিয়ে মরি আমি।'

'তোমাকে হয়তো মনে করত আমার মেসো কিংবা মামাশ্বশুর-'

'আমাকে যদি ওরা তোমাদের বাড়ির খাজাঞ্চি কিংবা সরকার মনে করতে পারত, তা হলে হয়তো খানিকটা লাভ ছিল-'

মাল্যবান হাঁটতে-হাঁটতে একটা চোরকাঁটা ছিঁড়ে খড়কে বানিয়ে বললে, 'সেই যে বিলেত গিয়ে মাখন-তোলা শিখে এসেছে-সব সময়ে সাহেবি পোশাকে থাকে, সাহেবি করে বেড়ায় সেই যে মাখন-তোলার সাহেব আমাদের মতীন চৌধুরী গো-তাকে যদি সঙ্গে করে আনতে পারতে, তা হলে তোমাকে ওরা ছো-ছো করে চিলের চোখ দিয়ে দেখে নিত বটে। ওদের ঐ রকমই তো স্বভাব। আমার মতন ধনকৃষ্ণের সঙ্গে চিড়িয়াখানা রোঁদ দিতে এসেছ-এ আবার একটা দেখবার কী। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখবে কে!'

'মতীন চৌধুরী কে?'

'আহা, বললাম যে বিলেত থেকে মাখন তুলতে শিখে এসেছে।'

'দুধের থেকে মাখন তুলছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাখন তোলার সাহেব-'

'তার সঙ্গে আমি চিড়িয়াখানায় আসতাম-মানে?'

'এমনি বলছি-কথার কথা-'

'তুমি বড্ড বেকুব।'

'আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছিলাম-'

কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে চলছিল না তারা, কোনদিকে যাচ্ছিল খেয়াল ছিল না, এমনি শীতের বিকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল চিড়িয়াখানার চিলতি-চিলতি মাঠ ঘাসের ভেতর-রাস্তায়-বেরাস্তায়।

'তোমার মাইনে তো আড়ইশ হল। রিটায়ার করবার আগে কত হবে?'

'দুশ পঁচাত্তর-তিনশ-'

'এর বেশি না?'

'না।'

উৎপলা ভাবছিল। চিন্তার মাঝপথে থেমে বললে, 'আড়াইশ টাকা মাইনেতে কি গলাবন্ধ কোট ছাড়া আর-কিছু পরা যায় না?'

'কেন যাবে না? ধুতি-পাঞ্জাবি পরা যায়! আজ-কাল অনেকেই তো তা পরছে।'

'তা নয়, আমি বলছিলাম হ্যাট-টাইয়ের কথা। কেন পর না তুমি? পরলে মানায় না বটে তোমাকে? কেমন যেন খাপছাড়া দেখায়। এ-রকম হল কেন?'

'কেন হল?' মাল্যবান তার হাতের ঘাসের শিষটা দাঁত দিয়ে কাটতে-কাটতে বললে, 'চিনি মিষ্টি আর নুন নোনতা কি না উৎপলা-সেই জন্যে হল।'

খানিকটা দূর নিঃশব্দে এগোল তারা। মনুর কথায় কেউ কান দেয় না, নালিশ কেউ শোনে না, সেই জন্যে সে অনেকক্ষণ থেকেই চুপ মেরে গিয়েছিল।

উৎপলা বললে, 'খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-কেমন দেখাচ্ছে তোমাকে-চেঁচে এলে না কেন?'

'হঠাৎ তোমরা সকলে বললে, চিড়িয়াখানা দেখবে-সময় পেলাম কোথায়?'

'তাই তো! কী দিয়ে চাঁচবে-জিনিস পাবে কোথায়!'

'দাড়ি যারা সত্যিই চাঁচে, প্রথম পক্ষের মাগকে শ্মশানে পোড়াতে-পোড়াতে গালে হাত বুলিয়ে নেয়-'

'তাই নেয় বুঝি।'

'দাড়িটা কামানো হল কি না দেখে নেয়।'

চিড়িয়াখানার থেকে বেরুচ্ছে না-কিছু দেখছে না-বসছে না কোথাও-পয়চারি করার মত আস্তে-আস্তে হাঁটছে-ঘাসের ওপর দিয়েই বেশি। কোথায় চলেছে-কেন চলেছে-খেই-খেয়াল না হারালেও শুধোচ্ছে না কেউ কাউকে। মনু কোনো কথাই বলছি না। তার পা টাটাচ্ছিল, বুক ধড়ফড় করছিল, জিভ শুকিয়ে আছে অনেক্ষণ। কিন্তু তার কোনো কথায়ই কেউ সাড়া দেয় না, সায় দেয় না বলে কাউকেই সেই কিছু বলতে পারছিল না। মনু খানিকটা পিছে পড়ে গিয়েছিল; তার জন্যে দু'জনে খানিকক্ষণ থেমে দাঁড়াল। মনু এল।

মাল্যবান ঠিক উৎপলার মনের মত ঠাটে পা ফেলে হাঁটতে পারছিল না। পাদুটো কিছুতেই আড় ভাঙতে চায় না যেন উৎপলা যা চায় মাল্যবানের পায়ে-পদক্ষেপে সে সৌন্দর্য, মাত্রা, দৃঢ়তা কিছুতেই ধরা পড়ে না। হাঁটতে-হাঁটতে তারা বাঘের ঘরের কাছে এসে পড়ল আবার। খাঁচার ওপর থেকে থপাস-থপাস করে ছুঁড়ে কাঁচা মাংস দেওয়া হচ্ছিল জানোয়ারগুলোকে-

'কী রকম করে এরা মাংস খায়, দেখবে এসো।'

উৎপলা মাথা নেড়ে বললে, 'এখন বেরিয়ে যাব।'

হাঁটতে-হাঁটতে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে উৎপলা বললে, 'আমার দাদা, মেজদা, ছোড়দা, এ-রকম নয়। কখনো ন্যাং-ন্যাং করে হাঁটে না তারা।'

সামনে তাকিয়ে দেখল দুটো মস্ত হাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে-আশেপাশে অনেক ডাল-পালা কেটে রাখা হয়েছে, হাতিগুলো ক্রমাগত শুঁড় দিয়ে সেগুলো টেনে-টেনে খাচ্ছে।

মনু বললে, 'দেখলে বাবা, কী রকম শুঁড় দিয়ে কলা টেনে নিয়ে মুখের মধ্যে ফেলে দেয়!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা মুসলমান ছেলে কলা দিচ্ছিল-পাঁচ-ছটা হাতি, কিন্তু কলা মাত্র দশ-বারটা; কিন্তু হাতিগুলোর হায়া আছে, নিয়ম মেনে চলাটা দেখবার মত; পাশাপাশি কটাতে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কেউ কারো ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে না, যার কপালে যেটুকু প্রসাদ পড়ছে, তাই নিয়েই তৃপ্ত; তারপর ডালপালার দিকে মন।

মাল্যবান বিমুগ্ধ হয়ে দেখছিল; বললে, 'মানুষের চেয়ে জীবনটাকে এরা বেশি বোঝে। জীবনের কষ্ট ও একঘেয়েমি সহ্য করবার ক্ষমতাও এদের চীনের বা ভারতের জ্ঞানভিক্ষুদের মত। বাস্তবিক, হাজার-দু'হাজার বছর আগে এরা ভারতে-চীনে সমাজের বড়-বড় জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখেছে, শুনেছে, রক্ষা করেছে–ধর্ম-কর্মের বিধান দিয়েছে বলে মনে হয়।'

শুনে উৎপলা কোনো সান্ত্বনা পেল না। হাতির কুলোর মত কান ও বুড়ো দিদিমার মত মুখ দেখে কেমন যেন কৌতুক, অসাধ, নিরেস অস্বস্তি বোধ করছিল সে। বললে, 'থাক, অনেক হয়েছে; এখন চলো।'

হাঁটতে-হাঁটতে মাল্যবান বললে, 'একবার বেরিয়ে গেলে ঢুকতে পারবে না কিন্তু আর।'

'আমি ঢুকতে চাইও না আর। এ-জায়গায় কোনোদিনও আর আসা হবে বলে মনে হয় না।'

'চলো, ছোলা কিনে নিয়ে কাকাতুয়ার ঘরে যাই; দানা খাবে আর পড়বে কা-কা-তু-য়া।'

'এক-আধটা পাখি বেশ পড়ে। সবগুলোই পারে?'

'পড়ালেই পারে। চলো।'

'থাক।'

'নানা রঙের কাকাতুয়া আছে, বেশ পশমের মত পালক; ডানার দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন আগুনের থেকেই উৎপত্তি হয়েছে ওদের সব-আগুনের ভেতর খেলা করছে সব–আগুনে-আগুনে খেলা করে একদিন আকাশে নীলিমায় মিলিয়ে যাবে–চলো-চলো'–

উৎপলা দাঁড়িয়ে রইল; আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ঐ তো টেবিলটা, সেই মেয়ে চারটি ওখানেই বসেছিল? ওখানে?'

মাল্যবান কিছু বলবার আগে উৎপলা বললে, 'কোথায় গেল তারা?'

'চলে গেছে।'

'চিড়িয়াখানার ভেতর কোথাও তো তাদের দেখলাম না।'

'বেরিয়ে গেছে।'

'এত তাড়াতাড়ি বেরুল যে?'

'ঢুকেছিল আমাদের ঢের আগে। দেখা-শোনা মজামারা হয়ে গেল–বসে থাকবে কেন। বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন কি সারাদিন বসে খাবে?'

মাল্যবানের অন্নপ্রাশনের কথাটা কোনো কথা নয়; একবার দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চোয়াল শক্ত করে কথাটা তারপর ঝেড়ে ফেলে দিল উৎপলা; বললে, 'দেখলাম, মেয়েকটির প্যাঁচে-প্যাঁচে বেশ জিলিপির রস। হাত তুলে ফুর্তি করছে। আগা-পাশতলা মিঠিয়ে-ঝিকিয়ে কী ফুর্তির তোড়–সারাটা সময়; টেঁসে যাচ্ছে না তো–আমার ও-রকম হয় না তো।'

'বেঁচে যেতে বুঝি ওদের মত ফুর্তি করতে পারলে?'

'হলে কেমন হত?' একটা বীতকাম নিশ্বাস ছেড়ে উৎপলা বললে।

'ফুর্তি মানে আমোদ–'

'আমোদ বলছ তুমি?'

'সত্যিকারের আমোদ -'

'মানে, আনন্দ?'

মাল্যবান ঘাসের ওপর পিচ কেটে বললে, 'ওঃ, ঐ সব মেয়ে! ওরা তো ছেনাল–আনন্দ-আমাদের ইষ্টকুটুম আমার সব। ওদের কথা ভাবে মানুষে! ওদের ঘাঁটিয়ে আবার কথা বলে!' মাল্যবান দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে পিচ কাটল ঘাসের ওপর আবার।

'তবে কী; ছাগল দিয়ে ধান মাড়িয়ে দশ মুখ করে সেই ছাগলের কথা বলে বুঝি?'

চলতে-চলতে মাল্যবান থেমে গেল, 'কোথায় যেতে চাচ্ছ তুমি?'

'এবার চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে যাব,' উৎপলা বললে।

'আমি তা বলছি না। তুমি রাখালি করে ধান খেতে চাচ্ছ তো ছাগলকে সরিয়ে দিয়ে। ঐ মেয়েগুলোর মত পাটে এসে বসতে চাচ্ছ তো–'

'কে না চায় পেতে বসবার পাট। কিন্তু দেবার ভার তো শামকলের ওপর নয়। মনু, এদিকে আয়। কেউ কারুর ওপর বরাত দিতে পারে না। ধনেশ পাখি ঠোঁট কেলিয়ে বসে থাকবে-মাড়োয়ারি কবে তার তেল নিতে আসবে, সেইজন্যে-চন্দনা নিজের পাটে উড়ে যাবে। মনু!'

মাল্যবান চিড়িয়াখানার থেকে বেরিয়ে যাবার গেট এড়িয়ে অন্য পথ ধরে চলতে লাগল। উৎপলা বুঝতে পারল না। অনেকক্ষণ হেঁটে বললে, 'কই, এ-গোলক ধাঁধা ফুরোয় না দেখছি–'

'বেরুতে চাও?'

'মনু কোথায় গেল–'

'চলো ঘুরি।'

'ঘোরো তুমি।'

'তুমি কী করবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একা তো বেরিয়ে যেতে পারব না', কাছে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে চোখ বুজে বসল উৎপলা!

'পা টাটাচ্ছে?'

একটা খালি বেঞ্চি–আলগোছে তার এক কিনারে বসে পড়েছে উৎপলা–একটা হাত তার বুকে-আর-একটা কোলের ওপর ভাটার টানে সমুদ্র সরে গেলে ভিজে ঝিনুক, পরগাছার ঠাণ্ডার মত করুণ হয়ে পড়ে আছে। খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক উঁচু-উঁচু গাছের মাথায় আকাশের মেঘ আলোর দিকে তাকিয়ে কী যেন কেমন একটা অন্তিমপ্রতিম অর্থ অবধান করে তারই কাছে শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে নিজেকে নির্বিশেষে ছেড়ে দিল উৎপলা; একটু কাত হয়ে ডান হাতের ওপর মাথা পাতল; চোখ বুজে এল।

মনুও ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন উৎপলা আগ বাড়িয়ে বললে, 'সিমেনায় চলো।'

অফিস ছুটি ছিল সে-দিনও, তিনটের শো-তে গেল তারা। ট্রাম থেকে নেমে উৎপলা বললে, 'বক্সে বসবে তো?'

'না, সে ঢের খরচ।'

'তা হলে কোথায় যাবে আবার। ছবিতে বক্সে না বসলে ভাল লাগে না।'

'কেন, নিচের গদিতে বসেও তো বেশ আরাম।'

'আরামের জন্যে বলছি না আমি–'

'তবে?'

'বক্সে বসলে নিচের লোকেরা হাঁস-হাঁসিনের মত ঘাড় বাঁকিয়ে আমাদের দিকে তাকায়, দেখতে বেশ লাগে।'

মাল্যবান হেসে বললে, 'ওঃ, সেই কথা; দু-তিন ঘণ্টার জন্যে তো শুধু, তার পর সিমেনা ভেঙে গেল কেউ কি আর বক্সের মানুষদের কথা মনে রাখে।'

'তা রাখে বইকি। যদি কোনো চেনা মানুষ নিচের থেকে আমাদের দেখতে পায়, তা হলে জনে-জনে বলে বেড়াবে কথাটা। আচ্ছা রগড়ই হবে! খুব কি খারাপ জিনিস হবে কথাটা চার হাত-পায়ে চতুর্দিকে ছুটে বেড়াবে–'

কেমন যেন নির্দোষ শয়তান মেয়ের মত হাসি–ডেঁপো ইশকুলের–উৎপলার পাউডার-ক্রিম মাখানো চমৎকার মুখখানাকে আঁকড়ে ধরল। হি-হি করে হাসতে লাগল সে।

মাল্যবান আড় চোখে একবার উৎপলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'না, তা নয়–তবে এতে আমাদের কী আর লাভ।'

'বেশ রগড় হয়।'

'ও-রকম রগড়ের কী আর মূল্য আছে।'

'মূল্য নেই? তুমি বললেই হল নেই? নিশ্চয়ই আছে। না থেকে পারে না।'

হাঁটতে-হাঁটতে উৎপলা বললে, 'সে দিন তো সোনার ঘড়ি বেচেছ, তিনশ পঁচাত্তর টাকা পেলে–বক্সের টিকিট কিনতে তোমার এত ভয়–'

'মিছেমিছি পয়সাবাজি করে কী লাভ।'

'মিছেমিছি হল?'

'চেনা মানুষ কে এমন থাকবে নিচে যে বক্সে আমাদের দেখে ঈর্ষার রাতে ঘুমোতে পারবে না আর,' বলেই মাল্যবান একটু দাঁত বার করে হাসল।

উৎপলা বললে, 'ঝপ করে মিথ্যে কথা বলে ফেললে।'

'কেন, মিছে কথা কী হল?'

'ঈর্ষার কথা বলেছিলাম আমি?'

'বেশ মজা হবে, বেশ পাঁয়তারা কষা হবে, বলেছিলে তুমি। তা তো হবে, কিন্তু অন্যেরা ঈর্ষায় না পুড়লে রগড় ফলাও হয় কী করে?'

'বেশ তো পুড়ুক হিংসায়!'

'বেশ। পুড়ুক।' মাল্যবান টিকিট ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

মাল্যবান অবিশ্যি সেকেন্ড ক্লাসের কিটিক কাটল–ম্যাটিনির সময়ে আদ্ধেক দামে পেলে-তিন-চার টাকাও খরচ হল না তার।

'যাক, আমি বাড়ি ফিরে যাই–'উৎপলা প্লাগ ঢোকাতে গিয়ে বিদ্যুতের ঘা খেয়ে যেন বললে।

'কেন?'

'দেখব না সিনেমা।'

'তুমিই তো সকাল থেকে তাড়া দিলে সিনেমায় আসবার জন্যে।'

'ঢের হয়েছে, আর কোনোদিন আসতে চাইব না।'

'কিন্তু এখন তো চলো।'

'তুমি আর মনু যাও।'

'আর তুমি?'

'ঠিক আছে। যাও তোমরা।'

'হুশ, এ-রকম ছেলেমানুষি করে না কি, পলা।'

'কী টিকিট কিনেছ, দেখেছি আমি,' ঝামটা মেরে উৎপলা বললে, 'ছেলেমানুষি? আমার? নাম ডোবালে তুমি। ধনমান খোয়ালে টিকিট কিনে। ওমা, থার্ড ক্লাসের টিকিট!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কে বললে তোমাকে?' টিকিটগুলো উৎপলার চোখের সামনে ধরে মাল্যবান, বললে, 'সেকেন্ড ক্লাস–'

'তবে দেড় টাকা নিলে কেন–সেকেন্ড ক্লাসে তো তিন টাকা দু-আনা নেবার কথা–'

'ম্যাটিনিতে অনেক দিন পরে এলাম, তাই ভুলে গেছ দর-দস্তুর সব। এটা ম্যাটিনি–আদ্ধেক দাম–'

উৎপলা দু-এক পা হেঁটে মুখিয়ে এসে বললে, 'তা হলে ফার্স্ট ক্লাস করলেই পারতে।'

'ভেবেছিলাম, কিন্তু তাতে সিট বড় পেছনে পড়ে যেত।'

'আ মল! সিনেমায় পেছনে বসেই তো ভাল দেখা যায়–'

'কিন্তু, তুমি চোখে তো কম দেখ–'

'কে, আমি?' উৎপলা মাল্যবানের দিকে সাঁ করে তার গালে চড় মারবার মত চোখ তুলে তাকাল, 'আমি চোখে কম না দেখলে সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেনার গুজর কেটে না? না কি?'

'তাই বুঝি তাই? গতবার যখন তোমাকে ফার্স্ট ক্লাসে নিয়ে গেলাম, তুমি সমস্তটা সময় আমাকে বললে, কিছু দেখছ না, ঝাপসা দেখছ–তুমি তো সামনে এগিয়ে বসতে চাইছিলে সে দিন'–বলতে বলতে মাল্যবান উৎপলার দিকে সোজাসুজি মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে বললে, 'দাঁড়িয়ে রইলে যে–'

'আমি বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে একটা বাসে ধরে চলে যাব।'

'ছবি দেখবে না?'

'উৎপলা মুখ ফিরিয়ে রইল।'

মাল্যবান বললে, 'বেশ বাড়ি চলো তা হলে–'

'এ-টিকিটগুলো পাল্টে টাকা নিয়ে এসো।'

'এখন ফেরত নেবে কেন?'

'তা হলে বিক্রি করে দাও কারুর কাছে।'

'কে কিনবে?'

'গলাবন্ধ ছিট, খোঁচা দাড়ি দেখলে কেউ কিনবে না বটে।'

আজ অবিশ্যি মাল্যবান একটা তসরের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেছিল-, দাড়িও কামিয়ে ছিল।

একটু কাঠ মেরে গিয়ে, হেসে, হাসিমাখা দাঁতে কুণ্ঠায় সঙ্কোচে মাল্যবান ইতস্তত তাকাতে লাগল। কার কাছে টিকিট বিক্রি করা যায়। দু-চার জায়গা ঘুরে সুবিধে হল না। তারপর একজন ভদ্রলোক টিকিট নেড়ে-চেড়ে বললেন, 'আজকের তারিখ তো? কলকাতা শহরের নানা রকম চোট্টা থাকে; যাক, তারিখটা আজকেরই; হ্যাঁ, এই সেন্টারের সিটই আমি চেয়েছিলাম–আমি আর আমার দুই মেয়ে। তা বেশ, টিকিটের মাথায় দু-আনা দু-আনা কম নেবেন, একুনে ছগণ্ডা পয়সা কমিয়ে দিতে হবে। আপনার তো সবই ভাগাড়ে গড়াচ্ছিল–'

পকেট থেকে ব্যাগ বার করে ভদ্রলোক বললেন, 'আট আনার টিকিট ফুরিয়ে গেছে কিনা সাব। এসেছিও সেই চেতলার থেকে কলকাতায় ছবি দেখতে। ফিরে যেতে তো আর পারি না; নইলে আমি ও হাতির শুঁড় ব্যাঙের লেজ সব অফিস থেকেই কিনি। তা এই একটা টাকা নিন, টিকিট তিনটে দিয়ে দিন আর-কি।'

উৎপলা মাল্যবানের পাঞ্জাবির ঝুল ধরে এক টান মেরে বললে, 'কই, ভেতরে তো ঘণ্টা পড়ে গেছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল, তবুও তোমার ন্যাকড়া ফুরোয় না দেখি।'

শুনে মাল্যবানেরা পা চালাতেই ভদ্রলোকটি বললেন, 'ও মশাই, ও মশাই, শুনছেন, দেড় টাকাই দিচ্ছি, নিন, আসুন, নিন। ও মশাই, ও দাদা!'

আর ও দাদা! তিন জনে ভেতরে ঢুকল। মনু মাঝখানে, দু'পাশে দু'জন; গদি-আঁটা চেয়ারে অন্ধকারের মধ্যে বেশ লাগছিল মনুর–মাল্যবানেরও। 'বই' আরম্ভ হয়ে গেছে।

উৎপলা পর্দাটাকে অগ্রাহ্য করে ওপরের দিকে তাকাতে লাগল বেশি। বক্সে কে কোথায় বসেছে ঠাহর করতে পারা যায় কি না, কোনো চেনা মুখ চোখে পড়ে কি না; ফার্স্ট ক্লাসের সিটেই-বা কারা; এই সব নিয়ে অনেক কটা মুহূর্ত কেটে গেল তার। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে বিশেষ কিছু বুঝল না সে। তারপর নিশ্বাস ফেলে অবসন্ন হয়ে ছবির দিকে তাকাল। একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পুরুষ উৎপলার পাশের সিটে বসে সিগারেট টানছিল; মন তার বিচ্ছিরি লাগছিল তাতে।

মাল্যবানকে বললে, 'তুমি এখানে এসো, আমি তোমার চেয়ারে গিয়ে বসি।'

সিট বদলে যখন বসেছে, 'উৎপলা দেখল তার পাশে একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে চকোলেট খাচ্ছে আর কাশছে–অনবরত কাশছে–

ব্যতিব্যস্ত বোধ করল উৎপলা, পর পর চার-পাঁচটি ফিরিঙ্গি মেয়ে বসে গেছে। উৎপলা মাল্যবানকে বললে, 'এ পাঁচ জন কি বি-এন-আর-এর মেয়ে না কি টেলিফোনের–'

'আস্তে।'

'মেয়ে কটি নিজেদের বাড়ির খবর, হাঁড়ির খবর, মাঝে-মাঝে ছবির তাৎপর্য নিয়ে গলা ছেড়ে হাঁকড়াবার জন্যেই হাজির হয়েছিল। যখনই ঘরোয়া কথা বলবার তাগিদ জুড়িয়ে যাচ্ছিল, হেসে, হল্লা করে চিৎকার পেড়ে, পর্দার ছবিটাকে তারাই তো জিইয়ে রাখছিল–

'কিছু জানে না, বোঝে না, কলির সন্ধ্যায় কী করবে আর, চেঁচাচ্ছে–'একটু নড়ে-চড়ে বসে কৌতুকে ও বিমর্ষতায় বিমিশ্র একটা নিশ্বাস ফেলে উৎপলা বললে।

'কাদের কথা বলছ?'

'ফিরিঙ্গি মেমদের, গুল ছাড়ছে শুনছ না?'

'কেন ঘাঁটাচ্ছ ওদের?' মাল্যবান উৎপলার কাঁধের ওপর এক বার হাত রেখে হাত সরিয়ে নিয়ে বললে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু, তবুও কথা বলবার দরকার আছে ঢের উৎপলার। চাপা গলায় বললে, 'ছবি তো আমরাও দেখছি, বাপু, তোমরাও দেখছ। ছবি তো চিত্তির; তা তো দেখছিই! কিন্তু তাই বলে দিক-বিদিকে নয়াল আন্ডা ছুঁড়ে একবারে ঝোল বের করে দেবে না কি? পর্দায় এক জনে একটা ছেঁড়া ট্রাউজার পরে এসেছে-অমনি হি-হি করে হাসি; একটা গাধা দৌড়ে গেল-অমনি হু-হু হু-হু; পকেটের থেকে এক জনে এক জোড়া নকল গোঁফ বের করল-অমনি ফ্যা-ফ্যা; বাস্কেটের থেকে একটা ইঁদুর লাফিয়ে পড়ল তো আমাদের মাথায়ও চাতাল ফাটল। হাতিবাগানে আগুন লেগেছে, না কি দমকল ছুটেছে, না কি শোভাবাজারের দামোদর বাবুরা সব খুন হয়ে গেল-এ কী সব মাগীদের কোলে করে বসেছি আমি!'

মাল্যবান ঘাড় কাত করে একটা সিগারেট জ্বেলে নিল। উৎপলা বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের দিকে সে ফিরে তাকাল না। ছবিটা তাকে আকৃষ্ট করে নি। মাল্যবান ছবি দেখতে-দেখতে নিজের সত্তার ভেতরের অঙ্গারশিল্প ও কাঠখোদাইয়ের আবছায়া মতন অনুপম ছবিগুলো দেখে নিচ্ছিল-চোখ বুজে। বাস্তবিকই চোখ বুজে ছিল সে।...ঘুমোচ্ছিল না, কথা ভাবছিল; কারা যেন কোথায়-অনেক দূরে সঙ্গত করছে। এক মনে শুনছিল সে।

মাল্যবানকে একটা ধাক্কা দিয়ে উৎপলা বললে, 'রেলি ব্রাদার্সের, না, পোর্ট কমিশনের? বিয়ে করেছে, না, রাঁড়ি?'

মাল্যবান যেন অপারেশন টেবিলের ক্লোরোফর্মের ঘোর আস্তে-আস্তে কাটিয়ে উঠতে-উঠতে চোখ মেলতে-মেলতে বললে, 'কে?'

'এই যে মেমসাহেব কটি, আমার পাশে যারা বসে আছে?'

'ওরা?' মাল্যবান অনেক খানি জেগে উঠে আরো জেগে উঠতে চেয়ে, তারপরে বললে, 'ওদের দিয়ে তুমি কী করবে?'

'আমাকে ছবিটা দেখতেই দিচ্ছে না।'

'ওদের মনে ওরা থাক। ছবি দেখতে দিচ্ছে না বলছ। দেখ ছবি; দেখলেই তো দেখা হল!'

'বলে দিল কথা! আর বাপু, কী রকম গুল মারছে শুনছ না। হাড়হদ্দ ঘাঁটিয়ে বার করছে।'

'কিসের?'

'না কিসের?'

'ওদের কথায় কান দিও না।'

'কান টেনে মাথা টেনে নিয়ে যায়-যে-'বাপ, রে,' উৎপলা ধড়-ফড় চন-মন করে উঠল, 'আমাকে চেপে বসেছে। ধরছে-উঃ!'

'দেখ না, ছবিটা দেখো-'

'এই জন্যেই আমি বলেছিলাম বক্সের কথা। উঃ! ধরো ধরো-হাতিমুখো গণেশ এসে আমার কোল ঠেসে বসেছে রে বাবা-গেল-গেল-হয়ে গেল-হয়ে গেল আমার-'

'ছবিটা দেখো, ছবিটা দেখো-'

মাল্যবানের সিটে এসে বসল উৎপলা।

মাল্যবানকে যেতে হল তার স্ত্রীর চেয়ারে। সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পুরুষটি রইল উৎপলার পাশে। কিন্তু লোকটা চুপচাপ, উৎপলার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়।

খানিকক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে উৎপলা বললে, 'খুব হিজিবিজি বই, না?'

'ছবিটা ভাল মনে হচ্ছে না।'

'খারাপও লাগছে না তোমার। আড়ি পেতে তাকিয়ে আছ তো বাপু।'

'কী করব, আট গণ্ডা পয়সা দিয়েছি-'

মনু ঘুমোচ্ছিল।

উৎপলা তার মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে বললে, 'দেখ, ছবি দেখ-তোর জন্যেই তো গচ্চা গেল দেড় টাকা। খা-খা-গঙ্গার ইলিশ খা-না খাবি তো সুঁটকি মাছ খা। চারদিকে সব বকনা বাছুর হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তাদের কানে ডাঁশ উড়ছে। কী খাবি খা-কী খাবি খা-' বলে গাঁট্টা মারতে-মারতে মনুকে জাগায়ে দিল উৎপলা।

মনু চোখ কচলাতে-কচলাতে এ-দিক সে-দিক তাকিয়ে অবশেষে ছবির দিকে ফিরে চুম্বক পাহাড়ের দিকেই ফিরল যেন-এমনই লেপটে রইল ছবির গায়ে যে, কিছুই দেখল না আর। দেখেশুনে তবুও গাঁট্টা মারতে গেল না আর মনুর মাথায় উৎপলা। সময়ের ভিতরে নয়-নিঃসময়ে নয়, নিজের প্রাণে অথবা অপরের হৃদয়েও নয়-অথচ এই সবেরই পরিচিত-আধোপরিচিত কেমন একটা আপতিত নিরবচ্ছিন্নতার ভেতর ঘাড় হেঁট করে ডুবে যেতে লাগল উৎপলা অনুপম অপর দেশের জীবন, অন্ধকার, মৃত্যু, নির্দায়ের ভেতর।

চার-পাঁচ দিন পরে উৎপলা পিওনের হাত থেকে কার্ড নিয়ে পড়তে-পড়তে উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'বড়বৌঠানের সংবাদ লিখেছে।'

মাল্যবান সর্ষের তেল গায়ে মাখছিল, 'এই বয়েসে আবার সংবাদ-' বলে নিরেস চোখে-মুখে তেল মাখতে লাগল আবার।

'তা হবে তো। কেন হবে না?'

'বড়বৌঠানের বয়েস না কত?'

'চুয়ান্ন।'

'এ-রকম বুড়ো গিন্নীদের যে ছেলেপুলে হয়, তা আমি জানতাম না।'

উৎপলা কার্ডটা ব্লাউজের ভেতর গলিয়ে দিয়ে বললে, 'তুমি কি বলতে চাও ভেঙে বল তো দিকি-'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা নয়, আমি বলছিলাম–' মাল্যবান চুপচাপ তেল মাখতে লাগল।

'না বললেও বুঝেছি আমি, পেটে-পেটে তুমি কী বলতে চাও–'

'না, না আমি ভাবছিলাম–' মাল্যবান থেমে গিয়ে হঠাৎ এক ফাঁকে ঝপ করে বলে ফেলল, 'আবার এই বয়েসে ছেলেপুলে–'

'সে কি বাবা, ছেলেটা না আসতেই মারমুখো হয়ে পথ আটকে দাঁড়াবে না কি?'

'আমি দাঁড়ালেই-বা শোনে কে–' দাঁতে কেটে-কেটে হাসতে-হাসতে মাল্যবান বললে।

উৎপলা গুনগুন করে গাইতে-গাইতে ছাদের দিকে গেল-বড়বৌঠানের সন্তান হবে বলে ছায়ানট–ছায়ানটের পরে ভীমপলাশি–তারপরে বাগেশ্রী–কিন্তু প্রত্যেকটা গানেরই এক-আধ লাইন মাত্র। পিঠে তেল মাখতে-মাখতে মাল্যবান ভাবছিল; নিজের বেলা তো উৎপলা এই বার বছর পরে ষষ্ঠীকে দেখিয়ে গেল, একটি সন্তান যা হল, তাও মেয়ে; এই প্রথম, এই-ই শেষ; বংশে ছেলে না হলে নাই-বা হল–এই তো ভাবে উৎপলা। কিন্তু পরের বেলা সে তেরটির পর চৌদ্দটিকে দেখ কেমন বেহাগ ভৈরবী কীর্তনের সুরে ফলাও করে ফলাচ্ছে ছাদে-ছাদে। এটা কী কাজ করছে উৎপলা, ঠিক কাজ করছে? ঠিক নয় অবিশ্যি। মোটেই ঠিক নয়। কিন্তু, তবুও, এইটেই ঠিক।

পায়ে তেল মাখতে-মাখতে মাল্যবানের মনে হল; কী জানি, আমার বদলে অন্য কোনো দশাসই পুরুষের স্ত্রী হলে এত দিনে উৎপলাও আট-দশটি সন্তানের মা না হয়ে ছাড়ত না হয় ত।

মাথায় তেল মাখতে-মাখতে কড়া রোদের আকাশটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল মাল্যবান; আমার প্রতি সে যতখানি বিমুখ, অন্য কোনো পুরুষ-মানুষের জন্যে ঠিক ততখানি আগ্রহ তার থাকতে তো পারত; তা হলে কী হত? বেশ ঝরঝরে নদীর পাশে তরতাজা সবুজে-সবুজে ফন ফন করে উছলে উঠত পানের বন তা হলে, উৎপলার পানের বন, নীল কালো সাপশিষের মত রোদে বাতাসে–হাওয়া বৃষ্টি নিঝোর ফলসানির ভেতর।

উৎপলা কীর্তন গাইতে-গাইতে ছাদের থেকে ফিরে এল-

'তোমার দাদার বয়েস কত হল এবারে?'

'চৌষট্টি।'

'চোষট্টি!'

'তা তিনি কি আজকে জন্মেছেন–'

'খুব বুড়ো হয়ে গেছেন তো তা হলে–'

'আজকের মানুষ তো নয়–'

'তাই তো, খুব বুড়ো তো–'

'বুড়ো-বুড়ো করে মুখে গ্যাজলা উঠল যে বুড়ো খোকার আমার! ঢং', উৎপলা বললে, 'নাও, এখন বড় বৌঠানের জন্যে কী জিনিস পাঠাবে বলো।'

মাল্যবান গায়ে তেল, পায়ে তেল, মাথায় তেল মেখে ভরা রোদে একটা বিচিত্র সরীসৃপের মত চিকচিক করছিল। ছাদের রোদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ধাঁধিয়ে উঠছিল উৎপলার চোখ; সরীসৃপকে সে একবার দেখছিল ঝিকমিক আঁশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নুয়ে পড়ছে, হাত নাড়ছে, চোখ পাঁজলাচ্ছে, আর-একবার মিলিয়ে যাচ্ছিল সব-অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত অন্ধকারের ভেতর কাউকেই, কিছুকেই আর দেখছিল না উৎপলা।

মাল্যবানকে যথেষ্ট হিংস্র, অথচ আপাতদৃষ্টিতে তেমন কিছুই না, বরং বেশ চকচকে মনে হচ্ছিল হয়ত উৎপলার; ঠিক বুঝতে পারছিল না। কিন্তু তার মানে হয় তো এই নয় যে, উৎপলা বেশ কাতর হয়ে পড়ছিল; এবং মাল্যবান বেশ প্রখর হয়ে উঠছিল। হলে হয়ত ভাল হত না।

'আমার মনে হয়, যদি কিছু দিতে যাও, তা হলে তাঁরা লজ্জা পাবেন।'

'কেন?'

'এ-রকম ব্যাপার যে হচ্ছে, এতে এখুনি লজ্জা পাচ্ছেন–'

'তুমি যখন তোমার মায়ের পেটে ছিলে, লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলেন তিনি! না কি? ম্যাদা মাদার, ঠেলে বেরুল তো তবুও, লজ্জাবতীর ঝাড় থেকে। বেরুল তো। কী হল তাতে? ইঁদুরের গর্তে ঢুকে পড়ল পৃথিবীর জনমনিষ্যি সব! লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা!'

মনের বিষ ঝেড়ে কথা বলে ছাদে এক চক্কর ঘুরে এসে উৎপলা বললে, 'তেমন হোক না-হোক, একটা বেনারসি শাড়ি অন্তত কিনে দিতে হবে পঞ্চাশ-ষাট টাকার মধ্যে আর রূপোর সিঁদুর কৌটো একটা। আমার ইচ্ছে ছিল সোনার কৌটো দিই একটা। চল্লিশ বছর স্বামীর সঙ্গে ঘর করল তো পয়মন্ত এয়োতি–এই চুয়ান্নতেও তো ফল দিচ্ছে–'

'তোতাপুরি আমের গাছটা?' মাল্যবান খ্যাঁক করে একটু হেসে, বেশি হাসির চাড় সামলে নিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে বললে, 'বড়বৌঠানকে চিনি আমি–'

'কেমন, বেনারসিতে তাঁকে মানাবে না?'

তা আমি বলছি না,' মাল্যবান তেলের বাটিটার কাছে ফিরে এসে বাটিটার দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল, 'এ-রকম একটা ব্যাপার নিয়ে কেউ যে ঘটা করে, সে-ইচ্ছে তার একটুও আছে বলে মনে হয় না।'

দূরের রৌদ্রে সরীসৃপটা চিকচিক করে জ্বলে উঠেছে। উৎপলা পুডিঙের কামড়ে কঠিন কংক্রিটের মত হয়ে গিয়ে তাকিয়ে দেখল একবার। মিলিয়ে গেল ছবিটা; রোদে বিহ্বলতায় চোখ ছটফট করে উঠেছে উৎপলার; অন্তশ্চক্ষু উপড়ে পড়ছে যেন অন্য রকম আগুনে–রৌদ্রে।

'আসল কথা হচ্ছে, কিছু খসাতে চাও না তুমি; আপন লোককে পর মনে করো। শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার ভাঁড়ামো, চিনি নে আমি তোমাকে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেলের বাটিটা উৎপলা ছাদের ওপর ছুঁড়ে ভাঙল!

'তেল পড়েছে, টাকা আসবে, মাল্যবান হেসে বললে, 'যাই, চান করি গে।'

অফিস থেকে ফিরে এসে সে বললে, 'চলো, বেরুই।'

'কোথায়?'

'কী কিনতে-কাটতে হবে, চলো দেখি গিয়ে-'

উৎপলার মনের থেকে কিছু ধোঁয়া কেটে গেল, 'তা তো বলেছিই, বেনারসি-'

'কিন্তু আমি ও-সব জিনিস একা কিনতে ভরসা পাই না। এসো আমার সঙ্গে-'

'ষাট-সত্তরের কমে হবে না শাড়ি; যে তিনশ পঁচাত্তর টাকা মেজদার বাবদ আমার কাছে আছে, তার থেকে কিছু তো খরচ করতে পারি নে-'

'তার দরকার নেই-'মাল্যবান রুমালে মুখ মুছে বললে।'

'তবে কোথায় পাবে টাকা?'

'প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে তুলে এনেছি।'

'কত?'

'পঁচাত্তর'।

নাক-মুখের চেকনাইয়ে চনমন করে হেসে উঠে উৎপলা বললে, 'বা, বেশ গুড বয় তো তুমি। সত্যিই এমন না হলে-। আ গেল, তুমি তো চাও খেলে না।'

চায়ের প্রতীক্ষায় মাল্যবান চেয়ারে বসল গিয়ে। খানিকক্ষণ পরে উৎপলা ফিরে এল, পরটা ও চা নিয়ে নয়, মার্কেটে যাবার জন্যে পোশাক-আশাকে তৈরি হয়ে।

মাল্যবান একটু হতচকিত হয়ে বললে, 'চা খেয়ে গেলে হত না?'

'ঠাকুরটা আজ বড় দেরি করে এসেছে,' উৎপলা মাল্যবানের ছাড়া-চেয়ারে ডান পাটা চড়িয়ে দিয়ে জুতোর পালিশে যে কিউটিকিউরা ট্যালকামের গুঁড়ি পড়েছিল, রুমাল দিয়ে তা ঝেড়ে ফেলতে-ফেলতে বললে, 'আমিই ভাত চড়িয়ে দিতে বললাম তাই। সকালবেলার সেই পরটাগুলো ঠাণ্ডা মেরে গেছে-লোনার মাকে দিয়ে দিলাম; ওর ছেলের কুষ্ঠ হয়েছিল, কিছু খেতে পায় না।'

উৎপলার সেলাইয়ের কলটা অনেক দিন ধরে পড়েছিল-অবিশ্যি অযত্নে নয়, জিনিসের যত্ন করে সে-কিন্তু অব্যবহারে। কলটার ডাকনি সাফ করা, ঢাকনি খুলে ঝেড়েপুছে ঝকঝক করে রাখা-হাতে কাজ না থাকলে এটা তার খুবই সোহাগের কাজ।

একদিন সকালবেলা পাশের ভাড়াটেদের একটি ছোট্ট মেয়ে এসে বললে, 'পলা মাসিমা, আপনার সেলায়ের কল আছে?'

'আমি যে তোমার মাসিমা, তা তোমাকে কে বললে?'

মেয়েটি উৎপলার দিকে টলমল করে তাকিয়ে রইল-কোনো কথা বললে না।

মাল্যবান বললে, 'আঃ, ওকে আর ও-রকম শুধচ্ছ কেন?'

'কোনোদিন এদের গ্যাজও দেখা যায় না,' উৎপলা বললে, 'আজ কল নেবার সময় পলা মাসিমা! আচ্ছা!'

মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ফ্রকের কাপড় তুলে চিবতে লাগল।

'তুমি কার মেয়ে গা?'

মেয়েটি তার বাবার নাম বললে।

'ও সেজগিন্নির মেয়ে তুমি বুঝি?'

মেয়েটি চিবনো কাপড়ের এক কিনার থেকে দাঁত বের করে বললে, 'হ্যাঁ।' উৎপলা মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সব জল ভরে গড়ায় কি না। ওপরওয়ালার কল এমনিই নড়ে। এই সেজগিন্নিই তো একদিন বলেছিলেন, কলকাতার জল সোনার দরে বিকোয় না কি। খুব মনে আছে আমার।

'সেকথা আমি ভুলব কোনোদিন!'

'কী লাভ ও-সব মনে রেখে!'

'না, না, তুমি কেন মনে রাখতে যাবে। তোমার দরদে তো মলম ঘষা হচ্ছিল সেজবৌয়ের সে-দিন, আমাকে তাঁবায় চড়িয়ে-'

'তাঁবায় চড়ালেই কি ফোস্কা পড়ে?'

'তা আমাদের পড়ে। এই রকম কথা শুনলে গায়ে জলবিছুটির জ্বালা হয়। ইশ!'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে উৎপলা বললে, 'তোমরা কে হে বাপু, পাশের ভাড়াটে ঘরে থাকো; তোমাদের আমরা খাই না পরি, তোমাদের তেউড়ি-খেসারির খেত মাড়াই না, বকের বিষ্ঠা দিয়ে বড়ি-খেসারি মেখে দিয়ে ভোগা দিই-তোমার মা যে-'

মাল্যবান উৎপলাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ছোট্ট মেয়েটির পিঠে-ঘাড়ে গোটা দুই চাপড় মেরে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমিও পার বাপু! ও কী জানে, ওকে নিয়ে ঘাঁটানো-কী হবে।'

'কিন্তু কল আমি দেব না।'

'সে হল আলাদা কথা।'

'আর ঐ সেজগিন্নি বড্ড অপয়া। পর-পর চারটি মেয়ে বিয়ল। পর-পর চারটি মেয়ে বিয়ল-'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট মেয়েটি ফ্রক কামড়াচ্ছিল; আরো জড়সড় হয়ে কামড়াতে লাগল।

'সে-দিন তোমার একটি বোন হয়েছে, না খুকি?'

'হ্যাঁ'

'তা আমি জানি। সাধে আমাদের বললে না। অথচ দশ মাইল দূর থেকে লোক ডেকে খাইয়েছে। মানুষ যে কী রকম বোকা শয়তান হতে পাবে–'

উৎপলা কথা শেষ করতে না করতেই মাল্যবান বললে, 'খুকি তো দাঁড়িয়ে রইল, ওকে যা দেবার দাও না হলে বলে দাও–'

'অথচ এক ফালি বাড়ির ভেতর পাশাপাশি দু-পরিবার থাকি–তবুও এটুকু গোয়ালার আক্কেল নেই।'

'তুমিও কি ওদের ডাকো-টাকো না কি কোনো কাজকম্মে?'

'কেন ডাকব? ওরা ঝিনুক ভরে মধু নিয়ে সুর করে ডাকছে দিনরাত–'

'এক পক্ষকে প্রথমে শুরু করতে হবে তো–'

'আমি একা মানুষ, গুষ্টি ডেকে খাওয়াব? ওদেরই তো বরং উচিত আমাদের তিনটিকে ডেকে একটু মিষ্টিমুখ করানো অন্তত। এই মনুকেও তো একদিন ডেকে জিবেগজা, শোনপাপড়ি যা-হোক একটা কিছু, হাতে তুলে দিতে পারত। আমরা তো দিই ওদের ছেলেমেয়েদের, ওরা একটা পিপারমিন্ট লজেনচুসও দিতে পারে না?'

'যাক গে, মরুক গে, তুমি এখন–'

'অথচ কত বড় পরিবার; জমজম করছে; কাকে খাচ্ছে, ঘুনে খাচ্ছে, ফোঁপড়ায় খাচ্ছে; চোট্টা শয়তান ওপরপড়া হয়ে ঝ্যাঁট মেরে উজোড় করে দিচ্ছে সব।'

'কলটা দেবে না কি, দিয়ে দাও।'

'কিন্তু মনটা ওদের লাউয়ের মাচায় কেলে হাঁড়ির মত। সে-হাঁড়িতে তো ভাত ফোটে না, বালি তাতে; জনপ্রাণী পাখপাখালি পালিয়ে যায় সে-হাঁড়ি দেখলে। ভাল কেলে হাঁড়ি পেতে বসেছে বটে সেজবৌরা–'

'এই মেয়েটির সামনে তুমি অনেক কথাই তো বললে–'

'শুনিয়েই বললাম যাতে ওদের আঁতে লাগে।'

মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়েছিল।

মাল্যবান বললে, 'খুকি, তুমি ফ্রক চিবিও না আর।'

ফ্রকটা সে মুখের থেকে ফেলে দিল। দেখা গেল, দাঁত দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

মনু বললে, 'পানসে দাঁত।'

'তোমার 'পানসে দাঁত', উৎপলা বললে, 'তোমার বাপ-মা ডাক্তার দেখিয়েছেন?

'না।' মেয়েটি (উৎপলার কেন) যেন মনে হল শামকলের বাচ্চার মত) মাথা নেড়ে বললে।

'না'? উৎপলা মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেমন ফ্রক চিবুচ্ছে দেখছ, শোথ হয়েছে এই মেয়েটার, শরীরে চুনখড়ি নেই; অথচ বছর-বছর না বিয়লেও চলবে না। ওদের বার মাসই কার্তিক মাস, বাবা!' মেয়েটি নিজের অজান্তেই আবার ফ্রক চিবুতে শুরু করেছিল; উৎপলা ফ্রকে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে বললে, 'দূ ধুমসি, খাসির রক্ত মাখিয়েছিস–মেড়েছিস–দু–দু–'

'মেয়েটি আস্তে-আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছিল।

'শোনো খুকি,' ডাক দিল উৎপলা।

এসে দাঁড়াল মেয়েটি।

'সর্ষের তেল আর নুন দিয়ে দাঁত ভাল করে ঘষে-ঘষে মেজো দিকিন রোজ। মাজবে?'

শামকলের বাচ্চার মতন তুড়বুড় মাথা নেড়ে মেয়েটি বললে, 'হ্যাঁ।'

'তোমাদের তিনটি বোনকেই তো দেখি আমি, একেবারে লিকপিক করছে; বাঁশপাতা মাছের মতন; চেহারাও তেমনি বিচ্ছিরি। তোমাদের ছোটবোন কেমন হল দেখতে?'

'বেশ সুন্দর।'

'রঙ কেমন?'

'খুব ফরশা।'

'কালো ফরশা তো কথা নয়,' বড় শামকলটার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট দিয়ে লাল লঙ্কা কেটে খেতে-খেতে বললে যেন চন্দনা, 'মগরাহাটার কুচোচিংড়ির মত হল তো দেখতে। মনে হয় যেন গলার নলী শুকিয়ে থোড়ে আঁশের মত হয়ে রয়েছে। বড্ড দুঃখ করে। বাস্তবিক মানুষের পেটে এ কী টোনা টেংড়ি বল তো দিকি–'

মনু একটা ফিক করে হেসে উঠল।

'যে-ফরশা রঙ বলছ খুকি ও তোমার বোনের গায়ে রঙ নেই বলে। দুধে-আলতায় রং–সে এক রকম।'

আবার শামকলের গা মাথা নাড়ল, 'না, আমার বোনের রক্ত আছে।'

'আছে? তবুও সাদা?'

'খুব সাদা।'

'তা হলে ন্যাবা হয়েছে।'

'না, ন্যাবা হয়নি' ফরশা রঙ। কেমন সুন্দর দেখতে! ইশ, ন্যাবা হবে আমার বোনের?'

উৎপলা বললে, 'কই, দেখালে না তো তোমার বোনকে।'

'আসুন না, দেখে যান।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখন দেখতে যাব কেন। খাইয়েছিল? সাধে? যে-দিন হয়েছিল সে-দিন খবর পাঠিয়েছিল?'

মাল্যবান একটু জ্বলে উঠে বললে, 'আ মল যা। ভাল বিপদেই পড়া গেছে দেখছি। সোমত্ত গাইগোরুর মত একটা বাছুরের ঘাড় মটকাবার জন্যে চাট মারছ সেই থেকে! কী হল তোমার।'

মেয়েটির চোখের ভেতরে যেন তলিয়ে গিয়ে তাকিয়ে থেকে উৎপলা বললে, 'কিন্তু, সেলাইয়ের কল নেবার সময়ে ঠিক মতন হাজির হয়েছ তো-শামকলের বাচ্চা।'

শুনে সচকিত হয়ে কেমন চমকে উঠে তাকাল মেয়েটির দিকে, উৎপলার দিকে, মাল্যবান।

'তোমার বোন যে-দিন হল, সে-দিন চারটে উলু দিলে কেন?'

'আমি তো দিই নি উলু।'

'উলুর যা ঘটা! ভাবলাম, এবার বুঝি রাজপুত্তুর এসেছেন?'

মেয়েটি শুকনো রৌদ্রডাঙায় পাখির বাচ্চার মত এক-আধ ফোঁটা মেঘের জল পেয়ে তিড়বিড় করে উঠল উৎপলার কথা শুনে।

'তোমার মা কল চেয়েছেন কার কাছে?'

'আপনার কাছে।'

'কী বলে দিয়েছেন?'

'বলেছেন তোর পলা মাসির কাছ থেকে সেলাইয়ের কলটা চেয়ে নিয়ে আয় তো–'

উৎপলার খানিকটা ভাল লাগল, জ্যৈষ্ঠের মাটিতে কিছু আষাঢ়ের মেঘের রস এসেছে যেন, এমনি ভাবে মেয়েটির কোঁকড়া চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে বললে, 'মাসি হলাম কোন সুবাদে?'

'মা বলে দিলেন তো।'

'তোমার চুলের ভেতর ঢের উকুন, খুকি।'

'হ্যাঁ, দিদির মাথার থেকে এসেছে।'

'কেউ বাছে না তোমার মাথার উকুন?'

'না।'

'উৎপলা বুড়ো আঙুলের নখে একটার পর একটা উকুন টিপে মারতে-মারতে বললে, 'এই যে মাথা বেছে দিচ্ছি তোমার, বেশ আরাম পাচ্ছ, না?'

মেয়েটি উৎপলার কোলে মাথা ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে রইল।

'তোমার মা কল দিয়ে কী করবেন?'

'জামা সেলাই।'

'কার জন্যে?'

'ছোড়দি, আমি, বোন–তিনজনের জামা।'

'তা, তোমার মা এখনও তো আঁতুড় ঘরে।'

'না, বেরিয়েছেন।'

'কবে?'

'এই তিন-চার দিন হল–'

'নাড়ী তো এখনও বড্ড কাঁচা, সেলাই করবেন কী করে? নাড়ী টনটন করে উঠবে যে।'

'চাইলেন তো।'

'লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ক্ষীর এসেছে–খাবে খুকি?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে বললে, 'খাব।' শামকল শাবকের মাথা কেমন তুড়বুড় করছে, চাঁদির ওপর জলের ফোঁটা রোদে শুকিয়ে গেছে যেন।

উৎপলা হাত ধুয়ে এসে মেয়েটিকে খানিকটা ক্ষীর দিল তারপর কলটা ভাল করে দেখে, মুছে, মনুকে বললে, 'যা মনু, কলটা সেজমাসিকে দিয়ে আয়। তোমার ক্ষীর খাওয়া হয়েছে, খুকি?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন লাগল?'

'বেশ–'

'তোমার নাম কী?'

'নোরা। নোড়া, ভেঙে দেব দাঁতের গোড়া।'

'কী পড়ো?'

'আমি এখনও–ক অক্ষর–'

বলে এঁটোহাত জামায় মুছতে-মুছতে মেয়েটি দৌড় দিল।

পাশের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটি আঁতুড়েই মারা গেল।

'আমি তো তখনই বলেছিলাম, এই রকম হবে–'

দুই-তিন দিন উৎপলা কেমন একটা শোকাগ্রাহিতায় আচ্ছন্ন (না, বিমুগ্ধ?) হয়ে কাটাল।

বললে, 'আমি একটু দেখতেও পারলাম না, আমাকে একটু ডেকে দেখালও না।'

'কী করতে তুমি দেখে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই তো পাশাপাশি বাড়ি-মানুষ জন্মায়-মরে যায়-যেন ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলে, মরবার সময়ে একবার ডাকলেও তো পারত। পরশু রাত তিনটের সময় মারা গেছে বললে।'

'হ্যাঁ।'

'কী করছিলাম তখন আমি?'

'ঘুমুচ্ছিলে,' মাল্যবান বললে, 'কত শিশুরাই তো মরে যাচ্ছে।'

'খুব কেঁদেছিলেন সেজগিন্নি?' উৎপলা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাত-পা নিঝুম করে ছাদের এ-পারে ও-পারে পরপারে শূন্যতার বড় একটা রৌদ্রচাঙাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

'বড় বৌকে শাড়ি পাঠালে-কোনো খবর-টবর দিল না তো', মাল্যবান বললে।

'খবর দেবার সময় হয়েছে কি?'

'বাঃ দশ-পনের দিন হয়ে গেল।'

'দাদা নিশ্চয় জবাব দিয়েছিলেন,' উৎপলা বললে, 'কিন্তু পথে চিঠি মারা গেছে।'

'তা নয়,' মাল্যবান একটু কাঁধ নাচিয়ে বললে, 'পোস্ট অফিসের চিঠি ওঝার বাটির মত চলে। তিন পয়সার একটা পোস্টকার্ড ঝেড়ে দিলে যে মুল্লুকে পাঠাও, ঠিক গিয়ে পৌঁছবে।'

বড় শামকল কেমন ঘাড়ের রোঁ ফুলিয়ে-ফুলিয়ে কথা কইছে শোন-মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল উৎপলা। কিন্তু চিঠি সম্পর্কে কথা বাড়াতে গেল না সে আর।

'আঁতুড়ের মেয়েটাকে বাক্স করে শ্মশানে নেওয়া হয়েছিল।'

'হ্যাঁ।'

'কী রকম বাক্স?'

'প্যাকিং বাক্স-পাইন কাঠের-'

'ভেতরে আটকে নিলে? পেরেক ঠুকে?'

'তবে কি বাক্সের বাইরে লেপটে নেবে গঁদের আঠা দিয়ে লেবেল মেরে?'

'কী করলে তারপর?'

'শ্মশানে নিয়ে গেল-'

'দাহ তো হয় না ছোটদের?'

'না।'

'না? পুঁতি ফেলে তবে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর কী হবে?'

'কীসের পরে?'

'আমি বলছি, মাটির নিচে কী হবে ওর?'

মাল্যবান এবার চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'ও-সব কথা কেউ ভাবে না। হবেই একটা কিছু। শেয়ালে মাটি খুঁড়ে না খেলে পচে গলে যাবে-কৃমি হবে।'

'কলকাতায় শেয়াল কোথায়? পচে মাটি হয়ে যাবে-'

শুনতে-শুনতে সামনের চেয়ারটায় না বসে মেঝের ওপরই ঝুপ করে বসল উৎপলা, দেয়ালে ঠেস দিয়ে, পা ছড়িয়ে, বসে রইল।

মাল্যবান চুরুট টানতে টানতে ভাবছিল; কী বোকা! কী বোকার মত কথা জিজ্ঞেস করে। কত রাজ্যি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, উৎপলা ফ্যাকড়া নিয়ে বসে আছে, তারপর একেবারেই নয়; একটি সন্তানের মা হয়ে-ও যেমন ভাবে মা হতে চেয়েছিল বহু সন্তানের, তা হতে পারে নি; সেই সব নিহিত তেজ উৎপলার আপাতমূর্খতার অতৃপ্তিতে ঝড়ে পড়ছে।

'আচ্ছা, মরে যাওয়ার পর বড়-বড়, মেয়েদের মাটিতে পুঁতলে তারপর কী হয়?'

'মাটিতে পুঁতবে কেন? দাহ হয়।'

'না, আমি বলছি, যাদের ভেতর দাহ-টাহ করার চল নেই, তাদের কথা-'

'ওঃ', মাল্যবান একটু পুরুষোচিত তীক্ষ্ণ ভাবে উৎপলার দিকে তাকাল।

'আমি শুনেছি, একজন খুব রূপসী কুড়ি-একুশ বছর বয়সেই সুস্থ শরীরে হঠাৎ কেন যেন মারা গেল। বিকেলবেলাতে তাকে মাটি দেওয়া হল। তারপর সবাই চলে গেল, যে যার গাঁয়ে। সেখানে আট-দশ মাইলের মধ্যে জনমানব কেউ ছিল না। সন্ধ্যের পরেই একটা লোক এসে মাটি সরিয়ে সেই মড়াকে চুরি করে নিয়ে গেল। কেন নিল, বল তো?'

'কুড়ি-একুশ বছরের মেয়েমানুষ?'

'হ্যাঁ, বেশ সুন্দরী ছিল, বেশ সোমত্ত; শবটাকে মাটি খুঁড়ে বার করবার পরও গা ফুটে রূপ বেরুচ্ছে; আর গতরের সে কী পুষ্টতা।'

'এই জন্যেই চুরি করা হয়েছিল-' মাল্যবান বললে।

মাল্যবানকে খুব বেশি জাগিয়ে দিয়েছে উৎপলা, কথায়-কথায় নিজেও খুব বেশি জেগে পড়েছে আজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচের ঘরে আর যেতে দেওয়া হল না মাল্যবানকে আজ রাতে। এ-রাতটা মাল্যবান ও উৎপলার বেশ নিবিড়ভাবেই কাটল। সমস্ত রাত–সমস্তটা শীতের রাত।

মাল্যবান যা-ই মনে করুক না কেন, স্ত্রী-সন্তানের পাট চুকিয়ে দিয়ে একা-একা আইবুড়ো থেকে জীবন কাটানো খুব শক্ত হত তার পক্ষে। গোলদিঘিতে ঘুরে-ঘুরে বার-চৌদ্দ বছর সে অনেক হাওয়াই ফসল ফলিয়ে গেছে: সমাজসেবা, দেশ স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা, বিপ্লবের তাড়নাতেজ, নির্বৈপ্লবিক মনের চারণা, উনিশ শতকের নিশায়মান সমুদ্রতীর ঃ সাহিত্যের, ধর্মের মননের; বিশ শতকের উপচীয়মান আবহমান রক্ত, রৌদ্র, ছায়া, জ্বালা, সমুদ্রসংগীত–নানা রকম অপর রকম জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্যকে ঈর্ষা করেছে–নিজের জীবনটাকে অনেক সময়েই অসার ও নিষ্ফল মনে হয়েছে তার। কিন্তু, তবুও, এই পাকা চাকরিটুকু, স্ত্রী ও মেয়ে, কলেজ স্ট্রিটের ঘর তিনখানা, এর চেয়ে অন্য কোনো সাফল্যের উত্তমর্ণতা তার জীবনে কোনোদিন ঘটে উঠত কি?

সে নিজে যখন খুব স্থির হয়ে ভাবে, বোঝে–জীবনের কাছ থেকে যথাযথ প্রাপ্য সে পেয়েছে। সে জানে, জীবনটা তার এর চেয়ে ঢের খারাপ হতে পারত। যদিও মৃগনাভির গন্ধে মাঝে-মাঝে অধীর হয়ে উঠে গোলদিঘিতেই এই নিজের একতলার ঘরের রাতের বিছানায়ই সে পাক খেয়েছে সব চেয়ে বেশি, কিন্তু তবুও সে বুঝেছে যে, তার নিজের সাংসারিক জীবনটা কস্তুরীমৃগ নয়, বেসংসারীও নয়; সাংসারিক সফলতার চূড়ান্তে উঠে যে-সব লোক টাকাকড়ি যশ মদ মেয়েদের নিয়ে সন্তপ্ত হয়ে আছে দিনরাত, তারা কি জানে তারা কী, কে, চলেছে কোথায়! তারা জানে না। তাদের অন্তঃশীলা আত্মা ঠিক নয়–তাদের নিম্ননাভির গন্ধ এ-দিকে ছিটকে ফেলে দিচ্ছে তাদের; মাঝে-মাঝে মাল্যবানের মতন পথের পাশের একজন লোককেও সচকিত, আলোড়িত করে তুলছে। কিন্তু মাল্যবান জানে, এ-নাভি তার নিজের নয়–এসব ওদের।

একদিন মা বেঁচেছিলেন। মা খুব স্নেহ সরসতার মানুষ ছিলেন; কিন্তু তখনই কলকাতায় প্রথম চাকরি শুরু করে মার সঙ্গে শ্যামবাজারের একটা একতলা বাড়িতে এক কোঠায় যে-দিনগুলো কাটিয়েছে সে-প্রত্যেকটা দিনের কথা মনে আছে তার ঃ সহজ কঠিন মৃদু নিরেস, কেমন নির্জলা জলীয় দিনগুলো জীবনের। ভাবত, মাকে মানুষ সূতিকাঘরের থেকেই পায় কি না–রোজই পায়–অনেক পায়–জননীগ্রন্থি কেটে যায় তাই শিগগিরই–নতুনত্ব হারিয়ে যায়। ভাবত, মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন মায়ের মমতা সজলতা এত স্বাভাবিক বলেই আলো-জল-বাতাসের মত সুলভ মনে হয়: একজন অপরিচিত মেয়েকে মনে ধরলে তার সহজ স্বাভাবিক সত্তাকে পায়ের নিচের মাটির, মেটে খুরির জলের মত সহজ ভেবে নিতে সময় লাগে; কাছে থাকলেও দূর–তার স্বচ্ছ সরল প্রকাশ ভানুমতীর খেলার মতই আপতিত হচ্ছে কী সহজে–কিন্তু তবুও কী রকম আঁধার, কঠিন, নিবিড়।

এইসব ভেবে-ভেবে কেমন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ত মাল্যবানের মন; মার কাছে ঘাট হয়েছে বলে তার প্রতি শ্রদ্ধায়, পথে-ঘাটে মনে-ধরে গেছে নারীটির প্রতি উদাসীনতায় এবং নিজের প্রতি ধিক্কারে নিজেকে সে সজাগ করে রাখত।

মাল্যবান যখন বিয়ে করে নি, নিজের অফিসের বিবাহিত কেরানিদের হপ্তাকাবারি অভিযান দেখে মন এমন গুমরে উঠত তার। উৎপলাকে নিজের ঘরে আনার থেকে আজ পর্যন্ত যখনই কোনো মানুষের স্ত্রীবিয়োগের কথা শুনেছে, মাল্যবান, সে মানুষটিকে জাদুঘরের কূলকিনারায় দেখা অতীব মৃত জিনিসের মত অতীতের আনন্ত্যের কুয়াশা-ঘরে লীন হয়ে থাকতে দেখছে সে–অনুভব করেছে, ও-মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই; সে-জীবনের শূন্যতা কল্পনা করে, অস্বস্তি বেদনার অভিজ্ঞতায় কেমন যেন অন্য আর-এক রকম ধার শানিয়ে উঠেছে তার। নিজের স্ত্রী যে বেঁচে আছে, এ-সান্ত্বনা ভেতরে-ভেতরে গুছিয়ে নিয়ে সারাদিন অফিসের ডেস্কে, সারারাত নিচের ঘরের বিছানায় কম্বলের নিচে, নিশ্চুপ শান্তির ভেতর একটার-পর-একটা বিদায় দিয়েছে–গ্রহণ করেছে।

এই সব হচ্ছে মাল্যবানের জীবনের ভিতরের কথা, ভিত্তিচিত্রের কথাও। সে একা থাকতে পারে না, মার সঙ্গে থাকে তাই; কিন্তু তবুও মায়ের ভালবাসা সান্নিধ্য তার কাছে কালক্রমে একা থাকার সামিল বলে মনে হয়; বিয়ে না করলে তার চলে না; স্ত্রীকে ঘুচিয়ে দিয়ে একা পথ চলবার কোনো শক্তিই তার নেই।

কিন্তু জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে এই দাম্পত্যজীবনেরও নানা রকম খাঁকতি দেখছে সে। ঝড়তি-পড়তি নষ্ট ফসল, পচা হাড়মাংসের গন্ধে ভরে উঠছে সব। উৎপলার উদাসীনতা ঠিক নয়, খুব সম্ভব অপ্রেম–দিনের পর-দিন স্বচ্ছ হয়ে আসছে যেন। অতল স্বচ্ছলতায় যে-রূপ দেখা যাচ্ছে তার, তাতে মনে হচ্ছে, কোনোদিনই প্রেম-প্রীতি ছিল না মাল্যবানের জন্যে উৎপলার। না থাকলে না থাকবে। অন্যদের জন্যে প্রীতি? অন্য কারো জন্যে প্রেম? তাই হোক। কিন্তু তবুও উৎপলাকে বহন করে বেড়াতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত? উৎপলাও তাকে তাই করবে বুঝি? চোখের সামনে অন্যদের প্রতি উৎপলাকে স্পষ্ট অনুরক্ত হয়ে পড়তে দেখে–সে-জায়গা থেকে একটু গা বাঁচিয়ে সরে যেতে হবে বুঝি মাল্যবানকে? আলখাল্লাপরা একজন চীন, একজন গ্রীক দার্শনিকের মত আকাশের তারা, পাতালের বালি, মানুষের জীবনের মিছে সমারোহকে যে নিমেষেই গ্রাস করে চলেছে সেই উপলব্ধিতে স্থির হয়ে নিতে আবার–তারপর বেশি রাত হলে টেবিলে খেতে বসে খোশগল্প করতে হবে স্ত্রীর সঙ্গে আর মেয়ের সঙ্গে?

বিয়ের আগের দিনগুলোকে তার শীতের আগে হেমন্তের, মেহন্তের আগে শরতের খেতে, মাঠে, রোদে মানুষের মুখে পাখির কথায় যে অধিনশ্বর সম্ভাবনা থাকে হেমন্তের, যে মহাপ্রাণ কুহক থাকে আসন্ন শীতের রাতের, সেই রকম মনে হয়েছে–

চলে যেতে পারে সে কি আবার বিয়ের আগের সেই পৃথিবীর দেশে? প্রশ্নটা পাড়া মাত্রই তার উত্তর মেলে; মানুষ তো মৃত্যুর দিকে এগচ্ছে, পিছে ফিরে যেতে পারে না তো সে আর। তবে উৎপলা মনুকে বাদ দিয়ে মৃত্যুর দিকে এগতে পারা যায় বটে–একা। মার আমলে পারে নি, বৌ পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তাকে? সজ্ঞানে হেঁটে চলে যেতে পারে সে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে–অজ্ঞান মৃত্যুর দিকে। পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সাময়িক এই সব ইচ্ছা, চিন্তা। মাল্যবানের মনের ভেতর কোনো পৃথিবী ঘুরে বিদ্রোহী বা ভাবুক নেই যে তা নয়; শয়তান জোচ্চোর অমানুষও রয়েছে, কিন্তু সবের ওপরে মানুষ সত্য হয়ে রয়েছে; একজন সাধারণ ধর্মভীরু ও ভীরু মানুষ। একটি সাধারণ স্নেহশীল ধর্মভীরু ভীরু বৌ যদি সে পেত, তা হলে এ-দুটি সাদাসিধে জীবন পৃথিবীতে বিশেষ কোনো সফলতা বা নিষ্ফলতার দান না রেখে শান্তভাবে শেষ হয়ে যেতে পারত একদিন। কিন্তু তা তো হল না, না, নম্র বশ্য ঘরজোড়া স্নিগ্ধতা হল না, খড়খড়ে আগুন কড়ের চমৎকার অগ্নি-ডাইনির মত হল মাল্যবানের বিয়ে আর বৌ, আর বিবাহিত জীবন।

উৎপলা দেখতে বেশ; শুধু বেশ বললে হয় না—এমনিই বেশ। সুস্থ। রুচি ও বুদ্ধির ধার মাঝে-মাঝে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে; হৃদয়ের বিমুখতা ও কঠিনতাও তার এক-এক জায়গায় এক-এক জন মনুষের তাপ বা জ্ঞান-পাপের ছোঁয়ায় মোমের মত গলে দাম্পত্য আবহে ফিরে এসে মোমের মত শক্ত ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে আবার। কুমারী হিসেবে এই মেয়েটির বেশ দাম ছিল—নারী হিসেবেও। কিন্তু মাল্যবানের মত এ-রকম একজন লোকের বৌ হয়ে ঠিক হল না তার। উৎপলার বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। বাপের বাড়ির দেশের ঢের লোক তাকে চেনে—ভালবাসে—কাছে আসে তার; কলকাতায় এসে এদেরই মারফত আরো অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার; দশ-পঁচিশ মিনিট উৎ, পলা, উৎপলা, ইত্যাদির সঙ্গে একশ রকম মানুষ একশ রকম ভাবের কথা বলে যাবার প্রয়োজন প্রায়ই বোধ করে; এই সব বিমিশ্র ভিড় এক সময় খুব বেশি আসত; আনাগোনা এখন খানিকটা কমেছে বলে মনে হচ্ছে; শিগগিরই বাড়বে আবার তাও মনে হচ্ছে। যারা যাওয়া-আসা করে এ বাড়িতে-কেউ থাকে পনের মিনিট, কেউ দু-তিন ঘণ্টা। সটান দোতলায় উৎপলার কাছে চলে যায় প্রায় সকলেই তারা; মাল্যবান নিচের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, চুরুট টানছে, দেখে বা না দেখে তারা সবটুকু দেখে নিয়েছে অনুভব করে, কৌতুক বা ক্লান্তি বা কঠিনতা বোধ করে। কিন্তু মাল্যবানের সঙ্গে বিশদ আলাপচারির আবশ্যকতা কেউই বড় একটা বোধ করে না। কেউ-কেউ এ-ও জানে যে, এ-মানুষটিকে এর স্ত্রী একেবারেই গ্রাহ্য করে না। এরকম উপলব্ধির পর সময়ের, পৃথিবীর স্তনাগ্রচূড়ায় অনতিদূর শাঙ্খনীকে ঢের বেশি সরস বলে মনে হয়—ভীরু দুরুদুরু বুকের সাহস ও কাম নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে। মাল্যবান দেখেছে, জেনেছে, উপলব্ধি করে দেখেছে সব দেখেছে, তার চেনা-আধোচেনা মানুষেরা কী রকম অনিমেষ বিদ্যায় ওপরে চলে যাচ্ছে—তাদের কী রকম তাগিদ—কত তাড়া! সে যে নিজে একজন প্রাণী নিচের ঘরে রয়েছে—এ বাড়িটাও যে তার সেটা কোনো কথা নয়-কথাটা সত্যিই খুব ঠিক।

যারা ওপরে যায়, তারা কেউ লজ্জিত হয়েও ফিরে আসে না তো? কেউ-কেউ অনেকক্ষণ তো বৈঠক জমায়; হাসি তামাশা রগড় গুণা ছিটোফোঁটায় ফেনায় ছিটকে আসে নিচের ঘরে; মাল্যবান মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে ভাবে—কথা ভাবে। কথা ভাবা কালোধূমসো পাখিদের নীড় তার মাথাটা। আচমকা একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বা দড়াম করে জানালার কপাটটা খুলে ফেলে পাখিগুলোকে উড়িয়ে দেয় সে। যারা ওপরে যায়, তাদের পেছনে-পেছনে সে ওপরে যায় না কোনোদিন; কাউকেউ কিছু বলতে যায় না। যখন দোতলার ঘরে আসর খুব জমে উঠেছে, তখনও ওপরে যেতে কেমন দ্বিধা বোধ হয় তার; যখন রাত বেশি, উৎপলার ঘরে লোক কম—দুটি কি একটি—খুব সম্ভব একটি—তখন সে কিছুতেই ওপরে যায় না; মন দিয়ে করেছে, চোখ দিয়ে সকলের জীবনের সব তলানি আবিষ্কার করতে চায় না।

চৌবাচ্চায় স্নান করে ঠাকুরের কাছ থেকে ভাত নিয়ে খেয়ে সে অফিসে চলে যায়। কিংবা সন্ধ্যেবেলা যখন ওপরের আড্ডা জমে, তখন আস্তে-আস্তে স্টিক হাতে গোলদিঘির দিকে চলে যায়। হাঁটতে-হাঁটতে ভাবে; কটা দিন আর? এই স্কোয়ারে পাক খাচ্ছি—চোখের পলকেই কুড়িটা বছর সাঁ করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে আমার, উৎপলার; দেখতে-দেখতে চুল পেকে যাবে ওর, দাঁত পড়ে যাবে, তারপরে সব ভোঁ-ভোঁ। ভাবতে-ভাবতে কুড়ি বছরের পাল্লা সত্যিই, দেখ, পেরিয়ে গেছে সে—জীবনটা এখন বেশ নিরালা, নিঃশব্দ; একটা অতিরিক্ত কাক, একটা ওপরপড়া বেড়াল নেই কোথাও; রোদে বাতাসে নির্ভাবনা ছড়িয়ে আছে চারদিকে; যত চাও, তত! কত নেবে? ভাবতে-ভাবতে ক্ষমার ক্ষমতায় বোশেখ-জ্যৈষ্ঠের মাটির শিরায়-শিরায় শ্রাবণের রস এসে পড়ে যেন। চুরুট জ্বালিয়ে নেয় মাল্যবান।

কুড়ি বছর তো পেরিয়ে গেছে সে আর উৎপলা। গত কুড়ি বছর যে-সব আতিশয্যচক্র হয়ে গেছে উৎপলার জীবনে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই এখন আর। গোলদিঘির রাতে, শীতে মাল্যবানের চুরুট তার মনের ভেতরে সেই ছেলেবেলার শীতরাতে শান্তর মার আগুনে খাপড়ার মত কেমন একটা নিঃশব্দতা নিশ্চয়তা শান্তির অবতারণা করছিল। বাড়ির দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ির খুব কাছাকাছি এসে পড়ে মাল্যবান বলেছিল, কাকে যেন বলছিল; 'কী গো, গোলা মরা সব চলে গেছে—রঙের গোলামও-বল। বিশটা বছর হস্কে গেছে চোখ না পাঁজলাতেই। মুন শ্বশুরবাড়ি, আর আমাদের বাড়ি সায়েব বিবি ওপরের ঘরে—বলো! বিছানাটা বেশ দু'জনের মতন উম্-উম্, কুসুম-কুসুম, শীত-রাত আর শেষ নেই বলো?' দুপুর-রাতে ঠাণ্ডা নদীর পারে শামকলের মাথাটা যেন ঢেঁকির পাড়ের মত উঠছিল পড়ছিল, যখন 'বলো-বলো।' বলছিল মাল্যবান। কথা বলতে-বলতে মাল্যবান হি-হি করে নিজের ঘরে ঢুকে লেপ টেনে নেয়; খুব বেশি অন্ধকারে খুব বেশি ঘুমের ভেতরে মানুষের শরীর বলে কোনো জিনিস থাকে না, মনটাও কাঠ হয়ে যায়, হঠাৎ জেগে উঠলে কাঠে আগুন লেগে যায়; আচমকা জেগে-জেগে ওঠে সারারাত, পুড়তে-পুড়তে সকালবেলা মাল্যবান জাগ্রত চেতনার অন্য আরেক রকম আগুনের ভেতর জেগে উঠল। এখানে 'বলো-বলো'-র চালাকি চলবে না শামকল শালার; প্রতিটি সেকেন্ড-মিনিট গুনে-গুনে অগ্নিকৃকলাসকে রূপকের মিথ্যে বলে বিদায় দিয়ে, আগুনকে সত্যিই আগুন বলে গ্রাহ্য করে পদে-পদে এগিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া কোনো উপায় নেই, কোনো পথ নেই আর।

একদিন মাল্যবান অফিসে গিয়ে শুনল যে, অফিসের কেরানি মনোমোহনবাবুর স্ত্রীর ভয়ঙ্কর অসুখ—মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে তাকে আনা হয়েছে।

'ঘাবড়াবেন না মনোমোহনদা, সেরে যাবে—' বললে মাল্যবান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সেদিন সমস্তটা দিন অফিসে মনটা তার উৎপলার জন্যে কেমন অসুবিধে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

সন্ধ্যের সময়ে বাসায় গিয়ে পোশাক না ছেড়েই সে ওপরের ঘরে চলে গেল। গিয়ে দেখল, উৎপলা আর মনু ছাদে বসে আছে– কার অসুখ, কোথায়?

'তুমি ভাল আছ তো উৎপলা? আমাদের অফিসের মনোমোহনবাবুর স্ত্রীর বড্ড অসুখ–'

'কী অসুখ, বাবা?' মনু জিজ্ঞেস করল।

'সে কী-এক রকম অসুখ, স্টোন হয়েছে–'

'সে আবার কী?'

'কী জানি।'

মাল্যবান খানিকক্ষণ আলো-আবছা চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভারি ভাবুক হয়ে পড়ল; একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'মনু, যা আমরা খাই, তার ভেতরে নানা রকম জিনিস থাকে, হজম হয় না, ভেতরে-ভেতরে স্টোন হয়–'

'পেটে হয় স্টোন?'

'না, পেটে না, কিডনিতে হতে পারে–গলব্লাডারে হতে পারে–'

'কিডনি কী, গলব্লাডার কী–?' জিজ্ঞেস করাতে মাল্যবান হাত দিয়ে নিষেধ জানিয়ে বললে, 'ও-সব তোমার জানবার দরকার নেই–'

'ভাতের ভেতর যে-কাঁকর থাকে, সেগুলো জমে গিয়ে বুঝি কিডনিতে?' মনু বললে।

'না, তা নয়, তা ঠিক নয়–'

'ও তো আমার পেটেও হতে পাবে–' উৎপলা বললে।

'না, তা কী করে হবে, উৎপলা–'মাল্যবান শিশুর মুখে ভূতের গল্প শুনে একটু হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললে।

'হবে না? তোমার ঠাকুর খুব দেখে-শুনে চাল ধোয় আর ভাত রাঁধে, উৎপলা বললে, 'এক-একদিন খেতে বসে দেখি কাঁকর পাথরের কাঁড়ি। গ্রাসে-গ্রাসে পেটে ঢুকাচ্ছে, স্টোন হবে না তো কী হবে–'

'ওতে স্টোন হয় না–ওটা–' যা-হোক মাল্যবান ঠাকুরকে ডাক দিল।

'ভাতে কাঁকর থাকে কেন?'

ঠাকুর আপত্তি করতে যাচ্ছিল, মাল্যবান বললে, 'ফের যদি কাঁকর পাথর নুড়িকুচি কিছু দেখি, তা হলে তোমার মাইনে কেটে তোমাকে তাড়িয়ে দেব আমি। খবরদার।'

ঠাকুর চলে গেলে উৎপলা বললে, 'ওকে বকে কী লাভ। যারা চাল নিয়ে বজ্জাতি করে সে-সব ওপরওয়ালাদের পেটের ভাত চাল করে ছাঁকব আমাদের চালুনিতে; নাও, সে-সব পেটোয়া চাল কয়েক বস্তা নিয়েসো দিকি। পারবে? মাঝখান থেকে ঠাকুরটাকে ঝাড়লে। কী রকম বেকুব তুমি।'

'এবারে আমি চালওয়ালাকে কড়কে দেব,' অফিসের ধরাচূড়া-পরা মাল্যবান একটা হাই তুলে বললে।

যে-আগ্রহ ও উদ্বেগ নিয়ে উৎপলাকে সে দেখতে এসেছিল, তা তার ধীরে-ধীরে ধোঁয়ার ভেতর মিলিয়ে যেতে লাগল যেন। মনোমোহনের স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে সমস্তটা দিন অফিসের কাজকর্মের ভেতর উৎপলার জন্যেও যে দুশ্চিন্তা হয়েছিল, বৌয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ খিটিমিটি করে সেই বিষণ্ন, ভাল জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল একেবারে। খারাপ হল–খুব খারাপ হয়ে গেল সব। অফিসের থেকে এ-রকম হ্যাঁচকা ছুটি নিয়ে বাড়িতে না এলেই ভাল হত।

'স্টোন হয়েছে–তারপর কী হল–মরে গেল?'

'না মরবে কেন? তা হলে বেচারির চলবে কী করে?'

'কোন বেচারির?'

'মনোমোহনদার।'

'মনোমোহনবাবু তোমাদের অফিসের কেরানি?'

'হ্যাঁ, নিচের দিকের; মাইনে পঞ্চান্ন টাকা, বড্ড মুশকিল মনোমোহনদার।'

'মনোমোহনবাবুর বৌয়ের জোর কপাল বলো–'

'কেন?'

'পারানির দিকে চলেছে–বৈকুণ্ঠে যাবে–কেরানির টাকায় টিকছে না আর–'

উৎপলা হাঁসফাঁস করে বললে, 'পেটে আমার কী যেন হয়েছে, মনে হয়–'

'কী হল?'

টিউমার হয়েছে মনে হয়–'

'কে বললে?'

'বলবে আবার কে? টের পাচ্ছি। এর অষুধ কী? অপারেশন করতে হবে?'

মাল্যবান সন্দিগ্ধ চোখে তার স্ত্রীর দিকে তাকাল: সত্য কথা বলছে? কী করে বুঝবে, কথাটা অসত্য? সুবিধের লাগছিল না তার। কোনো কিছু স্থির করে নয়, এমনিই কথা একটা-কিছু বলতে হবে বলেই মাল্যবান বললে, 'ও টিউমার নয়। ও কিছু নয়। ও তোমার মনের ধোঁকা।'

উৎপলা কথা খরচ করতে গেল না আর। মেঝের ওপর বসেছিল–বসে-বসে হাঁসফাঁস করতে লাগল; উঠে দাঁড়িয়ে হাঁসফাঁস করতে লাগল।

চার-পাঁচ দিন কেটে গেছে। মাল্যবানের কেমন যেন–কেন যে, কিছুই ভাল লাগছিল না।

'চলো, আজ একটু বেড়িয়ে আসি–'

'কোথায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চলো, আজ একটা গড়ের মাঠের দিকে যাই–' মাল্যবান বললে।

'থাক।'

'চলো, ভরসাঁঝে এ-রকম একা-একটা ছাদে বসে থাকলে মন খারাপ লাগবে–'

উৎপলা উঠে দাঁড়িয়ে বড় বাতাসে ফুল ধরা বাবলার মত হুড়মুড় করে কেঁপে পাক খেয়ে উঠে বললে, 'এই যে ছিরঙ্গ-ঠাকুরপো একটা বেহালা এনেছ দেখছি–' শ্রীরঙ্গ বললে, 'হ্যাঁ, কিছু দিন থেকে শিখছি–আচ্ছা, দেখ, কেমন বাজাই–'

'আচ্ছা কেত্তনের সুরই ধরছি।'

'কোচে বসো ঠাকুরপো। বাঃ, দাঁড়িয়ে কেন?'

'আমি দাঁড়িয়েই সুবিধে পাই; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নবনী মল্লিক বেহালা বাজায়। আমায় শিখিয়েছে সে।'

নবনী? পুরুষ, না মেয়ে?' মাল্যবান জিজ্ঞেস করল।

'অবনী যদি পুরুষ হয়, তা হলে নবনী কী হবে?' আড়চোখে মাল্যবানের দিকে একবার তাকিয়ে বিদ্যুতের ভরা ব্যাটারির মত সম্পন্ন সফল দৃষ্টিতে উৎপলার দিকে তাকাল শ্রীরঙ্গ।

'অবনী নবনী দু'ভাই? নবনীবাবু আপনার দাদা?' মাল্যবান বললে।

'আমি তো মল্লিক নই।'

'তবে?'

'পলা বৌদি জানে আমার কুলের খরব–'

'ওরা রামবাগানের দত্ত,' উৎপলা বললে।

উৎপলা শ্রীরঙ্গকে জিজ্ঞেস করলে, 'নবীন কি মল্লিকবাড়ির মেয়ে, রাজেন মল্লিকের–'

'হবে এক মল্লিকের; ব্যাটাছেলে নয় নবনী, মেয়ে বটে। পলা বৌদি, বেহালাটা বাজাই তা হলে?' ঘাড় কাত করে গোলাপজাম কামরাঙ্গা লটকান বনের কেমন এক অমায়িক হলুদ পাখির মত জিজ্ঞেস করল শ্রীরঙ্গ।

'বাজাও-বাজাও।'

'কেত্তনের সুর?'

'বাজাও।'

'না, কেত্তনের সুর নয়–' উৎপলা নিজেকে তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বললে।

'কেন?'

'বেহালায় তা বাজবে না। তুমি একটা অন্য সুর বাজাও শ্রীরঙ্গঠাকুরপো। যাকে বলে বেহালার সুর–'

শ্রীরঙ্গ বেহালা কাঁধে গুণীর মত দাঁড়িয়েছিল। এবারে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল-বাঁ পা পিছনের দেয়ালে ঠেকিয়ে, 'ব্যয়লার সুর মানে?'

'মনোমোহন ব্যয়লাদারকে চিনতে তুমি' উৎপলা বললে।

'না তো। কোথাকার?'

'চব্বিশ পরগনার। আমি তাকে প্রায়ই একটা চমৎকার সুর ভাঁজতে বলতাম। কোনো গানের সুর সেটা নয়। সেটা ব্যয়লার সুর। মনোমোহন মন্ত্রী লোকটার নাম।'

'ঐ একই সুর বাজাত?'

'একই সুর।'

'বরাবর?'

'বার মাস। আমাদের দেশের বাড়িতে শীত পড়লে আসত। কার্তিক মাসটি কাটিয়ে যেত। লোকটার নাম যা বললাম, মনে আছে তোমার?'

একটা শামুক; না, কী যাচ্ছে, দেখাবার জন্যে হাঁসের মত ঘাড় কাত করে শ্রীরঙ্গ ঘাড়টাকে আবার সোজা করে নিয়ে বললে, 'মনে আছে, মনোমোহন মন্ত্রী। এইবার বাজাই?'

'বাজাও। বাজাও। আয় মনু, আয়। নবীন মল্লিক রাজেন মল্লিকের বাড়ির, না?'

'না।'

'তবে?'

'ওদের বাড়ি জলপাইগুড়ি না কোথায় যেন ছিল; এখন কলকাতায়ই থাকে। ও হল কেষ্ট মল্লিকের মেয়ে, টালিগঞ্জের।'

'বড়-সড় মেয়ে?'

'মনুর চেয়ে বড়, তোমার চেয়ে ছোট, বেশ সোমথ মেয়ে। ভারি সুন্দর। টলটলে মাকালের মত যেন তেল চুয়ে পড়ছে চামড়ার থেকে; হাত বুলিয়ে নিলে ঘাসের শিশির উঠে আসে যেন ভোরবেলার। তাল বাজিয়ে। মোক্ষম গাইছে, মাইরি। আমি ওকে আমার গাইয়ে বৌ বলি–'

'ওকে বিয়ে করেছ তুমি'

'না। এমনিই মশকরা করে বলি।'

শ্রীরঙ্গ বললে, 'বেয়ালার আর্টিস্ট কাউকে বিয়ে করে না। অবিশ্যি তোমার মতন কাউকে পেলে বিয়ে করে, কি, না করে–বছরে কত দিন শনি-মঙ্গলবার টের পাইয়ে দিত আমাকে–কিন্তু কাউকে কোথাও পেলুম না–দেখলুম না তো তোমার মত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-রকম কথা শুনে নাক-মুখ লাল হবার বয়েস না থাকলেও সেই বয়েসের যে রক্ত এখনও আছে উৎপলার, চলকে উঠেছিল।

'সেই মাঠকোঠা, নেবুতলা, শোভাবাজার, পাথুরেঘাটা, কুমারটুলি, আহিরিটোলা, বৌবাজার, চিৎপুর, হাতিবাগান, রাজাবাজার, ধর্মতলা—সমস্ত কলকাতা আমার পায়ের নিচে পলা বৌদি—কিন্তু তোমার তমন এমন হাতি খেতে কাউকে তো দেখলুম না।'

উৎপলা একহাত পেছিয়ে চমকে উঠে বললে, 'হাতি খেতে?'

'হ্যাঁ, সে অনেক দূরের সমুদ্রে শ্রীমন্ত সদাগর যেমন দেখেছিলেন—'

উৎপলা খানিকটা বিলোড়িত হয়ে উঠে বললে, 'তুমি বুঝি শ্রীমন্ত সদাগর?' বেহালায় একবার ছড়ি টেনে উৎপলার দিকে চোখ তুলে শ্রীরঙ্গ বললে, 'আর তুমি দাঁড়িয়ে আছ পথের ওপরে, কিন্তু হাতি খাচ্ছ কেন, বলো তো কামিনী—'

'কমলে কামিনী বলো,' উৎপলা ফোঁড়ন দিয়ে বললে, 'কামিনী নয়। দেখছ না ওঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন-'

একটু এগিয়ে চাপা গলায় বললে শ্রীরঙ্গকে।

শ্রীরঙ্গ বেহালায় এবার একটা সুরই ভাঁজতে লাগল—খুব মন দিয়ে, কিন্তু তার চেয়েও নিবিদ নিবেশে মননের অপর বস্তুতে লেগে থাকতে চেয়ে; বুঝছিল উৎপলা; অনুভব করছিল একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে মাল্যবান। কিন্তু বাজাতে-বাজাতে-হঠাৎ মাঝখানে থেমে গেল শ্রীরঙ্গ।

'অনেক দূরের এক সাগর; দেখা যাচ্ছে নিরালা জল, রোদ। সেখানে পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—শ্রীমন্ত সদাগর দেখলেন,' শ্রীরঙ্গ চোখ বুজতে-বুজতে চোখ মেলে ভাল করে তাকিয়ে একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি হাতি খাচ্ছ কেন, পলা?'

'কী খাব তা হলে?' শ্রীরঙ্গের দিকে তাকিয়ে, মাল্যবান যে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা জানতে না চেয়ে নিজেকে একটু বেশি ছেড়ে দিয়ে বললে যেন উৎপলা।

'শ্রীরঙ্গ হঠাৎ চারদিকে চোখ ফিরিয়ে বললে, 'ওঃ এই যে মাল্যবানবাবু; এখানে দাঁড়িয়ে আছেন দেখছি; আমার চোখেই পড়ে নি। আচ্ছা, আমি বাজাই বেশ দুর্দান্ত একটা গৎ। শোন মনু, শোনে মনুর মা, শুনুন মাল্যবানবাবু।'

রাত দুটোর সময় খুব কাছাকাছি কোন বাড়ির ভেতর বড় কান্নাকাটি পড়ে গেল; মাল্যবানের ঘুম গেল ভেঙে। তাড়াতাড়ি বিছানার থেকে উঠে কম্বল গায়ে দিয়ে সে দরজা খুলে রাস্তায় নামল। তাকিয়ে দেখল ধীরেনবাবুদের সদর দরজার কাছে ভিড় জমে গেছে। ঢুকে দেখল, একটি মেয়েমানুষের শব নিচে নামানো হয়েছে—মেয়েটির বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে হয়তো, এমন সুন্দর শান্ত নিরিবিলি মুখ-কপাল চুল সিন্দুরে মাখা-মাখা-দেখে তার প্রাণের ভেতর কেমন যে করতে লাগল! অন্ধকার শীতের ভেতরে সে চুপে-চুপে নিজের ঘরে ফিরে এল আবার; খানিকটা সময় অবসন্ন হয়ে নিজের বিছানার ওপর বসে রইল; তারপর আস্তে-আস্তে সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে ওপরে গিয়ে দাঁড়াল।

মাল্যবান দেখল, উৎপলা আর মনু বিছানায় উঠে বসে আছে। একটা চেয়ারে বসে মাল্যবান বললে, 'আমিও ভেবেছিলাম, তোমাদের ঘুম ভেঙে যাবে—'

'কারা কাঁদছে?'

'ঐ ধীরেনবাবুদের বাড়ি—'

'কী হল?'

'সত্যেনের স্ত্রী মারা গেছে।'

'আহা, সেই রমা!'

হ্যাঁ।'

'কীসে মরল?'

'জানি না তো।'

'বাঃ, আমরা জানতেও পারলাম না।'

'হঠাৎ হয়ত মারা গেছে—কোনো রোগ হয়েছে বলে শুনি নি তো।'

'হার্ট—ফেল করল। কিন্তু ওর স্বামী তো পুরুষমানুষ যাকে বলে। গলায় গামছা দিয়ে মেয়েমানুষকে ও-রকম জামাই টেনে আনতে দেখি নি তো কোথাও—অনেক জামাইষষ্ঠী তো দেখলুম—' উৎপলা বললে।

'এবারকার জামাইষষ্ঠী হয়ে গেছে, মা? কী মাসে জামাই ষষ্ঠী হয়, মা?'

মনুকে কনুই দিয়ে ঠেলে ফেলে উৎপলা বললে, 'সুখের পায়রার ঘাড়ে সোহাগের পায়রা করে রেখেছিল তো বৌকে। মেয়েটা এ-রকম ভিরমি খেল কেন গা।'

'কীসে কী হয়েছে, কে জানে', চানের সময় সমস্ত মুখে সাবান মাখতে-মাখতে মানুষ যেমন সংক্ষেপে কথা সারে, তেমনি ভাবে বললে, মাল্যবান।

'আহা, দুটো কচিকাঁচা মেয়েও তো রয়েছে, ওদের কী হবে।'

'সকলে মিলে দেখবে। অমন বাবা আছে। ঠাকুমা, পিসিমারা রয়েছে, যেন চোখে সাবান না যায় সে দিকে দৃষ্টি রেখে কটাকট—কটাকট কথা বলছে মাল্যবান—চানের সময় যেন—মনে হচ্ছিল।

'তা পাড়াপড়শি মরেছে, যেতে নেই?'

'আমি গিয়েছিলাম।'

'গেলে তো চোরের মত, চলে এলে আবার?'

'তোমাদের একা ফেলে এ-রকম অবস্থায় বেশিক্ষণ তো সেখানে থাকা যায় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহা-হা, শিমুলের তুলো উড়তে-উড়তে মাদারকাঁটায় গিয়ে ঠেকেছি আমরা। ধনেশপাখি এসে ঠোঁট নেড়ে খসিয়ে দেবেন–' উৎপলা এক গা, জ্বালাতন ঝেড়ে দাঁতে দাঁতে ঘসে বললে।

'আহা-হাঁ!–আহা-হাঁ!–' বলতে লাগল উৎপলা।

'বিছানার থেকে নেমে আলনার থেকে একটা ধোসা পেড়ে গায়ে বেশ আঁটোসাঁটো জড়িয়ে নিয়ে উৎপলা বললে, 'আয় তো মনু কোটটা গায়ে দিয়ে।'

মনুকে নিয়ে ধীরেনবাবুর বাড়ির দিকে রওনা দিল সে।

লৌকিকতা রক্ষা করছে, ভালই, ভাবছিল মাল্যবান; কিন্তু মনুকে সঙ্গে নিচ্ছে কেন? সমাজিকতা রক্ষার জন্যই শুধুই যাচ্ছে না উৎপলা-যাচ্ছে দশ–পাঁচ রকম দেখবে বলে; হৃদয় আধার উৎপলার, বাইরের পৃথিবীটাও খুব সক্রিয় (আজ দুপুর-রাতেও), কয়েক ঘণ্টার খোরাক জুটল উৎপলার। মাল্যবান অন্ধকারের ভেতর একটা বিড়ি জ্বালাল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটা ফেলে দিয়ে নিচে নেমে সদর দরজায় তালা মেরে ধীরেনবাবুদের বাড়িতে যাবার মাঝরাস্তায় উৎপলাকে পেয়ে বললে, 'এই নাও চাবি।'

'চাবি আমি কী করব?'

'নাও। আমি শ্মশানে যাচ্ছি।'

উৎপলা ঠোঁট রসিয়ে বললে, 'পাড়ায় আর বামুন নেই, কাশীঠাকুর চিড়ে খাবে–'

'নাও, চাবিটা নাও, ধরো–' মাল্যবান চাবিটা গছিয়ে দিয়ে বললে।

'শ্মশানে যাবে মশানে যাবে, সেই একদিন যাবে, যাবে তো। নাও, পথ ছাড়ো–পথ ছাড়ো দিকিন, চৌখুপ্পি কম্বল জড়িয়ে রমাদের বাসায় রঁ-অলা রাঘববোয়ালের মত হোঁৎ করে উড়িয়ে উঠবার কোনো দরকার নেই তোমার–'

'কতা শোনা। কতা? মনটা একটু রঙে চড়ে ছিল বলে মাল্যবান 'থ'-কে 'ত' বানিয়ে দিয়ে বললে, 'রাঘববোয়াল আবার রঁ-অলা হয় না কি। কতা শোনো! কতা!' হি-হি করে কাঁপতে-কাঁপতে এগিয়ে গেল সে; যেন বীরজননীর ছেলে–দেশের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে; এ না হলে উৎপলাকে চমৎকৃত করে নেওয়া যাবে না।

কেমন যেন একটা প্রবল ছেলেমানুষি বীরপুরুষি ঝাপটা পেয়ে বসল তাকে; চমৎকৃত করে দেবার কী দরকার, ভাবতে গেল না সে; তার চেয়ে শীত রাতে নিচের ঘরের বিছানা-কম্বল যে সত্যিই ঢের পরিচ্ছন্ন সত্য শান্ত–মূল্য-মীমাংসার পৃথিবীতে সেটা ভুলে গেল।

মড়া পুড়িয়ে বেলা দুটোর সময়ে বাড়িতে ফিরে এলে উৎপলা বললে, 'আজকে অফিসটা বাদ দিলে তা হলে?'

'কী করব, পাড়াপড়শি যদি মরে যায়।'

'কী করলে শ্মশানে গিয়ে।'

'যাই, চৌবাচ্চায় চান করে আসি–' বলে মাল্যবান দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পিঠে গামছা ঘষতে লাগল।

'সত্যেনবাবু গিয়েছিলেন শ্মশানে?'

'ও মা, তিনি যাবেন না!'

'ও মা, চোখ পাল্টালে যে! শুদোচ্চি। কতক্ষণ ছিলেন তিনি?'

'কোন এক সময় কেটে পড়লেন, টের পেলাম না।'

'কেটে পড়লেন' কথার রকম দেখ। ওকে তো সবাই ধরাধরি করে শ্মশান থেকে নিয়ে এসেছে। খেদার হাতির মত কেমন অবলা উতলা হয়ে পড়েছিলেন শুনলাম। খুব কেঁদেছেন?'

'হ্যাঁ, কেঁদেছেন বটে। দু-চার বাটি।'

'খুব লেগেছে ভদ্রলোকের,' উৎপলা বললে, 'তবু পুরুষমানুষ তো। লেজ দিয়ে ডাঁশ উড়িয়ে আবার কলাগাছ খেতে শুরু করবে; এই তো হয়ে এল বলে। বনের হাতি পোষা হাতি হবে এবার, দোজবরে সত্যেনের বৌয়ের বিয়ের নেমন্তন্নে কলার পাত পড়ল বলে।'

'এ বৌ তোমার বাপের বাড়ির দেশের বুঝি? নিত-কনে হয়ে আসর জাঁকিয়ে বসবার শখ?' মাল্যবান শরীরটাকে, মুখটাকে (যেন তা ফোকলা হয়ে গেছে) একটু নাচিয়ে হাসিয়ে বললে, 'সত্যেনের বিয়েতে কলার পাত দিয়ে করবে কী তুমি। হাতি হয়ে সত্যেন কলাগাছ খাবে, বলছিলে, তো তুমি; কামিনী হয়ে সেই হাতিকেই খাবে তো তুমি। বাঃ, কেমন কামিনীর মত পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে উৎপলা!'

উৎপলা উঠে দাঁড়িয়েছিল। আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে বললে, 'বেশ তিরিখ-তিরিখ জবাব দিচ্ছ তো তুমি, যে যাই বলুক, এই ভর-সন্ধ্যেবেলা। নাও, চান করে এসো, চা খাবে এসো।'

একটি মৃতা–খুব অল্প বয়সেই-দগ্ধ হয়েছে শ্মশানে। একটি স্বামীর শোক খুবই জায়াকেন্দ্রিক, এখনও গভীর। কিন্তু এখনই তরল হয়ে যাচ্ছে সব; সচ্ছল সফল সময় ব্যথা, বাচালতা, সরলতা, নষ্টামি, ভয়, রক্ত, রিরংসা, অনাথ অন্ধকার ও গভীরতার ভেতর মৃত্যু নয়, শূন্য নয়, ব্যক্তি জীবন নয়, অফুরন্ত অনির্বচনীয় সময়–সময় শুধু।

রমা মারা যাওয়ার পর থেকেই মাল্যবান মাঝে-মাঝে কেমন সব মৃত্যু ও দাহের স্বপ্ন দেখত রাতের বেলা। একদিন সে দেখল, নিজে মরে গেছে, তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল; সেখানে সে খুব অমায়িক ভাবে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, সকলকে নমস্কার জানাচ্ছে, বিদায় নিচ্ছে বলছে; আপনাদের সঙ্গে আর তো দেখা হবে না, কোথায় যাই, কে জানে।

জেগে উঠে তার মনে হল; এ কী অদ্ভুত! হলই-বা স্বপ্ন, কিন্তু স্বপ্নের ভেতরেও মরে তো গিয়েছিল সে; মরে গিয়ে মানুষ আবার বসে-বসে জীবিত মানুষদের সঙ্গে কথা বলে কী করে! বাস্তবিক, স্বপ্ন এমন হিজিবিজি–মানুষের বুদ্ধি, বিচার, চেতনার দু-কান কেটে ছেড়ে দেয়। অনেকে বলে স্বপ্ন সত্য হয়। বাস্তবিক, মরে যাবে কি সে? শীতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

গভীর রাতে অন্ধকারকে মিশ-কালো করে দিয়ে বেশি অন্ধকারের প্রবাহের ভেতর–ভাবতে-ভাবতে–ভাবতে গিয়ে কেমন যেন ন্যাতা জোবড়ার মত হয়ে পড়ল সে। নিজের জন্যে ততটা নয়–কিন্তু সে মরে গেলে উৎপলার উপায় হবে কী? মনু আর উৎপলার জন্যে মনটা তার নিজের চেয়ে ঢের বুড়োমানুষের মত গুঁইগাঁই করে উঠল। বিছানায় উঠে বসল; চটি পায়ে দিয়ে কম্বল জড়িয়ে আস্তে-আস্তে ওপরের ঘরে গেল সে। গিয়ে দেখল, উৎপলা ঘুমিয়ে আছে–পাশে মনু-সেও ঘুমিয়ে। বেশ শান্ত নিরাময় নিশ্বাস তাদের। ওরা অন্তত কোনো দুষ্ট স্বপ্ন দেখে নি। বেশ। এদের দিকে তাকালে আশ্বাস পাওয়া যায়। কিন্তু, তবুও, এর স্বামী আর ওর বাবা যদি মরে যায়, তা হলে এ-রকম করে দু'জনে ঘুমোতে পারবে কি আর? জেগেও উঠতে পারবে না আর, জাগরীতে ঘুরেফিরে বেড়াতে পারবে না আর সহজ সফল ভাবে।

কিন্তু, তবুও, শেষ পর্যন্ত সত্যিই মরে সে তো যায় নি, বেশ সুস্থ হয়ে বেঁচে আছে। আছে। আমাদের জীবনের নদীর নাম-অনুত্তরণ,-মাল্যবান ভাবছিল, কোথাও কেউ উত্তীর্ণ হতে পারে না, কোনোদিন এ-নদীর পথে; কিন্তু তবুও, কত লোক ব্যথা বিপদ বিফলতা মৃত্যুর বলে প্রতিদিন ওতড়াচ্ছে; উৎপলা, মনু পারবে না কেন? মানুষ হয়ে জন্মালে নানা রকম দুর্নিবার শাস্তি ভোগ করতে হয়–করতেই হয়; মনু উৎপলা বাদ যাবে না; মাল্যবান মরে গেলে মানুষের সে-পাওনা বুঝে নিতে হবে স্ত্রী-সন্তানকে; কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয়; চুপ হয়ে যায় সব, শান্ত নিশ্চুপতা রয়েছে। প্রথমে মাল্যবানের মৃত্যু–তারপরে অনেকদিন পরে হয়তো তার স্ত্রী আর সন্তানের মৃত্যু; এই ত্রিমৃত্যুতে নিস্তব্ধ হয়ে যাবে সব। সময়ের কাছে মাল্যবানের দায়িত্ব ফুরিয়ে যাবে। ভাবতে-ভাবতে এখনই যেন ফুরিয়ে যাচ্ছিল সব–এই রকম একটা অনুভব ঘিরে রাখছিল মাল্যবানকে।

কিন্তু, আরেকদিনের স্বপ্ন সব-চেয়ে ব্যথা দিল তাকে। দেখল, উৎপলা মরে গেছে। স্বপ্নের ভেতর মনে হল, উৎপলা সত্যেনবাবুর স্ত্রী–সমস্ত পৃথিবীই তা জানে–মাল্যবান নিজেও খুব ভাল করেই জানে যে, দশ-বার বছর ধরে এরা পরস্পরের বৈধ স্ত্রী-স্বামী; এদের এ-রকম সম্পর্ক নিয়ে কোনো খটকার বাষ্প নেই মাল্যবানের মনে। কিন্তু তবুও, সেই সঙ্গে সেই স্বপ্নেই উৎপলা মাল্যবানের স্ত্রী-ই–আর কারুর কিছু নয়: এ-রকম সব খাপছাড়া জিনিস স্বপ্নের ভেতরে খুব সত্য ও স্বাভাবিক বোধ হচ্ছিল। দেখা গেল, উৎপলা মরে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে–সমস্ত চুল এলোমেলো, কপালে-মাথায় সিঁদুর ধ্যাবড়া, পরনে–আশ্চর্য!–বিধবার থান। মড়ার খাটিয়ার ওপর শুয়ে মরা নারী মনের, মাংসপেশীর নানা রকম নম্র, উদ্দাম আক্ষেপে নিজের মৃত্যুর বেদনা সত্যেনকে জানাচ্ছে, কিন্তু শূন্যতা ও হাহাকার বিঁধছে মাল্যবানকে মর্মস্নায়ুতে।

ঘুম ভেঙে গেল তার।

তখন শেষ রাত।

কম্বলের নিচে সমস্ত শরীর ঘেমে গেছে মাল্যবানের। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে খালি পায়ে ওপরের ঘরে চলে গেল। গিয়ে দেখল, মনু বিছানায় উঠে বসে আছে–উৎপলা নেই। নেই, থাকবে না, বলে দিয়েছে তো স্বপ্ন। তার সঙ্গে গাঁথা এই নাস্তিত্বটা বুঝি। নেই।

'তোর মা কোথায়, মনু?'

'বাথরুমে গেছে।'

আছে তা হলে; কিংবা হয়তো নেই; কী মানে আছ এত বেশি শীতে শূন্যতায় প্রসন্ন রাতে দূর বাথরুমের অন্ধকারে মানুষের অস্তিত্বের, মনুর মুখের 'বাথরুমে গেছে' নির্দেশের।

'কখন গেল?'

'এই তো, এখুনি।'

'এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো অসুখটসুখ করে নি তো?'

'কার? মার?' মনু মাথা নেড়ে বললে, 'না তো।'

'কোনো অসুবিধে হয়েছিল? কাঁদাকাটি করেছিল?'

চোখের ওপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে নিয়ে মনু বললে, 'না তো। আমি দেখেছি, কাঁদে নি। কে বললে মাকে-তুমি বলেছ কাঁদতে?'

'না রে।' মাল্যবান দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, চেয়ারে বসল এবার।

মাল্যবান সদ্য স্বপ্নছুট বিতর্কাসক্ত মনকে বলছিল, সত্যেনবাবুর কাছে খিচে-দুমড়ে দীনতায় দাবনা কাঁপিয়ে সে কী আক্ষেপ, কান্না–নিজে মরে গেছে বলে! বাস্তবিক, স্বপ্ন বড্ড ফিচেল–নিরেট নিজিস; খ্যাঁট মেরে বদহজম হলে ও-সব বিলকি-ছিলকি স্বপ্ন দেখা যায়, এই যারা ভাবে, তারা কি কিছু জানে? স্বপ্ন হচ্ছে অন্তিম জিনিস–এর পর আর-কিছু নেই; ছোট অন্ধকার আর বড় অন্ধকারের টানা-পোড়েনে রাতের আলোয় অন্তিম ঘনিয়ে উঠলে স্বপ্ন দেখা যায়–দুঃস্বপ্ন; ভাল স্বপ্নও আশ্চর্য রকমের স্নিগ্ধ স্বপ্ন সব–

'এখন কটা, বাবা? ভোর হয়ে গেছে না?'

'না। ঘুমুবে না কি? ঘুমোও, ঘুমোও।'

'ময়লার গাড়িগুলো ঘিনঘিন করছে; ওগুলো ময়লার গাড়ি, না? কাক ডাকছে তো। এখন কটা রাত, বাবা?'

'কটা রাত? বলছি তোমাকে।' মাল্যবান বললে। কিন্তু ধারাপাত প্রথম ভাগ নিয়ে মন তার বসে পড়তে চাচ্ছিল না। অমেয় অব্যয় স্বপ্নকূট–ও জ্ঞানবিজ্ঞানগ্রন্থি নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে ছিল তার মন–বৃহত্তর উৎপলা গ্রন্থি পরিধির ভেতর। সব রকম গ্রন্থিকে অতিক্রম করে একটা স্বাভাবিকতার মহত্ত্বে পৌছুবার জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎপলা বাথরুম থেকে ফিরে এসে বললে, 'তুমি এখানে বসে যে–'

'তুমি এখন ঘুমুবে?'

'মতলবটা কী মোতার?'

'না, কিছু না। মনে হল, কোনো অসুখটসুখ করল না কি?'

'কার? আমার?'

'সারারাত বেশ ঘুম হল?'

মাল্যবানের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার তাকিয়ে নিয়ে উৎপলা বললে, 'এখানে এখন কীসের জন্যে?'

'এমনিই এসেছিলাম। রাতে অনেকক্ষণ বইটই পড় বুঝি?'

'অনেক কাজ করি–'

'তুমি মনে করো, আমি বুঝি তোমার কাজের ফর্দ চাইতে এসেছি। না, তা নয়, এমনি কথাবার্তা বলতে এলুম।'

'এখন আমার সময় নেই,' উৎপলা বললে, 'ভাল মানুষের মত নিচে গিয়ে ঘুমোও তো।'

'তুমি এখন আর-এক দমক ঘুমিয়ে নেবে বুঝি?'

'আমার আজ উঠতে দেরি হবে। নিজে চা করে নিও।'

'নেব। দোকানেও খেয়ে আসতে পারি। আজ রাতে তোমার ঘুম হয়েছিল ভাল? আমি কেমন বিদকুটে স্বপ্ন দেখেছিলুম সারাটা রাত।'

উৎপলা লেপের ভেতর চলে গিয়েছিল; শেষ রাতে আর-একটা ঘুম জড়িমার আশ্চর্য ঢেউ এসে পড়েছিল ঠিক বাথরুমে যাবার আগে; এখনও আবেশটা কেটে যায় নি; কিন্তু নিচের থেকে মানুষটা ঠিক এই সময়েই উঠে এল বাদ সাধবার জন্যে!

'তুমি যাও।'

'আজকে রাতে স্বপ্ন দেখেছিলুম, তুমি মরে গেছ।'

'তুমি নিচে যাবে?'

'নিচে আমি যাব বটে,' মাল্যবান কম্বলটা আঁটি করে জড়িয়ে নিয়ে বললে, নিচে যেতে হবে। কিন্তু বিচ্ছিরি সব স্বপ্ন দেখছিলুম সারারাত। পোষ মাসের রাত; পোষলা বলে পাড়াগাঁয়–ধুম পড়ে গেছে সব। পোষলার গাঁজলা বলেন স্বপ্নকে ফ্রয়েড। কিন্তু কী জানেন স্বপ্নের ফ্রয়েড? হিবিয়েনার যত মৃগী রুগি আসত তো তাঁর কাছে; তাদের কফিসেদ্ধর গরম-গরম সুরুয়া বানিয়ে তো আর মানবজীবনের তত্ত্ব বেরয় না।'

মনু বললে, 'মা মরে গেছে, এই স্বপ্ন দেখেছিলে রাত্রে?'

'আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, তোর বাবা উল্টোগাধায় চড়ে সিধে নিয়ে চলেছে–বাজেশিবপুরের ব্রহ্মমোহনবাবুকে দেবে। চলেছে–চলেছে–চলার আর শেষ নেই–উল্টোগাধায় চড়ে চলেছে কোথায়? বাজেশিবপুরের নকড়ি খোসাল বটব্যালের কাছে–'

মনু ফিকফিক করে হেসে উঠল, বললে, 'ভোম্বা! বাজেশিবপুর–বা-জে-শি-ব ন-কড়ি খো-সা-ল–'

অন্ধকারের ভেতর একটা বিড়ি জ্বালিয়ে নিয়ে মাল্যবান ঠোঁট ভেঙে হাসছিল। বেশ ভাল লাগছিল তার; চারদিকে অন্ধকার–হয় তো একটু পাতলা হয়ে এসেছে; তবুও বেশ ভাল, নিশ্চুপ, উচ্ছিষ্ট অন্ধকারে ভরে আছে ঘরটা; খুব শীত; গায়ে গরম পট্টুর ওপর বেশ চৌখুপ্পি কম্বল জড়িয়ে বসেছে সে শীতের ভেতর। ডিমপাড়া নীড়ের দুটো কোলঘেঁষা পাখির মতন উষ্ণ হয়ে রয়েছে যেন তার একা মানুষের শরীর। বাইরে জীবনের সাড়া, চলাচল আরম্ভ হয়ে গেছে–তবুও মুখের নিস্তব্ধ অমরতাও অনেকখানি। ঘরের ভেতর লেপ মুড়ি দিয়ে ভারি আরামেই শুয়ে আছে উৎপলা আর মনু; মরে নি পলা, মনু বেশ ভালই আছে; উল্টোগাধার পিঠে চড়ে বাজেশিবপুরে যাওয়ার কথাটা পলা যা বলেছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে–এই-ই তো বোঝা যাচ্ছে যে, স্থির ঠাণ্ডা তার মাথা। যাক, ভাল আছে ওরা। রাত পোহাতে বাকি আছে খানিকটা সময়। ঘুমোক। মাল্যবান উঠবে, ভাবছিল। বিড়িটাও ফুরিয়ে এল। নিচে গিয়ে চুরুট জ্বালিয়ে বসবে এবার।

পর দিন সন্ধ্যের সময় অফিস থেকে ফিরে চা-জলখাবার খেয়ে মাল্যবান ওপরে এল।

'সেদিন সেই পরটাগুলো কাকে দিয়েছিলে?'

'কোন দিন?'

'ঐ যেদিন বৌঠানের জন্যে বেনারসি কিনতে গেলাম?'

'ওঃ, লোনার মাকে।'

'লোনার মা এসেছিল আর?'

'না।'

'তার ছেলের কী হয়েছে যেন?'

'কুষ্ঠা।'

উৎপলা বললে, 'কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'কুষ্ঠরুগি–তাই ভাবছি–'

'লোনার মাকে আমি বলেছিলাম রোজ এসে ভাত ডাল মাছ নিয়ে যেতে।'

'তা বলেছ, ভালই করেছ, উনুনের আগুনে নিজেকে জ্বালিয়ে তবে এ-সব মানুষকে হাঁড়ির ভাত সেদ্ধ করতে হয়। বড় সন্তাপ এদের–'

'কই, এল না তো আর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কুষ্ঠরুগি কী না, কী হয়েছে–'

'না, বুড়ির কোনো রোগ হয় নি,' উৎপলা বললে।

'আমি বলছি, ছেলের কথা–'

'তা অবিশ্যি, হয়ত কোনো আশ্রমে গেছে।'

'তা হতে পারে।'

বেশি নয়–একটু–আলোড়িত হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছিল মাল্যবান। ঘন-ঘন কয়েক বার চোখের পলক ফেলে বললে, 'আমাকে সেদিন উপোসি রেখে লোনার মাকে পরটা তো দিয়েছ–'

'চেয়েছিল, কেন দেব না?'

'দিয়েছ, ঠিক করেছ। ভালই করেছ। ভালই করেছ–'

মাল্যবান আর কথা বাড়াবে না, ভাবছিল। সেদিনকার সেই পরটার কথা বলবার জন্যেও প্রধানত আসে নি সে; অন্য সব বিশেষ অন্তরঙ্গ কথা বলার তাগিদ; কিন্তু তবুও বললে, 'ওকে দিয়েছ, ভালই করেছ, কিন্তু আমাকেও কিছু দিলে পারতে, সমস্ত দিন অফিস খেটে আসি–'

কবেকার পরটার কথা কপচাতে এসেছে মাল্যবান, উৎপলার গলায় ঝাঁঝ এল, বললে, 'তুমি বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে নিলেই পারতে–'

ভবিষ্যতে আন্যতেই হবে। না হলে আমি ঠকব। কিন্তু তোমাকে বলছিলাম–'

'আমার শুনে দরকার নেই।'

মাল্যবান একটু কঠিন হয়ে বললে, 'কেন, তোমার মাথার দুদিকে দুটো তো কান।'

কঠিনতর হয়ে মাল্যবানের স্ত্রী বললে, 'আমার কান সকলের যা-তা কথা শোনবার জন্যে নয়।'

মাল্যবানের মনে হল, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে সে ভুল পথে চলেছে। সে হেসে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বললে, 'যা বলতে চাই, তা বলা হয় না। অন্য পাঁচ রকম বলে ফেলি। নিজেকে ঠিকভাবে প্রকাশের শক্তি আমার নেই। তুমি কিছু মনে করো না।' উৎপলা একটা চিরুনি তুলে নিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল–চুল বাঁধবে বলে নয়–এমনিই। চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে সে চুপ করে রইল।

'সেদিনের মত ঘরোয়া আলাপ শেষ হয়ে গেল। নিচে চলে গেল মাল্যবান। কিন্তু সেদিনকার বিকেলের পরটা–জলখাবারের কথা নিয়ে ঢেঁকিতে পাড় দিতে সে চায় নি তো; অভিপ্রায় ছিল তার সূক্ষ্ম গভীরতর অনেক কিছুর কিনারা ঘেঁষে কথা বলার।

কথা শেষ হলে স্বাদ। অন্য সফলতা।

কিন্তু হল না কিছুই।

মাল্যবান প্রাণধারণের ব্যাপারে কেমন যেন খারিজ হয়ে নিচে নেমে গেল। কিছুই ভাল লাগছিল না তার।

স্ত্রীর গরজের কথা হচ্ছিল এতক্ষণ–মাল্যবান নিজের ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল, বাস্তবিক, বাড়ির গিন্নির স্পৃহার সম্পূর্ণ অভাবের জন্যেই এই ঘরটা একেবারে হতচ্ছাড়া হয়ে রয়েছে–ওপরের ঘরের পরিপাটির পাশে এ-ঘরটা কেমন থুবড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

মনটা তার সেকেন্ডখানেকের জন্যে কেমন একটা মোচড় দিয়ে উঠল, কেন, সে এমন ঘরে পড়ে থাকবে? সমস্ত ঘরগুলোর ভাড়াই কি সে দেয় না? সমস্ত সংসারটাই তো তার টকায় চলছে। কিন্তু তবুও–

সে সব গোছাতে মন দিল।

কেরোসিন কাঠের টেবিলগুলো বাইরে বার করে দিল, আলমারিটা ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করল, ঝাড়ু মেরে চারদিকের ঝুল ঝেড়ে নিল, মাকড়শার জাল সাফ করল, অনেক আরশোলা ঝেঁটিয়ে বার করলে, (ফ্লিট, ডি-ডি-টি হাতের কাছে ছিল না কিছুই), পায়ে পিষে মেরে ফেলল, ধোপার জন্যে অপেক্ষা না করে কাপড়ের ডাঁই সে নিজে কাচবে ঠিক করে ফেলল, জারুল কাঠের ছোট্ট টেবিলটার ওপর পরিষ্কার খবরের কাগজ পাতল, ভাবল, বিকেলে একটা কালো জমকালো টেবিলক্লথ কিনে আনবে, একটা ফুলদানি আনবে, কতকগুলো ফুল, দেয়ালে টাঙানোর জন্যে, একটি-কি দুটি, ছিমছাম ছবি।

তাড়াতাড়ি চান করে খেয়ে অফিসে গেল পরদিন সকালবেলা। অফিস থেকে ফিরে আসবার সময়ে দরকারি জিনিসগুলো কিনে আনল; টেবিলের কাপড়, ফুলদানি–

ঘরটাকে ঘন্টা দুই ধরে সাজাল সে। বাইরে তাকিয়ে দেখল, রাত বেশ অন্ধকার। এই শীতের ভেতর চান করার চৌবাচ্চাটা এখন কেউ ব্যবহার করতে আসে না। ওখানে গা-ঢাকা দিয়ে যদি সে কাপড় চাকতে বসে, তা হলে বড় একটা কেউ টের পাবে না। রাত দশটা পর্যন্ত প্রায় কাপড় কাচা হল। উৎপলার ঘরে মিহাংশু, শ্রীরঙ্গ ইত্যাদি কয়েক জন এসেছিল; বেহালার গৎ বাজছিল; উৎপলা নিজে গান শোনাচ্ছে–আরো শোনাবে–বেহালা আরো বাজবে–ওরা (কোরাসে) গাইবে; মাল্যবানের কাছে এ একটা নিস্তারের মত মনে হল; গান-বাজনা যত রাত অব্দি চলে, ততই তার লাভ–কাপড়গুলো কেচে, খাবার আগে, সে একটু জিরিয়ে নিতে পারবে। কেচে, নিংড়ে, কাপড়গুলো সে গোটা দুই বালতি ঠেসে রেখে দিয়ে, চান সেরে, টেরি কেটে, বিছানায় এসে শুল। একটা চুরুট দাঁতে আটকে নিয়ে সুশৃঙ্খল সংযমী জীবনের শান্তি ধীরে-ধীরে উপভোগ করছিল। কিন্তু একটা চুরুট–দুটো চুরুট ফুরল–অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সে, তবুও খাবারের ডাক পড়ল না। আরো অনেকক্ষণ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে হল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। মাল্যবান ধড়মড় করে উঠে পড়ল তারপর, বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ, উঠে বসল তারপর, ঠাকুরকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললে, 'কই, এখনও গান চলছে যে–'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গান আমাদের বাড়িতে নয়।'

'তবে?'

'পাশের বাড়িতে কোথাও–'

মাল্যবান একটু কান পেতে শুনে বললে, 'ও, তাই তো, এ যে কলের গান।'

ওপরের ঘর নিথর পাথরের মত চুপ হয়ে আছে বটে। মাল্যবান সিঁড়ি ভেঙে ওপরে যাচ্ছিল।

ঠাকুর বলল, 'দিদিমণি আর মা ঘুমিয়েছেন।'

'তাই নাকি? তুমি তো আজ অনেক রাত অব্দি আছ, ঠাকুর। ব্যাপার কী? ওরা খেল না?'

'খেয়েছেন।'

'কখন?'

'দুটো বাবুর সঙ্গে খেয়ে নিয়েছেন–'

মাল্যবান একটু চুপ থেকে বললে, 'আমার ভাত আছে তো?'

'তা আছে। আপনাকে এখানে এনে দিই?'

'বেশি কিছু দিও না। কেমন গা বমি-বমি করছে–'

অল্প কয়েক গ্রাস খেয়ে সে উঠল। ঝি এঁটো নিকিয়ে থালা বের করে চলে গেল। ঝি, ঠাকুর বাড়ি চলে গেল।

মাল্যবানের কেমন উল্টো বমি এসেছিল। সে দরজা বন্ধ করে কতকগুলো কাগজ পেতে অনেকক্ষণ ধরে হড়হড় করে বমি করল, অনেক বমি।

মাকে মনে পড়ছিল শুধু তার। অবাক হয়ে ভাবছিল : এই ঘরেই আছেন তিনি–এই অন্ধকারের ভেতরেই দাঁড়িয়ে আছেন বোধ করি; হয়ত আমার বিছানার পাশে এসে বসেছেন; গায়ে, বুকে, পিঠে, হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন; দিচ্ছেন হয়ত–

মাল্যবানের মনে হল : উৎপলাও তো মনুর মা–মা তো সে; মাল্যবানের মায়ের মতন বড়ও হয়ে উঠবে একদিন। নিজের মায়ের সঙ্গে এই মাকে মিলিয়ে ফেলে বৃষ্টির ছিপছিপে ছটফটে জল যেমন পুকুরের সমাহিত সঞ্চিত জলের শান্ত স্বরূপের ভেতর মিশে যায়, তেমনি একটা অব্যাহত মাতৃত্বের সদাত্মাকে চাচ্ছিল যেন সে। তার নিজের মা-যে নেই আজ, দশ-বার বছর আগে নিমতলা ঘাটে যাকে ছাই হয়ে যেতে দেখেছিল মাল্যবান–মাল্যবানের মায়ের অব্যক্ত ইঙ্গিতের মৃত্যু হয় নি তো তবু–ধারণ বহন করবার জন্যে অপর নারী এসেছে এই ঘরে; মা হয়েছে মনুর মা। মাল্যবান আজ মনুর মার স্বামী ঠিক নয়; মাল্যবানের সেই মৃত মা ও জীবিত উৎপলা–এই দুটি নারীকে এক জনের মতন–মায়ের মতন–তার ঘরের ভেতর খুঁজে পাবার জন্যে কেমন অদ্ভুত বিশালাক্ষ অস্বস্তিতে সে চারিদিকে তাকাতে লাগল; আসুক নিজের মায়ের মূর্তিতে, কিংবা আসুক উৎপলার বেশে- দু'জনের ভেতরেই দু'জনকে খুঁজে পাবে সে–পাবে একজন মাকে–মাতৃত্ব : যা এখন মাল্যবান পাবে তার কামস্পর্শহীন জায়াঘ্রাণহীন আনন্ত্যকে। মাল্যবান কয়েকবার ডাক ছেড়ে অস্পষ্টভাবে ডাকল–মাকে, ঠাকুরকে, ঝিকে–মনুর মাকে, না, উৎপলাকে, ঠিক বোঝা গেল না।

আস্তে আস্তে কমে গেল–থেমে গেল বমির চাড় মাল্যবানের।

মাল্যবান একটু ভড়কে গিয়ে তাকিয়ে দেখল, উৎপলা এসে দাঁড়িয়েছে।

'ঠাকুর বাড়ি চলে যাবার সময়ে আমাকে বলল, 'তুমি বমি করছ। বমি হল কেন?'

'কী জানি।'

'কী খেয়েছিলে?'

'কিছু না, শুধু ভাত।'

'বাজারের খাবারটাবার?'

'না তো।'

উৎপলা বললে, 'আর বমি হবে বলে মনে হচ্ছে?'

'না বোধ হয়।'

'পেটে ব্যথা আছে?'

'না সে-সব কিছু নেই।'

'আচ্ছা, শোও, শুয়ে পড়। আমি বাতাস করছি।'

মাল্যবান খানিকক্ষণ বালিশে মাথা রেখে বাতাস খেয়ে বললে, 'ভাল লাগছে এখন।'

'যে মা হয়েছে,' মাল্যবান বললে, 'সে মানুষের শিয়রে না এসে পারে না। তুমি মনুর মা বটে, আমার স্ত্রী। কিন্তু সময়ের কোনো শেষ নেই তো, সেই সময়ের ভেতর আমাদের বাস; সময়ের হাত এসে এখানে এ-জিনিসটা মুছে দেয়–সেখানে সে জিনিসটা জাগিয়ে দেয়; মানুষের স্ত্রী তুমি; নিজেও তো মানুষের মা, মনুষ, সময়ের নিরবচ্ছিন্ন বহতার ভেতর তোমার মা-রূপ ফুটে উঠল তো; দেখছি। সময়ের দু-একটা ঘূর্ণিকে কেমন অভিরাম গ্রন্থির বলয়ে নিয়ে এসে গড়ে তুললে, দেখছি তো। এই তো নিচে নেমে এলে হাড়-কালিয়ে শীতের রাতে, সিঁড়ি বেয়ে। না এলেও তো পারতে। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত আশাও করি নি যে, তুমি আসবে। কিন্তু তবুও তো এলে–'

উৎপলার বাঁ হাতের দু-চারটে আঙুলের দিকে ঝোঁক গেল মাল্যবানের। কিন্তু সে আঙুল কটি বিশেষ কোনো সাড়া দিল না। নিজের ভাবুকতা আন্তরিকতার আত্মনিমগ্নতা নিয়ে মাল্যবান এত বেশি তলিয়ে গিয়েছিল যে, স্ত্রীর আঙুল কটির রহস্য ছাঁকবার জন্যে কোনো তাড়া ছিল না তার। রহস্যকে কঠিন আলোর মত পরিষ্কার করে বুঝে দেখবার শক্তি ও সময় পুরুষ তাকে দেয় নি; অনেক বিষয়েই বেচারি অন্ধ অবোধ বলে পোড়ো ঘরের চামচিকের মত হর্ষকম্পান্বিত। কিন্তু মাল্যবানের অবকল্পনা আছে, অবপ্রত্তিভাও; সে-জিনিসটা খুব-নিয়ন্ত্রিত নয় যদিও। কাজেই চেতনার একটি সূর্যের বদলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবচেতনার অন্তহীন নক্ষত্র পেয়েছে সে। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের ওপর আরো একটি ইন্দ্রিয় আছে খুব সম্ভব মাল্যবানের। বিজ্ঞানের যাকে বলে চতুর্থ-বিস্তার, সেই চাতুর্যের দেশেও বাস করে সে। কাজেই মা ও মাতৃত্বের ঐ দিব্য কেন্দ্র তার নজরে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও-সব শিখরে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না সে, শিগগিরই ধসে ভেঙে পড়ে গেল সে তার ছোট সংস্কারের ছোট সংসারে—স্বামী-স্ত্রী কামনা লিপ্সা হতাশার ঘূর্ণিফেনার ভেতর।

উৎপলার হাতপাখা আবেগে নড়ে নি কখনো; সবেগে নড়ছিল কিছুক্ষণ আগে। এখন ক্রমে-ক্রমেই ঢিলে হয়ে আসছিল।

'মাঝে-মাঝে আমার মনে হয়, একা থাকলে বেশ হত। কেউ-কেউ একা থাকে বটে, যেমন আমাদের হেডমাস্টারমশাই চিরটা কাল কাটিয়ে গেলেন, কিন্তু শেষ বয়েসে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছিল। মেয়েদের দর্শন দিতেন বটে, কিন্তু সাধুপুরুষ, স্ত্রীলোকের দর্শন পাবার জন্যেই ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। লালসা জন্মাল। মেয়েরা ভাল মনে করে সেবা করবার জন্যে হেডমাস্টারমশাইর হাত-পা টিপে দিত রোজ, উনিও ক্রমে-ক্রমে গোপনে সুবিধে পেয়ে তাদের গাল টিপতে আরম্ভ করে দিলেন। গড়াল কেলেঙ্কারি অনেক দূর। বিয়ে হল না তবু ছেলে হল, মেয়ে হল। তবুও সিদ্ধপুরুষ রইলেন। হেডমাস্টারমশাইর চিতের ওপর ও-অঞ্চলের সব চেয়ে বড় মঠ। নৌকার ছইয়ের ওপর বসে কত মাইল দূরের থেকে সে মঠ দেখা যায়?...'

মাল্যবান কথা বলে যাচ্ছিল গভীর বৃষ্টির রাত কিছুক্ষণের জন্যে বীতবর্ষণ হয়ে পাড়াগাঁর নালায়, পুকুরে, খালে, কলকল শব্দে চলে যেতে যেতে নিজের সাথে নিজে যেমন কথা বলে চলে, জল।

বাতাস করতে-করতে উৎপলার হাত ব্যথা হয়ে উঠল, কিন্তু মাল্যবানের দিক থেকে কোনো নিষেধ নেই। বেশি কথা বলে মাল্যবান বেশি ফেনিয়ে ওঠে, মাঝে-মাঝে গ্যাঁজায়, নিজেকে নিয়ে নিজেকে উপভোগ করবার দুর্ভোগ ভোগাবার বেশ ক্ষমতা আছে; ধ্বেৎ, ভাল লাগে না আমার; এক-এক সময় অবিশ্যি আমাকেও অবশ করে ফেলে—যেমন মনু হবার আগে। কিন্তু ভাল লাগে না আর আজকাল, ধ্বুৎ।

পাখাটা বিছানার পাশে রেখে দিয়ে উৎপলা বললে, 'বমি তো করলে, কিন্তু এখন ওষুধের ব্যবস্থা কী করা হবে?'

'সে জন্যে তোমার কোনো ভাবনা নেই, পলা।'

'ওষুধ আছে?'

'না।'

'তবে?'

'ওষুধ আমার লাগবে না। কেমন পেটে মোচড় খেল, বমি হয়ে গেল, ব্যস। সে-রকম বেশি কিছু হলে শরীরের আক্ষেপটা এত তাড়াতাড়ি পড়ে যেত না।'

'বলা যায় না কিছু। ওষুধ নেই। ডাক্তারের ব্যবস্থাই-বা কে করবে?'

'না, না, অসুখ নয় তো, একটু হয়রানি হয়েছিল,' মাল্যবান একটু আলোড়িত হয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করে শেষমেশ শুয়ে থাকতে-থাকতেই বললে, 'সেরে গেছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতেই ঠিক হয়ে যাবে সব।'

'এ বাড়িতে কোনো পুরুষমানুষ নেই,' টক বিরস মুখে উৎপলা বললে, 'অসুখ-বিসুখের সময়ে নানা রকম অসুবিধে। ডাক্তার ডাকে কে-রাত জাগে কে।'

মাল্যবান স্ত্রীর মুখের খিঁচুনিটাকে ইস্ত্রি করে পালিশ করে দেবার জন্যে খুব স্নিগ্ধভাবে বললে, 'এবার একজন সরকারের মতন রাখব ভাবছি; ফাইফরমাস—সবই চলবে।'

'কিন্তু, আজকের রাতে কে জাগে—'

'বসো, তুমি খানিকটা সময় বসে যাও; নিজের থেকেই ঘুমিয়ে পড়ব।'

উৎপলা হাত গুটিয়ে গুম হয়ে বসে রইল।

কেটে গেল খানিকটা সময়। কেউ কোনো কথা বলছে না। কারো কোন কাজ করতে হবে মনে হচ্ছে। ভাল লাগছে না কারোরই। কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। সময় কেটে গেল আরও।

'চুপচাপ যে?'

'কী করতে হবে?'

'বাতাস করছিলে তো—'

উৎপলা উঠে দাঁড়াল। বাতি জ্বালিয়ে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বললে, 'এ বালতি দুটো ভিজে কাপড়ে ঠেসে রেখেছে কে?'

একটা বালতি তুলে সমস্ত কাপড় মেঝের ওপর ঢেলে ফেলে দিয়ে চৌবাচ্চার দিকে চলে গেল।

'ওগুলো-কাচা কাপড় ছিল, মাটিতে ফেলে দিলে—' মাল্যবান তাকিয়ে দেখল নোংরা কাদায় মাটিতে গড়াচ্ছে কাপড়গুলো, পায়ে মাড়িয়ে-মাড়িয়ে উৎপলা চলে গেছে। চৌবাচ্চার থেকে এক বালতি জল এনে হিস্‌সো করে ছড়িয়ে দিল উৎপলা; আরো এক বালতি ঢেলে ছড়িয়ে মরিয়া হয়ে তাকিয়ে দেখল, বমি সাফ করতে আরো অন্তত দু-বালতি জলের দরকার। উৎপলার লোকায়ত মন, আর যা লোকায়ত নয়, অথচ গভীরতার যা—লোকায়তকে চালাচ্ছে—এই শীতের দুপুর-রাতে হাত-পায়ের চেয়েও ঢের বেশি টনটন করে উঠল সে সব জিনিস।

শেষ বালতি জল এনে ঘরের ভেতর ঢেলে দিল উৎপলা; তারপরে মাল্যবানের একটা সাবানে কাচা ভিজে ধুতি নিয়ে জায়গাটা নিকোতে লাগল।

'কেন তুমি নিকোচ্ছ তোমার নিজের হাতে, আহা, থাক না!' মাল্যবান বললে। আনাড়ি ছেলের হাতে কলাপাতার বাঁশির মত কেমন কাহিল ভাবে কেঁপে-কেঁপে চিরে গিয়ে বেজে উঠে মাল্যবান আবার বললে, 'ঠিক হল না, ঠিক হল না, আমার ধুতিটা তুমি রেখে দাও—আমি নোংরা মুছবার জন্যে তোমাকে জিনিস দিচ্ছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলাপাতার বাঁশি কেঁপে ফেঁড়ে গিয়ে বললে, 'বাঃ, উৎপলা, আমার ধুতিটা লোপাট করলে—এই তো আজ সন্ধ্যেবেলা খিদিরপুরের সাবান দিয়ে কেচেছি।'

উৎপলা ঘাড় গুঁজে মেঝে পরিষ্কার করতে-করতে ঘরের কোণের একটা ড্রেনের দিকে সমস্ত বের করে দিচ্ছিল—হাত দিয়ে নয়, মাল্যবানের ধুতিটা পায়ে খানিকটা জড়িয়ে নিয়ে পা চালিয়ে কাজ করছিল সে; কাজ করে যেতে লাগল, কোনো জবাব দিল না। এ-রকম সব কাজ তার করবার কথা নয়, শীতের রাতে তো নয়ই; কিছুতেই করত না সে এ-কাজ। কিন্তু কেমন যেন ভূতে তাড়িয়ে এনেছে তাকে। তাই নিচে নেমে এসেছে সে এমন একটা বিশ্রী ছোঁয়াছ্যানার কাজ করছে-হোক না পায়ে দিয়ে—স্বাভাবিক অবস্থায় যা মেরে পিটিয়েও কেউ করাতে পারত না তাকে দিয়ে। ভূতেই পেয়েছে তাকে, চিমড়ে ভূতে পেয়েছে; স্তম্ভিত হয়ে পা ডলছিল আর ভাবছিল উৎপলা।

উৎপলার (মন্থদণ্ডের মত) পায়ে জড়ান ধুতিটার কাদা বমি লোকসানির দিকে তাকিয়ে মাল্যবান কী যেন কেমন যেন, হয়ে গিয়ে বলতে লাগল, 'করিম ভাই মিলের সুন্দর ধুতিটা—এই দিন পনের আগে কিনেছি—তার তুমি এই অবস্থা করলে—এ তো পরাও যাবে না আর।'

কিন্তু ধুতি আরও একটা লাগল উৎপলার—সেটা ক্যালিকো মিলের। মাল্যবানের ভেতরের শাঁসটাই মোচড় দিয়ে উঠল। এক মাসের মাইনের চেয়ে যে-সব লোকের একটা ধুতি বা চাদরকে এক-এক সময়ে ঢের বেশ দামি, দরকারি মনে হয়, মাল্যবান সেই ধরনের মানুষ। কাজেই, অনেক কুণ্ঠা, আক্ষেপ, কাতরতার পরিচয় দিল সে, অনেক ছোট ছেঁদো কথা বললে; কিন্তু সব সময়েই গলা তার হেমন্তের দুপুরে একটা নিঃসঙ্গ উড়চুঙোর মত মিনমিন ফিরফির ঝিনমিন করছিল, কাতর করুণ, ঝাঁঝ নেই, উষ্মা নেই।

উৎপলার হাসি পাচ্ছিল—মাঝে-মাঝে দয়া হচ্ছিল তার লোকটার জন্যে, মানুষটাকে খানিকটা নিষ্পেষিত করবার জন্যই আর ভাল-ভাল দুটো ধুতি দিয়ে নোংরা জায়গাটা সে নিকিয়েছে—এ-কথা মনে করে নির্যাতন করবার শখ এখন তার খানিকটা কমে গেল যেন—কাপড় দুটো লাথিয়ে-লাথিয়ে ঘর থেকে বার করে দিল উৎপলা।

'যা হবার হয়ে গেছে,' মাল্যবান মনে খুব বল, খুব সৎ সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে বললে, 'এ নিয়ে তুমি মন খারাপ করতে যেও না।' যেন কঠিন যত্নে নিয়ন্ত্রিত জীবনের দীনতা ও আত্মশুদ্ধির গহ্বর থেকে (মনে হচ্ছিল উৎপলার) মাল্যবান কথা বলছে।

কুলুঙ্গির থেকে সাবান নিয়ে উৎপলা হাত কচলাচ্ছিল—হাত পা ঘাড় মুখ ধুয়ে আসবে সে।

'কোথায় সরালে কাপড় দুটো? চুরি যাবে না তো?'

'এ-দিককার দরজা তো বন্ধ; তবে পাশের বাড়ির ঝি-চাকর ছাদের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করে সারা-রাত। দেখতে পেলে ওরা নিয়ে যাবে হয় তো।'

'নিয়ে যাবে?—ঘরের ভেতর রেখে দেবে না তুমি ধুতিগুলো?'

কোনো কথা না বলে চৌবাচ্চার থেকে হাত-পা ঘাড়-মুখ খুব ভাল করে ধুয়ে এল উৎপলা। মাল্যবানের বাক্সের থেকে একটা ধোপাবাড়ির ফেরত তোয়ালে বের করে উৎপলা বেশ তোয়াজ করে রগড়ে-রগড়ে হাত-পা মুখ-পিঠ মুছে ফেলতে লাগল। তার পর স্লিপার পায়ে গলিয়ে ওপরে যাবার উদ্যোগ করতে লাগল।

'আমার বিছানার পাশে এসে বসো-না।'

'না, আমি আর বসব না।' এ কি, এ যে তোমার স্লিপার পায়ে দিয়েছি!

আমার জুতো কোথায় গেল? ইশ, মশা কামড়াচ্ছে! যাক, চলি—' উৎপলা বললে।

'আচ্ছা, এসো—ঘুমোও গিয়ে।'

শেষ রাতের একটা বসন্তবউরি পাখির মত একরাশ নক্ষত্র ও অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়বার আগে, একটু চলকে উঠে, হেসে, জেগে উঠবার, বেঁচে থাকবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা অতিক্রম করে (মাল্যবানের মনে হল) কে যেন উৎক্রান্ত হয়ে গেল। সে কি উৎপলা? একটা চুরুট জ্বালিয়ে মাল্যবান নিজেকে বললে, না, সে উৎপলা নয়; উৎপলাতে মাল্যবান যে-জিনিস আরোপ করেছে, সেই অশরীরী আত্মাটা—নেই; ছিল না; এই মুহূর্তেই সরে গেল তবু; ওপরের দিকে, ওপরের ঘরে যাবার অছিলায় আরো ওপরে, বড় বাতাসে' শীতরাতের ঘুরনো সিঁড়ির শীর্ষে, নক্ষত্রে মিশে গেল কোথায়।

পর দিন রাতে ওপরের ঘরে মাল্যবান বলছিল উৎপলাকে, 'তোমার এই খাটটা ঢের বড়।'

'হ্যাঁ, বাবা দিয়েছিলেন। আমাদের বিয়ের সময়ে। বরপক্ষকে ঠকাবার মতলব ছিল না তো তাঁর।'

'আমি তা বলছি না।'

উৎপলা ধোপদুরস্ত বিছানার চাদরটা পাট-পাট করে পাতছিল—কোন কথা না বলে হাতের কাজ করে যেতে লাগল।

'আমি ভাবছিলাম, দু'জন বাড়ন্ত লোক এ-খাটে বেশ এঁটে যায়।'

'তা যায়, তাতে কী।'

'আজ রাতে এ-খাটে আমি শুলেও তো পারি; পারি না?'

'তা হলে আমাকে নিচের ঘরের খাটে যেতে হয়।'

'কেন যাবে?' মাল্যবান উৎপলাকে ভেদ করে কোনো শ্রেয়োতর আত্মার দিকে তাকিয়ে যেন বললে, 'আমার পাশে শুয়ে থাকবে।'

'যা নয়, তাই,' শান্ত দৃঢ়তায় বললে উৎপলা; কৃতী অভিভাবিকার মত ঠোঁট চেপে, দাঁত চেপে।

'তোমার মেজদা আর বৌঠান তো এ-খাটেই শোবে দু'জন।'

'তা তারা শুয়ে শান্তি পায়।'

মাল্যবান একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, 'আমরা পাব না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চাইলেই ভোগে লাগে না,' উৎপলা মনুকে নয়, মাল্যবানকেই বললে।

'তা বটে। মাল্যবান হাতে পানটা মুখে তুলবার ভরসা পেল না আর। সিগারেটটাও না খেয়ে জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল—জ্বলন্ত সিগারেটটা—

বললে, 'এ-রকমই যদি হল, তা হলে ফুটপাতে গিয়ে শুয়ে পড়ে থাকলেই পারি।'

পরিপাটি বিছানা পাতা শেষ করে উৎপলা বললে, 'ফুটপাতে তুমি কোনোদিন শোবে না। তবে একদিন শুয়ে দেখলে পারো। যাও-না, আজই যাও।'

'আমি ফুটপাতে শুলে খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তোমার মুখ।'

'তুমি তো নিজেই বলছ, ফুটপাতে আর ভদ্রলোকের বিছানায় কোনো তফাত নেই—'

'দেখছি তো নেই। কেন নেই? কেন নেই, সেটা তুমি আমাকে নিজের বুকের ওপর হাত রেখে বলবে?'

'বলবার যখন, তখন বলা হবে,' উৎপলা বললে, 'কিন্তু ফুটপাতে শোয়ার কী হল?'

'যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে শুতে আমার খুব আপত্তি নেই।'

উৎপলা মশারি টাঙিয়ে বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললে, 'আপত্তি নেই, তা হলে বাধাটা কীসের?'

মাল্যবান চকমকি ঠুকে আবার একটা সিগারেট জ্বেলে নিয়ে বললে, 'যাচ্ছি আমি শুতে—'

'কোথায়? তোমার নিজের ঘরে?'

'না—'

'ফুটপাতে? যাও—' বললে উৎপলা; ঘুমের লতায়-পাতায়-তন্তুতে জড়িয়ে যেতে-যেতে কাছের থেকে দূরে চলে যেতে-যেতে যেন।

'এসো, দেখে যাও। দেখবে না?'

'সে আমার দেখা আছে,' বলে পাশ ফিরল: ফিরে শুয়ে লেপটা ভাল করে জড়িয়ে নিতে না-নিতেই ঘুমিয়ে পড়ল উৎপলা।

নিশ্বাস পড়ার শব্দ শুনে মাল্যবান টের পেল; একটা নিবিড় বেড়ালের চেয়েও গভীর আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েমানুষটি—তুলোর গরম আর শীতের ঠাণ্ডা খুব প্রবল ভাবে মিশ খেলেই হল—কোনো পুরুষমানুষের স্পর্শের দরকার নেই, উৎপলার—

মাল্যবান নিচে চলে গেল।

এক ঘুমের পর মাঝরাতের শীতে—গরমে—নিজের বিছানাটা মন্দ লাগছিল না তার। মাল্যবানের মনে হল, মানুষের মন সারাটা দিন—রাতের প্রথম দিকটাও—বোকা হ্যাংলার মত চায়—অপেক্ষা করে সাধনা করে, যেন নিজের কিছু নেই তার, অন্যে এসে দেবে তাকে, তবে হবে। কিন্তু গভীর রাতে বিছানায় শরীরই তো স্বাদ। শরীরটাই তো সব দেয় মানুষকে। মন কী? মন কে? মন কিছু নয়। বেশ নিবিড় শীতের রাতে চমৎকার শরীরের স্বাদ পাচ্ছিল মাল্যবান।

পুরুষের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘুচিয়েছে বটে উৎপলা; কিন্তু তাই বলে শরীরের স্বাদের সঙ্গে নয়। দোতলায় গভীর রাতে তার নিজের বিছানায় আশ্চর্য স্বাদ উপলব্ধি করছিল সে।

মাল্যবানের ঘরের জিনিসপত্র ব্যবস্থা আবার আগের মতন দাঁত খিঁচিয়ে উঠল: নোঙরা হলদে কাগজের স্তূপ চারদিকে, জানালার ভেতর দিয়ে ক্রমাগত রাস্তার ধুলো, ধোঁয়া, অঝোর গোলাপায়রার বাসা, মেঝের চারদিকে চুরুটের টুকরো, থ্যাতলানো চুরুট, তামাকপাতা, ছাই, দেশলাইয়ের কাঠি, পাখির পালক, বিষ্ঠা, পুরনো বাতিল লণ্ঠনের টুকরো-টাকরা, ভাঙা চিমনির কাচের রাশ; তেল, অ্যাসিড, ওষুধের নোংরা শিশি-বোতলের জাঙ্গাল, হাঁড়িকুড়ি, কলসি, বস্তা ও ঝুড়ি ও একগাদা, আট-দশ জোড়া ছেঁড়া থ্যাবড়া প্যানেলা আর ক্যাম্বিসের জুতো, ময়লা জামা, মশারির নুড়ি—আশ্চর্য দৈববলে কোনো শব্দ হচ্ছে না, কোনো-কিছুকে নড়তেও দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু সমস্ত ঘরের ভেতর সুটকি বুড়ি, ডাইনি বুড়ি, থুপি বুড়িদের কান্নাকাটি হামলা কলাৎকার চলছে যেন দিনরাত—মাল্যবান টের পাচ্ছিল, উপলব্ধি করছিল।

ফুলদানিটা সে ঘরের এক কোণে ফেলে রেখেছিল। উৎপলা যখন এ-জিনিসটাকে পছন্দ করল না, তখন থেকেই এটার ভেতর কেমন একটা শ্রীছাঁদের বাপান্ত গরমিল বেরিয়ে পড়েছে যেন—এক রাশ হাঁড়িকুড়ির ভেতর ফুলদানিটাও কানা ভেঙে গড়িয়ে পড়ে রইল।

এই ঘরের ভেতরেই এক দিন একটা বেড়ালের ছানা আশ্রয় নিল। রাত্রে ঘুমিয়েছিল, ঘরের ভেতর মড়াকান্না শুনে উঠতে হল, উঠে বসল। বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই এই খোলা জানালার ভেতর দিয়ে বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে কেউ। মানুষ যে-জিনিস নিজে সহ্য করতে পারে না, পরের ঘাড়ে তা চাপাতে তার এত লোভ—এমন কৌশল; ভাবছিল, মাল্যবান; কিন্তু বাচ্চাটাকে নিয়ে করা যায় কী? যে-রকম ভাবে বেনো হাওয়ার মুখে হাঁ করে কাঁদছিল বাচ্চাটা, তাতে ওপরের ঘরের মানুষেরও ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

রাস্তার দিকের জানালা দিয়েই এটাকে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারা যায়—তার পর জানালা দিতে পারা যায় বন্ধ করে। বেড়ালের ছানাটার তারপরে কী হবে, সে-কথা ভেবে মাথা ঘামিয়ে কী দরকার। পৃথিবীতে বেড়াল-কুকুরের বাচ্চারা পথ কেটে নেয়—কিংবা যায় মরে। মৃত যে, তার তো রফা হয়ে গেল; গোলকধাঁধাটা সামনের থেকে সরে গেছে; নির্দেশ চাই না, সহানুভূতি সমাশ্রয়ের দরকার নেই আর; সব চেয়ে শান্তি; বেঁচে থাকার ব্যথা, বৈভব নেই। কিন্তু তবুও সে-রকম শান্তি বেড়াল ছানাটাকে পাইয়ে দিতে ভরসায় ঝুলিয়ে উঠল না মাল্যবানের।

রাত দুপুর—কোথাও কোনো দুধ নেই, খাবার নেই; বাচ্চাটাকে কিছু দেওয়ার উপায় নেই এখন; বিছানায় বসে-বসে অনেকক্ষণ এর কান্না সহ্য করতে লাগল মাল্যবান। মাল্যবান-পর্বত যেন সহ্যাদ্রি হয়ে গেল তবুও কান্না থামবে না—এমনই আনন্ত্য এর। একে-একে অনেক কথা ভেবে যাচ্ছিল মাল্যবান; ভাবছিল, এই বাচ্চাটার বাপ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার কথা, কেমন হাত-পা ঝেড়ে জীবনকে ঝাড়ছে তারা; এই বাচ্চার ঝাড়টাকে জন্ম দেবার আগে কালোকিষ্টি রাতে আর জ্যোৎস্না রাতে পরীতে পেয়েছিল সেই ধাড়ি বেড়াল দুটোকে; কী না করেছিল তারা; কিন্তু আগামী ঋতুর ছানাগুলোকে জন্ম দেওয়ার আগে আবার তারা দুর্নিবার ভাবে জোড় মেলাবে এসে, কিন্তু এখন তারা গত ঋতুর, সমস্ত বিগত ঋতুর, কৃতকর্মের দায়িত্বের থেকে খালাশ। জীবনকে তারা এ-রকম করে ফাঁকি দেয়, তবুও প্রশ্রয় পায় জীবনের কাছ থেকে নব-নব ঋতুসমাগম হলেই–বারবার–বারবার। মানুষকে তো এ-রকম আচার-ব্যবহারের জন্যে ঢের গভীর শাস্তি দিত জীবন। থাক, তবুও এর বাপ-মাকে কোনো শাস্তি দিতে চায় না সে।

মাল্যবানের ভাবনার মোড় ঘুরে গেল, পরীতে পাওয়া মিথুনের কথা ভুলে গেল সে; মনে-মনে বললে, কথায়ই বলে কুকুর-বেড়ালের জীবন–বাস্তবিক, সে-সব জীবনের এমনিই ঢের কষ্ট। হয়ত দু-চার মাস বয়েস এই ছানাটির, মা নেই, ভাই-বোন কিছু নেই, জবালার ছেলের পিতৃপরিচয় নেই বলে কোনো উদ্বেগও নেই বটে–মাল্যবান একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে ভাবছিল–

কিন্তু, মড়াকান্নায় তোলপাড় হয়ে উঠছিল; চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে ভাবছিল; এমন শীতের দুর্বার রাতে কোথাকার একটা মিকড়ে হারামজাদা জানালার ভেতর দিয়ে অন্ধকার খুপরির ভেতর এটাকে সটকাল।

সে এক সময় ছিল বটে, মাল্যবান উপলব্ধি করল, যখন মানুষের শিশুর এ-রকম ব্যাপার হলে এতক্ষণে কত দিক দিয়ে হৈ-চৈ পড়ে যেত, কিন্তু মানুষের পৃথিবী তো আজকাল পাগলাগারদ–সেখানে মানুষের শিশু আর বেড়ালের' ছানার একই অবস্থা।

মশা নেই ঘরে; ইঁদুরে কামড়াতে পারে'সেই ভয়ে মশারি টানিয়ে শুয়েছিল মাল্যবান; মশারিটা তুলে বালিশে ঠেস দিয়ে চুরুট মুখে বসে রইল সে।

একটু পরে উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাল।

মানুষের নড়াচড়ার শব্দে, আলো দেখে, ভয় পেয়ে, বাচ্চাটা একটু থামল। কিন্তু মাল্যবান বিছানায় এসে বসতেই আবার সেই কান্না। সমস্ত ট্রাম-বাস-লরির নটখটি ঘড়ঘড়ির চেয়ে এ-কান্না ঢের আলাদা জিনিস; এ-জিনিস সহ্য করতে হলে সৃষ্টিটাকেই বুঝে দেখতে হবে, উপনিষদের ও আইনস্টাইন হোয়াট হেডের ঈশ্বরের হিসেবের মিল-গরমিলটাকে; অনেক সহানুভূতি সহিষ্ণুতার দরকার। মাল্যবান কেমন অসময়ে তা হারিয়ে ফেলল।

বিছানার থেকে লাফিয়ে উঠে তেরিয়া হয়ে সে বাচ্চাটাকে তাড়া করল। এত জঞ্জাল এই ঘরের ভেতর–এমন সব অসম্ভব জায়গায় লুকোয়–এমন ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে–বিছানায় ফিরে আসতে না-আসতেই আবার ভরসা পেয়ে এমন প্যানপ্যানানি শুরু করে যে, মাল্যবানের ঘেন্না ধরে গেল একেবারে।

এবার সে বাচ্চাটাকে ধরলই।

ধরে, এমন জোরে তাকে দেয়ালে আছড়ে মারল যে, দুই মুহূর্তের ভেতরেই সেটা কাতরাতে-কাতরাতে মরে গেল।

এর পর পাঁচ-ছদিন মাল্যবান কারোর সঙ্গে কথাও বলতে পারল না আর। স্ত্রীর কাছে, অফিসে চোর; সংসারের সমাজে পৃথিবীর ডাঙার ওপর দিয়ে নৌকা চালিয়ে নেয় যে-মনপবনের আশ্চর্য দেবতা, তার কাছে, তামাকের হুঁকোর জলের ভেতর জোঁকের মত, যেন নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল মাল্যবানের মন।

উৎপলা যে তাকে এত উপেক্ষা করে, এটা তার ভাল লাগে; বাঘের মাসি বেড়ালকে মেরে ফেলেছে মাল্যবান, ঘরের ভেতর নারীসোনালিব্যাঘ্রের হিংস্রতায় হৃদয়হীনতায় কেমন একটা নিপট নিগূঢ় তৃপ্তি পায় সে। নিচের ঘরের সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও দুর্গতির ভেতর স্ত্রী-পরিত্যক্ত নচ্ছার মানুষ বলে নিজেকে সে বারবার প্রতিপাদন করে দেখতে চায়, এ তার ভাল লাগে; নিজেকে অবিচারিত, অভালবাসিত, বিড়ম্বিত মানুষ বলে খতিয়ে নিতে-নিতে মনটা লঘু হয়ে ওঠে তার; জীবনের থেকে কুবাতাস, দুর্ভাগ্য, অবিচার, অভালবাসা যদি শুকিয়ে যায়, তা হলে পথ থাকে না আর।

'তুমি কদিন থেকে মাছ খাচ্ছ না যে?'

'কেমন আঁশটে গন্ধ,' মাল্যবান বললে।

'কেন, পেঁয়াজ-মশলা দিয়ে বেশ তো রাঁধে ঠাকুর।'

'ভাল করে ভাজে না–' বলে দিল একটা কথা মাল্যবান।

'তুমি কি পুড়িয়ে খেতে চাও?'

'না, না–' মাল্যবান আঙুল ছড়িয়ে, হাত মুঠো করে বললে, 'বরফ-দেওয়া মাছ কিনা, কেমন কাঠের মতন। খেতে ইচ্ছে করে না।'

'বরফ-দেওয়া মাছ এ মোটেই নয়। বেশ তো জিনিস। টাটকা। পুকুরের। নিজে কিনে আন, অথচ নিজে বুঝতে পার না?'

মাল্যবান কোনো কথা বললে না।

'কই মাছ খেতে পার। বেশ তো লাগে খেতে।'

কিন্তু মাল্যবান বিনে মাছেই চালাতে লাগল। কোনোদিন দই খায়; কোনোদিন খায় না; ফেলাছড়া করে খায়। বৌয়ের ন্যাওটা নয় আর। খুব কম কথা বলে। কোনো নালিশ নেই, আপত্তি নেই, মাথার চুলে তেল, নেই, টেরি নেই। অন্য অনেকে হলে মাল্যবানকে চেপেই ধরত, 'খুলে বল তো,' 'হচ্ছে কী সব,' 'টেঁসে গেলে কোথায়,' 'সাপটে না খাবে তো জাপটে ধরব' বলে তোলপাড় করে তুলত তাকে; কিন্তু উৎপলার চোখে কিছু পড়ল না যেন; ভালই হল; মাল্যবানের রক্তের মনের শান্ত সাত্ত্বিকতা নষ্ট করবার জন্যে কেউ হাত কচলাল না। সে যা চাচ্ছিল, সেই পটনিশ্চয়তা বিনিঃশেষে দেওয়া হল তাকে; বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে চায়? সাপুড়ের চুবড়িতে থাকতে চায়? থাকুক। কেউ বাধা দিতে গেল না। কোনো গোলমাল নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু একটা বেড়ালছানা খুন—মাল্যবানের মতন মানুষের জীবনেও এ-ব্যাপারটার অখাদ্য অপরাধের তীক্ষ্ণতা দিনরাতের ঘষা খেতে-খেতে নষ্ট হয়ে ক্ষয় পেয়ে গেল। সে তার আগের জীবন ফিরে পেল। বেড়াল-ছানাটার কথা মাঝে-মাঝে মনে হয় বটে, কিন্তু তার নিজের জীবনের আবেদন ঢের বেশি। মাছ, মাংস, ডিম, অফিস, খবরের কাগজ, টাকাকড়ির চিন্তা, বৌয়ের একটা-ওটা-সেটা উনপঞ্চাশটা, বাতাস, গোলদিঘি, চুরুট—নানা রকম স্রোতের ভেতর হারিয়ে গেল সে। সাধারণ সাংসারিক মানুষ হয়ে উঠল আবার। এক-একদিন খুব বেশি রাত বিছানায় জেগে থেকে-থেকে মাল্যবানের মনে হয়, কাদাপাঁকের ভেতরে একটা শুয়োরের মত সমস্ত দিন জীবনটা যেন তার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বেড়ায়; বেড়ালের ছানার মৃত্যু তাকে বেশ একটা চমৎকার মুক্তি দিয়েছিল; স্ত্রীর মমতাবিমুখতার ঢের ওপরে চলে গিয়েছিল সে, অফিসের কাজে যে-কোনো মুহূর্তে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবার মত একটা সহজ স্বাধীনতা এসেছিল মনের ভেতর, রক্তমাংসের শরীরে পাখির মত লঘুতা এসেছিল যেন তার, যেন সে অনেক ওপরে উড়ে চলে যেতে পারে, জীবনের উপেক্ষা আকাঙ্ক্ষা লোভ কিছুই যেন নাগাল পায় না তাকে আর; চোত-বোশেখে পাড়াগাঁর দুপুরে বিকেলের অনির্বচনীয়তার ভেতর প্যাট-প্যাট করে ফাঁড়া ওড়া শিমুলের তুলোর মতন আশ্চর্য ধীরমুক্তির স্বাদ পেয়েছিল সে নীলিমা-নীলিমায়, সূর্যে, রৌদ্রে আকাশপথের পাখির পালকের, মৌমাছির পাখনায়, তারপর কোন নীলিমা নিঃঝুম পরলোকের দেশে। কিন্তু দিনেরবেলা এ-সব কথা মনে থাকে না বড় একটা তার; মনে পড়লেও দাগ বসাতে পারে না তেমন।

এই-ই হওয়া উচিত। মাল্যবানের মতন মানুষের পক্ষে সমস্তটা দিন অফিস বা সংসারের অন্য যে-কোন মানুষের মতন জীবন কাটানোই স্বাভাবিক। রাতের বেলাটাও তার তাদের মতই কেটে যেত, যদি উৎপলার মত এক জন 'সপ্তমা' স্ত্রী এসে বাদ না সাধত। উৎপলার সম্পর্কে এসে জীবন ধাক্কা, আঘাত, উপলব্ধির ভেতর দিয়ে চলেছে। এ না-হলে সে তার অফিসের মাইতি-দে-গড়াগড়ি—শুঁইবাবুদের মত এড়িগেড়ি বাচ্চায় ঘর ভরে ফেলে, সিঁদুর-ধ্যাবড়ানো ফোকলাদেঁতো শাকচুন্নিদের নিয়ে ঘর করত। কিন্তু উৎপলাকে নিয়ে তার জীবন সে-রকম নয় তো। ওদের তমন নয়-আর-এক রকম।

রববার সকালবেলা মাল্যবান ঝিকে বললে, 'মাকে একটু ডেকে আনো তো।' তিন-চার বার ঝিকে ওপরে পাঠাতে হল।

উৎপলা নিচে নেমে এল; বললে, 'তোমার লজ্জা করে না?'

'কেন?'

'ঝিকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠাচ্ছিলে?'

'তোমার কাছে লোকজন ছিল, আমি তো নিজে গিয়ে ডাকতে পারি না।'

'লোকজন চলে যাওয়া পর্যন্ত তর সইল না? আমি ওপরের ঘরে কী করি—না-করি, নিচের ঘরে বসে তুমি সে-সব গণেশ ওল্টাবে! আচ্ছা পেটোয়া গণেশ তো বাবা—'

'যাক, ওরা তো চলে গেছে—'

'তুমিই তো তাড়ালে—'

'যে-জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম-আমার এই ঘরটার কথা তোমাকে কদিন থেকেই বলব-বলব ভাবছি। ঘরটা কেমন থুবড়ি খেয়ে পড়ে আছে দেখছ তো।' ঘরের দিকে না তাকিয়েই উৎপলা বললে, 'তার আমি কী করব!'

'তোমাকে একটু গুছিয়ে দিতে বলছি—'

মাল্যবানের আতলস্পষ্ট বেকুবির দিকে তাকিয়ে উৎপলা কোনো কথা বললে না আর।

'ওপরে যারা ছিল, তারা চলে গেছে?'

এ-কথার জবাব না দিয়ে উৎপলা ওপরে চলে যাবার উপক্রম করছিল; পা বাড়াতেই কী যেন একটা জিনিস টপ করে টস করে উৎপলার পায়ের ওপর পড়ে ভেঙে ঝোল ছড়িয়ে দিল, শ্লিপার বাঁচিয়ে, উৎপলার পায়ের মাংসে চামড়ায়। দু'হাত পেছিয়ে গিয়ে আলসের দিকে তাকাতেই পাখিটাকে চোখে পড়ল; মাল্যবানের জুড়ির মতই বোকা-বোকা বেকুব পাখিটার দিকে কেমন যেন লেগে থাকতে চায় চোখ; কেমন অদ্ভুত জায়গায় ডিম পেড়েছে, ডিমটাকে ফেলে দিয়েছে হয়ত নিজের অজান্তেই বেশি নড়াচড়া, ঘোরাফেরা, ডানা ঝাপটাতে গিয়ে, পা নাড়া দিয়ে; কী যে হয়ে গেছে, ডিম যে পড়ে গেছে, ভেঙে গেছে, সে-দিকে খেয়াল নেই পাখিটার, হারানো নষ্ট ডিম সম্বন্ধে কোনো চেতনা নেই; কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে আলসের ওপর, গলা ফুলিয়ে বক-ব্রকম-ক্রকম-ক্রুক ইর্‌-ররম্‌-বিরম-ররম্‌-রুক করছে পাখিটা। উৎপলা জোরে-জোরে হাততালি দিতেই আরো একটা পাখি বেরিয়ে এল বিমের আড়াল থেকে; উড়ে চলে গেল পাখি দুটো।

মেঝের ওপর পাখির বিষ্টা, পালক-ভাঙা ডিমের লালায় নিজের আঁশটে এঁটো পায়ের দিকে তাকিয়ে উৎপলা বললে, 'খুব আগুনদার সোনার দরে গুদোম ভাড়া দিচ্ছে বুঝি জংলি পায়রার ঝাড়—'

'তা দিচ্ছে,' উৎপলার কথা ফুরোবার আগে মাল্যবান বললে, বেশ সমাহিত শান্ত ভাবে বললে, 'পাখিরা আর কদ্দূর কী করবে; মানুষরা পাখিদের চেয়ে শয়তান; না-হলে পৃথিবীটা এ-রকম পৃথিবী হয়! নাঃ, ও-পাখিগুলোকে আমি কিছু বলি না।'

'আমি জাল পেতে রাখব। এক-একটা করে ধরে ঠাকুরকে দেব। এ-সব কেঁদো পায়রার মাংস খেতে বেশ—'

'একটা বেড়ালের ছানা মেরে ফেলেছিলাম এক দিন,' মাল্যবান বললে, উৎপলার কথা সে শুনেছে কি না-শুনেছে, বোঝা গেল না, 'সেই থেকেই এ-সব বিষয়ে খুব সাবধানে চলতে আরম্ভ করেছি। এ-সব প্রাণীদের কিছু বলি না আমি।'

'বেড়ালের ছানা কে মেরেছিল?'

'আমি।' মাল্যবানের চোখ খানিকটা বুজে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কবে?'

'এই দিন পঁচিশেক আগে।'

'কোথায়?'

'এই ঘরেই।'

'কই আমি দেখি নি তো।'

'সে রাত-দুপুরে হয়েছিল; কে এক জন ক্যাঁক করে ছেড়ে দিয়ে গেল। বাচ্চার কান্নায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। তার পর—' বলে সে থামল।

'সেটাকে চাড় দিয়ে থেঁৎলে দিলে তুমি—'

মাল্যবান উৎপলার মুখের দিকে তাকাল একবার; পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে নিয়ে চোখ বুজে ভেতরের দিকে তাকাল মাল্যবান; ভিজে পর্দার ওপর কামলণ্ঠনের ছবির মত এসে পড়ল সব: সেই রাত্রি, সেই বেড়ালের ছানা, ছানাটাকে (ছবি চলতে আরম্ভ করল) কেমন বিশ্রী ও নিকষ অপকৌশলে ধরে ফেলেছিল সে—কেমন অন্ধ হয়ে দেয়ালে আছড়ে মেরেছিল, কেমন কাতরাতে-কাতরাতে মরে গেল বাচ্চাটা—সেই সবের দিকে আপ্রাণ করুণায় দাঁত-মুখ খিচিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাল্যবান বললে, 'মানুষ হওয়া হবে কবে, তাই ভাবছি; কোনো দিক দিয়েই হতে পারি নি তো আজও। চেষ্টা করছি; করছি? পাখিদের কিছু বলি না আমি; ময়লার লপসি করছে ঘরদোর; খুব ভোগান্তি বটে, কিন্তু তাতে আর কী, আমি নিজের মনে থাকি; ওদের চাল-চিঁড়ে দিই, যব খেতে ভালবাসে, মেঝের ওপর ছড়িয়ে রাখি, খায় আর হাগে, হাগে আর খায়; মানুষের ভেতর দু-চার জনকে ছেড়ে দিলে প্রায় মানুষই এদের চেয়ে ঢের খারাপ কাজ করে।' বলতে-বলতে মাল্যবান লজিকের সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে অবশেষে উৎপলার পায়ের দিকেও না তাকিয়ে পারল না, পাখির ডিমের লালায় ঝোলে নষ্ট হয়ে গেছে পাটা—

'কিন্তু এই পাখিগুলো', উৎপলার আগাপাশতলায় চোখ দুটোকে বেশ খানিকক্ষণ পাক খাইয়ে নিয়ে মাল্যবান বললে, 'একেবারে বেহেড হয়ে ডিম পাড়ে। যেন পাৎবাদামের গাছ থেকে বাদাম টপাটপ করে ঝরে। দিন-দিন মাল লোকসান করে—'

মাল্যবান কিছুক্ষণ চুপ মেরে থেকে হাতের চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে আকাশ-পাতালের অনেক বিশৃঙ্খল ঢেউ গুনে দেখল, তাদের সাজিয়ে নিয়ে কোনো নির্দেশের মত মুক্তাপ্রবাল দেখল যেন জ্বলে উঠে জলের শিখরচূড়ো হয়ে যেতে, এবং বেশ খানিকক্ষণ পরে সেই আলোটিকেই ব্যাখ্যা করে বললে, 'কিন্তু, তাই বলে গুলতি ছুঁড়ে ওদের মারা উচিত কি? উচিত নয়।'

তারপরে স্পষ্ট হয়ে বললে, 'তোমার নীলাম্বরীটা ঠিক আছে তো—ভিজিয়ে দেয় নি তো?'

'আহা, কী মানিয়েছে তোমাকে এই ময়ূরকণ্ঠী নীলে—', মাল্যবান ভাবছিল, 'যেন উত্তরাকে নেত্য শেখাচ্ছেন বৃহন্নলা। নাচের ঘোরে মিলেমিশে গেছে উত্তরা-বৃহন্নলা—কে উৎপলা কে বৃহন্নলা—' অনির্বচনীয় দেখাচ্ছে উৎপলাকে'—অথচ দাঁড়িয়ে আছে, সত্যিই তো আর নাচছে না, নড়ছেও না; অথচ দেখাচ্ছে উৎপলাকে যেন ক্ষুরধারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—পুরুষের যে-তিলোত্তম পেলে মেয়েমানুষকে মহানারীর মত দেখায়, সেই রকম।

'আমাকে কয়েকটা বালিশের ওয়াড় তৈরি করে দেবে? বলো তো কয়েক গজ মার্কিন নিয়ে আসি।'

উৎপলা যাবার জন্যে তৈরি হল, 'থাক, দর্জির বাড়িই দেওয়া যাবে।'

স্ত্রীর সঙ্গে সেও ওপরে চলল।

গিয়ে বললে, 'আমাকে একটা পান দিতে পারো?' ভেবেছিলাম, ছেড়ে দেব। কিন্তু লোভ সামলাতে পারি না।'

'কিন্তু, উৎপলা নড়ছিল-চড়ছিল না; ছাদের ওপর রোদে-বাতাসে একটা ডেকচেয়ারে বসে ঘাড় কাত করে বেণী খসাতে লাগল! খুব আমেজ এসেছে উৎপলার শরীরের রসে উপলব্ধি করে নিজেরও গ্রন্থিতে মাংসে একটা মন্থর, সুখ্যাত, মদির সুখানুভব ছড়িয়ে পড়ছিল মাল্যবানের। কিন্তু ওপরে থেকে লাভ নেই কোনো, মাল্যবানের মনে হল; এখন নিচে চলে যাওয়া উচিত।

নিচে গিয়ে মাল্যবান ঠিক করল, ঘরদোর সে নিজেই গোছাবে। তার মনে পর হল, ঝিকে দিয়ে গুছিয়ে নেবে। ঝি রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল। মাল্যবান একটা বিড়ি জ্বালিয়ে ভাবল, গুছিয়ে কী লাভ!

কিন্তু পরক্ষণে সে নিজেই গোছাতে লাগল। বিশৃঙ্খলা ও নোংরামির ভেতর মনটা কেমন খিচখিচ করে ওঠে; কিন্তু সেদিনকার মতন পর্বত ঝেড়ে নিখুঁতভাবে গোছাতে গেল না; ঘরটা ঝাঁট দিয়ে, জিনিসপত্র ঠিকঠাক রেখে দিয়ে, বিছানার চাদর বদলে, নোংরা কাপড়গুলো কাছেই একটা লন্ড্রিতে ফেলে দিয়ে এসে কাজ সাঙ্গ হল তার।

রাতেরবেলা বড্ড শীত; মোজাগুলো সব ছেঁড়া, একটা পুলওভার কিছুতেই কেনা হয় না, গায়ের আলোয়ান তেলে, জলে, রোদে, বাতাসে ছাই হয়ে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পড়েছে, কয়েকটা তালিও মেরেছে সে, বড় বিশ্রী লাগে, একটা নতুন আলোয়ান কিনতে ইচ্ছে করে, ডোরাকাটা কালো মশারিটার ছ্যাঁদার অন্ত নেই, নোংরা পচা ছারপোকা গুঁইগুঁই করছে, একটা মস্ত বড় ছিপড়ের জঙ্গল হয়েছে মশারিটা।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর নিচের ঘরে একটা ঠাণ্ডা টিনের চেয়ারে বসে মাল্যবানের মনে হচ্ছিল, দূর, এ-রকম জোড়াতালি দিয়ে জীবন কাটিয়ে কী লাভ, কার লাভ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিছানায় এসে বসে মনে হল, জীবনটা এই রকমই হ্যাঁচকা ব্যাপার। বিছানায় শুয়ে পড়ে, 'কেই-বা এখন শুতে যেত' ভাবছিল মাল্যবান; বসে-বসে কথাবার্তা, গল্প—তার পর শীতের রাতে—তার পর সারাটা শীতের রাত; এমন স্ত্রী কি আমি পেতে পারতাম না। হড়পা বানের ঠাণ্ডা স্রোতে যেন মুর্গি আমি হাঁসের মত সাঁতার কাটতে চাচ্ছি, বাজপাখির মত উড়ে যেতে চাচ্ছি। আমার জীবনের বানচালের ব্যাপারটা এই রকম। কিন্তু বড় বেশি আত্মপ্রেম হয়ে পড়েছে তো আমার; যেন একটা ব্যক্তি ছাড়া পৃথিবীতে আর-কেউ নেই, যেন ব্যক্তিসমুদ্র নিয়ে যে-মানুষের ও সময়ের ইতিহাস তৈরি হচ্ছে সেটা কিছু নয়। লেপ মুড়ি দিয়ে শীতের খুব গভীর রাতে আজকের আবহমানের ও ব্যক্তিসমুদ্রের রোল-যা নির্ব্যক্তিত্বে বিশোধিত হয়ে ফেনার কণার মত তাকে টেনে নিয়ে চলেছে অন্ধকারের থেকে খুব সম্ভব আরো ব্যাপক অন্ধকারের ভেতর-সেই সুর শুনতে পেল সে; অতএব আলোকিত হয়ে উঠল যেন তার মন; আস্তে-আস্তে সময়ের আশ্চর্য সমগ্রতার কাছে আত্মসমর্পণ করে স্থির হয়ে উঠতে থাকল তার মন।..

এত বেশি স্থির হল যে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পৌষ মাসের শেষাশেষি মেজদার পরিবার এল।

মাল্যবান একটা মেসে গিয়ে উঠল। মেস ঠিক নয়—মাঝারিগোছের একটা বোর্ডিং—একটা আলাদা কামরা বেশ গুছিয়ে নিল সে। মেজদা আর বৌঠান কিছুতেই ছাড়তে চায় নি মাল্যবানকে, কিন্তু তবুও সব দিক ভেবে সুবিবেচনা করে মেসেই যেতে হল তাকে।

মেসের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করবার বিশেষ আগ্রহ ছিল না তার। অফিস থেকে এসে নিজের জীবনের বিপর্যয়ের কথাই সে ভাবত-যে পর্যন্ত না ব্যক্তিঅতিক্রমণার দূর সমুদ্রসুর শুনতে পেত সে; সে-শব্দ শুনতে গিয়ে রাত বেশি হয়ে যেত—ঘুম আসত তার আগে; সে-সুর প্রায়ই আজকাল শোনা যেত না, আসত না, স্পষ্ট করে ধরা দিতে চাইত না। গোলদিঘি কাছে ছিল—বেড়াতে যেত। এক-একদিন নিজের বাড়িতে গিয়ে তত্ত্বতলব নিয়ে আসে-চারদিকে ঘুরেফিরে দেখে মেজদা ও বৌঠানের অমায়িক মুক্ষিমিষ্টত্ব উপভোগ করে। তাঁরা এমন চমৎকার মানুষ—হয়ত খুঁটিনাটি নিয়ে দু'জনে বচসা করছেন, কিন্তু তার ভেতরেও পরস্পরের জন্যে এক নাড়ীরই টান যেন, এক জোড়া বসন্তবউরির মত নীড়ের বাইরে, মুহূর্তেই নীড়ের ভেতরে যেন মানুষের মত শরীর ও বোধ নিয়ে—প্রত্যেক কথার ভেতর দিয়েই যৌনসম্বন্ধে মিছরি মাখানো ভালবাসার মর্ম ফুটে উঠছে। দেখে মাল্যবানের লাগছে মন্দ না, মানে খারাপ লাগে, কেমন বিশ্রী লাগে যেন; ব্যক্তিজলরাশি ভুলে গিয়ে ব্যক্তিকে, নিজের কী হল না-হল, সেটাকেই সব চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় বলে।

এ-জিনিসটা উপলব্ধি করে ব্যক্তিজলরাশির নিশ্চিহ্ন জলরৌদ্ররাশির ভেতর মিলিয়ে যেতে চেয়ে ঈষৎ ভাণ্ড খেয়ে কেমন ভাল লেগেছে যেন তার, এমনই একটা আস্বাদে, মিষ্টি গলায় মাল্যবান বলে, 'মেজদা, আপনাদের শুতে তো কোনো কষ্ট হয় না?'

'না। এই তো বেশ বড় ছাপ্পর খাট রয়েছে।'

'ওখানে একাই শোন বুঝি আপনি?'

'না।'

'ছেলেপুলেরা শোয় বুঝি আপনার সঙ্গে?'

'ওরা নিচে শোয়—পিসির কাছে।'

মেজদা বললেন, 'উনি আর আমি শুই এখানেই। একা বিছানায় ঘুম হয় না—পাশে, যা হোক অন্তত, একটা-শাড়ির খশখশানি উশখুশানি না থাকলে চলে না। বুঝলে কি না.........'

মাল্যবান নিজের কপাল থেকে একটা ডাঁশ উড়িয়ে দিল।

মেজদা গলা খাকরে বললেন, 'বিছানার চারদিকটা বেশ উম হয়ে থাকা চাই তো...হা হা ...'

মেজবৌঠান হামানদিস্তের পান ছেঁচতে-ছেঁচতে ঘরের ভেতরে ঢুকে ছেঁচা পানের বড়ি পাকিয়ে বিরাজবাবুকে দিয়ে গেলেন। তার পর হাত ধুয়ে বিরাজবাবুর দাবনা ঘেঁষেই যেন বসলেন—কোনো সঙ্কোচ নেই। মাপলারটা বিরাজের গলায় ভাল করে জড়িয়ে দিলেন, বললেন, 'বড্ড শীত' বালিশের নিচের থেকে এক জোড়া চকোলেট রঙের মোজা বের করে বিরাজ মিত্তিরের বাঁ পায়ের গোদে, সরু ডান ঠ্যাঙে পরিয়ে দিলেন মাঝবয়েসি আঙুলের সুকুশল সক্রিয়তায়—মোমের ঝরানির থেকে বেশি মধুর ঝরানির থেকে উঠে এসে যেন।

মেসে এসে মাল্যবান—যেন ফাঁপরে পড়ে গেলে, কেউ নেই তার, কিছু নেই। এখানে ছোকরারা থাকে, আর থাকে এমন সব লোক—বিশেষ এক রকম শারীরিক সুখের জন্যে যাদের সব সময়েই লালা ঝরছে; রাতেরবেলা বেরিয়ে যায় তারা; কোথায় থাকে—কী করে? কোনোদিন শেষ রাতে ফিরে আসে, কোনোদিন আসে না। মেসের যাদের এ-রকম রাত করা বাতিক নেই, তাদেরও লালা ঝরছে বিশেষ এক রকম শরীরগ্রন্থির সুখের জন্যে মেসের রাতের বিছানায় শুয়ে থেকে। বছরের পর বছর সারাটা জীবন এরা মেসেই কাটিয়ে দেয়। এ ছাড়া গতি নেই—কিছু নেই—সংসার করবার শক্তি নেই—

বিছানায় শুয়ে পড়ল সে; কিন্তু সেই মুহূর্তেই উঠে বসল। বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। গোলদিঘিতে গেল। ফিরে এল সেখান থেকে। খবরের কাগজ নিল; রেখে দিল; চুরুট জ্বালাল; নিভে গেল; ঠাকুর ভাত দিয়ে গেল?

পরদিন সকালবেলা মাল্যবানের মেসের ঘরের কাছে রেলিঙের ওপর কতকগুলো কাক এসে ডাকছিল। মাল্যবান তার স্ত্রীর মুক্ষি-ওড়ানোর মত ঝটপট হাততালি দিয়ে হা-হা করতে-করতে উড়িয়ে দিল সেগুলোকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের ঘরের একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বললেন, 'দেখলেন মশাই, কী রকম বিরক্ত করে! কাল আট আনার কচুরি-হালুয়া এনে টেবিলে রেখে একটু মুখ ধুতে গেছি, এরই মধ্যে ঘরের ভেতর ঢুকে খাবারের ঠোঙা লোপাট—'

'এই কাকগুলো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'বড্ড বেয়াদব তো—'

'কিন্তু মাল্যবানের ইচ্ছে হচ্ছিল, এই কাকগুলোকে ডেকে সে কিছু খেতে দেয়—এগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছে বলে কেমন একটু খালি-খালি লাগছিল তার। রোজ সকালে সে ঘুমের থেকে উঠবার ঢের আগেই পুবের দিকের এই রেলিঙের ওপর বসে কাকগুলো ডাকতে থাকে। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তার পাড়াগাঁর কথা মনে পড়ে—মা-র কথা; সেই খড়ের ঘর—এমনি শীতের ভোর—এমনি কাকের ডাক। কোথায় গেল সে সব!

মাল্যবান ঘরের ভেতর ঢুকে টেবিলের কাছে বসে এই সব কথা ভাবছিল। এমনি সময়ে কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা একটা কাক উড়ে এসে মাল্যবানের ঘরের পাশে ট্রামরাস্তার দিকের রোয়াকের রেলিঙের ওপর বসল আবার। মাল্যবান অনেকক্ষণ এক ঠাঁই বসে থেকে কাকটাকে দেখতে লাগল—তার ডাক শুনছিল। পাড়াগাঁয় দাঁড়কাক থাকে, পাতিকাক থাকে; কলকাতায় পাতিকাক;—দাঁড়কাক দেখছে না তো। অনেকদিন দাঁড়কাক দেখে নি; একটা দাঁড়কাক দেখেছিল বড় রাস্তার একটা মস্ত বড় বিজ্ঞাপনের ছবিতে; একটা মদের বোতলের টাইট ছিপি ঠুকরে খুলতে চাচ্ছে—ফ্রান্সের বিখ্যাত মদের গন্ধে এমনি তোলপাড় হয়ে গিয়েছে প্রাণীটি। মদের বোতলের বিজ্ঞাপনের দাঁড়কাক, কিন্তু তবুও চোখ তুলে দেখবার মত; এক ঝলকে জীবনের অনেক কটা বছরের আকাশ-বাতাস পাখি-প্রাণী সমাজ-উপলব্ধি উজিয়ে দিয়ে গেছে।

কাকটা উড়ে গেল কুয়াশার ভেতর দিয়ে—গোলদিঘির দিকে—একটা নিমগাছের ভেতর। এমনি উড়ে যেতে ভাল লাগে।

পাড়াগাঁর বাড়িতে প্রকাণ্ড বড় উঠোন ছিল তাদের, ঘাসে ঢাকা, কোথাও-বা শক্ত সাদা মাটি বেরিয়ে পড়ছে, তারই ওপর সারাদিন খেলা করত রোদ, ছায়া, মেঘের ছায়া, আকাশের চিলের ডানার ছায়া—রোদে দ্রুততায় চলিষ্ণু হীরেকষের মত তার ছটকানো। শালিখ উড়ে আসত উঠোনে; খড়ের চালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত বক—এই সরোবর থেকে সেই সরোবরে যাবার পথে, ডানায় তাদের জলের গন্ধ, ঠোঁটে রঙের আভা, চকিত চোখ দূরের দিকে, নীলিমার দিকে। কত উঁচু-উঁচু গাছ ছিল উঠোন ঘিরে; সারাটা শীতকাল ঘুঘুর ডাক জারুল ঝাউ পাৎবাদাম আমের বন নিম হিজলের জঙ্গল কেমন ফুকরে-ফুকরে উঠত—রোদের দিকে পিঠ রেখে নিজের শরীরটাকে একটু এলিয়ে দিয়ে সমস্ত শরীর ঘুমে ভরে উঠত সেই পাখির ডাকে। মাঝে-মাঝে উঠোনে এসে পড়ত ঘুঘু, কেমন কলের মত, পাখিদের দেশের খুদে ঢেঁকির পাড়ের মত ঘুঘুদের লেজগুলো উঠত-পড়ত উঠত-পড়ত—ঘুর-ঘুর-ঘুর-ঘুর করে ছুটে যেত তারা মাঠে ঘাসে—কী খুঁজত—কী চাইত? সেই পঁচিশ-তিরিশ বছর আগের শীতের ভোরের কুয়াশার ভেতর সেই সব পাখি যেন পৃথিবীর মনে কোনো দিন ছিল না; আজকের পৃথিবীটা কলকাতার বাণিজ্যিশক্তির গোলকধাঁধা নিয়ে এমনি অদ্ভুত অপৃথিবী। ফিকে কফির কোকোর মত রঙের গলা ফুলিয়ে কত পাতিকাক উড়ে আসত খড়ের চালে, উঠোনে; শন-শন করে উড়ে যেত ঠাণ্ডা জলের ওপর দিয়ে ছুঁই-ছুঁই করে কোনো নদীকে কোনো দিঘিকেই না ছুঁয়ে, জলের ভেতর ঝাপসা প্রতিফলিত হয়ে, শাঁ-শাঁ করে কোথা থেকে উড়ে যেত, তারা কোথায়; সকালের কুয়াশার দিক থেকে দূর বিদিকের পানে উড়ে যেত সেই কাকগুলো পৃথিবীটাকেই টেনে বার করবার জন্যে, উজ্জ্বল সূর্যটাকে সবাইকে পাইয়ে দেবার জন্যে—যারা কাক নয়, পাখি নয়, তাদের জন্যেও—ক্‌-ক্‌-ক্‌-ক্‌—কেমন শতচেতনার হাঁকডাক, সালিশি, নির্জনতা।

সরস্বতীপুজোর দিন মাল্যবানের ঘরের পাশেই বোর্ডিঙের কয়েকজনে মিলে খুব মদ খেল। বোর্ডিঙের একটা হলের মত ঘরে বাঈনাচ হল। বোর্ডিঙের ঝি বাবুদের সঙ্গে পাশাপাশি চেয়ারে বসে নাচগান দেখল-শুনল; মাল্যবান অবাক হয়ে দেখছিল, ঝি একটুও সঙ্কোচ বোধ করছে না—এ যেন তার পাকাপাকি অভ্যাস; বাবুদের মায়ের মতন কখনো তার ঠাঁট, কখনো কারো-কারো বিশেষ গিন্নি যেন সে, তেমনি ভাবগতিক, কখনো-কখনো সকলের অন্তরঙ্গ যেন—নম্র অমায়িক, সকলকে হাতের ভেতর গুছিয়ে নেবার জন্যে ব্যস্ত, নানা রকম সহজ সুলভ ছেনালিতে সরস। কাল সকালেই গিয়ে তো আবার বাসন মাজতে বসবে। তখন এর ন্যালাড্যালা মুখের দিকে মাল্যবান অন্তত তাকিয়েও দেখতে যাবে না। এই বাবুরাও কোনো তক্কা রাখবে কি? কিন্তু আজ রাতে একে দিয়েই আসর জমানো। আসর জমাচ্ছেও মন্দ না। পান চিবোয়-সিগারেট টানে—গালগল্পের পাট নিয়ে এর কাছে তার কাছে ফেরে—একে না পেলে কয়েকটি বাবুর অন্তত আজ রাতের অনেকখানি ফুর্তি মাটি হয়ে যেত।

মাল্যবান সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে আবার মাথায় ভাবছিল; সরস্বতী পুজোর সঙ্গে এ-সবের কী সম্পর্ক! মদ বাঈনাচ ঝি—এ সবের কী দরকার! কিন্তু-এ আসরের মধ্যে এমন কথা সে হয়ত একাই ভাবছিল। একাই সে কেমন এক! নিস্তব্ধ—কেমন যেন ঝক মেরে গেছে অন্য সবাইয়ের হল্লা জৌলুশের তুলনায়। কিন্তু এ-কথা ঠিক, এদের কারো ওপরই কোনো বিমুখ ভাব ছিল না তার।

মদ খেল না অবিশ্যি, আজ কেন যেন সিগারেটও টানতে গেল না, দু-একটা পান চিবুল মাত্র, কিন্তু আসর থেকে উঠে গেল না তো; বসে-বসে নাচগান দেখছিল-শুনছিল। গয়মতী (মানে কী, এ-নামের?) ঝিকে নিয়ে সবাই ফুর্তি করছিল, কিন্তু এই মাকড়ের ঠ্যাং, ফিঙের ঠ্যাং, কাতলের মুখ, ভেটকির মুখের মত মেয়ে মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝে-মাঝে ভারি দুঃখ হচ্ছিল মাল্যবানের। ইলেকট্রিক লাইটের আলো মাঝে-মাঝে মেয়েটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিমটিমে চোখে এসে পড়ে, বাতির কড়া কড়কড়ে ঝাঁঝে সে কষ্ট পায়, এমন দুঃখ হয় মাল্যবানের; মাথার থেকে ঘোমটা খসে পড়ে মেয়েটির, ছোট্ট খুকিদের মত এতটুকু খোঁপা বেরিয়ে পড়ে—বড় কষ্ট লাগে মাল্যবানের; একটা ভাঙা চেয়ারের খোঁচা খেয়ে মেয়েটির শাড়ির অনেকখানি ছিঁড়ে যায়, নিজে সে তা বুঝতেও পারে না, কিন্তু মাল্যবানের সংবেদনায় গিয়ে লাগে খুব,—খুব; মেয়েটি সিগারেট টানতে-টানতে প্রায়ই বুকে হাত দিয়ে কাশে—সুবিধের লাগে না মাল্যবানের; কাশে যখন মেয়েটি তখন তার চোখ দুটো মাছের মত গোল হয়ে ওঠে—বড় বিশ্রী দেখায়—মাল্যবানের খারাপ লাগে, কেমন দুঃখ করে এই অদ্ভুত হাড্ডিসারের জন্যে, এই ব্যক্তিটির জন্যেই। মাল্যবান খুব ভাল বোধ করছিল না, অবাক হয়ে ভাবছিল, এত সিগারেট টানছে, এতে কি সুখ পাচ্ছে গয়মতী, টানছে আর কাশছে, এই কাশছে তবুও এ-রকম খিঁচে সিগারেট টানছে; 'খুবই অদ্ভুত ভারি মজার বোধ হত জিনিসটাকে, কিন্তু দুঃখ হতে লাগল মাল্যবানের।

চার-পাঁচজন বাবু মিলে ঝিকে আলাদা একটা কামরায় নিয়ে গেল। মাল্যবান নিজের ঘরে চলে যাচ্ছিল, তাকিয়ে দেখল ঝিকে সবাই মিলে মদ খাওয়াচ্ছে।

মাল্যবান হাঁটতে-হাঁটতে ভাবল; এ কী-রকম ফুর্তি! কিন্তু তবুও প্রতিবাদ করতে গেল না; প্রতিবাদ করবার মত চোপা নেই তার, সে-শক্তি ও ঔশ্বর্য নেই; সে তাগিদও নেই; সে জানে, পৃথিবীর অনেক দিকেই এ-রকম অনাচার চলেছে, কেউ রোধ করতে পারে না, কারুর রোধ মানে না।

তেতলায় উঠে অন্ধকারের মধ্যে বারান্দায় খানিকক্ষণ সে পায়চারি করল। তার পর রেলিঙের কাছে এসে নিচের দিকে তাকাল একবার; দেখল, সেই ঝি কলতলার পাশে বসে মুখ থুবড়ে বমি করছে; তার আশেপাশে দু'জন সঙ্গী শুধু। মেসের ঠাকুর বামদেব—লম্বা হিরগিরে মানুষ—মুখটা অনেকটা স্যার ত্রৈলোক্যের মত—ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং চড়িয়ে খানিকটা দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিরাসক্ত ভাবে খইনি টিপছে—মাঝে-মাঝে মাকড়শার জালের মত জড়িত চোখের দৃষ্টি তুলে ঝির দিকে তাকাচ্ছে। ঝির কাছে বসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ছাপরা জেলার পূর্ণ কুর্মি। লোকটা বেঁটে, কালো, মুখে বসন্তের দাগ, উঁচু-উঁচু সাদা, দাঁত থেকে তবুও বিশ্রী গন্ধ বেরয়; কিন্তু হাসি-হাসি মানুষ; এই মেসে সব চেয়ে এই ঝিকেই ভালবাসে সে। ঝি কাকে ভালবাসে? পূর্ণকে নয়, ঠাকুরকে নয়, কাকে, জানে না মাল্যবান। উঠে-পড়ে ভালবাসার ব্যাপারে লেগে গেছে পূর্ণ আজ; ট্যাঁকে আজ কিছু টাকা আছে তার; ঝির সঙ্গে আজ রাতে কাজ হবে তার।

ওপর থেকে হঠাৎ এক সঙ্গে কয়েকটা রোশনচৌকি বেজে উঠল যেন; 'পূর্ণ! পূর্ণ! পূর্ণ!'

ওপরে মাল খাস্ত পড়েছে হয়ত মদের কিংবা মাংসের অথবা সোডা ওয়াটারের; এখুনি দোকানে ছুটতে হবে পূর্ণকে।

গয়মতী বললে, 'তুই যা পূর্ণ, বামদেব আছে, হুই বসে আছে—ওই ওতেই হবে—দেড়টা নাগাদ আসিস তুই।'

পূর্ণ আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে বসে বাঁকিয়ে নতুন মাটির কেঁচোর মত শরীরটাকে পাক খাওয়াল কিছুক্ষণ। তারপরে ধাঁ করে হাওয়া দিল।

বামদেব বললে, 'পরকাল ঝরঝরে করে রাঁড়ি তো হয়েছিস। কিন্তু আমি চক্কোত্তি বামুন, মনে রাখিস, পয়সা-টয়সা পূর্ণর মত আমি দিতে পারব না।'

'তুমি বামুন আছ, আমি হাড়ির মেয়ে নই, আমার বাপের নাম সিধু সরকার—'

'গোবরার সেই সিধু না কি রে? ঐ যে আসত, আর তুই পাত পেড়ে দিতি।'

'কসবার সিধু সরকার, তুমি দেখো নি তাকে।'

'সরকারও এক রকম কায়েত বটে,' বামদেব একটা ঢেকুর তুলে বললে, 'যাক গে, শোন বলি কায়েতের মেয়ে বমি করলি যে!'

'ওসব খাওয়ার অভ্যেস নেই আমার।'

'একটু বেসামাল হয়ে গেছিস, গয়া; আর বমি করবি?'

'না।'

'বমি-বমি করে যদি বল আমাকে, আমি তো তোর পিঠে হাত দিলেই বেরিয়ে যাবে সব হড়-হড় করে—'

'নাঃ। শান্তি হয়েছে,' গয়মতী বললে, 'হাড় নড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে শরীরের ভেতর।'

'তবে চ—'

'কোথা?'

'আর কোথা, বাবুদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে সব। তুই তো খেয়ে আঁশবটি হাতে করে উগরে ফেললি সব ভ্যান-ভ্যান করে, দেখে-দেখে আমার হয়ে গেছে, আর খেয়েছি আমি!'

'নাও, নাও, খেয়ে নাও গে,' গয়া বললে খুব আত্তি দেখিয়ে, 'খইনি টিপছ তো টিপছই, নাও ওঠে।'

'পিবিত্তি নেই,' মুখটা কেমন যেন ভেঙেচুলে ফেলে বামদেব বললে, 'সারাদিন কড়া আগুনে রাঁধতে-রাঁধতো, তোর বমি' দেখতে-দেখতে খাবার হাঁড়ি পেটের ভেতর শুকিয়ে আমার শালকাট হয়ে গেছে, গয়া!'

কলতলায় বসেছিল এতক্ষণ, মাথায় একটা আলতো ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গয়া বললে, 'এও বলি বাপু, ভাল ঠেছকে না আমার; কেমন যেন ঠ্যাকার তোমার, বাপু, ভারি ঠ্যাকারে হয়েছ! তোমার নাম ধরেই ডাকছি তোমাকে, বামদেব—খাবে না? সত্যিই, কিছুই খাবে না!'

'নাঃ, অন্ন খাব না আজ আর, মেষ্টান্ন খাব!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আচ্ছা। আচ্ছা।' একটা মরুকুঞ্জে শ্যাওড়াগাছের মত বাতাসের ঝাপটায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল যেন হাসতে-হাসতে গয়া। রোয়াকের ওপরে বামদেবের কাছেই এসে বসল সে।

'পূর্ণ কি দেড়টার সময়ে আসবে বলেছে?'

'কে জানে কী বলেছে,' ভারি বিপদ গুনে, বামদেবকে সালিশ মেনে, ক্লান্ত মলিন চোখ দুটো বামদেবের চেনা চাওয়ায় সে খানিকটা স্পষ্ট করে তুলে গয়া বললে 'বড্ড হুজ্জোৎ করে পূর্ণ। ওসব দেইজিপনা হবে না আজ।'

'বাঃ, কী করে হবে, তোমার তো একটা মেয়েমনুষের গতর, গয়া। ও চায় সেটাকে পাঁচখানা করে নিতে।'

বামদেব শিবিরাজার আশ্রিত পাখিকে ভরসা দিয়ে বললে, 'ওসব কালকেউটের জন্যে বেউলার রাত জাগতে হবে না, গয়া। আমি তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব, ও বিষদাঁত সেঁধতেই পারবে না।'

শুনতে-শুনতে মাল্যবান নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বোর্ডিঙের খাওয়া-দাওয়া মাল্যবানের ভাল লাগছিল না। কী কতকগুলো ডাঁটা খোসা চোকলা-চাকলা দিয়ে একটা ঘ্যাঁট বানায়, রাঁধতে পারে না, তেল-মশলা খরচ করে না, বাজারের থেকে ভাল মাছ-তরকারি আনতে পারে না; 'এ-রকম হলে এ-বোর্ডিং ছেড়ে যাব আমি।'

একদিন বোর্ডিঙের ম্যানেজার গোটা তিনেক পাঁঠা এনে নিচের ঘর একটা গুদামে বেঁধে রাখল সারাদিন পাঁঠাগুলো চেঁচায়, মাল্যবান কেমন একটু অস্পষ্ট অমানবসাধারণ্য ভাবে চিন্তা করে ভাবেঃ এই যবক্ষার শীতে বেচারিদের কী কষ্ট! হয়ত এরা টের পেয়েছে, মরতে হবে শিগগিরই; আমিষ গন্ধ যেন পেয়েছে, নিজেদের মৃত্যুর; মানুষের হাতে তৈরি যে সেটা, তাও বুঝেছে। সৃষ্টি, মাল্যবান ভেবে যেতে লাগল, প্রকৃতি এদের এত মোক্ষম কামপ্রবৃত্তি দিল কেবলই সন্তান বানিয়ে কেবলই সেগুলোকে ধ্বংস করবার জন্যে। এদের লালসার বাড়াবাড়ির সুবিধে নিয়ে এদের দিয়ে কেবলি এদের ঝাড়বংশ বাড়াচ্ছে কাটছে—খাচ্ছে মানুষ। মানুষের চেয়ে বড় শয়তান কে আছে এই সৃষ্টির ভেতর। শয়তান। শয়তান।

মাল্যবানের মন বেঁকে দুমড়ে গেল কেমন যেন, ইচ্ছে হচ্ছিল ম্যানেজারকে গিয়ে বলে, 'এগুলোকে আপনি ছেড়ে দিন আচায্যিমশাই, টাকাটা আপনাকে দিয়ে দেব আমি।' কিন্তু, ছেড়ে দিলে কী হবে, অন্য কেউ ধরে খাবে। নিজেদের সুমাংস নিয়ে এরা মানুষ-সমাজ থেকে অক্ষত হয়ে এড়িয়ে যাবে? কোথায়? কোন অজব্রহ্মাণ্ডে? তা তো নেই।

ম্যানেজার মনোহার আচায্যি তিনটি বেশ পুরুষ্ট তেলচুকচুকে পাঁঠা এনেছে। বোর্ডিঙের সকলেই পাঁঠার মাংস খাবার জন্যে খুব ব্যস্ত, কবে পাঁঠা কাটা হবে এ নিয়ে চারদিকে এমন একটা প্রবল তাগিদ, সব্বাইয়েরই জিভে এত জল যে মাল্যবান এদেরই মধ্যে একজন মানুষ, ভাবতে গিয়ে মনে হল, সহজ বিবেকেই মাংস খায় মানুষ, যেমন ফল-ফসল খায় সহজ বিবেকে; কেবলমাত্র তার মতন এক-আধজন মানুষের বিবেকে এসে খোঁচা লাগে; মানুষ হিসেবে সে হয়ত অস্বাভাবিক; নিজেকে খানিকটা অস্বাভাবিক মনে হল তার—মানুষ হিসেবে। মাল্যবান ঠিক করল, এ-পাঁঠার মাংস সে খাবে না।

কিন্তু চার-পাঁচ দিন পরে ম্যানেজার পাঁঠা তিনটি বিক্রি করে ফেলল; ঠাকুর পলতার তরকারি, ট্যাংরা মাছের ঝোল আর কলাইয়ের ডাল দিয়ে সাজিয়ে ভাত নিয়ে এল। মাল্যবানের মনটা কেমন একটু বিরস হয়ে উঠল, বললে, 'ঠাকুর, মাংস আর আমাদের কপালে জুটল না।' কিন্তু, খেতে-খেতে মাল্যবান নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে বলল ঃ ছি, তিনটে প্রাণীর জীবনের চেয়ে আমার মাংস খাওয়া হল বেশি?

পরদিনই গুদামঘরে দুটো পাঁঠা দেখা গেল আবার; মাল্যবান একটু ধাক্কা খেল; ভাবল ঃ এ আবার কী। ভাত খেতে-খেতে ভাবল; ও মাংস আমাদের খাবার জন্যে নয়, হয়ত পাঁঠার ব্যবসা ধরেছে ম্যানেজার। ভেবে—খানিকটা ঠেসে গেল তার সাত্ত্বিক উপলব্ধির সমস্ত তোড়জোড়।

সন্ধ্যের সময় ম্যাজেনার, নিকুঞ্জ পাকড়াশিকে বলছিল, 'না, না, এ-পাঁঠা আমি কালই কাটব।'

শুনে কেমন একটু ভরসা পেল যেন মাল্যবান। গোলদিঘিতে ঘুরতে-ঘুরতে ভাবল; জীবনে এমনি নোংরা হয়ে পড়েছে আজ—কয়েক টুকরো তো মাংস, সেজন্যে দুটো প্রাণীর মৃত্যু আমার কাছে এমন আশা-ভরসার জিনিস হয়ে দাঁড়াল! কিন্তু, এ তো স্বাভাবিকতা, শেয়াল-বেড়াল, চিতে বাঘ, কেঁদো বাঘের মত মানুষ হিংসাত্মক তো। মানুষ হয়ে স্বাভাবিকভাবে অহিংসা করে বেড়াবার মত নেই তো তার। কিন্তু, তবুও মাল্যবান সংকল্প করল, এ-মাংস সে খাবে না।

এবং খেল না বটে, কিন্তু মাংসের বাটি ফিরিয়ে দিতে ভারি বেগ পেতে হল তার, রাবড়ির তিন চামচে ঝোল মোটেই সরস লাগল না, খুব সক্রিয় আক্রোশে ম্যানেজার ঠাকুরের ওপর মারমুখো হয়ে উঠল তার মন। মানুষের জীবন সহজ সুন্দর মোটেই নয়, মাল্যবানের নিজের জীবনটাও সরল নয়, সত্য নয়, অনুভব করছিল সে।

মেসের বিছানায় শুয়ে সমস্ত লম্বা শীতের রাত এক-একদিন বেশ ঘুম হয় তার। এক-একদিন ঘুম তেমন হয় না—বারান্দায় পায়চারি করতে থাকে। ইচ্ছে হয়, পরের দিনই বাড়িতে চলে যাবে সে; সকালবেলাও সেই ইচ্ছে থাকে। কিন্তু বেলা যত বাড়তে থাকে, ততই সেই ইচ্ছের অস্বাভাবিকতা বুঝতে পারে সে, মেসের জীবনের থোড়-বড়ির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। এক একদিন শেষ-রাতে গভীর অন্ধকার শীতের ভেতর ঘুমের বিছানা এত ভাল লাগে, জীবনের হৈ-হুটপাট কলরোল এত নিরর্থক মনে হয় যে, ভোরের আলোর কথা মনে করে ভয় করে তার।

মাঝে-মাঝে সে খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোর্ডিঙের অনেকগুলো রাত তার বেশ চমৎকার কেটে গেল। একটা জিনিস খুব ভাল লাগে; একজন ছিপছিপে লম্বা সুন্দর যুবক রোজ শেষ রাতে নানা রকম ইংরেজি বাংলা কবিতা আওড়াতে-আওড়াতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়; মাল্যবান আলোড়িত হয়ে ভাবে—এর জীবনে সমারোহ আছে বটে, কিন্তু সেটা ফিচেল জিনিস নয়, সত্যিই গভীর; ওর'মতন জীবন পেলে হত।

সকালবেলা কুয়াশার ভেতর দিয়ে এক-একটা কাক মাল্যবানের বারান্দার রেলিঙের ওপর উড়ে আসে, কুয়াশার এলোমেলো ছেঁড়ো-ছেঁড়ার ভেতর দিয়ে ডানা মেলে গোলদিঘির দেবদারু নিমগাছের দিকে মিলিয়ে যায়; প্রকৃতির দিঙনির্ণয়ী মন নড়ে ওঠে যেন। কুহক অনুভব করে মাল্যবান। কিন্তু তবুও অতিপ্রাকৃত নয়—কী স্বাভাবিক ভাবে নির্বিদ, এই আলো, পাখি, আকাশের ভাষা।

একদিন সকালে একটা কাক মাল্যবানের রেলিঙের ওপর এসে বসল। কাকটা ঘুরে বসে মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে অনেকবার ডাকার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই গলার ভেতর দিয়ে আওয়াজ বেরল না পাখিটার। গলায় হিম লেগে স্বর বসে গেছে; আবার যে, আওয়াজ ফিরে পাবে পাখিটা হয়ত তা বোঝে না। নিজের গলার আওয়াজ হারিয়ে না জানি কী সে ভাবছে। মাল্যবান তাকে একটা বিস্কুটের টুকরো ছুঁড়ে দিল। কাকটা ঘরের ভেতর ঢুকে বিস্কুটের টুকরোটাকরা খাচ্ছে, কাগজপত্রের ভেতর খচখচ করে লাফাচ্ছে। মাল্যবানের ঘরে অনেকক্ষণ রইল কাকটা—কয়েক টুকরো বিস্কুট খেল।

হপ্তা-খানেক পরে বোর্ডিঙের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে মাল্যবান দেখল, গাঁটরি-বোঁচকা নিয়ে একজন ভদ্রলোক বোর্ডিঙের একটা বড় অন্ধকার দুর্গন্ধ কামরায় চুপচাপ বসে আছে। যেমন কামরা, তেমন তার মানুষ—এ দু'জনের দিকে তাকালে জীবনের পত্যাশা, ভরসা, ভুঁইপটকা হয়ে ফুরিয়ে যায়। মাল্যবান কয়েকদিন দেখল, ভদ্রলোক চুপচাপ বসেই থাকেন শুধু, কারুর সঙ্গে কথা বলেন না, কিচ্ছু না। মাঝে-মাঝে চশমা এঁটে এক-আধটা বই তুলে নেন, কিন্তু পড়া যে বেশি দূর এগোয়, তা মনে হয় না।

একদিন ভদ্রলোকটির ঘরের ভেতর ঢুকে মাল্যবান বললে, 'কেমন আছেন?

নাকের ডগা থেকে চশমাটা কেমন একটা এলোমেলো টুনটুনির ঠ্যাঙের মত খসিয়ে নিয়ে, বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে দুটো চোখ কচলাতে-কচলাতে বললেন ভদ্রলোক, 'আমার শরীর বিশেষ ভাল নেই।'

'কী হয়েছে?'

'এই কদিন থেকেই জ্বর—'

'তা, এ-ঘরে থাকেন কেন—'

'কোথায় থাকব আর?

'পকেট থেকে জড়িবাড়ি একটা ন্যাকড়ার নুড়ি বার করে চোখের পিঁচুটি পরিষ্কার করতে-করতে ভদ্রলোকটি বললেন, 'স্ত্রী মারা যাবার পর থেকেই বাসা ছেড়ে দিয়েছি—'

'ও!'

'এই মাস-পাঁচেক হল মারা গেছেন; পঁচিশ-তিরিশ বছর এক নাগাড়ে ঘরসংসার করেছি। ছেলেপুলে নেই। এখন আর পোড়োবাড়িতে মন টেকে না। পয়মন্তদের ঘুম দেখতে চলে এলুম তাই-আপনাদের পাঁচজনের।'

মাল্যবানকে শুধোলেন, 'আপনার স্ত্রী বেঁচে আছেন তো?'

'আছেন—আছেন—' মাল্যবান কেঁপে-কেঁপে মন্ত্রপড়ার মত করে বললে।

'বাপের বাড়ি গেছেন বুঝি?'

মাল্যবান একটু থতমত খেয়ে বারান্দার রেলিঙের দিকে, যেখানে কাকগুলো এসে বসত সেদিকে, কুয়াশার যে-শুঁড়িপথের ভেতর দিয়ে গোলদিঘির নিমগাছে উড়ে যেত তারা সেদিক পানে, তাকিয়ে রইল।

বাস্তবিক, আমাদের অবস্থা আপনি বুঝবেন না', ভদ্রলোক কাঁচাপাকা দড়ির ওপর হাত রেখে বললেন, 'কেউ বোঝে না। আমার স্ত্রী একটা সাদা উলের গোলা হাতে করে হাসতে-হাসতে চলে গেলেন—'

'উলের পেটি?'

'হ্যাঁ, ভেস্ট বুনছিলেন আমার জন্যে—'

'ওঃ!'

'বুনছিলেন আশ্বিন মাসে—দেশে শীত পড়বার আগে। গেল শীতে গরম জামার অভাবে খুব কুঁদেছিলুম; না, তত বেশি কুঁদিনি বটে, আমি তো ছেলেমানুষ নই, তবে কোঁ-কোঁ করতুম খুব, সত্যিই ভারি শীতকোঁৎকা হয়ে গিছলুম, টের পেয়েছিলেন উনি। কাজেই এবারে উলের জামা বানিয়ে দিচ্ছিলেন—'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আমাকে বলেছিলেন যে তোমাকে দু'দিনেই ভেস্ট বুনে দোব; বলে দিনরাত 'কুরুশ' কাঁটা চালিয়ে যেতে লাগলেন। একুনে চারটে হাত, বুঝলেন মশাই, দু'হাতে ভেস্ট বোনো, দু'হাতে সংসারের ব্যাগার ঠ্যালো, বাটনা-কুটনো রান্না, আমার চানের জন্যে গরম জল, আমার বাতকোমরে তেল মালিশ—ধনেশ পাখির তেল—আমার নাম বিপিন ঘোষ—'

বিপিনবাবু বললেন, 'সে আর-এক হিস্ট্রি আপনাকে পরে বলব কী করে ধনেশ পাখির তেল জোগাড় হল; রাস্তায় যে ফিরি করে বেড়ায়, সে-জিনিস নয়, খাঁটি মাল; এতেও আমার গিন্নির হাত ছিল-'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গিন্নি বটে', বিপিন ঘোষের দিকে তাকাতে-কাতাকেই মাল্যবান তার চোখ দুটোকে হোঁৎ করে কড়িকাঠ ঘুরিয়ে এনে খুব একটা সার্থকতা বোধ করে বললে, 'এখেনে-সেখানে পাঁচি থেঁদি, এর বউ ওর বউ—সব ডাঁটো তোতাপুরি তো। আপনি হাড়েমাসে কিষেণভোগটা পেয়েছিলেন, দাদা, আহা-হা, চলে গেলেন!'

'আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে পেয়েছিলুম,' বিপিনবাবুর কাঁচা ঘায়ে খোঁচা লাগলেও নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'চলে গেছেন আপনাদের আশীর্বাদ মাথায় করে—'

মাল্যবান অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, এ-কথা বলতে গিয়ে বিপিনবাবু একটুও টসকালেন না, কারখানার থেকে শিরা, গ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড তৈরি করে এনেছে যেন লোকটা।

'উলের জামা দু'দিনেই শেষ করে এনেছিলেন প্রায়—এই এত বড় প্রমাণ সাইজের ভেস্ট, দেখছেন তো আমার কেমন দশাসই চেহারা—'

বিপিন ঘোষ পকেট থেকে এক বাক্স কাঁচি সিগারেট বার করে মাল্যবানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিন, স্যার,—'

নিজে একটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'ভেস্ট বোনা শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়, আমি তাঁকে সাত-পাঁচ একটু বিশেষ ঘরোয়া আলাপ-মানে, আমিই তাঁকে সেদিনকার রাত্তিরটার জন্যে আগে থেকে বায়না দিয়ে রাখছিলাম; কথায়-কথায় ওঁর কেমন বুননের ঘর ভুল হয়ে গেল—সমস্ত জামাটাকে খুলে ফেলতে হল আবার—'

'আহা!'

'আবার মরিয়া হয়ে আরম্ভ করলেন। তার ওপর রাতে কিছুটা অত্যাচার হল সেই বায়নার কাজে; কাজটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেল—প্রায় শেষ রাত অব্দি। রক্তের চাপ বেড়ে গেল খুব। সকালবেলা একটু দেরিতে উঠে রোদে গিয়ে দাঁড়ালেন সেই উল আর 'কুরুচ' কাঁটা নিয়ে। আমি একটা জলচৌকিতে বসেছিলুম মুখোমুখি। আমার সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলতে-বলতে, ব্যস, ভিরমি খেয়ে পড়ে গেলেন। তখুনি হয়ে গেল—'

বিপিন ঘোষ আর-কোনো কথা বললেন না। একটা সিগারেট, দুটো সিগারেট, তিনটে সিগারেট শেষ করলেন তিনি। তারপরে মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে নিজের গলার কণ্ঠটার ওপর হাত রাখলেন বিপিন ঘোষ। চোখ দুটো অনবরত নাচতে লাগল তাঁর। একটা জহরকোট গায়ে এঁটে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন তার পর।

মাল্যবান অবিশ্যি সেই দিনই অফিস থেকে ফিরে উৎপলার কাছে গেল। গিয়ে বললে, 'না, মেসে আর না।'

'কেন?'

'আমি আজই চলে আসছি।'

'কোথায় থাকবে, শুনি?'

'যে জায়গায় ছিলাম—নিচের তলা—'

'সেখানে জায়গা নেই।'

মাল্যবান বললে, 'এ-বাড়ির কোনো ঘাপটিতে পড়ে থাকবে, সে-জন্যে ভাবতে হবে না—'

'খেপেছ?' উৎপলা একটু মেজাজে-মেজাজে বললে, 'আড়ি পাতবার জায়গা নেই বাড়িতে; তুমি বেশ রঙে আছ খুব যা-হোক। সঙ্কুলান হবে না, তোমার মেসেই থাকতে হবে; ওদের তো আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না।'

'কিন্তু, এটা তো আমার বাড়ি।'

'তা যদি বলো, তা হলে মেজদাকে নিয়ে আমরা অন্য ফ্লাট ভাড়া করি—'

'না, না, সে-কথা আমি বলছি না—' একটু বলার বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে অনুভব করে মাল্যবান বললে, 'তুমি চলে গেলে এ-বাড়িতে এসে কী হবে আর। সে তো মেসের মতনই হয়।'

একটা কথা বলতে হবে বলে মাল্যবান বললে, 'মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে এক-একদিন রাতে বড় ভরসা হারিয়ে ফেলি। আমার মনে হয়, যদি মরে যাই, তা হলে তোমার সঙ্গে আর-কোনোদিন দেখা—'

উৎপলার মুখের দিকে তাকিয়ে মাল্যবানের জুত লাগল না তেমন; যে-কথাটা পেড়েছিল, সেটা শেষ করতে গেল না আর, বললে, 'ঐ যা, আমার লাইফ ইনসিয়োরেন্স প্রিমিয়ামগুলো দিয়ে দিয়েছ তো। টাকাকড়ি তো তোমার কাছে রেখে গিয়েছিলাম—

'খরচ হয়ে গেছে।'

'খরচ হল! তা হবেই তো, আজকাল তো রাবণের চিতে জ্বলছে কি না এই বাড়িতে।'

'মেজদা বলেছেন, তোমাকে আর-একটা পলিসি নিতে।'

'তা আর হয় না।'

'কেন, বয়েস তো তোমার আছে।'

'না, বয়েসের জন্যে নয়।'

'মেজদা বলেছেন, মেডিকেল টেস্টে ঠেকবে না, তিনি পাস করিয়ে দিতে পারবেন।'

'তিনি এজেন্ট, তাঁর গরজ ঢের', মাল্যবান এঁচড়ে পাকা ছেলের মত একটু ঠাট্টা-অমানিয়ির হাসি, (মনে হচ্ছিল উৎপলার), ছাড়িয়ে বললে। কেমন সেয়ানার মত মুখ করে বসে রইল, আসল জায়গায় মাল্যবানকে ধরা যত সহজ মনে করেছিল উৎপলা, তা নয় যেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'মেজদার কম্পানিতেই তোমার করা দরকার।'

'তা আমি জানি। করবার সাধ্যি থাকলে করতাম বই-কি। যে-দুটো আছে তা, ল্যাপ্স্ না করলেই আমাদের কুলিয়ে যাবে—'

'না, না, করে ফেলো।'

'টাকা নেই!'

'সে আমি বুঝব।'

'তা দেখো। কিন্তু আমি যা বলছিলাম, মেসে থেকে কেমন চল শুকিয়ে যায়—এক-একদিন রাতে; বিয়ে করার আগে তো মেসে থাকতাম, কিন্তু এখন পারছি না, কিছুতেই পারছি না। মেসের বাবুরা বলে, বেশ বনে-জঙ্গলে তো চরছেন দাদা হাতির মত, আবার খেদার হাতি হবার সাধ!'

'বলে না কি?'

'আমি তো বাড়ির হাতি', মাল্যবান বললে, 'বন দিয়ে আমি কী করব?'

'বল নাকি তুমি? রাজবাড়ির হাতি বল নাকি নিজেকে?'

'বলি, শিববাড়ির হাতি—'

'কেন, শিববাড়ির কেন?'

'ঐ যা মুখে আসে, তাই বলি। আমি কাল মেস থেকে উঠে আসব।'

'মেসে গিয়ে তোমার শরীর সেরেছে', উৎপলা বললে, 'হুট করে কিছু করে বসো না। থাকো মেসে কিছুদিন। মেসেই তো বরাবর ছিলে, মেস-মেস ধাত হয়ে গেছে তোমার, ঘর-সংসার মানাচ্ছে না ঠিক। সেদিন আমার ভাইপো-ভাইঝিদের জন্যে নিচের ঘরটা গোছাচ্ছিলাম, মেজ বৌঠান বললে, ঘরটাকে শালগ্রামটি মেসের কামরার মতই করে রেখেছে দেখছি—'

'তাই নাকি? তুমি কী বললে?'

'বলব কী আর। বুদ্ধি খরচ করে কথা বলতে হলে চুপ করে থাকতে হয়।'

মাল্যবান চারদিকে চোখ পাকিয়ে তাকালে, একটা ঢেকুর তুলল, গোঁফের কোনায় একটা মোচড় দিয়ে বলল, 'মেজ বৌঠান যা খুশি তা বলুন। আমার স্ত্রী-সন্তান নিয়ে নিজের মনের ভাবে থাকবার অধিকার আমার রয়েছে। আমার যা খাসদখল, তা ফেলে মেসে গিয়ে আমি থাকব?'

মাল্যবান একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'স্বামীকে কি মেজ বৌঠান মেসে পাঠিয়ে সুখ করছেন?'

উৎপলা ঢিলে খোঁপা খসিয়ে ফেলে চুলের গোছা হাতে তুলে আঁট করে খোঁপা বাঁধতে-বাঁধতে বললে, 'ওদের তো আর আমাদের মত নয়—'

'হয়েছে, হয়েছে', মাল্যবান শিংশপা রাক্ষসীকে কাছে না পেয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে চুরুটটাকে সেপাট করতে-করতে বললে, 'পাঁচ রকম দশ রকম, সব রকম জানা আছে আমার। ল্যা-ল্যা করতে-করতে আমি পরের বাড়ি চড়াও করতে যাই না তোমার ভাজের ভাতারের মত। আমার নিজের রকম নিয়ে আমি নিজের বাড়ি থাকব—শালগ্রাম হব, শিবলিঙ্গ হব—যা খুশি হব—ওদের কী—'

উৎপলা মেজাজ না চড়িয়ে ঠাণ্ডা ভাবেই বললে, 'ঠিক কথাই তো। তবে কালকে হবে না। আট-দশটা দিন পরে এসো, নিচের ঘরটা তোমাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে—'

শুনে মাল্যবানের মনের গরমটা স্নিগ্ধ হয়ে এল; 'আট-দশদিন পরে?'

'হ্যাঁ।'

'নিচের ঘরটা খালি করে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে?'

'তা হচ্ছে।'

'কে করছে ব্যবস্থা?'

'আমরাই।'

ব্যবস্থা তো হচ্ছেই তার জন্যে, উৎপলাই ব্যবস্থা করছে, মিছেই চুরুটটাকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে সে। লোকস্যানি চুরুটটাকে ফেলে দিয়ে পকেট থেকে একটা টাটকা চুরুট বের করে মাল্যবান বললে, 'আমি ও-সব তেমন মানি-টানি না, তবে তথ্য হিসেবে জিনিসটা মন্দ নয়—'

'কোন জিনিসটা?'

'ঐ যে-আমাদের রাজযোটকে বিয়ে হয়েছিল-তোমার মেজদা ঠোঁট ওল্টালেও তোমার বড়দা-সেজদা খুশি হয়েছিলেন—তোমার বাবা তো খুবই—'

মাল্যবান খুব গনগনে আগুনে বেশ বানিয়ে ফেলল চুরুটটাকে, কথা বলার ফাঁকে—ফাঁকে, চুরুটটাকে বেশ প্যাঁচ মেরে টেনে-টেনে। কড়া গলায় একটু হাসি হেসে উৎপলা বললে, 'কে? বলেছিল তো পরেশ ঘটক।'

'হ্যাঁ, তিন রাত্তির মাথা ঘামিয়ে তিনি স্থির করেছিলেন।'

'রাজযোটক', উৎপলা ফিক করে হেসে উঠল শঙ্খিনীর মত চনমনে গলায়, 'রাজযোটক—বিয়ের ফলাফল ফ্যাকড়া টেংড়ি বলো গিয়ে পরেশ ঘটককে তার নির্বন্ধের বাইরে।'

'তুমি পণ্ডিতকে উড়িয়ে দিতে চাও!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পাণ্ডিত্য দিয়ে আমার কোনো দরকার নেই, আমি যা অনুভব করি, তাই বলি।'

'কী করো তুমি—অনুভব?'

'কথা বাড়াতে পারি না,' উৎপলা তুষের আগুনে যেন বাতাস লাগিয়ে একটু ধিক-ধিক করে উঠে বললে, 'এখন তোমাকে মেসে থাকতে হবে। আট-দশদিনে নিচের ঘরটা খালাস করে দেয়া যাবে হয়ত, বলেছিলাম; কিন্তু তা হবে বলে মনে হয় না, মাস দেড়েক তো লাগবেই।'

উৎপলা এক পাটি সুন্দর দাঁত বের করে হাসবার মত মুখ করে, তবুও না হেসে, গম্ভীর ভাবেই বললে। দেখতে-দেখতে দাঁতের পাটি অদৃশ্য হয়ে গেল তার। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট মিশ খেয়ে কঠিন হয়ে রইল খুব আঁট সিঁদুরের কৌটোর মত।

'মেসে কদিন থাকব?'

'যদ্দিন দরকার।'

'মেজদারা কবে যাবেন?'

'তা আমি কী করে জিজ্ঞেস করব তাঁদের?'

'তাঁদের নিজেদেরও তো একটা বিবেচনা থাকা দরকার।'

উৎপলা মাল্যবানের থেকে কয়েক ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে থেকে যেন বললে, 'সেটা কি তুমি তাঁদের শিখিয়ে দেবে?'

হাতের চুরুটটার দিকে চোখ পড়ল মাল্যবানের। চুরুটটা দাঁতে আটকে নিয়ে টানতে লাগল। টেনে-টেনে বেশ ছাই জমেছে যখন চুরুটের মুখে—তখনও, সে কী করবে আর, চুরুটটা টানতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেলে মনে পড়ল মাল্যবানের। বিপিন ঘোষের গল্পটা উৎপলাকে বলতে শুরু করল! মুখবন্ধ শুনেই উৎপলা বললে, 'দুধপোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে না?'

'কই, না তো।'

'এই যে, আমি পাচ্ছি।'

'না, না, গল্পটা, শোনো, ও, পাশের বাড়িতে দুধ উথলে পড়েছে হয়ত—'

পাশের বাড়িতে যে তা টের পেল উৎপলা; নাক আছে তার, কান আছে, আরো নানা রকম সূক্ষ্ম পক্ষীসংস্কার পশু অনুভূতি রয়ে গেছে তার, পাশের বাড়িতে ঠাকুরটা যে হেঁসেল থেকে সরে গিয়ে পানের দোকানে গল্প করছে, তা তো চোখ-কান খাড়া করে টের পেয়ে নিচ্ছিল সে, তবুও একটা খিচ রয়ে গিয়েছিল উৎপলার মনে, 'আমাদের দুধ পুড়লে সব্বোনাশ—মেজদার—'

'তোমার উনুনে দুধ নেই। আমি জানি। এই তো হেঁসেল থেকে ঘুরে এলাম, রাণ্ডি ছ্যাঁচড়া রাঁধছে—' মাল্যবান চুরুট নামিয়ে বললে।

উৎপলা তার ঘন কালো চুলের (বেণীর ভেতরে কোনো ট্যাসেল জড়ানো নেই) মস্ত বড় আবদ্ধ খোঁপার ওপর হাত রেখে চাপ দিতে-দিতে বললে, 'না রে বাপু, তোমার বিপিন ঘোষের কেচ্ছা শোনবার সময় নেই আমার। তুমি নিড়বিড়ে বলেই ওসব বিশ্বাস কর। খুব ভোগা দিয়েছে বিপিন ঘোষ; কিছু টাকা খসিয়েছে নিশ্চয়!'

মাল্যবান বিক্ষুব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'টাকা যদি কিছু চাইতে আমার কাছে, আমি দিতাম বই-কি। কিন্তু টাকা চাইবার লোক বিপিন ঘোষ! তা নয়। তুমি তার সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারতে। লোকটার বাস্তবিকই সব গেছে। দশ মিনিট বসে পর-পর তিনটে সিগারেট খেল—আমার সঙ্গে একটা কথাও বললে না—তারপর একটু গলায় কণ্ঠায় হাত দিতেই চোখ-মুখ একেবারে, পাঁশগাদার কুঁকরোটাকে কোথাও দেখতে না-পেয়ে মোচলমানের ধেড়ে মোড়গের মত, ভেঙে পড়ল যেন বিপিন ঘোষের। কোনো কথা না বলে একটা জহরকোট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

মাল্যবান বিপিন ঘোষের সঙ্গে একশোয়াসে হয়ে গেছে; যেন তারই স্ত্রী মরেছে, ঘর ভেঙে গেছে, কিন্তু তবু তো অন্তর থেকে সহ্য করবার শক্তি শানিয়ে নিতে হচ্ছে তার, এমনই একটা ভাঙা কাসি জোড়া দেবার মত ভরাট, সাহসিক মুখে উৎপলার দিকে তাকাল তার স্বামী।

'এমন উল্লুকও থাকে, তোমার ঐ বিপিন ঘোষের মত?'

'উল্লুক বললে, উৎপলা?'

'তোমার ট্যাঁক থেকে খসায় নি তো কিছু?'

'কেন খসাবে? তুমি ভেবেছ কী বল তো দিকি—'

'ভোগা দিয়ে খসায় নি তো কিছু তোমার মতন ঢ্যাপঢেপে মানুষের কাছ থেকে?' উৎপলা চোখে-মুখে চিনি-মিছরির দানা ছড়িয়ে মাল্যবানের কোমরে একবার নিজের হাতটা জড়িয়ে নিয়ে বললে, 'ভালই করেছ তা হলে। কিছু লাগবে আমার কাজ। কত আছে সঙ্গে?' মাল্যবানের গলায় একবার হাতটা জড়িয়ে নিয়ে মিষ্টিমুখে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'যা আছে, তাই দাও।'

মাল্যবান গড়িমসি করতে-করতে বললে, 'দিচ্ছি। কিন্তু আজ আর মেসে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। এখানে একটা রাতের ব্যবস্থা হতে পারে।'

টাকা হাতে নিয়ে উৎপলা বললে, 'খেতে তো পার এখানে এ-বেলা।'

'না, না, খাওয়ার কথা নয়; একটু ঘুমোবার ব্যবস্থা হতে পারে?' কোথায় শোও তুমি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার পঞ্চাশটা টাকার দরকার।'

'আচ্ছা, ধার করে দেব—'

'কবে!'

'কালই। আজ পঁচিশ টাকা দিচ্ছি। কোথায় ঘুমোয় মনু? আর তুমি?'

পরদিন মাল্যবান এসে বললে, 'ভেবেছিলাম, শিগগির এদিকে আসব না আর।'

উৎপলা কোনো কথা বলছিল না।

'কই, না এসে পারলাম না তো তবু', মাল্যবান একটা চেয়ার টেনে বসল।

'ওখানে বসলে যে?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'দেখলে, আমি নিরিবিলি একটু কাজ করছি।'

শুনে মাল্যবান একটু তাড়া দিয়ে বললে, 'তা কাজ করো—কাজ করো—আমি তো বাধা দিতে আসি নি। কার জন্যে ব্লাউজ সেলাই করছ?'

সেলাই-এর কলের হাতলটা আলগা মুঠোয় ধরে ঘোরাবে কি না ভাবছিল উৎপলা। জামাটাকে কলের সুচে ঠিক করে গুছিয়ে নিয়ে উৎপলা কল চালাতে লাগল।

'সেলাই-এর কল তোমার লক্ষ্মী। কেমন বলবন করে ঘুরছে তোমার হাতে বিষ্ণুর চাকার মত একেবারে সতীদেহ কেটে ফেলেঃ বাঃ! বাঃ!' বললে মাল্যবান; সতীদেহ কেটে ফেলার কথা বলে সুভাষিতই বলেছে মনে হল মাল্যবানের; নিজের মনের বিজ্ঞান-নির্জ্ঞানে যে-অপর উৎপলাকে কাঁধে নিয়ে ফিরছে, সে টুকরো-টুকরো করে কেটে দিচ্ছে এ-উৎপলাকে।

উৎপলা বেশ কল নিয়ে থাকতে পারে, এস্রাজ-সেতার নিয়েও। 'বড্ড একঘেয়ে লাগে রাতের বেলা মেসে: এস্রাজ শিখে নিলে হত।'

'তুমি বাজাবে এস্রাজ?'

'কেন, হবে না আমার?'

'বলে হরিকাকা কাছা দাও; হরিকাকা বলে, কাছা আমার খসল কোথায় যে দেব—' উৎপলা কল ঘোরাতে-ঘোরাতে ঘুরিয়েই চলল, পট করে সুতো কেটে যাওয়ায়, একটু থেমে নেড়ে-চেড়ে, বললে, 'না, কাটে নি, ঠিকই আছে।'

'ববিনে সুতো আছে?'

'আছে, ঠিক আছে, হাওড়ার ব্রিজ হয়ে আছে; নাও, সরো—দিক করো না।'

মাল্যবান উৎপলার হাতের চাকা-ঘুরুনির দিকে তাকিয়েছিল বটে, কিন্তু মনটা চোত মাসের ফলকাটা তুলোর মত কত শত বাতাসে—শতধা নীলিমায় যে উড়ছিল!

'ছেলেরা রাস্তায় সাইকেল হাঁকিয়ে যায়-বেনেটোলা, নবীন পালের লেন পটলডাঙা, কলেজ স্ট্রিট, কলাবাগান, হাতিবাগান, গোয়াবাগান—চৌরঙ্গির চৌমাথা। ভারি রগড়, কিন্তু এক-একটা জিনিস কিছুতেই শিখতে পারলাম না—বাইক করা, উর্দু বলা, পায়জামা চপ্পল শেরওয়ানি কিংবা সায়েবি স্যুটে পাড়ায়-পাড়ায় ল-ল করে বেড়ানো—'

উৎপলা চুপচাপ কল ঘোরাতে-ঘোরাতে আরো বেশি নিঃশব্দ নিঃসম্পর্ক হয়ে পড়ল।

'কেরানির চাকরি আমাকে জুতিয়ে মারল। ইচ্ছে করে এই সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটু নিজের ভাবে থাকি, তুমি সেতার বাজাও, আমি শুনি—সারাটা দিন এই রকম।'

উৎপলা কলের দাঁতের ভেতর থেকে ব্লাউজটাকে বের করে এনে একবার চোখের সামনে ছড়িয়ে দিয়েছিল; সেলাই-এর এখানো ঢের বাকি। মাল্যবান যে অনর্গল পাঁচালি পেড়ে চলেছে, সে-দিকে কান না দিলেও অবচেতনার পথ দিয়ে মনের কানে কিছু-কিছু শুনেছিল।

'ধরো, আর কুড়ি-পঁচিশটা বছর তো সামনে রয়েছে। জীবনের একটা রকমারি হবে নাকি এর মধ্যে? কী বলো তুমি, রকমারি হবে তো বটে? ভাল হবে-সুভালাভালি কেটে যাবে? কী বলো গো?'

'আরো কুড়ি বছর বাঁচবে বলে আশা কর?'

'বেঁচেও তো যেতে পারি।'

'অত বেশি বেঁচে কী লাভ?' উৎপলা ব্লাউজের দিকে মন রেখে তবুও নিজের কথার দিকে মন দিয়ে শান্ত ভাবে, 'আমার নিজের কথাও বলছি—জীবনের আমাদের কী সম্ভব অসম্ভব বুঝলাম তো অনেক দিন বসে; এখন শান্তিতে সরে পড়লেই তো বেশ—'

উৎপলার কথা শুনে মাল্যবান খানিকটা বিরক্ত বিচলিত হল, পকেট থেকে মনের ভুলে বিড়ি বের করে জ্বালিয়ে ফেলছিল, প্রায়, কিন্তু স্ত্রীর সুমুখে বিড়ি সে আজকাল খায় না, সিগারেটও বার করলে না, বললে, 'বিদায় নিলে আমিই নেব, বেঁচে থেকে তোমার ঢের লাভ আছে। আমি এক-একদিন রাতে মেসের বিছানায় শুয়ে ভাবি; ভাবি তোমার কথা। বাস্তবিক বেশ পড়তা নেই বটে কি তোমার জীবনে? কত লোকজনের সোরগোল তোমার ঘরে দিনরাত। তুমি নরকে বসলেও আশেপাশে একশটা নষ্ট চন্দ্র। তোমার মেজদা আর বৌঠান—এঁরা তোমার কাছে থেকে যত সুখী, তুমি নিজে তার চেয়ে ঢের বেশি সুখী এঁদের পেয়ে। কী বলো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাল্যবান চোখ বুজে কথা বলছিল। চোখ মেলে উৎপলার দিকে তাকাল। কাজ করছিল, কথা বলবার কিংবা মুখ তুলে তাকাবার সময় ছিল না উৎপলার।

'সত্যিই, তোমার জিনিস ছিল ঢের, সদ্ব্যবহারও ছিল—' বলতে-বলতে মাল্যবানের মনে হল নিজের বলিয়ে মুখটাকে দেখতে পেয়েছে সে; নিজের মুখটার মুখোমুখি এসে পড়েছে, মুখটা মুখ নেড়ে চলেছে শুধু, উৎপলার হৃদয়ে প্রতিফলিত হতে গিয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসে কী ভীষণ মুখ নেড়ে চলেছে সে, চিড়িয়াখানার একটা বানরের আকচার ছোলাভাজা চিবোবার মত। এই হল তার কথা বলা? ভাব প্রকাশ করা?

উৎপলা এক মনে কল চালাচ্ছিল। এর যে টনক না নড়ে, তা নয়, কিন্তু অন্য-কোনো যৌন-পরিস্থিতিতে অন্য-কোনো মানুষের সঙ্গে? আচ্ছন্ন সারস-বকের মত নিজের বুকের পালকে মুখ গুঁজে সমাধান খুঁজছিল মাল্যবান, কিন্তু কিছু বের করতে পারল না সে।

বুকের পালক মাংসের ভেতর থেকে মুখটা খসিয়ে এনে যেন মাল্যবান বললে, 'থাক, মৃত্যুর কথা আমরা কেউই না বলি যেন আর। বেঁচে যাক, যতদিন সময় বাঁচিয়ে রাখে। দেখা যাক, কী হয়। ভরসা রাখাই ভাল। আমাকে একটা বাজনা শিখিয়ে দাও না—এই এস্রাজ—'

'হিমাংশুবাবু ভাল এস্রাজ বাজাতে পারেন, তাকে ধরো।'

'তাঁকে ধরব'? আমি কি হিমাংশুবাবুর ঘাড়ে এস্রাজ শিখতে চেয়েছি?'

'কেন, খুব তো সহজ, তিনি তো প্রায়ই আসেন।'

মাল্যবান উৎপলার হাত, পেট্রোলিয়মের গন্ধ, সেলাই-এর কলের ঢাকা, ব্লাউজ তৈরির দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাকিয়ে শেষে বললে, 'নাঃ, বাজাতে কি সবাই পারে, মিছিমিছি বলছিলাম।'

এস্রাজের কথা সে আর তুলতে গেল না। 'মনুর শরীর কেমন দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে দেখলাম! কী হচ্ছে?'

'দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে।' উৎপলা বললে।

'কী খায়?'

'কী জানি।'

'পেটে সয় না হয়ত যা খায়, পেটের রোগ হয়েছে, শুকিয়ে যাচ্ছে তাই। না কি কিছু খেতেই পারে না, ভাল কিছু খেতে পায় না?'

উৎপলা একটা সেলাই-এর বই খুলে কতকগুলো নকশার দিকে মন নিবিষ্ট করছিল, মাল্যবান কী বলছে, না বলছে, তা সে বুঝছে কী না, বোঝা যাচ্ছিল না, কোনো উত্তর দিল না উৎপলা।

'মনুর শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'হচ্ছে না কি।'

'আদ্ধেক হয়ে গেছে, টের পাচ্ছ না তুমি?'

'রোগে ধরেছে হয়ত,' উৎপলা বললে, 'হয়ত ওর বাপের মনের রোগে ধরেছে ওকে—'

মাল্যবান তাকিয়ে দেখল সেলাই-এর বইটা ইংরেজি বই নয়—একটা জার্নাল হয়ত; জার্নালের পাতা নেড়েচেড়ে দেখছে উৎপলা। একেবারে ঝুঁকে পড়েছে পত্রিকাটার ওপর। উৎপলা সেলাই-এ এম-এ পাস করবে, ডক্টরেটও পাবে হয়ত, কিন্তু মনু তো, সুতোশাঁখ সাপ হয়ে যাচ্ছে—কেমন সরু—কী ভীষণ সিটে—মরুঞ্চে। এই হালে চললে মাল্যবান মেসে থাকতে-থাকতেই—এ বাড়ির হালচালের ভেতর মনুকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে। কঠিন হবে।

'মনুর লিভার খারাপ—সেই পিলগুলো দাও লিভারের?'

'না।'

'কেন।'

'কোথায় হারিয়ে গেছে ওষুধটা।'

'হারিয়ে গেল! তা হলে তো আজই কিনে দিতে হয়।'

'তা দিও।'

মাল্যবান কথাবার্তার রকম-সকমে একটু নষ্টামির আঁচ ধরতে পেরে বললে, 'মিছিমিছি কিনে কী লাভ—যদি না খাওয়ানো হয়।'

'তাও তো বটে।'

এ-পথ নয়, ও-পথ নয়, ঠিক পথটা ধরা দরকার, অনুভব করে মাল্যবান বললে, 'তুমি তো বলছ এ-বাড়িতে কোনো জায়গা নেই।'

'তাই তো জানি।'

'ছাদে একটা ক্যাম্পখাট ফেলে শুয়ে থাকলে কেমন হয়?'

'তা তুমি নিজে বুঝে দেখো।'

'তোমার কী মত?'

'আমরা বাড়ি দেখছি।'

'কেন?'

'কিছুকাল বাপের বাড়ি থাকব গিয়ে। বড়দা আসছেন কলকাতায়—সেজদা আসছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িও দেখা হচ্ছে না, কেউই আসছেন না, জানে মাল্যবান। বিচিত্র জ্ঞানপাপের বোঝাটা পিঠে ফেলে সে উঠে দাঁড়াল। উৎপলা ব্যস্ত হয়ে কল চালাচ্ছিল।

মাল্যবান চলে গেল।

মাল্যবান গোলদিঘিতে গেল। গোলদিঘিতে অনেকক্ষণ ঘুরল। তারপর মেসে এসে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুতে গিয়ে মাল্যবানের মনে হল মনুর জন্যে পিল কিনে দেওয়া হয় নি তো।

রাত কম নয়। তখনো দু-একটা ফার্মাসি খোলা ছিল। এক ফাইল লিভারের পিল কিনে নিয়ে উৎপলাকে দেবার জন্য একেবারে ওপরের ঘরে গিয়ে উঠল। গিয়ে দেখল, মেজদা, মেজ বৌঠান আর উৎপলা তিনজনেই খাওয়া-দাওয়ার পর ছাপরখাটের ওপর পা ছড়িয়ে, হাসি-তামাশা দোক্তা-পানের মজলিশ বসিয়ে দিয়েছে। ওষুধের ফাইলটা উৎপলাকে দিয়ে মাল্যবান নিচে নেমে যাচ্ছিল। মেজদা বললে, 'ও জামাই, পালালে যে—ও জামাই!'

মাল্যবান একেবারে নিচের ঘরে নেমে এল। দেখল, ছেলেমেয়েরা সব ঘুমুচ্ছে। মনুর খাটের কাছে এসে দাঁড়াল; ছোট্ট মেয়েটার ধঞ্চের কাঠির মত শরীরটা পড়ে আছে—ফুঁ দিলে উড়ে যাবে যেন—এ-শরীরে মাংস লাগবে এসে কোনো প্রক্রিয়ায়—কোনো রকম প্রক্রিয়ায়ই-সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না; ওষুধে, ভাল জায়গায় চেঞ্জে গেলে যে-কাঠামোর শরীর সারতে পারে আশা করা যায়, মেয়ের শরীরে সে-কাঠামোটুকুই নেই। হাড়ের মতন নয়—শুকনো সেলাহাকাঠির মত কয়েকখানা হাড় আছে শুধু।

মশায় খাচ্ছে; বাতাস করে মশারিটা ফেলে দিল মাল্যবান। মনুর বুকের ওপর কম্বলটা টেনে দিল।

মাল্যবানের মন শুকিয়ে যেতে-যেতে ভরে উঠল—কী জিনিসে? তা কামনা নয়—স্ত্রীলোকের জন্যে পুরুষের ভালবাসাও নয়; মনুর জন্যেও—তার এই একমাত্র সন্তানটির জন্যেই একটা নির্বিশেষ পিতৃস্নেহ শুধু নয়, কেমন একটা সর্বাত্মক করুণা এসেছে—মনুর জন্যে, যে-সব ছেলেমেয়েরা এখানে ঘুমিয়ে আছে, বিপিন ঘোষের স্ত্রী বিপিন ঘোষ, মেজদা, বৌঠান, এমনকি নিজের স্ত্রীর জন্যে। এ-মুহূর্তে কোনো তিক্ততা বিরসতা বোধ করল না। সে, কোনো যৌন আকর্ষণ বা যৌনাতীত গভীর ভালবাসা-নারীকে ভালবাসা—এ-সব স্তর ও ফাঁদ উতরে গিয়ে একটা নির্জন অন্তর্ভেদী সমভিব্যাপী দয়ার উজ্জ্বলতায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন অতিমানুষের মত হয়ে উঠল মাল্যবান।

রাস্তায় নেমে মাল্যবানের, মহাপুরুষদের মত, মনে হল ভালবাসা বা কামনা নয়, করুণাই মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির অগ্নিকারুকার্যের ভেতরে আপতিত শিশির-ফোঁটার মত খচিত করে রাখে।

প্রেম খুব বড় জিনিস বটে, নটীর প্রেমের চেয়ে নারীর প্রেম বড়, নারীর প্রেমের চেয়ে বড় সন্ধায়ের জন্যে ভালবাসা, পুরাণপুরুষের জন্যে নিবিড় আকর্ষণ। কিন্তু করুণা? একটা কীট, সেই মড়া বেড়াল-ছানাটা, মনু, বিপিন ঘোষের স্ত্রী, বিপিনবাবু নিজে, এমন-কি মাল্যবানের নিজের স্ত্রী—সকলেই তো মাল্যবানের হৃদয়ের করুণায় অভিষিক্ত হয়ে পুরাণপুরুষের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবে।

মাল্যবান মেসের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, 'ছি-ছি, এ-জন্যে অভিমান জেগেছে না কি আমার হৃদয়ে? আমার প্রাণে সৃষ্টির বড় করুণা এসেছে বলে অহঙ্কার বোধ করছি? না, না,—করুণার সঙ্গে অভিমানের কোনো সম্পর্ক নেই; এই প্রেম নয় তো, এ সবচেয়ে দীনতম জিনিস, তুচ্ছতম। আমি সবচেয়ে নিকৃষ্টমত—সবচেয়ে নিকৃষ্টতম—আমি সবাই-এর কৃপার পাত্র, সকলেই পরমপুরুষের করুণাভাজন, অতএব সকলেই সেই পুরুষের প্রিয়পাত্র—এই যে অনুভাব, এটা করুণা।

কিন্তু মেসের বিছানায় শুয়ে, করুণা, শীতের রাতের তুলোওঠা গরম লেপের ভেতর স্খলিত হতে-হতে যখন নারীপ্রেম নাগরীপ্রেম, এমন-কি, গ্রন্থি-মাংসে গিয়ে আঘাত করতে লাগল, তখন মাল্যবান পাড়াগাঁয়ে ছেলেবেলার কত ছোলার খেত, বড় দিঘি, চাঁচের বেড়ার ঘর, শীতের রাতে পোয়ালের গরম খড়ের গাদি, ফোড়নের মত চারদিকে শিশির ভেজা মাঠ, পেঁচার পাখার খসখসানি, দূরে সুভাবনীয়তম কাল পাখির ডাক—সময়ের ভাঁড়ার ভেঙে-ভেঙে মাল্যবান, বার করতে লাগল এই সব। মিনিট দশ-পনের পরে মনে হল মাল্যবানের অনেক মুখের হামলা, অনেক ঝামেলা, কী ভীষণ ওতপ্রোত ভাব—কী হট্টগোল।

আরো কয়েক মনিট পরেঃ যদিও আর-কয়েকটি মুখের দাবিও কম নয়, তবুও আজকের নিতান্তই সাময়িক প্রয়োজনের জন্যে নেহাতই আকস্মিক ঘটনার মত একটি মুখ রয়ে গেল তার বুকের ভেতর; সে মুখ তার স্ত্রীর নয়।

রাত তিনটের সময় মেসের চৌবাচ্চার থেকে ফিরে এসে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে মাল্যবান ভাবছিলঃ তার জীবনের সারাৎসার মুহূর্তে তার স্ত্রী কোনো কাজে লাগে না।

মেজদারা যতদিন রইলেন শরীর ও মনের নানা রকম অরুচি ও অস্বস্তি নিয়ে মাল্যবানকে মেসে থাকতেই হল।

এই রকম করে সাত মাস কেটে গেল। তারপর মেজদারা চলে গেলেন। কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসেও মাল্যবান বিশেষ সুবিধে পেল না এবার আর। কোনো ওষুধপথ্য কিছুই গায়ে লাগে না, মনুর শরীর দিনের পর দিন কেমন যে হয়ে যাচ্ছে—এ কথা ভেবে মাঝে-মাঝে দাম্পত্য জীবনের অমৃত যে বিষফল, কিংবা বিষফল নয় বঁইচির ফল; বঁইচির ফল—তা যে বিষফল নয় কিংবা বিষফল, এ ধোঁকাটা ভুলে যেতে হয়; প্রণয় আশঙ্কার চেয়ে দয়া জিনিসটাকে ঢের বড় বলে মনে হয় আবার।

অমরেশ বলে একটি মানুষ—মধ্যবিত্ত, বা হয়ত আর একটু ওপরের সমাজের—প্রায়ই আসছিল উৎপলার কাছে আজকাল। অমরেশের রঙ ফর্শা বলতে পারা যায় না—লম্বা চেহারায় ঠাট আছে বেশ, মনের উৎকর্ষ তার শরীরের প্রতিভার মত অতটা চোখে না পড়লেও সাংসারিক বুদ্ধিতে সে কৃতীকুশল—প্রায় সিদ্ধির স্তরে পৌছেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর হবে। বিয়ে করেছে আট-দশটা বছর হল-তিনটি ছেলেপুলে আছে। উৎপলার সঙ্গে কবে, কোথায় তার পরিচয় হয়েছিল—হয়ত এখানেই এখনই প্রথম পরিচয়, জানা নেই মাল্যবানের কিছু। অমরেশ ও উৎপলা দু'জনে মিলে অনেকটা সময় গান-বাজনা নিয়ে থাকে—দু'জনের মেলামেশা শালীন স্বাভাবিক কি না এই বিতর্কে অফিসে বাসায় অনেকটা সময় মাল্যবানের মন অভিভূত হয়ে থাকে—মনুর কথা ভুলে যায় সে—দয়া জিনিসটাকে ঢের অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। এই রকম ভাবে দিন কাটছিল। মনু আজকাল নিচের ঘরে মাল্যবানের সঙ্গেই শোয়। অমরেশ সাইকেলে চড়ে আসে। সাইকেলটা নিচে রেখে ওপরে চলে যায়; রাত নটা-সাড়ে নটা-দশটার সময় বেরিয়ে যায়। তার পর মাল্যবান ওপরে খেতে যায়। গিয়ে দেখে, উৎপলা এমনই নিজের ভাবে বিভোর হয়ে আছে যে কথা বলে তাকে বাধা দিতে ভয় করে। খেতে-খেতে মাল্যবান ভাবে, উৎপলার অন্য-সমস্ত চেনা-পরিচিত লোকের চেয়ে এই অমরেশ ঢের আলাদা জীবঃ অন্য সবাই যেখানে হাতছেড়ে, ঘাঁৎঘোঁৎ খুঁজে ফিরেছে, অমরেশ সেখানে টিক 'শাদাওয়ালা পিলাগো'র ওপর হাত রেখেছে পাকা মিস্ত্রির মত।

ভাবতে-ভাবতে থালার ভাতগুলো নোংরা কড়কড়ে শুকনো চিঁড়ের মত মনে হয় যেন মাল্যবানের; ইটের কুচির মত চিঁড়ে খেতে হবে ডাল দিয়ে মাছের ঝোল দিয়ে; সব মিলেমিশে সুরকি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও কী যেন কিসের একটা ভয়ে—কাকে ভয়, কেন ভয় ঠিক উপলব্ধি করতে পারে না সে, সে—আস্তে-আস্তে চিবুতে-চিবুতে নিঃশব্দে গলার ভেতর দিয়ে চালিয়ে নেয় সব। কিন্তু তবুও অমরেশ সম্বন্ধে একটা কথাও স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায় না মাল্যবান।

বুঝতে পারল, নিজের মনটা তার স্বাতীর শিশির হলেও শরীরটা তার শুক্তি নয়, কিন্তু শামুক-গুগলির মত ক্লেদাক্ত জিনিস। শরীরটার খাঁজে-খাঁজে যে রয়েছে মাংস—মাংসপিণ্ড, সেগুলোকে অনুভব করে মাল্যবান। একটা অদ্ভুত গলগণ্ডের মতন যেন শরীর—তার মন এক চিমটে সময়ের কিনার থেকে দু'দিনের জন্যে ঝুলে আছে এই সৃষ্টির ভেতরে।

মনু খাচ্ছে; কিন্তু খেতে-খেতেই টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। মনুকে জাগিয়ে দেবে কি না ভাবছিল মাল্যবান, না উৎপলা মনুকে কানে ধরে ঘুমের মিথ্যের থেকে ঘরের সংসারের গুমোট মিথ্যের ভেতর জাগিয়ে দেবে?

মনু ঘুমিয়ে আছে, কেউ তার দিকে নজর দিচ্ছে না।

অপরূপ চিত্রিনী যেন আজ শঙ্খিনী হয়ে উঠেছে—টেবিলের এক কিনারে বসে—খাচ্ছে না কিছু উৎপলা; চিনে মাটির ডিশ একটা সামনে রয়েছে, তার, কিন্তু তাতে ভাত নেই, চোখ তার ছাদের ওপারে অনেকখানি খোলা পৃথিবীর দিকে ফেলাতে পারত সে, কিন্তু ছাদের দিকে পিঠ রেখে দেয়ালের পানে তাকিয়ে আছে সে—কিন্তু তবুও দৃষ্টি তার অনেক দূরে চলে গেছে—মাঝখানে দেয়ালটা কোনো বাধা নয়—চোখে তার ব্যথা নেই—উদ্দীপ্তিও নেই কিছু—আছে, কেমন আলোর প্রতিফলনের থেকে টের পাওয়া যায় যে—আলোর উৎসকে, সে-সবের আসা-যাওয়ার মত একটা ঠাণ্ডা নিঃশব্দ ভাবনাময়তা; মনের এ-রকম আশ্চর্য পরিণতির ভেতর নিশ্চুপ হয়ে থাকতে উৎপলাকে তো দেখে নি কোনোদিন মাল্যবান। এ কি ভাল, না মন্দ?

এর মানে কী?

'তুমি খাবে না, উৎপলা?' মাল্যবান গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে।' তুমি খাবে না?' এবার একটু জোরে বলতে হল তাকে।

ঈষৎ নড়ে উঠে উৎপলা বসবার ভঙ্গি একটু ঠিক করে নিতে গেল। সে কী ভাবে বসেছিল? ধরনটা তো ঠিক এই মুহূর্তের উপযুক্ত নয়। ঘণ্টাখানেক আগে এ-রকম ভাবে বসলেও চলত; কিন্তু এখন তো এ-রকম ভঙ্গি চলে না। তা ছাড়া শাড়িটা কোমরে কেমন ঢিলে হয়ে আছে—খুবই ঢিলে—একেবারেই খুলে গেছে তো—উৎপলা দাঁড়াতে গেলেই সমস্ত শাড়িটাই খসে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

'এখন কটা রাত?'

'বেশ রাত হয়েছে, দশটার কম তো নয়।' মাল্যবান বললে।

'আজ খেতে দেরি হয়ে গেল।'

'না, এমন কিছু নয়, আমার খিদে ছিল না।'

'শীতের রাত-দশটা কম নয় তো।'

'তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে? এতক্ষণ? কে?' আস্তে-আস্তে একটার-পর একটা প্রশ্ন পেড়ে উত্তরের জন্যে থেমে রইল মাল্যবান।

'ও একজন লোক।' উৎপলা কোমরে হাত দিয়ে শাড়ি ঠিক করে নিচ্ছিল।

মাল্যবান না দেখল যে তা নয়, খানিকটা রাতের ঠাণ্ডা টেনে নিতে-নিতে দেখল আর-একবার; উৎপলা দেখল যে মাল্যবান দেখল; মাল্যবানের টনটনে জ্ঞান নেই, বৌ তা জানে; কিন্তু তবু মাজার কাপড় আঁটসাট করে নিতে-নিতে উৎপলার মনে হল; মানুষটা তো ঘোড়েল কম নয়, আমার দিকে নজর পড়েছে তার; কিন্তু আমি কী করেছি, আমি তো কিছু করি নি।

'ও একজন লোক যে, তা তো আমিও দেখেছি—'

'তবে আর কী—দেখেই তো ফেলেছে।'

'হ্যাঁ, যখন ওপরে উঠছিল, দেখেছিলাম মানুষটিকে। নিচে সাইকেল রেখে গেল।'

'তার পর?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি ওকে চিনি না তো। এ-বাড়িতে দেখি নি কোনোদিক এর আগে।' উৎপলা নিজের ডিশের ওপর খানিকটা জল ছিটিয়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে দু-চামচে ভাত রেখে বললে, 'আমার কাছে যারা আসে, সকলকেই কি তুমি চেন?'

'অল্পবিস্তর মুখচেনা হয়ে গেছে।'

'কারা আসে বলো তো?'

'তাদের নাম বলতে পারব না, তবে রাস্তায় দেখা হলে ভুল হবে না।'

'চেনা আছে বুঝি সকলের—'

'তা আছে,' মাল্যবান আসল কথার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'কিন্তু, এ কে?' ভাতের সঙ্গে অল্প মাখন মেখে নিয়ে একটু নুন আর কাঁচা লঙ্কা ঘষতে-ঘষতে উৎপলা বললে, 'কী উদ্দেশ্য নিয়ে আসে তারা?'

'তা আমি কী করে বলব। সেটা তোমার নিজের নির্বন্ধের কথা। সেখানে তো আমি হাত দিতে যাই নি কোনোদিন।'

'উৎপলা কাঁচা লঙ্কার বিচিগুলো বেছে বেছে ফেলে দিচ্ছিল, বললে, 'ভালই করেছ, কিন্তু আজ হাত বাড়াচ্ছ কেন?'

'মনু ঘুমিয়ে পড়ছে।'

'তা তো দেখছি।'

'জাগিয়ে দেব?'

'এখন না।'

ভাতগুলো তো চিঁড়ের মত।'

'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কড়কড়ে লাগছে তাই।'

'ঠাকুর এ-রকম বেলাবেলিই রেঁধে চলে যায় কেন?'

'শীতের রাত, কতক্ষণ বসে থাকবে; হাতের আরো দু-পাঁচটা কাজ সেরে বাড়ি যেতে চায়—সেই চেতলায়—' বলতে-বলতে খেতে আরম্ভ করল উৎপলা এবার; কাঁচা লঙ্কার কিছু-কিছু বিচি আছে এখনও ভাতের ভেতর; অনেকগুলোই সে বেছে ফেলে দিয়েছে।

'আমি অবিশ্যি বসিয়ে রাখি নি তাকে।'

'আমি তোমাকে বলি নি তো যে তুমি দায়ী—'

মাল্যবানের মনে হল উৎপলার কথাবার্তায় আগের সেই খড়খড়ে ভাবটা কেটে গেছে যেন, কথা স্বাভাবিক, গলা নরম, আলাপচারির তাৎপর্যে মমতা না থাকলেও ভাবগ্রহণ আছে, আছে ষত্ব-ণত্বের চেতনা—মাল্যবানের সৌকর্যের জন্যে।

পরদিনও সন্ধ্যের সময় অমরেশ এল। অমরেশ তার সাইকেলটা মাল্যবানের ঘরের এক কোনায় তালা মেরে আটকে রেখে গেল। মাল্যবান অফিস থেকে ফিরে বিছানায় শুয়েছিল। তার দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে অমরেশ বললে, 'কী করছেন আপনি?'

'শুয়ে আছি।'

'অফিস থেকে এলেন?'

'এই এলুম।'

'আপনার স্ত্রী আছেন?'

'হ্যাঁ, ওপরেই আছে উৎপলা।'

অমরেশ ওপরে চলে গেল। মাল্যবান ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল। কিন্তু বাইরের একটা আলো ঘরের ভেতর ঠিকরে পড়ছে, অমরেশের সাইকেলটা ঝিকিঝিক করে উঠছে তাই। যখনই সাত-পাঁচ ভাবে মাল্যবান—অন্ধকারের ভেতর চলে যায়; সুফলা ফলার মত অন্ধকারটা কেটে সাইকেলটা ঝলসে ওঠে আবার; মাল্যবানের মনে হল এ হচ্ছে উপচেতনার সঙ্গে চেতনার ঝগড়া, অবচেতনা ঘুমের দিকে টানে—মৃত্যুর দিকে; চেতনা অবহিত হতে বলে, ঢেলে সাজাতে বলে; আচ্ছা ঢেলেই সাজাবে সে।

চা খাওয়া হয় নি তো। চা খাবে কি? ঠাকুর এসে জিজ্ঞেস করে গিয়েছিল বাবু চা-জলখাবার খাবেন কি না—তাকে না করে দিয়েছে মাল্যবান।

গোলদিঘিতে যাবে কি? না, কই যাওয়া হচ্ছে কোথায়? মাল্যবান শুয়েই ছিল। ওপরে এক-আধটা গান হয়ে গেছে। এস্রাজও বেজে গেছে কিছুটা সময়। গান সহজে আসে—শীতের শেষে পাতা যেমন আসে শিমুলের, জারুল—পিয়ালের ডালে—ছেলেটির গলায়; খুব স্বাভাবিক ভাবে খুব ভাল গাইতে পারে সে; কোনো এক জায়গায় গিয়ে তার পর ব্যক্তিত্বের দিব্য স্পষ্টতা আছে ছেলেটির (ছেলেটি কেন বলছে অমরেশকে সে? চেহারায় সকালবেলার সরসতা এখনও খানিকটা লেগে আছে বলে?)—সে কি স্বরকৌশলের সিদ্ধি শুধু? আন্তরিকতা? বুঝতে পারছিল না মাল্যবান। অমরেশের চেয়ে ভাল গান শুনেছে সে অবিশ্যি, কিন্তু এটাও আঘাত করে এসে—দু'রকম ভাবে যদিও—শিল্প-শেফালির আঘাতটাই তবুও নিবিড়তর যেন। এস্রাজ বাজাল কি উৎপলা? তার পর এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা চুপ মেরে আছে সব—উপরে কোনো লোকজন আছে বলেই তো মনে হয় না। সাইলেকটা খুব বেশি ঝিকচিক চিকঝিক করছে; এবং মালিকও আঁশটে দুধরাজের মত ঝিকিয়ে উঠছে দোতলার ঘরে? সাইকেলের তালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খসিয়ে রাস্তায় নামিয়ে প্যাডেল ঘুরিয়ে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে মাল্যবানের—এর মালিক যেমন সন্ধ্যে না হতেই দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে বত্রিশ নম্বর বাড়িতেই উপস্থিত হয় তবু—ছায়া যেমন সারা দিন দেহের আগে-পিছে ছুটে নাগাল পায় না, রাতে অন্ধকারে শরীরের সঙ্গে বিনিঃশেষে মিশে যায় তবু, তেমনি ভাবে এসে পড়ে অমরেশ; তেমনি ভাবে কোনো বত্রিশ, বত্রিশশ, বত্রিশশ—অনন্তের দিগন্তে চলে যাবে না কি মাল্যবান।

বত্রিশশ-অনন্তের দিগন্তে না গিয়ে শেষ পর্যন্ত গোলদিঘিতে বেড়াতে গেল; বেড়িয়ে যখন ফিরছে তখন প্রায় সাড়ে—নটা—এসে দেখে অমরেশের সাইকেল তখনো দেয়ালে কাত হয়ে রয়েছে।

'বাবু, আপনাকে ভাত এনে দিই?'

'কেন?'

'মা দিতে বলছেন।'

'দাও।' মাল্যবান ঠাকুরকে বললে।

ভাত খেয়ে নিজের ঘরের ভেতর অনেকক্ষণ পায়চারি করল সে, কিন্তু সাইকেল গেল না।

মনু বিছানার একপাশে ঘুমিয়ে আছে। মাল্যবান ঘড়িতে দেখল প্রায় এগারটা বেজেছে; ওপরে গান বাজনা এক-আধবার দু- চার মিনিটের জন্যে তড়পে উঠে অতলে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে যেন।

মাল্যবান একটা চুরুট জ্বালিয়ে বিছানায় এসে বসল। ঢং করে একটা শব্দ হল, পাশের বাড়ির ঘড়িতে সাড়ে এগারটা। এই বারে হয়ত ছেলেটি নেমে চলে যাবে।—কিন্তু, কই, নামল না তো সে। মাল্যবান ভাবল, গান-বাজনা আবার শুরু হবে হয়ত। কিন্তু, তাও তো হল না। যতক্ষণ গান সরোদ হাসিতামাশা চলছিল অন্ধকারে ঢিল মেরে নিজেকে তবুও খানিকটা ব্যস্ত রাখা চলে। কিন্তু সব থেমে গেছে তো এখন—বেশি রাত, বেশি অন্ধকার, বেশি শীতঃ এখন কী? কী হচ্ছে এখন? যা হচ্ছে, তা হচ্ছে; মনের হেঁয়ালির কাছে মার খেয়ে কোন লাভ নেই। মনটাকে সে খুব হালকা করে নিল; যেন খুব মজাই হয়েছে ওপরের ঘরে, মনে করে হাসতে লাগল সে; সাইলেটাকে মনে হল অমরেশের নেপালি বয়ের মত, সাইকেলের ঝিমঝিকানিটাকে ভোজালির ঝলসানির মত; কোমরে ভোজালি গুঁজে অমরেশের নেপালি চাকরটা যেন বেশি রাতের নিরেট শীতে থুপি বুড়ির মত বসে আছে, মনিব ওপরের থেকে না নামলে রক্ষা নেই তার, কিছু নেই; কিন্তু তবুও একটা আশ্চর্য প্রতীকের মত যেন এই নেপালি, এই বোকা নেপালি ভোজালি—আজকের পৃথিবীর। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক, মানুষ-মানুষে সম্পর্ক, মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধ, সূক্ষ্মতা হারিয়ে ফেলেছে—সফলতাও সরলতাও; হারিয়ে ফেলেছে সরসতা; আজেকের বিমূঢ় পৃতিবীতে সমস্ত পরিচ্ছন্ন সম্পর্ক-গ্রন্থিকে ছেদ করে অপরিমিত গণ্ডমূর্খের অপরিময়ে মনোবল পথ কেটে চলেছে একটা বোকা নেপালি ভোজালির মত। সময়কে প্রকৃতিকে পুরাণপুরুষকে (যদি থেকে থাকে কেউ) তবে কী হিসেবে ধ্যান করা যাবে আজ? প্রভু হিসেবে? সখা হিসেবে? পত্নী হিসেবে? না, তা নয়। স্বামী স্ত্রী বা সখা ভাবে নয়, সাধা হবে নেপালি ভোজালি ভাবে; ঘুম আসছে না মাল্যবানের।

মাল্যবানের নিজের দোষ নয়; ঘুমেরও দোষ নয়; এই পৃথিবীরই দোষ, শতাব্দীর দোষ; কিন্তু তবুও রাত তিনটের সময় জেগে উঠল যখন সে, তা হলে ঘুমিয়ে পড়েছিল কোনো এক সময়।

সাইকেলটা নেই।

রাস্তার দিকের খোলা দরজা দিয়ে হু-হু করে শীত আসছে। উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল মাল্যবান।

পরের দিন সন্ধ্যেরাতেই বেরিয়ে ফিরে মাল্যবান ঠাকুরের কাছে শুনল যে অমরেশবাবু ওপরে বৌঠাকরুনের ঘরে ঢুকেছেন।

মাল্যবান খেল-দেল, খবরের কাগজ পড়ল, চুরুট টানল; তার পর কথা ভাবল সে; ভাবতে-ভাবতে কথাই ভাবল দু-তিন ঘণ্টা।

রাত বারটার সময় অমরেশ নিচে নেমে এল।

'আপনি এখনও জেগে আছেন চাঁদমোহনবাবু—'মাল্যবানকে একটা হ্যাঁচকা ডাক দিয়ে লেপের নিচে আড়ষ্ট অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলে বললে, অমরেশ। মাল্যবানের নাম চাঁদমোহন নয় তো। অমরেশ একটু জিভ নেড়ে লাট মারতে চাইছে নামটা নিয়ে, সেই নামে মাল্যবানকে ঢেকে। তা হোক। মাল্যবান মুখের থেকে লেপ সরিয়ে নিয়ে বললে, 'ঘুমিয়ে পড়ছিলুম।'

'তার পর?' সাইকেলের তালা খুলতে-খুলতে অমরেশ বললে।

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'আহিরিটোলা'।

'এত রাতে?'

'আহিরিটোলার গঙ্গায় নামেত হবে।'

'এত রাতে?'

'সাঁতার কাটব।'

মাল্যবান এবার আর-কিছু বললে, না। বালিশে শিরদাঁড়াটা ঠেস দিয়ে একটু উঁচু হয়ে বসল।

'সে আমাদের একটা দঙ্গল আছে। চার হাত পায়ে নিমকের বস্তার মত ভুশ করে পড়ে এক-একটা সাঁতারু মুনিষ আহিরিটোলায় গঙ্গায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মুনিষ' কেন বললে অমরেশ 'মানুষ' না বলে ভাবতে-ভাবতে মাল্যবান বললে, 'এত রাতে গঙ্গায় নাওয়া হবে?'

'নাওয়া না,মশাই। গঙ্গামৃত্তিকার তেলক কাটবার জন্যে আমাদের জন্ম হয় নি, দাদা। সাঁতার—দেখি কে কত দূর যেতে পারে, কার আগে যেতে পারে—'

'ওঃ', মাল্যবান বললে।

ছেলেটি সাইকেলটি খুলে রেখে মাল্যবানের টেবিলে এক কিনারে বসল।

'চেয়ারে বসুন।'

'এই বেশ বসেছি। আমাদের সাঁতার দেখতে যাবেন, চাঁদমোহনবাবু?'

'এখন? এত রাতে?'

'আচ্ছা, বেশ, বুড়োমানুষ আপনি, তা হলে বারুণী স্নানের সময় যাবেন। যখন গরম পড়ে যাবে।'

মাল্যবান বললে, 'কিন্তু, সত্যিই কি আহিরিটোলার ঘাটে সাঁতার কাটা হবে আজ?'

'কী বলছি তবে আপনাকে। মেয়েরা অব্দি দেখতে যাবে—'নিজের ডান পায়ের কড়া পালিশের নিউকাট উঁচিয়ে নিয়ে অমরেশ বললে, 'এই ভগবতীর চামড়া ছুঁয়ে বলছি ভদ্দরলোকের মেয়েরা যাবে সব দল বেঁধে আমাদের খেলা দেখতে, বেশ্যেরা যাবে, ওদিককার পাড়ায়-পাড়ায় যেখানে যত বেশ্যে আছে—'

মাল্যবান চুরুট জ্বালাল।

'রাঁড়েদের সঙ্গে ভদ্রঘরের মেয়েদের কোনো হামলা হবে না, সার, কেউ কাউকে দূর-দূর বলে তাড়িয়ে দেবে না। এরাও যে মানুষ, ওরাও তা অকপটে স্বীকার করবে, সার।'

মাল্যবান অবাক হয়ে ভাবছিল, এই সেই অমরেশ? একে নিয়ে উৎপলার রাত বারটা বাজে? থুতু না ছিটোলেও—কথা বলতে-বলতে জিভে-দাঁতে থুতু জমে যায় যাদের—সত্যি-সত্যি না অবিশ্যি, রূপক, হিসেবে—সেই রকমই অসার, অবুদ্ধিমান, উচ্ছ্বাসসর্বস্ব তো এই ছেলেটি, চেহারা লম্বা; গড়নপেটন ভাল; মুখ সুন্দর পুরুষ মানুষের মত; এ সব বলে, ভুশি, হীরে হয়ে গেল উৎপলার কাছে। তাই তো হয়। সৃষ্টিটা সংখ্যানবিশ বটে কিন্তু হিসেবতন্ত্রী নয়, কী রকম মারাত্মক ভুল বিষের মতন মিশে রয়েছে নিখিলের রক্তের ভেতর, তার নিরবচ্ছিন্ন মন্ত্রণার প্রবাহের মধ্যে!

'কিন্তু স্বীকার করলেই তো শুধু হবে না,' মাল্যবান বললে, 'ওদের মানুষ করবার পথ বাতলে দিতে হবে তো।'

'সে একটা মস্ত সামাজিক সমস্যার কথা হল—'

মাল্যবান চুরুট টানতে-টানতে বললে, 'সবই সব হল। তা বটে, সাঁতার কাটা দেখতে গিয়ে কি আর সামাজিক হেঁয়ালি মেটে। তবে হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন বেশ একটু ভ্রাতৃপ্রেম—ভগ্নীপ্রেম—ভাইব্রাদারি—কিন্তু ওদের তো ঢের খারাপ রোগ আছে।'

'আছে বটে, কিন্তু মেয়েরা তো মেয়েদের রোগ দিতে পারে না। খুব হৃদ্যতার সঙ্গেই মেলামেশা, কিন্তু মেয়েরা তো পুরুষ নয়—'

'মাল্যবান মুখের দিকে চুরুটটা নামিয়ে কিছুক্ষণ চর্মচক্ষে এবং মনশ্চক্ষে—চার চোখ মিলিয়ে নিয়ে অমরেশের দিকে তাকিয়ে থেকে তার পর বললে, 'ওখানে ছোকরাদের দলও তো বেশ ভারি।

'তাদের ভেতর দু-কানকাটা খুব কম।'

শুনে মাল্যবান ঘাড় বাঁকাল; ঘাড় সোজা করে চুরুট টেনে-টেনে ঘাড় বাঁকিয়ে অমরেশের দিকে তাকাল একবার। কিন্তু যে-কথাটি বলবে ভেবেছিল তা বললে না, বাজে কথা পেড়ে মাল্যবান বললে, 'এত ঠাণ্ডায় সাঁতার কেটে নিমোনিয়া হবে না তো।'

'হবে—সেরে যাবে। না হয় মরে যাবে।'

'আরে কী বলে! মরে যাবার কী আছে! তা, আমার স্ত্রীকে কী করে চিনলেন?' মাল্যবান বেড়ালের থেকে চিতে বাঘ, চিতে বাঘ থেকে বেড়াল সত্তায় আসা-যাওয়া করতে-করতে বললে।

'এখন চলি, মাল্যবানবাবু, রাত হয়ে গেছে।'

মাল্যবান চুরুটটা নিভে গিয়েছে টের পেল। দেশলাইটা জ্বালিয়ে চুরুট ধরিয়ে মাল্যবান একটা বড় হুড়াড়ের ছানার মত হঠাৎ উজিয়ে উঠে বললে, 'সাইকেল এনে সটান যে ওপরে চলে গেলেন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে কবে কোথায় পরিচয় ছিল আপনার, বলবেন না?'

খুব সোজা কথা জিজ্ঞেস করেছে মাল্যবান, সহজ উত্তর, এক্ষুণি' স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর না দিতে পারে যে অমরেশ তা নয়, কিন্তু তবুও সে বললে, 'আমি আরও তো আসব আপনাদের এখানে। আর-একদিন না হয় বলব।' অমরেশ ওভারকোটের পকেট থেকে সিগারেটের টিন বার করল। একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'সেই যে সামাজিক সমস্যার কথা বলছিলেন, সেটার বিশেষ কিছুই করা যাবে না আমাদের সকলের আর্থিক জীবনের সুবিধে না এলে। এদিন দিয়েই প্রথম চেষ্টা করা দরকার। অবিশ্যি সমাজভাবনা সম্বন্ধে অন্ধ থাকলে চলবে না।'

মাল্যবান নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির নিচে অমরেশের কথাগুলো পুরনো নোংরা খবরের কাগজের মত চেপে রেখে দিয়ে বললে, 'আপনি নিজে তো খুব সচ্ছল—'

আপনার স্ত্রীও তো খুব। দেখছি তো।' বলে অমরেশ যেন কোনো ইঙ্গিত করে নি, কোনো খারাপ ইঙ্গিত করেই নি এমনই স্নিগ্ধ নির্দোষভাবে হাসল। কিন্তু হাসিট কেটে গেল, অমরেশের মুখের চেহারা হল আরেক রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন; অনুধাবন করে অস্পষ্টতার ভেতর থেকে তবুও কোনো স্পষ্টতা খুঁজে পেল না মাল্যবান, হাতের চুরুটের আগুন অঙ্গারের দিকে তাকিয়ে রইল। ঘরটা নিস্তব্ধ হয়েছিল। দু'জনের চুরুট, সিগারেটের ধোঁয়া, পরস্পরকে কাটাকাটি করে কথা বলছিল শুধু।

'আমার স্ত্রীটি তৃতীয় পক্ষের, আমার চেহারা দেখে তা মনে হয়, মাল্যবানবাবু?'

অমরেশ বললে, 'প্রথম পক্ষের স্ত্রীটি এখনো আছে, বাপের বাড়িতে থাকে, আমি তাকে নিয়ে ঘর করব না। দু-নম্বরের কাত্যায়নী মরে গেছে। এই তিন নম্বর। এ স্ত্রীর ছেলেপুলে তিনটি। আর-একটি এই মাঘে হচ্ছে।'

মাল্যবানের মনে হল অমরেশের গলার সুর, শরীরের বাঁধ, সমস্ত অন্তরাত্মার থেকেই কেমন—একটা সুদৃঢ় (কিন্তু) সুলভ আত্মতুষ্টি চুঁইয়ে পড়ছে। আজকালকার এই শিশ্নোদরতন্ত্রী এবং যা শিশ্নোদর নয় কিন্তু তবুও উচ্ছৃঙ্খল—এই সব মূল্যবিশৃঙ্খলার পৃথিবীতে অমরেশের এই কথাগুলো বেশ স্বাভাবিক; স্বাভাবিক অতএব ভাল? ভাল না মন্দ? সে নিজে কী রকম? মাল্যবান নিজের চুরুটের ছাইচাপা আগুনের এক-আধটা কণিকার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। মূল্যবিশৃঙ্খলা? বিশৃঙ্খলরা একেই শৃঙ্খলা মনে করে। মূল্যশৃঙ্খলা কী? কী জিনিস মাল্যবানের মতে? সে নিজে যদি মূল্যশৃঙ্খলা চায়, তা হলে তার নিজের বাড়িতেই যে জিনিস এ-রকম সুসদৃশ ভাবে অনুপস্থিত?

'রাত তো কম হয়নি।'

'বারটা বেজে গেছে।' অমরেশ বললে।

'শীতের রাত বারটা....আমার স্ত্রীর কাছে কী দরকার ছিল আপনার?'

'কথা বলতে-বলতে রাত তো হবেই—'

'দেখছি তো হচ্ছে। এতদিন তো আপনাকে দেখি নি ওখানে।'

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার ধোঁয়া ঘোরার সঙ্গে-সঙ্গে মাথাটা নেড়েচেড়ে নিয়ে অমরেশ বললে, 'আপনারা যে এখানে আছেন তা তো জানতুম না আমি।'

'কী করে জানতে পারলেন তবে?'

'চাঁদমোহনদা, চিনি তো পিঁপড়ের গন্ধ পায় না। পিঁপড়েকেই খুঁজে পেতে বার করতে হয়,' অমরেশ খুব উল্লাস বোধ করে বললে, 'আপনারা বেশ ঝাড়াঝাপটা থাকতে চান, ছোঁয়াছানা বাঁচিয়ে খুব যা হোক; কিন্তু তা হয় না; পিঁপড়েতে চিনিতে ধুল পরিমাণ হয়ে যায়, চিনি পিঁপড়েকে বেছে খায়; দেখেছেন?'

মাল্যবানের মনে হচ্ছিল, অমরেশের কথার কোনো ঝাঁজ নেই, যেন দুটো ঠ্যাঙের বদলে আটটা ঠ্যাং অমরেশের, মাকড়সার মত, কেমন ল্যাং-ল্যাং, ল্যাং-ল্যাং করছে সব সময়েই; কখনো গাঢ় সবুজ, কখনো গাঢ় লাল মাকড়সানিদের দেখছে বলে—সমস্ত জীবনভরে। চেহারার চেকনাই আছে, টাকা আছে বলে বিগড়ে গেছে সে—অনেক মেয়ের হাতেই। উৎপলাও ইন্ধন দিচ্ছে?

মাল্যবান মুখের থেকে চুরুটটা নামিয়ে আন্দাজ করছিল ইন্ধনটা কত দূর—কী ধরনের—

ভাবতে-ভাবতে কেমন যেন সমাধিভূত হচ্ছিল; মুখে সে বলছিল, 'বসুন, বসুন, অমরেশবাবু,বসুন।' কিন্তু অনেকক্ষণ হল ঠোঁট-জিভ নাড়া স্তব্ধ করে দিয়েছিল তার মন নিমেষনিহত হয়েছিল; চুরুট নিভে গেছে—

'চলি, মাল্যবানবাবু।'

'আচ্ছা—'

'কাল আসব।'

'আসবেন। আসবেন।'

দিনসাতেক পরে রাত দশটার কিছু আগেই অমরেশ বেরিয়ে গেলে পরে মাল্যবান খাবার জন্যে ওপরে চলে গেল।

ওপরে উঠে সে দেখল উৎপলা খাবার টেবিলের এক কিনারে নিঃসাড় হয়ে বসে আছে; টেবিলের ওপর মাথা রেখে মনু ঘুমোচ্ছে।

'আজকাল খেতে বড্ড দেরি হয়ে যায়।' মাল্যবান বললে।

'কটা বেজেছে?'

'দশটা।'

'দশটা কি বেশি রাত?'

'সকলের কাছে বেশি নয়,' মাল্যবান বললে, 'মনু তো না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশি রাত হয়েছে বলে ঘুমোয় নি, খুব শীতে কাতরে ঘুমিয়েছে হয়ত।'

উৎপলা বললে, 'তুমি তো আগে খেলেই পারো। রান্নার তো তোমার নিচের ঘরের লাগাও। খাবার সময় মনুকে নিয়েও তো বসতে পারো—'

'হ্যাঁ, কাল থেকে একটা ব্যবস্থা করে নিতে হবে। যে-লোকটি তোমার কাছে আজকাল খুব ঘন-ঘন আসছেন তাঁর জন্যেই খানিকটা বিশৃঙ্খলা এসে পড়েছে পরিবারের ভেতর। ও কে?'

'চিনি না।'

'তার মানে?'

'মানে যে—' উৎপলার কথা কপচাবার ইচ্ছে ছিল না, বললে, 'চিনি না। এই মানে। মানে—কোচড় ভরে নিয়ে যাও, চিবিয়ে খাও মানে। এই মনু! মনু!' বলে ডাক পেড়ে উঠল উৎপলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওকে তুমি জাগিয়ো না, থাক—তুমি জাগিয়ো না ওকে।'

'খাবে না?'

'না।'

'রোজই তো না খেয়ে ঘুমুচ্ছে।'

'ওকে এখন জাগিয়ে খাওয়াতে গেলে খাবে না কিছু, আমাদেরও খেতে দেবে না।' মাল্যবান মনুকে কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় রেখে এল।

উৎপলা একটা তোয়ালে দিয়ে টেবিলটা মুছে নিয়ে দুটো চিনেমাটির ডিশ, কাচের গেলাস, একটা বড় পিরিচে নুন লেবু কাঁচালঙ্কা সাজিয়ে নিচ্ছিল। একটা পারুল ফুলের মত প্রকৃতির থেকেই যেন উৎপন্ন জমিনের তাঁতের শাড়ি সে পরেছিল—চওড়া লাল পাড়ের। আশাতিরিক্ত ভাবে পরিতৃপ্ত কেমন একজন সীতা, সরমা, দ্রৌপদী, চিত্রসেনীর মতন অপরূপ দেখাচ্ছিল তাকে।

'এসো—খেতে এসো—' উৎপলা বললে।

মাল্যবান চেয়ারে বসে বললে 'অমরেশ কখন এসেছিল?'

'সন্ধ্যের সময়।'

'আমি অফিস থেকে ফেরবার আগেই?'

'তুমি কখন ফিরেছ, তা তো আমি জানি না।'

'হ্যাঁ, অফিস ফিরেই ওর সাইকেলটা আমার ঘরে দেখলাম।'

'সাইকেলে আসে না কি?' উৎপলা বললে, 'জানি, না তো।'

'আজ রাত দশটার আগেই চলে গেল! একদিন তো দেখলাম এগারটা-বারটা না বাজলে নড়েচড়ে না। কে লোকটা?'

'আমি চিনি না ওকে।'

উৎপলা খানসাতেক লুচি মাল্যবানের পাতে দিল, খানতিনেক নিজে নিল। দু-তিনটে বাটিতে বেগুনভাজা, ছোলার ডাল, আর আলুর তরকারি ছিল। একটি সসপ্যানে দুধ ছিল—ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সবই মিইয়ে গেছে, লুচি কড়কড় করছে; কারুরই পেটে খিদে ছিল না যেন, কিন্তু তবুও এ-জিনিসের কিনার ভেঙে, ও-জিনিসটা খুঁটে, সে-জিনিসটা টিপে খুব গাফিলি গড়িমসি করে খেতে হচ্ছিল—খেতে-খেতে দু-একটা কথা বলবার জন্যে থেমে পড়ছিল।

'চেনো না—তা হলে কী করে ও তোমার ঘরের ভেতর ঢোকে?'

'এটা কি আমার বাড়ি?'

মাল্যবান বললে, 'এতদিন তাই তো জেনে এসেছি। আজ অমরেশ এখানে আসছে যাচ্ছে বলে আমার ঘাড়ে মালিকানার বোঝা ঠেলে তুমি ওর গতিবিধির কৈফিয়ত আমার কাছ থেকেই নেবে ঠিক করেছ?'

উৎপলা তিনখানা লুচির আধখানা খেয়েছিল এতক্ষণে, বাকি আড়াইটে দিয়ে কী করবে ঠিক করতে না পেরে আপাতত হাত গুটিয়ে মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার বাড়ি হোক, তোমার বাড়ি হোক, তোমার নাকের ওপর দিয়েই তো আমার ঘরে পাত্তা পাচ্ছে রোজ অমরেশ। কী করতে পেরেছ তুমি তার। কী করতে পারবে।'

মাল্যবান দু'খানা লুচি শেষ করেছিল, কিছু ছোলার ডাল, একখানা বেগুনভাজা। জলের গেলাসে চুমুক মেরে ঠোঁট জিভ ভিজিয়ে দাঁত ঠাণ্ডা করে নিয়ে বললে, 'আমি তো জানতাম না যে ওকে তুমি চেনো না।'

'কী মনে করেছিলে তুমি?'

'ওকে তুমি চেনো না?'

'চিনি না বলেছি তো।'

'তোমার বাপের বাড়ির কেউ না?'

'না।'

'কলেজে তোমার সঙ্গে পড়েছিল?'

'আমি তো মেয়েদের কলেজে পড়েছি—সেকেন্ড ইয়ার অব্দি। তুমি দিশে হারিয়ে ফেলছ।'

'কেউই না—কোনোদিনই দেখো নি ওকে এর আগে আর?' স্তম্ভিত হয়ে মাল্যবান বললে, 'তবে?'

'তবে মানে?' ভ্রূকুটি করে উৎপলা মাল্যবানের দিকে তাকাল।

'তবে তোমার দিনের পর দিনই খুব খুলছে মনে হচ্ছে,' মাল্যবান কোমল-কঠিন চোখে উৎপলার দিকে তাকাল; কী একটা দাবি জানিয়ে অথচ তা প্রত্যাহার করে তাকিয়ে রইল অনড়, অক্লান্ত চোখে কিছুক্ষণ। বললে, 'ও আসার পর থেকেই তোমার চেহারার ভেতর এমন একটা সরস-সরসতা—যা আগে আমি দেখি নি বড় একটা। তোমার কথাবার্তা ব্যবহার বিয়ের জল পেয়েছিল কি একদিন? মেঘের জল পাচ্ছে কি আজ? এখনকারটাই তো ভাল মনে হচ্ছে।'

গড়িমসি করছিল এতক্ষণ, উৎপলা এবার খেতে শুরু করল। ঠোঁট একটু নড়ল কি নড়ল না, হাসি ফুটে উঠতেই মিলিয়ে গেল মুখে, সে হাসিটা আমোদের—ব্যথার—হয়ত গ্রন্থিমাংসপেশীর কেমন একটা অচেতন আক্ষেপের—

আধখানা লুচি খাওয়া হয়েছিল উৎপলার, বাকি আধখানা খাচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অমরেশ তো দিন পনের হল আমার কাছে আসছে। চার-পাঁচ-ছ'ঘন্টা রাত কাটিয়ে যায়, বাতি জ্বলে ঘরে; বাতি নিভেও থাকে অনেকক্ষণ; আমরা মাঝে-মাঝে ভাবি তুমি হয়ত ওপরে আসছ; ওপরে এলে একটা কাণ্ডই বাধাতে তুমি—' লুচির বাকি টুকরোটুকু খেয়ে ফেলে উৎপলা বললে, 'তুমি বাধাতে কি না জানি না, তবে মানুষ তো মানুষ, ঝামেলা না হয়ে যায় না; বেধে যেত এত দিনে; অমরেশও চুপ করে থাকত না।'

'কেন কী হয় ওপরে?'

'আমি কেন তা বলব?'

'তা হলে পরের ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে যাব আমি?'

'কেন তুমি নিজে ওপরে এসে নিজের চোখে দেখে যেতে পারবে না? পনের দিন তো হল। নিচের থেকে তরতর করে লোকটাকে ওপরে উঠে যেতে দেখেছ তো রোজই। নিচের ঘরে বসে মাঝে-মাঝে কথাও বলেছে তোমার সঙ্গে। কথাবার্তা শুনে কেমন মনে হয়েছে অমরেশকে তোমার?'

মাল্যবান কিছু খেতে গেল না আর। এঁটো হাতে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, 'লুচি খেলে না যে—'

'খিদে নেই।'

'অমরেশ কাল আসবে?'

'আসবে বইকি,' উৎপলা আর-একখানা লুচির কিনার ভেঙে খিদে জাগিয়ে তুলবার সাহসিক চেষ্টায় নিজেকে আলোড়িত করে তুলে বললে, 'ওকে এ-বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিতে পারবে তুমি?'

উৎপলা উঠে দাঁড়াল।

'কী হল?'

'ঘুম পেয়েছে।'

'বসো, বসো, কথা আছে—'

'না, না, বসতে পারছি না, দুটো পায়ের গিঁটে ব্যথা করছে। কী বলবে বলো, আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছি—'

মাল্যবান সিগারেটটা টানতে গেল না আর। জলের গেলাসের ভেতর সেটা ফেলে দিয়ে বললে, 'অমরেশের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করবে বলো।'

উৎপলা নিজের জলের গেলাসটা মুখে নিয়ে খানিকটা জল খেল, বাকি কুলকুচো করে ছাদের দিকে ফেলে দিল। টেবিলে ছোট পিরিচে কয়েকটা পান ছিল। দুটো পান মুখে দিয়ে মাল্যবানের দিকে বিলোড়িত—ক্রমে-ক্রমে শান্তিমণ্ডিত, কেমন একটা স্থির মমতায়, তাকিয়ে, হেসে বললে, 'কোনো কিছু ব্যবস্থা করবার নেই।'

'কী বলছ তুমি!' উৎপলার দৃষ্টিশক্তির ওপর একটা পাখসাট মেরে যেন মাল্যবান বললে, 'খেয়াল আছে, কী বলছ তুমি।'

'যা বলছি, তাই বলছি,' তেমন দৃষ্টিতৃপ্তিতে মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে একটু ঝক না মেরে উৎপলা বললে, 'তুমি না-হয় কাল ওপরে এসে একটা বিহিত করে যেও—'

মাল্যবান উৎপলার মুখের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে, মনের ঢের বেশি চোখের আলোকপাতের কড়া ঝাঁঝ দিয়ে, সমস্ত ঘরটা ভরে ফেলতে লাগল; ধীরে-ধীরে মনে আলো এল তার; দেখল, আলোটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; মাল্যবান ভাবছিল, সে নিজে বিহিত কিছু করতে পারবে না; অন্ধকার রাতে পাঁচিল ডিঙিয়ে নিজের গাছেরও ফল চুরি করা বা যে যে চুরি করেছে তাকে ঠ্যাঙানো তার ধাতে নেই; ভাল হোক মন্দ হোক, কেমন একটা ধাত যেন তার; বন্ধুবান্ধব ডেকে হামলা করবার রুচি নেই; রটে যাবে সব, যেটুকু-বা সাংসারিক শান্তি আছে তাও ছটকে ছত্রিশখান হবে। কিন্তু উৎপলা কি তাকে সাহায্য করবে না?

মাল্যবান গেলাসটার জল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লোটার থেকে খানিকটা জল গড়িয়ে নিজে ঢক-ঢক করে গিলে খেল—হাত-মুখ ধুয়ে ফেলল। ভাল লাগল, খানিকটা ঈশার শান্তি সংস্থাপিত হল পৃথিবীতে যেন, কিন্তু তবুও বিজ্ঞানের ঘোড়া ডিঙিয়ে সান্ত্বনার ঘাস খাবার প্রবৃত্তি মাল্যবানের ছিল না, সে ভেবে দেখল, উৎপলা আর অমরেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে সে যা সন্দেহ করেছে স্বামীর চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেলে—আজকালকার পৃথিবী যা তাতে আটাশ বছরের রূপসী শঙ্খিনী স্ত্রী সম্পর্কে সে রকম সন্দেহ সে না করতে পারে যে তা নয়। কিন্তু উৎপলা মোটেই সে জাতের মেয়ে নয়, তাকে অবিশ্বাস করা ঠিক নয়। অমরেশ আসে রোজই বটে, কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে যায়, কিন্তু ওরা বোন-ভাইয়ের মত; বড় জোর জামাই-শালীর মত সম্বন্ধ ওদের, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়—জীবনের সৎ ও অসৎকে নিয়ে মাল্যবানের নিরবচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ ঘিরে মাক্রোপোলো সিগারেটের নীল ধূসর ধোঁয়ার নীলাঞ্জন মাল্যবানকে কেমন একটা আশ্চর্য নিশ্চিন্ততার ভেতর সমাধিপ্রীত করে রেখে দিল, কোনো কথা ভাববার দরকার বোধ করল না সে আর।

'অমরেশের খুব টাকা আছে?'

'না। বিশেষ কিছু নেই।'

'তবে, আমাদের চেয়ে বড়লোক?'

উৎপলা অত্যন্ত ছাড়া-ছাড়া গা-ছাড় ভাবে বললে, 'বলতে পারছি না। তা হতে পারে।'

'দেখে তো মনে হয় বনেদি ঘরের ছেলে।'

উৎপলা টেবিলের ও-কিনারে দাঁড়িয়েছিল, এ-কিনারে এসেছিল, কখন ও-দিককার কিনারে চলে গিয়েছে আবার, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ছিল, বসছিল না, বললে, 'ও, তুমি, কেবল টাকা আর বংশের কথাই ভাবছ। আমি ওসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে মাথা ঘামাতে যাই না। ওদের খুব বড় জমিদারি ছিল, অনেক শরিক হয়ে পড়েছে। জমিদারিতে ভাঙন ধরেছে—এখন বিশেষ কিছু নেই—'

'বয়স কত অমরেশের?'

'এই ছত্রিশ-সাঁতাইত্রিশ হবে—'

'স্ত্রী কেমন?'

'সেকেলে জমিদারদের যে-রকম হয়—'যেন বার্তা বহন করেছে, আর-কিছু নয়, শান্ত ঠাণ্ডা ভাবলেশহীনতায় উৎপলা বললে, 'এক-আধ ফোঁটা রক্তকণিকায় তবু নিজেকে, নিজের কথাকে, চারদিককার শীত রাতের আবহকে কেমন একটা বার্তাতীততা দান করে।

'ও তো সেকেলে নয়—ও তো এখনকার।'

'হ্যাঁ, ও নিজে মনে ভাবে যে ও আগামী যুগের,' উৎপলা ঢিলে হাসি হেসে খানিকটা গ্রন্থিমাংসপেশীর আক্ষেপে কেঁপে উঠে, অবিশ্বাসে, অথচ শিশুকে প্রশ্রয় দেবার মত একটা হৃতবল অকপট হাসিতে কাতর হয়ে উঠে বললে, 'ওর মাথায় অনেক বিদ্যে। কিন্তু ওর পরিবারটা ওকে পিছে টানছে, ওর ছেলেপিলে তিনটে, এই মাঘে আর-একটি হবে?'

'এত কথা তুমি জানতে পেরেছ,' অন্ধকারের ভেতর কেউটের মত নড়ছে একটা মহিষের লেজ, তার মুখোমুখি যেন এসে পড়ে বললে মাল্যবান।

উৎপলা পানের পিরিচের থেকে একটা পান তুলে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে রেখে দিল আবার। পিরিচে মশলা ছিল। আঙুল দিয়ে সেগুলো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ঘেঁটে একটা লবঙ্গ তুলে নিল। লবঙ্গটা দাঁত দিয়ে কাটতে-কাটতে বললে, 'অমরেশ তো আমার এখানে রোজ আসে। আমার এখানে অনেক রাত অব্দি থাকে। সব কথাই বলে আমাকে। কেন জানতে পারব না সব?'

মত কী রকম উম আমাদের দু'জনের। আবার দেখবে কী রকম লম্বা এ-সব রাত,

মাল্যবান চিতাবাঘের মত মুখ খিঁচোতে গিয়ে গৃহবলিভুকের মত ক্লান্ত ক্লিষ্ট চোখে বললে, 'ও কি নিজেই সব বলে—সব করে? তুমিই তো ওকে দিয়ে বলাচ্ছ। রাত বারটা-একটা অব্দি ও এখানে থাকে—তুমি আছ, তাই, তুমি ওকে থাকতে দিচ্ছ বলে। এর কোনো বিহিত করবে না?'

'এর কোন বিহিত নেই।'

'নেই?'

'নেই। কোনো নালিশ করো না তুমি।'

উৎপলা অন্তর্ভেদী অনিমেষ দৃষ্টিতে মাল্যবানের দিকে তাকাল, এমন মমতার সঙ্গে তাকাল সে-ভালবাসার এমন গভীর আবেশ! মাল্যবান উৎপলার চোখের দিকে তাকিয়েছিল—তাকাতে-তাকাতে তাকাতে পারল না সে আর।

'শোনো।'

মাল্যবান উৎপলার চোখের দিকে ফিরে তাকাল আবার। কিন্তু তাকিয়েই রইল সে। উৎপলাও মাল্যবানের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল। দু-জনেরই খুব ভাল লাগল। কিন্তু এ তো পরলোকের এঁয়োতি নিবিড়তা—জীবন-নদীর ওপারে—হয়ত হবে কোনোদিন—হয়ত হবে না।

'বলো।'

'বলেছিই তো।' বললে উৎপলা।

'অমরেশের মতন একটা অচ্ছুৎ—'

'অচ্ছুৎ মানে? ও তো বামুনের ছেলে—'

'বেশ্যাটা এখনও আসবে তোমার কাছে?'

'তুমি বড় বিশ্রী কথা বল,' কোথাও আগুন নেই, যেন ছাই-এর ভেতর, তবুও সর্বব্যাপ্ত আঁচ রয়েছে সেই নিশ্চল উনুনের মত তাপ ছড়িয়ে উৎপলা বললে। শীতের রাতে তাপটা খারাপ লাগছিল না মাল্যবানের। উৎপলা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাপ বিকিরণ করে কোনো-একটা অপরিচিত অন্যতম কুহর থেকে তাপ সঞ্চয় করে বললে, 'ও তো দশটা-এগারটা অব্দি থাকে। এখন দুটো। শীতের রাতটা পেকেছে এখন—'

'পেকেছে?' উৎপলার ইচ্ছুক অনুগত শরীরের দিকে তাকিয়ে মাল্যবান নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে, 'কাকে বলে পাকা শীত রাত?'

'এই তো এই সময়টা—'

'কিন্তু এই সময়টা তো সব সময় থাকবে না, ভেঙে যাবে তো সব কালকে ভোরবেলা।'

'ভোর হবে না আর।'

'কী করে বলছ তুমি?'

মাল্যবান উঠে দাঁড়াল। স্লিপারের ভেতর গা গলিয়ে গায়ের চাদর আঁট করে নিয়ে ঘরের চারদিকের অন্ধকারের দিকে চোখ বুলিয়ে নিতেই দেখল উৎপলা তার আরো অনেক কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

দু'জনে বিছানায় শুল গিয়ে। উৎপলা মাল্যবানকে বললে, 'ভোর হবে না আর, জানতে হবে না। দেখো শীতের রাত কী রকম শীত, খড়ের বিছানায় হাঁস-হাঁসিনের শীতের রাত সত্যিই কী যে চমৎকার, লম্বা বলে আরো ভাল। সত্যি, কোনোদিন শেষ হবে না আর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাল্যবানের আশ্চর্য লাগছিল। কোনোদিনও যে জেগে উঠতে হবে না আর, শীত, যা সবচেয়ে ভাল, এই বিশৃঙ্খল অধঃপতিত সময়ে সমাজে রাতের বিছানা, যা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেই শীত রাতের কোনোদিন শেষ হবে না আর, উৎপলা সব সময়ই মাল্যবানের সময় ঘেঁষে থেকে যাবে অনিঃশেষ শীত ঋতুর ভেতর। এই সব অপরূপ লাগল তার। কিন্তু তবুও কী করে তা হয়? ইতিহাস নেই? বিচ্ছেদ করে চলে যেতে দিয়েছে মাল্যবানকে নিয়ে উৎপলাকে? সময় তো আছে? সময় নেই? ছেদ করে চলে গেছে, তাকে নিয়ে, সকল সময়কে উৎপলাকে? গভীর গভীর এই শীতের রাত। অনির্বচনীয়—যখন নদীর থেকে নয়, শুকনো শক্ত চুনি-পান্নার ভেতর থেকে জল ঝরছে; সেই জলদেবীকে নিয়ে এ-রকম শীতের রাতে শুয়ে থাকা।

কোনোদিন শেষ হবে না রাতের?'

না।

কোনোদিন শেষ হবে না আমাদের রাতের, উৎপলা?'

হবে না। হবে না।

শীতের রাত ফুরুবে না কোনোদিন?

না।

কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম?

না, না, ফুরুবে না।

কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত আমাদের ঘুম?

ফুরুবে না। ফুরুবে না।

কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম?

না, না, ফুরুবে না।

কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম?

ফুরুবে না। ফুরুবে না। কোনোদিন—

আলোড়িত হয়ে কথা বলতে-বলতে কেমন আলো-অন্ধকার, সূর্য, শিকরে বাজ, বড় বাতাস, মাতৃগণ, গণিকাগণ, উৎপলার অট্টহাসি, সমুদ্রশব্দ, রক্তশব্দ, মৃত্যুশব্দ, অফুরন্ত শীত রাতের প্রবাহের রোল শুনতে-শুনতে মাল্যবানের ঘুম ভেঙে গেল। টেবিলের ওর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল সে। তাকিয়ে দেখল ঘর অন্ধকার; টেবিলের থালা বাসন সমস্ত সারিয়ে এঁটো পরিষ্কার করা হয়েছে কখন যে সে তা টেরও পায় নি; টেবিল ফিটফাট পরিচ্ছন্ন—কাল সরীসৃপের পিঠের মত চকচক করছে। মাল্যবান বুঝতে পারছিল না কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল। এই যে এইমাত্র উৎপলাকে দেখছিল, বিছানায় শুয়েছিল, কথা শুনছিল—এ সব তা হলে ঘুমের ভেতর দেখা, নির্জ্জান পরলোকের কণ্ঠে শোনা? জেগে থেকে তা হলে সে কোন অব্দি শুনেছিল। মাল্যবান ঘাড় হেঁট করে অন্ধকারে বুঝে নিতে চেষ্টা করছিল।...

মনে পড়ল তার। মনটা তার বড় খারাপ হয়ে গেল। কিছু হবে না, কিছু সে করতে পারবে না বলে উৎপলা তার পর মাল্যবানকে এঁটো টেবিলে ঘুমিয়ে পড়তে দেখল; এঁটো পরিষ্কার করল; মশারি ফেলল; বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়েও পড়ল,—কিন্তু মাল্যবানকে জাগিয়ে দেওয়াও উচিত মনে করল না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসমতীর উপাখ্যান

দুপুর রাতে সিদ্ধার্থ ঘুমের থেকে উঠল। আজ একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিল সে; শোবা মাত্রই ঘুমিয়ে পড়েছিল। প্রায় তিন ঘণ্টা ঘুম হয়েছে। রাত একটা বেজেছে হয় তো? ঘড়িটা দেরাজের ভেতর। পাশের কোঠায় সুনীতি ও তাঁর ছেলেমেয়েরা ঘুমুচ্ছে। নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে তাদের। ঘর একবারে অন্ধকার নয়; রোজ রাতেই কেরোসিনের হ্যারিকেনটা ডিম করে জ্বালিয়ে রাখা হয় ঘরের এক কোণে-একটা পুরনো বই বা খাতার আড়ালে; তারই খানিকটা আলো ঘরের ভেতর। মফস্বলের এই শহরে ইলেকট্রিক বাতি আছে কারো-কারো বাড়িতে, কিন্তু সিদ্ধার্থ টাকাকড়ির অভাবে ইলেকট্রিক কানেকশন আনতে পারেনি; আজকাল আর কানেকশান দেওয়া হয় না-খুব বেশি তদবির করতে না পারলে। তা ছাড়া-থোক টাকা নেই তার হাতে-তদবির করার কথা ভাবতেই পারে না সে। বাড়িটাও তার পাকা নয়; মেঝেটা পাকা অবিশ্যি। কিন্তু ছনের চাল, খলকার বেড়া। বেড়া ভেঙে গেছে অনেক জায়গায়; সেখানে হোগলা দিয়ে মেরামত করা হয়েছে। হোগলার বেড়াও আছে-এইটেই কায়েমি হবে বোধ হয় আস্তে-আস্তে। মুলি বাঁশের বেড়া, দরমার বেড়া, দু-এক জায়গায় টিনের পাতের বেড়া-বেড়ার বহুরূপই আছে এ ঘরের ভেতর। পঞ্চাশের বন্দ দু'খানা ঘর-পশ্চিম পোতায় আর দক্ষিণ পোতায়। দক্ষিণ পোতার ঘরে সিদ্ধার্থরা থাকে; অন্য ঘরটায় আত্মীয়স্বজনরা থাকত। কিন্তু একে-একে তারা সকলেই কলকাতায় বিহারে আসামে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে, কৃচ্চিৎ আসে এদিকে।

চার বিঘে জমি নিয়ে বাড়ি। দু'টো পুকুর আছে। দু'টোই প্রায় মজে এসেছে। জাপানি হিড়িকের সময়-ওরা এলে বা এসে পড়ল-পড়ল এই উদ্বেগে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে, শহরের জলের কল ঘায়েল হয়ে জল সরবরাহের অভাবে বেশি বিপদ হতে পারে, এ বাড়িতে তখন অনেক মানুষ ছিল, এই জন্য একটা মজা পুকুর নতুন করে কাটিয়ে নিয়েছিল আবর সিদ্ধার্থ—নোয়াখালির মুসলমান কামিনদের দিয়ে। কিন্তু সে-পুকুরটাও আগাছা জঙ্গলে, পাতার রাবিশে, তাল-নারকোলের গুঁড়ি, কাঠের তক্তা ও গোঁজে কেমন যেন জলকঙ্কালের মত রূপ ধরেছে আবার। কী করবে সিদ্ধার্থ? টাকা নেই, কাটাতে পারবে না আর। জল সে খুব ভালবাসে-নদীর জল, দিঘির জলের মতন একটা ঠাণ্ডা শামলা বা নীলচে গভীর বিথার সাদা-সাদা জলের ফেনার চঞ্চল—কিন্তু হাতে টাকা নেই, পুকুর আবার কাটাতে পারবে না। কিছু মাছ আছে দু'টো পুকুরেই—বড় মাছ দু—চারটে থাকতে পারে হয়তো, এর বেশি নেই; ফলি পুঁটি খলসে চিংড়ি আছে কিছু এখন। ছেলেবেলায় ছিপ পেতে মাছ ধরত সিদ্ধার্থ মাঝে-মাঝে কিন্তু সে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের কথা। আজকাল দুলে চাঁড়াল নমশূদ্র দিশি গরিব খ্রিস্টানরা এসে বঁড়শি ফেলে, 'ছাবি' বা 'চাই' পেতে, বা জলে ছেঁকে সাজি ডুবিয়ে মাছ নিয়ে যায়—প্রায়ই কিছু বলে না সিদ্ধার্থ। এ সব পুকুরে ত্রিশ বছর সিদ্ধার্থদের নিজেদের জাল পড়েনি। বর্ষাকালে, প্রথম বর্ষার দিকে, মাঝে-মাঝে জাল পড়ে—খুব গভীর রাতে। গবিরগুবরো বদমায়েশরা এসে মাছ চুরি করে নিয়ে যায়। কিছু বলবার নেই সিদ্ধার্থের। মাঝে-মাঝে দরজা খুলে বাহিরে এসে দাঁড়ায়; জাল ফেলার শব্দ থেমে যায়; অন্ধকারে টের পাওয়া যায় না কারা কোথায় রয়েছে, কেউই রয়েছে কিনা, বাস্তবিকই জাল পড়ছে কিনা, না সবই মনের ভুল। পুকুরের চারদিক ঘিরে সুপুরির জঙ্গল, বুনোলতার ঝাড়, কাগজি লেবুর জঙ্গল, বড়-বড় লিচু জামরুল গাছের বিরাট অন্ধকার পাহাড় যেন সেব। এরই ভেতর থেকে চোর খুঁজে বের করতে হবে? একজন চোর নয় নিশ্চয়ই, একটা দঙ্গল, কাল কুচকুচে শরীর, ন্যাংটো, সারা গায়ে তেল মেখে এসেছে। মাছ শুধু নয়—সবই চুরি করবে একে-একে, গাছের সুপুরি, ডাব, ঝুনো নারকোলের কাড়ি, সুবিধে পেলে ঘরে ঢুকবে—সিদ্ধার্থেরই ঘরে শুধু নয়। (তার ঘরে জিনিস বেশি কিছু নেই), যে-ঘরেই টুকিটাকি জিনিস রয়েছে, হলে-হবে সোনাদানা আছে, সিঁদ কেটে বা বেড়ার বাঁধ খসিয়ে ঢুকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। ভাবতে-ভাবতে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লেই আবার জাল ফেলার শব্দ। পাশ ফিরে শুয়ে পড়ত সিদ্ধার্থ—আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়ত। থেকে-থেকে জেগে উঠে গলার খাঁকারি আর হুমকি। সজলা সশব্দা কাল ভয়ঙ্কর পৃথিবী ভাল লাগত সিদ্ধার্থের, ঘুমের আবেশে শরীর চোখ ভরে উঠত। খানিকটা উদ্বেগের খামির এসে মিশেছে ঘুমের ভেতর; স্বাদটা আপরূপ তাই।

এমনি করে বাসমতী ক্ষেতে (শহরটার নাম; কেউ-কেউ 'চল্লিশ ক্ষেত' বা 'বাসমতী'ও বলত; শহরটা পূর্ব বাংলায়) এক-একটা আশ্চর্য অভিঘাত বোধ করত সিদ্ধার্থ। আরো অনেক রকম স্বাদ ছিল।

বাড়িটার মস্ত বড় উঠোন। অনেক আগে অবিশ্যি গোবরজল দিয়ে নিকানো হত; কিন্তু সে সিদ্ধার্থের শিশুকালের কথা। যে-সব মহিলারা এ কার্জ করত তাদের মুখ আবছা হয়ে ভেসে ওঠে মাঝে-মাঝে সিদ্ধার্থের চোখে; অনেক দিন থেকেই তারা নেই। আজকাল উঠোনে ঘাস গজিয়ে বেশ একটা সবুজ শ্রী ফলেছে—প্রায় আধবিঘে জমি নিয়ে। এত চমৎকার, কখনো-কখনো মনে হয়, এক হিসেবে এই ঘাসের অবলেপ ও নিস্তব্ধতা আগের চেয়ে ঢের ভাল। কোনো ঘাসকাটা কল নেই অবিশ্যি, তবে মাঝে-মাঝে আমিন শিকদারকে ডেকে আনা হয় কিংবা তার ছেলে রমিহকে, আগাছা পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, কাস্তে দিয়ে খুপ-খুপ ঘাস কেটে ছালায় ভরে নিয়ে যায় আমিনের গরু আর রহিমের আস্তাবলের জন্যে। উঠোনটা প্রায়ই বেশ ঝরঝরে দেখায়, তাই। কিন্তু আগাছা খুব তাড়াতাড়ি জন্মায়, বর্ষাকালে চোরকাঁটায় ভরে যায়, কাশ গজায়, শীতে চোরকাঁটা কাবু হয়ে পড়লেও আগাছাগুলো লক লক করতে থাকে—আমিনকে আসতে হয় আবার। বছর ভরে উঠোনটা পরিষ্কার রাখতে হলে বেশ কিছু টাকার দরকার। হেমন্তে-শীতে আমিন নিড়িয়ে কেটে ঝেড়ে ঠিক করে দিয়ে গেলে অনেকখানি সাদা মাটি বেরিয়ে থাকে উঠোনের, কিন্তু তবুও বেশির ভাগ জমি জুড়েই সবুজ ঘাস। পাড়ার ছেলেমেয়েরা খেলা করতে আসে, কুলের আঁটি, ফলপাকড়ের চোকলা-ছোবলা. মাটির ঢেলা, ন্যাকড়া, কাগজের টুকরো উড়িয়ে-ছড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঘাটা করে রাখে উঠোনটাকে। সিদ্ধার্থ নিজেই পরিষ্কার করে, ছেলেপিলেদেরও সাহায্য করতে ডাকে মাঝে-মাঝে। সুনীতি ভেতরের কাজে ব্যস্ত থাকে, আদিনাথের (চাকর) অন্য ডের কাজ অন্য অনেক দিকে। চোত-বোশেখ মাসে উঠোনের সাদা মাটি ফেটে যায়, পৃথিবী জখম হয়েছে। খুব বড্ড গভীর ফাটল নয় অবিশ্যি, সে-সব ধানের ক্ষেতে দেখা যাবে, সেখানে ফাটল আর নাড়া ধূ ধূ করছে এখন—কত যে ধান জমি জুড়ে। উঠোনের ফাটল অনেকটা মিহি—পৃথিবীর করকোষ্ঠী রেখার মত যেন। কী যেন সব ভবিতব্যতা লুকিয়ে রয়েছে ঐ রেখাগুলোর ভেতর। কাদের ভবিতব্যতা? মানুষের? পৃথিবীরই যেন।

উঠোনের পশ্চিম পোতার ঘরে মাটির মেঝে, শাল-সুন্দরী-গরানের খুঁটি, আসাম থেকে আনানো হয়েছিল, এক কাকা এনেছিলেন—প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়নি তখন। খুঁটিগুলো এখনো নিরেট তরুদানবের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন; তবে আলকাতরার পোঁচড় খেয়েছে খুব-গোড়ার দিকে—না হলে উঁইয়ে চিবিয়ে সাবাড় করে দিত। গত চার-পাঁচ বছর আলকাতরা পড়েনি—টাকা নেই সিদ্ধার্থের। মাটির নিচে নিচে খুঁটিগুলোর কী হচ্ছে টের পাওয়া যায় না, তবে ওপরে লোহার বিমের মত শক্ত, অব্যর্থ। কাঠের দেয়াল, কাঠের তক্তার শিলিং, টিনের চাল। চাল আর শিলিঙের মাঝখানের খোলা জায়গাটায় পাখিরা বাসা বাঁধতে পাবে বটে, কিন্তু বাঁধে না বেশি, ইঁদুর গড়িয়ে ফেরে, ধাড়ি-ধাড়ি ছুঁচো চিৎকার করে ছুটে বেড়ায়, শুকনো সুপুরি হড়গড় করতে থাকে ইঁদুরগুলোর গড়ানি খেয়ে, মাঝে-মাঝে ভোঁদড় আসে। অনেক লোকজন থাকত এক সময়ে এই ঘরে, অনেকে মরে গেছে, বাকি সব ছড়িয়ে পড়েছে দেশেবিদেশে, অনেকেই কলকাতায় গিয়ে কপাল ফিরিয়ে নিয়েছে, মাসমতীর কথা বড় একটা মনে পড়ে না তাদের, কেউ-কেউ আরো দূরে পশ্চিমে চলে গেছে। ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল আবার সিদ্ধার্থ।

তিনটি প্রাণী শুধু আছে এখন পশ্চিমের ঘরে—একজন সিদ্ধার্থের বুড়ো পিসিমা, বয়স প্রায় সত্তর হয়েছে তার। সরোজিনী ঠাকরুণকে পিসিমা ডাকে সিদ্ধার্থ, বাইরের লোকেরা সরোজিনীদি ডাকে কিংবা দিদিও ডাকে অনেকে, মাসিমা ডাকে বিস্তার লোক, যদিও সিদ্ধার্থের মাসিমা নন সরোজিনী পিসিমা। মিসেস বোস ডাকে কেউ-কেউ-প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগে শ্রীধর বোস নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল পিসিমার। ছ'মাস পরেই শ্রীধরবাবু মারা যান। কথাটা কারো-কারো খেয়াল আছে বলে এখনও মিসেস বোস বলে ডাকে সিদ্ধার্থের পিসিমাকে। পিসিমার অসবর্ণ বিয়ে হয়েছিল। সিদ্ধার্থরা কায়েত নয়-সেনগপ্ত—সিদ্ধার্থ গুপ্ত কেটে ফেরে শুধু সেন লেখে। সরোজিনী পিসিমা বিধবা হবার পর এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন, ফার্স্টআর্টস পড়ছিলেন কিন্তু বাসমতীর বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেটদের পরিবারে ধারাবাহিকভাবে ছেলেমেয়েদের ইংরেজি-মানে ইংরেজির থেকে বাংলা তর্জমা-ও বিশেষ করে বাংলা পড়াবার কাজে বহাল হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। মাঝে-মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করেছিলেন অবিশ্যি এম-এ পরীক্ষা দিতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। বঙ্কিমবাবু, ভূদেববাবু, চন্দ্রনাথ বোসের বাংলাই পিসিমার লেগেছিল ভাল—পরে রবীন্দ্রনাথ কিছু-কিছু পড়েছিলেন। বাসমতীর গার্লস স্কুলেও কাজ করেছিলেন অনেকদিন—শিক্ষক হিসেবে ঠিক নয়-রেকটর গোছের কী একটা কাজ ছিল তাঁর, প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর, বেশ মানসম্ভ্রম ছিল সেই কাজে, মাঝে-মাঝে ক্লাসও নিতেন; থার্ডক্লাস-সেকেন্ডক্লাস মেয়েদের বাংলা পড়াতেন। ফাস্ট ক্লাসের বাংলা পড়াতেন হেডমিস্ট্রেস, লেডি প্রিন্সিপ্যাল বলা হত তাঁকে বাসমতীতে-অবলা কাঞ্জিলাল। অবলা দেবী এম, এ পাস করেছিলেন, খুব সম্ভব অঙ্কে। থার্ড ক্লাস পেয়েছিলেন, কিন্তু খুব ভাল ইংরেজি জানতেন, তার চেয়েও ভাল বাংলা। সরোজিনী পিসিমার সেকেলে বাংলা নিয়ে অবলা দেবী একটু ঠাট্টা করতেন। কিন্তু পিসিমা তাই বলে সাধুসমাজি বাংলা ছাড়েননি, পরে রবীন্দ্রনাথ নয় শিবনাথ শাস্ত্রীর বাংলা খানিকটা রপ্ত করে নিয়েছিলেন। প্রটেস্টান্ট স্কচ, ইংরেজ পাদ্রিদের বড় আস্তানা ছিল বাসমতীতে, মস্ত একটা মিশনবাড়িও গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা। সেখানকার ফাদার-সিস্টারদের জন্যে বাংলা শেখাবার লোকের দরকার হলে মাঝে-মাঝে সরোজিনী পিসিমাকে ডেকে দিতেন তাঁরা। খুব বেশি টাকা দিতেন না, কিন্তু তখনকার দিনে টাকার মূল্য ছিল। কিন্তু অনেকদিন ধরে নানারকম রোজগারি কাজ করেও টাকা জমাতে পারেননি পিসিমা। খুব যে হাতখোলা তা নয়—তবে এলোমেলো ধরনের লোক। খারচের জন্যে টাকা, মণ্ড রাঁধবার জন্যে নয়-সিদ্ধার্থদের পরিবারের সকলেরই প্রায় এ-রকম ধারণা ছিল এক সময়। টাকা এনেছেন, ধরিয়েছেন জরা। কাজেই বাসমতীতে যারা আছে, তাদের থলি ঝেড়ে কিছু পাওয়া যায় না এখন আর। কলকাতায় যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা নতুন আওতার ভেতর হুঁশিয়ারি শিখে এখন বড়মানুষ, তাঁদের সঙ্গে রাসমতীর এ বাড়ির ফতুর লোকদের টাকাকড়ির দিক দিয়ে কোনো তুলনা হয় না। সরোজিনী পিসিমা ডাহা ফতুর। তবে কলকাতার বড়লোকদের কাছ থেকে মাঝে-মাঝে মনি-অর্ডার, ড্রাফট, চেক ইত্যাদি আসে—গড়পড়তা মাসে সত্তর-আশি টাকায় দাঁড়ায়। আশি টাকার এক সময়ে দাম ছিল বটে, বাসমতীর মতন মফস্বল শহরে, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে সে-সব মুছে দিয়েছে। তারপরে এখন—উনিশশ পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশে সত্তর-আশি টাকার কী কিম্মত আর? এ দু-বছর ধরে বাসমতীতেও চালের মণ বত্রিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকায় ঘোরাফেরা করছে; চল্লিশের ওপরেও ওঠে মাঝে-মাঝে। সরোজিনী পিসিমার জীবনযাপনার মান বেশ মানানসই ছিল একসময়ে—তাঁর রেক্টর, গার্ডিয়ান টিউটর, পাত্রীদের মুন্সিগিরির কাজের সময়ে। এখনো অনেকটা সেই মানই বজায় রাখবার সাধ তাঁর, কিন্তু উপরি রোজগারের কোনে উপায় নেই। বয়স সত্তর হয়েছে—এইবারে আশির দিকে মোড় ঘুরবে।

সিদ্ধার্থের ছাতুকাকাও এ বাড়িতে থাকেন। সিদ্ধার্থের বাবার সবচেয়ে ছোট ভাই। ছোট কাকা স্কুলে সেকেন্ড ক্লাস অবধি পড়েছিলেন, পড়াশোনা আর হল না, চাকরি-বাকরিও ভাল লাগল না, চাকরিতে হাতই দিতে গেলেন না। বিয়েও করলেন না, কেউ মেয়ে দিল না বলে ঠিক নয়-এমনিই। ছাতু কাকা সাদামাঠা মানুষ; একা পৃথিবীতে চরে বেড়াতে হলে অনেক আগেই মারা পড়তেন। কলকাতার বিদ্যাবুদ্ধি আর টাকাকড়ির গরম ঝাপটায় ডাক্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

মাছের মত কষ্ট পান—সেজন্যেই বাসমতীতে থাকতে ভালোবাসেন। খুব শান্ত নিস্তব্ধ এই দেশ নয় বটে, কিন্তু কলকাতার চেয়ে তা ঢের। কলকাতায়, দার্জিলিঙে,, জলপাইগুড়িতে তার বিশিষ্ট সব দাদারা রয়েছেন। বড়-বড় বাংলো, জমি, জায়গিরি নিয়ে। কিন্তু বাসমতীতে-সরোজিনীদি আছেন বলা ঠিক নয়—একটা নিরিবিলি নম্র গরিবানার ধাঁচ, কথাবার্তা চালচলনে বড়লোপনার হৃদয়গ্রাহী অবর্তমানতা এই সবই ঠিক জিনিস মনে হয়েছে তার। এখানে সব সময়ই সময়-শুয়ে পড়বার, উঠে বসবার, ঘুরে বেড়াবার; কেউ বাধা দেবে না; ঠিক চায়ের সময়ে চা পাওয়া যাবে, খিদের সময় ভাত; কাউকে তাগাদা দিতে হবে না। তাগাদা দিলেও সরোজিনীদিকে দিতে হবে, কিংবা সিদ্ধার্থের বউ সুনীতিকে, কিংবা আদিনাথ চারটাকে। এরা ঘরোয়া মানুষ সব, খানিকটা গরিব বলেই ঘরোয়া। কলকাতায় না-গিয়ে বাসমতীতে রয়েছে বলেই এসব সততা সম্ভব হয়—ছাতু কাকা চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে হেমন্তের বিকেলের রোদে উঠোনের কিনারে বড় আমগাছটার নিচে ঘাসের চাবড়ার ওপর বসে এইসব ভেবে দেখতেন। সিদ্ধার্থকে মাঝে-মাঝে বলতেনও এসব কথা—কলকাতায় যেতে নিষেধ করতেন সিদ্ধার্থকে। যাবার বিশেষ কোনো সম্ভাবনাও ছিল না অনেকদিন সিদ্ধার্থের—যদিও মাঝে-মাঝে কোলাহল, কামনা, চেতনার একটা নিরেট রসুনচৌকি বেজে উঠত যেন আত্মিক লোক থেকে—অন্ধকারে দীপ্তির ভেতর ডাঙা সাগরের জলে স্থলে—তাকে দূরে, কালকাতায়, ডেকে নেবার জন্যে।

বইটই পড়তে বেশি ভাল লাগে-না ছাতু কাকুর; তবুও খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলাটা বই পড়েই কাটিয়ে দিতে হয়। বসমতীর ব্রহ্মসমাজ লাইব্রেরির থেকে বই নিয়ে আসেন তিনি। বেছে আনবার ভেতরে কোনো শৃঙ্খলা বা ধারাবাহিকতা নেই—যা হাতের কাছে পাওয়া যা বা মনে ধরে তাই নিয়ে আসেন ধর্ম সম্পর্কে সব বইই মনে লাগে তাঁর; বিছানায় ছড়িয়ে আছে তাঁর 'ব্রহ্মধর্ম; কিংবা রামমোহন রায়ের চটি জীবচরিত, অথবা শিবনাথ তশাস্ত্রীর 'হিস্ট্রি অবদি ব্রাহ্মসমাজ' অথবা অঘোর প্রকাশ' কিংবা কেশব সেনের 'জীবনবেদ' কিংবা শাস্ত্রী মশায়ের 'রামতনু লাহিড়ী'। মাঝে-মাঝে দু-চারটে ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাস দেখা যেত-সাবেক কালের দাদারা যা ফেলে চলে গিয়েছেন, লোহাকাঠের আলমারিতে পচছিল, বের করে নিয়েছেন ছাতু কাকা। ইংরেজি পড়তেই ভালবাসে বেশি, সিদ্ধার্থের ইংরেজি খবরের কাগজের আটটি পৃষ্ঠা নেড়েচেড়ে পড়েন- কোন খবরই বাদ যায় না তাঁর, বিশেষ কোনো খবরই মনে থাকে না কাগজটা সরিয়ে রেখে দিয়ে। খুব বেশি ইংরেজদ্বেষী ছাতু কাকা—এত বেশি যে সেই বারীন ঘোষ-প্রফুল্ল চাকীর আমল থেকে ১৯৪৭ অব্দি ছাতু কাকার ফাঁসি, জেল, আন্দামান, বিনা বিচারে আটক সব কিছুই হতে পারত যদি তিনি কাজে ভিড়ে যেতেন। কিন্তু কোনো দলের সঙ্গে যোগ ছিল না তাঁর, ছাতু কাকাকে নিয়ে কেউ দল গড়বার কথা ভাবতে পারত না। ইংরেজের জেলে ন-মাস ছ-মাস হয় তো কাটাতে পারতেন তিনি, কিন্তু দলের আবহাওয়ায় পাঁচ মিনিটের চাপে মরে যেতেন—আজকাল দেশ খুব সম্ভব স্বাধীন হতে চলেছে, কিন্তু বিশেষ সুবিধে পাচ্ছেন না, বিশেষ দ্বেষী লোক নন তিনি, কিন্তু তবুও ইংরেজ তাকে দ্বেষ শিখিয়েছিল। সে-বিষ অস্থানে কুস্থানে রেখে আসতে গিয়ে আজকের নানারকম পীঠস্থানের শিলায় আঘাত খাচ্ছেন।

ছাতু কাকা বাসমতী কলেজের কয়েকজন বাছা বাছা প্রফেসরের সঙ্গে মেশেন—যাঁরা নম্র, ধর্মভীরু এবং রামকৃষ্ণ মিশনের চেয়েও ব্রাহ্ম সমাজের দিকে বেশি ঘেঁষা, সেই সব প্রফেসরের সঙ্গে। সে-সব প্রফেসর দু-তিনজন আছেন বাসমতীতে, ব্রাহ্মসমাজকে ভালোবাসেন তাঁরা, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনকে বেশি ভালোবাসেন তবুও, ধরতে পারেন না ছাতু কাকা। ধরতে পারলেও বিশেষ কিছু এসে যেত না অবিশ্যি, তবে একটু তারতম্য হত—শেষ পর্যন্ত ছাতু কাকার চোখে। ব্রাহ্ম সমাজের ষোল আনা মানুষ না হলে মানুষ নিখাদ হতে পারে না-ভাবতেন তিনি। আজকাল অবিশ্যি ধারণা বদলাচ্ছে ছাতু কাকার। ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে সে ভক্তি নেই এখন আর, কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে ভক্তি আরো ঢের কম। বাসমতীর ব্রাহ্ম সমাজে ফি রবিবার যান ছাতুকাকা—দু' বেলাই। তাছাড়া বিশেষ ব্যাপার উপলক্ষে যেতে হয়, অন্য নানা কাজ নিয়েও সমাজে রোজই প্রায় যেতে হয় তাঁকে।

যাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনের দিকে ঘেঁষেছেন সে-সব অধ্যাপকদের সঙ্গে মিশতে পারলে ভাল বোধ করেন আধ্যাপক জাতের ওঁপর একটা শ্রদ্ধা আছে তাঁর। এঁরা জ্ঞানী মানুষ সব; মানুষকে জ্ঞানী করবার কাজে লেগে আছেন, চরিত্রে কোনো খাকতি নেই; এ-রকম একটা ধরতাই সিদ্ধান্তে চালিত হয়ে খুব সম্ভ্রমের চোখে দেখেন ছাতু কাকা বাসমতী কলেজের অনেক প্রফেসরকে। কিন্তু সকলের নয়; এঁদের অনেকে তাসপাশা খেলে, চায়ের দোকানে ঘুরে বেড়ায়, আর কী সব বিসদৃশ কাজ করে—বলে দিয়েছেন তিনি সিদ্ধার্থকে। ব্রাহ্মসমাজের মত অধ্যাপক সমাজের ওপরও ভক্তি অনেকটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাঁর। এই সবই ত আদর্শ জিনিস ছিল, বাকি সবই ত আস্তাকুঁড়। কিন্তু ধর্ম, কলেজ সবই ভাগাড়ে হয়ে যাচ্ছে যেন। স্বাধীনতা পেতে গিয়েও অস্বস্তি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। যেন ক্যালোমেল খেয়েছেন এমনিভাবে দাঁতগুলো পড়ে গেল। রাতারাতি চুল পেকে গেছে, দাদারা সকলে মিলে আশি টাকা পাঠাতেন, এখন সত্তর টাকা পাঠাচ্ছেন। স্বাধীন সূর্য আসছে, আর-একটু বেশি জ্বললে পঞ্চাশ পাঠাবেন? সরোজিনীদির কোনো রোজগার নেই। যে-কোনো রাতে বিছানার চাদরে লেপটে মরে থাকতে পারেন দিদি, দশ বছর ধরে ব্লাড প্রেসার-তেমন তাঁকে থাকছেন না এখন আর।

বাসমতীর নদীর পাড়ে বেড়াতে যান ছাতু কাকা—রোজ বিকেলে। নদীর কিনার দিয়ে ঝামা সুরকির নীলচে লাল রাস্তা চলে গিয়েছে তিন—চার মাইল-উঁচু-উঁচু ঝাউগাছ রাস্তার পশ্চিম কিনার জাঁকিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বাঁক ঘুরে-ঘুরে নিরালা বীথির মতন সব। হাতের কাছে নদী পুবের আকাশ ঘেঁষে, উত্তর-পুবে তাকালে নদীর জল বেশি দেখা যায় না—ইস্টিমার, জেটি, গাধা বোট, গ্রিনবোট, পানসি, ডিঙি, জেলে নৌকা, পালোয়ারি, হাটুরে, বজরায় ছেয়ে ফেলেছে সব। কিন্তু তার পরেই জিরেন কাঠের রসের মতন রঙের অগাধ জলের কী উতরোল আলো—সূর্য চলে যাওয়ার পর শিশু সূর্যেরা জেগে উঠছে যেন অন্ধকার নামবার আগে—ছাতু কাকা ধানী নদীর দিকে তাকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকেন। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, ব্রাহ্মসমাজে যেতে হবে—সরোজিনীদি উপাসনা করবেন। একটা লেকার থাকলে ভাল হত—বাসমতী কলেজের শ্রীপতিবাবু যদি আধুনিক কাল ও ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলতেন কিংবা আমাদের এই নতুন স্বাধীনতা সম্বন্ধে। কিন্তু দেশ ত দু-টুকরো হবে শোনা যাচ্ছে, এ দিকটা ত পাকিস্তানে পড়বে, আগের মত জিভ নেড়ে সব কথা বলা সম্ভব হবে না তখন আর। তবে—সরোজিনীদি উপাসনা করবেন, বিশেষ এই, এইটুকু শুধু। ছাতু কাকার নিঃশ্বাসে খানিকটা ছাতকুড়ো ঝরে পড়ল যেন।

টিনি মজুমদারও থাকে এই পশ্চিম দিকের টিনের ঘরটায়। সিদ্ধার্থের সঙ্গে কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই এই মেয়েমানুষটির। টিনির বয়স পঞ্চাশ, চুল পেকেছে, বয়স ভেঙে পড়েছে, টাকা থাকলে শরীর জোড়া লাগাতে পারত হয়তো কিন্তু টাকা নেই টিনির, অথবা সরোজিনীর কিংবা সিদ্ধার্থের। এখানে একটা স্কুলে টিচারি করে টিনি কয়েকবার বি-এ পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করেছিল। তারপর দেশে স্বাধীনতা এল বুঝি-টাল সামলাতে গিয়ে বি-এ পাস করা হল না আর। বাপ-মা নেই—কলকাতায় এক বোন থাকে। বোনের অবস্থা ভাল। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে পরের তাঁবে থাকবে না সে। তা ছাড়া কলকাতা ভালই লাগে না তার। এক সময়ে চেহারা মন্দ ছিল না, কিন্তু এখন মুখের দিকে অনেকক্ষণ না তাকিয়ে থাকলে কিছুই বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু মেয়েদের মুখের দিকে কখনো তাকান না ছাতু কাকা। টিনির মুখের দিকে তাকাবার কোনো দরকার বোধ করে না সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থের মুখের দিকে চেয়ে দেখবার কোনো প্রয়োজন নেই টিনির। সরোজিনীর ঘরে একটা ঢাউস আর্শি আছে, অনেক জায়গায় পারা চটে গেছে, কিন্তু তবু সে আর্শিতে মুখ দেখতে গিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে মোটামুটি ঠিক মুখটাই অনুভব করতে পারা যায়, বুঝতে পেরেছে টিনি। চিরুনি হাতে নিয়ে মুখ দেখে। চুল আঁচড়াবার সময় সরোজিনীরও মুখ দেখতে হয়। এ কাজে এঁরা সারা দিনরাত্তির ভেতর দু-তিন মিনিটের বেশি সময় নষ্ট করেন না। একদিন সমস্ত দিন আর্শি লুকিয়ে রেখে টের পেয়েছিল সিদ্ধার্থ, স্কুলে যাবার মুখে সে আর্শিটা এক-আধ মিনিট খুঁজেছিল টিনি, সন্ধ্যার দিকে সমাজে যাবার সময় দু-এক মিনিট সরোজিনী। ছাতু অথবা বসুনীতি নিজেদের দরকারে কোথাও নিয়ে গেছে হয়তো-ভেবে মাথা ঘামায়নি আর। সিদ্ধার্থ যে লুকিয়ে রেখেছে সে-কথা ভাবতেও পারেনি বরং কিসা গোমতী ও সুজাতা, তথাগত সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবতে পারত। ভারি আশ্চর্য স্ত্রীলোকদের কানঘেঁষেই বাসমতীতে রয়েছে সিদ্ধার্থ। গভীর রাতে জেগে উঠে এই সব কথা মনে পড়ছিল সিদ্ধার্থের। ঘুমিয়ে পড়বার আগে কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী রমার কথা এক-আধ মিনিটের জন্যে—এমনিই আচমকা মনে পড়ে গেল তার; ঘুমিয়ে পড়ল সিদ্ধার্থ।

রমার বয়স উনিশ-বাসমতী কলেজে বি-এ পড়ছে। খুব চমৎকার ধানকেই বাসমতী বলা হয়—রমার চেহারা ও ফলন্ত মন এই গভীর নিবিড় ধানের মতন—এই চালের মতন। এর চেয়ে বেশি সুন্দর কী থাকতে পারে পৃথিবীতে? কলকাতা গেলে রমা শিরোপা পেতে পারে অনায়াসেই মহারাণী হিসেবে, কিন্তু বাসমতীতে থাকাই তার ভাল। নগর তাকে নষ্ট করে ফেলবে, বিকাশের বিশুদ্ধি—ক্রমেই আরো বিশুদ্ধি, শেষ পর্যন্ত একটা ঔশী সার্থকতা, বাসমতীতেই সম্ভব হবে। রমার কথা মাঝে-মাঝে মনে হলে এ-রকম ভাবে মন নাড়া খেয়ে যেত সিদ্ধার্থের, কিন্তু তবুও মেয়েটির থেকে নিজের মনটাকে স্বভাবতই একটু দূরে সরিয়ে রাখার ক্ষমতাটা কৃত্রিম না হয়ে ক্রমেই যাতে সহজ হয়ে পড়তে পারে—সেদিকে সাধনা রয়েছে সিদ্ধার্থের। বয়স ত তার পঞ্চাশের দিকে চলেছে, কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে—এমনকি পনের বা দশ বছর আগেও যদি রমা অর জীবনে আসত তাহলে অন্যরকম ভাবে হয়তো কথা ভাবত সিদ্ধার্থ। অথবা আইবুড়ো থাকত যদি সিদ্ধার্থ, তাহলে এই মেয়েটির জন্যেই কেন—চুয়াল্লিশ বছরে ঠেকে—বাসমতীর আকাশ-বাতাস, কলেজ, বাজার-কালেকটরেট ও ক্রিমিন্যাল কোর্টের পৃথিবীতে।

মা নেই রমা অধিকারীর। বড় বোন রয়েছে একজন, নাম ক্ষমা; সে আর তার স্বামী কলকাতায় থাকে। স্বামী-অভয়, কলকাতায় কারেন্সিতে কাজ করে, ক্ষমা নার্সের কাজ শিখছে নাকি-শুনেছিল সিদ্ধার্থ। ক্ষমার বাবা প্রভাসবাবু বাসমতীর পোস্ট অফিসে কাজ করেন। পোস্ট অফিসটা বড়। খুব সম্ভব ইন্সপেক্টর প্রভাসবাবু-কিংবা ঐ রকমই একটা কিছু, বাসমতী ছেড়ে প্রায় ট্যুরে বাইরে বেরিয়ে যেতে হয় তাঁকে। বাইরে যখন যান, মেয়েটিকে কার জিম্মায় রেখে যাবেন এই নিয়ে সমস্যায় সময় খুইয়েছেন অনেক। যাদের কাছে রেখে যেতেন তাদের কাউকেই সুবিধার মনে হল না—প্রভাসবাবুর চোখে রমা খুব সুন্দর নয় হয়তো, কিন্তু অন্যদের চোখে অন্য রকম এবং সন্তানটি তাঁর স্ত্রীজাতীয় সেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন, চট করে বোঝেননি, ঠেকে শিখতে হয়েছে। না, আর-কারো কাছে রমাকে রাখা চলেনা—স্থির করে ফেলেছেন তিনি। ট্যুরে যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো ভাবছিলেন, দু-একবার নিয়েও ছিলেন, সেখানেও ঠেকে শিখলেন আবার। লটবহরের মত কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করে না অবিশ্যি রমা, প্রভাসবাবুকে কোনো চলাচলতির বাধা বিড়ম্বনায় ঠেকে যেতে হয় না, সুবিধাই হয় তাঁর, রমা অনেক কাজই এগিয়ে দেয় প্রভাসবাবুর। গুছিয়ে ঠিক করে রাখে সব—কিন্তু তবুও পৃথিবীতে পুরুষ মানুষ কি কম?

একটি মেয়েমানুষের মতন ত রমা, আর ওরা ব্রহ্মার এক মুহূর্তে যে-সব বীজ জন্মায় তাদের মত-সংখ্যায়, প্রাণশক্তিতে।

দেখেছেন প্রভাসবাবু, রমার দিক দিয়ে কোনো অপরাধ, কোনো স্খলনপতনের ঈষৎ আমেজও বুঝি নেই এখন পর্যন্ত। খুব বিচক্ষণভাবে বাইফোকাল চশমা নাকের ডগায় আটকে রেখে মনশ্চক্ষে. নির্মনেও নেমে গিয়ে, বুঝে নিতে হয়েছে। কিন্তু তবু অপরাধ ত মীমাংসা নয় যে প্রথম থেকেই উপস্থিত থাকবে, অপরাধ ত জীবাণু, রমা কি আধার নয়? একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিলেন প্রভাসবাবু। ট্যুর থেকে ফিরছিলেন রমাকে সঙ্গে নিয়েই। তারপর চলেছিলেন আরো দূরের একটা ট্যুরে কাজ সেরে আসতে। স্টিমারের ডেকে বসেছিলেন সকালবেলার রোদে—চারদিকে পুব বাংলার সরু-সরু উঁচু-উঁচু অগাধ সুপুরিশ্রীর নীলচে বনানী। আরো গাছ আছে ঢের; জারুল, জামরুল, সিসু শিরিষ, আম, মহানিম, ঝাউ—প্রকৃতির বিরাট পরিভাষা, শক্তির মত। রোদের ভেতরে আলোকিত হয়ে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছে নদীগুলো—ঘুরে চলেছে নদীদের শাখা। কিন্তু কথা কার সঙ্গে যারা স্টিমারে চলেছে তাদের ভেতর এক-আধজন মানুষের সঙ্গে খুব সম্ভব। আরো ঢের মহত্তর মন আছে—পৃথিবীতে, অদৃশ্য শূন্যেও হয়ত, তাদের সঙ্গে। রমা কী করছে? তাকিয়ে দেখলেন। সকালের রোদে উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। চা খাচ্ছে। অপরাধ কোনো সিদ্ধান্ত নয়—প্রতি মুহূর্তেরই উচ্ছিত জীবাণুর মত ওটা। নিজের যুক্তির খেই ধরলেন চরুটের ভেতর থেকে খানিকটা কিছু শুষে নেবার চেষ্টা করে; গাল দু'টো কেঁপে উঠল তাঁর, নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল।

চুরুট তুলে নিলেন-নিভে গেছে। পকেট থেকে দেশলাই বের করে তক্ষুণি না জ্বালিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রমাকে বললেন, 'তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ট্যুরে চলাফেরা করব না আমি আর।'

'আমার পড়ার ক্ষতি?'

'ততটা হয় না। যা হয় সেটা শুধরে নিতে পার তুমি। স্টিমারে নৌকায় বই পড়বার সুযোগ যে নেই তা নয়—পড়েছ ত তুমি 'দেশলাই জ্বালিয়ে দু-হাতের বেড় দিয়ে ফাঁপা আবডালে চুরুট জ্বালিয়ে নিলেন। 'এখন থেকে তোমাকে বাসমতীতে রেখে আসব।

'কার কাছে?'

'তাই ভাবছি।'

'এই ত বেশ ছিল,' রমা বললে, 'নানারকম দেশ-গাঁ দেখে ফিরতাম।'

'না।'

ঠোঁটে একটু হাসি লেগে রইল রমার, ভাল বা খারাপ কিছুই লাগেনি—প্রভাসবাবুর কথাটাকে 'তথাস্তু' এর ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু দিনের আলো যেখানেই একটু মৃদু-পৃথিবীর সে-সব পথ দিয়ে চলে যেতে হলে সব সময়ই ত মশা; যত বড় লক্ষ্যই থাক না কেন, ওদের ভনভনানি এড়ানো কঠিন। মেয়ে মানুষের শরীর নিয়ে এসছে পৃথিবীতে, (খুব রূপসী মেয়ে মানুষের কিনা-সে কথাটা খেয়ালের ভেতর ছিল না এখন রমার), শরীরটা একটা ক্ষত যেন, মাছি এসে পড়বেই। কিন্তু তাই বলে মশামাছির রাজত্বে থাকবে না সে, ওরা এসে তার রাজত্বে উঁকি দেবে, তা দিক। বাড়াবাড়ি করলে চামরের মুখে উড়িয়ে দেবে, না হয় ফ্লাই-পেপার, না হয় ফ্লিট, ডি-ডি-টি- জানে সে সে-সব। প্রভাসবাবুর অজ্ঞান্তে নানারকম অভিজ্ঞতার কাঠামোর ভেতরে কুমোরের চাকিটুকু পরিকল্পনার মত তাঁর মন, তারপরে এতটা কিছুর গৈবী আবির্ভাবের মত তার বিশেষ চেতনা। তবে মাছি হটিয়ে দিতে গিয়ে এক সময়ে হয়তো পাখনায় ঠেকে যেতে পরে সে—আচমকা একটা নীলকণ্ঠ পাখির; আকজালই নয় হয় তো—আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে—কবে ঠিক বলতে পারা যায় না, তবে জীবনের শেষ পর্যন্ত শেষ হবার আগে নিশ্চয়ই। চারদিকের এই সব নদী যখন মনের ভেতরে এসে স্থান ঠিক করে নিয়েছে তাদের—নদী, আকাশ, মানুষ, সমাজ যতখানি বিচলিত করতে চাইবে তাকে তাদের নিহিত অর্থ ততদূর ধরে ফেলে বিচলিত হবার মত লৌস্ট্রপাথর থাকবে না যখন সে আর, শরীর ছাড়া তার ভেতর স্ত্রীত্ব থাকবে না আর- কিছু, কিন্তু তার চেয়েও ভাল জিনিস থাকবে, যাকে সে ভালবাসবে। সে পুরুষ-মানুষ হিসেবে বিখ্যাত হোক বা না হোক সেটা অসার, চলিত অর্থে প্রেম যে নেই এবং টাকা যে মূল্যহীন, জ্ঞান যে পাত্র হিসেবে নিজেকে পণ্ড করে কিংবা সফল সার্থক—এই সব শেষ শাস্তির কথা তাদের জানা হয়ে গেছে যখন, এই সব জানা হয়ে গেছে বলে কোনো আধবয়সীর সঙ্গে প্রেম হতে পারে, হয়তো আজই; কিংবা কোনো ছোকরার সঙ্গে একটা প্রচলিত সম্বন্ধে আটকে যেতে পারে সে, কিছুদিনের জন্য অন্তত, পনের-কুড়ি বছর পরে। কিন্তু এই কথাগুলো-ভাবনাগুলো সবই তার নিজের নয়। মোটামুটি শিখিয়েছিলেন তাকে ভক্তিদি আর বিনতাদি। একজন দু'বার বিয়ে করেছিল, এখন চুয়াল্লিশ বছরের বিধবা। আর-একজন বিয়ে করেনি বটে, কিন্তু অনেক দেখেছে-মিশেছে। এতদিন কলকাতায় ছিল, আবার চলে যাবে হয়তো কলকাতায়; কেউ আছে সেখানে।

রমা উঠে দাঁড়াল।

'কোথায় নামতে হবে—স্টিমারে ওঠার সময় জিজ্ঞেস করিনি তোমাকে—'

'দেরি আছে ঢের।'

'নটা বেজেছে।'

'এখনও ঘন্টা চারেক।'

'কী যে বলছ তুমি; সত্যি বলছ?'

'কেন, খারাপ লাগছে—এই নদী, বাতাস—? ফার্স্ট ক্লাসের ডেক ত কটা। আমার সেকেন্ড ক্লাস পাশ-কিন্তু সেখানে বার্থ খালি নেই বলে ফার্স্ট ক্লাসে জায়গা পেলুম।'

'রমা বসতে-বসতে বললে 'কিন্তু আমার টিকিট?'

'তোমার টিকিট তোমাকে দিইনি বুঝি? রেখে দিয়েছি ব্যাগে তাহলে। আছে আমার বুকপকেটে।'

'ইন্টার ফিমেলের?'

'ন ফার্স্ট ক্লাসের—' প্রভাসবাবু চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে বিরক্ত হয়ে রমার দিকে তাকালেন। রমার ঠোঁটের ওপর রোমের লক্ষণ যে একেবারেই নেই, তা নয়; কিন্তু কেন স্ত্রীলোকেরই-বা নেই? কোনো স্ত্রীলোককেই ঘাটাননি জীবনে প্রভাসবাবু-কিন্তু অনেক মেয়েদের সম্পর্কে আসতে হয়েছে তাঁকে। রোমরাজি আছে তাদের সকলেরই, তাঁর বাইফোকাল চশমায় ধরা পড়েছে সবই। কিন্তু না, সে জন্যে নয়, অন্য অনুসন্ধানে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু ঠোঁটের ওপর ঈষৎ উদগমের দিকে চোখ পড়ায় চোখ নিবিষ্ট হয়েছিল কিছুক্ষণ সেখানে। ফলে, মন সাঁতরাচ্ছিল রমার জন্মের আগের নানারকম নারীদের শৈবাল ও স্মৃতির পৃথিবীতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুরুটটা তুলে নিলেন।

'তুমি কি করে মনে করলে আমি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটিনি তোমার জন্যে?'

রমা কোনো উত্তর দেবার আগেই প্রভাসবাবু বললেন, 'আমাকে সন্দেহ হচ্ছে তোমার? আচ্ছা, আমি ব্যাগ বার করে দেখাচ্ছি—' কিন্তু ব্যাগ বার করবার আগে চুরুটটা জ্বালিয়ে নেয়া দরকার, দেশলাই কুড়িয়ে নিলেন।

ভুল বুঝলে তুমি-আমি বলেছিলাম ইন্টার ক্লাসের টিকিট কেটে একসেস্, দিয়ে আমাকে ফার্স্ট ক্লাসে আনলে বুঝি—'

ব্যাগের থেকে কিটিক বের করে রমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন প্রভাসবাবু।

বাতাসে উড়ে ছিটকে রমার স্লিপারের চাপে আটকে গেল।

'পা দিয়ে চেপে ধরলে?'

'না-হলে টপকে পড়ছিল ত—'

'কোথায়? নদীতে? তাহলে ঐ গুণচটগুলো আছে কী করতে?'

টিকিটটা কুড়িয়ে ফিরিয়ে দিল রমা—কোটের ভেতরের পকেটে আটকে রেখে দিল প্রভাসবাবু।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা? ধর্মপুর?'

ডেকের ওপর খানিকক্ষণ পায়চারি করে ফিরে এসে রমা বললে, 'ভারি চমৎকার বাতাস, রোদটা গরম দুধে মেশানো ডাবের জল আর-কি! তোমাকে যে ডাক্তার খেতে বলেছিল—সেই রকম। আকাশ বেগুনি নীল নয়, কিন্তু সে রকম আকাশ কি কোথাও আছে পৃথিবীতে? এ আকাশটা নীলচে—কিন্তু কোথাও মেঘ নেই। কিন্তু নীলচের চেয়ে বেশি নীল, তোমার বাইফোক্যালে ধরা পড়বে। আমার চোখ আগের মত ভার নেই। সত্যিই বেশ নীল, শরৎকাল?'

প্রভাসবাবু আকাশের দিকে তাকালেন। পাশের তাল-নারকোলের জঙ্গল থেকে একটা চিল সাঁই সাঁই করে উড়ে-এসে জাহাজের আগে এগিয়ে মুখিয়ে গেল—দেখলেন প্রভাসবাবু। সেটা পিছিয়ে পড়ে গেল।

'কোথায় চলেছি আমরা?'

'নিশিন্দা।'

'এ লাইনের শেষ স্টেশন?'

'হ্যাঁ। ওদিকে স্টিমার যায় না। এই এক মাসের জন্যে যাচ্ছে তারপরে বাতিল করে দেবে।'

'নিশিন্দা পৌঁছুব ত সেই একটার সময়?'

'যদি চরে না ঠেকে জাহাজ—'

'কী করে ঠেকবে-ফট্‌ফটে রোদে চলছে-কুয়াশা নেই ত—'

'সে-ব সারেঙ মন্ত্র পড়ে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু গাজির হুকুমে বালির চর পোষ মানে না, ভর দুপুরের সূয্যিতেও না, তার নিজের এলাকা বুঝে কাজ করে।'

'না, চরে ঠেকবে না।'

'চাকা ভাঙে মাঝে-মাঝে।' প্রভাসবাবু বললেন, 'স্টিমারই বটে। এ-সব স্টিমার তৈরি হয়েছিল কবে জানো?' মেয়েকে জিজ্ঞেস করছিলেন প্রভাসবাবু। কী যেন কী মনে করে অবচেতনার থেকে উত্তর জইয়ে গেল তাঁর, চুরুটটা দিয়ে দূর রৌদ্রের দিকে নিরূপণ করে আস্তে-আস্তে বললেন। কী যেন বললেন, শুনল না রমা।

রমা বাটলারকে ঢুকতে দেখে নিজেদের দু'জনের জন্য এইবারে আর-দু' কাপ চা এবং পরে, ভাত-মাংস ইত্যাদির ফর্দ ঠিক করে দিয়ে স্টিমারের চাকায় কাটা জলের শব্দের দিকে কান পেতে রইল।

গায়ের ওপর যে-খাড়া রোদটা এসে পড়ছিল তার থেকে খানিকটা দূরে একটু ছায়ার দিকে চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে রমা বসল।

চুরুট নিভে গেছে; পরে জ্বালিয়ে নেবেন।

এ রকমভাবে শূন্যে মিলিয়ে যাবার কথা নয়, কিন্তু তবুও মিশে গেছে, খুব কম জিনশই টিকে থাকে—' প্রভাসবাবু মাইলটাক নিঃশব্দতার ওপারে বিন্দু রেখার মত একটা বাজকুড়ুলের দিকে তাকিয়ে বললেন।

'কার কথা বলছ?'

জাহাজের চাকার জলকাটার শব্দ খুব ভাল লাগছিল রমার, বেশ ভাল লাগছে রোদের ঠিকরে আসা আঁচটুকু। এতক্ষণে বাতাস বাইরের রোদে-রোদে খানিকটা গনগনে হয়ে সকলের একটু শীত-শীত ভাবটাকে মানুষের প্রাণের দাবির অনুপাতে স্নিগ্ধ করে রাখতে পেরেছে।

প্রভাসবাবু চুরুটে টান মেরে চলেছিলেন, সেটাকে নামিয়ে রেখে বললেন, 'আকাশ সেই সকাল থেকেই নীল, চারদিকে উঠতি রোদ, জলে ঝরঝরানি, সাদা সূয্যি তার্পুলিনের পর্দাটা সরালেই দেখতে পাওয়া যায়, বাতাস আর বাতাস, জাহাজ চলেছে নিশিন্দার দিকে, দুটো বাজকুড়ুলকে দেখলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিল।'

'জাহাজ দেরি করে আজ নিশিন্দায় পৌঁছবে মনে হচ্ছে আমার।' রমা বললে।

প্রভাসবাবু চুরুটে টান দিয়ে বললেন, 'চরে ঠেকে যাবে আন্দাজ করছ?'

'না-না।'

'তবে, চাকা ভেঙে যেতে পারে?'

'না। এমনিই বড্ড ঢিমে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'লাইন ত নিশিন্দার—হাঃ হাঃ—খুলনা যাচ্ছে ত—ঢাকা যাচ্ছে না—ত'

'চা আনতে বাটলার বুড়ো হয়ে গেল দেখছি।'

'নিশিন্দার লাইন ত।'

'মাদারিপুরে কী-রকম জোরে যায়?'

'তেরছা কান্নিক মেরে মনপবনে উড়ে যায়।'

'নিশিন্দার চেয়ে ভাল?'

'চড়ে দেখবে একদিন!'

'এ দিক দিয়ে স্টিমার তারপাশার দিকে যায়?'

'ঐ যে বাজকুড়ুল—দেখেছ তুমি?'

রমা প্রভাসবাবুর তর্জনীর দিকের নীল আকাশের খোলা বহরটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'চিলের মত পাখি। নিশিন্দায় গিয়ে ডাকবাংলোয় উঠবে?' বাজকুড়ুলের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রভাসবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'ডাক-বাংলো নেই। দেখছে ত দু'টো বাজকুড়ুল। খুব পরমাই ওদের—দু'টো পাখি একসঙ্গে থাকে—একশ বছর। তুমি ভাবছ, একটা মরে গেলে বিধবা বিবাহে আপত্তি আছে কি না মেয়েটার? ওদের একবারই বিয়ে। প্রায়ই মেয়েটা মরে যায়—পুরুষ পাখিটাই শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে—একা—আমার মতন। মরবার সময় হলে দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে উড়ে যায়।' প্রভাসবাবু তাকিয়ে দেখলেন রমা ঘুমিয়ে পড়েছে। এ রকম সরস কথার ভেতর? মনটা দমে গেল তাঁর। বাজকুড়ুলের কথা ভাবতে গিয়েছিলেন তিনি—ওরা ত আকাশ, নক্ষত্রযানের জীব সব; মাটির সঙ্গে ওদের কী সম্পর্ক? প্রভাসবাবু চোখ বুজে একটা বেদী খাড়া করলেন—নিজের চেষ্টায় আচার্য বসে আছেন বেদীর ওপরে; বেদীর ইউনিভার্সিটির না ব্রাহ্মসমাজের? আচার্য মশাই শান্ত হতে বলছেন—'শান্ত হরে মম চিত্ত নিরাকুল', গানটা আগেই গাওয়া হয়ে গেছে—কিন্তু কেমন একটা বৃহৎ অশান্তি ডুকরে উঠছে তাঁর গলায়; কিন্তু-প্রভাসবাবুর মনে হচ্ছিল গলাটা মোলায়েম তবুও—

'ও তুমি! চোখ মেলে বিস্ফরিত করে বললেন প্রভাসবাবু—'ও তোমার গলা?'

'হ সাইব। চা-বিস্কুট অইন্যা দাঁড়াইয়া আছি। টোস্টফোস্ট পাওয়া যাইব না, নিশিন্দার লাইন—বোঝেনই ত। আপনারা ত হিন্দু মানুষ—খাসি আছে, খাইবেন?'

'খাসি?'

'মোরগের মধ্যে খাসি আছে এক পদ; হোনেন নাই?'

'পাখি আবার খাসি হয় না কি?'

'হয় কত্তা, ডয় নাই, পাখিই খাওয়াইমু—তবে হিন্দুর দাঁত আর জিভ–আর মোছলমানের জিভ আর দাঁত—ব্যাসকম আছে কত্তা—জিন্না সাইব—'

'শক্ত মাংস হবে?'

'খাসি শক্ত হইব না? দাঁত নাই বুঝি?'

'আছে, তবে—'

'লকল দাঁত?' বাটলার হাত্যকচলাতে-কচলাতে হেসে বললে, 'ঠ্যাকব না এরফান সাইব লকল দাঁত লাগাইয়া টাইন্যা ছিড়্যা খাইল না?'

'মুর্গি আছে?'

'মুর্গির কথাই ত কইলাম, ছাগল খাসির কথা হয় নাই।'

'না। আমি বলছি মাদি—ডিম পাড়ে যে-পাখি—'

কথা শেষ হবার আগেই জিভ দিয়ে চক্‌চক্‌ শব্দ করে বাটলার বললে, 'কান হালায় মিথ্যা কথা কয়—হেই পদ থাকলে হিন্দুরে আমি খাসি খাওয়াইমু ক্যা?'

'মাছ আছে?'

'ক্যা? মাংসের কী হইল?'

'আত শক্ত মাংস খেতে পারব না।'

'আপনার মাইয়া, হ্যাও খাইব না?'

'মাংস?'

'হ, গোস্তের কথাই জিগাইছি কত্তা। খাসি না খাইলে রুঠা পদ আছে—কোনোটাই জাঠ্‌ঠি হইব, কিন্তু মাইয়ার দাঁত ত লকল না হুজুর, সব তার লাহান কইট্যা জাঁতি দিয়া ছেইচ্যা খাইব—দুই মাড়ির দাঁত দিয়া হাবড়াইয়া। আপনার মাইয়া ত খুব জুয়ান—খপসুরাতই বা কম কিসে—' রমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বাটলার বললে, 'এ রকম চিজ হামেশা পয়দা হয় নাকি মনে করছেন আপনে?' চুরুটটা মুখে দিতে গিয়ে নামিয়ে নিলেন প্রভাসবাবু।

'পাকিস্তান হইব নাকি কত্তা?'

'হবে শুনছি।'

'আউজগাই?'

'হ্যাঁ—শিগগিরই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনারা পাকিস্তানে থাকইয়া না কত্তা?'

'দেখা যাক—'

'থাইক্যা যায়ন মাইয়াপোলা লইয়া, আণ্ডাবাচ্চা আরামে থাকব।'

প্রভাসবাবু চুরুটে টান দিয়ে বললেন, 'মিলেমিশে সুখে থাকতে পারলেই ভাল; মাছ খাওয়াও বাটলার—

'মাইয়া গোস্ত খাইব?'

'না।'

'ক্যা? জাঠ্ঠি? কইতরের মাংসের কিমা খাইবেন বুঝি কত্তা? মাঝগাঙে পাইবেন কই? বাসনা কি আছে খাইবার? ইলসা?'

'আছে ইলিশ?'

'আইছিল ত দুই নাও—ভোরডার সময়।'

'দুই নৌকা ইলিশ? কিনে রেখেছ নাকি?'

'দুই নাও ইলশার কি কামডা কত্তা? রাত পোয়াইল না—ক্যাডা গা তোলে? গা তোলোনের নি কথা তখন? জুত্তা মারি ইলশার মুখে; আইলো-দুই নাও ইলশা বেয়ান্ডার মুখে। মাইনষে ঘুমাইব—না হালাগো সঙ্গে দর কচকচি করব—হালার কুত্তার জাত'

'কে?'

'মাঝি হালা গো কথা কই, হালার জাইল্যা—'

'কেন, দরে বনল না?'

'ক্যাডা দর করে? ফুটানি ঝাড় গিয়া মির্জাপুরের হাটে—আমাগো সঙ্গে কথা কইতে আসিস না। বিলশা-কাঁটার ইলশা গোদার ফুটানি সারেঙ বাটলারের সঙ্গে—নিশিন্দার জাহাজের। জাইল্যার ডিম, প্যাট গাইলা দিমু না?'

'কী নাম তোমার বাটলার?'

'আইজ্ঞা, কত্তা, গফফুর আলী—'

'ইলিশ মাছ কেনা হল না?'

'গফুর একটু ওজন করে প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'ঐ চামার গো থন?'

'চামার ত বটেই। কিন্তু খুচরো কিছু কিনে রাখলে মন্দ হত না, কত চেয়েছিল?'

'দরদাম হইল কই; দরদাম করবার মাইনেষেরে পাইল কই? মাসুদ চাচা ত বেহুঁশ ঘুমে।'

'মাসুদ চাচা কে?'

'জাহাজের বড় চাচা—'

'সারেঙ?'

'আইজ্ঞা না—সারেঙ বাটলার না, পাক্কা বুইড়া' প্যাক্টে-প্যাডে কাছিমের লাহান না—কথাডা কইলে ফ্যালাইন্যা না বুইড়ার; বেশি ফরমান দেওইন্যা মানুষ না বুইড়া, কিন্তু যা দিব—'

গফুর একবার গোঁফের ওপর আঙুল চালিয়ে নিয়ে বললে, 'তামাম জাহাজ মানব বুইড়াকে—'

'মাসুদ চাচা ঘুমিয়েছিল ভোরবেলা?'

'হ। রাইত জাগে চাচা। জাহাজের খোলডা প্যাঁচাইয়া চাক্কির লাহান ঘোরে দিনরাইত—ঘোরেঘারে দ্যাহে—হুকুমের কথা কইয়া খালাস না—কাজ পয়দা করাইয়া ছাড়ব। বুইড়া কম না—আঠালির ঠাল আর বদনা হাতে লইয়া হাবাড়া বেইল এমুন—যেন টাট্টিতে চলছে! কিন্তু কোথায় টাট্টি? হালার টাট্টি!... বুইড়া—' বলতে বলতে গফুর নিজেকে টেনে গুটিয়ে নিয়ে বললে, 'হ। বড় রাত জাগাইন্যা দোষ আছে বুইড়ার।'

কেন, মাসুদ চাচা ছাড়া ইলিশ মাছের দর আর কেউ করতে পারবে না?'

'পারব না ক্যানে হুজুর? কিন্তু ঐ নক্সায় পারব না। কথার একটা ভারি বাহাইরা ডাইল আছে চাচার। লেখাপড়ি না জানলে হইব কী? দমভারি মুনসি গো কয়; ওদিক থাক।'

'ও, খুব গুণী লোক ত তাহলে—'

'জবর গুণী! আমার মনে লয়—হাতেমতাই রাইতে-রাইতে কিছু দিয়া থুইয়া যায় বুইড়ার কানে—।'

প্রভাসবাবু চায়ের পেয়ালার দিকে একবার তাকিয়ে নেব। চুরুটটার দিকে তাকালেন। বাইরের রৌদ্রের দিকে তারপর। চায়ের যে চেহারা—খেতে ইচ্ছা করছিল না। রমা ঘুমিয়ে আছে।

'কথাডা কি হারামির হইল?'

'কোন কথাটা?'

'ঐ যে কইলাম হাতেমতাইর কথাডা? ঐয়া না কইয়া খোদার কথা কইলে পারতাম—কী কয়ন কত্তা? খোদা তালাই বানাইছে শিখাইছে মাসুদ চাচারে—কী কয়ন?'

'হ্যাঁ—' চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে প্রভাসবাবু বললেন, 'আল্লাতালা রাগ করবেন না, মানুষের মুখের কথা তিনি শোনেন না, মন ঠিক এক জায়গায় থাকলেই হল, ঠিক আছে তোমার—'

গফুর একটু আবেশে ঝুম মেরে রইল; বুজে-বুজে আসছিল তার চোখ; তাকিয়ে-তাকিয়ে বললে, 'কথাডা কি লালন ফকিরের হুজুর? যেইডা কইলেন আপনে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফকির সাহেব আরো ঢের ভাল করে বলেছেন আমি যা বললাম—'

'হাচা কথাডা।'

গফুর বললে, ইলশা দুইটা-চারটা রাখছিল নাকি আকবর মিঞা—ক্যাডা কয়? মাসুদ চাচা না জাগলে ইলশার কথা কওনের জো নাই—'

'এখনও ঘুমুচ্ছে মাসুদ চাচা?'

'আইজ একটু বেশি ঘুমাইব। কাইল রাইতে রাইত'পোয়ানোর যম ইলশার নাওগুলা পাড়াপাড়ি বাজাইল না? ঘুমের বিষ মাইরা গেল মাসুদ চাচার খোয়াইয়া উঠব ত—এগারটা বাজাইয়া ছাড়ব—'

'ও—'

'আকবর গিয়া কয়েকটা মাছ রাখছিল'

'কটা?'

'আট-দশটা হইব—

'আছে মাছগুলো?'

'আছে না? যাইব কোথায়? খাওনের চিজ। কিন্তু কোথায় ধাঁধাইয়া রাখছে চাচা, খোদা ছাড়া ক্যাডা কইব। গা তোলনের নাম নাই—একটা বাজাইয়া ছাড়ব চাচা। ভোগাইয়া ছাড়ব।'

প্রভাসবাবুর চুরুটটা তাঁর দু'আঙুলের ফাঁকের ভেতর জ্বলছিল; প্রায় পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে; সেটা না টেনে গফুরকে তিনি বললেন, 'আর কোনো মাছ আছে?'

'পাঙাশ আছে-খাইবেন?'

'না—'প্রভাসবাবু রমার দিকে একবার তাকালেন, বেশ ঘুমুচ্ছে 'পাঙাশ খাবার অভ্যাস নেই গফুর।'

'খাইয়া দ্যাখেন না, গরম গরম পাকইয়া দি, মোটা-মোটা মিষ্টি ভাত হইব আউশের, বালাম কয়ন বালাম দিতে পারি, বগা লেমুখালির খুব সরস চাউল আছে, পাকাইয়া দি—পাঙাশের রসা—হালার ঝিঙা ট্যাঁড়শ শসা কুইচ্যা, ছিটকি মরিচ বাইট্যা, চোখ নাক জিভ দিয়া জল বাইর কইরা ছাড়ব, জীবনে পাঙাশ ছাড়া কিছু খাইতে চাইবেন না আর; গফুরের লাহান পাঙাশ পাকাইয়া না দিতে পারলে হেই বিবিরে তালাক দিবেন এমুনি খুন চড়ব কত্তার মাথায়—'

প্রভাসবাবুর মনে হল খুব সিধে কথা বলছে গফুর, বেশ প্রাণের গরমে। কিন্তু তবুও পাঙাশ মাছ কোনোদিন খাননি তিনি, নানারকম আমিষেরই গন্ধ সহ্য করতে পারেন না, দু-এক রকমের মাংস শুধু খান—মাছের বেলা বাছবিচার ত আরো বেশি, ইলিশ মাছও একটু নরম হলে ভাল লাগে না, অনেক ঋতুতে টাটকা হলেও ভাল লাগে না, পাঙাশ ত কোনোদিনই কোনোক্রমেই বরদাস্ত হয়নি।

'ডিম আছে?'

গফুর হাসতে লাগল।

'কেন, হাসছ কেন?'

'দেখি মাসুদ চাচারে জিগাইয়া—'

'কী জিজ্ঞেস করবে?'

'আণ্ডা ত আছে হুজুর, কিন্তু পাকাইব ক্যাডা? নিশিন্দার জাহাজে আণ্ডা পাকাইবার মানুষ কই? আমরা ত পাঙাশ মাছ আর ইলশা পাকাইয়া হাত মিঠা কইরা ফেলাইছি—এগুলার থনে ভাল খাবার ক্যাঁক ক্যাঁকের আণ্ডা? হাসাইলেন কত্তা—' গফুর মাথা কাত করে চিন্তিত মুখে একটু ভেতর থেকে হেসে বললে, 'আণ্ডার মামলেট বানাইয়া দিমু?'

'না। ডিমের ডালনার কথা বলছিলাম আমি—'

'আণ্ডা সিদ্ধ হইয়া যাইব ত কারি পাকাইলে। আণ্ডার চামড়া হইব বরাটের লাহান, আর কুসুম বালির মণ্ড, খাইয়া সুখ পাইবেন? পাঙাশ না খাইয়া সিদ্ধ আণ্ডার সালুন—এই পদ চায়ল নাকি আপনে?'

'হ্যাঁ, রেঁধে দিতে পারলে ভাল হয়।'

'আপনার মাইয়াও আণ্ডার কারি খাইব?'

'তা খাবে—বেশি ঝাল দিও না।'

'কয়ন ত—মোটেই দিমু না। আদা প্যাঁজ দিয়া পাকাইয়া দিমু। গরম মশলা খিছু দিমু। গোলমরিচ দেওনের কথা কী কয়ন?'

'দিতে পারো—বেশি না।'

'হ। বোঝলাম। হাঁসের আণ্ডা?'

'হাঁস-মুরগি-যা খুশি।'

'গফুর হেসে উঠল। 'কত্তার কথার একটা ভাইল্ আছে। আণ্ডা পাইলেই হইল, কাক কইত্তরে ঠ্যাহে না।' হাসি শুষে ফেলে মুখ গম্ভীর করে বললে, 'আচ্ছা দিমু-হাঁসের আণ্ডাই।'

গফুর কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে দেখল রমা ঘুমুচ্ছে; প্রভাসবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তারপর বললে, 'হারা রাইত জাগল বুঝি মাইয়া? ঘুমে ত হুঁশ নাই। রাইত উজাগর করে? হাদি করছে?'

'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কয়ন কি? জুয়ান মাইয়া ত আপনার; জৈবন ফারাক গেলে হাদি দিবেন আপনে?'

'দেব আজকালই।'

'লাগাইয়া দেন। নইলে মাইনষে কইব কি আপনেরে! বাহারের মানুষ কইব। মাইয়রে পাঙাশ রাইধা দি?'

'মিছেমিছি কেন কষ্ট করবে তুমি গফুর; খাবে না, অভ্যাস নেই। ঐ ডিমের ঝোল রেঁধে দিও আমাদের দু'জনের—যদি থাকে আলু একটু বেশি দিও ডুমো-ডুমো করে কেটে।'

গফুর একটু নিরাশ হয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, 'হ। হিন্দুর ডিম অনেক পাকাইছি। কওয়া লাগব না।'

রমার দিকে আর-একবার তাকিয়ে প্রভাসবাবুকে বললে, 'আর কী খাইবেন? ডাইল?'

'তা দিও।'

'কোন পদ খাইবেন—মুগ না মাসকলাই? চাঁদপাশার মুসুরি কিছু আছে আকবইরার কাছে। তামাম মুল্লুকে অমন ডাইল পাইবেন কত্তা?'

'চাঁদপাশার?' প্রভাসবাবু একটু উশকে উঠে বললেন, 'তাহলে ত ফতে করেছে আকবর। হ্যাঁ, মুসুরিই হোক।'

'আর? আণ্ডার মামলেট?'

'দিও—দিও—'

'চাউল খাইবেন কোন পদ? মোটা—বেশ মিষ্টি হইব। প্যাটে থাকব কয়েক ঘণ্টা; নিশিন্দা গিয়া খাড়াকখাড়ি খাবার না পাইলে প্যাট জ্বালা করব না; প্যাটে আউশ আছে, প্যাট ঠাণ্ডা থাকব।'

'মোটা চাল খেয়ে হজম করা কঠিন—'

গফুর তেরছা চোখে চেয়ে হেসে বললে, 'জুয়ান মাইয়াও পারব না? এইটা কী কইলেন?'

প্রভাসবাবু বললেন, 'দেশগাঁয়ে থাকত যদি, দৌড়ঝাপ করত, ঢেকিতে পাত দিত দুমদাম করে, তাহলে পারত।'

'রয়ন, রয়ন,' গফুর দু'আঙুল দিয়ে বাঁদিকের গোঁফের কোণে দু-চারটে মোচড় দিয়ে বললে, 'ঢেকিতে পাড় দেওয়া লাগব না, সোনার মাইয়া, মাইয়ারে সরস চাউল খাওয়াইমু আমি—রমজাইনার কাছে লেমুখালির খুব চিকণ ইলাহিপদ আছে, পোলাউ,খাবার লইগ্যা গুইজ্যা রাখছে হালা, হালারে ফেউল্যাইয়া বাইর করতে হইব।'

'না, না, অতটা দরকার নেই,' প্রভাসবাবু চুরুটটা ফুরিয়ে গেছে টের পেয়ে নদীর ভেতর ছুঁড়ে ফেলে বললেন, 'মোটামুটি বালাম পেলে হয়ে যাবে আমাদের।'

'ক্যান? রমজাইনা দিব না ক্যান?' গফুর গলা খাঁকারি দিয়ে বললে, 'আপনারে লইয়া ত কথা না, মাইয়ারে লেমুখালির বস্তার থেউকা খুইলা খাওয়াইমু আমি—লগে-লগে আপনেও বাদ যাবেন না কত্তা; নিশিন্দা জাহাজের বাটলারের কথা মনে থাকব মাইয়ার। রমজাইনা ট্যাডনের কথা হুইনা ডর লাগল আপনের। হালা ট্যাডন!'

প্রভাসবাবু পকেট থেকে আর-একটা চুরুট বের করে বললেন, 'খুব ভালবাসো তুমি আমাদের। কিন্তু আজ তুমি এমনি শাদামাঠা বালাম চালই দাও। এসব লাইনে প্রায়ই ত যাওয়া-আসা করতে হয় আমার। লেমুখালির চাল খাওয়া যাবে আর-এক সময়।'

'আপনার কথার মুড়া পাইলাম না আমি হুজুর—' গফুর তার সাদা চাপকানের পিঠে একবার ডান হাত ঘষে নিয়ে বললে।

'কেন?'

'না।'

'খুব মিহি চাল খাবার দরকার নেই আমাদের।'

'মাইয়ারও দরকার নেই?'

প্রভাসবাবু বললেন, 'আমরা বছর ভরেই ত মাঝারি চাল খাই।'

সে কথায় কান না দিয়ে গফুর বললে, 'চাউলডা রমজাইনার ক্যাডা কইল আপনেরে? হালার লগে একটা গোস্তাগুস্তি হইব ঠাওরাইয়া নাপাট দিলেন বুঝি আপনে? '

'চালটা রমজানের নয়? তবে কার?'

'মাসুদ চাচার হইতে পারে, আকবইরার, সারেঙের, আমার, মাইয়া ত একপো চাউলের ভাত খাইব, আপনে আধ পো চাউলের, এই দ্যাড় পো চাউলে বগা লেমুখালি ফতুর হইয়া যাইব কত্তা?'

প্রভাসবাবু পকেট থেকে দেশলাই বার করলেন, নতুন চুরুটটা জ্বালাতে হবে।

'ইস্টিমারের বাটলারের দুইটা-চাইরটা শখ থাকে, রমজাইনা খালাসি হেই শখের মুড়া পাইব না। চাউলের আড়ত আর দিলের শখ এক জিনিস না কত্তা।'

দেশলায়ের বাক্সটা হাতের ভেতর নাড়াচাড়া করতে লাগলেন প্রভাসবাবু; টিপ দিয়ে খুলে কাঠি বের করতে গেলেন না সরাসরি।

'আণ্ডা খাইবেন ক্যান—ইলিশ মাছই দিমু।'

'কোথায় পাবে?'

'আকবইরার সাধ্য নাই, ঘুমাইলে সারেঙের ডর লাগে মাসুদ চাচার গায়ে হাত দিতে। আমিই দিমু চাচার গায়ে হাত; মাইয়ারে মাছ খাওয়াইমু।'

'ও—' প্রভাসবাবু দেশলাইটা পকেটের ভেতর ডুবিয়ে রেখে আবার আস্তে-আস্তে বাইরের আলোর ভেতর বের করে এনে বললেন, 'মাসুদ চাচা। এখন ঘুমুচ্ছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ। একটা জাইক্কর দিয়া গা তুলব। দশ বাও পানির নিচে গেলেও ট্যার পামু, কান পাতা লাগব'ম্যা। জাগে নাই এখনও, ঘণ্টা-দুই আরো গড়াইব।' গফুর বললে-'আকবইরা, কী কমু আপনেরে কত্তা, রাইত চাইরটা তখন, ইলশায় নাও লাগল আইয়া জাহাজে, আমরা ঘুমাইছি সব, মাসুদ চাচা ঘুমের মধ্যে মইরা আছে, মইরা কাঠ, দশ ঘণ্টার আগে জাগব না, মাসুদ চাচা ছাড়া নিশিন্দার জাহাজে ইলশার দরের প্যাঁচ বোঝে ঘেটির উপুর হেই ক্যাল্লাডা আছে কোন হালার?' গফুর একটু দম নিয়ে বললে, 'আকবইরা হালার আছে। দুই নাও ইলশা জাইল্যারা বাহাত্তের ট্যাহা চাইলে তিহাত্তের ট্যাহা দিয়া কিইন্যা নিবার মুরাদ আছে হালার।'

প্রভাসবাবু চুরুট জ্বালিয়ে নিলেন।

'ষাইট ট্যাহা দিয়া হেই বাহাইত্তর ট্যাহার মাল কিনবার পরে সারেঙ, পঞ্চাশ ট্যাহা দিয়া আমি, পঁচিশ ট্যাহা দিয়া চাচা। চাচা কইব, পঁচিশ; জ্যাইল্যারা কইব হ, হ, বিশ টাকায় লিবা না চাচা? দাঁত নাই, মাড়ি দিয়া চাবাইয়া খাইবা না? না, চাচি চাবাইয়া দিলে পাতের ছাবা খাইবা? বুইড়া ইলশা খায়। লগি দিয়া জাহাজের পাটাতনে বাড়ি মাইরা হুম হুম কইরা ভাইস্যা যাইব নাও, মকিবপুরের বাজারের ফাইড়াগুলার কাছে মাছ বেইচ্যা ফেরোনের পথে তবু এক নাও মাছ দিয়া যাইব চাচারে—'

'কারা?'

'ঐ হালারাই।'

'কত টাকায়?'

'হেই পঁচিশ। আবার কত? এউক্কা আধলাও বেশি না। হালারা ঢাইল্যা দিয়া যাইব। চাচা, বগল দিয়া চাবাইয়া খাইও, কইব, কিন্তু মাছ লইয়া পাইজ্যামি করব'নো, দর লইয়া খ্যাচাখ্যাচি লাই।

প্রভাসবাবু চুরুটে টান মেরে-মেরে গফুরের কথা শুনছিলেন; আস্তে-আস্তে সাদা ছাই জমে উঠেছে চুরুটের মুখে, 'একটা নৌকায় কত মাছ থাকে?'

'আগে বেশি থাকত, আইজ কাইল কম—'

'কী রকম মাছ? টাকটা?'

'একটু বাসি না হইলে ইলশা খাইয়া সুখ?'

প্রভাসবাবু টোকা মেরে চুরুটের ছাইটা ঝেড়ে ফেললেন। ভুল হয়ে গেল মনে হল তার। ছাই-এর আস্তরটা থাকলে বোধকরি চুরুটের আগুন টেনে সুখ আছে; অবিশ্যি চুলচেরা হিসেব করে দেখেননি কোনোদিন।

'ভাইয়া ব্যাঙের লাহান ফাল মারল।'

'কে?'

'আর কে—আকবইরা। বেইন্না রাইতে তখন মাসুদ চাচা ঘুমাইয়া, সারেঙ ঘুমে, আমি ঘুমে, রহিম চিৎকার পাইড়া কইল, 'যাইছ না আকবইরা, ইলশার নাও আইব-যাইব, দর করব কাল মাসুদ চাচা, ইলশা খুব উজায় রে আইজকাইল, নাওয়ে-নাওয়ে ছাইয়া গ্যাল দ্যাশ, তুই ফ্যাল দ্যাছ ক্যা? কিন্তু কে কার কথা হোনে? তেলাচোরারে ঠেহাইয়া রাখব নি টুনটুনি? হালারা আটটা মাছ গড়াইয়া দিল বোকচন্দ্ররে, চাইরডা ট্যাহা ছিনাইয়া লাইয়া গেল আকবইরার দাড়ি মোচড়াইয়া।'

আটটা ইলিশ মাছ চার টাকায়। প্রভাসবাবুর কাছে সস্তাই মনে হল আজকালকার বাজারে। কিন্তু কিছু বলতে গেলেন না তিনি। এরা হয়ত কমে পায়। মাসুদ চাচা ঘুমিয়ে আছে, জেগে থাকলে একবার আলাপ করে আসবেন নাকি ভাবছিলেন প্রভাসবাবু। সারেঙ বাটলার খালাশি জেলে সকলকে অনুগত করে রাখবার সহজ প্রাধান্যে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে হয় তো চাচাকে—গফুর বাটলারের?

'আপনে আর মাইয়া নিশিন্দায় যাইবেন ত?'

হ্যাঁ।'

'বেড়াইতে?'

'না। একটু অফিসের কাজ আছে।'

'দুই-চার দিনে হইব কাজ?'

'তা হবে।'

'এই জাহাজে ফিরবেন না কত্তা—না অফিসের বোটে?'

'আফিসের কোনো বোট নেই, বাসে ফিরতে পারি।'

'তা ফেরা যায় বটে, গইনার নৌকায়ও ফেরা যায়, কেরায়া নৌকায়ও,' গফুরকে একটু দমে যেতে দেখা গেল।' 'হুজুর যদি বাটলারের কথা মনে না রাখেন, মাইয়াও মনে না রাখে আমি কইব না কিছু—আপনার ধম্মে যা লয়। আমি কচি মুরগি ঠিক কইরা রাখুম, লেমুখালির এক লম্বরের চাউল আর টাটকা ইলশা খাইবেন না আইয়া আপনে আর মাইয়া ফেরোনের পথে?'

'দেখি—'প্রভাসবাবু খুশি হয়ে হেসে বললেন। গফুরের মুখের দিকে তাকিয়ে পর্যালোচনা করে তারপরে বললেন, 'বাসে যা গাদাগাদি; স্টিমারে ফার্স্ট ক্লাসে ফিরতে পারলে কথা আছে কী আর। তাড়াতাড়ি ফেরা যায় বাসে—কিন্তু আমার তাড়া নেই। স্টিমারেই ফিরব, তবে খোদার হাত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের মনের খুশি মুখে উপচে পড়ল না গফুরের, কিন্তু প্রভাসবাবুর সিদ্ধান্তটা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে বাটলারের—তা মুখের দিকে তাকিয়ে অনুভব করলেন তিনি। না, খুশিই হয়েছে বাটলার—দুই চোখের কপালের কোঁচকানো রেখাগুলো একটু আলগা হাসির টানে পালিশ হয়ে এসেছে।

'আইবেন কত্তা, ভুলবেন না, ধম্মের কিরা।'

'কিরার দরকার নেই, মুখের কথায় বলেছি, যদি বেঁচে থাকি।'

'না বাঁচনের কী হইল? মাইয়ার সোমখে বইয়া এইটা কী কুডাক পাড়বার চাইলেন আপনে। আরে ধম্মো—'

'না, এমনিই বলছিলাম, তবে মানুষের সুখ দুঃখের মালিক সে ত নিজে নয়, আমি—'

বাধা দিয়ে গফুর বললে, 'ধম্মো, কত্তারে অদৈন্য, কইরা দিও, আঁধাইরা কথার খই ফুটাইতে চায় কত্তা, ও সব কথা থাউক এ্যহন ছ্যাক দ্যান, হক্কের কথা হইল, আইজ সোমবার, নিশিন্দার থনে ফিরবেন তো বুধবার আমার জাহাজে।'

'বুধবার না হলেও বিষ্যুৎবার ফিরব, দেরি হয়ে গেলে শুক্কুরবার নিশ্চয়ই।'

গফুর ডান হাতটা নিজের মুখের ওপর একবার বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'হইল। বুঝলাম। একটু গোস্‌সা করলেন নাকি কত্তা?'

'কেন?'

'গলায় চাদর প্যাচাইয়া গফ্‌ফুইরা টান দিল আপনারে, নিশিন্দা জাহাজে, হেইডা ভাবলেন নাকি?'

প্রভাসবাবু মুখের থেকে চুরুট নামিয়ে একটু হেসে বললেন, 'তা তুমি না থাকলে নিশিন্দা জাহাজে আমি ফিরতাম কিনা বলা যায় না। নদীর পথে চলতে আমার ভাল লাগে, এ-রকম নিরিবিলি জাহাজে, বাসভাড়া ঢের কম—চলেও তাড়াতাড়ি। কিন্তু তুমি টানছ, তোমার ধর্ম টানছে আমাকে, জাহাজেই সবচেয়ে ভাল লাগে আমার, আমি প্রাণের কথা বলছি বাটলার।

'হ, হ', গফুর চোখে দাঁতে মিট মিট করে হেসে বললে, 'কথাডা প্রাণের থন গোথ্‌লাইয়া উঠছে কত্তার।'

ঠাণ্ডা চায়ে একটু চুমুক দিয়ে দ্বিতীয়বার চুমুক দেবার আগে পেয়ালাটা টিপয়ের ওপর রেখে দিলেন প্রভাসবাবু।

'মোছলমানের বাচ্চা হইয়া আল্লাতালা না কইয়া কইলাম ধম্মো—মাসুদ চাচা হুনলে—'

'কী করত?'

'খুব তরজুত করত কত্তা, যাতে চ্যাগাইয়া হাঁটতে হয় হেই ব্যবস্থা করত।'

'ও—' প্রভাসবাবু বললেন চায়ে চুমুক দেবেন কিনা ভাবছিলেন খুব ফিকে হয়েছে চা, মিষ্টি বেশি, পাতাটা সুবিধের নয়।

'কোনো হালারে ডরাই না আমি। মাসুদ চাচা টিকব না, চাচার মাটির উপুর তাল—নাইরকোল গজাইব, হেইয়ার পিডা আর লাড্ডু খাইব তামাম দ্যাশ, চাচা কোথায় তখন? কিন্তু ধর্ম আছে। একটা কথার 'অ'কার আ'কার ব্যাসকমে কী আসব যাইব? খোদাও যা ধম্মও তা—অ'কার অ'কার ব্যাসকম।

ব্যাকরণের মতে 'অ'কার 'আ' কারের পার্থক্য নয় শুধু, তার চিত্তের ব্যাকরণের কথা বলছে গফুর, ভুল হয়নি হয়তো সেখানে তার।

'এই লাইনে চল্লেন না আর কত্তা?'

'না।'

'কেমন নদীজঙ্গল দেখলেন? চাইয়া-চাইয়া দেখলেন ত বেয়ালডার থন ভাল ঠেকল?'

প্রভাসবাবু কিছু বলবার আগেই গফুর বললে, 'মাইয়া রইল ঘুমাইয়া। নিশিন্দার থন জাহাজ রাইতে ছাড়ব।'

'রাতে? কটার সময়?'

'আটটা, লয়টা, দশটার সোম ছাড়ে মাঝে-মাঝে—ঠিক নাই।'

'ও—তাহলে ত সেটা সুবিধে হবে না।'

'ক্যা? আইবেন বইবেন, বাতচিৎ করবেন আমার লগে, আকবইরার লগে মাসুইদা আসব না, খাইবেন মাইয়ারে লইয়া, খাসি না, নয়ান মুর্গি আর তাজা ইলশা প্রাণ ঠাণ্ডা কইরা, আণ্ডার মামলেট হইব, চাটনি চায়ন তো চাটনি, ফুলবাহাইরা চাউল লেমুখালির—আর চাঁদপাখার গরম-গরম মুসুরি, লবারের লাহান। বেজুত লাগব ক্যা? কী কয়ন আপনে?'

প্রভাসবাবু বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম দিনের আলোয় ফিরলে সুবিধা হবে, এই যেমন চলেছি ভোর দুপুরের আলোয় বেশ, রোদে, বাতাসে।'

'ক্যা? রাইত কি কামড়াইব কত্তারে? রাইতে হুলাগ নাই?'

'ইলেকট্রিক বাতির কথা বলছ?'

'আছে না নিশিন্দার জাহাজে? জাহাজভর্তি দরমার সিলিঙ ফুইরা-ফুইরা কোম্পানির বাল্‌, টিপি দিলেই আলো জ্বলব। এই যে বেয়ানডার আলোর কথা কইলেন—এইয়ার থন বালের আলো হুলাগ দিব বেশি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুইচে টিপ দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে প্রভাসবাবুকে দেখিয়ে দিল গফুর—ফার্স্ট-ক্লাসের ডেকে দু'টো পয়েন্ট আছে, দু'টো আলোই জ্বলে উঠেছে। সুইচ নিবিয়ে দিয়ে এসে গফুর বললে, 'ঢাকা-খুলনা লাইনের থিইকা নিশিন্দার লাইনডা খারাপ, বিলাতি কোম্পানির মাথাও খারাপ কত্তা, কিন্তু জেলাপির প্যাঁচে-প্যাঁচে রসের লাহান হালাগো কেরামতিও আছে দুইডা-চাইরডা।'

তা আছে বটে। চাটা খেতে হবে। একবারে না খেলে মাথা ধরবে বিকেলের দিকে। একটু কড়া চা খাওয়ার অভ্যাস প্রভাসবাবুর, ঠিক মতন দুধ মিশিয়ে, ফ্লেভারের চেয়েও পাতায় রসের দিকে নজর রেখে বেশি।

'বাসমতী থেকে নিশিন্দা যেতে কয়টা স্টেশন গফুর?'

'ছয়ডা।'

'কই, একটাতেও ধরল না ত এতক্ষণে।'

'আইলে তো ধরবে।'

'বাস এতক্ষণে মাঝপথ ছাড়িয়ে যেত।'

'হ। নিশিন্দার লাইনডা ক্যাজা। গফুর অন্য কথা কী যেন ভাবছিল, প্রভাসবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটার পুনরুক্তি করে গফুর বললে, 'লাইনডা পচা বাঁশের ঘুণ—গোনে—বেগোনে বাসাতে (বাতাসে) ঠনঠন ঝুরঝুর করবার লাগছে। ভেট্‌কি মাইরা পাছাড় খাইব হালা।'

'লাইনটা উঠে যাবে শুনেছি, ঠিক নাকি?'

'হ। ওঠোনের কথা ত আছে। কয়লা কম কত্তা। বাসও আবার পাল্লা দিবার লাগছে। কিন্তু হেইডা একটা কথা না—কয়লাডাই কম।'

'শিগগিরই উঠে যাবে লাইন?'

'হ। মাসাবধি আছে।'

'খুলনার লাইনে চাকরিতে চলে যাবে নাকি তুমি?'

'আমি কইমু আর হুইব?' গফুর আস্তে-আস্তে গোঁফে প্যাঁচ দিতে-দিতে বললে, 'কোম্পানির মর্জিতে যাওন আর থাকোন। ঘেটিতে লাথি মাইরা পেরির মধ্যে ডাবাইব, না, তকমা পরাইয়া ঢাকা-খুলনার বাদশা বানাইব হালারা জানে। চা খাইলেন কই?'

'খাচ্ছি।'

'পাতাডা ভাল ছিল না।'

'কোথেকে কেনা?'

'নিশিন্দার থন। এইবার বাসমতীর থন লাল মাক্কা বুকবণ্ড কিনুম এক টিন—ফিরবার পথে খাইবেন—চিনি হইছে নি?'

'চায়ে? হ্যাঁ চিনি ঠিক আছে।'

'দুধ পাওয়া গেল না—বকরির দুধ যা বাকি ছিল কাইল রাইতেই মাসুইদা থুইছে হোধ দিয়া। আমি গুইজা রাখছিলাম আগে ভাগে খানিক কত্তা—জাহাজে চিকিন কেলাসের পাসিন্দারগো চা খাওনের লইগ্যা। খাওয়া হোধ দিছে সব। জাহাজে রয়না দিতেই হোধ। আষ্টো পেয়ালা চা বানাইতে হইছে দুই ছটাক বকরির রস দিয়া। ডাক্কাইত! কী ঢুসাঢুসি পাছড়াপাছড়ি হেই ছাটুরনি খাইব—হেই গতিকে। হালা—উটকাল চ্যাঙের লাহান ফাল দিয়া মরছি না হারা বেয়ানডা পাসিন্দারগো চায়ের তান্না মিটাইতে—হালা!'

'জোব্বার খুতির বেতর থেকে একটা ছোট্ট ময়লা গামছা বের করে মুখ মুছতে-মুছতে গফুর মাথা নেড়ে ইশারায় রমাকে নির্দেশ করে দিয়ে প্রভাসবাবুকে বললে, 'মাইয়া যখন আম্মর চা চাইল ফাঁপরেই পড়লাম। আকবইরা কইল ঘাবড়াও ক্যান মিঞা, যা দুই চামচ দুধ আছে পানি মিশাইয়া পিলাইয়া দেও। কি করুম কত্তা—তাই ত দিছি। চা ভাল হইব কইথন? ধর্মের নাম লইয়া চোখ টিইপ্যা গলায় টান দিয়া চুমুক ত মারলেন দুইটা—চাইয়া-চাইয়া দেখলাম। জুত লাগল না আপনার—পরানডা হেই গতিকে একটু ক্যাজা-ক্যাজা আমার। মাইয়া না ঘুমের থেইকা উইঠ্যা হাউশ কইরা এই চাতে আবার চুমুক মারে!' বলতে-বলতে রমার দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে তারপর প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে গফুর বললে—'ঘুমাইয়া সুখ হইল মাইয়ার। জাগাইবেন না; হাউশ মিটলে নিজের থন জাগব।' গফুর একটু গোঁফে হেসে বললে—'হাবিজাবি চা খাইয়া আমারে ফ্যারে ফেলাবার মন নাই মাইয়ার, হেই গতিকে ঘুম, খুব চাঁদপাইলা ঘুম, খুব জবর ঘুম—'

'এই ত চা খাওয়া হয়ে গেল আমার—'শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে প্রভাসবাবু বললেন।

'শুভেনাভে হইল একরকম—' গফুর ময়লা গামছাটা দিয়ে ডান হাতের কব্জি ঘষতে-ঘষতে বললে 'চা খাইয়া আমার কান কাটলেন কত্তা, ফেরোনো পথে আমার হাতের চা খাইয়া জোড়া লাগাইয়া দিয়া যাইবেন। এই গতিকেই নিশিন্দার জাহাজে ফিরতে হইব—আপনার আর মাইয়ার।'

প্রভাসবাবু হেসে উঠলেন।

'তোমার পাল্লায় পড়ে আমার কানও আস্ত থাকবে না দেখছি—'

'ক্যান?'

'আমি ত টাকা পয়সা দিয়ে দাম মিটিয়ে দেব গফুর—কিন্তু আরো কি পাওনা থাকে তোমার?'

গফুর গামছা দিয়ে কনুই ঘষছিল, গামছাটা বাঁ কাঁধের ওপর ফেলে বললে, 'হেইডা আপনারা খুশি হইয়া আমাগে মুল্লুকে থাকলেই মিটব আমার।'

'তোমাদের মুল্লুক?'

'পাকিস্তানের কথা কইছি। হইব না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাসবাবু চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে মুছতে-মুছতে বললেন, 'শিগগিরই হবে শুনেছি।'

'হইলে দৌড় বাজাইবেন নাকি কইলকাত্তায়? কইলকাত্তা হইয়া উইড়া বিহারীগো মুল্লুকে?'

প্রভাসবাবু চুরুটটা নিভে গেছে দেখে দেশলাই বের করে বললেন, 'না, কোথাও না।'

গফুর চুপ করে ছিল।

'কেউ-কেউ চলে যাবে হয় তো। আমি থাকব ভাবছি।'

'জবরদস্তির কথা কইমু না। কইলকাতার দিকে দৌড় বাজাইতে খুব ফূর্তি হইব অনেকের, কিন্তু এই দ্যাশে না-থাকোনের কিছু নাই, ভালোবাইস্যা থাকোন লইয়া কথা।'

প্রভাসবাবু চোখে চশমা এঁটে গফুরের বাঁ কাঁধের নোংরা গামছার দিকে, তারপর তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মানুষ যাবে-আসবে, ঠেকে শিখবে, ধানচালের দরদস্তুর, কায়দাকানুনের কথাগুলোও ভালোবাসার কথা হতে পারত, কিন্তু—'

'কিন্তু কী কত্তা?'

প্রভাসবাবু চুরুট জ্বালিয়ে বললেন, 'সময় লাগবে ঢের।' কিছুক্ষণ চুরুট টেনে গফুরকে প্রভাসবাবু বললেন 'কটার সময় নিশিন্দা পৌঁছবে গিয়ে জাহাজ?'

'একটা-দুইটা—'

'কোনো স্টেশনে আসেনি ত এখনও?'

'না।'

'এত দেরি কেন?'

'হ-দেরি ত হইলই, পাটাতন রৈদে-রৈদে ভাইস্যা গেল, চরকাশিম ছাড়াইয়া যাওনের কথা, ছাড়াইল কই? কয়ডা বাজল কত্তা;

'দশটা,' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন।

'ডাক্কাইত! পয়লা টিশিনেরও লাগাল পাইল না নিশিন্দার জাহাজ। আঁধারকোঁদার নাই, খাড়া ঝিলকি নাই, কুয়া নাই—হাল চকচকাইয়া রৈদে নতুন বৌয়ের লাহান আল্লাদ—আল্লাদ লাগাইল, মাউচ্ছ্যা নৌকার লগে পাল্লা বাজাইল জাহাজ—' বলতে-বলতে কাঁধের থেকে গামছাটা নামিয়ে কনুই ঘষতে-ঘষতে গফুর একবার নদীখাড়ি, চারদিকের চর, আকাশের রোদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এই কমলে চললে চার বজাইব; না বাজাইলেও ভোগাইব। আল্লা!

'কী হল?'

'চাক্কি ভাঙছে।'

'কে বললে?'

'চাইয়া দেখেন—হেই জল, হেই চর, হেই রৈদ—জাহাজ আউগ্যায় কই?

কাউয়া উইড়া যায়, জহাজ চাইয়া-চাইয়া দেখে; হট ছুইড়া কাউয়াগুলোরে নদীর পানিতে চুবানি খাওয়াইতে মন লয়।'

প্রভাসবাবু কাকের ওড়াউড়ির দিকে একবার তাকিয়ে গফুরকে বললেন, 'এই-সব পক্ষিরাজ ঘোড়ার লাথি খেয়ে ডেবে গেল বুঝি জাহাজ?'

'হ। খুব জোরেই লাথি মারছে। চ্যাগাইয়া-চ্যাগাইয়া উড়বার লাগছে তাই। পছন্দ হইল পাছ দিয়া ভেটকি মাইরা যাইব সারেঙটারে। নতুন সারেঙ!'

'কবে এসেছে?'

'দিন পনের হইল। ফালতু সারেঙ।'

'আগের লোক কোথায়?'

'গোয়ালন্দ লাইনে। মতলব হইল নির্শিন্দা লাইন টিকাইব না—' গফুরের নিঃশ্বাসে নিশ্চয়তা না সংকল্প থমথম করছে ঠিক ধরতে পারলেন না প্রভাসবাবু।

'জাহাজ চরে ঠেকল তাহলে—'

'হ। মোড় ঘুরাইয়া চরে হাঁধাইল সারেঙ, খাড়াখাড়ি বাইর হইব না; রাইত দশটার এইকূলে নিশিন্দা পাইবেন না কত্তা—'

'রাত দশটা?' প্রভাসবাবু চক্ষু স্থির করে গফুরের দিকে তাকালেন—'সত্যি রাত দশটা?'

'আটটা-লটার এইকূলে না। আমি চললাম।

'কোথায়?'

'আরাম কইরা বহেন কত্তা; জাহাজ এখন জিরাইব, নাস্তা খাইব। মাইয়া জাগল না। ঘুমাউক, ঘুমাউক, আপনাগো নাওনা খাওনের একটা জুত কইরা আহি। নাইবেন না? গোসলখানার টবে পানি নাই—করিম দিয়া যাইব, কইয়া দিমু। দু-দণ্ড দাঁড়াইয়া কথা কইমু যে আপনেগো লগে হেই জুইত নাই। চিকিন কেলাশের পাসিন্দারগুলা মাক্কামাক্কি লাগাইছে—পায় ত বাটলাররে ধইরা ফাইড়া তামুক কুচি করে—,' বলে ময়লা গামছা দিয়ে ঘাড় গর্দান ঘষতে-ঘষতে গামছাটাকে জোব্বার খুতির ভেতর ঠেলে দিয়ে রমা ও প্রভাসবাবুর দিকে একবার তড়িৎ চোখে তাকিয়ে হেসে সাঁ করে পিরিচপেয়ালাগুলো তুলে নিল গফুর—'তিন প্যাইখার চরে ঠেকাইল, দণ্ড চাইরের ঢুসাঢুসি, হেইয়ার পর পীর বদরের খাসির লাহান ছুটব জাহাজ, চল্লাম কত্তা, ব্যাজার হইবার কিছু নাই, কইবেন মাইয়ারে। আইমু।'

গফুর চলে গেল।

এ-সব দেশ স্বাধীন হবার কিছুকাল আগে হয়েছিল। নিশিন্দাপুরে সন্ধ্যের সময়ই পৌঁছেছিলেন প্রভাসবাবু। জাহাজ ঘণ্টা দুই চলে আটকেছিল। নিশিন্দাপুরে দু'দিন ছিলেন। ফিরবার পথে বাসে না চড়ে—গফুরদের জাহাজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরেছিলেন। খাওয়া-দাওয়া আরামতরজুত—চমৎকার হয়েছিল সব। কিন্তু তারপরে ও-লাইনে আর যাওয়া পড়েনি প্রভাসবাবুর। ট্যুরেই বেরনো হয় না বড় একটা। নিশিন্দাপুরের লাইনটা আছে না বাতিল হয়ে গেছে খবরটা জোগাড় করে উঠতে পারেন নি। মাঝে-মাঝে মনে হয় বটে গফুর আর তার জাহাজের কথা, কিন্তু নিজেই গিয়ে একদিন সাত নম্বর ঘাটে খোঁজ নিয়ে আসবেন ভাবতে-ভাবতে ব্যাপারটা তখনকার মত চাপা পড়ে যায়, নানারকম কাজকর্ম চিন্তাভাবনা, সাতরকম ধান্দা এসে জোটে, যাওয়া হয় না সাত নম্বর ঘাটে।

সম্প্রতি আবার ট্যুর বাড়িয়ে দিয়েছে সরকার—নিশিন্দার দিকে নয়, অন্য নানাদিকে। প্রভাসবাবু দু'দিন বসমতীতে বসে কাজ করেন ত তিন দিনের দিন বিছানা বাঁধতে হয়। চামড়ার বড় সুটকেসটা ছিঁড়ে ঢলঢলে নড়বড়ে হয়ে গেছে—কাজ চলে না, মাঝারিটা চুরি গেছে, ছোট্টটা বেশি ছোট, জিনিসপত্র আঁটে না। একটা টিনের মাঝারি সাইজের ট্রাঙ্ক কিনে গুছিয়ে নিতে হয়েছে কিন্তু সেটাকে নাকচ করে হ্যাভারস্যাক আর বোচকা ঠিক করলেন। এতেও মন খুঁতখুঁত করতে লাগল, পরে বেচু মিস্ত্রি পাইন কাঠের একটা বাক্স তৈরি করে কী যেন কী এক রকম রাফ রং মাখিয়ে দিল, জিনিসটা একটু বেখাপ্পা দেখাল বটে রমা ও বাইরের লোকদের চোখে, বেচু কারিগরের নিজের চোখেও—কিন্তু বেশ পছন্দ হয়ে গেল প্রভাসবাবুর। ঐ বাক্স, বিছানা, একটা ফ্ল্যাস্ক, আর বেশি ট্যুর হলে, একটা ঝুড়ি, এই রকম ব্যবস্থা হল।

দেশ এখনও স্বাধীন হয়নি, হবে শিগগিরই, জোর বৈঠক হচ্ছে সব চারদিকে, স্বাধীন হবে, দু'টুকরো হবে, কাটাছেঁড়া না করে স্বাধীনতা ভোগ করার সম্ভাবনা খুব কম।

প্রভাসবাবুকে এত ট্যুরে যেতে হচ্ছে বলে রমার সম্বন্ধে অবিলম্বেই একটা ব্যবস্থা করা দরকার হয়ে পড়ল তার। গোড়ার দিকে রমাকে সঙ্গে নিয়ে স্টিমারে নৌকায় মোটরবাসে ফিরেছেন তিনি; কিন্তু বাসমতীতে রেখে যাওয়াই ভাল—অবিশ্যি যার-তার কাছে রেখে যেতে পারেন না।

রমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কাছে থাকতে চাস, বলত!'

'আমি এই বাড়িতেই থাকতে পারব', রমা বললে, 'আমার ভূতের ভয় নেই।'

'এটা ত আমার বাপের ভিটে নয়—বাড়িটা ভাড়া করেছি রায়মল্ল মিস্তিরের কাছ থেকে। একতলা দালান, ছাদে একটা ঘর আছে। নোনা ধরেছে, খসে যাচ্ছে ইট, বাইরে থেকে গাঁইতি দিয়ে চাট মারলেই পাঁচখানা ইট খসে পড়বে। আমি যখন নিজে এ বাড়িতে থাকি তখনই তোমার কথা ভেবে আমার রাতে ঘুম হয় না।'

প্রভাসবাবু চুরুটে টান দিয়ে বললেন, 'কী রকম উটকো জায়গায় বাড়িটা, দেখেছিস?'

রমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাছে পিঠে কোনো লোকজন নেই, প্রায় আধমাইলটাক হেঁটে যেতে হবে—তারপরে সেনগুপ্ত মশাই, মহেন্দ্র বোস, অবিনাশ ঘোষালদের ভদ্রাসন।'

'কেন, তুমি আগেই পুব দিকে যাবে কেন? এই ত হাতের কাছে—আম জামরুল নিমগাছগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যাচ্ছে মোছলমানপাড়া, দক্ষিণে পশ্চিমে—'

'তা দেখা যাচ্ছে বটে।'

'দু'মিনিটের পথ ত—'

প্রভাসবাবু গোঁফে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে নাকের ওপর থেকে একটা মশা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'পঁচিশ-ত্রিশ ঘর মোছলমান রয়েছে ওখানে, তা আছে বটে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনোরকম লেনদেন নেই ওদের, ওখানে কোনো মুন্সিমোল্লা, কোনো গ্র্যাজুয়েট ছোকরা নেই, ওদের ছেলেরা স্কুল—কলেজে পড়ে না, মেয়েরা বোরখা এঁটে আবডালে পড়ে থাকে; ওদের ভেতর গফুরের মত কেউ একজন নেই কিংবা থাকলেও এখনো তাকে আবিষ্কার করতে পারিনি আমরা।'

'গফুর, কে?' প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে রমা বললো।

'নিশিন্দার জাহাজের বাটলার—মনে নেই?

'ও' গফুর, মাংস ইলিশ খাওয়াল, ফেরবার পথে পোলাওটোলাও অনেক কিছু খাওয়াল—নিশিন্দার বাটলার গফুর! অমন লোটি হয় না—' রমা বললে, 'এ পড়ায় সে-রকম মানুষ পাবে কোথায় তুমি?'

'বাসতমীতেও পাওয়া কঠিন,' প্রভাসবাবু বললেন।

'এরা খুব সম্ভব কাঁচা চামড়ার যোগানদার, খুচরো যোগানদার।'

'হ্যাঁ, গন্ধের চোটে টিকতে পারি না এক-এক সময়। ওদিককার জানালা দু'টো বন্ধ করে রাখতে হয়।'

'পাদ্রিদের মিশনও ত কাছে—উত্তরপুবে দশ বার মিনিটের পথ। তুমি যাওনি কোনোদিন?'

'না। দিশি পাদ্রি সব?'

'ফাদার চক্রবর্তী-কে—একজন আছেন—নিশ্চয়ই বাঙালি হবেন; নাকি মাদ্রাজিদের ভেতরও চক্রবর্তী হয়?' পদবী হিসেবে হয় বলে শুনিনি ত। পদবীটা রাজাগোপাল—নাকি আচারিয়া? কী জানি? মিশনে গেছলে একদিনও তুমি?'

'না। কাউকে চিনি না ত। কার কাছে যাব? কে নিয়ে যাবে?'

'আমি গিয়ে কী করব? আমার এসব শুঁকে বেড়াবার বাতিক নেই—'

রমা সেলাই করতে-করতে একবার মুখ তুলে প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে নিল। চুরুট খাচ্ছেন, চোখের চশমা চকচক করছে—পাথর দু'টোর ভেতর চারদিককার সবুজ গাছপালার ছবি এসে পড়েছে।

'দিশি লোকদের নিয়েই মিশন, কয়েকজন সায়েব মেমও আছেন।'

'এই আখড়াটায়?'

'হ্যাঁ, দেখ না তুমি? আমাদের ঐ সব বাঁশ জামরুল বাসক মানকচুর নিরিবিলি পথ দিয়ে প্রায়ই ত ওরা আসা-যাওয়া করে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দেখেছি,' প্রভাসবাবু বললেন, 'ওরা কি এই মিশনের মেম নাকি?'

'মেম বলা ঠিক হবে না—সিস্টার। সিস্টার আর ফাদার। হ্যাঁ, এই মিশনের।'

'বাসমতীতে আর-একটা বড় মিশন আছে ত, শহরের ভেতর গিয়ে—'

'সেটা অক্সফোর্ড মিশন; সেখানে বড়-বড় ময়দান, পুকুর, গির্জা, বোর্ডিংসব রয়েছে, বেশ জায়গা, বড়-বড়-সব ঝাউ, দেবদারুগাছ, রক্ত হলদে নীল গোলাপি ক্যানার ঝাড়, পোয়া মাইল, আধমাইল ঘিরে সব ক্যানার কেয়ারি, যখন ফুলে-ফুলে থইথই করে অদ্ভুত সুন্দর দেখায়; তা ছাড়া কত রকম বিলিতি সিজনের ফুল, দু-চারটে দিঘি, সব মিশনের ফাদারদের ছনের চালের ছোট-ছোট ঘরগুলো, কেমন একটা সবুজ স্বাভাবিক শান্তির মতন যেন; অবিশ্যি আমি জানি না ফাদাররা সত্যিই কী ধরনের মানুষ। অ্যাসবেস্টসের ছাউনির বোর্ডিঙের বহর রয়েছে সব দিশি ছেলেমেয়েদের জন্যে। গির্জাটা গথিক ধরনে তৈরি করেছে—' রমা ছুঁচটা দাঁতে আটকে নিয়ে বললে।

'কবে তৈরি করেছে?'

'অনেক দিন আগে।'

'গথিক কাকে বলে?'

'ইমারৎ তৈরি করবার এক ধরনের পদ্ধতি।

'খুব লাল রঙের গির্জার বাড়িটা?'

'হ্যাঁ, ছিল এ সময়। কিন্তু লাল ইটের ছকটা চোখে পড়ে না—' ছুঁচটার দিকে একবার তাকিয়ে সেলাই করতে-করতে রমা বললে, 'আছে ছক—কিন্তু ট্যাব-ট্যাব করে চেয়ে নেই—ফৌজদারি আদালত আর জিলা স্কুলের বাড়িগুলোর মতন। লাল মার্বেল দিয়ে তৈরি মনে হয় গির্জাটাকে, বেশ পালিশ।'

'রোজই ত প্রায় চোখে পড়ে গির্জাটা আমার, কিন্তু তোমার মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে যাইনি।'

'ভেতরে যাওনি?'

'গিয়েছি দু-চার দিন।'

'মনে হয়েছে বুঝি কাশ্মীরের মত জায়গা?' সেলাইটা চোখের সামনে ছড়িয়ে উঁচু করে তুলে ধরে এক-আধ মুহূর্ত নজর দিয়ে দেখে নিয়ে রমা বললে, 'বড়-বড় সিসু, নিম, ঝাউ, রেনট্রি, দেবদারু গাছ, নানারকম পাখি ঝাঁক বেঁধে এসে পড়ে ওখানে— চিল, বক, টিয়া, শালিখ, লালশর, বালিহাঁস, নীলকণ্ঠ, ফিঙ্গ, পায়রা হরিয়াল ত আছেই, আরো ঢের, নাম জানি না—'

মনে-মনে ভাবছিল, 'মাছরাঙা পাখিরা, বউকথা কও, কোকিল, হাড়িচাচা এ ছাড়া আরো কত রকম পাখি—'

'দিঘির পাড়ে একটা নারকোলগাছে বাজকুড়ুলও দেখলাম।'

'ও—' প্রভাসবাবু বললেন, অন্য কথা ভাবছিলেন তিনি।

'সেই যে নদীতে ওপারের তালবনের বাজকুড়ুল দেখিয়েছিলে তুমি—নিশিন্দার জাহাজে?'

'হ্যাঁ দেখিয়েছিলাম— প্রভাসবাবু বললেন না আর কিছু। রমা একটু আশ্চর্য হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে সেলাই করতে-করতে আবার বললে, 'কিন্তু পাদ্রিরা ঠিক সন্নেসি নয়। মিশনটা বেশ বড় আশ্রমের মত—শান্তি আছে; কিন্তু পরিপাটি রয়েছে বেশ—পাদ্রি হলেও ওদেশের সাহেবদের ও-সব না থাকলে চলে না। চলাফেরা ওঠা-বসা খাওয়া-দাওয়ায় আছাড়িপিছাড়ি নেই, কিন্তু জুতসই ভাবটা আছে। আমি যদি ওখানে সিস্টার হতাম' রমা বললে, 'তাহলে প্রতিটি দিন দু-তিন ঘণ্টা অন্তত ওদের গাছপালার পাখিদের দিকে তাকিয়ে থেকেই আমি সাধনপথে এগুতে পারতাম, এই ত মনে হয় আমার।'

প্রভাসবাবু কী যেন কী ভাবছিলেন এতক্ষণ, এইবারে রমার দিকে ফিরে তাকালেন। রমার শেষের কথাগুলো কানে ঢুকে পড়েছে তার, তারপরে কেমন একট ঢেউ তুলেছে যেন ভেতরে। কিন্তু কিছু বলতে গেলেন না তিনি, চুরুট টেনে চললেন আগেরই মতন চুপ করে।

'কিন্তু ঐ ফাদাররা আর-একরকম। একটু ছকের বাইরে গেলেই হয়েছে; একতিল বেশি জ্বালাতন বোধ করলে গাদা বন্দুক দিয়ে পাখি সাবাড় করবার কাজে লেগে যায় তিন-চারজনে মিলে, একটুও দ্বিধা নেই—Thou shall not kill এখানে খাটে না, গ্রহণীর নয় সবই ফাউল মাটন বিফ আর-কী। গাছের পাখিগুলোকে উজাড় করে মানুষের খাদ্য ছাড়া আর-সব ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে কাজকর্মে চলে যায়—মিলিটারি ব্যারাকের না—যিশুখ্রিস্টের গির্জার।'

'ও-তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ রমা।'

'কেন?'

'আমরাও কি কাটির্ছিড়ি কম?'

'আমাদের মধ্যে যারা আশ্রমে থাকি? কেন, বুদ্ধদেবের—

'বুদ্ধদেবকে ত আমরা তাড়িয়ে দিলাম, আমরা শাক্ত হয়েছি, তান্ত্রিক হয়েছি।'

'কে?' প্রভাসবাবু একটু কঠিন ভঙ্গিতে বললেন।

'কোথায় কে?'

'দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে না?'

'রমা একটু কান পেতে বললে, 'না, ওটা বাতাসের শব্দ। ছিটকিনিটা একটু আলগা হয়ে গেছে।'

'ও—' প্রভাসবাবু বললেন, কিন্তু ছিটকিনিটা এঁটেই-বা রেখেছ কেন?'

তুমিই ত আটকে রাখলে!'

'আমি?' প্রভাসবাবু ছিটকিনি, কার্নিশ, জানালার দিকে তাকিয়ে পরে বললেন, 'এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে আমাদের।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আনেক দিন থেকেই ত বলছ, 'কিন্তু মনের মতন বাড়িই ত পেলে না।'

চুরুটটা নিভে গিয়েছে। দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে নিয়ে বললেন, 'বাড়ি আছে, কিন্তু মিত্তির মশায়ের দশ মাসের ভাড়া বাকি পড়ে আছে, ভাড়াটা মিটিয়ে ত বাড়ি ছাড়তে হবে—'

'মিটিয়ে দিলেই পার।'

'ব্যাঙ্কে বেশি কিছু ত নেই। একসঙ্গে অতগুলো টাকা তুলবে? আর—মিত্তিরমশাই গা করেন না।' প্রভাসবাবু বললেন আবার।

'কোনোদিনই চাইবেন না বুঝি তিনি?'

'আমার বদলি হবার কথা—বাসমতী ছাড়বার আগে মিটিয়ে দেব।'

'কোথায় বদলি হবে?'

'কলকাতায় দেবে খু. সম্ভব। কিন্তু গিয়ে লাভ নেই। বাসমতীতেই থাকা যাক। ওপর থেকে চাপ দিলে অবিশ্যি চলে যেতেই হবে। ভাবছি একটা হেস্তনেস্ত হবার সময় মিত্তিরের টাকা বুঝিয়ে দিয়ে যাব।'

প্রভাসবাবু চুরুট জ্বালিয়েছিলেন, কিন্তু ভাল করে জ্বলেনি, কথায়-কথায় নিভেই যেন গেল আবার। মন দিয়ে খুব ভাল করে পুড়িয়ে-পুড়িয়ে জ্বালালেন।

'এই সব ভেবেই এ বাড়িটাও ছাড়তে পারছি না, নতুন বাড়িও ভাড়া করতে পারছি না। বেলা দশটার সময় আমি চলে যাই অফিসে, তুমি চলে যাও কলেজে। অফিস থেকে ফেরবার সময় তোমাকে কলেজ থেকে নিয়ে আসি রোজ-অফিস থেকে ফেরার পথেই ত কলেজ পড়ে। ঠিকে ঝিটা ঠিকের নাম করে সারাদিনই ত এই বাড়িতে থাকে—ওর মেয়েটাও থাকে। তোমার ছুটির দিনে আমি অফিসে চলে গেলে ওদের জিম্মায় তোমাকে ফেলে যেতে তবুও কেমন ভরসা হয় না আমার, অবিশ্যি দু'জন লোক আছে বলে খানিকটা স্বস্তি—কিন্তু—'

'আজ অফিসে যাব নাকি—একটা-দু'টোর সময়?

'না, আজ ছুটি। আরো তিন-চার দিন ছুটি নিয়েছি। ছুটি ফুরিয়ে গেলে তোমাকে এ-বাড়িতে রাখব না আর।

'কোথায় রাখবে?'

'কলেজের মেয়েদের বোর্ডিঙে।

'কলেজের বোর্ডিঙে?'

'হ্যাঁ, সিট ঠিক করে এসেছি।'

'বোর্ডিংটা ত এখান .থকে ঢের দূর।'

'এ বাড়ির সঙ্গে তোমার ত সম্পর্ক রাখবার দরকার নেই।'

'এখানে একা থাকবে তুমি?'

'আমি ত ট্যুরেই থাকব প্রায়।'

'যখন ফিবে আসবে?'

'আমি ছাদের ঘরে শোব।'

রমা সেলাইটা একটু হাঁটুর ওপর নামিয়ে রেখে প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'যদি বলো যে রাতের বেলা ওখানে শুতে তোমার এটুও গা ছমছম করবে না, তাহলে বলব তুমি কেমন যেন একটু আলগা হ্যাঁচকা মানুষ।'

'গা ছমছম করবে কেন—চোর আসবে বলে? কী জিনিস আছে আমার ঘরে যে চোর ঢুকবে?'

'চোরের জন্য গা ছমহম করে?'

'কিসের জন্যে তবে?'

প্রভাসবাবু চুরুটে টান দিতে গিয়ে সেটাকে শূন্যে সরিয়ে রেখে বললেন, 'ও—সেই কথা। তা আমি ও-জিনিস দেখিনি কোনোদিন।'

'কেউই প্রায় দেখে না—কিন্তু দেখা যেতে পারে এই বলেই ত ভয়।'

'ও দেখা যায় না।'

'কী রকম? নেই?'

'থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের চোখে পড়বে না।'

'কেন?'

'খুব সম্ভব নেই—সেই জন্যে। এ জীবনে অনেককেই দেখতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না।'

'নেই বলে নয়—আমরা ভয় পাব বলেই হয় তো দেখা দেয় না তারা।

নেই—প্রমাণ করতে .পরেছ তুমি?'

'না।'

'তবে?'

অস্বাভাবিক মানুষ নই আমি—ভয় আছে আমার; কিন্তু বেশি নেই।'

'ভয়ের অস্তিত্বটা বড় খারাপ।'

'মানুষ তাতে মারা পড়ে।'

তাই ত—কথা বলতে—বলতে কোথায় এসে ঠেকেছে রমা। এ জাতীয় কথা—এই লোকের সঙ্গে এর আগে এতদূর টেনে এনে বলেনি সে কখনো। সেলাই করতে-করতে কথা বলছিল, মাঝপথে ছুঁচ থেমে গেছে, ছুঁচটাকে আবার চালাবার আগে প্রভাসবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'আমাদের বাড়ির পাশের পাদ্রিরা শুনেছি ক্যাথলিক মিশনের।' এটা কী রকম একটা খাপছাড়া কথা হল—পরলোক আর ভূতের আলোচনার মাঝপথে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমা অন্য কথা বলতে চাইছে, অন্য বিষয়ে মন ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে অনুভব করে চুরুটটা মুখের থেকে নামিয়ে প্রভাসবাবু বললেন, 'ক্যাথলিক মিশনের? আর ওরা বুঝি প্রটেস্টন্ট?'

'হ্যাঁ; ওরা চার্চ অব ইংল্যান্ডের।' নিঃশ্বাসটা নির্মল হাল্কা বাতাসের মত ধীরে-ধীরে অন্তরাত্মার থেকে বেরিয়ে গেল তাঁর। মৃত্যুর না, ভূতের না, আস্তী ভলোকের শান্তিসান্ত্বনার কথা হচ্ছে।

'শুনেছ নাকি ওরা ক্যানেডার মিশনের।'

'ক্যানেডার? এই এরা—আমাদের পড়শিরা?

'হ্যাঁ—'

'ইংরেজ?'

'না। বলছিল ফরাসি—'

'কে বলছিল?'

'ফাদার বার্থেলো—বার্থেলোই ত তাঁর নাম বলছিলেন সেদিন। তিনি এসেছিলেন আমাদের এখানে।'

'কবে?'

'আসেন মাঝে-মাঝে।'

'কই, আমি ত দেখি না!'

'তুমি অফিসে থাক তখন।'

'ও—' চোখের থেকে চশমা খসিয়ে নিয়ে প্রভাসবাবু। ডেকচেয়ারে বসেছিলেন, চশমাটা ধুতির ভাঁজে রেখে দিলেন—কোলের ওপর।

'কত বয়স হবে বার্থেলোর?'

'ত্রিশ-বত্রিশ হবে।'

ধুতির খুঁট দিয়ে আস্তে-আস্তে চশমা ঘষছিলেন প্রভাসবাবু। কিছু বললেন না, চশমা পরলেন না, পরিষ্কার করা হয়ে গেলে চোখ বুজে আঙুল দিয়ে মোলায়েমভাবে টিপে-টিপে চোখে বুলোতে লাগলেন।

'এরা কজন আছে?'

'তিনজন মিশনারি আছেন এখানে।'

'বার্থেলো কি মিশনারি?'

রমার ছুঁচ হুঁচোট খেয়ে থেমে গেল। বাবাকে বলেনি কি সে এরা ক্যানেডিয়ান মিশনের পাদ্রি, কয়েকবারই ত বলেছে, তবে আবার জিজ্ঞস করছেন কেন তিনি, 'হ্যাঁ ফরাসি ক্যানেডার। মিশনারি-ত তোমাকে বলেছি আমি।'

'দাড়ি আছে?'

আবার থেমে গেল রমার ছুঁচ। এর পরে হয় তো জিজ্ঞেস করবেন দাড়ির রং কী রকম—মেরুন না বাদামি। 'আছে অল্প-অল্প কটা দাড়ি-লাল নয়। ভাল করে তাকিয়ে দেখি নি; মনে হল সোনালি।'

'ইংরেজিতে কথা বললে তোমার সঙ্গে?'

'ইংরেজি তেমন বলতে পারে না।'

'ওরা ফরাসি তুমি কী করে বুঝলে?'

'বাংলা জানে মন্দ না।'

'ও-' প্রভাসবাবু চোখ মেলে চশমা এঁটে নিয়ে চুরুটটা খুঁজে বার করলেন। নিভে গেছে। ফুরিয়েও ত গেছে প্রায়। জানালা দিয়ে চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। পকেটেই আছে আর-একটা চুরুট। বের করে বললেন,

'দুপুরবেলাই আসে বুঝি এদিকে?'

'পর-পর কয়েকবার দুপুরেই ত এল।'

'আমি না—থাকলেই আসে?'

রমা দাঁত দিয়ে সেলাইয়ের খানিকটা সুতো কেটে বললে, 'দুপুরেই অবসর পায়, নানারকম নিয়মকানুন আছে ওদের। অনেকে কাজকর্ম চিন্তাভাবনা, নতুন এসেছে, মিশনটা গড়ে তুলতে হবে।'

'সেই নিয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ?'

ছুঁচটা ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে রমা বললে, 'ওদের মিশনের লাগাও ভদ্রলোকের বাড়ি দেখেই আমাদের এখানে এসেছে। এদিকে ত আর জনপ্রাণী নেই। তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যই এসেছিল। বাংলা শিখতে চাচ্ছে।'

'ইংরেজি তো শেখা হল না, বাংলার ওপর দখল তুমি বলছ ইংরেজির চেয়ে বেশি বার্থেলোর। আরো পাকাপাকি করে নিতে চায়?'

'হ্যাঁ—'

'তোমাকে পেয়েছে বুঝি?'

রমা সেলাইয়ে ডুবে থেকে খনিকক্ষণ পরে উত্তর দিল, 'আমি ত সোরাবজি হস্টেলে যাচ্ছি।'

প্রভাসবাবু আস্ত চুরুটটা জ্বালান নি—হাতের ভেতরেই রেখে দিয়েছিলেন। মাঝে-মাঝে সেটাকে দিয়ে পেন্সিলের মতন আঁকিবুঁকি কাটছিলেন, জামার ওপরে, ধুতির ভাঁজে, হাতের তেলোয়, কপালের রগ ঘেঁষে।

'এ মিশনে মেমসাহেব নেই?'

'আছে।'

'বার্থেলোর স্ত্রী?'

'না, উনি বিয়ে করেননি, মেম হচ্ছেন ভালোরির স্ত্রী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'আমি তোমাকে সোরাবজি হস্টেলে যেতে বলেছি বটে—কিন্তু তোমার নিজের ইচ্ছা কী সেটা জিজ্ঞেস করিনি। তোমার যদি ইচ্ছা করে তাহলে এখানে তুমি থাকতে পার,' বললেন প্রভাসবাবু, 'এখানে কোনো শক্ত শিক্ষিত পুরুষ মানুষ নেই, সেই কথা ভেবে এতদিন ভয় হচ্ছিল আমার। কিন্তু বার্থেলো আছেন, ভালোরি আছেন তা ত জানতাম না আমি। এখন দেখছি এরা আমাদের ঘরের ছেলের মত।'

মুশকিল প্রভাসবাবুকে বুঝে ওঠা। শাদামাঠা গলায় কথা বলছেন বটে কিন্তু তাৎপর্যের নানারকম ইতরব্যাসকম থাকে বলে গলার সরলতার নির্দেশ নিয়ে কথার ইঙ্গিত ধরা অনেক সময়ই কঠিন।

হয়তো ভাল মনে ভালো কথাই বলছেন ভদ্রলোক। রমা সেলাইয়ের দিকে চোখ রেখে-ভেবে দেখছিল। বেশ নিপুণভাবে চলেছে বটে সেলাই, কিন্তু কী বলতে চাচ্ছেন উনি?

'সকাল বিকেল নানা ধান্দায় ঘুরতে হয় ওদের, দুপুরবেলাই মঠের অবসর। সেইটেই ভাল হয়েছে।'

'কী হিসেবে?'

'বাংলা শিখতে চাচ্ছে, শিখুক।

'কে পড়াবে?'

প্রভাসবাবু বললেন, 'তুমি পড়াতে পারো, পাল্টা ফরাসিটা শিখে নেবে।'

'আমি হস্টেলে যাচ্ছি।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে প্রভাসবাবু বললেন, 'তোমাকে আমি খুশি মনে এখানে থাকতে বলছি।'

'না, আমি হস্টেলে যাব।'

চুরুটে টান দিয়ে মরীয়া হয়ে উঠবার মত কোনো খারাপ কাজ না করে সহজ স্বাভাবিকভাবে উনি বললেন, 'তুমি ভেবেছ, টাকাকড়ির লোকসান হবে তুমি হস্টেলে না গেলে। কিন্তু তোমার সিটের ভাড়া দিই নি তো এখনো আমি। সে-রকম পাকাপাকি কিছু ঠিক করিনি, তুমি এখানেই থাকো।'

'এখানে থাকা ঠিক নয় আমার,' রমা বললে, 'তোমার মনে একটা সন্দেহ হয়েছে বার্থেলো সম্পর্কে।' রমার এই আশ্চর্য সিদ্ধান্তটাকে কেটে ফেলে একটা জবাব দেবার আগেই রমা বললে, 'এটা-ওটা-সেটা নিয়ে সময় কেটে গেল ঢের, শিগগিরই এগজামিন আছে, হস্টেলে না গেলে আমার পড়া হবে না।'

দরজায় একটা ধাক্কা পড়ল।

'কে?'

'কেউ এসেছে', রমা বললে।

'বার্থেলো হয় তো—'

'না—' রমা সেলাইটা টুলের ওপর রেখে দিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে একটু পিছিয়ে দাঁড়াল। সিদ্ধার্থ ঘরের ভেতর ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসে প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি আছেন বাড়িতে যা-হোক। আমি ভেবেছিলাম নাও পেতে পারি, অফিসটফিস থাকতে পারে।'

'আজ ব্যাঙ্ক হলি-ডে ত—'

'ও—তাই নাকি! আমাদের কলেজও ত ছুটি।'

'পোস্টাল হলি-ডেও আজ,' সিদ্ধার্থের দিকে নাক ফিরিয়ে প্রভাসবাবু বললেন, 'তোমাকে ত আজকাল দেখিই না সিদ্ধার্থ। নানারকম ঝঞ্ঝাটা চলেছে?' প্রভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

সিদ্ধার্থ এক কথায় সেরে দিয়ে বললে, 'না।' রমার দিকে তাকিয়ে বললে 'হাতে সেলাই করছ দেখছি। ওটা কী কাটছ? কী হবে?'

'দেখি ব্লাউজ হয় না পাঞ্জাবি হয়ে দাঁড়ায়!'

'আমি, তোমার কলেজের নয়, ব্যক্তিগত কোনো মুস্কিলটুস্কিল চলেছে কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'না, কিছু নেই,' অত্যন্ত সাদা কথায় সিদ্ধার্থ বললে।

'তুমি তাহলে এদিকে আসছ না কেন?'

'কোনোদিকেই আমার যাওয়া হয়ে উঠছে না আজকাল আর অধিকারী মশাই।'

'খুব পড়াশোনা করছ বুঝি? মাস্টারমানুষ, করবেই ত।'

'মফস্বলে মাস্টারি নিয়ে ত পড়াশোনা ছেড়ে দিলুম, কলেজে যে দু-চারটে বই পড়াতে হয় কলেজ টাইমেই সেগুলোর পাতার ছাতকুড়ো ঝেড়ে তারপর সারা দিন রাত্তিরে কী থাকে আমাদের আর পড়বার—খবরের কাগজ ছাড়া?

'ও, তাই বুঝি?'

'পুরো দস্তুর তাই।'

'ভাল লাগে?'

'লাগাতে হচ্ছে, উপায় নেই।'

প্রভাসবাবু বললেন, 'কেন, কলকাতার কলেজে চেষ্টা করতে পার না?'

'বার্থেলো সাইকেলে চড়ে মিশনের দিকে ফিরছিল, খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। প্রভাসবাবুদের বাড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে সে মিশনের দিকেই চলে গেল—এদিকে ভিড়ল না। বার্থেলোকে দেখছিল সিদ্ধার্থ—জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যায়। এ কে, কোথাকার সাহেব, জানে না সে। জারুল, শিরীষ, জামগাছ, লেবুর ঝাড় ও ঘন মেহেদি জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষটা।

রমা পিছু ফিরে ছিল, দেখেনি বার্থেলোকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাসবাবু ডান হাত উঁচিয়ে তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁকে নিজের চুরুটটার দিকে তাকিয়ে চুপ করেছিলেন, বার্থেলোকে চোখে পড়ল না তাঁর।

'কলকাতায় গিয়ে কী হবে। বেশি মাইনে পাব?'

'না, মাইনের কথা বলছি না আমি—চুরুটটা মুখে দিতে গিয়ে নামিয়ে নিয়ে প্রভাসবাবু বললেন, 'কী রকম মাইনে দেয়?'

'সে-মহাভারত শুনে মন খুশি হবে না আপনার। ব্রিটিশি সরকারি চাকরিতে আছেন, ভালই আছেন,' পকেট থেকে একটা লবঙ্গ বের করে দাঁত দিয়ে কেটে সিদ্ধার্থ বললে, 'পঞ্চাশ-ষাট থেকে একশ-সোয়াশ দুশ-আড়াইশ—যে-মূর্খকে যেরকম ভাবে বাগাতে পারে তার জন্যে সেই মাইনের ব্যবস্থা করে।'

'কলকাতার কলেজগুলো?'

'হ্যাঁ। পেশা ত। শিক্ষাদীক্ষার কোনো কথা নেই। মাড়োয়ারি-ভাটিয়াদের সঙ্গে বুদ্ধিফন্দি পরিশ্রমে পেরে না-উঠে বাঙালির ফন্দিবুদ্ধি এখন কয়েকটা গোয়াল সামলাচ্ছে। সেই গোয়ালগুলোই তাদের স্কুল-কলেজ—চাঁদা তুলে দুর্গোপুজো, কালীবাড়ি, জমিদারি, লগ্নীর কারবার—এই আর-কি।'

প্রভাসবাবু চুরুটটা মুখে দেবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু সিদ্ধার্থের কথা শুনে ভুলে গেলেন চুরুটের কথা। মাড়োয়ারি ভাটিয়াদের মত ফন্দি স্কুল-কলেজে? ভাবতে-ভাবতে চুরুট নিভে গেল তাঁর। বলতে-বলতে আবার বললেন, 'তুমি কলকাতার কলেজগুলোর কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, মোটামুটি দু-চারটে অবিশ্যি ভাল কুলীন কলেজ থাকতে পারে, মিশনারিদের কলেজ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জানাশোনা নেই।'

'মফস্বলের কলেজগুলোও এই রকম?'

গোটা লবঙ্গ আস্তে-আস্তে দাঁত দিয়ে কাটছিল সিদ্ধার্থ, লবঙ্গের ঝাল ও সুগন্ধ জিভে-মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল তার, রমা সেলাইটা ফেলে রেখো সিদ্ধার্থের দিকে তাকিয়েছিল, প্রভাসবাবুর দিকে চোখ চেয়ে সিদ্ধার্থ বললে—'কোন বিষয়ে বলছেন?'

'মাইনে দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে'

'অনেক মফস্বল কলেজই ফান্ড কম, নিরুপায়তা আছে কিছু—নানারকম বিশৃঙ্খলা রয়েছে। কিন্তু মাস্টারদের ভেতর টাকাকড়ির বিলিব্যবস্থার ব্যাপারে কলকাতার সঙ্গে টেক্কা দেয়ার সাধ্য এদের নেই।'

'আরো কয়েক জন্ম বুঝি শিখতে হবে।' রমা বললে।

'শিখুক—সিদ্ধার্থ বললে; 'কিন্তু কলকাতার মত ঘোড়েল কলকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ হতেও পারবে না কোনোদিন।'

'তুমি কলকাতা-বিদ্বেষী।'

'আমি ভালবাসি শহরটাকে।'

'বাসমতী খারাপ লাগে তোমার?'

'না।'

'কাকে বেশি ভাল লাগে?'

লবঙ্গের ঝাল আস্বাদে মুখের ভেতরটা স্নিগ্ধ হয়ে আছে, মেহেদির ঘন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ বললে, 'প্রাণের দিক দিয়ে বাসমতীকেই বেশি—কিন্তু—'

প্রভাসবাবুর চুরুট নিভে গিয়েছে, পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালিয়ে নেবেন কিনা ভাবছিলেন। রমা থুতনির ওপর হাত রেখে দক্ষিণের জানালার দিকে তাকিয়েছিল, বার্থেলোদের যাওয়া-আসা উত্তর-পুবের জানালার দিকে না তাকালে দেখা যায় না। রমার চোখ ছিল না সেদিকে। একটা মিশন আছে? সাহেব আছে?—ভুলে গিয়েছিল সে।

'জীবনের কয়েকটা দিক দিয়ে খুব আশ্চর্য একাগ্রতা আছে—কলকাতায়, কয়েকজন মানুষের। সে জিনিসের সংস্পর্শে থাকা দরকার।' সিদ্ধার্থ বললে।

'তুমি কি ইউনিভার্সিটির কথা বলছ?' প্রভাসবাবু বললেন।

'তুমি শ্রেষ্ঠ লোকদের কথা বলছ আমার মনে হয়—রাইটার্স বিল্ডিঙের।' আস্তে-আস্তে বললে রমা!

'তুমি কি ইউনিভার্সিটির'—প্রভাসবাবু আবার শুরু করলেন।

'না। ইউনিভার্সিটির কথা আমি বলিনি—'

'তবে তুমি নিশ্চয়ই কর্পোরেশনের কথা বলছ—' নিজের মুখের হাসি রমা শুষে নিতেই চোখের ভেতরে বুঝি সেটা ধরা পড়ল রমার; তাকিয়ে দেখল সিদ্ধার্থ। প্রভাসবাবু একটু বিরক্ত হয়ে ভাবছিলেন। তাঁকে কথা বলতে দিচ্ছে না সিদ্ধার্থের সঙ্গে। কথা কি তিনি বলবেন? না রমা? রমাকে ছাদের ঘরে চলে যেতে বলি—বলি করেও বলতে পারলেন না তবুও। উত্তর পুরুষের মুখপাত্রের মত দেখাচ্ছে যেন সিদ্ধার্থকে। নিজেকেই একটু খর্ব করে নিতে হবে বুড়ো মানুষের। কর্পোরেশনের কথা অনেক শুনেছেন তিনি; সেক্রেটারিয়েট তো উজ্জ্বল, ইউনিভার্সিটি আরো উজ্জ্বল; কলকাতার কলেজগুলো উজ্জ্বলতম—সিদ্ধার্থ ত বললে। কিন্তু কলকাতা ত এই-সব নিয়েই। না—সিনেমা নিয়ে?

'লায়ন্স রেঞ্জের সেই বাড়িটা সিদ্ধার্থ—'

'কোনটা?'

'ঐ যে—ঐটেই ত শেয়ার মার্কেটের হদ্দো?'

'না, সেখানে ঢুকিনি আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোনোদিনই না?'

'তুমি মনে করছ ঐটেই বুঝি হেস্টিংসের কলকাতার হারানো চাবি!' প্রভাসবাবুকে বললে রমা।

'হেরম্ববাবুর কাছে সিটি কলেজে পড়েছিলাম। এ ছাড়া কলকাতার বিশেষ কিছু জানি না আমি।' প্রভাসবাবু চোখ বুজে বললেন।

পকেট থেকে আর—একটা লবঙ্গ বের করে সিদ্ধার্থ ভাবছিল চুরুট সিগারেট নস্যি সবই ছেড়ে দিয়ে লবঙ্গের নেশায় ধরল কি তাকে?

'হাইকোর্টও কি উজ্জ্বল?'

'হাইকোর্টের হাট ভেঙে গেছে।'

'সি, আর দাসের পরে?'

'সি, আর দাসের পরেও ছিল কিছুকাল, কিন্তু এখন নেই বিশেষ কিছু।'

'কী আর আছে সিদ্ধার্থ—মাড়োয়াড়িদের গদি?'

'কলকাতার ট্রাম ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল—' রমা তার ঘন কালো আট খোপাটার ওপর হাত রেখে আস্তে একটু চাপ দিয়ে একটা চুলের কাঁটা বের করে নিয়ে বললে।

'ট্রাম শুধু? একটা শহর তার ট্রাম দিয়ে বড় হবে—এইটুকু মাত্র?' প্রভাসবাবু আহত হয়ে বললেন।

'ট্রামেরও ত স্ট্রাইক লেগে আছে প্রায়ই সিদ্ধার্থদা।

'দেখছি ত।'

'তাহলে ট্রাম নিয়ে বড়াই করাও কঠিন।' হেয়ার পিনটা আবার গুঁজে রেখে বললে রমা।

কলকাতা এখন বাংলাদেশের রাজধানী, কিন্তু প্রভাসবাবু যখন কলকাতার কলেজে পড়তেন তখন সেটা ভারতবর্ষেরও রাজধানী ছিল। কলকাতার নামডাক ছিল খুব—নানা দিক দিয়ে। কালে-কালে নাম আরো বেড়ে গিয়েছিল, মাঝে-মাঝে অফিসের কাজে দু-এক দিনের জন্য গিয়েছেন কিন্তু ভালভাবে দেখবার মতন করে অনেকদিন কলকাতায় যাওয়া হয়নি তাঁর, কিন্তু অনেকটা কাছেই এত বড় একটা নগরী রয়েছে—এত নাম তার—এ নামের সঙ্গে বাংলাভাষীদের পিতৃপিতামহাপুরুষদের নাম জড়ানো ভেবে ভালই লাগত। সেই কলকাতা এই রকম হয়ে গেছে? তার গৌরব এখন ট্রামের খেলনায় গিয়ে ঠেকেছে? কলকাতায় যখন ঘোড়ার ট্রাম ছিল, তখন মানুষ মহত্তর ছিল—ভাবছিলেন প্রভাসবাবু।

'তুমি, হেস্টিংসের কলকাতার কথা বলছিলে রমা?'

'হ্যাঁ। হেস্টিংস হাউসটা রয়েছে হয় তো এখনো?'

'আপনি দেখেছিলেন বাড়িটা?' সিদ্ধার্থ বললে।'

'সে অনেক আগের কথা।'

'ভেতরে ঢুকে দেখেছিলেন?'

'কম্পাউন্ডে গিয়েছিলাম, বাড়ির ভেতরে মাড়াতে দেয়নি। পরোয়ানা পাইনি। তখন ত পুরোদমে ব্রিটিশ আমল চলছে।'

'হেস্টিংস হাউস নিয়ে অনেক ভূতের গল্প আছে।' রমা বললে।

'আছে।'

'দু-চারটে বলো ত।'

'আমি একটা জানি', রমা শুরু করলে, 'তুমি যা জান আগে বলে নাও সিদ্ধার্থদা।'

প্রভাসবাবু বললেন, 'সিদ্ধার্থ ত তোমার মাস্টার রমা। মনে হচ্ছে তুমি যেন তার সমানে-সমানে চলেছ। তা চলো, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাকে তুমি ওভাবে শুধোচ্ছ কি হিসেবে?' প্রভাসবাবু চুরুট জ্বালাবার জন্যে দেশলাইয়ের কাঠি বার করলেন, দু-এক বারের ঘষায় কাঠি জ্বলল না, বাক্সে আছে মাত্র দু'টো কাঠি।

'তোমার বয়স কত সিদ্ধার্থ?

'চিরদিনই ত এই বয়স ছিল না।' রমা বললে।

'সাত বছর আগের কথা মনে করো বাবা।'

'তার মানে?'

'তুমি যখন তিনপাগ্গা অফিস থেকে বদলি হয়ে প্রথম বাসমতীতে এলে।'

'কী হয়েছিল তখন?'

'বাসমতীতে এসে রায়মল্ল মিস্তিরের বাড়িতেই ত উঠলে তুমি।'

'হ্যাঁ, তিনপাগ্গা থেকে প্রথম দিনই এ-বাড়িতে উঠেছিলাম; সাত বছর পাঁচ মাস এগারো দিন আগের কথা। মিস্তিরের সঙ্গে আমার চিঠি লেখালেখি হয়েছিল তিনপাগ্গা থেকে। এ বাড়িটা খালিই পড়েছিল—একটু ঝেড়েপুঁছে রাখিয়েছিলেন; স্টেশনে লোক পাঠিয়ে আমাদের এখানে মোতায়েন করে দিয়েই সটকে পড়লেন তিনি—তিনি চলে গেলেন বটে, কিন্তু প্রফেসর সেনকে পাঠিয়ে দিলেন, মনে আছে তোমার?'

চুরুটের দিকে তাকিয়ে কাঠির দিকে মন গেল। দু'টো মাত্র কাঠি আছে দেশলাইয়ের বাক্সে, বাক্সের বারুদের জায়গাটা চটে গেছে, ছিঁড়েও গেছে জায়গায়-জায়গায়, আরো দু-তিনবার ঘষে টের পেলেন হাতের কাঠির বারুদ ঝরে গেছে।

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'তখন ঘোর-ঘোর হয়ে গেছে, ঘরে বাতি নেই, চাঁদের বাতি এসে পড়েছে, প্রফেসর সেন ঘরে ঢুকতেই তুমি বললে, 'মিস্তির মশাই বুঝি পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমাকে? তুমি ছেলে মানুষ পারবে সব?' মাস্টারমশাই হেসে বলেছিলেন, সব পারব না, তবে আপনার আজ যাতে খেতে শুতে পারেন সেটা দেখছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও সে-সব কথা—'ডেক চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে একটা নতুন দেশলাই পেড়ে এনে প্রভাসবাবু বললেন; 'হ্যাঁ, ছেলেমানুষ মনে হয়েছিল ওকে, বেশ লম্বা মানানসই ছিল বটে, কিন্তু ভেবেছিলাম কলেজে পড়ে বুঝি।'

'সিদ্ধার্থ! 'চেয়ারে এসে বসে প্রভাসবাবু বললেন, 'সাত বছরে তুমি বদলে গেছ ঢের—'

'মানুষ আরো ঢের বদলায়, আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি শুধু।'

'বুড়ো না। বড় হয়ে গেছ।' রমা বললে।

'সেদিন তুমি আমাকে কেন বললে সিদ্ধার্থ, যে তোমার কুড়ি বছর বয়স?' প্রভাসবাবু দেশলাইয়ের বাক্সটা খুলতে-খুলতে বললেন।

রমা তার বাবাকে বললে, 'তুমি বারবার যাচাই করেও টের পেলে না কেন সাঁইত্রিশ? মাস্টারমশাই ত রাত বারটা অব্দি পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে কাজ করছিলেন।'

নতুন দেশলাইয়ে ফস করে আগুন জ্বলে উঠল। এত সহজে আগুন জ্বললে এখুনি চুরুট জ্বালাবার কোনো দরকার নেই। বাক্সভরা কাঠি রয়েছে। তাকিয়ে দেখলেন প্রভাসবাবু।

'তুমি টের পেয়েছিলে ওর সাঁইত্রিশ?' প্রভাসবাবু রমাকে জিজ্ঞেস করলেন। দেশলাইয়ের কাঠির আগুন জ্বলে জ্বলে নিভে গেল প্রভাসবাবুর হাতে।

'মানুষের বয়স নিয়ে অনেক হয়েছে, যেন অঙ্কের কেলাসের ঘণ্টা পড়ল', রমা সুতোঅলা ছুঁচটা কুড়িয়ে নিয়ে জামার ভেতর ফুঁড়ে রেখে দিল, এখন আর সেলাই করবে না সে।

নতুন দেশলাইয়ের বাক্সের দ্বিতীয় কাঠিটা জ্বালালেন প্রভাসবাবু, এইবারে চুরুটটা জ্বালিয়ে নিতে হবে, কাঠিটা টিকল অনেকক্ষণ, বেশ ভাল করে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আগুনে গনগন করে নেয়া গেল চুরুটের মুখটা।

'তুমি বার্থেলোকে কী বলে ডাক?' প্রভাসবাবু বললেন রমাকে।

'বার্থেলো কে?' সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল।

'একজন মিশনারি সাহেব।'

'ফরাসি মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ফরাসি।' রমা সিদ্ধার্থের দিকে তাকিয়ে বললে।

'অক্সফোর্ড মিশনের?'

'না, উনি ক্যানেডার ফারসি। এখানে ক্যানেডার মিশনের কাজে এসেছেন ওরা কয়েকজন। আমি বার্থেলোকে বার্থেলো সাহেব ডাকি, কিম্বা মিস্টার বার্থেলো; উনি ফরাসি হলেও ওকে মঁসিয়ে ডাকি না।'

প্রভাসবাবু চুরুট কয়েকবার টান মেরে নিয়ে বললেন, 'সিদ্ধার্থের বেলাও একটা এটিকেটের কথা বলছিলাম আমি; তোমরা সামাজের বীজ— সেখানে কী আদবকায়দা চলে তোমাদের—জানতে চেয়েছিলাম। সমাজের বাইরে এসে নিজেদের পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে কী বলে ডাকে সেটা তাদের ব্যক্তিগত বিচার বাসনার জিনিস।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাহলে অনেক ঘুরপাক খেয়ে মহাভারতের কথা এতক্ষণে ফুরিয়ে গিয়েছে তোমার বলো। আমি যখন ফ্রক পরে স্কুলে পড়তাম তখন যে ভদ্রলোককে 'দাদা ডাকতে শুরু করেছি—তার কলেজের ক্লাসে পা দিয়ে 'স্যার' ডাকতে বাঁধছে কেন আমার বার করতে গিয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল আমাদের—হেস্টিংস হাউসের গল্পটাও মাঝপথে মারা গেল—'

'গল্পটা জিইয়ে তোলো—'

'একটা গল্প নয়—'

'একে একে বলতে থাকো।'

'থমথমে নিশুতি রাত ছাড়া ও-সব গল্প জমবে না।'

'কিন্তু অতটা রাত অবদি তুমি কি আমাদের বাড়িতে থাকবে সিদ্ধার্থ?'

'আজ না—আর-একদিন।

'কেন? আজ কী হল'

'আজ কলেজ ইউনিয়নের একটা মিটিং আছে—প্রফেসরদের।'

'কখন?'

'সন্ধ্যের সময়।'

'ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন বুঝি?'

'আসবেন অনেকেই।' সিদ্ধার্থ কথা বলতে-বলতে রমার দিকে তাকাতেই দেখল সে তার ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সিদ্ধার্থের দিকে, হাতে কয়েক টুকরো দারচিনি আর ছোট এলাচির দানা। কুড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধার্থ বললে, 'যাব না ভেবেছিলাম। কিন্তু পর-পর তিনটে ইউনিয়নের মিটিঙে যাই নি।'

'এ-সব মিটিঙে না গেলে তোমার চাকরি যাবে?'

'মফস্বলে অত সহজে যাবে না, কলকাতার মত গলকাটা হাতসাফাই নেই এখানে, তবে কথাবার্তা হবে ক্লিকের ভেতর। কিন্তু সেজন্যে আমার ভাবনা নেই। এই দারচিনি কোথায় পেলে রমা?'

'বাসমতীতে এ জিনিস পাবে না তুমি।'

'চারমাস আগে কলকাতায় গিয়েছিলাম আমি। আমি অনেক ঘুরে দেখেছি—এরকম দারচিনি কোথাও পাই নি ত।'

'সিদ্ধার্থ যে দারচিনি ভালোবাসে তা তুমি কি করে বুঝলে রমা?'

'প্রায়, দারচিনিই ত কাঠ', রমা বললে, 'জারুল কাঠের ছিবড়ে, সিদ্ধার্থদা মাঝে-মাঝে আমাকে বলেছে ছেলেবেলায় কখনো-কখনো আসল দারচিনি মিলেছে, তারপর ত্রিশ বছরের মধ্যে আর পায় নি। যেটা দিলুম কেমন লাগছে তোমার?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সিদ্ধার্থ দারচিনির টুকরোগুলো পকেটে রেখে দিয়ে বললে, 'একটা নেশা ধরিয়ে দিলে আর-কি, পান পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু কোথায় এ দারচিনি পেলে রমা? চুরুট নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন প্রভাসবাবু।

'বার্থেলো সেদিন দিল আমাকে।'

'ও—' চুরুটটা মুখের দিকে আস্তে-আস্তে তুলে নিলেন প্রভাসবাবু, কিন্তু মুখে দিলেন না।

'ক্যানেডার সাহেব—' সিদ্ধার্থ তিন-চারটে এলাচির দানা বেছে দাঁতে মেড়ে নিয়ে বললে 'ওরা আমেরিকানদের সামিল, অনেক ভেলকি জানে।'

'আমি রেখে দিয়েছি তোমার জন্যে?' সিদ্ধার্থকে বললে রমা।

'কী?'

'দারচিনি।'

'ঢের।'

'ক্লিকের ভেতর কথাবার্তা হবে—' রমা বললে, 'সে-জন্য তোমার ভাবনা নেই?

'না।'

'কটা ক্লিক প্রফেসারদের মধ্যে?'

'আছে তিন-চারটে।

'তামার নিজের ক্লিক নেই?

'অন্যদের ক্লিক ভাঙতে চাই ত আমি।'

'কিন্তু মনে-মনে ভেঙে শেষ করে দিচ্ছ। কাজে কী করছ?'

সিদ্ধার্থ হাতের দারচিনির বড় টুকরোটা টোকা মেরে শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে বললে, 'তাহলে নিজের দল গড়তে হয়, আমার ধাতে তা পোষায় না।'

'তা ত দেখছিই।' রমা বাঁ-হাতের কাচের চুড়ির ওপর ডান হাতের তর্জনি দিয়ে আস্তে-আস্তে ঘা দিচ্ছিল, চোখ তুলে বললে, 'আছে ত কতগুলো পকেটের ভেতর।'

'আছে বটে', একটু দমে গিয়ে রমা বললে, 'কিন্তু হয় তো এ বাড়ির থেকে নেমেই পথে ফেলে দেবে।'

'তোমাকে চুরুট দেব সিদ্ধার্থ?' জিজ্ঞেস করলেন প্রভাসবাবু।

সিদ্ধার্থ তাকিয়ে দেখল রমার মুখে বিমর্ষতা ঠিক নয়, কেমন একটা চিন্তা যেন নিজের বয়ঃপ্রাপ্তিলোকে পৌঁছে গিয়ে মানুষের সীমা দেখতে চেয়ে পেরিয়ে গিয়ে সময়ের সীমা দেখে ফেলে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছি।

'তুমি চুরুট খাবে সিদ্ধার্থ?'

'চুরুট? না—এখন না।'

'কখন তাহলে?'

'রাতে, ঘুমের আগে।'

'সিদ্ধার্থের কোনো নেশা নেই রমা।'

রমা চিন্তার কুণ্ডলীর নিস্তব্ধতা ভেঙে বললে, 'ইউনিয়নের মিটিঙে যাচ্ছ তাহলে তুমি। যাওয়াটাই ঠিক, সরে থাকাটা খারাপ হবে। পরের কাজ করছ, বেশি ব্যক্তিস্বাধীনতা ভাল নয়।'

'তাতে বুদ্ধির স্বাধীনতা নষ্ট হয় বুঝি? তোমার তা হয়নি। দেখছি ত।'

'রমার বুদ্ধি?' প্রভাসবাবু বললেন, 'ভেবে হিসেব করে কথা বলতে জানে।'

'আমি দেখেছি প্রিন্সিপ্যাল আর শাঁসালো প্রফেসাররা ডিসিপ্লিনের কাঙাল, সব সময়ই তাঁরা চান এ-সব মিটিঙে সব প্রফেসাররাই যোগ দিক। যাব আমি, হোক ওদের ডিসিপ্লিন চরিতার্থ।'

'তোহলে কোমর বেঁধে যাচ্ছ আজ?'

'মনটা ঝুঁকেছে খানিক।'

'ক্লিকগুলোর জন্যেও বেশ টান আছে তোমার।' রমা হাসতে-হাসতে বললে,

'উঠি।'

'কেন?'

'চা করব।'

'না, আজ চা খাব না।'

'ও-ইউনিয়নে এক টি-পট খেতে হবে তোমাকে?'

'এক টি-পট কফিও খেতে হতে পারে।'

প্রভাসবাবু কথা বলছিলেন না, নিজের জীবনের ধান্দা নিয়ে ভাবছিলেন হয় তো, ওরা ভুলে গিয়েছিল যে তিনি আছেন।

'এক টি-পট কফি মাথা পিছু?' একটু ডাক পেড়ে বললেন তিনি এতক্ষণ চুপ করে থাকবার পর, 'তোমাদের ইউনিয়নের তেল বেড়েছে দেখছি।'

'কোথায় কফি" তুমি স্বপ্ন দেখছ?'

'আমাদের সময়ে প্রফেসরদের ইউনিয়ন—ফিউনিয়ন ছিল না, সিটি কলেজের হেরম্ববাবু—'

'ও-সব পছন্দ করতেন না?' সিদ্ধার্থ বললে।

'খ্যাঁট ভালবাসতেন না বুঝি তিনি?' প্রভাসবাবুকে জিজ্ঞেস করল রমা।

'গোলদিঘির পাড়ে মির্জাপুরের ঐ আলমারির মত বাড়িটায় কলেজ বসত তখন, বাড়িটা আছে সিদ্ধার্থ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আছে?'

'কলেজ ত আমহার্স্ট স্ট্রিটে গিয়েছে শুনেছি।'

'হ্যাঁ, অনেকদিন।'

'মির্জাপুরের ও-বাড়িটা কাদের এখন? মাড়োয়াড়ির?'

'না, ওখানে কমার্স ক্লাস বসে।'

'কর্মাস? মাড়োয়ারিদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে? সেটা কি ক্লাসে গিয়ে লিখে পড়ে এলেম হবে?'

'কাঁচা মাল নিয়ে' সিদ্ধার্থ বললে, 'কমার্স জমছে বেশ, ফেঁপে উঠছে।'

'হুঁ?'

'আমি ছেলেদের নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ফেঁপে ওঠার কথা বলছি না। ছেলেরা ত আখের ক্ষেত আজকাল, কার ক্ষেত কত বড় সেই নিয়ে চিনির কারবারগুলোর রেশারেশি।'

প্রভাসবাবু বললেন, 'ও? এ-সব চিনি আর জিরেন কাট রসের কারবার চলেছে বুঝি? আমি কলকাতায় যাই মাঝে-মাঝে। কিন্তু দু-এক দিনের বেশি থাকি না, শেয়ালদার একটা মেসে অফিসের কাজ নিয়ে ঘাড় গুঁজে থাকতে হয়, ট্রামে চড়ে হেডঅফিসে গিয়ে জবানবন্দি। ওকি কলকাতায় থাকা!'

'কলকাতায় ভালও লাগবে না আপনার।'

'কী করে লাগাব? ট্যাঁকে জামবাটির মতন ঘড়ি নিয়ে ঘুরি। ও অনেক মিহি চেক ওড়াতে হয় কলকাতার রস পেতে হলে।'

জমেছিল এসে বুকের কোনো জায়গায় নিঃশ্বাসটাকে আস্তে-আস্তে বার করে দিয়ে প্রভাসবাবু বললেন,—'কলকাতায় অনেক চেনা লোক আছে, কিন্তু দেখা হয় না কারো সঙ্গে।'

চুরুটের ছাইয়ে ছুঁই-কি-না ছুঁই একটা টোকা মেরে প্রভাসবাবু বললেন, 'তাদের ভেতর মহিলাও দু-চারজন আছেন।'

'কী করে তাদের সঙ্গে দেখা হবে শেয়ালদার মেসে পড়ে থাকলে?' রমা একটা উড়ন্ত কুমড়ো পোকার—কুমড়ো পোকাই ত—ওড়াওড়ি ও জীবনের মধুর ছটফটানির দিকে তাকিয়ে বললে।

'তাদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে দেখা করা?'

'তোমাকে মেসে এসে তারা দেখা দেবে?'

অফিস গলায় ঝুলিয়ে কলকাতায় গিয়ে ফুরসতই পাই না। কোনদিক দিয়ে কোত্থেকে যে সময় চলে যায়!'

'সময়ের কানমলাটাই ভাল।' রমা কুমড়ো পোকাটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে বললে, 'না হলে—'

'না হলে?'

'না হলে কী হয় বলে দাও সিদ্ধার্থদা।'

'আমি উঠি।' সিদ্ধার্থ বললে, 'ইউনিয়নের মিটিঙে—'

'ইউনিয়নের ভোজ ত তোমাদের সন্ধ্যের সময়, এখন ত মোটে চারটে।'

বলে কুমড়ো পোকাটা ফিরে এসেছে তাকিয়ে দেখল রমা।

'খুব আলতো টোকা মারলেও চুরুটের মুখের ছাই ঝরে যায়, এমনই ভঙ্গুর জিনিস চুরুট, মানুষের জীবন-ছাই-এর গ্রন্থি; মানুষের কথা কাজ সংকল্প—ভাবতে-ভাবতে তবুও হঠাৎ সংকল্পে বলীয়ান হয়ে উঠে প্রভাসবাবু বললেন,

'এইবারে যাব।'

কিন্তু কোথায় যাবে জিজ্ঞেস করল না কেউ। ইউনিয়নের মিটিঙে দু-চারটে মনের কথা প্রেসিডেন্টকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলবে নাকি ভাবছিল সিদ্ধার্থ, বলে কী লাভ? কিছু হবে না, কিন্তু তবুও বলা দরকার, ওপরওয়ালাদের উপলব্ধিটাকে আয়ত করে তোলবার প্রয়াস ভাল; কিন্তু তবুও এ যেন রবারের ফিতে ধরে টানা, টানাটানি ছেড়ে দিলেই নিজের নিরেট সঙ্কোচনে ফিরে যাবে ফিতেটা। রমা হস্টেলে যাবে কিনা ভাবছিল। কড়াকড়ির ভেতর নানারকম সচ্ছলতা থাকবে না বটে তার, কিন্তু নানারকম দীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে মানুষের ভবিষ্যৎ, আজও স্বাধীনতা মোটেই অবাধ নয় তার, কিন্তু সেটাকে আরো অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করে দিলে গলানো ধাতুর মতন (সোনা বা লোহাই হোক না কেন) নমনীয়তায় সার্থক হয়ে উঠতে পারে যদি সে-তবেই পথ খুলে যাবে ভবিষ্যতের প্রাণ শিল্পের, জ্ঞানশিল্পের, চেতনা-শিল্পের—মানুষের জীবনের খাঁটি পরিণতি শিল্পের।

'হ্যাঁ, যাব এইবার।'

'কোথায়?'

'কলকাতায় ওদের সঙ্গে দেখা করতে।' প্রভাসবাবু বললেন।

'ও—' রমা বোর্ডিঙেই থাকবে মনস্থির করে চিন্তার ভেতর থেকে উঠে এসে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বললে, 'যাবে এইবারে কলকাতায়? দিদি-জামাইবাবুদের সঙ্গে দেখা করতে?'

'তা ত আছেই—' প্রভাসবাবু এই মোটা কথাটাকে বেশি আমল না দিয়ে বললেন, 'আরো অনেকের সঙ্গে দেখা করব ভাবছি।'

এই রকমই দেখা করে আসছেন অনেক দিন থেকে। কলকাতায়ও ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে প্রায়ই। মানুষের সাধ অনেক, সংকল্প কম না, কিন্তু সিদ্ধির কথা বলে কী আর লাভ। বাসমতীতেই একটানা পেনশন নেয়া অবদি থাকতে হবে ভদ্রলোককে, তারপর থাকতে হবে পেনশন নিয়ে। তবে তিনপাঞ্জায় না মরে বাসমতীতে যে মরতে হবে এইটেই লাভ। হয়ত কলকাতায় বালিগঞ্জে-ভবানীপুরে না মরে বাসমতীতে যে-মরা, তাতেও লাভ, হ্যাঁ লাভ খুব। সিসু গাছে বাতাস উড়ছে মহানিমের শাখায় একটা বাজপাখি এসে বসেছে, জিরাফের মাথায় জিরাফ দাঁড়িয়ে আছে যেন, উঁচু-উঁচু ঝাউগাছগুলোর দিকে তাকালে মনে হয়। ঝাউদের ডালপালার ফাঁক দিয়ে বেশি আকাশ দেখা যায়;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপরের ডালগুলোর ফাঁক দিয়ে ওপরের আকাশ বিকেলের দিকের রোদ্দুর, সাদা পাঁশুটে, ধোয়া সাজ্জিমাটিরমত মেঘ, সাদাই বেশি, সূর্যের বুকের ওপরে বড়-বড় সাদা শান্তি ও নিস্তব্ধতার মতন উজ্জ্বল—ভাবছিল, দেখছিল রমা।

'সিদ্ধার্থ।'

'আজ্ঞে?'

'কলকাতা একটা কসমোপলিটান শহর আজকাল।'

ঘুরে ফিরে আবার সেই কলকাতার কথা?—রমা খানিকটা বীতশ্রদ্ধ অথচ শান্তভাবে প্রভাসবাবুর দিকে তাকাল। যারা বেড়াতে, ব্যবসা করতে, ছুটি কাটাতে এসে মাঝে-মাঝে বাসমতীতে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যায়, কলকাতার অলিগলির সে-সব উঠতি বাঙালিদের কথাবার্তা শুনে-শুনে কান পচে গেছে রমার। ইনি বুড়ো মানুষ, তাদের চেয়ে ঢের আলাদা, প্রাণের অন্যরকম টানে কলকাতার জন্যে এর পড়ন্ত বয়সে কেমন একটা প্রীতি বুঝি জন্মেছে, তা চাগিয়ে ওঠে থেকে-থেকে, কিন্তু মনে-প্রাণে-ভবিতব্যতায় ইনি যে বাসমতীর সে সম্বন্ধে এঁর চেতনা পরিষ্কার ও প্রসন্ন হতে পারলে...কিন্তু সে প্রসন্নতা লাভ করা সহজ নয়, বাবার আমার, এমন-কি সিদ্ধার্থদারও।

প্রভাসবাবুর নাকের ডগা রুমালে চেপে রেখেছেন তিনি। হাঁচি দেবেন হয় তো, সেদিকে তাকিয়ে রমা বললে, 'কলকাতাকে ত বার ভূতে বার জাতে লুটে খাচ্ছে, কোনো-কোনো বাঙালি বলে এটা বাঙালির হৃদয়ের পরিচয়। হৃদয় বা বুদ্ধি কোনো কিছুরই পরিচয় নয়। পৃথিবীরই হৃদয়বান হতে ঢের দেরি, কলকাতার বাঙালি কী করে তা হবে। তবে বাঙালির চেয়ে অন্য জাতদের কাণ্ডজ্ঞান বেশি। দেশ স্বাধীন হলে কলকাতা কোন এলাকায় চলে যায় কে বলবে?

'ও—তুমি ভেবেছ পাকিস্তানে যাবে?' প্রভাসবাবু এতক্ষণে হাঁচিটা খালাস করে ফেলে বললেন।

'বাসমতী ত পাকিস্তানে পড়বে'

'কিন্তু কলকাতাও?'

তারপর ক্রমাগত হাঁচতে লাগলেন তিনি।

'বাঁধা পড়েছে রমা,' সিদ্ধার্থ বললে, 'কলকাতা পাকিস্তানে যাচ্ছে না।'

'তাহলে দিল্লি-পাটনা গোটা হিন্দি হিন্দুস্তান ওটাকে বগলদাবা করবে,' রমা বললে 'এখনই ত করেছে।'

'বাঙালিও একদিন গোটা হিন্দুস্তান চরে বেড়িয়েছে।'

'হ্যাঁ, কলকাতা এথেন্সের মত হয়ে উঠেছিল প্রায়,' রমা বললে, 'কিন্তু এথেন্সের চেয়ে ঢের নিচে রইল, এখন ত পড়ে যাচ্ছে, আর-কোনো সম্ভাবনা নেই।'

মাথা নেড়ে সিদ্ধার্থ বললে, 'আঠার-উনিশ-বিশ শতক যোগ দিলে এথেন্সের চেয়ে কম নয়।'

রমা গালে কপালে লেখনের মত দু-তিনটে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'অনেক বড় বাঙালি কাজ করে গেছেন বটে কলকাতায়, বাংলায়, কিন্তু এথেন্স খুব নিটোল ছিল।'

'গ্রীসকে খুব ভালবাস তুমি,' সিদ্ধার্থ বললে, 'এই বয়সে গ্রীসকেই, আমাদের ব্রিটিশ শিক্ষাবিধানে থেকে তবুও সত্যিই মানুষ হচ্ছে যারা—ভাল লাগবে তাদের। আমারও লেগেছিল!'

সিদ্ধার্থ বললে, 'তুমি গ্রীক দেবী ছিলে—মাঝে-মাঝে মনে হয় না তোমার?'

'নিজেকে মাঝে-মাঝে ডায়োনিসিয়াস মনে হয়েছে তোমার?'

'আমি তোমাকে জলদেবী বিটপীদেবী বলেছি কে বললে তোমাকে?'

'কী বলেছে—আর্টিমিস?'

'না—এথেনা।'

'এথেন্সের কথা বলেছি বলে?' রমা সিদ্ধার্থের শার্টের বোতামের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এথেনাকে আমার আরাধ্যা মনে করে ভুল বুঝেছ তুমি।'

'ফজলুল হক বলেছিলেন—' প্রভাসবাবু দাঁতে চুরুট আটকে রেখে বললেন, কিন্তু কাশি এসে পড়ল তাঁর, কথাটা শেষ করতে পারলেন না তিনি, চুরুট টানাও থেমে রইল কিছুক্ষণ।

'মানুষের মধ্যে না হোক, প্রকৃতির ভেতর যে ডায়েনিসিয়াস রয়েছে তাকে জানি আমি, উনি চিনতে পারেন নি।'

'ডায়েনিসিয়াস?' সিদ্ধার্থ লেবু মেহেদি বনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেন প্লেটোর কথা বলছ না কেন?'

'প্লেটোকে', রমা সেই কুমড়ো পোকটাকে আবার উড়ে আসতে দেখে একটু হেসে বললে, 'মার্কস এসে সরিয়ে দেয়, কিন্তু ডায়োনিসিয়াস টিকে থাকে।'

'প্লেটোকে সরানো কঠিন, আমাদের লাইব্রেরিতে গ্রীক সাহিত্যের ওপর কোনো নতুন বই এসেছে?'

'কই দেখি নি ত!'

'গ্রীক দর্শনের ওপর?'

'বলতে পারি না। কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'একটু নেড়েচেড়ে দেখতে হবে, গল্পচ্ছলে অনেক সত্য আছে। আমাদের মহাভারতে এ্যায়োনিসিয়াস কে?'

'নেই। শ্রীকৃষ্ণ অন্যরকম।'

'আমার মনে হয় আদিম নাদ যখন মানুষের প্রয়োজনের দিক দিয়ে অনেকটা শুদ্ধ হয়ে এসেছে, তখনই সেফোক্রেস ইসকাইলাস বই লিখেছিলেন, উপনিষদও তৈরি হয়েছিল, উপনিষদের নিবিড় শ্লোকগুলো ডায়োনিসিয়াসের মতন।' শুনে রমা সিদ্ধার্থের মুখের দিকে তাকাল, ভাবছিল, ধরতে পারে নি, কিংবা আমার কাছে ধরা দেবে না, হয় তো ইউনিয়নের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত, বাবা এত কাছে আছেন বলে প্রতীকে কথা বলছি আমি, পরিভাষায় উত্তর দিতে গিয়ে ডায়োনিসিয়াস আর উপনিষদে এ-রকম ভাবে জট পাকিয়ে ঘুলিয়ে ফেলল কেন, ওর মত বয়স হলে আমিও ওরই মতন টসকে যাব হয় তো, অনেকটা এই রকম পরিস্থিতির ভেতর আফ্রোদিতের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠল, মীরাবাঈয়ের কথা পাড়ব? কে জানে, নিজের অপ্রাপ্তবয়সের পৃথিবীতে এখনো রয়েছে তাহলে বুঝি রমা, সিদ্ধার্থদার অভিজ্ঞতা ও বয়সের সঙ্গে সেতু বেঁধেছে মনে ভেবেছে, কিন্তু তবুও বাঁধতে পারেনি?

'রমা—' সিদ্ধার্থ বললে।

প্রভাসবাবু—রমার বাবার দিকে তাকিয়ে বললে সিদ্ধার্থ।

'তুমি আমাকে ডাকছিলে না?'

'একটা চুরুট দিন আমাকে।'

'তুমি আমাকে কী বলতে যাচ্ছিলে সিদ্ধার্থদা?'

'তোমার কাছে লুক্রেসিয়াস আছে?'

'এই যে চুরুট সিদ্ধার্থ।'

'না, ওর বই কলকাতায়ও পাওয়া দুষ্কর।'

'ঠিক জান আমাদের লাইব্রেরিতে নেই?'

'কলকাতায় ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে পেতে পার। তুমি ত ইউনিভার্সিটির রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট?'

'না। কিছু হই নি, কিছু করি নি।' সিদ্ধার্থ বললে, 'কিন্তু গলার ভেতর তার অনুতাপের বিমর্ষতা নেই, সংসার বয়স ও পরিবারের চাপ খেয়ে প্রতি মুহূর্তেই কেমন পুরুষের মত মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে যেন আবার, অনেক সময় মনে হয়েছে রমার; বুক বাঁধবার আশা কিংবা সংকল্পের সবল সরলতা নেই সেনের কিন্তু কথাবার্তা আচারে স্বাভাবিকতার টনক রয়েছে।

'এক আধটা অন্তত বই লেখার দরকার ছিল আমার।' সিদ্ধার্থ বললে।

'কী ধরনের বই?'

'ছেলেপেলে পরিবারের টানা হেঁচড়ায় মফস্বলে মাস্টারি করে বই লেখার কাজে হাত দেয়া কঠিন।'

'হয়তো তাই হবে, কিংবা নাও হতে পারে, কিন্তু লেখা হচ্ছে না।'

'আস্তে-আস্তে একটার পর একটা হয়'।,

রমা বললে, 'মানুষ তারপরে এক সময়ে লিখতে আরম্ভ করে।'

'লিখব। পড়েছি অল্পসল্প। না লিখে পড়ার দিকে বেশি ঝোঁক।'

'প্রবন্ধ লিখবে না ত, কী লাভ হবে তত বেশি পড়ে? লুক্রেশিয়াস কিন্তু আমার কাছে নেই।'

'বাসমতীতে বসে কলকাতা ইউনিভার্সিটি রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হয়ে কী লাভ?'

'সিদ্ধার্থ, তুমি চুরুট জ্বালালে না ত।'

'আপনার দেশলাইটা অধিকারী মশাই?'

'সিদ্ধার্থদা, তুমি প্রবন্ধের নামে উপন্যাস লিখবে? নিজের জীবন আশ্রয় করে উপন্যাস যদি লেখ গল্পের চেয়ে মন্তব্য বেশি থাকবে তাতে?'

'তুমিও একদিন উপন্যাস লিখবে মনে হচ্ছে আমার। তাহলে কলম ধরি না আমি, অনেক ভাল লিখবে তুমি আমার চেয়ে। নিজের কথা, বাসমতীর কথা লিখলে হত, কিন্তু হল না; আমাদের তুমি জুড়ে দিও তোমার কোনো এক বইয়ে।'

'যদি লিখি, করে লিখি, জীবন কোথায় তখন গড়িয়ে গেছে কে জানে। আমার লেখার পণ্ডশ্রম নিজকে মাটি হতে দেখে বুড়ো বয়সে কষ্ট হবে তোমার। আমি তোমাকে বলছি প্রফেসর সেন এখুনি কলম ধরো। লুক্রেশিয়াস খুব ভাল জিনিস, কিন্তু তিনি নিজেদের দেশ সময়ের আওতায় বসে কথাই বলেছিলেন, তুমিও তাই বলো।'

'দেশলাই দিয়েছি ত তোমাকে অনেকক্ষণ সিদ্ধার্থ।'

'ও, আমি চুরুট জ্বালিনি!'

'ফজলুল হক বলেছিলেন' প্রভাসবাবু বললে, 'যে, কলকাতার বাড়িগুলো মুসলমান রাজমিস্ত্রিরা তৈরি করেছে, অতএব কলকাতা শহরটা মুসলমানদের।'

চুরুট জ্বালাল সিদ্ধার্থ।

'তোমাদের ত সন্ধ্যের সময় ইউনিয়নের মিটিং— এখনই উঠলে যে?'

'ইউনিয়নের ফাংশনে আমি যাব কি না ঠিক বলতে পারছি না।'

রমা মনে মনে হুঁচোট খেয়ে ধীরে শান্তভাবে তবুও বললে, 'যেও।'

'কেমন লাগছে চুরুট সিদ্ধার্থ?'

'ইউনিয়নে যেতে আমার বাধা নেই, কিন্তু দু-চারটে কথা বলব, তাতে বচসা হবার কথা;

'কার সঙ্গে?'

'যে গায়ে মাখবে তার সঙ্গে।'

'গায়ে না মেখে করবো কি, তুমি ত আলগোছে ছেনে দেবে না সিদ্ধার্থ?'

দেখি কিছু বলে কিনা,' সিদ্ধার্থ জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বার্থেলো সাহেবকে সাইকেলে চড়ে পাল্লার দিকে চলে যেতে দেখে মেহেদি ঝাউ বনের স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতার দিকে তাকিয়ে পারত পক্ষে বললে, 'বলব না কিছু কলকাতার কলেজ কর্পোরেশন এসেম্বলিতে যে মানুষ ছুঁচও চালাতে পারে নি, মফস্বলের একটা নিরীহ কলেজ নিয়ে মাথা গরম করে কী হবে আর তার।'

'সিদ্ধার্থ, তোমার চুরুট নিভে গেছে, একটা দেশলাই সঙ্গে নাও।'

'এই জ্বালিয়ে নিচ্ছি আমি, আর নিভাব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিয়নের মিটিঙে যাবার মুখে লুক্রেশিয়াসের কবিতা চেয়েছিলে কেন তুমি প্রফেসর সেন?' রমা জিজ্ঞেস করল।

'অনেক দিন থেকেই ভাবছি পড়ব, হঠাৎ মনে পড়ে গেল— মিটিঙের সঙ্গে কালতালীয় যেটা লুক্রেশিয়াসের কবিতার ওরা এ বই-এর নাম শোনেনি। দেখি যোগাড় করতে পারি কি না।'

'কার কাছ থেকে?'

'বার্থেলার থাকতে পারে। অনেক বই এনেছে বললে।'

সিদ্ধার্থ চুরুট টানছিল, দাঁতের থেকে খসিয়ে নিয়ে বলরে, 'এই বই থাকবার কথা নয়।'

'হ্যা, পাওয়া যায় না কোথাও বড় একটা, তা জানি আমি। কিন্তু বড় বাক্স করে বই এনেছে— এখনো খোলে নি।'

'খুলবে আজ-কাল?'

'এই বইটার জন্যেই খোলাব বার্থেলাকে দিয়ে। বইটা আছে আমার মনে হচ্ছে।'

লুক্রেশিয়াসের কবিতা কী রকম জানি না—' সিদ্ধার্থ আর একবার দেশলাই দিয়ে চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'কিন্তু মেয়েটির অন্বেষণ কবিতার চেয়েও গভীর।'

'সিদ্ধার্থ চলে গেছে?' প্রভাসবাবু বললেন।

'হ্যাঁ ইউনিয়নের মিটিঙে গেল।'

'তাহলে লুক্রেশিয়াস কে বল দেখি।'

'শুনলেই তো, একজন কবি।'

'কেমন লেখে?'

অনেকদিন আগের কবি; ওর খেলা আমি পড়ে দেখি নি এখনো। শুনেছি নিজের যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে লিখেছেন।'

'শেলীর মতন?'

বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে প্রভাসবাবুর দিকবিদিকের দিকে একবার তাকিয়ে একটু বিমর্শ ক্ষমামধুর হাসি মুহূর্তেই ঠোঁটের ওপর শুকিয়ে নিয়ে রমা বললে 'না। শেলী অন্যরকম। লুক্রেশিয়াস ভিন্ন জাতের। ঠিকে ঝিটা আসেনি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'চা করে আনি।'

'বাসমতরতে কফি পাওয়া যায় না?'

'হ্যাঁ, আছে বৈ কি।'

'আমি ইন্ডিয়ান স্টোরে খুঁজে দেখব।'

পরের দিন সিদ্ধার্থকে প্রত্যাশা করেছিলেন যদিও প্রভাসবাবু, অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিলেন কয়েক দিনের সারাটা দুপুর বিকেল বাড়িতেই রয়েছেন কিন্তু দশ বারো দিনের ভেতরেও এল না সিদ্ধার্থ। পায়ে একটা বাতের ব্যথা করেছিল প্রভাসবাবুর, নিজে সিদ্ধার্থের বাড়িতে যেতে পারে নি। কলেজে রমানদার ক্লাসে যেদিনই প্রফেসর সেনের ক্লাস সেদিনই একটা না একটা কারণে কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। যেদিন নেহাৎই কলেজ বসেছে সেদিনও থার্ড পিরিয়ড অবদি কলেজ হয়েছে, ফিফ্‌থ পিরিয়ডে সিদ্ধার্থ ক্লাস নেবার আগেই হয় ফুটবল, না হয় কলেজ ডিবেটিং-এর জন্য, না হয় কোনো পর্বে অথবা বিশেষ কেউ কলেজে এসেছেন বলে ক্লাস হয়নি আর।

সিদ্ধার্থের অবিশ্যি প্রভাসবাবুর বাড়ি ঘন ঘন যাবার কথা নয়— বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আড্ডা মারবে, তাস খেলবে অথবা বাসমতীর দু-চারটে বিশেষ সাগরেদি চায়ের দোকানে প্রফেসরদের সঙ্গে ঢুকে গল্প জমিয়ে কাটাবে, মফস্বলের সে জাতীয় প্রফেসর নয় সিদ্ধার্থ। জানে এ-সব রমা। প্রভাসবাবুর বাড়িতে সেদিন প্রায় সাত আট মাস পরে গিয়েছিল সেন। 'আসবে বলেই আমাদের বাড়িতে আসেনি হয়তো— অন্য কোন দিকে যেতে যেতে আমাদের বাড়িটা হয়তো পথে পড়ে গিয়েছিল—'প্রফেসর সেন তাদের বাড়িতে আসবার নাম মাত্র করছে না দেখে ভেবে ঠিক করে রেখেছিল রমা। সিদ্ধার্থের বাড়িতে গিয়ে অবিশ্যি খোঁজ নিয়ে দেখতে পায় নি; কিসের খোঁজ নেবে? খোঁজ নেবার কোনো কথা নেই। কোনোরকম কথাই নেই— কালেভদ্রে দেখা হলে তাদের মনের ভেতরে যে-সব কথা আস্তে আস্তে উদয় হয় সেই- সব সাদাসিদে মর্যাদাগুলো নিয়ে একটু নড়চড়া করা ছাড়া।

ইন্টারমিডিয়েটেই পড়বার সময় প্রফেসরদের রুমে বেশি যেত রমা, তিন চার জন মেয়ের সঙ্গে দল বেঁধে যেত- অন্য কোনো বিষয় নিয়ে নয়, এক আধটা অঙ্কের খটকা মেটাবার জন্যে। বি. এ ক্লাসে উঠে ওদের ওখানে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছে; ইংরেজিতে অনার্স নিয়েছে, নিজেই সামলাতে পারে, অন্তত মনে করেছে যে ভালই হচ্ছে, ফোর্থ ইয়ার হল তো তার' মত বদলাবার কোনো কারণ দেখছে না।

এই কয়দিনে তবুও প্রফেসরদের কামরায় গিয়েছিল একবারে ও বেশি; প্রায় তিনবার তো। শেষবার অবিশ্যি ঢুকেই বেরিয়ে এসেছে, মুখোমুখি দেখা হয়েছিল সিদ্ধার্থের সঙ্গে; হেসে এগিয়ে গিয়ে কী একটা কথা বলবে গিয়েছিল যেন সিদ্ধার্থ, লক্ষ্য না করার ভান করে সোজাসুজি হেটে গিয়ে দরজা ঠেলে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে চলে গিয়েছিল রমা। পিছে পিছে খানিকটা এসে ফিরে গেল সিদ্ধার্থ। প্রিন্সিপ্যাল একাই ছিলেন, বললেন, 'তুমি খুব হাসছ দেখছি। কী হল? এই ধর আমার টাক নেই— একটা হ্যাঁচকা টাকের কথা ভেবে হাসছ না তো রমা? প্রিন্সিপ্যাল হবার বিপদ অনেক, টাক পাকাচুল ভরিক্কে পানা, ছেলেরা একটা ছুতো পেলেই প্রিন্সিপ্যালকে এ-সবের অবতার বলে মনে করে। কিন্তু শরীর মনের দিক দিয়ে আমি ওদের চেয়ে ঢের তাজা, মেয়েরা বরং আমাকে বুঝতে পারে।'

রমা আমার প্রফেসার্স রুমের দিকে ফিরে যাবে ভাবছিল। কিন্তু কেমন যেন সৌজন্যকূট এসে নিরস্ত্র করল তাকে, কোনো কথা বললে না সে, নড়ল না, কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল।

'বোসো তুমি—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, আমি একটা কাজে এসেছিলাম।'

'বোসো বোসে নাও—'প্রিন্সিপ্যাল প্রায় তার পাশের চেয়ারে বসবার জন্য ইশারায় নির্দেশ দিল রমাকে। 'কাজ আছে, তাতে বলতে বাধা কি। বোসো।' একটু দূরে প্রিন্সিপ্যালের মুখোমুখি একটা চয়ারে বসল রমা। 'আমার এক মিনিটের কাজ—এখুনি হয়ে যাবে।'

'কি হয়েছে বলো?'

'কাজটা অবিশ্যি আমার এলেকার নয়।'

'নাই বা হল, তাতে ইতস্তত করবার কি আছে? আমি যদি কিছু করতে পারি—'

'ব্যাপারটা লাইব্রেরি নিয়ে।'

'ও-লাইব্রেরিতে ছেলেরা বড্ড গোলমাল করে?'

'না তা নয়। গোলমাল সয়ে গেছে আমাদের—'

বাধা দিয়ে মজুমদার বললেন, এটা তো সেঁকো ওষুধ নয়। খুব খারাপ কথা কলেজের দিক দিয়ে। কেন মেয়েরা বোকা বজ্জাত ছেলেগুলোর উৎপাত চোখ কান বুজে সইবে? আমি আবার নোটিশ দিয়ে দেব যেন লাইব্রেরিতে টু শব্দ না হয় আর, বিশেষত মেয়েরা যখন থাকে।

প্রিন্সিপ্যাল কাগজ টেনে লিখতে বসে কাগজটা সরিয়ে রেখে বললেন, 'টাইপিস্ট চলে গেছে ব্যাঙ্কে। ফিরে এলে ওকে ডিক্টেট করব।'

রমা উঠে যাবে ভাবছিল। কিছুই বলতে আসেনি প্রিন্সিপ্যালকে সে। তবে প্রিন্সিপ্যাল তাকে বসতে বলবার সময় একটা কথা ছ্যাঁৎ করে মনে পড়েছিল রমার, সেই কথাটা মজুমদার সাহেবকে বলবে মনে করেছিল।

কিন্তু এখন, রমা ভাবছিল, কোনো কথা না বললেও নয়; ব্যবহারের কোনো অসঙ্গতি থাকবে না তাহলে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে, তিনি ভাববেন লাইব্রেরির গোলমালের কথা জানাবার জন্যেই রমা ঢুকেছিল এ ঘরে। শেষ বিশ্লেষণে এ জিনিসটাও একটু খাপছাড়া বটে—মেয়েরা অনেকে মিলে না এসে রমা একা এল যে এ ব্যাপারটা জানাতে? কাঁচা কাজ হল; কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত মানুষ প্রিন্সিপ্যাল মজুমদার, এই-সব ছোটখাট ব্যাপারের কী হল না হল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তার নেই। তিনি মেনে নিয়েছেন যে একটা সঙ্গত কারণেই রমা ঢুকেছে তার ঘরে—টাইপিস্টকে ডিক্টেট করে নোটিশ পর্যন্ত চালু করে দেবেন জানিয়ে দিয়েছেন। প্রিন্সিপ্যালকে ঘাড় নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে ঠোঁটে হাসি টেনে নিয়ে এখন উঠে যেতে পারে সে। সেনকে এড়াবেই, এড়াতে গিয়ে পিন্সিপ্যালের ঘরে অবদি উটকো খেয়ালের চাপে ঢুকে পড়বে, এমন কোনো উদ্দেশ্য ছিল না রমার। কিন্তু মুহূর্তের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় হল তো তাই। রমা টের পেল প্রিন্সিপ্যাল তার দিকে তাকিয়ে আছেন, সে উঠতে পারছে না, মজুমদার সাহেব এত ভাল যে আচমকা মানুষটার স্থির নিখাদ দৃষ্টিসেতুর ওপর মিত্রশক্তির বোমা মেরে উঠে চলে যেতে রমার সেজন্য বাধছে।

'আমি দৃষ্টি রাখব। লাইব্রেরিতে কোনো অসুবিধা হবে না এবার থেকে আর মেয়েদের।'

'কিন্তু ছেলেরা—'

'বড্ড দুর্দান্ত?'

'আমি বলছিলাম—'

'আমার নোটিশ ওদের কাছে ঝুটো চিরকুটের মত হবে মনে হচ্ছে তোমার রমা?'

'তা কেন হবে? আমি—'

'তুমি জান না আজকালকার কলেজের ছেলেরা এক একটি কী বোমার টুকরো। তাছাড় ওদের ট্রেড ইউনিয়ন আছে। আমরা তো ছাই, কলকাতার মিনিস্টাররা পর্যন্তা হয়রান হয়ে গেল ওদের বাগে আনতে গিয়ে।'

'বাগে এনে কি আর হবে? দেশ তো স্বাধীন করে দিল—'

'কারা? এই ছেলেরা?'

'না হয় তাদের বাপের কালের ছেলেরা। গোটা স্বদেশী যুগ আর বারোআনি গান্ধিযুগ তো বাংলাদেশের কলেজের ছেলেরাই চালিয়েছে।'

'তাদের মনুষ্যত্ব এরা পায় নি।'

'আজকাল হুজুগে মেতে কেমন যেন বিতিকিচ্ছিরি হয়ে যাচ্ছে সব। দেখছি আমি। কিন্তু স্বাধীনতা পেলে ঠিক হয়ে যাবে।'

'আরো খারাপ হবে,' মজুমদার সাহেব কামানো গোঁফের ওপর দু-চারটে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'এ জেনারেশনের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। আমার ভাবনা হচ্ছে এর পরে যারা আসবে আরো খারাপ না হয়।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'স্বাধীনতা ত তারা অর্জন করবে না, কুড়িয়ে পাবে।'

নেকটাই-এর সোনার পিনে একটু চাপ দিয়ে হেসে বললেন, 'আজকালকার গোয়াল খাটালের সর্দার পোড়োরাও কুড়িয়েই পাচ্ছে; এত সব বেলেল্লাপনা যে হচ্ছে তার এও একটা কারণ।' একেবারে মিছে কথা বলেন নি প্রিন্সিপ্যাল, মনে হচ্ছিল রমার; তবে বেলেল্লাপনাদেরও নিজেদের তরফ থেকে দু-চারটে কথা বলবার আছে হয়তো।

'তুমি এ মাসের স্কলারশিপটা পেয়েছ, রমা?'

'কোনটা? গভর্নমেন্টের?'

'না, কলেজেরটা?'

'ও—' রমা তার বাঁ হাতের চুড়ির ওপর একটা টোকা দিয়ে হেসে বললে, 'ওটা আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

'প্রিন্সিপ্যাল থ হয়ে রমার মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর বললেন, 'ছেড়ে দিয়েছ মানে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'থার্ড ইয়ারে নিয়েছিলুম, ফোর্থ ইয়ারে উঠে ভাবলাম ওটা অন্য কাউকে দিয়ে দিলে হয়. আমার টাকার অভাব নেই।'

'প্রিন্সিপ্যাল বিরক্ত হয়ে বললেন, 'টাকার জন্যেই ত নয়—স্কলারশিপের অন্য মানেও আছে; তোমাকে আমি কী শেখাব? ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় এ কলেজে থেকে ছেলেমেয়েদের ভেতর যে ফার্স্ট হয় সে ওটা পাবেই। ত্রিশ বছর ধরে এ রেওয়াজ চলে আসছে—একটা বিশৃঙ্খলা হতে দেওয়া ভাল নয়। একটা খারাপ প্রিন্সিডেন্ট হবে।' টেবিলের ওপর একটা ফাইলের ফিতে খুলতে গিয়ে সেটা সরিয়ে রেখে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'স্কলারশিপ তুমি ছেড়ে দিয়েছ বললে? কী করে ছেড়ে দিলে? কার মারফতে হল? আমাকে না জানিয়ে? আমি তো প্রিন্সিপ্যাল।'

'দিন পনের আগে,' রমা বললে, 'আমি দরখাস্ত করেছি।'

'কই আমি পাই নি তো।'

'ফাইলে আছে নিশ্চয়ই।'

'দেখব আমি,' রমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'কিন্তু আমার হাতে দাও নি ত বুঝি।'

'আমি আপনার বড় কেরানিকে দিয়েছি—'

'ও রাজীবের কাছে আছে তাহলে। হয়তো ও দরখাস্তের কোনো দিসপাশ না পেয়ে ফেলে রেখেছে। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে ওরকম আর্জি এই প্রথম পেল কিনা—প্রিন্সিপ্যাল শ্রদ্ধা বিরক্তির কেমন যেন একটা ভিয়েনে তড়পে উঠে হেসে ফেলে বললেন। শ্রদ্ধা বেড়েছে ওপর মাসে পঞ্চাশ টাকাও স্কলারশিপের সম্মান মেয়েটি স্বভাবতই ত্যাগ করতে পারে বলে, কিন্তু তবুও মেয়েটি প্রথা প্রচলনের বিশুদ্ধি মানছে না বলে মনে একটা তাপ ছড়িয়ে পড়েছে প্রিন্সিপ্যালের।

'রাজীববাবুর উচিত ছিল দরখাস্তটা আপনাকে দেওয়া।'

'মাঝে-মাঝে নিজের মাথা খাটায় রাজীব।' রমা একটু আতঙ্কিত হয়ে বললে, 'খুব দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয় রাজীববাবুর, কিন্তু এটা তো ঠিক হল না। আমরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলব রাজীববাবুর ওপরই শুধু নয়—পরিচালনার ওপর, সমস্ত কলেজটার ওপর।'

'বিশ্বাস হারাতে হবে না।' প্রিন্সিপ্যাল হেসে আশ্বাস দিয়ে বললেন।

'অবিশ্যি রাজীববাবুর কোনো দোষ নেই—'

'আমি বকব না, ভয় নেই তোমার।'

'আমার দরখাস্তটার কী হবে?'

'তুমি চাও ত কমিটিতে পেশ করতে পারি।'

রমা ঘাড় একটু কাত করে সিঁথির ডান দিকে ঘন চুলে ডান হাতের কয়েকটা আঙুল ছড়িয়ে রেখে আস্তে আস্তে প্রিন্সিপ্যালকে বললে, 'আমি ভাবছিলাম আমাদের ক্লাসের সীমা চক্রবর্তী, সেকেন্ড হয়েছে, সীমা খুব ভাল মেয়ে কিন্তু বড্ড গরিব। ওকে যদি স্কলারশিপটা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়—'

'ও তো ফার্স্ট হয়নি। এ স্কলারশিপ ফার্স্ট ছাড়া আর কাউকে দিতে পারা যাবে না।'

'যে ফার্স্ট হয়েছে সে যদি দাবি ছেড়ে দেয়?'

'তাহলে বোধ হয় স্কলারশিপটা মুলতুবি থাকবে।'

'সেকেন্ডকে দেওয়া যাবে না?'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'সেটা কমিটি বিচার করে দেখতে পারে সীমা তো মেয়েদের মধ্যে সেকেন্ড হয়েছে, তাতে তো হবে না, ছেলেমেয়ে সকলকে ডিঙিয়ে ফার্স্ট হওয়া চাই। তোমার দরখাস্তটা কমিটিকে দিতে বলছ?'

'আপনি প্রিন্সিপ্যাল, আপনি নিজে কিছু করতে পারেন না?'

'ইচ্ছে করলে পারি, কিন্তু আমি তো ছিঁড়ে ফেলে দেব এ দরখাস্ত।'

'ও—' রমা ওঠবার উপক্রম করে বললে, 'তাহলে কমিটিও তাই করবে।'

প্রিন্সিপ্যাল নিরুপায়তায় একটু মুখ কাচুমাচু করবার ভান করে বললেন, 'এ ছাড়া কী আর করতে পারে বলো? আমি ত নিয়মের চাকর, ওরাও ত; নিয়মের মুনিবগিরি কমিটিতে কেউ করতে চাইলে আমাকে বাধা দিতে হবে।'

বসেছিল রমা।

'তুমি টাকা নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পার।' কামানো গালে গোঁফের উপর হাত আঙুল বুলিয়ে মুখের ওপর ঈষৎ নিঃসহায়তার কেমন একটা ভাঙাচোরা ভাঁজ এনে প্রিন্সিপ্যাল বললেন।

'ওরকম ভাবে দিলে সীমা নেবে না।'

'সীমা ছাড়া আরো তো অনেকে আছে—' আগের মতনই কেমন একটা খটকা বিরাগের ধ্বক লেগে আছে প্রিন্সিপ্যালের মুখে; 'মাসে পঞ্চাশ টাকা হাতে নিয়ে নিজের খুশিতে ভাল কাজে বিলিয়ে দিতে পারা যায়। কিন্তু সে পরামর্শ দিই না তোমাকে আমি। নিজের পড়াশোনার কাজেই লাগাও স্কলারশিপটা। এডুকেশনের কাজে লাগাবার জন্যেই রায় সাহেব অমৃত দত্ত মশাই ট্রাস্টিদের হাতে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। এ টাকা তুমি নার্সিং হোম বা বাসমতীর জেনারেল হাসপাতালের বেড অথবা ভিখিরি টিখিরিদের দিয়ে দিলে আমাদের কারোরই নৈতিক সমর্থন পাবে না। গোপনে অবিশ্যি যা খুশি তাই করা যায়। কিন্তু সেটা কি নীতি?'

'কমিটির অ্যাজেন্ডায় ঢুকিয়ে আর কী হবে তাহলে দরখাস্তটাকে?' রমা প্রিন্সিপ্যালের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের প্রকাণ্ড কাঁচের ঢাকনির পালিশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কমিটির মনের কথা টের পেলাম ত; আপনার নিজের মতামতও জানতে পারলাম।'

'দরখাস্তটা তবে রাজীবের কাছেই থাকুক।'

'কেন থাকবে? ও—' রমা একটু ভুরু তুলে হেসে বললে, 'তার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে থাকবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমা উঠবার আগে একটা কথা বলা দরকার মনে করল প্রিন্সিপ্যালকে; বললে, 'রাজীববাবুকে কি আপনি পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দিয়েছেন?'

'কেন?'

'যাই লিখে থাকি না কেন—আমার অ্যাপ্লিকেশনটা পনের দিন আগে আপনার হাতে আসা তো উচিত ছিল।'

প্রিন্সিপ্যাল টেবিলের পুরু কাঁচের এক কিনারে নীল সবুজ স্মেলিং সল্টের শিশিটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে কুড়িয়ে আনলেন সেটা, ছিপি খুলে দু-চার বার টেনে নিয়ে মুখটা এঁটে শিশিটা সরিয়ে রেখে বললেন, 'তুমি যা বললে তার একটা বিশেষ দিক রয়েছে। ও কী জবাবদিহি দেবে জানি না আমি। কিন্তু রাজীবের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন নালিশ করেনি।'

'খুব ভালো কাজ করেন নিশ্চয়ই রাজীববাবু—'স্মেলিং সল্টের শিশিটা কুড়িয়ে এনে নাকের কাছে ছিপি খুলে দেখবার ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রেখে বললে, 'কিন্তু আমার ব্যাপারে মন দিলেন না উনি; আমার পিটিশনটা কলেজের ব্যাপার, কমিটির ব্যাপারে গিয়ে দাঁড়াত যদি আপনার এখানে এসে ও বিষয় সম্পর্কে খোলাখুলি কথাবার্তা না হত। 'এ কথাবার্তা দৈবাত ঘটে গেছে, কিন্তু যে অ্যাপ্লিকেশনটা খুবই সাধারণ নিয়মে আপনার হাতে আসবে সেটা এখনো এল না।'

'না, কোনো পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নেই। গম্ভীরভাবে বললেন প্রিন্সিপ্যাল। 'আমার নামের দরকারি অদরকারি সমস্ত কাগজই আমাকে দেখাবার কথা। তোমার দরখাস্তটা টিনেবল নয়, কিন্তু সেটা আমি হাতে পাব না কেন? ও শিশিটা—'

'ভারি চমৎকার নীল রঙের' রমা বললে।

'স্মেলিং সল্টের—'

'আপনার কাছে একটা অনুরোধ—'

'কী বল তো?' প্রিন্সিপ্যাল যেন বুঝে ফেলে হেসে বললেন, 'এই শিশিটা শুঁকে দেখবে তুমি?' মাথায় গিয়ে ঝিম করে হাতুড়ি মারবে কিন্তু খুব কড়া ঝাঁক। কালকে পার্সেলে এসছে, ভীষণ টাটকা সল্ট।'

তাহলে শিশিটা কুড়িয়ে নিজের দিকে আনতে পারা যায়। মত দিয়েছেন, বেয়াদবি মনে করবেন না আর পিন্সিপ্যাল; কিন্তু শিশিতে হাত দেবার আগে রমা বললে, 'আমারি কথার মূর্খতায় রাজীববাবুকে বড্ড বেকায়দায় ফেলেছি আমি। ওর কোনো দোষ নেই। ওকে যাতে কিছু না বলা হয়।'

'এ মিনতি প্রিন্সিপ্যাল রাখবেন কিনা—যাতে রাখেন সেই-সব সাত পাঁচ ভেবে নতুন কোনো মূর্খতা বা বেয়াদবি করবে না ঠিক করে স্মেলিং সল্টের শিশিটা সরিয়ে রেখে দিল। শুঁকে দেখতে গেল না আর।

'সাহসে কুলোল না বুজি তোমার?' 'প্রিন্সিপ্যাল কাগজপত্তরের ফাইলটা কাছে এগিয়ে এনে বললেন।

'কিসের কথা বলছেন?'

'বোতলটার কথা বলছিলাম। ভেতরে সিয়ানাইডই আছে বুঝি?'

'রাজীববাবুর সম্বন্ধে আমাকে কথা দিন দয়া করে। ওর কিছু নয়—আমারই দোষ, ক্ষমা করুন।'

'অনেক স্টেট সিক্রেট জেনে নিয়েছ এর মধ্যে। সব জানতে পারবে না।'

সল্টের বোতলটা একটু চিন্তিত মুখে এগিয়ে এনে ঢাকনা খুলে একবার টানতেই পাঁচ বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল রমার। কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় ছিল তখন তারা মোহিতবাবুর বাড়িতে; অন্য নানারকম সুন্দর, সৌষ্ঠবের জিনিসের সঙ্গে স্মেলিং সল্টের একটা বোতলও মোহিতবাবুর পরিপাটি টেবিলের কিনারে দেখেছিল সে আর বাড়ির ছেলে হারীত। প্রায়ই নেড়ে চেড়ে ছিপি খুলে দেখত দু'জনে। মোহিতবাবুর বাড়ি-হারীত-কলকাতার মেহস্তের দিনরাত হঠাৎ মনে পড়ে গেল রমার, বাসমতী কলেজের এই ঘরটার কথা মনে পড়বে আবার সাত বছর দশ বছর পরে হঠাৎ অন্য কোথাও সল্টের বোতল নাকের কাছে টেনে ভির্মি খেয়ে। বোতলটা হাতে রইল তার, ছিপি এঁটে রেখেছে। প্রিন্সিপ্যালের কাছে একজন লম্বা ধ্যাড়ধেড়ে চাপরাশি এসেছে, চুটিয়ে তকমা পরে, পিওন বুক নিয়ে, হয়তো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে এসেছে। পিওন-বইয়ে নাম সই করে চাপরাশিকে বিদায় করে দিলেন মজুমদার সাহেব। একটা বড় খামের ভেতর থেকে বার করে চিঠিপত্র এক মিনিটের ভেতর পড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন টেবিলের এক কিনারে।

'রমা, ফোর্থইয়ারের মেয়েদের একটা আলাদা অনার্স ক্লাস নেব বলেছিলাম। সেটা কবে?'

'আজ শুক্রবার, আমাদের ফার্স্ট আর থার্ড পিরিয়ডে দু'টো অনার্স ক্লাস হয়ে গেছে। তা তো হয়ে গেছে, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল কবে অনার্স ক্লাস নেবেন বলছিলেন মনে নেই রমার।

দেরাজ থেকে তিনি রুটিনের চার্ট খুলে দেখছিলেন, 'আজ শুক্রবার বললে?'

'হ্যাঁ—'

'এটা কোন পিরিয়ড?'

'ফোর্থ পিরিয়ড চলছে।'

'ও' দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ফিফ্‌থ্‌ পিরিয়ডে ক্লাস নেব তোমাদের।'

'কোন ঘরে?'

'আমার এই ঘরেই। জানে তো মেয়েরা?'

সঠিক কিছু বলতে পারল না রমার শুক্রবার ফিফ্‌থ্‌ পিরিয়ডে তার নিজের ঘরে অনার্স ক্লাস নেবেন বলেছিলেন বুঝি প্রিন্সিপ্যাল? সীমাকে জিজ্ঞেস করলে কোন বইয়ের কোন প্যারাগ্রাফ থেকে পড়াবেন তাও বলে দিতে পারত; কিন্তু ক্লাসের পড়ার দিকে কোনো মন নেই রমার, ঠোঁট নাড়িয়ে মাস্টারের দল পড়িয়ে যাচ্ছে, দিনের চাকা ঘুরছে, আর রাত্রের চাকা, কিন্তু হচ্ছে না কিছুই; মাঝখানে রাজীববাবুর মতন ভাল মানুষকে বদনাম মুখপাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকেই সাজতে হল; কী করবেন প্রিন্সিপ্যাল বুঝতে পাচ্ছে না, কিন্তু মজুমদার যেরকম লেফাফাদুরস্ত তাতে রাজীববাবুকে বেশি বিপদে পড়তে না হয়।

কে এই রাজীব চক্রবর্তী?

সীমা চক্রবর্তীর বাবা।

ছটফট করতে লাগল রমা। স্মেলিং সল্টের শিশিটা প্রিন্সিপ্যালের নিজের দরকারে লাগবে হয়তো; শিশিটা রমার হাতের ভেতর, প্রিন্সিপ্যাল আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে এইবারে ও শিশিটা তার লাগবে, মনে হচ্ছিল রমার, কিন্তু তবুও সঠিক কিছু বোঝার আগে নিজের কাছেই রেখে দিল শিশিটা। ইশারা ইঙ্গিতে পরিভাষায় নয়—সোজা ভাষায় চাইলেই সেটা প্রিন্সিপ্যালকে সে ফিরিয়ে দেবে।'

'তোমার কি মাথা ধরেছে?'

'না।'

'খুব টানছ দেখছি স্মেলিং সল্ট—'

বোতলটার ছিপি আটকাতে আটকাতে রমা বললে, 'রাজীববাবু তো সীমা চক্রবর্তীর বাবা।'

'ওর মেয়ের নাম সীমা?' কালেকটরের চিঠিটা আর একবার পড়ে শেষ করে টেবিলে রেখে দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'তা জানি না—হবে। তোমার সর্দি হয়েছে?'

'না। ঠিক আছে। সল্টটা চাই আপনার?'

'এখুনি না। থাকুক তোমার কাছে। অনার্সের মেয়েদের এখন অফ? বলতে পার?'

'হ্যাঁ। পাঁচ মিনিট তো বাকি আছে বেল পড়বার। এই বেলা চিরকুট পাঠিয়ে দিলে খবর পাবে ওরা।'

'কিন্তু কোনদিকে পাব দপ্তরীকে? কোথায় আছে ওরা?'

'মেয়েদের কম্পাউন্ডে,' স্মেলিং সল্টের শিশিটা টেবিলের কাঁচের ঢাকনার ওপর রেখে দিয়ে বললে, 'কলেজের ঠাণ্ডা ঝিলটার কিনারে সিঙাড়া ফলগুলোর কাছাকাছি একটা পেয়ারা গাছের ছায়ায় বসেছে দেখে এসেছি।'

'সিঙাড়া? পানফল?' দপ্তরীকে ডেকে শ্লিপ দিয়ে স্মেলিং সল্টের শিশিটা একবার খুলে নিয়ে একটু নাকে ছুঁইয়ে রেখে দিলেন টেবিলে। প্রিন্সিপ্যালের চোখ জলে ভরে গেছে।

'আমাদের লাইব্রেরিতে লুক্রেশিয়াসের বই দেখলুম না তো।'

'লুক্রেশিয়াস?—সেই কবির কথা বলছ?'

'তাছাড়া আর কে আছেন?

'কোনো আধুনিক লেখকের ছদ্মনামও তো হতে পারে।'

'আছে নাকি? শুনি নি তো।'

'আমি আধুনিক লেখা বেশি পড়িনি।'

'আমাদের লাইব্রেরি বাজেটে শ'পাঁচেক টাকা খরচ করা হবে তো এবার-ইংরেজি বই-এর জন্য?'

'না। তিনশো।'

'গতবার তো সাতশো হয়েছিল।'

'এবারে প্রফেসাররা অনেক বই কিনিয়ে নিয়েছেন আগেই—এখন দেখছি সবই প্রায় বাজে বই।' বাজে কি-না সে বিষয়ে মত প্রকাশ করবার দরকার ছিল না রমার। প্রিন্সিপ্যাল প্রায়ই টেক্সট্ বই ভালবাসেন—এবং টেকসট্ জাতীয় নানারকম বই অধিকাংশ প্রফেসাররাই তাই। রমা এ কলেজে মাস্টার নয়, কেউ নয়; ছাত্রী হিসেবে লাইব্রেরির বই কেনাকাটার নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার তার নেই, কিন্তু ভাল বই পড়বার ইচ্ছা আছে। তা ছাড়া সেনকে লুক্রেশিয়াস পড়াবে না সে? বার্থেলো বাক্সেগুলো খোলেনি এখনো; আট দশ দিন হল কলকাতায় গিয়েছে, আরো দু-এক সপ্তাহ থাকবে। 'তিনশ টাকা তবে ইংরেজি বইয়ের বাজেটে বরাদ্দ হল এবার?'

'হ্যাঁ-দু'শো পঁচাত্তর টাকার অর্ডার চলে গেছে, এখন মোটে পঁচিশ টাকা বাকি—সল্টের শিশিটা এক জায়গার থেকে উঠিয়ে আর এক জায়গায় বসিয়ে রেখে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'আমাদের এখুনি আড়াইশো টাকার বইয়ের দরকার আরো, তবুও কিছুই করতে পারছি না।'

দপ্তরী ফিরে এসে বললে, 'মেয়েরা আসছেন।'

'এখনো ঘণ্টা পড়ে নি—'

'এইবারে পড়বে।'

'আমার এ ঘড়ি পাঁচ মিনিট ফার্স্ট।'

'কলেজের ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে রাখলে সুবিধা হত।'

'অনেকবার মিলিয়ে দেখেছি কি এ ঘড়িটা প্রগ্রেসিভ।' রমার লুক্রেশিয়াস বাতিকটাকে একটু লজ্জা দেবার জন্যে প্রিন্সিপ্যাল মুখ টিপে হেসে বললেন, 'কিন্তু মনে পড়ে গেল প্রগ্রেসিভ নয়, লুক্রেশিয়াস তো পরনো রোমান।'

'কোন দোকানে পাওয়া যাবে?'

'লুক্রেশিয়াস? বলছি, কিন্তু রাজীববাবুকে একটু দেখবেন দয়া করে—বরং আমার লুক্রেশিয়াস না হল—'

কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের দার্ঢ্য ভাঙতে পারা গেল না যেন; কোনো কথাই বললেন না তিনি রাজীব চক্রবর্তী সম্বন্ধে, বরং ক্ষেপে উঠে স্টিম ঝেড়ে দিতেন যদি ভাল হত সেটা, কিন্তু কেমন থমথমে হয়ে আছেন যেন।'

'কলকাতায় পাওয়া যাবে লুক্রেশিয়াস?'

'হু?' আড়চোখে রমার দিকে তাকিয়ে বললেন মজুমদার সাহেব, 'অথচ বিলেতে অর্ডার দিয়েও অনেক বই পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল। বইটার কি ইন্ডিয়ান এডিশন বেরিয়েছে নাকি হে কিতাবিস্থান থেকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সেদিন আমাদের দেশে আর সূয্যি উঠবে না।'

'কেন? কেন?'

'নিজের লক্ষ লক্ষ বছরের অপকর্মে বেচারী লজ্জায় মুখ লুকোবে।'

স্মেলিং-এর শিশিটা তুলে নিয়ে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'কিন্তু কিতাবিস্থান থেকে বই বেরুচ্ছে তো ঢের; সূয্যিও ধর্মসাক্ষী হয়ে জেগে আছে, মানুষ খাচ্ছে-দাচ্ছে শান্তি পাচ্ছে। তোমার বইটা কি হে যে, আমাদের দেশের কোনো প্রেস কুল্লে সাতশো কপি ছাপাতেও সাহস পাচ্ছে না?'

'সাতশো?' প্রিন্সিপ্যালের খাস তালুকের চুল পাকে না, দু'দিকে রগের ধারে পেকেছে শুধু, পেকে আরো খুলেছে চেহারা; একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রমা বললে, 'বিলেতি এডিশনও সাত কপির বেশি এদেশে পাঠায় না, ভাবে সাত দশ ওদের এতেই চলবে।'

প্রিন্সিপ্যাল নিজের প্যাডটা রমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কলকাতায় হবে না, বিলিতি পাবলিশারের নাম লিখে দাও।'

'কে পাবলিশার জানি না আমি।'

প্রিন্সিপ্যাল ভেবে বললেন, 'কলকাতায় হ্যাঁচকা অর্ডার দিলে পাওয়া যাবে?'

'অক্সফোর্ডে ম্যাকমিলনে পাওয়া যেতে পারে—হয়তো একটা নির্দেশ দিতে পারে ওরা।'

'আচ্ছা আমি লাইব্রেরিয়ানকে বলছি আজই অর্ডার দিতে।'

নীল শিশিটা রাখলেন তিনি টেবিলের ওপর। রাজিবরবাবু একরাশ নথিপত্র নিয়ে হরতরাস হয়ে ঢুকে পড়লেন প্রিন্সিপ্যালের ঘরের ভেতর। রমা বিপদ গণল, কী যেন কী হবে।

'এই তো এতক্ষণ হাত খালি ছিল,' প্রিন্সিপ্যাল ভুরু কুঁচকে বললেন, এখন তো আমার ক্লাস-এখন এ-সব নিয়ে এসেছেন?' রাজীববাবুর কাগজপত্রের দিকে নিরেট বিতৃষ্ণা ও অশ্রদ্ধায় তাকালেন তিনি।

'আমি আগেই আসতাম' রাজীববাবু বললেন, 'কিন্তু অডিটর এসেছিলেন, তিনি আবার কানে শোনেন না—'

'কোন অডিটর? কে?'

'ভূপতিবাবু—ভূপতি চট্টরাজ। ওই যে বিলেতী ডিগ্রি আছে—'

'তিনি এলেন, চিনি না ত। কেন আমাদের প্রফুল্লবাবু কোথায়?'

'প্রফুল্লবাবুই পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

প্রিন্সিপ্যাল দেরাজ থেকে চশমার খাপটা বের করে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, 'চট্টরাজ কি ছোকরা?'

'আপনি দেখেছেন তাকে, তিন মাস আগে অডিট করতে এসেছিলেন—প্রফুল্লবাবু আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন—মনে নেই হয়তো আপনার—'

'কার মনে থাকে?' প্রিন্সিপ্যাল একটু মনের গরমে বললেন, কলেজের পরিচালনা, শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ ও যাবতীয় বিষয় সম্পর্ক ওয়াকিবহাল থাকার ব্যাপরে একান্ত একক তো তিনি, সকলেই জানে; কিন্তু কেউ কেউ ভুলে যায় মাঝে মাঝে।

'না বেশি বয়স নয় চট্টরাজ সাহেবের-ত্রিশ বত্রিশ হবে।'

'কানে শোনেন না?'

'খুব কম শোনেন।'

'তবে কি ইয়ারফোন লাগিয়ে কাজ করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে প্রফুল্লবাবু?'

এ কথার কোনো জবাব নেই রাজীব চক্রবর্তীর হাতে চার-পাঁচদিন হল দাড়ি কামানো হয় নি রাজিববাবুর, তিনি দাড়িতে আস্তে-আস্তে নখের খোঁচা দিয়ে আমতা-আমতা করছিলেন।

'অডিটরের ত এখানে আসার কথা নয় বারবার—'

'এসেছেন ত নিজের গাড়িতে চড়ে—'

'খুব দয়া করেছেন,' মজুমদার সাহেব বললেন, 'কিন্তু রাজীববাবু বলে দেবেন ভূপতিবাবুকে—এখানে এসে কিছু অডিট করার দরকার থাকে যদি তার তাহলে কলেজের প্রিন্সিপ্যালের অজ্ঞাতে যেন সে কাজটা না হয়।'

'আপনাকে খবর দেওয়া হয়েছিল ত। বেনি দপ্তরি এসে বলেনি?'

'বেনিকে কে পাঠিয়েছিল?'

'আমিই ত।'

রমা তাকিয়ে দেখল প্রিন্সিপ্যালের সমস্ত মুখে যা ছুটে এসেছে তা ভাল জিনিস নয়; নিঃশব্দ বটে, কিন্তু তবুও তোড়টা রক্তের। কিন্তু তবুও নিজেকে সামলে নিলেন প্রিন্সিপ্যাল; মুখের কঠিন লালিমা আস্তে আগের মত গৌর হয়ে, ফ্যাকাশে হয়ে গেল তারপর।

'বেনি আমাকে কোনো খবর দেয়নি।'

'রাজীব বাবুকিছু বলতে পারলেন না।'

'বেনি কোথায়?'

'নিচে আছে।'

'তাকে পাঠিয়েছিলেন—সে এল না কেন?'

'বেনি বলতে পারে।'

'রমা,' প্রিন্সিপ্যাল তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'অনার্স ক্লাসের মেয়েরা এসেছে?'

'আসেনি এখনো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওয়ার্নিং বেল পড়েছে, ফাইনাল বেল পড়েনি?'

'এখনো পড়েনি।'

'আমি একটু এদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি,' তিনি বললেন, 'অনার্স ক্লাস আজ নেব কি—না বলতে পারছি না।'

'আমি উঠব তাহলে?' চেয়ার ছাড়ার উপক্রম করে রমা বললেন।

'না বোসো, মেয়েরা এসে নিক।'

বেনিকে ডেকে পাঠাব?' রাজীববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

না। প্রিন্সিপ্যাল মাথা নেড়ে বললেন, 'সে ত সাতটা অবদি আজ কলেজে থাকবে—'

'আজ শুক্রুরবার,' রাজীববাবু বললেন, 'বেনির আজ সাতটা—সাড়ে সাতটা অবদি থাকার কথা।'

'আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে তাকে সাতটার সময়।'

'আপনার বাড়িতে?'

'না, কলেজেই থাকব আমি।'

স্মেলিং সল্টের শিশিটা টেবিলের এক কিনারে জড়সড় হয়ে পড়েছিল এতক্ষণ, কেউই ফিরেও তাকাচ্ছিল না শিশিটার দিকে। প্রিন্সিপ্যালের মাথায় অনেক ধান্দা, কিন্তু সস্নেহে তাকালেন শিশিটার দিকে। সসম্মানে ডান হাতে, তারপর ছিপি না খুলে প্রায় নাকের কাছাকাছি তুলে নিয়ে আস্তে-আস্তে, গালের চামড়ায় ঠাণ্ডা নীল কাঁচের পালিশ ঘষতে-ঘষতে রাজীববাবুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'বেনিকে না পাঠিয়ে নিজে এসে আমাকে খবর দেওয়া উচিত ছিল আপনার।'

'আমি উঠি—' রমা বললে।

'বোসো। অনার্স ক্লাস নেব না 'বলি নি ত।'

'মেয়েরা কি খবর পেল না নাকি?' রমা নিজেকে যেন বললে।

'পেয়েছে; আসবে,' প্রিন্সিপ্যাল বললেন, ফাইনাল বেল পড়ে নি ত!'

'বেনি যে এমন করবে তা ত আমি বুঝতে পারি নি।' প্রিন্সিপ্যালের চেহারার স্পষ্ট, সুন্দর, দৃঢ় চেকনাইয়ের দিকে তাকিয়ে রাজীববাবু নিজের অপরাধে, অকিঞ্চিৎকরতায় কেমন যেন একটু মরে গিয়ে বললেন।

'বেনির কথা এখন থাক; সাতটার সময় কথা হবে তার সঙ্গে; তার দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে নির্দোষ বলে ধরে নিতে হবে।'

কথাটা লাগল রাজীববাবুর; তাঁর চেয়ে বেনির ওপরই তাহলে বেশি বিশ্বাস প্রিন্সিপ্যাল মজুমদার মশাইয়ের' কুড়ি বছর আগে ঢুকেছেন এ কলেজের অফিসের কাজে, চৌত্রিশ বছর কাজ করেছেন তিনি এখানে, বেনি ত সেদিন এল। কেমন যেন চলকে উঠল রাজীববাবুর লো ব্লাড প্রেসারের রক্তের মারাত্মক নম্রতা; কিন্তু থামিয়ে রাখতে হয় কোনো উপায় নেই। প্রিন্সিপ্যাল তাকে যে বিষয় নিয়ে আটকেছেন আজ সেটার ভিতর স্থির যুক্তিও নেই। বেনি প্রিন্সিপ্যালকে কী বলবে আন্দাজ করতে পারছেন না রাজীববাবু; তবে যাতে নিজে সে সাফাই হতে পারে সেই কথাই বলবে। বেনির কথাই খুব সম্ভব বিশ্বাস করবেন প্রিন্সিপ্যাল। অডিটর এল, প্রিন্সিপ্যালকে খবর দেওয়া হল না, গাফিলতিটা আজকে এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে রাজীববাবুর ছাড়া আর কারো নয়।

আগে এরকম ছিল না। চুয়ান্ন বছর বয়স হয়েছে, গরিব বাঙালির সংসারে অনেক ভাল করে ফোঁটা ফোঁটা রস ঢেলে ছিবড়ে হয়ে গেছেন তিনি। বেনিকে ডেকেছিলেন তিনি দু-তিনবার ডেকে বলেছিলেন, বেনি বেরিয়েও গেল; কিন্তু রাজীববাবুর হুকুমের ভনভনানি শুনতে পায়নি নাকি সে? না আধখানা শুনে ওস্তাদি করে বাকি আধখানার হারা-উদ্দেশ্য চলে গেছে? প্রিন্সিপ্যালের কাছে আসেনি ত বেনি।

দোষ রাজীববাবুর নিজের।

বেনিকে জেরা করলে রাজীববাবুর মিথ্যাচার নয়, কিন্তু কাজকর্মে পানের থেকে চুন খসবার মত খানিকটা অসাধ অমনোযোগ ধরা পড়ে যাবে; গ্রাহ্য করবার মত দোষ নয় সেটা, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল নিজের খুশিতে সেটা বড় করেও দেখতে পারেন।

'ভূপতি চট্টরাজ অডিট করছিলেন, তিনি অডিটর ত—'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'আপনাকে দিয়ে কী দরকার ছিল তার?'

'অনেক কথা বুঝিয়ে দিতে হচ্ছিল তাকে।'

'কে বলেছিল আপনাকে বুঝিয়ে দিতে?'

'প্রফুল্লবাবুকেও কোনো-কোনো কথা বলে দিতে হত, কলেজের হিসেব-নিকেশের তো অনেক রকম জট রয়েছে, ওরা জেরা করেন।'

'তা করেন বটে, প্রিন্সিপ্যাল জানেনও তা; নানারকম ঝড়তি-পড়তি গলতি আবছায়া ও দুর্ধর্ষ হিসেব-নিকেশের অদ্বিতীয় কর্ণধারও রাজীববাবু, অডিটরের সঙ্গে ও-সব জিনিস নিয়ে আলোচনায় প্রিন্সিপ্যালের মর্যাদায় ঠেকে, ভাইস প্রিন্সিপ্যালেরও; জাবড়া কাজগুলো রাজীববাবুর বরাতে ছেড়ে দেন তাঁরা, জানেন লোকটা টাকাকড়ি হিসেবকিতেবের সব রকম চোরাবালি উৎরে কলেজের মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে। মান খোয়াবার মত কোনো কাজ করেনি বটে কলেজে, প্রিন্সিপ্যাল-ভাইস প্রিন্সিপ্যালের গোচরে তেমন কিছু কোনোদিন করেছে বলে মনে পড়ছে না মজুমদার সাহেবের। কিন্তু একটা অথই সমুদ্রের মত যেন টাকাকড়ির নিত্যনিতান্ত বিষয়ের বিরাট জমাখরচ নিয়ে কলেজের, বোর্ডিঙের, ছেলেমেয়ে হিন্দু-সুমলমান হোস্টেলহদ্দোগুলোর হিসাবনিকাশের ব্যাপারটা। রাজীববাবু পনর বছর ধরে এই-সব কাজে হাত পাকিয়ে এখন অব্যর্থ হয়ে উঠেছেন প্রায়। ও কাজে প্রতিভা লাগে না কিন্তু একাগ্রতা ও পরিশ্রমের দরকার; পারতপক্ষে প্রিন্সিপ্যাল বা বড় প্রফেসররা ও জিনিসে অতিরিক্তভাবে নাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢোকাতে যায় না; ছোট প্রফেসারদের কারো-কারো অবিশ্যি এদিকে কৌতূহল আছে ঢের; তাদের ভেতর যারা তাসটাস খেলা তেমন পছন্দ করে না, কোথাও বাইরে গিয়ে চটে বসবার বা অন্দরমহলে ঢুকে পর্দা টেনে দেবার, নিদেন পক্ষে কোনো পড়বার মত বইও খুঁজে পায় না, ছুটির দিনে দুপুরগুলো তারা কলেজের অফিসে এসে হিসাবকিতাবের ঢাউস বাঁধানো খাতাগুলো তারা কোলে তুলে নেয়, কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে নয়, কলেজের সব ব্যাপারেই ষোল আনা এলেম থাকা দরকার, কলেজটা ত তাদেরই এই হিসেবে। রাজীববাবু তাদের কাছে আশ্চর্য ধাতুশক্তি; দ্রোণাচার্যের মত কত শিষ্য তৈরি করেছেন। তিনি জুনিয়র প্রফেসরদের মধ্যে সকলকেই সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। কলেজে ভারিক্কে অডিটর এসে যা-কিছু জানবার বোঝবার জিজ্ঞেস করবার সবই নিখুঁতভাবে পেতে পারেন ছোটতরফের এই-সব মাস্টারদের কাছ থেকে। কিন্তু অডিটরদের আজকাল বিশেষ কিছু জানতে জিজ্ঞেস করতে হয় না, গত আট-দশ বছর ধরে নীরবেই প্রায় কাজ করে যেতেন তাঁরা, দু-একটা গুরুতর ব্যাপারে প্রিন্সিপ্যাল ও ভাইস প্রিন্সিপ্যালকে এক-অধটা কথা পরিবারের বন্ধুর মত জিজ্ঞেস করতে হত, মোটামুটি সহজেই মিটে যেত সব। রমেনবাবু প্রফুল্লবাবুর আমলে এই রকমই হয়েছে। কিন্তু ভূপতি চট্টরাজ ইদানিং আসছে। ছোকরা মতন অডিটর, প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখন-হাসির মতন একবার উঁকি দিয়ে দেখা করে যায়; কাছে বসে দু-চার কথা বলবার প্রয়োজনীতাই বোধ করে না। তাছাড়া কলেজের হিসেব অডিট করতে এসে রাজীববাবুর কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক কথা জিজ্ঞেস করবার অছিলায় দশরকম অবান্তর জিনিস আদায় করে জেনে নেবার দিকে বিশেষ তৎপরতা আছে এই ছেলেটির; প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়েছে সে খবর। রাজীববাবু সৎ লোক, কিন্তু সমীচীন লোক নন যে, জানেন তা প্রিন্সিপ্যাল। অবিশ্যি লেখাপড়া-খেলাধূলা, কিংবা চট্টরাজের যেটা চৌহদ্দি, সেই হিসেব-নিকেসের ব্যাপারে, কলেজের কোনো গুমর নেই—কী ফাঁক করবে চট্টরাজ রাজীব আহম্মককে হাত করবার চেষ্টা করে।

নীল শিশিটার ঢাকনা খুলে নাকের ভেতর দিয়ে মাথার তালুটা আস্তে একটু ঝাঁকিয়ে নিলেন প্রিন্সিপ্যাল। ঢাকনাটা সট করে এঁটে দিলেন। কিন্তু চট্টরাজের এই কলেজের খুঁত বার করবার জন্যে তক্কেতক্কে থাকাটাই ত নচ্ছার বেল্লিকপনা, প্রফুল্লবাবু বেশি ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন, আসতে পারেন না; কিন্তু কী হিসেবে এই লোকটাকে পাঠাচ্ছেন?'

ফাইনাল বেল কিছুক্ষণ হয় বেজে গেছে; শোনেন নি হয়তো প্রিন্সিপ্যাল; রমা শুনেছে; মেয়েরা কেউ এখন পর্যন্ত এল না ত; মেয়েরা এলনা বলে নয়, এমনি কেমন একটা উদ্বেগে দরজার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল রমা; সীমা এসে আবার এই অবস্থায় তার বাবার মুখোমুখি না পড়ে যায়! রাজীববাবু ত এখন কাঠগড়ায়। প্রিন্সিপ্যালের অবচেতন মনে ডুব দিয়ে এসে টের পেয়েছে রমা যে অনেকটা তারই বোকা পিটিশনও বেকুবের মত কথাবার্তা বলার ফলে রাজীববাবুর এই অবস্থা, অডিটর দিয়ে তর্কাতর্কি একটু ফালতু ফোড়নের ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।

'ভূপতি চট্টরাজ কানে কম শোনেন, কী করে বুঝেসুঝে নিলেন তবে?'

'তার কানের কাছে চিৎকার করে কথা বলতে হয়।'

'ও—তবু ভাল—' প্রিন্সিপ্যাল আড়চোখে একবার রমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে হেসে বললেন, 'দশজনের সামনে চেঁচিয়ে রগচটা কথা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না; একটু মাখামাখি করে কথা বলতে হলে-'রমার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, চট্টরাজমশাই কানে খাটো, কিন্তু তবুও সব কথাই শুনতে চান।'

'দরকারি কথাগুলো।' রাজীববাবু বললেন।

'দরকারের একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আপনাকে বলেছিলাম কি যে আজ আমার ফিফ্‌থ পিরিয়ডে ক্লাস আছে?'

'না।' রাজীববাবু বললেন।

'ফোর্থ পিরিয়ডে আজ অপ্‌সর্ আছে তাও জানতেন না? আমার রুটিনের চার্ট এক কপি রয়েছে ত আপনার কাছে।'

'আছে। জানতাম। কিন্তু চট্টরাজ—'

'গলায় গামছা বেঁধে আটকে রাখলেন? রাজীববাবু', প্রিন্সিপ্যাল নীল শিশিটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললেন। কিন্তু মনের কথাটা আপাতত সরিয়ে রেখে বললেন, 'আপনার এই-সব কাগজপত্র?'

'আজ্ঞে হ্যা।'

'এখুনি দেখে দিতে হবে?'

'আপনি যদি এখন সই করে দেন, তাহলে তাড়াতাড়ি ডিসপাচ করতে পারি।'

'কিন্তু না পড়ে সই করব কী করে?'

'মিনিট পনের-কুড়ি—'দেয়ালের ঘড়ির দিকে একবার ঝাঁ করে তাকিয়ে রাজীববাবু বললেন, 'হয় তো লাহবে চোখ বুলিয়ে যেতে।'

'না, চোখ বুলোলেই হবে না শুধু; শিশিটা কুড়িয়ে নিয়ে তিনি বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে আজকে ডিসপাচ করতে পারবেন না আপনি। ঘণ্টাখানেক আগে আসা উচিত ছিল আপনার।'

রাজীববাবু দাঁড়িয়ে আছেন অনেকক্ষণ, চেয়ারও আছে এ ঘরে আট-দশখানা কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের কাছ থেকে বসবার নির্দেশ পান নি এখনো; নির্দেশ না পেলে বসাটা বেয়াদবি হবে। আজ যদি ডিসপাচ করা না হয় তাহলে দলিলপত্রগুলো নিয়ে চলে যাবেন কি-না ভাবছিলেন তিনি; টেবিলের ওপর কাগজপত্র ছড়িয়ে আছে সব, কিন্তু সেগুলির সম্বন্ধে কোনো বিধিব্যবস্থা করবার তাগিদ দেখা যাচ্ছে না মজুমদার সাহেবের, স্মেলিং সল্টটা শুঁকছেন তিনি। সল্টের শিশি ও প্রিন্সিপ্যালের নাকের দিকে তাকাতেই সীমাকে চোখে পড়ে গেল রাজীববাবুর। প্রিন্সিপ্যালের ঘরের দরজায় উঁকি দিয়েই পিছিয়ে গেল সীমা, খুব সম্ভব ঘরটা থমথম করছে দেখে ঢুকতে সাহস হল না তার। তা ছাড়া তার বাবাকে যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সেটা স্বাভাবিক মনে হয়নি তার; খুবই খারাপ কিছু হয়েছে, হচ্ছে, তার বাবা রাজীববাবু সাক্ষীগোপালের মতন দাঁড়িয়ে আছেন, রেহাই নেই তাঁর ভাবতে-ভাবতে সীমা ঘরে পা দিতে-না-দিতেই পিছিয়ে গিয়ে বাইরের বিশাল আলোর অন্ধকারের মধ্যে নিভে গেল যেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সীমাকে দেখেছিল রমা। স্মেলিং সল্টের শিশিটা হাতে তুলে, সাধ করে নয়—রাজীব-প্রিন্সিপ্যাল-সিদ্ধার্থ-লুক্রেশিয়সের কথা ভাবার ভীষণ নিসপিসানির থেকে সরে গিয়ে নিজেকে খানিকটা ছড়িয়ে নেবার জন্য শিশির ছিপি খুলবে—খুলবে ভাবছিল। খুব আঁট করে আটকে রেখেছেন এবার প্রিন্সিপ্যাল। ছিপিতে মোচড় দিতে গিয়ে রমার ঠোঁট কী রকম কুঁচকে উঠছে সেটা দেখছিল। সীমাকে দেখতে পেল রমা, কিন্তু তাকে ডাক দেবার আগেই সে পালিয়ে গেছে।

স্মেলিং সল্টের শিশিটা খোলা গেল না। টেবিলের ওপর রেখে দিল রমা।

'খুলতে পারলে না বুঝি?'

'না, খুলতে চাইনি—এমনিই তুলে নিয়েছিলাম।'

'খুব শক্ত করে আটকে রেখেছি।'

'হ্যাঁ,' শিশিটার নীল কাঁচের নিঃশব্দ ডেলাটার দিকে তাকিয়ে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'আমাদের আর দরকার নেই—আজকের মতন।'

'কিসের?'

'সেল্টের। আমার চেয়ে বেশি টেনেছ তুমি।'

'সীমা এসেছিল—'

'সল্ট বেশি টানলে কী হয় জানো? রাতে ঘুমানো কঠিন। আমি ভুক্তভোগী।'

'আমি বসতে না বললে কি বসবেন না আপনি রাজীববাবু?'

প্রিন্সিপ্যাল কলেজের 'সি' ডিপার্টমেন্টের বড় কেরানির দিকে তাকিয়ে বললেন; 'আপনার ঠ্যাং ব্যথা হল যে। বসুন, বসুন, বসে পড়ুন।'

'এই কুড়ি বছর ধরে সল্টের শিশি কাছে রাখছি আমি।' রমার মুখের দিকে চোখ রেখে তিনি বললেন, 'এ জিনিসের নানারকম কেরদানি জানা আছে আমার। তোমার বয়সে এই শিশি নিয়ে এই রকমই করতাম আমি। তুমি ত ছোট। আমি তোমার চেয়ে বেশি বড় না হলেও কম বড় নই।' তিনি তাকিয়ে দেখলেন রাজীববাবু চেয়ারে বসেছেন। চেয়ারটা রমার একেবারে গায়ের ওপর টেনে বসেছে যে রাজীববাবু, রমা একটু সরে যেতে পারে; তিনি বলতে পারেন রাজীববাবুকে একটু সরে বসতে। মুখে কিছু না বলে চোখ দিয়ে বললেন, কিন্তু কোনো ফল হল না রাজীবের ওপর। আ—রমা নিজেই চেয়ারটা টেনে সরে বসেছে।

'বেশি টেনো না সল্ট। নিজের কাছে রেখে দিও। কিন্তু এ জিনিস যে রয়েছে তোমার কাছে সারাদিনের মধ্যে ভাবতে যেও না; তারপরে ত রাত এল। রাতের এক-আধ মুহূর্তে বেশ কাজে দেবে।'

নিজের কাছে রেখে দিও, বললেন তিনি। এই শিশিটা? না আমার সল্টের শিশি আছে ভেবেছেন? অথবা কিনে নেব মনে করেছেন? ভাবছিল রমা। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল এ নিয়ে এখন আর কোনো কথা বলতে গেলেন না।

'ফাইনাল বেল কিছুক্ষণ হল পড়েছে শুনলাম।'

'হ্যাঁ ফিফথ পিরিয়ড শুরু হয়ে গেছে।'

'মেয়েরা কেউ এল না—'

'আমি ছাড়া আর দু'জন ত ফোর্থইয়ারের অনার্স ক্লাসে। সুমিতা আর ঋক ছেড়ে দিয়েছে, সবিতা রেখেছে এখনো, কিন্তু তাকে আজ ক্লাসে দেখলুম না, সে খুব সম্ভব কলেজেই আসেনি।'

'তুমি ছাড়া আর দু'জন? কে কে?'

'সবিতা আর সীমা। সবিতা আজ কলেজে আসেনি। সীমা ত মিনিট পাঁচেক আগে—'

'মিনিট পাঁচেক আগে কী হল?'

'এই ঘরে ঢুকল মনে হল।'

'আপনি দেখলেন না তাকে?' রাজীববাবুর দিকে ফিরে রমা বললে।

'হ্যাঁ এসেছিল।'

'চলে গেল?' প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'এসে চলে গেল? আজ অনার্স ক্লাস আমার ঘরে, জানে তা! দপ্তরিও বলে এসেছে।'

'রাজীবকাকার মেয়ে সীমা।' রমা বললেন।

'তা জানি—'প্রিন্সিপ্যাল মজুমদার বললেন, 'আমার ক্লাস না করে চলে গেল?'

'হয় তো ভেবেছে আপনি অফিসের কাজে ব্যস্ত আছেন।'

'আমার কলেজের ছেলেমেয়েরা কি ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাসের কথা ভাবতে যাবে? তুমি বলো।'

'আপনি কী বললেন বুঝতে পারছি না।'

প্রিন্সিপ্যাল হাসতে-হাসতে বললেন, 'গত সপ্তাহে তোমাদের ক্লাসে আমি বলে এসেছি, আজও দপ্তরিকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছি আমি ক্লাস নেব। না ভেবে বলেছি? কিন্তু ওরা এত বেশি অনিয়মের ভেতরে মানুষ যে কোনোরকম শৃঙ্খলা বা স্পষ্টতার কথা ভাবতেই পারে না।'

প্রিন্সিপ্যাল বেশি কোনো কড়া কথা বলেননি, নির্বুদ্ধিতার জন্যে পরে কী সাজা দেবেন সীমাকে বলতে পারা যায় না, হয় তো দেবেন না কিছু, কিন্তু এখন আর একটু বেশি বকলেও খারাপ হত না, অনুভব করছিলেন রাজীববাবু।

'সীমা বোকা, ওকে মাফ করুন।'

'বোকা?' রাজীববাবুর মুখের বদলে তার জামার বোতামের দিকে তাকিয়ে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'ক্ষমা করেছি, তবে বোকা বলে নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বোকা কী করে বললেন আপনি? মেয়েটি সেকেন্ড হয়েছে শুনেছি, রমা?' প্রিন্সিপ্যাল বললেন।

'মেয়েদের ভেতর সেকেন্ড হয়েছে' রাজীববাবু গলা নরম করে বললেন, 'রমার মত ছেলেমেয়ে সকলের ওপরে ফার্স্ট হয়নি।' নরম গলায় একটু ঝাঁঝ এনে রাজীববাবু বললেন, 'সত্যিই বোকা। তবে এখন দেখছি নিয়ম মানবার মত আক্কেলটুকুও নেই।'

বিশেষ কিছু ভিজলেন না প্রিন্সিপ্যাল, 'আপনি রাজীববাবু অসময়ে এসে কত রকম তছনছ করলেন দেখুন ত। এখন ত আপনার আসবার কথা নয়।' টেবিলের জিনিসপত্র হাটকাতে-হাটকাতে একটু গর্জন করার মত করে বললেন।

'সীমা আছে হয় তো কলেজে, দপ্তরি পাঠিয়ে ডেকে আনাব তাকে?' রাজীববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'না।'

'অনার্স ক্লাস হবে তাহলে—আজ?' রমা প্রশ্ন করল।

'সবিতা আসে নি?'

'না।'

'ঋক ছেড়ে দিয়েছে অনার্স?'

'দেখছি ত তাই।'

'কেন ছাড়ল?'

'পেরে উঠছে না হয় তো?'

'কেন, টাকাকড়িন টানাটানি?'

'পড়াশুনোর চাপ। সেটা সইছে না মনে হচ্ছে?'

'ছেড়ে দেবার আগে আমাকে একবার জানালে পারত।'

'ঋকের মেনিনজাইটিস হয়েছিল।'

'ও—কবে?'

'গরমের ছুটিতে।'

'বাসমতীতে ছিল?'

'না, কলকাতায় গিয়েছিল ওরা।' রমা প্রিন্সিপ্যালের জামার বোতামের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সেই থেকে শরীরটা কেমন ভেঙে পড়েছে, বি. এ দেবে না ঠিক করেছিল, এখন পাস পরীক্ষাটা দেবে শুধু বলছিল সেদিন।'

বেনি দপ্তরি দরজা দিয়ে ঢুকেই বেরিয়ে গেল, প্রিন্সিপ্যাল পিছু ফিরেছিলেন, দেখেন নি তাকে; আর দু'জনে দেখল। পাখা ঘুরছে সময় কাটছে।' নিঃস্তব্ধতা।

'সুমিতার পড়াশুনোর দিকে মন নেই।'

'অনার্স পেত।'

'ছেড়ে দিল ত; কী হল?'

'ও নানারকম কাজ করে বেড়ায়।'

'পোলিটিক্স?'

সিংহ নিজেই জানতে চাচ্ছেন বুঝি শশকেরা পোলিটিক্স করে কি-না। নিজের মাথার পেছনে খোপার ওপরে চুলের ওপর ডান হাতটা ঘুরিয়ে নিয়ে আঙুল দিয়ে আস্তে-আস্তে চাপ দিয়ে বুলোতে-বুলোতে রমা বললে, 'এখন পোলিটিক্স হোফ পাখির পোলিটিক্স—দেশ ত স্বাধীন হচ্ছে।'

'তা হচ্ছে,' প্রিন্সিপ্যাল একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'অনার্স ছেড়ো না তুমি।'

'সীমাও ছাড়বে না। সীমা আমার চেয়ে ভাল করবে।'

'বাসমতীর মত ছোট জায়গায় কি পোষাবে তোমাকে?'

'আমাকে?'

'তুমিও ত সুমিতার মত নানারকম কাজ করে বেড়াও।'

'আমাদের দেশে কাজ মানে পোলিটিক্স', বললেন বিনয়তোষবাবু প্রফেসর। কী একটা দরকারে এইমাত্র প্রিন্সিপ্যালের ঘরে ঢুকে নড়াচড়া করেছিলেন তিনি। শেল্‌ফের থেকে ইউনিভার্সিটির একটা ক্যালেন্ডার তুলে নিয়ে যেতে-যেতে বললেন, 'আর পোলিটিক্স মানে পার্টি।'

'ঐ কম্যুনিস্ট পার্টিটা আর কি।' বলে রমার দিকে উৎফুল্ল আগুনের মত দপ করে তাকিয়ে মেয়েটির কাছ থেকে নিজের সিদ্ধান্তের অনুকূলে ষোলআনা সায় আদায় করতে পেরেছেন মনে করে ঝা করে বেরিয়ে গেলেন।

'বিনয়তোষ কী নিয়ে চলে গেল?'

'একটা ক্যালেন্ডার', রাজীববাবু বললেন।

'বিনয়তোষ চলে গেছে? না করিডরে?'

'ডাকব তাকে?' রাজীববাবু বললেন।

'আ, কী মুস্কিল।'

'চলে গেছেন প্রফেসার্স রুমে!' রমা বললে।

'আমার কথার ত কোনো উত্তর দিলে না তুমি?'

রমা তাকিয়ে দেখল রাজীববাবু মাথা চেয়ারের কাঁধের ওপর কাত করে ঝিমিয়ে পড়েছেন।

'সুমিতা কম্যুনিজম নিয়ে আছে। ওর সঙ্গে মতে বনে না আমার।'

'আমি ভেবেছিলুম তুমিও কম্যুনিস্ট।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সেটা ভুল ভেবেছিলেন।'

'তুমি কংগ্রেসের?'

'না।'

'আমি ভুলে গিয়েছিলাম,' প্রিন্সিপ্যাল খানিকক্ষণ পরে বললেন, যেন কংগ্রেস—কম্যুনিজম ছাড়া আর পৃথিবীর নেই।

'আছে, সেখানে পোলিটিক্স ও আছে হয় তো—কিন্তু আজকালকার চারদিককার সব চালু পোলিটিক্সনেই।'

রমার মুখে কথাটা শোনা অবধি ভাবছিলেন তিনি; এইরকম কথাই খুব সম্ভব যুক্তি ও কামনার মিলনভূমিতে প্রায় কুড়ি বছর আগে শুনতে চেয়েছিলেন। যাক শোনা হল। পোলিটিক্স অবশ্য পোলিটিক্স তা থাকবে, মানুষ যা তাতে দরকারও রয়েছে তার। কিন্তু সে-সব স্বীকার করেও, হয় তো স্বীকার করেই, রমার ঐ কথাটা একটা অপূর্ব নির্দেশ।

'স্বাধীন হচ্ছে ত দেশ।'

'স্বাধীন হচ্ছে।'

'বড় পৃথিবী তোমাদের।'

'বড় পৃথিবীর খোঁজ পাওয়া যাবে হয় তো দেশ স্বাধীন হলে,' রমা বললে। 'হয় তো পাওয়া যাবে না। স্বাধীনতাকেই চার অক্ষরের অমৃত মনে করলে পাওয়া অসম্ভব। আমার ভয় হচ্ছে অনেকেই মনে করবে তাই।'

বিনয়তোষবাবু ক্যালেন্ডারটা ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

'কিছু দরকার আছে বিনয়তোষ?'

'আপনার সঙ্গে? না। অনার্স ক্লাস নিচ্ছেন?'

'নেওয়া হল না।'

বড্ড বেকায়দায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন রাজীববাবু।'

'দেখেছি। মাথাটা ঠিক করে দেওয়া যাবে না। তাহলে ঘুম ভেঙে যাবে।'

বিনয়তোষ চালাক মানুষ, প্রিন্সিপ্যাল যখন বসতে বলেননি তাকে তখন অন্য কাজ আছে প্রিন্সিপ্যালের; সে এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে চলে গেলেই খুশি হবেন তিনি।

'শরীর ভাল আছে আপনার?'

'হ্যাঁ খুব, মাথার চুল আবার ফিরে কাঁচা হল মনে হচ্ছে।'

'বিনয়তোষ আর দাঁড়ালেন না।'

'চলে গেছে—না করিডরে?'

'কে?'

বিনয়তোষবাবু।' প্রিন্সিপ্যাল নীল শিশিটা কুড়িয়ে ছিপির আঁটসাঁট একটু ঢিলে করে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললেন।

'চলে গেছেন।

'আমরাও উঠি, আজ আর ক্লাস হল না। সামনের শুক্রবার এই পিরিয়ডে এই ঘরে হবে। বলে দিও সীমাকে। আর কে আসবে?'

'আর কেউ না।'

'বলে দিও সবাইকেই তবুও, যদি আসে—'

'আমি উঠি তাহলে', রমা বললে।

'এই এক মিনিট, এই রাজীববাবুর সঙ্গে একটা কথা।'

'উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

'আমি জাগিয়ে দিচ্ছি। ওকে আগেই ছুটি দিয়ে দেব আজ। বাড়িতে গিয়ে বেশি বিশ্রাম নিতে পারবেন।'

'রাজীবকাকার শরীর ভেঙে পড়েছে।'

'একটু লম্বা অবসর নিলে ভাল হয় ওর?' প্রিন্সিপ্যাল একটু থেমে টেবিলের আনাচকানাচ কাগজপত্র বই ফাইল পোর্টফোলিও ব্যাগ সব দিকে একবার চোখ চালিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি ও ভাবছিলুম তাই।' কিন্তু অবসর নেওয়ার মানে নানারকম হতে পারে; অবিশ্যি প্রিন্সিপ্যাল ভাল জিনিসটাই লক্ষ্যের ভেতর রেখে রাজীবকাকার অবসরে কথা পেড়েছেন।

কিন্তু তবুও একটু উশখুশ করে রমা বললে, 'না, একা মানুষ সংসার চালাচ্ছেন; কাজ ওকে করতে হবে।'

'ছুটি পাওনা থাকলেও?'

'আছে?'

'নিশ্চয়ই, অনেক।'

'পুরো মাইনেতে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ।'

'তাহলে চেঞ্জে গিয়ে একবার দেখলে পারেন' তার এরকম ধরনের কথায় কোনো দুর্লক্ষ্য মাকড়সার জালে কিছুই আটকে যাচ্ছে না নিশ্চয়ই, অনুভব করে ফেলে রমা বললে, 'কিন্তু পরিবার সঙ্গে নিতে হবে; অনেক টাকা-কড়ির ব্যাপার, পেরে উঠবেন কি উনি?'

'প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে লোন নিতে পারেন।'

'বেশি টাকা আছে?'

'পি. এফ-এ? না। উনি ত চৌদ্দ আনির বেশি ধার করে নিয়েছে, মোটা সুদ দিতে হয় ফি-মাসেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে ত বড় পোর্টফোলিও ব্যাগ খুলে দু-একটা চিঠিপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন,' কলেজে কোঅপারেটিভের কাছ থেকে কিছু ধার করতে পারেন।'

'কেবলই ধার—'

'কোনো উপায় নেই, শরীর সজুত না হলে কাজ করবেন কী করে। কিন্তু শরীরের চেয়েও রাজীব চক্রবর্তী মশাইর মন-মাথা একটু কাহিল হয়ে পড়েছে বেশি।'

ব্যাগটা সরিয়ে রেখে তিনি বললেন, 'বেশি কিছু খরচের দরকার নেই-শিমুলতারা-মিহিজাম নয়, এই কাছেই ত কক্স বাজার আছে, স্টিমারে বেশি কী খরচ হবে আর, সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে আসুন।'

কথাগুলো ভালই বলছেন প্রিন্সিপ্যাল, কিন্তু কথার বক্তব্যের সঙ্গে সমতা রেখে ভঙ্গিটা তার ঠিক সেরকম দ্রব নয়, লক্ষ্যটাও ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে রাজীববাবু সম্পর্কে একটা সংকল্প ঠিক করে রেখেছেন, কোনো নড়চড় হবার জো নেই যেন তার, সংকল্পটা অনুভূতি ক্ষমায় আর্দ্র নয় বুঝেছে রমা। বিপদের কথা। কিন্তু তবু এ নিয়ে প্রিন্সিপ্যালকে কিছু বলতে যাবে না আর সে। বিপদের ভবিতব্যতা প্রতিটি মানুষের মাথায়ই ঝুলছে। এই বাসমতীতেই ক্লাস ঘর রাজীব চক্রবর্তী আছে—তার অজানা নেই। যা হবার হবে। হয় তো ভালই হবে। হয় তো প্রিন্সিপ্যাল খারাপ মনে করে কিছু বলেননি; কালো দিকটা নিজের মনের দোষে উজিয়ে দেখেছে খুব সম্ভব সে; রাজীববাবুর যাতে ভাল হয় সেইটেই চাইছেন বুঝি উনি।

'রমা—'

'উনি ঘুমুচ্ছেন।'

'জাগিয়ে দেব।' প্রিন্সিপ্যাল বললেন।

'আপনি কী খুঁজছেন? নীল শিশিটা?'

'হ্যাঁ। ছায়া পড়েছে। স্কাইলাইট দিয়ে রোদ পড়েছিল টেবিলে—কিরকম তাড়াতাড়ি নিভে গেছে দেখছ। ছায়ার ভেতরে টেবিলের ঢাকনাটা কেমন নীল মনে হচ্ছে না?'

'কেমন কালো দেখাচ্ছে—'

'এটা নীলচে,' প্রিন্সিপ্যাল নাক খাড়া করে হেসে বললেন, 'সন্টের শিশিটা কেমন বেমালুম ভারি মিশে গেছে টেবিলের কাঁচের সঙ্গে।'

আচমকা তাকালে শিশিটা চোখে পড়ে না, দেখছিল রমা।

'নেচারে এরকম লুকোচুরি রয়েছে।'

'দেখলে ত মানুষের কারবারেও আছে, সকলেই তারপরে এক সময়ে গা ঢাকা দিতে ভালবাসে।' প্রিন্সিপ্যাল রাজীববাবুর ফাইলটা খুলতে-খুলতে বললেন।

'রয়েসয়ে টেনো। তুমি নিয়ে যাও শিশিটা।'

'আমি?'

'দেরাজে রেখে দেবে; সারাদিনের ভিতর ঘেষবে না ওর কাছে। তবে দুপুরে, গরমে, বেশি গরম-টরম পড়লে একআধ বার। রাত বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এল-একবার।'

'ও—'

'কিন্তু তাই বলে ফি-রোজ নয়। এক হপ্তার ভিতর এক বারও নয়, পনের কুড়ি ত্রিশ দিন কেটে গেলেও না, শিশিটা আছে যে সেটা একেবারে ভুলে গেলে নিরালা সময়ে এক-এক দিন মনে পড়বে যে রয়েছে, তাতে কাজে দেবে।'

শিশিটা তুলে নিল রমা।

এই ঘরে ঢুকে প্রিন্সিপ্যালের টেবিলে স্মেলিঙের শিশিটা দেখে সত্যিই লোভ হয়েছিল তার; দোকান থেকে এরকম স্মেলিঙ সন্টের একটা শিশি কিনে নিলে হত, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল নিজেই দিয়েছেন তাকে, জিনিসটার মূল্য বেড়ে গেছে তাতে। নাকি কমে গেল? কারো অন্তরের আগ্রহে জিনিসের মূল্য কমার কথা নয়, প্রিন্সিপ্যাল এ ক্ষেত্রে আন্তরিক এ কথা কেউ বলবে না। কিছু যে দিচ্ছে ও যে নিচ্ছে তাদের ভেতর শূন্যে বেসেছে-দু'জনেরই জীবনমর্ম দু-রকম বলে। কিন্তু তবুও এখনকার এই আদান-প্রদানের ব্যাপারে প্রিন্সিপ্যালের দিক থেকে টসকায় নি কিছু রমা খুশি হয়ে শিশিটা নিল।

'রাজীববাবু—'

প্রিন্সিপ্যাল আরো দু-বার হাঁকডাক দিতেই ঘুম ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সীমার বাবা।

'বসুন।'

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, দেখেছি। আপনার ফাইলের কাগজপত্র এইবারে দেখছি আমি।'

'আজ আর ডিসপাচ হতে পারবে না—' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রাজীববাবু বললেন।

'না। বসুন। রমা একটা দরখাস্ত করেছিল?'

'রাজীববাবু চেয়ারে বসে বললেন, 'কোন রমা?'

'এই-যে বসে আছে আপনার পাশে।'

'ও-রমা অধিকারী?'

'অধিকারী কি তুমি?' রমার দিকে ফিরে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'ঠিক মনে নেই আমার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—অধিকারী।'

'হ্যাঁ, একটা দরখাস্ত করেছিল, মনে আছে আমার,' রাজীববাবু আবার একটা নতুন বিপদ গণে বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কবে করেছিল?'

'দিন বার-চৌদ্দ আগে।'

'রমা বলছে, পনের দিন।'

'তা পনের দিনই হবে—'রাজীববাবু তার গলার নিরেট কণ্ঠার ওপর-আস্তে আস্তে আঁচড় রাখতে-রাখতে বললেন।

'কিসের দরখাস্ত—জরুরি?'

রাজীববাবু টেবিলের ওপর বাঁ হাতের কব্জিটা আস্তে-আস্তে ঘষে-ঘষে বললেন, 'না, জরুরি মনে হল না, আমার পড়বার কথা নয়; কিন্তু রমা করেছে বলে পড়ে দেখলাম।'

'বেশ, হল, 'প্রিন্সিপ্যাল ফাইলটা একটু সরিয়ে রেখে বললেন, 'কী লিখেছিল পড়ে দেখলেন?'

'এই কলেজ থেকে মাসে-মাসে যে-বৃত্তিটা পাচ্ছে রমা সেটা—' রাজীববাবু ইতস্তত করছিলেন।

'বলুন রাজীবকাকা, আমি যা লিখেছি সেটা বলুন।'

'সেটার আর দরকার নেই লিখেছিল রমা।' রাজীববাবু প্রিন্সিপ্যালের চোখ এড়িয়ে রমার চোখ মুখের দিকে তাকাবার তাগিদ দমিয়ে রেখে চোখ বুজে বললেন। রমা তাহলে তাকে বলতে বলছে দরখাস্তে যা সে লিখেছিল সব কথা। এই প্রিন্সিপ্যালকে? রমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঢোক গিলে রাজীববাবু বললেন, 'সে-ই বৃত্তিটা সীমাকে দেবার অনুরোধ জানিয়েছিল।'

'ভালই করেছিল, 'প্রিন্সিপ্যাল ফাইলটা কাছে টেনে এনে খাপের ভেতর থেকে লঙ সাইটের চশমাটা বের করে বললেন, 'কিন্তু সেই পিটিশনটা কি প্রিন্সিপ্যালের নামে করা হয়েছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কিন্তু প্রিন্সিপ্যালকে দেওয়া হল না যে?'

'রাজীববাবু কোনো বেফাঁস উত্তর দেবার আগেই রমা বললে, 'পিটিশনটা চেপে রাখেন নি রাজীবকাকা—'

'প্রিন্সিপ্যাল একটু থমকে গিয়ে রমার দিকে তাকালেন।

'কী বলছ তুমি?'

'পিটিশনটা দেবার পরদিনই আমি রাজীবকাকে বলেছিলাম, থাক ওটা প্রিন্সিপ্যাল মজুমদারের কাছে পেশ করে দরকার নেই।'

শুনে রাজীববাবুর সততায় নিদারুণ ঘা লাগলেও তিনি চুপ করে রইলেন একটা বেশি বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে তাকে রমা। রমার দিকে চোখাচোখি তাকাবার চেষ্টা করে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'তুমি এই কথা বলেছিলে রাজীববাবুকে?'

কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের দিকে আর তাকাতে পারছিল না রমা, টেবিলটার দিকেও না; চোখ বুজে আসছিল তার কোনো রমকে ঈষৎ ফাঁক করে ঘরের মেঝের ওপরে কেমন একটা বাষ্পের দিকে চেয়ে থেকে সে বললে, হ্যাঁ, এই কথা বলেছিলাম ওকে।'

'তুমি যখন মুখ ফুটে বলেছ, তখন তোমার কথা সত্য। কিন্তু—' প্রিন্সিপ্যাল চশমা পরবেন-পরবেন করেও না পরে হাতে রেখে দিয়ে বললেন, 'রাজীববাবু আসবার আগে তুমি ত আমাকে এতক্ষণ অন্যরকম বুঝিয়েছিলে।'

প্রিন্সিপ্যালের কথা শুনে রাজীববাবু রমার দিকে তাকালেন; রাজীববাবু পিটিশনের কথা রমা তাহলে প্রিন্সিপ্যালের কাছে আগেই বলেছে; রাজীববাবু এ ঘরে ঢোকবার আগেই কথাবার্তা হয়ে গেছে তাহলে, কে পাড়ল কথাটা, রমাই নিশ্চয়; প্রিন্সিপ্যাল ত জানতেন না কিছু দরখাস্তের ব্যাপারটা। রাজীববাবুকে না জানিয়ে রমা প্রিন্সিপ্যালের কাছে পিটিশনের বিষয়টা তুলে সীমার বন্ধুর মত কাজ করেনি ভাবছিলেন রাজীববাবু। রমার ওপর খানিক আগেই শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল তার, এখন কমে গেল খানিকটা। কিন্তু রাজীববাবুকে বাঁচাবার জন্যে প্রিন্সিপ্যালের কাছে মিছে কথা বলে রমা যে বিশেষ অনর্থে পড়েছে সেদিক দিয়ে বড় একটা ভাবতে গেলেন না তিনি; এই শুধু ভাবলেন যে বাকপটুতা ও সাহস থাকলে সব কূল রক্ষা করে এ বিপদের একটা সমাধান খুব সম্ভব করতে পারতেন তিনি, কিন্তু সে-সব গুণ কিছুই নেই তার, চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই; নিঃসহায়, নির্গুণ, বিরস হয়ে চুপ করে রইলেন।'

'তুমি যা বলছিলে তাতে আমি ভেবেছিলাম, আমার কেরানি বুঝি তোমার পিটিশনটা চেপে রেখেছে।

রমা চুপ করেছিল। দেখল রাজীববাবুও চুপ করে আছেন। ভালই হয়েছে, উনি মুখ খুললে ব্যাপারটা আরো ঘুলিয়ে উত্তরই ক্ষতি হবে। রমার নিজের যা হয়েছে তা হয়ে গেছে, তার আর কোনো রদ নেই, তা নিয়ে কথা ভাবতে গেলে কোনো কিনারা পাওয়া যাবে না। 'এ মেয়েটিকে চিনেছি আমি, এর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করব না, কিন্তু একে চিনেছি আমি—'এই ত ভাবছেন প্রিন্সিপ্যাল, কিন্তু এ চেনাকে পাল্টে দেবার মত কোনো অস্ত্রই রমার হাতে নেই, হাত তার একেবারে খালি; প্রিন্সিপ্যাল বিশ্বাস করতেন তাকে; বিশ্বাসের ভান করে করুণা করবেন এখন থেকে।

'আমার একজন বড় কেরানি সম্বন্ধে আমার কাছে এসে ওরকম কথা বলা কি ঠিক হয়েছিল তোমার?'

বড় কেরানি বা রমা কেউ কিছু বললে না।

'আমাকে কী মনে করেছিলে তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন প্রিন্সিপ্যাল।

'ওঁকে ক্ষমা করুন।' রাজীববাবু বললেন।

'সত্যিই কি তুমি পিটিশন করেছিলে? আমার সন্দেহ হয়।'

'হ্যাঁ, করেছিল। আমি নিজে দেখেছি।' রাজীববাবু বললেন।

'আপনি নিজেই ছিঁড়ে ফেললেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, আছে ফাইলে। আপনাকে দেখাতে পারি।'

প্রিন্সিপ্যাল আস্তে-আস্তে বললেন, 'না। আপনি ছিঁড়ে ফেলে দিন।'

'কী করতে হবে এই-সব কাগজপত্রের?'

'আমি দেখছি। আমি আজ রাত আটটা-নটা অব্দি কলেজে আছি! আপনাকে আমি তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিচ্ছি রাজীববাবু—' লঙ সাইটের চশমাটা এঁকে নিয়ে বললেন 'ছেলেদের আমি প্রায়ই সে রকম বিশ্বাস করি না, কিন্তু মেয়েদের করি।'

রমার দিকে চেয়ে থেকে তিনি বললেন, 'স্বভাবতই মেয়েদের করি। কেন করি? ওরা বেশি বিশ্বাসী বলে। এতদিন সত্যিই তাই মনে করেছি আমি। কিন্তু—' প্রিন্সিপ্যাল কাগজপত্র নিজের দিকে টেনে নিলেন, 'এ কী হল? তুমি এটা কী করলে?'

'আমি?'

খানিকটা বিচলিত হয়ে পড়লেন তিনি সত্যিই বিচলিত হয়ে ওঠবার অভিনয় করছেন বলে মনে হচ্ছে না রমার। এ বিচলিত ভাব প্রিন্সিপ্যালের তবুও কেটে যাবে শেষ পর্যন্ত, রমাকে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা করার যে স্বভাবের কথা বলছেন তিনি সেইটেই টিকে থাকবে; আগে অবশ্য এ স্বভাবকে প্রিন্সিপ্যালের যুক্তির বল এসে সাহায্য করত, এখন ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করব, ফলে ওর বিশ্বাসটা এই সাতান্ন বছর বয়সে যে বিশ্বাস প্রবণতায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেই বিচিত্র ও বিমিশ্র ভূমি এক দিক দিয়ে তৃপ্তি জাগালেও অন্য দিক দিয়ে দুঃখকারী, রমা ভাবছিল।

'মানুষের যুক্তিরই দরকার।' রমা বললে।

'কেবল যুক্তি ?'

'না, তা নয়।'

'খুব বেশি যুক্তির?'

'যার যেরকম ভাণ্ডার রয়েছে, তার পূরণের অনুপাতে।'

'ও—' প্রিন্সিপ্যাল চশমার জ্বলজ্বলে কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি দেখছি যুক্তিদেবী।'

শুনে একটু চমকে উঠল রমা। কয়েক দিনের আগের কথা মনে পড়ল, তাকে 'আথেনা' বলেছিল সিদ্ধার্থ সেন, তারপরে ঠিক এই শব্দটাই ত ব্যবহার করেছিল সেন? শব্দটা কি কলেজে চলে? কে চালিয়েছে প্রথম? প্রফেসর সেন হয় তো আলগোছ চিপটেন কেটে শুরু করেছিল কোনো মেয়ে অধ্যাপক সম্বন্ধে, তারপর ছড়িয়ে পড়েছে।

'আজ্ঞে—'

'আপনি একটু ভাইস প্রিন্সিপ্যালকে সেই কলকাতা ইউনিভার্সিটির সার্কুলারের কথা জানিয়ে আসবেন?'

'যাচ্ছি।'

'তিনি কলেজে নেই খুব সম্ভব। কোয়ার্টার্সে গেছেন, এখন আর দরকার নেই তার আপনি জানালেই হবে।'

'আজ রাতে গিয়ে জানিয়ে আসব। কাগজগুলো দেখছেন আপনি, আমি পাঁচ মিনিটের জন্যে একটু নিচে ভবেশবাবুর কামরার থেকে আসছি।'

'আচ্ছা।'

রাজীববাবু চলে গেলে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'খামখেয়ালিভাবে পিটিশন করে ঝোঁকের মাথায় আবার মানা করে দিলে রাজীববাবুকে, বিশ্বাস হয় না আমার।'

'কেন রাজীববাবু ত অবিশ্বাস করেন নি,' বললে রমা। তর্কের সোজা রাস্তায় না গিয়ে কেমন যেন একটা বেটপকা গলির ভেতর ঢুকে পড়ে সে।

'তিনি ভুক্তভোগী', প্রিন্সিপ্যাল একটু হেসে বললেন, 'কী করে অবিশ্বাস করবেন? কিন্তু আজকাল তুমি বড় হয়েছ।' প্রিন্সিপ্যাল চশমাটা না খসিয়ে রমার দিকে না তাকিয়ে বললেন।

'কী হয়েছে তাতে?'

'পৃথিবীটাকে দেখছ।'

রমা বললে, 'যে যত ভাল করে দেখে সে তত পরের বিশ্বাস হারায়।'

'তুমি হারিয়েছ আমার বিশ্বাস?'

প্রিন্সিপ্যালের মাথার ওপরে ফ্যানটা আস্তে-আস্তে ঘুরছে, কমানো স্পিড, হেমন্ত ঋতু এসে পড়েছে বলে। কিছু শব্দ করছিল পাখাটা, ঘড়িটাও চারদিক ওদের চেয়েও বেশি নিঃশব্দ হয়ে পড়েছে বলে।

'রাজীববাবুর ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা কিছু ভেবে রেখেছেন আপনি,' রমা বললে,' 'আমার পিটিশন-ফিটিশন সম্পর্কেও। ফলে আপনি রাজীববাবু ও আমি পরস্পরের সম্পর্কে যেখানে ছিলাম এর আগে, সেখানে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।'

'ও-' প্রিন্সিপ্যাল মোটা নীল পেন্সিলটা তুলে চশমার ফাঁক দিয়ে রমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু ফিরে গিয়েছি ত—'

'কে?'

'আমি। তুমি যদি না গিয়ে থাকতে পার সেটা আমার দোষ নয়।'

'আর রাজীববাবু?' প্রিন্সিপ্যাল নীল-লাল পেন্সিল দিয়ে টাইপ-করা কাগজে দাগ কাটতে-কাটতে মন্তব্য লিখতে-লিখতে বললেন, 'তিনি আসুন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা যাবে।'

'আমাদের সম্পর্কে মনে-মনে তাঁর ভূমিকা বদলেছে কি না?'

'এটা ঠাট্টা করা হল, বেচারি মানুষ পেয়ে,' রমা হাসতে গিয়ে থেমে-থেমে বললে।

প্রিন্সিপ্যাল লাল পেন্সিল দিয়ে কাগজগুলোর আনাচে-কানাচে, নিচের দিকে আরো দু-একটা স্বাক্ষর বসিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে বললেন, 'ঠাট্টার মত শোনাতে পারে, কিন্তু আমি রাজীববাবু সম্বন্ধে ভাল মনে করে বলছি, যতদূর সম্ভব ঠিকভাবে চিন্তা করে। কিন্তু উনি কি কিছু ঠিক কথা বলবেন আমি জিজ্ঞেস করলে? সকলের কাছে সকলে আমরা মন খুলি না। উনি ভবেশের কাছে মন খুলতে গেলেন। আর আমি—' প্রিন্সিপ্যাল ফাইলের ভেতর ডুবে গেলেন। এইবারে তাহলে উঠতে হয় রমাকে। সে বুঝি স্লিপারের ভেতর পা ডুবিয়ে দিয়েছে। 'সীমাকে খুব ভালবাস তুমি, সীমার বাবাকে খুব শ্রদ্ধা কর দেখলাম। তার জন্যে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পার,' রমা বাঁ পা চালিয়ে ডান পাটাও সেঁধিয়ে দিয়েছিল স্লিপারের ভেতর, এইবারে উঠত, কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের কথা শুনে একটু থেমে রইল। রাজীববাবুর জন্য একটা কিছু করেছে বটে সে, সেটা কম নয়; কিন্তু জিনিসটা প্রিন্সিপ্যালের ধরে ফেলবার কথা? অবিশ্যি ধরে যে ফেলেছেন সেটা আগেই বোঝা যাচ্ছিল, এখন একটু নাদা, সাত্ত্বিকভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

'উঠলে?'

'হ্যাঁ, চলি।'

'ক্লাস হয় না, নানা গোলমালে সময় কেটে গেল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত আটকে রাখলাম তোমাকে।'

'আপনি আজ রাত আটটা অব্দি কলেজে থাকবেন?'

'আটটা—নটা—'

কোনো মিটিঙ আছে বুঝি?'

'না, তা কিছু নেই। গভর্নিং বডির মিটিঙের এখনো দশ—বার দিন বাকি। নানারকম কাজ জমে গেছে, বাড়িতে গিয়ে আর কলেজের জের টানতে ভাল লাগে না, এখানেই সেরে যাই।'

'অনেক খাটুনি,' বলে শুরু করতেই দপ্তরি এসে সুইচ টিপে লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, দেখল রমা, 'রোজই রাত করে বাড়ি ফেরেন?'

'না, এই তিন-চারটে দিন শুধু একটু চাপ বেশি; আমি এমনি চারটে-পাঁচটের সময় রোজ চলে যাই।'

'রাজীববাবু তা ফিরলেন না।'

'এখুনি আসবেন। শুক্রবার এই ঘরে আমার অনার্স ক্লাস হবে, বলে দিও মেয়েদের।'

বলে দেবে রমা।

'লুক্রেশিয়সের অর্ডারটা আজ গেল না। কোথায় রেখেছি কাগজটা—ও, এই পোর্টফোলিও ব্যাগের ভেতর আছে।'

'রমা—'

'আজ্ঞে—'

'এই নীল শিশিটা ফেলে রেখে গেলে তুমি;

'ও—' রমা চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল শিশিটা নেবার ইচ্ছা ছিল না তার। কী হবে স্মেলিং সল্ট দিয়ে, কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিরতে হল তাকে। ফিরে এসে শিশিটা কুড়িয়ে নেবার সময় টের পেল তাকিয়ে আছেন। কিন্তু যেন অনেক কালের পৃথিবীর মতন সহজ স্বাভাবিকতায় মাথা কাত করে মেঝের ওপর চোখ রেখে প্রিন্সিপ্যালের চোখের দিকে তাকাতে গেল না রমা।

'রাজীববাবু এসেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। রমা চলে গেছে?'

'অনেকক্ষণ।'

'আমিও রাত আটটা অবদি থাকব আপনার সঙ্গে।'

'আমার কাজ ফুরোতে—' প্রিন্সিপ্যাল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাত নটা—দশটা বেজে যাবে।'

প্রিন্সিপ্যাল কিছু ইশারা-ইঙ্গিত না করলেও নিজের চেয়ার টেনে বসে পড়ে রাজীববাবু বললেন; 'সীমাকে আপনার কেমন লাগে?'

'খুব ভাল।'

'রমা তার পিটিশনে লিখেছিল তার বৃত্তিটা দিতে পারা যায় কি—না।'

প্রিন্সিপ্যাল কাজে ডুবেছিলেন; কোনো উত্তর দিলেন না।

'কিন্তু ওরকম ত কোনো নিয়মটিয়ম নেই—' রাজীববাবু প্রিন্সিপ্যালের দেখা, সই করা কাগজগুলো নিজের দিকে গুছিয়ে আনতে-আনতে বললেন।

'সেই জন্যেই,' কথা বলতে-বলতে হঠাৎ হুঁস হল রাজীববাবুর, থেমে গেলেন।

'রাজীববাবু,' মিনিট পনের পরে প্রিন্সিপ্যাল বললেন।

'আজ্ঞে—'

'কোথাও চেঞ্জে ঘুরে আসুন।'

'চেঞ্জে?' প্রিন্সিপ্যাল যখন মিনিস্টারিয়েল অফিসারদের চেঞ্জে যেতে বলেন সে ত আন্দামানে পাঠাবার শমিল। রাজীববাবু সীমার তিন টাকা দামের ফাউন্টেন পেন দিয়ে নানারকম মুসাবিদা লিখছিলেন, একটু টেঁসে গেলেন অতিব্যস্ততার মাঝখানে।

'কিছু টাকার দরকার, কো-অপারেটিভ থেকে ধার নিন; অসুবিধে থাকলে আমি সুপারিশ করে দেব।'

'সীমা বি. এ. টা দিয়ে নিক।'

'সীমা এইখানেই থাকবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি একা যাব?'

'মানুষ ত একটা পরলোকেও যায়, এ ত চেঞ্জ।'

শুনে রাজীববাবুর সুবিধার লাগল না।

আট-দশ দিন পরে সিদ্ধার্থকে রমাদের পাড়ার ওদিকে যেতে হল; প্রভাসবাবু বা রমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ঠিক নয়, অন্য কাজ ছিল।

আরো কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছেন প্রভাসবাবু, বাড়িতেই ছিলেন তিনি। কলেজেও চার-পাঁচ দিন ছুটি। দুপুরবেলা জানালার পাশে খবরের কাগজ পড়ছিল রমা। কলকাতার দৈনিকগুলো এখানে বেলা এগারটা-বারটার সময় এসে পৌঁছয়, কলকাতার সোমবারের কাগজ এখানে মঙ্গলবারে আসে। এইমাত্র দিয়ে গিয়েছিল কাগজ রমার হাতে সাইকেল থেকে নেমে খবরের কাগজওয়ালা। এ বাড়িতে খবরের কাগজ যে প্রথম কুড়িয়ে পায় সেই পড়ে; যেদিন রমার হাতে এসে পড়ে প্রথম, সেদিন রমাই পড়ে নেয়, প্রভাসবাবু অপেক্ষা করে থাকেন; প্রভাসবাবুর হাতে এলে রমা সরে থেকে অপেক্ষা করে বটে, তবে কাগজের মোটা খবরগুলো যেন বাবা হাঁকডাক পেড়ে আগেই তাকে বলে না দেয় এই অনুরোধ রয়েছে।

প্রভাসবাবু আর-একটা জানালার পাশে খাটের ওপর বসে একটা মোটা বইয়ের ওপর ডাককাগজ রেখে চিঠি লিখছিলেন। চমশার ফাঁক দিয়ে দূরে রমার হাতে খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন কি-না ভাবছিলেন, কিন্তু মেয়েকে খুব নিবিষ্ট হয়ে পড়তে দেখে কিছু বললেন না।

রমা পড়ে নিক, তারপর পড়া যাবে। চিঠিগুলো জরুরি; সেরে ফেলেছেন প্রায়, আরো খানিকটা সময় লাগবে অবিশ্যি, এই শেষের চিঠিটা বেশ ভেবে লিখতে হবে। শুরু করেছেন, কিন্তু কলম এগচ্ছে না। যা মনে আসে সে কথা লিখলে চলবে না এ-চিঠিতে, মনের সবচেয়ে যুক্তিগম্ভীর কথা লিখতে হবে সবচেয়ে সহজ স্পষ্ট কোমলতায়। কিন্তু সাহিত্যিক তিনি নন, অভিজ্ঞ সংসারী মানুষ, লেখার মান ওদের চেয়ে আলাদা; মনে ওদের মত অতটা খুঁতখুঁতানি নেই; লিখতে বেশি কিছু বেগ পেতে হচ্ছিল না তাই তাকে।

কীই-বা খবর থাকবে কাগজে আজকাল আর।

দেশ ত স্বাধীন হচ্ছে।

মুখ তুলেছিলেন, মাথা কাত করে নুইয়ে চিঠি লেখায় মন দিলেন আবার কেমন বোবার মত লিখে যাচ্ছেন তিনি, কেমন নিরেট বোবার মত খবরের কাগজটা পড়ে যাচ্ছে রমা। পৃথিবীর চাকা ঘুরছে। বনবনানির পাতা ও বাতাসের সাড়া ছাড়া এইখানে বাসমতীর দুপুরের চরাচরে কেমন একটা নিরাবিল নিঃশব্দতা।

ভালোরির সাইকেলটা মাটিঘাসের রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল; চাকা যে চলছে, প্যাডেল ঘুরছে, মানুষ সাইকেলে চড়ে দিগন্তের দিকে রওনা হয়েছে—এই মন নিয়ে একটা 'টু' শব্দ পর্যন্ত নেই। অথচ খুব ছোট কাজ হাসিল করতেই চলেছে কি ভালোরি? অতদূর পৃথিবীর থেকে এখানে এসে একটা খ্রিস্টিয় মিশন আস্তে-আস্তে গড়ে তুলে দাঁড় করিয়ে রাখবে। রোদের ভেতর ভালোরি ও তার সাইকেলের ছায়াটা কেমন এবড়ো—খেবড়ো পথে দুমড়ে মুচড়ে পালিশ হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল, মনের ভেতর একটা চিত্রখণ্ড রয়ে গেল তবু। দেখছিলেন, পোষণ করছিলেন প্রভাসবাবু।

'রমা—'

'কী বলছ?'

'বার্থেলো কি ফিরে এসেছে?'

'আজ-কালই ত আসবার কথা।'

'এসেছে কি—না ঠিক বলতে পারছ না?'

'না।'

'মাদাম ভালোরি আছেন?'

'জানিনা।'

'বার্থেলো কি কলকাতায় গিয়েছিল?'

'কলকাতার থেকে ভিজিগাপট্টম, মাদ্রাজে যাবার কথাও ছিল, আমাকে বলেছিলেন, ফেরেন নি হয় তো।'

'তুমি যাওনি ওদের মিশনে?' প্রভাসবাবু বললেন।

রমা খবরের কাগজের দিকে চোখ ফিরিয়ে আস্তে-আস্তে বললে না—মিশনের ঘরবাড়ি ওঠেনি এখনো, কতগুলো খড়ের ছাউনি। খড় ঠিক না, সুন্দর নতুন ছনেব চাল। বেশ সোনালি দেখায়, খুব পুরু ছাউনি, দূর থেকে দেখেছি আমি।'

'ভেতরে ঢোকনি এখনো?'

'না, মাদাম ভালোরির সঙ্গে একদিন যাব ভাবছি। কিন্তু ওরা ত আসছেন না আজকাল আর এদিকে—'

'কেন?'

'বার্থেলোই আসত। কিন্তু সে ত নেই বাসমতীতে। ভালোরিরা বোধ হয় নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত।'

'তাছাড়া সাহেবরা আদান-প্রদানের রেওয়াজ মানে, মানে না?' প্রভাসবাবু হাতের চিঠিটা শেষ করবার আগে এতক্ষণের টানা নিঃশব্দতার মৌরসি বাঙবার প্রয়োজনবোধ করে বললেন, 'ওরাই আসবে, আমরা কেউ যাব না—এরকম একতরফা চালচলন ওরা পাদ্রি হলেও মানবেন কেন? আমাদের কারো যাওয়া উচিত।'

'তুমি যেও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি গিয়ে কী করব?'

'ওরা বাংলা জানে।'

'ইংরেজি জানি না আমি?'

'ইংরেজের সঙ্গেও ইংরেজি বলা কঠিন, কিন্তু ওরা ত ফরাসি। বলতে পারবে?'

প্রভাসবাবু এক লাইন লিখে একটু থেমে দেড় লাইনের কথাটা শেষ করলেন চিঠির কাগজের ওপর। ঘাড় তুলে বললেন, 'কিন্তু বার্থেলো আর-এক রকম মানুষ।'

রমা কাগজ পড়ছিল; কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না তার দিক থেকে।'

'বার্থেলো এখানে ফিরে এলে—'

'আমার পড়া হয়ে গেছে। পড়বে তুমি কাগজ?'

'আমি বলছিলুম বার্থেলো ভালোরিদের মত নয়। এখানে এসে প্রথমেই আমাদের সঙ্গে দেখা করবে।'

'ও—এ বাড়িটা বাসমতীর বনবিবিতলা বুঝি?'

'বাজে মানসম্মানের কোনো ভেকটেক নেই ছোকরার। কিন্তু ফালতু নয়, লেখাপড়া করেছে, মর্যাদা আছে, কিন্তু গুমর নেই ঐ মেয়েমানুষটার মত।'

'কে মেয়েমানুষ?'

'মাদাম ভালোরির কথা বলছি—'

'কোথায় আলাপ হল তার সঙ্গে তোমার?'

'হয় নি। ও আর ওর কর্তা যেচে আলাপ করে না কারো সঙ্গে। সাহেব হাঁ করে মাঝে-মাঝে বোকা ধনেশের মত হাসে বটে, ইংরেজি রপ্ত নেই, বাংলা শিখছে সবে, কী করবে দিশে পায় না; মানুষ খারাপ নয়। কিন্তু ওর গিন্নিটা নাক উঁচু করে চলে।'

'ফিরেও তাকায় না বুঝি তোমার দিকে?'

'না, সে কথা হচ্ছে না।'

'আমার সঙ্গে ত বেশ আলাপ জমায়,' রমা খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে বললে, 'মাদাম ভালোরি।'

'তা জমায় বটে—' প্রভাসবাবু ডাককাগজের ওপর কী লিখবেন কী লিখবেন কিছু ঠিক করতে না পেরে যা লিখলেন, সেটা কেটে ফেলে রমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সেটা তুমি মেয়ে বলেই সম্ভব হয়েছে। আমার মনে হয় মাদাম ভালোরি ফরাসি নয়।'

'কেন?'

'ফরাসি মেয়েরা অন্যরকম।' যেন প্যারিস ঘুরে এসেছেন এইরকম জ্ঞান—গম্ভীর মুখে বাইরের মেহেদি-শিশু-জামরুলের ভেতরে-ভেতরে ঘাসধূলোয় মানুষের পায়ে চলা পথে, পায়ের চেয়ে সাইকেলের, বার্থেলো-ভালোরিদের সাইকেলের, রবার টায়ারেরই ছাপ বেশি, কেটেকুটে কত রকম আঁকিবুকি হয়ে কত-যে রিবনের মত কত দিকে চলে গিয়েছে সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার চিঠির দিকে মন ফিরিয়ে এনে বললেন।

'ফরাসি মেয়েদের কথা কে বললে তোমাকে?'

'আমি জানি।'

'সিটি কলেজে ত পড়েছিলে, সে-চৌহদ্দির বাইরে জীবনে কোথাও যাও নি ত কোনোদিন। ফরাসি মেয়েদের জান তুমি? তুমি ত হেরম্ববাবুর প্রিয়পাত্র ছিলে?'

'প্রিয়পাত্র হতে চেষ্টা করেছিলাম এক সময়, কিন্তু হতে পেরেছিলাম কি—না, হওয়ার সার্থকতাই-বা কী', প্রভাসবাবু বললেন।

'ইউরোপ-টিউরোপ ঘুরেছেন তিনি। প্যারিসেও বেড়িয়েছেন, আমাদের দেশের শিক্ষা ও ধর্মের সেবক হিসেবে। কিন্তু ফোর্থ ইয়ারের টিউটোরিয়াল ক্লাসেও প্যারিসের মেয়েদের কথা বলবার লোক নন তিনি।'

কী তিনি আর কী নন সেটা ক্রমে-ক্রমে বেশ ভাল করেই জানা আছে প্রভাসবাবুর। ও নিয়ে রমা যেন কথাটথা বলে না।

'তোমার কাগজ পড়া গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'নতুন খবরটবর কিছু আছে?'

'পাকিস্তান হবে মনে হচ্ছে।'

'পাকিস্তান না হয়ে দেশ স্বাধীন হতে পারবে না?'

'না। এ দেশে ত কোনো লিংকন নেই।'

'লিংকন? প্রভাসবাবু চিঠি লেখায় মন দিয়েছিলেন আবার, চশমার ফাঁক দিয়ে রমার দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন, 'কেন, গান্ধি আছেন।'

'আছেন।' রমা কাগজ কুড়িয়ে নিল আবার। প্রভাসবাবু ছুঁইয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তর্কের সূত্রটা ধরল না সে। প্রভাসবাবু কথাটাকে ফুরোতে না দিয়ে বললেন, 'তাছাড়া কংগ্রেসের ওঁয়ারা ত সকলেই আছেন।'

'আছেন।' কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রেখে দূরের জাম-কাঁঠাল-নিমের ভেতরের চিলতি ধুলোঘাসের রাস্তার ওপর দিয়ে একটা সাইকেল এগিয়ে আসছে, মাদাম ভালোরির, মিশনের দিকে। তাকিয়ে দেখে, ভালোরিকে না দেখবার ভান করে প্রভাসবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে রমা বললে, 'কিন্তু লিংকনের পদ্ধতি অন্যরকম ছিল।'

'ঘরোয়া লড়ায় দেশ জ্বালিয়ে দেবার?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু আমেরিকা ত একা।'

'বাইরে এক, কিন্তু ভেতরে কিরকম?' এ-সব পোলিটিক্সের কচকচানি না করে চিঠি কাটাকুটি কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন কাগজে চিঠিটা লিখে শেষ করাবার সংকল্প করতে-করতে প্রভাসবাবু বললেন, 'ও-সব রক্তের সমুদ্দুর ডিঙিয়ে এক হয়ে থাকবার দরকার নেই।'

'নোয়াখালি, কলকাতায় কি কম রক্ত ঝরছে?'

'তোমার কাগজ পড়া হলে দিও আমাকে।'

'হয়েছে।'

'চিঠি লিখে শেষ করে নিই।'

'ভালোরিকে খুব চিন্তিত দেখলাম।'

'কত্তাকে?'

'না, মাদামকে—'

'কোথায়?'

'এই ত সাইকেলে মিশনে ফিরলেন। আমি ওদিকে তাকিয়েছিলাম চোখে চোখ পড়তেই আমাকে কী যেন বলবেন মন হল, কিন্তু আমি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নেওয়াতে বলা হল না। উনি তাড়াতাড়ি প্যাবডেল করে মিশনে চলে গেলেন। জিনিসটা খারাপ হল। ভাবলেন হয় তো তাচ্ছিল্য করলাম। আজ রাত্রে মিশনে একবার যাব ভাবছিল।'

'কে তুমি?'

'হ্যাঁ, এতদিনেও একবার যাওয়া হল না, সেটাও খারাপ হল।'

'যাবে, যাও, কিন্তু ও কিছু মনে করে নি। যদি মনে করে থাকে তাহলে ক্যানাডা থেকে এত দূরে মিশনারি হয়ে এসে ও মিছেই খেলা করছে। ওর হয়নি তাহলে কিছু, কোনো আত্মিক লাভ হল না।'

'আমাদের সেই হ্যারিকেনটা আছে?'

'সেই ক্ষমার বিয়ের সময় যেটা কিনেছিলাম?'

'দেখছি না সেটা।'

'উঠিয়ে রেখেছি। আছে।'

'ঝেড়েপুছে পরিষ্কার করে নিতে হবে। আলো হাতে ওদের উঠোনে গিয়ে উঠতে হবে। অন্ধকারে ওরা চলাফেরা পছন্দ করে না। বার্থেলো একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসে।'

'টর্চ নেই বার্থেলোর?'

'আছে হয় তো; কিন্তু এ দেশে একটা কুপিপিদিম পণ্ঠন নিয়ে চলাফেরার নিয়মটাই আমাদের নিজেদের। এখন ত বুঝেছ; সেইজন্যই দিশি মানুষের মত লণ্ঠন হাতে করে খুব চুপচাপ ঠাণ্ডা একাগ্র হয়ে আসে।'

'রমা বলে,' ওকে যদি বলা যায় যে রাতের বেলা কেরোসিনের কুপ হাতে করে চলাফেরা করলে এ দেশের অন্ধকার দেশাত্মাকে আরো ভাল করে বুঝবে তুমি বার্থেলো—তাহলে তাই করবে।'

'হুঁ?'

'বার্থেলোর একটা রকম আছে।'

প্রভাসবাবু বললেন, 'যা বললে তাতে খাঁটি সন্নেসি বলে মনে হয়।'

'সব দিকেই খুব পরিষ্কার বুদ্ধি খেলে। এমন-কি ঘোড়েল পর্যন্ত বলতে পারা যায়; কিন্তু তবুও—' রমা বললে, 'কোনো চেষ্টাচরিত্তির না করেই বার্থেলো বড় ভাল লোক।'

'আজ রাতে যাবে তুমি মিশনে?'

'হ্যাঁ—যাচ্ছি।'

'বার্থেলো যদি ফিরে থাকে, তাহলে কাল একবার তাকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলবে?'

'বলব।'

'মাদাম ভালোরি বাপের দিক দিয়ে সত্যিই ফরাসি কি-না সেটা জেনে আসতে পারবে ত রমা?'

না জেনে যদি ফিরে আসে তাহলে আজ রাতে রমার ক্যানাডিয়ান মিশনে যাওয়া ততটা সার্থক ঠেকবে না বুঝি প্রভাসবাবুর চোখে; মানুষের মনের কাছে কোনো জিনিসই অবান্তর নয়, ঐ মহিলার সঙ্গে কোনোদিন কথাও কইবে না বাবা, কিন্তু তবুও জেনে আসা দরকার মেয়েটি ফরাসি কি-না; ফরাসি নয় বলেই ত ধরে নিয়েছেন, রমা ফিরে এসে তার বাবাকে বলবে যে চেক বা বুলগার বা পোলিশ, ফরাসি ভদ্রলোককে বিয়ে করে প্যারির সালঁর থেকে তাকে কানে ধরে টেনে এই বাসমতীর জঙ্গলে এনে ফেলেছে। শুনে খুশি হবেন; কিন্তু এর কমে খুশি হবেন না। মেমসাহেবটিকে প্রথম দৃষ্টিতে যা ভালবেসে ফেলেছেন তার বাবা!

'হ্যাঁ, জেনে আসব,' রমা বললে, 'তোমার সঙ্গে আলাপও করিয়ে দেব।'

'কার?'

'ঐ ফরাসি স্ত্রীলোকটির।'

'না, কোনো দরকার নেই, প্রভাসবাবু একটু ক্ষেপে উঠে যেন বললেন। তারপর চিঠিতে মন দিয়ে বললেন, 'স্ত্রীলোকটি ফরাসি হলেও-বা পারে; কিন্তু বাস্তবিকই যদি তুমি বাজি ধরে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও আমি বলব ও ফরাসি নয়। বেশ ধরো, আমার চেয়ে যদি বেশি মুন্সী হয়ে থাক এখুনি দশটা টাকা পেয়ে যাবে,' বলতে-বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠির কাগজ সরিয়ে ব্যাগ থেকে দু'টো কড়কড়ে পাঁচ টাকার নোট হাতের কাছের তেপয়ের ওপর দোয়াত-চাপা দিয়ে রেখে রমার দিকে যেন তার পিঠোপিঠি ভাইয়ের মত কেমন একটা সন্তপ্ত কটাক্ষে তাকিয়ে রইলেন।

'বাব্বা! এত।'

'ও সাহস হল না বুঝি?'

'টাকা সাজিয়ে রেখেছ, লোভ হয়; কিন্তু কী করেছিল বল ত মেমসাহেব, এত খাপ্পা তার ওপর?'

'কিছু করেনি। কিন্তু কাউকে-কাউকে দেখেই হয়ে যায় আর-কি?'

'আচ্ছা আমি জেনে আসব উনি ফরাসি কি—না।'

'তারপর বার্থেলোকে জিজ্ঞেস করব আমি,' প্রভাসবাবু বললেন,' টাকা দশটা তুমি নিয়ে নাও।'

'এখনি কেন? দেরি আছে ত বার্থেলোর কলকাতার থেকে বাসমতীতে ফিরে আসতে।'

'নিয়ে রাখো টাকা; পরে মীমাংসা হলে সময় বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। আর কিছুর জন্যে নয়, ফরাসিরা শুনেছিলাম মানুষের মত। মানুষ হিসেবে মানুষকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা, ও-সব বড় কথা। কোনো জাতিই তা পারেনি, কোনোদিন পারবেও কি—না সন্দেহ। দু-চারজন প্রেমিক মানুষ অবিশ্যি তা পেরেছেন। কিন্তু প্রায়ই সাদাজাতিরা অন্যদের ঘৃণা করবার ব্যাপারে যে সিদ্ধিলাভ করেছেন, শুনেছি ফরাসিরা ততটা পারেনি। কী শুনেছ তুমি?'

'কানাঘুষোর মতন শুনেছিলাম ওরকম একটা কথা, ঠিক জানি না কিছু—'

'আমি শুনেছিলাম। সেই জন্যই ফরাসি ক্যানেডিয়ান মিশনের কথা যখন বললে ভাল লাগল আমার। কিন্তু মেমটাকে দেখে সুবিধার লাগল না; কিন্তু আমি কি মেয়েদেরই বরদাস্ত করতে পারছি না আজকাল? হৃদয় মন-টনই বদলে যাচ্ছে।'

বলা শক্ত—' রমা খবরের কাগজটা ভাল করে ভাঁজ করে রাখতে-রাখতে বললে, 'শিগগির কোনো স্ত্রীলোকের সম্পর্শে আসনি তুমি। আমার মনে হয় ফরাসি মেয়েটিকে ক্রমে-ক্রমে ভাল লাগবে তোমার। না ভাল লাগলেও এতটা অশ্রদ্ধা থাকবে না। নিতান্তই চোখের শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার ওপর আজকাল খুব বেশি নির্ভর কর তুমি। চোখ নয়। আমাদের মন—' রমা কথা বলাবার মাঝখানে খোলা দরজার ভেতর দিয়ে সিদ্ধার্থ এসে দাঁড়াল ঘরের ভেতর; সে যে বাইরের থেকে ভেতরে আসছে, সিঁড়ি বেয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকছে, কোনোরকম শব্দই পায়নি রমা। সেন কি ঘাসের ওপর থাবা ফেলে হাঁটে, না বাবাকে লক্ষ্য করে রমার নিজের স্বগত কথা বলা—টলা মাঝে মাঝে বেশ জমে ওঠে, খানিকক্ষণের জন্যে তাকে কালা করে রাখে।

'এসো সিদ্ধার্থ,' হাতের চিঠি সরিয়ে রেখে প্রভাসবাবু বললেন, 'তোমার কথাই ভাবছিলাম। দাঁড়িয়ে রয়েছ?'

'সিদ্ধার্থ ভাবছিল সে এখনই এখানে বসবে কি-না, না পাশের মিশন থেকে আগে একটু ঘুরে আসবে; মিশনের পাদ্রীদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলা দরকার, মনে-মনে সংকল্প করেছিল, রমাদের বাড়িতে ঢোকবার আগে। মিশনে যায়নি সে কোনোদিন, পাদ্রিদের কাউকে চেনেও না; তবে একটা দরকারে আজ যাবে ভেবেছিল। চলেছিলও মিশনের দিকে; জানালার ভেতর দিয়ে প্রভাসবাবুকে দেখা গেল, কী যেন লিখছেন; কেমন যেন একটা শান্ত আত্মগত ভঙ্গিতে কথা বলছে রমা টের পাওয়া গেল, কোনো রোগীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে মনে হল; এ বাড়িতে কারো অসুখবিসুখ করেছে নাকি? প্রভাসবাবুকে ত বেশ সুস্থ স্বাভাবিক দেখা যাচ্ছে। ভাবতে-ভাবতে মিশনে যাবার পথে আগেই রমাদের বাড়িতে একবার উঁকি দিয়ে দেখবার জন্যে ঢুকে পড়েছিল সিদ্ধার্থ। 'তুমি সেই যে চলে গেলে—' প্রভাসবাবু বললেন, 'আর এই কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে, আমরা আছি কি নেই, একবার খোঁজ খবর নিতে হয় না?'

'পোস্ট অফিস ছুটি আজ?'

'বোসো। আমি ছুটি নিয়েছি।'

'শরীর অসুস্থ হয়েছে?' সিদ্ধার্থ হাতের কাছে একটা জারুল কাঠের চেয়ারে বসে বললেন।

'না, ততটা নয়। তবে হাঁটতে-চলতে কষ্ট হয়, বাতে কষ্ট পাচ্ছি দু-পায়ে বাত; বাতের কোনো ওষুধ জান তুমি?'

'হ্যাঁ, যা ধন্বন্তরিত মত কাজ করে।'

সিদ্ধার্থ হেসে বললে, 'শুনেছি ধনেশ পাখির তেল আছে—শুনেছ নাকি রমা?'

'না ত। সে আবার এক রকম পাখি আছে নাকি?' রমা বললে।

'হ্যাঁ শুনেছি,' প্রভাসবাবু বললেন, 'কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সে তেল?'

'এই ত বছর পাঁচেক আগেও ত এমনি দুপুরবেলা বাসমতীর রাস্তায় ফিরি করে বেড়াত, কিন্তু সে-সব লোকদের অনেক দিন ত দেখি না,' সিদ্ধার্থ বললে, 'হয় তো কোনো মাড়োয়ারি ওদের ব্যবসা কিনে ফেলে পেটেন্ট করে নিয়েছে।'

'মানে ভেজাল চালাচ্ছে? সেঁটে?'

'তা আর বলতে।'

'খাঁটি জিনিস পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না এখন আর।'

'না, পৃথিবী ঢের সেয়ানা হয়ে গেছে,' সিদ্ধার্থ বললে, 'এই ত্রিশ বছর আগেও আমাদের ছেলেবেলায় মারাত্মক রকমের সরল ছিল। আমি বাসমতীর কথা বলছি। কিন্তু সে বাসমতী নেই এখন আর।'

'কলকাতা হয়ে উঠছে।'

'হ্যাঁ। তাই ভাবছি এ আখড়া ছেড়ে দিয়ে সেই পীঠস্থানেই চলে যাই।'

'কলকাতায় যাবে তুমি?' রমা বললে।

'ভাল কাজ পেলে চলে যেতাম। এখন ত ব্রিটিশ আমল চলছে, আমার জন্য কোনো কাজ বসে নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শিগগিরই ত দেশ স্বাধীন হবে।'

'সে ভিড়ের মধ্যে আমাদের কোনো স্থান হবে না।'

'এই বলছ? কী করে বুঝলে?' রমা বললে, 'চোখে বুঝি দূরের জিনিস দেখতে পাও?'

'সিদ্ধার্থ কাঠের চেয়ারে বসেছিল, ছারপোকায় কামড়াচ্ছে মনে হল, পাল্টে ডেকচেয়ারে বসল।

'স্বাধীনতার ভিড়ে চাপা পড়ে যাবে মনে করছ?'

'হ্যাঁ, নির্ঘাত। মিলিটারিতে চেষ্টা করলে অবিশ্যি কমিশন পাওয়া যেত, মনে হচ্ছে, কিন্তু আমার বয়স নেই। অন্য কোনো কাজ পাওয়া যাবে না। যে-সব ছেলেদের পরীক্ষার খাতা দেকে ঘেন্না ধরে গেছে, চাকরি ও ব্যবসার বাজারে ওদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল; কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে ওরা পথ কেটে নিতে জানে, স্বাধীন ভারতে ওদের সুবিধা হবে।'

'ওদের সুবিধে হবে বলতে চাও বুঝি তুমি?' রমা যেন অবহিত হয়ে স্ফটিকের ভেতর দিয়ে গ্লানিকর ভবিষ্যৎটাকে দেখে, তবুও সেটাকে অবিশ্বাস করবার চেষ্টা করে বললে।

'হ্যাঁ, ওদের; আর ওদের মতন ছোকরা আর বুড়োদের। কিন্তু আমাদের কোনো মীমাংসা হবে না। মীমাংসার ভার যাদের ওপরে বাংলাদেশের সে-সব অন্ধদের ত এখনই দেখছি আমি; রাতারাতি ভোল বদলাবে এরা। এদের আওতায় সমস্ত দেশ অন্ধ, খোঁড়া, নুলো, বোবায় ভরে যাবে টাকা চাকরি ব্যবসা, সবই ওদের; দেশ স্বাধীন হল বলে ভালো লাগবে আমাদের; কিন্তু অন্য সব দিক দিয়ে খুবই খারাপ লাগবে। সপরিবারে মরেও যেতে পারি। বাসমতীতে কলেজের কাজে থাকলে খেয়ে বেঁচে থাকার খানিকটা সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু কলকাতায় গেলে সপরিবারে শেষে মারা যাব কিংবা টি-বিতে না খেতে পেয়ে; স্বাধীনতার কোনো সেবকও আমাদের দিকে ফিরে তাকাতে যাবে না।'

শুনে প্রভাসবাবুর খুব খারাপ লাগল, কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইলেন না তিনি। কী হবে, না হবে সিদ্ধার্থ এত আগের থেকে কী করে তা বলে। ভবিষ্যৎ দেখবার বিশেষ শক্তি কোনো সাধুমহাত্মার থাকতে পারে বটে, কিন্তু সিদ্ধার্থ ত সহজ সিধে পথের মাস্টার।

'তুমি মিছে ঘাবড়াচ্ছ সিদ্ধার্থ,' প্রভাসবাবু বললেন, 'ওরকম কিছু নয়। দেশ স্বাধীন হলে সবই খুব ভাল হবে।'

'তা হবে—' রমা হেসে বললে, 'তুমি ব্রিটিশ সরকারে নিমক খেয়েছ এতকাল, স্বাধীন কর্তারা এসে তোমার পেনসন কেড়ে নেবে না। পুলিশ সেক্রেটারিয়েট সবই বেশ জুতিয়ে সুখে থাকবে।'

'জুতিয়ে?' প্রভাসবাবু বললেন, 'তাহলে দুঃখ হবে কাদের?'

'যারা দুঃখের জন্য জন্মেছিল তাদের।'

'ওরকম করে বললে বুঝব না রমা, একটু তাকিয়ে বলো।'

'ব্রিটিশ আমলে যারা ঘাড় পেতে দুঃখ সহ্য করছিল এবারেও বহন করবার ক্ষমতায় খুব সম্ভব আরো বেশি দুঃখ সহ্য করতে হবে তাদের; কিন্তু আরো খানিকটা চোখ খুলে যাবে তাদের, মানুষের জীবন সম্বন্ধে, আশাও আশাবাদ সম্বন্ধে যা ভুল বুঝেছিল শুধরে নিতে পারবে, আরো স্পষ্ট একটা দার্শনিক সংস্থানে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে মনে হচ্ছে।'

'তাতে কী সুখ হল?'

'সুখ এদের জন্য নয়।'

'তাহলে শান্তি।'

'না, তা নয়।'

'তবে?'

রমা বললে, 'এরা যা দেখলেন—বুঝলেন সে—সম্বন্ধে যদি কিছু লিখে রেখে যেতে চান তাহলে আমাদের দেশের আগের কালের পণ্ডিতেরা যা রেখে গেছেন, কিংবা ইউরোপের স্পিনোজা, ফ্রয়েড, মার্কস, আইনস্টাইন-সে-সবের চেয়ে নতুন কিছু লিখে যেতে পারবেন বলে মনে হয় না; এও এক বিষম দুঃখ। কিছু লিখে রেখে যেতে পারবে তুমি সেন?'

'কে? আমি? কিছু বিবৃতি লিখে যেতে পারি। কিছু যা দেখেছি, বোধ করেছি, তা গুছিয়ে লিখতে পারলে আমাদের এই শান্তির দেশে বসেও একটা ওয়র অ্যান্ড পিস লেখা যেত।'

'অথবা অ্যানা ক্যারেনিনা?' রমা বললে।

'ক্যারেনিনা লেখবার মত অবস্থান অভিজ্ঞতা আমার নেই।'

'পরে হবে।'

'হতে পারে,' সিদ্ধার্থ তার প্রিয়পাত্রের মত এদিককার জানালার বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু টলস্টয় ত আর কলম আমাকে দেবে না।'

'আমার একটা চুরুট আমি তোমাকে দিচ্ছি,' প্রভাসবাবু বললেন।

'কিংবা আজ অবদি ইউরোপে বিজ্ঞান দর্শন যতদূর এগিয়েছে,' প্রভাসবাবু হাত থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিতে-নিতে সিদ্ধার্থ বললে, 'তার ওপর ভিত্তি করে শিগগিরই নতুন দর্শন তৈরি হবে। আমরা কেউ তার প্রথম খসড়া লিখে যেতে পারতাম। অনুভব করেছি, বুঝেছি, কিন্তু কলমের শক্তি নেই।'

'শক্তি আছে।' রমা বললে।

'আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু অবসর নেই।' রমা বললে, 'টাকা নেই, লাইব্রেরি নেই; ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মত লাইব্রেরির দরকার ত।'

'এ-সব থাকলে হত কিছু?'

'আইবুড়োও থাকতে হত তোমাকে। টাকার কথা ত আগেই বলেছি। লিখতে বসে পারিপার্শ্বিকের বাধাবিপত্তির বাইরে থাকতে হত।'

'ওয়র অ্যান্ড পিস তৈরি হত বুঝি তাহলে?'

'তুমি এ যুগের ফিলসফির নতুন খসড়া তৈরি করবে বলছিলে—' চুরুটটা ধরাবার জন্যে দেশলাই জ্বালিয়ে সিদ্ধার্থ বললে, 'অ্যানা ক্যারেনিনার কথা বলছিলে ত বুঝ,' কাঠিটা জ্বলে উঠে একটা উড়ো বাতাসে নিভে গেল।

'তুমি সিদ্ধার্থকে আইবুড়ো থাকতে বললে কী হিসেবে রমা?'

কুড়ি বছর আগে রমার কুড়ি বছর বয়স থাকলে হিসেবটা বাবাকে বুঝিয়ে দিতে পারত রমা। কিন্তু এখন অন্যরকম ভাবে হিসেব কষে দিতে হবে, বুঝবেন না হয় তো তিনি।

'যারা বড়-বড় বই লেখে তাদের পারিবারিক জীবন প্রায়ই থাকে না, কিংবা থেকেও থাকে না—' রমা প্রভাসবাবুকে খুব সম্ভব অজ্ঞাত এক রকম সত্যের মোটামুটি একটা আভাস দিয়ে বললে।

'ও-সব মানি না আমি,' প্রভাসবাবু বললেন।

'সেন ত মানেন।'

'মানবার ইচ্ছে ছিল,' সিদ্ধার্থ বললে, 'কিন্তু শক্তিতে কুলোল না।'

'কিন্তু তুমি শুধু পারিবারিক মানুষ?' সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞেস করল রমা।

'হতে হয়েছে ত,' সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'তবে পরিবারের প্রতি টান রয়েছে বলে যে এরকম হয়েছে, তা নয়। হয়েছে, ভেসে চলেছি বলে; সেটা খারাপ কি ভাল জানি না। মানুষের মন গতিবান বলেই আমাদের জীবনের বাস্তবতা নদীর মত নয়। নদী তৈরি করতে চেষ্টা করে আমরা প্রায়ই রক্তের নদীই তৈরি করেছি।'

'একটা কথা সিদ্ধার্থ।'

'বলুন।'

'পরিবারের ওপর টান আমারও কমে গিয়েছিল,' প্রভাসবাবু বললেন, 'ওরকম হয়।'

অঙ্কের ভেতর হাল্কা গর্ভাঙ্কের মত মনে হল প্রভাসবাবুর কথাটাকে রমার, কিন্তু সিদ্ধার্থের আগের কথার উত্তরে মনের গাম্ভীর্যে সে কিছু বলতে যাবার আগেই প্রভাসবাবু বললেন, 'কিন্তু সকলের বেলা হয় না, কারো-কারো হয়, যেমন আমার হয়েছিল, তোমার হয়েছে। আমি অবশ্য অনেক স্ত্রৈণ পুরুষ দেখেছি, বিয়ের পরে আট-দশ বছর কেটে গেলেও স্ত্রৈণ, কিন্তু সাধারণত ও-সব সময়ে বৈষ্ণবদের পরকীয়া সাধনাই ভাল লাগে।'

এ-সব কথা রমার কানে গিয়েছেই বলে ভাব দেখাল না, কিন্তু তবুও বললে,

'যেমন মাদাম ভালোরিকে লেগেছে তোমার?'

'না, ওকে নয়,' প্রভাসবাবু বেশি কথা না বলে এক কথায় রমাকে জব্দ করে দিয়ে বললেন, 'ও ত আমার মেয়ের মতন।'

'ভালোরি কে?'

'মাদাম ভালোরি।'

'ও, এই মিশনের।'

'হ্যাঁ, ক্যানেডিয়ান মিশনের পাদ্রি ভালোরি সাহেবের বউ।'

'ও, সিদ্ধার্থ বললে।'

'আমার মনে হয় বউ নয়', রমা বললে।

'তবে?' প্রভাসবাবু বুরুটে টান দিয়ে তাকালেন রমার দিকে।

'ক্যাথলিক মিশনের পাদ্রিরা কি বিয়ে করে?'

'জানি না।' সিদ্ধার্থ বললে।

'আঁরি ভালোরির বোন হতে পারে।'

'বোন হলে ত ও খাঁটি ফরাসি,' প্রভাসবাবু বললেন, 'কিন্তু ওকে তা ত মনে হয় না।'

সিদ্ধার্থ বললে, 'এই মিশনেই যাচ্ছিলাম আমি এখন, সেই জন্যেই এদিকে এসেছিলাম আজ।'

'মিশনে যাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ, মিশনারিদের সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার ছিল। এখন দুপুরবেলা পাওয়া যাবে ওদের?'

'বার্থেলো ত নেই বাসমতীতে; বাকি দু'জনকে পেতে পার। কী দরকার ওদের সঙ্গে?' রমা বললে, 'আমিও ভাবছিলাম আজ রাতে মিশনে যাব।'

'তুমি যাবে?'

'রাতের বেলা', রমা বললে, 'ও, তাহলে মিশনে যাবার পথে আমাদের এখানে আটকে গেছ তুমি?'

'জীবনে কি রকম ভেসে চলেছি তাই বলছি রমা—' সিদ্ধার্থ হাতের চুরুটটা পাশে সিমেন্টের মেঝের ওপর আস্তে রেখে দিয়ে বললে, 'কলেজ ছুটি, আজ সকালে একটি বই নিয়ে বসেছিলাম, কিন্তু চুয়াল্লিশ বছরের গরিব মাস্টারের সংসার, ঘরের ভেতরেরই নানা রকম অসুবিধা অন্ধকারে দুপাতার বেশি এগতে পারলাম না। দুপুরবেলা মনে হল সবাই ঘুমিয়েছে—কিংবা এ পাড়ায় ও পাড়ায় চলে গেছে, অন্তত ঘণ্টাখানেক নিরিবিলি পাওয়া যাবে ভেবে কলম নিয়ে লিখতে বসেছি।'

'কলেজের নোট?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, ব্যক্তিগত মতামতের মত একটা কিছু, প্রবন্ধ নয়, গল্পও নয়, শ্লেষ থাকলেও ভারিক্কে-এমনি সময় রজনী এসে বললে, 'সিদ্ধার্থ আমার গরুটা পাচ্ছি না—'

'রজনী কে?'

'আমার কলেজের এক বন্ধু।'

'রজনী নান্? কেমিস্ট্রির লেকচারার?' রমা বললে।

'হ্যাঁ। রজনী আমার বাড়ির পাশেই থাকে, দশটি ছেলেপিলে, একটা গাই রজনীর; গরুর দুধের ওপর নিরেট শ্রদ্ধা; বলে দুধ না খেলে ছেলেরা বাঁচবে কী করে। গরু হারিয়ে লোকটা পাগল হবার জোগাড়। কলম ফেলে উঠতে হল আমাকে। কিন্তু কোথায় গেছে, কী করে খুঁজে বার করব গরু?'

'খুঁজতে-খুঁজতে আমাদের বাথানে এলে বুঝি?'

সিদ্ধার্থ মেঝের ওপর থেকে চুরুটটা তুলে নিয়ে বললে, 'হিন্দুমহাসভার অনন্ত বিশ্বাস বললে যে গরুটা শালিখডাঙার দিকে যে নতুন ক্রিশ্চান মিশন হচ্ছে সেদিকে গিয়েছে—'

'শালিখডাঙা কোনটা?'

'এই পাড়াটা।'

'এটাকে ত জিরানডাঙা বলে।'

'শালিখডাঙা বলে কেউ-কেউ।'

'তারপরে?

'রজনী বললে, 'অনন্তবাবুর কথা মত আজ সকালেই সে মিশনে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসেছে, কিন্তু মিশনের লোকেরা বলেছে যে তারা কোনো গরু দেখেনি, রজনীকে মিশনের সব ঘাট ঘুরিয়ে দেখিয়েছে তারা, অত বড় গরু কোথাও লুকিয়ে রাখবার জো নেই, রজনীর বিশ্বাস মিশনে গরু নেই।'

'পরের গরু লুকিয়ে রাখবার মানুষ ওরা নয়,' রমা বললে, 'মিশনে গরুর খোঁজে তুমি যেও না সিদ্ধার্থদা।'

'তবে ভালোরির মেম সাহেবকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে পার, 'প্রভাসবাবু বললেন।

হাতের চুরুটে আগুন রয়েছে, না টানলে নিভে যাবে, দু-চার বার টেনে আগুনটাকে চৈতন্যে ফিরিয়ে এনে সিদ্ধার্থ বললে, 'হিন্দুমহাসভার শরৎ ভৌমিকের সঙ্গে পথে দেখা, মহাসভার লোকেরাই দেখেছি এক-আধটা কিনারা বাতলে দিতে পারেন, শরৎবাবু বললেন, শালিখডাঙার ক্রিশ্চান মিশন ত এই বসেছে, ওরা এখনই অত বড় একটা গাই দিয়ে কী করবে, বেঁধে রেখে দুধ খাওয়া ছাড়া? তা ত খাচ্ছে না, রজনী ত নিজের চোখে দেখে এল। গরুটা জিরানডাঙার মোছলমানরাই বেহাত করেছে, মেরেছেও হয় তো, মাংস খাওয়ার জন্য ওরা দুধেল গরুও মানকচু থোড়ের মত খেয়ে ফেলে, ওখানে কুড়ি-বাইশ ঘর কসাই আছে, চামড়ার ব্যবসা করে।'

'ও, এই কসাইরা?'

'হ্যাঁ, এদেরই জিরানডাঙার কসাই বলে।'

'গরু খুঁজলে কসাইপাড়ায়?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম, আমি আর রজনী।'

'কোনো খোঁজ পেলে?'

'না। ওরা বললে যে ওরা গাই বলদ আবাল গরু বকরি সব পয়সা দিয়ে কিনে কাটে, কোনো সড়কের গরু কাটে না। রজনীর গাইগরু যে পথ ভুলে ওদের ওখানে এসে পড়তে পারে সে সম্বন্ধে কোনো কথাই তুলতে দিল না। যতবার কথাটা পাড়লাম ততবার বললে সড়কের গরু জিরান-পাড়ার কসাইরা কাটে না।'

'হুঁ?'

'দু-চারবার দা নিয়ে তেড়ে এসেছিল।'

'তা ত আসবেই', রমা বললে, 'আমি হলেও দা মাঝখানে রেখে কথা বলতাম। ওরা তবু ছেড়ে দিয়েছে তোমাদের; আমি জিরানডাঙার কসাই বাড়ির ছেলে হলে—;

'কেটে ফেলতে সিদ্ধার্থকে?'

হিন্দুমহাসভার শরৎ ভৌমিকের কথায় কী করে তোমরা না জেনেশুনে মোছলমানদের কাছে গিয়ে তাদের কাজকর্মের সময় তোমাদের গরু হারিয়েছে বলে হাঁড়িমুখ করে গিয়ে দাঁড়ালে?'

'শুনে দা নিয়ে তেড়ে এলে?'

'হ্যাঁ, বোঝা গেল আমি আর রজনী নান, আমাদের চেয়ে মোটের ওপর ওরাই ভাল। আমাদের কথাবার্থাতার সব ব্যাকরণ ঠিক ছিল না তখন, অবিশ্যি ভালভাবেই কথা বলতে চেষ্টা করেছিলাম, অনেকেই ওরা মন দিয়ে শুনল, ভাল মনে উত্তর দিল। দলশুদ্ধ দা নিয়ে ছুটে এলেও অস্বাভাবিক হত না, কিন্তু দু-তিন জন হেঁকে এসেছিল শুধু। কিন্তু বাকি কসাইরাই মাঝখানে পড়ে তাদের ঠেকিয়ে রাখল, থামাল। দা বাগিয়ে এসেছিল যারা তারা ঠাণ্ডা হয়ে তামাক খেতে বলল।' সিদ্ধার্থ বললে; 'আমাদের ফিরে আসা উচিত ছিল তখন, কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলাম।'

'কেন?'

'এই একমুহূর্ত আগেই ত পাড়া সরগরম হয়ে উঠেছিল, আমারও রক্ত গরম হয়েছিল খানিকটা। কিন্তু এখন,' সিদ্ধার্থ কী বলবে ভাষা খুঁজতে গিয়ে কিছুই খুঁজে পেল না যেন, বলা হল না তার, শুধু বললে টিপাইয়ের মেঝের ওপর চুরুটটা রেখে দিয়ে, 'মনে হল, সমস্ত কসাইপাড়াটাকে আগের চেয়ে ভাল করে বুঝলাম।'

মেঝের ওপর সিদ্ধার্থের নিভন্ত চুরুটটার দিকে তাকিয়ে রমা বললে 'কী বলতে চাচ্ছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই ত বললাম।'

'প্রকাশ করে বলো।'

'তুমি বলো।'

'আমি ত দেখি নি তাদের।' রমা বললে।

কেউ কিছু বলবার আগে প্রভাসবাবু বললেন, 'দা নিয়ে তেড়ে এসেছিল। ওদের মাতব্বররা মাঝখানে পড়ে থামিয়ে দিল। তারপর একটা কিছু ঘটল, ওদের মনে। চারদিককার আবহাওয়ার ভেতরেও, মানুষের, ইতিহাসের ভেতরেও যেন, যার পরে ওরা আর-এক রকম জিনিস হয়ে গেল। ঠাণ্ডা হয়ে তামাক খেতে বসল তারপর, এটা হল সমস্ত ব্যাপারটার যা পরিণাম, তারই বাইরের অভিব্যক্তি।'

প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ খানিকক্ষণ পরে বললেন, 'হ্যাঁ এই রকমই। হুঁকো, কল্কি, মানুষ তাদের সাদামাঠা বসবার ভঙ্গি, হঠাৎ এমন একটা পটভূমি খুলে গেল এর ভেতর, সেরকম আমি দেখিনি কোনোদিন। জীবনে দেখবও না আর। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।'

'রজনী নান?'

'আমার কাছেই ছিল।'

'কী করছিল সে?'

'সে কিছু দেখেনি।'

'এই পৃথিবীতে, এই সৃষ্টিকেই করুন, যে একটা বিশেষ অর্থের বাহন হয়ে এসেছে মানুষ সেটা তার কেবলি আত্মঘাতের ইচ্ছা, কী সেন?' রমা বললে, 'কিন্তু তবুও পুরোপুরি আত্মঘাত করেনি সে, অনেকখানি করেছে, বাকিটুকুও সেরে ফেলবার বিশেষ তাগিদ রয়েছে। তার, পৃথিবীর নানা জায়গায়ই এই জিনিসের ছায়াছবি এসে পড়েছিল। তুমি রক্তমাংসের মানুষগুলোর দিকে তাকাতে-তাকাতে টের পেয়েছিলে চারদিককার চৈতন্য বিশুদ্ধ হয়ে যেন ছবিতে ফলে উঠেছে। প্রথমে আত্মঘাতের ছবি, তারপরে আত্মরক্ষার, তারপরে ভবিতব্যতার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর অতীত পর্যন্ত খোঁজার ইহলোক বা পরলোক নয় অন্য কোথাও, ঠাণ্ডা হয়ে বসে তামাক খাবার। এটা কসাইপাড়ার ছবি শুধু নয়, সমস্ত পৃথিবীরই। উদ্যম হল, নিরুদ্যম হল, যেখানে বেঁচে থাকা বা মৃত্যু নেই সেই সঙ্গমস্থলে শান্তি হল। পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ, চেষ্টাই হচ্ছে উদ্যম, তারপরে আত্মবিচারে সময়, নিরুদ্যাম, এই সবের অতীত কোনো এই জায়াগয় আমাদের মৃত্যুর আগের শান্তি। পৃথিবী বস্তু নির্দেশ করে শান্তি পেতে চাচ্ছে, রাষ্ট্রে বা সমাজে, কিন্তু সেটা অসম্ভব।'

'মনে হচ্ছে অসম্ভব।'

'নানারকম দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে তবুও যুক্তির হার মানিয়ে এক-আধ মুহূর্তের যে শান্তি আসে সেটাকে চিরস্থায়ী করতে চাচ্ছে তবুও ত মানুষ—'

'দেখা যাক মানুষ কতদূর পারে।'

'তোমার কী মনে হয়?'

'এ পর্যন্ত ত ঠকেছে মানুষের হাতেই।'

'পরে ঠকবে না হয় তো। কিন্তু প্রকৃতির হাতে ঠকবে?'

'প্রকৃতি ত মানুষের হয়ে মানুষকে নাশ করে।'

গরুর কোনো খোঁজ পেলে না সিদ্ধার্থ?' প্রভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন?'

'না। রজনী এখনো খুঁজছে।

'একবার বিইয়ে ছিল নাকি গাইটা? ক সের দুধ দিত? কত টাকা দিয়ে কিনেছিল?'

'কিন্তু প্রভাসবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলে গেল সিদ্ধার্থ। রমার সঙ্গে আর-এক বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল, কিন্তু রমা কিছু বলছে না এখন আর; কী যেন চিন্তাকূটে জড়িয়ে গিয়ে চুপ করে আছে।

'হ্যাঁ এই রকম একটা ছবি দেখেছিলাম আমি—' সিদ্ধার্থ বললে, 'মনে হল যেন মানুষের জীবনের ভেতরে হাত রাখতে পেরেছি। সেই জন্যই জিরানডাঙার কসাইদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, চট করে চলে আসতে পারলাম না।' সিদ্ধার্থ মেঝের টিপাইয়ের ওপর থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিয়ে ছাই-এর দিকে একবার তাকিয়ে চুরুটটা হাতে রেখে দিল; ডেক চেয়ারের ক্যানভাসে মাথা এলিয়ে দিয়ে মাথাটা টান করে খাড়া করল তারপর।

'খুবই সাধারণ মনে হবে তোমাদের, জিরানডাঙার সেই-সব মোছলমান কসাই-কামিনদের দিকে তাকিয়ে থাকা, সাধারণ ত বটেই,' সিদ্ধার্থ বললে, 'কিন্তু আমি ভেবে শেষ করতে পারছি না, কিরকম ধরনের অসাধারণ। আমার খুব বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার আর কল্পনার জীবন। কোনোদিন দেখিনি কিছু, দূর পাড়াগাঁর জঙ্গলে মাঠে গভীর রাতে ঘুরেছি ঢের। কিন্তু আজ ফটফটে রোদের ভেতর এত সব মানুষের ভিড়ে আমার মনে হল এক মুহূর্তের জন্য যেন আদি মর্ম পৌঁছেছে আমার হাতে। কী সে জিনিস, কী মর্ম আর তোমার বাবা ভাল করে বোঝাতে চেষ্টা করেছে; আমি এ সম্বন্ধে পরে লিখব, আজ কিছু স্পষ্ট করে বলতে পারলাম না।'

'তুমি ভূত দেখ নি কোনোদিন?'

'না।' সিদ্ধার্থ বললে।

'আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সিদ্ধার্থ চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চুরুটটা না জ্বালিয়ে প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'ভূত দেখা, তাসের খেলা, ও-সব মোটা কথা। আমি যা দেখার কথা বললাম সেটা আমার মনে হয় সময় সম্বন্ধে একটা নতুন জ্ঞান, জীবনের মানে সম্বন্ধে হঠাৎ একটা অর্থ, প্রতিদিনের দেখা জিনিসকে অন্য জিনিসে দাঁড় করিয়ে স্বরূপের ছবি দেখতে-দেখতে হঠাৎ সত্যস্বরূপকে দেখা ধ্যান করে স্থির করতে যাওয়া এক জিনিস, চোখ মেলে স্পষ্ট দেখে ফেলা অন্যরকম ; আমি সাধারণ জিনিসকে পাঁচজনের মত চোখ মেলে কি রকম অসাধারণ হয়ে উঠল দেখলাম আজ।

'ঈশ্বর আছেন?' প্রভাসবাবু বললেন।

'সত্যস্বরূপ বলতে ঈশ্বর বুঝিনি আমি।'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি আছেন?' সিদ্ধার্থ একটু হেসে বললে, 'তিনি থাকুন।'

'তার মানে?'

'আপনার নিজের জিনিস ত তিনি; আপনি বুঝে দেখুন। আমারটা আমি নিজে বুঝে দেখব।'

'তুমি মান না, জানি আমি,' প্রভাসবাবু বললেন, 'তুমি কিছুই মান না, তবু জিরানডাঙায় তোমার চোখেই পড়ল ব্যাপারটা। আমরা কোনোদিন ওরকম কিছু দেখিনি।'

'কিছুতেই যখন গরুটা পাওয়া গেল না তখন কসাইদের ভেতর দাঁড়িয়ে রজনী কেঁদে ফেলল।'

'হুঁ?' প্রভাসবাবু চুরুটটা তেপয়ের উপর রেখে দিয়ে বললেন, 'আমি মাকে খুব ভালবাসতাম। কিন্তু আমার বাবা আগে মারা গেলেন। এত কেঁদে-ছিলাম তখন যে কিছুকাল পরে মা যখন মারা গেলেন আমি কাঁদতে পারলাম না আর। রজনী নানের বাবার কী হল, গরুর জন্যে কাঁদছে?'

'আপনি পারেনও অধিকারী মশাই।' প্রভাসবাবু তেপয়ের ওপর চুরুটটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি জিজ্ঞেস করছিলাম ওর বাপমার কোনো খেসারত হয়নি ত?'

'আজ সকালে ওর মাকে যে রকম দেখলাম,' সিদ্ধার্থ বললে, 'তাতে ওর বাপের অমঙ্গল হয়েছে বলে মনে হল না।'

প্রভাসবাবু তেপয়ের থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিলেন; নিভে গেছে বলে মনে হচ্ছে না, আধ ইঞ্চি ছাই জমে আছে মুখে। চুরুটটা মুখে দিতে গেলেন না তিনি, হাতেই রইল। ধুলোর রাস্তার ওপর দিয়ে একটা সাইকেল চলে গেল। ক্যাথলিক মিশনের একজন বাঙালি কর্মচারীর; নাকি মদ্রাজি লোকটা? শার্ট আর সাদা ট্রাউজার্স পরেছে, খুব বেশি কাল, মাথার চুল অল্প বয়সেই পেকে গেছে আধাআধি, ভাল করে মানুষটাকে দেখতে-না-দেখতেই সাঁ করে চলে গেল। 'রজনীকে কাঁদতে দেখে জিরানডাঙার একজন কসাইয়ের কেমন যেন মন কেমন করল—' সিদ্ধার্থ প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'বুড়ো রজনীকে জিজ্ঞেস করল আপনার গরুর কি রকম রঙ ছিল, রজনী বললে সাদা; ফয়জুদ্দি বললে কয়েকটা সাদা গরু মেরেছি আমরা, চামড়া তুলে শুকোতে দিয়েছি, আসুন কত্তা আপনার গরুর চামড়া দেখে চিনে নিতে পারেন ত চামড়া মুফতে দিয়ে দেব আপনাকে। কয়েকজন মুফত চামড়া দেবে কোন হিসেবে। ফয়জুদ্দি বললে, কত্তা চামড়া চিনে নিতে পাড়লে তবে ত দেব 'মাক্রা' দেখিয়ে চিনিয়ে দিতে হবে কোন চামড়া আপনার, এখানে দাঁড়িয়ে বলে দিতে হবে আপনার গরুর চামড়ার ওপর কি রকম "মাক্রা" ছিল; চামড়া পরে দেখা আপনাকে, আগে "মাক্রা"র মুশাবিদা হোক।'

প্রভাসবাবু চুরুট জ্বাললেন।

'রজনী বললে, 'আমার গরুর গায়ে কোনো মার্কা ছিল না, পালিশ চামড়া ছিল। কসাইরা একসঙ্গে হেসে ধুম্বল দিয়ে উঠে বললে, তা হতেই পারে না, গরুর চামড়ার দাগ থাকে, দাগি থাকে, চাকচিক্কর থাকে, দগদগে ঘা, কাটা ঘা, নালি ঝাড়ু পাচনের কালশিটে থাকে, সেগুলোর রকমফের থাকে এক-এক বকরির গায়ে এক-এক রকম, বকরির সালিক দেখেই চিনতে পারে। ফয়জুদ্দি কোমরে জোর পেয়ে বললে, আসুন দেখে যান, কোন চামড়া। আপনার কি রকম "নসকা' —কি রকম "মাক্রা" রজনী থ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর কনুই দিয়ে আমাকে আস্তে ঠেলে বললে, চলো সিদ্ধার্থ, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই, এরা একবার বলছে আমার বকরির কথা, আর-একবার বলছে, 'আপনার চামড়া, অবিশ্যি বকরিটা উহ্য, কিন্তু এখন থেকে ওটা আর আমার মাঠে চরবে না বুঝতে পারছি। সব সময়ই উহ্য থেকে যাবে; বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে উহ্যটাও উঠে যেতে পারে। তখন আমার নিজের গায়ের চামড়া বাঁচানো দায় হবে।'

'ও-গরু তালাশ করতে চামড়া বাঁচিয়ে চলে এল বুঝি রজনী নান,' প্রভাসবাবু চুরুটের গ্যাঁজটা জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এরই জন্যে কেঁদেছিল আবার।'

'আমাদের কাঁদা আর হাসা।' সিদ্ধার্থ বললে।

'একটা নতুন চুরুট বের করে প্রভাসবাবু বললেন, 'ফিরে এলে তোমরা?'

'না। ফিরে আসছিলাম, তবে থেমে গেলাম।'

'কিনারা পেলে গরুর?'

'না। শুনলাম ওদের বস্তিতে কলেরা লেগেছে।'

'বেশি?' রমা বললে।

'তিন-চার জনের হয়েছে। জিরানডাঙার বস্তিতে দু'শ-আড়াইশ লোক আছে, রোগটা ছড়িয়ে পড়লে খারাপ হবে।'

'বিশেষ কিছু করবার নেই,' সিদ্ধার্থ বললে, 'কিংবা করতে হলে দিনরাত আগলাতে হয়। ওরা ডাক্তার দেখায়নি, সুধাংশু ডাক্তারের বাড়ি জিরান ডাঙার বস্তিটার চেয়ে বেশি দূরে নয়, মিনিট কুড়ির পথ হবে। তাকেই আনালাম, তার ভিজিট আজকাল আট টাকা হয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'নিলে ভিজিট?'

'কলেরা কেস যে—' সিদ্ধার্থ বললে 'নেবেই ত।'

'কে দিল টাকা?'

'রজনী দিয়েছে।'

'কি রকম অবস্থা রুগীদের?'

'খুব খারাপ।'

খুব ভোগ?'

'বাঁচবে না। সুধাংশু ডাক্তার চলে যাবার সময় বলে গেল সে আর আসতে পারবে না।'

'কেন?'

'কিছু করবার নেই, বললে, এক-আধ ঘণ্টার ভেতরেই মরে যাবে; অনেক আগে ডাকলে চেষ্টা করে দেখতে পারত।'

'খুব খারাপ জাতের কলেরা?'

'তাই ত মনে হচ্ছে।'

'জিরানডাঙাটা ত আমাদের বাড়ির কাছেই—' প্রভাসবাবু বললেন, 'ও-দিককার জানালা দু'টো বন্ধ করে দেবে?'

'জল ফুটিয়ে খান, দুধ নাই-বা খেলেন কয়েকটা দিন। ঘরদোর সমস্ত বাড়িটায় ক্লোরিন দেয়া থাক; ক্লোরিনই ত রমা?'

'আছে ক্লোরিন তোমার কাছে সিদ্ধার্থ?'

'ক্লোরিন কি হবে?' রমা বললে।

'তবে?'

'চলো, জিরানডাঙায় সিদ্ধার্থদা।'

'কেন?'

'আমাদের দেখতে হবে ব্যারামটা ওদের মধ্যে যাতে ছড়িয়ে না পড়ে।' সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'ব্রহ্মারও সাধ্য নেই যে কিছু করে, তুমি আর আমি? এখন উশকে কথা ভাবলে চলবে না, একটু শক্ত হতে হবে। আমি কলেজের কয়েকজন ছেলেকে খবর দিয়েছি, মুসলমান ছেলেরাও আছে তাদের মধ্যে, বলে দিয়েছি ওদের যে, রুগীরা মরে গেলে তাদের কাপড়চোপড় বিছানাপত্তর সব যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়, কসাইরা যাতে বাঁধা না দেয়। তাদের জিনিসের জন্যে কসাইদের আমরা ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা দেব। সমস্ত কসাইপড়াটায় অ্যান্টিসেপটিকের ব্যবস্থা করতে বলেছি, যতদূর পারা যায়, বেশি কিছু পারা যাবে না, বাসমতীতে আজকাল ওষুধবিষুদের চালান খুব কম।'

'ছেলেরা আসবে?'

'যারা সত্যিই আসবে, তাদেরই বলেছি।'

'ওষুধবিষুদ কোথায় গেল?'

'আমদানি কম, এই অজুহাত দেখায়।

'এটা পৃথিবীর ব্যাধি', রমা বললে, 'আমাদের দেশে এতদিনে সত্যিই গেড়ে বসেছে কালবাজার এখন; সাদা হবে না আমরা বেঁচে থাকতে আর।'

'কোনোদিনই সাদা হবে কি এর?' প্রভাসবাবু জিরানডাঙার কসাইপাড়ার দিকদিগন্তের দিকে তাকিয়ে বললে।

'তোমার কলেজের ছেলেরা ডিউটি দেবে?'

'যা বলেছি সেই-সব করবে। কসাইদের ভেতর নতুন কোনো কেস হলে সেখানে ডিউটি দেবে; এ তিনটি রুগী মরে গেছে এতক্ষণে। 'আমার মনে হয় সুধাংশুবাবু বারবার আট টাকা ভিজিট পাবেন না বলেই খুব সম্ভব বলেছেন যে রুগীরা শিগগিরই মরে যাবে। কসাইপাড়া ত একটা দুখের বস্তি, ওখান থেকে মোটা টাকা শুষবার উপায় নেই ত, মিছেমিছি মেহনত করে কী লাভ।'

'ডাক্তাররা কি এত শক্ত।'

'সকলেই নয়; তবে অনেকেই হচ্ছে আজকাল; এটাত রাখি-টাকার ওপরে বসে টাকা কামাবার যুগ।

'না—' সিদ্ধার্থ বললে,' 'সুধাংশুবাবু ওরকম লোক নন।'

'নন? আটটি টাকা ফিরিয়ে দেয়া উচিত ছিল তাহলে রজনী নানকে,' প্রভাসবাবু বললেন, 'কিছুইত করলেন না সুধাংশু ডাক্তার।'

'এসে দেখে গেলেন ত! ডাক্তারের দিক দিয়ে তার দাম রয়েছে। জিরানডাঙার কসাইপাড়ার কলেরার ইন্‌জেকশান দেয়া দরকার; আমি জানিয়েছিলাম মিউনিসিপ্যালিটিকে, ওরা বলেছে ওদের কাছে ওষুধ নেই এখন, কলকাতায় অর্ডার গেছে।'

'কবে আসবে?'

'সাত দিনে হতে পারে, সাত মাসেও হতে পারে। কলকাতা থেকে ওষুধ আনিয়ে নেবার অসুবিধা রয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানকার কর্তাদেরও অব্যবস্থা ঢের।'

'ইনজেকশনের কোনো রসজ্ঞান নেই?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সিরিঞ্জ আছে,' সিদ্ধার্থ চুরুটটা তুলে নিয়ে বললে।

'তাহলে জল ভরে ফুঁড়ে দিলেই ত হল,' প্রভাসবাবু বললেন, 'জিরানডাঙা ত বালিগঞ্জ নয়, কতকগুলো খাজা কসাইয়ের একচালা। কী দিয়ে কী করা হল জানতে চাইবে না, কর্তারা বিলিতি ওষুধ দিয়েছে আশ্বাস পেয়ে মনের আতঙ্ক কমলে রোগের প্রকোপও কমে যাবে মনে হয়। এদের রোগ আতঙ্কে বেড়ে যায় অনেকখানি।'

'পঁচিশ-ত্রিশ জনের ইনজেকশন দেওয়ার মত ওষুধ আছে।'

সিদ্ধার্থ বললে, 'কসাইরা আড়াইশ।

'তাহলে কী করা যেতে পারে? শিগগিরই একটা কিছু ভেবেচিন্তে ঠিক করা যায় কি-না বিশেষভাবে বোধ করে রমা বললে।

'ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি কোথাও ত কিছু সুবিধার হল না। ডাক্তারদের নিজেদের কাছে কী আছে না আছে সেটা জানবার জো নেই, সুবিধেও নেই, আমি ভাবছি একবার এই মিশনটায় যাব।

'ওষুধ আছে কি-না খোঁজ নিতে?'

'সিদ্ধার্থ উঠে চলে গেল।'

কুড়ি পঁচিশ মিনিট পরে ফিরে এসে বললে, 'পাদ্রি সাহেব বললে অনেক জিনিস আছে ত তাদের সঙ্গে, কিন্তু বাক্সে প্যাক করা আছে, বার্থেলো ফিরে না এলে কিছু বলতে পারবে না।'

'বার্থেলো কবে আসবে?'

'তিন-চার দিন ধরে রোজই আসবার কথা, কিন্তু এল না ত; আজ বিকেলের স্টিমারে আসবে মনে করছে।'

'আজ রাতে আমি মিশনে যাব,' রমা বললে, 'তোমাদের সঙ্গে ভালোরির স্ত্রীর দেখা হয়নি?

'হয়েছে। দু'জনেই পাশাপাশি বসে ছিল। ওরা জিজ্ঞেস করল আমাকে জিরানডাঙার লোকগুলো কী ক্রিশ্চান, ক্যাথলিক ক্রিশ্চান কি-না। আমি বলে এসেছি, হ্যাঁ ক্যাথলিক ক্রিশ্চান বলেই মনে হয়।'

'সে কী কথা!' রমা যেন একটা ব্যাটারির ধাক্কা খেয়ে বললে।

'ওরা বললে যে এত কাছে ও যে এতগুলো ক্যাথলিক ক্রিশ্চান আছে, তা ওরা জানতই না, এ দেশে অনেক ক্যাথলিক আছে তাহলে। বাসমতীতে নতুন এসেছে, কোথায় কী আছে না আছে, কী দেশ কী রকম ব্যাপার কিছুই জানে না, আমি সাহায্য করলে খুবই উপকার হয়। বললে, বার্থেলো কিছু-কিছু জানত, কিন্তু সে চলে গিয়ে একটু মুশকিল হয়েছে, ওরা দু'জনে কিছুই জানে না বললে।'

'কিন্তু তুমি জিরানডাঙার কসাইদের ক্যাথলিক ক্রিশ্চান বলে চালিয়ে দিয়ে এলে।'

'ভালোরিরা বললে ওদের ওষুধ ওদের থাকলেও ওষুধ মিশনের জন্যে। যদি কিছু বাড়তি থাকে তাহলে সেটা অন্যদের দেয়া যেতে পারে—কিন্তু সবচেয়ে আগে ক্যাথলিকদেরই পুরোপুরি দাবি না মিটিয়ে আর কাউকে কিছু দেয়া যেতে পারে না বলে দুঃখ জানাল। সব মানুষই সমান—সকলের দাবিই হল মাদারের নিজের—সেটা স্বীকার করেও বললে যে সব ধর্মেরই নিজেদের নিজেদের সেবাব্রতীরা সব রয়েছে, নিজেদের উপরওয়ালারা আছেন, সরকার আছেন—এরাই দেখবেন এদের নিজেদের মিশনটা প্রধানত ক্যাথলিকদের জন্যে—'

'কিন্তু তুমি ত বলে এসেছ জিরানডাঙার মানুষগুলো ক্যাথলিক।'

'হ্যাঁ তা ত বলে এসেছি।'

'এতে কোনো লাভ হল না সেন,' রমা বললে 'ওরা কি টের পাবে না কসাইরা ক্রিশ্চান নয়?'

'আজ রাতেই টের পাবে হয়ত।'

'আজ রাতেই কি ওরা কসাই বস্তিতে যাবে?'

'হ্যাঁ, কসাইরা ক্যাথলিক শুনে একটু মন কেমন করছে যেন ভালোরিদের। হাভভাব দেখে মনে হল খুব সম্ভব শিগগিরই ওষুধ নিয়ে যাবে—আমিও জিরানডাঙায় থাকব তখন। আমি নির্মল আর অমূল্য তিনজনেই ইনজেকশন দিতে পারি—রজনীও পারে; চার-পাঁচটা সিরিঞ্জ-ফিরিঞ্জ নিয়ে আমরা তৈরি হয়ে থাকব।'

'ভালোরিরা যাবে আজ রাতে জিরানডাঙায়?' রমা বললে, 'বাস্তবিকই কি ওষুধ রয়েছে ওদের—থাকে যদি—অত ওষুধ নিয়ে সত্যিই যদি যায় মিথ্যা কথা বলে সে ওষুধটা কাজে লাগান ঠিক হবে কি তোমাদের?' সিদ্ধার্থ পকেট থেকে এক টুকরো দারচিনি বের করে বললে, 'কিন্তু কোনটা ঠিক বলে দাও তুমি—এরা সকলে মরবে না, কোনোদিন কোনো ক্যাথলিক রুগী না পেয়ে ওষুধগুলো ভালোরিদের বাক্সে পচবে?'

রমা একটু ভেবে বললে 'পচুক।'

'প্রভাসবাবু চুরুটটা মুখে নিতে যাচ্ছিলেন, বদলে ছাই ঝেড়ে হাত নামিয়ে 'আবার ছাই ঝেড়ে জিরানডাঙার পড়ন্ত রোদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'তা কি করে হয়।'

'তুমি মিশনারিদের কাছে আবার যাও সেন।' রমা বললে।

'আবার যাবে কেন? কেন? আবার যাবে কেন?' রমার বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

'যাও—গিয়ে বল যে জিরানডাঙার কসাইরা ক্রিশ্চান নয়।'

সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'আচ্ছা তুমি গিয়ে বলে এস রমা, যে, জিরানডাঙার লোকগুলো ক্রিশ্চান নয়—পনের মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে তোমার। প্রভাসবাবু আর আমি এইখানে অপেক্ষা করছি।'

'রমার কথাই তাহলে মেনে নিলে তুমি সিদ্ধার্থ।'

'হ্যাঁ,' সিদ্ধার্থ আর একবার কাঠি জ্বালিয়ে চুরুটটাকে ভাল করে জ্বালিয়ে নিতে নিতে বললে, ঠিক কথাই, মিথ্যের ওপর ভিত্তি করে মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েও লাভ নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু মিথ্যে কথা কাকে বলে?' প্রভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন। উনি একেবারে সৃষ্টির প্রথম কথা নিয়ে নাড়া দিয়েছেন বটে, সামাজিক সত্য যে একটা দেশ কাল সন্ততির জিনিস নয়; কিন্তু সময়ের প্রত্যেকটি নতুন চারণায় চারণায় বদলে গিয়ে মানুষের অন্তিম উপকারের জন্যে, সে হিসেবে সেন হয়ত সত্য, আমি মিথ্যা—কিন্তু তবুও সত্যের একটা চির-পদার্থও রইল কোথায়? ভাবছিল রমা।

প্রভাসবাবুর কথার কেউ উত্তর দিল না।

'মিশনে তুমি যাও সেন।'

'তুমিই যাও। আজ সকাল থেকে অনেক ঘোরাঘুরি করে বড্ড গা ছেড়ে দিয়েছে। রাতে জাগতে হবে জিরানডাঙায়।'

'রাতে আমিও যাব জিরানডাঙা—নিয়ে যেও আমাকে।'

'না, তোমার আজ রাতেই দরকার নেই, পরে দেখা যাবে। আজ আমরা অনেকে আছি।'

'আমি যেতে পারি মিশনে—কিন্তু তুমি গেলেই ভাল হত।'

'মিশনের—আমার নিজের দিক দিয়ে ভালই ত হত, ব্যাপারটা ত আমারি একটা মিথ্যাকে নিয়ে', সিদ্ধার্থ বললে, 'আমার মিথ্যা শোধরাবার ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে থাকা—এ ত ঠিক হল না কিন্তু, আমি ওপরে উঠতে পারছি না আর; শরীরে আর একেবারেই কিছু দিচ্ছে না—এই চেয়ারটার থেকেই উঠতে পারছি না।'

সিদ্ধার্থ উঠবার উপক্রম করল।

'না না নড়াচড়া কোর না' রমা বললে, 'শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর ডেকচেয়ারটায়; বিছানায় যাবে?'

'না।'

'তোমার ব্লাড প্রেসার বেড়েছে সেন? বড্ড ধকল গেছে বুঝি কদিন থেকে? হাই ব্লাড প্রেসার? কত দু'শো সোয়া দু'শো?' প্রভাসবাবু বললেন।

'না—লো প্রেসার' রমা বললে, গত বছর যে রকম হয়েছিল। ব্লাডপ্রেসার মাপবার জিনিসটা কোথায় বাবা।

'সেটা পোস্টাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট খগেন বোস ত নিয়ে গেলেন প্রায় মাস তিনেক হল, ফিরিয়ে দেননি আর।'

'না বেশি কিছু হয়নি,' সিদ্ধার্থ বললে 'একটু ডেকচেয়ারে শুয়ে জিরিয়ে নিলেই হবে। আমি সন্ধ্যার সময় মিশনে যাব রমা, ভালোরিকে গিয়ে বলে আসব।'

'মানুষের সব জায়গায়ই পায়ে হেঁটে যাবার দরকার নেই,' রমা বললে।

'আমার একটা খটকা ছিল—সেইজন্যেই যেতে বলেছিলাম তোমাকে। কিন্তু নিজের কাছে তুমি পরিষ্কার হয়েছ। যাচ্ছি আমি মিশনে।'

রমা মিশনের দিকে চলে গেল।

মিনিট পনের কুড়ি পরে ফিরে এসে রমা বললে, 'সে কি কথা সেন—তুমি নাকি ভালোরিদের বলে এসেছ জিরানডাঙার কসাইরা মুসলমান?'

সিদ্ধার্থ লো ব্লাড প্রেসারের জন্য আস্তে আস্তে চুরুট টানছিল। চুরুটটা আলগোছে নামিয়ে বললে, 'তুমি আবার বলে এসেছ, নাকি ক্যাথলিক ক্রিশ্চান?'

'ওখানে যেতেই ওরা আমাকে বললে, কাছেই মুসলমানদের বস্তিতে কলেরা লেগেছে, আমি কোনো খবর পেয়েছি কিনা।' আমি বললাম যে জিরানডাঙার কসাইরা যে মুসলমান তা কে বলেছে আপনাদের, তখন তোমার কথা বললে, নাম টুকে রেখেছে তোমার সাহেব, নোটবুক খুলে নামটা আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে পড়ে বললে চীনেও অনেক সেন আছে, কিন্তু সেটা সেখানে নাম—আর এখানে পদবী।'

'জিরানডাঙার কলেরার কথা কী বললে?'

'তোমাকে ওরা বলে দিয়েছে ত যে ওদের কাছে ইনজেকশনের ওষুধ নেই?'

সিদ্ধার্থ চুরুটটা বেশি আলগোছে টেনে টেনে নিভিয়ে ফেলেছে, যাক গিয়ে নিভে, নেভা চুরুটটা দাঁতে আটকে রয়ে সয়ে টানতে টানতে বললে, 'তুমি আবার আগের থেকেই গায়ে পড়ে ওদের জিজ্ঞেস করতে যাওনি ত ওষুধ আছে কি না—কতখানি আছে—আড়াই শ কসায়ের চলবে কি না।'

'ব্লাড প্রেসারে চুরুট খাওয়াটা খারাপ সেন।'

'খাচ্ছি না ত—নিভে গেছে।'

'সেই কথাই বলছিলাম আমি—নেভা চুরুট খাওয়া খুব খারাপ।'

সিদ্ধার্থ চুরুটটাকে দাঁতে ধরে রেখে আস্তে আস্তে বললে, 'কেমন একটা বিষ তৈরি হয় যেন—বুঝতে পারছি—জ্বালিয়ে নেয়া যাক।'

'ওরা ত জিরানডাঙায় যাবে না।'

'জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'তোমার কাছে ত জিরানডাঙায় যাওয়ার কোনো কথা পাড়েনি ওরা।'

'ভালোরি বললে বুঝি তোমাকে?'

'কোথায় জিরানডাঙা তাও জানে না।'

'দেখলে ত সব কিছু থেকেই খানিকটা আলগা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমা বললে, 'আলগা—নাকি—তা একদিনেই ত বোঝা যাবে না। এই ত সবে এসেছে। তৈরি হচ্ছে মিশন, বসতে না বসতেই যজ্ঞি শেষ করবে কি করে-এই ত ধোঁয়া উড়ছে সবে। কিন্তু তুমি ত মিশনে গিয়ে সব কথাই সেরে এসেছ প্রফেসর—আমাকে কি করতে পাঠালে বল ত দেখি।'

খুব তির তির করে টেনে টেনে চুরুটে একসময়ে আগুনের আঁচ পেল না আর সিদ্ধার্থ, নেভানো তামাক পাতার গ্যাস টেনে নিল খানিকক্ষণ, চুরুটটা তারপর মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে বললে, 'মিশনে গিয়ে ভালই করেছ। ওরা মানুষ ভাল, কথাবার্তা বলে সুখ আছে ওদের সঙ্গে।'

'সত্য মিথ্যায় মিশিয়ে কথাবার্তা?' একটা পুরনো খবরের কাগজ একটু ঝেড়ে নিয়ে ভাল করে ভাঁজ করতে করতে রমা বললে। মেঝের ওপর থেকে চুরুটটা তুলে নিয়ে সিদ্ধার্থ হাসতে হাসতে বললে, 'সে রকম কথা আমার রজনীর সঙ্গে চলে, ভালোরির চেয়ে রজনীকে অনেক বেশি নিজের জিনিস মনে হয় বলে—'

রমার হাতের পুরনো কাগজটার গায়ে কোনো ময়লা নেই, তবুও হাত দিয়ে আস্তে আস্তে সেটা বুলিয়ে বুলিয়ে ঝাড়তে সে বললে, 'রজনীবাবুকে বলেছ বুঝি যে ক্যানেডার মিশনের কর্তারা মুসলমান?'

'না, সে কথা বলি কি করে!'

'তাহলে কি আর মিথ্যা কথা বললে তাকে। সত্যমিথ্যায় মিশিয়ে কথাবার্তা বেশ জমে তার সঙ্গে' বললে সিদ্ধার্থ। চুরুট জ্বালাবার ফিকিরে রয়েছে। দেশলাই পাচ্ছে না। দেশলাইয়ের খোঁজ এদিক যেদিক তাকিয়ে পরে বললে, 'তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করেছিলে যে ভালোরিকে আমি বলেছি যে জিরানডাঙার কসাইরা ক্যাথলিক ক্রিশ্চান?'

'তুমি কি দেশালাই খুঁজছ?'

'দেশলাইটা কোথায়?'

'দেখছি না।'

'প্রভাসবাবু ঘুমুচ্ছেন—'

'চেয়ারের বেতে হেলান দিয়ে বসে বসে একটু ঝিম এসেছে বাবার—এখুনি ভেঙে যাবে চটকা।'

'কোথায় হয়ত রেখেছেন উনি—'

'উনি না জাগলে একটা দেশলাই, পাওয়া যাবে না।' রমা ভুরু কুঁচকে হেসে বললে, 'বড্ড ঠেকে রইলে ত তুমি।'

'আমি কি ভালোরিকে বলতে পারি এরকম কথা যে জিরানডাঙার কসাইরা ক্যাথলিক ক্রিশ্চান? তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করেছিলে আমি বলেছি?'

'মিশনে গেলাম ত বড় একটা বিশ্বাসের ভরে।'

'কী বিশ্বাস করে?'

'কসাইরা খুব বিপদে পড়েছে—তাদের ওষুধ পত্রের জন্যে। মিশনের সঙ্গে সত্যিই একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে এসেছ তুমি, মরিয়া হয়ে জিরানডাঙার মানুষদের ক্যাথলিক পর্যন্ত বলে এসেছ, এটা, ঐ লোকগুলোর বড় বিপদের সময় আমি—' রমা হাতের কাগজটা পরিপাটি করে ভাঁজ করে জানালার ভেতর দিয়ে বস্তির একচালাগুলো ঢেকে ফেলে গাছগাছালি, জঙ্গল; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিকেলের রোদ পোহাচ্ছে—সেই দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি সত্যি বিশ্বাস করেছিলাম সেন।'

'কিন্তু ওরা যে ক্যাথলিক সেটা নাকচ করতে তুমি ত মিশনে গেলে।'

'সে কথা তোমাকে মুখে বলে গেলাম বটে কিন্তু ওদের কাছে সত্যি বেশি ওষুধ আছে এবং সেটা ওরা ক্যাথলিকদের উপকারের জন্যে বিলিয়ে দেবে একথা বুঝতে পারলে জিরানডাঙায় কসাইদের কী ধর্ম কী জাত সে-সব আমি ভাঙতে যেতাম না আর।'

সিদ্ধার্থ বললে, 'অক্সফোর্ড মিশনে একবার যাব।'

'ওষুধের জন্যে?'

'আছে ওষুধ, বলতে পারো?'

'নেই,' রমা হাতের ভাঁজ করা কাগজটা সিদ্ধার্থের কেম্বিসের হেলান চেয়ারের পাশে মেঝের ওপর ঠিক করে গুছিয়ে পেতে রাখতে রাখতে বললে, 'থাকলেও বেশি নেই, তা ছাড়া ওদের নানারকম নিয়ম-টিয়ম আছে; বড় ফাদার, মেজ ফাদার, ফাদারদের সব কর্তা ব্যক্তিরাই কলকাতায় চলে গেছেন, মাদার সুপিরিয়রও এখানে নেই; কলকাতার থেকে ওরা ফিরে না এলে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'কাগজটা এখানে পাতলে কেন?'

'ওর ওপর চুরুট রেখো, মেঝের বদলে এইটে ভাল হবে।'

'পুড়ে যাবে ত কাগজ!'

'কত আর পুড়বে?'

'সিগারেটের এক-আধটা ফুলকিতে এক-একটা বড় থিয়েটার পুড়ে যায় ত।'

প্রভাসবাবু চোখ মেলে আড়ামোড়া ভেঙে চোখ তারিয়ে তাকালেন সিদ্ধার্থের দিকে, 'কিছু বললে আমাকে?'

'আপনার দেশলাইটা চেয়েছিলাম।'

'আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম?'

'ঝিমুচ্ছিলেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জিরানডাঙায় কলেরা লাগল তাহলে—' পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে সিদ্ধার্থের হাতে গুঁজে দিয়ে প্রভাসবাবু বললেন, 'কোনো ব্যবস্থাও করা গেল না—ইনজেকশন ফিনজেকশনের?'

'না। ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সিরিঞ্জই পাওয়া যাচ্ছে বুঝি শুধু?'

'পঁচিশ-ত্রিশ জনের ইনজেকশন দেওয়ার মত জিনিস রয়েছে ত?' রমা বললে।

'তা আছে।'

'তাহলে কলেজের যে-ছেলেরা ডিউটি দিচ্ছে তাদেরই প্রথমে ইনজেকশন দিয়ে দিলে কাজে লাগবে—'

'রজনী নান আর আমি আট দশজন ছেলেকে ফুঁড়ে ঠিক করে রেখেছি।' সিদ্ধার্থ দেশলাইয়ের বারুদের ওপর কাঠি ঘষতে-ঘষতে বললে।

'তোমরা নিজেরা ফোঁড় খেয়েছ ত?'

'রজনী খেয়েছে, আমি খাব এইবারে,' সিদ্ধার্থের হাতের কাঠিটা জ্বলে নিভে গেল; 'তোমাদের দু'জনের ইনজেকশন দেবে রমা—জিনিস এনেছি।'

'কোথায়?'

'বারান্দায় আমার ছোট অ্যাটাচিতে রেখে এসেছি।'

'দাও, ইনজেকশন দিয়ে দাও।' প্রভাসবাবু বললেন, 'রমাকে এবারে হস্টেলে পাঠাতে হবে।'

'হস্টেলে যাব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু এই মড়কটা কমে না গেলে যেতে পারব না।'

'কেন?' আমার জন্যে চিন্তা?' প্রভাসবাবু বললেন, 'আমি ট্যুরে বেরিয়ে যাব।'

'চাইলে ত তোমাকে ট্যুর দেবে না সরকার। গত তিন মাসে একদিনও ত বাসমতীর বাইরে কোথাও পাঠাল না, নদীর ওপারে ঐ ছঘাড়া বকচরে অব্দি না।'

'আসছে সপ্তাহে আমার ট্যুর আছে,' প্রভাসবাবু তেপয়ের ওপর থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'আজ শুক্কুরবার—সোমবার যেতে হবে নিশিন্দায়।'

'নিশিন্দায়?' একটু চমকে উঠে রমা বললে।

'হ্যাঁ, নিশিন্দায়।'

'স্টিমারে?'

'স্টিমারে।'

সেই লাইনটা এখনো আছে?'

'রেখেছে তা দেখছি।'

'রমা বললে—'গফুর আছে?'

'প্রভাসবাবু চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললেন, 'বলতে পারি না। আছে বলেই ত মনে হয়। অনেকদিন কোনো খোঁজখবর নিতে পারিনি; আমার অন্যায় হয়েছে। আমার ঠিকানাও জানে না গফুর' না হলে এখানে এসে দেখা করত নিশ্চয়ই।'

'গফুর কে?' সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল।

'বাটলার—নিশিন্দার জাহাজের।'

'নিশিন্দার জাহাজ?' দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সিদ্ধার্থ বললে, 'ওদিকে আবার জাহাজ যায় নাকি?'

'খুব চমৎকার নদী জঙ্গল আছে ওদিকে', প্রভাসবাবু বললেন, 'যাবে বেড়াতে? চল—এই সোমবার।'

'কে? আমি?' সিদ্ধার্থ বললে, 'না, এখন নয়—এই ত জিরানডাঙায় কলেরা লাগল।'

'তুমি যাও ট্যুরে,' রমা বললে, 'আমি এখনই হস্টেলে যেতে পারব না। বাড়ির পাশে এরকম মড়ক লাগল, আমার এখনই করবার নেই হয়ত কিছু—তবুও দেখি কিছু করা যায় কি—না। এখন হস্টেলে যাবার চেয়ে নিশিন্দা যাওয়াও ভাল। কিন্তু এ বাড়ির থেকে নড়তেই ইচ্ছা করছে না আমার।'

'এখানে ঠিকা ঝি, আর তার মেয়ের সঙ্গে থাকবে তুমি?'

'বেশ ত থাকা যাবে।'

'রাতে ওরা থাকবে?'

'খেতে দিলেই থাকবে।'

'বেশ ত—' প্রভাসবাবু চুরুটের পেটে-দু'টো তিনেট টোকা মেরে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি সোমবার চলে যাচ্ছি। রদবদল নেই, কিন্তু যা দেখছি শেষ মুহূর্তে তুমি বাগড়া না দিয়ে ছাড়বে না।'

'জিরানডাঙায় কলেরার ডিউটি তোমাকে দিতে হবে না' সিদ্ধার্থ বললে।

'এর পরে যদি বাসমতীতে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে দরকার হলে তোমাকে আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব। তোমার বাবা ট্যুরে গেলে হস্টেলে চলে যাও কিংবা ওঁর সঙ্গে নিশিন্দায় ত যেতে পার?'

'আমাকে এসে ডেকে নিয়ে যাবে?'

'হুঁ,' কাজে ডেকে নেব,' সিদ্ধার্থ বললে, 'বাসমতীতে যদি মড়ক ছড়ায়।'

'কসাইদের ব্যাপার তোমরা সামলাবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ', চুরুট না জ্বালিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিই জ্বালিয়ে যাচ্ছে সিদ্ধার্থ, কিন্তু এবার ভাল করে চুরুট ধরিয়ে নিল, 'আমার মনে হয় কসাইদের বস্তিতেও কলেরাটা ছড়াবে না, কেটে যাবে শিগগিরই, বড় জোর আঠার-বুড়ি জনের হলে হবে।' সিদ্ধার্থ বললে।

'আমি এই বাড়িতেই থাকব, সেন!'

সেনের মন অন্যদিকে ছিল, রমার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না।

'নিশিন্দায়ও ত যেতে পারি।'

সিদ্ধার্থ বারান্দার থেকে অ্যাটাচি কেস এনে বললে, 'হ্যাঁ, যেতে পার নিশিন্দায়।'

সিদ্ধার্থ সিরিঞ্জ বার করে সাজসরঞ্জাম করতে-করতে প্রভাসবাবুকে বলল, 'আপনি ট্যুরে যাচ্ছেন, নেবেন ত ইনজেকশন? জ্বরজারি হতে পারে কিন্তু অল্পসল্প—নদীখালের পথে; খুব বেশি গা ব্যথা হতে পারে।'

'খানিকটা অস্বস্তি হবেই?'

'তা হবে বলেই ত মনে হয়।'

'হলে ত সোমবারের আগেই হবে।'

'তা হবে।'

'শেষ মুহূর্তে ট্যুর বন্ধ করা,' প্রভাসবাবু চুরুটটা সরিয়ে রেখে বললে না, 'কিন্তু বাড়ির কাছে আর বলি কেন? মড়কটা ত একেবারে চৌকাঠের ওপর আমাদের, কিছু প্রতিষেধক না নিলে—আচ্ছা, দাও।'

প্রভাসবাবুকে, রমাকেও, ইনজেকশন দিয়ে দিল সিদ্ধার্থ।'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি সেন?'

তুমি চা তৈরি করে রাখো—আমি আসছি।'

'জিরানডাঙার দিকে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, দেখি গিয়ে রজনী-টজনী আছে নাকি ওখানে।'

'সিদ্ধার্থ অ্যাটাচি কেসটা বন্ধ করে চাবি এঁটে, একটা চামড়ার স্ট্র্যাপের সঙ্গে জুতছিল সেটাকে-হ্যাভারস্যাকের মত কাঁধে ফেলে নেবে।

'সকলকে দিলে—তুমি নিজে ত ইনজেকশন নিলে না সেন?'

'হ্যাঁ,' হ্যাভারস্যাকের মত পিঠে ফেলে বেল্ট বেঁধে নিতে পেরেছে অ্যাটাচি কেসটা।

'ওখানে রজনীবাবু ছাড়া আর-কেউ ইনজেকশন দিতে জানে না?' রমা বললে।

'জানে, ছেলেদের ভেতর দু-চারজন, তারা রাতে আসবে।'

বলতে-বলতে সিদ্ধার্থ বেরিয়ে গেল—জামরুল সরবতিলেবু মেহেদির ঝাড় জঙ্গল পেরিয়ে গেল প্রায়।

জিরানডাঙায় রজনীবাবু থাকলে তুমি এখুনি ইনজেকশন নিয়ে নিও সেন,' রমা জোরে হাঁক পেড়ে বললে।

'আচ্ছা', উত্তর এল সিদ্ধার্থের, সিসু জারুল মেহেদির জঙ্গলের ওপার থেকে; আওয়াজ শোনা গেল শুধু, আওয়াজটা নিজে পটান্তরের ভেতর সেঁদিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

কিন্তু চা খেতে এল না সিদ্ধার্থ।

চারটে বেজে গেল, পাঁচটা বেজে গেল, প্রথমবারের চা ঠাণ্ডা হয়ে সর পড়তে সেটা ফেলে দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য চা করল রমা-সেন হয়তো এখুনি এসে পড়বে।

কিন্তু সাড়ে পাঁচটার সময়ও সে এল না। পৌনে ছটার সময় না।

'কী করা যায় বাবা।'

'আটকে পড়েছে হয়ত জিরানডাঙায়।'

'আমি গিয়ে দেখে আসব?'

'তাকি একটা কথা? কার সঙ্গে যাবে তুমি?'

'দিনের আলো থাকতে-থাকতে তুমি ত নিয়ে যেতে পার।' না, একটা

হারা-উদ্দেশ্যে জিরানডাঙায় যাবার মত শরীরের অবস্থা নেই প্রভাসবাবুর। পায়ে বাতের বাড়াবাড়িতে হাঁটতেই পারেন না, মনে তেমন তাগিদ নেই; সিদ্ধার্থ ও-বস্তিটায় সত্যিই রয়েছে এখনো সঠিক জানতে পারলে একটা রিকশা ডেকে যেতেও পারতেন হয়ত, কিন্তু প্রভাসবাবুর মনে হচ্ছিল নানা দিকের দিশারি মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে ত আজকাল সিদ্ধার্থ, অন্য কোথাও চলে গেছে নিশ্চয়ই। এখানে এসে চা খাবে বলে গেছে বলেই যে ফিরে আসবে আজই, বা দু-চার দিনের মধ্যে, সিদ্ধার্থের সে-রকম কাজের কম্মের হিড়িক-টিড়িক দেখা যাচ্ছে আজকাল, তাতে সেটা বস্তব বলে মনে হয় না।

'আমি ত যেতে পারি না, পায়ের বাতে আমি নড়তে পারছি না।'

'নিশিন্দায় যাবে ত!'

'সে ত আজ নয়—সোমবার। মঙ্গলবারও হতে পারে।'

'তাড়াতাড়ি বাত সেরে যাবে দেখছি তাহলে।'

'স্টিমার স্টেশন ত আমি রিকশা চড়ে যাব, ঐ ত মিশনের পাশ দিয়ে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে। জিরানডাঙার দিকে কোনো রাস্তা নেই, পথই নেই, কেবল বড়-বড় গাছের শেকড়, জঙ্গল, গর্ত, ওদিক দিয়ে সাইকেল রিকশা যেতে পারবে না, হেঁটে যাওয়াও কঠিন, আমি এই পা নিয়ে কী করেই বা যাই?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাসবাবুর কথার দিকে অতটা নজর ছিল না রমার—অন্য কথা ভাবছিল। আস্তে-আস্তে নিজের স্থিরতায় ফিরে এল তার মনটা, স্থির, শীতল হল।

'দিনের আলো থাকতে থাকতে আমি নিজে, গিয়ে একবার দেখে আসতে পারতাম—' রমা বললে, 'ওখানে আমাদের কলেজের দু'জন প্রফেসর রয়েছেন ত, পাড়াটাও বিপন্ন এখন, কিন্তু এখনই একা-একা আমার যাওয়ার কোনো দরকার নেই। পরে যেতে হতে পারে। সময় আছে। আমার সময় আসবে, ঠিক সময়ে।'

'বার্থেলো থাকলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতে হয়ত।'

'আমি যেতাম না—তবে তাকে বললে একবার খোঁজ নিয়ে আসতে পারত।'

'ভালোরি ও যাবে না?'

'আমার মনে হয় ওরা জিরানডাঙায় নেই এখন।' প্রভাসবাবু বললেন।

'বলা যায় না কিছু, কিন্তু খুব বেশি জড়িয়ে গেছে যেখানেই থাক-না কেন,' রমা বললে।

'কয়েকবার ত চা করলে, তুমি নিজে খেয়েছ রমা?'

'তুমি আর-এক কাপ চা খাবে নাকি?'

'দিতে পারো।'

'হ্যাঁ, সেই সঙ্গে আমিও খেয়ে নেব', রমা বললে, 'তবে এটা সেটা নানারকমও হতে পারে, জিরানডাঙায় রজনীবাবু নাও থাকতে পারেন, সেন গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারো—ব্লাডপ্রেসার ছিল ত। সেই জন্যেই একবার খোঁজ নেয়া দরকার ভাবছিলাম।'

'ভালোরি ছাড়া আর কেউ ত নেই এদিকে।' প্রভাসবাবু বললে, 'কাকে বলি? কে যায়?'

'ভালোরি যাবে না—'

'মিশনে দু-চারজন মাদ্রাজী রয়েছে।'

'ওরাও যাবে না—' রমা আঙুল মটকে দ্বিতীয় আঙুলটা মটকাল না দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে; 'ওরা বুঝবেই না কিছু। নিতান্তই যদি বুঝিয়ে দেয়া যায়, পাঠানো সম্ভব হবে না, তাহলেও হবে না কিছু, পারবে না। বার্থেলো পারত।'

'আলোটা জ্বালা হয় নি।

রমা চা করে আনল।

'অন্ধকার হয়ে গেছে,' সে বললে, 'আমার আগে খেয়াল ছিল না, আলোটা জ্বালা হয়নি।'

'জ্বালাবে?'

'হ্যাঁ, জ্বালি; কেন অন্ধকারে বসে থাকবে?'

'এই বেশ লাগছিল,' চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে প্রভাসবাবু বললেন,' একটু শীত পড়েছে। আকাশে এত তারা উঠে গেল। ঐ কে আসছে না?'

'কোথায়?' আলো জ্বেলে এনে টেবিলের ওপর রেখে রমা বললে।

'রমা আছো বাড়িতে?' বলতে-বলতে রাজীববাবু ঢুকে পড়লেন।

'ও, আপনি? বসুন, রমা বললে, 'সীমা এসেছে?'

'না, আমি একাই।' রাজীববাবু বললেন, 'কেমন আছেন প্রভাসবাবু?'

'ভালই। সব ভাল ত? বসুন। রাত করে এলেন, আবার ত যেতে হবে সেই দানাপুরের দিকে, এখান থেকে তিন মাইল ত হবে।'

'বসতে না বসতেই যাবার কথা! চা দিই আপনাকে রাজীবকাকা?'

'না, আমি সেই সকালে একবার চা খাই, খুব পাতলা করে; পেটের ভেতর কেমন একটা ব্যথা ওঠে, চা আমার সহ্য হয় না। বিকেলে খেয়ে এসেছি, কিছু খাবার দরকার নেই। তুমি বোসো। একটু কাজে এসেছি তোমার কাছে।'

'আমার কাছে?' রমা একটা চেয়ার টেনে বসে বললে, 'এই কেম্বিসের ডেকচেয়ারটায় আপনি বসুন রাজীবকাকা।'

হেলান চেয়ারটায় বসে রাজীববাবু বললেন, 'কয়েকদিন কলেজ ছুটি আছে, সকালবেলার দিকে বা দুপুরে তোমাদের এখানে এলে ঠিক হত; বাড়িতে নানারকম ঝক্কিঝামেলা—আমি সকালে দুপুরে না থাকলে চলে না। কাজটাজ সেরে, একটু রোদ পড়তেই রওনা দিয়েছি এখানে আসব করে, তিন-চার মাইলের পাল্লা, দেরি হয়ে গেল আসতে—'

'হেঁটে এলেন বুঝি?' প্রভাসবাবু বললেন।

'প্রিন্সিপ্যালের ঘরে সেই যে সেদিন তুমি গিয়েছিলে, মনে আছে? শুক্কুরবার ওর ঘরে অনার্স ক্লাস হবার কথা ছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ছিলেন ত সেদিন,' রমা বললে।

'তোমার পিটিশন নিয়ে নানারকম কথাবার্তা হয়েছিল সেদিন।'

'কীসের পিটিশন?' প্রভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আছে একটা।'

'সেই পিটিশনের ব্যাপার নিয়ে বড্ড গোলমাল চলছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাদের ভেতর?'

'প্রিন্সিপ্যাল আর দু-চারজন বড় কর্তাদের।'

'পিটিশনটা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন আপনি।'

'না। ফাইলে রেখে দিয়েছিলাম। তুমি সেদিন চলে যাবার পর উনি চেয়ে নিয়েছেন।'

'ও।'

'সেই ব্যাপারটার ত মিটমাট তখুনি হয়ে গিয়েছিল,' রমা বললে, 'আবার উনি ওঠালেন কেন?'

'সে আমি কী করে বলব! আমিও ত ভেবেছিলাম মিটে গেছে। তুমি নিজে প্রিন্সিপ্যালকে বললে যে তুমি পিটিশনটা তার কাছে পেশ করতে নিশেধ করেছ আমাকে। এর পর ত আর কোনো কথা থাকতে পারে না।'

হাতে ধরে বসেছিল চায়ের পেয়ালাটা, চুমুক দেয়া হয়নি এখন পর্যন্ত, পেয়ালটা নামিয়ে রেখে রমা বললে, 'বিষয়টা একেবারেই চুকে গেছে—এই ত ভেবেছিলাম আমি।'

'তুমি চা খেলে না ত।'

'মেঝের ওপর চায়ের পেয়ালার দিকে একবার তাকিয়ে রমা বললে, 'কী হিসেবে পিটিশনটা চেয়ে নিলেন উনি আপনার কাছ থেকে?'

'প্রথম যখন চেয়ে নিলেন,' রাজীববাবু বললেন, 'তখন আমি মনে করেছিলাম ওটা একবার পড়ে দেখবেন, তারপরে, কিছু করবার নেই ত পিটিশনের, ছিঁড়ে ফেলে দেবেন ভেবেছিলাম।'

'কমিটিতে পেশ করেছেন কি তিনি আমার দরখাস্তটা?'

'না, এখনো করেন নি।'

'পরে করবেন শুনেছেন?'

'কথা উঠেছে আমি নাকি ওটা ঠিক সময়ে মজুমদার সাহেবের কাছে পেশ না করে চাপা দিয়ে রেখেছি।'

রমা মেঝের ওপর থেকে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নেবে ভাবছিল, কিন্তু ঘাড় নুইয়ে সেটা ধরতে গিয়ে ছুঁয়ে ছেড়ে দিল তবুও, মাথা তুলে রাজীববাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'প্রিন্সিপ্যাল তাহলে বিশ্বাস করলেন না আমাকে।'

'নাও, চা-টা খেয়ে নাও।' রাজীববাবু বললেন।

'প্রিন্সিপ্যালকে আপনার সামনেই ত আমি বললাম যে আমিই ও-দরখাস্তটা আপনাকে প্রিন্সিপ্যালের কাছে পাঠাতে নিষেধ করেছি,' রমা একবার রাজীববাবুর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'তিনি তক্ষুণি মেনে নিলেন সেটা, একটুও ইতস্তত করলেন না ত, কথাটা শেষ হল ত সেখানে।'

রমা রাজীববাবুর গোছা-গোছা এলোমেলো চুলের মাথা ঘাড়ের দিকে চেয়ে থেকে বললে, 'এখন আবার কী হল?

'আপনি চুরুট খান রাজীববাবু?'

'সিগারেট পেলে খেতাম একটা।

'চুরুট সিগারেটের চেয়ে ওৎরাবে ভাল, আস্তে-আস্তে টানবেন, খেয়ে সুখ হবে।'

'দিন।'

প্রভাসবাবুর হাতের থেকে চুরুটটা তুলে নিয়ে রমার দিকে ফিরে রাজীববাবু বললেন,'প্রিন্সিপ্যাল কী করবেন না করবেন প্রথম থেকেই ঠিক করে ফেলেন। তুমি হয়ত মনে করেছিলে তোমাকে বিশ্বাস করেছেন, পিটিশনের ব্যাপারটা চুকে গেল। কিন্তু দেখেছ?'

চুরুটটার দিকে তাকিয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আবার সেদিকে তাকিয়ে রাজীববাবু বললেন, 'জিনিসটা তুমি আমি আর প্রিন্সিপ্যাল জানতেন, অন্য কারুর কানেই যায়নি। প্রিন্সিপ্যাল ইচ্ছে করলে ব্যাপারটা সেদিনই ত চুকিয়ে দিতে পারতেন, তুমি নিজেই ত যা বলবার বললে, আমি বললাম, কিন্তু কিছুই হল না আমাদের কাউকেই একবারও বললেন না যে দরখাস্তের ব্যাপার নিয়ে তার আরো ঢের কথা আছে বুঝি নি ত আমরা। প্রিন্সিপ্যাল মানুষটাকে বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের কাউকেই করেননি। তোমাকে পর্যন্ত করলেন না।'

'চুরুটটা জ্বালিয়ে নিন রাজীববাবু।' জিরানডাঙার থমথমে শূন্যতার দিকে তাকিয়ে প্রভাসবাবু বললেন। শূন্যের ওপরে আকাশে অনেকগুলো তারা জ্বলে উঠেছে। প্রভাসবাবুর চুরুটের ধোঁয়া এঁকেবেঁকে সেই সব নিচের ও ওপরের কী যেন কী রকম কৃতকর্মে নিঃশব্দে বিরাট অন্ধকারও আবছা পরিষদের ভেতর চুপেচুপে মিলিয়ে যেতে লাগল। রাজীববাবু ও রমার কথা শুনছিলেন সবই তিনি, কিন্তু নিজে কোনো কথা বলা দরকার মনে করছিলেন না। হয়ত, পরে কিছু বলতে পারেন।

রমা চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিল। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এবারকার চা-টা পাতলা হয়েছিল; এতক্ষণে খানিকটা ফিকে সরের মত ভেসে উঠেছে। চুমুক এক-আধটা দেবে বলে পেয়ালাটা তুলে ধরেছে, কিন্তু জানালার ভেতর নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল, জিরানডাঙা বা ক্যাথলিক মিশন কোনোদিকেই নয় যেন, এমনি একটা অব্যবহিত শূন্যের দিকে।

রাজীববাবুকে দেশলাই দিয়েছেন প্রভাসবাবু। চুরুটটা জ্বালানো হয়নি। চুরুটের মত দেশলাইটাও নাড়াচাড়া করতে-করতে রাজীববাবু বললেন, 'প্রিন্সিপ্যাল কলেজ সম্পর্কে সব ব্যাপারেই খুব কড়াকড়ি নিয়মের ভক্ত, খুব সম্ভব একটা চাল বজায় রাখতে চান। সেটা জানে ত সকলে।' নিয়ম, মানে প্রায়ই ওর ভাবনায় যেটা নিয়ম বলে মনে হয় তাই। অনেক সময় দেখেছি সেটা অন্য সকলের দিক দিয়ে মোটেই সঙ্গত বলে বোধ হয় না, কিন্তু উনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজে যেটা ঠিক মনে করেন সেটাই সব সময়েই সকলের জন্যে ঠিক, এ-রকম একটা নিরেট ধারণা রয়েছে ওর; কাজেই অনেক দুঃখ কষ্ট হয় আমাদের। আমাদের কাউকেই বিশ্বাস করেন না।'

'কমিটির মেম্বারদের বিশ্বাস করেন?'

'বাধ্য হয়ে করতে হয় প্রেসিডেন্টকে, ওপরের দিকের আরো দু-চার জনকে। কিন্তু মনে-মনে ওদের কাউকেই যে বড় একটা শ্রদ্ধা বিশ্বাস করেন না সেটা ওর কথাবার্তায় হাবভাবে অনেক সময়ই টের পেয়েছি আমরা।'

'প্রফেসরদের বিশ্বাস করেন?'

'তা কয়েকজনকে করেন বলে মনে হয়। রমা—' রাজীববাবু বললেন, 'এসব ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারি না। মানুষের মনের কোথায় যে কিছু আছে তবে প্রিন্সিপ্যাল খুব কঠিন লোক; মানুষের ওপর ওর কোনো শ্রদ্ধা নেই। উনি নিজে ভেতরে-ভেতরে কী মনে করেন জানি না, বাইরের আচারে আচরণে দেখেছি কোনো-কোনো সিনিয়র প্রফেসরকে নিয়ে গোপনে-গোপনে দরজায় খিল এঁটে পরামর্শ করেন। তাদের কি বিশ্বাস করেন?' রাজীববাবু চুরুট জ্বালিয়ে বললেন, 'বলতে পারি না। করেন হয়ত। হয়ত করেন না।' চুরুটটা মুখের থেকে নামিয়ে সেটার আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন।

ঠিকা ঝি মানকুমারের মা উঁকি দিতেই রমা বললে, 'এই চা টা একটু গরম করে আনবে মানুর মা?' চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঝি চলে গেলে রমা বললে, 'আমার মনে হচ্ছে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিয়ে মাথা ঘামান না আমাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। উনি নিজের পদে টিকে থাকতে চান। নানারকম মানুষ ওর সম্বন্ধে নানা কথা ভাবলেও একটা পোশাকি সুনাম আজ পর্যন্ত রয়েছে যে-পদের বসে আছেন সেটার, সেটা যাতে কোনোরকমে না টেঁসে যায়!'

মানকুমারের মা চা গরম করে দিয়ে গেল; পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে রমা বললে, 'তা যাবে না। সুনামের বান না-ডাকিয়ে ছাড়বেন না। আমি জানি।'

'ও।' প্রভাসবাবু বাতে ঝিমঝিম পাটাকে আস্তে-আস্তে সামনে একটা কাঠের চেয়ারের ওপর তুলে দিয়ে বললেন। 'তোমার পিটিশনটা, ছিঁড়ে ফেললেই পারতেন তিনি,' রাজীববাবু এক-আধটা টান দিয়ে চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে হাতে ধরে রেখে বললেন, 'তুমি আমি আর তিনিই ত জানতেন-অন্য কেউই ত জানত না কিছু, না ছিঁড়ে জিনিসটা দশ কানে তুলে কী সতর্কতা হচ্ছে?'

'ওঁর দিক দিয়ে ঠিক কাজই করেছেন উনি।'

'কেন?'

'প্রিন্সিপ্যাল মনে করেন দরখাস্তটা ওঁর হাতে দেবার আগে অন্য অনেককে দেখিয়েছেন আপনি—'

'কাউকেই দেখাইনি আমি। এ সম্বন্ধে কারুর সঙ্গেই কোনো কথা হয়নি আমার।'

'সেটা সত্য। কিন্তু উনি প্রিন্সিপ্যালের কাজ করেছেন, অনেক কিছু ভেবে দেখতে হয় ওঁকে।'

'তা হবে', রাজীববাবু বললেন, 'কিন্তু এর আগের প্রিন্সিপ্যাল এ-রকম ছিলেন না, তার আগে মল্লিক মশাই ছিলেন। তিনিও এরকম ছিলেন না। এরা অফিসের সব ব্যাপারে পুরোপুরি আমাদের বিশ্বাস করতেন, কোনোদিন ত কোনো গোলমাল হয়নি, মল্লিকের আগে শ্রীধর চাটুয্যে প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি নির্বিচারে আমাদের বিশ্বাস করেছেন, আমরা শৃঙ্খলা রেখেছি, কলেজের সুনাম আরো বেশি ছিল তখন—দেবতার মত মানুষ তিনি—'

চায়ে চুমুক দিয়ে রমা বললে, 'সে সব দেবতার দিন নেই এখন আর। কলেজের ছেলেমেয়েরা সব খুদে শয়তান, বাইরের বড় বাসমতীটায় নানারকম ঘোড়েল লোক থাকে, প্রিন্সিপ্যাল সতর্ক না হয়ে করবেন কী?'

প্রভাসবাবু বাতে টনটনে পা-টা একটু নেড়েচেড়ে বললেন, 'কী, হল কী তোমাদের, ব্যাপার ভাঙছ না রমা?'

'কিছু না, একটু বাতচিত হচ্ছে,' রমা বললে। টের পেল পাতলা চা-টা গরম করে নিয়ে আরো খারাপ হয়েছে।

তবে হতে থাকুক বাতচিত। মানকুমার ছোকরা এসেছে?'

'হ্যাঁ, পেয়ারা গাছে চড়েছে।'

'ওকে ডাক দাও ত। আচ্ছা ওরা কি ক্রিশ্চান?'

'মানকুমার বলে কিন্তু মানোয়েল নাম, ক্রিশ্চানই ত,' রমা বললে, 'খুব সম্ভব নামটা ইম্যানুয়েল।'

'ক্যাথলিক?'

'জিজ্ঞেস করিনি। মানোয়েলকে দিয়ে কী দরকার তোমার?'

'আজ বোধহয় একাদশী, পা-টা টাটাচ্ছে, বারান্দয় তারপিন তেলের বোতলটা আছে, আনতে বলো, মালিশ করে দেবে।'

'মানোয়েলকে ডেকে রমা বললে, 'দেরাজে উইন্টোজেনো আছে তোমার; তারপিন কেন, সেইটেই দিক।'

'দিক। এস ত মনোয়েল, তোমাকে আনা চারেকের পয়সা দিচ্ছি বাবা, এই মলমটা আমার বাতের জায়গাটায় সেঁটে মালিশ করে দাও ত,' পা বাড়িয়ে দিলেন প্রভাসবাবু।

'ফ্ল্যানেলের সেঁক দেবে?' রমা বললেন।

'না, অতটা না।'

'আচ্ছা ব্যথা না-কমলে রাতে আমি মালিশ করে দেব। হ্যারিকেনের ওপর মার সেই পুরনো দু'টো ফ্ল্যানেলের জ্যাকেট গরম করে নিয়ে পর-পর সেঁক দিয়ে দেব।'

'এখুনি কমে যাবে' প্রভাসবাবু চুরুটটা মুখের দিকে তুলে নিতে-নিতে বললেন, 'তোমার মার ফ্ল্যানেলের জ্যাকেট হ্যারিকেনে কালি করে দরকার নেই। বেশ টিপছে মানোয়েল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমা রাজীববাবুর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললে, 'প্রিন্সিপ্যালকে ধরে নিতে হয়েছে যে আমার পিটিশনটার কথা আমিও দশজনের কাছে বলে বেড়িয়েছি।'

মজুমদার প্রিন্সিপ্যালের আমলে কলেজ দরখাস্ত-টরখাস্ত চাপা দেয়—আরো কত কী করে—এই সব বদনাম আমি রটিয়েও বেড়াতে পারি আন্দাজ করে তিনি নিজের কর্তব্য ঠিক করে গিয়েছেন।'

রাজীববাবু চুরুট নামিয়ে রেখে বললেন, 'কিন্তু তোমার সম্বন্ধে এ-রকম সব কথা—এতটা দূর—ভাবতে পারলেন, তিনি?'

'আপনার সম্বন্ধেও ভাবলেন, কলেজের পুরনো বিশ্বাসী মানুষ আপনি।' রমা পাতলা মিয়নো চায়ে কোনোরকমে আর-একবার চুমুক দিয়ে বললে, 'আমাকে আর ক'দিন চেনেন উনি।'

'কিন্তু খুব ত বিশ্বাস করেছেন এর-আগে তোমাকে।'

'আমাকে?'

'কলেজের সব ছেলেমেয়ের চেয়ে বেশি। দেখছি তা। তুমিও টের পেয়েছ যে প্রিন্সিপ্যাল নিজেকেই সবচেয়ে ভালবাসেন বলে তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন সেটা এত খারাপ হল।'

চায়ের কাপের আধাআধি অবদি শুষে ফেলেছে আস্তে-আস্তে রাজীববাবুর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে রমা। চায়ের কাপের দিকেই তাকাল আবার সে, আরো খাবে। রাজীববাবু সেদিন যখন প্রিন্সিপ্যালের কামরা থেকে কিছুক্ষণের জন্যে নিচে ভবেনবাবুর ঘরে চলে গিয়েছিলেন তখন রমাকে একা পেয়ে প্রিন্সিপ্যাল যে-কথাগুলো বলেছিলেন, পোশাকি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বিনিময়ের চেয়ে যা ঢের বেশি প্রাণঘন, সেইসব মনে পড়ল রমার। সে সব ত সেই সব।

কিন্তু রমার পিটিশনটা নিয়ে দু-চারজন প্রফেসর ও মেম্বারের সঙ্গে ব্যাপারটা পাকিয়ে তোলবার আগে রমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে পারতেন তিনি। অন্তত কী তার সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্য একটা বিবৃতির মত রমাকে সেটা জানালে প্রিন্সিপ্যালের সম্বন্ধে মন এ-রকম বিরস হয়ে উঠত না। প্রিন্সিপ্যালের ওটাও বাইরের ঠাট হত বটে, কিন্তু ঠাটেরও অন্তরঙ্গতার একটা মূল্য আছে। ভানের ভেতর থেকেও আন্তরিক মানুষের ক্রমে ক্রমে প্রাণ ফুটে ওঠে কিন্তু বাসমতী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মাড়িয়ে যেতেই ভালবাসেন যেন, কলেজের কেরানি মাস্টার ছেলেমেয়েদের প্রাণের ওপর দিয়ে, নিজের সুবিধার জন্যে।

অথচ রমাকে ঘরে একা পেয়ে স্মেলিং সল্টের শিশিটা ঘনিয়ে দিয়ে দেয়া, কথায়-কথায় ছোট ছোট ছেঁড়া-ছেঁড়া কথায় প্রাণের পরিচয় দেয়ার অদ্ভুত পটুতা, যেন প্রাণ নেই লোকটার, বদলে প্রাণের কলকাটিটাতে আশ্চর্য প্রাণশক্তি রয়েছে।

'তোমার সঙ্গে তারপরে আর দেখা হয়েছিল প্রিন্সিপ্যালের?' রাজীববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'না।'

'কেন? অনার্স ক্লাস আর হয়নি?'

'একটা ক্লাস হতে পারত। কিন্তু সেদিনও তিনি ক্লাস নেন নি, অন্য সব জরুরি কাজ ছিল।'

'তারপর আর হল না?'

তারপর শুক্কুরবারগুলো কেবলি ত কলেজ ছুটি হয়ে যাচ্ছে—ওঁর অনার্স ক্লাস আর হয়নি। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।'

'প্রিন্সিপ্যাল কি এর মধ্যে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কোনোদিন?'

'না।'

'তোমার ঐ পিটিশনটা নিয়ে যে এত ব্যাপার হচ্ছে, তোমার কানে যায়নি কিছু?'

রমা পেয়ালার ভেতরে, চায়ের পরিমাণের দিকে চোখ তুলে চামচ দিয়ে চা নাড়তে নাড়তে বললে, 'না, কিছু না। এই ত আপনার কাছে শুনছি আমি। আমার দরখাস্তটা প্রফেসরদের দেখিয়েছেন বুঝি? এ নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে? কমিটিতেও তুলবেন ঠিক করেছেন?'

'ও—' রাজীববাবু চুরুটটা মুখের থেকে নামিয়ে ডান হাতের থেকে বাঁ হাতে রেখে দিয়ে বললেন, 'তুমি তাহলে এর মানে কিছুই জানতে পারনি? বলেনি কেউ তোমাকে?'

'না।'

'তোমাকে জানানো উচিত ছিল এসব।'

'আমি ত ওঁর কাছে দোষী হয়ে আছি, কেন জানাবেন?' রমা চায়ে আরো এক চুমুক দিয়ে বললে। যে-দেশে চায়ের নামও কেউ কোনোদিন শোনেনি, সে-দেশের স্টেশনে ট্রেন থেমেছে যেন, রমাকে এই পেয়ালার চা-টা কেউ অনেক কষ্টে কী করে কোত্থেকে যেন জোগাড় করে দিয়ে গেছে, এই স্টেশনে চা বলতে এইটুকুই যেন ছিল, এই রকম ভেবে নিলে এই চা-ও ভাল লাগে। 'আমি যে বলেছিলাম পিটিশন করে পরদিনই রাজীববাবুকেই সেটা প্রিন্সিপ্যালের কাছে পেশ করতে বারণ করেছি, আমার সে মিথ্যা উনি ধরে ফেলেছেন।'

'সঙ্গে আমার ডবল মিথ্যাটাও ধরেছেন। আমি ত সেদিন কোনো প্রতিবাদ করিনি তোমার সৎ মিথ্যা কথাটার।

রমা হেসে বললে, 'মিথ্যা কথার সৎ অসৎ আছে?'

'নিশ্চয়ই, তুমি যা-বলেছিলে তা মিথ্যাও না সত্যও না, একটা সৎ জিনিস। একটা চশমখোর ঘোড়েল লোকের হাত থেকে তুমি ত আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলে।'

'চশমখোর কি উনি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও রকম চমশখোর আমাদের কলেজের কর্তৃপক্ষের ভেতরেও এক অমিয় সেনশর্মা আর অরুণ সেনশর্মা ছাড়া আর—কাউকে দেখিনি কোনোদিন। আমি ত চল্লিশ বছর ধরে এই কলেজের নাড়ীনক্ষত্র দেখছি।'

আরো চার পাঁচ চুমুক আন্দাজ চা আছে পেয়ালাটার ভেতর। খুব বেশি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মিষ্টিও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

রমা চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'কিন্তু তবুও এই রকম সব ত হল রাজীব কাকা, প্রিন্সিপ্যালের কাছে মিথ্যা কথা বলেও পিটিশনের ভূত ত তাড়ানো গেল না।'

'মিথ্যা কথা বলেছিলে প্রিন্সিপ্যালের কাছে?' প্রভাসবাবু মানোয়েলকে বাঁ পা-টা মালিশ করতে বললেন, 'সিদ্ধার্থ যে-রকম ভালোরিকে বলতে চেয়েছিল জিরানডাঙার লোকগুলো ক্যাথলিক? সৎ উদ্দেশ্য ছিল সিদ্ধার্থের, কিন্তু তুমি ত তাকে চেপে ধরেছিলে।'

'সিদ্ধার্থদা মিথ্যা কথা বলেন নি শেষ পর্যন্ত, কোনো কারণও ঘটেনি বলবার। দরকার হলে বলত কি না জানি না। কিন্তু আমি ত বলেছিলাম। কিন্তু হল না ত কিছু—কোনো উপকার হয়ত হল না আপনার,' রাজীববাবুর চোখ, চুল, জামা, বোতামের দিকে তাকিয়ে রমা বললে।

'পিটিশনটা নিয়ে এ-রকম ছেঁড়াকাটা হচ্ছে যখন, তখন এর পরিণাম —'। রমা বললে—'রাজীব কাকা।'

রাজীববাবু কথা বলতে-বলতে, কথা ভাবতে-ভাবতে একটা নিঃশব্দ অন্ধকারের খোড়ল ফাটলের ভেতর ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। রমার কথা শুনে সাড়া দেবার জন্যে নড়েচড়ে উঠলেন।

'আমার দরখাস্তটা আপনি চেপে গেলেন কেন?'

'কেন?'

'আমি দেখলাম দরখাস্তটা তুমি ঝোঁকের মাথায় লিখেছ।'

'ও দরখাস্তের কোনো মূল্যই দিইনি আমি।'

'কী মনে করে? মাসে পঞ্চাশ টাকা করে বৃত্তি তোমাকে কলেজ দিচ্ছে, তুমি ফার্স্ট হয়েছ বলে। তোমার কোনো বিশেষ নৈতিক অধঃপতন না ঘটলে সে বৃত্তি রদ করে দেবার ত কোনো কথাই ওঠে না। তোমার ও-দরখাস্ত প্রিন্সিপ্যালই ছিঁড়ে ফেলে দিত, না-হলে গভর্নিং বড়ি হেসে উড়িয়ে দিত।'

'এ-রকম একটা দরখাস্ত করেছিলে নাকি মরা?' প্রভাসবাবু বললেন। অনেকক্ষণ চুরুট খাননি, পুরনো আধ-খাওয়াটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে একটা নতুন চুরুট বের করে নিলেন কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে। কই আমাকে তুমি বলোনি ত।'

'আমি বুঝতে পারলাম—'রাজীববাবু চুরুট টেনে নিয়ে বললেন, 'তোমার ও-দরখাস্ত ওপরওয়ালাদের টিপ্পনী-ছ্যাবলামি হবে। বড় প্রফেসররা, কমিটির মেম্বারদেরও অনেকে, কলেজের মেয়েদের নিয়ে এমনিই ত কত কেচ্ছা করে, মাঝে-মাঝে শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। তোমার দরখাস্তটা নিয়ে অনেক রগড় চিপটেন চলত!'

উপলক্ষ্য ছাড়িয়ে তারপর পাত্রীর ওপর গিয়ে সেটা উপচে পড়ত?'

'এখানে পাত্রের চেয়ে পাত্রীকে নিয়ে রসালো গল্প জমে বেশি, সেটা চার বছর এই কলেজে পড়ে কিছু-কিছু বুঝেছ, হয়ত; 'রাজীববাবু বললেন, 'এই সব ভেবেই দরখাস্তটা চেপে গেলাম আমি।'

খুব তাড়াহুড়ো ছিল না,' চুরুটটা নিভে যাচ্ছে প্রায়, নিভুক ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে আলগোছে সেটাকে ঠেকিয়ে রেখে রাজীববাবু বললেন, 'রমাকে সব বুঝিয়ে বলব ভাবছিলাম, কিন্তু তার আগেই প্রিন্সিপ্যাল জেনে ফেললেন।'

'কী করে জানলেন তিনি?' প্রভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আমিই জানতে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে দরখাস্তটার কী হল।' রমা চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'ফলে কি যে সব সন্দেহ আর হিংসে জাগিয়ে দিলাম তাঁর মনে! এরকম কী করে হয় আমি বুঝতে পারি না।'

বাইরে রাত্রি বাড়ছে, অন্ধকার জমে উঠছে বেশ। রমার কথাটাকে ঘরের ভেতরের দু'জন বয়স্ক পুরুষ নিজেদের বিচারবুদ্ধির আলোয় সমাধান করতে চাইছিলেন, কিন্তু ঠিক করতে পারছিলেন না কিছু। পৃথিবী আর আগের মত নেই—দ্রুত পটভূমি বদলে যাচ্ছে বাড়ি, ব্যাঙ্ক, শেয়ার মার্কেট, সাপ-খোপ, কুমির, বাঘের জঙ্গল, কলেজ, সবই মুক্তোর মতন টলমল করছে যেন, একই সুতোর ভেতর,—একটা অব্যর্থ মুক্তের মালার।

'সীমার কথা লিখেছিলে তুমি তোমার দরখাস্তে,' রাজীববাবু, 'তা নিয়েও পাঁচালি জমেছে খানিকটা ওদের মধ্যেও।'

'কী লিখেছিলে সীমার কথা?' প্রভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'লিখেছিলাম ঐ পঞ্চাশ টাকার বৃত্তিটা। দিয়ে আমার আর কোনো দরকার নেই, সীমা সেকেন্ড হয়েছে, কাজেই সীমাকে—'

'মেয়েদের মধ্যে সেকেন্ড!' রাজীববাবু বললেন।

'কিন্তু তখন তোমার দরখাস্তটা রাজীববাবুকে বাইরে ডেকে তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে চলে এলেই ত ভাল করতে তুমি,' প্রভাসবাবু বললেন।

'তা কী করে বলা যায়?' রাজীববাবু ছোট্ট কাগজের মোড়ক খুলে এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'তাহলে ত চাকরি যেত আমার।'

'কোনো নৈতিক অপরাধ হত না? শুধু চাকরি যেত?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দুইই হত। নৈতিক অপরাধ যেত।' নস্যির ঝাঁঝে হাঁচি দিলেন রাজীববাবু, একটা ময়লা রুমাল বের করে ভাল করে নাক ঝেড়ে রগড়ে লাল করে ফেললেন নাকটা।

প্রভাসবাবু চুরুট জ্বালিয়ে বিরস মুখে বললেন, 'এসব কলেজে চাকরি টিকিয়ে রাখাই প্রধান কথা—যারা না-খেতে পেয়ে মরছে সেই সব বাঙালিরা যারা বেশি মাইনে পাচ্ছে কলেজের সে সব ওপরওয়ালাদের নীতি ঠিক থাকলেই আপনারা হেসে ধুম্বল দিতে তাদের কাছা ধরে স্বর্গে চলে যেতে পারবেন।' রাজীববাবুর দিকে ফিরে প্রভাসবাবু বললেন, 'তবে এখনো পথ আছে আপনার।'

'কীসের কথা বলছেন?'

'সেই কানুর কথা বলছি, তিনি ছাড়া আর গতি নেই দেখছি কোথাও বাসমতীতে,' প্রভাসবাবু বললেন, 'প্রিন্সিপ্যাল আপনার চাকরি নিয়ে টানাটানি করতে চাইলে আপনি বলবেন যে দরখাস্ত পাবার পরদিনই আমি রমার হাতে দরখাস্তটা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—'

'তারপর?'

'তারপর রমা বুঝবে।'

রমা চুপ করে রইল। প্রভাসবাবু মানোয়েলকে ডান পায়ের আরো খানিকটা মালিশ লাগিয়ে আর পাঁচ-সাত মিনিট টিপলেই হয়ে যাবে বললেন। রাজীববাবু নেভানো চুরুটটা জ্বালাবেন কিনা ভাবছিলেন, দানাপুরে ফিরতে-ফিরতে বেশি রাত হয়ে যাবে, এদিককার পথঘাট যে-রকম, মাইল খানেকের ভেতরেও কোনো লোকজন পাওয়া যাবে না। স্নুত রাতে চারদিকে ঝোপ-জঙ্গল ঘাঁটি উঁচু-উঁচু গাছের মত উপবন, জ্যোৎস্না রাতে বেশ দেখায়। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের বেশি অন্ধকার রাত আজকাল, চুরুটের আলো জ্বালিয়ে পাড়ি দিতে হবে, এই চুরুটটার আধাআধি শেষ হয়েছে, বাকি অর্ধেক থাক তাহলে পথের সম্বল রইল, উঠবার সময় ভাল করে জ্বালিয়ে রওনা দেবেন। চুরুটটা জ্বালাতে গেলেন না এখন আর।

'আমাকে চাকরির থেকে সাসপেন্ড করেছে,' রাজীববাবু বললেন।

'কে?'

'প্রিন্সিপ্যাল। তিন মাসের জন্যে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কমড়ে তাকিয়ে রইল রমা। প্রভাসবাবু চোখ বুঁজে তলিয়ে দেখছিলেন।

'তিন মাস? তারপর?'

'তারপর কী হবে এখুনি বলতে পারছি না। তবে মনে হয় বরখাস্ত হবার সম্ভাবনা। খুব খোশামুদি সুপারিশের ব্যবস্থা করলে খুশি হয়ে কাজে রাখতেও পারেন' কিন্তু রাজীববাবু কাতরে উঠে বললেন 'একেবারে নিরেস হয়ে গেছি, আর-কোনো হয়রানি করবার মতন অবস্থা নেই।'

'কেন সাসপেন্ড করল আপনাকে? কার কী ছিল?'

'গ্রস নেগলিজেনসির জন্যে, একটা জরুরি পিটিশন চেপে রেখেছি বলে, রমার পিটিশনটা।'

'প্রিন্সিপ্যাল কি একাই সাসপেন্ড করতে পারেন?'

'হয়ত গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছেন, নিজের অধিকারেও পারেন হয়ত।'

'প্রেসিডেন্ট কে?'

'বাসমতীর কালেকটর সাহেব।'

'ও,' প্রভাসবাবু বললেন, 'সাসপেনশন কি চালু হয়েছে?'

'আজ ত পঁচিশে, ও-মাসের পয়লার থেকে হবে।'

রাজীববাবু বললেন, 'প্রিন্সিপ্যাল একটা কড়ার দিয়েছেন এই যে রমা যদি প্রিন্সিপ্যাল ও কয়েকজন সিনিয়র প্রফেসর শিগগিরই যে-একটা বৈঠক হবে, সেখানে গিয়ে মুখে বলে আসে যে দরখাস্তটা রাজীববাবুকে দিয়ে পরদিনই তাকে বলে এসেছে যে সেটা উইথড্র করা হল, প্রিন্সিপ্যালের কাছে পেশ করবার আর কোনো দরকার নেই—তাহলে আমাকে সাসপেন্ড করবে না, তবে একটু ওয়ার্নিং দিয়ে কাজে বহাল করা হবে!'

'ওয়ার্নিং?'

'ওটা হয়ত অফিসি দপ্তর, বিশেষ কোনো মানে নেই ওর।' রাজীববাবু বললেন।

'আপনাকে সাসপেন্ড করেছে আমারই দোষে রাজীব কাকা,' রমা বললে, 'কী যে করা যায় বুঝে উঠতে পারছি না, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসারদের কাছে গিয়ে এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না।'

শুনে কেমন থমকে গেলেন রাজীববাবু, যেন নাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, আস্তে আস্তে নিজেকে গুছিয়ে নিতে খানিকটা সময় লাগবে তাঁর। তারপর বললেন, 'প্রিন্সিপ্যাল আর তিনজন সিনিয়র প্রফেসর শুধু থাকবেন সেখানে যাবে রমা?'

'না।'

চুপচাপে কেটে গেল খানিকটা সময়।

রাজীববাবু বললেন, 'প্রিন্সিপ্যাল আরো বলেছেন যে তুমি যদি কথাটা কমিটিতে গিয়ে বলে আসতে চাও, তাহলে প্রিন্সিপ্যাল নিজের গাড়িতে করে খুব খুশি হয়ে তোমাকে কমিটি মিটিঙে নিয়ে যেতে রাজি আছেন। কলেজ কমিটির মিটিঙ সামনের শুক্কুরবার হবে।'

'কলেজ কমিটি মানে, কলেজের গভর্নিং বডির কথা বলছেন? গভর্নিং বডির মিটিঙ?' প্রভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ।'

'আসছে শুক্কুরবার ত আটাশ তারিখ।'

'আটাশ তারিখেই মিটিঙ হবে।'

'কোথায়?'

'কলেজে হবার কথা ছিল, কিন্তু কালেকটর সাহেব সেদিনই ট্যুর থেকে ফিরবেন বাসমতীতে, তিনি আর আসতে পারবেন না। কাজেই তাঁর বাংলোয় মিটিঙ হবে—'

'সকালবেলা?'

'না, সন্ধ্যের পর। রমাকে শুধু দু-মিনিট বসে কথাটা বলে আসতে হবে মিটিঙে। তারপরে প্রিন্সিপ্যালের নিজের গাড়িতে তক্ষুণি তোমাকে জিরানডাঙায় এ বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন তিনি, প্রিন্সিপ্যাল সে-সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন—'

প্রভাসবাবু মানোয়েলকে বিদায় দিয়ে দিয়েছেন। পায়ের ব্যথা কমে গেছে ঢের। বাইরে রাত্রি, তারা, আফ্রিকার বন যদি উপবন হয়ে যায়, তেমনি সব উঁচু উঁচু গাছগাছালি, তবে ঝোপজঙ্গলের বিশৃঙ্খলাও রয়েছে মাঝে-মাঝে। ফুর ফুর করে বাতাস আসছিল। শীত নেই, শীত পড়েনি এখনো দেশে, কিন্তু গরমও নেই, ভাল লাগছিল প্রভাসবাবুর।

'তুমি যাও গাড়িতে যাবে আসবে' দু-মিনিটের জন্যে হয়ে এসো,' প্রভাসবাবু বললেন রমাকে, 'এখানে সত্য মিথ্যার কোনো কথা ওঠে না। কোনোরকম দোষত্রুটি না করে একজন মানুষ ধনেপ্রাণে শেষ হতে চলেছে, এর ভেতর তুমি নিজেও খানিকটা জড়িয়ে রয়েছ। তোমার মুখের কথায় রাজীববাবুর উপকার হবে।' 'না,' রমা ঘরের ভেতরের আলো, ঢের মহত্তর পশ্চাতভূমির মত বাইরের রাত্রির উঁচু উঁচু গাছ ও তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে 'আমার কিছু বলবার নেই।'

প্রভাসবাবু কোনো কথা বলতে গেলেন না আর। তাঁর যা বলা কওয়ার বলে শেষ করেছেন তিনি সব। কোনো মানুষকে বেশি অনিচ্ছায় কাজ করাতে ইচ্ছুক নন। রমা কেন আপত্তি করছে বুঝতে পারলেন না। লাগল খুব প্রভাসবাবুর। ছ'মাস আগেও রমার এ-রকম ধরনের ব্যবহারে তিনি সহজে ছেড়ে দিচ্ছেন না মেয়েকে কিন্তু ছড়িয়ে পড়ছে সব, দূরে সরে যাচ্ছে—খুবই তাড়াতাড়ি; একই সাগরের ভেতর সব দ্বৈপ অস্তিত্বের মত।—সাগরটা কোনো সেতুর মত নয়।

রাজীববাবু মুষড়ে না পড়ে জোর করেই খানিকটা প্রাণসংগ্রহ করে বললেন, 'তুমি প্রিন্সিপ্যালকে একটা দরখাস্ত লিখে দাও যে তোমার পিটিশনটা আমি চেপে রাখিনি, লিখে দাও যে তুমি অ্যাপ্লিকেশন করবার পরদিনই আমার কাছে এসে বলেছিলে যে তোমার মত বদলেছে ও-রকম দরখাস্তের কোনো অর্থটর্থ হয় না, ওটা প্রিন্সিপ্যালের কাছে পাঠাবার কোনো দরকার বোধ করছ না তুমি, ওটাকে ছিঁড়ে ফেলা দেয়া হোক,'—রাজীববাবু ট্যাকের থেকে কাগজের মোড়কটা বের করে ছোট এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'প্রিন্সিপ্যাল বলছিলেন যে মিটিঙে রমার মুখের একটা কথাও হবে, একটা দলিল রাখতে চান ওঁরা। কী বল তুমি?'

'আমার যা-বলবার তা ত হয়েছে; বার বার জিজ্ঞেস করে ওলটানো যাচ্ছে না, আমারও খারাপ লাগছে, রমা বললে, 'আমি দরখাস্তও লিখতে পারব না।'

'এখানে বসে লিখে দাও, প্রভাসবাবু বললেন, রাত হয়ে যাচ্ছে রাজীববাবুর।' রাজীববাবুকে রমা বললে, 'প্রিন্সিপ্যালকে সেদিনই আমি সব বলেছি, আপনিও ছিলেন সেখানে, কিন্তু বিশ্বাস করেননি তিনি। কিন্তু সেই একই কথা পাঁচজনের সামনে মিটিঙে বললে বিশ্বাস করবেন, অথবা লিখে সই করে দিলে দলিল হিসেবে সকলে মিলে বিশ্বাস করবেন, প্রিন্সিপ্যালের এ-রকম ধরনের বিশ্বাসভাজন হয়ে কোনো দরকার নেই আমার।'

'রমা'—

'আপনি নিজে খুব ধাক্কাটা খেলেন রাজীব কাকা,' রমা বললে, 'কিন্তু অন্য কোনো রকমে এর বিধান হয় কি না সেটা চেষ্টা করে দেখতে হবে—'

'অন্য কোনো রকমে? প্রভাসবাবু থমকে ঠাণ্ডা মেরে গিয়ে বললেন, 'ওটা ত প্রায় পরলোকের কথা হল।'

'প্রিন্সিপ্যাল যা চাচ্ছেন সেটা পারা গেল না।' তেপয়ের ওপর হ্যারিকেনের আলোটা একটু ডিম করে দিয়ে রমা বললে।

'আমি উঠি,' রাজীববাবু ঘরের ফিকে আলোয় দেয়ালের ওপর বাইরের বাবলা গাছের ছায়াটাকে আবছা হয়ে যেতে দেখে বললেন।

'অনেক রাত হয়ে গেল আপনার', প্রভাসবাবু বললেন।

'আমি যাব আপনাদের বাড়িতে দু-এক দিনের মধ্যে,' রমা বললে রাজীববাবুকে।

'আচ্ছা যেও।'

'দমে যাবেন না রাজীব কাকা, প্রিন্সিপ্যাল কিছুতেই সাসপেন্ড করতে পারবেন না আপনাকে।'

'তিনি করেছেন ত, নোটিশ দিয়েছেন।'

'ও নোটিশ পাল্টাতে হবে, আপনাকে কিছুতে বরখাস্ত করতে পারবেন না।' রাজীববাবু ট্যাঁকের থেকে ঘড়ি বের করে একবার সময়টা দেখে নিয়ে বললেন, 'শ্রীধর চাটুজ্যে মশায়ের সামনে সে-কথা বলতে পারতে; কিন্তু দিনকাল বদলেছে, মানুষরাও অন্যরকম হয়েছে। এই কলেজে সবই কিছু ভাল দেখিনি এই চল্লিশ বছর ধরে চাকরি করে। কিন্তু সবই যে এত বেশি খারাপ হয়ে যাবে সে কথা ভাবতে পারিনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি চেনো না—' রাজীববাবু অনেক দিনের বরফে মৃত একটা মাছের মত একটু ফ্যাকাশে হাসির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিন্তু চেনো না বলি কী করে, খুব চিনেছ এখন। প্রিন্সিপ্যালকে আমার চেয়ে কম চেনোনি তুমি। উনি আমার একটা ব্যক্তিগত সর্বনাশ করেছেন বলে মনটা আমার খুব তিতো হয়ে আছে, তাই বেশি কিছু বলব না আমি। কিন্তু আমার নিজের স্বার্থে তোমাকে যে কমিটিতে গিয়ে একটা কথা বলতে বলেছিলাম কিংবা দরখাস্ত লিখে সই করে দিতে। তোমাকে সেদিন তিনি সত্যিই বিশ্বাস করলেন না, অথচ আজ আবার বিশ্বাসের একটা অদ্ভুত মাখামাখির পাতে নেমতন্ন করছেন, ওসব লোকের থেকে একটু আলগা থাকাই ভাল। তুমি যেও আমাদের বাড়িতে রমা, সীমা অনেকবার করে বলে দিয়েছে।'

'বাইরে ত খুব অন্ধকার রাজীব কাকা।'

'অন্ধকারে চলাই অভ্যাস আমার।' চুরুটটা খুব ভাল করে জ্বালিয়ে নিয়ে রাজীববাবু বললেন।'

'হ্যারিকেনটা ধরছি।'

'না, কিছু দরকার নেই। এই যে আমার টর্চ,' বলে দূরে অন্ধকারের ভেতর থেকে কয়লামণ্ডের মত জ্বলন্ত চুরুটটা উঁচিয়ে দেখালেন রমাকে। রমা হ্যারিকেন নিয়ে গেল পেছনে-পেছনে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা অবদি, এবং আরো অনেকটা দূর।

'আমাকে ত অন্ধকারে রেখে গেলে,' প্রভাসবাবু বললেন, 'কিন্তু নিজেও তুমি একা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চরে এলে দেখছি।'

'অন্ধকারে মুস্কিল হল তোমার? এই ত ভালয় ভালয় আমি চলে এসেছি। আমাদের এক বান্ডেল মোম আছে।'

'কিন্তু হ্যারিকেনটা তুমি রাজীববাবুকে গছাতে পারবে সেটা আমি ভাবতেই পারিনি।'

'কেন?'

'দরখাস্তে একটা সই পর্যন্ত দিতে চাইলে না। ও হ্যারিকেন ত তোমার মুখে ছুঁড়ে মারল ঠিক কাজ করতেন তিনি।'

'কিন্তু উনি খুব ভাল মানুষ।'

'প্রভাসবাবু চুরুটটা নামিয়ে রেখে বললে, 'ওঁর সম্বন্ধে এখুনি ব্যবস্থা করতে হবে। তোমায় গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ ও কলেজ স্কলারশিপের টাকাগুলো, আমিও কিছু-কিছু দেব ওঁকে না জানিয়ে, কখনো যেন জানতে না পারেন সীমার সঙ্গে কড়ার করে মাসে-মাসে দিয়ে আসতে হবে সীমার হাতে তোমাকে, যে-পর্যন্ত না কলেজের ব্যাপারের একটা কিছু রফা হয়।'

'কিন্তু ট্রাকা নেয়াতে পারব—সীমাকে কিংবা রাজীববাবুকে দিয়ে?'

রমা অন্ধকারে মোমের বান্ডিল খুঁজতে-খুঁজতে বললে, 'যদিও-বা সীমার বাবাকে টাকাটা বাঁকা পথ দিয়ে পাইয়ে দেয়া যেতে পারে, কিন্তু সীমা খুব হুঁশিয়ার, ওকে নিয়ে বিপদ। এও সেই দরখাস্তে সই দেবার মতই কঠিন।'

মোম খুঁজে পাচ্ছিল না রমা। প্রভাসবাবু চুরুটটা তুলে নিয়ে বললেন, 'রাজীববাবুর সুবিধার জন্যে একবার মিথ্যা কথা বলে দ্বিতীয়বার তার উপকার হবে জেনেও মিথ্যা কথা বলতে রাজি না হয়ে ব্যাপারটাকে তুমি খুব ঘুলিয়ে ফেলেছ। এ কাজ তোমায় করতেই হবে।'

রমা মোম জ্বালল।

কিন্তু মোমা বাইরের বাতাসে নিভে নিভে যাচ্ছিল। মোমের আগুনে চুরুটটা ভাল করে জ্বালিয়ে নিলেন প্রভাসবাবু।

'মানোয়েলের মা চলে গেছে?'

'না ওরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে।

'কাজকর্ম হয়ে গেছে সব।'

'হ্যাঁ, যাবে তুমি?'

'একটু পরে। কিন্তু এ বাতি টিকবে বলে মনে হচ্ছে না। টেকাতে গেলে সব জানালাগুলো বন্ধ করে দিতে হবে।'

ঘর গরম হয়ে যাবে তাতে।' রমা বললে, দিদির বিয়ের সময় যে লণ্ঠনটা কেনা হয়েছিল সেটা কোথায়?

প্রভাসবাবু কোনো কথা বলবার আগে উড়ো হাওয়ার মোমের বাতিটা নিভু-নিভু হয়ে কোন রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে জ্বলে ওঠে, প্রভাসবাবু ও রমার দিকে একবার উজ্জ্বল ভাবে তাকিয়ে নিয়ে খস করে নিভে গেল তারপর। এ বাতিটা জ্বালান হয়েছিল বলেই বোধহয় সব কটি জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকে পড়ছে এই ঘরে। এই বাতাস আগেও কি ছিল, মোম জ্বালিয়ে এখন নজরে পড়ছে? ভাবতে-ভাবতে রমা দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে নিল মোমবাতিটা।

'সেই লণ্ঠনটা কি হারিয়ে গেছে?'

'না, আছে।'

মোমের বান্ডিলের ভেতর থেকে আর-একটা মোম বের করে রমা বললে, 'আছে? কোথায় আছে খুঁজে দেখতে হবে। না কি তুমি জানো?'

'তুমি কি পারবে নিয়ে আসতে? অনেক দিন থেকে ত পড়ে আছে বাতিটা। ছাদে যে আমার ঘরটা আছে, সে-ঘরে ছাদের ওপর একটা বড় কেরোসিন কাঠের বাক্সের ভেতর লণ্ঠনটা আছে। সে-বাক্স নানারকম গেলাস, বোতল, বইম, ছেঁড়া জুতো, পরনের জামা, নাট বল্টু, লোহার গজাল, পেরেক-ভাঙা, কাঁচ, কত কী যে আছে—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রমা হাতের মোমটা জ্বালিয়ে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা আমি দেখে আসছি। বাক্সের ঢাকনি খোলা ত? না, পেরেক মেরে প্যাক করে দিয়েছিলে বেচু মিস্ত্রিকে দিয়ে?'

'খোলা আছে। কিন্তু ভয় হয় ওর ভেতর সাপটাপ বাসা বাঁধে নি ত?'

'সাপ ওখানে গিয়ে কী করবে?'

'অসম্ভব নয়। কাঁকড়া বিছে কিলবিল করছে। রাতের বেলা তুমি ওখানে যেও না। মানোয়েলের মা একটা ঝাঁটা নিয়ে যাবে কাল সকালে—'

'কিছু হবে না। ঠিক আমি এই যাচ্ছি আর আসছি,' রমা বললে। তুমি আগে আস্তে বাক্সের ঢাকনিটা তুলে মোম ঘুরিয়ে ভাল করে ভেতরটা দেখে নিও, লণ্ঠনটা এক কিনারে আছে নিচের দিকে, আলগোছে তুলে এনো। কিছু নাড়াচাড়া দিও না।'

'আচ্ছা-হবে সব।' রমা বললে।

'তুমি যাবেই, তুমি করবেই,' প্রভাসবাবু সময়ের বহমান, নিরেট সম্ভাব্যতার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার কোনো ব্যাপারে হাত দেবার জো নেই ত আমার। রমা—'

'এই যা, আমার হাতের বাতিটা নিভে গেল আবার। একটা দেশলাই সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।'

'চিলেকোঠার ছাদে ওঠবার সিঁড়িটা কিন্তু জায়গায়—জায়গায় ধসে গেছে। মেরামত করাব-করাব ভাবছিলাম, কিন্তু কিছু করানো হয়নি এখনো। সাবধানে পা ফেলে উঠো।'

রমা নিজের হাতের মোমটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'এই দেশলাইটা সঙ্গে নিলাম। আর খালি দেশলাই বাক্সটার কয়েকটা কাঠি রেখে যাচ্ছি তোমার জন্যে।'

'চিলেকোঠার ছাদটা কিন্তু একেবারে খোলা, কোনো পাঁচিল নেই, কিনারে যেও না।'

আধঘন্টা পরে লণ্ঠন নিয়ে ফিরে এল রমা। আকাশে চাঁদ এসেছে, খুব সম্ভব কৃষ্ণা দশমীর ঝাউ সিসুর ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। কেমন যেন একটা ভাঙা ধোঁয়াটে চিমনির ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে আলোকখণ্ড অথচ আকাশে কোনো মেঘ নেই। কৃষ্ণা তিথির চাঁদটাকে আলোর পয়জারে মানুষ ও সৃষ্টির কেমন যেন একটা সম্ভাব্য অন্ধকারে প্রতীক বলে মনে হয়, লণ্ঠনটা টেবিলের ওপর রেখে অদ্ভুত নিঃশব্দ চাঁদখণ্ডের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল রমা।

ভাল করে বাতিটা পরিষ্কার করে নিল সে; চিমনিটা সাবান দিয়ে ধুয়ে মুছে সাফ করে নিল।

'দেখছ, কী রকম ঝকমক করছে লণ্ঠনটা' তার বাবাকে বললে রমা, 'এই বারে এ আলো জ্বালালে বাইরের থেকে শ্যামা পোকা উড়ে এসে পড়বে সব, ফড়িং আসবে, টাকা প্রজাপতি আসবে—;

'প্রজাপতি? ইংরেজিতে ওগুলোকে কি বলে?'

'মথ।' রমা বললে, 'মথ নয়?'

'কী জানি।'

বাতি জ্বালানো হল না, বোতলে এক ফোঁটাও কেরোসিন তেল নেই। অনেক দিন থেকেই কেরোসিনের কন্ট্রোল চলছে বাসমতীতে, আরো অনেক দিন চলবে বলে মনে হয়। স্পিরিটের বোতলের দু-তিন বোতল আন্দাজ তেল পাওয়া যায় মাসে, অনেক সময় তাও জোটে না। ক্যানাডিয়ান মিশনের পাদ্রিদের কাছে হয়ত কয়েক ক্যানেস্তারা তেল রয়েছে, এক বোতল ধার চেয়ে আনলে হয়। কিন্তু কে যাবে সেখানে এত রাতে? মোম জ্বালিয়ে ক্যানেডিয়ান ক্যাথলিক মিশনের দিকে রওনা দেবে রাত বারটা-একটার সময়?

এইবার চাঁদের আলোটা খুব ভাল লাগল। সবকটা জানালা খুলে রাখলে সারারাত আলোটা ঘরের ভেতর টিকে থাকবে—মানুষের কোনো দূর অন্ধকারে অস্পষ্ট ভাগ্য বিধাতা বলে মনে হয় না আর; এখুনি আর্জকের প্রয়োজনে স্বাগত কেমন যেন সত্য পারমিতা দেবীর মত মনে হচ্ছিল তাকে।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল প্রভাসবাবুদের।

'ভালোরিরা ঘুমিয়েছে?'

'ঘুমিয়েছে হয়ত' রমা বললে, 'জেগেও থাকতে পারে। মানুষের পৃথিবীতে ঢের কাজ। ওরা ত পরোপকারে মিশন নিয়ে এসেছে।'

'মানোয়েলের মা চলে গেছে।'

'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।'

'এই জানালাগুলো সারারাত খোলা থাক।'

'হ্যাঁ, থাকবে।'

'মোমের বাতিটা নিভিয়ে দাও।'

'দেব।' রমা বললে।

'বই পড়ছ তুমি?'

'একটু লিখছি।'

'চিঠি?'

'না, এমনিই।'

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকটা সময় কেটে গেল। প্রভাসবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

'রমা আছ?'

'কে?' 'আঁতকে উঠে ছটা খোলা জানালার ওপরেই চোখ বুলিয়ে ঘুরিয়ে নিল রমা।

একটা জানালার পাশে এসে দাঁড়াল সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের পেছনে আকাশে মিশরের দেবীর আধুনিক রেডক্রস সংস্করণের মত চাঁদ, মেহেদির বন, উঁচু সিসু আর ঝাউগাছগুলোও এদিকে।

'প্রভাসবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

'হ্যাঁ, এই ঘুমুলেন। এখুনি মশারি ফেলে দেব।'

'না, না, দরজা খুলতে হবে না,' রমা কয়েক পা হেঁটে দরজার খিলে হাত দিতেই সিদ্ধার্থ বললে, 'আমি এই জানালায় দাঁড়িয়ে বলছি তোমাকে। মোম জ্বালিয়েছ দেখছি।'

'লণ্ঠনটা কেমন বিগড়ে গেছে।'

'নিভে যাবে না মোম? আজ রাতে বাতাস আছে।'

'ওদের মিশন থেকে তুমি আমাকে একটু কেরোসিন তেল এনে দিতে পারো সেন?'

'দিচ্ছি,' সিদ্ধার্থ বললে, 'কিন্তু আমার চা খাওয়ার কথা ছিল ত এখানে ফ্লাস্কে আমার চা রেখে দিয়েছ ত?'

রমা একটু পিছিয়ে গিয়ে হাসতে-হাসতে বললে—'এ'

এগিয়ে জারুল কাঠের চেয়ারটার ওপর এসে ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে বাঁ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রমা বললে, 'ভাগ্যিস বাবা ট্যুরের জন্যে এই গেল হপ্তায় একটা ফ্লাস্ক কিনেছিলেন, না-হলে কি করে তোমার চা এত রাত অব্দি গরম রেখে দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না।'

'ফ্লাস্কটা দাও তাহলে আমাকে।'

'ভেতরে এসো।'

'না, ভেতরে যাব না, জানালা দিয়ে গলিয়ে দাও।'

'এই শিকের ফাঁক দিয়ে ফ্লাস্ক যাবে না।'

'ও' সিদ্ধার্থ বললে, 'আচ্ছা তাহলে ফ্লাস্ক থাক। একটা পেয়ালায় চা ঢেলে জানালার ভেতর দিয়ে চালিয়ে দাও। তোমাদের পেয়ালা ত ট্যাঙ্কার্ডের মত নয়, শিকে আটকাবে না। দাও, একটু গরম চা খাওয়া যাক।' রমা সিসু জাম মহানিম ঝাউয়ের পেছনে চাঁদটার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থের মুখের ওপর চোখ রেখে বললে, 'চায়ের পেয়ালা ত রান্নাঘরে তালা মেরে আটকে রেখে গেছে মানোয়েলের মা। শেষ রাতে এসে খুলবে, তখন আমরা কেউ ঘুম থেকে উঠি না, সেইজন্য চাবি।'

'সেই জন্যে চাবি ওর কাছে চেয়ে দিয়েছ বুঝি? বেশ লোক তোমরা' এসো ঘরের ভেতর, ফ্লাস্ক থেকে খাবে। কাঁচের গেলাস আছে এ ঘরে দু'টো। কুঁজোয় জল আছে।'

'কাঁচের গেলাসে চা ঢেলে দাও তাহলে, আমি এই ধরছি।'

খুব চওড়া গেলাস সেন, শিকের ফাঁক দিয়ে যাবে না। চামচে দিয়ে চলবে? যদি বলো, সেটা আমি করে দেখতে পারি। কিন্তু তুমি ত বারবার ক্লাসের লেকচারে বল যে জীবনে কোনো দিক দিয়েই স্পুন-ফিডিঙের পক্ষপাতি নও।'

'জিরানডাঙার খবর ভাল।' সিদ্ধার্থ বললে।

'কী রকম?'

'ওরা তিনজনই মরে গেছে। মুসলমানদের কবরখানায় নিয়ে মাটি দেয়া হয়েছে। কাপড়চোপড় সব কিছু পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। যতদূর সম্ভব ডিজইনফেক্ট করেছি আমরা সমস্ত বস্তিটাই। যে-আটজন ছেলেকে আসতে বলেছিলাম তারা সবাই এসেছে, এদের ভেতর তিনজন মুসলমান ছেলে আছে। বেশ খেটেছে পিটেছে সবাই মিলে। আমি ওদের চারজনকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি।'

'বাকি চারজন রয়েছে জিরানডাঙায়?'

'হ্যাঁ।'

'রজনী নান?'

'রজনী অনেকক্ষণ ছিল, কাল আসবে আবার।'

'ইনজেকশনের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলে?'

'না। চেষ্টা করছি। আর কোনো নতুন কেস হয় নি।'

'ভালয় ভালয় এখন আর বেশি জেরবার না-হলেই ভাল। এত রাতে সাইকেল রিকসা পাবে? নেই হয়ত কোথাও। নেই'—রমা অনেক দূর-দূরান্তের দিকে তাকিয়ে বললে।

রিকসা কী হবে?'

'এই বারে জিরিয়ে নাও। এই ঘরে দুধ আর পাঁউরুটি চিনি আছে, ফ্লাস্কে চা নেই সেন, তুমি এলে না, বাসি চা রাখতে গেলাম না আর। এসো'—, রমা দরজা খুলতে গেল। সিদ্ধার্থ বললে, না গো, আমার সময় নেই, আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে কথা বলছি, দরজা খুলো না তুমি রজনী হ্যাভারস্যাকে অনেক খাবার এনেছিল, জিরানডাঙায় বসেই খেয়ে নিয়েছি আমরা দু'জনে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'কিন্তু এইবার জিরতে হবে তোমার সেন, আমি কোনো কথা শুনব না। ছাদের চিলেকোঠায় একটা খাট রয়েছে, আমি বিছানা পেতে দিচ্ছি।

'আমার এখুনি জিরানডাঙায় যেতে হবে।' সিদ্ধার্থ বললে, 'তোমার ফ্লাস্কটা আমাকে দাও

'কেন?'

'ছেলেরা চা তৈরি করে ভরে রাখবে। মাঝরাত জাগতে হবে ওদের। বারবার চা তৈরি করবার সুবিধা নেই জিরানডাঙায়। তোমাদের ফ্লাস্কটা ত বেশ বড়'—সিদ্ধার্থ খানিকটা দূরে চাঁদের আলোয় একটা জাতসাপ চলে যাচ্ছিল সড় সড় করে. সেটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'অনেক চা আঁটবে।' সাপটা চলে গেল. দেখতে পায়নি রমা; পকেটে একটা ছুরি আছে সিদ্ধার্থের, কিন্তু আরো ত অনেক জিনিসের দরকার, শক্ত গিঁটবাঁধবার দড়ি, পারম্যাঙ্গানেট পটাশ, হয়ত লেকসিন, একটা বেজী, ঝাড়বার জন্যে একদল ওঝা, কাটা জায়গার বিষটা শুষে নেবার জন্যে জ্যান্ত মুরগির রেকটামের দিকটা, যদি সম্ভব হয় দাঁত দিয়ে শুষে নেবার জন্যে রমাকেই—

'সাপখোপের রাস্তায় এত অন্ধকারের ভেতর হেঁটে যাবে আবার?'

'সাপ কোথায়?' সিদ্ধার্থ মোমের আলোয় প্রভাসবাবুর জবুথবু শরীরও রমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'শুনেছ কখনো কোনো লোককে সাপে কেটেছে জিরানডাঙায়? শুকনো কলাপাতার ফ্যাকড়ার ওপর পা দিলাম, আর অমনি সাপে ছোবল দিল, তাহলে ত এক রাতে একশ বার করে মানুষকে সাপে কামড়াত জিরানডাঙার থেকে শালিকডাঙায় চলাফেরার সময়।'

'কেউ চলে এত রাতে? কেউ না।'

'চলছি ত।'

'কেন যে-তা তুমিই জান।'

'ফ্লাস্কটা দাও।'

দরজা খুলে ফ্লাস্ক দিতেই কাঁধে ঝুলিয়ে অন্ধকারে নেমে পড়ল সিদ্ধার্থ।

সিদ্ধার্থ কলেজ থেকে তিন সপ্তাহের ছুটি নিল। তিন-চার মাসের নেবে ভেবেছিল, পনের দিন ছুটি পাওনা ছিল তার, কিন্তু বেশি লম্বা ছুটি প্রিন্সিপ্যাল দিতে রাজি হলেন না, প্রিভিলেজ লিভও দিলেন নাম ছুটি যখন পাওনা আছে সিদ্ধার্থের, নিজেও সে নিতান্তই ছুটি পাচ্ছে এবারে, তখন সিদ্ধার্থের, দরখাস্তের তিন মাসের জায়গায় তিন সপ্তাহ মঞ্জুর করলেন, সিদ্ধার্থের কাছ থেকে একটা মেডিকেল সার্টিফিকেটও চাইলেন তিনি।

'কিন্তু আমি ত প্রিভিলেজ লিভ চাইছি—' সিদ্ধার্থ বললে।

'সেটা এখন দিতে পারা যাবে না।'

'আমার ত দেড় বছরের প্রিভিলেজ লিভ জমা আছে।'

'সেই জন্যে দেড় বছরের ছুটি নেবেন নাকি আপনি—' প্রিন্সিপ্যাল তাঁর নতুন স্মেলিং সল্টের শিশিটার টাইট ছিপি না খসিয়ে সেটাকে নাকের কাছে এগিয়ে এনে বললেন, 'বড় জোর ছ'মাস দিতে পারা যায়, কিন্তু উইথদাউট পে—গরমের ছুটির মাইনেও পাবেন না।'

সিদ্ধার্থ মনের ধীরতা টিকিয়ে রেখে একটু হেসে বললে, 'ঢের ছুটি পাওনা আছে সে কথা বলছিলাম এ জন্যে যে তাতে কি আমি অন্তত তিন মাস পুরো মাইনের ছুটি পেতে পারিব না।'

'কেন চাচ্ছেন ছুটি?'

'বাসমতী ছেড়ে একটু চলে যাব, একটু বিশ্রাম চাই।'

'শরীর খারাপ হয়েছে?'

'আছে লো ব্লাড প্রেসার, কিন্তু সেটা তত মারাত্মক নয়, একটু নিয়মে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।' কিন্তু সিদ্ধার্থ প্রিন্সিপ্যালের ঘরের দেওয়ালের সান লাইফ অব ক্যানডার ক্যালেন্ডারটার দিকে তাকিয়ে বললে। ক্যালেন্ডারটা পুরনো, কিন্তু উজ্জ্বল রয়েছে এখনো বেশ। এদিকে একটা মানচিত্র ঝুলছে ভারতবর্ষের; কোন কোন এলাকা পাকিস্তান হতে পারে জিরে সর্পের মত কালো কালো ফুটকি দিয়ে ঘেরাও করে সে সবের একটা আন্দাজি নির্দেশ দেয়া আছে।

'কিন্তু মোটের ওপর একটু বিশ্রামের দরকার' সিদ্ধার্থ বললে।

'মনের জন্যে?'

'না,' সিদ্ধার্থ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'মন বাসমতীতেই ভাল থাকবে, কাজের ভেতর আরো বেশি ভাল থাকবে। তবে আপনার কাজের চাপ যদি বেশি পড়ে থাকে, দু' একটা টিউটোরিয়াল ক্লাস বাদ দিয়ে দিতে পারি।'

মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীই যে হাসতে পারে না, পিঁপড়ের থেকে হাতি অবদি কেউ না, সেই কথা মনে পড়তে ঠোঁটে একটু হাসি দেখা দিল সিদ্ধার্থের। মানুষ হাসতে পারে—কিন্তু ভোগ করতে পারে না কেন?

'লেকচারের ক্লাসগুলো থাকুক, ও যেমন চলছে তেমনই চলবে, 'তবে তিনি দেয়ালে ঝোলানো কলেজ টাইম টেব্‌লটা খসিয়ে আনতে বললেন দপ্তরিকে। টাইম টেব্‌লটা প্রিন্সিপ্যালের টেবিলের ওপর রাখতেই তিনি লাল পেন্সিল হাতে নিয়ে সিদ্ধার্থের দিতে তাকালেন।

'দেখুন ত সিদ্ধার্থের টাইম টেবিল মিলিয়ে আপনার কোন টিউটোরিয়ালটা আমি নিতে পারি।'

'আপনি নেবেন? কেন আপনি'—?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি ছাড়া কে আর নেবে? সকলেরই ত বাঁধাধরা কাজ,' তারপরে 'বোঝার ওপরে শাকের আঁঠি' বা 'ছাই ফেলতে আমি আছি ভাঙা কুলো' এসব উপমা দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবার কোনো রকম অন্তরঙ্গ প্রয়াসের দিকে একটুও না ঘেঁষে তিনি বললেন, 'সকলের, সাতাশ, আটাশ পিরিয়ড করে ক্লাস, রাজেনবাবুর ত ত্রিশ পিরিয়ড—আপনার পঁচিশ পিরিয়ড সিদ্ধার্থবাবু, পঁচিশ নয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে—' টাইম টেব্‌লটা সরিয়ে রেখে বললেন, 'আরো দু'এক পিরিয়ড কমিয়ে দেবার দরকার আছে মনে করেন?'

'না। নেই। তবে আমার সবই ত লেকচার, টিউটোরিয়াল খুব কম। সেইজন্যেই গড় পড়তায় মেহনতটা কম নয় কারো চেয়ে' সিদ্ধার্থ দেয়ালে হবু পাকিস্তানের আন্দাজি বেষ্টনীগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে, 'না, আমার কোনো ক্লাস আপনাকে নিতে হবে না। কিন্তু—'

'ফোর্থ ইয়ারের অনার্স আছে আপনার?'

'আছে।'

'মেয়েদের?'

'আমি ত অনার্সের ছেলে মেয়েদের একসঙ্গে বসিয়ে পড়াই।'

'কদিন পড়ান ওদের সপ্তাহে?'

'দু'টো ক্লাস নেই।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'কতদূর হয়েছে আপনার বইটার?'

'প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, আর দু-একটা লেকচার।'

প্রিন্সিপ্যাল স্মেলিঙ সল্টের শিশিটার ছিপি খসাতে গিয়ে, একটু থেমে, দোমনা হয়ে, ছিপিটাকে বরং আটকেই রাখলেন। টেবিলের ওপর শিশিটা নামিয়ে রেখে সিদ্ধার্থকে বললেন, 'তাহলে এ সপ্তাহেই ত বই শেষ হয়ে যাবে আপনার। আসছে সপ্তাহ ও-দু'টো পিরিয়ড আমাকেই দিন। আমি বিনিয়ন পড়াব, সেটা শুরুই করতে পারিনি এতদিনে। আমি মেয়েদের পড়াব, আমার এই ঘরে এনে। মেয়েদের শুক্রবার অনার্স পড়াচ্ছিলাম; সে ক্লাসটা বাদ বিয়ে বরং আপনার এই দু'টো পিরিয়ড নেব। আপনি তাহলে এই দুই পিরিয়ড থেকে রেহাই পেতে পারেন সিদ্ধার্থবাবু। আপনার তেইশ পিরিয়ড হল তাহলে।'

সিদ্ধার্থ বললে, 'এ ত রুটিন অদলবদলের ব্যবস্থা—কিন্তু আমি ত ছুটি নিতে এসেছিলাম।'

প্রিন্সিপ্যাল বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি ত তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত করেছেন।'

'হ্যাঁ, প্রায় তিন সপ্তাহ হল দরখাস্ত করেছি। যে তারিখ থেকে ছুটি চেয়েছি তার পরেও এক সপ্তাহ কেটে গেল।'

'আপনি হয় তো ভাবছেন আপনার দরখাস্ত কলেজের কেরানি চেপে রেখেছে।'

রাজীববাবুর ব্যাপারটা কিছু-কিছু শুনেছিল সিদ্ধার্থ। রমা বা রাজীববাবুর কাছে নয় অবিশ্যি, প্রফেসরদের আলাপ আলোচনার থেকে। মোটামুটি কী যে হয়েছিল না হয়েছিল ভাল করে জানে না। একটা খুব ছোট্ট এফিড্রিনের শিশি পকেট থেকে বের করল সে, শিশিটা কাত করে খানিকটা নস্যি বাঁ-হাতের তেলোয় ঢেলে নিয়ে সিদ্ধাথ বললে, 'না না তা কেন, তা ত নয়। দরখাস্তটা ত আপনার হাতেই দিয়ে গেছি 'আমি।' প্রিন্সিপ্যাল আগেই অন্য নানারকম কাগজপত্রের ফাইল খুলে বসেছিলেন; সিদ্ধার্থের কথাটা স্বীকার না অস্বীকার করে কিছু বলতে গেলেন না তিনি। একটু নিজের ভেতর সরে গেছেন মনে হল। গম্ভীর চোখে নেড়েচেড়ে দেখছিলেন আজকের ডাকের চিঠিপত্র, নথি, দলিল, সব।

এক সময়ে চোখ তুলে তিনি বললেন, 'কিন্তু কী জন্যে ছুটি চাচ্ছেন আপনি সে আমি বুঝতে পারলাম না।'

বিনয়তোষ ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে চারদিকে চুনমুন-চুনমুন করতে ঘুরতে-ঘুরতে বললে, 'বা, একটা এফিড্রিনের শিশি দেখছি টেবিলের ওপর, ওটা কার? স্যারের ত নয় নিশ্চয়ই—' প্রিন্সিপ্যালকে লক্ষ্য করে বিনয়তোষ বললে, 'ওঁর আইডিয়াল ফিজিক, শরীর মনের দিক দিয়ে উনি আমাদের সব কটি প্রফেসরকে বসিয়ে বসিয়ে মহাভারতের আচার্যদের মত অস্ত্রশিক্ষা আর ধর্মশিক্ষা দিতে পারেন।'

'বিনয়তোষ আমাকে আমার জন্যেই ভালবাসে, 'প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'কোনো তপস্যার ফলের দিকে লোভ নেই ওর। শুনলেন ত সিদ্ধার্থবাবু কী রকম কথা বললে। বসো।'

'এক্ষুণি-ক্লাস আছে আমার—আজ ছয় পিরিয়ড।'

'সেই সকাল থেকেই সাঁটাচ্ছ বুঝি। বেশ বেশ' প্রিন্সিপ্যাল মুগ্ধ উজ্জ্বল চোখে নীল শিশিটার দিকে তাকালেন।

'আপনার হাঁপানির টানফান উঠছে নাকি আজকাল স্যার?' মমতাময়ী মাসির মত সতাগ্রহে গলা বাড়িয়ে প্রিন্সিপ্যালকে জিজ্ঞেস করল বিনয়তোষ। সিদ্ধার্থের মনে হল বিনয়ের জিজ্ঞেসটিজ্ঞেসের উচ্ছেদে একটা লবঙ্গকণিকা বিনয়ের দাঁতের থেকে ঠিকরে প্রিন্সিপ্যালের চোখের কোনায় গিয়ে যেন পড়ল। টেরও পেল যেন বিনয়, কিন্তু তখুনি অভদ্র সেজে রুমাল দিয়ে চোখটা মুছে ফেলতে গেলেন না প্রিন্সিপ্যাল, বিশেষত বিনয় এমন-কি সিদ্ধার্থও টের পেয়েছে। সেটা টের পেলেন তিনি; এ-সব সূক্ষ্ম বিষয়েও এ মানুষটি কেমন পরিপাটি দেখছিল সিদ্ধার্থ। বিনয়ের জন্যে একটা বিশেষ টান অবশ্য রয়েছে প্রিন্সিপ্যালের—সেটা কখনো স্বাভাবিক, কখনো কপট আকার ধারণ করে যেন। বিনয়ের শালা বাসমতীর বড় পুলিশ সাহেব। বিনয়ের শ্বশুর কলেজ গভর্নিং বডির ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এ রকম কোনো একটা নির্ধারিত পদ নেই যদিও)। কালেক্টরের অবর্তমানে, এমন-কি তিনি উপস্থিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকলেও, লোচনবাবুই ধর্মত প্রেসিডেন্টের কাজ করেন। তাছাড়া বিনয় নিজে প্রিন্সিপ্যাল ও তার স্ত্রী ও শালীদের এবং পরিবারের সব কটি খাড়ি ক্ষুদির হাতের কাছের খুব ভাল গোছালো জিনিস।

'না না টানফান নেই আমার?' প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'আমার বুক দেখে বিধান রায় বলেছিলেন আপনি মরলে আপনার কলজে দিয়ে হাসপাতালের আয়রন লাংসের কাজ হবে।'

'ও বাবা—' ফড়কে উঠে বিনয় বললে; লবঙ্গের কুচি এবারও যাতে দাঁত থেকে ছিটকে প্রিন্সিপ্যালের চোখে গিয়ে না ঢোকে সে জন্যে একটু দূরে সরে বসেছিল সে। তড়বড় করে কথা বলতে গিয়ে একটু হুঁশিয়ার হয়ে থেমে রইল।

'খুব শীতেও আপনার ব্রঙ্কয়াল কাট্যারও হয় না বুঝি?' বিনয়তোষ দূরের থেকে লবঙ্গ সম্বন্ধে একটু সাবধান হয়ে বললে।

'না। কক্ষণো না। একটু কাশি অবদি না।' প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'বারবার ঠাণ্ডা জলে চান করতুম। আজকাল শালীদের পাল্লায় পড়ে ঠাণ্ডা গরমে মিশিয়ে করছি।'

কথাটার দু-রকম অর্থ থাকতে পারে—ভাবছিল সিদ্ধার্থ। বিনয় অবিশ্যি মোটামুটি মোটা অর্থটার সাহায্যে একটু বিভোর হয়ে প্রিন্সিপ্যালের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

'এই শিশিটা তোমার সিদ্ধার্থ?'

'ঐ স্মেলিঙ সল্টের?'

'না, এই এফিড্রিনের।'

'আম্মার।'

'তোমার হাঁফানি হল?'

'এর ভেতর নস্যি আছে।' বিনয়কে বললে সিদ্ধার্থ।'

'ও' মাইনাস সাত পাওয়ারের চশমাটা খুলে তক্ষুণি এঁটে নিয়ে বিনয় বললে, 'চোখে কম দেখছি আজকাল; নস্যিটা দেখে নিতে।' শিশিটা একবার তুলে ধরে ঘুরিয়ে দেখে নিল বিনয়তোষ।

'এফিড্রিন কে খেল? তোমার পরিবার?'

ফাইনাল বেল পড়ল।

'ওরে বাব্বা, আমার যেতে হবে সেই সায়েন্স বিল্ডিঙে, গ্যালারিতে, ইকনমিকস পড়াতে, এদিকে রুম খালি নেই আর, চললুম স্যার, তোমার স্ত্রীকে এফিড্রিন দিও না, খারাপ জিনিস খুব, তাগা তাবিজের ব্যবস্থা করো, আমার নজরে-টজরে পড়লে কিছু মিলেটিলে গেলে তোমাকে জানাব সিদ্ধার্থ—' পায়ে ছুটতে-ছুটতে কথা বলতে-বলতে অদৃশ্য হয়ে গেল বিনয়। রুমাল বার করে চোখটা আস্তে-আস্তে ঘষে রগড়ে মুছে নিলেন প্রিন্সিপ্যাল—কী যে তাকে একটা লবঙ্গের কুচি উপহার দিয়ে গেল বিনয়—বদলে তিনি শিবের দত্তক লিঙ্গের মত অনড় হয়ে বসে রইলেন একটা মিছে সৌজন্যের খাতিরে। পাশের ঘরেই প্রিন্সিপ্যালের নিজের প্রাইভেট ল্যাবরেটরিতে কলে জল ছিল, বেসিন ছিল, ভাল করে চোখমুখ ধুয়েমুছে চেয়ারে এসে বসলেন তিনি।

'আপনার আজকের ক্লাস সব হয়ে গেছে সিদ্ধার্থবাবু?'

'হয়েছে।'

প্রিন্সিপ্যাল ফাইলে হাত দিয়ে বললেন, 'কী জন্যে ছুটি চাচ্ছেন আপনি বুঝতে পারলাম না ত।'

'ডাক্তার আমাকে দেখলে বলবে যে ব্লাড প্রেসারের বাড়াবাড়ি চলছে, কিন্তু আমি নিজে সেটা মানতে রাজি নেই।'

'নিজে কী মনে করেন আপনি?'

'আমি গত চার বছর একদিনও ছুটি নিইনি—ক্যাজুয়াল লিভ অবদি না। নেই নি-কোনো দরকার বোধ করিনি। মাঝে-মাঝে শরীর মন খুব খারাপ হয়েছে, কিন্তু তবুও কলেজ কামাই করিনি। কিন্তু এখন আমি কয়েক মাসের অবসরের দরকার খুবই বোধ করছি। আপনি যদি মনে করেন সবই ঠিক আছে, আমাকে ছুটি না দিলেও চলে তাহলে আমার দরখাস্তটা অগ্রাহ্য করতে পারেন। করুন তাই। তাহলে আমি কলেজে যে রকম যাচ্ছি-আসছি তাই করব।'

'গত চার বছর কোনো ছুটি নেন নি আপনি বলেছেন, কিন্তু সেটা মহীনকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

সিদ্ধার্থ একবার প্রিন্সিপ্যালের দিকে একটু চোখ কঠিন করে তাকিয়ে তারপর নরম গলায় বললে, 'আচ্ছা জিজ্ঞেস করে দেখুন, অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার আছে ত কলেজে সব, মহীনবাবুকে দিয়ে আনিয়ে নিজেও সে-সব দেখে নিতে পারেন।'

'দেখব। গত চার বছরের আগে শ্রীধরবাবুর আমলে এই কলেজে কাজ করতেন ত আপনি। তখন ছুটিফুটি নিতে হয়েছিল?'

'হ্যাঁ বছর পাঁচেক আগে নিয়েছিলাম একবার। শ্রীধরবাবু প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁকে গিয়ে বলেছিলাম মাস তিনেকের ছুটির দরকার হবে। তিনি বললেন, দরখাস্ত কারো, দরখাস্ত করলাম, তিনি মঞ্জুর করে দিলেন।'

'আচ্ছা,' প্রিন্সিপ্যাল স্মেলিঙ সল্টের শিশিটা কাছে কুড়িয়ে এনে বললেন, 'রেকর্ডে আছে ত সব। দেখব আমি।'

চোখ নয়, মাথার স্নায়ু শিরা নয়, লো ব্লাড প্রেসারের রক্ত নয়, এবারে মনটাই যেন কেমন শক্ত হয়ে উঠল সিদ্ধার্থের। প্রিন্সিপ্যাল সমস্ত রেকর্ড দেখতে চাচ্ছেন, ভাল কথা, মহীনবাবুকে ডাকিয়ে রেকর্ড আনিয়ে তন্নতন্ন করে দেখে নেবেন সব। কিন্তু মানুষকে সত্যি বিশ্বাস করবার ঠাটে অবিশ্বাসের কথাগুলো বলবার কী দরকার ছিল প্রিন্সিপ্যালের। এ কলেজের অল্পাধিক পুরানো মাস্টার সিদ্ধার্থের সামনে? যাক, বলেছেন বলেছেন। অনেকেই সেয়ানা হয়, কিন্তু এক আধ জনের বেশি জ্ঞানী হয় না, এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। কিন্তু এই প্রিন্সিপ্যালও শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সেয়ানা তা নয়, মাঝে-মাঝে একেও প্রায় জ্ঞানীদের ভেতর একজন অনুভব করে-করে তবুও সত্যি জ্ঞানী বলে স্বীকার করে নিতে পারেনি আজ পর্যন্ত সিদ্ধার্থ। কোথায় যেন এক তিলে আটকে যায় জ্ঞানী ও গুণীমানীর ভেতরে পার্থক্যটা। কিন্তু সেই তিল ভেবে দেখতে গেলে—সত্যিই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

'রেকর্ড দেখে কোনো ভুল ত্রুটি না পেলে ছুটি পাওয়া যাবে?'

'ক মাসের ছুটি?'

'তিন মাসের চেয়েছি।'

'পুরো মাইনেতে তিন মাস?'

'ছুটি ত পুরো মাইনেতেই তিন-চার মাসের পাওয়ার কথা, আমরা অনেক দিন কাজ করছি।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'দেখি রেকর্ড, আপনার একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগবে।'

'কেন?'

'তাছাড়া ছুটি মঞ্জুর হবে না।'

'কে কমিটির কথা বলছেন?'

'দিলে আমি নিজেই ছুটি দেব; দরকার বোধ করলে কমিটির কাছে সুপারিশ করব।'

'ক মাসের?'

'একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই। পুরো মাইনেতে আমি তিন সপ্তাহের বেশি ছুটি দিতে পারব না আপনাকে।'

'সত্যসুন্দর ঘোষকে অবিশ্যি চার মাসের ছুটি দিয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল। পুরো মাইনেতে, কোনো মেডিকেল সার্টিফিকেটও লাগেনি। গত বছরও সত্যসুন্দর ছুটি নিয়েছিলেন তিন-চার মাসের। কিন্তু কী হিসেবে এ-রকম হয়? খুব সম্ভব প্রিন্সিপ্যাল ঘোড়েল বলেই এ-রকম ঘোড়েল লোক রয়েছে বলেই কলেজটাকে বেশ ঠাটে চালাচ্ছে। কী ঠাট? ঘুন প্রথম ঢুকলেই বাঁশটাকে খারাপ দেখায় না কিন্তু নিজের কাজ সেরে এ প্রিন্সিপ্যাল যখন চলে যাবেন তখন কলেজের পঁচা বাঁশের মত চেহারা এখুনি যেন চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছে সিদ্ধার্থ। চিরন্তন সান্যালকে আড়াই মাসের ছুটি দেয়া হয়েছে, ত্রিদিব সরকারকে তিন মাসের, পুরো মাইনেতে। ছুটির মুখে তাদের পঞ্চাশ টাকা করে মাইনেও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কীসের জন্যে এ-সব? যতদূর মনে হয় এরা উদ্যোগ করে এই প্রিন্সিপ্যালকে এ কলেজে আনিয়ে ছিলেন বলে, এদের টাকা ও লোকবল আছে বলে, কলেজ ক্লাসে না হোক বাইরে দশ জায়গায় এরা বেশ কইয়ে-বলিয়ে লোক বলে। অথচ প্রফেসর সরিৎ মুখুজ্জের ছেলের টি-বি হয়েছে কলকাতায় কোন এক মেসে, ছেলেটাকে দেখবার কেউ নেই সেখানে, তাকে চিকিৎসা করতে হবে, তার জন্যে হাসপাতালের বেড ঠিক করতে হবে, বেড না পেলে কোথায় রাখা যাবে তাই নিয়ে দিনরাতের ধান্দায় ঘুরতে হবে বাপকে কিন্তু কিছুতেই প্রিন্সিপ্যাল তাকে ছুটি দিতে চাচ্ছেন না। সরিৎ নিজের সৎ বিচারবুদ্ধির আলোয় চলে, মনিব বলেই মনিবের তাঁবেতে থাকতে চায় না, সিধে অথচ বিচক্ষণ মানুষের সঙ্গে বাঁকা ব্যবহারের নানারকম, ঠোকাঠুকির ভেতর দিয়ে এ জিনিসটাকে বিশেষভাবে বুঝতে হয়েছে প্রিন্সিপ্যালের। কিন্তু এবার খুব কায়দা করে আটকাতে পেরেছেন সরিৎকে। অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর দেড় মাসের ছুটি দিয়ে রাজি হয়েছেন। কিন্তু হাফ-পেতে। কিন্তু হাফ-পেতে কিছুতেই ছুটি নেবে না সরিৎ, কেন নেবে, পুরো মাইনেতে ছুটি পাওনা রয়েছে তার। গভর্নিং বডি বলেছে প্রিন্সিপ্যালের নির্দেশের ওপর তাদের আর কিছু বলবার নেই। সরিৎ চাকরিতেও ইস্তফা দেবে ঠিক করেছিল কিন্তু দু-চারজন প্রফেসর তাকে বুঝিয়ে থামিয়ে রেখেছে। সরিতের, ছেলের এই বিশেষ বিপদের সময় এখুনি চাকরি ছেড়ে দিলে সবংশে মরতে হবে। অনেক ভেবে-চিন্তে হাফ-পেতেই দেড় মাসের ছুটি নিয়ে চলে গেছেন সরিৎ। দেড় মাস উৎরে গেলে ছুটি মঞ্জুর হতে পারে বিনে মাইনের কিংবা সাসপেনসন হতে পারে—সরিৎ কলকাতায় যাবার সময় সেটা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল তাকে।

এই—সব হচ্ছে আজকাল কলেজে।

কলেজের তিনজন প্রফেসর পলিটিক্যাল প্রিজনার হিসেবে বন্দী ছিলেন চার-পাঁচ মাস। স্বাধীনতা ত আসছে দেশে বছর খানেকের ভেতরেই পাওয়া যাবে, প্রফেসরদের ছেড়ে দিয়েছে গভর্নমেন্ট। প্রিন্সিপ্যাল তাদের একজনকে কাজে বাহাল করেছেন-বিনয়তোষের শ্বশুর, গভর্নিং বডির ভাইস-প্রেসিডেন্ট লোচনবাবু, সুপারিশ করেছেন বলে। কিন্তু বাকি দু'জনের বিশেষ কেউ মুরব্বি নেই, বড়দের তরফ থেকে কোনো সুপারিশ আসেনি, কালেকটর সাহেব 'হ্যাঁ' 'না' কিছু বলছেন না, ঠেকিয়ে রেখেছেন প্রফেসর দু'টিকে প্রিন্সিপ্যাল। তিন মাস ঠেকিয়ে রেখে বিদায় করে দিয়েছেন। তারা কারোরেই সুপারিশ আনতে পারলে না। মারাত্মক পলিটিক্যালদের কোঠায় এ কটি মাস্টারও পড়েন না। কলকাতার সেক্রেটারিয়েটের কাছে ব্যাপারটা জানানো হয়েছিল। তারা বলে দিয়েছে এ বিষয়ে প্রিন্সিপ্যাল যা ভাল বোঝেন তাই করতে পারেন। প্রফেসাদের রেকর্ড ঘাটিয়ে দেখেছে ডিপার্টমেন্ট, বিষয়টা তাদের কাছে তেমন গুরুতর মনে হচ্ছে না, মাথা ঘামাবার মত কিছু নেই; যা ঠিক মনে করেন তাই করতে পারেন। তা ত ভালই। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল ঠিক যা মনে করেছেন এ প্রফেসরদের যদি সম্বন্ধে তাই ত করলেন। তবুও দেশ স্বাধীন হলে এই প্রফেসরদের যদি ডাক পড়ে কলেজে, ছেলেরা কলেজে সভাসমিতি করে এদের সম্মান করতে চায়, প্রিন্সিপ্যালকে সভাপেতি হতে বলে, খুব পর্যাপ্ত পরিমাণে খুশি হয়ে প্রিন্সিপ্যাল তা করবেন। একেই সেয়ানা বলে—সিদ্ধার্থ ভাবছিল। জ্ঞানী মানুষ অন্যরকম।

রাজীববাবুকে সাসপেন্ড করেছেন নাকি প্রিন্সিপ্যাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট চাইছেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সেটা দরখাস্তের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে!'

'হ্যাঁ, সপ্তাহের ছুটি?'

'হ্যাঁ, কাছেই বালিসড়কের সমুদ্র আছে। যুদ্ধের সময় একটা মিলিটারি ঘাঁটি ছিল ওখানে। ভাল ঘরদোর আছে; ঘুরে আসুন—সময় পেলে আমিও যেতাম। কিন্তু আমাকে কে ছুটি দেয়?'

কলকাতায় কনভেকেশনে গিয়ে পঁচিশ-ত্রিশ দিন কাটিয়ে আসেন ত ফি-বছর প্রিন্সিপ্যাল, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ব্যাপারটা দু-এক দিনের। তাছাড়া পাবলিক ডিউটির নাম করে প্রায়ই ত কলকাতায় চলে যান ইনি, পনের-কুড়ি-পঁচিশ দিন কাটিয়ে আসেন। কীসের পাবলিক ডিউটি? কী করেন? কিন্তু সেটা গভর্নিং বডি জানে। জানলেই হল। তবে বালি-সড়কের সমুদ্র ঠিক নয়, একেবারে গোপালপুরের সমুদ্রের পাড়ে পাবলিক ডিউটির বছর মাঝে-মাঝে চলে যায় প্রিন্সিপ্যালের। মানে খুঁজে পায় না কোনো-কোনো প্রফেসর। গরমের ছুটি আর পুজোর ছুটির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে খানিকটা বড় মুড়ো ও ল্যাজা চিবিয়ে খাবার সহজ অধিকারে কলেজের গতিতে বসে থাকলে স্বভাবতই পাওনা থাকে—দেখেছ ত সিদ্ধার্থ। গভর্নিং বডি ও-সবের কোনো খবর রাখে না। প্রিন্সিপ্যাল কখন বাসমতীতে থাকেন, কখন থাকেন না, জানাবার দরকার নেই গভর্নিং বডির। প্রিন্সিপ্যাল উদ্যোগ করে কমিটির মিটিং ডাকলে এবং কালেক্টর সাহেবের বাড়িতে সন্ধ্যার পরে সকলেই হাজির হয়ে নানারকম' বাদবিতণ্ড সত্ত্বেও প্রীতিসম্মেলনটাকে শেষ পর্যন্ত বেশ জমিয়ে রাখেন। বাদবিতণ্ডা অবিশ্যি কলেজের প্রফেসরদের ভাগ্য নিয়ে ছেঁড়াকাটার কলাকৌশলে। প্রিন্সিপ্যাল সেখানে অপারেশন টেবিলের প্রধান নার্স হিসেবে প্রিয় পাত্রীর মতন উপস্থিত।

কিন্তু নিজের বরাত মেনে নিতে হবে। তিন সপ্তাহের মাত্র ছুটি দিতে চাইছেন প্রিন্সিপ্যাল। আচ্ছা; তাই নেয়া যাক, ডাক্তারের সার্টিফিকেটের একটা দরকার ওর—সিদ্ধার্থের অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে গেঁথে রাখবেন ঠিক করেছেন। সিদ্ধার্থ বললে, 'আপনার নির্ধারিত কোনো ডাক্তারের সুপারিশ চাইছেন আপনি?'

'না। সিভিল সার্জেনের না হলেও হবে। এটা ত সরকারি কলেজ নয়। কলেজটা বড়, কিন্তু নিয়মটিয়ম শক্ত করে বাঁধা হয়নি এখনো—সিভিল সার্জেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'না—' প্রিন্সিপ্যাল একটু দ্বিধায় দোমনায় বললেন, 'এলে ভাল হত, কিন্তু সে রেওয়াজ নেই ত এ-কলেজে—এখনো। পরে দেখা যাবে—অবিশ্যি এ জিনিস গভর্নিং বাডিতে ক্যারি করা—' কিন্তু সিদ্ধার্থের কাছে নিজের সাধ সংকল্পর ওপরওয়ালার ওসব শিবের গীতি গাইতে আসেননি ত, নিজেকে হাতের মোটা কাজটার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'না, সিভিল সার্জন, অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন না হলেও হবে, যে-কোনো ভাল ডাক্তারের সার্টিফিকেট হলেই চলবে, তিন সপ্তাহের ত মামলা, এর ভেতরে আর চিচিঙ্গের বাদ্যি দিয়ে কী হবে?' ডাক্তার মানে এম-বি ডাক্তার—' প্রিন্সিপ্যাল বললেন।

'বিশেষ কোনো মানে হয় না এ-সব সার্টিফিকেটের,' সিদ্ধার্থ বললে।

'কেন।'

'চাইলেই ত পাওয়া যায়।'

সিদ্ধার্থের কথাটা প্রিন্সিপ্যাল শুনেছেন এ-রকম কোনো ভাব দেখাতে গেলেন না। ফাইলের কাগজপত্রের দিকে চোখ রেখে নাড়াচাড়া করতে-করতে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কী হয় সেটা রুগী আর তার ডাক্তার বুঝবে। একজন এম-বি ডাক্তারকে শ্রদ্ধাই করতে চাই আমরা, বিশেষত অশ্রদ্ধার কোনো কাজ না করা পর্যন্ত, তাছাড়া একটা দরকারি বিধি পড়তে-পড়তে বললেন, 'তিন সপ্তাহের ত ব্যাপার শুধু,' চিঠি রেখে দিয়ে বললেন, 'আমরা একটা রেকর্ড রাখতে চাই।'

'আমার শরীর ভাল, আমার কোনো অসুখ নেই।'

'ডাক্তার যদি সে কথা লিখে দেয় তাহলে আপনার দরখাস্তটা ফাইলে পড়ে থাকবে।'

'আমি ঠিক এ রকম ভাবে ছুটি চেয়েছিলাম না।'

'তবে কী হিসেবে?'

তাই ত কী হিসেবে? যে-কোনো একজন এম-বি ডাক্তারকে ডেকে বুক, পিঠ, ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে, বা না নিয়েও, টাকা ফেলে দিয়ে একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করা, সার্টিফিকেটটা জাহির করে ছুটি নেয়া—এর চয়ে সত্যিই অসুখ করলে বেশি—বেশি ভাল লাগত সিদ্ধার্থের। কিন্তু শরীর মনে কোথাও কোনো অসুখ নেই তার—যদি ছুটি চাওয়ার এই আচমকা বাতিকটাকে একটা মনের অসুখ বলে ধরে না নেয়া যায়। কেন ছুটি চাইছে সে? কিন্তু চাইছে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে। অবিশ্যি লো ব্লাডপ্রেসার রয়েছে তার, সেটাকে অস্বীকার করাও মনের বাতিক, খুব ভাল ডাক্তারেও সেই কথা বলবে। একটা গাছের ডালপালা পাতার ভেতরে কী সব বিজ্ঞান রয়েছে সেটা বিজ্ঞানী জানে, নচাড়াল বা দেবদারু গাছের পক্ষেও তা বলা অসাধ্য।

বিজ্ঞান সত্যিই বললে যে ব্লাড প্রেসারের ব্যাপারটা সুবিধার নয় সিদ্ধার্থের—দু-তিন মাসের অন্তত বিশ্রাম দরকার তার। শুনে একদিক দিয়ে বেশ আরাম বোধ করল সিদ্ধার্থ।

যে-সে ডাক্তারকে দেখায় নি সে; এখানকার বেশ নামকরা ডাক্তার মহেন্দ্র ঘোষালকে দেখিয়েছিল। ইনি একসময়ে গান্ধির চিকিৎসাও করেছিলেন—গান্ধির আশ্রমে থেকে। মানুষ ইনি বরাবরই সৎ, আশ্রমের থেকে সত্যার্থ বিষয়ে আরো সিদ্ধ হয়ে এসেছেন। কাজেই টাকা পেয়ে বা খাতিরের মানুষ বলেছে বলে বিন্দুবিসর্গ সন্দেহ থাকলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুটির দরখাস্তের জন্য মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে ইনি রাজি নন। কিন্তু সিদ্ধার্থকে বেশ ভাল ভাবে পরীক্ষা করে ইনি পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে বললেন—আট-ন সপ্তাহ অন্তত, খাবারদাবারের একটা তালিকা ঠিক করে দিলেন, দিন পনের কুড়ি পরে সিদ্ধার্থকে নিজে গিয়ে দেখে আসবেন বললেন, খানিকটা স্বেচ্ছায়ই যাচ্ছেন বলে ভিজিটের টাকাও লাগবে না জানিয়ে দিলেন।

মহেন্দ্র ঘোষালের স্ত্রী শ্রীময়ী ঘোষালও গিয়েছিল গান্ধির আশ্রমে। সিদ্ধার্থের সঙ্গে আগেই চেনা ছিল শ্রীময়ীর। কিন্তু শ্রীময়ী নেই বাসমতীতে, অনেক দিন হল কলকাতাতে চলে গেছে। কবে ফিরবে বলতে পারছিল না মহেন্দ্র ঘোষাল। ডাক্তার ঘোষাল জীবনের সব বিষয়েই সত্য ও সত্যার্থে এত বেশি অব্যর্থভাবে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছেন যে তাঁর স্ত্রীর কাছে সরসতা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। সেই জন্যই ঘোষালের স্ত্রী তার বাপের বাড়িতে থেকে কলকাতার জীবনের নানারকম দ্বীপাবলীর সমুদ্রে নাবিক হয়ে ফিরছেন, বাসমতীতে ফেরবার কথা মনে পড়ছে না তার, এরকম একটা কানাঘুষো ডাক্তার ঘোষালের স্ত্রী সম্বন্ধে শোনা যায় বাসমতীতে। এইজন্য মহেন্দ্র ঘোষালের ওপর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেছে বুঝি সিদ্ধার্থের। ডাক্তার ঘোষালের সার্টিফিকেট নিয়ে দু-তিন দিন পাবে, কলেজের কাজ শেষ করে প্রিন্সিপ্যালের কামরায় ঢুকল সিদ্ধার্থ।

'ও-ঘোষালের সার্টিফিকেট এনেছেন। বসুন সেন; হ্যাঁ ভালই হয়েছে। ভাল হয়েছে।' সার্টিফিকেটটা পড়তে-পড়তে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'ওর স্ত্রী শ্রীময়ী কি ফিরে এসেছে?' সিদ্ধার্থ চেয়ার টেনে বসে বললে 'না, আসে নি এখনো।'

'দেরি লাগবে আসতে,' প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'কিন্তু ঘোষাল বড় একটা সার্টিফিকেট দেয় না ত কাউকে। আপনাকে দিয়েছে দেখছি।'

'ঘোষাল বললেন বেশি ব্লাডপ্রেসার, আট-ন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করতে বললেন।'

প্রিন্সিপ্যাল সার্টিফিকেটটা কুঞ্জ কেরানিকে ফাইলে রেখে দিতে নির্দেশ দিতে বললেন 'গান্ধীর আশ্রমের ঘোষাল বলেছে, সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু গান্ধীবাদের সঙ্গে ডাক্তারির বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই, ঘর-সংসারেরও না, শ্রীময়ী জানে ত তা।'

'শ্রীময়ীর কথা বলে কী আর লাভ?'

'সিদ্ধার্থবাবু,' সল্টের শিশিটা হাতে তুলে নিয়ে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'আপনি নিজে বলছেন আপনার শরীর ভালই আছে, কোনো অসুখটসুখ আছে বলে মনে হচ্ছে না। ডাক্তারের সাধ্যি আছে আপনাকে ভজাবে?'

'ভালই ত আছি মনে হচ্ছে,' সিদ্ধার্থ নিজের পাঞ্জাবির একটা হাতের বোতামের ওপর বাঁ হাতের আঙুল রেখে বোতামটা ঘোরাতে-ঘোরাতে প্রিন্সিপ্যালের মুখের ওপর চোখ রেখে বললে, 'কিন্তু উনি ত খুব ভাল করে দেখলেন আমাকে।'

'আজ শুক্কুরবার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কাল শনি,' প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'সোমবার থেকে আপনার তিন সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর হল।'

'দু'মাস হবে না?'

'না।'

'ডাক্তার ত বলেছিলেন অন্তত মাস ছয়েকের বিশ্রাম চাই—'

'টাকা দিলেই সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় ওরা। ওদের আর কী। গান্ধীকে রেখেছে রামের চটিজোড়ার মত। তিনি বড় জোর সোদপুর অবদি আসবেন, এখানে এসে চেলার কীর্তি ফাঁস করবার সময় কোথায় তাঁর?'

বিয়তোষ এক মিনিটের জন্যে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বললে, 'সেই দুঃখেই ত গান্ধী নিজে পারেন না আর, চেলারা সব গান্ধীটুপি এঁটে বেড়ায়।' 'না, মহেন্দ্র ঘোষাল গান্ধী ক্যাপ পরেন না,' সিদ্ধার্থ বললে।

'ক্যাপ নানারকম আছে, তারি একটা পরেন আর কী।' বিনয়তোষ একটা নধর ইঙ্গিত করে প্রিন্সিপ্যালের দিকে তাকিয়ে বললে। মিহি জিনিসটার থেই ধরে প্রিন্সিপ্যাল একটু ঘাড় নাচিয়ে বললেন, 'সব ক্যাপ মাথায় আঁটতে হয় না আবার।'

হো হো করে হেসে উঠল বিনয়তোষ, পাশে দাঁড়িয়ে কুঞ্জ কেরানি ঠোঁটে দাঁতে হাসির একফোঁটা শালিমারের বার্নিশ লাগিয়ে টেবিলের ওপর প্রিন্সিপ্যালের দরকারি কাগজপত্র গুছিয়ে যেতে লাগল।

না, আর কোনো কথা নয়, প্রিন্সিপ্যাল ইস্কাপনের টেক্কা সেঁটেছেন, ফাইনাল বেলও পড়ল, হুট করে বেরিয়ে গেল বিনয়তোষ।

'ঐ তিন সপ্তাহের ছুটিই পাবেন সিদ্ধার্থবাবু।'

সিদ্ধার্থ উঠবে ভাবছিল। তবে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দু-একটা কথা আছে তার, ছুটির বিষয়ে নয়, অন্য বিষয়ে। প্রিন্সিপ্যাল কাগজপত্র দেখছিলেন, কুঞ্জ কেরানি দরকার মত এগিয়ে দিচ্ছিল, গুছিয়ে রাখছিল। একেই বোধহয় প্রমোশন দিয়ে রাজীববাবুর জায়গায় বহাল করা হয়েছে। রাজীববাবু সাসপেন্ড হয়েই রইলেন? ভাবতে-ভাবতে সিদ্ধার্থ অন্য কি সব বিষয়ের ভেতর ডুবে গিয়েছিল, ভুরু কুঁচকে প্রিন্সিপ্যালের ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে। হুঁশ হল সিদ্ধার্থের।

'আপনি আমাকে ডেকেছেন?' রমা বললে।

'হ্যাঁ, ডেকেছি, বসো।' প্রিন্সিপ্যাল ফাইলের থেকে চোখ তুলে আড়চোখে একবার রমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন।

'দপ্তরি তোমাকে গিয়ে শ্লিপ দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সেই কলেজের ঝিলের কাছে, পানফলের কাছে, পানফলের ঝিল ত ওটা, কিন্তু পানফলগুলোর কিনারা দিয়ে ফলেছে, একটা বড় দিঘির মত অঢেল জল ত রয়েছে ঝিলে? না?'

'হ্যাঁ, খুব জল, কলকাতার লেকের মতন' বলতে-বলতে রমা বললে 'লেকের চেয়ে ঢের বেশি।'

'বুনো হাঁস এসে পড়ে কখনো ঝিলের জলে?'

'পড়ে দেখেছি অনেক সময়ই ত। কিন্তু কলেজের এদিককার ঝিলে বেশি আসে না। এদিকে লোকজনদের সাড়াশব্দ। এ ঝিলটার পরে পরে আরো দু-তিনটি ঝিল রয়েছে, একেবারে মাঠজঙ্গলের ভেতর গিয়ে পড়েছে, সেখানেই জমে গিয়ে বালিহাঁসগুলো।'

'একদিন শিকার করব ভাবছি—'

'কে, আপনি?'

'কালেক্টর সাহেব, লোচনবাবু, অমিয় সেন, অরুণ সেন—অমিয় আর অরুণ ত দু'টো খাটাশ, কাঁচা হাঁস চিবিয়ে খেতে পারে। শুনেছি আমি সরে গেলে অমিয় সেনকে প্রিন্সিপ্যাল করা হবে, তারপরে অরুন সেনকে। দু'টো খাটাশ।' প্রিন্সিপ্যাল দাঁত দিয়ে গভার্নিং বডির মেম্বার লোচন কবিরাজের ঘাড়ের হাড় যেন ছিবড়ে করে ফেলে বললেন, 'যাক, আমার দলে আছে ওরা সব এখনো। ওদের নিয়ে একদিন শিকারে যেতে হবে, কালেক্টর বলছেন তার বন্দুকে মরচে পড়ে যাচ্ছে।'

'আজ ত শুক্কুরবার।'

'তুমি বালিহাঁসের মাংস খেতে ভালোবাস?' রমা প্রিন্সিপ্যালের ঘরের দেয়ালের ম্যাপটার দিকে তাকিয়েছিল। ম্যাপের ভেতর গোটা বাংলাদেশকেই পাকিস্তানের ভেতর ধরা হয়েছে, আসামকেও। প্রিন্সিপ্যাল একটা কথা জিজ্ঞেস করে উত্তরের অপেক্ষায় বসে আছেন। কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করেছেন—সিদ্ধার্থদাকে হয়ত কিংবা কুঞ্জবাবুকে—কিন্তু কেউই কোনো কথা বলছে না। রমা বললে, 'আপনি স্লিপে লিখে দিয়েছিলেন যে আজ শুক্কুরবার অনার্স ক্লাস নেবেন না।'

'অমিয় সেন অরুণ সেন এদের কলকাতায়ই মানায়, মাড়োয়াড়িদের চিনি আর টেক্সটাইলের কারবারে, কলেজের টেকসটে নয়, ওরা প্রিন্সিপ্যাল হতে চাচ্ছে, শুনেছ কুঞ্জ?'

'বাসমতী কলেজের?'

'লোচন কবিরাজ যায়নি অবিশ্যি এখনো এদের দিকে—তবে যেতে পারে। কালেক্টার আমার দিকে আছেন, তবে ইনি ত আই-সি-এস, বেন্দাবনে এর কতদিন থাকবেন? রমা—'

'আজ্ঞে—' 'মেয়েদের বলে দিয়েছ যে শুক্কুরবারের অনার্স ক্লাস আমি নেব না।'

'সে ক্লাস ত কোনোদিনই হচ্ছে না।'

প্রিন্সিপ্যাল একটু মুখ লজ্জা করে, একটা পয়সা বেশ টাইট হয়ে এঁটে থাকতে পারে ঠোঁট দু'টোকে তেমনি আঁট গোল করে নিয়ে, বাঁ হাত দিয়ে কামানো গাল আস্তে চুলকে নিতে-নিতে বললেন, 'সিদ্ধার্থবাবুর বইটা শেষ হয়েছে তোমাদের ক্লাসে?'

'হ্যাঁ, রিভিশনও ত প্রায় হয়ে এল।'

'তা বেশ হল। উনি ছুটি নিচ্ছেন তিন হপ্তার। ওর সেই অনার্স ক্লসগুলো আমি নেব। বানেয়ান নেব,—কিছু হয় নি বুঝি বানিয়ানের? না দু'চারটে কবিতা পড়িয়েছিলাম? মেয়েদের নেব, আমার ঘরে। কবে-কবে সেন মশায়ের ক্লাস সেটা টাইম-টেবিল থেকে দেখে নেব আমি। নোটিশ দেব তোমাদের। তবে তোমাকেও বলে রাখলাম—তুমি জানিয়ে দিও সবাইকে।' রমা কোন কথা বললে না। ও, একই জন্য—প্রিন্সিপ্যাল ডেকেছিলেন বুঝি তাকে— খুব শখের ডাক ত তাহলে বলতে হবে। সিদ্ধার্থদা ছুটি নিচ্ছে, কেন? কোথাও যাবে নাকি? কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে গেল না সিদ্ধার্থকে রমা।

'সুমিতা অনার্স ক্লাসে আসছে শুনলাম।'

'হ্যাঁ, আসছে আবার।'

'বাসনাও আসছে।'

'সেও আসছে আজকাল।'

'এই ত ভরে উঠছে আবার কলেজ,' প্রিন্সিপ্যাল বাঁ চোখ টিপে রমার দিকে, পরে নিপাতনে সিদ্ধ হিসেবে সিদ্ধার্থর দিকে, তাকিয়ে একটু ঠোঁটে দাঁতে খুশি হয়ে হেসে বললেন, 'এদের সবাইকে দিয়ে আমি অনার্স পাওয়াব। ঋক এসেছে?'

'না'

'আছে বাসমতীতে?'

'আছে।'

'আসে টাসে কলেজে?'

'হ্যাঁ, পাস পরীক্ষাটা দেবে।'

'অনার্স পেত ঋক, প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'কি মনে করেন সেন?'

'বলতে পারি না—আমি ওর একসারসাইজ দেখিনি কখনো।'

'উঠি তাহলে' রমা বললে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রাজীববাবু তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলেন, ও মাসের শেষের দিকে।'

'তার সঙ্গে কথা হয়েছিল?'

'কী কথা?'

'তাকে ত আমি সাসপেন্ড করেছি।'

'শুনেছি।'

সিদ্ধার্থ বললে, 'রাজীববাবুকে আপনি বিশ্রাম দিয়েছেন বুঝি, পরে মাইনেটা পাইয়ে দেবেন? কিন্তু এরকম মনের উদ্বেগে কি ওর ঠিক মতন বিশ্রাম হবে?'

'সাসপেন্ড করা মানে ত বিশ্রাম দেয়া নয়,' সিদ্ধার্থর দিকে ফিরে একবার সাঁ করে তাকিয়ে প্রিন্সিপ্যাল বললেন। রমার দিকে ফিরে বললেন, 'রাজীববাবু তোমাদের বাড়িতে গিয়ে কী বলেছিলেন তোমাকে?'

'মনটা একটু তাড়াতাড়ি নড়ছিল প্রিন্সিপ্যালের ধীরেসুস্থে কথাবার্তা হবে না হয়ত এখন, রমা কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন, শুধু বিবৃতি দিলেন যে সাসপেন্ড হয়েছেন?'

'সেটা বললেন আমাদের।'

প্রিন্সিপ্যাল গাল চুলকে গালের একটা ছোট্ট আঁচিলে ঠেকে গিয়ে আস্তে-আস্তে বললেন, 'শুধু বললেন বুঝি? এরই জন্যে রাত করে দানাপুর থেকে জিরানডাঙায় গেলেন, একটা হ্যারিকেন হাতে করে রাত একটার সময় ঢ্যান ঢ্যান করতে-করতে বাড়ি ফিরলেন? প্রভাসবাবুর কাছ থেকে একটা চুরুট ঝাড়বার জন্যে শুধু?'

'কে বললে আপনাকে?'

'কেন রাজীববাবু নিজে বলতে পারেন না।'

'আমি সেটা বিশ্বাস করি না।'

এক ডাকেই সেরে দিল রমা? প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে একটু ভদ্রতা রেখে অন্তত কথা বলতে হয় ভাবছিলেন মজুমদার সাহেব। কিন্তু গায়ে মাখতে চাইলেন না তিনি এই বিশেষ মেয়েটির সম্পর্কে।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা ত হচ্ছে না। একজন গরিব মানুষ বিপাকে পড়ে গেছেন। আমি তাকে বলেছিলাম যে আমাদের এখানে এসে রমা যদি মুখে বলে যায় যে দরখাস্তটা দিয়ে পরদিনই রাজীববাবুকে সে-ই নিষেধ করেছিল দরখাস্তটা আমার কাছে পেশ করতে, ব্যস তাহলেই হয়ে যায় সব, রাজীববাবুকে আমি কাজে বহাল করি।'

'সিদ্ধার্থ ব্যাপারটার সূত্র ধরতে পারছিল না। ঘটনাটা পুরোপুরি কেউ তার কাছে বলেনি, সিকিটাক শুনেছিল হয়ত অন্যমনস্ক হয়ে, কিন্তু জানাশোনার দিক দিয়ে সেটা কিছু নয়, জানবার জন্যে কাউকে সে জিজ্ঞেস করতেও যায়নি এতদিন। প্রিন্সিপ্যাল একটা দরখাস্তের কথা বলছেন—রমা দরখাস্ত করেছিল? দরখাস্তটা প্রিন্সিপ্যালের কাছে পেশ করতে রাজীববাবুকে নিষেধ করেছিল রমা—বলেছেন প্রিন্সিপ্যাল এই রকমই হয়েছিল সত্যি? ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াল তবে? রাজীববাবু পর্যন্ত সাসপেন্ড হয়ে গেলেন—কী হল? রমার দিকে একটু বুঝতে জানতে চাইবার মত চোখ করে তাকাল সিদ্ধার্থ। কিন্তু দেয়ালের টাইম-টেবলটার দিকে একবার, মানচিত্রটার দিকে একবার, তাকাচ্ছিল রমা—সিদ্ধার্থের দিকে একবারও নয়।

'অমিয় সেন, অরুণ সেন, গঙ্গানারায়ণ মৈত্র, ত্রিদিব পাঠক আর আমি থাকব, এই আমারই ঘরে। তুমি একটা দিন-তারিখ ঠিক করে দাও সন্ধ্যের পরে, সেদিনই এসে বসব আমরা এখানে। আমরা গাড়ি পাঠিয়ে দেব জিরানডাঙায়। গাড়িতে কুঞ্জ থাকবে, বিনয়তোষও থাকতে পারে। তুমি এখানে এসেই আমাদের বলে যাবে শুধু যে রাজীববাবুকে দরখাস্ত দিয়ে পরদিন তুমিই নিষেধ করেছিলে দরখাস্তটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে।'

'সে কথা ত সেদিনই বলেছি আপনাকে আমি।'

'বলেছ বটে,' প্রিন্সিপ্যাল দেরাজের থেকে একটা সিগারেটের টিন বের করে বললেন, 'আমার কাছে বলেছ, আমি ত কলেজের সব নয়, কিন্তু আমি আর ওরা চারজন এই সমবায়টাই কলেজের সব। লোচনবাবু এলে পারতেন—কিন্তু তার নাকি সিফিলিস হয়েছে মনে করে বড্ড ভয় পেয়েছেন—আজকালই কলকাতায় চলে যাবেন।'

রমা উঠে চলে যেত, কিন্তু রাজীববাবুর কথা মনে করে বসে ছিল। বললে, আর যা বলার রাজীববাবু আর আপনাকে বলা হয়ে গেছে সবই।

'প্রিন্সিপ্যাল টিনের ভেতর থেকে একটা সিগারেট খসিয়ে নিয়ে বললে, 'তা ত হয়েছে। কিন্তু এটা হবে এখন সর্বসমক্ষে সীতার অগ্নিপরীক্ষার মতন।'

'বসো রমা,' সিদ্ধার্থ বললে।

'কেন, ওঠবার উপক্রম করছিল নাকি সে, প্রিন্সিপ্যালের কথার কোনো একটা রুচিসম্মত কিনারা না করে? এখন সিদ্ধার্থের কথায় বসল বুঝি, সিগারেটটা মুখে দিতে গিয়ে নামিয়ে রেখে মনে হল স্নেহ সমীচিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওজন করে দেখছেন তিনি দু'জনেরই দিকে।

'আমি কিছু বলতে পারব না।'

'কমিটিতে কালেক্টর থাকবেন, খুব সাধুপুরুষ তিনি যেতে পারবে না সেখানে?

'আমি ক্ষমা চাচ্ছি।'

প্রিন্সিপ্যাল সিগারেট জ্বালবার আগে দেশলাইটা বার করে বললেন, 'তাহলে যা হয়েছিল, করেছিল, উল্লেখ করে অল্প কথায় একটা দরখাস্ত লিখে সই করে আমাকে দিয়ে দাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজীববাবুও বলেছিল দরখাস্ত দিতে, কিন্তু আমি সম্মত হতে পারিনি।' সিগারেটের টিনের ঢাকনিটা খোলা ছিল, প্রিন্সিপ্যাল আস্তে-আস্তে সেটা এঁটে ফেললেন। ডান হাতের সিগারেটটা দুই আঙুলের ফাঁকে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে আড়াআড়ি ভাবে রেখে বললেন, 'তাহলে রাজীববাবুকে ত কাজে বহাল করতে পারি না আমি।'

'উঠি।' রমা বললে।

'কিন্তু এ-সম্পর্কে তোমার নিজের কিছু করবার নেই আর?'

'আছে। আমার দোষেই ত তিনি এত বেশি মুস্কিলে পড়লেন। সীমারা যাতে খেতে পরতে পায় সেটা দেখতে হবে।'

'কী করে দেখবে? চাঁদা তুলে?'

'না। চাঁদাটাঁদা ওরা নেবেন না,' রমা উঠে দাঁড়িয়ে প্রিন্সিপ্যালের জামার বোতামের দিকে তাকিয়ে বললে, 'উনি অনেক দিনের অভিজ্ঞ ভাল কেরানি। বাসমতী কলেজ ওকে ছাড়িয়ে দিলে অন্য কোথাও চাকরির ব্যবস্থা হতে পারে কি না—সকলে মিলে দেখা যাবে।'

'সকলে? কারা?'

'অনেক কথা বললাম আপনার সঙ্গে' রমা হেসে ফেলে বললে।

'চাকুরি কি এত সহজেই পাওয়া যায় আকজাল?'

'আচ্ছা চলি, কিছু মনে করবেন না' এতক্ষণের ভেতর শুধু এই একবার প্রিন্সিপ্যালের সরস আতুর চোখের দিকে নয়, কিন্তু তার প্রৌঢ়, কামানো মিয়োনা, জোরালো মুখের দিকে তাকাল রমা। এতক্ষণ জামার বোতাম তসরের কোট, বড় জোর নেকটাইয়ের দিকে, মেঝের দিকে, দেয়ালের দিকে টেবিলের কাঁচের ঢাকনি; দরজা, জানালা, ফ্যান, স্কাইলাইটের আলোর দিকে তাকিয়েছে। খুব ক্ষমা গভীরতার পরিতৃপ্ত হয়ে তাকিয়ে রমা বললে, 'আমাদের দোষ মনে করে রাখবার মতন কিছু নয়, এ-রকম একটা মস্ত কলেজের কত রকম বড়-বড় ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় আপনাকে। যাবে নাকি সিদ্ধার্থদা?'

'এখুনি যাব না। আমার কাজ আছে।' সিদ্ধার্থ বললে।

'ওঁর সঙ্গে?

'হ্যাঁ।'

'ছুটি নিয়েছ শুনলাম।'

'নিয়েছি তিন সপ্তাহের।'

'কোথাও যাবে নাকি?'

'বালিসড়কের দিকটা কেমন— সমুদ্রের দিক?'

'যাইনি কোনোদিন, স্টিমার যায় খানিকটা দূর, তারপরে শুনেছি নৌকায় যেতে হয়।'

'তুমি ক্যানিঙ হস্টেলে এসেছ বুঝি?'

'না শালিখডাপ্রায়ই আছি। যাবে নাকি সমুদ্রের দিকে?'

'দেখি।' সিদ্ধার্থ বললে।

'কী কাজ আপনার?' রমা চলে গেলে সিদ্ধার্থকে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'এ-মেয়েটাকে ভাল করে চেনেন দেখছি।'

'ওরই জন্য রাজীববাবুর চাকরি গেল?'

'শুনলেন ত। কিছু করতে চাচ্ছে না রমা।'

'দেখছি ত,' সিদ্ধার্থ বললে, 'আমাদের কলেজের লুক্রেসিয়াসের কবিতা এসেছে নাকি শুনলাম।'

'কে বললে?' প্রিন্সিপ্যাল একটু কঠিনভাবে সিদ্ধার্থের দিকে তাকিয়ে বললে। হয়ত রমা বলেছে সিদ্ধার্থকে? এর সম্পর্কে মেয়েটির মনের খানিকটা দ্রবতা যেন দেখা গেল।

'না, কেউ বলেনি। আমি লাইব্রেরির নতুন ক্যাটালগটা নাড়ছিলুম, নতুন বই কী কী এল দেখছিলুম—'

'লুক্রেসিয়াস এসেছে। আছে আমার কাছে।'

'এই ছুটির তিন সপ্তাহের জন্যে বইটা আমাকে একটু দিতে পারবেন?'

'এখুনি বলতে পারছি না আমি, প্রিন্সিপ্যাল বললেন। ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি রমাকেও ত বলা হয়নি যে তার মহারোমান এত তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে। কিন্তু রমা সরে যাচ্ছে যেন, এই সেদিনও যা ছিল, আজ তা নেই। কেন নেই তা তিনি জানেন বটে; কিন্তু কী করা যায়, ব্যাপারটা রমা আর রাজীববাবুর হাতে ফেলে রাখলে—অমিয় সেনের কানে যদি একবার যেত কিংবা অরুণ সেনের কানে, তাহলে লোচন কবিরাজের সঙ্গে মিলে এই সামান্য একটা ছুতো নিয়ে মাইনোটারকে জন্ম দেবার আগে জুপিটারের ষণ্ড-অবতার না হয়ে ছাড়ত নাকি সেন ব্রাদার্স? উপমাটা গ্রীক হয়ে গেল, ভাবছিলেন প্রিন্সিপ্যাল, আর, এই লুক্রেসিয়াস রোমান। বেশি কিছুদিন ছুটি নিয়ে মহাভারত না হোক, অন্তত উপনিষদগুলো পড়া দরকার। কিছুই করতে পারত না হয়ত কিন্তু কোনোরকম ছিদ্রটিদ্র না রেখে দেয়াই ভাল। রমাও ত প্রথমে চটে গিয়েছিল রাজীববাবুর ওপর ভদ্রলোকের গাফিলতির নচ্ছার কারবারটা দেখে, তারপরে সীমার বাবাকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বললে। হৃদয় আছে রমার, কিংবা ছেলেমানুষি আবেগ। কিন্তু রাজীববাবুর যখন খুব বেশি দরকার তখন নিজেরই মিথ্যার মুখোমুখি দ্বিতীয়বার দাঁড়াতে কিছুতেই রাজি করানো যাচ্ছে না রমাকে। আমি তার প্রথম মিথ্যাটাকে বিশ্বাস করেছি ভাল করেছিলাম, আমার সেই ভাল ধরতে পেরে আগের সেই আবেগের ছেলেমানুষটি কিছুই নেই এখন আর তার—আমার সম্পর্কে নেই। কিন্তু ভাল হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমার, শুক্তির ভেতরের জিনিসটা ক্রমেই কঠিন হচ্ছে, যতই মড়া খোলাটা আমার চোখের দিকে ফিরিয়ে রাখছে ঠিক সে-অনুপাতেই মুক্তোর উজ্জ্বলতাটা অন্য কারো দিকে। এরও একটা বিহিত করা দরকার। এ মেয়ের সঙ্গে হৃদ্যতার একটা শেষ ভূমিতে গিয়ে দাঁড়াবার প্রয়োজন রয়েছে জীবনে।

'লুক্রেসিয়াস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওটা আমি পড়ছি। আমি আনিয়েছি বইটা। ওটা আপনাকে দিতে পারব না আমি।'

সিদ্ধার্থ চলে গেল।

দশ-পনের মিনিট পরে সিদ্ধার্থের খোঁজে এই ঘরে রমা ঢুকল আবার। প্রিন্সিপ্যাল ফাইল নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

'প্রফেসর সেন কি চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ। লুক্রেসিয়াস এসেছে। তোমাকে বলতে মনে ছিল না আমার।' রমার দাঁড়াবার কোনো কথা ছিল না, দাঁড়িয়ে থাকত না, এখুনি চলে যেত কিন্তু—

'লুক্রেসিয়াস?'

'হ্যাঁ, পাওয়া গেল বইটা, কয়েকদিন হল এসেছে আজও কলেজে নিয়ে এসেছি রোজকার মত, কিন্তু পড়বার সময় পাচ্ছি না, বলতে-বলতে টেবিলের কিনারের চামড়া সুটকেসটার ডালা তুলে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'তোমাকে দিচ্ছি বইটা, পড়ে কেমন লাগল আমাকে বলবে। বসো।'

বইটা হাতে তুলে নিয়ে রমা বললে, 'এখুনি চলে যেতে হবে আমাকে।'

'তাড়া নেই। আমার গাড়িতে পৌঁছে দেব তোমাকে।'

'অনেক জায়গায় যেতে হবে ত আমার। সে সব জায়গায় আপনার গাড়ি না গেলেই ভাল।'

প্রিন্সিপ্যাল রমার শাড়ির ভাঁজের থেকে বেরনো হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার গাড়িতে চড়তে মন ওঠে না তোমার।'

'এই বইটা নিয়ে যাচ্ছি আমি, ফিরিয়ে দিতে একটু দেরি হবে।'

প্রিন্সিপ্যালেরও যে ব্লাডপ্রেসার নেই তা নয় সিদ্ধার্থের মত লো নয়, সরিৎ মুখুয্যের মত হাইও নয়, কিন্তু কেমন যেন অবসাদের মত একটা জিনিস, কিছু নেই, কিছু নয়, বাসমতী কলেজটা অমিয় সেনের, নিজের স্ত্রীও পরের জিনিস, আর পরীকীয় বলে যা মনে করছেন তা—

'এখুনি বইটা নেবে?' একটা মস্ত বড় মাটির জালার ভেতর খেলাচ্ছলে ঢুকে বেরবার কোনো পথ না পেয়ে শিশুর মত মাকে ডাকছেন যেন তিনি, নিজের গলার স্বর শুনে মনে হল তাঁর চুয়ান্ন বছর আগে শিশুকালে এ-রকম হত ত তাঁর। আটমণি দশমণি মটকির ভেতর কেমন একটা নিরেট কৌতুকে ঢুকে পড়তেন তিনি, বেরুনো যেত না আর, মা নিজে না এলে, মাঝে-মাঝে কিছুতেই আসতেন না তিনি।

'বইটা নিয়ে যাই?'

'নাও। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?'

'কী যেন ভাবছিলেন চোখ বুজে?'

'ও, সেই জালার কথা,' প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'মনে হচ্ছিল নিজেরই দোষে ভেতরে ঢুকে গেছি কিন্তু বেরুতে পারছি না আর।'

'রমা ধরতে পারল না প্রিন্সিপ্যালের কথা, কী বলছেন তিনি?

'তারপর মা এসে আমাকে বাঁচাতেন। মার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান ঢের বেশি ছিল। যখন বড় হলাম, ওরকম পার্থক্যটা কমে গেল, স্ত্রী এলেন। কিন্তু মা যেমন মাটির জালার ভেতর থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারতেন—'

'বুঝেছি এখন জালার কথা; আটমণ দশমণ জালার কথা বলছেন—ও—' রমা বললে, 'দেখেছি আমি। আমিও নেমে যেতাম ও-সবের ভেতর।'

'তারপর?'

'তারপর বড় ফাপড়ে হত।'

'কিন্তু সেটা ত বেশিক্ষণ টিকত না—একজন লোক ত শেষ পর্যন্ত এসেই পড়ত।'

'হ্যাঁ, তা আসত।'

'সব সময়ই সেই একই একজন।'

'হ্যাঁ—প্রায়ই তিনি।'

'আমিও তাই বলছিলাম। রমা—'

বিনয়তোষ ঢুকে পড়ল।

রমা চলে গেল—সিদ্ধার্থকে এই কবিতার বইটা পড়াবে, আজই রাতে, সেন যদি জিরানডাঙায় আসে, তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়েছে—এখুনি বালিসড়কের সমুদ্রের দিকে ওরনা না—দিলে হয়!

অন্ধকার হয়ে আসছিল; আলো দেয়া হয়নি এখনো; মশা ওড়াওড়ি করছিল—তবে খুব বেশি নয়, মাঝে মাঝে আস্তে চড়চাপড় মারছিল গালে, হাতে দাবনায়, খুব জোরে ঠাশ করে চড় মেরে মশা মারবার দিকে রুচি ছিল না কারো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধার্থের সরোজিনী পিসিমা বললেন, 'তুমি কি মনে কর টিনি যে ব্রাহ্ম সমাজের কাজ সত্যিই ফুরিয়ে গেছে আমাদের দেশে?'

টিনি বললে, 'না, তা কী করে হয়।'

সিদ্ধার্থের ছাতু কাকা বললে, 'কোনো ভাল মানুষের কাজ কি কখনো ফুরোয়, তবে জোর কমে আসছে বলে মনে হচ্ছে।'

'তাই তুমি মনে করো ছাতু?'

'আমার ত তাই মনে হচ্ছে,' ছাতু কাকা বললে, 'আলো দেবে না টিনি।'

দিচ্ছি, কিন্তু আপনি ত খুব নিরাশার কথা বলছেন ছাতুবাবু।'

'ছাতু কাকার কানের ওপরে একটা মশা বসেছে, সুড়সুড়ি লাগছিল, তারপরে আস্তে আলপিনের খোঁচার মত হুল ফুটিয়ে দিতেই সাঁ করে ডান হাত তুলে ওটাকে পালাতে না দিয়ে সট করে ঘষে ফেলবার চেষ্টা করে ছাতু কাকা বললে, 'কই ব্রাহ্মসমাজে আজকাল লোকজন যায় কোথায়? দেখি না ত কাউকে যেতে।' পিষে মেরে ফেলবার আগেই মশাটা পালিয়ে গেছে টের পেল ছাতু কাকা।

'আপনি নিজে ত নিয়মমত যাচ্ছেন না ছাতুবাবু।'

'হ্যাঁ, আমি কি রোববার দু'বেলাই যাই। সব অনুষ্ঠানেই যেতে হয় আমাকে। তাগিদ বোধ করি আমি। সমাজের ঘরদোর পরিষ্কার থাকছে কিনা—মালিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে, সমাজের লাইব্রেরির বইগুলো গুছিয়ে মিলিয়ে ঠিক করে রাখতে আমি রোজই যাই। কিন্তু সরোজিনীদি, টিনি মজুমদার, হিতেনবাবু, গগনবাবু, কখনো সুকুমার ছোকরা, আর সমাজের উড়ে মালি, এই নিয়েই কি একটা সমাজ হয়—'

'হচ্ছে ত, চলছে ত,' সরোজিনী পিসিমা বললেন, 'আমাদের এ আলো জ্বালিয়ে রাখতেই হবে।

টিনি বললে, 'আমরা যতদিন আছি, বাতি নেভাতে দেব না। মনে পড়ে পনের-কুড়ি বছর আগেও ওঁরা সব যখন বেঁচেছিলেন, কী সব দিন গিয়েছে সমাজের, ভিড় করে ভেঙে পড়ত বাসমতীর লোকজন দেবব্রতবাবুর এগারই মাঘের সার্মন শোনবার জন্যে। কী গান হত সব—ব্রাহ্মসঙ্গীতের সত্যেন ঠাকুর ছিলেন দ্বিজেন ঠাকুর, ত্রৈলোক্য সান্যাল শাস্ত্রী মশায়ের।'

'আবার ফিরে আসবে টিনি।' সরোজিনী পিসিমা এই সত্তর বছর বয়সে এখন আর অসাধ্য-সাধনে খুব সম্ভব বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তবুও নিজেকে নিবেদন করে বিশ্বাস করবার একটা প্রবৃত্তি বাঁচিয়ে রাখতে চান। কে জানে, যা দুঃসাধ্য বলে মনে করা যায় তা সম্ভব হতেও পারে। দেবব্রতবাবু সোমনাথ মুখুয্যে, বড় কমলবাবু, ছোট কমলবাবু, অবিনাশ গুপ্ত মশাই, চক্রবর্তী মশাই—এঁরা কেউ নেই যদিও আজ তবুও পঁচিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ বছর পরে এদের উদয় হতে পারে ত এই দেশে আবার? যে-জিনিস শুধু মানুষের এ-লোক ও-লোকের জন্যে বাস্তব ও সারাৎসার, যেমন ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন ও ব্রাহ্মসমাজ, তা মাঝে-মাঝে অসাড় আবছা যুগের প্রভাবে পড়ে মরে গেছে বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তা মরেনি, আছে, ভবিষ্যতের জন্যে প্রাণ আলো সফলতা সঞ্চয় করেছে, আজকের জন্যে টিনি মজুমদার হিতেনবাবু গগনবাবু সরোজিনী পিসিমার নিজের বুকে—এমন-কি, ছাতুর ভেতরেও, আশা, পদার্থের মত আছে—বেঁচে রয়েছে—ভাবছিলেন সরোজিনী।

'আছে সব।' সরোজিনী বললেন।

'আছে বটে—কিন্তু আমাদের স্মৃতির ভেতর।' টিনি বললে স্মৃতির কথাই পাড়তে গেল আবার টিনি, কেমন চমৎকার গান করতেন বড় কমলবাবু, দেববাবুর উপাসনা আরাধনা, সামনের পর এরকম ভাল জিনিস টিনি আর দেখেনি কোথাও, সত্যিই পায়নি কোথাও, কলকাতায় পাটনায় ঢাকা আসামে, অথবা বাসমতীর পৃথিবীতে।

'বড় কমলবাবুর গান! কী যে মনে করিয়ে দিলে তুমি আমাকে টিনি। তিনি রবিবাবুর গান গাইতে পারতেন না বটে, কিন্তু রামলোচন, দ্বিজেন ঠাকুর, সত্যেন ঠাকুর, ত্রৈলোক্য সান্যাল, অন্নদা চাটুয্যে, বেচারাম চাটুয্যের গান কীই যে গাইতেন তিনি-মনে হত সৃষ্টি যে নাদ তৈরি করেছিল সব চেয়ে প্রথমে, যার চেয়ে স্বাভাবিক শুদ্ধ জিনিস কিছুই আর হতে পারে না। বড় কমলবাবুর গলা সেইখানে গিয়ে মিশেছে, এক হয়ে গেছে তার সঙ্গে।'

'ক্রমেই আরো শুদ্ধ হলেন উনি', অন্ধকারের ভেতর হিতেনবাবু বললেন। হিতেনবাবুর বয়স চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি হবে, কিন্তু বয়স আন্দাজে বুড়িয়ে যাননি বিশেষ কিছু তেমন, সরোজিনীকে কখনো সরোজিনীদি কখনো শুধু সরোজিনী বলেই ডাকেন, প্রায়ই 'আপনি' বলেন, মাঝে-মাঝে এক আধবার 'তুমি' বলে না যে ডেকে ফেলেন তা নয়, নিজের ইচ্ছায় খুব সম্ভব নয়, কথা বলতে-বলতে এমনিই, দু'জনেরই বয়স যা হয়েছে তাতে এরকম ধরনের সব ব্যবধান স্বভাবতই ঘুচে যায়, হিতেনবাবু সে-রকম নয়।

'আপনি সৃষ্টির প্রথম নাদের কথা বলেছেন সরোজিনীদি, সৃষ্টির না বলে ঈশ্বরেরই সৃষ্টি প্রথম নাদ এও বলতে পারতেন, সে জিনিসের চেয়ে, 'হিতেনবাবু বললেন, 'বেশি শুদ্ধ কোনো জিনিস থাকেত পারে না আর? তা নেই। তবুও বড় কমলবাবুর গান শেষের দিকে আগের চেয়েও বেশি সাত্ত্বিক, কেমন একটা শিখার মত হয়ে উঠেছে মনে হত না আপনার সরোজিনীদি? কী বলো তুমি টিনি?'

'সাত্ত্বিক বলছেন আপনি? সাত্ত্বিক বললে জিনিসটার ঠিক চেহারা দেয়া হল না,' টিনি বললে, 'ভাল হিন্দু বিধবাদের চানটানের শেষে একাদশীর ভোরবেলার মুখখানির কথা মনে পড়ে। না, তা নয়, বড় কমলবাবু ক্রমেই আরো ব্রহ্মনিষ্ঠ হচ্ছিলেন, গান ধরলেই সেটা মাসিমার মত উপাসিকা—আমার মত ব্রাহ্মিকা, উপাসকমণ্ডলী হঠাৎ যেন একেবারে ভেতরের রসে ডুবে গিয়ে টের পেত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শরবৎ তন্ময়ো ভাব—উপনিষদ বলছেন,' সরোজিনী পায়ের দিকে মশা কামড়াচ্ছে টের পেয়ে এক পায়ের ফাটা চামড়ার গুড়ুলি দিয়ে আর এক পা রগড়ে ঘষে বেশ ভাল শুকনো ধুন্দুলখোলের কাজ হচ্ছে অনুভব করতে করতে খানিকটা আরাম পেয়ে বললেন, 'কিন্তু আমরা ব্রাহ্মসমাজে ক'জন মানুষই বা আর ধনুকের তীরের মত বিঁধে লেগে থাকতে পারি পরব্রহ্মের দিনরাতের সত্য প্রকাশের ভেতর। কিন্তু, হিতেনবাবু,—আমার মনে হয় বড় কমলবাবু সেটা পারছিলেন শেষের দিকে।'

'কিন্তু তিনি ত শেষের দিকে কীর্তনই গাইতেন শুধু' বললেন গগনবাবু, ছাপান্ন বছর বয়স হয়েছে তার, হাতের চুরুটটা নামিয়ে। চুরুটটা নিভে গেছে অনেকক্ষণ হয়।

'এ ঘরে একটা আলো দিলে হত,' সরোজিনী পিসিমা বললেন। 'দিচ্ছি,' টিনি মজুমদার ওঠবার উপক্রম করে বললে। কিন্তু কীর্তন সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার মনে করে গগনবাবুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বাঁ-হাতে যেখানে চুলকুনিগুলো, বোরিক পাউডার শুকিয়ে এসেছে প্রায় মশাটা সেইখানেই বসে পড়েছে টের পেয়ে সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে চুলকুনির জায়গাটা আস্তে-আস্তে ঘষতে ঘষতে অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

'ধুপকাঠিও জ্বালাতে হবে,' টিনি বললে।

'ধুপকাঠি ফাটি নয়, কিছু খাঁটি ধুপের ব্যবস্থা করতে পার?' সরোজিনী পিসিমা বললেন।

'ধুপ পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল বাসমতীতে—'

'কেন ধুপ কী হল, এ নিয়েও কালোবাজার?'

'চালান নেই হয়ত!'

'ধুপ কোথা থেকে আসে, জিনিসটা বলুন ত কি?' সরোজিনী পিসিমা হিতেনবাবুর দিকে কেমন যেন গুণীজ্ঞানী ভাইয়ের পিঠোপিঠি দিদির মত ব্যস্ত, ক্লান্ত, নির্ভরস্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললেন।

'বলতে পারছি না', হিতেনবাবু ভুরু কুঁচকে হেসে বললেন।

'বড় কমলবাবুর কথা হচ্ছিল। ঘরটা বেশি অন্ধকার হয়ে পড়েছে, বাইরে চাঁদ রয়েছে বটে—কিন্তু পঞ্চমী-ষষ্ঠীর চাঁদ হয়ত, বেশ ঝরঝরে কাস্তের মত ফলে উঠেছিল কিছুক্ষণ আগে, কিন্তু নানারকম মেঘের বহরে সমস্ত আকাশটা ঢাকা পড়ে গেছে এখন, পাটকিলে, মেটে, উনুনের ছাইয়ের মত আর রাশি রাশি নোংরা-লবণের মত রঙের আকাশভরা পুরু মেঘের নিঃশব্দ নিরেট থানের নিচে চাপা পড়ে গেছে চাঁদটা। আকাশে কোনো তারা দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টি হবে না, এ-সব মেঘ বৃষ্টির নয়, বর্ষার ঋতুও কেটে গেছে অনেক দিন আগে, বাতাস নেই, মেঘের চাপে গরম পড়েছে একটু, বেশ খানিকটা ঘোরঘোর ও কিছুটা থমথমে হয়ে আছে বাসমতীর পৃথিবী।

'বড় কমলবাবু শেষের দিকে কীর্তন গাইতেনই ত। ভক্তরা কখনো শুধু নিজেদের মুক্তিই চান না,' ছাতু কাকা বললে, 'যত জনকে পারা যায় আলিঙ্গন করে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে চান। কাজেই কীর্তনের কাল স্বভাবতই এসে পড়ে তাদের হৃদয়ে। খাম্বাজ, বেহাগ, পূরবী, পলশ্রী, বাঁরোয়া-ওসব হচ্ছে নিজের ব্যক্তিগত সাধনার গান। কীর্তন সবাইকে নিয়ে। বড় কমলবাবু সাধনের পথে ঢের এগিয়ে, গিয়েছিলেন বলেই শেষের দিকে কীর্তন গাইতেন।'

'কীর্তনের আধ্যাত্মিক সাধন ভজনের হিসেব-নিকেশের দিকটা সম্পর্কে ঠিকই বলেছেন আপনি ছাতুবাবু,' টিনি মজুমদার বললে, 'কিন্তু মাসিমা যে-নাদের কথা বলছিলেন, আমার মনে হয়, কীর্তনেই সেই প্রথম নাদ মূল গায়েনের গলায়ই শুধু নয়, সমগ্র জিনিসটার ভেতর, অন্য যে—নাদের কথা বলছিলেন, আমার মনে হয়, কীর্তনেই সেই প্রথম নাদ, মূল গায়েনের গগনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, তা কী করে হয়।' চুরুটটা জ্বালিয়ে নেবেন কিনা ভাবছিলেন—এ ঘরে ঢুকে অবদি, চুরুটটা টানেন নি আর। সরোজিনীদি বা টিনি সিগারেট খাওয়া পছন্দ করেন না, যে লোক সিগারেট চুরুট খায় তার নীতিনিষ্ঠার অবনতি হয়েছে সেটা হয়ত মনে করেন না, কিন্তু কর্মসাধনার দিকে উন্নতির অন্তরায় চুরুট-সিগারেট নিশ্চয়ই এটা তারা বোধ করেন—সেজন্যেই গুণে গগনবাবুর সিগারেট খাওয়াটাকে হাসিমুখে সহ্য করেন যদিও। না চুরুট জ্বালাবেন না গগনবাবু এখন আর, আলো জ্বালা হোক, ধুপকাঠি জ্বালানো হোক—বুঝেশুনে তখন দেখা যাবে। 'বড় কমলবাবু রবীন্দ্রনাথের গান গাইলেন না,' গগনবাবু আজো এতদিন পরে খানিকটা তিতো চোখে এদিক-সেদিক তাকিয়ে হাঁপিয়ে উঠে দম নিতে নিতে বললেন।

'তাতে কী হল?' বিরক্ত হয়ে সরোজিনী পিসিমা বললেন, 'ঠাকুরবাড়ির গান গাইতেই হবে এমন ত কোনো কথা নেই, বিশেষ কোনো কেন্দ্রীয় কালচার-টালচারেও না। ব্রাহ্মসমাজকে কোনো কিছুর জন্যে জোড়াসাঁকোর বাড়ির দিকে চেয়ে থাকতে হবে—এমন কথা বলবেন না। রবীন্দ্রনাথ ভাল গান লিখেছেন বটে, কিন্তু কেন আমাদের ব্রাহ্মসমাজের লোকজনের সাধনার কথাটা একজন মানুষের গানের সঙ্গে আপনি জড়িয়ে ফেলছেন গগনবাবু?'

'আপনি নাদের কথা বলছিলেন সরোজিনীদি,' হিতেনবাবু বললেন, 'কীর্তনে দোহার যারা গায় তাদের ভেতরে না-হোক, আমি টের পেয়েছিলুম বড় কমলবাবুর গলার কীর্তনেই সে জিনিস ধরা দিয়েছিল, তার সঙ্গে যারা দোহার গেয়েছে কমলবাবুর তুলনায় নিজেদের অসারতার কথা ভেবে লজ্জা পেয়েছে।'

'কে?' গগনবাবু বললেন?

'কীর্তন ত দশজনকে নিয়ে, সকলেই ত তাদের বড় কমলবাবু নন। অনেক ত ভাঙা কাঁসির গলা জুটত তার ভেতর, শুনেছি ত আমি। ঈশ্বরের সেই প্রথম নাদ—অন্য জিনিস। এই বাসমতী ব্রাহ্মসমাজে বিশ বছর বসে কীর্তন শুনলাম ত আমি। বড় কমলবাবু বুড়ো হয়ে গিয়ে কীর্তনে একটা নতুন তার এনেছিলেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয় সত্য সখা ঘোষাল যখন একা গান গাইত, ধরুন ত্রৈলোক্য সান্যালের বা সত্যেন ঠাকুরের, বা....' কিন্তু ওদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে যুক্তিযুক্ত সাক্ষ্য, তর্কের খাতিরে সত্যেন ঠাকুরের অনুজের নাম উল্লেখ করতে গেলেন না আর গগনবাবু, 'তখন—সত্যসখাই বাসমতী ব্রাহ্মসমাজে গান শুনিয়েছে বটে।'

'শোনানোর কথা নয়।' সরোজিনী পিসিমা লজ্জিত হয়ে বললেন, লজ্জিত হলেন, বেশি দুঃখিত হলেন, বললেন, 'ব্রাহ্মসমাজকে কালোয়াতি গান, এমন কি ভাবগভীর গানের একটা পীঠ মনে করে অনেকে এখানে গান করতে আসেন, আমি দেখেছি কয়েক বছর ধরে। ভুল করেন তাঁরা। ব্রাহ্মসমাজে কোনোদিন ও গান নিয়ে কালোয়াতি চলে নিত, ও-রকম গানের কোনো প্রশ্রয়ই দেয়নি আমাদের সমাজ কোনোদিন। কেউ কেউ গান গাইবার সময় একটু-আধটু কারিগরি ওস্তাদী দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু সেটা স্বভাবতই হয়েছে। সাধনার লক্ষ্যে পৌছুবার পথে সাধকদের প্রাণের আকুতির সঙ্গে খুবই সহজ মিশ খেয়েছে সেটা—আমি দেখেছি। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে যারা উদাসীন, ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাবতে যায় না কিছু-সেই সব মানুষের নিছক গীতপিপাসা মেটাবার জন্যে ব্রাহ্মসমাজ তৈরি হয়নি ত। অথচ অনেক দিন থেকে যারা আমাদের সমাজে আসে, তাদের অনেকেই চাটে মজলিশে গান শুনতে ভালবাসে বলে ব্রাহ্মসমাজে আসে, মনে করে ব্রাহ্মসমাজও মজলিশ, কয়েকখানা গান ফেঁদে শ্রোতাদের তৃপ্ত করতে পারলে চরিতার্থ হবে। ওরা যা খুশি ভাবুক গিয়ে কিন্তু গগনবাবু, আপনি ত অনেক দিনের পুরনো ব্রাহ্ম, আপনি এরকম মনে করলেন কী করে?'

গগনবাবু নড়েচড়ে একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে রইলেন।

সরোজিনী বললেন, 'বড় কমলবাবু বা সত্যসখা ঘোষাল কাঁউকে শুনিয়ে মাত করবার জন্যে গান গাইতে যান নি, গানকে তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের সেতু হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সবচেয়ে গভীরতম সেতু।'

'মিশনের সেতু সরোজিনীদি সোলো গান?'

'কেন—ডুয়েটও ত।' টিনি মজুমদার বললে।

'ভাবসাধকদের দিক দিয়ে কীর্তনই সবচেয়ে স্বাভাবিক গান,' ছাতু কাকা বললে, 'বড় কমলবাবু সেই জন্যেই শেষ বয়সে কীর্তন ছাড়া আর-কিছু গাইতেন না।'

'গগনবাবু—'

'আজ্ঞে।'

'বড় কমলবাবুকে আপনি চিনলেন না।'

'সত্যসখার গানই আমার বেশি ভাল মনে হত।'

'গান সম্বন্ধে একটা বিলাস রয়েছে আপনার মনে। ব্রাহ্মসমাজ যে একটা ধর্মের ক্ষেত্রে, গানের থিয়েটার নয়, সেটা ভুলে গেলেন আপনি।'

'সরোজিনীদি?'

ছাতু কাকার দিকে তাকালেন সরোজিনী।

'কিন্তু এটা আপনি দেখেছেন হয়ত সরোজিনীদি, আমি অনেক বছর ধরেই দেখছি,' ছাতু কাকা বললে, 'যে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ ত বটেই, বাসমতী ব্রাহ্মসমাজেও খুব হাঁকডাকের দিনে শহরের এত লোক যে ভেঙে পড়ত এখানে সেটা ব্রাহ্মসমাজে এসে গান শোনবার জন্যে। গান যত বেশি ভাল হয়েছে তত বেশি মজলিশি শখ বেড়ে গেছে ওদের। গানের চমৎকার মৌতাত রয়েছে বলে এটা যে ধর্মসমাজও, সেটা ওরা অগত্যা স্বীকার করেছে। ধর্মের জন্যে মাথা মাঘায়নি, আমাদের সমাজকে বড় একটা গ্রাহ্যও করতে যায়নি।'

'মেয়েরা যখন সোলো গেয়েছে' গগনবাবু বললেন, 'মেয়েপুরুষ মিলে ডুয়েট গেয়েছে—তখন আমেজ আরো ঢের জমেছে। দশই মাঘ এগারই মাঘের উৎসবে অবিনাস গুপ্ত মশাই, চক্রবর্তী মশাই, সরোজিনীদি, সত্যসখা, বীণা, চিনি, অলকা, নন্দাদি, রানুদি, দ্বিজেনবাবু, ছাতুবাবু সকলের কাছেই গানগুলো এসে পৌঁছেছে ধর্মসমাজেরই প্রাণের প্রাধান্যে, একান্তভাবে কিন্তু বাইরের বিশাল সমাজ যে অন্য রকম রুচি বুদ্ধি নিয়ে এই গানগুলি শুনে গেছে এ জিনিসের কোন প্রতিকার নেই। আমরা গান শোনাতে চাই বা না চাই, সত্যসখার মতন একজন লোক এ সমাজে গান গাইতে থাকলে বাইরের ষোল আনি জনসাধারণ এখানে গান শুনতেই আসবে, ধর্ম করতে নয়। ধর্ম আন্দোলন আরম্ভ করেছিল বটে ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু মানুষ আজকাল ধ্যানট্যান ধর্মটর্মের গণেশ উল্টে দিয়েছে। ধর্মসমাজ হিসেবে ব্রাহ্মসমাজের কাজ প্রায় ফুরিয়ে গেছে বলেই মনে হয়।'

'প্রায় আর কেন বিনয় করে বলছেন গগনবাবু', ফাটা মহলানবিশ ঘরের পুবদিকের খাপটির অন্ধকারে এতক্ষণ ঝিমুচ্ছিল, ফাটাও চুরুট খায়, হাতে চুরুট রয়েছে তার, ধরানো হয়নি এখনো, যখন দরকার ধরিয়ে নেবে। গগনবাবুর মতন ওরকম দ্বিধাটিধা নেই ফাটা মহলানবিশের 'নিজের চোখেই সব জায়গায় দেখে এলাম ব্রাহ্মসমাজ জাতব্রাহ্মদের নিয়ে বড্ড ব্যস্ত। দেশ পৃথিবী ইতিহাস তাই একবারেই অব্রাহ্ম হয়ে পড়ছে। ইতিহাস ভাল হোক বা খারাপ হোক 'ন' কাটা বাহ্মণদের সেখানেও আর-কোনো স্থান নেই, শাস্ত্রীমশাই মরবার আগেই তাদের দম ফুরিয়ে গেছে।' ফাটা মহলানবিশ চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে।

'ও তুমি চুরুট খাও বুঝি?' সরোজিনী বললে; এর চেয়ে বেশি কি আর বলবেন? কিন্তু বলার রকমে একটু বাহাদুরি আছে।

'চুরুটটা একটু পরে, জ্বালালেই পারতেন ফাটাবাবু।' টিনি মজুমদার ঠাট্টা অনুনয়ের সুরে-সুরে বললে, 'আবার তামাকের গন্ধ সইতে হবে, কিন্তু তাই বলে সরোজিনীদির যতটা খারাপ লাগে আমার ততটা না।' এমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের একটা ক্ষমাবিলাসেও অনুভূতির বসনে ফাটার দিকে তাকাল সে। টিনির থেকে বয়সে খানিকটা ছোট ফাটা কিন্তু কিছুদিনের পরিচয় সত্ত্বেও এখনো তাকে 'আপনি' বলেই ডাকে টিনি।

'এ-ঘরে কি আলো দেয়া হবে?' ছাতু কাকা বললে।

'তুই একটু চুপ করবি ছাতু?' সরোজিনী বললেন।

'আলো আসছে বুঝি?'

'সময় হলেই পাবি-ধানরাজের মা একটু বাজারে গেছে, এসে নিক। অস্থির করিস নি।'

'সময় হলে পাব?' ছাতু কাকা একটু গোঁফ মুচড়ে নিয়ে দাঁতের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে কামড়ে ধরে বললে, 'রাত আটটা সোয়া আটটা বাজে, সন্ধ্যা দেবার সময় হল না।'

'সন্ধ্যা দেয়া কাকে বলে ছাতুবাবু,' হিতেনবাবু বললেন, 'সন্ধ্যা হলেই বাতি জ্বালাবার একটা নিয়ম থাকা ভাল বটে, কিন্তু তা না-হলেই যে ঘর অপবিত্র হতে পারে বা অপদেবতা আশ্রয় করতে পারে, এটা যুক্তির কথা নয়। নিয়ম বাঁধা হয় বটে এক-এক সময়, কিন্তু দিনকাল, ধারণা, প্রয়োজন বদলে যায়, আগেকার নিয়মের কোন সার্থকতা থাকে না। সন্ধ্যার বাতি কী করে জ্বলবে বাসমতীতে বলুন ত ছাতুবাবু?'

ছাতু তাকিয়ে দেখছিল বেতের চেয়ারে বসে ফাটা বেশ পা ছড়িয়ে চুরুটে বুঁদ হয়ে টিনির দিকে তাকিয়ে আছে, চুরুটের গন্ধ ততটা খারাপ মনে হচ্ছে না হয়ত টিনির, ক্ষমা করে ফেলেছে ফাটাকে-চোখ নরম হয়ে রয়েছে টিনির। হিতেনবাবুর দিকে তাকাল ছাতু কাকা, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন উনি, জিজ্ঞেস করে জ্ঞাত সমাধানটা নিজের হাতে রেখে ছাতুর উত্তরটা জানতে চাইছেনই কিন্তু ব্যাপারটা ত সেই কেরোসিন নিয়ে।

'বাসমতীতে ত আজকাল কেরোসিন তেল পাওয়া যায় না ছাতু কাকা। মাসে দেড় সের তেল শুধু কন্ট্রোলে মিলবে। মানুষ বাতি জ্বালাবে কী করে—সরোজিনী কি কালোবাজর করবেন?'

'হ্যারিকেনের তেলটেল আছে—তলানির দিকে?'

'না-রে।' সরোজিনী ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন।

'এক ক্যানেস্তারা কেরোসিন চাই আপনার সরোজিনীদি?' ফাটা বললে।

'কত দাম পড়বে?'

'কন্ট্রোল রেটে সাড়ে তিন-চার—খুব সম্ভব। কিন্তু গেরস্তদের ত ক্যানেস্তারা হিসেবে কিনতে দেবে না—তাদের বরাদ্দ আসে সেড় দেড়েকে আন্দাজ। আমি ছালার চটে মুড়ে রাত এগারটা বারটায় এক ক্যানেস্তারা তেল ঢুকিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তা ত আপনি নেবেন না।'

'তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে একথা কী করে বলছ ফাটা। বড় কমলবাবুর ছেলে তুমি। তোমার বাবা—'

'কোন কথা সরোজিনীদি? বিনি পয়সায় আপনাকে কেরোসিনের ক্যানেস্তারা দেয়ার কথা?'

'না-না—' সরোজিনী পা ঝাড়া দিয়ে নিচের দিকের মশাগুলো তাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'গরমেন্টের নিয়ম যে মাসে দেড় সের কেরোসিন পাবে গেরস্ত, আমি সেই নিয়ম ভেঙে কী করে ক্যানেস্তারা নেই।'

'ও', ফাটা এক রাশ ধোঁয়া বের করে মুখের থেকে চুরুট নামিয়ে বললে, 'আমার বাবা বড় কমলবাবু বেঁচে থাকলে নিতেন না বটে, কিন্তু তিনি চার টাকা পাঁচ টাকা চালের মণ দেখে চলে গেছেন দ্বিতীয় লড়াই বাঁধাবার ঢের আগে, এক টাকায় বারো-চৌদ্দ সের দুধ ছিল, তিন-চার পয়সায় একটা তেল চুকচুকে ড্যাকড়া ইলিশ মিলত, দু'টোও মিলত কখনো-কখনো ইলিশে বাজার তলিয়ে গেলে, তিনি হেসে খেলে গান গেয়ে চলে গেছেন।'

'এক ক্যানেস্তারা কেরোসিন আপনি দিতে পারেন ফাটাবাবু?' টিনি মজুমদার বললে।

ছাতু কাকা বললে, 'তুমি কিসের ব্যবসা করছ হে কলকাতায় ফাটা? বছর দুই পরে ত এলে বাসমতিতে, খুব স্যুট চড়িয়েছ দেখছি আবার যাবে নাকি কলকাতায় ফিরে শিগগির? কিসের ব্যবসা তোমার?' চুরুটটা মুখের দিকে তুলেই হাতটা নামিয়ে রেখে ফাটা বললে, 'বড় কমলবাবু যদি আজ এই ফাঁপড়ের ভেতর বেঁচে থাকতেন তাহলে এক ক্যানেস্তারা তেল কি তিনি নিতেন না সরোজিনী?'

সরোজিনী ডান পায়ের খসখসে গুড়লি দিয়ে বাঁ পায়ের ডাট রগড়াচ্ছিলেন মশার সুরসুড়ির-বিষ মারবার জন্যে, আরাম লাগছিল। 'তোমার কথা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয় সরোজিনী বললেন, 'তুমি বড় কমলবাবুকে তোমার নিজের বাবা শুধু মনে কোরো না ফাটা, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সকলেরই আশার জিনিস, সত্যের জিনিস, প্রীতির জিনিস। তিনি চলে গেছেন-অনেক দিন ত। চৌদ্দ-পনের বছর হয়ে গেল আজ। ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা এখন আরো ঢের খারাপ হয়ে পড়েছে, কলকাতায়, ঢাকায়, বাসমতীতে। তুমি এই সময়ে এরকম আসার কথা বলবে ফাটা?'

'আপনারা মাসে তিন বোতল তেল পান নাকি সরোজিনীদি?' হ্যাঁ, চার বোতলও পাই কোন-কোন মাসে। দেড় সের-দু'সের তেল—এক মাসের জন্যে।'

'কী করে চলে তাহলে?'

'এই ত কী রকম করে চালাচ্ছি, দেখছ ত। তোমরা সকলে এসেছ, অথচ

'বাতি জ্বালাতে পারছি না।'

ফাটার চুরুটটা তার আঙুলের ফাঁকে জ্বলে জ্বলে নিভে গিয়েছে হয়ত, গোড়ার দিকে দু'টো চারটে টান মেরেছিল শুধু, সরোজিনীদির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হচ্ছে, তিনি এক নাগাড়ে তাকিয়ে আছেন, চুরুট মুখে দিতে বাঁধ-বাঁধ ঠেকেছে তাই। কলকাতায় এসব সমীহ ছিল না, সারদা বোসের সামনে দাঁড়িয়ে চুরুট টেনেছে সে। আর ত সব মরে হেজে গেছে—হেরম্ব মৈত্র, কেষ্টবাবু, প্রাণকৃষ্ণবাবু কলকাতায় কেউ নেই এখন আর, ছোট পাণ্ডারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে অনেকে কিন্তু তাদের সামনে শুধু চুরুট কেন, কোন কিছুতেই বাঁধে না কারুরই। বাঁধবে কি করে—সবই ত এক ঝাঁকের কই। কিন্তু এখানে কেমন একটা নতুন সমীহ—হিতেনবাবুর সামনে, সরোজিনীদির সামনে ত নিশ্চয়ই। চুরুটটা টানতে পেরে খুব অসুবিধা হচ্ছিল ফাটার, কিন্তু কী করে টানবে—এটা ত বড় কমলবাবুর দেশ।

'সারা রাত বাতি না জ্বালিয়ে কী রকম করে থাকেন এ-রকম কাঠ হোগলা ছাপড়ার বেড়ার ঘরে? ভিতটাও ত মাটির,' বুট দিয়ে মেঝের ওপর বার দুই চাট মেরে ফাটা বললে, 'এটা ত চোর-ছ্যাঁচোড়ের দেশ, চারদিকে ধান জমিজঙ্গল, সাপখোপ ত কম নেই।'

'এখন ত জ্যোৎস্না রাত, দু-চারটে জানালা খোলা রাখি, মুলি বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়েও আলো আসে, ঘরে আলো থাকে মন্দ না, আমাদের রাতে তত বেশি উঠতে হয় না।'

'মাঝে-মাঝে চলাফেরা করতে হয় না ঘরের ভেতরে। বাইরে যেতে হয় না? ঘরের ভেতরেই ল্যাভেটরি?'

'আমাদের ঠিক ল্যাভেটরি বলে কোনো জিনিস নেই, ঘরের সঙ্গে লাগান নেই, বাইরে।'

'রাতে বাইরে যাবার দরকার হয় না।' টিনি মজুমদার বললে।

'হ্যাঁ টিনি সারারাত দিব্যি মুখ থুবড়ে ঘুমোয়। আমি একটা মোম, দেশলাই হাতের কাছে রাখি।' সরোজিনী বললেন।

'সরোজিনীদির ডায়াবেটিশ আছে,' ছাতু কাকা বললে, 'তাছাড়া ডাক্তার সুধাংশু মিত্তির বলছেন প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের গোলমাল অনেক দিনের, চেপে রাখতে পারেন না, বার বার উঠতে হয়, কিন্তু এ বয়সে ত অপারেশন করা ঠিক হবে না।'

'বাসমতীতে মোমবাতি পাওয়া যায়?'

'এক আধটা দোকানে মাঝে-মাঝে। চালানি নেই।'

'রেডির তেল এক জের কিনে রাখুন সরোজিনীদি,' ফাটা বললে, 'ওটার কনট্রোল হয়নি এখনো; আলো বেশি হবে না ও-তেলে, বেশি আলোর দরকারও নেই আপনাদের। চাঁদের আলোয় ত চালাচ্ছেন, রেডির আলোয় তার চেয়ে ভাল হবে। কিছু লেখা পড়া হয়ত করতেও পারবেন। সলতেটা একটু টেনে মুচি হাতে করে বাইরেও যেতে পারেন, কিন্তু মোম জ্বালিয়ে বাইরে যাওয়াই ভাল।'

'রেডির তেল কিনে রেখেছি আমরা।' সরোজিনী বললেন।

'হাটুতে পাক খাইয়ে সলতেও তৈরি করে রেখেছি,' টিনি বললে ফাটাকে, 'আমরা রাত বুঝে রেডির তেল জ্বালাই।'

গগনবাবু চুরুট জ্বালালেন।

সরোজিনীদিদের সঙ্গে কথা বলে একটু সহজ হয়ে এসেছে সবই—কোনো-দিকে আর-না তাকিয়ে চুরুট জ্বালিয়ে ফেলেছেন গগনবাবু, ধোঁয়াটা একটু অভয়ে ভরসায় ভরাট হয়ে উঠলে ফাটাও এবার একটু দ্রুত করে চুরুট জ্বালাল। 'বললে রাতের বেলায় অত বেশি বাইরে যাওয়া উচিত নয় আপনার সরোজিনীদি, বাসমতীতে সারারাত সাপ মামদো চোর চিমড়ে কিলবিল করে, এদিকটা ত জঙ্গলের মত। ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের রোগ বাইরে গিয়ে ঠকাশ করে বিরমি খেতে পারেন—' ফাটা বললে, 'আপনার বড়-বড় ইমানদার ভাইরা দু-তিন বছর আগেও ত হামেশা বাসমতীতে আসতেন—কিছু পট কমোড ফেলে রেখে যাননি তারা?'

'রেখে গেছেন,' ছাতু কাকা বললে, 'আমাদের এ-ঘরের উত্তর দিকের ছোট কামরায় সেগুলো আছে—টিনি সরোজিনীদি যে-ঘরে শোয় তারই পাশের কামরায়। রাতের বেলায় সেইখানেই আমরা যাই। দিনে জমাদারনী এসে সাফ করে দিয়ে যায়।'

'তোমরা বড্ড ল্যাভেটরির কথা বলছ.' হিতেনবাবু একটু অস্বস্তি বোধ করে বললেন, 'এই ব্রাহ্মসমাজের কথা হচ্ছিল।'

'হবে—ব্রাহ্মসমাজের কথা হবে', ফাটা বললে, 'রাত ত এখন মোটে সাড়ে আটটা, একটা—দেড়টার আগে আমি নড়ছি না এখান থেকে। হিতেনবাবু ত কাছেই থাকেন-চাঁদের আলোয় মোমের আলোয় পৌঁছিয়ে দেব। গগনবাবু বুঝি সেই দানাপুরের দিকে?'

'হ্যাঁ, আমি টর্চ এনেছি, তবে ঝপ করে নিভে গেল সরোজিনীদির উঠোনে এসে।'

'কেন।'

'বিগড়ে গেছে, তার পুড়ে গেছে হয়ত, কে জানে ব্যাটারি ফুরল কি না। বাসমতীতে আমি তিন মাস ধরে খুঁজছি-কোথাও ব্যাটারি নেই।'

'কলকাতায়ও নেই,' ফাটা বললে, 'আমার মোটর সাইকেলটা এনেছি গগনবাবুকে বক্সে বসিয়ে নিয়ে যাব। এখান থেকে দেড়টার সময় উঠলে দানাপুরে পৌঁছতে দু'টো সোয়া দু'টো আড়াইটাও হতে পারে, যে-রকম রাস্তাঘাট হয়েছে আজকাল বাসমতীতে।'

তারপরে অত রাতে কোথায় আর যাওয়া যায় বলো ত ছাতুবাবু।'

'সে—সব ঘাঁটি আজকাল আর নেই বাসমতীতে তিনটে বেজে যেতে পারে।'

কীসের ঘাঁটি?' জিজ্ঞেস করল টিনি।

'তুমি আমার এখানে থেকে যাও ফাটা, কোথায় যাবে অত রাতে,' সরোজিনীদি বললেন।

'তাহলে ত গগনবাবুরও থাকতে হয়।'

'নাগো,' গননবাবু বললেন, 'আমি আর এই আধঘণ্টা আছি। তারপর একটা রিকশা করে চলে যাব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি কবে এলে বাসমতীতে কোথায় আছ আজকাল ফাটা? বড় কমলবাবুর ত অনেক জায়গাজমি ছিল ওদিকে—জিরানডাঙার দিকে?'

'জিরানডাঙায় নয়, পাশাবতীতে।'

'পাশাবতী ত জিরানডাঙার পাশেই।'

'হ্যাঁ,' ফাটা চুরুটটা ঘুরিয়ে ছাই ফেলে বললে।

'ওখানে একটা একতলা দালান ছিল বড় কমলবাবুর, সেটা ত দোতলা করে রেখেছিলেন? ওখানে থাকতেন না অবিশ্যি তিনি, সমাজবাড়িতেই থাকতেন তিনি আর তোমার মা। তোমরা ছেলেমেয়েরা অনেক সময় পাশাবতীর বাড়িতে থাকতে। ফাটা—'

'আজ্ঞে।'

'বড় কমলবাবুর অতবড় জমিদারির কিছু কি তিনি পাননি—হিন্দু সমাজ ছেড়ে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন বলে?'

'বাবা বেঁচে থাকতে ঠাকুরদার নায়েব গোমস্তাদের মুখে শুনেছিলাম ত রয়েছে বাবার নামে সবই, কিন্তু বাবা যেতেন না গ্রাহ্যও করতেন না, পায়ে ধরে ডাকাডাকি করলেও ঘেঁষতেন না এদিকে। গান গেয়ে মাত করে রেখেছিলেন ত ব্রাহ্মসমাজ পঁচিশ বছর—'

'তোমার বাবার জমিদারির ভাগিদার কারা?'

'ছিলেন ত অনেকেই-অবিশ্যি নিজেদের হিম্মতে, আইনের দিক দিয়ে বিশেষ কোনো সুবিধে করতে পারেন নি। বাবা ছাড়া ঠাকুরদার আরো দুই ছেলে ছিলেন—একজন বাইশ বছর বয়সেই মরে গেছেন, আর একজন প্রায় আমার জন্মাবার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই যে বিলেত চলে গেলেন—তারপর দু-দু'টো যুদ্ধ হল, ফ্যাসিজম কম্যুনিম অন্ধকারবাদ ব্যবহারবাদ সোভিয়েট বিজ্ঞান অস্তিত্ববাদ, কত কী হল, তিনি এখনো ইয়োরোপেই আছেন।'

'আছেন, কী করে জানলে?'

'তিনি ইউরোপের লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে বাবাকে ফি বছরই একবার করে চিঠি লেখেন; এখনো লিখছেন; এবারেও এসে পেলাম তার চিঠি।'

'লিখছেন? বড় কমলবাবুকে?'

'হ্যাঁ, আমি ভাল করে পড়ে দেখি তার চিঠি কাকার মাথা খারাপ হয়নি। অনেক উন্নতি হয়েছে শরীর-মনের। অনেক জ্ঞান সাবড়েছেন তিনি। আমাদের দেশ স্বাধীন হচ্ছে সে-খবর পেয়েছেন বটে, কিন্তু ফিরবেন না তিনি ভারতে আর; হাম্বুর্গে আছেন—শিগগিরই বার্লিনে যাচ্ছে।'

'জার্মানি ত আজকাল বড় হ্যাঙ্গামার জায়গা—'

'মস্কোয় ছিলেন, বিয়ে করেছেন হাঙ্গেরির মেয়ে। এবারে প্যারিসে গিয়ে জন্মের মত গুছিয়ে বসবেন লিখেছেন।'

'কিন্তু এসব চিঠি বড় কমলবাবুকে লেখা? কী হিসেবে? তিনি ত—'

'না, তিনি ত নেই অনেকদিন,' ফাটা বললে, 'বাবা যখন চলে গেলেন তখন বড় কাকা ত বলশেভিক গোলমালের ভেতর তলিয়ে গেছেন। কোথায় তিনি আছেন, বেঁচেই আছেন কিনা কিছু ঠাওর করতে না-পেরে লন্ডনের ক্রমওয়েল হাউসের ঠিকানায় তাকে চিঠি দেয়া হয়েছিল পর-পর চারখানা, কিন্তু কোনে উত্তর পাওয়া যায়নি। অনেক পরে কর্তাদের জবাব এসেছিল যে মহলানবিশের নামে পোলিটিক্যাল ওয়ারেন্ট আছে, কিন্তু সে রাশিয়ায় না সাইবেরিয়ায় বেঁচে আছে না মরে গেছে, কেউই জানে না কিছু। বাবার মৃত্যুর খবর পাননি কাকা। তারপরেই মা মারা গেলেন। গোলমালে কাকাকে আর জানানো হল না কিছু, তাঁর ঠিকানাও পাওয়া গেল না।'

'তাঁর ধারণা বড় কমলবাবু এখনো বেঁচে আছেন?'

'বড় কমলবাবু ত তাঁর ষোল বছরের চিঠির একখানাও উত্তর দেননি,' ফাটা বললে, 'কাকা হয়ত উত্তরের প্রত্যাশী নন। প্রকৃতিস্থ মানুষ—খুব মনেপ্রাণে চিঠি লেখেন, তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন বাবা বেঁচে আছেন।'

'তোমরা তার এ ভুল শুধরে দিলে না কেন?'

'গোড়ার দিকে ভেবেছিলাম, দেব। কিন্তু তার সঠিক ঠিকানা পাওয়া দুষ্কর। অনেক চিঠিতে ঠিকানাও থাকে না। আজ যেখানে আছেন, কাল সেখানে থাকেন না। তবে এবারে প্যারিসে গিয়ে পাকাপাকিভাবে থাকবেন লিখেছেন।'

'বড় কমলবাবু যে নেই—এ কথা আর তাঁকে লিখে কোনো লাভ নেই,' হিতেনবাবু বললেন।

'লিখে দেব দু-এক বছরের ভেতর। প্যারিসে বসুন ত গুছিয়ে। বাবা নেই জানলে কাকা হয়ত আর চিঠিও লিখবেন না কোনো সম্বন্ধ রাখবেন না আর আমাদের কারুর সঙ্গে। কিন্তু কী করা যায়? এক সময় জিনিসটা ভেঙে বলা দরকার কাকাকে। বড় কমলবাবু নিজে যখন বেঁচে নেই তখন তাঁর হয়ে কাজটা করে দেয়া উচিত আমাদের—'ফাটা চটাশ করে কব্জির ওপর একটা মশা মেরে বললে—'তিনি কোনো রকম বিশৃঙ্খলা ভালোবাসতেন না।'

'তোমার কাকা তাহলে জমিদারির ভাগ ছেড়ে দিলেন?'

'হ্যাঁ, তা দিয়েছেন। চিঠিতেও তা লিখেছেন।'

'আর ত কেউ শরিক নেই?'

'না। শাস্ত্রমতে নেই। তবে জমিদারিটা চলছে যখন নানারকম মানুষের হাত আছে এর ভেতর। খোঁজ করে দেখা চলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'তিনি ত হাত ঝেড়ে চলে গিয়েছিলেন অনেক দিন—' ফাটা চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'তারপর কে কী করেছে না-করেছে, কী হয়েছে না-হয়েছে একটু ভেতরে ঢুকে না-দেখলে বুঝতে পারা যাবে না কিছু। দিদি বিয়ে করে চলে গেল বেরিলি, ডাক্তারিতে পশার জমিয়ে বসেছেন জামাইবাবু, সেখান থেকে নড়বেন না আর, ইউ-পি, সি-পির ভেতরেই ওদের চলাফেরা, বাসমতীর কথাও ওদের মনে নেই, কলকাতায়ই আসে না। আর আমার ছোট ভাইয়ের হাতে-খুব ভালই বলতে হবে সরোজিনীদি, বড় কমলবাবুর ধর্মে 'ত' পড়েনি, নিজের দরকার মত ময়ান মিশেয়ে নিয়েছে এই যা। মঠে চলে গেছে।'

'পণ্ডিচেরিতে?' হিতেনবাবু বললেন।

'না। মঠে। মিশনে' ফাটা হাঁটুর ওপর হাত রেখে টাউজার একটু গুটিয়ে নিয়ে বললে।

'আহা, বড় কমলবাবু ব্রাহ্মসমাজ বলতে অজ্ঞান হবেন আর তার ছেলে সমাজ ছেড়ে চলে গেল?' বললেন সরোজিনীদি।

'গান গাইতে পারে না, উপাসনাও করতে পারে না, তবে গড়তে পেটাতে পারে বেশ, কাজে টান আছে, ধর্মের ভাব আছে, শুনছি মিশনে অনেক কাজ করছে হীরেন—এখন নিউইয়র্কে আছে।' ফাটা সরোজিনীদিকে জিনিসটা আস্তে-আস্তে বুঝিয়ে দিয়ে বললে, 'বেশ নিজের ভাবে আছে হীরেন, ভালই করেছে; বাবা ব্যক্তিস্বাধীনতা ভালোবাসতেন। তিনি বেঁচে থাকলে আমাদের আজকের যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে হীরেনকে দেখতে না পেলে খুব সম্ভব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন না। যাক গে, হীরেন গেছে, আমি রয়েছি। বড় কমলবাবুর ছেলে ফাটা মহলানবীশ হিসেবে ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়ে রেখে আমি এ-সমাজে শেষ পর্যন্ত থেকে যাব বলেই মনে করেছি।

খানিকটা ভাল লাগল সরোজিনীদির। বেশি আশ্বস্ত হল টিনি। হিতেনবাবু ভাবছিলেন, শুধু দলে ভারি করে নাম টিকিয়ে রাখবার জিনিস ত ব্রাহ্মসমাজ নয়। ফাটা এ সমাজে থাকলে বাসমতীর ব্রাহ্মদের সাংসারিক কী সুবিধা হবে—গগনবাবু ভাবছিলেন তাই।

তোমার দিদি তোমার বাবার কথা মনে রাখছে ত?

দিদি ত খুব গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিল।

আমাদের সমাজে ত কেউ গোঁড়া হতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ মানুষ সাধারণের ধর্ম কী, মানুষকেই তা জানতে দিচ্ছে শান্ত একনিষ্ঠ যুক্তিযুক্ত উপায়ে, এখানে গোঁড়ামির ত কোনো কথা নেই ফাটা।

আপনি রামমোহনবাবুর মত কথা বলছেন হিতেনবাবু, ফাটা হাতের চুরুটটা পাশেই একটা ছোট কেরোসিন কাঠের ওপর রাখে। জলচৌকির ও লেখা যে-একটা ছোট্ট কাপড়ের ঢাকনি ছিল সেটা নজরে পড়েনি তার। টিনি আস্তে আস্তে এসে কাপড়ের ঢাকনিটা সরিয়ে নিয়ে চুরুটটা কাঠের ওপর রেখে দিল। কেউ দেখল, কেউ দেখল না, অন্ধকারে কী করা হল কেউ বুঝতে পারলেন না—সরোজিনী ছাড়া।

রাজা এই ধর্ম ঘোষণা করলেন, সমাজের ভিত গড়লেন, ফাটা বললে কিন্তু তিনি যদি একাই একমাত্র ব্রাহ্ম থাকতেন, তাহলে আপনি যা বলেছেন সেইটেই মোটামুটি ঠিক কথা হত। কিন্তু অনেক সাধারণ লোক ত ঢুকে পড়েছে এই সমাজে; ফলে যা হয় তা হয়েছে। বড় কমলবাবু নিজেই ঢের গোঁড়ামি দেখে গেছেন, নিজেরও দুর্বলতা ছিল খানিকটা। বিয়ের আগে দিদি খুব ব্রাহ্ম ছিল।

এখন বুঝি বড়কেও নিজের দলে ভজিয়েছে? টিনি বললে।

'না,' দু'টো পা ট্রাউজার বুটে জাঁকিয়ে একটু ছড়িয়ে বসেছিল, খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে ফাটা বললে, বাংলা ভাষাই ভুলে গেছে, তার বাঙালির ব্রাহ্মসমাজ? ওটা যাচ্ছেতাই বড়লোক হয়ে গেছে। ধর্মটর্ম ভাব উড়িয়ে দিয়েছে। দুনিয়ার সব ভোগ সুখের জিনিসের সঙ্গে এতটা মাখামাখি হবে আমি ভাবতেও পারিনি, বাবাকে ব্রাহ্মসঙ্গীত থেকে বেছে-বেছে গান ঠিক করে দিত, সমাজে বা পরিবারে উপাসনার সময় আমিই ত ঘুমিয়ে পড়তাম, ও আমাকে চাঁটি মেরে জাগিয়ে রাখত, 'ফাটা জলচৌকির থেকে চুরুটটা তুলে নিয়ে বললে, 'এই ত সেদিন হয়েছিল সব-এর ভেতরে দেখুন কত-কী হয়ে গেল, কেউ নেই, কিছু নেই, আমারও বাসমতীতে থাকবার কথা নয়, জয়দ্রথের কাটা মাথাটার মত তবুও এসে ছিটকে পড়েছি কী করে যেন আজও আপনাদের সকলের মধ্যে।

জয়দ্রথ কে? টিনি বললে।

মাঝে-মাঝে দেখেছি লেখাটেখার ভেতর জয়দ্রথের কথা, সরোজিনীদি বললেন, গল্পটা ঠিক মনে নেই আমার। না কি পড়িনি? ভুলে যাই সব।

হিতেনবাবু বললেন, 'জয়দ্রথের গল্প মহাভারতে—ছেলেবেলায় পড়েছিলুম কিন্তু তোমার তাৎপর্যটা ঠিক ধরতে পারছি না ফাটা।'

গগনবাবু অন্ধকারের ভেতর দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়েছিলেন, আগুনের রঙে মুখ লাল করে চুরুট জ্বালাতে জ্বালাতে বললেন, 'তাৎপর্য একটা রয়েছে মনে হল, কিন্তু ফাটা কী ভেবে বলেছে সেইটেই ভাবছি।'

সত্যিই কেউ নেই; পনের-কুড়ি বছর আগেও বাসমতী ব্রাহ্ম সমাজের যে-সব কর্ণধার চিন্তা করে গেছেন, কথা বলে গেছেন, কাজ করে গেছেন—সেই দেবব্রতবাবু, অবিনাশবাবু, চক্রবর্তী মশাই, বড় কমলবাবু, আরো কতজন, আজ এতদিন পরে স্মরণে রেখে ধরবার ছোঁবার মত হিসেবে মনে হচ্ছে, কিছুই যেন রেখে যেতে পারেননি তাঁরা পরবর্তীদের জন্যে—সরোজিনী ভাবছিলেন। দোষ তাঁদের নয়—আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন তাঁরা। ধর্ম কি সেইটে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। এও বুঝেছিলেন যে ধর্মের অনুষ্ঠানগুলোকে সর্বতোভাবে সত্য করে তুলতে না-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারলে ঠিকভাবে ধর্মসাধনা হয় না—যা বুঝেছিলেন তাই করেছিলেন তাঁরা, সেই জন্যেই দলে দলে খাঁটি মানুষ পেয়েছিলুম আমরা ব্রাহ্মসমাজে, বাসমতীর ব্রাহ্ম সমাজে কিন্তু কুড়ি বছরের ভেতর কী ভীষণ ওলট পালট হয়ে গেল সব; এই যে বড় কমলবাবু এখুনি কেন সমাজে বসে শান্ত হরে মম চিত্ত নিরাকুল', 'কর তার নাম গান', গাইছিলেন, কথা বলছিলেন, 'তেন তাক্তেন ভুঞ্জীথ'র ব্যাখ্যা করে তাঁর স্ত্রীকে সাধিকার মত পাশে বসিয়ে বরাবরের সকালবেলার সমাজ ভেঙে যাবার পর সমাজের ভেতরই সতরঞ্চির ওপর মুখোমুখি আমাদের সকলের সঙ্গে বসে, হঠাৎ থেমে গেলেন যে তিনি, হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গেলেন যে তারা সব! বাসমতীর সমাজে রেখে গেলেন ইঁদুর আর চামচিকে।

'তোমার দিদির নামও ভুলে যাচ্ছি আমি ফাটা। ও, মনে পড়েছে, সরোজিনী বললেন, তোমার বাবা তাকে মৈতি বলে ডাকতেন। মেয়েকে ডাকতে গিয়ে সমাজের করিডরে, বারান্দায়, সমাজ ভেঙে গেলে পুরুষদের ওপরের গ্যালারিতে কী রকম গানের গলা বেজে উঠত বড় কমলবাবুর মেয়েকে ডাকতে গিয়ে।'

শুনে নিজের মানসকর্ণ হয়ত খানিকটা স্নিগ্ধ হল। বড় কমলবাবুর ধরনে সকলকে শুনিয়ে সরোজিনী বলতে চেষ্টা করলেন, মৈ-তি—ব্রাহ্মধর্মটা নিয়ে এসো ত 'ব্রাহ্মসঙ্গীত'টা কোথায় রেখে দিয়েছে, আমাকে দিয়ে যাও, মৈ—তি—'

'এসব ত সেদিন শুনেছিলাম জিতেনবাবু—' ভেতর থেকে কী সব চাড় দিয়ে উঠেছে বলে সরোজিনী একটু বুকে গলায় চোয়ালে ব্যথা পেয়ে নিঃশ্বাসে আটকে গিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে ওরা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে সব বাসমতী ব্রাহ্মসমাজের ভাদ্র মাসের উৎসবটা সেরে, কাল ভোরেই জেগে উঠবে আবার।'

জাগবেই বটে,' ফাটা বুট দিয়ে নিচের মাটির আস্তে-আস্তে ঘষতে-ঘষতে বললে, দিদি ত পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে কালীবাড়ির জন্যে।'

কালীবাড়ি? কোথায়? অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে হিতেনবাবু বললেন, মিশে গেলেন অন্ধকারের মধ্যে সরোজিনীদি, না, আর-কোনো কথা বলবার নেই তার অসাড় হয়ে পড়েছে যেন সব।

'ইউ-পি, সি-পি, বিহারের যে সব জায়গার জন্যে ও ওর প্রাণের টান আছে সেখানে ও-ই উদ্যোগ করে বাঙালি টোলায় কালীবাড়ি তৈরি করাচ্ছে অথবা যেগুলো আছে সেগুলোকে আরো বাড়িয়ে সাজিয়ে বেশ জমিয়ে তুলেছে কালীবাড়ির মুভমেন্টটা মৈতি,' ফাটা টোকা দিয়ে নেভা চুরুটের ছাই, ছোট-ছোট তামাক পাতার কুচি উড়িয়ে দিতে-দিতে বললে, 'বেরিলিতে ওর নিজের বাড়িতেও ত কালীমন্দির রয়েছে।'

বেরিলিতে ব্রাহ্মসমাজ আছে? অনেকক্ষণ পরে হিতেনবাবু বললেন।

'না।'

'সে সম্বন্ধে কিছু ভাবে টাবে মৈত্রেয়ী?' জিজ্ঞেস করলেন হিতেনবাবু।

এতক্ষণ তাহলে কী বললাম আপনাদের হিতেনবাবু—ফাটা তামাক পাতার আরো কিছু কিছু ছোট ছোট কুচি ও অঙ্গারের অনু-রেণু আস্তে-আস্তে ছিটকে উড়িয়ে ফেলতে-ফেলতে বললে, ওরা ডেরাডুনে বাড়ি কিনেছে, অনেক জায়গা জমি, মস্ত বড় কালীবাড়িও তৈরি করে নিয়েছে নিজেদের বাড়ির ভেতর। এখন থেকে ডেরাডুনে থাকবে ঠিক করেছে।

মৈত্রেয়ী যদি রামপ্রসাদের মত কালীর উপাসনা করতে পারে, ভাল হবে তাতে. গগনবাবু বললেন, কিন্তু তাত নয়, ও ত একটা ঠাট নিয়ে মাতামাতি করছে।

বড় কমলবাবু ওর নাম রেখেছিলেন মৈত্রেয়ী, চব্বিশ বছর আগের কথা, এখনো মনে তাজা হয়ে আছে, যেন আজ ভোরেই কথাটা পাড়লেন, সেই রকম—হিতেনবাবু চশমা খুলে ধুতির খুট দিয়ে মুছতে গিয়ে না-মুছেই চশমাটা এঁটে নিয়ে বললেন, মাঘ মাসের উৎসবটা তখন শেষ হয়ে গেছে বাসমতীর সমাজে শীত কমে গিয়ে হঠাৎ আবার বেশ শীত পড়েছে, খুব ঠাণ্ডা সকালবেলা, আমি সমাজবাড়িতে ঢুকতেই দেখলাম কেউ কোথাও নেই, ওপরে পুরুষদের গ্যালারিতে চওড়া পাটাতনের ওপর আসন পেতে বড় কমলবাবু বসে আছেন, সুয্যির সাগরের ভেতর, হু হু করে যেন রোদ ঝরে পড়ছে ব্রহ্মপুত্রের তোড়ের মত, পুবের জানালা দিয়ে; পুরনো ঋষিদের মত চেহারা, রূপা, খালি গায়ে বসে আছেন কমলবাবু, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মশাইয়ের উপনিষদের সংস্করণগুলো চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে, আমি গ্যালারিতে উঠতেই তিনি বললেন, আমি সমস্ত সকালবেলা বসে একটা কথা ভাবছিলাম, একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু এখন শান্তি পাচ্ছি—ঠিক হয়ে গেছে সব। ছেলেমেয়েদের ভেতর আমার মেয়েটিকেই ভালবাসি সবচেয়ে বেশি, ও-ই ভবিষ্যতে পূর্ণ ব্রাহ্মিকা হতে পারবে। উপনিষদে যে-মহিলা ভূমার কথা পেড়েছিলেন, বুঝেছিলেন নচিকেতার আত্মার সহোদরার মতন যেন-যে পরব্রহ্মের এক কণিকার তুলনায় ও পৃথিবীর সুখ-ঐশ্বর্য কিছুই নয়, তারই নামে নাম রাখবে আমার মেয়েটির।

নামকরণ হয়েছিল সমাজবাড়ির সামনে ঘাসের উঠোনে সতরঞ্চি, হরিণের ছাল, বাঘের ছাল আর চৌখুপি চাদর পেতে-মনে আছে আমার—সরোজিনী বললেন।

'হ্যাঁ, সেদিন বিকেলেই নামকরণ হয়েছিল। দেবব্রত বাবু উপাসনা করেছিলেন। বড় কমলবাবু গাইলেন।

'খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল কিছু?' ফাটা জিজ্ঞেস করল 'আমার মনে নেই কিছু।' তুমি ত আজকাল টাকা বাঁধছ বেশ, গগনবাবু বললেন, তোমার দিদির নামকরণের খাওয়াটা এখনো একবার হোক না ফাটা।

মনে থাকবে কী করে তোমার ফাটা। তোমার ত তখন দেড় বছর, সরোজিনী বললেন।

হ্যাঁ, বিস্কুট চা রসগোল্লা খাওয়ানো হয়েছিল, হিতেনবাবু বললেন, চশমার ফাঁকে চক্ষু ঝিলমিলিয়ে উঠল তার, বাসমতীর ভূবন ময়রার বড়-বড় স্পঞ্জ রসগোল্লা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও, এই সব ফাটা চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, বড় কমলবাবুর তখন কিছু আয় ছিল না বুঝি সরোজিনী দি? জমিদারটা ছেড়ে দিলেন—সমাজ থেকে কিছু টাকা পেতেন সমাজের গাইয়ে হিসেবে? তাই নাকি?

খুব অল্পই পেতেন, সরোজিনী চোখে কপালে একবার আস্তে হাত বুলিয়ে নিয়ে একটু চিন্তাগম্ভীর হয়ে বললেন, বাসমতী ব্রাহ্ম সমাজে তোমার বাবাকে কিছুই দিতে পারেনি। সমাজের প্রাণ ছিলেন তিনি—এই চারজনেই ত বাসমতী ব্রাহ্ম সমাজের আত্মা ছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেরও ভেতরের দিক দিয়ে এদের চেয়ে কেউ বড় ছিলেন না। কমলবাবুকে সমাজের গাইয়ে বলাটা ঠিক হল না তোমার।

গগনবাবু টানছিলেন, মুখের থেকে চুরুটটা নামিয়ে নিয়ে বললেন, ও কিছু মনে করে বলেনি। ওর ভাষাই অনেকটা ঐ রকম।

'ভাষাটা বড় কমলবাবুর ছেলের মত হোক তোমার হিতেনবাবু চশমাটা না-খুলে নাকের ওপরেই সেটাকে আলগোছে একবার গুছিয়ে নিয়ে বললেন শেষ পর্যন্ত তাঁর হয়ে তুমিই ত টিকে রইলে ফাটা।—আর সব ত আর সব। ধানরাজের মার পায়ের শব্দ যেন শোনা গেল পাশের ঘরের অন্ধকারে-সরোজিনীর মনে হল। ঝি-র কাপড়ের থেকে তামাক পান এমন-কি কেরোসিনের প্রীতিকর গন্ধ যেন সত্যিই ভেসে এল-টের পেলেন তিনি। কেরোসিন কি পেল তবে ধানরাজের মা? এক বোতল কেরোসিন সরোজিনীর আজকের এই বাসমতীর সংসারে যেন কুড়ি বছর আগের বড় কমলবাবুর গানের এক-আধটা কালির দ্রব পদার্থের মত স্নিগ্ধ।

কিন্তু ধানরাজের মা আসে নি হয়ত একটা ধাড়ি ইঁদুর খস খস করছে, বড় কমলবাবুর ব্রাহ্মসঙ্গীতের সঙ্গে কেরোসিনের কথা জড়িয়ে ফেলে মনের কাছে পাপ করেছে বোধ হল সরোজিনীর। দু'পায়ে ছেঁকে ধরেছে আবার মশা।

'কত?—কুড়ি পঁচিশ পেতেন ব্রাহ্মসমাজ থেকে বাবা?'

'বাইশ টাকা পেতেন। সরোজিনী বললেন।'

'ও সেই জন্যেই বিস্কুট আর চা খাওয়ালেন বুঝি কমলবাবু' ফাটা এমনিই পুড়িয়ে পুড়িয়ে হাতের চুরুটটাকে ছোট করে ফেলেছে, এক-আধবার টেনেছে শুধু, এবারেও একবার টানতে গিয়ে কী মনে করে আস্তে-আস্তে নামিয়ে রেখে বললে, দিদির নিজের মেয়ের নামকরণে দু-হাজার আড়াই-হাজার লোক ডেকে পোলাও মাংস, চকলেট, কালিয়া খাওয়ানো হল, খুব উৎসব হল কয়েকদিন, নাচটাচ হল, লখনৌয়ের থেকে মেয়েদের নেয়া হয়েছিল, কলকাতার থেকেও কীর্তনের মেয়েরা গিয়েছিল।'

শুনে নড়তে ভুলে গিয়ে বসে রইল সব-অন্ধকারের ভেতর—ফাটার মনে হল দীনহীনের মত যেন। কিন্তু ভেতরের আলোর সঙ্গে বাইরের অন্ধকারের তুলনা করেছিলেন সরোজিনী, হিতেনবাবু তিনিও খানিকটা। ও-আলোটা কোনো তেল টেলের ওপর নির্ভর করে না বলে কোন অন্ধকারই মারতে পারে না ওকে-বোধ করেছিলেন যেন।

গগনবাবু বললেন, 'হীরেনও ত স্বামী হয়েছে, সে এখন নিউ-ইয়র্কে?'

'হ্যাঁ।'

'ভালই করেছে। সে-ও ত কালীভক্ত?'

'সেটা আমি বলতে পারছি না।'

'পরমহংস দেব ত কালীর উপাসক ছিলেন।'

স্বামী বিবেকানন্দও হিতেনবাবু বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে সিদ্ধ হয়েছিলেন। নানারকম জিনিসের সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছিলেন, পেরেছিলেন কি না বুঝতে পারছি না।'

'সমস্ত দেশ বলছে ত পেরেছিলেন।'

'সমস্ত দেশ তা বলছে কিনা জানি না আমি, হিতেনবাবু চশমাটা নাক থেকে খুলে ফেলে বললেন, দেশ সময় সন্ততিরা মিলে অনেক কথাই বলে যদিও, তাহলেও সাধনার নানারকম পথ রয়েছে, আমি ব্রাহ্মসমাজের পথের চেয়ে বেশি স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ আর-কিছুই মনে করি না। এটা আমার ব্যক্তিক দুর্বলতা বা সচলতা যা-খুশি তাই বলতে পারো, বিবেকানন্দ বড় খুবই, কিন্তু রামমোহন মহর্ষির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের সাধকদের তুলনা করা উচিত নয়, ব্রাহ্ম হিসেবে আবার ওতে বাধে বডড, কথাটা আপাতত শেষ করে হিতেনবাবু খালি চোখে দূর দূরান্তের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাইরের মেঘের চাপ কমেছে বলে মনে হয়, আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে, তবে পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গেছে এতক্ষণে। শর্ট সাইট চোখেও অনেক তারা দেখা যচ্ছে আকাশের আনাচকানাচ ভর্তি করে। কিন্তু তারার আলোয় অন্ধকার মরেনি, রাত বেশি হয়েছে বলে অন্ধকারটা জমেছে যেন বেশ, চারদিকে তাল, নারকোল, সুপুরি, আম, নিম, জামরুল, সিসু, জামরুলের ঝুপসি জঙ্গলই-বা কত। কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে বাইরের পৃথিবীটাকে আকাশে, অন্ধকারে সুপুরি সিসু জামরুলে, নক্ষত্রের জ্বলজ্বালানিতে।

'হীরেন মিশনে গিয়েছে, হক্সালি ইশারউডদের সঙ্গে আমেরিকায় ওর খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে শুনেছিলাম, কিন্তু ও-সব সাহেবদের মত ধর্ম নিয়ে অতি-জিজ্ঞাসাও নেই ওর মনে, প্রতিক্রিয়া হিসেবে ওঁরা যা বিলাস করেছেন আজকাল সেটাও নেই।'

'কালীপূজো করে?'

'কে হীরেন? দেখি নি আমি কোনোদিন।'

'ওকে ব্রাহ্মোপসনা করতে দেখেছিলে বড় কমলবাবু বেঁচে থাকতে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দেখেছিলাম। আমার চেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল না ওর।'

'তবে করে কালীপূজো,' হিতেনবাবু বললেন,' করে, বেশ করে, ভালই করে।

ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার পথে প্রত্যেকেই নিজের স্বভাব বুঝে একটা প্রতীক গ্রহণ করে, কালীকে নিয়েছে হীরেন।'

'অনেক পুরুষ ধরে কালীই ছিলেন পার্শ্ববর্তীর জমিদারদের পরিবারের দেবতা,' গগনবাবু বললেন, 'শুধু বড় কমলবাবু মাঝখান থেকে এসে মনপ্রাণ দিয়ে ব্রাহ্ম হলেন, ছেলেমেয়েরা আবার চুম্বকের টানে ফিরে যাচ্ছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ টিকবে বলে মনে হয় না। চারদিকেই ত পূজো আচ্চার ধুমধাম, আগের চেয়ে বেড়েছে বলে মনে হয়। এটা আবেগের দেশ—এখানে ধর্মই টিকবে, কিন্তু ধর্মকে বেশি-বিশুদ্ধ করতে গেলে সেটা টিকবে না। টিকলে কত ভাল হত— কিন্তু হবার নয় বলেই মনে হচ্ছে । এ দেশে কর্মপ্রেরণাও টিকবে, কিন্তু কর্ম টিকবে না। না টিকেই ভাল হবে হয়ত, বেশি ধর্মবেগ নিয়ে আমরাও যেমন পিছিয়ে রইলাম, বেশি কাজ করে ইউরোপও ত এগতে পারল না—আমাদের চেয়ে পিছিয়ে থাকার সামিল ত।' গগনবাবু একটু খুলে হাসতে গিয়ে শরীরের হৃদয়যন্ত্রে হঠাৎ খানিকটা বাঁধা পেয়ে হাসি থামিয়ে ফেলে বললেন, শুদ্ধ ধর্ম ও ষোল আনা সত্য কাজ নিয়ে সিদ্ধ হয়েছে—এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো জাতিকেই ত সে-রকম দেখা গেল না।

'ব্রাহ্মসমাজ একটা চেষ্টা করেছিল' হিতেনবাবু বললেন।

'কিন্তু তা নিরর্থক হবে?' টিনি জিজ্ঞেস করল।

'ধর্মের দিক দিয়ে ত হচ্ছে,' গগনবাবু মোটা-মোটা আঙুলের ভেতর হাতের চুরুটটাকে নাচিয়ে নিয়ে বললেন, 'একটা স্টিকই যেন গগনবাবুর চুরুট'—টিনির মনে হচ্ছিল,' ভারতবর্ষে ত নানারকম লোকের জটিল দ্বন্দো সব,' ধর্ম চায় তারা বটে, নিরীশ্বর নয় তারা বটে, কিন্তু ধরতে ছুঁতে চায় ঈশ্বর যে মানুষেরই পরাকাষ্ঠা এবং প্রেমভক্তির বলে তার সঙ্গে ঘর করা সম্ভব এর বাইরে তার যেতেই চায় না। সাড়ে তিন হাত বিস্তার এবং পাঁচ ইন্দ্রিয় ছাড়া আর কিছু স্বীকারই করতে চায় না। ব্রাহ্মসমাজ একটু অন্য জিনিস চেয়েছিল।'

'অবিশ্যি তাই বলে যুক্তিকে দেবতা বানায় নি ব্রাহ্মসমাজ,' গগনবাবু দেশলাই ধরিয়ে চুরুট জ্বালাতে-জ্বালাতে আগুনটার দিকে চোখ আটকে রেখে বললেন, 'ব্রাহ্মসমাজ কোনো দেবতা বানাতে যায় নি—এমনই একটা শুদ্ধ আবেগে স্থিত হতে চেয়েছিল।

'এ ত গেল ধর্ম যুক্তি আবেগের দিক, 'ফাটা বললে, 'কিন্তু কাজের দিক দিয়ে ব্রাহ্মসমাজ প্রায় প্রথম থেকেই ভেঙে আছে।'

'এ সমাজ ত ধর্মকেই প্রাণের প্রাণ এই বোধ সম্বল করে নেমেছিল কিন্তু সে প্রাণবস্তুর দিক দিয়ে দেশের কাছ থেকে কোনো সায় পেল না—গগনবাবু চুরুটটাকে ভাল করে জ্বালিয়ে নিয়ে তারই হাতের একটা মোটা আঙুল জ্বালিয়ে ফেলেছেন যেন অন্ধকারের ভেতর এ-রকম একটা ধোঁকা তৈরি করে ফেলে বললেন, 'কাজকর্মও থিতিয়ে গেল তাই। ধর্ম ও কাজ ত ছ-খুপরির জিনিস নয়, একই জিনিস, এক প্রাণ। নীল রং খুব বেশি গাঢ় হলে কাল দেখায়—কিন্তু একই মাতৃবর্ণ রয়েছে ওখানে—আলো পড়লে নীল ছায়ার ভেতরে কলোনীল রংটাকে পৃথক করে বের করা যায় না ত ওর ভেতর থেকে। কাজের দিকটা নীলের মতন যেন আর ধর্মের দিকটা কৃষ্ণ বর্ণের—' চুরুটটা জ্বালিয়েছেন বেশ জুত মতন, কিন্তু মুখে দিয়ে ফুরসত পাচ্ছিলেন না গগনবাবু। জ্বলিত চুরুট, চুরুটের মত মোটা ছ্যাঁচা কাল আঙুলগুলো উঠছিল, পড়ছিল, ঘুরছিল নাচছিল, ডিঙ্গি কান্নিক মারছিল তার কথার সঙ্গে তাল রেখে। তিনি বললেন, একটা উপমা ব্যবহার করলাম আমি, এর মানে এ কখনো নয় যে ধর্ম কাল রঙের আর কাজ নীল। মানে হচ্ছে এই যে ধর্ম কর্ম অভিন্ন—একটা একই রঙের মাতৃরঙের ভেতরে যেন।'

'কটা বাজল?' হিতেনবাবু বললেন।

'সাড়ে নটা।'

'ধনরাজের মা এল না ত এখনো'-টিনি বললে।

'বড় কমলবাবুর জমিদারির একটা কিনারা করতে এসেছ বুঝি তুমি ফাটা?'

'জমিদারি প্রথা দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে শিগগিরই'—ফাটা বললো। পকেট থেকে সে একটা পাইপ বের করে নিয়েছে, অন্ধকারে নজরে পড়েনি বড় একটা কারো, টিনি দেখছিল। উঠে গেলেই ভাল বাবা অনেক আগেই সেই কথাটা সরকারকে বলতে চেয়েছিলেন, সেই জন্যে সব ছেড়ে দিয়ে ব্রাহ্মসমাজে চলে এসেছিলেন, হাতের ছোট্ট চুরুটটা জানালার ভেতর দিয়ে আস্তে ছুঁড়ে ফেরে ফাটা বললে, 'কাকা ছেড়ে দিলেন, হীরেণ ছেড়ে দিল, আমি একা জমিদারির স্বত্বটা দিয়ে কী করব তাই ভাবছি, প্রজাদের ভেতর ভাগ করে দেয়া যেত—কিন্তু—

'স্বত্ব—আইনে—আদালতে বুঝে পেয়েছ তুমি?'

'না। যদি পাই?'

'পাওয়া কঠিন,' হিতেন বললে, 'ও-জমিদারির কিছু কি আছে আর—তোমাদের ভোগের জন্যে?'

'নেই বলেই ত ধরে নিয়েছিলাম, কিন্তু ঠাকুরদার আমলের নায়েব মশাই মুস্কিল লাগালেন!'

'কেন?'

'চিঠির পর চিঠি লিখে আমাকে হয়রান করেছেন দু-বছর ধরে। গত পনের দিন ধরে কেবল টেলিগ্রাম চলেছে।'

'কেন, কী হল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তিনি বললেন মামলা করতে হবে ম্যানেজার শীতল দত্তের নামে, আরো দু-চারজন জ্ঞাতি ভাই মহিলা-টহিলার নামে, দলিলপত্র সব নায়েবের কাছেই আছে, মোকদ্দমায় কোনোই বেগ পেতে হবে না, ঠুকে দিলেই হয়ে গেল,—জমিদারি পেয়ে গেলাম, এক লক্ষ টাকার মুনাফা এখনো কেটে ছেঁটে পাওয়া যাবে বছরে প্রাণকিশোর বাবু কেবলই লিখছেন আমাকে, ফাটা হাতের পাইপটা পকেটের ভেতর রেখে দিয়ে জার্মান সিলভারের একটা সিগারেট কেস বের করে বললে,' খবরটা মৈতি, আমার দিদি মৈত্রেয়ীরও কানে গেছে।'

'কী করে গেল?' কেমন যেন বিপদ গণে সরোজিনীদি বললেন, অথচ বড় কমলবাবুর মেয়ে মৈত্রেয়ীকে কত ভালবাসতেন তিনি একসময়ে। মাঘোৎসবে যখন গানে বক্তৃতায় লোকে লোকরণ্য, সমাজ সরগরম থাকত দিনরাত—কত আদর করতেন তিনি মেয়েটিকে, কিন্তু শুকিয়ে বুঝি গেছে সব অপ্রস্তুত হয়ে ভাবছিলেন সরোজিনী।

'আমাকে চিঠি-টেলিগ্রাম করে করে কোনো উত্তরই যখন পাচ্ছিলেন না মরিয়া হয়ে অবশেষে দিদিকে লিখে ফেলেছেন প্রাণকিশোর বাবু।'

'ও,' অবসাদ বোধ করে সরোজিনী বললেন,' শুনে ফেলেছে বুঝি মৈতি। কী বলে?'

'দিদি আট-দশ দিনের ভেতরেই বাসমতীতে চলে আসছে', রক্তের ভেতর বরফ তৈরি হতে লাগল যেন কেমন একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধ শীতে, ঝিমিয়ে আসা টলমলানির ভেতর, যে-কয়টি লোক বসেছিলেন সরোজিনীর ঘরে-তাদের হৃদয়ে মনে।

'কেন, মৈত্রেয়ী আসছে কেন?' গগনবাবু বললেন, 'জমিদারি পেলে ত তুমি পাবে।'

'পেলে আমি ওকে দিয়ে দেব।' ফাটা কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে কেসটা পকেটে ফেলে দিয়ে বললে।

'ও-রকম কাজ করতে যেও না ফাটা,' সরোজিনী একটু চিৎকার দিয়ে উঠে বললেন,' তাহলে তোমার নাম কেটে দেব আমরা বাসমতীর ব্রাহ্মসমাজ থেকে।' আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন সরোজিনী, কিন্তু উত্তেজনার ঘোরে ঢের বেশি বলা হয়েছে অনুভব করে নিজেকে জোর করে থামিয়ে রেখে চুপ করে গেলেন তিনি।

'আমার নাম কি আছে বাসমতীর ব্রাহ্মসমাজের খাতায়?' সিগারেটটা না-জ্বালিয়ে দু-হাতের তেলোয় আড়াআড়িভাবে রেখে দিয়ে ফাটা জিজ্ঞেস করল আস্তে-আস্তে।

'আছে,' ছাতু কাকা বললে, 'তুমি ত মোটা চাঁদা দিচ্ছ সমাজে। তবে গত ছ' মাসের ভেতর কিছু দাওনি, প্রায় ত্রিশ টাকা জমেছে তোমার নামে।'

'তুমি কি আজকাল সেক্রেটারি নাকি বাসমতী সমাজের ছাতুবাবু?'

'গগন সেক্রেটারি,' হিতেনবাবু বললেন, 'ছাতু এ্যাসিস্টেন্ট।' তাহলে তোমাকেই দিচ্ছি, এই পঞ্চাশ টাকা নাও,' ফাটা কোটের ভেতরের গুপ্তি পকেট থেকে পাঁচটা দশটাকার নোট বের করে ছাতু কাকার হাতে দিয়ে বললে, 'চাঁদার খাতায় আমার নামে জমা করে রেখে দিও। ওরে বাব্বা—বাসমতীর ব্রাহ্মসমাজ থেকে আমার নাম কেটো না তোমরা, এই একটা জিনিসই ত আছে আমার; আর-সব দিক দিয়েই ত আমি কাটা আর ফাটা। সিগারেটটা পকেটের ভেতর ফেলে দিল ফাটা, না সিগারেট খাবে না এখন সে, সরোজিনীদিদের সামনে চুরুট খেয়েও ঢের বেকুচি করেছে। এদের সামনে এখন সে সিগারেট চুরুট খাবে না। কোনো ভয় ডর সমীহ, এমন-কি নিয়ম শাসন রুচি সৌজন্য মেনে চলার জন্যে ঠিক নয়, বড় কমলবাবুর কাজ ও স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করবার জন্যেও নয়, ধর্ম বলেও বিশেষ কিছু নেই ফাটার, আনুষ্ঠানিকতা আরো কম, কিন্তু তবুও মনের উঠতি সময়টা খুব গভীর ভাবে জড়িত বলে-মন সে সময়ে শ্রদ্ধা করতেই চাইত, ভালবাসতে চাইত, বিশ্বাস করতে চাইত বলে—কয়েকজন খুব খাঁটি পুরুষ-স্ত্রীলোক এমন-কি মাঝে-মাঝে মাঘোৎসবের গভীর রাতে, সমাজ ভেঙে যাবার অনেক পরেও যখন বড় কমলবাবু একা বসে থাকতেন মন্দিরে অন্ধকারের ভেতর আর পাশে শতরঞ্জির ওপর শুয়ে থাকত সে, তখন মনে হত ঈশ্বরকেও যেন পেয়েছে সে,—এইসব কারণেই এখানকার ব্রাহ্মসমাজ ও সরোজিনীদি, হিতেনবাবু, ছাতুবাবু গগনবাবুর জন্যে আলাদা একটা টান রয়েছে ফাটার। এ আরেক রকম শ্রদ্ধা প্রীতি। অনেক লেখাপড়া শিখেছে সে তারপর, যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসকে কেটে ফেলেছে সে—কিন্তু বাসমতীর সেই বিশ্বাসের পাত্রদের কাটতে পারেনি। ঈশ্বর নেই—কিন্তু বাসমতীর সেই মাঘোৎসবের রাতের ঈশ্বর বেঁচে রয়েছে আজও। ধর্ম বিশেষ কোনো ভাব জাগায় না এখন আর তার মনে, কিন্তু তার বাবা, অবিনাশবাবু, দেববাবু, নিশিকান্ত চক্রবর্তী শীতে অন্ধকারে দরিদ্রতায় যে-ধর্মকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন অবচেতনার ভেতরে চেতনায় রয়েছে সব—মিথ্যা হয়ে নয় সত্য হয়ে নয় কিন্তু তর্কোত্তর এক অপরিমেয় অস্তিত্ব হিসেবে। তর্ক করতেই চাই বটে সে, যুক্তি ছাড়া শ্রদ্ধেয় আর-কিছুই নেই আজ পর্যন্ত বোধ করে সে, কিন্তু এক জায়গায় এসে তর্কেরও কোনো স্থান নেই যেন আর—এমনই সুতর্কিত প্রদেশ সেটা। তার নিজের মনের অতীত কোনো এক আশ্চর্য মন স্বয়ম্ভর বিশুদ্ধ যুক্তির প্রকরণে কেমন অব্যয় সে দেশ—এই বাসমতীর' ব্রাহ্মসমাজ।

'পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিলে এখন?'

'কাল আরো দেব', ফাটা বললে।

'তোমার কাছে আর-ত পাওনা নেই।'

'অনেক পাওনা আছে।'

সরোজিনীদির হুমকি খেয়েই এ-সব কথা বলছে না অবিশ্যি ফাটা। বাসমতীর ব্রাহ্মসমাজ থেকে তার নাম কেটে দিলে কিছুই এসে যাবে না তার। তার মত অতিশিক্ষিত ছেলেদের মূল্যজ্ঞান বদলে গেছে ত ঢের, প্রথমতম মূল্যের জিনিস টাকা, টাকা যে-সুখ ও সম্মান আনে সেই সব। কোনো মূল্যই ধর্মের, ঈশ্বরের বা নীতির যদি না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকার হিসেবে সেগুলোর কোনো সার্থকতা থাকে—ভাবছিলেন হিতেনবাবু। ফাটা ত প্রায় সেই দলেরই ছেলে, একটু গায়ে পড়েই যেন ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে খাতির করে এসেছে কিংবা কে জানে শ্রদ্ধা বিশ্বাস খানিকটা রয়েছে এখনো হয়ত।

'বাসমতীর ব্রাহ্মসমাজটা ভেঙে চুরে গেছে; চারদিকের মাঠ কম্পাউন্ড জঙ্গলে জাংলায় ভরে গেছে সরোজিনীদি।'

'তুমি গিয়েছিলে নাকি দেখতে?'

'হ্যাঁ, আজ সমস্ত দিন ঐখানেই ছিলাম, একজন লোককেও ত দেখলাম না সমাজে।'

'কী করে দেখবে, আজ ত রববার নয়।' ছাতু কাকা বললে, 'আজকাল এরকমই হাল চলে। রববারেও পনের-কুড়ি জনের বেশি লোক আসে না।'

'মালিও নেই? দপ্তরি আছে?'

'আছে একজন—উড়ে মালি, সরকারি অফিসে পেয়াদার কাজ করে, শনি রববার এসে আমাদের কাজ করে দিয়ে যায়।'

ফাটা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের বেড়টা আস্তে-আস্তে ঘষতে-ঘষতে বললে, 'সমাজবাড়িটা মেরামত করে ঠিকঠাক করে ফেলতে ছ' হাজার আড়াই হাজার টাকা লাগবে গগনবাবু?'

'তা লাগবে। কিন্তু টাকার জোগাড় কী করে হবে? টাকা নেই।'

দেখি—কিছু জোগাড় করতে পারা যায় কি না। বাসমতীর পাট ত উঠিয়েই দিয়েছি, এখানে আমার উপায়ের কোনো পথ নেই। কলকাতায় বসে রোজগার দেখছি; ব্যবসা করছি।'

'তুমি বাসমতীতে এসে থাকো ফাটা,' সরোজিনী বললেন,' 'এই জমিদারিটা পেলে তোমার ত কোনো চিন্তা থাকবে না আর।'

'জমিদারিটা মৈতি চাইছে।'

'তার মানে?' হিতেনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তার টাকায় ত দশটা পাশাবতীর জমিদারি কিনতে পারা যায় হে ফাটা। যে-ফিরিস্তি দিলে তুমি তার, তারপর মৈতির কথা শুনতেও আমার ঘেন্না করে।'

'তাহলে হীরেনের কথা শুনুন' ফাটা গানের মত সুরে হেসে উঠে বললে, 'তাকে কেবল করেছিল মৈতি সিকাগোতে, উত্তরে হীরেন আমাকে জানিয়েছে যে সে কিছুই চায় না জমিদারির, মৈতি যদি বেশি চেপে ধরে খানিকটা যেন মৈতিকে দিয়ে দিই আমি। খানিকটা কতটা তাও বুঝলাম না। তাছাড়া আগাগোড়া জিনিসটাই ত একটা কাঁটাল হয়ে ঝুলছে, মৈতির গোঁফ নেই, সে-ই তেল মাখছে সব চেয়ে বেশি।'

'তুমি ওকে কিছু দিও না ফাটা; সরোজিনী কঠিন নির্দেশের মত বললেন।'

'তুমি মৈতিকে কিছু কথাটথা দিয়েছ নাকি ফাটা?' গননবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'না। এখনো কিছু বলিনি। তবে শুনেছি মৈতি খুব টাকায় ঠেকেছে।'

'মিথ্যা কথা,' সরোজিনী খুব গরম হয়ে বলে উঠলেন, 'সোনার টুকরো ছেলে আমার হীরেন; রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের একটা আলাদা শালীনতা আছে হিতেনবাবু।'

'তা আছে।'

'সত্যিই বড্ড টাকার টানাটানি চলেছে নাকি মৈতির। অনেক ধারধোর হয়ে গেছে সরোজিনীদি,' ফাটা বললে।

মৈতির কথা ভাবতে গিয়ে যেন আগুন সমান জ্বলে যাচ্ছিল সরোজিনীর মনের ভেতর।' ফাটার কথায় এমন-কি বড় কমলবাবুর ছায়ায়-ছায়ায় সেই ফ্রক পরা খুকির কথা ভেবে, নিজেও কত রাতে সমাজের চিকের পর্দার পেছনে অথবা ওপরে মেয়েদের গ্যালারিতে মেয়েটাকে কোলের কাছে টেনে নিতেন—বড় কমলবাবুর স্মৃতির প্রতি কর্তব্যের খাতিরে আজ জোর করে সে-সব কথা ভাবতে গিয়ে কোনো জলের প্রক্ষেপ পড়তে চাইল না যেন মনে কেমন একটা ধিকি ধিকি আগুন ডাঙার ভেতরে।

'মৈতি টাকার লোভে মিথ্যা কথা বলছে, 'সরোজিনী বললেন, 'তুমি যদি মৈতির কথায় কান দাও, 'আবার বললেন সরোজিনী, সকলেই সরোজিনীর মুখের দিকে তাকাল, তাহলে-কিন্তু সরোজিনী যে-কথা বলবেন ভেবেছিলেন, সেটা যে বলা চলে না তার মনের মুসাবিদায় শেষ মুহূর্তে সেটা ঠিক করে ফেলে, কিছুই তিনি বলতে গেলেন না আর, ধানরাজের মাও এই মুহূর্তে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে বাঁচিয়ে দিল সরোজিনীকে।

'একটু আলো দিতে পারো ধানরাজের মা?'

'দিচ্ছি।'

'দিচ্ছি? কেরোসিন পেলে না কি গো?'

'হ্যাঁ, আধবোতল পেয়েছি, কনট্রোলে নয়, ডবল দাম নিলে।'

'ওঃ—চুরি করে কেনা।' সরোজিনী অম্বলের ঢেকুরে ব্যথা পেতে-পেতে বললেন, 'ও তেল তুমি ফেলে দাও ধানরাজের মা।'

'বাতি দেব না তাহলে?'

'না।' অম্বল, ঢেকুর, ধানরাজের মা যা কাজ করেছে, ফাটা যা মহাভারত শোনাচ্ছে সব কিছুতেই শেষ বয়সের কেমন একটা অন্তিম সন্নিপাত তাঁকে হতাশ, নিস্তব্ধ করে রাখতে চাইলেও তিনি দু-এক মুহূর্তের ভেতরেই ছাড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠতে পারলেন সব। বললেন, 'তোমাকে কতবার বলেছি সোজাসুজি ন্যায্যভাবে যা পাবে তা ছাড়া কোনো জিনিস হাত দিতে যাবে না ধানরাজের মা।'

'অন্ধকারেই থাকব আমরা,' টিনি সরোজিনীর মনের ভাব সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে নরম ভাষে ভাঙিয়ে বললে,—হয়ত কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে এমন কোনো বিনীত সত্যার্থিনীর মত।

চলে গেল ধানরাজের মা।

'আমাকে যেন কী বলছিলেন যেন আপনি সরোজিনীদি,' ফাটা বললে।

'কিন্তু বললেন না ত।'

সরোজিনীর মনে শান্তি এসেছে এইবারে। সংসারের থেকে আলগা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পেরেছেন যেন তিনি। কিছুক্ষণ আরো বাসনা বেশি জেগেছিল বলে তারই প্রতিশোধন হিসেবে হয়ত, কিন্তু খুব সম্ভব ধর্ম ও সাধনার সঙ্গে অনেক দিন থেকে আত্মীয়তা রয়েছে বলে। মনের পরিসর বেড়েই ত আছে—সমস্ত সুপরিসর স্থান ভরে এই মুহূর্তে তৃপ্তি,' এসেছে যেন।

তিনি বললেন, 'তোমার ঠাকুরদা। জমিদারিটা তোমার বাবাকেই দিয়ে গিয়েছেন—তুমি বললে ত। কিন্তু বড় কমলবাবু সেটা একেবারেই ছেড়ে দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের কাজই করে গেলেন সমস্ত জীবন ভরে। এ জমিদারিটা এখন তুমি পাবে হয়ত। মৈতি চাচ্ছে তোমার কাছ থেকে। মৈতিরা নিজেদের টাকা উড়িয়ে দিয়েছে কিনা, জানি না। দিক বা না-দিক বড় কমলবাবুর জমিদারির ভাগ তাঁর মেয়ে চাইবে তাঁর ছেলের কাছ থেকে—এ বিষয়ে বাসমতীর ব্রাহ্মসমাজের কারুরই কিছু বলবার নেই। তোমরা দু'ভাইবোনে মিলে যা ভাল বোঝ তাই করবে। কিছু বলবার আছে আপনার হিতেনবাবু?'

'না।'

'গগনবাবু?'

'জমিদারি সিস্টেম নাকি গভর্নমেন্ট উঠিয়ে দেবে শুনছি-ওঠাতে-ওঠাতে এখনো দশ পনের বছর, আমরাও সংসার থেকে উঠে যাব সে-সময়। আমার নিজের তিনকাঠা খাস তালুক আছে বাসমতীতে। সেইটুকু জমির ফ্যাকড়া নিয়েই আমার রাত্তিরে ঘুম হয় না, বড় কমলবাবুর জমিদারির কথা আমার মাথায় আঁটে না-বলে গগনবাবুর চুরুটে দু'টো আলতো টান মেরে নিয়ে বললেন দেশ স্বাধীন হলে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সব জমিদারিগুলো স্টেট নিজের হাতে নিয়ে প্রজাদের ভেতর ভাগ করে দিলেই ভাল হয়,' সরোজিনী বললেন, 'বাসমতী ব্রাহ্মসমাজ কমিটির প্রায় সব মেম্বারই ত এসেছেন আমার ঘরে। এ বিষয়ে আজ কিছু বলবার আছে কারো?'

'না।' টিনি বললে।

'কিছু বলবার নেই।' হাতু বললে।

সুকুমার এক কোণে সরোজিনীর ভাইদের পরিত্যক্ত একটা পুরনো স্টিল ফ্রেমের ন্যাওড়ের খাটে গা বিছিয়ে দিয়ে ঝাড়া ছ'ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়েছে। চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে সাড়া দিয়ে বললে, 'আপনার প্রশ্নটা আমি শুনেছি সরোজিনীদি, আমাকেও কিছু বলতে হবে?'

'বলো, তুমি ত মেম্বার।'

সুকুমার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

হিতেনবাবু বললেন, 'তোমার কী বলার আছে—কই—কোথায় হে সুকুমার?'

'নাক ডাকাচ্ছে সুকুমার।' টিনি বললে।

'আমি দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, তোমাকে ফাটা,' গগনবাবু বললেন,

'মৈতি কবে আসছে বাসমতীতে?'

'দশ-পনের দিনের ভেতর।'

'ওর স্বামী ভবকিস্বরবাবুও আসছেন?'

'কলকাতা অব্দি পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবেন।' তারপর—ফাটা বললে, কিন্তু মৈতি বেরিলির থেকে বাসমতী একাই ত আসতে পারে-পায়ে হেঁটে।

আপনি ত চেনেন তাকে গগনবাবু।'

'এসে বাসমতীতেই বসবাস করবে ত এবার?'

'তাহলে গোটা জমিদারি চালাবে কী করে? নায়েব-গোমস্তা দিয়ে? সেই বেরিলির থেকে?

'আমি ত তাকে সমস্ত জমিদারিটা দিচ্ছি না।'

'তবে?'

'জমিদারি আমার নামেই থাকবে; মুনাফার শতকরা পঁচানব্বই ভাগ দিদিকে দেব।'

'ও, হিতেনবাবু একটা ঢেকুর তুলে বললেন, কটা বেজেছে গগনবাবু?

'প্রায় দশটা বাজে, আমি এবারে উঠব।'

'একটু বসুন, গগনবাবু, আপনারা সকলেই ত এখানে আছেন, এ মাসের বক্তৃতা কে কী করবেন একটা খসড়া এখানে বসেই ঠিক করে নিই,' সরোজিনী বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোনো আলোটালো নেই ত-খশড়াটা মুখে-মুখে হতে পারে,' হিতেনবাবু বলছিলেন।

'একটু কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলে ভাল হত, একটা মোমবাতিও নেই টিনি?'

'মোমবাতির ক্যান্ডেলটা ফুরিয়ে গেছে, আপনাকে কেনার কথা বলেছিলাম ত মাসিমা, তা মোম পাওয়া যাচ্ছে না শুনছি, ধানরাজের মার কেরোসিনের কুপা আছে,' টিনি বললে, 'সিদ্ধার্থের ঘরেও অন্ধকার।'

'বাড়ি ফিরেছে সিদ্ধার্থ?' ফাটা জিজ্ঞেস করল, 'এ বাড়িতে ঢোকবার সময় ওকে পেলুম না, ওর ছেলেমেয়ে স্ত্রী কোথায়? কাউকেই ত দেখলুম না।'

'সিদ্ধার্থ ফেরেনি এখনো। ওরা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। রেড়ির তেল আছে। রেড়ির বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে আসব মাসিমা?'

'থাক,' পকেট থেকে পেন্সিল নোটবুক বের করে গগনবাবু বললেন,

'ওসব বাতিফাতি ঠিক করে আনতে দেরি হয়ে যাবে। আমি টুকে রাখছি, অন্ধকারে লেখা অভ্যাস আছে আমার,' পকেট থেকে চশমার খাপ বের করে বললেন গগনবাবু।

'চশমা চোখে অন্ধকারে লেখা?' ফাটা বললে।

চশমা এঁটে নিয়ে গগনবাবু বললেন, 'এ মাসে বক্তৃতা হবে না, ব্রাহ্মসমাজের কোনো বড় আচার্য বা নেতারা বা অন্য কোনো বিশেষ স্মরণীয় কারো মৃত্যু তারিখ নেই এই মাসে, স্মৃতিসভার কোনো দরকার দেখছি না। এমনি ধর্ম, সমাজ, ভারতবর্ষের পুরনো ও নতুন, মর্ম বার্তা, ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণভাবে বক্তৃতা হতে পারে। কিন্তু কে দেবে? আমাদের বাসমতী ব্রাহ্মসমাজের সব বড় বড় বক্তারা ত দশ-পনের বছর আগে চলে গেছেন, হিতেনবাবুর বয়স হল, সরোজিনীদি বুড়োমানুষ, আমি কিছু বলতে-টলতে পারি না, নোটখাতার লেখরাজ সর্দার। ফাটা, কিছু বলবে?'

'সমাজে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা?'

'হ্যাঁ, এই পনের-কুড়ি জন লোকের সামনে। বাসমতীতে যুদ্ধের হিড়িক টিড়িকে কত যে লোক বেড়েছে— এখন ত প্রায় ছ' লাখ, সোয়া ছ' লাখ হয়েছে, কলেজে চুয়াল্লিশ জন প্রফেসর, তিন হাজার ছেলে, কিন্তু সমাজের বক্তৃতা শুনতে কুল্লে পনের জন মানুষ হবে কিনা সন্দেহ। তাও আমরা আমরাই। বাইরের থেকে পাঁচ-সাত জন আসবে হয়ত। অথচ এই সমাজেই অবিনাশ গুপ্ত মশাই যখন বক্তৃতা দিতেন কুড়ি-বাইশ বছর আগে, তখন ছোট কমলবাবু, কিংবা চক্রবর্তী মশাই, কিংবা পরেশ সে তখন বাসমতী ব্রাহ্ম সমাজের দেয়ালের ইট ভেঙে যাবার সামিল হত লোকের ধস্তাধস্তিতে। আমরা ঘরে-বাইরে, গ্যালারিতে, বারান্দায়, বেঞ্চ ঠেলে গাদিয়ে পথ খুঁজে পেতাম না কার ঘাড়ে বসব দাঁড়ান।'

ফাটা চুরুট জ্বালিয়ে নিল, মনটা তার কেমন যেন তেতে উঠেছে, কিন্তু নিঃসহায় সে, এ পৃথিবীতে কোনো কোনো জিনিস আশ্চর্যভাবে হয়ে যায়, কিন্তু দ্বিতীয়বার হবার নয়, কোনো উপায় নেই, কী করবে সে।

'বক্তৃতা আমি দিতে পারি না গগনবাবু।'

'তা জানি।' কেমন নিরেটভাবে যেন বললেন গগনবাবু।

'সিদ্ধার্থকে বলুন।'

'ও দিতে পারে, কিন্তু দেবে না।'

'কেন?'

'কয়েক বছর আগে কয়েকটা বক্তৃতা দিয়েছিল। বেশ বলতে পারে। বললে হবে না-আধুনিক সমাজের নাড়ী টিপে ঘা দিয়ে যেতে পারে—ঘায়ের পরে ঘা। আশ্চর্য।' গগনবাবু চুরুটের ছাই নোটবুকের পেন্সিল দিয়ে ঠুকরে ফেরে বললেন, 'কিন্তু তারপর থেকেই চুপ মেরে গেছে সিদ্ধার্থ, কেউ কিছুতেই ওকে দিয়ে একটা কথাও বলাতে পারছে না সমাজে, ও বলে ওসবে কিছু হবে না।'

'সিদ্ধার্থ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে,' সরোজিনী পেটের ভেতর বুকের ভেতর অম্বলের ও তারও অতীত একটা কষ্টের বাষ্প চেপে রাখতে চেষ্টা করে বললেন।

'কীসের বিশ্বাসের কথা বলছেন সরোজিনীদি?'

'ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি ও তা বোঝে না।'

'কী বোঝে সিদ্ধার্থ?'

'ঈশ্বরকে আমরা যেভাবে উপাসনা করি—সে পদ্ধতির থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে সিদ্ধার্থ; টের পেয়েছি আমি। ও অনেক কথা ভাবে, আমরা সে-সবের কিনারা করতে পারি না। পদ্ধতি সম্পর্কেই শুধু নয়-স্বরূপ সম্বন্ধেও আমি বুঝতে পারছি সিদ্ধার্থের ধারণা একেবারে অন্যরকম। ও হয়ত মনে ভাবে যে আমরা স্বরূপের কাছে যে হিসেবে নিবেদন জানাই তার কোনো অর্থ হয় না। আমাদের অনুষ্ঠান পদ্ধতির অর্থ-ত ভাবছে—আমাদের মনে রয়েছে শুধু, হিতেনবাবুর মনে, গগনবাবুর মনে, আমার মনে—কিন্তু সৃষ্টির ভেতরে নেই।'

'স্বরূপে বিশ্বাস করে না সিদ্ধার্থ?'

'যা বললাম ফাটা তার থেকে বুঝে নিতে হবে তোমায়।'

'আমার মনে হয় সিদ্ধার্থ অন্যভাবে বিশ্বাস করে।'

'সিদ্ধার্থের দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না, 'গগনবাবু তাড়া দিয়ে বললেন, 'ওকে দিয়ে সমাজের কাজ হবে ঢের, কিন্তু ও কিছু করবে না। তাহলে সমাজে কিছু বলবে-টলবে না ফাটা? কলেজ-টলেজ, বার লাইব্রেরি বা বাইরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ-ছ জায়গায় কেউ-কেউ আছেন, জ্ঞানী মানুষ, সাধনা টাধনাও করেছেন, কিন্তু তাদের ডেকে এনে সমাজে বক্তৃতার ব্যবস্থা করে ব্রাহ্মসমাজের দিক থেকে বিশেষ কোনো লাভ নেই। অনেকবার ডাকা হয়েছে তাদের, অনেক বক্তৃতা হয়ে গেছে। তাতে শ্রোতার সংখ্যা কিছু বাড়ে বটে, সমাজের বাতিও জ্বলতে থাকে, কিন্তু রামমোহন, মহর্ষি, শাস্ত্রীমশাই ধর্ম ও সমাজে হিসেবে দেশকে যা দান করতে চেয়েছিলেন সে কাজ একটুও এগয় না। আমাকে তোমরা গোঁড়া মনে করো না ফাটা, ছাতু আর চিনি, আর সুকুমার, ঘুমুচ্ছে নাকি এখনো?'—

'নাক ডাকাচ্ছে,' টিনি বললে।

'কিন্তু,' গগনবাবু চুরুটে টান মেরে নিয়ে বললেন, 'ও-সব বক্তারা শেষ পর্যন্ত পন্তিচারি, রামকৃষ্ণ মিশন, পলিটিক্স, জমিদারি উচ্ছেদ, খাদ্য সমস্যা, কম্যুনিজম, কংগ্রেস, দেশের গরু-মহিষ, হিন্দু মহাসভা, বিড়লাটাটাবাদের উপকারিতা—এই সবের ভেতর থেকে এক—একটা খুঁটি বেছে নিয়ে কোথায় থেকে কোথায় যে চলে যান—' মুখের কাছে চুরুট তুলে নিয়ে গগনবাবু বললেন, 'ওদের কারো বলবার ক্ষমতা আছে, কেউ-কেউ গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, কিন্তু ও-সব বক্তৃতা বাইরের জনসভায় চলে। ধর্মসমাজে ও-সব জিনিসকে পটভূমি হিসেবে রেখে মুখ্যত ধর্মের কথাই বলতে হয়। আমাদের সমাজে আমরা ব্রাহ্মধর্মের কথা শুনতে চাই, এর আগেকার ইতিহাস এখনকার অবস্থা, এ দুরবস্থার কারণ কী, কোন দিক দিয়ে জ্ঞানের আলো ও উদ্যম নিয়োগ করতে হবে, দেশ ধর্মের থেকে সরে যাচ্ছে কেন, স্বাদেশী আন্দোলনে স্বাধীনতা এল না কেন, ঈশ্বরকে উপাসনা করতে গিয়ে দেশ হাজার রকম ছেলেমানুষি সংস্কার থেকে মুক্ত হল না কেন, কী করে আগামীকালে সার্থকতা লাভ করতে পারা যায়, এইসব নিয়ে বক্তৃতা দেয়া দরকার।'

'একজন সেন্ট পলের দরকার,' ফাটা বললে, চুরুটটা অনেকক্ষণ হল জ্বালিয়ে রেখেছে সে, কিন্তু টানেনি। একবার টানার চেষ্টা করে বললে, কবে সমাজের ভেতর সেন্ট পল বা গৌতম বুদ্ধ বেরিয়ে যায় কে জানে; তবে শিগগির কিছু হবার সম্ভাবনা কম। তারপর ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন-মানুষের হাতে সবই যখন প্রায় হয়ে এল, অন্ধকারের স্রোতে-স্রোতে নিমজ্জিত করে যায় সব, এত বেশি যে আজকাল ধর্মের প্রয়োজন বোধ করে না কেউ। কেন সমাজে আসবে? এটা ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জায়গা। এখানে টাকা, স্ত্রীলোক বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এলাহি খোরাক কোথায়—তা ছাড়া সভ্যতার মানেই বা কী? সভ্যতা মানেই সুখীদের ইকনমিকস্ অসুখীদের পলটিক্স, তিনটে বিস্তার নিয়ে কাজ; ধর্ম চতুর্থ বিস্তারের জিনিস, সভ্যতার এলাকায় পড়ে না। সুখীদের ভেতর অনেক তাজা-তাজা কইয়ে-বলিয়ে আছে—গত চার-পাঁচ শ বছর ধরে তারা ত হু হু করে মহাপুরুষ হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ ইন্দ্রিয় ছাড়া-মাইক্রোফোনের জন্যেও তাদের লোভ আজকাল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখছি। এ পথ ধরে কি তারা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দিকে পৌছতে পারবে—ধর্মের দিকে? আশা করেছিলুম পারবে হয়ত। কিন্তু এখন দেখছি সব গাবিয়ে যাচ্ছে, মাইকের বক্তা মহাপুরুষদের কেবলই দাবিকর্দম ত নজরে পড়ছে।'

ফাটা গলায় টাইয়ের ওপর হাত দিয়ে সেটা খসিয়ে নেবার দরকার বোধ করে একটু দম নিয়ে বললে, 'একটা বেলপাতা ছিঁড়ে নিয়ে তার ওপর লিখে দাও একটা কথা, বাটখারার একদিকে পাতাটা ফেলে রাখ-আর এক দিকে ধর্ম আর ঈশ্বরকে চাপাও—দেখবে বেলপাতাই অনেক বেশি ভারী।'

'কী কথা লেখা আছে সেই বেল পাতায়?'

'দু-চারটে মনের কথা শুধু আজকের সভ্যতার।'

'ও—আমার মনে হয় রূপচাঁদ পক্ষী এরকম একটা গান বেঁধেছিলেন?'

ফাটা বললে, 'না, তিনি হরি আর হরির নামের কথা বলেছিলেন; তিনি বলেছিলেন হরির চেয়েও তুলসী পাতায় হরির নামের ওজন বেশি ভারী হবে বাটখারার। তখনকার দিনে স্বরূপের চেয়ে নামের প্রতাপ বেশি ছিল, আজকাল আরো অনেক জিনিসের মড়কের মাছি এসে পড়েছে।'

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গগনবাবু বললেন, দশটা বাজে। আমাদের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিই এইবার; সুকুমার কি জেগেছে?'

'না।'

'এত ঘুমুচ্ছে অসময়ে?'

'কয়েক রাত খুব জেগেছে; জিরানডাঙায় কলেরা লেগেছিল-সেখানে ডিউটি দিয়েছিল সিদ্ধার্থের সঙ্গে।'

'কলেরা লেগেছে নাকি বাসমতীতে? ফাটা জিজ্ঞেস করল।

'ওসব আধিব্যাধি সব সময়ই আছে কোনো-না-কোনো জায়গায়—শহরটা ত বেড়েছে-কেঁপেছে খুব। কিন্তু কলেরা বসন্তের মড়ক বাসমতীতে দু-তিন বছরের ভেতর লাগেনি। জিরানডাঙায় কলেরা লাগছিল—তবে উঠতি মুখেই সেটাকে নিকেশ করেছে সিদ্ধার্থরা।'

'সুকুমার কী করে আজকাল?'

'এই কলেজে লেকচারার।'

'কত পাচ্ছে?'

'শ দেড়েক।'

'সিদ্ধার্থ কী রকম পাচ্ছে?'

'দুশ আন্দাজ।'

'এত কম মাইনে?' ফাটা একটু তাজ্জব মেনে বলরে, 'কলেজটা ত খুব বড়।'

'প্রাইভেট কলেজের মাস্টারদের মাইনে ও-বকমই' ছাতু কাকা বললে, তা ছাড়া অমিয় সেন অরুণ সেন দু'টো চোট্টা ত আছে কলেজ কমিটিতে, ওদের ত কলেজ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গগনবাবু বললেন, 'দশটা বাজল।'

'প্রিন্সিপ্যালটাও চোট্টা।'

'থামবি ছাতু?' সরোজিনী বললেন, 'সুকুমার আজকাল আমাদের সমাজে গান করছে ফাটা, বেশ গায়। আমি বেদীতে উপাসনা করতে বসে একটুও অসুবিধা বোধ করি না। ঠিক যে-রকম উদ্বোধন আরাধনা উপাসনা করতুম—সবদিনই তা আর এরকম করি না, কত পার্থক্য থাকে একদিনের সঙ্গে আর-একদিনের-তা আমার ভাব, প্রস্তাবনা যে-রকমই হোক না কেন, সেই অনুযায়ী গান গাইতে সুকুমার সত্যিই সিদ্ধিলাভ করেছে। বেদীর আচার্যের মনমেজাজ সম্পর্কে এরকম অদ্ভুত চেতনা আমি সত্যসখা ঘোষালকেও অনুভব করতে দেখিনি।'

'সুকুমার অনেক গান জানে তাহলে?'

'ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সব গানই,' সরোজিনী বললেন, 'গান গাইবার সময় ব্রহ্মসঙ্গীত একখানা ওর কাছে রেখে দেয়া হয় বটে, কিন্তু আর-দশজনের মত পনের মিনিট বসে বইটা হাঁটকে জুৎমতন গান খুঁজে বার করবার জন্যে মাথা ঘামাতে হয় না ও—আরাধনা শেষ করেছি কি সুকুমারও হারমোনিয়াম বেলো করে গান শুরু করে দিল। গান ত ওর অন্তরের ভেতর আছে শ্রুতিস্মৃতির মতন—বাইরে সেই বাগীশ্বরীর প্রকাশ।'

'ও,' ফাটা চুরুটের ছাইয়ের দিকটা একবার দেখে নিয়ে অন্য দিকটা দিয়ে হাঁটুর ওপর আস্তে আস্তে ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'সুকুমারের বেশ খুলেছে তাহলে। ওকে আমি খাকির হাফপ্যান্ট পরে খালি গায়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি; ওর গান শুনিনি ত কোনোদিন। গান গাইতে পারে তা ত জানতাম না।'

'ইদানিং গাইছে—আগে লুকিয়ে সাধনা করেছিল খুব সম্ভব,' ছাতু বললে।

'সুকুমার ব্রাহ্ম হয়েছে'

'না। এখনো হয়নি।'

'হবে!'

'তা বলতে পারি না,' সরোজিনী বললেন, মনে প্রাণে বাছা আমার ব্রাহ্ম, দীক্ষিত হয়ে যে হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।'

'তাহলে আর সমাজ দাঁড়িয়ে আছে কিসের জন্যে?' ছাতু কাকা বললে, 'সুকুমার অবিশ্যি খুব ভাল। কিন্তু তাই বলে সাক্ষীগোপাল এবং দীক্ষিত ব্রাহ্মে সত্যিই একটা ভেদ রয়েছে কোথাও, সুকুমার সম্বন্ধে আপনার মনের আমেজ ঘুচিয়ে না-ফেললে সেটা আপনি বুঝবেন না, যেমন শাস্ত্রীমশাই বুঝতেন, হেরম্ববাবু বুঝতে বড় কমলবাবু বুঝতেন।'

'আচ্ছা সে মীমাংসা পরে; গগনবাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ মাসে তাহলে সরোজিনীদি, বক্তৃতা হবে না সমাজে। তুমি সত্যিই কিছু বলতে পারবে না ফাটা?'

'আমি বলব' ফাটা টাইয়ের ওপর হাত রেখে সেটাকে আস্তে-আস্তে খুলে ফেলতে-ফেলতে বললে, 'কিন্তু এখুনি না আজকাল আমাকে বড্ড ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, এবারে আট-দশদিন আছি বাসমতীতে, মাস তিনেক পরে কলকাতা থেকে ফিরে আসব আবার, আপনাকে কথা দিচ্ছি গগনবাবু-সেবারে আমি দু-তিনটে বক্তৃতা দেব বাসমতী সমাজে; আমি মন স্থির করে ফেলেছি।'

'আচ্ছা বেশ, গগনবাবু খুশি হয়ে বলবেন, 'খুব ভাল হল, তাহলে কোনো বক্তৃতার পাট রাখলুম না আর এ-মাসে হিতেনবাবু। আচ্ছা এ-মাসে সমাজে গান গাইবে, সুকুমার, চারটে রববার, একা পেরে উঠবে?'

'ঘুমুচ্ছে সুকুমার?' হিতেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'কলেরা ডিউটি দিয়ে-দিয়ে ওর ভেতরে আর নেই কিছু,' সরোজিনী বললেন,

'জাগিয়ে দরকার নেই হিতেনবাবু।'

'না, জাগাচ্ছি না।'

'সুকুমার গাইবে, তবে রজনী নান এসে মাঝে মাঝে দু-চারটে গান দিয়ে যায়। দিন ঠিক করে দিন গগনবাবু রজনীবাবুকে বলবি গিয়ে তুই ছাতু, কোন-কোন তারিখে সমাজে এসে তাকে গান করতে হবে। একটু সাহায্য না পেলে বড্ড হয়রানি হবে সুকুমারের। ব্রাহ্মসমাজের দিকে টান আছে রজনীবাবুর', সরোজিনী বললেন, 'লাডলি বিশ্বাসের কীর্তনের দলটাকেও আসতে বলিস ছাতু, ওরা বললেই আসে নিজেদের খোল করতাল নিয়ে, তবুও ভাল করে বলে আসিস ছাতু।'

হিতেনবাবুর মুখ ব্যথায় বিমর্ষতার কৃতজ্ঞতায় ভেঙে পড়ছিল কী যেন একটা কথা ভাবার নিরেট জাঁতাকলের চাপে পড়ে বললেন, 'সুকুমার, রজনী নান, লাডলি বিশ্বাসের কীর্তনের দল ওরা কেউই ব্রাহ্ম নয়, অথচ কী রকম দীনতায় বশ্যতায় সমাজের কাজ চালিয়ে দিচ্ছে ওরা, সমাজের জন্যে ওরা ভাবে বলে নয়, আমরা নিরাশ্রয় হয়ে ওদের ডাকছি বলে, খুব ভাল, খুব ভাল, ওরা আমাদের বুকের কাছের জিনিস, কিন্তু কোথায় সেই সমাজপ্রাণ ভাবুক ব্রাহ্ম গাইয়ের দল, একজনও কি নেই আজ?'

হিতেনবাবুর কথা শুনে অন্ধকার ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ পরে ভাবের ঘনতা একটা কেটে গেলে ফাটা বললে, 'সত্যসখাবাবু আজকাল গাইছেন না বাসমতী সমাজে?'

'তিনি, ত নেই বাসমতীতে।'

'কোথায় গেলেন?'

'তিনি কলকাতার সমাজে চলে গেছেন, অনেক দিন ত!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোনোই খবর রাখি না দেখছি আমি', ফাটা বললে, 'সত্যসখাবাবু কলকাতায় গেলেন কেন?'

'কলকাতায় বেড়াতে গেলেন একবার, ঘুরে এসে বললেন কলকাতার সমাজেই সুবিধা হবে তার। তখন সুকুমারকেও পাইনি আমরা, রজনীবাবুও এদিকে ঘেঁষতেন না, লাডলির দলের গায়েন মহী বিশ্বাসও ছিল না, কী যেন, কী বিষম বিপদে পড়েছিলাম, সত্যসখাবাবুকে সকলে মিলে আমরা বললাম বাসমতী সমাজ, এই সমাজের পরলোকগত আচার্যেরা, আমরা আজকের এ রকম নিরাশ্রয়তার সময় কেউই তাকে যেতে দিতে পারি না। কিন্তু কারো কথাই শুনলেন না তিনি-চলে গেলেন।'

'কলকাতার সমাজে গাইছেন?'

'গাইছেন কোথাও নিশ্চয়ই, যেখানে বাসমতীর চেয়ে নানা দিক দিয়ে বেশি সুবিধা হয়েছে সেইখানেই আছেন।'

'সত্যসখাবাবু ত চাকরিবাকরি করতেন না, বেশ পয়সাঅলা বাপের মানুষ ছিলেন; ওর অসুবিধা কি হল বাসমতীতেই?'

'এ সমাজটা বেঙে গেছে সেই অসুবিধা,' হিতেনব্যবু এতক্ষণ পরে এ কথায় একটু যোগ দিয়ে বললেন,' স্ত্রী-পুরুষের আগের মত সেরকম ভিড় নেই, সমাজে বেশি কেউ আসে না, মেয়েদের চেয়ে দাড়িপাকা বুড়োদের হুদ্দো বেশি, ও কি বেঞ্চির দিকে তাকিয়ে গান গাইবে?'

একটা বেশ ধপধপে ঝরঝরে হ্যারিকেন হাতে করে সিদ্ধার্থের স্ত্রী সুনীতি ঢুকল ঘরের ভেতর—সঙ্গে বিশাখা আর বনচ্ছবি।

'আলো হল এতক্ষণে,' সরোজিনী বললেন, 'বসো তোমরা সব।'

'আমরা বসব না,' বনচ্ছবি বললে, 'সিদ্ধার্থদার খোঁজে এসেছিলাম, কিন্তু এখনো ফেরেননি তিনি।'

'কোথায় গিয়েছে সিদ্ধার্থ, সুনীতি?'

'বলে যাননি ত, আমার মনে হয় জিরানডাঙার দিকে গিয়েছেন।'

'সেখানে কী?'

'কলেরা আছে বলছিলেন ত।'

সরোজিনী বললেন, 'বারে, তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে সব, সুকুমার কি ঘুমুচ্ছে টিনি? খুব ঘুমুচ্ছে? আচ্ছা তাহলে ঐ ঘুমের মড়ার বিছানার কিনার দিয়ে বসো ত ভাই তোমরা তিনজনে।'

ফাটা বললে, 'আমিই বসি গিয়ে সুকুমারের বিছানায়, আপনি এখানে বসুন বৌদি। চিনতে পারছেন?'

সুনীতি ঘরের মাঝখানে গেলে টেবিলটার ওপর হ্যারিকেনটা বসিয়ে রেখে বললে, 'অনেক দিন পরে ত বাসমতীতে এলে নীরেন, এখন থেকে এইখানেই থাকবে ত।'

'তা থাকব বইকি,' ফাটা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমার বাবার মস্ত বড় হোটেল আছে এইখানে। আমি নীরেন নই, ফাটা মহলানবীশ, সিদ্ধার্থ জিরানডাঙায় গেছে? এত রাতে? ভেবেছিলুম রাতচরা রোগ আমারই আছে শুধু, বাসমতীর গেরস্তদের ত এখন খেয়েদেয়ে রাত দুপুর হয়ে যাবার কথা, তা কলেরা ওয়ার্ডের তদারক করছে বুঝি সিদ্ধার্থ? বেশ কথা, এই চেয়ারটায় এসে বসো তুমি বৌদি।'

'না, না, তুমিই বসো, আমরা সকুমারের বিছানায় বসছি।' সুনীতি বললে।

'আমাকে চিনতে পেরেছ নীরেনদা?'

'ফাটা, ফাটা, নীরেন নয়, ও, তুমি ত বেশ বড় হয়ে গেছ বনচ্ছবি; ছ বছর আগে একবার এসেছিলাম বাসমতীতে; কিন্তু তখন কারো সঙ্গেই দেখা করতে পারিনি। তারো আগে একবার এসেছিলাম আট বছর আগে, তখন তুমি স্কুলে পড়ছ, ধাতুরূপ মুখস্থ করছিলে কিন্তু ফ্রক পরে, আত্মনেপদী ধাতু গড় গড় করে মুখস্থ বলে যাচ্ছে একটা পুতুল যেন। সমুদ্রের নিচে এক রকম ক্রাস্টেশিয়ান থাকে, বৌদি, তুমি সুকুমারের বিছানায় বসলে গিয়ে শেষে, আরে এসো এ দিকে, তোমার জন্য গতি ছেড়ে দিয়েছি, বাংলায় মসনদ খালি থাকে না কখনো, বসো এসে।'

'কয়েকটা জটিল একসট্রা করিয়ে নিয়েছিলাম তোমাকে দিয়ে মনে পড়ে? বনচ্ছবি বললে।

'হ্যাঁ, সবই মনে আছে, চুলের একটা কাঁটা অবদি হারায় না, জেকার্ড ম্যানলি হপকিনস বলেছিলেন,' ফাটা ঘরের ভেতরকার মহৎত্রয়ীর দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললে।

'বড় শোভনাদির জ্যামিতির ক্লাস ছিল সেদিন, বনচ্ছবি বললে।

'বড্ড কড়া মাস্টার ভারী ভয় পেয়েছিলুম, খুব বাঁচিয়ে ছিলে আমাকে সেদিন। একে মনে পড়ছে তোমার?' বিশাখাকে দেখিয়ে দিয়ে বনচ্ছবি বললে।

'ভিড়ের ভেতর একে ধরতে পারতুম না আমি', ফাটা বললে, 'এখন চিনতে পারছি।'

'ভিড়ের ভেতর আমিও তোমাকে চিনতে পারতুম না,' বিশাখা বললে, 'তা ছাড়া এ-রকম স্যুট,' একটু থমকে থেমে গিয়ে বিশাখা বললে, 'আমায় চেননি তুমি, আমায় চেনা তোমার অসাধ্য।'

'একে তুমি বার-চৌদ্দ বছর আগে দেখেছ নীরেনদা।' বনচ্ছবি বললে।

'চিনেছি, বিশাখা ত।'

'বাপরে, খুন করতে পারে লোকটা, বনচ্ছবি।'

'কোনো মুরোদ নেই,' বনচ্ছবি বললে, 'সরোজিনীদিই ত ঘরে ঢোকা মাত্র সমাজের নাম ভাঙিয়ে দিলেন।'

'বাসমতী কলেজে তুমি পড়ছ বিশাখা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখন একথা বল তুমি?' বনচ্ছবি বললে, 'এ-কলেজে পড়াবার সময়ে হয়ে এল বিশাখার—'

'বনচ্ছবি, বি-এ পাস করেছ ত; বছর দুই আগে গেজেটে দেখছিলুম তোমার নাম—

'গেজেটটা এনেছিলুম আমি একটা বিশেষ দরকারে,' ফাটা হ্যারিকেনের সলতের ঠাণ্ডা ঘরানা আগুনটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'কিন্তু কোনো কাজের কথাই পেলুম না, বি-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে, বোকার মতন চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ বনচ্ছবি নামটায় এসে থেমে রইলাম, খুব সম্ভব দু'টো ইংরেজি 'সি' এইচ' পর পর সাজিয়ে রেখেছে বলে, কিন্তু নামটাও অসাধারণ।'

'অসাধারণ মেয়ে ত!' সুনীতি বললে।

'যিনি তোমার নাম রেখেছেন তাকে শ্রদ্ধা করি আমি।'

'বড় কমলবাবু রেখেছিলেন,' সরোজিনী বললেন।

'সেটা জেনেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছ বুঝি ফাটা,' গগনবাবু বললেন, 'তবে আরো জেনে নাও; তোমার নাম ফাটা রেখে ওর নাম বনচ্ছবি, কমলবাবু খুব দরের মানুষ ছিলেন বলেই এইসব অনেক রকম করতে পেরেছেন। তুমিও ডাটের মানুষ হয়েছ মন্দ না। সুনীতি—'

'আজ্ঞে—'

'তুমি এই চেয়ারটায় এসে বসো, ফাটা এখন ঘরের ভেতর পাইচারি করে সকলের সঙ্গে কথা বলবে।'

'সুকুমার কি জেগেছে?' সরোজিনী জিজ্ঞেস করলেন।

'না, লোকজন দেখে আরো বেশি ঘুমুচ্ছে।' টিনি বললে।

'সুনীতি, কই এগিয়ে এসে বসল কোথায়?' সরোজিনী বললেন, 'তুমিত আমাদের সমাজ কমিটির মেম্বার আছ?'

'হ্যাঁ, আছে,' গগনবাবু বললেন, 'ফাটার চেয়ারে এসে বসতে বলছেন সকলে তোমাকে সুনীতি।'

সুনীতিকে বসতে দেখে সরোজিনী বললেন, 'কেরোসিন পেলে কোথায় এমন সাদা ফটফটে হ্যারিকেন?'

'বাতিটা আমার নয়।'

'তবে কার?'

'বনচ্ছবি হাতে করে এনে দিল; এটা কি তোমার বাতি বনচ্ছবি?' সুনীতি বললে।

'ওটা বিশাখার।'

'এখন বিশাখাকে জিজ্ঞেস করুন সরোজিনীদি ও কেরোসিন কোথায় পেল, ছাতু বললে।

'ছাতু,' গগনবাবু বললেন, 'তুমি বসবার নাম করে বেশ একটা আলিশান কাঠের পাটাতন জুড়ে বসেছ; এটা টুলও নয়, বেঞ্চিও নয়, তবে বসে আরাম হচ্ছে বেশ, অনায়াসে দু-তিনজন ওখানে বসতে পারে। তুমি উঠে গিয়ে সুকুমারের বিছানায় বসো-ফটার পাশে; এখানে বনচ্ছবি আর বিশাখা বসবে।'

উঠে তার নতুন জায়গায় চলে গেল ছাতু।

বনচ্ছবি বললে, 'আমরা কি আর এখন বসব গগনককা?'

'কেন না? তোমরা ত সেই মীরমহলের দিকে যাবে। কে পৌঁছে দেবে তোমাদের? কার সঙ্গে এসেছ? রাত ত এখন সাড়ে দশটা,' রেডিয়াম ডায়ালের দিকে তাকিয়ে গগনবাবু বললেন, 'দশটা পঁয়ত্রিশ বনচ্ছবি।'

'আপনি ত দানাপুরের দিকে যাবেন?' বনচ্ছবি বললে, 'মীরমহল ত দানাপুরের কাছেই।'

'নিয়ে যাব তোমাদের,' গগনবাবু বললেন, 'কিন্তু কার সঙ্গে এলে এতটা রাত করে সাহেবডাঙায়?'

ফাটা ট্রাউজারের পকেটে হাত রেখে ঘরের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'বাসমতীর পাড়াগুলোর নাম ত বেশ ডাটের মাথায় তৈরি করেছিলেন আমাদের বাপদাদারা-দানাপুর, মীরমহল, জিরানডাঙা, পাশাবতী-বা, একেবারে গ্রীক নক্ষত্রদের নাম-তাই মনে হয় না তোমার বনচ্ছবি।'

'আমের নামের মতই-শোনায় ভাল, কিন্তু কাজে কিচ্ছু না,' বনচ্ছবি চলন্ত ফাটার দিকে তাকিয়ে বললে, চলতে-চলতে পিঠ ও ঘাড়রে দিকটা ফাটার বনচ্ছবির দিকে ঘুরে গিয়েছে। জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের অনেকখানি আকাশের অপরিমাণ নক্ষত্র রাশির দিকে। কোনো দিকে কোনো মেঘ নেই এখন আর। সমস্ত আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, চাঁদ নেই, আগাগোড়া শূন্যতা এখন অযুত কালের কোটি তারার বাসভবন; দেখছিল ফাটা।

'আমরা বেলা থাকতেই বেরিয়ে ছিলাম গগন কাকা,' বনচ্ছবি বললে, 'কিন্তু এ-বাড়ি ঘুরতে-ঘুরতে রাত হয়ে গেল।'

'সাইকেল রিকশা চড়ে ফিরে যাবে ভেবেছিলে?'

'সে-রকম কিছু ভাবিনি,' 'বিশাখা বললে, 'পায়ে হেঁটেও চলে যেতে পারতাম।'

'তোমাদের বাড়ি ত অনেক ঝুপসি গলির ভেতর দিয়ে, বন জঙ্গল ঢের, টর্চ আছে তোমাদের কাছে?'

'না। ব্যাটারিই পাওয়া যাচ্ছে না, বিশাখা বললে, 'বাসমতীতে একটু আধটু দাঙ্গাটাঙ্গা হচ্ছে শুনলাম—'

'হুঁ,' গগনবাবু বললেন। ঘরের কাঠে তক্তাপাতা সিলিঙের দিকে চোখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'এত রাতে সিদ্ধার্থের কাছে কী দরকার ছিল তোমাদের?'

ওকে ত বেশি রাত না—হলে পাওয়া যায় না?'

'দিনেরবেলা ত কলেজে, সকালবেলা একটা ট্যুইশন আছে সুনীতিদি?

'দু'টো আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বেশি রাত না হলে কথা বলারই অবসরই নেই' বনচ্ছবি বললে, 'ছুটির দিন ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে যায়। অনেক রাত করে বাড়িতে ফেরে।'

'সিদ্ধার্থের একটু বায়ুচড়া বাতিক হয়েছে আকজাল; গগনবাবু বললেন, 'না, এ অনেক কালের? তুমি ওকে একটু শতরঞ্জ খেলায় আটকে রাখতে পারবে না সুনীতি? যখন থাকে বাড়িতে তখন দিনমানই থাকে-কোথাও বেরয় না। ও এক ধাতের মানুষ। কোথায় সিদ্ধার্থ যাচ্ছে হে সুনীতি, আজকাল? এত রাত অব্দি? চুরুটে পর-পর তিন-চারটে বেশি জোরে-জোরে টান দিয়ে গগনবাবু বললেন, 'সমাজের সেক্রেটারি হিসেবে এ কথা জিজ্ঞেস করছি না আমি। সমাজের দিকে সিদ্ধার্থ একদম ঘেষে না, কোনো ব্রাহ্মদের বাড়িতেও না। ভেবেছিলাম হিউম-টিউমের মত একটা দর্শনের ছক নিয়ে ব্যস্ত হয়, লেখাপড়া নিয়ে আছে। কিন্তু তা ত নয়! আমাদের ব্রাহ্মসমাজে পুরো স্বাধীনতা রয়েছে প্রতিটি যুক্তিবাদীর, সিদ্ধার্থের মনে সুযুক্তি রয়েছে ঢের, জানি আমি। কিন্তু সত্যিই কী করছে আমরা জানতে পারলে ওর অপকার হবে না।'

সুনীতি ফাটার চেয়ারে এসে বসেছিল, হ্যারিকেনের বাতিটা একটু ডিম করে দিয়ে বললে, 'উনি কলেজে কাজ হয়ে গেলেও অনেকটা সময় সেইখানে কাটান, দু'টো ট্যুইশন আছে, মাঝে-মাঝে সভাসমিতি থাকে, পলিটিক্সের নয়, সাহিত্য সমাজ-তত্ত্ব এই সবের। তাছাড়া হাসপাতাল-টাসপাতাল দু'চারটে কমিটির মেম্বার আছেন। এই কিছুদিন ত জিরানডাঙায় কলেরার হিড়িক গেল,' বলতে-বলতে সুনীতি কেমন যেন কাঠ হয়ে আস্তে-আস্তে বললে, 'যখন কোনো কাজ থাকে না নদীর পাড়ে রয়ানীর মাঠে শুয়ে থেকে আকাশের তারা দেখে। সত্যি বলছি আপনাকে গগনবাবু।' সুনীতির দাঁত ও চোখের ভেতর থেকে কেমন যেন একটা আগুনের তাত বেরিয়ে এল—সুবিধার লাগল না গগনবাবুর।

রয়ানীর মাঠে শুয়ে তারা দেখে সিদ্ধার্থ? ফাটাও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তারা দেখছে—দেখছিল বনচ্ছবি বিশাখা, গগনবাবু, টিনি।

খুব জোরালো চমশার ভেতর দিয়েও এত বেশি রাতে হিতেনবাবুর মরচে পড়া চোখে বিশেষ কিছু ধরা পড়ছিল না, কিন্তু কানে শুনছিলেন তিনি সবই।

'আমি সেদিন রাত দু'টোর সময় জিরানডাঙায় দেখলাম সিদ্ধার্থকে,' বললেন হিতেনবাবু।

'সেদিন? কবে?'

'দশ-বার দিন আগে হবে।'

'অত রাতে ওখানে গিয়েছিলেন আপনি?' গগনবাবু চোখ দু'টো একটু কুঁচকে মনোযোগ টেনে আনতে চেষ্টা করে বললেন। ঘাড়টা একটু ভেঙে পড়ল, ডান হাতের মুঠোর ওপর রাখলেন থুতনিটা।

'ওখানে ক্যানেডিয়ান মিশনের ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের একটা কুঠি তৈরি হচ্ছে। আমি খবর পেয়ে গিয়েছিলাম একবার। তারপর ওরা আমাকে ডাকিয়ে নিয়েছিলেন একদিন। ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে ধর্মটর্ম সম্বন্ধে কী বলবার আছে আমাদের, বাসমতীর লোকজনদের মনে ধর্মভাব কী রকম, এখানকার ব্রাহ্মসমাজের কী রকম অবস্থা আকজাল, ওদের নিজেদের মিশন সম্বন্ধে কী-রকম সংকল্প-টংকল্প আছে, এই সব নিয়ে কথা বলতে-বলতে খুব বেশি রাত হয়ে গেল। আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ফেরবার সময়ে ভালোরিসাহেবের সঙ্গে খানিকটা হেঁটে গিয়ে গাড়িটা ধরতে হল। ওদের নিজেদের মোটর নয়, অন্য কোনো এক সাহেবের। ড্রাইভার মোটরটা এগিয়ে নিয়ে পাকা রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছিল। হেঁটে যাবার সময় দেখলাম সিদ্ধার্থকে।'

'জিরানডাঙায় কসাইদের বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন বুঝি,' সুনীতি বললে, 'ওখানে ওরা কয়েকজন মিলে বস্তির কলেরার তদারকি নিয়েছিল।'

'না, না,' হিতেনবাবু বললেন, 'সে বস্তির থেকে অনেকটা দূরে পোস্ট অফিসের প্রভাসবাবুর বাড়ির জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলাম সিদ্ধার্থকে। ভেতরে আলো জ্বলছিল। অত রাতে বাইরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে বুঝতে পারছিলাম না।'

'প্রভাসবাবুর সঙ্গে হয়ত বলছিল,' গগনবাবু বললেন।

'তা হবে।'

'ও-বাড়িতে আর-কে থাকে?'

আর-কে থাকে কেউ বলতে পারছিল না। প্রভাসবাবুকে চেনেন সরোজিনীদি, রমাকেও চেনেন। কিন্তু নানারকম সাতপাঁচ ভেবে এত রাতে হিতেনবাবুর কথাটা বাড়াতে গেলেন না তিনি আর। বনচ্ছবিও চেনে রমাকে, বিশাখাও। সিদ্ধার্থদা খুব সম্ভব রমার সঙ্গে কথা বলছিল আন্দাজ করে নিল বনচ্ছবি। কিন্তু রাত দু'টোর সময়ে? হয়ত কলেরার কোনো ব্যাপার সম্পর্কে। গগনবাবুও জানেন প্রভাসবাবুর বাড়ির কথা। রাত দু'টোর সময় রমার সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা বলছিল সিদ্ধার্থ-খুব সম্ভব বস্তির কলেরা সম্পর্কে উপলব্ধি কলেছিলেন তিনি, কিন্তু তবুও অত রাতে হানা দিয়ে কথা না-বললেও হয়ত পারত, মেয়েটিকে ডেকে জাগিয়েছিল সিদ্ধার্থ? বাপ কোথায় ছিল-প্রায়ই ট্যুরে যায় ত, কারা ছিল মেয়েটির কাছে? রমার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বেশি আলাপ আছে? ভাবছিলেন গগনবাবু। কিন্তু হিতেনবাবু যে-বিষয়টা পেড়েছেন তা নিয়ে অনেক অনুসন্ধান আলোচনা সম্ভব হলেও ওদিক দিয়ে গেল না কেউ; ব্যাপারটা সিদ্ধার্থকে নিয়ে—সে নিজের সত্যার্থকে হাতে করে বাসমতীর বহু জায়গায় ঘুরে বেড়ায়—স্বীকার করল সকলে।

সুনীতির খানিকটা খটকা লাগল। খটকা লাগা উচিত ছিল না অবিশ্যি। সিদ্ধার্থ কত রাতে কোথায় ঘোরে তা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বড় একটা নালিশ নেই সুনীতির। সে জানে, মুখ ফুটে তেমন কিছু বলেনি যদিও, তবুও, তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে খুশি হয়নি সিদ্ধার্থ। এমনিই বিশেষ কোনো বাঁধনে থাকবার মত মানুষ নয়, বিয়ের জোয়ালে সুনীতিকে পেয়ে আরো খানিকটা অস্বস্তি বোধ করেছে যেন সিদ্ধার্থ। দোষ কার তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যায়নি সুনীতি, সে যে ছকের ভেতর রয়েছে। সেখানে অনেকদিন থেকে তার নিজের মনও বসেনি।

'ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়েছে বৌদি?' ফাটা জানালার দিক থেকে ফিরে এসে সুনীতিকে বললে।

'হ্যাঁ, তাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, ঘুমিয়েছে অনেকক্ষণ।'

'সিদ্ধার্থ কখন ফিরবে?'

'বলতে পারি না।'

'আমি এ-রাতটা আজ বোধহয় সরোজিনীদির ওখানেই কাটাব।'

'দয়া করে থাকো যদি তুমি,' সরোজিনী বললেন।

'গগনবাবু থাকবেন?' ফাটা জিজ্ঞেস করল।

'না। আমাকে দানাপুর যেতে হবে—মেয়েদের নিয়ে।'

'মেয়েরা ত মীরমহলে থাকে,' ফাটা ট্রাউজারের পকেট থেকে হাত নামিয়ে এনে বললে, 'কী হবে আর এত রাতে দানাপুরে মীরমহলে গিয়ে। থেকে যান গগনবাবু, থাক বনচ্ছবি বিশাখা, বসুন বৌদি। অনেক দিন পরে এসেছি বাসমতীতে, গল্পগুজব করে সারাটা রাত কাটিয়ে দেয়া যাক।'

'আর দশ বছর আগে একথা যদি বলতে ফাটা,' গগনবাবু ওপেনব্রেস্ট কোটের দু'টো বোতাম খুলে বুক—পেটের ওর আস্তে বাঁ হাতটা বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'তাহলে সরোজিনীদিকে দিয়ে টুক করে একটু প্রার্থনা করিয়ে, ব্যস বসে যেতাম গুলতানি পাকিয়ে। মোদ্দা চারটে চুরুট লাগত আমার—আর দশ সেরি কেটলি উনুনে সারারাত। মনে নেই নয়ই-দশই মাঘের রাতগুলোর কথা পনের-কুড়ি বছর আগে?'

'না, সে-রকম রাতের কথা বলছি না আমি।'

'বুঝেছি কী রকম রাতের কথা বলছ তুমি? খুব চুটিয়ে মজলিশ করতে চাইছ ত সবাইকে নিয়ে? গালগল্প কেচ্ছা হররা ধর্মকর্ম-যা হচ্ছিল এতক্ষণ-লোভ বেড়ে গেছে। রাত ঠাণ্ডা হয়েছে-এখনই ত জমবার কথা। কিন্তু হিতেনবাবু থাকতে পারবেন কি?'

'না, আমার চলে যেতে হবে। কটা রাত?'

'সাড়ে দশ। আমারও উঠতে হবে ফাটা। আগের সে শরীর নেই—ব্লাড-প্রেসার হয়েছে, শরীর রোগা হবার কথা, কিন্তু মোটা হয়ে আরো খারাপ হচ্ছে। একটু এদিক-সেদিক করলেই বড্ড কষ্ট পেতে হয়-দুশ, শোয়া দুশ, আড়াইশ অব্দি—'

'বনচ্ছবি, তুমি থাক,' ফাটা বললে।

'কী করে থাকে?' গগনবাবু জানতে চাইলেন।

'বিশাখা যদি থাকে তাহলে থাকতে পারে না?' সরোজিনীদির বাড়িতে থাকবে ত—এর ওপর ত কোনো কথা নেই বাসমতী ব্রাহ্মসমাজে। বৌদি আছেন, টিনিদি আছেন, ছাতুবাবু, আমি আছি, সিদ্ধার্থ এসে পড়বে—বেশ গল্প জমছে সারারাত সকলে মিলে।'

'আচ্ছা তা জমুক,' গগনবাবু বললেন, 'আমি আমার কাজটা সেরে নিই। বেশ ফটফটে আলো এসেছে ঘরে,' হ্যারিকেনটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গগনবাবু বললেন, 'বনচ্ছবি, ঐ তেপয়টা আমার দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে হ্যারিকেনটা রাখত তার ওপর, আমি বইয়ে লিখে নিচ্ছি।'

'আলো এনেছ? আচ্ছা-বসো গিয়ে এখন তুমি। এ-মাসে সমাজের গান উপাসনার প্রোগ্রামটা আমি ঠিক করে নিচ্ছি সরোজিনীদি। পকেটে রেখে দিয়েছিলেন সব। খাতা, পেন্সিল, চশমা পকেট থেকে বের করে ফেলে গগনবাবু বললেন, 'গান গাইবে তাহলে—ধরতে গেলে—সুকুমার একা; সাহায্য করবে রজনী নান, মহী বিশ্বাস আর অনন্ত মুচ্ছুদ্দির দল—লাডলি বিশ্বাসের দল যাকে বলা হয়,' খাতায় টুকতে টুকতে বললেন,' ছাতু বলে দিও কিন্তু এদের সবাইকে, সকালবেলা না-হোক ফি-রোববার সন্ধের সময় যেন সমাজে হাজিরা দেয় বাছারা। মুচ্ছুদ্দিরা ত নিজেদের খোল করতাল আনে। না-যদি আনে আমাদের করতাল—টরতাল ঠিক আছে ত? কটা খোল আছে? তিনটে? টনক ঠিক আছে ত সব কটার ছাতু? এ মাসে মেরামত না-করলেও হবে, নাকি বায়েনদের দোকানে পাঠিয়ে দিতে হবে এক-আধটা?'

একটু ইতস্তত করছিল ছাতু।

'বলো বলো বলে ফেলো, সময় নেই।'

'এখানে মেরামতের দরকার নেই। বিশ্বাসরা নিজেদের খোল আনে। না যদি আনে আমাদের ওগুলো ঢ্যাব ঢ্যাব করবে বলে মনে হয় না।'

'গগনবাবু নোট বইয়ে লিখতে-লিখতে বললেন, 'তুমি ত নিজেও একজন ভাল বাজিয়ে ছাতু। কাল সকালে সাধন শ্রীমানীকে সঙ্গে নিয়ে সমাজ বাড়িতে গিয়ে আমাদের খোলগুলো একটু বাজিয়ে দেখো ত তোমরা দু'জনে মিলে। যদি কোনো খুঁত বেরিয়ে পড়ে নিমাই বায়েনের দোকানে পাঠিয়ে দেবে—মালী যদি কাল ওখানে থাকে তবে তাকে দিয়ে, না হলে মুটে ডেকে। যা খরচা পড়ে বিল তৈরি করে রেখো।

'বনচ্ছবি।'

'কী গগন কাকা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি গাইবে নাকি এ মাসে সমাজে-এক-আধদিন রাতের উপাসনার সময়ে? কী বলেন সরোজিনীদি—দু'চারটে গান করুক বনচ্ছবি।'

'করুক।'

'এ মাসে নয়,' বনচ্ছবি গাইলেও গাইতে পারে, কিন্তু তবুও আজই এ প্রোগ্রামে ধরা দিতে গিয়ে নানা করণে অসুবিধা বোধ করে বললে, 'এ মাসে আমি বড্ড ব্যস্ত, আমি আসছে মাসে নিশ্চয়ই গাইব গগন কাকা।'

'আচ্ছা।' গগনবাবু লিখতে-লিখতে বললেন, 'উপাসনা করবেন সরোজিনীদি, হিতেনবাবু-আর-কে?' পেন্সিল থামিয়ে রেখে হ্যারিকেনের আগুনটার দিকে খানিকক্ষণ চোখ গোল করে তাকিয়ে রইলেন। সাপ্তাহিক রবিবারের উপাসনা করবার জন্যে বাসমতী ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে পনের কুড়ি জন বড় বড় উপাসক ছিলেন, আজ দু'জন আছেন শুধু, এঁরাও যে-কোনো মুহূর্তেই সরে যাচ্ছেন, এঁদের হাতে বেশি সময় নেই আর। কিন্তু এ-নিয়ে কথা ভাবতে গেলে কোনো কিনারাই পাওয়া যাবে না। গগনবাবু পেন্সিলটা দু-একবার আঁকিবুঁকির মত নোটবুকের এক কিনারে ঘষে নিয়ে বললেন, 'আপনাদের বয়স হয়েছে সরোজিনীদি, মাসে আপনাদের দু'জনের আটবেলা উপাসনা, এটা কি সম্ভব হবে?'

'কষ্ট হবে মাসিমার।' টিনি বললে।

'কিন্তু চলেছে ত এতদিন। সরোজিনী বললেন।

'চালাতে হবে।' হিতেনবাবু বললেন।

গগনবাবু পেন্সিলটা নোটবুকের ওপর ফেলে রেখে সরোজিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছি কিছুকাল থেকে সারোজিনীদি, আমাদের সমাজে এখন থেকে শুধু সকালবেলা উপাসনা চালালে কেমন হয়?'

'তা হতে পারে না,' হিতেনবাবু বললেন।

'এই একটা মাস।'

'কেন, এ মাসে কিসের চাপ গগন?'

'কিছুর না। শুধু একবেলা উপাসনা চালিয়ে বিশেষ কোনো অভাব বোধ হচ্ছে না কি আমাদের সামাজিক সাধনাটাধনার জীবনে সেইটে অনুভব করে দেখতাম।'

'অনুভব করেছি,' হিতেনবাবু বললেন, 'আমার মরে গেলে অনুভব করবার সময়ও থাকবে ঢের; কিন্তু এখন ওসব কথা উঠতে পারে না। সরোজিনীর কষ্ট হলে আমি একাই আটবেলা চালাবো, এ মাসটায়, এ-মাসেরই কথা হচ্ছে ত এখন, লিখে নিন গগনবাবু, তারপর বেঁচে থাকলে পরের মাসের ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন।'

'করে দেবেন, করাচ্ছেন, করিয়েছেন,' ভেতরের থেকে কেমন একটা বেগ, নিঃশ্বাসেরই খুব সম্ভব, হঠাৎ চাড় দিয়ে উঠে আটকে ফেলতে চাচ্ছিল সরোজিনীর কথা বলার সহজ দমটাকে, কিন্তু আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেল নিঃশ্বাসটা, তিনি না করালে আমরা আর কী করতে পারি; তিনি আছেন ভেতরে প্রবেশ করে। তাই সজ্ঞানে কথা বলতে বলতে চলে যাই। ঠিক আছে আমরা সব, ঘাবড়াবেন না হিতেনবাবু, আমি চারবেলা করি, আপনি বারবেলা করুন-এ মাসে।'

'চারবেলা তোমার পক্ষে বেশি হয়ে যাবে মাসিমা,' টিনি বললে, 'হিতেনবাবুর বয়স ত তোমার চেয়ে ঢের-ঢের কম; তিনি পুরুষ মানুষ, কোনো রোগও গাড়েনি। তোমার ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেসার, প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের অসুবিধা। মাসিমাকে তিনবেলা দিন গগনবাবু।'

'হিতেনবাবুকে পাঁচবেলা?'

'তাই হোক,' হিতেনবাবু বললেন, 'আমি দু-বেলাও নিতে পারতাম, কিন্তু লোকেরা সরোজিনীদির উপাসনাই শুনতে চায়।'

'সেটা আপনার অমায়িকত,' সরোজিনী হ্যারিকেনের পরিষ্কার কাঁচ ও আগুনের দিকে, ডিম করে দিয়েছে সুনীতি, স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে হেসে বললেন। এক-আধটা দাঁতের ঝিলিক দেখা গেল—আমেরিক্যান। মুখ বুঝে ফেলেছেন।

'কে কবে কোন বেলা উপাসনা করবেন—সেটাও এবারেই ঠিক করে নিই,' গননবাবু পেন্সিল তুলে নিয়ে বললেন।

'নিন।'

'সরোজিনীদির সকালবেলাই সুবিধা হবে?' নোট করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন গগনবাবু।

'দু'দিন সকালে দিন, একদিন রাতে,' বললেন সরোজিনী 'হবে ত ঠিক হিতেনবাবু?'

'ঠিক হয়েই আছে,' হেসে সায় দিয়ে শালীনতায় স্নিগ্ধ সদয় হয়ে বললেন হিতেনবাবু।

'আচ্ছা, তাহলে—'

'কিন্তু হিতেনবাবু বলছিলেন লোকেরা মাসিমার উপাসনা শুনতে চায়, মাসিমাকে দু'দিন অন্তত রাতের বেলা সার্ভিস দিলে হত না? লোকেরা ত রাতের বেলাইয় যা-একটু অবসর পায় মন্দিরে আসতে।' টিনি গগনবাবুকে বললে।

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' গগনবাবু চুরুটটার দিকে তাকিয়ে পেন্সিলটা থামিয়ে বাতিটা একটু উসকে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এখনো ত শীত পড়েনি, বিষ্টিবাদলও নেই, আজকাল রাতের সার্ভিসে অসুবিধা হবে না সরোজিনীদির।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সাইকেল রিকশা করে যাবেন। রিকশা ভাড়া সমাজ দেবে ত? মাঝখানে চাঁদাটাদা পাওয়া যাচ্ছিল না, একটু অসুবিধা হচ্ছিল,' টিনি গগনবাবুকে বললে।

'এবারে চাঁদা পাওয়া যাচ্ছে ভালই, ফাটাইত পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিল। আচার্যদের যাতায়াতের ভাড়া সমাজ ত বরাবরই দিচ্ছে। বুড়োমানুষদের মোটরে করে নিলেই ভাল হত, কিন্তু কেরায়া মোটর ত নেই বাসমতীতে। আছে? ছাতু?'

'মীরমহলের দিকে এসেছে দু-তিনটে ট্যাক্সি,' বনচ্ছবি বললে।

'রয়ানীর দিকে ট্যাক্সি সার্ভিস আছে,' বিশাখা, গগনবাবু, বনচ্ছবি, ফাটা সরোজিনীর দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে নিয়ে বললে।

'মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি জানে দেখছি,' গগনবাবু পেন্সিলের শিষের দিকে তাকিয়ে ট্যাক্সি সার্ভিসের জানাজানির সম্পর্কে আরো খানিকটা খুঁটিয়ে ভেবে নিয়ে কাজের কথায় ফিরে এসে বললেন, 'রাতের সার্ভিসে ট্যাক্সিতেই নিয়ে যাওয়া হবে আপনাদের।'

'সাইকেল রিকশা খুব ভাল,' সরোজিনী বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর ডান পা চড়িয়ে বসেছিলেন—মাথা কাত করে। গগনবাবুর কথা ফুরতে না-ফুরতেই নিজেকে বসবার স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে বললেন, 'ব্রাহ্মসমাজ কোনো জাঁক ভালোবাসেন না। আগেকার ব্রাহ্মরা ঝড় বাদলে-শীতে, অন্ধকার রাতে, পায়ে হেঁটে, বুড়ো-বুড়ো মানুষ সব, বাসমতীর এপার থেকে ওপার পাড়ি দিতেন মন্দিরের কাজে। তাঁদের সময় রিকশাও ছিল না, ঘোড়ার গাড়ি ছিল, কিন্তু গাড়ি করবার মত পয়সা ছিল না তাঁদের। সেটাকে মিথ্যা ঠাট বলে মনে করতেন তাঁরা। মোটরের কথা হচ্ছে-আমি সাইকেল রিকশাতে চড়তেও লজ্জাবোধ করি, তাও সমাজের পয়সায়? কেন, সমাজকে আমরা উদ্ধার করতে যাচ্ছি না ত।'

'তাঁর জিনিস, তিনিই করছেন সব, আমরা কে? সেই ত্যক্তেন ভুঞ্জীথার কথাই মনে পড়েছে আমার গগনবাবু,' টিনি বললে,' ব্রাহ্মসমাজ সহজ আদান-প্রদান চায়, দীনতাকেই ভালবাসে।'

'তাহলে মোটর থাক, রিকশাই হোক,' গগনবাবু বললেন।

'পায়ে হেঁটেই যাওয়া যায়,' হিতেনবাবু বললেন, 'তবে সরোজিনীদি বেশি বুড়োমানুষ এ বয়সে ওটা ঠিক হবে না ওঁর।'

'অনেক রাত হল।' চুরুটটা নেড়েচেড়ে বললেন গগনবাবু, জ্বালালেন না।

'বসুন, কী আর এমন রাত হয়েছে? আমার মোটর সাইকেলে আপনাকে পৌছিয়ে দেব গগনবাবু,' ফাটা বললে।

'আঁটবে কি করে? বনচ্ছবিরাও যাচ্ছে আমার সঙ্গে। সরোজিনীদি, একদিন সকালে, দু' দিন রাতে আপনার সার্ভিস পড়ল এ-মাসে। হিতেনবাবুর তিন দিন সকালে, ছ' দিন রাতে। আপনাদের কারুর যদি হঠাৎ শেষ মুহূর্তে কোনোদিন অসুবিধা হয়ে পড়ে, না যেতে পারেন তাহলে জোড়াতালি দেবার জন্যে-'

'ফাটা রয়েছে,' গগনবাবুর মুখের থেকে কথাটা লুফে নিয়ে ঘাড় টান করে, হাসতে গিয়ে মাঝপথে থেমে একটু গম্ভীর হয়ে ফাটা বললে।

'বাসমতী ব্রাহ্মসমাজের গানের দিকটা ত বাইরের লোকেরাই চালাচ্ছেন। উপাসনা করবার জন্যে সরোজিনী আর হিতেনবাবু আছেন এখনো, ফাটা ধরে নি এখনো, কিন্তু যদি ধরে তাহলে আমার দ্বারা যে কিছু হবে না সেটা জেনেই বাবা আমার নাম ফাটা রেখেছিলেন,' ঘাড় নুইয়ে পিঠের ওপর হাত বেঁধে ঘরের ভেতর আস্তে-আস্তে হাঁটতে-হাঁটতে ফাটা বলছিল, কিন্তু আমি একটা কথা ভেবে দেখছি, যখন বাসমতীতে ব্রাহ্মদের ভেতর মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসানা করবার মতন কোনো লোক থাকবে না, তখন বেদীর ওপরে না উঠে, নিচে বেদীর এক কিনারে বসে নানারকম ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে মনে হয় না, সেটা আমি করতে পারব। আমাকে দিয়ে সেটা হবে।' ফাটা সুকুমারের বিছানার কিনারে এসে বসল।

'তোমার ত কলকাতায় ব্যবসা। বাসমতীতে ফিরবে?'

'ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেলে লিমিটেড কোম্পানি করে দিয়ে চলে আসব আমি। বছরে দু-এক মাসের জন্যে কলকাতায় যেতে পারি।'

'এখানেই থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

এখানে ত জমিদারির জন্যেও থাকতে হবে ফাটাকে।'

'না, জমিদারি পেলেও নায়েব প্রাণকিশোরবাবুর হাতেই ছেড়ে দিব সব। মৈতি শতকরা পঁচানব্বই চাচ্ছে-তাই নিয়ে নেবে। টাকা বুঝে নিতে হলে মৈতিকে বছর-বছর এসে অনেকটা সময়ই বাসমতীতে থাকতে হবে। ও আমার হিসেবনিকেশে খুশি হবে না, আমার জমিদারি চালনাতেও না, নিজেই চালাতে চাইবে। চালাক ও আর প্রাণকিশোরবাবু।'

বেদীর নিচে বসে ধর্মগ্রন্থ পড়ার কথা-সেটা তুমি বেশ ভাল কথা বলেছ ফাটা,' গগনবাবু বললেন,' একবার পেন্সিল একবার চুরুটটাকে আঙুলের ভেতর আটকে নিচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ জ্বালাননি চুরুট, পেন্সিলটাই তুলে নিলেন, বললেন, কিন্তু সেসব হল ঢের পরের কথা। তাহলে এই ব্যবস্থাই রইল এ মাসে, সরোজিনীদি, আপনি আর হিতেনবাবু, যদি দৈবাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে আমি কাজ চালিয়ে নেব কিংবা ছাতু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'ছাতু এক-আধ দিন হয়ত পারে,' সরোজিনী বললেন, 'কিন্তু আমরা মরে গেলে ওকে দিয়ে সমাজের উপাসনার কায়েমি কাজ চালাতে যেও না। সেটা ঠিক হবে না।'

'এক-আধ দিনের কথাই।'

'এর পরে,' ছাতু বললে, 'ফাটা যা বলেছে বেদীর নিচে বসে ধর্মগ্রন্থই পড়তে হবে। অবিশ্যি ব্রাহ্মদের হিতৈষী হিন্দুদের ভেতর জ্ঞানী সাধু মানুষ আছেন কয়েকজন, তাঁদের বললে সমাজে এসে উপাসনা করতে রাজি হবেন। কিন্তু গান উপাসনা সবই যদি তাঁরা করেন, অথচ নিজেদের হিন্দু বলেন, সামাজিক অনুষ্ঠানে পুরোপুরি হিন্দু থাকেন, তাহলে এ-সমাজটাকে ত ব্রাহ্মসমাজ বলা চলবে না।'

'এ-মাসের খশড়া হয়ে গেল তাহলে, আমি উঠি,' গগনবাবু বললেন,' সুকুমার জেগেছে?'

'না।'

'আপিং টাপিং খেল কি?'

'আপিং কোকেন খেয়ে ঝিমোয় মানুষ, ও ত অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ব্রোমাইড দিয়েছিলেন সরোজিনীদি?'

'না। আমার এখানে ওসব নেই ত। তবে, অনেক দিনের পুরনো ভেরামনের একটা ফাইল ছিল; ট্যাবলেট খেল নাকি?'

'ঘুমোবার আগে মাথার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল?'

'তোমরা কেউ আসবার আগেই ও আমার ঘরে ঢুকেছে, ঘরের ভেতর ঘুরে ফিরে বেড়াল, শিশি বোতল নাড়াচাড়া করছিল, আমি একটু 'অঘোর প্রকাশ' আর লাবণ্যদির দৈনিক নিয়ে বসেছিলাম, নজর পড়েনি ওর দিকে, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে শুয়ে পড়ল, বললে যে ঘুমব, আমি বললাম ন্যাওড়ের খাটে বিছানা পাতা আছে, ঘুমো।'

'থাক গে, ঘুমোক। রাত দুটো-তিনটের আগে উঠবে বলে মনে হয় না, কলিকের মতন কিছু ব্যথাট্যথায় ভেরামন খেয়েছে হয় ত,' গগনবাবু বললেন।

'ভেরামনের লোভেই সুকুমার তোমার ঘরে এসেছে হয়ত মাসিমা,' টিনি বললে, 'জার্মান ওষুধ, কলকাতার কালবাজারেও তিন চার বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এ মাসে পাঁচটা রবিবার হয়ত ছাতু?' গগনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। 'চারটে রববার।'

'ভালই হল,' নোটবুকের দিকে তাকিয়ে গগনবাবু বললেন, 'কোন-কোন সপ্তাহে আপনার সার্ভিস হলে ভাল হয় সরোজিনীদি, বলুন, লিখে রাখছি।'

প্রথম সপ্তাহে রাতে,' সরোজিনী গগনবাবুর একরত্তি চিমসে পেন্সিলটার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী রকম মোটা আঙুলের হাতির শুঁড় এসে সাপটে ধরেছে সেটাকে; 'পরের সপ্তাহে-সকালবেলা, আর একেবারে মাসের শেষ সপ্তাহে দিন আমাকে—রাতে।'

'হয়ে গেল,' পেন্সিলটা গুঁজে রেখে নোটবুক বন্ধ করে পকেটে ফেলে দিয়ে চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে গগনবাবু বললেন, 'আপনার তাহলে কবে কোন-কোন বেলা পড়ল সেটা জানতে পারলেন হিতেনবাবু। ফি শনিবার আপনাদের মনে করিয়ে দেবার জন্যে মালির হাতে অবশ্য একটা চিট পাঠিয়ে দেব, মাসের প্রোগ্রামটা কী হল-টাইপ করে কালই এক এক কপি পাঠিয়ে দেব আপনাদের দু'জনকে। আজ সোমবার, এই বিষ্যুৎবার সন্ধ্যায় এখানে সরোজিনীদির ঘরে, সমাজের কার্যনির্বাহক সমিতির একটা সভার ব্যবস্থা করতে পারবে ছাতু?'

'মেম্বাররা শুনে গেলেন ত সব,' ছাতু বললে, 'যে দু-চারজন আসেননি তাদের খবর দিয়ে আসব। কাল সকালে আপনার বাড়িতে যাব গগনবাবু, নোটিশটা লিখে আমার হাতে দিয়ে দেবেন!'

'এসব কাজ তোমাকে করতে হয় নাকি ছাতুবাবু, 'ফাটা ঘরের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'মালি নেই?'

'মালি শনি-রবিবার ছাড়া কাজ করতে পারে না, তবে রাতে এসে সমাজে শুয়ে থাকে, পাহারা দেয় রোজই, তা ছাড়া ঘরদোর পরিষ্কার রাখে। সারা দিনরাতের কাজকর্মের জন্য লোক রাখতে হলে বেশি টাকা দিতে হয়। চাঁদা কম দিচ্ছে মানুষে-অত টাকা দিয়ে রাখতে পারি না। ফাটা, তুমি যদি এক নাগাড়ে পাঁচ মাস বাসমতীতে থাক ফি বছর—কিংবা বছরে ঘুরে ফিরে ছ-সাত মাস তাহলে তোমাকে আমাদের সমাজের কমিটির মেম্বার হতে বলি। থাকবে?'

'এখন না।'

'বনচ্ছবিকে এবার কমিটির মেম্বার করে নেয়া যাক, কী বলেন সরোজিনীদি?' গগনবাবু মুখের থেকে চুরুট নামিয়ে বললেন।

'বিশাখাও হতে পারে,' সরোজিনী বললেন।

'ব্রাহ্মসমাজের যে-কটি মানুষ আছি বাসমতীতে সবাই কি আমরা একসিটিউটিভ কমিটির মেম্বার হব?' হিতেনবাবু তাজ্জব মেনে বলেন; আলোটা উশকে দিয়েছিলেন গগনবাবু, পুরু কাঁচের চশমাটা চক চক করে উঠছিল হিতেনবাবুর, হ্যারিকেনের আভা কাঁচের ওপরে গিয়ে মানুষটার ভেতরে ধবকটাকে ঠিক ভাবে প্রতিফলিত করতে পারছিল বলে।

দেখছিল বনচ্ছবি।

'সমাজ কমিটির মেম্বার হতে পারলে খুব খুশি হতাম গগন কাকা,' বনচ্ছবি বললে, 'কিন্তু আমি কলকাতায় চলে যাচ্ছি।'

'কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বি-এ পাস করে দু-বছর ত বসে রইলাম বাসমতীতে। এবার ভাবছি ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে পড়ব।'

'বি-টি?' জিজ্ঞেস করল ফাটা।

'না।-এম-এ।'

'আজকালই যাবে?; গগনবাবু বললেন।

'বিশাখাও যাচ্ছে। না, এখনই না, ছ-মাস পরে,' বনচ্ছবি বললে 'আপনাকে ত কথা দিয়েছি আসছে মাসে সমাজে গাইব।'

'ও—একেবারে গান গেয়ে ডঙ্কা মেরে চলে যাবে বুঝি?'

ফাটা ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পায়চারি করতে-করতে বললে 'কীসে এম-এ পড়বে হে বনচ্ছবি? বাংলায়?'

'ইকনমিক্সে।'

'বিশাখা?'

'আমিও ইকনমিক্সেই পড়ব ভাবছি।'

'বেশ ভাল কথা,' পিঠের ওপর দু'হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে একটু কুঁজো হয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফাটা বললে, 'ইকনমিক্স পুরুষদের শাস্ত্র ছিল। অনেকদিন থেকে ধস্তাধস্তি করে আসছে তারা। শেষ মার্কসে এসে সিদ্ধি পেয়েছে। রাশিয়া সেটাকে প্রামাণিক সাফল্য দিচ্ছে-শুনে ভাল লেগেছিল। কিন্তু হল না কিছু। পুরুষদের হাতে এ শাস্ত্র মনের ভূমিতে বা সমাজ ভূমিতে খুব সম্ভব কোথাও সিদ্ধ হবার নয়। ইকনমিক্স নিছক বিজ্ঞান নয়, কিন্তু এটা কী তাহলে? কোন জিনিস মেয়েরা পারে। কিন্তু পুরুষরা পারে না? আছে কিছু এমন জিনিস রান্না সেলাই আলপনা আঁকা পিঠে তৈরি করা? সব জিনিসেই পুরুষদের ভেতর থেকে ওস্তাদ জুড়ি এসে জুটবে। তবে মেয়েরা সৃষ্টি রক্ষা করছে, কিন্তু তাও ত পুরুষদের সঙ্গে মিলে যুগল হয়ে,' ফাটা হাঁটতে-হাঁটতে বলছিল। এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে কারো মুখের দিক না তাকিয়ে বললে 'কিন্তু মেয়েরা, সব মেয়েরা নয় অবিশ্যি, নিজেদের পরম ভূমিকায় দাঁড়িয়ে মায়ের মত শুশ্রূষা করতে পারে, কক্ষনো কোনো পুরুষের বাবার মত শুশ্রূষার সঙ্গে তার কোনো তুলনা হয় না। আজকের পৃথিবী এই শুশ্রূষা চাইছে-জ্ঞানের ভেতর দিয়ে। দরকারে একটা বিশেষ জ্ঞান—ইকনমিক্স্। কিন্তু একে এর আধুনিক অবস্থায় ফেলে রাখলে চলবে না, অনেক দূর এগিয়ে নিতে হবে, মানুষের সেবা শুশ্রূষার বড়, ব্যাপ্ত, প্রাণঘন সুর এর ভেতরে ফুটিয়ে তুলে। পুরুষরা কি তা পারবে?'

কথা বলা শেষ করে হাঁটতে লাগল আবার ফাটা।

'কিন্তু তোমরা ত ইকনমিক্সের টেকস্‌ট পড়তে যাচ্ছ বনচ্ছবি,' ফাটা বললে, 'টেক্সটের ওপরে আর ক'জন মানুষ উঠতে পারে? সমস্ত পৃথিবীর ভেতর একজন মেয়েকেও ত উঠতে দেখছি না এই যুগে। অথচ এ-যুগ সে-যুদ একজন দু'জন নয়—খুব বড় পটভূমির কথা বলছিলাম আমি।'

'তুমি ত ভূমার আস্বাদ নিয়ে ফিরছ নীরেনদা,' বনচ্ছবি বললে, 'সমাজে সংসারে ব্যবসায়, মানুষের মত বেঁচে থেকে চলতে-ফিরতে—'

'আর আমরা ত সেই বৌদ্ধ যুগেরও আগের ভারতবর্ষে? নয় বনচ্ছবি? সেই বিদুলাকে যে বলেছিল, নাকি বিদুলা বলেছিল যে মুষিকাঞ্জলি নিয়ে খুশি হয়ে যাচ্ছি।'

'সুকুমার কি জেগেছে?'

'না। ও ভেরামনই খেয়েছে নিশ্চয়,' টিনি বললে, 'তবে একটা ট্যাবলেট খেয়েছে না দু'টো তাই ভাবছি।'

'দু'টো খেলে ত সর্বনাশ,' সরোজিনী একটু আতকে উঠে বললেন, 'আপনি একটু দেখুন ত গগনবাবু।'

গগনবাবু তাঁর মোটা শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াবার জন্যে নিচের দিক থেকে একটু চাড় দিচ্ছিলেন, কিন্তু সুকুমারের নাড়ীতে হাত রেখেছে ফাটা, গগনবাবুর ওঠবার দরকার নেই।—কিন্তু উঠতেই হবে, ঘড়িতে এগারটা বেজে গেছে।

'সুকুমার খুব সম্ভব জেগে ঘুমুচ্ছে,' ফাটা বললে, 'যা হোক ঠিক আছে সরোজিনীদি। বেশ বড় আছে বিছানাটা আমি ওর পাশ দিয়ে শুয়ে পড়ব, যদি শেষ রাতে এলিয়ে পড়ি তাহলে, সে ব্যবস্থা আমিই করব।'

'জেগে ঘুমুচ্ছে?' খটকাটা মিটে গেলে সরোজিনী মিষ্টি গলায় বললেন, 'কিন্তু জেগে ঘুমুচ্ছে কেন?'

'খুব সম্ভব মেয়েরা এসে পড়েছে বলে,' ফাটা বললে, 'এই সময়ে গা ঢাকা দিয়ে কান পেতে থাকতে খুব ভাল লাগে।'

কিন্তু তবুও সুকুমার নড়ছিল না, বনচ্ছবি মুখ টিপে হেসে ফাটার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখল জানালার ভেতর দিয়ে নক্ষত্রদের দিকে তাকিয়ে আছে, এদেশের সপ্তর্ষি, গ্রেট রেয়ারের দিকে; ধ্রুব, অভিজিৎ, লুব্ধক, অনুরাধা, আলডেবরন, ক্যাসাডা, গ্রীক আর দেশি নামে নিবিড় কত শত নক্ষত্র যে আকাশে। কিন্তু সুকুমারদা ঘুমিয়েছে নিশ্চয়ই—না হলে নীরেনদার কথা শুনে পুরুষমানুষ কি কখনো ও-রকম শুয়ে থাকতে পারে? বনচ্ছবি ভাবছিল, তবে পুরুষমানুষকে শেষ পর্যন্ত চেনেনি হয়ত সে। নীরেনদার সঙ্গে—আজকালই খুলে কথা বলতে হবে সমাজবাড়িতে গিয়ে-কলকাতার ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে দেশ স্বাধীন হলে কী রকম হবে, পাকিস্তান হচ্ছে কিনা, এত রাতেও সিদ্ধার্থদা এল না, প্রভাসবাবুর মেয়ে রমা পেয়ে বসেছে নাকি সেনকে? কী কী হিসেবে? সেন ত কোনো হিসেবেই মানতে চায় না, সুনীতিদি যে বলেছে অনেক রাতে রয়ানীর মাঠে শুয়ে থেকে তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে—সেই একটি হিসেব ছাড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একটা সাইকেল রিকশা ডেকে আনবে ছাতু?' গগনবাবু বললেন।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল ফাটা।

'এইবারে মীরমহলের দিকে রওনা দিই আর কি। মীরমহল হয়ে দানাপুর।'

'ক'টা বাজল?'

'সোয়া এগারটা। কাছেই ত রিকশার আস্তাবল আছে ছাতু?'

'আস্তাবল?' ফাটা বনচ্ছবির দিকে একবার তাকিয়ে গগনবাবুকে বললে।

'ঐ—আস্তানা,' গগনবাবু বললেন।

'আগে ত বাসমতীতে ঘোড়ার গাড়িই চলত শুধু,' বনচ্ছবি বললে, 'সেই থেকে সব গাড়িরই আস্তাবল'।

'এক পেয়ালা চাও দিতে পারলুম না, কারুরই খাওয়া হয়নি হিতেনবাবু গগনবাবু ফাটা বনচ্ছবি বিশাখা?' সরোজিনী কি দিয়ে কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে বললেন। ঘুম পায়নি তার নিজের, খিদেও পায়নি। টিনির পেয়েছে?

'এই বারে বাড়িতে পাত পেড়ে বসব আমরা,' গগনবাবু বললেন, 'মোটা শরীর আমার লাফালাফি পোষায় না, একটা রিকশা ডেকে দাও তুমি ছাতু।'

'রিকশা লাগবে না, আমার মোটর সাইকেলে দিয়ে আসব।'

'কাকে?'

'দানাপুরে।'

'তা কী করে হয়-আমরা তিনজন—তোমার সাইকেলের বক্স ত একটা।'

'প্রথমবারে আপনি এঁটে যাবেন, পরের বার ওদের দু'জনকে নিয়ে যাব।'

'দু'বার দু'বার যাবে দানাপুর—এত রাতে?' তোমার পৈতৃক প্রাণের আজকাল দাম হয়েছে ফাটা-কলকাতায় ইট সিমেন্টের ব্যবসা, এখানে পাশাবতীর জমিদারি, তোমাকে এ রকম হয়রানির ভেতর ফেলতে চাই না আমরা,' গগনবাবু চুরুটের সাদা ছাই লালচে আগুনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'বাসমতী আজকাল মোটেই সুবিধার জায়গা নয়। ইংরেজ চলে যাচ্ছে, স্বাধীনতা আসছে, পাকিস্তান হচ্ছে—কেমন একটা ভাঙনের মহড়ার ভেতর সোরগোল চলছে চারদিকে-কেউই নিজের মাথায় দায়িত্ব নিতে চাইছে না, খুব বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে সব; অনেক রকম বিপদ, বেশি রাতে খুব বেশি।'

চুরুটে টান দিতে গিয়ে গগনবাবু তার কথাটা আগে সেরে ফেলার দরকার বোধ করে বললেন, 'প্রথমে ত আমাকে পৌছে দিতে যাচ্ছে দানাপুরে, তারপরে ওদের নিয়ে মীরমহলে। কিন্তু ওদের বাপ-মা আমার কাছ থেকে এ ব্যাপারের কৈফিয়ত চাইলে কিছু দিয়ে উঠতে পারব বলে মনে করতে পারছি না। কৈফিয়ত কি চাইবেন বনচ্ছবি?'

'কেন চাইবেন? নীরেনদাকে ত চেনেন বাবা।'

'কী বললে তুমি বিশাখা?' চুরুট টান দিয়ে গগনবাবু বললেন।

'আমি ভাবছি একটা বক্সে তুমি একসঙ্গে আমাদের দু'জনকে কী করে নিয়ে যাবে নীরেনদা, সেটা কী করে হয়, 'বিশাখা একটু ইংরেজি মিউজিকের মত সুরে চেঁচিয়ে হেসে উঠে বললে, 'তাছাড়া পিচের রাস্তা ত নয়, বাসমতীর রাস্তাঘাট ভেঙে ধসে গিয়ে মেরামতির অভাবে যে বিচ্ছিরি তা ভাবতেই পার না। উঃ, যা জার্কিং হবে, আমি মুটিয়ে গেছি, একটু চেপে ঠেশে থাকতে পারব, কিন্তু বনচ্ছবি, তুই নির্ঘাত ছিটকে পড়বি।'

ফাটা ঘরের ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে একটা বড় কাল পাথরের থালার কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'এগুলো কী সরোজিনীদি?'

'ও-ওটা পাথরের থালায় আচার রয়েছে।'

'আচার মাটির ওপর রেখে দিয়েছেন কেন?'

'বাইরে রোদে দিয়েছিলাম, রোদ পড়বার আগে ঘরের ভেতর এনে রেখেছি, তুলে রাখতে মনে নেই।'

'কীসের আচার?'

'জলপাইয়ের, মিষ্টি আচার, খাবে নাকি, পাঁচফোড়ন আর লঙ্কার ঝালও আছে কিন্তু।'

'খুব বেশি ঝাল,' টিনি বললে, 'কিন্তু সেই জন্যেই মিষ্টিতে ঝালে কি যে খাশা হয়েছে। মাসিমার ভারী চমৎকার হাত আচার তৈরি করবার।'

'ফাটাকে দাও টিনি,' সরোজিনী বললেন, 'ঐ ত পিরিচ-চামচে টেবিলের ওপর—'

'না, টিনিদিকে দিতে হবে না, শুধু চামচটাই দিলে হবে,' বলে টিনির হাতের থেকে চামচ নিয়ে আচারের থালার দিকে এগতেই কোত্থেকে এসে ধানরাজের মা ফাটার একেবারে মুখোমুখি পড়ে গিয়ে পালাবার পথ খুঁজতে গিয়ে আচারের থালাটাকে দুই পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে গেল।

ফাটা চামচ নিয়ে নুয়ে পড়েছিল, টান-টান হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসতে হাসতে বললে, 'ভৃগু মুনি পদাঘাত করে গেছেন।'

মোটা শরীর নিয়ে গগনবাবুর হাসির হররাটা দেখবার মত, কোন কাঠের চেয়ারে বসেছিলেন বলতে পারা যায় না, কিন্তু সেটা সেলাহা কাঠের মত ছাতু হয়ে যায় আর-কী। বনচ্ছবি ও বিশাখা যে যার গায়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল, চুলোচুলির মতন একটা দৃষ্টিবিভ্রম জাগিয়ে তুলে হেসে ছিঁড়ে পড়ছিল তারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিতেনবাবু একটু হাসলেন—গোঁফে এক-আধ ফোঁটা আতর মাখিয়ে নেবার মত বিশেষ কোনো জোর দিলেন না ব্যাপারটার ওপর তেমন। এ মাসে সমাজে তার নিজের উপাসনাগুলোর রকম কী রকম হলে ভাল হয় তারই একটা খশড়ার ভেতর ডুবে পড়ছিলেন প্রায়। ওরা যে হাসছে সেটা মাঝে মাঝে অবশ্য বুঝিয়ে ছাড়ছিল ওরা হিতেনবাবুকে। অনেকখানি আচারও নষ্ট হয়ে গেল উপলব্ধি করছিলেন তিনি। ফাটা তাকিয়ে দেখল, সরোজিনীর চোখ ছল ছল করছে, বেশি হেসেছেন, না ভেতর থেকে কেমন একটা নিরোধ ঠেলে উঠে তাকে বোবা করে রেখেছে—হাসতে দিচ্ছে না, কাঁদতে দিচ্ছে না—সেইজন্যে চোখ এ-রকম—বুঝে উঠতে পারছিল না ফাটা। ছাতুবাবু হাসছে-না-হেসে পারছে না। কিন্তু হাসিই সব নয় তার, মাঝে-মাঝে ভুরু কুঁচকে উঠছে, ধানরাজের মাকে দু-চারটে প্যাঁচ দেখিয়ে ছাড়বে সে, দু-চারটে বোম্বাই প্যাঁচ, এর-ওর দিকে তেরছা কান্নিক মেরে তাকিয়ে মাঝে-মাঝে কেমন যেন ঝেঁঝে উঠে জানিয়ে দিচ্ছে ছাতু। সুনীতি বৌদি মাথা একদিকে হেলিয়ে রেখে ঠোঁটে কাপড় তুলে প্রাণপণে চেপে রাখতে চেষ্টা করছে হাসি না অন্য কিছু? হাসিই মনে হল ফাটার, কিন্তু আচারের ব্যাপারের চেয়েও সুনীতি বৌদি হাসছে যেন এক-একবার আড়চোখে নজর দিয়ে হিতেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু সে মুখে হাসির নেই ত কিছু, তিনি ত হাসাতে চাচ্ছেন না কাউকে, সেইজন্যেই দুমড়ে হেসে উঠছে বৌদি, দেখে না-হেসে পারছিল না ফাটা। 'হাসছে কেন?' হিতেনবাবু মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন ফাটাকে।

গগনবাবু গম্ভীর হয়ে পড়ছিলেন। হাসির দম ফুরিয়ে এসেছে তার প্রায়, ফাটা হিতেনবাবুর ভেতরে কী রস পেয়েছে সেটা গগনবাবু ধরতে পেরেছেন, কিন্তু তা নিয়ে সরোজিনীদি কিংবা গগনবাবু টসকাতে পারেন না, ওতে রুচি নেই, তাদের স্বভাবেরই বিরুদ্ধে ওটা, ছোকরারা যা-খুশি তাই করুক গিয়ে। হিতেনবাবুর মুখের দিকে তাকালে গগনবাবু, ফাটা চুপ করে আছে কিন্তু কি ভাবছে, ধরে ফেলেছেন কি হিতেনবাবু? না, তিনি একেবারেই অন্যরকম ভাবনা,-ধারণা-নিঃশব্দতার ভেতরে,-আরেক রকম পৃথিবীতে। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সুনীতি আর ফাটা (মুখ আড়াল করে) স্বভাবতই না-হেসে পারছে না-কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটা সর্বনাশের নেশা আজকালকার এক ধরনের 'সংস্কার রিক্ত' জ্ঞানীদের—তাদের হাতে বড় কমলবাবু, ছোট কমলবাবু, হেরম্ববাবু, অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী-কেউই বাদ পড়বেন না। গগনবাবু একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে-উঠি সরোজিনীদি।'

'সুকুমার জাগেনি এখনো?'

'না।'

'এরপরও জাগল না? কি হল ওর!' সরোজিনী মিহি পাড়ের ফরাসডাঙার খুঁট দিয়ে চোখের কোনা মুছতে-মুছতে বললেন। আচারের ব্যাপারে নিয়ে সকলকে বেহদ্দ হাসতে দেখে একটু চাপা পড়ে গিয়েছিল টিনি, গগনবাবুর মতন মানুষও এত-এত হাসলেন? কিন্তু হিতেনবাবুও ধানরাজের মাকে ডিঙ্গি মারতে দেখে একবার খ্যাঁক করে হেসে উঠে সত্যিই যে হাসেন নি, ধমক মেরেছিলেন ঝিটাকে-তারপর থেকে চারদিকে যে-হাসির হররা ফেটে উঠছে সে সম্বন্ধে নিরেট থেকে নিজের আলাদা চিন্তাচৈতন্য একেবারে যে তন্ময় হয়ে বসে আছেন সেই দিকেই তাকিয়েছিলে টিনি, প্রায় ফাটার মতনই অব্যর্থভাবে হিতেনবাবুর ব্যাপারটা, কিন্তু তবুও হাসি পায়নি তার, ধানরাজের মার নচ্ছার নষ্টামিটা এসে ঠেকিয়ে রাখছিল তাকে; জিনিসটা মোটেই হাসির নয়, কী রকম পাগলের মতন হাসছে বিশাখারা, হল কি গগনবাবু, ভাবছিলেন টিনি। ভাবতে-ভাবতে সময় কাটছিল।

হাসিটা কিছুক্ষণ হল থেমে গেছে। গগনবাবু দস্তুর মত গম্ভীর হয়ে পড়েছেন, বিশাখারা পথে এসেছে, ছাতুবাবুও বিষ ঝেড়ে ফেলেছে সব-ঝিমচ্ছে এখন, পায়চারি করছে ফাটা, ঘাড় গুঁজে আছে সুনীতি, হিতেনবাবু এ-ঘরে যতক্ষণ ওরকম ভাবে বসে থাকবেন ততক্ষণ অবিশ্যি সুনীতি আর ফাটাকে একটু বেগ পেতে হবে গগনবাবুর মত একটা আত্মস্থ গাম্ভীর্য ফিরে পেতে, নজর দিয়ে দেখছিল সব, উপলব্ধি করে নিচ্ছিল টিনি। মাসিমা হাসেননি বটে এতক্ষণ, কাঁদতেও দেখা যায়নি তাঁকে, কিন্তু খুব ক্লান্ত, মুখটা একটু ফাঁক হয়ে পড়েছে, নিচের পাটির একটা দাঁতের ওপর আঙুল ঠেকিয়ে মাঝে-মাঝে গগনবাবুর দিকে তাকাচ্ছেন, গগনবাবু এখুনি কিছু বলবেন, বললে এখুনি কিছু ভাল হয়ে যাবে-এ রকম ভরসায় নয়, এমনি নিজের কথাই ভেবে যাচ্ছেন মাসিমা, কখনো সাক্ষীগোপালের মত কখনো নিজের করিৎকর্মারূপ নিয়ে মাসিমার চোখের সামনে ফুটে উঠছে বুঝি গগনবাবু।

'সুকুমার জাগল না?'

'না। ভাবছিলাম জেগে ঘুমুচ্ছে, তা নয়।'

'ওষুধ খেয়ে ঘুমুচ্ছে?'

'ক্লান্ত হয়েই ঘুমুচ্ছে মনে হয়।'

'এত ক্লান্তি? ধানরাজের মা ত মড়াদেরও জাগিয়ে দিয়ে গেল।'

'ও আজ ঘুমুবে সারারাত, কাল দিনের বেলাও হয়ত জের চলবে। কারোকারো ঘুম খুব বেশি, ও-একরকম ধাত।'

'কিছু খাবেটাবে না?'

'জাগিয়ে ওকে খাওয়াবেন সরোজিনীদি। তাহলে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে আরম্ভ করবে। যাদের বেশি ঘুম তারা একেবারেই আর-এক জাতের মানুষ। খুব ভাল করে জেগে কাজে লেগে না-গেলে ষাট বছরের ও নাবালকের মত ওরা হেসেকেঁদে বিড়বিড় করে মন খারাপ করে দেবে মানুষের, ফাটা ঘরের ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে বললে।

'যদি শেষ রাতে উঠে খিদে পায় ওর,' সরোজিনী বললেন।

'বড্ড আহ্লাদ দিচ্ছেন সুকুমারকে আপনি,' ছাতু বললে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সমাজের গান ত ও-ই চালাচ্ছে।'

'দেখছি ত তাই, আমাদের সকলের মাথা কিনে রেখেছে।'

'কয়েকখানা হাতগড়া রুটি, অড়হরের ডাল, ডুমুর ছেঁচকি আর পেঁপে আলু বড়ির তরকারিটা একটা থালায় সাজিয়ে রেখে দিও ত তেপয়ের ওপর, সুকুমারের মাথার কাছে।' সরোজিনী টিনিকে বললেন।

'ধানরাজের মা তৈরি করে রেখেছে ত এত সব? রান্নাঘরের কাজে হাত লাগাতে পারলাম না ত আমরা আজ।'

'না রেঁধে রাখে যদি তাহলে করছে কি ও এতক্ষণ বসে? সরোজিনী বললেন।'

রাত এগারটার সময় আচারটায় লাথি মেরে গেল ত। এই প্যাঁচ মেরে ভেগে পড়বার জন্যে রাত দুপুর অবদি বসেছিল নাকি। ঘরে বড্ড মশা, ধুপ নেই, ধুপকাঠি জ্বালানো হল না।'

'এ-ঘরে আপনার মশা খানিকটা কম,' গগনবাবু বললেন, 'দালাপুরের দিকে সন্ধ্যে হলে হাত-পা ছড়িয়ে বসবে কার সাধ্য।'

'ক্ষীরমহলে আরো বেশি,' বনচ্ছবি বললে, 'ধুপটুপ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, সন্ধ্যের পরে শোবার বসবার ঘরে তোলা উনুনে আঁচ দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়।'

'ইশ, তাড়াবে এই সব!' হিতেনবাবু বললেন।

'ধোঁয়া অনেকক্ষণ থাকে বুঝি?' ফাটা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ—'

'কেউ না।'

'রোজই ফিউমিগেট করা হয় বুঝি?' হাঁটতে-হাঁটতে এক জায়গায় থেমে চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে ফাটা বললে।

'ওতে মশা পালাতে পারে, হাঁপানি ঠেকাবে কে?' হিতেনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন,' তোমার বাবার ত ব্রঙ্কাইটিসের মতন লেগেই আছে। বি-এ, এম-এ, পাস ছেলেমানুষি ঘুচল না তোমাদের; উনুনের ধোঁয়ায় টিউবারকুলসিস হবে না তোমাদের? তোমার ত বেশ একহারা ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, এরকম মেয়েদেরই সহজে টি-বি হয়, টি-বি ত খুব বেড়ে যাচ্ছে আজকাল দেশে। কলকাতায় ওটা আটপৌরে গিন্নি রোগ। তোমার বাবাকে বলে দিও ত যে হিতেন জ্যাঠা বলে দিয়েছেন উনুনের ধোঁয়া নিয়ে চ্যাংড়ামো না করতে। কই, সমাজে আসেনটাসেন না ত তিনি। 'হিতেনবাবুর মুখ সেদ্ধ বেগুনের মত দুমড়ে কুঁচকে উঠল, তিনি বনচ্ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এত সন্দুর মেয়ের দিকে এরকম দৃষ্টির দ্রার্ঢ্য নিয়ে যে-মানুষ তাকাতে পারে তার ভেতরে একটা আলাদা শক্তিই আছে, সংসারের বাসনা কোনো প্রশ্নই নয় হিতেনবাবুর সাধনার জীবনে, ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তিনি তবে তাঁর দক্ষিণমুখকে যদি হিসেবের ভেতর গ্রাহ্য করতে হয় তাহলে বনচ্ছবির মত এই রূপের পরাকাষ্ঠাই ত তিনি, না অরূপ, কুরূপ? হাঁটতে-হাঁটতে কুঁজো হয়ে প্রায় বুকের ওপর মুখ ঠেকিয়ে ভাবছিল ফাটা।

'এত কথা?' সরোজিনী খানিকটা হাঁপিয়ে উঠে বললেন, 'আমি টিনিকে বলছিলাম সুকুমারের জন্যে একটা মশারি ঠিক করে রাখতে—'

'আমাদের বাড়তি মশারি কোথায় মাসিমা?'

'দু'টো রয়েছে ত।'

'হ্যাঁ, বড়টায় আমরা দু'জনেই শুই, আরেকটায় ছাতুবাবু।'

'সুকুমারের পাশ দিয়েই শোবে ছাতু আজ, বেশ ঢালা বড় বিছানা ত, আমাদের বড় মশারিটা ওখানেই টাঙিয়ে দিও, আমরা ছাতুর মশারিতে শোব।'

'তোমাদের কোনোরকম ডি-ডি-টি নেই বনচ্ছবি?' ফাটা বললে।

'কিচ্ছু না, বাসমতীতে কিচ্ছু মিলছে না আজকাল, বনচ্ছবি বললে, 'এরকম চীনে টেংরি পাওয়া যেত—কিট না কি জ্বালালে মশা মরে যেত কিন্তু আজকাল আর সেগুলোও পাওয়া যাচ্ছে না।'

'যুদ্ধে ঝেড়ে পুছে উজোড় করে নিয়েছে সব।'

'কলকাতার চোরাবাজারে গিয়ে ঢুকছে। বাসমতীর চোরাবাজারেও মোটাসোটা দু'চারটে জিনিস ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না।'

'আমার কাছে ফ্লিট আছে, দেব তোমাকে। 'হিতেনবাবু ঠিকই বলেছেন উনুনের ধোঁয়া খারাপ। কিছু ফ্লিট আনাব বাসমতীতে আপনাদের সকলের জন্যে,' 'পায়চারি করতে-করতে জানালার পাশে থেমে দাঁড়িয়ে ফাটা বললে, 'এখানে মশা মাছি উৎখাত করবার জন্যে কতগুলো জিনিসের আমদানি করলে মন্দ হয় না, একটা ব্যবসাও চলতে পারে। করো না ছাতুবাবু এই ব্যবসা, আমি বাসমতীর চকবাজারে ঘর ঠিক করে দিচ্ছি, টাকা দিচ্ছি, কলকাতার থেকে মাল চালাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'না গো,' ছাতুবাবু কাতরে উঠে বললে, 'আমি ব্রাহ্মসমাজের কাজ করছি, আমার সময় কোথায়? সারা জীবনে ব্রাহ্মসমাজের কাজে ঢেলে দিয়ে এখন বুড়ো বয়সে ডি-ডি-টির ব্যবস্থা করব। বেশ বলছ হে তুমি ফাটা।'

'তোমার কাছে ফ্লিট আছে ফাটা?' সরোজিনী যেন বিন্না ঘাস খুঁজতে গিয়ে অনেকখানি পদিনার শাক দেখে ফেলে চমকে উঠে বললেন, 'কাল আমার ঘরগুলো একটু ঠিক করে দিও তাহলে। আমার ঘরেই ত ব্রাহ্মদের আসতে হয়, সন্ধ্যের পরে সমাজের কমিটির মিটিঙ, ব্রাহ্মবন্ধু সভা, এমনি সামাজিক অধিবেশন, মেলামেশা কথাবার্তা, সবই ত এই দু'পাঁচখানা ঘরে। ওঁরা বসে মশার কামড় খাবেন সেটা ভাল নয়। ফ্লিট দিও তুমি ফাটা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, আমাদের ঘরে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিন ত কিছু—কী যে মশা, কী যে মশা।' টিনি বললে 'খুব ভাল হয় এর পর কলকাতার থেকে যদি কিছু আনিয়ে দিতে পারেন-আমরা রেখে দিতে পারি তাহলে। ব্রাহ্মরা ত সন্ধ্যের পর প্রায়ই জমেন এসে আমাদের এখানে। বেঁচে যাই যদি কামড় থেকে একটু রেহাই পাই আমরা সকলে। ভাল করে কথাটথা হতে পারে।'

'ফাটা যে আজ এখানে থাকবে বলেছিল টিনি?

'হ্যাঁ, ফাটাবাবুকে হাতেগড়া আটার রুটি, অড়হরের ডাল, ডুমুর চচ্চড়ি, আর পেঁপে বড়ির তরকারি দেব।'

'সুকুমার ও আমার জন্যে বাড়তি রান্না করে রেখেছেন নাকি আপনারা?'

কী করে জানলেন আগের থেকে?'

'সুকুমার আসবে বলেছিল। ছাতু সন্ধ্যের পর বললে যে সে কিছু খাবে না-চোঁয়া ঢেকুর উঠছে। আমরা দু-চারখানা বেশি রুটি ও একটু মুঠো আলগা করে তরকারি টরকারি রেঁধে রাখি পরদিন সকালে চায়ের সঙ্গে খাবার জন্যে,' সরোজিনী বললেন, 'আমি মাছ খাই না, টিনিও খাচ্ছে না আজকাল। ছাতু খায়। এ বাড়িতে মাছটাছ বেশি আনা হয় না। সরোজিনীদির বাড়িতে তোমাকে নিরামিষ খেতে হবে আজ ফাটা। আপনাদের কাউকে চা-টা দিতে পারলাম না হিতেনবাবু গগনবাবু। ধানরাজের মাকে চা চিনি পূর্ণ ময়রার দোকান থেকে একটু জ্বাল দেয়া দুধ আনতে বলেছিলাম; রাত দশটা বাজিয়ে এসে আমার আচারের থালা—' সরোজিনী একটু থেমে গিয়ে বললেন, 'ফ্লিটে কি মশা মরে ফাটা?'

'মশা মাছি কুমরো পোকা-সব।'

'ছাতু আর সুকুমার শোবে এক বিছানায়। নাকি তুমি শোবে সুকুমারের সঙ্গে? উত্তরের কোঠায় একটা দড়ির চারপাই আছে, সেখানেও শুতে পার। আরো একটা মশারি রয়েছে আমার কিছু জায়গায় ফেঁসে গেছে, গড়িমশি করে তালি দেয়া হয়নি। ওটা দেব তোমাকে।'

'আজ রাতে কি আর শোবার দরকার হবে সরোজিনীদি?'

'কেন?'

'এই ত বেশ কথাবার্তা হচ্ছে; হিতেনবাবু এত রাত অবদি কোথাও থাকেন নি; উনিও আজ বসবেন।'

'আমি উঠি।' হিতেনবাবু বললেন।

'বাইরে খুব বেশি অন্ধকার,' টিনি বললে।

গগনবাবু পকেট থেকে টর্চ বের করে বললেন, 'না, জ্বলছে না, যা ভেবেছিলাম তাই-আলোর কাছে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তার পুড়ে গেছে।'

'মোম এক টুকরোও নেই টিনি? হিতেনবাবুর সঙ্গে দিয়ে দিতাম।'

'একটুও নেই, 'টিনি বললে, 'নিভে যাচ্ছে যেন সুনীতিদির বাতিটা।'

'তেল ফুরিয়ে আসছে,' বনচ্ছবি বললে।

'বাতিটা আমার নয়—বিশাখার,' টিনিকে বললে সুনীতি।

'সিদ্ধার্থ বাড়ি ফিরছে?' সরোজিনী জিজ্ঞেস করলেন।

'না।'

'জিরানডাঙায় কলেরা নেই ত এখন আর?'

'অন্য কোথাও গেছে,' টিনি বললে।

'হ্যারিকেনটা নিভে যাবার আগে হিতেনবাবুকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি আগে,' বাতিটা হাতে তুলে নিয়ে ফাটা বললে।

ফাটার সঙ্গে চলে গেলেন তিনি।

গগনবাবু অন্ধকারের ভেতর চুরুট জ্বালালেন। ঘরদোর সব ঘুরঘুট্টি। চুপ চাপ হয়ে গেছে দেখে ধানরাজের মা একটু ভরসা পেয়ে এক দু'পা করে এগিয়ে এসে বললে, 'আমি কেরোসিন তেল ফেলে দিই নি, বাতিটা জ্বালিয়ে আনব?'

'তাই আনো বাছা' ছাতু বললে, 'তেল নিয়ে অত কড়াক্কড় চলবে না, চোরা বাজার থেকে এনেছ বেশ করেছ, কী করবে আর? আমাদের কর্তারা যদি আমাদের বাঁচাতে না পারেন, মান-অভিমান বা খুঁতখুতি করে আমাদের মরে গেলে চলবে না ত! মড়ার কোনো ধর্ম নেই, না বুঝে নিজেরা যদি মরণের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ঠিক মনে করি তাহলে ধর্মই মরবে। দেশকাল বুঝে মানিয়ে নিয়ে ধর্ম আর ধার্মিককে চলতে হবে ত।'

'আমি ঠিকই বলেছিলাম', সরোজিনী বললেন, 'ও-তেলটা ধানরাজের মা ফেলে দিলে ভাল করত।'

'কেন?'

'বরং একটু অন্ধকারেই থাকা যাক। কী ক্ষতি হচ্ছে? কিন্তু চোরাবাজারকে অল্প-স্বল্প সায়-দিতে মনের অভ্যাসটা খারাপ হয়ে যাবে ক্রমে,' ধানরাজের মার কড়কড়ে আলোর দিকে তাকিয়ে চোখটা একটু ধাঁধিয়ে গেল সরোজিনীর, 'একটি চিজ তুমি—' সরোজিনী বললেন, 'সেই চোরাই আলোই নিয়ে এলে ত শেষ অবদি। আর এই প্রথম হেমন্তের রোদে দেয়া আমার মীরমহলের জলপাইগুলো-মিষ্টি মশলা ঝাল পাঁচফোঁড়ন দিয়ে মেখে রোদে তাতিয়ে আমি বোতল বোতল তুলে রাখব, তুমি'—

'বাতিটা তাহলে নিভিয়ে ফেলব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নিয়ে যাও বাতিটা।'

'নিয়ে ফেলে দেব?'

'নিভিয়ে রাখো।' টিনি বললে।

'বাতিটা থাক,' গগনবাবু বললেন।

'কেন?'

'তোমরা যদি অন্ধকারে থাকতে চাও থাকো.' ছাতু বললে, 'বাতিটা নিয়ে যাচ্ছি আমি, গগনবাবুদের জন্যে একটা রিকশা ডেকে আনতে হবে।'

'দুটো রিকশা ছাতুবাবু-একটায় হবে না।' বিশাখা বললে।

'একটা-গগনবাবু আর বিশাখার জন্যে' ছাতু বললে, 'তুমি মোটর সাইকেলে যাবে না বনচ্ছবি, ফাটা বলছিল?'

'না-দু'টো রিকশাই নিয়ে এস ছাতু, ওরা দু'জন একটায় বসবে, আমি আর একটায়, ওদের মীরমহল পৌছিয়ে দিয়ে দানাপুর চলে যাব আমি। বারটা বেজেছে। এত রাতে বাসমতীতে বার বার ঘোরাফেরা ঠিক হবে না ফাটার। কেমন যেন ভীমরুলের চাকের মত হয়ে আছে সমস্ত শহরটা।'

'যা-পথ ঘাট সাহেবডাঙার থেকে মীরমহলে আর দানাপুর তাতে মোটর সাইকেল উতরোবে কী করে-বিশাখা বললে।

'তিনি চালিয়েছেন ত সারাদিন।'

'কী করে জানলে তুমি বনচ্ছবি?' গগনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'নীরেনদা কাল ত কলকাতা থেকে এসেছেন। এ দু'দিন চলাফেরা করছেন ত বাসমতীতে; মোটর সাইকেল এনেছেন যখন—ফেলে রাখেননি।'

'বেশ, তাহলে একটা রিকশাই এনো ছাতু।'

'কে যাবে একটা রিকশায়?' বনচ্ছবি বললে।

'আমাদের দু'জন। আর-একজন মোটর সাইকেলে যাবে।'

'ফাটা আবার যাবে, আবার আসবে, খাবে ত এখানে—' সরোজিনী বললেন,

'ঘুমবে, রাত প্রায় একটা বাজতে চলল, তোমরা গগনবাবুর সঙ্গেই রিকশাতে চলে যাও। রিকশাই ডেকে আনো ছাতু—'

'ছাতু, একটু আলোটা দেখাও ত, এই আচারের থালাটা ধানরাজের মা বের করে নিয়ে যাক।'

থালা নিয়ে গেল ধানরাজের মা। ছাতু হ্যারিকেন হাতে করে রিকশা ডাকতে চলে গেল। ঘরে অন্ধকার জমে উঠেছে, হুড় হুড় করে এসে পড়েছে যেন সব, ছাতুর হ্যারিকেনের শেষ ঠিকরানিটা মিলিয়ে যেতেই। আশেপাশে কোথাও কোনো বাড়ি নেই, অনেক দূরে দূরে বাড়িগুলোতে কোথাও-কোথাও আলো জ্বলছিল বটে, কিন্তু নিভে গেছে অনেকক্ষণ আগে। মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা এ-বাড়ির থেকে খানিকটা দূরে, সেখানে ইলেকট্রিক বাতির ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু একটা ল্যাম্পপোস্টের চেয়ে আর একটা পোস্ট ঢের বেশি দূরে, আলোর বিধিব্যবস্থা বিগড়ে আছে অনেকদিন ধরে। বাল্ব লাগিয়ে দিয়ে গেলেও কারা যেন খসিয়ে নিয়ে যায়, লম্বা সরু ল্যাম্পপোস্টগুলো ন্যাড়া সুপুরিগাছের মত অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে, রাত্তির হলে বাসমতী না হোক, সমস্ত সাহেবডাঙাটাই যে প্রেত, পৃথিবীই প্রেত হয়ে যাবে একদিন, কেমন যেন ধূসর দেহশক্তির নিঃশব্দতায় সেই কথা বলতে চায় এক-আধজন একা লোককে।

'খুব ত অন্ধকার, আমি এত রাত অবদি জেগে দেখিনে শিগগির,' গগনবাবু বললেন, 'তা ছাড়া আমাদের ঘরে সব সময়ই বাতি জ্বলে রাতে—'

'কেরোসিনের বাতি?'

'হ্যাঁ, কেরোসিনের বাতিটা ডিম করে রেখে দিই সারারাত। দানাপুরের ফুড কমিটি সাহেবডাঙার মত অত খারাপ নয়। ওখানে বেশি কেরোসিন তেলের বরাদ্দ আছে।'

'মীরমহলেও' বনচ্ছবি বললে, 'মীরমহল দানাপুর মিলিয়ে একটা ফুড কমিটি ত, তুমি সেই কমিটির সেক্রেটারি ত গগন কাকা।'

'এ মাস অবদি আছি। আসছে মাস থেকে ছেড়ে দেব।'

'কেন? বড্ড মুস্কিলে পড়তে হবে তাহলে আমাদের,' বিশাখা বললে' এই ত দেখছেন সাহেবডাঙার অবস্থা, না দিচ্ছে কেরোসিন, না জ্বালছে রাস্তায় বাতি। কী-রকম ঘুরঘুট্টি অন্ধকার সমস্ত সাহেবডাঙাটা। এর ভেতর কী করে থাক তোমরা টিনিদি?'

'কে এখানকার ফুড কমিটির সেক্রেটারি?' গগনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'রতিলাল ঘোষ, বাসমতী কলেজেরই একজন বকাটে ছেলে, তিনবার বি-এ ফেল করে ঝাউডাঙা স্কুলে মাস্টারি করত, সকলে মাস্টারমশাই বলে ডাকে, মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে চোরা-বাজারে ঢুকে রতি ঘোষ টাকা করেছে অনেক, সাগরেদ জুটেছে ঢের, তারই জোরে রতি ঘোষ ফুড কমিটির সেক্রেটারি হয়ে গেল। আমাদের কর্তারা কী রকম যে জেগে ঘুমোন বাসমতীর প্রথম ষাট বছরে আমি যা দেখিনি এই শেষের দশটা বছরে তার দশগুণ দেখে নিলাম গগনবাবু।'

'কিন্তু কর্তারা নিজেরাও ত এক-একটি রতি ঘোষ, আমি জানি সব,' গগনবাবু চুরুটে দু-চারটে টান দিয়ে বললেন, 'সেইজন্যেই দানাপুর মীরমহলের ফুড কমিটির দায়িত্ব আমি ছেড়ে দিচ্ছি, এসব কাজে ঢের ভালমানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরকার ছিল, দেশের গরিবদের গেরস্থদের এ-রকম দুরবস্থার সময় সত্যি উপকার হত কিছু-কিছু কিন্তু তা হবার নয়। যারা নিজেরা সুবিধা চায় শুধু রাতারাতি বড়লোক হয়ে যেতে চায় তাদের ভিড় বেড়ে যাচ্ছে-চারদিকে। আমি যদি চাই, যদি সেক্রেটারি হয়ে এঁটে বসে থাকতে চায়, ওরা আমাকে নাড়তে পারবে না কিছুতেই। কিন্তু কোনো লাভ নেই এ-সব জোচ্চর লোচ্চাদের ভেতর বসে থেকে কাজ করে-এতে কারুরই কোনো উপকার হবে না। আমি উনিশ শ তেতাল্লিশের কয়েকটা মাস, গোটা চুয়াল্লিশ আর পঁয়তাল্লিশের খানিকটা সময় ফুড কমিটির সেক্রেটারির কাজ করেছি, তখন দানাপুরের কমিটি আলাদা ছিল, মীরমহলের সঙ্গে মিশে যায়নি, দেশের খুব খারাপ অবস্থা ছিল তখন, তবুও জিয়াউদ্দিন কালেক্টর ছিল বলে খানিকটা কাজ করতে পেরেছি।

গগনবাবু বাঁ-হাতের থেকে ডান হাতে কুড়িয়ে নিয়ে মুখের দিকে তুলে নিলেন চুরুটটাকে, কিছু বলবার আগে তামাকের পিপাসা মিটিয়ে খানিকটা আগুন ঠিকরালেন। তাকিয়ে দেখছিল চুরুটের মুখের সেই আগুন খণ্ডটার দিকে সকলে, চারদিককার কালো চৈতন্য কালো শূন্যের মত অনর্গল অন্ধকারের চলাফেরার ভেতরে।

ফাটা এখনো ফিরে এল না। হিতেনবাবুদের বাড়িটা অবিশ্যি এখান থেকে পোয়াটাক মাইল দূরে। পথে হ্যারিকেনটা নিভে যায়নি ত? নিভে গেলেও অবিশ্যি ক্ষতি নেই বিশেষ কিছু। দরকার হলে গরিলার বুড়ো বাঘের মত হিতেনবাবুকে কাঁধের ওপর ফেলে তার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে পারবে ফাটা। গায়ের শক্তি এবং গোষ্ঠীমমতার দিক দিয়ে গরিলার মত, চেহারার দিক দিয়ে অবিশ্যি মানুষের মত মানুষ-টিনি ভাবছিল।

ছাতু রিকশা ডেকে আনতে দেরি করে ফেলছে—গগনবাবুর মনে হচ্ছিল, তিনি নিজে গেলেই ভাল হত। তাজ মহম্মদের আস্তাবলটা ছিল যেখানে, কাছেই ত, সেখানে ছ্যাকরা গাড়ির দু'টো খোল আছে এখনো, রোগা ছিঁচকে হাড়গোড়ের মতন দু-তিনটে ঘোড়াঘুড়ী চরে বেড়ায়, একটা ঘুড়ী দু'টো ঘোড়া, খেয়ালে আছে সব গগনবাবুর, সেইখানেই শাহাবুদ্দিনের সাইকেল রিকশার ঘাঁটি, চেনে ত খুব ভাল করে ছাতু, এত দেরি হবার ত কথা নয়। একটা বাজে, এত রাতে দানাপুরে যেতে হলে রিকশা মাথায় দেড় টাকার চাইবে হয়ত। কিন্তু হাতলেও সরোজিনীদির এখানে সারারাত বৈঠক না বসিয়ে-এখনো বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল। সকলেই সব দিক দিয়ে দেরি করে ফেলছে-রাতটা শেষ পর্যন্ত বসে-বসেই এ বাড়িতেই কাটিয়ে দেবার সামিল হয়ে উঠল দেখছি, কিন্তু যেতে হবে, যেতেই হবে, বনচ্ছবি বিশাখাকে গগনবাবুই সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলে দেরি করিয়ে দিয়েছেন।

অনেক আগেই ছাতুর সঙ্গে রিকশা করে ওদের পাঠিয়ে দিতে পারতেন। যাক-যত রাতই হোক, ওদের মার কাছে হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে তবে নিজের বাড়ি ফিরবেন।

'সিদ্ধার্থ এসেছে?' সরোজিনী বললেন।

'না। এলে ত টের পেতাম। ও-ঘরে তালা মেরে এসেছি।'

'রাত ত একটা হল। কোথায় ঘুরছে?' সরোজিনী জিজ্ঞেস করলেন।

'কে সিদ্ধার্থ?' গগনবাবু বললেন, 'কোথাও গিয়েছে নিশ্চয়ই-ঠেকে পড়েছে। ও ত দু-চারটে ব্যাপারের কনভেনার, কিসের কিসের যেন সেক্রেটারি, সদর বাসমতীতে এখনো আলোটালো জ্বলছে মন্দ না, লোকজন চলাফেরা করছে, সভা সমিতি ভাঙছে। আপনাদের সাহেবডাঙার দিকটা সরোজিনীদি একেবারে নিঃসাড়।'

'মীরমহল এত গ্রাম-গ্রাম নয়।' বিশাখা বললে।

'এ যে পাড়াগাঁয়ের ও বাড়া, শীত রাতের অন্ধকারে মনে হয় কোথায় থেকে কোথায় চলে গিয়েছি আমরা। জঙ্গলের ভেতর পাখির ডিমের মত গাছ থেকে পড়ে গিয়েছি যেন,' টিনি বললে, 'পৃথিবীর একেবারে কিনারে পড়ে রয়েছি। আমরা শীত রাতের অন্ধকারে মাঝে মাঝে হুট করে বাইরের অন্ধকারে হারিয়ে যাই, পৃথিবী টিথিবী কিছু নেই আর সেখানে বনচ্ছবি।'

'তুমি তবু ঘুমিয়ে থাক, ঘুমের ভেতর দিক্‌বিদিক বলে আর কিছু থাকে না-সবই এক পুঁটলিতে ঠেকে, নিরাপদ নিশ্চিন্তি। কিন্তু আমার ত তা নয়-কেবলি চটকা ভেঙে যায়, ঘুমোই, আবার জেগে উঠি-কোন দিকে যে ইস্টিমারের সিটি, বংশাল, মীরমহলের শ্মশান, দানাপুরের ভাটিখানা, হাসপাতাল, সব জড়িবড়ি হয়ে যায়। একবার মনে হয় মন্দিরে শানের ওপর আছি, বড় কমলবাবু ওপরের গ্যালারিতে শুয়ে আছেন, কখনো মনে হয় দেববাবু উপাসনা শেষ করে চলে গেছেন, বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছে সব, আমি একা পড়ে আছি। হঠাৎ মনে হয় দাদা কী একটা কথা বলে ঘুমতে চলে গেলেন, কাল খুব সকালে সব্বায়ের সমাজে যেতে হবে। মনে হয়, যেন বাসমতীতে নেই আমি কলকাতায় চলে গেছি, শাস্ত্রীমশাই একবার আমার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বসলেন, সামনের বড় শূন্যটা কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির। তাকাতে-তাকাতে ঘুমের ভেতর থেকে নিজেকে ভাল করে খসিয়ে টের পাই বাসমতীতে রয়েছি অনেক দূরে চলে এসেছি জীবনের পথে, জানালার ভেতর দিয়ে সিদ্ধার্থের আটচালা আর আম-মহানিমের গাছের ঝুপসি-' সরোজিনী বললেন, টিনির মত যদি একটানা ঘুমতে পারতাম আমি তাহলে এ বুড়ো বয়সে পৌছে সাহেবডাঙার অন্ধকারেও এতটা নাকানি-চোবানি খেতাম না। কিন্তু ঘুম হয় না, ব্রোমাইড খেতে হয়, এ-রকম একটা ধরাবাঁধা রোগ আমার নেই। ঘুম হয়, মাঝে-মাঝে বেশ দিব্বি ঘুম এসে পড়ে, কিন্তু ডায়াবেটিস আর প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের গোলমালে ঘুমবে কার সাধ্যি। বারবার উঠতে হয়।'

ডায়াবেটিসের জন্যে সময় দত্ত দেখছিল না আপনাকে?'

'হ্যাঁ দেখেছে। এর আর কিছু করবার নেই ত। ডায়েটিং। তা সব সময়ে একনাগাড়ে সব রকম স্টার্চ কার্বোহাইড্রেট বাদ দিয়ে চলতে প্যারি না। আমারই দোষ। টাকাকড়ি নেই-তাও খুব গুণের কথা নয়। সব দিক দিয়েই দেখতে পাচ্ছি ত বুড়ো বয়সে-বাসমতীতে পড়ে থেকে।'

'ওষুধ ত সেই ইনসুলিন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে, ওষুধ নানারকম। দামি ওষুধ। ভাইয়েরা মাঝে-মাঝে পাঠায় কলকাতার থেকে। তবু ফুরিয়ে যায়-ফুরিয়ে গেলেই কিনে পাঠাতে লিখতে পারি না। নিজের টাকা আর নিজের বাপের টাকা আর নিজের ডান হাত—আর সব সত্যিই—' কথাটা শেষ না করেই জুতসইভাবে শেষ করে নিলেন সরোজিনী, 'এ বুড়ো বয়সে কোনোরকম ওষুধেই হয় না কিছু। রোগটা হচ্ছে বয়স। তবে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের অপারেশনের কথা বলে কেউ-কেউ।'

'ওটা সুবিধা হবে না,' গগনবাবু বললেন।

'এ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নাকি অপারেশন করে ভাল আছেন শুনলাম।

'প্রিন্সিপ্যাল আপনার চেয়ে ঢের ছোট, ষাট হয়েছে হয়ত। অবিশ্যি দেবেন গাঙ্গুলি মশাই বাহাত্তর বছর বয়সে অপারেশন করিয়ে এলেন ত কলকাতার থেকে, হাসপাতালে ছিলেন অনেকদিন আলাদা বেড ভাড়া করে, তারপরে চেঞ্জে গিয়েছিলেন, এখানে এসে ভালই বোধ করছেন।'

'টাকাঅলা মানুষ।'

'দু-চারটে লেগে যায় বেশ, কিন্তু প্রায়ই ফেঁসে যায় সার্জিকাল অপারেশন আপনাদের মত এই বয়সে।'

'নাক ডাকাচ্ছে কে?' সরোজিনী বললেন।

'সুকুমার।'

'ওর কোনো ফ্যাসাদ হল নাকি গগনবাবু।

'না, কিচ্ছু না, তাহলে কি আর-এরকম আওয়াজ বেরুত।

'আমি দেখেছি মর্ফিয়া ইনজেকশন করে এরকম হামাদামি করে নাক ডাকে মানুষ।'

গগনবাবু চুরুটে টান দিতে যাচ্ছিলেন, মর্ফিয়ার কথা শুনে থেমে, গেলেন 'কলিকের টলিকের ব্যথা আছে সুকুমারের?'

'না, শুনি নি ত।'

'মর্ফিয়া ইনজেকশন দিয়েছে কখনো?'

'বলে নি ত কোনোদিন আমাকে।'

'ফাটা এখনো এল না, হিতেন বাবুরবাড়ি চেনা নেই নাকি ওর, হিতেনবাবু নিজে ত চেনেন?'

'ফাটাবাবুর মোটর সাইকেলটা কি বাইরে নাকি?' টিনি বললে।

'হ্যাঁ,' বনচ্ছবি বারান্দায় গিয়ে ফিরে এসে বললে, 'উঠোনে আছে।'

'ওটাকে ঘরে এনে রাখা উচিত,' গগনবাবু উঠবার উপক্রম করে বললেন। কিন্তু মোটা মানুষ, যে-রকম চেহারার বহর সেই অনুপাতে গায়ে জোর নেই কিছু, দম রাখতে পারেন না, একা পারবেন না। জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ত সাইকেলটাকে, একটু নজর রেখো ত বনচ্ছবি, বাসমতীতে আজকাল জোচ্চোর শয়তান বাড়ছে-ভদ্রঘরের ছেলেদের ভেতরও।'

সুনীতি বললে, 'আলো একটা থাকলে আপনারা খেতে বসতে পারতেন সরোজিনী পিসিমা। দেরি হয়ে গেল বড্ড।'

'তুমি খেয়েছ?'

'না।'

'আলোটা এলে তোমার খাবার নিয়ে এস এখানে, ঢাকা দিয়ে রেখো সিদ্ধার্থেরটা। কটা বাজল গগনবাবু?

'একটা বেজে গেছে।'

'বাঃ, এল না ত ছাতু।' সরোজিনী বললেন।

'ফাটাও ত এল না।'

'একে একে পুরুষরা অন্তর্ধান করল দেখছি সকলে,' টিনি বললে, 'যদুবংশের মেয়েদের মত অবস্থা হল বুঝি আমাদের। কেউ নেই, কিচ্ছু নেই, বাইরে মোটরসাইকেলটা, সুকুমার হয়ত মর্ফিয়া ইনজেকশন করে ঘুমচ্ছে। গগনবাবুর ব্লাডপ্রেসার এমনিতে একশ পঁচাত্তর দু'শ আন্দাজ-রাত জেগে চুরুট টেনে—টেনে আড়াইশোয় চড়ল বুঝি। এখন যদি কেউ আমাদের ওপর চড়াও হয় তাহলে—'

'তুমি বেশি কথা বল টিনি,' সরোজিনী একটু কর্কশতা দেখিয়ে বললেন, 'রাত দেড়টা,' গগনবাবু বললেন।

'তাহলে নীরেনদা যা চেয়েছিলেন, সারারাতের বৈঠক, তাই ত হল,' বনচ্ছবি গগনবাবুকে বলছিল।

'তাই ত হল,' ঘরের ভেতরে ঢুকে ফাটা বললে, তার হাতের হ্যারিকেনটা নিভে গেছে।

'বাতিটা কি যাওয়ার পথেই নিভল নাকি নীরেনদা, না ফেরবার পথে?'

'তাহলে বসবে তোমরা এখন সকলে, এত রাতে কে কোথায় আর যাবে,' ফাটা বললে, 'বেশ একটা হ্যারিকেন জুড়ে দিয়েছিলে তুমি আমার হাতে বনচ্ছবি, আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখো ত—'

'কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—' বনচ্ছবি একটু এগিয়ে গিয়ে ফাটার পায়ের সমান্তরাল অসংখ্য পায়ের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললে। কিন্তু পা নয়ত ওগুলো-অন্ধকার; কোনো জ্যামিতিক রেখার মত নয়-বিভোল বিন্যাসে রাশি রাশি হয়ে দেখা দিচ্ছে যেন এখন।

'আমিও দেখতে পাচ্ছি না কিছু, তবে হিতেনবাবুর বাড়ির থেকে ফেরবার সময় রাস্তা ধরে চলতে—চলতে ধানজমি-মাঠ-কাদা-গোবরের একটা তিন মাইল চক্কর ঘুরে এলাম। চক্করটা কেন যে দিতে হল বুঝতে পারলাম না। হিতেনবাবুর বাড়ি ত এখান থেকে শোয়া মাইলের পথ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অনেক কাদা-গোবর লাগল বুঝি,' গগনবাবু বললেন,' হ্যারিকেনটা কখন নিভল?'

'ও হ্যারিকেনটা বিশাখারও নয়,' বনচ্ছবি বললে, 'সিদ্ধার্থদার এখানে আসতে-আসতে রাত হয়ে গেল, পথে হিরণদের বাড়ির থেকে ও এনেছে।'

'ছাতুবাবু কোথায়?' ফাটা বললে।

'রিকশা ডাকতে গেছে-তোমারই সঙ্গে সঙ্গে গেল ত প্রায়,' সরোজিনী বললেন, 'আসছে না।'

'আচ্ছা আমি দেখছি, রিকশার আস্তানাটা কোন দিকে গগনবাবু?'

'রাস্তায় নেমে সোজা পুবমুখো গিয়ে, প্রথম বাঁ হাতি গলিতে ঢুকে, ও, তুমি তাজ মহম্মদের আস্তানাটা চিনতে না?'

'সেইখানে?'

'সেইটাই তিনচাক্কির আস্তাবল হয়েছে।'

'চললে নীরেনদা?'

'কাল দুপুরে তুমি সমাজবাড়িতে যেতে পারবে বনচ্ছবি। ছাতুবাবুকে নিয়ে যেও।'

'কেন?'

'ওখানেই আমি আছি। সমাজ-টমাজ নিয়ে কথাতার্বা হবে,' বলতে-বলতে বারান্দায় এসে চুরুট জ্বালিয়ে নিল ফাটা।

ছাতু রিকশা নিয়ে এসে পড়েছে।

তিনজনেই চলে গেল ওরা। সিদ্ধার্থ এখনো আসেনি।

সরোজিনী, টিনি, সুনীতি, ফাটা হ্যারিকেনের আলোয় পুবদিকের ঘরের টেবিলে বসে খেয়ে নিল। নিজের ঘরে চলে গেল সুনীতি। জাগল না সুকুমার। সুকুমারের পাশে ছাতুবাবুও ঘুমিয়ে পড়েছে। দড়ির চারপাইয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল ফাটা। সারারাত জেগে কথাবার্তা বলেই কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল সে, কিন্তু সকলেরই ঘরে ফিরে যাবার, শুয়ে পড়বার দিকে মন।

টিনি একটা মশারি নিয়ে এল।

'আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন ফাটাবাবু।'

'না, ব্রোমাইড আছে?'

'কেন, ঘুম আসছে না?'

'কেমন যেন পা টিপে-টিপে আসছে।'

'মশারিটা টানিয়ে দিই?'

'তাহলে গরমে হাঁপিয়ে উঠব না?'

'গরম কোথায়?' টিনি বললে, শীত পড়েছে,—আপনি গায়ের ধরাচুড়ো খসিয়ে নেবেন ত? মোজা বুট সবই এঁটে আছেন দেখছি।'

'ব্রোমাইড নেই?'

'না। অনেক দিন থেকেই নেই। গেল বছর মাঝে-মাঝে খেত মাসিমা, তারপর ছেড়ে দিয়েছে।'

'নিতান্তই কিছু খেতে চান?' টিনি মশারিটা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বললে।

ফাটা পা ঝুলিয়ে ডান হাতের কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে বসে বললে, হ্যাঁ যাতে ঘুম আসে।'

'শরীরে কোথাও কোনো ব্যথা আছে?'

'না,' ফাটা মাথা হেলিয়ে বললে, 'শরীর দিব্বি। তবু ঘুম আসছে না।'

'রাত কত?'

'দু'টো প্রায়। ঘুমিয়েছেন সরোজিনীদি?'

'না। আজ রাতে কারুরই ঘুম হবে না দেখছি। আমরা এমনি সাড়ে ন'টা দশটার সময় শুয়ে পড়ি; টিনি হাতের মশারিটা ফাটার বিছানার এক কিনারে আস্তে ঝুপ করে ফেলে দিয়ে বললে, 'যেদিন মাসিমার বাড়িতে ব্রাহ্মবন্ধু সভা বা সমাজকমিটির মিটিং থাকে সেদিনও শুয়ে পড়তে-পড়তে সাড়ে দশটা এগারটার বেশি হয় না। দু'টো বেজে গেল আজ।'

'বড্ড ভেল্কি লাগিয়ে দিলাম তাহলে আমি এসে, 'ফাটা পকেট থেকে পাইপ বের করে বললে।

'এখন আর ওসব নাই-বা খেলেন ফাটাবাবু,' ব্রায়ার পাইপটার দিকে তাকিয়ে টিনি বললে, তাহলে আরো অস্বস্তি বোধ করবেন, ঘুম হবে না। আপনাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিই।'

'না, তেষ্টা পায়নি। জল আমি কম খাই না, জলই খাই। খেতে বসে ঢের জল খেয়েছি আজ। আজ রাতে আর লাগবে বলে মনে হচ্ছে না। পাশের ঘরেই আপনি আর সরোজিনীদি শুয়েছেন?'

'হ্যাঁ, দশ বছর ধরেই এক খাটে শুই, অভ্যাস হয়ে গেছে। না-হলে মাসিমা ঘুমতেই পারে না। আমি অবিশ্যি—'

'এ ঘর থেকে ওর ঘরে যাবার দরজা ত খোলা আছে দেখছি।'

'ওটা খোলাই থাকবে। বন্ধ করবার দরকার নেই ত কিছু।'

'ও-ঘরে কুজোয় জল রয়েছে ত?

'আছে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তেষ্টা পেলে নেব গিয়ে,' ট্রাউজারের পকেট থেকে পাউচ বের করে ফাটা বললে, 'কিছু মনে করবেন না, দু-চারবার হয়ত যেতে হবে আপনাদের ঘরে। তবে যদি ঘুমিয়ে পড়ি। না হলে পাইপ জ্বালিয়ে বসে থাকব সারা রাত। মশারি কী হবে?'

'টানিয়ে দিই?'

'না, মশা লাগে না,' ফাটা পাইপের ভেতর তামাক ভরতে-ভরতে বললে, যখন ঢাকা গিয়েছিলাম মাঘ মাসে, বছর আষ্টেক আগে, মশারি টানাতে হয়েছিল। এখন অবিশ্যি ঢাকায় গেলেও লাগে না—ছারপোকা মশা কিস্যুতে ঘুম বাধে না। কিন্তু ব্যতিক চড়ে গেলে ঘুমতে পারি না।'

'সকলকে নিয়ে সারারাত জাগবেন ঠিক করেছিলেন; হিতেনবাবু আর মাসিমাকে ছেড়ে দিলে সে-জিনিসটা জমত।'

'আমরা কথাবার্তা বলছি, সরোজিনীদি শুনছেন?'

'শুনছেন হয়ত,' টিনি ঘরের কোনো খামচির অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভেবে নিয়ে বললে, আপনি সুকুমার যা করেছে তাই করুন।

পাইপ জ্বালিয়ে ফাটা বললে, 'আচ্ছা, আনুন তাহলে। আমি ভেবেছিলাম জেগে কাটাব, আপনিও বসতেন বেতের চেয়ারটায়। বাসমতীতে এলে অনেক কথা মনে পড়ে, কথাবার্তা বলে রাত কাটাতে ইচ্ছে করে: আপনারা ত বাসমতীর অনেক দিনের মানুষ।'

চিনি মশারিটা বিছানার থেকে কুড়িয়ে গুছিয়ে নিতে নিতে বললে, 'মশারি টানাব না তা হলে? বাসমতী সমাজের কথা বলে কি আর শেষ করা যায়? এ সমাজের যা হয়ে গেছে সেইটাই হল, পরে আর কিছু হবার নয়। বাসমতীতে এসে থাকুন আপনি, এক রাত কি কথাবার্তা বলে শেষ করা যায়?'

ফাটা পাইপ টানতে-টানতে চুপ করে রইল।

জলের কুজো, একটা বড় কাঁচের গেলাস আর ভেরামনের ফাইলটা নিয়ে এল টিনি।

'একটা বড়ির বেশি খাবেন না।'

'আচ্ছা।'

'আপনার মাথা ধরে নি ত? শিরদাঁড়ায় ব্যথা নেই?'

'না।'

ফাটার বিছানার বালিশের কিনারে ওষুধের ফাইলটা রেখে দিয়ে টিনি, 'জানালাগুলো খোলা থাকবে আপনার ঘরের? বড়ি একটার বেশি খাবেন না।'

কী আর দরকার আছে ফাটার?

দাঁড়িয়ে ছিল টিনি।

বেতের চেয়ারে গিয়ে বসেছে ফাটা; অন্ধকারে খুব নিজমনে পাইপ টানছে। ঘুম হবে না বটে, কিন্তু বেশ নিবিড়ভাবে রপ্ত হতে পেয়েছে অনর্গল পিপাসায় তামাক টেনে চলার একটা আশ্চর্য গতির ভেতর। কোনো কথা বলছে না আর সে।

'জেগে আছে মাসিমা।'

'এখনো? রাত আড়াইটে ত।'

'কিছু আর দরকার আছে আপনার?'

'না। বড্ড ঘুম পেয়ে গেছে।'

ফাটা পাইপ নামিয়ে রেখে বললে, 'এই বারে বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে আমার। উঠে দাঁড়িয়ে কুজোর থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে আধাআধি গ্লাস খেয়ে বাকি জলটায় চোখের মাথায় একটু ঝাপটা দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল সে।

কেউ যেন মশারি টানাচ্ছে মনে হল। ইঁদুর শব্দ করছে সিলিঙের কাঠের পাটাতনের ওপর। মশা ভন ভন করছে। পাইপটা ঠক করে পড়ে গেল মেঝের ওপর-বিছানার একেবারে কিনারায় রেখে দিয়ে ছিল।

টিনি চলে গেছে।

ফাটা বিছানার ওপর উঠে বসে ভাল করে তাকিয়ে দেখল ঘরের চারদিকে। পাশের ঘরের থেকে ওদের দু'জনের ঘুমের নিঃশ্বাস টের পাওয়া যাচ্ছে, প্রথম ঘুমের গভীরতা-একজন নয়-খুব সঠিক ভাবে দু'জন মানুষের।

খুব শান্তির দেশ এই বাসমতী।

ঘণ্টাখানেক বেতের চেয়ারে বসে পাইপ টানল ফাটা। টেবিলের ওপরে ভেরামনের ফাইলটা রয়েছে। একটা বড়ি, না দু'টো, গিলে নিয়ে ঘুমনো যাবে বটে, কিন্তু সেরকম ধরনের ঘুমের কোনো প্রয়োজন নেই আজ-এখন বাসমতীতে সরোজিনীদির এ-বড়িতে ঘুমের দরকার বিশেষ বোধ করছিল না সে।

আরো এক গেলাস জল খেল।

বিছানায় শরীরটা এলিয়ে রেখে দরজার ভেতর দিয়ে অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে রইল ফাটা। বাঁ দিকে ঘন গাছের জঙ্গলঃ উত্তর দিকের জানলাটার দিকে তাকালে চোখে পড়ে সব। আম, কাঁঠাল, জামরুল, সিসু, জাম, লিচুর বড় উপবনের ভেতর থেকে কোনো গাছই হারিয়ে যাবার মত যেন নয়, কেউই খোয়া যাবে না যেন পৃথিবীর কোনো অন্তিম রাতের অশেষ অন্যমনস্কতার ভেতরেও কী যেন একটা ইচ্ছা সংকল্প ক্ষমতার আশ্চর্য দ্রাঢ্যে প্রতিটি গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে, সময়ের ভেতর দিয়ে তাদের গতি, সময়ের অতীত কোন এক লক্ষ্যের দিকে তারা অনেক দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরে চলেছে বলে মনে হচ্ছে। সেই লক্ষ্যই সময়ের নিজ স্বরূপ। সময়ের নিজ স্বরূপ এই গাছগুলো। এই গাছগুলো সময়, মানুস ধ্যানে সময়কে ধারণ করে টের পেয়েছে বহিঃপৃথিবীতে তার উপলব্ধি ছবির মত প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

পুব দিকের জানালার ভেতর দিয়ে সমস্ত আকাশখানা দেখা যাচ্ছে। সরু সরু জিরাফের মত উঁচু কয়েকটা গাছ রয়েছে এইদিকে, বেশি নেই; কী গাছ ওগুলো? কয়েকটা কাঠ আছে। ছোট-ছোট খুদে পাতার মিহি ডালপালার একটা সজনে গাছ খুব উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ওপরে গলার দিকে সরু লম্বা হয়ে তারার ভেতর দিয়ে ঠেকেছে যেন। আঁধারের পটভূমিকায় মানুষের চোখে দৃষ্টিবিভ্রম জাগিয়ে তোলবার জন্য নয় মনে অন্য এক জিজ্ঞাসা জাগাবার জন্যে এই উদ্ভিদ আজ প্রাণশক্তির স্রোতে কেমন নিখুঁতভাবে জিরাফরূপী।

পাইপে নিভে গিয়েছে আগুন, জ্বালিয়ে নিল। সৃষ্টির ভেতর প্রাণ এসেছে, প্রাণ পরিকল্পিত করে নিয়েছে নিজেকে বিভিন্ন আধারের ভেতর, কে আগে কোন কোন আধারে কী—রকম বিশেষভাবে শ্রীমণ্ডিত হল জিজ্ঞাসা তা নিয়ে নয়, অগ্রপশ্চাতের প্রশ্ন নয়, আত্মীয়তার প্রশ্ন। মানুষ বুদ্ধির উৎকর্ষে সমস্ত জড় পৃথিবী প্রাণী পৃথিবীর থেকে খানিকটা আলাদা হয়ে পড়লেও সকলকে যুক্ত করে সব কিছুর সঙ্গে যে নিখুঁত-গ্রন্থি রয়েছে সেটা আবিষ্কারের ভার পড়েছে মানুষের ওপর। এই আবিষ্কার করবার সহজ প্রতিভার ভেতর দিয়েই মানুষ ক্রমে-ক্রমে শুধু যে আত্মীয়তারই মিলিত করতে পারছে অ-প্রাণকে প্রাণের সঙ্গে, প্রাণকে প্রাণীর সঙ্গে, প্রাণীদের পরস্পরকে পরস্পরের তা নয়, নিজেও স্পষ্ট সফল আত্মীয়তা বোধ করছে এদের সকলের সঙ্গে। ঐ অত বড় উঁচু নক্ষত্রলেহী সরু সজনে গাছটা একটা জিরাফের মত, জিরাফ আমারই মত-এই অন্ধকার নিঃশব্দতায় স্থিত হয়ে আছে সে বটে আজ, মুছে যাবে কাল, আবার মণ্ডিত হয়ে উঠবে অন্য কোথাও, আবার মুছে যাবে-সৃষ্টির মনের ভয়াবহ অনিশ্চয়তার (প্রাণীদের কাছে) নিরাবিল আনন্ত্যের কাছে রেণুর মতন সে আজ, সূর্য হতে হবে তাকে আর-এক দিন; কিন্তু নিরাবিল আনন্ত্যের শেষ হল না তখনো তবুও, সূর্য আর ধূলিসূর্য রেণুসূর্য, একটা বিস্তীর্ণ আত্মীয়তায় গ্রথিত হয়ে চলতে লাগল। শেষ শৃঙ্খলা শেষ হয়ে গেলে কী থাকে তারপর?

কিন্তু কোনো শৃঙ্খলাই পরিসমাপ্ত হবার নয়, গ্রথিত হয়ে চলছে সব, গ্রথিত হবার প্রতি মুহূর্তই প্রাণঘন মুহূর্ত, এই ত গেলাসটা দিয়ে গেল টিনি, কাঁচের গেলাসের কিনারে-কিনারে জলবিন্দু জেগে রয়েছে ঢের, তারার আলো এসে পড়ছে তার ওপর, চোখের খুব কাছে গেলাসটা এনে জলের কণিকাগুলো অনুসন্ধান করা যায়, এইখানে একটা বিশ্ব রয়েছে যেন। ঐ সজনে গাছের জিরাফমূর্তি ছোট-ছোট পাতার ফাঁকে ওর শরীরের নিকট আত্মীয়ের মত নক্ষত্রগুলো, ওর মাথার দিকটা অনিশ্চয়তার আনন্ত্যের ভেতর জেগে উঠেছে আজ, মুছে যাচ্ছে কাল। ঐ জিরাফের মতন আমিও বাসমতীর এই অদ্ভুত অন্ধকার প্রসূর্যমানতার ভেতর, সৃষ্টির পিঠের ওপর আমরা দু'টি আত্মীয়-এইখানেও একটি বিশ্ব রয়েছে যেন। সরোজিনীদির ঘুম ভেঙে গেছে টের পেল ফাটা। পাইপ নিভে গিয়েছিল। জ্বালিয়ে নিল। বেতের চেয়ার থেকে উঠে গরের ভেতর পায়চারি করতে লাগল। বসল গিয়ে চেয়ারে আবার।

সরোজিনী অন্য কোনো দিককার দরজা দিয়ে বেরিয়ে অন্ধকারের ভেতর হাতড়ে-হ্যতড়ে বাইরের কাজ সেরে এসেছেন। টিনি জাগেনি। খানিকটা শীত পড়েছে আজ। কাঁপতে-কাঁপতে বিছানায় খসখসে লাল কম্বলটার ভেতরে ঢুকে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রইলেন। জেগে আছেন।

জেগে যে আছেন টের পেয়েছে ফাটা। দু'টো কামরার মাঝখানে একটা খলফার বেড়ার পার্টিশন।

'সরোজিনীদি—'বেতের চেয়ারে বসে থেকে ওপাশের ঘরে মানুষকে ডাকল সে।

'কী দরকার তোমার ফাটা?'

'কিছু না, আপনি জেগে আছেন টের পেলাম।'

'ও।'

'বেশ চমৎকার জায়গায় আপনার বাড়িটা। আগে ত কতবার এসেছি, কিন্তু এ-রকম দেখিনি কখনো, এত রাতে পৃথিবীর মাটি ছেড়ে আকাশের দিকে উঠছে যেন সব, চারদিকে জোনাকি, সিসু গাছ, সজনে, ঝাউ। পুবদিকের আকাশটা বেশ খোলা, আমার অনেক দিনের চেনা নক্ষত্রগুলোকে দেখছিলাম।'

'তুমি কি অঙ্কে এম, এ?'

'আমি? ফিজিক্সে। ইংরেজিতে এ-গ্রুপেরও একটা সার্টিফিকেট নিয়ে রেখেছি।'

'তুমি প্রফেসরি করলে না কেন?'

ভাবছি। বাসমতীতে এলে এই কলেজে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'তাহলে খুব ভাল হয়।'

'ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'কেন?

'ঢের জেগেছেন আজ। আমিই পাপ করে জাগালাম। কীট ত একশ পঁচাত্তর আপনার, দু'শ সোয়া দু'শ হয়েছিল রাত একটা দেড়টা অবদি জেগে। এখন না ঘুমলে আড়াইশয় উঠবে। ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'তুমি ঘুমিয়েছিলে?'

'বেশ চৌকশ ঘুম। আবার ঘুমোবার চেষ্টায় আছি। একটু শীত-শীত পড়েছে, ঘুম জমবে ভালো।'

'টিনি লম্বা ঘুম দিচ্ছে।'

'আমাকেও কাল আটটার সময় উঠতে হবে, যা ভাবগতিক দেখছি, বেশ বড় একটা ঘুম হয়ে গেল, কিন্তু তার চেয়েও বড়টা আসছে এইবারে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সুকুমার জেগেছিল?'

'না।' ও জার্মান বড়ি খেয়ে ঘুমচ্ছে।'

'ভেরামন?'

'হ্যাঁ, আপনার ফাইলে ত আছে অনেকগুলো। এ জিনিস আজকাল কলকাতার চোরাবাজারেও পাওয়া যায় না। আপনার এখানে একেবারে পড়ে পাওয়া মাল হিসেবে এমন জিনিস পেয়ে লোভ সামলাতে পারে নি।'

'ফাইলটা সরিয়ে রাখতে হবে ত তাহলে।'

'কাল সকালেই অনেকগুলো বড়ি আছে শুনলাম,' টেবিলের থেকে ভেরামনের ফাইলটা তুলে নিয়ে সেদিকে তাকাতে-তাকাতে ফাটা বললে।

'টিনি জানে সব। ও সরিয়ে ফেলতে হবে। আফিম খাওয়ার বাড়া। কী রকম পাগলের মতন ঘুমচ্ছে, দেখছে। ওকে দিয়ে সমাজে গান গাওয়াতে হবে-এ মাসের সমস্ত গানের ভার ওর ওপর। সত্যসখার চেয়ে ভাল গায় সুকুমার, বুঝলে ফাটা? বড় কমলবাবুর পর এ-রকম গান আর শুনিনি আমি কোথাও। অথচ করছে কি সুকুমার? সেঁকো খেয়ে নিজেকে ফোঁপরা করে ফেলছে।'

'ওর কোনো দুঃখ আছে মনে?'

'কিচ্ছু না। কোনো স্ত্রীলোকের দিকে একদম ঘেঁষে না।'

'কেন?'

'ভালবাসে না।'

স্ত্রীলোকের ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপার নিয়ে মানুষের মনে দুঃখ হতে পারে না এমন কথা অবিশ্যি সরোজিনীকে বলতে চাননি, সুকুমারের মত ছেলেদের প্রধান দুঃখ কী নিয়ে হতে পারে—নির্দেশ দিয়েছেন। সুকুমার এমনিই ঘুমচ্ছে হয়ত—ঘুমের বাতিক আছে বলে; কোনো ওষুধ খেয়ে ঘুমচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

'ঘুমিয়েছে ফাটা?'

'না।'

'সিদ্ধার্থ ফিরছে?'

'কই টের পাইনি ত।'

'সুনীতি একা ও ঘরে কী করে থাকে তাহলে?'

'এ নিয়ে কাল সিদ্ধার্থের সঙ্গে কথা হবে আমার।' ফাটা পাইপ জ্বালিয়ে নিয়ে বলবে।

'গগনবাবুরা ঠিক মতন গিয়ে পৌঁছলেন ত?'

'আমার মনে হয় দু'ঘণ্টা ঘুম হয়ে গেছে গগনবাবুদের, আরো ঘণ্টা চারেক ঘুমাবেন। যাক, কালকে খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানিয়ে যাব এক সময়। সবচেয়ে বেশি ঘুমলেন হিতেনবাবু।'

'ছাতুও ঘুমল যা, খারাপ বলতে পারা যায় না। টিনিও কম যাচ্ছে না। বেশ একটু শীত-শীত। আ—ফাটা। এসব রোগটোক যদি আমার না থাকত, আর আয়ুটাকে কুড়ি বছর আগে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম, বেশ চমৎকার ঘুমের রাত ছিল আজ, কম্বলের নিচের থেকে শিতের আরামে, একটু কুকড়েসুকড়ে সরোজিনী বললেন।

'বুড়ো মানুষ কথা বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়ে।' ফাটা বললে, 'বেশ শীত শীত, আধো ঘুমের ভেতর চলে গিয়েছেন আপনি সরোজিনীদি; কাল সকলে উঠে টের পাবেন ঠাণ্ডা রাত পেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঐ যে পাশ ফিরে এই শুলেন-এতেই।'

কিছুক্ষণ পরে সরোজিনী বললেন, 'জেগে আছ?'

'দু'মিনিট পরে আবার বললেন, 'জেগে আছ ফাটা?'

'ও—আমাকে? আমি ভেবেছিলাম টিনিদিকে ডাকছেন বুঝি।'

'না তোমাকেই। শব্দ শুনছ?'

'কোথায়?'

'এ ঘরের সিলিঙের কাঠের পাটাতনের ওপর।'

'ও! কীসের শব্দ?

'ভোঁদড় এসেছে বোধহয় পাশের জঙ্গল থেকে।'

'ভোঁদড়?' ফাটা পাইপ টানতে-টানতে বললে, 'কেন, পাটাতনের, ওপর কি কলার কাঁদি আছে।'

'না, কিছু নেই।' সরোজিনী চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন খুব সম্ভব, ফাটার কামরার দিকে পাশ ফিরে শুলেন মনে হল; আমাদের বাড়ির গাছপালার সম্বচ্ছরের সুপুরিগুলো রোদে দিয়ে পাকিয়ে শুকনো করে রেখে দেয়া হয় পাটাতনের ওপরে, সেগুলো রয়েছে ওখানে। আর কিছু নেই।'

'ভোঁদড় সুপুরি খেতে আসে?'

'বলো তুমি কী যে ফাটা, ভোঁদড় কখনো সুপুরি খায়? আসে এখানে একটু ফুর্তি করতে দু-তিনটে ভোঁদড়ে মিলে। অনেকখানি ফাঁকা জায়গা পেয়েছে ত, টিনের ছাইনির নিচে, সুপুরি আর গরান কাঠের বেশ মজবুত পালিশ পাটাতনের ওপরে। বনজঙ্গল গেরস্তদের ঘরের থেকে কলা বিলিতি গাব ক্যাঁকড়া ট্যাঁকড়া খেয়ে এসে এখানে একটু হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে বেশ জিরিয়ে গড়িয়ে নেয়—ঐ যে হড়হড় ধড়মড় গড়গড় হগড় গগড় ঢগড় জাগুড় জাগুড় শব্দ শুনছ। দু-তিনটে ভোঁদড় আসে হেমন্ত-শীতের রাতের দুপুরে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গগনবাবুরা সাত তাড়াতাড়ি চলে না গেলে এ-বাড়ির নানা ঘরের একটা-না একটা খাটে শুয়ে থেকে, খানিক জেগে খানিক ঘুমিয়ে, শীত অন্ধকারের ভেতর এ-কামরার থেকে ও-কামরায় কথা চালানো যেত। এ-সব রাতের মর্ম পরস্পরের কাছে ভাঙিয়ে বাসমতীর পৃথিবীর সৃষ্টির ক্রমগভীরতার ভেতর সকলেই যে কাছে কাছে আছি জানাবার বোঝাবার সুযোগ দিতে পারতেন। পৃথিবীতে কড়কড়ে দিনের দৌরাত্ম্য প্রায় সমস্তটা জায়গা জুড়ে খুবই অল্প একটা অংশ এ-রকম রাত্রির জন্যে। আমার খুব ভাল লাগছে—সরোজিনীদি—'

'শুনেছি তোমার কথা সব।'

'কিন্তু আপনাদের ঘরে কি অত খাট বিছানা ছিল?'

'তা আছে, তোষক, চাদর, পুরনো লেপ—কম্বলও আছে কতকগুলো। আমার ভাইরা ত আট-দশ বছর আগেও প্রায়ই আসা-যাওয়া করত বাসমতীতে; অনেক জিনিসপত্র, লেপ-তোষক, বালিশ—কোলবালিশ, খাট-চারপাই ফেল গেছে তারা।'

'তাহলে ত সব হয়ে যেত,' ফাটা বললে, 'কিন্তু কিছু হয়, বাকিটা মুলতুবী থাকে, এই হচ্ছে পৃথিবীর কথা। আমি আপনি কথা বলে খানিকটা শান্তি পাচ্ছি। বনচ্ছবিরা যদি থাকত, সিদ্ধার্থরা যদি আসত, গগনবাবুও থাকতেন-বেশ হত তাহলে।'

'তুমি একটা কথা মনে করিয়ে দিলে বটে—সরোজিনী নরম বালিশের ভেতর একটা চোখ ও কপালের অনেকখানি ডুবিয়ে রেখে বললেন, একদিন সবাইকে রাতের বেলা আমার বাড়িতে নেমতন্ন করে আনব ভাবছি। খাওয়া-দাওয়ার পর এখানেই শোবার ব্যবস্থা হবে। যাঁরা আজ এসেছিলেন তাঁরা সকলেই থাকবেন। তাছাড়া সিদ্ধার্থকে রাখতে হবে। হিতেনবাবু?'

'উনি না-থাকলেই ভাল।'

'আর-কেউ?'

'না, সম্প্রতি আর কেউ না। বেশি লোক এনে হাটহদ্দো বানিয়ে লাভ নেই,' ফাটা বেতের চেয়ার থেকে উঠে ভেরামনের ফাইলটা একবার হাতে তুলে নিয়ে খাবে কিনা ভাবতে-ভাবতে টেবিলের ওপর সেটা সরিয়ে রেখে দিয়ে বললে, 'বেশ চমৎকার হবে তাহলে, সারারাত ঘুমিয়ে জেগে পাঁচখানা ঘরে পাঁচ-ছটা খাটে যে যার নিজের কম্বলে শুয়ে থেকে শীতরাতের কথা চালানো যাবে।' ঘরের ভেতর দু-চারবার পায়চারি করে চেয়ারে এসে বসল সে আবার, পাইপটা বারবার নিভে যাচ্ছে, জ্বালিয়ে নিল ভাল করে। 'খুব অন্ধকার থাকবে ঘর।'

'হ্যাঁ, আজকের মতন, 'সরোজিনী বললেন, 'একটা হ্যারিকেনও জ্বলবে না।'

কেউ কোনো কথা বলছিল না। সরোজিনী হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। ফাটা পাইপ টানছিলা ভোঁদড়গুলো এখনো রয়েছে পাটাতনের ওপর, তবে আগের চেয়ে সোরগোল কমে গেছে ঢের; হঠাৎ বেড়ে উঠলো আবার।

'তুমি কি চেয়ারে বসে আছ নাকি?'

'হ্যাঁ, এইবার বিছানায় যাব।' ফাটা বললে।

'তাই ভাবছিলাম,' সরোজিনী বালিশের ওপর একটু এপাশওপাশ ফিরে বললেন, 'একজন বসা লোকের সঙ্গে যেন কথা বলছি। তুমি বসে আছ ত অনেকক্ষণ।'

'আপনিও জাগলেন—আমি ত চেয়ারে এসে বসলাম।'

'কীসের গন্ধ পাচ্ছি?'

'আমি পাইপ টানছি সরোজিনীদি।'

'ও।'

আপনার খারাপ লাগছে?

'না চুরুটের মত কড়া গন্ধ নয়। টান তুমি। বেশ শীত পড়েছে। তোমাকে একটা কম্বল দিয়েছিল টিনি?'

'দিয়েছে।'

'ভোঁদড়গুলো আবার তিড়বিড় করে উঠছে, টের পাচ্ছ?'

'সারারাতই থাকবে বুঝি?'

'এই প্রথম শীত পড়েছে, এখন ওরা জোড়া মিলবে, 'সরোজিনী বললেন, 'সেই জন্যেই আজ রাতে—বলতে—বলতে থেমে গেলেন তিনি।

টিনি জেগে উঠে ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে বললে, 'ভোঁদর এসেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'কার সঙ্গে কথা বলছিলে তুমি মাসিমা?'

'ফাটা। এই এতক্ষণ জেগেছিল ও ঘরে।'

'একদম ঘুমোন নি?'

'এই কিছুক্ষণ হল ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, ভোঁদড়ের গোলমালে—'

'ও—' টিনি ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে বললে, 'বেশ শীত পড়েছে। একজোড়া ভোঁদর এসেছে, নাকি দু'জোড়া? আমাদের পাটাতনটাকে ওদের আখড়া করে নিয়েছে বেশ। তুমিও বিয়ে করলে না মাসিমা, আমিও করলাম না; কিন্তু আমাদের ঘরদোরে এসে ওরা বেশ বাচ্চা বানাবার তালে আছে,' টিনি আরো খানিকটা ঘুমের ভেতর তলিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে-যেতে বললে, 'বেশ ভাল, সকলকেই স্নেহ ক্ষমা, ভালবাসতে ইচ্ছা করে, সকলকে এই সব প্রথম হেমন্তের, কেমন শিশির, অন্ধকার, বাসমতীর এই সব টিনের, ছনের ছাইনির রাত, 'বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়ল টিনি।

খানিকক্ষণ পরে সরোজিনী বললেন, 'চলে গেছে ভোঁদড়গুলো।'

'টিনি।'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

'ঘুমিয়ে পড়েছে আবার টিনি। বাবা, কী ঘুমই ঘুমচ্ছে। ফাটাও ঘুমিয়ে পড়ল বুঝি?'

'ফাটা।'

কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই, ভোঁদড়গুলোও চলে গেছে, চারদিকে ধানজমি, জঙ্গল, হুহু করে ফাঁকা মাঠ, পৃথিবীর বুকভরা অন্ধকারের মত অনিমেষ নিস্তব্ধতা। সরোজিনীর কথায় কোনো উত্তর দিতে গেল না ফাটা। পাইপটাও টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বুকের ওপর দু-হাত বেঁধে জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

'একটা পেঁচা উড়ে এসে বসেছে আমাদের টিনের চালের ওপর, ঝুং করে একটু শব্দ হল, আমি টের পেয়েছি,' সরোজিনী বললেন।

কিন্তু কাকে?

টিনি ত ঘুমিয়ে পড়েছে। ফাটাও ঘুমিয়েছে বলেই জানেন তিনি। নিজেকেই বলছেন সরোজিনী। এমনই চলে বুঝি সরোজিনীর স্বগত বিহ্বলতা-বাসমতীর হেমন্তকাল রাত্রির গভীরে ঢুকে এরকম আদি অতুল পৃথিবীর মত নিঃশব্দ হলে। এই বারে ডাকবে পেঁচা, সরোজিনী বললেন, 'এটা কালপেঁচা নয়, কাল পাখি, হুতোম পেঁচা-ভারি চমৎকার লাগে এর ভাব আমার। কোকিল ডাকে, সে-এক রকম। হুতোম ডাকে, সে আর-এক রকম। বেশ গাম্ভীর্য আছে এর ডাকের ভেতর। কার্তিক অঘ্রাণে খুব অথই নিশ্চুপ হয়ে উঠলে অন্ধকার আর শিশিরের ভেতরে জেগে ওঠে হুতোম। কেমন ডাক ছাড়ে শুনছ? ফাটা—'

শুনছিল। ভারি আশ্চর্য লাগছিল তার। অনেক দূরে মোরগ ডাকছে কোনো গেরস্তের ঘরের ভেতর থেকে হয়ত। কিংবা বুনোপাখি। চারদিককার জমি জঙ্গলের ভেতর থেকে বনমোরগ ডাকছে খুব সম্ভব; শুনে কানই শুধু খুশি হয় না, মানুষকে আলগোছে নিজেদের দিকে টেনে রাখে যেন এই সব পাখিদের ডাক-হেমন্ত শীতের বাসমতীর এক কিনারে প্রকৃতির ধান মাঠ-জঙ্গল গন্ধের খুব কাছে বসে-এত রাতে এত নক্ষত্রের ভেতর। কলকাতার বালিগঞ্জের দিকে শীতকালে বেশি রাতে মোরগের প্রহরে-প্রহরে কহুরে ডাক শুনেছে বটে সে-কোনো বড়লোকের বাড়ির খাঁচার ভেতর থেকে ডেকেছে-শহরপাড়ার রাতের নিঃশব্দতায় ছেলেবেলার বাসমতীর কথা মনে পড়েছে তার, বিশেষত পাশাবতী আর সিদ্ধার্থের এই সাহেবডাঙার খেত জঙ্গল ঝিল নক্ষত্র হেমন্তরাত্তির কথা। কিন্তু বালিগঞ্জে হুতোমের ডাক কোনোদিন শোনে নি সে,—অনেক দিন পরে আস্বাদ পেয়ে কান পেতে শুনছিল আজ-হৃদয় অন্তঃকরণের কাজ করছিল, দিনের আলো আর গ্যাসের আলোর নিরেটে একঘেয়েমির শেষ আছে কোথাও—তারপর প্রকৃতি তার নিজের হাতে অন্ধকারের অবতারণা করে এসব দেশের কার্তিক অঘ্রাণ ঋতুর; রেডিওর অনর্গল শব্দবহ অসাড়তার শেষ আছে—তারপর স্নিগ্ধতা আছে, শিশির আছে, সাকোরখোরা ধানক্ষেত থেকে উঠে এসেছে এই পাখি—এইখানে প্রকৃতি আছে; তার হৃদয়ের ভেতর হাত রেখেছেন বুঝি সরোজিনীদি, পেরেছেন রাখতে? সুযোগ পেয়েছেন বটে অনেক। আমার অবস্থা রাজসূয় যজ্ঞের শেষে সেই বেদীটার মত যেন না হয়; কিন্তু প্রকৃতি এখানে একটা যজ্ঞের মত ব্যাপার নয়। পাইপটা তুলে নিয়ে নিভে গেছে দেখে টেবিলে সরিয়ে রেখে ভাবল ফাটা; প্রকৃতি এখানে একেবারেই অন্যরকম জিনিস-মিতব্যয়ী, নিঃশব্দ, কেমন ক্ষমাময়, আদান-প্রদান পরিশীলনে ভরপুর-কিন্তু তবুও আবার শেষে নিঃশব্দ—

'ঘুমিয়ে তুমি?'

'ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি ফাটা?' সরোজিনী প্রথম বারে উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ফাটা পাইপ জ্বালিয়ে নিয়ে বললে কালেকটরেটে এই ত ঘণ্টা পেটাল-না?'

'পিটিয়েছে।'

'কবার-শুনতে পারলাম না।'

'চারবার।' সরোজিনী বললেন, 'পেঁচাটা উড়ে গিয়েছে।'

'কেন গেল?'

'এক জায়গায়ই কি থাকবে সারারাত। আবার আসবে।'

'কখন?'

'আজ নয়-কাল রাত আবার। এখন সাকোরখোরা নদীর দিকে গেছে—'

'রয়ানী নদীর কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, সেটা আমাদের বাড়ির পেছনে উত্তর দিকের ধানজমি দু'তিন কানি শেষ হলে কালিজিরা ধানের ক্ষেতগুলোর পাশ দিয়ে সাকোরখোরার ক্ষেতটা আছে-ঐখান দিয়ে ঘুরে যায়—দেখনি তুমি?'

'দেখেছি ছেলেবেলা-অনেক দিন যাইনি ওদিকে। নদীটা মোড় ঘুরে কোন দিকে যায় ওখান থেকে?'

'জলজিরানির দিকে।'

'ও-ফাটা পাইপ টানতে টানতে বললে, 'দিককার নদীটাকে সাকোরখোরা নদী বলে বুঝি?'

'হ্যাঁ, ভারি সুন্দর জায়গা, দেখবার মত। একদিন চড়িভাতি করলে হয়,' টিনি জেগে উঠে বললে, 'অনেক জামগাছ আছে নদীর পারে, বাঁশবন আছে, ঝাউগাছ হয়েছে ঢের। স্টিমার কোম্পানির সাহেবদের একটা সাদা কুঠি আছে নদীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে—লিচু জামরুল জলপাই মেহেদি ক্যানার বাগান জঙ্গলের ভেতর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবরা থাকে ওখানে?'

'না, ওরা শনিবার শনিবার ওখানে আসে; বিকেলে টেনিশ খেলে, রাতে খায়দায় নাচগান করে, রোববারের দুপুরে অবদি ওখানে থাকে-তার পরে চলে যায়।'

'আর ছ'দিন কী হয়?

'ঘরদোরে তালা ঝুলতে থাকে-আর কি হয়-ওপাড়ার ছেলে-ছোকরারা আগানে-বাগানে খেলা করে ফলপাকড় উজোড় করে যায়-বনজঙ্গলে মাঠ ক্ষেত, বাগান মিলিয়ে ভারি চমৎকার জায়গা। কি রকম নির্জন, কত ফুল, কত বড় আকাশ। গাছ-গাছালির ভেতর ঝাউ, বোনঝাউ, বাঁশবন, লিচু, জামরুল, ধানক্ষেত, আখের ক্ষেত, মেহেদির বন আর ক্যানার বাগানই বেশি—বন বাগানের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা পাকা বাড়ি আছে সাহেবদের। আর কোনো বসতি নেই।'

'সেই দিকে উড়ে গেল বুঝি পেঁচাটা?' ফাটা বললে।

'ওটা কো-অপারেটিভের বেল পড়েছিল-এবার কালেকটরেটের বেল পড়ছে-শুনছ?' সরোজিনী বললেন।

'কটা পেটাল বুঝতে পারলাম না।'

'চারটে; কো-অপারেটিভের ঘড়িটা দশ মিনিট ফাস্ট,' টিনি বললে, 'চারটে বেজে গেল। আপনি কখন ঘুম থেকে জাগেন নীরেনবাবু? ভোঁদড়ের গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল বুঝি?

'ভোদড় আবার যেন এসেছে মনে হয়।'

'না-ওটা ইঁদুরের শব্দ। অনেকগুলো ধাড়ি ইঁদুর আছে পাটাতনের ওপর, কতকগুলো পায়রা শালিখ টালিখের বাসাও আছে চারদিকের খোপ খুপরির ভেতর। এদের সকলকে নিয়ে শীত রাতে শুয়ে থাকতে বেশ ভাল লাগে। চারদিক খুব বেশি নিঃসাড় হয়ে পড়ে যখন নানারকম প্রাণের আওয়াজের সাড়া পাওয়া যায়-ওরাও ভালবাসে, ডিম পাড়ে, ছোটাছুটি করে, ঘুমচ্ছে, জাগাচ্ছে-খুব ভাল লাগে—' টিনি বললে।

'সিদ্ধার্থ কি এসেছে ফাটা?'

'কৈ না ত-টের পাইনি।'

'এখনো এল না? তাহলে আজ রাতে আর ফিরব না। তুমি বসে বসে পাইপ টানছ এখনো? শুয়ে পড়ো এই বারে।' সরোজিনী বললেন।

'রাত দু'ঘণ্টা আছে আর নীরেনবাবু।'

'দেড় ঘণ্টা—' সরোজিনী বললেন,' তোমরা সাড়ে পাঁচটার সময় উঠো, আমি পাঁচটার সময় ব্রহ্মোপসনা করতে উঠব—'

'উপাসনা হবে সরোজিনীদি? কোথায়?

সরোজিনী একটু নিজের ভেতর সরে গিয়ে বললেন, 'কোথাও না, এই আমি বিছানায় উঠে বসেই একটু প্রার্থনা করব। এই কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েই। টিনি, কোনোদিন ওঠে, কোনোদিন ওঠে না। বেশি নয়, এই ঘণ্টা খানিকের ব্যাপার।

'পাঁচটার সময়? পাঁচটা ত হয়ে এল।'

'হ্যাঁ, এই হল আর কি, এখন একটু চোখ বুজে নিই।'

'আপনার উপাসনায় যোগ দেব আমি-আমার ঘরে বসে থেকেই। শুনতে পাব ত? ফাটা বললে।'

'জেগে থাকলে শুনতে পার, সরোজিনী কম্বলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে শীতের আরামের ভেতর বেশ আঁটসাঁট হয়ে বললেন, 'উপাসনা সেরে তত্ত্বভূষণ মশাইর ঈশোপনিষৎটা পড়তে হবে একটু আধটু; বাংলা তর্জমা পড়া, সংস্কৃত ভাল জানলে ভাল হত বেশ। অঘোরকামিনীর জীবনচরিত লাবণ্যদির দৈনিক, সাধন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কতকগুলো চিঠি-দাদাকে লিখেছিলেন-এই সব পড়ব কিছু কিছু; টিনি চা করে আনবে; চা না খেয়ে যেও না তুমি ফাটা—'

'চা আর হাতে গড়া রুটি আর কালকের আলু-ডুমুরের তরকারিটা গরম করে—আমি কিন্তু ভাল চা করতে পারি না নীরেনবাবু; টিনি অন্ধকারের ভেতর চোখ তারিয়ে তারিয়ে বললে; ঘুমিয়ে পড়ছে, 'ব্রুকবন্ড লিপটন নয়-সাহেবডাঙার লুজ চা—ভাল লাগবে না আপনার—'

'তোমার মোটর সাইকেলটা ঘরের ভেতর নিয়ে এসেছ ত ফাটা—'

'ও ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন সরোজিনীদি; ফাটা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমারই মনেই ছিল না বাইকটার কথা—'

'সব্বোনাশ চুরি হয়ে যায় যে।'

'এখানে ত জনমানিষ্যি নেই কোথাও সরোজিনীদি—ভোঁদড়ে চুরি করবে—'

ঘুমের নিঃশ্বাস আস্তে আস্তে উঠছে পড়ছে সরোজিনীদির ঘরে; টিনি ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি আবার।

'তুমি জান না ফাটা' সরোজিনী বালিশ থেকে মাথাটা একটু আলগা করে তুলে নিয়ে খানিকটা ব্যস্ত বিপন্ন হয়ে বললেন 'মোটর-বাইকটা যদি তুমি ঘরের ভেতর এনে রাখতে তাহলেও বেড়া কেটে নিয়ে যেত—এই ধরনের লোক দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে বাসমতীতে। দেখে এস ত—কোথায় রেখেছিলে—কী হল—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালবেলার উপাসনার মুখে একটা জড়িয়ে পড়েছেন সরোজিনীদি, সবকিছুর থেকে আলগা করে এখন থেকেই একটু নিবেদনের ভাবে মনটাতে বসানো উচিত তাঁর: তিনি অবিশ্যি খুব খারাপ কিছু করছেন না-অব্যয়ের দিকে পা বাড়িয়ে দেবার আগে সাংসারিক ব্যক্তিহিতের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো। যা হোক-সরোজিনীদির মনটাকে তারই নিজের এবং নিজ সমাজের প্রয়োজনীয় শুদ্ধ তন্ময়তার ভেতর এখনই স্থির হতে দেয়া যাবে—মোটর-বাইকটা চুরি গেলেও-জানে ফাটা। বাইরে গেল না সে আর, এই বারে সত্যিই অসম্ভব ঘুম পেয়েছে তার, হাতের পাইপটা আলগা মুঠো থেকে খসে মেঝের ওপর পড়ে দু'চারটে গড়াগড়ি খেল, মাথাটা এলিয়ে পড়ল বেতের চেয়ারের এক কিনারে, ঝুলে পড়ল হাতদু'টো, পা ঢিলে হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, বেতের চেয়ারটা একটা বুড়ো উটের হাড়ের মত মড় মড় মচ মচ করে ভেঙে যেতে যেতে কোনোরকমে টিকে থেকে ঘুমন্ত মানুষটাকে ধরে রাখল।

কিন্তু তবুও সরোজিনী ভোর পাঁচটায় উপাসনা আরম্ভ করবার আগেই ফাটা জেগে উঠল; তিন কোয়ার্টার ঘুমিয়েছে হয়ত, আরো কম-খুব সম্ভব। জেগে উঠে হাতটা স্বভাবতই টেবিলের পাইপটার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু তবুও সেটাকে কুড়িয়ে না নিয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখে দিল; কুজোর থেকে জল ঢেলে নিয়ে চোখ মুখ ভাল করে ধুয়ে বড় কমলবাবু বেশি আগ্রহে যে গানগুলি গাইতেন সে সবের ভেতর থেকে প্রথমেই যা মনে পড়ল-সত্যেন ঠাকুরের একটা গান শুরু করল আস্তে-আস্তে। চোখ বুজে গান গাইছিল ফাটা; গান শেষ হবার আগেই একবার চোখ মেলে তাকাতেই দেখল সরোজিনীদি আর টিনি হাত মুখ ধুয়ে বসেছেন এসে তার বিছানার ওপর।

উপাসনা হল মিনিট পনের।

উপাসনার পর আরো তিনটে গান গাইল ফাটা।

'তুমি এত অদ্ভুত গাইতে পার-জানতাম না ত আমি, ফাটা। আমিও ভাবছিলাম বড় কমলবাবুর গলা আর ভাব-তা ত মরবার নয়—'

'আপনার মোটর সাইকেলটা আছে, চুরি যায়নি।' টিনি বললে।

'কী করে জানলেন আপনি?'

'আপনি ত সব ভুলে ঘুমোচ্ছিলেন; সত্যি আশ্চর্য মানুষ-এ যেন মিথিলা পুড়ে গেলেও—আমি দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দেখে এলাম; বাইকটা একেবারে শিশিরে ভিজে আছে—

'সরোজিনীদি মিছেমিছি কাল বাসমতীর লোকদের দুষছিলেন—'

ফাটা বললে, 'আমি জানি ওরা একেবারে ভোর হয়ে গেলে চুরি করবে-তার আগে না।'

তার মানে?

ফাটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, বললে, 'কই দেখছি না ত বাইকটা—সিঁড়ির কাছেই ত রেখেছিলাম।'

'বাঃ রে—' টিনি চা করতে করতে এগিয়ে এসে বললে, 'এই ত আধঘণ্টা আগে আমি দেখলাম—বলছেন কি আপনি নীরেনবাবু—'

'দেখলে টিনি-তাহলে ভেতরে এনে রাখলেই পারতে-সরোজিনী বললে, একেবারে সকালবেলা চুরি গেল।'

'ভাল হল', ফাটা বললে আমার গান সত্যিই ভাল লাগল আপনার?

'হ্যাঁ, বেশ গেয়েছ—'

'টিনিদির কেমন লাগল?'

'আমি ভাবছিলাম আপনি বাসমতীতে থাকলে কি রকম ভাল হত। কিন্তু বড় কমলবাবুদের সে সব দিন নেই ত এখন আর। আপনারা কি থাকবেন গরিবদের দেশে?

'ছাত্রা কি জেগেছে?—ক কাপ চা করলে টিনি?'

'তিন কাপ-ওদের চা পরে হবে।'

'ধানরাজের মা কি এসেছে টিনি?'

'হ্যাঁ। তরকারি গরম করছে।'

ফাটা রুটি তরকারি চা খেতে খেতে বললে, 'বাবা আমাকে কিছুতেই গান শেখাতে পারেনি, কোনো তালজ্ঞানই নেই আমার। অনেকে অনেক চেষ্টা করেছে, আমিও সাধ্যসাধনা কম করিনি, কিন্তু কিছুই হল না। আজ ভাবলাম সরোজিনীদি উপাসনা করবেন—আমি গাইবই। লোকে যেমন করে কবিতা পড়ে-মোটামুটি সেই ভাবেই গাইলাম; অন্য সময় হলে নিজের এ বেয়াদবিতে খুব লাগত, কিন্তু আজ তা হয়নি, ভালই লেগেছে।'

সরোজিনীদি তরকারির থেকে আলু সরিয়ে ডুমুর বেছে নিয়ে খুঁটে খুঁটে খেতে খেতে বললেন, 'আমি আগেই ত বলেছি তোমাদের দু-রকম ব্রাহ্মসমাজ আছে। আমরা নিজ ব্রাহ্মসমাজের লোক; সেটা গায়কের কাছ থেকে গলা চায় না-ভাব চায়। যেমন তুমি গাইলে।'

টিনি আলু দিয়ে রুটি খাচ্ছিল, ডুমুর পাতে জড়ো হয়ে উঠছে, দেখে রুটির টুকরো দিয়ে খপ করে খানিকটা ডুমুর সাপটে মুখে তুলবার আগে ফাটাকে বললে, 'আপনার গান শুনে মনে হচ্ছিল গানে কোনোদিন হাতে খড়ি হয়নি আপনার। আপনি যদি কবিতা পড়ার মত গাইতেন, তাহলে সেটা পাঠ হত, কিন্তু মাঝে মাঝে টান দিচ্ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি কিন্তু কানে যে বাজে সে প্রশ্ন রইল না আর। প্রাণ ঢেলে দিলেন আপনি। শেষের তিনটে গানে ত খুব। বাসমতীর ব্রাহ্মসমাজ এই রকম গান চায়।'

'ছাতুবাবুরা জাগল না এখনো?'

'তেমার চা খাওয়া হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ চলি-সুকুমারকে দেখে যাই একবার।' ফাটা বললে।

'ছাতুবাবু এই উঠে বসেছে—' ফাটা ফিরে এসে চললে, 'সুকুমার ঘুমুচ্ছে এখনো—'

'এখনো?' সরোজিনী চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললেন, 'তাহলে ত বড় বিষম হল। এর একটা বিহিত কর তুমি।'

'আমি বিকেলের দিকে আসব।'

'ও মরফিরা ইনজেকশন করেছে,' সরোজিনী একটু ভেঙে পড়ে বললেন, আমার এখানে সিরিঞ্জ ছিল-নিজে সঙ্গে করে মার্ফিয়া এনে ছিল হয়ত। তুমি এরকম অবস্থায় একটু শিগগির আসবে না?'

'ইনজেকশন করলে করেছে,' ফাটা চারদিককার ঘাস শিশির মাঠ সিদ্ধার্থের আটচালা কার্তিক ভোরের উঠতি আলোর দিকে তাকিয়ে বললে, 'ভাল করে নাড়ীটাড়ি দেখে এসেছি আমি। এইবারে মরবে না।'

মোটর সাইকেলটা কোথায় গেল কাউকে জিজ্ঞেস করতে গেল না আর ফাটা, সরোজিনী টিনিরও মনে ছিল না যেন বাইকটার কথা, কিছুতেই বললেন না তাঁরা, ফাটা লম্বা লম্বা পা ফেলে 'সুনীতি বৌদি' বলে সিদ্ধার্থের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দু-চার সেকেন্ড থেমে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সিদ্ধার্থ এলে নাকি হে—' বলে একটা সন্ধানী ডাক ছেড়ে সজনে গাছটার পাশ দিয়ে ঝাউগাছের কিনার দিয়ে চলে গেল।

সিদ্ধার্থ বেলা দশটার সময় বাড়িতে ফিরে এসে দেখল—যে ডেকচেয়ারে বসে সে একটু জিরিয়ে নেবে ভেবেছিল—সেখানে সুনীতি বসে আছে—রোদের ভেতর। ঘরের ভেতর সব জায়গায়ই প্রায় ছায়া; পুবের দরজা দিয়ে বেশ খানিকটা রোদ আটটা ন'টার সময় খেলে গেছে ঘরের ভেতর—এখন দু'টো উঁচু উঁচু জাম আর সিসুগাছের মাথায় আটকে গেছে সূর্যটা; ডালপালার ফাঁক দিয়ে তবুও খানিকটা রোদ এসে পড়েছে সুনীতির ক্যাম্বিসের হেলান চেয়ারটার ওপরে, চেয়ারটার চারদিকে বেশ খানিকটা গনগনে রোদের আমেজ আরামের বলয় সৃষ্টি করতে পেরেছে অল্প খানিকটা জায়গা জুড়ে। ঘরের ভেতর বাকি সমস্তটা জায়গায় কেমন ঘোর ছায়া আর শীত। কাল সারারাত জেগেছে, খায়নি কিছু, খুব কাহিল বোধ করছে-সেইজন্যেই শীত বেশি লাগছিল সিদ্ধার্থের। গায়ে একটা পাতলা পাঞ্জাবির নিচে আধময়লা জালি গেঞ্জি; গেঞ্জিটা অনেক জায়গায়ই ফেঁসে গেছে, পাঞ্জাবিও ঘাড়ের দিকে ছিঁড়ে গেছে, গলার দিকে ফেঁসে গেছে জায়গায় জায়গায়, শীত মানাচ্ছে না। একটু রোদে এসে বসলে হত, কিন্তু সুনীতি বসে আছে-এবারে কার্তিক মাসের প্রথম দিক দিয়েই শীতটা খুব তাড়াতাড়ি পড়ে গেল।

একটা চেয়ার টেনে টেবিলের কাছে ছায়া শীতের ভেতর বসল সিদ্ধার্থ।

কিংবা বাইরে রোদের ভেতর গিয়ে দাঁড়ালে হয়। কিন্তু দাঁড়াতে পারবে না এখন আর সে, কেমন ঠক ঠক করে কাঁপছে যেন পা। খাটে শুয়েও পড়তে পারে, কিন্তু এখুনি শোবে না; জামা কাপড় বদলে, মাথায় জল দিয়ে হাত পা ধুয়ে-পরে এ সময় শুয়ে পড়তে হবে হয়ত। এখন এক কাপ চা খেয়ে নিলে হয়ত একটু ভাল লাগতে পারে; চাও খাওয়া হয়ে ওঠেনি আজ সকালে।

'একটু চা হবে?'

'আমাদের চা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।' সুনীতি বললে।

'আমার হয়নি আজ সকালে—'

'আদিনাথকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমি।'

সিদ্ধার্থ বাইরের রোদে গিয়ে দাঁড়াবে ভাবছিল, কিংবা মাঠের ঘাসের এক কিনারে রোদের ভেতর বসে থাকলে হয় গিয়ে-শিশির শুকিয়ে গেছে এখন প্রায়, সিসুগাছের ডালপালার ফাঁকে ছায়ারোদের ভেতর ঘাস ওখানে এখনো খানিকটা ভিজে ও নরম। কিন্তু এদিকে-একটু উত্তর-পশ্চিমের দিকে মাটি শক্ত সাদা-রোদে তাতছে-ঘাসগুলো শুকিয়ে গেছে সব; যাবে? বসবে গিয়ে?

কিন্তু কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের ভেতরই বসে রইল সে।

'আদিনাথকে উঠিয়ে দিলে কেন?'

'বারো টাকা মাইনে চাচ্ছে-না হলে সে কাজ করতে পারবে না—'

'কবে বললে? কাল ত বলেনি আমাকে—'

'কাল রাতে বলেছে। কুমুদিনীবাবু মুনসেফের বাড়িতে কাজ ঠিক করে এসেছে-পনের টাকায়।'

'চলে গেছে?'

'আজ সকালে আসেনি আর।'

'আমার সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে পারত-চলে যাবার আগে,' সিদ্ধার্থ পাঞ্জাবির বোতাম খুলে ফেলতে বললে, 'পনের টাকার কাজ পাচ্ছে-তাহলে বারো টাকায় থাকতে চেয়েছিল কেন আমাদের বাড়িতে? থাকত বারো টাকায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি দিতে পারতে বারো টাকা?'

সিদ্ধার্থ জামাটা খুলে ফেলে আরো খানিকটা শীতবোধ করে বললে, 'রাখলেই হত, তোমার ত হাঁপানি; এই শীতকালে আরো বাড়বে। একটা চাকর ঝি ছাড়া চলবে কি করে?'

শীতের সকালে বেশ রোদে বসে থেকে থেকে সুনীতির শরীরটা আরামে তৃপ্তিতে এই বারে বেশ গরম হয়ে উঠেছে, আরো রোদের ঝাঁজ ভাল লাগছিল না, একটা কপাট আবজে রেখে একটু ছায়া করে নিয়ে বললে, 'হিসেবটা তাহলে এইখানেই হয়ে যাক—'

'কীসের হিসেব?'

'কলেজ থেকে তুমি দু'শ টাকা পাচ্ছ ত—আমার হাতে দেড়শ টাকা দেয়া হয় ফি মাসে-এর চেয়ে—'

'তুমি ছায়ায় বসলে-রোদে ভাল লাগছে না তোমার—' সিদ্ধার্থ ছাড়া পাঞ্জাবিটা কাঁধের ওপর চড়িয়ে রেখে বললে 'আমি তাহলে একটু রোদে বসি, তোমার ডেক চেয়ারটাকে একটু ঘুরিয়ে বস ছায়ায়; আমি আমার এই বেতের চেয়ারটা—

'রোদে নিয়ে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ—' সিদ্ধার্থ পাঞ্জাবিটা ডান কাঁধ থেকে বাঁ-কাঁধে সরিয়ে রেখে সুনীতির দিকে তাকিয়ে বললে, 'কার্তিক মাসের ফাঠারোই বুঝি আজ; কেমন শীত শীত করছে—'

'শীত পড়েছে, 'সুনীতি আবজানো কপাটের ছোট ছোট ছ্যাঁদার অজস্রতা ঘিরে উড়ন্ত পোকাগুলোকে গুন গুন করতে দেখে সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'এ শীতটা কী করে কাটানো যায় তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে ত। একটাও গরম সেমিজ নেই আমার।'

'তুমি এদিকে এসে বস যদি একটু তাহলে আমি রোদের ভেতর বেতের চেয়ারটা সরিয়ে নিতে পারি।'

'ছায়ায় গিয়ে বসব আমি?' সুনীতি সিদ্ধার্থের স্বার্থপরতার চেহারার দিকে যেন তাকিয়ে নিজেকে নিজের শরীরটাকে একটা নিঃস্বার্থ শিকারের মত বোধ করে বললে, 'শীত লাগবে না আমার?'

'ছায়ায়ই ত বসে আছে তুমি', সিদ্ধার্থ টেবিলের ওপর কয়েকটা চিঠির দিকে তাকিয়ে (চিঠিগুলো ছেঁড়া হয়নি এখনো) বললে, 'কপাট আবজে রোদ আটকে রাখলে তুমি, ভাবলাম রোদের দরকার নেই তোমার। রোদে বসবে?'

সুনীতির কাশি উঠল; বেশ কাশি; কথা বলতে পারা যায় না। দম আটকে আসে, নাক-চোখ, ঠোঁট-মুখের দু—চারটে আঁচিল তিলও ঠিকরে ঠিকরে উঠে কি যেন বলতে চাচ্ছিল সিদ্ধার্থকে, সমূদ্রের জল ফেনা রৌদ্র ঝাঁজের ঘূর্ণির মতন।

'থাক, থাক, বলতে হবে না কিছু বলতে চেষ্টা কোর না,' সিদ্ধার্থ কর্তব্যের খাতিরে কথা বলতে বলতে খানিকটা মমতাপন্ন হয়ে বললে, 'বুঝেছি আমি; রোদের ভেতর বসা দরকার তোমার। বোসো, বোসো। কথা থাক এখন, কেন চেষ্টা করছ কথা বলতে; কাশিটা কিসে পড়ে যায় দেখ-একটু পিঠে হাত বুলিয়ে দেব?'

সুনীতি ডান হাতটা বাড়িয়ে পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে দিয়ে নিঃশেষ জানিয়ে ইশারার ভাষায় বললে' 'পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে হবে না—।'

'সেই ধোঁয়াটা টানবে?'

'না।'

'এফিড্রিন দেব?'

তক্ষুণি কোনো জবাব এল না। সুনীতি ঘাড় গুঁজে আছে, প্রতীকের মত তার মাথাটা; সিদ্ধার্থের ওপর নিতান্তই যদি সুনীতি রাগ না করে থাকে, কিংবা আগের দিকে রাগ করলেও শেষের দিকে সিদ্ধার্থের কথাবার্তা একটু দায়িত্ব মমতার আঁচ পেয়ে ক্ষমা করে থাকে তাহলে সিদ্ধার্থের প্রশ্নের উত্তরে সুনীতির মাথা পাপড়ির ওপরে ঘুমকাতুরে প্রজাপতির মত আস্তে একটু নড়বে;-কি ভাবে নড়েছে-কী তার অর্থ—সেটা বাইরের কেউ ধরতে না পারলেও সিদ্ধার্থ ধরে ফেলতে পারবে। সুনীতির নাড়ীনক্ষত্র বুঝতে পারে সে-তারই স্রষ্টা যেন কোনো এক ঐশী পুরুষের মত; কিন্তু তবুও সুনীতির স্রষ্টা সিদ্ধার্থ নয়-প্রকৃতি, হিতেনবাবু গগনবাবুরা হয়ত বলবেন ঈশ্বর; কিন্তু হিতেনবাবুদের ঈশ্বরের তৈরি এই স্ত্রীলোকটিকে চিনতে পারলেও নিজের জীবনে তাকে কোথেকে কিভাবে জড়িত করে কোথায় চলেছে তারা-এ জিজ্ঞাসা অর্থ বা সমাজনীতির চেয়ে বিষম প্রশ্ন; বিজ্ঞান ছেড়ে দিয়েছে, জ্ঞান চেষ্টা করে দেখছে-জ্ঞানের পদ্ধতি অনেকখানি অনুপ্রেরণা ও ভাবনা প্রতিভার ওপর নির্ভর করে বলে। সুনীতি মাথা নেড়েছে। এফিড্রিন চায় না সে। ডাক্তার ঘোষকে ডাকি তাহলে?' ঘরের ছায়া ঠাণ্ডায় কার্তিক মাস নিজেকে টের পাইয়ে পাইয়ে এখন উঠতি সূর্যের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিল প্রায়, তবুও একটু নাড়ীর শীতে কেঁপে উঠে সিদ্ধার্থ বললে। কে ঘোষ? কোন ঘোষের কথা বলছ তুমি—' হাঁপ সামলাতে সামলাতে সুনীতি বললে।

'আনন্দ ঘোষ—হুপিং কাফ, হাঁপানি ব্রংকাইটিসের স্পেশালিস্ট তিনি—'

'ও-আমি ভাবলাম মহেন্দ্র ঘোষের কথা বলছ নাকি তুমি—'

'না, তিনি বোধহয় এখন নেই বাসমতীতে।'

'কোথায় গেছেন তিনি? কলকাতায়?'

'না-কলকাতায় যান টান না। তবে শুনেছিলাম মৈমনসিং গিয়েছেন-ওখানকার কোন এক জমিদার বাড়ি চিকিৎসায় ডাক পড়েছে—'

'ও—' সুনীতি বললে, কাশির ধকলটা কমে আসছিল তার; মহেন্দ্র ঘোষের বাইরে খুব নাম ডাক আছে দেখছি। কোথায় বা মৈমনসিং-ঐ অতদূর থেকে ডেকে নিয়ে গেল বুঝি তারা।'

'মহেন্দ্রবাবু ত বেশ বড় ডাক্তার।'

'শ্রীময়ী ফিরেছে বাসমতীতে?'

'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন?'

'সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়াল। টেবিলের ওপর কতকগুলো চিঠি এসে রয়েছে; কাল বিকেলের ডাকে এসেছে বোধহয় চিঠিগুলো-সন্ধ্যের সময় বিলি করে গেছে হয়ত পিওন; চিঠিগুলো না ছিঁড়ে উল্টেপাল্টে নেড়ে চেড়ে সরিয়ে রেখে দিল সে। সসুগাছের মাথা ছাড়িয়ে আরো ওপরে উঠেছে সূর্য, মুখোমুখি দু'টো জানালার ভেতর দিয়েই অনেকখানি রোদ টেবিলের ওপর এসে পড়েছে; নিজে সেখানে সে বসেছিল-বা ঘরের অন্য কোনো দিকে রোদ নেই যদিও-তবুও শীতের ভাবটাও নেই। গেঞ্জিটা খুলে ফেলল সে; গেঞ্জি পাঞ্জাবি ঘরের ভেতর এক দিককার একটা টানানো তারে ঝুলিয়ে রেখে এসে চেয়ারটা টেনে ধুতির খুট গায়ে জড়িয়ে বসে পড়ে বললে, 'কী জিজ্ঞেস করছিলে তুমি?'

'শ্রীময়ী ফিরছে না কেন বাসমতীতে?'

'ও—সেই কথা—সিদ্ধার্থ আবার উঠে গেল; একটা শার্ট আঁটতে আঁটতে বললে, 'মহেন্দ্রবাবুকে ভাল লাগে না তাঁর-সেই জন্যেই আসে না।'

'কেন, মহেন্দ্রবাবুর ত অনেক টাকা আছে।'

'টাকা সব নয়।' সিদ্ধার্থ শার্টের বাঁ হাতের ঝিনুকের বোতামটা আটকাতে আটকাতে বললে।

'সকলের কাছে সব নয়।' বোতামটা আটকে ফেলে জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ বললে।

'কোথাও যাচ্ছ নাকি তুমি?'

'না।'

'শার্ট পরলে যে?'

কেমন একটু শীত করছে।

'শ্রীময়ী তাহলে বাসমতীতেই ফিরবেই না? সহেন্দ্র ডাক্তারের চেহারা ত শ্রীময়ীর চেয়ে খারাপ নয়—'

'না—না—শ্রীমতীর চেহারা ঢের ভাল।' সিদ্ধার্থ বললে, 'কিন্তু চেহারা দিয়ে কি হবে—' কি যেন বলতে যাচ্ছিল সিদ্ধার্থ; কিন্তু থেমে গিয়ে টেবিলের চিঠিগুলোর দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, মহেন্দ্রবাবুর চেহারা ঠিকই আছে, মহেন্দ্রবাবুর চেহারা খারাপ ত নয়। তবে—শ্রীমতীর মত অতটা ভাল নয়। কি হবে মানুষের চেহারা দিয়ে? সুস্থ সবল লম্বা মানুষ, মহেন্দ্রবাবু—'

'শার্ট গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল সিদ্ধার্থ, চোখ যেন কি একটা জিনিসের কিনারা মাপছে-বাইরের দিকে একটু চিন্তিত চোখে তাকিয়ে থেকে আকাশ মাঠ গাছপালার বদলে ভেতরের পৃথিবীটাকে দেখছিল সে, কি যেন একটা পৃথিবীর অনেকবার মীমাংসিত ব্যাপারের সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে অন্য কোন নতুন আলো পাওয়া যায় কিনা খোঁজাখুঁজি করছিল।

'বেশ লম্বা চওড়া মানুষ মহেন্দ্রবাবু। গায়ের রং কালো বটে, নাকের ফোকা দু'টো বেশ বড় হলেও নাক বেশ উঁচু—'

'মানে অনেকখানি মাংস আছে নাকে।'

'তুমি অত সব আবার দেখেছ নাকি-সুনীতির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সিদ্ধার্থ বললে, 'আমি স্ত্রীলোক হলে মহেন্দ্রবাবুকে নিয়ে বেশ সুখী হতাম—'

'অনেক টাকা আছে ত তার।'

'টাকার কথা নয় মানুষের কথা।'

সুনীতি আবজানো কপাটটা খুলে ফেলে আস্তে আস্তে বললে, 'অস্বাভাবিক সব কথা তোমার; তুমি যদি স্ত্রীলোক হতে, তাহলে মহেন্দ্রবাবুকে নিয়ে খুশি হতে। এ কিরকম কথা।'

চেয়ারটা টেনে বসল সিদ্ধার্থ; টেবিলের চিঠিগুলো কুড়িয়ে এনে হাতের কাছে রাখল, দু'টো চিঠিই এসেছে কলকাতার ইনসিওরেন্স কোম্পানির থেকে-একটা বিলিতি কোম্পানি, বিশ বছর আগে সেখানে ইনসিওরেন্স করিয়েছিল সে—আর একটা দিশি কোম্পানি-বছর আষ্টেক আগে কুড়ি বছরের মেয়াদে একটা পলিসি নিয়েছিল। কী লিখেছে এরা? কোয়ার্টারলি প্রিমিয়াম দেবার মোটামুটি তারিখ সিদ্ধার্থকে জানিয়ে দেবার দায়ে এরা যেমন লেখে, আজও তেমনি লিখেছে। না ছিঁড়ে চিঠি দু'টো সরিয়ে রাখল সিদ্ধার্থ। আরো চিঠি আছে টেবিলেরি ওপর, সবই খাম। কুড়ি পঁচিশ দিনের ভেতরেও একখানা চিঠি আসে না-পোস্ট অফিসের সঙ্গে এই রকমই সম্পর্ক তার। কিন্তু কাল বিকেলে এতগুলি চিঠি এল।

'তোমার ত খুব কাশি বেড়ে গেল—টানের মতন হল দেখছি-ইনজেকশনের কথা বলছিলাম—'

'না, লাগবে না। ওটা ত আমার গৃহিণী রোগ; একদিনের ইনজেকশনে কি হবে। আনন্দ ঘোষকে চারটে টাকা গচ্চা দিতে হবে-এই ত।'

'তা দরকার হলে টাকা দেব—' সিদ্ধার্থ বিলিতি ইনসিওরেন্স কোম্পানির চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ছিঁড়ে দেখল দু'হাজার টাকার পলিসি নিয়েছিল বিশ বছর আগে-পঁচিশ বছরের মেয়াদে; বছর দুই আগে পলিসি বাঁধা দিয়ে হাজার খানেক টাকা ধার করেছিল কোম্পানির কাছে; ছ'মাস অন্তর বত্রিশ টাকা করে সুদ দিয়ে আসছে; চিঠি খুলে দেখল এবারেও সুদে-আসলে মিলিয়ে প্রায় ষাট টাকা দিতে হবে। আর দিশি কোম্পানিটাকে কত দিতে হবে? ওখানে ও ত পলিসি বাঁধা দিয়ে শ পাঁচেক টাকা ধার নিয়েছিল ত গত বছর; ওটারও ষান্মাসিক সুদের সময় হয়েছে, অঙ্কটা কত? কিন্তু দেখবার জন্যে এখুনি কোনো তাগিদ বোধ করল না সিদ্ধার্থ; একশ টাকা সুদ আর প্রিমিয়াম দিতে হবে এই মাসে-কিংবা সামনের মাসে। এই মাসের টাকা ত খরচ হয়ে গেছে সব-সামনের মাসের মাইনের থেকে আধাআধি আগাম নিয়ে এসেছে; কলেজ কো-অপারিটিভে আড়াই হাজার টাকা ধার, প্রভিডেন্ট ফান্ডে যেটুকু টাকা না থাকলে নয় সেই নামমাত্র টাকাটা আছে-বাকি সব কর্জ করে করে ফুকে দিয়েছে। মদ খায় না-সিনেমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে না-কোনোরকম বদ খেয়াল নেই—চার পাঁচ বছর হল বই কেনা ছেড়ে দিয়েছে-বাসমতী ছাড়া স্ত্রী পরিবার নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাবার সঙ্গতি নেই, যায়ও নি সে কোথাও-এক আধবার কলকাতায় ঘুরে এসেছে।

টাকাকড়ির কেমন একা পাপচক্রের ভেতরে পড়ে গেছে সে; একশ পঁচাত্তর টাকা মাইনে ত তার-পঁচিশ টাকা ডি এ; কিন্তু নানাদিকের দেনা ও সুদে একশ দশ পনেরর বেশি কলেজ থেকে কোনো মাসেই আনতে পারে না, পঞ্চাশ ষাট টাকা আবার নতুন করে ফি মাসেই ধার করতে হয় কলেজের কোনো না কোনো ফান্ডের থেকে। কিন্তু সে সব ফান্ডেরই ঋণ দেবার একটা নির্ধারিত পরিমাণ ঠিক করা আছে-প্রফেসরদের মাইনের সঙ্গে অনুপাত রক্ষা করে, নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি ঋণ দেয়া হয় না কাউকেই কখনো। সিদ্ধার্থ সব ফান্ডের থেকেই বোধহয় উর্ধ্বতন পরিমাণ ধার করে ফেলেছে; সামনের মাসে কোনো ফান্ড থেকেই ধার নেয়া চলবে না বুঝি আর। তাহলে একশ দশ টাকায় সংসার চালাতে হবে সামনের মাস-ইনসিওরেন্স কোম্পানি দু'টোকে দিতে হবে একশ টাকা।

দশ টাকায় সংসার চালাতে হবে? মোটের ওপর দু'টো ইনসিওরেন্স করেছিল সে-সাড়ে তিন হাজার টাকার। দু'টো পলিসিই ল্যাপস করাবে সে,-এ ছাড়া কোনো পথ নেই তার।

কিন্তু বড় বেশি টাকাকড়ির কথা ভাবছে সে। যদি না ভাবতে যাওয়া যায় তাহলে সিসুগাছের ডালে শালিকগুলো পরস্পরকে তাড়া করে যে কি ভীষণ ঠোকাঠুকি করছে তা দেখেও একটা নিস্তার বোধ করতে পারা যায়; কি-রকম আশ্চর্যভাবে নির্দোষ এই পাখিগুলো মানুষের ইতিহাসের পটভূমিকার তুলনায়; কেমন তিনি ত্রিরাখে নয়ের মতন লাফাচ্ছে সিসুগাছের কচি মিহি মোটা ডালপালার ভেতর, রয়ানী মাঠের সেই দু'টো ষাঁড়ের মত মাথা নিচু করে গভীর শয়তানের মত খিঁচে ছুটেছে একটা পাখি আর একটা পাখিকে নিকেশ করে ফেলবার জন্যে? কী নিয়ে এত আক্রোশ তাদের? কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ কাউকে মারে না, একটা আধটা পালক খসিয়ে শেষ হয়ে যায় ব্যাপারটা, মিল মিশ হয়ে যায়। প্রথম মেহস্তের উঁচু উঁচু গাছের ঝরঝরে রোদে এরাই মানুষের সহজ সরস কল্পনা, সাধের এক একটা স্ফুলিঙ্গ।

কিন্তু তবুও মানুষ অনুভূতিময় নয় শুধু-চিন্তিতও—কোনো কোনো জায়গায় আশ্চর্য রকমে সুচিন্তিত—। সে সব দিকের প্রায় পূর্ণ অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে কোনো কোনো মানুষ সবচেয়ে বেশি ব্যথা বেদনা বিজ্ঞানী হতে পেরেছে সৃষ্টির ভেতর।

এই সব দিক দিয়ে পাখিদের চেয়ে মানুষ বড়। কিন্তু সব দিক দিয়ে নয়; সব মানুষ নয়।

'আনন্দ ঘোষকে ডেকে নিয়ে আসি।'

'না। সে চারটে টাকা বরং আমাকে দাও।'

'তোমাকে দেব? সিদ্ধার্থ সুনীতির দিকে তাকিয়ে বললে 'তাহলে ত তোমার-হাঁপানির কোনো উপশম হবে না।'

'আনন্দ এসে আমাকে অ্যাড্রিনেলিন দিয়ে এক আধ দিন একটু চাপাটাপা দিয়ে যাবে-কিন্তু আবার ত চাগিয়ে উঠবে। তখন কিছু করতে পারবে আনন্দ আবার অ্যাড্রিনেলিন ছাড়া?'

সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'সে রকম কোনো ওষুধ নেই হাঁপানির।'

'তোমাকে কি চিঠি লিখল?' টেবিলের চিঠিগুলোর দিকে চোখ ইশারা করে সুনীতি বললে।

'ইনসিওরেন্স কোম্পানির চিঠি।'

'প্রিমিয়াম দিতে হবে বুঝি এ মাসে?'

'হ্যাঁ,' সিদ্ধার্থ পায়চারি করতে করতে বললে, 'সামনের মাসে দিলেও হয়।'

'কত কাটা?'

'বরাবর যা দিচ্ছি।'

'দু'টো মিলিয়ে সাড়ে তিন হাজার পলিসি ত?'

'সিদ্ধার্থ পেছনে হাত বেঁধে একটু কুঁজো হয়ে ঘরের ভেতর আস্তে আস্তে পায়চারি করছিল-অনেকটা ফাঁটার মতই; এটা বোধহয় বাসমতী সমাজের বয়স্ক ছেলেদের কেমন একটা সংস্কারগত অভ্যাস-কারো সঙ্গে কারো রক্তের বা মনের কোনোরকম মিল না থাকলেও। কিছুই ছিল না মিল ফাটা আর সিদ্ধার্থের।

'হ্যাঁ, সাড়ে তিন হাজার।' সিদ্ধার্থ বললে।

বোনাস ফান্ড মিলিয়ে হাজার পাঁচেক টাকা হবে?'

'ওরা ভালই বোনাস দিচ্ছে অনেক দিন থেকে,' সিদ্ধার্থ টেবিলের একটা কিনার ধরে দাঁড়িয়ে বললে, 'তবে আজকাল সব ব্যবসায়েরই সময়টা খারাপ যাচ্ছে, বোনাস আগের মতন দিতে পারছে না তাই। তবে হ্যাঁ-মেরে কেটে পাঁচ হাজার ত হবেই।'

এক হাজার টাকা ধার নিয়েছিল যে সানলাইফের থেকে বছর দুই আগে সেটা সুনীতিকে জানায়নি সিদ্ধার্থ। পাঁচশো টাকা ধার নিতে হয়েছে যে হিন্দুস্থানের থেকে গত বছর তাও জানে না সুনীতি। কি হবে এসব জানিয়ে? হাঁপানির টানে এ্যান্টিনেলিনের কাজ করবে না। এমনিই টাকাকড়ির অভাব খুব কাতরে আছে সুনীতির মন-এত বেশি যে কিছু কাল ধরে ঠিক ভাবে ভজিয়ে উচিত মত ব্যবস্থা করে দিলে টাকাঅলা মহেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে বসবাস করতে হয়ত রাজি করানো যেতে পারে সুনীতিকে।

হাঁপানির টানে সুনীতির বুক কোক উঠছিল পড়ছিল, ঘরের ভেথর পায়চারি করছিল সিদ্ধার্থ-ময়লা ধুতি ও ধোপা বাড়ির শার্ট গায়ে দিয়ে; ধুতিটা খুবই ময়লা—

কোনো হিসেবেই-কোনো ক্রমেই মোটেই মানাচ্ছিল না;—জিনিসটা নিজের চোখে পড়েনি সিদ্ধার্থের। সিদ্ধার্থ চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েছিল একবার; কিন্তু উপায় নেই-কে কেচে দেবে? কোনো লোক নেই, সাবান নেই—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মোটমাট পাঁচ হাজার টাকা বলছ তুমি? এই সব?

'হ্যাঁ-দু'টো ত করেছি। প্রফিট টফিট মিলিয়ে পাঁচ হাজার আন্দাজ দাঁড়াবে গিয়ে।'

'ইনসিওরেন্সের টাকা আমাদের ভাগে খুব কম পড়ে গেল।'

'নেই। ভেবে দেখেছি আমি,' সিদ্ধার্থ ঘাড় গুঁজে হাঁটছিল, ঘাড় তুলে সুনীতির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি মরে গেলে তোমরা মাত্র পাঁচ হাজার টাকা পাবে। আজকালকার দিনে টাকার দাম যা তাতে পাঁচ হাজার টাকা কিছু নয়। কিন্তু এর চেয়ে বেশি ইনসিওরেন্স করতে পারলাম না।'

'এরকম কথা বলা হল কেন আবার?'

'না, আমি যদি মরে যাই-সেই কথা বলছিলাম—'

'তোমার দেরাজে আমার এফিড্রিনের শিশিটা আছে—'

'চাই? বড়ি খাবে একটা?'

'হ্যাঁ, বেশি হাঁপ উঠেছে, না খেলে হবে না। তোমার টেবিলের কিনারে কুজো গেলাস আছে-খানিকটা জল দাও ত আমাকে।'

সুনীতি এফিড্রিনের শিশি হাতে তুলে নিয়ে বললে, 'আমি বলছি তুমি হাজার পনের কর।'

ওষুধের শিশির গায়ে কী লেখা ছিল পড়ে দেখছিল সুনীতি; কিছুটা পড়ে সিদ্ধার্থের দিকে বাড়িয়ে বললে, 'হ্যাঁ। না হলে কি দিয়ে কী হবে আমাদের—আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।'

সিদ্ধার্থ কুজোর থেকে জল ঢালছিল, বললে 'এখনই পনের হাজার টাকা ইনসিওরেন্স করতে পারছি না। তবে একটা ব্যবস্থা তোমাদের জন্যে করে যাব আমি। তুমি হয়ত ভাবছ আমি শিগগিরই মরে যাব। তুমি ত খুব স্বপ্নে টপ্নে বিশ্বাস কর; কী স্বপ্ন দেখলে আজকাল; অনেক দিন জিজ্ঞেস করিনি। দেখেছ নাকি তেমন কিছু?'

সিদ্ধার্থের হাত থেকে জলের গেলাসটা তুলে নিয়ে সুনীতি বললে, 'প্রভিডেন্ট ফান্ড কত জমেছে?'

'প্রায় হাজার সাতেক হবে।'

'প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে আগে আগে মাসে মাসে টাকা ধার টার আনতে শুনতাম—'

'ও—সে অনেক আগের কথা—'একটা চুরুট জ্বালিয়ে নেবে নাকি ভাবতে ভাবতে সিদ্ধার্থ বললে, 'যা টাকা ধার নিয়েছিলাম সে সব পুরিয়ে রেখেছি আবার। এখন আর কোনো ধারধোর নেই।'

জলের গেলাসটা মুখের কাছে এনে সুনীতি বললে, 'মোটমাট বারো হাজার টাকা তাহলে। ত্রিশ হাজার টাকা হলেই ঠিক হত।' একটু জল চুমুক দিয়ে এফ্রিডিনের বড়িটা গলার ভেতর ঠেলে দিল সুনীতি।

আজই সে মরে যেতে পারে-কিংবা কালও মরে যেতে পারে সিদ্ধার্থ; মরে গেলে ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলো ধার টার কেটে তার ওয়ারিশকে ছ'হাজার টাকাও দেবে কিনা সন্দেহ, কে বা সেই পুরুষমানুষ যে সুনীতির হয়ে খুব চটাপট তত্ত্বতালাশ হয়ে টাকাটা তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেবে এই স্ত্রীলোকটির হাতে; সিদ্ধার্থের শালাও নেই, শ্বশুরও নেই; সুনীতির দেওর আছে এজন্য কিন্তু দূরে থাকে, নানা কাজ কর্ম নিয়ে জড়িত। প্রভিডেন্ট ফান্ডে হাজার খানেক টাকা আছে-বাকি সব ধার করে খেয়ে ফেলেছে সিদ্ধার্থরা। সে মরে গেলে সব মিলিয়ে এই তিন হাজার টাকা পাবার কথা সুনীতির-কতদিন লাগবে পেতে-বলা কঠিন। কিন্তু সুনীতিকে বারো হাজার টাকার বুঝ দিয়েছে সিদ্ধার্থ। মন মানেনি, ত্রিশ হাজার টাকা চাচ্ছে সুনীতি। জিনিসটাকে জড়িয়ে দিলেও পারে সিদ্ধার্থ। সে যা দিতে পারে-তার চেয়ে বেশি কি করে দেবে সুনীতিকে। কিন্তু ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়া উচিত সুনীতিকে। এ রকম লুকোচুরি করে লাভ কি। সে মরে গেলে লুকোচুরিটা ধরা পড়ে যাবে-ঠিক। কিন্তু কী হবে তাতে? সে ত নেই তখন।

এ রকম অব্যাহতিবাদে অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস নেই তার। জীবনবেদ তার অন্য রকম। কিন্তু বাস্তবে ফলাতে পারছে না সেটাকে। চুয়াল্লিশ বছর বয়স হল।

লাইফ ইনসিওরেন্সে সুনীতির যত প্রাপ্য, প্রভিডেন্ট ফান্ডে কত টাকা আছে—কলেজ কো-আপারেটিভেই বা কত ধার কিছুই জানানো হল না সুনীতিকে।

আজই জানিয় দেবে এই অদম্য সংকল্প নিয়ে আজ বেলা দশটায় বাসায় ফিরে ছিল সে। কিন্তু হল না। সানলাইফ অব ক্যানেডার চিঠিটা হাতে তুলে মুড়ে মুচড়ে ফেলল সিদ্ধার্থ, পকেটে ফেলে রাখল, বাকি চিঠিটাও। সুনীতি যে চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলেনি-অব্যাহতির পথেই সুনীতি নিজের অজ্ঞাতসারে সিদ্ধার্থকে চলতে শিখিয়েছে। এই স্ত্রীলোকটির সম্পর্কে এই পথেই কি বারবার চলতে হবে তাকে? বিয়ে মানেই সর্বদাই ভালোবাসার একটা কিছু ব্যাপার নয়, ভালোবাসা হলেও স্ত্রীকে সব সময়ই সত্য কথা বলা কঠিন প্রধানত টাকাকড়ির ব্যাপারে, বিশেষত টাকা জমানোর চেয়ে ধার করাই। যেখানে স্বামীর প্রধান গুণ হয়ে দাঁড়াল। ওতে বালোবাসার বিষয়ও টেঁসে যেতে চায়- আজকাল বাংলাদেশেও—বিশেষ করে কলকাতার লিগ্যাল সেপারেশন বেড়ে যাচ্ছে স্বামী অন্য কোনো মেয়েকে নিয়ে মজে গেছে বলে ততটা ঠিক নয়, কিন্তু স্বামীর টাকার জোর কমে গেছে বলে কিংবা নিজের স্ত্রীকেই ষোলো আনা ভাগ দেয়া হচ্ছে না বলে। তাই নয়? 'তুমি ত চুরুট খেতে না।'

'না খেতাম না।'

'চুরুট কোথায় পেলে তুমি?'

'এই দেরাজের ভেতরে ছিল।' সিদ্ধার্থ খুব সম্ভব ভাল কথা ভাবছে না। এতক্ষণ যা ভাবছিল। ভাল কাজ করছে না-অনুভব করে। চুরুটটা টেবিলের ওপর রেখে দিল। চুরুটের পাশেই দেশলাইটা খুঁজে বার করে রেখে দিয়েছে।

'বড়ি খেয়ে কেমন বোধ করছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এটায় তাড়াতাড়ি কাজ হবে মনে হচ্ছে, ওষুধটা পার্ক ডেভিসের।'

'পার্ক ডেভিসে? কে কিনে দিল?'

'সুকুমার।'

'ও-সুকুমার।' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে ঘরের একটা গরান কাঠের খুঁটির কিনারে মুলিবাঁশের বেড়া ঘঁষে মাকড়সার জালটা বেশ জায়গা জুড়ে জমিয়ে বসেছিল, সেটা ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে হাত বাড়াতে গিয়ে সুতোর মত ফিনফিনিয়ে কয়েকটা মাকড়সা জীবনের স্বাদে নিঝঝুম হয়ে আছে টের পেয়ে হাতটা সরিয়ে নিল। 'সুকুমার কলকাতার থেকে এনে দিয়েছিল?'

'না, এখানে পেয়েছে।'

'বাসমতীতে পার্ক ডেভিসের এফিড্রিন। এখানে ত কোনো বিলিতি ওসুধই পাওয়া যায় না। তবে—'

চোরাবাজারে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে কথা উল্লেখ করতে গেল না সিদ্ধার্থ; কিছু বলে না সুনীতি; সে ঘাড় গুঁজে নিজের ল্যাংসের ব্যাপারের দিকে নিবিষ্ট হয়ে আছে মনে হচ্ছিল তার দিকে তাকিয়ে-কিন্তু এরকম ভাবেই মাথা কাত করে মেঝের দিকে চোখ রেখে নিঃশ্বাসের ওঠাপড়ার ভেতর দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের কথা ভেবে নেয় এই মেয়েলোকটি জানা আছে সিদ্ধার্থের।

'চোরাবাজারে কেনে নি সুকুমার।' সুনীতি বললে। হাতের শিশিরটার লেবেলের লেখাগুলোর দিকে চোখ মেলে সুনীতি বললে, 'যা দাম-সেই দামেই এনে দিয়েছে।'

'এক আধটা ফাইল ছিল হয়ত।'

'চুরুট কোথায় পেলে তুমি?'

'আমি কিনেছি এক বাক্স।'

'খাচ্ছ নাকি আজকাল?'

'একটু আধটু আরম্ভ করেছি আবার।' সিদ্ধার্থ মাটির মেঝের ড্যাম্পে পা কালিয়ে এসেছে টের পেয়ে বছর দেড়েকের পুরনো নিউ কাটটায় এখনো কিছু পদার্থ আছে বোধ করে জুতো জোড়ার ভেতর পা ঢুকিয়ে দিতে দিতে বললে, 'বিয়ের আগে এক সময় সিগারেট চুরুট নেহাত কম খেতাম না। অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছিলাম তারপর। আবার দেখছি।'

সুনীতি বললে—'আমার সামনে খাবে না। খাওয়া ভাল কি মন্দ সে নিয়ে সরোজিনী পিসির মত ভিটকেলেমি নেই, হাঁপানির মানুষ ত।

'শোনো—'

সিদ্ধার্থ নেমে দাঁড়ালে, সিদ্ধার্থ বললে, 'সেই দেড়শো টাকার হিসেবটার—তুমি দু'শো টাকা মাইনে পাচ্ছ—দেড়শো দিচ্ছ আমাকে সংসার চালাতে—পঞ্চাশ নিজে রেখে দিচ্ছ—কি করে দেড়শো টাকায় সব চালাতে পারি আমি? চালের মণ কুড়ি বাইশ টাকার নিচে ত নামছেই না, মাঝে মাঝে ত্রিশ চল্লিশে ওঠে, এক টাকায় দেড়সের দুধ

'টেবিলের থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধার্থ বললে 'ওসব রাতে মুসাবিদা করে ঠিক করা যাবে। তখন তোমার হাঁপানির টানও পড়ে যাবে একেবারে। খেয়েদেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে হিসেবপত্র নিয়ে বসা যাবে—'

'আজ ত মাসের বিশ তারিখ? আমার দেড়শো টাকা ফুরিয়ে গেছে।'

'ফুরিয়ে গেছে?' চুরুটটা জ্বালানো হয় নি-টেবিলের ওপর রেখে দিল সিদ্ধার্থ। হাঁটছিল, একেবারে থেমে গেল। টেবিলের একটা কিনারে হাত রেখে বললে, 'এত টাকা কি করে খরচ হয়ে গেল? তোমার ত শুধু খাওয়াদাওয়া চাকর বাকরের দিকটা দেখতে হয়, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, বাড়ির খাজনা, লাইফ ইনসিওরেন্স, ইনকাম ট্যাক্স, খবরের কাগজের দাম-কুড়োনির মাইনে, দপ্তরির মাইনে-পাঁচরকম হাত খরচের ব্যাপার সমস্তই ত আমায় দেখতে হয়।'

'তুমিই সব চালিও—' সুনীতি বললে, 'সবটাই। মিছেমিছি আমাকে দেড়শো টাকা গছিয়ে ভাঁওতা দিয়ে লাভ কি।'

'তোমার সব কথায় চলে আসে টাকাকড়ির চোরাবালিতে ঠেকে যায়—'

জীবনের বৃহত্তর ভেদ করে যেখানে টাকার অঙ্ক এত কম সেখানে সম্ভব ভালোবাসাই শুধু এলে রক্ষা করতে পারে স্বামীকে ও স্ত্রীকে। কিন্তু টাকা এত বাস্তব বলেই শুধু নয়-তাছাড়াও ভালোবাসা ত এক অব্যয় জিনিস। কাকে ভালোবাসে সিদ্ধার্থ? কয়েকটা দিন যে আবেদনকে বিয়ের পর প্রথম প্রথম একমাত্র উৎসব মনে হয়েছিল বোঝা গেল যে তা মৃত্তিকাগভীর; মৃত্তিকাগভীরতার একটা মূল্য আছে, কিন্তু সুনীতির শরীর নানারকম পৈতৃক রোগে (হাঁপানীও তার ভেতরে একটা) অল্প দিনের ভেতরেই ভেঙে চুপসে গিয়ে সেই মদিরতার স্বাদও খুব তাড়াতাড়ি গাদিয়ে দিয়েছিল সিদ্ধার্থের জীবনে। পচা শরীর যাকে ধারণ করে সে আধেয় অনেক সময় খুব উজ্জ্বল হয়, কিন্তু এর বেলা তা হয়নি, আরো খারাপ হল তাতে, কোনো আশ্রয়ই পাওয়া গেল না কোনো দিক দিয়ে তাই। অথচ সমাজের নির্দেশে বিবাহিত হয়ে নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কার কাছে মদিরতা খুঁজতে যাবে সে কিংবা আনন্দ? এ দু'টো জিনিস চাই তার; এ না হলে সময় অসময়ের পরিপূরক নয়, জীবন সেই; কিন্তু গত পনের বছর ধরে এ জিনিস পাচ্ছে না-সুনীতির কাছ থেকে পাচ্ছে না।

এ দু'টো জিনিস চাই তার? চাই-ই বুঝি? সিদ্ধার্থের হাসি পেল। এতদিনের ভাবনা চিন্তা মন্থন করে জীবনে তার দু'টি দু-মুখো সিদ্ধার্থে জেগে উঠেছে; এরকম আবিষ্কারের অস্থির তাড়নায় তত নয়-কিন্তু শুদ্ধভাবে কেবলি সত্য লাভের ফলে নিজেকে নিজেকে জ্ঞানী মনে করতে চায়, আরেক জন সিদ্ধার্থের মনের আর একটা দিক-মানুষের জীবনে অত বেশি আগ্রহ ও আন্তরিকতা যে ফুলে ওঠে স্তনিত নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করতে পারে না রঙ বেরঙের বেলুন ফাঁপিয়ে তোলে সেই খাপছাড়া করুণ সুনীতির দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয় মানুষের-সৃষ্টি ও সমাজের অন্ধকারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্গুণ গহ্বরের ভেতরে দুর্বল নিঃসহায় মানুষের। সমাজকে ভাল করা যেতে পারে হয়ত। অনেক কালের সাধনার দরকার। কিন্তু সৃষ্টিকে কে ঠিক করবে?

'কত টাকা চাই তোমার মাসে?'

'আমার দু'শো টাকার কমে হবে না।'

'দু'শো টাকা ত আমার মাইনে।'

আজকাল টুইশন ত করছ।'

'দু'টো নিয়েছিলাম—কিন্তু ছেড়ে দিতে হয়েছে—'

'ছেড়ে দিলে টুইশন? কেন?'

'যা ইংরেজি লেখে বি এ এমনি পাস করতে পারবে না, অনার্স নিয়ে পরীক্ষা দিতে চায়, পরীক্ষার ত আর চার পাঁচ মাস বাকি।।' সিদ্ধার্থ টেবিল থেকে চুরুটটা তুলে নিয়ে বললে, 'আর একটি ছেলে ইকনমিকস্-এ কিছু না, ইংরেজিতে আরো খারাপ, কিন্তু ইংরেজি পড়াতে বসলেই ইকনমিকস্ টেনে এনে সময় নষ্ট করতে থাকে, কোনো লাভ নেই এমন ছেলেদের পড়িয়ে। টাকা পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু টাকার লোভে ফাঁকি দিতে আমি রাজি নই-আমাদের কলেজের প্রফেসররা কী করেন জানি না, তবে প্রফেসরদের ভেতর থেকেই এদের প্রাইভেট মাস্টার জুটে যাবে, হয়ত কেউ নিয়ে নিয়েছেন টুইশন দু'টো—'নিশ্চয় নেবে,' সুনীতি গেলাস থেকে একটু জল খেয়ে নিয়ে বললে, 'তারা ত তোমার মতন ধারে কাটেন না।'

'ধার? সিদ্ধার্থ চুরুটটা টেবিলে গড়িয়ে রেখে দিয়ে বললে, 'কার কাছ থেকে আমি ধার করেছি?'

'তোমার মাইনের টাকায়ই চলছে সবে?' সুনীতি জলের গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে কাঁচের ভেতর জলটাকে নাড়া খাওয়াতে খাওয়াতে বললে।

'ধার করেছি অবিশ্যি আমি—' দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সুনীতির সঙ্গে এবারে একটু বিনত বিব্রত মনে হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধার্থ বললে, 'তবে আমি শোধ করে দেব বলেই করেছি ধার—'

'আমাকে লুকিয়ে ধার করার অভ্যাস ত তোমার—'

'কে বললে?'

'কিন্তু তবুও আমি টের পাই।'

'এর পরেই তাহলে সুনীতিকে সব কথাটা ভাঙিয়ে বললে হয়; সুনীতির কানে গিয়েছে হয়ত কিছু কিছু কিন্তু সিদ্ধার্থের ধারকর্জের ব্যাপারের সবটা সে জানে না-অনেকখানিই জানে না। এই বারে তাহলে স্বামী সব পরিষ্কার করে বলে দিক সব-স্ত্রীকে; ফলে যতই অশান্তি আসুক না ঘরে সেটা সইতেই হবে।

সিদ্ধার্থ একটা চেয়ার টেনে বসে বললে, 'আমি ধার করেছি বটে কিছু, কিন্তু মরবার আগে শোধ করে দিয়ে যাব সব। এক পয়সাও কর্জ রেখে যাব না। আমার ঋণ টিন নিয়ে তোমাদের কোনো বেগ পেতে হবে না।'

'কত ধার করেছ প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে?'

তক্ষুণি উত্তর দিল না সিদ্ধার্থ, টেবিলের চুরুট ও দেশলাই নিয়ে অজানিত শিশুর মতন নিমগ্ন হয়ে রইল কিছুক্ষণ, মাথাটা একটু ঝুঁকে পড়ল টেবিলের দিকে।

'যাক, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করতে যাব না।'

'বলছি তোমাকে।'

'তুমি নিজের থেকে বলোনি যখন। এখনই ত দ্বিধাবোধ করছ বলতে।' সুনীতি গেলাস থেকে আরো খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে বললে, 'আমি খোঁচাব না, বলব না তুমি ফাঁকি দিচ্ছ যা সাধ্যিতে কুলোয় ধার টাকা দিচ্ছ তুমি সংসারে। আমি দেখেছি টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে তুমি খুব ধকলে পড়েছ। কিন্তু তবুও আমাকে কিছু জানাবার দরকার বলে মনে কর না, আমার ওপর কোনো শ্রদ্ধা নেই তোমার। তোমার ওপরও আমার কোনো বিশ্বাস নেই।'

সিদ্ধার্থ সুনীতির হাতের জলের গেলাসটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ঠাণ্ডা জল খাচ্ছি খুব।'

'এ ওষুধটা খেলে তেষ্টা পায়।'

'টান পড়ে গেছে ত অনেকটা।'

'না। ভেতরে ভেতরে আছে।'

'বেশি?'

'কম নয়। তবে খানিকটা উপকার হয়েছে। আরো একটা বড়ি খেতে হবে।'

সিদ্ধার্থ টেবিলের থেকে একটা চটি বই তুলে নিয়ে কাঠের ওপর আস্তে আস্তে ঘা দিতে দিতে বললে, 'ডাক্তারেরা ত অত বেশি খেতে বলেন না, একটা বড়ির অর্ধেক করে খেতে বলেন শুধু-রোগটা খুব বেশি হলেও—'

'রুগী তার নিজের শরীর বোঝে,' জলের গেলাসটাকে হাতে করে রেখে সুনীতি বললে, 'ডাক্তারেরা ত বই পড়ে কথা বলে।'

'প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যা ধার নিয়েছি সেজন্য খানিকটা টাকা প্রতি মাসেই আমার মাইনের থেকে কেটে নেয়া হয়। এরকম করে টাকাটা শোধ হয়ে যাবে।'

সুনীতি সাদা সিটে মুখে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল।

'থাক প্রভিডেন্ট ফান্ডের কথা এখন। সুনীতি হাতের জলের গেলাসটাকে একটু খাড়া করে ধরে বললে।

সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আসছে মাসে হয়ত আমার টাকা মাইনে বাড়াতে পারে—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুনীতির হাতে গেলাসটা কাত হয়ে গেছে আবার, পড়ে না ভেঙে যায়, 'ও-সুনীতি গেলাসের জলের মত আস্তে একটু নাড়া খেয়ে হেসে বললে, 'তিন বছর থেকেই ত শুনছি মাইনে বাড়িয়ে দেবে। ওদের বলে দিও তুমি দশ টাকা মাইনে কমিয়ে দেয় যেন। দশটা টাকার এদিক ওদিক হিসেবের গরমিল হবে না।'

সিদ্ধার্থ সারাদিন বাড়িতেই থাকল; কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছে তিন সপ্তাহের। বিকেলের থেকে সুনীতির হাঁফানির টান একেবারে কমে গেল। 'যা হোক, সামনের মাস থেকে তুমি আমাকে একশো আশি টাকা দেবে।'

সিদ্ধার্থ দরজার কাছে ডেকচেয়ারে বসেছে এবেলা-অবিশ্যি সকালের সেই রোদটুকু নেই এখন এদিকে; কিন্তু রোদের দরকারও নেই, কাল রাতে, সকালবেলার দিকে শীতও পড়েছিল বটে, কিন্তু এখন শীত ত নেইই। গরম পড়েছে একটু; টেবিলের পাশের চেয়ারটায় সুনীত বসেছিল; ডেকচেয়ারের পাশে একটা তেপয়ের ওপর কয়েকটা বই ছড়িয়ে রেখেছে সিদ্ধার্থ, বইগুলোর ভেতর লুক্রেসিয়াস এখনো আসে নি, রমার সঙ্গে দেখা হয়নি সিদ্ধার্থের আর।

'তাহলে সেই অনার্সের টুইশনটা নিতে হয় আমায়—'

'শুধু একটা কেন—দু'টো টুইশন নেয়া দরকার।'

'যদি এর মধ্যে কেউ নিয়ে না থাকে—'

'কবে ছেড়ে দিয়েছিলে তুমি?'

'চার পাঁচ দিন হল।' সিদ্ধার্থ বললে, 'কিন্তু ওদের আমি পাস করাতে পারব না।'

'কে আছে ওদের গার্জেন? স্বচ্ছল সংসার? টাকা দেবে?'

'তা দেবে, আমাকেও নিতে হবে, সিদ্ধার্থ একটু নির্জিত হয়ে বললে, 'কিন্তু পাস করবে না, পাস কিছুতেই করবে না-কেউই ওদের পাস করাতে পারবে না। এটা খুব ভাল করে বুঝে তবুও খুব ভাল করে ওদের পড়ানো—'

সুনীতি কুজোর থেকে কাছড়ে গেলাসে জল ঢেলে নিয়ে গেলাসটা হাতের কাছে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললে, 'খুব ভাল করে পড়াবার কোনো দরকার নেই। এসব টুইশনে যে রকম টাকা পাও-সেই টাকাই ত দেবে ওদের গার্জেনরা-স্বীকার করছে?'

'টাকা আমি যা চেয়েছি তাতেই রাজি হয়েছে।'

'মিটে গেল,' সুনীতি বললে, 'মিছেমিছি হাঁদিয়ে লাভ নেই। কিন্তু ঠিক মতন পড়িয়ে দেখ-তা পাস করতে পারবে। আমি ফাঁকি দিয়ে টাকা নিতে বলছি না তোমাকে; ভাল মানুষ চেষ্টা করে দেখে-কর তাই। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে কিছুকাল আর টাকা ধার করতে যেও না।'

যেন প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকেই সিদ্ধার্থ ধার করেছে শুধু, কলেজ কো-অপারেটিভ, লাইফ ইনসিওরেন্স-ঋণদান সমিতি-সকলের কাছ থেকেই তার শেষ প্রাপ্য ঋণ আদায় করে এনেছে ত, আর কিছু পাওয়া যাবে না ওদের কারো কাছ থেকে। এই ত ব্যাপার। জানাজানি করেও শেষ পর্যন্ত এসবের কিছুই জানতে পারল না সুনীতি; জানানোও হল না ওকে।

'শীত এসে পড়েছে-লেপ কম্বল ছিঁড়ে গেছে সব-বছর দশেক আগে করানো হয়েছিল ত-শালু পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল, তবে লেপ তোষকের কাপড়-তুলো আর ধনুকার কাল সকালেই নিয়ে আসতে হবে তোমাকে।

'কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছ ত?'

'হ্যাঁ।'

'ক' মাসের?'

'তিন সপ্তাহের।'

'সুনীতি বললে—'কিছু টাকা ধার করতে হবে তোমাকে।'

সিদ্ধার্থ পকেট থেকে চুরুট বার করে হেসে বললে, 'যে সর্ষে ভূত ছাড়াবে তাকেই ভূতে ধরল বুঝি।'

'তা ধরল ত। কী করব। ধার না করে উপায় নেই। আমি মুখে মুখে হিসেব দিচ্ছি তোমাকে। লেপ তোষক গরম কাপড়চোপড় কিছু আমাদের নেই-তোমারও নেই। তোমার গরম শার্টটা ত ন্যাকড়া হয়ে গেছে-গরমে কোট কিনি কিনি করেও এই আট বছরের মধ্যে কিনতে পারলে না, কুড়ুনির আর আমার গরম শেমিজ ব্লাউজ ত নেইই সুতির ব্লাউজ শেমিজগুলোও ছিঁড়ে গেছে—দপ্তরির কিচ্ছু নেই—'

'ওকে এখনো দপ্তরি ডাকা হয়?'

'ঠাকুরদা ওর নাম দিয়ে গেল-তুমি পাল্টে দিতে হলে দাও।'

সিদ্ধার্থ তেপয়ের এক কিনারে চুরুটটা রেখে দিয়ে বললে, 'ওর ঠাকুদ্দা নামটা রেখেছে—এখুনি বদলাবার দরকার নেই। পরে ভেবে একটা কিছু ঠিক করা যাবে। কিন্তু বাবা ওর দপ্তরি নাম রাখলেন কি হিসেবে।' সিদ্ধার্থ একটু ভেবে বললে, 'ঠিকই আছে, আমাদের জীবনের হাড়মাংসের সঙ্গে মিশে গেছে ওর নাম। কিন্তু কোথায় দেখছি না ত দপ্তরিকে সারাদিন।'

কুড়ুনি এসে বললে, 'ওর আজ স্কুল ছুটি-কাল ওদের স্কুলের একজন মাস্টার মরেছে। ও আজ ধুচুনিদের সঙ্গে মিলে চড়িভাতি করতে গেছে।'

'ধুচুনি কে?'

চড়িভাতি ত ওর রোজই', সুনীতি টেবিলের থেকে জলের গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে বলরে, 'কেউ দেখে না বখে গেছে ছেলেটা-ক্লাস ফোরের থেকে ফেল করে ক্লাস ফাইভে উঠল, ক্লাস ফাইভের থেকে ফেল করে ক্লাস সিক্সে-এবারেও পাস করতে পারবে না-এক মাস পরে ত পরীক্ষা।'

কথা ভাবতে গিয়ে সিদ্ধার্থের ঘাড় নুয়ে একটু হেলে পড়ল, চেয়ারের ফ্রেমে কাঠ ও কেম্বিসের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটার কিনারে, কিন্তু দপ্তরির কথা ভাবছিল না সে শুধু, নানারমক কথা রয়েছে, খুলতে চেষ্টা করলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো বেশি জট পাকিয়ে যেতে চায় সব, কিন্তু তবুও ভাল করে চেষ্টা করে দেখতে হবে; বি এ অনার্সের ছেলেটি অনার্স পাস করতে পারবে না; কিন্তু তার ছেলে ক্লাস ফোর ফাইভ থেকে ফেল করে যে উঠেছে সেটা শুনেছিল বটে সে অনেক আগে-ভুলে গিয়েছিল; কিন্তু কেন ফেল করছে এরকম।

কুডুনি বললে, 'দপ্তরিকে তুমি অনাথ মুন্সীর স্কুলে পড়াও কেন বাবা? সে স্কুলে ত মাইনে কনট্রিবিউশনের টাকা দিয়ে দিলেই প্রমোশন দিয়ে দেয়। কাছেই বাসমতীর নাম করা বড় কলেজ স্কুলে নয়। থাকতে তুমি ওকে অতদূরে দানাপুরের পচা স্কুলটায় পড়াচ্ছ।'

'আমি ত নিজেই অনাথ মুন্সীর স্কুলে পড়েছিলাম, কিন্তু তখন স্কুলটা অনেক ভাল ছিল—' সিদ্ধার্থ নড়ে সোজা করে চেয়ারে ঠিক হয়ে বসেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে; ঘরের ভেতর হাঁটতে লাগল; আমাদের সেই হেডমাস্টার পরেশ বাবু হেডমাস্টার এখনো ত আছেন ঐ স্কুলে। ওরকম জ্ঞানীগুণী সাধু মানুষ আমি আর কাউকেই ত দেখিনি এ পর্যন্ত বাসমতীতে। তিনি অবিশ্যি ক্লাস নাইন টেন ছাড়া আর কোথাও পড়ান না। কিন্তু ওরকম মানুষ স্কুলে থাকাতে ওরা টাকা পেয়ে প্রমোশন দেয়? আচ্ছা খোঁজ করে আমি দেখব।'

'কী খোঁজ করবে?' সুনীতি বললে।

'মাইনে পেলেই প্রমোশন দেয় কিনা? দপ্তরি ফেল করেছে তবুও তাকে প্রমোশন দেয়া হল কীসের জন্যে-জানতে হবে পরেশবাবুর কাছ থেকে আমায়।'

'তা জেনে কোনো দরকার নেই।' সুনীতি বললে, 'এবারে যাতে পাস হতে পারে তাই দেখ।'

'পরেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে।

'কিন্তু দপ্তরির কথা বলে কোনো লাভ নেই। আমি কাজের কথা বলছিলাম তোমাকে-আমাদের কারুরই কিছু জামাকাপড় নেই, জুতো নেই, লেপ তোষক মশারি কম্বল ছিঁড়ে কাই কাই হয়ে গেছে সব; বেশি শীত পড়বার আগে সব নতুন করে তৈরি করিয়ে নিতে হবে; পাঁচশো টাকা দু-চার দিনের ভেতরই দরকার-এখুনি যোগাড় দেখতে হবে তোমাকে। হাঁটছিল কোনো কথা বললে না সিদ্ধার্থ।

'আদিনাথ আর ফিরে আসবে না?'

'না।' সুনীতি বললে, 'ফিরলেও ওকে রাখব না আমি।'

'এতদিনের পুরনো চাকর' সিদ্ধার্থ নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বললে 'বাবা থাকলেও দশ বছর তার কাজ করেছিল-আমাদের এখানে সাত আট বছর হয়ে গেল।'

'এই পাঁচশো টাকা,' সুনীতি গেলাস থেকে তিনি চার চামচে আন্দাজ জল খেয়ে নিয়ে বললে, দিন চারেকের মধ্যেই চাই। তোমার সানলাইফের পলিসি কবে ম্যাচিওর করবে?'

'এখনো বছর চারেক বাকি আছে।'

'সেখান থেকে ধার নিতে পার কিছু।'

'সে ত কলকাতায় লেখালেখি করতে হবে।'

'ক'দিন লাগবে টাকাটা পেতে?

সিদ্ধার্থ বললে, 'কুড়ি পঁচিশ দিন লেগে যেতে পারে।'

সুনীতি বললে, 'তোমার পলিসি দু'টো ত আমার নামে অ্যাসাইন করেছ?'

'হ্যাঁ। দেখে ছিলে না তুমি সে সব কাগজপত্র?'

'পলিসি দু'টো আমার কাছে রেখে দিলেই ভাল করতে তুমি।'

'আমার ট্রাঙ্কে তালা মেরে রেখে দিয়েছি-হারাবার ভয় নেই।'

'আজ রাতে দেখাতে হবে আমাকে।'

'কোন জিনিস দেখবার কথা বলছ?'

'সানলাইফ আর হিন্দুস্থানের পলিসি দু'টো।'

শুনে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল সিদ্ধার্থ। কুডুনি কাছেই একটা টুলের ওপর বসে দু'জনের কথা শুনছিল-একবার তাকাচ্ছিল সিদ্ধার্থের মুখের দিকে আর একবার সুনীতির হাবভাব নজর করছিল। সিদ্ধার্থকে কেমন যেন ফাঁপরে পড়তে দেখে খুশি হয়ে খিক খিক করে হেসে উঠে সিদ্ধার্থের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেমন জব্দ! কেমন জব্দ এইবারে।'

কুডুনির দিকে তাকাল সিদ্ধার্থ; খুব আমোদ পেয়েছে বটে মেয়েটি। কিন্তু দশ পনের বছর পরে আজকের দিনের কথা যদি মনে পড়ে তার তাহলে একেবারেই অন্যরকম মনোভাব জাগবে মেয়েটির হৃদয়ে, নাকি মনের দিক দিয়ে দপ্তরির মত কুডুনির কোনোদিন বড় হবে না? লাইফ ইনসিওরেন্সের দু'টো পলিসিই আজ রাতে দেখতে চেয়েছে সুনীতি; কিন্তু কী দেখবে সে-কি করে দেখাবে। বুঝে উঠতে পারছিল না। কুডুনিও দপ্তরিকে পথে আনা দরকার, কিন্তু সেটা সম্ভব হবে কি না—ওদের নির্মিতির ভেতরেই আদিপুরুষদের দোষ রয়েছে কিনা-ওদের মায়ের দিক থেকে কিংবা হয়ত বাপের দিক থেকেই-সেই নিস্ফলতার ফলেই সব সৎ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে কি না-ভেবে ঠিক করতে পারছিল না সিদ্ধার্থ।

'আমি জব্দ হয়েছি মনে করেছ তুমি?'

'আচ্ছা জব্দ বুড়ো মানুষ, কেমন ঠেলে ধরেছে মা তোমাকে।'

'কি করে ধরল ঠেসে?'

'কই-দেখাও তুমি,' কুডুনি চোখ কঠিন করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হেসে বললে, আজ রাতেই ত তোমাকে দেখাতে হবে-কি সব ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রেখেছ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও—' সিদ্ধার্থ ভাবল, ভেতরে সম্ভাবনা আছে মেয়েটির, কিন্তু ঠিক জলবাতাস পাচ্ছে না, দপ্তরিরও হয়ত এরকম; নরম কাদার মত বয়স ওদের এখন, এরই ভেতর থেকে খুব সস্নেহে দৃঢ় কুশল হাতে তৈরি করে নিতে হয়, কাদাটা পাঁক নয় অবিশ্যি। দপ্তরি আর কুড়ুনির দিকে মন দিতে পারছে না। সুনীতিকে দিয়ে হচ্ছে না কিছু। অনেক ছেলেমেয়ে আছে একটা মোটামুটি নির্দেশ পেলে ঠিক পথে চলতে পারে। কিন্তু এই দু'টি ভাইবোনের পেছনে পেছনে লেগে থাকা দরকার; একজন আলাদা মানুষের সর্বক্ষণের কাজ। কত দিনের কত বিশেষ দরকারি কাজ রয়েছে ত, সব ছেড়ে দিয়ে কুড়ুনি ও দপ্তরিকে নিয়েই সমস্ত সময় আটকে থাকবার সময় আছে? সুনীতির বদলে অন্য কোনো স্ত্রীলোক (চারদিকে কত অজস্র তারা) যদি এ দু'টি ছেলেমেয়ের মা হত তাহলে একটা গুরুতর দায়িত্বের থেকে অনেকখানি নিষ্কৃতি পেত সিদ্ধার্থ।

'তোমার এবার কোন ক্লাস?'

কুড়ুনি টান হেয়ে ঠোঁট দু'টো আঁট হয়ে গেছে মেয়েটির। সমস্ত মুখটাই সিদ্ধার্থের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস একটা কঠিন মোয়া বেঁধে ফেলেছে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে অবিশ্যি লেনদেন হয় না তার বেশি, এ ছাড়া এদের সম্বন্ধে আর কোনো পাপ করেছে বলে মনে পড়ছিল না সিদ্ধার্থের।

'কেন বলবে না?'

'দপ্তরি যে ফেল করে এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে ওঠে ত তুমি জানতে না-ওকে যে দপ্তরি বলে ডাকা হয়-তা তোমার খেয়াল নেই—ও কোন ক্লাসে পড়ে তা তোমার মনে নেই-আমার এখন কোন ক্লাস তা আমি বলতে পারব না-তুমি কিছু জান না, দেখ না, খবর রাখ না-কেন বলব তোমাকে?'

সিদ্ধার্থ তেপয়ের ওপর থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিয়ে দেশলাই বার করে বললে, 'ঠিক কথা বলেছ তুমি। এইবার থেকে দেখব ভাবছি। আমি ভেবেছিলাম তোমরা-আরো একটু ওপরের ক্লাসে উঠলে হাতে নেব-কিন্তু এখন দেখছি—'

সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালাল।

'ও মা, এ কি চুরুট খায়।' কুড়ুনি মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল।

সিদ্ধার্থ চুরুটটা নিভিয়ে ফেলে সরিয়ে রেখে বললে, 'কোন ক্লাস হল তোমার?'

'ক্লাস ফাইভ।'

'সিদ্ধার্থ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, পায়চারি করতে করতে বললে, 'ফাইভ? দপ্তরি ত সিক্সে পড়ে।'

'ও ত ফেল্ করে করে পই পই করে উঠে যায়। ওরকম হলে কী করে পারব ওর সঙ্গে। আমাদের স্কুলের মত নয়।'

'তুমি বরাবর পাস করে উঠছ?'

'বরাবর।'

কুড়ুনি বললে, 'আমি ক্লাস টুতে ভর্তি হয়েছিলাম ত। পাস করে করে ফাইভে উঠেছি। আমাদের হেডমিস্ট্রেস খুব কড়া, আমাদের স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার রেকর্ড গভর্নমেন্টের ইন্‌সপেক্টরের কাছে যায়—'

'যায়?' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে থেমে দাঁড়িয়ে কুড়ুনির দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেন, তোমাদের ত প্রাইভেট স্কুল, গভর্নমেন্ট কি করবে?'

'গভর্নমেন্ট টাকা দেয়, অন্যসব স্কুলের চেয়ে আমাদের বেশি দেয়। তা ছাড়া আমাদের হেডমিস্ট্রেস বড় শোভনাদির বাবা ত গভর্নমেন্ট—'

সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে আবার দাঁড়িয়ে গিয়ে বললে, 'কী বলছ তুমি কুড়ুনি? ওটা মুখ ফোঁড়ের মত কথা হল। ওরকম বলতে হয় না। তোমাদের পরীক্ষা কবে?'

'ডিসেম্বর মাসে।'

'পরীক্ষা কি তুমি পাসই করে যাও শুধু? প্রাইজ টাইজ পেয়েছ একবারও?'

'না, আমি অঙ্কে কাঁচা,' কুড়ুনি বললে, 'ইংরেজিতে আরো কাঁচা। তোমরা ত কেউ দেখিয়ে দাও না আমাকে। আমাদের ক্লাসের কত মেয়ের বাড়িতে মাস্টার এসে পড়িয়ে যায়।'

'আচ্ছা আমি দেখব তোমার ইংরেজি আর অঙ্ক।' সিদ্ধার্থ বললে, 'প্রাইজ পেলে না তুমি; পড়ছ ফাইভে; তুমি ত দপ্তরির চেয়ে দু'বছরের বড়, অন্তত ক্লাস সিক্সে—'

'আনব ইংরেজি বই?'

'এখন না।'

'তবে কখন?'

'রাতে।'

'রাতে হবে না,' সুনীতি বললে, 'আদিনাথকে উঠিয়ে দিয়েছি, রাঁধাবাড়ার কাজ রয়েছে।'

তাই ত, কে রাঁধবে কুড়ুনি? কুড়ুনি আর সুনীতি? জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল সিদ্ধার্থ। আজ দুপুরে ভাত আর আলু সেদ্ধ খেয়েছে তারা। রান্নার সময় কুড়ুনিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি, সিদ্ধার্থ বাড়ি ছিল না, সুনীতি উনুন জ্বালায়নি, চাল আর আলু লুকিয়ে ধানরাজের মাকে দিয়ে এসেছিল এক ফাঁকে সরোজিনী পিসিমাদের তোলা উনুন সেদ্ধ করে পাঠিয়ে। এই রকম ব্যাপার। অথচ অনাথের মতন চাকরকে তাড়িয়ে দিলে সুনীতি।

'আচ্ছা ইংরেজি বইগুলো নিয়ে এস।'

কিন্তু বই আনতে গিয়ে কুড়ুনি আর ফিরে এল না। দু-চার বার মেয়েকে ডেকে কোনো সাড়া পেল না সিদ্ধার্থ। সুনীতিকে বললে, 'ও আসে না যে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি বুঝি ভেবেছ ও বই আনতে গেছে?'

'কোথায় গেল তাহলে?'

'তোমাদের ত ঐ এক দিনের গরজ,' সুনীতি বললে, 'কয়েকদিন দেখ; দেখে চোখ জুড়িয়ে নাও।'

'খানিকটা জুড়িয়েছে। বেশ আলগোছে সরে পড়ল দেখছি। এরকম বুঝলে আমিই ওর সঙ্গে সঙ্গে যেতাম।' কুড়ুনির অস্পষ্ট রসিকতায় খানিকটা ধাঁধিয়ে গিয়ে সিদ্ধার্থ বললে।

সুনীতি এক চুমুক জল খেয়ে বললে, ওদের আমি পারিনি; তুমি পারবে না।'

'ঠিক হয়ে যাবে সব' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'এখন থেকে চোখ রাখতে হবে আমায়।'

সুনীতি জলের গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললে, 'অন্য ছেলেপিলেদেরও দেখি-এদেরও দেখি। কেন যে এমন হল বুঝতে পারছি না-আমাদের দেশে বিয়ে জিনিসটায় না আছে বিজ্ঞান, না আছে সহজ মর্মজ্ঞান। ওতে হয় না কিছু ঠিক মতন। এদের আর অতটা দোষ কী করে দিই। এরা একটা সম্বন্ধের ফলে জন্মেছে।'

সিদ্ধার্থ পায়চারি করতে করতে ঠোঁটের কিনারে একটা হাসির ছোঁয়াচ লাগিয়েছে, কিন্তু চোখে তা প্রতিফলিত করতে পারছে না; কেমন একটা চিন্তাগম্ভীরতা রয়েছে সেখানে।

সুনীতি জলের গেলাসটা আরো কাছে টেনে এনে বললে, 'আমি অনেক আগেই বুঝেছি, তারপরে হাল ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের দেশে অজাত বলে একটা কথা আছে—'

শব্দটা শুনেছে বটে সিদ্ধার্থ, কিন্তু মানে ঠিক জানে না; কিংবা বাংলাদেশে এদিকে শব্দটার একটা চলতি মানে আছে-সেটা জানে; সিদ্ধার্থের মাও মাঝে মাঝে খুব রাগ করলে সিদ্ধার্থকে 'অজাত' বলতেন। কিন্তু দপ্তরির চেয়ে অনেক ভাল ছেলে ছিল সিদ্ধার্থ-অনেক-অনেক-কোনো তুলনাই হয় না। সিদ্ধার্থের মা বাবাও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিয়ে করেননি, প্রেমে পড়েও না, নিতান্ত সেকেলে ঘটকালির ফলে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তবুও স্পষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল তাদের দু'জনের মধ্যে। মাঝে মাঝে একটু টসকে যেত বটে, আবছা হয়ে পড়ত, কিন্তু মোটামুটি জিনিসটা সুস্থ ও স্পষ্ট ছিল. সিদ্ধার্থদের সম্বন্ধের চেয়ে সেটা আলাদা রকমের জিনিস। সিদ্ধার্থের মনে হচ্ছিল সুনীতিই যে গায়ে পড়ে এসে তাকে ঠকিয়েছে তা নয়, সমাজ ত আজকালও অন্ধ, সৃষ্টির ওপরও মানুষের তেমন কিছু কর্তৃত্ব নেই—এইসব অন্ধতার মুখপাত্র হিসেবে সুনীতি এসে পড়েছে; নিজে সিদ্ধার্থ মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছিল সব, কিন্তু এখন অন্ধকারখণ্ডটা সিদ্ধার্থকে অন্ধকারখণ্ড বলে সোজাসুজি নালিশ জানিয়ে ক্লান্তি ও ব্যর্থতায় চাপা পড়ে গেল বুঝি।

'হ্যাঁ,' 'অজাত' বলে একটা কথা আছে আমাদের দেশে।'

'দপ্তরির–দপ্তরিদের জন্মাবার কথা ছিল না।'

'তাই ত মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু তবুও জন্মাল-এ পাপের ফল মানুষকে ভোগ করতে হবে বৈকি, সুনীতি জলের গেলাসটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল, একরাশি রোদের উজ্জ্বলতায় গেলাসের জলের ভেতর কতকগুলো অণু পরমাণু যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে; ছায়ার ভেতর গেলাসটাকে সরিয়ে দিল সে।

সিদ্ধার্থ তেপয়ের ওপর থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিল, সুনীতি একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে বটে, সেটা খুব সম্ভব আত্মিকই শুধু নয়, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বলেও মনে করেছে সে; কিন্তু এ বিশ্লেষণের একটু বিজ্ঞানী চেহারা থাকলেও-খুব সম্ভব এটাই শেষ সত্য নয়। দপ্তরিদের জন্ম যে অনুতাপের ফলেই হোক, তাদের ভবিষ্যৎ যে শূন্য সেটা স্বীকার করতে পারে না সে। তবে তার সঙ্গে সুনীতির স্বামী স্ত্রীর জীবন কতকগুলো কথা ভাবলে রহিত করলেও চলে, কিন্তু তা করবার উপায় নেই, কিটিয়ে রাখতে হবে। সিদ্ধার্থ যদি অনেক টাকার মালিক হত তাহলে বিবাহবিচ্ছেদ করতে যেত না হয়ত সে। কিন্তু সেটা করবার ঢের সুবিধা সুযোগ থাকত তার; কিন্তু যে ধাত নিয়ে মানুষ বিয়ে ছেদ করে সে ধাতে সিদ্ধ হওয়া তার পক্ষে বোধহয় কঠিন, তাছাড়া সুনীতি ভালোবাসা না জাগালেও আক্রোশ জাগায় না মনে, করুণা জাগাচ্ছে; আমাদের দেশে অন্তত প্রায় সব স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধই কয়েকটা বছর কেটে গেলে এই করুণা-মমতায় দাঁড়ায় গিয়ে; ভালোবাসা থাকে না, খুব বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে ঘৃণা বা আক্রোশও বেশিক্ষণের জন্যে টেকে না।

খুব সুখী স্বামী স্ত্রীও যে পরস্পরকে ভালোবাসবেই তা নয়। কিন্তু দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রাখতে হলে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া থাকা চাই, বলতে গেলে সিদ্ধার্থের সেটা নেই-ই একরকম; কিন্তু একেবারে যে নিঃশেষ হয়ে গেছে তা সে মনে করে না। শূন্য হয়েও যদি যায় আবার খানিকটা এই রকম ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে; অসম্ভব নয়-তার আর সুনীতির ক্ষেত্রে? সুনীতির সঙ্গে থেকে সুখী হল না সে, শান্তি নেই-একেবারেই অন্য নানা কারণে সুনীতির একটা করুণার টান পাচ্ছে না স্বস্তির সুখ, কিন্তু তবুও সিদ্ধার্থের দিক থেকে অনেকদিনের অনুক্ষণের উৎপন্ন হয়েছে-এ না থাকলে শুধুই কর্তব্যের দায়ে এ সম্বন্ধ টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করত না সে।

'দপ্তরির সম্বন্ধে আমি হাল ছেড়ে দিই নি,' সিদ্ধার্থ চুরুটটা না জ্বালিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'মাঝে মাঝে অবশ্য আমারও ঈডিপাসের মত মনে হয়েছে না জন্মালেই ভাল হত—'

সিদ্ধার্থ নেমে দাঁড়িয়ে বললে, 'কিন্তু আমাদের দেশে শাস্ত্রে পুরাণে এরকম কথা বলেনি কেউ? বলেছে?'

সিদ্ধার্থ আবার হাঁটতে শুরু করে বললে, 'অবশ্য আমাদের দেশে জন্মলাভ করাটা আগের আগের যোগির ঋণ পরিশোধ বলেই মেনে নিয়েছে মানুষ, ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়াটাই ঠিক জিনিস বলে স্থির করেছে।'

'তুমি ফান্ডেমেন্টালে হাত দিতে পারলে না।' সুনীতি বললে।

'আমি যখন বি-এ পড়তাম তখন ফিলসফির প্রফেসরের চেয়েও ইতিহাসের প্রফেসরই এই শব্দটা বেশি আওড়াতেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বি-এ তে ফিলসফি ছিল বুঝি তোমার।'

'আমাদের দেশে 'রাওয়া' বামুন বলে,' সুনীতি জলের গেলাসটা কাছে এনে টেবিলে বসিয়ে তার ওপর বাঁ হাতটা চাপা দিয়ে রেখে বললে, 'নেমতন্ন বাড়িতে যে শ্রেণীর বামুনরা যেচে গিয়ে পাত পেড়ে বসে, 'রাওয়া' মানে 'রবাহুত' সমাজ ছোঁয় না; জীবনে আর কিছু হল না তাদের। এই ছেলে মেয়ে দু'টোও রাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়, তেমনিভাবেই পৃথিবীতে এসেছে। তেমনিভাবেই পিঠে লাথি খেয়ে লুট খেতে খেতে বেরিয়ে যাবে।'

'সুনীতি ভাবছিলঃ সুনীতির দশ বারো বছর ধরে নানারকম বিষম রোগে শরীরটা পচে ক্ষয়ে না গেলে সুনীতিরই ইচ্ছায় যে আরো কয়েকটি সন্তান হত তাদের, জানা আছে; নিজেরও সিদ্ধার্থের খুব সম্ভব অনিচ্ছা থাকত না; কিন্তু খুব শিগগিরই সীমা নির্ধারণ করে দিত; সুস্থ সবল স্ত্রী হলে কোনো ধরা বাঁধা নিয়মের ভেতর রাখা কঠিন হত। দু'জনেই সুস্থ সমর্থ মন ও শরীরের মানুষ হলে জীবনে স্বস্তি সম্ভাব্যতার চেহারাটাই বদলে যেত-হাঁটতে হাঁটতে কথা ভাবছিল সিদ্ধার্থ। রমার কথাও মনে পড়ে গেল তার-শুধু লুক্রেসিয়াসের বইটার জন্যই নয়-আর বনচ্ছবির কথা-এখুন যা সব ভাবছিল সে-সেই সবের কেমন একটা শুদ্ধ অব্যর্থ পরি সমাপ্তি হিসেবে।

কিন্তু রমাকে রজত মুখার্জির সাথে যাতে বিয়ে দেয়া যায় সেই চেষ্টাই করা উচিত সিদ্ধার্থের। রজত এই কলেজ থেকেই ছ' বছর আগে ইকনমিক্সে ফার্স্টক্লাস পেয়ে বি এ পাস করেছিল, এখন কলকাতায় অ্যাকাউন্টটেন্ট জেনারেলের অফিসে চাকরি করে; পাইলটিঙও শিখেছিল, সেদিক দিয়েও বড় কাজের আকার এসেছে, নিবে কিনা ঠিক করতে পারছে না। রজতকে চেনে না রমা। নামও শুনেছে কি না সন্দেহ; কিন্তু পরিচয় হলে-তার পর বিয়ে হলে খুব ভাল হবে সেটা। খুব ভাল মনে হচ্ছে; এ পক্ষের শেষ গোপন কথা অবিশ্যি জানা নেই সিদ্ধার্থের। রজত মদ ধরবে-খারাপ ব্যবহার করবে-এসব কি অবচেতনার বিষম কিমাকার অন্ধকার হাটকে বেড়াচ্ছে সিদ্ধার্থ। তার চেয়ে এই কথাটা ভাবা ভাল,—সত্য বলেই ভাল; রমা ও রজতের মত অনেক ছেলেমেয়ে হবে রজতদের, কলকাতায় একটা কৃতি, কৃতকৃতার্থ বিখ্যাত পরিবার দাঁড় করাবে তারা, যে বংশস্রোত কত শত বছর ধরে কত আশ্চর্য দৈবত সম্ভাবনায়ও সিদ্ধিতে কত দিক দিয়ে দেশ সমাজ ও পৃথিবীকে খুব ভালভাবে সংবদ্ধ করে রাখতে চেষ্টা করবে-মন্ধাতা ও পৃথুরা যা করেছিল কিংবা জ্যাসন ও বিসিয়ুসরা তার চেয়ে ঢের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে। ভাবতে গেলে ব্যাপারটাকে এখুনি হাতে হাতে অবান্তর মনে হতে পারে বটে-কিন্তু তা নয়, সত্য সম্ভাবনা খুব বেশি পরিমাণেই রয়েছে। এরকম একটা ব্যাপারের ছোট্ট ভিত্তি পাথরটা শিগগিরই বসানো উচিত সিদ্ধার্থের।

আচ্ছা দেখবে সে।

আর বনচ্ছবি অন্য রকম, গভীরের কথা মনে পড়িয়ে দেয় সিদ্ধার্থকে।

ফান্ডেমেন্টাল?

সুনীতি কাঁচের গেলাস থেকে হাত খসিয়ে নিয়েছে। গেলাসটা টেবিলের এক কিনারায় রয়েছে, টেবিলের এক নিচে একটা ছোট্ট কাঁচের পিরিচ ছিল তাই দিয়ে ঢেকে রেখেছে জলের গেলাস।

'দপ্তরিদের কথা নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না ত অনেক কাজের কথা আছে—'সুনীতির মুখ পুরনো গাছের নতুন চেরা কাঠের মত কঠিন হয়ে উঠল।

'কিন্তু তবুও দপ্তরিদের ব্যাপার সম্বন্ধে আর একটা কথা বলে শেষ করছি।'

সুনীতি কাঁচের পিরিচটা একবার হাতে তুলে নিয়ে আবার গেলাসের মুখে চাপা দিয়ে রেখে বললে-অনেকের সঙ্গেই আমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল; যে অবস্থায় আছি তার চেয়ে সেগুলো'—বলতে বলতে থেমে গিয়ে সুনীতি বললে, 'নিখিল রায়দের পক্ষ থেকে খুব চেয়ে ছিল আমাকে—' সুনীতির কথাটা শেষ হয়নি, ভেতরে হাঁপ রয়েছে এখনো খানিকটা, দু'টো এফিড্রিনের বড়ি খেয়ে শরীরটা বিষিয়ে ঝিমিয়ে রয়েছে তার; বিয়ের আগের বারো চৌদ্দ বছর পূর্বের জীবনের সে সব বড়, উঠতি সম্ভাবনার কথা ভাবতে গিয়েও রক্তে একটুও যেন বেশি সচ্ছলতার স্রোত বইতে চায় না আজ আর তার।

'নিখিল রায় কে?'

'সুপার টেকনোলজিস্ট, কলকাতা ইউনিভার্সিটির ডি-এফ-সি। হাজার হাজার টাকা পাচ্ছেন—

'চাকরি করছেন কোথায়?'

'দিল্লিতে। মস্ত বড় এয়ার কনডিশনড় বাড়িতে থাকেন আজকাল। কলকাতায় বালিগঞ্জে দু'খানা বাড়ি, রাঁচিতেও বাড়ি আছে, ভুবনেশ্বরে আছে, শিলঙে আছে-চিনির কারবার করে কত লাখ লাখ টাকা তার।'

'কারবার? চাকরিও করছেন বললে?'

'অ্যাদ্দিন করছিলেন-এখন ছেড়ে দেবেন, ব্যবসা নিয়েই থাকবেন, তিনি না হলে আর কেউ অত ভাল করে বুঝবে না জিনিসটা। কিন্তু ব্যবসা মানে মানুষ ঠকানো নয়, বিদেশ থেকে ত কত লাখ মণ চিনি আমদানি হচ্ছে, কিন্তু আমাদের ভাতরবর্ষেই যাতে চিনির ব্যাপারে পুরোপুরি আত্মস্বাধীন হতে পারে সেই চেষ্টা করছেন উনি।'

'তুমি এত খাবার পেলে কোথায়?'

'ওঁর বোনেরা এসেছিল সেদিন।'

'কোথায়?'

'বাসমতীতে এসেছে, এখানে ত ওঁদের মামাবাড়ি, আমার সঙ্গে অনেকদিনের চেনা ধরিত্রীদির'—

'ধরিত্রী কে?'

'ওঁর মেজদি; ভাইয়ের দু'ছেলেকে সঙ্গে করে এসেছিলেন সরোজিনী পিসিমা ও আমার সঙ্গে দেখা করতে। তার কাছ থেকেই ডক্টর রায়ের কথা শুনলাম সব। ডক্টর রায়ের ছেলে দু'টোকে দেখে এমন ভাল লাগল-ওরকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলে হয় না কেন মানুষের ঘরে ঘরে-কাঁচের পিরিচটা সরিয়ে নিয়ে অনেকখানি জল খেয়ে ফেলে সুনীতি বললে। মাথাটা খানিকক্ষণ টেবিলের ওপর ফেলে রাখল সে। হাঁপানির ক্লান্তি, এফিড্রিন ও মনের ভেতরের অব্যয় এফিড্রিনের আলোড়নে মড়া শরীরে ঝিমিয়ে পড়ছিল সে। কিন্তু তবুও প্রাণ কোটি ক্ষয়ে ক্ষয়েও রেডিয়ামের মতনই যেন অনুভব করে সুনীতি আস্তে আস্তে মাথা তুলে বললে, 'ডক্টর রায়ের ছেলে দু'টি দপ্তরির চেয়েও কিন্তু চার বছরের ছোট, অথচ দপ্তরির চেয়ে দু'জনেই ওপরের ক্লাসে পড়ে তারা-দিল্লির বড় বাঙালি স্কুলে-প্রত্যেকবার ফার্স্ট হয়ে ওঠে। সুন্দর পুরুষমানুষের মতন দেখতে, জ্ঞানীগুণী ছেলেদের তমন স্বভাব। পৃথিবীতে সত্যিই জন্ম হল এদের-সত্য একটা প্রয়োজন মেটাতে। দপ্তরিদের মতন ত নয়—'

সুনীতি গেলাসের বাকি জলটুকু খেয়ে টেবিলের ওপর হাত বিছিয়ে রেখে বাইরের বাতাসের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'সেই ডক্টর রায়ের কথা বলছিলাম না' সুনীতি খানিকক্ষণ পরে বললে, 'ডক্টর রায় তার পর শেষে যাকে বিয়ে করেছেন সে স্ত্রী দেখতে শুনতে আমার তুলনায় কিছু নয়; খুবই সাধারণ। কিন্তু ছেলেরা এই রকম হল। আমার বাবা কি মনে করে যে তখন ডক্টর রায়কে কথা দিলেন না বুঝতে পারলাম না আমি।'

'হয়ত ভেবেছিলাম যে তার মেয়ের যখন এত হাঁফানি রোগ হবে তখন মিছে-মিছি রায়কে বিব্রত করে লাভ নেই—' সুনীতিকে বলা যেতে পারে ভাবছিল সিদ্ধার্থ; কিন্তু সুনীতি যা বলেছে তার উত্তরে সিদ্ধার্থের মুখে এরকম কথা নিছক ইয়ার্কির মতই শোনাবে। সুনীতির বক্তব্য খুব চিন্তিত ও সুস্থির হোক বা না হোক,-এই মুহূর্তে অন্তত লঘুতার স্তর ভেদ করে গভীর হয়ে যাচ্ছে।

সুনীতির গেলাসের জল ফুরিয়ে গিয়েছিল। কুজোর থেকে আর এক গেলাস জল ঢেলে এনে সে টেবিলের ওপর রাখল।

'আচ্ছা খুব জল খাচ্ছ তুমি।'

'ইচ্ছে করে নয়।'

'এই বড়িটা খেলে খুব জল খেতে ইচ্ছা করে?'

'না-বমি আসে, কিছুই খেতে ইচ্ছা করে না, অরুচি হয়।' মাস ছয়েক আগে বাসমতীর সদর হাসপাতালে কমিটির একটা মিটিঙে মহেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার,' সুনীতি বললে, 'কথাবার্তা হল, আমার হাঁপানির কথা উঠতে তিনি বললেন, দিনে পাঁচ ছ' গেলাস জল খেয়ে দেখুন আপনি। এতদিন খাইনি। কিন্তু হাঁপানির বাড়াবাড়ি হচ্ছে আজকাল। এইবারে দেখছি-কিন্তু বমি ঠেলে আসে ঐ ওষুধটা খেয়ে জল খেতে গেলে।— এমনিই আমি জল খেতেই পারি না।'

সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'ঝাউডাঙায় একটা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে প্রিন্সিপ্যালের কাজ আমি পেতে পারি, আড়াই শো টাকা মাইনে দেবে, পঁচিশ টাকা ডি এ, জায়গাটা একেবারে পাড়াগাঁ, বনজঙ্গল, কিন্তু কাজটা মোটের ওপর মন্দ নয়, সব মিলিয়ে দু'শো পঁচাত্তর আন্দাজ পাওয়া যাবে। কী মনে হয় তোমার?'

'কাজটা পাবেই তুমি-না সম্ভাবনার কথা বলছ?'

'না, ওখানকার কলেজ কমিটির সেক্রেটারি মহম্মদ ইশাক সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। কাজটা চাইলেই তিনি আমাকে দিয়েছেন, আমাকে সাধাসাধি করছেন, কিন্তু কিছু ঠিক করতে পারছি না।'

'যেতে পারা যায়।' সুনীতি বলতে, 'পঁচাত্তর টাকা ত বেশি।'

'তাহলে বলে আসব ইশাক সাহেবকে?'

'একেবারে পাড়াগাঁ?'

'হ্যাঁ-এই ত বাসমতীর থেকে পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে-সুন্দরবন আর সমুদ্রের দিকে। মুসলমান আর নমঃশূদ্র ছেলেদের দিয়ে কলেজ।

সুনীতি জলে দু'চুমুক দিয়ে বললে, 'বাসমতী ছেড়ে বনজঙ্গলের দিকে যাওয়া; গেলে কলকাতায় গেলে ভাল হত তবু।'

'পঁচাত্তর টাকা মাত্র বেশি দেবে তোমাকে-তার বদলে জঙ্গলবাস,' সুনীতি গেলাসটা একটু সরিয়ে রেখে বললে, 'পাঁচ ছ' শ টাকা মাইনে পাওয়া যায় না কোথাও?'

'না, কলেজ আইনে সে সব নেই।'

'লাইন বদলানো যেতে পারে ত।'

'এই বয়সে গভর্নমেন্টের চাকরি পাওয়া যাবে না।'

'দেশ ত স্বাধীন হচ্ছে—'

'খুব ভাল জিনিসটা,' সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'কিন্তু পরাধীন বা স্বাধীন দেশে কারো ব্যাপারে কোনো মীমাংসা হয় না। বাসমতী কলেজের দু' চারজন প্রফেসরের হয়ত সুবিধা হতে পারে, কিন্তু মোটামুটি মাস্টারদের কোনো লাভ হবে না, আরো ক্ষতি হবে কি না বলতে পারছি না।'

সুনীতি মাথা নেড়ে বললে, 'আমার বিশ্বাস আছে স্বাধীনতার ওপর। ঢের ভাল হবে আগের থেকে। কলেজের জ্ঞানীগুণী মাস্টারদের মুরোদ বুঝবে দেশের কর্তারা। অনেক কিছু ত ভাল করে ঢেলে সাজাতে হবে তখন-তাতে শিক্ষিতদের খুব বেশি দরকার হবে নিশ্চয়ই—'

'যারা টেকনিক্যাল শিক্ষা পেয়েছে; কিন্তু আমরা' সিদ্ধার্থ চুরুট টেনে নিয়ে বললে, বাসমতীতে টিকে থাকা সম্ভব হলে বেঁচে যেতে পারি, কিন্তু কলকাতায় গেলে তলিয়ে যাব।'

শুনে সুনীতি মুষড়াল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক আবর্জনা সরে যাবে, অনেক নোংরামি শুদ্ধ হবে, শত হলেও এটা ভারতবর্ষের প্রাণ, সেই প্রাণ অনেক দিন পরে সেই কবে কার উষাপুরুষের মত জেগে উঠবে আবার। সেই জন্যে সে সত্যিই প্রত্যাশা করে রয়েছে। কিন্তু সে যা জানে তা সে জানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সেই দ্রার্ঢ্যের থেকে তাকে নড়াতে পারবে না।'

বাসমতী কলেজের একজন-মাস্টার মানুষকে বিয়ে করে টাকাকড়ির টানা হ্যাঁচড়া ধর্ষণে রোগের আক্ষেপে অবচেতনে চেতনায় ঘুরে অনেক রকম অদ্ভুত কথা আজ মুখ দিয়ে সে বের করেছে সিদ্ধার্থর সঙ্গে অনেকদিন পরে একটা লম্বা বৈঠকে বসে-আরো অনেক কথা মুখ দিয়ে বেরবে হয়ত তার-কিন্তু এসব কথা প্রায়ই বুদবুদের মত বেরিয়ে ফুরিয়ে গেছে তখুনি, স্থির সুস্থ অতল সংস্থানের ভেতর থেকে উঠে আসেনি, কিন্তু তবুও তার শিক্ষাদীক্ষা সাধ অনুভূতি প্রাণ মনের একান্ত দু'একটা কথাও বলেছে সে। কোন রকমের কথা কম আর কোন রকমের কথা বেশি বলা হবে সিদ্ধার্থের সঙ্গে আজ এখন থেকে গভীর রাত পর্যন্ত-ঠিক বলতে পারছে না সে; রাতে ঘুমের আগে (হাঁপানি কমে গিয়ে ঘুম যদি হয়) সব কথা পরিমাপ করে করে যা মুছে ফেলবার মুছে ফেলে দেবে সে। যা মনে রাখবার কাল সকালে মনে থাকবে তার-জীবনের শেষ সকাল পর্যন্ত।

খানিকক্ষণ বিমুগ্ধ হয়ে রইল তার মন। জানালার ভেতর দিয়ে অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখছিল চারদিকে হ্যারিকেনের আলো নিভে যাচ্ছে। বাসমতীতে কত পাখি থাকে-কত ফড়িং পাতা পোকা প্রজাপতি, তাদের প্রাণনার, অন্বেষণার একটা আশ্চর্য শব্দে স্নিগ্ধ মথিত হয়ে বিকেলের আলো আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে—

ঘরের ভেতর পায়চারি করছে সিদ্ধার্থ, মুখটা তার বুকের কাছে খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে; আজ এতক্ষণ বসে কিছু কিছু বিসদৃশ কথা মানুষটাকে আলোড়িত করে দেবার জন্যে বলেনি সুনীতি-দরকার বোধ করেছিল বলে বলেছিল। সে দরকার অনেক পরিমাণে ফুরিয়ে গেছে; যাকে বলা হয়েছিল সেও বিশেষ কিছু মনে করে বলে থাকেনি, তার মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, একটা আত্মস্থতায় নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে; পায়চারি করছে পিঠে হাত বেঁধে-সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে-ঘরের খুবই লম্বা (যেন অনেকখানি সুদীর্ঘ শালু পাতা) মেঝের ওপর দিয়ে; হাতে চুরুট নিভে গেছে।

সুনীতির কথা বা সংসারের কথাই যে ভাবছে সিদ্ধার্থ তা নয়—নানা রকম ভাবার কথা আছে তার-মনে হচ্ছিল সুনীতির।

খানিকটা সময় এই রকম কথা চিন্তন ও নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে কেটে গেল।

মনে আবার অসুখ-অসুবিধা-আরো হয়ত খারাপ কিছু আস্তে আস্তে জেগে উঠতে লাগল, অথচ যে মানুষ পায়চারি করছে তুলনায় সে প্রায় পুরোপুরি কীতকাম স্থির ও সুস্থ হয়েও নিজে গুণ ও নির্গুণকে স্ত্রীর অসুস্থ মনে কোনোদিনই কোনো প্রকারেই সংক্রামিত করতে পারল না বুঝি।

'আদিনাথ আট টাকা পাচ্ছিল-বারো টাকা চেয়েছিল-আমি তাকে উঠিয়ে দিয়ে ঝি রেখেছি; কাল সকাল থেকে আসবে।'

'আদিনাথকে উঠিয়ে দেয়া ঠিক হয়নি তোমার।'

'ঝি কাল সকাল থেকে আসবে।'

'বেশ, আসুক। আদিনাথ একবার এসে দেখা করলে পারত আমার সঙ্গে। ঘরে একটা হ্যারিকেন দেবে কে?'

সিদ্ধার্থ বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আর একটু পরে দিলেও হবে হয়ত।'

'ঝিকে আমি চৌদ্দ টাকা মাইনেতে ঠিক করেছি।'

'এতগুলো টাকা?' পায়চারির ভেতর ছেদ পড়ল সিদ্ধার্থের, বাঁ হাতের সঙ্গে পিঠের ওপর বাঁধা ছিল হাতটা, খসিয়ে এনে হাতের নেভা চুরুটের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ বললে, 'ও ত বারো টাকা চেয়েছিল শুধু; পুরনো চাকর; তাকে তাড়িয়ে দিয়ে এটা করলে বুঝি তুমি। খামখেয়ালি হলে।'

'তা হল,' সুনীতি একটু জল খেয়ে নিয়ে বললে, 'খুব ভালই হল। আমি দেখেছি ভাল একজন ঝি ছাড়া আমার মনের মতন কাজ কিছুতেই হবে না; ও ব্যাটা তোমার পা টেপা মাহিন্দার ছিল ত, সেইজন্য ওর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তোমার কথার এত রস। ও অনেকদিন চলেছে-এই বারে আমার নিজের লোক চাই। বেশ শক্ত সোমত্ত, ঢের বুদ্ধি রাখে, অনেক বড় বড় বাড়িতে কাজ করেছে, আমার সমস্ত রকম কাজ আগলাতে পারবে-লাল কমলের বউ, বাঁজা-ছেলেপিলে এঁড়ি পেঁড়ি নেই; এই বেশ হয়েছে।'

চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল সিদ্ধার্থ।

সুনীতি বললে, 'কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে?'

'কাল রাতে তোমাকে ঠিক সময় খবর দিতে পারিনি;—একটু আটকে পড়েছিলাম। একা থাকতে হয়েছিল তোমাকে এ ঘরে?' সিদ্ধার্থ পায়চারি করতে করতে বললে, 'আমি ভেবেছিলাম টিনি এসে শোবে। তোমার সঙ্গে, শুয়েছিল?'

'কেন বলতে যাব তাকে আমি আমার ঘরে এসে শুতে? সে কোন দিন সরোজিনী পিসিমাকে ছেড়ে কোথায় যায়-মানুষ মরে গেলেও?'

'পিসিমা জানত যে আমি ছিলাম না?'

'সকলেই জানত।' সুনীতি বললে, 'কিন্তু আমি অসুখের মানুষ-একা ঘরে রয়েছি-চারদিকে সব শয়তান বজ্জাত-কেউ একটু খোঁজখবর নেওয়াও দরকার মনে করল না। অনেক দিনের পুরনো মানুষ বললে ত তুমি-তোমার বাবার কালের মানুষ-কিন্তু সন্ধ্যের সময় ফ্যাচফ্যাচ করে ঝগড়া করে তোমার মাহিন্দার। এই সব কারণেই লালকমলের বৌকে রেখেছি আমি, সে রাতে আমার ঘরে শোবে; তার জন্যে একটা দড়ির খাটিয়া আর একটা মশারি কিনেছি আমি সংসারের খরচের টাকার থেকে-এই টাকাটা পুষিয়ে দেবে তুমি। আমাদের লেপ তোষকের সঙ্গে ওরও তোষক বালিশ তৈরি করে দিতে হবে, একটা পুরনো কম্বল দিয়েছি। শীত বেশি পড়লে ছিটের কাপড় দিয়ে লেপ তৈরি করে দিতে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধার্থ চুরুট টানতে টানতে বললে,—'তা হবে। আমার মাঝে মাঝে রাতে বেরিয়ে যেতে হয়- হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'আমি আগে আগেও দরকারি কাজে চলে যেতাম রাতে-এই ত জিরানডাঙায় কলেরার সময়-তখন টিনি কি এসে শুত তোমার এখানে? তাই ত মনে করতাম আমি। আগে আগে ত সরোজিনী পিসিমা এসে শুতেন তোমার ঘরে-আমার বেশি দেরি হয়ে গেলে আমি না ফিরলে—'

'সেই সব দিন ত নেই এখন আর, ওরা সকলেই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।' সুনীতি জলের গেলাসটা টেবিলের ওপর একটু কাত করে ধরে বললে, 'ওরা মনে করে আমার টি বি হয়েছে। হাঁপানিতে টি বি নয়; কিন্তু হাঁপানির থেকে টি বি হতেও পারে; সে রকম শরীর আমার কি হয়েছে কে জানে।'

টি বি হতেও পারে হাঁটতে হাঁটতে সুনীতির দিকে তাকাল সিদ্ধার্থ; অনেক যক্ষ্মা রুগীর চেহারা এই রকমই ত; চলতে চলতে ভাল করে দু'চারবার তাকিয়ে দেখে মনে হল, যাদের বিশেষ কোনো রোগ নেই তাদের অনেকের চেহারাও এইরকম। তিন চার বছর আগে সুনীতির হাঁপানির চিকিৎসার জন্যে অনেক টাকা খরচ করেছিল সে-অমূল্যকে সঙ্গে দিয়ে চেঞ্জেও পাঠিয়ে দিয়েছিল গিরিডিতে-মাস তিনেকের জন্যে; কিছুই হল না তাতে, যে রকম শরীর নিয়ে গিয়েছিল প্রায় সেটাকেই ফিরিয়ে এনেছিল, সেই শরীরটাই ক্রমে ক্রমে আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে; টি বি যদি হয়ে থাকে তবে হয়েছে; তিন চার বছর আগে সিদ্ধার্থের সংস্থান ছিল এখন তা নেই-চিকিৎসা চেঞ্জের কথা ভাবতে পারে না সে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে-সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল-যাদের বিশেষ তেমন কোনো রোগ নেই, ধরতে গেলে কোনো রোগই নেই-তাদের অনেকের চেহারাও সুনীতির মতন।

অবিশ্যি যাদবপুরের হাসপাতালে বছর দুই আগে সে বাসমতী কলেজের একজন প্রফেসরের সঙ্গে গিয়েছিল প্রফেসরটি একজন আত্মীয়কে দেখবার জন্যে-হাসপাতালে কয়েকজনকে সে দেখেছিল-সুনীতির আগাগোড়া শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখল আবার সিদ্ধার্থ-দেখেছিল এই রকম। সিদ্ধার্থের হাতে টাকা থাকলে তার প্রথম দায়িত্ব হত সুনীতির চিকিৎসা করানো।

কিন্তু কিছুই নেই, যেসব জায়গার থেকে ঋণ পাওয়া যেত সকলেই শেষ পর্যন্ত ঢেলে উপুড় করে দিয়েছে তাকে। সুনীতির সম্পর্কে যে-কোনো এম বি ডাক্তারকে খাটাতে গেলে খুব সম্ভব হাজার দু'হাজার টাকায় এক্ষুণি পড়তে হবে।

হোমিওপ্যাথি করতে হবে?

তেমন কোনো বিশ্বাস নেই অবিশ্যি হোমিওপ্যাথির ওপর তার। কিন্তু তবুও আগের চেয়ে বিশ্বাস বেড়েছে খানিকটা যেন। কিন্তু বাসমতীতে যে সব ডাক্তার হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করে তাদের ওপর সত্যিই বিশ্বাস নেই সিদ্ধার্থের।

তবুও কেউ কেউ আছে হোমিওপ্যাথি নাকি অ্যালোপ্যাথির চেয়েও ঢের বেশি শক্তিশালী-সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল; তা হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে আরোগ্যশাস্ত্রের সত্যের প্রকৃত স্বরূপ কীসের ভেতর আছে কঠিন। হোমিওপ্যাথিতে থাকতে পারে। টাকা অবশ্য কম খরচ হবে।

'কাল রাতে কোথায় ছিলে তুমি? জিরানডাঙায়?'

'না।'

'সেখানকার কলেরার কেসগুলো ভাল হয়ে গেছে?'

'মরেছে কয়েক জন, এখন কলেরা নেই জিরানডাঙায়।'

'নতুন কোথাও কলেরা হল?'

'না। সব জায়গায় কলেরা হলেই যে আমার যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই।'

'আমি ভাবছিলাম টুইশনের চেয়ে কলেরার তাগিদ বেশি।'

সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'এইবারে পথে ফিরতে হবে।'

'তা ত ফিরবে,' সিদ্ধার্থ অনেকক্ষণ জল খায়নি, এবারে চুমুক দেবার আগে গেলাসটা একটু কাছে এগিয়ে রেখে বললে, 'প্রভিডেন্ট ফান্ডের ধার আর ইনসিওরেন্সের পলিসির মত রাতের ঘুরে বেড়াবার ব্যাপারটা। এই ছ-সাত মাস ধরে দেখছি। রাত চরলে সর্দি কাশি হয় না-ঘুরবে; ভালই ত। পথে ফিরবে বলছ মানে বাড়িতে থাকবে রাতে? বাড়িতে থাকলে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পার বাসমতী কলেজের অন্য সব মাস্টারদের মত। কিন্তু অন্য সব মাস্টারদের স্ত্রীদের চেয়ে আমি বরাবরই একটু বেশি নতুনত্ব দেখে আসছি-আরো দেখতে হবে ঢের।'

সুনীতির কথার শেষ পর্যন্ত শুনে সিদ্ধার্থ হাঁটতে আরম্ভ করল আবার। হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'দেশ ত স্বাধীন হচ্ছে-পলিটিক্সের এখন বিশেষ কিছু নেই তেমন আর-আমার দিক থেকে অন্তত এখুনি কিছু নেই। সাহিত্য টাহিত্য হল না আমাকে দিয়ে। এখানকার হাসপাতালটা যাতে ভাল হয়-আরো কয়েকটা ওয়ার্ড বাড়ানো হয়-অনেক বেশি বেডের ব্যবস্থা হয় সেই চেষ্টা করছিলাম কয়েকজন মিলে; দেখছি প্রতি পদেই সকলে মিলে হটিয়ে দিতে চায় আমাদের। কিন্তু তবুও হটা উচিত নয়। একটা তাঁতও বসাতে চেষ্টা করেছি কয়েকজন আমরা। অবিশ্যি হাসপাতালের কর্মীদের চেয়ে তাঁতের কর্মীরা আলাদা। কোনো ব্যবসা হিসেবে তাঁত চালাতে যাচ্ছি না-যাতে বাসমতীর নানারকম ভুক্তভোগীদের উপকার হয়-সেইজন্যে। সেই জন্যেই কোনো দিক থেকে কিছুই সাহায্য পাচ্ছি না। হটব না। দু'টো নাইট স্কুলে খুলেছি। এই সব কারণেই কয়েক মাস পরে খুব রাত করে বাড়িতে ফিরতে হচ্ছে আমায়। কোনো কোনো সময় ফিরতে পারিনি-নাইট স্কুলে শুয়ে থাকতে হয়েছে।'

'হাসপাতালে ওয়ার্ড বাড়াবে-টাকা কে দিচ্ছে?'

'যাদের টাকা আছে তাদের কাছেই যাচ্ছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'কিছু দিয়েছে?'

'হাজার পনের পেয়েছি।'

'হাতে হাতে-না ওয়াদা?'

'ক্যাস। আমি ট্রেজারার নই। টাকাকড়ির ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি টাকাটা আদায় করে বিলাসবাবুকে দিয়ে দিই—'

'ও—' সুনীতি একটু জল খেয়ে যেখান থেকে খুব সম্ভব ভীমরুলরা উড়ে গেছে সেই চাকে খোঁচা দেবার মত একটা চেষ্টা করে বললে, 'তাহলে ত একটা কাজ নিয়ে আছ। কলেজের কাজের থেকে এটা সত্যিই ভাল।'

সিদ্ধার্থ মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে বললে, 'টাকাটা আমরা সকলে মিলে খাব কিনা ভাবছ। এ বিষয়ে বাঙালিদের একটা সুনাম আছে অনেক দিন থেকে। যে কাজটা হাতে নিয়েছি সেটা বাস্তবিকই ঠিক ভাবে না শেষ হওয়া পর্যন্ত নিজেদের ওপর বিশ্বাস নেই আমাদের।'

'মহেন্দ্র ঘোষ কিছু দিয়েছেন?'

'না, তিনি দেননি। তিনি কিছু দিতে পারবে না বলেছেন।'

'কেন?'

'তিনি এরকম দশজনের ব্যাপারে বিশ্বাস করে না বলেছেন। নিজে একাই একটা হাসপাতালের মতন কিছু করবেন টরবেন-ইচ্ছা আছে—'

'বাসমতীতে?'

'না। অন্য কোথাও।'

'উনি ত গান্ধির ভক্ত। সোদপুরে প্রায় যান।'

সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে, মহেন্দ্রবাবু কিছু অন্তত দিলে পারতেন আমাদের। ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ড, চিলড্রেন্স ওয়ার্ড, অরফান্স্ ওয়ার্ড, কলেরা ওয়ার্ড-আরো কত ওয়ার্ড রয়েছে; কতকগুলো নতুন খোলা হবে, আগেরগুলো বাড়ানো হবে, বেডের ব্যবস্থা করা হবে আরো কুড়ি বাইশটা-মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে নানারকম কথা হয়েছিল আমার এসব ব্যাপার নিয়ে, তিনি পরামর্শ দিতে রাজি আছেন, কিন্তু টাকা দেবেন না। কোনো ডাক্তারই টাকা দিলেন না।' সিদ্ধার্থ বললে।

'কেন?'

'বুঝতে পারলাম না কিছু। ডাক্তারি করে এদের কেউ কেউ ত অনেক টাকা করেছেন। দু' টাকার ভিজিট-চার টাকা, চার টাকারটা আট টাকা, ষোল টাকা, স্পেশাল কেসে আরো অনেক,—দক্ষিণা বাড়িয়ে দিচ্ছেন ত ক্রমে ক্রমে। কিন্তু হাসপাতালের ব্যাপারে হাত গুটিয়ে রইলেন কেন বলতে পারছি না। আমি অবিশ্যি হাল ছেড়ে দিইনি, আবার দেখব।'

সিদ্ধার্থ বললে, 'মীরমহলের দিকে একটা নাইট স্কুল খোলা হয়েছে। তোমার শরীর যদি ভাল থাকত, তাহলে সপ্তাহে চার পাঁচদিন পড়াতে পারতে। কিন্তু শরীর ত এই রকম। টিচারের বড্ড অভাব আমাদের।'

'এটা কি মেয়েদের নাইট স্কুল?'

'মেয়ে পুরুষ সকলেরই; পুরুষরা একদিকে পড়ে-মেয়েদের জন্যে একটা ভিন্ন ঘর রয়েছে।' সিদ্ধার্থ আবার চলতে শুরু করে বললে, 'অনেকদিন যাওয়া হয়নি ওদিকে। কি হল না হল বুঝতে পারছি না। মনোতোষবাবু আর সাধন দত্ত ত দেখছিলেন।'

'বনচ্ছবিরা আছে এই নাইট স্কুলের ভেতর?'

'বনচ্ছবি ত উদ্যোগে করেছিল স্ত্রীলোকদের আর ছোট ছেলেমেয়েদের সেকশনটা—' সিদ্ধার্থ বললে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'অনেকদিন দেখা হয়নি বনচ্ছবিদের সঙ্গে আমার। অনেকদিন যাইনি মীরমহলের নাইট স্কুলে—' বনচ্ছবির যে এ বাড়িতে সিদ্ধার্থের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সে কথা এখুনি পাড়বার তেমন কোনো প্রয়োজনবোধ করছিল না সুনীতি। পরে আস্তে আস্তে বলা যাবে। সরোজিনী পিসিমাই বলবেন, ওরা নিজেরাই এসে পড়বে আজ হয়ত।

'নাইট স্কুলগুলোই আজকাল নাইট ক্লাব হয়ে দাঁড়ায়।' সুনীতি বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে। আকাশে একটি তারা উঠেছে বলে মনে হচ্ছে, চারদিকে মাঠ, ক্ষেত, ধুলোর পথ, সুরকির রাস্তা আবছা হয়ে আসছে।

পায়চারির ব্যাপারে ক্লান্তি নেই যেন সিদ্ধার্থের। ডেক চেয়ারটার দিকে এগিয়ে আসছিল সে, বসবে ভাবছিল, চেয়ারটার পেছনে এসে ফ্রেমের ওপরের কাঠ ধরে দাঁড়িয়ে বলবে, 'সত্যি একটা নেশা ধরে যায় এসব করতে করতে, নাইট ক্লাবের চেয়ে একটুও কম নেশা বলে মনে হচ্ছে না।'

'তবে নেশা জিনিসটা খারাপ,' সিদ্ধার্থ আবার হাঁটতে শুরু করে বললে, 'এক এক সময় মনে হয় ছেড়ে দেব সব। কলেজ থেকে তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি, এই ক'টা দিন বাড়িতে থেকে লিখে বই পড়ে কাটিয়ে দেব ভাবছি।' 'একটা বইয়ের অভাব বড্ড করছি।' সিদ্ধার্থ চেয়ারে এসে বসে বলবে।

'কার বই?'

'লুক্রেসিয়াসের।'

'কে সে?'

'একজন রোমান কবি।'

'তা হোক। নাইট ক্লাবের কথা বলছিলাম, 'সুনীতি সিদ্ধার্থের বই পড়াটড়া সমস্ত সাধু উদ্দেশ্যকে আলগোছে সারিয়ে দিয়ে আগের খেই ধরে বললে, 'কাল রাতে ত মীরমহলের নাইট স্কুলে ছিলে না, সদরের দিকে আর একটা নাইট ক্লাব করছ নাকি শুনছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নাইট ক্লাব?'

'নাকি জিরানডাঙার দিকে।'

'কাল রাতে আমি বিলাসবাবুর বাড়িতে ছিলাম,' সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'সেখানে হাসপাতালের ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা সভা হচ্ছিল। এই প্রথম বাসমতীর কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে আমার যাওয়া। আমি মাঠঘাটেই থাকি-এক আধজন প্রফেসরের বাড়িতে কৃচিৎ যাই—'

'সারারাত বিলাসবাবুর বাড়িতে কাটল?'

'না। ওরা আমাকে হাসপাতাল রিকনস্ট্রাকশন কমিটির সেক্রেটারি করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে একটু বাড়াবাড়ি মতই ঠেকল; ও পদ আমাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে দিলে ঠিক হত, তিনি সব দিক বেশ মানিয়ে চলতে পারতেন। হাসপাতালের কথা আমি ভেবেছিলাম প্রথম, কিন্তু এখন দেখছি কোনো একটা কাজ করতে হলে কাজটা বরং বাদ গেলে চলে, কিন্তু কাজের অফিসের এত ভাল ভাল অফিসার জুটে যায় যে তাদের বাদ দিতে দুঃখ করে। বোঝেন আমাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এসব, কলেজটা চালিয়ে নিচ্ছেন এসব বুঝেই। আমি বিলাসবাবুকে বলে এসেছি যে প্রিন্সিপ্যালকেই হাসপাতালে রিকনস্ট্রাকশন কমিটির সেক্রেটারি করা হোক—'

'প্রেসিডেন্ট হবে কে?'

'কালেক্টর।'

'কালেক্টরের নাম তুমি সুপারিশ করেছিলে?'

'না। সেটা বাসমতীর যে সব মহাজনেরা চাঁদা দিয়েছে-দিচ্ছে-তারা জোট প্যাকিয়ে আমাদের দিয়ে শর্ত করিয়ে নিয়েছে। এরাই মোটা চাঁদা দিচ্ছে।'

'তা চোরাবাজারের টাকা মিহি হবে আর কি করেই' সুনীতি গেলাসের দিকে হাত বাড়িয়ে হেসে বললে, 'প্রিন্সিপ্যালও আছেন এর মধ্যে? বিলাসবাবুর সভায় বসে বসে রাত বেড়ে গেল বুঝি-নাকি একেবারে ফর্শা হয়ে গেল। যা হোক সভা না ভাঙতে বাড়ি না এসে ভালই করেছ।

সিদ্ধার্থ ডানহাতের চুরুট আস্তে আস্তে একটু ঝাঁকি দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। কেউই কোনো কথা বলছিল না। একটা হ্যারিকেনের দরকার। তেল না থাকলে মোম হলেও হয়। কিন্তু অন্ধকার করে আসতে আসেত শেষ পর্যন্ত জমল না অন্ধকার; ঝাউগাছের মাথার ওপর চাঁদ দেখা যাচ্ছে-খুব সম্ভব ষষ্ঠীর, এক চিলতি ফ্যাকাশে মেঘের মত এখনো, কিন্তু ক্রমেই উজ্জ্বল হবে। রাত দশটা এগারটা অবদি এই চাঁদেই চলবে।

'হাসপাতালের চাঁদার টাকাটা খেয়ে ফেলবার লোভও আছে কয়েকজনের দেখলাম,' সিদ্ধার্থ চাঁদটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বিলাসবাবুর অবশ্য না। একজন মানুষ ঠিক আছেন। তিনি ঠিক থাকলে আমিও কোমরে জোর পাব। না হলে—' সিদ্ধার্থ বললে— 'ছেড়ে দিতাম না কিছুতেই অবিশ্যি। আমি একা হলেও ছেড়ে দেব না-কিছুতেই না। হাসপাতালের আরো কয়েকটা ওয়ার্ডের দরকার, আরো অনেক বেডের। যত শিগগির সম্ভব এসব করা দরকার। কিন্তু খুব করিতকর্মা মনে করে যাদের বেছে ঠিক করেছিলাম—'

'তারা ধোপে টিকছে না?' সুনীতি বললে, 'বিলাসবাবুদের বাড়িতে খুব মশা ছিল না?'

'কাল আমাদের কলেজের একজন প্রফেসর মারা গেলেন,' সিদ্ধার্থ বললে।

'কে মারা গেলেন?'

'অবনী খাস্তগির মশাই।'

'ও-তার ত হাঁপানি ছিল।'

মনে করে রেখেছে দেখছি সুনীতি; কলেজের কোন কোন প্রফেসরের হাঁপানি আছে মোটামুটি জানা আছে সুনীতির; মাঝে মাঝে তাদের খবর জিজ্ঞেস করে সিদ্ধার্থের কাছে। ওদের একটা ট্রেড-ইউনিয়নের মতন আছে বোধহয়।

'হ্যাঁ, এই ত সেদিনও আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। হাঁপানি সম্বন্ধে তোমাকে কয়েকটা মুষ্টিযোগ জানিয়ে গেলেন।'

'যিনি মুষ্টিযোগ দিলেন তিনি নিজেই ত সরে পড়লেন।'

সুনীতি বললে, 'বেশি বয়স হয়নি ত খাস্তগিরের?'

'বছর পঞ্চাশেক হয়েছিল।'

'সেদিন যে এখানে এসেছিলেন, বেশ ভালই ত দেখলাম তাকে।'

'ভালই ছিলেন,' সিদ্ধার্থ চেয়ার থেকে উঠে পিছনে হাত বেঁধে পায়চারি করতে করতে বললে, 'কাল সারাদিন কলেজ করেছেন, সাড়ে চারটার সময় কলেজ ওর কাজ হয়ে গেলে কলেজে বসেই এক কাপ চা আর তিন পয়সার বিস্কুট খেয়ে টুইশন করতে বেরুলেন। কম মাইনে, অনেক ছেলেপিলের সংসার, তিনটে টুইশন ওঁর। কলেজ থেকে হেঁটে-চল্লিশ মিনিটের পথ-প্রথম টুইশনটা করলেন; তারপর দেড় মাইল হেঁটে দ্বিতীয়টা। কিন্তু সেটা শেষ করে হেঁটে চলবার কথা রইল না আর-একটা সাইকেল রিকশা করতে হল, তখুনি বাড়ি চলে যাওয়া উচিত ছিল তার, কিন্তু বাকি ছেলেটির বাড়ির দিকে রিকশা চালাতে বললেন। সমস্তটা পথ দোমনা হয়ে ভাবছিলেন গাড়িটাকে বাড়ির দিকে ফেরাতে বলবেন কিনা—কিন্তু পঁচিশ বছর মাস্টারি করেছেন, সিভিলিয়ানি করেননি ত-সেটা পারলেন না অবনীবাবু; ছেলেটির সঙ্গে দেখা করে পড়াতে বসবেন, কিন্তু পারা গেল না আর; ধরাধরি করে রিকশাতে করে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেয়া হল। শুতে পারলেন না, একটা কেম্বিসের হেলান চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হল—স্ত্রী ছেলেপিলেরা সব পায়ের কাছে এসে বসল-টের পেলেন যে মরে যাচ্ছেন—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'টের পাওয়া যায় সেটা?'

'মরে দেখিনিত।' সিদ্ধার্থ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বললে।

'সকলকেই অনেক কথা বলবার ছিল তার, কিন্তু কাউকেই কিছু বলতে পারলেন না।'

'জ্ঞান ছিল না?'

'বেশ অজ্ঞানে ছিলেন।'

'স্বর ভেঙে গেছল?'

'না, কিচ্ছু না। যে কয় মিনিট বেঁচেছিলেন কেবলি কাঁদলেন। সকলের অবিশ্যি এরকম হয় না, কিন্তু কারো কারো হয়—'

সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'রাত দশটায় মৃত্যু হবে-কিন্তু তবুও সারাটা দিন কলেজ, তারপর গুঁড়ো পাতার চা খেয়ে পায়ে হেঁটে ছ' মাইল দূরে টুইশন, তারপর পায়ে হেঁটে আবার মাইল দেড়েক দূরে আরেকটা-তিন নম্বরের টুইশনটা তারপর-রাত দশটায় মৃত্যুর গাড়ি ধরবার এক-একটা স্টেশন; তারপরে গাড়িটা ধরে ফেলেছেন যখন প্রায় তখন ফিরে আসবার জন্যে শিশুর মত কান্না। অবিশ্যি এর চেয়েও ঢের খারাপ মৃত্যু আছে। কিন্তু তবুও মাস্টারদের মৃত্যুও কম খারাপ না।'

'তুমি দেখছি আজ খুলে ধরছ সব।' সুনীতি বললে।

'কেন?'

'বলছ এই রকম মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হবে-তোমাকে আমাকে।'

'খবর পেয়ে অবনীবাবুর বাড়ি যেতে হল আমাকে রাত এগারটার সময়। আমি বাসায় ফিরছিলাম, পথে বিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা-তিনি বললেন যে অবনীবাবু মারা গেছেন।'

'সেইখানেই ছিলে সারারাত।'

'একটা অবদি; তারপর শ্মশানে।'

সিদ্ধার্থ চেয়ারে এসে বসে ঝাউগাছের দিকে তাকাল; চাঁদটা আরো ওপরে উঠেছে; আরো উজ্জ্বল হয়েছে। কাল শীত পড়েছিল বেশ, আজ শীত নেই—মনে হচ্ছে যেন শীত টিত সব ফুরিয়ে ফেলে বসন্তকাল বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছে দেশে। দিনের পাখি কোথাও একটাও নেই; ঝাউয়ের কচি কচি ঝুরঝুরে ডালপালার ভেতর দিয়ে একটা পেঁচা উড়ে গেল।

'দপ্তরি এখনো এল না দেখছি।'

'হিতেনবাবু কাল রাতে একটা কথা বলেছিলেন,' সুনীতি জানালার ভেতর দিয়ে একটা উঁচু গাছের-ঝাউগাছটার নিশ্চয়ই মাথার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তিনি নাকি তোমাকে কয়েকদিন আগে রাত দু'টো আড়াইটার সময় জিরানডাঙায় ঘুরতে দেখেছিলেন—কী করেছিলে অত রাতে ওখানে?'

'কবে?'

'কয়েকদিন আগে।'

'হিতেনবাবুর সঙ্গে কোথায় দেখা হল তোমার?'

'যেখানেই হোক, জিরানডাঙায় অত রাত্রে কী করছিলে?'

'তখন ত কলেরা ছিল-কসাইদের ওখানে আমরা কয়েকজন রাত কাটাতাম রোজ; পিসিমা তুমি টিনি-তোমরা জানতে ত সব।'

'সব কি আর সব মানুষ জানতে পারে।'

আবার উঠে পায়চারি করতে ইচ্ছা করছিল সিদ্ধার্থের, কিংবা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে, কোথাও মেঘ নেই আকাশে, শীত নেই, একদিকে ধানজমি আর মাঠ পড়ে আছে, সাদা মাটি দেখা যাচ্ছে; আর একদিকে সরু ফর্সা ধুলোর গাঁয়ের পথ; ডান দিকে লাল রাস্তাটা সদরের দিকে চলে গেছে-জিরানডাঙার দিকেও যাওয়া যায়। লুক্রেসিয়াসের বইটা আনতে অন্তত, সিদ্ধার্থ খবর পেয়েছে বইটা ওখানে আছে।

'হিতেনবাবুর সঙ্গে মাস খানেকের মধ্যে দেখা হয়নি আমার।' সিদ্ধার্থ বললে।

'তুমি ব্যস্ত ছিলে তাই দেখতে পারনি।'

'কবেকার কথা বলছ তুমি?'

'তারিখ মনে করে রাখিনি।'

'কী বলেছেন তিনি? সরোজিনী পিসির কাছে এসেছিলেন বুঝি কাল? রাত দু'টো আড়াইটার সময় জিরানডাঙায় গিয়েছিলেন একদিন—বললেন?' সিদ্ধার্থ হাসতে লাগল।

'গিয়েছিলেন বলে বললেন, এমনিই সিদ্ধার্থের হাসিটা মুছে যাচ্ছে, তাকিয়ে দেখতে দেখতে সুনীতি বললে, 'তিনি মিছে কথা বলেন না। তাঁকে আমি বিশ্বাস করি।'

শুনে চুপ করে রইল সিদ্ধার্থ।

'ওদিকে একটা মিশন আছে?'

'হ্যাঁ আছে; ক্যানেডিয়ান ক্যাথলিক ক্রিশ্চানদের মিশন।'

'ভালোরি নামে এক মিশনারি আছেন ওখানে?'

'আছেন।'

'মিশনটা কসাইদের বস্তির থেকে কত দূরে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খানিকটা দূরে।'

'প্রভাসবাবুর বাড়ির কাছে?'

'কাছেই।'

'অত রাতে জিরানডাঙায় প্রভাসবাবুর জানালায় দাঁড়িয়ে তুমি কী করছিলে?'

সিদ্ধার্থ এক মিনিট চুপ করে থেকে বললে, 'রমার সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

'রমা?' সুনীতি জলের গেলাসের জলের ভেতর বাঁ হাতটা ডুবিয়ে রেখে সিদ্ধার্থের দিকে তাকাল।

'প্রভাসবাবুর মেয়ে। চেন তাকে তুমি।' সিদ্ধার্থ বললে।

সুনীতি জলের গেলাসের ভেতর আঙুল ডুবিয়ে রেখে বললে, 'খুব খারাপ লেগেছিল-হিতেনবাবুর।'

'হিতেনবাবুর? আড়াইটার সময় ওখানে কী করছিলেন?'

'দরকার ছিল—তাই ছিলেন।'

'কোনো মানুষই ছিল না-অত রাতে-জিরানডাঙায়-তিনি কি করে থাকবেন।'

সুনীতি জলের ভেতর থেকে আঙুল ক'টা একটু তুলে আবার ডুবিয়ে রেখে বললে, 'তিনি ছিলেন কি না ছিলেন সেইটে কোনো একটা কথাই নয়। কিন্তু তুমি ছিলে।'

সিদ্ধার্থ জলের গেলাসটার জলে ডোবানো সুনীতির আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়েছিল, সুনীতির টি বি রুগীর মতন আঙুলগুলো একটু মোটা দেখাচ্ছিল জলের ভেতর। বিয়ের পরেই ঠিক এইরকম আঙুল ছিল—তাকিয়ে দেখছিল সিদ্ধার্থ-চাঁদের বেশ ফটফটে আলো এসে পড়েছে টেবিলের ওপরে-ঘরের ভেতর।

'হিতেনবাবু ছিলেন সেখানে।' সুনীতি বললে। 'ক্যানেডিয়ান মিশনে গিয়েছিলেন।'

সিদ্ধার্থ ঝাউগাছটার সরু সরু নীলচে অদূরত্বের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বললে, 'মিশন থেকে ফিরছিলেন বুঝি-দেখিনি আমি তাঁকে।'

'তিনি দেখছিলেন। ভালোরিও দেখেছিলেন নিশ্চয়-রাস্তার মোড়ে গাড়িটা ছিল-যাচ্ছিলেন ওঁরা সেদিকে।' সুনীতি বললে, 'কিন্তু এসব ত বলবার মত কিছু কথা নয়, আমি তোমাকে হিতেনবাবুর কথাটথা নয়-আসল ব্যাপারটা ভেবে দেখতে বলছি। ভেবে ঠিক করেছ কিছু?'

'রমার কাছে জিরানডাঙার কলেরার ব্যাপারেই—একটা দরকারে গিয়েছিলাম আমি।'

'ও কি লেডি ডাক্তারি পড়ছ?'

চওড়া লম্বা কাঁচের গেলাসটার ভেতর আরো খানিকটা হাত ডুবিয়ে ফেলে সুনীতি বললে।

'যে ছেলেরা কলেরার ডিউটি দিচ্ছিল তাদের চা খাবার দরকার হল—'সিদ্ধার্থ চেয়ার থেকে উঠে শার্টের পকেটে হাত ডুবিয়ে পায়চারি করতে করতে বললে, ভুরু কুঁচতে উঠছিল তার, 'রাতে দু-তিনবার চা খাবার দরকার; রমাদের একটু নতুন বড় ফ্লাস্ক ছিল-সেইটে নিয়ে আসবার জন্যে গিয়েছিলাম আমি।'

'গল্পটা এরকমও হতে পারে-কে জানে কি হতে পারে—' সুনীতি জলের ভেতর হাতটাকে মুঠ বেঁধে ফেলতে ফেলতে বললে, 'কেন গিয়েছিলে, কী হয়েছিল-আমাদের কারো তা জানবার কথা নয়। হিতেনবাবু না দেখলে-কিছু যে ঘটেছিল তাও কারো কানে আসত না। হিতেনবাবু সকলের কাছে বললেন ব্যাপারটা-কাল রাতে।'

'গগনবাবু এসেছিলেন?'

গেলাসে হাত ডুবিয়ে চুপ করে বসে রইল সুনীতি।

'চায়ের দরকার হয়েছিল-ফ্লাস্ক আনতে গিয়েছিলাম। ফ্লাস্কটা দিল আমাকে রমা—'

'জিনিসটা এক মিনিটে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তুমি তিন কোয়ার্টার দাঁড়িয়ে ছিলে কেন।'

সিদ্ধার্থ এরকম ধরনের জেরার কোনো উত্তর দেবে না ভাবছিল, কিংবা সহজে মোটামুটি সঠিক উত্তর মনের ভেতর এসে পড়ে যদি তার-দেবে সে তাহলে।

'প্রভাসবাবু কী করছিলেন?' গেলাসটা সরিয়ে রেখে সুনীতি বললে। 'ঘুমিয়েছিলেন।'

'ও বাড়িতে আর কোনো স্ত্রীলোক ছিল?'

'না, কেউই ছিল না আর।'

'আশে পাশে কোনো দিকেই কেউ—'

'অত রাতে জিরানডাঙায় জনমনিষ্যি থাকে না।' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে। 'কোনো ঘরবাড়ি নেই এক দেড় মাইলের ভেতর কোনোদিকে; মিশনটা অবিশ্যি আছে, জিরানডাঙার কসাইদের বস্তি-ধানজমি জঙ্গলের ওপরে।'

'বুঝেছি।' খানিকক্ষণ পরে সুনীতি বললে।

'কী বুঝেছ?'

'তিন কোয়ার্টারের হিসেবটা।'

'ও—' সিদ্ধার্থ আধ মিনিট পরে বললে তারপর হাঁটতে শুরু করে বললে, 'ওর ভেতর হিসেব টিশেবের কিছু আছে? আমি ফেলে রেখেছিলাম। কিন্তু তোমরা সকলে মিলে ভাবাচ্ছ আমাকে।'

পিঠটা ধনুকের মত বেঁকে গেছে সিদ্ধার্থের-হাঁটতে গিয়ে; হাঁটছিল; বললে, 'হিসেবের কিছু নেই। বেশি কথা ভাবতে গেলে মানুষ কাজ করতে পারে না; আমি অবিশ্যি কথা ভাবি না-কিন্তু—'

সুনীতি হাত চোবানো গেলাসটা নিজের দিকে টেনে এনে বললে, 'কিন্তু তবুও কাজ করবার মানুষই ত তুমি-সে তিন কোয়ার্টারই হোক, কি তিন মাসই হোক। ওঁরা অবিশ্যি ভাবনা চিন্তা করলেন—সুখী মানুষদের মত কাজের লাফালাফিটা কুললো না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে যুক্তির কথায় ফিরে এসে সিদ্ধার্থ বললে, 'রমা আমার ছাত্রী।'

'ঠিক। ছাত্র নয়।' সুনীতি বললে।

অযৌক্তিক বলেনি-চুরুট টানতে টানতে সিদ্ধার্থের মনে হল; যুক্তিটা একটা উসকে দিয়েছে খুব সম্ভব।

'তুমি কখন এলে সিদ্ধার্থ?' সরোজিনী পিসিমা আর টিনি প্রায় ধবধবে শাড়ি ব্লাউজের কিছু গন্ধ কিছু নির্গন্ধ কিছু স্বাদ নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে বললেন, 'বিকেল থেকেই তোমার গলা পাচ্ছি-আসি আসি করে আসা হল না—'

'আমি বেলা দশটার সময়ই এসেছি পিসিমা। বসুন। বসো টিনি।'

সুনীতি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বসো টিনিদি-আমি চকীতে বসছি।'

ডেক চেয়ারে বসে সরোজিনী বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে সিদ্ধার্থ?'

'হ্যাঁ, আমি পায়চারি করছি—' চুরুটটা নিভে গেছে বুঝি—পকেটের ভেতর ফেলে রাখল সে।

'ঘরে একটা বাতি নেই'—সরোজিনী বললেন।

কেরোসিন নেই।' সুনীতি বললে।

'মোম আছে?'

'আছে-খাওয়ার সময় জ্বালাব। এখন আলো চাই আপনার পিসিমা?'

'না। বেশ জ্যোৎস্না আছে। কী রান্না করলে এ-বেলা?'

'এখনো উনুন ধরাইনি—'

'এখনো না।' বাঁ চোখে সুড় সুড় করছিল, রগড়ে নিয়ে বললেন সরোজিনী, 'তোমাদের মাহিন্দার কী করছে?'

'সে বেশি মাইনের চাকরিতে চলে গেছে।' সিদ্ধার্থ বললে।

'মরণ আর কি! সেই যুদ্ধটার সময় থেকে কি যে আরম্ভ হল-বাসার মাহিন্দারিতে কোনো বাবুই টিকবেন না আর; ব্যাটারা সকলেই রাতারাতি বড় বড় কামিন টানিন হয়ে গেল। একটু ঠুক ঠুক করতে পারলেই মিস্ত্রি-রংশালের ইঞ্জিনিয়ার—আরে বাবা রে বাবা-ষাট সত্তর আশি টাকা করে মাইনে সব;' সরোজিনী চলন্ত সিদ্ধার্থের কুঁজো পিঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গেরস্তের কাজে চাকর বাকরদের পাওয়া যাবে না আজকাল আর।'

'কি হবে তোমাদের রান্না সুনীতি?'

'ওবেলা ত ধানরাজের মাকে চাল আর আলু দিয়েছিলাম, পিসিমার উনুনে সেদ্ধ করে দিয়েছিল। এবেলা ভাত তরকারি হবে-ডালও হবে—'

'কিছু ভেজো' সরোজিনী বললেন।

'বড়ির টক করতে পার তেঁতুল দিয়ে; কিছু লাউ বা শশা কুচি কুচি করে দেবে,' টিনি বললে, 'কিন্তু এখনো ত তোমরা উনুনই ধরাও নি।'

'আজ রাতের মত তোলা উনুনটা ধরিয়ে নাও—তোমাদের ও কয়লা আছে; হ্যাঁ?'

'না, কয়লা ঘুটে কিছু নেই।'

'ও লাকড়ি—' সরোজিনী সুনীতির দিকে মুখ ফিরিয়ে কেমন যেন একটা সুস্থ তিলে টনটনে জড়িবড়ি দৃষ্টিবিভ্রম জাগিয়ে তুলে বললেন, 'এই শীতে বেশ শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে আছে; দেখতে দেখতে রান্নাবান্না হয়ে যাবে তোমাদের। ছোট উনুনটা জ্বালিয়ে নিও। না, রাত হবে নি টিনি। কটা বাজল সিদ্ধার্থ?'

'এই সাড়ে পাঁচটা হবে।'

'মোটে?' টিনি বললে।

'তা কার্তিক অঘ্রাণ মাসে বিকেলবেলা আর কোথায়। শুরু হতে হতেই রাত নেমে আসে। 'সরোজিনী টিনিকে বললেন, 'আমরা উঠতি পড়তি বেলা হিসেবে কাজ করি আলো অন্ধকার দেখে-সিদ্ধার্থরা ঘড়ির টাইম দেখে। নাকি সিদ্ধার্থ? ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ, রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে খাওয়া হবে না আমাদের; তোমাদের তখন জোড়া ঘুম হয়ে গেছে পিসিমা। রান্নাবান্না হয়ে গেছে তোমাদের? খাওয়া দাওয়া হল?' সিদ্ধার্থ চলার পথে পিঠের ওপর কথাগুলো সরোজিনী পিসিমাকে পৌঁছিয়ে দিতে বললে।

'না, খাওয়া হয়নি। রান্না বেশি কিছু না-ধানরাজের মার হয়ে এল প্রায়। শসার তরকারি আছে বড়ি দিয়ে, কাঁচকলা সেদ্ধ আছে, তেল আর মরিচ পোড়া দিয়ে মাখা হয়েছে, বেগুন ভাজা আছে, একটু আলু স্কোয়াস বীম দিয়ে তরকারি আমি নিজে রেঁধে রেখেছিলাম-অড়লের ডাল-হাত-গড়া রুটি—'

জলপাইয়ের টক একটু রাঁধতে বলে এসেছি আমি ধানরাজের মাকে—'টিনি বললে।

'চিনি পাচ্ছ কোথায় তোমরা?' সিদ্ধার্থ বললে।

'গুড় দিয়ে।' সরোজিনী বললেন।

'রুটি দিয়ে কি জলপাইয়ের টক ভালো লাগবে?' সিদ্ধার্থ বললে।

'তা লাগবে মন্দ না। বেশ জমিয়ে করবে টকটা। বেশ টকও হবে মিষ্টি ও হবে—' সরোজিনী বললেন।

'তোমার ত ডায়াবটিস-মিষ্টি খাওয়া ভাল?'

'ডায়াবেটিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি আমি আর কি। বুড়ো মানুষ মিষ্টি ছাড়া কি করে জলপাই খায়।'

জলপাই খাবারই বা দরকার কি—সিদ্ধার্থ ভাবছিল।

'ধানরাজের মা চমৎকার রাঁধে জলপাই। যেমন টক, তেমনি মিষ্টি, তেমনি ঝাল—'

'ঝালও আবার?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'উঃ উঃ উঃ-জিভ সিটিয়ে পুড়িয়ে কি যে আরাম। কিছু পাঁচফোড়ন থাকবে; ছিট মরিচ দিতে বলে এসেছি ধানরাজের মাকে—বেশ ছিঁড়ে কসিয়ে কসিয়ে—টকের মধ্যে। পদিনার চাটটা খাবে সিদ্ধার্থ?'

'তৈরি করেছ নাকি?'

'না আজ নয়—পদিনার শাক আজ আর কুড়োলাম কোথায়। কাল তৈরি করব ভাবছি—তেঁতুল আর লঙ্কা দিয়ে—পনের কুড়িটা কাঁচা লঙ্কা বেটে। খেয়ে বাবার নাম মনে থাকবে বটে তোমার। খাবে?'

'হ্যাঁ, তা খাব বইকি,' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'কানখুসকির কিনারে যেটুকু আঁটে—'

'এ্য ম্যা ম্যা মা'—সরোজিনী ভারি অভক্তি বোধ করে বললেন, 'কার কান খুঁচেছ তুমি সেটা দিয়ে—'

'আরে বাবা রে বাবা, আরে বাবা রে বাবা টিনি বাঁ হাতের তিন চারটে আঙুলের হাড়ে টেবিলের কাঠে ঠক্ ঠক্ করে ঘা দিয়ে বললে, 'কি যে আরম্ভ করেছ তোমরা পদিনার চাটনি আর কানখুসকির কথা; এর পরে ও চাটনি খেতে গেলেই ওয়াক করে উঠব রে বাবা। পদিনার চাটনিতে তুমি অত কাঁচালঙ্কা দিও না মাসিমা; মদ্রাজীরা ওরকম খায়—পাঞ্জাবীরাও। ঝাল দিও—তবে ছিট মরিচের; আর মিষ্টি বেশ কসিয়ে দেবে—'

'সে ত জলপাইয়ের রকমফের হল রে বাপু, 'সরোজিনী গায়ে পাতলা চাদর একটু আঁটো করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন; 'একটু শীত পড়েছে যেন এখন; জিভে নানারকম স্বাদ মাড়িয়ে দেখতে হয়। টিনির আছে ঐ ছিট মরিচ আর মিষ্টি দিয়ে কসিয়ে-আরে বাবা তা ত জলপাইয়ে হল-পদিনায় ত তাই।'

'তোমরা সালাদ খাও না সুনীতি?' টিনি বললে।

'তোমরা খেতে আরম্ভ করেছ বুঝি? আমি একটা চুরুট খাব পিসিমা।'

'তুমি ত খেতে না চুরুট।'

'এই ধরেছি নতুন।'

'তা খাও; সুনীতির মত থাকলেই হল,' সরোজিনী বললেন 'আমি ওতে এখন আর দোষ ধরি না, চুরুট আজকাল সকলেই খায়-হিতেনবাবু ছাড়া। ছাতু অবিশ্যি চুরুট সিগারেট খেতে গেলে কাসতে কাসতে দম ফিরে পাবে না আর-সটকাবে। চুরুটটা জ্বালিয়ে বাতাসটা টেনে কলজের ভেতর নিতে হয়-এসব বুঝবে না কিছু ছাতু। তোমরা সালাদ খাও সিদ্ধার্থ?'

'ক্বচিৎ খাওয়া পড়ে'—সিদ্ধার্থ পকেট থেকে চুরুটটা বের করে বললে; চুরুটের ছাই কালিতে পকেট একটু নোংরা হয়ে গেছে; এবারে শীতের তরকারি উঠলে খাব ভাবছি।'

শীতের তরকারি-মানে বাঁধাকপি পাতার জন্যে বসে আছ নাকি তুমি, শসা আছে, পেঁয়াজ আছে, বিলিতি বেগুন পাওয়া যাচ্ছে-এই দিয়েই ত চমৎকার সালাদ হয়—

'লেটুস পাওয়া যাচ্ছে, নেবু ত সব সময়ই আছে। কিছু নেবুর রস দিতে পার, কাঁচালঙ্কা অল্প কিছু কুচি করে-আর পেঁয়াজ কুচি-যত খুশি'—টিনি বললে সিদ্ধার্থকে, 'আমরা এ রকম মিলিয়ে ঘুলিয়ে খাচ্ছি অনেক দিন থেকে।'

'খেয়ো' সরোজিনী বললে, 'খুব ভিটামিন আছে সালাদে।'

'তোমরা অনেক জিনিস খাচ্ছ ত' সিদ্ধার্থ চুরুটটা জ্বালাবে কিনা ভাবতে ভাবতে বললে, 'এত সব হজম হয়।'

'হজম না হলে মূর্খও খায় নাকি?' সরোজিনী বললেন, 'খেয়ে পেট ভাঙলে জিভ তিতো হয়ে যায়-কোনো জিনিস খেতে পারা যায় নাকি আর; আমাদের সেরকম না, আমাদের জিভে খুব জোশ।'

'মাসিমাকে এই ডায়াবেটিসই খেল, 'টিনি খানিকটা জোর দিয়ে কথা বলতে গিয়ে একটু পিঠ ঝাঁকিয়ে পা দু'টো হাঁটুর কাছে ভেঙে একটু দম দিয়ে বললে, 'না হলে মাসিমা সেই গল্পে আইবুড়িমার মত লোহার গুলিও হজম করে ফেলতে পারেন।'

'বাবা কি তুলনা। সরোজিনী খুশি বিরক্ত নিম-বিরক্ত হয়ে বললেন, 'না গো হজম টজম নয়-ঐ প্রস্টেট গ্ল্যান্ডটাই আমাকে শেষ করল। অপারেশন হতে পারে সিদ্ধার্থ!'

জ্বালি জ্বালি করে চুরুটটা জ্বালে নি সিদ্ধার্থ, পায়চারি করতে করতে বললে, 'এই বয়সে এখানে অপারেশন চলে না-বাসমতীতে সেরকম ডাক্তার নেই।'

'কলকাতায় গিয়ে দেখলে হয় না?'

'কারো কারো এরকম বয়সেও অপারেশন করে কিছু সুবিধা হয়েছে বটে। কিন্তু না করাই ভাল, এত বুড়োরা গ্লান্ডের অপারেশন করে প্রায়ই টেকে না।'

'তাহলে কি এই রোগটা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে-যদ্দিন আছি? অপারেশন টপারেশন করে একটু ঝরঝরে হতে বসতে পারব না?'

সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'কাকাদের কাছে লিখে দাও-চেষ্টা করে দেখতে পার কলকাতায় গিয়ে।'

'না, ওসব আর হবে না'—পা-টা ভাল করে ছড়িয়ে নিয়ে স্যান্ডাল দিয়ে আস্তে আস্তে মেঝের মাটি ঘষতে ঘষতে সরোজিনী বললেন, 'যে কদিন আছি বাসমতীতেই থাকব এখন। কাল তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'বিলাসবাবুর বাড়িতে একটা মিটিং ছিল, 'সিদ্ধার্থ বললে, 'সেখানেই ছিলাম রাত দশটা অবদি- তারপর আমি—'

'ও হো হো বিলাসবাবুদের সেই হাসপাতালের কতদূর?' সরোজিনী ভুলেই গিয়েছিলেন সেই কথাটা, হঠাৎ মনে পড়তেই গরজে নড়ে চড়ে উঠে বললেন, 'তুমিই ত উদ্যোগ করে করছ?'

'আমি এখনো আছি এর মধ্যে; কতদিন থাকতে পারি বলতে পারছি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না রে বাবু, ছেড়ে দিও না। ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড চিলড্রেন্স ওয়ার্ড-না হয় অরফানস্ ওয়ার্ডের একটা কিনারে আমার আর টিনির জন্যে দু'টো ফ্রি বেড রেখে দিতে হবে তোমার বাবা-যে পর্যন্ত না আমরা মরে যাই—'

'সেই জন্যেই ত পাসপাতাল তৈরি হচ্ছে আমাদের—' সিদ্ধার্থ চুরুটটা মুখের থেকে খসিয়ে নিয়ে বললে, 'আমার নিজের জন্যেও একটা ফ্রি বেড রেখে দেব-অরফ্যানদের ঘরের এক কিনারে। টিনিকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি; শীত রাতে নিজের বিছানায় শুয়ে থেকে সমস্ত বাসমতীটাকেই একটা ওয়ার্ড মনে হয়?'

'তা হয়,' টিনি বললে, 'বেশ আরামও লাগে কম্বলের নিচে শুয়ে থাকতে থাকতে; তবে নতুন বড় ফ্লাস্কে এক ফ্লাস্ক চা থাকে বিছানার পাশে-মাঝে মাঝে আমার সেই দরকারি নার্স এসে মশারি তুলে পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে যায়-সেইটেই চাই। তা না হলে ছাই ফ্রি বেডের হদ্দ করেও কোনো সুখ নেই। হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা নেহাৎ ছেলেমানুষি মনে হতে থাকে।'

'চায়ের কথা বললে বুঝি সুনীতি?' সরোজিনী ভাল করে সমস্ত কিছুর খেই ধরতে না পেরে 'একটু চা হলে ভাল হত এখন' এ রকম একটা তৃষ্ণা তাড়নার নিঃশব্দ সংযমে ঘরের চারিদিকে একবার চোখ চালিয়ে নিয়ে তারপর সুনীতির মুখের ওপর সেটা স্থির করে বললেন।

'ঠিকই বলেছ সুনীতি' টিনি সিদ্ধার্থের দিকে তাকাতে গিয়ে সে পিছু ফিরেছে বলে পায়চারিটার দিকে তাকাতে তাকাতে বললে 'হাসপাতালের তুমি যে কোনো ওয়ার্ডই বল না কেন, যারা শীত রাতে আমেরিকান কম্বল মুড়ে যারা কনডালেস্ করছে তাদের সমস্ত সুখ সত্যিই মাঠে মারা যায় যদি নার্স এসে মাঝে মাঝে ফ্লাস্ক থেকে গরম চা না ঢেলে দিয়ে যায়—'

'হাসিমুখে নার্স হলে চলবে না,' সুনীতি বললে।

'নার্সের মুখের হাঁড়ি পাতিলের দিকে কেউ তাকাতে চায় না-সরোজিনী পায়ের গাঁটে গুড়লি ঘষে মশার সুড়সুড়িটা পিষে ফেলতে ফেলতে বললেন, 'গরম গরম চা পেলেই হল।'

'ফ্লাস্কে ক'ঘণ্টা চা গরম থাকে সিদ্ধার্থ?' টিনি খুব নির্দোষ চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল। সুনীতির চোখ অনেকখানি জটিল। সরোজিনী মাসিমাকে জিরানডাঙার ফ্লাস্কের বৃত্তান্তটা বললে চোখ দু'টি তার কি রকম হয়ে উঠত বুঝতে পারছিল সিদ্ধার্থ; সম্প্রতি কিছু না বুঝে-বোঝবার কিছু রয়েছে কিনা সে সম্বন্ধেও না করে তিনি যেন দু'চার মুহূর্তের জন্যে চোখের তারা হারিয়ে ফেলে কুমড়ো বিচির মত তাকিয়ে আছেন।

'ফ্লাস্কে মোটামুটি আট দশ ঘণ্টা চা গরম থাকে,' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'জিরানডাঙায় কসাইদের বস্তিতে কলেরার সময় প্রভাসবাবুর মেয়ে রমার কাছ থেকে আমি রাত আড়াইটার সময় একটা ফ্লাস্ক নিয়েছিলাম—সেটায় আরো অনেকক্ষণ গরম ছিল চা—'

'ও—রমার কাছ থেকে ফ্লাস্ক নিয়েছিলে তুমি' সরোজিনী বললেন 'হিতেনবাবু বলছিলেন কাল। রাত ক'টা তখন?'

'আড়াইটে।'

'তুমি একাই গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, আমি। ছেলেরা ডিউটি দিচ্ছিল।'

'কে ছিল ও বাড়িতে?'

'রমা-আর অধিকারী মশাই।'

'আর কেউই না?' টিনি একটু থমকে-আস্তে আস্তে বললে। আগের মত সেই শান্ত সুব্রত সাক্ষীগোপালের মত চোখ নেই টিনির-কিংবা সরোজিনীর;-সিদ্ধার্থ আস্তে আস্তে মাথা তুলে দেখল।

'অত রাতে জেগেছিলেন তাঁরা?' সরোজিনী বললেন।

'ঘুমুচ্ছিলেন প্রভাসবাবু। কি যেন লিখছিল রমা।'

'অত রাতে লিখছিল-সে কি।' সরোজিনী একটু বিব্রত হয়ে বললেন।

'সিদ্ধার্থ ডাক দিয়ে তাকে জাগায়নি।' সরোজিনী একটু বিব্রত হয়ে বললেন।

'সিদ্ধার্থ ডাক দিয়ে তাকে জাগায়নি।' যোগ দিয়ে বাকি মহিলা দু'টির দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থের পায়চারিটায় নিরবচ্ছিন্নতার দিকে নিবিষ্ট হয়ে চেয়ে রইল টিনি।

বাইরে জ্যোৎস্না মাইল মাইল জায়গা জুড়ে এখুনি খুব নিঃশব্দ।

'তোমাকে হঠাৎ অত রাতে দেখে ভড়কে গেল ও? ফ্লাস্কটা চাইলে?'

'হ্যাঁ।'

'দিল তক্ষুণি?'

'আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার কথা হয়েছিল।' সিদ্ধার্থ বললে, 'হিতেনবাবু তখন বোধহয় ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি দেখিনি তাঁকে।'

সিদ্ধার্থের পায়চারিটার দিকে আর তাকাতে গেল না টিনি; কি করে এরকম ভাবে অনবরত হাঁটে লোক?—মনের ভিতর কি অস্বস্তি—অথবা শান্তি ও হতে পারে এক আশ্চর্য ধরনের-রয়েছে তার।' কিন্তু যে প্রশান্তিই থাকুক না কেন দেখতে গিয়ে মাথা কেমন ঝিম ঝিম করে ওঠে তার।

বাইরের ঠাণ্ডা জ্যোৎস্নার দিকে তাকাল সে।

'উঠবে মাসিমা?'

'দপ্তরিরা কোথায়?' সরোজিনী বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখনো ফেরেনি।' সিদ্ধার্থ বললে।

'ফেরেনি? রাত ত হচ্ছে। চারদিকে কি ভীষণ নিঝঝুম। কোথায় ওরা?'

'আসবেই।' হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধার্থ বললে।

'এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কথা, প্রভাসবাবু ঘুমের থেকে উঠলেন না আর?' সরোজিনী বললেন।

'না।'

'জিরানডাঙায় কলেরার ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা? কলেজের ছেলেরা ডিউটি দিচ্ছিল?'

'হ্যাঁ, ছেলেরা ডিউটি দিচ্ছিল।'

'কলেরার চিকিৎসার জিনিস টিনিস হিসেব নিকেশ-ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা নিয়ে ওকে একটা অফিসের মতন রাখতে বলেছিলে নাকি তুমি ওদের বাড়িতে?'

'না, তা কিছু বলিনি আমি; কোনো অফিসের দরকার ছিল না; একটা ফ্লাস্ক চাইতে গিয়েছিলাম।

'চাইতে গিয়ে তিন কোয়ার্টার লেগে থাকলে সিদ্ধার্থ।' টিনি সিদ্ধার্থের চোখ খুঁজে নিয়ে কথাটা বলতে চেষ্টা করে বললে; কিন্তু সিদ্ধার্থ ঘাড় ঝুঁকিয়ে হাঁটছে; তার চোখে কারুরই কোনো রকম সাধ লাগবার সম্ভাবনা নেই।

'কিন্তু সুনীতির এজন্যে কিছু মনে করা উচিত নয়, সরোজিনী বললেন, 'ও সিদ্ধার্থের ছাত্রী। একটা বেডপ্যান বা ডুস বা ফ্লাস্ক চাইতে গিয়ে পাঁচটা কথা মানুষ মানুষকে বলবার জন্যে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে জিরোতে পারে অত রাতে-ওরকম অবস্থায়। ফ্লাস্কটা হাতে পেয়ে হুট করে যদি সটকাতো সিদ্ধার্থ তাহলে সেটা খারাপ হত। খুব ভাল করেছ। হিতেন বাবুরও যত কারবার-এই মোদ্দা কথাটা বলতে গিয়ে নাশপাতির ঝুড়ি খুলি খুলি করে আঁশটে ডিমের চুবড়ি ছড়িয়ে বসলেন যেন কালকে রাতে আমার ঘরের ব্রাহ্মবন্ধুসভার ভেতরে। ফাটা এসেছে-বলেছ সিদ্ধার্থকে সুনীতি?'

'ফাটা কে?' সিদ্ধার্থ পায়চারির অনর্গলতাকে একটু জিরিয়ে আনতে আনতে বললে। বসবে সে কোথাও।

'ফাটা মহলানবীশ; বড় কমলবাবুর ছেলে।'

'ও—' সিদ্ধার্থ বসবার জন্যে একটা চেয়ার খুঁজে টেনে নিয়ে বললে, 'ফাটাকে দেখিনি, অনেকদিন; কবে এল? ক'দিন আছে বাসমতীতে? কী বলে?'

'দিন দুই হল এসেছে।' সরোজিনীর পায়ে মশা সুড়সুড়ি দিচ্ছিল আবার, একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'থাকবে কিছুদিন বলছে; বড় কমলবাবুর জমিদারিরও তদারক করবে। খুব টাকা পিটছে কলকাতায় ফাটা। কিন্তু সেইরকমই আছে; খুব ভাল; ব্রাহ্মসমাজের দিকে টান আছে। কাল সারারাত আমাদের ঘরে ছিল।'

'ফাটাবাবু তোমাকে খুঁজেছিলেন সিদ্ধার্থ,' টিনি বললে, 'আজ ভোর না হতেই চলে গেলেন, কৈ সারাদিনের মধ্যে এলেন না ত আর বীরেনবাবু মাসিমা, আমি ভেবেছিলাম সিদ্ধার্থের সঙ্গে দেখা করতে খুবই আসবেন একবার।'

'নানা কাজে ব্যস্ত-আজ না হোক কাল আসবে।' সরোজিনী ডান পাটা তুলে দু' হাত দিয়ে রগড়াতে রগড়াতে বললেন, 'মোটর সাইকেলটা হারিয়ে গেল আবার ফাটার।'

'কি করে হারাল বুঝতে পারলাম না আমি।'

'চুরি গেল।' সরোজিনী বললেন।

'কোত্থেকে চুরি গেল বাইক।' সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল।

'আমাদের উঠোনে রেখে দিয়েছিল সারারাত' সরোজিনী ডান পা নামিয়ে রেখে বললেন, 'ভোরবেলা চুরি গেল। আমি উপাসনা করছিলাম—ফাটা গাইছিল—'

সরোজিনীর কথা শেষ না হতেই দরজার কাছে সিঁড়ির নিচের দিকে এসে দাঁড়াল একজন লোক; মাথার ওপর ভারী একটা মোট; সমস্তটা চটে জড়ানো।

'কে হে তুমি?' হকচকিয়ে বললেন।'

'বাবু আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'কোন বাবু?'

'ব্রাহ্মসমাজে যে নতুন বাবু এসেছেন।'

'ফাটা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনিই—এক জের কেরোসিন তেল পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রফেসরবাবুকে— সিদ্ধার্থবাবুকে— কেরোসিনের ক্যানেস্তারাটা ঘরের ভেতরে রেখে লোকটি বললে, 'কাল আসবেন তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে। আচ্ছা আসি—'কেউ কিছু বলবার আগে হন হন করে চলে গেল।

'কোত্থেকে তেল পেল ফাটা?' সিদ্ধার্থ বললে।

'ওর নানারকম কারবার আছে। চোরাবাজার থেকে কিনেছে বলে মনে হচ্ছে না; পারমিট পেয়েছে; সরোজিনী সুনীতির কাছ থেকে হাতপাখাটা চেয়ে নিয়ে নিচের দিকে বাতাস করতে করতে এ-ঘরের অল্প স্বল্প মশা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তেল আছে তোমাদের?

'নেই অবিশ্যি—কিন্তু—'

'পাবেও না নচ্ছার ফুড কমিটির কাছ থেকে—দু'তিন বোতলের বেশি আসে। মাস্টার মানুষ লেখাপড়ার দরকার আছে ঢের। ক্যানেস্তারাটা রেখে দাও।' 'সিদ্ধার্থকে তেলটা রেখে দিতে বলছ বুঝি মাসিমা,' টিনি বললে, 'কিন্তু কাল রাতে ব্রাহ্মসভায় তুমি ত আরেক রকম কথা বলেছিলে।'

'কাল রাতে তারপর আমি অনেক ভেবে দেখেছি।'

'এখন তেল পেলে তুমিও নাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দরকার হলে সিদ্ধার্থের কাছ থেকে এক বোতল চেয়ে নেব—তা নেব। এটা পারমিটের তেল; ভালবেসে দিয়েছে ফাটা। আমরা সাহেবডাঙার ফুড কমিটির কাছে চাইতে গেলে তারা লাল কেরোসিন অবদি আমাদের দেবে না কালোবাজারে নাকে দড়ি দিয়ে না ঘুরিয়ে। সেটা ধানরাজের মাকে দিয়ে আমি করতে দেব না।'

'সিদ্ধার্থ তোমাকে একবার বেরতে হবে।' টিনি বললে।

'কেন?'

'কৈ, দপ্তরিরা এল না ত। সন্ধ্যে উতরে গেছে—এখন আর বাইরে থাকা উচিত নয় শীতের সময়—ধানজমি জঙ্গলের দেশে। এটা ত সদর বাসমতী নয়।'

একটু শীত করছিল সিদ্ধার্থের, দু'পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, 'কেন, বাঘ টাঘ নামে নাকি শীতে?'

'এখুনি নামবে না; তবে কাল রাতে ফেউ ডাকছিল শুনেছিলাম। ভোঁদড় আছে, ভাব আছে, শেয়াল টেয়াল আছে—'

'ও—টিনি—' সিদ্ধার্থ হেসে উঠে, 'কুড়ুনি আর দপ্তরি—ওরা কি বলে—'কইতর' গেরস্তের হাঁসমুরগি আর কইতরের সামিল বুঝি।'

'তা না হোক, তবু সে রকম ত প্রায়; কত বড় আর। তাছাড়া দপ্তরি আর কুড়ুনির কচি ঠ্যাং আর পাঁজর—কি রকম রিকেট ওদের। ভারি দুঃখ করে—' টিনি বললে, 'তুমি বুঝছ না সিদ্ধার্থ।'

'ঠিক চলে আসবে ওরা।'

'ওরা প্রায়ই এর চেয়ে খানিকটা রাত করে আসে।' সুনীতি বললে।

'এখানে এক আধটা হায়না দেখা যাচ্ছে নাকি—' টিনি বাইরের জ্যোৎস্না ধানজমির স্নিগ্ধ, কর্কশ, বিরাট ঢালাও নিঃশব্দতার দিকে তাকিয়ে বললে।

'কোথায় সাহেবডাঙায়? কে বলেছে?' সরোজিনী বললেন।

'আমি শুনেছি।' টিনি বললে।

'হায়েনা থাকলে—তিন চারটে ধানজমির পেছনে—' সিদ্ধার্থ একটু ভেবে বললে—'কিন্তু দপ্তরিরা ত ওদিকে যায়নি—'

'কোন দিকে গিয়েছে তাহলে?'

কোন দিকে গিয়েছে বলতে পারল না সিদ্ধার্থ। সুনীতিও টিনিকে আবছা মতনও একটা নির্দেশ দিতে পারল না। কেমন একটা খটকায় বেধে টিনি নিশ্চুপ হয়ে বসে কথা ভাবছিল বাপেদের কথা মায়েদের কথা ছেলেমেয়েদের কথা—যে রকম হওয়া উচিত আর যা না হলে যে রকম হয় সেই সব বাবা মা আর ছেলেমেয়ের পৃথিবীর চারদিকে ভাল ভাল কিছু কিছু সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও চোরাবালি আর বালুচরের শীত ছোট্ট জায়গাটুকুর কথা। মাসিমা ও তার জীবনও মাঝে মাঝে হারিয়ে গড়িয়ে সেই সব অন্ধকারের ভেতরে গিয়ে পড়ে—সিদ্ধার্থের পড়ে না অবিশ্যি—কি যে সিদ্ধার্থ যে আধারখণ্ড সত্যিই সূর্য তেমন একটা লোকায়তের কাছে—অস্পষ্ট আলোর ভেতর সব সময়ই চলেছে যেন সে। শুধু জানোয়ার টানোয়ার নয়—বাসমতীতে আজকাল খারাপ লোকজনও বেড়ে যাচ্ছে ঢের,' টিনি বললে, 'সাহেবডাঙার এদিকটায় আরো বেশি। এখনো দপ্তরিরা এল না—কোথায় আছে তাও ত বলতে পারছ না তোমরা।'

'ছেলেধরা এসেছে নাকি টিনি?' সরোজিনী বললেন।

'ছেলেধরা ত সাহেবডাঙায় বারোমাসই আছে।'

'আছে?'

'এই কার্তিক অঘ্রাণ মাসে বাড়ে। শুনেছি দু-চারটে নতুন দল এসেছে।'

'কৈ কোথাও ছেলে টেলে ধরে নিয়েছে শুনি নি ত—' সিদ্ধার্থ সাদাসিধে কথাবার্তার গলায় বললে 'কুড়ুনি বলছিল দপ্তরি কোথায় চড়িভাতি করতে গেছে। কোন দিকে গেছে বলতে পার সুনীতি?'

'আমি ওদের কোনো খবর টবর রাখি না।'

'এই ত সন্ধ্যা হল' সিদ্ধার্থ চুরুট মুখে দিয়ে সেটা নিভে গেছে টের পেয়ে বললে, 'এখুনি ওদের আসবার কথা নয়।'

'এতক্ষণে এলে পারত।' সরোজিনী বললেন।

'নিজের ছেলেপিলেদের জন্যে সিদ্ধার্থের কোনো দরদ নেই', টিনি বললেন, 'কার জন্যে-কীসের জন্যে আছে তাও বলা কঠিন।'

'নার্সের জন্যে আছে।' সুনীতি বললে।

'কে নার্স?' সরোজিনী বললেন 'কোন নার্সের কথা বলছ তুমি সুনীতি?'

'ঐ যে বড় হাসপাতালটার কথা বলা হচ্ছিল শীত রাতের-এই বাসমতী আর একটা ওয়ার্ড মাঝে মাঝে রুগীর বিছানার কাছে এসে ফ্লাস্কের থেকে গরম চা দিয়ে যাবে নার্স—'

'ও—' সরোজিনী বললেন; মন তার অন্য দিকে ছিল; বিশেষ খুঁচিয়ে সুনীতির কথার আসল তাৎপর্যটা ধরতে পারলেন না।

টিনিও অন্য নানারকম কথা ভাবছিল। সুনিতির ইঙ্গিতের সঙ্গে জিরানডাঙার বাস্তব ঘটনাটা মিলিয়ে জিনিসটার ওপর আলো ফেলি ফেলি করে ফেলতে ভুলে গেল সে।

কেবলি সেই নার্স আর ফ্লাস্কের একই প্রতীক ব্যবহার করছে যদিও সুনীতি—তবুও মনের ভেতর জিরানডাঙার কোয়ার্টার সম্বন্ধে ঝাঁঝ খানিকটা কমে এসেছে যেন সুনীতির-সিদ্ধার্থ টের পাচ্ছিল।

'দপ্তরিরা এইবারে ফিরে এলে পারত—' সরোজিন হাতপাখাটা সারা গায়ে গায়ে চালিয়ে বুলিয়ে মশা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কেমন যেন ক্লান্তি লাগছে।'

'একটু শীত পড়েছে।' সিদ্ধার্থ বললে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধার্থের এই শীতটাকে তাড়াবার জন্যে নার্স আর ফ্লাস্কের গরম চায়ের কথা এবার আর পাড়তে গেল না সুনীতি।

'আমার পাতলা চাদরে মানাচ্ছে না—বালাপোষটা আনলে পারতাম; তুমি ত ফয়েলের ব্লাউজ পরে বসে আছ টিনি, শীত করছে না তোমার?' সরোজিনী জিজ্ঞেস করলেন।

'এইবারে উঠবে নাকি মাসিমা।'

'ধানরাজের মার কতদূর হল?'

'এখনো রাঁধছে—না হলে ডাক দিত।'

'বসা যাক' সরোজিনী গায়ের চাদরটা ভাল করে এঁটে সেঁটে নিয়ে বললেন, 'দপ্তরিরা এসে নিক, ওরা না এলে ধীরে সুস্থে ঘরে বসে খেতে ঘুমোতে পারা যাবে না বাবু বুড়ো বয়সে-কোথায় গেল-কী হল-কী করল-মন যেন ধর্ম টর্ম ছেড়ে ধর্মক্ষেত্রে ঘুরে মরছে বাবা—'

'মুরগি ধান খেয়েছে, কোথায় আর যাবে সরোজিনী পিসিমা।' সিদ্ধার্থ চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে।

'কীসের কথা বলছ?'

'দপ্তরিদের;—আসবেই-বাড়া ভাতের সময় হলেই চলে আসবে। তোমাদের ও ঘরে পৌঁছিয়ে দিই। না টিনি একাই পারবে পিসিমাকে আগলাতে?'

সুনীতি টেবিলের ওপর এনে হ্যারিকেনটা মুছে পরিষ্কার করছিল, ছেঁড়া নোংরা তোয়ালে দিয়ে খুব ভাল করে ঝেড়ে পুছে চিমনিটাকে বেশ ঝকঝকে করে তুলল; চাঁদের আলো পড়েছে চিমনিটার ওপর।

'হ্যারিকেনটার ভেতরে খানিকটা তেল আছে।' সুনীতি বললে।

'আছে? কতক্ষণ জ্বলবে?'

'ঘণ্টা দেড়েক—' 'হ্যারিকেনের খোলটা ধরে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে কেরোসিনের শব্দে কান পেতে থেকে সুনীতি বললে।

'জ্বালো বাতিটা।' সিদ্ধার্থ বলল।

'এখুনি জ্বালাবার কোন দরকার নেই।'

'আমি ভাবছিলাম উনুন জ্বালাবার সময় হল হল বুঝি। পারবে অন্ধকারে?'

'না,' সুনীতি চিমনিটা ফ্রেমের ভেতর বসিয়ে ফেলতে ফেলতে বললে, 'আজ আর রাঁধব না কিছু, আমার খিদে নেই, ওরা কত রাতে ফেরে কে জানে—ফিরল ত না, তুমি টিনিদির ওখান থেকে দু'টো রুটি খেয়ে নাও। কাল লালকমলের বউ এলে কিছু পরোটা তরকারি রেঁধে দিলে খাবে ত তোমরা পিসিমা টিনিদি?'

'পরোটা তরকারি আমাকে খেতে দাও সুনীতিদি, বড্ড খিদে পেয়েছে—' সুকুমার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে বললে, 'বাঃ, তোমরা টিনিদি সকলে মিলে বেশ গুলতানি পাকিয়ে বসেছ দেখছি ঘরের ভেতরে। কী খেলে টেলে, পরোটা তরকারি? চা দিয়েছ টিয়েছ সুনীতিদি?'

'না দুধ নেই, 'সুনীতি বললে 'চিনি ফুরিয়ে গেছে।'

'গুড় আছে? কাঁচটা চা তৈরি করে দাও।'

'উনুন জ্বালানো হয়নি সুনীতি বললে, 'স্টোভ আছে সুকুমার, কিন্তু কেরোসিন নেই—'

'আমাদের একটা অনেক দিনের পুরনো স্পিরিট স্টোভ আছে,' টিনি বললে, 'কিন্তু স্পিরিট কোথায় পাবে সুকুমার-সাহেবডাঙায় ত না।'

'বাসমতীতেও পাবে না,' সরোজিনী হাতপাখাটা সরিয়ে রেখে বললেন, 'কেরোসিন স্পিরিট চিনি চাল দেশের হাড়মাংস চিবিয়ে গিলে খাচ্ছে ফুড কমিটি—'

'না' সুকুমার বললে, 'মরীমহলের ফুড কমিটি খুব ভাল, গগনবাবু সেক্রেটারি, সাহেবডাঙারটা নচ্ছার-এখানে আর লোক খুঁজে পেলে না তোমরা সিদ্ধার্থদা, রতিলালকে সেক্রেটারি রাখলে-সঙ্গে জুটেছে ক্ষেত্র বিশ্বাস আর নীরদ ঘোষ-তিনটাকে এক সিসু গাছের ডালে ঝুরিয়ে জিভ ক–হাত ক–হাত বেরিয়ে আসছে দেখে নিতে হয়। না বেরলে আমি টেনে বার করে পেটের সঙ্গে লাগিয়ে দেব জিভ।'

'সে কাজটা তুমি কেন করছ না সুকুমার। এখনি বেরিয়ে ক্ষেত্রটাকে কানে ধরে নিয়ে আসতে পার।' সরোজিনী কেমন যেন একটু জ্বলে উঠে অব্রাহ্মির মতন হয়ে পড়ে বললেন। এখন তার দু'চারজনকে নিয়ে একটু নিরিবিলিতে বসবার সময়—উপাসনা করবার জন্যে-ফুড কমিটি নিয়ে মাথা গরম করবার কথা নয়।

'তাকে তাকে আছি আমি সরোজিনীদি—রতি ক্ষেত্র নীরোদ তিনজনকেই সাহেবডাঙার জমিতে ফেলে একটু হাত পায়ের সুখ করে নেব,' সুকুমার সেগুন কাঠের বড়, শক্ত, টেবিলটার এক কিনারে উঠে বসে বললে, 'এ না হলে–বাসমতীতে বেঁচে থেকে সুখ নেই।'

'তুমি একাই তিনজনকে?' টিনি বললে।

'তিনটে বেড়াল সাহেবডাঙায় ঢুকে বনবেড়াল হয়েছে; বোনপো যে কাছেই আছে আর একটু নাবাল জমিতে না নামলে টের পাবে না। আসছে বেশ গোঁফ চুমড়ে ভাম ভাম বাঘের মত এগিয়ে আসছে-ওদের এই হয়ে এল আর কি।' সুকুমার সিদ্ধার্থ-সরোজিনীর দিকে তাকিয়ে বললে, সাহেবডাঙায় ছিলাম আমি কয়েকদিন; ফেউদের সঙ্গে লাঠালাঠি হয়ে এসে ছিল আমার প্রায়-মীরমহলে ভাল বাড়ি পেয়ে চলে গেলাম-সেখানে গগনদা মহারাজ অশোকের মত চালাচ্ছেন ব্যাপারটা-বাসমতীতে এক গগনবাবুর সুনাম সবাই বলছে—' টিনি কিছুটা খুশিতে উসকে উঠে বললে, 'সত্যি খুব ভাল কথা সুকুমার। শুনে খুব ভাল লাগছে আমার।'

'গগনবাবু ছেড়ে দিচ্ছেন নাকি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পাজিদের সঙ্গে কাজ করতে হয়-সেই জন্যেই মাঝে মাঝে দমে গিয়ে ছেড়ে দেবার কথা বলেন; ছাড়বেন না, তাহলে গগনবাবুর কাছার কাপড় ধরে টেনে রাখবে গেরস্তরা। উনি ত মীরমহলের বাবা হয়ে আছেন।'

'তুমি একটু ব্রাহ্মসমাজ ঘেষা সুকুমার; সেই জন্যেই হয়ত গগনবাবুকে একটু বেশি ভাল লাগছে তোমার।'

'তা বলতে পারেন সরোজিনীদি—'

'যা হোক, ক্ষেত্ররকে মারতে যেও না,' সরোজিনী ভাবুক গাইয়ে সুকুমারকে দেখতে চায় ষণ্ডাটাকে না-সেইভাবে চোখ ছেড়ে স্নিগ্ধ করে এনে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে এনে বললেন, 'রতিকেও না-নীরদকেও না না-ওরা মানুষ নয়; সাহেবডাঙা বাসমতীর ফুড কমিটির বাঙালির কাছে বাঙালির যা পরিচয় দিচ্ছে তাতে জাতি হিসেব আমাদের মরে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ওদের মেরে কী হবে, তাতে কোনো লাভ নেই—'

'সিদ্ধার্থ চেয়ারে বসে ছিল। সুকুমার চেয়ার থাকে নেমে তার সমস্ত লম্বা জোয়ান শরীরটা খাড়া করে ঘরের ভেতর-এ ঘরটা অনেকখানি লম্বা ও চওড়া, জিনিসপত্র বিশেষ কিছু না থাকতে বেশ ফাঁকা, খুব সুবিধা পায়চারি করবার পক্ষে, পুরুষদের খুব লোভ হয় হেঁটে বেড়াতে-হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'আচ্ছা তা দেখা যাবে সরোজিনীদি। তুমি সাহেবডাঙার ফুড কমিটির সেক্রেটারি হলে না কেন সিদ্ধার্থদা?'

'কোনো কাজে ঢুকতে ইচ্ছা করে না।' সিদ্ধার্থ বললে।

'হাসপাতাল নিয়ে ত আচ্ছ।'

'বেশি কাজে এক সঙ্গে হাত দিয়ে সুবিধা করতে পারি না; হাসপাতালে কি হয় না হয় সেইটেই দেখছি এখনো।'

'নাইট স্কুলও ত করছ।'

'মীরমহলে;—সেখানে যাইনি অনেকদিন, সিদ্ধার্থ বললে, 'বনচ্ছবিরা চালাচ্ছে।'

'ছবি এসেছিল কাল-বিশাখাও এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে সিদ্ধার্থ।'

সরোজিনী বললেন।

'কী দরকারে এসেছিল? বললে?'

'না। অনেক রাত অবদি ছিল।'

'অনেকদিন দেখা হয়নি বনচ্ছবিদের সঙ্গে,' দপ্তরিটা এখনো এল না অনুভব করে সিদ্ধার্থ বললে, উঠবে উঠবে ভাবছিল, উঠে পায়চারি করবে ঘরের ভেতর? সুকুমার করছে। 'বোধ হয় নাইট স্কুল সম্পর্কে কিছু বলবে আমার কাছে। ওটা টিকছে না-না কি হে সুকুমার-তোমাদের মীরমহলের স্কুলটা?'

'আমি খোঁজ নেই নি, শিগগির।'

'বনচ্ছবিদের সঙ্গে দেখা হয়?'

'না।'

'কাছেই ত থাকে।'

'যে যার ধান্দায় থাকে মানুষ আজকাল, কে কার সঙ্গে দেখা করবে?' সুকুমার একটু গম্ভীর হয়ে বললে. 'হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাত ডিঙিয়ে এসেছিল ত তবু বনচ্ছবিরা সিদ্ধার্থ সেনের সঙ্গে দেখা করতে।'

'একটা ফ্লাস্ক কেনা দরকার।' সুনীতির একটা পরিত্যক্ত খেই ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে চড়িয়ে সম্পূর্ণ একটা নতুন পদার্থে দাঁড় করিয়ে টিনি বললে। কেমন একটা বিসদৃশ হাসি এক ফোঁটা লেগে রয়েছে টিনির ঠোঁটের এক কিনারে। সুনীতি অন্যমনস্ক হয়ে ছিল, চাঁদ আছে বটে, কিন্তু আকাশ ভরা মেটে রঙের মেঘে চাপা পড়ে গেছে, চারদিকটা কেমন ঘোর ঘোর হয়ে গেছে তাই, হ্যারিকেনটা জ্বালাবে কিনা ভাবছিল।

সরোজিনী বুঝলেন না কিছু, বললেন, 'ফ্লাস্ক কেনার কথা বলছে কেন টিনি? আমাদের ত চব্বিশ ঘণ্টা গরম জল লাগে না।'

সুকুমার হাঁটতে হাঁটতে আরো অনেকখানি অজ্ঞের মত বললে—'ফ্লাস্ক কি হবে টিনিদি? হঠাৎ ফ্লাস্কের কথা বলল কোথাও চড়িভাতি করতে যাবার ইচ্ছা আছে নাকি। ঝড় জল নেই এখন আর, কার্তিক অঘ্রাণ মাস পড়ল-চড়িভাতি করে সুখ আছে এখন।'

শুনে হাসিটা পেকে উঠল টিনির ঠোঁটে।

সুনীতিও শুনছিল, কিন্তু জিরানডাঙার রমার ফ্লাস্কের সে প্রতীকটা কাটিয়ে উঠেছে এখন তার মন-সেটাকে এখন আর ব্যবহার করার দরকার নেই-প্রয়োজন হলে-পরে অন্য কোনো প্যাঁচ বা পরিভাষা কাজে লেগে যেতে পারে, কিন্তু এটা নয়, এটা দিয়ে সিদ্ধার্থের মনের আচ্ছন্নতা খুব সম্ভব একটুও টলিয়ে দিতে পারেনি সে।

পারেনি সেটা সে বুঝেছে সুনীতি-মনও যে সুনীতির অনেক দূরের চিন্তায়-দপ্তরিদেরও দূরের পটভূমি পেরিয়ে আরো অ-বাক নির্লক্ষ্যের ভেতরে দানা বেঁধে প্রায় শীত বরফ হয়ে এল—সুনীতির মুখের দিকে তাকিয়ে দু-একবার বুঝতে পারছিল সিদ্ধার্থ।

'না চড়িভাতি হবে না।' সিদ্ধার্থ বললে।

'ফ্লাস্ক দিয়ে কী করবে টিনিদি?'

'কি করবে-ছাই করবে, 'সরোজিনী বললেন, 'ভারি ফ্লাস্ক কেনবার শখ গজাল টিনির।'

'আমি বাসমতীর সদরে আর একটা নাইট স্কুল খোলার চেষ্টায় আছি সুকুমার-পুলিশ আইনের থেকে কিছুটা দূরে, মেডিকেল স্টোর আর জুতোর দোকানগুলোর পেছনে-খেলাৎবাবুদের কম্পাণ্ডে। খেলাৎবাবুরা কেউ নেই এখন আর বাসমতীতে, পাট উঠিয়ে কলকাতায় চলে গেছেন সব। তাদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করে তাদের বড় কাছারি বাড়িটা পেয়েছি-'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কি বলছ সেন, অতবড় কাছারি বাড়িটা ছেড়ে দিল?'

'সুকুমার একবার চোখ ঘুরিয়ে সিদ্ধার্থের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খেলাৎ ত খুব দিলখোলা মানুষ নয়।'

'এক সঙ্গে পড়েছিলাম আমরা। আমার এক আধটা কথা শোনে এখনো।'

'বাসমতীতে ফিরবে না ওরা?'

'না। কলকাতায় মস্ত বড় কারবার সরিয়ে নিয়েছে। জমিয়ে বসেছে।'

'এখানকার ঘরদোর বিক্রি করবে নাকি সব?'

'না, মাঝে মাঝে খেলাৎ নিজে আসবে; কতবড় জমিদারি পড়ে রয়েছে বাসমতীতে—ঝাউডাঙায়, জলজিরানিতে; সিদ্ধার্থ বললে, 'এ নাইট স্কুলটা ঢের বড় হবে; একেবারে সদরের মধ্যিখানে-তোমাকে রোজ পড়াতে হবে একঘণ্টা করে—'

'সুকুমার একটু আবছামনা ভাবে মাথা নেড়ে বললে, 'না সেন, দরকার হলে মীরমহলের নাইট স্কুলটা দেখব—'

'ওটা ত বনচ্ছবিরা দেখছে।'

'দেখছে।' সুকুমার হেসে বললে, 'কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না ত ওটার। যে যাক গে আমি পুলিশ লাইন পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে-বড্ড হাড়ভাঙা খাটুনি আমার কলেজে-তিনটে টুইশন আছে-দেখলে ত অবনী খাস্তগীরের রকমটা' সুকুমার হাঁটতে হাঁটতে হাই তুলে কুড়েমি ভাঙতে ভাঙতে বললে 'তুমি যদি সাহেবডাঙার ফুড কমিটির ভার নিতে পার তাহলে তোমার কথাটাও রাখব আমি-পড়াব গিয়ে তোমার সদর নাইট স্কুলে—'

সিদ্ধার্থ চুরুটটা তুলে দেশলাইটা পকেটে না পেয়ে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'জান ত তুমি সব, জেনে শুনে আর বলছ কেন, এক মীরমহল ছাড়া বাসমতীর আর কোনো ফুড কমিটির পঞ্চাশ হাত দূরেও গিয়ে কোনো ভদ্রলোক দাঁড়াতে পারে—'

সিদ্ধার্থ দেশলাইটা খুঁজে পেয়ে একটা কাঠি জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'আমাদের উঠোন থেকে ভোর রাতে ফাটার মোটর বাইকটা চুরি গেল-কি করে যায়? কে নেয়? কতগুলো ভদ্র শয়তান জুটেছে। স্বাধীনতা আসছে আমাদের দেশে; এলে একটা খুব বড় পরিবর্তন হবে সুনীতি তাই ভাবে, টিনিও, সরোজিনী পিসিমাও, তুমিও।'

সিদ্ধার্থ চুরুটটা জ্বালাতে গিয়ে সরিয়ে রেখে বলল, কিন্তু আমি জানি, বাড়াবাড়ি কিছু হবে না। এত পচে গেলে গ্যাংগ্রিনের সার্জনরা সহজে কিছু করতে পারবে না। তাছাড়া সার্জেনদের নিজেদেরই ত সব চেয়ে বেশি গ্যাংগ্রিন হল-এদের পেছনে দু'চারশ বছরের স্বাধীনতার কোনো স্পষ্ট সুস্থ ইতিহাস নেই।'

মোটর বাইকটা ভোর রাতে চুরি গেল বুঝি। পুলিশে খবর দিয়েছ তোমরা?' সিদ্ধার্থকে বললে সুকুমার।

'ফাটার সঙ্গে দেখা হয়নি। নিজে কিছু খোঁজতলব করেছে নিশ্চয়ই।'

'আমি কাল ঘুমের চোখে ভাল করে দেখতে পারছিলাম না ওকে, একবার দু'মিনিটের জন্যে জেগেছিলাম।'

'কে?'

'বড় কমলবাবুর ছেলে।'

'ও—' সুকুমার হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'ওঁর মেয়ে ত খুব কালীর সাধিকা হয়েছে শুনলাম—ওঁর আর এক ছেলে আমেরিকার রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী—সাধকও—তিনিও কালীর সাধক খুব সম্ভব। বড় কমলবাবু ত ব্রাহ্ম ছিলেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ একশ বার।' সরোজিনী যেন কোনো একটা শেষ আশ্রয়কে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে কালীর সাধক রামপ্রসাদের মতনই একান্তভাই—কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম এক প্রতীকে বিশ্বাস করে প্রসাদী গানের মত সুরে উছলে আছড়ে উঠে বললেন।

'ফটাবাবু নিজেও ব্রাহ্ম?'

'এখন পর্যন্ত আছে।' এবং থাকবে হয়ত বিশ্বাস করে টিনি আস্তে আস্তে বললে।

'এ কেমন না—ফাটা' সুকুমার বললে, কমলবাবু নাম দিয়েছিলেন?'

'খুব সম্ভব কমলবাবুর স্ত্রী স্বর্ণদি নাম রেখেছিলেন।' ছোট কমলবাবু, নাকি সরোজিনী নিজে, নাকি চক্রবর্তী মশাই, নাকি চক্রবর্তী গিন্নি-কে রেখেছিলেন নাম-কেনই বা রেখেছিল-অনেক আগের অন্ধকার কুয়াশার হিজিবিজির ভেতর থেকে স্মরণ করতে চেষ্টা করে সরোজিনী বললেন।

'ভাল নাম কি?'

'নীরেন মহালনবীশ?'

'কোথায় আছেন আজকাল?'

'ফাটা সমাজে—আশ্রমবাড়ির একচালা দালানটায় আছে;—থাকবে কয়েকদিন।'

'আমি যাব দেখা করতে। এই ক্যানেস্তারাটা কিসের?'

'কেরোসিন আছে এর ভেতর।'

'ভর্তি? কোথায় পেলে এই অমৃত?'

'ফাটা পাঠিয়েছে।'

'কেরোসিনের কারবার?'

'না। তবে কারবারি মানুষ,' সিদ্ধার্থ বললে, ভোরবেলা আমাদের এখানে ওর মোটর বাইকটা খোয়া গেল—পুরিয়ে দিতে সন্ধ্যাবেলা কেরোসিনের ক্যানেস্তারা পাঠিয়েছে।'

'তোমার চাই কেরোসিন সুকুমার—'কে যেন অন্ধকারের ভেতর থেকে বললে।

'বাসমতীতে কে না চায়, সুনীতি বললে, 'আমাদের তিন পরিবারের মধ্যে টিনটা ভাগ করে নেয়া যাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে আলো টালো জ্বালিয়ে একটু পড়া টড়া যাবে,' সুকুমার অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা নড়বড়ে বেতের চেয়ার টেনে এনে বললে, 'আলোর অভাবে পড়াশোনা ছেড়েই দিয়েছি, অন্ধকারের ভেতর পড়ে থাকতে থাকতে কেমন ঘুমের অভ্যাস হয়ে গেলে। কাল রাতে কি আমি খুব বেশি ঘুমিয়েছিলাম সরোজিনীদি?'

টিনি বলল, 'মাসিমার ত ভয় লেগে গিয়েছিল কাল—তোমার ঘুমের বহর দেখে। ভেরামন খেয়েছিলে কাল সুকুমার ক'টা? কি করে খুঁজে পেলে ফাইল?'

'তুমি ত চেয়ারে বসতে পারবে না সুকুমার, মচ মচ শব্দ হচ্ছে—ওটায় গগনবাবু একবার বসে নিকেশ করে দিয়েছেন'—সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি আমারটায় এস।'

'বোসো সিদ্ধার্থ, টিনি বললে, আমারটায় এস তুমি সুকুমার।'

'না টিনি আমি এখন একটু পায়চারি করব।'

সিদ্ধার্থ বললে—' আগেই উঠতাম—তবে লাইন ক্লিয়ার ছিল না, ক্লিয়ার করে দিয়েছে সুকুমার। ওকে একটা ভাল চেয়ার দিতে হয়—আমার এই জারুল কাঠেরটায় এসে বোস, ছারপোকা কম হবে।'

'খুব বেশি কম না সিদ্ধার্থ' টিনি বললে, 'চেয়ার টেয়ার ফেলে তোমার দিন-রাতের উদোম পায়চারি দেখে সেটা বুঝতে পারছি আমি অনেকক্ষণ থেকে।

কোথায় পেলে ভেরামন তুমি সুকুমার?'

'ভেরামন জার্মান ওষুধ,' জারুলের চেয়ারে বসে সুকুমার বললে,' ওটা পাওয়া যায় না আজকাল-কলকাতা বোম্বের চোরাবাজারে অবদি কোথাও না—'

মাসিমার তাকের আলমারির সব ওষুধ ত তুমি হাটকেছ ছ' মাস ধরে—'

'সেখানে ভেরামন আছে নাকি?' সিদ্ধার্থ বললে।

'আছে, তুমি জানতে না সিদ্ধার্থ? তোমার দরকার?' টিনি জিজ্ঞেস করল, 'মাথার না শরীরের ভেতর ব্যথা আছে কোথাও?'

'ব্যথা নেই আমার।'

'ঘুম হয় না।'

'ঘুম হচ্ছে।'

'তাহলে আর ভেরামন খেয়ে করবে কি?' সিদ্ধার্থের অসুবিধা হলে একটা ভাল জিনিস তাকে দেয়া যেত, কিন্তু এখন ফাইলটা একটু মাঠে মারা গিয়ে কাঁদছে অনুভব করে টিনি খানিকটা ক্লান্তি বোধ করে বললে, 'কোথাও ব্যথা টনটনে অথবা ঘুম টুম না হলে আমাকে জানিও তুমি। খাঁটি জার্মানের ভেরামন রয়েছে আমার কাছে।'

'কাল সারারাত তুমি যে কি ঘুম ঘুমটা ঘুমোলে সুকুমার' সরোজিনী হাত পাখাটা মাটির থেকে তুলে নিয়ে নিচে পায়ের দিকে বাতাস করতে করতে বললেন, 'আমরা ভেবেছিলাম দু'টো বড়ি ত তুমি খেয়েছ নিশ্চয়ই।'

'ফুড কমিটির কেরোসিনের অভাবে আমার ঘুমের রোগ হয়েছে। সুকুমার শার্টের পকেট থেকে নস্যির শিশি বের করে বললে, বড্ড গেড়ে বসেছে। গগনবাবু আজকাল সাত আট বোতল কেরোসিন দিয়েও রোগ সারাতে পারছেন না। সাহেবডাঙায় থাকতে তিন বোতল মেটে পাওয়া যেত মাসে; ক্ষেত্রর বলত ওটা কেরোসিনই, লাল কেরোসিন, ভাল জ্বলবে, বোতলে কিছু নুন ফেলে নেবেন সুকুমারবাবু, আমি তেলটা ক্ষেত্রমণির মুখের ওপর ফেলে দিয়ে আসতাম। সেই থেকে সারারাত অন্ধকারে শুয়ে থেকে থেকে কেমন একটা ঘাপটি মেরে পড়ে থাকার রোগ হয়েছে আমার; কখনো মড়ার মত ঘুমোই, কখনো বিছানায় শুয়ে শুয়ে নাইট শিফটে হাঁকড়াতে থাকি সারারাত; কিন্তু কিসের শিফট—কোন ফ্যাক্টরি বলে দিতে পার টিনিদি—'

সুনীতি কিছুক্ষণ পরে বললে—'অনেকে তা রাতের বেলা বাইরে বাইরে চরে বেড়ায় বাসমতীর মিউনিসিপ্যালিটির বাতি কিংবা সুবিধা বুঝে কোনো বাড়ির টেবল ল্যাম্পের আলোয়। তুমি বাড়ির বিছানায় পড়ে থাক এত বড় প্রফেসর মানুষ হয়ে?'

'আমার চেয়ে বড় প্রফেসর ত সিদ্ধার্থদা।'

'সিদ্ধার্থ রাত বেড়াতে জানে।' টিনি বললে।

'আমার ধাতে কুলোয় না' সুকুমার বললে,' আমারই মতন সেনেরই ধাত-তেতাল্লিশ বছর অবদি ঘরে বসে বসেই কাটাত, কিন্তু এই চুয়াল্লিশে পড়ে কেমন একটা আত্মজিজ্ঞাসা এসেছে সেনের মনে; পলিটিক্স নেই, সাহিত্য নেই, তাস পাশা আড্ডা ইয়ার্কি ঘোটপাকানো অন্য প্রফেসরদের মত, থিসিস লেখা আমাদের প্রফেসর তারিনীবাবু থাইসিসওয়ালার মত—কিংবা প্রিন্সিপ্যাল গভর্নিং বডি বা বাইরের নানা রকম লোকজনদের মত দশরকম নষ্টামি ত্যাঁদড়ামি—কিছু নেই ত জীবনে;—এই সব অনেক রকম কথা চিন্তা করে বেঁচে থাকার মানে সম্বন্ধে নানারকম নিরেট প্রশ্নে সেনের ভেতরটা ফুটো ফুটো হয়ে যাচ্ছে টের পাচ্ছি আমি—হাসপাতাল আর নাইট স্কুলে তাই'—সুকুমার কেমন যেন একটা আক্ষেপ বোধ করে হাসতে লাগল, কিংবা তত্ত্বভূষণ মশাইর উপনিষদের সংগ্রহগুলো—গুছিয়ে নিচ্ছে আজকাল সেন, দেখনি সুনীতিদি?—অথবা লুক্রেসিয়াস'—সিদ্ধার্থ চমকে উঠে বললে, লুক্রেসিয়াসের কথা কে তোমাকে বললে?'

সিদ্ধার্থকে এরকমভাবে উত্তেজিত হতে দেখেনি শিগগির টিনি; ফ্লাস্কের মত লুক্রেসিয়াসও যে কোনো জিনিস বা বই একেবারেই নয়, একটা প্রতীক—সেটা টিনি জানে না, সুনীতি জানে না, সুকুমার কি না জানে, এখনো বোঝা যাচ্ছে না কিছু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভেতরটা ফুটো ফুটো হয়ে যাচ্ছে সেনের,' সুকুমার বললে, কিন্তু সেই ফুটোগুলো কি মধুতে ভরে উঠবে মৌচাকের মতন একটা মস্ত বড় নির্মাণ শিল্পের পরিসমাপ্তির জন্যে অপেক্ষা করে—না থাইসিস হলে মানুষের কলজের ভেতর যে ছ্যাঁদা ছ্যাঁদা হয়ে যায়—'

'তুমি বড় বোকার মত কথা বলছ সুকুমার, 'সরোজিনী ঝেঁজে উঠে বললেন, 'আমি জানি তুমি কাল রাতে নিজেই মর্ফিয়া ইনজেকশন করে ঘুমোচ্ছিলে।

বড্ড বাজে—বোকার মতন কথা বলছ তুমি।'

মাসিমা বড্ড লটকে পড়লে তুমি দেখছি সুকুমারকে নিয়ে,' টিনি বললে।

'ও কি বলছে বলুক,' সুনীতি বললে, আপনি ওকে মাঝখানে পড়ে বাঁধা দিচ্ছেন কেন? উপাসনা ও গান খুব ভাল জিনিস, কিন্তু কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটাও আমাদের জানা দরকার। সুকুমার আভাস দিয়ে যাচ্ছে ভেতরের কথা পরে আস্তে আস্তে পাওয়া যাবে। তারপরে সবকিছু মিলিয়ে দেখতে পারলে ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে থাকবে।'

সুকুমারকে এত ভালবাসেন সরোজিনী হঠাৎ তার ওপর কেন যে ওরকম খেপে উঠেছিলেন বুঝে উঠতে না পেরে পাকা আতার মত ক্ষীরের মত মমতায় নরম হয়ে বললেন, 'আমার ব্লাডপ্রেসার খুব বেড়ে গেছে সুকুমার।'

'কত?'

'দু'শ—শোয়া দু'শ—তার ত এই প্রমাণ পেলে—তোমাকে এত ভালোবাসি, অথচ এই সব ছাই পাস বলে ফেললাম। রাগের মাথায় মেয়েমানুষের কথার কোনো অর্থ থাকে না। আমি জানি তুমি আমার ওপর রাগ করনি। এখানে কথা শেষ হল তুমি যাবে আমার ঘরে।'

'সোয়া দু'শ হল' সুকুমার একটু চিন্তিত হয়ে বললে।

'মাসিমাকে গান শোনাতে হবে আজ রাতে।' টিনি বললে।

'উদ্বোধনে বসবেন তারপরে গান, আরাধনা হবে তারপরে গান,' সুকুমার এতক্ষণে ঘনঘন বড় বড় কয়েক টিপ নস্যি নিয়ে বললে' সেটা ওর দু'শ শোয়া দু'শর দিক দিয়েও সুবিধা হবে না—আমারও টুইশনে বেরুতে হবে।'

'কখন যাবে?'

'আটটা সাড়ে আটটার সময়।'

'কটা বাজল সিদ্ধার্থ?'

'সোয়া সাতটা।'

'তাহলে উপাসনা পরে করব, টিনি আর আমি বসব, তুমি তার আগে এমনি একটা গান শুনিয়ে যাবে আমাদের।'

'আচ্ছা, দেখছি' সুকুমার বললে।

'তুমি তত্ত্বকথা বললে বেশ ভাল হয়' সরোজিনী বললেন, খুব আরামের চোখের জল চোখ পর্যন্ত না পৌঁছে সরোজিনীর গলায় ঠেকে গিয়েছে যেন, স্বরটা ভারী এবং নিবিড়,' তুমি লজিকের দিকে যেও না। কোনো কিছু ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখার চেষ্টা কোর না, সেটা বড্ড বেমানানো হয়—যা বলবার তোমার সামনেই বলছি আমি। কিন্তু তত্ত্বকথা যা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া-কোনো একটা বইয়ের থেকে পড়লে কিংবা নিজের মনের থেকে বললে ভারি স্পষ্টতায় উপলব্ধি করতে পারি তোমার শক্তি। গানের গলা তিনিই তোমাকে দিয়েছেন।'

সরোজিনী একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কিন্তু সিদ্ধার্থের কী হল না হল সেটা বোঝাবার চেষ্টা করে ভুল পথে যাচ্ছিলে তুমি। এটা সিদ্ধার্থ নিজে জানে, সুনীতি জানে তারপর। আমার অনুমান করতে পারি কিন্তু কি আশ্চর্য, তুমি কী বলছিলে না বলছিলে সেটা শোনবার জন্যে সুনীতি গালে হাত দিয়ে তোমার মুখের দিকে কি রকম বিভোর হয়ে তাকিয়েছে।'

সরোজিনী বললেন, 'সিদ্ধার্থের বিপদ।'

সুকুমার তাকিয়ে দেখল সুনীতির বাঁ কানটা তার নাগালের ভেতরে, অন্ধকারও জমছে বেশ, আকাশে খুব মেঘ করেছে বলে—সরোজিনী আবছার ভেতর থেকে কিছু দেখবেন না হয়ত—সিদ্ধার্থ আস্তে গলা বাড়িয়ে কানে কানে বললে, 'সুনীতিদি, এই রেটে যদি উনি কথা বলেন তাহলে ব্লাডপ্রেসার আড়াইশ হবে না?'

'হয়েছে বোধহয় এর মধ্যে।'

'কিন্তু কথাগুলোর মধ্যে বেশ টনক রয়েছে যা হোক।'

'তাই ত দেখছি।'

'কিন্তু কী করা যায় বল ত।'

'চট করে কিছু একটা করা যায় না, খানিকটা সুখী লোক, মানীও বটে।'

'কিন্তু এরকম কথা বলে যাবেন অনর্গল?'

'না এখুনি থামবেন, থেমে গেছেন ত।'

'দেখছেন নাকি আমি কানে কানে কথা বলছি তোমার?'

'তাকিয়ে আছেন মনে হচ্ছে—'

'তাহলে সরে পড়ি এবারে—'

'থামো, তোমাকে এক কাপ চা দেয়া হল না সুকুমার।'

'কিন্তু রাতে কানে কথা বলে কি চা খাওয়ানো যায় সুনীতিদি?'

'কাল রাতে সত্যি ঘুমিয়েছিলে তুমি? আমার মনে হল আড়ি পেতে শুনছিলে সকলের কথাবার্তা—'

'কাল রাতে আমি ঘুমিয়ে খুব সুখ পেয়েছিলাম। কারো কোনো কথা কানে যায়নি আমার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভেরামন খেয়েছিলে? সত্যিই?'

'না গো-এমনিই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সে-কি যে গভীর ঘুম'—

'তাই ত কারো ভেরামনের সাধ্যি আছে—অমন ঘুম পাড়াতে।'

'তাড়াতাড়ি কয়েক কাপ চা করে দাও না সুনীতিদি।'

'এক কাপ দিতে পারি—ওরা সব চলে গেলে।'

'এক কাপ শুধু? সেন কি দোষ করল?'

'সেন একটু সন্ন্যেসী গোছের মানুষ।'

ঢের মেঘ এসে পড়ে সমস্ত আকাশ ভরে আগেকার মেঘগুলোর সঙ্গে আরো অনেক কালি ছুঁড়ে দিয়েছে। সমস্ত আকাশটা যে কালো—শ্রাবণ রাতের এরকম অদ্ভুত অন্ধকার দেখা যায় না বড় একটা। চাঁদ আছে—ডুবে যেতে এখনো কিছু দেরি; কিন্তু মেঘকালিমার কোনো একটা দিক ছুঁড়ে অল্প একটু ঝিকিমিকি সৃষ্টি করবার কোনো উপায় নেই এখন তার—খুবই চাপা পড়ে গেছে বেচারী; তাকিয়ে দেখছিল সুকুমার। সুনীতি কানের দিকটা একটু বাড়িয়ে রেখেছিল—হয়ত আরো দু'একটা কথা শোনাবার জন্যে। কিন্তু মাথাটা সরিয়ে নিয়েছে সুকুমার। চাঁদটা কোথায় আছে অনুমান করতে গিয়ে অন্তহীন আড়ম্বর দেখছিল।

'সুকুমার,' সরোজিনী বললেন,' সুনীতির সঙ্গে শেষ হয়েছে তোমার কথা?' ও তাহলে এত আবছা টাবছার মধ্যেও মাইনাস ফাইভ চোখ নিয়ে যা সব দেখে নিয়েছেন সরোজিনী। 'একটু চা-টা হতে পারে কিনা কথা হচ্ছিল সুনীতিদির সঙ্গে।'

'চা এখন হবে না,' সরোজিনী বললেন, 'দুধ চিনি থাকলে আগে আগেই চা করে দিতে সুনীতি। উনুনও ত জ্বালানো হয়নি ওদের। কী বলেছিলে সুনীতিকে?'

'এই চায়ের কথাই।'

'খোলাখুলি বললেই ভাল হত'—সরোজিনী হাতপাখাটা মাটির ওপর রেখে বললেন, 'আমরা শুনলে সাহায্যই করতে পারতাম; সুনীতির কানের পোকা খসাবার কোনো মানে হয় না।'

'বড্ড অন্ধকার হয়েছে, 'টিনি বললে।

'ঝড় জল হবে—'

'উঃ একেবারে ভেঙে আসছে আকাশ—একবার শুরু হলে কাণ্ডই বাঁধাবে দেখছি।'

'না জল টল হবে না।' সিদ্ধার্থ আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে বললে 'তবে রাতটা খুব ঘুটঘুট্টি হয়ে থাকবে—সারারাত—যা দেখছি—সুনীতি,' সিদ্ধার্থ বললে, 'হ্যারিকেনটা জ্বলে ত সুনীতি।'

'এ মাসে দু' বেলাই তোমাকে সমাজে গান গাইতে হবে সুকুমার—কাল রাতে আমার ঘরে ব্রাহ্মবন্ধুসভায় এ মাসের প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলেছেন গগনবাবু।' সরোজিনী আস্তে আস্তে বললেন।

'কতগুলো গান আমি নিজে ঠিক করে নেব সরোজিনীদি—না আপনি বেছে দেবেন।'

'তুমি নিজেই পারবে সব। তোমার বাছনির ওপর কোনো কথা বলবার নেই আমার। টিনি সুকুমারকে একটু গুড় দিয়ে চা করে দিতে বলে না ধানরাজের মাকে। তুমি চা খাবে সিদ্ধার্থ?'

'না—আমার কেমন যেন গ্যাসট্রাইটিসের মতন হয়েছে। তোমাকে বাতি জ্বালাতে বলেছিলাম সুনীতি।' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে।

'গ্যাস হয়েছে পেটে,' সুকুমার বললে, 'চা খাব না কেমন যেন অম্বল ঠেলে উঠছে বুকে। এই বার আমার টুইশানিতে নেমে পড়তে হয়। টিনিদি বাইরে কেমন অন্ধকার দেখছ—অথচ রাত দশটা বারটা অবদি জ্যোৎস্নার জোয়ার ছোটাবার কথা ছিল। হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে ফেল সুনীতিদি—আমার কোনো টর্চফর্চ নেই—তোমাদের আলোটা নিয়েই চলে যেতে হবে আজ। তোমাদের আলোর দুঃখ নেই—এক ক্যানেস্তারা তেল পাঠিয়েছেন ত ফাটা মহলানবীশ। দরজা জানালা বন্ধ করে ঐ টিনটার দিকে তাকিয়েও সুখ। হ্যারিকেনটা জ্বাল জ্বাল সুনীতিদি। আমার জিরানডাঙায় যেতে হবে।'

'পড়াতে?'

'হ্যাঁ গো—'

'ওরে বাবা—সে ত তিন মাইলের পথ।'

'সেই জন্যেই ত আলো চাচ্ছি এই ঘুঘুট্টি রাতে।'

'আজকের টুইশনটা বাদ দাও সুকুমার। কিছু হবে না, আর একদিন পুষিয়ে নেবে', সরোজিনী বললেন, 'জিরানডাঙা কি এখানে, মাঝরাতেই তুমি ঝড় জলে পড়ে যাবে।'

'না, তা হবে না, খুব পা চালিয়ে যাব। ছেলে হলে তবুও হত, আমার নিজের বাড়িতে পড়াতাম, কিন্তু মেয়েদের পড়াতে হচ্ছে—কথা দিয়ে এসেছি মেয়েটিকে।'

সুনীতি বাতিটা জ্বালাচ্ছিল।

সরোজিনী একটু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'জিরানডাঙার মেয়ে, কে গা?'

সিদ্ধার্থ পায়চারী করতে করতে চোখ তুলে একবার সুকুমারের দিকে তাকাল। তার পর ঘাড় গুঁজে আত্মস্থতার ভেতর ডুবে গেল। 'নির্মলা দত্ত।' সুকুমার বললে।

'ও' সরোজিনী যেন মাকড়সার জালটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'তিনি ভেবেছিলেন অন্য আর একজন মেয়ের কথা জিরানডাঙার কসাইদের বস্তিটার কাছে—ক্যাথলিক মিশনটার কাছে—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি ভুল করছ সুকুমার' টিনি বললে, 'ওটা জিরানডাঙা নয়, পাশাবতী, জিরানডাঙার কান ঘেষে অবিশ্যি পাশাবতী; একেবারে কিনার দিয়ে যে জায়গাটা তাকে কেউ কেউ জিরানডাঙা বলে বটে, কিন্তু ওটা জিরানডাঙা নয়।'

হ্যারিকেনটা জ্বালিয়েছে সুনীতি।

'দপ্তরিরা কি এসেছে?'

'না আসেনি—এখনো।'

'এখনো না?' কি সর্বোনাশ। এই ঝড় যে ভেঙে পড়ল বলে। তোমারও পার বাবু সিদ্ধার্থ—এই হ্যারিকেনটা নিয়ে এক্ষুণি বেরিয়ে বড় ত' বলতে বলতে সরোজিনী জল ত আগুনের একটা আশ্চর্য শরীরপটের মত উঠে দাঁড়ালেন—কম আগুন, বেশি জল যেন, অথবা কম জল বেশি আগুন: সাদা কাপড়, মাথায় সাদা কালো অবিরাম চুল—পেছনের মেঘরাত্রি বিদ্যুতের চেয়ে আলাদা একটা জিনিস খুবই, মানুষের শরীরপাত্র থেকে উদ্ভূত; কিন্তু এই মুহূর্তে কেমন যেন একটা দৃষ্টিবিভ্রম জাগিয়ে তোলে—সবাই যেন ক্লান্ত, বন্ধ, করুণাত্মক-অন্ধকার সনাতদের সঙ্গে এক;—এই রকম একটা ভাব জেগে ওঠে মনে।

'কুড়ুনিরা এখনো ফেরেনি সুনীতিদি?'

'না, টিনি বললে, 'কি অদ্ভুত কাণ্ড দেখত।'

'অদ্ভুত বিশেষ কিছু নয়'—বাইরের দিকে তাকিয়ে সুকুমার বললে।

'সিদ্ধার্থ পায়চারি করছে আর চুরুট টানছে। এও করে মানুষ। কিন্তু সিদ্ধার্থের মত এত নিরিবিলি হতে পারে?' সুকুমারের দিকে তাকিয়ে টিনি বললে, 'এই রকম হয় নাকি?'

'সেন এখন বাবা হয়েছে,' সুকুমার কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, 'আমার নিজের বাবার কথা মনে পড়ে; দপ্তরিদের মত এইরকম করতাম আমরা; বাবা লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতেন। ভুশো কাকা বলে আমাদের এক কাকা ছিলেন—তিনিই কানে ধরে হিঁচড়ে নিয়ে যেতেন—যেখানেই থাকি না কেন। আমাদের জন্যে রোজ রাতে ডিটমার লণ্ঠন হাঁকড়ে তাকে ভুশণ্ডির মাঠে ছুটতে হত বলে লোকে তাকে ভুশো কাকা বলে ডাকত।'

'হতে পারে তোমরা ঘাপটি মেরে পড়ে থাকতে, হতে পারে তোমার ভুশো কাকা ছিলেন,' টিনি বললেন,'কিন্তু মোটের ওপর তুমি এটা যা বলছ সেটা গল্প হচ্ছে; সিদ্ধার্থ যা করছে সেটা ঠিক করছে না।'

'আর কিছু করবার নেই সিদ্ধার্থের।' সরোজিনীর পায়ে কোমরে খিল ধরে গিয়েছিল অনেকক্ষণ বসে বসে, একটা খুঁটির ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বললেন।

'পায়চারি করা আর নিরিবিলি চুরুট টানা ছাড়া?' টিনি আস্তে আস্তে বললে। 'এই রকমই হয়ে পড়ে সব—তারপর টের পাওয়া যায় একদিন।' সরোজিনী পাটা যেন একটু নাড়তে পারছেন মনে করে বললেন। কিন্তু হাঁটতে পারছেন না এখনো; খুঁটিটা আঁকড়ে আছেন।'

'তোমার ভুশোকাকা লণ্ঠন হাতে ছুটে যেতেন—তোমার মা কী করতেন সুমুকার?' টিনি বললে।

'আমার মা ত অনেক আগেই মরে গিয়েছিলেন, 'সুকুমার হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে টিনির দিকে সেটাকে একটু উঁচু করে ধরে টিনির মুখের ওপর খানিকটা আলো ফেলে বললে।

'ও—সেই জন্যেই বুঝি তোমরা ধানজমি কুমোরবাড়ি শেয়ালবাড়ি গিয়ে পড়ে থাকতে, মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই ঘরে চলে আসতে?'

'তা বলা যায় না কিছু—' সুকুমার পা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন।

'বলা যায় না, তা ত দেখছি।'

ও—সেনদের ব্যাপারে একটা কিছু দেখছে বুঝি টিনিদি-ভাবতে ভাবতে সুকুমার সরোজিনীর মুখের দিকে তাকাল।

'তোমার মা চলে গেলেন,' হাঁটু কোমরের থেকে হাত সরিয়ে শরীরটা সোজা করে নিয়ে সরোজিনী বললেন, 'তোমরা দূরে দূরে অন্ধকারের জমিজিরেতে গিয়ে পড়ে থাকতে বুঝি তাই। কিন্তু দপ্তরিরাও সে-রকম করছে। নাও—এবার হ্যারিকেনটা নিয়ে এগোও সুকুমার, আমাদেরও পৌঁছিয়ে দাও।'

সরোজিনী বললেন।

'ঝড় হবে আজ?'

'হতে পারে।'

'এক্ষুণি চেপে বৃষ্টি আসবে যেন মনে হচ্ছে।'

'বাবা রে এমন ঘুটঘুট্টি রাতে কোথায় রইল দপ্তরিরা।' সরোজিনী বললেন।

'চলুন—আপনার পায়ে খিল ধরেছিল দেখছিলাম, খিল না ঝিঁঝি?—'

এইবারে হাঁটতে পারছেন ত বেশ?'

হ্যারিকেনটা নিয়ে চলে গেল ওরা।

সুনীতি দরজার কাছে ডেক-চেয়ারটায় এসে বসল। অন্ধকারের ভেতর পায়চারি করতে গিয়ে হুঁচোট খাচ্ছিল সিদ্ধার্থ; টেবিলের কাছে জারুল কাঠের চেয়ারটায় বসল; হাতের এবড়োখেবড়ো চুরুটটা টেবিলের ওপর রেখে দিল।

'টিনির কথার কোনো উত্তর দিলাম না আমি।' সুনীতি বললে।

'টিনি কী বলেছে?'

'শুনেছ সব। নতুন করে বলার কিছু কথাগুলো নয়।'

'টিনির যা মনে আসে সেই কথাই সে বলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সুনীতি বললে, 'ঠিক অত সহজে হলে, ভাল লাগত আমার টিনিকে। খুব খারাপ লাগে সে কথা বলা ঠিক হবে না। কিন্তু টিনির নিজের কথা বলে কী লাভ—যে কথাটা বলেছে সে তা টিনি নয়, সেটা একটা কথা।'

খুব সম্ভব দপ্তরিদের কথা, সুকুমার যে হ্যারিকেন নিয়ে চলে গেছে সেই কথা, ভাবছিল সিদ্ধার্থ, কেন সুনীতির কথা শুনছিল সে—যদিও মনের নিবিষ্ট খণ্ডগুলো কাছে-দূরে অনেক দূর দিকে ঘুরছিল তার।

'কথার পেছনে কোনো সত্য রয়েছে কিনা ভেবে দেখতে হবে।' সিদ্ধার্থ বললে।

'বারো বছর পরে?'

'এক একটা সত্যের কিনারা করতে অনেকদিন সময় লেগে যায়।'

'হয়ত তোমার কাছে—কিন্তু টিনির কাছে ত নয়, আমার কাছেও নয়।'

'নয়?' সিদ্ধার্থ টেবিলের থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে, 'কী সত্য পেলে?—সরোজিনী পিসিমা আর টিনি আমাদের এই বারো বছর সম্পর্কে যা পেয়েছে—সেই রকম একটা কিছু?'

চুরুটটা জ্বালাল সিদ্ধার্থ। উঠে দাঁড়াবে ভাবল; উঠে পায়চারি করবে; কিন্তু ঘরে খুব বেশি অন্ধকার জমেছে, মেঘের চারদিককার গাছপালার ছায়ার, চেয়ার টেবিল খাট তেপয়গুলো কেমন বিশৃঙ্খল হয়ে ছড়িয়ে আছে সব—কোথায় কৌটো আছে ঠিক ঠাওর করা যাচ্ছে না।

'ওদের কথা শুনছিলাম আমি,' সিদ্ধার্থ বললে, 'সুকুমার যে ভুশো কাকার গল্পটা ফেঁদে বসল—গল্প না হিতোপদেশ? সেটাও শুনেছি। আমার মনে হয় আমাদের সম্পর্কে ওরা যে যার নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। সেগুলোর ভেতরে সরোজিনী পিসিমারটা বেশি ঠিক না টিনিরটা না সুকুমারেটা বলতে পারছি না একটা কিছু সবের ভেতরে থাকবে হয়ত;—বরো বছর কেটে গেছে আরো কয়েকটা বছর কাটবে হয়ত।'

'আরো কয়েকটা বছর?'

'বেঁচে থাকব আশা করছি ত।'

'আমিও বেঁচে থাকতে পারি, নাও পারি—কিন্তু তুমি জান সরোজিনীদির মতন আমিও একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি—সেটা যা আছে তাই ত আছে, তাই ত থাকবে। বেশি বা কম বেঁচে থাকার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই।'

'পিসিমাকে সরোজিনী বললে?'

'ওভাবে ডাকলেই সুবিধা পাই। সরোজিনী মানী লোক শুনলে কষ্ট পেতেন। কিন্তু তিনি ত নেই এখানে। ও ঘরে গিয়ে খেতে বসেছেন ওঁরা।'

'এখনো খেতে আরম্ভ করেছেন বলে মনে হয় না; দপ্তরিরা ফিরে না এলে বসবেন না—' সিদ্ধার্থ চুরুটটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললে, 'পিসিমাকে খুব একটা আশ্চর্য কিছু সাধিকা বলে মনে করি না আমি, কিন্তু তিনি অসাধু নন। আমাদের রান্না নেই আজ, মোটামুটি একটা কিছু ব্যবস্থা না করে নিজেদের পাট সারবেন যে মনে হয় না আমার। তাছাড়া দপ্তরিদের জন্যে উদ্বেগ আছে।'

'তা থাক, ধানরাজের মা আর দু'খানা বেগুন ভাজা দাও,' শুনছি ত আমি; পাতে দাও না কোথাও দাও সেটা অবিশ্যি বলতে পারছি না।' সুনীতি হাতের কাছের দূরের দিকের দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিয়ে বললে, 'ভাল-মন্দয় মিলিয়ে আছেন এই রকম মানুষ; সেই ছাঁদেই টিনিও। ওরা আমাদের কাছে থাকে বলে খুব বেশি রাতে—শীতে—ভালই লাগে আমার; এর চেয়ে ভাল কিছু খুব সম্ভব ঘর সংসার সকলের ভাগ্যেই জোটবার নয়। এসব কথা ত হল—আমি সরোজিনীর সেই মীমাংসাটার কথা বলছিলাম, সেটা বদলাবে না, আমারটাও না; তুমি বলছ ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে চলছে বলে তোমার মীমাংসার ঠিক রূপ তুমি এখনো দেখতে পাচ্ছ না—পরে দেখতে পারবে—হয়ত অনেক পরে; আমার মনে হয় এগুলো জ্ঞানের কথা নয় সুবিধাবাদের কথা; নানারকম সুবিধা রয়েছে—সেগুলোকে খুঁজে বার করে এখন কাজে লাগাবার আপ্রাণ চেষ্টা চুয়াল্লিশ বছরে। সুকুমার সাবধান-টাবধান করে দিতে পারে; সরোজিনী থামিয়ে দেন; সুকুমার কানে কানে কথা বলছিল আমার। বেশ ভাল লাগছিল। লুক্রেসিয়াস কে?'

'লুক্রেসিয়াস অনার্সের পাঠ্য?'

'না।'

'তোমার অনার্স ক্লাসের ছাত্রীর কথা এল কি করে তাহলে?'

সিদ্ধার্থ চুপ করে রইল।

'কোন ছাত্রী?'

'সুকুমারের এসব ইয়ার্কির কোনো মানে নেই।'

'সুকুমার কবির কথাটা পাড়ল কেন?'

'সেটা সুকুমার বলতে পারে।'

সুনীতি বললে, 'এত কবি থাকতে লুক্রেসিয়াস কিন্তু বেশ বেছেই বের করেছে সুকুমার; বেশ রামনামের মত কাজ করল দেখলাম।'

সিদ্ধার্থ বললে, 'হ্যারিকেন নিয়ে যাওয়া আমারই উচিত ছিল, সুকুমার খুঁজে পাবে না হয়ত। এখনো আসছে না—কত দিব্যি অন্ধকার হয়ে আছে—এই রকম অন্ধকারেই ভাল লাগে আমার। পিসিমা ভেবেছিলেন ঝড় বৃষ্টি এখুনি লটকাবে, আকাশ দেখে সেই রকমই মনে হয়; কিন্তু কিছু বলতে পারা যাচ্ছে না; সাইক্লোন হতে পারে একটা—দেড়টা বেজে যেতে পারে—' সিদ্ধার্থ টেবিলের থেকে চুরুটটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের চেয়ার টেবিলগুলো এক কোনায় সরিয়ে জড়ো করে রেখে সব রান্নাঘরে গিয়ে খুঁজে হাতড়ে দা-টা নিয়ে এসে কেরোসিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিনের মুখটা খুলে ফেলে—দেরাজ থেকে মোম বার করে জ্বালিয়ে টেবিলের ওপর শক্ত করে বসিয়ে রাখল সেটা নরম মোমদানির ওপর; বাইরে মেঘ অন্ধকার; কালো কালো হিমালয়; বাতাস নেই। বেশ জ্বলছিল মোমটা।

'দপ্তরিদের কিছু হয়নি—' ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে সিদ্ধার্থ বললে।

'আমার মনে হয় তুমি জান ওরা কোথায় আছে।'

সুনীতি গালে হাত রেখে দরজার ভেতর দিয়ে শেষ সিসু ঝাউগাছ পেরিয়ে নীলমাধব গোয়ালাদের আটচালার ওপারে—ধান জমির শেষ কিনারের দিকে তাকিয়ে ছিল—কোনো একটা হ্যারিকেন অন্ধকারের ভেতর হঠাৎ আগুনের মার্বেলের মতন ফুটে উঠবে বলে নয়—এমনিই—কিছু সাধা হল না, বলা হল না, করা করা না, ভাল হল না—এমন একটা বিমূঢ় অন্ধকার বুকে নিয়ে,—বাইরের অন্ধকারটার চেয়ে বড়।

'জান ওরা কোথায় আছে?'

'ক'টা বেজেছে এখন?'

'আটটা—সাড়ে আটটা?'

'ঘড়ি দেখে বলছ?'

'সিদ্ধার্থ টেবিলের এক কিনারে বই খাতার নিচের দিকে ঘড়িটাকে বার করে সরিয়ে রেখে বললে, 'আটটা কুড়ি।'

সুনীতি তার চোখের আংটির মত বৃত্ত যেখানে ভূমার পরিধির ভেতর মিশে গেছে সেই গাছগাছালি ও অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি ওদের ঠিক মা হতে পারিনি। তাহলে সুকুমার যেই ঘরে ঢুকেছিল তখুনি তাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। কন্তু সুকুমার যখন হ্যারিকেন নিয়ে বেরিয়ে গেল তখনো কত তেল খরচ হবে ভাবছিলাম।'

'আমাদের চেতনা পাঁচ সাত রকম ভাবে—আমাদের অবচেতনাও; সব মিলে কে কী ভাবে বলা কঠিন।' সিদ্ধার্থ পায়চারি করতে করতে বললে, 'আমার বাবা হ্যারিকেন নিয়ে শীতে বেঘোরে বেরিয়ে পড়তেন মনে আছে আমার, পারলে মা ছাড়িয়ে যেতেন বাবাকে, কিন্তু আমি চুরুট টানছি, হাঁটছি, তুমি বসে আছ। কিন্তু তারা যে বোধ করতেন, আর আমরা যা বোধ করি, তার ভেতর খুব বেশি উনিশ বিশ আছে বলে মনে হয় না আমার।'

'আছে। একটা সমুদ্রেরই ব্যবধান আছে।'

'তুমি মনে কর তাই?'

'সেটা সত্য।'

সিদ্ধার্থ পায়চারি করতে করতে পৃথিবীর ওপর নিজের পায়ের শব্দ শুনতে লাগল। যা জানবার জানাবার ছিল সুনীতির—আপাতত ফুরিয়ে গেছে যেন সব; কোনো কথা বলছিল না সে।

'সুকুমার আসছে না ত।'

'খট করে ওটা কী শব্দ হল?'

'ওটা?' সিদ্ধার্থ নেমে দাঁড়িয়ে বললে, 'ইঁদুরের খচমচ, কাঁচা আলু খেতে এসেছে। ঘরে খাবার জিনিস আর কিছু নেই।'

'একটা দু'টো আলু আছে, কাঁচা পেঁয়াজ ছিল চারটে, আর কিছু নেই; পেঁয়াজ অবিশ্যি ওরা খাবে না। সুকুমার ঘুরপথে গিয়ে ভুল করেছে। কুড়ুনিরা ত এই পথ দিয়ে আসে।' সুনীতি অন্ধকারে কেমন যেন রোগা ডাইনীর মত হাত বাড়িয়ে আমলকি বিলিতি গাব সিসুগাছের আশপাশের পথটা দেখিয়ে দিল—আঙুলগুলো খাঁটি ভূতের মতন। তবে আরো চিমসে হাড়গোড়ের যেন;—দেখছিল সিদ্ধার্থ।

'সুকুমার গেছে ঐ ঝাড় সজনের পথটা দিয়ে। ও বড় ধান জমিটার দিকে গিয়েছে—'

'তুমি কখন দেখলে? আমি ত দেখিনি—'

'সরোজিনী পিসিমাদের ও ঘরে পৌছিয়ে দিয়ে কোন দিক দিয়ে যায় দেখছিলাম। সট্ করে চলে গেল।'

সিদ্ধার্থ বললে, 'ছ-সাত মাস ধরে এগারটা বারটার আগে বাড়ি ফিরতে পারি না। দপ্তরিরা এমনি ক'টার সময় ফেরে রোজ?'

'এই এই—সময়ই ফেরে—সাড়ে আট, পৌনে নয়। ক'টা বেজেছে?'

সিদ্ধার্থ টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আটটা পঁয়ত্রিশ।'

ঘড়ি দেখে মাথা তোলবার আগে দপ করে নিভে গেল মোমটা।

'কি হল।'

'বাতাস ছেড়েছে। 'সিদ্ধার্থ বললে।

এক মিনিটের ভেতরই ঝড়ে অন্ধকারে ডুবে গেল সব। সমস্ত দিক দেশ যেন ডেবে যাচ্ছে, এমন ঝড় এত কালি এত জল–এত গর্জন।

সরোজিনীর অন্ধ হ্যারিকেনটা নিয়ে এল সিদ্ধার্থ, তেল ভরে জ্বালিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ছিল।

সুনীতি বললে, 'এখুনি নয়, কখন হবে তাও বলা যায় না।'

'সময়–সব সময়ই সময়।'

'বাইরে যেতে পারবে–সুকুমারকে খুঁজে আনতে পারবে?'

'সুকুমারকে শুধু?'

'তার পরে হিসেব পাওয়া যাবে তার কাছ থেকে।'

'এটা একটা কথা হল না। 'সিদ্ধার্থ ঝড় জলের ঝাপটার থেকে হ্যারিকেনটাকে বাঁচাতে বাঁচাতে বললে।

'এর চেয়ে ভাল কথা সৃষ্টি কর তুমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু ওদের জন্ম দেওয়ার সময় তোমারও একটা নিমিত্ত ছিল।'

'কিন্তু তোমাকে জন্ম দেওয়ার সময় পৃথিবীরই একটা বড় ইঙ্গিত ছিল তাতে;

'ওদের বেলা তা হয়নি–'

সিদ্ধার্থ হ্যারিকেনটাকে উঁচু করে ধরে সুনীতির মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখল সুনীতি সরে দাঁড়িয়েছে অন্ধকারের ভেতর আর এক দিকে।

'সেই জন্যেই আলো নিয়ে ছুটে যেতেন তোমার বাবা–তোমার মাও,' বলতে বলতে সুনীতি ঘরের কোনো একটা বিশেষ জায়গায় দাঁড়াবে স্থির করে পথ বেছে দেখেছিল–কিন্তু কোথায় বা দাঁড়াবে সে, সে জায়গা নেই; কিন্তু আমাদের হালে সে আলো জ্বলছে না।' সুনীতি সরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে।

সিদ্ধার্থ হাতের হ্যারিকেনটা মাটির ওপর নামিয়ে দেরাজের থেকে খানিকটা শক্ত সুতো বের করে চিমনির চারদিকের পুরু সাদা কাগজ জড়িয়ে সুতো বেঁধে আঁট করে নিল।

'তাই যদি বল তাহলে আর একটা কথা বলব।' সিদ্ধার্থ বললে।

সুনীতি সিদ্ধার্থের থেকে খানিকটা দূরে একটা জানালার দিকে এগিয়ে আসছিল–বাইরে পৃথিবীর দিকে মুখ ঝুঁকে রইল তার খানিকক্ষণ।

'আমাদের মতন লোকের সংখ্যা আজকের পৃথিবীতে খুব কম নয়।' সিদ্ধার্থ বললে।

'এটা কি আজকের পৃথিবীরই ব্যাধি শুধু?'

'না। সব সময় ছিল। তবে আজকে একটু বেশি বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। কিংবা নিজেদের রোগ আগের কালের লোকদের চেয়ে ভাল করে বুঝতে পারছি আমরা।'

'বুঝে যদি কোনো ওষুধের ব্যবস্থা করতে না পারি তাহলে শূন্যতা ত আরো বেড়ে যায়। কিন্তু কোনো ওষুধ নাই। আমাদের বেলা অন্তত নেই।'

'নেই?'

'নেই।'

'তুমি খুব তাড়াতাড়ি খুব সাংঘাতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পার,' সিদ্ধার্থ হ্যারিকেনটা হাতে তুলে নিয়ে আলোর ঠিকরানির মত নিঃশব্দে হেসে ফেলে বললে, 'আমার ধারণা অন্যরকম, কিন্তু আমার ধারণায় ত তোমার বিশ্বাস নেই।'

সিদ্ধার্থ রান্নাঘর থেকে একটা কুপি এনে তেল ভরে সেটাকে জ্বালিয়ে হ্যারিকেন হাতে কবেকার সেই নিজের বাবার মত অন্ধকারের ভেতর বেরিয়ে পড়ল, অনেক দিন পরে বাবাকে–সত্যসরণ সেনকে খুব নিবিড়ভাবে মনে পড়ছিল তার-সিসুগাছ, আমলকি গাছ, মহানিম গাছের বাতাস সাইক্লোন বৃষ্টির সমুদ্র পেরিয়ে। কিন্তু উত্তরাধিকারে সে পিতৃত্ব পায়নি সে, কিন্তু নানারকম পিতৃত্ব মাতৃত্ব প্রেম ও অপ্রেম বিশ্লেষণ করে বেশ খানিকটা জ্ঞানসিদ্ধি ও প্রশান্তি পেয়েছি কিছু। মড় মড় করে একটা মস্ত বড় অর্জুনগাছ ভেঙে দুরন্ত শব্দে আছড়ে পড়ল ঘাস মাঠ পেরিয়ে অনেকখানি সুরকির রাস্তাটা জুড়ে; আর একটু হলেই চাপা পড়ে গিয়েছিল প্রায় সিদ্ধার্থ। হাতের বাতিটার বিশেষ কোনো অর্থ হয় না–এ আলো থাকলেও বা না থাকলেও তাই; চারদিকে অবিনাশ অন্ধকার–লোকজন একটা পাখি বা শেয়াল পর্যন্ত কোথাও কেউ নেই; মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আগুনের গন্ধটা সে খুব সম্ভব মনের ভুলে অনুভব করছে–কিন্তু থেকে থেকে কড়কড়ে রোদের মত আলোয় ভরে উঠছে চারদিক। সোঁ সোঁ সোঁ ঝড়ের শব্দ–কতগুলো সমুদ্র যেন ছুটে আসছে চারদিক থেকে; মাঝে মাঝে জলের সমুদ্রের তলেই যেন সে তলিয়ে যাচ্ছে–বৃষ্টির জলে।

ঐ কৃষ্ণচূড়ার গাছটা উড়ে গেল। কাদের বাড়ির ছনের চালগুলো দিগদিগন্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। মোচড় দিয়ে ছাউনির টিন খসিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিজেরও মাটি আকাশের ভেতর থেকে মুছে যাবার কথা তার, হ্যারিকেনটা ভেঙে আছড়ে অন্ধকার হয়ে যাবার কথা। এখনো টিকে আছে–কিন্তু এখুনি ফুরিয়ে যাবে সব। সামনের নিমগাছটা মনে হল বিদ্যুতে পুড়ে গেল; হয়ত তার মনের ভুল, কিন্তু শত কামানের শব্দ শুনেছে, একটা উৎকট সাদা জ্যোতি–জ্যোতির্ময় আগুন দেখেছে; সরোজিনী পিসিমার ঈশ্বরকে এই রকম আগুন আলোই বোধহয় ঘিরে থাকে–কিন্তু মানুষের প্রয়োজন স্নিগ্ধ হয়ে উদয় হয়–মানুষের ব্রহ্মোপসনার সময়। সে রকম উপাসনায় তেমন কিছু বিশ্বাস করে না সে; সে আশ্বাসের শান্তি হিসেবে নিমগাছটাকে না জ্বালিয়ে সিদ্ধার্থকেই পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়া উচিত ছিল নাদ ও অগ্নির চোখরুচিকর নিদারুণ যুগল শক্তির। সৎ প্রকৃতিকে দেখেছে সে অন্য প্রকৃতিকেও দেখেছে জীবনে অনেকবার। এবারে যে প্রকৃতিকে দেখতে পেল তার আদি আলো আর আগুনের ভেতরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি তাকিয়ে আছে সিদ্ধার্থের দিকে–

সিদ্ধার্থের পায়ে পিছলে মস্ত বড় একটা সাপ লাফ দিয়ে চলে গেল; পেছনে তার আর একটা সাপ; তেড়ে এল না তারা; চলে যাচ্ছে জল বাতাসের স্বরূপ ও গতির ভেতর মিশে গিয়ে–কী ভীষণ দ্রার্ঢ্যে দ্রুতবেগে চারদিককার সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে একপ্রাণ হয়ে।

হ্যারিকেন হাতে করে ঘর থেকে বেরুবার পর–আজ এই দু'টো প্রাণীকেই দেখল সিদ্ধার্থ; মানুষ প্রাণ বলতে যা বোঝে তারই চিহ্ন নিয়ে এমন দুরন্ত প্রাণগামী অন্ধকারে কেউই আর দেখা দেবে না–শেষ পর্যন্ত।

সাপটা কামড়ায় নি খুব সম্ভব সিদ্ধার্থকে; পিছল শরীরের একটা হুঁচোটে অবিশ্যি লেগেছে তার পায়ে; কিন্তু কামড়ালে একটা আগুনের মতন কিছু জ্বলে উঠত না শরীরের ভেতর? সে রকম কিছু হয়েছে বলে বোধ করছিল না সে।

আজ রাতে দপ্তরিদের কোথাও পাওয়া যাবে না কোথাও।

সুকুমার ফিরে আসতে পারে।

বাড়ির দিকে নিজে ফিরে গেলেও পারে সিদ্ধার্থ। কোনো একদিকে এগিয়ে চলল, কিন্তু সেটা বাড়ির দিক নয়, কোনো দিকও নয়; কিন্তু এরকম রাতে দিক নিরিখ বলে কোনো কিছু নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই বলে জীবনে অরুচি এসেছে তার–সেটা বলা ঠিক হবে না।

'কোন দিষ্টে স্যালা করলেন বাবু–এমন বইন্যা বাগুলার রাইতে!–হারে ডাকাইত!' অন্ধকারের ভেতরে কে যেন ডাক পেড়ে বলে উঠল।

সিদ্ধার্থ পড়ে যাচ্ছিল।

'তুমি কোন দিকে চললে মহেশ?'

কিন্তু উত্তর দেবার জন্যে দাঁড়াল না সে। দু'জনেই দু'দিকে চলে গেল। লণ্ঠনটা নিভে গেছে সিদ্ধার্থের। কতক্ষণ হল নিভে গেছে খেয়াল ছিল না তার; ভেঙে চুরে গেছে কিনা বলতে পারছে না সে।

চোখে দেখা কথা ভাবা ধারণা করার পৃথিবীটা আস্তে আস্তে যেন সরে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল–যদিও জলের ঝাপটানি আশ্চর্য রকমের সুন্দর–রাতের অন্ধকারে আরো বেশি,–চারদিকে বিদ্যুতের আলো দিনের মতন উজ্জ্বল–কোথাও একটু শুয়ে পড়লে ভাল হত।

'চল সিদ্ধার্থ–' তবুও কে যেন বললে। অতএব উঠে চলতে চলতে সরোজিনী পিসিমার হ্যারিকনটাকেও সঙ্গে নিতে হয়, আজ হোক কাল হোক মৃত্যু পরপারে হোক বুঝে দিতে হবে পিসিমাকে এই বাতিটা;–দপ্তরি কুড়ুনিদের ফিরিয়ে দিতে হবে সুনীতির কাছে; কিন্তু তার চেয়ে বেশি করে সিদ্ধার্থের কেমন যেন আজকের রাতের জড়ভরতের মতন এক আত্মার কাছে মৃতশিশুকে দেখালে হয়; কিন্তু কোনো দাবি জানাচ্ছে না সেই আত্মা, কোনো হিসেব চাইছে না। কালকের দিনের আলোয় কাজ কর্মের ভেতরে–জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে আত্মার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

সুকুমার কে খুঁজে দেখতে হবে।

এতগুলোর দায়িত্ব ওকমনীয়তার কাজের পটভূমিকায় আজকের রাত এরকম ভীষণ সাইক্লোনে এত বেশি অন্ধকার না হয়ে পড়লে ভাল হত।

অথবা এ অন্ধকার ও নিরবচ্ছিন্ন সর্বনাস ছাড়া রামপ্রসাদও একদিন ভাল করে গান করতে পারেনি–সাধক রামপ্রসাদের চেয়ে ঢের বিভিন্ন ও দূর যে সিদ্ধার্থের আত্মা তাও নিজেকে ঠিকভাবে চিনতে পারবে না।

'পরশু আমি সরোজিনীদির বাড়ি গিয়েছিলাম,' পাইপটা দাঁতের কামড়ে ধরে ফাটা বললে, কাল সারাদিন কাজকর্মে বড্ড ব্যস্ত ছিলাম, বিকেলে এসে শুয়ে পড়লাম–আটটা সাড়ে আটটার সময় ঘুম ভাঙ্গল; একটু যাব ভাবছিলাম কোথাও; কিন্তু কাল ত বড় সাইক্লোন হয়ে গেল বাসমতীতে।

আমাদের এই সমাজবাড়ির পুরনো দালানটা হয়ে যাবে ভাবছিলাম, ইট, পাথর, লোহার চাপে চাপা পড়ে যে কোনো মুহূর্তে থেঁতলে যেতে পারে শরীরটা–কিন্তু বেশ পাকা ঘুমের ভেতরই থেঁতলালে ভাল ভাবতে ভাবতে মড়ার মতন ঘুমিয়ে পড়লাম। সারা রাত বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়েছি। কাল কী হয়েছিল বনচ্ছবি?'

'অনেক গাছপালা ঘরদোর পড়ে গেছে, পাকা দেয়াল ছাদ টাদও ধসেছে কম না; গরু ছাগল হাঁস মুরগি মরেছে ঢের–অনেকগুলো নৌকো ডুবে গেছে; ডাঙায় মানুষ টানুষ ত বেশি মরেনি–' বনচ্ছবি বললে,' আমি সরোজিনীদির বাড়িতে যে.ে পারিনি আজ।'

'আমিও যেতে পারিনি' বাসমতী ব্রাহ্মসমাজের চারদিককার উঁচু ইটের পাঁচিল ঘেরা কম্পাউন্ডে তিন চারটে বেশ ঝাড়ালো দেবদারু গাছের নিচে ঘাসের ভেতরে বসে ছিল দু'জনে। বিকেল হয়েছে–শেষ কার্তিকের বিকেল বেশিক্ষণ থাকবে না, সমাজের পুরানো বাড়িটাকে ঘিরে চারদিকেই ঘাসের মাঠ, মাঠটাকে বেড় দিয়ে উঁচু পাঁচিল ঘাস ও শ্যাওলায় সবুজ হয়ে রয়েছে; সমাজের কালিমা পড়েছে সব দিকেই; চোখ কেবলি নিবিড় ঘাস–ও হাত পা কোমলতা মহাশ্বেতা বনচ্ছবির মুখের মত চারদিককার কাশগুচ্ছের দিকে ফিরে আসতে চায়। কত ঘাস;–অনেকখানি জায়গায় কাস্তে পড়েছে বটে, কিন্তু বেশি পড়েনি, খুব ভাল ভাবে পড়েনি, ফলে প্রকৃতি যা চেয়েছে তার সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এসে মানুষের হাত জিনিসটা এমন একটা বিসদৃশ অমনৃষত্বে এসে পৌঁছেছে যে এই গভীর সমাজ মন্দিরটাকে পাশে রেখে এই নিস্তব্ধ জায়গায় এর চেয়ে ভাল কিছু প্রকৃতি বা মানবসংসারে কোথাও কোথাও যেন হতে পারে না–ভাবছিল ফাটা।

তাছাড়া কতকাল এখানকার ব্রাহ্মসমাজের কার্য নির্বাহক সমিতি খুব রসিক ও সমীচীন–মুখের থেকে পাইপ নামিয়ে ঘাসের ওপর রেখে দিয়ে ভাবছিল সে। চারদিককার আগাছা জঙ্গলগুলো প্রায় সমস্ত নিড়োনো হয়েছে বটে, কিন্তু কাঁশ বাঁচিয়ে। কোথাও একগুচ্ছ কাশের ওপরও হাত দেয়া হয়নি, দেয়ালের কিনার ঘিরে চারদিকই ওর রয়েছে;–ভিতরের দিকেও এসেছে বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত; আরো ভেতরে এসে সমস্তই নিছক সবুজ ঘাস যদিও বটে–কিন্তু প্রকৃতি তার স্নিগ্ধ ও নির্জন মুহূর্তে এই রকমই চেয়েছিল খুব সম্ভব; তার নিজের হাতে ছেড়ে দিলে সমস্ত জায়গাটাই; কাশে ভরে যেত অবশ্য, কিন্তু জ্ঞানী ও প্রকৃতিস্থ মানুষদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতে সে ভালবাসে–সেই জন্যেই সবচেয়ে ভাল খুলেছে এরকম সত্য ও নিজের কান্ত স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে রয়েছে এখানে প্রকৃতির রূপ ও মানুষের হৃদয় নিজের হাতের কাজ। কালকের ঝড়ে এই কাশগুলোর বিশেষ কোনো ক্ষতি করতে পারে নি। বোধ হয় উঁচু দেয়ালের ওপর দিয়ে বাতাসটা চলে গেছে–সমাজ মন্দিরের দেয়ালে সবুজ খিলান কার্নিস একদিকে আর দেবদারু গাছগুলো আর একদিকে ঠেকিয়ে রেখেছে দৃষ্টির বিষম ঝাপটাগুলোকে। তবুও নুয়ে পড়েছিল সমস্ত সকাল এই সব কাশ–সমস্ত দিনের পরে প্রাণ পেয়ে খানিকটা মাথা খাড়া করে উঠেছে আবার।

'ছাতুবাবু ত এসেছিলেন তোমার সঙ্গে বনচ্ছবি–'

'তিনি অনেক আগে আসছিলেন–আমাদের গেটের কাছে দেখা হল তাঁর সঙ্গে। সিদ্ধার্থ সরোজিনীদির কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার মনে ছিল না। ছাতুবাবু ত এক আধ মিনিটের বেশি এখানে বসলেন না। কোথায় গেলেন?'

'সমাজের লাইব্রেরিতে গিয়েছেন খুব সম্ভব।'

'বিশাখা আসবে?'

'আমার সঙ্গেই আসছিল, পথে আটকে গেল।'

'কোথায়?'

'বাসমতী কলেজের একজন প্রফেসরের বাড়িতে।'

'খোদ প্রফেসরের সঙ্গে কারবার—না তার গিন্নির সঙ্গে?'

'না, কর্তার সঙ্গেই।'

'তোমরা ভায়া খিদিরপুর হয়ে আসছিলে নাকি?'

'না, সদর রাস্তা দিয়ে—রিকশাতে চড়ে।'

'বাড়ির জানালা থেকে গলা বাড়িয়ে ডাক দিলেন বুঝি কত্তা—রিকশার মেয়েটিকে।' ফাটা ঘাসের উপর থেকে পাইপটা তুলে নিয়ে বললে, 'কিন্তু তোমাকেই ত ডেকেছিলেন তিনি। ডাকেন নি?'

পাইপটা নিভে গেছে, দাঁতে কামড়ে ধরে ছিল ফাটা, নিভে যাত, তা ক্ষতি কি, এক্ষুণি জ্বালাবার দরকার নেই; দাঁতের আটকে কথা বললেও চলবে, কিংবা খসিয়ে ঘাসের ওপর রেখে দিলেও হয়।

'আমাদের এই মন্দিরটা শহরের এক টেরে ছিল এক সময়; তখন আমার বাবা বড় কমলবাবু বেঁচেছিলেন। কিন্তু আজকাল দেখছি শহরটা এগিয়ে এসেছে এদিকে অনেকখানি—'

'মন্দিরটা আজকাল শহরের বড় লোক আর বড় বড় অফিসারদের এলাকার ভেতর পড়ে গেল প্রায়। তাই দেখছি চারদিকে গাড়ি ঘোড়া পিটছে খুব; হাটবাজারের গুলজারটা বেশ জমেছে এদিকে; মোটর গাড়ি ত বাসমতীতে কম না; প্রায়ই ত আসা যাওয়া করছে।'

শহরটা আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে। এরাই ফেঁপে উঠছে, লোক বেড়ে গেছে ঢের; বনচ্ছবি ঘাসের ওপর থেকে ফাটার পাউচটাকে একবার তুলে নিয়ে বললে, পাকিস্তান হলে কি রকম হবে বলতে পারছি না; না হলে বাসমতী দু'চার বছরের মধ্যে বেশ জমকালো হয়ে দাঁড়াবে।

'এটা কি?' বনচ্ছবি বললে।

'পাউচ।'

'পাউচ?'

'কাউকে পাইপ টানতে দেখনি তুমি এর আগে,' ফাটা একটু হেসে বললে, 'গগনবাবুও চুরুটই টানেন শুধু। তোমরা মফস্বলের ব্রাহ্মসমাজে থেকে বেশ শুচি শুদ্ধ হয়ে থাকতে পেরেছ। বড় কমলবাবু সেইটেই ভালবাসতেন; আমিও এই বিষয় আমার বাবার রুচি পেয়েছি।'

'ও—পাউচ' বনচ্ছবি বললে, 'আমি অনাদিবাবুকে এর থেকে তামাক পাতা বের করতে দেখেছি—'

'অনাদিবাবু কে?' পাইপ টানেন।

'হ্যাঁ। এখানকার ইনকাম ট্যাক্সের অফিসার।'

'বিয়ে করেছেন?'

'তার ছেলের নামকরণেই ত তাকে পাইপ টানতে দেখলাম।'

'ব্রাহ্ম—অনাদিবাবু?'

'না। ব্রাহ্মসমাজে একদম ঘেষেন না, মাঘোৎসবের সময়ই কোনোদিন মন্দিরে দেখিনি তাঁকে। তবে মৈতিদির মতন কালীভক্ত নন; ধর্মের বাইরের ভড়ংটা রেখেছেন—বছরের শেষে যখন পূজো আসে তখন খানিকটা মাতামাতি করেন। কিন্তু ওদের কোনো ধর্মটর্ম নেই।'

ফাটা আলগোছে পাইপটা জ্বালাবার চেষ্টা করে নিভন্ত পাইপটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'তোমার নিজের আছে?'

'তোমার?'

'বলছি।' ফাটা নেভানো পাইপটা মুখের থেকে নামিয়ে দু'চারটে কচি কাশ নুইয়ে তার ওপর সেটাকে রেখে বললে, 'আমরা দু'জনে খুব কাছাকাছি ঘেষে বসেছি—একেবারে সদর বাসমতীর মাঝখানে। কোনো অন্যায় করিনি। ভালই করেছি। ঠিক আছে। কিন্তু লোকজন যে নচ্ছারের মত চেয়ে থাকে সেটা আমার পছন্দ হয় না বনচ্ছবি—' ফাটা টাউজারের পকেট থেকে দেশলাই বার করতে করতে বললে, কেউ উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে চোখে পড়েছে তোমার?'

'আমি রাস্তার লোকের দিকে তাকাই না। আমি খুব কাছে বসিনি তোমার।'

'কোনো দোষ নেই আরো কাছে এগিয়ে বসলে'—ফাটা পাইপের থেকে পোড়া তামাকের ছাই গুঁড়ি ঘাসের ভেতর ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে, 'কিন্তু এটা মফস্বলের মতন জায়গা এখানকার লোকগুলোর আদিখ্যেতা বেশি, বুদ্ধি চাঁছাছোলা খুব—আমি চাই না যে এরা আমাদের সমাজের সম্বন্ধে কথা বলে বেড়াবে চারিদিকে। ও কি করলে বনচ্ছবি?'

'না তা হবে না।' ফাটা গম্ভিরভাবে বললে, 'তুমি যেখানে বসেছিলে সেখানেই থাক। আমি শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম তোমাকে।'

ফাটা একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে পাইপের ভেতরটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পোড়া তামাকের কুচি বার করতে করতে বললে, 'যে রকম বসেছিলে সেইটেই ভাল—আমার বিচারে। তবে বাসমতী ব্রাহ্ম সমাজের একটা ইতিহাসের দিকও আছে। কর্তারা কেউ বেঁচে নেই। তাদের আমলে এ সমাজের ধর্ম সম্বন্ধে অবিশ্যি আপত্তি ছিল বাইরের লোকদের—আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাকারের উপাসনা গান নিয়ে ঠাট্টা করত, কিন্তু নীতির দিক দিয়ে আমাদের আবার ব্যবহারের যে কোনো মার নেই, আমরা যে মিথ্যা কথা অবদি বলি না এটা তারা খুশি দিলে বরাবরই স্বীকার করে নিয়েছে।'

ব্রাহ্মদের সেই নীতিই আঁকড়ে আছ তুমি? পাইপ ত টানছ, ওঁরা কেউ মন্দিরের প্রাঙ্গণে কোনোদিনও তামাক খেতেন না।'

ফাটা পাইপের ভেতর থেকে আরো কিছু কুচি ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে বললে, এটায় গগনবাবু আমাকে পথ দেখিয়েছেন। উনি আমার চেয়ে পনের কুড়ি বছরের বড়। ঢের বেশি বড় ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে'—একবার মুখ তুলে বনচ্ছবির দিকে তাকিয়ে ফাটা বললে, 'মানে সত্যিকারের সুশীল ও মহাজন। কিন্তু গগনবাবু মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুরুট টানেন। চুরুট সিগারেট আজকাল সকলেই খায়, নীতি টীতি নয়, স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্যের কথা গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনকালের সঙ্গে বদলায় এরকম সিগারেট চুরুটের ব্যাপারটা। কিন্তু কতকগুলি জিনিস আছে অবিশ্যি—ফাটা খানিকটা দূরের দু'তিনটে দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে,' যেগুলো বড় জিনিস হয়ে রয়েছে—সব সময়ের জন্যে—সেগুলো সম্বন্ধে—'

ফাটা বলল, 'আমি অনেক কথা বলছি বনচ্ছবি।'

'কী বলছিলে তুমি—থেমে গেলে কেন?'

'তুমি জান ত এমনিতেই বেশি কথা বলি—না হলে তোমার মতন জ্ঞানীকে বোঝাবার জন্যে আমার কোনো কথা বলবার দরকার ছিল না।'

'তুমি কলকাতার মানুষ, অনেকদিন কলকাতায় আছ। মফস্বলে এসে একটু বেশি সতর্ক হয়ে পড়ছ। দেখছি তাই।'

'জ্ঞানী মানুষ, তবু ত তুমি দূরে সরেই বসলে।'

'সমাজের সুনামের কথা ত চিন্তা করছ তুমি।'

'সেটা ত জ্ঞান নয়।'

'কে বলবে জ্ঞান নয়। জ্ঞান না হোক ধর্ম। ধর্ম খুব সম্ভব জ্ঞানের চেয়ে বড়।'

কথা ত বলছি অনেক; কিন্তু ধর্ম কি—অজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না বনচ্ছবি।'

বনচ্ছবি ফাটার পাইপটার খোড়লের ভেতর থেকে কুচি ঝেড়ে ফেলবার শেষ প্রয়াসের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে দেবদারু গাছ, ঘাস, নিভন্ত রোদ সবই কেমন পট পরিবর্তন করে ফেলছে দেখতে দেখতে চুপ করে ছিলে।

'কই বললে না ত?'

'কীসের কথা?'

'ধর্মের কথা হচ্ছিল।'

'হচ্ছিল ত।' দেবদারু গাছের ডালপালার ভেতর দিয়ে বনচ্ছবির মুখে রোদ এসে পড়েছে; তোমার ধর্মে কি আছে তুমি সেধেছ; আমি— নাই বা সাধলে—আমার ব্যক্তিগত ধর্মের কথা বলছি না ত।'

বনচ্ছবি ডানহাতের আঙুল দিয়ে ঘাসের ওপর ছক কাটতে কাটতে বললে, 'এ ছাড়া ধর্ম নেই। বড় কমলবাবুর ব্যক্তিগত ভাবে ধর্ম পালন করে গেছেন। কিন্তু ঠিক তাদের ধর্ম খুব সম্ভব এখন আর আমাদের নয়—আমার অন্তত নয়।

'আমি সমাজে মাসে মাসে আসি বটে, কিন্তু—'

ফাটা পাইপ পরিষ্কার করে নিয়ে বনচ্ছবির দিকে তাকাল।

'সিদ্ধার্থদা একেবারেই আসে না।'

'সিদ্ধার্থ?—শুনেছি কাল সরোজিনীদির কাছে।'

বনচ্ছবি বললে, 'অধার্মিক নয় লোকটা।'

'না, তা নয়। নিজের কোন এক আলাদা ধর্ম স্থির করে নিয়েছে। সেটা খুব সম্ভব ব্রাহ্মধর্ম নয়,—কিংবা এর ভেতর থেকেই উৎপত্তি তার। আমাদের ত জ্ঞানসম্মত ধর্ম ছিল সিদ্ধার্থ ত জ্ঞানের চর্চাই করে।'

'ঠিক সেই জন্যেই অবিশ্যি সেনের পথে যাইনি আমি।'

'সে জন্যে নয়?'

'না অতটা সাহস নেই আমার—'

ফাটা পাইপটার দিকে তাকিয়ে, সেটা ঘুরিয়ে ঘাসের ওপর রেখে দিয়ে বললে, 'রোববার দিন সমাজে না গেলে গগনবাবু রাগ করবেন সেই ভয়?'

'গগনকাকা আছেন—সরোজিনীদিরা আছেন—আরো অনেক আছেন—একসঙ্গে রয়েছি যখন মফস্বলের মতন একটা জায়গা—ব্রাহ্মসমাজের সব দিকে দিয়ে এই নিভে যাওয়ার মতন সময়টা—তখন ওদের মনে কষ্ট দিতে খারাপ লাগে। ওদের নিজেদের একটা ধর্ম রয়েছে সেটা সত্য ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে জ্ঞান উপাসনায় সেটা পালন হয় তাও ঠিক, আমাদের বেলাও সেটা সম্পূর্ণ সত্য হলে কত ভাল হত; কিন্তু হল না ত।'

ফাটা কিছু বললে না।

বনচ্ছবি বললে, 'কিছু মনে করলে নাকি নীরেনদা?'

'কেন?'

'আমাদের বেলা বললাম, আমাদের মানে—তোমার নয়; আবার, বিশাখার—'

'সিদ্ধার্থের।'

'তাকে আমাদের দলে ফেলি না।'

ফাটা পাইপটা তুলে নিয়ে ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বললে, 'না, তা নয়, তবে ক্রমে ক্রমে মাস্টারমশায়ের সাহস আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। হিতেনবাবু গগন কাকা সরোজিনীদি কি বলবেন তার বাইরে চলে গেছেন। সমাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায়ই যান না, মাঘোৎসবের সময় এক আধ দিন যান, কিন্তু সেটা কারো মন রক্ষা করার জন্যে নয়; সমাজে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেন, কিন্তু সেটা ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদ ছেড়ে দিয়ে দেশগুলো করেনি, এই কথাটা বলবার জন্যে; সেইসঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্মের খুঁটি আগলে বসে থাকার যে কোনো দরকার নেই–সেই কথাটাও বলে দিয়ে আসেন।'

'সিদ্ধার্থ আজকাল শিগগির বক্তৃতা দিয়েছে?'

'না। দু'তিন বছর আগের কথা বলছি।'

'আজকাল এ সবও ছেড়ে দিয়েছে।'

'সেনের সাহসের কথা বলছিলাম,' বনচ্ছবি বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুল ঘাসের ওপর পেতে রেখে বললে,' কিন্তু সাহসটা কর্কশ নয়, ওর বিচারবুদ্ধি–খুবই প্রাণসরস, কাউকে দুঃখ দেবার উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু ওর ব্যবহারে এখন আর কেউ দুঃখ পায় না–সেই জন্যে সেই প্রশ্নটা জাগছে না আজকাল আর।'

'এতখানি দূরে সরে গেছে সিদ্ধার্থ?'

'গগন বাবুদের ভরসা আমার বিবেচনার দূরে সরে গেছেনই ত।'

'কী উপকার হল তাতে সিদ্ধার্থের?'

'আমাদের চেয়ে ঢের বেশি জ্ঞান তার নিজে জানেন কি হচ্ছে। কিন্তু সরোজিনীদিরা ধর্মসমাজ বলতে যা বোঝেন সেটার ক্ষতি হচ্ছে।'

'মাস্টারমশাইকে 'আপনি' বল বুঝি তুমি?'

'না, তার সঙ্গে কথা বলবার সময় রইল না–তার সম্বন্ধে কারো কাছে একটা বিবৃতি দেবার সময় বলি–' বনচ্ছবি ঘাসের ওপর নিজের ছড়ানো আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল, হাতটা তুলে নিয়ে, ফাটার মুখটাকে নিজের নজরের ভেতরে এনে বললে, 'সেন একদিকে–সরোজিনীদিরা আর একদিকে, তুমি মাঝ পথে রয়েছ।'

'হ্যাঁ, গগনবাবুদের দিকেই একটু ঝুঁকে।'

'তাই মনে হল তোমার, পরশু রাতের কথায়।' ফাটা পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে সেটা বাঁ হাতের আঙুলে আস্তে আস্তে ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'তুমি সেনের দিকে ঝুঁকেছ। আমার মনে হয় সমাজটাকে টিকিয়ে রাখা দরকার–ধর্মসমাজ হিসেবে–'

'বাসমতী সমাজের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, কলকাতা ব্রাহ্মসমাজকে টেকাবার ভার আমাদের ওপর নেই আমার। কিন্তু দেশের কোনো এক জায়গায় সমাজ ভাল ভাবে বেঁচে থাকলে আমার ছোট আত্মা শান্তি পাবে; এটা ত রাইসর্ষের বীজ রামমোহনের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়।

'নীরেনদা' বনচ্ছবি বললেন।

তারপরে বললেন, 'খুব বিশ্বাস তোমার। তোমাকে দিয়ে সমাজের উপকার হবে। এই সমাজেই লালিত হয়েছি আমি, বড়দের দেখছি। মৃতদের কথা শুনেছি–তাদের আশা ভরসার দিক দিয়ে শূন্য হয়ে গেছে ত সব–খানিকটা ভরে রাখতে পারবে তুমি; ভেবে ভাল লাগছে আমার। কিন্তু–' ফাটার চোখে চোখে তাকিয়ে নিজের ভিন্ন রকম বোধ ও সংকল্পের নেপথ্যে চাঁদসদাগরের এক বিরোধী দৈবশক্তির মত কিন্তু কানা নয়–খুব সুন্দর বনচ্ছবি অল্পস্বল্প হাসিতে মুখ মাখিয়ে ফেলে বললে, 'আমাকে তোমার সমাজের কাজের কর্মী হিসেবে নিলে আমার গাফিলতি দেখে কষ্ট পাবে তুমি।'

'তোমাকে নিচ্ছি নাকি আমি বনচ্ছবি? বড় কমল বলতেন কেউ না থাকলেও আমি আছি, সমাজের বাতি জ্বলবে, আমি একজন গান গাইব। সত্যেন ঠাকুর দ্বিজেন ঠাকুর–রবি ঠাকুর দাদাদের গান গাইতেন তিনি সব।' ঠিক ছিল।'

শুনে ফাটার দিকে তাকাল বনচ্ছবি; যুক্তির পথে সে এগিয়ে যেতে চাচ্ছে; ব্রাহ্মসমাজ সেই ইঙ্গিত করেছিল, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে নিয়ে পড়ে থাকতে বলেনি (খুব সম্ভব), কিন্তু এই মানুষটির কথা শুনলে প্রাণ কেমন যেন নড়ে ওঠে, সুকুমারদা ত গান গেয়ে টলিয়ে দিতে চায়, কিন্তু এই লোক ফিজিক্সে এম এসসি পাস করে ধর্ম একটা বিশেষ ধর্ম–ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে আত্যন্তিক অনুভূতির অল্পস্বল্প গদ্যের ভাষায় এর কথা শুনিয়ে ভাবিয়ে ছাড়ে।

কিন্তু তবুও নিজের পথ বনচ্ছবির আলাদা।

মানুষ হিসেবে নীরেন তাকে কি ভাবে কতদূর টানে সেটা অন্য কথা, কিন্তু এ মানুষের একটা বিশেষ সাধনার থেকে, সব সত্যিই বিচ্ছিন্ন–কোনোদিন কোনোভাবে ও-সম্বন্ধে পূরণ করবার কাজে ডাক যদি পড়ে তার–তাহলে তাতে সাড়া দেয়া সম্ভব হবে না।

ফাটা বললে, 'অবিনাশবাবুরা বলতেন যে সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ না করলে পৃথিবীর মুক্তি নাই। ওসব আমি বিশ্বাস করি না। অদ্ভুত অত্যুক্তি করতেন পঁচিশ তিরিশ বছর আগের জোষ ব্রাহ্মেরা। কিন্তু এটা ঠিক যে এক ধরণের যুক্তিবাদী লোক–বিশেষভাবে বাংলাদেশে যাদের জন্ম–হৃদয়ে যদি তাদের খানিকটা ভক্তির ভাব থাকে তাহলে এই ধর্মই খুব সম্ভব সবচেয়ে বেশি মানাবে তাদের। বনচ্ছবি, আমি এখন পর্যন্ত বোধ করছি যে, আমার মন এরকম খানিকটা; সেইজন্যে সমাজের কাজ কিছু কিছু করতে পারব ভাবছি। পরে কি হবে বলতে পারছি না; অনেক পরিবর্তন হতে পারে, এখন যা ভাবছি, করছি তার থেকেই ক্রমে ক্রমেই সরে যেতে পারি। তবে আমার জীবনে এসব জিনিস নিয়ে মতামতের পরিবর্তন বিশেষ নেই তেমন কিছু। বয়স ত অনেক হয়েছে, প্রায় এক পথেই চলছি।'

'তুমি এই পথেই চলো।'

'তুমি এটা চাচ্ছ?'

বনচ্ছবি একটা কচি কাশ ছিঁড়ে পাতলা ঠোঁট খসিয়ে হেসে বললে, 'আমি না চাইলেও চলবে তুমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাটা চুরুটটা জ্বালাবার জন্যে দেশলাই বের করে বললে,'আমি জানি তুমি মনে মনে আমাকে খানিকটা করুণার চোখে দেখ।'

বনচ্ছবির ঠোঁটে যে হাসিটা লেগেছিল সেটা চোখের ভেতরে ঢুকে ভেতরে ডুবে গেল তার; চোখে আর একরকম ভাব এল।

চুরুট জ্বালাবার আগে ফাটা মুখোমুখি দেবদারুর ডালে দু'চারটে শালিখের ওড়াওড়ির দিকে তাকিয় বললে, 'বলছি তোমাকে, বেলা পড়ে এল বনচ্ছবি।'

'কার্তিক মাস-'

'ভারি চমৎকার এই বাসমতীতে।'

'তুমি দেবদারু গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে ঘাসের ভেতর পা ছড়িয়ে বসে আছ; অবিশ্যি পা দু'টো ট্রাউজারে ঢাকা। কিন্তু তবুও বাসমতীর হেমন্তের বিকেলের স্বভাবই যেন সমস্ত-ঐ আকাশ-সমাজের বাড়িটা-ধানজমি-লাইব্রেরি ঘরে ছাতুবাবু-অল্পস্বল্প কথাবার্তা-চারদিককার নিঃশব্দতা।'

ট্রাউজারটা বেসামাল হয়েছে কেন।'

বনচ্ছবি কাশের গুছির থেকে এক একটা রোয়া খসিয়ে ছেঁড়া কচি কাশটা ঘাসের ওপর ফেলে রেখে বললে, ওটা পরা তোমার অভ্যাস হয়ে গেছে। ঐ শালিখগুলোর ঠোঁট হলদে, পা হলদে, চোখের কাছ দিয়ে কালো; ঠিকই মনে হয় সব; ঠিকই আছে।'

ফাটা এবারেও চুরুট জ্বালাতে গিয়ে দেশলাইটা আস্তে ঘাসের ওপর রেখে দিয়ে তার ওপর আড়াআড়ি ভাবে শুইয়ে রেখে বললে, 'বড্ড ভুল করেছি কলকাতার থেকে আসবার সময় একখানাও ধুতি আনা হল না। শালিখের ঠোঁট হলদে না হয়ে নীল হলেও ভাল হত যেন-পা যদি অত কটকটে হলদে না হয়ে পাকা ধানের মত সোনালি রঙের হত-তাহলে এই ধান দূর্বার হেমন্ত বিকেলের বেশি মানাত তাকে আমাদের বাসমতীর মত দেশে।'

'বড্ড লেগেছে তোমার দেখছি।'

'চারটে ট্রাউজার এনেছি, ট্রাউজারই শুধু-'

'বেশ ভাল দর্জির কাট, চারদিককার পড়ন্ত বেলার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে,'খাপছাড়া ঠেকেনি ত-'

'তবুও শালিখের হলুদ রঙের কথা পাড়লে ত তুমি।'

বনচ্ছবি ঘাসের ওপর থেকে কাশের গুছিটা তুলে নিয়ে স্বল্প গলা খাকারির সঙ্গে একটু হাসি মিশিয়ে নিয়ে বললে, 'শালিখের হলুদ ঠ্যাং দেখে হাসি পায় একথা কাউকে কোনোদিন বলতে শুনেছ তুমি?'

দেশলাইয়ের বাক্সের ওপর থেকে চুরুটটা তুলে নিয়ে ফাটা বললে, 'তুমি আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছ; এখন হয়ত আমিই হাসব।'

'বড্ড অস্বস্তি বোধ করছ নীরেনদা। একজোড়া ধুতির ব্যবস্থা করা যাবে তোমার জন্যে। কিন্তু ধুতি একটু মোটা হবে।'

'একেবারে খাখি খদ্দরের যেন না হয়।'

'না, তা হবে না। তবে তুমি আবার লম্বা মানুষ; হাঁটুর ওপরে গিয়ে আবার না উঠে।'

ফাটা একটু চুপ করে বললে, 'তুমি আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলে না বনচ্ছবি?'

'তুমি আমাকে একটা কথা বলবে বলেছিলে, কথাটা সমাজ নিয়ে খুব সম্ভব-'

'হ্যাঁ, ধর্মসমাজ নিয়ে,' শুকনো চুরুটটা আঙুলের ভেতর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফাটা বললে, 'ধর্ম বলতে ব্রাহ্মরা যা বুঝতেন সিদ্ধার্থ তা বোঝে না এখন, একটা নতুন জিনিস বুঝছে সে; তুমিও সিদ্ধার্থের দিকে। ধর্ম বলতে কি বোঝ তুমি বনচ্ছবি?'

'বাবা রে, 'বনচ্ছবি ঘামিয়ে ওঠবার ভান করে বললে, এত বড় একটা কঠিন জিনিস আমি এক কথায় কি করে বলি।'

'যত কথায় পার তাই বল।'

'তা আরো কঠিন। এ নিয়ে সেনের সঙ্গে কথা বোলো তুমি।'

'সেনের কথাই তোমার কথা।'

ফাটার মুখের কেমন একটা জ্ঞানভিক্ষু উজ্জ্বল দীনতার দিকে তাকিয়ে বনচ্ছবির মনে হল সে যা জানে এখনই এখানে একে সেটা বলে দিয়ে এই মানুষের সৎ আগ্রহটাকে একটা সম্মান দেয়া উচিত।

'ধর্ম ত প্রথমতই সেই ঈশ্বরকে নিয়ে ও আমাকে নিয়ে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ধর্ম প্রধানভাবে সেই জিনিসটে জানাচ্ছে আমাদের। বিশুদ্ধ ধর্ম বলতে সাধকরা এই বোঝেন; নীতিও ধর্মের অংশ খুব সম্ভব, কিন্তু বিশুদ্ধ ধর্ম সাধকদের কাছে নীতি পালনের ব্যাপারের চেয়ে আরো অনেকখানি স্পষ্ট ও গভীর জিনিস; অথচ আমি সাধক নই।'

'ও-' ফাটা শুকনো চুরুটটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'সাধনের পথেও যাবার ইচ্ছে নেই।'

ফাটা বললে, 'আমি ব্রাহ্মসাধনের কথাই বলছি।'

'আমি সেটাকে একটু আলাদা করে শুদ্ধ ধর্মসাধনের কথা বলি। আমাকে তাই বলতে দাও তুমি। খাঁটি সাধকদের দিক থেকে দু'টোই এক জিনিস।' বনচ্ছবি সমাজ কমপাউন্ডের মাঠ ঘাস দেবদারু গাছগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে বললে, 'ধর্মসাধনা তাহলে এই রকম একটা জিনিস। কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে সাধকদের সাধারণত যে রকম ধারণা চেতনা সে বিষয়ে আমি দিনের পর দিন নিজেকে অজ্ঞ বলে বোধ করছি। অন্য সব দিক দিয়ে জ্ঞানদান বাড়বে কিনা বলতে পারছি না; বাড়লে এদিক দিয়ে অন্ধকারটা ঘুচবে বলে বুঝতে পারছি না।'

'অনেক ঘুরিয়ে বললে, 'ফাটা খড়খড়ে চুরুটটা আঙুলের ভেতর নেড়েচেড়ে বললে,' তোমার বিশ্বাস নেই বলতে চাচ্ছ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ধর্মসমাজগুলো সাধকদের পথে পা বাড়াবার শক্তি আমার নেই; এইটে বলতে চেয়েছিলাম; কিন্তু বিশ্বাস আছে।'

'কীসে বিশ্বাস?'

'ধর্মের বিশ্বাস।'

'তোমার? এই ত বলছিলে যে–'

'সময়ের সঙ্গে মানুষের রীতিনীতি বদলে যাচ্ছে–অগ্রসর হচ্ছে কেউ কেউ বলছে–সেটা ঠিক ভাবে ধারণা করে মানুষের ভালর জন্যে মানুষের কাজে লাগানো–'

'ও এই? এই সব?'

'হ্যাঁ, প্রায় সব। তুমি বলবে এ ত নীতি হল? কিন্তু আজকাল খুব সম্ভব–'

ফাটা চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল।

'কিন্তু আরো খানিকটা আছে; বনচ্ছবি বললে, 'এই যেমন কার্তিকের বিকেলে আজ যেমন বসেছি ঘাস দেবদারু খোলা আকাশের ভেতর; কিন্তু বাসমতীর হেমন্তকালকে চেন ত তুমি–কালিজিরা চামরমণি সাকোরখোরা ধান কেটে নেয়া হয়ে গেছে যে সব ক্ষেতের থেকে–সোনালি খড়, শালিখ, আকাশ, চাষাভুষোদের অল্প স্বল্প আসা যাওয়া–নিঃশব্দতা মাইলের পর মাইল রয়ে গেছে–সেখানে মাঝে মাঝে বিকেলবেলা বিশাখা বা ওদের দু' একজনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে, কখনো বা বসে থেকে মনে হয়' আরো আছে। বড় কমলবাবু গান গেয়ে (একটা নির্ধারিত সীমায়) পেয়েছেন বলে মনে করতেন। কিন্তু আমার সেরকম কোনো দিক নিরূপণ নেই–খুবই অস্পষ্টতা–কিন্তু তবুও এটাকে বাদ দিয়ে শুধু নীতিবিজ্ঞান নিয়ে ধর্ম হয় না–মনে হয় আমার। অনেকের মত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সত্যই ত হল; এটা আমি পুরোপুরি স্বীকার করি না। শুদ্ধ সত্য এবং মানুষের কাজে কর্মে ফলিত সত্যের রূপ; এগুলো কিভাবে ঠিক ভাবে নির্ণয় করা যাবে তাও প্রায়ই বুঝে উঠতে পারি না। এই সব নিয়েই একটা ধর্মকে দাঁড়া করাবার চেষ্টা আমার–কিন্তু সেটা দাঁড়ায় না কিন্তু তবুও কোনো দিন হয়ত দাঁড়াতে পারে–নাও পারে–'

মাঝে মাঝে ব্রাহ্মসমাজের দালানটার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে দেখতে দেখতে ফাটা এক মনে বনচ্ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে শুনে যাচ্ছিল; কিন্তু এর এসব সিদ্ধান্তের ওপর এ সমাজ ধর্মের বিশেষ কোনো প্রভাবে নেই বোধ করছিল জ্বালানো চুরুটটা হাতে রেখে; টানছিল না; কথা শেষ হলে ফাটা বললে,' সেই কথাই বলছিলাম তোমাকে আমি তখন–আজকের যুগে আমার মতন এত বয়সে আমি যে ধর্মসাধকদের মানে আগেকার ধর্মসাধকদের আলোয় এখনো খানিকটা পথ দেখে নিতে চাচ্ছি সেটা বোধ করে তুমি অবিশ্যি কাউকে খুব সম্ভব মনে মনে–হাস যদি–তা হাসতেও পার।

'সিদ্ধার্থ হাসে?'

'এতক্ষণ পরে এই কথা বলা?'

'কেন?'

'কেন সেন হাসবে?' বনচ্ছবি ভুরু কুঁচকে গানের মত একটা টান দিয়ে হেসে বললে, 'জ্ঞানীরা নিজেকেই একমাত্র হাসির পাত্র বলে মনে করে।'

ফাটা চুরুটটা টানতে গিয়ে নামিয়ে রেখে বললে, 'হ্যাঁ, সেইজন্যেই তারা জ্ঞানী মনটা শুচি থাকে; জ্ঞানও টলটল করে থাকে নির্মলী কলের জলের মতন।'

বনচ্ছবি হেসে বললে, 'তুমি মানুষের মাথা খারাপ করে দেবে দেখছি।'

'কেন?'

'একেবারে লজিক হাকড়ে চলছ।'

'সিদ্ধার্থের অবিশ্যি মেটাফিজিক্স্ নিয়ে ব্যবসা। মেটাফিজিক্স্ ত লজিকের চেয়ে ঢের বড়।'

চুরুটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে দু' একটা টান দিয়ে ফাটা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল।

বনচ্ছবি বললে, 'তুমি যে জ্ঞানীদের ভেকের কথা বললে–সেটা তাদের আছে অনুভব করেই জ্ঞানীরা নিজেদের দিকে তাকিয়ে হাসে; আছে–ঢের আছে বৈকি; সেইজন্যেই জ্ঞানটাকে ধূলিস্যাৎ করে ফেলতে চায় তারা। আমাদের জ্ঞান ত মোটামুটি বিজ্ঞান–বড় জোর বিজ্ঞানের পোষ্য আধুনিক জানি। তারপর অল্প স্বল্প কিছুটা আত্মজিজ্ঞাসা। তুমি ত ব্রাহ্মজ্ঞানের দিক চলেছ। সেটা এ জীবনে আমাদের দিয়ে সম্ভব হল না।'

নিজের কথা বলে চলছিল, কথা বলে চলছিল–কিন্তু নিজের মুখেই এই তর্ক বিতর্কের কথা বলতে বলতে বনচ্ছবির মনে হল কেমন যেন বড় কমলবাবুর গান শুনে মনটা অভিভূত হয়ে পড়েছে তার; তেমনি যে একটা কিছু হয়েছে গলার দিকের, অস্ফোটে সেটা ধরা পড়ে গেল যেন ফাটার হৃদয়ে। সমাজের চারদিককার উঁচু চার দেওয়ালের ওপারে সদর বাসমতীর ঘর বাড়ি দালানকোঠা গাছগাছালি ও আকাশের একটা দূর বলয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল যে; চোখ ফেরালো বনচ্ছবির দিকে। বনচ্ছবি আঙুল দিয়ে ধূলো দূর্বা ঘাস চারখুপীর শিষের ওপর হিজিবিজি আঁকছিল, চোখ তুলে তাকাতে গেল না কোনোদিকে, কী করছে বনচ্ছবি? যুক্তি সাধিকার মনে হঠাৎ যে একটু ঢল নেমে পড়ছিল যেন–কোনো মানুষকে নিয়ে নয়, ধর্ম এবং ধর্মের সেই রিফল বিষয়কে নিয়ে খুব সম্ভব–সেইজন্যে একটু থমকে গিয়ে লজ্জা বোধ করে ভাবটা কাটিয়ে উঠতে চাচ্ছে বুঝি। খানিকটা সময় কেটে শেষ হলে ফাটা আবার আস্তে আস্তে বললে 'বিকেল চলে গেল প্রায়।'

'অনেকদিন পরে বাসমতীর গাছে ঠেস দিয়ে–ঘাসের ওপর বসে।' বনচ্ছবি বললে, 'আট দশ বছর এক নাগাড়ে কলকাতা কাটিয়ে এসে কার্তিক মাসে বাসমতীতে এসে পড়েছ তুমি। ঠিক করেছ। কার্তিক মাস–জ্বর–জারির মাস–সে হিসেবে কিন্তু বলছি না আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বর তোমার হত–যখন ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াতে, আমারও হত; খালি গা আর খাকির আফপ্যান্টে তারপর অনেকদিন সে ম্যালেরিয়া আর হয়নি–তোমার হয়েছে বনচ্ছবি?'

'না–এখানে রেলস্টেশনটা অনেক দূরে–বাসমতীতে ঠিক রেলওয়ে স্টেশন নেই-স্টিমার রয়েছে–মিউনিসিপ্যালিটির তদারকি কি রকম জানি না–তবে ম্যালেরিয়া ঢের কমে গেছে।'

'বাসমতী কার্তিক অঘ্রাণ মাসের দেশ,' ফাটা বললে, 'আমি জানি; সেই জন্যেই এই সময়ে এসেছি এখানে।

'আমাদের ব্রাহ্মসমাজের বাড়িটা সদরের এরকম কাছে থেকেও বেশ নিঃশব্দ–এখানে বসে বসে এদেশের কার্তিক অঘ্রাণের বিকেলের ঠিক স্বরূপটা অনেক দূর পর্যন্ত বোঝা যায়।'

'তুমি অবিশ্যি ব্রাহ্মসমাজের কাজ করতে চাচ্ছ।'

'চাচ্ছি।'

'এখানে যাঁরা সাধক ছিলেন তাঁরা এ রকম গাছে ঠেস দিয়ে কার্তিক অঘ্রাণের বিকেলের ঠিক স্বরূপের কথা ভাবতেন মাঝে মাঝে হয়ত–কিন্তু এতক্ষণের ভেতর উপাসনা আরাধনা হয়ে যেত, কিছু গুণ গুণ করে তার নাম টেনে দিয়ে সুর করে–খোল করতাল এসে পড়ত–সমাজের মানী আসত–উপাসকেরা জড়ো হয়ে যেতেন–

'বুঝেছি আমি জিনিসটা,' ফাটা বললে, 'আমার সব হয়ে আস্তে আস্তে, কলকাতার ব্যাপারটা কারো হাতে দিয়ে আসতে হবে; এখানকার জমিদারিটা যদি পাওয়া যায়–মৈতি চাচ্ছে–দেয়া যাবে তাকে। তারপর এসে বসব।'

শুনে বনচ্ছবি ভাবছিল এই রকম সেন একদিকে চলেছে; এই মানুষ আর একদিকে যেতে চাচ্ছে; সেনের মতামতের সঙ্গেই বনচ্ছবিরও চলা, কিন্তু এই লোকটিকে তার মতের ও বিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিয়ে দেখা চাই; দেখছে বনচ্ছবি; এর ওপর আগে যা শ্রদ্ধা ছিল তা যেন আরো খানিকটা বেড়েছে মনে হচ্ছে। এই সময়ে এই জায়গায় এত কথাবার্তা এতটা মন খুলে (মোটামুটিভাবে) আর কোনো পুরুষমানুষের সঙ্গেই সে কোনোদিন করেছে বলে মনে পড়ছে না–এক সেন ছাড়া।

'তুমি বাসমতীতে থাকবে তাহলে?'

ফাটা চুরুটটা ঘাসের ওপর রেখে বললে, 'এবার বাসমতীতে এসে নির্গুণ চিন্তা টিন্তা নয়–একেবারে নানারকম বিষয়ের ভেতরে ঢুকে ভেবে বুঝে দেখেছি আমি; কলকাতার চেয়ে–কলকাতার আশপাশের চেয়ে এই জায়গাটাকে ভাল লেগেছে আমার।'

'এই জায়গার পরেই কলকাতার দাবি?'

'কলকাতার দাবি বেশি ছিল এক সময়; এখন ক্রমে ক্রমে কমে যাচ্ছে। বাড়বার সম্ভাবনা নেই আর। তুমি ত কলকাতায় যাচ্ছ?'

বনচ্ছবি সমাজবাড়ির খোলা দরজার ভেতরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বিশাখাও যাবে; আমরা এম এ পড়ব ভাবছি।'

'এম এ পাস করে কী করবে?'

'অনেক পরের কথা। আগে পাস করে নিই।'

'বাসমতীতে ফিরে আসবার ইচ্ছা নেই?'

'কিছুই বলতে পারছি না এখন–' সমাজের দালানটার ভেতরের সেই আগেকার অন্ধকারের (কিন্তু কোনো দৃশ্য অন্ধকার চোখে পড়ছিল না তার, এটা যে সমাজ সেটা মনে ছিল না) দিকে তাকিয়ে এই মানুষটির কাছে এক দিকের অস্পষ্টতাতে খানিকটা স্বচ্ছ করবার চেষ্টা করে বনচ্ছবি বললে,

'এম এ পাস করে কি কি অস্পষ্টতাতে পড়তে হতে পারে–'

ঘাসের ভেতর থেকে চুরুটের ধোঁয়া উড়ছিল, ঘুরে ভেসে মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যে; একবার তাকিয়ে চুরুটটা না তুলে ফাটা সামনের দূরের মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

'বি টি মানেই ত টিচারি করা, কিন্তু কোথায়?' বাসমতীতে নয় খুব সম্ভব? কথা ভাবছিল, ভুরু আলগাভাবে কোঁচকালো, দূরের সার্কিট হাউসটার দিকে তাকিয়েছিল, বললে, 'হতে পারে বাসমতীতে; অতটা আগা কিছু ঠিক করে রাখতে পারি না।'

'তুমি ত কলেজে পড়াবে?' বাসমতী কলেজে ত মেয়েরাও দু-চারজন প্রফেসারি করছে–'

'আমি স্কুলেও পড়াতে পারি–কলকাতায় না কোথায় ঠিক করে উঠতে পারিনি এখনো।' বনচ্ছবি কথা ভাবার মত একটু গম্ভীর মুখে দূরের সেই সার্কিট দালানটার দিকেই তাকিয়ে বললে, 'তুমি জীবনে কি করবে না করবে স্থির করে ফেলেছ; জায়গাও ঠিক করেছ। তোমার জীবনে একটা নিশ্চয়তা আছে; ধর্মের থেকে সেই নিশ্চয়তা পেলে তুমি। আমারও একটা ধর্ম আছে বলেছি তোমাকে, কিন্তু সেখানে কোনো গুরু সমাজ এমন কি বিজ্ঞান পর্যন্ত কোনো ঠিক নিরিখ দিতে পারছে না-কারো ওপরই কোনো আপ্তবিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই আমাদের-কাজেই কিছু স্থির হচ্ছে না।'

চুরুটটা তুলে নিয়ে ফাটা বললে, 'তুমি আধুনিক মানুষ; এ যুগে আধুনিক মানুষ হয়ে সুখে আছ, কিন্তু শান্তি নেই। আমি তোমাকে আমার সব টাকা দিয়ে দেব; কিন্তু শান্তি পাবে তাতে তুমি?'

বনচ্ছবি এক মনে সমাজের দালানের ভেতর বেঞ্চিগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল; অন্ধকারে শূন্য হয়ে পড়ে রয়েছে সব, কিন্তু এই শূন্যতার দিকে তার তেমন কিছু মন ছিল না, চারদিককার বড় পৃথিবীর কেমন যেন একটু অন্ধকার শূন্য গর্ভতার এ ত খুব ছোট প্রতীক; ভাবতে নিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল সে; সেই নিস্তব্ধ হ্রদের ভেতর একটা ঢিল পড়ল যেন ফাটার কথা শুনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ব্যাঙ্কে আমার হাজার চল্লিশেক টাকা আছে,' ফাটা চুরুটটা হাতে রেখে বললে, 'ব্যবসা করে জমিয়েছি। হট বালি চুন সরকির ব্যবসা।'

'হাজার চল্লিশ মজুরের ভেতর বিলিয়ে দিতে পার টাকাটা এখন।'

'না,' ফাটা চুরুটটা টেনে প্রায় নিভে গেছে এখন। দেখে জোরে দু'চার বার টান দিয়ে জ্বালিয়ে তুলে বললে, 'সে রকম দিতে পারলে ত লা সঞ্জা আমার মক্কেল হত-ডন্ কিক্‌স্যটের মত আশ্চর্য জিনিস ঘটিয়ে তোলবার শক্তিতে মানুষ হয়ে যেতাম আমি বনচ্ছবি। কলকাতাতে যতদিন ব্যবসা করেছি, খুব ঘোড়েল ব্যবসাদার ছিলাম, কিন্তু বাবুদের টাকা মেরেও কোনো শান্তি নেই–ওদের টাকা বিলিয়ে দিয়েও কোনো শান্তি নেই, মনিব দালালদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে কোনো সুখ শান্তি নেই। ঐ টাকা আমি একজনকেই দেব ঠিক করেছি–যদি সে নেয়।'

ফাটা চুরুটটা আস্তে আস্তে টানতে লাগল–নিভে গেছে সেটা, কিন্তু জিনিসটা খেয়ালের ভেতর নেই তার। সূর্য ডুবে যাচ্ছিল-একটা প্রকাণ্ড সিংহকে নিজের বুকের ভেতর প্রতিফলিত করে যেন; ক্ষমা নিস্তব্ধতা; খোলা চোখে সমস্ত সূর্যটাকে দেখা যায় এখন–চোখে কোনো ঝাঁজ লাগে না।

সূর্যটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে ছিল বনচ্ছবি; আলো ফাটার মুখে পড়েছে খানিকটা। 'জীবনে টাকা আর শান্তির সম্বন্ধে ওরা কি বলে?' বনচ্ছবি একটা মিহি ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নিয়ে ঘাসটাকেই উপড়ে ফেলে বললে।

'কারা?' কেমন যেন নির্দোষ দয়াময়ের মত মুখে জিজ্ঞেস করল ফাটা। এরকমভাবে ব্রাহ্মসমাজের মৃত আচার্যদের মুখে ছেলেবেলায় দেখেছিল বনচ্ছবি; মানুষের নির্দোষতার প্রমাণ, কিন্তু ব্যবসার দিক দিয়ে আর এক রকম ব্যক্তিত্ব এই মানুষটির, এবং এই দু'টো দিক–সব দিক মিলিয়ে অন্য রকম কিছু। কোনো কোনো মানুষকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না, কিন্তু টানে না তারা; কেউ কেউ স্বভাবতই এত বেশি টানে যে বিশ্বাস করে পারা যায় না–ভাবতে ভাবতে সমাজের দালানের অন্ধকারের ভেতর মানুষ ও ঈশ্বর পরিত্যক্ত নিঃশব্দ বেঞ্চিগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখ ব্যথিয়ে উঠল বনচ্ছবির।

'ধর্মের চেয়েও শান্তি সম্বন্ধে কথা বলা কঠিন, সমাজ ধর্ম হল অথচ শান্তি হল না, কিন্তু টাকা হল শান্তি হল–এরকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।'

বনচ্ছবি সেই বেঞ্চিগুলোর দিকে তাকাল আবার, আরো অন্ধকার এসে জমে পড়েছে; ভেতরের সার্শির কাঁচগুলো বাইরের আকাশের স্বল্প আলোয় ঝিকমিক করছিল এতক্ষণ; সে স্বল্পতা সরে গেছে।

'শান্তি সম্বন্ধে বলা কঠিন, কিন্তু আমার নিজের জীবনের কথা বলতে পারি–টাকা দিয়ে এখুনি কোনো দরকার নেই আমার।'

সূর্যের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললে,

'কিন্তু হবে।'

'হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু এখনি না।' বনচ্ছবি একটু হেসে বললে–কাঁচা আত্মকর্ত্রীর চেয়ে বেশি গভীরতা ও গাম্ভীর্য নিয়ে। দেখছিল ফাটা।

চুরুটটা তুলে নিয়ে ঘাসের ওপরেই আবার রেখে দিল, কুড়িয়ে নিয়ে দেশলাইয়ের বাক্সটার ওপর রেখে দিতে গিয়ে বাক্সটাকে খুঁজে পেল না সে, চুরুটটা ঘাসের ওপর ফেলে ট্রাউজারের পকেটে আলগোছে হাত ঢুকিয়ে খালি হাতটা বার করে এনে ফাটা বললে, 'টাকা নেই তোমার। থাকলে তুমি বোধ করতে পারতে যে টাকাকড়ির সঙ্গে সত্যিই শান্তির কোনো সম্পর্ক নেই।'

'টাকা অল্প স্বল্পই আছে বাবার,-আমাদেরও রোজগার করতে হবে–যত বেশি পারা যায়।' বনচ্ছবি সমাজের লাইব্রেরি ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে বললে, 'টাকা ছাড়া প্রায়ই সংসারে বা জীবনে স্বস্তি শান্তি লাভ করা কঠিন–কিন্তু অসম্ভব নয়।'

অনেক দূরে ডালপালার কালো রঙের নিচে আধাআধি ডুবে গেছে সূর্য।

'টাকা ছাড়া আরো কিছু আছে। কিন্তু মানুষ বুঝে চলতে পারলে সেগুলির মূল্য বেশি কিছু নয়। ফলে–যথেষ্ট টাকা থাকলে হয়ত শান্তি সম্ভব।' বনচ্ছবি আস্তে আস্তে বললে। শুনে ফাটা স্তম্ভিত হয়ে বনচ্ছবির দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমার যা হয়েছে তাই বলেছি তোমাকে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ত বেশি নয়। তোমার অস্বস্তি হল হয়ত।'

'আমি বলছি তোমাকে বনচ্ছবি, যথেষ্ট টাকা অনেকেরই আছে; আমার নিজেরও রয়েছে; চল্লিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে–আরো এক বছর ব্যবসা চালালে আরো পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা জমানো যায়। কলকাতায় থাকলে এত–সব টাকা দিয়ে বেশ সুখের জীবন চলে আমার; যখনই চালাতে চেষ্টা করেছি অনায়াসেই পেরেছি। কিন্তু তাতে শরীর ভাল লেগেছে, কিন্তু কোনো সুস্থিরতা বোধ করেনি। গত আট দশ বছর ধরে প্রায়ই প্রতি রাতেই বাবার কথা মনে হয়েছে আমার; তিনি এক কাপ চা আর মুড়ি খেয়ে আমার চেয়ে ঢের বেশি শারীরিক সুখও পেয়েছিলেন–কারণ তার মনে প্রথম থেকেই শান্তি স্থিত ছিল। নিজের আলোয় চলতে হয়। খুব ধনী মানী লোকও জানে টাকার আলোয় শান্তি নেই, ও আলো, আলো নয়, শান্তির আলো আলাদা জিনিস।

'তোমার দিক দিয়ে তুমি ঠিক কথা বলছ,' বনচ্ছবি বললে, 'কিন্তু তোমার মতন লোক পৃথিবীতে খুব কম।'

'সেই জন্যেই পৃথিবীতে এত অশান্তি!' কে যেন বললে।

'কিন্তু কি করে পৃথিবীর মানুষদের মন বদলাবে তুমি।' ফাটা বললে, 'আমি না, ধর্মসমাজ তা করবে। অন্য আর এক ভাবে সেন চেষ্টা করে দেখতে পারে। কিন্তু ধর্ম সমাজ ছেড়ে দিয়ে সেন কতদূর এগোবে আর?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অবিশ্যি পৃথিবীর মানুষদের মন বদলাবার কাজে হাত দেয়নি সেন।'

'কি করে দেবে, বলেছিই ত তোমাকে সে কাজটা ধর্মসমাজের; কিন্তু একদিনের নয়।'

বনচ্ছবি বললে, 'আমাদের এই ভীষণ অনিশ্চয়তার পৃথিবীতে তুমি একটা কিছু লাভ করেছ মনে হয়।' ফাটা চুরুটটা তুলে নিয়ে বললে, 'লাভ করিনি এখনো। কিন্তু এবার বাসমতীতে এসে আমার সমস্ত মন এদিকে ঘুরে পড়েছে।' চুরুট জ্বালিয়ে সূর্যের খোঁজে অনেক দূর একটা মসজিদের গম্বুজের ওপারে তাকাল–কিন্তু সূর্য ত ওদিক নয়–আকাশে নেই; নাবাল জমির নীল কালো ডালপালার ভেতরে আগুনটা মরে যেতে যেতে সোনার মতন ঠিকরে উঠছিল মাঝে মাঝে; একজন মহাপুরুষের মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছিল ফাটার। সন্ধ্যা হচ্ছে শীত করার কথা, কিন্তু আজ আবার একটু গরম লাগছে; বাতাস আছে ফুরফুরে, দেশে ভাল করে শীত পড়বার আগে–কেমন খানিকটা বসন্তের আমেজ; মেঘ নেই কোথাও,–সমস্ত আকাশটা তবু ধোঁয়া ধোঁয়া ধূসর, তারই ভেতর একটা ফাটা পাতিলের ভেতর থেকে সাদাটে এবড়োখেবড়ো চুনের গুঁড়ির মতন উঁকি দিচ্ছে যেন চাঁদ;–পরে আঁট হবে–আকৃতি লাভ করবে–উজ্জ্বল হবে। সমস্ত আকাশটা এতক্ষণ নির্ণয়ের ভেতরে ছিল ফাটার, চোখ নামিয়ে এনে মনে হল বনচ্ছবি চারদিককার আকাশ সূর্য প্রকৃতির থেকে নিজেকে রহিত করে মানুষ ও লোকসমাজের কথা আপ্রাণ চিন্তা করছে–অনেক দূরের টেকনিক্যাল স্কুলের অ্যাসবেসটসের ছাইনিগুলোর দিকে তাকিয়ে।

'সেন এলে ভাল হত।'

'তার সঙ্গে পরে দেখা হবে তোমার। সে এদিকে আসবে না। তার কাছে যেতে হয়।

'বাসমতীতে যখন থাকব ঠিক করেছি–সেনকে দিয়ে বিশেষ দরকার আমার।'

'খুব উপকার হবে অন্য নানা দিক দিয়ে। কিন্তু সমাজের কাজে লাগবে না। 'ফাটা বললে, 'আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব–দু'জন মানুষকে নিয়ে।' চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'দু'জনই যদি আমাকে ছেড়ে দেয়–তাহলে খুব মুশকিলে পড়তে হবে বাসমতীতে। আমি আমার বিরুদ্ধে ক্যাম্পের থেকে লোক ঠিক করি; একজনকে আমি শ্রদ্ধা করি; আর একজনকে–' ফাটা কথাটা শেষ না করে আকাশের একটি কি দু'টি তারার দিকে তাকিয়ে রইল।

বনচ্ছবি কি বুঝেছে না বুঝেছে ব্যক্ত না করে ফাটাকে বললে, 'সরোজিনীদি গগনকাকা এরা তোমার নিজের ক্যাম্পে ছিলেন;–এঁদের ছেড়ে যখন তুমি বিরোধীদের ভেতর থেকে লোক ঠিক করেছ দু'জনেই ডোবাবে তোমাকে।'

'ডোবাক। কিন্তু টাকার লোভে তুমি আমাকে ডোবাবে না। এই মুহূর্তেই ত দেখলাম আমি। তা তুমি দেখনি। সিনেমায় নামব না ঠিকই; কিন্তু একটা ডাক্তারি ডিগ্রী থাকলে অনেক টাকা করতে পারতাম; মাঝে মাঝে ভাবি তাই টাকা আমাকে খুব বেশি টানে।'

'তোমাকে চল্লিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলাম–কাউকে কোনোদিন সাধিনি, সাধবও না; কিন্তু তুমি নিতে চাইলে না; টাকা টানছে তোমাকে?'

বনচ্ছবি বললে, 'টানে কি না দেখে, আমাকে কলকাতার কোনো অফিসে চারশ পাঁচশ টাকার একটা চাকরি যোগাড় করে দাও। আমাকে দেখে দেখে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে।'

'সব টাকাই একই টাকা–যারা টাকা ভালবাসে তাদের কাছে,' ফাটা বললে, 'তুমি আর্থিক স্বাধীনতা ভালোবাস; ঠিকই আছে। কিন্তু সেটা টাকার ভালোবাসা নয়। তুমি আমার চল্লিশ হাজার নেবে?'–ফাটা পকেট থেকে চেক বই বের করে বললে।

'বইটা সঙ্গে এনেছ দেখছি।'

'ঘরে রেখে আসতাম–কিন্তু খানিকটা কেনাবেচার ব্যাপারে আড়তে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে সোজা এখানে এসে বসেছি–নানারকম জিনিস সঙ্গে রয়ে গেছে।'

'কোন ব্যাঙ্কের চেক?'

'গ্রিভলেজ। চেকটা এখানে তোমার নিজের ব্যাঙ্কে জমা দিতে পার–কয়েক দিন পরে টাকা পেয়ে যাবে।'

'কোনো ব্যাঙ্কে আমার কড়ি নেই।'

'তাহলে কলকাতায় গিয়ে ভাঙিয়ে আনতে পার–আমি বেয়ারার চেক দিচ্ছি–ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া দিচ্ছি তোমার আর–কাকে সঙ্গে নেবে?

'তোমাকে নিতে পারা যায়–'

ফাটা নিজের মনের সাত পাঁচের ভেতরে ডুবে ছিল, বললে 'তাহলে দশ বারো দিন অপেক্ষা করতে হবে। এখনি যদি চাও-সেনকে নিতে পার।' 'সেন কেন যাবে?' বনচ্ছবি শান্তভাবে বুঝিয়ে দিয়ে বললে, 'আমি তোমার কাছ থেকে এরকম ভাবে টাকা নিচ্ছি জানতে পারলে সে হয়ত খুব সম্ভব মিতভাষিতা আরম্ভ করবে আমার সঙ্গে; একেবারে কথা বন্ধ করে দেবার মত অভদ্রতা করবে না। কিন্তু এ টাকা ত নিচ্ছি না আমি।'

'সেনের ভয়ে?'

'সেনকে জানাবে না ত তুমি; আমিও জানাব না।' বনচ্ছবি গম্ভীর হয়ে বললে, 'তাছাড়া চল্লিশ হাজার টাকা আজকের পৃথিবীতে সেনের ভয়ের চেয়ে ঢের বেশি ভাল জিনিস।'

'কিন্তু তুমি কই তা বোঝাতে পারলে। মৈতি আমার জমিদারি চাচ্ছে–সেটা তাকে দিয়ে দিতে বিশেষ কিছু খারাপ লাগছে না আমার। কিন্তু এ টাকাটা দিতে সত্যিই ভাল লাগবে। তুমি নিলে এর চেয়ে ভাল জিনিস আর কোথাও কিছু আছে কি না আমি এখুনি তা বলতে পারছি না। 'ফাটা গাছে আরো ভাল করে ঠেস দিয়ে একটা পা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে বললে। অনেকক্ষণ পরে কিন্তু তুমি বাসমতীর দু'জন মানুষের কথা বলেছিলে যাদের দিয়ে দরকার তোমার; সেন একজন; এ টাকাটা সেনকে দেবে তুমি?'

'তুমি অনুরোধ করছ?'

'তুমি নিজের থেকে দেবে ভাবছি।'

'না।' ফাটা হাতে চুরুটটা ফেলে দিয়ে বললে, 'তা দেব না আমি। তুমি যদি দিতে বল, তাহলে তুমি একদিকে সেন একদিকে—আমি আর এক বিন্দুতে—এই ত্রিভুজের একটা মীমাংসা না করে কোনো কাজ করব না।'

বনচ্ছবি ফাটাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ধূলোর ওপর একটা অষ্টভুজ আঁকতে আঁকতে বললে, 'তাহলে সেন ঠকে যাবে—সে ত বারো বছর হল বিয়ে করেছে।'

'তাতে কিছু হয় না। তাতে কিছু আটকায় না।' ফাটা নিজের কথাটার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে বনচ্ছবির দিকে তাকাল।

'তাই বলছ তুমি—কিন্তু তুমি ধর্মসমাজে প্রবেশ করেও এরকম জ্যামিতির ছবিগুলোর কথা ভাববে?'

'না। এখন আমার সব কিছু স্থির হয়ে গেছে।'

'কিন্তু সেন সম্বন্ধে এটা যা ভেবে রেখেছ তুমি—তা খুব ভুল হল। সেন সুনীতিদি আর আমাকে নিয়ে যখন একটা ত্রিভুজ সৃষ্টি হয় না—সুনীতিকে ছেঁটে ফেলে তখন তোমাকে বসালে কি করে তা হয়? আমি আবার এদিকে একটা অক্টোগন এঁকে বসেছি। কারো জীবনে ত্রিভুজের চেয়ে অক্টোগনই সত্য? তিনটে বিন্দুর জায়গায়। আটটা বিন্দু বসাতে হবে। আমি এও দেখছিলাম গণিত সংক্ষেপে কত কথা বলতে পারে। জীবনদর্শন সম্পর্কে একটা অক্টোগন বা পলিগনের কি রকম সরস মিতব্যয়িতা।'

'হ্যাঁ, ঠিকই। মার কাছে মামাবাড়ির খবর বলছ তুমি। কিন্তু যেরকম অনেকক্ষণ ধরে বলতে চাচ্ছিলাম আমার মনে হয় সে কথার কাছে একেবারে পৌঁছে গেছি; বনচ্ছবির দিকে তাকিয়ে ফাটা বললে, একটা মীমাংসাও করতে পেরেছি মনে হচ্ছে। কিন্তু মীমাংসা করবার ভার একা আমার ওপর?'

'ওরকম কথার উত্তর পৃথিবীতে নেই।'

'কিন্তু কিছু একটা উত্তর পেলে ভাল হত।'

'কারো সঙ্গে কোনো ধর্মসমাজে প্রবেশ করতে আমি রাজি নই।'

'কলকাতার ব্যবসায়ী সমাজে যদি থাকি—তাহলে?'

'তাহলে ত নিজেকেই নষ্ট করে ফেলবে তুমি। তুমি ধর্মই চাচ্ছ।'

বনচ্ছবি বললে, 'একটা লক্ষণ আমি ভাল দেখছি না, তুমি জিনিসটাকে এত বড় করে দেখলে যে সেজন্যে ধর্মসমাজ ছেড়ে কলকাতার ব্যবসায়ী সমাজেও লেগে থাকতে রাজি হলে মনে হল।'

ফাটা বললে, 'না রাজি হইনি—তবে ধর্মসমাজটা শুধু অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে কি না সেটা জানবার জন্যে জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'আমি যদি বলি যে সিমেন্ট-টিমেন্টের ব্যবসা যে রকম করছে সেটা না চালালে জিনিসটা হতে পারবে না?'

'তাহলে আমাদের মিটে গেল; টাকার জন্যে তোমার জন্যে কোনো কিছুর জন্যেই বাসমতী ব্রাহ্মসমাজকে আমি ছাড়তে পারছি না।'

'অথচ কত সহজে তোমাকে ছেড়ে যেতে পারছি আমি।' বনচ্ছবি ম্রিয়মান দুষ্টুমিতে হেসে বললে।

ফাটা পকেট থেকে পাইপ বের করে বললে, 'তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে, সেইটেই সবচেয়ে ভাল হত। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজের আলোয় চলা ভাল। তুমি যদি বিদ্যাবুদ্ধিতে কম হতে তাহলে অনেকদিন বসে বোঝাতাম তোমাকে, প্রায় আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। কিন্তু কোনো দরকার নেই তার; তুমি ত প্রায় সেনের মতন জ্ঞানী। একটা শুধু অভাব বোধ হয় আমার এই যে তোমার জ্ঞান তোমাকে ধর্মসমাজের দিকে নিয়ে এল না কেন। কিন্তু আজকের পৃথিবীর জ্ঞানীদের ভোট নিলে টের পাওয়া যাবে যে আমি নই তুমি ঠিক পথে চলছ। চলেছ—বেশ। আমার নিজের পথ আমার কাছে সত্য। তুমি বলছ যে সেটা দেখতে আমার ভাল লাগছে।'

'কোথায় দাঁড়িয়ে?'

'তুমি ধর্মের থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলবে—আর আমি অবিশ্বাস থেকে গভীরতর অবিশ্বাসে তলিয়ে যেতে থাকব—'

'কিন্তু যতই তলিয়ে যাও না সেন সব সময়ই কাছে থাকবে ত তোমার?'

'সেন?'

'হ্যাঁ সিদ্ধার্থ।'

'হ্যাঁ। এখনো কাছে আছেন বটে, কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করবার ক্ষমতা আমার নেই।'

'আমার কাছে। সেনকে তুমি সব সময়ই তোমার হাতের কাছে পাবে।'

'আমার সঙ্গে সঙ্গে অতলে তলাবে সেন?'

'হ্যাঁ, তোমার মতন লোক তলিয়ে যাচ্ছে বলে।'

বনচ্ছবি পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সেনের মনে অনেক ধাঁধা—হাতে অনেক কাজ। আমি তার গ্রাহ্যের মধ্যে নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাটা চুরুটটা কুড়িয়ে নিল, দেশলাই হাতড়ে খুঁজে বার করে চুরুটটা জ্বালিয়ে নিতে নিতে বললে, 'তা নয়, তুমি জান না কিছু বনচ্ছবি। সুনীতির জন্যেই সিদ্ধার্থ কিছু করতে পারছে না। তুমি করতে পারছ না কিছু। তুমি যদি দশটা বছর আগে বাসমতীতে জন্মাতে তাহলে সিদ্ধার্থের জীবনের মানেই বদলে যেত।'

ফাটাব চুরুট ভাল করে জ্বলেনি–অল্প স্বল্প ধোঁয়া ছাড়ছে–ভাল করে জ্বালিয়ে নেবার জন্যে দেশলাই কাঠি ঘষছিল। বনচ্ছবি তাকিয়ে দেখল সূর্য নিভে গেছে।

'তুমি যা বলেছ তারপর আমি কিছু বলতাম না,' বনচ্ছবি বললে, 'কিন্তু তুমি সেনকে চেননি সেই জন্যেই বলছি–'

'সেনকে আমি ষোল আনা চিনিনি–এই ত বলতে চাচ্ছ বনচ্ছবি?'

'ওকে বারো আনা চিনেও তুমি কি সব বুঝতে পারবে?'

'ও সুনীতিকে ভালোবাসে না। আমি জানি।'

'কিন্তু তাই বলে সেন অন্য কাউকেই ভালোবাসে না–' অন্ধকার হয়ে পড়েছে। বাতাস ছেড়েছে। চার পাঁচটা দেশলাইয়ের কাঠি খুইয়ে চুরুটটাকে জ্বালিয়ে নিতে পেরেছে ফাটা; দাঁতে দাঁতে কামড়ে একটানা কামড়ে খানিকটা ছাই জমিয়ে নিয়ে বললে 'তাহলে পারে বনচ্ছবি। কিছু না হবারই সম্ভবনা। সিদ্ধার্থ পারলে মানুষকে না ভালোবেসে পারে না। শুধু প্রেমিক নয়। শুধু কি তাই? বাসমতীতে ওকে কত বড় প্রেমিক বানিয়েছ তুমি জান না। ও জানে–কিন্তু বাইরে কিছু বলবে না; ওর হালচাল দেখে কারো কিছু বোঝার সাধ্য নেই।'

অন্ধকার হয়ে গেছে। চাঁদ উঠবে অবিশ্যি–কিন্তু দেরী আছে। কোনো মেঘ নেই, কিন্তু বাতাস দিয়েছে, আঙুল প্রমাণ মেঘ কোথাও বা কোথাও রয়েছে হয়ত, দল বেঁধে জমতে কতক্ষণ? কালকের মতন একটা সাইক্লোনের লক্ষণ অবিশ্যি কোনোদিকেই নেই। বেশ নিরিবিলি অন্ধকার; চারদিককার দেবদারু, ঝাউ নীল আর হারিতের একটানা সঙ্গীতে কতক্ষণ যে আলোড়িত হয়ে চলেছে অবাক হয়ে ভাবছিল ফাটা।

'তুমি বাঁ হাতে কলকাতার সিমেন্টের কারবার কর বুঝি? আর ডান হাতে বাসমতীর নাড়ী টিপে দেখ?'

'আমার বাবা বড় কমলবাবুর সে গুণ আমি দেখছি। তিনি অবশ্য মানুষের দৈহিক রোগের নিদান ঠিক করতেন–নাড়ী টিপে–মনের রোগেরও' ফাটা চুরুটা টানতে টানতে বললে।

'সেনকে যদি আমি প্রেমিক বানিয়ে থাকি সেটা আমার দোষ?' বনচ্ছবি বললে।

'না।, সেনেরও দোষ নয়।'

'তবে?'

'দোষ পৃথিবীরও নেই কিছু।'

'অনেক দূর ত এগোলে নীরেনদা–'

'দোষ তোমাদের তিনজন নক্ষত্রের।' ফাটা চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে দেশলাইয়ের বাক্সটার ওপর দিয়ে বললে।

কাছে কোথাও মৌমাছির ঝাঁক বেঁধেছে হয়ত, দু' একটা মাছি ছটকে এসে মাটির ওপর পড়ল–বনচ্ছবির পায়ের কাছে, ফাটা দেখেনি, মৌমাছির দিকে তাকিয়ে দেখবার মত মন বনচ্ছবিরও ছিল না।

'এতসব সিদ্ধান্তে পৌছবার আগে তুমি সেনকে জিজ্ঞেস করে দেখো নীরেনদা। সে মিথ্যে কথা বলবার মানুষ নয়–তোমার কাছে ত কিছুতেই বলবে না।'

'সেনকে খুঁচিয়ে আমি কি বলব। সব ত জলের মতন সত্য।'

'কেন, সে তোমাকে বলেনি যে সে তোমাকে ভালোবাসে?'

মৌমাছিটা ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বনচ্ছবির পায়ের ওপর এসে পড়েছে। হুল ফুটিয়ে দিলেই হয়েছে। হাঁটুক–হেঁটে চলুক পায়ের ওপর, হুল ফোটাবে না। উড়ে যাবে শিগগির এক সময়।

'কথা বলার মানুষ নয় সেন।' বনচ্ছবি বললেন।

'গত সাত আট বছরে নানা ব্যাপারে তোমরা দু'জনে ত খুব কাছে কাছে এসেছ বাসমতীতে। কথাটা মুখ দিয়ে একবারও বেরুল না সেনের?' ফাটা চুরুটে টান দিয়ে বললে।

মৌমাছিটা শাড়ির ওপর এসে পড়েছে, এসে নেমে আছে এক জায়গায়।

একটা টোকা দিলেই উড়ে পড়ে যেত। থাকুক।

'তুমি নিজেও কি বলোনি তাকে একবারও?'

'কী কথা?'

'তুমি যে তাকে ভালোবাস–'

'আমি নিজে সেটা স্থির করে উঠতে পারিনি সে কথা কি করে বলব তাকে?'

ফাটা চুরুট টানতে টানতে বললে, 'সবই স্থির করা আছে, অথচ কিছুই স্থির হল না।'

বনচ্ছবি হেসে বললে–'মানে নক্ষত্রের দোষ।'

মৌমাছিটা আবার চলতে শুরু করেছে–বনচ্ছবির শাড়ির ওপর দিয়ে। কোথাও আঘাত পেয়েছে নাকি মাছিটা? ওড়বার ক্ষমতা নেই আর?

খানিক এগিয়ে থেমে রয়েছে আবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নক্ষত্রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে চুপ করে থাকবার মত মন আমার নেই। আমি যা কামনা করি তাকে পেতে হলে নক্ষত্র আমাকে বাঁধা দেবে কেন?'

'তা দেয়। সেই জন্যেই কিছু হয় না বনচ্ছবি?'

ছাতুবাবু গ্যালারির থেকে নেমে–সমাজ মন্দিরের উঠানে নেমে–নিজের মনেই অন্ধকারের ভেতরে কোনো একদিকে চলে গেছে যেন। বিশাখা এল না আর, হঠাৎ এক হালকা বাতাসের ধাক্কা খেয়ে মৌমাছিটা বনচ্ছবির শাড়ি থেকে ঠিকরে পড়ল ঘাসের ওপর আবার। উড়ে গেল না তবু। আবার আসবে বুঝি ঘাস বেয়ে বনচ্ছবির শাড়ির ওপর।

'ওঠ নীরেনদা।'

'আমি আরো কিছুক্ষণ বসব এখানে।'

'বড় কমলবাবুর মতন ভাব এসেছে বুঝি তোমার মনে?'

'এখন কোথায় তুমি যাবে বনচ্ছবি?'

'সেনের কাছে একটু যেতে হবে–সেই নাইট স্কুলের ব্যাপার নিয়ে।'

'কোথায় পাবে তাকে?'

'তার বাড়িতেই।'

'পাবে বলে মনে হয় না। পরশু রাতে ত দেখলে, সারা রাতের মধ্যে বাড়ি ছিল না।'

'কাল রাতে সেনদের কি হল? কালকের ঝড় তুফানের সারারাত বাইরে বাইরে ছিল নাকি সেন?'

'অসম্ভব নয়।'

'আমি সাত মাস ধরে সেনকে পাচ্ছি না নীরেনদা। অথচ বাসমতীতে রয়েছি আমরা সব।'

ফাটা বললে, 'খুব ভাল করে খুঁজলে নিশ্চয়ই পেতে পারতে। কলেজ গিয়েও ত সেখানে পারতে দু'চারবার।'

উড়ে গেল মৌমাছিটা। বনচ্ছবি উড়ন্ত মাছিটাকে অন্ধকারে ডুবে যেতে দেখে চোখ ফিরিয়ে এনে বললে, 'অনেকবার গিয়েছি কলেজে গিয়েছি নীরেনদা। অতবড় একটা ছেলেদের কলেজে একজন প্রফেসরের খোঁজে আমাদের যে বার বার যাওয়া ভাল নয় সেটা প্রথমে না বুঝলেও নানা কারণে ঠেকে শিখতে হয়েছে।'

ফাটা চুরুট টানতে টানতে বললে, 'কেন, কী হল?'

'অনেক নচ্ছার জিনিস আছে ওখানে–শিক্ষিতদের মধ্যেও।'

'ও–'

'গত দেড় বছর কলেজে যাইনি আর তাই।' বনচ্ছবি দূরের গাছপালাটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু আজ যদি সেনকে বাড়িতে না পাই–তাহলে কাল একবার কলেজে যাব ভাবছি।'

একটু চুপ থেকে বললে, 'নাইট স্কুলের কাজটা খুব জরুরি।'

ফাটা চুরুট টানতে টানতে বললে–'এই কলেজে কি তুমি পড়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'সেন পড়িয়েছিল তোমাদের?'

'হ্যাঁ, সেইবারেই প্রথমে কাজ নিল এ কলেজে।'

'তোমার সময় এই প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন?'

'না।'

'ইনি কেমন?'

'চেন না একে?'

'না।'

'আমিও চিনি না খুব ভাল করে। আলাপ করে নিতে পার তুমি। একটা বড় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল–আলাপ করে খুশি হবে মনে হয়।' বনচ্ছবি বললে, 'তুমি এই কলেজে একটা প্রফেসারি নিলে খুব ভাল হয় নীরেনদা।' ফাটা চুরুটে টান দিয়ে বললে, 'তুমিও এস না এম- এ পাস করে–এই কলেজে মেয়েদের ডিপার্টমেন্টে।'

'আমার লোভ আছে,' বনচ্ছবি বললে, 'কিন্তু শক্তি নেই। সেন নাকি এই কলেজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে?'

'কে বললে?'

'সেনের নিজের মুখে অবিশ্যি শুনিনি। কিন্তু কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি বিশ্বাস করি না। সেন বাসমতী ছেড়ে কোথাও যাবে বলে মনে করি না।'

'যাবে না?–এখানে কি আছে সেনের?'

বনচ্ছবি বললে–'ওর ভালোবাসার মতন বিশেষ কিছু নেই। তবু নানা রকম ভালোবাসার জিনিস গড়ে তুলতে চায়। তুমি যেমন ব্রাহ্মসমাজটাকে গড়ে তুলতে চাচ্ছ বাসমতীতে এসে।'

বনচ্ছবি অন্ধকার সমাজ মন্দিরটার দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'কিন্তু কথা রইল তবুও যে কেন কাজ নিয়ে কলকাতায় চলে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম না কিছু।' ফাটা চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে রেখে বললে,' বোঝবার দরকার নেই। জলের মতন পরিষ্কার। ও যাবে না কোথাও। তুমিও থাকো বাসমতীতে।'

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুরুটটা টানবার উপক্রম করে মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে ফাটা বললে, 'বনচ্ছবি', সময়ের লীলা আশ্চর্য। আরো ক'টা বছর থেকে যেয়ো না বাসমতীতে। অনেক ওলট পালট হয়ে যাবে। আমি যে নক্ষত্রকে দুষছিলাম তুমি হয়ত আশীর্বাদ না করে পারবে না তখন।'

কিছুক্ষণ পরে বনচ্ছবি বললে, 'তুমি ত অনেকক্ষণ ধরে চোখ বুজে আছ নীরেনদা।'

'হ্যাঁ, একটু বড় কমলবাবুর মতন হয়ে এসেছে মনে হচ্ছে।'

'গান গাইবে?'

'না, এখন নয়, পরে।' ফাটা চোখ মেলেই বললে, 'একটু বসে থাকব কিছুক্ষণ. দেখি তেমন কিছু ঘটে কি না যাতে তোমার কথা মনে থাকবে না আমার, সেনের কথাও না। অথচ মনটা লেগে পড়ে থাকবে এমন যে ভালই লাগেব না, ভাবনাই হবে। বড় কমলবাবুর যেমন হত।'

বনচ্ছবি বললে, 'আমি উঠি নীরনেদা। আমি এখানে থাকলে তোমার সাধনায় বাঁধা পড়বে।'

'না, তা কিছু হবে না। কিন্তু তুমি চলে যেতে চাচ্ছ। আচ্ছা তাহলে এস বনচ্ছবি।'

'কাল কি তুমি এখানে থাকবে?'

'কখন?'

'বিকেলে?'

'না। রাত্তিরে থাকব।'

'তুমি ক'দিন আছ বাসমতীতে?'

'সাত আট দিন।'

'চলি নীরেনদা।'

'এসো।'

বনচ্ছবি উঠে দাঁড়িয়ে নীরেনের বোজা চোখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কোথাও কোনো শব্দ নেই। বনচ্ছবি আছে কি গেছে–ঘাসের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেছে কি না মুদ্রিত চোখ মেলা না নীরেনের।

বনচ্ছবি গুটি গুটি চলে যেতে যেতে ভাবছিল বসে থাকলে সে পারে হয়ত কিছুক্ষণ নীরেনের কাছে। কিন্তু রাস্তায় উঠে মনে হল সেনের সঙ্গে আজ রাতে দেখা না হলে কিছুতেই চলবে না। একটা সাইকেল রিকশা ভাড়া করা যাক ঘণ্টা হিসেবে। সেনের ত অনেক ঘাঁটি; কোন ঘাঁটিতে পাওয়া যায় দেখা যাক। কোথাও না পাওয়া গেলে বাসমতীর মাঠে আজকাল অনেক রাতে সেনকে দেখা যায় নাকি–তা কেউ কেউ বলাবলি করে চিরদিন ধরে শুনছিল বনচ্ছবি। সেখানেও যেতে হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

জীবনযাপন

অজিত চায়ের কাপটা টেবিলে রাখতেই দরজা ঠেলে তারকবাবু ঢুকলেন–

অজিত বললে–বসুন রাঙাখুড়ো–এই রাজেন চেয়ার দে–

রাজেনকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না, কোনো প্রয়োজনও ছিল না, অজিত নিজের হাতেই শশব্যস্তে চেয়ার টেনে দিয়ে বললে–বসুন–তারপর কি মনে করে রাঙাখুড়ো–তামাক দেব?

–না না না তামাকের কোনো দরকার নেই–দিলেও তোমার এখানে আমি খাব না তো।

অজিত বিস্মিত হয়ে বললে–কেন রাঙাখুড়ো–

–না–না–না–

অজিত ঘাড় হেঁট করে আধ মিনিট চুপ থেকে বললে–সব ভাল রাঙাখুড়ো?

–সব ভাল–

তারকবাবু কোঁচানো চাদরের জোড় একবার ঘাড়ের থেকে উঠিয়ে আবার বিন্যস্ত করে নিয়ে বললেন–বড় আঘাত পেয়ে তোমার কাছে এসেছি অজিত–

–আপনি আঘাত পেয়েছেন?

–হ্যাঁ অজিত।

–কেন?

–অজিত, তুমি শেষ পর্যন্ত থিয়েটারে নামলে?

অজিত ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হয়ে তারকবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল।

তারকবাবু বললেন–তোমার বাবার কথা কি তুমি একটুও মনে কর নি?

অজিত কোনো কথা বললে না।

–তোমার মাকেও ভুলে গিয়েছিলে?

অজিত কোনো উত্তর দিল না।

–তোমার মা সেই ছেলেবেলা থেকে কত যত্ন করে তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন–

অজিত বললে–রাঙাখুড়ো–

তারকবাবু বাধা দিয়ে বললেন–তারপর বি-এ পাস করলে–এম-এ পাস করলে–

–হ্যাঁ

–তোমার চরিত্র তোমার বাপের মত মর্যাদা পেল–অন্তত আমরা তাই ভেবেছিলাম–অনেক দিন অব্দি ভেবেছিলাম–কিন্তু তোমার যত অধঃপতন হোক না কেন–এ সব দিকে যে তুমি আসবে কোনোদিন এ কথা তো আমরা কল্পনাও করতে পারি না–

অজিত বললে–এসে পড়লাম।

–এসে পড়লে? থিয়েটারে? মহিমের ছেলে হয়ে?

তারকবাবু বললেন–তোমাদের পরিবারকে আমি চিরজীবন ধরে এমন শ্রদ্ধা করে এসেছি অজিত। এ পরিবার বামুন বা কায়েত বা কোনো সদ্বংশজাতহিন্দু পরিবার বলেই নয়–কিন্তু এর মনুষ্যত্বের জন্য। তোমার ঠাকুর্দ্দা আমার বন্ধু ছিলেন–তামাকটি অব্দি ছুঁতেন না–কোনো দিন কোনো মজলিস মজুরোয় তাঁকে দেখি নি–সঙ্কীর্তন ছাড়া অন্য কোনো গান তাঁর অত্যন্ত উপেক্ষার জিনিস ছিল–স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোনো রকম প্রেমই তিনি কোনো দিন স্বীকার করতেন না। মেয়েমানুষের শরীরের কোনো রকম ব্যাখ্যাও কেউই কোনো দিন তাঁর কাছে করতে সাহস পেত না, পরস্ত্রীর দিকে তিনি ভুলেও কোনো দিন তাকাতে যেতেন না,–অথচ উদার–হৃদয়ের কত সৌন্দর্যে ঐশ্বর্য্যশালী মানুষ–তোমার বাবাও তো ঠিক তাঁরই মত–সব বিষয়েই তোমার ঠাকুর্দ্দার মত।

একটু থেমে তারকবাবু বললেন–আমি ভেবে পাই না তাঁদের বংশের সন্তান হয়ে তোমার বাপমায়ের হাতে চরিত্র গড়ে কি করে তোমার এ রকম অবস্থা হ'ল–

তারকবাবু হতভম্ব হয়ে অজিতের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অজিত একটু হেসে বললে–এই কথা রাঙাখুড়ো?

–কথাটা কি সামান্য অজিত?

–আপনার কাছে নয়–

–থাক, তর্ক করব না বড় দুঃখ পাই। তবুও এই কথাটুকু নিয়েও তোমার কাছে আসতাম না আমি যদি না জানতাম তোমার ভেতর তোমার বাবার মতই একটা চমৎকার মর্যাদা আছে–

–সে মর্যাদা আমি হারিয়ে ফেলি নি কি?

–চরিত্র খারাপ হ'লেও অনেক সময় তা হারায় না-

–হারায় না?

–না

–কিন্তু আমার চরিত্র খারাপ হয়েছে এ কথা কেন বলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এ সব দিকে এলে তা খারাপ হয়ই—

এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে অজিত বললে—অনেক দিন আপনাদের নানা জনের সঙ্গে আমার দেখানেই রাঙাখুড়ো—কিন্তু আপনারা সকলেই কি এই কথাই বলেন?

—হ্যাঁ, আমরা সকলেই এই কথা বলি—

—আপনার ছেলেরাও?

—হ্যাঁ

—আপনার নাতি নাতনীরাও?

—আমার ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী বলেই তো নয়—এমন অনেক সন্তান সন্ততি পরিবার রয়েছে যারা তোমার এ রকম পরিণতি দেখে অত্যন্ত দুঃখ করে, কেউ কেউ তোমাকে খুব ঘৃণাও করে অজিত—

তারকবাবু থামলেন

—রানীদিও দুঃখ করে বুঝি?

—কে, রানী?

—হ্যাঁ

—সে তো করেই

—কি বলে—?

—কিন্তু রানী একা বলেই তো নয়—এমন অনেক মা বধূ কন্যা রয়েছেন যাঁরা এতে অত্যন্ত কষ্ট পান, খুব গ্লানি বোধ করেন।

অজিত বললে—কিন্তু রাঙাখুড়ো রানীদি কি বলে?

—রানী?

—হ্যাঁ

—রানী বলে—তারকবাবু একটু কেশে বললেন—রানী বলে যে অজিতের এ রকম দুর্ভাগ্য হবে তা স্বপ্নেও ভাবে নি—

তারকবাবু চুপ করে রইলেন—

অজিত চুপ করে রইল।

তারকবাবু বললেন—রানী তো খুব বেশি কথার মানুষ নয়—এই টুকুই বলে—

অজিত তারকবাবুর দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল—

একটু পরে বললে—কিন্তু রানীদিকে বোলো—

—এ সব নিয়ে রানীকে আমি কিছু বলতে পারব না।

—আচ্ছা, আমি গিয়ে তার সঙ্গে একদিন দেখা করব।

—তা যেও না।

—রানী দেখা করবে না?

—আমি বারণ করব।

তারকবাবু বললেন—কিন্তু তুমি এ সব ছেড়ে দিলে পার—

—ছেড়ে দেব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা সকলেই তাই চাই—

—আপনারা চান?

—নিশ্চয়ই—তোমার বাপমার মনেও কত দূর আঘাত দিয়েছ তুমি—তোমার বংশের মানসম্ভ্রমও কত দূর ছোট করে ফেলেছ—তোমার যে রকম চরিত্র ও মর্যাদার সম্পদ ছিল তা নিয়ে একবার ভেবে দেখ তো অজিত।

তিন চার মিনিট চুপ থেকে অজিত বললে—ভেবে দেখেছি রাঙাবুড়ো। ভেবেছিলাম রানীদির সঙ্গে একদিন দেখা করতে যাব—কিন্তু তা হবে না। আমি যদি খুব ভালো অভিনয় করতে পারি তাহ'লে হয়তো একদিন এক দল আমাকে মাথায় তুলে নেবে; তাতে আমার খুব ভালো লাগবে কিনা বলতে পারি না—কিন্তু মা বা বাবা বা আপনি বা রানীদি যে কোনো দিন আমাকে বুঝাবেন না, এ আঘাত চিরদিনই আমার আঁতে লেগে থাকবে। জীবনের অত্যন্ত গৌরবের মুহূর্তেও এই কথা ভেবে আমাকে অনেক ঢোক গিলতে হবে—

তারকবাবু বললেন—এতই যদি বোঝ তাহ'লে আর থাক কেন এ সবে?

—থাকি—আপনারা আপনাদের মত করে বোঝেন—তাও আপনাদের অপরাধ নয়। আমি আমার কল্পনা ভালোবাসা বিচার বিবেকের অনুসারে চলি—

—এখানেও আবার বিবেক?

—তা আছে বৈকি রাঙাখুড়ো।

তারকবাবু গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

অজিত বললে—প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটা ভালোবাসার জিনিস থাকে—

—তুমি তো এম-এ পাস করেছিলে—

—তা করেছিলাম—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–তারপর কোন ফার্মে কেমিক্যাল অ্যানালিস্ট হয়েছিলে, না?

–হ্যাঁ

–কত মাইনে ছিল?

–শত দেড়েক।

–তারপরেও প্রফেসরি পাওয়া? না?

অজিত ঘাড় নেড়ে বললে–পেয়েছিলাম–

–খুব বড় কলেজেও।

–কলেজটা মন্দ বড় নয়–

–এই সব সৎ পথ শিক্ষা-দীক্ষা শ্রদ্ধা মর্যাদার পথ ছেড়ে দিলে কেন তুমি–

অজিত একটু হেসে বললে–এক দিন লেকচার দিতে দিতে একটা প্র্যাক্টিক্যাল একসপিরিমেন্ট শুরু করতে গিয়েই দেখি সমস্ত ঘর আগুনে ভরে গেছে–

–কে?

–ভুল হয়ে গিয়েছিল; আর একটু হ'লেই সকলকে পুড়িয়ে মারতাম। এ রকম অল্প বিস্তর ভুল রোজই একটা আধটা হতে লাগল রাঙাখুড়ো। কেন জানেন? এ সব জিসিনের ভিতর আমার মন ছিল না। এ সব জিনিসের জন্য কোনো মমতা ছিল না–কোনো হৃদয় ছিল না–

–মমতা থিয়েটারের জন্য হ'ল?

–প্রথমে আমি কবিতা লিখতাম–

–সেও তো বেশ ছিল–

–কিন্তু বুঝলাম ঠিক হচ্ছে না; কলম ছেড়ে দিয়ে ভাবতে লাগলাম কেন এ সব খোঁচ–এ রকম গরমিল কেন সব লেখার ভিতর? বুঝতে পারলাম এ সব নিয়ে মাথা ঘামাতেও চায় না যেন মন–আমি অন্য কিছু চাই যেন–

–অন্য কিছু শেষ পর্যন্ত এই সব গোবরের পাঁকের ভিতর গড়াল? তারকবাবু গলা খাকরে নিয়ে অজিতের দিকে তাকালেন–

অজিত বললে–পরের কবিতা আওড়ে যেন ভালো লাগত–ইংরেজি কবিতা। লিয়ার আবৃত্তি করে এমন ভালো লাগল আমার। অনেকেই মুগ্ধ হ'ত; নিজের জীবনের ভিতর আমিও এমন একটা আস্বাদ বোধ করতে লাগলাম কি বলব আপনাকে রাঙাখুড়ো! তারপর–

তারকবাবু বললেন–কিং লিয়ার সে তো বেশ ছিল–এটুকু আবৃত্তি করেই তুমি থামলে না কেন অজিত–

–কিন্তু বাংলা গল্পের আমাদের বাঙালির জীবনের কথাবার্তা নিজের মনের মত ক'রে বলতে পারলাম এমনই মনের মত করে যে নিজেই অনেক সময় বিমুগ্ধ হয়ে বসে থাকতাম, ভাবতাম এই তো কথাবার্তা যা কত সময় আমরা বলি, কত সময় আমরা শুনি–এই তো সব ভাব রস যা এমন কিছু গভীর ধোঁয়ার জিনিস নয়, কিন্তু তবুও এই সব উপকরণ ব্যবহার করেই যতক্ষণ না কবি তার বিধাতার মত হাত নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে একটা গল্প তৈরি করল ততক্ষণ এ সবের মর্যাদা আমরা বুঝতে পারলাম কৈ?–তার পর আমি এলাম আমিও কবি; নট আমি–মানুষের জীবনের গল্পের আশা সাধ বিচ্ছেদ নিষ্ফলতার আমিও এমন মর্যাদা দিলাম যে লোকে গল্প লেখককেও ভুলে গেল–

অজিত হো হো করে হেসে উঠল–

তারকবাবু হয়তো শুনছিলেন না কিছু–

অজিত বললে–একটা অত্যন্ত অবজ্ঞেয় বইয়ের সাহায্যেও আমরা মানুষের হৃদয়কে অধিকার করে রাখতে পারি। বাংলা স্টেজে এ রকম বইই ঢের; সে সবের কোনোই সাহিত্যিক মূল্য নেই–জীবন সম্বন্ধেও কোনো ধারণা নেই। থিয়েটারে যে নেমেছি রাঙাখুড়ো অনেক নিজিসই আমি চাই–যে সব বই জীবন সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞ, যে সব কলম বিধাতার কল্পনা বিচার বুদ্ধি দুর্বুদ্ধি, সফলতা ব্যর্থতার নাড়ীর খবর সবচেয়ে গভীর ভাবে রাখে সে সব লেখা দিয়েই স্টেজ জমাতে চেষ্টা করব এখন, শুধু হৈ রৈ বা অবাস্তবতা দিয়ে নয়। এই একটা জিনিস রাঙাখুড়ো। আর একটা হচ্ছে এই–স্টেজের প্রতি লোকের বিরূপ বিরস ভাব আমি ঢের কমিয়ে আনতে চেষ্টা করব। আমি আস্তে আস্তে বোঝাব তাদের যে এই বইগুলো জীবনের পক্ষে যেমন মূল্যবান–এদের অভিনয়ও তেমনি; শুধু তাই নয়–অভিনয়েরই একটা মূল্য আছে–একটা ঐশ্বর্য্যভরা কবিতা বা গান বা ছবির যে মূল্য দাও তোমরা তত দূরই। আমি দেখেছি অনেক বাড়িতে বিশ্রী বীভৎস ছবি সব চিন্তাহীন কবিতা প্রবন্ধের এক একটা লাইব্রেরী নির্বোধ গান সব গানের বই গানের খাতা–এই সব–সবই নির্বিবাদে হজম করছে তারা–কিন্তু ছেলেরা যে পাড়ায় স্টেজ বেঁধে হয়তো তাদের নিজেদের লেখা একটা বই, কিংবা বাংলা সাহিত্যের কোনো সম্পদময় গল্প অভিনয় করতে চাচ্ছে এ তারা সহ্যই করতে পারে না।

–আমিও তো পারি না।

–এ কি উচিৎ রাঙাখুড়ো?

–তোমার ঠাকুদ্দার কথা মনে কর অজিত?

–কি মনে করব?

–তিনি পরের স্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকাবেন না–

–অভিনয় করতে গেলেই মানুষ তাই করে নাকি?

–সেই রকম ভাব এসে পড়ে নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–একেবারেই না।

–কি বল তুমি?

–যে নট–আর্টিস্ট আমি তার কথা বলি?

–কি করে যে?

–একজন সচ্চরিত্র বুড়ো হেডমাস্টারের চেয়ে তার ঐকান্তিকতা একটুও কম নয়–

–তুমি যা খুসী কর অজিত–কিন্তু বাজে কথা বোলো না–আমাদের দিগম্বর মুখুয্যের সঙ্গে তুমি নটনটীর তুলনা কর–তুমি মহিমের ছেলে হয়ে। ঢের হয়েছে–ঢের হয়েছে–এখন আমি উঠি–

–আচ্ছা নমস্কার রাঙাখুড়ো–

–তুমি ঐকান্তিকতার কথা বলেছিলে?

–হ্যাঁ

–চরিত্রও তোমাদের ভালো–

–যে যে জিনিসকে ভালোবাসে তার সাধনায় যায় যদি, তার না সে? ধূলো লেগে পড়ে সেটা নিয়ে অপরে এত মাথা ঘামাতে যায় কেন? ধূলোকে তো সে নিজেই ধূলো বলে বোঝে–যথাসময়ে ফেলে দেয়। তার সাধনা কত দূর সত্য হ'ল এই নিয়েই কি বিচার করা উচিৎ নয়। ধূলোই যদি তাকে গিলে ফেলে তা হ'লে সে উকীলও নয় হেডমাস্টারও নয় দারোয়ানও নয় কবিও নয় নটও নয়–কিছুই নয়–

তারকবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে অজিত তৃপ্তি পাচ্ছিল না–

জানালার ভিতর দিয়ে অনেক দূর অব্দি মেঘ ও আকাশের দিকে চেয়ে অজিত বললে; একজন মানুষ বাস্তবিকই যখন তার অন্তঃসার হারিয়ে ফেলে তখন সে দারোয়ান হবারও যোগ্য হয় না–নট ঢের বড় জিনিস রাঙাখুড়ো–

–কিন্তু আমার ছেলেকে নাতিকে তো কখনও সে রকম স্টেজ বাঁধতে দেব না–

–তারা যদি না চায়–

–চাইলেও দেব না।

–আমাদের বাড়ির লোকেরাও ঠিক এই রকম করত–

–যাদের ধর্মবোধ আছে তারাই করে–

–ধর্মবোধ?

–আমাদের বাড়ির মেয়েদের ওপর কড়া হুকুম আছে–

–জানি দেখাও নিষেধ তাদের।

–কোনো ভদ্র মজলিসেরও গানে যোগ দেবার অনুমতি তাদের নেই–

–জানি আমি অনেক কিছু অনুমতিই তাদের নেই। অনেক সময়ই ভাবি কি নিয়ে থাকে তারা। জীবনকেই বা এতভয় পায় কেন?

–জীবনকে?

অজিত বললে–আপনাদের এই পরিবার কিম্বা আমাদের পরিবারই শুধু নয়–এমন অনেক পরিবার আছে জীবনের সংস্পর্শে আসলেই ভয় পায়–

(পাণ্ডুলিপির খাতায় এর পর দুই পৃষ্ঠা লেখেন নি।)

অজিত বললে–করুণাবাবু

–আজ্ঞে

–আমি ভেবেছি একটা নতুন বই নেব

–কি বই?

–এই ধরুন এমন একটা বই যার বেশ সাহিত্যিক মূল্য আছে–

–তার মানে?

–ভালো ভাব–ভাষা–তাছাড়া–

–হুঁ?

–মানুষের জীবনটা বুঝতে গিয়ে কোথাও ফাঁকি দেবার চেষ্টা নেই। এই সত্য প্রচেষ্টার ভিতর তবুও এমন একটা সংসত্য রয়ে গেছে যে অনেক দুঃখ অনেক গ্লানি বিচ্ছেদ ও নিষ্ফলতার এই জীবনটাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে না–এর গভীর মূল্যের কথা ভেবে আপনাদের অবাস্তব নিয়ে পড়ে থাকতে ভালো লাগে না আর–

–আমাদের অবাস্তব?

–আপনাদেরই–

–কি রকম?

–মহাভারত পুরাণ রামায়ণ ইতিহাসের থেকে ঢের নেওয়া হয়ে গেছে–মহাভারতীয় নাটকটা আপনারা চালাচ্ছেন সেটা থামিয়ে দিন এখন–

–বল কি দেড়শো রাত ধরে চলেছে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–আরো দেড়শো রাত হয়তো চলবে–

–নিশ্চয় দেড় হাজার রাতও চলতে পারে–

–টাকা আপনারা খুব পাবেন–লোকের বাহবাও পাবেন, কিন্তু স্টেজের কর্তব্য কি এইই শুধু–?

–লোকেরা তো এইই চায়–

–যাকে আপিং খাওয়া শেখানো হয়েছে সে আপিংই চায়।...যাক, আমি উপমা দিয়ে কথা বলব না। আমি এই কথা বলতে চাই করুণাবাবু যে আমাদের বাংলাদেশে এমন এক আধ জন লেখক আছেন যে জীবনটাকে সত্য ভাবে বুঝতে গিয়ে যাঁরা খুব কঠিন হয়ে ওঠেন নি–আর কঠিন হ'লেও তা কোনো অপরাধের নয়, আমার নিজের মনের ভিতরেও কেমন একটা বিরূপ নিষ্ঠুরতা নেই যে তা নয়–কিন্তু সে যাক, জীবনটাকে সত্যিকারভাবে বুঝবার মত প্রতিভা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েও দু'এক জন লেখক তাদের আন্তরিক সংসত্য এমন অক্ষুণ্ন রেখেছে দেখলাম যে সেটা আমারও ভালো লেগেছে–আপনারও লাগবে–সে সব বই স্টেজে যারা দেখতে আসবে তাদেরও খারাপ লাগবে না–

–অবিশ্যি সে রকম বইএ আমরা নেই; যা লোকের ভাল লাগে তা নেব না কেন;

–আচ্ছা তাহ'লে বেছে দেব আমি?

–এখন নয়

–কেন?

–আপনি নতুন এসেছেন–মানেন না তো?

–কি মানতে হবে?

–স্টেজ একটা ব্যবসা। একটা নতুন বই নেবার আগে আমাদের ঢের ভাবতে হয়। আপনার যা ভালো লাগে সকলের তা ভালো লাগে না। এই মহাভারতের নাটকটাকে অনেক সময়ই মিথ্যা হৈ রৈ বলে আপনি আক্ষেপ করেছেন; আজ যদি লঙ্কায় বা কুরুক্ষেত্রে আবার তেমনি সেই সব যুদ্ধ বাধে, দেবতারাও বিস্মিত হয়ে আকাশ থেকে তাকিয়ে দেখেন–কিন্তু তবুও আপনার হৃদয়কে সে সব বড় একটা স্পর্শ করে না। কিন্তু আমাদের দেশের লোকদের তো সেই সবই ভালো লাগে-মেয়েদেরও; আমারও। দেবতাদেরও এক দিন ভালো লেগেছিল–আজো লাগে। এর কি করবেন আপনি?

–এ আমাদেরই অপরাধ–

–কেন?

–এত দিনেও আমরা মানুষের রুচি তৈরি করতে পারি নি?

–সে কি স্টেজের কাজ?

–স্টেজেরই।

করুণাবাবু একটু টিটকারি দিয়ে বললেন–আপনি হয়তো ভালো অভিনয় করতে পারেন। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট আপনার হাতে দিলে আর রক্ষা ছিল না–

–কেন?

–তা হ'লে দু'দিনেই এক একটা থিয়েটারকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারতেন আপনি–

অজিত আস্তে আস্তে চুরুটটা জ্বালাল।

করুণাবাবু বললেন–আপনি হয়তো বার্ণার্ড শ-কে আমাদের স্টেজে টেনে আনতে চাইবেন–বলবেন সেই ধরনের নাটক চাই।

–না, তা আমি বলব না

–আজকাল কেউ কেউ এমন কথাই তো বলে–

–শয়ের মত লেখক আমাদের দেশে একজনও নেই

–তা আমি জানি

–কোনো দিন হবেও না হয়তো।

–তাও বটে

–যদিও বা হয় তাতে আমার আক্ষেপ বড় একটা ঘুচবে না

–কেন?

–বার্ণার্ড শ-কে আমার ভালো লাগে না–

–কি রকম?

–জীবনটাকে বুঝতে গিয়ে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা তাঁর হয়তো নেই-কিন্তু সমস্তই কেমন একটা ভোজবাজীর ব্যাপার বলে মনে হয়। আমি যাকে ভালোবাসি সে মেয়ে শয়ের নায়িকার মত কথা বলে না, বললে আমার ভালোও লাগত না, আমিও শয়ের নায়কের মত অনুভব করি না, কথা বলি না; পৃথিবীর খুব কম লোকই তেমন ভাবে অনুভব করে–ও রকম ধরনের কথাবার্তাগুলোকেও একটা দায়ীত্বের মত মনে করে শুধু। ও একটা প্রবন্ধকারের জন্য। হয়তো কোনো ভবিষ্যৎ জীবন ঐ রকমই সজাগ সচকিত ও চতুর লোকে ভরে উঠবে কিন্তু আজকের জীবনের সংসত্যকে অন্তত ও রকম ভাবে হারিয়ে ফেলতে উপদেশ দেই না আমি আপনাদের–

–দিলেও তা গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই আমাদের–

–কিন্তু নতুন বইয়ের দরকার আমাদের–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–কিন্তু সে বই কে লিখবে?

–আজকের কাজ চলে যায় বাংলা গল্প উপন্যাসের ভিতর এমন দু'চার খানা প্রাণসম্পদভরা বই আমি দেখেছি; হয়তো কালকের কাজও চলে যাবে তাতে–হয়তো অনেক দিনের কাজ। কিন্তু ভবিষ্যৎ চলুক আর না চলুক–আমরা অন্তত ধোঁয়ার হাত থেকে বেরিয়ে একটা নিস্তার পাব। এ সংস্কার আপনাদের করা উচিত–এ রকম সাহস সাধ আপনাদের থাকা উচিত। যাতে এরকম ধরনের বই আরো বেরোয় আপনাদেরও একটু আধটু সাহায্য করা উচিত সে জন্য। লেখকের জন্ম দিতে পারবেন না আপনারা অবিশ্যি–ভবিষ্যতের গঠনের ভিতর কার কোন প্রতিভার কতখানি হাত থাকবে তা বলাও শক্ত–কিন্তু আপনাদেরও খানিকটা হাত থাকা উচিত–

অজিত এই সব বললে।

এ সব অনেক দিন থেকে ভেবে এসেছে সে; এই সব তার প্রিয় চিন্তা, প্রিয় কথা। কিন্তু সকলের এ সব শুনবারও বড় একটা সময় নেই–

করুণাবাবু বললেন–আচ্ছা দেখব।

আজ রাতেও কৃষ্ণের পার্টই অভিনয় করতে হবে অজিতকে; যিনি এই নাটকখানা লিখেছেন অজিত দেখল কৃষ্ণচরিত্রের সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ কোনো জ্ঞান বা উপলব্ধি নেই– এ চরিত্রকে তিনি ফোটাতে পারেন নি। তা ছাড়া কোন ভাবও সেই তাঁর– কোনো ভাষাও নেই। প্রাণহীন অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল অজিত–চরিত্রের অবাস্তবতা তাকে ব্যথা দিচ্ছিল–কিছুই ভালো লাগছিল না।

বাইরে ঝর ঝর করে বৃষ্টি পড়ছে–

অজিত বললে–এসো পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা সত্যভামার পার্ট অভিনয় করে। এ তার খুব ভালো লাগে; খুব অনুরাগের সঙ্গে বলতেও পারে সে; অভিনয়ে তাই তার একটা চমৎকার সুর বাজে।

অজিত প্রথম কয়েক দিন পূর্ণিমাকে আপনি বলে ডাকত; কিন্তু পূর্ণিমা একদিন অভিমান ক'রে বললে–আপনি বললে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব না আর।

অজিত বললে–আচ্ছা, তুমিই বলব।

তবুও কয়েক বার ভুল করে ফেলেছিল সে; পূর্ণিমাও কথা প্রায় বন্ধ করে এনেছিল। কিন্তু এখন 'তুমি' ছাড়া আর কিছু বলে না–অজিতের মুখে আর কিছু আসেও না–তা ভালোও লাগে না তার।

পূর্ণিমা অবিশ্যি অজিতকে এখনও আপনিই বলে–কিন্তু তাতে অজিতের কোনো রাগ বা অভিমানের কথা মনেই আসে না; এ নিয়ে সে চিন্তাও করতে যায় না।

পূর্ণিমা বললে–বাঃ, আপনি দেখি বই, খুলে বসে রয়েছেন–

–বসেই রয়েছি শুধু

–পড়ছেন না?

–নাঃ

–তবে যে বড় খুলে আছেন

–এ পড়তে আমার প্রবৃত্তি হয় না

–কি বই?

পূর্ণিমা কাছে এল–

অজিত বললে–বোস

একটা কৌচের ওপর বসল সে

পূর্ণিমা বললে–বইটা দিন

অজিত দিল

–ওঃ এই বইটা–

বইটা অজিতের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে পূর্ণিমা বললে–তা আপনার পার্ট তো বেশ নির্ভুলই বলতে পারেন আপনি–বইটা আর মিছেমিছি খুলে রেখেছিলেন কেন–

অজিত একটু হেসে বললে–নির্ভুল!

–বই যখন খুলে বসেছেন তখন নিশ্চয়ই ভুলের ভাবনা আপনার ছিল–

–তা নয়–

–আমিও তো জানি না কি অজিতবাবু; এ সব আপনার মনের ধাঁধা। এত ভালো পার্ট করেন–কিন্তু তবুও আপনার মনের ভিতর একটা সন্দেহ কেন যেন ঘোচে না–

–তাই না কি পূর্ণিমা?

–হ্যাঁ

–তুমি লক্ষ্য করেছ?

–করেছি বৈ কি–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজিত প্রাণ খুলে হেসে উঠল।

তারপর ধীরে ধীরে পূর্ণিমার দিকে তাকিয়ে বললে–তুমি সবই বুঝে ফেলতে পার দেখেছি–

অজিস আবার হাসল

তারপর বললে–আমি ভেবেছিলাম স্টেজে যেমন জীবনেও তেমনি আমার সব সময়ের অভিনয়ের পিছনের মানুষটিকে কেউ দেখ না–

পূর্ণিমা নিস্তব্ধ হয়ে রইল–

অজিত বললে–স্টেজে দাঁড়িয়ে ভুল পড়বার ভয় আমার নেই পূর্ণিমা। এ যা বই–এ যে রকম সব কথাবার্তা এর চেয়ে ভালো জিনিস অভিনয় করতে দাঁড়িয়ে তখন তখনই আমি নিজের মনের থেকে তৈরি করে নিতে পারি–

পূর্ণিমা ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল।

অজিত বললে–আমার মুখে এ বইয়ের এ পদগুলোর অনবরত গরমিল হয়ে যায় যদি তাতে আমি একটুও ভাবি না–অনেক সময় তা হয়–আমি চাই যে তা হোক্–না হ'লে আমার মন খোলে না–। কোনো একটা বিশেষত্বহীন অসাড় বইয়ের ভুল পড়া ঠিক পড়া নিয়ে আমি একটু মাথা ঘামাই না। আমার মনের সন্দিগ্ধতা সত্য কিছু নিয়ে।

–কি নিয়ে?

–এই এক্ষুণি ভাবছিলাম এমন বই আমাদের অভিনয় করতে হয় কেন; কোনো দিন লিখি না বটে–কিন্তু কলম নিয়ে বসলে এই জিনিসই এর চেয়ে আমিও তো ঢের ভালো করে লিখতে পারতাম–বাংলাদেশের অন্য লেখকদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম–

–বইটা ভালো কি মন্দ আমি বুঝি না অজিতবাবু। কিন্তু আপনার পার্ট শুনতেই ঘরটা তো অজস্র লোকে ভরে যায়–

অজিত মনে ভাবছিল।–কিন্তু এই ঘরভরা লোকদের ভিতর দু'চার জন বিচক্ষণ মানুষও যদি এক কোণে পড়ে থাকে তারা এই কথাই ভাবে যে এই একটা বই (কোনো দিক দিয়ে) যার কোনো প্রয়োজন ছিল না–লেখকের কোনো বুদ্ধি ছিল না–হৃদয় ছিল না–ভাষা ছিল না–লিখবার কোনোই দরকার ছিল না তার–কতকগুলো অসাড় নির্বোধ অবাস্তব জিনিস দিয়ে একটা মিথ্যা সত্যতামাকে দাঁড় করাল মিছেমিছি সে–কিন্তু তবুও এই হাড্ডিসার চরিত্রের ভিতরেও পূর্ণিমা এমন প্রাণসম্পদ ফুটিয়ে তুললে যে বিমুগ্ধ হয়ে রাতের পর রাত বসে থাকতে ইচ্ছে করে শুধু–বইটার সম্বন্ধেই একটা ভুল ধারণা হয়ে যায়–এই তারা ভাবে না কি?

কিন্তু মুখে সে কিছু বললে না।

পূর্ণিমার অভিনয়ের কোনো প্রশংসা করলে না সে।

দু'জনেই চুপ করে বসে রইল।

পূর্ণিমা বললে–ওঃ এই আপনার সন্দেহ; এই সব বইটই নিয়ে।

–হ্যাঁ

–তাহ'লে নিজেই আপনি লিখুন না কেন?

অজিত বললে–আমি লিখতে পারি না।

–তবে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিন।

–কাকে দিয়ে লেখাব?

পূর্ণিমা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে–তবে কি হবে?

–থাক এ সব কথা এখন।

পূর্ণিমা বললে–আপনার বোধ হয় মনে আছে কিছুদিন আগে বেশ একটা নামজাদা উপন্যাসকে ড্রামাটাইজ করা হয়েছিল এখানে–

–হ্যাঁ

–আপনি বুঝি সেই চান?

–হ্যাঁ; এর চেয়ে ঢের ভালো হয়।

–কিন্তু সে রকম উপন্যাস কটা আর আছে?

–বেশি নেই–

–কিন্তু যে কটা আছে, সেগুলো একবার আমানত করলে মন্দ হয় না।

–আমিও তো তাই বলি–

অজিত বললে–কিন্তু, তোমার হয়তো তা ভালো লাগবে না পূর্ণিমা–

–আমার? সে উপন্যাসের অভিনয়ে আমি তো নেমেছিলাম–

–তা আমি জানি–

–কিন্তু এক রাত কি দু'রাত হয়েছিল শুধু–

–কেন?

–ভালো করে তৈরি না হতেই নামানো হয়েছিল।

–ওঃ

–কিন্তু এবার আপুনি তৈরি করে দিন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তাই ভাবছি—

—তা হ'লে হয়তো একশো দেড়শো রাতও চলতে পারে।

—চলবে কি পূর্ণিমা? তুমি পারবে (...)? তোমার ভালো লাগবে?

—আমার?

—একটা গল্প হলেই বুঝি তোমার খুব ভালো লাগে?

—আপনার যা ভালো লাগে না আমার তা খুব ভালো লাগে এই কথা বোধ করতেই আপনি বুঝি খুব তৃপ্তি পান।

অজিত হেসে উঠল।

পূর্ণিমা হাসছিল না।

অজিত গম্ভীর হয়ে গেল।

পূর্ণিমা বললে—আপনাকে খুব বড় মনে করেন আপনি; সে আপনার শোভা পায়—কিন্তু—

পূর্ণিমা থমকে চুপ করে রইল।

অজিত বললে—বড়? মনে করি আমাকে? কোন বিষয়ে?

—সব বিষয়েই।

—অজিত—

পূর্ণিমা বললে—আপনি ঢের শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছেন আমাদের চেয়ে—অনেক জানেন—অনেক বোঝেন—সদ্বংশের ছেলে—ভগবান আপনাকে ঢের ক্ষমতা দিয়েছেন—থিয়েটারে না এলেও আপনার কিছু এসে যেত না; যেখানেই যেতেন সেখানেই আপনি মানুষের পূজো পেতেন; থিয়েটারে আপনি এসেছেন এ আমাদের সৌভাগ্য কিন্তু একটা কথা আপনাকে অজিতবাবু—বরাবর আদর আহ্লাদ পেয়েই হোক বা যে করেই হোক—মনে আমার বড় অভিমান; সে অভিমানে অজ্ঞাতসারেও যদি আপনি এক আধ বার ঘা দিয়ে বসেন তা হ'লে বড় কষ্ট লাগে আমার—

—আমি কি তোমাকে আঘাত দিয়েছি পূর্ণিমা? কখন?

—আপনি বললেন যে কোনো একটা গল্প হলেই তো তোমার চলে—

অজিত হাসতে লাগল—

কিন্তু পূর্ণিমা কাঠের মত শক্ত—

অজিত দু'এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে নিগূঢ় ভাবে চিন্তা করে বুঝে উঠতে পারল না এ কথা পূর্ণিমাকে কি করে—কেমন করে—কোথায় আঘাত দিতে পারে—কিন্তু তারপর চমকে উঠে বুঝতে পারল যেন সব—এ মেয়েটির অভিমান ও একটা প্রখরতার অপরিসীম পরিধি চোখ বুজে দেখে ফেলল যেন সব অজিত।

কিন্তু পূর্ণিমা হাসছিল, বললে—আপনি এত কি ভাবছেন?

অজিত কোনো উত্তর দিল না।

পূর্ণিমা বললে—রাগ করেছেন?

—আমি কখন কি বলে ফেলি—আমাকে সতর্ক করে দিও—

পূর্ণিমা বললে—আমি বড় বোকা; এই এক্ষুণি বলছিলাম আমার খুব অভিমান—কিন্তু অভিমানটা আপনার কাছে এলেই যেন বেড়ে ওঠে আমার। এর সমুচিত শাস্তি যখনই আপনার দরকার হয় তখনই আপনি দেবেন। আর কিছু বলবার নেই আমার।

বলেই মনে হল পূর্ণিমার সে ঢের বলে ফেলেছে যেন—এত বলবার কি প্রয়োজন ছিল তার। অত্যন্ত লজ্জা পেতে লাগল পূর্ণিমা—এক এক সময় যেন মাটির সঙ্গে মিশেও যেতে ইচ্ছে করে।

—পড়বেন?

—হ্যাঁ

—যাই তাহ'লে এখন আমি?

—আচ্ছা যাও—

পরদিন পূর্ণিমা এল না—তার পর দিনও না—

তার পর দিন কোনো অভিনয় ছিল না।

শেষ রাত থেকেই পৃথিবী কালো করে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়ছে—

ভোর চারটার সময় উঠে অজিত বিছানার ওপর জেগে বসে ছিল—কিছুই ভালো লাগছিল না তার। রেনকোটটা গায় দিয়ে একটা শোলার টুপি মাথায় চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। কোথায় যাওয়া যায়?

এক পূর্ণিমা ছাড়া আর কোনো লোকের কথাই মনে হ'ল না তার।

কিন্তু পূর্ণিমার কাছে এই সময়?

সে উঠেছে কি না তাও বা কে জানে?

গিয়ে সেখানে কি দেখতে হবে তাই বা কে বলতে পারে?

কিন্তু তবুও গেল অজিত।

দোতলায় পূর্ণিমার কোঠার পাশে গিয়ে দরজাটা ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণিমা একটা শাল গায় দিয়ে জানালার পাশে মস্ত বেতের ইজিচেয়ারে বসে ছিল—অজিতকে দেখে তার মুখের কোনো ভাবপরিবর্তন হয়েছে বলে বোধ হ'ল না; ইজিচেয়ারে বসেই বললে—ওঃ আপনি—

—হ্যাঁ আমিই।

অজিত তার ভিজে কাপড়চোপড় জুতো নিয়ে ঘরের মাঝখানে এসে সমস্ত কার্পেটে কাদা জল মাখিয়ে দিতে লাগল—সে দিকে তার কোনো খেয়ালও ছিল না যেন—

পূর্ণিমা বললে—আঃ কার্পেটটা নষ্ট করে ফেললেন।

—ওঃ তাই তো।

—জুতোটা ছেড়ে আসুন।

অজিত তাড়াতাড়ি দরজার দিকে সরে গেল

পূর্ণিমা বললে—টুপী কোট র‍্যাকে রেখে আসুন।

—র‍্যাক কোথায়?

—বাইরের দেয়ালে

—থাক্—আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছিলাম—তোমার জানালা খোলা দেখে ভাবলাম তুমি উঠেছ হয়তো—আমি চলে যাচ্ছি—

অজিত দরজা অব্দি গিয়ে একটু থেমে দাঁড়াল।

—যা বৃষ্টি

আস্তে আস্তে (পূর্ণিমার) কার্পেটের দিকে তাকিয়ে বললে—তোমার কার্পেটের ওপর এই মহিষের ক্ষুরের মত জুতো নিয়ে কি করে যে চড়ে বসলাম আমি?

পূর্ণিমা বললে-বুট আপনি খুলুন। একটু ইতস্তত করে সাত পাঁচ ভেবে একবার এগিয়ে একবার পিছিয়ে অজিত শেষ পর্যন্ত বুটজোড়া খুলে ফেলতে লাগল—

টুপীটা র‍্যাকে রেখে এল—রেনকোটটাও—

পূর্ণিমা ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—এইখানে বসুন আপনি—

—এইখানে বসব? তা বেশ। অভ্যর্থনা করবার শক্তি ও সহৃদয়তা তোমারই আছে—কিন্তু তুমি কোথায় বসবে পূর্ণিমা?

—বিছানায়।

—ইজিচেয়ারটা একটু কাছে টেনে নি—

—নিন্

চেয়ারটা পূর্ণিমার দিকে অল্প খানিকটা টেনে নিলে অজিত—

পূর্ণিমা অজিতের বুটজোড়া বারান্দায় রেখে এল—

পূর্ণিমা বিছানার এক কিনারে এসে বসে বললে—আপনাকে চুরুট দেব?

—চুরুট?

—খান তো আপনি—

—তা খাই বটে কিন্তু তুমি কোথায় পাবে?

—আনিয়ে দিচ্ছি—হয়তো দেরাজেও আছে।

—দেরাজে?

—হ্যাঁ

—কি করে থাকে পূর্ণিমা?

—আপানাদের জন্য।

অজিত বললে—আমাদের? আমাদের কাদের জন্য?

কিন্তু প্রশ্ন করে এর কোনো উত্তর চাইল না সে। কেমন বিহ্বল হয়ে গেল—গম্ভীর হয়ে উঠল—

পূর্ণিমা উপলব্ধি করে বললে—আমার এখানে কেউ তো বড় একটা আসে না—থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ থেকে লোকেরা এসে মাঝে মাঝে আমাকে পার্ট বুঝিয়ে দিয়ে যায়। তা ছাড়া আমার সঙ্গে দেখা করতে হলে কার্ড দিয়ে দেখা করতে হয়—

(এর পর প্রায় তিন পৃষ্ঠা জুড়ে যা লিখেছেন, কেটে দিয়েছেন।)

এই মেয়েটির এই আত্মনিবেদনটুকু অজিতের পক্ষে যথেষ্ট—সে কি করে না করে—কার্ড দিয়ে মানুষ কত দূর নিজেকে সুরক্ষা করতে পারে—সে প্রবৃত্তি কতক্ষণই বা থাকে তার—কখন সমস্ত আত্মরক্ষাই লাঞ্ছিত হয়ে যায়—সে সব কথা ভাবতে গেলে হয়রান হয়ে পড়তে হয়।

পূর্ণিমার অভিনয়ের জীবন নিয়েই তো অজিতের দরকার—অন্য জীবনের খোঁজই বা সে নিতে যায় কেন?

ব্যথা লাগে—কিন্তু তবুও যে খোঁজ নেবার অধিকার নেই তার।

ব্যথা লাগে কি যে!

পূর্ণিমা বুঝল—

অজিত বড় ব্যথা পাচ্ছিল।

পূর্ণিমা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বোধ করল তা—

কিন্তু কি করবে যে? কি বলবে? পূর্ণিমা চুপ করে রইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজিত বললে—পূর্ণিমা—

পূর্ণিমা অনেকক্ষণ পরে বললে—আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন?

অজিত একটু হেসে বললে—না, অস্বস্তি নয়—

—কি চান আপনি?

—কেমন শীত করছে, কেন বল দেখি?

—ঠাণ্ডা পড়েছে যে।

—এই বাদলার জন্য?

—হ্যাঁ

পূর্ণিমা বললে—একটা হুইস্কি দেব আপনাকে?

অজিত স্তম্ভিত হয়ে পূর্ণিমার দিকে তাকাল—

পূর্ণিমা একটু ভয় পেয়ে গেল—

কিন্তু তবুও সে বললে—এক গ্লাস সোডার সঙ্গে দেই? তাহ'লে শরীরটা বেশ গরম হয়ে উঠবে—আরাম বোধ করবেন আপনি অজিতবাবু—

অজিত খানিকক্ষণ চুপ থেকে জানালার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে—মদ!

—অল্প স্বল্প—

জানালার দিকে তাকিয়েই অজিত বললে—কোনো দিন খাই নি তো—

—একদিনও না!

—না

—একটুও না?

—শুনলে আমার মা কি বলতেন?

—কিন্তু আপনি থিয়েটার করছেন বলে মা খুব ভাল বলেন না আপনাকে।

—কিন্তু আমি জানি—একদিন যদি তাঁকে বুঝিয়ে বলি যে এ জিনিস ছবি আঁকার মত, কবিতা লেখার মত নানা রকম মানুষের নানা রকম জীবনের নানা রকম প্রিয় একাগ্রতার নিবেদনের ঐকান্তিকতার জিনিসের মত তাহ'লে তিনি তা বুঝবেন সব; কিন্তু মদ খেয়ে তাঁকে আমি কি বলব?

—এটা মদ খাওয়া নয়।

—কেন?

—এক গ্লাস তো খাচ্ছেন শুধু।

—যদি ভালো লাগে?

—আর এক গ্লাস চাইবেন?

—চাই যদি।

—আপনাকে দেব না আমি আর—

—কিন্তু এইকুটুই বা কেন দাও পূর্ণিমা?

—এতে আপনার লোভ বেড়ে যাবে মনে করেন?

—কত রকম কি হতে পারে—

—এত বড় হলেন—কিন্তু মদ নিয়ে কেউই কি কোনো দিন আপনাকে সাধে নি?

—সেধেছে—

—তবে?

—কিন্তু মেয়েমানুষ তো কোনোদিন সাধে নি—

পূর্ণিমার মুখ দু'এক মুহূর্তের জন্য ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল—

অজিতের চোখ পূর্ণিমার মুখের দিকে ছিল না—সে মাটির দিকে তাকিয়ে ভাবছিল—

একটু পরে অজিত বললে—সকলকেই আমি অগ্রাহ্য করেছি, কিন্তু তুমি যদি আর একটু বেশি সাধ তাহ'লে অনেক কথাই আমার মনে পড়তে থাকবে—ওমর খৈয়াম—সাকী—জীবনের নশ্বরতা—মেয়েমানুষের রূপ—ভালোবাসা—আর্টিস্টের অধিকার—কত কি—তার পর একটা গেলাস শুধুই নয়—সমস্ত বোতলটাই আমি শেষ করে ফেলব—তোমার অনুমতি নিয়েই—তোমার চোখের সামনেই—

পূর্ণিমা পাথরের মত নিষ্প্রাণ হয়ে রইল—

—এমন তুমি অনেককে খেতে দেখেছ, না?

পূর্ণিমা কোনো কথা বললে না।

অজিত বললে—তুমি কি মনে কর পূর্ণিমা?

পূর্ণিমা কোনো উত্তর দিল না।

অজিত ছোট ছেলের মত বায়না ধর বললে—বল তুমি কি মনে কর।

পূর্ণিমা পীড়িত ভাবে বললে—কিসের কথা অজিতবাবু—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজিত বললে—তুমি বললে, আপনি এত বড় হয়েছেন অজিতবাবু—তবুও কেউ আপনাকে সাধে নি? আমি বললাম কোনো মেয়েমানুষ আমাকে মদ নিয়ে সাধে নি পূর্ণিমা, কিন্তু তোমার মত মেয়েমানুষ যদি সাধাসাধি করে তাহ'লে আমি উপেক্ষা করতে পারব না।

অজিত একটু থেমে বললে—তারপর আমার যে নতুন জীবন আরম্ভ হবে তুমিও সেটাকে উপেক্ষা করবে না—

—কেন উপেক্ষা করব?

—বরং সেই জীবনটাকে তোমার ভালো লাগবে আরো?

পূর্ণিমা কোনো জবাব দিল না। নারী সে; লজ্জা পাচ্ছিল—

অজিত বললে—তুমি তো খাও?

—খাই

—কবের থেকে

—বছর দুই

—খুব বেশি খাও?

—না

—কতটুকু খাও?

—এক আধ গেলাস—কিম্বা দুই—আড়াই—

বলতে বলতে পূর্ণিমা সঙ্কোচে মুখ নত করল।

অজিত বললে—রোজ?

পূর্ণিমা কোনো জবাব দিল না।

অজিত বললে—লোকজনের সঙ্গে মিশে?

পূর্ণিমা বললে—এ রকম কেন জিজ্ঞেস করলেন আপনি!

অজিত পূর্ণিমার প্রাঙ্গণের একটা জামীর গাছের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিল—

পূর্ণিমা বললে—আমার ঘরে এসে বসেছেন বলেই নানা রকম অধিকার আপনার জন্মায় নি—

এমনি করেই মেয়েটি নিজের লজ্জা চাপতে চাইল।

কিন্তু লজ্জার বিশেষ কোনো কারণ ছিল না তো তার। সে অভিনয় করেছে, ভেবেছে দু'এক গ্লাস খেলে অভিনয় তার সফল হবে, কিম্বা বন্ধুবান্ধবদের মাঝখানে বসে দু'এক গ্লাস খেলে সকলে তাকে সেয়ান মনে করবে—এই শুধু, যাতে চোখে কালি পড়ে, মুখ চুন হয়ে যায়, শরীর ঘামাতে থাকে নিঃশ্বাস রক্তের মত গরম বোধ হয়—জীবনের বা হৃদয়ের সে সব লালসা ও খেদের নিষ্ফলতার থেকে এই দিব্যি চেহারার নারীটি ঢের দূরে। সে ঢের মূল্যবান—এত মূল্যবান যে অজিতের সঙ্গেও অনেক সময় সম্ভ্রম রক্ষা করে চলাই সে ঠিক মনে করে—অন্যদের সঙ্গে সে সম্ভ্রমের এক তিলও সে খোয়াতে যায় নি। কেন যাবে? (সে অভিনয় করতে এসেছে—কোনো অবান্তর আরাধনা করতে আসে নি তো।)

কিন্তু তবুও নারী সে;—তার লজ্জা করছিল—বিশেষত অজিতের কাছে। যে লোকটা জীবনে এক গ্লাস মদও খয় নি—অথচ এত বড় হয়েছে—এত ভালো অ্যাক্টও করতে পারে—থিয়েটারে এল—তবুও মদের গেলাসের সম্ভাবনা দেখে যে মানুষ তার মায়ের কথা পাড়ে তার কোনো নাড়ীনক্ষত্র বুঝতে পারছিল না যেন পূর্ণিমা—নিজের নারীত্ব তার কেমন গুমরে উঠছিল যেন; অজিতকে শোনাতে গিয়ে নিজেই নিজের গলার সুরে কি যেন শুনতে পেল সে—লজ্জা পেল—

অজিত বললে—আমি এক সময় কবিতা লিখতাম—

পূর্ণিমা স্নিগ্ধ কথার সুরে বললে—কবিতা লিখতেন?

—হ্যাঁ, পূর্ণিমা, ঢের কবিদের সঙ্গে মিশবারও সুযোগ হয়েছিল। অনেকের চেয়েই আমি ভালো লিখতাম বলে আজো বোধ করি কিন্তু তাদের একটা বিশেষত্বকে আমি কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারি নি।

—কি অজিতবাবু?

—তারা ভাবত এই যে যখন তারা মিল দিয়ে কবিতা লিখতে শিখেছে তখন তাদের জাত বদলে গেছে, অন্যরা যেখানে একটি স্ত্রী নিয়ে রয়েছে সেখানে দশটি মেয়েমানুষ নিয়ে তাদের থাকতে হয়, অন্যরা যেখানে জল চায় সেখানে তাদের মদ না হ'লে চলে না, অন্যরা যেখানে চুল ছাটে সেখানে তাদের বাবরি কাটা চাই—এই সব আর কি—

পূর্ণিমা চুপ করে শুনেছিল।

অজিত বললে—আচ্ছা ভূয়ো কবিদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, সত্যিকার কবি হ'লেও বড় বড় চুল রাখতে হবে? মদ খেতে হবে?

পূর্ণিমা ফাঁপড়ে-পড়া ভাবে অজিতের দিকে তাকাল।

অজিত হেসে বললে—বল তো পূর্ণিমা?

—আপনিই তো জানেন—

—কবিত্বের সঙ্গে লম্বা চুল বা মদের কোনো সম্পর্ক নেই।

—আমারও তাই মনে হয়—কিন্তু লোকে তো বিশ্বাস করে আছে—

—দু'লাইন মিল দিয়ে মদ খাবার নিরঙ্কুশ অধিকার এক এক জনের জন্মায়—তার কবিপ্রতিভাও সাব্যস্ত হয়ে যায়—কিন্তু গণিতের প্রতিভা নিয়ে যে লোকটা নব নব আবিষ্কারে মেতে আছে তার লম্বা চুল মানুষের উপহাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিনিস—মদ খাওয়াটাও অত্যন্ত দুনীর্তি অত্যন্ত অধঃপতন। কিন্তু সুবিধে এই যে লোক আমাদের চেয়ে মাথা ঢের ঠিক রাখে—মদ খেতেও যায় না, চুলও ছাটে—একটি স্ত্রী নিয়েও কিম্বা মেয়েমানুষবিহীন হয়েও প্রতিভার স্ফুরণে বিশেষ কিছু বাধে না তার—তার প্রতিভার কবিত্বের দিকটাও দু'লাইনের মিলের চেয়ে ঢের বেশি গভীর—কিম্বা আমাদের অনেক নটের চেয়েও খাঁটি নটরাজের তালে তালে ঢের বেশি সিদ্ধ হৃদয়ঘোরে চলেছে—

পূর্ণিমা চুপ করে রইল।

অজিত বললে—অঙ্ক জ্যামিতি জ্যোতিষ বিজ্ঞান মীমাংসা ন্যায় এই সব নিয়ে যাদের প্রতিভা ফুটে উঠছে তারাও নটরাজের বন্ধু—তারাও কবি—কিন্তু মদ বা লম্বা চুলের প্রয়োজন তারা বোধ করে না—আমরাই বা কেন বোধ করব? আমাদের এ আনুষঙ্গিকগুলোর কি প্রয়োজন আছে? কবিতা লিখতে গিয়ে, গান গাইতে গিয়ে কিম্বা অভিনয় করবার সময় ছবি আঁকবার সময় ব্রান্ডি ঝাকড়া চুল বা উচ্ছৃঙ্খলতার কি প্রয়োজন? কিন্তু আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই যে এক এক জন সত্যিকার কবি বা নাট্যপ্রতিভাও এ জিনিসগুলোকে তাদের অন্তরের জীবনের পক্ষেও এমন দরকার মনে করে।

অজিত বললে—এ রকম নির্বোধ কি করে হওয়া যায়?

অজিত বললে—এ ঘোর কেন তাদের কাটে না?

অজিত বললে—এর চেয়ে মদের রসের জন্যই যারা মদ খায় কিম্বা মেয়েমানুষ ভালো লাগে বলেই নিরবচ্ছিন্ন উপভোগ করে চলে তারা ঢের বাস্তব।

পূর্ণিমা বললে—ঠিক তাই। কিন্তু যে ভড়ং দিয়েই শুরু করুক না কেন, কবি গুণী যাই বলুক না কেন অজিতবাবু শেষ পর্যন্ত রসের জন্যই খায় তারা—সব করে—

—তখন আর ভড়ং থাকে না!

—না। একটা বাস্তব দরকার হয়ে পড়ে।

—তোমারও তাই হয়েছে নাকি!

—এখনও হয় নি—

—কিন্তু হতে পারে?

—বলতে পারি কি অজিতবাবু?

—কিন্তু অভিনয়কেই তুমি সব চেয়ে ভালোবাস না পূর্ণিমা?

—তাই তো বাসি—

—যে জন্য তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে হয়েও অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করছ—

—হ্যাঁ, অজিতবাবু—

—তোমার শিক্ষাদীক্ষা এত রূপ এত গুণ তোমাকে মানুষের জীবনের চলতি পথের কত সুখ সম্মান সাধের দিকে নিয়ে যেতে পারত পূর্ণিমা—কিন্তু স্টেজকে ভালোবেসেই তুমি এলে—কাজেই এ তোমার সুখের নয় সংগ্রামের জায়গা—আরাম নয় নিবেদনের স্থল হয়ে উঠল—কিন্তু পূর্ণিমা—

অজিতের গলা ভারী হয়ে উঠল।

তিন চার মিনিট চুপ করে রইল সে—

পূর্ণিমা বললে—কি ভাবছেন?

অজিত একটু হেসে বললে—তোমার এই নিবেদনের মূর্তিটি চিরদিনই রেখো। কোনো কিছুই যেন একে কোনোদিন পণ্ড না করে ফেলে—

পূর্ণিমা হাসতে হাসতে বললে—আপনি ভয় পাচ্ছেন মদ খেয়ে আমি বুঝি বা নষ্ট হয়ে যাই—

অজিত ব্যথা পেয়ে বললে—থাক এ কথা—

—কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না—

—কি?

—যে মদ খেয়ে বা অত্যাচার করে প্রতিভা খরচ হয়ে যায়—

—তা যায়।

—আপনি জোর করে কেন বলেন?

—জোর নয়।

—কিন্তু আমি ঢের শুনেছি—আমি নিজেও জানি যে আমি এক আধ গ্লাস খেয়ে স্টেজে যখন উঠি তখন আমার (...) খুলে যায়। ও না হলে আমি হাঁপিয়ে উঠতাম—

অজিত নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

পূর্ণিমা বললে—এ প্রয়োজন আমার বেড়ে চলে যদি—আমার মনে হয় ক্রমে ক্রমেই বেড়ে যাবে—বাড়ছে যেন—

অজিত অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বললে—কি?

—এ আমার প্রয়োজন যে—

—আমিও তো অ্যাক্ট করি—

—কিন্তু আপনার মত ভাগ্যবান আমি তো নই—

—তোমার ঢের সম্পদ আছে পূর্ণিমা—তুমি এ আর কোরো না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–কিন্তু স্টেজে উঠে গুলিয়ে যায় যদি সব।

–মদ না খেলে?

–হ্যাঁ অজিতবাবু–

–বরং নেমে খেও–বা অন্য সময়ে এক আধটু খেও–এতে এ অভ্যাসের দৃঢ়তা কমে যায়–

–তা হবে না।

–কেন?

–বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়ি–

–এ তোমাকে কে শিখিয়েছে?

–প্রথম দু'চার রাত এমন ভালো অ্যাক্ট করলাম–কোনো ভুল হ'ল না। ভয় ভেঙে গেল–একটা সার্থকতা পেলাম–তখনই এই প্রবৃত্তি জাগল আমার। এতে জিনিসটা এমন সহজ হয়ে গেছে–

–সহজে হয়ে যায়?

–হ্যাঁ

–তাহ'লে আমিও খেতে আরম্ভ করব পূর্ণিমা?

পূর্ণিমা শঙ্কিত হয়ে উঠে বললে–আপনার কি দরকার? আপনার জন্মগত ক্ষমতার কাছে এ সব জিনিসের তো কোনো প্রয়োজন নেই।

অজিত অবসন্ন হযে হেসে বললে–জন্মগত ক্ষমতা! প্রতিটি রাতের জন্য আমার কত কষ্ট পেতে হয় তা তুমি জান কি পূর্ণিমা–

–আপনার দুটি পায় পড়ি–তাই বলে এ সব করবেন না।

অজিত হাসতে হাসতে বললে–আচ্ছা, এখন তো এক গ্লাস ঢাল।

–আপনার দুটি পায় পড়ি, চাইবেন না আপনি–

–দুটি পায়! কিন্তু আমি একটা বোতল কিনে নিয়ে নিজের ঘরে বসে খাই যদি–

–তাহ'লে আমি সব ছেড়ে দেব–

–মদ?

–এ স্টেজ এ অভিনয়–যাকে আমার নিবেদনের জীবন বলেছেন আপনি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব–

অজিত হাসতে হাসতে বললে–অত বাড়াবাড়ি কেন করবে?

পূর্ণিমা বললে–সব ছেড়ে দিয়ে যখন এখানে চলে এলাম তখনও তো বাড়াবাড়িই করেছি।

–তাই তো।

–আবার যদি তেমনি তাগিদে চলে যাই।

–আমি মদ খেলে তাগিদটা তত বড় হবে?

–হ্যাঁ

–একটা সামান্য মদ খাওয়ার ব্যাপার শুধু–

–মদ খাওয়ার ব্যাপার শুধু নয়।

–তবে?

–আপনার মদ খাওয়া।

অজিত হাসতে লাগল–

হাসতে হাসতে বললে–এতে তো আমার অধিকার আছে–

পূর্ণিমা বললে–আপনার?

–হ্যাঁ, আমি কবি ছিলাম–এখন গুণী হয়েছি–লোকেও তো আমাকে সমর্থন করবে।

অজিত একটু থেমে বললে–হয়তো আমার কাছ থেকে এ জিনিস প্রত্যাশাই করবে তারা। আমি কবি ছিলাম–গুণী হয়েছি–তুমি চুপ করে আছ কেন পূর্ণিমা? আমার অদিকার নেই?

–আছে বৈ কি।

–তবে?

–আপনার অধিকারের প্রতিবাদ আমি করব না, কিন্তু আপনার মাকে আপনি কি বলবেন?

–হাঃ হাঃ............মা?

–কি বলবেন তাঁকে আপনি?

–বলবার কি দরকার আর?

–কিছুই বলবেন না?

–না।

–কেন?

–মানুষের জীবন ক্রমে ক্রমে তার নিজেরই জিনিস হয়ে দাঁড়ায়–কোনো শ্রদ্ধা মমতা ভালোবাসার সঙ্গে বাঁধ আর তেমন কঠিন হয়ে থাকে না, ঢিলে হয়–খসে যায়। যা তার ভালো লাগে তা সে করে–এরই ভিতর থেকে তার নবীন ভালোবাসা শ্রদ্ধা ও মমতার জন্ম হয়–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আমি অভিনয়কে শ্রদ্ধা করি—চুরুটের প্রতি মমতা—কাকে ভালোবাসি আজো তা বুঝি না—

পূর্ণিমা বললে—কিন্তু মানুষের শ্রদ্ধা মমতা ভালোবাসা মোচড় দিয়ে ধীরে ধীরে আবার সেই পুরোনো জিনিসগুলোতেই গিয়ে বাঁধা পড়ে।

—ওঃ—পড়ে না কি?

—হ্যাঁ

—কি করে বুঝলে তুমি?

—মানুষ শেষ পর্যন্ত এই পুরোনো জিনিসগুলোকে কিছুতেই ছাড়াতে পারে না; যে জিনিস যত পুরোনো তাকে ভোলা ততই কঠিন—যতই দিন বাড়ছে ততই বুঝছি—

—তোমারও তোমার মাকে মনে পড়ে?

—মাকে বাবাকে।

—বেঁচে আছেন আজো?

—হ্যাঁ

—তুমি বাংলা অক্ষর প্রথম লিখলে কোথায়?

—মেমের স্কুলে।

—মেমের স্কুলে? ফ্রক পরতে?

—হ্যাঁ

—খুব ছোট্ট মেয়ে ছিলে?

—ছিলাম বৈ কি।

—দেশের নাম কি?

—হিজলডাঙা

—হিজলডাঙা! বা পৃথিবীতে এমন সুন্দর নামও আছে পূর্ণিমা? এ দেশ বাস্তবিকও কোথাও আছে—না একটা স্বপ্নের কথা বলছ তুমি? অনেক হিজল আছে সেখানে?

—আছে বৈ কি—

—কত দিন হিজল গাছ দেখি নি—ছাতিম দেখি নি—মাছরাঙা দেখি নি—তুমিও তো দেখ নি—এ সবের জন্য দুঃখ হয় না তোমার—

—হয় বৈ কি—এক এক দিন রাতে ঘুম ভেঙে যায়—ঝর ঝর করে বৃষ্টি পড়তে থাকে—এমন একা লাগে—আপনি যে আত্মনিবেদনের মূর্তির কথা বলেছেন তাকে এমন হৃদয়হীন জন্তু বলে মনে হয়—আমি সব ছেড়ে দিয়ে আমার হিজলডাঙায় চলে যেতে চাই

অজিত উঠল—

পূর্ণিমা কাতর হয়ে বললে—বাঃ হিজলডাঙার কথা পেড়ে আপনি বিদায় নেবেন?

—হিজলডাঙার সঙ্গে আমার কি?

—কৈ আমার দেশের কথা এত দিন এমন ভালোবেসে জিজ্ঞেস করে নি তো কেউ! হিজলডাঙা নামের যে মধুরতা সে আমার নিজেরই জিনিস ছিল—আপনি এ সব বুঝলেন কি করে অজিতবাবু? কেন আপনি জিজ্ঞেস করলেন সে সব মধুর গাছপালা মানুষ ছায়া নিস্তব্ধতার কথা মনে করে আমার দুঃখ করে কিনা? আপনি এ সব বোঝেন কি করে? আমি ভেবেছিলাম আমার এ পাড়াগাঁকে আমি ছাড়া কেউ ভালোবাসে না—তার রূপও কেউ বোঝে না, আপনি এসে বললেন—কত দিন হিজলের ফুল দেখি নি—তাই তো—এত সব ধরা পড়ে আপনার হৃদয়ে?

অজিত এ সব কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে—তারপর তুমি বড় হ'লে—কলকাতার কলেজে পড়তে এলে। অনেক শিক্ষাদীক্ষা পেলে তুমি—আমাদের স্টেজের পক্ষে এ খুব মূল্যবান জিনিস হ'ল—এমনটি হয় নি কোনো দিন—কে জানে আর কত দিন পরেই বা হবে। তোমার এই নিবেদনের মূর্তিকে সব সময়ই মনে রেখো পূর্ণিমা—আমিও মনে রাখব।

আজ আমাদের আর কোনো কথা নেই।

অজিত উঠে চ'লে গেল।

অনেক গভীর রাতেও হিজলডাঙার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারল না পূর্ণিমা। সেই রূপশালী ধানের দেশে—দেশের কত রকম যে রূপ আর রস ছায়া মমতা গন্ধ তাকে নিবিড় ভাবে পেয়ে বসেছে—

বাইরে ঝর ঝর করে বৃষ্টি পড়ছে—

জানালার পাশে বসে পূর্ণিমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু তারপর অজিতের কথাগুলো মনে পড়ল তার; মানুষের জীবন ক্রমে ক্রমে তার নিজেরই জিনিস হয়ে দাঁড়ায়...মমতার জন্য হয়।

তাই হয় না কি?

আর অজিতবাবুর এই কথাগুলো ঃ তারপর তুমি বড় হলে...আমিও মনে করে রাখব।

মূল্যবান জিনিস? নিবেদনের মূর্তি? বাইরে কি গভীর বাদল এখনও! হিজলডাঙার বনে না কি? যেন ঝিঁ ঝিঁ জোনাকী অবসাদ কল্পনা স্বপ্ন ঘুম মিশে যাচ্ছে সব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজিত টাকা পাচ্ছিল–

একদিন মায়ের নামে দেড় শো টাকা মনিঅর্ডার করে সে পাঠিয়ে দিল–চিঠিতে লিখে দিল–এমনি মাঝে মাঝে পাঠাব।

কয়েক দিন পরে ডাকপিওন এসে সে টাকা ফেরৎ দিয়ে গেল–এ টাকা যাঁর নামে পাঠান হয়েছে তিনি রাখেন নি, তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

দিন তিনেক পরে চিঠি–

মা লিখেছেন ঃ তোমার এ টাকা আমি রাখতে পারলাম না। তুমি আর আমাদের টাকা পাঠিও না। এর চেয়ে তুমি যদি মুদীর দোকান খুলে, গাড়োয়ানের কাজ করে, জুতো সেলাই করে আমাদের টাকা পাঠাতে তাও আমরা আদরে গ্রহণ করতাম।

কিন্তু তোমার অধঃপতন সে সবের চেয়ে ঢের বেশি হয়েছে।

তোমার জন্য লজ্জায় ঘেন্নায় অনেক সময় মানুষের কাছে মুখ দেখানোও শক্ত হয়ে ওঠে।

তুমি এ রকম করবে তা আমরা ভাবতেও পারি নি–নিধিবাবুর ছেলে হরিলাল যাকে সমস্ত দেশশুদ্ধ কেউ দেখতে পারত না সেও তাহ'লে তোমার চেয়ে ঢের মানুষ–

অজিত চিঠিখানা পনেরো ভাঁজ করল–তবু ছিঁড়ল না–

আবার খুলল–আবার ভাঁজ করল–

আবার খুলল–

চায়ের কাপ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল–

একটা মাছি মরে পেয়ালার ভিতর পড়ে রয়েছে–

পূর্ণিমা যে কখন ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে অজিত তা টেরও পায় নি। চোখ যখন তুলল তখন দেখল পূর্ণিমা বসে রয়েছে–একটা কৌচে।

–কি মনে করে?

–আপনি কি ভাবছেন অজিতবাবু?

অজিত কোনো উত্তর দিল না।

–আজো সেই বইয়ের কথাই ভাবছেন নাকি?

অজিত ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়ল–

পূর্ণিমা বললে–আপনার হাতে ওটা কি?

–একটা চিঠি।

–কার?

–মার–

–ওঃ

দু'জনেই চুপ করে রইল–

খানিকক্ষণ পরে অজিত বললে–মা লিখেছেন–

চায়ের পেয়ালা তুলতে গিয়ে অজিত বললে–একটা মাছি মরে পড়ে রয়েছে।

চায়ের পেয়ালাটা অজিত সরিয়ে রেখে দিল

–মা লিখেছেন তোমার টাকা আমি নেব না–

–মাকে টাকা পাঠিয়ে ছিলেন বুঝি?

–হ্যাঁ–সে টাকা তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন–লিখেছেন এর চেয়ে তুমি যদি মুদীর দোকান খুলে–গাড়োয়ানের কাজ করে–জুতো সেলাই করে আমাদের টাকা পাঠাতে আমরা তা সাদরে নিতাম–

–এমনি কথা লিখলেন আপনার মা? থিয়েটারকে তিনি এত দূর ঘেণ্ণার জায়গা মনে করলেন?

–লিখেছেন 'তোমার অধঃপতন সে সবের চেয়ে...হরিলাল তোমার চেয়ে ঢের মানুষ–'

–হরিলাল কে?

–আমাদের দেশেরই একটা ছেলে।

–কি করে?

–মদ গাঁজা খেয়ে বেড়ায়–বেশ্যাপাড়ায় পড়ে থাকে–

পূর্ণিমার সমস্ত শরীর দু'এক মুহূর্তের জন্য কাঁটা দিয়ে উঠল।–অত্যন্ত কষ্টে নিজেকে দমন করে একটা ঢোক গিলে পূর্ণিমা বললে–সেই হরিলালের কথাও উঠল আপনার এই টাকার ব্যাপার নিয়ে–তার চেয়েও আপনাকে হীন মনে করেন আপনার মা?

–হ্যাঁ, তার চেয়েও আমাকে হীন মনে করেন আমার মা, না হ'লে টাকা ফিরিয়ে দেন কখনও? পৃথিবীর সব চেয়ে বড় চামারের কাছ থেকে টাকা নিতে সাধুমানুষরা একটুও চিন্তা করে না কতবার দেখলাম–কিন্তু আমার এ টাকাও মার অস্পৃশ্য–

–থিয়েটারকে কি তিনি এতই জঘন্য মনে করেন?

–আমাদের পরিবারকে তো তুমি চেন না–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–কি রকম?

–ভদ্রলোকদের বাড়িতে যে গানের মজলিস হয় তাতেও তাঁরা-

–তাঁরা কি গান গান না?

–গান বৈ কি–ভজন–সঙ্কীর্তন–খুব প্রাণ ঢেলে গান। খুব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস–পরলোকে, ভগবানের ওপর–

–তা তো সকলেরই আছে–

–হ্যাঁ, তোমার আছে পূর্ণিমা–তা আমি জানি। কিন্তু তাঁদের খুব বেশি আছে,–বলা না ঘটাই বেশি–ঘটা বেশি না বিশ্বাস শ্রদ্ধা বেশি সে সব খোঁজ নিয়ে আমার মনের কোনো রকম চরিতার্থতা পাই না–তবে খুব শ্রদ্ধা বিশ্বাস নিয়েই তাঁরা তৃপ্ত নন–সে জন্য আড়ম্বরও ঢের আছে বটে–এত আয়োজন এত সমারোহ যে তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না–তোমার কাছে সেগুলো খুব অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে–

–আপনার কাছে মনে হয়েছিল?

–কিন্তু খুব সৎ–কেউ তামাকও খান না–আমিই আমাদের বংশে প্রথম চুরুট খেয়েছি–গানের মজলিসে গিয়েছি–থিয়েটার দেখেছি–কবিতা লিখেছি–

–কবিতা লেখাও পাপ?

–আমাদের পরিবারই তো শুধু নয়–এমন অনেক পরিবার রয়েছে যারা এ সমস্ত জিনিসগুলোকেই অত্যন্ত অশ্রদ্ধার চোখে দেখে–কবিতা লিখলেও মনে করে–কবি-গুণী হয়ে গেল–জাত হয়ে গেল আলাদা–হয়তো সারা দিন একটা এস্রাজ নিয়ে পড়ে থাকবে–না হয় মদ খাবে–কিংবা এ সব কিছু না করলেও মেয়েমানুষের রূপ গুণ স্তন চুমো নিয়ে এই সব লিখবে–কবিতা বা কবি যে এ ছাড়া আর কিছু–হতে পারে সে ধারণাও নেই তাদের–

–আপনি হয়তো এস্রাজ নিয়ে পড়ে থাকতেন না সারাদিন!

–থাকতে পারলে মন্দ হ'ত না–

–আপনার কবিতা–

–থাক্

–আজকাল লেখেন না বুঝি আর?

–না

যেগুলো লিখেছেন তা আছে?

(–তুমি দেখবে?)

–দেখতে ইচ্ছা করে।

–ছাপাই নি তো কোনো দিন–পুঁজি করেও রাখি নি–যদি জানতাম তুমি দেখতে চাইবে–

–তাহ'লে নেই?

–এই তো সেদিন সমস্ত পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেললাম–

–পুড়িয়ে ফেললেন? বলেন কি? কেন? কবে?

–সেই যে বড় বৃষ্টিটার দিনে।

–কেন?

–ভাবলাম ও পাট আমার শেষ হয়ে গেছে–এ সব ঘরের এক কোণে পড়ে থাকলেও আমার নতুন জীবনের একান্ততাকে বাধা দেয়–কেমন একটা সমস্যা নিয়ে আসে–কেবলই মনে হয়, আমি নট না কবি?

পূর্ণিমা বললে–তাই পুড়িয়ে ফেললেন?

–হ্যাঁ। ভালো করি নি? একটা জিনিসকেই তো ধরতে হয় আমাদের–যে জিনিসটা আমরা সব চেয়ে ভালো পারি?

–কিন্তু তবুও কবি–হলে এত অশ্রদ্ধা পেতেন না আপনি–

–তাও পেয়েছিলাম–

–কিন্তু এখন একেবারে কলঙ্ক কুড়োচ্ছেন।

–কিন্তু সব পরিবারই তো আমাদের পরিবারের মত নয়–

–কিন্তু নিজের পরিবারের ঘৃণা উপেক্ষাই সব চেয়ে বেশি আঘাত দেয়–

–নিজের মাও যখন ছেলের টাকা ফিরিয়ে দেয়!

অজিত তার মায়ের চিঠিটা পনেরো ভাঁজ করছিল–

পূর্ণিমা বললে–এ চিঠিটার ওপর আপনি খুব নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছেন দেখছি।

অজিত একটু হাসল–

হেসে চিঠিটা পকেটের ভিতর রেখে দিল–

চায়ের কাপটা তুলতে গিয়ে অজিত দেখল একটা মাছি মরে পড়ে রয়েছে–

পূর্ণিমার সামনে চুরুট সে আর জ্বালাল না–

পূর্ণিমা বললে–আপনাদের পরিবারে আর কেউ বিগড়ায় নি?

–না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–খুব বড় পরিবার?

–হ্যাঁ, আমার ঠাকুদ্দার চৌদ্দটি ছেলেপিলে!

–তাই নাকি!

–আমার জেঠামশায়েরও আঠারো কুড়ি জন।

পূর্ণিমা খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললে–এরা সকলেই মানুষ হচ্ছে?

–হ্যাঁ

–কেউই চুরুট খায় না?

–না

–গানের মজলিসেও যায় না?

–না

–কি করে?

–পড়াশুনো করে।

–তার পর।

–বিয়ে করবে, সন্তানের পিতামাতা হবে।

–এমন আঠারো কুড়ি জন করে সন্তান?

–দেশেরই তো উপকার তাতে–

–নিজেদেরও ঢের সাধ–

বলেই পূর্ণিমা লজ্জিত হ'ল–

অজিত হয়তো শোনে নি–সে বললে–তাদের মানুষ করবে–সন্তান-সন্ততি কেউ কোনো দিন যাতে কুপথে না যায়–চুরুট না খায়, গানের মজলিসে না যায়, এস্রাজ নিয়ে না পড়ে থাকে–পড়াশুনো করে উকীল মোক্তার হেডমাস্টার হয় মানুষ হয়–এইই তারা দেখবে–এরা আছে বলেই দেশ টিকে আছে–স্টেটের কাছ থেকে এরা বৃত্তি দাবী করতে পারে–

–কেন?

–এদের কুলবধূরা তো খুবই পারে।

–কি রকম?

–সমস্ত জীবন ভরে এক একটি বধূ সতেরো কুড়ি জন সন্তানকে পেটে ধরবার অসহ্য কষ্ট ও সহিষ্ণুতা কেন মিছেমিছি বহন করবে? এর জন্য কি তারা পুরস্কার পাবে না? হাজার হাজার বাঙালি রোজ মরে যাচ্ছে সেখানে আঠারো কুড়ি জন করে জ্যান্ত বাঙালি প্রতিটি মেয়ের কাছ থেকে চালানি মালের মত জুটে যাচ্ছে–এই অক্লান্ত ক্লেশ ও ধৈর্য একটা জাতকে রক্ষা করবার মত, এই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের কি কোনো মূল্য নেই?

পূর্ণিমা খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললে–খুবই মূল্য আছে অজিতবাবু–কিন্তু আমার এই মনে হয় যে এরা গানও যদি ভালোবাসত–

–উপাসনা ভজনের গান ভালোবাসে বৈ কি–

–সঙ্কীর্তন ভজনের গানই শুধু নয়–অন্য রকম গানও–দিন রাত যে লোকটা বীণা নিয়ে সাধছে তার একটা মূল্য দিতে পারত যদি–নিজেদের প্রথামত জীবনের বাইরে অন্য অন্য জীবন।

–তাহ'লে কি হত?

–আপনার মা কি এই টাকা ফেরাতে পারতেন?

অজিত আবার চায়ের পেয়ালাটা মুখে দিতে গিয়ে দেখল একটা মাছি মরে পড়ে রয়েছে–

বললে–মূর্ণিমা–

–কি?

–এই চায়ের পেয়ালাটা দেখ তো–

–বসুন আমি চা করে আনছি–

কয়েক দিন কেটে গিয়েছে–

অভিনয় বেশ জমছে–

সেই পুরোনো বইটাই–ভালো লাগছিল না অজিতের–কিন্তু আশ্চর্য লোকে তার অ্যাক্টিঙের নিন্দে করে না তবু–অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শোনে–ভালোবাসে–কে জানে আরো কত কি করে–

পূর্ণিমাকে খুব সফল মনে হয়; এ দু'জনের অভিনয়ের সফলতা তো বটেই, আরো কত কি সার্থকতা নিয়ে মানুষের চাঁট বসায়।

অজিত ভাবছিল বইটাকে নিয়ে পূর্ণিমার তো বিশেষ ধোঁকা নেই–কিন্তু অজিত নিজে এ লেখাটির অন্তঃসারশূন্যতা পদে পদে বুঝতে পেরেও কোন হৃদয় নিয়েই বা একটা অনভিজ্ঞ নির্বোধ লেখকের অসাড় চরিত্রের ভূমিকা নিয়ে স্টেজে গিয়ে দাঁড়ায়–কি কথাই বা বলে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত নির্বোধ কথাগুলোই বলে তো সে–বলে প্রশংসাও পায়।

এমন কেন হয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজিত বিছানায় এ পাশ ও পাশ ফিরতে ফিরতে ভাবছিল স্টেজে দাঁড়ালেই লেখকের মূর্খতার কথা আর মনে থাকে না তার–অভিনয়কে সে এমনই ভালোবাসে যে তারই গুণে সমস্তই যেন প্রাণ পায়–

পূর্ণিমারও তাই।

কাল কি একটা পর্ব ছিল–সারা রাত অভিনয় করে কাটাতে হয়েছে–পূর্ণিমার তার দু'জনেরই।

অজিতের ঘুম পাচ্ছিল–

সে ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু চটকা ভেঙে গেল–স্নান টান করে শোভা সজ্জা রূপের হিল্লোল ভুলে পূর্ণিমা এসে ঢুকেছে–

–সারা রাত তো জাগলে কাল–

আপনিও তো জেগেছেন–

–আমি তো ঘুমুচ্ছিলাম–কিন্তু তোমার কি কোনো ক্লান্তি নেই?

–আমার ঘুম পায় নি অজিতবাবু।

অজিত ভালো করে একবার পূর্ণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে–তোমাকে দেখে মনে হয়, কাল সারা রাত ফ্রক–পরে খুকির মত ঘুমিয়েছ–। মনে কোনো পাপ নেই তোমার, মুখে কোনো কালি নেই। অথচ সারা রাত জেগে পার্ট খিস্তি। এ সব তুমি কি করে ঘটাও পূর্ণিমা?

–আরসীতে একটু আগেও আমার মুখ দেখে এসেছি আমি–দেখে আর ফিরে তাকাতেও ইচ্ছে করে না–

আপনি বড্ড সৌখীন কি না–

–সে যাক, ফিরে যে তাকাতে ইচ্ছে করে না তা আমিই জানি, আর আমার উনিই জানেন, ও রকম একটা রাতের পরিশ্রান্তির পর এই রকমই হয়।–কিন্তু তোমার এ দিব্যি চেহারা কি করে হইল?

অজিত বললে–শুনলাম তুমি না কি মদও ছেড়ে দিয়েছ।

–দিয়েছি অজিতবাবু।

–সেই দিন থেকেই–

–হ্যাঁ

–বাঃ!

–কিন্তু কত দিন ছেড়ে থাকতে পারব বলতে পারি না–

অজিত সে কথার কোনো উত্তর দিল না।

পূর্ণিমা বললে–আপনি ঘুমোবেন?

–না

–আমি এসে আপনার ঘুম নষ্ট করে দিলুম–

–তুমি এসে?

পূর্ণিমা ঠোঁট ফাঁক করে হাসছিল–

একটা সাদা বেনারসী শাড়ী পরেছে সে–

ভোরের আলো জানালার ভিতর দিয়ে এসে পূর্ণিমার মুখ ঘিরে একটা দিব্য রৌদ্রচক্র সৃষ্টি করেছিল; সেই আভার ভিতর পূর্ণিমাকে আকাশযানী দিব্যযোনির মতন মনে হচ্ছিল।

অজিত মেয়েটির আপাদমস্তকের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত ভরসা পেয়ে বললে–কলেজে পড়তে যখন থিয়েটার দেখতাম তখন একটা জিনিস আমাকে বড় আঘাত দিত–

পূর্ণিমা ঘাড় হেঁট করে আঁচ করছিল।

অজিত বললে–দেখতাম অ্যাকট্রেসদের সব হোঁৎকা চেহারা–কালো ঠোঁট চোখ বসে গিয়েছে–

পূর্ণিমা শিহরিত হয়ে উঠল–

অজিত বললে–এমন ঘেন্না করত।

–চেহারার জন্য?

–অত্যন্ত কদর্য্য চেহারা তা তুমি ধারণা করতে পার না।

পূর্ণিমা বললে–পারি না? তা বলবেন না। কালো কুরূপ হলে হয় কি–এক জন যদি ভালো গাইতে পারে কিম্বা পার্ট প্লে করতে পারে–

অজিত বাধা দিয়ে বললে–তা সে নিজের ঘরে বসে করুক।

পূর্ণিমা ব্যথিত হয়ে বললে–কেন?

অজিত বললে–শুধু ভালো অভিনয় বা গান করতেই পারলে হয় না–সে গ্রামোফোনে চলে রেডিওতে বেশ নিজের স্বামী বা স্ত্রী বা প্রেমিকের কাছেও তার মূল্য আছে। কিন্তু থিয়েটারে দেহের মর্যাদা কত যে মূল্যবান তা সেই গ্রীকরা জানত, আমাদের যাদের বস্তুচেতনা আছে তারা বোঝে।

পূর্ণিমা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললে–চেহারার অপরাধ তো মানুষের নিজের নয় অজিত বললে–তা নয়।

–তবে?

–যে তাকে আমদানি করে তার অপরাধ–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণিমা একটু হেসে বললে—কোথায় আমদানি করে?

—থিয়েটারে।

—তার অপরাধ?

—হ্যাঁ

—কেন?

—থিয়েটারের সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্যের দিকে তার চোখ নেই—ভাবে গাফিলতি করলেও চলে। কিন্তু এতে তাদের বড্ড খারাপ লাগে যারা দেখতে আসে, তারা বড্ড পীড়া বোধ করে। কলেজে পড়বার সময় আমার কিশোর মনও এমনি ঢের বিক্ষুব্ধ হয়ে অনেক দিন ফিরে গেছে। শৈবলিনীর পার্ট নিয়ে যে এল সে যদি এক জন হোঁৎকা বুড়ী হয়—ঠোঁটে তার তখনও তামাকের গন্ধ লেগে—মস্ত বড় ভুঁড়ো পেট—হাতের মাংস মুখের মাংস ঝুলছে কেমন লাগে তা হ'লে বল তো—

পূর্ণিমা বললে—এ রকম হয় না—এ রকম হয় নি কোনো দিন।

একটু থেমে পূর্ণিমা বললে—আমার নিজের চেহারাও কি রকম কে জানে?

অজিত বালিশের থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললে—তোমার চেহারা এ যুগের একটা সৌভাগ্যের জিনিস।

—এ যুগের?

—হ্যাঁ

—যুদ তো একটা বড় কথা।

—তোমার চেহারাও ছোট নজরের জিনিস নয় তো—বিধাতা খুব মহৎ হয়ে তৈরি করেছিলেন—

অজিত বললে—আজকাল যারা কলেজে পড়ে—যাদের কিশোর বয়স—তোমার অভিনয় ও শরীরের রূপকুশলতা দেখে কাটল তারা রোজ রাতেই যে সার্থকতা নিয়ে ঘরে ফিরে যায় তাকে আমি ঈর্ষা করি—আমার কৈশোর যৌবনের সময় শত চেষ্টা করেও এ সার্থকতা আমি একটা থিয়েটার দেখেও পাই নি। কি যে নিষ্ফল নিরুপায় দিন গিয়েছে সে সময়ে!

—উপায়হীন হয়ে পড়েছিলেন?

—থিয়েটারকে আমি ছোটবেলা থেকেই ভালোবেসেছি—বরাবরই এর অভাব অভিযোগগুলো নিয়ে মন হৃদয়হীন মন্তব্যে ভরে উঠেছে—আজো কত অভাব রয়েছে—কিন্তু শৈবলিনীর পার্ট যদি শৈবলিনীর মত মেয়ে এসেই করে কিম্বা পার্ট মত যুবা তাহ'লেও একটা মস্ত অভিযোগ কেটে যায়—

অজিত বললে—যুবাদের পাওয়া যায়—কিন্তু তোমার মত এক অধ জন মেয়েমানুষ যখন স্টেজের থেকে বিদায় নেবে তখন রমা বা ষোড়শীর ভূমিকার জন্য একজন ধুমসো ঝি ছাড়া কিছুই যদি আমরা খুঁজে না পাই?

পূর্ণিমা শুনে একটু হাসল।

পরে বললে—না, সে জন্য ভাববেন না অজিতবাবু, সে ব্যর্থতার দিন চলে গেছে—তুমি এসে দূর করে দিয়েছ বটে—কিন্তু তুমি যে দিন চলে যাবে—

—আমি চলে যাব কেন?

—তুমিই বা কত দিন থাকবে?

—আমাকে তাড়াতে চান?

অজিত হেসে বললে—না আমি স্টেজের অনেক দূর ভবিষ্যতের কথা বলছি—যখন আমিও মরে যাব—আমাদের দু'জনের কেউই নেই—

—তা নিয়ে আক্ষেপ করে কি লাভ? সে আপনার প্রতিনিধিরা বুঝবে। আপনি যা পেয়েছেন তাই নিয়েই তৃপ্ত থাকুন—

অজিত শুরু করল—বিলেতে—

—বিলেতে আমার চেয়ে ঢের ভালো ঢের অভিনেত্রী মেলে—তা আমি জানি। কে জানে বাংলাদেশেও এক দিন মিলবে কি না—

—কিন্তু তার তো কোনো লক্ষণ দেখছি না—

—কিছুটা পথ আমরা হয়তো কেটে দিয়ে যাচ্ছি—

—তারপর?

—তারপর—একজন মানুষই দু'চার বছরের মধ্যে কত মুখোস বদলে ফেলতে পারে—একটা স্টেজ বা দেশের পরিবর্তনের কি আর সীমা আছে অজিতবাবু? আজ আপনার মা টকা নিলেন না—এক দিন হয়তো এ দেশেরই কত বড় ঘরের কত মা তাঁদের মেয়েদের গিয়ে সাধবেন—অভিনেত্রী হবার জন্য। যে জিনিস বস্তুনিষ্ঠ সৌন্দর্যের এবং হয়তো বা সত্যের এক দিন তা তার মূল্য পাবেই।

পূর্ণিমার কথা শুনতে শুনতে অজিত এর ভেতর প্রতিবাদ করবার কিছু খুঁজে পেল না—এই মেয়েটি যেন নিকষপাথরে রেখা কেটে কথা বলছে।

নিজে অজিত জিনিসটাকে কোনো দিন এমন করে বুঝে দেখে নি কি?

দু'এক মুহূর্তের ভেতরেই অজিত অকাতরে ঘুমুতে লাগল।

পূর্ণিমা ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল।

আরো কয়েক দিন কেটে গিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক লোক আজকাল অজিতের সঙ্গে দেখা করতে আসে—কেউ বা বইএর পাণ্ডুলিপি নিয়ে, কেউ বা পাশের জন্য, কেউ মন্তব্য করতে, কেউ বা প্রশংসার ভাষা খুঁজে পায় না—কেউ বা চাঁট বসাতে চায় শুধু, কেউ টাকা ধার করে নিয়ে যায়—কেউ মদ মজলিসের জন্য কামনা করে আসে—কেউ বা দু'কথা শুনিয়েও যায়—মেয়েরাও মাঝে মাঝে আসে—

এক দিন অজিত ভোররাতে ঘুমোতে এসে রাজেনকে ডেকে বললে—দেখ রাজেন—আজ কাউকেই আসতে দিবি না—

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর!

—বলবি বাবুর শরীর ভালো নেই, বাবু ঘুমুচ্ছে—

—হুজুর

—বেলা আটটার সময় গোলমালে অজিতের ঘুম ভেঙে গেল—জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল রাজেন দাঁড়িয়ে আছে।

অজিত বললে—ভিতরে আয়।

রাজেন এসে বললে—অনেক ভিড় জমে গেছে বাবু—

—কিসের ভিড়?

—লোকজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়—

অজিত পাশ ফিরে শুয়ে বললে—বলা গিয়ে দেখা হবে না।

রাজেন বললে—আমি কোলাপসিবল গেটে তালা বন্ধ করে এসেছি বাবু।

অজিত বিছানায় এ পাশ ও পাশ একটু অস্বস্তির সঙ্গে নড়ে চড়ে উঠে বসল।

রাজেন দোতলার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

অজিত বললে—শোন—

রাজেন এসে বললে—বলুন—

—ক'জন লোক এসেছে?

—অনেক।

—কি চায়?

—যেমনি রোজ আসে—দেখা করতে চায় আর কি—

অজিত বললে—আচ্ছা বৈঠকখানায় নিয়ে বসাও—স্লিপ কার্ড যা হয় পাঠিয়ে দু'এক জন করে আসুক—

মিনিট পাঁচেক করে রাজেন এক রাশ স্লিপ এনে অজিতের টেবিলের ওপর রাখল।

অজিত বললে—মিশিয়ে ফেলেছিস দেখি সব—আচ্ছা যা।

একটা যে-কে-সে স্লিপ তুলে নিয়ে অজিত রাজেনকে বললে—নিয়ে যাও এটা—আসতে বল—

মিনিট খানেক পরে এক জন ছোকরা এসে হাজির।

অজিত বললে—বোস।

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে একটা কৌচের ওপর সে বসল।

—কি চাও তুমি?

—কিছু চাই না।

—তবে?

—আপনাকে দেখতে এসেছি।

—আমাকে দেখতে?

—হ্যাঁ

—স্টেজে কি দেখ না?

—দেখি

—তবে?

—একজন বড় লোক তাঁর প্রাইভেট লাইফে কেন?

—সেই তো আমার বাইরের জীবন—আমি তো প্যান্ডাল গিয়ে পোলিটিক্যাল লেকচার দেই না—

ছেলেটি বললে—স্টেজে আপনাকে তকমাপরা দেখি—আপনি পরের কথা আওড়ান—কিন্তু এখানে আপনার নিজের মুখের কথা শুনব—

—কতক্ষণ শুনবে?

—যতক্ষণ আপনি সময় দিতে পারেন—আচ্ছা মানুষের জীবনটা কি?

অজিত একটু হেসে বললে—তুমি কি বোঝ?

—আমার বোঝার কোনো মূল্য আছে?

—তুমি নিজে কি মনে কর?

—কোনো মূল্য নেই—

—কেন?

—আমার কোনো ক্ষমা নেই—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–তুমি কলেজে পড়?
–হ্যাঁ
–কোন ক্লাসে?
–এবার বি-এ পাস করেছি–
–তার পর?
–বাবা অ্যাটর্নি তিনি আর্টিকেলড্‌ হতে বলেন–
–আর তুমি? তুমি কি বল?
আমি দেখি টাকার অভাব আমাদের নেই–আমাদের তিন পুরুষ অ্যাটর্নিগিরি করে খেয়ে ছেলেপিলে রেখে মরে গেছেন–কিন্তু মরে যাবার পর কেউ তাদের নামও করে না–কেউ তাদের কথা বড় একটা বলে না ভাবে না–ওদিকে যত দিন বেঁচে থাকেন কি কঠোর পরিশ্রমই না এরা করেন। আমার মনে হয় এদের পথে যদি যাই অবস্থা আমারও তো এদের মতনই হবে–এত খাটাখুটি–এত ঝকমারি–এত নেশা–হয়তো টাকার, হয়তো নিছক এটর্নিপনার–যার জন্য জীবনের অন্য সমস্ত সাধ ও সম্পদ বিসর্জন দিতে হয়–শেষ পর্যন্ত এর কোনো মূল্য থাকে না কেন?
–থাকে বৈ কি?
- কি মূল্য?
–তা তাঁরা বুঝেছেন–
–আপনি যদি দয়া করে একটু বলে দেন–
–আমি?
–একটু দয়া করে যদি–
অজিত বললে–তুমি তো নিজেও বুঝেছ–বলেও ফেলেছ–বলেছ এত নেশা–হয়তো টাকার–হয়তো নিছক এটর্নিপনার-এই নেশার তৃপ্তিই তাঁদের প্রত্যেক জীবনকে তাঁদের প্রত্যেকের কাছে একটা মূল্য দিয়েছে–
–কিন্তু সে মূল্যকে আমি রাবিশ মনে করি।
–রাবিশ?
–একেবারে রাবিশ–
–কেন?
–লাখ লাখ টাকা তো একটা মুদীও রোজগার করতে পারে–এটর্নিপনায়ও. তা মানুষের অন্তরের কোন কামনা বা সাধনা বা সত্য তৃপ্ত হয়–
–তোমার হয় না?
–একেবারেই না অজিতবাবু–এ সব জিনিসকে আমি ঘৃণা করি–
–কি ভালোবাস তা হ'ল–
–সেইটেই আজো বুঝছি না–
–ফুটবল?
ছেলেটির মুখ অভিমানে ও ব্যথায় রক্তিম হয়ে উঠল–
অজিত বললে–পড়াশুনো?
–কলেজের ডিগ্রির জন্য পড়াশুনো নয়–এমনি বইটই নিয়ে অনেক সময় মন্দ কেটে যায় না–কিন্তু সব চেয়ে আশ্রয়ের জিনিস বইও নয়–
–নারীপ্রেম?
–হয়তো না–কিম্বা কোনো নারীকে ভালোবাসলেও শেষ পর্যন্ত তার ভিতর কোনো চরিতার্থতা নেই–
–তাই বল?
–একে একে অনেক মেয়েকেই তো ভালোবেসে দেখলাম।
–তারপর?
–তবে এই নিষ্ফলা বা টাকার চেয়ে সে ঢের ভাল–
–তবে এই কর না কেন? টাকার অভাব তো আমার নেই–এক পুরুষ এটর্নি না হলে কিছু এসে যাবে না–তোমার ছেলেকে না হয় এটর্নি করবে আবার–
ছেলেটি বললে–দেখুন নারীর সঙ্গে প্রেম নিয়ে জীবনটা কাটানো মন্দের ভাল। এর ভেতর ঢের মাধুর্য রয়েছে–তবুও বিচ্ছেদ ব্যথা ঈর্ষা একঘেয়েমিরও কি শেষ আছে? তারপর একটা ভালোবাসা যখন শেষ হয়ে যায় তখন মনে হয় কি কাদামাটি নিয়েই না ছিলাম–
এ ছাড়া অন্য কোনো কিছুই কি নেই যা নিয়ে বাবা ঠাকুদ্দার মত তৃপ্তও থাকতে পারি বটে–কিন্তু জীবনের একটা মূল্যবান কাজও করা হয়–
–এটর্নিগিরিকে একটু মূল্যবান মনে হয় না?
–একটুও না–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এত বড় জিনিসই যখন তোমার কাছে অসার হয়ে উঠল তখন আমি ছোট ছোট জিনিসের কথা বলতে পারি শুধু—

—যে কোনো এটর্নি বা রাউন্ডটেবল কনফারেন্স ম্যানের চেয়ে ঢের বড় মনে করি আপনাকে আমি। একজন ভাইসরায়ের কি দাম অজিতবাবু? একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টারেরই বা কি মূল্য? কিন্তু যে কবি—

অজিত থামিয়ে দিয়ে বললে—তোমার এই ভালোবাসাগুলো নিয়ে একটা উপন্যাস লেখ না—

—লিখতে আমি পারি না—

—চেষ্টা কর না—

—লেখা আমার আসে না।

—তবু কি করতে চাও তুমি—অ্যাক্ট?

—তাও আমি পারি না—

—তবে

—সেই জন্যই তো বলছি আপনাকে—আমার জীবন বড্ড নিষ্ফল—

—কিন্তু মেয়েরা তো তোমাকে ভালোবাসে?

—তা বাসে

—তবে প্রেম কর না গিয়ে—বাঃ—আমিও তো স্টেজে বাঁধা না পড়লে তাই করতাম—

—বাবা ঠাকুর্দার কাজের চেয়ে সে ঢের ভালো জিনিস হয়—

অজিত হাসতে হাসতে বললে—তবে আর কি?

—কিন্তু জীবনের কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় কি?

—কার কাছে কৈফিয়ৎ?

—ধরুন নিজের কাছেই—মনে হয় জীবনটাকে নিয়ে এ খেলা করছি শুধু—। এর আরো তো ঢের ব্যবহার ছিল। ভালো আমি আরো ঢের বেসেছি যে রোজ হাঁপিয়ে উঠি। ঠিক যাকে ভালোবাসতে চাই তাকেও কিছুতেই তো পাওয়া যায় না।

ছেলেটি বললে—এবার কাকে ঠিক ভালোবেসেছি জানেন?

—কাকে?

—মিস পূর্ণিমাকে।

অজিত একটা ধাক্কা সামলে বললে—ওঃ

—এখন কি করি বলুন তো?

অজিত কোনো উত্তর দিল না।

ছেলেটি বললে—তাকে কি করে পাওয়া যায়?

—পেতে চাও? দূরের থেকে ভালোবেসে ভালো লাগে না?

—না

—কেন?

—একটা ভালোবাসা হয় বটে—কিন্তু তাতে কোনো চরিতার্থতা নেই—অজিত-বাবু—

অজিত বললে—জীবনটাকে মূল্যবান করতে চেয়েছিলে?

—হ্যাঁ

—আমি বললাম, লেখ, কিম্বা স্টেজ-অ্যাক্টিং যদি পার—তাও কর—কিন্তু কিছুই যখন পার না তুমি তখন এই জিনিসটা কর—পূর্ণিমাকে ভালোবেসে অন্য কোনো রকম রস চরিতার্থতার কথা ভাবতে যেও না। সে একজন অভিনেত্রী—স্টেজে দাঁড়িয়ে মানুষের জীবনের অনেক নিহিত সৌন্দর্য ও সম্পদকে অনুভব করতে সে তোমাদের সাহায্য করে। তোমরা যদি অনুভব করতে পার তাহলে সে কৃতার্থ হয়। তেমন ভাবে অনুভব করতে পেরেছ—এবং সে অনুভবের মাধুর্য নিয়ে অনেক দুঃখ ও নিষ্ফলতার রাত একা একা মুগ্ধতায় কেটে যাবে তোমার এমন যদি বোধ কর তাহ'লে তোমার সমস্ত জীবনের এই সাধনাটুকুই পৃথিবীর কোনো অমূল্য জিনিসের চেয়েই কম মূল্যবান হবে না।

তোমার জীবন মূল্যবান হবে—

ছেলেটি মাথা পেতে সব শুনল—

তারপর চলে গেল—

অজিত বললে—রাজেন, বেলা তো ঢের বেড়ে গেল—তুমি ওদের একে একে সকলকে আসতে বল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~